দেশ

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন | সহকারী সম্পাদক : শ্রী[illegible]

চতুর্দশ বর্ষ] শনিবার, ১লা চৈত্র, ১৩৫৩ সাল। Saturday, 15th March, 1947. [১৯শ সংখ্যা

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত—

গত ২৪শে ফাল্গুন শনিবার কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি ভারতের রাজনীতিক পরিস্থিতি, বিশেষভাবে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখের ঘোষণা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। কমিটি ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ভারতবাসীদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং পূর্ব হইতে তজ্জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট যে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন সেজন্য সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। সেই সঙ্গে কমিটি এই দাবী করিয়াছেন যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের এই কার্য সুশৃঙ্খলতার সঙ্গে নির্বাহ করিতে হইলে অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টকে তৎপূর্বেই স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতাসম্পন্ন গভর্নমেণ্ট বলিয়া ঘোষণা করা উচিত। ভারতের সমগ্র শাসন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিবার ভার এই গভর্নমেণ্টের হাতে থাকিবে এবং বড়লাট ইহার নিয়মতান্ত্রিক নায়ক হইবেন। এতদ্ব্যতীত কমিটি দেশের নূতন পরিস্থিতি সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া মুসলিম লীগের প্রতিনিধিবর্গকে কংগ্রেস প্রতিনিধিদের সঙ্গে আপোষ-আলোচনার জন্য প্রবৃত্ত হইতে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তসমূহের গুরুত্ব সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু মুসলিম লীগ, কংগ্রেসের এই আমন্ত্রণে কতটা সাড়া দিবে, এ বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণরূপেই সন্দেহ রহিয়াছে। কারণ, দেখা যাইতেছে, ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখের ঘোষণার পর হইতে লীগ ভেদ এবং অনৈক্য সৃষ্টির পথই অধিক দৃঢ়তার সঙ্গে অবলম্বন করিয়াছে। তাহারা জুলুমবাজি জোরে চালাইয়া পাঞ্জাবের মিলিত মন্ত্রিমণ্ডল ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। তাহার ফলে পাঞ্জাবের সর্বত্র আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সীমান্ত প্রদেশেও লীগের উস্কানিতে অশান্তি ঘটিয়াছে এবং হাজারা জেলায় নর-নিধন-যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এদিকে আসামেও অরাজকতা ঘটাইবার জন্য আয়োজন চলিতেছে। বস্তুত ১৯৪৮ সালের জুন মাস আসিবার আগেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানের কাঠামো খাড়া করিবার উদ্দেশ্যে লীগের সর্বনাশকর প্রচেষ্টা বিশেষভাবে সুরু হইয়াছে। বলা বাহুল্য, লীগের এই অনিষ্টকর উদ্যম ব্যর্থ করিতে হইলে অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টের ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন। সময় বেশী নাই। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতবাসীদিগকে সত্যই স্বাধীনতা প্রদান করিতে চাহেন কিংবা ক্ষমতা হস্তান্তর করিবার অজুহাতে ভারতব্যাপী অরাজকতা সৃষ্টির পথে এদেশে নিজেদের সুবিধা করিয়া লইবার ফিকিরেই তাঁহারা এখনও আছেন অল্পদিনের মধ্যেই তাহা বোঝা যাইবে। বস্তুত সোজা এবং সরলভাবে চলিতে গেলে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ২০শে ফেব্রুয়ারীর ঘোষণা কার্যে পরিণত করিবার পক্ষে শুধু একমাত্র পথই আছে এবং অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টের হাতে সর্বতোময় কর্তৃত্ব প্রদান করাই সেই পথ। লর্ড ওয়াভেল প্রথমত সেই পথেই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে রক্ষণশীল দলের প্ররোচনায় পড়িয়া কিংবা নিজের দুর্বুদ্ধিবশত তিনি সে পথ পরিত্যাগ করেন এবং লীগ সদস্যদিগকে অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টে ঢুকাইয়া অন্তর্দ্বন্দ্বের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেন। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন বড়লাট হইয়া আসিয়া লর্ড ওয়াভেলের এই ভুল শোধরাইবেন কিনা আমরা এখনও বলিতে পারি না। যদি তিনি তাহা না করেন, তবে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ঘোষণা [illegible] কপটতাপূর্ণ বলিয়াই প্রমাণিত হইবে এবং বোঝা যাইবে, ভারতে অরাজকতা সৃষ্টি করাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন এদেশে আসিয়া যদি অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টকে শক্তিশালী করিতে চাহেন, তবে অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টের লীগ সদস্যদিগকে সংযত করা সর্বাগ্রে তাঁহার কর্তব্য হইবে এবং [illegible] নীতি পরিত্যাগে লীগকে বাধ্য করিতে হইবে। লীগ তাহাতে রাজী না হইলে, নতুবা লীগের সদস্যদিগকে অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্ট হইতে অপসারিত করা [illegible] মাউণ্টব্যাটেনের পক্ষে অন্য কোন পথ [illegible] না। বলা বাহুল্য, এই পথে [illegible] ভারতকে একটি কেন্দ্রীয় [illegible] নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালনার নীতিকেই [illegible] ভাবে মানিয়া লইতে হইবে। [illegible] এই নীতিতে চলিতে গেলে অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টের সদস্যগণ পদত্যাগ করিতে পারেন এবং সেক্ষেত্রে লীগের পরিচালনাধীন কয়েকটি প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে বেয়াড়া মনোভাব অবলম্বন করিবে, ইহাও সম্ভব; কিন্তু তদ্দ্বারা [illegible] অরাজকতা ঘটানো [illegible] হইবে [illegible] কারণ কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের সম্পূর্ণ প্রভাব-বিনির্মুক্ত অবস্থায় কোন প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের পক্ষেই শাসনকার্য পরিচালনা করা বর্তমান অবস্থায় সম্ভব নয়। সুতরাং দেশের লোকের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করিবার পক্ষে অগ্রসর হইবার পথ এই একটিমাত্রই রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনের বর্তমান ভিত্তি হইতেই ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে হইবে।

আমাদের সুদৃঢ় অভিমত এই যে, কেন্দ্রের এই ভিত্তিতে জনমতকে সংহত না করিয়া ভারতের জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করার কোনও অর্থই হয় না। পক্ষান্তরে তেমন যুক্তি ভারতবাসীর দেশ-শাসনে মগ্ন ক্ষমতা বিধ্বস্ত করিবার দুরভিসন্ধি লইয়া পশু-শক্তিকে উন্মুক্ত করিবার উদ্দেশ্য লইয়া নিয়ন্ত্রিত সাম্রাজ্যবাদী-সুলভ দুঃশাসন নীতির মূলীভূত আতঙ্কই সৃষ্টি করে।

লীগের উদ্ভট যুক্তি—

লীগ যে দাবী লইয়া চলিতেছে তাহা সকল দিক হইতে উৎকট এবং অকার্যকর। কিন্তু লীগ-নেতারা সে কথা স্বীকার করিবেন না। তাঁহারা পাকিস্থান না হইলে ছাড়িবেন না, এখনও এই এক কথাই শুনিতেছি। কিন্তু তাঁহাদের দাবী অনুযায়ী পাকিস্থান, বেচ্ছাচারিতার বলে এবং গুণ্ডামীর জোরে জনমত দাবাইয়াই শুধু প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। কংগ্রেস ইহাতে রাজী নহে এবং কংগ্রেসের ন্যায় জনগণের প্রতিনিধিত্বপূর্ণ কোন প্রতিষ্ঠান গায়ের জোরে কোন প্রদেশে বা প্রদেশের অংশ-বিশেষের উপর শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্যমে রাজী হইতেও পারে না। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সিদ্ধান্তে ইহা সুস্পষ্ট যে, তাঁহারাও ইহাতে রাজী নহেন। প্রকৃতপক্ষে জনমতের মর্যাদা এবং ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষিত নীতি সমভাবে মানিয়া মোসলেম লীগের দাবীর মূলীভূত পাকিস্থান যদি প্রতিষ্ঠা করিতেই হয় তবে পূর্ব পাকিস্থান কার্যত বাঙলা দেশের কতকটা মুসলমান-প্রধান অঞ্চলে এবং পশ্চিম পাকিস্থান পাঞ্জাব এবং সিন্ধুর কতকটা অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। সহজেই বোঝা যাইবে, সমগ্র ভারতের কেন্দ্রগত শাসনশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতীত লীগের তেমন পাকিস্থান চলিতে পারে না; এমনকি এইরূপ সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ অঞ্চলের মধ্যে ভেদবাদকে গায়ের জোরে আঁকড়াইয়া ধরিয়া লীগ যদি চলিতেই চায়, তবে শান্তি ও সঙ্গতিপূর্ণ শাসন যে সে অঞ্চলে অক্ষুণ্ণ থাকিবে না, ইহা সুস্পষ্ট। কংগ্রেস এই অবস্থা বুঝাইয়া দিয়া লীগকে পুনরায় আপোষ-নিষ্পত্তির জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছেন। লীগ যদি তাঁহাদের এই শেষ আমন্ত্রণও অগ্রাহ্য করে, তবে তাহার অনিবার্য ফল ইহাই দাঁড়াইবে যে, পাঞ্জাবের শিখেরা বলিবে আমরা পাকিস্থান চাহি না, আমরা কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের সঙ্গেই যুক্ত থাকিব, অপর হিন্দুপ্রধান পশ্চিমবঙ্গও সঙ্গতভাবেই এই দাবী উত্থাপন করিবে। আসাম তো এই স্পষ্ট ভাষাতেই পাকিস্থানের সম্পর্ক হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং কোন দিক হইতেই সভ্যনীতিসম্মতভাবে লীগের পাকিস্থানের দাবী সফল হইতে পারে না; বস্তুত লীগের দাবী মানিয়া লইতে গেলে হয় ভারতের পক্ষে বর্তমান বিজেতার অধীনতা একান্ত করিয়া লইতে হয়, নতুবা মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধ বর্বরতায় বিধ্বস্ত দেশে অপর কোন বিজেতার আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত করিতে হয়। বলা বাহুল্য, স্বাধীনতার অধিকার লাভে জাগ্রত ভারত এই দুইয়ের কোন অবস্থাই স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত নহে। দীর্ঘ সংগ্রামের পর সে আজ স্বাধীনতার তোরণদ্বারে উপনীত হইয়াছে এবং প্রয়োজন হইলে শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত দিয়া সে স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করিবে।

বিহারে মহাত্মা গান্ধী—

গান্ধীজী বিহার গমন করিতে কয়েকদিনের মধ্যেই সেখানকার আবহাওয়া বিদ্যুৎগতিতে পরিবর্তিত হইয়াছে। গান্ধীজীর মানবতাময় উদার আহ্বান মুসলমানদের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে এবং তাহাদের মনে নববলের সঞ্চার ঘটিয়াছে। গান্ধীজীর নোয়াখালী পরিভ্রমণের ফলেও যে হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে প্রীতির ভাব বর্ধিত হইয়াছে সম্প্রতি বাঙলার অন্যতম মন্ত্রী মিঃ সামসুদ্দীন আহম্মদ হায়দরাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সভায় একথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বস্তুত গান্ধীজীকে নোয়াখালী হইতে অপসারিত করিবার জিগীর তুলিয়া বাঙলার লীগের মধ্যে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলে যে সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছিল, আপাততঃ সে সংগ্রামে কতকটা ভাটা পড়িয়াছে। বর্তমানে নোয়াখালীর অশান্তি ও অরাজকতা সম্পর্কিত অভিযোগের তদন্তকার্যে প্রবৃত্ত পুলিশের ক্ষমতার সঙ্কোচ সাধনের জন্য, পুলিশ-উৎপীড়নের আর্তনাদ উত্থাপন এবং দাঙ্গা সম্পর্কে ধৃত গোলাম সারোয়ারের মুক্তির নিমিত্ত অশ্রু বিসর্জনের পরিমাণই হক সাহেব ও মিঃ সুরাবর্দী—এই দুই লীগ-নেতার প্রতিষ্ঠা-ক্ষেত্রের পরিমাপক হইয়া উঠিয়াছে। বলা বাহুল্য, বাঙলার লীগ নেতাদের এইরূপ সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট নীতির জন্যই গান্ধীজীর নোয়াখালি-পরিভ্রমণ তাঁহার বিহার-পরিভ্রমণের ন্যায় ফলদায়ক হইয়া উঠিতে পারে নাই এবং নোয়াখালী-ত্রিপুরায় গান্ধীজীর কর্মোদ্যম অদ্যাপি অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে। দেখা যায়, গান্ধীজীর আবেদন বিহারের উপদ্রুত অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মনে অনুতাপ সঞ্চারে যতটা প্রত্যক্ষভাবে কাজ করিয়াছে, নোয়াখালীর সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহা করে নাই। মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িকতান্ধ সঙ্কীর্ণ স্বার্থ-প্রভাবিত সুবিধামূলক প্রচারকার্যই ইহার মূলে রহিয়াছে। বস্তুত আমরা এই কথাই বলিব যে, দেশের বর্তমানের এই সাম্প্রতিক অশান্তির জন্য কি হিন্দু মুসলমান, জনসাধারণের দিক হইতে সম্প্রদায়ই এজন্য দায়ী নহে এবং মুসলিম আমাদের এই দুর্দশার জন্য একমাত্র সেদিন গান্ধীজী অন্তরের গভীর বে বলিয়াছেন, এদেশের হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের সূত্রে আবদ্ধ না হয় এবং দেশময় মারি কাটাকাটিই চলিতে থাকে, তবে প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ করাই শ্রেয় মনে করিবেন। গা অন্তরের বেদনা আমরা উপলব্ধি করিতে নোয়াখালী ও ত্রিপুরার উপদ্রব এবং অত্য সংবাদে সাময়িকভাবে বিহারের সংখ্য সম্প্রদায় ক্ষিপ্ত হইয়াছিল, গান্ধীজীর আকুলতাপূর্ণ আবেদনে সমগ্রভাবে সাড়া দেয়; সুতরাং গান্ বিহার ভ্রমণের সাফল্য সুনি পক্ষান্তরে নোয়াখালী ও ত্রি সমস্যার অদ্যাপি সম্পূর্ণভাবে সমাধান নাই। আজও সেখানে জনতা সাম্প্রদায়ি অন্ধ হইয়া দল বাঁধিতেছে। সেদিনও চা থানার এলাকাধীন একটি গ্রামে ত পুলিশকে বাধা দিয়াছে, ঘাটে স্টীমার ভি দেয় নাই। বলা বাহুল্য, এমন অবস্থায় স লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মনে অস্বস্তির বিদ্যমান না থাকিয়া পারে না। স পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার এই স্ব নিষ্ঠুর প্রতিবেশের মধ্যে মানবতাকে প্র করিবার জন্য সেখানে গান্ধীজীর অবস্থ প্রয়োজনীয়তা অদ্যাপি একান্তভাবেই রহিয় লীগ নেতারা কেহ কেহ সাম্প্রদায়িক প্র কথা বলিতেছেন বটে; কিন্তু মুখের কথ শুধু এই বঞ্চনা চলিতেছে, প্রকৃতপক্ষে তাঁ কাজের ধারা ভিন্ন দিকে যাইতেছে। স সাম্প্রদায়িকতা ছাড়িলে লীগওয়ালাদের স্ব বেসাতিই যে বন্ধ হইয়া সেদিন বাঙলার প্রধান মন্ত্রী সুরাবর্দী রাজসাহীতে গিয়া আমাদি এই তত্ত্বকথা শুনাইয়া কৃতার্থ করিয়াছেন বাঙলার উভয় সম্প্রদায়ের স্বার্থই তাঁহার সমান। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম হইতে অ করিয়া সাম্প্রদায়িক বিষ-সম্প্রসারণ-লীগের সকল পরিকল্পনাকে নির্লজ্জভাবে প্রশ্রয় দিতেছেন এবং বাঙ মধ্যযুগীয় বর্বরতার স্রোত প্রবাহিত কর্ পূর্ণোদ্যমে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহার এমন কথা বিদ্রূপের মতই শোনায় সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের বুকে সে বিদ্যুৎ ব মতই আঘাত করে। বাঙলার নির্যা মানবতা পুনরায় মহাত্মাজীর স্নেহময় স্প জন্যই একান্তভাবে অপেক্ষা করিতেছে।

পণ্ডিত জওহরলালের বিরুদ্ধে আক্রোশ—

মিঃ চার্চিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী দলের শীর্ষস্থানীয় পুরুষ। তিনি ভারতের স্বাধীনতার শত্রু; সুতরাং বিগত ৫ই মার্চ কমন্স সভায় ভারত সম্পর্কিত বিতর্কের কালে চার্চিল সাহেব পণ্ডিত জওহরলালের বিরুদ্ধে যে আক্রোশবুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে আমরা আদৌ বিস্মিত হই নাই; বরং মিঃ চার্চিলের মুখে পণ্ডিতজীর সম্বন্ধে অন্যরূপ কথা শুনিলেই আমরা আশ্চর্য বোধ করিতাম। বস্তুত ক্রোধের বশে মানুষের সত্য-মিথ্যা জ্ঞান থাকে না; বিশেষভাবে ব্রিটিশ রাজনীতিকদের পক্ষে সত্য-মিথ্যা বিবেক-সম্মত বিচারের বালাই কোন অবস্থাতেই কোনদিন নাই। চার্চিল সাহেব পণ্ডিতজীকে আক্রমণ করিয়া বলেন, "লর্ড ওয়াভেল পণ্ডিত নেহরুর হাতে শাসনভার ছাড়িয়া দিয়া ভারতে দুর্দৈব ডাকিয়া আনিয়াছেন। ইহার ফলে ভারতের শাসন বিভাগে চূড়ান্ত দুর্নীতি দেখা দেয়। সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ফলে ইতিমধ্যেই ত্রিশ হইতে চল্লিশ সহস্র লোক নিহত হইয়াছে। আপনারা ভারতকে স্বাধীনতা দিবেন বলিতেছেন; কিন্তু পণ্ডিত নেহরু পরিচালিত অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠার পর হইতে ভারতের নরনারীর স্বাধীনতা নানাদিক হইতে ব্যাহত হইতে বসিয়াছে। বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়ের নেতা পণ্ডিত নেহরুর উপর অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টের ভার এইভাবে ছাড়িয়া দেওয়াতে মারাত্মক ভুল ঘটিয়াছে। পণ্ডিত নেহরু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু"--ইত্যাদি। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িকতান্ধ নেতারা পণ্ডিত জওহরলালজীকে আক্রমণ করিয়া যেসব ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মন্ত্রগুরু চার্চিল সাহেবের মুখেও সেই সব কথাই শোনা গিয়াছে। কিন্তু মিথ্যার সাহায্যে সত্যকে স্থায়িভাবে বিকৃত করা সম্ভব হয় না। বস্তুত ভারতে যদি দুর্নীতির স্রোত প্রবাহিত হইয়া থাকে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তের ফলেই তাহা ঘটিয়াছে এবং তাহাদের করধৃত পুত্তলিকা-বৎ চালিত লীগ দলের মহিমাই সেক্ষেত্রে প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। নরঘাতী সাম্প্রদায়িকতার জন্য লীগই সাক্ষাৎ সম্পর্কে দায়ী। ভারতে সাম্প্রদায়িকতামূলক নীতির প্রবর্তনকর্তা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রদত্ত মন্ত্রের সাধনা করিয়া এবং তাঁহাদের প্ররোচনাসূত্রেই লীগ এই শক্তি পাইয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টে পণ্ডিত জওহরলালের অবলম্বিত নীতির গতি যদি লীগের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হইত, তবে ভারতের অবস্থার বর্তমান এই অবনতি ঘটিত না এবং সাম্প্রদায়িক যত দৌরাত্ম্য দুই দিনে ঠাণ্ডা হইয়া যাইত; কিন্তু ব্রিটিশ রাজনীতিকদের কূটনীতির খেলাই ইহাতে বাদ সাধিয়াছে। তাঁহাদেরই মন্ত্র-মহিমায় লীগের দলকে অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টে লইয়া ঢুকানো হয়। তাঁহারা অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টে প্রবেশ করিয়া লীগের ভেদ-বিদ্বেষের নীতিকেই সর্বত্র প্ররোচিত করা নিজেদের মুখ্য কর্তব্যরূপে গ্রহণ করেন। বস্তুত লীগ সদস্যদিগকে এই-ভাবে প্রশ্রয় না দিলে চার্চিল সাহেবের এবম্বিধ বীরত্ব প্রকাশের সুযোগই ঘটিত না। পণ্ডিত জওহরলাল ব্রিটিশের সাম্রাজ্য সম্পর্কের চিরন্তন শত্রু বলিয়া চার্চিল আক্রোশ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা এ অভিযোগ সম্পূর্ণরূপেই স্বীকার করি। স্বার্থ সম্পর্কের ক্ষেত্রে জগতে স্বাধীনতাকামী কোন পুরুষই এ পর্যন্ত ব্রিটিশের কাছে বন্ধু বলিয়া বিবেচিত হন নাই। সুতরাং জওহরলাল যে তাঁহাদের শত্রু হইবেন, ইহাতে আশ্চর্য কি? পণ্ডিতজী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বহুবার কারাবরণ করিয়াছেন, মিঃ চার্চিলের কাছে ইহা চূড়ান্ত অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। যিনি নিজের দেশের স্বাধীনতা কামনা করেন, ইংরেজের কাছে তাঁহার অপরাধের তুলনা নাই, ঐতিহাসিক এই সত্য আমাদের অবিদিত নহে। কিন্তু আমরা ইহাও জানি যে, শেষ পর্যন্ত দায়ে পড়িয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী-দিগকেও দেশপ্রেমের অপরাধে যাঁহারা অপরাধী, তাঁহাদের কাছেই মাথা নত করিতে হইয়াছে। চার্চিল সাহেব যতই তর্জন-গর্জন করুন, আর মুসলিম লীগের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া কংগ্রেস নেতাদিগের বিরুদ্ধে যেমন খুশী কঠোর ভাষা প্রয়োগ করুন, ভারতের ক্ষেত্রেও এই সব সত্যের ব্যতিক্রম ঘটিবে না। স্বাধীনতা-সংগ্রামে নির্যাতিত, নিপীড়িত আত্মোৎসর্গকারী ভারতের বীরব্রত সন্তানদের হাতেই শাসন-ক্ষমতা অর্পণ করিয়া তাঁহাদিগকে অবিলম্বে ভারত ছাড়িতে হইবে।

বাঙলার তৈল-সমস্যা

বাঙলার অন্ন-সমস্যা উত্তরোত্তর জটিল আকারই ধারণ করিতেছে। মফঃস্বলে চাউলের দর ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। তেলের সমস্যা আরও জটিল। সম্প্রতি ভারত গভর্নমেণ্ট তৈল ও তৈলবীজের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ-বিধি প্রত্যাহার করিয়াছেন। বাঙলা গভর্নমেণ্টও উক্ত নীতির অনুসরণ করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে, অতঃপর ব্যবসায়ীরা ইচ্ছামত তৈল ও তৈলবীজ আমদানী ও বিক্রয় করিতে পারিবেন। কিন্তু তদ্দ্বারা বাঙলার তেলের সমস্যা মিটিবে, এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই। বাহির হইতে তেল এবং সরিষা আমদানীর পথ এই ব্যবস্থার খোলা থাকিল বটে, কিন্তু কৃত্রিমভাবে তেলের বাজারের দর চড়া রাখিবার ঘোঁট পাকাইবার সুবিধা নষ্ট হইল না। বলা বাহুল্য, তেল এবং সরিষার সম্পর্কে বাঙলা ঘাটতি প্রদেশ। ভিন্ন প্রদেশ হইতে তেল বা সরিষা আমদানী না হইলে বাঙলার বিপুল অভাব পূরণ হয় না। সুতরাং বাঙলার তেলের অভাব পূরণ করিতে হইলে ভিন্ন প্রদেশ হইতে যাহাতে বাঙলায় তেল ও সরিষার স্বচ্ছন্দ আমদানী হইতে পারে, সরকারের সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। ইহা ছাড়া লাভখোরদের দুর্নীতি দমন করা বিশেষভাবে প্রয়োজন।

বিপ্লবীর প্রত্যাবর্তন

৩৯ বৎসরকাল নির্বাসিত জীবন যাপন করিয়া ভারতের অন্যতম বিপ্লবী নেতা সর্দার অজিত সিং গত ৮ই মার্চ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। সর্দারজী লালা লজপত রায়ের সঙ্গে নির্বাসিত হইয়াছিলেন। সুরাটের কংগ্রেসে চরমপন্থী দল মডারেটদের সম্পর্ক বর্জন করিয়া বাহির হইয়া আসেন এবং সে দলের বাঙলা, পাঞ্জাব এবং মহারাষ্ট্রের নেতৃবর্গ মিলিত হইয়া স্বতন্ত্রভাবে কর্মপন্থা অবলম্বনে সিদ্ধান্ত করেন। সর্দার অজিত সিংজী এই সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট নেতৃবর্গের অন্যতম ছিলেন। ইহার পর তাঁহার সুদীর্ঘ নির্বাসিত জীবন আরম্ভ হয়। তাঁহার এই নির্বাসিত জীবন বৈচিত্র্যময়। তিনি তুরস্ক, ব্রেজিল, ইটালী, স্পেন, পর্তুগাল, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে বহু বৎসর অতিবাহিত করেন। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার আদর্শ সর্বত্র তাঁহার লক্ষ্যপথে ছিল। বিগত মহাসমরের সময় সর্দারজী ইটালীতে ছিলেন। জার্মানীর পরাজয়ের পর তিনি মিত্রপক্ষের হস্তে বন্দী হন। অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টের বিশেষ চেষ্টায় গত ১৮ই ডিসেম্বর তিনি জার্মান বন্দীশালা হইতে মুক্তিলাভ করেন। তাঁহার স্বাস্থ্য অত্যন্ত ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছে, এজন্য মুক্তির পর তাঁহাকে কিছুকাল লণ্ডনে বিশ্রাম গ্রহণ করিতে হয়। ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া সর্দারজী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠাকল্পে আত্মনিয়োগ করিবেন, এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। সর্দারজীর সমগ্র পরিবার ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন। পাঞ্জাব ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত সর্দার ভগত সিং তাঁহারই ভ্রাতুষ্পুত্র। আমরা [illegible] এই বহু-নির্যাতিত বিপ্লবী বীরকে আমাদের শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি।

দুমকার দৃশ্য

বসন্তে

শিল্পী—শ্রীগোপাল ঘোষ

সকলেই জানেন, জলের কোন নিজস্ব রঙ্ নাই—যে পাত্রে রাখা যায়, সেই পাত্রের রঙই জলে প্রতিবিম্বিত হয়। ফজলুল হক সাহেবও যে একবারে জলের মত মানুষ (আপত্তি থাকিলে পানির মত পাঠ করিবেন) সে প্রমাণ আবার পাওয়া গেল। গান্ধী-পোকার

ছাগল বহনের মিশন লইয়া গান্ধী-পোকা সন্দর্শন করিয়াই তিনি হিন্দু-মুসলমানের মিলনের মিশন নাকি গ্রহণ করিয়াছেন। —ছাগী বহনের মহান ব্রতের পর হিন্দু-মুসলমানের মৈত্রী প্রচেষ্টা—What a fall my Countrymen.

* * * * *

বৃটিশ ভারত ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেই সিন্ধুতে এক সার্বভৌম স্বাধীন মুসলমান রাজ্য স্থাপিত হইবে। —সংবাদটি পাওয়া গিয়াছে করচী হইতে। (কম্পোজিটার এবং প্রুফরীডার যেন ইহাকে 'রাঁচী'র সংবাদ বলিয়া না ছাপেন!)

* * * * *

একটি সংবাদে শুনিলাম, ভারতের ভাবী বড়লাট নাকি খুব আমুদে লোক। খুড়ো বলিলেন—" ভারত ত্যাগের কথাটা কি তবে হাসি-পরিহাসের মধ্যেই চাপা পড়িয়া যাইবে?"

* * * * *

কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট সম্বন্ধে খুড়োর মতামত জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন—"শুনিতেছি, এই বজেট নাকি Common manদের সুখ-সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই তৈরী করা হইয়াছে—তোমার-আমার মত un-Commonদের তাহাতে কী-বা যাইবে আসিবে!"

* * * * *

মিঃ সুরাবর্দী নাকি গান্ধীজীকে জানাইয়াছেন যে, বিহার হইতে বাঙলায় আগত আশ্রিতদের সংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ। -গুরুদেবের কবিতাটা গান্ধীজীর মনে পড়িয়াছে কিনা জানি না, খুড়োর কিন্তু মনে পড়িল। তিনি চট্ করিয়া কবিতাটায় নিজস্ব ঢঙ জুড়িয়া আওড়াইয়া গেলেন—

"দিবে আর নিবে, মিলিবে মিলাবে যাবে না ফিরে
এই বাঙলার কামধেনুদের গঙ্গাতীরে!"

* * * * *

সিন্ধুর কোন এক ব্যক্তি এক স্ত্রী বর্তমান থাকিতে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার কন্যাও দুই স্বামীকে একসঙ্গে বিবাহ করিবার দাবী জানাইয়াছেন। যেমন বাপ, তেমনি বেটা কথাটাই এতদিন প্রবাদ হইয়া গিয়াছিল, যুগান্তরে বেটারও লিঙ্গান্তরের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে!

* * * * *

জনৈক লীগ-সদস্য পাগড়ীর বদলে 'জিন্না ক্যাপ' ব্যবহারের জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। "ফেল্ট্ হ্যাট, না সোলা-টুপি

কোন্টা সকলে ব্যবহার করিবে, এ কথাটা পরিষ্কার করিয়া বলা উচিত ছিল"—বলেন খুড়ো!

* * * * *

হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির জনৈক কর্তা পুরুষদের জন্য হাইহিল-সু ব্যবহারের সুপারিশ করিয়াছেন। আমাদের কোন বিশ্ব-বিদ্যালয় পুরুষদের শাড়ি পরার নির্দেশ দিলে আর কিছু না হউক অন্তত বাসে (হায় ট্রাম!) ওঠানামার সুবিধা হইত।

* * * * *

একটি সংবাদে দেখিলাম—দক্ষিণার হার বৃদ্ধির জন্য পুরোহিতরা নাকি একটি Brahmin Trade Union গঠন করিয়াছেন। কিন্তু সেই যজমান কি আর আছে? গুরু-

দক্ষিণাস্বরূপ একলব্য একদিন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কাটিয়া দিয়াছিলেন—আজকালের একলব্যেরা হয়ত শুধু বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি দেখাইয়াই ক্ষান্ত হইবেন!

* * * * *

সুইডেনে বাড়ির গৃহিণীরা নাকি সরকারী খরচায় বছরে একবার দশ দিনের জন্য annual leave পাইয়া থাকেন। খুড়ো বলিলেন—খরচাটা সরকারী হইলে, দশ দিন কেন বছরে দশ মাস annual leave grant করিতেও রাজি আছি। কিন্তু সেই সরকারও নাই, সেই গিন্নীও নাই!

* * * * *

চলতি সপ্তাহে একটি বৃহৎ ছাগলাদ্য সংবাদ সংগ্রহ করা গেল—শুনিলাম, সুরাটের একটি পাঠা নাকি দুগ্ধদান করিতেছে। বিশু খুড়ো সংবাদটায় খুব উৎসাহ বোধ করিলেন না, বলিলেন—সব পাঠাই যদি ছাগী বনিয়া যায়, তাহা হইলে মা-কালী এবং সেই সঙ্গে তাঁর প্রসাদেচ্ছু অগণিত মাতৃ-ভক্তদের কি দুর্দশা হইবে, তা ভাবিতেও গায়ে জ্বর আসিয়া যায়।

* * * * *

MARRIAGE Guidance Council-এর সেক্রেটারী মিঃ রেজিনাল্ড পেস্টেল নাকি বলিয়াছেন—

In Queen Victoria's time husband was a woman's managing director—today this feeling persists.

খুড়ো বলিলেন—কাউন্সিলের Guidance নিয়া বিবাহের ঐত গলদ. মিঃ পেস্টেল বোধ হয় জানেন না যে, বিনা Guidance-এ বিবাহের স্বামীরা স্ত্রীদের Managing Director নয়, তাদের Office-Bearer মাত্র!"

পাঞ্জাবে পাকিস্থান-বিরোধী বিক্ষোভ

পাঞ্জাবে প্রস্তাবিত সংখ্যাগরিষ্ঠের সাম্প্রদায়িক শাসনের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের বিক্ষোভ প্রদর্শনের প্রথম দিবসে পুলিশ জনতার উপর সাতবার গুলীবর্ষণ ও বহুবার লাঠি চালনা করে। উপরের ছবিতে শ্রীযুত ভীমসেন সাচারকে পরিষদ গৃহের সম্মুখে এক জনতার সমক্ষে বক্তৃতা করিতে দেখা যাইতেছে।

পাঞ্জাবে প্রস্তাবিত লীগ মন্ত্রিসভা গঠনের প্রতিবাদে লাহোরে ছাত্রগণের বিক্ষোভ প্রদর্শন। পুলিশ উহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য লাঠি-চালনা ও গুলী বর্ষণ করে।

অমলের বাবা

শ্রীকনাদ গুপ্ত

অমলের বাবা অমন কর্তব্যপরায়ণ এবং কৃতী গৃহী হওয়া সত্ত্বেও অমলরা কেউই কেন মানুষের মত হতে পারল না, এ রহস্য আমি বহুদিন অবধি আবিষ্কার করতে পারিনি।

স্কুল-বয়সে অমলের সঙ্গে আলাপ হবার পর ওদের বাড়ি গিয়ে ওর বাবাকে যেদিন প্রথম দেখি, সেদিন থেকেই ও'র ব্যক্তিত্বের একটা সুদৃঢ় ছাপ আমার মনের মধ্যে আঁকা হয়ে গিয়েছিল। হোমিওপ্যাথিতে তখন ও'র বেশ একটু পসার জমেছে। চেম্বারে প্রায়সই লোক ধরে না। কিন্তু সচরাচর রোগী বহুল চিকিৎসালয়ে যে গুঞ্জন ও ব্যস্ততার আবহাওয়া দেখা যায়, শ্যামসুন্দরবাবুর চেম্বারে তার একান্ত অভাব ছিল। একেবারে আগন্তুকের পক্ষে তাঁর চেম্বারে প্রথম প্রবেশ করলে এ কথা মনে হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না যে, হয় এ মন্দির, নয় গোরস্থান। রোগীদের মধ্যে প্রগলভ মানুষের অভাব নিশ্চয়ই ছিল না। কিন্তু সেই গৌরবর্ণ, শীর্ণকায়, নাতিদীর্ঘ মানুষটির দেহ-রেখার ফাঁকে ফাঁকে নীরবতার এমন একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ বানানো ছিল যে, সহসা তাঁর সামনে পড়লে অতি বড় বাচাল লোককেও মুহূর্তের মধ্যে তপস্বী ঋষির মত মৌনী হয়ে যেতে হত।

জটিল লক্ষণ তত্ত্বের জন্য হোমিওপ্যাথির যে বাজার-ভরা দুর্ণাম আছে, শ্যামসুন্দরবাবুকে কোনদিন তা নিয়ে মাথা ঘামাতে দেখিনি। রোগীর রোগ ডান পাশ চেপে আসে কি বাঁ পাশ চেপে, তার দরদ ঝন্ ঝন্ ধরণের কি কট্ কট্ ধরণের রোগীর প্রতি এ সকল অত্যন্ত বিরক্তিকর এবং দুশ্চিন্তাজনক প্রশ্ন তাঁকে কোনদিন করতে শুনিনি। রোগের সংক্ষিপ্ত পূর্বাভাষ পাওয়ামাত্রই তাঁর ধূসর ভ্রূ-দুটি সন্ধি স্থলে পূর্ণচ্ছেদের মত একটি রেখা সৃষ্টি করে পরস্পরের অত্যন্ত কাছাকাছি এসে পড়ত। চোখ দুটি ক্ষণকালের জন্য ঈষৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠত। তারপর কণ্ঠ থেকে অতিশয় গম্ভীর একটি ধ্বনি নির্গত করে বলতেন, হুঁ। পরিচিত রোগীর কাছে শ্যামসুন্দরবাবুর এই হুঁ সিগন্যাল স্বরূপ, যত বড় চপলই হোক, তার বাক প্রবাহ এখানে থামতেই হত। কিন্তু নূতন রোগী এই সিগন্যালের মর্ম গ্রহণ করতে সক্ষম হত না। আপন স্মৃতি সিন্ধু মন্থন করে সে হয়তো তার রুচি অরুচি, খেয়াল, ভালবাসা, সুবিধা অসুবিধার অতি বৃহৎ বিস্তৃত তালিকা থালাভরে সাজিয়ে তার চিকিৎসকের সামনে উপস্থিত করতে উদ্যত হত। তখন আসত শ্যামসুন্দরবাবুর দ্বিতীয় সিগন্যাল। তাঁর ভ্রূ-যুগ আরও সন্নিকটবর্তী হত, পূর্ণচ্ছেদ আরও গভীর হত এবং কণ্ঠস্বর আরও গম্ভীরতর হয়ে বলে উঠত, থাক, বুঝেছি। মানুষের গুণাগুণের মধ্যে গাম্ভীর্য বস্তুটা এমনিই কিছু বেয়াড়া, তার পর শ্যামসুন্দরবাবুর গাম্ভীর্য ছিল বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনির মত, যত জাগায় শ্রদ্ধা, তত জাগায় ভয়। চপলতম মানুষকেও তখন এর কাছে মাথা নোয়াতে হত।

তারপর রোগের একেবারে মূল ধরে নাড়া দিয়ে তিনি দুটি কি একটি প্রশ্ন করতেন। জবাব পাওয়ার পর অল্পক্ষণ চিন্তা করে যে ওষুধ ব্যবস্থা করতেন, তা সেবনের পর সচরাচর কোন রোগীকে আর চিকিৎসক পরিবর্তন করতে হত না।

শুধু চিকিৎসক হিসাবে নয়, অতিশয় সজ্জন প্রতিবেশী বলে পল্লীতে তাঁর যে সুনাম ছিল তারও কোনদিন ব্যত্যয় হতে দেখিনি। আদর্শবাদী পরহিতৈষীর মত হাত বাড়িয়ে তিনি লোকের উপকার করতে যেতেন না বটে, কিন্তু রৌদ্রতপ্ত দ্বিপ্রহরের নিঃসঙ্গ বটবৃক্ষের মত তিনি আপনার চারিদিকে একটি সুস্নিগ্ধ ছায়া বিস্তার করে থাকতেন। যে আপনা থেকে সেই ছায়াতলে আসত, সে তৃপ্তি পেত। যে আসত না, সে ছায়া পেল না বলে কোনদিন বৃক্ষকে দোষ দিত না।

কিন্তু এমন যিনি মানুষ, তাঁর সম্বন্ধে তাঁর নিজের ছেলেদের মুখে কোনদিন সপ্রশংস উক্তি শুনিনি। অথচ অমল নির্বোধও নয়, অকৃতজ্ঞও নয়।

কিছুদিন পূর্বে শ্যামসুন্দরবাবু লোকান্তরিত হয়েছেন। সংবাদপত্রে শোক-সংবাদের স্তম্ভে এ খবর দু' এক ছত্রে বের হলেও স্বজন, প্রতিবেশী, এমন কি, দূর প্রতিবেশীর নিকটও এ শোক ব্যক্তিগত বিয়োগ-ব্যথার মত বেজেছে। কিন্তু অমলকে অভিভূত হওয়া দূরের কথা, মুখে কোনদিন শোক প্রকাশ করতেও আমি শুনিনি।

যে কোন সময় অমলকে সোজাসুজি প্রশ্ন করে আমি তার এই বিসদৃশ মনোভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করতে পারতাম। কিন্তু আমার এই কখনও প্রগলভ কখনও বা অতিশয় গম্ভীর বন্ধুটির ব্যক্তিত্বের মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এমন একটি স্বাতন্ত্র্যের পরিবেশ ছিল যে, কোনও আবেগজনক বিষয় নিয়ে সহসা তার সঙ্গে আলোচনায় নামতে ভয় হত। কিন্তু একদিন যোগাযোগ ঘটে গেল।

সেদিন সন্ধ্যায় আমরা দু'জন ময়দানে পায়চারী করছি। কি একটা সাময়িক রাজ-নৈতিক বিষয় নিয়ে কিছু বিতর্কের পর উভয়ে সহসা নির্বাক হয়ে গেছি। অমলের পরণে ছিল সাদা ধুতি-পাঞ্জাবী আর একটি চাদর, এলোমেলো হাওয়ায় তার প্রান্তটা মাঝে মাঝে দুলছে। আকাশ ছেয়ে সন্ধ্যার আঁধার যতই ঘন হচ্ছে, অমলের দেহের ওপর ততই যেন পুঞ্জ পুঞ্জ বিষন্নতার স্তর নেমে আসছে।

মনের মধ্যে অমলের প্রতি করুণামিশ্রিত একটা দুর্জয় প্রীতির আবেগ অনুভব করলাম। বললাম, হঠাৎ চুপ করলে অমল?

অমল বললে, বাবার কথা মনে পড়ছে। লোক চলাচল কমে গেছে, যতদূর চাই মস্ত ময়দানটা ধু ধু করছে, এমনি নিঃসঙ্গ আর বিশাল কিছু দেখলেই আমার বাবার কথা মনে পড়ে।

বললাম, তোমার বাবার সম্বন্ধে এমন শ্রদ্ধার কথা তোমার মুখ থেকে তো আগে শুনিনি।

অমল বললে, অশ্রদ্ধা তো করি না। তবে বাবার কাছে আমরা যেভাবে মানুষ হয়েছি, তাতে তাঁকে ভালবাসা বা ভক্তি করা সম্ভব নয়। হিমালয়ের মত একটি বিশাল কাণ্ড দেখলে জড় বস্তু হলেও মানুষ তার কাছে শ্রদ্ধায় মাথা নোয়ায়। কিন্তু তাই বলে ওই পাথরের স্তূপকে কেউ ভক্তি করে না ভালবাসে?

বললাম, পাথরের স্তূপের উপমাটা একটু বাড়াবাড়ি নয়?

অমল ঈষৎ হাসল, বললে, বাড়াবাড়ি কি না, তা বাবাকে শুধু বাইরে থেকে দেখলে বোঝা যায় না। বেশ, এস এই ঘাসের ওপর একটু বসি। আজ বাবার কথাই আলোচনা করি।

আমার হাতে সেদিনের একটি খবরের কাগজ ছিল, ঘাসের ওপর তার শিট দুটিকে পেতে আয়েস করে বসার পর অমল বলতে শুরু করল ঃ—

"বাবার কথা কী বলব! অনেক নাটকীয় ঘটনার মধ্য দিয়ে যাদের জীবনের পরিণতি হয়, তাদের বোঝা সহজ। বাবা তেমন ছিলেন না। বাবা ছিলেন থান কাপড়ের মত শুভ্র আর সাদাসিধে। বাইরে থেকে দেখতে তার একটা মাধুর্য আছে, কিন্তু ভিতরটা বড় রুক্ষ।

শুনেছি, খুব ছেলে বয়স থেকেই বাবা অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং এক রোখা ছিলেন। ঠাকুরদা ছিলেন খুব গরীব। স্কুলে পণ্ডিতি করতেন। পড়ার মাইনে লাগত না, কিন্তু বই পত্র, এমন কি, পরণের জামা কাপড়ও অনেক সময় জুটত না। তবু বাবা পরীক্ষার পর বরাবরই কিছু না কিছু পুরস্কার পেতেন।

ঠাকুরদা খামখেয়ালী আর অযোগ্য মানুষ হলেও ঠাকুরমা ভারী হিসাবী এবং কড়া প্রকৃতির স্ত্রীলোক ছিলেন। বাবা অনেকটা তাঁরই স্বভাব পান। তেল খরচ এড়াবার জন্য ঠাকুরমার নিয়ম ছিল, দু' ঘণ্টার বেশী কোন কারণেই হ্যারিকেন জ্বালা হবে না। স্কুলের এক শিক্ষক ছেলেদের নোট বই লিখত। বাবার হাতের লেখা ভাল ছিল বলে তাঁকে দিয়ে নকল করাতেন। পারিশ্রমিক ছিল প্রতিদিন দুই পয়সা। সেই পয়সা দিয়ে বাতি কিনে বাবা অনেক রাত্রি অবধি পড়াশোনা করতেন।

বৃত্তি নিয়ে দুটো পাস করবার পর যখন বি, এ পড়ছেন, ঠাকুরমা বায়না ধরলেন বিয়ে দেবার। বাবা এড়িয়ে গেলেন বললেন, এখন না, আগে পড়া শেষ করি।

বি. এ পাশ করা অবধি ঠাকুরমা ধৈর্য ধরে রইলেন। কিন্তু তারপর বাবা আবার যখন আইন পড়বার জন্য কলেজে ভর্তি হয়ে কলকাতায় এসে থাকবার বাবস্থা করলেন, তখন ঠাকুরমা বেঁকে বসলেন। সাধারণ থেকে ঈষৎ ভিন্ন প্রকৃতির হলেও ঠাকুরমা সেকালের মেয়ে, তায় পণ্ডিতের স্ত্রী। লেখাপড়ার ব্যাপারে বি. এ পাশের পর গরীব ঘরের ছেলের আরও উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকাটা তাঁর কাছে বাড়াবাড়ি মনে হল। একেবারে মেয়ে দেখে সম্বন্ধ ঠিক করে ফেললেন। কন্যা পক্ষ অনেক দেবে থোবে। শেষে বাবার কাছে যখন কথা পাড়লেন, অনেক পীড়াপীড়ির জবাবে বাবা শুধু বললেন, আর তিন বছর অপেক্ষা কর। বলে কলকাতায় চলে এলেন।

ইংরাজীতে একটা কথা আছে Single-track mind বা একমুখী মন। বাবার মনও ছিল এই ধরণের। কিন্তু এমন মনের বিপদ হল এই যে, এর মধ্য দিয়ে একটিবার কোন বস্তু অন্তরে প্রবেশ করলে অবস্থার হাজার পরিবর্তনেও এ আর তাকে ওগরাতে চায় না। সেকালে মধ্যবিত্ত ঘরের যুবকদের প্রতিষ্ঠা লাভের শ্রেষ্ঠ পন্থা ছিল ওকালতি। বাবা মনে মনে আদর্শ ঠিক করে রেখেছিলেন একেবারে স্যার রাসবিহারী ঘোষকে। প্রথম যৌবনে অন্তরের ক্ষেতে এই উচ্চাকাঙ্ক্ষার বীজ আপনিই রোপণ করেছিলেন, জল দিয়ে তাপ দিয়ে তাকে আপনিই বাড়িয়েছিলেন এবং ক্রমে ক্রমে নীরব একনিষ্ঠ সাধনায় তাকে মহীরুহে পরিণত করেছিলেন। বাকী ছিল শুধু ফললাভ। বাধা না এলে হয়তো একদিন তাও ঘটতো।

কিন্তু বাধা এল। কলকাতায় মাস দুই থেকে পড়াশোনার পর একদিন বাড়ি থেকে ঠাকুরদার চিঠি এল, তোমার মা অত্যন্ত অসুস্থ। তুমি যাওয়ার পর থেকে খাওয়া দাওয়া একরকম ত্যাগ করেছেন, কথাও বলছেন না। কারণ কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি এলে হয়তো কিছু বিহিত হতে পারে।

বলা বাহুল্য, বাবা ছুটে গেলেন। দেখলেন, তাই বটে, ঠাকুরমা এমনিতেই রোগা, তায় অনশনে শীর্ণ হয়ে একেবারে মুমূর্ষুর মত হয়ে পড়েছেন। এখনকার চেয়ে সেকালে মাতৃ-ভক্তির আঁট ছিল অনেক বেশী। বাবা একেবারে অকুল হয়ে পড়লেন। বললেন, কি হয়েছে বল। তুমি এমন করলে কেন?

ঠাকুরমা অনেকক্ষণ অবধি কোন জবাব দিলেন না। শেষে বাবা যখন বললেন, তুমি কথা না বললে আমিও খাব না, দাব না, এইখানে বসে থাকব, তখন মুখ খুললেন। বললেন, আমাকে যেতে দাও। সংসারে আমার দরকার ফুরিয়েছে। তুমি বড় হয়েছ, নিজের ভালমন্দ বুঝতে শিখেছ, এখন আমি থাকলে আগের মত তোমার ওপর আমার ইচ্ছা চাপাতে যাব। তাতে তোমার উন্নতির বাধা হবে, তেমনভাবে আমি বেঁচে থাকতে চাইনে।

বাবা বুঝলেন, ব্যথা কোথায় বেজেছে। হৃদয় ভেঙে পড়ল বড় উকীল হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ভুলে যেতে। তবু কলেজে আর ফিরে গেলেন না। মাসখানেকের মধ্যে ঠাকুরমার নির্বাচিতা কন্যাকে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে এলেন। তারপর ঠাকুরমা বহুদিন বেঁচেছিলেন।

কিছুদিন পরে বাবা ফিরে এলেন কলকাতায় — আইন পড়তে নয়, চাকরী করতে। পোস্ট অফিসে কেরাণী হলেন। ঠাকুরমা অবশ্য বলেছিলেন, বিয়ে করেছ বলেই পড়াশোনা বন্ধ করার দরকার নেই। কিন্তু বাবা আর সেদিকে ফেরেননি। ভর্তা হয়ে স্ত্রীর ভরণের ভার নিজে গ্রহণ না করাকে তিনি মনুষ্যোচিত বলে মনে করেননি।

যে মেল গাড়ী নির্ধারিত লাইন বাঁধা পথে অতি দ্রুতগতিতে চলে, মাঝে মাঝে উঠানো সিগনাল দেখলে সে কিছুকাল থেমে দাঁড়ায় বটে, কিন্তু সিগনাল নেমে গেলে আবার ঠিক পূর্বের মত পূর্ণোদ্যমেই যাত্রা শুরু করে। বাবারও তাই হল। একটা ছকে নেওয়া জীবন-ধারার গতি পথে সহসা উপল দেখা দিলেও বাবা নিরাশ হলেন না। দিক পরিবর্তন হল, কিন্তু বেগ কমলো না। কেরাণীগিরির উচ্চতম শিখরে উঠবার জন্য প্রাণপণে লাগলেন। লক্ষ্মীর ভাঙা দেউলে উদয়াস্ত পরিশ্রমের ফুল দিয়ে সাজি সাজিয়ে দিনের পর দিন পুজো দিতে লাগলেন।

সত্যি, অফিসে বাবা কি পরিশ্রমই না করতেন। সাহেবরা চলে যেত, কেরাণীরা বিদায় নিত, চাপরাশি পালাবার জন্য ছটফট করত, শুধু বাবা একা নিজের কাজ সেরে আয়েসী উপরওয়ালাদের কাজের ভার যেচে নিয়ে তাও শেষ করে তবে বাড়ি ফিরতেন। রাত্রি হয়তো ন'টা হয়তো বা দশটাও বেজে যেত।

ক্রমে ক্রমে সাধনার ফল ফলতে লাগল। আঠারো বছর চাকরীর পর মাইনে চল্লিশ থেকে চারশোয় দাঁড়াল। নড়বড়ে জীর্ণ সংসারটা ঈষৎ শ্রীমণ্ডিত হল।

কিন্তু এ অবস্থা স্থায়ী হল না। মেল-গাড়ীর লাইন-বাঁধা পথে আবার এল বাধা। গতি থামাতে হল, দিক বদলাতে হল।

তখন সংসারে এসে গেছি আমরা—ভাই-বোনে মিলে সাত-আটটি শিশু। নূতন এক সাহেব এসে বাবার ওপর বদলির আদেশ দিলেন সেই পাবনা জেলায়। সেখানে তখন ম্যালেরিয়া সংক্রামক রূপে দেখা দিয়েছে। বাবা নিজে ম্যালেরিয়ার দেশের লোক। জানতেন, ঐ ডাইনী একবার সংসারে প্রবেশ করলে সন্তানদের শুষে নেবে। সাহেবকে বললেন, আমি ওখানে যাব না। আমাকে কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় বদলি করুন। সাহেব জবাব দিলেন, ডিপার্টমেণ্ট তোমার মর্জি অনুযায়ী চলবে না, তোমাকে ডিপার্টমেণ্টের আদেশ মেনে চলতে হবে।

Single-track mindএর লাইন-বাঁধা পথের বাইরে দুর্ভিক্ষ মহামারী, বন্যা হয়ে গেলেও তার চলায় বাধা হয় না, কিন্তু লাইনের মধ্যে তুচ্ছতম বস্তু থাকলেও হয় সে তাকে দলে পিষে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গম্ গম্ করে আপনার পথে চলে যাবে, নয় তাকে থমকে দাঁড়াতে হবে। সাহেবকে পিষে ধূলিসাৎ করার শক্তি বাবার ছিল না। তাই আবার থামতে হল, দিক বদলে লাইন ভিন্ন পথে পাততে হল।

বাবা চাকরীতে ইস্তফা দিলেন। তাঁর বয়স তখন আটত্রিশ। ওই বয়সে অত বড় একটা বিরাট সংসার নিয়ে একেবারে বেকার হয়ে পড়া—সাধারণ মানুষ হলে দিশাহারা হয়ে পড়ত। কিন্তু দিশাহারানো ওই ধরণের মনের কোণ্ঠীতে লেখেনি। অল্প কয়দিন ভেবে বাবা পথ বেছে নিলেন। আমাদের অসুখ-বিসুখের জন্য বাবা কিছু কিছু হোমিওপ্যাথি চর্চা করছিলেন। বাবার মনের সঙ্গে এই ধরণের চিকিৎসা পদ্ধতির কোথায় একটা মিল ছিল। ঠিক করলেন হোমিওপাথি শিখবেন।

বছর দুই একটু কষ্ট হয়েছিল। আমাদের

খাওয়া-দাওয়ার স্ট্যান্ডার্ড কমতে দেননি। নিজে একবেলা খেতেন। বছর দুই কোন প্রতিষ্ঠাবান চিকিৎসকের সাকরেদি করার পর নিজে যখন রোগীদের ওষুধ দিতে শুরু করলেন, তখন অত্যন্ত দ্রুত সুচিকিৎসক হিসাবে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে গেল।

সুবিধা ছিল। কোন সমস্যায় পড়লে বাবার মনে কখনও একটির অধিক দুটি সমাধানের উদয় হত না। যত দুরারোগ্য ব্যাধিই হোক বাবা মূলে রেমিডি বাছতেন একটি এবং সেইটিকেই শেষ অবধি চালিয়ে যেতেন। এতে সহজ রোগী কিছু কিছু মারা পড়ত। কিন্তু মাঝে মাঝে সকল চিকিৎসকের বর্জিত অতি দুঃসাধ্য ব্যাধিও তাঁর হাতে জব্দ হত। চিকিৎসকদের ভাগ্যের কথা এই যে, একশ রোগী মারলে যত বদ নাম হয়, একটি দুরারোগ্য ব্যাধির আরাম হলে তদধিক সুনাম হয়।

বছর তিনেকের মধ্যে অবস্থা ফিরে গেল। তারপর একটি শোচনীয় ঘটনায় বাবার মত চরিত্রের ভয়াবহ মহত্বের চরম বিকাশ দেখা গেল।

একবার প্রসূতি হবার পর মার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল। ঠাণ্ডা লেগে নিউমোনিয়ায় পড়লেন। বাবা ক্যানসার পক্ষাঘাত প্রভৃতি অতি কঠিন ব্যাধির চিকিৎসার একটা ধারা দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু টাইফয়েড, নিউমোনিয়া প্রভৃতি যেসব রোগ এ্যালোপ্যাথির বিশেষ ক্ষেত্র, সেখানে হাত দিতে পারেননি। মা'র অসুখে হতে ঠিক করলেন নিজেই চিকিৎসা করবেন।

আত্মীয়, স্বজন, প্রতিবেশী—সকলেই বাবাকে নিষেধ করলেন। বললেন, পত্নীর মত পরমাত্মীয়ের চিকিৎসার গুরু দায়িত্ব কখনই নিজের হাতে রাখা উচিত নয়। কিন্তু বাবা শুনলেন না। বোধ করি ভাবলেন, পরমাত্মীয়ের প্রতি মমতাবশত চিকিৎসকের চিত্তে যে মোহ আসে সে মোহ তো তাঁর নেই। মোটা মোটা বই ঘেঁটে নিজস্ব ধারায় একটা ওষুধ বেছে মাকে খাইয়ে দিলেন।

তিন চার দিন কেটে গেল রোগ কিন্তু সারল না। কমলোও না। কঠিন ব্যাধি। সকলে অধীর হয়ে পড়ল। দিদিমা সজল চোখে বার বার মিনতি করলেন, কোন এ্যালোপ্যাথ ডাক্তার দেখাতে। বাবা শুধু বললেন, দরকার নেই। উচ্চ শক্তির ওষুধ দিয়েছি। দেরী হবে, কিন্তু ওতেই কাজ হবে।

ঘরভরা কাঁচ শিশু। তাদের মা মারা গেলে আর কারও না হোক্ নিজের যে নাকালের অবধি থাকবে না, এ ভাবনাও তাঁকে ভাবালো না।

এগার দিন কেটে গেল। আমি তখন শিশু। মাত্র আট বছর বয়স। কিন্তু বেশ মনে আছে, একদিন মা'র অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছে। তিন চারটে বালিস ওপর ওপর সাজিয়ে তাতে মাথা ঠেস দিয়ে শুয়ে বুকে হাত বুলোচ্ছেন। চোখ দিয়ে জল পড়ছে। এমন সময় বাবা এলেন দেখতে। বুকে ষ্টেথ্‌স্কোপ বসিয়ে পরীক্ষা করছেন। হঠাৎ মা একেবারে হু হু করে কেঁদে উঠলেন। বাবার পা জড়িয়ে ধরে বললেন, তোমার পায়ে পড়ি, একবারটি একটি ডাক্তার আনাও। এ কষ্ট আর আমি সইতে পারি না, পারি না।

তুমি ভাবতে পার, এমন অবস্থায় স্বামীর, —যাঁর পত্নী তাঁরই আট সন্তানের জননী—কি করা উচিত? বাবা শুধু মার হাত দুটো ধরে যথাস্থানে শুইয়ে দিয়ে বললেন, অস্থির হয়ো না, অস্থির হলে রোগ বেড়ে যাবে।

কি দেখলেন ঈশ্বর জানেন। বাইরে এসে বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয়দের বললেন, ওষুধের কাজ শুরু হয়েছে, এবার সেরে যাবে।

সেই দিনই রাত্রি বারোটার পর মা মারা গেলেন। মেল-গাড়ীর চাকার তলায় আমাদের পরিবারে মা'ই প্রথম বলি।

তুমি হয়তো বলবে, ঋষিরও ভুল হয়, বাবার জীবনেও এ একটা ভুল। নইলে নিজের স্ত্রীকে কে ইচ্ছা করে মারে? কি বাইরে, কি নিজের মনে বাবা কখনও একে ভুল বলে মেনে নেন নি। বাবার অনেক কৃতী মহাপুরুষের মত একটি নিজস্ব মনগড়া এথিক্স ছিল। তাঁর বিচারে যেটি কর্তব্য বলে বুঝতেন, মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লেও তা করতেন; আর যেটি অন্যায় মনে হত, তাকে সযত্নে এড়িয়ে যেতেন। মা'র চিকিৎসায় যে অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেছিলেন, তার ফলে নিউমোনিয়া রোগী হাতে নিয়ে তিনি নাকি আর কখনও ব্যর্থ হননি।

যাক! মা গেলেন,—তারপর ঐ বিশাল রথচক্রের সামনে মুখোমুখি এসে পড়লাম আমরা কয়টি শিশু। এর পূর্বে কোমলপ্রকৃতি মায়ের ওপর কত দুরন্তপনা, কত উৎপাতই না করেছি। সে সবের ওপর একেবারে লম্বা দাঁড়ি টেনে দিতে হল। আমাদের দেখাশুনার জন্য বাবা কিছুকাল আমার এক দূরসম্পর্কীয়া পিসীমাকে এনে রেখেছিলেন। কিন্তু তিনি আসবার অনতিকাল পর থেকেই তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-আত্মীয়েরা অত্যন্ত ঘন ঘন আমাদের বাড়িতে অতিথি হতে লাগলেন এবং যখন তাঁদের অনেকেই অনেক তিথি কেটে গেলেও নড়বার লক্ষণ দেখালেন না, বাবা বিরক্ত হয়ে পিসীমাকে পুনরায় দেশে রেখে এলেন।

যদি বলি বাবাকে আমরা ভয় করতাম, কিছুই বলা হয় না। ভয়ের একটি সীমা আছে, যে অবধি ভক্তি ও ভালবাসা তার সংগে রফা করে বোঝাপড়া করে সমান তালে চলতে পারে। কিন্তু ভয় যেখানে সমস্ত সীমা লংঘন করে অন্তরের সুগুপ্ত কক্ষেও আপনার অধিকার বিস্তার করে, সেখানে ভয় আর আতঙ্কে কোন ভেদ থাকে না।

আমার মনে আছে আমরা খেলতাম ভয়ে ভয়ে, পড়তাম ভয়ে ভয়ে, কথা বলতাম ভয়ে ভয়ে, খেতাম ভয়ে ভয়ে, এমন কি আমাদের সুপ্তির মধ্যেও মায়ের অভয়-কর-স্পর্শের পরিবর্তে যেন ভয়ের একটা ভয়ঙ্কর ভারী হাত আমাদের বুকের ওপর চাপানো থাকত। পরিণত জীবনে আমরা যে অনেকেই খামখেয়ালী হয়েছি, মালার সুতো থেকে খসে পড়া ফুলের মত ব্যর্থ হয়েছি, তার মূলে শৈশবের এই সার্বক্ষণিক ভীতি।

অথচ বাবা কি আমাদের ওপর অত্যাচার করতেন? আদৌ না। বরং মা থাকতে ভাগ্য বিরূপ বলে বাবার কঠোর ধমক অথবা নৃশংস প্রহার আমাদের ও[illegible] মধ্যে মধ্যে এসে পড়ত। কিন্তু মা'র মৃত্যুর পর তিনি কোনদিন আমাদের গায়ে হাত তোলেন নি। না-না, বাবা সংস্কৃতিহীন গ্রাম্য লোক ছিলেন না। একেবারেই না। কিন্তু তবু যে কেন আমরা তাঁকে ভয় করতাম তা তোমাকে বলে বোঝানো কঠিন। কিন্তু তুমি নিজেও তো দেখেছ, একেবারে অপরিচিত লোক কোন কাজে বাবার কাছে এলেও কেমন থমকে দাঁড়াত, কথা হারিয়ে ফেলত। তার কিসের ভয়? তার ভয়ের কারণ, বিশ্বসৃষ্টির যে উপাদানগুলো অতিশয় গুরু-গম্ভীর, বিধাতা বাবার হৃদয়-গঠনে শুধু মাত্র সেইগুলিরই ব্যবহার করেছিলেন; যেগুলো লঘু, যেগুলো চপল, যেগুলো সুমিষ্ট, তার কণামাত্রও সেই গাঁথনির মধ্যে স্থান পায়নি।

বাবার কতকগুলি নিয়ম ছিল। সেগুলো আমাদের মানতেই হত। কোনদিন আঙুলে তুলে আদেশ বা নিষেধ করেন নি। কিন্তু একটা সহজ বুদ্ধিতে আমরা বুঝেছিলাম, বাবার সংসারে থাকতে গেলে ওগুলি অমান্য করা চলবে না। তার মধ্যে একটি ছিল থিয়েটার যাত্রা বা ওই জাতীয় প্রমোদে না যোগদান করা।

একদিন ছিল সারদীয়া পূজার নবমী। পল্লীর কোনও ধনীর বাড়ীতে নাটমণ্ডপে যাত্রার একটি বিখ্যাত পালা হবার কথা ছিল। শুরু হবে রাত্রি দশটায়। যে দল যাত্রা করবে, তাদের অভিনয় পটুত্বের কথা নানাভাবে পল্লবিত হয়ে আমাদের কাছে একটি দুর্বার আকর্ষণ হয়ে দাঁড়াল। বাবার কাছে অনুমতি নেওয়ার কথা ভাবতেও পারতাম না। আমরা তিন ভাই স্থির করলাম, রাত্রি বারোটার সময় চুপি চুপি বাবাকে না জানিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ব, এবং ভোর চারটেয় বাবা জেগে ওঠার পূর্বেই পুনরায় বাড়ী ফিরে আসব।

বলত বড় দুর্বল কণ্ঠে। স্বরে তার অস্থিরতার পরিমাপ ফুটে বেরুতো না। বাবাও বুঝতেন না।

একদিন রাত্রি বারোটা বেজে গেছে। আমরা আপন আপন ঘরে শুয়ে পড়েছি। কেউ কেউ নিদ্রাগত হয়েছি। বাবার ঘরেও আলো জ্বলছে না।

সহসা একটা শব্দে আমরা সজাগ হলাম। কে যেন একটা লৌহদন্ড দিয়ে কিসের ওপর আঘাত করছে। গেটে দ্বারবান ছিল। চোর নয়। তবে অকারণ শব্দ কেন জানবার জন্য আমরা নীচে নেমে এলাম।

দেখলাম, বাবাও ইতিমধ্যে বেরিয়ে এসেছেন। তাঁর হাত দুটো পিছন দিকে। মুখে বিচলিত মানুষের লক্ষণ। থেকে থেকে বলছেন, সন্তোষ, চলে এস, সন্তোষ, চলে এস।

বাইরের আলোটা ইতিমধ্যেই জ্বালা হয়েছিল। দেখলাম, সন্তোষ কোথা থেকে একটি মস্ত হাতুড়ী সংগ্রহ করে ফটকের তালাটার ওপর বার বার উন্মাদের মত আঘাত করছে। চোখ দুটো বিস্ফারিত, মুখের শিরাগুলো ফুলে উঠেছে। আর এক একবার আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠ থেকে একটি অশ্রুতপূর্ব অদ্ভুত শব্দ নির্গত হচ্ছে।

তাকে বাধা দেব বলে আমি ছুটে যাচ্ছিলাম, বাবা হাত বাড়িয়ে আমার পথরোধ করলেন। বললেন, যেও না, ওর মাথার ঠিক নেই। যা খুশি তা করতে পারে।

অত্যন্ত দৃঢ় মজবুত তালা। তার ওপর তার আঘাতও ঠিক জায়গায় পড়ছিল না। কিন্তু এমন করে এদৃশ্য দেখা যায় না। অবশেষে, বাবার হাত সরিয়ে আমি ছুটে সন্তোষকে বাধা দিতে গেলাম।

কিন্তু আমি পৌঁছুবার পূর্বেই একটা প্রবল আঘাতে তালাটা বিপুল ঝন ঝন শব্দে ভেঙে পড়ল। ফটক খুলে গেল। আঘাতের ঝোঁকে আপনাকে সামলাতে অক্ষম হয়ে সন্তোষ হাতুড়ী শুদ্ধ মুখ গুঁজড়ে পথের ওপর পড়ে গেল।

ধরাধরি করে সন্তোষের দেহটা যখন বাবার সামনে উপস্থিত করলাম, বাবা ঈষৎ দূর থেকেই বললেন, কোথায় আনছ? ওর প্রাণ নেই।

মেলগাড়ীর চাকার তলায় কনিষ্ঠই হল শেষের বলি।

কিন্তু এই সঙ্গে বুঝি মেলগাড়ীও লাইনচ্যুত হল। বাবার স্বাস্থ্যভঙ্গ হল। এর পর আর পাঁচ বছর বেঁচেছিলেন। এই সমস্ত সময়টা তিনি যে কনিষ্ঠের মৃত্যুতে কিছুমাত্র বিচলিত বা শোকাহত হন নি, এমনি একটা অভিনয়ের ভাব বজায় রেখেছিলেন। কিন্তু সংসারে আর লিপ্ত হতে পারেন নি। বৈষয়িক দেখাশুনার ভার একজন পুরাতন কর্মচারীর ওপর ছেড়ে দিয়ে সুস্থ সময়টুকু শুধু চিকিৎসা আর উপাসনা নিয়ে থাকতেন।

একেবারে শেষের দিনে তখন শ্বাস উঠেছে। আমরা শয্যার চারিদিকে দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের দুই জ্যেষ্ঠা ভগ্নীও উপস্থিত হয়েছে। শ্বাসের বিশ্রী শব্দ যখন ক্রমশই বাড়ছে, একজন জিজ্ঞাসা করলে, বাবা, কষ্ট হচ্ছে?

বাবা ঘাড় নেড়ে জানালেন, না।

ডান হাতের আঙুলের রেখাগুলোর ওপর অঙ্গুষ্ঠ ঘুরিয়ে মনে মনে নাম করছিলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার কে জিজ্ঞাসা করল, বাবা, কিছু বলবার আছে?

টেনে টেনে শ্বাস নিতে নিতে বাবা এবারও স্পষ্ট শব্দ করে বললেন, না।

না। এই আলো বাতাস শব্দ গন্ধে ভরা বিপুল পৃথিবীতে কর্ম এবং শ্রমে ঠাসা সত্তরটি বৎসর কাটিয়ে গেলেও অনাড়ম্বর বিদায়কালে তাঁর একটি ইচ্ছা একটি অনুতাপ, একটি অতৃপ্ত বাসনার কথাও বলে যাবার নেই।

দশ বার ঘণ্টা পরে যখন সব শেষ হয়ে গেল, একটা অপূরণীয় ক্ষতির অনুভূতি আমাদের মন আচ্ছন্ন করেছিল বৈ কি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত চক্ষুর অন্তরালে, সকল আত্মীয় পরিজন প্রতিবেশীকে লুকিয়ে এমন কি নিজের সতর্ক বিবেককেও ক্ষণকালের জন্য নিদ্রিত করে একটা পরিত্রাণের নিঃশ্বাস ফেলে বসি নি, এমন কথাও বলতে পারি না।

শূন্যপাত্র

বিভা সরকার

'জীবনের শূন্য পাত্র মম
এ কোন বেদনা-রসে লইতেছি ভরি
(তাই) অমৃত জীবন-পুঞ্জে
উদাসী এ গুঞ্জরণ মরিছে গুমরি।
জীবন আছিল শুধু কল্পনা-স্বপন
মায়াপুরে বেঁধেছিনু নীড়,
ভেঙেছে কল্পনা, তাই
অন্ধকার হল কি নিবিড়।
খুলেছো দুয়ার যদি
আর কেন বন্ধ কর তারে,
হারায়ে ফেলেছো যাহা
ভুলে যাও তারে একেবারে।

কাঁদায় সে স্মৃতি শুধু
কেন তাহা চাহ আঁকড়িতে
বিলায়ে দিয়েছো যাহা
পার নাকি একেবারে দিতে—
ভাঙা হাটে ভাঙিয়াছে যাহা
কেমনে তা জুড়ে নেবে আর,
পাবে না কিনারা মিছে হবে পথহারা
বৃথা কেন খুঁজিছ আবার।
এ পার ওপার বৃথা
কি খুঁজিছ অন্তরে বাহিরে,
বৃন্তহারা পুষ্প বৃন্তে
কভু ফিরে না রে।

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী বিলাতের সরকার ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে বৃটিশের পাকিস্থান প্রীতির পরিচয় আরও একটু সুস্পষ্ট হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে, ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের মধ্যে ইংরেজ ভারত ত্যাগ করিবেন; তখন তাঁহাদিগকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে—কোন কোন প্রদেশে তাঁহাদিগকে হয়ত প্রথমিক প্রাদেশিক সরকারকেই ক্ষমতা দিয়া যাইতে হইবে।

এই বিবৃতি প্রচারের পরেই মুসলমান-প্রধান পাঞ্জাবে অশান্তি প্রবল হইয়াছে। পাঞ্জাব মুসলমানপ্রধান এবং তথায় মুসলমান ও শিখ—দুই সম্প্রদায় বাঙলার মুসলমান ও হিন্দুর মত অল্পসংখ্যাভেদে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ। কিন্তু বাঙলায় বর্তমান শাসনপদ্ধতি প্রবর্তনাবধিই—কেবল দুই বৎসর ব্যতীত—মুসলিম লীগ সচিবসংঘ রহিয়াছে। পাঞ্জাবে গত আট বৎসরকাল মুসলিম লীগের পক্ষে সচিবসংঘ গঠন করা সম্ভব হয় নাই। বর্তমান শাসনপদ্ধতি অনুসারে প্রথম নির্বাচনের পরে বাঙলায় কংগ্রেসই এক দল হিসাবে প্রবল থাকায় শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু যখন বাঙলায় সচিবসংঘ গঠন করিবার জন্য কংগ্রেসের অনুমতি চাহিয়াছিলেন, তখন কংগ্রেসের নেতারা সে অনুমতি দেন নাই। তখন মুসলিম লীগের দল—দলাদলি ত্যাগ করিয়া এবং কয়জন কংগ্রেসত্যাগী হিন্দুকে লইয়া সচিবসংঘ গঠিত করেন। মধ্যে কেবল—ঢাকায় হাঙ্গামার পরে—শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর চেষ্টায় সম্মিলিত সচিবসংঘ গঠিত হয়। কিন্তু তাহার গঠন শেষ হইবার পূর্বেই তাঁহাকে বিনা বিচারে বন্দী করা হয় এবং কিছুদিন পরে তৎকালীন গভর্নর স্যার জন হার্বার্ট প্রধান সচিব মিস্টার ফজলুল হককে ডাকাইয়া পদত্যাগ পত্রে তাঁহার স্বাক্ষর গ্রহণ করেন। তদবধি আবার মুসলিম লীগ সচিবসংঘই চলিতেছে। সেই সচিবসংঘই কলিকাতায় মুসলিম লীগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের' দিন সরকারী ছুটী ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং বাঙলার গভর্নর—সংখ্যালঘিষ্ঠদিগের স্বার্থ সম্বন্ধে অনবহিত হইয়া—তাহাতে আপত্তি করেন নাই। কলিকাতার হত্যাকাণ্ডের পরে নোয়াখালির ব্যাপার। যখন নোয়াখালিতে অগ্নি জ্বলিতেছিল, তখন বাঙলার প্রধান সচিব বলিয়াছিলেন, তাঁহার সরকারের এমনই সুব্যবস্থা যে অগ্নি কিছুতেই নোয়াখালির সীমা অতিক্রম করিয়া ত্রিপুরা জিলায় প্রবেশ করিতে পারিবে না এবং তাহার কয়দিন পরেই ত্রিপুরা জিলা উপদ্রুত হয়।

বাঙলার গভর্নর নোয়াখালির ব্যাপারের গুরুত্ব হ্রাস করিয়া বিলাতে যে বিবৃতি দিয়াছিলেন, তাহা যে নির্ভরযোগ্য নহে, তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে।

নোয়াখালির প্রতিক্রিয়ায় বিহারে বিক্ষুব্ধ হিন্দুরা যে উপদ্রব করিয়াছিল, তাহার সুযোগ লইয়া বাঙলার মুসলিম লীগ সচিবসংঘ অন্তত এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বিহারী মুসলমানকে বাঙলায় আনিয়া বাঙলা সরকারের অর্থ তাহাদিগের জন্য অকাতরে ব্যয় করিতেছেন এবং পাকিস্থানী পত্রে বলা হইতেছে—বাঙলার লোকের যত দুরবস্থাই হউক না—বাঙলায় যখন মুসলিম লীগ সচিবসংঘ প্রতিষ্ঠিত, তখন বিহারের উপদ্রুত মুসলমানগণ বাঙলায় আশ্রয় ও সুবিধালাভের দাবী অবশ্যই করিতে পারে। বিহারী মুসলমানদিগকে বাঙলায় আনা সম্বন্ধে বাঙলার প্রধান সচিব যাহা বলিয়াছেন—তাহা বিহার সরকার মিথ্যা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু বাঙলার মুসলিম লীগ সচিবসংঘ লজ্জা জয় করিয়াছেন। তাঁহারা যে বিহার হইতে লক্ষাধিক মুসলমানকে বাঙলায় আনিয়াছেন, তাহা যেন বাঙলার হিন্দুকে বুঝাইবার অভিপ্রায়ে যে, বাঙলা মুসলমান-প্রধান। অবশ্য ইহাও পাকিস্থানের পূর্বাভাষ মনে করা যায় এবং পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাতে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অবস্থা কি হইবে, তাহাও অনুমান করা যায়।

গত ৪ঠা মার্চ কলিকাতায় 'স্টেটসম্যান' পত্রে কলিকাতার পুলিশ কমিশনার কলিকাতার অস্ত্রধারী পুলিশে পাঞ্জাবী মুসলমান নিয়োগ করা হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। এই পুলিশ কমিশনারই 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে' কলিকাতায় মুসলিম লীগ সচিবসংঘের প্রধান সচিবকে লালবাজারে কন্ট্রোল রুমে যাইতে নিষেধ করিতে সাহস করেন নাই; এখন সেই প্রধান সচিবের নির্দেশেই তিনি এই বিজ্ঞাপন দিয়াছেন।

ইহাতে বাঙলার মুসলমানগণ কি মনে করেন, বলিতে পারি না; কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের হিন্দুরা কর্তব্যের সন্ধান পাইবেন, সন্দেহ নাই। ইহাও হিন্দুকে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা—পাকিস্থানে অ-মুসলমানের কোন স্বার্থ রক্ষা করা না করা মুসলিম লীগের ইচ্ছাধীন। সে কথা সিন্ধুর ব্যবস্থা পরিষদে একজন লীগপন্থী সদস্য স্পষ্টই বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, সিন্ধু মুসলমান প্রদেশ—তাহাতে কাফেরের স্থান নাই; মুসলমান দুর্নীতিপরায়ণ মদ্যপ হইলেও গান্ধীজী অপেক্ষা ভাল।

পূর্ববঙ্গে কয় মাসকাল থাকিয়াও যে গান্ধীজী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই তাহা তাঁহার কার্যে প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, তিনি বিহারে গিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে আবার নোয়াখালি-ত্রিপুরায় ফিরিতে হইবে; কারণ তথায় তাঁহার কাজ এখনও অসমাপ্ত।

গত ৬ই মার্চ তারিখেও বাঙলা সরকার ঘোষণা করিয়াছেন, নোয়াখালি জিলায় এখনও ১৪৪ ধারা বহাল থাকিবে, কারণ—যে কারণে তথায় গত ২৮শে জানুয়ারী ঐ ধারা জারি করা হইয়াছিল, সে কারণ এখনও বিদ্যমান।

কলিকাতা পুলিশে যে পাঞ্জাবী মুসলমান নিয়োগ করা হইবে, সে প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন—কলিকাতার শতকরা ৭৫ জন অধিবাসী অ-মুসলমান—সুতরাং লোক হিসাবে কলিকাতা পুলিশে অন্তত ৭৫ জন অ-মুসলমান নিয়োগ সঙ্গত। কিন্তু যুক্তির স্থান কোথায়?

এই সকল কারণে পাঞ্জাবে শিখদিগের মত বাঙলায় একদল হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে স্বতন্ত্র প্রদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য যে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা ব্যাপ্তিলাভ করিতেছে।

বাঙলায় হিন্দুপ্রধান স্থানের ও ঐ সকল স্থানে মুসলমান কয়জন, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

কলিকাতা	২৩·৫৯
বর্ধমান বিভাগ	১৩·৯০
চব্বিশ পরগণা	৩২·৪৭
খুলনা জিলা	৪৯·৩৬
জলপাইগুড়ি জিলা	২৩·০৮
দার্জিলিং	২·৪২

এই সকল স্থানের অধিবাসীদিগের মধ্যে মোট শতকরা ২২·২৯ জন মাত্র মুসলমান। সত্তর বৎসরেরও অধিক পূর্বে যে লোক-গণনা হয়, তাহাতে দেখা যায়, নিম্নলিখিত জিলাগুলিতে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর সংখ্যা অধিক ছিল—

বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি।

এখন এই সকলের মধ্যে মুর্শিদাবাদে মুসলমান—শতকরা ৫৬ জন, মালদহেও তাহাই।

সেবার লোক-গণনার বিবরণে মিস্টার

বিভালী বলিয়াছিলেন—বাঙলায় মুসলমানরা পূর্বে নীচ জাতীয় হিন্দু ছিল—পরে মুসলমান হইয়াছে; নীচ জাতীয় হিন্দুরা পূর্বে বন্য-জাতীয় ছিল—সেই জন্য বাঙলার মুসলমানরা বন্য জাতির স্বভাবানুযায়ী অধিক সন্তানোৎপাদক। এ যুক্তি গ্রহণ করা যায় না। তবে এখনও মুসলমানদিগের মধ্যে বহু-বিবাহ অধিক। যদি এই সামাজিক রীতির পরিবর্তন না হয় এবং বাঙলায় বিহার প্রভৃতি স্থান হইতে মুসলিম লীগ সচিবসংঘ মুসলমান আমদানী করেন—আর কেন্দ্রী সরকার ও বাঙলা গভর্নর তাহাতে আপত্তি না করেন—তবে পশ্চিমবঙ্গেও মুসলমানের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিবে। যাহাকে আমরা রাজশক্তি বলি, তাহা মুসলমানের হস্তগত থাকিলে রাজনীতিক, অর্থনীতিক ও শিক্ষা সম্পর্কিত ব্যবস্থায় বাঙলায় হিন্দুর সংস্কৃতি নষ্ট হইবে এবং পারস্যে ও মিশরে যাহা হইয়াছে, তাহাই হইবে—স্বদেশী সংস্কৃতি রক্ষিত হইবে না।

এই সকল মনে করিয়া একদল লোক পশ্চিমবঙ্গে স্বতন্ত্র হিন্দুপ্রধান প্রদেশ প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী।

তাঁহাদিগের প্রস্তাব যে বিশেষভাবে বিবেচ্য তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে তাহাতে

(১) পূর্ববঙ্গে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠায় সম্মতি প্রদান—পরোক্ষভাবে হইবে;

(২) পূর্ববঙ্গের হিন্দুদিগের পক্ষে আত্মরক্ষা কষ্টকর হইবে।

কাজেই বাঙলাকে হিন্দুপ্রধান ও মুসলমান-প্রধান—দুইভাগে বিভক্ত করিবার প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে যে সকল যুক্তি আছে, সে সকল বিবেচনা করিয়া বাঙ্গালীকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে।

এ বিষয়ে পাঞ্জাবের সহিত বাঙলার যে সাদৃশ্য আছে, তাহার উল্লেখ আমরা পূর্বে করিয়াছি।

পাঞ্জাবে গত আট বৎসর মুসলিম লীগ সচিবসংঘ গঠন করিতে পারেন নাই। এবার—বৃটিশ সরকারের মনোভাবে উৎসাহিত হইয়া পাঞ্জাবে মুসলিম লীগ—ব্যক্তিস্বাধীনতা বিপন্ন—এই রব তুলিয়া যে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা পরে অভিনয়মাত্র বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। মুসলিম লীগের নেতারা পূর্বে কখনও ত্যাগের পথে পাদক্ষেপ করেন নাই। এবার যে তাঁহারা কংগ্রেসের অনুকরণে সেই পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার কারণ অতি অল্পদিনেই সপ্রকাশ হইয়াছে।

প্রথমে মুসলিম লীগের পক্ষে খাজা নাজিমুদ্দীন লাহোরে যাইয়া মীমাংসার জন্য প্রাদেশিক গভর্নরের সহিত আলোচনা করিতে থাকেন। পাঞ্জাবে মুসলমানরা সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় নহেন। কাজেই তাঁহাদিগের সম্বন্ধে পাঞ্জাব সরকারের ব্যবহার সম্পর্কে কোন আলোচনা করিতে হইলে তাহা সচিবসঙ্ঘের সহিত হওয়াই নিয়মানুগ। এক্ষেত্রে পাঞ্জাবের গভর্নর সে নিয়ম রক্ষা করেন নাই। তাহার পরে পাঞ্জাবের সচিবসঙ্ঘের মুসলমানপ্রধান সচিব—দুইজন মুসলমান সহ-সচিব ব্যতীত আর কাহাকেও না জানাইয়া গভর্নরের নিকটে যাইয়া সমগ্র সচিবসঙ্ঘের পদত্যাগ জ্ঞাপন করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিশ্রুতি দেন, পরবর্তী সচিবসংঘ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁহারা কার্য পরিচালনা করিবেন। তাহা হইলে ব্যবস্থা পরিষদে বাজেট গৃহীত হইত। আর গভর্নর কালবিলম্ব না করিয়া যেভাবে মুসলিম লীগ দলের দলপতিকে সচিবসংঘ গঠনের জন্য আহ্বান করেন ও তিনি তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করেন, তাহাতেই সমস্ত ব্যাপারটি অভিনয়-মাত্র বলিয়া মনে হয়।

যে পাঞ্জাবে দীর্ঘ আট বৎসরকাল মুসলিম লীগের পক্ষে সচিবসংঘ গঠন সম্ভব হয় নাই, এই কার্যে সে নিয়মের ব্যতিক্রম সহজসাধ্য হয়। আর গভর্নরও ভারত-শাসন আইনের ৯৩ ধারা জারি করিয়া—বড়লাটের সম্মতি লইয়া—কার্যভার গ্রহণ করেন নাই।

কিন্তু মুসলিম লীগ ও পাঞ্জাবের গভর্নর যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা সফল হয় নাই। শিখ সম্প্রদায় প্রথমাবধিই বলিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা কিছুতেই পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট সচিবসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইতে দিবেন না। পাঞ্জাবের সম্মিলিত সচিবসঙ্ঘের প্রধান সচিবের পদত্যাগে শিখরা যেমন, হিন্দু প্রভৃতিও তেমনই মনে করেন—বৃটিশ সরকারের ঘোষণার পরে পাঞ্জাবে মুসলিম লীগ সচিবসংঘ প্রতিষ্ঠার জনাই ইঙ্গ-লীগ ষড়যন্ত্র হইয়াছে। পাঞ্জাবে বিক্ষোভ আরম্ভ হয় এবং তাহা দলিত করিবার চেষ্টাও হয়। সেই অবস্থায়—যে প্রধান সচিব তাঁহাদিগকে না জানাইয়া পদত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার সহিত পরবর্তী সচিবসংঘ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত কাজ করিয়া—শাসনকার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে মুসলমানাতিরিক্ত সচিবগণ অস্বীকার করেন। বাধ্য হইয়া গভর্নরকে ভারত-শাসন আইনের ৯৩ ধারা জারি করিয়া প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

পাঞ্জাবে যে বিক্ষোভ বাত্যাতাড়িত সিন্ধু-তরঙ্গের মত ব্যাপ্ত হইতেছে, তাহাতে কি হইবে, বলা যায় না।

বৃটিশ সরকার যে মুসলিম লীগকে তুষ্ট রাখিয়া ভারতবর্ষের জাতীয়তার বেগ ক্ষুণ্ণ করিতে সচেষ্ট এবং তাঁহারা ভারতবর্ষে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা অসম্ভব, একথা বলিয়া ক্রমে ক্রমে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থাই করিয়া দিতেছেন; তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু শিখদিগকেও যে তাঁহারা অসন্তুষ্ট করিতে চাহেন, এমন নহে। তাঁহারা মুসলমান-দিগকে যখন সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় বলিয়া কতকগুলি বিশেষ সুবিধা দিয়াছিলেন, তখন শিখদিগের তাহা দাবী করিবার অধিকার স্বীকার করিয়াও শিখদিগকে সেরূপ অধিকার প্রদান করেন নাই। শিখরাও সে দাবী করিয়া ভারতের অকল্যাণ সাধন করেন নাই। পাঞ্জাব শিখদিগের মাতৃভূমি। বিশেষ মুসলমানদিগের অত্যাচারেই শিখ সম্প্রদায়ের উদ্ভব এবং সেই সম্প্রদায়ের সামরিক ভাবের আরম্ভ। সুতরাং শিখরা যদি আপত্তি করেন, তবে ইংরেজ-লীগ ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইবে। বৃটিশ-শাসিত ভারতবর্ষে সরকারের সেনাবলে শিখদিগের গুরুত্বও অসাধারণ। শিখ সম্প্রদায়কে কি পাঞ্জাবের একাংশ স্বতন্ত্র প্রদেশ করিয়া দিয়া ইংরেজ ভারতবর্ষে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা করিবেন? যদি তাহাই হয়, তবে বাঙলায় হিন্দুদিগের দাবীও কোনরূপেই অসঙ্গত বলিয়া অবজ্ঞা করিবার উপায় অর্থাৎ যুক্তিসঙ্গত উপায় থাকিতে পারিবে না।

পাঞ্জাবে যাহা ঘটিতেছে, তাহাকে গৃহ-যুদ্ধ ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। সর্দার শান্ত সিংহ কয় মাস পূর্বে ইংলণ্ডে বলিয়া-ছিলেন—যদি গৃহযুদ্ধ অনিবার্য হয়, তাহাতে দশ লক্ষ লোকের মৃত্যু হইলেও তাহা স্বাধীনতার মূল্য হিসাবে অল্পই বলিতে হইবে এবং যে খৃষ্টানরা গত জার্মান-যুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করিয়াছে, তাহাদিগের তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণই থাকিতে পারে না। আমেরিকা আজ যে সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে, তাহার জন্যও তাহাকে গৃহযুদ্ধে ভোগ করিতে হইয়াছে।

পাঞ্জাবে পাকিস্থানবিরোধী আন্দোলন যে আকার ধারণ করিতেছে, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

হয়ত বাঙলার পক্ষে তাহা কেবল লক্ষ্য করিবার বিষয়ই নহে—তাহার শিক্ষা গ্রহণ করিবার বিষয়ও বটে।

(৬)

মিলন-ভূমি

শ্রীশ্রীগুরুদেব আমাদিগকে ধর্মের এমন একটি মিলন-ভূমি দেখাইয়া দিয়াছেন যে, যাহাতে আমাদের ধর্মবিদ্বেষ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

প্রাণ ছাড়িয়া খাদ্য-বিচার এবং মান ছাড়িয়া বড়মানষী করা যেমন মূর্খের কর্ম, আমরাও সেইরূপ মূর্খের মতন ধর্ম ছাড়িয়া শুধু কর্ম লইয়াই ব্যতিব্যস্ত ছিলাম, কতকগুলি সামাজিক রীতিনীতি ও আচার-পদ্ধতির মধ্যে বিভিন্নতা ও বিচিত্রতা দেখিয়া ধর্মের মিলন-ভূমি খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না, শ্রীগুরুদেবের কৃপায় সেই মিলন-ভূমি প্রাপ্ত হইয়া আমরা একটা বিষম বিদ্বেষের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছি।

মনে করুন, একজন ভেকধারী বৈষ্ণব একজন নানকপন্থী উদাসী, একজন ঈশাপন্থী পাদরী ও একজন মুসলমান ফকীর একস্থানে বসিয়া আছেন। ইঁহাদের পরস্পরের পরিচ্ছদে ও আচার-ব্যবহারে কি বিষম বিসদৃশ! একজনের মস্তক মুণ্ডিত, গলায় তুলসীর মালা, নাসিকায় দীর্ঘ ফোঁটা ও সর্বাঙ্গে হরিনামের কি রাধাকৃষ্ণ নামের ছাপ এবং পরিধানে কৌপীন ও বহির্বাস; অন্য জনের সদীর্ঘ কেশ ও শ্মশ্রু এবং পরিধানে পট্টবস্ত্র বা শ্বেতবস্ত্র, মস্তকে পাগড়ী অথবা দীর্ঘ জটা; আবার পাদরী সাহেব হ্যাট-কোটধারী, ফকীর সাহেবের কণ্ঠে স্ফটিক-মালা, পরিধানে বিবিধ বর্ণের বস্ত্রে নির্মিত আলখেল্লা। পরস্পরের আচার-ব্যবহার অধিকতর বিচিত্র। সে সকলের বর্ণনা অনাবশ্যক। বাহিরের দিক হইতে দেখিলে ইঁহাদের যে একটি মিলন-ভূমি আছে, তাহা কিছুতেই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু ইঁহারা যখন অন্তরে প্রবেশ করিলেন, তখন বৈষ্ণব গাহিলেন "হরিসে লাগি রহ ভাই তেরা বনত বনত বনি যাই" অর্থাৎ হরিতে লাগিয়া থাক তোমার সর্বকামনা পূর্ণ হইবে। নানকপন্থী বলিলেন "তোমার প্রত্যেকটি শ্বাস-প্রশ্বাস গণিয়া গণিয়া গুরুকে অর্পণ কর।" পাদরী সাহেব বলিলেন, 'অবিশ্রান্ত প্রার্থনা কর' . এবং ফকীর সাহেব বলিলেন, "আমার মন পাগ্‌লারে হরদমে আল্লাজীর নাম নিও, দমে দমে নিও নাম, কামাই নাহি দিও।" দেখা গেল যে, ইঁহাদের বাহ্যিক বিচিত্রতা ও বিরুদ্ধতার মধ্যেও একটি আন্তরিক একতা ও অভিন্নতা আছে; ইঁহাদের কর্ম স্বতন্ত্র হইলেও ধর্ম স্বতন্ত্র নহে। সকলেই অবিশ্রান্ত শ্বাসে-প্রশ্বাসে আরাধ্য দেবতার স্মরণ করিতেছেন।

মনুষ্যের আকৃতি কিরূপ বিচিত্র! একজনের বর্ণ ও গঠন আশ্চর্যরূপে অন্যের বর্ণ ও গঠন হইতে স্বতন্ত্রতা রক্ষা করে; কিন্তু সকলেরই প্রাণরাজ্যে একটি মিলন আছে, হৃদয়ের স্পন্দন ও আভ্যন্তরীণ যন্ত্রাদি এবং স্নায়ু-শৃঙ্খলার (Nervous System) মধ্যে পার্থক্য কিছু দেখা যায় না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আবার মনোরাজ্যেও সেইরূপ, রুচি বিভিন্ন; সুতরাং আহার বিহার ও পোষাক-পরিচ্ছদের বিচিত্রতা ত থাকিবেই, কিন্তু সকলের মনের গতি একই দিকে। হাজার ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিলেও লক্ষ্যের বিভিন্নতা নাই। সকলেই 'সুখ' চায়, 'শান্তি' চায়। কেহবা ধন দ্বারা কেহ যশ দ্বারা, কেহ আধিপত্য দ্বারা, সংক্ষেপে কেহ সৎকার্য দ্বারা, কেহ অসৎকার্য দ্বারা বা অন্য কোনরূপে এই সুখলিপ্সা, এই শান্তি-পিপাসাকে চরিতার্থ করিতে চায়। কিন্তু 'অল্প বস্তু' লইয়া কেহই সিদ্ধকাম হইতে পারে না। "যো ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি।" মানুষের অনন্ত পিপাসা কিছুতেই সীমাবদ্ধ বস্তু লইয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। আজ হউক, কাল হউক, সকলকেই ঠেকিয়া শিখিয়া সেই অসীম অমৃত-পুরুষের দিকে ছুটিয়া যাইতেই হইবে। সুখ-পিপাসা ও শান্তি-পিপাসার মধ্যে ধর্মের বীজ লুকাইয়া রহিয়াছে, কেহ কিছুকালের জন্য পথভ্রষ্ট হইতে পারে, কিন্তু কেহই লক্ষ্যভ্রষ্ট নহে। উপায় লইয়াই বিবাদ, উদ্দেশ্য লইয়া প্রকৃতপক্ষে কাহারও সহিত কাহারও বিরোধ নাই।

হিন্দুস্থানী লোকেরা দাঁতন না করিয়া জলগ্রহণ করে না। এই নিয়মটি ইহারা এমনই-ভাবে রক্ষা করে যে, মুমূর্ষু রোগীকে ঔষধ খাওয়াইতে হইলে তাহার মুখে অন্তত একটা দাঁতন কাঠি ছোঁয়াইয়া তবে মুখে ঔষধ দিতে হয়, নতুবা জাতি যায়। বাঙলা দেশে হিন্দুর ছেলের পক্ষে মুরগী খাওয়া যেমন নিন্দনীয় কার্য, কোন একজন খোট্টার পক্ষে দাঁতন না করিয়া জলগ্রহণ করা তদপেক্ষাও নিন্দনীয় ও পাপজনক কার্য। একজন লোক যতই ধার্মিক হউক না কেন, দাঁতন না করিয়া জল-গ্রহণ করিলে হিন্দুস্থানীরা কখনই তাহাকে ষোল আনা শ্রদ্ধা করিতে পারে না। এইরূপ খুঁটিনাটি কর্ম সকল সমাজেই আছে, যাহা করিলে অথবা না করিলে জাতি যায় এবং ঐরূপ কর্ম করায় কিম্বা না করায় ধার্মিক ব্যক্তিও যবন, ম্লেচ্ছ, কাফের বা হিদেন নামে অভিহিত হয়। এইরূপে বাহিরের কর্মের প্রতি দৃষ্টি অধিক হওয়ায় ক্রমশ প্রকৃত ধর্ম উপেক্ষিত হয় এবং ধর্মের নামে বিদ্বেষ ও হিংসা জগতে প্রাধান্য লাভ করে।

কিন্তু একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রত্যেক ধর্মই তাহার অনুকূল কর্মের ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠে। সে সমস্ত কর্মকে পরিত্যাগ করিয়া শুধু সেই ধর্মটিকে লাভ করার চেষ্টা ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র। যাঁহারা সকল ধর্মের উৎকৃষ্ট বস্তুগুলি একসঙ্গে জড় করিয়া একটি সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম প্রস্তুত করিতে চাহেন, অথচ যে সকল কর্মের ভিতর দিয়া সেই সকল ধর্ম ফুটিয়াছে, সে সকল কর্মকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহাদের আশা কখনও পূর্ণ হইতে পারে না। পাঁচ ফুলের একটি তোড়া হয়, কিন্তু পাঁচ ফুলের একটি জীবন্ত বৃক্ষ হয় না। গোলাপকে পাইতে হইলে তাহার কণ্টকময় বৃক্ষ পরিত্যাগ করিলে চলিবে না, পদ্মফুল ফুটাইতে হইলে কণ্টকময় মৃণালেই ফুটাইতে হইবে। তোমার প্রয়োজন নাই বলিয়া প্রকৃতি তোমার আবদার শুনিবে না। খড়, তুষ ও কুঁড়ো তোমার খাদ্য নহে, তুমি চাহিবে ছাঁটা বালাম, কিন্তু সে বালাম চাউলগুলি খড়, তুষ ও কুঁড়োর ভিতর দিয়া ভিন্ন জন্মিতে পারে না। এ সকল পরীক্ষা-সিদ্ধ সত্য, ইহার বিরুদ্ধে কোন যুক্তি খাটে না।

জড় রাজ্যই বল আর মনোরাজ্যই বল, সকল রাজ্যই নিয়মের অনুগত। শূন্য হইতে কিছুই উৎপন্ন হয় না, সকল কার্যেরই কারণ আছে এবং সে কারণও অব্যবহিত পূর্ববর্তী কার্য বই আর কিছু নহে। যে অব্যবহিত পূর্ববর্তী কার্য হইতে পরবর্তী কার্য উৎপন্ন হইয়াছে, সেই পূর্ববর্তী কার্যকে পরিত্যাগ করিয়া পরবর্তী কার্য উৎপন্ন করা অসম্ভব ব্যাপার। কৃতকার্যতার সাক্ষী চাই, আনুমানিক মত কে শুনিবে? এই জন্যই লোকেরা যুক্তির অনুসরণ না করিয়া মহাপুরুষের অনুগমন

করে এবং এই জন্যই সহস্র সহস্র বৎসরের পরে লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রচারকের মধ্যে জগতের লোকেরা কদাচিৎ কোন এক ব্যক্তির কথা মানিয়া চলে। তবে একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, কর্মকে অত্যধিকরূপে প্রশ্রয় দিলে অনেক বাহুল্য আসিয়া ধর্মকে মলিন করিয়া ফেলে, তখন মনে হয় দাঁতন না করিলে আর পরিত্রাণ নাই।

ধর্ম এক হইলেও দেশ, কাল, সমাজ ও প্রাকৃতিক ব্যাপার সকলের বিভিন্নতায় কর্ম বিচিত্র। যে বৃক্ষকে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে নিয়ত জল সিঞ্চন করিয়া বাঁচাইতে হয়, শীতপ্রধান দেশে উহাকে বাঁচাইবার জন্য কাঁচের গৃহে রক্ষা করিয়া উষ্ণ বাষ্প প্রদান করা কর্তব্য। কোন ঋতুতে জলদান মহা পুণ্য, কোন ঋতুতে অগ্নি সেবন করান মহাধর্ম। কোন দেশে লবণ-দান অতি সামান্য কার্য, কোন দেশে নেমক-হারামের অধিক গালি নাই; যাহার লবণ খাইল, তাঁহার বাড়িতে ডাকাতগণও ডাকাতি করিতে পারে না। সকল দেশের লোকের স্বাদ-গ্রহণ শক্তি একরূপ নহে, ইউরোপীয়গণ যে পনির (cheese) খায়, তাহার গন্ধে আমাদের বমি আইসে, আমাদের ঘৃত তাহাদের পক্ষে সুখাদ্য নহে, ব্রহ্মবাসিগণ ঘৃতের গন্ধে বমি করে। সৌন্দর্যবোধ সব দেশে সমান নহে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গজেন্দ্রগামিনীর প্রশংসা, শীতপ্রধান দেশের সুন্দরী চঞ্চল-চরণা; কোথাও পীত, কোথাও শ্বেত, কোথাও বা শ্যামবর্ণের আদর। কোথাও ভ্রমর-কৃষ্ণ-কেশ প্রশংসনীয়, কোথাও অরুণবর্ণ আদরণীয়। কোথাও সুন্দরী কুরঙ্গনয়না, কোথাও বিড়ালাক্ষী প্রশংসনীয়া। সংক্ষেপত প্রকৃতিভেদে রুচি-ভেদ, রুচিভেদে সমাজভেদ ও সমাজভেদে কর্মভেদ ঘটে, একথা অস্বীকার করার উপায় নাই। যাঁহারা এই পৃথিবীর সকল দেশের ও সকল সমাজের লোককে একপ্রকার আচার-আচরণে আনিতে চাহেন, একপ্রকার কর্মে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন এবং একই রুচিতে আসক্ত ও একইরূপে কর্মে অনুরক্ত করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের ইচ্ছা কখনও পূর্ণ হইতে পারে না। পরন্তু সকলকে এইরূপে এক ছাঁচে ঢালিবার চেষ্টা করায় সমাজ-বিপ্লব ও ধর্ম-বিপ্লব উপস্থিত হইয়া ধর্মের পরিবর্তে জগৎকে অধর্মে প্লাবিত করে। ধর্মের নামে মানুষ যেরূপ অধর্ম করিয়াছে, অধর্মের নামে ততদূর করিয়াছে কিনা সন্দেহ।

তবে ধর্ম ও কর্মের কতকগুলি মূল নীতি আছে, সেগুলিকে উপেক্ষা করিতে কাহারও অধিকার নাই। ক্রোধ করিলে হিন্দুর যেমন তপস্যা নষ্ট হয়, মুসলমানেরও তেমনি রোজা নষ্ট হয়। এইরূপ চুরি-ডাকাতি, ব্যভিচার, হিংসা, বিদ্বেষ, পরপীড়ন, পরনিন্দা পরচর্চা প্রভৃতি সকল ধর্মেই নিন্দনীয় ও সকল ধর্মশাস্ত্রে নিষিদ্ধ। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য প্রভৃতি যে সকল প্রবৃত্তি এই সকল অসৎকার্যের প্রবর্তক, সে সকলের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করা সকল দেশীয় সাধক-গণেরই মুখ্য সাধন। এই সাধন ক্ষেত্রে যাঁহারা একনিষ্ঠ তপস্বী, তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ কখনও সম্ভবে না, তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের অনুরক্ত, এমন কি এই সাধনপথে হিন্দু মুসলমানের এবং মুসলমান হিন্দুর সাহায্য ও সাহচর্য গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হন না। সুফী সম্প্রদায়ের মুসলমান এবং হিন্দু যোগীদিগের মধ্যে কিরূপ বন্ধুত্ব জন্মে, তাহা দেখিলে একান্ত সংকীর্ণচিত্ত ব্যক্তির হৃদয়ও কিছুকালের জন্য মিলন-আনন্দে উদ্ভাসিত হয়। এই সাধন ধর্মের মধ্য অঙ্গ; আচার-পদ্ধতি ধর্মের বহিরঙ্গ, এবং ধ্যান ধারণা, সমাধি, আত্মদর্শন, ব্রহ্মদর্শনই অন্তরঙ্গ। যাহা কিছু মতান্তর ও মনান্তর, সে সমস্তই বহিরঙ্গ লইয়া, সাধকের একটু অন্তর্দৃষ্টি হইলে বিবাদের আর স্থান থাকে না। কিন্তু হায়, সে দৃষ্টি অতি অল্প লোকেরই হইয়া থাকে। যাঁহাদের ধর্ম শাস্ত্রে ঈশ্বরের প্রধান দশটি আজ্ঞার মধ্যে "নরহত্যা করিও না" ইহা বিশেষ আজ্ঞা, তাঁহারা ধর্মের নামে নরমুণ্ড লইয়া কিরূপ তাণ্ডব নৃত্য করিয়াছে, ভাবিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। এমন কি, বিরুদ্ধ ধর্মাবলম্বী রণহত বীর পুরুষগণের মাংস দ্বারা আনন্দ ভোজন করিতেও ধর্মান্ধ ব্যক্তিরা সঙ্কোচবোধ করে নাই।

রাজনীতি লইয়া যখন একদেশবাসী এক ধর্মাবলম্বী শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যেও অত্যন্ত মতান্তর ও মনান্তর নিয়ত উৎপন্ন হইতেছে, তখন সমাজনীতি ও গার্হস্থ্যনীতি লইয়া যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মতান্তর ঘটিবে না, এরূপ আশা দুরাশা মাত্র। ধর্ম বস্তুটি নিত্য, সনাতন; সমাজ জিনিসটা সেরূপ নহে, উহা মানুষের মন গড়া বস্তু; প্রকৃতির তাড়নায় এবং মানব মনের বিভিন্ন আদর্শে উহা গঠিত হইয়াছে এবং প্রয়োজন ও আদর্শের পরিবর্ধন ও পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজও পরিবর্তিত হইতেছে এবং চিরকালই হইবে। ধর্ম এরূপ চঞ্চল বস্তু নহে, উহা অপরি-বর্তনীয়। শ্মশান কিম্বা সমাধির পর-পারে যাহার কিছুমাত্র অস্তিত্ব থাকিবে না, তাহা লইয়াই মানুষে বিবাদ বিসম্বাদ যুদ্ধ বিগ্রহ করিতেছে। যাহা মৃত্যুর পরেও সঙ্গে যাইবে, তাহা সকল সম্প্রদায়েরই "এক" বস্তু, তাহা লইয়া বিরোধ নাই মতান্তর নাই। এই মিলন ভূমি যে ব্যক্তি দেখিতে পায় না, সেই ব্যক্তিই ধর্মের নামে বিরোধ উৎপন্ন করে। যাহার পাপ তাপ দেখিয়া তুমি বিন্দুমাত্র ব্যথিত হও না, তাহাকেই ধর্ম দেওয়ার জন্য তুমি ব্যথিত করিতেছ! কতকগুলি বাহিরের বস্তুকে "ধর্ম" আখ্যা প্রদান করিয়া প্রকৃত ধর্মকে জলাঞ্জলি দিতেছ। তুমি কি মনে কর যে, হিন্দু অবতার ও ঋষিগণ, মুসলমান ধর্ম প্রবর্তক হজরৎ মহম্মদ এবং মুসলমান পেগাম্বরগণ, ইহুদী ধর্মের মুসা ও ইব্রাহিম এবং ঈষা ও পিটারগণ প্রভৃতি খৃষ্টীয় প্রেরিতগণ এবং শাক্য সিংহ ও কনফুস প্রভৃতি বৌদ্ধ যোগিগণ পরলোকে বিবাদ করিয়া কাল কাটাইতেছেন? অথবা তাঁহারা এই পৃথিবীতে চির বিরোধের সূত্রপাৎ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন?

বিশ্বাস নেত্রে চাহিয়া দেখ, তাঁহারা সকলেই তাঁহাদের অনুগতগণ লইয়া প্রেমানন্দে বিরাজ করিতেছেন এবং পৃথিবীর দিকে তাকাইয়া তোমাদিগের আচরণে বিস্মিত ও দুঃখিত হইতেছেন।

যাহাতে মনুষ্য সমাজের অনিষ্ট না হয়, এমন সকল আচার আচরণ সকলেই স্বাধীন-ভাবে করিতে পারে, ইহাতে বিচিত্রতা কিম্বা বিভিন্নতা থাকিবেই থাকিবে, কিন্তু যাহা ধর্ম, তাহা একই বস্তু, উহা অভিন্ন ও অপরিবর্তনীয়। অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, সরলতা, অচৌর্য প্রভৃতি উহার প্রথম স্তর, এই স্তরে উত্তীর্ণ হইলে তুমি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে; ইহার পরে ধ্যান, ধারণা সমাধি, আত্মদর্শন, ব্রহ্মদর্শন প্রভৃতি স্তরের পর স্তর অতিক্রম করিতে হইবে। প্রবেশিক পরীক্ষায় হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান সকলকেই এক ক্ষেত্রে বসিয়া পরীক্ষা দিতে হইবে। তাহাদের পাঠ্য এক এবং পরীক্ষার প্রশ্নও একই প্রকারের, পরীক্ষক একই ব্যক্তি সাধ্য সাধন কিছুই স্বতন্ত্র নহে, এইখানেই ধর্মের নিত্যত্ব এবং ইহাই সর্ব ধর্মাবলম্বীর "মিলন-ভূমি।"

(৭)

ভক্তি ও ভক্ত

ব্রাহ্মসমাজের প্রখর প্রতিভা-সম্পন্ন নায়ব ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র আপনার সাধকমণ্ডলী হইতে দুইজনকে বাছিয়া লইয়া বিশেষভাবে ভক্তি ও যোগ সাধনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন শ্রীশ্রীগুরুদেব (গোঁসাইজী), অন্যজন সাধু অঘোরনাথ একথা বলা বাহুল্য যে, কেশবচন্দ্র যে পথে এই সাধকদ্বয়কে পরিচালিত করিয়াছিলেন উহা তাঁহারই স্ব-কপোল-কল্পিত-পথ, কোন ঋষি প্রবর্তিত পরীক্ষিত প্রাচীন পন্থা নহে এই ভক্তি ও যোগ পথের পথিকদ্বয় একটি নির্দিষ্টকালের জন্য সংযম ও ব্রত অবলম্বন পূর্বক প্রগাঢ় অধ্যবসায় সহকারে স্ব স্ব পথে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করিলেন। ব্রত উদ্‌যাপনের দিনে আচার্য ব্রহ্মানন্দ সাধক দ্বয়কে যথাক্রমে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে

"তোমরা আজ ভক্তি ও যোগে সিদ্ধিলাভ করিলে।"

আচার্যের কথা শুনিয়া গোঁসাইজীর মনে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইল। তিনি বৈষ্ণব-সন্তান, শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর বংশধর, বাল্যকাল হইতে ভক্তির ও ভক্তের লক্ষণ শুনিয়া আসিয়াছেন, এক্ষণ এই অবস্থায় তিনি কিরূপে আপনাকে "ভক্তি-সিদ্ধ" বলিয়া মনে করিবেন? তিনি কেশবচন্দ্রকে আপনার মনের কথা খুলিয়া বলিলেন।

আচার্য কেশবচন্দ্র সত্য-গ্রহণের জন্য সর্বদা উন্মুক্ত-হৃদয় ছিলেন। যেরূপ লোকেরা আপনার সংকীর্ণ-গণ্ডীর বাহিরের কোন বস্তু গ্রহণ করিতে ভীত হয়, তিনি সেরূপ লোক ছিলেন না, তাঁহার সিংহের ন্যায় বিক্রম ছিল, আপনার অপ্রতিহত গতির জন্য তিনি কোন বাধা মানিতেন না। তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী ছিলেন না, সুতরাং নূতন কথা শুনিতে কি নূতন পথে চলিতে তিনি কখনও সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। গোঁসাইজী যখন কেশবচন্দ্রকে মনের কথা বলিতে লাগিলেন, তিনি শ্রদ্ধা ও মনোযোগ পূর্বক সমস্ত শুনিলেন।

গোঁসাইজী যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম এইরূপ,—

বৈষ্ণব শাস্ত্রে ভক্তির নিম্নলিখিত লক্ষণ বর্ণিত আছে,—

"ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদারুচিঃ॥
আশক্তিস্তদ্ গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্ বসতিস্থলে
ইত্যাদয়োহনুভাবাঃ স্যুঃ জাত ভাবাঙ্কুরে জনে॥

ইহার অর্থ এই যে, যাহাতে ভক্তির অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে আটটি গুণের আবির্ভাব দৃষ্ট হইবে, আটটি গুণ যথা,—

(১) ক্ষমা। (২) অব্যর্থকালত্ব। (৩) বৈরাগ্য। (৪) মানশূন্যতা। (৫) আশাবন্ধ সমুৎকণ্ঠা। (৬) নামগানে সদারুচি। (৭) তাঁহার (ভগবানের) গুণগানে আসক্তি। (৮) তাঁহার বসতিস্থানে প্রীতি।

১ম ক্ষমা। তিনি (যাঁহাতে ভক্তির অঙ্কুর জন্মিয়াছে) বৃক্ষের ন্যায় ক্ষমাশীল হইবেন। পথিকগণ বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গে, ফল পাড়িয়া খায়, তথাপি বৃক্ষ আপনার ছায়া ও আশ্রয়-দানে পথিককে বঞ্চিত করে না।

আমরা কি ক্ষমা করিতে শিখিয়াছি? যদি আপনি আমার কিছুমাত্র অনিষ্ট করেন, অথবা একটি লোকের নিকট কোন ব্যাপার লইয়া বিন্দুমাত্র নিন্দা করেন, আপনার আকৃতিটি আমার নিকট মলিন হইয়া যাইবে, আপনার শত প্রকারের গুণ থাকিলেও আমি আর প্রাণ খুলিয়া আপনার প্রশংসা করিতে পারিব না। সেই সামান্য নিন্দা, সামান্য ক্ষতি আপনার মূর্তিকে জড়াইয়া লইয়া আমার হৃদয়ে এমনই একটি কালো দাগ বসাইবে যে, আমি বহু তপস্যায়ও তাহা মুছিতে পারিব না। হৃদয়ে বিন্দুমাত্র ভক্তি-রসের সঞ্চার হইলে কিছুতেই এই দাগ উৎপন্ন হয় না। যৌবন যেমন শরীরের একটি অবস্থা বিশেষ, ক্ষমাও সেইরূপ মানসিক একটি অবস্থা। পরচুলা পরিয়া যেমন যৌবন পাওয়া যায় না, বিচার বিবেচনা করিয়া সেইরূপ প্রকৃত ক্ষমা উৎপন্ন হয় না। পুত্র জন্মিলেই যেরূপ অপত্যস্নেহ আপনি উদিত হয়, ভক্তি জন্মিলে ক্ষমাও সেইরূপ আপনি উৎপন্ন হয়, ভাবিয়া চিন্তিয়া ডাকিয়া হাঁকিয়া তাহাকে আনা যায় না। কাহারও প্রতি বিন্দুমাত্র বিরক্ত থাকিলে চিত্ত নির্মল হয় না, সুতরাং ভক্তি আসিবে কিরূপে?

দ্বিতীয়, অব্যর্থকালত্বং অর্থাৎ বৃথা সময় নষ্ট না করা—ভক্তির একটি লক্ষণ। শ্রীশ্রীগুরুদেব বলিয়াছেন, "সেই ব্যক্তি (ভক্ত) কাল ব্যর্থ যাইতে দেয় না। যাহাতে প্রভুর নাম নাই, সেবা নাই, এমন কার্য তিনি করিতে পারেন না। একটি শ্বাস প্রশ্বাসও ব্যর্থ যাইতে দেন না। কখন সৎসঙ্গ, কখন ধর্মগ্রন্থ পাঠ, কখন প্রভুর সেবাতে রত থাকেন।

"না কহিবে গ্রাম্য কথা গ্রাম্য আলাপন।"

ভগবৎ প্রসঙ্গ শূন্য সর্বপ্রকারের আলোচনাকে বৈষ্ণব সাধকগণ "গ্রাম্য কথা" ও "গ্রাম্য আলাপন" বলিয়াছেন।

তবে কি সংসারের অন্য কোন কাজ করিবে না? তাহা নহে, কাজত করিতেই হইবে, কেননা সর্বাভিলাষ পরিত্যাগপূর্বক ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করিতে তোমার শক্তি কোথায়? কাজ ত করিবে, কিন্তু কিভাবে করিবে?

বাড়িতে নূতন জামাই আসিলে মেয়েরা যেমন নানাপ্রকারের খাদ্য প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত থাকে, কিন্তু সেই সমস্ত ব্যস্ততার মধ্যে মনে সর্বদা এই ভাবটি জাগরূক রাখে যে, জামাইকে সন্তুষ্ট করার জন্যই সমস্ত কার্য করা হইতেছে, এইরূপ ভাবে সংসারের কার্য করিবে। গৃহিণী যেমন স্বামীর সংসার সাজায়, গোছায়; কিন্তু সর্বদাই স্বামীকে মনে রাখে, সেইরূপ ভাবে সংসার করিবে। শুধু "সু-গৃহিণী" হইলে চলিবে না, "পতিপ্রাণা" হওয়া চাই, নতুবা তোমার সমস্ত সংসারই মাটি হইল। আগে "প্রীতি" না হইলে কি "প্রিয়কার্য" হয়? সংসারটা স্বামীর বন্ধু, আগে স্বামীকে খুব ভালবেসে, তবে তাঁর বন্ধুর সঙ্গে মেলামেশা উচিত। নতুবা বিপদের সম্ভাবনা থাকে, কেন না সংসারও সু-পুরুষ বটে, তাতে যদি মন মজে যায়, তবে ব্যভিচার হলো। ভক্তি অব্যভিচারিণী, পতিব্রতা, সতী, তিনি অন্যের সঙ্গে ততটাই মিলিতে পারেন, যাতে স্বামীর অধিকার অক্ষুন্ন থাকে।

তৃতীয় লক্ষণ, বিরক্তি অর্থাৎ বৈরাগ্য। ব্রহ্মলোকের ভোগের ইচ্ছা পর্যন্ত পরিত্যাগের নাম বৈরাগ্য। শ্রীগুরুদেব বলিয়াছেন, "তিনি (ভক্ত) সর্বদাই এই ভাবিয়া থাকেন, আর সব অসার, আমার প্রভুই সার, তাঁহাকে ছাড়া আর কিছুই বুঝি না। অনাসক্তির অর্থ পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য পদার্থে বীতানুরাগতা।"

এই বৈরাগ্য শুষ্ক বৈরাগ্য নহে। সংসারের উপর চটিয়া গিয়া অথবা সংসারের ঝঞ্জাট ভাল লাগে না বলিয়া আলগা দেওয়ার নাম বৈরাগ্য নহে। প্রকৃত বৈরাগ্য আর প্রেম একই কথা। মা যখন হাটের মধ্যে হারাণো ছেলে খুঁজে বেড়ান তখন তিনি লোকের ভিড় ঠেলিয়া চলেন, উঁচু-নীচু খানা-খন্দ কিছুতেই তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না, "কোথা গেলিরে আমার প্রাণের ধন" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে তিনি শুধু ছুটিয়া চলেন। সেইরূপ যখন ভগবানের প্রতি টান হয়, "কোথায় তুমি, কোথায় তুমি, কোথায় আমার সর্বস্বধন" বলিয়া যখন প্রাণ অধীর হয়, তাঁহাকে না পাইয়া অন্য সমস্ত সুখের সামগ্রী যখন বিষের মতন বোধ হয়, তখনই বৈরাগ্যের উদয় হইল। ভক্তির অঙ্কুর জন্মিলে এইরূপে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়।

চতুর্থ লক্ষণ, মানশূন্যতা। গুরুদেব বলিয়াছেন,—"যাঁহার সর্বদাই অন্তরের দিকে দৃষ্টি থাকে, তিনি নিজকে ধূলা হইতে লঘু মনে করেন। যিনি সেরূপ নহেন, তিনিই নিজকে বড় ভাবিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি অনন্তেতে সব ডোবা দেখে, সকলকে সুন্দর দেখে, তার অহঙ্কার আসিতে পারে না।"

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন, তৃণ অপেক্ষা নীচু ও তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু হইয়া নিজে অমানী হইয়া অন্যকে মান দান করিয়া হরিনাম করিতে হয়। এই কথা শুনিয়া একজন বলিয়াছিলেন—

"বৈষ্ণব হইতে মনে ছিল বড় সাধ!
তৃণাদপি শ্লোক পড়ি ঘটিল বিষাদ।"

বস্তুত ভক্তির প্রকৃতি জলের মতন। উচ্চ ডাঙ্গায় যেমন জল দাঁড়ায় না, ভক্তি সেইরূপ অতি মানীর হৃদয়ে তিষ্ঠিতে পারে না। একটি সঙ্গীতে আছে,

"গৌর প্রেমের বন্যাতে ডুবলো সব ব্রিজগতে
সে জল রৈল বেধে নিম্ন হ্রদে রৈল না উচ্চ ডাঙ্গাতে
ইত্যাদি।"

বলিতে গেলে অভিমানই ভক্তির প্রধান শত্রু। যাঁহার হৃদয়ে ভক্তির অঙ্কুর মাত্র উৎপন্ন হয়, তাঁহার অভিমান থাকে না।

পঞ্চম লক্ষণ, "আশাবন্ধ সমুৎকণ্ঠা।" শ্রীগুরুদেব বলিয়াছেন, "তাঁহার (ভক্তের) প্রাণে আশাবন্ধ সমুৎকণ্ঠা বর্তমান থাকে। "এই আমার প্রিয়তম, এই যে প্রভু আর ভয় নাই" এই বলিয়া তিনি নিশ্চিন্ত। তিনি নিজের জন্য প্রভুর কাছে কিছু বলেন না। "প্রভু খাইতে দাও, পরিতে দাও" এরূপ কিছু প্রার্থনা করেন না। যেমন (শালবৃক্ষ) ঝড় বৃষ্টি রৌদ্র প্রভৃতির অত্যাচার সহ্য করিয়া স্থির থাকে, তেমনই তিনিও দুঃখ বিপদে অটল হইয়া থাকেন। তাঁহার আনন্দের

পরিসীমা নাই, অথচ তাঁহার প্রাণে ইষ্টদেবের জন্য লোভ সর্বদাই বর্তমান।"

পূর্ণ আশা অথচ দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠা, ইহাই আশাবন্ধ সমুৎকণ্ঠা। কি চমৎকার কথা! তিনি আমার, তাঁহাকে নিশ্চয়ই পাইব, এই বিশ্বাস ও আশা না থাকিলে কি লইয়া জীবনধারণ করিব? কিন্তু এই আশার উপর নির্ভর করিয়া ভক্ত কি বসিয়া কাল কাটাইতে পারেন? প্রাণনাথের মিলনের জন্য প্রতি পলে পলে তাঁহার প্রাণ ছট্‌ফট্ করিতে থাকে। শ্রীকবীর সাহেব বলিয়াছেন, "হে প্রিয়তম, তোমার বিরহ কালসর্পের আকার ধারণ করিয়া আমার কলিজায় ঘা করিয়াছে, তথাপি আমি পাশ ফিরিব না, তোমার যেমন ইচ্ছা তেমনই করিয়া যাও,"

ভক্ত কি করিয়া পাশ ফিরিবেন? পাশ ফিরিলে যে প্রিয়তমকে হারাইতে হয়।

শ্রীকৃষ্ণ আসিবেন, তাই পূর্ণ আশায় আশ্বস্ত হইয়া শ্রীমতী বাসর-শয্যা করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন, সে অপেক্ষার মধ্যে পলে পলে উৎকণ্ঠা। ভক্ত কবি জয়দেব গোস্বামী এই "আশাবন্ধ সমুৎকণ্ঠার" কথা ব্যক্ত করিতে যাইয়া বলিয়াছেন,—

"পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে
শঙ্কিত ভবদুপযানাং
রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং
পশ্যতি তব পন্থানাং"

পাখীটি নড়িতেছে, পাতাটি পড়িতেছে, অমনি শ্রীমতী প্রিয়তম আসিতেছেন ভাবিয়া চমকিয়া উঠিতেছেন, সচকিত নয়নে পথপানে তাকাইতেছেন; ভক্তের যদি ভগবানের জন্য এইরূপ অবস্থা হয়, তবে তাহাকেই বলে "আশাবন্ধ সমুৎকণ্ঠা।" ভক্তির অঙ্কুর মাত্র জন্মিলে সাধকের প্রাণে এইরূপ অবস্থা জন্মে।

ষষ্ঠ লক্ষণ, "নাম গানে সদারুচিঃ।" শ্রীশ্রীগুরুদেব বলিয়াছেন, "তিনি (ভক্ত) যে নাম করেন, করিতে হইবে বলিয়া করা নয়, রুচির সঙ্গে করেন। সে রুচি সর্বদাই শ্বাস-প্রশ্বাসের মতন লাগিয়া আছে। সুর মিলিল কিনা, তাল ঠিক হইল কিনা, এ সকলের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নাই, কেবল নামই তাঁহার লক্ষ্য। পথের মুটে-মজুরে যদি নাম করে, তাহা শুনিয়া "ও কে নাম কল্লে" বলিয়া তিনি মোহিত হইয়া যান।"

"নাম গানে সদারুচিঃ" এখানে "সদা" শব্দটির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিতে হইবে। সাধকমাত্রই জানেন যে, "নাম" ও "নামী" একই বস্তু, নামী ভিন্ন নামের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, বিভিন্ন মূর্তি নাই। ভক্তিশাস্ত্রে লিখিত আছে,—

"নামচিন্তামণিকৃষ্ণঃ চৈতন্যরস বিগ্রহঃ
নিত্য শুদ্ধঃ নিত্য মুক্তোঽভিন্নত্বান্নাম নামিনঃ॥"

নাম চিন্তামণি কৃষ্ণস্বরূপ, নামই বিগ্রহ। কিরূপ বিগ্রহ? রসবিগ্রহ। কিরূপ রসবিগ্রহ? চৈতন্য-রস-বিগ্রহ অর্থাৎ নাম চৈতন্যস্বরূপ, রসস্বরূপ ও বিগ্রহস্বরূপ। নাম নিত্য শুদ্ধ, নিত্য মুক্ত, কেননা নাম ও নামীতে কিছুই প্রভেদ নাই।

তুমি যে নাম জপ কর, সেই নামের মধ্যে তোমার পূর্ণাঙ্গ সাধনা জমাট বাঁধিয়া আছে। তুমি ঈশ্বর বলিতে যাহা কিছু বুঝ, সমস্তই তুমি ঐ নামে অর্পণ করিয়াছ। তোমার উপাসনা, আরাধনা, প্রার্থনা, সমস্তই ঐ নামে নিহিত আছে। নামের শব্দার্থের সহিত তোমার কোনই সম্বন্ধ নাই, কেননা তুমি তোমার সর্বস্ব দিয়া সেই নামকে সাজাইয়াছ, অভিধান খুঁজিয়া সে অর্থ কোথায় পাইবে? "পিতা" শব্দের অর্থ পালনকর্তা কিন্তু তুমি পিতা বলিতে কি শুধু পালনকর্তাই বুঝিয়া থাক? তোমার সাধনের নাম যদি ব্যাকরণের হিসাবে অর্থশূন্য হয়, তাহাতে তোমার বিন্দুমাত্রও ক্ষতি নাই।

সাধন বলে নাম "সজীব" হয়, তখন উহাকে সিদ্ধ-মন্ত্র বলে। তখন উহা "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া প্রাণকে আকুল করে।" ইহার পরে উহা "রসময়" হয়। তখন সাধক বলেন,—

"যপিতে যপিতে নাম ঐছন করল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।"

ইহার পরে নাম যখন "বিগ্রহ"রূপে অঙ্গ স্পর্শ করে, তখন প্রাণ মন ইন্দ্রিয়াদি কৃতার্থ হইয়া সেই বিগ্রহের সেবায় সম্পূর্ণ আত্ম-বিসর্জন করে। শ্বাস-প্রশ্বাস যেমন প্রাণরাজ্যের রাজা, সমস্ত দেহযন্ত্র যেমন উহারই অপেক্ষা করে, সেইরূপ "চৈতন্য রসবিগ্রহ নাম" মনোরাজ্যের রাজা হয়, উহা শ্বাস-প্রশ্বাসের মতন অবিরত প্রবাহিত হয় এবং সমস্ত ইন্দ্রিয় শক্তি ও বাসনা কামনা প্রভৃতি সর্বতোভাবে তাহাকেই পূজা করিয়া কৃতার্থ হয়। এই অবস্থায়ই "নাম গানে সদারুচি" উৎপন্ন হয় এবং ইহাই ভক্তি সঞ্চারের একটি লক্ষণ। *

সপ্তম লক্ষণ—আসক্তিস্তদ্ গুণাখ্যানে। এখানে "আসক্তি" শব্দটির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ধনের প্রতি কৃপণ ব্যক্তির যেরূপ প্রাণের টান, প্রণয়মুগ্ধ ব্যক্তির প্রণয়িনীর প্রতি যেরূপ অনুরাগ, তাহারই নাম আসক্তি। যাঁহার হৃদয়ে ভক্তির অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়াছে, ভগবানের গুণ-শ্রবণ-কীর্তনে তাঁহার সেইরূপ আসক্তি জন্মিয়া থাকে। প্রিয়তমের কথা বলিয়া শুনিয়া কি সাধ মিটে? তাঁর কথা, তাঁর প্র[illegible] "আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণাম[illegible] স্বাদনং।"

অষ্টম লক্ষণ—"প্রীতিস্তদ্‌বসতি স্থলে" ভগবানের বসতি স্থলে ভক্তের প্রীতি জন্মি[illegible] ভগবানের বসতি স্থান কোথায়? তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক পরমাণুতে অ[illegible] প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, সুতরাং সমস্ত জগ[illegible] প্রীতির চক্ষে দেখিতে হইবে। মানুষ চিন্তা করিয়া, বিচার করিয়া এইরূপ প্র[illegible] অর্পণ বা অর্জন করিতে পারে? তাহা কখ[illegible] সম্ভব নহে, তবে সূর্য উদিত হইলে যে[illegible] সমস্ত বস্তু প্রকাশিত হয়, সেইরূপ ভগব[illegible] প্রীতি হইলে সমস্ত বস্তুতে প্রীতি উৎ[illegible] হয়। প্রদীপ হাতে লইয়া তুমি কয়টি ব[illegible] দেখিবে? একটি দেখিতে গেলে অন[illegible] আঁধারে পড়িবে। গাছের গোড়ায় জল দি[illegible] যেমন সমগ্র বৃক্ষটিতে উহা সঞ্চারিত [illegible] সেইরূপ হরিকে প্রেম করিলে সে প্রেম সম[illegible] সৃষ্টিতে সঞ্চারিত হয়, ভক্তগণ ইহাই ব[illegible] গিয়াছেন। তখন আর বিচার-বিবেচনা ক[illegible] কাহাকেও ভালবাসিতে হয় না, প্রেম আপ[illegible] আসিয়া পড়ে।

শ্রীশ্রীগুরুদেব বলিয়াছেন—"যখন ভগবা[illegible] দিকে টান হয়, তখন সকল বস্তুই তাঁহার" [illegible] বলিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক পদার্থের উ[illegible] প্রাণের টান উপস্থিত হয়। তখন বিশ্ব[illegible] ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক পদার্থকে যেরূপ ভালবা[illegible] যায়, আগে কি তেমন ধারা হয়? আম[illegible] প্রিয়তমের বস্তু বলিয়া যে ভালবাসা তাহার [illegible] তুলনা আছে? কেহ যদি প্রণয়ীর পত্র পা[illegible]

* কলিকাতার মূক বধির বিদ্যালয়ের অন্য[illegible] শিক্ষক "নলদময়ন্তী" ও "হাসান হোসেন" নাম[illegible] উৎকৃষ্ট গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা শ্রীমান রেবতীমোহ[illegible] সেন নাম-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে যে সংগীত রচনা করিয়[illegible] ছেন, তাহা হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত কর[illegible] প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না, সু[illegible] সহিত যিনি উহা শুনিবেন তিনিই মুগ্ধ হইবে[illegible] যথা,—

"কৃষ্ণ ইতি আখর দুটি পুনহুঁ যব পরশে হৃ[illegible]
বদনে যব বিলসিত প্রাণমন ইন্দ্রিয়াদি
বাড়য় রতি রসনা কোটি লাগি। স্তব্ধ রহু মানি
বহুভাগী
(সখি এক মুখে আর সাধ মিটে না) * *

সে তাহাকে কত চুম্বন করে, কত আদর করিয়া সোণার কৌটায় রাখিয়া দেয়, উহাকে ইষ্ট-কবচ করিয়া রাখিলেও যথেষ্ট আদর হইল না বলিয়া মনে করে। এই যে বৃক্ষপত্র, এই যে চন্দ্রতারা, এ সকল তাঁহার হাতের অক্ষর, ইহা বুঝিলে ইহাদের আমি কোথায় রাখিয়া দিব? না, আমি 'হিরন্ময়ে পরে কোষে' রাখিয়া দিব।"

যাঁহারা অবতারবাদী, তাঁহাদের অবতীর্ণ ভগবান যেখানে যেখানে মর্তলীলা করিয়াছেন, সেই সেই স্থানের প্রতি তাঁহাদের বিশেষ প্রীতি জন্মে, তাই অযোধ্যা মথুরা বৃন্দাবন এবং নবদ্বীপ ও নীলাচল দেখিবার জন্য ভক্তের এত আকিঞ্চন। ভক্ত কি ভাবে ব্রজের ধূলিতে গড়াগড়ি দিয়া জীবন সার্থক জ্ঞান করেন, অবতারবাদী ভিন্ন অন্যে তাহা বুঝিতে পারিবে না। ভক্ত খৃষ্টান জেরুজালাম বলিতে যাহা বুঝেন, তাহা অপার্থিব বস্তু। বৌদ্ধগণ বুদ্ধগয়াকে যেরূপ প্রীতির চক্ষে দেখেন, অন্যে সেরূপ দেখিতে পারেন না।

ভক্তের ধর্ম, প্রেমের ধর্ম, যুক্তির দ্বারা বুঝা যায় না। তোমার প্রণয়িনীর ফটোখানা যে তোমার প্রণয়িনী নহে, তাহা তুমি নিশ্চয়ই জান, তবে উহাকে পুষ্প-চন্দনে সাজাইয়া তৃপ্তিলাভ কর কেন? উহা বুকে চাপিয়া ধরিয়া প্রাণ জুড়াইতে চাও কেন? শুষ্ক-হৃদয় তার্কিক বলিবে, "ইহা একান্তই কুসংস্কার" আর সে কথা শুনিয়া প্রেমিক বলিবে, "তুমি আমার নিকট হতে দূরে হও।"

মোট কথা, ভক্তির অঙ্কুর হইলে আর পাপ থাকিতে পারে না। শ্রীশ্রীগুরুদেব বলিয়াছেন, "যদি আমি পরমেশ্বর পরমেশ্বর বলি, নাচি কাঁদি; কিন্তু পরস্ত্রীকে কুভাবে দর্শন করি, মিথ্যা বলি, স্বার্থ স্বার্থ করিয়া বেড়াই—তবে আমি এখনও তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই, আমার ভালবাসা পাপে। একটু প্রেম হইলে কি আর পাপ থাকে?" অন্যত্র "যেমন জলে হাত দিয়ে, আগুনে হাত দিয়ে (উহার অস্তিত্ব) প্রতীত হয়, পরমেশ্বর আছেন; এটি যতদিন তেমনি ধারায় প্রতীত না হয়, ততদিন প্রেম হয় না।" আমি একদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, পাপ যায় কিসে? প্রত্যুত্তরে তিনি সুর করিয়া গাহিলেন,—"প্রেমমুখ দেখরে তাঁহার।"

কোন একটি জিনিসের বস্তার গায়ে "উত্তম জিনিস" মার্কা মারিলেই উহার ভিতর-কার জিনিস প্রকৃতপক্ষে উত্তম হয় না, সেইরূপ কতকগুলি তত্ত্বকথা মুখস্থ করিয়া 'ভক্ত' কি 'জ্ঞানী' উপাধি ধারণ করিলেই কেহ কখন ভক্ত বা জ্ঞানী হয় না। ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য মহাশয় এই জন্যই বড়ই সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহার 'ব্রাহ্ম ধর্ম' গ্রন্থে তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্বজ্ঞানীর লক্ষণ দিয়াছেন, বলা বাহুল্য যে, তিনি মনগড়া কথা লেখেন নাই, হিন্দু শাস্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ভগবান আমাদের দেশকে এই বিপদের হস্ত হইতে রক্ষা করুন, আমরা যেন ঋষি-প্রবর্তিত আদর্শকে খর্ব না করি এবং নিজে উচ্চে উঠিয়া ধর্মের সঙ্গে মিলিতে না পারিয়া ধর্মকে নীচে নামাইয়া আপনার সঙ্গে মিলাইয়া তৃপ্তিলাভ না করি।

আমরা যতই হীন হই না কেন, আমাদের আদর্শ যেন উচ্চ থাকে। (ক্রমশঃ)

যুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষে মধ্যবিত্তের অর্থনীতি, রাজনীতি

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র মণ্ডল
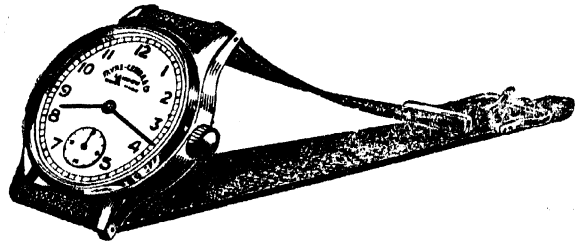
মধ্যবিত্তের অর্থনীতি ও রাজনীতি সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে প্রথমেই **প্রশ্ন** উঠে মধ্যবিত্ত কাহাকে বলিব। মধ্যবিত্তের সঠিক রূপটি কি? আমরা কি উপায়ে মধ্যবিত্তের স্বরূপ নির্ণয় করিব? একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ আয়ের মাপকাঠি দিয়া অথবা অর্থ-উপার্জনের একটি নির্দিষ্ট অবলম্বনের মাপকাঠি দিয়া? প্রথম মাপকাঠি দিয়া বিচার করিতে গেলে মধ্যবিত্তের কোনো সংজ্ঞাই পাওয়া যায় না; কারণ মধ্যবিত্তশ্রেণী কোনো এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। যাহাদিগকে আমরা স্বভাবতই মধ্যবিত্ত বলিয়া মনে করি তাহাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে যাহার মাসিক আয় ৬০৲ মাত্র আবার এমন ব্যক্তি আছে যাহার মাসিক আয় ৩০০৲। স্বভাবতঃই যাহাকে আমরা মধ্যবিত্ত বলিয়া মনে করি তাহার সংজ্ঞা কেবলমাত্র আয়ের মাপকাঠির পরিবর্তে জীবিকা অর্জনের **পদ্ধতি** এবং আয় দুইটিকে বিচার করিয়াই নিরূপণ করিতে পারি। এইরূপ মাপকাঠি দিয়া বিচার করিলে তাহাদিগকেই মধ্যবিত্ত বলিব যাহারা অন্যের কাছে কায়িক পরিশ্রম বিক্রয় করিয়া জীবিকা অর্জন করে না অথবা কোনো সুবৃহৎ সম্পত্তির মালিকানার বলে বড় রকম চাকুরীর গুণে বড় রকমের আয় ভোগ করে না। অর্থাৎ মধ্যবিত্তের পর্যায়ভুক্ত হইতেছে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ঃ—

(১) যাহারা মানসিক পরিশ্রম বিক্রয় করিয়া মাঝারি রকমের অর্থ উপার্জন করে; যথা ঃ—কেরাণী, শিক্ষক, অধ্যাপক, আইনজীবী চিকিৎসক ম্যানেজার প্রভৃতি।

(২) যাহারা নিজ কায়িক পরিশ্রম স্বাধীনভাবে নিয়োগ করিয়া জীবিকা অর্জন করে; যথা ঃ—তন্তুবায়, কর্মকার প্রভৃতি শিল্পী এবং সম্পন্ন কৃষক।

(৩) যাহারা অনধিক মূলধন বা সম্পত্তির মালিকানার গুণে ছোটো খাটো ব্যবসা পরিচালনা করিয়া মাঝারি রকমের আয় উপার্জন করে; যথা ঃ—ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার প্রভৃতি।

এখন আমাদের আলোচনার বিষয়—ভারতবর্ষের মধ্যবিত্ত সমাজের উপর সাম্প্রতিক যুদ্ধের কি প্রতিক্রিয়া ঘটিয়াছে। মধ্যবিত্ত আজ কোথায়? কি তাহার ভবিষ্যৎ?

বর্তমান কালের যুদ্ধের ন্যায় একটি সর্বব্যাপী মহাযুদ্ধ সমাজের মধ্যে বিরাট বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। সাম্প্রতিক যুদ্ধকে ভারতবর্ষ সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করে নাই সত্য। এ দেশের একটি ক্ষুদ্র অংশই যে সাক্ষাৎভাবে সমর প্রাঙ্গণে সমাবিষ্ট হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা হইলেও এই যুদ্ধ আমাদের দেশে যেভাবে আর্থিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা ইংলণ্ড বা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বা সোভিয়েট রাষ্ট্রে ঘটে নাই। অথচ শেষোক্ত দেশগুলি আমাদের দেশ অপেক্ষা অনেক গুণে অধিকভাবে যুদ্ধের সঙ্গে বিজড়িত ছিল। আমরা যে বিপর্যয়ের কথা এখানে বলিতেছি তাহা হইতেছে নিদারুণ ধন বৈষম্য এবং শ্রেণী-ব্যবধান। যে ধনবৈষম্য ভারতবর্ষে যুদ্ধের পূর্বেই অত্যন্ত অশোভনীয়ভাবে বিদ্যমান ছিল তাহা যুদ্ধের মধ্যদিয়া বহুগুণে তীব্রতর হইয়াছে। যুদ্ধের সময় রাষ্ট্র কর্তৃক যে বিপুল অর্থব্যয় হয় তাহার ফলে একদল ব্যক্তির নিকট হইতে অন্যদল ব্যক্তির নিকটে বহুল পরিমাণ অর্থ হস্তান্তরিত হইয়া যায়। আসলে যাহারা সামরিক পণ্য সরবরাহ করিতেছে অথবা সমরক্ষেত্রে কাজ করিতেছে অথবা কোনো না কোনো ভাবে যুদ্ধের সঙ্গে নিজদিগকে সম্পর্কিত করিয়াছে, যুদ্ধকালে ব্যয়িত অর্থ তাহাদের নিকটে গিয়াই উপস্থিত হয়। যুদ্ধের সময়ে সমস্ত পণ্যের চাহিদা বাড়ে বলিয়া ব্যবসায়ীরা বিশেষ লাভবান হন। কিন্তু যাহারা কোনো ভাবেই যুদ্ধের সঙ্গে নিজদিগকে সম্পর্কিত করিতে পারে না তাহারা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়; কারণ সকলের ন্যায় তাহারাও রাষ্ট্রের যুদ্ধকালীন ব্যয় সংকুলনের জন্য নূতন নূতন কর বহন করে এবং তাহা ছাড়া বহু গুণ বর্ধিত মূল্যে পণ্য ক্রয় করে কিন্তু পরিবর্তে বিশেষ কিছুই লাভ করে না। সুতরাং বলিতে পারি তাহাদের নিকট হইতেই অর্থ বাহির হইয়া গিয়া যুদ্ধ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলে। যুদ্ধের সময় দ্রব্যমূল্য যেরূপ বৃদ্ধি পায় তদনুপাতে যাহাদের উপার্জন বৃদ্ধি পায় না, তাহাদের নিকট হইতে বহু অর্থ বর্ধিত মূল্যে দ্রব্য ক্রয়ের মধ্য দিয়া হাতছাড়া হইয়া গিয়া ব্যবসায়ীদের নিকটই উপস্থিত হয়। তাই যুদ্ধের ফলে যাহারা লাভ করে তাহাদের মধ্যে ব্যবসায়ী এবং পুঁজিপতিরাই সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে। শ্রমিকের আয়ও বৃদ্ধি পায় কিন্তু শিল্পপতিদের মুনাফার তু[...] তাহা কম। অর্থের এইরূপ হস্তান্তরিতক[...] পরিমাণ নির্ভর করে দেশের অর্থনৈ[...] অবস্থা রাষ্ট্রের দ্বারা কতখানি নিয়[...] হইতেছে তাহার উপর। যে দেশের পণ্য [...] এবং পণ্য বণ্টন রাষ্ট্রের দ্বারা যত [...] নিয়ন্ত্রিত সে দেশে অর্থের হস্তান্তরিত[...] ততই কম পরিমাণে ঘটে। সাম্প্রতিক যুদ্ধে[...] ভারতবর্ষে যখন রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ চালু হইল [...] দেশের আর্থিক অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে চ[...] গিয়াছে। তাই দেখিতে দেখিতে খাদ্যা[...] বাঙলাদেশে ৩৫ লক্ষ লোকের জীবন [...] হইয়া গেল। জীবনধারণের শেষ সম্বলট[...] তাহাদের হাতছাড়া হইয়া গিয়া ব্যবসায়ীর ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিল। একথা আমরা কিছুতেই ভুলিয়া না যাই যে সাম্প্রতিক য[...] ধনিক বা বণিকের যে নূতনতর সম[...] ঘটিয়াছে তাহা বহুলোকের অনাহারে মৃত্যু[...] বা নূতনতর দারিদ্র্য সৃষ্টির মধ্য দিয়াই স[...] হইয়াছে। যুদ্ধের ফলে এদেশে দরিদ্র হইয়[...] দরিদ্রতর ব্যক্তিরা এবং ধনী হইয়াছে বহু[...] অধিকতর ধনীবৃন্দ; আর মধ্যবিত্তের অব[...] শ্রমিকের অপেক্ষাও অধঃপতিত হইয়া[...] অধ্যাপক কে টি সা ভারতবর্ষে বিভিন্ন শ্রে[...] মধ্যে ধন-বণ্টনের যে চিত্র দিয়াছিলেন ত[...] এই ঃ—

> জমিদার ও পুঁজিদারগণ সমগ্র [...] সংখ্যার শতকরা ১ ভাগ মাত্র হইয়া স[...] জাতীয় আয়ের শতকরা ৩৩ ভাগ লাভ ক[...] মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সমগ্র জনসংখ্যার শত[...] ৩৩ ভাগ হইয়া সমগ্র জাতীয় আয়ের শত[...] ৩৩ ভাগ লাভ করে। শ্রমিকগণ সংখ্যায় স[...] ভারতবর্ষের শতকরা ৬৬ ভাগ হইয়া জা[...] আয়ের শতকরা ৩৪ ভাগ লাভ ক[...]
> (Economic Background—Oxf[...] Pamphlet পৃঃ ১[...]

ইহা হইতে মধ্যবিত্তের অবস্থা সম্ব[...] যাহা বুঝিতে পারি তাহা এই—একজন মধ্য[...] যাহা উপার্জন করে তাহার ৩৩ গুণ অ[...] উপার্জন করে একজন জমিদার বা পুঁজিদ[...] কিন্তু মধ্যবিত্ত যাহা উপার্জন করে ত[...] সাধারণ শ্রমিকের মাত্র দুইগুণ অধিক। [...] ছিল সাম্প্রতিক যুদ্ধের আগের অবস্থা। ই[...] সঙ্গে তখনকার বেকার সমস্যার কথাও স্ম[...] করা একান্ত প্রয়োজন। এই বেকার সমস্যা [...]

কাজেই মধ্যবিত্তের বেকার সমস্যা, শ্রমিকের য়। মধ্যবিত্তের উপযোগী কাজের পরিমাণ ম। শ্রমিকের পর্যায়ে নামিয়া আসিলে তাহাদের কাজ জুটে। কিন্তু চিরকালের সংস্কার মধ্যবিত্তকে কায়িক পরিশ্রমের পথে গিয়া উপার্জন করিতে বাধা দেয়। তাই তাহারা পূর্বপুরুষের সঞ্চয়ের উপর নির্ভর করিয়া কোনো মতে নিজেদের কৌলিন্য বজায় রাখিতেছিল।

যুদ্ধ বেকারসমস্যার সমাধান লইয়া আসিল। যুদ্ধকালীন নানাপ্রকার কাজে মধ্যবিত্তেরা তাহাদের স্থান করিয়া লইল। কিন্তু বেকারসমস্যার সমাধান হইলেও তাহাদের আর্থিক অবস্থার মোট উন্নতি না অবনতি ঘটিয়াছে? অবনতি যে ঘটিয়াছে তাহা সুস্পষ্ট। কাজ পাইয়া তাহারা কোনো মতে অনাহার-মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচিয়াছে মাত্র। কিন্তু তাহাদের অবস্থা নীচে নামিয়া গিয়াছে। বেকারসমস্যার সমাধানের মধ্য দিয়া কোনো একটা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের আয় যদি শতকরা ৫০ ভাগ বাড়িয়া থাকে জীবনধারণের ব্যয় বাড়িয়াছে শতকরা ২০০ ভাগ। কিন্তু ধনিক শ্রেণীর দিকে তাকাইলে দেখা যায় দ্রব্যমূল্য যেভাবে বাড়িয়াছে তাহা অপেক্ষা তাহাদের মুনাফা অধিক গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। এইভাবে ধনীর মোট তহবিল পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ ফাঁপিয়া উঠিয়াছে। Wadia & Merchant লিখিত Our Economic Problem নামক পুস্তকে দেখা যায় বোম্বাই-এর কাপড়ের কলগুলি ১৯৪১-এ ১৯৪০-এর উপর শতকরা ১২৮৮ ভাগ অধিক মুনাফা অর্জন করিয়াছে। আবার কতকগুলি কল ১৯৪২ সালে যাহা লাভ করে তাহা ১৯৪০-এর অপেক্ষা শতকরা ২২৫০ ভাগ অধিক (Our Economic Problem পৃঃ ৩৮০)।

চোরাবাজার হইতে অর্জিত মুনাফার কোনো হিসাব নাই। কিন্তু অনুমানে বোঝা যায় উহা হইতে ব্যবসায়ীর লাভের অঙ্ক আশ্চর্যজনকভাবে বাড়িয়া গিয়াছে।

তথাকথিত মধ্যবিত্ত হইতে ধনিক শ্রেণী আজ বহুগুণ ঊর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছে। যুদ্ধের পূর্বে যদি ধনিকের আয় মধ্যবিত্ত অপেক্ষা ৩৩ গুণ অধিক ছিল বর্তমানে উহা অন্তত ১০০ গুণ অধিক হইয়াছে। মধ্যবিত্ত এবং সাধারণ শ্রমিকের অধঃপতনের মধ্য দিয়াই উহা সম্ভব হইয়াছে; কারণ আগেই বলিয়াছি এদেশে যুদ্ধের মধ্য দিয়া অর্থ কিভাবে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

সুতরাং দেখিতে পাইতেছি যুদ্ধের মধ্য দিয়া ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণী ধনিকশ্রেণী হইতে অধিকতর দূরাপসারিত হইয়া শ্রমিক-শ্রেণীর অধিকতর নিকটে আসিয়াছে। যুদ্ধের আগের হিসাবেই দেখা যায় শ্রমিকের অপেক্ষা মধ্যবিত্তের অবস্থা যদি দুইগুণ উন্নত ছিল মধ্যবিত্ত অপেক্ষা ধনিকের আয় ছিল ৩৩ গুণ অধিক। সুতরাং শ্রমিকের এবং মধ্যবিত্তের ব্যবধান যাহা ছিল তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল ধনিকের সঙ্গে মধ্যবিত্তের ব্যবধান। সাম্প্রতিক যুদ্ধে শ্রমিকের আয় অনুমান শতকরা ৪৫ ভাগ বাড়িয়াছে* কিন্তু বেকারসমস্যার সমাধানের মধ্য দিয়া মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মোট আয় কিছু পরিমাণে বাড়িলেও প্রতি উপার্জনকারীর আয়ের হার শ্রমিকের অপেক্ষা অনেক কম বাড়িয়াছে। উপরন্তু শ্রমিক-পরিবারের মধ্যে উপার্জনশীল ব্যক্তির সংখ্যা মধ্যবিত্ত পরিবারের তুলনায় অধিক। এই সমস্ত বিষয় বিচার করিয়া দেখিলে পরিষ্কার বোঝা যায় শ্রমিক ও মধ্যবিত্তের ব্যবধান যুদ্ধের পূর্বে যেটুকু ছিল তাহা বর্তমানে অনেক কমিয়া গিয়াছে। এদিকে যুদ্ধ থামিয়া যাওয়াতে মধ্যবিত্ত পুনরায় যেভাবে বেকারসমস্যার সম্মুখীন হইতেছে শ্রমিক সেরূপ নহে।

মোটের উপর আজ ভারতবর্ষে শ্রমিকের ভাগ্যের সঙ্গে মধ্যবিত্তের ভাগ্য অধিকতর জড়াইয়া গিয়াছে। ইহাই হইতেছে বাস্তব অবস্থা।

এই বাস্তব অবস্থা আজ ভারতের মধ্যবিত্তের উপলব্ধি করার দিন আসিয়াছে। তাহাদের ভুলিবার দিন আসিয়াছে তাহারা শ্রমিক হইতে অর্থনৈতিক দিক দিয়া উচ্চস্তরে অবস্থিত। তাহাদের পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, যে সমাজ ব্যবস্থার দ্বারা শ্রমিকের অধিকার ও কল্যাণ স্থিরীকৃত হইবে তাহার মধ্যে মধ্যবিত্তের শ্রীবৃদ্ধিও অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। তাহাদের উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে সমাজ-ব্যবস্থা শ্রমিককে করিয়াছে দরিদ্র তাহার মধ্যে মধ্যবিত্তেরও অধঃপতনের বীজ রহিয়াছে। এই উপলব্ধি হইতেই মধ্যবিত্তের একটি সঠিক এবং সুষ্ঠু রাজনীতির বিকাশ ঘটিয়া ধীরে ধীরে চারিদিকে ব্যাপ্ত হইবে।

যদি ধরিয়া লই শ্রমিকের কল্যাণ হইবে সেই সমাজ ব্যবস্থায় যেখানে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমস্ত জমি এবং উৎপাদন যন্ত্র অধিকৃত এবং নিয়ন্ত্রিত করে, সেখানে মধ্যবিত্তের কি স্থান হইবে? বৈদেশিক শাসনের অবসানে ভারতবর্ষে যদি ঐরূপ একটি সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে শ্রমিকের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্তের অবস্থা যে উন্নীত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই, অবশ্য তখন তাহার মধ্যবিত্ত নাম আর থাকিবে না—সমগ্র সমাজ-দেহের সহিত সে তখন গোত্রহীনভাবে একীভূত হইবে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্গত যে শিক্ষকেরা বর্তমানে অতিশয় দীনহীনভাবে জীবন যাপন করিতেছে নূতন ব্যবস্থায় তাহারা জাতিকে নূতনভাবে গড়িয়া তোলার দায়িত্ব পালন করিয়া তাহার যথোচিত মূল্য লাভ করিবে।

কাজের অভাবে যাহারা আজ জমির মধ্যস্বত্বের উপর জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইতেছে তাহারা হইবে যৌথ-কৃষি এবং বৈজ্ঞানিক উৎপাদনের নেতা।

যাহারা আজ ছোটো খাটো ব্যবসায় বা বৃত্তি হইতে অনিশ্চিত লাভের উপর জীবন ধারণ করিতেছে তাহারা হইবে সমবায় বিক্রয়-ব্যবস্থার পরিচালক।

নূতন ব্যবস্থার মধ্যে জাতির উৎপাদন এতগুণ বাড়িয়া যাইবে যে, তাহাতে সর্বসাধারণই স্বচ্ছন্দ-জীবন যাপনের উপায়গুলি লাভ করিবে।

ভারতবর্ষে শ্রমিক এবং মধ্যবিত্তের রাজনীতির মধ্যে যদি ঐক্য ঘটে তাহাকে পরাভূত করিবার শক্তি কাহারও নাই। কারণ শ্রমিক এবং মধ্যবিত্ত হইতেছে ভারতের জন-সংখ্যার শতকরা ৯৯ ভাগ; নিছক সংখ্যাবলেই তাহারা জয়লাভের পথে অগ্রসর হইবে।

---

* Modern Review, August, 1946-এ প্রকাশিত লেখকের প্রবন্ধ The Movement of Profits and Wages in India during the war দ্রষ্টব্য।

সাহিত্য প্রসঙ্গ

লেখার খেলা

শ্রীদেবব্রত ঘটক

লেখা আর খেলার মধ্যে তফাৎ যা তা শুধু অক্ষর আর আকার-একারের রকম ফের। বাস্তবিক ও দুটো শব্দে পার্থক্য কিছু নেই। খেলা যত সহজ লেখাও তত অনায়াস-সাধ্য। কিন্তু খেলার মত খেলা আর লেখার মত লেখা ঠিক তত সহজ নয়। খেলতে আমরা সবাই পারি তাই বলে আমরা সকলেই কি ব্র্যাডম্যান? খেলতে নামলে ব্র্যাডম্যানের সেঞ্চুরী যেমন অবধারিত, প্রায় 'মিস' হয় না বললেই চলে, তেমনি রবীন্দ্রনাথের লেখা ভালো না হয়ে উপায় নেই। চেষ্টা করেও তিনি আমার-আপনার মত লিখতে পারেন না। তবেই দেখা যাচ্ছে লেখা আর খেলার মধ্যে যতটুকু প্রভেদ ঠিক ততটুকুই ব্যবধান আছে ব্র্যাডম্যানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের। দুজনেই খেলেন, একজন ব্যাট দিয়ে আর একজন কলম দিয়ে। একজন লেখক আর একজন খেলক। কিন্তু আসলে দুজনেই আর্টিষ্ট।

আর্ট বলতে সাধারণত সাহিত্য, চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত, ভাস্কর্য ইত্যাদি বুঝে থাকি। কিন্তু আর্টের সার্থকতা কিসে? আর্টিস্টের উদ্দেশ্য কি? এ নিয়ে বহু তর্ক, আলোচনা এবং সমালোচনা ইতিপূর্বে হ'য়ে গেছে। সে-সব আলোচনার জলীয় অংশটুকু বাদ দিলে যা থাকে তা হচ্ছে এই—আর্টিস্টের উদ্দেশ্য খেলা করা। কথা নিয়ে খেলা, সুর নিয়ে খেলা, রং নিয়ে খেলা। যে সাতটি পোষা পাখীর সুরকে কতরকমে সুসংবদ্ধভাবে বাতাসে ছড়িয়ে দিতে পারে, যে কথা দিয়ে মালা গাঁথতে পারে, তোতা বাঁধতে পারে এ-খেলা তারই খেলা। এ-খেলায় আর্টিস্টের আনন্দ আছে এবং অন্যজন যখন এই আনন্দের ভাগ নিতে পারে, লেখকের মনের সহিত পাঠকের মনের যখন যোগাযোগ ঘটে তখন তা সাহিত্য হোয়ে ওঠে, সত্যিকার সাহিত্য। তাতে বাস্তবতাই থাক বা আদর্শবাদই থাক এমনকি প্রচারবাদও যদি থাকে তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু তা লেখার মত লেখা হওয়া চাই। খেলার লেখা হলে চলবে না। আর এ-খেলা, এই লেখার খেলা সকলে পারে না। যে পারে সে আপনি পারে, পারে সে ফুল ফোটাতে।

এই ফুল ফোটানো, সমস্ত দুঃখ-বেদনার কাঁটাকে ধন্য করে একটি গোলাপের বিকশিত হয়ে ওঠা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। নীহারিকার মত যে অনুভূতি মনের আকাশে নিরবলম্ব হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাকে কতকগুলো অক্ষরের ভিতরে একটি নির্দিষ্ট রূপ দেওয়া যেন অত্যাশ্চর্য ঘটনা। গুটিকয়েক অক্ষরের সমাবেশ, কমা দাঁড়ি ও ড্যাসের প্রয়োগ আর তাইতেই চোখের সামনে (অবশ্য যদি চোখ থাকে) দেখা দেয় অভিনব রূপ যা আগে দেখিনি কিম্বা দেখলেও এমন করে দেখিনি। আমি যে এত ভালোবাসি, আমার বিরহ যে এত অপার তা প্রথম অনুভব করলাম 'মহুয়া' পড়বার পর, যদিও একথা সাহস ক'রেই বলা যায় যে, হৃদয়ের দিক থেকে আমার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আসমান-জমীন ফাড়াক নেই। আমার দুঃখ-বোধ সকলের দুঃখ-বোধ। আমি যে জিনিষটি চোখ দিয়ে যেমন দেখি আর সকলেও সেই জিনিষটি ঠিক সেই ভাবেই দেখে। হ'তে পারে তার চোখ পদ্মপলাশের মত এবং আমার একটা চোখ কাণা। যদিও আমার চোখ কালো এবং তার চোখ ঘন নীল। কিন্তু নীল-নয়নাই হোক বা কাণা-চোখই হোক, চামড়া শাদাই হোক বা কালোই হোক, চামড়ার নীচে যে রক্ত আছে তা শাদাও নয়, কালোও নয়। তা সম্পূর্ণ লাল, একেবারে নিষ্কলঙ্ক লাল। তাহ'লে লেখকের সঙ্গে পাঠকের বিভেদ কোথায়? বিভেদ শুধু প্রকাশ-ভঙ্গীর বৈচিত্র্যে, তফাৎ শুধু বলবার কায়দায়, অক্ষর সাজানোর ওস্তাদিতে। ওস্তাদ লেখক জানেন কোন শব্দ দেখতে ছোট হোলেও ওজনে ভারী, কোন কথা না বলে কোন কথা বলা যায়। শব্দ যোজনার কৌশল কেমন করে একটা সম্পূর্ণ মনোভাব কুজ্ঝটিকাহীন রৌদ্রের মত ঝক্‌ঝক্ করে ওঠে। তিনি জানেন কোন অক্ষর পর পর ঠিক মত সাজিয়ে গেলে পাঠকের চোখে শ্রাবণের মেঘের মত অশ্রুভারানত কালো ছায়া এসে পড়ে, বা কোন কথায় মনের ছাই-চাপা আগুন উস্কে দেওয়া যায়। অর্থাৎ যিনি লেখক, জাত-লেখক যিনি তাঁকে Juggler of words বললে ভুল বলা হবে না।

সুতরাং জাত-লেখক মাত্রেই প্রতিভাবান। কিন্তু এর বিপরীত সব সময় ঠিক নাও হ'তে পারে। কারণ সৃষ্টি এবং প্রতিভা একই বস্তুর দুটো দিক হ'লেও এক জিনিষ নয়। প্রতিভাকে কাজে লাগাতে গেলে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়। অনেক তপস্যায় তবে সিদ্ধিলাভ। সার্থক সৃষ্টির পিছনে বহু পরিশ্রমের দুঃখ, অনেক রাত-জাগা ক্লান্তির ইতিহাস। অথচ তা যবনিকার আড়ালে আত্মগোপন করে থাকে— পাদপ্রদীপের সম্মুখে বার হবার তার যোগ্যতা নেই। কারণ তা নিতান্তই কাঠ-খড় আর কেরোসিন তেল।

কিন্তু প্রতিভা জিনিষটা কি? এ কি ভগবদ্দত্ত? দয়ার দান? সর্বসাধারণের, সকল মানুষের কি তাতে সমান অধিকার নেই? এ-সম্পর্কে এক কৌতুকজনক উক্তি মনে পড়ছে। উক্তিটি এক বিখ্যাত লেখকের, জাত-লেখকের (যদিও তিনি নিজে জাতি-ভেদ মনেন না)। প্রতিভার বিশ্লেষণে উক্ত লেখক যখন বলেন—Genius means one per cent inspiration and ninety-nine per cent perspiration তখন আমরা চমকে উঠি তাঁর অসাধারণ বাগ্‌বৈদগ্ধে। ইন্‌সপিরেশন ও পারস্‌পিরেশনের পার্থক্য ধরতে না পারলেও এটুকু বুঝতে পারি যে, বাক্-পটুতায় লেখক সবিশেষ পারদর্শী। ভাষা নিয়ে অমন সাবলীল খেলা, অমন সাহিত্যিক অঙ্ক কষা অন্তত আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যেহেতু আমার প্রতিভা তাঁর তুলনায় শতকরা মাত্র এক ভাগ।

বাঙলা সাহিত্যে কথা নিয়ে যিনি সফলভাবে খেলা করেছেন, কথাশিল্পী যদি কেউ থাকেন তবে তিনি প্রমথ চৌধুরী। অমন লিপিচাতুর্য, ভাষার অমন সূক্ষ্ম কারুকার্য সচরাচর নজরে পড়ে না। উন্মুক্ত তরবারির মত তাঁর ভাষা ঝিলিক দিয়ে ওঠে। তাতে যেমন ধার তেমনি ভার। কথায় যেমন রং বলার তেমনি ঢং। সামান্য বস্তু মাত্র কয়েকটি অক্ষর প্রয়োগে কেমন অসামান্য হ'য়ে উঠেছে তাঁর কলমে তার একটু নমুনা দেখুন। যেমন ধরুন চোখ। আসলে চোখ জিনিষটা কি? আইরিস, লেনস্, রেটিনা ইত্যাদির যথাযথ সমন্বয় বই তো নয়? কিন্তু সেই চোখ প্রমথ চৌধুরীর ভাষায় কেমন দেখায় তা দেখুন—

"আমি তার সমুখে থমকে দাঁড়িয়ে, নির্নিমেষে তার দিকে চেয়ে রইলুম। দেখি, সেও এক দৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। যখন তার চোখের উপর আমার চোখ তখন দেখি তার চোখ দুটি আলোয় জ্বল-জ্বল করছে। মানুষের চোখে এমন জ্যোতি আমি জীবনে আর কখনো দেখিনি। সে আলো

তারার নয়, চন্দ্রের নয়, সূর্যের নয়—বিদ্যুতের। সে আলো জ্যোৎস্নাকে আরো উজ্জ্বল করে তুললে, চন্দ্রালোকের বুকের ভিতর যেন তাড়িৎ সঞ্চারিত হ'ল।"

সেই চোখ আবার দেখুন। "আমার মনে হ'তে লাগলো যে, তার চোখ দুটি যেন ছুরির মত আমার পিঠে বিঁধছে। এতে আমার এত অস্বোয়াস্তি করতে লাগলো যে, আমি আবার তার দিকে ফিরে দাঁড়ালুম। দেখি, সেই মুখ-টেপা হাসি তার মুখে লেগেই রয়েছে। ভালো করে নিরীক্ষণ করে দেখলুম যে, এ-হাসি তার মুখের নয়, চোখের। ইস্পাতের মত নীল, ইস্পাতের মত কঠিন দুটি চোখের কোণ থেকে সে হাসি ছুরির ধারের মত চিকচিক করছে। আমি সে দৃষ্টি এড়াবার যতবার চেষ্টা করলুম আমার চোখ ততবার ফিরে ফিরে সেই দিকেই গেল। শুনতে পাই কোন কোন সাপের চোখে এমন আকর্ষণী শক্তি আছে যার টানে গাছের পাখী মাটীতে নেমে আসে—হাজার পাখা ঝাপ্টা দিয়েও উড়ে যেতে পারে না। আমার মনের অবস্থা ঐ পাখীর মতই হয়েছিল।"

আবার দেখুন সেই চোখ। "এই অবসরে আমি যুবতীটিকে একবার ভালো করে দেখে নিলুম। তার মত বড় চোখ ইউরোপে লাখে একটি স্ত্রীলোকের মুখে দেখা যায় না। সে চোখ যেমন বড় তেমনি জ্বলো, যেমন নিশ্চল তেমনি নিস্তেজ। এ-চোখ দেখলে সতীশ ভালোবাসায় পড়ে যেত আর সেন কবিতা লিখতে বসত। তোমাদের ভাষায় এ নয়ন বিশাল, তরল, করুণ, প্রশান্ত। তোমরা এ-রকম চোখে মায়া মমতা স্নেহ প্রেম প্রভৃতি কত কি মনের ভাব দেখতে পাও—কিন্তু তাতে আমি যা দেখতে পাই সে হ'চ্ছে পোষা জানোয়ারের ভাব; গরু, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতির সব ঐ জাতের চোখ—তাতে অন্তরের দীপ্তি নেই, প্রাণের স্ফূর্তিও নেই।"

সেই একই চোখ, সেই আইরিস, লেনস, রেটিনা ইত্যাদির সমষ্টি। কিন্তু তা বারবার নতুন রূপে দেখা দিয়েছে কথার রকমফেরে, ভাষার প্রয়োগ-নৈপুণ্যে। এ চোখ চেনা চোখ, জানা চোখ অথচ তা লেখার খেলায় অপরূপ হ'য়ে উঠেছে।

নতুন অর্থাৎ ওরিজিনাল। নতুনত্ব সম্বন্ধে আমাদের মোহ আছে, আকর্ষণ আছে। একটা নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু চাই। সমালোচকের মতে লেখা হবে ওরিজিনাল, একেবারে আনকোরা টাট্কা নতুন। বিপরীত তার নাম অনুকরণ, অসাধু ভাষায় যাকে বলে চুরি। অবশ্য এ চুরি আইনত দণ্ডনীয় নয়, ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের তিনশো উন-আশী ধারা এর নাগাল পায় না। এ বিষয়ে আইনের হাত অত্যন্ত দুর্বল। তা না হোলে চুনোপুঁটী লেখকদের কথা ছেড়েই দিলাম, স্বয়ং রথী-মহারথীরাও এর কবল থেকে রেহাই পেতেন না। এঁদের রচনায় ঐ অপরাধের ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যাবে। সেক্সপীয়ার তো বিশ্ববিখ্যাত প্ল্যাজারিস্ট। একমাত্র সম্ভবত টেমপেস্ট ছাড়া কোন নাটক তাঁর নিজস্ব নয়। অপরের আখ্যানভাগ এমনকি চরিত্র সুদ্ধ তিনি প্রকাশ্যভাবে হরণ করেছেন। তবু সেই পুরনো গল্পের তাঁর কলমে কি আশ্চর্য রূপান্তর ঘটেছে! পুরনো আইডিয়া নতুনভাবে দেখা দিয়েছে তাঁর চোখে। লেখার খেলায় পূর্ববর্তীদের (যাঁদের কাছে সেক্সপীয়ার অশেষভাবে ঋণী) হার মানিয়েছেন সেক্সপীয়ার। তেমনি হার মানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। মহাভারতের কাহিনী [illegible] বর্ণনা করেছেন তাঁর নিজের মত [illegible] আমাদের মনের মত করে। পৌরাণিক আ[illegible] তাঁর কলমে সম্পূর্ণ একালের, চিরকালের [illegible] উঠেছে। যেমন ধরুন কর্ণ-কুন্তী সংবাদ, [illegible] ও দেবযানী। অথচ ওগুলো নতুন নয়, [illegible] পুরাতন। যে মনোভাব তাতে ব্যক্ত হ[illegible] তা অতি প্রাচীন সুতরাং চিরন্তন ও অন[illegible] নতুন যা তা শুধু ব্যবহারিক, নতুনত্ব [illegible] দৃষ্টিভঙ্গীতে। নব সাজে সজ্জিত [illegible] আর্ট তখন সলজ্জ প্রশ্ন করে—দেখো তো [illegible] আমায় তুমি চিনিতে পারো কি না?

এর পরে প্রশ্ন ওঠে ভাব ও ভাষার সম[illegible] নিয়ে। ভাষা ভাবের বাহন মাত্র, ভাবের [illegible]

ক্বার সদর দরজা। মনোরাজ্যের সন্ধান তে পারে ভাষা। ভাষা শুধু মনের সীমানা র্ধি পেঁাছে দিতে পারে। তার দৌড় ঐ ন্তই। এর বেশী যেতে হ'লে তা নির্ভর র ব্যক্তিবিশেষের মননশীলতায়, হৃদয়বত্তায়, ভীরতায়, সাংস্কৃতিক পরিচ্ছন্নতায়। যেখানে ষার শেষ সেখানে ভাবের আরম্ভ। কারণ যা আদি ও অকৃত্রিম নয়। ভাষার মাধ্যমে বচেতন বা সচেতন মনের রূপান্তর ঘটে। কটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলা য়। সদ্য পুত্রহারা এক জননীর শোক চিন্তা রুন। কল্পনা করুন এক ছাত্রের পরীক্ষায় ল করার দুঃখ। ভাবুন আর এক ব্যবসায়ীর লাপ ফাট্‌কা বাজারে যে সর্বস্বান্ত হ'য়েছে। তিনজনের দুঃখ যদিচ বিভিন্ন প্রকৃতির থাপি গভীরতার দিক থেকে কারু দুঃখ ন্যজনের চেয়ে কম নয়। এ-অবস্থায় এমন বিতা কি পাওয়া যাবে না যাতে ঐ তিনজনের দনাবোধ সমভাবে প্রকাশ পেয়েছে? আমার নে হয় নীচের এই নৈর্বাক্তিক গানটিতে তা ষ্টরূপে ফুটে উঠেছে—

মোহি তেজি পিয়া মোর গেল বিদেশ
কোন পরি খেপব বারি বএস।
সেজ ভেল পরিমল, ফুল ভেল বাস
কতয় ভমর মোর পরল উপাস।
সুমরি সুমরি চিত নহি রহ থির
মদন-দহন তন, দগধ শরীর।

গানটি শুনে শোক-সন্তপ্ত জননী ভাবেন কাথায় আমার শোকের প্রকাশ? ওগানে আমার সন্তানের বিন্দুমাত্র উল্লেখ নেই।' ছাত্রটি াবেে—'ফেল হওয়ার দুঃখ যে কত ও গানে তার রিচয় পাওয়া যায় না।' আর চোরঙ্গি ক্রোড়জি লওয়ালা বিরক্ত হয়ে বলবে—'যত সব আজে-াজে মদন-দহনের কথা। শেয়ার মার্কেটে আমার শরীর যে পুড়ে গেল ও গানে সে জ্বালা ই?' অথচ ও গানটি যেমন করুণ তেমনি ধুর—বিচ্ছেদ-বেদনার অমন স্বচ্ছন্দ প্রকাশ ষ্ণব-পদাবলীতে খুব বেশী নেই। তবুও গানে কেউই নিজের দুঃখ খুঁজে পেলেন না। কন্তু ঐ গানটি, ঐ একই গান যদি বাঁশীতে রবী-রাগে সুর দেওয়া যায় তবে তার ফল দখা দেবে সম্পূর্ণ বিপরীত। মা ভাববেন—ঠক, ঠিক। বাঁশীর সুরে আমারই শোক ছলে পড়ছে।' ছেলেটি ভাববে—'আমার "ফেলে" য এত দুঃখ বাঁশী তা জানল কি করে?' ্যবসায়ীটি ভাববেন—'তাজ্জব কি বাত! আমার লক্ষ টাকার দুঃখ যে এত করুণ তা তো আমিও ভাবিনি!' অর্থাৎ বাঁশীর সুরে প্রত্যেকেই তার দুঃখ খুঁজে পাবে যা ভাষায় ক্ষম হয়নি। কারণ ভাষার ক্ষমতা সীমাবন্ধ। অব্যক্তকে ব্যক্ত করতে পারে না ভাষা, অসীমকে সীমার বন্ধনে বন্দী করতে পারে না। ভাষা শুধু আভাস দেয়, পরপারে পেঁাছে দেবার সেতু মাত্র। পরপারে কি আছে তা জানি না। সেইজন্যই এত কৌতূহল, এত সাধনা, এত আয়োজন। তারই জন্যে এত খেলা, এত লেখা, এত গান, এত সুর। তবুও এত সাধনা, এত আরাধনার শেষে শুধু আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাইনে তোমারে।

পেনিসিলিনের ইতিহাস

শ্রীশান্তিদাশঙ্কর দাশগুপ্ত, এম-এস-সি

গো-সাপ যে ছোট সাপ খাইয়া জীবন-ধারণ করে, এ খবর অনেকেরই জানা। জীব-জগতে এক প্রাণী যে অন্য প্রাণী হত্যা করিয়া তাহার মৃতদেহ খাইয়া বাঁচিয়া থাকে, এমন দৃষ্টান্ত চক্ষু খুলিলেই অসংখ্য মিলিয়া যায়। যাহা বড় প্রাণীদের বেলায় সত্য, জীবাণুদের পক্ষেও যে তাহা ঘটিতে পারে, এমন সন্দেহ বৈজ্ঞানিকেরা বহুকাল ধরিয়া করিয়া আসিতেছিলেন। এই সন্দেহ সত্যে পরিণত করিলেন সর্বপ্রথম লুই পাস্তুর ১৮৭৭ সনে। তিনি দেখাইলেন যে, বাতাস হইতে এমন এক প্রকার জীবাণু সংগ্রহ করা সম্ভব যাহা এ্যানথ্রাক্স জীবাণু সকলকে (Anthrax bacilli) ধ্বংস করিতে পারে। এই সত্য হইতে পাস্তুর কল্পনা করিলেন যে, বাতাস হইতে সংগ্রহ করা উক্ত জীবাণু ছাড়া যে সব গবাদি পশু এ্যানথ্রাক্স ঘটিত মারাত্মক স্ফোটক হইতে ভুগিতে থাকে, তাহাদের সুচিকিৎসা সম্ভব হওয়া উচিত। এই যুক্তি-ধারা অবলম্বন করিয়া পাস্তুর ও তাঁহার সহকর্মিগণ অনেক সুফল পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা খুব বেশী দূরে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। পাস্তুরের কিছু পরে বৈজ্ঞানিক ক্যানটানি (Cantani) দেখাইলেন যে, যদি কোন মারাত্মক জীবাণু রোগীর দেহের ভিতর শরীরের পক্ষে নিরীহ অন্য জীবাণু দ্বারা ধ্বংস না করা যায়, তাহা হইলে সেই সব মারাত্মক জীবাণুদের অন্য নিরীহ জীবাণু দ্বারা অন্তত রোগ-স্থান হইতে বিতাড়ন করা উচিত। তিনি এই পদ্ধতিতে একটি যক্ষ্মা রোগীকে চিকিৎসা করিয়া সুফল পাইয়াছিলেন।

এই সব ধরণের গবেষণা হইতে নতুন শব্দাবলী বৈজ্ঞানিকের অভিধানে প্রবেশ করিতে লাগিল। ইংরেজিতে জীব-বিদ্যাঘটিত কথা-গুলি 'Bio' দিয়াই শুরু হইয়া থাকে। যেমন বাইওলজি, বাইওকেমিস্ট্রি ইত্যাদি। জীবাণু-জগতে একশ্রেণীর সহিত অন্য শ্রেণীর মেলা-মেশাকে বলা হয় বাইওসিস (Biosis) যাহার বাঙলা করা যাইতে পারে জীবাণু-লীলা। এই লীলা যদি শ্রেণীযুদ্ধে পরিণত হয়, তাহা হইলে তাহাকে বলা হয় এ্যান্টি-বাইওসিস (Anti-Biosis) বা প্রতি-জীবাণু-লীলা। যখন এক শ্রেণীর জীবাণু অন্য আর এক শ্রেণীর জীবাণুকে ধ্বংস করে, তখন হত্যাকারী জীবাণুর দল নিজেদের দেহ হইতে এমন এক প্রকারের রাসায়নিক দ্রব্য সৃষ্টি করে যাহা আক্রান্ত জীবাণুদের পক্ষে মারাত্মক বিষ। এই যুদ্ধে যে রাসায়নিক দ্রব্য এই বিষের ক্রিয়া করে তাহাকে বলা হয় এ্যান্টি-বাইওটিক (Anti-Biotic), যাহাকে বাঙলায় বলা যাইতে পারে জীবাণু-বিষ। পেনিসিলিন এইরূপ একটি অতি বিখ্যাত এ্যান্টি-বাইওটিক বা জীবাণু-বিষ।

বৈজ্ঞানিকেরা বহুদিন ধরিয়া বহু ক্ষেত্র হইতে জীবাণু-বিষের সন্ধান করিতেছিলেন। এই সন্ধান যে সব সময়ে একটা যুক্তিধারার সহিত জড়িত ছিল তাহা নহে। অনেক রকমের বিচ্ছিন্ন ধরণের খোঁজ হইতে লাগিল। ভিজা জায়গায় যেসব ছত্রাক (Fungus) জন্মায়, তাহা হইতেও সন্ধান চলিতে লাগিল। এই দিক হইতে প্রথম সফলকাম হইলেন গসিও (Gosio) নামক এক বৈজ্ঞানিক ১৮৯৮ সনে। তিনি ভুট্টা হইতে সংগৃহীত একপ্রকার নীল রংয়ের ছত্রাক হইতে দানাযুক্ত একপ্রকার দ্রব্য আবিষ্কার করিলেন। এ্যানথ্রাক্স জীবাণুসমূহকে ইহার দমন করিবার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে দেখা

গেল। এই দ্রব্যটির পরে নানা রকমের র
পরীক্ষা করা হয়। ইহার অণুতত্ত্ব
করিয়া দেখা গেল যে, ইহা মাইকো
এ্যাসিড। এইরূপ গবেষণার সবচেয়ে
ঘটনা ঘটে ১৯২৯ সনে। বৈজ্ঞানিক
(Fleming) স্ট্যাপিলওকক্কি (Sta
cocci) ধ্বংসকারী জীবাণু-বিষের
করিতেছিলেন। তিনি একদিন দেখি
তাঁহার কাচের প্লেটের উপর বি
খানিকটা একপ্রকারের নীল রংয়ের
অকস্মাৎ পড়িয়া রহিয়াছে এবং যে
ঐ ছত্রাক পড়িয়াছে তাহার কাছাকা
স্ট্যাপিলওকক্কাস জীবাণু ছিল, তা
মরিয়া গিয়াছে। তিনি ঐ ছত্রাক যত্নে
আরও বৃদ্ধি করিলেন। ঐ বৃদ্ধির মে
এক প্রকারের ঘন ঝোল (broth)।
দেখিলেন যে নীল ছত্রাক হইতে এম
রাসায়নিক দ্রব্য সৃষ্টি হয়, যাহা না
রোগ জীবাণুর বৃদ্ধি বন্ধ করিয়া তা
করিতে পারে। ইংরেজিতে নীল
সাধারণ পরিভাষা পেনিসিলিয়াম
cillium)। যে বিশেষ ছত্রাক লইয়া
গবেষণা করিতেছিলেন, তাহার
পেনিসিলিয়াম নোটাটাম (Penic
Notatum)। ফ্লেমিং তাঁহার জীবাণুধ্ব
নীল ছত্রাকযুক্ত ঘন ঝোলের নাম
আজিকার বিশ্ববিখ্যাত পেনি
(Penicilin)। ফ্লেমিং তাঁহার পেনি
লইয়া বেশী পরীক্ষা করিতে পারেন না
যে জীবাণুধ্বংসকারী, ক্ষতস্থানে ইহার

বিশেষ ফলপ্রসূ, ইহা বলিয়া তিনি এই য়ে তাঁহার গবেষণা শেষ করিলেন।

আরও দশ বৎসর কাটিয়া গেল। নিসিলিন জন্মগ্রহণ করিল, কিন্তু বৈজ্ঞানিক লে কোন উদ্বেগ সৃষ্টি করিল না।

১৯৩৯ সনে ফ্লোরি (Florey) চেইন (Chain) অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পকভাবে এ্যান্টি-বাইওটিকের বা জীবাণু-ষের গবেষণা শুরু করিলেন। তাঁহারা ৮৭৭ সন হইতে বৈজ্ঞানিক-সাহিত্যে যেসব জীবাণু-বিষের নামোল্লেখ হইয়াছে, তাহাই বেষণার প্রথম সোপান হিসাবে গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের প্রথম দৃষ্টি পড়িল ফ্লমিংয়ের পেনিসিলিনের উপর। ১৯৩২ সনে কয়েকজন বৈজ্ঞানিক দেখিয়াছিলেন যে ফ্লেমিং-বর্ণিত নীল ছত্রাক একপ্রকার সংশ্লিষ্ট (Synthetic) মাধ্যমের (Medium) ভিতর ভালভাবে বৃদ্ধি করা সম্ভব। তাহার পরের সমস্যা হইল যে রাসায়নিক দ্রব্যটি নীল ছত্রাক দ্বারা সৃষ্টি হয়, ফ্লেমিংয়ের ঘন ঝোল হইতে তাহা পৃথক করা। এই সমস্যা সমাধান করিতে বিশেষ সময় লাগিল না। এমন দ্রাবকের (Solvent) সন্ধান মিলিল, যাহা ঐ রাসায়নিক দ্রব্যটিকে ঘন ঝোলের অন্যান্য পদার্থ হইতে পৃথক করিয়া আনিল। ফ্লেমিং তাঁহার সমস্ত ঘন ঝোলটিরই নাম দিয়াছিলেন পেনিসিলিন। কিন্তু তাঁহার পরবর্তীরা তাহা হইতে পৃথক করা এই বিশেষ রাসায়নিক দ্রব্যটির নাম দিলেন পেনিসিলিন। ইহার সার্থকতা এই যে, ঐ ঘন ঝোলের ভিতরের মাত্র এই একটি বস্তুই জীবাণু-বিষ হিসাবে কাজ করিত।

ফ্লোরি ও তাঁহার সহকর্মীরা অসাধারণ অধ্যবসায়ের সহিত কাজ করিয়া পেনিসিলিন ব্যাপকভাবে তৈয়ার করিতে সক্ষম হন। ইঁহারা পেনিসিলিনের কল্পনাবহির্ভূত জীবাণুধ্বংসের ক্ষমতা দেখাইয়া বৈজ্ঞানিক জগৎকে বিস্মিত করেন ও চিকিৎসায় ইহা নিয়োগ করিয়া যুদ্ধের সময় শত-সহস্র ব্যক্তির জীবন রক্ষা করেন। ফ্লেমিং যাহার উদয়ের সন্ধান দিয়াছিলেন, ইঁহারা তাহাকে মধ্যগগনে আনিয়া তাহার শক্তির পরিপূর্ণ ব্যবহার করেন।

পেনিসিলিন এই শতাব্দীর বিজ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান। নিউমোনিয়া, গণোরিয়া, মাংসে পচন ও আরও বহুপ্রকার রোগ যাহা জীবাণু-সৃষ্ট, তাহা পেনিসিলিন কর্তৃক আশ্চর্যরূপে আরোগ্য হয়।

পেনিসিলিন আবিষ্কারের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত যে তিনজন বৈজ্ঞানিক সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁহাদের পুরা নাম হইতেছে **Sir Alexander Fleming, Sir Howard** W. Florey ও Dr. E. Chain. এই তিনজনকে ১৯৪৫ সনে চিকিৎসা-শাস্ত্রে তাঁহাদের অমর দানের জন্য যুক্তভাবে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। বিজ্ঞানের ইতিহাস ইঁহাদের কোনদিন ভুলিবেনা এবং ভবিষ্যতের পাতায় ইঁহারা চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবেন।

নৃত্যসঙ্গী

[জেরোম কে জেরোম]

ম্যা কশনাসী বলতে সুরু করল,—এই গল্পটা হ'চ্ছে ব্ল্যাক ফরেস্ট অঞ্চলের কার্টওয়াঞ্জেন নামে একটি ছোট শহরের। সেখানে নিকোলাস গিবেল নামে এক অদ্ভুত বুড়ো থাকত। কলকব্জার খেলনা তৈরী করা ছিল তার পেশা আর সে কাজে তার খ্যাতি ছিল সারা ইউরোপ-জোড়া। সে এমন সব খরগোস বানাত, যা একটা কপির ভেতর থেকে বেরিয়ে কান নাড়তে থাকত, তারপর হঠাৎ অদৃশ্য হত; এমন বেড়াল বানাত যার মিউ মিউ ডাক শুনে কুকুরে তেড়ে যেত; এমন সব ফনোগ্রাফ লাগানো পুতুল বানাত যেগুলো ভদ্রলোকের মত টুপি খুলে বলত 'নমস্কার, কেমন আছেন?' এক একটা পুতুল আবার গান গাইত।

কিন্তু বুড়ো ঠিক কারিগর ছিলনা। সে ছিল শিল্পী। তার কাজটা ছিল তার একটা বাতিক, প্রায় নেশার মত। তার দোকানে অনেক অদ্ভুত জিনিস ছিল যা কখনও বিক্রী হ'ত না। সেগুলো সে শুধু বানাবার আনন্দেই বানিয়েছিল। সে একটা কলের গাধা বানিয়েছিল, সেটা বিদ্যুৎশক্তিতে চ'রে বেড়াত—সত্যিকারের গাধার থেকে জোরেই চ'রে বেড়াত। একটা পাখী ছিল, সেটা উড়ে উপরে উঠত, চরকির মত ঘুরে বেড়াত, তারপর যেখান থেকে উড়েছিল ঠিক সেখানেই প'ড়ে যেত। লোহার রড বাঁধা একটা কঙ্কাল ছিল, সেটা হর্ণপাইপ নাচ নাচত। একটা পূর্ণাকৃতি মহিলা পুতুল ছিল, সেটি বেহালা বাজাত। আর একটা ফাঁপা পুতুল ছিল যেটা পাইপ টানত, আর এত মদ খেত যা তিনজন জার্মান ছাত্রও খেয়ে উঠতে পারে না।

মোটকথা শহরের লোকে বিশ্বাস করত বুড়ো গিবেল এমন কলের মানুষ বানাতে পারে, যা যে-কোনো লোকের মত চলাফেরা করতে পারে। আর সত্যিই সে একদিন এমন একটা মানুষ বানালো যা অনেক কিছুই ক'রলো। ব্যাপারটা হ'য়েছিল এইরকম :

ডক্টর ফার্লেনের একটি ছেলে হয়েছিল। তারই জন্মদিন উপলক্ষে মিসেস ফার্লেন একটা বলনাচ দিয়েছিলেন। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে বুড়ো গিবেল ও তার মেয়ে ওলগাও ছিল।

তার পরদিন বিকেলবেলা ওলগার তিন-জন বান্ধবী তার বাড়িতে বসে আগেরদিনের বলনাচের গল্প করছিল। আলোচনা স্বভাবতই হচ্ছিল পুরুষদের নিয়ে এবং তাদের নাচ সম্বন্ধে বেশ মন্তব্য চলছিল। বুড়ো গিবেলও সেই ঘরে ব'সে ছিল, কিন্তু সে মনোযোগ দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিল বলে মেয়েরা তার দিকে কোন নজর দেয়নি।

"প্রত্যেক বলনাচে নাচের সঙ্গী যেন কমতে থাকে"—একটি মেয়ে বল্‌লে।

"সত্যিকথা", আর একজন বল্‌ল, "আর যারা নাচতে জানে, কী অহংকার তাদের! আমাদের নাচতে অনুরোধ ক'রে তারা যেন কৃতার্থ করে দেয়।"

"আর কী বোকার মত সব কথা বলে। তাদের সব্বার মুখে এক বাঁধা গৎ : 'তোমাকে আজ কী সুন্দর দেখাচ্ছে', 'তোমার পোষাকটা কী সুন্দর', 'আজকের দিনটা কিরকম গরম পড়েছিল', 'ভাগ্‌নারের সংগীত তোমার কেমন লাগে।' একেবারে মামুলী কথা।"

"তাদের কথা নিয়ে আমি কখনো মাথা ঘামাই না", আর একটি মেয়ে বল্‌ল, "যদি কেউ ভাল নাচতে জানে তবে সে গোমুখ্যু হ'লেও কিছু এসে যায় না'।"

"আর তাই তারা হয়", একটি রোগামত মেয়ে বিদ্রূপ করে বল্‌ল।

আগের মেয়েটি বল্‌তে লাগল, "আমি শুধু চাই এমন একটি নৃত্যসংগী যে আমাকে শক্ত করে ধরে রাখতে পারবে, স্থিরভাবে চারদিকে ঘুরে বেড়াতে পারবে, আর আমি হাঁপিয়ে পড়ার আগে হাঁপিয়ে পড়বে না।"

"তাহলে একটা কলের মানুষই তোমার ঠিক নাচের সংগী হবে"—বাধা দিয়ে আর একজন বল্‌ল।

"ঠিক বলেছ", একজন হাততালি দিয়ে বল্‌ল, "কী মজা।"

মেয়েরা সবাই খুব উৎসাহের সঙ্গে এতে সায় দিল।

"ওঃ কী চমৎকার নৃত্যসংগী হবে", একটি মেয়ে বল্‌ল, "সে কখনও ধাক্কা মারবে না, কিম্বা পা মাড়িয়ে চলবে না।"

"পোষাক ছিঁড়ে ফেলবে না", আর একজন বল্‌ল।

"নাচের তাল ভাঙবে না।"

"কিম্বা হাঁপিয়ে পড়ে গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়াবে না।"

"আর সে কখনো রুমাল দিয়ে মুখ মুছবে না। মুখ মুছতে দেখলে কী লাগে।"

"সে সমস্ত বিকেলটাই খাবারঘরে থাকবে না।"

"এমনকি ভেতরে ফনোগ্রাফ লা থাকলে সে সব মামুলী বুলিও আও পারবে। তাতে তাকে সত্যিকারের বলে মনে হবে।"

বুড়ো গিবেল তার কাগজ রেখে মেয়েদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুন একটি মেয়ে তার দিকে তাকাতেই সে খবরের কাগজের পিছনে লুকোল।

মেয়েরা চলে যাবার পর বুড়ো গি তার কারখানায় গিয়ে ঢুকল। ওলগা শ পেল সে পায়চারী করতে ক'রতে আপন হাসছে। সেদিন রাত্রে গিবেল ওলগাকে সম্বন্ধে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করল— নাচ বেশী চলতি—কোন নাচে কি পা ফেলতে হয়, এইসব নানারকমের প্রশ্ন।

তারপর সপ্তাহ দুই সে নিজের কার ব্যস্ত থাকল। সব সময়েই তাকে চিন্তিত দেখাতে লাগল—যদিও মাঝে সে এমন একটা হাসি হাসত' যেন সে সব অজ্ঞাত একটা রসিকতা উপভোগ করছে।

এক মাস পরে শহরে আর একটা ব হ'ল। কাঠের ব্যবসায়ী ওয়েঞ্জেল ভগ্নীর বাকদান উৎসবে একটা বলনাচ এবং তাতে গিবেল ও তার মেয়ের নেম হ'ল।

যখন 'বলে' যাবার সময় হল ওলগা বাবাকে কোথাও না পেয়ে কারখানার দর এসে কড়া নাড়ল। বুড়ো গিবেল দরজা খ দিল—তার জামার আস্তিন গোটানো, ব চেহারা।

"আমার জন্য দেরী কোরো না", ওলগাকে বল্‌ল, "তুমি চলে যাও। অ একটা কাজ শেষ করে যাব।"

ওলগা কথামত চ'লে যাচ্ছিল এমন স গিবেল পিছন থেকে ডেকে বল্‌ল, "সবাই বোলো আমি একটি যুবককে সঙ্গে নি যাব। সে খুব চমৎকার লোক—আর নাচে খুব সুন্দর। মেয়েরা তাকে নিশ্চয়ই খ পছন্দ করবে।" এই বলে সে হেসে দরজ বন্ধ করে দিল।

বুড়ো গিবেল যদিও ওলগাকে কিছু

তবু ওলগা আন্দাজে অনেকখানি পেরেছিল। নিমন্ত্রিতদের তার জের কথা জানাতে সবাই বেশ চঞ্চল হয়ে এবং গিবেলের আসার প্রতীক্ষা করতে ।

অবশেষে দরজার বাইরে একটা গাড়ীর াজের সংগে খুব হৈচৈ শোনা গেল। পরেই ওয়েঞ্জেল নিজে হাসি চেপে ঘরে ঘোষণা করল :

"হের গিবেল ও একজন বন্ধু" এবং "বন্ধু" প্রবেশ করল এবং চারদিক থেকে ও হল্লার মধ্যে এসে দাঁড়াল।

"ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ", গিবেল , "আমার বন্ধু লেফটেনান্ট ফ্রিজ-এর আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। , অভ্যাগতদের নমস্কার কর।"

গিবেল মুরুব্বিয়ানার ভাবে ফ্রিজের পিঠে রাখতেই সে নীচু হয়ে সবাইকে নমস্কার াল। তার গলা থেকে কেমন একটা ঘড় আওয়াজ হল অনেকটা যেন মরার য়ের গলার আওয়াজের মত। অবশ্য ও টা উপমা।

"ও একটু আড়ষ্ট হয়ে হাঁটে" (বুড়ো বল তার হাত ধরে কয়েকপা হাঁটিয়ে নিয়ে । সত্যিই সে খুব আড়ষ্ট হয়ে ছিল); "কিন্তু হাঁটা তো ওর কাজ নয়। হচ্ছে নাচিয়ে লোক। আমি ওকে শুধু লজ্ নাচই শিখিয়েছি। আর সে নাচও বারে নিখুঁতভাবে নাচে। এস মেয়েরা, াদের মধ্যে কে ওকে নৃত্যসংগী করবে। কখনো তাল ভাংগে না; কখনো হাঁপিয়ে না; কখনো ধাক্কা দেয়না বা পা মাড়িয়ে না; তোমদের যত জোরে বা আস্তে নাচতে ছ হয় ও ঠিক তাল রাখতে পারবে। আর খুব অলাপী। ফ্রিজ মহিলাদের সংগে বার্তা বল।"

বুড়ো গিবেল ফ্রিজের পিঠের একটা তাম টিপতেই সে মুখ খুল্‌ল। "আপনার গ নাচের আনন্দ পেতে পারি কি"— াগুলো যেন তার মাথার পিছন দিক থেকে । তারপর আবার সে চট করে মুখ বন্ধ ফেলল।

লেফ্‌টেনান্ট ফ্রিজ যে সবাইকে আশ্চর্য িছল সেটা নিঃসন্দেহ, কিন্তু তার সংগে তে কোন মেয়েই চাইল না। তারা সবাই চোখে তার মোমের মত মুখ চোখ আর ভূত হাসির দিকে তাকিয়ে কেমন যেন রে উঠতে লাগল। অবশেষে বুড়ো বল এ্যানেট নামে মেয়েটির কাছে এল। সেই প্রথম কলের নৃত্যসংগীর কথা বলে-।

"তোমার কথা মতই একে তৈরী করা হয়েছে", গিবেল বল্‌ল, "তোমার এই ভদ্রলোকের সংগে একবার নাচা উচিত।"

মেয়েটি ছিল খুব আমুদে। বুড়ো গিবেল ও ওয়েঞ্জেল দুজনে সাধাসাধি করাতে সে রাজী হয়ে গেল।

গিবেল যন্ত্রটিকে সেই মেয়েটির সংগে লাগিয়ে দিল। মূর্তিটির ডানহাত মেয়েটির কোমরে আটকিয়ে দেওয়া হ'ল এবং বাঁ-হাতটি মেয়েটির ডানহাতে লাগানো হল। কি করে মূর্তিটির গতি দ্রুত করতে হয়, কি করে থামাতে হয়, গিবেল মেয়েটিকে সব শিখিয়ে দিল।

গিবেল মেয়েটিকে বল্‌ল, "ও তোমাকে নিয়ে গোল হ'য়ে ঘুরে ঘুরে নাচবে", দেখো যেন কেউ ধাক্কা লাগিয়ে না দেয়।"

বাজনা বেজে উঠল। গিবেল মূর্তিটিকে চালিয়ে দিল। এ্যানেট আর তার অদ্ভুত নৃত্যসংগী নাচতে আরম্ভ করল।

কিছুক্ষণ সবাই মিলে তাদের দেখতে লাগল। মূর্তিটি সত্যিই খুব আশ্চর্যজনক। বাজনার সংগে ঠিকমত তাল রেখে পা ফেলে মেয়েটিকে শক্ত করে জড়িয়ে সে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল। আর মাঝে মাঝে সেইরকম অদ্ভুতভাবে একই কথা বলতে লাগল।

মূর্তি হঠাৎ মুখ খুলল, "আজ তোমাকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে, আজ দিনটা কি সুন্দর ছিল। তুমি নাচতে খুব ভালোবাসো নয় কি? আমাদের পা কি সুন্দর মিলছে। অত নিষ্ঠুর হয়ো না। তুমি আমার সংগে আবার নাচবে, কেমন? তোমার পোষাকটা কি সুন্দর। ওআলজ্ নাচতে খুব চমৎকার লাগে। আমি তোমার সংগে চিরকাল ধরে এইভাবে নাচতে পারি। তোমার খাওয়া হয়েছে তো?"

মেয়েটি আস্তে আস্তে তার এই অদ্ভুত নৃত্যসংগীর সংগে পরিচিত হতে লাগল। ক্রমশঃ তার ভয়ের ভাবটা কেটে গিয়ে মজা লাগতে লাগল।

সে হাসতে হাসতে বলল, "ওঃ কী চমৎকার, আমি ওর সংগে সারাজীবন ধরে নাচতে পারি।"

কিছুক্ষণ বাদে এক এক করে অনেকে তাদের সংগে নাচতে লাগল। নিকোলাস গিবেল দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। যন্ত্রের সাফল্যে তার মুখে শিশুর মত হাসি ফুটে উঠল।

ওয়েঞ্জেল তার কাছে গিয়ে কানে কানে কি বলল। গিবেল হেসে তাতে সায় দিল এবং তারা দুজন চুপ করে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ওয়েঞ্জেল বাইরে এসে বল্‌ল, "এ উৎসবের হৈচৈ ছেলেমেয়েদের জন্যই, চল, তুমি আর আমি বাইরের ঘরে বসে ধূমপান করি।"

এদিকে নাচ ক্রমেই দ্রুততর হ'তে লাগল। এ্যানেট তার নৃত্যসংগীর স্পীডএর স্ক্রু আলগা করে দিতে মূর্তিটি তাকে নিয়ে যেন উড়ে চলল। এক জোড়ের পর আর এক জোড় হাঁপিয়ে পড়ে নাচ বন্ধ করল, কিন্তু তারা দুজন নেচেই চলল।

আস্তে আস্তে সবাই নাচ থামাল, কেবল এ্যানেট আর তার সংগী নাচতে থাকল। ওয়াল্‌জ ক্রমেই পাগলের মত হ'তে লাগল। বাজিয়েরা তাল রাখতে না পেরে বাজনা বন্ধ করে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। অল্প-বয়সীরা খুব বাহবা দিতে লাগল, কিন্তু বয়স্করা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল।

একজন মহিলা বললেন, "এ্যানেট, এবার নাচ থামাও। নইলে একেবারে ক্লান্ত হ'য়ে পড়বে।"

কিন্তু এ্যানেট কোন উত্তর দিল না।

"এ্যানেট অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে," একটি মেয়ে তার ফ্যাকাসে মুখ দেখতে পেয়ে চীৎকার করে উঠল।

একজন লোক ছুটে গিয়ে মূর্তিটিকে জাপটে ধরবার চেষ্টা করল, কিন্তু মূর্তিটির দ্রুতবেগের ধাক্কায় তৎক্ষণাৎ ছিটকে পড়ল। যন্ত্রটি অত সহজে তার 'পুরস্কার' ছেড়ে দিতে রাজী নয়।

কেউ যদি স্থিরমস্তিষ্কে থাকত, তবে মূর্তিটিকে থামানো শক্ত হ'ত না। দু-তিনজন

একসংগে মূর্তিটিকে তুলে ধরতে পারত কিংবা এক কোণে চেপে ধরতে পারত। কিন্তু উত্তেজনার সময় কম লোকেরই মাথার ঠিক থাকে। পরে সবাই ভেবে দেখেছিল যে, স্থিরবুদ্ধিতে কাজ ক'রলে যন্ত্রটিকে তখনই থামানো যেত।

মেয়েরা ভয়ে চীৎকার করে উঠল। পুরুষেরা একজন আরেকজনকে হুকুম করতে লাগল। দুজন মূর্তিটিকে ধরবার চেষ্টা করতে গিয়ে তাকে কক্ষচ্যুত করে ফেলল। মূর্তিটি তার পথ ছেড়ে এককোণে দেয়ালের গায়ে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগাল। মেয়েটির সাদা নাচের পোষাক রক্তে লাল হয়ে উঠল। ব্যাপারটা ভীষণ ভয়াবহ হয়ে উঠল। মেয়েরা ভয়ে চীৎকার করে ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে গেল। পুরুষরাও তাদের পিছু পিছু এল।

কে একজন এতক্ষণে একটা বুদ্ধির কথা বলল: "গিবেলকে খুঁজে আন।"

তারা কেউ গিবেলকে বেরোতে দেখেনি। সে কোথায় গেছে কেউই জানত না। একদল তাকে খুঁজতে গেল। আর সবাই ভয়ে ও উত্তেজনায় বল-রুমের দরজার বাইরে কান পেতে রইল। ঘরের ভিতরে চাকা-ঘোরার একটা শব্দ হচ্ছিল, আর মাঝে মাঝে এক একটা প্রচণ্ড ধাক্কার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। যন্ত্রটা তার কক্ষচ্যুত হ'য়ে তার সংগীকে নিয়ে যেখানে সেখানে ধাক্কা লাগাচ্ছে আবার উঠে আর একদিকে এগুচ্ছে!

আর থেকে থেকে সেই অদ্ভুত গলায় সেই একই কথা শোনা যেতে লাগল: "আজ তোমাকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে। আজ কি সুন্দর দিন গেছে।.........অত নিষ্ঠুর হয়ো না।.........আমি তোমার সংগে চিরকাল ধরে এইভাবে নেচে যেতে পারি।......"

ওদিকে তারা সব জায়গায় গিবেলকে খুঁজে বেড়াতে লাগল। তারা বাড়ির সব ঘর খুঁজল, তারপর গিবেলের বাড়ি গিয়ে ডাকাডাকি করে অনেক সময় নষ্ট করল। শেষে একজনের খেয়াল হল যে ওয়েঞ্জেলকেও পাওয়া যাচ্ছে না। তখন বাড়ির বাইরের ঘরটার কথা তাদের মনে পড়ল এবং সেখানে তারা গিবেলকে খুঁজে পেল।

খবর পেয়ে গিবেল তাড়াতাড়ি তাদের সংগে এল। তার মুখ মড়ার মত বিবর্ণ দেখাচ্ছিল। সে এবং ওয়েঞ্জেল ভিড় ঠেলে ঘরে ঢুকল এবং দরজা বন্ধ করে দিল।

ভিতর থেকে নীচু গলার কথা ভেসে আসতে লাগল। কতকগুলো দ্রুত পায়ের শব্দ তারপরে একটা হুটোপাটির আওয়াজ, তারপর সব চুপ।

কিছুক্ষণ বাদে দরজা খুলল। সবাই ঘরে ঢুকতে চেষ্টা করল, কিন্তু ওয়েঞ্জেল দরজা জুড়ে পথ আটকে থাকল।

"বেক্‌লার, এদিকে এস—আর তুমিও এস," সে দুজনকে ডেকে বলল: "আর সবাই দয়া করে বাড়ি চলে যাও এবং মহিলাদের সংগে নিয়ে যাও।"

নিকোলাস গিবেল সেদিন থেকে তার কারখানায় কেবল কলের খরগোশ বানায়, যেগুলো কান নাড়ে; আর কলের বিড়াল বানায়, যেগুলো শুধু মিউ মিউ করে।

অনুবাদক—নরেশ মজু[illegible]

যুক্তপ্রদেশের কিশোরদের মাঝে

শ্রীসত্যব্রত বসু
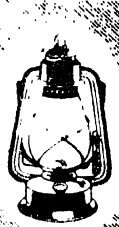
মাছি'র পরিচালনায় ও বাঙলার শ্রেষ্ঠ জাতীয়তাবাদী দৈনিক পত্রিকা ন্দবাজার পত্রিকার" পৃষ্ঠপোষকতায় মেলা" শীর্ষক কিশোর কল্যাণ-আন্দোলন আজ সারা ভারতে বে প্রসার লাভ করেছে, সে ধ বোধ হয় বিস্তৃতভাবে আর বিশেষ বলার নেই। সবচেয়ে বড়কথা এই যে, বাঙলায় উদ্ভূত এই কল্যাণকর কর্মপ্রচেষ্টা ী বাঙগালী ও অবাঙগালী কিশোর-রীদের মনেও সাড়া জাগিয়ে তুলছে। লার বাইরে এই "মণিমেলা"র যুক্তপ্রাদেশিক লনে যোগ দেবার সৌভাগ্য আমার ছল। গত জানুয়ারী মাসের ২৬ তারিখ ২৮ তারিখ পর্যন্ত এলাহাবাদের রগঞ্জ এলাকায় এই অধিবেশন হয়। তা থেকেও মণিমেলার ছয়জন কর্মী নে গিয়েছিলেন। লুকারগঞ্জের খেলার মাঝখানে একটি ১৫।১৬ বছরের মেয়ে ও গুড়োমাটি দিয়ে তৈরী করেছিল বর্ষের একটি বাস্তব প্রতিকৃতি আর চূর্ণ-দিয়ে এঁকে দেখিয়ে দিয়েছিল এই ভারত-সীমা আর সিন্ধু, গঙ্গা, যমুনা, ত্রের গতিপথ এবং ভারতবর্ষের যে র এলাহাবাদ সেই যায়গাটি বেছে নিয়ে ন দেবদারু পাতা দিয়ে সাজিয়ে একটি শ পোঁতা হয়েছিল পতাকাদণ্ড হিসাবে।

৬শে জানুয়ারী ভোরবেলা এই পতাকা জাতীয় পতাকা তুলে স্বাধীনতা দিবস ও র কল্যাণ দিবস পালন করা হল। নিখিল কংগ্রেস কমিটির স্থায়ী সম্পাদক মিঃ আলী জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন সেখানে সমবেত শত শত বাঙগালী ও লী কিশোর কিশোরীকে সম্বোধন করে বললেন, "মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত লাল মৌলানা আবুল কালাম আজাদ দেশনেতারা দেশকে সেবা করবার সুযোগ লেন যখন তাঁরা কলেজের ছাত্র কিন্তু কিশোর কিশোরীরা মণিমেলায় যোগ তারা দেশসেবার সুযোগ পাচ্ছে থেকেই এটা তাদের মস্ত বড় সৌভাগ্য। দার মধ্য দিয়ে এই সুযোগ ও শিক্ষা তোমরা পাচ্ছ তা সত্যই আনন্দের তোমরা যদি এখন থেকেই ধভাবে দেশসেবার ব্রত গ্রহণ করো, তবে তোমরাই পারবে দেশজননীকে পরাধীনতার বন্ধন থেকে মুক্ত করতে।"

মিঃ শাদিক আলীর ভাষণের পর মণিমেলার ভাইবোনেরা মিলিত কণ্ঠে কিশোর কল্যাণ দিবসের সংকল্প গ্রহণ করে এবং মিলিত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত গীত হলে পর লক্ষ্ণৌ আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ বিখ্যাত শিল্পী অসিতকুমার হালদার মহাশয় ভারতীয় শিল্পের গৌরবময় পরিচয় দিয়ে মণি ভাইবোনদের তৈরী হাতের কাজের প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন এবং প্রদর্শনীতে কিশোর কিশোরীদের তৈরী হাতের কাজ দেখে তিনি বিশেষ প্রীত হন এবং এই মন্তব্য করেন যে, ছোটদের এই শিল্পবোধ বয়স্কদের চাইতে কোন অংশে কম নয়। তিনি আরও বলেন, মনকে সবল করে গড়ে তুলতে হলে মনে শিল্পপ্রীতি জাগিয়ে তুলতে হবে। তারপর সেই দিন বিকেলে বসে শিশু পরিষদ। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দ্বারা বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত এই সভায় একটি বিশেষ অভিনবত্ব খুঁজে পাওয়া গেল। সভার পরি-

সম্মেলনের প্রথম দিনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এ-আই-সি-সি'র স্থায়ী সম্পাদক মিঃ শাদিক আলি
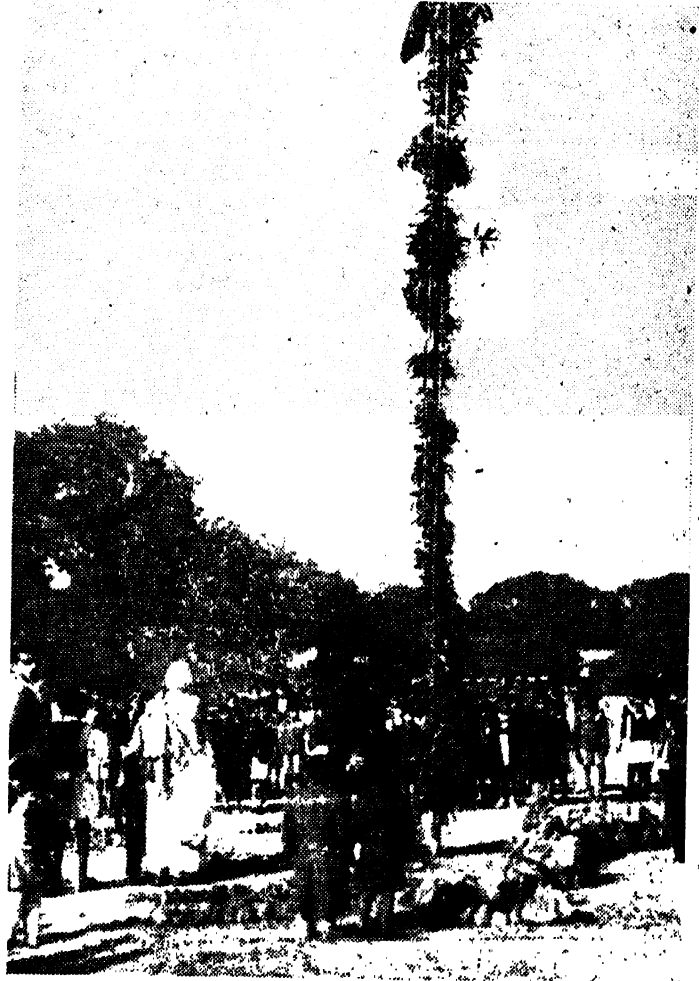
যুক্তপ্রদেশ মণিমেলা সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের কয়েকজন

চালনার নেতৃত্বভার গ্রহণ করেছিল মীণাক্ষী চৌধুরী নামে ন' বছরের একটি মেয়ে এবং বক্তৃতা দিয়েছিল ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা, নিজেদের সুবিধে অসুবিধে এবং দাবীর কথা জানিয়ে, কিন্তু শ্রোতা ছিলেন তাদের বাবা, কাকা, মা, মাসী, দাদু, দিদিমারা। দশ বছর বয়সের অবাঙ্গালী কিশোর মদনমোহন স্বতঃস্ফূর্ত হিন্দী ভাষায় যে বক্তৃতা দিয়েছিল তা বহুদিন আমার মনে থাকবে।

তারপর দিন ২৭শে জানুয়ারী যুক্তপ্রদেশ মণিমেলা সম্মেলনের মূল অধিবেশন বসল বিকেল পাঁচটায় এবং সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী শ্রীযুক্তা পরিমল গুপ্তা নিমন্ত্রিত অতিথিদের ও উপস্থিত সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বলেন, "আমাদের দেশের সমাজে শৃঙ্খলা বা নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলার অভ্যাস বিশেষ দেখতে পাওয়া যায় না, কিন্তু "মণিমেলা"র সংস্পর্শে এসে এ দেশের কিশোর কিশোরীরা যে নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে দিয়ে বড় হয়ে উঠছে, তাতে আশা হয় যে, এই সব ভবিষ্যৎ কালের নাগরিকরা মানুষের জীবনে ও সমাজে বিশৃঙ্খলা ঘটতে দেবে না, ফিরিয়ে আনবে একতা ও ভ্রাতৃভাব। মানুষের সভ্য এবং সামাজিক জীবনে যা কিছু শিক্ষণীয় তা সবই শিখতে পারা যায় এই "মণিমেলা" আন্দোলনের সংস্পর্শে এসে। আনন্দের মধ্য দিয়ে সংগঠনের এমন সুষ্ঠু ব্যবস্থা কোনও আদর্শ শিক্ষায়তনেও নেই।" এরপরে উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্য থেকে কয়েকজন বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী অভিভাবক বক্তৃতা করেন। সবশেষে সম্মেলনের মূল সভানেত্রী শ্রীযুক্তা প্রভা বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন—"দেশকে স্বাধীন করতে হলে সর্বপ্রথম দরকার দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার এবং এই দুইয়ের প্রসারের জন্য আমাদের উচিত বিদেশী বেশভূষা ও জিনিষপত্রের ব্যবহার কমিয়ে দেওয়া।" তিনি আরও বলেন যে, আনন্দমেলার আদর্শ আজ শুধু সহরে বা নগরে সীমাবদ্ধ না থেকে, গ্রামে গ্রামেও ছড়িয়ে গেছে, তা থেকেই বুঝতে পারা যায় যে, আজ "মণিমেলা" কত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তারপর ২৮শে জানুয়ারী বিকেল পাঁচটায় বসে সম্মেলনের শেষ অধিবেশন। এই অধিবেশনে জড়ো হয় শত শত শিশু, কিশোর যুবক-যুবতী ও তাদের অভিভাবক। এই দিন ছোট ছেলেমেয়েরা শ্রীযুত বিমল ঘোষের লেখা "পুতুলের দেশ" নাটিকাটি সুন্দর অভিনয় করে, বিশেষ করে রতা শেয়ালের ভূমিকায় একটি ছেলে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। এ ছাড়া ছোটরা আরো নাচ, গান ও সুন্দর সুন্দর আবৃত্তি করে। সত্যি ঐ তিনটে দিনের কথা আমি ভুলতে পারবো না। ভুলতে পারবো না লীলা-চঞ্চল খুশীচপল প্রবাসী ভাইবোন সেই সব ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কথা, যারা বাঙ্গলার বাইরে থেকেও মণিমেলার সংস্পর্শে এসে নির্মল আনন্দ পাবার সুযোগ হারায়নি। সাত বছর আগে বাঙ্গলা দেশে ভারতের সর্ববৃহৎ ও সবচেয়ে সুসংগঠিত কিশোর আন্দোলন ও সংগঠন কার্যের যে সূচনা হয়েছিল তার প্রভাব আজ সারা ভারতে কিভাবে যে ছড়িয়ে পড়েছে তা আমরা প্রথম বুঝতে পারলাম যুক্তপ্রদেশের মণিমেলা সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে।

"দেশ"

প্রতি সংখ্যা চার আনা

বার্ষিক মূল্য—১৩ ষাণ্মাসিক—৬

প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে নিয়ম

পাঠক, গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গের নিকট হ প্রাপ্ত উপযুক্ত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি স গৃহীত হয়।

প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কা লিখিবেন। কোন প্রবন্ধের সহিত ছবি দিতে হ অনুগ্রহপূর্বক ছবি সঙ্গে পাঠাইবেন অথবা কোথায় পাওয়া যাইবে জানাইবেন।

অমনোনীত লেখা ফেরত লইতে হইলে উপযুক্ত ডাক টিকিট দিবেন। লেখা পাঠা তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে যদি তাহা পত্রিকায় প্রকাশিত না হয়, তাহা হইলে লে অমনোনীত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অমনো লেখা ছয় মাসের পর নষ্ট করিয়া ফেলা অমনোনীত কবিতা টিকিট দেওয়া না থাকিলে মাসের মধ্যেই নষ্ট করা হয়।

সমালোচনার জন্য দুইখানি করিয়া পুস্তক হয়।

ঠিকানা ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা
১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা।

অশ্বত্থের অভিশাপ

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

৫

আজ বৃহস্পতিবার, জোড়াদীঘির হাটবার। বিকালের দিকে হাট-লায় ক্রেতা বিক্রেতার সমাবেশ ইয়াছে। চারিপাশের গ্রাম হইতে াকে ডালা ভরিয়া তরিতরকারি আনিয়াছে; লেরা মাছ আনিয়াছে, অধিকাংশই বিলের ই এবং মাগুর; দূরের গ্রাম হইতে চাষীরা তাবন্দী চাল আনিয়াছে—পুরাতন চাল, ুন চাল এখনো ওঠে নাই; সহর হইতে য়েকখানি খেলনা ও মনোহারির দোকানও াসিয়াছে। বাজারে কয়েকখানি ছোট বড় ায়ী দোকান আছে। দোকানীরা নিজ নিজ াকানের জিনিষগুলি ভালো করিয়া সাজাইয়া াখিয়াছে—ক্রেতার দৃষ্টি যাহাতে সহজেই াকৃষ্ট হয়। এখনো কেনা-বেচা পুরা দমে ুরু হয় নাই।

ভজহরি সাহার দোকানের কাছে একটা ড় জমিয়া গিয়াছে। সহর হইতে গাড়ী াঝাই দিয়া চাল, ডাল, নুন, তেল ও চিনি াসিয়া পেঁৗছিয়াছে। সমস্ত জিনিষ নামানো ইয়াছে, কেবল একটা চিনির বস্তা কেমন রিয়া যেন মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে। বস্তায় ায় আড়াই মন চিনি আছে। অনেক ষ্টাতেও বস্তাটিকে দোকান ঘরে তোলা ইতেছে না। আর যাইবেই বা কেমন করিয়া? কলেই পরামর্শ দিতেছে। কাজে বড় কেহ গ্রসর হইতেছে না। কেহ বলিতেছে ঠেলিয়া াোলো, কেহ বলিতেছে কাটিয়া তোলো, কেহ কহ বা শুধুই বিলাপ করিয়া বলিতেছে—ভিজিয়া সব সরববৎ হইয়া গেল। বাস্তবিক ায়গাটা কর্দমাক্ত, বস্তার নীচের দিকটা তিমধ্যেই ভিজিয়া উঠিয়াছে। পরামর্শের াকিভাগ কাজ হইলে বস্তা এতক্ষণ ঘরে ঠিত। বৃদ্ধ ভজহরি সাহা নিকটে দাঁড়াইয়া প করিয়া আছে। সে অনেকক্ষণ ঘোষণা রিয়াছে যে বা যাহারা চিনির বস্তা দোকানে লিয়া দিতে পারবে তাহাদের পেট ভরিয়া সন্দেশ খাওয়াইবে। তবু কেহ অগ্রসর হয় নাই। সন্দেশ তাহারা সকলেই কখনো না কখনো খাইয়াছে—কিন্তু আড়াই মণ চিনি জলে ভিজিলে কি পদার্থ হয় কখনো দেখে নাই, কাজেই বস্তা উদ্ধারে তাহাদের বড় উৎসাহ নাই।

এমন সময়ে কানু ঘোষ ভিড় ঠেলিয়া ঢুকিল, শুধাইল—কি হ'য়েছে?

ভজহরি বলিল—বাবা কানু, আড়াই মণ চিনি গেল।

কানু স্বাভাবিক স্বরে বলিল—তোলোনি কেন? কানুর কথা শুনিয়া সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল—তুলবে কে? বাবা আড়াই মণি বস্তা ওকি তোমার আমার কাজ!

ভিড়ের মধ্য হইতে কে একজন বলিল—না, বাবা চিনির বলদ হওয়া আমাদের সাধ্য নয়। কানুর মুখে একবার হাসির আভা ফুটিল কিন্তু তখন হাসির সময় নয়। সে গামছাখানা কোমরে বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল—সা মশায় ভয় নাই।

ভজহরি বলিল—বাবা একটু কষ্ট ক'রে বস্তা-টা তুলে দাও, পেট ভরে সন্দেশ খাইয়ে দেবো।

কানু বলিল—আর একজন কেউ এসো তো।

কিন্তু কেহই আগাইল না। কেনই বা আগাইবে? একজন লোককে একাকী আড়াই মণি বস্তা তুলিতে তাহারা কখনো দেখে নাই—সে সুযোগ আজ তাহারা নষ্ট করিতে মোটেই উৎসাহ প্রকাশ করিল না।

ভজহরি ব্যাপার দেখিয়া বলিল—বাবা কানু তুমি একা পারবে না কি?

পারবো বই কি—বলিয়া কানু প্রস্তুত হইতে লাগিল।

বাস্তবিকই কানু ঘোষ পারিবে। ওরকম জোয়ান জোড়াদীঘিতে আর দ্বিতীয়টি নাই। তাহার বয়স বছর পঁচিশ; কালো দেহ পাথর কুঁদিয়া কাটা; পেশীবহুল দেহ মেদ-বাহুল্য বর্জিত; লোহার শাবলের মতো দুই বাহুর দার্ঢ্য। সে ঈষৎ নত হইয়া বস্তার দুটি কোণ ধরিল—জনতা ফাঁক হইয়া গিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। তখন সে সবলে বস্তা ধরিয়া গোটা দুই ঝাঁকুনি দিয়া একটানে পিঠের উপরে তুলিয়া ফেলিল। জনতার আশা সফল হইল—কিন্তু একটু আশাভঙ্গও যে হয় নাই এমন বলা যায় না। তাহারা আশা করিতেছিল বস্তা চাপা পড়িয়া কানুর একটা দুর্দশা হইবে তেমন কিছুই ঘটিল না। আশাভঙ্গের দীর্ঘ নিশ্বাস চাপিয়া জনতা কানুর গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিল। সে এক পা দুই পা করিয়া দোকানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। এমন সময়ে হঠাৎ একটি ঘটনায় সমস্ত ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিত পথে মোড় ঘুরিয়া গেল। ভিড় ঠেলিয়া বিজয় বৈরাগী প্রবেশ করিল এবং কানুকে ওই অবস্থায় দেখিয়া বলিয়া উঠিল—বাবা গোয়ালাদের কানু এবার দেখছি গোবর্ধন ধারণ করেছে। তাহার মন্তব্যে সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল এবং কানুর কষ্ট-পেষিত মুখমণ্ডলের পেশীতে হাসির তরঙ্গ দেখা দিল। সে বস্তার ভার বিস্মৃত হইয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। কানুর হাসি শুনিবা মাত্র জনতা দূরে সরিয়া গেল। কানু কোন রকমে বস্তাটা ভজহরির দোকানের বারান্দায় নিক্ষেপ করিয়া হাসিতে একেবারে ভাঙিয়া পড়িল। হো হো হা হা হী হী আর থামিতেই চায় না। হাসির সঙ্গে তাহার হাত পা ছুটিতে আরম্ভ করিল—যাহাকে পাইল কিল চড় লাথি বসাইয়া দিল। কানুর ওই এক মুদ্রাদোষ। বিজয় বৈরাগী সরিবে সরিবে করিতেছিল—কিন্তু তার আগেই কানু তাহার উপরে গিয়া পড়িল—বলিল—তবে রে বাইসিকেলের বৈরাগী ......হো হো হা হা......কিল, চড়, লাথি......

...মলাম, বাবা, মলাম, কানাই হ'য়ে তুই বৈরাগী বধ করবি...

কানুর হাসি আরো বাড়িয়া যায় এবং সে অধিকতর উৎসাহে হাত পা ছুঁড়িতে আরম্ভ করে।

অবশেষে বিজয় কোন রকমে কানুর কবল-মুক্ত হইয়া সবেগে দৌড় মারিল। তাহার চিমটা, ঝুলি পড়িয়া রহিল, তাহার দীর্ঘ চুল খুলিয়া গিয়া বাতাসে উড়িতে লাগিল; কানু পিছে পিছে ছুটিল।

কানুর মস্ত একটা মুদ্রাদোষ ছিল এই যে, হঠাৎ হাসি পাইলে যাহাকে সম্মুখে পাইত তাহাকে মারিতে সুরু করিত; কিল, চড়, লাথি; তাহার আর কাণ্ডজ্ঞান থাকিত না; আর তাহার সবল দেহের আঘাতে অনেক সময়ে আহত

ব্যক্তির সকল প্রকার জ্ঞান লুপ্ত হইয়া যাইত। গ্রামের লোকে পারৎপক্ষে তাহাকে না হাসাইতে চেষ্টা করিত, কিম্বা সে হাসিতে আরম্ভ করা মাত্র দূরে সরিয়া যাইত। আবার কানুরও এমন অভ্যাস যে, অল্প কারণেই তাহার হাসি পায়। কানুর হাসি গ্রামের এক সমস্যা।

কানু ছুটিতেছে আর বলিতেছে—তবেরে বাইসিকেলের বৈরাগী—বেটার পায়েই যেন বাইসিকেলের গতি।

বিজয় বৈরাগী এক সময়ে সংসারী ছিল। তখন সে খেলনা বিক্রয় করিত, শহর হইতে নূতন নূতন মনোহারি জিনিস আনিয়া বেচিত; একবার গাঁয়ের মেলাতে ছায়াবাজি আনিয়া দেখাইয়া বেশ দু' পয়সা কামাইয়াছিল। তারপরে কেন জানি না হঠাৎ সংসার ত্যাগ করিয়া সে বৈরাগী সাজিয়া ভিক্ষা করিতে লাগিল এবং ভিক্ষার সৌকর্যার্থে সে একখানা পুরাতন সাইকেল কিনিয়া ফেলিল। সাইকেলের ভিক্ষুক একটা নূতন ব্যাপার। ইহাতে ভিক্ষার হাঁটাহাঁটি যেমন সহজ হইয়া গেল, ভিক্ষার পরিমাণও তেমনি বাড়িল। সাইকেল হইতে নামিয়া ভিক্ষা চাহিলে না দিয়া পারা যায় না, এবং পদাতিক ভিক্ষুকের চেয়ে তাহাকে কিছু বেশিই দিতে হয়, সম্প্রতি সাইকেলখানা তাহার গিয়াছে কিন্তু খ্যাতিটা এখনো যায় নাই।

এদিকে কানুর তাড়া খাইয়া বিজয় বৈরাগী দিক্-বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিতে ছুটিতে হাটের অপর প্রান্তে গিয়া পৌঁছিল এবং কি করিতেছে বুঝিবার আগেই একজন লোকের ঘাড়ে গিয়া পড়িল—

—পাষণ্ড কোথাকার—

বিজয় মুখ তুলিয়া দেখিল টোলের অধ্যাপক সারদা ভট্টাচার্য।

ভট্টাচার্য বলিতে লাগিলেন, পাষণ্ড কোথাকার, আর একটু হ'লেই পদস্খলন ঘটেছিল আর কি...

দূর হইতে বিজয়ের নূতন দুরবস্থা দেখিয়া কানু থামিল, বলিল, বেশ হয়েছে বেটা এবার কেশরীর মুখে পড়েছে।

সারদা ভট্টাচার্যের মুখে ও মাথায় প্রচুর চুল, দাড়ি ও গোঁফের সমাবেশের জন্য গাঁয়ের লোকে আড়ালে তাঁহাকে কেশরী বলিত।

বিজয় বলিতেছে, দোহাই বাবাঠাকুর, আমি ইচ্ছে ক'রে পড়িনি।

ভট্টাচার্য বলিলেন, না, আমিই ইচ্ছে ক'রে তোমার স্কন্ধে গিয়ে পড়েছি, কেমন?

ভট্টাচার্য বাক্যের মাঝে মাঝে এক আধটা বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করিয়া গৌড়ীয় ভাষাকে শোধন করিয়া লন।

বিজয় বলিল—বাবাঠাকুর, কানুকে জানো তো! তারই হাসির তাড়ায় আমি তোমার ঘাড়ে এসে পড়েছি। বুড়ো অশথের শপথ ক'রে বলছি বাবা, এই হচ্ছে গিয়ে সত্যি কথা—নইলে আমি কেন—

কিন্তু তাহার কথা শেষ হইতে পাইল না. বুড়ো অশ্বত্থের নাম শুনিবামাত্র ভট্টাচার্য আবার ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং বলিতে লাগিলেন...পাষণ্ড, নাস্তিক, বেটা ইংরাজি পড়া কালাপাহাড়...

এসব অভিধা নিজের বিরুদ্ধে ভাবিয়া বিজয় বলিল—সত্যি বাবা, বুড়ো অশথের শপথ—আমি ইংরাজি পড়িনি—

ভট্টাচার্য বলিয়া উঠিলেন—বুড়ো অশথ! অশথের দোহাই আর দিতে হবে না। আর এক মাস পরে ওখানে তিসির চাষ হবে। সেই তিসির তেল যাবে বিলেতে—সাহেব বিবিরা খানা খাবে!

তিসির তেল যে সাহেব বিবিদের খানার উপকরণ ইহা বিজয়কে বিস্মিত করিলেও কি করিয়া অশথ গাছে তিসি ফলিবে সে কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। ভট্টাচার্য আপন মনে বক বক করিতে করিতে জগু সরকারের দোকানে প্রবেশ করিলেন।

৬

জগু সরকার মহাজন ও ব্যবসায়ী। বাজারের মধ্যে তাহার দোকানখানিই সবচেয়ে বড়। লোকটার দেবে দ্বিজে ভক্তি যেমন প্রবল, দেনদারের সঙ্গে ব্যবহার তেমনি নির্মম; কণ্ঠী ও তিলকে যেমন সে উদার, হিসাবপত্রে তেমনি সে সূক্ষ্ম। লোকটা অতিশয় ধূর্ত, সবাই তাহাকে ভয় করে। এমন লোক বেশি কথা বলে না, জগু সরকার স্বল্পভাষী। লোকটা অজীর্ণের রুগী, আহার অত্যন্ত পরিমিত, তন্মধ্যে সাগু বার্লির ভাগই বেশি। বোধ করি, তজ্জন্য সে দুঃখিত নয়, খরচ কম হয় বলিয়া সে খুশীই। শুষ্ক আমশির মতো লোকটা শুকাইয়া শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কেবল চোখ দুইটি রোগের তাড়নায় ও লোভের জ্বালায় উজ্জ্বল।

জগু সরকারের ফরাসের উপরে যোগেশ, ঘাড়-টান পঞ্চানন এবং নীলাম্বর ঘোষ বসিয়া নিজেদের মধ্যে কথা বলিতেছিল। জগু নিজেও ছিল বটে, তবে সে চুপ করিয়া ছিল, কারণ তাহার ধারণা অপব্যয়ের সূত্রপাত বাক্য হইতেই সুরু হয়। পায়ের শব্দ শুনিবামাত্র তাহারা উৎকর্ণ হইয়া উঠিতেছিল, স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, তাহারা আরও দু'এক জনের জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

যোগেশ বলিল—আমি এখন করাতি পাই কোথায়? চারদিকে লোক পাঠিয়েছিলাম, কেউ রাজি নয়।

নীলাম্বর এক চোখ বুজিয়া উত্তর করিল—হুঁ, লোকের মনে এখনো দেব দ্বিজে ভক্তি আছে। হুঁ, সবাই তো কলেজে পড়েনি।

তারপরে একটু থামিয়া আবার [illegible] চলিল—গাছ তো গাছ মাত্র নয়, যে-কাঠে জ[illegible] মূর্তি সৃষ্টি, গাছ হচ্ছে সে-ই কাঠ।

জগন্নাথের উল্লেখে জগু সরকার [illegible] মাথায় হাত ঠেকাইল।

এমন সময় সারদা ভট্টাচার্য [illegible] করিলেন। বিজয়ের হঠকারিতায় তিনি [illegible] তাঁহার মুখ দেখিলে মনে হয়, বিশ্বজ[illegible] উপরেই তিনি বীতশ্রদ্ধ হইয়া গিয়াছেন।

জগু বলিল—বসতে আজ্ঞা হোক মশাই।

যোগেশ বলিল—দেরী হল যে।

ভট্টাচার্য ক্ষেপিয়া উঠিয়া বলি[illegible] ত্বরাতেই বা কি আবশ্যক। আজ অশথ[illegible] কাল হরিবাড়িটা, পুজাপার্বণ তো গিয়েছে[illegible]

নীলাম্বর সুযোগ বুঝিয়া বলি[illegible] 'একবর্ণা ভবেৎ পৃথ্বী।'—

—ভবেৎ কেন? ঘটতে আর ত[illegible] কি? শেষে কিনা বিজয় বৈরাগী বেটা [illegible] দেহের উপরে এসে পড়লো।—এই বলিয়া ঘটনাটাকে সালঙ্কারে বর্ণনা করিলেন।

ঘাড়-টান পঞ্চানন বলিল—ওটা ইচ্ছে করেনি।

—না, ইচ্ছে ক'রে নয়! এর পরে ছোটবাবু অশথবৃক্ষও ইচ্ছে করে করেনি।

পঞ্চানন বলিল—এখন আপনারা [illegible] এসেছেন, যাতে এই অধর্ম না হ'তে পা[illegible] ব্যবস্থা করুন।

ভট্টাচার্য উপস্থিত সকলকে নিরীক্ষণ করিয়া লইয়া শুধাইল—ভজহ[illegible]

যোগেশ তাহার অনুপস্থিতির বর্ণনা করিয়া বলিল—খবর পাঠিয়েছে, আসছে।

সত্যই দু'এক মিনিটের মধ্যে বৃদ্ধ [illegible] আসিয়া উপস্থিত হইল।

ভজহরি বৃদ্ধ হইয়াছে—তবুও একহারা সরল দেহ এখনো বেশ [illegible] লোকটি ব্যবসায়ী হইলেও গ্রামে তাহার খ্যাতি আছে। গ্রামের সকলেই মায় [illegible] অবধি তাহাকে শ্রদ্ধা করিয়া চলে।

ভজহরি আসিয়া ভট্টাচার্যের পদধূ[illegible] করিয়া ফরাসের একান্তে বসিল।

নীলাম্বর প্রশ্নের সূত্রপাত করিয়া [illegible] হুঁ, এবারে সবাই মিলে একটা সমাধান [illegible] এমন কাজ কখনো হ'তে দেওয়া যায় না[illegible]

ভজহরি বলিল—ছোটবাবুকে বুঝিয়ে বললেই—তাহার বাক্য শেষ [illegible] আগেই নীলাম্বর বলিল—অসম্ভব।

ভজহরি নিজের তর্কের সূত্র না [illegible] বলিল—তাঁকে বুঝিয়ে বলা হ'য়েছে কি

নীলাম্বর বলিল—তা হয়নি বটে, কিন্তু বাবা সে গুড়ে বালি।

—কেন? ছোটবাবু লেখাপড়া জানা লোক, বুঝোলে তিনি কি বুঝবেন না?—ভজহরি বলিল।

সারদা ভট্টাচার্য একটি সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া অস্যার্থ বলিয়া বুঝাইয়া বলিল—অজ্ঞকে বুঝানো যায়, বিজ্ঞকে বুঝানো যায়, কিন্তু যে নরাধম জ্ঞানের কণামাত্র পেয়েছে ব্রহ্মারও সাধ্য নয় তাহাকে বোঝানো।

ভজহরি বলিল—না হয় তো নাই হবে, কিন্তু একবার চেষ্টা করতে দোষ কি?

নীলাম্বর অগ্রসর হইয়া বলিল—হুঁ, কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? সে এইরূপ সমাধান আশা করে নাই। তাহার ইচ্ছা ব্যাপারটা লইয়া একটা ঘোঁট পাকাইয়া উঠিবে, আনাগোনা শলা-পরামর্শ, বাকবিতণ্ডা চলিবে, আর সকলে মিলিয়া সেই উত্তাপে হাত-পা সেঁকিতে থাকিবে—ইহাই ছিল তাহার আশা। কিন্তু সবশুদ্ধ ব্যাপারটা কেমন যেন আপোষের পন্থা ধরিল! তাই তাহার অপ্রসন্নতা।

কিন্তু ভজহরির কথা কেহ ঠেলিতে পারে না, বিশেষ কথাটায় যুক্তিও আছে।

আলোচনা যখন এই অবস্থায় আসিয়া ঠেকিয়াছে যোগেশ বলিল—তাহলে ঠাকুর মশাই, আপনি গিয়ে কাল একবার ছোট-বাবুকে—

এইবার জগু নীরবতা ভঙ্গ করিল—সে বলিল, ভজহরি দাদার যাওয়াই উচিত।

যোগেশ পুনরায় বলিল—বেশ সঙ্গে ভজহরি দাদাও যাবেন।

জগু বলিল—না ভজহরি দাদা একাই যাবেন।

জগু বেশি কথা বলে না—কাজেই ইহার বেশি বলিল না। কিন্তু তাহার কথার অন্তরালে যে চিন্তা লুক্কায়িত তাহা এইরূপ। জগু নিজে ধার্মিক না হইলেও ধর্মের সাংসারিক গুরুত্ব সম্বন্ধে সে সচেতন। এ বিষয়ে তাহার কোনরূপ মোহ নাই। সে জানে সে ভণ্ড ধার্মিক, আর ভজহরি যথার্থ ধার্মিক। ভণ্ডামির পুরস্কারস্বরূপ সে টাকা ও প্রতিপত্তি পাইয়াছে, কিন্তু সত্যকার ধর্মেরও তো একটা পুরস্কার আছে। জগুর বিশ্বাস সংসারে ধর্মের এখনো এতটুকু প্রেস্টিজ আছে যে লোকে অনিচ্ছাতেও ধার্মিককে সমীহ করে। তাহার উপদেশ কেহ গ্রাহ্য করে না বটে, করা উচিতও নয়, কিন্তু তাহার কথাটুকু অন্তত মন দিয়া শোনে। সত্য কথা সত্যই তো আর কেহ বলে না—কিন্তু তাই বলিয়া কেহ কি সত্য-বাদীকে উপহাস করে। জগু বুঝিয়াছে ছোট-বাবুর কাছে ভজহরি এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে তিনি কথাটা শুনিবেন—আর কেহ গেলে শুনিতেও চাহিবেন না। সংসারে অর্থের ও বিদ্যার প্রতাপ প্রতিপত্তি প্রয়োগের স্থান আছে—কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্র ধর্মের, কাজেই এখানে ভজহরির যাওয়া আবশ্যক। তাহার সঙ্গে অপর কেহ গেলে ভজহরির গুরুত্ব নষ্ট হইবে, বলিয়াই জগুর বিশ্বাস। গঙ্গোদক নর্দমা দিয়া প্রবাহিত হইলে তাহার পবিত্রতা কি আর থাকে?

ভজহরি সবিনয়ে বলিল—বেশ আপনাদের যখন অনুমতি, আমিই যাবো। ভালো কথা বুঝিয়ে বলুতে ক্ষতি কি?

এইরূপে মূল সমস্যার মীমাংসা হইয়া গেলে অবান্তর কথা ও তামাক আসিয়া পড়িল। কানু ঘোষের দৈহিক শক্তি ও বিজয় বৈরাগীর অবিমৃষ্যকারিতাই প্রধান প্রসঙ্গ। ভজহরি বলিল—কানু শক্তিও রাখে যেমন খেতেও পারে তেমনি। বস্তাটা তুলে দিয়ে এক জায়গায় বসে পাঁচ সের রসগোল্লা খেয়ে নিলো।

নীলাম্বর বলিল—বয়সকালে সবাই পারে। ওর আর বয়স কি? হুঁ, তাছাড়া পরের পয়সার পাঁচ সের তো এক সের মাত্র।

ভট্টাচার্যের এই সব অর্বাচীন প্রসঙ্গ মুখরোচক লাগিতেছিল না, সায়ং সন্ধ্যার সময় উত্তীর্ণপ্রায় অজুহাতে তিনি উঠিয়া পড়িলেন, যোগেশ, পঞ্চানন নীলাম্বর প্রভৃতি যাহারা অন্য পাড়ায় থাকে তাহারাও বাহির হইয়া পড়িল। যোগেশ আর একবার কথাটা মনে করাইয়া দিবার জন্য বলিল—ভজহরি দাদা, ছোটবাবু সকাল সাতটার মধ্যেই বাইরে এসে বসেন।

ভজহরি বলিল—আমার ভুল হবে না, ভাই।

(ক্রমশ)

পিতামহীর পরিণয়

মাতামহের বিয়ে দেখার সৌভাগ্য আমাদের দেশে কারু না হলেও সম্প্রতি সে সৌভাগ্য হয়েছে বিলেতের ভাগ্যবান কয়েকটি নাতি-নাতনীর। তা জানা গেছে সেখানকার টাটকা এক খবরে। কিছুদিন আগে জানা যায় ৬৭ বছরের বৃদ্ধা বিধবা মিসেস আগ কুপার যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিমানযোগে সাউথ ইয়র্কের কোনিসরাওতে আসছেন তাঁর ছেলে-মেয়ে দেখতে। হঠাৎ নাতি-নাতনীদের খবর পাওয়া গেল—তিনি তাঁর আসাটা বাতিল করেছেন। কারণ কি? না তিনি জানিয়েছেন হঠাৎ যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর শৈশবের বন্ধু, খেলার সংগী ৭১ বছরের বৃদ্ধ উইলিয়াম হেনরী রাণ্টিংয়ের সঙ্গে বহুদিন পরে তাঁর দেখা হয়েছে এবং তাঁদের দুজনের নতুন করে বিয়ের ঠিক হয়েছে। মিসেস কুপার—৯টি সন্তানের জননী—তিনটি নাতি-নাতনীর ঠাকুরমা!

মাছ পড়লো মোটর চাপা

সম্প্রতি বিলেতের "সানডে এক্সপ্রেস" কাগজের একটি খবরে জানা গেছে যে, সমুদ্র তীরবর্তী কোক্স্টোন হাইদ্ রোডের পাশে বসে কয়েকটি মৎস্য শিকারী সমুদ্রে ছিপ ফেলে মাছ ধরছিলেন। একজন মৎস্য শিকারীর বঁড়শীতে মাছ গাঁথার তিনি জোরসে এমন ঘ্যাঁচ্ মারেন যে টানের চোটে মাছটি ওপরের ঐ রাস্তার ওপর ছিটকে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে তখনই ঐ মাছটি এক মোটর গাড়ীতে চাপা পড়ে! মৎস্য শিকারী দৌড়ে গিয়ে দেখে—তার শিকারের দুরবস্থা। গাড়ীর ড্রাইভার কিন্তু পালায়নি, তিনি মৎস্য শিকারীর কাছে ক্ষমা চেয়ে দুঃখ প্রকাশ করলেন। চাপা-পড়া কড্ মাছটির ওজন ছিল ন' পাউণ্ড, অর্থাৎ প্রায় সাড়ে চার সের!

বৃটেনবাসীর নেশার বহর!

সম্প্রতি নিখিল বিশ্ব মাদক নিবারণী সঙ্ঘের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দেশের মাদক ব্যবহারের হিসাব দেখিয়ে যে বুলেটিন প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে দেখা যায় বৃটেনবাসীর মাদকানুরাগটা এই কয়েক বছরে বেশ বেড়ে গিয়েছে। ১৯৪১ সালে বৃটেনে মোট ৪৬ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের মাদক দ্রব্য বিক্রী হয়েছিল—১৯৪৪ সালে বিক্রী হয় ৬৬ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের মাদক দ্রব্য। আর ১৯৪৫ সালে বিক্রী ৬৮ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের মাদক দ্রব্য।

শুয়োর বেশে—টমাটো চুরি!

সম্প্রতি জোহান্সবার্গের এক বিচারালয়ে অদ্ভুত এক মামলায় দুটি নারীকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। অভিযোগ, তারা লাওভেল্ডের এক চাষবাড়ীতে শুয়োর সেজে টমাটো চুরি করছিল। জেরার উত্তরে অপরাধীরা বলে যে, তারা দুজনেই গেরস্ত ঘরের বউ এবং কয়েক সপ্তাহ ধরে টমাটো কেনার চেষ্টা করেও টমাটো কিনতে না পেরে ঐ উপায় অবলম্বন করেছে। টমাটো কিনতে পারেনি—তার কারণ বাজারে টমাটো বড় একটা পাওয়াই যায় না, যখন পাওয়া যায় তখন চাষীরা এমন দাম হাঁকে যে তা ছোঁওয়া যায় না। মহিলা দুটি আরও বলেন যে, চাষীরা ঐ চড়া দামেও খুশী না হয়ে সম্প্রতি বলতে শুরু করেছিল যে, "টমাটো বেচে লাভ কি—তার চেয়ে শুয়োরদেরই খেতে দোব।" কাজেই আমাদের টমাটো পাওয়ার একমাত্র উপায় আবিষ্কার করলাম যে, শুয়োর সেজে চাষীদের ক্ষেতে ঢোকা। বিচারে এই এজাহারের পর, —মহিলা দুটিকে বিচারপতি তিরস্কার করে মুক্তি দিয়েছেন এবং তাদের ব্যবহৃত শুয়োরের ছদ্মবেশ দুটি বাজেয়াপ্ত করে জোহানস্বার্গের কৃষি বিভাগের সম্পাদকের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

দিল ডাক—পরিমল মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—বুক স্ট্যাণ্ড, ১।১।১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৩৲ টাকা।

আলোচ্য উপন্যাসখানির পটভূমিকা রণাঙ্গন এবং লেখক প্রত্যক্ষ রণাঙ্গনের অভিজ্ঞতা লইয়াই উপন্যাসখানি রচনা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। যুদ্ধ ও যুদ্ধক্ষেত্রের পটভূমিকায় নায়িকা মিতার প্রগতিবাদী ও বিদ্রোহী মন, চিরাচরিত অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সংগ্রাম লেখক সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহ পাঠকের মনকে শেষ পর্যন্ত টানিয়া লইয়া যায়। ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গী সুন্দর। কিন্তু মিতার মত নারীর চরিত্রের পরিণতি কেমন যেন বেমানান বলিয়াই মনে হয়। ইহা লেখকের প্রথম উপন্যাস হইলেও মোটের উপর আমাদের ভাল লাগিয়াছে এবং সাহিত্যরসিক পাঠকগণও এই উপন্যাসখানি পাঠে আনন্দলাভ করিবেন বলিয়া আমরা মনে করি। সামান্য সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও লিপিকুশলতার জন্য লেখককে প্রশংসা করিতে হয়। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ মনোজ্ঞ ও সুরুচিসম্মত।

জাতীয়তার বাণীমূর্তি হার্ডার—শ্রীদিলীপকুমার মালাকার প্রণীত এবং ডক্টর বীণা সরকারের লিখিত ভূমিকা সংবলিত। প্রাপ্তিস্থান, শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৩, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

মনীষা হার্ডার ছিলেন জার্মান লোক-সাহিত্যের উদ্গাতা, দার্শনিক ঋষি। আলোচ্য গ্রন্থে তাঁহারই জীবন ও বাণীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তৎসহ হার্ডারের সমসাময়িক দার্শনিক ও লেখকদেরও কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে। বইটি ক্ষুদ্র হইলেও আগাগোড়া তথ্যপূর্ণ। এই সকল তথ্য বাঙালী পাঠকগণকে পরিবেশন করার দরুণ রচয়িতা ধন্যবাদার্হ।

১৫।৪৭

The Indian National Congress Vol. 1—ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক—জে কে দাশগুপ্ত, ১২৪।৫বি, রসা রোড, কলিকাতা। মূল্য ছয় টাকা।

ডাঃ দাশগুপ্ত ইতিপূর্বে বঙ্গভাষায় কংগ্রেসের বিস্তৃত ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন এবং বাঙালী পাঠক সমাজের নিকট উক্ত গ্রন্থ বিশেষ আদৃত হইয়াছে। বঙ্গ ভাষানভিজ্ঞ পাঠকগণের জন্য তিনি ইংরাজি ভাষায় আলোচ্য গ্রন্থখানা প্রণয়ন করিয়াছেন। ভারতীয় জাতীয় মহাসভা বা কংগ্রেস সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ প্রণীত হওয়া সত্ত্বেও ডাঃ দাশগুপ্তের প্রণীত এই পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কংগ্রেসের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে বাঙলার অবদান কতখানি, তাহা এই গ্রন্থপাঠে যতখানি উপলব্ধ হইবে, এই শ্রেণীর অন্যান্য গ্রন্থ পাঠে ততখানি হইবে না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। এ হিসাবে আলোচ্য গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য সকলেরই চোখে পড়িবে। কংগ্রেসের ভিতর জাতীয় ভাব ও বৈপ্লবিক চেতনা সঞ্চারের দায়িত্ব বাঙলা দেশই বোধ হয় সর্বাগ্রে পালন করিয়াছে। বঙ্গের পটভূমিকায় কংগ্রেসের জাতীয় উদ্দীপনা বিকাশের ক্রমাভিব্যক্তি অতি সুন্দরভাবে লেখক এই গ্রন্থে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।' কংগ্রেসের জন্ম হইতে ১৯০০ সাল পর্যন্ত তাহার মোটামুটি ইতিহাস গ্রন্থের আলোচ্যখণ্ডে পাওয়া যাইবে। তৎকালে রচিত ও স্বদেশী সভাসমিতিতে গীত বাঙলার জাতীয় সংগীতের ইংরাজি অনুবাদ গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে। এতৎসহ লেখকের সহজ ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গী গ্রন্থখানাকে শুষ্ক ই[illegible] মাত্র না করিয়া রসসমৃদ্ধ সাহিত্য গ্রন্থে [illegible] করিয়াছে। বইটি বহু চিত্রে সমৃদ্ধ এবং ছাপা, কাগজ উত্তম ও প্রচ্ছদপট মনোরম। ২[illegible]

ইনসমনিয়া

কিছুদিন যাবত আমি ইনসমনিয়ায় ভুগছি। অবশ্যি সেটা আমার ফাউন্টেন পেনের শোকে নয়। এমন আমার মাঝে মাঝে হয়; আর একবার শুরু হলে দিন পনের এর জের চলতে থাকে। তারপরে আপনি স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে। গত সাত আট বছর ধরে এমনি চলছে, কাজেই অবস্থাটা আমার অভ্যাসগত হয়ে গেছে। শরীরের স্নায়ুগুলি অতিরিক্ত উত্তেজিত হয়ে নিদ্রার ব্যাঘাত করে, সেই উত্তেজনা আপনি যখন স্তিমিত হয়ে আসে তখন নিদ্রার জন্য আর ভাবতে হয় না। এই অনিদ্রারোগের শারীরিক কিম্বা মনস্তাত্বিক কারণ নিয়ে আমি কখনো মাথা ঘামাইনি। আমি আসলে ঘুম-কাতর মানুষ নই। একটু নিদ্রালাভের জন্য কত মানুষকে কত কাতরোক্তি করতে দেখেছি। একজন ফরাসী মন্ত্রী বলেছিলেন, আহা, ঘুম যদি বাজারে কিনতে পাওয়া যেত। ঘুম কিনতে পাওয়া যাক বা না যাক, ঘুমের ওষুধ অবশ্যই কিনতে পাওয়া যায়। অনিদ্রার জন্য যখন লোকে ওষুধ খায় তখন স্বীকার করতেই হবে যে অনিদ্রা একটা রোগ বিশেষ।

আমি লোকটা রুগ্ন, অজীর্ণ রোগীর মতো জীর্ণ আমার মূর্তি, ডিসপেপ্টিকের মতো খিটখিটে আমার প্রকৃতি। কিন্তু অনিদ্রারোগীর মতো বিনিদ্র নয়ন কিম্বা বয়ান আমার নয়। ঘুম হয়নি বলে আমার চোখের জ্বালাও নেই, মনের জ্বলুনিও নেই। সাধারণত যাঁরা অনিদ্রারোগে ভোগেন তাঁরা দেখেছি সারাক্ষণ চোখ রাঙিয়েই আছেন। অনিদ্রা যেমন আমার গা-সহা তেমনি আমার মন-সহা। ইন্দ্রজিৎ নাম না নিয়ে আমি যদি নিদ্রাজিৎ নাম নিতুম তবেই আমাকে মানাত ভাল।

আমি যে ইন্দ্রজিৎ নাম গ্রহণ করেছি সেটা মিথ্যা, কারণ আমি ইন্দ্রকে জয় করিনি, ইন্দ্রিয়কে তো নয়ই। দেবরাজ ইন্দ্রের স্বর্গ-সিংহাসনের প্রতি আমার লোভ নেই আর পঞ্চেন্দ্রিয় জয়ের প্রতি আমার স্পৃহা নেই। বলতে সংকোচ নেই ইন্দ্রিয় জয়ের চাইতে ইন্দ্রিয়-সম্ভোগেই আমি বেশি বিশ্বাস করি। ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি যোগাসন সে আমার নয়। অতএব যা কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে স্বাদে স্পর্শে গানে—আমার আনন্দ রবে তারই মাঝখানে। এ আনন্দ আপনারাও সবাই চান। কিন্তু জিগগেস করি জীবন-সম্ভোগ করবে কে? যে জেগে থাকবে সে না যে ঘুমিয়ে থাকবে সে?

আমার যে চোখে ঘুম নেই সেটাকে আমি অভিশাপ বলে মনে করিনা বরং ওটাকে দেবতার বর বলে গ্রহণ করেছি। 'আঁখি হতে ঘুম কে নিল হরি' বলে আমি কখনো বিলাপ করতে বসিনি। ঘুম-কাতরদের মতো প্রাণপণে চোখ বুজে ভেড়ার পালের গতিভঙ্গি কল্পনা করতে আমি রাজি নই। সেদিন হেমিংওয়ের গল্প পড়তে গিয়ে দেখলুম এক ব্যক্তি নিজেকে ঘুম পাড়াবার জন্য বিছানায় শুয়ে শুয়ে বঁড়শিতে ট্রাউট মাছ ধরবার ছবিটি কল্পনা করছেন। ভাবুন একবার, মাছ ধরবার মতো বঁড়শি দিয়ে যদি ঘুম ধরতে হয় তবেই হয়েছে। নিদ্রা-দেবীকে তুষ্ট করবার জন্য আমি তো কোনরকম নৈবেদ্য সাজাতে প্রস্তুত নই।

নিদ্রাকে জ্ঞানী ব্যক্তিরা মৃত্যুর সঙ্গে তুলনা করেছেন। কোনো কোনো ইংরেজ কবি নিদ্রাকে মৃত্যুর দোসর কিম্বা কনিষ্ঠ ভ্রাতা আখ্যা দিয়েছেন। চিরনিদ্রা হল আসল মৃত্যু কিন্তু প্রতিদিনের নিদ্রাও ছোটখাট মৃত্যু—temporary death. ইংরেজ কবি যে বলেছেন কাপুরুষরা মৃত্যুর পূর্বে বহুবার মরে সে কথাটা তাহলে কিছুমাত্র মিথ্যা নয় এবং দুনিয়া শুদ্ধ লোককে কাপুরুষ বলে গাল দেবার জন্যই সেক্সপিয়ার ও কথাটি বলেছেন।

প্রতিদিনের নিদ্রাকে টুকরো টুকরো করে দেখি বলেই ওটা আমাদের গায়ে লাগে না। নইলে আমাদের অতি স্বল্পস্থায়ী জীবনের কত বড় একটা অংশ নিদ্রাদেবী গ্রাস করে বসে আছেন ভাবলে আর চোখে ঘুম থাকে না। একজন সুস্থ ব্যক্তি গড়পড়তা দিনে আট ঘণ্টা করে ঘুমোয় অর্থাৎ দিনের এক-তৃতীয়াংশ আমরা ঘুমিয়ে কাটাই, তাহলেই বলতে হবে জীবনেরও এক তৃতীয়াংশ ঘুমিয়ে কাটে। অর্থাৎ একজন লোক যদি ষাট বছর বেঁচে থাকেন তবে বলতে হবে অন্ততঃ কুড়ি বছর তিনি ঘুমিয়ে কাটিয়েছেন। রিপ্ ভান্ উইংকল্ কি জগতে একজনই ছিল? আমরা সকলেই রিপ্ ভান্ উইংকল-এর জ্ঞাতিগোষ্ঠী। ও গল্পটা একটা রূপক।

এমন সুন্দর পৃথিবীতে এসে এমন মহা-মূল্য মানবজীবন পেয়েও কিনা আমরা হেলায় ঘুমিয়েই নষ্ট করছি। Early to bed এর মতো এমন আত্মঘাতী সদুপদেশ আর হতে পারে না। সদা সত্য কথা কহিয়ো-র চাইতেও এটা সর্বনেশে উপদেশ। সাধে ডক্টর জনসন বলেছিলেন—

One who goes to bed before midnight is a perfect scoundrel.

নিজেকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা আত্মহত্যার মতো পাপ। আমাদের দেশের প্রাচীনেরা উপদেশ দিয়েছেন মা দিবা স্বাপ্সি। মা দিবারাত্রি স্বাপ্সি বললে আরো ভালো কথা হত। ইংরেজেরা আসলে বুদ্ধিমান। ওদের দেশ নাইট ক্লাবের দেশ। ওরা দুনিয়াশুদ্ধ লোককে উপদেশ দিয়েছে Early to bed, নিজেরা কিন্তু সারারাত জেগে কাটিয়েছে। ওটাই ইংরেজের প্রথম exploitation এর বাণী। অপর সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে নিজেরা রাত জেগে কাজ করেছে, বাণিজ্য বিস্তার অর্থাৎ সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে। এইজন্যই পোহালে শর্বরী বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ড-রূপে। সেই দীর্ঘ শর্বরীটি কি আমরা ঘুমিয়ে কাটাইনি? বাঙলাদেশ ঘুম পাড়ানি মাসি পিসির দেশ। বর্গী আসে আসুক বুলবুলিতে ধান খায় তো খেয়ে যাক। তবু দস্যি ছেলে ঘুমাক, পাড়া জুড়োক। এখন একেবারেই জুড়িয়েছে। ইংরেজ নিশাচর জাত। তার চৌর্যবৃত্তির সাক্ষ্য রয়েছে ইতিহাসে। সিঁদকাঠি তার হাতে, নইলে রবীন্দ্রনাথ কেন বলবেন—

সেদিন এই বঙ্গপ্রান্তে পণ্য বিপণির এক ধারে
নিঃশব্দ চরণ
আনিল বণিকলক্ষ্মী সুরঙ্গ পথের অন্ধকারে
রাজ-সিংহাসন।

এই সুরঙ্গ পথটি কি সিঁদ নয়? কিন্তু চৌর্য-বৃত্তির জন্য চোর যতখানি দায়ী গৃহস্থের অচৈতন্য ঘুমও ততখানি দায়ী।
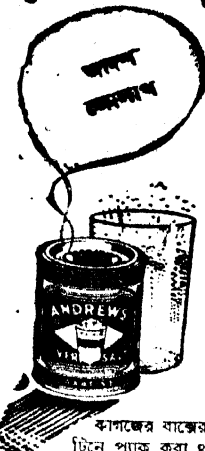
"মাপ করুন!"

"দেহাভ্যন্তরের পরিচ্ছন্নতা স্বাস্থ্যের জন্য প্রথম প্রয়োজন"

প্রত্যহেই এক গ্লাস উজ্জ্বল ফেনিল এণ্ড্রুজ আপনাকে যে মধুর ভাব এনে দেবে তার প্রভাব থাকবে সারা দিন। মনে রাখবেন, এণ্ড্রুজ আপনার শরীরের ভিতরে যে শুচিতা এনে দেয় তা আপনার স্বাস্থ্যরক্ষা করে এবং দৈনন্দিন পীড়া দূর করে।

এণ্ড্রুজ মুখ ও জিহ্বা পরিষ্কার ও সঞ্জীবিত করে।

এণ্ড্রুজ পাকস্থলীকে অম্লমুক্ত করে স্বাভাবিক রাখে।

এণ্ড্রুজ লিভারকে সবল রাখে ও পিত্তাধিক্য দমন করে।

এণ্ড্রুজ ধীরে ধীরে কোষ্ঠ পরিষ্কার করে দেহাভ্যন্তর সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন রাখে। ইহা যন্ত্রণাদায়ক বিষবস্তু দূর করে, কোষ্ঠকাঠিন্য ভাল করে এবং রক্তকে বিশুদ্ধ ও স্নিগ্ধ রাখে।

কাগজের বাক্সের মধ্যে টিনে প্যাক করা থাকে। সর্বত্র নূতন মাল পাওয়া যায়।

ANDREWS

এণ্ড্রুজ লিভার সল্ট

স্নিগ্ধ করে পুনঃ সঞ্জীবিত করে সতেজ করে

পাকা চুল

কলপ ব্যবহার করিবেন না। আমাদের আয়ুর্বেদীয় সুগন্ধি তৈল ব্যবহার করুন এবং ৬০ বৎসর পর্যন্ত আপনার পাকা চুল কালো রাখুন। আপনার দৃষ্টিশক্তির উন্নতি হইবে এবং মাথাধরা সারিয়া যাইবে। অল্প সংখ্যক চুল পাকিলে ২৷৷০ টাকা মূল্যের এক শিশি বেশী পাকিয়া থাকিলে ৩৷৷০ মূল্যের এক শিশি যদি সবগুলিই পাকিয়া থাকে তাহা হইলে ৫ টাকা মূল্যের এক শিশি তৈল ক্রয় করেন। ব্যর্থ হইলে দ্বিগুণ মূল্য ফেরত দেওয়া হইবে।

শ্বেতকুষ্ঠ ও ধবল

শ্বেতকুষ্ঠ ও ধবলে কয়েক দিন এই ঔষধ প্রয়োগের পর আশ্চর্যজনক ফল দেখা যায়। এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া এই ভয়াবহ ব্যাধির হাত হইতে মুক্তিলাভ করুন। সহস্র সহস্র হাকিম ডাক্তার কবিরাজ বা বিজ্ঞাপনদাতা কর্তৃক ব্যর্থ হইয়া থাকিলেও ইহা নিশ্চয়ই কার্যকরী হইবে। ১৫ দিনের ঔষধের মূল্য ২৷৷০ আনা।

বৈদ্যরাজ অখিলকিশোর রায়

নং ১০২ কাতরাসগড় গয়া।

জুয়েল ফিটেড রিষ্টওয়াচ।

সুইস মেড, লীভার মেশিন, নির্ভুল সময়রক্ষক, ৫ বছরের জন্য গ্যারাণ্টী দত্ত। ক্রোমিয়াম কেস, গোলাকার ২৫৲, চতুষ্কোণ ৩০, উৎকৃষ্ট ৩৩৲, রেক্টাঙ্গুলার বা টোনো শেপ ৪৫৲, রোল্ড গোল্ড ১০ বছরের গ্যারাণ্টীযুক্ত ৬০৲। ১৫টি জুয়েল খচিত রোল্ড-গোল্ড ৭৫৲, কার্ভ শেপ রোল্ড-গোল্ড ৮০৲, ডাকব্যয় অতিরিক্ত ৷৶০ আনা; ক্যাটালগ ষ্টকে নাই।

ফাউণ্টেন পেন (আমেরিকান বা ইংলিশ) রোল্ড-গোল্ড অথবা প্ল্যাটিনাম নিব সমন্বিত। বিভিন্ন ডিজাইনের পাওয়া যায়। মূল্য—৫৷০, সুপিরিয়র—৫৸০, উৎকৃষ্ট—৮৲ টাকা। অর্ধ ডজন বা তদূর্ধ্ব একত্রে লইলে ১২½% কমিশন দেওয়া হয়। ডাকমাশুল—৸০। সোল ডিষ্ট্রিবিউটার্স:

প্যারাগন ওয়াচ কোং

পোষ্ট বক্স নং ১১৪১৯, কলিকাতা (ডি)

দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক

স্প্রতি দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির যে বৈঠক হয়, তাহাতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে পাঞ্জাবকে দ্বিধা বিভক্ত করার প্রস্তাব এবং অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টকে ডোমিনিয়ন গবর্ণমেণ্ট রূপে স্বীকারের দাবী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ারের পথে গান্ধীজী

পাটনা গমনের পথে গান্ধীজী তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় দাঁড়াইয়া হরিজন ভাণ্ডারের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন।

চলচ্চিত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং চলচ্চিত্রানুরাগীরা সম্ভবতঃ অবগত আছেন যে, দীর্ঘকাল ধরে হলিউডের চলচ্চিত্র কর্মীরা সুখ সুবিধার হার, বেতন বৃদ্ধি ও কর্মীসংঘ মেনে নেওয়ার ব্যাপার নিয়ে ধর্মঘট চালিয়ে আসচে। এই নিয়ে মালিক ও কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষও হয়েছে, ফলে কয়েক মাস যাবৎ হলিউডে কাজ প্রায় বন্ধই আছে। সম্প্রতি সম্মিলিত ষ্টুডিও কর্মীসংঘ সমূহের সভাপতি হার্বার্ট কে সরেল এই ধর্মঘটের একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্যে পৃথিবীর চিত্রানুরাগীদের কাছে হলিউডের ছবি বয়কট করার জন্য এক আবেদন প্রচার করেছেন। এই আবেদন প্রচার করা হয়েচে হলিউডের ৯০০০ ধর্মঘটী কর্মীদের সংঘ থেকে। এই সঙ্ঘগুলি বলছে যে, বর্তমানে ছবি তোলার যে কাজ হচ্ছে তা শ্রম-বিরোধী সন্ত্রাসবাদের সাহায্যেই সাধিত হচ্ছে এবং সেসব ষ্টুডিও হচ্ছে মেট্রো গোল্ডুইন, ওয়ার্ণার, প্যারামাউণ্ট, কলম্বিয়া, আর কে ও, টোয়েণ্টিয়েথ সেঞ্চুরী, ইউনিভার্সাল, হল রোচ ও রিপাবলিক। ধর্মঘটীদের পক্ষ থেকে বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, "দীর্ঘ বিবেচনার পর আমরা এই পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েচি। ডলার নীতিতে সচকিত বিদেশী বাজারে এর প্রতিক্রিয়া কি হবে আমরা জানি। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে হলিউডে আজ যা ঘটচে—ডেমোক্রেটিক ইউনিয়নগুলির ধ্বংস সাধন; আইনের খামখেয়ালী প্রয়োগে বিভিন্ন কেন্দ্রের শ্রমিক সংঘগুলি কর্তৃক বিপন্নাবস্থা ঘোষণা—ডেমোক্রেটিক নীতিতে বিশ্বাসী পৃথিবীর সকলেরই এসব ব্যাপার জানা দরকার।"

মালিকদের তরফ থেকে বলা হয়েচে যে, ধর্মঘটী ইউনিয়নদের বিবৃতির কোন জবাবই দেবার দরকার নেই। ধর্মঘটীদের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে মেক্সিকোর শ্রমিক নেতা লম্বার্ডো টলিডানো, লণ্ডনের সিনে টেকনিসিয়ন এসোসিয়েসনের সেক্রেটারী জর্জ এলভিন, ফ্রেঞ্চ ন পিকচার্স ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের রী মঃ চ্যাজো প্রভৃতি টেলিগ্রাম য়েছেন।

চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এই ধরণের ধর্মঘট প্রথম। শ্রমিকদের ওপর অন্যায় জুলুমের প্রতিবাদ সকলেই করবে, তাদের অবস্থা ভাল করার জন্যে যদি চিত্রানুরাগীদের দ্বারা এতটুকুও কিছু করা সম্ভব হয়, তা তারা করতে দ্বিধা করবে না একথাও ঠিক। তাছাড়া বর্তমান যুগে পৃথিবীর সমস্ত দেশের পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ যেভাবে নিবিড় হয়ে উঠেছে এবং পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক এত গভীর হয়েছে যে, এক দেশের কোন ব্যাপারের প্রতিক্রিয়া আর সব দেশে দেখা দেয়ই। শ্রমিকদের দুঃখ সর্বত্রই সমান; হলিউডের শ্রমিকদের দুঃখ দূর করার জন্যে ভারতের সাধারণ চিত্রানুরাগী ও শ্রমিকদের সহযোগিতা ও সহানুভূতিও নিশ্চয়ই প্রকাশ পাওয়া উচিত।

নূতন ও আগামী আকর্ষণ

গত সপ্তাহে রূপবাণীতে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'র চিত্র সংস্করণ মুক্তিলাভ করেছে। ছবিখানি প্রযোজনা করেছে এসোসিয়েটেড পিকচার্স, পরিচালনা সতীশ দাশগুপ্ত এবং ভূমিকায় দেবী মুখোপাধ্যায়, জহর গাঙ্গুলী, চন্দ্রাবতী, সুমিত্রা, মিহির ভট্টাচার্য তুলসী চক্রবর্তী কৃষ্ণধন প্রভৃতি।

'ভারত নাট্যম্' নৃত্যভঙ্গিমায় শ্রীমতী শান্তা

* * *

এ সপ্তাহের আকর্ষণের মধ্যে রয়েছে শ্রী-উজ্জ্বলা-পূরবীতে সীতা দেবীর বিখ্যাত উপন্যাস 'পরভৃতিকা'; পরিচালক বিধায়ক ভট্টাচার্য এবং প্রযোজক প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী; জ্যোতি-প্রভাত-রূপালি-পার্ক শো'তে কারদার প্রডাকসন্সের 'সাজাহান'; ভূমিকায় সায়গল, রাগিণী, জয়রাজ ও কানওয়ার; সেণ্ট্রাল-ক্রাউন-সিটিতে মিনার্ভা মুভীটোনের 'শমা'; ভূমিকায় মেহতাব ও ওয়াস্তী।

বিবিধ

প্রতিমা দাশগুপ্তা আবার বম্বেতে ছবি তুলছেন এবং এবারও কাহিনী রচনা, প্রযোজনা ও পরিচালনা তাঁর নিজেরই। ছবিখানির নাম, 'ঝরণা'।

* * * *

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী চিত্র-জগতের খ্যাতনামা সংগীতবিদ অমরনাথ লাহোরে পরলোকগমন করেছেন। অমরনাথ প্রথম নাম করেন 'দাসী' চিত্রে এবং চিত্রজগতে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা করলেন 'শিরী ফরহাদ' থেকে।

* * * *

খ্যাতনামা অভিনেত্রী দুর্গা খোটে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বম্বে সভানেত্রী নির্বাচিত হয়েছেন।

* * * *

গত সপ্তাহে ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে ডি জি পিকচার্সের নবতম অবদান 'জীবন ও যুদ্ধ'র মহরৎ ধীরেন গাঙ্গুলীর পরিচালনায় সুসম্পন্ন হয়েছে। কালী ফিল্মসেও একখানি নতুন ছবির মহরৎ হ'য়েছে—অতুল দাশগুপ্তের পরিচালনায় অঞ্জলি পিকচার্সের 'মরেও যারা বাঁচে'।

* * * *

অভিনেত্রী মীনা এই সর্তে অভিনয় করার চুক্তি করে যে, সে যে ছবিতে অবতরণ করবে তাতে নায়কের ভূমিকায় তার স্বামী রেজা মীরকে রাখতে হবে।

* * * *

বিলেত আমেরিকা ঘুরে এসে প্রযোজক পরিচালক শান্তারাম বিদেশে ভারতীয় ছবি মুক্তি দেবার উদ্দেশ্যে দেড় কোটি টাকা মূলধনে শান্তারাম ইণ্টারন্যাশনাল লিমিটেড নাম দিয়ে একটি চিত্র পরিবেশন প্রতিষ্ঠান খুলেছেন। নিউ ইয়র্কে ইতিমধ্যেই একটি

খোলা হ'য়েছে। কেবলমাত্র ছবিই নয়, অন্যান্য ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের মারফতে বিদেশে ক'রতে পারবে।

* * * *

তি বিবাহিত তারকাদের মধ্যে নাম বাচ্ছে ওয়াস্তী ও সাহু মোদকের।

* * * *

নিল বিশ্বাস বিক্রম পিকচার্সের পর- তামিল ছবিতে সুর যোজনা ক'রবেন হ'য়েছে; সম্ভবত তিনিই প্রথম জী যিনি মাদ্রাজী ভাষার ছবিতে সুর না করছেন।

* * *

নতুন চালু হ'য়েই কলকাতার ন্যাশনাল ন্ড স্টুডিও বেশ জমে উঠেছে। বর্তমানে ানে তোলা হ'চ্ছে মহামায়া চিত্রপীঠের 'মা র মাটি' পরিচালক বিধায়ক ভট্টাচার্য; রাশঙ্করের 'পথের ডাক'-এর হিন্দী ংস্করণ, পরিচালক পি টি জানি; সরদা আর্ট ফল্মসের 'বাগবাত', পরিচালক জাফর চাবরেজী; ড্রিমল্যান্ড পিকচার্সের 'মানুষের ভগবান' পরিচালক উদয়ন, রজনী ফিল্ম কর্পোরেশনের 'চলার পথে', পরিচালক টকেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শৈলজানন্দ প্রডাকসন্সের একখানি ছবি, পরিচালক শলজানন্দ নিজেই। এর মধ্যে প্রথম তিনখানি ছবির চিত্রগ্রহণ সমাপ্তপ্রায়।

* * * * *

হলিউডের শেমুর নেবেঞ্জেল নামক এক প্রযোজক 'ইন্টারন্যাশনাল্ লাভ্ এফেয়ার' নামে একখানি ছবি তুলছেন; এর চিত্রগ্রহণ হবে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালি, সুইডেন ও যুক্তরাষ্ট্রে এবং খরচ পড়বে প্রায় পঁচাত্তর লক্ষ টাকা।

* * * * *

ভারতীয়দের জন্যে ছবি ভারতেই তৈরী করার উদ্দেশ্যে বিলেতের প্রযোজক আলেক- জাণ্ডার কর্ডা বিলিতী কলাকুশলীদের এদেশে পাঠাবার আয়োজন করেছেন। প্রথম ছবির নাম 'সন অফ ইণ্ডিয়া', লেখক সাইকেল বীর জানকী দাস এবং পরিচালক কর্ডার প্রাক্তন সহকারী আমীর শা।

ভারত নাট্যমের একটি বিশিষ্ট নৃত্যভঙ্গি

নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী শান্তা

সম্প্রতি নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে বোম্বাইয়ের শ্রীমতী শান্তা দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত ক্ল্যাসিক্যাল নৃত্যপদ্ধতি ভারত নাট্যম্ প্রদর্শন করেছেন। কলকাতার শিল্পরসিক দর্শক- সাধারণ এই নাচ দেখে মুগ্ধ হয়েছেন এইজন্যে যে শ্রীমতী শান্তা একনিষ্ঠ অধ্যবসায় এবং কঠিন পরিশ্রম সহকারে এই নৃত্যপদ্ধতি আয়ত্ত করেছেন এবং তাঁর সুন্দর অঙ্গসৌষ্ঠব ও স্বচ্ছন্দ নৃত্যভঙ্গিমার জন্য ভারতনাট্যম্ সত্যিকারের রসোত্তীর্ণ হয়েছে। এই নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজনের জন্য শ্রীযুক্ত হরেন ঘোষকে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

রক্ত সন্ধ্যা

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

নির্জন হাওয়ায় তুমি দিনান্তের দেয়ালি উৎসবে
একটি নক্ষত্র এসে জেলে দিলে বিপুল বৈভবে
জনশূন্যতার তীরে। যবে মোর আসন্ন শর্বরী
প্রত্যাশার বেদনায় তৃণমূলে উঠিলো শিহরি!
দিগন্তে উল্কার ঝড়ে ছিন্ন হলো মৌনতার পাখা।
হে পরমা! ক্ষণদীপ্ত মুহূর্তের মেঘের লীলায়
এ হৃদয় পলকের স্বর্ণ হয়ে জ্বলেছিল কবে?

হাওয়ার স্তম্ভিত বেগ—দিগন্তের আনমিত সীমা
আনেনি হৃদয়ে আর বাহুময়ী তন্বীর ভঙ্গিমা,
রেখার উৎসব। তবু সময়ের গভীর গহনে
দূরান্তের স্বচ্ছ স্রোত এঁকে গেছে মৃত্তিকার বনে
একটি রক্তিম কুঁড়ি—শুভ্র এক শূন্যতার তলে
অদৃশ্যের ঢেউ ভাঙে চেতনার ব্যথিত উপলে।

রোমাঞ্চিত বনচ্ছায়ে পত্রঝরা চৈতালির চিঠি।
প্রান্তিক বসন্ত জাগে হাতে নিয়ে শেষ মঞ্জরীটি
সুবর্ণের সমারোহে। এইখানে তোমাকে পেলাম?
বসন্তের গোধূলিতে এ অক্লান্তঃ আমারি উদ্দাম;
অশরীরী কর হানে নিরন্তর স্মৃতির কবাটে
হিংস্র এক চিতাবাঘ পশ্চিমে রক্তাক্ত থাবা চাটে।

খেলাধূলা

ইংলণ্ড ক্রিকেট দল পুনরায় শেষ বা পঞ্চম টেস্ট খেলায় অষ্ট্রেলিয়া দলের নিকট শোচনীয় ভাবে ৫ উইকেটে পরাজিত হইয়াছে। প্রথম দুইটি টেস্ট খেলায় ইনিংসে পরাজিত হইয়া পর পর দুইটি টেস্ট অমীমাংসিতভাবে শেষ করায় অনেকেই আশা করিয়াছিলেন, ইংলণ্ড দল শেষ টেস্ট খেলায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া জয়ী হইবেন। ইংলণ্ড দল তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছেন, কিন্তু জয়লাভ ভাগ্যে জুটেল না। ইহা খুবই দুঃখের বিষয়। তবে এই কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, যোগ্য দলই সকল গৌরবের অধিকারী হইয়াছে।

এই খেলার একমাত্র হাটন ছাড়া কোন দলের কোন খেলোয়াড় শতাধিক রাণ করিতে পারে নাই। হাটন প্রথম ইনিংসে ১২২ রাণ করিয়া অসুস্থতার জন্য অবসর গ্রহণ করেন। সুস্থ হইতে না পারায় দ্বিতীয় ইনিংসে তাহাকে মাঠে নামান সম্ভব হয় নাই।

এই খেলার আর একটি উল্লেখযোগ্য হইতেছে খেলার ফলাফল। চারিদিনের খেলাতেই মীমাংসা হইয়াছে। প্রথম দিন খেলা হইবার পর দ্বিতীয় দিনে বৃষ্টির জন্য খেলা হয় নাই। ইহার পর তৃতীয় দিনে খেলা আরম্ভ হইয়া পঞ্চম দিনেই শেষ হয়। খেলায় উভয় দলের বোলারদের কৃতিত্বই বিশেষভাবে সকলকে চমৎকৃত করিয়াছে।

ইংলণ্ড দলের জয়-পরাজয়ে আমাদের কিছু যায় আসে না। আমাদের একমাত্র কাম্য ভারতীয় দল অষ্ট্রেলিয়াতে ভাল ফলাফল প্রদর্শন করুক। ভারতীয় ক্রিকেট দলের নির্বাচকগণ যদি পক্ষপাত-দুষ্ট রোগ হইতে মুক্ত হইয়া খেলোয়াড় নির্বাচন করেন, তবেই আমাদের এই আশা পূরণ হইতে পারে। নিম্নে অষ্ট্রেলিয়া ও ইংলণ্ডের পঞ্চম টেস্ট খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইল:—

ইংলণ্ড প্রথম ইনিংস:—২৮০ রাণ (হাটন ১২২, এড্রিচ ৬০, লিণ্ডওয়াল ৬৩ রাণে ৭টি, ম্যাককুল ৩৪ রাণে ১টি ও মিলার ৩১ রাণে ১টি উইকেট পান।)

অষ্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংস:—২৫৩ রাণ (বার্ণেস ৭১, মোরিস ৫৭, হেমেন্স ৩০ নট আউট; রাইট ১০৫ রাণে ৭টি ও বেডসার ৪৯ রাণে ২টি উইকেট পান।)

ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংস:—১৮৬ রাণ (কম্পটন ৭৬, ম্যাককুল ৪৪ রাণে ৫টি, লিণ্ডওয়াল ৪৬ রাণে ২টি, মিলার ১১ রাণে ১টি উইকেট পান।)

অষ্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংস:—৫ উই: ২১৪ রাণ (ব্র্যাডম্যান ৬৩, হ্যাসেট ৪৭, মিলার নট আউট ৩৪, বেডসার ৭৫ রাণে ২টি ও রাইট ৯৩ রাণে ২টি উইকেট পান।)

বিভিন্ন টেস্ট খেলার ফলাফল

অষ্ট্রেলিয়া ও ইংলণ্ডের এইবারের বিভিন্ন টেস্ট খেলার ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

প্রথম টেস্ট খেলায়:—অষ্ট্রেলিয়া দল এক ইনিংস ও ৩৩২ রাণে বিজয়ী হয়। অষ্ট্রেলিয়া দল ৬৪৫ রাণ করে। ইংলণ্ড দল প্রথম ইনিংসে ১৪১ রাণ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ১৭২ রাণ করে।

দ্বিতীয় টেস্ট খেলায়:—অষ্ট্রেলিয়া দল এক ইনিংস ও ৩৩ রাণে বিজয়ী হয়। ইংলণ্ড দল ১ম ইনিংসে ২৫৫ রাণ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৭১ রাণ করে। অষ্ট্রেলিয়া দল প্রথম ইনিংসে ৬৫৯ রাণ করে।

তৃতীয় টেস্ট খেলায়:—খেলা অমীমাংসিত-ভাবে শেষ হয়। অষ্ট্রেলিয়া দল প্রথম ইনিংসে ৩৬৫ রাণ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৫৩৬ রাণ করে। ইংলণ্ড প্রথম ইনিংসে ৩৫১ রাণ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৭ উই: ৩১০ রাণ করে।

চতুর্থ টেস্ট খেলায়:—খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। ইংলণ্ড প্রথম ইনিংসে ৪৬০ রাণ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৮ উইকেটে ৩৪০ রাণ করিয়া ডিক্লেয়ার্ড করে। অষ্ট্রেলিয়া দল প্রথম ইনিংসে ৪৮৭ রাণ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ১ উইকেটে ২১৫ রাণ করে।

পঞ্চম টেস্ট খেলায়:—অষ্ট্রেলিয়া দল ৫ উইকেটে বিজয়ী হয়। ইংলণ্ড দল প্রথম ইনিংসে ২৮০ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ১৮৬ রাণ করে। অষ্ট্রেলিয়া ১ম ইনিংসে ২৫৩ রাণ ও ২য় ইনিংসে ৫ উইকেটে ২১৪ রাণ করে।

বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠান আগামী বৎসরে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত হইবে। এই অনুষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মসূচীর কথা প্রত্যহই প্রকাশিত হইতেছে। এইরূপ প্রকাশের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্য বিভিন্ন দেশে এই অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য যাহাতে বিপুল উৎসাহ জাগে। ভারতবর্ষে এই প্রচারের ফলে যে কিছু জাগরণ দেখা দিয়াছে ইহা অস্বীকার আমরা করিতে পারি না। তবে একটি বিষয় আমাদের সকল সময়েই মনে হইতেছে "এই অনুষ্ঠান কি ঠিক পূর্ব আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াই করা হইতেছে?" পরলোকগত মহাত্মা ব্যারণ কুবারতাঁ যে বিশ্ব মৈত্রীর মহান আদর্শ লইয়া এই অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করেন, তাহা কি ঠিক বজায় রাখা হইয়াছে? এই সকল প্রশ্ন যতই আমাদের মনে জাগিতেছে ততই মনে হইতেছে "অনুষ্ঠান আদর্শচ্যুত" হইয়াছে। যদি তাহাই না হইবে তবে কেন জাপান ও জার্মানের উৎসাহী এ্যাথলীট ও সাঁতারুদের এই অনুষ্ঠানে যোগ করিতে দেওয়া হইতেছে না? ইহার জন্য কি বলা চলে না যে বিশ্ব মৈত্রী স্থাপনের উদ্দেশ্য ইহাদের নাই? এইরূপ অবস্থার মাঝে নিপীড়িত জাতি হিসাবে ভারতের কি যোগদান করা উচিত হইবে?

ব্যাডমিণ্টন

ভারতীয় ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড়দ্বয় অশোকনাথ ও দেবীন্দর মোহন যেরূপ আশা করিয়াছিলাম সেইরূপ ফলাফল প্রদর্শন করিয়াছেন, খুবই আনন্দের বিষয়। তাঁহারা নিখিল ইংলণ্ড ব্যাড-মিণ্টন প্রতিযোগিতায় কোন বিভাগে সাফল্য অর্জন করেন নাই সত্য; কিন্তু প্রমাণিত করিয়াছেন যে, ভারতীয় খেলোয়াড়গণ ইউরোপীয় অথবা বিশ্ব ব্যাডমিণ্টন অনুষ্ঠানে যোগদান করিবার মত শক্তি রাখে। ইহা ছাড়া খেলায় যোগদান করিবার পূর্বে ইংলণ্ডের যে সকল সংবাদপত্র নানাপ্রকার ভীতি প্রদর্শন করিয়া সংবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিয়াছেন। প্রকাশনাথ সিংগলসে রানার্স আপ, ডাবলস খেলায় দেবীন্দরের সহযোগিতায় সেমি ফাইনালে খেলিয়াছেন ইহাতেই আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। শীঘ্রই তাঁহারা আরও উন্নততর নৈপুণ্য প্রদর্শন করিবেন ইহাতে আমাদের কোনই সন্দেহ নাই।
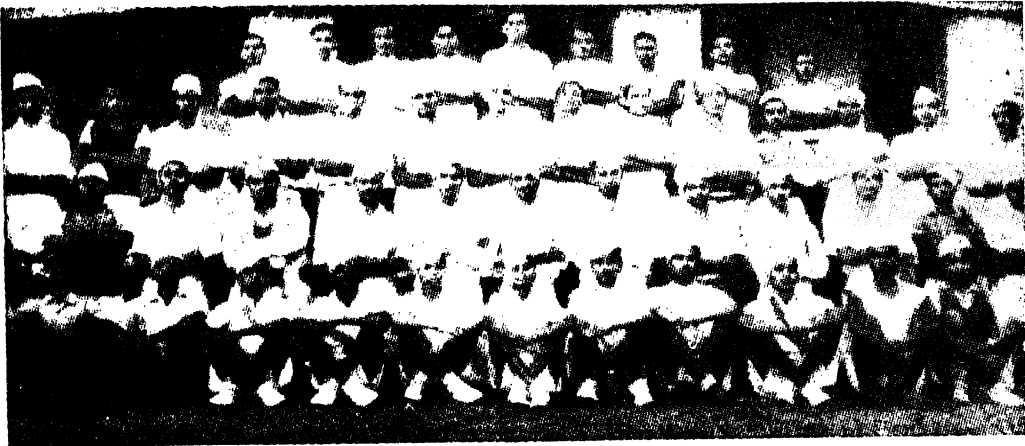
জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সঙ্ঘের পরিচালিত বর্ধমান জেলা ব্যায়াম শিক্ষা-শিবিরে যোগদানকারী হিন্দু ও মুসলমান যুবকগণ

দেশী সংবাদ

৩রা মার্চ—লাহোরে কংগ্রেস ও আকালী শিখ দলের উদ্যোগে এক বিরাট জনসভায় ১১ই মার্চ "পাকিস্থান বিরোধী দিবস" পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভার পর হিন্দু ও শিখের মিলিত শোভাযাত্রা পাকিস্থান বিরোধী ধ্বনি করিয়া শহরের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করে।

ত্রিপুরা ও নোয়াখালির দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চলে প্রায় চারি মাসকাল অতিবাহিত করিয়া মহাত্মা গান্ধী অদ্য রাত্রে সোদপুরে প্রত্যাবর্তন করেন।

পাঞ্জাবের গভর্নর খিজির হায়াৎ খাঁ মন্ত্রিসভার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন এবং পাঞ্জাব পরিষদের লীগ দলের নেতা মামদোতের খানকে মন্ত্রিসভা গঠন করিতে অনুরোধ করেন।

সীমান্ত প্রদেশে মুসলিম লীগের আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে গতকল্য সমগ্র সীমান্ত প্রদেশে প্রায় ৪ শত জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত কলিকাতা ও হাওড়ার প্রায় ১১ হাজার লোককে গভর্ণমেণ্ট আগামী ১৭ই মার্চ হইতে পুনর্বসতি সাহায্য দান করিতে আরম্ভ করিবেন। কলিকাতায় মোট অর্থ সাহায্যের পরিমাণ ১৬ লক্ষ টাকা ও মফঃস্বলে প্রায় তিন লক্ষ টাকা।

পাবনা, জলপাইগুড়ি, ত্রিপুরা ও মুন্সীগঞ্জ বাঙলার এই চারিটি জেলা হইতে চাউলের মূল্য বৃদ্ধির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

৪ঠা মার্চ—অদ্য লাহোর সহরের চকমাট্টিতে পাকিস্থান বিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হয়।

মধ্যাহ্নে গুলবাগে পুলিশ ও স্থানীয় ছাত্র শোভাযাত্রীদের মধ্যে এক সংঘর্ষ হয়—ছাত্রগণ পুলিশের প্রতি ঢিল ছোড়ে, পুলিশ লাঠি চার্জ ও গুলী বর্ষণ করে। হাঙ্গামা মোচিগেট পর্যন্ত বিস্তারলাভ করে। উপদ্রুত অঞ্চলে সৈন্য ও পুলিশ মোতায়েন করা হয়। প্রকাশ যে অদ্যকার হাঙ্গামায় ১০ জন নিহত ও ৯৬ জন আহত হইয়াছে।

সোদপুর আশ্রমে ২৩ ঘণ্টাকাল অতিবাহিত করিয়া মহাত্মা গান্ধী অদ্য রাত্রে পাঞ্জাব মেলযোগে পাটনা যাত্রা করেন।

৫ই মার্চ—লাহোরে অদ্যকার হাঙ্গামায় ও পুলিশের গুলীতে ১৭ জন নিহত ও ৮৯ জন আহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য পুলিশ গুলী চালায়। স্থানে স্থানে রাস্তায় উভয়পক্ষে প্রকাশ্যে খণ্ডযুদ্ধ হয়। আজ মুলতানেও দাঙ্গা বাধে।

পাঞ্জাবের গভর্নর ভারত শাসন আইনের ৯৩ ধারা জারী করিয়া স্বহস্তে প্রদেশের শাসন ভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাব ব্যবস্থা পরিষদের বর্তমান বাজেট অধিবেশন বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধী আজ প্রাতে পাটনায় পৌঁছেন। পাটনায় বাঁকীপুর ময়দানে প্রায় এক লক্ষ লোকের এক বিরাট প্রার্থনান্তিক সভায় মহাত্মা গান্ধী বলেন, "বিহারের হিন্দুগণ একটি পাপকার্য করিয়াছেন। ইতিহাসে এইরূপ ঘটনাবলীর নজীর থাকুক আর নাই থাকুক আপনাদের কার্যের ফলে

সমগ্র কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান আজ লজ্জাবোধ করিতেছে।"

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে অর্থসচিব তাঁহার তিনটি বিল সিলেক্ট কমিটিতে দিবার যে প্রস্তাব করেন, পরিষদে তাহা বিনা বিতর্কে গৃহীত হয়। এই তিনটি বিলের মধ্যে একটিতে বিশেষ আয়কর ধার্য করার প্রস্তাব করা হইয়াছে। অপর একটিতে মূলধন বিনিয়োগ কর ধার্য করার প্রস্তাব করা হইয়াছে। আর একটি বিলে কর সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি কমিশন গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

৬ই মার্চ—লাহোরে ২৪ ঘণ্টাব্যাপী সান্ধ্য-আইন জারী করা হইয়াছে। করাচীর সংবাদে প্রকাশ, পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক অশান্তি দমনের জন্য করাচী হইতে একদল প্যারা সৈন্য বিমানযোগে পাঞ্জাবে প্রেরিত হইয়াছে। আজ লাহোরের উপকণ্ঠে রাজগড়ে এক উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী গুলী চালায়। একটি সম্প্রদায়ের লোকেরাও গুলী চালায় এবং তাহার ফলে পাঁচজন নিহত হয়।

নয়াদিল্লীতে আচার্য কৃপালনীর ভবনে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হয়। বৃটিশ সরকার গত ২০শে ফেব্রুয়ারী ভারত ত্যাগের নির্দিষ্ট অধ্যায় ঘোষণা করিয়া যে বিবৃতি দিয়াছেন, সেই সম্পর্কে কমিটিতে আলোচনা চলে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের এক বিশেষ অধিবেশনে দ্বিতীয় ডেপুটি এক্জিকিউটিভ অফিসার শ্রীযুত ভাস্কর মুখার্জিকে ১৯৪৭ সালের ১১ই মার্চ তারিখ হইতে তিন বৎসরের জন্য কর্পোরেশনের চীফ এক্জিকিউটিভ অফিসার নিযুক্ত করা হয়।

বোম্বাই প্রাদেশিক ফরোয়ার্ড ব্লকের কার্য-নির্বাহক সমিতির এক সভায় 'ফরোয়ার্ড ব্লকের' নাম পরিবর্তন করিয়া "আজাদ হিন্দ সমাজতন্ত্রী দল" নাম রাখার সুপারিশ করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বাঙলা সরকার এক বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন যে, সরিষার তৈল আর রেশন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত থাকিবে না।

৭ই মার্চ—বাঙলার শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মিঃ সামসুদ্দীন আমেদ হায়দরাবাদে (দাক্ষিণাত্য) সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের এক সভায় বলেন যে, গান্ধীজী নোয়াখালি গমন করায় ও দীর্ঘকাল তথায় অবস্থান করায় সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ভীতি বহুল পরিমাণে দূরীভূত হইয়াছে। গান্ধীজীর সততা সন্দেহের অতীত।

৮ই মার্চ—নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন সমাপ্ত হয়। ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে যে নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে সেই সম্বন্ধে বিবেচনা এবং এজন্য উপায় উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে কংগ্রেস প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনা করিবার জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি মুসলিম লীগকে প্রতিনিধি মনোনয়ন করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। কমিটি বলেন যে ক্ষমতা হস্তান্তর যাহাতে সুশৃঙ্খলায় হইতে পারে এজন্য অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টকে ডোমিনিয়ন গবর্ণমেণ্ট হিসাবে পূর্বেই স্বীকার করিয়া লওয়া প্রয়োজন।

৩৯ বৎসর নির্বাসিত থাকিয়া ভারতের বিপ্লবী নেতা সর্দার অজিত সিং অদ্য ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

লাহোরের অবস্থা আয়ত্তে আসিয়াছে। হাঙ্গামা সম্পর্কে অমৃতসরে শতাধিক লোক হতাহত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। মুলতানে এতাব-

পাঞ্জাবে প্রস্তাবিত লীগ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে লাহোর ছাত্রগণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করিলে, পুলিশ লাঠি ও গুলী চালায়। ছবিতে পুলিশের গুলীতে আহত দুইজন ছাত্রকে দেখা যাইতেছে।

চীনের ভারতীয় রাষ্ট্রদূত হিসাবে শ্রীযুত কে পি এস মেননকে পণ্ডিত নেহরু বিদায় সম্বর্ধনা জানাইতেছেন।

১০টিরও অধিক মৃতদেহের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। দুইদিনের হাঙ্গামায় রাওয়ালপিণ্ডিতে মোট ৫০ নিহত এবং দুইশত জন আহত হইয়াছে।

ক্লাসে রামকৃষ্ণ বেদান্ত আন্দোলনের প্রধান আচার্য স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দকে অদ্য ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে কলিকাতা নাগরিকগণের পক্ষ হইতে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত করা হয়।

পৌরপরিষদের অন্যতম সদস্য এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের অন্যতম কাউন্সিলার শ্রীযুত সোমনাথ লাহিড়ীকে কলিকাতায় বঙ্গীয় বিশেষ ক্ষমতা অর্ডিন্যান্স বলে গ্রেপ্তার করা হয়। শ্রীযুত লাহিড়ী কলিকাতায় ট্রামওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের অন্যতম ভাইস-প্রেসিডেণ্ট।

৯ই মার্চ—কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি পাঞ্জাব বিভাগের সুপারিশ করিয়াছেন কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে সভাপতি আচার্য কৃপালনী বলেন যে, প্রস্তাবে পাঞ্জাব বিভাগের সুপারিশ করা হয়। কংগ্রেস অখণ্ড ভারতই চাহে, তবে উহা যদি সম্ভবপর না হয় এবং লোকেরা যদি পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করিতে থাকে সেক্ষেত্রে ওয়ার্কিং কমিটি পাঞ্জাবকে দুইটি প্রদেশে বিভক্ত করিবারই সুপারিশ করেন। বাঙলা সম্পর্কেও ঐ ব্যবস্থাই প্রযোজ্য বলিয়া তিনি মনে করেন।

লাহোরে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, রাওয়ালপিণ্ডি হইতে ১৮ মাইল দূরে ইতিহাস প্রসিদ্ধ তক্ষশিলা সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হইয়াছে। পাঞ্জাবের গভর্নর অদ্য বিমানযোগে রাওয়ালপিণ্ডি যাত্রা করেন। তথায় এখনও দাঙ্গা হাঙ্গামা চলিতেছে। অমৃতসর ও মুলতানের অবস্থা শান্ত আছে।

চাঁদপুরের সংবাদে প্রকাশ, চাঁদপুরের হানার এক অঞ্চলে একদল পুলিশ কয়েক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিতে গেলে এক জনতা তাহাদিগকে বাধা দেয়। পুলিশ জনতার উপর গুলী চালনা করে, ফলে এক ব্যক্তি নিহত হয়।

দিনাজপুরের সংবাদে প্রকাশ, তে-ভাগা আন্দোলন সম্পর্কে দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের গুলী চালনার ফলে এ পর্যন্ত ৩৩ জন নিহত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৪ জন স্ত্রীলোক।

পাটনার সংবাদে প্রকাশ, মহাত্মা গান্ধীর বিহার আগমনের ফলে এই সুফল পরিলক্ষিত হইতেছে যে, ইহা মুসলমানদের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে এবং তাঁহাদের অন্তরে নববলের সঞ্চার হইয়াছে।

ইউনাইটেড প্রেসের প্রতিনিধি জানিতে পারিয়াছেন যে, বিহারী হিন্দুদের হৃদয়ের পরিবর্তন না ঘটিলে গান্ধীজী প্রায়োপবেশন করিবেন বলিয়া চিন্তা করিতেছেন।

কমিউনিস্ট পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক হেড কোয়ার্টার হইতে এই মর্মে এক বিবৃতি প্রকাশ করা হইয়াছে যে, ২৪ পরগণা জিলার সন্দেশখালি থানার অন্তর্গত বেড়মজুর গ্রামে পুলিশ কর্তৃক গুলী চালনা সম্পর্কে আরও যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, মৃতের সংখ্যা ৭ জনের কম হইবে না।

বিদেশী সংবাদ

৪ঠা মার্চ—নানকিং-এর সংবাদে প্রকাশ, চীন সরকারী সৈন্যদল ইয়েনানের ৫০ মাইলের মধ্যে পীত নদী অতিক্রম করিয়াছে। চ্যাংচুয়ের ৬০ মাইল উত্তর-পূর্বে তেহই নামক স্থানে ২০ হাজার কমিউনিস্ট নিশ্চিহ্ন হইয়াছে এবং আরও ৬০ হাজার কমিউনিস্ট সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়াছে।

আজ ডানকার্কে বৃটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে ৫০ বৎসরের এক মৈত্রী চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

গত সোমবার কমন্স সভায় এক প্রশ্নের উত্তরে সহকারী ভারত সচিব স্যার আর্থার হেণ্ডারসন বলেন, এতাবৎ যে নির্ভরযোগ্য সংখ্যা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, গত বৎসর ভারতের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ১২,৪০০ ব্যক্তি নিহত হইয়াছে।

৬ই মার্চ—১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে বৃটেন কর্তৃক ভারতীয়দের হস্তে ক্ষমতা হস্তান্তর মূলক সরকারী নীতি অনুমোদনে অসম্মতিসূচক বিরোধী পক্ষের সংশোধন প্রস্তাব আজ কমন্স সভায় ১৮৫—৩৩৭ ভোটে অগ্রাহ্য হয়। উক্ত সময়ের মধ্যে বৃটেন কর্তৃক ভারতীয়দের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরমূলক সরকারী নীতি অনুমোদনের জন্য গভর্নমেণ্ট পক্ষ হইতে আনীত প্রস্তাব বিনা ডিভিসনে গৃহীত হয়।

দেশ

সূচীপত্র

দেশ

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

চতুর্দশ বর্ষ] শনিবার, ৮ই চৈত্র, ১৩৫৩ সাল। Saturday, 22nd March, 1947. [২০শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভারতের শেষ বড়লাট

লর্ড ওয়াভেল ভারত হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ভারতের শেষ বড়লাটস্বরূপে কার্যভার গ্রহণ করিলেন। সাধারণত লাট-বড়লাট পরিবর্তনের এমন ধরণের ব্যাপারে আমাদের লক্ষ্য করিবার মত বিশেষ কোন কিছু থাকে না; কারণ সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকদের মামুলী ধারা ধরিয়াই তাঁহারা চলেন এবং ভারত শাসন-ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে তাঁহাদের কোন প্রভাব কার্যকর হয় না; কিন্তু লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের সম্বন্ধে একটু বিশেষ বক্তব্য আছে। বর্তমানে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভারত-ত্যাগের সংকল্প সুনিশ্চিতভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতসচিব সেদিন লর্ড সভায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যেই ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান ঘটিবে এবং তৎপূর্বেই বড়লাটের হাতে সম্প্রতি যেসব ক্ষমতা আছে, সেগুলি ক্রমে ক্রমে ভারতবাসীদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। বস্তুত লর্ড পেথিক লরেন্সের সাম্প্রতিক এই উক্তিতে ইহা সুস্পষ্ট ভাষাতেই স্বীকৃত হইয়াছে যে, বর্তমানে ভারত শাসন-সংস্কারবিধির ভাষাগত পরিবর্তন না ঘটিলেও বড়লাটের হাতে ন্যস্ত ক্ষমতার সংকোচসাধনে সে বিধানের কার্যত পরিবর্তন ঘটিবে এবং প্রকৃতপক্ষে অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টের হাতে ঔপনিবেশিক শাসনের অধিকারই অর্পিত হইবে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, বিশ্বস্তভাবে কেন্দ্রগত গভর্নমেণ্টকে এইভাবে শক্তিশালী করিয়াই সুশৃংখলার সংগে ভারতবাসীদের হাতে শাসন-ক্ষমতা হস্তান্তরের কর্তব্য প্রতিপালিত হইতে পারে। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন এই কর্তব্য কিভাবে প্রতিপালন করেন তৎপ্রতি শুধু ভারত নহে, সমগ্র জগতের দৃষ্টি আকৃষ্ট রহিয়াছে।

লর্ড ওয়াভেলের দুর্বুদ্ধি

আমরা স্পষ্টত ইহাই দেখিতে পাইতেছি যে, লর্ড ওয়াভেল সাম্রাজ্যবাদীদের দুর্বুদ্ধির পাকে পড়িয়াছিলেন। তিনি অখণ্ড ভারতের মৌলিক আদর্শকে নীতিস্বরূপে অবলম্বন করিয়া চলেন নাই; পক্ষান্তরে প্রদেশসমূহকে কেন্দ্রীয় শাসনের বিরোধী করিয়া তুলিবার জন্যই তিনি চেষ্টা করিয়াছেন। পাঞ্জাবের ব্যাপক অরাজকতা ভারতের প্রতি লর্ড ওয়াভেলের বিদায়কালীন পদাঘাত বলা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য, লর্ড ওয়াভেলের ইংগিত না পাইলে এবং তাঁহার সায় না থাকিলে পাঞ্জাবের গভর্নর স্যার ইভান্স জেঙ্কিন্স স্যার খিজির হায়াৎ খানের মন্ত্রিমণ্ডলকে পদচ্যুত করিবার জন্য ব্যগ্র হইতেন বলিয়া আমরা মনে করি না; বস্তুত সে পক্ষে কোন কারণই ছিল না। স্যার খিজিরের মন্ত্রিমণ্ডলের আমলে পাঞ্জাব সাম্প্রদায়িক অশান্তি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল এবং পাঞ্জাব ব্যবস্থা পরিষদের অধিকাংশ সদস্যের সমর্থনও এই মন্ত্রিমণ্ডলের পিছনে সুনিশ্চিত ছিল। এখন ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে যে, স্যার ইভান্স স্যার খিজির হায়াৎকে পদত্যাগে বাধ্য করেন এবং মুসলিম লীগের হাতে পাঞ্জাবের শাসন-প্রভুত্ব প্রদান করিবার গরজে তাঁহার মস্তিষ্ক বিশেষভাবে সঞ্চালিত হয়। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, পাঞ্জাবের ব্যাপক, অরাজকতা, লুণ্ঠন, অগ্নিদাহ এবং নরহত্যার জন্য তিনিই কার্যত দায়ী। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারত ত্যাগ করিবার পূর্বে তাঁহারা কোন কোন অঞ্চলে প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের হাতে ক্ষমতা ছাড়িয়া দিয়া যাইতে পারেন; সুতরাং সময় থাকিতে পাঞ্জাবের গদিতে সাম্রাজ্যবাদী চার্চিলী দলের অনুগত মুসলিম লীগের প্রভুত্ব পাকা করিতে হইবে এই উদ্দেশ্য লইয়াই স্যার ইভান্স কাজ করিয়াছেন, বোঝা যায়। প্রকৃতপক্ষে শুধু পাঞ্জাবে নয়, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও ব্যাপক অরাজকতা দেখা দিয়াছে এবং আসামেও আগুন জ্বালাইয়া তুলিবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু আসামে মুসলিম লীগের ঘাঁটি তেমন দৃঢ় নয়, এজন্য বাঙলা দেশে সাহায্যকারী বাহিনীর রণবাদ্য শুরু হইয়াছে। সুতরাং আসামও নিরাপদ নহে এবং মুসলিম লীগের আসাম অভিমুখে এই পাকিস্থানী অভিযানের অনিষ্টকর উদ্দাম বাঙলাকেও যে কোন মুহূর্তে পুনরায় বর্বর তাণ্ডবে বিপর্যস্ত করিতে পারে। দেখা যাইতেছে, বাঙলা এবং পাঞ্জাব এই দুই প্রদেশের গভর্নর, সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে গিয়া বড়লাটের সংগে দরবার করিয়াছেন। ভিতরের কথা কি আমরা জানি না, তবে ঘটনাচক্রের গতি দেখিয়া স্বভাবতই আমাদের মনে নানারূপ সন্দেহের উদ্রেক হয়। বলা বাহুল্য, ব্রিটিশের ভারত-ত্যাগের পূর্বে সাম্রাজ্যবাদী দল, হয় ভারতবর্ষকে পাকিস্থানী পাকে ফেলিয়া বিচ্ছিন্ন এবং দুর্বল করিতে চায়, নতুবা তাঁহারা অন্তর্দ্রোহের আগুনে ভারতকে দগ্ধ করিয়া শকুনী গৃধিনীর বুভুক্ষা পূর্ণ করিবে, ইহাই তাহাদের মতলব। নিষ্ঠুর এই সব সাম্রাজ্যবাদী বুঝিয়া লইয়াছে যে, এই দুইটির যে কোনটি সফল হইলেই তাহাদের ষোল আনা সুবিধা ঘটিবে। বর্তমানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, চার্চিলী সাম্রাজ্যবাদীর দল এবং ভারতের শাসন বিভাগে তাঁহাদের প্রশ্রয়পুষ্ট শাসকগণ যাহা কামনা করিতেছেন, এটলীর মন্ত্রিমণ্ডলও প্রকৃতপক্ষে তাহাই চাহেন কি? তাঁহারা কিছুদিন পূর্বেও বলিয়াছেন যে, তাঁহারা পাকিস্থান চাহেন না। এ সম্বন্ধে লর্ড পেথিক লরেন্সের উক্তি উক্তি আমরা বিস্মৃত হই নাই। তিনি বিশেষ জোরের সংগে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের উক্তি হইতে কেহ যদি পাকিস্থানের আভাস পাইয়া থাকেন, তিনি ভুল বুঝিয়াছেন। বস্তুত

ভারতবর্ষকে বিভক্ত করিবার নীতি লইয়া তাঁহারা অগ্রসর হইতেছেন না এবং কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের হাতে ভারত শাসনের ক্ষমতা হস্তান্তরিত করাই তাঁহারা সর্বাধিক শ্রেয় বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ভারতে আসিয়া শাসনক্ষমতা হস্তান্তরে এই নীতি দৃঢ়তার সঙ্গে অনুসরণ করিতে যত্নপর হন কিনা এবং মুসলিম লীগ প্রদেশে প্রদেশে আগুনে জ্বালাইয়া তুলিয়া ভারতকে বিভক্ত করিবার প্রতিবেশ গঠনের জন্য যে বর্বর ও নিষ্ঠুর খেলা আরম্ভ করিয়াছে, তিনি তাহার গতিরোধে প্রবৃত্ত হন কিনা জাতীয়তাবাদী ভারত আগ্রহ সহকারে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবে। বলা বাহুল্য, নূতন বড়লাট যেন ভালভাবেই এই সঙ্গে একথাটাও বোঝেন যে, জাতীয়তাবাদিগণ নিতান্ত অসহায়ের মত তাঁহার দিকে তাকাইয়া নাই। সাম্রাজ্যবাদীর দল যদি মুসলিম লীগের মধ্যযুগীয় অসংস্কৃত ও বর্বর মনোবৃত্তিকেই প্রশ্রয় দেয় এবং সেই-ভাবে ভারতের জাগ্রত জাতীয়তাবাদকে আঘাত করিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির দুরভিসন্ধি সত্যই তাহাদের থাকে, তবে স্বাধীনতাকামী ভারতের আত্মদাতা সন্তানগণ বুকের রক্ত ঢালিয়া দিয়া তাহাদের সেই পৈশাচিক উদ্যম প্রতিহত করিবে।

মিঃ সুরাবর্দীর "স্বাধীন বাঙলা"

বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী বাঙলার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার পরম ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। বৎসরাধিককাল পূর্বে, ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বাঙলা বিদ্রোহ ঘোষণা করিবে এই সংকল্প তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন। বর্তমানে সুরাবর্দী সাহেবের বুকের বল আরও বাড়িয়া গিয়াছে। তিনি এই আশা করিতেছেন যে, মুসলিম লীগ গণপরিষদে যোগদান না করাতে লীগ-শাসিত বাঙলার শাসনতন্ত্র নিয়ন্ত্রণের সার্বভৌম অধিকার ইংরেজ লীগ মন্ত্রিমণ্ডলের হাতেই দিয়া যাইবে। এই আশার উপর নির্ভর করিয়া তিনি গত ১৬ই মার্চ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বলেন,—'ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র কি আকার ধারণ করিবে, তাহা এখনও কেহ জানে না। সে বিষয়ে কিছু বলিবার সময় এখনও আসে নাই। তবে, এইটুকু আমি নিশ্চিতভাবে বুঝিতে পারিয়াছি যে, শাসনতন্ত্র যে আকারই লউক, বাঙলা প্রদেশ স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করিবে।' কয়েকদিন পূর্বে ত্রিপুরার অন্তর্গত কাশিমপুরেও সুরাবর্দী সাহেব তাঁহার ঐ উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। বাঙলার এই স্বতন্ত্র রাষ্ট্র বলিতে মিঃ সুরাবর্দী কি বুঝিয়াছেন সহজেই ধারণা করা যায়। বস্তুত বাঙলাদেশ ভারতের অন্যান্য অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মুসলিম লীগের খর্পরের মধ্যেই ষোল আনা গিয়া পড়ে ইহাই তাঁহার অন্তরের অভিপ্রায়। এখানকার সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় যাহাতে লীগের গোলামী মানিয়া লয়, তাহার জন্যই মিঃ সুরাবর্দী কৌশল খাটাইতেছেন এবং সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য তাঁহার আগ্রহের মূল কথাও তাহাই। প্রকৃতপক্ষে লীগ পাঞ্জাবে স্যার খিজিরের মন্ত্রিমণ্ডলকে সরাইয়া যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে গিয়াছিল, মিঃ সুরাবর্দীও তাহাই চাহিতেছেন। পাঞ্জাবে লীগের প্রচেষ্টা অদ্যাপি সার্থকতালাভ করে নাই। সেখানে ৯৩ ধারার শাসন চলিতেছে। মিঃ সুরাবর্দী সর্মাধক চতুর। তিনি পাঞ্জাবের সমস্যা এড়াইতে চাহেন। বাঙলার জাতীয়তাবাদী দলকে মোলায়েম ভাষায় বিভ্রান্ত করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবেন, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। কিন্তু বাঙলার জাতীয়তাবাদিগণ এতদ্দ্বারা বিভ্রান্ত হইবেন না। বস্তুত অখণ্ড ভারতের ভিত্তিতে ভারতের স্বাধীনতার সংবেদন সর্বাগ্রে এই বাঙলা দেশেই জাগিয়া উঠে। সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা যতই চেষ্টা করুক না কেন, বাঙলা তাহার এই প্রাণধর্ম লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। বাঙলার সাধক সন্তানগণ অখণ্ড ভারতের মূর্তি দর্শন করিয়াছেন। মুসলিম লীগের প্রগতি-বিরোধী প্রচেষ্টা তাঁহাদের সে দৃষ্টিকে ব্যাহত করিতে সমর্থ হইবে না। বস্তুত মুসলিম লীগের শাসনাধীনে থাকিয়া আমরা পাকিস্থানী মহিমা যথেষ্টই উপলব্ধি করিয়া লইয়াছি। কলিকাতা এবং নোয়াখালির রক্তাক্ত বিভীষিকাপ্রদ চিত্র অদ্যাপি আমাদের দৃষ্টি পথ হইতে অপসৃত হয় নাই। পাকিস্থানের জন্য সংগ্রাম পরিকল্পনাতেই যখন এমন নারকীয় ব্যাপার ঘটে, তখন পুরাপুরি পাকিস্থানে ভারতের যুক্তাংশ হইতে বিচ্ছিন্ন বাঙলায় মুসলিম লীগের শাসনের দাপটে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে, অনুমান করা দুঃসাধ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে মিঃ সুরাবর্দী যতদিন মুসলিম লীগের প্রগতি-বিরোধী নীতি আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবেন, ততদিন পর্যন্ত তাঁহার মুখে বাঙলা দেশের স্বাতন্ত্র্য বা তৎসম্পর্কিত রাষ্ট্র মর্যাদা আমাদের মনে বিরক্তি এবং বিক্ষোভেরই সঞ্চার করিবে। এক্ষেত্রে বাঙলা দেশের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁহার সহযোগিতার সকল কথাই আন্তরিকতাবিহীন হইয়া পড়ে। মিঃ জিন্নাই মিঃ সুরাবর্দীর রাজনীতিক গুরু। দেখিতেছি সেই জিন্না সাহেব সেদিনও বলিয়াছেন যে, হিন্দুদের সঙ্গে লীগওয়ালাদের শুধু যে লক্ষ্য বা নীতিগত পার্থক্যই রহিয়াছে ইহা নয়, দস্তুর-মত বিরোধ বিদ্যমান আছে। সুতরাং জাতীয়তা-বাদী এবং প্রগতিবাদী বাঙলার সঙ্গে ধর্মান্ধ প্রগতিবিরোধী লীগের কোনক্রমেই সহযোগিতা সম্ভব হইতে পারে না। তেলে জলে মিশ খাইবে না এবং বাঙলাদেশকে সমগ্র ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার সকল প্রচেষ্টা বাঙলার প্রাণ-বান্ সন্তানগণের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইবে। আমরা পৃথিবীর বুক হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাই, তাহাও ভাল, তথাপি অসংস্কৃত মধ্যযুগীয় বর্বরতায় অভিভূত ক্রীতদাসদের মত আমাদের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে, ইহা বাঞ্ছনীয় নয়।

পুলিশ বিভাগে সাম্প্রদায়িকতা

গত ১৫ই মার্চ, শনিবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী পুলিশ বিভাগের পরিচালনা সম্বন্ধে একটি বিবৃতি প্রদান করেন। তিনি পুলিশ বিভাগের অতিরিক্ত ব্যয়ের কৈফিয়ৎ দিতে গিয়া অনেক কথা বলিয়াছেন এবং দেশের নানা স্থানে অশান্তির উল্লেখ করিয়া সেই ব্যয় বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন। অশান্তি, অরাজকতা, উপদ্রব—এই সব দমনের জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন পুলিশ বাহিনী রাখিবার প্রয়োজনীয়তা আছে একথা আমরা অস্বীকার করি না; কিন্তু এক্ষেত্রে প্রথমেই এই প্রশ্ন উঠিবে যে, বাঙলা দেশে বর্তমানে যেসব অশান্তি ঘটিতেছে, তাহার মূল কারন কোথায়। সুরাবর্দী সাহেব তাহা কি জানেন না? বলা বাহুল্য, সকলেই জানেন, লীগের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপূর্ণ নীতির ফলেই বাঙলার সমাজ-জীবন আজ বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। বস্তুত লীগ মন্ত্রিমণ্ডল যদি বাঙলা দেশে অনর্থক রকমে সাম্প্রদায়িকতাপূর্ণ পাকিস্থানী নীতির মহড়া দিতে প্রবৃত্ত না হইতেন, তবে কলিকাতা, নোয়াখালি, ঢাকা, চট্টগ্রাম ত্রিপুরাতে বর্বরতার তাণ্ডব নৃত্য আমরা প্রত্যক্ষ করিতাম না। একথা সত্য যে, লীগ যেদিন সাম্প্রদায়িকতাপূর্ণ এই মারাত্মক নীতি পরিত্যাগ করিবে, সেই মুহূর্তে বাঙলা দেশের সমাজ-জীবনে শান্তির স্থায়ী প্রতিবেশ গড়িয়া উঠিবে। এইরূপ অবস্থায় সাম্প্রদায়িকতার নীতিকে যাঁহারা প্রশ্রয় দিতেছেন, পুলিশের ব্যয় বৃদ্ধির জন্য দেশের লোকের শোণিত সম অর্থ শোষণ করিবার সঙ্গত কারণ তাঁহাদের কিছুই নাই। বস্তুত দেশের লোকের শান্তি বা স্বস্তির জন্য তাঁহারা পুলিশ চাহিতেছেন না। নিজেদের উপদলীয় স্বার্থের ঘাঁটি পুষ্ট রাখিবার জনাই পুলিশের ব্যয় বৃদ্ধির জন্য তাঁহাদের আগ্রহ রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে গভর্নমেণ্টের নীতি সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট হইলে পুলিশ বিভাগেও সাম্প্রদায়িকতা পুষ্ট হইয় উঠিবে। বাঙলা দেশের পুলিশ বিভাগে যে সাম্প্রদায়িকতার ভাব প্রবিষ্ট হইয়াছে, পুলিশ

বিভাগের কর্তাস্বরূপে মিঃ সুরাবর্দী সেদিন সে কথা স্বীকারই করিয়াছেন। তে-ভাগা আন্দোলন দমনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া মিঃ সুরাবর্দী বলিয়াছেন যে, বে-আইনী কাণ্ড অবাধে চলিতেছে, এরূপ অবস্থায় গভর্নমেণ্ট কিছুতেই নির্জীবের মত বসিয়া থাকিতে পারেন না। ঠিক কথা; কিন্তু আমাদের প্রশ্ন এই যে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় বে-আইনী কার্য-দমনে গভর্নমেণ্টের এই আগ্রহ কোথায় থাকে এবং পুলিশই বা তখন আশ্চর্য রকমে অহিংসার উপাসক হইয়া পড়ে কেন? বস্তুত পুলিশ বিভাগের এই অযোগ্যতার সঙ্গে গভর্নমেণ্টের সাম্প্রদায়িক নীতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত রহিয়াছে। এই-রূপ অবস্থায় পুলিশের খরচ বাড়াইলেই কিংবা পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেই বিভাগীয় যোগ্যতা দেখা দিবে না; পক্ষান্তরে সেক্ষেত্রে পুলিশ সাম্প্রদায়িকতার নীতিরই পরি-পোষক হইয়া উঠিবে এবং অশান্তি দমনের নামে পুলিশের শক্তি লীগ সরকারের সাম্প্র-দায়িক নীতির তুষ্টি এবং পুষ্টির উদ্দেশ্যেই বর্ধিত হইবে। পুলিশ বিভাগে সাম্প্রদায়িক-তার এ নীতি বিশেষভাবে মারাত্মক। অথচ সেদিন বাঙলার শান্তি এবং আইন বিভাগের সর্বময় কর্তা সাক্ষাৎ-সম্পর্কে পুলিশ বিভাগে এই সাম্প্রদায়িকতার নীতিকেই প্রশ্রয় দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বিগত দাঙ্গার সময় কলিকাতার সশস্ত্র পুলিশ বিভাগে মুসলমানের সংখ্যা কম ছিল, এই-জন্যই কলিকাতার বহু স্থানে মুসলমানেরা নিহত হইয়াছে। সুতরাং পাঞ্জাবী পাঠানদিগকে পুলিশ বিভাগে আমদানী করিবার চেষ্টা হইতেছে। পুলিশের কর্তব্য প্রতিপালনে এইভাবে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার দৃষ্টি লইয়া যাঁহারা শাসনকার্য পরিচালনা করেন, তাঁহাদের প্রভুত্ব বিদ্যমান থাকিতে বাঙলা দেশে কোনদিন স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে না, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

নবযুগের প্রবর্তক গান্ধীজী—

ডক্টর জন হোমস আমেরিকার একজন খ্যাতনামা মনীষী পুরুষ। সম্প্রতি তিনি ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা আলোচনা করিয়া একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"কোন প্রকার বলপ্রয়োগ ও হিংসার আশ্রয় না লইয়া মিঃ গান্ধী ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছেন এবং এই সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য যে, ২৫ বৎসরের মধ্যে এই স্বাধীনতা অর্জিত হইয়াছে। ইতিহাসে এই কৃতিত্বের তুলনা নাই। গান্ধীজীর এই কৃতিত্ব মানব-সভ্যতার ইতিহাসে এক নবযুগের প্রবর্তন করিয়াছে।" ডক্টর জন হোমসের এই উক্তিতে কিছু বিশেষত্ব আছে। তিনি গান্ধীজীর অবদানকে গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং মানব-সভ্যতার মূলে সেই অবদান কিরূপভাবে অভিনব শক্তি সঞ্চার করিয়াছে জগতের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট করিয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষে বিজেতাদের বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ-কাল শোণিতস্রাবী সংগ্রাম পরিচালনা না করিয়া আধুনিক জগতে কোন জাতি এ পর্যন্ত স্বাধীনতা লাভ করে নাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কূটনীতির প্রভাবে ভারতের বুকে শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছিল সুতরাং অস্ত্রবলের সাহায্যে সংগ্রাম করিয়া ভারতের পক্ষে স্বাধীনতা অর্জন করা সহজ ছিল না। কিন্তু গান্ধীজীর মনস্বিতাপূর্ণ সাধনা এই অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদীদের সুকৌশল-পূর্ণ ভেদ-বিভেদে বিচ্ছিন্ন ভারতকে তিনি স্বাধীনতার পথে সুসংহত করিয়াছেন। নানা-রূপ প্রতিকূল শক্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া সুগভীর প্রজ্ঞাবলে মহাত্মাজী যেমনভাবে স্থির লক্ষ্যে ভারতকে অভীষ্ট সিদ্ধির পথে লইয়া গিয়াছেন, সাধারণ নেতার পক্ষে তাহা সম্ভব হইত না। পশুবলকে তিনি মানব-ধর্মে সংযত করিয়াছেন; একান্ত যে উদ্ধত, গান্ধীজীর অধ্যাত্ম-শক্তির কাছে তাঁহাকেও অবনত হইতে হইয়াছে। তাঁহার বিরুদ্ধে যে আঘাত হানিতে গিয়াছে পরিশেষে সেও তাঁহার প্রাণবলের প্রভাব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে এবং ক্ষুদ্রদেহ এই মানুষটির চরিত্রশক্তিতে সেও বিস্মিত হইয়াছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের শক্তিপুরুষ চার্চিল সাহেব একদিন গান্ধীজীকে ভারতের উলঙ্গ ফকীর বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন; কিন্তু সেই উলঙ্গ ফকীরের কাছেই অবশেষে চার্চিলী দলের গর্ব চূর্ণ হইয়াছে। বস্তুত ভারতবর্ষ যদি অধ্যাত্মশক্তিসম্পন্ন এমন মহাত্মাকে নেতৃরূপে লাভ না করিত তবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর দল এত সহজে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিত না। গান্ধীজীর মানবতাপূর্ণ সাধনা সভ্য-জগতের চেতনাকে ভারতের পিছনে সংহত করিয়াছে। গান্ধীজীর সাধনায় সমুন্নত এই প্রতিবেশে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রতিহত করিতে আজ পশুবল স্বীয় দুর্বলতা একান্তভাবে উপলব্ধি করিয়া লজ্জিত হইতেছে। সমগ্র জগতের দিক হইতে দেখিতে গেলে মানব-সভ্যতার এই সমুন্নতি এবং মর্যাদাবোধের উন্মেষ সাধনই গান্ধীজীর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। মানুষের মনে গান্ধীজী আত্মবোধ জাগ্রত করিয়াছেন এবং দার্শনিক ভাষায় বলিতে গেলে মানবের স্বরূপতত্ত্ব তিনি উন্মুক্ত করিয়াছেন। মানুষের ভিতরকার পশু ইহাতে তাহার নিজের কাছেই ধরা পড়িয়া যাইতেছে এবং বিবেকের আলোকে জাগ্রত স্বরূপগত সত্যকে মানুষ অস্বীকার করিয়া উঠিতে সমর্থ হইতেছে না। অবশ্য পশুবল এখনও সম্পূর্ণরূপে নির্জিত হয় নাই। সাম্রাজ্যবাদীরা কূট-কৌশলে পরোক্ষভাবে ভারতের জাতীয় জীবনে পশু শক্তির উদ্দাম-তাণ্ডব জাগ্রত করিয়া গান্ধীজীর সাধনাকে ব্যর্থ করিতে চেষ্টা করিতেছে। লীগের ভেদ-বিদ্বেষপূর্ণ নীতির পশ্চাতে সেই সাম্রাজ্য-বাদীদের লীলা খেলারই আমরা স্পষ্ট পরিচয় পাইতেছি। আমরা দেখিয়াছি, গান্ধীজীর মানবতাপূর্ণ উদ্যমকে পঙ্গু করিবার জন্য নোয়াখালিতে চেষ্টা হইয়াছে; কিন্তু সে চেষ্টা সার্থক হয় নাই। লীগের স্বার্থ-প্রতিষ্ঠার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পড়িয়া যাহারা নোয়াখালিতে গান্ধীজীকে অবজ্ঞাত করিতে চেষ্টা করিয়া-ছিলেন, তাহাদিগকেই শেষে গান্ধীজীর কার্যের প্রশংসা করিতে হইয়াছে। গান্ধীজীর বিহার পরিদর্শনের সাফল্য নষ্ট করিবার জন্যও লীগের দল হইতে যথারীতি চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু মুসলমান জনসাধারণের উপর গান্ধীজীর প্রভাব দেখিয়া লীগ মহল চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। কারণ গান্ধীজীর চেষ্টার সাফল্যের অর্থই হইল লীগের ভেদ-বিদ্বেষপর মানবতাবিরোধী নীতির পরাজয়। কিন্তু লীগপন্থীদের এই দুরভিসন্ধি গান্ধীজীর মানবতার স্পর্শে আঁটি বাঁধিতেছে না। বিহারের আশ্রয়প্রার্থীরা দলে দলে গৃহে ফিরিতেছে। বস্তুত গান্ধীজী সমগ্র ভারতের বুকে নূতন আশা উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছেন। ইহা নিশ্চিত যে, মানবতা-বিরোধী শক্তি তাঁহার কাছে পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে এবং স্বাধীন ভারত পশু-শক্তির গ্লানি হইতে জগতকে মুক্ত করিবার নূতন পথ উন্মুক্ত করিবে। আমাদের সম্মুখে যে সব বাধাবিঘ্ন আসিতেছে, সে সব আমরা নিতান্ত সাময়িক ব্যাপার বলিয়াই মনে করি। সেদিন লাহোরে বক্তৃতাকালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু পাঞ্জাবের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন—দীর্ঘ যাত্রাপথের শেষে ভারত স্বাধীনতার সুনিশ্চিত লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইবে এবং বর্তমান ঘটনাবলী কিছুতেই ইহা রোধ করিতে পারিবে না। পণ্ডিতজী যে কথা বলিয়াছেন, আমরা সেই অভিমতই অন্তরে পোষণ বোধ করিয়া থাকি। আমাদের বিশ্বাস এই যে, মানব-ধর্মের মূলীভূত যে সত্যকে অবলম্বন করিয়া গান্ধীজী ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামকে উজ্জীবিত রাখিয়াছেন, তাহা ব্যর্থ হইবার নহে।

এশিয়ার নব জাগরণ

আগামী ২৩শে মার্চ নয়াদিল্লীতে আন্তঃ-এশিয়া সম্মেলন আরম্ভ হইবে। এশিয়ার বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবর্গ এই অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য ইতিমধ্যেই দিল্লীতে সমবেত হইয়াছেন। বলা বাহুল্য, পরাধীন ভারতের ইতিহাসে ইহা অভূতপূর্ব ঘটনা। যাঁহারা ভারতের ঐতিহাসিক তথ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, তাঁহারা অবশ্য সকলেই জানেন, পরাধীন অবস্থাতেই ভারতবর্ষ এশিয়ার অপরাপর দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে; কিন্তু স্বাধীন ভারতের অবস্থা এইরূপ ছিল না। ভারত তখন এশিয়ার অন্যান্য দেশের সঙ্গে সভ্যতা সংস্কৃতি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যসূত্রে নানাভাবে নিবিড়তর সম্পর্কে আবদ্ধ ছিল। এদেশের

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু

প্রাচীন শাস্ত্রসমূহ আলোচনা করিলে সম্প্রসারণশীল সেই ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতির উদার প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। কালের গতিক্রমে এবং নানাবিধ বিপর্যয়ে ঐতিহাসিক সত্যের এই ধারা অবশ্য অনেকটা অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু অপেক্ষাকৃত আধুনিক ঐতিহাসিক যুগেও সমগ্র এশিয়ার উপর ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাবের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাও আমাদের মনে বিস্ময় উৎপাদন করে। উত্তরে সাইবেরিয়ার সীমান্ত প্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া চীন, তিব্বত, তুর্কিস্থান, আফগানিস্থান; পশ্চিমে আরব, পারস্য, প্যালেস্টাইন এবং পূর্বে যব, বলী, সুমাত্রা, হিন্দুচীন এই সকল দেশের ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির মূলে ভারতীয় সভ্যতা এবং সংগতি যে অসামান্যভাবে কাজ করিয়াছে, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। আফগানিস্থান, বালখ, আনাম, ব্রহ্ম, শ্যাম, যব, বলী সুমাত্রা, এগুলি প্রকৃতপক্ষে একদিন বৃহত্তর ভারতেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিব্বত, চীন এবং জাপান এই বৃহত্তর ভারতের সান্নিকটাসূত্রে ভারতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। কিন্তু পরাধীনতার আবহাওয়া বিষাক্ত। পরাধীনতার বিষাক্ত প্রতিবেশের মধ্যে মানুষ বাঁচিতে পারে না এবং জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতি এবং অভিব্যক্তির পথ রুদ্ধ হয়। পরাধীন জাতির সমাজজীবন সর্বাংশে পঙ্গু হইয়া পড়ে। এইজন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্প্রসারণে জগতের বিভিন্ন দেশের মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান হ্রাস পাইলেও চীন, তিব্বত, আরব, পারস্য প্রভৃতি প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে এবং ভারতের অসহায়ত্ব সকল দিক হইতে বাড়িয়া চলিয়াছে। নব জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটিবার পর হইতে স্বাধীনতাকামী ভারত এই অসহায়ত্বের ব্যথা একান্তভাবে অন্তরে উপলব্ধি করে। মুখ্যভাবে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদমূলক আন্দোলন হইতেই ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে এই ভাবধারার বিকাশ ঘটে। ইউরোপের শোষণ-নীতি এবং সাম্রাজ্য-স্বার্থবাদ হইতে মুক্ত হইবার তীব্র লালসা এশিয়ার সংহতি সাধনের দিকে জাতীয়তাবাদী ভারতের চিত্তকে উদ্দীপ্ত করে। প্রকৃতপক্ষে বাঙলার সাধকগণই প্রত্যক্ষভাবে জাতির দৃষ্টিকে এই দিকে আকৃষ্ট করেন এবং বাঙলার বৈপ্লবিক যুগের পর হইতে পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে এশিয়ার

সুভাষচন্দ্র বসু

শক্তিসমূহকে সংহত করিবার একটা আগ্রহ ভারতের রাজনীতিক জীবনে উদ্দীপিত হয়। দেখা যায়, ভারত হইতে নির্বাসিত বিপ্লবী কর্মিগণ প্রথমে অপেক্ষাকৃত স্বল্পায়তন গণ্ডির মধ্যে এই আন্দোলন আরম্ভ করেন। জাপানে নির্বাসিত স্বর্গীয় রাসবিহারী বসুর নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জাপানীদের অধিকৃত মাঞ্চুকুর অন্তর্বর্তী ডেইরিনে তিনি সর্বপ্রথমে এশিয়ার নির্যাতিত জাতিসমূহের প্রতিনিধিদিগকে লইয়া একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। ইহার পরও কয়েকটি স্থানে এইরূপ ভাবে সম্মেলনের অধিবেশনের দ্বারা আন্দোলন চালাইবার চেষ্টা হইয়াছে। কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনের সভাপতিস্বরূপে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশই সর্বপ্রথম আন্তঃ-এশিয়া

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু

সঙ্ঘ গঠনের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করেন। কিন্তু পরাধীন ভারতে রাজনীতিক ধারা ধরিয়া প্রত্যক্ষভাবে সে প্রচেষ্টা কার্যে পরিণত করার সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। বিদেশে থাকিয়া কয়েকজন বিপ্লবী এই আন্দোলনের ধারাটি বজায় রাখিয়াছিলেন মাত্র। রাজা মহেন্দ্র-প্রতাপ, লালা হরদয়াল এবং সুফী অম্বাপ্রসাদ প্রভৃতি কয়েকজন নির্বাসিত ভারতীয় কর্মী এই সব চেষ্টার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কার্যত বিগত মহাসমরের সময় হইতে এই আন্দোলন একটি সতেজ ধারা ধরিয়া চলিবার সুযোগ লাভ করে। সুভাষচন্দ্র তাঁহার অগ্নিময়ী প্রাণশক্তিতে এশিয়ার নির্যাতিত জাতিসমূহের অন্তরে স্বাধীনতার অদম্য

প্রেরণা জাগাইয়া তোলে। প্রত্যক্ষভাবে সুভাষচন্দ্রের আন্দোলন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে এবং ভারতের স্বাধীনতার জন্য হইলেও সমগ্রভাবে এশিয়ার জাগরণে যে সে প্রচেষ্টা নূতন শক্তি সঞ্চার করিয়াছে, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। যুদ্ধের অবসান ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে এশিয়ার নির্যাতিত জাতিসমূহের এই জাগরণ সুস্পষ্ট হইয়া উঠে এবং তাহার সংবেদনা সমগ্র এশিয়ায় সম্প্রসারিত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্বত্র সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শক্তির অভ্যুত্থান ঘটে। ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েৎনাম প্রভৃতি অঞ্চলে শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আজও অবসান হয় নাই। এই সব দেশের স্বদেশপ্রেমিক সন্তানগণ হৃদয়ের রক্ত ঢালিয়া দিয়া পরাধীনতার কলঙ্ক-কালিমা দেশের বুক হইতে প্রক্ষালিত করিতে প্রবৃত্ত আছেন। কিন্তু এশিয়ার শুধু পূর্ব দিকেই এই আন্দোলন নিবদ্ধ নাই; পশ্চিম দিকে আরব জাতিও সম্পূর্ণ শ্বেতাঙ্গ-প্রভাব-বিনির্মুক্ত স্বাধীনতা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে আত্মোৎসর্গে উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছে। সিরিয়া এবং লেবানন ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের নাগপাশ ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে। সমগ্র আরব জাতি আজ নিজেদের ভিতরের ভেদবিভেদ ভুলিয়া গিয়া স্বদেশের স্বাধীনতার পতাকামূলে সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছে। শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদীরা ভেদনীতির কূটকৌশলে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের পায়ে শৃঙ্খল পরাইতে সমর্থ হইয়াছিল, আজ তাহাদের কূটনীতির এই খেলা ধরা পড়িয়াছে। এশিয়ার বিভিন্ন দেশ আর বিচ্ছিন্ন থাকিতে চায় না—সমগ্র এশিয়ার গতি বর্তমানে সংহতির অভিমুখে চলিয়াছে এবং মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধ ভেদবিভেদ প্রগতিমূলক সংস্কৃতির প্রভাবে উত্তরোত্তর বিলুপ্ত হইতেছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁহার সূক্ষ্ম দূরদৃষ্টিবলে এশিয়ার এই আসন্ন বিবর্তন উপলব্ধি করিয়াছিলেন। গত ১৯৪৫ সালের ১৯শে জুন তিনি সিঙ্গাপুর হইতে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ভারতের সর্বাধিক গুরুত্ব লাভের সম্ভাবনার কথা আমাদিগকে বেতারযোগে শুনাইয়াছিলেন। এই বক্তৃতায় তিনি বলেন,—'বর্তমান যুদ্ধে ভারত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গুরুত্ব লাভ করিয়াছে এবং অদূরভবিষ্যতে এই গুরুত্ব আরও বাড়িয়া চলিবে। এখনই এই কথা বলা যাইতে পারে যে, ভবিষ্যতে যেসব আন্তর্জাতিক সম্মেলন হইবে, তাহার সবগুলিতে ভারতের সমস্যা মুখ্য স্থান গ্রহণ করিবে; কিন্তু সুচতুর ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ ইহা এড়াইতে চাহেন।' সুভাষচন্দ্র স্পষ্টভাবে একথাও বলেন যে, মিত্রশক্তি যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের সুবিধালাভের পথই উন্মুক্ত হইবে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের এই গুরুত্বলাভের উপর সমগ্র এশিয়ার আসন্ন রাজনীতিক অবস্থা যে বিশেষভাবে নির্ভর করিবে, সুভাষচন্দ্র সে কথাও বলিয়াছিলেন।

কিন্তু এশিয়ার নব জাগরণে আজ ভারতের স্থান কোথায়? ভারতের স্বাধীনতাকামী বিপ্লবী সন্তানেরা নির্যাতিত এশিয়ার যে বেদনা একদিন অন্তরে উপলব্ধি করিয়া ঘরের বাহির হইয়াছিলেন এবং সুভাষচন্দ্র তাঁহার প্রাণময় সাধনায় যে বিপুল বেদনার হুতাশন প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, তাহা প্রশমিত হইতে পারে না। মহদাদর্শের প্রেরণায় ত্যাগের পথে যে সাধনার গতি আরম্ভ হয়, পশুশক্তির বলে তাহা প্রতিহত হয় না। এশিয়ার বিভিন্ন জাতিসমূহকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার প্রচেষ্টা বর্তমানে ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ এবং স্পষ্টতর গতি ধরিয়া অগ্রসর হইতেছে। বাঙলার নেতা শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু বন্দীদশা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া এই আন্দোলনের উপরেই প্রথমে গুরুত্ব আরোপ করেন। আনামের স্বাধীনতাকামী বীর সন্তানদের সাহায্যের জন্য তাঁহার সাম্প্রতিক প্রচেষ্টা এবং উদ্যমের কথা সকলেই অবগত আছেন।

ভারত আজ স্বাধীনতার তোরণদ্বারে সমাগত হইয়াছে। প্রগতিবিরোধী লীগের দল বর্বর ধর্মান্ধতার আগুন জ্বালাইয়া স্বাধীনতালাভে ভারতের এই গতিকে প্রতিহত করিবার জন্য যতই চেষ্টা করুক না কেন, কালের গতির বিরুদ্ধে তাহাদের চেষ্টা কখনই সফল

আন্তঃএশিয়া সম্মেলনে ইরাণের প্রতিনিধি প্রিন্সেস মাসিয়া ফিরোজ (ইঁহার চোখে সানগ্লাস রহিয়াছে)। অর্গেনাইজিং কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু দিল্লী বিমান ঘাঁটিতে তাঁহাকে সম্বর্ধনা করিতেছেন।

আন্তঃএসিয়া সম্মেলনে ইরাণের প্রতিনিধিবর্গ। সম্মেলনে ইঁহাদের নেতৃত্ব করিবেন ইরাণের ভূতপূর্ব অর্থসচিব এইচ ই আলি আসগর।

হইতে পারে না। সকলেই জানেন, লীগের দল অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টে প্রবেশ করিয়া ভারতের স্বাধীনতার পথে নানারূপ অন্তরায় সৃষ্টি করিতেছে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পণ্ডিত জওহরলালের প্রচেষ্টাকে তাহারা প্রতিহত করিতে পারিতেছে না। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতকে তিনি মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার উদ্যোগে আমেরিকা এবং চীনে ভারতের স্বাধীন রাষ্ট্র-মর্যাদায় ভারতের দূত নিযুক্ত হইয়াছেন; পণ্ডিত জওহরলালই নয়াদিল্লীর আন্তঃএশিয়া সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের নামও ভারতের ইতিহাসে চিরদিন উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। তিনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের মহিমাকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছেন এবং শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদীদের কূটনীতির খেলা এশিয়ার জাতিসমূহের দৃষ্টিতে উন্মুক্ত করিয়াছেন। ভারতের বিরুদ্ধে শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদীদের মিথ্যা গ্লানি প্রচারের সব চেষ্টা এই মহীয়সী মহিলার প্রতিভাবলে ব্যর্থ হইয়াছে। আজ জগতের বিভিন্ন শক্তি এই সত্য সম্যকভাবে উপলব্ধি করিয়াছে যে, বর্তমান জগতের সব সমস্যার সমাধানের চাবিকাঠি ভারতের হাতে রহিয়াছে। বস্তুত ভারতবর্ষ যদি স্বাধীনতা লাভ করিতে সমর্থ না হয়, তবে ভারতকে কেন্দ্র করিয়া অদূরভবিষ্যতে শোণিত-স্রাবী সংগ্রাম আরম্ভ হইবে। ইউরোপ ও আমেরিকার মুখপাত্রগণ স্পষ্টভাবেই এখন এ সত্য স্বীকার করিতেছেন। আজ এশিয়ার বিভিন্ন জাতিও বুঝিতে পারিয়াছে যে, ভারতের স্বাধীনতার উপরেই এশিয়ায় জাতিসমূহের স্বাধীনতা নির্ভর করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে দিল্লীতে আহূত আন্তঃ-এশিয়া সম্মেলনের গুরুত্ব রহিয়াছে এইখানে এবং সেই গুরুত্ব ভাল করিয়া বুঝিয়াই নিজেদের দায়িত্ব গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে এশিয়ায় বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধিগণ বহুল আয়াস স্বীকার করিয়াও দিল্লীতে সমাগত হইয়াছেন। এইভাবে এশিয়ার সব জাতির কাছে ভারত উত্তরোত্তর একান্তই আপন হইয়া উঠিতেছে এবং নিজেদের স্বাধীনতার জন্যই ভারতের স্বাধীনতা তাঁহাদের পক্ষে প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, এশিয়ার কোন জাতিই আর ভারতকে পর করিয়া বাঁচিতে পারে না—স্বাধীনতা আজ তাহাদের সকলেরই চাই; সুতরাং ভারতকেও চাই। আন্তরিক হৃদ্যতাপূর্ণ এই নিবিড় প্রতিবেশের মধ্যে আমরা আন্তঃ-এশিয়া সম্মেলন উপলক্ষ্যে সমাগত অতিথিবর্গকে আমাদের সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। আমরা জানি, এশিয়ার যেসব দেশ এখনও শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদীদের অধীনে রহিয়াছে, সেই সব দেশের প্রতিনিধিদের পক্ষে এই সম্মেলনে যোগদান করা সহজ হয় নাই; আনামের ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা এবং ইন্দোনেশিয়ার ওলন্দাজ সরকার এই সম্মেলনে যোগদানে ইচ্ছুক ব্যক্তিদিগকে 'বিদ্রোহীর' দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে ভারতে আসিবার পথে যত রকমে সম্ভব বাধা সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু এসব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও এশিয়ার বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতাকামী সন্তানগণ আজ ভারতের স্বাধীনতাকামী সন্তানদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আমরা আশা করি, তাঁহাদের আন্তরিক সহানুভূতি এবং সাহচর্যে এই সম্মেলন সর্বাংশে সার্থকতা লাভ করিবে এবং এই সম্মেলনের ফলে জগতের ইতিহাসে এশিয়ার নব জাগরণের এক অভিনব উজ্জ্বল অধ্যায় উন্মুক্ত হইবে।

স্মারক

এ সোক্লোনোভ্

[এ সোক্লোনোভ্-এর নাম আধুনিক রুশ লেখকদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কাহিনীতে তিনি যে যুদ্ধকালীন চিত্রটিকে এঁকেছেন তা বিস্ময়কর।]

ছোট্ট, দুধের মতো শাদা নরম সেই দস্তানা দুটীকে কাজমিনিচনা অপূর্ব নৈপুণ্যে ধীরে ধীরে বুনে যাচ্ছিলো। বুনছিলো আর মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিলো ঘড়ির দিকে। এখনি বেলা প্রায় তিনটে বাজে, কতটুকুই বা সময়, আগামীকাল ভোরেই ৬টার সময়ে মিটিয়াকে এখান থেকে রওনা হ'য়ে যেতে হবে।

ছোট্ট টেবিল থেকে আলোর একটি দীর্ঘ রেখা এসে ওর মুখে প'ড়েছে, সেলাইয়ের পর সেলাই চলছে, আর তার কোলের উপরে রাখা শাদা উলের বলটা ঠিক যেন একটি ছোট্ট শাদা বেরাল ছানার মতো লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে।

তার চুলগুলি সামনের দিকে ভারী সুন্দর ক'রে আঁচড়ানো, কিছু কিছু ইতিমধ্যেই শাদা হয়ে এসেছে। ছোট্ট দুটি ঠোঁট পরস্পর দৃঢ়-সংবদ্ধ, মাঝে মাঝে কাজমিনিচনা ঘড়ি দেখছে। তার সেই দৃষ্টির দিকে তাকালে স্বভাবতঃই এই কথা মনে হয় যে, ঘড়ির কাঁটা'টা কি নির্মম, ভয়ানক তাড়াতাড়ি সে এগিয়ে চ'লেছে। আশ্চর্য, কিছুতে কল্পনা করা যায় না, সময় এতো তাড়াতাড়ি কি করে কাটে!

বাইরে উঠোনের উপরে হঠাৎ একটা বড়ো মোরগ ডেকে উঠ্‌লো, গলা বাড়িয়ে দেখ্‌লে কাজমিনিচনা। লাল ঝুঁটিওলা বড়ো সুন্দর মোরগটা, মিটিয়া ওকে বড্ডো ভালবাসে, আহা, এই সব ছেড়ে তাকে কোথায় যে চ'লে যেতে হবে!

কাজ্‌মিনিচ্‌না'র আঙুল দ্রুত চলতে লাগলো। এই দস্তানা হাতে না দিয়ে মিটিয়াকে সে কিছুতেই বাইরে পাঠাতে পারবে না। অক্টোবরের ঠান্ডা আর কন্‌কনে বাতাস বইছে বাইরে। রোয়ান গাছের ডালপালাগুলির আঘাত মাঝে মাঝে সাশীর ওপরে এসে পড়ছে, আর সেই ধাক্কায় কাজ্‌মিনিচ্‌নার কেবলি মনে হচ্ছে, যেন 'ডেমি' ব'লে সেই লোকটাই এসে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। সে বলতে এসেছে মিটিয়াকে নিয়ে যাবার জন্যে তার ঘোড়াটা একেবারে তৈরী হ'য়ে আছে, কাল সকালেই ওর ঘোড়ার ওপর চড়েই মিটিয়া রওনা হবে ঠিক হয়েছে কিনা।

ঘরের অন্ধকার কোণটা ভারী নিঝ্‌ঝুম আর শান্ত! এমন কি তার ছেলের নিঃশ্বাস পতনের শব্দটাও বেশ এবার অনুভব করা যাচ্ছে। সত্যিকথা বল্‌তে, আজ কাজ্‌মিনিচনার কানে তার ছেলের এই নিঃশ্বাস পতনের শব্দের কাছে কোনও বাজনা, কোনও গানই লাগে না, এই পরম নিশ্চিন্ত নিশ্বাস পতন, তার এই উজ্জ্বল স্বাস্থ্য, তার এই জীবন, যে জীবনকে কাজমিনিচনাই একদিন পৃথিবীতে এনেছিলো, আর তারপরে তাকে একটু একটু করে বড়ো করা, কতো ঝড়, কতো ঝঞ্ঝাই যে এসেছে তার মধ্যে, কতো বাধার মধ্যে দিয়েই যে তাকে বড়ো করতে হয়েছে! তার মিটিয়া! আর একবার ঘড়ির দিকে তাকালো কাজ্‌মিনিচ্‌না, নাঃ, মিনিটের কাঁটাটা কী তাড়াতাড়ি ঘুরে চলেছে দ্যাখো, মনে মনে ভারী রাগ হোলো তার। আর এই ভাবেই তো হঠাৎ এক সময়ে দেখা যাবে মিটিয়ার রওনা হবার সময় একেবারে এসে পড়েছে, আর বিন্দুমাত্র দেরী করবার কোনও অবকাশ নেই! আর তারপরেই আসবে সেই নির্দয় আর নির্মম মুহূর্ত, যখন তার বুকের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে মিটিয়াকে। তারপরে সে কোথায় যে যাবে কে জানে, কোন্ দুর্গমে, যেখানে এর আগে অনেক মানুষ গেছে, কিন্তু আর কখনও ফেরেনি!

এই ঘটনাটা এতো তাড়াতাড়ি ঘট্‌লো যে কাজমিনিচনা প্রথমে কিছু বুঝতেই পারেনি, আগের দিন সন্ধ্যাতেও সে কী সুখীই না ছিলো, হঠাৎ মস্কো থেকে এসে মিটিয়া তাকে ভারী চমকে দিয়েছিলো কাল। চোখে তার সে কী দীপ্তি, সমস্ত মুখে সে কী উত্তেজনা, সব কিছু মিলে ভাবী সুন্দর দেখাচ্ছিলো মিটিয়াকে। আর তার মধ্যেই কাজমিনিচনা যেন হঠাৎই স্পষ্ট বুঝতে পারলো, মিটিয়া এখন আর সেই ছোট্ট দুষ্টু ছেলেটি নেই, এখন সে বেশ বড়ো হয়ে উঠেছে, যাকে বলা যায় রীতিমতো ভদ্রলোক, সত্যি তার ছেলের জীবনে কতো পরিবর্তনই না ঘটে গেছে, রীতিমতো স্মরণীয় পরিবর্তন বলা যায়!

একবার কাজ্‌মিনিচ্‌না ভাবলে, মিটিয়া নিশ্চয়ই কোনও মেয়েকে ভালোবেসেছে। সেই যে যখন এসে সোজা দরোজার ওপরে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, এই যে মা, দ্যাখো আমি এসে গেছি, ওঃ বাস্তবিক তুমি কী সুন্দর, তোমাকে আমার এতো ভালো লাগে! আবেগে তার গলা কাঁপছিলো, কাজমিনিচনা তাড়াতাড়ি গিয়ে ছেলেকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেছিলো, তারপরে তার সেই কোঁকড়ানো চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে দিয়েছিলো, কী সুন্দর ঘন বাদামী রংএর চুল তার, অবিকল তার বাবার মতো, আর গলার স্বরও কী গম্ভীর, যাকে বলা যেতে পারে পুরুষোচিত।

বাস্তবিক, মিটিয়ার মনে যে আবেগ যে অপূর্ব প্রেরণা এসেছিলো তাকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করতে সত্যিই তার লজ্জা করেছে; সে শুধু প্রবল আবেগে তার মাকে দুই হাতে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরেছিলো আর কাজ্‌মিনিচ্‌নাও আচ্ছন্নের মতো তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে তার মাথার চুলের গন্ধের মধ্যে একেবারে যেন ডুবে গিয়েছিলো, তার তামাকের গন্ধে ভরা নিঃশ্বাস এসে লাগছিলো কাজ্‌মিনিচ্‌নার মুখে, কী অপূর্বই যে তার মনে হচ্ছিলো, অথচ আশ্চর্য এই, কাজ্‌মিনিচনা এমনি সাধারণত তামাকের গন্ধ এর আগে মোটেই সহ্য করতে পারতো না!

সত্যিই মিটিয়া এখন অনেক বড়ো হয়েছে! একেবারে যাকে ব'লে ভদ্রলোক। অথচ কতো'ই বা তার বয়েস। এই তো সবে মাত্র আঠারো বছরে পড়েছে। এতোদিন সে বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়ছিলো, ইতিহাস, দর্শন আর সাহিত্যেরই সে ছাত্র ছিলো, অবশ্য কাজ্‌মিনিচনা জানে না ঠিক কি কি সে পড়তো, কিন্তু সে যখন চিঠিতে ঠিকানা লিখতে গিয়ে তার ছেলের নামের শেষে লিখতো 'দর্শনের ছাত্র' তখন ভারী একটা আত্মপ্রসাদে তার সমস্ত মন ভরে উঠতো!

কাজমিনিচনা, সাধারণত নগরীর কোলাহল থেকে দূরে জনবিরল এই গ্রামে বসে তার ছেলের কর্মব্যস্ত জীবনের জটিলতাকে সামান্যই উপলব্ধি করতে পারতো, আর মিটিয়াও জান্‌তো মায়ের পক্ষে তার বর্তমান এই জ্ঞানের অরণ্যে প্রবেশ করা রীতিমতো দুরূহ ব্যাপার। তাই যখনই সে কাজমিনিচনার সঙ্গে কথা বলতো, তখনি খুব সহজে সরল ভাবেই সে প্রসঙ্গটির অবতারণা করতো, ঠিক যেমন ছোট্ট ছেলেমেয়েকে মানুষ বুঝিয়ে দেয়, অবিকল সেইভাবে!

জানো মা, হঠাৎ কোনও দিন সে বল্‌তো,

দর্শনটা কি ব্যাপার জানো, এ হ'চ্ছে বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ একটা বিশেষ শাখা, এর কাজই হচ্ছে মানুষকে বুঝিয়ে দেওয়া, কেন সে পৃথিবীতে বাস করছে, কী তার উদ্দেশ্য, কী তার কাজ!

হ্যাঁ, বাবা জানি! সকলেই তাদের নিজে-দের সুখের জন্যে বেঁচে থাকে, যেমন ধর তুই, তোর জন্যেই তো আমি বেঁচে আছি!

হ্যাঁ, মা সেটাও একটা দর্শন বটে, কিন্তু আমি কী ক'রে তোমাকে বোঝাই, এটা ভুল দর্শন, দ্যাখো, ধরো সকলেই যদি তার নিজের নিজের সুখের জন্যে ব্যস্ত থাকে, তাহ'লে সমস্ত লোকের সুখের এবং স্বাচ্ছন্দ্যের কথা কে ভাববে? সুতরাং একজনকে সমস্ত লোকের জন্যে তার নিজের জীবনের সুখকে ত্যাগ করতেই হ'বে, তার নিজের দেশের জন্যে, মানবতার জন্যে!

কিন্তু এসব কথা কাজমিনিচনার পক্ষে অত্যন্ত গভীর। অতি সাধারণ অর্ধশিক্ষিতা একটি গ্রাম্য প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক সে, ইতিমধ্যেই তার নিজের সম্বন্ধে সে কিছুটা ভেবে রেখেছে, সেইটাকেই তার নিজের জীবনের দর্শন বলা যেতে পারে। অতি সরল আর সহজ মানুষ এই কাজমিনিচনা, সুতরাং ছেলের গভীর জ্ঞানের কাছাকাছি পৌঁছবার আশাও ছিল না তার কোনও দিন।

জানলা দিয়ে কাজমিনিচনা বাইরের দিকে চেয়ে রইলো। দূরে কাছে চার দিকেই তার পরিচিত পৃথিবী, চার দিকেই তার যেন নিজের জিনিস ছড়ানো।

জানলার নীচে ওই রোয়ান গাছটার গুচ্ছ গুচ্ছ ফলে পরিপূর্ণ ডালগুলি যেন ছবির মতো মনে হয় এখান থেকে, ছাদের উপরে একটা শাদা মোরগ চুপচাপ একটি পা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, কাঠের ছোট্ট বালতিটা বাতাসে ঈষৎ এদিকে ওদিকে আন্দোলিত হচ্ছে দেয়ালে।

কাজমিনিচনার সমস্ত জীবন এই জায়গাতেই অতিবাহিত হয়েছে। এইখানেই, এই ছোট্ট ছাদের নীচে। ওদিকে চোখ পড়লো তার, তাকের উপরে মিটিয়ার ছোট বেলার দুধ খাবার কাপটা পর্যন্ত এখনো রয়েছে, তাড়াতাড়ি সেই দুধের কাপটা নামিয়ে নিয়ে এসে দুধ ভরতে ভরতে পূর্ব প্রসঙ্গ টেনে নিয়ে সে বললে, আমার লক্ষ্মী সোনা, তুই তো জানিস বাবা, আমি তোর মতোন অতো লেখাপড়া শিখতে পারি নি, সামান্য একটু আধটু যা শিখেছিলুম, তা কবেই ভুলে গেছি, আমি জানি বাবা তুই আমার থেকে কতো বেশী জানিস্!

মিটিয়া তাড়াতাড়ি ছুটে এসে তার মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে মুখ লুকাতো। বলতো, চুপ করো মা, সত্যি আমি অন্যায় ক'রেছি। এই ছিলো তার মায়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গী!

সেদিন অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে বললে, মা, শোনো, আমার জিনিসপত্তরগুলো সব ভালো ক'রে গুছিয়ে দিও, কাল সকালেই আমাকে চ'লে যেতে হ'বে!

—সকালেই যাবি?—কোথায়?

সূর্য যে দিকে অস্ত যাচ্ছিলো, সেই দিকে ঘুরে আঙুলে দিয়ে জায়গাটা দেখিয়ে বললে, ঐ দিকে মা!

কাজমিনিচনার সব আঙুলগুলো, মনে হলো হঠাৎই যেন কেমন অবশ হয়ে আসছে; হাত থেকে তার কাপটা মাটিতে পড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেলো, কিন্তু কানে তার সে ঝন্ ঝন্ শব্দ বাজলোই না। বরং একটু আগে তার ছেলের মুখ থেকে যা সে শুনেছে তাই যেন তাকে নৈরাশ্যের গভীর অন্ধকারে ঠেলে ফেলে দিলে। বিমূঢ়ভাবে সে তার ছেলের দিকে চেয়ে রইলো, বুঝতে পারলো বরফের মতো ভারী একটা হিমশীতল বিচ্ছেদ এসে তার আর মিটিয়ার জীবনকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলছে, ঠিক যেমন বরফ এসে আস্তে আস্তে একটা গতি-শীলা তটিনীর অবারিত স্রোতকে অবলীলায় গ্রাস করে সেইভাবে, বরফের এপার থেকে তার স্বচ্ছতার মধ্যে দিয়ে অনায়াসে ওপাশে ফোটা পদ্মগুলিকে দেখতে পাবে, কিন্তু যেই নেবার জন্যে হাত বাড়াবে, অমনি কঠিন বরফে তা ব্যাহত হবে, এপার থেকে যা তোমার জীবন্ত প্রাণরসে পরিপূর্ণ মনে হচ্ছিলো হাত বাড়ালেই বুঝতে পারবে তা মৃত, তা হিমশীতল!

মিটিয়া, সোনি! তোর কি কলেজের পড়া শেষ হয়ে গেছে?

না মা, কিন্তু তবু আমাকে এই পথেই যেতে হবে। আমি স্বেচ্ছাসৈনিকের দলে নাম লিখিয়েছি মা। আমি জানি, এ সব কথা শুনতে তোমার কতো কষ্ট হবে, কতো দুঃখ পাবে মনে, তবু তুমি দুঃখ কোর না, আমাকে বুঝবার চেষ্টা করো, এ ছাড়া আমি আর কিছুই করতে পারতুম না, সত্যি কথা বলতে এ সময়ে দর্শন পড়ে সময় কাটিয়ে দেবার বিন্দুমাত্র অধিকার নেই মা আমার জীবনে।

কিন্তু বাবা, মিটিয়া, এভাবে তোকে আমি কিছুতে যেতে দেবো না, কিছুতে যেতে দেবো না। কাজমিনিচনার ঠোঁট কাঁপতে লাগলো, আর শেষের কথাগুলি এতো দ্রুত উচ্চারণ করলো, যে যেন তার বলার উপরেই মিটিয়ার যাওয়া এবং না যাওয়া নির্ভর করছে।

আমার সোনি, আমার সোনা, সত্যি এ তুই কি বলছিস বাবা! না না, তোকে আমি কিছুতে যেতে দিতে পারি না, একথা ঠিক যে তুই আগের থেকে অনেক বড়ো হয়েছিস, কিন্তু তা বলে যুদ্ধে যাবার মতো নয়, এক বছর আগেও তো তুই ছেলেমানুষ ছিলি বাবা, গত বছরেও তোর ঐ জ্যাকেটটা আমি নিজের হাতে সেলাই করে দিয়েছিলুম, না না বাবা, লক্ষ্মী সোনা আমার, তা কিছুতে হবে না! একটু থেমে নিঃশ্বাস নিয়ে সে আবার বলতে আরম্ভ করলো : আমি তা কিছুতে পারবো না, আমি তোকে কিছুতে ছেড়ে দিতে পারবো না বাবা, তুই ভাবছিস্ কি? তুই চলে গেলে কাকে নিয়ে আমি বাঁচবো, বেঁচে থেকেই বা আমার লাভ কি হবে? লক্ষ্মী বাবা আমার! আমার এই বুড়ো বয়েসের কথাটা একবার ভাবিস, আমাকে দেখে তোর কি একটু দয়াও হয় না? তোর মায়ের জীবনের দিকে একবার চেয়ে দ্যাখ, তোর জন্যে কতো যে কষ্ট পেয়েছি, কতো দুঃখে যে তোকে একটু একটু করে মানুষ করেছি, সব আমি তোকে দিয়েছি, এইভাবে সারা জীবনের পরিশ্রমে আমার সমস্ত শরীর ভেঙে গেছে, লক্ষ্মী সোনা আমার।

মিটিয়ার দুই হাত বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে এসে নিজের ঠোঁট দিয়ে স্পর্শ করলে সে, কিন্তু তবু মিটিয়া চুপচাপ সেই জায়গাতেই দাঁড়িয়ে রইলো, মাথাটা তার ঈষৎ নীচু হয়ে এসেছে, চোখে তার অনেক দূরে অন্ধকার ভবিষ্যতের কেমন যেন একটা ম্লান ছায়া কাঁপছে, রাগে দুঃখে তার সমস্ত মুখে ভারী একটা বিষণ্ন ছায়া পড়লো, বললে, না মা, তা হতেই পারে না, আমি যে তাদের কথা দিয়েছি, আমি একটা ইউনিটে যাবো বলে যে তাদের চুক্তিপত্রে সই করেছি মা, আমাকে আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়তেই হবে, কাঁচের হাতবোমা দিয়ে তাদের আমি ধ্বংস করবো, আমি তাদের তাঁবুতে তাঁবুতে আগুন লাগিয়ে দেবো, কিন্তু তাই বলে তুমি আমার জন্যে ভয় পেয়োনা মা।

কাজমিনিচনার বুকের উপরে মাথা রেখে তাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলো মিটিয়া, দুই হাতে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরতে গেলো সে, কিন্তু কী আশ্চর্য! হাত দুটো যেন সীসের মতো ভারী মনে হচ্ছে, তাঁর চুলের রাশিতে কেমন যেন সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। সে তার মায়ের বুকের উপরে আবার মাথা রাখলে, যেন সেইভাবে তার মাকে আঁকড়ে ধরে আজকের তার এই ক্ষত বিক্ষত মনের উপরে খানিকটা উৎসাহের প্রলেপ লাগিয়ে দেবে, তারপরে তার মায়ের সেই মৃদু কণ্ঠস্বরকে ডুবিয়ে গভীর আবেগে সে মাকে বোঝাতে লাগলো তার এই যুদ্ধে যাওয়া কতোটা বীরত্বের, কতোটা আনন্দের, সমস্ত দেশের দিক থেকে তা কতোটা বেশী গৌরবের। তারপরে সে রীতিমতো অঙ্গভঙ্গী করে বক্তৃতা আরম্ভ করলো, যেমন সে এর আগে ছোট ছোট সভায় করতো—অবিকল সেই রকম।

তুমি বিশ্বাস করো মা, যদি আমরা না জিতি তাহ'লে ইতিহাস কখনো আমাদের ক্ষমা করতে পারবে না, আমাদের দেশের ভবিষ্যতের জন্যে, সমস্ত মানুষের কল্যাণের জন্যে আমাদের জীবনের সবথেকে চরম ত্যাগের

দুঃখের জন্যে যেন আজ প্রস্তুত থাকি, যেন না ভুলি—

কিন্তু কাজ্‌মিনিচ্‌না তাকে আর কথা শেষ করতে দিলে না, দুই হাতে বুকের মধ্যে আরো নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরলে, তারপরে মিটিয়ার গালের উপরে নিজের গাল রাখ্‌লো একবার, তারপরে গভীর আবেগে আবার নিজের বুকের মধ্যে তাকে চেপে ধরলে, যেন মনে হোল সমস্ত বিপদ, সমস্ত বাধা থেকেই তার মিটিয়াকে সে এইভাবে লুকিয়ে রাখ্‌তে পারবে, মিটিয়া—তার মিটিয়া, তার জীবনের একমাত্র সম্পদ, তার প্রাণ!

......হাতের বুনবার কাঁটাগুলো ঝক্‌ ঝক্‌ ক'রে আলোতে জ্বলছে, অত্যন্ত দ্রুত-হাতে কাজ্‌মিনিচ্‌না দস্তানা সেলাই ক'রে চলেছে। সেলাইয়ের পর সেলাই হয়ে যাচ্ছে, এক মনে দস্তানা বুনে চলেছে সে। ব্যস এখন কেবল বুড়ো আঙুলটাকে করলেই কাজ মেটে। এইবার দস্তানার উপরে যাহোক একটা কিছু চিহ্ন এঁকে দিতে হবে। সব দস্তানাই তো দেখতে একরকম, মিটিয়া ভুল করতে পারে, হয়তো বদল কোরে অন্য কারুর একটা নিয়ে নেবে, আর সেটাতো এমন গরম, এমন চমৎকার হবে না, আর তাছাড়া এটা যে তার মায়ের নিজের হাতের বোনা, চিহ্নটা খুব ঝকঝকে উজ্জ্বল কোনো রঙীন সুতো দিয়ে করতে হবে, আর বেশ বড়ো ক'রে করা দরকার, না হলে হয়তো কারুর চোখেই পড়বে না। হ্যাঁ ঠিক হয়েছে, পিছনের দিকে বেশ বড়ো ক'রে সে একটা পাইন গাছই এমব্রয়ডারী ক'রে দেবে, সেই বেশ চমৎকার হবে।

আস্তে আস্তে সেই দস্তানার উপরে চমৎকার একটি পাইন গাছের ছবি ফুটে উঠ্‌লো, অস্পষ্টভাবে কি যেন ব'লে কাজ্‌-মিনিচ্‌না গভীর আবেগে চুম্বন করলো সেই চিহ্নটিকে, কি যে সে বললে তা আমরা অবশ্য জানি না, তবে মনে হয় একমাত্র মায়েরাই বোধ হয় তাদের সন্তানের প্রতি অপরিসীম স্নেহে সেই সব কথা বল্‌তে পারেন, অন্য কেউ নয়!

দুই

বেশ কিছুদিন হ'লো কনকনে শীত পড়েছে চারদিকে। জানলার নীচে রোয়ান গাছটা চুপচাপ নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে আছে। মনে হ'চ্ছে, সে যেন একটা মস্ত বড়ো বরফের কম্বল গায়ে জড়িয়েছে আর গুচ্ছ গুচ্ছ ফল-গুলি রয়েছে তেমনি নিটোল, কেউ তা আজো পেড়ে নেয়নি, এই ফল বড্ডো ভালবাসতো মিটিয়া। একদিন সকালে হঠাৎ দেখা গেলো কোথা থেকে একদল ম্যাগপাইপ পাখী এসে বসলো সেই গাছের উপরে, আর তাদের ঠোঁটের আঘাতে ফলগুলি বরফের উপরে বিন্দু বিন্দু রক্তের ফোঁটার মতো ছড়িয়ে পড়লো।

কাজ্‌মিনিচ্‌না আজকাল এই জানলা দিয়ে চুপচাপ প্রায়ই পশ্চিম দিকে চেয়ে বসে থাকে। তার মিটিয়া একদিন ওই দিকেই যাত্রা করেছিলো। অনেকক্ষণ বসে থাকে, আস্তে আস্তে সমস্ত আকাশটা লাল হয়ে ওঠে, সূর্য অস্ত যায়, চুপচাপ তাই বসে বসে দ্যাখে কাজমিনিচনা, মনে হয় পশ্চিম দিগন্তে যেন আগুনের লকলকে শিখা জ্বলছে, মনে হয় কাছাকাছি, কোথায় যেন ভয়ানক আগুন লেগেছে।

সেইদিকে চেয়ে কোনো কোনো দিন কাজমিনিচনা অস্ফুটভাবে উচ্চারণ করতো মিটিয়ার নাম, বলতো, মিটিয়া—মিটিয়া, আমার সোনা, আমার মাণিক! এইভাবেই তার আজ-কাল দিন কাটে, কজে কর্মে আর সেরকম আগের মতো উৎসাহ নেই তার। চারপাশে কী যে ঘটছে, কী যে ঘটছে না, তার কোনো খবরই সে রাখে না আজকাল। ঠিক এই সময়েই তাদের গ্রামের খুব কাছাকাছি একদিন কামান গর্জনের শব্দ শোনা গেলো, প্রতি-বেশীরা যার যা নেওয়া সম্ভব তাই নিয়ে গ্রামান্তরে রওনা হলো। তারা এসে কাজমিনিচনাকেও তাদের সঙ্গে যাবার অনুরোধ জানালে, কিন্তু সে কর্ণপাতও করলো না তাদের কথায়, শুধু গম্ভীরভাবে বল্লে, এগ্রাম ছেড়ে আর কোনো জায়গাতেই সে যেতে পারবে না।

কোনো ভয়ই যেন তাকে স্পর্শ করতে পারে না আজকাল, মনে মনে এই কথাই সে ভাবতো, আমার পক্ষে কি এখান থেকে চ'লে যাওয়া কখনও সম্ভব? ছি ছি, মিটিয়া ফিরে এসে কি ভাববে তাহলে, আমার তো তারই সঙ্গে চলে যাওয়া উচিত ছিলো, কী নিদারুণ দুঃখ যে সে বরণ করেছে তা সে-ই জানে। বরং আমি সঙ্গে থাকলে তার খাবার সময়ে তাকে খাওয়াতে পারতুম, তার জিনিসপত্র ধুয়ে দিতে পারতুম, ছি ছি, তার মা হয়ে শেষকালে আমি নাকি পালাবো? একথা ভাবাই যায় না মোটে!

যখন জার্মানরা এসে গ্রামের মধ্যে ঢুক্‌লো তখন সমস্ত গ্রামের মধ্যে জীবিত প্রাণী বলতে কাজমিনিচনা আর সেই সাদা মোরগটা, এছাড়া আর কেউ ছিলো না সেখানে। ছোট ছোট ছেলেদের ওপরে গ্রাম-বৃদ্ধদের আদেশ ছিলো এই যে তাদের এখানকার সব মোরগদের তাড়িয়ে বনের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে, কিন্তু এই সাদা মোরগটাকে তারা কিছুতেই সঙ্গে নিতে পারলো না, সে যে সেই চালের মট্‌কার উপরে গিয়ে উঠলো, অনেক চেষ্টা অনেক কৌশলেই, কিছুতেই সেখান থেকে তাকে নামাতে পারা গেলো না।

এক পা তুলে এখনো প্রায়ই তাকে তাই সেই মটকার ওপরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়, আর সে যখন ডাকতে আরম্ভ করে, কাজমিনিচনার মনে হয়, সে যেন তাদের দেশেরই জয়বার্তা ঘোষণা করছে, নিশ্চয়ই তারা একদিন জিতবে।

এই মোরগের ডাক শুনলেই কাজ্‌-মিনিচনার তার নিজের ছেলেকে মনে পড়ে। না, সত্যি ওটা যে আজো বেঁচে আছে তার জন্যে মিটিয়াকেই ধন্যবাদ দিতে হয়, তা না হলে রওনা হবার আগে কাজমিনিচনা তো ওটাকে মেরে মিটিয়াকে রোষ্ট করেই দিতে চেয়েছিলো সেদিন, রাস্তায় যখন তার খিদে পাবে তখন সে খাবে এই জন্যে। এমন কি ছুরি নিয়ে ওটাকে কাটবার জন্যে সে বেরিয়েও এসেছিলো।

মোরগটা দরজার ধারে চুপচাপ দুটি চোখ বুজে এক রকম গলা বাড়িয়েই বসেছিলো, আর একটু হলেই কাজমিনিচনা তার গলার উপরে কোপ বসিয়েছিলো আর কি! ঠিক সেই সময়ে অন্য দিক থেকে আরেকটি মোরগ হঠাৎ ডেকে উঠলো, আর তার ডাকে উত্তর দেবার জন্যে এও যেন সচকিত হয়ে খুব জোরে চীৎকার করতে আরম্ভ করলো।

কাজমিনিচনার তখন মনে হলো এ যেন শুধু ডাক নয়, যেন গানের একটা সুর, এই ডাক শুনেই ছেলেরা দৌড়য় স্কুলের দিকে, এই ডাকই চাষী বালকদের মনে গরু আর ভেড়া নিয়ে মাঠের দিকে বেরিয়ে পড়বার প্রেরণা ছড়িয়ে দেয়।

আর মিটিয়াও সেদিন যেন এই মোরগের গান শুনে তার সেই অতীত কৈশোরে ফিরে গেলো, সেই সোনায় মোড়া উজ্জ্বল শৈশব, তার মা যখন ছিলেন তন্বী তরুণী, ঘন কালো দীর্ঘ চুলের রাশি যখন তার এলিয়ে পড়তো পিঠে, সেই অতীতকালে। আস্তে এসে বললে, মা, আহা ওকে ছেড়ে দাও! আর কাজমিনিচনারও কী যে হলো তার হাত থেকে ছুরিটা যেন হঠাৎই খসে গেলো, আর মোরগটা যখন একলাফে উঠোনের উপরে গিয়ে ধান খুঁটে খুঁটে খেতে লাগলো তখন কাজমিনিচনার ঠোঁট দুটি হাসিতে ভ'রে উঠলো, তার ছেলের কথারই প্রতিধ্বনি ক'রে সেযেন সেদিন বলেছিলো, হ্যাঁ বাবা! ওকে আমি ছেড়েই দেবো!

সেই থেকে এই মোরগটা কাজমিনিচনার কাছে যেন তার ছেলের জীবনের একটা প্রতীক হয়ে উঠেছে। এর সঙ্গে যেন অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে গেছে তার ছেলে মিটিয়ার স্মৃতি,

যখন সে ডাকে, যখন সে তার লাল ঝুঁটি ঝুলিয়ে ইতস্তত ঘুরে বেড়ায়। ভারী চমৎকার লাগে তার, চুপচাপ সেইদিকেই চেয়ে থাকে, আর ভাবে।

আর এক-একদিন যখন সে চালের মটকার উপর থেকে তারস্বরে ডাকতে আরম্ভ করে, তখন সে শব্দ তার ঘরের জানলা, খড়খড়ি পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয়, বরফের মধ্যে দিয়ে শির শির ক'রে সে শব্দ বহুদূর দিগন্তে যেন মিলিয়ে যায়।

আজকাল চুপচাপ কাজর্মিনিচনার ঘরের মধ্যে বসে থাকতেও ভাল লাগে না। একদিন সে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো। মনটা আজকাল তার ভয়ানক ভারাক্রান্ত।

হঠাৎ পিছন থেকে সে একটা কর্কশ হিংস্র গর্জন শুনলো—এই বুড়ী, দাঁড়া ওখানে চুপ ক'রে।

পিছন ফিরে দেখলে, বন্দুক উঁচিয়ে দস্যুর মত একটা লোক, কান মাথা তার টুপিতে ঢাকা, রাক্ষসের মতো চীৎকার কোরে ব'লছে, এই বুড়ী দাঁড়া ওখানে!

জার্মানটা চীৎকার ক'রে কী যেন তাকে বলতে লাগলো।

কাজর্মিনিচনা কখনো এভাবে কথা শুনতে অভ্যস্ত নয়। গ্রামের সব লোকেরা অতি শান্ত আর ভদ্রভাবে তার সঙ্গে কথা বলতো। কাজর্মিনিচনা চীৎকার করে উঠলো, বললে, তোমার কুকুরের মতো ঘেউঘেউ থামাও বলছি! বলে ঘৃণার সঙ্গে একবার তার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে নিজের বাড়ির দিকে এগিয়ে চললো। জার্মানটা পিছন পিছন এসে দেখতে পেলে চালের মটকার উপরে সেই মোরগটা বসে রয়েছে। অমনি আর বিন্দুমাত্র দেরী না ক'রে গুলী ছুঁড়লে। মনে হলো একটা সাদা তুলোর বল যেন গড়াতে গড়াতে এসে মাটীর উপরে আছড়ে পড়লো, তারপরে একবার নিজের পায়ের উপরে সে দাঁড়াতে চেষ্টা করলে, কিন্তু পারলো না, তার পালক-গুলো ইতঃস্তত উড়তে লাগলো, মনে হলো একটা পোর্সিলেনের কাপ যেন শত টুকরো হয়ে ভেঙে চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে।

মোরগটা ঝটপট করতে করতে এসে কাজর্মিনিচনার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়লো, যেন তার কাছেই আজ সে শেষ আশ্রয় চায়, কাজর্মিনিচনাও তাড়াতাড়ি দুইহাতে তুলে নিয়ে তাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরলো, জার্মানটা ততক্ষণে ওটাকে ধরবার জন্যে একেবারে তার কাছে ছুটে এসেছে।

এই বুড়ী! ব'লেই সে লোকটা বিকট একটা চীৎকার করে উঠলো, তারপরে হাত বাড়িয়ে মোরগটাকে নেবার জন্যে আরো কাছে সে এগিয়ে এলো।

ভয়ে কাজর্মিনিচনা একটু কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলো, তাড়াতাড়ি কয়েক পা পিছনে সে সরে গেলো। হঠাৎ তার চোখ পড়লো লোকটার দুটো দস্তানা পরা হাতের দিকে, না—না, কাজর্মিনিচনা ভুল দেখেনি, এযে সেই দস্তানা, বুড়ো আঙুলের কাছে পরিষ্কার তার হাতের আঁকা সেই পাইন গাছ! এখনো তা জ্বলজ্বল করে জ্বলছে যেন।

জার্মানটা কাজর্মিনিচনার হাত থেকে মোরগটাকে জোর ক'রে ছিনিয়ে নিলে। তার ঘাড়টা হাত দিয়ে ভেঙে দিলে, তারপরে সেই দস্তানা পরা হাতে সেটাকে শক্ত করে ধরে চীৎকার করে উঠলো, রোষ্ট—রোষ্ট।

কাজর্মিনিচনার কানে এখন আর কোনো শব্দ, কোনো কথাই ঢুকছিলো না, মনে হতে লাগলো অত্যন্ত বেগে সমস্ত পৃথিবীটা যেন তার চোখের সামনে ঘুরছে, আর্তকণ্ঠে সে চীৎকার করে উঠলো, মিটিয়া—মিটিয়া—বাবা মিটিয়া! সোনা আমার! ঠোঁট দুটো তার থর থর করে কাঁপতে লাগলো! চারদিকে মনে হলো দুর্ভেদ্য অন্ধকার, আর তার মধ্যে দস্তানার উপরে তারই হাতের আঁকা পাইন গাছটা যেন উদ্দাম নৃত্য করে বেড়াতে লাগলো!

অনেকক্ষণ পরে যখন তার চেতনা ফিরলো, বুঝতে পারলে তার শরীরে ভয়ানক যেন একটা ব্যথা হয়েছে, এতোক্ষণ ওই জার্মানটা তাকে তার ভারী বুট দিয়ে লাথি মেরেছে, তারই আঘাতের বেদনা এটা।

এই বুড়ি, ওঠ্—ওঠ্ বলছি! লোকটা কুকুরের মতো আরো একবার ঘেউ ঘেউ করে উঠলো।

কাঁপতে কাঁপতে কাজর্মিনিচনা নিজের ঘরের ভিতরে এসে ঢুকলো, তারপরে অনেক কষ্টে উনুনে আগুন জ্বাললে, জার্মানটা মোরগটার সমস্ত পালক ছাড়িয়ে ফেলতে লাগলো, মুখে তার ইতিমধ্যেই লালা এসে জমেছে, তার খোঁচা খোঁচা দাড়ি-ওঠা গালের উপরে একটা হিংস্র আভা ছড়িয়ে পড়েছে।

শেষ পর্যন্ত এটাকে পুড়িয়ে রোস্ট করবার ধৈর্যও তার সইলো না, সেই আধপোড়া অবস্থাতেই সে টেনে বের করলো সেটা, তার পরে দাঁত দিয়ে সে আধ-কাঁচা মাংস ছিঁড়তে আরম্ভ করলে, মাথাটা ঈষৎ নাড়াতে লাগলো, টুকরো টুকরো করে ছিঁড়তে লাগলো তাকে। তারপরে তার ফ্লাস্কে মুখ দিয়ে ঢোঁক ঢোঁক করে অনেকটা জল খেলে, চোয়াল বেয়ে তা গড়িয়ে পড়তে লাগলো নীচে, দাঁতগুলো ঈষৎ দেখা গেলো, এই দাঁত দিয়েই সে মোরগটার নরম হাড় একটু আগেই কড়মড় করে চিবিয়েছে!

পশু—পশু কোথাকার, মনে মনে কাজর্মিনিচনা এক মুহূর্তের জন্য কথাটা উচ্চারণ করলে। তারপরে উনুনের ডালাটা সে হঠাৎ বন্ধ করে দিলে, কয়লাগুলোকে সেখান থেকে বের করে দেবার কথা সে একেবারে ভুলে গেলো!

খাওয়া শেষ করে সেই জার্মান পশুটা কাজর্মিনিচনাকে তার ঘর থেকে দূর করে তাড়িয়ে দিলে। তারপরে দরোজায় খিল লাগিয়ে দিয়ে বিছানার উপরে শুয়ে পড়লো।

পরের দিন সকালে এসে জানলাটা ঈষৎ ঠেলে মুখ বাড়িয়ে কাজর্মিনিচনা দেখলে, সেই লোকটা ঘরের ছাদের দিকে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে মরে পড়ে আছে; আর কার্বন-গ্যাসে সমস্ত ঘরটা একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে, আর তার বিছানা থেকে একটু দূরে মেঝের উপরে সেই দস্তানা দুটো পড়ে রয়েছে! ......

আমার স্বদেশের অরণ্যসংকুল দুর্গম বন-প্রান্তের গভীর অন্ধকারে বড়ো বড়ো গাছের আড়ালে, আমাদের সেই প্রস্তর-যুগের আদিম বাসভূমিতে হাজার হাজার নরনারী আজ তাদের বিধ্বস্ত গ্রাম এবং শহর থেকে এসে আশ্রয় নিয়েছে, সেখানে তারা বিন্দু বিন্দু করে শক্তি সঞ্চয় করছে তাদের দেহের শ্রেষ্ঠতম শোণিত বিন্দু দিয়ে শত্রুকে ধ্বংস করবার জন্যে প্রতিদিন প্রস্তুত হচ্ছে তারা! আর তাদের মধ্যে আমি জানি, প্রতিটি বালক-বালিকা এবং নরনারীর মুখে মুখে একটা অপূর্ব কাহিনী গান হয়ে, কবিতা হয়ে, একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। তা তাদের প্রেরণা দিচ্ছে, তাদের শক্তিকে উজ্জীবিত করছে। সে কাহিনী আর কারো নয়, আমাদের সেই প্রৌঢ়া পরিচিতা মাতা কাজর্মিনিচনার। সাদা হয়ে এসেছে তাঁর মাথার চুল, অতি শান্ত আর স্নিগ্ধ মূর্তি, চুপচাপ জানলার কাছে বসে একান্ত আগ্রহে একজোড়া দস্তানা বুনে চলেছেন তিনি।

আমরা জানি, কোনো জার্মান বুলেটই তাঁকে কোনোদিন বিদ্ধ করতে পারবে না, কারণ তিনি তাঁর হৃদয়ের উপরে, বেদনার পশমের বুনানিতে যে দস্তানা বুনেছিলেন, সেই দস্তানা, সেই ঐন্দ্রজালিক দস্তানা চিরকাল তাঁর দেশের সকলের চোখে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। তারা স্তব্ধ আর মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখবে: অতি সুন্দর টকটকে লাল একটি পাইন গাছ—হাল্কা শাদা আর নরম দুটি দস্তানার উপরে চমৎকারভাবে তা এম্ব্রয়ডারী করা!

অনুবাদক—শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

৭

পরদিন ভোরবেলা ভজহরি দাস নবীননারায়ণের বৈঠকখানায় গিয়া উপস্থিত হইল। নবীননারায়ণ বিস্তৃত ফরাসের উপরে তাকিয়া আশ্রয় করিয়া একখানা বই পড়িতেছিল। ভজহরিকে দেখিয়া সে উঠিয়া বসিল। বলিল, আসুন দাস মশাই, খবর কি?

নবীননারায়ণকে প্রণাম করিয়া ফরাসের একান্তে বসিতে বসিতে ভজহরি বলিল—খবর আর কি বাবা, একবার দেখা করতে এলাম। শুনেছি তুমি এসেছো কিন্তু সময় পাইনি, কেবলি কলুর ঘানি টেনে মরছি। তোমার শরীর ভালো তো বাবা? বৌ-মা কুশলে আছেন?

নবীননারায়ণ যথাযোগ্য উত্তর দিল। ভজহরি বলিল, বৌমাকে মাঝে মাঝে নিয়ে আসতে হয়। এ গ্রাম ভালো হোক মন্দ হোক এরিই তো বটে। না আসলে চলবে কেন?

নবীননারায়ণ বলিল—এবারে গরমের সময়ে আনবো ভাবছি, এখন সময়টা ভালো নয়।

ভজহরি দাস বলিল—এ সময় না এনে ভালই করেছো। ম্যালেরিয়া জ্বর কিছু কিছু দেখা দিয়েছে।

নবীননারায়ণ বলিল—কিন্তু যোগেশ যেমন মহামারীর কথা লিখেছিল, তেমন কিছুই নয়।

এই কথায় দুজনেই হাসিল—আসল রহস্য কাহারো অজ্ঞাত নয়।

তারপরে নবীননারায়ণ বলিল—আর ম্যালেরিয়া হবেই বা না কেন? গ্রাম যে আগাছায় ভ'রে গেল।

ভজহরির আসল প্রসঙ্গ উঠাইবার সুযোগ অপ্রত্যাশিতভাবে আসিল, বলিল—কিন্তু বাবা বুড়ো অশথ তো আগাছা নয়। ওটাকে নাকি কাটবার সিদ্ধান্ত করেছ?

—না কেটে করি কি? দেখছেন তো কতখানি জায়গা আটকে রয়েছে?

ভজহরি বলিল—কিন্তু সেটা কি উচিত হবে বাবা?

নবীন বলিল—কেন নয়? বিশেষ ওটাতো আমারি এলাকা বটে!

তাহার যুক্তি শুনিয়া ভজহরি জিভ কাটিয়া বলিল, বাবা এ তোমার উপযুক্ত কথা নয়। এলাকা তোমারি অবশ্য। কালীবাড়িও তো তোমারি এলাকায়, তাই বলে কি মা-কালী তোমার প্রজা? তিনি কি আঁচলে খাজনা বেঁধে তোমার কাছারীতে আসেন? না বাবা, এ তোমার যোগ্য কথা নয়। দেবস্থানের মালিক দেবতা, জমিদার যেই হোন না কেন।

নবীননারায়ণ বুঝিল কথাটা সত্যই বে-সুরো হইয়া গিয়াছে তাই সে ঘুরাইয়া লইয়া বলিল—না, না, আমি তা বলিনি। দেখুন, ওই অশথ গাছটার জন্যে দু'তিন বিঘা জমি ওখানে অনাবাদী পড়ে আছে। এদিকে লোকে চাষের জমি পায় না। দাস মশাই, দেশের লোকসংখ্যা হু হু ক'রে বেড়ে যাচ্ছে—অথচ জমি তো আর বাড়ছে না—খাদ্যাভাব হবে যে তাতে আর বিচিত্র কি?

ভজহরি বলিল—কিন্তু ছোটবাবু আমি তো তা দেখিনে। আমাদের এদিকে লোক ম'রে শেষ হ'য়ে গেল। জমি অনাবাদী পড়ে আছে। যার পাঁচ বিঘে জমি হ'লে চলে, তার হাতে পনেরো বিঘে আছে। চাষ করতে পারে না, ফেলে রেখেছে। ধানের দাম এবারে পাঁচ সিকে হয়তো আমাদের ভাগ্য!

নবীননারায়ণ বলিল—আমি আমার এদিকের কথা বলছিনে, অন্য অঞ্চলের কথা বলছি।

—কিন্তু বাবা অশথ গাছটা তো এই অঞ্চলের, অন্য অঞ্চলের অভাবে ওটাকে কাটতে যাবে কেন?

—সব অঞ্চল মিলিয়েই তো এই দেশ। দেশে যখন জমির অভাব তখন বনে-জঙ্গলে জমি অনাবাদী পড়ে থাকা কি অপরাধ নয়? আপনি ভাববেন না যে কেবল এই গাছটা কাটতেই আমি সঙ্কল্প করেছি। আমার এলাকায় যেখানে যত আগাছা জঙ্গল আছে সব কেটে ফেলে চাষের জমি বাড়িয়ে দেবো। তাতে প্রজাদেরও সুবিধে—আমার আয়ও দু'পয়সা বাড়বে।

ভজহরি তাহার কথা মন দিয়া শুনিল, বলিল, তোমার কথা ঠিক, কিন্তু আরও একটা বিষয় ভাববার আছে।

এই বলিয়া সে তর্কের মোড় ফিরাইয়া লইয়া আরম্ভ করিল—লোকের যেমন খাদ্যের দরকার, তেমনি ভক্তিরও দরকার, সেইজন্যই তো দেবস্থান। চাষের জন্য যেমন বৃষ্টির আবশ্যক, মানব-জমিন আবাদের জন্য তেমনি আবশ্যক ভক্তির। ওই বুড়ো অশথ, কালীবাড়ি, হরিবাড়ি অনেকটা ক'রে জমি অধিকার ক'রে আছে বটে, কিন্তু ওগুলো না থাকলে কি এখানকার মানব-জমিন মরুভূমি হ'য়ে যেতো না? তখন তোমার চাষ-আবাদ করতো কারা? আমি বাবা তোমার মতো পণ্ডিত নই, ভুলভ্রান্তি ক'রে থাকিতো বুঝিয়ে দাও।

নবীননারায়ণ কি বুঝাইবে? দুজন এক সমতলে অবস্থান করিলে তবেই মিলন সম্ভব। আর দ্বন্দ্ব—তাহার জন্যও এক সমতলের আবশ্যক! কিন্তু নবীননারায়ণ ও ভজহরি যে উচ্চাবচ সমতলে অবস্থিত, কে কাহাকে বুঝাইবে? নবীননারায়ণ মানবজীবনকে অর্থনীতির আতস কাচের মাধ্যমে দেখিতে অভ্যস্ত। আতস কাচ দৃষ্টিকে সাহায্য করে বটে, কিন্তু অনভ্যস্ত হাতে পড়িলে অগ্নিকাণ্ড ঘটা অসম্ভব নহে। পৃথিবীময় যে আজ অগ্নিকাণ্ড চলিতেছে তাহার কারণ অর্থনৈতিক দৃষ্টির আতস কাচ মারাত্মক কোণ রচনা করিয়া মানুষের মনের যত হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতার উত্তাপকে সংহত করিয়া ইতিহাসের উপরে নিক্ষেপ করিয়াছে। আগুন জ্বলিতেছে। কিন্তু এসব কথা ভজহরির মতো লোককে সে বুঝাইবে কেমন করিয়া? ভজহরি যে স্তর হইতে কথা বলিতেছে তাহা বুঝিয়া ওঠাও নবীননারায়ণের পক্ষে অসম্ভব। অথচ দুজনেই সমাজের কল্যাণ চায়। মানুষের মন হইতে কল্যাণকামিতা কিছু কমিলে সমাজের সত্য সত্যই কিছু কল্যাণ হইবার সম্ভাবনা ছিল।

নবীননারায়ণকে নীরব দেখিয়া ভজহরি বলিতে লাগিল—বাবা, বুড়ো অশথ গাছ নয়, গ্রামের দেবতা, জোড়াদীঘির পিতামহ ভীষ্ম। কত পুরুষের ভক্তিশ্রদ্ধা ওখানে মিশেছে, কত সুখ-দুঃখের ও যে সান্ত্বনা! ও যে আর দশটা গাছের মতো গাছ মাত্র একথা লোকে ভুলেই গিয়েছিল। তোমার প্রস্তাবে আজ সবাই চমকে উঠেছে। না বাবা, ও-কাজে বিরত থাকো। বুড়ো অশথ কাটলে গাঁয়ের অমঙ্গল হবে।

নবীননারায়ণ নীরব হইয়া থাকিল। একবার তাহার দৃষ্টি দেওয়াল ঘড়িটার দিকে

পড়িল। ভজহরি তাহার দৃষ্টিকে অনুসরণ করিয়া ঘড়ি দেখিয়া বলিয়া উঠিল—দশটা বাজে! ছোটবাবুর বোধকরি স্নানের সময় হল।

তারপরে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল—কেহই কথা বলে না। অবশেষে সে বলিল—আজ তাহলে উঠি।

নবীননারায়ণ ক্ষুদ্র একটি 'আচ্ছা' শব্দ মাত্র বলিল। ভজহরি তাহাকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল। নবীননারায়ণ সেই শূন্য, সুবৃহৎ, টিক্‌টিকি-ডাকা কক্ষের মধ্যে একাকী, তাকিয়া মাথায় দিয়া ছাদের দিকে তাকাইয়া পড়িয়া রহিল।

সারা দীর্ঘদিন তাহার মনের মধ্যে ভজহরি দাসের কথাগুলি পাক খাইয়া ফিরিতে লাগিল। যে অশথ গাছটা কাটিতে তাহার বিন্দুমাত্র দ্বিধা হইবার কারণ নাই, তার সম্বন্ধে গ্রামবাসীদের এত আপত্তির কারণ কি? গ্রামবাসীদের আপত্তি বই কি, কারণ নবীননারায়ণ বুঝিয়া লইয়াছে যে ভজহরি সকলের প্রতিনিধি হইয়াই আসিয়াছিল। ভজহরির সাধুতার খ্যাতি সে অবগত আছে। সে ছাড়া অপর কেহ আসিলে স্বার্থসিদ্ধির সন্দেহ তাহার মনে উদিত হইত! গাছটা তাহার কাছে গাছই—অঙ্গারের বিকার মাত্র! গ্রামের লোকদের চোখে কি তাহার একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন সত্তা আছে? তাহা কিভাবে সম্ভব? এই কথাটাই সে বুঝিতে পারে না।

ভজহরির আরও একটা কথা তাহার মনে পাক খাইতে লাগিল। মানব-জমিন আবাদের পক্ষে ভক্তির আবশ্যক আছে। নবীননারায়ণ জানে অবশ্যই আছে—কিন্তু ভক্তির সঙ্গে ওই গাছটার কি সম্পর্ক। নবীননারায়ণের মন গ্রামের সহিত ভাব-সূত্রে গ্রথিত থাকিলে কথাটা সহজেই বুঝিতে পারিত, কিন্তু সহরের দীক্ষায় ও ভিন্নমুখী শিক্ষায় সে সূত্র সম্পূর্ণ ছিন্ন। জ্ঞানের বর্মে সজ্জিত হইয়া সে কোমল পল্লীকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত, লোহার স্পর্শে গ্রামের স্পর্শ-কাতর দেহ যে বিক্ষত হইয়া যাইবে এ প্রশ্ন তাহার মনে একেবারেই উঠিল না। প্রেমে যে আলিঙ্গন করিবে বর্মমুক্ত হওয়া তাহার পক্ষে অত্যাবশ্যক।

বিচিত্র সন্দেহ ও বিচিত্রতর সংকল্পে মস্তিষ্ক পূর্ণ করিয়া সে সুবৃহৎ অট্টালিকার শূন্য কক্ষে কক্ষে একাকী ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। আদর্শবাদের অংকুরোদ্‌গমের পক্ষে শূন্য অট্টালিকার মতো প্রশস্ত স্থান আর অল্পই আছে। ইহার ঘটাকাশে যুগপৎ অনন্ত ও সান্ত সম্মিলিত, অনন্তের উদারতা ও সান্তের আশ্রয়, একের মহিমা ও অপরের নৈভৃত্য, শান্তি ও মোহ এখানে গায়ে গায়ে সংলগ্ন।

ঝাঁ ঝাঁ-করা দুপুরের রৌদ্র-বিমূঢ় প্রহরে শূন্য ঘরগুলি খাঁ খাঁ করিতে থাকে, আর বিভ্রান্ত নবীননারায়ণ রুক্ষ চুলের মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে কক্ষের পরে কক্ষ অতিক্রম করিয়া পায়চারি করে—সমস্যার কূল পায় না, তল পায় না।

কিন্তু সে কি জানে এই নির্জনতায় আদর্শবাদের অংকুরের সঙ্গে সগোত্রভাবে বিষ-বৃক্ষের অংকুরও উদ্‌গত—স্বয়ং শয়তানের হস্তে রোপিত। মানুষে আদর্শবাদের অংকুর চয়ন করিতে গিয়া সঙ্গে সঙ্গে বিষ-বৃক্ষের অংকুরও সংগ্রহ করে, না করিয়া তাহার উপায় নাই। তাই প্রত্যেক আদর্শই অজ্ঞাতসারে নিজের মৃত্যুবাণ বহন করে। কোন্ আদর্শবাদ না অল্পবিস্তর বিষমিশ্রিত?

নবীননারায়ণ সমস্যার সমাধান পাইল না বটে, কিন্তু অশথ গাছটা কাটিবার সংকল্প হইতেও তিলমাত্র বিচ্যুত হইল না। পৃথিবীর মঙ্গল করিবার মহৎ সংকল্প যাহার মাথায় চাপিয়াছে তাহার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে! আদর্শবাদের দোহাই দিয়া অত্যাচারী হইয়া ওঠা সবচেয়ে সহজ—তখন অত্যাচারকে অত্যাচার নিবারণের উপায় বলিয়াই মনে হয়। মানুষের উপকার করিবার উদ্দেশ্য লইয়া যত মানুষ মারা হইয়াছে, এত আর কিসে? হায় আদর্শবাদ! হায় মানুষ!

৮

সংবাদটা ক্রমে গ্রামের সর্বজনের মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া গেল। প্রথমে কানে কানে রটিল, তারপরে কাণাঘুষায় রটিল, তারপরে মুখে মুখে রটিল এবং অবশেষে সকলেই জানিল ছোটবাবু অশথ গাছ কাটিবার হুকুম দিয়াছেন। প্রথমে কথাটা কেহ বিশ্বাস করে নাই, সবাই ভাবিয়াছিল ছোটবাবুর নাম করিয়া একটা মিথ্যা খবর রটানো হইয়াছে, তারপর ভাবিল ব্যাপারটা ঠাট্টা ছাড়া আর কিছু নয়, তারপরে ভাবিল কোন স্বার্থপর ব্যক্তি জায়গাটা দখল করিবার মতলব করিয়াছে—কিন্তু এমন ধর্মদ্রোহী স্বার্থপর গ্রামে কে, আছে? অবশেষে খবরের সত্যতা সম্বন্ধে কাহারো আর সংশয় রহিল না।

দেহের বেদনার স্থানে হাতটা যেমন আপনিই গিয়া পড়ে, তেমনি পরদিন ভোর বেলায় লোকে নিজেদের অজ্ঞাতসারে অশথ-তলায় আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। অল্প অল্প শীত পড়িয়াছে। মাণিক খুড়ো তাহার বালাপোষখানা গায়ে জড়াইয়া বাধানো শানের উপরে বেশ জাঁকিয়া বসিয়াছে। এই বালাপোষখানার ইতিহাস গ্রামের সকলেই জানে। অনেককাল আগের কথা, মাণিক খুড়োর বয়স তখন অল্প, তিনি নদীর ধারে সকাল বেলা বসিয়া মাছ ধরিতেছিলেন—এমন সময়ে মস্ত এক বজরা করিয়া কোন্ এক মহারাজা যাইতেছিলেন। মাছ আছে কিনা জিজ্ঞাসিত হইয়া মাণিক খুড়ো এক খালুই তাজা পাব্‌দা মাছ মহারাজার হাতে ধরিয়া দিলেন।

মাণিক খুড়ো বলে—তোমরা ভেবো না, নোকর, বরকন্দাজ—স্বয়ং মহারাজা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আর আমি স্বয়ং মহারাজার হাতে দিলাম।

লোকে শুধায়—কি ক'রে জানলেন যে, তিনি মহারাজা।

মাণিক খুড়ো তাহার উত্তর না দিয়া বলে, মহারাজ পকেট থেকে একখানা দশ টাকার নোট বের করলেন—আমি পৈতে দেখিয়া বললাম, ব্রাহ্মণ, মাছ বেচা আমার ব্যবসা নয়, মহারাজের ভোগের জন্য দিলাম। মহারাজ বললেন, ব্রাহ্মণের যোগ্যই কথা বটে। কিন্তু আমিও তো ব্রাহ্মণ, দান প্রতিগ্রহ করবো কেন? কিছু তো নিতে হবে, এই বলে তিনি গায়ের বালাপোষখানা খুলে আমার হাতে দিলেন। বালাপোষের ভাঁজ থেকে কস্তুরীর গন্ধ ছুটলো। দেখো শুঁকে দেখো—

তাঁহার আহ্বানে আগে লোকে নাক বাড়াইয়া দিত—কিন্তু কোথায় সে রাজকীয় গন্ধ! তেলের দুর্গন্ধ ছাড়া কেহ কিছু পাইত না। এখনো মাণিক খুড়ো গল্পটি বলিবার সময়ে শ্রোতাদের আহ্বান করে—কিন্তু কেহ আর নাক বাড়ায় না। তাহার এক দুশ্চিন্তা মৃত্যুর পরে এই বালাপোষখানার উত্তরাধিকারী কে হইবে? মাণিক খুড়ো নিঃসন্তান। শীতের রোদ মাণিকের হংসডিম্বের মতো মসৃণ টাকের উপরে পড়িয়া ঝক ঝক করিতেছে সে দিকে তাকাইলে চোখ ঝলসিয়া যায়।

মাণিক বেশ করিয়া বালাপোষ গায়ে জড়াইয়া লইয়া বলিল—এমন সুন্দর জিনিষটা আমার পরে ভোগ করবার লোক নেই—

শ্রোতাদের মধ্যে হইতে একজন বলিয়া উঠিল—আজ্ঞে, কর্তা, আপনার মৃত্যুর আগেই তো ওখানা ছিঁড়ে যেতে পারে।

মাণিক অজাতশত্রু লোক, কেবল ওই বালাপোষটার সম্বন্ধে একটু দুর্বলতা আছে। বালাপোষের মর্যাদা রক্ষার্থে বলিল—বেটা রজক, তুই বালাপোষের মর্ম বুঝবি কি? এ কি কাপড়, শাড়ী, পিরাণ যে মাসে একবার করে তোর বাড়ি যাবে? বালাপোষের সম্মানই আলাদা—সে কখনো ধোপার বাড়ি মাড়ায় না।

বালাপোষ ধোপার বাড়ি যায় কিনা জানি না—তবে মাণিক খুড়োর বালাপোষ সম্বন্ধে একথা সর্বৈব সত্য। তারপরে যুক্তিটার চরম আঘাত হানিয়া খুড়ো বলিল—

গায়ের রং দেখো না, যেন কালি মেখে এসেছে।

বাস্তবিকই তাই। শ্রীচরণ রজক অস্বাভাবিক কালো, এমন বার্ণিশ-করা কালো সচরাচর দেখা যায় না। কেহ তার রং লইয়া ঠাট্টা করিলে সে কালো মুখে হাসির উগ্র শুভ্রতা ফুটাইয়া উত্তর দেয়, আজ্ঞে কর্তা,

আমি নিজে কালো কিন্তু পরের কাপড় ফরসা করি, আর কতজন আছে যারা নিজেরা ফরসা কিন্তু পরের কাপড় কালো ক'রে বেড়ায়। তাদের কাজের চেয়ে আমার কাজটা কি ভালো নয়?

শ্রীচরণ ধীরে বলে, ধীরে চলে, সকলেই তাহার কাছে কর্তা, আর গাঁয়ের বারো আনা লোককে সে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম না করিয়া পথ ছাড়িয়া দেয় না।

শ্রোতারা অধীর হইয়া উঠিয়া বলিল—ওসব থাক, এখন অশথ গাছের কথা বলো খুড়ো।

মাণিক উৎসাহিত হইয়া আরম্ভ করিল:

সে অনেকদিন আগের কথা, নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর আমল, তখন গ্রামের কী-ই বা ছিল? থাকবার মধ্যে ছিল কয়েক ঘর জোলা আর জেলে, এই যে বাড়িঘর দালান কোঠা দেখছ তার কিছুই ছিল না—

তারপরে গলার স্বর নীচু করিয়া বলে—চৌধুরীবাবুদের অবস্থাও আজকার মতো ছিল না, না ছিল জমিদারি, না ছিল দর-দালান, সামান্য কিছু ব্রহ্মত্র জমি মাত্র ছিল, আর ছিল এই বুড়ো অশথ—

এই বলিয়া অশ্বথ গাছটির দিকে একবার তাকায়—

আর ছিল ওই নদী, কিন্তু নদী এখন যেখানে সেখানে ছিল না। এই গাছের তলা দিয়ে নদী বয়ে যেতো, এখন নদী এখান থেকে দুই শ' গজ সরে গিয়েছে। আর অতদিনের কথাই বা বলি কেন? আমরাই ছেলে বয়সে দেখেছি—নদী ওই ওখানে ছিল—আর বর্ষা-কালে জলের ঢেউ এসে লাগতো গাছটার গুঁড়িতে, কি বল হরিচরণ?

এই বলিয়া মাণিক খুড়ো শ্রোতাদের মধ্যে সমবয়সী এক বৃদ্ধের দিকে তাকায়, হরিচরণ সমর্থনসূচকভাবে মাথাটা নাড়ে। আবার আরম্ভ হয়—

ওঃ সে কি জলের ডাক! রাত্রিবেলা বিছানায় শুয়ে ভয় করতো, মনে হ'ত বাড়িঘর বুঝি ভেসে গেল। দিনের বেলায় দেখতাম ইলিশমাছ ধরার সে কি ধুম! ছোট ছোট জেলে ডিঙি, এমন বিশ পঞ্চাশখানা। আমরা স্নান করতে গিয়ে জোড়া জোড়া টাটকা ইলিশ কিনে আনতাম, পাঁচ পয়সা, ছয় পয়সা জোড়া। সে কি তার স্বাদ!"

কথাটা এমনভাবে বলিত যেন সে বাল্য-কালের ইলিশের স্বাদ এখনো জিহ্বায় অনুভব করিতেছে। গল্পের সূত্রটাকে তাহার বাল্য-কাল হইতে টানিয়া আবার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে লইয়া গিয়া সুরু করিত—

"একবার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ চলেছেন ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে—এই নদীপথই ছিল সোজা পথ, পদ্মা দিয়ে গেলে অনেক ঘুরে যেতে হ'ত। নবাবের বজরা যখন জোড়া-দীঘির কাছে এসেছে, তখন সন্ধ্যা, এমন সময়ে এলো বিষম আশ্বিনে ঝড়। আশ্বিনে ঝড় আর আজকাল দেখিনে, ছেলেবেলায় দেখতাম আশ্বিনে ঝড়, সে এক সর্বনেশে লণ্ডভণ্ড ব্যাপার। প্রত্যেকবারই পূজোর আগে এক দফা ক'রে ঝড় হ'ত। বিষম ঝড়ে পড়লো নবাবের বজরা! বানচাল হয় আর কি! মাঝি-মাল্লা পাইক বরকন্দাজ নৌকা থেকে লাফিয়ে পড়ে কাছি ধরে নৌকাখানাকে টেনে রাখতে চায়—পারবে কেন? এমন সময় গাঁয়ের লোক-জন এসে হাজির হ'ল—আর এলেন রূপনারায়ণ চৌধুরী—(আবার গলা খাটো করিয়া) চৌধুরীদের পূর্বপুরুষ। তখন সকলে মিলে কাছি দিয়ে বজরাখানাকে এই অশথের গুঁড়ির সংগে আচ্ছা ক'রে কষে বেঁধে ফেললে। বাস্! ঝড়ের আর সাধ্য কি কিছু করে। নবাবের বজরা রক্ষা পেলো—নবাব রক্ষা পেলেন। সে রাতটা নবাব এখানেই কাটালেন। পরদিন ভোরবেলায় তিনি চৌধুরীর পরিচয় নিলেন। তাঁকে নিজের গায়ের শালখানা খুলে বকশিস করলেন। সে শাল ছোটবেলায় আমরা দেখেছি। আর এই যতদূর দেখতে পাচ্ছ—এই বলিয়া হাত দিয়া চারদিকের দিগন্ত পর্যন্ত নির্দেশ করিয়া বলিলেন—এই সমস্ত জমিদারি নামে মাত্র খাজনায় চৌধুরীবাবুকে লিখে দিলেন। তারপর থেকেই তো চৌধুরীদের উন্নতি।

মাণিক খুড়ো বলিয়া চলে—নবাবের সংগে আর একখানা নৌকায় ছিলেন এক ব্রাহ্মণ পন্ডিত, হাঁ, নবাব গুণী লোকদের আদর ক'রে সংগে রাখতেন, সেই ব্রাহ্মণ পন্ডিত চৌধুরী-বাবুকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বল্লেন—দেখো বাবা—এই বৃক্ষটা তোমাদের গাঁয়ের দেবতা। এই গাছ যতদিন তোমাদের গাঁয়ে থাকবে তোমাদের সকলের বাড়বাড়ন্ত হবে, গাঁয়ের লোক দুধে ভাতে থাকবে, তাদের বংশ লোপ পাবে না, গাছটাকে তোমরা দেবতার মতো পূজো ক'রো। এর গায়ে হাত দেবার কথাও কখনো মনে ক'রো না। তারপরে নবাবের বহর ডংকা বাজিয়ে নিশেন তুলে যাত্রা করলো!

তারপরে একটু থামিয়া আবার আরম্ভ হয়—সেই থেকে সবাই বুড়ো অশথকে গাঁয়ের দেবতা বলেই মনে করে। আর করবেই বা না কেন? ব্রাহ্মণ পন্ডিতের কথা যে অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। তারপর থেকেই জোড়া-দীঘি সব গাঁয়ের রাজা, আর জোড়াদীঘির চৌধুরীরা এদিকের সকলের রাজা! সেই বংশের একজন আজ বুড়ো অশথকে কাটবার কথা ভাবছে। এই বলিয়া মাণিক কপালে হাত ঠেকাইয়া সর্বনাশের ও দুরদৃষ্টের ইঙ্গিত করে। তাহার শ্রোতার দল কিছুক্ষণ কথা বলিতে পারে না।

ক্রমশ

কবিভাবলী—(সংস্কৃত ও প্রাকৃত) নারী কবিগণ কর্তৃক রচিত, শ্রীমতী রমা চৌধুরী কর্তৃক অনূদিত, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, মূল্য ২্ টাকা।

উপস্থিত গ্রন্থখানিতে প্রাচীন মহিলাদের রচিত কতিপয় সংস্কৃত ও প্রাকৃত কবিতার অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার ভূমিকা পড়িয়া মনে হয় নারী প্রগতির সাহায্য করাই এই গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য সাধু সন্দেহ নাই, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, বর্তমান পুস্তক বিদুষী লেখিকার উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করিবারই সাহায্য করিবে। তিনি ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "শিক্ষায়, দীক্ষায়, কার্যে—সকল ক্ষেত্রেই নারী আজ পুরুষের সমান অধিকার দাবী করিতেছে।" ইহা হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে, এ দাবীতে লেখিকারও পূর্ণ সম্মতি আছে। তাই ভরসা করিয়া আমরা স্পষ্ট ভাষায় তাঁহার রচনার ত্রুটিগুলিকে বিবৃত করিব।

ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে, "বৈদিক নারী ঋষি ব্যতীত, পরবর্তী যুগের অন্যান্য নারী কবি ও লেখিকাগণের বিষয়ে এতদিন আমরা বিশেষ কিছুই জানিতাম না। সম্প্রতি ইহাদের অমূল্য রচনাসমূহ কিছু কিছু সংগৃহীত ও মুদ্রিত হইয়াছে;" লেখিকার এই উক্তি গ্রহণীয় নহে। কারণ বর্তমান সাল হইতে অন্ততঃ বাইশ বছর আগে বাংলা দেশের মাসিকপত্রে এ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল। এ প্রসঙ্গে ১৩৩১ বাংলা সালের 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় প্রকাশিত "সংস্কৃত সাহিত্যের মহিলা কবিগণ" ও "প্রাকৃত সাহিত্যের মহিলা কবিগণ" শীর্ষক প্রবন্ধ দুইটি দ্রষ্টব্য। ইহাদের মধ্যে প্রথম প্রবন্ধটির সারাংশ তৎকালীন 'ভারতী' পত্রিকায় সংকলিত হইয়াছিল এবং সেই সংকলনের গুজরাতী অনুবাদ 'প্রস্থান' নামক কাগজেও ছাপা হইয়াছিল। বড়ই দুঃখের বিষয় লেখিকা এ সম্বন্ধে কোন খবরই রাখেন নাই, এবং নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিয়াছেন যে, তিনি সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যের মহিলা কবিগণের রচনা প্রচারের আদি পথিকৃৎ। লেখিকার এই ভুলটিকে আমরা খুব মারাত্মক বিবেচনা করিতাম না, যদি একজন উল্লেখযোগ্য মহিলা কবির রচনা তাঁহার সংগ্রহ হইতে একেবারে বাদ না পড়িত। এই কবিটি হইতেছেন কাঞ্চী রাজমহিষী গঙ্গা দেবী। তিনি আনুমানিক ১৪শ শতাব্দীর লোক। তাঁহার রচিত 'মথুরাবিজয়' নামক কাব্যের যে প্রথম আট সর্গ ও নবম সর্গের কিয়দংশ পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে জানা যায়, গঙ্গা দেবীর সংস্কৃত ভাষায় যথেষ্ট অধিকার এবং প্রশংসনীয় কবিত্বশক্তি ছিল। এবিষয়ে কৌতূহলী পাঠকগণ ১৩৩১ সালের 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যা দেখিতে পারেন। এহেন মহিলা কবির কোনও খোঁজ না রাখিয়া লেখিকা যে সকল মহিলা-লিখিত পদ্যের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, সেগুলির বেশীর ভাগই অকিঞ্চিৎকর। অন্ততঃ সেগুলি পড়িয়া মুগ্ধ হইবার মত নহে এবং ছন্দোবন্ধহীন গদ্যে সেগুলি প্রায় অপাঠ্য। এই সকল রচনার অনুবাদ কোনও পাঠককেই যে মহিলা কবিদের কৃতিত্ব সম্বন্ধে প্রশংসামুখর করিয়া তুলিবে না, তাহা একরূপ জোর করিয়া বলা যায়।

লেখিকা তাঁহার অনুবাদে ও ভূমিকাদিতে যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। গ্রন্থখানি বিশ্বভারতী দ্বারা প্রকাশিত বলিয়াই এবিষয়ে আলোচনা অত্যাবশ্যক। কারণ অজ্ঞ লোকে জানিতে পারে যে, এ ভাষার ব্যবহারে বিশ্বভারতীর সম্পর্কিত পণ্ডিতবর্গের সম্মতি আছে। ভূমিকাতে লিখিত হইয়াছে, "সংস্কৃত নারী কবি" ও "প্রাকৃত নারী কবি"; সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দ কাহার সহিত অন্বিত? লেখিকা গদ্য অনুবাদের প্রসঙ্গে 'পাদপূরণ' কথার ব্যবহার করিয়াছেন (পৃঃ ৷০)। ইহা নিতান্ত আশ্চর্যজনক। পাদপূরক তো শুধু পদ্যের বেলায়ই ব্যবহৃত হয়। 'শিরোনামা' কথাটির অর্থ কি? লেখিকা বোধ হয় 'শিরোনাম' বলিতে গিয়া 'শিরোনামা' বলিয়াছেন। এরূপ ভ্রম তাঁহার না হইলেই ভালো ছিল।

বাংলা শব্দের লিঙ্গ বিচার করিয়া বিশেষণ প্রয়োগ সম্বন্ধে লেখিকা যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও গ্রহণযোগ্য নহে। 'সংক্ষিপ্তা ও সারগর্ভা ভাষা' ইত্যাদির মত প্রয়োগ আজকালকার দিনে হাস্যকর। এবিষয়ে বাংলা ভাষার বৈয়াকরণগণের মত লেখিকার প্রতিকূলে (বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় রচিত 'ব্যবহারিক বাংলা ব্যাকরণ' পুস্তকে স্ত্রী প্রত্যয়ের ব্যবহার দ্রষ্টব্য)।

লেখিকার এবং অন্যান্য সকলের ব্যবহৃত 'বাধ্যতামূলক' কথাটির ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথ আপত্তি জানাইয়া দিয়াছেন, কাজেই তাহার ব্যবহার না করাই ভালো ছিল।

বৈদিক নারী কবিগণের রচনার অনুবাদ ইতঃপূর্বে রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার ঋগ্বেদানুবাদে। বর্তমান গ্রন্থের লেখিকার উহা জানা ছিল বলিয়াই মনে হয়। এবিষয়ে স্পষ্ট স্বীকৃতি **থাকিলেই ভাল হইত।**

শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্বসুবোধিনী—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, কাব্যতীর্থ সম্পাদিত। প্রাপ্তিস্থান গ্রন্থকারের নিকট ১৭বি, শ্রীমোহন লেন, কালীঘাট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

রচয়িতা এই গ্রন্থে চণ্ডীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ব্যাখ্যা বিশেষ মনোরম হইয়াছে। মানবদেহের পাশববৃত্তিনিচয়কে চণ্ডী-উক্ত আসুরিক উপাদানসমূহের ছাঁচে ফেলিয়া উহাদের উপর বিজয়ী হওয়ার উত্তম প্রচেষ্টা এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় দেদীপ্যমান। স্থূল বিষয়বস্তু পুরোভাগে রাখিয়া তত্ত্বের অতলে তলাইয়া রচয়িতা বহু মণি-মুক্তার সন্ধান দিয়াছেন, তাহা পাঠকগণ পাঠমাত্রেই উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন। এই গ্রন্থে সমগ্র মূল চণ্ডী নাই, কিন্তু চণ্ডীর উপাখ্যানবস্তু ও তৎসহ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা গ্রন্থারম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত পরপর শ্লোকসহ এমনভাবে সংযোজিত করা হইয়াছে যে, পাঠকবর্গ মূল চণ্ডীর বিষয় অধ্যায়ক্রমে সহজেই বুঝিতে সক্ষম হইবেন। গ্রন্থের পরিশিষ্টে অর্গলা স্তোত্র, কীলকস্তব, চণ্ডী কবচ ও দেবীসূক্তের ব্যাখ্যা এবং 'চণ্ডীতত্ত্বে' ষট্‌চক্র ভেদ নামক একটি প্রবন্ধ যোগ করা হইয়াছে। অধ্যাত্ম-তত্ত্বজিজ্ঞাসু পাঠকগণ বইটি পড়িয়া লাভবান হইবেন।

২৯।৪৭

মানুষের অধিকার (সমাজতন্ত্রী নাটক)—শ্রীবিশ্বনাথ রায় প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীপ্রমথনাথ রায়, নব্য বাঙলা সাহিত্য সংঘ, ২০০, হেজার রোড, আলম বাজার, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

দেশ প্রেমিক শ্রমিক নেতা, ধনী ব্যবসায়ী, পুলিশ অফিসার, সর্দার, কৃষক, শ্রমিক প্রভৃতি নানা ধরণের লোকজন লইয়া একটি সমাজতান্ত্রিক কাহিনীকে নাটকাকারে রূপ দেওয়া হইয়াছে। নাটকখানি মঞ্চস্থ হইলে কতখানি উৎরাইবে বলা যায় না; কিন্তু উহার প্রতি পৃষ্ঠায় রচয়িতার সাধু প্রচেষ্টার পরিচয় সুস্পষ্ট।

১।৪৭

চৈনিক ঋষি লাউৎসে—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—বিবেকানন্দ সংঘ, বজবজ, ২৪-পরগণা। মূল্য দেড় টাকা।

চৈনিক ঋষি লাউৎসে খৃষ্টপূর্ব ৬০৪ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নামের অর্থ "বৃদ্ধ শিশু", তিনি 'বৃদ্ধ দার্শনিক' নামেও পরিচিত। তিনি যে ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন, উহার নাম তাও ধর্ম। তাঁহার উপদেশাবলী যে গ্রন্থে সংগৃহীত আছে, তাহার নাম "তাওতে কিং" 'তাওতে' অর্থে ব্রহ্ম (The Absolute), নির্বিশেষ, নাম রূপাতীত তৎপদবাচ্য সত্তা। 'তে' অর্থে সাকার সগুণ, সক্রিয় ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। 'কিং' অর্থে বেদ বা শাস্ত্র। যখন পিথাগোরাস গ্রীসে মানবকে সৎপথ প্রদর্শন করিতেছিলেন এবং যখন ভারতে বুদ্ধদেব আর্য ধর্ম প্রচার করিতেছিলেন, সেই সময় চীন দেশে ঋষি লাউৎসে তাও ধর্ম প্রচার করেন। তিনি ছিলেন শান্তি, সরলতা ও সাধুতার অবতার। আলোচ্য গ্রন্থে তাঁহার জীবনী ও তাও ধর্মের মোটামুটি পরিচয় দেওয়া হইয়াছে এবং তাঁহার উপদেশসমূহ বিস্তৃতভাবে সংকলিত হইয়াছে। মানবের আত্মোন্নতি, চরিত্র গঠন এবং ঐহিক ও পারত্রিক জ্ঞান ও রহস্য এই সকল উপদেশ-পাঠে হৃদয়ঙ্গম হইবে। জগতের মহামহা মনীষিবৃন্দের মতোই ঋষি লাউৎসের উপদেশাবলীও মানব কল্যাণের পথ প্রদর্শক। গ্রন্থের পরিশিষ্টে বৌদ্ধধর্মোক্ত জেন-সাধনার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। হিন্দু ধর্মে যোগের ন্যায় বৌদ্ধধর্মে জেন অতি রহস্যপূর্ণ অদ্ভুত সাধন। ভারতে উহার জন্ম হইলেও চীন দেশে উহার শ্রীবৃদ্ধি ও উৎকর্ষ সাধিত হয়। সংস্কৃত ধ্যান শব্দ হইতে পালি ঝান এবং চীনের চেন ও জাপানী জেন শব্দ আসিয়াছে। ধর্ম ও সংস্কৃতিতে ভারতের সঙ্গে চীন এক অচ্ছেদ্য যোগ-সূত্রে বাঁধা। তাও ধর্ম বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে উহা সনাতন ধর্মেরই মত ভূমার সন্ধানে মানুষকে অঞ্জলিবদ্ধ ও যোগযুক্ত করিতেছে। বেলুড় মঠের স্বামী জগদীশ্বরানন্দজী এই পুস্তকে বাঙালী পাঠকদিগকে তাও ধর্মের উজ্জ্বল মণি-মুক্তার ভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছেন। গ্রন্থখানা নাতিবৃহৎ, কিন্তু আগাগোড়া জানিবার ও বুঝিবার কথায় পূর্ণ। তত্ত্ব ও তথ্যান্বেষী ব্যক্তি মাত্রই বইটি পড়িয়া বিশেষ লাভবান হইবেন। কয়েকখানি দুষ্প্রাপ্য ছবি বইটির সম্পদবৃদ্ধি করিয়াছে।

২১৭।৪৬

ভ্রম সংশোধন

গত সপ্তাহের পুস্তক পরিচয় বিভাগে 'জাতীয়তার বাণীমূর্তি হার্ডার' গ্রন্থের সমালোচনার দ্বিতীয় লাইনে 'ডক্টর বীণা সরকারের' স্থানে 'ডক্টর বিনয় সরকার' হইবে।

ছবি

শ্রীসৌরীন্দ্র মজুমদার

একজন অপরিচিত শিল্পীর স্টুডিওতে নিজের চিত্র দেখতে পেয়ে লগ্নমিতা থমকে গেল।

এ কি করে সম্ভবপর! শিল্পীর ভাবরাজ্যে বিস্ময় ও সৌন্দর্যের কল্পনা সুষমায় পরিপূর্ণ হয়ে তারই প্রতিকৃতি সযত্ন সম্মান নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সত্যই ত' এ কি করে সম্ভবপর হল?

বিস্ময়ে, আশ্চর্যে লগ্নমিতার মন ভরে যায়—গর্ব ও আনন্দ অবচেতন অনুভূতিতে চাপা পড়ে থাকে। মনে হয় তার, সে কোন সুদূর ছোট্ট এক মফঃস্বল সহরে দারিদ্র্যভরা এক গৃহস্থ সংসারে প্রাণরক্ষার্থে প্রাণান্ত হয়ে বার্ধক্যে এসে পৌঁছেছে। চিকিৎসা করবার জন্যও কলকাতায় আসতে পারে না। তার প্রতিকৃতি কি করে দেরাদুনের ছায়াঘেরা শৈল-শিখরের পটভূমিকায় আলিম্পিত হল?

এ কোন্ ভাবুক শিল্পী? একে ত সে চেনে না। এমন কোন শিল্পীর সঙ্গে ত' তার কোনদিন পরিচয় ছিল না। এ কোন্ শিল্পী, যে তাকে বিশেষ এক অভিব্যক্তিতে রাঙিয়ে তুলল?

ফেলে আসা দিনগুলির দিকে লগ্নমিতা পিছিয়ে যেতে চায় কিন্তু এত এগিয়ে আসা পথ সে খুঁজে পায় না—অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে, কিন্তু বিস্মৃতির পথ খুঁজে সে পায় না।

নিবেদিতা চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল, কোন ছবির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়নি। সেও লগ্নমিতার মত ছবিটির দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে ছিল।

হঠাৎ প্রশ্ন করল, ওই ছবির মেয়েটি কি খুব সুন্দরী নয়?

লগ্নমিতা বলল, তোমার কি মনে হয়?

খুব সুন্দরী। আমি যত কুৎসিত ও তত সুন্দরী—এমন নিখুঁত বৈপরীত্য সমাবেশ পৃথিবীর আর কোথায়ও ঘটেনি।

লগ্নমিতা বলল, কী যে বল। এমন কিছু বেশি নয়।

বেশি নয়। তোমার রূপ সম্পর্কে দেখছি একেবারেই ধারণা নেই। আমার দিকে তাকাও। কুৎসিত ও সৌন্দর্যের চরম নিদর্শন।

তা' মোটেই নয়।

তুমি বুঝতে পারছ না, হয়ত বুঝতে পারছ তাই আমায় সান্ত্বনা দিচ্ছ মাত্র। ও এত রূপসী বলে আর আমি এত কুৎসিত বলেই ত' আমাদের দাম্পত্য জীবন এমনি করে ব্যর্থ হয়ে গেল।

ও ত' শুধু ছবি—শুধু কবির শিল্প-কল্পনার অপূর্ব প্রকাশ।

কবির কল্পনা নয়। জীবন্ত নারী। সে কবির হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি।

—"আমাদের দাম্পত্যজীবন এমনি করে ব্যর্থ হয়ে গেল!"

তোমাকে মডেল করলে তুমিও এমনিভাবে অপূর্ব সৃষ্টি হয়ে প্রকাশ পেতে শিল্পীর ভাবধারায়।

না। ও শুধু ছবি নয়, সে কোনদিন সশরীরে মডেল হয়ে দাঁড়ায়নি। বছরের পর বছর ধরে তিলে তিলে একে সৃষ্টি করেছে। সৌন্দর্যের ও ভাবের এমন অভিব্যক্তি কি মডেল দিয়ে কখনও সম্ভবপর।

তবে?

ভালবাসা!

লগ্নমিতা চমকে উঠল।

নিবেদিতা বলে চলল, কী সে গভীর ভালবাসা। এত গভীর ভালবাসা যে, আমি প্রতিক্ষণ অনুভব করতে পারি। গত পনের বছর ধরে সমানভাবে অনুভব করে আসছি। সে যেন সতীনের মত সর্বক্ষণ আমাকে পিছনে ঠেলে রেখে আমার স্বামীকে আড়াল করে রেখেছে। একটিবারের জন্যও আমি রুদ্ধ দুয়ার খুলে ভেতরে প্রবেশ করতে পারিনি।

নিবেদিতা খানিক ছবিটির দিকে তাকিয়ে বলল, এ চিত্রখানি লণ্ডন শিল্প প্রদর্শনীতে প্রথম হয়েছিল। তখন দেশ-বিদেশ থেকে আসে কত অভিনন্দন ও জয়মাল্য। আমার স্বামীর মুখে যে জয় ও আনন্দের ছবি ফুটে উঠেছিল, তাতে শিল্পীর ভাব প্রকাশ পায়নি, পেয়েছিল প্রেমসৌধ সৃষ্টির অপূর্ব তৃপ্তি। ছবিটির দাম হয়েছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা। সকলের অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি ছবিটি বিক্রী করেননি। প্রিয়তমাকে সর্বদা চোখের উপর রাখবার জন্য ছবিখানি ফিরিয়ে নিয়ে এলেন।

লগ্নমিতা বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইল ছবিটির দিকে। খুঁজে বেড়াতে লাগল শিল্পীকে। ও কোন শিল্পী, যার মানসপটে কোন অতীতে কোন এক অজ্ঞাত নর্তকী জাগিয়েছিল ভাবের প্রেরণা। এ কোন শিল্পী যে বিস্মৃতির মাঝে ভাব ঐশ্বর্য দিয়ে কল্পনাকে আজও রূপরসগন্ধ সৌন্দর্য সুষমায় মহীয়ান করে রেখেছে।

এমন কোন শিল্পীকে ত' সে চেনে না, কোনদিন তার সঙ্গে পরিচয় ছিল বলেও ত মনে পড়ে না।

মনে হয় বিস্মৃতির পথে বহুকাল পূর্বে এমনি যেন কোন এক ভাবুক শিল্পীর সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল। এই কি সেই শিল্পী?

হয়ত হবে, হয়ত সে নয়। যা সে ভুলতে চেয়েছিল, যা সে ভুলে গিয়েছিল তা' আজ মনে পড়তে চায় না। আজ কেনই বা সে তাকে সুমুখে টেনে আনতে চাইছে। জীবনের শেষ অধ্যায়ে উপনীত হয়ে এত বড় ভুল সে কেন করতে চাইছে!

না সে ত' চায়নি। সে ত' ভুলে গেছে, ভুলে যাবার জন্যই ত' সে সংসারের মহা-বিপর্যয়ের মাঝে সংগ্রাম করে এতদূর এগিয়ে এসেছে। আজ সে পৃথিবীবিখ্যাত রূপসী নর্তকী নয়, গৃহে গৃহে, দোকানে দোকানে, ক্যালেণ্ডারে ক্যালেণ্ডারে, পত্রিকায় পত্রিকায় তার চিত্র নয়, খেলার মাঠে, চায়ের আসরে তার যশ-

...ান নয়। আজ সে অতি সাধারণ গৃহিণী-মাত্র। আজ সে অজ্ঞাত এক মফঃস্বল সহরের স্কুল মাস্টারের স্ত্রী। রোগ, শোক, দারিদ্র্যের মাঝে স্বামীপুত্রকন্যা নিয়ে ভাগ্যস্রোতে ভেসে চলেছে। আজ সে ক্লান্ত, শ্রান্ত এবং পরাস্ত। আজ সে ভাবতেও পারে না যে, চল্লিশ বছর পূর্বে এই দেরাদুন শহরেই তার জন্ম হয়েছিল। এইখানেই সে ভোগে-বিলাসে মানুষ হয়েছিল। বিগত কুড়ি বছরের মধ্যে সে একদিনের জন্যও, জন্মস্থানটি দেখবার জন্য, আসতে পারেনি। যুদ্ধের কল্যাণে তার ভাই ভাল চাকরি পেয়ে দেরাদুনে আসে। ভাই তাকে এখানে আনিয়েছে। হাওয়া বদল করাবার জন্য। বিবাহিত জীবনে এই প্রথম তার প্রাচীরের বাইরে আসা।

মনে প্রশ্ন জাগে, সে কি সব ভুলতে পেরেছিল? তার কি এখানকার বনজঙ্গল, রহস্যময় পাহাড়ের নিস্তব্ধতা মনে পড়ত না। সে কি একেবারেই অতীতকে ভুলতে পেরেছিল। যতই সে অতীতকে বিস্মৃতির মাঝে ঠেলে দিক না কেন—সত্যই ত' সে স্মরণাতীত নয়। মিথ্যা আত্মছলনা ত' মনের স্বাভাবিক গতিকে চাপতে পারে না।

লগ্নমিতার মনে পড়ে, তার বাবা গোঁড়া পরিবারের কুসংস্কার ছিন্ন করে সরকারী চাকুরি নিয়ে দেরাদুনে এসেছিলেন। তিনি অতি আধুনিক চালচলনের জন্য পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। এ নিয়ে তার বাবা মা'র মধ্যেও একটা পার্থক্য দানা বেঁধেছিল। তিনি ম্লেচ্ছ আচার ব্যবহার গ্রহণ করতে পারেননি, কিন্তু সহ্য করে নিয়েছিলেন। লগ্নমিতার মেমসাহেবের স্কুলে কো-এডুকেশন, নাচ-গান শেখা তিনি পছন্দ করেননি, কিন্তু বাধা দিতেও পারেন নি। পিতা ও মাতার এই সংস্কারগত মতদ্বন্দ্ব লগ্নমিতার জীবনকে প্রবল ভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল। সেজন্য সে শুধু জীবনব্যাপী পরীক্ষাই করে গেল জীবনকে, হার-জিতের সংশয় কাটাতে পারল না।

লগ্নমিতা যেবার সিনিয়র কেমব্রিজ পাশ করে কলেজে প্রবেশ করে, তখন তার বাবা আকস্মিকভাবে মারা যান। মা তার বহুপূর্বেই মারা গিয়েছিলেন। অতিমিতব্যয়ী পিতা নাবালক পুত্র ও কন্যার জন্য কিছুই সঞ্চয় রেখে যেতে পারেন নি। পিতার প্রভাবে লগ্নমিতা শুধু পেয়েছিল জীবন নিয়ে খেলার উদ্দাম প্রেরণা আর দুঃসাহস।

পিতৃহীন নাবালক ভাইকে নিয়ে লগ্নমিতা এলো দেশে। ম্লেচ্ছভাবাপন্ন মেয়ের স্থান হল না। ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে লগ্নমিতা ভাইকে নিয়ে ফিরে এল দেরাদুনে।

এতদিন নিষ্ঠার সঙ্গে সে যে নাচ ও গান শিক্ষা করেছিল তাকে মূলধন করে লগ্নমিতা নামল জীবনসংগ্রামে। শিল্পময় অপরূপ দেহ-সৌষ্ঠবের নিখুঁত ও প্রাণবন্ত ভাবের অভিব্যক্তি ধীরে ধীরে তাকে এনে দিল যশঃ, প্রতিষ্ঠা ও অর্থ। সে যতটুকু কামনা করেছিল পেল তার বেশি।

এমনি চলেছিল। চাওয়ার অতিরিক্ত পাওয়া নেশা নেশা হয়ে উঠল। বন্ধনহীন সংসার ও সমাজের বন্ধন আরও বন্ধনমুক্ত হয়ে উঠল। যে বন্ধন আশার অতিরিক্ত হয়ে এসেছিল অনাহূতভাবে তাও ফিরে গেল ব্যর্থ হয়ে। বন্ধন নয়—শুধু যশ, শুধু প্রতিষ্ঠা আর আগুনের ঝলকানি।

লগ্নমিতার এ তন্ময়তা দেখে নিবেদিতার বিস্ময় জাগে। লগ্নমিতার মত এমন অর্ধ-শিক্ষিতা পল্লীগ্রামের এক গরীব গৃহস্থবধূর পক্ষে এই ধরণের ভাববিহ্বলতা কি করে সম্ভবপর? ছবিটি যে দেখবার মত সে বিষয়ে

"নিজের ছবির পাশে দাঁড় করিয়েও চিনতে পার নি!"

সন্দেহ নেই। ইহা শিল্পীর শিল্পসাধনার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। শিল্পী যেন তার জীবনময় জ্ঞানসাধনার অপূর্ব মূর্তি হৃদয় নিঙড়ে দিয়েছে প্রতি রেখায় রেখায়। এই যে ভাব ও কল্পনার এত বড় সমাবেশ, এই যে প্রেমের এত বড় অভিব্যক্তি তা কটি লোক বুঝতে পারে!

নিবেদিতা কোন কথা বলল না, অবাক হয়ে লগ্নমিতার দিকে তাকিয়ে রইল।

লগ্নমিতার চোখে এ ভাবান্তর পড়ল না, তার মনে পড়ল জয়রথের চাকায় কোন এক শিল্পী যেন পড়েছিল। তখন তার আমেরিকা থেকে এসেছিল আমন্ত্রণ। নাচ রচনা করেছিল সুকুমার। সুকুমার ছিল সেই শিল্পী।

লগ্নমিতার মনে পড়ে, সুকুমার ছিল ভারি নিরীহ। ধনী বনেদী বংশের একমাত্র ছেলে ছিল সে। কোন বিষয়েই আত্মসচেতন ছিল না, ভাবের অভিব্যক্তি সর্বক্ষণ চোখেমুখে ফুটে থাকত। কল্পনার মাঝে সে আত্মবিস্মৃত হয়ে থাকত। আদর্শের পিছনে এমন আত্মহারা হয়ে থাকতে সে আর দেখেনি। ধনজনমান, যশ ও ভালবাসা কিছুই সে চায়নি। চাইতেই যেন সে জানত না। ভাবের মাঝেই সে পরিতৃপ্ত ও পরিপূর্ণ ছিল।

এমন লোককে সাধনার ক্ষেত্রে পেয়ে লগ্নমিতা উপকৃত হয়েছিল। আমেরিকায় সে যে উচ্চাঙ্গের ভাবধারা নাচে রূপ দিয়ে প্রচুর যশ পেয়েছিল তার মূলে ছিল সুকুমারের দান। তার জীবনে বহু ধনী, বহু রূপবান যুবক, বহু গুণী ব্যক্তি এসেছিল। তারা আদর্শকে চায়নি, চেয়েছিল তার যশমণ্ডিত অপরূপ অঙ্গসৌষ্ঠব।

সুকুমার ছিল অন্য ধাতুর। প্রায় বছর-খানেক সুকুমার তার সঙ্গে আমেরিকা, ইউরোপ, চীন, জাপান ঘুরেছে। এই সুদীর্ঘ সময়ে সে লগ্নমিতার জীবনকে মহান আদর্শের পথে টেনে নিতে চেষ্টা করেছে, জ্ঞানগরিমা প্রশস্ত করে তুলতে চেষ্টা করেছে, আর দিয়েছে বন্ধুর সাহচর্য। দুর্দিনে অনাহূতভাবে অর্থ সাহায্যও করেছে। কিন্তু কখনও সুকুমার কোন প্রতিদান চায়নি।

তারপর তাদের মাঝে হল ছাড়াছাড়ি অতি সহজভাবে বন্ধুর মতই তারা দু' দিকে সরে যায়। যশের ডালি নিয়ে লগ্নমিতা গেল এগিয়ে আর সুকুমার পাহাড়ের পাদদেশে নির্জন বনছায়ায় রচনা করল তার শিল্প সাধনার স্টুডিও।

সান্নিধ্যে যে কথা পায়নি প্রকাশ, যে ভাব দেয়নি ধরা—নির্জনতায় তা' পেল প্রকাশের সুযোগ। সুকুমারের মনে হল, সে ভালবাসে, ভালবাসে গভীরভাবে লগ্নমিতাকে। ভালবাসার অপূর্ণতায় তার সাধনা, তার কল্পনার ধারা হয়েছে ব্যাহত। পাওয়া ও না পাওয়ার মাঝখানে মানুষ চলতে পারে না, তাকে হয় পেতে হয়, নতুবা হারাতে হয়। তবেই মানুষের জীবন শুরু হয়। সুকুমার পদে পদে হার মেনে যখন একই স্থানে তার গতিকে থেমে থাকতে দেখল তখন সে শংকিতচিত্তে লগ্নমিতাকে পাঠাল আবেদন।

লগ্নমিতা তখন যশের উচ্চ শিখরে, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অর্থ অতুলন। অভিনন্দন, ফুলের মালা আর পার্টিতে তার সময় ভারাক্রান্ত। এর মোহ সে কি করে ছাড়তে পারে! কিন্তু সে ভালবাসে এবং তার নারীত্ব ও তার রক্তের ধারা চায় বন্ধন। এতদিন সে এমনি আহ্বানের জন্যই প্রতীক্ষা করেছিল। সে ত' ভালবেসেই চেয়েছিল ভালবাসা। কিন্তু

সুকুমারের কঠোর সংযম, দৃঢ় আদর্শ ও ভাবের মাঝে আত্মবিহ্বলতা তাকে প্রকাশ পেতে দেয়নি, দূরে ঠেলে রেখেছিল। সর্বত্র তার জয় হয়েছিল। তার রূপ, যৌবন, যশ ও প্রতিষ্ঠা তাকে সর্বত্র অপরাজেয় বিজয়িনী করেছিল। কিন্তু তার পরাজয় হয় সুকুমারের নিকট। তাই সে এতদিন সর্ব ইন্দ্রিয় দিয়ে সুকুমারের দিকে ফিরেছিল।

যে সুকুমারের নিকট থেকে আহবানের জন্য সর্বক্ষণ কাঙালিনীর মত হাত যোড় করে প্রতীক্ষা করেছিল, তার নিকট থেকে যখন অপ্রত্যাশিতভাবে আহবান এল প্রার্থনারূপে তখন লগ্নমিতা করল প্রত্যাখ্যান।

আজ সে জয়ী। তাই সে ভুল করল বিজয়িনীর দম্ভ নিয়ে। তার মনে হল বন্ধন নয়—শুধু জয়। যে বিজিত তাকে জয় নয়, সে অপরাজিত তাকেই জয়।

পিতার প্রভাব লগ্নমিতাকে ঠেলে নিয়ে চলল, আরও চাই যশ, আরও চাই প্রতিষ্ঠা। এর শেষ সীমায় না পৌঁছে সে থাকতে পারে না। তাই সে সুকুমারের প্রভাব মুক্ত হবার জন্য সদলবলে পুনরায় ইউরোপে গেল।

প্রত্যাখ্যাত হয়েও সুকুমার নিরাশ হল না, নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করতে লাগল। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, একদিন লগ্নমিতার ভুল ভাঙবে, ভালবাসার মর্যাদা সে দিতে পারবে।

লগ্নমিতা বিলাত থেকে ফিরে এসে কেমন যেন বদলে গেল। অপ্রত্যাশিতভাবে অজানা, অচেনা মফঃস্বল শহরের কোন এক স্কুল মাস্টারকে সে বিয়ে করল। লোক অবাক হল, ভাবল, ইউরোপ ভ্রমণে অকৃতকার্য হওয়ায় এবং প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হওয়ায় তার মানসিক বিপর্যয় ঘটেছে। এমনি ভুল বোঝা স্বাভাবিক, পিতার রক্তের সঙ্গেই জনসাধারণের পরিচয়—মাতৃঋণের কথা কেউ জানে না।

নিজের ছবির পাশে দাঁড়িয়ে সকল ঘটনাই লগ্নমিতার চোখের উপর ভেসে উঠল। মনে হল আশ্চর্য মানুষের জীবন, আশ্চর্য কালের গতি। যার যশ, খ্যাতি ছিল ঘরে ঘরে, যাকে দেখবার জন্য লোক রাস্তায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকত, যার ছবি থাকত ঘরে ঘরে আজ তাকে তার ছবির পাশে চিনতে পারে না।

সে কি ভুল করেনি? সে যদি সুকুমারের আহবানে সাড়া দিত তবে অর্থ, যশ, প্রতিষ্ঠা সবই থাকত। কেন সে এত বড় ভুল করল? সত্যই কি সে ভুল করেছে? সত্যই কি সে অনুতপ্ত?

একটা গাড়ি এসে লনে থামল। নির্বেদিতা উঠে দাঁড়াল, বলল, ওই উনি এসেছেন। তুমি ছবি দেখতে থাক, আমি এল্যম বলে।

লগ্নমিতার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল, কোনভাবে আত্মসংবরণ করে বলল, কে সুকুমারবাবু?

হ্যাঁ, তুমি একটু বস, আমি চায়ের ব্যবস্থা করে আসছি। চায়ের টেবিলেই ওঁর সঙ্গে পরিচয় করে দেব।

নির্বেদিতা চলে গেল।

চায়ের ব্যবস্থা করে নির্বেদিতা ফিরে এসে দেখল যে, লগ্নমিতা চলে গেছে। আশে পাশে, বাইরে কোথায়ও তাকে দেখা গেল না।

টেবিলের উপর একটি ছোট চিঠি পাওয়া গেল।

লগ্নমিতা লিখেছে—ভাই নির্বেদিতা, চলে যেতে বাধ্য হয়েছি ব্যক্তিগত কারণে। আমার এই অদ্ভুত ও অভদ্র আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমার কিছু বলবার নেই। বিশ বছর পূর্বে কথা বলা শেষ করে এসেছি। অনুরোধ, আমায় আর খোঁজ করোনা। বিদায় বন্ধু! ইতি

"লগ্ন"

সুকুমার যে কখন এসে পাশে দাঁড়িয়েছে তা' নির্বেদিতা বুঝতে পারেনি। এমনভাবে লগ্নমিতা কেন চলে গেল তা' সে কিছুতেই ভেবে পেল না।

সুকুমার বলল, লগ্নমিতা এসেছিল?

নির্বেদিতা বলল, এ সে লগ্নমিতা নয়।

তুমি ভুল করতে পার, কিন্তু আমার ভুল হবার নয়। আশ্চর্য, নিজের ছবির পাশে দাঁড়িয়েও চিনতে পারনি!

এ সে লগ্নমিতা হতেই পারে না। এ তোমার স্বপ্ন। কুড়ি বছর ধরে যার ধ্যান করে আসছ তারই প্রতিক্রিয়া মাত্র।

হতে পারে। কিন্তু লগ্নমিতা এসেছিল। সে ভুল করে এসেছিল, তাই চলে গেছে, আর কখনও আসবে না। তুমি চিনতে পারনি, তাই পরিচয় লিখে রেখে গেছে "লগ্ন"।

নির্বেদিতা কোন কথা বলতে পারল না, শূন্য দৃষ্টিতে চিঠিটার উপর তাকিয়ে রইল।

সাহিত্যে করুণ রস

শ্রীকল্যাণী মিত্র

সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য আনন্দদান। কিন্তু এসম্বন্ধে একটি প্রশ্ন স্বতঃই উত্থিত হয়। সাহিত্য সকলসময়েই আনন্দদায়ক অথবা সুন্দর সামগ্রী লইয়া কারবার করে না। কাব্যজগতেও দুঃখ, মৃত্যু, ধ্বংস আছে; যাহা কিছু স্বভবতঃই কুৎসিত এবং বীভৎস তাহার প্রবেশও এখানে নিষিদ্ধ নহে। ইহাদের বিষয় পাঠ করিলে কি করিয়া পাঠকচিত্তে আনন্দের উদয় হয়?—এ প্রশ্ন সকল দেশেরই আলঙ্কারিকগণের মনে উঠিয়াছে এবং তাঁহারা বিভিন্ন দিক দিয়া বিভিন্নভাবে ইহার সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

প্রত্যেক দেশেই সাহিত্যের ক্রমবিকাশের একটি বিশেষ ধারা আছে। ইউরোপে সেই ধারায় tragedy নামক বিয়োগান্ত নাটকের উদ্ভব হইয়াছে। ইহার অনুরূপ রচনা সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায় না। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে নাটকে নায়কের মৃত্যু হইতে পারিবে না। যদিও নাট্যে করুণ, বীভৎস এবং ভয়ানক রসের স্ফূর্তির পক্ষে কোনও বাধা নাই, কিন্তু সাধারণতঃ এইগুলি প্রধান রস হইতে পারে না। নাটকে শোক স্থায়ীভাবরূপে পরিগণিত হইবে না। * সাধারণতঃ এইরূপ নিয়ম থাকিলেও সংস্কৃত-নাট্যে বিষাদের সুর ঝঙ্কৃত হইয়াছে। অতি বিচিত্র সুখদুঃখের মধ্য দিয়া জীবনের রূপায়ণ,—নাট্যেও সেই জীবনেরই আভাস;—অতএব বাহিরের প্রচণ্ড ঘাতপ্রতিঘাত এবং তীক্ষ্ণ মানসিক দ্বন্দ্ব ব্যতীত কোনও নাট্যই সম্পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না। অভিজ্ঞান শকুন্তলা, মৃচ্ছকটিক, উত্তররামচরিত, মুদ্রারাক্ষস প্রভৃতি উত্তম রূপকগুলির প্রত্যেকটিই এইরূপ কঠোর ঘাতপ্রতিঘাতে পূর্ণ। আদিকবি বাল্মীকিও তাঁহার কাব্যবীণার তার করুণ সুরেই বাঁধিয়াছেন। কবির ভাষায়—

"পুণ্যকাহিনী রঘুকুলরবি
রাঘবের ইতিহাস।
অসহ দুঃখ সহি নিরবধি
কেমনে জনম গিয়াছে দগধি
জীবনের শেষ দিবস অবধি
অসীম নিরাশ্বাস।"

মহাভারতের প্রধান রস শান্ত হইলেও ইহার আদ্যোপান্ত একটি মহান্ বিষাদে আচ্ছন্ন।

ট্র্যাজেডী সম্বন্ধে আরিস্টটলের মতবাদকে ভিত্তি করিয়াই পরবর্তী সমালোচকগণের আলোচনার বিরাট সৌধ গড়িয়া উঠিয়াছে। আরিস্টটলের মতে Tragedyর ফল Katharsis. Lascelles Abercrombie তাঁহার Principles of Literary Criticism নামক নিবন্ধে Katharsisএর নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা দিয়াছেন—

—"In Greek medicine, an organism could be purged of any undesirable product by the administration in judicious doses, of sometling similar, as in modern homeopathy 'like cures like'. Excess of any kind is unwholesome, health could be secured by purgation of anything which tended to be present in excess. This seems to be what Aristotle meant by Katharsis. Tragedy effected the purgation of pity and fear, by its administration of these very emotions. It was desirable that these emotions should be discharged, either because they were unwholesome in themselves, or because they tended to excess."

কিন্তু আমরা এই উদ্দেশ্য লইয়া অভিনয় দেখিতে যাই না, এবং এইভাবে যে 'অন্তঃশুদ্ধি' কতটা ঘটে তাহাও বিচার্য।

করুণরসাপ্লুত কাব্যপাঠে কেন আনন্দ হয় সে সম্বন্ধে ইউরোপে প্রচলিত বিভিন্ন মতবাদগুলি Allardyce Nicoll তাঁহার Theory of Drama নামক পুস্তকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত মতবাদগুলি রহিয়াছে—

(1) Heroic grandeur, (2) feeling of nobility, (3) Sense of universality, (4) Poetical effect, (5) Vainty of vanities, (6) Malicious pleasure, (7) Masochistic idea.

পরিশেষে তিনি ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন যে, এই মতগুলি বিচ্ছিন্নভাবে সত্যের একাংশ উদ্ঘাটিত করে মাত্র,—কিন্তু ইহাদের সমগ্রভাবে দেখিলে বিষয়টির বিভিন্ন দিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তথাপি এসকল মতবাদ বিশ্লেষণের পরও অনেক কিছুই অকথিত থাকিয়া যায়।

ভারতীয় আলঙ্কারিকগণ বিষয়টি রসশাস্ত্রের মূলতত্ত্বের দিক হইতে বিচার করিয়া দেখিয়াছেন। সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মচৈতন্য অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে। উপাধি ভেদে আবরক অজ্ঞান ত্রিবিধ—অসত্ত্বাপাদক, অভানাপাদক এবং অনানন্দাপাদক। অনানন্দাপাদক অজ্ঞান আত্মার আনন্দাংশকে আবৃত করিয়া রাখে বলিয়া আত্মা যে আনন্দস্বরূপ তাহা আমরা ভুলিয়া থাকি। সমাধিতে ব্রহ্মানন্দ প্রকাশ হইলে এই আবরণ নাশ হয়। কাব্যপাঠ অথবা নাট্যদর্শন করিবার সময়ে কাব্যের অপরূপ ব্যঞ্জনার সাহায্যেও অনানন্দাপাদক অজ্ঞানের আবরণ ভঙ্গ হয়। ভগ্নাবরণা চিৎ বিভাবাদিসম্মিলিত রত্যাদিস্থায়িভাবকে প্রকাশ করে,—উহাই রস। রসাস্বাদে আত্মার আনন্দাংশেরই প্রকাশ হয় বলিয়া করুণরসাত্মক সাহিত্যপাঠেও আনন্দই পাওয়া যায়। সাহিত্যদর্পণকার বলিয়াছেন যে, করুণ প্রভৃতি রসে পরম সুখ উৎপন্ন হয়,—এবিষয়ে সহৃদয়ের অনুভবই প্রমাণ। করুণরসাশ্রিত কাব্যপাঠে দুঃখ হইলে কেহই তাহা পাঠ করিতে উৎসুক হইত না। লৌকিক জগতে যাহারা শোক-হর্ষাদির কারণ, তাহারা কবিপ্রতিভাদীপ্ত অলৌকিক কাব্যজগতে বিভাব প্রভৃতিতে পরিণত হইয়া সুখেরই কারণ হয়। করুণরসাশ্রিত কাব্যপাঠে অশ্রুপাতের কারণ চিত্তের দ্রুতি।

যদি বলা যায়, করুণ রসের আস্বাদনে কিছু দুঃখের অনুভূতিও থাকে,—তবে তাহার উত্তর এই যে, সুখেরই আধিক্যহেতু আনন্দ হয়। যেমন, চন্দন ঘর্ষণ করিয়া দ্রব প্রস্তুত করিতে পরিশ্রম হয়, কিন্তু তাহার শৈত্য ও সৌরভে সে ক্লান্তি দূর হয়। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ এবিচারটি করিয়াছেন। কাব্যপ্রকাশ-দীপিকায় চণ্ডীদাসও অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। Wordsworthএর মত এসম্বন্ধে তুলনীয়—

"Wherever we sympathize with pain, it will be found that the sympathy is produced and carried on by subtle combinations with pleasure."

এবিষয়ে নাট্যদর্পণের গ্রন্থকারদ্বয় রামচন্দ্র এবং গুণচন্দ্রের মতবাদবৈশিষ্ট্য এবং অভিনবত্বহেতু লক্ষণীয়। তাঁহারা সমস্যা সমাধানের জন্য কোনও দার্শনিক তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদের মতে রস দ্বিবিধ—সুখাত্মক এবং দুঃখাত্মক। ইষ্ট-বিভাবাদিহেতু শৃঙ্গার, হাস্য, বীর ও অদ্ভুত

---

*ইহার অবশ্য একটি ব্যতিক্রম আছে। উৎসৃষ্টিকাঙ্ক নামে এক প্রকার রূপকের প্রধান রস করুণ। 'দশ রূপক' গ্রন্থে ইহার স্বরূপ বর্ণিত আছে। সাহিত্যদর্পণকার ইহার উদাহরণস্বরূপ 'শর্মিষ্ঠা-যযাতি' নামে একখানি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

রস সুখাত্মক এবং অনিষ্টবিভাবহেতু করুণ, রৌদ্র, বীভৎস ও ভয়ানক রস দুঃখাত্মক। ভয়ানকদৃশ্য প্রভৃতি দেখিলে মনে উদ্বেগ হয়, সুখাস্বাদে উদ্বেগ নাই; অতএব সমস্ত রসের সুখাত্মকত্ব অনুভববিরুদ্ধ। সীতাহরণ, লক্ষ্মণের শক্তিভেদ ইত্যাদি দৃশ্য দেখিলে কাহার সুখ বোধ হয়? যদি অনুকরণে সুখবোধ হয় তবে সম্যগ্‌রূপে অনুকরণই হয় নাই বুঝিতে হইবে। তবে দুঃখাত্মক রসে চমৎকারিত্ব কী করিয়া সম্ভব হয়? রসাস্বাদের পর কবি এবং নটের যথাযথভাবে বস্তুপ্রদর্শনের শক্তি ও কৌশল দেখিয়া চিত্ত মোহিত হয়। এই বাস্তবতার স্পর্শ এবং কবি ও নটের শক্তিই পাঠক ও দর্শককে পরম আনন্দ দান করে। সেই আনন্দ আস্বাদ করিবার ইচ্ছাই দুঃখাত্মকরসাশ্রিত কাব্যের প্রতি পাঠকের চিত্ত উন্মুখ করিয়া তুলে। আলো-ছায়াবিজড়িত—সংসারের ন্যায় কাব্যেও বেদনা ও আনন্দের বিচিত্র সমাবেশ। দুঃখ আছে বলিয়াই সুখের স্বাদ এত মধুর বলিয়া বোধ হয়। দুঃখী পাঠক দুঃখের কাব্যপাঠেই সান্ত্বনা পায়, প্রমোদের কথাবার্তায় তাহার কিছুমাত্র আনন্দ হয় না। Allardyce Nicollএর Theory of Dramaতে এই শেষ কথাটিরই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়—

"Life is a thing of misery......Tragedy is the form of dramatic art in which this serious and miserable side of life is emphasised......After all, life is a foolish thing, and a thing dark and often full of torment, here in tragedy its very darkness is intensified that our own gloom may thereby be made the lighter."

রামচন্দ্র ও গুণচন্দ্রের মত অনুসারে করুণ-রসাশ্রিত কাব্যে রসাস্বাদের বিরাম হইলে পর কবি ও নটের শক্তি ও কৌশল বিশ্লেষণ করিয়া আমরা চমৎকারিত্ব অনুভব করি। একথা সত্য যে, বিশ্লেষণেও আনন্দ আছে, এবং উপযুক্ত বিশ্লেষণ আমাদের art উপ-ভোগকে সকল দিক হইতে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে সহায়তা করে। কিন্তু রসাস্বাদের সময়ে চমৎকারিত্ব হয় না, তাহার পরে হয়,—একথা সহৃদয়সম্মত নহে। আলোক হইতে দীপ্তিকে, গান হইতে সুরকে যেরূপ পৃথক্ করা যায় না, সেরূপ রসচর্বণা হইতে চমৎকারকে পৃথক্ করা যায় না। রসের প্রাণই হইল চমৎকার। রসাস্বাদের পর কবি ও নটের শক্তিকৌশলের জন্য চমৎকার উৎপন্ন হয়, একথাটি—বিচারসহ না হইবার আর একটি কারণ এই যে, কবি ও নটের উপযুক্ত শক্তিকৌশল না থাকিলে কোন কাব্য এবং অভিনয় রসোত্তীর্ণই হয় না, সুতরাং সেরূপ অবস্থায় রসাস্বাদই সম্ভবপর নহে। রসাস্বাদ হইয়াছে বলিলে ইহাই ধরিয়া লইতে হইবে যে, আর্টিস্টিক শক্তির পূর্ণ বিকাশহেতু রসাস্বাদ-কালেই চমৎকার উৎপন্ন হইয়াছে।

নাট্যদর্পণকারের মতে করুণরসাপ্লুত কাব্যে বাস্তবতার স্পর্শ আনন্দ দেয়। সাহিত্য জীবনের দর্পণ। দুঃখবিধুর জীবনের অনু-করণ যদি দুঃখপূর্ণ না হয় তবে অনুকরণে নিশ্চয় ত্রুটি হইয়াছে। কিন্তু কাব্যে বাস্তব-জীবনের ছায়াপাত হইলেও কাব্য অনুকরণমাত্র নহে,—উহা অভিনব সৃষ্টি। লৌকিক জগত ও কল্পনার জগতে অনেক প্রভেদ। কাব্যের বাস্তবতা ও লৌকিক জগতের বাস্তবতা এক নহে। কাব্যে পক্ষীরাজ ঘোড়া, আলাদীনের প্রদীপ প্রভৃতি অনেক কিছুরই সাক্ষাৎ পাই যাহা বাস্তবজীবনে কোথাও মেলে না। কাব্য-জগতের সত্যকে স্বীকার করিতে হইলে Coleridgeএর ভাষায় কেবল একটি বস্তু আবশ্যক—

"that willing suspension of disbelief which constitutes poetic faith."

নাট্যশাস্ত্রের টীকা অভিনবভারতীতে অভিনব গুপ্ত বলিয়াছেন—"তত্র সর্বেঽমী সুখপ্রধানাঃ স্বসংবিচ্চর্বণরূপস্য একঘনস্য প্রকাশস্য আনন্দসারত্বাৎ। তথা হি একঘনশোক-সংবিচ্চর্বণেঽপি অস্তি লোকস্য হৃদয়বিশ্রান্তিঃ অন্তরায়শূন্যবিশ্রান্তি শরীরত্বাৎ। অবিশ্রান্ত-রূপতৈব চ দুঃখমত এব কাপিলৈর্দুঃখস্য চাঞ্চল্যমেব প্রাণত্বেন উক্তম্ রজোবৃত্তিং বদদ্ভিঃ; ইতি আনন্দরূপতা সর্বরসানাম্।" রস অনুভব কালে আনন্দস্বরূপ আত্মচৈতন্যের প্রকাশহেতু সর্বরসই আনন্দময়। অনুভূতির নিবিড়তায় একপ্রকার সূক্ষ্ম আনন্দ বোধ হয়। লৌকিক জীবনেও যখন প্রেম আসে, তখন এমন সব আবেগ-বিহ্বল রসঘন মুহূর্ত আসে, যেসময়ে মানব তাহার দৈনন্দিন ও পারিপার্শ্বিক জগতকে ভুলিয়া যায়, তাহার দৈন্য এবং তুচ্ছতাকে অতিক্রম করিয়া যায়, তাহার প্রিয়-তমার মধ্যে সীমা খুঁজিয়া পায় না। শোকের নিবিড়তার মধ্যেও এইরূপ হৃদয়বিশ্রান্তি ঘটে। যে সারাজীবন দুঃখই পাইয়া আসে তাহার দুঃখ তাহাকে একটি অপূর্ব মহিমা দান করে; সে সেই দুঃখের মধ্যেও একটি আস্বাদ খুঁজিয়া পায়। নিবিড়তা ভগ্ন হইলেই চাঞ্চল্যহেতু এই আস্বাদটি নষ্ট হইয়া যায়।

Abercrombie কর্তৃক Burkeএর যে মতবাদ বিশ্লেষিত হইয়াছে তাহা আমাদের সমস্যাটির উপর যথেষ্ট আলোকপাত করিবে এই আশায় তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল—

"The free exercise of any emotion is in itself pleasant; and the greater the emotion, the greater the pleasure. Even emotions associated with painful or terrible things are, as emotions, pleasant, provided they are disinterested. In poetry, that is precisely what they are; the painful and terrible things in poetry do not happen to us: we contemplate them, and are only affected by the emotions which accompany them. These emotions can be freely enjoyed; and those are found to be most moving which accompany ideas or suggestions of death, destruction, annihilation, immensity, the unbounded, the infinite. That which astonishes and overwhelms us with its emotional effect is what we call the sublime, and this effect is usually produced by something which is incapable of apprehension. The effect is indeed that of terror, terrorism all cases whatsoever, either more openly or latently, the ruling principle of the sublime........This category of the sublime admits ugliness as an element of poetry."

ভট্টনায়ক এবং অভিনবগুপ্তের মতেও সাহিত্যে যে বেদনাবোধ তাহা নৈর্ব্যক্তিক এবং বিশ্বজনীন। আমার ব্যক্তিগত শোক একান্ত-ভাবে আমারই শোক, তাহা আমার চিত্তকে ভারাক্রান্ত করে, তাহাতে অপরের কিছুই যায় আসে না। কিন্তু এই অনুভূতির ব্যক্তিগত দিকটি না থাকিলে শোকের জ্বালা থাকে না। আমার শোকে আমি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ি,—দশরথের পুত্রশোকে সকল শ্রোতারই নয়ন অশ্রু-আকুল হয়, চিত্ত বেদনার রঙে রঙীন হইয়া উঠে,—কিন্তু ব্যক্তিগত ক্ষতিবোধ কাহাকেও পীড়িত করে না। সাহিত্যে যে sublimeএর কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহাও প্রাচ্য আলঙ্কারিকগণের দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে তাহা 'চমৎকার' নামে অভিহিত হয়। বিশ্বনাথ তাহার সংজ্ঞা দিয়াছেন—'চমৎকারশ্চিত্তবিস্তাররূপো বিস্ময়া-পরপর্যায়ঃ।' এই চমৎকার সর্বরসেই অনুস্যূত। চমৎকার অথবা বিস্ময় রসের সার হওয়ায় নারায়ণ নামে একজন আলঙ্কারিক রসকে অদ্ভুত বলিয়া থাকেন। (*) বেদান্ত মতে চিত্ত বিষয়-আকারে আকারিত হয়। রস অলৌকিক, অপরিমেয়। রসানুভবকালে তাহার আকারে আকারিত হইয়া চিত্ত অনন্ত বিস্তৃতি লাভ করে, আমরা আমাদের সীমিত অস্তিত্ব অতি-ক্রম করিয়া অসীমের দিকে যাই, সীমার মধ্যে অসীমের সুর ঝঙ্কৃত হয়। যাহা পরিচ্ছিন্ন, যাহা পরিমিত, যাহা ক্ষুদ্র,—তাহাতে চাঞ্চল্য সম্ভব—তাহাই দুঃখ দেয়। শ্রুতি বলিয়াছেন—'নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম্।' করুণরস অনুভবকালে মহাশোকের বিরাটত্বের মধ্যে সহৃদয়ের বিস্ময়াপ্লুত চিত্ত প্রসারিত হইয়া ভূমার আনন্দ লাভ করে।

---

*'রসে সারশ্চমৎকারঃ সর্বত্রাপ্যনুভূয়তে।
তচ্চমৎকারসারত্বে সর্বত্রাপ্যদ্ভুতো রসঃ।
তস্মাদদ্ভুতমেবাহ কৃতী নারায়ণো রসম্।'—
—সাহিত্য দর্পণে ধর্মদত্তের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

বাংলায় উনিশ শ ছেচল্লিশ

সুনীলচন্দ্র সরকার

(১)

বাঙলায় উনিশ শ ছেচল্লিশের
আমি একজন নীরব সাক্ষী।
আমার নাম ওঠেনি
হতাহত নিখোঁজের তালিকায়;
আমার ঘরে হয়নি এখনো লুট,
ভিড়তে হয়নি উদ্বাস্তুদের দলে;
ঘরেই ছিলুম আমি—
সেখানে আমার প্রথম শিশু
নতুন চোখে চাইছে।
সে যেন জানে এই পৃথিবী সুন্দর
সুন্দর মানুষের আশা, মানুষের ভাষা,
মানুষের পরস্পরকে ভালোলাগা, ভালোবাসা।
কিন্তু সাধ্য নেই বাঁচি, বাঁচাই;
নিষ্কৃতি পাই না চোখ-কাণ বুজিয়ে।
একদিন এল সেই রাত্রি,
বেরিয়ে এল অনেকদিনের চোঁয়ানো ব্যথা
বয়স-শুকনো চোখ ছাপিয়ে,
জানলুম তখন হঠাৎ-টের-পাওয়ার ঠাণ্ডা বিদ্যুতে
আমিও ঐ উদ্বাস্তুদের একজন;
ভূসম্পত্তি হারাইনি আমি কিছু,
হারিয়েছি আমার এতকালের প্রাণের ভিটে।
আজ বলছি সেই হারমানার কাহিনী।

(২)

একথা আমি জানি যে
বেঁচে আছি এক আশ্চর্য যুগে।
স্বিচারিণী এই বিংশ শতাব্দী।
তার তপস্যাজাত রবীন্দ্র-গান্ধী-রোলাঁ একদিকে
আর অপর দিকে হিটলার-মুসোলিনী-চার্চিল।
বুঝতে দেরী হয়নি সেয়ানা লোকের
সেই প্রভু যার দাপট বেশী।
দেখলুম দিনের পর দিন
সোজা সত্যির দিন ফুরোল,
কথায় কাজে বিষয় ব্যবসায়ে
মিথ্যার আসন হ'ল পাকা।
ন্যায় রইল বিলিতি রাজার মত
কর্মঠ অন্যায়ের জমকালো সমর্থন।
দেখলুম সিংহাসনে ভূতের নৃত্য,
আর মহাদেব বেরিয়েছেন ভিক্ষায়।

কৃতিত্বহীন মানুষ আমি,
তবু আমার বলার মত আছে এইটুকু—
হারিনি আমি, হারাইনি আমার বিশ্বাস;
পৃথিবীর এই অপঘাতের দিনে
খুঁজে নিয়েছি ধ্বংসস্তূপের থেকে
টুকরো টুকরো ঘটনার দানা;
নতুন ধাতুর দীপ্তি আছে তাতে
আছে মহাত্মার হাতের স্পর্শ।
মাথায় ঠেকিয়ে তার নমুনো
রেখেছি স্মৃতির প্রদর্শনীতে—
নাম দিয়েছি—'নতুন যুগের গঠন সামগ্রী।'
আমার জীবনের ঐটুকুই সার্থকতা।

(৩)

এই আমার ভুল
আমি বিশ্বাস করেছিলুম বিশ্বপ্রকৃতিকে,
মানব-প্রকৃতিকে।
ভাবিনি কোনদিন
পৃথিবীর সমানদৃষ্টি হবে ঘোলা,
দেখতে হবে সূর্যের মুখে মারীর চিহ্ন।
পাপের প্রসাদ ছাড়া অন্ন নেই আজ,
মুদ্রা চলে বাজারে পাপের ছাপমারা,
বোঝে না কেউ আর ভালোমানষির ভাষা।
আশা ছিল আবার শুনবো এই ভারতেই
বজ্ররবে, সত্যবাণী যুগে যুগে,
হঠাৎ দেখি কেমন ক'রে
ঠেকেছি এসে নিরুপায়ের নোয়াখালিতে।
বাইরে যখন হা হা হাওয়ার ঝড়,
ঘরোয়া মন দোর ভেজায়।
আবছা শোনায় কড়ানাড়া ট্রাজেডির।
আমার দোর যে খুলতে হ'ল
তার কারণ আমার শিশু।

(৪)

লোককে ব'লে বেড়িয়েছি, আমার প্রথম ছেলে
জন্মাবে দেখো স্বাধীন ভারতে;
বিধাতার পরিহাস,
ছেলে জন্মালো কলকাতায়
রায়টের কিছু আগে।
তবু এই আমার প্রথম পিতৃত্ব।

বিপদের ঘূর্ণি থেকে সরিয়ে এনে
ওকে নাচাই, কাঁদাই, খেলি,
কখনো ভাবি ওর মুখের দিকে চেয়ে
পোরা আছে ওর মধ্যে
না জানি কি জীবন-বৃত্তান্ত,
জাপানী বাঁশের নলে
ছবির আখরে আঁকা স্ক্রোলের মত।

(৫)

ওর বয়স যখন চারমাস পেরিয়েছে
অসুখ হ'ল ওর মার, ওর পিসির
একই সঙ্গে।
সুখের আলাপ চলেছিল এতদিন,
হঠাৎ শুরু হ'ল দিনরাতের সান্নিধ্য,
কান্না, হাসি,
খিদেয় আতুর ঠোঁটনাড়ার জোর তলব,
গায়ে মিশে থাকার উত্তাপ, আরাম, অস্বস্তি।
গাছের ফল যদি ডাল থেকে ছুটি পেয়ে
আবার কোনদিন ফিরে এসে ধরে আঁকড়ে,
সেই নতুন ধাঁচের ফলধরায় গাছটার যেমন
লাগবে আশ্চর্য,
আমারো লাগে তেমনি।
কখনো এই ফল দোলে, রসায়,
মূল-আমির দোলনে, নির্যাসে;
কখনো বাধে আলাদার ছটকানি,
বুঝতে পারি ও আর একজন।
রস আসে মনে যেন কোন প্রাচীন মাটির তলা থেকে,
যেখানে চিরকাল চলে এক থেকে বহু হওয়ার লীলা,
রংধরা আমের শাঁসের মত
স্নেহের মোচড়ে নরম হয় মন।

(৬)

ঝি-চাকরের সুবিধে নেই,
যুদ্ধের আস্কারা পাওয়া অভাব অচলতার ভূতপ্রেত
উঞ্ছবৃত্তি শুরু ক'রেছে সমাজে, ঘরে।
রোগীকে দেখি, না ছেলেকে!
আটচল্লিশ ঘণ্টার আলো অন্ধকার পার ক'রে দিলুম
পায়ে ভর দিয়ে
ঘুরে ঘুরে এ ঘর ও ঘর
যেন মাছে ঠোকরানো জলে-ভাসা নুড়ি।
শরীরবোধ তখন নেমে গেছে ব্যারোমিটারের মত
নর্ম্যালের নীচে সেই দাগে যেখানে
আধো স্বপ্নের শুরু;
মনের কথায় আর কাজ কি,
রক্তলিপ্ত তখনো কলকাতা, বোম্বাই, বেহার
গুপ্তঘাতকের ছুরিতে।
মুছতে পারি না মনের পর্দায়
দুঃস্বপ্নের নাচ;
নিরীহ মানুষ ঘর থেকে ওপড়ানো,
শিশু থ্যাঁতলানো গলা আঙুরের মত,
নারীধর্ষণ স্বামীকে সামনে রেখে।

জানি না, কোথায় কোন জানলা ভেঙ্গাবো,
বন্ধ হবে এই বুঝতে-পারার ঝাপটা।
আমার মা-ভাই স্বজন সব কলকাতায়,
চিঠি পাই না, দিই না,
কারণ নিরাপদ-সংবাদ ক্ষণভঙ্গুর—
সে শুধু একটা সাময়িক বিজ্ঞপ্তি,
আশ্বাসহীন, সান্ত্বনাহীন।

(৭)

সেদিন রাত্রে রুগীরা অশান্ত,
ছেলেটা শুরু ক'রেছে কান্না,
চোখ মুখ সারা শরীর দিয়ে খুঁজছে ওর মাকে।
হঠাৎ হ'ল অসহ্য,
দিলুম ছেলেটাকে ঝাঁকানি,
ঘুমিয়ে পড়ল কেঁদে কেঁদে রাত তিনটেয়।
ওর বিছানার একপাশে রইলুম, যেন
থার্ড ক্লাস প্যাসেঞ্জার;
নতুন শীতের আনাড়িপনায়
ঘরে চলেছে ঠাণ্ডা-গরমের হাতাহাতি,
অন্ধকারটাও হয়ে উঠেছে বিরূপ,
বিদ্ধ ক'রছে মশার হুলে।
মনে হ'ল অসহায়,
আমি অসহায়
এসেছি হার স্বীকারের শেষ প্রান্তে
যেখানে লোকে শিশুর সঙ্গে ব্যবহার ভোলে,
শুরু হয় প্রাণের অযথা স্পন্দন
বিকারের খাপছাড়া বেগে।

(৮)

ঘড়িতে বাজল পাঁচটা,
জানলার চৌসীমায় নীল আলো ফুটল ফিকে,
স্বচ্ছ হ'ল পরদা।
খাওয়ালুম ছেলেকে ফ্লাস্কের দুধ,
ওর মুখে চোখে ফুটল নির্ভর,
রাতের স্মৃতি নেই সেখানে।
শান্তি, শান্তি!
শুয়ে আছে শান্ত হয়ে,
সাড়া দেওয়ার খেলা চলেছে মূল ভাষায়,
হঠাৎ দিলে কেমনতর আওয়াজ
তার কিছু হাসি, কিছু কান্না।
বুঝলুম এ আর কিছু নয়,
জীবনবোধের ছোট্ট একটা ঢেউ
ভেঙেছে এসে ওর কচি বুকে!

(৯)

শান্তি, শান্তি!
অন্ধকার গলা আলোর নির্যাস
প'ড়েছে খোকার মুখে
হৃষীকেশের নীল গঙ্গার মত।
তাকেই মধ্যস্থ রেখে শোনালুম—
ওঁ পিতা নোঽসি।

ঐ মন্ত্রে আমার অধিকার নেই সাধনালব্ধ,
শোনা কথা আনাগোনা করে ভালো লাগার মহলে
তারি রেশ দিতে চাইলুম খোকার কানে,
গানের মত, আদরের ডাকের মত।
ওর কানে কি ঠেকল
সেই সুর-ওপছানো রূপোর ঝিনুক?
আলো হল ওর মাথার কোনো কুলুঙ্গি
পিতৃবোধের প্রদীপে?
তা জানি না, তা জানি না;
কিন্তু, আমার মনে হঠাৎ এল আকুলি বিকুলি
কিসের সঙ্গে কিসের যেন মিল হল না,
মন-নাইয়ার দিনপারানি ফেরিনৌকো
কোন ঘাটে আর ভেড়ার যেন উপায় নেই।
কান্না এল।
আমি, আমার শিশু,
প্রবল স্রোতের এপারে ওপারে।
মুখটা তুলে ওপর দিকে
ঠোঁট কাঁপিয়ে আঘাত-পাওয়া মোষের মত
কান্না, কান্না!

(১০)

অবাক হলুম।
হঠাৎ নামল এ কোন মনসুন,
এই আজন্ম শুকনো ডাঙায়!
আমার কুঁড়ের ভিত চাল দেয়াল
তৈরি হয়েছে অন্য আবহাওয়ার খেয়ালে,
সেখানে সমস্ত কাঠামো-কাঁপানো
এ কিসের থরথরানি!
কয়েকদিনরাত বিছানা থেকে উঁচু থাকায়
শরীর যেন সূক্ষ্ম শরীর,
হাওয়ার দোলনে দুলছে যেন মন
এমনই সে আলগা
এই শান্ত আদি প্রহরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে
অতীত জীবন দেখলুম যেন এক নজরে—
তার চার পাশে কাঁটার বেড়া তোলা,
কোন নতুন আইনে সে এখন নিষিদ্ধ এলাকা।
কর্তৃপক্ষ কোথাও নেই
যাকে জানাই আবেদন,
যে নেবে ঐ রাজ্য রক্ষার দায়।

(১১)

প্রকৃতির আদিম সুস্থতা
ফিরে ফিরে ওঠে ছিটকে
নোয়ানো বেতের মত;
তাই তো জানতুম আমিও!
দ্রুত মিলোয় পৃথিবীর মুখের কাটা দাগ,
তার বুকের গভীর ক্ষতগুলি
ঢাকা পড়ে সমুদ্রে;
ইতিহাসের অপঘাতকে ডোবায়
ঝরো ঝরো মেঘছিটোন শান্তি,
ঝিরি ঝিরি দক্ষিণের স্বপ্ন।
আমার মন আর সাড়া দেয় না এ আশায়।
আজ আমার এই কান্নায়
অনেক যুগের অনেক মানুষ অনেক পশুর
ভুলে যাওয়া কান্নার বেগ,
হার মেনে নেমে গেল তারা দলে দলে
জীবন মঞ্চ থেকে,
নিয়ে গেল তাদের অভিমান বিধাতার ওপর—
যিনি রাখেন নি তাঁর কথা,
আলো-সিঁড়ি-বাওয়া জীবের পায়ের নীচে
হঠাৎ উঠেছেন হেসে
অন্ধকারের খল খল হাসি,
তাঁরি আপন অনুচরকে
ছিন্ন করেছেন বর্বরতার থাবায়।

(১২)

ওরে অবুঝ শিশু,
সকাল-খুসী ঐ হলুদ রঙের ফুলটি দেখে
তুইও দুলিস্ ফুলের দোল।
জানিস্ না রে, জানিস্ না তুই—
নির্লজ্জা এই পৃথিবী;
সে আজকের পাপ ভোলে কাল
হি হি হাসে সাঁওতাল মেয়ের মত
দুটি ক্ষত বেঁধে সবুজ ব্যাণ্ডেজে;
খোঁপায় পরে উদ্ধত খুসীর রাঙা ফুল।
কখনো কিছুকাল থাকে শান্ত
মহাপুরুষের স্পর্শে—
যায় না তবু তার নাড়ীর বিষ।
আমি দিয়ে যাবো তোকে আমার এই কান্না,
রেখে যাবো তাদের চেতনায়
যারা শান্ত দিনের কারিকর।
এই আকাশে যখন আবার বইবে স্বাচ্ছন্দ্য,
এই পৃথিবী যখন আবার বসবে বুনতে
কোলের ওপর ছড়িয়ে নিয়ে অনেক জীবন,
মুখে মিষ্টি হাসি—
সেদিনো যেন বাজে আমার কান্না,
তৃপ্ত লোকের ঘুম-পাওয়ায়
বেঁধে যেন কাঁটার মত।
শাসন যেন তৈরী থাকে
আচমকা খ্যাপামির—
আজকে এই দুর্যোগের লগ্নে
ওরে শিশু,
এই আমার চোখের জলের আশীর্বাদ।

কণিকার শক্তি

অমরেন্দ্রকুমার সেন

১৯৪৫ সালে শুধুই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়নি, ঐ বৎসরে জাপানের হিরোশিমা শহর অ্যাটম বোমা দ্বারা বিধ্বস্ত হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-বিরতি অথবা অ্যাটম-বোমার বিস্ফোরণ এই দুটির মধ্যে কোন ঘটনাটি যে ১৯৪৫কে স্মরণীয় করে রাখবে তার প্রমাণ একদা ইতিহাসের পাতাতেই পাওয়া যাবে।

সেই বিখ্যাত বোমা ফাটবার পর থেকে আমরা সকলেই অ্যাটম অর্থাৎ পরমাণু সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছি। কবে আড়াই হাজার বৎসর আগে ডিমক্রিটাস অণু পরমাণু সম্বন্ধে কি বলে গেছেন, ডালটন সাহেব কবে পরমাণুকে অবিভাজ্য বলে গেছেন, তারপর কবে তাঁর সেই উক্তিকে রাদারফোর্ড সাহেব ভুল প্রমাণিত করলেন, এ-সকল খবর আমরা এখন রাখি।

মার্কিন যুক্তরাজ্যের নিউ মেক্সিকোর মরুভূমিতে প্রথম অ্যাটম বোমার পরীক্ষা হয়; যে ইস্পাত নির্মিত উঁচু চূড়োর ওপর অ্যাটম বোমা রেখে ফাটানো হয়েছিল, সেই ইস্পাতের চূড়ো কর্পূরের মতো উবে গেল, আর সেই জায়গার সমস্ত বালি কাচ হয়ে গেল; তারপর পাঁচ মাইল দূরের সেই লোকটি বোমা ফাটবার পর যে বাতাস উঠেছিল, সেই ভীষণ বাতাসে আবার কত মাইল দূরে উড়ে গিয়েছিল সে সব খবরও আমরা এতদূরে বসে রেখে থাকি।

হিরোশিমায় বোমা ফাটবার পর নাগাসাকিতে বোমা ফাটল, কত লোক মারা গেল, কত বাড়ি ধ্বংস হ'লো, গাছ সব নিষ্পত্র হ'লো, কংক্রীটের বাড়িগুলি টিকলো কিনা, পরে আবার মৃত ব্যক্তিদের ভৌতিক আবছায়া মূর্তি দেখা গেল; এ সকল সংবাদ কারও অজানা নয়। বিকিনির প্রবাল বলয়েই বা কি পরীক্ষা হ'লো, ক'টি জাহাজ মারা পড়লো, আর ক'টি ছাগল মারা পড়ল না, এ সমস্ত কাহিনী খবরের কাগজে সকলেই পড়েছি।
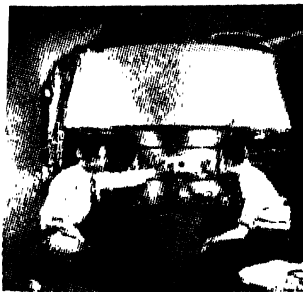
সাইক্লোট্রন

এখন যখন যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে এবং আপাতত আর অ্যাটম বোমা ফাটাবার ক্ষেত্র পাওয়া যাচ্ছে না তখন চেষ্টা করা হচ্ছে এই অ্যাটম বোমাকে কোনো ভাল কাজে লাগানো যায় কিনা! এই যেমন সাহারা মরুভূমির মাঝে কয়েকটা বোমা ফাটিয়ে বিরাট হ্রদের সৃষ্টি করে' সেখানে কিছু চাষবাস করা যায় কিনা; কিংবা অ্যাটম বোমায় নিহিত শক্তিটাকে প্রয়োগ করে' মেরুপ্রদেশকে কিছু গরম করে' সে স্থানটায় প্রমোদ-ভ্রমণ করা যায় কিনা।
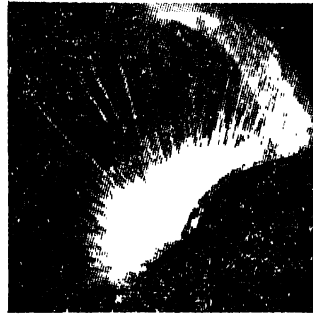
গামা রশ্মি

আগুন শক্তির উৎস। আগুন যেমন ধ্বংস করে আবার সে না হলেও মানুষের চলে না। একদা আগুন মানুষের ভয়ের কারণ ছিল, কিন্তু যখন মানুষ তাকে আয়ত্তে আনলে তখন থেকে সে মানুষের ভৃত্য, যদিও মাঝে মাঝে সে বিদ্রোহ করে। সেই রকম যে পরমাণু ধ্বংসের উৎস তাকে আয়ত্তে এনে যাতে তাকে মানুষের কাজে খাটিয়ে নেওয়া যেতে পারে; এখন সেই চেষ্টাই চলছে।

আমাদের পৃথিবীর সমস্ত পদার্থ বিরানব্বইটি মৌলিক পদার্থ দ্বারা গঠিত; অবশ্য প্রত্যেক পদার্থেই বিরানব্বইটি মৌলিক পদার্থ থাকে না। যে কোন পদার্থ বিশ্লেষণ করলে ঐ বিরানব্বইটি মৌলিক পদার্থের মধ্যে একটি, দু'টি অথবা তারও বেশী মৌলিক

বিজ্ঞানী যন্ত্রে পরীক্ষা করছেন তাঁর শরীরে রেডিও-অ্যাক্টিভ রশ্মি প্রবেশ করছে কি না

পদার্থ আছে। মৌলিক পদার্থের শেষ পরিণতি পরমাণু; যৌগিক পদার্থের শেষ পরিণতি অণু; ইংরাজীতে যাদের যথাক্রমে বলা হয় অ্যাটম ও মলিকিউল।

বহুদিন পর্যন্ত আমাদের ধারণা ছিল যে, পরমাণুকে আর ভাগ করা যায় না; কিন্তু সে ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী পরমাণু ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন দ্বারা গঠিত। যে সকল মনীষী পরমাণুর নবতম রূপের জন্য দায়ী তাঁদের অনেকের মধ্যে প্রথমে নাম করতে হয় লর্ড রাদারফোর্ড ও নাইল্স বোরের।

সমস্ত মৌলিক পদার্থের মধ্যে হালকা হ'লো হাইড্রোজেন পরমাণু, এর ওজন ধরা হয় ১। হাইড্রোজেন পরমাণুর গঠন সর্বাপেক্ষা সরল। এই পরমাণুর একটি কেন্দ্র আছে যাকে ইংরাজীতে বলা হয় নিউক্লিয়াস্। হাইড্রোজেন পরমাণুটির এই কেন্দ্রটি ধনাত্মক তড়িৎ যুক্ত যাদের বলা হয় প্রোটন; এই প্রোটনটিকে প্রদক্ষিণ করছে ঋণাত্মক তড়িৎ যুক্ত একটি কণা যার নাম ইলেকট্রন। এই ইলেকট্রন ও প্রোটন পরস্পরকে আকর্ষণ করে সেইজন্য এরা পরস্পরকে ধরে রাখে, বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় না। ভারী হাইড্রোজেনের পরমাণুর গঠন একটু পৃথক। তাদের কেন্দ্রে একটি প্রোটনের সঙ্গে আর একটি কণা থাকে যার নাম নিউট্রন, ইলেকট্রন কিন্তু সেই একটিই থাকে। নিউট্রনে উভয় প্রকারের তড়িৎ সমান অংশে থাকে বলে তারা নিরপেক্ষ। হিলিয়াম নামক গ্যাসের পরমাণুর কেন্দ্রে আছে দু'টি প্রোটন আর দু'টি নিউট্রন, আর এদের প্রদক্ষিণ করছে দু'টি ইলেকট্রন। এই রকম একপ্রকার পরমাণুর গঠন

এক এক প্রকার; প্রোটন ও ইলেকট্রনের সংখ্যা এক একপ্রকার মৌলিক পদার্থের পরমাণু নির্ণয় করে; এদের সংখ্যা দেখে মৌলিক পদার্থের নাম বলে দেওয়া যায়। ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রনের মধ্যে ইলেকট্রন সবচেয়ে হাল্‌কা। ওজনে এক পাউন্ড ইলেকট্রনের মধ্যে ৫ এর পিঠে ২৯টি শূন্য দিলে যে সংখ্যা হ'বে, ততগুলি ইলেকট্রন আছে। এই সকল প্রোটন ও ইলেকট্রন পরস্পরকে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে ধরে থাকে। মাত্র এক আউন্স হাইড্রোজেনের সমস্ত পরমাণুকে টুক্‌রো টুক্‌রো করতে হ'লে, ৭৫ টন কয়লা পোড়ালে যে শক্তি নির্গত হয়, তত পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হ'বে। এক আউন্স হিলিয়ামের সমস্ত ইলেকট্রন ও প্রোটনকে পৃথক করতে হ'লে আরও দশ গুণ শক্তির আবশ্যক। তাহলে পরমাণু থেকে কি অতুল শক্তি নির্গত হ'তে পারে তার একটা ধারণা করা যেতে পারে।

লর্ড রাদারফোর্ড

কতকগুলি ভারী ওজনের মৌলিক পদার্থ আছে যাদের পরমাণুগুলির মধ্যে বোধহয় খুব সদ্ভাব নেই, তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে চায়, আর বিচ্ছিন্ন হবার সময় কয়েক প্রকার রশ্মি বিচ্ছুরিত করে। রশ্মি বিচ্ছুরিত করার এই পদ্ধতির ইংরেজী নাম রেডিও-আক্টিভিটি অথবা স্বতঃ-দীপ্তি। ইউরেনিয়াম এবং রেডিয়াম এই ভারী দু'টি মৌলিক পদার্থ এই রকম রশ্মি বিচ্ছুরিত করে। মনে করা যাক যে, ঐ দু'টি মৌলিক পদার্থের মধ্যে কোনো একটি মৌলিক পদার্থের পরমাণুর দু'টি প্রোটন ও দু'টি নিউট্রন যাদের নাম দেওয়া হয়েছে আল্‌ফা কণা—ছুটে বেরিয়ে এল, অমনি সঙ্গে সঙ্গে দু'টি ইলেকট্রনও সাথীহারা হয়ে' তারাও ছুটে বেরিয়ে এল; এদের নাম দেওয়া হ'ল বিটা কণা; তখন আবার পরমাণুর মধ্যে যে প্রোটন, ইলেকট্রন ও নিউট্রন বাকি রইল তারা নিজেদের বাঁচিয়ে রাখবার জন্য অন্য ধাতুর সৃষ্টি করে ও সেই সময় গামা রশ্মি বিচ্ছুরিত করে।

বিচ্ছুরিত অ্যাল্‌ফা ও বিটা কণিকাদের ও গামা রশ্মির মতো অ্যাল্‌ফা ও বিটা রশ্মি বলা হয়। এই তিন প্রকার রশ্মির বেগ অতি ভীষণ, আলোর গতির সমান; সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। এই রশ্মি অথবা কণিকা দ্বারা অপর মৌলিক পদার্থের পরমাণুকে ভাঙা যায়। লর্ড রাদারফোর্ড সর্বপ্রথম অ্যাল্‌ফা কণিকা দ্বারা নাইট্রোজেন এবং অ্যাল্‌মিনিয়ামের পরমাণু ভাঙতে সক্ষম হ'ন।

ভ্যান ডি গ্রাফের যন্ত্রে পরমাণু ভাঙ্গা হচ্ছে

১৯৩২ সালে ইংরাজ বৈজ্ঞানিক জেমস্‌ চ্যাডউইক নিউট্রন আবিষ্কার করেন। পরে ইটালির বৈজ্ঞানিক এনরিকো ফার্মি, জার্মান বৈজ্ঞানিক অটো হ্যান এবং আর একজন জার্মান মহিলা বৈজ্ঞানিক লিজি মাইটনার নিউট্রন দিয়ে ইউরেনিয়ামের পরমাণুকে আঘাত করেন। ইউরেনিয়াম পরমাণু সে আঘাত সহ্য

...তে না পেরে ভেঙে যায়, কিন্তু সেই সঙ্গে প্রবল শক্তি নির্গত হ'তে থাকে। এই পরমাণু ভাঙার নাম দেওয়া হয়েছে "অ্যাটমিক ফিসান" অথবা পরমাণু বিভাজন। নিউট্রন দ্বারা ইউরেনিয়াম পরমাণু বিভাজনের ফলে আরও কতকগুলি নতুন নিউট্রন জন্মায়; নবজাত নিউট্রনরা আবার আরও নতুন নিউট্রন সৃষ্টি

নাইলস্ বোর

করে ও সেই সঙ্গে পরমাণু বিভাজনও চলতে থাকে। এই অবিরত ক্রিয়ার নাম দেওয়া হয়েছে "চেন রিঅ্যাকশান" অথবা শৃঙ্খল ক্রিয়া। পরীক্ষা করে' দেখা গেল যে যদি ইউরেনিয়ামকে ধীরগতি নিউট্রন দিয়ে আঘাত করা যায়, তাহলে কায আরও ভাল হয়, নির্গত শক্তির আরও জোর বেড়ে যায়; অথচ হঠাৎ শৃঙ্খল ক্রিয়া আরম্ভ হয়ে যাতে কাজ না পণ্ড হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। পরমাণু-শক্তির ধ্বংসমূলক কাজ ব্যতীত সেই শক্তিকে আরও অনেক ভাল কাজে লাগানো যায়। কি ভাবে ও কি করে' সেই শক্তি নিয়োজিত করা যাবে, বৈজ্ঞানিকেরা এখন সেই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন।

পরমাণু ভাঙার কয়েকটি যন্ত্র আগেই আবিষ্কৃত হয়েছে, যেমন ভ্যান ডি গ্রাফের একপ্রকার যন্ত্র, লরেন্স আবিষ্কৃত সাইক্লোট্রন। পরে বিটাট্রন নামে আর একটি যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এখন বৈজ্ঞানিকেরা 'অ্যাটমিক পাইল' নিয়ে কিছু ব্যস্ত। এই যন্ত্রে গ্র্যাফাইটে ঢাকা ইউরেনিয়াম থেকে শক্তি আহরণ করে' নেওয়া হয়। সেই শক্তি দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী কারখানার কাজ চালানো যায়। এই অ্যাটমিক পাইলে প্লুটোনিয়াম নামে ইউরেনিয়ামের অনুরূপ আর একটি ধাতু প্রস্তুত হয়, যা অ্যাটম বোমায় ব্যবহৃত হয়।

পরমাণু-শক্তিদ্বারা একটি বিদ্যুতের কারখানা মার্কিন যুক্তরাজ্যে শীঘ্রই স্থাপিত হ'বে। যেখানে অ্যাটম বোমা তৈরী করবার কারখানা বসানো হয়েছিল, সেখানেই এই কারখানা বসবে। কারখানাটির তদারক করবে অ্যামেরিকান বিখ্যাত রাসায়নিক প্রতিষ্ঠান মনস্যানটো কেমিক্যাল কোম্পানী। প্লুটোনিয়াম তৈরী করবার জন্য একটি কারখানা আগেই ওয়াশিংটন প্রদেশের হ্যানফোর্ড নামক স্থানে বসানো হয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে অন্যান্য দেশ অপেক্ষা মার্কিন যুক্তরাজ্য উদ্যমী ও অগ্রণী।

এ সমস্তই কাগজে কলমে পড়তে বেশ ভালই লাগে; কিন্তু যে সব কর্মীরা পরমাণু-শক্তি নিয়ে কাজ করে তাদের জীবন বিপন্ন করে' কাজ চালাতে হয়; অবশ্য এজন্য যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। কিন্তু কোথা থেকে যে অদৃশ্য রশ্মি কার শরীরে প্রবেশ করে' কার কি ক্ষতি করবে বলা বড় শক্ত। এজন্য কর্মীরা সত্যই কতখানি অদৃশ্য রশ্মি শরীরে ঢুকিয়ে বসে আছেন তা দেখবার জন্য যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।

পরমাণু-শক্তিদ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদনের কারখানা, বড় জাহাজ এবং রেলগাড়ি চালানো সম্ভব হলেও মোটর গাড়ি এবং বিমান সম্ভবত চালানো যাবে না। কারণ শক্তি উৎপাদন করবার সময় পরমাণু—বিভাজনের ফলে যে সমস্ত অদৃশ্য ক্ষতিকর রশ্মি বিচ্ছুরিত হয় সেগুলি থেকে মানুষকে রক্ষা করবার জন্য যে সমস্ত আবশ্যকীয় রক্ষামূলক ব্যবস্থা

স্যার জেমস্ চ্যাডউইক

অবলম্বন করা হয় সেগুলি এতই ভারী যে মোটর গাড়ি ও বিমানে সেগুলি বহন করা অসম্ভব। পরমাণুশক্তি উৎপাদক যন্ত্রগুলিকে পুরু সীসে অথবা কংক্রীটের দেওয়াল কিংবা জলের ট্যাঙ্কের দ্বারা আবৃত করে' রাখা হয়। পরমাণুশক্তি দ্বারা চালিত মোটর গাড়ির ইঞ্জিনকে যদি কংক্রীটের দেওয়াল দিয়ে ঘিরে রাখতে হয় তাহলে তা হবে চার থেকে ছ ফিট পুরু, যার ওজন হ'বে প্রায় একশত টন। অবশ্য এ সমস্ত বাধা দূর করবার জন্য বৈজ্ঞানিকেরা অবিরত চেষ্টা করছেন এবং যাতে অচিরেই পরমাণু-শক্তিকে মানবের কল্যাণকর কাজে নিয়োজিত করা যায়, সেজন্য তাঁরা বদ্ধপরিকর।

কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি পাঞ্জাবে অশান্তির ফলে পাঞ্জাবকে মুসলমান-প্রধান ও অ-মুসলমানপ্রধান দুইটি স্বতন্ত্র প্রদেশে বিভক্ত করিবার প্রস্তাবের অনুমোদন করায় বাঙলায় যাঁহারা পশ্চিমবঙ্গকে পূর্ববঙ্গ হইতে পৃথক করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, তাঁহাদিগের আন্দোলন পূর্বাপেক্ষা প্রবল হইয়াছে।

পাঞ্জাবের অগ্নি এখনও নির্বাপিত হয় নাই। বড়লাটের শাসন-পরিষদের দেশরক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য সর্দার বলদেব সিংহ পাঞ্জাবের কতকগুলি স্থান পরিদর্শন করিয়া গত ১৩ই মার্চ যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়, নিষেধ-নিরোধ হেতু পাঞ্জাবের বাহিরের লোক পাঞ্জাব সম্বন্ধে যে সংবাদ পাইতেছে, তাহা যথেষ্ট নহে। সর্দার বলদেব সিংহ বলিয়াছেন—

(১) "আজ আমি যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা পূর্ববঙ্গে নোয়াখালির ভীষণ ব্যাপার ও হত্যাকাণ্ড নিষ্প্রভ করিয়াছে।"

(২) "আমরা যে জনরব শুনিয়াছিলাম, তদপেক্ষা প্রকৃত ব্যাপার অধিক শোচনীয়।"

তিনি বিমানে পরিভ্রমণকালে অনেক স্থানে প্রজ্বলিত বহ্নিশিখা দেখিয়াছেন। যাহারা পলায়ন করিয়া রক্ষা পাইয়াছে, আশ্রয়-শিবিরে তাহারা যাহা বলিয়াছে, তাহার সহিত পূর্ববঙ্গের উপদ্রবের গোষ্ঠীগত সাদৃশ্য আছে —শত শত লোক নিহত হইয়াছে, ধর্মস্থান অগ্নিযোগে ভস্মীভূত করা হইয়াছে, নারীহরণ হইয়াছে, লোককে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হইয়াছে।

কাহারা এই সকল বর্বরোচিত কার্য করিয়াছে, তাহা সর্দার বলদেব সিংহের উক্তিতেই বুঝিতে পারা যায়। তিনি বলিয়াছেন, মুসলমান নেতারা যদি সাধু ও কল্যাণ-কামী হন, তবে তিনি তাঁহাদিগকে উপদ্রুত অঞ্চলসমূহে যাইতে অনুরোধ করেন।

বাঙলার দুর্ভাগ্য, কলিকাতায় হত্যাকাণ্ডের সময় নহে—পরে লর্ড ওয়াভেল তাঁহার পুনর্গঠিত শাসন-পরিষদের সদস্য স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সর্দার বল্লভভাইকে বাঙলায় আসতে নিষেধ করিয়াছিলেন এবং বাঙলার ও দুর্ভাগ্য, শাসন-পরিষদের সদস্যগণ সে নিষেধ পদদলিত করিয়া বাঙলায় আগমন করেন নাই। সর্দার বলদেব সিংহ ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু পাঞ্জাবে গিয়াছেন। যদি বলা হয়, তথায় আর প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন নাই, কাজেই পাঞ্জাবের ব্যাপারে শাসন-পরিষদের হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা আইনত আছে, তবে বলিতে হয়, তাঁহারা তো বিহারে গিয়াছিলেন। উত্তরে হয়ত বলা হইবে, বিহারে কংগ্রেসী সচিবসংঘ প্রতিষ্ঠিত এবং সেই জন্য কংগ্রেসী নেতারা তাঁহাদিগকে সহযোগ প্রদান করিতে আসিয়াছিলেন। বাঙলার দুর্ভাগ্য—তথায় প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন আছে এবং তথায় যে সচিবসংঘ 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' প্রবল করিবার কার্যের জন্য দায়ী, তাঁহারা কংগ্রেসের পন্থাবলম্বী নহেন। কিন্তু বাঙলায় গভর্নর যে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে তাঁহার কর্তব্য পালন করেন নাই, সে বিষয়ে বড়লাটের শাসন-পরিষদ কি কোনরূপ কাজ করিতে পারিতেন না?
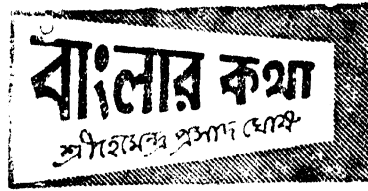
পাঞ্জাবের মোট জনসংখ্যা ২ কোটি ৮৪ লক্ষ; তন্মধ্যে মুসলমান এক কোটি ৬২ লক্ষ; শিখরা শতকরা প্রায় ১৪ জন। এই শিখগণের সহিত পাঞ্জাবের হিন্দুরা একযোগে কাজ করিতেছেন। কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি শিখ-দিগের জন্য স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের পক্ষপাতী। প্রকাশ, এখনই পূর্বে আয়ার্লাণ্ডকে যেরূপ দুইভাগে বিভক্ত করিয়া স্বতন্ত্র দুইটি পার্লামেণ্ট প্রদান করা হইয়াছিল, পাঞ্জাবে আপাতত সেইরূপ ব্যবস্থা করিবার বিষয় বিবেচিত হইতেছে। বাঙলা সম্বন্ধে কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি সুস্পষ্টভাবে মত প্রকাশ করেন নাই বটে, কিন্তু কংগ্রেসের সভাপতি আচার্য কৃপালনী বাঙলায় পাঞ্জাবের অনুরূপ ব্যবস্থার কথা বলিয়াছেন এবং কেন্দ্রী ব্যবস্থা পরিষদে বাঙলার মুসলমানাতিরিক্ত প্রতিনিধিরা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তাঁহারা বলিয়াছেন, বাঙলাকে বিভক্ত করিবার পক্ষে কোন বাধা থাকিতে পারে না; কিন্তু সেজন্য বাঙলার হিন্দুদিগকে দাবী উপস্থাপিত করিতে হইবে। তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলিয়াছেন যে, নূতন বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন আসিয়া (২২শে মার্চের পরেই) কার্যভার গ্রহণ করিলে বৃটিশ সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তর করিবার আয়োজন আরম্ভ হইবে। সুতরাং বাঙলাকে আর কালবিলম্ব না করিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে—বাঙলা এক প্রদেশ থাকিয়া সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট সরকারের অধীনে স্বতন্ত্র থাকিবে কি বাঙলার হিন্দুপ্রধান অংশ স্বতন্ত্র হইয়া প্রদেশ-সঙ্ঘে যোগ দিবে? বলা বাহুল্য, বর্তমানে যে সকল প্রদেশে কংগ্রেসী সচিবসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত, সে সকলই ঐ প্রদেশ-সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত হইয়া এক কেন্দ্রী সরকারের অধীন থাকিবে।

দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, কেন্দ্রী ব্যবস্থা-পরিষদে বাঙলার মুসলমানাতিরিক্ত প্রতিনিধি-দিগের প্রতিনিধিরূপে দুইজন শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর সহিত এই বিষয়ে আলোচনার জন্য কলিকাতায় আসিবেন। কারণ শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু বাঙলাকে বিভক্ত করিবার বিরোধী এবং বাঙলায় নেতৃত্ব আজ তাঁহার।

শরৎবাবুর যুক্তি এখনও কেহ খণ্ডিত করিয়াছেন, এমন জানা যায় নাই। তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ বিবেচনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—শেষ কোথায়? যাঁহারা ধর্মের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ বিভক্ত করিবার বিরোধী—অখণ্ড ভারতের আদর্শের সমর্থক তাঁহারা কিরূপে ধর্মের ভিত্তিতে প্রদেশ বিভাগ সমর্থন করেন? ইতোমধ্যেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দুষ্টবুদ্ধিতে সৃষ্ট ও পুষ্ট মুসলিম লীগ বিহারে সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানদিগের জন্য প্রদেশের একাংশ চাহিতেছেন। বলা হইতেছে, যখন দেখা যাইতেছে, বিহারে সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানগণ নোয়াখালিতে সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুদিগের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠদিগের অত্যাচারের প্রতিক্রিয়ায় বিক্ষুব্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদিগের দ্বারা উপদ্রুত হইবার পরে আর সংখ্যাগরিষ্ঠদিগের মধ্যে পূর্ববৎ বাস করিতে সাহস করিতেছেন না,—যদি বাঙলার হিন্দুরা পূর্ববঙ্গকে বিচ্ছিন্ন করিতে চাহেন, তাহা হইলে সেই যুক্তিরই সমর্থন করা হইবে—সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ একস্থানে থাকিতে পারে না,—তখন পশ্চিমবঙ্গেও মুসলমানগণ স্বতন্ত্র অঞ্চল চাহিবেন এবং মুসলমানদিগের সেই দাবী—যত অসঙ্গতই কেন হউক না—হিন্দুস্থানের সকল প্রদেশে সেই দাবী উপস্থাপিত হইবে। তখন ফল কি হইবে? এই বিভাগের শেষ কোথায় এবং ইহার ফলে কি ভারতবর্ষ আত্মরক্ষায় ও স্বাধীনতালাভ করিলে তাহা রক্ষায় অক্ষম হইবার সম্ভাবনাই প্রবল হইবে না?

শরৎবাবুর এই প্রধান যুক্তির সহিত আরও ২টি যুক্তির উল্লেখ করা যায়ঃ—

(১) পূর্ববঙ্গের ধনী ও মধ্যবিত্ত হিন্দুরা যাহাই কেন করুন না, পূর্ববঙ্গের দরিদ্র ও কৃষক হিন্দুরা—লর্ড কার্জন যাহাদিগকে ভারতবর্ষের প্রকৃত লোক বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন, তাহারা কি করিবে? তাহাদিগের সংখ্যা আরও হ্রাস পাইবে এবং সেইজন্যই তাহাদিগকে বিপন্মুক্ত হইবার একমাত্র উপায় হিসাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রবল ও উৎপীড়নপটু সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রহণ করিতে হইবে। তাহা

...ন্দ হিন্দুদিগের অভিপ্রেত হইতে পারে না।

(২) পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা নোয়াখালি ও ...পুরা জিলা ২টিতে উপদ্রুত হিন্দু ...নারীর জন্য কি করিয়াছেন যে, আজ ...হারা বলিতেছেন—পূর্ববঙ্গ স্বতন্ত্র প্রদেশ ...া ব্যতীত রক্ষা পাইবার অন্য উপায় নাই? ...ই প্রসঙ্গে কেহ কেহ বঙ্গবিভাগ-বিরোধী ...ান্দোলনের উল্লেখও করিয়াছেন। তখনও ...র্ববঙ্গে ছোটলাট স্যার ব্যামফাইল্ড ফুলার ...সলমানদিগকে "সুয়ো বিবি" বলিয়া ...ভিহিত করিয়াছিলেন এবং সেই অনিষ্ট ...ক্তে পূর্ববঙ্গের মুসলমানগণ আপনা- ...গকে অপমানিত মনে না করিয়া সম্মানিতই ...ন করিয়া যে ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহার ...ভাস পাঠকগণ কংগ্রেসের সভাপতি রাস- ...হারী ঘোষ মহাশয়ের অভিভাষণে পাইবেন। ...িং তখনও রাজশক্তি বলিতে আমরা যাহা ...ঝি, তাহা পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ ...প্রদায়ের সমর্থক আর সেই সম্প্রদায়ও উগ্র ...য়া "লাল ইস্তাহারের" মত জঘন্য প্রচার- ...র্য প্রবৃত্ত। তখন পশ্চিমবঙ্গ হইতে দলে ... তরুণ যাইয়া অত্যাচারের প্রতিকার ...পরতা দেখাইয়াছিল—তাহারাই জামালপুরে ...ময়ীর মন্দিরে অসাধারণ সাহসের পরিচয় ...িছিল। এবার সেরূপ কোন দৃষ্টান্ত নাই। ...রে যাহা হইয়াছে, তাহা নোয়াখালির ...ারের প্রতিক্রিয়া—বিহারী হিন্দুরা বাঙালী ...হইয়াও বাঙালী হিন্দুর প্রতি অত্যাচারে ...ধ হইয়াছিল। বিহারী হিন্দুরা যে কাজ ...য়াছে, তাহা গান্ধীজী প্রমুখ নেতৃগণের ... নিন্দিত হইয়াছে—কংগ্রেসী সচিবসঙ্ঘও ...ার দ্বারা হিংসা দলিত করিয়াছেন— ...র জন্য বিহারী তরুণেরা পণ্ডিত জওহর- ... নেহরুকে অপমানসূচক আক্রমণ ...তেও কুণ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু ...াদ্যোতক কার্যের সম্বন্ধে যত মত- ...ই কেন থাকুক না—অত্যাচারে ...নুভব করা মানুষের মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। ...রিচয় পশ্চিমবঙ্গ কিরূপ দিয়াছে?

পূর্ববঙ্গে ত্যক্ত হিন্দুরা যে তথায় সংখ্যা- ...ষ্ঠ বলিয়া রক্ষার জন্য অধিকার পাইবে, ...াশা সুদূরপরাহত। কারণ, দেখা যাইতেছে, ...লম লীগ এখন আর পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার ... কোন কাজেই দ্বিধানুভব করিতেছেন ... এমন কি কেন্দ্রী সরকারের যে সকল ... এখন মুসলিম লীগের প্রতিনিধি ...দিগের দ্বারা পরিচালিত সে সকলে এখন ...ার ও চাকরীর কালের বিষয় বিবেচনা ...রিয়া কেবল মুসলমান নিয়োগ হইতেছে। লীগের পরিচালকগণ নাকি সেই মর্মে নির্দেশ প্রচারও করিয়াছেন। সম্প্রতি কতকগুলি চাকরীতে নিয়োগ ব্যাপারেও ইহাই দেখা যাইতেছে:—

(১) ডাক ও বিমান বিভাগে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে কার্যে নিযুক্ত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদের দাবী উপেক্ষা করিয়া ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে নিযুক্ত মিস্টার জুবেরীকে সেক্রেটারী করা হইতেছে।

(২) বাণিজ্য বিভাগে মিস্টার সাক্সেনাকে অস্ট্রেলিয়া ট্রেড কমিশনার পদ হইতে সরাইয়া সে পদে মিস্টার আজারকে নিযুক্ত করা হইতেছে।

মিস্টার খাজা নাজিমুদ্দীনকে বিলাতে হাই কমিশনার করিবার কথা ছিল; কিন্তু সে বিভাগ এখন আর বাণিজ্য বিভাগের অধীন নহে—পররাষ্ট্রগত ব্যাপার বিভাগের অধীন হওয়ায় সে প্রস্তাব কার্যে পরিণত হয় নাই।

এই সকল বিষয়ও বিবেচ্য। কারণ, মুসলিম লীগের অধীন সরকারের পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা কিরূপ ব্যবহার পাইতে পারেন, তাহা এই সকল হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।

এই সকল যুক্তির সঙ্গে আর একটি যুক্তিও যোগ করিতে হয়—

বাঙালী কি মুসলিম লীগের পাকিস্থান নীতি—এইভাবে সমর্থন করিবে?

গত ১৩ই মার্চ ৮০ বৎসরের বৃদ্ধ শিখ-নেতা বাবা খড়্গ সিংহ মত প্রকাশ করিয়াছেন—

পাঞ্জাবকে দুই ভাগে বিভক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়া কংগ্রেস ন্যায় পথ বর্জন করিয়াছেন ও অখণ্ড হিন্দুস্থানের দাবী ত্যাগ করিয়াছেন। কংগ্রেস এই প্রস্তাবের দ্বারা পাকিস্থান প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন।

বাঙলার প্রথম মুসলিম লীগ সচিব সঙ্ঘের অর্থসচিব পূর্ববঙ্গকে পৃথক করিবার প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন—তাহাতে পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা এই সান্ত্বনা অনুভব করিবে যে, পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুর সংস্কৃতি প্রভৃতি নিরাপদ আছে। সেইরূপ সান্ত্বনার সার্থকতা কি তাহা যেমন বলা যায় না; তেমনই দেখা যাইতেছে, পূর্ববঙ্গের বহু নেতা বিভাগ-বিরোধী। তাঁহারা যে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদিগের পক্ষ হইয়া মত প্রকাশের অধিকারী তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এইরূপ মতভেদের মধ্যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু-মহাসভা এই বিষয়ের আলোচনার জন্য যে সভা করিয়াছেন, তাহাতে বলা হইয়াছে—কতকগুলি সর্তে বাঙলার হিন্দুরা বঙ্গবিভাগে অসম্মত হইতে পারেন। সে সকল সর্ত মুসলিম লীগের দ্বারা স্বীকৃত হইবে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের বিশেষ কারণ আছে।

পূর্ববঙ্গ যদি পৃথক হয়, তবে যে আর এক বিপদের উদ্রেক হইবে, তাহার সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে। আসামে বাঙলা হইতে কতকগুলি মুসলমান যাইয়া সরকারী জমি দখল করিয়াছিল। তাহাদিগকে উচ্ছেদ করিবার প্রস্তাব তথায় মুসলিম লীগ সচিবসঙ্ঘই করিয়াছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসী সচিবসঙ্ঘ সেই প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন বলিয়া মুসলিম লীগ তাহার বিরোধিতা করিতেছেন। আন্দোলনেই সে বিরোধিতা সীমাবদ্ধ নহে। তথায় এই বিষয় লইয়া যে অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে, তাহা অনুমান করিয়া প্রধান সচিব শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বরদলৈ বাঙলার মুসলিম লীগ সচিবসঙ্ঘের প্রধান সচিব—১৬ই আগস্ট মুসলিম লীগের "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস" সমর্থক মিস্টার সুরাবর্দী আসামে যাইতে চাহিলে তাঁহাকে নিবৃত্ত হইতে বলিয়াছিলেন। এখন মুসলিম লীগ—পাঞ্জাবে যেরূপ উপদ্রব আরম্ভ করিয়া সম্মিলিত সচিবসঙ্ঘের অবসান ঘটাইবার পথ করিয়াছিলেন তেমনই উপদ্রব আসামে করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন। আসামের বাহির হইতে দলে দলে মুসলমানকে বলপূর্বক আসামে প্রেরণ করা হইবে। তাহাতে হয়ত বহু মুসলমানকে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু কংগ্রেসী সচিবসঙ্ঘ যে বিব্রত হইবেন, ইহাতেই লীগপন্থীদিগের পরম আনন্দ।

মিস্টার নাজিমুদ্দীন বা মিস্টার আক্রাম খাঁন, উভয়েই এই "বিজয় অভিযানে" নেতৃত্ব করিবেন কি না, তাহা এখনও জানা যায় নাই। যদি তাঁহারা নেতৃত্ব করেন, তবে যেন মিস্টার ফজলুল হককে সঙ্গে গ্রহণ করেন। তিনিই বলিয়াছিলেন—বিহারের উপদ্রবে লক্ষ মুসলমান নিহত হইয়াছে, এবং তিনিই বলিয়াছিলেন, গান্ধীজী বরিশালে যাইলে তিনিই তাঁহাকে ঠেলিয়া খালের জলে ফেলিয়া দিবেন।

বাঙলাকে বিভক্ত করিবার প্রস্তাব লইয়া যে মতভেদ ঘটিয়াছে, তাহাতে সর্বাপেক্ষা দুঃখের কারণ, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর মত ত্যাগী জননায়কের সম্বন্ধে কোন কোন লোক —বহুদিন অজ্ঞাতবাসের পরে প্রকাশিত হইবার সুযোগ সন্ধান করিয়া—অন্যায়, অপ্রিয় ও অশিষ্ট উক্তি করিতেছেন।

আমরা আশা করি বিভাগের পক্ষে ও বিপক্ষে যেসকল যুক্তি আছে সে সকল বিশেষ-ভাবে বিবেচনা করিয়া বাঙলার হিন্দুরা একযোগে কাজ করিবেন।

বৈদেশিক ভারত

ভারতবর্ষের অন্তর্বর্তী সরকার কর্তৃক নিযুক্ত চীনের সর্বপ্রথম ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীযুক্ত কে পি এস মেনন্ চিয়াং কাইশেকের চীনের রাজধানী ন্যান্কিং শহরে পৌঁছেছেন। তিনি ভারতবর্ষের থেকে চীনের প্রতি এদেশের সহানুভূতি ও সহযোগিতার ইচ্ছা বহন ক'রে নিয়ে গিয়েছেন।

এইটি হ'ল দ্বিতীয় দেশ, যেখানে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত গিয়ে তাঁর কার্যভার গ্রহণ করলেন। প্রথম দেশ মার্কিন, যেখানে ভারতীয় প্রথম রাষ্ট্রদূত হিসাবে মিঃ আসফ আলি গিয়েছেন। চিয়াং কাইশেকের চীনও প্রধানত আমেরিকারই প্রভাব ভূমি বা 'স্ফিয়ার অফ্ ইনফ্লুয়েন্স' এবং আমেরিকার বর্তমান সেক্রেটারী অফ্ স্টেট্ জেনারেল জর্জ মার্শাল এতকাল চীনেই কাটিয়ে গেছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ভারতের বর্তমান বৈদেশিক নীতির কর্তা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এখন পর্যন্ত বৈদেশিক নীতিতে একটি বিশেষ দলের বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধ স্থাপন করে যাচ্ছেন।

এই সম্পর্কে এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মিঃ মেননের ন্যানকিং পৌঁছনোর খবর বেরুবার দুদিন আগেই খবর বেরিয়েছে যে, ন্যানকিং-এর সঙ্গে য়েনান্ বা কমিউনিস্ট চীনের সমস্ত কূটনীতিক সম্পর্ক ছিন্ন হ'ল। সুতরাং ভারতবর্ষের সঙ্গে যে চীনের বৈদেশিক সম্বন্ধ স্থাপিত হ'ল, সেটা সমগ্র চীন নয়, কমিউনিস্ট চীন বাদে শুধু চিয়াং-এর চীন।

দক্ষিণ আফ্রিকাতে ভারতীয় বিদ্বেষের আর একটি নমুনা সম্প্রতি পাওয়া গেল। দক্ষিণ আফ্রিকা বিমানপথে ভারতীয়দের প্রতি যে বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা হয়, তার বিরুদ্ধে ট্রান্সভাল মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রতিবাদের ফলে জানা গিয়াছে, ঐ বিমানপথের বিমানগুলিতে শ্বেতাঙ্গদের বিমানের পিছনের আসনগুলিতে বসানো হয় এবং ভারতীয়দিগকে বসানো হয় সামনের আসনগুলিতে, পাছে উভয়ে ছোঁয়াছুঁয়ি হ'লে শ্বেতাঙ্গদের জাত যায়। দেখা যাচ্ছে, সম্মিলিত জাতি সংঘের কাছে ধাব্‌ড়া খেয়েও দক্ষিণ আফ্রিকার চৈতন্যোদয় হয়নি। আশা করি, অন্তর্বর্তী সরকার এসব বিষয়ে নজর রেখে তার সুব্যবস্থা করবেন।

ডাচ বিমান কোম্পানী KLM-এর বিমান-যাত্রীরা যাতে ভারতের কোন বিমান-বন্দরে অবতরণ করতে না পারে, তার জন্যে হুকুম জারী হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিমান কোম্পানীগুলি সম্বন্ধেও অন্তর্বর্তী সরকারের অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্তব্য।

মস্কো কন্‌ফারেন্স: জার্মানী

রাশিয়ার রাজধানী মস্কো শহরে বৈদেশিক মন্ত্রী সম্মেলনের বৈঠক আরম্ভ হ'ল। নানান্ দিক থেকে এই বৈঠক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। আমেরিকার ভূতপূর্ব ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট মিঃ হেন্‌রী ওয়ালেস্ বলেছেন যে, এই বৈঠক যদি সাফল্যপূর্ণ হয়, তার অর্থ হ'ল পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি আসবে, আর যদি বিফল হয়, তার মানে শেষ পর্যন্ত তৃতীয় মহাযুদ্ধ।

প্যারিস কন্‌ফারেন্স থেকে বিভিন্ন জাতিগুলির সঙ্গে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করা শুরু হয়েছে। তার মধ্যে প্রধানতম হ'ল অক্ষশক্তি ইটালী। এইবারে মস্কোতে প্রধানতম অক্ষশক্তি জার্মানীর সঙ্গে সন্ধির ব্যবস্থাপত্র তৈরী হবার কথা। সুতরাং এইবারের বৈঠকটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

জার্মানীর ব্যবস্থা

যুদ্ধের পর থেকে জার্মানীর ব্যবস্থা নিয়ে ত্রিশক্তির মধ্যে অনেক মতভেদ দেখা দিয়েছে। যুদ্ধ শেষ হবার পরেই পট্‌স্‌ডাম শহরে রাশিয়া, আমেরিকা ও বৃটেনের মধ্যে জার্মানীকে নিয়ে যে চুক্তি হয়, এখন পর্যন্ত খাতায়-পত্রে সেই চুক্তিই ভবিষ্যৎ সন্ধিপত্রের ভিত্তি। এই চুক্তির উদ্দেশ্য মোটামুটি দুইটিঃ প্রথম, যুদ্ধের জন্য জার্মানী কর্তৃক বিভিন্ন দেশকে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা এবং দ্বিতীয় হ'ল, জার্মানীর নাৎসীতন্ত্রের সমূলে উৎপাটন ক'রে, শান্তিকালের উপযোগী ক'রে জার্মাণীর পুনর্গঠন। এই দেড় বছরের ভিতর এই বিষয়ে বহুবার রাশিয়ার সঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিন-ফরাসী মতবিরোধ হয়েছে। পট্‌স্‌ডামের চুক্তি অনুসারে জার্মানীকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। এক একটি ভাগ হ'ল, এক একটি বৃহৎ মিত্রশক্তির অধিকৃত এলাকাঃ (১) রাশিয়া, (২) ইংলণ্ড, (৩) আমেরিকা, (৪) ফ্রান্স। এই চারটি এলাকার শাসনতন্ত্র একরকম হয়নি। মার্কিন, বৃটিশ ও ফরাসী এলাকা থেকে অনেক রকম কুশাসনের খবর এই দেড় বছরে প্রকাশ পেয়েছে। প্রধানত কয়লার অভাব, খাদ্যের অভাব ও বস্ত্রের অভাব। তা ছাড়া বিশেষভাবে মার্কিন এলাকায় চোরাবাজারের খুব বেশী প্রভাব ও সামরিক কর্মচারীদের মধ্যে অনেক দুর্নীতি দেখা দিয়েছে। এত বেশী বেড়েছিল যে, আমেরিকায় অনেক খবর চাপা দিতে হয়েছে।

পশ্চিম জার্মানীতে মার্কিন ও বৃটিশরা জার্মানীর মাথায় কাঁঠাল ভেঙে পুরোদমে ব্যবসা চালাচ্ছে। তা ছাড়া সেখানে সাবেকী জমিদারী ব্যবস্থা কায়েমী রাখা হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়নও নিষিদ্ধ। রুশ এলাকায় জমিদারদের ক্ষমতা সংকুচিত ক'রে চাষীদের অবস্থা উন্নত করা হয়েছে এবং ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতি সর্বপ্রকারের শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষমতা খুব বেশী বাড়ানো হয়েছে। এই সবের জন্যে পশ্চিম জার্মানীতে রুশ এলাকার ছোঁয়াচ লেগে অশান্তি বাড়বার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

এ ছাড়া, ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে পটস্‌ডাম চুক্তি অনুসারে পশ্চিম জার্মানীর যে সব শিল্প-সংক্রান্ত কারখানা প্রভৃতি রাশিয়া পাবে ব'লে ধার্য হয়েছিল, এই দেড় বছরে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি তার প্রায় কিছুই দেয় নি এবং সম্ভবত দেবার মতলব নেই ব'লে রাশিয়া বার বা[র] অভিযোগ করেছে। অবশ্য এই না দেবা[র] মতলব যে জার্মানীর প্রতি সহানুভূতি তা ন[য়] আসলে ইঙ্গ-মার্কিনের নিজেদের ভো[...] আনা।

এইসব নানান্ কারণে জার্মানী নি[য়ে] রাশিয়ার সঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিনের মতান্তর লেগে আছে। সম্প্রতি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যোগাযো[গ] আরও ঘনিষ্ঠ করবার ও জার্মানীর অধি[...] এলাকায় ব্যবসায়িক ও শিল্পিক স্বার্থ আরও সুসংবদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে জার্মানীতে বৃটিশ ও মার্কিন এলাকার শাসনতান্ত্রিক নীতি পরস্পর যুক্ত করা হয়েছে। এখন ইঙ্গ-মার্কি[ন] দাবী করছে যে, সমগ্র জার্মানীকে এক করতে হবে, সম্ভবত এই উদ্দেশ্যে যে, সম[গ্র] জার্মানীতে যাতে ইঙ্গ-মার্কিন শোষণ কায়ে[ম] করতে পারা যায়।

মস্কো কন্‌ফারেন্সে এই বিষয়ের চূড়া[ন্ত] মীমাংসা হবার কথা। আশা করা যায়, রাশি[য়া] এ বিষয়ে বাধা উপস্থিত করবে।

প্রকাশ, আমেরিকার বর্তমান সেক্রেটা[রী] অফ্ স্টেট জেনারেল মার্শাল নাকি ভূতপূ[র্ব] সেক্রেটারী অফ্ স্টেট্ মিঃ বির্নসের নী[তি] অনুসরণ ক'রে চতুঃশক্তির মধ্যে একটি চু[ক্তি] করাবার চেষ্টা করবেন, যাতে জার্মানী আগা[মী] ৪০ বছরের মতো নিরস্ত্র থাকে।

মস্কো কন্‌ফারেন্স: চীন

মস্কো কন্‌ফারেন্সের কার্যতালিকায় [...] রাশিয়া চেয়েছিল, চীনের ব্যাপারকে অন্ত[...] করতে। চীনের প্রতিনিধি তা'তে ঘোর আপত্তি জানিয়ে বলেছেন, চীনের আভ্যন্ত[রীণ] ব্যাপারে সম্মিলিত জাতি সঙ্ঘের কোন হস্তক্ষেপ করা চলবে না। এখানে ত[...] চীনের প্রতিনিধি বল্‌তে বুঝতে হবে, [...]

কাইশেকের চীন। কমিউনিস্ট চীনের কোন প্রতিনিধি সম্মিলিত জাতি সংঘে নেই এবং চিয়াং কাইশেক বরাবরই আমেরিকার বন্ধু ও উমেদার। সুতরাং চীনের প্রতিনিধির এই আপত্তি যে আমেরিকার দরদ জাগাবে, এ জানা কথা। আমেরিকা, বৃটেন ও ফ্রান্স চীনের সংগে রাশিয়ার বিরুদ্ধে জোট বাঁধে। ফলে রাশিয়া তার প্রস্তাব প্রত্যাহার করে।

প্রস্তাব পরাজয়ের কারণে দেখা যাচ্ছে ব্লক-ভোটিং বা ভোটের জোট-বাঁধা, প্রস্তাবের যৌক্তিকতা বা অযৌক্তিকতা নয়। সম্মিলিত জাতিসংঘের মূল সনদের সর্ত অনুসারে যে কোন দেশের যে কোন অন্তর্বিরোধ সম্বন্ধে আলোচনা চলতে পারে, যদি সেই অন্তর্বিরোধ এমন আকার ধারণ করে যাতে বিশ্ব-শান্তি বিপন্ন হতে পারে। চীনের গৃহযুদ্ধ ক্রমশ বাড়তে আরম্ভ করেছে এবং তার দ্বারা সমগ্র এশিয়ার অবস্থা ক্রমশ সংকটাপন্ন হবার আশংকা দেখা দিচ্ছে। সুতরাং ঐ প্রশ্ন শুধু চীনের আভ্যন্তরীণ প্রশ্ন বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

চীনের প্রশ্ন আজ মস্কো কনফারেন্সে আলোচিত হলে, একটা সম্ভাবনা এই ছিল যে, আলোচনা প্রসংগে চীনের বর্তমান গৃহযুদ্ধের পিছনে আমেরিকার উস্কানী কতখানি ছিল তার রহস্য প্রকাশ হয়ে পড়বার আশংকা ছিল। তা ছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিদের উদ্যোগে সম্মিলিত জাতিসংঘে যে অভিজ্ঞতা ইংগ-মার্কিনী দলের জাতিগুলি লাভ করেছিল, তার পরে আর চীন নিয়ে ঘাঁটাবার ভরসা বোধ হয় ইংগ-মার্কিনের হয় নি। যাই হোক চীনের গৃহযুদ্ধ যদি আরও বৃহদাকার ধারণ করে, তবে আর কতকাল ঐ প্রশ্ন সম্মিলিত জাতিসংঘ থেকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হবে, বলা চলে না।

গ্রীস, আমেরিকা ও জাতিসংঘ

কিছুকাল আগে গ্রীসের মন্ত্রী আমেরিকার কাছে সাহায্য ভিক্ষা করেছিলেন এবং গ্রীসে গেরিলা যুদ্ধ প্রসংগে বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া প্রভৃতি দেশের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপের অজুহাতে সম্মিলিত জাতিসংঘের কাছে অনুসন্ধানের দাবী করেছিলেন। জাতিসংঘ সেই অনুসারে একটি তদন্ত কমিটি গ্রীসে পাঠিয়েছেন এবং তাঁরা কাজও আরম্ভ করেছেন।

সম্প্রতি আমেরিকা বলেছিল যে, আমেরিকা গ্রীসকে প্রচুর সাহায্য করতে পারে, যদি গ্রীস থেকে বৃটিশ সৈন্য সরানো না হয়। এবারে স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান মার্কিন দেশের কংগ্রেসের নিকট আবেদন জানিয়েছেন, যাতে আমেরিকা গ্রীসকে ও তুর্কীকে চল্লিশ কোটি ডলার সাহায্য করে এবং গ্রীসে মার্কিন সামরিক ও বেসামরিক দল পাঠানো হয়। এই প্রস্তাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই প্রস্তাব গৃহীত হলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার প্রতিক্রিয়া বহুদূর পেঁছিবে। ঐ প্রসংগে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা তিনি বলেছেন। তিনি বলেন যে, গ্রীসের ব্যাপার সামলানো সম্মিলিত জাতিসংঘের সাধ্যায়ত্ত নয়, আমেরিকাই তা পারে। এটা পরিষ্কারভাবে জাতিসংঘের কর্তৃত্ব ও অধিকারকে চ্যালেঞ্জ করা, হিটলারী জার্মানী লীগ অফ নেশনস্ ছাড়বার আগে যে রকম ঔদ্ধত্য দেখিয়েছিল, এটাও প্রায় সেই রকম। উল্লেখযোগ্য এই যে, ঠিক মস্কো কনফারেন্সের আরম্ভকালে এই প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়েছে। —বো

৩০শে ফাল্গুন, ১৩৫৩

নবীন লেখক

কয়েকজন পাঠক কিছু কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে আমাকে চিঠি লিখেছেন। আমি সে সব চিঠির জবাব দিইনি তার একমাত্র কারণ আমি ও সব প্রশ্নের জবাব জানিনে। জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলেছেন, প্রশ্ন জিজ্ঞেস করো না, জিজ্ঞেস করলে মিথ্যে জবাব শুনতে হবে অর্থাৎ কিনা জ্ঞানী ব্যক্তিরা মিথ্যে জবাব দেবার জন্য তৈরি হয়েই আছেন। আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, এই প্রবাদ-বাক্যটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কারণ আমি যখনই কোনো প্রশ্ন করেছি তখনই মিথ্যা জবাব পেয়েছি। হতে পারে উত্তরদাতা সত্যি কথাই বলেছেন কিন্তু সেই সত্য কথা আমার মনঃপূত হয়নি। কাজেই আমার কাছে সে জবাব মিথ্যা হয়েছে। আমি জানি আমি জবাব দিতে গেলেও সে জবাব আপনাদের মনঃপূত হবে না অর্থাৎ কিনা আমার কাছে আপনারা মিথ্যে জবাব শুনবেন। তাছাড়া মিথ্যে জবাব দিবার জন্য যেটুকু জ্ঞান থাকা দরকার সেটুকুও আমার নেই। আমি জ্ঞানের ভাণ্ডারী নই, আমি রসের কারবারী। আমি রস সমুদ্রে ডুবতে রাজি আছি কিন্তু জ্ঞান সমুদ্রের উপকূলে নুড়ি কুড়োতে রাজি নই। আমাদের পণ্ডিত ব্যক্তিরা নিউটনের দেখাদেখি নুড়ি কুড়াতে ব্যস্ত। সে সব নুড়ি কুড়িয়ে কুড়িয়ে তাঁরা ঝুড়ি ভর্তি করেছেন, যার যখন তখন সে সব লোষ্ট্র নিক্ষেপ করে আমাদের মাথার অবস্থা যা করেছেন সে আর বলবার নয়। পরদ্রব্যেষু মতো পরা অপরা সব রকম বিদ্যাকে আমি লোষ্ট্রবৎ জ্ঞান করেছি এবং মাথা বাঁচিয়ে চলবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একবার প্রবেশ করলে ওসব ঢিল অল্প-বিস্তর মাথায় লাগবেই। সুস্থ অক্ষত মাথা নিয়ে খুব কম লোকেই ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। কিন্তু ঢিল ছুড়লে পাটকেলটি খেতেই হয়। এজন্য সুযোগ পেলেই ইন্দ্রজিতের খাতার তরফতে আমি পণ্ডিতদের লক্ষ্য করে পাটকেল ছুঁড়ে মারি।

যাকগে, যা বলতে যাচ্ছিলাম, পাবনা থেকে জনৈক পাঠক আমাকে একখানা চিঠি লিখেছেন। তিনি নিজে একজন নবীন লেখক! লেখক মাত্রই আমার আত্মীয়, সে আত্মীয়তায় আমি গৌরব অনুভব করি। ঐ সাধারণ সম্পর্ক ছাড়াও এ'র সংগে আমার বিশেষ একটি আত্মীয়তা আছে। তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে ইন্দ্রজিৎ ছদ্মনামে কিছু কিছু লেখা তিনি লিখেছেন। অবশ্য সে সব লেখা স্থানীয় কোনো কাগজে ছাপা হয়েছিল কাজেই তেমন প্রচারিত হয়নি। একই ছদ্মনাম গ্রহণের মধ্যে তাঁর এবং আমার কোথাও একটি মনের মিল রয়েছে একথা আবিষ্কার করে তিনি আনন্দ বোধ করেছেন। স্বনামেও ইনি লিখে থাকেন।
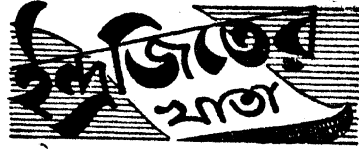
এতৎসম্পর্কে নবীন লেখকদের হয়ে কিছু কিছু দুঃখের কথা তিনি আমাকে জানিয়েছেন। লেখক হয়ে লেখকের দুঃখ যদি না বুঝি তবে আমি লেখক নামের অযোগ্য। তাছাড়া আমি বয়সে নিতান্ত প্রবীণ না হলেও নবীন নই, কিন্তু লেখক হিসেবে আমি অপেক্ষাকৃত নবীন। কারণ আমি লেখা শুরু করেছি খুব বেশি দিন নয়। এখনও অখ্যাতনামা লেখক। নবীন বয়সে এক আধখানা বই লিখেছিলাম প্রথম সংস্করণেই তাদের কৈবল্যপ্রাপ্তি হয়েছে। সে সব বই নিশ্চয় যথেষ্ট পুণ্যসঞ্চয় করেছে কারণ তাদের পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। ইদানীং টেকনিক বদল করেছি। খ্যাতিলাভের জন্য স্বনাম গোপন করে ছদ্মনামে আসরে নেমেছি। অচেনার বন্ধন সবচেয়ে বড় বন্ধন। রে অচেনা, মোর মুষ্টি ছাড়াবি কি করে যতক্ষণ চিনি নাই তোরে? জানি অচেনা মানুষকে লোকে একটু খুঁচিয়ে দেখবেই। অচেনাকে চিনে তবে শান্তি। আমার পত্র-প্রেরকটি বলেছেন, বেশি দিন আপনার নাম অজানা থাকবে না। অতি উত্তম কথা, তাই তো চাই। যে মুহূর্তে লোক চিনে ফেলবে সে মুহূর্তে মুখোস খুলে ফেলে স্বরূপ আত্মপ্রকাশ করব।

লেখক বন্ধুটি দুঃখ করে লিখেছেন, নবীন লেখকদের কেউ পাত্তা দিতে চায় না, লেখা ছাপায় না। এইতো 'উপযুক্ত' নামে একটি গল্প অমুক পত্রিকায় পাঠিয়েছিলেন সেটি কেন যে তাঁরা অনুপযুক্ত বিবেচনা করেছেন তা তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না। এ বড় কঠিন প্রশ্ন। সম্পাদকের মনের কথা দেবাঃ ন জানন্তি, আমি কেমন করে জানব? ও'র মতো বয়সে আমি কোনো দিন কোনো পত্রিকায় লেখা পাঠাইনি, পাঠালে নিশ্চয় অনুপযুক্ত বিবেচিত হত। আর তা হলেও আমি কিছুমাত্র বিচলিত হতাম না। কারণ, অপরে অযোগ্য বললেই লেখক অযোগ্য হয় না। নবীনদের অনেকের মুখেই শুনেছি বাঙলা দেশের সব পত্রিকা মামুলি লেখকদের দিয়েই চলছে, নবীনদের প্রবেশ নিষেধ। এ কথার জবাবে আমি এইটুকুই শুধু বলব যে, মামুলি লেখক বলে কোনো কথা নেই। লেখা যদি মামুলি হয় তবে সেটা নিশ্চয় অগ্রাহ্য এবং মামুলি লেখা প্রবীণরাও লিখে থাকেন, নবীনরাও।

এ সূত্রে সম্পাদক মশায়দের কাছে আমার একটি নিবেদন আছে। তাঁদের প্রধান কাজ হচ্ছে সাহিত্য পরিবেশনের কাজ। সেই পরিবেশনের কাজে আমরা অবশ্যই আশা করব যে তাঁরা নতুন নতুন সাহিত্য-প্রতিভা আবিষ্কার করবেন। কালি-কলম কল্লোল—এই দুটি পত্রিকা বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে কারণ এ'রা বহু নবীন প্রতিভাকে পাঠক সমাজের সংগে পরিচিত করে দিয়েছিলেন এবং উত্তরকালে এ'দের মধ্যে অনেকে সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। কিছুদিন পূর্বে আমাদের একজন অতি বিশিষ্ট সাহিত্যিক কথাপ্রসংগে বলেছিলেন যে, তাঁর লেখা প্রথম গল্পটি কোন সুপরিচিত পত্রিকার আপিসে বছরখানেক ফাইল-বন্দী হয়ে পড়েছিল। যতবার তাগিদ দিয়েছেন ততবারই বলছেন, গল্পটি বিচারাধীন আছে। পরে ঐ গল্পটি উদ্ধার করে তিনি 'কল্লোল' পত্রিকায় পাঠান। one man's poison is another man's food. গল্পটি তৎক্ষণাৎ প্রকাশিত হয় এবং ঐ এক গল্পের জোরেই সাহিত্যের আসরে লেখকের আসন পাকা হয়। সম্পাদক মহাশয় গল্প লেখককে লিখেছিলেন আপনার এমন পাকা হাত, আপনি এতকাল কোথায় ছিলেন? একেই বলে সম্পাদকীয় প্রতিভা। অমিট্ রায়ের মতো বলা নেই কওয়া নেই গোটা একটা নিবারণ চক্রবর্তী এ'রা সর্ব-সমক্ষে হাজির করে দিতে পারেন। মানলাম অপরিচিতের নাম ধরণীতে, পরিচিত জনতার সরণীতে। সম্পাদক হবেন অনাগত বিধাতা। যিনি আজও অনাগত তাঁকে তিনি আমাদের সম্মুখে এনে দেবেন। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক স্যার হামফ্রে ডেভিকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আপনার সবচেয়ে বড় আবিষ্কার কি। ডেভি তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়েছিলেন, Faraday is my greatest discovery. ডেভির লেবরেটরিতে ফ্যারাডে ছিলেন ছোকরা চাকর। ঐ বালকের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ডেভি আবিষ্কার করেন এবং তার উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। সম্পাদক মশায়দের কাছে আমরা নবীন লেখকের promise সম্বন্ধে অনুরূপ অন্তর্দৃষ্টি প্রত্যাশা করি।

রবীন্দ্রনাথের ছবি

কবির চিত্রধারায় অগণ্য বিষয়বস্তুর মধ্যে বিচিত্র চারিত্র্যদ্যোতক মুখমণ্ডলা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। বিসদৃশ ছদ্মমুখের বিরূপ এবং ভয়াবহ ভঙ্গিমার প্রতিপক্ষ দাঁড়ায় মায়াময় সকরুণ স্নিগ্ধ মুখচ্ছবি। যাবতীয় মানসিক ভাবাবেগ ব্যঞ্জিত হয় এই দুই অন্ত্য-সীমার মধ্যবর্তী বিভিন্ন মুখাবয়বে।

জান্তব আকৃতি এবং পক্ষীরূপে কল্পনার খেলা যতটা অবাধ, মনুষ্যাকৃতি রচনায় তত সাদৃশ্যমুক্তি সর্বদা পাওয়া যায় না, কিন্তু দেহের গতিভঙ্গী এবং অঙ্গচেষ্টার সার্থক ব্যঞ্জন প্রায়ই বর্তমান। রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত বহ অবাস্তব জীবাকৃতিও প্রাণবান লাগে। বল বাহুল্য অপ্রাকৃত রূপের এই প্রাণবত্তা পার্থি কোন বিশেষ জীবের জীবন-সংশ্লিষ্ট নয়— নিছক প্রাণসত্তার প্রকাশ। জীববিদ্যাবিরোধী মায়া জগতের বিচিত্র অধিবাসীরা যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের অসম্ভাব্য আদিম প্রাণী স্বপ্নস্মৃতি।

দেশীয় চিত্রকলার পুনরুজ্জীবনে রবীন্দ্র নাথের উদ্দীপনা অমূল্য, কিন্তু অবশেষে কবি স্বয়ং যখন রেখা রঙের কুহকে মুগ্ধ হলে পুনরুদ্বোধনের কোন প্রশ্ন ওঠেনি মন কোন বিশেষ দেশের, বিশেষ ঐতিহ্যের, বিশে পদ্ধতির অন্তর্গত নয় তাঁর অত্যন্ত অভিন মুক্ত শিল্পপ্রয়াস। রঙে রেখায় সৃষ্ট এ স্বত জগৎ চিত্রকলার এলাকায় পৌঁছয়, যদিও নানা গুণের ঐন্দ্রজালিক সমন্বয় দক্ষ চিত্র সৃষ্টিকে শাশ্বত করে তোলে সেই সর্বাঙ্গ দ্যোতনা সর্বদা মেলে না কবির অঙ্কনপ্রয়া ঐকান্তিক স্বকীয়তা, অশেষ উদ্ভাবন এ অপরিমিত বৈচিত্র্য, স্বভাবতই ঐতিহ্য স্থায়ী শিল্পের প্রতিকূল। এই চিত্রধার অকৌলীন্য তাঁর কাব্য-রীতির সঙ্গে তুল স্পষ্ট হবে। রবীন্দ্র-কাব্যের নৈর্ব্যক্তিক বিশ্ব জনীনতার তুলনায় অস্পষ্ট চেতনার পটভূমি আকারের এই নৃত্যচাঞ্চল্য অনেকাংশে আত্মমুখ অনির্দেশ্য ভাবনা এবং ব্যক্তিগত কল্পনার অনাহ প্রকাশ। রেখার নির্ভীক প্রয়োগ, আকারে সুশৃঙ্খল বিন্যাস, পটাবকাশের বণ্টনে সূক্ষ্ম মাত্রাজ্ঞান, দ্বিধাহীন বর্ণদ্যুতি ইত্যা শিল্পোচিত কয়েকটি গুণের অস্তিত্ব, কল্প ও বাস্তবের সম্মিলনে রচিত এই অদ্ভু জগৎকে শুধুই স্বগত অনুষঙ্গ এবং ব্যক্তিগ প্রতীকের প্রকাশ থেকে রক্ষা করেছে।

সমগ্রভাবে কবির চিত্রাঙ্কন প্রয়াস অব কলা-দক্ষতার প্রচলিত রীতিনীতির বিরোধ পুনরাবর্তন-জর্জরিত নিস্পন্দ ম্রিয়মান শিল্প গতানুগতিকতা স্বীকার করেন নি কবি। কি রবীন্দ্র-প্রতিভা শুধুই বৈনাশিক নয় এবং চি রচনায় উৎকর্ষের বিলক্ষণ অসমতা সত্ত্বেও এব অবশ্যস্বীকার্য যে, আঙ্গিক নৈপুণ্য, রীতি পদ্ধতি, স্থান কাল এবং পরম্পরার ধ্বংসস্ত থেকে পুনর্গঠিত বাস্তবিক রসোত্তীর্ণ চি সংখ্যাও প্রচুর।
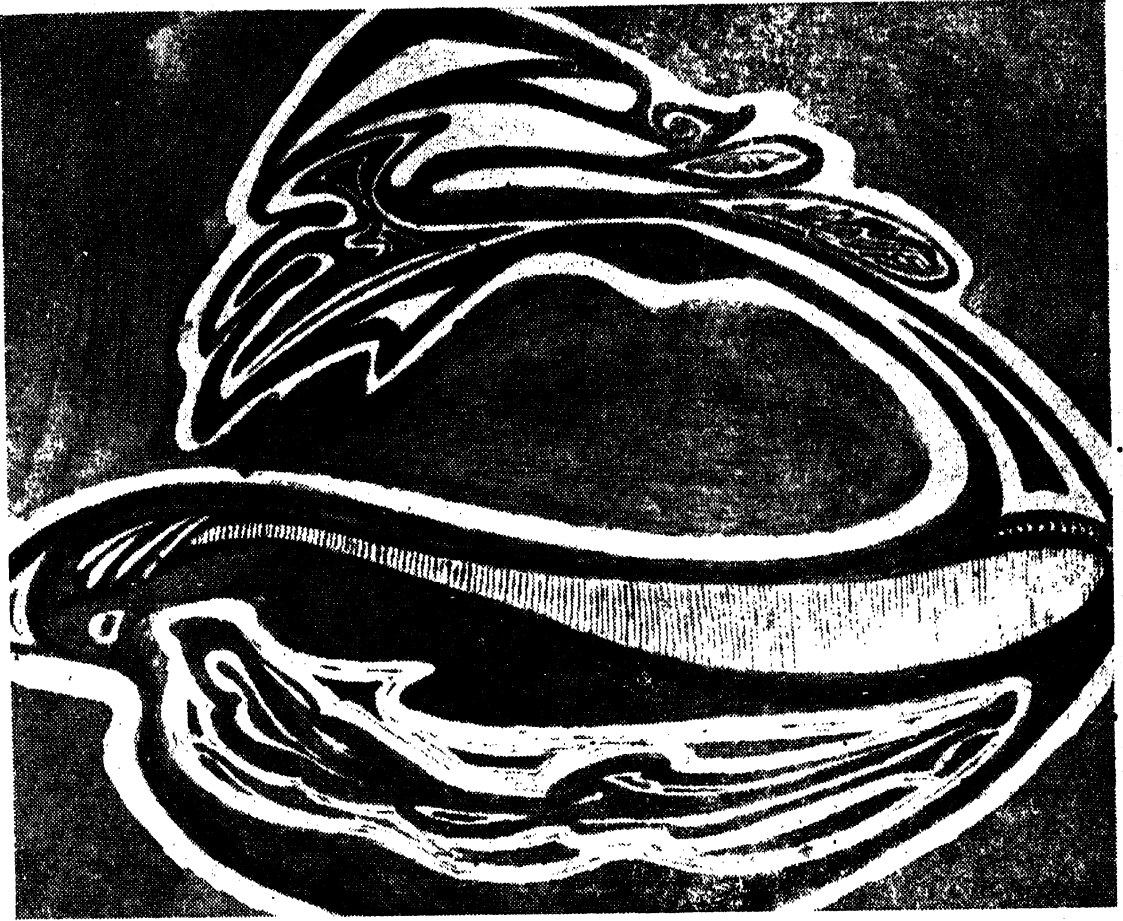
তোরে আমি চিনিয়াছি রেখায় রেখায়
লেখনীর নটনলেখায়।
নির্বাকের গুহা হতে আনিয়াছি
নিখিলের কাছাকাছি।
যে সংসারে হতেছে বিচার
নিন্দা প্রশংসার।
এই আস্পর্ধার তরে
আছে কি নালিশ তোর রচয়িতা আমার উপরে।
অব্যক্ত আছিলি যবে
বিশ্বের বিচিত্র রূপ চলেছিল নানা কলরবে
নানা ছন্দে লয়ে
সৃজনে প্রলয়ে।

অপেক্ষা করিয়া ছিলি শূন্যে শূন্যে, কবে কোন্ গুণী
নিঃশব্দ ক্রন্দন তোর শুনি
সীমায় বাঁধিবে তোরে সাদায় কালোয়
আঁধারে আলোয়।
পথে আমি চলেছিনু। তোর আবেদন
করিল ভেদন
নাস্তিকের মহা অন্তরাল,
পরশিল মোর ভাল
চুপে চুপে
অর্ধস্ফুট স্বপ্নমূর্তিরূপে।
অমর্ত্য সাগরতীরে রেখার আলেখ্যলোকে
আনিয়াছি তোকে।

ব্যথা কি কোথাও বাজে
মূর্তির মর্মের মাঝে।
সুষমার অন্যথায়
ছন্দ কি লাঞ্ছিত হল অস্তিত্বের সত্য মর্যাদায়।
যদিও তাই বা হয়
নাই ভয়,
প্রকাশের ভ্রম কোনো
চিরদিন রবে না কখনো।
রূপের মরণদুটি
আপনিই যাবে টুটি
আপনারি ভারে,
আর বার মুক্ত হবি দেহহীন অব্যক্তের পারে।

বসন্ত-উৎসব

অমল হোম

বসন্ত-উৎসবের 'প্রধান অতিথি' যিনি,—তিনি ডাকবার অপেক্ষা রাখেন না। না ডাকতেই, তিনি আসেন,—"উড়ায়ে চঞ্চল-পাখা পুষ্পরেণুগন্ধমাখা দক্ষিণ সমীর";—আসেন উড়িয়ে তাঁর 'উতলা উত্তরীয়',—ঝরা পাতার বীতরাগকে শ্যাম-অনুরাগে স্নিগ্ধ করে।

আপনারা এনেছেন আমাকে ডেকে। প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তসীমায় পৌঁছিয়ে বসন্ত-উৎসবের 'প্রধান অতিথি'র আসনে এসে বসা দেখায় যেমন বেমানান, শোনায়ও তেমনই। বে-সুর। বসন্ত-উৎসব যৌবনের উৎসব। যৌবনের উৎসাহ-উদ্দীপনা, যৌবনের আগ্রহ-অনুরাগ, যৌবনের দীপ্তি ও তৃপ্তি—সবই এসেছি পিছনে ফেলে। আপনাদের কাছে এসে, আপনাদের দেখে,—সেই কথা আরও বেশি ক'রে মনে পড়ছে।

কেন যে আপনারা আমাকে ডেকেছেন, তা সত্যিই জানি না। যদি কবি হতাম, তবে বা হয়তো আমার ছন্দে স্পন্দিত হোত আপনাদের বসন্ত-অন্তর। যদি শিল্পী হতাম, তবে বা হয়তো আমার 'তুলির লিখন' নন্দিত করতো আপনাদের নয়ন। যদি বক্তা হতাম, তবে বা হয়তো আমার বাকবিভূতি করতো আপনাদের অভিভূত। আমি এর একটিও নই।

আমি সেই নিত্যকার অনিত্য নিউজ-পেপারের ব্যাপারী,—যা প্রত্যহ পথপ্রান্তে ফেলে যায় তার নিশান্তের সঞ্চয়। তার শুকনো পাতার পীতরাগকে বসন্তও পারে না রাঙিয়ে দিতে;—ভ্রমরগুঞ্জনে জাগে না তার মর্মরধ্বনি; কোনো হৃদয়-স্পন্দনে ধ্বনিত হয় না তার সাড়া। আপনাদের এ উৎসবের সুরে সুর মেলাতে পারি, এমন সামর্থ্য আমার কোথায়?

তবু, আপনাদের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারিনি,—কেন না বনে যাবার বয়স পেরিয়ে গেলেও মনটা ঠিক বন-মুখী হয় নি। তরুণের সঙ্গ সে কামনা করে আজও,—কেন না সে জানে তারুণ্যামৃতধারাতেই আছে প্রাণের সঞ্জীবনীমন্ত্র;—আপনাদের হাতেই আছে রূপ-কথার সেই 'জিয়নকাঠি'!

যৌবনের সেই জাদুকাঠির স্পর্শে মূকও বাচাল হয়, পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করে। তবে, আমি মূক নই,—কেন না নিজের বৈঠকখানায় যখন বসি, তখন আমার বক্‌বকানির চোটে বন্ধুদের কাছ থেকে আখ্যা অর্জন করি—'বক্‌-তিয়ার খাঁ!' আর পঙ্গুও নই, যদিও—বসতে পারলে আর দাঁড়াতে চাও না',—আমার জাড্য-দোষের এ ব্যাখ্যা নিত্যই শুনে থাকি আমার ঘরের লোকের কাছে।

আপনাদের অনুরোধ আমাকে, কিছু ব'লতে হবে। কিন্তু কি যে ব'লবো তাতো পাইনে ভেবে। আমি আপনাদের এই কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের একজন নই। আমার বহু বন্ধুর এখানে পড়বার সৌভাগ্য হ'লেও আমার তা হয়নি। তাঁদের অনেকেই আজ সবিশেষ কৃতী। তাঁদের মধ্যে লক্ষ্ণৌর নির্মল সিদ্ধান্ত, ঢাকার হরিদাস ভট্টাচার্য, ক'লকাতার কালিদাস নাগ, হারীতকৃষ্ণ দেব,—এঁদের নাম কে না জানে? আমার অনেক স্নেহাস্পদও এখানে পড়েছেন;—আজ আমার কন্যা ও কন্যাস্থানীয়া একটি আপনাদের অনেকের সহপাঠিনী। আপনাদের প্রাক্তন ও বর্তমান অধ্যাপকদের মধ্যেও আমার বন্ধুবান্ধব কয়েকজন আছেন বৈকি। তাঁদের সকলকে আজ অবশ্য এখানে দেখছি না। আপনাদের প্রাক্তন অধ্যক্ষ পরম শ্রদ্ধেয় আর্কুহার্ট সাহেবের সঙ্গে আমার বিশেষ যোগ ছিল। রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবের উদ্‌যোগ পর্বে আমি তাঁর যথেষ্ট সহায়তা পেয়েছিলুম। আজ সকৃতজ্ঞ অন্তরে সে-কথা স্মরণ করি। এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে, স্কটিশের প্রাক্তন ছাত্র, তখনকার ক'লকাতার মেয়র সুভাষচন্দ্রকে, — 'নেতাজীকে', — প্রধান অতিথিরূপে পাবার দৌত্যকার্যে তিনি বন্ধুবর হারীতকৃষ্ণ দেবকে প্রথম আমার কাছেই পাঠান। আমি তাঁকে নিয়ে যাই সুভাষচন্দ্রের কাছে। হারীতকৃষ্ণের সহজাত সৌজন্য ও বিদগ্ধ-বাক-পটুতার সঙ্গে আমারও অনুরোধেরও জোর ছিল কতকটা,—শেষ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রকে রাজী করানোতে। তাঁর বাধা ছিল বড়লাট আরউইনের উপস্থিতি-সম্ভাবনা। লাটবাহাদুর শেষ পর্যন্ত আসেননি। আর্কুহার্ট সাহেবও সেজন্য একটুও ব্যস্ত হননি। পরম সমাদরে সম্বর্ধিত সুভাষচন্দ্র সগৌরবে আপনাদের শতবার্ষিকী উৎসবের অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন। আজকের এই উৎসব-সভায় এসে, সে-উৎসবের স্মৃতি আমার মনের পটে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠছে।

বসন্ত-উৎসবে ব'সে গানের পর গান শুনছি। ঠিকই হচ্ছে। গায়কদের কণ্ঠের কায়দা-কেরামতির তারিফ করতেই হবে,—শ্রোতাদের আগ্রহেরও করবো বইকি! কিন্তু অবাক হচ্ছি এই ভেবে,—এ-উৎসবে কোথায় তাঁর স্থান,—যিনি বসন্ত বর্ষা শরৎ হেমন্তের আবর্তনে গেঁথেছেন তাঁর গানের মালা,—যাঁর ঋতুরঙ্গশালায় নব নব ঋতুর তালে তালে চলেছে অবিরাম নৃত্য? কোথায় আজ এ-উৎসবে রবীন্দ্রনাথের বসন্ত-গানের হিন্দোলা?—কোথায় তার 'নূতন প্রাণের পুলক-ছাওয়া পরশ'? এখানে ব'সে শুনলাম অনেক কিছুই,—শুনছি না শুধু তাঁর, গান! উদ্বোধনে অবশ্য 'ফাগুন লেগেছে বনে বনে', কিন্তু 'সে আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে' সব গানে কোথায়? তারপর মাঝে একটিবার 'ভীরু মাধবী'র সুরের হাওয়া বিনা দ্বিধায় ফেলেছিলো বটে ছেয়ে এই বৃহৎ কক্ষ;—তার পর থেকে শুনছি,—ক্রমাগতই শুনছি, যাকে আপনারা বলেন "আধুনিক সঙ্গীত",—যার অঙ্গে বসন্তের এতটুকু ইঙ্গিতও জাগায়নি তার বাণী! বসন্তরাজের 'উজ্জ্বল সাজ' আজ ম্লান হোলো, নিষ্প্রভ হোলো 'সঙ্গীবিহীন অন্ধকারে',—তাঁর আগমন রইলো অসম্বর্ধিত—আধুনিকতার স্পর্ধায়! দেখতে পাচ্ছি আপনারা অনেকেই ক্লাসলেস্ সোসাইটিতে বিশ্বাসী হ'লেও বাঙলা গানের ক্লাসিফিকেশনে অল-ইণ্ডিয়া রেডিওর অহেতুক ও অযৌক্তিক শ্রেণীবিভাগ নিয়েছেন মেনে:—বাঙলা গানকে ভাগ করেছেন দুই অতি স্থূল ভাগে—'রবীন্দ্র-সঙ্গীত' ও 'আধুনিক সঙ্গীত' আমি এ কৃত্রিম বিভাগ বুঝতে পারি না ঠিক। যা 'রবীন্দ্র-সঙ্গীত' নয়, তাই কি 'আধুনিক সঙ্গীত'? আর যা কিছু প্রাচীন, তাই বুঝি 'রবীন্দ্র-সঙ্গীত'?

আমাদের সঙ্গীতের এই শ্রেণীবিচার কোন্ শাস্ত্র-সম্মত জানি না;—কিন্তু 'আধুনিক সঙ্গীত' নামে যে বিচিত্র বস্তুটি আজকাল চলছে সর্বত্র, তা তো দেখতে পাই—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই—রবীন্দ্রনাথেরই গানের বিচ্ছিন্ন পংক্তিকে অপাংক্তেয় ও তাঁরি দেওয়া সুরকে বিকৃত ক'রে হয়েছে এক অদ্ভুত সৃষ্টি। কবির কাব্যরসে জল মিশিয়ে তাকে করা হয়েছে পানসে,—আর তাঁর সুর-লোকে সুরু হয়েছে সুর ও অ-সুরের দ্বন্দ্ব। দেখছি, তাতে জয় হয়েছে অ-সুরেরই!

আমাদের শাস্ত্রীয় সদাচারবিধিতে মস্তক-চ্যুত কেশকে, অশুচি ব'লে, অস্পৃশ্য করেছে। রবীন্দ্রনাথের গানের ছন্দচ্যুত পংক্তিকে আমি সেই পর্যায়েই ফেলে থাকি। তার অবমাননা দেখে দুঃখ হয়,—রাগও যে হয় না এমন কথা ব'লতে পারি না। অনেকখানি ন্যাকামি ও বেশ খানিক বোকামি মিশিয়ে যে-সব সঙ্গীত কিছু-দিন ধ'রে বাঙলাদেশে রচিত হচ্ছে ও 'আধুনিক'

আখ্যায় অলঙ্কৃত হ'য়ে, বহু সু-কণ্ঠকে কলঙ্কিত করছে, তাদের অধিকাংশকেই আজ, রবীন্দ্রনাথের খাতিরেই, বিদায় ক'রবার দিন এসেছে ব'লে আমি মনে করি। 'কাল্‌চারের' সংগে তার কোনও সম্পর্ক নেই। আপনাদের অনুরোধ করি, আপনারা আপনাদের এই কাল্‌চারাল সোসাইটিতে তা বর্জন ক'রে সুনাম অর্জন করুন,—রবীন্দ্র-সংস্কৃতির ধারা অক্ষুণ্ণ ও অমলিন রাখুন।

তা ব'লে আমি এমন কথা বলছি না যে, রবীন্দ্রনাথের গান আছে ব'লে আর কেউ গান রচনা করবে না, বা সে গান গাইবে না। এ-গোঁড়ামি আর যারি থাকুক, আমার নেই! নজরুল ইসলামের গানকে তো রবীন্দ্র-সংগীত নয় বলে 'আধুনিক' পর্যায়ে ফেলা হয় না। অতুলপ্রসাদের গানকে আপনারা কি বলবেন? দ্বিজেন্দ্রলালের গানের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম! রবীন্দ্র-পরবর্তী যে কোনও গানকে 'আধুনিক' আখ্যা দিয়ে রবীন্দ্রনাথের গানের অভিনবত্ব ও আধুনিকতাকে অমর্যাদা করা না হয় যেন,—এইটেই শুধু আমার বলবার কথা। আর সত্যিই, একটু ভেবে দেখলেই, আপনারাও স্বীকার করবেন যে, আমার এ-কথাগুলি হয়তো খুব অযৌক্তিক নাও হ'তে পারে।

আপনাদের 'কাল্‌চারাল সোসাইটি'র এই উৎসব-সভায় ব'সে আরেকটি কথা মনে হচ্ছে! আমার মেয়ে এখানে পড়ে ব'লেই আমি জানি যে, আপনাদের কলেজের মধ্যে আরও অনেক বৃহত্তর প্রতিষ্ঠানের শাখা-প্রশাখা আছে,—আছে অনেক দল-উপদল, মত-অমত, পথ-বিপথ। তাদের ইডিয়োলজিরও অন্ত নেই, প্যাম্ফলেট-বাজিরও বিরাম নেই। তার কিছু কিছু পড়ে এসে আমার হাতে,—মন দিয়েই পড়ি তা। সে-প্রচার প্রচারণার তির্যক্‌ ভংগী, স্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন ঈর্ষা-কলুষিত ইংগিত, পরমত-অসহিষ্ণুতা দেখে ভাবি,—এ বাদবিসম্বাদের বিদ্বেষ-সংঘর্ষে, এ মনোমালিন্যের মলিনতায় কোথায় সেই "sweetness and light",—CULTURE-কে চিহ্নিত ক'রেছেন যে সংজ্ঞায় ম্যাথু আর্নল্ড?—এই মনোভংগীতে কোথায় সেই মাধুর্য,—এই গোলোকধাঁধার অন্ধকারে কোথায় সেই আলো?

তারুণ্যের ধর্ম—জিজ্ঞাসা। জিজ্ঞাসা আনে বিচার। সত্যকে নিরিখ ক'রে পরখ ক'রে নেবার অধিকার যৌবনের। আপনাদের সেই মহৎ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হোক্‌—জ্ঞানে ও ধৈর্যে, প্রেমে ও মাধুর্যে। স্বদেশের সেবা অপেক্ষা রাখে যুক্তিনিষ্ঠ মনের। সে মন অপেক্ষা রাখে বিচার-বুদ্ধির। তোতাপাখীর মতো শুধু ধর্তাই-বুলি বা ক্যাচ্‌-ওয়ার্ডসে বাঁধা পড়ায়, কি উচ্চকণ্ঠে জিগির বা স্লোগান-ঘোষণায়, নেই কোনও পরিচয় কাল্‌চারের:—তা সে-বুলি সাংখ্যের সিদ্ধান্তেই হোক, বা মার্ক্সের বিচারেই বাড়ুক;—সে-ঘোষণা রাশ্যাতেই বাসা বেঁধে থাকুক, কি জার্মানী থেকেই বিদায় নিক;—তা যুধাজিৎ মার্কিণ-মার্কাই হোক্‌, বা হোক শ্বসিত মুমূর্ষু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নাভিশ্বাসে:—তা "প্রাগ্রসর'দের বাহ্বাস্ফোটই হোক, বা হোক সংগ্রাম-ক্লান্তদের শান্তি-বুভুক্ষা;—তা অরুণালোকিত মনোহর-বচনের জয়-ঘোষণাই হোক, বা হোক যশাধিকারীদের বম্বাই বিজয় নিনাদ! আপনাদের কাছে আমার এই অনুরোধ,—আপনারা কোনও স্রোতেই গা ভাসাবেন না, কোনও সুরেই সুর মেলাবেন না,—সব কিছু অপ্রমত্তচিত্তে বাছাই ক'রে, যাচাই ক'রে নেবার আগে। আপনাদের এই কাল্‌চারাল সোসাইটিতে সেই কাল্‌চারেরই প্রতিষ্ঠা হোক—যা কোনদিন বিসর্জন দেবে না চির-চলিষ্ণু মনের স্বাধীনতাকে, যে-মন চলবে তার অখণ্ড বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী নিয়ে, ভেদবুদ্ধিবিসর্জিত স্বদেশপ্রীতি নিয়ে—সার্বজনীন সম-অধিকারের নব্যন্যায়ের পথে।

অপ্রাসংগিক যদি কিছু ব'লে থাকি, অপ্রিয়ও যদি কিছু ব'লে থাকি—আপনারা ক্ষমা করবেন আমাকে। আমার আপন সন্তানকে যে-কথা বলি, সেই কথাই ব'লতে ভরসা পেয়েছি আপনাদের কাছে। এবার, অনুমতি পেলে, প্রিয়বচনে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' ক'রে বিদায় নিই,—কবির বসন্ত-গানে আপনাদের আনন্দ-অভিনন্দন জানিয়ে!

---

* কলিকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজের কাল্‌চারাল সোসাইটী কর্তৃক অনুষ্ঠিত বসন্তোৎসবে প্রধান অতিথির ভাষণের সারাংশ।

বাজেট আলোচনা

শ্রীঅনিলকুমার বসু

এই বৎসর কেন্দ্রীয় আইন সভায় যে বাজেট পেশ করা হইয়াছে তাহা ভারতবাসীর ... বিশেষ কৌতূহল সৃষ্টি করিয়াছিল এই ...য়া যে, ইহাই সর্বপ্রথম এমন একটি বাজেট ...া একটি জাতীয় সরকার দ্বারা রচিত ...য়াছে। ধনবানেরা ভাবিলেন, জাতির প্রতি-...ধিরূপে বাজেট-রচয়িতা নিশ্চয়ই এবার ...দের ওপর আশাতিরিক্ত কৃপাবারি সিঞ্চন ...রবেন, বিশেষ করিয়া যখন যুদ্ধাবসানের ...তীয় বর্ষ প্রায় উত্তীর্ণ হইতে চলিল। ...দের এরূপ আশা পোষণের কারণ ইহাও ...ল যে, ঠিক এক বৎসর পূর্বে যুদ্ধাবসানের ...ব্যবহিত পরেই যখন একজন খাঁটি ব্রিটিশ ...র্থসচিব অতিরিক্ত লাভকর সম্পূর্ণরূপে ...লোপ করিয়া এতটা অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া-...ন, তখন একজন ভারতীয় যে অনুগ্রহ ...র্শনের ঘোড়দৌড়ে উক্ত অ-ভারতীয় অর্থ-...চবকে দীর্ঘ ব্যবধানে পরাজিত করিবেন এ ...ষয়ে একপ্রকার নিঃসন্দেহ। গরীব দিনমজুর ...বিল, তাহাদের দুঃখনিশা এতদিনে কাটিয়া ...য়া এখন হইতে হয়ত আশার অরুণ আলো ...টিল। এইবার তাহাদের বহু-ঈপ্সিত ...সমান হাতের কাছেই বোধ হয় ঠেকিল। ...ীর অর্থকোষ হইতে সঞ্চিত ধনের মোটা ...ংশ সরকার সংগ্রহ করিয়া তাহাদের সুখ-...চ্ছন্দ্য বিধানে নিশ্চয়ই নিয়োগ করিবেন, ...ধ্যবিত্ত চাকুরিজীবীরা ভাবিলেন, বৎসর শেষে ... কয়টি রৌপ্যমুদ্রা সরকারের ভাণ্ডারে এতদিন ...ক্ষিণা দিতে হইত সেই কয়টি মুদ্রা এইবার ...াধ হয় তাহাদের জীর্ণ পরিচ্ছদের ছিন্ন ...হ্বরে একটু মৃদু কিঙ্কিনীর আবেশ সঞ্চার ...রিবে। ধনী, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত সবাই যখন ...নুরূপ ভাবনার স্বপ্ন-জড়িমায় বিহ্বল তখন ...ই বাজেটের রূঢ় আলোক তাহাদিগকে সচকিত ...রিয়া দিল। পরক্ষণেই দেখিলাম, অর্থবানেরা ...মাদ গণিলেন, মধ্যবিত্ত অলক্ষ্যে দীর্ঘনিঃশ্বাস ...ফেলিলেন, আর আসমান হাত হইতে ফসকাইয়া ...গল কিনা তাহার হদিস করিতে দরিদ্র ব্যস্ত। ...াজেই বিচার করা যাক, উক্ত বাজেটের ...রূপখানা কি।

...এই বৎসর উক্ত বাজেটে রাজস্বের পরিমাণ ...৯/৪২ কোটি টাকা এবং ব্যয় বরাদ্দ করা ...য়াছে আনুমানিক ৩২৭·৮৮ কোটি টাকা। ...জেই বাজেটের ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইল ...৮·৪৬ কোটি টাকা। পূর্ব বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে রাজস্বের পরিমাণ ৫৬·৭৭ কোটি টাকা কমিয়া গিয়াছে। অতিরিক্ত লাভ-কর ও যুদ্ধবীমা তুলিয়া দেওয়ায় রাজস্ব এতটা হ্রাস পাইয়াছে। তাহা ছাড়া, ডাক ও তার বিভাগের ব্যয় বৃদ্ধি ও কেন্দ্রী আবগারী বিভাগের আয় তিন কোটি টাকার মত কমিয়া যাওয়াতেও উক্ত অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা ছাড়া, লবণ কর হইতে যে ৮·২৫ কোটি পরিমিত অর্থ রাজস্ব বাবদ আদায় হইত তাহা তুলিয়া দেওয়াতে মোট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইল ৫৬·৭১ কোটি টাকা। এখন দেখা যাক রাজস্ব আদায়ের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কি কি কর পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। যুদ্ধোত্তরকালের মাপ-কাঠিতে ৫৬·৭১ কোটি টাকার ঘাটতি অতি সামান্যই—সিন্ধু মাঝে বিন্দুবৎ। ইহাতে বিস্মিত বা বিচলিত হইবার কিছুই নাই। একমাত্র আমেরিকা ছাড়া অন্য কোন দেশ উদ্বৃত্ত বাজেট প্রণয়ন করিতে সমর্থ হয় নাই। ভারত সরকারের আলোচ্য বাজেটে লবণ কর রহিত করা হইয়াছে, বাৎসরিক ২০০০৲ টাকার পরিবর্তে ২৫০০৲ টাকার আয়ের উপর কোন আয় কর ধার্য করা হইবে না। ১৯৪৬-৪৭ সালে বিভিন্ন ব্যবসায়ে লক্ষাধিক টাকা মুনাফার উপর শতকরা ২৫% টাকা হিসাবে কর নিরূপিত হইয়াছে। বৎসরে ৫০০০৲ টাকার ঊর্ধ্বের মূলধন-মুনাফার (Capital gains) উপর কর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে, টাকায় এক আনা হইতে দুই আনা করিয়া কর্পোরেশন কর বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাৎসরিক আয়ের উপর যে কর নির্দিষ্ট ছিল তাহার সর্বোচ্চ হার ৫ লক্ষ টাকার স্থলে ১½ লক্ষ টাকার উপার্জিত আয়ের (earned-income) উপরই পূর্ণ মাত্রায় প্রযুক্ত হইবে এবং চা রপ্তানির উপর করের হার টাকায় এক আনার স্থলে দুই আনা করিয়া বর্ধিত করা হইয়াছে। উপরোক্ত প্রস্তাব কেন্দ্রীয় আইন সভায় গৃহীত হইলে রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়াইবে ২৭৯·৪২ কোটি টাকা, এখন এই প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া জনসাধারণের উপর কি আকার ধারণ করিয়াছে তাহা আলোচনা করিব।

প্রথমেই অর্থসচিব উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে, ধন-বণ্টনের অসমতা হেতু ধনী-দরিদ্রের জীবনযাত্রার মানদণ্ডে যে বৈষম্য দেখা দিয়াছে তাহা দূর করিয়া দারিদ্র্যক্লিষ্ট জনগণের আর্থিক অবস্থার প্রভূত উন্নতি করিবার উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই আলোচ্য বাজেট প্রণীত হইয়াছে। এই বাজেটকে তিনি দরিদ্রের সুখভোগের সহায়ক বাজেট রূপেই বর্ণনায় পঞ্চমুখ হইয়াছেন। কথার বর্ণচ্ছটায়, ভাষার বেগে ও বক্তৃতার মাধুর্যে সমস্ত বিবরণীটি শ্রুতিমধুর ও সুখপাঠ্য হইলেও দরিদ্রের দুঃখজ্বালা ইহাতে একতিলও নির্বাপিত হয় নাই। একমাত্র দেখা যায় লবণ কর লোপ করিয়া দরিদ্রের প্রতি কিছুটা সহানুভূতি দেখান হইয়াছে। কিন্তু সহানুভূতির আয়তন কাগজে কলমে বর্ধিত করিয়া দেখাইলেও লবণ কর তিরোহিত হওয়ায় দরিদ্রের মাথা পিছু প্রতি মাসে ৩ পাই অর্থাৎ বৎসরে মাত্র ৩ আনা ৩½ পাই করিয়া বাঁচিয়াছে। বস্তুত লবণ কর তিরোহিত হওয়ায় গরীবের উল্লেখযোগ্য কিছুই রেহাই হয় না। কারণ লবণ করের গুরুত্ব অতি সামান্য, তাহা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। লবণ করের সহিত ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের অঙ্গাঙ্গী সংযোগ ছিল বলিয়াই জাতীয় সরকারের বাজেটে উক্ত কর বাদ দিতে হইল। ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলন লবণ আইন ভঙ্গ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধীর বিখ্যাত "ডাণ্ডী অভিযান" ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। কাজেই ভারতের দায়িত্বশীল সরকারকে ঐ কর তুলিয়া দিতে হইল—স্বাধীনতার বিজয় অভিযানের মূল মন্ত্রকে স্মরণ করিয়াই,—দরিদ্রের উপর চাপান করের বোঝা লাঘব করিবার জন্য নহে। লবণ কর লোপ করিয়াই সরকারের কর্তব্য শেষ হইল না। যাহাতে জনসাধারণ সুলভ মূল্যে প্রয়োজন মত লবণ পাইতে পারে সেই দিকেই সরকারের অধিকতর দৃষ্টি দিতে হইবে। এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সরকারকে লবণের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া প্রয়োজন। সকলেই অবগত আছেন যে, লবণ প্রস্তুত ব্যাপারে ভারত স্বয়ং সম্পূর্ণ (Self Sufficient) কদাচ নয়। ভারতের চাহিদা মিটাইবার জন্য ইংলণ্ড হইতে প্রচুর লবণ আমদানী করা হইত। ভারতে ব্রিটিশ বণিকস্বার্থ রক্ষা করিবার ইহা এক অভিনব রীতিই বটে। দৈনন্দিন আহার্য ব্যতিরেকেও বিভিন্ন শিল্পকার্যের জন্য ভারতে লবণের প্রয়োজন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। কাজেই যাহাতে ভারতকে লবণ সরবরাহ ব্যাপারে পর-

মুখাপেক্ষী একেবারেই না হইতে হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ভারতকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে হইবে। ১৯২৯ সালে Tariff Board এর অভিমত অনুসারে যদি করাচী, ওখা, খেওড়া, সম্বল, পাঁচপদ্র প্রভৃতি অঞ্চলে লবণ তৈরির যে সম্ভাবনা আছে, তাহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা হয়, তবে ভারত লবণ সরবরাহ ব্যাপারে আত্ম-নির্ভরশীল হইতে পারে। কাজেই লবণ প্রস্তুত বিষয়ে মনোনিবেশ না করিয়া কেবল লবণ কর তুলিয়া দিয়াই দুঃখীর স্বর্গ রচনা করা সম্ভব নহে।

দ্বিতীয়ত জনসাধারণ যাহাতে অল্প মূল্যে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে পারে সেই বাবদ সরকার ১৭·৩৫ কোটি টাকা ব্যয় করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা জনসাধারণের সত্যই কিছুটা সুবিধা হইবে। কিন্তু মাত্র ১৭·৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে অভুক্ত ও অর্ধভুক্ত ৪০ কোটি নরনারীর জন্য সুলভ মূল্যে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ আলাদীনের মায়া-প্রদীপের মতই মনে হয়।

তৃতীয়ত ২০০০৲ টাকা স্থলে ২৫০০৲ টাকার বাৎসরিক আয় আয়-কর হইতে বাদ দেওয়ায় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সমস্যার কিছুই সমাধান হয় নাই। তাহারা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া গেল। যেখানে জীবনযাত্রার মান শতকরা ২৬৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে সেই-স্থলে মাত্র ৫০০৲ টাকার আয় আয়-কর হইতে বাদ দেওয়ায় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রতি কোন সহানুভূতিই প্রদর্শিত হয় নাই। টাকার অঙ্কের শুধু আয় বৃদ্ধিটাই সরকার লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু উক্ত বর্ধিত আয়ের ক্রয়ক্ষমতা (Purchasing Powers) যে কোন অতল তলে ডুবিয়া গেল তাহা একবার ভাবিয়াও দেখিলেন না। এই দিক দিয়া বিচার করিলে আয়কর নীতি কোথায় বর্ধিষ্ণু (Progressive) হইবে, না উক্ত নীতি অল্প আয়ের উপরই পূর্ণবেগে প্রয়োগ করা হইল! কোথায় দরিদ্রের দুঃখের বোঝা লাঘব হইবে, তাহা না হইয়া উহা দিন দিন বাড়িয়াই চলিল! কাজেই দুঃখীর স্বর্গলাভের স্বপ্ন মরু-মরীচিকার মতই নিরাশায় বিলীন হইয়া গেল। জনসাধারণ আশা করিয়াছিলেন যে, অন্তত বাৎসরিক ৪০০০৲ টাকার উপর হইতে আয়-কর উঠাইয়া নেওয়া হইবে। তাহা হইলে অন্ততঃ অনেকেই একটু নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিতে পারিতেন। ২৫০০৲ টাকার আয় আয়-কর হইতে বাদ দেওয়ায় সরকারের রাজস্ব ২৫ লক্ষ টাকা কমিয়া গেল বটে কিন্তু ৪০০০৲ টাকার আয় আয়-কর হইতে বাদ পড়িলে মোট ৭৫ লক্ষ টাকার রাজস্ব কম পড়িত। এই সামান্য টাকা ছাড়িয়া দিতে সরকারের কোনই বেগ পাইতে হইত না, বস্তুত জনসাধারণ ইহাতে অনেকটা রেহাই পাইতে পারিত। অর্থসচিবকে ৫৬·৭১ কোটি টাকার ঘাটতি পূরাইবার জন্য নূতন কর বসাইয়া ৪৪ কোটি টাকা পরিমিত অর্থ সংগ্রহ করিবার বিষয়ে এতটা নিবিষ্ট থাকিতে হইয়াছে যে, ঐ করের প্রতিক্রিয়া দরিদ্রের অনুকূলে গেল কিনা ইহা তলাইয়া দেখিতে সময়ক্ষেপ তিনি করিলেন না।

নূতন প্রত্যক্ষ করের (direct tax) মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল একলক্ষাধিক টাকা মুনাফার উপর শতকরা ২৫ টাকা কর ধার্য করা। অর্থসচিবের মতে এই করটি আদায় করা অতি সহজ এবং ইহার প্রতিক্রিয়া (incidence) অতিরিক্ত লাভ-করের (Excess profit tax) চাইতে অনেক কম। এই কর হইতে আনুমানিক ৩০ কোটি টাকা রাজস্ব পাওয়া যাইবে বলিয়া তিনি আশা করেন। দ্বিতীয় অভিনব কর হইল মূলধন লাভের উপর কর (Tax on capital gains)। অর্থসচিব বলেন যে সাধারণ আয় অপেক্ষা এই সব আয়ের উপর উচ্চ হারে আয়-কর বসাইবার পক্ষে এই যৌক্তিকতা আছে যে, এই আয়ের মোটা ভাগই পরিশ্রমলব্ধ উপার্জন নহে (unearned income)। এইরূপ কর আমেরিকায় প্রচলিত আছে। অর্থসচিবের মতে দুই বৎসরের মধ্যে যে সব মাল সম্পত্তি হস্তস্থিত ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া এবং দুই বৎসরাধিক স্থিত মাল সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া যে লাভ পাওয়া যাইবে তাহার উপর প্রথম ক্ষেত্রে আয়-কর ও অতিরিক্ত আয়-কর নির্ধারিত হইবে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কেবল আয়-কর বসান হইবে, অতিরিক্ত আয়-কর বসান হইবে না। অবশ্য ৫০০০৲ টাকার ঊর্ধ্বে মুনাফার উপর উক্ত কর বসান হইবে। এই কর হইতে অর্থসচিব আনুমানিক ৩ই কোটি টাকা তুলিতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন। এই দুইটি অভিনব কর ধার্য করিবার কি যৌক্তিকতা থাকিতে পারে এবং ব্যবসায় শিল্প-প্রতিষ্ঠানের উপর এই করের প্রতিক্রিয়া কিভাবে দেখা দেয় তাহা একটু তলাইয়া দেখা যাক।

ব্যবসায় লব্ধ মুনাফা সাধারণত এই কয়টি কাজে নিয়োজিত করা হয়, যথা (১) মাল সম্পত্তির পরিবর্তন, পরিবর্ধন, (২) নূতন নূতন সম্পত্তি ক্রয় করা (৩) শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি সাধন, (৪) সামাজিক উন্নয়ন-কল্পে, (৫) সঞ্চয়, (৬) স্বকীয় বিলাস ব্যসনে ব্যয়।

উপরোক্ত কর চাপাইলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে অর্থ নিয়োগ যে হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে এই বিষয়ে সকলেই একমত। বর্তমান পরিস্থিতিতে শিল্প-কার্যে [illegible] অধিক অর্থ নিয়োজিত না হইলে ভারতের শিল্পোন্নতির সম্ভাবনা [illegible] হইবে। অনেকেই আশঙ্কা করেন, উক্ত কর ধার্য দ্বারা শিল্পে মূলধন বিনিয়োগ অনেকাংশে বাধা প্রাপ্ত হইবে। কাজেই এ[illegible] অবস্থায় বেকার সমস্যার পুনরুদ্ভব মোটে[illegible] অসম্ভব নয়। কাজেই তাহাদের মতে সরকার[illegible] এমন কোন কর নীতি অবলম্বন করা উচিত [illegible] যাহা দ্বারা শিল্পোন্নতির জয়যাত্রা কোনপ্রকা[illegible] শ্লথ হয়, প্রথম পাঁচটি কাজে ব্যবসা[illegible] লব্ধ মুনাফার পুনর্নিয়োগ অত্যন্ত প্রয়োজন[illegible] কিন্তু উক্ত করের ফলে যদি ঐ স[illegible] কার্যে অর্থ নিয়োগ কমিয়া শি[illegible] বিলাস ব্যসনে অধিকতর অর্থ ব্যয়িত হ[illegible] তবে দেশের ভবিষ্যৎ তমসাচ্ছন্ন। ইহ[illegible] অবশ্যম্ভাবী বিষময় ফল আবার গরীব দুঃখ[illegible] দেরই ভুগিতে হইবে। কাজেই গরীব দুঃখী[illegible] মুখের দিকে চাহিয়াও এমন কোন কর চাপ[illegible] উচিত নয় যাহা দ্বারা গরীব দুঃখী[illegible] জীবিকার্জনের পথই রুদ্ধ হইয়া যাইতে পা[illegible] অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করেন ব্যবসায় প্রতি[illegible] ষ্ঠানের মুনাফা ঠিক করিতে উক্ত প্রতিষ্ঠা[illegible] কত পরিমিত অর্থ নিয়োজিত হইয়াছে তাহ[illegible] হিসাব রাখাও প্রয়োজন। যে প্রতিষ্ঠান ৪ [illegible] টাকা নিয়োগে এক লক্ষাধিক মুনাফা অর্জন ক[illegible] এবং যে প্রতিষ্ঠান এক কোটি টাকা নিয়ো[illegible] করিয়া এক লক্ষাধিক টাকা লাভ করে [illegible] দুইয়ের মধ্যে ব্যবসায় কর নিরূপণে নিশ্চ[illegible] পার্থক্য থাকিবে। প্রথম ক্ষেত্রে এই আয় অ[illegible] রিক্ত আয়ের কোঠায় পড়িলেও দ্বিতীয় ক্ষে[illegible] ইহা মোটেই পড়ে না। কাজেই অনেকে [illegible] করেন সরাসরি শতকরা ২৫৲ টাকা ব্যবসায় [illegible] ধার্য না করিয়া, উক্ত ব্যবসায়ে নিয়োজি[illegible] অর্থের সহিত তারতম্য করিয়া বি[illegible] হারে কর নিরূপণ করা উচি[illegible] সকল মুনাফাই এক পর্যায়ে ফেলি[illegible] আপাতদৃষ্টিতে সুবিচারের পরাকাষ্ঠা দে[illegible] হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহার দ্বারা সুবিচার [illegible] হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্যাঙ্কের মুনা[illegible] কথাই ধরা যাইতে পারে। অন্যান্য ব্যবসা[illegible] লাভের সহিত ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের লাভ [illegible] পর্যায়ে পড়িতে পারে না। কোটি [illegible] খাটাইয়া ব্যাঙ্ক যদি এক লক্ষ [illegible] লাভ করে তাহাকে কি অতিরিক্ত আ[illegible] কোঠায় ফেলা যাইতে পারে? [illegible] অর্থসচিবের সূত্র অনুসারে এইসব প্রতি[illegible] গুলিকেও অযথা গুরু কর ভার বহন করি[illegible] হইবে যাহা বিচার ও যুক্তির মাপকা[illegible] মোটেই টিকিতে পারে না। ইহা ছাড়া যে [illegible] নূতন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অল্পকালের [illegible] গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদিগকে উক্ত কর[illegible] নিপীড়িত করিলে তাহাদের বাঁচিয়া [illegible] কষ্টকর হইবে। যে সব ব্যবসায় ও [illegible] প্রতিষ্ঠান সরকার হইতে সংরক্ষণ [illegible] সুবিধা অর্জন করিয়াছে তাহাদের একলক্ষা[illegible] টাকার উপরকার মুনাফাও কি অতিরিক্ত আ[illegible]

পর্যায়ে পড়ে? বিদেশীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিবার জন্যই সরকার সংরক্ষণ নীতি (Protection Policy) অবলম্বন করেন। এবং এই অবস্থায় তাহাদের মুনাফাকে অতিরিক্ত আয়ের পর্যায়ে ফেলিয়া উহাদের উপর শতকরা ২৫, টাকা কর চাপান অযৌক্তিক। স্বপক্ষ সমর্থনে অর্থসচিব বলিয়াছেন যে, গত বৎসরের মুনাফার উপরে যখন এই কর আরোপিত হইয়াছে তখন ইহা দ্বারা আলোচ্য বর্ষের মুনাফা কিছুতেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে না। এই যুক্তি যে অর্থনীতির সূত্র অনুসারে টিকিতে পারে না তাহার কারণ ব্যবসায় বাণিজ্যে অর্থ নিয়োগ পূর্বেকার লাভ-লোকসান ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনার উপর অনেকখানি নির্ভর করে। গত বৎসরের মুনাফার উপর হইলেও প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে তাহার নিজের অর্থকোষ হইতে উক্ত কর দিতে হইবে। ইহার ফলে উক্ত অর্থ আর ব্যবসায়-বাণিজ্যে নিয়োজিত হইতে পারিল না। কাজেই ইহার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া আগত বর্ষের উপর প্রতিফলিত হইবে।

এখন মূলধন-আয়ের উপর আরোপিত কর (Tax on Capital gains) সম্বন্ধে একটু বিচার করা যাক। এই করটি ভারতবর্ষে এই প্রথম প্রস্তাবিত হইল। আমেরিকাতে এই কর শতকরা ১২½ টাকা হিসাবে নিরূপিত আছে। কিন্তু এই কর আদায় করার পথ অত্যন্ত জটিল ও সমস্যাসংকুল। আমেরিকাতেও ইহা সহজসাধ্য হয় নাই। একজন বিশেষজ্ঞ আমেরিকানের অভিমত এই যে, এই কর নিরূপণকালে সাধারণ নিয়মের বহু ব্যতিক্রম মানিয়া নিতে হয়। যাহাকে সাধুভাষায় বলে—"নিপাতনে সিদ্ধ"। প্রথমত এই কর অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য, অনেক অবৈধ লোকসানের দৃষ্টান্ত স্বীকার করিয়া নিতে হয়, সম্পত্তি সংরক্ষণ ও উন্নয়নকল্পে যে অর্থ ব্যয়িত হয় তাহা হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করিতে হয় এবং সাধারণ মূল্যে রেখার (General price-level) সংথে লাভের অঙ্ক নিক্তির ওজনে মাপিয়া কষিয়া নিতে হয়। কাজেই যে কর ধার্যকালে এত সব সমস্যার সমাধান প্রয়োজন সেই কর যে কিরূপে জটিল হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। তাই কেহ কেহ মনে করেন আমাদের দেশে যদি এই অভিনব করের পরীক্ষা করিয়া দেখিতেই হয় তবে এত উচ্চ হার ধার্য না করিয়া তাহা আমেরিকার হার অনুসারে শতকরা ১২½ টাকা নিরূপিত হউক। অন্তত এক বৎসর পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক এই করের প্রতিক্রিয়া কি আকার ধারণ করে। অর্থসচিব আরও বলিয়াছেন যে, যদি কোন বিদেশীয় তাহার মূল সম্পত্তি ভারতে বিক্রয় করিয়া লাভ করিয়া থাকেন তবে যাহার নিকট বিক্রয় করিয়াছেন তাহার কাছ হইতে উক্ত লাভের উপর কর আদায় করিবেন। এ এক অসমর্থনীয় যুক্তি। এ যেন "উদোর পিণ্ড বুধোর ঘাড়ে" চাপাইবার ফন্দি। ইহার ফলে অভারতীয়দের হাত হইতে যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠান ভারতীয়দের হাতে আসিতেছিল তাহার গতি অনেকটা বাধা প্রাপ্ত হইবে, এবং পরিশেষে বিদেশী স্বার্থই কায়েম থাকিবে। ইহা ছাড়া ১৯৩৯ সালের ভিত্তিতে Capital gains নির্ধারিত করা যুক্তিসংগত হইবে না, যেহেতু মুদ্রাস্ফীতির ফলে লাভের অঙ্ক স্ফীত-কলেবর হইলেও মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতা কমিয়া যাওয়ার প্রকৃত লাভের অঙ্ক অনেকখানিই ফাঁকা।

রাজস্বের দিক ছাড়িয়া ব্যয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও জনসাধারণের উল্লসিত হইবার কিছুই নাই। এই বাজেটে ব্যয়-নীতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষিত হয় নাই। পরাধীন ভারতের চিরাচরিত ব্যয়নীতিরই নূতন সংস্করণ এই আলোচ্য বাজেট। বরাবরের মত এবারও দেশরক্ষার ব্যয়ভার রাজস্বের বহুলাংশ গলাধঃকরণ করিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে দেশরক্ষা বাবদ ব্যয়বরাদ্দ হইয়াছে ১৮৮·৭১ কোটি টাকা। অসামরিক কাজের জন্য বরাদ্দ হইল ১৩৯·১৭ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে মাত্র ১৩ কোটি টাকা বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য ব্যয়িত হইবে। যথা—শিক্ষার জন্য ৯৯ লক্ষ টাকা, জনস্বাস্থ্যের জন্য ৭৪ লক্ষ টাকা, কৃষি-উন্নয়নের জন্য ১·৮ কোটি টাকা এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য ২·২ কোটি টাকা। মোট ব্যয়-বরাদ্দের ছিঁটেফোঁটা মাত্র জনহিতকর কার্যে নিয়োজিত হইবে। অবশ্য ইহা ছাড়া বিভিন্ন প্রদেশের উন্নয়নের জন্য ৩২ কোটি টাকা মঞ্জুর করার প্রস্তাব করা হইয়াছে। কিন্তু এই অর্থ বিনিয়োগ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাদেশিক সরকারের উপর কতখানি ক্ষমতা থাকিবে, সেই বিষয়ে অর্থসচিব কিন্তু নীরব। তিনি বরঞ্চ খুব ফলাও করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে, রাস্তাঘাট উন্নয়নের জন্য ৬·৫ কোটি টাকা ব্যয়িত হইবে। ইহার জন্য অর্থসচিবকে সাধুবাদ জানাই। কিন্তু দরিদ্রের পক্ষে ইহার উপযোগিতা কতটুকু? তাহাদের প্রথম প্রয়োজন মোটা ভাত, মোটা কাপড় ও মাথা গুঁজিবার মত একটু স্থান। এই ব্যাপারে সরকার কতটুকু কার্যকরী নীতি গ্রহণ করিলেন, তাহা আমরা বহু অনুসন্ধানেও খুঁজিয়া পাইলাম না। গৃহ-নির্মাণের যে পরিকল্পনা সরকার ঘাষণা করিয়াছিলেন, তাহা এখন পর্যন্ত কার্যে রূপান্তরিত হয় নাই। খাদ্যদ্রব্যের দাম কমিবার কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। ভারতের জনসাধারণের ভাল রাস্তাঘাটে ঘুরিবার বা আকাশে উড়িবার (civil aviation) কিংবা বেতারবার্তা (broadcasting) শুনিবার যতটা প্রয়োজন, তাহার চাইতে ঢের বেশী প্রয়োজন মোটা ডাল-ভাতের সংস্থান। সরকারকে সেই দিকে মনোনিবেশ করিতে আমরা অনুরোধ জানাইতেছি।

এই প্রসংগে রাজস্ব বৃদ্ধি-সহায়ক কয়েকটি কর সম্বন্ধে আলোচনা না করিয়া পারিলাম না। সকলেই জানেন, বিভিন্ন প্রদেশে বিক্রয়-কর (Sales Tax) প্রবর্তিত আছে। এক সময় এই বিক্রয় করটিকে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। যদি কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়ে উদ্যোগী হইয়া বিক্রয় করটিকে নিজ আয়ত্তে আনিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের রাজস্ব বৃদ্ধির পথ অনেকটা সুগম হইত। বরঞ্চ প্রাদেশিক সরকারগুলিকে বিক্রয় করসম্ভূত আয়ের অর্ধভাগ প্রদান করিয়া বাকী অর্ধেক কেন্দ্রীয় সরকার নিজ হস্তে রাখিতে পারিতেন। তাহা ছাড়া মৃত্যু কর (Death Duty) ধার্য করিয়া রাজস্ব বৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবন করাও একটি বিচার্য বিষয়। কয়েকমাস পূর্বে মৃত্যু কর বসাইবার যে প্রস্তাব করা হইয়াছিল, সেই সম্বন্ধে এখন আর নূতন কোন তথ্য জানিতে পারিতেছি না। এই মৃত্যু কর প্রবর্তিত হইলে নূতন রাজস্ব আয়ের প্রচুর সম্ভাবনা আছে।

এই আলোচনা হইতে কেহ যেন না মনে করেন যে, জাতীয় গভর্নমেণ্টের দেশোন্নতির সাধু ইচ্ছাকে আমরা কোনপ্রকার সন্দেহ বা ক্ষুণ্ণ করিতেছি। কেন্দ্রে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় জনসাধারণের স্তিমিত মনে আবার আশার সঞ্চার হইয়াছে। কিন্তু আশা আমাদের গগনচুম্বী হইলেও জাতীয় সরকারের কর্মপথে বাধা থাকবে। পৃথিবীর অন্যতম মনীষী বার্নাড শ' যেমন ইংলণ্ডের শ্রমিক গভর্নমেণ্ট সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, উক্ত গভর্নমেণ্ট এমন এক সময় প্রতিষ্ঠিত হইল, যখন তাঁহাদিগকে অভাব, অনটন, বুভুক্ষা, দারিদ্র্য, বেকার-সমস্যা প্রভৃতি দুরতিক্রমণীয় বাধার সংগে যুদ্ধ করিতে হইবে—মহাযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ হইতে এক নূতন সভ্যতা গড়িয়া তুলিতে হইবে। সেই মনীষীর কথা আমাদের দেশের জাতীয় গভর্নমেণ্ট সম্বন্ধেও অক্ষরে অক্ষরে খাটে। আমরা আশা করিতে পারি না যে, দ্বিশত বর্ষের পরাধীনতা পাশে আবদ্ধ ভারতের সমুদয় সমস্যা জাতীয় গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠার এক বৎসরের মধ্যে সমাধান হইয়া যাইতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষণীতে বিচার করিয়া বাজেট সম্বন্ধে সমালোচক হইলেও আমাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হইবার কারণ নাই কিংবা জাতীয় গভর্নমেণ্টের শক্তি সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার হেতু নাই। দেশকে আরও কতিপয় বৎসর এই সব দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়া সহিষ্ণুতার সহিত অগ্রসর হইতে হইবে। এই বৎসরের বাজেট সমালোচনাই তাঁহাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে চূড়ান্ত অভিমত নয়।

ভারত ও এসিয়ার নৃত্যাভিনয়

শান্তিদেব ঘোষ

সাধারণভবে আমাদের দেশে এই বিশ্বাস প্রবল যে, সংগীত নৃত্যাভিনয়ে ভারতের সংগে সমগ্র এশিয়া মহাদেশের একটা সাক্ষাৎ যোগাযোগ ঘটেছিল। সেই মিলনের সুযোগে এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলি নৃত্যাভিনয়ে ভারতের কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য পায়। খুব সূক্ষ্ম বিচার না করেও সাধারণভাবে এনিয়ে আলোচনা করে দেখলে দেখা যাবে যে, কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেবার মত নয়।

চীন মহাদেশের সভ্যতা অতি প্রাচীন,—তাই তাদের দেশে সংগীত ও নৃত্যও যে বহু প্রচীন যুগ থেকেই চলে আসছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু এখনো পর্যন্ত চীনে প্রাচীন সংগীত ও নৃত্য যা দেখতে পাওয়া যায়, বর্তমান ঐতিহাসিকদের ধারণা, তা অনেক পরবর্তী যুগের জিনিস। এবং এই যুগের সংগে নৃত্যগীতে ভারতের একটা যোগাযোগ ঘটেছিল। এর ঐতিহাসিক প্রমাণও অনেক পাওয়া গেছে।

পণ্ডিতদের মতে ভারতের সংগে পাকাপাকিভাবে চীন দেশের যোগাযোগ শুরু হয় খৃস্টাব্দের দ্বিতীয়শতকে এবং একাদশশতক পর্যন্ত এর জের সমানভাবে চলেছিল। কাশ্মীর থেকে মধ্য এশিয়া হয়ে ভারতীয় জ্ঞানী সন্যাসীদের চীন যেতে হোতো—তাঁরাও আসতেন ঐ পথে। মধ্য এশিয়ায় 'কুচী' নামে কোন এক বড় নগরে কাশ্মীর অঞ্চলের লোকেরা বসবাস করতো। সেখান থেকে চীনদেশে কয়েকজন ভারতীয় সংগীতজ্ঞ ও নর্তক গিয়েছিলেন সে দেশের সম্রাটদের আমন্ত্রণে। খৃঃ দ্বিতীয়শতক থেকে ষষ্ঠশতক পর্যন্ত গাইয়ে বাজিয়ে নাচিয়েদের যাতায়াতের বহু খবর জানা যায়। এর পরের খবর ত আছেই। তখনকার ভারতীয় গীতকারদের সাজ-পোষাক এবং নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্রেরও নাম পাওয়া গেছে। পরে ভারতীয় সংগীত ও নৃত্যপ্রভাব কোরিয়ায় যায় ও খৃঃ অষ্টম শতাব্দীতে জাপানে গিয়ে উপস্থিত হয়। জানা যায়, প্রথম যিনি গিয়েছিলেন তিনি ছিলেন ভারতীয় ব্রাহ্মণ সন্তান, নাম 'বোধীসেন', কিন্তু ছিলেন বৌদ্ধ-সন্যাসী। তাঁকে বৌদ্ধ মন্দিরের পুরোহিত করা হয়। তিনি ও তাঁর এক সহকর্মী সে দেশের মন্দিরে গান ও নাচ প্রথম প্রচার করলেন। জাপানবাসীরা আজও শ্রদ্ধার সংগে তাঁদের নাম স্মরণ করে। ভারতীয় গাইয়েদের সংগে সব সময় কয়েকজন করে নাচিয়ে থাকতো। তারা সকলেই ছিলো মুখোস-নাচের নর্তক। আজও চীন ও জাপানে প্রাচীন নৃত্যকলা বা নৃত্যাভিনয়ে মুখোস ব্যবহারের খুব প্রাধান্য। তিব্বতে বৌদ্ধ লামাদের মধ্যে সেই জাতীয় মুখোস-নৃত্য আজও বর্তমান। মুখোস-নাচ আজ ভারতে অতিপ্রচলিত না হলেও প্রাচীন নৃত্যশাস্ত্র-গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এক,ধিক হাত ও মুখ এবং পশুদের অভিনয়কালে মুখোস ব্যবহার সে যুগে হোতো। আজও ভারতে কোন কোন স্থানে মুখোস ব্যবহৃত হয়। তার মধ্যে প্রধান একটি অঞ্চল হোল বিহার প্রদেশান্তর্গত সিংহভূম ও মানভূম অঞ্চল। 'কথাকালি'তে মুখোস ব্যবহারের চলন নেই কিন্তু নর্তকেরা মুখকে যেভাবে নানা রঙ্গে চিত্রিত করে তাতে তাকে মুখোসের অনুকরণ না বলে পারা যায় না। জাপানে ও চীনে রং দিয়ে মুখকে চিত্রিত করে মুখোসের আকার দেওয়ার প্রথা আজও বর্তমান। তাছাড়া তৈরী মুখোসও তারা ব্যবহার করে।

মণিপুরী নৃত্য

দক্ষিণ ভারতের দেবদাসী নৃত্য

চীন ও জাপানে নৃত্যাভিনয় সম্পন্ন হয় রঙ্গমঞ্চে, কিন্তু সে রঙ্গমঞ্চ আধুনিক পাশ্চাত্যদেশের আদর্শে রচিত রঙ্গমঞ্চ নয়। ভারতে এযুগে প্রচলিত প্রাচীন কোন নৃত্যাভিনয়ই রঙ্গমঞ্চের সংগে জড়িত নয়। এখন সাধারণত অভিনয় হয় মন্দিরের নাট-মন্দিরে, কিম্বা গ্রামে বা নগরে উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে, সামিয়ানার তলায়। ভরতমুনি তাঁর নাট্যশাস্ত্রে লিখেছেন যে, আমাদের দেশে তাঁর সময়ে রঙ্গমঞ্চ ছিল ও তার ব্যবহার হোতো। রঙ্গমঞ্চ না থাকার দরুণ আজকাল প্রাচীন কোন নৃত্যাভিনয়েই দৃশ্যসজ্জার কোন ব্যবস্থা

নেই এবং পরদা ফেলা বা সরানোরও কোন প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু ভরতমুনি বলছেন, রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে নানাপ্রকার চিত্রিত দৃশ্য-সজ্জার ব্যবহার, পরদা ফেলা ও সরানোর প্রথা এদেশে ছিল। যাই হোক এই প্রথা ভারতবর্ষ থেকে কেন জানিনা বহু যুগ আগেই লুপ্ত হোলো। চীন ও জাপানে তাদের পুরাণো আদর্শ মত নৃত্যনাট্যে দৃশ্যসজ্জার নিয়ম নেই। পরদা ব্যবহারও হয় না। কারণ, মঞ্চের তিন দিকে দর্শকরা বসে নৃত্যাভিনয় দেখে বলে' আড়ালের কোন প্রশ্ন জাগে না। রঙ্গমঞ্চ নেই বলে ভারতে তিন দিকে ত দর্শকরা বসেই তাছাড়া চতুর্দিকে বসে নাটক দেখার উদাহরণও সর্বত্রই বর্তমান। প্রাচীন ভারতের রঙ্গমঞ্চের পিছনে দুইটি যবনিকার কথা বলা হয়েছে। এই দুইটি প্রবেশ পথ দিয়ে নট ও নর্তকেরা প্রবেশ ও প্রস্থান করতো। চীন-দেশে এই প্রথা প্রচলিত—কিন্তু জাপানে 'নো' জাতীয় নৃত্যাভিনয়ে একদিক থেকে প্রবেশ ও প্রস্থানের নিয়ম। ভারতে দুই যবনিকার মধ্যস্থলে গাইয়েদের বসবার রীতি প্রচলিত ছিল। বর্তমানে যবনিকা নেই বটে তবে গাইয়েরা এখনো পিছনেই বসে; কখনো কখনো তাল-বাদককে পাশে বসতে দেখা যায়। চীন ও জাপানে গাইয়ে বাজিয়েরা পিছনে ও পাশে বসে এবং এই বসাও নিয়মিত। সেদেশে রঙ্গমঞ্চের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের একটি বাঁধা মাপ আছে, প্রাচীন ভারতেও তা' ছিল।

ভারতে গাইয়ে বাজিয়ে দলের সংখ্যা তুলনায় চীন দেশের মত বেশী নয়। গাইয়ে থাকে একজন, কখনো সঙ্গে সাকরেদ থাকে, আর থাকে করতাল ও তাল বাদ্যবাজিয়ে। চীন ও জাপানের যন্ত্র-সংগীতে তারের যন্ত্রের প্রভাব ভারতের চেয়ে বেশী। আজকাল ভারতে তারের যন্ত্র ব্যবহার কখনো চোখে পড়েনি। প্রাচীন নৃত্যমূর্তিগুলিতে বাঁশী, মন্দিরা, করতাল ও নানাপ্রকার চামড়ার তাল-যন্ত্রই সবচেয়ে বেশী চোখে পড়ে। ভারতের 'ডমরু' জাতীয় বাজনাটি চীন-জাপানের খুব প্রসিদ্ধ চামড়ার বাজনা, এখনো সেদেশে এ বাজনাটি নৃত্যাভিনয়ে বাজানো হচ্ছে। প্রাচীন তারের যন্ত্রে চীন ও জাপান কখনো লোহা বা স্টিলের তার ব্যবহার করে না। সিল্ক বা জন্তুর নাড়ি থেকে তৈরী তারের ব্যবহার এখনো প্রচলিত। বাঁশের বাঁশীর বৈচিত্র্য সে দেশের যন্ত্র-সংগীতে বিশেষভাবে চোখে পড়ে। একমাত্র ব্রহ্মদেশ ছাড়া শানাই জাতীয় কোন যন্ত্র সে দেশে নেই।

ভারত ও এশিয়া মহাদেশের সব ক'টি প্রাচীন নৃত্যাভিনয় হোল গীত-নাটক। গানের কথা ও সুরের উপরেই সমস্ত অভিনয় দাঁড়িয়ে আছে। ভারতে পুরাগোকালের গানের মাঝে সাধারণ ভাষায় কথা বলার বিষয় লিখিত

দক্ষিণ ভারতের ভরত নাটাম নৃত্যের একটি বিশিষ্ট ভঙ্গি

আছে। 'শকুন্তলা' নাটককে তারই উদাহরণ-স্বরূপ বহু পণ্ডিতই ধরেছেন। নাট্যশাস্ত্রে যেভাবে গানের বিষয় আলোচিত হয়েছে, সেদিক বিচার করে 'শকুন্তলা'কে উদাহরণস্বরূপ ধরা সঙ্গত কিনা, জানি না। কারণ 'শকুন্তলা'য় গানের চেয়ে কথা অনেক। নাট্যশাস্ত্র পড়ে মনে হয়, গানের দিকেই তাঁদের নজর ছিল বেশী। এখনো পর্যন্ত প্রাচীন আদর্শের প্রচলিত নৃত্যাভিনয়ে গানেরই প্রাধান্য। 'কথাকলি' নৃত্য-নাটকে সাধারণ ভাষায় কথা বলা একেবারে নিষিদ্ধ। এশিয়া মহাদেশে প্রাচীন সব ক'টি নৃত্য-নাটকে গানের ফাঁকে ফাঁকে কথা বলার রীতি বর্তমান। শকুন্তলার মত কথাবহুল নাটক সেগুলি নয়। 'শকুন্তলা' নাটকের আরম্ভে সূত্রধার নট নটীকে দিয়ে যেভাবে নাটকের পরিচয় দেওয়া হয়েছে, এ-প্রথাটি ভারতের কোন গীতনাটকে আজকাল চলতি নেই। এশিয়া দেশের অন্যান্য জায়গায়ও নেই। সর্বত্রই গায়কের গানেই সেই পরিচয় প্রকাশ পায়।

নাট্যশাস্ত্র বিশেষ করে মুদ্রাভিনয়ের কথাই বলেছে; যার উদাহরণ দক্ষিণ ভারতে আজও প্রচলিত কথাকলি ও দেবদাসী নৃত্যের মধ্যে। মুদ্রাভিনয় ছাড়াও নৃত্যাভিনয় ভারতে বহু স্থানে দেখা যায়। এই নৃত্যে সমগ্রভাবে দেহ-ভঙ্গীর সাহায্যেই নাটকের ভাব প্রকাশ পায়। কয়েক প্রকার মুদ্রা দেখা যায় হাতের শোভা বর্ধনের জন্য। চীন, জাপান, জাভা বালী শ্যামের নৃত্যাভিনয় মুদ্রাভিনয় নয়—সেগুলি সবই দেহভঙ্গীর অভিনয়। সমস্ত দেহের ভঙ্গীতে ও ছন্দে ভাব প্রকাশ করে।

দেহভঙ্গীর দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, ভারতের যে কোন নৃত্যাভিনয়ের চলতি ভঙ্গীর সঙ্গে চীন জাপান ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোন নৃত্যভঙ্গীর মিল নেই। সেদেশের নৃত্যভঙ্গী স্বতন্ত্র। ভারতীয় প্রাচীন নৃত্য-গ্রন্থে অভিনেতাদের চলার নিয়মবদ্ধ ভঙ্গীর উল্লেখ পাই। চলার রকম দেখে বলা যেতো কে কোন পাত্র। কত তাল অন্তর পদক্ষেপ কে করবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। এ-নিয়ম আজকাল প্রাচীন আদর্শে চালিত ভারতের নৃত্যাভিনয়ে কদাচিৎ দেখা যায়। কিন্তু চীন জাপান জাভা শ্যাম ইত্যাদি দেশে ঐ নিয়ম এখনো প্রবল।

চীনে প্রাচীন নৃত্যের অভিনেতাদের মুখে রং মাখানোর একটি বিশেষ নিয়ম প্রচলিত আছে। যেমন শাদা রং মাখবে রাজা। সাধু-প্রকৃতির লোকের মুখের রং কালো। দানব-রাক্ষসদের সবুজ ও দেবতাদের রং লাল। জাপানেও মুখে রং মাখানো বিষয়ে নিজস্ব নিয়ম বর্তমান। প্রাচীন নৃত্যশাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে, ভারতেও রং মাখানো বিষয়ে এ ধরণের একটা নিয়ম ছিল। যেমন দেবতার রং গৌড়বর্ণ। ব্রহ্মার রং সোনালী। মানুষ ও দৈত্য-দানবের জন্য শ্যামবর্ণ, ইত্যাদি। সে যুগের দর্শক রং দেখেও বলতে পারতো কে কোন চরিত্র অভিনয় করছে। কথাকলিতে এখনো এ-নিয়ম প্রচলিত আছে। সেখানে রাম, কৃষ্ণ ও পঞ্চপাণ্ডবদের মুখের রং শাদা। অসুর, রাবণ, রাক্ষস ইত্যাদির রং লাল। নিশাচর, ভূত, প্রেত—কালো। নারী চরিত্রমাত্রেই হলদে।

ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে 'নৃত্য' ও 'নৃত্ত' এই দুই শব্দের মধ্যে কোন ভেদ উল্লেখ করেন নি। কিন্তু পরবর্তী শাস্ত্রকারেরা

বলেছেন, এই দুই শব্দকে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করতে। ভাবযুক্ত নাটকে তাঁরা বলেছেন, 'নৃত্য' আর 'নৃত্ত' হোল অভিনয়বিহীন, কেবল ছন্দ-প্রধান দেহভঙ্গী। এশিয়া মহাদেশের আর কোনখানের নাচে এই অর্থভেদ পাওয়া যায় না।

চীন ও জাপানের উপর ভারতের প্রভাব ততটা সুস্পষ্ট মনে হয় না, যতটা মনে হয় জাভা বালী শ্যাম ও ব্রহ্মদেশে। এই দ্বিতীয় দলের মধ্যে এখনো পর্যন্ত রামায়ণ ও মহাভারতের প্রভাব অতি সুস্পষ্ট। এই সব দেশের প্রাচীন নৃত্য-নাটকগুলির প্রায় সব গল্পই রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প অবলম্বনে তৈরী। চীন জাপানে এই রকমের প্রভাব দেখা যায় না। ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, জাভা, বালীতে নৃত্যাভিনয়ের গঠনপ্রণালীতে ও নৃত্যভঙ্গীতে চীন দেশের প্রভাব পড়েছে। ভারতের কাছ থেকে পেয়েছে আদর্শ, গল্প ইত্যাদি। ব্রহ্মদেশের অভিনয় প্রথা শ্যাম দেশের অনুকরণেই গঠিত—জাভা ও বালীর মধ্যেও শ্যাম দেশের প্রভাব বর্তমান। এদের রঙ্গমঞ্চ নেই—দৃশ্যপট আঁকার প্রথাও নেই। উন্মুক্ত প্রাঙ্গনেও নাট-মন্দিরের মত বড় বড় থামের আটচালার তলায় অভিনয় সম্পন্ন হয়। দর্শকেরা সাধারণত তিন দিকে বসবার জায়গা করে নেয়। এদেশেও গানের মাঝে মাঝে কথা বলে। মুখোসের ব্যবহারও হয়। তাছাড়া কেবল মুখোস পরে নাচ, তাও আছে।

ভারতে এখনো প্রাচীন নৃত্যাদর্শে যে সকল নৃত্যাভিনয় বর্তমান, তার সঙ্গে অনেক রকমে ভরত মুনিকৃত নাটাশাস্ত্রের মিল পাওয়া যায় না। তার কয়েকটির উল্লেখ আগেই করেছি। হুবহু প্রাচীন আদর্শের নৃত্যনাট্য বহু যুগ আগেই ভারত থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে। নাট্যশাস্ত্র মনে হয় কেবল ধনী, রাজা ও বড় বড় মন্দিরের পৃষ্ঠপোষকতায় যে নাচ পরিচালিত হোত, কেবল তাদেরই কথা আলোচনা করেছেন। কিন্তু এই নাচের অনুপ্রেরণায় জনসাধারণ সহজভাবে যে নাচের চলন করলো নিজেদের আনন্দের জন্য, তার আলোচনা তিনি করেন নি। অথচ গ্রামের জন্য ভ্রাম্যমান অভিনেতা সম্প্রদায়ও সে যুগে ছিল, আজও আছে। এদের জন্য কোন রঙ্গমঞ্চ-দৃশ্যপট বা রঙ্গশালা ইত্যাদি আড়ম্বরের দরকার হয়নি। সেই কারণেই এরা যথাসম্ভব অল্প লোকের সাহায্যে—স্বল্প আড়ম্বরে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে ভ্রমণ করতে পারতো।

ভারতে এখন রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় কোন প্রাচীন নৃত্যাভিনয় নেই। কিন্তু জাপান, শ্যাম, জাভাতে ধনী ও রাজাদের সাহায্যে প্রাচীন নৃত্য পরিচালিত এবং রাজবাড়িরই সম্পদরূপে গণ্য। চীনের শেষ সম্রাটের রাজত্ব পর্যন্ত প্রাসাদে শ্রেষ্ঠ নৃত্যাভিনয় পদ্ধতির অভিনেতাদের স্থান ছিল। তাঁরই তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হোত। এই কারণে বাইরের লোকদের ঐসব নৃত্যাভিনয় যখন-তখন দেখতে পাওয়া সহজ হত না।

নাট্যশাস্ত্রে দোতলা স্টেজের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু চলতি প্রথা হিসেবে তার কোন নমুনা এদেশে নেই। বলা হয়েছে, পৃথিবীর বিষয়ে অভিনয় হবে একতলায় স্বর্গের অভিনয় দোতলায়। চীন দেশের শেষ-সম্রাটের আমল পর্যন্ত পিকিংয়ে তিনটি ধাপে রঙ্গমঞ্চ ব্যবহার হোত। সবচেয়ে উঁচুটি ছিল দেবতাদের, মাঝেরটিতে মর্তবাসী ও সর্বনিম্নটি ছিল দৈত্য, দানব ও রাক্ষস ইত্যাদিদের অভিনয়স্থান। এশিয়ায় অন্য দেশে এ-প্রথা এখন আছে বলে জানা যায় না।

ভারত ও এশিয়া মহাদেশের সর্বত্রই প্রাচীন নৃত্যাভিনয়ের বিষয় ছিল দেবদেবী, রাজা-মহারাজা ও যুদ্ধ নিয়ে। আর সকলেই অভিনয় কলাকে অতিশয় ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখে। মনে করে যেন দেবতার পূজা। ভারতের প্রাচীনেরা অভিনয়ে নরনারীর আলিঙ্গন, চুম্বন ও একত্র শয়ন ইত্যাদিকে নিষিদ্ধ করে গিয়েছিলেন। এশিয়ার সর্বত্রই এ-নিয়ম আজও পালিত হয়। অভিনয়কালে মানুষের করণীয় যাবতীয় সাধারণ ভঙ্গীকে নৃত্যভঙ্গী ছাড়া প্রকাশ না করার কথাই সর্বত্র স্বীকৃত হয়েছে। এমন কি, যুদ্ধকেও আজকালের দৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে ছেলেখেলা।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে রাগ-রাগিনী কথাটির উল্লেখ পাওয়া যায় নি। তার পরিবর্তে অন্য নাম পাওয়া যায়। রাগ-রাগিনী বিভাগটি শুরু হয়েছে অনেক পরে। তাই পরবর্তীকালে সব গীতিনাট্যকের গানেই প্রচলিত রাগ-রাগিনীর উল্লেখ আছে। এশিয়ার অন্যত্র সঙ্গীতে রাগ-রাগিনীর মত কোন বিভাগ নেই গীতিনাট্যকে। পাঁচ সুরের প্রাধান্য এখনো সেখানে খুব বেশী। ছায়ামূর্তির অভিনয় ভারতবর্ষে আরম্ভ ও এশিয়া মহাদেশে তা ছড়িয়ে পড়ে। অনেকের ধারণা, বর্তমানে ভারতে এ-প্রথা নেই একমাত্র জাভা ও বালী দ্বীপেই এই প্রথা প্রচলিত। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের গ্রামে আজও চামড়ায় তৈরী পুতুলের ছায়া-নৃত্য গ্রামবাসীদের চিত্তবিনোদন করছে।

আমাদের দেশের নৃত্যশাস্ত্রগুলি, সবই যে এক কথা বলে তা মনে হয় না—তাই অনেক সময় এক শাস্ত্রে যা বলেনি, অন্য শাস্ত্রগ্রন্থে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। তাতে মনে হয়, নানা সময়ে নানা মত ভারতে প্রসারলাভ করেছিল। তারাই ভারতের বাইরেও সেই মত প্রচার করেছে। শাস্ত্রগ্রন্থগুলির নির্দেশ মনে রেখে ভারতের প্রাচীন নৃত্যাভিনয় চীন জাপান ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া দেশের নৃত্যাভিনয় যদি ভালো করে আলোচনা করা যায়, তাহলে নাট্যশাস্ত্রে লিখিত অনেক কথারই চাক্ষুষ পরিচয় পাওয়া যাবে, যার হদিস পাওয়া ভারতে অসম্ভব। কারণ মূলে ভারত ও এশিয়া মহাদেশের নৃত্যাভিনয় কলা একই আদর্শে অনুপ্রাণিত।

"**PAKISTAN cannot be had by use of sword**"—
বলিয়াছেন মহাত্মা গান্ধী। কিন্তু লীগ বলেন—(সংবাদ অসমর্থিত) যেহেতু গান্ধীজী তরবারির মহিমা সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ, সেই হেতু এই ব্যাপারে তাঁর মতামত মোটেই গ্রাহ্য নয়।

* * * *

মৌলানা আবুল কালাম আজাদের বিবৃতিতে জানা গেল, শিক্ষা সংসদ নাকি ভারতীয় সংগীত, নাট্য এবং নৃত্যের জন্য শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের সুপারিশ করিয়াছেন।

"ভারতে বাস করিয়াও যাঁরা নিজেকে অ-ভারতীয় মনে করেন, তাঁরা ভারতীয় নৃত্য-ছন্দে পা মিলাইয়া নাচিতে রাজী হইবেন কি?" —বলেন বিশুখুড়ো।

* * *

মিঃ ফিরোজ খাঁ নুন বলিয়াছেন—"পাঞ্জাব হিন্দু-মুসলমান-শিখ সকলেরই বাসস্থান—এখানে সকলকেই মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে হইবে।" খুব সত্য কথা, কিন্তু এতবড় সত্য বস্তুটা আগুনের আলো ছাড়া যে চোখে পড়ে না, এই ত আমাদের দুঃখ!

* * * *

ভারতে স্বর্ণ এবং রৌপ্য আমদানী নাকি নিষিদ্ধ হইয়াছে। এ ব্যাপারে আমরা কিভাবে লাভবান হইব, সেই প্রশ্ন করিলে খুড়ো বলিলেন—"গলার হার আর পায়ের মলের ফরমাস এড়ানোর সুবিধা হইবে?"

* * * *

শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী গ্রামাঞ্চলে আরও বেশী করিয়া শাড়ী ও ধুতি সরবরাহের আশ্বাস দিয়াছেন। "অতঃপর গ্রামে শাড়ী ও ধুতি দুষ্প্রাপ্য হইবার সম্ভাবনা সমাসন্ন হইয়া উঠিল"—এই কথাও খুড়োর।

* * * * *

একটি ছোট সংবাদে দেখিলাম, যুদ্ধের আগে বৃটেনে নাকি পাঁচশত পঞ্চাশ কোটি পিন্ ব্যবহার করা হইত। যুদ্ধের পর কি পরিমাণ পিন্ ব্যবহার করা হইতেছে, জানা যায় নাই. "তবে—(বলেন খুড়ো) এখন যা ব্যবহার করা হইতেছে, সেগুলি নেহাৎ পিন্-প্রিক্ নয়—!"

* * * * *

বিলাতে প্রতি পাঁচ মিনিটের মধ্যে নাকি কারখানা হইতে এলুমিনিয়ামের বাড়ি প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। আমরা এখানে পাঁচ মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে বড় বড় প্রাসাদ তৈয়ার করিতেছি, তবে সেইগুলি সবই হাওয়ায়, এই যা তফাৎ।

* * * * *

সোভিয়েট রাশিয়া মরুভূমিকে ধানক্ষেতে পরিণত করিবার পরিকল্পনা করিতেছেন। "কিন্তু ধানক্ষেতকে মরুতে পরিণত করার কায়দা তাঁরা জানেন কি'—জিজ্ঞাসা করেন খুড়ো।

* * * * *

এরোপ্লেনের দুর্ঘটনায় মৃত্যু অপেক্ষা সিঁড়ি হইতে পতনের ফলে মৃত্যুর সংখ্যা অনেক বেশী,—একটি সংবাদ। "পতনের

ফলে মৃত্যু এই দুইটি অপেক্ষাও মহামারীরূপে দেখা গিয়াছে প্রেমের পথে"—বলে রসিক শ্যামলাল।

* * * * *

ডেট্রোয়েটের পুলিস বারের মালিকদের উপর একটি নোটিশ জারী করিয়া বলিয়াছেন যে, কেহ যদি অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে বেহুঁস হইয়া পড়ে, তবে তার গাড়ির চাবি চাহিয়া রাখিয়া দিয়া তাহাকে ট্যাক্সি করিয়া বাড়ি যাইতে বলিবে। ইহাতে নাকি রাস্তায় মোটর দুর্ঘটনা কম হইবে। কিন্তু এই সংগে বাড়ির Latch Keyটি চাহিয়া না রাখিলে বাড়ির দুর্ঘটনা যে বাড়িয়াই চলিবে. সেই কথাটা বুঝি পুলিস ভাবিয়া দেখেন নাই?

* * * * *

"**AT least four people in ten are susceptible to sea sickness**"
"এই জন্যই ভারত ত্যাগের প্রাক্কালে বৃটেন একজন এড্‌মিরাল বড়লাটের হাতে সমুদ্রপথে যাত্রার সমস্ত ভার ছাড়িয়া দিয়াছেন"—খুড়ো ছাড়া এ তথ্য সংগ্রহ করা যে কঠিন, তা বলাই বাহুল্য।

* * * * *

WOMAN Communist Deputy gives several lasty slaps about opponent's ears—

ফ্রান্স পরিষদ-গৃহের একটি টাট্‌কা খবর। পারিষদরা সতর্ক হউন।

* * * * *

জনৈক অজ্ঞাতনামা কবি—তার কবিতা বইর প্রতিটি কপির সংগে চিত্রতারকা লানা টার্নারের এক একটি চুল গ্রথিত করিয়া দেওয়ার জন্য সুন্দরীকে একটি অনুরোধ-পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু টেকো হইয়া যাওয়ার আশংকায় লানা টার্নার এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। অতঃপর মনের দুঃখে নিজের চুল নিজে ছিঁড়িয়া কবি স্বয়ং টেকো হইয়াছেন কিনা জানা যায় নাই।

ক্রিকেট

ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড এই বৎসর অষ্ট্রেলিয়ায় ভ্রমণের জন্য নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণকে মনোনীত করিয়াছেন।

বিজয় মার্চেণ্ট (বোম্বাই), অধিনায়ক); **এল অমরনাথ** (দক্ষিণ পাঞ্জাব), (সহকারী অধিনায়ক); **মুস্তাক আলী** (হোলকার); **বিনু মানকড়** (গুজরাট); **ভি এস হাজারী** (বরোদা); **আর এস মোদী** (বোম্বাই); **সি এস নাইডু** (হোলকার); **গুল মহম্মদ** (বরোদা); **সোহনী** (মহারাষ্ট্র); **আমীর ইলাহি** (বরোদা); **জে কে ইরাণী** (সিন্ধু); **পি সেন** (বাঙলা); **কে এম রঙ্গনেকার** (বোম্বাই); **জি কিষেণচাঁদ** (পশ্চিম ভারত); **ডি ফাদকার** (বোম্বাই); **ফজল মামুদ** (উত্তর ভারত); **এইচ অধিকারী** (বরোদা)।

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

বরোদা ক্রিকেট দল এই বৎসরের রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করিয়াছে। ফাইনালে বরোদা দল এক ইনিংস ও ৪০৯ রানে হোলকার দলকে পরাজিত করে। গত বৎসর বরোদা দলকে ফাইনালে হোলকার দলের নিকট পরাজিত হইতে হইয়াছিল। এই বৎসর তাহারই পাল্টা জবাব দেওয়া হইল। বরোদা দলের এইবারের সাফল্য সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এইজন্য যে, ইতিপূর্বে কোন দল এক ইনিংস ও ৪০৯ রানে কোন খেলায় জয়লাভ করিতে পারে নাই। ১৯৪১—৪২ সালে উত্তর ভারত দল উত্তর পশ্চিম সীমান্ত দলকে এক ইনিংস ও ৪০৫ রানে পরাজিত করিয়া জয়ের নূতন রেকর্ড করে। বরোদা দল সেই রেকর্ড ভঙ্গ করিল। বরোদা দলের প্রথম ইনিংসে চতুর্থ উইকেটে গুল মহম্মদ ও হাজারী একত্রে ৫৭৭ রান সংগ্রহ করিয়া জুটীর খেলার নূতন পৃথিবীর রেকর্ড করিয়াছেন। ইতিপূর্বে ১৯৪১ সালে ত্রিনিদাদে এফ এম ওরেল ও সি এল ওয়ালকট একত্রে ৫৭৪ রান সংগ্রহ করিয়া পৃথিবীর রেকর্ড করেন। হাজারী ও গুল মহম্মদ সেই রেকর্ড ভঙ্গ করিলেন। ইহা ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায় রচনা করিল। ইহা ছাড়া গুল মহম্মদ এই ইনিংসে একা ৩১৯ রান করিয়া ১৯৩৯—৪০ সালে মহারাষ্ট্রের পক্ষে খেলিয়া বিজয় হাজারী ৩১৬ রান করিয়া ব্যক্তিগত রানের যে রেকর্ড করেন তাহা অতিক্রম করিয়াছেন।

বরোদা এই খেলায় এক ইনিংসে ৭৮০ রান সংগ্রহ করিয়া কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন সন্দেহ নাই। তবে ইতিপূর্বে গত বৎসর হোলকার দল মহীশূর দলের বিরুদ্ধে ৮ উইকেটে ৯১২ রান করিয়া মোট রানের যে রেকর্ড করিয়াছিলেন তাহা অতিক্রম করিতে পারেন নাই। মহারাষ্ট্র দল ১৯৪০—৪১ সালে উত্তর ভারত দলের বিরুদ্ধে ৭৯৮ রান করিয়াছিলেন। বরোদা দল তাহাও অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তবে এইটুকু বলা চলে যে, এইবারে রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় কোন দল এত অধিক রান সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। বরোদা দল এইবার লইয়া দুইবার রণজি ক্রিকেট কাপ লাভ করিলেন। নিম্নে খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইল:—

হোলকার প্রথম ইনিংস:—২০২ রান (সারভাতে নট আউট ৯৪, বিজয় হাজারী ৮৫ রানে ৬টি ও আমীর ইলাহি ৪৭ রানে ৩টি উইকেট পান।)

বরোদা প্রথম ইনিংস:—৭৮৪ রান (গুল মহম্মদ ৩১৯, বিজয় হাজারী ২৮৮, নিম্বলকার ৪৩, সি কে নাইডু ১৭৮ রানে ৪টি, গাইকোয়াড় ১৩৪ রানে ৩টি উইকেট পান)।

হোলকার দলের দ্বিতীয় ইনিংস:—১৭৩ রান (নিম্বলকার ৮৭, ভায়া ২৮, আমীর ইলাহি ৬২ রানে ৬টি ও হাজারী ৫২ রানে ২টি উইকেট পান)।

রণজি ক্রিকেট পূর্ববর্তী বিজয়ী দল

১৯৩৪—৩৫ সালে বোম্বাই, ১৯৩৫—৩৬ সালে বোম্বাই, ১৯৩৬—৩৭ সালে নবনগর, ১৯৩৭—৩৮ সালে হায়দরাবাদ, ১৯৩৮—৩৯ সালে বাঙলা, ১৯৩৯—৪০ সালে মহারাষ্ট্র, ১৯৪০—৪১ সালে মহারাষ্ট্র, ১৯৪১—৪২ সালে বোম্বাই, ১৯৪২—৪৩ সালে বরোদা, ১৯৪৩—৪৪ সালে পশ্চিম ভারত রাজ্য দল, ১৯৪৪—৪৫ সালে বোম্বাই, ১৯৪৫—৪৬ সালে হোলকার।

হকি

আন্তঃপ্রাদেশিক বা ন্যাশনাল হকি প্রতিযোগিতা এখনও শেষ হয় নাই। বোম্বাই দল ফাইনালে উন্নীত হইয়াছে। এই দলকে ফাইনালে পাঞ্জাব ও দিল্লী দলের বিজয়ীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইবে। বাঙলা দল প্রথম খেলাতেই বোম্বাই দলের নিকট শোচনীয়ভাবে ৪—০ গোলে পরাজিত হইয়াছে। হকি খেলায় বাঙলা দলের ষ্ট্যাণ্ডার্ড যে কত নিম্ন স্তরের হইয়াছে এই খেলার ফলাফল হইতে অনুমান করা যায়। তবে সুখের বিষয় এই পরাজয় বাঙলার হকি পরিচালকদের একটু চঞ্চল করিতে সক্ষম হইয়াছে। সম্প্রতি বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশনের এক সভায় এইজন্যই আলোচনা হইয়াছে কিরূপে হকি ষ্ট্যাণ্ডার্ড উন্নত করিতে পারা যায়। একটি বিশেষ কমিটিও নাকি ইহারা গঠন করিয়াছেন। তবে আলোচনা কার্যকরী যতক্ষণ না হইতেছে ততক্ষণ আমরা এই আলোচনার কোন মূল্য দিই না।

ভারতীয় হকি ফেডারেশন বিশ্বঅলিম্পিক অনুষ্ঠানে ভারতীয় দল প্রেরণের উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন দল হইতে বাছাই করিয়া একটি ২২ জন খেলোয়াড়ের দল গঠন করিয়াছেন। এই দল বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শনী হকি খেলায় যোগদান করিবেন। পরে ভারতীয় হকি দল গঠন করা হইবে। বাঙলা দলের একজন মাত্র খেলোয়াড় এই মনোনীত দলে স্থান পাইয়াছেন। নিম্নে মনোনীত ২২ জন খেলোয়াড়ের নাম প্রদত্ত হইল:—এল পিন্টো (বোম্বাই), রাজশেখর (মহীশূর), ত্রিলোচন সিং (পাঞ্জাব), কাজিম (হায়দরাবাদ), জেণ্টল (দিল্লী), ওয়াল্টার ডিসুজা (বোম্বাই), নবী আমেদ (দিল্লী), কেশবচন্দ্র (পাঞ্জাব), আমীর কুমার (পাঞ্জাব), রবি মিশ্র (যুক্তপ্রদেশ), ইয়াকুব (সীমান্ত প্রদেশ), এম ভাজ (বোম্বাই), রামস্বরূপ (পাঞ্জাব), আজিজুল রহমন (দিল্লী), বাবু (যুক্তপ্রদেশ), ব্রাউন (যুক্তপ্রদেশ), জামসেদ (দিল্লী), বলবীর সিং (পাঞ্জাব), জ্যানসেন (বাঙলা), আজিজ (পাঞ্জাব), উডকক্ (বোম্বাই) ও রাজগোপাল (মহীশূর)।

নিখিল লণ্ডন ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার রাণার্স আপ প্রকাশনাথ গত বৎসরের চাম্পিয়ান ম্যাডসেনের সহিত করমর্দন করিতেছেন। প্রকাশনাথ ইঁহাকে সহজেই পরাজিত করেন।

দেশী সংবাদ

১০ই মার্চ ঃ—বে-সরকারী হিসাবে প্রকাশ, রাওয়ালপিণ্ডি জেলায় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে এযাবৎ দুইশত লোক নিহত ও ৪ শত লোক আহত হইয়াছে। অমৃতসরে হাঙ্গামায় এযাবৎ ১৪০জন নিহত হইয়াছে। মুলতানে বিমানযোগে দুই ব্যাটালিয়ান সৈন্য পাঠান হইয়াছে।

তেজপুরে আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মৌলানা আব্দুল হামিদ খাঁকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। বঙ্গীয় ও আসাম মুসলিম লীগের যুক্ত কর্ম পরিষদের আহ্বানে অদ্য সমগ্র আসাম প্রদেশে বহিরাগত উচ্ছেদের সরকারী নীতির প্রতিবাদে "আসাম দিবস" উদযাপিত হইয়াছে।

শিলংয়ের সংবাদে প্রকাশ, এই দিন গোয়ালপাড়া জিলার সীমায় কতকগুলি অশান্তিকর ঘটনা ঘটে।

ভারতে স্বর্ণ ও রৌপ্য আমদানী ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াছে।

কাশ্মীরের সেখ মহম্মদ আবদুল্লা নিখিল ভারত দেশীয় রাজ্যের প্রজা সম্মেলনের আগামী অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্নেল প্রেমকুমার সায়গলের সহিত ঝাঁসীর রাণী রেজিমেণ্টের ক্যাপ্টেন কর্নেল লক্ষ্মীর বিবাহ গত ৮ই মার্চ লাহোরে হইয়া গিয়াছে।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং দর্শন-শাস্ত্র বিষয়ক লেখক মিঃ ক্যাটলীন আজ বিমানযোগে কলিকাতায় উপনীত হন। তিনি শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর আতিথ্য গ্রহণ করেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাঙলা গভর্নমেণ্টের চলতি বৎসরের অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দ সম্পর্কে সাধারণভাবে আলোচনা হয় এবং বিরোধী পক্ষ হইতে মন্ত্রিসভার কার্যাদির তীব্র সমালোচনা করা হয়। শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্ত এই দিন বক্তৃতা-প্রসঙ্গে গত কয়েক মাস চট্টগ্রামের কয়েকটি অপ্রীতিকর অবস্থার কথা উল্লেখ করেন এবং উক্ত জেলায় বিনাবাধায় মুসলিম লীগের লোকেরা সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে বলিয়া অভিযোগ করেন।

১১ই মার্চ—মিঃ এন সি চ্যাটার্জি প্রমুখ কলিকাতার ৫০ জন বিশিষ্ট ব্যারিষ্টার বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন সমর্থন করিয়া এক বিবৃতি দিয়াছেন।

১২ই মার্চ—আজ বিহারে মহাত্মা গান্ধীর পল্লী পরিক্রমা আরম্ভ হয়। খাঁ আব্দুল গফুর খাঁ সমভিব্যাহারে গান্ধীজী পাটনা হইতে ছয় মাইল দূরে কুমারার গ্রামে গমন করেন। আজ পাটনায় তাঁহার প্রার্থনান্তিক বক্তৃতা প্রসঙ্গে গান্ধীজী বলেন যে, পাঞ্জাব, বাঙলা অথবা অন্য কোন প্রদেশ বিভাগের অর্থই হইতেছে ধর্মের ভিত্তিতে প্রদেশ সংগঠন। তিনি এই শ্রেণীর প্রদেশ বিভাগ বা বিচ্ছেদ পছন্দ করেন না।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ১৯৪৭ সালের অর্ডিন্যান্সসমূহ বৈধীকরণ (সাময়িক) বিল গৃহীত হয়।

অন্তর্বর্তী সরকারের দেশরক্ষা সচিব সর্দার বলদেব সিং রাওয়ালপিণ্ডির চারিপার্শ্বস্থ বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া এক বিবৃতিতে বলেন যে, পাঞ্জাবের ঘটনা পূর্ববঙ্গের নোয়াখালির ঘটনা অপেক্ষাও ভয়াবহ।

সরকারীভাবে জানা গিয়াছে যে, মুলতানে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় ২৫০ জন মারা গিয়াছে এবং ৭৫০ জন আহত হইয়াছে।

১৪ই মার্চ—লাহোরের সংবাদে প্রকাশ, ক্যাম্বেলপুরে একদল হাঙ্গামাকারীর সহিত পুলিশ ও সৈন্যদলের দুই ঘণ্টাব্যাপী যুদ্ধের ফলে ৪ জন

হাঙ্গামাকারী নিহত হয়।

মাদ্রাজের প্রধান মন্ত্রী মিঃ টি প্রকাশম গভর্নরের নিকট তাঁহার মন্ত্রিসভার পদত্যাগপত্র দাখিল করেন। গভর্নর বাজেট পাশ না হওয়া পর্যন্ত মন্ত্রিসভার কাজ চালাইয়া যাইতে অনুরোধ করায় মিঃ টি প্রকাশম তাহাতে রাজী হইয়াছেন।

১৫ই মার্চ—এসোসিয়েটেড প্রেস জানিতে পারিয়াছেন যে, সমগ্র পাঞ্জাব প্রদেশে হাঙ্গামার ফলে ১৫ই মার্চ পর্যন্ত ১০৩৬ জন নিহত এবং ১১১০ জন সাংঘাতিক ভাবে আহত হইয়াছে। দাঙ্গা দমনকল্পে সমগ্র প্রদেশে চারি হাজারের অধিক সৈন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে।

পাঞ্জাবের উপদ্রুত অঞ্চলসমূহে ভ্রমণরত পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু অদ্য রাওয়ালপিণ্ডি পরিদর্শন করিয়া লাহোরে প্রত্যাবর্তন করেন।

পাঞ্জাবকে বিভক্ত করা সম্পর্কে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, সেই সম্পর্কে শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু বলেন যে, ধর্মের ভিত্তিতে প্রদেশ বিভাগ করিলে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হইবে না।

নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সভাপতি শ্রীযুত এল বি ভোপৎকার এবং নিঃ ভাঃ হিন্দু মহাসভার সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুত আশুতোষ লাহিড়ী পাঞ্জাবের দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শনের জন্য লাহোর যাইতেছিলেন, ফিরোজপুর স্টেশনে তাঁহাদের উপর পাঞ্জাব গভর্নমেণ্টের এক আদেশ জারী করা হয়। ঐ আদেশে ছয় মাসের জন্য তাঁহাদের পাঞ্জাবে প্রবেশ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

বারাণসীতে ১৩ই তারিখে যে হাঙ্গামা শুরু হয়, তাহার ফলে মোট ১৫ জন মারা গিয়াছে।

শ্রীযুত দেবদাস গান্ধী আগামী বৎসরের জন্য নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন।

অদ্য রাত্রে মধ্য কলিকাতায় কয়েকটি ঘটনার ফলে এক ব্যক্তি নিহত ও ৯জন আহত হয়।

পেশোয়ারের সংবাদে প্রকাশ, হরিপুরের গ্রামাঞ্চলে গত বৃহস্পতিবারের দাঙ্গায় ৪৭জন লোক নিহত ও ৩জন আহত হইয়াছে। পেশোয়ার তহশীলে আনুমানিক ৯০জনকে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

১০ই মার্চ ঃ—সাংহাই হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী ফরমোসায় ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দেয়। প্রকাশ, বিদ্রোহের ফলে ১০ হাজার লোক হতাহত হইয়াছে।

মস্কোতে চতুঃশক্তি পররাষ্ট্র সচিব সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। সম্মেলনে জার্মানীর প্রুশিয়া রাষ্ট্রের বিলোপ সাধনের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

হাঙ্গেরীতে রুশিয়ার হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে প্রতিবাদ জানাইয়াছিল, সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

১২ই মার্চ—মার্কিন প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান অদ্য কংগ্রেসে বক্তৃতা প্রসঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দেন যে, বল প্রয়োগ ও কমিউনিজম প্রসারের দ্বারা বর্তমান পৃথিবীর রাজনৈতিক সীমানার পরিবর্তন ঘটাইবার সুবিধা সোভিয়েট রাশিয়াকে দেওয়া হইবে না।

১৩ই মার্চ ঃ—অদ্য লর্ডস সভায় এক প্রশ্নের উত্তরে ভারত সচিব বলেন যে, ভারতের অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টকে ডোমিনিয়ন গভর্নমেণ্টের মর্যাদা দেওয়া হইবে।

১৪ই মার্চ ঃ—অসলোর এক সংবাদে প্রকাশ, শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া নিমিত্ত বিভিন্ন জাতির যে সমস্ত ব্যক্তির নাম প্রস্তাবিত হইয়াছে, মহাত্মা গান্ধী তাঁহাদের অন্যতম।

১৬ই মার্চ ঃ—আফ্রিকার জাতীয় কংগ্রেস, নাটাল ও ট্রান্সভাল ভারতীয় কংগ্রেস এক যৌথ বিবৃতিতে ঘোষণা করিয়াছেন যে, পরস্পরের সহযোগিতায় ৬ দফা উদ্দেশ্য লইয়া সংগ্রাম চালাইয়া যাইবার জন্য আফ্রিকার ৮০ লক্ষ অশ্বেত আদিবাসীর প্রতিনিধি স্থানীয় আফ্রিকার জাতীয় কংগ্রেস নাটাল ও ট্রান্সভাল ভারতীয় কংগ্রেসের সহিত মিলিত হইয়াছে।
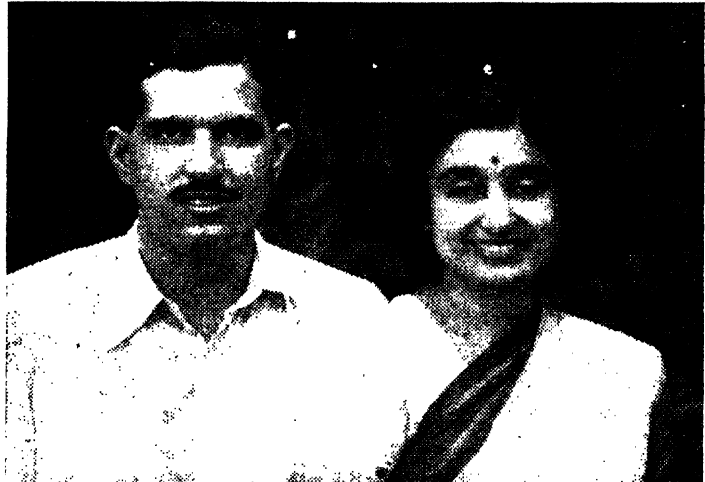
কর্নেল সায়গল ও কর্নেল লক্ষ্মী। গত ৮ই মার্চ ইঁহাদের বিবাহ হইয়াছে

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৬নং চিন্তামণি দাস লেন কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক:- আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড ১নং বর্ম্মণ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

দেশ

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন   সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

চতুর্দশ বর্ষ]   শনিবার, ১৫ই চৈত্র, ১৩৫৩ সাল।   Saturday, 29th March, 1947.   [২১শ সংখ্যা

লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের দায়িত্ব

গত ২৪শে মার্চ লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ভারতের বড়লাটের কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। সামরিক হিসাবেই লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের খ্যাতি আছে; কিন্তু রাজনীতিকস্বরূপে আমরা তাঁহার কৃতিত্বের কোন পরিচয়ই অবগত নহি। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট আজ ভারত পরিত্যাগে উদ্যত হইয়াছেন এবং নির্দিষ্ট সময় ১৪ মাসের মধ্যেই তাঁহারা ভারত ত্যাগ করিবেন ঘোষণা করিয়াছেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে ভারতের সমগ্র শাসনভার ভারতবাসীদের হাতে সুশৃঙ্খলার সঙ্গে অর্পণের ব্যবস্থা করা সহজ ব্যাপার নয়। যিনি এই কাজ সম্পন্ন করিবেন, তাঁহার শুধু সামরিক কৃতিত্ব নয়, রাজনীতিক প্রতিভা থাকাও বিশেষভাবে প্রয়োজন। শুনিতেছি, ভারতের শাসন বিভাগের উপর হইতে ভারত-সচিবের কর্তৃত্ব লোপ এবং ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিসের অবসান ঘটাইবার ব্যবস্থা সম্পন্ন করিতেই নূতন বড়লাট প্রথমে দৃষ্টি দিবেন। কিন্তু এই কাজ করিতে হইলে অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টকে প্রথমে শক্তিশালী করা দরকার। বস্তুত মুসলিম লীগের বাধাদান নীতির ফলে অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টে ইতিমধ্যেই ঘোরতর অব্যবস্থা সুরু হইয়াছে, অবিলম্বে ইহার অবসান না করিলে যুগপৎ ভারতের কেন্দ্র ও প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থা এলাইয়া পড়িবে। আমরা শুনিতেছি, মুসলিম লীগ কোনক্রমেই অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টকে শক্তিশালী করিতে দিবে না। লীগের কর্তাপুরুষ মিঃ জিন্না দিল্লীতে গিয়া বসিয়াছেন। তিনি সর্বপ্রযত্নে এই চেষ্টায় বাধা দিবেন। বস্তুত কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টকে বাধাদানের নীতির ফলে দুর্বল করিয়া মোশ্লেম লীগের প্রভুত্বাধীন প্রদেশ কয়েকটির শাসন-ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করিয়া তোলাই লীগের কর্ণধারগণের উদ্দেশ্য। এইভাবে তাঁহারা পাকিস্থানের স্বপ্ন কার্যে পরিণত করিতে চাহেন। ইহা সুস্পষ্ট যে, পশুবলের প্রয়োগে অত্যাচার, উৎপীড়ন এবং গুণ্ডামীর দ্বারা সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে পিষ্ট করিয়াই লীগ প্রাদেশিক শাসনে তাহার এই কর্তৃত্বকে অপ্রতিহত করিতে চায় এবং নানাভাবে সে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ কয়েকটি প্রদেশে এই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহার দৃষ্টি শুধু মুসলমান-সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলির উপরই নহে; প্রকৃতপক্ষে ঐ প্রদেশগুলিকে ঘাঁটি করিয়া পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্থানের লীগ পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে তাহার কার্য আরম্ভ হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই নীতি কার্যে পরিণত করিতে ভেদ-বিদ্বেষ সৃষ্টিই লীগের প্রধান অস্ত্র, এবং সে অস্ত্র প্রয়োগের ফলে শোণিতস্রাবী অনর্থ ঘটিবে, এ সম্ভাবনাকে লীগ স্বীকার করিয়াই লইয়াছে। লীগওয়ালারা মনে করিতেছে যে, এইভাবে ভয় দেখাইয়া তাহারা অখণ্ড ভারতের জাতীয়তাবাদের আদর্শ পরিম্লান করিতে সমর্থ হইবে। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন যদি অবিলম্বে লীগের এই দুষ্প্রবৃত্তি সংযত করিতে রাজনীতিক দূরদর্শিতার সহিত অগ্রসর না হন এবং যথেষ্ট সাহসের পরিচয় প্রদান না করেন, তবে ভারতব্যাপী বিপুল বিক্ষোভের সৃষ্টি হইবে। বস্তুত জাতীয়তাবাদী ভারত আজ মোশ্লেম লীগের ধর্মান্ধকারিতার দৌড় দেখিয়া লইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে এবং বৃহৎ আদর্শের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ভারতের স্বাধীনতাকামী সন্তানগণ আত্মদানে ভীত নহেন। জাতীয়তাবাদী ভারত জানে, লীগের প্রগতি বিরোধী প্রচেষ্টা সার্থক হইতে পারে না; পক্ষান্তরে এমন নীতি অবলম্বনের ফলে পরিশেষে লীগকেই বিধ্বস্ত হইতে হইবে। আমরা দেখিলাম, ভারতের বর্তমান রাজনীতিক অবস্থা সম্বন্ধে পর্যালোচনা করিয়া মার্কিণ সাংবাদিক রবার্ট আউরা স্মিথ এই কথাই বলিয়াছেন। তিনি তাঁহার 'ডিভাইডেড ইণ্ডিয়া' বা বিভক্ত ভারত নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন,—'প্রগতি-বিরোধী জমিদার প্রধান লীগ নেতাদের এমন সংগঠন-ক্ষমতা বা শক্তি নাই যে, তাহারা একটা গৃহযুদ্ধও বাধাইতে পারেন। তাঁহারা বড় জোর কিছুদিনের জন্য ভারতবর্ষকে দাঙ্গাহাঙ্গামা সাম্প্রদায়িক বয়কট প্রভৃতি অশান্তির মধ্যে লইয়া যাইতে পারেন, এবং দরিদ্র ভারতের সর্বাধিক দারিদ্র্য এবং দুর্দশার যুগ দীর্ঘ করিতে পারেন। নিতান্ত মনুষ্যত্ববিহীন ব্যক্তির পক্ষেই নির্বিবাদে তাহাদের এই কার্য সহ্য করা সম্ভব।' মার্কিন লেখক আবেগভরে তাঁহার বক্তব্যের উপসংহারে বলিয়াছেন—"বিভক্ত ভারতে কেহই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবে না, প্রত্যেক ভারতবাসীকে সেজন্য মূল্য দিতে হইবে, অন্ন বস্ত্র, স্বাস্থ্য, সুখ সকল দিক হইতে ভারতের দুর্দশা বৃদ্ধি পাইবে। ভারত বিভক্ত করিলে ভারতের ৪০ কোটি নরনারী অবর্ণনীয় ক্লেশ ভোগ করিবে, রক্তপাত ঘটিবে, পরিশেষে নবজাগ্রত ভারত পুনরায় ঐক্য বন্ধনে আবদ্ধ হইবার জন্য জাগ্রত হইবে।" লর্ড মাউণ্টব্যাটেন অখণ্ড ভারতের এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবাসীদের হাতে শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিতে প্রবৃত্ত হইবেন কিনা আমরা জানি না। ভারতের শাসন ভার গ্রহণ করিয়া তিনি তাঁহার সর্বপ্রথম বক্তৃতায় নিজের গুরুদায়িত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে যে কোন রকমে হউক, ভারতীয় শাসন-সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। আমরা শুধু এই কথা তাঁহাকে বলিতে পারি যে, গণতান্ত্রিক

ভিত্তিতে ভারতের সর্বজনীন বৃহত্তম কল্যাণ সাধনের একমাত্র প্রতিনিধি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস। কংগ্রেসের ঐক্য এবং সংহতিমূলক নীতিকে অবলম্বন করিয়া গণপরিষদের পথেই তাঁহাকে অগ্রসর হইতে হইবে। তিনি তাঁহার ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য ভারতের বৃহত্তম অংশের সর্বোত্তম শুভেচ্ছা কামনা করিয়াছেন; শুধু কংগ্রেসের আদর্শের পথেই তাঁহার পক্ষে তাহা লাভ করা সম্ভব। পক্ষান্তরে সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থরক্ষার অছিলায় তিনি যদি ভারতের বৃহত্তম স্বার্থকে আঘাত করিতে উদ্যত হন এবং ঐক্য ও সংহতির সূত্র ছিন্ন করিবার দুর্বুদ্ধির দ্বারা প্ররোচিত হন, তবে ভারতব্যাপী গণবিদ্রোহ অনিবার্য হইয়া উঠিবে। ভারতের আত্মদাতা সন্তানগণ, যে আদর্শের জন্য প্রাণ দিয়াছেন, মধ্যযুগীয় বর্বরতার বিনিময়ে ভারতবাসী তাহা পরিম্লান হইতে দিয়া কার্যতঃ সাম্রাজ্যবাদীদের দাসত্ব বরণ করিয়া লইবে না; এজন্য তাহারা যে কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকারের সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত আছে।

মিঃ সুরাবর্দীর স্পর্ধিত উক্তি

পাকিস্থান দিবসের গরম আবহাওয়ায় বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দি মোসলেম ইনস্টিটিউট হলে গরম বক্তৃতা দিয়াছেন। পাকিস্থানী প্রেরণায় উত্তেজিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে উল্লসিত করিয়া সুরাবর্দী সাহেব বলেন, "আমি বিশ্বাস করি, আর পাকিস্থান দিবস উদ্‌যাপনের প্রয়োজন হইবে না; কারণ আগামী বৎসরের পাকিস্থান দিবসের পূর্বেই আমরা পাকিস্থান হাছেল করিব। পাকিস্থানে শুধু মুসলমানের প্রাধান্য থাকিবে না। আমাদের নীতি নিজে বাঁচ, অপরকে বাঁচিতে দাও' ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, মিঃ সুরাবর্দী পাকিস্থানী-নীতির যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, আমরা বিশেষভাবেই তাঁহার শাসনে তাহার মহিমা উপলব্ধি করিয়াছি। সে নীতির মর্ম হইল এই যে, পাকিস্থানী মোড়লেরা তাঁহাদের নিজেদের বাঁচাটাই প্রধান লক্ষ্য স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং বাঁচিবার জন্য তাঁহারা সব কিছু করিতে পারেন। বাঙলাদেশে অন্য যদি কেহ বাঁচিতে চায়, তবে তাঁহাদের গোলামী করিয়াই তাহাদিগকে বাঁচিতে হইবে। বস্তুত সুরাবর্দী সাহেব মোসলেম ইনস্টিটিউটে পাকিস্থান-নীতির যে ভাষ্য বা ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, আমরা ইহার পূর্বেই তাঁহার মুখে সে কথা শুনিয়াছি। নোয়াখালির অন্তর্গত রামগঞ্জে তাঁহার প্রথম বক্তৃতার কথা আমাদের স্মরণ আছে। সেখানে তিনি উচ্ছ্বসিত আত্মম্ভরিতার সহিত বলিয়াছিলেন, এখানে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অধীনেই বাস করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, সাম্প্রদায়িক ভেদ রেখাকে স্পষ্ট করিয়া না তুলিয়া লীগওয়ালারা কোন কথা বলেন না, সুচতুর সুরাবর্দী সাহেবও সে কৌশল প্রয়োগ করিতে বিশেষভাবে ওস্তাদ ব্যক্তি। বস্তুত এইভাবে লীগের মধ্যযুগীয় সাম্প্রদায়িকতান্ধ মনোবৃত্তিকে তুষ্ট ও পুষ্ট না করিলে তাঁহাদের স্বার্থের ব্যাপারে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। মিঃ সুরাবর্দী তেমন ভুল করিবার মত মানুষ নহেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার এই মনোবৃত্তি স্বাধীনতার প্রেরণার উদার আদর্শে জাগ্রত বাঙলাকে বিভ্রান্ত করিতে পারে না। 'পাকিস্থান শুধু মুসলমানদের জন্য নহে, হিন্দুদের জন্যও বাঙলা অবিভাজ্য। বাঙলার এক অংশের সঙ্গে অপর অংশের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ, স্বার্থও এক। পাকিস্থান হইতে পশ্চিম বাঙলাকে বাদ দেওয়া চলে না।" —সুরাবর্দী সাহেবের মুখে এইসব কথা আমাদের কাছে পরিহাসের মতই শোনায়। বস্তুত বাঙলার সমস্ত সভ্যতা ও সংস্কৃতি মানবতার উপরই প্রতিষ্ঠিত এবং একমাত্র সেই উদার আদর্শকে ভিত্তি করিয়াই বাঙলার সমুন্নতি সম্ভব। অবিভাজ্য বঙ্গ বলিতে আমরা জাতীয়তার সেই উদার আদর্শের সংহতি বোধে জাগ্রত বাঙলাকেই বুঝি। যাঁহারা লীগের সাম্প্রদায়িক বর্বরান্ধ ক্রূরতাকে বাঙলার সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, বাঙলার স্বাধীনতার কথা তাঁহাদের মুখে সাজে না। বাস্তবিকপক্ষে জাতীয় স্বার্থবোধে সংহত চেতনা যাহাদের অন্তরে নাই; সাম্প্রদায়িক উপদলীয় সঙ্কীর্ণ স্বার্থই যাহাদের সমস্ত কর্মনীতির মূলে প্রেরণা যোগাইতেছে, তাঁহারা বাঙলাকে পরাধীনতার অভিমুখেই ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছেন। জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতিকে ব্যাহত করিয়া দল বা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের স্বার্থ সিদ্ধ করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। এই অবস্থাকে কোন মূর্খই জাতির স্বাধীনতার অনুকূল বলিতে পারে না। সঙ্কীর্ণ স্বার্থের সংস্কার মিঃ সুরাবর্দীর দৃষ্টিকে কলুষিত করিয়াছে। সেই সংস্কারে অভিভূত হইয়া আজ তিনি বাঙলাদেশের অখণ্ডতার মহিমার কথা আওড়াইতেছেন অথচ ভারতবর্ষকে খণ্ড খণ্ড করিবার উদ্দেশ্যে দলবল সহ জেহাদী জিগীর তোলাই তাঁহার পরম ব্রত। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত বাঙলার জনমতকে দলিত করিয়া সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠায় নিজেদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থকে পুষ্ট করা এবং বিদ্বেষ-গত বৈষম্যের ভাব পরিতৃপ্ত করাই লীগ নেতাদের সকল নীতির মূলীভূত উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে বাঙলার সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় দেশের স্বাধীনতার উজ্জ্বল আদর্শ ও সংস্কৃতির উদার অনুভূতিতে জাগ্রত; তাহারা এমন গোলামী স্বীকার করিবে না। জাতিগত মর্যাদাবোধ অক্ষুণ্ণ রাখিতে যদি প্রয়োজন হয়, তাহারা প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত আছে। সুরাবর্দী সাহেব যেন এ কথা ভাল করিয়াই বুঝিয়া রাখেন। আমরা দেখিলাম, সুরাবর্দী সাহেব গত ২৪শে তারিখেও বাঙলার জন্য সর্বদলীয় মন্ত্রিমণ্ডল সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু এই সর্বদলীয় মন্ত্রিমণ্ডল বলিতে কয়েকজন দেশ-দ্রোহী, বিশ্বাসঘাতককে পদ মান বা প্রতিষ্ঠার লোভে দলে জুটাইয়া মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করা নয়। বাঙলা দেশে যদি সত্যই সর্বদলীয় মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে হয়, তবে লীগ-নীতির সর্বময় কর্তৃত্ব হইতে মন্ত্রিমণ্ডলকে সর্বাংশে মুক্ত করিতে হইবে। লীগের সর্বভারতীয় নীতির জোয়াল বহিয়া বাঙলার স্বাধীনতার কথা আওড়ানো সুরাবর্দী সাহেব বন্ধ করিলেই ভাল হয়।

নবজাগ্রত এসিয়ার বাণী—

মহাসমারোহের সঙ্গে আন্ত-এসিয়া সম্মেলন হইয়া গেল। এসিয়ার ত্রিশটির অধিক দেশ হইতে এই সম্মেলনে যোগদান করিবার জন্য ২৩০জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এসিয়ার ইতিহাসে এই সম্মেলন একটি অভূতপূর্ব ব্যাপার এবং প্রয়োজনীয় মুহূর্তেই এই সম্মেলনের অধিবেশন ঘটিয়াছে। আজ জগতের ইতিহাসের পট পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছে। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ সুদীর্ঘকাল এসিয়ার সভ্যতা এবং সংস্কৃতিকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল; বর্তমানে পুরাতন সাম্রাজ্যবাদ শূন্যে মিলাইয়া যাইতেছে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু সম্মেলনের সমাগত অভ্যাগতদিগকে অভিনন্দন করিতে গিয়া এসিয়ার বর্তমান আন্তর্জাতিক অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া বলেন,—"বর্তমানে এসিয়ার বিভিন্ন অংশে সংগ্রাম এবং অশান্তি চলিলেও, এই সব ঘটনাবলীর পশ্চাতে এক প্রাণশক্তি সক্রিয় হইয়া উঠিতেছে। সমস্ত এসিয়ায় আজ যৌবনোচিত আলোড়ন দেখা যাইতেছে। এসিয়ার দৃষ্টিতে যৌবনের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে।' বস্তুত পণ্ডিত নেহেরুর এই উক্তি কবিত্বপূর্ণ হইলেও ইহাতে অতিরঞ্জন কিছু নাই। ইউরোপ ও আমেরিকা আণবিক বোমা আবিষ্কার করিয়াছে; কিন্তু এই আণবিক বোমাকে সম্বলস্বরূপে পাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সাম্রাজ্যবাদের মূলীভূত পশুবল এলাইয়া পড়িয়াছে। বাহিরের শক্তিতে তাহারা আর অন্তরের একান্ত নিঃস্বতাকে ঢাকিতে পারিতেছে না। এই নিঃস্বতা নানারূপ দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা ইউরোপ এবং আমেরিকার সম্মুখে সৃষ্টি করিতেছে। এমন অবস্থায় এসিয়ার অন্তরগত সাধনাই সমগ্র জগৎকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে সক্ষম। বলা বাহুল্য, ভারতকে কেন্দ্র করিয়াই এসিয়া একদিন জগতের বিভিন্ন অংশে জ্ঞান-

বিজ্ঞানের ধারা সম্প্রসারিত করিয়াছিল। আবার সেই দিন ফিরিতেছে। এবারও ভারতের অধ্যাত্ম, সাধনাগত সংস্কৃতিকে অবলম্বন করিয়াই এসিয়া মানব-সভ্যতার ধারায় অভিনব শক্তি সঞ্চার করিবে। বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের মুখে আমরা এই আশার বাণীই শুনিতে পাইয়াছি। এসিয়ার সভ্যতা এবং সংস্কৃতি পশুবলকে বড় করিয়া দেখে নাই। সাম্য, প্রেম এবং মৈত্রীকেই সর্বোচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছে। নবজাগ্রত এসিয়া সেই শক্তির বলেই জগতের মুক্তি আনয়ন করিবে। সমগ্র এসিয়ার এই সু-মহান্ ব্রত উদ্‌যাপনে আমরা যেন আমাদের দায়িত্ব বিস্মৃত না হই; এবং পশু বলের কাছে কিছুতেই মস্তক নত না করি; আন্ত-এসিয়া সম্মেলন এজন্য আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে।

বিহার ও নোয়াখালি—

মহাত্মা গান্ধী নোয়াখালি ছাড়িয়া বিহারে গমন করিবার সঙ্গে সঙ্গে নোয়াখালি এবং ত্রিপুরার কোন কোন অঞ্চলে পাকিস্থানী মহিমা আবার মাথা তুলিতে চেষ্টা করিতেছে। গুণ্ডার দল গৃহ-প্রত্যাগতদিগকে নানারকমে শাসাইতেছে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে আনীত মামলা প্রত্যাহৃত করিবার জন্য সংখ্যা-লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোকদের ভয় দেখাইতেছে। পক্ষান্তরে গান্ধীজী বিহারে গমন করিবার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানকার আবহাওয়ার সম্যক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কিছুদিন পূর্বে গান্ধীজী তাঁহার প্রার্থনান্ত অভিভাষণে জানান যে, বিহার প্রদেশের দাঙ্গায় যে সমস্ত লোক অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা এখনও ধৃত হয় নাই, তাহাদের মধ্যে ৫০ জন মহাত্মাজীর নিকট তাঁহাদের নাম প্রেরণ করিয়াছে। কিন্তু নোয়াখালির দুষ্কৃতকারীরা অনেকেই ফেরার। অনেকে প্রকাশ্যভাবে ঘোরাফেরা করিতেছে; ইহা-দিগকে গ্রেপ্তার করিতে গেলে অদ্যাপি দলবদ্ধ-ভাবে বাধা দিবার দুঃসাহস ইহাদের রহিয়াছে। বড়ই দুঃখের বিষয়, এই সুদীর্ঘকালের মধ্যেও নোয়াখালির অশান্তির যবনিকাপাত ঘটিল না এবং সে অঞ্চলে পূর্ণ আশ্বস্তির ভাব ফিরিল না; বস্তুত শাসকদের নীতির সাম্প্রদায়িক মনোভাবগত দুর্বলতাই ইহার কারণ। বাঙলার অন্যান্য অঞ্চলের অবস্থাও নিরাপদ বলা চলে না। বগুড়া হইতে কিছুদিন হইল অশান্তির খবর আসিতেছে। সেখানে দুর্বৃত্তেরা একখানা ট্রেন আটকাইয়া ফেলিয়াছিল। ইহাতেই গুণ্ডা-শ্রেণীর লোকদের দৌরাত্ম্যের মাত্রা কতদূর উঠিয়াছে, কিছু অনুমান করা যাইতে পারে। বস্তুত শাসন-নীতির সঙ্গে সাম্প্রদায়িক দল-বিশেষের স্বার্থ যেখানে জড়িত থাকে, সেখানে যে এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইবে, ইহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। অবশ্য বাঙলায় লীগ মন্ত্রিমণ্ডলের কেহ কেহ শান্তি এবং সদ্ভাবের কথা বলিতেছেন; কিন্তু লীগের সাম্প্রদায়িক নীতির মহিমাকে পরিস্ফুট করিয়াই তাঁহাদিগকে সে কথা বলিতে হইতেছে। লীগ মন্ত্রীদের এই ধরণের দোমুখো চালে লীগের মূলীভূত সাম্প্রদায়িকতার প্রেরণাতেই সম্প্রদায়বিশেষ সচেতন হয়; ফলত অপর সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধিই তাহাদের মনে স্পষ্ট হইয়া পড়ে। লীগের মহিমাতে অপর সম্প্রদায়কে দাবাইয়া বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডল সম্প্রদায়বিশেষের সমাজ-জীবনে এইভাবে ভেদ-বিদ্বেষ এবং সংকীর্ণতা সম্প্রসারিত করিতেছেন। সাম্প্র-দায়িকতার অন্ধ সংস্কার বশেই তাঁহারা পাকিস্থানী জিগীরে নাচে এবং মন্ত্রীদের মুখের আনুষঙ্গিক কোন ভাল কথাই তাঁহাদের অন্তরে কাজ করে না। সেদিন বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাজেট বিতর্কের প্রত্যুত্তরে বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী আক্ষেপ করিয়াছেন যে, বাঙলা দেশে এখনও পাকিস্থান হয় নাই। আমাদের ভয় হয়, এ কথায় তাঁহার অনুগত দল সাম্প্রদায়িক স্বার্থ সাধনের উপর জোর দিয়াই সেই সুখের রাজ্য বাঙলায় প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিবে। বিহার ও বাঙলার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মনোভাব সমাজ-জীবনে শান্তি-প্রতিষ্ঠায় এইভাবে পার্থক্য সৃষ্টি করিতেছে।

পরলোকে স্যার আজিজুল হক—

গত ৮ই চৈত্র শনিবার স্যার আজিজুল হক পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙলার নেতৃস্থানীয় একজন মুসলমানের অভাব ঘটিল। রাজনীতিক জীবনে স্যার আজিজুল যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অনেকের পক্ষেই দুর্লভ। মফঃস্বলের আইন ব্যবসায়ী হইতে আরম্ভ করিয়া তিনি প্রাদেশিক মন্ত্রী, স্পীকার, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার, ভারত গভর্নমেণ্টের হাই কমিশনার এবং বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য পদ লাভ করিয়াছিলেন। স্যার আজিজুল মুসলিম লীগের রাজনীতির অনুগামী ছিলেন; কিন্তু লীগ-নীতিগত উগ্র সাম্প্র-দায়িকতার ভাব তাঁহার জীবনে পরিলক্ষিত হয় নাই। বাঙলা দেশ, বাঙলা ভাষার প্রতি তাঁহার প্রচুর অনুরাগ ছিল এবং বাঙলার দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি তাঁহার অন্তরে প্রগাঢ় সহানুভূতির ভাব বিদ্যমান ছিল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৫ বৎসর হইয়াছিল। আমরা তাঁহার পুত্রকন্যা ও পরিজনবর্গের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

লীগ দলের দুরভিসন্ধি—

লীগের দল আসামে গোলযোগ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। লীগওয়ালাদের উস্কানীতে উত্তেজিত জনশ্রেণীর উপদ্রব প্রশমিত করিতে আসাম গভর্নমেণ্টকে গুলী চালাইতে হইয়াছে। ইহার ফলে, অবশ্য নেতাদের কোন লোকসান হইবে না; কতকগুলি অজ্ঞ ব্যক্তিই ধর্মান্ধতায় পড়িয়া মারা যাইবে। পক্ষান্তরে নেতাদের জয়ঢাক বাজিয়া উঠিবে। আসামে লীগ নেতাদের এই নিষ্ঠুর ব্যবসায় আরম্ভ হইয়াছে। বড়দলৈ গভর্নমেণ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে অশান্তি দমনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ওদিকে সীমান্ত প্রদেশেও লীগ দল এখনও পূর্ণ নিরস্ত হয় নাই। সম্প্রতি সেখানকার রাজস্বসচিব কাজী আতাউল্লা লীগ দলের উদ্দেশ্য অতি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন সাম্প্রদায়িক অশান্তি সৃষ্টি করাই লীগ দলের একমাত্র উদ্দেশ্য। পাঞ্জাবে মুসলিম লীগ যে নীতি চালাইয়াছিল, সীমান্তেও তাহা কার্যক[...] করিবে, ইহাই তাহাদের অভিপ্রায়। মুসলিম লীগ পাকিস্থানের প্রস্তাব লইয়াই সীমান্তের গত নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়। নির্বাচনে তাহাদের শোচনীয়ভাবে পরাজয় ঘটে। এখন তাহারা ভ[...] দেখাইয়া গায়ের জোরে ডাক্তার খান সাহেবের মন্ত্রিমণ্ডলকে অপসারিত করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছে। কিন্তু সীমান্তের প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার খান সাহেব, স্যার খিজির হায়াৎ খান নহেন। তিনি শক্ত লোক। তিনি অবস্থাকে ইহার মধ্যেই আয়ত্তের মধ্যে আনিয়াছেন। তিনি স্পষ্ট ভাষাতেই ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডলের পশ্চাতে সমগ্র পাঠান জাতির সমর্থন রহিয়াছে এবং সীমান্তের ব্যবস্থা-পরিষদের একজন সদস্যও এ পর্যন্ত তাঁহার দল পরিত্যাগ করেন নাই। এরূপ অবস্থায় লীগওয়ালাদের গুণ্ডামির ভয়ে তিনি প্রধান মন্ত্রিত্ব ছাড়িবেন না। কাজী আতাউল্লাও বলিয়াছেন যে, মুসলিম লীগের এই সাম্প্রদায়িক অশান্তি সৃষ্টির প্রয়াস সীমান্ত গভর্নমেণ্ট কঠোর হস্তে দমন করিবেন। সুতরাং সীমান্ত প্রদেশে কিংবা আসামে লীগওয়ালাদের অশান্তি সৃষ্টির দুরভিসন্ধি সফল হইবে, এরূপ আশঙ্কার কারণ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না।

এশিয়ার প্রতি ভারতের শ্রদ্ধাঞ্জলি

[রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনা হইতে উদ্ধৃত]

জাপান

ভোরের বেলা উঠে জানালার কাছে আসন পেতে যখন বসলুম, তখন বুঝলুম জাপানীরা কেবল যে শিল্পকলার ওস্তাদ, তা নয়,— মানুষের জীবনযাত্রাকে এরা একটি কলাবিদ্যার মতো আয়ত্ত করেছে। এরা এটুকু জানে যে-জিনিষের মূল্য আছে গৌরব আছে, তার জন্য যথেষ্ট জায়গা ছেড়ে দেওয়া চাই। পূর্ণতার জন্য রিক্ততা সবচেয়ে দরকারী। বস্তু বাহুল্য জীবনবিকাশের প্রধান বাধা। এই সমস্ত বাড়ীটির মধ্যে কোথাও একটি কোণেও একটু অনাদর নেই, অনাবশ্যকতা নেই। চোখকে মিছি মিছি কোনো জিনস আঘাত করছেনা, কাণকে বাজে কোনো শব্দ বিরক্ত করছে না,— মানুষের মন নিজেকে যতখানি ছড়াতে চায় ততখানি ছড়াতে পারে, পদে পদে জিনিসপত্রের উপরে ঠোকর খেয়ে পড়ে না।

*   *   *

এদের জীবনযাত্রায় এই রিক্ততা, বিরলতা, মিতাচার কেবলমাত্র যদি অভাবাত্মক হোত, তা হোলে সেটাকে প্রশংসা করবার কোনো হেতু থাকত না। কিন্তু এই তো দেখছি, এরা ঝগড়া করে না বটে, অথচ প্রয়োজনের সময় প্রাণ দিতে প্রাণ নিতে এরা পিছপাও হয় না। জিনিসপত্রের ব্যবহারে এ'দের সংযম, কিন্তু জিনিসপত্রের প্রতি প্রভুত্ব এদের ত কম নয়। সকল বিষয়েই এদের যেমন শক্তি, তেমনি নৈপুণ্য, তেমনি সৌন্দর্যবোধ।

এ সম্বন্ধে যখন আমি এদের প্রশংসা করেছি, তখন এদের অনেকের কাছেই শুনেছি যে, "এটা আমরা বৌদ্ধধর্মের প্রসাদে পেয়েছি। অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মের একদিকে সংযম আর একদিকে মৈত্রী, এই যে সামঞ্জস্যের সাধনা আছে, এতেই আমরা মিতাচারের দ্বারাই অমিত-শক্তির অধিকার পাই। বৌদ্ধধর্ম যে মধ্যপথের ধর্ম।"

শুনে আমার লজ্জাবোধ হয়। বৌদ্ধধর্ম তো আমাদের দেশেও ছিল, কিন্তু আমাদের জীবনযাত্রাকে তো এমন আশ্চর্য ও সুন্দর সামঞ্জস্যে বেঁধে তুলতে পারেনি। আমাদের কল্পনায় ও কাজে এমনিতরো প্রভূত আতিশয্য, ঔদাসীন্য, উচ্ছৃংখলতা কোথা থেকে এল?

চীন

পরিব্রাজকের দল যে সত্যের বাণী আপনাদের দেশ হইতে আমাদের দেশে বহন করিয়া আনিয়াছিল এবং আমাদের দেশ হইতেও যাহা আপনাদের দেশে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, বিস্মৃতির গর্ভে আজও তাহা বিলীন হয় নাই। আমরা অনুভব করি যে, সে-সকল চিন্তাধারার সহিত বর্তমানকালের পরিবর্তিত পারি-পার্শ্বিকের সঙ্গতি রক্ষার প্রয়োজন আছে এবং সহস্র বর্ষ পূর্বের সাধকদের চিন্তাধারা ও বাণী সম্পূর্ণরূপে আজ আমরা গ্রহণে অসমর্থ। সেদিনের সেই সত্য-বাণী আজ আমাদের কাছে দুরভিসন্ধিপূর্ণ বলিয়া মনে হইতে পারে এবং তজ্জন্য ক্রোধের উদ্রেক হওয়াও অসম্ভব না, কিন্তু এ-কথা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না যে, আপনার ও আমার দেশবাসীর জীবনে সে বাণী ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া রহিয়াছে। ভালর জন্য অথবা মন্দর জন্যই হউক, আমাদের পূর্বপুরুষগণের এই সাধনালব্ধ চিন্তাধারার ফলে দুই দেশের মধ্যে প্রকৃত মিলন সম্ভবপর হইয়াছে।

সে কী মহান ও বিরাট তীর্থযাত্রা! ইতিহাসের সে এক গৌরবোজ্জ্বল সময়। সেই সকল মহান বীরের দল নিজেদের

ইন্দোচীনে আঙ্করভাট বিষ্ণুমন্দির
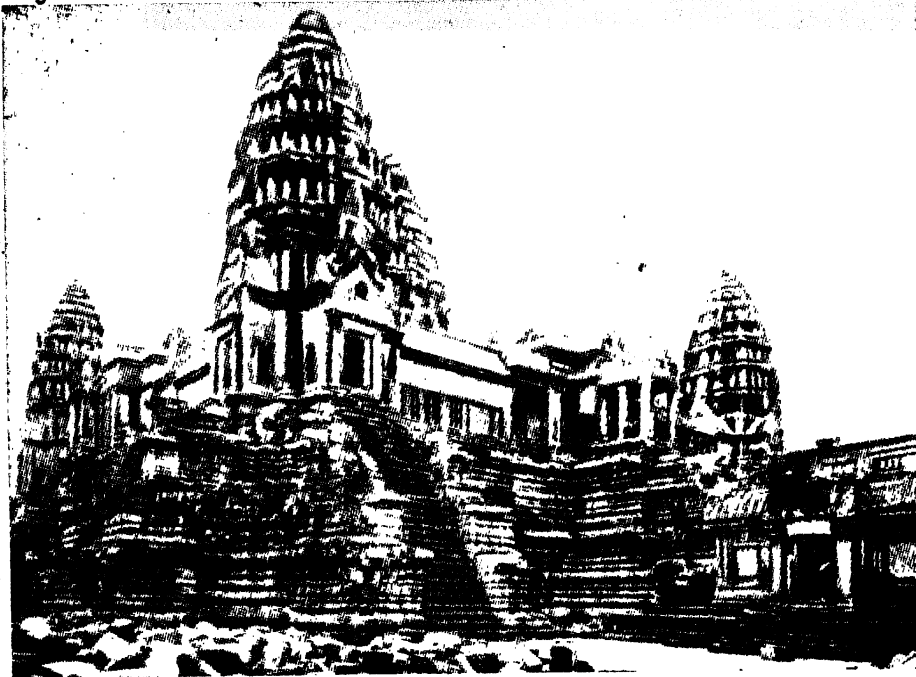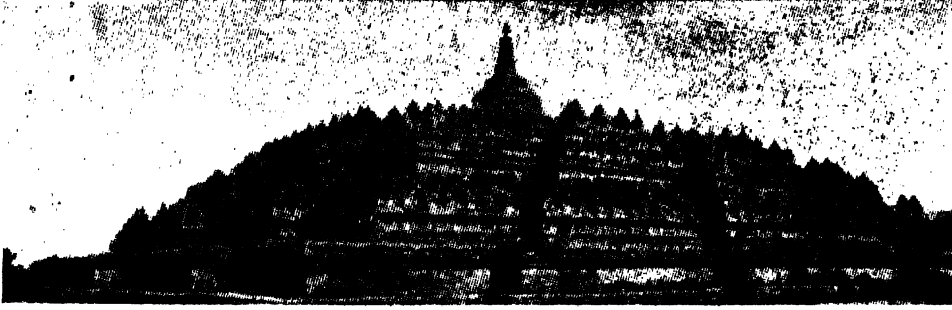
ইন্দোনেশিয়ার যবদ্বীপে বরোবুদুর মন্দির

বিশ্বাসের জন্য জীবনকে তুচ্ছ করিয়া বৎসরের পর বৎসর গৃহ হইতে নির্বাসিত ছিলেন। অনেকেরই জীবন পথেই বিনষ্ট হইয়াছে, কোনো কীর্তিই তাঁহারা রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। স্বল্প যে কয়েকজনের জীবন তাঁহাদের বিপদসংকুল অভিজ্ঞতার কাহিনী আমাদের কাছে বলিবার জন্য রক্ষা পাইয়াছিল তাঁহারা কোনো নথিপত্র রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহাদের অভিজ্ঞতার কাহিনী যতটুকু আমরা পাইয়াছি তজ্জন্য তাঁহারা আমাদের ধন্যবাদার্হ। যদিও সে কাহিনীর মধ্যে অনেকখানি আদিম যুগের ছাপ রহিয়াছে তথাপি সত্য উদ্ঘাটনে তাঁহারা কুণ্ঠিত হন নাই।

যবদ্বীপ

রামায়ণ মহাভারতের গল্প এদেশের মনকে জীবনকে যে কী রকম গভীরভাবে অধিকার করেছে তা এই কদিনেই স্পষ্ট বোঝা গেল। ভূগোলের বইয়ে পড়া গেছে বিদেশ থেকে অনুকূল ক্ষেত্রে কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদের নতুন আমদানি হবার অনতিকাল পরেই দেখতে দেখতে তারা সমস্ত দেশকে ছেয়ে ফেলেছে; এমনকি, যেখান থেকে তাদের আনা হয়েছে সেখানেও তাদের এমন অপরিমিত প্রভাব নেই। রামায়ণ মহাভারতের গল্প এদের চিত্তক্ষেত্রে তেমনি করে এসে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। চিত্তের এমন প্রবল উদ্বোধন কলা রচনায় নিজেকে প্রকাশ না করে থাকতে পারে না। সেই প্রকাশের অপর্যাপ্ত আনন্দ দেখা দিয়েছিল বরোবুদরের মূর্তি-কল্পনায়। আজ এখানকার মেয়ে পুরুষ নিজেদের দেহের মধ্যেই যেন মহাকাব্যের পাত্রদের চরিত্র-কথাকে নৃত্যমূর্তিতে প্রকাশ করছে, ছন্দে ছন্দে এদের রক্তপ্রবাহে সেই সকল কাহিনী ভাবের বেগে আন্দোলিত।

বালী দ্বীপ

যজ্ঞক্ষেত্র লোকে লোকারণ্য। এই উপলক্ষে সেখানে অনেকগুলি বাঁশের উঁচু মাচা-বাঁধা ঘরে এখানকার ব্রাহ্মণেরা সুসজ্জিত হয়ে শিখা বেঁধে ভূরি ভূরি খাদ্য বস্ত্র ফল পুষ্পপত্রের নৈবেদ্যের মধ্যে নানা রকম মুদ্রা সহযোগে মন্ত্র পড়ছে; তারা কেউ-বা কতরকম অর্ঘ্য উপকরণ তৈরি করছে। কোথাও-বা এখানকার বহু মন্ত্র-মিলিত সংগীত; এক জায়গায় তাঁবুর মধ্যে পৌরাণিক যাত্রার অভিনয়। উৎসবের এত অতিবৃহৎ আনুষ্ঠানিক বৈচিত্র্য আর কোথাও দেখিনি। অথচ কোথাও অসুন্দর বা বিশৃঙ্খল কিছু নেই। বিপুল সমারোহের দৃশ্যরূপটি বস্তুরাশির অসংলগ্নতায় বা জনতার ঠেলাঠেলিতে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায়নি। এতগুলি মানুষের সমাবেশ, অথচ গোলমাল বা নোংরামি বা অব্যবস্থা নেই। উৎসবের
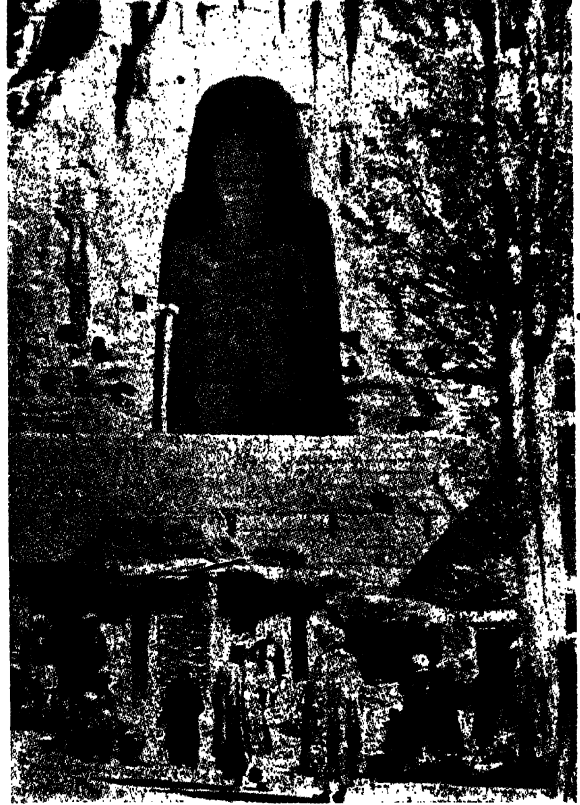
নাগারহারায় (বেলুচিস্থান) বৌদ্ধস্তূপের অভ্যন্তরস্থ বুদ্ধমূর্তি
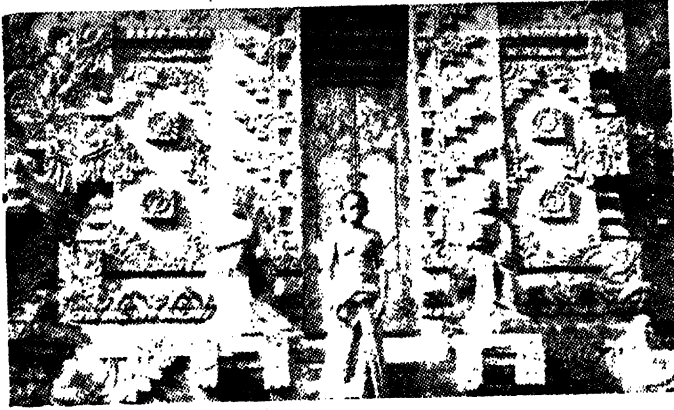
যবদ্বীপের একটি বুদ্ধমন্দির

ন্তর্নিহিত সুন্দর ঐক্যবন্ধনেই সমস্ত ভিড়ের লোককে আপনিই সংযত করে বেঁধেছে। সমস্ত ব্যাপারটি এত বৃহৎ এত বিচিত্র আর আমাদের পক্ষে এত অপূর্ব যে এর বিস্তারিত বর্ণনা করা অসম্ভব। হিন্দু অনুষ্ঠান-বিধির সঙ্গে এদেশের লোকের চিত্তবৃত্তির মিল হয়ে এই যে সৃষ্টি, এর রূপের প্রাচুর্যটিই বিশেষ করে দেখবার ও ভাববার জিনিস। অপরিমিত উপকরণের দ্বারা নিজেকে অশেষভাবে প্রকাশ করবার চেষ্টা. সেই প্রকাশ কেবলমাত্র বস্তুকে পুঞ্জিত করে নয়, তাকে নানা নিপুণ রীতিতে সজ্জিত করে।

ব্রহ্ম দেশ

এখানকার মেয়েরা সেই খাঁচা থেকে ছাড়া পেয়ে এখন পূর্ণতা এবং আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তারা নিজের অস্তিত্ব নিয়ে নিজের কাছে সংকুচিত হয়ে নেই. রমণীর লাবণ্যে যেমন তারা প্রেয়সী. শক্তির মুক্তি গৌরবে তেমনি তারা মহিয়সী। কর্মতৎপরতাই যে মেয়েদের যথার্থ শ্রী দেয়, সাঁওতাল মেয়েদের দেখে তা আমি প্রথম বুঝতে পেরেছিলুম। তারা কঠিন পরিশ্রম করে, কিন্তু কারিগর যেমন কঠিন আঘাতে মূর্তিটিকে সুব্যক্ত করে তোলে তেমনি এই পরিশ্রমের আঘাতেই এই সাঁওতাল মেয়েদের দেহ নিটোল এমন সুব্যক্ত হয়ে ওঠে তাদের সকল প্রকার গতিভঙ্গিতে এমন একটা মুক্তির মহিমা প্রকাশ পায়। কবি কীট্‌স বলেছেন, সত্যই সুন্দর। অর্থাৎ সত্যের বাধামুক্ত সুসম্পূর্ণতাতেই সৌন্দর্য। সত্য মুক্তিলাভ করলে আপনিই সুন্দর হয়ে প্রকাশ পায়। প্রকাশের পূর্ণতাই সৌন্দর্য, এই কথাটাই আমি উপনিষদের এই বাণীতে অনুভব করি—আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি: অনন্তস্বরূপ যেখানে প্রকাশ পাচ্ছেন, সেইখানেই তাঁর অমৃত-রূপ আনন্দরূপ। মানুষ ভয়ে, লোভে, ঈর্ষায় মূঢ়তায়, প্রয়োজনের সংকীর্ণতায় এই প্রকাশকে আচ্ছন্ন করে, বিকৃত করে; এবং সেই বিকৃতিকেই অনেক সময় বড়ো নাম দিয়ে বিশেষভাবে আদর করে থাকে।

তুরস্ক

নব তুরস্ক একদিকে য়ুরোপকে যেমন সবলে নিরস্ত করলে আর একদিকে তেমনি সবলে তাকে গ্রহণ করলে অন্তরে বাহিরে। কামাল পাশা বললেন, মধ্যযুগের অচলয়াতন থেকে তুরস্ককে মুক্তি নিতে হবে। আধুনিক য়ুরোপে মানবিক চিত্তের সেই মুক্তি তাঁরা শ্রদ্ধা করেন। এই মোহমুক্ত চিত্তই বিশ্বে আজ বিজয়ী। পরাভবের দুর্গতি থেকে আত্মরক্ষা করতে হলে এই বৈজ্ঞানিক চিত্তবৃত্তির উদ্বোধন সকলের আগে চাই। তুরস্কের বিচার বিভাগের মন্ত্রী বললেন,

"Mediaeval principles must give way to secular laws. We are creating a modern, civilised nation, and we desire to meet contemporary needs. We have the will to live, and nobody can prevent us."

এই পরিপূর্ণভাবে বুদ্ধিসংগতভাবে প্রাণযাত্রা নির্বাহের বাধা দেয় মধ্যযুগের পৌরাণিক অন্ধ সংস্কার। আধুনিক লোকব্যবহারে তার প্রতি নির্মম হতে হবে এই তাঁদের ঘোষণা।

মধ্য প্রাচ্য

আজ আমি একটি দরবার নিয়ে আপনাদের কাছে এসেছি। একদা আরবের পরম গৌরবের দিনে পূর্ব পশ্চিমে পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক ভূভাগ আরব্যের প্রভাব অধীনে এসেছিল। ভারতবর্ষে সেই প্রভাব যদিও আজ রাষ্ট্র-শাসনের আকারে নেই, তবুও সেখানকার বৃহৎ মুসলমান সম্প্রদায়কে অধিকার ক'রে বিদ্যার আকারে ধর্মের আকারে আছে। সেই দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে আমি আপনাদের বলছি আরব-সাগর পার ক'রে আরব্যের নববাণী আর একবার ভারতবর্ষে পাঠান,—যাঁরা আপনাদের স্বধর্মী তাঁদের কাছে,—আপনাদের মহৎ ধর্মগুরুর পূজ্য নামে, আপনাদের পবিত্র ধর্মের সুনাম রক্ষার জন্য। দুঃসহ আমাদের দুঃখ, আমাদের মুক্তির অধ্যবসায় পদে পদে ব্যর্থ; আপনাদের নবজাগ্রত প্রাণের উদার আহ্বান সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা থেকে, অমানুষিক অসহিষ্ণুতা থেকে, উদার ধর্মের অবমাননা থেকে মানুষে মানুষে মিলনের পথে মুক্তির পথে নিয়ে যাক হতভাগ্য ভারতবর্ষকে। এক দেশের কোলে যাদের জন্ম অন্তরে বাহিরে তারা এক হোক।
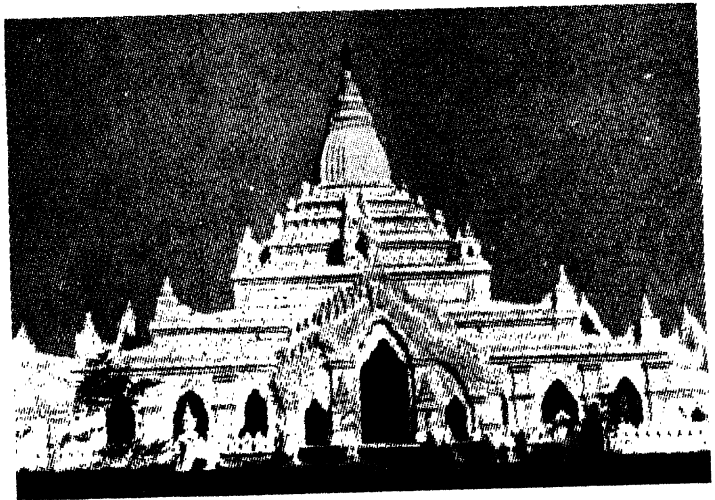
ব্রহ্মদেশের অমরপুরার জিয়াউকটাউগ মন্দির (ভারতীয় শিল্পীদের দ্বারা নির্মিত)

একটি যাদুঘরের কাহিনী

দিল্লী নগরী। মধ্যাদিনের সূর্য কিছুক্ষণ হয় উত্তপ্ত কুতুবের শীর্ষরেখা থেকে পশ্চিমে সরে এসেছে। চারিদিকের পরিব্যাপ্ত জনপদমুখরতার মধ্যেও হুমায়ুনের সমাধি একেবারে শান্ত, একখণ্ড সুন্দর শিলীভূত দিবাস্বপ্নের মত। অশোকস্তম্ভের মসৃণ লৌহ ক্ষণিকের জন্য আভাময় হয়ে ওঠে। ইন্দ্রপ্রস্থের মাঠে একটা সংগীহীন ঘূর্ণি-হাওয়া হঠাৎ ক্ষুব্ধ হয়ে দূরান্তরে দৌড়ে চলে যায়। সন্দেহ হয়, ওটা ঠিক ঘূর্ণি-হাওয়া নয়; একটা ঐতিহাসিক অভিমানের শরীর—অস্পষ্ট ও অবয়বহীন, মাত্র একটা দীর্ঘশ্বাসের জোরে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। শুকনো পাতাগুলো তার মাথায় ছেঁড়া পাগড়ীর মত নিতান্ত করুণ বলে মনে হয়।

হঠাৎ আকাশে একটা গুরু গুঞ্জন শোনা যায়। ব্রিটিশ জঙ্গী-বিমান বহরের একটি দুরন্ত ইয়র্ক বায়ুপুঞ্জে ডুবসাঁতার দিয়ে মাটি-মাখা মহীতলে নেমে আসছে। ভারতের নতুন বড়লাট লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন আসছেন। পালামপুর বিমানবন্দরে রাজপুত রাইফেলস্ সার বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়ে, সম্বর্ধনার আবেগে সুতীক্ষ্ম সংগীনের ফলক চকচক্ করে। এক দুই তিন...বার বার একত্রিশ বার তোপধ্বনি গমগম ওঠে। একত্রিশবার লালকেল্লার উদ্যানে নিঝুম দেওদারের পাতার আড়ালে বিশ্রাম-বিলাসী পাখির দল ডানা ঝাপ্টিয়ে চঞ্চল হয়ে ওঠে।

আর, শেষে তোপধ্বনির সংগে সংগে নয়াদিল্লীর মধ্য-এশিয়া মিউজিয়ামের ফটকের পাশে তন্দ্রাচ্ছন্ন একটি অদ্ভুত মূর্তির মানুষ হঠাৎ চমকে' চোখ মেলে তাকায়। রাত্রিশেষের শেষ অন্ধকারের মধ্যে ঠিক এইখানে এসে সে বসেছিল, এখনও বসে আছে।

লোকটি খুবই বৃদ্ধ। গায়ের রং গৌর ছিল বলেই মনে হয়, কিন্তু এখন তামাটে হয়ে গেছে। বোধহয়, বহু বৎসরের মধ্যাহ্ন সূর্যের জ্বালা এই বৃদ্ধের দেহকে এত প্রচণ্ডভাবে বিবর্ণ করে তুলেছে। মাথাভরা পাকা চুলের বোঝা, সুতরাং মাথার গড়নটা ঠাহর হয় না, সাদা ভুরু দুটো অবসন্নভাবে ঝুলে পড়েছে, চোখের তারায় একটা ঘোলাটে ছায়া, কার দিকে তাকিয়ে আছে বোঝা যায় না। যেন, বহু দূর ব্যবধান থেকে দাঁড়িয়ে সমস্ত পৃথিবীর সকলের দিকেই এই বৃদ্ধ তাকিয়ে আছে। মাত্র একটা জীর্ণ শীর্ণ কম্বল তার পরিচ্ছদ, এমনভাবে গায়ে জড়িয়ে আছে যার মধ্যে কোন দেশী বা বিদেশী রীতি নেই। লোকটার চেহারা এতই রিক্ত, এতই নিঃস্ব ও এতই দরিদ্র যে দেখা মাত্র কেউ বলে দিতে পারবে না কোন্ দেশের লোক।

কিন্তু লোকটি হিন্দী ভাষাতেই কথা বলে। সুতরাং ও যে ভারতবর্ষের লোক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবু মোটামুটি কেমন একটু অভারতীয় বলেই ধারণা হয়। যার গায়ে কোন সংস্কৃতির ছাপই নেই, তার জাতি-কুলমান ধারণা করা কঠিন নয় কি?

সংস্কৃতিহীন এই রহস্যময় বৃদ্ধ একটি রূপকথার পিতামহের মত যেন কিসের অপেক্ষায় বসে আছে। তার হাতে পোড়ামাটির তৈরী চৌক ঝাঁপির মত গঠনের একটা পাত্র, পাত্রের ভেতরে কি আছে তা সেই জানে। পাত্রের গায়ে কয়েকটা সাংকেতিক চিহ্ন—গমের শীষের মত একটা অক্ষর, তার পাশে শাবলের ফলার মত একটা অক্ষর, তার পাশে সাপের কুণ্ডলীর মত আর একটা চিহ্ন।

মধ্য-এশিয়া মিউজিয়ামের সুরম্য অট্টালিকার সিঁড়িতে একটা কলরব শোনা যায়। বৃদ্ধ একটু ব্যস্ত হয়ে ওঠে। বহু বিচিত্র পরিচ্ছদে শোভিত, সুন্দর ও সুশ্রী নরনারীর একটি জনতা মিউজিয়াম কক্ষের অভ্যন্তর থেকে বেরিয়ে বাইরে যাবার জন্য সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে। এশিয়া মহাদেশের, এমন কি মিশর প্রভৃতি নিকট প্রাচ্যের সমস্ত রাষ্ট্র ও দেশের লোক এই জনতার মধ্যে আছে। সুধী মনস্বী ও রুচিমান —জ্ঞানী গুণী ও গবেষক—পণ্ডিত শিল্পী ও বৈজ্ঞানিক সকলেই আছে। একটি সুশোভন সংস্কৃতিপরায়ণ জনতা।

জনতা ধীরে ধীরে ফটক পর্যন্ত এগিয়ে এল। রহস্যময় বৃদ্ধ হঠাৎ উত্তেজিত ভাবে উঠে দাঁড়ায়। এক হাতে পোড়া মাটির পাত্রটি তুলে ধরে, জনতাকে উদ্দেশ্য করে গম্ভীরভাবে ডাক দেয়—থামুন। জনতা বিস্মিত হয়ে থমকে দাঁড়ায়।

বৃদ্ধ—এই আমার উপহার, কে নিতে চান বলুন?

বৃদ্ধের ভাষার মধ্যে কেমন একটা রূঢ়তা ছিল। জনতা বিস্মিত হলেও উৎসাহিত হলো না। তবু জনতার মধ্যে মাত্র একজন বৃদ্ধের দিকে একটু কৌতুহলী হয়ে এগিয়ে এলেন। এঁর নাম জামশিয়েদ বুখারী, ইরাণের শিল্পী।

জামশিয়েদ বুখারী—উপহার চেয়ে নিতে হবে, এ কেমন অদ্ভুত কথা। আপনার ইচ্ছে হয়, উপহার দিয়ে দেবেন—চাই বা না চাই।

বৃদ্ধ—আমি যোগ্য লোকের হাতেই এই উপহার দিতে চাই।

জামশিয়েদ বুখারী হেসে ফেললেন—আমরা কি আপনার কাছে যোগ্যতার পরীক্ষা দেব?

বৃদ্ধও মৃদু মৃদু হাসতে থাকে—আপনাদের পরীক্ষা করার যোগ্যতা আমার নেই, কেমন? এই কথাই তো বলতে চান?

বুখারী একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। হঠাৎ কোন উত্তর দিতে পারে না।

বৃদ্ধ—আমার গায়ে কোন সংস্কৃতির ছাপ নেই, কিন্তু সেজন্য তুচ্ছ করবেন না। আমার এই উপহারের জিনিসটির সংস্কৃতির মূল্য কম নয়।

বুখারী—তার মানে?

বৃদ্ধ—আপনার হাতের ঐ গজদন্তের তৈরী সিগারেট কেসের চেয়ে এর দাম অনেক বেশী।

বুখারী বিরক্ত হয়ে ওঠেন—তার মানে?

বৃদ্ধ—এটা একটা ঐতিহাসিক নিদর্শন।

এশিয়ার সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদের মধ্যে একটা কৌতুহলের সাড়া জেগে ওঠে। সকলে বৃদ্ধের দিকে এগিয়ে আসে।

বৃদ্ধ এইবার একটু গর্বিত ভাবেই বলে—এই মাটির পাত্রকে মাটি খুঁড়ে বের করেছি।

দেখি দেখি দেখি—জনতার সকলেই আগ্রহের সংগে হাত তুলে মাটির পাত্রটা দেখবার জন্য অনুরোধ করতে থাকে। প্যালেস্টাইনের প্রত্নতত্ত্বের ইহুদী অধ্যাপক জ্যাকব বেন এজরা একটু বেশী ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

বেন এজরা—আচ্ছা, জিনিসটা মাটির নীচে কত ফুট গভীরে পেয়েছেন?

বৃদ্ধ—বাইশ ফুটেরও বেশী।

বেন এজরা—শুধু মাটি খুঁড়তেই হয়েছে?

বৃদ্ধ—না। এক স্তর মাটি, তারপর এক স্তর বালু, তারপর চূণাপাথরের একটা স্তর, তারপর একটা নরম শ্লেটের স্তরের ওপর এই জিনিসটি পড়েছিল।

বেন এজরার দুই চক্ষুর দৃষ্টি পুলকাপ্লুত হয়ে ওঠে।

বেন এজরা অনুরোধ করে—ওটা আমাকে দিন, আমি ওর মূল্য বুঝতে পেরেছি।

বৃদ্ধ—কি বুঝতে পেরেছেন?

বেন এজরা—ওটা কম করেও খৃষ্টপূর্ব সাত হাজার বছর আগেকার সভ্যতার নিদর্শন।

বৃদ্ধ হেসে ফেলে—শান্ত হন, ব্যস্ত হবেন না। আমার প্রশ্নের উত্তর যিনি দিতে পারবেন, তাঁকেই এই উপহার দেব।

বুখারীও এবার ব্যস্ত হয়ে ওঠে—প্রশ্ন করুন, কি আপনার প্রশ্ন?

বেন এজরা—জিজ্ঞেসা করুন, আমরা উত্তর দেব।

বুদ্ধ—আমার বিশ্বাস, এশিয়াকে যিনি ঠিক ঠিক বুঝতে পেরেছেন, তিনিই এশিয়াকে মহৎ করবার পথও চিনতে পেরেছেন।

আরব ঐতিহাসিক রফিক বে খুসী হয়ে বলেন—আমারও তাই বিশ্বাস।

বুদ্ধ—আমার আর একটা বিশ্বাস, যিনি এশিয়াকে বুঝতে পেরেছেন, তিনিই বলে দিতে পারবেন এই পাত্রের ভেতর কি আছে? বলুন, কে বলতে পারেন? বলুন, বলুন।

বুদ্ধের বিহ্বল আবেদনে জনতাও চঞ্চল হয়ে ওঠে। প্রত্যেকে উত্তর দেবার জন্য প্রস্তুত হয়।

প্রথম এগিয়ে আসেন কাজাকিস্তানের ভূতত্ত্ববিৎ অধ্যাপক রুশ্‌তম্‌ বাহেরাম।

রুশ্‌তম বাহেরাম—আমি এশিয়াকে বুঝেছি, কারণ আমি তুষারমৌলী হিমালয়ের প্রতিটি পাষাণ-কণিকার ইতিহাস আজীবন অনুসন্ধান করেছি। এই হিমালয় এশিয়ার মাটিকে গড়েছে। সাইবেরিয়ার চিরতুহিন জীবন এই হিমালয়ের দান। হিমালয় প্রসন্ন হয়নি বলেই বিরাট গোবির বক্ষোবিস্তৃত বালুকায় আগুনের জ্বালা জ্বলছে। ভারতের পঞ্চসিন্ধু যমুনা গঙ্গা এই হিমালয়েরই হৃদয়ের বিগলিত করুণার ধারা। ভলগা, নীপার ও ইয়াংসিকিয়াং —এশিয়ার নদনদী ও হ্রদ আজও হিমালয়ের শাসনে যুগ যুগ ধরে চিহ্নিত পথে সলিলতীর্থ রচনা করে চলেছে। সম্রাট হিমালয়, বিরাট এশিয়া তাঁরই পাষাণের সাম্রাজ্য। একই গ্রানিটের কঠিন সূত্রে এশিয়ার সমগ্র উপত্যকার মৃন্ময় শরীর নিবিড়ভাবে বাঁধা। কবে কোন্ দূর অতীতে, বিস্মরণের বাহিরে, টেথিস সমুদ্রের তরল সমাধি থেকে এক খন্ড কঠিন পাষাণ নিজ পরমাণুর শক্তিতে উদ্গত হয়ে ধীরে ধীরে হিমালয়রূপে উঠে দাঁড়িয়েছিল, গলিত বস্তু-পুঞ্জের বৈচিত্র্যহীন শ্মশান থেকে এশিয়া নামে এই মহাদেশকে কোলে করে উঠে দাঁড়িয়েছিল এই হিমালয়। ককেসাসের উপত্যকা আর কাশ্মীরের উপত্যকায় যে সগোত্রতা লক্ষ লক্ষ বছর ধরে অক্ষুণ্ণ হয়ে রয়েছে, তার ইতিহাস আমি জানি। প্রথম পল্বলযুগের প্রাণপঙ্কের আবির্ভাবকে, প্রথম আর্কীয় আগ্নেয় বিবরের উৎসারিত লাভাপুঞ্জকে, পামীয়, জুরাসিক ও ক্রিটেসীয় পুরাকল্পের পদার্থযজ্ঞের লক্ষ লক্ষ তুষারধৌত স্তরীভূত ও পুঞ্জীকৃত শিলা ধাতু ও লবণের শৈলমালা হিমালয়ের ইঙ্গিতে দিকে দিকে প্রসারিত হয়েছে। ভারতের গন্ডোয়ানা ও ধারোয়াব সচল অস্থির মত এশিয়া ও আফ্রিকার কায়া রচনা করেছে। সমগ্র এশিয়ার এই শিলাময় ঐক্যের স্বরূপ আমি বুঝেছি।

বুদ্ধ—বেশ, তাহ'লে বলুন, আমার এই ঐতিহাসিক পাত্রটির ভিতরে কি আছে?

রুশ্‌তম্‌ বাহেরাম্‌ কিছুক্ষণ চিন্তিতভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন। তারপর বলেন—এক টুকরো প্রাচীন অগ্নিশিলা।

বুদ্ধ হেসে ফেলে—না, আপনি বলতে পারলেন না।

উত্তর দেবার জন্য এগিয়ে আসেন নৃতাত্ত্বিক জ্যাকব বেন এজরা।

বেন এজরা—আমি এশিয়াকে বুঝেছি। আপনাকেও আমার খুবই চেনা-চেনা মনে হয়। আপনি ভারতের মানুষ, কিন্তু আপনার এই করোটীর গঠনে ও কপালের কুঞ্চিত ত্বকের রেখায় রেখায় আদি এশিয়ার শোণিত-সমন্বয়ের ইতিহাস লেখা রয়েছে। আদি মানবের প্রসূতি ও ধাত্রী এই এশিয়াভূমি। আর্য ও ককেসীয় মঙ্গোলীয় ও প্রায়-অস্ট্রোল, নেগ্রিটো ও আলপাইন, কত নরমূর্তির ছাঁচ এই এশিয়া গড়েছে। আবার মিলিয়ে মিশিয়ে মানুষের মূর্তিকে বিচিত্র থেকে বিচিত্রতর করে তুলেছে। ফিলিপিন থেকে মাদাগাস্কার, মিশর হতে মহেঞ্জোদাড়ো, হুনান থেকে তেহারান, শ্রীনগর থেকে অনুরাধাপুর—এশিয়ার মানুষ সর্বত্র একই মানুষ। কাশ্মীরে ককেসাসের নীলনলিন নয়নের দ্যুতি, ককেসাসে ভারতের কাজল চোখের চাহনি। ওষ্ঠে চিবুকে, ভুরু ও নাসিকায়, কেশে ও করোটীতে এশিয়ার মানুষ যুগ যুগ ব্যাপী বংশবিপ্লবের দান গ্রহণ করে এসেছে। আমি এশিয়ার মানুষ, আপনি এশিয়ার মানুষ। আমাদের শোণিতে একই ইতিহাসের উত্তাপ, তরলতা ও প্রবাহ। আমি এশিয়াকে এইভাবেই বুঝেছি। আমি জানি আপনার এই পোড়া-মাটীর পাত্রে কি বস্তু আছে।

বুদ্ধ—কি?

বেন এজরা—ভারতে প্রথম আর্য অভিযাত্রীর করোটীর একটি ভগ্নাংশ।

বুদ্ধ—না, বলতে পারলেন না।

উত্তর দেবার জন্য এগিয়ে আসেন কুমারী সুরীতা, ইন্দোনেশিয়ার শিল্পী।

কুমারী সুরীতা—আমি চিনেছি এশিয়াকে। এশিয়ার চিত্তের গভীরে যে ধ্যান, এশিয়ার কল্পনায় যে ঐশ্বর্য, এশিয়ার রুচিতে যে বর্ণময় বৈচিত্র্য, আমি তার রূপ উপলব্ধি করেছি। এশিয়ার প্রতিটি রঞ্জ টেরাকোট্টা, দারুময়, ধাতুময় ও শিলাময় ভাস্কর্যের বাণী আমি বুঝতে পারি। আমি জানি এলিফ্যান্টার ত্র্যম্বক সদাশিব সমগ্র এশিয়াকে সর্ব অকল্যাণের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্যে আজও জাগ্রত প্রহরীর মত রয়েছেন। নৃত্যপর নটরাজের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি বলি—তুমি ভারতবর্ষ, তুমিই এশিয়া। জাপদ্বীপে অমিতাভ আছেন, চীনে অবলোকিতেশ্বর আছেন, বরবুদুরে বোধিসত্ত্বেরা অবিচল হয়ে আছেন। আংকর ভাটের বিষ্ণুর হাতে আজও অভয়মুদ্রা অক্ষুণ্ণ হয়ে আছে। কুশান গান্ধার আর হেলেনীয়, দ্রাবিড় আর ব্যাবিলনীয়—কত পদ্ধতি, কত রীতি ও কত অলঙ্কার এশিয়ার দেশে দেশে এক দেহে লীন হয়ে আছে। কত ধ্যানী বুদ্ধ, কত গলিত-জটা ত্রিনয়ন রুদ্র, কত গ্রোটেস্ক নরসিংহ ও স্ফিংক্স, কত উমা-মহেশ্বরের বিহ্বল দাম্পত্য, কত গণেশ-জননীর মাতৃত্ব মূর্তিতে মূর্তিতে রূপময় হয়ে আছে। আমি প্রজ্ঞাপারমিতার দেশের মেয়ে, হে বুদ্ধ এশিয়া-মানব আমার মুখের দিকে তাকাও। তাহলে বুঝতে পারবে, আমি মিথ্যে বলিনি।

বুদ্ধ সস্নেহে কুমারী সুরীতার দিকে তাকায়—হ্যাঁ, মিথ্যে বলনি। প্রজ্ঞাপারমিতার সুস্মিত অধরের ঐশ্বর্য তুমি পেয়েছ। তরুণী এশিয়া! তুমি এশিয়ার রূপশিল্পের মহিমা বুঝতে পেরেছ।

কুমারী সুরীতা—আমি শিল্পী বলেই এশিয়ার রূপের ঐক্য বুঝতে পেরেছি।

বুদ্ধ—বল, এই পাত্রে কি আছে?

কুমারী সুরীতা—গুপ্তযুগের কোন স্তূপ পীঠের প্রাচীরালম্ব একটি ক্ষুদ্র পুত্তলিকা।

বুদ্ধ—না।

কুমারী সুরীতা—তবে চালুক্য যুগের কোন দেবদাসীর পদস্খলিত একটি নূপুর।

বুদ্ধ—না।

অল্ এদিল পাশা, মিশরের বৈজ্ঞানিক উত্তর দেবার জন্য এগিয়ে আসেন।

এদিল পাশা—আমি এশিয়া বুঝেছি, আমি মিশরবাসী, তবু আমি নিজেকে এশিয়ার আত্মীয় বলেই মনে করি। আমার দেশের পিরামিড আমার অহঙ্কার, কিন্তু এশিয়া-বাসীরও অহঙ্কার। সমগ্র এশিয়ার প্রস্তর যুগের মনোলিথ (Monolith) সংস্কৃতি ও আমার দেশের পিরামিডের সাধনা একই প্রেরণার ইতিহাসে। সমগ্র এশিয়ার মানুষ বৃহৎ শিলার বেদিকা রচনা করে যে সভ্যতার আরাধনা করেছিল, আমন রা ও তুতেনখামেন তারই মহিমাকে চরম করে তুলেছিলেন। সে কথা যাক, আমি বিশ্বাস করি, সমগ্র এশিয়া বিজ্ঞানের আত্মীয়তায় একদিন এক হয়েছিল এশিয়ার সেই জ্ঞানময় ঐক্যকে আমি উপলব্ধি করি। ভারতবর্ষ এশিয়াকে দশমিক শূন্য উপহার দিয়েছে, ইরান এশিয়াকে বস্তুবিজ্ঞান দিয়েছে, চীন এশিয়াকে কারুবিজ্ঞান দিয়েছে আরব এশিয়াকে নৌবিদ্যা দিয়েছে। এই ভারতে তক্ষশিলা এশিয়ার জ্ঞানতীর্থ। জ্ঞানে বিনিময়ে, বিজ্ঞানীর দৌত্যে এশিয়ার সম দেশ সাংস্কৃতিক ঐক্য অর্জন করেছিল আলেকজান্দ্রিয়া ও ভারতের উজ্জয়িনী বিদ্যা ও বিজ্ঞানের বিনিময়ে সংস্কৃতি ঐক্যে

সাধনাকে সফল করেছিল। আমি এশিয়াকে বুঝেছি।

বৃদ্ধ—বলুন, আমার এই অতি-পুরাতন ঐতিহাসিক মৃৎপাত্রের ভেতরে কি আছে?

এদিল পাশা—উজ্জয়িনীর মানমন্দিরের একটি দিগ্‌যন্ত্রের কাঁটা।

বৃদ্ধ—না।

রফিক বে (আরব ঐতিহাসিক)—আমি এশিয়াকে চিনি। আজ নয়, দশ হাজার বছর আগে থেকে এশিয়ার মানুষ পণ্য বিনিময়ের সাধনায় ও ব্যবসায়ের সূত্রে যুক্ত হয়ে আছে। আমি কল্পনায় দেখতে পাই, মহেঞ্জোদাড়োর বণিকের দল পণ্যসম্ভার নিয়ে কত গিরিকান্তার পার হয়ে স্থলপথে হেঁটে চলেছে, মরুদ্যানে বিশ্রাম গ্রহণ করছে। উর কিশ ব্যাবিলন পার হয়ে তারা হেঁটে চলেছে। নীল নদের উপকূল ধরে তারা আরও উত্তরে হেঁটে চলেছে। আমি কল্পনা করতে পারি চীনের সার্থবাহ চীনাংশুকের সম্ভার নিয়ে খোটান সমরকন্দ খিবা বোখারা পার হয়ে এশিয়ার বাজারে বাজারে ব্যবসায় করে ফিরে যাচ্ছে। তাম্রলিপ্তি ও সিংহশ্রীর বন্দরে এশিয়ার সমুদ্রচারী পণ্য-তরীর ভীড়। বাণিজ্যের যোগাযোগে নিখিল এশিয়া একদিন যুক্ত ছিল। আমার বিশ্বাস, আপনার এই ঐতিহাসিক মৃৎপাত্রে একটি প্রাচীন মুদ্রা আছে।

বৃদ্ধ—না।

ইন্দোচীনের ভাষাতাত্ত্বিক ডক্টর তিন্ চুয়ান্ উত্তর দেবার চেষ্টা করেন।

তিন্ চুয়ান্—আমি এশিয়াকে বুঝেছি, ভাষার বন্ধনে সমগ্র এশিয়া যুক্ত হয়ে আছে। এশিয়ার ভাষার ইতিহাসও একটা প্লাবনের ইতিহাসের মত। এশিয়ার মানুষ যে দেশেরই হউক, আমি যেন একই কণ্ঠস্বরের সুর শুনতে পাই। এই মানবতীর্থ ভারতেরই প্রতি জনপদে সমগ্র এশিয়ারই ভাষাস্রোত প্রবাহিত হয়ে চলেছে। আর্য ও মঙ্গোলীয়, মন্‌খমের ও ফিনো-উগ্রীয়—এশিয়ার সকল দেশের ভাষা। তার ধ্বনি সমাস ও ব্যঞ্জনা নিয়ে কোটি কোটি মানুষের মুখে নিত্যদিন উচ্চারিত হয়ে চলেছে। ভাষার বন্ধনে এশিয়ার সকল দেশের হৃদয় এক হয়ে বাঁধা। আমি এশিয়ার এই ঐক্য মনেপ্রাণে বুঝতে পারি। আমার বিশ্বাস, আপনার এই পাত্রের মধ্যে আকিমীয় বা খরোষ্ঠি অক্ষরে লিখিত একটি তাম্রশাসন আছে।

বৃদ্ধ—না।

কেউ উত্তর দিতে পারে না। সকলের মুখে একটা বিষণ্ণতার ভাব দেখা দেয়। কী এমন প্রচণ্ড মূল্যবান বস্তু আছে এই রহস্যময় বৃদ্ধের মৃৎপাত্রের ভেতরে? কিন্তু বৃদ্ধের মুখে আগের চেয়ে একটু উৎফুল্লতার চিহ্ন ফুটে ওঠে। বৃদ্ধ যেন নিজেই অনুতপ্ত হয়ে সৌজন্যের সুরে বলে—আপনারা কেউ বলতে পারলেন না, তার জন্যে আমি দুঃখিত। এই উপহার আমি কাউকে দিয়ে দিতে পারলেই খুশি হ'তাম। কারণ এটা আমার কাছে একটা ভয়ানক বোঝার মত হয়ে আছে। বিশ্বাস ক'রে কারও হাতে এর ভার দিয়ে দিতে পারলেই আমি নিশ্চিন্ত হই।

বুখারী একটু বিরক্ত হয়—এত কথা বলবার পরেও কি আপনার মনে এই ধারণা রয়ে গেল যে, আমরা এশিয়াকে বুঝিনি।

বৃদ্ধ—হ্যাঁ, বোঝেন নি।

বৃদ্ধ যেন একটু উদ্ধতভাবেই প্রত্যুত্তর দেয়। এশিয়ার সাংস্কৃতিক অতিথির দল অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। কুমারী সুরীতা অভিমানিনী এশিয়া দুহিতার মতই ভ্রূভঙ্গী করে।

কুমারী সুরীতা—তাহ'লে আজ পর্যন্ত কেউ এশিয়াকে বোঝেনি, আর আপনার এই মৃৎপাত্রের মধ্যেও কিছু নেই।

বৃদ্ধ—রাগ করো না। আমি বিশ্বাস করি এশিয়ার সংস্কৃতির গৌরব তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ, এশিয়ার সাংস্কৃতিক ঐক্যের সত্যকেও তোমরা চিনতে পেরেছ, এ বড় কম কথা নয়।

বেন এজ্‌রা—তবে আপনার আপত্তির কারণটা কি?

বৃদ্ধ—আপনারা এশিয়াকে বোঝেননি, বুঝলে এশিয়ার সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে পারতেন।

এদিল পাশা—আবার সেই কথা!

বৃদ্ধের শান্ত মুখের লোল মাংসপেশী-গুলি হঠাৎ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে—হ্যাঁ, সেই একই কথা। অহংকার করবেন না। কোথায় আপনার এশিয়ার সংস্কৃতি?

জার্মাশিয়েদ বুখারী—ওমরখৈয়ামের রুবাইয়ে, তানসেনের গানে, আগ্রার তাজমহলে, তাঞ্জোরের মন্দিরে, দামাস্কার গোলাপে, ভারতের মসলিনে, যবদ্বীপের নৃত্যে......

বৃদ্ধ—থামুন। বাজে কথা বলবেন না। আমার দিকে তাকান।

সকলে সন্ত্রস্তভাবে রহস্যময় বৃদ্ধের বিক্ষুব্ধ মূর্তির দিকে তাকায়।

বৃদ্ধ—কোথায় আমার গান? আমার কবিতাই বা কোথায়? কে কবে আমাকে নাচ শিখিয়েছে? আমার বাগিচাও নেই, গোলাপও নেই। তাঞ্জোরের মন্দিরে আমাকে কে কবে ঢুকতে দেখেছে? আমি কবে মসলিনের পরিচ্ছদ গায়ে দিয়েছি? আপনাদের সংস্কৃতি আমাকে দিতে পেরেছেন কি? কিন্তু আমিও তো আপনাদেরই মত এশিয়ার মানুষ।

সংস্কৃতিপরায়ণ মনস্বীদের জনতা হঠাৎ একটা মূর্খের ভীড়ের মত নিরুত্তর হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। দেখে মনে হয় এই রূঢ় প্রশ্নটা তাদের আত্মপ্রসন্ন বিদ্যা ও অহমিকার ওপর আকস্মিক আঘাতের মত এসে পড়েছে।

বৃদ্ধের চোখের দৃষ্টিটা কিন্তু প্রিয় পিতামহের মত মুহূর্তের মধ্যেই স্নেহার্দ্র হয়ে ওঠে।

বৃদ্ধ—একটা কথা বলি শুনুন। সত্যিই যদি আপনারা এশিয়াকে বুঝতেন, তবে এশিয়ার সংস্কৃতি রক্ষার জন্যও চেষ্টা করতেন।

রফিক বে, বেন্ এজ্‌রা, রুশত্ বাহেরাম, জর্মাশিয়েদ বুখারী, কুমারী সুরীতা, এদিল পাশা ও ডক্টর তিন্ চুয়ান্ সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে—আমরা চেষ্টা করছি। বিশ্বাস না হয়......।

বৃদ্ধ—কি চেষ্টা করছেন?

কুমারী সুরীতা—আমাদের সঙ্গে আসুন, স্বচক্ষে দেখবেন।

বৃদ্ধ—চল, আমিও নিশ্চিন্ত হই, আর এই বোঝা বইতে পারছি না।

বৃদ্ধকে সঙ্গে নিয়ে এশিয়ার অতিথিদল রওনা হয়।

(২)

পুরানা কেল্লার বড় দরওয়াজা পার হয়ে জনতা প্রাচীন সেরশাহী দিল্লীর আঙিনায় প্রবেশ করে। নিকটে সেরশাহের মসজিদ শতাব্দীর সাক্ষীর মত দাঁড়িয়ে আছে। নূতন মণ্ডপ তৈরী হয়েছে, তারই অভ্যন্তরে প্রথম এশিয়া সম্মেলন। শত শত অভ্যাগত ও প্রতিনিধি এবং হাজার হাজার দর্শক।

সম্মেলন মণ্ডপের প্রবেশপথে জনতা এগিয়ে যেতেই স্বেচ্ছাসেবকেরা সরে দাঁড়ায়। সকলে একে একে ভেতরে প্রবেশ করে। বৃদ্ধ ভেতরে যাবার জন্য এগিয়ে যেতেই স্বেচ্ছাসেবক বাধা দেয়।—আপনি বাইরে থাকুন।

বৃদ্ধ—কেন?

স্বেচ্ছাসেবক—আপনি প্রতিনিধি নন, দর্শকও নন, আপনার কোন টিকিট নেই।

বৃদ্ধ—সত্যি কথা, আমার কিছুই নেই। কিন্তু আমি এশিয়া সম্মেলনের জন্য একটা উপহার নিয়ে এসেছি।

স্বেচ্ছাসেবক—প্রদর্শনীর ম্যানেজারের কাছে নিয়ে যান।

বৃদ্ধ হেসে ফেলে। ফিরে যাবার জন্য আবার মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু হঠাৎ একটা সোরগোল শোনা যায়। কুমারী সুরীতা, জার্মাশিয়েদ, বেন্ এজরা সবাই আবার মণ্ডপের ভেতর থেকে ব্যস্তভাবে বাইরে ছুটে এসেছে। সোরগোল শোনা যায়—যাবেন না। যাবেন না।

কুমারী সুরীতা এসে বৃদ্ধের হাত চেপে ধরে—চলে যাবেন না।

বৃদ্ধ—আমি প্রতিনিধি নই।

সুরীতার মুখ করুণ হয়ে ওঠে—বুঝেছি, কিন্তু একটু দাঁড়ান। অভ্যর্থনা সমিতির কেউ আসলে একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

বেন্ এজ্রা—আপনি ক্ষুণ্ন হবেন না। আপনাকে বুঝতে পারছে না বলেই বাধা দিচ্ছে। ভারতীয় প্রতিনিধিরা এসে সব কথা শুনলেই একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

মণ্ডপের প্রবেশপথে ভীড় ক্রমেই বাড়তে থাকে। বহু প্রতিনিধি, দর্শক ও অভ্যাগত কৌতূহলী হয়ে বুদ্ধের চারদিকে একটা ব্যূহ রচনা করে দাঁড়ায়। ভারত গভর্নমেণ্টের প্রত্নতাত্ত্বিক সার্ভে বিভাগের জনৈক বলিষ্ঠ গবেষক ভীড় ঠেলে একেবারে বুদ্ধের সম্মুখে এসে দাঁড়ায়।

বলিষ্ঠ গবেষক—আপনি কি একটা উপহার নিয়ে এসেছেন শুনলাম। দেখি?

বুদ্ধ পোড়ামাটির পাত্রটি দেখায়—এই যে।

বলিষ্ঠ গবেষক—ওটা আবার কি?

বুদ্ধ—একটা ঐতিহাসিক নিদর্শন।

বলিষ্ঠ গবেষক—কোথায় পেয়েছেন?

বুদ্ধ—ঝেলম নদীর ধারে, ভেড়ীওয়ালাদের গ্রামে, একটা স্তূপ খনন করে, বাইশ ফুট গভীরে।

বলিষ্ঠ গবেষক—ওটা আমাকে দিয়ে দিন।

বুদ্ধ—কেন?

বলিষ্ঠ গবেষক—এশিয়ার সংস্কৃতির একটা মূল্যবান নিদর্শন বলে মনে হচ্ছে।

বুদ্ধ—কিন্তু আপনাকে দেব কেন?

বলিষ্ঠ গবেষক—কিন্তু আপনি ওটা কাছে রেখে কি করবেন? এশিয়ার সংস্কৃতির কি বোঝেন আপনি?

বুদ্ধের নিষ্প্রভ চোখ দুটো দপ্ করে জ্বলে ওঠে।

বুদ্ধ—হ্যাঁ মহাশয়, আমি এশিয়ার সংস্কৃতির কিছুই বুঝি না। কিন্তু আমি না হলে এশিয়ার সব রঙের আলপনা একদিনে মুছে যেত, সব সুর স্তব্ধ হয়ে যেত, সব শিখর আমলক মিনার ও গম্বুজ ধুলোয় লুটিয়ে পড়তো। আমি পাথর ভেঙে পথ না করে দিলে এশিয়ার শোভাযাত্রার গতি রুদ্ধ হয়ে যেত। মার্কো পোলো মেগাস্থিনিসের দৌত্য আর হুয়েন সাঙের পরিব্রজ্যা অলীক হয়ে থাকতো।

বলিষ্ঠ গবেষক—আপনি দেখছি বেতালের মত কথা বলছেন। কে আপনি?

বুদ্ধ—আমার মুখের দিকে তাকিয়ে চিনতে চেষ্টা করুন। আমার স্বেদ শোণিত আর নিঃশ্বাস দিয়ে আমি সংস্কৃতির রথ টানি। লক্ষ সংঘারামের জন্য মাটি কাটি, পিরামিডের জন্যে পাথর ভাঙি আর ফতেপুর সিক্রীর স্বপ্নভবন খোয়াবগাহের জন্য রক্তশিলার বোঝা বহন করে আনি। আমি সমুদ্র গুপ্তের সিংহাসন মাথায় বহন করে যোজন পথ পার হয়ে মধ্যএশিয়ায় নিয়ে গেছি। বণিকের পণ্যের বোঝা আমারই মেরুদণ্ডের জোরে বহন করে আমিই নিয়ে গেছি অতীত মেসেপটেমিয়ায়। কত চেঙ্গিসের হিংসার সেবায় আমিই সৈনিকরূপে প্রাণ উৎসর্গ করেছি, এশিয়ার প্রতি খর্জুরকুঞ্জে আজও আমার অস্থি ছড়িয়ে আছে। আমি চিরকালের ডুবুরী, সমুদ্রে ডুব দিয়ে মুক্তি কুড়াই, নিজে উলঙ্গ হয়েই রয়ে গেছি আর আপনার সংস্কৃতির গলায় দোলে মুক্তার মালা।

বলিষ্ঠ গবেষক—আপনি শুধু একদিক দেখছেন। এসিয়ার সংস্কৃতি, অর্থাৎ ভগবান তথাগতের পঞ্চশীল ও মহাকরুণা, কনফুসিয়াসের নীতি, জরথুস্ত্রের গাথা.........।

বুদ্ধ গর্জন করে ওঠে—চুপ! তাঁদের বাণীকে আপনারা চিরকাল অগ্রাহ্য করেছেন, আর চিরকাল ঐ মহামানবদেরই নামের দোহাই দিয়ে এসেছেন। আমাকে বাদ দিয়ে শুধু আপনাকে সভ্য হবার জন্য বুদ্ধ ও কনফুসিয়াস নির্দেশ দিয়েছিলেন?

বলিষ্ঠ গবেষক—না।

বুদ্ধ—তবে আমার এদশা কেন?

বলিষ্ঠ গবেষক—আমি কি জানি? এশিয়া সম্মেলনকে জিজ্ঞেসা করুন।

বলিষ্ঠ গবেষক যেমন হন্তদন্ত হয়ে এসেছিল, তেমনি হন্তদন্ত হয়ে চলে যায়।

সম্মেলনের লগ্ন ঘনিয়ে আসছে। কর্মীদের ছুটোছুটি উদ্দাম হয়ে ওঠে। বাইরের দিকে আর একটা নতুন হর্ষ শোনা যায়, হেমন্তের গঙ্গার মৃদু তরঙ্গরোলের মত, মহীশূরের চন্দন বনে প্রথম দক্ষিণসমীরের উল্লাসের মত, দূরে আরতির বাদ্যের মত সুললিত ও শ্রুতিমধুর। ভারতীয় প্রতিনিধির দল আসছেন। তাঁদের চোখের দৃষ্টি নতুন প্রদীপের আলোকের মত দ্যুতিময়, তাঁদের ওষ্ঠে মীরপুর খাসের বুদ্ধের হাসিটি আবার যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁদের গ্রীবার ভঙ্গীতে, তাঁদের গতিতে, তাঁদের দুই বাহুর আন্দোলনে আজও যেন ক্ষমা, করুণা ও অবন্তী মুদ্রা ও বিভঙ্গ অস্পষ্ট ভাবে মিশে আছে। কুমারজীব, জিনগুপ্ত, বুদ্ধভদ্র, দীপঙ্কর ও ধীমানের প্রতিচ্ছায়ায় মিছিলের মত ভারতের সুধীবৃন্দ আসছেন।

সম্মেলনের প্রবেশপথে এসে মিছিল হঠাৎ থেমে যায়। রহস্যময় বুদ্ধ তার ঐতিহাসিক নিদর্শন পোড়ামাটির পাত্রটি দুহাত দিয়ে ঊর্ধে তুলে হাঁক দেয়—আমার উপহার।

এশিয়া মিউজিয়ামের কিউরেটর, সৌম্যমূর্তি প্রবীণ জ্ঞানী ডক্টর অভয়ঙ্কর বুদ্ধের মৃৎপাত্রটির দিকে গভীর দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকেন। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসেন, বুদ্ধকে প্রশ্ন করেন। বিরাট জনতা একটা বিরাট নাটকের কুশীলবের মত দাঁড়িয়ে থাকে।

ডক্টর অভয়ঙ্কর—দেখি, জিনিসটা আমার চেনা চেনা মনে হচ্ছে।

বুদ্ধ ক্ষণিকের মত চমকে ওঠে। ডক্টর অভয়ঙ্করের মুখের দিকে ভয়ার্তভাবে তাকিয়ে থাকে।

ডক্টর অভয়ঙ্কর মৃৎপাত্রের গায়ে চিহ্নিত অক্ষরগুলির ওপর হাত বুলিয়ে যেন একটা ঐতিহাসিক রহস্যের ঘুম ভাঙাতে থাকেন। তারপর তৃপ্তভাবে বলেন—হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি।

বুদ্ধ বিবর্ণমুখে ত্রাসকম্পিত স্বরে যেন আক্ষেপ করে ওঠে—আপনি জানেন, এর ভেতর কি আছে?

ডক্টর অভয়ঙ্কর—জানি। পাত্রের ঢাকা তুলে ফেলুন।

বুদ্ধ দুহাত দিয়ে পাত্রটাকে চেপে ধরে।—না, না, না। আপনার বিদ্যার জোরে আমার উপহার কেড়ে নেবেন না।

ডক্টর অভয়ঙ্কর—আমি কথা দিচ্ছি, কেউ কাড়বে না। আপনার যাকে ইচ্ছে হয় উপহার দিয়ে যাবেন।

বুদ্ধের হাত ঠক্ ঠক্ করে কাঁপে। ধীরে ধীরে মৃৎপাত্রের ঢাকা তুলে নেয়। সমস্ত জনতার দৃষ্টি একমুখী হয়ে দেখতে থাকে, পাত্রের ভেতর ধূসরবর্ণের কি একটা চূর্ণ বস্তু পড়ে রয়েছে।

ভস্ম! একমুঠো ভস্ম! জনতা হতভম্বের মত তাকিয়ে থাকে। ডক্টর অভয়ঙ্কর তাঁর চশমা মুছে নিয়ে আবার চোখে পরেন।

ডক্টর অভয়ঙ্কর—হ্যাঁ, এই ভস্ম কোন আগ্নেয়গিরির ভস্ম নয়। এশিয়ার কোন এক প্রাচীন ক্রীতদাসের অস্থিভস্ম।

ডাঃ তিন্ চুয়ান্—কোন যুগের?

ডক্টর অভয়ঙ্কর—আর্যযুগের হতে পারে, প্রাগার্যও হতে পারে। অতীতে এই ধরণের একটা লোকাচার ছিল। প্রবাসে কোন ক্রীতদাসের মৃত্যু হ'লে, তার অস্থিভস্ম মাটির আধারে প্রিয়-পরিজনের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। আমি বেলুচিস্তানে ও সিওয়ালিকের কয়েকটা জায়গায় ঢিবি খুঁড়ে এই ধরণের আরও কতগুলি ভস্মাধারের ভাঙা ভাঙা অংশ পেয়েছি, কিন্তু এরকম আস্ত একটা নিদর্শন এই প্রথম দেখলাম। যাক্, সম্মেলনের সময় হয়ে এসেছে, সবাই চলুন।

কুমারী সুরীতা—এই বুদ্ধকেও ভেতরে যাবার অনুমতি দিন।

ডক্টর অভয়ঙ্কর—কেন?

কুমারী সুরীতা—ইনি সম্মেলনকে এই মৃৎপাত্রটি উপহার দিতে চান।

ডক্টর অভয়ঙ্কর—বেশ তো, আমার হাতে দিন।

বুদ্ধ—আমার দিতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু নিশ্চিন্ত না হলে......।

ডক্টর অভয়ঙ্কর—আপনার কিসের দুশ্চিন্তা?

বুদ্ধ—আমার কতগুলো ধারণা আছে,

সেগুলো পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত......

ডক্টর অভয়ঙ্কর—তাড়াতাড়ি বলুন।

বৃদ্ধ—আমার ধারণা এশিয়াকে যাঁরা ঠিক ঠিক বুঝেছেন, তাঁরাই এশিয়ার সংস্কৃতি রক্ষা করতে পারবেন। আমি তাঁদেরই হাতে এই উপহার দিতে চাই।

ডক্টর অভয়ঙ্কর—ভেতরে চলুন। আপনার ধারণা পরিষ্কার করে নিতে পারবেন।

সমস্ত জনতা সম্মেলন মণ্ডপের ভেতরে প্রবেশ করে।

(৩)

এশিয়া সম্মেলনের মণ্ডপ। এশিয়ার সমস্ত দেশের অতিথিবৃন্দের এক বিরাট পরিষদ। প্রতি রাষ্ট্রের পতাকা, কত বিচিত্র লাঞ্ছন, কত প্রতীক ও কত মূর্তির গ্যালারি। কত চিত্র ও রঞ্জিত চীনাংশুক। সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে, প্রদর্শনীর পুঞ্জ পুঞ্জ সজ্জীকৃত নিদর্শনের সম্ভারের দিকে তাকিয়ে রহস্যময় বৃদ্ধ মণ্ডপের ভেতর ঘুরতে থাকে। ধীরে ধীরে বৃদ্ধের উৎসাহ স্তিমিত হয়ে আসে, নিজেকে বড় বেশি অসহায় মনে হয়। যেন একটা অনাহূত অপয়া আবির্ভাবের মত সে এই গৌরবের মেলায় এসে জোর করে ঢুকেছে।

সম্মেলন আরম্ভ হবে। সভাতল গম্ভীর হয়ে আসে, বৃদ্ধ হঠাৎ ব্যস্তভাবে মণ্ডপের দরজার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। কুমারী সুরীতা দৌড়ে এসে বৃদ্ধকে অনুনয় করে।

সুরীতা—আপনি আবার চলে যাচ্ছেন?

বৃদ্ধ—হ্যাঁ।

সুরীতা—কেন?

বৃদ্ধ—এখানে আমার ভরসা নেই।

সুরীতা—কেন? সমস্ত এশিয়া আজ এক হয়ে দাঁড়িয়েছে, এশিয়াকে আবার সংস্কৃতির পুণ্য দিয়ে আমরা বাঁচিয়ে তুলবো।

বৃদ্ধ—আমি কামনা করি তোমাদের চেষ্টা সফল হোক্। তোমাদের দিকে তাকিয়ে অনেকখানি আশা হচ্ছে, কিন্তু একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারছি না কন্যা। একবার ইচ্ছে হয়েছিল, এই সম্মেলনের হাতেই উপহার দিয়ে দিই, কিন্তু পারলাম না।

সুরীতা—এশিয়ার এই ঐক্য দেখেও আপনি বিশ্বাস করলেন না?

বৃদ্ধ—এটা তোমাদের গৌরবের ঐক্য, সোনার শিকল দিয়ে বাঁধা। এরকম তো আগেও হয়েছিল, হয়েও আসছে। তবু এশিয়ার সংস্কৃতি যুগে যুগে বারবার ভেঙে গেছে। মর্মর স্তম্ভ আর স্বর্ণচূড়া সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে পারে না।

সুরীতা—কে পারে?

বৃদ্ধ—আমি পারি।

সুরীতা—সত্যি করে বলুন তো আপনি কে?

বৃদ্ধ—এখনো চিনতে পারলে না, এটাই আশ্চর্য। আমি এশিয়ার শূদ্র। আমাকে সংস্কৃতি দাও, তবেই সংস্কৃতি বাঁচবে। আমাকে সংস্কৃতি দাও তবে আর পৃথিবীতে চেঙ্গিসের অভ্যুত্থান সম্ভব হবে না। নইলে, হে এশিয়ার করুণারূপিণী কন্যা, বার বার দুর্যোগে ও অপমানে তোমাকে কাঁদতে হবে, তোমার বীণা ভেঙে যাবে, আলপনার রঙ মুছে যাবে। আমি চলি।

সুরীতা—আপনার এই মৃৎ পাত্রটিকে কি করবেন?

বৃদ্ধ—আমার সঙ্গে আমারই সমাধিতে প্রোথিত হয়ে থাকবে।

সুরীতার চক্ষু সজল হয়ে ওঠে। বৃদ্ধ সান্ত্বনা দেয়।

বৃদ্ধ—দুঃখ করো না। এই ক্রীতদাসের অস্থিভস্ম, আমারই পূর্ব পুরুষের আবেদন এর প্রতি রেণুতে নির্বাক হয়ে মিশে আছে। এরই মতন আমিও আজ এশিয়ার যাদুঘরের সামগ্রী হয়ে রয়েছি। এরা স্তব্ধ ও ভস্মীভূত, আমি সবাক্ ও চলমান। যাদুঘরের জীবন আর সইতে পারি না কন্যা।

বৃদ্ধ সম্মেলন-মণ্ডপের বহির্দ্বার পার হয়ে বাইরে চলে যায়। সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়।

আবার পুরোণা কিল্লার বড় দরওয়াজা। একটি সবল অস্থিবহুল চেহারার যুবক একাকী বসেছিল, তার পাশে একটা কোদাল। যুবকটির পরিধানে গিরিমাটীর রঙে ছোপান একটা শতছিন্ন ও মলিন পায়জামা। গায়ে কোন জামা নেই।

রহস্যময় বৃদ্ধ উপস্থিত হয়। সাদা ভুরু টান করে কপালের ওপর তুলে, চোখের দৃষ্টিটাকে যেন বাধামুক্ত ক'রে বৃদ্ধ যুবকটির দিকে কৌতুহলী হয়ে তাকায়।

বৃদ্ধ—তুমি এখানে কি করছো?

যুবক—বসে আছি।

বৃদ্ধ—ওখানে এশিয়া সম্মেলন হচ্ছে, জান না?

যুবক—জানি বৈকি। আমিই তো এতদিন তার জন্যে খেটেছি।

বৃদ্ধ—তুমি খেটেছ?

যুবক—হ্যাঁ, আমি সমস্ত জায়গাটার মাটি চৌরস করেছি, গর্ত খুঁড়েছি, রাবিশ সরিয়েছি—ডবল মজুরী পেয়েছি।

বৃদ্ধ—তুমি কুলি?

যুবক—হ্যাঁ।

বৃদ্ধ—তবে আর এখানে বসে কেন? তোমার কাজ তো ফুরিয়ে গেছে।

যুবক একটু ইতস্তত করে বলে—আমি একজনের অপেক্ষায় বসে আছি। শুনেছি তিনি আসবেন। একবার তাঁকে দেখতে পারলেই আমার এশিয়া দেখা হয়ে যাবে।

বৃদ্ধ—তিনি কে?

যুবক—গান্ধীজী।

বৃদ্ধ—তিনি এখন কোথায়?

যুবক—পাটনাতে আছেন।

বৃদ্ধ—সেখানে কি করছেন?

যুবক—শোনেন নি? মানুষ মানুষকে খুন করছে, ঘর পুড়িয়ে দিচ্ছে, ধর্মস্থান ভেঙে চুরমার করছে। গান্ধীজী সেখানে আছেন, খুনীকে প্রায়শ্চিত্ত করাচ্ছেন, পীড়িতকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। মানুষের পোড়া ভিটায় আবার নতুন ক'রে ঘর তুলে দিচ্ছেন।

বৃদ্ধ যেন দিগন্তের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার মুখ থেকে অর্ধস্ফুট স্বরে একটা কথা বার বার ধ্বনিত হতে থাকে—এশিয়ার মানুষ! এশিয়ার মানুষ!

যুবকটি ভয় পায়। বিচলিতভাবে উঠে দাঁড়ায়। বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে—কি হলো? আপনি কে? এশিয়ার মানুষের কি হয়েছে? আপনি অমন করে কি দেখছেন?

বৃদ্ধ—দেখছি, এশিয়ার মানুষের আত্মাকে পাথর-চাপা সমাধি থেকে খুঁড়ে বের করছেন এক মহাশ্রমিক, তাঁরই নাম গান্ধী। শোন......।

বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর হঠাৎ উল্লাসে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে। কুলি যুবকটি আবার চমকে ওঠে।

বৃদ্ধ—আমি এশিয়ার পথের মানুষ, নগণ্য নিরীহ ও সাধারণ। তোমারই মত। আমাকে সভ্যতার পুণ্য দিয়ে সুন্দর করে যিনি তুলবেন, তাঁরই নাম তুমি আমাকে শুনিয়েছ। তিনি আসছেন, তাঁর পদধ্বনির জন্য কান পেতে তুমি বসে আছ। আমার অনুরোধ—বসে থাক ভাই। আমার হয়ে এইখানে তুমি তাঁর জন্যে অপেক্ষা কর। যদি তিনি আসেন, তাঁর হাতে আমার প্রতিনিধি হয়ে তুমি এই উপহার তুলে দিও; আমাকে কথা দাও।

যুবক—আমি কথা দিচ্ছি।

বৃদ্ধ—আমি নিশ্চিন্ত।

রহস্যময় বৃদ্ধ চলে যায়। দিল্লীর অপরাহ্নের সূর্যালোকে হঠাৎ পথের ওপর একটা ধুলোর ঝড় ছটফট করে ওঠে। তারই মধ্যে ধুলো ও ছায়া হয়ে যেন বৃদ্ধ অদৃশ্য হয়ে যায়।

[ভারত গভর্নমেণ্টের প্রত্নতাত্ত্বিক সার্ভে বিভাগের একজন ক্যাম্প কুলি, তার নাম ছিল নাথুরাম। বহু বছর ধরে সার্ভেয়ারদের অধীনে সে মাটী খুঁড়েছে। মজুরী নিয়ে সার্ভেয়ারদের সঙ্গে সে প্রায়ই গণ্ডগোল করতো। একদিন দেখা গেল ক্যাম্প মিউজিয়ামে চুরি হয়ে গেছে। নীলার মালা, তামার মূর্তি, একটা সোনার দীপাধার—এত সব মূল্যবান নিদর্শন থাকতেও চোর শুধু একটা ছোট মৃৎপাত্র চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। নাথুরামকেও তারপর দিন আর ক্যাম্পে দেখা গেল না। আর তাকে কোথাও কখনো দেখা যায়নি। নাথুরাম বুড়ো হয়েছিল, কাজেই যেখানে চলে যাক না কেন, আজ পর্যন্ত সে বেঁচে থাকতে পারে না]

এশিয়ায় নূতন প্রাণ-শক্তির উদ্বোধন

[আন্তঃএশিয়া সম্মেলনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর অভিভাষণ]

এশিয়ার নরনারীগণ, কি উদ্দেশে আজ আপনারা এখানে সমবেত হইয়াছেন? কি উদ্দেশ্যে এই এশিয়ার বিভিন্ন দেশ হইতে আপনারা আসিয়া প্রাচীন দিল্লী সহরে সমবেত হইয়াছেন?

শ্যামের প্রতিনিধি শ্রীমতী কাঞ্চনাগম্ সহ পণ্ডিত নেহরু ও শ্রীযুক্তা শিবরাও

এশিয়া সম্মেলনের পরিকল্পনা নূতন কিছু নয় এবং অনেকেই ইহার বিষয় চিন্তা করিয়াছেন। আরও অনেক বৎসর পূর্বে যে এইরূপ সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয় নাই ইহাই আশ্চর্যের বিষয়। যাহা হউক, হয়ত ইহার উপযুক্ত সময় তখনও হয় নাই এবং তখন এইপ্রকার কিছু করিবার চেষ্টা সম্ভবতঃ অপ্রয়োজনীয় হইত এবং বিশ্বের ঘটনাস্রোতের সহিত ইহার কোন যোগ থাকিত না। ঘটনাক্রমে আমরা ভারতবাসীরাই এই সম্মেলনের উদ্যোগ করিলাম। কিন্তু এই প্রকার সম্মেলনের কথা একই সময়ে এশিয়ার অনেক দেশের বহু লোকের মনেই উদয় হইয়াছিল। আমাদের এসিয়াবাসীদের পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা করা ও একযোগে অগ্রসর হওয়ার সময় উপস্থিত—ইহা অনেকেই অনুধাবন করিয়াছিলেন। ইহা কেবল অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষা নয়, ঘটনাস্রোতেই আমাদিগকে এইভাবে চিন্তা করিতে বাধ্য করিয়াছে। ইহার জন্যই আমাদেরই কেহ কেহ এই সম্মেলনের জন্য আপনাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন এবং আপনারা এই আমন্ত্রণে সোৎসাহে সাড়া দিয়াছেন। কিন্তু কেবল আমাদের এই আহ্বানের জন্যই নয়, ইহা ছাড়া আরও গভীরতর কোন প্রেরণার ফলে আপনারা আজ এখানে আসিয়াছেন।

আমরা আজ ইতিহাসের এক যুগের শেষ সীমান্তে নূতন যুগের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান!

মানবেতিহাসের এই যুগসন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা আমাদের সুদীর্ঘ অতীতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারি এবং আমাদের চক্ষের সম্মুখে যে ভবিষ্যৎ গড়িয়া উঠিতেছে তাহার প্রতিও দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারি। দীর্ঘ নীরবতার পর হঠাৎ আজ এশিয়া পুনরায় বিশ্ব-ব্যাপারে বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

হাজার বৎসরের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে, এশিয়া— যাহার সহিত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মিশরের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল, মানবজাতির বিবর্তনে এক বিরাট অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। এই এশিয়ায়ই প্রথম সভ্যতার জন্ম হয় এবং এই এশিয়ায়ই মানব তাহার অনন্ত জীবন সংগ্রাম সুরু করে। এই মহাদেশেই মানবমন নিয়ত সত্যের সন্ধানে রত হয় এবং মানবের সত্য রূপ আলোক-রশ্মির মত বিকশিত হয়। এই আলোকে সমগ্র বিশ্ব আলোকিত হইয়াছিল।

এই বিরাট শক্তিশালী এশিয়া হইতে একদিন চারিদিকে সংস্কৃতির ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল; কিন্তু ক্রমে ইহা অনড় ও অপরিবর্তনীয় হইয়া উঠিল। অপরাপর জাতি এবং অন্য মহাদেশ পুরোভাগে আসিল এবং তাহারা নূতন শক্তিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং বিশ্বের এক বড় অংশের উপর আধিপত্য লাভ করিল। আমাদের এই শক্তিশালী এশিয়া মহাদেশ ইউরোপের প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের ক্ষেত্রে পরিণত হইল এবং ইউরোপই ইতিহাস ও মানব-সভ্যতার অগ্রগতির কেন্দ্র হইল। এখন আবার পট-পরিবর্তন সুরু হইয়াছে এবং এশিয়া পুনরায় তাহার আত্মসম্বিৎ ফিরিয়া পাইতেছে। এক বিরাট যুগবিবর্তনের মধ্যে আমরা বাস করিতেছি এবং ইতিমধ্যেই পরবর্তী অবস্থা রূপ পরিগ্রহ করিতে সুরু করিয়াছে। এই সময়ে এশিয়া অপরাপর মহাদেশের পাশে তাহার যথার্থ স্থান গ্রহণ করিবে।

এই যুগসন্ধিক্ষণে আমরা আজ এখানে মিলিত হইয়াছি। এশিয়ার অন্যান্য দেশের অধিবাসীদিগকে সাদরে আহ্বান করিয়া বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁহাদের সহিত আলোচনার এবং আমাদের অগ্রগতি, কল্যাণ ও বন্ধুত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ করায় ভারতবাসী আজ গৌরবান্বিত।

চীনের প্রতিনিধিদ্বয়—ডেমোক্রেটিক সোস্যালিস্ট পার্টির মিঃ ওয়াই এইচ মাও এবং ক্যাণ্টনের চৌনসান্ বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার মিঃ এস কে ওয়াং

ভারতবাসীর আমন্ত্রণে এশিয়ার প্রত্যেক দেশ হইতেই বিপুল সাড়া পাওয়া গিয়াছে।

চীন দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ, আপনাদিগকে আমরা সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি। এশিয়া এই চীনের নিকট বহুভাবে ঋণী এবং ভবিষ্যতে এই দেশের নিকট আরও বহু কিছু পাইবার আশা আমরা করি। মিশর এবং পশ্চিম এশিয়ার আরব দেশসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছি। আপনারা এক গৌরবোজ্জ্বল সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী। ভারতের সংস্কৃতিকেও ইহা বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। ইরাণের প্রতিনিধিগণকে সম্বর্ধনা করিতেছি। ইতিহাসের সূচনা হইতেই দেখা যায়, এই দেশের সহিত ভারতের যোগাযোগ বর্তমান। যে ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েৎনামের সংস্কৃতির সহিত ভারতের সংস্কৃতি অংগাঙ্গিভাবে জড়িত এবং সম্প্রতি যেখানে স্বাধীনতার সংগ্রাম চলিতেছে (এই সংগ্রাম আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয় যে, স্বাধীনতা অর্জন করিতে হয়, ইহা কেহ দান করিতে পারে না) ইহাদের প্রতিনিধিদিগকে আমরা স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছি। তুরস্কের প্রতিনিধিগণকে সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি। এক মহান নেতার প্রতিভাবলে তুরস্ক নবজীবন লাভ করিয়াছে। কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া, শ্যাম, মালয় ও ফিলিপাইন দ্বীপের প্রতিনিধিবৃন্দকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছি। সোভিয়েট রুশিয়ার অধীন এশিয়ার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি আমাদের জীবনকালেই অতিদ্রুত অগ্রসর হইয়াছে এবং আমাদের অনেক কিছু তাহাদের নিকট শিখিবার আছে। তাহাদের প্রতিনিধিগণকে আমরা স্বাগত বরণ করিতেছি এবং আমাদের প্রতিবেশী আফগানিস্থান, তিব্বত, নেপাল, ভুটান, ব্রহ্ম ও সিংহলের প্রতিনিধিবৃন্দকে আমরা সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি, তাঁহাদের দিকে বিশেষভাবে আমরা সহযোগিতা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপনের প্রত্যাশায় চাহিয়া আছি। এই সম্মেলনে এশিয়ার প্রায় সকল দেশেরই প্রতিনিধি আসিয়াছেন, দুই একটি দেশ অবশ্য প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারেন নাই। তবে, আমাদের কিংবা তাহাদের ইচ্ছার অভাবের ফলে এমন হয় নাই, আমাদের আয়ত্তের বহির্ভূত প্রতিবন্ধকের জন্যই এইরূপ হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ড হইতে আগত পর্যবেক্ষকগণকেও আমরা স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছি। কারণ, আমাদের অনেক সাধারণ সমস্যা (বিশেষভাবে প্রশান্ত মহাসাগর ও এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে) আছে এবং উহাদের সমাধানের জন্য আমাদিগকে পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিতে হইবে।

আজ আমরা এখানে মিলিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে এশিয়ার সুদীর্ঘ অতীতের ছবি আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইতেছে। বিগত কয়েক বৎসরের দুঃখকষ্ট আমাদের মন হইতে মুছিয়া যাইতেছে এবং তাহার স্থলে সহস্র সহস্র স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত হইতেছে। কিন্তু আমি আপনাদিগকে অতীত যুগের গৌরব কাহিনী এবং তখনকার জয়পরাজয়ের কথা বলিব না কিংবা সম্প্রতি আমরা যে সকল নির্যাতন ভোগ করিয়াছি এবং এখন পর্যন্ত যাহার কিছুটা আমাদিগকে ভোগ করিতে হইতেছে, তাহার কথাও আমি আপনাদিগকে শুনাইব না।

গত দুই শত বৎসরের মধ্যে আমরা প্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদের অভ্যুদয় এবং এশিয়ার বহু অংশ উপনিবেশ কিংবা আংশিক উপনিবেশে পরিণত হইতে দেখিয়াছি। এই দুই শত বৎসরের মধ্যে অনেক কিছুই ঘটিয়াছে। এশিয়ায় ইউরোপীয় জাতির প্রভুত্ব স্থাপনের ফলে অনেক কিছুই ঘটিয়াছে। কিন্তু এশিয়ার বিভিন্ন জাতির পরস্পরের বিচ্ছিন্নতা অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। উত্তর-পশ্চিম, উত্তর-পূর্ব, পূর্ব এবং দক্ষিণ পূর্বের প্রতিবেশী দেশগুলির সহিত সর্বদাই ভারতের যোগাযোগ ও আদানপ্রদান ছিল।

ভারতে বৃটিশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন হইয়া যায় এবং ভারতবর্ষ অবশিষ্ট এশিয়া হইতে প্রায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। প্রাচীন স্থলপথসমূহ একরূপ বন্ধ হইয়াই গেল। বহির্জগতের সহিত আমাদের যোগাযোগ স্থাপনের প্রধান পথ রহিল সমুদ্র পথ। এই পথে আমাদিগকে ইংলণ্ডেই নিয়া যাইত। এশিয়ার অন্যান্য দেশের সম্পর্কেও ঠিক একই কথা। ইউরোপের কোন না কোন সাম্রাজ্যবাদী দেশের সহিত তাহাদের আর্থিক বিলি ব্যবস্থা যুক্ত ছিল। এমনকি, সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তাহারা, অতীতে নিজের যে সকল বন্ধু ও প্রতিবেশীর কাছে বহু কিছু পাইয়াছে, তাহাদের দিকে না চাহিয়া ইউরোপের দিকে তাকাইয়া থাকিত।

আজ রাজনৈতিক ও অন্যান্য নানা কারণে এই পরস্পর বিচ্ছিন্নতা দূর হইয়া যাইতেছে। পুরাতন সাম্রাজ্যবাদ ভাঙিগয়া পড়িতেছে। স্থলপথ আবার উন্মুক্ত হওয়ায় এবং বিমান
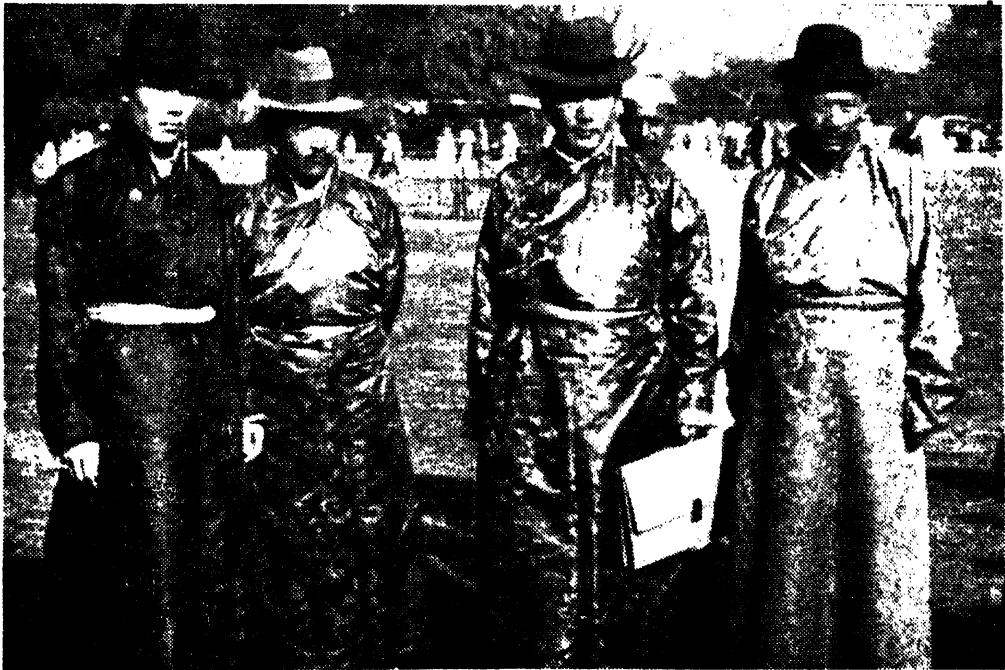
তিব্বতীয় প্রতিনিধিদল

চলাচলের প্রসার হওয়ায় আমরা পরস্পরের অতি নিকটে আসিতে পারিয়াছি। ইউরোপীয় প্রভুত্ব আমাদিগকে পরস্পরের নিকট হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল। এই প্রভুত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চতুষ্পার্শ্বের প্রাচীর ভাঙিয়া পড়িতেছে এবং আমরা দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর পুনরায় পুরাতন বন্ধুরূপে মিলিত হইবার সুযোগ পাইয়াছি। এই সম্মেলন আমাদের গভীর মিলনাকাঙ্ক্ষারই অভিব্যক্তি।

এশিয়ার প্রত্যেক দেশকেই সমান ভিত্তির উপর মিলিত হইয়া সাধারণ প্রচেষ্টা ও কার্যকে জয়যুক্ত করিতে হইবে। এশিয়ার এই নূতন বিবর্তনে ভারতের যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ করা কর্তব্য। ভারতবর্ষের আসন্ন স্বাধীনতার কথা ছাড়িয়া দিলেও ভারতবর্ষ স্বভাবতঃই এশিয়ার নানা শক্তির কেন্দ্রস্থল। ইহার ভৌগোলিক অবস্থান এরূপ যে, ইহা পশ্চিম, উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মিলনক্ষেত্র হইবার পক্ষে প্রশস্ত। প্রাচীনকাল হইতে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সহিত ভারতের সম্পর্ক রহিয়াছে। ভারতের ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। পশ্চিম ও পূর্ব হইতে বহু সংস্কৃতির ধারা ভারতে আসিয়াছে এবং ভারত সেগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া স্বীয় সংস্কৃতিকে পুষ্ট ও বিচিত্র করিয়াছে। এই সঙ্গে ভারতেরও সংস্কৃতির ধারা এশিয়ার দূর দূরান্ত দেশে প্রবাহিত হইয়া বহু লোকের উপর আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

আমি আপনাদের নিকট অতীত অপেক্ষা বর্তমানের কথাই বলিতে চাই। আমরা এখানে আমাদের অতীত ইতিহাস ও সম্পর্ক আলোচনা করিতে সমবেত হই নাই, আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কের বিষয় আলোচনা করিতে চাহি। আমি এই সম্মেলনে বলিতে চাই যে, অন্য কোন মহাদেশ বা দেশের বিরুদ্ধে আক্রমণ এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য নহে। এই সম্মেলনের সংবাদ বিদেশে প্রচারিত হওয়ার পর হইতে ইউরোপ ও আমেরিকার কোন কোন ব্যক্তি এই সম্মেলনকে ইউরোপ ও আমেরিকার বিরুদ্ধে এশিয়ার মিলিত আন্দোলনরূপে কল্পনা করিতেছেন। কিন্তু কাহারও বিরুদ্ধে আমাদের কোন অভিসন্ধি নাই; সমগ্র জগতে আমরা শান্তি ও প্রগতির পথ প্রশস্ত করিতে চাহি—ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য।

আমরা এশিয়াবাসীরা বহুকাল যাবৎ পাশ্চাত্য দেশগুলির আদালতে আবেদন-নিবেদন করিয়াছি। ইহার এখন অবসান হওয়া উচিত। আমরা এখন আত্মনির্ভরশীল হইতে চাই এবং যাঁহারা আমাদের সহিত সহযোগিতা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের সহিত আমরা সহযোগিতা করিব। আমরা আর অন্যের ক্রীড়নক হইয়া থাকিতে ইচ্ছুক নহি।

পৃথিবীর ইতিহাসের বর্তমান সংকটে এশিয়াকে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। এশিয়ার দেশগুলি আর অন্যের কথায় উঠিতে বসিতে পারে না। জগদ্ব্যাপারে এশিয়াকে তাহার নিজস্ব নীতিই পালন করিয়া চলিতে হইবে। মানব-সভ্যতায় ইউরোপ ও আমেরিকার প্রভূত দান আছে সত্য ও এজন্য আমরা কৃতজ্ঞ এবং তাহাদের নিকট হইতে আমাদের অনেক কিছু শিক্ষণীয় আছে। কিন্তু পশ্চিম গোলার্ধ আমাদিগকে বার বার যুদ্ধের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে এবং মাত্র সেদিন একটা যুদ্ধ শেষ হইতে না হইতেই এই আণবিক বোমার যুগে আবার নূতন যুদ্ধের কথা শোনা যাইতেছে। এই আণবিক বোমার যুগে শান্তিরক্ষার জন্য এশিয়াকে সাফল্যের সহিত কার্য করিতে হইবে। এশিয়া তাহার যোগ্য অংশ গ্রহণ না করা পর্যন্ত শান্তি স্থাপিত হইতে পারে না। পৃথিবীর বহু দেশে এবং এশিয়ায় গোলযোগ চলিতেছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এশিয়া শান্তির দৃষ্টিতেই সব কিছু দেখিয়া থাকে। বিশ্ব ব্যাপারে এশিয়া যোগ্য স্থানে আসীন হইলে জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইহার প্রভাব অসাধারণ হইবে।

শান্তি তখনই আসিতে পারে যখন সমস্ত জাতি স্বাধীন এবং সর্বত্র মানুষ মুক্ত ও নিরাপদ। সুতরাং শান্তি ও স্বাধীনতাকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয় দিক হইতেই দেখিতে হইবে। আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, এশিয়ার দেশগুলি অত্যন্ত অনুন্নত এবং জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিম্ন। এই অর্থনৈতিক সমস্যার আশু মীমাংসা করা আবশ্যক, নতুবা সংকট ও বিপদ আমাদিগকে অভিভূত করিতে পারে।

আমরা মানবেতিহাসের এমন এক পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছি যখন 'এক-জগতের' আদর্শ ও বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় কিছুর একান্ত আবশ্যক। পথে অনেক বাধা-বিপত্তি থাকিলেও এই আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে আমাদিগকে চেষ্টা করিতে হইবে। এজন্য এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা থাকা আবশ্যক।

বর্তমান সম্মেলন এশিয়ার দেশগুলিকে একত্র করিবার একটি সামান্য প্রয়াস। ইহার ফল যাহাই হউক না কেন, ইহা যে অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহারই একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে। ইতিহাসে এরূপ সম্মেলন অভূতপূর্ব, ইতিপূর্বে কোন স্থানে এরূপ আর হয় নাই। সুতরাং আমরা যে একত্র সম্মিলিত হইতে পারিয়াছি, ইহাই যথেষ্ট কাজ এবং এই সম্মেলন হইতে অনেক বড় কিছুর উদ্ভব হইবে বলিয়াই আমি বিশ্বাস করি। আমাদের বর্তমানকালের ইতিহাস যখন রচিত হইবে, তখন এই ঘটনা এশিয়ার অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে একটা সীমারেখা টানিয়া দিবে এবং এই ইতিহাস রচনায় আমাদের যোগ থাকায় আমরাও ঐতিহাসিক গৌরবের খানিকটা অংশের অধিকারী হইব।

আমরা সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ চাহি না। প্রত্যেক দেশেই জাতীয়তার স্থান থাকিলেও ইহাকে আক্রমণশীল ও আন্তর্জাতিক প্রগতির প্রতিবন্ধক হইতে দেওয়া যায় না। এশিয়া তাহার বন্ধুত্বের বাহু ইউরোপ ও আমেরিকা এবং আফ্রিকাস্থ আমাদের নির্যাতিত ভ্রাতৃগণের প্রতি প্রসারিত করিতেছে। আফ্রিকার অধিবাসীদের প্রতি এশিয়ার একটি বিশেষ দায়িত্ব আছে। মানবসমাজে তাহাদের যথাস্থান অধিকার করায় আমাদিগকে তাহাদের সাহায্য করিতে হইবে। আমরা কোন বিশেষ এক জাতির জন্য স্বাধীনতা চাহি না। আমরা সমগ্র মানবজাতির মুক্তি চাহি। সর্বজনীন স্বাধীনতায় শ্রেণী-বিশেষের প্রাধান্য স্বীকৃত হইবে না। প্রত্যেকেরই পূর্ণতম আত্মবিকাশের সমান সুযোগ থাকিবে।

সকলের সাধারণ সমস্যা আলোচনার জন্য সম্মেলনকে কয়েকটি কমিটিতে বিভক্ত করা হইবে। প্রত্যেক দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে আমাদের ঔৎসুক্য থাকিলেও সম্মেলনে আমরা কোন দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির আলোচনা করিব না। কারণ তাহাতে যে অশেষ তর্ক ও যুক্তিতর্কের অবতারণা হইবে, তাহাতে আমাদের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইতে পারে। আমি আশা করি, সাধারণ সমস্যাসমূহ আলোচনার জন্য ও পরস্পর ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কে আবদ্ধ হইবার জন্য এই সম্মেলন হইতে একটি স্থায়ী এশিয়া পরিষদের উদ্ভব হইবে। পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠতর পরিচয়ের উদ্দেশ্যে পরস্পরের দেশ পরিদর্শন এবং ছাত্র ও অধ্যাপক বিনিময়ের ব্যবস্থাও করা যাইতে পারে। আমরা আরও অনেক কিছু করিতে পারি, কিন্তু সেগুলি সম্বন্ধে আপনারা আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিবেন।

এশিয়ার স্বাধীনতার যাঁহারা স্রষ্টা—সান ইয়াৎ সেন, জগলুল পাশা, আতাতুর্ক কামাল পাশা—আজ তাঁহাদিগকে আমরা স্মরণ করি। যে মহাপুরুষের শ্রম ও প্রেরণা ভারতবর্ষকে আজ স্বাধীনতার দ্বারে পৌঁছাইয়াছে—সেই মহাত্মা গান্ধীকেও আজ আমরা স্মরণ করিতেছি। তিনি এই সম্মেলনে উপস্থিত না থাকিলেও আমি আশা করি, সম্মেলন শেষ হইবার পূর্বে তিনি একবার ইহা দেখিয়া যাইবেন।

সমগ্র এশিয়াকে নানা সংকটের ভিতর দিয়া যাইতে হইলেও আমাদিগকে তাহাতে নিরুৎসাহ হইলে চলিবে না। বিপ্লব পরিবর্তনের সময় এই প্রকার সংকট অপরিহার্য ঝড়ঝঞ্ঝা দেখিয়া আমাদিগকে ভীত হইলে চলিবে না; ঝড়ঝঞ্ঝার ভিতর দিয়াই আমাদিগকে আমাদের ঈপ্সিত নূতন এশিয়া গঠন করিতে হইবে। সর্বোপরি মানুষের প্রাণশক্তির উপর আমাদের বিশ্বাস রাখিতে হইবে—যুগ যুগ ধরিয়া এশিয়া যে প্রাণশক্তির প্রতীক।

বোন

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

ফাল্গুন মাসের বিকেল। হাঁটতে হাঁটতে ঘেমে উঠেছি। ঝি খুঁজে পাই না একটি শহরে। কত কষ্ট ঝি-চাকর খুঁজে বার করা এ সময়ে বুঝুন। পটলডাঙা গলির মোড়ে একটা মুড়ির দোকানের সামনে শেষে এই বুড়ির দেখা পেয়েছি। বললাম, 'লোক দিতে পারবে? আছে কেউ তোমার জানা-শোনা, বাড়িতে কাজ করবে?'

যেন কথাটা বুড়ির কানেই ঢুকল না প্রথম, গ্রাহ্য করলে না। বরং তাকালো অন্য দিকে। বললাম, 'দু'টাকা আমি বেশি দিতে রাজী।'

'কোথা লোক পাব বাবা।' বুড়ি এবার আমার মুখের দিকে তাকালো, 'লোক কি আজকাল বাজারে মেলে।' কৌটো খুলে দাঁতে একদলা মিশি গুঁজে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বুড়ি হাসল, 'তা, লোক খুঁজছ, রাত-দিনের কি এমনি?'

'জল তুলবে আর বাসন মাজবে।'

'আর কিছু না?'

'আমরা দু'জন মোটে মানুষ, বাজার সওদা আমি নিজেই করি, বাটনা বাটা তারও দরকার নেই, যদি সময় হয় দু'দিন অন্তর ঘরের মেঝেটা একবার মুছে দেবে,—এই।'

'রাঁধা-বাড়া করতে হবে না?'

'না, ওসব আমার স্ত্রী নিজের হাতে করে।' বললাম, 'কাজ কম, সারাক্ষণের জন্যে লোক রেখে আমার লাভ কি বল।'

যেন আর বিশেষ গরজ নেই বুড়ির। রাস্তার দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বললে, 'তা রাত-দিনের লোক যদি রাখতে, যামিনীকে নয় বলে দেখতাম। ঠিকে কাজের ঝি কোথা পাই বল, ঠিকে কাজের ঠেলা বেশি।'

চুপ ক'রে রইলাম একটুক্ষণ। যেন লোকের সন্ধান বুড়ি জানে, একটু বললেই হয়ত হ'তে পারে, আশা হ'ল। 'কোন কষ্ট হবে না যামিনীর, বলছি তো তোমায়, দু'জন লোকের কখানা থালা-বাসন হয়? আর সকালে দু'বালতি, বিকেলে দু'বালতি জল তুলে দিলেই আমাদের যথেষ্ট। স্নান আমরা নীচের চৌবাচ্চায় করি।'

'বুঝলাম তো বাবা,' বুড়ি ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। 'টাইফটে ভুগে মোর যামিনীর একটা চোখ কাণা হয়ে গেল কি না, একটা ঠ্যাং গেছে শুকিয়ে। বাড়ি বাড়ি ঘুরে জল টানতে বাসন মাজতে ওর কষ্ট হয়।' ব'লে বুড়ি আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করলে। আমিও ছাড়ব না।

'তুমি একবার ব'লে দেখতে পার। রাজী হতে পারে ও। দু'টাকা আমি বেশি দিচ্ছি।' চললাম বুড়ির সঙ্গে হেঁটে আমিও। 'এ-দিনে রোজগার ফেলতে আছে?'

'টাকা কি সব গো বাবু, টাকা যামিনী কামায় ঢের। পাঁচ বাড়িতে ও ঠিকে কাজ করে।' আকাশের দিকে চেয়ে বুড়ি যেন নিজের মনে কথাগুলো ব'লে চলল, 'চাইছে ও এখন এক বাড়িতে রাত-দিনের ঝি হয়ে থাকতে, বাঁধা কাজের ঝক্কি কম, ছোটাছুটি নেই। তা সবাই কি পারে এখন খোরাক দিয়ে, কাপড়লতা দিয়ে ঝি-চাকর রাখতে। যেমন সব ঠিন্‌ঠিনে বাবুর দল, চাইছেও কেবল কোনমতে ঠিকে দিয়ে ঝি-চাকর রাখতে, ঠেকা কাজ চললেই হ'ল।' বুড়ির দাঁত পড়ে গেছে, গাল বসে গেছে, কিন্তু ধার কমেনি বেশ বোঝা গেল চাওয়ার, কথা বলার। আমার মুখের দিকে চেয়ে হাত ঘুরিয়ে বললে, 'ছিনু গো বাবু, রতনপুরের রঙ্গবাবুর নাম শোনোনি,—মোরা আটটি ঝি এক বাড়িতে ছিনু। হাঁ, সে দিনও নেই, সে বাবু আর কোথা।' বুড়ি দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'যা বলেছ,' বললাম বুড়ির কথায় সায় দিয়েই, 'সে তো ঠিকই সেকাল কি আর আছে এখন।'

'বসিরহাটের বড়বাবু গোলক রায়ের নাম শোন নি। বাবুর ছিল সাত ঝি, গিন্নী-মা'র ছিল তেরো। আর বাইরের কাজের চাকর ছিল এগারোজন।'

'যামিনী তোমার কেউ হয় বুঝি?'

'পেটের মেয়ে গো বাবা, নিজ সন্তান।' হঠাৎ বুড়ি গম্ভীর হয়ে গেল। একটা গলি পার হয়ে আমরা আবার একটা গলিতে এসে গেছি তখন। আমি যে সঙ্গে আছি, বুড়ি বিরক্ত হয়নি দেখলাম।

বললাম, 'তা তোমার যখন মেয়ে, ওর কোন কষ্ট না হয়, কাজের সুবিধে হয় সেদিকে আমার নজর থাকবে। একবার তুমি ওকে বলে দেখ।'

'তা তো দেখব, কিন্তু—' বুড়ি কি বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে যায়। আমার মুখের দিকে চেয়ে তখনই মুখ ফিরিয়ে নেয়।

বললাম, 'আরো হাঁটতে হবে না কি। কোথায় থাক গো তোমরা?'

'এই এসে গেছি এই তো আমাদের পাড়া।' ব'লে কোঠা বাড়ির সারি যেখানে শেষ হয়েছে, ফাঁকা মতন একটা জায়গায় এসে বুড়ি দাঁড়াল। প্রকাণ্ড জাম গাছ। আশে-পাশে ছোট খড় অনেকগুলি খোলার ঘর। ও-ধারে ছাগল বাঁধা আছে আট দশটা, এ-ধারে একটু চালা মতন দোকান সাজিয়ে একজন বেগুনি ভাজছে কে। বুড়ি এক ঠোঙা বেগুনি কিনে নিলে ঝপ্ করে।

'যামিনী বুঝি তোমার সঙ্গেই থাকে?'

'হ্যাঁ গো বাবু, হ্যাঁ। যামিনী আছে কি নেই, না বোস বাড়ির বাসন ধুয়ে ফেরেনি এখনো কে জানে।' জাম গাছের বাঁয়ে ঘুরে মাঝারি মতন একটি ঘরের সামনে এসে বুড়ী দাঁড়াল, 'তুমি একটু দাঁড়াও বাবু বাইরে, যামিনী এলো কি না দেখি।'

আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললাম, 'এই যে—!' কিন্তু মাঝপথে থামলাম। বুড়ি আমার চোখে চোখে চেয়ে আছে শক্ত হয়ে। 'এ নয় গো বাবু, এ মোর ধম্ম মেয়ে। জল তোলা বাসন ধোওয়ার আলাদা লোক।'

আমিও যেন লজ্জিত হ'লাম। কেননা মেয়েটি যে যামিনী নয়, পরে আবার ওর সারা গায়ে চোখ না বুলিয়েই বলেছি। কেবল সুস্থ সমর্থ দুটো পা দেখে। এক জোড়া আস্ত চোখ দেখে কালো কালো। আমার দিকে চোখ পড়তে মেয়েটি চোখ নামালো। বুড়ির ঘরের দাওয়ায় শেষ বেলার রোদে বসে গেলাসে ক'রে চা খাচ্ছিল। পা ছড়িয়ে বসেছে। আল্‌তা পরার শুক্‌নো দাগ। পাশে একটি বিড়াল বসে আছে গুটিশুটি। ঢুলছে।

বুড়ি বললে, 'আমার ছোট মেয়ে ময়না।' ব'লে বেগুনির ঠোঙাটা ও মেয়ের দিকে এগিয়ে দেয়।

'তবে যামিনী কি ফেরেনি?' মাটির দিকে চোখ রাখলাম আমি।

'ওই ত বললাম গো বাবু ভদ্দরলোকদের এখন কথার ঠিক থাকে না। সকালবেলার যামিনী চারটের জল না আসা তক ছাড়া পায় না। বলি খাবে কখন, শোবে কখন।'

ছোট মেয়েকে একটু আড়াল করেই দাঁড়াল বুড়ি আমার মুখের সামনে।

'নাতি নাত-বৌ ছেলে ছেলে-বৌ ধুমসো আরো দুটো মেয়ে—বোস-গিন্নী আবাগীর এই এত বড় সংসার, বাবা। এই এত এত এঁটো বাসন জমছে দু'বেলা। যখন নোক ঠিক করতে আসে, বুড়ো মিনসে বলেছিল বাড়িতে নোক কই, কাজ আর এমন কি। আট টাকা ব'লে আঠারো টাকা ন্যায্য মাইনে হয় না কি ও-বাড়ি। মোক্ষদা তখনই বলছিল বোস বাড়ির ঠিকে

যামিনীকে দিসনে দিদি, পরে বুঝবি ঠ্যালা।'

নির্বাক এবং অনেকটা অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। যামিনী ফিরছে না ব'লে বুড়ি আরো কিছুক্ষণ হাত-মুখ নেড়ে আবাগী বোস-গিন্নীর মুন্ডপাত করল। বুঝি ধর্ম-মেয়ের চা খাওয়া শেষ হয়েছে তখন। এবার বেগুনির ওপর হাত দিয়েছে। রোদের রেখা লম্বা হয়ে ওর কাঁধে পড়েছে, চুলে। চোরের মত চুপিচুপি দেখে নিলাম একবার। এমন সময় বুড়ির গলার আওয়াজ আরেক রকম শুনে চোখ ফেরালাম।

'এলি? হারামজাদী মাগীকে বেশ দু'কথা শুনিয়ে দিলি নে, তোমার কাজের নিকুচি করি তোমার এ'টো না ধুয়েও যামিনীর দিন চলে? মাগীর সংসার কলেরায় নিপাত যাক।'

এখন যামিনীকে দেখলাম। সকলের আগে চোখে পড়ল ওর সরু শীর্ণ একটা পা। এত বেশি অসাড় ও অথর্ব বলে মনে হ'ল পা'টাকে যে তখনই অনুমান করলাম ভালো আর একটা পায়ে যামিনী যখন হাঁটে তখন নিশ্চয় কাঁপে, পড়ে যেতে চায়। সত্যি ওর একটা চোখও কানা।

বুড়ির কথা শুনে যামিনী ভারি একটা নিশ্বাস ফেললে।

'আবার তুমি নোক নিয়ে এলে?'

'কাছেই, খুব বেশি দূরে নয় ঘর। কোথায় বললে না গো, বাবু?'

'মধু গুপ্তের লেন', বলে বুড়ির চেহারার পরিবর্তনটা লক্ষ্য করলাম। এবার বলছে বুড়ি মেয়ের দিকে চেয়ে, 'মাত্তর দু'টো প্রাণী। স্বামী-স্ত্রী। এবেলা দু'বালতি ওবেলা দু'-বালতি জল আর বাসন মাজা, কেমন এই ত গো কর্তা?' বুড়ি আমার দিকে মুখ ফেরালো।

'এই কেবল' আমি যামিনীর দিকে তাকালাম। 'উঠোন-বারান্দা নেই, এক-কোঠার ঘর। দু'দিন অন্তর মেঝেটা মুছে দিলেই যথেষ্ট।'

'দু'টাকা করে বেশি দেবে বাবু,—কেমন গো কর্তা এই ত বলেছিলে?'

বুড়ির দিকে না চেয়েই আমি বললাম যামিনীকে, 'আমার ঘরের বালতি ছোট বাসন অল্প।'

'ঠিকে কাজ যখন তোর', যামিনী না,—বুড়ির গলা। 'বুদ্ধি করে সময় খরচ করবি এক এক জায়গায়। ঘোষ দাদার উনুন ধরে বেলায়। ওখানে তাড়া নেই একটু দেরী করে গেলে পারিস। কানাই পালের ঘরে জলটা বিকেলে দে। আর বোস মাগীকে বলে দিবি কাল, অত সস্তা সময় নেই যামিনীর রোজ রোজ বাড়তি এ'টোয় হাত ঠেকাবে।'

যামিনী তখনো কিছু বলছে না, ওপরের দিকে চেয়ে এক চোখে জাম পাতার গায়ে হলদে রোদ দেখছে বুঝি। উঁচু শক্ত চোয়ালে ছিটে ছিটে বসন্তের দাগ। যামিনীর বসন্তও হয়েছিল যেন কবে। ছেলেদের মতো ছোট্ট করে ছাঁটা মাথার চুল। বেশি রোগা।

'সকালের দিকে আমি আপিসে একটু সকাল সকাল বেরোই কিনা তাই তখন একটু তাড়াহুড়ো, বিকেলে দেরি করে গেলেও চলবে।'

'আপীসের বাবু', বুড়িও যামিনীকে বোঝালো, 'এখন রাজী হ', কথা দে বাবুকে।'

'কী আর বলব।' মুখ নামিয়ে যামিনী এতক্ষণে নিশ্বাস ফেলল, 'ভোর রাতে তো ঘর থেকে বেরোই, ফিরি সন্ধ্যায়, আবার কাজ নিয়ে কখন মুই সামাল দেব!'

'পারবি, পারবি' বুড়ি মাথা নাড়ল। কখানা তো মোটে ঘর। বিন্দে করে তেরো বাড়ি কাজ,

ধম্ম মেয়ের দিকে আবার চোখ কেন?

শশী করে আঠারো, তোর কি ওই সাত আট ঘরই বেশি হয়ে গেল?'

'জল ঘে'টে ঘে'টে আঙুলে আমার ঘা হয়ে গেছে, রাতে পিঠের ব্যথায় ঘুমোতে পারি না।' বলে যামিনী নিজের হাত পায়ের আঙুল ফাঁক করে সাদা দগ্‌দগে ঘা দেখতে লাগলো। আমাকেও দেখালো।

বুঝলাম শেষ পর্যন্ত যামিনীকে আর পাওয়াই যাবে না। হাল ছেড়ে দিয়ে ঘাড় ফেরাবো। বুড়ির গলা খনখনিয়ে উঠেছে আরো বেশি তখন।

'পাড়ার ভুবন ডাক্তার দাদাকে বলে এক ফোঁটা ওষুধ লাগাতে বারণ করেছে কে তোকে শুনি? তোর আঙুলের ঘা যদি না সারে তো মুই কি করব। মোকে বলে লাভ কি।'

'ওষুধ কি আর মাগনা দেবে তোমার ধর্ম মেয়ের মতো'—যামিনীও এখন তেতে উঠেছে সমান। 'এক ফোঁটা ওষুধ না দিতে বলবে তিন বালটি জল তুলে দিস্ যামিনী, বুড়ো মিনসের জলের বাই কমছে না কি।' হাত ঘোরালো যামিনী।

'বলি ধম্ম মেয়েকে নিয়ে টানাটানি করিস কেন, ভুবন যদি তোকে ওষুধ না দেয় তো কার ওপর রাগ করবি।' বুড়ি আরো জোরে মুখ ঝামটা দেয়। 'বলছি তোর ভালর জন্যে। কাজ এনে দোব যদি না ধরিস মোর কি, কেমন গো বাবু—তোর একটা চোখ নেই, একটা পা গেছে, সময় থাকতে যদি রোজগার না করিস মুই মলে তোকে দেখবে কে শুনি?' বলে বুড়ি রাগ হয়ে গিয়ে ঘরে ঢুকল।

একবার দেখলাম চোখ তুলে দাওয়ার ওপর বসা মেয়েটি বেগুনিগুলো শেষ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে,—তারপর যামিনীর সঙ্গে চোখাচোখি হ'ল। আর কথা বলছে না যামিনী। হঠাৎ কেমন চুপ করে গিয়ে নিজের আঙুলের ঘা দেখলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। যেন সত্যিই ও এখন ভবিষ্যৎ ভেবে একটু ভয় পেয়েছে।

কিন্তু ভয়ের চেয়েও বুঝি ওর রাগ হয়েছে বেশি, দুঃখ।

'মুই না বলেছি গো? দিনভর খাটছি না?' বুড়ির উদ্দেশে কথাগুলো ব'লে যামিনী কাঁদতে লাগল। আঁচল চাপা দিয়েছে ভালো চোখটায়।

ঘর থেকে বুড়ি আর বেরোল না। দাওয়ার সেই মেয়েটিও আর তাকাচ্ছে না। কোলের বেড়ালটার মত ওরও বুঝি ঘুম পেয়েছে এখন। ঢুলছে।

ঢোক গিলে যামিনীর দিকে চেয়ে বললাম, 'বেশি দূরে তোমায় হাঁটতে হবে না, কাছেই আমার ঘর।'

'থাক আর বলতে হয় না গো আপীসের বাবু। মধু গুপ্তের লেন মুই খুব চিনি।' চোখ মুছে যামিনী ঘাড় সোজা করল। যেন রাগটা বেশি আমার ওপর। চুপ করে রইলাম। ভালোয় ভালোয় রাজী হয়েছে এই ঢের।

যামিনী আগে আগে চলেছে সরু পা'টা টেনে। আমি পেছনে।

কি জানি খেয়াল হল। মাঝ রাস্তায় কথাটা হঠাৎ জিগ্‌গেস করে বসলাম। ওই যে দাওয়ায় বসে, তোমার বোন বুঝি?'

'হুঁ।'

'ধর্ম মেয়ে না কি বলছিল যেন বুড়ি?'

'হ্যাঁ গো হ্যাঁ, ওরা রাতদিনের ঝি, লোকের ঘরে থাকে, ঘরের নক্ষ্মী, তাই ওই নাম।'

ব্যাখ্যাটা শুনে অল্প একটু হাসলাম।

'ধম্ম মেয়ের দিকে আবার চোখ কেন, ঠিকে কাজের নোক চাইছ,— নোক তো পেলে, তোমাদের ঠিকে সারতে কানা যামিনীই তো আছে।'

শুনে গম্ভীর হয়ে গেলাম। কষ্টও হল।

'ময়নাকে বুড়ি খুব আদর করে?'

'করবে না? কেন আদর করবে না গো শুনি?' যেন অপরাধ হয়েছে আমার এমনভাবে যামিনী রুখে উঠল। রোগা শরীর ঘুরিয়ে মাঝপথে ও দাঁড়িয়ে পড়ল।

'ভুবন ডাক্তারের ঘরে থাকে ও রাতদিন, কাজ করে খায়। কাপড় গয়না আলতা চিরুণী কোনটা না পায় ময়না, কী না এনেছে ও ঘরে ভুবনের কাছ থেকে শুনি?'

নিঃশব্দে শুধু মাথা নাড়লাম। অর্থাৎ স্বীকার করলাম যদি এমন হয় তবে বুড়ি ওই মেয়েকে আদর না-ই বা করবে কেন।

'মুরোদ থাকা চাই গো বাবু, মুরোদ চাই' যামিনী থামে নি। 'ঘরে থাকবে রাঁধা-বাড়া করবে বিছানাপত্তর রোদে দেবে কাপড়-গামছা চানের জল এগিয়ে দিয়ে আলাদা একটা মানুষ। সবাই কি আর পারে, সকলে পারে না পোষাতে রাত-দিনের ঝি রাখতে।' বলে কানা চোখটা একবার আমার মুখের ওপর বুলিয়ে যামিনী হাঁটতে লাগল।

চুপ ছিলাম আমি। একটু পরে বললাম, 'ময়নার বুঝি এখন অবসর?'

'হ্যাঁ গো কর্তা অবসর।' ফের দাঁড়িয়ে পড়েছে যামিনী। কানা চোখটাই তেরছা করে আমার মুখের ওপর ধরে বললে, 'মেয়ে মানুষের এটা কিসের সময় চেহারা দেখেও বোঝ না।'

এতক্ষণে বুঝলাম, বললাম মনে মনে।

'মেজাজ চাই মরজি চাই' যামিনী বলছে, 'ভুবনের সাধ হয়েছে ছেলে রাখবে ময়নাকে দিয়ে মারবে না। বুঝলে গো আপীসের বাবু, পয়সা যার আছে তার সখও আছে।'

সে তো ঠিকই। চিরকালের সত্য ওটা। ভাবলাম আপীসের বাবুর অফিস করার সুবিধার জন্যে যামিনী যদি নিয়মিত দু'বালতি জল তুলে দেয় আর বাসন ক'খানা মেজে দেয় তবেই যথেষ্ট। ভুবন ভুবনের সুখ নিয়ে থাক, না কি সখ।

ভাবতে ভাবতে বাড়ির দরজা পর্যন্ত এসেছিলাম ঠিক। চৌকাঠও পার হয়েছিলাম যামিনীকে সঙ্গে নিয়ে। কিন্তু দোতলার সিঁড়ির মুখে গিয়ে যামিনীর আর পা উঠল না। আমার মন খারাপ হয়ে গেল।

'অ বাবা, অত উঁচু সিঁড়ি!' যামিনী মুখ ঘুরালো। 'মুই পারব না গো বাবু।'

'তেমন আর উঁচু কি।' বেশ শক্ত গলায় বললাম, 'দু'দিন ওঠানামা করলেই অভ্যাস হয়ে যাবে।'

ভুবন যদি মোরে ডাকে......ত মুই কি করব

'না গো কর্তা, মোর একটা পায়ে জোর নেই, দেখছো না তুমি?'

চুপ করে রইলাম। ওর রোগা শীর্ণ পা'টার দিকে চেয়ে দুঃখও হল রাগও হল। কানা চোখে যামিনী সদরের দিকে তাকাচ্ছে, অর্থাৎ চলে যাবে। তবু একবার চেষ্টা।

বললাম অনুনয় করে, 'আমার স্ত্রী অসুস্থ, জলের অভাবে রান্না চাপে না, তুমি বুঝতে পারছ না?'

'তা মুই কি করব', যামিনী আগে থেকেই বিরক্ত। 'অত উঁচু সিঁড়িই যদি ভাঙতে হয় তো ভুবন দোষ করেছে কি গো, নয় ভুবনকেই জল দিই!'

'ভুবনের সিঁড়ি নীচু?' রীতিমতো ভেংচি দিয়ে ওঠলাম। 'তাই কর। ভুবনের কাছে যাও। ময়নার এখন অবসর।'

'বলি ভুবনকে নিয়ে টানাটানি কেন গো, ময়না তোমার করেছে কি, অ্যাঁ।' যামিনী জোরে ঝামটা দিয়ে উঠল। 'ভুবনের মতো পয়সা করতে তোমার সাত জন্ম লাগবে গো আপীসের বাবু, সাত জন্ম।' বলে আর এক মিনিট অপেক্ষা না করে ও কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে গেল।

ভাবলাম, তোমার ওষুধ বুড়ি, বুড়িই তোমায় চালাচ্ছে। তাই একদিন সকালে আবার গেলাম সেই পাড়ায়, যদি ধমক দিয়ে শাসিয়ে বুড়ি মেয়েকে রাজী করাতে পারে। কেননা লোক আমার চাই-ই। বুড়ি চাপ দিলে যামিনীর রাজী হওয়া ছাড়া উপায় কি।

কিন্তু অবাক হয়ে গেলাম কান্ড-কারখানা দেখে। লোক জমে গেছে বুড়ির ঘরের দরজায়। ব্যাপার কি। যামিনী নিচে মাটিতে বসে কাঁদছে আর দাওয়ায় রণরঙ্গিণীর বেশে দাঁড়িয়ে আছে ময়না।

'ল্যাংড়ী, ল্যাংড়ী আবার ওখানে গিয়ে ঠাঁই নিয়েছে।' ময়না গায়ের জোরে চিৎকার করছে আর হাঁপাচ্ছে। 'যদি শুনি, আবার যদি শুনি ওখানে গেছিস লাথি মেরে তোর খুলি উড়িয়ে দোব হারামজাদী,—কতবড় সাহস!'

'বলি মোর কি দোষ গো, তোমরা পাঁচজন আছ একবার বিচার কর।' কান্নার মাঝে মুখ তুলে যামিনী পাঁচজনের দিকে তাকালো। 'ভুবন যদি মোরে ডাকে মোর গায়ে হাত দেয় তো মুই কি করব গো তোমরা বলে দাও।' বলে রোগা যামিনী ফের আর্তনাদ করে উঠল।

'টাইফটে তুই মরলি নি কেন, শীতলা মা তোকে নেয়নি কেন।' ময়নার গলা আরো চড়ে গেছে। না কি যামিনীর মাথায় লাথি মারতে এগিয়ে এসেছিল ও কে একজন ধরে ফেললে। এবং তখন আমার খেয়াল হল বুড়ি কই, রঙ্গমঞ্চের কোথাও বুড়িকে দেখছি না যে।

'বুড়ি কি আর হেথা গো বাবু, কাল ত গঙ্গা পেল।' প্রৌঢ়া মতন কে একটি মেয়ে-মানুষে দীর্ঘশ্বাস ফেলে জানিয়ে দিলে আমায়। 'চিতার আগুন নিভল না ভাল করে দুই ডাইনীর কামড়াকামড়ি সুরু হয়েছে ভুবনকে নিয়ে।'

অবাক হয়ে দুই ডাইনীকেই দেখছি আমি তখন। অবিশ্যি এখন আর ঠিক কামড়াকামড়ি করছে না। জামগাছের ওধারে বেগুনি ভাজছিল যে লোকটা, বুঝি বুড়ি নেই বলে নিজেই হাতে করে ঠোঙা ভরে বেগুনি নিয়ে এসেছে রেখেছে ময়নার পায়ের ধারে। ময়নার এখন দিব্যি ফট্‌ফটে চেহারা। আর ঠোঙা রেখে লোকটা যখন দাওয়া থেকে নীচে নামল উঠে দাঁড়িয়েছে যামিনী, চোখ মুছতে মুছতে। বলছে লোকটাকে, 'কই গা সনাতন, দু'বালতি জল দেবার কথা বলে কাল তো কিছু বললে না আর।'

গরম বেগুনিতে কামড় দিয়ে ময়না কট্‌মট করে দেখছে যামিনীকে।

রোদ চড়ে গেছে তখন। আস্তে আস্তে চলে এলাম।

(৮)

দরদ ও দরদী

এ কি অপরূপ দৃশ্য! আজ কেন গৌরাঙ্গ আমার পদ্মহস্তে অঞ্জলি অঞ্জলি পূরিয়া আপনার শ্রীঅঙ্গে "কুলীন গ্রামের" ধূলি মাখিতেছেন? মাথায়, মুখে, সারা গায়ে, ধূলি মাখিয়া সোনার অঙ্গ মলিন হইয়া গিয়াছে, তথাপি সাধ মিটে নাই, আজি এই গ্রামের ধূলিতে অঙ্গ একেবারে ধূসরিত করিবেন।

বর্ধমান জেলায় "কুলীন গ্রাম" নামে একটি গণ্ডগ্রাম আছে, এই গ্রামের রামানন্দ বসু (বসু রামানন্দ) মহাশয় শ্রীগৌরাঙ্গের অন্যতম পার্ষদ ছিলেন। বসু রামানন্দের একজন পূর্বপুরুষের নাম ছিল গুণরাজ বসু; কিন্তু নবাব সরকার হইতে "খান" উপাধি প্রাপ্ত হওয়ায় "গুণরাজ খান" নামেই বিখ্যাত হইয়াছিলেন। উক্ত খান মহাশয় "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়" নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন, সেই গ্রন্থে তিনি নন্দের নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে "প্রাণনাথ" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। গোরাচাঁদের প্রেমাস্পদকে যিনি "প্রাণনাথ" বলিয়াছেন, এই কুলীন গ্রামে তাঁহার বাড়ী ছিল, এই কথা মনে করিয়া আজি সোনার গৌর অঞ্জলি পূরিয়া কুলীন গ্রামের ধূলি মাথায় মাখিতেছেন—

"গুণরাজ খান্ কৈল শ্রীকৃষ্ণ বিজয়,
তাতে এক বাক্য তাঁর আছে রসময়,
"নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ,"
এই গুণে বিকাইলাম সে বংশের হাত।"

এ প্রেমের তুলনা কোথায়? পৃথিবীর কোনও মহাকবি কি এরূপ প্রেমের কল্পনা করিতে পারিয়াছেন, গোরার প্রিয়তম কৃষ্ণকে যিনি "প্রাণনাথ" বলিয়াছেন, তাঁহার বংশের নিকট গোরা বিকাইয়াছেন আর যে গ্রামে তিনি বাস করিতেন, সেই গ্রামের ধূলি অঞ্জলি অঞ্জলি করিয়া মাথায় মাখিতেছেন। ইহারই নাম কৃষ্ণপ্রেম, "দরদী" ভিন্ন এই প্রেমের মূল্য অন্য কে বুঝিবে?

একবার জন্মাষ্টমীর সময় শ্রীশ্রীগুরুদেব হ্যারিসন রোডে বাস করিতেছিলেন। শেঠের বাগান হইতে সুপ্রসিদ্ধ মনোহর দাস বাবাজী জন্মাষ্টমীর পরের দিন প্রভাতকালে অন্য কয়েকজন সঙ্গীসহ শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা গাহিতে গাহিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৈরাগীরা সকলেই "গোপবেশ" ধারণ করিয়াছেন, তাঁহাদের কাঁধে দধির ভাঁড়, তাঁহারা আসিয়া সঙ্গীতচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-সংবাদ দিলেন। ঠাকুর কিছুক্ষণ অবনত মস্তকে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন, চক্ষুর জলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল, পরে আনন্দে অধীর হইয়া খোল করতাল-সমন্বিত কীর্তনের সঙ্গে নৃত্য করিলেন। আবার কিছুক্ষণ পরে প্রস্তর মূর্তির ন্যায় নির্নিমেষ নেত্রে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার সম্পূর্ণ পলকহীন নেত্র একলক্ষ্যে পড়িয়া থাকিল, সে নেত্রে মাছি পড়িতেছিল; কিন্তু পলক পড়িতেছিল না। ক্রমে ক্রমে তাঁহার মুখে অপূর্ব জ্যোতি বিকীর্ণ হইল, তখন তিনি বামে দক্ষিণে, সম্মুখে পশ্চাতে, নিম্নে এবং ঊর্ধ্বে সুদীর্ঘ হস্ত প্রসারিত করিয়া আরতি করিতে লাগিলেন, সেই সুস্থির দেবচক্ষু সেই হস্তের কম্পন সেই মুখের জ্যোতি, সেই বিবিধ ভঙ্গিমাযুক্ত আরতি দেখিয়া আমরা বিহ্বল হইয়া পড়িলাম। আমাদের মনে হইতে লাগিল যেন ঘরের সর্বত্র দেবাবির্ভাব হইয়াছে এবং শ্রীগুরুদেব প্রত্যক্ষ দেখিয়া দেখিয়া আরতি করিতেছেন, কোন কাল্পনিক বস্তুকে কেউ সেইরূপে আরতি করিতে পারে না।

কীর্তনান্তে শ্রীগুরুদেব সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন, অন্যান্য সকলেও উপবেশন করিলেন। আসনে বসিয়াও নয়নজলে তাঁহার গণ্ডস্থল ভাসিয়া যাইতেছিল। অনন্তন সেবক পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ঘোষ মহাশয় নিকটে ছিলেন, গুরুদেব তাঁহাকে ডাকিলেন, তিনি কাছে আসিলে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বিধু, কিছু হাতে আছে?" বিধুবাবু প্রয়োজন জানিতে চাহিলে বলিলেন, "ইঁহাদের প্রত্যেককে একজোড়া করিয়া কাপড় ও একটি করিয়া পিতলের ঘড়া দিতে পারিলে ভাল হয়।" বলা বাহুল্য যে সেবা-পরায়ণ বিধুভূষণ অবিলম্বে উহা সংগ্রহ করিলেন, বৈরাগীদিগকে ঘড়া ও কলসী দিতে গিয়া ঠাকুর বালকের মতন কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, "আজ আপনারা যে শুভ সংবাদ লইয়া আসিয়াছেন, তাহাতে আপনাদিগকে যাহা দিতে পারিলে তৃপ্ত হওয়া যায়, তাহার মতন কিছুই নাই। আমি ফকির, এই যৎসামান্য গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।" এ দরদ বুঝিবে কে?

আর একদিন একটি বালক রাস্তা দিয়া হরিনাম গাহিয়া যাইতেছিল। কণ্ঠস্বর শুনিয়া গোসাইজী ভিখারী বালককে ডাকাইলেন, সে উপরে আসিয়া মধুরস্বরে একটি গান গাহিল। গানটি সমাপ্ত করিয়া বালক যখন বিদায় চাহিল, তখন তাহাকে কি দিবেন ভাবিয়া ঠাকুর এদিকে সেদিকে তাকাইতে লাগিলেন।

একজন ভক্ত অতি উৎকৃষ্ট ফ্লানেলের একটা আলখেল্লা প্রস্তুত করিয়া গোসাইজীকে দিয়াছেন, বেশী দামের কাপড়ে সেই প্রকাণ্ড আলখেল্লাটি প্রস্তুত করিতে অনেক টাকা খরচ পড়িয়াছিল। সবেমাত্র সেটিকে গৈরিক রং করিয়া শুকাইয়া রাখা হইয়াছে, উহা দড়ির উপর ঝুলান ছিল, ঠাকুর একজন শিষ্যকে ইঙ্গিত করিয়া সেইটি চাহিলেন। তখন শীতকাল, শিষ্য ভাবিলেন, ঠাকুর বুঝি শীত অনুভব করিতেছেন। তিনি ত্রস্ত হইয়া আলখেল্লাটি আনিয়া ঠাকুরের হাতে দিলেন। ঠাকুর সেটি ধরিয়া বালককে অর্পণ করিলেন। বালক আনন্দে উৎফুল্ল হইল, কেন না সে বুঝিয়াছিল যে, উহা বিক্রয় করিয়া অনেক টাকা হইবে, অথচ সে দুই চারি পয়সার বেশী আশা করে নাই।

একটি বালকের মুখে একটি মাত্র গান শুনিয়া তাহাকে মূল্যবান আলখেল্লাটি দিয়া দিলেন দেখিয়া আমরা কিছু অপ্রতিভ হইলাম, কিন্তু পরে ঠাকুরের কথার আভাসে বুঝিলাম যে, বালক হরিনাম শুনাইয়া যে আনন্দ দিয়াছে, যেরূপ উপকার করিয়াছে, টাকা কড়ি কিম্বা কোন জিনিসপত্র দিয়া কি তাহার প্রতিশোধ হয়? যে ব্যক্তি প্রিয়তমের নাম শুনাইয়াছে, তাহাকে সর্বস্ব দিলেও প্রাণ তৃপ্ত হয় না, সামান্য একটা ফ্লানেলের আলখেল্লা কোন্ ছার পদার্থ!

এরূপ ঘটনা কতবার ঘটিয়াছে যে, এইরূপে দান করিতে করিতে তাঁহার আসন কমণ্ডলু অবধি দিয়া মাটীতে বসিয়া আছেন।

অনেকে বলেন পাত্রাপাত্র না দেখিয়া দান করিলে সেরূপ দানে অধর্ম হয়। হিন্দু শাস্ত্রকারগণও অনেক স্থলে এইরূপ কথা লিখিয়াছেন এবং সাধারণভাবে দেখিতে গেলে একথা যে অতীব সত্য, তাহাতে সংশয় নাই, কিন্তু সমস্ত বিধানের মধ্যেই সামান্য বিধি ও বিশেষ বিধি আছে।

ডাকহরকরা যদি কোন এক পুত্রবিয়োগ-বিধুরা স্নেহময়ী জননীকে বলে "আমি তোমার হারানো ছেলের খবর এনেছি, কি বকসিস্ দিবে দাও" জননী তখনি আপনার কণ্ঠহার খুলে তাহাকে অর্পণ করেন, তাহাকে কত দেওয়া উচিত, কত দেওয়া অনুচিত, একথা ভাবিবার তাঁহার অবকাশ থাকে না। প্রাণে যখন "দরদ" জেগে উঠে, তখন বিধি নিষেধের কথা মনেই আসে না। শ্রীকবির সাহেব বলিয়াছেন,—

"যাঁহা প্রেম তাঁহা নেম্ নেহি
নেহি বুধ ব্যাওহার।
প্রেম মগন যব্ মন
ভয়া কোন্ গিনে তিথিবার?"

অর্থাৎ প্রেমের কাছে নিয়ম টেঁকে না, বুদ্ধি বিচারও খাটে না, হিসাব রেখে কেউ কি চলতে পারে?

প্রেমের সঙ্গে বণিগ্‌বৃত্তির কোন সম্পর্ক নাই, প্রেমিক কখনও লাভ লোকসানের হিসাব রাখতে পারে না, প্রেমিক দস্তুরের কিছুই জানে না। প্রেমাস্পদের যাহা কিছু সমস্তই প্রেমিকের নিকট অমূল্য, অতুল্য। তাঁহার নামের প্রত্যেক অক্ষর তাঁহার নিকট অমৃতময়। যে ব্যক্তি সেই অমৃতময় নাম কানে শুনায় তাহাকে কি দিলে যে সাধ মিটে, প্রেমিক তাহা ভাবিয়া পান না। আমার প্রেমাস্পদকে যে আদর করে তাকে, সেই ত আমার "দরদী।"

পুরুষোত্তম ধামে জগন্নাথ-বল্লভ-মঠে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে "মহাপ্রভু রাত্র দিনে" কৃষ্ণনাম করিয়া দিনের পর দিন অতিবাহিত করিয়াছেন। দুইজনার কথোপকথনে যে কি অমৃতের ধারা প্রবাহিত হইত, তাহা "দরদী" ভিন্ন অন্যে বুঝিতে পারে না। তুমি বল আমি শুনি, আমি বলি তুমি শুন, শুনিয়া আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি নাই, ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, সেই নামই ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার জল, সেই নামই "আনন্দাম্বুধি বর্দ্ধনং পূর্ণামৃতা-স্বাদনং", সেই নামই "সর্ব্বাত্মস্নপনং পরসালং।" সেই নাম আমার প্রিয়তমের নাম, যে ব্যক্তি শুনাইল, যে আমার প্রাণনাথের সংবাদ দিল, তাহাকে যদি বুক চিরিয়া রক্ত দেই, তবুও প্রাণ জুড়োয় না। কিন্তু "দরদী" ভিন্ন অন্য লোক একথা বুঝিতে পারে না, তারা বলে এরা পাগল।

একদিন একজন শিষ্যা যিশুখৃষ্টের মস্তকে মূল্যবান সুগন্ধ তৈল মাখাইয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া একজন প্রধান শিষ্য বলিলেন, এই তৈলের মূল্য দ্বারা দরিদ্রের সাহায্য করিতে পারা যাইত। এই নির্ম্মম নিষ্ঠুর কথা শুনিয়া যিশু তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, ইহাকে নিবারণ করিও না, দরিদ্রদিগকে চিরকাল পাইবে, কিন্তু আমাকে পাইবে না।" দরদী ভিন্ন একথার মর্ম্ম কে বুঝিবে? একজন প্রধান শিষ্য যিনি বার জনার মধ্যে একজন, তিনি দরদের মূল্য বুঝিলেন না, সাধারণ ব্যক্তিরা কি বুঝিবে?

সকল ব্যাপারের মধ্যেই যাঁহারা "দরদী" সাধারণ লোকেরা তাঁহাদিগকে পাগল বলিয়া থাকে। "একদেশদর্শী নাম দিয়া নিজেরা মুরুব্বি সাজিয়া তাঁহাদিগকে উপদেশ প্রদান করে। পুত্র-শোকাতুরা জননী যখন প্রাণের জ্বালায় ধূলায় লুটাইয়া ছট্‌ফট্ করে, তখন যদি কেহ তাহার নিকট যাইয়া গুরুগম্ভীর ভাবে বলে "কেন বৃথা শোক করিতেছ? এ সংসার অনিত্য কেহ কারু নয়," তবে সেই উপদেষ্টার কথাগুলি শোকাতুরা মাতার নিকট বিষের ছিটার মত বোধ হয়। সেইরূপ যেব্যক্তি প্রেমের দরদ বুঝে না, তাহার উপদেশ, তাহার সঙ্গ দরদীর নিকট বিষের মতন বোধ হয়। এই জগতে দরদীরা চিরকালই "বেদরদীর" সঙ্গে পড়িয়া কষ্ট অনুভব করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগকে কেহ চিনিতে পারে নাই। তাঁহাদের মর্ম্মকথা বুঝিতে পারে নাই। তাঁহাদের বুকের ভাবা, মুখের ভাষায় প্রকাশ পায় না।

শ্রীশ্রীগুরুদেব বহুকাল একাসনে বসিয়া রাত্রি কাটাইয়াছেন, আমরা তাঁহার আশেপাশে মৃতের ন্যায় নিদ্রিত রহিয়াছি, শেষ রাত্রে তাঁহার মধুর কণ্ঠের সংগীত শুনিয়া আমরা জাগিয়াছি, এক একদিন তিনি গাহিয়াছেন,—

"মনের মানুষ পেলে,
কথা কৈতাম আপন দেল খুলে;
বেদরদীর সঙ্গে কথা কইব না
এ প্রাণ গেলে।"

তিনি সারারাত্রি আপন প্রেমাস্পদকে লইয়া বসিয়া কাটাইতেন, আর আমরা সেইখানেই নাক ডাকইয়া ঘুমাইতাম। দরদী পাইয়াও আমরা—তাঁহার দরদ বুঝিলাম না।

(৯)

প্রার্থনা

শ্রীশ্রীগুরুদেব বলিয়াছেন,—"সেদিন নৌকা করিয়া ঢাকায় আসিতে আসিতে দেখিলাম, তিন জন স্ত্রীলোক বুড়ীগঙ্গার তীরে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছে, "বাবা গো পার কর গো", তাহাদের পিতা অপর পারে ছিল, তাহারা ঢাকার পারে দাঁড়াইয়া ওপারে যাইবার জন্য চীৎকার করিতেছিল, "বাবাগো পার করগো।" এই শব্দ অনেকবার শুনিয়াছি, কিন্তু সেদিন যেমন ভাবে শুনিলাম, এমন আর কখন শুনি নাই। তাহারা তিনজন একটা ভাঙ্গাঘাটে দাঁড়াইয়া অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে ডাকিতেছিল "বাবাগো পার করগো।" এইরূপ অবস্থা দেখিয়া মনে মনে ভাবিলাম, এই ত' প্রকৃত অবস্থা, যদি ভব-সাগরের তীরে দাঁড়াইয়া এইরূপ যথার্থ ভাবে ব্যাকুল হইয়া প্রাণের সহিত "পার কর" বলিয়া একবার ডাকিতে পারি, তাহা হইলে কি আর পারে যাইতে বিলম্ব হয়?"

যাহারা "কাঙ্গালী" নাম ধারণ করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে, তাহাদের মধ্যে এমন অনেক লোক থাকে, যাহারা প্রকৃতপক্ষে তেমন অভাব-গ্রস্ত নয়। ইহাদের ভাল ভাল ধুতি ও জামা আছে। ভিক্ষার সময় ভিন্ন অন্য সময় ইহারা সেই সকল পোষাক পরিধান করিয়া বাহির হয়, ভিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র এক প্রস্থ পোষাক রাখে, সে পোষাক যেমন মলিন তেমনই জীর্ণ ও ছিন্ন, অনেক সময় উহা দ্বারা স্ত্রী পুরুষের লজ্জা রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে। যদি জীর্ণ ও মলিন বস্ত্রের অভাব উপস্থিত হয়, তবে ভাল পরিচ্ছদকে মলিন ও ছিন্ন করিয়া লয়, কেন না সেটি তাহাদের ভিক্ষার পোষাক। দরিদ্র না সাজিলে ভিক্ষা করিবার অধিকারী হইবে কিরূপে?

আমরাও অনেক সময় এই শ্রেণীর ভিখারী-দিগের অনুকরণ করিয়া থাকি। যখন উপাসনা কি প্রার্থনা করিতে বসি, তখন আমরা আমাদের চরিত্রের প্রকৃত পোষাকটি ছাড়িয়া রাখিয়া বাহিক ও কৃত্রিম দীন-হীনতার একটি পোষাক পরিধান করিয়া লই, বস্তুতঃ সেটি আমাদের প্রকৃত পরিচ্ছদ নহে, আটপৌরে পোষাক নহে, ভিক্ষার পোষাক মাত্র। পূর্ব্বোক্ত ভিখারীর দল যখন ভিক্ষা করিতে আইসে, তখন বলে, "বাবুজী, আমরা বড় দুঃখী, দুদিন খেতে পাইনি, তুমি না দিলে আজও উপোস করবো।" কিন্তু অন্য সময় যদি তুমি তাহাদিগকে "গরীব" বলো, তাহারা একান্ত অপমান বোধ করিবে এবং তোমাকে দুই চারিটি শক্ত কথা শুনাইয়া দিবে, কেন না প্রকৃতপক্ষে তাহারা আপনাদিগকে দরিদ্র মনে করে না।

আমরাও উপাসনা প্রার্থনার সময় বলি, "হে প্রভো, আমি অতিশয় নরাধম, পাপে তাপে জীর্ণশীর্ণ, তুমি রক্ষা না করিলে আমার আর গতি নাই।" এইরূপ বলিতে বলিতে নেত্র-নীরে ভাসিয়া যাই, কিন্তু উপাসনা হইতে উঠিয়া যখন ভিক্ষার পোষাক পরিত্যাগ করি, তখন যদি কেহ আমাকে "মন্দলোক" বলে, তবে তাহার সঙ্গে তুমুল কলহ উপস্থিত করি এবং শক্তি থাকিলে সেই লোকের বিরুদ্ধে রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত করিয়া থাকি। ভিক্ষার পোষাক পরিয়া বলি, "হে প্রভো, তুমি ভিন্ন আমার আর কেহ নাই, আমি একান্তই অনন্য-গতি।" আবার ভিক্ষার পোষাক ছাড়িয়া দিয়া যখন কার্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হই, তখন দেখিতে পাই, "প্রভু" ভিন্নও আমার স্বচ্ছন্দে দিন কাটিতেছে, তাঁহার অনুপস্থিতিতে আমার কাজ-কর্ম্ম, সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কিছুমাত্র বিঘ্ন ঘটে নাই, চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া "প্রভুর" নিকট যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলাম এবং যাহা না পাইলে

আমি একান্ত অনাথ হইব বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলাম, সেই বস্তুর সর্বদা অভাবেও আমার সংসার সুখের কিছুমাত্র ন্যূনতা বোধ করিতেছি না। ইহাকে প্রার্থনা বলে না, বেলা অবসানে বুড়ীগঙ্গার ভাঙ্গাঘাটে দাঁড়াইয়া সেই কন্যা তিনটি "বাবা গো পার কর গো" বলিয়া যেরূপ কাতরভাবে বাবাকে ডাকিয়াছিল, সেইটিই প্রকৃত প্রার্থনার ভাব। আশা, আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাস ও উৎকণ্ঠা, এই চারিটি না মিলিলে প্রার্থনা হয় না। ঐ কন্যা তিনটির পিতা যতক্ষণ আসিয়া তাহাদিগকে পার করিয়া না লইবে, ততক্ষণ "বাবা গো পার কর গো" বলিয়া তাহারা অবিশ্রান্ত ডাকিবে। "বাবার" অস্তিত্বে তাহারা বিশ্বাস করে, বাবার স্নেহ-মমতায় তাহাদের আস্থা আছে, "পার' না হইলে তাহাদের উপায়ান্তর নাই। এতটা না হইলে প্রার্থনা হয় না, বাক্যের প্রার্থনা, বাক্যের দীন-হীনতা ভিক্ষার পোষাক পরিয়া দরিদ্র সাজার মতন এক প্রকারের ছদ্মবেশ ধারণ মাত্র। বস্তুত মুখে মুখে ঐরূপ কথা বলিয়া বলিয়া হৃদয় অজ্ঞাতসারে কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন আর ঐরূপ বৃথা কথা বলিতে শুনিতে হৃদয়ে ব্যথা লাগে না, মিথ্যাচার এমনভাবে সহিয়া যায় যে, উহা একান্ত স্বাভাবিক হইয়া পড়ে।

বিন্দুমাত্র অহঙ্কার থাকিতে প্রকৃত প্রার্থনা আসিতে পারে না! রূপ-যৌবনসম্পন্ন বলিষ্ঠকায় কোন এক ধনীর সন্তান যখন ভগ্নপোত হইয়া তরঙ্গসঙ্কুল নদীবক্ষে হাবুডুবু খায়, তখন প্রথমত শারীরিক বলের উপর নির্ভর করে, সন্তরণ দ্বারা উত্তীর্ণ হওয়ার চেষ্টা করিতে থাকে, কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই তাহার হস্তপদ অবসন্ন হইয়া পড়ে। তখন ধনবলের আশ্রয় গ্রহণ করে, উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলে—"আমি অমুক রাজার পুত্র, যে আমাকে রক্ষা করিবে, আমার পিতা তাহাকে লক্ষ টাকা পুরস্কার দিবেন।" ইহার পরে যখন দেখে, নিজের বল, ধনবল, জনবল, কিছুই কাজে আসিল না, ক্রমশ মাথা পর্যন্ত জলে ডুবিল, আর রক্ষা নাই, তখন যেরূপ ব্যাকুল প্রাণে "রক্ষা কর, রক্ষা কর" বলিয়া ঊর্ধ্বদিকে হাত তুলিয়া দেয়, তাহারই নাম প্রকৃত প্রার্থনা।

কথা বলিয়া উপাসনা, প্রার্থনা করা বড়ই কঠিন কার্য, কেননা ধর্মের পথ ক্ষুর-ধারের ন্যায় সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ম, একটুকু অসাবধানতায় পতনের ও সর্বনাশের সম্ভাবনা রহিয়াছে।

এক মুসলমান সাধুর কথা শুনিয়াছি, তাঁহার নাম ছিল "হাজি মহম্মদ।" মক্কা-শরিফ গমনের নাম "হজ" করা, যাঁহারা হজ করেন, তাঁহাদিগকে "হাজি" বলে। হাজিগণ মুসলমান সমাজে বিশেষ সম্মানভাজন। হাজি-মহম্মদ তাঁহার জীবনে ষাটবার "হজ" করিয়াছেন; সুতরাং তিনি একজন প্রধান "হাজি"রূপে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। দীক্ষা (নামাজ) গ্রহণের পর হইতে তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের মধ্যে তিনি রোগে শোকে কোনও অবস্থায় কখনও দৈনিক পাঁচবেলা নামাজ করিতে বিরত হন নাই। এই অসাধারণ ধর্ম-নিষ্ঠার জন্য তিনি একজন মহামান্য ফকীররূপে গণ্য হইয়াছিলেন।

একদিন হাজি-মহম্মদ স্বপ্নে দেখিলেন যে, মহা-বিচারের দিন উপস্থিত। স্বর্গীয়-দূত বেত্রহস্তে স্বর্গ ও নরকের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছেন; যে যাত্রী যাইতেছে, তাহাকে তাহার সদসৎ কর্মের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া কাহাকেও স্বর্গে, কাহাকেও নরকে পাঠাইতেছেন। হাজি মহম্মদ দূতের সম্মুখে উপস্থিত হইলে দূত জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোন্ সৎকাজের ফলে তুমি স্বর্গে যাইতে চাহিতেছ?" উত্তরে তিনি বলিলেন—"আমি ৬০ ষাটবার হজ করিয়াছি।" স্বর্গীয় দূত বলিলেন, "সে কথা সত্য বটে, কিন্তু একদিন কোন ব্যক্তি তোমার নাম জিজ্ঞাসা করিলে তুমি একটু গর্বের সহিত বলিয়াছিলে যে, আমি "হাজি" মহম্মদ। এই গর্বের জন্য তোমার ৬০ বৎসরের সমস্ত হজের পুণ্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তোমার অন্য কি পুণ্য আছে, বল?

স্বর্গ-যাত্রীর মুখ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তিনি আর কথা কহিতে পারেন না, কম্পিত কণ্ঠে স্বর্গীয় দূতকে বলিলেন—"আমি ৬০ বৎসর-কাল নিয়মিতরূপে পাঁচবেলা নামাজ করিয়াছি।"

স্বর্গীয় দূত বলিলেন, তোমার সেই পুণ্যরাশিও নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

হাজি-মহম্মদ ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন—"কি অপরাধে আমার ৬০ বৎসরের তপস্যা নষ্ট হইয়া গেল?"

স্বর্গীয় দূত বলিলেন—"একদিন মফঃস্বল হইতে অনেকগুলি ধর্মার্থী তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, সেইদিন তুমি তাহাদের সমক্ষে অন্যান্য দিন অপেক্ষা বেশীক্ষণ নামাজ করিয়াছিলে, এই লোকমুখাপেক্ষিতার জন্য তোমার ৬০ বৎসরের সমস্ত তপস্যা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।"

স্বর্গীয় দূতের কথা শুনিয়া বৃদ্ধ হাজী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, সেই ক্রন্দন-ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করায় তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, জাগিয়া উঠিয়াও স্বপ্নের কথা স্মরণ করিয়া তিনি ভয়ে কাঁপিতে ও কাঁদিতে লাগিলেন। স্বপ্নের ছলে ভগবান তাঁহাকে যে উপদেশ দিলেন, উহার একবর্ণও অসত্য নহে। এই জন্যই ঋষিরা বলিয়াছেন যে, ধর্মের পথ ক্ষুরধারের ন্যায়, একটু অসাবধান হইলেই বিপদ। একটু আমিত্ব থাকিলে ৬০ বৎসরের তপস্যা পলকে নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং দশজনের মধ্যে বসিয়া, কথা বলিয়া, উপাসনা, প্রার্থনা করা বড়ই কঠিন কার্য; এরূপ কার্যের অধিকারী "কোটীতে গুটী" মেলা ভার। অনধিকারী হইয়া যাঁহারা এইরূপ গুরু-কার্যের ভার গ্রহণ করে, তাহাদের জীবনে ধর্মলাভ হওয়া ত দূরের কথা, পরন্তু অজ্ঞাতসারে নাস্তিকতা ও সংশয়বাদ তাহাদের হৃদয়ক্ষেত্র অধিকার করিয়া বসে। তাহারা শুক পক্ষীর মতন কতকগুলি মুখস্থ ও অভ্যস্ত কথা উচ্চারণ করিয়া প্রার্থনা করা হইল বলিয়া মনে করে এবং শুষ্ক ও ধর্মহীন জীবন লইয়া ধর্ম-জীবন যাপনের কল্পনা করে, লোকের কাছে বড় বড় ধর্মকথা বলিয়া বেড়ায় এবং অন্তরে শূন্যতা অনুভব করিয়াও বাহিরের লোকের নিকট পূর্ণতার বড়াই করে। ক্রমশ এইরূপে তাহাদের হৃদয় নাস্তিকতা অপেক্ষা সহস্রগুণে সাংঘাতিক কপটতার আবাসভূমি হইয়া উঠে। কপটতা যদি একবার অভ্যস্ত হইয়া যায়, তখন আর অনুতাপ জন্মে না। সুতরাং মনুষ্য-হৃদয় পশু-হৃদয়ের সমান হইয়া পড়ে। যে সরিষা দ্বারা ভূত ছাড়াইবে, সেই সরিষার মধ্যেই যদি ভূত থাকে, তবে আর উপায় কি? যে প্রার্থনা দ্বারা ধর্মলাভ করিবে, সেই প্রার্থনা যদি প্রার্থনা না হয়, তবে আর উপায় কি থাকে? কিন্তু হায়! সহস্র সহস্র ধর্মার্থী এইরূপে আত্ম-প্রতারিত হইয়া অন্তরে অন্তরে নাস্তিক ও কপট হইয়া পড়িতেছে। সম্মুখে উপযুক্ত আদর্শ দেখিতে না পাইয়া আপনাকে ধরিতে পারিতেছে না। তুমি বলিতে পার যে, প্রার্থনাই ত ধর্মলাভের একমাত্র উপায়, প্রার্থনা না করিলে চলিবে কেন? অন্তর্যামী ভগবান যিনি পক্ষী-শাবকের ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিতে পান, সামান্য মল-কীটের মর্মবেদনা জানিতে পান, তিনি কি আমার কথা শুনিতে পাইবেন না? এই কথার উত্তর এই যে, এতকাল যে প্রার্থনা করিলে, তাহাতে তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে কি? তোমার পাপ-তাপ, জ্বালা যন্ত্রণা ঘুচিয়া গিয়াছে কি? তোমার আত্মদর্শন, ব্রহ্ম-দর্শন লাভ হইয়াছে কি? তুমি কি নিরাপদ-ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছ? তুমি বলিতে পার যে, তোমার প্রার্থনা "প্রকৃত প্রার্থনা" হয় নাই বলিয়া তুমি সিদ্ধিলাভ করিতে পার নাই। একথা অতীব সত্য, কিন্তু তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তোমার প্রার্থনা যাহাতে "প্রকৃত প্রার্থনা" হয়, তজ্জন্যও কি প্রার্থনা কর নাই? তবে সে প্রার্থনা পূর্ণ হইল না কেন? একথার উত্তরে ত তুমি বলিবে যে, সে প্রার্থনাও "সরল প্রার্থনা" হয় নাই, যদি একথা সত্য হয়, তবে আর তোমার হাতে এমন কি ঔষধ আছে, যাহা দ্বারা তুমি ভব-রোগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে? ঈশ্বর তোমার সকল কথা শুনিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু তিনি ত কথা শুনিয়া প্রার্থনা পূর্ণ করেন না, তোমার প্রাণের অবস্থা কি, তাহাই তিনি দেখেন, তাঁহাকে কেহ ফাঁকি দিতে পারে না।

শ্রীশ্রীগুরুদেব বলিয়াছেন, "তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি যেমন শিক্ষিত বা অভ্যস্ত কথা বলে না, সে যেমন প্রাণের কথা বলে, সেইপ্রকার তৃষিত হইয়া ডাকিলে করুণাময় পরমেশ্বর প্রকাশিত হন। ইঁহার মতন নিকটস্থ বস্তু তার কিছুই নাই। প্রাণ যদি চায়, একবার যদি বলিতে পারি "প্রভো, তোমাকে চাই, তোমা বিনে আমার অন্য উপায় নাই, তুমি আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হও, তোমাকে পূজা না করিয়া প্রাণ আর কিছু চায় না, কেবল তোমাকেই চায়।" অমনি তিনি প্রকাশিত হন।

অগ্নির সঙ্গে উত্তাপের যেরূপ সম্বন্ধ, প্রার্থনার সঙ্গে "কৃতার্থতার" ঠিক সেইরূপ সম্বন্ধ। উত্তাপ যেমন অগ্নির সর্বদা সহচর, "কৃতার্থতা" সেইরূপ প্রার্থনার চিরসঙ্গী; কিন্তু সে প্রার্থনা বাক্যময় প্রার্থনা নহে, প্রাণের প্রার্থনা। তুমি প্রার্থনা করিতে বসিয়া চক্ষু বুজিয়া বলিলে "দীনবন্ধো, তোমাকে না পাইলে আর আমার দিন চলে না।" কিন্তু কথাগুলি সমাপ্ত করিয়া চক্ষু খুলিয়া তুমি বন্ধু বান্ধবদিগের সহিত নানা প্রসঙ্গে কথা-বার্তা বলিতে লাগিলে, হাসি খুশীতে দিন কাটাইলে, "দীনবন্ধুর" অভাবে অনায়াসে তোমার দিন চলিতে লাগিল এবং কর্তব্যকার্যের নাম করিয়া সংসারের মধ্যে মহাসংসারী হইয়া বসিলে। যাহার প্রাণের বস্তু হারাইয়াছে, সে ব্যক্তিও এরূপ করিতে পারে না। লোকেরা যিশুখ্রীষ্টকে "দুঃখের প্রতিমূর্তি" (man of sorrow) বলিত। শ্রীকবীর সাহেব বলিয়াছেন,—

"সব জগৎ সুখীয়া হ্যায় খায় আওর শোয়।
দুখীয়া দাস কবীর হ্যায় জাগে আওর রোঁয়।"

ইহার অর্থ এই যে, জগতে সকলেই সুখে আছে, তাহারা পেট ভরিয়া খায় আর নিশ্চিন্তে নিদ্রা যায়, একমাত্র কবীর দাসই এ সংসারে দুঃখী, কেন না সে শুধু জাগে আর কাঁদে।

যে পর্যন্ত প্রার্থনা পূর্ণ না হয়, ততদিন সাধক কিছুতেই সুখী হইতে পারে না।

যেমন কল্পনা করিয়া পুত্র-শোক কি অপত্য-স্নেহ উৎপন্ন করা যায় না, সেইরূপ কতকগুলি কথা আওড়াইয়া প্রার্থনা হয় না। এক একজন উৎকৃষ্ট অভিনেতা এমন চমৎকার অভিনয় করিতে পারে যে, তাহার অভিনয় দেখিয়া মনে হয় যেন সত্যই রাজা দশরথ পুত্র-শোকে বিলাপ করিতে-ছেন। সাময়িক ভাবে অভিনেতার অন্তরেও কল্পনাবলে একটি শোকের ভাব আবির্ভূত হয়, অশ্রুজলে তাহার গণ্ডদেশ ভাসিয়া যায়, তাহার কথাগুলি তীব্র শোকের বিলাপ-বাক্যরূপে উত্তপ্ত লৌহশলাকার মত শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয় বিদ্ধ করে। অভিনেতা "হা রাম তুমি কোথায়?" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, তখন সকলে সত্য সত্যই তাহার জন্য হাহাকার করিয়া উঠে। অনেক স্থলে অভিনেতা এমনই আত্ম-বিস্মৃত হয় যে, সত্য সত্যই আপনাকে পুত্রশোকার্তুর বলিয়া অনুভব করে, কিন্তু পট-পরিবর্তনের পরে সে ব্যক্তি যখন অন্য একটি সাজে সাজিয়া আইসে, তখন আর তাহার পুত্রশোক নাই, হয়ত তখন রসিকতার তরঙ্গে শ্রোতৃবর্গের মন প্রাণ ভাসাইয়া দিতে থাকে, কে বুঝিবে সেই লোক আর এই লোক একই ব্যক্তি!
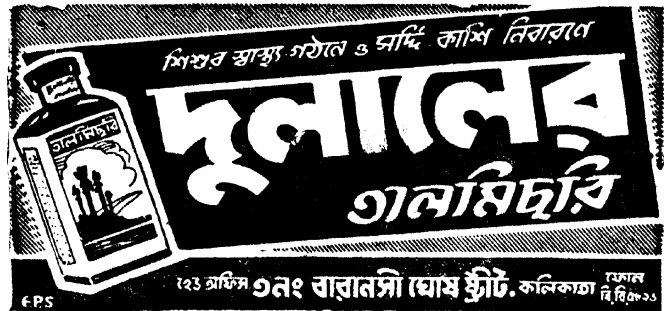
অনেকের প্রার্থনাও এইরূপ। কল্পনা-বলে আপনাকে দীন দুঃখী পাপীতাপী করিয়া লইয়া ভাষার সাহায্যে সুকরুণ শব্দ বিন্যাস করিয়া নিজে অভিভূত হন এবং উপাসক-মণ্ডলীকে অভিভূত করেন, কিন্তু পরক্ষণেই অন্য আলাপ আরম্ভ করেন, অথবা বিলম্বে গাড়ী আনার জন্য কোচম্যানকে যথেষ্ট তিরস্কার করেন, মনে হয়, সেই ব্যক্তি আর এই ব্যক্তি এক ব্যক্তি নহে।

তবে কি এই মৌখিক উপাসনা প্রার্থনাটুকুও ছাড়িয়া দিতে হইবে? তাহাতে কি প্রাণের টান বাড়িয়া যাইবে? উত্তর এই যে কেহই উহা ছাড়িয়া দিতে পারে না, কিন্তু এমন দিন আসিবে, যখন ঐরূপ উপাসনা প্রার্থনা আপনি ছাড়িয়া যাইবে। "মা কালী রক্ষা কর।" "মা দুর্গা উদ্ধার কর" "হে নারায়ণ ভব-সাগর পার কর" "হে পরমেশ্বর দেখা দাও" এইরূপ প্রার্থনা সকল ধর্মাবলম্বীর মধ্যেই স্ত্রীলোক পুরুষ অনেকেই সর্বদা করিয়া থাকে, উহা একটা সাধারণ প্রথা, উহাতে অসাধারণত্ব কিছুই নাই। যখন কোন কামনা সিদ্ধ হয়, তখন মনে করে, প্রার্থনার ফল ফলিয়াছে এবং সেইজন্য দেবতাকে পূজা দেয় এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করে। কিন্তু একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর পরে একথা কেহই বলে না, "হে দয়াময়, আমার পুত্রটির অকাল-মৃত্যুর জন্য আমি তোমাকে শত শত ধন্যবাদ করিতেছি এবং সেই জন্য তোমার নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞ রহিলাম।" যদি কেহ এরূপ করে, তবে সে ব্যক্তি অবশ্যই অসামান্য পুরুষ। আর তাহার অনুকরণ করিয়া যদি কেহ বলে, তবে সে ব্যক্তি হয় ভণ্ড, নতুবা আত্ম-প্রতারিত। যাঁহারা মোক্ষ-মুক্তি কামনা করেন, আত্ম-দর্শন, ব্রহ্ম দর্শনের জন্য লালায়িত হন, তাঁহারা মৌখিক প্রার্থনা করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন না। শ্রীশ্রীগুরুদেব এক সময় বলিয়াছেন—"যাহাতে সত্য উপাসনা করিতে পারি, সত্য সাধনা করিতে পারি সেই প্রকার চেষ্টা আবশ্যক, আজ কাল করিয়া আর সময় কাটাইতে পারি না। যাঁহাকে লাভ করিবার জন্য জীবন, তাঁহাকে যেন প্রাণের সহিত লাভ করিয়া হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে চলিয়া যাইতে পারি। ঊর্ধে বাহু তুলিয়া নাচিতে যেন বলিতে পারি "আমার আশা পূর্ণ হইয়াছে। * * * আমার প্রভু আমার মালিক (তাঁহাকে) সকলের মাথায় দেখিতেছি, আনন্দে সব পরিপূর্ণ হইতেছে। * * * এই যে সোনার মাণিক, দুর্বাঘাস-গুলিকে—সমস্ত জল স্থলকে আলো করিয়া তুলিতেছে, এই সোনার মাণিককে লয়ে যেন কাটিয়ে যেতে পারি!"

ফণী আপনার মাথার মণিকে মাথায় রাখিয়া জীবনধারণ করে, সেই মণি হারাইলে সে অন্ধকারে মাটীতে গড়াগড়ি দিয়া ছটফট করিতে থাকে। সেই মণি, সেই মাথার মণি হারাইলে সে জীবনধারণ করিতে পারে না। সেইরূপ ভগবান যে সাধকের মাথার মণি, তিনি কি তাঁহাকে হারাইয়া শান্তিলাভ করিতে পারেন? ইহারই নাম প্রকৃত প্রার্থনা। "সম্বন্ধ নির্ণয় না হইলে প্রাণের টান হইবে কেন? অজানিত বস্তুর প্রতি কি কখনও প্রকৃত অনুরাগ হয়? শ্রীশ্রীগুরুদেব বলিয়াছেন, "হে প্রভো, হে দয়াল, হে কাঙালের ধন, বড় দয়াল তুমি, এহেন করে পরিচয় না দিলে কি আমার রক্ষা ছিল? আমার হৃদয়ের ধন প্রভো, আমি কিছুই জানি না আমি কি বলি। আমার ইচ্ছা হয় তোমাকে আমার এক এক টুকরা মাংস বলি, আমার অস্থি মাংস বলিয়াও তৃপ্তি নাই" ইত্যাদি। শরীরধারীকে সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য আপনার শরীরের অস্থি মাংস অপেক্ষা অধিকতর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের দৃষ্টান্ত আর কি আছে? তাহারি পরে বলিলেন

"অস্থি মাংস বলিয়াও তৃপ্তি নাই", মানুষের ভাষায় আর কুলাইল না।

নিজের অস্থি মাংসের প্রতি মানুষের কিরূপ অনুরাগ, তাহা আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। কিন্তু অস্থি মাংসের মতন প্রত্যক্ষীভূত না হইলে, অস্থিমাংসের মতন আপনার হয় না, আপনার না হইলে তাহার জন্য অনুরাগ হয় না। এই অনুরাগ লাভের সর্ব-প্রধান উপায় সাধুসংঘ। সাধুসংঘ না হইলে আপনার হীনতার প্রতি দৃষ্টি পড়ে না, সুতরাং যাহাকিছু করিয়া তৃপ্তিলাভ করা যায়।

যোগিবর ঈশা রুটীর জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কেননা তিনি একমাত্র স্বর্গস্থ পিতা ভিন্ন অন্য কাহাকেও জানিতেন না, কিন্তু যে সকল লোকের অহংভাব ও আত্মনির্ভর আছে, তাহারা যদি রুটীর জন্য প্রার্থনা করে, সে প্রার্থনা প্রকৃত প্রার্থনা হইতে পারে না। অনন্যগতি না হইলে প্রার্থনা হয় না। হৃদয়ের একটি অবস্থার নাম প্রার্থনা। যৌবন যেমন শরীরের একটি অবস্থা, প্রার্থনাও সেইরূপ সাধক হৃদয়ের অবস্থাবিশেষ, ভাবিয়া চিন্তিয়া উহাকে টানিয়া আনা যায় না। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যৌবন আসিয়া পড়ে, সাধনার সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ যথাকালে প্রার্থনার উদয় হয়। যেমন ঘুম পায়, ক্ষুধা পায়, সেইরূপ প্রার্থনা পায়। যাঁহার প্রার্থনা পায়, তাঁহার প্রাণের আবেগে সে ধরা পড়ে। শ্রীশ্রীগুরুদেব বলিয়াছেন,—কি টান * * আমার হারানিধি—অনেকদিন ছেলেটি মারা গেছে, এ যেন তারই সংবাদ, প্রাণ যেন ছাঁৎ করে উঠে! তাঁর নাম শুনলাম, অমনি হৃদয় ভেদ করে উঠলো। "পরমেশ্বর" এই কথাটি প্রাণ ভেদ ক'রে যায়। এ নামে কি মন্ত্রতন্ত্র আছে জানি না; কিন্ত যাই হউক না কেন, একবার "হরি, রাম, দুর্গা, কালী, খোদা আল্লা" যা বলুক, আমার ভেকে যদি ডাকে, অমনি আমার প্রাণ কেড়ে নেয়। * * বলি (লোকেরা বলে) গাছে, জলে, আকাশে সর্বত্র আছেন, কিন্ত প্রাণে বড় আবেগ! উন্মাদের মতন জলে ডুব দিয়া খুঁজি, পাতা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলি, দা নিয়ে গাছ কাটি, বাতাসে লাফ দিয়ে ধরতে চাই; পাহাড়ের উচ্চ শিখরে উঠে দেখি—কোথায় কোথায়?" * * * খুঁজিতে খুঁজিতে, হাহাকার করিতে করিতে দেখি পেছনে কে ফেরে! কে তুমি? তুমি কে আমার পেছনে? একবার দুবার দেখতে দেখতে চিনে ফেলি, "পরিপূর্ণমানন্দং পরিপূর্ণমানন্দং" সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড প'রে গেল, তাঁর ভাষা নাই, শব্দ নাই। মনে হয় কত কি বলবো, তাঁর কথা প্রকাশ করবো, কিন্ত তখন নির্বোধের মত অজ্ঞানের মত হয়ে যাই। তাঁর উপমা নাই, তুলনা নাই; বোবার স্বপন দেখার মতন।"

একটি বাউল সংগীত শুনিয়াছি, কয়েকটি চরণ স্মরণে আছে, যথা,—

অনুরাগীর নয়ন দেখ্‌লে চেনা যায়।
যে জন অনুরাগী, প্রেম বৈরাগী
প্রেমের পুলক লাগে তার গায়॥

* * * *

নবীন বলে শোন্ অধ'রে
কল্লি কিরে হায়রে হায়!
(ও তুই) ভাজিস ঝিঙা, বলিস পটল
সে বলা কি কাজে পায়?

বস্তুত আমরাও অনেক সময়ে "ভাজি ঝিঙে বলি পটল" অন্তর্যামী ভগবানের দরবারে সেরূপ বলা কোন কাজেই আসে না, পরন্তু মিথ্যাবাদিতার জন্য পতিত হইতে হয়।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

অশ্বত্থের অভিশাপ

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

১

অবশেষে যোগেশ অনেক সন্ধান করিয়া একদল করাতি সংগ্রহ করিল। তাহারা পদ্মাপারের লোক, অশথ গাছের মাহাত্ম্যে ধার ধারে না। গাঁয়ের লোক তাহাদের মারিয়া খেদাইয়া দিত—কিন্তু সাহস করিল না, করাতিরা জমিদারের আশ্রিত। তখন তাহারা নিরুপায় হইয়া টোলের পড়ুয়া শশাঙ্ককে মুখপাত্র করিয়া দশ আনির জমিদার কীর্তিনারায়ণবাবুর কাছে গিয়া উপস্থিত হইল।

কীর্তিনারায়ণ বৈঠকখানায় ছিল। অতিকায় জলহস্তী যেমন নলখাগড়া বেষ্টিত কর্দম শয্যায় সুখ-আলস্যে গড়াইতে থাকে, প্রশস্ত ফরাসের উপরে কীর্তিনারায়ণ তেমনি খালি গায়ে গড়াইতেছিল। পাশে একটি নাতিবৃহৎ পানের ডিবা, পঞ্জিকা, কয়েকদিনের সঞ্চিত বাঙলা সংবাদপত্র। সেই আসন্ন শীতেও পাঙ্খাবর্দার টানাপাখা টানিতেছিল। পাঙ্খাবর্দার বলে—বড়বাবু বড় হিসাবী, শীতকালেও পাখা টানাইয়া লন। কথাটা সত্য। শীতের দুপুরে আহারান্তে লেপ কম্বল গায়ে দিয়া ফরাসে তিনি শুইয়া পড়েন, পাঙ্খাবর্দার পাখা টানিতে থাকে। লোকটা পাখা টানিবার জন্য নিষ্কর জমি • ভোগ করে—শীতকালে যে সে অবকাশ ভোগ করিবে হিসাবী কীর্তিনারায়ণের তাহা অসহ্য। তাই সে অতিরিক্ত লেপ কম্বলের দ্বারা কৃত্রিম তাপ সৃষ্টি করিয়া তাহা নিবারণের জন্য পাখা টানাইয়া থাকে। বড়বাবু সত্য সত্যই হিসাবী।

সকলে গিয়া ঘরের মেঝেতে বসিল। শশাঙ্ক বাবুকে প্রণাম করিয়া একখানি জলচৌকিতে উপবেশন করিল। শশাঙ্কর বয়স ত্রিশের কাছে। অনেক দিন হইল টোলে পড়িতেছে। পড়া কবে শেষ হইবে জিজ্ঞাসা করিলে সে সবিনয়ে উত্তর দেয়—জ্ঞানসমুদ্রের কি শেষ আছে? কেবল জলে নামিয়া সাঁতার আরম্ভ করিয়াছি।

তাহার নাকটি টিকালো, চোখ দুইটি ছোট, মাথা একেবারে নিষ্কেশ হইলেও যথাস্থানে একটি শিখা সমুদ্যত। এমন টাকের মধ্যে টিকি গজাইল কিরূপে জিজ্ঞাসা করিলে সে পাল্টা জিজ্ঞাসা করে—মরুভূমিতে খেজুর গাছ গজায় কিরূপে? তারপরে বলে—ব্রহ্মতেজ বাবা! ব্রহ্মতেজ! জ্ঞানের উত্তাপে মাথায় টাক পড়িয়াছে—কিন্তু তাই বলিয়া ব্রাহ্মণের টিকিতো না গজাইয়া পারে না! ব্রাহ্মণের লক্ষণের মধ্যে তাহার শিখা ও উপবীতই প্রধান চিহ্ন, একমাত্র চিহ্ন বলিলেই অনেকে মনে করে।

কীর্তিনারায়ণ বলিল—শশাঙ্ক, তারপরে খবর কি?

শশাঙ্ক পোষমানা পোষের মতো মৃদু হাসিয়া বলিল—কর্তা সবই তো জানেন, এখন আপনি রক্ষা না করলে যে সব যায়।

বিস্মিত কীর্তি শুধাইল—কি হ'য়েছে?

তখন শশাঙ্ক তাহাদের আগমনের কারণ নিবেদন করিল। কীর্তিনারায়ণ সবই জানিত, সব খবরই রাখিত, তবু না-জানার ভাণ করিয়া সমস্ত ব্যাপারটা আবার শুনিয়া লইল। তারপরে বলিল—ওটাতো ছোটবাবুর এলাকা, আমি কি করবো?

শশাঙ্ক বলিল—সবই কর্তার এলাকা। আপনার অসাধ্য কি?

এই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ খোসামুদিতেও কীর্তিনারায়ণ মনে মনে খুশি হইল। খানিকটা গড়াইয়া লইয়া কাত হইয়া শুইয়া একটা পান লইয়া মুখে পুরিল।

কীর্তিনারায়ণ ও উদয়নারায়ণ পরস্পরের যেন বিপরীত, বিরুদ্ধ ধাতুতে তাহাদের দেহ ও মন গঠিত। নবীননারায়ণকে বলা যাইতে পারে চাঁদের পূর্ণিমার দিক আর কীর্তিনারায়ণ ঘোরতর অমাবস্যা। একজনের গায়ের রঙ শুভ্র, ছিপছিপে গড়ন, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, আচারে-ব্যবহারে কথায় বার্তায় ভদ্র; আর একজন ঘন মসীবর্ণ, স্থূলায়ত অবাধ্য তাহার দেহভার, একপ্রকার বুদ্ধি আছে বটে, যাহাকে লোকে কুবুদ্ধি বলে, আচার ব্যবহারে গ্রামের আতঙ্ক—সংক্ষেপে কীর্তিনারায়ণ গ্রাম্যতা দোষের ঘনীভূত পিরামিড। সে মনে মনে নবীনকে বিষম হিংসা করে—এবং সেই হিংসা অবজ্ঞার আকারে যখন তখন প্রকাশিত হইয়া পড়ে। যেবার নবীননারায়ণের এম-এ পাশ করিবার খবর গ্রামে আসিল কীর্তিনারায়ণ গ্রামের মধ্য-ইংরাজি ইস্কুল ঘর আগুন দিয়া পোড়াইয়া দিল। সকলে সভয়ে শুধাইল কর্তা এ কি রকম হ'ল? কীর্তি হাসিয়া উত্তর দিল—চৌধুরী বংশের প্রথম ছেলে এম-এ পাশ করলো—তাই আনন্দে আতসবাজি পোড়ালাম! ক্ষতি কি? তারপরে সেই ছাই সংগ্রহ করিয়া সাড়ম্বরে সর্বাঙ্গে মাখিল—সকলকে ডাকিয়া বলিল—দেখো নবীনের এম-এ পাশের আনন্দে আমি জ্ঞানের দিগম্বর সাজিয়াছি। এরপরেও যদি লোকে বলে আমি নবীনকে ভালবাসি না—তবে শালাদের—

ইস্কুল পুড়িয়া যাইবার সংবাদ পাইয়া নবীননারায়ণ পাকা দালান তুলিয়া দিলেন। কীর্তি বলিল—দেখো, কাজটা করেছিলাম বলেই তো পাকা কোঠবাড়ি পেলে!

অশথ গাছ কাটিবার বিবরণ সে যথাসময়ে শুনিয়াছিল এবং সত্য কথা বলিতে কি সে মনে মনে খুশিই হইয়াছিল। গাঁয়ের লোকে নবীননারায়ণকে ভালবাসে এবারে সেই ভালবাসায় টোল খাইবে ইহাতে সে অত্যন্ত খুশি হইয়াছিল—তাহা ছাড়া আরও একটা হিসাব তাহার মনে ছিল। পাছে গাছ কাটায় কোন বাধা জন্মায় তাই সে কোনরূপে উৎসাহ প্রকাশ না করিয়া বলিল—শশাঙ্ক আমি কি করবো বলো। সেও গাঁয়ের জমিদার, তার উপরে এম-এ পাশ।

শশাঙ্ক বলিল—আপনিই বা কি কম? আর এতে যে গাঁয়ের অমঙ্গল হবে—কারণ শ্রীভগবান স্বয়ং বলেছেন 'বৃক্ষাণাং অশ্বত্থোহহং'—

কীর্তি বলিল—আরে এম-এ পাশ যে করেছে স্বয়ং ভগবানের সঙ্গে তার মোকাবিলা হ'য়ে গিয়েছে—তাকে গিয়ে বোঝাও না কেন?

শশাঙ্ক ছাড়িবার পাত্র নয়। সে বলিল—আজ্ঞে এম-এ তো ম্লেচ্ছের বিদ্যা—

কীর্তি তাহাকে বাধা দিয়া বলিল—রাজত্বই তো ম্লেচ্ছের! ওরে জোরে টান্।

পাঙ্খাবর্দার জোরে পাখা টানিতে লাগিল। তারপরেও শশাঙ্ক ও আর সকলে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল—কিন্তু অশথ গাছের প্রসঙ্গ আর উঠিল না। সকলে একে একে উঠিয়া যাইতে লাগিল—অবশেষে শশাঙ্ক একটা প্রণাম করিয়া উঠিয়া গেল। সকলে চলিয়া গেলে

কীর্তিনারায়ণ খুব এক চোট হাসিয়া লইল। সেই হাসির শব্দে বৈঠকখানার বাগানের গাছে বসা গোটা দুই চড়াই পাখী ভয়ে উড়িয়া গেল কেবল কার্নিসে বসা পায়রার দল কিছুমাত্র ভীত না হইয়া বক্ বকম বক্ বকিয়া যাইতে লাগিল—

তাহারা কীর্তিনারায়ণের হাসির সঙ্গে পরিচিত।

(১০)

আজ বুড়ো অশথ কাটা শুরু হইবে। অতি প্রত্যুষে গ্রামের নরনারী অশথতলায় গিয়া সমবেত হইল। জনতার অধিকাংশই স্ত্রীলোক, সঙ্গে ছেলের দল আছে, যুবক ও বৃদ্ধের সংখ্যাও অল্প নহে।

মেয়েরা নৈবেদ্য লইয়া গিয়া অশথের পাদমূলে রাখিল। কৌটা হইতে সিঁদুর গাছের গুঁড়িতে মাখাইয়া দিল—সেই উৎসৃষ্ট সিঁদুর সধবাগণ পরস্পরের কপালে ও শাঁখায় মাখিয়া লইল এবং নিজের নিজের সিঁদুর-কৌটায় ভরিয়া রাখিল। অবশেষে পুরুষগণ হরিধ্বনি করিতে করিতে ফিরিয়া চলিল—পিছনে পিছনে চোখে জল ফেলিতে ফেলিতে মেয়েরা তাহাদের অনুসরণ করিল।

রোদ উঠিলে করাতীর দল কোমরে নগদ টাকা বাঁধিয়া এবং মাথায় গামছা জড়াইয়া অশথতলে আসিয়া সমবেত হইল। তাহারা তিনবার বৃক্ষকে সেলাম করিয়া লইয়া কুড়ুল ধরিল।

ঠক্ ঠক্—ঠকা ঠক্—ঠক্ ঠক্। কুড়ুলের শব্দ। সেই শব্দ দূরে দূরান্তে প্রতিধ্বনি জাগাইয়া দিল ঠক্ ঠক্ ঠকা ঠক্। সমস্ত গ্রামের হৃৎপিণ্ড ওই সর্বনাশের তালে কম্পিত হইতে লাগিল—ঠক্ ঠক্ ঠকাঠক্। অন্তহীন তালে তালে কোন সর্বনাশের হাতুড়ির আওয়াজ ধ্বনিত হইয়াই চলিল—ঠক্ ঠক্ ঠকাঠক্।

... ...

গ্রামে মুমূর্ষার নীরবতা। জনসংখ্যা তেমনি আছে—তবু যেন কেমন নির্জন। পথ লোকবিরল, ঘাটে স্ত্রীলোক নাই, মাঠে কৃষক নাই, হাটে ক্রেতা-বিক্রেতা না থাকিবার মধ্যে। যাহার চলা-ফেরা নিতান্ত না করিলে নয় সে ছায়ার মতো সন্তর্পণে যাতায়াত করিতেছে, মেয়েদের স্বাভাবিক মুখরতা কেমন স্তব্ধ, বালকরা খেলা ছাড়িয়াছে এমন কি শিশুও যেন আজ কিসের আশঙ্কায় উদ্যত কান্নাকে চাপিয়া রাখিয়াছে। সমগ্র গ্রামে আজ একটিমাত্র শব্দ—ঠক্ ঠক্ ঠকাঠক্... সর্বনাশের ঘোড়সোয়ারের অশ্ব-ক্ষুরের ধ্বনি।

অবশেষে তৃতীয় দিন সন্ধ্যার সময়ে মর্ম-ভেদী অন্তিম রব করিয়া জোড়াদীঘির বৃদ্ধ অশথ ভূপাতিত হইল। বৃদ্ধেরা হরিধ্বনি করিয়া উঠিল—স্ত্রীলোকেরা অশ্রুধারা অবারিত করিয়া দিল—বালকের দল ঘটনার সম্যক মর্ম উপলব্ধি করিতে না পারিয়া অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—আর বৃদ্ধ অশথ বৃক্ষ পিতামহ ভীষ্মের মতো জীবন-সংগ্রামের অবসানে স্বেচ্ছামৃত্যুর শরশয্যায় শয়ান হইয়া নিস্পন্দ হইয়া রহিল।

সন্ধ্যাবেলা কাকের দল গ্রামান্তর হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল তাহাদের চিরদিনের আশ্রয় আজ নাই। তাহারা ঝাঁক বাঁধিয়া কা কা রবে চীৎকার করিতে লাগিল। একখানি নিরেট কালো মেঘের মতো তাহারা কিছুক্ষণ আকাশে বৃত্তাকারে ভাসিয়া বেড়াইল তারপরে বৃত্তকে দীর্ঘতর করিয়া চক্রাকারে উড়িতে উড়িতে নূতন বাসার সন্ধানে প্রস্থান করিল।

তারায় ভরা রাত্রি আসিল—ভীষ্মের শর-শয্যার সাক্ষী তারার দল অশ্বত্থের শেষ শয্যার শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইল।

ভোর রাত্রে আহার সন্ধানী বাদুড়ের দল ফিরিয়া দেখিল অশথ নাই। তাহারা আতঙ্কে কর্কশ চীৎকার করিয়া উঠিল—তাহাদের মুখ হইতে নখরক্ষত বাদাম খসিয়া পড়িল। অবশেষে তাহারাও নূতন আশ্রয়ের সন্ধানে কোথায় উড়িয়া চলিয়া গেল।

ভোর বেলা জোড়াদীঘির লোকেরা চাহিয়া দেখিল যেখানে অশথ ছিল সেখানে এক বিরাট শূন্যতা, সেখানে এক নূতন আকাশ।

শোকের অপরিহার্যতার অবসানের জনাই হোক আর কৌতূহলের জনাই হোক ভূপাতিত অশথের চারিদিকে জনতা জুটিয়া গেল। বালকেরা গাছের ডালে উঠিয়া তালে তালে নাচিতে লাগিল—আরও ছোটর দল একটা, দুটো, আরও একটা বলিয়া বাদাম কুড়াইয়া কাড়াকাড়ি করিতে লাগিল। পাখীর বাসা ভাঙিয়া পড়িয়া অনেকগুলি পক্ষীশাবক মাটিতে পড়িয়া গিয়া-ছিল—সারা রাত্রি শিয়ালের দল সেগুলিকে কাড়াকাড়ি করিয়া খাইয়াছে। একজন একটা শাবককে সযত্নে তুলিয়া লইল—কেহ বলিল—মরিয়াছে, কেহ বলিল—না, না এখনো যেন আছে—তখন দুইজনে মিলিয়া তাহাকে বাঁচানো যায় কিনা সেই চেষ্টা করিতে লাগিল।

রহিম খোঁড়া একটা ডালের কোটরের দিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠিল—ওঃ বাবা ওই সেই গর্ত! মনে পড়লে এখনো ভয় করে। সকলে জিজ্ঞাসু হইয়া বলিল—ব্যাপার কি? রহিম বলিল—মনে নেই? পা-টা তো গেল ওই জন্যেই। কয়েক বছর আগের কথা, আমি আর বাদল—এইখানে ব্যাখ্যা করিয়া বলে, সে এখন পাটের হাকিম, তখন আমরা দুইজনে এক ক্লাসে পড়ি, দুইজনে শালিখের বাচ্ছা পাড়বার জন্যে উঠেছি গাছে। ওই গর্তটায় ছিল শালিখের বাসা! যেই না ওই ডালটার কাছে গিয়েছি—ওঃ বাবা! এখনো গা-শিউরে ওঠে সে কী কালো। যমরাজার মহিষটাও বুঝি অত কালো নয়—এক মস্ত সাপ! আমি বললাম বাদল, বাদল বললে—রহিম! দে লাফ, দে লাফ—দুইজনে দুই লাফ! মাটিতে পড়ে সেই যে আমার পা মচ্কালো—আর সারলো না। —এই বলিয়া সে একটা লাঠি দিয়া গর্তটার মধ্যে খোঁচা দেয়। নাঃ আর সাপ বাহির হয় না। সে ভাবে এখন যদি একবার বাহির হয় তবে দেখিয়া লই। তারপরে ভাবে এখন বাহির হইবে কেন? এখন যে আমি প্রস্তুত। কপাল খারাপ না হইলে আর এমনটি হয়!

বুড়োরা ছেলেদের বলে—যা, যা, এখান থেকে সব যা। ছেলেরা যাইতে চাহে না। তাহাদের ইচ্ছা বুড়োরা একটু সরিলেই ডাংগুলি খেলিবার জন্যে কয়েকটা ডাণ্ডা কাটিয়া লইবে—চমৎকার ডাণ্ডা হইবে যেমন মজবুত, তেমনি সরল।

জনতা ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসে—সবাই চলিয়া যায় কেবল কয়েকটি বালক মাত্র অবশিষ্ট থাকে। অশান্ত বাতাসে মুমূর্ষু গাছের পল্লব-গুলি শির শির করিয়া কি যেন বলিতে থাকে, তাহাতে করুণা আছে ক্রোধ নাই, বিষাদ আছে, দুঃখ নাই; জোড়াদীঘির জন্য দুশ্চিন্তা আছে নিজের জন্য উদ্বেগ নাই। শরশয্যাগ্রস্ত ভীষ্মেরও কি ঠিক এইরূপ মনোভাব ছিল না? হেমন্তের আকাশ সোনার রোদের স্বর্ণভৃঙ্গার ভরিয়া পিপাসার বারি আনিয়া উপস্থিত করে। অশথ সে দিকে ফিরিয়াও তাকায় না। বেদনার শরাভিন্ন প্রেমের অমৃতময় পানীয়ের জন্য তাহার অন্তিম প্রতীক্ষা।

(১১)

সকাল বেলায় নবীননারায়ণ একাকী বসিয়া একখানি বই পড়িতেছিল, এমন সময়ে তাহার নায়েব যোগেশ হাঁফাইতে হাঁফাইতে প্রবেশ করিল। নবীন অল্প কয়েকদিনেই বুঝিয়া লইয়াছে যে, যোগেশ অতি সামান্য কারণেই চঞ্চল হইয়া পড়ে। নবীন শুধাইল—যোগেশ ব্যাপার কি? কিন্তু যোগেশের মুখে কথা সরে না, কেবলি হাঁফায়, আর চুলের মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিয়া সেগুলিকে আরও অবিন্যস্ত করিয়া তোলে। তখন নবীন আবার বলিল—বাড়িতে কোন গোলমাল হয়েছে কি? নবীন ইতিমধ্যেই জানিয়াছে যে, যোগেশ এ সংসারে তাহার স্ত্রীকেই সবচেয়ে বেশী ভয় করে। তবু যোগেশ কথা বলে না। তখন অনেক কষ্টে তাহার নিকট হইতে যে সংবাদ সংগ্রহ করিল তাহাতে বুঝিতে পারিল যে দশানির কীর্তি-বাবু মজুর ও লাঠিয়াল লইয়া আসিয়া অশথ তলার জায়গাটা দ্রুত ঘিরিয়া লইতেছে। যোগেশ আসিবার সময়ে স্বয়ং স্বচক্ষে তাহা দেখিয়া আসিয়াছে।

খবরটা শুনিয়া নবীন বই রাখিয়া উঠিয়া বসিল, যোগেশকে বলিল—তুমি যাও, আর শোনো, একবার মিলন সর্দারকে পাঠিয়ে দাও।

যোগেশ সরিয়া পড়িল, এবং দু'চার মিনিটের মধ্যেই মিলন সর্দার আসিয়া দণ্ডায়মান হইল।

নবীন বলিল—মিলন, দশানির বড়বাবু অশথতলা ঘিরে নিচ্ছেন। জমিটা তবে কি বেহাত হয়েই যাবে?

মিলন শুধু বলিল—আচ্ছা, ছোটবাবু। তারপরে যেমন ছায়ার মতো আসিয়াছিল, তেমনি ছায়ার মতো সরিয়া গেল। নবীননারায়ণ আবার পুস্তকে মনঃসংযোগ করিল।

কীর্তি নারায়ণের কতকটা পরিচয় আমরা পূর্বে দিয়াছি। লোকটার দৌরাত্ম্যে গ্রামের লোক অস্থির। তাহার প্রতাপে বাঘে গরুতে এক-ঘাটে জল খায় কিনা বলিতে পারি না, তবে ঋণী ও মহাজন যে এক ঘাটে স্নান করে তাহা নিত্য দেখিতে পাওয়া যায়। সে যতক্ষণ জাগিয়া থাকে গ্রামের লোকের বুক ঢীপ ঢীপ করে, কেবল যখন তার ঘুমের মধ্যে তালে তালে তাহার নাসিকা গর্জন নিদ্রার দেয়ালে চাঁদমারিগুলি ছুঁড়িতে থাকে, গ্রামের লোক একটু স্বস্তি অনুভব করে। সে গর্জন এমন বিকট যে তাহার পাঙ্খাবর্দারের ধারে কাছেও তন্দ্রা আসিতে সাহস পায় না, সে জাগিয়া বসিয়া পাখা টানিতে বাধ্য হয়।

নবীন নারায়ণ অশথ গাছ কাটিবে জানিতে পারিয়া কীর্তি নারায়ণ মনে মনে খুব খুশী হইয়াছিল। ওই জমিটার উপরে অনেকদিন হইতেই তাহার লোভ। কিন্তু গাছটা থাকিতে জমিটা দখল করা যায় না। লোকটা মোটেই ধর্মভীরু নয়—তবে সংস্কার বলিয়া একটা ভয় তাহার ছিল। কিন্তু আর কেহ যদি গাছটা কাটিয়া ফেলিয়া সংস্কারের মূলোচ্ছেদ করে তবে জমিটা দখল করিতে আর বাধা কি? সে মনে মনে খুব হাসিয়াছিল। সে ভাবিল যে, নবীন করিবে পাপ, আমি লইব জমি—চমৎকার 'ডিবিশন অব লেবার'। সেইজন্যই গাছ কাটিতে কোনরূপ সে আপত্তি করে নাই, গ্রামের লোক যখন তাহার কাছে আসিয়াছিল কোনরূপ উৎসাহ সে প্রকাশ করে নাই—বরঞ্চ ভাবিয়াছিল এইবারে গ্রামের লোকে বুঝুক আমাদের মধ্যে অধিকতর চতুর কে?

যেদিন রাত্রে অশথ গাছ পড়িল কীর্তি তাহার লাঠিয়াল সর্দার আবেদ আলিকে বৈঠকখানায় ডাকিয়া আনিল—শুধাইল, আবেদ, তোর দলবল সব আছে?

আবেদ বলিল—হুজুর সবাই হাজির। এইতো আজ সকালে ধুপোলের হাট লুটে এলাম। ধনঞ্জয়, রামভজ, ইদ্রিস, তেওয়ারি সবাই কাছারীতে হাজির।

কীর্তিনারায়ণ শুধাইল—কতজন হবে?

আবেদ মনে মনে সংখ্যা গণনা করিয়া বলিল—তা হুজুর জন দশেক তো বটে।

তখন কীর্তি নারায়ণ গলা খাটো করিয়া বলিল—দেখ, কাল সকালে, খুব সকালে, পূর্ব-দিক ফরসা হ'বার আগে গিয়ে অশথ তলা ঘিরে নিতে হবে। বেড়া বাঁধবার জন্যে মজুর আমি ঠিক করে রেখেছি। তোরা তৈরী থাকিস্।

তারপরে একটু উচ্চস্বরে বলিল—পারবি তো? ওদিকে কিন্তু মিলন সর্দার আছে।

কীর্তি জানিত আবেদের কোমল স্থান কোথায়—তাই সে মিলন সর্দারের উল্লেখ করিল। তারপরে বলিল—ভয় নেই বন্দুক নিয়ে আমি কাছেই থাক্‌বো।

সেই প্রায়ান্ধকার কক্ষেও আবেদের চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল, সে বলিল—হুজুর আবার কেন? আমরাই কি পারি না?

কীর্তি বলিল—পারিস বই কি—তবু কাছে একটা বন্দুক থাকা ভালো। আর মিলন সর্দারকে জানিস তো!

আবেদের মনিব যে তাহার চেয়ে মিলন সর্দারকে বড় লাঠিয়াল মনে করে ইহা আবেদ আর সহ্য করিতে পারিল না। সে যাইবার জন্য উঠিয়া পড়িল। কীর্তি আর একবার স্মরণ করাইয়া দিল—ফিঙে ডাকবার আগেই উঠতে হবে, মনে থাকে যেন।

আবেদ একটা সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল।

সেরাত্রে আবেদের ঘুম আসিল না। শয্যায় জাগিয়া কেবল সে এপাশ ওপাশ করিতে লাগিল কখন প্রথম ফিঙা ডাকিবে, কখন ভোরের বাতাস বহিবে, কখন পূব আকাশ ধূসর হইয়া উঠিবে। তাহার মনিব অবধি মিলনকে তাহার চেয়ে বড় ওস্তাদ মনে করে—তবে গ্রামের লোকের আর দোষ কি! একে একে তাহার দীর্ঘ লাঠিয়াল জীবনের ইতিহাস মনে পড়িতে লাগিল।

আবেদ আলী লোকটি বেঁটে, মাংসপেশী গঠিত দৃঢ় শরীর; মাথার সম্মুখে তাহার টাক পড়িয়াছে। বহুকাল হইতে সে কীর্তিবাবুর অধীনে লাঠিয়ালের কাজ করিতেছে—এখন সে দলের সর্দার। তাহাকে কীর্তিবাবুর সমস্ত অপকীর্তির দক্ষিণ হস্ত বলা চলে—কিম্বা দক্ষিণ হস্তের যষ্ঠি বলিলেই যথার্থ হয়।

লোকটা পাকা লাঠিয়াল বটে, কিন্তু ছ'আনির মিলন সর্দারের কাছে নাবালক—বয়সে এবং লাঠি-বাজিতে। তাহার বহুদিনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা মিলন সর্দারকে লাঠি খেলায় পরাজিত করিবে। মাঝে মাঝে সে সুযোগ জুটিয়াছে—কিন্তু প্রত্যেকবারই সে পরাজিত হইয়াছে—আবার প্রত্যেক পরাজয়ের সঙ্গে তাহার রোখ যেন দশ গুণ বাড়িয়া গিয়াছে।

মিলন সর্দার নবীন নারায়ণের পিতার আমল হইতে ছ' আনির বাড়ীতে সর্দারী করিতেছে। তখন তাহার বয়সও এখনকার চেয়ে অল্প ছিল—আবার লাঠি-বাজির সুযোগও ছিল বেশী। নবীননারায়ণের আমলে লাঠিবাজির সুযোগ বড় আসে না, একে তো সে সহরে থাকে, তার উপরে লাঠিবাজি তাহার পছন্দ নয়। মিলন এখন বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু গাঁয়ের লোকে জানে মিলন সর্দার কত বড় লাঠিয়াল। আগেকার আমলে যেদিন সে দলবল লইয়া গ্রাম শাসন করিতে বাহির হইত, তাহাদের ডাক শুনিয়া লোকের হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া যাইত। গভীর রাত্রে সেই ডাকের শব্দে ঘুম ভাঙিয়া লোকে বলাবলি করিত—সর্দার দল লইয়া বাহির হইয়াছে। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে সবাই মিলন সর্দারকে ভয়ের চেয়ে ভালবাসিত বেশী। সে লাঠিয়াল হইলেও স্নেহপরায়ণ সামাজিক জীব ছিল। গ্রামের সকলের সঙ্গেই তাহার আত্মীয়তা ছিল। সন্ধ্যাবেলায় যখন সে মধুর সুরে নাম গান করিত—অসংখ্য শ্রোতা জুটিয়া যাইত আশে-পাশে। আবেদের কাছে এ সমস্তই তাহার বিরুদ্ধে একটা নিগূঢ় ষড়যন্ত্র বলিয়া বোধ হইত।

আবেদের মনে পড়িয়া গেল, একবার সে দলবল লইয়া হাট গোপালগঞ্জ লুটিতে গিয়াছিল—মিলন সর্দার প্রতিপক্ষে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার অনেক দিনের সাধ ছিল সর্দারের সঙ্গে লড়িবে—আজ সেই সুযোগ উপস্থিত হইল। কিন্তু দু'চার মিনিট যাইতেই সর্দারের প্রচণ্ড লাঠি তাহার মাথায় আসিয়া পড়িল। সব কেমন অন্ধকার হইয়া গেল। অনেক ক্ষণ পরে তাহার চৈতন্য হইলে দেখিল সর্দার তাহার মাথা কোলে লইয়া জল দিতেছে—আর চারদিকের জনতার মুখে যেন ব্যঙ্গের হাসি। তখন তাহার মনে হইল তাহার জ্ঞান না ফিরিলেই ছিল ভালো! তাহার মনে হইল পৃথিবী কেন দ্বিধা হইয়া যায় না। সেদিনের অপমানের শোধ লইবার জন্য আর একদিন সর্দারকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করিয়াছিল—সর্দার কোন কথা না বলিয়া মাথা নাড়িয়া চলিয়া গেল। আবার দর্শকদের মুখে সেই ব্যঙ্গের হাসি।

বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া তাহার মনে হইতে লাগিল আজ তাহার চরম সুযোগ উপস্থিত। কাল দেখা যাইবে কত বড় ওস্তাদ! কাল হয় আবেদ আলি থাকিবে, নয় মিলন সর্দার থাকিবে—দু'জনে একত্র আর কখনো জোড়া-দীঘির মাটিতে পদার্পণ করিবে না। এই সব কথা মনে পড়িয়া তাহার মাথা গরম হইয়া উঠিল, সে আর শুইয়া থাকিতে পারিল না, উঠিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল পূর্বদিক ফরসা হইয়াছে কিনা! না, রাত্রিটা এত অনাবশ্যক

দীর্ঘ কেন? তাহার রাত্রি আর কিছুতেই শেষ হইতে চাহে না। **প্রতীক্ষমানতা অনাবিল বার্ধক্যের ধর্ম। প্রতীক্ষমানতাই জীবনের চরম শিক্ষা, বিধাতা বার্ধক্যের শুভ্র ললাটে প্রতীক্ষা-পরায়ণতার নির্মল কিরীট পরাইয়া দিয়াছেন। যৌবন প্রতীক্ষা করিতে জানে না।**

ছ' আনির নায়েব যোগেশ বাড়ী হইতে জমিদারের কাছারীতে আসিবার সময়ে দেখিতে পাইল অশথতলায় মস্ত ভিড় জমিয়া গিয়াছে। **একদল মজুর খটাখট করিয়া বাঁশ পুঁতিয়া জায়গাটা ঘিরিয়া লইতেছে;** আবেদ আলী **লাঠিয়ালের দল** লইয়া দণ্ডায়মান আর স্বয়ং **কীর্তিবাবু** বন্দুক হাতে উপস্থিত—**ইতস্ততঃ দর্শকের দল।** সে ছুটিয়া আসিয়া খবরটা নবীননারায়ণকে জ্ঞাপন করিল—এ সংবাদ আমরা পাঠককে আগেই দিয়াছি।

(১২)

মিলন সর্দার তাহার ছোট ভাই সোনা এবং উমীর, কালু প্রভৃতি ছয়জন লাঠিয়ালকে লইয়া অশথতলায় আসিয়া **উপস্থিত হইল। তাহাদের গা খালি, মালকোঁচা করিয়া কাপড় পরা, হাতে** লাঠি। তাহারা দেখিল দশানির মজুরেরা ইতিমধ্যেই বেড়া দিয়া অনেকটা ঘিরিয়া ফেলিয়াছে—আর কাছেই আবেদ আলী তাহার লাঠিয়ালের দল লইয়া প্রস্তুত।

মিলন সর্দারের দলটিকে দেখিতে পাইবা-মাত্র আবেদ আলী হাঁকিয়া উঠিল—সর্দার, হুঁসিয়ার। মিলন তাহার কথার উত্তর না দিয়া নিজের দলের প্রতি ইঙ্গিত করিল। তখন তাহাদের ছয়জনের দেহ ছয়টি সরল উন্নত শাল বৃক্ষের মতো বাতাসে দুলিয়া উঠিল, আর সেই সারিবন্ধ ছয়টি শাল বৃক্ষ অগ্রসর হইয়া চলিল—তাহাদের মাথার উপরে লাঠি ঘুরিতেছে। মিলন সর্দারের দলকে অগ্রসর হইতে দেখিয়াই মজুরের **দল খন্তা হাতুড়ি ফেলিয়া পলায়ন করিল—আর** ঠিক সেই সময়েই আবেদ আলি সদলবলে হুঙ্কার ছাড়িয়া রণাঙ্গনে আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল। দুই দলই সমান শিক্ষিত—এখনো তাহাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ দূরত্ব আছে, দুই দলের লাঠি চক্রাকারে মাথার উপরে ঘুরিতেছে। হঠাৎ যেন বাঁশের লাঠি মাথার উপরে বাঁশের ছাতায় পরিণত—বাঁশের ছাতা ক্রমে লাঠির ছায়াবাজিতে পরিণত। ভালো করিয়া দেখিবার উপায় নাই। কিন্তু দুই দল ঘেঁসিয়া আসিতেই লাঠির ঠকাঠক জানাইয়া দিল যে লাঠিগুলি পাকা বাঁশে তৈয়ারি। সমবেত দর্শকের জনতা অদূরে দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতে লাগিল। তাহারা লাঠিয়ালদের আপেক্ষিক গুণ ও কৃতিত্ব বর্ণনা করিতে লাগিল—কখনো বা বাহবা, কখনো বা সাবাস দিতে লাগিল—কখনো বা হায় হায় করিয়া উঠিল।

"ও কার লাঠি গেল?

"তেওয়ারির"

"ঠিক হ'য়েছে, বেটা রাজপুত কি না"

বাহবা, সোনা, বাহবা—"

"হবে না কেন? সর্দারের ভাই তো বটে।"

"দেখো দেখো—আবেদের আস্পর্ধা দেখো—ও যাচ্ছে মিলন সর্দারকে আক্রমণ করতে।"

"ইস্, ওই দেখো ভাই, কালু মাথায় চোট পেয়েছে, একেবারে ব'সে পড়লো।"

"ও কে পড়লো—ইদ্রিস না?"

"তোর কেন বাপু হাল ছেড়ে লাঠি ধরা!"

"ওই দেখো—আবেদ আর সর্দারে লেগে গিয়েছে"

ঠকাঠক্ ঠক ঠক

"বাঃ বাঃ"

"আবেদও কম যায় না"

"কিন্তু তাই বলে কি সর্দারের সঙ্গে......"

এমন সময় জনতা হায় হায় করিয়া উঠিল—

"মরলো, মরলো, আবেদ এবার মরলো"

সত্যই তাহার হাতের লাঠি ছুটিয়া পড়িয়া গিয়াছিল আর মিলন সর্দারের ভীম লাঠি তাহার মাথার উপরে উদ্যত। আর এক মুহূর্ত......

"গেলো, গেলো, আবেদ গেলো"

ঠিক সেই মুহূর্তে বন্দুকের শব্দ হইল, পর মুহূর্তেই মিলন সর্দারের গুলীবিদ্ধ দেহ মাটিতে পড়িল। ধোঁয়া মিলাইবা মাত্র সকলে দেখিল মিলনের দেহ মাটিতে পতিত, রক্তে জায়গাটা ভাসিয়া যাইতেছে, সে গতপ্রাণ।

আবেদ চীৎকার করিয়া উঠিল—"কর্তা—**এ কি করলে, এ কি করলে! আমার দুশমনকে** তুমি মারতে গেলে কেন? আমি কি ছিলাম না? এখন আমি কি ক'রে মুখ দেখাবো?"

কিন্তু তাহার কথা শেষ হইতে পাইল না মিলনের ভাই অতর্কিতে তাহার মাথায় আসিয়া বজ্রের বেগে লাঠির আঘাত করিল। আবেদ মাটিতে পড়িল। তাহার দেহটা বার দুই নড়িয়া উঠিল, পা দুখানি বার দুই সঙ্কুচিত বিস্ফারিত হইল—তার পরে সব নিস্তব্ধ।

এক মুহূর্তের মধ্যে জোড়া খুন! কেহই ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল না। দর্শক ও লাঠিয়ালের দল পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া প্রস্থান করিল। যাহারা হাজার জীবিতকে ভয় করে নাই—দুইটি মৃত্যুকে তাহাদের এত ভয়। মৃতকে মানুষের এত ভয় কিসের?

সবশেষে নিরুপায় কীর্তিনারায়ণ ফিরিয়া চলিল। মৃত্যুর জন্য তাহার আক্ষেপ নয়। আবেদ যে জমির দখল না দিয়া মরিল সেইজন্য তাহার উপরে কীর্তির একটা অন্ধ আক্রোশ হইতে লাগিল। সে ভাবিতে লাগিল বেটা কথা দিয়া শেষে এমনভাবে আমাকে ফাঁকি দিয়া গেল। একবার পাইলে তাহাকে দেখাইতাম। কিন্তু তাহাকে পাইবার উপায় কই? হায়, হায় সংসারে তাহা হইলে এমন স্থানও আছে যেখানে কীর্তিবাবুর শাসন চলে না। হঠাৎ কীর্তিনারায়ণ যেন অপ্রত্যাশিতভাবে বুঝিতে পারিল সংসারে সে সর্বশক্তিমান নয়।

সেই কর্তিত অশথ বৃক্ষের মূলে দুইটি সদ্য নিহত মৃতদেহ পাশাপাশি পড়িয়া রহিল। আবেদের কপাল হইতে রক্ত গড়াইয়া আসিয়া তাহার ঈষন্মুক্ত অধরোষ্ঠের মধ্যে পড়িল। তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর দীর্ঘকালের সঞ্চিত রক্তের তৃষ্ণা কি আজ তাহার নিজের রক্ত পান করিয়া নিবৃত্ত হইল? দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর দেহ হইতে দুইটি সর্পিল রক্তের ধারা আসিয়া একত্র হইল—তারপরে সেই যুক্তধারা গড়াইয়া গিয়া উন্মূলিত অশথ-শিকড়ের গর্তে প্রবেশ করিল। লাঞ্ছিত অশ্বত্থ গ্রামের রক্ত পান করিল। গ্রামের প্রথম রক্ত। কিন্তু ইহাই শেষ নয়।

প্রথম খণ্ড শেষ

(ক্রমশঃ)

রাক্ষুসে নদী

পার্ল বাক্
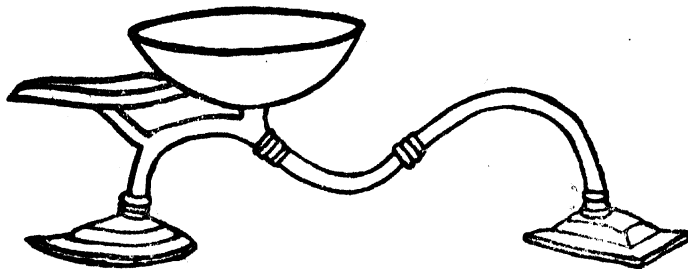
যুদ্ধ যে একটা চলেছে তা অবিশ্যি ওয়াঙ্ বুড়ীর অজানা নয়। সবাই তো জানে—বহুদিন থেকেই জানে—যুদ্ধ চলেছে; মহাযুদ্ধ; জাপানীরা ধ্বংস করছে চীনেদের। তা হ'লেও সত্যি নয় সেটা; শোনা কথা, উড়ো কথা ছাড়া আর কি! কই, ওয়াঙ্দের কেউ তো যুদ্ধে মরেনি আজও। দেড়-কোশ জোড়া ওয়াঙ্ গাঁয়ে—পীত নদীর সমতল পাড় ঘেঁষে যে গাঁ—ওয়াঙ্ বুড়ীর জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর সেই গাঁয়ে আজ অবধি জাপানীদের মুখ দেখেনি কেউ। জাপানীদের সম্বন্ধে আলোচনা উঠেছিল এইভাবেঃ

সন্ধ্যাবেলা। প্রথম গ্রীষ্মের সন্ধ্যা। খাওয়া-দাওয়া সেরে ওয়াঙ্ বুড়ী উঠেছে সিঁড়ি বেয়ে বাঁধের ওপরে। এমন সে রোজই ওঠে। নদীর জল কতটা বেড়ে উঠল দেখা চাই তার। জাপানীদের চেয়েও এই নদীকে তার বেশি ভয়। তার তো আর অজানা নয় নদীর কীর্তি।

এক এক ক'রে সবাই উঠেছে বাঁধের ওপরে; নীচে তাকিয়ে দেখছে সেই খল পীত জলের ধারা; হাজার হাজার সাপ খেলে বেড়াচ্ছে যেন, আর ছুবলে যাচ্ছে উঁচু বাঁধের গায়ে।

ওয়াঙ্ বুড়ী বল্লে, 'এরি মধ্যে গাঙের জল এতটা বেড়ে উঠতে দেখিনি বাপু।' ব'সে পড়ল বুড়ী তার নাতি ক্ষুদে শো'র যে টুলটা এনেছে তারই ওপরে। থু ক'রে থুতু ফেল্লে নদীর বুকে। ক্ষুদে শো'র না ভেবেই ব'লে উঠ্ল, 'জাপানীদের চেয়েও পাজী হচ্ছে এটা,—এই পুরনো শয়তানের আণ্ডিল গাঙটা!

'মুখ্খু কোথাকার!'—ধম্কে উঠল বুড়ী তক্ষুনি—'গাঙের দেবতা শুনতে পাবে যে: আর কিছু কথা নেই তোর?'

তখন জাপানীদের নিয়ে কথা উঠ্ল। ওয়াঙ্ বুড়ীর দূর সম্পর্কের ভাগ্নে—রুটী-ওয়ালা ওয়াঙ্ বললে, 'জাপানীদের দেখলে চিন্‌বো কি ক'রে, সেইটেই হচ্ছে ভাববার কথা!'

ওয়াঙ্ বুড়ী জোর দিয়ে বল্লে, 'চিনতে খুব পারবি;—আমিই তো একবার দেখেছিলুম এক পরদেশীকে। কি লম্বা! আমার ঘরের ছাইচ্ ছাড়িয়ে উঠেছে তার মুণ্ডুটা; মাথার চুল কাদা রঙয়ের; আর চোখ দুটোতে যেন ঠিক মাছের চোখের রঙ; জানিস্?—আরে বোকা, আমাদের মত চেহারা যাদের নয়, তারাই হচ্ছে জাপানী।'

ওয়াঙ্ বুড়ীর কথার কদর সকলের কাছেই; গাঁয়েতে ও-ই হচ্ছে সবচেয়ে পুরনো বুড়ী কি-না। তার কথার ওপরে কথা কইবে কে?

বুড়ীর নাতি আচম্কা ব'লে ব'সল, 'তাদের দেখবে কি করে ঠাক্মা? ওরা লুকিয়ে থাকে আকাশে, হাওয়াই জাহাজে চ'রে।'

বুড়ী তক্ষুনি জবাব দিল না। আগেকার দিন হ'লে সে জোর গলায় ব'লত, 'চোখে না দেখলে হাওয়াই জাহাজ-টাহাজ বিশ্বেস করিনে আমি!' কিন্তু সে বিশ্বাস করেনি এমন কত কিছুই তো ঘটে গেল দুনিয়ায়;—যেমন, মহারাণী—যিনি মরেন নি ব'লে তার বিশ্বাস ছিল, তিনি সত্যি মারা গেছেন; তারপরে এই যে গণতন্ত্র—যা সে আদপে বিশ্বাস করত না। কারণ জানতই না সেটা আসলে কি চিজ্! এখনও বুড়ী জানে না সেটা কি ব্যাপার;—কিন্তু সবাই বল্‌ছে বহুদিন থেকেই নাকি চলেছে গণতন্ত্র! কি জানি!

তাই বুড়ী তার নিঃশব্দ দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল বাঁধের দিকে—যে বাঁধের ওপরে ওরা ঘিরে বসেছে বুড়ীকে। দিব্যি ঠাণ্ডা; আরাম লাগছে। বুড়ী মনে মনে ভাবছে গাঙে যদি বান না ডাকে তা হ'লে আবার ভাববার কি আছে। সোজা ব'লে দিল বুড়ী, 'ওসব জাপানী-টাপানী আমি বিশ্বেস করিনে; যতই বলিস্ তোরা।'

ওরা হাস্‌লে সবাই একটু, কিন্তু বল্‌লে না কেউ কিছু। বুড়ীর পাইপ ধরিয়ে দিলে ওর পেয়ারের নাত-বৌ; বুড়ী তামাক টান্‌তে লাগল। 'একটা গান ধর না ক্ষুদে শো'র', বল'ল একজন। ক্ষুদে শো'র গান ধ'রে দিল, সেকেলে গান, চড়া সুরে, গলা কাঁপিয়ে। শুন্‌তে শুন্‌তে বুড়ী ভুলে গেল জাপানীদের কথা। ভারী চমৎকার সন্ধ্যা। আকাশ স্থির, পরিষ্কার। বাঁধের ওপর দিয়ে যে ঝুঁকে পড়েছে নলখাগড়াগুলো—ঘোলাজলের ওপরেও পড়েছে তাদের ছায়া। কোথাও অশান্তি নেই এতোটুকু।

বছরের পর বছর গরমি কালের সাঁঝ কেটেছে বুড়ীর এই বাঁধের ওপরে। প্রথম যেদিন এসেছিল, সেদিন সে কনে-বৌ; সতেরো বছর বয়স। স্বামী তাকে চেঁচিয়ে হুকুম করেছিল ঘর ছেড়ে চ'লে আসতে এই বাঁধের ওপরে। সে এসেছিল, লজ্জায় মুখ লাল ক'রে হাত কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে; লুকোতে চেয়েছিল মেয়েদের আড়ালে—মিনসেরা—যখন মস্করা শুরু করেছিল তাকে নিয়ে। কিন্তু হাসি-ঠাট্টা করলেও কনে-বৌকে তাদের ভালই লেগেছিল। ওর স্বামীকে তারা বলেছিল, 'বেড়ে রাঙা টুকটুকে বৌ পেয়েছিস তো!'

আহা, বেচারী জোয়ান বয়সেই ডুবে মারা গেল গো। আর বুড়ী কি কম ভুগেছে তাকে বৌদ্ধ নরক থেকে উদ্ধার ক'রত! পুরুতদের দিয়ে কত বছরের চেষ্টায়.........শেষ অবধি তো সে বিরক্তই হ'য়ে উঠেছিল। ছেলেটা কোলে, ওদিকে জমি-জমার কাজ; তার ওপরে যখন পুরুত মশাই খোসামোদের সুরে বলল, 'আর দশটা টাকা খরচ করো বৌ, তা হ'লেই একেবারে পুরোপুরি উদ্ধার হ'য়ে যাবে—'

বুড়ী তখন জিগেস করেছিল, 'এখনও কিসে আটকে আছে, বলোতো ঠাকুর!' ঠাকুর ভরসা দিয়ে বলেছিল, 'আর একখানা পা শুধু বাকি।'

তখন আর ওর ধৈর্য রইলো না। আরও দশটা টাকা! এরা ভেবেছে কি?

সমস্ত শীতটাই খোরাক হয়ে যাবে ওই দশটা টাকায়; তাছাড়া, বাঁধের যে অংশটুকু সারাবার ভার আছে ওর—তা-ও করতে হবে পয়সা দিয়ে মজুর খাটিয়ে। যাতে আর বন্যা না হয়। তাই জোর দিয়েই বললে বৌ, 'আর একটা পা তো মোটে! ও সে নিজেই টেনে তুলতে পারবে'খন।'

তারপরে কিন্তু সে অনেকবারই ভেবেছে—পা-টা সত্যি নরককুণ্ডু থেকে আজও তুলতে পেরেছে কি-না মানুষটা! হয়তো পারেনি। রাত্রিতে আর সে স্বস্তি পেত না ভেবে যে, বেচারা এখনো সেই নরকেই পড়ে আছে—স্ত্রী ওকে উদ্ধার করবে, এই আশায়। মানুষটাও যে ছিল ওই রকমই কিনা! তা নাত-বোয়ের ছেলেটা শুভে-লাভে ভূমিষ্ঠ হলে, হাতে কিছু টাকাকড়ি হলে বরঞ্চ দেখা যাবে বাকি পা টাও টেনে তোলা যায় কিনা; তার জন্যে সাত তাড়াতাড়ি কি এমন.........

'ঠাক্মা, এবার তুমি নেমে ঘরে যাও'—নাত-বৌ বলল নরম গলায়—'কুয়াশা করে আসছে গাঙ্ থেকে, সূর্য্যি অস্ত গেছে কিনা।

'হ্যাঁ, তা যেতে হবে বৈকি'—ব'লল বুড়ী।

নদীর দিকে তাকাল এক নিমেষের তরে। এই যে পুরনো নদী—ভালোও ক'রছে, মন্দও ক'রছে। সেচের জল ও-ই তো দেয় যখন ওকে বেঁধে বাঁকিয়ে নেয়া যায়। আবার ওকে এক ইঞ্চি আস্কারা দিয়েছ কি—ড্র্যাগনের মত ফুঁসে তেড়ে কুঁড়ে আসবে! ওই ক'রেই তো ধুইয়ে নিয়ে গেল মানুষটাকে; তার বাঁধের অংশটুকু সামাল দিতে পারেনি ব'লেই তো।

সারাক্ষণই মানুষটা বাঁধের পেছনে লেগে থাকত; মাটির ওপর মাটি চাপিয়ে যেত। তারপরে এক রাত্রিতে হঠাৎ ফুলে ফেঁপে উঠল নদী; বাঁধ ভেঙে ছুটল রাক্ষসের মত। মানুষটা পালিয়ে গেল ছুটে; আর ও চড়েছিল বাচ্চাটাকে নিয়ে ঘরের চালের ওপরে; তাইতে ও বেঁচে গেল কিন্তু মানুষটা মারা গেল ডুবে। তারপরে গাঁয়ের সবাই মিলে রাক্ষুসে নদীটাকে ফের ঠেলেঠুলে দিলে বাঁকের পেছনে। সেই থেকে নদী আর বাঁধ ভাঙতে পারেনি এত কাল। প্রতিদিন বুড়ী বাঁধটার আগাগোড়া ঘুরে আসত তদারক ক'রে। যদিও বাঁধ রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল সমস্ত গাঁয়ের।

একথা কখনো কারুর মনে হয়নি যে গাঁ-টাকেই সরিয়ে দেয়া যাক দূরে। ওয়াঙদের জাত-গোষ্ঠী পুরুষানুক্রমে বাস ক'রে আসছে এই গাঁয়ে। বন্যার হাত থেকে বরাবরই কিছু কিছু লোক বেঁচে যেত, তারপরেই এসে তারা আরও তোড়জোড় ক'রে লেগে যেত গাঙের সঙ্গে লড়াইতে.......

অবশেষে বুড়ি নিজের বিছানায় নাতবৌয়ের নিজের হাতে খাটানো নীল-রঙা মশারির নীচে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল নিশ্চিন্ত আরামে। যে সময়টুকু জেগেছিল বুড়ি ভাবছিল জাপানী-দের কথা। বুঝে উঠতেই পারছিল না কেন জাপানীরা লড়াই করতে চায় : কেন? অতি পাজি বদমায়েস লোকেরাই না চায় হানাহানি! —যদি এসেই পড়ে জাপানীরা কোনদিন, তাহলে ওদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে, চা-টা খাইয়ে—বেশ করে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দিতে হবে। তবে—কথা হচ্ছে, তারা আসবেই বা কেন ঠাণ্ডা মেজাজের চাষী-দের এই অজ পাড়াগাঁয়ে। ......

তাইতেই বুড়ি একেবারে হকচকিয়ে গেল নাত-বোয়ের চীৎকার শুনে—'এসেছে! এসে পড়েছে জাপানীরা!' বুড়ী উঠে বসে আপন মনেই বলল, 'চায়ের বাটীগুলো আনতো—চা—'

'কী বলছ ঠাকুমা! সময় আছে নাকি চা খাবার ?, ওরা যে এসে পড়েছে ! আমাদের গাঁয়ে এসে পড়েছে !'

ওয়াঙ্ বুড়ীর আর তখন ঘুম নেই চোখে; বলল, 'কোথায় রে? কোনখানে ?' নাত-বৌ ধরা গলায় বলল, 'মাথার ওপরে! আকাশে !'

এ-কথার পরে বাইরে বেরিয়ে পড়ল সবাই। সবে ভোর হয়েছে তখন। ওপর দিকে তাকিয়ে আছে সব; আকাশে দেখা যাচ্ছে মস্ত মস্ত পাখির মত এক একটা কি যেন—শরৎকালে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে-যাওয়া বুনো হাঁসের মত।

বুড়ী বলল, 'দেখছি তো, কিন্তু কী ওগুলো বল্ দেখিনি?'

পরক্ষণেই রুপোলী ডিমের মত কি যেন একটা শাঁ করে নেমে এল : পড়ল গিয়ে গাঁয়ের সীমানায়, কিছু দূরে একটা মাঠের মধ্যে। ছিটকে উঠলো একরাশ ধুলো মাটি। সবাই ছুটল দেখতে। একটা ডোবার মত গর্ত হয়ে গেছে সেখানটায়—তিরিশ ফিট চওড়া গর্ত। এমন অবাক হয়ে গেছে সব যে, মুখে আর কারও রা নেই। কেউ কিছু বলার আগেই আর একটা ডিম পড়ল। তারপরে আর একটা—পড়েই চলল। আর লোকগুলো সব ছুট! ছুট দে ছুট......

সকলেই ছুটল ওয়াঙ্ বুড়ী ছাড়া। নাত-বৌ যখন এসে হাতটা চেপে ধরল তার টেনে নিয়ে যাবার জন্যে, বুড়ী হাতটা ছাড়িয়ে নিল। বাঁধের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে বলল, 'আমি ছুটতে পারবো না নাত-বৌ। সত্তর বছর আগে পা দুটো যখন আমার বেঁধে দিয়েছিল, তারপরে আর ছুটিনি আমি কোন-দিন। তুই চলে যা, ক্ষুদে শোরটা গেল কোথা?'

নাত-বৌ চেয়ে দেখল এদিক-ওদিক। পালিয়েছে আগেই ক্ষুদে শো'র। বুড়ী বলল, 'ছোঁড়া হয়েছে অবিকল ওর দাদুর মত। সে-ও সকলের আগে পালাতো কি না!'

কিন্তু নাত-বৌ পালাবে না কিছুতেই, মানে—যতক্ষণ না বুড়ী বলছে যে, ওর এখন পালানোই কর্তব্য। 'ক্ষুদে শো'র' যদি মারা পড়ে, তাহলে তার ছেলেটা যাতে বেঁচে থাকে, তা-ই দেখতে হবে তো! বুড়ী বলল। কিন্তু তখনও যখন ইতস্তত করছে মেয়েটি, বুড়ী পাইপটা দিয়ে তাকে মৃদু তাড়না করে বলল, 'তুই যা; পালা শীগ্গির!'

মাত্র কয়েক মিনিট কেটেছে। কিন্তু এরি মধ্যে ধ্বংস হয়ে গেছে গ্রামখানা। খড়ের চাল আর কাঠের বড়গা-কড়ি জ্বলছে দাউ-দাউ করে। সব পালিয়েছে। যেতে যেতে তারা ডাক দিয়ে গেছে বুড়ীকে চীৎকার করে; কিন্তু বুড়ী হাসিমুখে তাদের ফিরিয়েছে—'যাচ্ছি রে বাপু, যাচ্ছি—'

যায়নি কিন্তু বুড়ী। একাই বসে আছে চুপটি করে; দেখছে যে দৃশ্য জীবনে দেখেনি কোনদিন। কারণ, কিছুক্ষণের মধ্যে আরও কতকগুলি বিমান এসে হাজির; কোত্থেকে এল কিচ্ছু জানে না বুড়ী। তারা এসে পয়লা বহরের সঙ্গে লড়াই লাগিয়ে দিলে। তখন পাকা গমের মাঠে সূর্যের আলো এসে পড়েছে। পরিচ্ছন্ন গ্রীষ্মের আকাশে হাওয়াই জাহাজ-গুলো ঘুরতে লাগল চক্কর দিয়ে—একটা আর একটাকে ছোঁ মেরে থুতু ছিটিয়ে।

লড়াই শেষ হলে বুড়ী ভাবল—ঘুরে আসা যাক গাঁটা একবার; কোথাও যদি কিছু বেঁচে গিয়ে থাকে। এখানে-ওখানে একেকটা দেয়াল হুমড়ি-খাওয়া চালাটাকে ঠেকিয়ে রেখেছে কোন রকমে। ওর নিজের বাড়ি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না এখান থেকে।

বুড়ী যে লড়াই দেখেনি কোনদিন, এমন তো নয়। ডাকাতরা একবার ওদের গাঁ লুটে গিয়ে-ছিল; সেবারেও বাড়িঘর পুড়ে গিয়েছিল সব। এবারেও তাই হল। কিন্তু আগুনে পুড়ে যাওয়া আর দেখেনি কে! এরকম চকমকে রুপোলী হাওয়াই লড়াই কিন্তু কেউ দেখেনি জন্মে কখনো! বুড়ীর তো মাথায় আসে না জিনিসটা কি—কেমন করেই বা চলে হাওয়ায় ভর করে। পেটে ক্ষিদে নিয়ে চুপ করে বসে বসে দেখছে বুড়ী।

'কাছে থেকে দেখতে পেলে হত একটাকে' —হেঁকেই বলল বুড়ী। আর ঠিক সেই মুহূর্তে বুড়ীর আশা পূরণের জন্যেই যেন একখানা হাওয়াই জাহাজ হঠাৎ করে নীচের দিকে নেমে আসতে লাগল—চক্কর দিতে দিতে টলমল করতে করতে—চোট্-খাওয়া মানুষের মত; সয়াবীনের জন্যে তার নাতি যে জমিটা চষে রেখেছে, তারই ওপর পড়ল মুখ থুবড়ে। চোখের পলকে আকাশ একেবারে ফাঁকা; নীচে শুধু বুড়ী, আর ওই হাত-পা ভাঙা জন্তুটা।

সাবধানে উঠে দাঁড়াল বুড়ী। তার বয়সে ভয় করবার মত নেই কিছু দুনিয়ায়। ভেবে দেখল, অনায়াসেই গিয়ে দেখে আসা যায় জন্তুটা কি। বাঁশের পাইপটার ওপরে ভর দিয়ে বুড়ী ধীরে-সুস্থে মাঠ পেরিয়ে চলল। তার পেছনে হঠাৎ নিস্তব্ধতার মধ্যে দু-তিনটে গেঁয়ো কুকুর এসে হাজির। বুড়ীর পেছনে পেছনে হুঁশিয়ার হয়ে চলেছে তারা প্রাণের ভয়ে। ভাঙা হাওয়াই জাহাজটার কাছাকাছি গিয়ে কুকুরগুলো ভীষণ ঘেউ ঘেউ শুরু করল। পাইপটা দিয়ে বুড়ী পিটল কুকুর-ক'টাকে; ধমকে বলল, 'চুপ কর না হতচ্ছাড়ারা! কানে তালা লাগার মত আওয়াজ কি আগে শুনিনি!'

বিমানটা বারকয়েক ঠুকে দেখল বুড়ী। কুকুরগুলোকে বলল, 'ধাতু! (দেখেছিস কাণ্ড! রুপো না হয়ে যায় না!' গালিয়ে নিলে বড়োলোক হয়ে যাবে ওরা সব।

ঘুরে এল বুড়ী বিমানটার চার ধারে খুঁটিয়ে দেখে। কিসের জোরে ওড়ে ওটা? মরে গেছে যেন। কোন কিছু তো নড়ছে না, আওয়াজও দিচ্ছে না। তারপরে যে পাশটা কাত হয়ে আছে যন্তরটা, সে পাশটাতে এসে

বুড়ী দেখে একটা ছোট আসনের গায়ে নেতিয়ে পড়ে আছে একটা ছোকরা। কুকুরগুলো ফের তেড়ে গেল , কিন্তু বুড়ী ওদের মেরে হটিয়ে দিল। তারপর ভদ্রভাবেই জিগ্যেস করল বুড়ী, 'বেঁচে আছ তো বাবু?' —তার গলার সাড়া পেয়ে ছোকরা একটু নড়ে চড়ে উঠল, কিন্তু কথা বলল না কিছু। আরও কাছে এগিয়ে গেল বুড়ী; উঁকি মেরে দেখলে যে গর্তটায় বসে আছে ছোকরা, তার একপাশটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। 'হু, ভারী চোট লেগেছে দেখছি'-- ওর কব্জিটা হাতে টেনে নিল বুড়ী। গরম রয়েছে বটে, কিন্তু অসাড়; ছেড়ে দিতে ধুপ করে পড়ে গেল হাতটা। বুড়ী তাকিয়ে রইলো ছেলেটার দিকে। ছোকরার কালো চুল; চীনেদের মতই ময়লা রঙ; কিন্তু তবু চীনেদের মত নয় দেখতে। বুড়ী ভাবল দক্ষিণী লোক হবে হয়তো ছোকরা। সে থাকগে যাক; বেঁচে আছে ছেলেটা, সেইটে হচ্ছে আসল কথা। বুড়ী বলল, 'তুমি বেরিয়ে এলেই ভালো করতে বাপু; পাঁজরায় আমি ওষুধের পাতা বেটে লাগিয়ে দিতাম।'

ছোকরা কি যেন বলল বিড় বিড় করে; বোঝা গেল না কিছু। 'কি বললে তুমি?' —বুড়ী জিগ্যেস করল, কিন্তু আর কথা ফুটল না ছেলেটার মুখে। বুড়ী ভেবে দেখলে গায়ে তার যথেষ্ট শক্তি আছে। তাই ঝুঁকে পড়ে ছোকরার কোমরটা আঁকড়ে ধরে বুড়ী তাকে টেনে তুলল কোনরকমে অনেক হাঁপিয়ে। ভাগ্যিস ছেলেটা ছোটখাটো, হাল্কা। মাটির ওপরে দাঁড় করিয়ে দিতে ছোকরা যেন খুঁজে পেল নিজের পা দুটো; কাঁপতে কাঁপতে খাড়া হল কোনরকমে বুড়ীকে আঁকড়ে ধরে; বুড়ী তাকে ধরে রাখল।

'এবার দ্যাখো বাপু, যদি হেঁটে যেতে পারো আমার বাড়িতে; দেখি গিয়ে আছে কিনা ঘর-দোর।' কি যেন বলল ছোকরা বেশ জোরেই; বুড়ী শুনলো, কিন্তু একবর্ণও বুঝতে পারলো না। হাত ছাড়িয়ে খানিকটা তফাতে সরে গিয়ে তাকিয়ে রইলো বুড়ী; জিগ্যেস করল, 'কি বললে তুমি?' ছেলেটা ইসারা করল কুকুর ক'টার দিকে। গজরাচ্ছে কুকুরগুলো; গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠেছে। আবার কি যেন বলল ছেলেটা, বলেই ঘাড় মুষড়ে পড়ে গেল মাটিতে। কুকুরগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ল গিয়ে; বুড়ী দু-হাতে মেরে হটিয়ে দিল কুকুর ক'টাকে। 'দূর হ হারামজাদারা তোদের কে বলেছে ওকে মারতে!

তারপরে কুকুরগুলো সরে যেতে কোনরকমে ছোকরাকে কাঁধে ঝুলিয়ে আদ্ধেক বয়ে, আদ্ধেক টেনে নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বুড়ী তাকে টেনে নিয়ে এল পোড়া গাঁয়ে। ছোকরাকে পথের ওপরেই শুইয়ে দিয়ে, কুকুরগুলোকে সঙ্গে নিয়ে বুড়ী বেরুলো তার বাড়ির সন্ধানে। চিহ্নও নেই বাড়ির। জায়গাটা খুঁজে বের করা শক্ত নয় বুড়ীর পক্ষে। এইখানেই থাকার কথা, ওই বাঁধের জল-ফটকের বিপরীত দিকে। এ-ফটকের খবরদারী বুড়ীই করে আসছে কিনা বরাবর। বরাত গুণে বেঁচে গেছে ফটকটা; বাঁধটাও ভাঙেনি কোনখানে। বাড়িটা আবার খাড়া করা শক্ত হবে না বিশেষ, এখনই শুধু তার চিহ্ন নেই।

ছোকরার কাছেই ফিরে গেল বুড়ী। যেমন শুইয়ে দিয়ে গেছে, সেইভাবেই বাঁধের গায়ে ঠেস দিয়ে পড়ে আছে; হাঁফাচ্ছে একটু, আর ভীষণ ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে মুখটা। কোটটার বোতাম নিজেই খুলে ফেলেছে; একটা ছোট ব্যাগ থেকে বের করেছে ন্যাকড়ার ফালি আর কিসের যেন একটা শিশি। আর একবার কি যেন বলল ছেলেটা; এবারেও কিছুই বুঝতে পারল না বুড়ী। তখন ইসারা করল ছেলেটা; বুড়ী বুঝল জল চাচ্ছে। তখন সে রাস্তার ওপরে পড়ে আছে যে অগুন্তি ভাঙা হাঁড়ি কুঁড়ি তারই একটা নিয়ে গিয়ে বাঁধে উঠে জল নিয়ে এলো নদীর; এনে ছেলেটার কাটা-ঘা ধুয়ে মুছে দিল। ছেলেটা যে ব্যান্ডেজ বের করেছিল, তাই ছিঁড়ে ঠিক করে নিল বুড়ী। ছোকরা জানে কি ভাবে আঘাতের জায়গায় ব্যান্ডেজ লাগাতে হয়; ইসারায় দেখিয়ে দিতে লাগল, আর বুড়ী তার ইসারামত ঠিক-ঠিক কাজ করে গেল। সর্বক্ষণই কি যেন বলতে চাচ্ছিল ছোকরা, কিন্তু বুড়ী তার বিন্দুবিসর্গ কিছুই বুঝতে পারেনি।

'তুমি নিশ্চয়ই দক্ষিণী বাবু'—বুড়ী বলল; বোঝা শক্ত নয় যে, লেখাপড়া জানে ছেলেটি; চেহারাতেই চালাক-চতুর বলে মালুম হয়; 'তোমাদের ভাষা আর আমাদের ভাষা এক নয়, আমি শুনেছি'—একটু হেসে বলল বুড়ী, আলাপ জমাবার চেষ্টায়, কিন্তু নিষ্প্রভ চোখে শুধু তার দিকে তাকিয়ে রইলো ছেলেটা গম্ভীরভাবে। বুড়ী তখন খুশীর সুরে বলল, 'এবার যদি কিছু খাবার যোগাড় হয়ে যেত, তাহলেই বেশ হত।'

জবাব এল না। ভীষণ হাঁফাচ্ছে ছোকরা বাঁধের গায়ে শুয়ে পড়ে। দৃষ্টি রয়েছে শূন্যে; —বুড়ী যেন কথাই বলেনি কিছু। 'কিছু খেতে পেলেই তোমার একটু ভালো বোধ হত' —বলে চলল বুড়ী—'আমারও বটে।' হঠাৎ যেন অসহ্য ক্ষিদে পেয়েছে বুড়ীর।

তাইতো! রুটীওয়ালা ওয়াঙের দোকানে তো রুটী মিলতে পারে। ধ্বসে-পড়া ধুলো-বালিতে নোংরা হলেও রুটী তো বটে ! গিয়েই দেখা যাক না......

রুটীওয়ালার দোকানের অবস্থাও' আর আর বাড়ি-ঘরের মতই কাহিল। কেউ নেই সেখানে। প্রথমটা কিছুই চোখে পড়ল না ধুয়ে-যাওয়া মেটে দেয়ালের স্তূপ ছাড়া। তারপরে বুড়ীর মনে পড়ল—চুল্লীটা ছিল ঠিক দরজার পাশটাতেই। আর চৌকাঠটা ছাউনির একটা অংশ ঠেকিয়ে রেখে খাড়াই রয়েছে তখনও। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে হাত গলিয়ে দিল বুড়ী ভেঙে-পড়া চালাটার ভেতর দিয়ে; হাতে ঠেকল লোহার কড়ার ওপরকার কাঠের ঢাকনাটা। এটার তলায় ভাপের রুটী থেকে যেতে পারে। ধীরে সন্তর্পণে গোটা হাতখানা ঢুকিয়ে দিল বুড়ী। বহুক্ষণ লাগল, চুণের গুড়োয়, ধুলোয় দম বন্ধ হয়ে যায় আর কি! তাহলেও বুড়ীর অনুমান মিথ্যা নয়। হাতটা ঠেলে ঢাকনার ভেতর গলিয়ে দিতে বুড়ীর আঙুলে ঠেকল পরতে পরতে তৈরী রুটীর মসৃণ, শক্ত পিঠ। এক-এক করে চারখানা বের করে নিল বুড়ী। 'আমার মত বুড়ীর পাকা হাড় শেষ করা বড় শক্ত বাবা !' —খুশীর সুরে বলল বুড়ী আপন মনেই। ফিরে যাবার পথে সে একখানা রুটী খেতে খেতে চলল।

এমনি সময়ে কাদের কথার আওয়াজ এল কানে। সৈনিকটিকে দেখতে পাওয়া যায়, এমন জায়গায় এসে দেখলে, তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে অপর একদল সৈনিক। কোত্থেকে এল ওরা। আহত সৈনিকটির দিকে তাকিয়ে আছে ওরা; ততক্ষণ চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গেছে ছেলেটার।

আগন্তুক সৈনিকেরা বুড়ীকে হেঁকে বলল, 'এ-জাপানীটাকে কোত্থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এলে বুড়ী-মা?' গভীরতম বিস্ময়ে বুড়ী চীৎকার করে উঠল, 'জাপানী নাকি ও ! কিন্তু ওতো আমাদেরই মত দেখতে; কালো চোখ, চামড়া—'

'জাপানী ! জাপানী ! সৈনিকদের একজন হেঁকে বলল তাকে। ঠাণ্ডা গলায় বুড়ী বলল, 'ও পড়েছে আকাশ থেকে।'

'আমাকে দিয়ে দাও রুটীগুলো !' —আর একজন উঠল চেঁচিয়ে। 'নেও বাছারা; শুধু এই একখানা রইলো ওর জন্যে।' ধমকে উঠল সৈনিক; 'কী ! একটা জাপানী বন্দির খাবে এই মিঠে রুটী।'

বুড়ী ওয়াঙ্ জবাব দিল, 'তা ওরও তো ক্ষিদে পেয়েছে। লোকগুলোকে ভালো লাগছে না বুড়ীর। অবিশ্যি সৈনিকদের কোনদিনই ভাল লাগে না বুড়ির। সোজা বললে, 'তোমরা এখান থেকে বিদেয় হলেই মঙ্গল বাপু। কি করছো তোমরা এখানে ? আমাদের গাঁ ঠাণ্ডা আছে চিরকাল।

বিদ্রূপের হাসির সঙ্গে একজন সেপাই বলল, 'হ্যাঁ, তা গাঁয়ের চেহারাটা এখন বেশ ঠাণ্ডাই দেখাচ্ছে বটে! একেবারে শ্মশানের মত চুপচাপ!—বুড়ী-মা, কারা করেছে এরকম জানো ? জাপানীরা !'

বুড়ী সায় দিয়ে বলল, 'তাইতো মনে হচ্ছে; কিন্তু কেন ? —সেইটেই বুঝিনে আমি।' 'বোঝো না? শয়তানেরা আমাদের জমি কেড়ে নিতে চায়।'

'আমাদের জমি। ভালো রে ভালো, আমাদের জমি তারা নেবে কি করে ?' 'কক্ষণো নয়'। —সমস্বরে বলল সৈনিকেরা।

ভাগ-করা রুটী চিবোতে চিবোতে যতক্ষণ কথাবার্তা চলছিল, সমস্তক্ষণই সেপাইরা বার বার তাকাচ্ছিল পূব আকাশের দিকে। এবার ওয়াঙ বুড়ী তন্দের জিগ্যেস করল, 'কী দেখছো তোমরা পূব দিকে ?'

যে সেপাইটি তার হাত থেকে রুটী নিয়েছিল, সে বলল, 'ওই পূব দিক থেকেই আসছে জাপানীরা।'

'তোমরা কি পালাচ্ছো নাকি তাদের দেখে ?'

মিনতির সুরে সেপাইটি বলল, 'আমরা আর ক'জন বাছা; আমাদের ওপর ভার ছিল পাহারা দেয়ার—পাও এ্যান গাঁয়ে—'

'চিনি আমি সে গাঁ—' বাধা দিয়ে বলল বুড়ী; 'তোমাদের চেনাতে হবে না; আমি সেখানকার মেয়ে। আচ্ছা, সদর রাস্তার ধারে চায়ের দোকানওয়ালা পাও বুড়ো কেমন আছে বলো তো? আমার ভাই হয় কিনা—'

'সে গাঁয়ে বেঁচে নেই কেউ,' —জবাব এল, —'জাপানীরা সেটা দখল করে নিয়েছে;—অগুন্তি সেপাই এসেছিল তাদের বিদেশী কামান আর সাঁজোয়া গাড়ি নিয়ে; আমরা কি আর করতে পারি বলো।'

বটেই তো, পালানো ছাড়া কি আর করবে —সায় দিল বুড়ী। কিন্তু বুড়ীর আর শরীরে পদার্থ নেই যেন। তাহলে সে-ও ম'রা গেছে, একমাত্র যে ভাইটিকে ছেড়ে এসেছিল সে। বাপের বংশে সে নিজে ছাড়া আর তাহলে কেউ বেঁচে নেই !

সেপাইরা কিন্তু তখন বুড়ীকে একা ফেলে সরে পড়ছে সব; বলতে বলতে যাচ্ছে—'কালো বামন ব্যাটারা এসে পড়ল বলে। এই বেলা সরে পড়া ভালো—'

একজন কিন্তু দাঁড়িয়ে গেল এক মুহূর্ত: রুটী নিয়েছিল যে সেপাইটি। বেশ ভালো ক'রে একবার নজর ক'রে দেখল আহত জাপানী ছোকরার দিকে। চোখ বন্ধ ক'রেই পড়ে আছে সে; নড়ে চড়েনি একদম।

'মারা গেছে নাকি?' জিগেস ক'রল চীনে সেপাই; তারপর বুড়ীকে জবাব দেবার সময় না দিয়েই কোমরবন্ধ থেকে একখানা বেঁটে ছোরা বের ক'রে বললে, 'মড়াই হোক আর জ্যান্তই হোক—দু-এক ঘা বসিয়ে দিয়ে যাই এটা দিয়ে—'

কিন্তু ওয়াঙ বুড়ী ঠেলে ওর হাতটা সরিয়ে দিল; কর্তৃত্বের সুরে ব'লল, 'না, সে হবে না! যদি মরেই গিয়ে থাকে তাহ'লে দেহটা খণ্ডবিখণ্ড ক'রে নরকে পাঠাবার কি দরকার বাপু! আমি নিজে খাঁটি বৌদ্ধ; বুঝলে?'

হাসল লোকটা; বলল, 'বটে! তবে ওটা মরে গেছে ঠিক—' ব'লে তাকিয়ে দেখল সেপাই ওর সাঙাতরা বেশ খানিকটা দূরে চলে গেছে; তখন সে-ও ছুটল ওদের পেছনে।

জাপানী তাহ'লে লোকটা! অসাড় দেহটা সামনে ক'রে ব'সে ওয়াঙ বুড়ী আড়চোখে তাকাল ছোকরার দিকে। চোখ বন্ধ আছে বলেই বুড়ী দেখল ভাল ক'রে। একেবারে ছেলেমানুষ। চেতনাহীন অসাড় হাতখানা দেখলেই বোঝা যায়, গঠন হয়নি ঠিক—বাড়তির মুখে তখনও। কব্জিতে হাত দিয়ে দেখল, কিন্তু নাড়ীর স্পন্দন নেই। ঝুঁকে পড়ে নিজের আধখানা-খাওয়া রুটীটা ওর
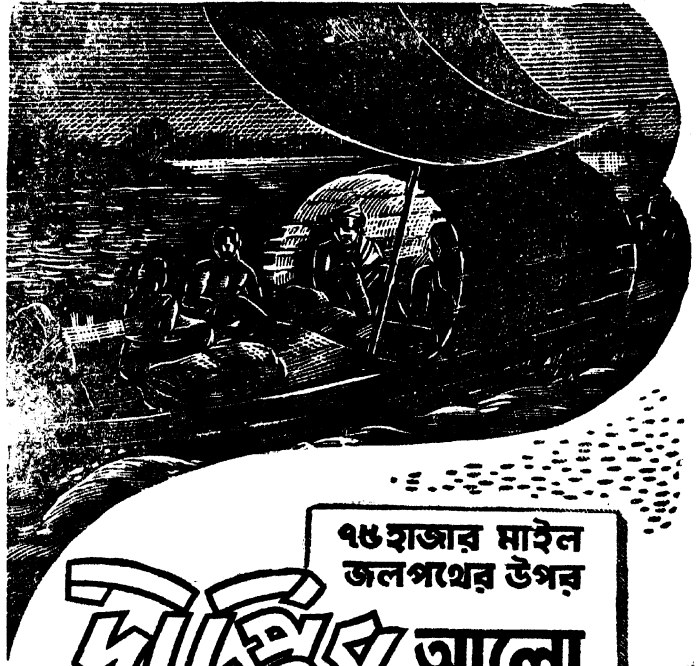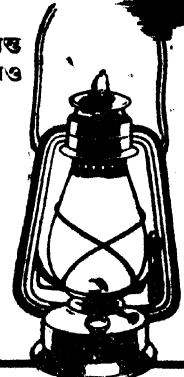
মুখের কাছে ধ'রলে বুড়ী। চেঁচিয়ে স্পষ্ট ক'রে বলল, 'খাও! রুটী!'

কিন্তু সাড়া এল না। মরেই গেছে তা হ'লে। বুড়ী যতক্ষণ রুটী টেনে বের ক'রছিল চুল্লী থেকে, তারই মধ্যে মারা গেছে ছোক্‌রা। এর পরে রুটীখানা নিজেই খেয়ে শেষ করা ছাড়া আর কি-ই বা করবার আছে। খাওয়া শেষ হ'লে বুড়ী ভাবতে লাগল—ক্ষুদে শো'র, তার বৌ, সমস্ত গাঁয়ের লোকেরা যেদিকে গেছে—তাদেরই সন্ধানে যাওয়া উচিত কি না। বেলা বেড়ে চলেছে; সূর্যের তেজও বেড়ে উঠ্‌ছে; যেতে যদি হয় তা হ'লে রওনা হ'তে হয় এই বেলা। কিন্তু আগে বাঁধের ওপরে উঠে দেখতে হয় কোন্ দিকে গেল ওরা। সোজা পশ্চিম দিকেই গেছে। আর পশ্চিম দিকে যতদূর দৃষ্টি চলে ধূ ধূ করে মাঠ। মাইল কয়েক দূরে মস্ত একটা ভীড় জমেছে, তা-ও দেখল বুড়ী। অন্তত পাশের গ্রামখানা দেখতেই পাচ্ছে বুড়ী; ওরা হয়তো ও গাঁয়েই রয়েছে সব।

বাঁধের ওপরে উঠ্‌ল বুড়ী ধীরে ধীরে, গলদ্‌ঘর্ম হ'য়ে। উঠে অবিশ্যি ভালই লাগল; ঝির ঝির ক'রে একটু হাওয়া দিচ্ছিল। হঠাৎ আঁতকে উঠ্‌ল বুড়ী—গাঙের জল প্রায় বাঁধের কাঁধ ছুঁয়েছে। তা হ'লে এই ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বেড়ে উঠেছে নদী। —'ওরে রাক্ষুসে নদী!' গাল দিয়েই ব'লল বুড়ী; শুনলেই বা নদীর দেবতা, যদি শুনতে চায়! পাজী—শয়তান সে; স্পষ্ট কথা, হ্যাঁ!

ঝুঁকে প'ড়ে বুড়ী হাত দুটো, গাল দুটো ভিজিয়ে নিল। বেশ ঠাণ্ডা জলটা; কোথায় যেন বৃষ্টি পড়েছে হালে। তারপরে উঠে চারদিকে তাকিয়ে দেখল বুড়ী। পশ্চিম দিকে শুধু দেখা যাচ্ছে বহু দূরে সেই সেপাইরা চলেছে তখনও আধা-ছুটের তালে; তাদেরও ছাড়িয়ে দেখা যাচ্ছে উঁচু ডাঙ্গা জমিতে পাশের গ্রামখানা আবছায়াতে। ওই গাঁয়ের দিকেই তা হ'লে বেরিয়ে পড়তে হয়;—নাতি, নাত-বৌ নিশ্চয় ওই গাঁয়েই অপেক্ষা ক'রছে তার জন্যে।

তারপর—যেমন নেমে আসতে যাবে, হঠাৎ পূব দিগন্তে কি যেন দেখল বুড়ী। প্রথমটায় মনে হ'ল মস্ত একটা ধূলির মেঘ যেন; তারপরে নজর ক'রে দেখতেই চোখে পড়ল—অগুন্তি কালো কালো ফুট্‌কি—আর চিক্‌মিক্ কি যেন সব। পরক্ষণেই বুঝল কী ওগুলো। মেলা লোক আসছে—একটা মস্ত সেনাবাহিনী। তৎক্ষণাৎ সে বুঝতে পারল কাদের সে বাহিনী।

'জাপানীরাই আসছে নিশ্চয়'—বুড়ী মনে মনে ব'লল; হুঁ, তাই তো,—ওইতো ওদের মাথার ওপর ভন্ ভন্ ক'রে উড়ছে সেই রুপোলী হাওয়াই জাহাজগুলো; চক্কর দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে চারদিকে; কা'কে খুঁজছে যেন।

অস্ফুট স্বরে বুড়ী ব'লল, 'জানিনে বাবা কাদের খুঁজছিস্ তোরা—আমাকে, নাতিকে আর তার বৌকে ছাড়া; বাকী তো আমরাই রয়েছি শুধু। আমার ভাই পাওকে তোরা তো আগেই খেয়েছিস্!'—প্রায় ভুলেই গিয়েছিল বুড়ী পাও যে মারা গেছে সে কথা। কিন্তু এখন তীব্রভাবেই সে কথা মনে পড়ল। কি সুন্দর দোকানটি ছিল পাও-এর! সারাক্ষণ পরিপাটি,—চমৎকার চা আর সেরা মাংসের খাবার—বরাবর একই দামে। বড় ভাল লোক ছিল পাও। তা-ছাড়া, তার বৌ—সাতটি ছেলেমেয়ে,—তাদেরই বা কি হ'ল কে জানে! মেরেই ফেলেছে নিশ্চয় সব কটাকে। তারপরে এখন বেরিয়েছে বুড়ীর সন্ধানে!

এবার বুড়ীর মাথায় এল—বাঁধের ওপরে থাকলে সহজেই জাপানীদের নজরে পড়বে সে; তাই তাড়াতাড়ি নেমে আসতে লাগল বুড়ী। প্রায় আধাআধি নেমে এসেছে যখন, তখন হঠাৎ মনে পড়ল জল-ফটকের কথা। এই পুরনো রাক্ষুসে নদী আদিকাল থেকে ওদের ক্ষতি ক'রে আসছে; আজ ওদের দুঃসময়ে এতকালের পাপের খানিকটা প্রায়শ্চিত্ত করুক না নদীটা; আবার তো শয়তানীর মতলব আঁটছে ব'সে ব'সে—চুপি চুপি যাতে বাঁধ ডিঙোতে পারে। তা ভালোই তো!

কি ক'রে জল-ফটকের কবাট খুলতে হয়, বুড়ীর বেশ ভালই জানা আছে। ফসলের জন্যে ফটকের খিড়কি খুলে দিতে কে-ই বা না জানতো! একটা ছোটো ছেলেও তা পারত। কিন্তু বুড়ী জানতে কি ক'রে গোটা ফটকটা খুলে ফেলা যায় হুস্ ক'রে। কথা হচ্ছে—নিজেকে বাঁচাবার মত তাড়াতাড়ি খুলতে পারবে কিনা সে।

নিজের মনেই বুড়ী ব'লল, 'আমি তো একটা অকেজো বুড়ী!' আর এক মুহূর্ত ইতস্তত—তাইতো, নাত-বৌয়ের খোকা না খুকী হ'ল, দেখে যাওয়া হ'ল না তো! তা হোক্; সবাই সব দেখে যেতে পারে না। এক জীবনে আজ অবধি কি কম দেখেছে বুড়ী! দেখে যাওয়ার একটা সীমা আছে তো!

আর একবার সে তাকাল পূর্বদিক পানে। ও-ই আসছে মাঠ পেরিয়ে জাপানী সৈন্যেরা। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সোজা কালো রেখা, তাতে ঝিক্‌মিক্ ক'রছে হাজার হাজার বিন্দু বিন্দু। জল-ফটক যদি সে খুলে দেয়—রাক্ষুসে নদী শোঁ শোঁ ক'রে ছুটবে ওদের দিকে; ডুবিয়ে ভাসিয়ে দেবে পূবের মাঠটা; বিরাট এক হ্রদ দাঁড়িয়ে যাবে সেখানে, আর তা'তে হয়তো ডুবে মরবে জাপানীরা;—অন্তত বুড়ীর কাছে, বা তার পথ চেয়ে ব'সে আছে যে নাতি—নাত-বৌ, তাদের কাছে আর ঘেঁষতে পারবে না নিশ্চয়। ক্ষুদে শো'র আর তার বৌ ব'সে ব'সে ভাববে—কোথায় গেল ঠাক্‌মা! কিন্তু একথা তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না।

ফটকের দিকেই এগিয়ে গেল বুড়ী মন শক্ত ক'রে। হুঁ! (শত্রুর সঙ্গে কতো রকমেই তো লড়াই করা যায়!) কেউ লড়ে হাওয়াই জাহাজ নিয়ে; কেউ বা কামান নিয়ে; কিন্তু নদীকেও অস্ত্র বানিয়ে লড়াই করা যায় বৈ কি!

প্রকাণ্ড কাঠের খোঁটাগুলির একটা ছিনিয়ে নিল বুড়ী। গায়ে রুপালী-সবুজ শ্যাওলা পড়ে পিছল হয়েছে সেটা। পাক খেয়ে একটা তীব্র জলের ধারা ছুটল তৎক্ষণাৎ। আর একটা খোঁটা তুলতে পারলেই হ'ল; বাকিগুলো তখন ভীষণ জলের চাপে নিজেরাই পড়বে ভেঙে। দ্বিতীয়টা ধ'রে প্রাণপণে টানতে লাগলে বুড়ী; গর্ত থেকে সেটা আল্‌গা হ'য়ে আসছে, তা-ও টের পেল।

'এরই জোরে হয়তো নরক থেকে মুক্তি পাবো আমি'—বুড়ী ভাবলে—'হয়তো বুড়োকেও রেহাই দেবে সেই সঙ্গে; এ যা করছি, এর পরেও কি আর একটা পা পুঁতে থাকে! তারপরে আমরা—'

হঠাৎ সরে গেল খোঁটাটা; কপাটটা খুলে গেল একেবারে বুড়ীর গায়ের ওপরে; দম্ বের ক'রে দিলে বুড়ীর। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে নদীকে শুধু ডাকার সময় পেল বুড়ী—'আয় রাক্ষুসে নদী!'

তারপরেই বুড়ী অনুভব ক'রল রাক্ষুসে নদী ঝাঁকিয়ে পড়েছে ওর দেহের ওপরে... আকাশে তুলেছে ওকে...নদী ওর পিঠের তলায় ...চারধারে...ওকে নিয়ে মনের আনন্দে চলেছে নদী হেসে—খেলে—গড়িয়ে...অবশেষে বুড়ীকে জঠরস্থ ক'রে রাক্ষুসে নদী নক্ষত্রবেগে ছুটল যেদিক থেকে শত্রু আসছে—সেই দিকে।

অনুবাদক—শ্রীরবি বন্দ্যোপাধ্যায়

স্ট্যালিনের কোষ্ঠি-বিচার!

সংবাদপত্রে নিশ্চয়ই পড়েছেন, কিছুদিন আগে রুশিয়ার সর্বময় কর্তা মার্শাল স্ট্যালিনের ৬৭ বছরের জন্মদিনের উৎসব হয়ে গেছে। এই উপলক্ষে আমেরিকার দু'টি পত্রিকার দু'জন প্রসিদ্ধ আমেরিকান জ্যোতিষী তাঁর কোষ্ঠি-বিচার প্রকাশ করেছেন। সেই কোষ্ঠি-বিচারটা স্ট্যালিন সাহেব

৬৭ বৎসরে মার্শাল স্ট্যালিন

কিভাবে উপভোগ করেছিলেন সে খবরটা জানি না—তবে আপনারা তার কিছুটা উপভোগ করলে খুশী হবেন বোধ হয়। 'জার্নাল আমেরিকান' বলে পত্রিকার লেখক ফ্রান্সেস্ ড্রেক্ তাঁর কোষ্ঠি-বিচার করতে গিয়ে স্ট্যালিনকে লক্ষ্য করে এক জায়গায় লিখেছেন,—"আপনি কখনও কখনও এমন সব সাফল্যের জন্য অতিরিক্ত আশাবাদী হ'ন—যে সাফল্য আপনার উপর আদৌ নির্ভর করে না। আপনার মধ্যে সব সময় বাস্তব লাভকেই বড় বলে গণ্য করার যে আগ্রহটা দেখা যাচ্ছে—সেটাকে সংযত করুন।" "দি ডেলি নিউজ" পত্রিকায়

ম্যারিয়ন ড্রু স্ট্যালিনের কোষ্ঠি-বিচার করে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁকে আরও স্পষ্ট কথা বলেছেন—তিনি লিখেছেন, "আপনার সামনে আরও দু'টি বছর রয়েছে—যে দু'টি বছরে আপনার পক্ষে স্থির হয়ে বসা শক্ত হবে। কারণ, নতুন বন্ধু, নতুন কর্মপন্থা ও নতুন নতুন আকাঙ্ক্ষা দেখা দেবে আপনার জীবনের পথে। এগুলির অধিকাংশই দেখা দেবে নিতান্ত আচমকা—আপনার স্বাভাবিক জীবনযাত্রার মধ্যেই, কিন্তু কোনও কিছু বিরক্তিকর বা দুঃখজনক হবে না, যদি আপনি সকলের সঙ্গে খাপ-খাইয়ে চলার মত মানুষ হতে রাজি থাকেন। আপনার স্বাস্থ্যের অবস্থা হয়তো কিছুটা আশংকাজনক হয়ে উঠতে পরে, কিন্তু তার গুরুত্ব নির্ভর করবে ষোলআনাই আপনার মনের সবলতার ওপর—কারণ, ব্যাধিটা শারীরিক নয়, মানসিকই হবে। তাই বলে চিন্তিত হবেন না যেন!" কোষ্ঠি-বিচারের উক্তিগুলি পড়ে স্ট্যালিন তাঁর ভাগ্যাকাশের কোনও ইঙ্গিত পেয়েছেন কি না জানি না, তবে আমরা বলবো ঐ উক্তিতে রাজনৈতিক গ্রহ-উপগ্রহের প্রভাবের ইঙ্গিত আছে। ঠিক কিনা বলুন?

যেমন কুকুর—তেমনি মুগুর!

যুদ্ধ আর দাঙ্গার ফলে কলিকাতা সহরে বাড়ীওয়ালা ও ভাড়াটেদের মধ্যে সম্পর্কটা যে কত মধুর হয়ে উঠেছে সে খবর আপনারা অনেকেই রাখেন। ঘর-বাড়ীর ভাড়াটের সংখ্যা বেড়ে যাওয়াতে বাড়ীওয়ালারা দেদ্রেমসে ভাড়া নিচ্ছেন, কমভাড়ার পুরাণো ভাড়াটেদের ওপর অকথ্য অভদ্র জুলুম চালাচ্ছেন—অন্যদিকে ভাড়াটিয়ার দলও বাড়ীওয়ালাদের জব্দ করার জন্য সমানে পাল্লা দিয়ে চলেছেন। এমন কাণ্ড শুধু কলকাতা শহরেই ঘটছে তা ভাববেন না। পৃথিবীর সমস্ত বড় বড় শহরে—নিউইয়র্ক, লণ্ডন, প্যারিস, রোম, সাংহাই সব শহরেই এমন ভাড়াটিয়া বনাম বাড়ীওয়ালার লড়াই চলেছে। সম্প্রতি ইতালীতে ভাড়াটিয়া বনাম বাড়ীওয়ালা সংগ্রামের চরম পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে খবর পেয়েছি। ব্যাপারটা হচ্ছে—কার্লো লেভি বলে এক ইতালীয়ান শিল্পী-সাহিত্যিক রোমের প্যালাৎসো আলতেইরী বলে যায়গাটিতে এক বাড়ী ভাড়া নিয়ে তাঁর স্টুডিও ও বাসা ক'রে সুখে-স্বাচ্ছন্দে দিন কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু বাড়ীওয়ালা দেখলেন, শিল্পীকে উঠিয়ে তাঁর স্টুডিওর মস্ত হল ঘরটিকে কয়েকটি ছোট ঘরে ভাগ করে নিয়ে ভাড়া দিলে অনেক ভাড়া পাবেন। তাই শিল্পী লেভিকে বাড়ী ছেড়ে অন্যত্র যাওয়ার জন্য নোটিশ দিলেন। বেচারী শিল্পী কোথায় বাড়ী পাবেন যে উঠে যাবেন। কাজেই বাড়ীওয়ালাকে তিনি তাঁর অসুবিধার কথা জানিয়ে বললেন যে, যতক্ষণ না তিনি তাঁর সুবিধামত নতুন বাসা পান, ততদিন তিনি ঐ বাড়ী ছাড়তে পারবেন না। বাড়ীওয়ালা গেলেন ক্ষেপে—তিনি তাঁর ভাড়াটিয়ার পিছনে লাগলেন। মিঃ লেভির টেলিফোনের লাইন, জলের কল সব কেটে দিলেন—ওপরে ওঠার সিঁড়িতে যতরাজ্যের শাকপাতা জঞ্জাল এনে ফেলতে সুরু করলেন। তাতেও সুফল হলো না দেখে বাড়ীওয়ালা শেষ পর্যন্ত ঐ শিল্পীর স্টুডিওর বাইরের দেওয়ালে লিখে দিলেন—"কার্লো লেভি দস্যু—লম্পট জঘন্য ব্যক্তি......কার্লো লেভি নিরাশ্রয় লোকদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য বাড়ীটি ছেড়ে দিতে না পারুন—তাঁর রক্ষিত মডেলগুলি ভোর রাত চারটেয় যখন স্টুডিও ছাড়েন তখন তাঁরা যাতে দরজায় শব্দ না করেন, সে অনুরোধটুকুতো করতে পারেন।"

ভাড়াটিয়া শিল্পী লেভি বুঝলেন যে, তাঁর বাড়ীওয়ালাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া দরকার—তিনিও একটা মতলব বার করে কাজে লাগালেন। জানা গেছে ঐ ঘটনার পর শিল্পী লেভি ঐ স্টুডিওর দেওয়ালের গায়ে তাঁর বাড়ীওয়ালার জীবনের গোপনীয় ও কুৎসিত ঘটনাবলীকে বড় বড় চিত্রে রূপায়িত করে তুলেছেন। বাড়ীওয়ালা ভাড়াটিয়ার সংগ্রামে যাঁরা লিপ্ত তাঁরা আশা করি এ খবরটি উপভোগ করবেন।

নাকুয়ার বদলে নরুন!

সম্প্রতি লণ্ডন থেকে এক চাঞ্চল্যকর চুরির খবর পাওয়া গেছে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন "টাওয়ার অফ লণ্ডন" দুর্গটি নিতান্ত সুরক্ষিত এবং তাই সেখানে বৃটেনের রাজার মণি-রত্ন অলঙ্কার ইত্যাদি যাকিছু সব রাখা হয়। সম্প্রতি কয়েকজন উচ্চাভিলাষী চোর ঐ সব মণিরত্ন চুরি করার অভিলাষে ঐ দুর্গে ঢুকেছিল, কিন্তু তারা সেখানে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও মণি-রত্নের কোনও সন্ধান পায়নি—বেচারা চোরের দল হতাশ হয়ে শেষ পর্যন্ত ঐ দুর্গের প্রহরীদের জন্য সেখানে যেসব সিগারেট মজুত ছিল—সেইগুলি নিয়েই সরে পড়েছে।

কবিওয়ালা

গৌরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম-এ
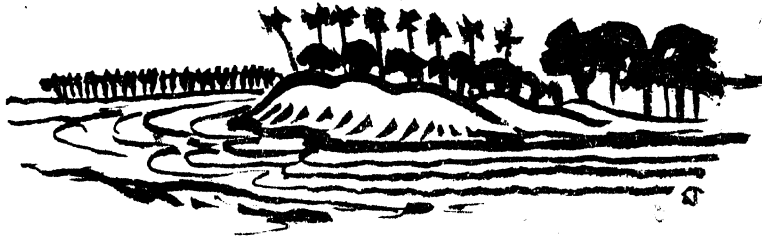
অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতচন্দ্রের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই একদিকে যেমন বাঙলা মঙ্গল-কাব্যের ঐশ্বর্যযুগ শেষ হয়ে এলো, সেই সঙ্গেই বাঙলা সাহিত্যও তার চলার পথে বাঁক ফিরলো। সন্ধিযুগের কবি রায়গুণাকরের নির্বাণলাভের পরে বাঙলার কাব্যক্ষেত্রে নতুন একদল গীতিকারের অভ্যুদয় ঘটে, তাঁরা অবসর বিনোদনের এবং অপ্রয়োজনের আনন্দ পরিবেশনের উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন আখড়ায় এবং সভাক্ষেত্রে খণ্ড খণ্ড কবিতা ও গান বেঁধে জনসাধারণের মন ভোলাতেন। পলাশীর যুদ্ধের পর যে রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তনের জোয়ারে বাঙলা দেশ তখন আন্দোলিত হয়ে ওঠে এবং তার ফলে ভাগীরথীর দুই তীর জুড়ে যে নতুন নাগরিক সভ্যতা জন্মলাভ করে, তারই প্রয়োজন পূরণের ভার নিয়ে এই কবিদলের উদ্ভব। বাঙলা সাহিত্যের ঐশ্বর্যময় ইতিহাসে তাঁরাই কবিওয়ালা ব'লে পরিচিত। কীর্তনীয়াদের মত এই কবিওয়ালারা কোন দীর্ঘ পালা বাঁধতেন না। কর্মক্লান্ত দিনের বিস্ত প্রান্তে সন্ধ্যার স্বল্প ও সামান্য অবসরে বিভিন্ন শ্রেণীর যে নাগরিক সম্প্রদায় সঙ্গীতের আনন্দ উপভোগ করতে আসতেন, তাঁরা চাইতেন সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকে বসে দুদণ্ড আমোদের উত্তেজনা, সাহিত্যরসের ধার দিয়াও তাঁরা ঘেঁষতেন না। কবিওয়ালারা তাঁদের সেই অভাব পূর্ণ করতে আসরে নামতেন। এই শ্রোতৃবৃন্দের শ্রবণ করবার মত তেমন প্রচুর অবসর না থাকাতে কবিদলের পালাগুলিও হোতো সংক্ষিপ্ত। বৈষ্ণব-কবিতার ভাব, ভাষা ও ছন্দকে ভেঙে-চুরে তাঁরা মান, বিরহ, সখী-সংবাদ ইত্যাদি ছোট ছোট পালা রচনা করতেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"বাঙলার প্রাচীন কাব্য-সাহিত্য এবং আধুনিক কাব্যসাহিত্যের মাঝখানে কবিওয়ালাদের গান। কবিদলের গানে অনেক স্থলে অনুপ্রাস ভাব এবং ভাষা এমন কি ব্যাকরণকে ঠেলিয়া ফেলিয়া শ্রোতাদের নিকট প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করিতে অগ্রসর হয়। পূর্ববর্তী শাক্ত এবং বৈষ্ণব মহাজনদিগের ভাবগুলিকে অত্যন্ত তরল এবং ফিকা করিয়া কবিগণ শহরের শ্রোতাদিগকে জোগাইয়াছেন। আমাদের কবিওয়ালারা বৈষ্ণব কাব্যের সৌন্দর্য এবং গভীরতা নিজেদের এবং শ্রোতাদের আয়ত্তের অতীত জানিয়া প্রধানত যে অংশ নির্বাচিত করিয়া লইয়াছেন, তাহা অতি অযোগ্য।"

এই কবি-সঙ্গীতের উৎপত্তি কীর্তন হ'তেই এই মত এবং ধারণাটি বিশেষ জনপ্রিয় হ'লেও ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের মতে এই কবিসঙ্গীত জন্মলাভ করেছে, যাত্রা থেকে এবং "অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে অশিক্ষিত তরজাওয়ালাদের হাত হইতে দাঁড়া কবি শিক্ষিত গীত-রচয়িতাদের হাতে পড়িয়া কতকটা ভদ্রসমাজের উপযুক্ত হইল। আসরে বসিয়া সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নোত্তরে গান রচনা করিবার ধারাও প্রবর্তিত হইল।" আবার ডক্টর সুশীলকুমার দে এইরূপ অভিমত পোষণ করেন যে, এর উদ্ভব হয়েছে পাঁচালী থেকে। তবে, কবিওয়ালারা যেমন বৈষ্ণব কবিদের অনুসরণ করেছিলেন, তেমনি রামপ্রসাদকে অনুসরণ করেও তাঁরা অজস্র শাক্ত পদাবলী রচনা করেছিলেন।

কবিওয়ালা রাম বসু (১৭৮৬—১৮২৬ খৃঃ)—রচনার প্রসাদ-গুণ এবং শব্দচয়নের নৈপুণ্যে তাঁকে বিশেষভাবে জনপ্রিয় করেছিল। পাঁচ বছর বয়সে পাঠশালায় পড়তে পড়তে কলাপাতায় তিনি কবিতা রচনা করতেন বলে জনশ্রুতি প্রবল। তখন থেকেই তাঁর কাব্য-স্ফূর্তির বিকাশ। বারো বছর বয়সেই তাঁর লেখা গান ভবানী বণিক বলে অন্য একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিওয়ালার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তিনি সমাদরে সেই বালক-কবির গান নিজের দলে গাওয়াতেন এবং সেইভাবেই তা অল্পকালের মধ্যে সাধারণ্যে প্রচারিত হয়ে ওঠে। প্রথম প্রথম এইভাবে তিনি ভবানী বেণে, নীলু ঠাকুর, মোহন সরকার প্রভৃতির দলে দরকার ও ফরমাসমাফিক গান বেঁধে বেড়াতেন, শেষে নিজেই এক দল তৈরী করলেন। তাঁর রচনার মধ্যে রাধা-কৃষ্ণবিষয়ক গানগুলিই বিশেষভাবে অভিনন্দিত। বর্ণনা এবং চিত্র-যোজনায় এগুলি ভাস্বর হয়ে উঠেছে। জলের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের স্নিগ্ধ সৌম্যরূপের ছায়া পড়েছে, তাই দেখে রাধা বিমুগ্ধা, জলভরা চোখে হাতজোড় ক'রে তিনি হতচেতন হয়ে তাকিয়ে রয়েছেন সেই দিকে, আর অন্তর-ব্যাকুলিত কাতরতায় মিনতি জানাচ্ছেন সখীদের—

"ঢেউ দিও না কেউ এ জলে, বলে কিশোরী
দরশনে দাগা দিলে হবে পাতকী॥"

রাধার বিরহ বর্ণনাতেও রাম বসু বঙ্গ-বধূর চিরন্তন হৃদয়টিকে মেলে ধরেছেন—

"যখন হাসি হাসি সে আসি বলে।
সে হাসি দেখে ভাসি নয়নজলে॥"

ভাবের অন্তরালে অনুপ্রাসের চটকও প্রকট হ'য়ে আছে—

"এত ভৃঙ্গ নয় ত্রিভঙ্গ বুঝি এসেছে।
শ্রীমতীর কুঞ্জে গুন্ গুন্ স্বরে কেন অলি,
শ্রীরাধার শ্রীপদে গুঞ্জে॥

রাম বসুর ৪২ বছর বয়সে মৃত্যু হয়।

এণ্টনি ফিরিঙ্গি—ইনি ছিলেন পর্তুগীজ। একজন ব্রাহ্মণ মেয়ের প্রেমে পড়ায় তিনি একান্তভাবেই হিন্দুভাবাপন্ন হ'য়ে পড়েন। দোল-দুর্গোৎসবে তিনি যোগ দিতেন বিনা দ্বিধায় ও পরম আগ্রহে। শেষকালে উৎসাহের আতিশয্যে কবির দল বেঁধে আসরেও নেমেছিলেন। তখন ইংরেজ আর বাঙালীর মধ্যে সামাজিক দিক দিয়ে অনেকটা আত্মীয়তা ছিল বলা যায়। মাথার টুপি আর গায়ের কুর্তি ফেলে দিব্যি ভদ্র এবং নিম্নশ্রেণীর শ্রোতার মিলিত গুঞ্জরণে মুখরিত আসরের পাশে আপন মহিমায় দাঁড়িয়ে এই ফিরিঙ্গি-কবি পরমানন্দে আত্মভোলা হ'য়ে আপন মনে স্বরচিত গান দিতেন জুড়ে। বিরুদ্ধ পক্ষের নেতা ঠাকুর সিংহ আসর ভর্তি লোকের সামনে সাহেবকে লক্ষ্য ক'রে তীক্ষ্ম কটাক্ষ এবং প্রশ্নবাণে জর্জরিত করছেন তাঁকে। বিষয়, সাহেবের এই হিন্দু সেজে নাচানাচি করা। ঠাকুর সিংহকে অবলীলাক্রমে কিন্তু অতি পরোক্ষ এবং মার্জিত ভাষায় 'শ্যালক' সম্বোধন ক'রে এণ্টনি প্রতিশোধ নিচ্ছেন—

"এই বাঙলায় বাঙালীর বেশে আনন্দে আছি।
হ'য়ে ঠাকুরে সিংহের বাপের জামাই,
কুর্তি-টুপি ছেড়েছি॥"

রাম বসুও সেখানে হাজির। তিনি আরো সুর চড়িয়ে সাহেবকে গালাগাল দিলেন—

"সাহেব! মিথ্যে তুই কৃষ্ণপদে মাথা মুড়ালি।
ও তোর পাদরী-সাহেব শুনতে পেলে
গালে দেবে চুণ-কালি॥"

সাহেবও অপ্রস্তুত হবার পাত্র নন। তাঁর সতেজ স্বাভাবিক এবং এবারে অপেক্ষাকৃত কোমল উত্তর শোনা যায়—

"খৃষ্টে আর কৃষ্টে কিছু ভিন্ন নাই রে ভাই।
আমার খোদা যে হিন্দুর হরি সে,
ঐ দ্যাখ্ শ্যাম দাঁড়িয়ে আছে,
আমার মানব জনম সফল হবে যদি
রাঙা চরণ পাই॥

সাহেব যে নিজের ধর্ম ত্যাগ করেছিলেন দীনেশচন্দ্র সেন তা মনে করেন না, কেবল

আসরের শ্রোতাদের প্রাণভরা আনন্দ বিতরণের জন্যই এই সংস্কারলেশহীন সরল সাদাসিধা বিদেশী কবিটি দেশীয় সাজে সেজে আসর মাতিয়ে আপন মনের দুর্জয় দুর্বার আবেগে গেয়ে যেতেন—

"আমি ভজন সাধন জানি না মা,
নিজে ত ফিরিঙ্গি।
যদি দয়া ক'রে কৃপা কর
হে শিবে মাতঙ্গী॥"

ফরাসী অধিকারভুক্ত গরিটির কাছে এই এণ্টনি কবিওয়ালার বাগান-বাড়ির ধ্বংসাবশেষ নাকি এখনও বিদ্যমান।

হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাড়ি—১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় এ'র জন্ম। হরু ঠাকুর বলেই ইনি বিশেষ পরিচিত। রঘুনাথ দাস বলে এক তাঁতীর কাছে ইনি কবিতা লেখার বিদ্যাটি আয়ত্ত করেন। রাম বসুর প্রতিভা হরু ঠাকুরের ছিল না। কবিত্ব অপেক্ষা ধর্মপ্রাণতাই তাঁর রচনায় লক্ষ্যণীয় বস্তু। যেমন,—

"হরি নাম লইতে অলস হও না,
রসনা যা হবার তাই হবে।
ঐহিকের সুখ হল না বলে কি,
ঢেউ দেখি তরী ডুবাবে।"

তাঁর বিরহ বর্ণনা রাম বসুর সহিত তুলনায় উল্লেখযোগ্য—

"সুধীর ধীর বহিছে এই ঘোরতরা রজনী।
এ সময়ে প্রাণসখীরে কোথায় গুনমণি,
ঘন গরজে ঘন শুনি॥
ঐ ময়ুর ময়ুরী হরষিত,
হেরি চাতক চাতকিনী।
এ কদম্ব কেতকী চম্পক জাতি,
সেউতি শেফালিকে॥"

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে হরু ঠাকুরের মৃত্যু হয়।

রাসু ও নৃসিংহ—এ'রা দুই সহোদর ভাই, ফরাসডাঙ্গার গোন্দলপাড়া গ্রামে ছিল এ'দের বাস। তাঁরা নাম করেছিলেন সখীসংবাদ গান লিখে। অনেকে অনুমান করেন এ'দের রচনা-কাল এখন থেকে দেড়শো বছর আগে। রচনার নিদর্শন পাওয়া যায় এইরকম—

"শ্যাম তোমার চরিত, পথিক যেমত হোয়ে
শ্রান্তিযুত বিশ্রাম করে।
শ্রান্তি দূর হলে, যায় পুন চলে,
পুন নাহি চায় ফিরে॥

গোঁজলাগুই—এ'র লেখা কতকগুলি গান বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ পেয়েছেন। সেগুলি প্রায় দুশো বছর আগের রচনা বলে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে।

নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী—(১৭৫১-১৮২১ খৃঃ) ইনি ছিলেন চন্দননগরের অধিবাসী। তাঁর রচনায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোনো কৃতিত্ব না থাকলেও তা' বেশ শ্রুতিমধুর—

"বঁধুর বাঁশী বাজে বিপিনে। শ্যামের বাঁশী
বুঝি বাজে বিপিনে।
নহে কেন অঙ্গ অবশ হইল,
সুধা বরিষল শ্রবণে॥
বৃক্ষ ডালে বসি, পক্ষী অগণিত,
জড়বৎ কোন্ কারণে।
যমুনার জলে, বহিছে তরঙ্গ,
তরু হেলে বিনে পবনে॥

ভোলানাথ নায়ক—বা ভোলা ময়রা ছিলেন হরু ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য। তাঁর এই ভোলানাথ নাম নিয়ে বিরুদ্ধ দল ব্যঙ্গ করাতে তিনি রুখে উঠতেন এই ব'লে—

"আমি সে ভোলানাথ নই,
আমি সে ভোলানাথ নই।
আমি ময়রা ভোলা হরুর চেলা,
শ্যামবাজারে রই,
আমি যদি সে ভোলানাথ হই,
তোরা সবাই বিল্বদলে আমায় পুজলি কই।"

পূর্ববঙ্গের কবিওয়ালা—পূর্ববঙ্গেও বহু কবিওয়ালা সুন্দর সুন্দর গান রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়। আপাতত তাঁদের মধ্যে মাত্র রামরূপ ঠাকুর বলে একজনের রচনা পাওয়া যায় সেটি একটি সখীসংবাদ গান। তার একটি অংশের কয়েকটি কথা এইরকম—

"শ্যাম আসার আশা পেয়ে,
সখীগণ সঙ্গে নিয়ে, বিনোদিনী।
যেমন চাতকিনী পিপাসায়, তৃষিত জল-আশায়,
কুঞ্জ সাজায় তেমনি কমলিনী।"

দাশরথি রায় (১৮০৪-১৮৫৭ খৃঃ)—যদিও পাঁচালী রচয়িতা বলেই তিনি একান্ত-ভাবে পরিচিত তবুও কবিওয়ালাদের মধ্যে তাঁর নাম উল্লেখ নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক নয়। কেন না, তিনি প্রথম জীবনে শাঁকাই বলে একটি জায়গার নীলকুঠিতে কেরাণীগিরি করতেন। তারপর আকাবাই বলে একটি নীচ-জাতীয়া মেয়ের রূপে মুগ্ধ হয়ে 'চাকরী ছেড়ে দেন। এই সময় মেয়েটি এক ওস্তাদী কবির দল গ'ড়ে তোলে। দাশু রায় সেখানে গান বেঁধে দিতেন। কিন্তু অন্য আর এক কবিদলের নেতা ছড়া বেঁধে সর্বসমক্ষে দাশুকে গালি-গালাজ করেন, কালক্রমে একথা দাশুর মায়ের কাণে ওঠে এবং তিনি দাশুকে তিরস্কার করেন। এই ভৎর্সনায় দাশুর মন বিগড়ে যায়। তিনি প্রতিজ্ঞা করে বসেন, আর কবির দলে গান তিনি বাঁধবেন না। কিন্তু তাঁর বাঁধা গানের কোনো নিদর্শন মেলেনা, কাহিনীটিই পাওয়া যায়।

অন্যান্য কবিওয়ালা—মধুসূদন কিন্নরের লেখা কয়েকটি রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদ প্রচলিত আছে। যজ্ঞেশ্বরী ব'লে এক মহিলা কবির লেখা সখীসংবাদগান পাওয়া গেছে, তাঁর রচনার নমুনা এইরকম—

"কর্মক্রমে আশ্রমে সখা হলে যদি অধিষ্ঠান।
হেরে মুখ, গেল দুঃখ, দুটো কথার কথা
বলি প্রাণ।
আমায় বন্দী করি প্রেমে, এখন ক্ষ্যান্ত হলে হে
ক্রমে ক্রমে,
দিয়ে জলাঞ্জলি এ আশ্রমে।"

এ ছাড়া কৃষ্ণচন্দ্র চর্মকার (কৃষ্ণেমুচি), লালু-নন্দলাল, নিত্যানন্দ, ভবানী, নীলমণি পাটুণী, কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য, সাতুরায়, গদাধর মুখোপাধ্যায়, জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠাকুর দাস চক্রবর্তী, রাজ কিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়, গোরক্ষ-নাথ, নসাই ঠাকুর, গৌর কবিরাজ, রঘুনাথ দাস তন্তুবায়, লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস, নীলু ঠাকুর, রামপ্রসাদ ঠাকুর, রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, রঘু, মতে এবং নন্দ এ'রাও প্রাচীন কবিগানরচয়িতা-গণের পর্যায়ভুক্ত। পৃথক পৃথকভাবে তাঁদের রচনার নিদর্শন এবং কাল সবিশেষ উল্লেখযোগ্য কিংবা বিশদ কিছু পাওয়া যায় না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যে দুজন কবি সাহিত্যে আধুনিক ধারার সূত্রপাত করেন —ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এবং তাঁর শিষ্য রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম এই কবিওয়ালাগণের সঙ্গেই উল্লেখ করা চলে। তাঁরা এবং আরো অনেকে কবির গান বেঁধে দিতেন। এ'দের রচিত অনেকগুলি সখীসংবাদগান প্রচলিত আছে। ঈশ্বর গুপ্তের আর এক কৃতিত্বও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। গুপ্তকবিই সর্বপ্রথম কবি-ওয়ালাদের কথা ও কাহিনী সংগ্রহ করে বাঙলা সাহিত্যের অনুরাগীদের উপহার দেন।

বৈষ্ণবীদেরও কবির দল ছিল বলে প্রসিদ্ধি আছে। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় গোলোকমণি, দয়ামণি ও রত্নমণি এই তিনজন 'নেড়ি কবি' গাওনা করতে এসে নাম করেছিল। কবিওয়ালাদের সম্বন্ধে কোনো সমালোচক বলেছেন—

"From the death of Bharatchandra in 1760 to the death of Iswar Gupta in 1858, flourished a class of writers, chiefly poets, who were uninfluenced by English ideas and who maintained even with declining powers, the literary traditions of the past".

বস্তুত কবিওয়ালাদের রুচিকে যতই বিকৃত এবং অমার্জিত এবং তাঁদের বিষয়বস্তুকে সাহিত্যপদবাচ্যের অযোগ্য বলে সমালোচনা করা যাক না কেন, তাঁদের এই ইংরাজীয়ানা থেকে দূরে সরে থাকবার এবং পূর্ববর্তী-কালের সাহিত্যিক ঐতিহ্যকে কোনোক্রমে ধরে রাখার বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করা চলে না। ডক্টর দীনেশচন্দ্র বলেছেন—"কবিওয়ালাগণের বহু-সংখ্যক গীতরচকই হিন্দুসমাজের অধস্তন স্তর হইতে উৎপন্ন। যখন বড় বড় রাজগণ, সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও বিশিষ্ট ভদ্রলোকবর্গ বঙ্গ-সাহিত্যকে কৃত্রিম সৌন্দর্যে শ্রীসম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন ও বিলাসের পঙ্ক দ্বারা ইহাকে কাব্যপিপাসুর অসেব্য করিয়া তুলিতে-ছিলেন, তখন নিম্নশ্রেণীর লোকবৃন্দ ভাষার বিশুদ্ধতা ও রুচির নির্মলতা রক্ষা করিতে

দাঁড়াইয়াছিলেন ইহা কম আশ্চর্যের বিষয় নহে।” বঙ্কিমচন্দ্রও বলেছেন—“কবিওয়ালাগণের মধ্যে কাহারও কাহারও গীত অতি সুন্দর। কিন্তু কবিওয়ালাগণের অধিকাংশ রচনা অশ্রদ্ধেয় ও অশ্রাব্য সন্দেহ নাই।” একথা রবীন্দ্রনাথও বলেছেন। তাঁরই কথা দিয়ে প্রবন্ধটির সমাপ্তিরেখা টানি—“একদিন হঠাৎ গোধূলির সময়ে যেমন পতঙ্গে আকাশ ছাইয়া যায় মধ্যাহ্নের আলোকেও তাহাদিগকে দেখা যায় না, এবং অন্ধকার ঘনীভূত হইবার পূর্বেই তাহারা অদৃশ্য হইয়া যায়—এই কবির গানও সেইরূপ এক সময়ে বঙ্গ সাহিত্যের স্বল্পক্ষণস্থায়ী গোধূলি আকাশে অকস্মাৎ দেখা দিয়াছিল, তৎপূর্বেও তাহাদের কোনও পরিচয় ছিল না এখনও তাহাদের কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। স্থানে স্থানে সে সকল গানের মধ্যে সৌন্দর্য এবং ভাবের উচ্চতাও আছে—কিন্তু মোটের উপর এই গানগুলির মধ্যে ক্ষণস্থায়িত্ব রসের জলীয়তা, এবং কাব্যকলার প্রতি অবহেলাই লক্ষিত হয়। তথাপি এই নষ্টপরমায়ু কবির-দলের গান আমাদের সাহিত্য এবং সমাজের ইতিহাসের একটি অঙ্গ,—এবং ইংরাজ-রাজ্যের অভ্যুদয়ে যে আধুনিক সাহিত্য রাজসভা ত্যাগ করিয়া পৌরজনসভায় আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছে এই গানগুলি তাহারই প্রথম পথ-প্রদর্শক।”

বাংলার ব্যাঙ্কিং কোন পথে

শ্রীমনকুমার সেন

১৯৪৬-এর শেষভাগে বাঙলার ব্যাঙ্কিং জগতে যে বিপর্যয় শুরু হয় তাহার বেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলেও সংকট আজিও উত্তীর্ণ হয় নাই বলা চলে। ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের এই চাঞ্চল্য ও বিপর্যয় বাঙলার শিল্প ও বাণিজ্যের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করিয়াছে ও করিতেছে তদ্বিষয়ে দেশবাসীর সম্যক সচেতন হওয়া ও উপযুক্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা স্থির করা আশু কর্তব্য। দুঃখের বিষয় এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে প্রভাবশালী বাঙালী মহল হইতে উল্লেখযোগ্য সাড়া পাওয়া যাইতেছে না।

এ দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় কত বাধা বিপত্তি ও ক্ষয়-ক্ষতির সুদীর্ঘ বন্ধুর পথ অতিক্রম করিয়া এই ব্যবসায় বর্তমান অবস্থায় উন্নীত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের প্রথম যৌথ ব্যাঙ্ক বাঙলার এই কলিকাতা সহরেই প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে। বিদেশীর পৃষ্ঠপোষকতা ও পরিচালনা-মুক্ত ব্যাঙ্কিং আন্দোলন স্বদেশী যুগ হইতে একটি নির্দিষ্ট গতি পথে প্রবাহিত হয়।

১৯২৭ সনে যখন স্বদেশী যুগের স্বদেশী ব্যাঙ্ক 'বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক' কাজ-কর্ম বন্ধ করে, তখন দেশব্যাপী একটা নৈরাশ্য ও অনাস্থার সৃষ্টি হইলেও এই ব্যবসায়ে বাঙালী প্রতিভা পরাজয় স্বীকার করে নাই। বাঙলার ব্যাঙ্কিং-এর পরবর্তী কর্মমুখর ও গৌরবময় ইতিহাস তাহা বিশেষভাবে প্রমাণিত করিয়াছে। সেই দিনের কথা স্মরণ করিয়া ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ী ও জনসাধারণ উভয়কেই নিজ নিজ কর্তব্য সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন হইতে হইবে এবং দীর্ঘকালের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও গলদগুলিকে দূরীভূত করিয়া বাঙলার ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়কে স্থায়ী মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

সুদীর্ঘ ছয় বৎসরব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যে অনিবার্য মুদ্রাস্ফীতি ঘটে, তাহারই সুযোগে বাঙলার ব্যাঙ্কিং দ্রুত প্রসারলাভ করে ও ব্যাঙ্কের সংখ্যা বিশেষরূপে বৃদ্ধি পায়। ফলে দেশের সর্বত্র শিল্প ও বাণিজ্যের আশাতীত প্রসার ও উন্নতি লাভ হয়। কিন্তু এই যুদ্ধলব্ধ দৌলতে লক্ষপতি হইয়া একদল অনভিজ্ঞ ও অপরিণামদর্শী ব্যবসায়ীও ব্যাঙ্কিং জগতে প্রবেশ করে। নূতন কোম্পানী গঠনের অসুবিধা হেতু ইহারা অনেকেই মফঃস্বলের কোন কোন স্থান হইতে মৃতপ্রায় 'লোন কোম্পানী'গুলিকে হস্তগত করে ও সহরে তাহাদের কর্মক্ষেত্র খুলিয়া বসে। বলা বাহুল্য প্রভাব প্রতিপত্তি ও মুদ্রাস্ফীতির ফলে জনসাধারণের নিকট হইতে আমানত সংগ্রহে ইহাদের খুব বেগ পাইতে হয় নাই।

যুদ্ধোত্তরকালে অবস্থার অনিবার্য পরিবর্তন ঘটে। নূতন ব্যাঙ্ক পরিচালকদের যাঁহারা খেয়াল-খুশী মাফিক দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপ চালাইতেছিলেন এবং অত্যন্ত অন্যায়ভাবে যত্রতত্র ব্যাঙ্কের শাখা প্রশাখা বিস্তার করিতেছিলেন, তাঁহাদের 'কর্মোদ্যম' ব্যাহত হয়। নূতন অর্থের অভাবে প্রাপ্ত সম্পদ ভাঙাইয়া ইঁহারা ইঁহাদের চাল-চলন ও ঢক্কানিনাদ বজায় রাখিতে চেষ্টা করেন। এই পরিচালকদলের অদূরদর্শী ও অনভিজ্ঞ কার্যক্রমই যে বর্তমান ব্যাঙ্ক-সংকটের অন্যতম প্রধান কারণ একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। বাড়ি, গাড়ী ও ব্যাঙ্কের শাখা-সংখ্যার প্রতি ইঁহাদের যেরূপ কঠোর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল, সত্যিকারের ব্যাঙ্কিং প্রণালী ও শিল্পোন্নতি এবং কল্যাণমূলক কর্মপন্থায় তাহার শতাংশের একাংশও আগ্রহ ছিল না। আইন-নির্দিষ্ট গণ্ডী অতিক্রম করিয়া ইঁহাদের অতিরিক্ত মূলধন সংগ্রহের উপায় ছিল না। তাই শাখা প্রসারের প্রলোভন ইঁহাদের আরও অর্থ সংগ্রহে প্রলুব্ধ করিয়াছে।

ইঁহারা ছাড়াও নূতন ব্যাঙ্কগুলির অধিকাংশ ভাবী সম্ভাবনার দিকে উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন না করিয়া Non-Banking (অ-ব্যাঙ্ক) কোম্পানীগুলির শেয়ারে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করে। শেয়ার বাজারের গতি, সম্ভাবিত লাভ বা নিজেদের আর্থিক সংগতি সম্বন্ধে ইঁহারা সম্যক কর্তব্য পালন করে নাই বা সচেতন থাকে নাই। নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও হিসাবের কারসাজি (window-dressing) দ্বারা ইঁহারা বার্ষিক উদ্বর্ত (Balance Sheet) প্রকাশ করিয়াছে এবং আমানতকারী ও অংশীদারগণের নিকট ব্যাঙ্কের সত্যিকারের অসংগতি ও দুর্বল আর্থিক অবস্থা গোপন রাখিয়াছে।

গত বৎসরের শেষাংশে একদল স্বার্থান্বেষী ও ধুরন্ধর ব্যক্তি 'ক্যালকাটা ক্লিয়ারিং হাউসে'র একটি তালিকা বিকৃত অবস্থায় প্রকাশ করে এবং ব্যাপক প্রচারকার্যের দ্বারা জনসাধারণ ও আমানতকারীদের বিভ্রান্ত ও আতঙ্কগ্রস্ত করিয়া তোলে। এই তালিকা 'ব্ল্যাক লিস্ট' (কালো তালিকা) বলিয়া বর্তমানে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। বাঙালীর ব্যাঙ্ক প্রধানতঃ মধ্যবিত্তের প্রতিষ্ঠান। গুজব যখন ব্যাপক আকারে চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল, তখন এই নিরীহ মধ্যবিত্ত আমানতকারীরা স্বভাবতঃই নিজ নিজ কষ্টার্জিত অর্থের জন্য চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন। ছোট বড় সকল ব্যাঙ্কে অল্পকালমধ্যেই টাকা উঠানোর হিড়িক পড়ে এবং এই 'এটমিক আক্রমণে' সৎ-অসৎ ছোট-বড় সমস্ত ব্যাঙ্ক প্রবল সংকটের সম্মুখীন হয়।

এই প্রসঙ্গে ব্যাঙ্কগুলির সহিত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার যে সম্পর্ক রহিয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক। বর্তমান আইনের বিধি-বিধান অনুসারে কেবলমাত্র তালিকাভুক্ত (Scheduled) ব্যাঙ্কগুলিই প্রয়োজনানুসারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে অর্থসাহায্য লাভ করিয়া থাকে। ছোট ছোট (তালিকাভুক্ত নহে এইরূপ) ব্যাঙ্কগুলি

সংকটকালেও কোনরূপ অর্থসাহায্য পায় না অথচ রিজার্ভ ব্যাংক ইহাদের তদারকের কর্তৃত্ব করেন, রিজার্ভ ব্যাংকের মুষ্টিমেয় অংশীদার যাহারা, অর্থসংগতি ও প্রভাবের বলে ব্যাংকের কার্যকলাপও কার্যতঃ তাঁহারাই নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকেন। স্বভাবতঃই মালিকানাভুক্ত বৃহৎ বৃহৎ ব্যাংকগুলির সহিত ইঁহাদের প্রেমের বন্ধন দৃঢ়তর হইল, আর সততা ও নিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও রিজার্ভ ব্যাংকের প্রেমের কিয়দংশের অভাবে কতকগুলি ছোট ছোট ব্যাংক দৈনন্দিন কাজ-কর্ম বন্ধ করিতে বাধ্য হইল।

বাঙালীর ক্রমবর্ধমান ব্যাংক-ব্যবসা তাহার সর্বাঙ্গীন শিল্পোন্নতির সূচনা করিতেছিল। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বাঙালীর সম্মান ও প্রতিপত্তি বজায় রাখিতে হইলে পুনরায় বাঙলার শিল্প ও সম্পদকে নেতৃস্থানীয় করিয়া তুলিতে হইবে। বাঙলার অপরিমেয় প্রাকৃতিক সম্পদ ও শিল্পোদ্যোগকে যথোপযুক্ত কার্যকরী করিতে হইলে বৃহৎ বাঙালী ব্যাংক পরিচালকদের অগ্রণী একটি সহযোগিতামূলক কর্মপন্থা গ্রহণ করিতে হইবে। ছোট ছোট ব্যাংকগুলির মধ্যে একত্রীকরণ (amalgamation)এর চেষ্টাও তাঁহাদের আন্তরিক মধ্যস্থতার ফলেই ফলবতী হইতে পারে। তাঁহারা তাঁহাদের 'প্রেস্টিজ'এর ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করিয়া সংকটাপন্ন ছোট ছোট ব্যাংকগুলির তথা সমগ্র দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের একটা প্রধান অংশের ক্রমোন্নতি ও বিকাশের কার্যে নিজ নিজ সংগতি ও প্রভাব প্রয়োগ করিবেন. ইহাই জনসাধারণ আশা করে। বাঙলার যাঁহারা 'বিগ ফাইভ' (বড় পাঁচটি) বলিয়া কথিত, সেই কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং করপোরেশন, কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাংক, ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাংক, বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাংক ও নাথ ব্যাংক-এর এ বিষয়ে বিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে।

ব্যাংকের নিরাপত্তা, তথা আমানতকারীদের অর্থের সদ্ব্যবহার ও সংরক্ষণ, এবং সংগতি স্থায়ী করিতে হইলে সরকারী ব্যবস্থারও প্রভূত পরিবর্তন আবশ্যক বলিয়া আমরা মনে করি। বর্তমান বিশৃঙ্খল অপব্যবস্থার জন্য সরকারী কর্তব্যের ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আইনের অসংগতিও কম দায়ী নহে। প্রথমতঃ মূলধনের কথা ধরা যাক। উপযুক্ত পরিকল্পনাধীনে দেশের বিশিষ্ট ব্যবসায়-কেন্দ্রগুলিতে কার্য প্রসারিত করিতে হইলে মূলধন সংগ্রহ সম্পর্কে আইনের পরিধি বিস্তৃত হওয়া অত্যাবশ্যক। অবশ্য তজ্জন্য উপযুক্ত স্থল ও সর্ত নিশ্চয়ই বিবেচনা করিতে হইবে। এই বিধানটির প্রয়োজনানুরূপে পরিবর্তন না করিলে শিল্প-বাণিজ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদার সহিত ব্যাংকগুলির অর্থ সরবরাহ করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িবে।

ব্যাংক ব্যবসায়ের প্রথম এবং প্রধান ব্যাধি অনভিজ্ঞ ও দুর্নীতিমূলক পরিচালনা। ইহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। এই দিকেও সরকারী সতর্কতা ও কর্তব্যের অপহ্নব ঘটিয়াছে বলিয়া আমাদের আশংকা হয়। কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণকারী রিজার্ভ ব্যাংক যদি অধীন ব্যাংকগুলির কার্যকলাপ ও তথ্যানুসন্ধানে বিশেষজ্ঞ ও পরীক্ষকদের অধিকতর সতর্ক ও নিয়মানুবর্তী হইবার নির্দেশ দেন, আর বাঙলায়—যৌথ প্রতিষ্ঠানসমূহের রেজিস্ট্রার মহোদয় যদি ব্যাংক হইতে প্রাপ্ত রিপোর্টগুলির সম্বন্ধে অধিকতর সজাগ থাকেন ও সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহার গুরু দায়িত্ব পালন করেন, তাহা হইলে ব্যাংকের অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা ও অসাধুতা অন্ততঃ কিছু পরিমাণেও দূরীভূত হইতে পারে।

বাঙলাকে হিন্দু বা পশ্চিম বঙ্গ আর মুসলমান বা পূর্ব বঙ্গ এই দুই ভাগে বিভক্ত করিবার বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হইতেছে। কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি পাঞ্জাবের ভয়াবহ ব্যাপারের ফলে পাঞ্জাবকে দুই ভাগে বিভক্ত করিবার প্রস্তাব অসংগত নহে বলিবার পরে লাহোরের কোন ইংরেজ-পরিচালিত পত্রের দিল্লীস্থ প্রতিনিধি সংবাদ দিয়াছেন, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু পাঞ্জাবকে দুইটি প্রদেশে বিভক্ত না করিয়া আপাততঃ তিনটি ভাগে বিভক্ত করিবার পরিকল্পনা করিয়াছেন—

(১) আম্বালা ও জলন্ধর বিভাগদ্বয় লইয়া পূর্বাঞ্চল গঠিত হইবে এবং তথায় একজন হিন্দু, একজন শিখ ও একজন মুসলমান সচিব থাকিবেন।

(২) মুলতান ও রাওয়ালপিণ্ডি বিভাগদ্বয় লইয়া পশ্চিমাঞ্চল গঠিত হইবে এবং তথায় দুইজন মুসলমান ও একজন শিখ সচিব থাকিবেন।

(৩) মধ্যাঞ্চল লাহোর প্রদেশে একজন মুসলমান ও একজন হিন্দু সচিব থাকিবেন।

মোট সচিবের সংখ্যা—

মুসলমান—৪ জন
শিখ—২ জন
হিন্দু—২ জন

হইবে।

অর্থ ও সেচ ব্যতীত আর সকল বিভাগে অঞ্চলগুলি স্বপ্রধান হইবে অর্থাৎ যে যাহার কাজ স্বাধীনভাবে নির্বাহ করিবে। ইহার পরে যদি পাঞ্জাবকে প্রদেশ হিসাবে বিভক্ত করিতে হয়, তবে এই ভিত্তিতেই তাহা হইতে পারিবে। আপাতত একই ব্যবস্থা পরিষদ রাখিয়া তিন অঞ্চলে কাজ হইতে পারিবে।

অবশ্য মুসলিম লীগ এই প্রস্তাবে সম্মত হইবেন কি না তাহা বলা যায় না।

প্রকাশ, বাঙলা সম্বন্ধেও অনুরূপ প্রস্তাব বা পরিকল্পনা হইবার সম্ভাবনা।

দেখা যাইতেছে, বাঙলাকে বিভক্ত করিবার প্রস্তাবে দুই পক্ষ বিচলিত হইয়াছেন ঃ—

(১) য়ুরোপীয় দল
(২) মুসলিম লীগ দল

য়ুরোপীয়গণ সমগ্র বাঙলায় শোষণ নীতি পরিচালিত করিয়া লাভবান হইতে চাহিলে তাহা তাঁহাদিগের পক্ষে স্বাভাবিক বলা যায়।

মুসলিম লীগও সমগ্র বাঙলায় প্রভুত্ব চাহেন। বৃটিশ সরকারের সাম্প্রদায়িক ঘোষণায় বাঙলা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হইতে পারে, এই আশায় লীগ উৎফুল্ল হইয়া বাঙলা বিভাগের বিরোধিতায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ত্রিপুরা—মুসলিম লীগের অনুচরদিগের উপদ্রবে উপদ্রুত ত্রিপুরা জিলার কাসিমপুরে এক সভায় মিস্টার সুরাবর্দী প্রথমে সে কথা উত্থাপন করেন এবং তাহার পরে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহার সহসচিব মিস্টার মহম্মদ আলী তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।
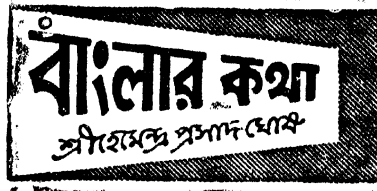
মিস্টার সুরাবর্দীর কথায় তাঁহার উদ্দেশ্য সুপ্রকাশ হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন—ইংরেজ ত চলিয়া যাইতেছেন; বাঙলা আসন্ন স্বাধীনতার আশায় উৎফুল্ল হইয়াছে। বাঙলা বলিতে তিনি মুসলমান-প্রধান বাঙলাই বুঝেন—সেই জন্য বলিয়াছেন, কোন না কোনরূপে পাকিস্থান হইবেই এবং বাঙলা পাকিস্থানভুক্ত হইবে। কাজেই বাঙলার মুসলমানরা সমৃদ্ধ ও ধনী বাঙলার আশা যেমন করিতে পারে—তেমনই আবার সমৃদ্ধি ও গৌরব অর্জনের আশাও করিতে পারে। সেই বাঙলায় অবশ্য মুসলমান প্রাধান্য করিবে, সমৃদ্ধ হইবে এবং গৌরব লাভ করিবে! আর হিন্দুরা সে মুসলমানের অধীনে "যে তিমিরে সে তিমিরে" থাকিবে। সুতরাং বাঙলাকে বিভক্ত করা অসংগত। কেন না, বাঙলা বাঙালীর এবং অখণ্ড—বাঙলার একাংশ অপরাংশের উপর নির্ভর করে। বাঙলার শাসন কার্যে সকলেরই অধিকার দাবী করা যায় এবং তিনি আশা করেন, সকল সম্প্রদায়ই বাঙলার গৌরবের জন্য বাঁচিবে ও কাজ করিতে কৃতসংকল্প।

এমন মিষ্ট কথায় লোককে প্রতারিত করা হয়ত কলিকাতার ও নোয়াখালি-ত্রিপুরার ব্যাপারের পূর্বে সম্ভব হইত। কিন্তু আজ আর তাহা সম্ভব নহে। তিনি প্রথমেই বলিয়াছেন, বাঙলা স্বাধীন হইবে সেইজন্য বাঙলার মুসলমানরা উৎফুল্ল হইয়াছে। অর্থাৎ বাঙলায় সকল সম্প্রদায়ই কাজ করিবে—তবে এক সম্প্রদায় প্রভুত্ব করিবে, আর এক সম্প্রদায় তাহার অধীনে থাকিবে। ইংরেজ ঐতিহাসিক এদেশে অভিযানকারী মুসলমানদিগের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন—লুণ্ঠন, হিন্দুর ধর্মাচার-বিরোধী কার্য করা আর হিন্দুকে দাস করা। নোয়াখালি ত্রিপুরায় লুণ্ঠন হইয়াছে, হিন্দুর ধর্মস্থান অপবিত্র করিয়া হিন্দু নরনারীকে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হইয়াছে আর ইংরেজের শাসনে দাস প্রথা নাই বটে, কিন্তু নারী হরণ কি তাহারই গোত্রস্থ নহে?

বাঙলার শাসন কার্যে যে সকল মুসলমানেরও স্থান মুসলিম লীগ স্বীকার করে না, তাহা ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের সময় বিশেষভাবেই দেখা গিয়াছে। সে সময় বাঙলায় সকল দলে সম্মিলিত সচিবসংঘ গঠন লোকের মনে আস্থা স্থাপন জন্য বিশেষ প্রয়োজন ছিল বটে, কিন্তু যে মুসলমান মুসলিম লীগের আনুগত্য স্বীকার করেন না, লীগানুগত মুসলমানরা তাঁহাকে অস্পৃশ্য বিবেচনা করায় তাহা হয় নাই।

সুতরাং মিস্টার সুরাবর্দীর মতে গৌরব মুসলমানরা পাইবে—হিন্দুরা নহে।

আর তিনি যে স্বাধীনতার জন্য লালায়িত তাহাতে বাঙলা রাষ্ট্রসংঘে যোগ না দিয়া অপাংক্তেয় হইয়া থাকিবে।

বাঙালী বাঙলাকে অবিভক্ত করিতে চাহে। কিন্তু তাঁহার আদর্শ ঘৃণায় বর্জন করে। সেই জন্যই আজ বাঙলাকে বিভক্ত করিয়া হিন্দুর আত্মরক্ষার কথা উঠিয়াছে।

মিস্টার মহম্মদ আলী তাঁহার দলপতির উক্তির প্রতিধ্বনি মাত্র করিয়াছেন এবং সুবিধার জন্য ভুলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পিতামহই ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বাঙলাকে বিভক্ত করিবার কার্যে নবাব সলিমুল্লার অনুচর ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, বাঙলা যখন স্বাধীন হইবে তখন হিন্দু, মুসলমান কেহ কাহারও প্রাধান্য চাহিবে না। কিন্তু সে "হনোজ দিল্লী দূরস্ত"। তিনি হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়কে বাংলার উন্নতির রথের দুইখানি চক্র বলিয়া কবিপ্রবণতা দেখাইয়াছেন বটে; কিন্তু যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে—বাংলায় সম্মিলিত সচিবসংঘ গঠিত হইবে কি? তখন তিনি লজ্জায় দন্তে জিহ্বা দংশন করিয়া বলিয়াছেন—সে উচ্চাঙ্গের রাজনীতির কথা, তিনি সেকথা বলিতে পারেন না।

ইহাতেই তাঁহার ভণ্ডামীর পরিচয় প্রকট হয়।

এই সঙ্গে বিহার হইতে আনীত দেড়লক্ষ মুসলমানের কথাও বিবেচ্য। বাঙলার মুসলিম লীগ সচিবসংঘ নোয়াখালির প্রতিক্রিয়া বিহারে হাঙ্গামার সুযোগ লইয়া, বিহার সরকারের অনুমতি না লইয়াই বাঙলা হইতে নিয়াজ মহম্মদ খাঁন নামক কর্মচারীকে পাঠাইয়া বিহার হইতে এই সব মুসলমান নরনারীকে আনিয়া পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় দিয়াছেন। ইহারা বাঙলা সরকারের অর্থে অর্থাৎ বাঙলার দরিদ্র প্রজার প্রদত্ত রাজস্বে আশ্রয়, অন্ন, বস্ত্র সবই পাইতেছে এবং প্রতিবেশী গ্রামবাসীদিগের প্রতি অত্যাচারও করিতেছে। তাহাও মুসলিম লীগের নির্দেশে কিনা, তাহা কে বলিবে? গত ১৯শে

মার্চ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাঙলা সরকারের 'পতিত' জমি খাস করিয়া লইবার জন্য প্রস্তাবিত আইনের আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র দাস যখন জিজ্ঞাসা করেন, বিহারী প্রভৃতি অবাঙ্গালী মুসলমানদিগকে কি ঐ সকল জমিতে "পত্তন" করা হইবে? তখন রাজস্বসচিব বলেন, সে বিষয়ে তিনি কোন শেষ কথা বলিতে পারেন না; তাহার কারণ, বাঙলায় কেবল বাঙ্গালীরই বাস নহে; অন্যান্য লোকও বাঙলার অধিবাসী। বিহার হইতে যাহারা আসিয়াছে, তাহাদিগকে যদি ঐ সকল জমিতে "পত্তন" করা হয়, তাহাতে দোষ কি? তাহারা যখন বাঙলায় আসিয়াছে, তখন তাহাদিগের সম্বন্ধে বাঙলা সরকারই দায়ী। মানবপ্রেমবশে সরকার তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছেন। তাহা যদি বাঙলা সরকারের দায়িত্ব হয়, তবে বাঙলার জমি প্রজাকে প্রদান-কালে তাহাদিগের সহিত বাঙালীদিগের প্রভেদ করা সংগত হইবে না।

বিহার হইতে এই সকল লোক আমদানী করা যে একটা সুচিন্তিত পরিকল্পনা বা ষড়যন্ত্র অনুসারে হইয়াছে তাহা পূর্বেই জানা গিয়াছিল। 'আজাদ' তখনই বলিয়াছিলেন, তাহারা মুসলমান—কাজেই বাঙলার মুসলমান সরকারের উপর তাহাদিগের দাবী আছে। বাঙলার পশ্চিম অংশে যে "পতিত" জমি আছে, তাহাতে তাহাদিগকে বাস করাইলে সেই শ্রমশীল বিহারী মুসলমানরা সে সকলে বহু শস্য উৎপাদন করিতে পারিবে।

মিস্টার সুরাবর্দী যে বলিয়াছেন, বাঙলায় বাঙালীর অধিকার তাহার সহিত তাঁহার সহসচিবের পূর্বোদ্ধৃত উক্তির এবং সচিব-সঙ্ঘের কার্যের সামঞ্জস্য সাধন সম্ভব নহে। তাঁহার কথা—বাঙলা মুসলমানের এবং বাঙলায় মুসলমানেরই অধিকারঃ অন্য কোন ধর্মাবলম্বীর নহে।

এই সকল কারণে বাঙলার হিন্দু বাঙলায় তাহার অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছে এবং তাহার সে চেষ্টা যে আত্মরক্ষার শেষ উপায় হিসাবেই হইতেছে তাহাও বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

মিস্টার সুরাবর্দী ও মিস্টার মহম্মদ আলী উভয়েই স্বাধীন অর্থাৎ প্রদেশ সঙ্ঘ হইতে বিচ্ছিন্ন বাঙলার সমৃদ্ধির চিত্র চিত্রিত করিয়া "শাক দিয়া মাছ ঢাকিবার" মত চেষ্টা করিয়াছেন। কেবল মিস্টার সুরাবর্দী বলিয়াছেন—মুসলমানরাই সমৃদ্ধি ও গৌরব লাভের আশা করিতে পারে; মিস্টার মহম্মদ আলী সে কথা উহ্য রাখিয়াছেন। উভয়ের যুক্তি এই যে—বাঙলা স্বভাবত সমৃদ্ধির খনি; কেন্দ্রী সরকারকে অনেক টাকা দিতে হয় বলিয়াই আজ বাঙলা দরিদ্র। বোধ হয় সেইজন্যই মিস্টার সুরাবর্দী বাঙলায় "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম" ঘোষণা করিবার পূর্বেই বলিয়াছিলেন—যদি ইংরেজ পাকিস্থান প্রদান না করেন, তবে তিনি বাঙলায় স্বতন্ত্র সমান্তরাল সরকার ঘোষণা করিয়া কেন্দ্রী সরকারকে রাজস্ব প্রদান বন্ধ করিবেন। উভয়েই বলিয়াছেন, স্বাধীন বাঙলায় সমৃদ্ধির সীমা থাকিবে না। দুর্ভিক্ষ নিবার্য হইলেও যাঁহারা তাহা অনিবার্য করিয়া—নিরন্নের জন্য অন্ন সংগ্রহেও লাভ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই, যাঁহারা ১৩ কোটিরও অধিক টাকা এবার কেন্দ্রী সরকারের নিকট দান চাহিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন, তাঁহারা যে বাঙলার সমৃদ্ধি সম্বন্ধে কিরূপ অবহিত তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না।

গত দুর্ভিক্ষের পরেও তাঁহারা বাঙলাকে খাদ্য সম্বন্ধে স্বাবলম্বী করিতে পারেন নাই। সরিষার তৈলের মত একটি বস্তুর সরবরাহেও তাঁহারা যে অক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অযোগ্যতার উৎস হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। অথচ তাঁহারা বার্ষিক প্রায় ৬ কোটি টাকা ব্যয়ে বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগ পোষণ করিতেছেন। যে ইউরোপীয় দল মুসলিম লীগ সচিবসঙ্ঘকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত রাখিতেছেন, সেদিন সেই দলের দল-পতিও ব্যবস্থাপক সভায় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ঐ ব্যয়ের বিনিময়ে লোক কি পাইতেছে? আর এই বিভাগের কৃতিত্ব সম্বন্ধে সেদিন অর্থসচিব মিস্টার মহম্মদ আলী বলিয়াছেন যে, নৌ নির্মাণ ব্যাপারে বাঙলা সরকারের বহু অর্থ নষ্ট হইয়াছে। আগামী বৎসরের বাজেটেও বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগ নৌকাগুলি বিক্রয় করিবার জন্য ৭৯ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করিতে চাহিয়াছিলেন; অর্থাৎ তাঁহারা সরকারকে ৫০ লক্ষ টাকা পাইবার জন্য ৭৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে বলিয়াছিলেন! অর্থসচিব সদর্পে বলিয়াছেন, তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ৩১শে মার্চের অর্থাৎ বর্তমান সরকারী বৎসরের পরে ঐ কারণে এক কপর্দকও ব্যয় করা হইবে না। কিন্তু তিনি অর্থসচিব হইয়া এ পর্যন্ত ঐ বাবদে কত অর্থের অপব্যয় করা হইয়াছে, তাহা তিনি বলেন নাই এবং তিনি যে এক বৎসর পূর্বে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, নৌ নির্মাণের ব্যাপার সম্বন্ধে বিশদ অনুসন্ধান হইবে সে সম্বন্ধে তিনি নির্বাক।

কলিকাতার সশস্ত্র পুলিশে মুসলমানের সংখ্যাবৃদ্ধি করিবার জন্য পাঞ্জাব হইতে মুসলমান আমদানী করা হইতেছে। প্রকাশ, মিস্টার সুরাবর্দী বাঙলায় পাকিস্থানী সেনাবাস রচনা করিবার জন্য আসাম সীমান্তের রক্ষকরূপে সহস্র পাঞ্জাবী আনিবার প্রস্তাব করিয়াছেন; সে প্রস্তাব মঞ্জুর হইয়া গিয়াছে কিনা, তাহা আমরা এখনও জানিতে পারি নাই।

সরকারী কর্মচারীদিগের মধ্যে কিরূপ দুর্নীতি প্রসারিত হইয়াছে, তাহা সরকারের নিযুক্ত কমিটিই বলিয়াছেন। তাহার কারণও কমিটি নির্দেশ করিয়াছেন।

বাঙলার রাজস্ব যদি বৃদ্ধি পায় এবং বাঙলা মুসলিম লীগের শাসনাধীন থাকে, তবে সেই রাজস্ব কিরূপে ব্যয়িত হইবে, তাহা মুসলিম লীগের মুখপত্রকে ৩০ হাজার টাকা এককালীন দানে, নৌকা নির্মাণের অপব্যয়ে এবং সম্প্রতি বিহার হইতে মুসলমান আনিয়া তাহাদিগকে আহার্য, পরিধেয় প্রভৃতি দিয়া রক্ষায় সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

বাঙালী বাঙলার সমৃদ্ধি চাহে—কিন্তু তাহা হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টাননির্বিশেষে বাঙালীমাত্রেরই জন্য—কেবল মুসলমানদিগের কল্যাণ সাধন জন্য নহে।

মুসলিম লীগ সচিবসঙ্ঘ এবারও যে বাজেট পেশ করিয়াছেন এবং যাহার আলোচনায় নানা তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতেও সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং সচিবদিগের উক্তিতে মনে হয়, তাঁহারা তাহাতে লজ্জিত না হইয়া গৌরবানুভবই করেন—বাঙলার মুসলমান অধিবাসিগণকে যেন দেখাইতে চাহেন, সিন্ধু প্রদেশে ব্যবস্থা পরিষদে লীগপন্থী কোন সদস্য যাহা বলিয়াছেন, বাঙলার সম্বন্ধেও তাহা প্রযোজ্য—বাঙলা মুসলমান প্রদেশ, ইহাতে কাফেরদের স্থান নাই।

বাঙলার সমৃদ্ধি, সংস্কৃতি যাহাদিগের কার্যের ফল—সমগ্র ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন যে আজ সফল হইতেছে তাহা যাহাদিগের ত্যাগ ফলে ও নিষ্ঠাবলে—বাঙলার সেই হিন্দুরা মুসলিম লীগের সেই নীতি সহ্য করিতে প্রস্তুত নহে। সেই নীতির পরিচয় সমগ্র সভ্য জগৎ নোয়াখালি-ত্রিপুরায় যেরূপ পাইয়াছে, তাহা কি আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে?

ত্রয়ী—বাল্মীকি—কালিদাস—রবীন্দ্রনাথ। সমালোচনা সাহিত্য। লেখক—শ্রীশশিভূষণ দাসগুপ্ত। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

বাঙলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সমালোচনার পুস্তক বড় একটা চোখে পড়ে না। সমালোচনার কার্যটা পরিশ্রমসাপেক্ষ, জ্ঞান সাপেক্ষও বটে। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাসগুপ্ত এই উভয় দিক দিয়াই যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন তাহা এক কথায় বলিতে গেলে অসাধারণ। পুস্তকটির বিষয়বস্তু ভারতীয় সাহিত্যের তিনটি প্রধানতম দিকপাল—বাল্মীকি, কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ। মানব-সভ্যতার প্রাচীনতম লীলাভূমি ভারতবর্ষের বুকের উপর দিয়া কত যুগ বহিয়া গিয়াছে, তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার কত বৈচিত্র, সমাজ ব্যবস্থার কত পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, কিন্তু তাহারই ভিতর দিয়া এমন একটি সুর ভারতীয় সাহিত্যে প্রবহমান হইয়া চলিয়াছে যাহা ভারতবর্ষের একান্ত আপনার—তাহাই ভারতীয় সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। বাল্মীকি, কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ ভারতের কৃষি, সমৃদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক যুগের কবি। ইঁহাদের কাব্যের বহিঃপ্রকাশ নিজ নিজ যুগধর্মী হইলেও অন্তরের সূত্রে ইঁহাদের ভিতর এক অখণ্ড ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায়। তিন কবির কাব্য হইতে বহু অংশ উদ্ধৃত করিয়া লেখক এই সূত্রটির প্রকাশ পাঠকের সম্মুখে মেলিয়া ধরিয়াছেন। বহু যুগের ব্যবধানেও এই তিন কবিগুরুর দৃষ্টিভঙ্গীর ভিতর যে বিস্ময়কর ঐক্য রহিয়াছে, উদ্ধৃত অংশগুলির তুলনামূলক সমাবেশের ফলে তাহা পাঠকের মনে এক অদ্ভুত কৌতূহলের সৃষ্টি করে। পুস্তকটির বৈশিষ্ট্য এই যে, লেখক পুরো তিনশত পৃষ্ঠা ধরিয়া তিনজন বিভিন্ন লেখকের সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া নিজের প্রতিপাদ্য বিষয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্তু আলোচনা করিতে যাইয়া কোথাও কোনও একজনকে অপরের অপেক্ষা ছোট বা বড় বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করেন নাই। ইহা বড় কম কৃতিত্বের পরিচয় নহে। একথা ঠিক যে, আলোচ্য গ্রন্থে লেখক কবিত্রয়ের সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ বিশ্লেষণ করেন নাই, মাত্র তাঁহাদের মিলের দিকটাই আলোচনা করিয়াছেন, তথাপি তাহার ভিতর দিয়াই যে সুরটি স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায় সেইটিই মূলে সুর হইয়া তিন মহাকবির কাব্যবীণার তারে ঝঙ্কার তুলিয়াছে। সেই সুরের স্পন্দনেই যুগে যুগে সকল ভারতীয় কবির কাব্যবীণা মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে—তাহাই ভারতীয় সাহিত্যের মর্মবাণী। এই অপূর্ব গ্রন্থখানি রচনা করিয়া শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাসগুপ্ত যে সুনিপুণ বিশ্লেষণ শক্তি ও গভীর রসানুভূতির পরিচয় দিয়াছেন সাহিত্যরসিকগণের নিকট তাহার সমাদর হইবেই।

সাহিত্যের কথা—(প্রবন্ধমালা); শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। মূল্য চার টাকা। শ্রীমণীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত কর্তৃক ১২৪।৫বি, রসা রোড হইতে প্রকাশিত।

ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়কগণের অন্যতম। আলোচ্য গ্রন্থখানি লেখকের বিভিন্ন সময়ে লিখিত কতকগুলি প্রবন্ধের সমষ্টি। রচনাগুলি বহুদিন পূর্বেকার লেখা হইলেও পুরাতন হইবার নহে। প্রতিটি প্রবন্ধেই বিভিন্ন বিষয়বস্তুর উপর লেখক স্বকীয় বিশিষ্টতায় যে আলোকসম্পাত করিয়াছেন, বঙ্গসাহিত্যের তাহা স্থায়ী সম্পদ হইয়া রহিবে। "রবির পিছনে একটি ছায়া" একটি অপূর্ব মনোজ্ঞ প্রবন্ধ। সকলেই জানেন যে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার উন্মেষকালেই সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র একদিন স্বহস্তে আপনার গলার মালা তাঁহাকে পরাইয়া অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। কিন্তু একথা হয়ত অনেকেরই জানা নাই যে, সেই বঙ্কিমচন্দ্রই একদিন রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলিয়াছিলেন "রবির পিছনে একটা বড় ছায়া দেখিতেছি।" এই দুই সাহিত্যগুরুকে কেন্দ্র করিয়া শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত বঙ্গসাহিত্যের এক বিস্মৃত অধ্যায়ের পুনরবতারণা করিয়াছেন। সব কয়টি প্রবন্ধের বিস্তারিত আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গীয় কৃষ্টি ও সমাজ সম্পর্কে যাঁহারা আগ্রহশীল তাঁহারা এই পুস্তকখানি পড়িলে সবিশেষ লাভবান হইবেন।

মুক্তির ডাক—শ্রীবীরেশ্বর ভট্টাচার্য প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকালী প্রকাশালয়, ১৪বি, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

মুক্তির ডাক ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত দেশপ্রেমমূলক উপন্যাস। দেশদ্রোহী সুজিত রায়ের নষ্টামির দরুণ শিবনাথ গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিল এবং গৃহশিক্ষকের কাজ লইয়া গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করিল। কিন্তু অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় সেখানেও বেশী দিন সে থাকিতে পারিল না। অবশেষে গান্ধীজীর "করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে" বাণী হৃদয়ে ধারণপূর্বক পুলিশের পীড়ন ও কারাক্লেশ বরণ করিয়া লইল। এদিকে তাহার স্ত্রী সুলতা একটি শিশুপুত্র দুর্ভিক্ষের তাড়নায় তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করিলে, কারামুক্ত হইয়া সেও অশরণের শরণ একমাত্র মৃত্যুর পথই বাছিয়া লইল। গল্পটি আগাগোড়া দুঃখ ও বেদনায় পূর্ণ। লেখকের বর্ণনানৈপুণ্যে গ্রন্থের বেদনামধুর চিত্রগুলি জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। লেখক সম্ভবত সাহিত্যক্ষেত্রে নূতন ব্রতী; কিন্তু তাঁহার রচনার কোথাও আড়ষ্টতা নাই। ৪৮।৪৭

প্রেম-মৃত্যু—শ্রীপুষ্পিতানাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—সেনগুপ্ত এন্ড কোং, ৪০, কৈলাস বসু স্ট্রীট, কলিকাতা। ২৪০ পৃষ্ঠা। মূল্য তিন টাকা।

প্রেম-মৃত্যু উপন্যাস। মৈনাক, বৈশালী, প্রবীর, সুরভি, শ্রীমতী প্রভৃতি কতিপয় নরনারীর জীবন লইয়া ইহার সৃষ্টি। সাহিত্য, কাব্য, প্রেম, কাম, সভা-সমিতি প্রভৃতি নানা বস্তুর সম্মেলনে উপন্যাসটি রীতিমত ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছে। তবে মাঝে মাঝে ভাষা বেশ মধুর কবিত্বময় হইয়াছে। ২২।৪৭

বিচিত্র মণিপুর—শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র প্রণীত। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৮সি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

গ্রন্থখানা পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম। ১১৮ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থখানাতে অল্প কথায় মণিপুরের সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় লেখক ব্যক্ত করিয়াছেন। 'বিচিত্র মণিপুর' প্রকৃতই বিচিত্র দেশ। এখানকার সামাজিক রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, ভাষা ও চালচলন সবই বিচিত্র। লেখক নিজে দেখিয়া শুনিয়া এ সকল বিষয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মণিপুরের মোটামুটি ইতিহাস এবং তথাকার লোকজনের সম্বন্ধে বহু কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য এই গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। কয়েকখানি ছবি থাকাতে গ্রন্থখানা অধিকতর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। —৭।৪৭

গোর্কির ছোট গল্প—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র কর্তৃক অনূদিত। প্রাপ্তিস্থান—ইউ এন ধর এ্যান্ড সন্স লিঃ, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

ম্যাক্সিম গোর্কির সাতটি বিখ্যাত গল্পের অনুবাদ লইয়া বইটি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইংরাজি অনভিজ্ঞ যে সকল পাঠক এ সকল গল্পের রস গ্রহণে বঞ্চিত ছিলেন, তাহারা এই বইখানা সাদরে গ্রহণ করিবেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। গ্রন্থে এই সাতটি গল্প স্থান পাইয়াছে—এক শারদ রাত্রি, একটি মানুষের জন্ম, ছাব্বিশ জন পুরুষ ও একটি মেয়ে, লাল, সাথী, সামান্য ঘটনা, তাপস। মোটা কাগজে ছাপা। রঙ্গীণ প্রচ্ছদপটে গোর্কির ছবিখানা বেশ চিত্তাকর্ষক। ৩৩।৪৭

চতুরিকা—শ্রীরবি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২।১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

চতুরিকা রহস্যোপন্যাস। উহার আখ্যান ভাগ অজস্র বিলাতী রহস্যোপন্যাসের রচিতা এডগার ওয়ালেসের "ফোর স্কয়ার জেইন" নামক উপন্যাস হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া লেখক ভূমিকায় স্বীকার করিয়াছেন। কাজেই কাহিনীর চমৎকারিত্ব কিছু থাকিলে তাহা মূল লেখকেরই প্রাপ্য। তবে রচনাগুণে বইটি অনুবাদ বা ছায়ানুবাদ বলিয়া মনে হয় না। বইটির ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই ভাল। প্রচ্ছদপটের ছবি মনোরম। ২৮।৪৭

জাতীয় পতাকা—শ্রীসুধেন্দুশেখর দাসগুপ্ত প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—খাদি ও গ্রাম উদ্যোগ বিপণি, বি ৫৮—৮৬, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। মূল্য দশ আনা।

পৃথিবীর প্রধান প্রধান কয়েকটি দেশের জাতীয় পতাকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং তৎসহ ভারতের জাতীয় পতাকা ও তৎসংশ্লিষ্ট দুঃখ ও ত্যাগ বরণের কাহিনী লইয়া বইটি রচিত হইয়াছে। এ ধরণের বই বঙ্গভাষায় সম্ভবত এই প্রথম। জাতীয় পতাকার কয়েকটি রঙীণ ছবি এবং পতাকা উত্তোলনের একটি নক্সা গ্রন্থমধ্যে দেওয়া হইয়াছে। বিষয়বস্তুর নূতনত্ব হিসাবে আশা করি বইটি সকলেরই নিকট আকর্ষণীয় হইবে। ৩।৪৭

খাদ্যের নববিধান—শ্রীকুঞ্জরঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ২০৬ পৃষ্ঠা। মূল্য দুই টাকা। প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এ্যান্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

এই পুস্তকের কয়েকটি প্রবন্ধ ইতিপূর্বে আনন্দবাজার ও 'দেশ' পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। তখনই প্রবন্ধগুলি জনসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। গ্রন্থকার ঐ প্রবন্ধগুলির সহিত আরও অনেক নূতন বিষয় সংযোগ করিয়া এই বইখানা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে প্রচলিত খাদ্যের গুণাগুণ এবং রোগ ও স্বাস্থ্যে উহাদের বিভিন্ন প্রয়োগ বিধি বিস্তৃত ভাবে দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থকার এই পুস্তকের বিভিন্ন অধ্যায়ে শর্করা, আমিষ ও চর্বিজাতীয় খাদ্য, ভাইটামিন, ধাতব লবণ, ফল, শাক সব্জী, ক্ষার ও অম্লধর্মী খাদ্য, মসলা, প্রাকৃতিক খাদ্য, খাদ্যের তাপমূল্য, আহারের স্বাস্থ্য-নীতি এবং রোগের পথ্য প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। শুষ্ক বৈজ্ঞানিক আলোচনা অপেক্ষা কার্যকারিতার দিক হইতে বইখানাকে সুসম্পন্ন করার জন্য ইহাতে বিশেষভাবে চেষ্টা করা হইয়াছে। এইরূপ একখানা বই যে বাঙলা ভাষায় নাই, তাহা আমরা নিঃসংকোচে বলিতে পারি। আমরা আশা করি, স্বাস্থ্যকামী প্রত্যেকটি নরনারীর নিকটই এই বইখানা বিশেষ সমাদর লাভ করিবে।

শাশ্বতী — শ্রীঅনাথবন্ধু বেদজ্ঞ প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। ১৮১ পৃষ্ঠা, মূল্য তিন টাকা।

'শাশ্বতী' একখানি নূতন ধরণের উপন্যাস। বীরবল, মিহির, দেবব্রত, মীরা প্রভৃতি অনেকগুলি নরনারীকে কেন্দ্র করিয়া লেখক একটি দেশপ্রেম-মূলক কাহিনী রূপায়িত করিয়াছেন। প্রধান চরিত্র বীরবল—তাহার জীবনের ক্রমবিকাশের ধারা বেশ নিপুণতার সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে। ছাপা, কাগজ চলনসই, কিন্তু বাঁধাই তিন টাকা মূল্যের বইয়ের উপযুক্ত হয় নাই। ৩৮।৪৭

সচিত্র বিশুদ্ধ শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা—শ্রীগৌ[illegible] ৪৬১। শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী [illegible] কুসুম সম্পাদিত এবং কলিকাতা ৮নং [illegible] রোডস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীসুন্দরগো[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রকাশিত।

এই পঞ্জিকায় ব্যবহৃত মাস, পক্ষ, বার, [illegible] তিথি প্রভৃতির নাম বিভিন্ন বিষ্ণু নামে প্রকাশ[illegible] হইয়াছে। এই জন্য ভক্তগণ পঞ্জিকানুশীলন প্র[illegible] শ্রীনাম কীর্তনেরও সুযোগ পাইবেন। পঞ্জিকা চান্দ্রবর্ষ মতে অনুশীলিত। বর্ষের দ্বাদশ ম[illegible] নাম যথাক্রমে বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, [illegible] শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর, [illegible] নারায়ণ, মাধব ও গোবিন্দ—এই দ্বাদশ বিষ্ণু নির্দিষ্ট হইয়াছে। আরও বহুবিধ বি[illegible] অবতারণা আলোচ্য পঞ্জিকায় আছে যাহা ভক্ত[illegible] পক্ষে একান্ত অপরিহার্য। ৩৭

বিজ্ঞানের কথা

হারমান জোহানেস মালার

শ্রীশশাঙ্কশেখর সরকার

প্রফেসর হারমান জে মালার চিকিৎসা-বিদ্যায় ১৯৪৬ সালের নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন। কিন্তু কয়জন ডাক্তার প্রফেসর মালারের নাম শুনিয়াছেন? মালার আমেরিকান বৈজ্ঞানিক এবং আমেরিকান মেডিক্যাল এসো-সিয়েসানের গত ৯ই নবেম্বর তারিখের পত্রিকায় প্রফেসর মালারের এই বিশ্ববিখ্যাত প্রাইজ পাওয়ার বিজ্ঞপ্তি যেভাবে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে মনে হয় সেই দেশেরও বহু ডাক্তার প্রফেসর মালারের নাম জানেন না।

প্রফেসর মালার ডাক্তার নহেন; তিনি প্রজনন (Genetics) বিদ্যার চর্চা করেন। ১৯২৭ সালে তিনি প্রথম দেখান যে রঞ্জন-রশ্মি (X-Ray) দ্বারা বংশানুক্রম কণা অর্থাৎ জীনসের (Genes) পরিবর্তন আনা যায়। প্রজনন বিদ্যার ইতিহাসের গোড়ার দিকে জীনসের (Genes) সুকঠিন ভিত্তি ভাঙ্গা যায় কি না তাহা লইয়া প্রত্যেক পরীক্ষামূলক গবেষক গভীরভাবে চিন্তা করিতে থাকেন। তখন ১৮৯৫ খৃঃ আবিষ্কৃত রঞ্জন-রশ্মি দ্বারা পদার্থবিদেরা জড়জগৎ প্রায় তোলপাড় করিয়া ফেলিয়াছেন। মালারের বিচক্ষণ দৃষ্টি এই-দিকে পড়িল—তিনি পদার্থবিদের এই অস্ত্র জীবজগতের অন্তর্নিহিত সমস্যার জন্য প্রয়োগ করিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে অবশ্য তখন মানব-দেহের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার লক্ষ্য করার জন্য রঞ্জন-রশ্মির প্রয়োগ শুরু হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে রঞ্জন-রশ্মি ব্যবহারের ফলে মানব-দেহের নানা প্রকার বিকৃতিও ঘটিতেছে।

জীবদেহে রঞ্জনরশ্মি প্রয়োগের ফলে যে সকল দুর্বিপাক ঘটিয়া থাকে এবং তাহা যে কিরূপে হওয়া সম্ভব তাহা প্রফেসর মালারের গবেষণা হইতে বুঝা যায়। মালারের এই

প্রোফেসর মালার

গবেষণার ২০ বৎসর পরেও চিকিৎসাশাস্ত্রে রঞ্জন-রশ্মির প্রয়োগ সম্বন্ধে খুব বেশী পরিবর্তন আজিও হয় নাই। মালারের গবেষণার ফলে দেখা যায় যে, রঞ্জন-রশ্মির মাত্র ২০ r. মাত্রায় জীনসের (Genes) এবং অন্যান্য [illegible] (Tissue) মধ্যে পরিবর্তনের (Mutation[illegible] বাড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। পরিবর্তনের ফলে যাহা ঘটে তাহার অধি[illegible] প্রাণহানিকর। অথচ চিকিৎসা শাস্ত্রের প্র[illegible] কিভাবেই না দেশে বিদেশে সংখ্যাতীত [illegible] নারী প্রত্যহই রঞ্জন-রশ্মির সম্মুখীন হই[illegible] একখানি রঞ্জন-রশ্মির ফোটোগ্রাফ [illegible] রোগীর দেহে অন্তত ৪০০ r মাত্রা লাগিয়া থাকে। রোগীর দেহ ইহাতে [illegible] সাংঘাতিক হইতে পারে তাহার প্রণালী [illegible] আজিও সম্যকরূপে জানা নাই। রঞ্জন-র[illegible] এই প্রকারের অন্যান্য রশ্মিগুলি [illegible] শরীরে পুঞ্জীভূত আকারে (cumula[illegible] কুফল আনিয়া থাকে। প্রফেসর ম[illegible] গবেষণা পৃথিবীর অন্যান্য গবেষণা[illegible] সমর্থিত হইয়াছে এবং ইহার কুফল [illegible] সন্দেহের অবকাশ নাই।

জাপানের উপর আণবিক বোমা প্র[illegible] ফলে তথাকার জনসাধারণের উপর যে শ[illegible] রশ্মি বিকীর্ণ করা হইয়াছে এবং তাহা[illegible] Muller Effectএর মতে যে কি ভয়াব[illegible] হইতে পারে তাহা আনবিক বোমা [illegible] করিবার পূর্বে আমেরিকার সুধী [illegible] একবারও ভাবিয়া দেখেন নাই। প্রফেসর ম[illegible] উপর এই বিশ্ববিখ্যাত সম্মান বর্ষিত [illegible] সঙ্গে আজ এই কথাই বারবার মনে প[illegible]

চীনের চিত্রকলা

শ্রীযতীন্দ্র সেন

"চীন শিল্পীদের শিল্পসাধনার গতি কোন্ পথে চলেছে?" এই সহজ প্রশ্নটির মধ্যেই ভবিষ্যৎ চীন-সংস্কৃতির সমগ্র সমস্যা নিহিত। প্রশ্নটি সহজ হলেও এর উত্তর বর্তমানে পাওয়া শক্ত। শিল্পের প্রতি ক্ষেত্রে শিক্ষক ও ছাত্রগণের মধ্যে আজ যে বিতর্ক
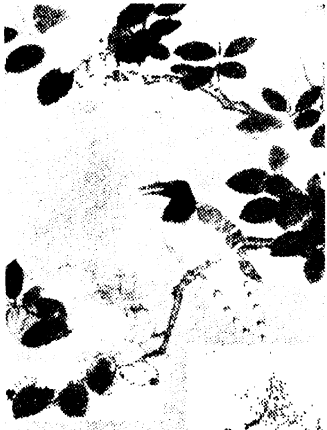
পুষ্পিত বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট পাখী
প্রাচীন চিত্র : দশম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে সুঙ্ রাজত্বকালে অংকিত

চলছে তা হচ্ছে এই,—চিরাগত শিল্পরীতির চর্চাই উৎসাহসহকারে করা উচিত, না, নূতন জ্ঞান ও আঙ্গিকের সাহায্যে তার পরিবর্তন সাধন করা উচিত,—অথবা প্রাচীন শিল্পরীতিকে অচল ও নৈরাশ্যজনক বিবেচনা করে একমাত্র আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পরীতির দিকেই মনোযোগ দেওয়া উচিত। এ'দের মধ্যে দ্বিতীয় দল,—যাঁরা পাশ্চাত্য শিল্প অনুশীলন করে প্রাচীন শিল্পরীতির সঙ্গে নূতন শিল্পাদর্শের খাপ খাইয়ে প্রাচীন শিল্পরীতির মধ্যে নূতন প্রাণশক্তি সঞ্চার করতে চান, তাঁদের অর্থাৎ এই মধ্যবর্তী দলেরই সফলতা-লাভের আশা আছে বলে মনে হয়। কিন্তু কোন কোন শিল্প-সমালোচক মনে করেন চীনের শিল্পে সাফল্যের সঙ্গে নূতন শিল্প-সৃষ্টি করবার মতো কোন যুগের আবির্ভাব ঘটান এ'দের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

চীনের শিল্পরীতি যে বিগত দু' তিন হাজার বছর যাবৎ অপরিবর্তিত অবস্থায় রয়েছে, একথা কেবল আপেক্ষিকভাবে সত্য। যদি কেউ চৈনিক শিল্পের ক্রমবিবর্তনের ধারা অনুসরণ করেন, তা হ'লে তিনি, যুগে যুগে চীন শিল্পের যে পরিবর্তন ঘটেছে, তার মনোজ্ঞ ইতিহাস রচনা করতে পারবেন। যাকে সাধারণতঃ চীনের স্থাপত্য বা চিত্রকলা বলা হয়, ইউরোপের তুলনায় তা বহু প্রাচীন এবং ইউরোপীয় স্থাপত্য ও শিল্পকলার বহু পূর্বেই তা চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে। চীনের স্থাপত্য ও শিল্পকলা শতাব্দীর পর শতাব্দীর সক্রিয় সাধনার ফল।

"চীনের শিল্প-সাধনার গতি কোন্ দিকে চলেছে?"—এই প্রশ্নে, চিরাচরিত শিল্প-

অভিনেত্রী
শিল্পী : লিন্ ফেঙাসিয়েন (আধুনিক পন্থী)

রীতিতে আরও উন্নতি সাধন সম্ভবপর কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। চিরাচরিত শিল্পাদর্শ অনুসারে অংকিত চিত্রের অংকন-শৈলী এত পরিণত ও সুনিপুণ হতে পারে যে, তার অধিকতর উৎকর্ষ সাধন করা সম্ভবপর না-ও হতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে চিত্রকলা বৈশিষ্ট্যহীন অনুকৃতি মাত্র হয়ে পড়তে পারে। অধিকন্তু কোন শিল্প-কলাই নিরালম্বভাবে ক্রমোন্নতি লাভ করতে পারে না এবং কোন জীবন্ত শিল্পই, যারা সেই শিল্পের চর্চা করে,

একটি আধুনিক চিত্র
শিল্পী : ন্যানিঙ্ স্টেলাওঙ্

তাদের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে না। আমরা যাকে বর্তমানে "চীনের শিল্প" বলি, তাতে এক সময় চীনের জনগণের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী ও মনস্তাত্ত্বিক ভাবধারা যথার্থরূপে রূপায়িত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু যখন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশান্তিতে ও মনস্তাত্ত্বিক ভাবলোকে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়, যেমন আমাদের চোখের সামনেই আজকাল ঘটছে, তখন এক সময়ে যে শিল্পরীতি যথোপযুক্ত ছিল, তা অনুপযোগী, এমন কি অচল পর্যন্ত হয়ে পড়ে। প্রকৃত কথা হচ্ছে এই যে, কোনও শিল্পরীতি পছন্দ করে নেওয়া ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপার নয়, পরন্তু তা ইতিহাসের প্রয়োজনের তাগিদেই হয়ে থাকে। যে শিল্প-রীতির মৃত্যু অনিবার্য, অধিকতর এবং উৎকৃষ্টতর অনুকৃতির সাহায্যে তাকে পুনরুজ্জীবিত করা যায় না এবং যার আবির্ভাব ঘটবে, ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের জন্য তার পথ কখনও রোধ করা যায় না।

চীনের স্থাপত্য

চীনের যে কোন অট্টালিকার দিকে তাকালে,—তা কোন মন্দিরই হোক, কোন সুপ্রাচীন গৃহই হোক, বা পিপিং-য়ে অবস্থিত সম্রাটের প্রাসাদই হোক,—মনে যে ভাবের উদয় হয়, তা হচ্ছে শান্তি, সমন্বয় ও মাতা রসুন্ধরার প্রতি অনুরাগের ভাব। এই ভাব আধুনিক কোন 'স্কাই-স্ক্রেপার' (বা গগনচুম্বী অট্টালিকা), অথবা কোন গথিক্ গীর্জার দিকে তাকালে মনে যে ভাবের উদয় হয়, তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। শেষোক্ত ভাবটি পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অনুভূতি এবং শূন্যালোকে গতিশীল হওয়ার একটা অবচেতন বাসনা মনে জাগ্রত করে। এ থেকে আমরা বলতে পারি, আধুনিক 'স্কাই-স্ক্রেপার' গতিদ্যোতক স্থাপত্য-নিদর্শন এবং চীনের স্থাপত্য হচ্ছে স্থাণু বা স্থিতিশীলতার ব্যঞ্জনাময়। চীনের গৃহ-নির্মাণ-শিল্পে যে একটি মাত্র জিনিষ শূন্যালোকে অধিরোহণের ভাব জাগায়, তা হচ্ছে গৃহের উপরের দিকে কোণ-তোলা ছাদ,—কিন্তু তাও একটা মৃদু ভঙ্গি, একটা দুর্বল চেষ্টা মাত্র এবং প্রধানতঃ অলঙ্কৃত। চীনের প্যাগোডা অনেক-কাল আগে থেকেই চীনের প্রাকৃতিক দৃশ্য-চিত্রের অংশস্বরূপ হয়ে আসছে। এই প্যাগোডার স্থাপত্য-রীতিতে নিঃসন্দেহে একটা ঊর্ধ্বমুখী গতির ভাব আছে। কিন্তু এই রীতি প্রথমে ভারতবর্ষ থেকে আমদানি হয়েছিল এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তা কখনও খাঁটি চীন-স্থাপত্য-রীতির দাবী করতে পারে না।

চীনের অট্টালিকার ভিতরে ও বাহিরে সামঞ্জস্য-বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। তাতে ভার-সাম্য বিদ্যমান,—যে ভারসাম্যের ভাব জীবনে প্রতিফলিত হয়ে চীনাদের আচার-ব্যবহারে বিনয়ের বৈশিষ্ট্য দান করে। অট্টালিকার বিভিন্ন অংশ সুনিয়মিত এবং দিগন্তরেখার সঙ্গে সমান্তরালভাবে, অর্থাৎ লম্বালম্বিভাবে অট্টালিকার যে গঠন, তাতে সর্বত্র সুক্রমিকতা অক্ষুণ্ণ থাকে। উদাহরণ-স্বরূপে বলা যেতে পারে, চীনের কোন গৃহের সদর দরজা কখনও একপেশে হ'তে পারে না,—সর্বত্রই ঠিক মাঝামাঝি হবে। যে সমানুপাতের ধারণাকে চীনারা এত মূল্য-বান বলে মনে করতে শেখে, সেই সমানুপাত-অনুযায়ী কেবল এই ধরণের অট্টালিকা নির্মিত হয়ে থাকে। গৃহই হচ্ছে সমগ্র দার্শনিক জীবনের অভিব্যক্তি।

তিন হাজার বছর ধরে চীনাদের কোন 'স্কাই-স্ক্রেপার' বা গগন-চুম্বী অট্টালিকা-গঠনের প্রয়োজন ঘটে নাই। মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে এটা অসম্ভব ছিল। প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে যে সমন্বয় বিদ্যমান, ত্রিশ অথবা চল্লিশ-তলা অট্টালিকা নির্মাণ করে আকাশ বিদ্ধ করলে তা বিপর্যস্ত হ'ত। এই সমন্বয়ই হচ্ছে চীনের প্রাকৃতিক দৃশ্যের বৈশিষ্ট্য। চীনারা মাটী আঁকড়ে থাকতে এবং নিজেদের একটা গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতেই ভালবাসত। 'স্কাই-স্ক্রেপারে'র পেছনে যে মনস্তাত্ত্বিক উদ্দেশ্য বিদ্যমান, তার অর্থ হচ্ছে আত্ম-সম্প্রসারণ। কাজেই দোতলার বেশী উঁচু বাড়ি চীনে তৈরি হয় না,—সাধারণতঃ একতলাকে সামান্য একটু বাড়িয়েই দোতলা তৈরি করা হয় এবং বাইরে থেকে দোতলার অংশটুকু এক রকম দেখাই যায় না। এই মাটী আঁকড়ে থাকার ব্যাপারে চীনের গৃহগুলিতে শান্তি ও প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতার ভাবই যথাযথরূপে ফুটে ওঠে।

বাঘ — শিল্পী : কাও ওয়েঙ (প্রাচীন ও নূতন পদ্ধতির সমন্বয়েচ্ছু দলের)

চীনের চিত্র-কলা

স্থানবিশেষের দৃশ্য, গাছ, ফুল এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী-অঙ্কনের ব্যাপারে চীনারা তাদের অনুভূতি এবং পৃথিবীকে দেখবার তাদের বিশিষ্ট ভঙ্গীর সবখানি যেন উজাড় করে দিয়েছে। যদিও দ্বিতীয় শতকের আগে মানুষের মূর্তি আঁকার রীতিই তাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত ছিল, তা হ'লেও এই চিত্রকে তাদের সবচেয়ে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক চিত্র বলা যায় না।

আধুনিক শিল্পিগোষ্ঠীর চিত্র বাদ দিলে, চীনের চিত্র পাশ্চাত্যের চিত্র অপেক্ষা নিঃসন্দেহে অধ্যাত্মীয় বা বস্তুনিরপেক্ষ। কেবল চীনের শিল্প-সম্বন্ধীয় উপলব্ধির ভঙ্গীই নয়, চীনা শিল্পীদের চিত্রকলা বুঝতে হলে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের 'মানস-অভিক্ষেপ-তত্ত্ব' বা 'Theory Empathy' অর্থাৎ শিল্পের বিষয়-বস্তুতে শিল্পীর মনের অভিক্ষেপ বা আরোপ করবার রীতি হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। অনেক সময় বলা হয়ে থাকে, এই মানস-অভিক্ষেপ বা শিল্পের বিষয়বস্তুর সঙ্গে শিল্পীর মনের সমন্বয়-বোধই হচ্ছে চৈনিক চিত্রকলার বড় কথা। সব কিছুতেই ভগবৎ-সত্তা বিরাজমান,—জগৎ সম্বন্ধে শিল্পীর এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই স্বাভাবিক ক্রমেই পরোক্ষ-ভাবে মানস-অভিক্ষেপ তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে এবং 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে মানুষ প্রকৃতিরই অংশ-বিশেষ।

চীনা শিল্পীদের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর চিত্রের দার্শনিক পটভূমি উপলব্ধি করা বিশেষ-ভাবে আবশ্যক। প্রকাশ-ভঙ্গির দিক থেকে চীনের দৃশ্যচিত্র প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সমন্বয়-বোধের মূর্ত অভিব্যক্তি। এই সমন্বয় সৃষ্টি করবার এবং তা অক্ষুণ্ণ রাখবার পক্ষে মানুষ প্রকৃতি থেকে পৃথক কিংবা তার বিরুদ্ধ নয়, মানুষ প্রকৃতির মধ্যেই হারিয়ে যায়। এই জন্যে চিত্রের পরিপ্রেক্ষিত বা perspective শিল্পীর নিজের চোখে প্রতিভাত ব্যাপার নয়, তা হচ্ছে যেন ঊর্ধ্বলোক থেকে দেখা পারসপেক্টিভ্। ঊর্ধ্বলোক থেকে দেখলে দৃশ্যের পটভূমি বা দৃশ্যের সম্মুখভাগ হিসাবে আলাদা করে কিছু চোখে পড়ে না, কিন্তু প্রকৃতির সমন্বয়প্রাপ্ত এমন একটা দৃশ্য

আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, যার মধ্যে পাহাড়-পর্বত, নদী, বাড়ি, গাছপালা, মানুষ সব মিলে একাকার হয়ে গেছে।

চীনের দৃশ্য-চিত্র অঙ্কনে আর একটি দার্শনিক মনোভাব প্রকাশ পেয়েছিল,—তা হচ্ছে ঐহিক সুখদুঃখময় ঘটনাপুঞ্জে পূর্ণ এই মাটির জগৎ থেকে মনকে দূরে সরিয়ে নিয়ে প্রকৃতির জগতে আশ্রমবাসী তপস্বিজনোচিত আনন্দের অনুসন্ধান। একে পলায়নী বৃত্তি বলা যেতে পারে, কিন্তু এই পলায়নী বৃত্তির অর্থ ছিল মনুষ্য-কেন্দ্রিক ও আত্মকেন্দ্রিক ব্যাপার থেকে মনকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া।

মানুষ প্রাত্যহিক সমস্যাসমূহের সংস্রবে এসে মানসিক শান্তি পেত না; যে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষ একাত্মতা অনুভব করত, সেই প্রকৃতির কোলে আশ্রয় নিয়ে মানুষ সেই অলব্ধ শান্তি লাভ করত। যা কৃত্রিম নয়—প্রাকৃতিক, তা থেকে শিল্পী প্রেরণা লাভ করত। কাজেই একখণ্ড বাঁশ, একটা ক্রিসান-থিমাম্ ফুলের এক থোকা ফুল অথবা একটা অর্কিড মানুষের হাতের তৈরি জিনিসের চেয়ে ছবি আঁকবার পক্ষে অধিকতর উপযোগী ছিল। যা স্বভাবতঃই সুন্দর, মহনীয় এবং ইহলোকের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য, তার উপরই মনোযোগ দেওয়া হত, নগ্ন মনুষ্য-মূর্তি ইত্যাদির মতো পার্থিব জিনিসের প্রতি কোনরূপে আগ্রহ দেখানো হত না। প্রকৃতিতে ফিরে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকেই শিল্পী চিত্রে অনাড়ম্বর সহজ সরল রূপ ফুটিয়ে তুলতে পারতেন। এ থেকেই বুঝতে পারা যায়, চীনের কোন কোন প্রসিদ্ধ চিত্রে একেবারেই রং ব্যবহৃত হয় নি এবং তাতে খুঁটিনাটি কিছুই দেখান হয় নি।

দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ছাড়াও চীনা ও পাশ্চাত্য চিত্রকরদের মধ্যে আরও কতকগুলি পার্থক্য আছে, যা থেকে চীনা-রীতির উৎকর্ষ বেশ ভাল করে বুঝতে পারা যায়।

চিত্রাঙ্কন ও হস্তলিখনের (ক্যালিগ্রাফি) মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, নরম তুলি এবং ছবি-আঁকার উপাদান হিসাবে নরম কাগজ অথবা রেশমের ব্যবহার, প্রাচীন আদর্শের দিকে ঝোঁক, রেখার কবিত্বময় লীলায়িত গতি—এ সমস্তই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শিল্প-সৃষ্টির উপযোগী ছিল। ভবিষ্যতে ছবি আঁকার উপকরণ ও উপাদানের এবং দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটলে চীন-শিল্পের এই বিভাগের অগ্রগতি যে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তাতে কোন সন্দেহ নাই।

প্রাচীন পদ্ধতি-অনুকরণের কুফল

প্রাচীন আদর্শের দিকে যে চিরাচরিত অনুরাগ দেখা যায়, অন্য কিছুর চেয়ে কেবল তার ফলেই হয়ত চীনের চিত্রকলার অগ্রগতি বেশী বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। প্রাচীন শিল্প-গুরুদের অনুকৃতি এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, অঙ্কিত মনুষ্যমূর্তির দেহ পুরানো ধরণের পোষাকে সজ্জিত না হলে লোকে তা খাঁটি চীনা চিত্র বলে স্বীকার করে নেয় না। চৈনিক চিত্রের দৃশ্যাবলীতে আধুনিক সভ্যতার কোন ছাপই পাওয়া যায় না। যেমন প্রাচীন দলের কোন শিল্পীই তাঁর ছবিতে মোটর গাড়ী বা রেলওয়ে ট্রাক আঁকার কথা কল্পনাও করতে পারেন না। কাজেই আধুনিক চিত্রশিল্পীর পক্ষে এ একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদি তিনি প্রাচীন রীতি অনুসরণ করতে চান, তবে তাঁকে আধুনিক জীবনযাত্রার দিকে চোখ বন্ধ করতেই হবে, আবার তিনি যদি তাঁর ছবিতে জীবনযাত্রা যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলতে চান, তবে তাঁকে নির্ঘাৎ 'আধুনিক' ও 'অ-চীনা' বলে অপাংক্তেয় হয়ে পড়তে হবে! প্রাচীন দলের শিল্পীদের কাছে চিত্রকলা অনুকরণ মাত্র এবং শিল্পীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃত জীবনের রূপ ফুটিয়ে তোলার প্রয়োজন তাঁদের নাই। এইরূপে এই চিত্রকলা এমন এক বস্তু হয়ে দাঁড়ায়, যা প্রাচীন ও প্রাণহীন। যদি এই চিত্রকলার প্রশংসা করতে হয়, তবে প্রাচীন কৌতূহল-উদ্রেককারী কোন জিনিসকে যেভাবে প্রশংসা করা হয়, ঠিক সেইভাবেই প্রশংসা করতে হবে।

চীনের অধিকাংশ চিত্রকর, যাঁরা জাপান, ইউরোপ অথবা আমেরিকায় শিক্ষালাভ করেছেন, অথবা পরোক্ষভাবে পাশ্চাত্য শিল্প-গুরুগণের সংস্রবে এসেছেন, তাঁরা চিত্রকলার এই অনুকৃতিতে সন্তুষ্ট নন। নূতন শিল্প-সৃষ্টি করে তাঁরা তাঁদের ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখতে ইচ্ছুক। তাঁরা মনে করেন, পাশ্চাত্য শিল্পগুরুদের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখবার আছে,—যেমন বিশেষ করে রংয়ের আলোছায়ার উৎকৃষ্ট শিল্পরুচিসম্মত ব্যবহার, চিত্রে দৈর্ঘ্য-প্রস্থ বাদেও বেধ বা গভীরতার ভাব ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস, মনে আনন্দদান করবার উপযোগী করে' মনুষ্যমূর্তি অঙ্কন, এবং চিত্রে শিল্পীর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া। অতীতে যে রূপ-দক্ষতা লাভ করা গিয়েছে, তার বিস্মৃতি যেমন আধুনিক চীনা শিল্পীদের বাঞ্ছনীয় নয়, তেমনি, প্রাচীন শিল্পগুরুদের অন্ধ অনুকরণ করতেও তাঁরা বিশেষ ইচ্ছুক নন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অনুকরণের ফলে চীনের চিত্রকলা এমন এক চরম পরিণতি লাভ করেছে, যার উন্নতি সাধন করা আর সম্ভব নয়,—এই চিত্রকলা যাতে নব সম্ভাবনার ভিতর দিয়ে গড়ে উঠতে পারে, তার উপায় আবিষ্কারের জন্যে চীনের চিত্রশিল্পিগণ আগ্রহান্বিত। চিত্রশিল্পে নবরূপ প্রবর্তন করতে গিয়ে চীনা শিল্পীদের অনেক কিছু পরীক্ষা করে দেখতে হবে। তাঁদের নূতন ছবি আঁকার উপকরণগুলি পরীক্ষা করলেই চলবে না, প্রাচ্য খণ্ডে যে নূতন জগতের আবির্ভাব ঘটতে চলেছে, তার বহু সম্ভাবনাপূর্ণ জটিলতা নিয়েও তাঁদের পরীক্ষা করতে হবে।

রেস্তোরাঁ (আধুনিক চিত্র)   শিল্পী : ন্যানিঙ্ স্টেলাওঙ্

চৈনিক চিত্রকলার নবরূপ

চীনের জীবন-রূপের যেমন রূপান্তর ঘটছে, চীনের অধিবাসীদের দার্শনিক দৃষ্টি-ভঙ্গির যেমন পরিবর্তন হচ্ছে, চৈনিক চিত্র-কলার প্রকাশভঙ্গিরও তেমনি পরিবর্তন ঘটা আবশ্যক। গতি-প্রবাহহীন চীন তার চিরা-চরিত শিল্পাদর্শ রক্ষা করে চলতে পারে। কিন্তু নব-রূপান্তরের ভিতর দিয়ে পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক সভ্যতার অবিচ্ছিন্ন অংশ হয়ে দাঁড়ালে, তার সভ্যতার রূপে যে বিশ্বজনীন উপাদান আছে তারও পরিবর্ধন ঘটতে বাধ্য। বৃথা গর্বের বশে অথবা ঐতিহাসিক পরিণতি-সম্বন্ধে সংকীর্ণ জ্ঞানের জন্য কোন দেশের পক্ষে সেই দেশের শিল্পরীতি পরিবর্তন করতে অস্বীকৃত হওয়ার অর্থ হচ্ছে শিল্পে প্রাদেশিকতা বজায় রেখে চলা। জীবন-ধারার প্রতি চোখ বন্ধ করে রাখলেই শিল্পে প্রাদেশিকতা টিকিয়ে রাখা চলে। সুন্দর সুন্দর উদ্যান ও প্যাগোডার দেশ চীন, ক্ষুদ্র পাদুকা-বন্ধ পদবিশিষ্টা তন্বী রমণীগণের চীন, দীর্ঘ আলখাল্লা পরিহিত, হস্তাঙ্গুলির দীর্ঘ নখবিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তিগণের চীন, সহিষ্ণু কৃষক ও নিষ্ঠুর ভূম্যধিকারিগণের চীন, বৌদ্ধ ভিক্ষু ও তাও-ধর্মমন্দিরের চীন এবং কনফুসিয়াস ও মধ্যপথগামিতা-মতবাদের * দেশ চীনের একটা নিজস্ব সৌন্দর্য আছে। শান্ত গৃহগুলিতে বায়ু-বাহিত সংগীতে এবং অতি প্রাকৃত দৃশ্য-চিত্রে এই সৌন্দর্য প্রতিফলিত।

কিন্তু চীনের পরিবর্তন ঘটছে। চীনের অধিবাসীরা ক্রমাগত অধিকসংখ্যক মোটর গাড়ির রাস্তা, রেলপথ, বিমানক্ষেত্র, শ্রম-শিল্পের যন্ত্র, যন্ত্রপাতি মেরামতের কারখানা, গ্যারেজ, উদ্যান ও আধুনিক জীবনযন্ত্রের নানা উপকরণ, গঠন করছে।

চীনের তরুণ-তরুণীরা লণ্ডন ও সান-ফ্রান্সিসকো থেকে প্রচারিত বেতারবার্তা শুনবে, সিনেমায় যাবে, টিন-প্যান অ্যালের আধুনিক গানগুলি গুণ্ গুণ্ করে ভাঁজতে থাকবে এবং ক্যানেস্ত্রা বাজনার তালে তালে নাচবে। ভবিষ্যতে চীনের আরও বাণিজ্য-কুশলতা, সময়ের মূল্যে সম্বন্ধে অধিকতর সচেতনতা এবং বর্তমান জগতের গতি-চাঞ্চল্যের সংগে খাপ খাওয়ানর জন্যে আরও আগ্রহ ও উদ্যম দেখাতে হবে। তা হলেই দার্শনিক-সুলভ প্রশান্তির পরিবর্তে বর্তমান যুগের জীবন-চাঞ্চল্যের স্পন্দন জাগবে। এইরূপ একটি পৃথক জগতে চীনা শিল্পীদের অধিক-তর বিশ্বজনীন আদর্শ নিয়ে শিল্প-পদ্ধতি গড়ে তুলতে হবে।

যদি শিল্প-পদ্ধতিকে যথার্থ হতে হয়, তবে শিল্পপদ্ধতি ও জীবনকে অবিচ্ছিন্ন হতে হবে। শিল্পের পদ্ধতি ও ভাবের মধ্যেও তাহলে সংগতি-রক্ষা হবে। যে শিল্প-রূপের ভিতর জীবন্ত ভাবের পরিপ্রকাশ ঘটে না, তা মৃত। এইরূপভাবে প্রত্যেক ঐতিহাসিক যুগেরই এক একটি বিশিষ্ট শিল্পরীতি আছে এবং প্রাচীন শিল্পরীতি এই অর্থেই প্রাচীন যে, তাকে সেই ঐতিহাসিক যুগের সীমার বাইরে জবরদস্তি করে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। অন্যান্য নানা জিনিসের মতো শিল্পও মানুষেরই সৃষ্টি, কাজেই তা সময়ের প্রভাব-শূন্য নয়। কাল ও স্থানের সংগে শিল্পের যোগ থাকলেই তার অর্থ হয়। কেবল অতীতের সংগে যোগ রেখে শিল্পের কথা চিন্তা করার অর্থ হচ্ছে জীবনের প্রকৃত প্রকাশ-ভঙ্গিকে অস্বীকার করা।

* মধ্যম প্রতিপদ বা Doctrine of Mean.

মিঃ সুরাবর্দী এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন —কোম্পানী এবং কর্মীদের মধ্যে কোন রকম আপোষ মীমাংসা না হইলে গভর্নমেণ্ট নিজেই ট্রাম চালাইবেন। "প্রধান সচিব এবং শ্রমসচিবের মধ্যে কে কনডাকটার
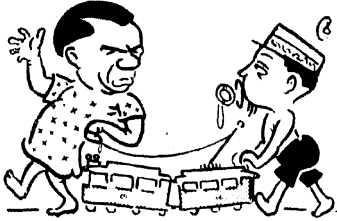
এবং কে ড্রাইভার হইবেন সেই কথা অবশ্য বিবৃতিতে বলা হয় নাই"—এই বিবৃতি বিশুখুড়োর।

* * *

সরবরাহ সচিব মিঃ আবদুল গফরান মুন্সীগঞ্জ অঞ্চলে সফরে গিয়াছিলেন। সংবাদে প্রকাশ, এক সভায় জনসাধারণ তাহাদের বস্ত্রাভাবের কথা তাঁহার নিকট উল্লেখ করিলে মন্ত্রী মহাশয় নাকি বলিয়াছেন—"সভাতে উপস্থিত কাহাকেও তো উলঙ্গ দেখিতেছি না, তবে আর বস্ত্রাভাব কোথায়।" এই উলঙ্গ যুক্তির পর জনসাধারণ নিশ্চয় বেকুব বনিয়া গিয়াছিল। খুড়ো বলিলেন, "তাদের ফাঁকিবাজিটা এইভাবে ধরা পড়িয়া যাইবে ভাবিতে পারিলে হয়ত তাঁরা........কিন্তু খুড়ো কথাটা শেষ করিতে পারিলেন না, হয়ত মন্ত্রী মহাশয়ের মত উলঙ্গ-সত্য বলিবার সৎ সাহস তাঁহার নাই বলিয়াই।

* * *

নূতন সহযোগী "ইত্তেহাদ" "মুরগীর মড়কের প্রতিষেধ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ উপহার দিয়াছেন। মুরগীর ব্যবসায়ীরা ইহাতে নিশ্চয়ই উপকৃত হইবেন। "কিন্তু সর্বসাধারণ উপকৃত হইতেন মুরগীর লড়াইর প্রতিষেধ সম্বন্ধে প্রবন্ধ ছাপাইলে"—মন্তব্য খুড়োর।

* * *

বার্মিংহাম কর্পোরেশন নাকি একটি Dance Hall স্থাপন করিয়াছেন এবং নাগরিকদিগকে সেখানে নৃত্যানন্দ উপভোগ করিতে আহ্বান জানাইয়াছেন। কলিকাতার নাগরিকদের তেমন সুবিধা না থাকিলেও

পৌরকর্তাদের "তাণ্ডব" পরিদর্শনের সৌভাগ্য হইতে তারা নেহাৎ বঞ্চিত নহেন।

* * *

জানা গেল বড়লাটের প্রাসাদটিকে নাকি জাতীয় মিউজিয়ামে পরিণত করার পরিকল্পনা চলিতেছে। প্রাদেশিক লাটভবনগুলিকে অতঃপর চিড়িয়াখানায় পরিণত করিলেই পরিকল্পনা সর্বাঙ্গসুন্দর হয়।

* * *

THAMES rises one inch hourly—একটি সংবাদ। আশ্চর্য নয়, শ্রীমতী রাধার নয়নজলে একদিন যমুনার জল বাড়িয়া গিয়াছিল। আজ মিঃ চার্চিল প্রমুখ সাম্রাজ্যবাদীদের নয়নজলেই টেমসের জল হয়ত বাড়িয়া যাইতেছে।

* * *

সরকারী বন বিভাগের ব্যয়-বরাদ্দের জন্য বাষট্টি লক্ষ তিরাশী হাজার টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। শুনিলাম, কংগ্রেসী

সদস্যারা নাকি এই ব্যয়বরাদ্দের বিরোধিতা করিয়াছেন। খুড়ো বলিলেন—"তাঁদের এই মনোভাবের প্রশংসা করিতে পারিলাম না। জনসাধারণের পক্ষে যখন এখন 'যথারণ্যম্ তথাগৃহম্' হইয়াছে তখন বন বিভাগকে উন্নত করাকেই সরকারের একান্ত কর্তব্য বলিয়া আমি মনে করি।"

* * *

বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মহাশয় সম্প্রতি এক জনসভায় বলিয়াছেন—"প্রয়োজনীয় অনেক জিনিসের জন্যই বাঙলাকে পরের উপর নির্ভর করিতে হয়: কাপড়, তেল, নুন, ডাল, চিনি, সুতা, কেরোসিন........কিন্তু বক্তৃতার সমস্ত অংশটা শেষ করিবার আগেই খুড়ো বলিয়া

উঠিলেন—"এমন কি পুলিশ ও গুণ্ডা আমদানীর ব্যাপারেও বাঙলা পরমুখাপেক্ষী!"

* * *

জার্মানিতে পুলিশ এবং সরবরাহ বিভাগে লোক নিয়োগ ব্যাপারে একটি অভিনব পন্থা অবলম্বন করা হয়। চাকরীতে বহাল করিবার আগে প্রত্যেককেই ওজন করিয়া নেওয়া হয়। কতকদিন পর যদি দেখা যায় যে, নিতান্ত বিনা কারণে তাহাদের ওজন বাড়িয়া গিয়াছে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে কাজ হইতে বরখাস্ত করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। খুড়ো বলিলেন—"চাকরী বজায় রাখিতে হইলে বাঙলা দেশ হইতে কিছু হজমীগুলী যেন জার্মানি নিয়া যান, দেখিবেন নির্বিচারে হাতী ঘোড়া গিলিয়াও ভিজা বিড়ালটি সাজিয়া বসিয়া থাকা সম্ভব হইবে, ওজনে রতি-মাষাও এদিক-সেদিক হইবে না।"

* * *

'FUEL crisis not to affect production of spring and summer fashions'—একটি প্রবন্ধের শিরোনামা। খুড়ো বলিলেন—"কয়লা কোন্ ছার, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, Great Killing-এও ফ্যাসান অব্যাহতই রহিয়াছে এবং থাকিবে।"

গুজব

গত কয়েক মাস যাবৎ দেশময় যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা লঙ্কাকাণ্ড চলছে তার ফলে দেশে একটা অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা যে পরিমাণে অস্বাভাবিক হয় মানুষের মানসিক অবস্থাও সেই পরিমাণে অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে। বহুকাল আমরা এমন সদাসন্ত্রস্ত সদা সশঙ্কিত অবস্থায় দিন কাটাইনি। বাঙালীর প্লীহা কোনকালেই সুস্থ নয়, একটুতেই পিলে চমকে ওঠে। যদি শোনে গড়পারে হাঙ্গামা হয়েছে অমনি সহরের দূরতম প্রান্ত অবধি চকিত এবং বিচলিত হয়ে পড়ে। টালায় গোলযোগ হলে টালিগঞ্জে দোকান বন্ধ হয়ে ওঠে---। মুখে মুখে পল্লবিত হয়ে এতটুকু ব্যাপার এ-ই বিশাল হয়ে ওঠে। কমিয়ে বলা কার্পণ্য কাজেই সবাই বাড়িয়ে বলে। ফলে আহত ব্যক্তি হয় নিহত, আর একের মুখের এক, দশের মুখে দশ হয়ে ওঠে। স্নো-বলের মতো কথা মুখে মুখে গড়াতে গড়াতে ক্রমেই আয়তনে বড় হতে থাকে। বিহার দাঙ্গায় মৃতের সংখ্যা শেষ পর্যন্ত ত্রিশ হাজারে গিয়ে উঠেছে। স্বয়ং জিন্না সাহেব বিলেতে গিয়ে ঐ সংখ্যাটি প্রচার করেছেন। ভবিষ্যৎ পাকিস্তানের ইস্কুল পাঠ্য ইতিহাসে উক্ত সংখ্যা অধিকতর স্ফীতিলাভ করবে, আশা করা যায়।

পাঞ্জাবের হাঙ্গামা সম্বন্ধে ওখানকার একজন নেতা বলেছেন মিথ্যে গুজবের ফলেই ব্যাপারটা এতো দ্রুত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। একজন বল্লে, অমুক যায়গায় মসজিদ ধ্বংস হয়েছে আর একজন এসে বল্লে, অমুক যায়গায় মন্দির। বাস্ আর যায় কোথায়! যে দেবতার গৃহের কোনই প্রয়োজন নেই সে দেবতার গৃহরক্ষার জন্য নিরপরাধ ব্যক্তির গৃহদাহ করতে হবে। দেবতাকে রক্ষা করবার জন্যে মানুষকে হত্যা করতে হবে। মন্দির কিম্বা মসজিদ ভেঙে দিলেই যে দেবতা নিরাশ্রয় হয় সে অক্ষম দেবতার পূজো করে কি লাভ? আর সত্যি যদি তিনি জাগ্রত দেবতা হন তবে কত বড় আস্পর্ধা মানুষের? যে ক্ষুদ্র কৃপণ—নাহি পারে গৃহ দিতে গৃহহীন নিজ প্রজাগণে, সে আমারে গৃহ করে দান! দেবতার এতবড় অপমান কোন দেশে কবে হয়েছে? এই অপমানের লজ্জাতেই দেবতার abdicate করা প্রয়োজন।

বাঙলাদেশের অতি সরলপ্রাণ গ্রাম্য মুসলমান সাধক কবি বলেছেন—তোমার পথ ঢাইকাছে মন্দিরে মসজিদে। এতবড় সত্য কথা

ক'জন শিক্ষাভিমানী আধুনিক মানবের মুখ দিয়ে বেরিয়েছে! মন্দির মসজিদ দিয়েই দেবতার পথ রোধ করে রেখেছি। আর মানুষের উন্মত্ত আচরণ দেখে দেবতা লজ্জায় মুখ ঢেকেছেন।

আজ অত যে ধর্মকথা বলে ফেললাম তার কারণ বোধকরি আমিও প্যানিক-গ্রস্ত। বিপদে না পড়লে আমি কক্‌খনো মধুসূদনের নাম করিনা। বাস্তবিক পক্ষে শঙ্কিত মন স্বভাবতই দুর্বল মন। ত্রাসের তাড়নায় মানুষ সব কিছু বিশ্বাস করে বসে। আর গুজব রটনাকারী-দের একটা নিজস্ব আর্ট আছে। কথা বলে একেবারে প্রত্যক্ষদর্শীর মতো। হন্তদন্ত হয়ে আপনার ঘরে ঢুকে বলবে, মশাই, শুনেছেন? আপনি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বলবেন, এ্যাঁ, কি হল আবার? আরে, তাও জানেন না! তারপরে যে রোমহর্ষক কাহিনীটি সবিস্তারে বর্ণনা করে যাবেন সেটি বিশ্বাস না করে আপনার উপায় কি? নোয়াখালীতে আমার আত্মীয় বন্ধু অনেক আছেন। ওখানকার দাঙ্গার সময় এক ব্যক্তি এসে আমাকে খবর দিলেন—আপনাদের অমুকবাবুর খবর শুনেছেন? আমি ব্যস্ত হয়ে বল্লুম, ওঁর খবর কিছু পেলেন নাকি? আর খবর মশায়, সপরিবারে নিহত। নি-হত। আমি তো হতভম্ব। সংবাদদাতা (খবরের কাগজের রিপোর্টার নয়) মুখ অতিশয় গম্ভীর করে বল্লেন, শুধু কি তাই? ওঁর বিবাহযোগ্যা কন্যাটিকে জোর করে নিয়ে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে। আমি এতক্ষণে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে একটি সিগারেট ধরালাম। ভদ্রলোক আমার রকম সকম দেখে বল্লেন, আপনার বুঝি বিশ্বাস হচ্ছে না? আমি বল্লুম আজ্ঞে না। কেন বলুন তো? বল্লুম, উক্ত বিবাহযোগ্যা কন্যাটি এই কিছুক্ষণ আগে এখানে এসেছিলেন, বাপ মায়ের জন্য খুবই উদ্বেগে আছেন সন্দেহ নাই।

এই কাহিনী থেকে আপনারা অবশ্যই মনে করবেন না যে, গুজবের সবই মিথ্যে। নোয়াখালীস্থ আমার আত্মীয় বন্ধুটি সপরিবারে নিহত হন নি বটে কিন্তু অক্ষত দেহে ফিরতে পারেন নি। সর্বস্বান্ত তো হয়েছেনই আর লাঞ্ছনা যা হয়েছে তাও মৃত্যুতুল্য। আমাদের দেশে প্রবাদ আছে যা রটে তার কতক বটে। কিন্তু সেই কতকটা কতটুকু তাই হল বিবেচ্য। পৃথিবীতে যেমন দুই ভাগ জল, একভাগ স্থল, গুজবের মধ্যে তেমনি দুই ভাগ মিথ্যা একভাগ সত্য। কিন্তু ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ মিথ্যা থেকে সত্য-টুকু উদ্ধার করা বড় কঠিন ব্যাপার। স্যার ওয়ালটার র‍্যালের কাহিনী আপনারা বোধকরি জানেন। কারাগারে বসে তিনি পৃথিবীর ইতিহাস রচনা করেছিলেন। তিনি যখন ঐ কাজে লিপ্ত, তখন একদিন সকালবেলায় রাস্তায় একটা হৈ চৈ মারামারির শব্দ শুনে কারাকক্ষের জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলেন। ব্যাপারটা কি জানবার জন্য কয়েকজন লোককে ডেকে জিগগেস করলেন। তিনজন লোকের কাছে একই ব্যাপার সম্বন্ধে তিনটি বিভিন্ন Version পাওয়া গেল তার কোনটার সঙ্গে কোনটার মিল নেই। র‍্যালে তখন হতাশ হয়ে ভেবেছিলেন যে, চোখের সামনে যে ঘটনাটি ঘটল তারই সত্য নিরূপণ করা যখন এত কষ্টসাধ্য তখন কারাকক্ষে বসে তিনি সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস রচনা করবেন কোন ভরসায়? বাস্তবিক পক্ষে আমরা যে ইতিহাস পাঠ করে—পরীক্ষা পাশ করে থাকি তার বারো আনা গুজব-সম্ভূত অর্থাৎ তার বেশির ভাগ legend, সামান্যই যথার্থ ইতিহাস।

গুজবের যে কি অসম্ভব শক্তি সে সম্বন্ধে একটি গল্প বলছি। গল্পটি বলেছেন বিশ্ব-বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনস্টিন্। কাজেই ধরে নিতে হবে এর মধ্যে খানিকটা বৈজ্ঞানিক সত্য আছে। দুই বন্ধুতে মিলে একটি পার্কে বেড়াতে গেছে। ধরুন এদের নাম রাম আর শ্যাম। পার্কে বহু লোক জড় হয়েছে। রাম হঠাৎ বল্লে, এক মিনিটের মধ্যে আমি পার্ক খালি করে দিতে পারি, এক্ষুনি সব ছুটে বেরিয়ে যাবে। শ্যাম বল্লে, অসম্ভব। রাম তৎক্ষণাৎ একটা বেঞ্চিতে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, অমুক রাস্তায় একজন কোটিপতি লোক তার যথাসর্বস্ব বিলিয়ে দিচ্ছেন। রাস্তা দিয়ে যে যাচ্ছে তাকেই কিছু দিচ্ছেন। যেই না বলা—মুহূর্তমধ্যে পার্ক শূন্য লোক পাগলের মতো ছুটতে লাগল। কিন্তু দেখা গেল হঠাৎ রামও তাদের পেছন পেছন ছুটতে শুরু করেছে। বন্ধু ব্যস্ত হয়ে বল্লে, ওকি তুমি ছুটছ কেন? রাম বল্লে, সবাই যখন বিশ্বেস করছে তাহলে বোধকরি এর মধ্যে কিছু আছে। কিমাশ্চর্যমতঃপরম্!

হকি

আন্তঃপ্রাদেশিক বা ন্যাশানাল হকি চ্যাম্পিয়ানসিপ প্রতিযোগিতায় পাঞ্জাব হকি দল সাফল্যলাভ করিয়াছে। ফাইনালে বোম্বাই দল পাঞ্জাব দলের সহিত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া ২—০ গোলে পরাজয় বরণ করে। পাঞ্জাব দল এই সাফল্যের ফলে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ হকি দলের সম্মানলাভ করিল। ১৯৩৬ সালের বিশ্বঅলিম্পিক অনুষ্ঠানের বিজয়ী ভারতীয় হকি দলের খেলোয়াড় দারা পাঞ্জাব দলের অধিনায়ক ছিলেন। তাঁহার সুপরিচালনার ফল নিখিল ভারত হকি ফেডারেশনের পরিচালকগণ দেখিলেন। আশা করি, আগামী বিশ্বঅলিম্পিক অনুষ্ঠানে যে ভারতীয় হকি দল প্রেরিত হইবে সেই দলের অধিনায়ক নির্বাচনের সময়ে দারাকে উপেক্ষা করা হইবে না। দলের সাফল্য অধিনায়কের পরিচালনার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে ইহা বলাই বাহুল্য।

টেনিস

ভারতীয় টেনিস সঙ্ঘের মনোনীত টেনিস খেলোয়াড়গণ ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবার জন্য ইংলণ্ড অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। ভারতীয় টেনিস সঙ্ঘের পরিচালকগণ শেষ মুহূর্তে মানমোহনকে দলভুক্ত করিবেন এই আশা আমরা মনে মনে পোষণ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহা হইল না। কেন হইল না, কি যে বাধা কেহই জানিতে পারিল না। যে ভারতীয় দল প্রেরিত হইল তাহা দ্বারা ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতা বিজয়ী হওয়া অসম্ভব। সাফল্যলাভের যখন কোনই সম্ভাবনা নাই তখন একজন উদীয়মান তরুণ খেলোয়াড়কে উপেক্ষা করা কোনরূপেই সমীচীন হয় নাই।

পেশাদার ও অপেশাদার খেলোয়াড়

আন্তর্জাতিক টেনিস ফেডারেশনের সভায় ভারতীয় প্রতিনিধি পেশাদার ও অপেশাদার টেনিস খেলোয়াড়দের মধ্যে যে পার্থক্য রাখা হইয়াছে তাহা তুলিয়া দিবার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু তাঁহার প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধিগণ বিরোধিতা করিয়া ভারতীয় প্রতিনিধিকে ভোটে পরাজিত করিয়াছেন। ভারতীয় টেনিস ষ্ট্যাণ্ডার্ড এখনও বিশ্বষ্ট্যাণ্ডার্ডের সমতুল্য হয় নাই। তাহা যেদিন হইবে সেইদিন ভারতীয় প্রতিনিধি যে প্রস্তাব সভায় উত্থাপন করিবেন সেই প্রস্তাবের বহু সমর্থক দেখা দিবে। অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্স এই চারিটি দেশ গত কয়েক বৎসর হইতে আন্তর্জাতিক টেনিস প্রতিযোগিতা পরিচালনার একমাত্র অধিকারী হইয়া আছে। এই বৎসর কেবল দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনকে এই অধিকার দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং আন্তর্জাতিক টেনিস সঙ্ঘের সভায় উক্ত সকল দেশের প্রতিনিধিদের কথার মূল্য ভারতীয় প্রতিনিধি অপেক্ষা অনেক বেশী। সেইজন্য মনে হয় ভারতীয় টেনিস সঙ্ঘের উচিত এখন হইতেই খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড উন্নততর করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা। অযথা প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া অপদস্থ হওয়ার কোনই মানে হয় না।

কুস্তি

বঙ্গীয় অপেশাদার কুস্তি সঙ্ঘ বাঙলায় কুস্তির এক নূতন যুগ সৃষ্টি করিতে চলিয়াছেন। এই পর্যন্ত ইহাদের কর্মক্ষেত্র বাঙলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু বর্তমানে সারা ভারতে ইহা ছড়াইয়া পড়িতে চলিয়াছে। ভারতের বাহির হইতেও ইহাদের আমন্ত্রণ আসিতেছে। সম্প্রতি সিংহল মল্লবীর সঙ্ঘের অনুরোধে বঙ্গীয় অপেশাদার কুস্তি সঙ্ঘকে একটি বাঙালী মল্লবীর দল প্রেরণ করিতে হইয়াছে। এই দল বাঙলার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে এই ভরসা আমরা রাখি। নিম্নে সিংহলে যে বাঙালী মল্লবীরগণ গিয়াছেন তাঁহাদের নামের তালিকা প্রদত্ত হইলঃ—শিবু দত্ত (মারুতী ব্যায়াম বিদ্যালয়), রবীন নস্কর (চেতলা সঙ্ঘ), নিরঞ্জন দাস (বজরঙ্ ব্যায়ামাগার), প্রভাস চ্যাটার্জি (মাণিক বাবুর আখড়া), গোপাল দে (চেতলা সঙ্ঘ), অমূল্য রায় (চেতলা সঙ্ঘ), বলাই মল্লিক (পি মজুমদার জিমন্যাসিয়াম), নেপাল ভট্টাচার্য (বনমালী ব্যায়ামাগার) ও অনাদি ঘোষ (এন ঘোষেজ জিমন্যাসিয়াম)। বঙ্গীয় অপেশাদার কুস্তি সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীযুত বীরেন বসু, বাঙলার বিশ্ববিখ্যাত মল্লবীর শ্রীযুত গোবরবাবুর দুই পুত্র শ্রীমান মাণিক গুহ ও জহর গুহ এই দলের সহিত গিয়াছেন।

জাতীয় খেলাধূলা

বঙ্গীয় প্রাদেশিক জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সঙ্ঘ এতদিন বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে জাতীয় খেলাধূলার জনপ্রিয়তার জনাই বিশেষ মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি ইহারা বাঙলার জনসাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতির দ্রুত পথ নির্দেশ দিবার জন্য বিভিন্ন জেলার ব্যায়াম প্রতিষ্ঠানকে লইয়া এক একটি জেলা ব্যায়াম শিক্ষা শিবির স্থাপন করিতেছেন। এই সকল শিবিরে কেবল যে জাতীয় খেলাধূলা বা ব্যায়ামের বিভিন্ন কৌশল শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা নহে। ব্যায়াম প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া জনসাধারণকে সর্ববিষয়ে সাহায্য দ্বারা কিরূপে নূতন জাতীয় জীবন গঠন করা যায় তাহারও পথ নির্দেশ করা হইতেছে। ইহা ছাড়া বাঙলা ও হিন্দি ভাষায় কুচকাওয়াজ, দল পরিচালনা, প্রাথমিক প্রতিবিধান, গ্রাম উন্নতি সহায়ক ব্যবস্থাদিও শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ইহাদের প্রথম ব্যায়াম শিক্ষাশিবির প্রতিষ্ঠিত হয় বর্ধমান জেলার জন্য রসুলপুরে গ্রামে। এই শিবিরে বর্ধমানের ৭০।৮০টি ব্যায়াম প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি যোগদান করেন। দ্বিতীয় ব্যায়াম শিক্ষা শিবির প্রতিষ্ঠিত হয় হুগলী জেলার জন্য চন্দননগরে। এই শিবিরে হুগলী জেলার শতাধিক প্রতিষ্ঠানের সভ্য ও সভ্যা যোগদান করেন। তৃতীয় ব্যায়াম শিক্ষা শিবির প্রতিষ্ঠিত হয় ২৪-পরগণা জেলার জন্য হালিসহরে। এই শিবিরেও ২৪-পরগণা জেলার ৫০।৬০টি প্রতিষ্ঠানের সভ্য ও সভ্যা যোগদান করেন। ইহার পরেই হাওড়া জেলার জন্য আন্দুল রাজবাটীতে এক শিবিরের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই শিবির সম্বন্ধে এই পর্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, হাওড়ার প্রায় ১৫০টি প্রতিষ্ঠানের ৫০০ শত প্রতিনিধি যোগদান করিবেন। ইহাদের মধ্যে শতাধিক মহিলা ও বালিকা প্রতিনিধিও আছেন। জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সঙ্ঘের কর্মকুশলতার ফলে এই সকল শিক্ষা শিবির যে কতখানি সাধারণের মধ্যে সাড়া আনিতে পারিয়াছে তাহা যোগদানকারীর সংখ্যা হইতে উপলব্ধি করা যায়। দেশের প্রকৃত উন্নতিকামী ব্যক্তিবর্গ ইহাদের কিছু কিছু আর্থিক সাহায্য যদি করেন—আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে ইহারা প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়া স্থায়ী শিক্ষা শিবির প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন।

জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সঙ্ঘের পরিচালিত হালিসহর ব্যায়াম শিক্ষা শিবিরের কয়েকটি বালিকা

দেশী সংবাদ

১৭ই মার্চ—বহিষ্কার আদেশ অমান্য করার অভিযোগে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুত ভি জি দেশপাণ্ডে অদ্য লাহোরে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু পাঞ্জাবের দাঙ্গা বিধ্বস্ত অঞ্চলে সফর শেষ করিয়া অদ্য লাহোরে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, পাঞ্জাবের অবস্থা অনেকটা আয়ত্তে আসিয়াছে।

বগুড়ার সংবাদে প্রকাশ, গত রাত্রিতে বগুড়া শহরের একটি অঞ্চলে হাঙ্গামা ঘটে এবং একটি বাজারের কতিপয় দোকানে অগ্নিসংযোগ করা হয়।

কুমিল্লায় মৌলানা মণিরুজ্জমান ইসলামাবাদীর সভাপতিত্বে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের এক সম্মেলন হয়। প্রস্তাবিত বাঙলা ও পাঞ্জাব

শ্রীমতী শিবরাও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে অন্তঃএশিয়া সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির প্রতীক চিহ্ন পরাইয়া দিতেছেন

বিভাগের বিরোধিতা এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নিন্দা করিয়া সম্মেলনে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৮ই মার্চ—গতকল্য মহাত্মা গান্ধীর পাটনা জেলা পরিক্রমার দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হইয়াছে। তিনি মাসাউরী গ্রামে কয়েকটি গৃহ পরিদর্শন করেন।

বাউড়িয়ায় (হাওড়া) নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লক কাউন্সিলের অধিবেশন আরম্ভ হয়। সর্দার শার্দুল সিং কবিশের সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, ইংরেজ যদি ঐকান্তিকতার সহিত ভারতীয়দের হাতেই ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে চায়, তবে গণতান্ত্রিক আদর্শের অনুসরণ করিয়া দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের হাতেই ক্ষমতা হস্তান্তর করা কর্তব্য।

বগুড়ার সংবাদে প্রকাশ, গতকল্য রাত্রিতে এক জনতা বগুড়া রেল স্টেশনের ডিস্ট্যাণ্ট সিগন্যাল ছাড়াইয়া গেলে একখানি প্যাসেঞ্জার ট্রেন থামাইয়া উহা লুণ্ঠন করে।

কলিকাতা ট্রাম শ্রমিক সঙ্ঘের সভাপতি ও

কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার মিঃ মহম্মদ ইসমাইলকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ধুবড়ীর সংবাদে প্রকাশ, আসাম সীমান্তের কোন স্থানে প্রায় ১৫ হাজার মুসলমানকে আসামের সীমান্ত অতিক্রমের জন্য প্রস্তুত দেখা গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। আসাম সরকার কয়েকজন সৈন্যকে উক্ত সীমান্তে প্রেরণ করিয়াছেন।

বিহারে পাঞ্জাব দিবস পালন করা হইবে এইরূপ গুজবের উল্লেখ করিয়া মহাত্মা গান্ধী বীরগ্রামে (পাটনা) প্রার্থনা সভায় বলেন যে, এইরূপ দুর্ঘটনা যদি বিহারে অনুষ্ঠিত হইতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে তিনি জ্বলন্ত অনলে আত্মবিসর্জন করিবেন।

আসাম ব্যবস্থা পরিষদে রাজস্ব সচিব মিঃ মেধি বলেন যে, আসামে বহিরাগতদের অভিযান প্রতিরোধ করিতেই হইবে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রাদেশিক আবগারী খাতে ব্যয়-বরাদ্দের আলোচনাকালে বিরোধী দলের পক্ষ হইতে প্রদেশে সম্পূর্ণরূপে মাদক বর্জন নীতি প্রবর্তনে মুসলিম লীগ মন্ত্রিমণ্ডলীর অক্ষমতার বিশেষ সমালোচনা করা হয়।

১৯শে মার্চ—কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় বাজেট স্পেশ্যাল কমিটির সুপারিশগুলি পেশ করা হয়। উহাতে দেখা যায় যে, কর্পোরেশনের আগামী বৎসরের বাজেটে শহরের বিভিন্ন হাসপাতাল, অনাথালয় প্রভৃতি জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে কর্পোরেশন হইতে যে অর্থ সাহায্য দেওয়া হইত তাহা বন্ধ করার প্রস্তাব হইয়াছে এবং কর্পোরেশনের ট্যাক্সের হার শতকরা ২৲ টাকা বৃদ্ধি করার প্রস্তাব হইয়াছে।

অন্তর্বর্তী সরকারের অর্থসচিব মিঃ লিয়াকৎ আলী খাঁ 'মুনাফা কর' বিল সম্পর্কে সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট অদ্য কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে পেশ করেন। চলতি বৎসরের বাজেটে ইহাই প্রধান রাজনৈতিক প্রস্তাব।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় রাজস্ব মন্ত্রী মিঃ ফজলুর রহমান কর্তৃক বঙ্গীয় পতিত জমি দখল বিল (১৯৪৭) সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ প্রসঙ্গে সরকার পক্ষ হইতে যে সকল জমি দখল করা হইবে, বিহার আশ্রয়প্রার্থী সমেত অ-বাঙালী মুসলমানদের ঐ সকল জমিতে বসবাসের ব্যবস্থার প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। রাজস্ব মন্ত্রী এই সম্পর্কে বলেন যে, মানবতার দিক হইতে সরকার বিহার আশ্রয়প্রার্থীদিগকে আশ্রয়দান করিয়াছেন।

লাহোরের এক সরকারী ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, গভর্নর জেনারেল পাঞ্জাব উপদ্রুত অঞ্চল সম্পর্কিত আইনে সম্মতি দিয়াছেন এবং উহা অদ্য হইতেই বলবৎ হইবে। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা নিবারণকল্পে উহা করা হইয়াছে।

হাওড়ার অন্তর্গত বাউড়িয়া গ্রামে নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লক কাউন্সিলের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বৃটিশ গভর্নমেণ্টের সর্বশেষ বিবৃতির প্রশ্নে ফরোয়ার্ড ব্লকের সদস্যগণ গণপরিষদ হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারেন। আর ব্যক্তিস্বাধীনতা ইত্যাদি প্রশ্নে ফরোয়ার্ড ব্লক সভ্যগণ আইন সভাসমূহ হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারেন।

হাওড়া টাউন হলে বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীযুত প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

২০শে মার্চ—সরকারীভাবে জানা গিয়াছে যে, পাঞ্জাবের সাম্প্রতিক দাঙ্গায় এ পর্যন্ত মোট ২০৪৯ জন নিহত এবং ১৯০৩ জন গুরুতরভাবে আহত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বিভিন্ন শহরে হতাহতের সংখ্যা ৫১১ জন নিহত ১৪৪ জন গুরুতর আহত এবং পল্লী অঞ্চলে ১৫৩৮ জন নিহত ও ১৫৯ জন গুরুতর আহত। বড়লাট ১৯৪৭ সালের পাঞ্জাব গণ-নিরাপত্তা আইনে সম্মতি দিয়াছেন।

লাহোরের সংবাদে প্রকাশ, অন্তর্বর্তী সরকারের ভাইস প্রেসিডেণ্ট পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু পাঞ্জাব প্রদেশে আঞ্চলিক শাসনের প্রস্তাব করিয়া-

ভারতের নূতন বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ও বিদায়ী বড়লাট লর্ড ওয়াভেল

ছেন। এই পরিকল্পনায় প্রাদেশিক অখণ্ডতা বজায় রাখিয়া আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্তনের কথ বলা হইয়াছে।

নোয়াখালিতে পাকিস্থান দিবসের অনুষ্ঠান বন্ধ করার জন্য মহাত্মা গান্ধী বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দিকে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

২১শে মার্চ—আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে খা মহিবুর রহমান, শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযু নির্মলচন্দ্র ভদ্র, শ্রীযুত অমলচন্দ্র দে ও শ্রীযু সতীশচন্দ্র মুখার্জি—এই পাঁচজন রাজনৈতিক বন্দী কতকগুলি দীর্ঘদিনের অভাব অভিযোগে প্রতিবাদে আমৃত্যু অনশন আরম্ভ করিয়াছেন।

মিঃ ও আর রেড্ডিয়ার মাদ্রাজ ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেসী দলের নেতা নির্বাচিত হইয়াছেন।

গরাহুনান (পাটনা) গ্রামে গান্ধীজী তাঁহা প্রার্থনান্তিক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, সমস্ত লোক বিহার প্রদেশের দাঙ্গায় অংশ গ্রহ করিয়াছিল, তাহারা তাহাদের নাম তাঁহার নিক প্রেরণ করিয়াছে। তিনি ঐ সমস্ত লোককে তাহাদে

দোষ স্বীকার করিয়া আইন অনুযায়ী দণ্ড গ্রহণ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন।

২২শে মার্চ—বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রশ্নোত্তরের সময় সরকার পক্ষ হইতে জানান হয় যে, গত ২০শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সংগৃহীত হিসাব অনুযায়ী বাঙলায় ৯২,৩৪২ জন বিহার হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থী আছে। গভর্নমেণ্ট ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ, খাদ্য প্রভৃতি বাবদ ২৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন।

নবনিযুক্ত বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ও লেডী মাউণ্টব্যাটেন নয়াদিল্লীতে পেণীছয়াছেন।

ভারত গভর্নমেণ্টের ভূতপূর্ব বাণিজ্য সচিব স্যার আজিজুল হক পরলোকগমন করিয়াছেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে শিক্ষা বাজেটের আলোচনাকালে বিরোধী দলের পক্ষ হইতে শিক্ষাক্ষেত্রে গভর্নমেণ্টের সাম্প্রদায়িক মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করা হয়। বিতর্কের উত্তরে শিক্ষাসচিব জানান যে, তাঁহারা প্রদেশের এক-চতুর্থাংশে এই বৎসরই বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করিবেন।

২৩শে মার্চ—অদ্য অপরাহ্ণে দিল্লীর ঐতিহাসিক পুরান কেল্লায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আন্তঃএসিয়া সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। এশিয়ার বিভিন্ন দেশ হইতে ২৫০ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দেন। পণ্ডিত নেহরু তাঁহার ভাষণে বলেন যে, পৃথিবীকে শান্তিপূর্ণ করিতে হইলে প্রথমে এশিয়াকে ঐক্যবদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ করা আবশ্যক।

আন্তঃএশিয়া সম্মেলনের সভানেত্রী শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু তাঁহার উদ্দীপনাময়ী ভাষণে এশিয়ায় নবজাগরণের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এশিয়া সমগ্র বিশ্বের মিলনতীর্থে পরিণত হইবে।

মাদ্রাজ ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসী দলের নব-নির্বাচিত নেতা শ্রীযুত ও পি রামস্বামী রেড্ডিয়ারের নেতৃত্বে মাদ্রাজে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। নূতন মন্ত্রিসভার সদস্যগণ আজ শপথ গ্রহণ করেন। তাঁহাদের নাম—(১) শ্রীযুত ওমান্দুর পি রামস্বামী রেড্ডিয়ার (প্রধান মন্ত্রী), (২) ডাঃ টি এস এস রাজন, (৩) ডাঃ পি সুব্বারায়ান, (৪) শ্রীযুত এম ভক্তবৎসলম্, (৫) শ্রীযুত বি গোপাল রেড্ডি, (৬) শ্রীযুত এইচ সীতারাম রেড্ডি, (৭) শ্রীযুত কে চন্দ্রমৌলী এবং (৮) শ্রীযুত কে মাধব মেনন।

বিদায়ী বড়লাট লর্ড ওয়াভেল ও তাঁহার পত্নী লেডী ওয়াভেল অদ্য নয়াদিল্লী হইতে বিমানযোগে ইংলণ্ড যাত্রা করেন।

রাওয়ালপিণ্ডির সংবাদে প্রকাশ, অদ্য উত্তরাঞ্চলের সামরিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রচারিত এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দমনে অষ্টাদশ সহস্রাধিক ভারতীয় ও দুই সহস্র বৃটিশ সৈন্য এবং বিমান বাহিনীর অনুমান দুইটি স্কোয়াড্রন নিয়োগ করা হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

১৮ই মার্চ—সোভিয়েট পররাষ্ট্র সচিব মঃ মলোটভ গত রাত্রিতে মস্কোতে পররাষ্ট্র সচিব সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, জার্মানীর বৃটিশ ও মার্কিন এলাকাতে একই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অধীন করিয়া বৃটেন ও আমেরিকা পটসডাম চুক্তি-ভঙ্গ করিয়াছে। এই ব্যবস্থা বাতিল করিয়া দিবার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। জার্মানীর রূর অঞ্চলকে চতুঃশক্তির নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যও মঃ মলোটভ প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

১৯শে মার্চ—নানকিংএর সরকারী ঘোষণায় প্রকাশ, চীনের সরকারী সৈন্যদল কম্যুনিস্টদের রাজধানী ইয়েনানে প্রবেশ করিয়াছে।

২০শে মার্চ—ভারতের ভাবী বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন লেডী মাউণ্টব্যাটেন ও কন্যা পামেলা সমভিব্যাহারে লণ্ডন হইতে বিমানযোগে ভারত যাত্রা করিয়াছেন।

২২শে মার্চ—মস্কোতে পররাষ্ট্র সচিব সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৃটেন ও সোভিয়েটের তরফ হইতে অস্থায়ী জার্মান গভর্নমেণ্ট এবং স্থায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় জার্মান প্রজাতন্ত্র স্থাপনের পরিকল্পনা পেশ করা হয়। স্থায়ী প্রজাতন্ত্রে একজন প্রেসিডেণ্ট, দুইটি ব্যবস্থা পরিষদ লইয়া গঠিত আইন সভা থাকিবে। মিঃ বেভিন ভাবী জার্মান যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো বর্ণনা করেন। ইহা মোটামুটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার অনুরূপ। পক্ষান্তরে রাশিয়ার পক্ষ হইতে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় জার্মান গভর্নমেণ্ট স্থাপনের দাবী করিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করা হইয়াছে।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক ঃ—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্ম্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশ

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন — সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

চতুর্দশ বর্ষ] শনিবার, ২২শে চৈত্র, ১৩৫৩ সাল। Saturday, 5th April, 1947. [২২শ সংখ্যা

কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক অশান্তি

গত ১১ই চৈত্র, মঙ্গলবার হইতে কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক অশান্তি দেখা দেয়। বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবদী বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে এতৎসম্পর্কিত আলোচনা-প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন যে, গভর্নমেণ্ট এই দাঙ্গাহাঙ্গামা প্রশমনকল্পে সর্ববিধ কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন এবং দাঙ্গা দমনে সেনাশক্তি প্রয়োগে বিলম্ব করা হইয়াছে বলিয়া গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার মত কোন কারণ এবার অন্তত থাকিবে না। তিনি আরও বলেন, সেনাদল প্রস্তুত হইয়াই আছে, যখনই প্রয়োজন হইবে, তখনই তাহারা দাঙ্গা দমনে অবতীর্ণ হইবে। কিন্তু কলিকাতার অধিবাসীরা বিগত আগষ্ট এবং অক্টোবর মাসের নিদারুণ অভিজ্ঞতা এখনও বিস্মৃত হয় নাই; সুতরাং মিঃ সুরাবদীর মুখে শান্তিরক্ষার সম্বন্ধে এই ধরণের প্রতিশ্রুতিতে তাহারা বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারে নাই। অন্তত পরবর্তী কয়েক দিনে বাঙলার প্রধান মন্ত্রীর উক্তিতে বিশ্বাস না করিবার কারণ শহরবাসীদের মনে আরও প্রবল হইয়া উঠে। দেখা যায়, এবারকার দাঙ্গা সামান্য ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া প্রথমত আরম্ভ হয়। এই দাঙ্গা সহসা প্রবল আকার ধারণ করে নাই; ধীরে ধীরে ইহা ব্যাপক হইয়া উঠে এবং শহরের বিভিন্ন অংশে উপদ্রববহুল অরাজকতা চলিতে থাকে, পরে হাওড়া এবং তাহার উপকণ্ঠভাগে বিস্তৃত হয়। স্পষ্টই বোঝা যায়, গভর্নমেণ্ট হইতে যদি যথাসময়ে উপযুক্ত কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হইত, তবে এই দাঙ্গা সামান্য অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতেই প্রশমিত হইত এবং তাহা ব্যাপক আকার ধারণ করিতে পারিত না। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, আগষ্টের দাঙ্গা-হাঙ্গামার বিভীষিকাপ্রদ অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ এবারও দাঙ্গা দমনে কঠোরতা অবলম্বন করিতে দ্বিধা এবং সঙ্কোচের সহিতই অগ্রসর হইয়াছেন। গুণ্ডার দলের যথেচ্ছ দৌরাত্ম্য এবং উপদ্রবের জন্য কলিকাতার চারটি অঞ্চলে সেনা-সাহায্য গৃহীত হয়; কিন্তু তাহাতেও ঐ সব অঞ্চলের অশান্তির গতি প্রতিরুদ্ধ হয় বলা চলে না। সেনাদলের পাহারার আওতা-টুকুর বাহিরে উপদ্রবকারীরা অশান্তির আগুন অপ্রতিহতবেগেই বিস্তার করিতে থাকে। কলিকাতার সর্বশুদ্ধ ২৮টি থানার মধ্যে ১০টি থানায় সান্ধ্য আইন জারী করা হয়। কিন্তু সান্ধ্য আইনকে স্বচ্ছন্দভাবে অগ্রাহ্য করিয়া উপদ্রবকারীরা দল বাঁধিয়াছে এবং অত্যাচার চালাইয়াছে। বাঙলার প্রধান মন্ত্রী পরিষদে দাঁড়াইয়া বীরত্বপূর্ণ অভিনয়সহকারে বলিয়াছিলেন, 'দাঙ্গা দমন করিবার জন্য গুলী চালানো হইবে, ধর-পাকড় করা হইবে, পাইকারী জরিমানা ধার্য হইবে' ইত্যাদি। কিন্তু কার্যত দেখা যায়, উপদ্রবকারীরা তাঁহার এই সব উক্তিতে কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই। তাহারা দিনে এবং রাত্রিতে সমানে ছোরা-ছুরি চালাইয়াছে এবং হাওড়ার কতকগুলি বস্তী প্রকাশ্য দিবালোকেই আগুনে পোড়াইয়া দিয়াছে। কুত্রাপি পুলিশের কঠোর ব্যবস্থার ফলোপধারকতার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। শহরের অন্তত কয়েকটি অঞ্চলে বাস চলাচল বজায় রাখিবার জন্য বাস-চালকদের পক্ষ হইতে দৃঢ়তার সঙ্গে বিশেষ বিপজ্জনক অঞ্চল এড়াইয়া বাস চালাইবার চেষ্টা হয়; কিন্তু কর্তৃপক্ষ পুলিশের ব্যবস্থা এমন করিতে পারেন নাই, যাহাতে নির্দিষ্ট এই কয়েকটি লাইনেও অব্যাহতভাবে বাস চলে। দাঙ্গাকারীদের দ্বারা বারংবার আক্রান্ত হইয়া অবশেষে শহরে বাস চলাচল বজায় রাখা অসম্ভব হইয়া উঠে। বাস্তবিকপক্ষে কর্তৃপক্ষের কোন ব্যবস্থাই কার্যকর হয় নাই। গুণ্ডারা সাঁজবাতি আইন মানে নাই; ১৪৪ ধারা স্পষ্টভাবে ভঙ্গ করিয়া দিনের আলোকেই দলবদ্ধভাবে বাসের গতি রুদ্ধ করিয়া আরোহীদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। সুতরাং বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মুখে যাহাই বলুন না কেন, তাঁহার নিয়ন্ত্রিত পুলিশ বিভাগের কোন ব্যবস্থাই গুণ্ডাদের দৌরাত্ম্য প্রতিহত করিতে পারে নাই এবং শহরবাসীরা এবারও এই অভিজ্ঞতা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছে যে, উপদ্রবকারী গুণ্ডাদের অত্যাচারের কাছে তাহারা একান্তই অসহায়। ভারতের শ্রেষ্ঠ নগরীতে আজ বস্তুত গুণ্ডার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং উপদ্রবকারী এই সব গুণ্ডাদের ইঙ্গিতে শহরবাসীদের ধন-প্রাণ যে কোন মুহূর্তে বিপন্ন হইতে পারে। তাহাদের অন্তরে অন্তরে এই সত্য সুনিশ্চিত হইয়াছে যে, বাঙলার বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের উপর বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বস্তুত অশান্তি দমনে যোগ্যতা বা আন্তরিকতা এ মন্ত্রিমণ্ডলের নাই। যদি তাহাই থাকিত, তবে কতকগুলি গুণ্ডা মিলিয়া সীমাবদ্ধ অঞ্চল হইতে শহরের অশান্তি ধীরে-সুস্থে এমন ব্যাপক করিয়া তুলিবার সুবিধা লাভ করিত না। শাসকদের কঠোর হস্তের নিপীড়নে তাহাদের দৌরাত্ম্য দুই দিনের মধ্যেই বিচূর্ণ হইত। কোন সভ্য গভর্নমেণ্ট এই অবস্থা বরদাস্ত করিতে পারে না। বাঙলার রাজধানী কলিকাতা শহরে যে কাণ্ড আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে বাঙলার বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের অযোগ্যতা সকল রকমে উন্মুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। আজ দেশবাসীরা

বুঝিয়াছে যে, এই মন্ত্রিমণ্ডলের প্রভুত্ব বিদ্যমান থাকিতে তাঁহাদের ধন-প্রাণ নিরাপদ নয় এবং বাঙলার মন্ত্রীদের কোন রকম আশ্বাস বা প্রতিশ্রুতির কার্যত কোন মূল্যে নাই।

দাঙ্গা বাধিল কেন?

কলিকাতা এবং হাওড়ার বিগত সপ্তাহ-কালের ব্যাপার লক্ষ্য করিলে একটা সত্য সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাইবে; দেখা যায়, ক্রমিক-ভাবে দাঙ্গার গতি এক্ষেত্রে প্রসার লাভ করে। বস্তুত দাঙ্গাকারীরা যেন কর্তৃপক্ষকে যথেষ্ট সময় এবং সুযোগ দিয়াই তাঁহাদের রক্তাক্ত হিংস্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডল এবং গভর্নর যথেষ্ট সময় পাইয়াও অশান্তি দমন করিতে পারেন নাই। অথচ সতর্কতার সঙ্কেত বহু দিক হইতেই তাঁহারা পাইয়াছিলেন। বাঙলার প্রধান মন্ত্রী সেদিন পরিষদে দাঙ্গার কারণ নির্দেশ করিয়া বলেন যে, কলিকাতায় কোন অঞ্চলের একটি পতিতালয়ে একটি স্ত্রীলোক তাহার শিশু-সন্তানসহ নিহত হয়; এই ব্যাপার উপলক্ষ্য করিয়াই দাঙ্গা বাধে। আমরা মিঃ সুরবাদী'র এই উক্তি সমর্থন করিতে পারি না। মিঃ সুরাবর্দীর নির্দেশিত ঘটনাটি বুধবার দিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়; কিন্তু তৎপূর্ব দিন অর্থাৎ মঙ্গলবার রাত্রি হইতেই শহরে দাঙ্গাহাঙ্গামার সূত্রপাত হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে পতিতালয়ের ঘটনাটির সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার কোন সম্পর্কই ছিল না এবং কলিকাতা শহরে এই ধরণের অপরাধের সংবাদ উত্তেজনাকর কিছুই নয়। প্রকৃত সত্য এই যে, উত্তেজনার কারণ তৎপূর্বেই সৃষ্ট হইয়াছিল এবং আমাদের বিশ্বাস, বাঙলা গভর্নমেণ্ট যদি দেশের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া পাকিস্থান দিবস পালন বন্ধ করিতেন, তবে শহরে এই উত্তেজনার কারণ দেখা দিত না। কিন্তু বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলের কাছে বাঙলার জনসাধারণের শান্তি ও স্বস্তির অপেক্ষা লীগের রাজনীতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধিই বড় হইয়া উঠিয়াছে। লীগের কর্মনীতির বিরুদ্ধাচরণ করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের নাই; পক্ষান্তরে বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডল কার্যত লীগেরই দপ্তরখানায় পরিণত হইয়াছে। লীগওয়ালাদের মর্জি মাথা পাতিয়া লওয়াই মন্ত্রীরা নিজেদের কর্তব্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার ফলে বাঙলা দেশের অবস্থা যাহাই ঘটুক না কেন। কলিকাতা শহরের সর্বত্র ১৪৪ ধারা জারী হইয়াছে; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও আমরা দেখিতে পাইতেছি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের সেক্রেটারী ওয়ার্ডসমূহের লীগদলের কর্মীদের সাহচর্যে রাত্রিতে গার্ড দলকে পাড়ায় পাড়ায় টহল দিবার নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, সাঁজবাতির আইন ভঙ্গ না করিয়া তাহা করিবার উপায় নাই। বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডল লীগ মুসলিম গার্ডদিগকে বিশেষভাবে এই সর্দারী ফলাইবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন কি না, আমরা জানি না; যদি তাঁহারা তাহাই দিয়া থাকেন, তবে তাঁহাদের দুঃসাহসের অন্ত নাই বলিতে হইবে; কারণ লীগ-পরিচালিত এই সব গার্ডদের সম্বন্ধে মন্ত্রীদের ধারণা যেমনই হউক, দেশের লোকের ধারণা ভাল নয়। গার্ড-বাহিনী নিতান্ত সাম্প্রদায়িকতামূলক প্রতিষ্ঠান এবং পাকিস্থানী সংগ্রামের সূত্রে তাহাদের ক্ষাত্রবীর্য সর্বত্র উদ্দীপিত হইয়া উঠে, ইহা দেখা গিয়াছে। সাম্প্রদায়িক স্বার্থ ব্যতীত মানবতামূলক বৃহত্তর কোন আদর্শ এই প্রতিষ্ঠানের মূলে নাই; এরূপ অবস্থায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাপূর্ণ শহরের আবহাওয়ায় ইহাদিগকে বিশেষ অধিকার প্রদান করিলে জনসাধারণের মনে অস্বস্তির আতঙ্ক বৃদ্ধি পাইবে, ইহা স্বাভাবিক। বস্তুত পাকিস্থানী দিবস অনুষ্ঠানের কিছুদিন পূর্ব হইতেই শহরের সর্বত্র মুসলিম গার্ড দলের তৎপরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এই সঙ্গে আসামের অভিমুখে পাকিস্থানী অভিযানের সম্পর্কের কথাও সর্বত্র শোনা যাইতেছে। গত ৩০শে মার্চ লীগ-ওয়ালারা আসামের সব জেলায় ব্যাপক আইন অমান্য করা হইবে, এই সঙ্কল্প ঘোষণা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, বাঙলা দেশের লীগের দলই এই আন্দোলনের পিছনে প্রধান উদ্যোক্তা এবং বাঙলাকে ঘাঁটি করিয়া এই আন্দোলন পরিচালনা করা হইবে, ইহাই তাঁহাদের পরিকল্পনা রহিয়াছে। লীগের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য লীগওয়ালারা বাঙলায় সাম্প্রদায়িক প্রতিবেশ সৃষ্টি করিবে এবং তজ্জন্য বিশেষভাবে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে উত্তেজনা-মূলক প্রচারকার্য চালাইতে থাকিবে, এ আশঙ্কা অমূলক নহে। লীগের আনুগত্য এবং সেই সূত্রে নিজেদের মন্ত্রিত্ব বজার রাখিবার দায়ে বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডল যে তেমন অনর্থকর সাম্প্রদায়িকতার আবহাওয়া হইতে নিজদিগকে মুক্ত রাখিতে পারিবেন, আমরা ইহা মনে করি না। সুতরাং বাঙলা দেশে বর্তমান সাম্প্রদায়িক মন্ত্রিমণ্ডল বিদ্যমান থাকিতে আমরা স্থায়ী শান্তির কোন সম্ভাবনা দেখি না।

লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের কর্তব্য—

লর্ড মাউণ্টব্যাটেন কার্যভার গ্রহণ করিয়া ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত বর্তমান সমস্যা সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পণ্ডিত জওহরলালের সহিত তাঁহার আলোচনা হইয়াছে, মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তিনি সুদীর্ঘকাল আলোচনা করিয়াছেন। লীগ-দলপতি মিঃ জিন্নাও ন[...] বড়লাটের সঙ্গে দেখা করিবার সুযোগ [...] করিয়াছেন। সুতরাং বোঝা যায়, ন[...] বড়লাট তাঁহার হস্তে ন্যস্ত কর্তব্য পাল[...] উপায় নির্ধারণের জন্য তৎপর হইয়াছেন। তি[...] পূর্বেই বলিয়াছেন যে, বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ২০ ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারতবাসীদের হাতে দে[...] শাসনক্ষমতা হস্তান্তরিত করিবার যে সিদ্ধা[...] গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা প্রতিপালন করাই তাঁ[...] কর্তব্য হইবে। নূতন বড়লাট ভারতে[...] বর্তমান অবস্থাকে কিরূপ দৃষ্টিতে ল[...] করিতেছেন আমরা জানি না। সাম্রাজ্যবাদ[...] সুলভ সংস্কার হইতে নিজেকে মুক্ত রাখি[...] যদি তিনি ভারতের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে[...] তবে দেখিতে পাইবেন ভারতবর্ষের ব্যাপ[...] অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক অশান্তির আগুন বিস্ত[...] লাভ করিতেছে এবং শান্তিপূর্ণ পথে য[...] এ দেশের শাসনভার দেশবাসীর হস্তে অপ[...] করিতে হয়, তবে এইসব অশান্তি ও অরাজক[...] দমন করা প্রথমে প্রয়োজন। শুধু তাহাই ন[...] যাহারা রাজনীতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এ[...] সব অনর্থ সৃষ্টি করিতেছে, তাহাদিগকে আ[...] নিরস্ত করা দরকার। নতুবা দেশবাসী[...] রাজনীতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিকভা[...] অভিব্যক্ত হইতে পারে না। লর্ড মাউণ্টব্যাটে[...] নিরপেক্ষভাবে একটু বিবেচনা করিলেই বুঝি[...] পারিবেন, বর্তমানের এইসব অশান্তি এ[...] অরাজকতার মূলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদে[...] ভেদ-বিভেদের নীতিই বীজস্বরূপে রহিয়া[...] এবং মুসলিম লীগের বিষবৃক্ষ সেই বী[...] হইতেই উদ্গত হইয়া আজ সমগ্র ভারতকে বি[...] করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদীদের পৃষ্ঠপোষকতা যদি না থাকিত, ত[...] লীগের অপচেষ্টা আজ এতটা অনর্থ সৃ[...] করিতে সমর্থ হইত না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী[...] ভারতের প্রতি সদিচ্ছার বড় বড় কথা মু[...] বলিয়াছেন; কিন্তু কার্যত তাঁহারা এতদি[...] পর্যন্তও লীগের দুষ্কার্যেই প্ররোচনা প্রদ[...] করিয়াছেন। তাঁহারা কংগ্রেসের স্বাধীনত[...] মূলক আন্দোলন দলন করিতে অমানুষিকভা[...] পশুশক্তি প্রয়োগে সঙ্কুচিত হন নাই; কি[...] লীগের অনুগতগণের দ্বারা প্ররোচি[...] সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা দমনে তাঁহাদে[...] অহিংসা-নিষ্ঠা এবং অসামান্য নিয়মতান্ত্রি[...] নির্লিপ্ততার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ল[...] ওয়াভেলের আমলেও ব্রিটিশ শাসকদের এ[...] লীলাখেলাই আমরা সর্বত্র দেখিয়াছি[...] বস্তুত ১৬ই আগস্ট কলিকাতার নিধনয[...] সম্পর্কে লর্ড ওয়াভেল নিরপেক্ষ দ্রষ্[...] মাত্র ছিলেন; দেখা গিয়াছে, বাঙলার সম্বন্ধে গভর্নর বারোজ সাহেবের নির্লিপ্ততা ততোধিক অথচ দেশবাসীর হাতে শাসনক্ষমতা যতদি

সম্পূর্ণভাবে হস্তান্তর করা না হইতেছে, ততদিন পর্যন্ত কেন্দ্রে গভর্নর-জেনারেল এবং প্রদেশসমূহে গভর্নরদের উপরই আইন ও শৃঙ্খলারক্ষার পূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত রহিয়াছে। তবে তাঁহারা সে সম্পর্কে তাঁহাদের কর্তব্য প্রতিপালন করেন নাই কেন? গৃহযুদ্ধের দ্বারা ভারতবর্ষ দুর্বল হউক এবং সেইভাবে কার্যত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভুত্ব এখানে দৃঢ়তা লাভ করুক, এমন একটা হিংস্র ও নিষ্ঠুর স্বার্থপরতার ভাবই তাঁহাদের মনে কাজ করিয়াছে। লর্ড মাউন্টব্যাটেনের ঘোষণা যদি আন্তরিকতাপূর্ণ হয়, তবে শাসনতান্ত্রিক অন্তরায়ের বাজে যুক্তি উপস্থিত না করিয়া ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অশান্তি সৃষ্টির জন্য লীগের যে ব্যাপক প্রচেষ্টা চলিতেছে, কঠোর-হস্তে তাহা দলন করিয়া সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই তাঁহার পক্ষে বর্তমানে প্রধান কর্তব্য। লীগ-নেতাদিগকে অবিলম্বে সমঝাইয়া দেওয়া দরকার যে, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট সত্যই ভারতের স্বাধীনতা চাহেন, ভেদ-বিদ্বেষ উস্কাইয়া তুলিয়া এদেশের পরাধীনতা দীর্ঘতর করিবার জন্য সাম্রাজ্যবাদিসুলভ যে নীতি তাঁহারা এতদিন অবলম্বন করিয়া চলিয়াছিলেন, অবস্থার গতিকে পড়িয়া পরিশেষে সে নীতি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। সুতরাং ভেদ-বিদ্বেষ সৃষ্টির দ্বারা ব্রিটিশ প্রভুদের মন জোগাইয়া তাঁহাদের কাছে আব্দার করিলে এখন আর বিশেষ সুবিধা হইবে না। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে প্রতিহত করিবার শক্তি তাঁহাদের হাতে নাই।

এসিয়ার ভবিষ্যৎ-গঠনে ভারত

নয়াদিল্লীতে আন্তঃ-এসিয়া সম্মেলনের সুদীর্ঘ অধিবেশন পরিসমাপ্ত হইয়াছে। এই অধিবেশন আমাদের অন্তরে নূতন আশা উদ্দীপ্ত করিয়াছে এবং নবীন প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছে। বিগত মহাযুদ্ধের ফলে বিপর্যস্ত জাপান ব্যতীত এসিয়ার সব দেশের প্রতিনিধিরাই এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। এসিয়ার নব অভ্যুত্থানের যাঁহারা নেতৃস্থানীয় পুরুষ, এই উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষ তাঁহাদের আতিথ্য-সেবা করিবার সৌভাগ্য লাভে ধন্য হইয়াছে। এসিয়ার দুইটি দেশের স্বাধীনতা-কামী সন্তানগণ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সংগ্রাম পরিচালনা করিয়া এসিয়ার সাম্প্রতিক ইতিহাসকে উজ্জ্বল করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ইন্দোনেশিয়া ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদীদের নাগ-পাশ বন্ধন ইহার মধ্যেই ছিন্ন করিয়া ফেলিতে সমর্থ হইয়াছে বলা চলে। সেখানকার প্রধানমন্ত্রী ডক্টর শারীর অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। ভিয়েৎনামের স্বাধীনতা সংগ্রামের এখনও পরিসমাপ্তি ঘটে নাই। সেখানকার প্রত্যেকটি যুবক স্বদেশের জন্য সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ করিয়া ফরাসীদের সঙ্গে লড়াই চালাইতেছে। ভিয়েৎনামের দক্ষিণ বাহিনীর প্রধান সেনাপতি এবং বীর সন্তানগণের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। মিশর, সিরিয়া, এসিয়ার কয়েকটি সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সমাবেশে এই সম্মেলন বিশেষভাবেই সমৃদ্ধ হইয়াছিল। দিল্লীর এই ঐতিহাসিক সম্মেলনে সমবেত প্রতিনিধিরা সকলেই এসিয়ার স্বাধীনতার উপর জোর দিয়াছেন। যদিও সম্মেলনে দেশবিদেশের প্রত্যক্ষ রাজনীতির সম্বন্ধে প্রসঙ্গ উত্থাপনের সুবিধা ছিল না; তথাপি প্রতিনিধিরা সকলেই তাঁহাদের অভিভাষণে নানাভাবে ভারতের স্বাধীনতার জন্য বিশেষভাবে আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন। একথা সুনিশ্চিতভাবে বলা চলে যে, ভারতবর্ষ হইতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদীরা বিদায় গ্রহণ করিলে ওলন্দাজ এবং ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদিগকেও তাহাদের ব্যবসা গুটাইয়া লইতে হইবে। সেই সঙ্গে মিশর এবং মধ্য প্রাচীতেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ঘাঁটি উপযুক্ত রসদের অভাবে এলাইয়া পড়িবে। জেনারেল চিয়াং কাইসেক গত ২৯শে মার্চ ভারতের প্রথম রাষ্ট্রদূত স্বরূপে মিঃ কে পি এস মেননকে অভিনন্দন করিতে গিয়া ভারতের স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে এসিয়ার নব-জাগরণের সূচনা দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "চীনের অধিবাসীরা বরাবরই ভারতের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। বর্তমানে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসান সুনিশ্চিত হইয়াছে। ত্রিশ বৎসরকাল অবিশ্রান্ত সংগ্রাম পরিচালনা করিয়া ভারতের স্বদেশ-প্রেমিক সন্তানগণ অবশেষে তাঁহাদের অভীষ্ট লাভে সমর্থ হইয়াছেন, ইহা দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি।" বলা বাহুল্য ভারতের স্বাধীনতার দিন সন্নিকটবর্তী দেখিয়া আজ এসিয়ার সকল দেশই আশায় উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছে, এবং ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামশীল কংগ্রেসকে অভিনন্দিত করিতেছে। কিন্তু এই দৃশ্য সাম্রাজ্য-বাদীদের চোখে সহ্য হইতেছে না। সম্প্রতি বিলাতের 'ইকোনমিস্ট' পত্র আন্তঃএসিয়া সম্মেলনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, জাপান এবং চীন এক সময় এসিয়ার নেতৃস্থান অধিকার করিতে চাহিয়াছিল, আজ ভারতের কংগ্রেসীরা সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের এমন নেকনজরের কারণ বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না; মোসলেম লীগওয়ালাদের সঙ্গে ইহাদের অন্তরের যে যোগসূত্র রহিয়াছে, এতদ্দ্বারা ইহাও বোঝা যায়। নবজীবনে জাগ্রত এসিয়ার উদার আদর্শের আলোকে এই সব সঙ্কীর্ণচেতা পেচকের দল অচিরেই বিবরে লুকাইতে বাধ্য হইবে।

আইনের মর্যাদার মূল্য

গত আগষ্ট মাসের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা সম্পর্কে একটি ১৩ বৎসর বয়স্ক বালককে হত্যা করার অপরাধে রাণীগঞ্জের গুমো খাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। হাইকোর্ট হইতে এই দণ্ডাদেশ অনুমোদিত হইয়াছিল। সম্প্রতি বাঙলার গভর্নর এই আদেশ মকুব করিয়া তাহার উপর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছেন। আরও একটি সংবাদে দেখা যায়, ঢাকার অন্তর্গত কেরাণীগঞ্জ থানার এলাকাধীন চুনপুটিয়া নিবাসী জনৈক তপশীলী সম্প্রদায়ের নেতাকে মারাত্মক-ভাবে জখম করিবার অপরাধে শুভাড্ডা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট মৌলবী আজিজুল হক চৌধুরী ওরফে কালু মিঞাকে ৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আসামীপক্ষ হইতে হাইকোর্টে আপীল করা হইলে, হাইকোর্ট তাহা অগ্রাহ্য করিয়া দণ্ডাদেশ বহাল রাখেন। কিন্তু বাঙলা গভর্নমেণ্ট ঐ দণ্ডভোগ স্থগিত রাখিয়াছেন। প্রথমোক্ত ঘটনার আসামী গুমো খাঁ রাণীগঞ্জের মুসলিম লীগের সভাপতি। তাহার দণ্ডাদেশ মকুব করিবার মূলে সে বিবেচনা বিশেষভাবে কার্য করিয়াছে বোঝা যায়। নতুবা বাঙলার প্রধান ধর্মাধিকরণের বিচার সিদ্ধান্ত নাকচ করিবার মত কোন কারণই এক্ষেত্রে নাই। বস্তুতঃ গভর্নর এই আদেশ মকুব করিবার ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই আইন ও শান্তিরক্ষার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর অভিমত গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই পরামর্শে এই আদেশ মকুব করা হইয়াছে। দ্বিতীয় ঘটনায় আসামীর দণ্ডও হাইকোর্ট কর্তৃক সমর্থিত হয়। আট মাসের কারাবাস, অপরাধের তুলনায় দণ্ড কিছুই বেশী নয়। কিন্তু বাঙলায় লীগ গভর্নমেণ্ট তাঁহাদের অনুগৃহীতগণের এতটুকু দণ্ড সহ্য করিতে রাজী নহেন। শাসন বিভাগে সাম্প্রদায়িকতা যদি ন্যায়-বিচারকে এইভাবে ব্যাহত করে, তবে সভ্য সমাজের ভিত্তিমূলই বিপর্যস্ত হইয়া যায়। নারীর মর্যাদা রক্ষা ও দেশপ্রেমের বৃহত্তর আদর্শের প্রেরণায় অনুষ্ঠিত 'অপরাধের' জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে অপরাধীর সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করা হইয়া থাকে এবং এদেশেও তাহা করা হইয়াছে, আমরা অস্বীকার করি না; কিন্তু নিছক সাম্প্রদায়িক হীন স্বার্থ এবং ক্রূর বিদ্বেষবুদ্ধিই যেক্ষেত্রে অপরাধের প্রেরণা যোগাইয়াছে, সেক্ষেত্রে এইভাবে দণ্ডাদেশে হস্তক্ষেপ করিলে সমাজের উপর তাহার প্রতি-ক্রিয়া কখনই শুভ হইতে পারে না।

শান্তি ও সমর

শিল্পী : শ্রীনন্দলাল বসু

পাইন গাছ : জনৈক চীনা শিল্পী অঙ্কিত

আন্তঃএশিয়া সম্মেলনে চিত্র-প্রদর্শনী

নয়াদিল্লীতে আন্তঃ-এশিয়া সম্মেলন উপলক্ষে যে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে এশিয়ার সংস্কৃতির নিদর্শনস্বরূপ প্রাচীন ও আধুনিক মূর্তি ও চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। উচ্চশ্রেণীর ভাস্কর্য ও চিত্রকলার নিদর্শন হিসাবে এগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। আমরা এই সমস্ত প্রদর্শিত চিত্র ও মূর্তি-শিল্পের কয়েকটি প্রতিলিপি মুদ্রিত করিলাম।

"খাজুরাহ" মন্দিরে একটি অপ্সরা মূর্তি

পোলো খেলা : ১৩২১ হিজরীতে অঙ্কিত পারস্য চিত্র

শিল্পী : রোকন আলি করিমি...

প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ

শিল্পী : শ্রীঅমূল্যগোপাল সেন

ভারতের নূতন বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন সম্বন্ধে সহযোগী-স্টেটসম্যান বলিয়াছেন—"He has charm, tact and good look"—"সুতরাং অচিরেই তাঁহাকে

নিয়া বিভিন্ন দলের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাওয়া কিছুই অসম্ভব নয়"—বলিলেন খুড়ো।

* * * *

এ কথা আমরা অনেকেই জানিতাম না যে লাট-পত্নীর সঙ্গে বড়লাটের বিবাহের পাকা কথাটা এই ভারতেই হইয়াছিল। ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া তাঁর প্রথম ভাষণেই লাট সাহেব সেই কথা আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন। যে মাটিতে থাকিয়া নিজের জীবনের এতবড় পাকা সিদ্ধান্ত তিনি করিলেন আশা করি সেই মাটিতেই ভারতের রাজনৈতিক জীবনের পাকা সিদ্ধান্ত করিতেও তিনি সক্ষম হইবেন। "তবে"—খুড়ো বলিলেন—"বড় ভয় হয়, তিনি বড় অদিনে-অক্ষণে ভারতে পৌঁছিয়াছেন, বারটা শনি, সময় শনির শেষ এবং তিথিটা ভরা অমাবস্যা।"

* * * *

দিল্লীর "Asian Relation Conference"-এ মুসলিম লীগ যোগদান করেন নাই। "কায়েদে আজম যে ভারতীয় নহেন একথা অবশ্য তিনি আগেই জানাইয়াছিলেন কিন্তু গোটা এশিয়ার সঙ্গেই যে তাঁহার দলের কোন Relation নাই এই কথা কিন্তু আমরা জানিতাম না"—বলিলেন খুড়ো।

* * * *

আমাদের শ্যামলাল একটি টাটকা খবরে জানাইল যে, শীঘ্রই নাকি বাঙলার মন্ত্রিসভার একটি রদবদল হওয়ার সম্ভাবনা

আছে। শ্যামলালের মন্ত্রী হওয়ার যে কোন সম্ভাবনাই নাই সেই কথা খুড়ো শ্যামকে জানাইয়া দিলেন।

* * * *

একটি সংবাদে প্রকাশ যে, প্রায় সাতাশ হাজার মুসলিম গার্ড নাকি আসামের এক গোচারণভূমিতে সমবেত হইয়াছেন। "তাঁহাদের সমবেত হওয়ার স্থান মনোনয়নের প্রশংসা করিতে পারিলাম না"—বলিলেন খুড়ো।

* * * *

কলিকাতার পথে ঘাটে গরু-ঘোড়া-মহিষ প্রভৃতি জন্তু-জানোয়ারের প্রতি যে প্রতিদিন অমানুষিক অত্যাচার চলে—তাই নিয়া স্টেটসম্যান Cruelty to animal শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধটি বেশ ভালই হইয়াছে কিন্তু যে সব animalদের ট্রাক্ ঠাসা করিয়া অফিসে আনা হয় তাহাদের উপর মানুষের জুলুমের উল্লেখ থাকিলে প্রবন্ধটি আরও ভাল হইতে পারিত।

* * * *

আন্তঃ এশিয়া সম্মেলনের প্রতিনিধিদের entertainment-এর জন্য কথাকলি, সেরাইকেলা নাচ প্রভৃতির ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গেল। পাঞ্জাবে লীগের

অপূর্ব তাণ্ডব নৃত্য দেখিয়াও অতিথিরা খুব amused হইয়াছেন—একটি অসমর্থিত সংবাদে এই কথাও জানা গেল।

* * * *

রাশিয়ার যে-সব মেয়েরা বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর লোকদের বিবাহ করিয়াছিলেন, জানা গেল সোভিয়েট সরকার নাকি তাঁহাদিগকে বৃটেনে গিয়া তাঁদের স্বামীদের সঙ্গে বসবাস করিবার অনুমতি দিতেছেন না।

"তৃতীয়পক্ষের বউ নিয়া ঘর করিয়াও যদি স্টালিন বিবাহের মূল্য বুঝিতে না পারেন, তবে আর কবে পারিবেন"—স্বখেদে বলে শ্যাম!

* * * *

"Britain is hungry—but healthy"—স্টেটসম্যান কাগজে প্রকাশিত একটি সংবাদের শিরোনামা। সুস্থ-

সবল অবস্থায় চলাফেরা করা সত্ত্বেও যে বৃটেন আজন্ম দুর্নিবার ক্ষুধায় কাতর এ সংবাদ পৃথিবীর কাহারও কাছেই নূতন নয়!

* * * *

আমেরিকাতে বিছানাবিক্রেতারা নাকি বালিশের উপর জনপ্রিয় চিত্রতারকাদের ছবি আঁকিয়া বাজারে বিক্রয় করিতেছেন। বিক্রেতার বেশ দুই পয়সা আয় হইতেছে তা বুঝিতেই পারিতেছি, কিন্তু চিত্রতারকার নামে যাদের মাথা ঘোরে, মাথা গুঁজিবার এইটুকু ব্যবস্থায় কি সেই মাথা ঠাণ্ডা হইবে?

* * * *

একটি সংবাদে প্রকাশ, ১৯৪৫—১৯৪৬ সালের মধ্যে ভারতের সিনেমা শিল্পে নাকি সাত শত উননব্বই লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। খুড়ো বলিলেন—"মাত্র! তবে আর এই লাইনের কথা ভাবিয়া মরি কেন!"

* * * *

এই বৎসরে ফুটবল খেলা হইবে না। মরসুমের সময় কর্তৃপক্ষ নাকি দর্শকদিগকে খেলার আইনকানুন এবং ঐ সঙ্গে "সৎ-ব্যবহার" শিক্ষা দিবেন। খুড়ো বলিলেন—"তার চাইতে এই সময় গাছে চড়াটা শিখাইয়া দিলে সকলেই নির্ঝঞ্ঝাটে ভবিষ্যতে খেলাটা দেখিতে পারিত, ফলে খেলায় লোক সমাগমও হইত, একটি স্টেডিয়ামের সমস্যারও সহজ-সমাধান হইয়া যাইত।"

পশুপতিবাবু খবরেরকাগজটা ভাঁজ করে রেখে দিলেন পাশে; তারপর চশমাটা ...ল কপালের ওপর তুলে দিয়ে কান পেতে ...নতে লাগলেন। হ্যাঁ, অনেকদূর থেকে ...ওয়াজ একটা আসছে বটে, কিন্তু কিসের ...ড়া এই অসময়ে? পালপার্বণ নয়, রোগ-...নাইয়ের কথাও শোনা যায়নি বিশেষ, তবে ... ঢেঁড়া কিসের?

খবর শোনবার আশায় সামনের উঠানে ...সছিলো যারা, তাদের মধ্যেও চঞ্চল হয়ে ...লো দু'একজন।

ঃ মাস্টার, আওয়াজ কিসের গো। শব্দটা ...দকেই আসছে যেন?

ঃ হুঁ, কিসের যেন একটা ঢেঁড়া বলেই মনে ...চ্ছ, চিন্তিত মনে হলো পশুপতিবাবুকে ঃ মা...তলার দয়াটয়া শুরু হলো নাকি কাছে-পিঠে ...থাও?

সে সমস্ত কিছু নয়। ঢেঁড়া পিটিয়ে ...ৎকার করে বলে গেলো লোকটা পাকুড় গাছের ...লায় দাঁড়িয়ে। লণ্ঠন উঁচিয়ে ধরলো আর ...ড় গড় ক'রে বলে গেলো মুখস্থ পড়ার মত।

খাস গোবিন্দপুর থেকে পালিয়েছে তিনজন ...কাত। এই গাঁয়ের দিকেই এসেছে তারা। ...বধান সবাই, মেয়েছেলে আর জিনিসপত্তর ...য়ে খুব হুঁসিয়ার। জোয়ান-মদ্দ তিনজন ...াককে ঘুরতে দেখলে এদিক সেদিক, মাঠে ...দানে কিংবা বনে-বাদাড়ে, চট করে খবর দিয়ে ...য় যেন গাঁয়ের থানায়। ব্যস খবর ঠিক হলে ...রকরে একশো টাকার নোট বখশিশ পেয়ে ...বে।

কথার ফাঁকে ফাঁকে ঢপ ঢপ ক'রে চললো ...কের কাঠি। ভাগ্যিস, রাত হয়েছিলো একটু ...লে ভীড়ই একটা জমে যেতো ঢাকীকে ঘিরে।

ঃ শুনলে মাস্টার, এ আবার কি উপদ্রব।

কোন উত্তর দিলেন না পশুপতিবাবু। ...মাটা আবার নামিয়ে নিলেন চোখের ওপর। ভাঁজ করা কাগজটা তুলে নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন।

ঃ এ গাঁয়ে ডাকাত ঢোকা মানে উপোস করা বাবাজীদের। দেখবে কিছুদিন পরেই ডাকাত তিনটে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে বাড়ি বাড়ি, হুঁ—নরহরি খুব চিবিয়ে চিবিয়ে বললো কথাগুলো, তারপর কাঁধ থেকে গামছা নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে খেতে বললোঃ নাও মাস্টার, পড়বে তো পড়ো।

ঃ আজ থাক নরহরি, অনেক রাত হয়ে গেছে—খড়ম পায়ে দিয়ে উঠান পার হয়ে পথে এসে দাঁড়ালেন পশুপতিবাবু।

এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিলো উমাচরণ, কোন কথা বলে নি। গাঁয়ের মধ্যে ছিটেফোঁটা যা কিছু ওরই আছে একটু। রোজগেরে দুই ছেলে শহরে, জমিজেরাতও আছে। সুদী কারবারের আয়ও নিন্দের নয়। আস্তে আস্তে বললোঃ কিন্তু এতো বড় ভাল কথা নয়। তিন তিনটে ডাকাত ঢুকেছে গাঁয়ের মধ্যে, কার কখন কি সর্বনাশ করে ঠিক কি!

পশুপতিবাবু হাসলেন একটুঃ ন্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়। তুমি খিলগুলো ভালো করে এঁটে শুয়ো উমাচরণ।

পথ চলতে চলতে কিন্তু বার বার অন্যমনস্ক হয়ে পড়তে লাগলেন পশুপতিবাবু।

অনেকদিন আগেকার একটা কথা কেবলই মনে পড়ে যেতে লাগলো। তখন কতই বা বয়স পশুপতিবাবুর—বড় জোর বারো কি তেরো। এক মহকুমা থেকে আর এক মহকুমায় বদলি হচ্ছিলেন ও'র বাপ। খালের নামই ছিলো ডাকাতের খাল। মাঝরাত্তিরে হৈ হৈ চীৎকার। অনেকগুলো মশালের আলোয় চক চক করে উঠেছিলো খালের জল। ঝাঁকড়া চুল, কপালের মাঝখানে প্রকাণ্ড সিঁদুরের টিপ, মিশ কালো গায়ের রং, সেই বাঘা ডাকাতের সর্দার, হুঙ্কার করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো নৌকার ওপর। তার-পরের কথাগুলো মনে হ'লে আজও গা যেন শির শির করে ওঠে পশুপতিবাবুর। বিরাট চেহারা রামগোপালবাবুর, বিখ্যাত লেঠেল নবী মিঞার নামকরা ছাত্র। সর্দারের হাত থেকে লাঠি ছিনিয়ে নিয়ে কি এলোপাথারী মার! দুলে দুলে উঠেছিলো সমস্ত নৌকাটা। মেয়েদের কান্না আর ডাকাতদের চীৎকারে সে এক বীভৎস ব্যাপার। মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে চুপ করে পড়েছিলেন পশুপতিবাবু। ডাকাতদের চেয়েও ও'র বাপের ভীষণ মূর্তিটা দেখেই কেমন যেন হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। এসব অনেকদিনের কথা। দিনকাল পাল্টে গেছে এখন। সে সব ডাকাতও নেই, ডাকাত ঠেকাবার মত তেমন জোয়ান মদ্দই কি আর আছে নাকি এ যুগে। সব যেন কেমন স্তিমিত হয়ে গেছে। ছোট পরিমিত এক গণ্ডির মধ্যে ঘোরাফেরা আর ছক বাঁধা জীবনযাত্রা। কোথাও কোন উন্মাদনা নেই।

ডাকাত না আরো কিছু? ছিঁচকে চোর-টোরই হবে। কেমন করে খাস গোবিন্দপুর থেকে ছিটকে এসে পড়েছে এদিকে,—তার জন্য আবার ঢ্যাঁড়া আর বখশিশের বহর! ঠোঁট মুচকে একটু হাসলেন পশুপতিবাবু, তারপর ঢালু জমির পাড় বেয়ে মাঠের পথ ধরলেন।

মাঝরাতে আচমকা কড়ানাড়ার শব্দে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে পড়লেন পশুপতিবাবু। নিশুত রাতে অমন করে ডাকছে কেন শান্তি। বেশ একটু ভয়ই পেয়ে লেগেন তিনি। দরজা খুলে বেরিয়ে দেখলেন কেমন যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে শান্তির মুখ।

ঃ কি ব্যাপার মা, এমন করছিস কেন?

গলায় যেন জোর নেই শান্তির। খুব আস্তে বললোঃ পুকুরধারে বাঁশঝোপের মধ্যে থেকে কেমন যেন একটা গোঙানী আসছে বাবা।

ঃ সে কি, কে বললে? তুই শুনলি কি করে? —বিচলিত হয়ে পড়লেন পশুপতিবাবু। বাড়ির পিছন দিকে ঘন বাঁশের ঝোপ। তিনটে কেন তিরিশটা জোয়ান-মদ্দ লোক দিনের বেলাও অনায়াসে লুকিয়ে থাকতে পারে সেখানে। কিন্তু কই কোন গোঙানীর আওয়াজ তো শোনা যাচ্ছে না এখান থেকে।

ঃ খেয়েদেয়ে শোবার পর হঠাৎ খেয়াল হলো ছোট বাটি একটা ফেলে এসেছি পুকুরঘাটে। কি জানি, যা দিনকাল। কাল ভোর অবধি অপেক্ষা করলে কি আর থাকবে বাটিটা। তাই বাটিটা আনার জন্য পুকুরপাড়ে যেতেই গোঙানীর শব্দ একটা কানে এলো। এগোবার সাহস হলো না আর, দৌড়ে পালিয়ে এলাম।

খড়মটা পায়ে দিয়ে ততক্ষণ তৈরী হয়ে নিলেন পশুপতিবাবু।

ঃ তোর যেমন কাণ্ড; শেয়ালের বাচ্চাটাচ্চার চীৎকার হবে। নে আয়, লণ্ঠনটা ধর।

পশুপতিবাবুর পিছন পিছন লণ্ঠন নিয়ে চললো শান্তি কিন্তু ঘাটের কাছ বরাবর গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন পশুপতিবাবু। কেমন

যেন একটা কাতরানীর শব্দ আসছে বাঁশবন থেকে। মানুষের কাতরানী বলেই মনে হচ্ছে যেন। শান্তির হাত থেকে লণ্ঠনটা নিয়ে তিনি সাবধানে পা ফেলে এগিয়ে গেলেন।

বেশীদূর এগোতে হলো না। ঝাঁকড়া জামরুল গাছটার তলায় সাদা মতন কি যেন একটা রয়েছে পড়ে। নুয়ে পড়া বাঁশগুলো এড়িয়ে আস্তে আস্তে আরো এগিয়ে গেলেন পশুপতিবাবু। বছর চব্বিশ পঁচিশের একটি ছোকরা, ক্ষতবিক্ষত সারা গা, কপালের পাশ দিয়ে ঝরছে রক্তের ধারা, পরণের কাপড়েও চাপ চাপ রক্তের দাগ। দাঁতের ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে একটা গোঙানীর শব্দ বেরিয়ে আসছে। একটু বিস্মিতই হলেন পশুপতিবাবু। এভাবে এখানে আসলো কি করে ছেলেটি। পুকুর থেকে আঁজলা আঁজলা জল ছিটোলেন তার মুখে চোখে। অনেকক্ষণ পরে চোখ খুললো ছেলেটি। কেমন যেন উদাস দৃষ্টি দুটি চোখেঃ কোথায় আমি?

আস্তানা? অচেনা, অজানা একটা লোককে নিয়ে তুলবে ঘরে? তারপর?

শান্তি কিন্তু দ্বিধা করলো না একটুও। এগিয়ে এসে বাপের হাত থেকে টেনে নিলো লণ্ঠনটা তারপর মৃদু গলায় বললোঃ বাবা, তুমি ওঁকে নিয়ে এসো ধ'রে। চিলেকোঠার ঘরে শোবার বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি আমি।
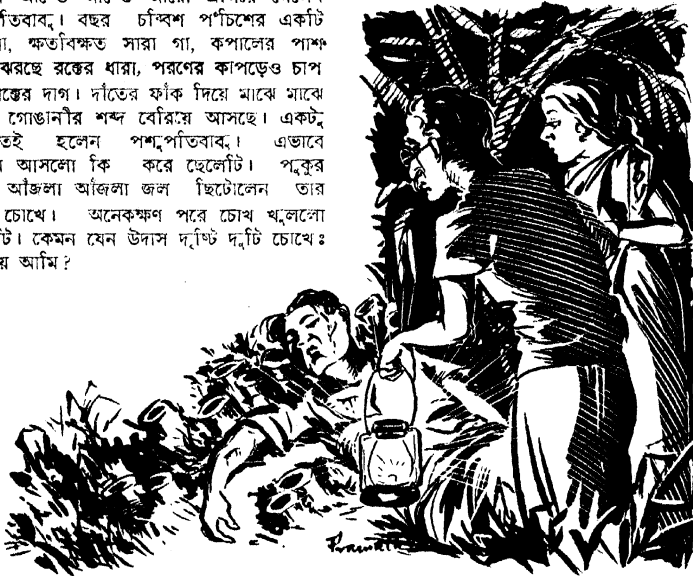
দাঁতের ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে একটা গোঙানীর শব্দ বেরিয়ে আসছে

ঃ ভালো জায়গাতেই আছো তুমি। কিন্তু এখানে আসলে কি করে?

কষ্টে উঠে বসলো ছেলেটি। চেয়ে দেখলো এদিক ওদিক, তারপর ঝুঁকে পড়লো পশুপতিবাবুর দিকেঃ অন্ধকারে পথ চিনতে না পেরে ঢুকে পড়েছি এইদিকে। গাছের গুঁড়িতে হোঁচট খেয়ে ঠিকরে পড়েছি এখানে।

চমকে উঠলেন পশুপতিবাবু। লণ্ঠন তুলে ধরে সন্ধানী দৃষ্টি বুলালেন ছেলেটির সারা দেহে। ম্লান আলোয় আরো যেন অসহায় দেখালো ছেলেটিকে কিন্তু বিক্ষত মুখেও কেমন যেন একটা সম্ভ্রমের ছাপ। যে কথাটা মনের অন্তরালে উঁকি ঝুঁকি দিলো পশুপতিবাবুর, সে কথাটা কিন্তু কিছুতেই মানতে চাইলো না তার মন। তবু একবার জিজ্ঞাসা করলেন তিনি ঃ সঙ্গে ছিলো নাকি কেউ?

অন্ধকারেও যেন জ্বলে উঠলো চোখ দুটি ছেলেটির ঃ না, সঙ্গে কে থাকবে? এ গাঁয়ের নাম কি বলতে পারেন?

ঃ বনমালীপুর।

ঃ রাতের মত একটা আস্তানা দিতে পারেন আমাকে? ভোরের আগেই চলে যাবো।—খুব কাতর শোনালো ছেলেটির গলা।

হাত ধরে ছেলেটিকে তুলে ধরলেন পশুপতিবাবু। সন্তর্পণে একটা হাত তার কোমরে দিয়ে আস্তে আস্তে নিয়ে এলেন বাঁশবন পেরিয়ে। সিঁড়ি পার হয়ে দুতলার চিলেকোঠার ঘরে এনে শুইয়ে দিলেন তাকে।

ঃ আজকের রাত্তিটা কাটিয়ে ভোরের আগেই চলে যেও কিন্তু। উত্তরে ঘাড় নাড়লো ছেলেটি।

সিঁড়িতে নামবার মুখে দেখা হয়ে গেলো শান্তির সঙ্গে।

ঃ তোর যেমন কাণ্ড, চেনা নেই জানা নেই, কোথাকার কে, ঘরে এনে ঢোকালি একেবারে। চোর-ছ্যাঁচড় কিনা ভগবান জানেন!

ঃ আহা, কি যে বলো তার ঠিক নেই। দেখছো না ভদ্দর ঘরের মতন চেহারা! ওরকম চেহারা হয় নাকি চোর-ছ্যাঁচড়দের?

ঃ হুঁ, চেহারা, কত রকম চেহারা করে ওরা। ওদের অসাধ্য কাজ আছে নাকি দুনিয়ায়। চোর-বদমাইস যদি নয়, তবে বলুক না আসছে কোন গাঁ থেকে, যাবেই বা কোথায়? পথ ভুলে অমনি বাঁশবনের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো মাঝ-রাত্তিরে। পরণের কাপড় আর জামা দুই-ই শত-ছিন্ন, হাঁটু অবধি কাদায় মাখানো। অনেক দূরের জলা ভেঙে আসছে নিশ্চয়। খাস গোবিন্দপুর কি এখানে নাকি? না, এসব লোক ঘরে রাখা কোন কাজের কথা নয়।

পায়ে পায়ে আবার সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলেন পশুপতিবাবু। আস্তে কপাটের শিকলটা তুলে দিলেন। তবু খানিকটা বাঁচোয়া। নিশুত রাতে ঘরের জিনিসপত্তর নিয়ে সরে পড়লেই তো সর্বনাশ। যত সব আপদ এসে জোটে।

খুব ভোর থাকতেই উঠে পড়লেন পশুপতিবাবু। সারারাত ভালো ঘুমও হয় নি তাঁর। ঘরে একটা জলজ্যান্ত ডাকাত পুরে রেখে ঘুম আসে নাকি কারো?

ঘরের কপাটটা খুলেই তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। মাথার ওপর হাতটা রেখে অঘোরে ঘুমোচ্ছে ছেলেটি। অন্ধকার রাতে চেহারা ভালো করে দেখা যায় নি কাল। দিব্বি ফুটফুটে গায়ের রং, নিটোল স্বাস্থ্য, ক্ষত-চিহ্ন গুলো যেন যুদ্ধবিজয়ী বীরের রূপ দিয়েছে তাকে।

ছেলেটির গায়ে হাত দিয়ে ডাকতে গিয়ে কিন্তু ঘাবড়ে গেলেন পশুপতিবাবু। আগুনের মতন গরম সারা গা, হাত রাখা যায় না। সর্বনাশ, এ আবার কি বিপদ। কোথাকার কে তার ঠিক নেই, এই রকম বেহুঁস হয়ে পড়ে রইলো জ্বরে, কদিনে সারবে ভগবানই জানেন। কে দেখে ফেলবে কোথা থেকে, একবার লোক জানাজানি হয়ে গেলে বিপদের অন্ত থাকবে না। কিন্তু কিছু একটা করতে হয়। এমনি বেহুঁস হয়ে পড়ে থাকবে নাকি ছেলেটা!

ঃ শান্তি, শান্তি।

ধারে কাছেই ছিলো শান্তি। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলো ওপরেঃ কি বাবা।

ঃ দ্যাখ কাণ্ড! কি মুস্কিলে পড়লাম বল তো? গা যেন একেবারে পুড়ে যাচ্ছে। কদিন চলবে এর জের ঠিক আছে!—সত্যিই মুষড়ে পড়লেন পশুপতিবাবু।

ঃ আহা, কার বাছা রে, ভিন গাঁয়ে এসে অসুখে পড়লো এমনিভাবে! অধর কবরেজকে একবার খবর দিলে হয় না বাবা?

ঃ হ্যাঁ কবরেজ আর ডাকবে না। নইলে আর সবশুদ্ধ হাতে দড়ি পড়বে কেন! বিরক্ত হয়ে উঠলেন পশুপতিবাবু। না, আর নয়, কাল রাতের ছোঁড়ার কথাটা স্পষ্ট করে জান্‌ত হবে শান্তিকে। চেহারা দেখে লোক চেনা গেলে আর ভাবনার কি ছিলো? মানুষ কি কম দেখেছেন পশুপতিবাবু। মাষ্টারী জীবনে গণ্ডায় গণ্ডায় ছেলে পার হয়েছে তাঁর হাত থেকে। শান্তশিষ্ট চেহারার কত ছেলেকে টিফিনের সময় স্কুল-বাড়ীর পিছনের মুদীখানার দোকানে বসে সিগারেট খেতে দেখেছেন তিনি, তার হিসেব আছে? পুলিশের তাড়া খেয়ে বাঁশবনে ঢুকে পড়ে বড় বেকায়দায় পড়ে গেছে ছোকরা! বলা যায় নাকি, পেটকাপড়ে হয়ত লুকানো রয়েছে হারের ছড়া কিংবা কারুর কানের মাকড়ি।

সমস্ত দিনটা একইভাবে কাটলো। বিকেলের দিকে উঠে বসলো ছেলেটি। থমথমে মুখের ভাব।

কথাটা আর না বলে পারলেন না পশুপতি-
ঃ লুকোচুরি করে আর লাভ কি বলো? াদের এ গাঁয়ে ঢোকবার খবর ঢেড়া পিটিয়ে ানো হয়েছে চারদিকে। কার সর্বনাশ করে য়েছো বলো তো? ছি, ছি, চেহারায় তো রলোক বলেই মালুম হচ্ছে, কিন্তু এই ্য কাজ করতে প্রবৃত্তিও হয় তোমাদের?

অনেকক্ষণ কোন কথা বললো না ছেলেটি। দৃষ্টে চেয়ে রইলো পশুপতিবাবুর দিকে, পর মাথাটা দেয়ালে ঠেস দিয়ে চোখ বন্ধ বসে রইলো চুপচাপ।

ঃ অনুতাপ যদি এসে থাকে তো খুবই ন্দের কথা। আমি একেবারে জাত-মাষ্টার, ন ছেলেছোকরা বিপথে গেলে, চেনা হোক, চনা হোক আমার বড্ড কষ্ট হয়। ছেড়ে দাও পথ, বুঝলে, ভগবান তোমার ভালোই বেন।

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন টে পড়লো ছেলেটিঃ না, অনুতপ্ত মি হই নি। যে পথ আমি বেছে য়েছি, সেই আমার পথ। এজন্য টুও দুঃখিত নই আমি। কিন্তু আপনারাও মাদের ঘৃণা করবেন এইভাবে, আপনারাও বেন ভুল পথে চলেছি আমরা?

একটু বিব্রত হয়ে পড়লেন পশুপতিবাবু, মতা আমতা করলেনঃ অন্যায় সব সময়েই ন্যায়! কিন্তু খাস গোবিন্দপুরে কার সর্বনাশ র এসেছো বলো তো?

মাথাটা দু'হাতে চেপে ধরে উঠে দাঁড়ালো লেটি, পা'দুটো তার কাঁপছে ঠক ঠক করে। রা মুখ উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে। জ্বরের াপ এখনো রয়েছে বৈ কি—

ঃ যা ইচ্ছে বলতে পারেন আপনি। স্বীকার করতে চাই না কিছু। হ্যাঁ, আমরাই ট করেছি খাস গোবিন্দপুরের ডাকঘর, হনচরের থানা জ্বালিয়ে দিয়েছি, রেলের ইন তুলে ফেলেছি। আমরা চোর, আমরা কাত, নিন কোথায় নিয়ে যাবেন চলুন। নায় নিয়ে যেতে পারলে হয়ত মোটা রকমের খশিশের বন্দোবস্ত হয়ে যেতে পারে আপনার।

ভীষণভাবে কাঁপতে লাগলো ছেলেটি। ঠিক ময়ে পশুপতিবাবু ধরে না ফেললে হয়ত ড়েই যেতো মেঝেতে। আস্তে আস্তে বিছানায় ইয়ে দিলেন ছেলেটিকে তারপর হাতের ছে আর কিছু না পেয়ে সেদিনের খবরের গজটা দিয়েই বাতাস করতে সুরু করলেন।

কিন্তু বলে কি ছেলেটি! দিনের পর দিন মোটা মোটা হরফে যে সব খবর দেখা গিয়েছিলো গজের পাতায়, সে সব এদেরই কাণ্ড! পুলিশের গুলীর সামনে বুক পেতে দিয়ে-ছিলো দলে দলে! অনেক বছরের জমানো ঞ্জাল দু'হাতে পরিষ্কার করতে চেয়েছিলো বুঝি!

খুট করে একটু আওয়াজ হতেই পিছন ফরে চেয়ে দেখলেন পশুপতিবাবু। দরজার পাটে হেলান দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে ান্তি। সবই শুনেছে বোধহয় সে। খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে নেমে গেলেন তিনি।

সে রাতে উমাচরণের দাওয়ায় বসে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে বার বার অন্যমনস্ক হয়ে যেতে লাগলেন পশুপতিবাবু। দেবানন্দপুরে রেলের লাইন তুলে ফেলেছে ডাকাতেরা। লড়াইয়ের মশলা নিয়ে যাচ্ছিলো রেলগাড়ী,—সেই গাড়ী আটক করে সমস্ত কিছু লুট করেছে তারা। সেই ডাকাতদের দলের মধ্যে মেয়েও নাকি ছিলো গোটাকতক।

ঃ বলো কি মাষ্টার, দিনকাল কি হলো। মেয়েছেলে পর্যন্ত ডাকাতি করতে শুরু করেছে? উঃ, ভাবতেও যেন গা শিউরে ওঠে। সত্যি সত্যিই পা'দুটো মুড়ে সরে বসলো উমাচরণ।

ঃ মরবার আগে পিঁপড়ের পালক ওঠে না মাস্টার, তাই হ'য়েছে বুঝি। আরে বাবা, পুলিশের সঙ্গে ইয়ারকি, দেবে ঝাড়ে-বংশে শেষ করে।

অন্য দিনের মত আজ কিন্তু একটি কথাও বলতে পারলেন না পশুপতিবাবু। জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে এরা কিসের জোরে? নাবালক শিশু থেকে শুরু ক'রে বাড়ির মেয়েরা পর্যন্ত হাতিয়ার ধরেছে কিসের আশায়? পারবে তো এরা টিকে থাকতে শেষ পর্যন্ত। না, না, যাই বলুক কাগজওয়ালারা, ডাকাত এরা নয়! দেশের লোক আজ হয়ত চিনতে পারছে না এদের, কিন্তু একদিন চিনবে ঠিক! কিন্তু সেদিন সে চেনার কোন দামই হয়ত থাকবে না।

ঃ থামলে কেন মাস্টার, পড়ো, পড়োঃ ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো নরহরিঃ যাই বলো, বুকের পাটা আছে কিন্তু লোকগুলোর। তারপরেই গলার সুরটা হঠাৎ নামিয়ে আনলো নরহরিঃ আচ্ছা, সেই ডাকাত তিনটের খবর কি মাস্টার? আছে নিশ্চয় ঘাপটি মেরে কোথাও। পুলিশে ঘেরাও করে ফেলেছে গাঁ, যাবে কোথায় বাছাধনরা।

ঃ কেউ হয়ত আশ্রয় দিয়ে থাকবে তাদের। গাঁয়ের লোকের বুদ্ধির দৌড় তো জানি। মরবে একদিন গুষ্টি শুদ্ধ! কেমন যেন একটা ঝাঁজ উমাচরণের কথায়।

খড়ম পায়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন পশুপতিবাবুঃ তোমাদের এক কথা! এ গাঁয়ে ডাকাত ঢুকবে, না আরো কিছু! উঠি আজ।

ঃ সে কি মাস্টার, এর মধ্যে উঠছো?

ঃ শরীরটা কেমন ম্যাজ ম্যাজ করছে। আচ্ছা চলি—পালিয়ে যেন বাঁচলেন পশুপতিবাবু।

জ্বরের ঘোরটা কেটে গেছে অনেকটা। বালিশে ঠেস দিয়ে ব'সেছিলো ছেলেটি। পশুপতিবাবু কাছে যেতেই মুখ তুলে চাইলো তাঁর দিকেঃ কি থানায় খবর দিয়ে এলেন বুঝি?

আশ্চর্য মনে হ'লো পশুপতিবাবুর। এই অবস্থাতেও পরিহাস করতে পারে নাকি মানুষে!

ঃ কেন এমনভাবে জীবনটা নষ্ট করছো বাবা? তোমরা দেশের আশা ভরসা সবই। হাতিয়ারের সঙ্গে কদিন যুঝবে তোমরা?

ঠোঁট মুচকে হাসলো ছেলেটিঃ যুঝতে না পারি মরবো। আমরা কয়েকজন মরে যদি দেশের অনেক লোক বাঁচে, তাতে ক্ষতি কি! অত্যাচার সহ্য করারও একটা সীমা আছে মাস্টার মশাই। কুকুর শেয়ালের বেহদ্দ নাকি আমরা? উত্তেজনায় গলার শিরাগুলো ফুলে উঠলো ছেলেটির। মুষ্টিবদ্ধ দুটি হাত।

ঃ কিন্তু এভাবে কদিন লুকিয়ে থাকবে তুমি। আমি বা কদিন লুকিয়ে রাখতে পারবো তোমাকে—

ঃ ভয় পাবেন না আপনি, আমি একটু দাঁড়াতে পারলেই চলে যাবো এখান থেকে। সঙ্গী দুজনের খোঁজও করতে হবে আমাকে। তা ছাড়া, আমার বোনের মরা খবরও নিয়ে যেতে হবে মার কাছে।

পাথরের মতন শক্ত হ'য়ে গেলেন পশুপতিবাবু। নিষ্পলক দৃষ্টিতে শুধু চেয়ে রইলেন ছেলেটির দিকে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ। শান্তি এসে বসলো চৌকাঠের পাশে। লণ্ঠনের ম্লান আলোয় সব কিছু যেন কেমন বিষণ্ণ আর অস্পষ্ট।

বেশ কিছুক্ষণ পর কথা কইলেন পশুপতিবাবুঃ তুমি না সেরে উঠে কিন্তু যেতে পারবে না বাবা। আমার যাই হোক, আমি লুকিয়ে রাখবো তোমাকে।

একটা হাত বাড়িয়ে পশুপতিবাবুর পা দুটো ছুঁলো ছেলেটি, হাতটা ঠেকালো নিজের কপালে তারপর বললোঃ না, মাস্টার মশাই, আপনাদের বিব্রত করবো না। আপনাদের দয়া জীবনে কোনদিন ভুলবো না। কথা বলতে যেন কষ্টই হচ্ছে ছেলেটির। কথার শেষে চোখ দুটো বন্ধ করে ফেললো আর আস্তে আস্তে মাথাটা রাখলো বালিশে।

উঠে পড়লেন পশুপতিবাবু। ভারি বিশ্রী লাগছে ওঁর। এত জায়গা থাকতে ওর বাড়িতেই বা আশ্রয় নিলো কেন ছেলেটি? ওর নিস্তরঙ্গ জীবনে বিরাট একটা ঢেউয়ের আভাষ যেন।

ঃ বাবা—শান্তি এসে দাঁড়ালো পাশে।

ঃ কি মা!

ঃকিন্তু এভাবে কতদিন চলবে বাবা, পাড়ার মেয়েরা একদিন এলেই সব জানাজানি হ'য়ে যাবে? পুলিশের হাত থেকে আমাদের বাঁচাই যে শক্ত হ'য়ে উঠবে তখন!

ঃ কিন্তু তাই ব'লে অসুস্থ দুর্বল একটা লোককে কিভাবে ঘাড় ধ'রে পথে বের করে দিই বল্? দু একদিনের মধ্যেই সেরে উঠবে ছেলেটি, তখন নিজেই চলে যাবে। ওরা

কারুর বাড়িতে বেশীদিন থাকে না রে, কোথাও ওরা বেশীদিন থাকে না।

খুব ভোরবেলা গীতা পাঠ করতে করতে কেমন যেন সন্দেহ হ'লো পশুপতিবাবুর। খস্ খস্ ক'রে আওয়াজ আসছে বাঁশবনের দিক থেকে আর ফিস্‌ফাস্ শব্দ। জানলা একটু খুলেই চমকে উঠলেন পশুপতিবাবু। গোটা পাঁচেক পুলিশ মিলে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজছে সমস্ত বাঁশবন। দু একজন পুকুর পাড়ের কাঠালী চাঁপার ঝোপটাও খোঁচাচ্ছে লাঠি দিয়ে। সন্দেহ করলো নাকি ওকে? এত জায়গা থাকতে এখানে এত খোঁজাখোঁজি কিসের! গীতা বন্ধ করে বাইরে এলেন পশুপতিবাবু। রাস্তার ওপরেই বড়ো দারোগাবাবু দাঁড়িয়েছিলেন। এগিয়ে এলেন পশুপতিবাবুকে দেখে: নমস্কার মাস্টার মশাই!

: নমস্কার, কি ব্যাপার, এত খোঁজার ধুম যে?

সঙ্গে। কপাটের আড়ালে দাঁড়িয়ে সবই শুনে-ছিলো সে। ফ্যাকাসে হ'য়ে গেছে তার মুখ। নিষ্প্রভ দুটি চোখ। কিন্তু হাত নেড়ে নেড়ে ইসারায় কি যেন বললো শান্তি। কি ব্যাপার. আছে নাকি কোন উপায়!

: মাস্টার মশাই, আপনার বাড়িতে তো মেয়েছেলের বালাই নেই বিশেষ। আপনার মেয়েকে বলুন বাইরে এসে বসতে, আমরা একবার ঘুরে দেখবো ভিতরটা। বুঝতেই তো পারছেন, এ আমাদের কর্তব্য, নইলে আপনি যে কি মানুষ, তাতো আমরা সবাই জানি। এ সব গুণ্ডাদের আপনি প্রশ্রয় কোনদিনই দেবেন না।

দারোগাবাবুর মুখের দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন পশুপতিবাবু। সব কথাগুলো যেন ভালো ক'রে কানেই গেলো না তাঁর। পা দুটো কাঁপছে বিশ্রীভাবে আর অবসাদ নামছে সারা শরীরে।

: বাবা, বাবা,—আচমকা শান্তির গলায় যেন চমক ভাঙলো তাঁর। এ কি, এমন ক'রে

"আমরা কয়েকজন মরে যদি দেশের অনেক লোক বাঁচে তাতে ক্ষতি কি!"

এক গাল হাসলেন দারোগাবাবু: দুটো বদমাইস ধরা পড়েছে কাল রাত্তিরে। দু এক ঘা পিঠে পড়তেই সত্যি কথা বেরিয়ে পড়লো মুখ দিয়ে। তিন নম্বরেরটি নাকি এই বাঁশবনের মধ্যেই লুকিয়ে পড়েছিলো। দেখা যাক খুঁজে, পাই তো ভালো, না হ'লে আশেপাশের বাড়ি-গুলোও খানাতল্লাসী করতে হবে একবার। যাবে কোথায় ব্যাটা। উঃ, কম ভুগিয়েছে মশাই, ওপরওয়ালার গালাগাল খেতে খেতে জান যবার যোগাড়।

মাথাটা যেন ঘুরে উঠলো পশুপতিবাবুর। সর্বনাশ, এখন উপায়। যে ক'রেই হোক বাঁচাতে হবে ছেলেটিকে। এমনি করে বাঘের মুখে কিছুতেই তুলে দিতে পারবেন না তিনি। মুখ ফেরাতেই চোখাচোখি হ'য়ে গেলো শান্তির

বাগানের দিক থেকে দৌড়ে আসছে কেন শান্তি? খিড়কির দোর দিয়ে বেরিয়ে বাগানের দিকেই বা কেন গিয়েছিলো সে?

কাছে আসতেই কিন্তু ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে আসলো। খুব হাঁফাচ্ছে শান্তি, বাতাসে উড়ছে ওর এলোমেলো খোলা চুলের রাশ। দু হাত দিয়ে বুকটা চেপে ধরে পশুপতিবাবুর পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়লো শান্তি।

: কি, কি ব্যাপার? উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন পশুপতিবাবু। দারোগাবাবুও ঝুঁকে পড়লেন শান্তির দিকে।

: পুকুরের ওপার থেকে কার যেন গোঙানীর শব্দ আসছে বাবা, কে একজন বসে রয়েছে হোগলার ঝোপের ভিতরে। লাল দুটো চোখ, খোঁচা খোঁচা একমুখ দাড়ি—কথা বন্ধ ক'রে আবার

হাঁফাতে শুরু করলো শান্তি।

: ব্যস, ব্যস, আর বলতে হবে না। ঐ ব্যাটাকেই তো খুঁজছি আমরা। কোন দিকে বললেন?

হাত তুলে পুকুরপাড়ের দিকে দেখিয়ে দিলো শান্তি: চলুন, আমিও যাচ্ছি আপনাদের সঙ্গে। বাবা, তুমি ঘরের ভিতর যাও। ঠাণ্ডা লাগিও না এইভাবে।

দারোগাবাবুর ইঙ্গিতে পুলিসগুলো বেরিয়ে এলো বাঁশবন থেকে, তারপর চলতে শুরু করলো শান্তি আর দারোগাবাবুর পিছনে।

তিলমাত্র সময় নষ্ট করলেন না পশুপতি-বাবু। জোর পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলেন চিলেকোঠায়। ভেজানোই ছিল দরজাটা। আস্তে ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়লেন পশুপতি-বাবু। অঘোরে ঘুমাচ্ছে ছেলেটি নিশ্বাসের ছন্দে দুলছে পেশীবহুল বুক। কেমন যেন মায়া হয় ছেলেটির দিকে চাইলে। দু-একবার ডাকতেই ধড়মড় করে উঠে পড়লো ছেলেটি।

: কি, কি ব্যাপার?

: চুপ, পুলিস সন্ধান করছে তোমার। বাঁশবন তন্ন তন্ন করে খুঁজছে তারা। শীগ্গির বেরিয়ে এসো আমার সঙ্গে। যে রকম করেই হোক পালাতে হবে তোমাকে।

: কিন্তু পুলিস যদি ঘিরে ফেলে থাকে চারদিক, পালাবো কোথা দিয়ে মাস্টারমশাই?

: কোন ভয় নেই, আমার মেয়ে সরিয়ে নিয়ে গেছে তাদের পুকুরের ওপারে। কিন্তু আর সময় নেই, এখনি হয়ত ফিরে আসবে তারা বাড়ি খানাতল্লাসী করতে। খিড়কীর দোর দিয়ে বেরিয়ে পড়ো তুমি। বাঁশবনের ভিতর দিয়ে; ধানক্ষেতের আলের ওপর দিয়ে চলে যাও সোজা। ভৈরবী নদী পেরিয়ে একবার ওপারে পেঁছাতে পারলে আর বোধ হয় ভয়ের কিছু নেই, কিংবা নদীর পার দিয়ে দিয়ে শ্মশানের পাশের জঙ্গলে গিয়ে যদি ঢুকতে পারো, তাহলে আর চট করে কেউ সন্ধান পাবে না তোমার।

হাত ধরে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে আনলেন ছেলেটিকে। সাবধানে খিড়কীর দোর খুলে উঁকি দিয়ে দেখলেন একবার। না, কেউ নেই ধারে কাছে। খুব বুদ্ধি করে শান্তি সরিয়ে নিয়ে গেছে ওদের।

ছেলেটি নীচু হয়ে পশুপতিবাবুর পায়ে হাত দিতেই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তিনি: থাক বাবা, আমার মতন লোক তোমাদের প্রণামের যোগ্য নয়। আর দেরী ক'রো না, সোজা বাঁশবনের ভিতর দিয়ে চলে যাও। ভালোই হ'য়েছে ঘন কুয়াশা নেমেছে ভোরবেলা, অনায়াসে যেতে পারবে গা-ঢাকা দিয়ে।

দাওয়া থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লো ছেলেটি একবার পিছন ফিরে দেখলো পশুপতি বাবুর দিকে চেয়ে, তারপর সাবধানে পা বাড়ালো

নের দিকে। পা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই র আমগাছের পিছন থেকে সশব্দে হাসতে ত বেরিয়ে এলেন খগেনবাবু—থানার ছোট গা। হাতের লাঠিটা দিয়ে ছেলেটির বুকে রে আঘাত করতেই ঠিকরে পড়ে গেলো টি। জামার প্রান্ত ধরে আবার তাকে টেনে লন খগেনবাবু। পশুপতিবাবুর দিকে হাসলেন গোঁফটা মুচকে: ধন্যবাদ মাস্টার- , একটা কাজের কাজ করলেন আপনি। , এ সবের প্রশ্রয় কোনদিন দেন না আপনি। ঠায় দাঁড়িয়ে আছি আমগাছটার পিছনে ঘণ্টাখানেক ধ'রে। বেড়াতে বেড়াতে যাবেন একবার থানার দিকে, বখশিশের টাকাটা নিয়ে আসবেন।

ছেলেটি ঘাড় ফিরিয়ে একবার শুধু চাইলো পশুপতিবাবুর দিকে। জ্বলে উঠলো চোখ দুটি তার। ঠোঁট দুটি একবার একটু কেঁপেই স্থির হ'য়ে গেলো।

পশুপতিবাবু কিন্তু বেশীক্ষণ চেয়ে থাকতে পারলেন না ছেলেটির জ্বলন্ত দৃষ্টির দিকে। সমস্ত কেমন যেন গোলমাল হ'য়ে গেলো তার। বাঁশের বন আর দূরের নারকেল গাছগুলো তালগোল পাকিয়ে ঘুরতে লাগলো চোখের সামনে। অনেক কষ্টে জানলার গরাদ ধ'রে টালটা সামলে নিলেন তিনি। কিন্তু না, এভাবে দুলছে কেন পায়ের তলার মাটি। আমগাছটা কেবলই যেন এগিয়ে আসছে। প্রচুর বোল কিন্তু ধরেছে এবার বারোমেসে আমগাছটায়। কুয়াশা কাটিয়ে উঠতে পারলে খুব ফলবে এবার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাটিয়ে উঠতে পারবে তো এই জমাট কুয়াশা!

(১০)

আত্ম-দর্শন

রক্ত মাংস অস্থিময়, কৃমিকীট মলমূত্রবসা ও পূঁজযুক্ত শরীর এবং ইহাতে সংলগ্ন টি ইন্দ্রিয় যন্ত্র এই সমস্তই জড়পদার্থ ইহাদের হারই কোন বাসনা কামনা লালসা নাই। ই বৃহৎ জড়পিণ্ডকে হাসায় কাঁদায় নাচায়, ায় হাঁটায় খাটায় এবং অশেষ প্রকারের কাজে গায় যে শক্তি, তাহাকে আমরা "মন" বলি।

একটা প্রকাণ্ড হাতী মনের ইঙ্গিত মাত্রে কশত মণ ওজনের শরীরের বোঝাটা লইয়া রূপ অনায়াসে ছুটিতে থাকে, তাহা ভাবিয়া খিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়, কিন্তু আমরা র্বদা এইরূপ ঘটনা দেখিতেছি বলিয়া বিস্ময় াধ করি না; দেখিতে দেখিতে উহা আমাদের হিয়া গিয়াছে। নিবিষ্ট মনে হাতী ঘোড়া ভৃতি জীবজন্তুর এবং মানুষের ছুটাছুটি খিলে হাসি পায়, কিন্তু সেরূপ হাসিতে গেলে াকে পাগল বলিবে।

আমাদের মনের অসংখ্য মতলব আছে। রীরটাকে সেই সকল মতলব সিদ্ধির উপায়- রূপ গ্রহণ করিয়া মন সর্বদা ইহাকে সাজায় গাজায় এবং মেরামত করিয়া ঠিকঠাক রাখিতে য়। শরীরটার সুখদুঃখ লাভালাভ, ভালমন্দ কছুই নাই, সেটা একটা কলাগাছের মতন তর্‌তর্ ক'রে বাড়ে, পরে তার ফুল হয়, ফল য়, তখন ম'রে যায়। জীবের শরীর বাল্য হইতে কৈশোর, কৈশোর হইতে যৌবন, পরে প্রৌঢ়, প্রত্যেক বয়সে কিরূপ অপূর্ব শোভা বিস্তার করে। দেখিয়া শুনিয়া মন বলে, "মরি! মরি! আমার ঘরখানি কী সুন্দর!"

ঘোড়সওয়ার যেমন কোন দূরস্থ হাস-পাতালে ঘোড়ার চিকিৎসা করিতে সেই ঘোড়ায় চড়েই যায়, সেইরূপে মনও তার মেরামতের জন্য কোথাও যাইতে হইলে দেহটায় চড়েই গমনা-গমন করে। বলতে গেলে মনের এই দেহটি সেকালের পুষ্পকরথের মতন। আরোহীর ইচ্ছামাত্রই সেকালে পুষ্পক যেমন অভীপ্সিত স্থানে উপস্থিত হ'তো, এই দেহ-পুষ্পকও মন-সারথীর ইচ্ছামাত্র তেমনি অভীপ্সিত স্থানে উপস্থিত হয়।

মন দেখে যে, তাহার দেহটি বড়ই সুন্দর। এই সৌন্দর্য-বোধটা মনের একটা ভাবুকতা মাত্র। মন যখন মানব দেহে বাস করে, তখন বলে, "মানবী অপেক্ষা সুন্দরী নাই।" আবার যখন শূকর-দেহে বাস করে, তখন বলে যে, "শূকরীর বদন-কমলের তুলনা নাই।" সেই কুঁচেরমতন চক্ষু ও সূচের মতন লোমযুক্ত দীঘল-ছন্দের মুখখানির অন্তরাল হইয়া সে তো বৈকুণ্ঠে বাস করিতেও ইচ্ছুক হয় না। সে মনে করে, এই শূকরী-মুখের অনুপম সৌন্দর্যের নিকট মানবীর লোমহীন গোলাকার মুখের কি তুলনা সাজে? আঃ ছিঃ! বস্তুতঃ সৌন্দর্য-বোধটা মনের নিজের, সৌন্দর্যের কোন আদর্শ নাই। মানব মানবীকে, শূকর শূকরীকে, সর্প সর্পিনীকে এবং জোঁক জোঁকীকে আদর্শ সুন্দরী মনে করে। তোমরা বল যে, উষ্ট্র জানোয়ারটা বড়ই কুৎসিত, উষ্ট্রী মনে করে যে, তাহার প্রিয়তম রূপে গুণে আদর্শ-পুরুষ! মনের প্রয়োজনে মন দেহকে আদর করে, দেহের নির্দিষ্ট রূপ গুণ কিছুই নাই।

মন দেহকে কেন ভালবাসে? দেহকে ভালবাসাই কি মনের উদ্দেশ্য? ইহাতেই কি সে চরম তৃপ্তি লাভ করে? চরম তৃপ্তি লাভ করে না বটে, কিন্তু দেহে তাহার প্রয়োজন আছে।

মনের প্রার্থনীয় বস্তু "সুখ"। এই সুখ সে দুই প্রকারে সম্ভোগ করিতে পারে। এক প্রকার সুখের নাম "ঐহিক", অন্য প্রকারের নাম "আধ্যাত্মিক"। মন এই উভয় পথের মধ্যস্থলে বসিয়া আছে। মানভূম জেলার লোকেরা যেমন বাঙলা ও হিন্দি ভাষার মধ্যস্থলে বাস করে, মনও সেইরূপ জড় ও চৈতন্যের সন্ধিস্থলে অবস্থিত।

সূক্ষ্মতম জড় এবং চৈতন্যাভাষ, এই উভয় বস্তু দ্বারা মন গঠিত হইয়াছে। তাহার জড়ীয় অংশের সহিত সমস্ত জড় পদার্থের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; দেহকে মধ্যবর্তী (medium) করিয়া এই সম্বন্ধ রক্ষিত হইতেছে, তাই মন দেহকে সর্বদা রক্ষা করিতে চায়, দেহকে মাজা ঘষা করে, দেহের বিনাশ-ভয়ে ত্রাসিত হয়। কেন না, সে মনে করে, দেহ নষ্ট হইলে তাহার আর সুখভোগের সম্ভাবনা রহিল না।

জমিদারের অনুপস্থিতিতে ম্যানেজার যেমন আপনাকে সর্বেসর্বা বলিয়া মনে করে, আত্মাকে না দেখিতে পাইয়া মনও সেইরূপ আপনাকে সর্বময় কর্তা ভাবিয়া কার্য করিয়া থাকে। আধ্যাত্মিক সুখ-রাজ্যটির সন্ধান না পাওয়ায় ঐহিক সুখকেই সর্বস্ব মনে করে। কিন্তু এই বাহিরের সুখকে অতিক্রম করিয়া মন যদি একবার ভিতরের সুখের আস্বাদ পায়, তখন আর ইন্দ্রিয়-জনিত সুখকে সুখ মনে করে না। গীতা বলিয়াছেন,—

"সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ং।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥
যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুনাপি বিচাল্যতে॥"

গীতা ৬, ২১ ও ২২

"এই অবস্থায় (যোগের অবস্থায়) ইন্দ্রিয়ের অতীত সুখ বোধ হইতে থাকে। এই অবস্থায় অবস্থিত হইলে যোগী আর কিছুতেই বিচলিত হন না, এই অবস্থা লাভ করিলে যোগী অন্য কোন প্রকারের লাভকেই লাভ বলিয়া মনে করেন না। এই অবস্থা লাভ করিলে কোন প্রকারের গুরুতর দুঃখেই যোগী বিচলিত হন না।"

যে ব্যক্তি অমৃত পান করিতেছে, সে ব্যক্তি কি গুড়ের ঠোঙ্গা হারাইয়া কাঁদিতে বসে? যতক্ষণ অমৃতের আস্বাদ না পায়, ততক্ষণই গুড়ের ঠোঙ্গাটি বগলে গুঁজিয়া রাখে, অমৃত পাইলে ঠোঙ্গাটা নর্দমায় ফেলিয়া দিয়া হাতের ভার হাল্কা করে। উৎকৃষ্টতম বস্তু লাভে অপকৃষ্ট পরিত্যাগ করাকে লোকেরা বৈরাগ্য বলিয়া থাকে।

মন যতদিন সেই আনন্দ-লোকের সাক্ষাৎ না পায়, ততদিনই ইহলোকের সুখ অন্বেষণ করে এবং তথাকথিত সুখ-সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করে। যে ব্যক্তি এইরূপ বাসনা লইয়া দেহত্যাগ করে, তাহাকে সেই বাসনার অনুগত হইয়া জন্মজন্মান্তর গ্রহণ করিতে হয় এবং যতদিন সে অন্তর্মুখী না হয়, তদিন দেহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে। "ভব" শব্দের অর্থ "জন্ম", জন্মজন্মান্তররূপে ভীষণ সমুদ্রের নাম "ভবসাগর"। এই ভবসাগর উত্তীর্ণ হওয়ার জনাই সাধকগণ প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

জন্মজন্মান্তরের সৌভাগ্যবশতঃ চিত্ত যদি অন্তর্মুখী হয়, তবে অমৃতের স্বাদ উপলব্ধি করিয়া এই জন্মেই ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারে। সেই অমৃতের সন্ধান পাইলে লুব্ধ মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের সহিত একেবারে স্তব্ধ হইয়া যায়। তখন ডানাভাঙ্গা প্রজাপতির মতন মধু ভাণ্ডার হইতে আর নড়িতে চড়িতে পারে না।

আত্মা স্বয়ং আনন্দময়, আনন্দ-সাগরে ডুবিতে ডুবিতে যখন তাঁহার সাক্ষাৎলাভ হয়, তখন মন আপনাকে তাঁহার পাদপদ্মে বিক্রয় করিয়া কৃতার্থ হয়। ইহারই নাম "আত্মদর্শন"। দার্শনিকভাবে বিচার করিয়া আত্মার স্বরূপ নির্ণয়ের নাম আত্ম-দর্শন নহে, উহা আপনার কল্পনাকে নানাভাবে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বিভিন্ন বেশে দেখা মাত্র। যাঁহার আত্ম-দর্শন হইবে, তাঁহার রাগ দ্বেষ, যশোলিপ্সা, মান অভিমান কিছুই থাকিবে না। তিনি লাভালাভ, জয়-পরাজয়, ক্ষতি বৃদ্ধি, মান অপমান সকলই সমান চক্ষে দেখিবেন। অমৃতসাগরে স্নান না করিলে এরূপ অবস্থা লাভ হয় না।

শ্বাস-প্রশ্বাসের যেমন অনুলোম ও প্রতিলোম গতি হয়, মনেরও সেইরূপ অনুলোম প্রতিলোম গতি আছে। যতক্ষণ প্রতিলোম গতি থাকে, ততক্ষণ মন উপরে উপরে ভাসিয়া বেড়ায়, এইরূপ অবস্থায় ঐহিক ও দৈহিক সুখই তাহার উপাস্য। অনুলোম গতি হইলে মন অন্তর-রাজ্যে প্রবিষ্ট হয়। তখন আত্ম-দর্শন ব্রহ্মদর্শনই তাঁহার একমাত্র বাঞ্ছনীয় হইয়া পড়ে। এবং তদভাবে তাহার বিষম বিরহ উপস্থিত হয়।

আমরা ধনের বিরহ, জনের বিরহ বেশ বুঝি, পীড়িত হইলে "চোখ গেল রে, কান গেল রে, মাথা গেল রে" বলিয়া চীৎকার করি, কিন্তু এই সমস্ত অপেক্ষা যে বস্তু আমাদের অনন্ত গুণ প্রয়োজনীয় ও প্রিয়তম, তাঁহার বিরহ অনুভব করি না।

বিখ্যাত লালন বাউল গাহিয়াছেন,—

"আমি একদিন না দেখিলাম তাঁরে,
বাড়ীর মাঝে আরসী নগর,
তথায় এক পরশী বসত করে।
সে পরশী যদি আমায় ছুঁত
তবে, যম-যাতনা দূরে যেত, হায় রে।
সদা লালন আর সাঁঞি একখানে রয়
তবু লক্ষ যোজন ফাঁক রে।"

এই দেহ-ঘরের মধ্যে একটি "আরসী-নগর" আছে, সে নগর স্ফটিকের মতন নির্মল, তাই উহাকে আরসী-নগর বলা হইয়াছে। সে নগরে আমার একজন পরশী অথবা দরদী আছে, সে যদি আমাকে স্পর্শ করিত, তবে আমার আর যম-যাতনা থাকিত না, মৃত্যুভয় থাকিত না, আর আমাকে জন্ম-মৃত্যুর অধীন হইতে হইত না; কিন্তু যদিও লালন এবং তাহার প্রভু এক স্থানেই বাস করেন, তথাপি উভয়ের মধ্যে লক্ষ যোজন ফাঁক রহিয়াছে। ইহার কারণ এই যে, আমাদের মন একান্তই প্রতিলোমগামী, বাহিরে ভিক্ষা করিয়া এই সংসারের ধন মান যশ রূপ যাহা কিছু খুদ কণা পায়, তাহা লইয়াই পরিতৃপ্ত থাকে। অন্তরে প্রবেশ করিয়া অমৃতসাগরে অবগাহন করিতে ইচ্ছুক হয় না, বেচারা সেখানকার খবরও রাখে না।

—"ঘরে তোর মাণিকের খনি, (তাতে)
লক্ষ কোটী পরশমণি,
দু-কড়ার তরে মন তুমি, প্রাণ সঁপেছ
পরের করে।"

হে মন, সংসারের কাছে তুমি ভিখারী হইয়া ধন ভিক্ষা, জন ভিক্ষা, মান ভিক্ষা, যশ ভিক্ষা করিতেছ। রে হতভাগ্য, তোমার নিজের ঘরে যে অফুরন্ত ঐশ্বর্য রহিয়াছে, তাহা দেখিতে পাইতেছ না। যদি একবার তুমি অন্তর্মুখী হও, তবে হে কাঙ্গাল মন, তুমি অনন্ত সুখী হইতে পারিবে। তুমি বড় উকীল হ'য়ে, বড় হাকিম হয়ে, বড় জমিদার হ'য়ে, বড় মহাজন হ'য়ে মনে করিতেছ, তুমি প্রকৃতই বড় হইয়াছ, কিন্তু হে নির্বোধ মন, তুমি যে হীরে ফেলে শক্ত ক'রে আঁচলে গিরে দিয়েছ, তাহা তুমি বুঝিতে পার না। সুখের ভাণ্ডার, জ্ঞানের ভাণ্ডার, প্রেমের ভাণ্ডার পরিত্যাগ করে কিরূপ কাঙ্গাল সেজেছ তাহা ভাবিয়াও ক্লেশ হয় না। তোমার সুখের ব্যর্থ আয়োজন লক্ষ্য ক'রে, তোমার গাড়ি ঘোড়া, শাল দোশালা, বাড়িঘর, পোষাকপরিচ্ছদ সমস্ত দেখে বাউল বলেছেন,—

"যেন মৃতের নয়নেতে অঞ্জন পরা"

মৃত ব্যক্তির নয়নে অঞ্জন পরাইয়া তাহার শোভা বর্ধন করা যেরূপ মূর্খের কার্য, তোমার জড়-দেহের সাজপোষাকের জন্য ব্যস্ত হওয়াও তেমনই মূর্খতা।

সাধক গাহিয়াছেন,—

"আমার মন কি যেতে চায়, সুধা খেতে
আনন্দপুরে?"

"আনন্দপুরে" স্থানটি কিরূপ, "সুধা" বস্তুটি কি, তাহা যে ব্যক্তি পলকের জন্য দেখে নাই, আস্বাদ করে নাই, তাহাকে বুঝাইয়া বলা দুঃসাধ্য।

"আনন্দ" বলিলে আমরা আমাদের পরিচিত বিষয়ানন্দকেই বুঝি, "সুধা" বলিলে একটা বেশ মিষ্ট বস্তু আমাদের মনে হয়, কিন্তু "আনন্দপুরে" এবং "সুধা" শব্দ শুধু অজ্ঞ ব্যক্তিকে বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। জাগ্রতে কিম্বা স্বপ্নে পলকের জন্য যে ব্যক্তি আনন্দপুরে প্রবেশ করিয়াছে, সে বলিবে, সেখানকার সুখ বুঝাইবার জন্য অমৃতপানের তুলনাও ব্যর্থ উপমা মাত্র।

এই সত্য বস্তুর প্রতি আমাদের আস্থা নাই, কাজেই আমাদের মন বাজে কাজে যেরূপ মনোযোগ করে, কাজের কাজে সেরূপ ঘেঁষিতে চায় না। এক একদিন শ্রীশ্রীগুরুদেব মৃদু-মধুর স্বরে গাহিতেন,—

"কারে বল্‌বো ও কে যাবেরে প্রত্যয়,
এই মানুষে আছে সত্য নিত্য চিদানন্দময়।"

সমস্ত অসত্যের মধ্যে যিনি সত্যস্বরূপ, সমস্ত অনিত্যের মধ্যে যিনি নিত্য-বান্ধব, সমস্ত ভ্রান্তির মধ্যে যিনি জ্ঞানস্বরূপ, সমস্ত দুঃখের মধ্যে যিনি আনন্দময়, এই স্থূল মানুষের মধ্যে (অভ্যন্তরে) সেই "সত্য নিত্য চিদানন্দময়" পুরুষ বিদ্যমান, একথা কাকেই বা বলিব, সেই বা বিশ্বাস করিবে, ইহাই আত্মদর্শকের আক্ষেপ।

প্রত্যক্ষ সাক্ষী না পাইলে কোন বিষয়ে বিশ্বাস করা মানুষের প্রকৃতিবিরুদ্ধ কার্য, কিন্তু এ বিষয়ের যাঁহারা সাক্ষী, তাঁহারা আত্ম-প্রকাশের জন্য ব্যস্ত নহেন। ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের সাক্ষাৎ লাভ হইলে জিজ্ঞাসুর সকল সংশয় দূর হইয়া যায়। তাই জ্ঞানাবতার ভগবান শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন,—

**"ক্ষণমিহ সজ্জন-সঙ্গতিরেকা।
ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা॥"**

সমাপ্ত

দ্বিতীয় খণ্ড

(১)

কোথায় যেন কি একটা যোগ আছে, অরণ্যের হীনতম কীট হইতে সমাজের মহত্তম ুষের মধ্যে, পথের নগণ্যতম ধূলি কণা তে আকাশের বৃহত্তম জ্যোতিষ্করাজের মধ্যে। স্ত বিশ্বটা যেন অন্তহীন মাল্যাকারে থিত বিনা সূতার মালা। কিন্তু বিনা তায় গাঁথা বলিয়াই যে ঘনিষ্ঠতা অল্প এমন । বরঞ্চ বাহিরের বন্ধনের উপরে নির্ভর রিতে হয় না বলিয়াই যোগটা গভীরভাবে ন্তরিক হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বিপদ এই ।, মানুষের চোখে ভিতরের বন্ধনটা তেমন রিয়া ধরা পড়ে না, তাই তাহাকে অস্বীকার রিবার একটা ঝোঁক মানুষের যেন আছে। তুবা গ্রামের একটি অশথ বৃক্ষকে কাটিলে গ্রাম ংস হইতে পারে, একথা কে বিশ্বাস করিবে? কন্তু ওই অশথ গাছটিকে বিশ্বমাল্যের একটি ্ণটি বলিয়া যদি জানিতাম, তবে হয় তো াপারটাকে এমন অসম্ভব মনে হইত না।

কিন্তু ধ্বংসের লীলার ফলে এমন সর্বনাশ কি নিত্য নিয়ত চলিতেছে না? গিরিশিখরের অরণ্যজাল মানুষের হাতে বিধ্বস্ত হইতেছে—নগ্নীকৃত গিরিশিখর আর তেমন করিয়া আষাঢ় মেঘের কামধেনুকে দোহন করিতে পারিতেছে না, নধর অরণ্যই যে মেঘধেনুর বৎসতর, ফলে ধরণী কি ক্রমে অনুর্বর হইয়া পড়িতেছে না? নগ্নীকৃত মালভূমির বৃষ্টিধারা-বাহিত বালুকণায় নাব্য নদী কি কালক্রমে অগভীর ও অনাব্য হইতে হইতে অবশেষে নদী নির্মোক মাত্রে পরিণত হইতেছে না? প্রকৃতিকে আঘাত করিলে সে আঘাত ফিরিয়া আসিয়া যে মানুষের উপরে পড়ে—একথা মানুষে কেমন করিয়া বিশ্বাস করিবে, যে মানুষ এখনো সম্যক-রূপে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না যে, মানুষকে আঘাত করিলে সে আঘাত ফিরিয়া আসিয়া আঘাতকারীকেই আহত করে? একজনকে আঘাত করিলে সে আঘাতে সমস্ত সমাজ পীড়িত হয়। এমন মানুষকে প্রকৃতির আঘাতের কথা বুঝাইতে চেষ্টা বাতুলতা ছাড়া আর কি?

মানুষই যে বিধাতার চরম সৃষ্টি, সমস্ত বিশ্বটাই যে তাহার ভোগের জন্য সৃষ্ট এমন একটা আত্মসর্বস্ব তত্ত্ব মানুষের মনে কেন উদ্ভূত হইল জানি না। হয় তো মানুষ বিশ্ব-মাল্যের দুর্লভতম অক্ষ, হয় তো মানুষ বিশ্ব-মাল্যের সুন্দরতম মাণিক্য, হয় তো বা তাই। কিন্তু তাহাতেই বা কি আসে যায়? মাল্যের সত্তা তো দুর্গততম, সুন্দরতমের উপরে নির্ভর করে না—দুর্বলতম গ্রন্থির উপরেই মাল্যের অস্তিত্বের নির্ভর।

কিন্তু এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে বিশ্ব-ব্যাপারের দীনতম, ঘৃণ্যতমকেও লোপ করিয়া দিবার যৌক্তিকতা যদি না থাকে, তাই বলিয়া কি সর্প, ব্যাঘ্র প্রভৃতি মারাত্মক পশুকে লইয়াও ঘর করিতে হইবে? রোগের বীজাণুও তো এই বিশ্ব ব্যাপারের অঙ্গ—তবে তাহাকেই বা বর্জন করা চলে কোন যুক্তিতে। যুক্তিটা আজিও মানুষ আবিষ্কার করিতে পারে নাই। কিভাবে বাঁচিলে যথার্থ বাঁচা হয়, জীবন-শিল্প যাহার প্রকৃত নাম, তাহা কি মানুষ আজ শিখিয়াছে? যেদিন সে জীবন-শিল্প-পারঙ্গম হইবে সেদিন নিশ্চয় সে দেখিতে পাইবে সাপ, বাঘ প্রভৃতি অরণ্যের শ্বাপদ ও মারাত্মকতম ব্যাধির বীজাণুর স্থানও বিশ্বে রহিয়াছে এবং অপরকে ব্যাহত না করিয়াই রহিয়াছে। এই অমৃততত্ত্ব আবিষ্কার করাতেই মানবজীবনের সার্থকতা এবং ইহাই মানুষের অমরত্ব লাভ। এতদধিক অমরত্ব যদি থাকে, তবে তাহা কল্পনা মাত্র। কেবল এই আবিষ্কারের ক্ষেত্রেই বাস্তব ও কল্পনার যুক্ত বেণী গ্রথিত।

কিন্তু এই আবিষ্কারের আজও অনেক বিলম্ব। তাই সে গ্রামের একটি নিরীহ অশথ বৃক্ষকে কাটিয়া ফেলিয়া মনে করে গ্রামের উন্নতি করিতেছে, কিন্তু সে কিছুতেই বুঝিতে পারে না যে তাহার কার্যের ফলে গ্রামের সর্বনাশের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হইয়া গেল।

২

জোড়া খুনের তদন্ত করিবার উদ্দেশ্যে দারোগা রামনাথ রায় দশানির কাছারীতে আসিয়া পদার্পণ করিয়াছেন। পদার্পণই বটে, কারণ তাঁহার কথা শুনিলে ও আচরণ দেখিলে তাঁহাকে কোম্পানীর দারোগা না মনে হইয়া ভবজলধির একটি বৃহৎ পরমহংস বলিয়া মনে হয়। তিনি কাছারীর তক্তপোষের উপরে তাকিয়াশ্রয় করিয়া সুখাসীন হইয়াই জন্মান্তর-বাদ সম্বন্ধে গভীর আলোচনা সুরু করিয়া দিলেন। আর জলে মজ্জমান ব্যক্তি যেমন হাতের কাছে যাহাকে পায় তাহাকেই জড়াইয়া ধরিয়া অতলে টানিতে থাকে, তেমনি তিনি নায়েব দুর্গাদাসকে জড়াইয়া ধরিয়া জন্মান্তর-বাদের গভীর স্রোতের মধ্যে লইয়া ফেলিলেন। এই স্রোত যদি রূপকমাত্র না হইয়া সত্য হইত তবু দুর্গা দাসের আপত্তি করিবার উপায় ছিল না—কারণ জমিদারের নায়েব বাদীই হোক আর প্রতিবাদীই হোক, দারোগার সন্নিধানে চির-কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা।

দারোগাবাবু বলিতে লাগিলেন—বুঝলেন নায়েব মশাই, মনে সাধ ছিল, সংস্কৃত শিখবো, আর সংস্কৃত শিখে আমাদের সনাতন শাস্ত্র-চর্চায় জীবন অতিবাহিত করবো। একে ব্রাহ্মণের ছেলে, তায় ছোটবেলা থেকেই আমার ওই দিকে ঝোঁক।

দুর্গাদাস নীরবে দাঁড়াইয়া জোড়হাতে রমানাথবাবুর কথা শোনে, আর চোখে দেখে—ইস্, দারোগাবাবুর পাঁচনরি কণ্ঠী মাংসল গ্রীবার খাঁজে খাঁজে বসিয়া গিয়াছে! সে বুঝিতে পারে না, কণ্ঠির দৃঢ়তা বেশি কি গ্রীবার মাংস-পেশীর দৃঢ়তা অধিক। গ্রীবা স্ফীত হয়, কণ্ঠি বিচলিত হয়—অথচ কণ্ঠি ছেঁড়ে না, দুইয়ে বেশ আপোষ হইয়া গিয়াছে। দুর্গাদাস দারোগা-বাবুর বাহুর বিপুলতায় চমৎকৃত হইয়া ভাবিতে থাকে—হাঁ, প্রাচীন মুনিঋষিদের যোগ্য উত্তরাধি-কারী বটে! দাস পণ্ডিত না হইলেও রামায়ণ মহাভারতের সহিত পরিচিত। তাহার হঠাৎ মনে পড়িয়া যায় নৈমিষারণ্যে যজ্ঞোপলক্ষে যে শত সহস্র মুনি ঋষি সমবেত হইতেন, তাঁহাদের আকৃতি ও প্রকৃতি অনেকটা এই রামনাথবাবুর অনুরূপ।

রামনাথবাবু বলিতে থাকেন—কিন্তু আমার পোড়াকপালে সে সৌভাগ্য হবে কেন? এমন সময়ে পিতার মৃত্যু হ'ল, খুড়ো দিলেন ঠেলে পাঠশালায়, তারপর দেখছেন যা করছি।

দুর্গাদাস একবার ভাবে যে দারোগাবাবুর পিতার মৃত্যুতে জাতির যে অপূরণীয় ক্ষতি

হইল তজ্জন্য সময়োচিত কিছু বলা উচিত কিনা, কিম্বা একবার অশ্রু-মোচনের ভান করা উচিত কি না—কিন্তু হঠাৎ তাহার চোখে পড়ে দারোগবাবুর বিপর্যয় টাক-টি। ইতিপূর্বে বহুবার এই টাক-সন্দর্শনের সৌভাগ্য তাহার ঘটিয়াছে, কিন্তু হইলে কি হয়? প্রথম দর্শনের বিস্ময় কখনই কাটিতে চায় না। কোথায় যে কপালের শেষ আর টাকের শুরু সে সীমান্ত আবিষ্কার এক গবেষণার বিষয়। খোশামুদের দল দারোগাবাবুর সম্মুখে বলাবলি করে— হুজুরের কি দরাজ কপাল। নিন্দুকের দল আড়ালে বলিয়া থাকে—বাপরে কি টাক—একেধারে নাক থেকে সুরু।

দারোগা বাবু বলেন, নায়েব মশাই, দাঁড়িয়ে রইলেন যে, বসুন, বসুন। তারপরে একটু থামিয়া বলেন, আহা কি মধুর বাণী—'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়'—আহা এমন বাণী এই সনাতন আর্যভূমি ছাড়া আর কোথায় উচ্চারিত হয়েছে?

দুর্গাদাসের হঠাৎ নজরে পড়িয়া যায়—খাঁকি সরকারী কোর্তার ফাঁক দিয়া দারোগা বাবুর শুভ্র স্থূলে উপবীতটা দৃশ্যমান। তাহার মনে হয় সনাতন সভ্যতার এ এক চিরন্তন মহিমা! ম্লেচ্ছের পোষাক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রধানতম চিহ্নটিকে কিছুতেই আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। দুর্গাদাস পাশের ব্যক্তিটিকে ইঙ্গিতে পৈতাটি দেখাইয়া দেয়। সে এবং তৎপার্শ্ববর্তী সকলে উকিঝুঁকি মারিতে থাকে। হঠাৎ দারোগাবাবু সচেতন হইয়া বলিয়া ওঠেন, ও জিনিষটা কিছুতেই ত্যাগ করতে পারলাম না রক্তের এমনি সংস্কার। তারপরে গলা খাটো করিয়া বলেন যে, যখন হালুয়াখড় থানায় ছিলাম, পাশের গাঁয়ে ছিল এক মিশনারি সাহেব। সে প্রায়ই বল্‌তো মিঃ রায়—ওটা ছাড়ো, আমি ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলে তোমার উন্নতি করে দিচ্ছি! কিন্তু কই পারলাম তো না। বুঝলেন, নায়েব মশাই, রক্তের সংস্কার কি সহজে যায়।

কাছারীর আমলাগণ অবাক হইয়া দেখে—বাস্তবিক এমন সদাশয় লোক আর হয় না। কথায় কথায় হাসি, অনেকগুলি দাঁত পড়িয়া যাওয়ায়, সে হাসি অনর্গল ধারায় মুখ ছাপাইয়া, দেহ ছাপাইয়া ফরাসের উপরে আসিয়া পড়ে। লোকটি বহুভাষী হইলেও মৃদুভাষী। শ্বাপদের কোমল পদশব্দের মতো একপ্রকার মৃদুতা আছে তাঁহার কণ্ঠস্বরে। সকলে আরও দেখে যে, তাঁহার মরিচা-ধরা লোমশ নাসিকাটি গরুড়ের চঞ্চুর মতো অত্যন্ত ধারালো।

এমন সময়ে দুর্গাদাস বলিয়া ওঠে—অনেক রাত হয়েছে, হুজুরের আহারের কি ব্যবস্থা করবো?

আহারের কথা শুনিয়া রামনাথবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, সে হাসি আর থামিতেই চায়না। হো হো হা হা! ভাবটা যেন এমন অবান্তর অসম্ভব কথা তিনি জন্মে শোনেন নাই!—আহার এই বয়সে আবার! নায়েব মশাই কি যে বলেন?

উপস্থিত সকলে দারোগাবাবুর বৈরাগ্য-দর্শন করিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহারা ভাবিল প্রাচীনকালের মুনিঋষির রক্ত ধমনীতে প্রবাহিত না থাকিলে এমন বিষয়-বৈরাগ্য কখনই সম্ভবপর হয় না। রাত্রি অনেক হইয়াছিল, সকলেরই ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল, নিজেদের ক্ষুধার সহিত দারোগাবাবুর স্পৃহা-হীনতার তুলনা করিয়া তাহারা লজ্জা অনুভব করিতে লাগিল।

কিন্তু দুর্গাদাস জমিদারের নায়েব, দারোগার কথাকে বিশ্বাস করিতে সে শেখে নাই, বিশেষ জমিদার বাড়ীতে আসিয়া ক্ষুধা নাই বলিলে দারোগার জন্য আহারের আয়োজন আরও বিরাট আকারে করিতে হয়—সে শিক্ষাও তাহার আছে। সে শুধু বলিল, —হুজুর রাত অনেক হয়েছে।

দারোগাবাবু একবার পকেট ঘড়িটি বাহির করিয়া দেখিয়া বলিলেন—তা বটে। তারপরে দু'একবার নৈর্ব্যক্তিকভাবে উচ্চারণ করিলেন, আহার! আহার! আবার কণ্ঠস্বরে মানবীয় মূর্চ্ছনা আনিয়া বলিলেন,—কি আর বল্‌বো! অনেক দিন থেকে রাতের বেলায় লুচির অভ্যাস! লুচি সেই সঙ্গে কিছু ভাজাভুজি। নায়েব মশাই, তাই বলে মাংসটা আমার রাতের বেলায় একদম চলে না।

দুর্গাদাস বলিল,—তা খাসিটা আজ থাকুক, কাল দুপুরবেলা ভোগে লাগবে।

দারোগাবাবু আহার্যের পূর্বসূত্র অনুসরণ করিয়া বলিয়া চলিলেন, আর সর্বশেষে এক বাটি দুধ! বাস্! তাই বলে ক্ষীর নয়। আপনাদের গাঁয়ে আবার দুধ সস্তা, কিন্তু বুড়ো বয়সে আমাকে ক্ষীর দিয়ে অপদস্থ করবেন না।

দুর্গাদাস পাকা লোক। দারোগাবাবুর কথার বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গার্থ দুই-ই সে বোঝে। একথা দারোগাবাবুও জানেন। কাজেই কোন পক্ষে অসুবিধা হইবার কথা নয়। উপস্থিত সকলে সংসার-বিরাগীর আহারে বীতস্পৃহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। এই সব তুচ্ছ বিষয়ে সময় নষ্ট করিবার পাত্র দারোগাবাবু নহেন, তাই অবিলম্বে পুনরায় জন্মান্তরবাদের সুগভীর আলোচনায় মনোনিবেশ করিলেন। উপস্থিত শ্রোতার দল দেখিয়া বিস্মিত হইল গীতা ও ক্ষীর কেমন গায়ে গায়ে সংলগ্ন—একটি হইতে পা বাড়াইলেই অপরটিতে গিয়া পৌঁছানো যায়। প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানীর নিকটে সমস্ত চরাচর করতলগত আমলকবৎ।

পরদিন সকালে দারোগাবাবু যখন নিজের দাঁতন দিয়া সবেগে দন্তধাবন করিতেছিলেন এমন সময়ে কাছারীর সম্মুখে একখানা এক্কা গাড়ী আসিয়া থামিল। এক্কা হইতে শীর্ণ কৃষ্ণকায় এক বৃদ্ধ নামিল। তাহার মাথায় শামলা, কালো চাপকানের উপরে পাকানো চাদর, গুম্ফো-বন্ধনীর অভ্যন্তরে দোক্তার দাগ-ধরা ওষ্ঠাধর। তাহাকে দেখিয়াই রামনাথবাবু দুই হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া বলিলেন,—সুরেনদাদা যে—প্রাতঃপ্রণাম।

সুরেনদাদা শশব্যস্তে বলিয়া উঠিলেন—আহা আহা কি করেন, ব্রাহ্মণ হয়ে ও আবার কি?

রামনাথবাবু বলিলেন—হ'লে কি হয়, তাই বলে কি বয়সের মর্যাদা নেই! আসুন, আসুন, ওরে তামাক দে!

বাস্তবিক এই দুইজনের মধ্যে কে যে কাহার চেয়ে জ্যেষ্ঠ—সে এক বিষম সমস্যা!

পাঠক হয়তো ভাবিতেছেন এ সংসারে আর কে থাকিতে পারে যাহাকে স্বয়ং দারোগা এমন সভয়ে অভ্যর্থনা করে? কথাটা একেবারে অমূলক নয়, এরূপ ব্যক্তি সংসারে বিরল হইলেও একেবারে অসম্ভব নয়। সর্বভীতিকর দারোগাবাবুরাও মফঃস্বল আদালতের মোক্তারবাবুকে ভয় না করিয়া পারে না। কেন এমন হয়? তাহার একটি মাত্র কারণ এই যে, বলিলে বিশ্বাস করিবেন কিনা জানিনা, দারোগাবাবুরাও মানুষ। তাহাদেরও সুদিন-দুর্দিন, সময়-অসময় আছে। সেই দুঃসময়ে একটা শক্ত মোক্তাররূপী খুঁটি পাইলে আর কোন ভয় থাকে না।

সুরেন মোক্তার এ অঞ্চলের দৃঢ়তম খুঁটি। খুনের আসামীকে তিনি ফাঁসিকাষ্ঠ হইতে নামাইয়া আনিতে সমর্থ। কতবার কত দারোগার ঘুষের কলঙ্ক তিনি জেরার সময়ে বানচাল করিয়া দিয়াছেন। হাকিমরা অবধি তাঁহাকে সমীহ করিয়া চলেন। অবশ্য তিনিও হাকিমদের শুশ্রূষা করিতে ভোলেন না। গ্রীষ্মকালে তিনি হাকিম মহলে কচি ডাব ভেট দেন, শীতকালে খাসি, আর শীতে গ্রীষ্মে সমানভাবে চলে এমন বস্তু তিনি রাত্রিবেলায় হাকিমদের খাস কামরায় পৌঁছাইয়া দেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। কাজেই এমন অব্রাহ্মণ সুরেন মোক্তারকে ব্রাহ্মণ রামনাথবাবু যদি একটা প্রণাম করিয়াই ফেলেন তবু তাঁহাকে অশাস্ত্রজ্ঞ বলা চলে না।

দারোগাবাবু সুরেন মোক্তারকে সাদরে লইয়া গিয়া নিজের কক্ষে বসাইলেন। এমন সময়ে দুজনের জন্য চা আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন দারোগা ও মোক্তার পাশাপাশি বসিয়া কুশলপ্রশ্নাদি-সমন্বিত চা-পান সুরু করিলেন। দারোগা-মোক্তারের এই অর্ধ-নারীশ্বর রূপ যাহারা না দেখিয়াছে তাহাদের জীবনটাই বৃথা! ইঁহাদের সহযোগিতার ফলে

পানীর রাজত্ব চলিতেছে—বিরোধিতা লে ইঁহারা কোম্পানীর রাজত্বের ভরাডুবি য়া ছাড়িতে পারেন, এমনই ইঁহাদের য্য!

রাত্রের উল্লিখিত সেই খাসিটি দিয়া হ্যভোজন সমাধা করিয়া রামনাথবাবু জন কনস্টেবল সঙ্গে লইয়া জোড়া খুনের তকার্য আরম্ভ করিলেন। একটি মত্ত তীকে পদ্মবনে ছাড়িয়া দিলে যেমন হয় তান্তে গ্রামের অবস্থা অনেকটা তেমনি ল। উপরের জল নীচে গেল, নীচের জল র উঠিল. পঙ্ক এবং পঙ্কজে মাখামাখি য়া গেল। তদন্ত শেষ করিয়া এবং দশানি, নি দুইপক্ষ হইতে আড়াই হাজার, আড়াই র পাঁচ হাজার টাকা হস্তগত করিয়া পেক্ষ রামনাথবাবু দুই পক্ষের জন-কুড়ি চশ লোককে চালান দিবার ব্যবস্থা লেন এবং সন্ধ্যার প্রাক্কালে পরজন্মে তে তাঁহাকে আর দারোগাবৃত্তি করিতে না সেই আশা সকলকে বিজ্ঞাপিত করিয়া য় হইয়া গেলেন।

দারোগাবাবু বিদায় হইয়া গেলে সুরেন ক্তার দুর্গাদাসকে বলিল—দেখলেন বেটার ড! চামার কোথাকার।

দুর্গাদাস দশানির পুরাতন কর্মচারী। সে র্ঘ চাকরী জীবনে চামার কামার দারোগা লিশ উকিল মোক্তার এত দেখিয়াছে যে, হুতেই তাহার আর এখন বিস্ময়বোধ হয় না। চুপ করিয়া রহিল।

সুরেন মোক্তার বলিল—ও যা পারে কে। সব আমি জামিনে খালাস ক'রে নবো। তাহার কথায় অবিশ্বাস করিবার হেতু ল না। সে মফঃস্বল আদালতের প্রবীণতম ক্তার। দশানি তাহার পুরাতন ঘর। অনেক ল, ঘর-জ্বালানি, খুন-জখমের মামলার সামীকে সে বে-কসুর খালাস করিয়া য়াছে। এবারেও খুন হইবার সংবাদ পাওয়া- ৷ সে দ্রুত চলিয়া আসিয়াছে। সকলকে যথা- হিত উপদেশ দিয়া, তদ্বিরের মোটা ফিঃ দায় করিয়া লইয়া সে-ও যথাসময়ে প্রস্থান রল।

৩

একদিন সকালে উঠিয়া নবীননারায়ণ খিল মুক্তামালা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। নীন বিস্মিত হইয়া বলিল—একি তুমি হঠাৎ!

মুক্তামালা বলিল—একজন দুদিনের জন্য স যাবার কথা ভুলে গেলে আর একজনের ৎ আসা ছাড়া আর উপায় কি?

নবীন বলিল—যাক্, এসেছ ভালই হয়েছে, সা বসো।

মুক্তামালা হাসিয়া বলিল—বাঃ বেশ তো। মারই বাড়িঘর, আর আমাকেই অতিথির মতো ্যর্থনা করছো।

নবীন পাল্টা হাসিয়া বলিল—এ গায়ে তো তুমি অতিথি হ'য়েই রইলে। নিজের আসন তার বেশি তো পাকা করলে না। আচ্ছা, সে তর্ক না হয় পরে, ধীরে সুস্থে হবে, কিন্তু আগে বলো তো স্টেশন থেকে তুমি এলে কি করে? পাল্কী তো যায়নি।

মুক্তামালা বলিল—ঘোড়ার গাড়ী ক'রে এলাম।

নবীন বলিয়া উঠিল—সর্বনাশ! ঘোড়ার গাড়ী করে তাও আবার একলা।

মুক্তামালা বলিল—কেন এতে সর্বনাশের কি আছে? তারপরে একটু থামিয়া বলিল—ও, বুঝেছি, চৌধুরী বাড়ির বউ কখনো ঘোড়ার গাড়ী ক'রে এ গাঁয়ে আসেনি, এই তো! চৌধুরী বাড়ির বউ আসবে পাল্কী চেপে, তার আগে পিছে ছুটবে আশা সোটাধারী পাইক, তাই না।

নবীন বলিল—যাক, যা হবার হ'য়েছে, এখন হাত মুখ ধুয়ে নাও।

কিছুক্ষণ পরে দুইজনে একান্তে বসিলে পত্নী শুধাইল, কি ব্যাপার বল তো, এখানে এসে এমন আটকে পড়লে কেন?

এই এক মাসকালের মধ্যে জোরাদীঘিতে যে সব কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে মুক্তামালা তাহার কিছুই জানিত না। নবীন তাহাকে লেখে নাই. এ সব বিষয় সম্পত্তির কাণ্ড, লাঠালাঠির ব্যাপার মুক্তামালা ভালো বুঝিত না, তাহার ভালো লাগিত না, নবীন জানে, কাজেই ইচ্ছা করিয়াই লেখে নাই।

এখন সে সবিস্তারে সমস্ত ঘটনা, আর ঘটনার তলে যে ভাবনা রহিয়াছে, আনুপূর্বিক সব কথা মুক্তামালাকে বলিল। কোন বিষয়ে মনোযোগ দিতে হইলে মুক্তামালার বিশেষ একটি বসিবার ভঙ্গী ছিল। বাম হাতে চিবুক রাখিয়া, ডান হাতের তর্জনী দিয়া গলার হারটিকে বার বার জড়াইত আবার খুলিত, চোখে মুখে শ্বেত পাথরের শুভ্র নীরবতা। নবীননারায়ণের পরিচিত সেই ভঙ্গিমা সর্বদেহে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়া মুক্তামালা নিস্তব্ধভাবে শুনিয়া গেল।

নবীনের বক্তব্য শেষ হইলে কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সে বলিল—কি জানি, আমি এ সব ভালো বুঝতে পারি না। আমি যে ঘরে মানুষ, তাদের কাছে এমন সব ঘটনা উপন্যাসের বস্তু।

নবীন বলিল—সেই উপন্যাসের পটভূমি এই সব গ্রাম—আর সেই উপন্যাসের লেখক পুরাতন জমিদার বংশের প্রভু এবং ভৃত্যের দল। আমাদের কলঙ্কের কালোয় আর মিলন সর্দার দলের রক্তের লালে সেই উপন্যাসের ছত্রের পর ছত্র লিখিত হয়ে চলেছে। আর তুমি ভাগ্যের ইঙ্গিতে সেই উপন্যাসের পাঠকের ঘর থেকে লেখকের ঘরে এসে পড়েছ।

মুক্তামালার চিন্তাকরুণ মুখ আর এই বসিবার ভঙ্গীটি নবীননারায়ণের খুব ভালো লাগে। আলাপের মুখর স্রোত নৈঃশব্দ্যের সমুদ্রে আসিয়া হঠাৎ নীরব হইয়া গেল, সেই অতল সমুদ্রের নীল পদ্মের উপরে মুক্তামালা অকূলের কমলে-কামিনীর মতো প্রতিভাসিত হইয়া উঠিল। তাহাকে সুন্দরী বলিলে যথেষ্ট বলা হয় না। তাহার সৌন্দর্যে এমন একটি প্রশান্ত মহিমা আছে যাহাতে তাহাকে গৃহের প্রদীপ বলিয়া মনে না হইয়া আকাশের সন্ধ্যার তারা বলিয়া মনে হয়। পথের ক্লান্তি ও রাত্রি জাগরণের অনিয়ম সেই সন্ধ্যাতারার উপরে একখানি সূক্ষ্ম মোহময় কুয়াশা বিস্তারিত করিয়া দিয়া তাহাকে যেন আরও দূরতর, আরও সুন্দরতর করিয়া তুলিয়াছে। তাহার কেশরাশির ঈষৎ বিশ্রস্তি, তাহার নীলাভ-ধূসর শাড়ীর ঈষৎ অপারিপাট্য, তাহার চক্ষুদ্বয়ের ঈষৎ জড়িমা-জড়িত দৃষ্টি তাহাকে বাসনার দিগন্তের ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়াছে; অথচ সে উচ্চতা এত অধিক নয়, যে একবার হাত বাড়াইয়া তাহাকে করায়ত্ত করিতে ইচ্ছা হয় না। ওইখানেই তাহার সৌন্দর্যের বৈশিষ্ট্য। উর্বশীর সৌন্দর্যের চপল মোহ এবং লক্ষ্মীর সৌন্দর্যের অচপল আশীর্বাদ তাহার দেহে যেন যুগলে একক হইয়া বিরাজমান। সেইজন্যই তাহাকে বুঝিয়া ওঠা কঠিন। আর যে নারীকে বুঝিয়া ওঠা সহজ নয়, সে যেমন পুরুষকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ, এমন আর কেহ নয়। যে নারী সহজ-বোধ্য, আর যে নারী একেবারেই দুর্বোধ্য—তাহারা উভয়েই পুরুষের মনকে প্রতিহত করে, একজন অতিপরিচয়ের অনাসক্তিতে, অপরজন অপরিচয়ের আসক্তিহীনতায়। কিন্তু যে নারী পুরুষের মনকে আসক্তির আকর্ষণ ও দুষ্প্রাপ্যতার দুরাশার মধ্যে চিরকাল দোলায়িত রাখিতে পারে—আশা ও আশাতীতের মধ্যে তরঙ্গ করিতে সমর্থ হয়—প্রেয়সীত্ব ও গৃহিণীত্বের মধ্যে পুরুষবৎ ভ্রমণ করাইয়া ফিরিতে বাধ্য করিতে পারে, তাহারাই পুরুষের চিরকালের আকাঙ্ক্ষার বস্তু। এ বস্তুটি সাধনালভ্য নয়, যে পারে সে সৌন্দর্য-দীক্ষার সহজাত অধিকারের বলেই পারে। মুক্তামালা সেই জাতির নারী, সেই সহজ অধিকার লইয়াই সে জগতে আসিয়াছে।

মুক্তামালা চপল চটুল তটিনী নয়, আবার সে অকূল, অতল সমুদ্রও নয়, তটিনী যেখানে সমুদ্রে আত্মবিসর্জন করিয়াছে, মুক্তামালা সেই সমুদ্র-সঙ্গম, দুকূল ও অকূলের টানা-পোড়েনে বোনা অলৌকিক চেলাংশুকে অবগুণ্ঠিতা—সে পুরুষচিত্তের চিরকালের প্রেয়সী।

এই শ্রেণীর নারীর প্রেমে একটি অটল গাম্ভীর্য থাকে। তাহাদের ভালবাসা কাজে প্রকাশ পায়, কথায় নয়। কিন্তু অধিকাংশ পুরুষের এমনি বালকোচিত ভাব যে কথার

ভালবাসাই তাহাদের কাম্য, তাহার অধিক না পাইলেও তাহারা ক্ষতি গণে না। সংসারের কাজে এমনি তাহারা ব্যস্ত যে, মুখে দু'চারবার ভালবাসি, ভালবাসি শুনিলেই তাহারা খুশী, আসলে ফাঁকি পড়িল কিনা, সে হিসাব মিলাইবার সময়ের তাহাদের একান্ত অভাব। এই মেয়েদের লইয়াই সংসারে অশান্তি দেখা দেয়। অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়গিরির শিখরে অটল তুষারস্তূপ জমিলে যে রকম বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিতে পারে, মুক্তামালার ব্যক্তিত্বে সেই বিভ্রান্তির উপাদান সুপ্রচুর। তাহার হৃদয়ের প্রেমের অগ্নিরস অটল গাম্ভীর্যের শীতলতার দ্বারা আবৃত। ইহারা দুঃখ পায়, দুঃখ দেয়, কিন্তু সেই দুঃখের খনিতেই একদিন তুষাররাশি উদ্ভিন্ন হইয়া বাসনার বহ্নিময়ী ভোগবতী আত্মপ্রকাশ করে। ইহাদের না পাইলে পুরুষের চলে, কিন্তু মানুষের চলে না। ইহারাই শিল্প-লক্ষ্মীর চরণাশ্রয় কুবলয়।

৪

পরদিন সকালে মুক্তামালা স্বামীকে বলিল, আমি একবার কাকীমার সঙ্গে দেখা করে আসি।

নবীননারায়ণ বিস্মিতভাবে শুধাইল, কোন্ কাকীমা? কীর্তিদাদার মা?

মুক্তামালা বলিল--হাঁ, কিন্তু চমকে উঠলে কেন?

নবীন প্রশ্নের উত্তর সোজাসুজি না দিয়া বলিল--সেখানে তুমি যাবে?

পত্নী বলিল--ক্ষতি কি?

নবীন বিস্ময় ও অসন্তোষ চাপিয়া রাখিয়া বলিল--না ক্ষতি নেই।

নবীন কোনদিনই মুক্তামালাকে পুরোপুরি বুঝিতে পারে নাই, আজও পারিল না। স্ত্রী যে তাহাকে ভালবাসে, সে বিষয়ে তাহার কিছুমাত্র সংশয় ছিল না। কিন্তু ভালবাসা আর মানুষকে বোঝা এক কথা নয়। বরঞ্চ যাহাকে ভালবাসা যায়, তাহাকেই যেন বুঝিয়া ওঠা কিছু দুরূহ। রঙীন কাচ মানুষের দৃষ্টির স্বচ্ছতা নষ্ট করিয়া দেয়, অনুরাগ কাচের সেই রঙটি।

নবীনের মনে হইল, মুক্তা তাহাকে ভালবাসিলেও তাহার বংশ মর্যাদার প্রতি যথেষ্ট সচেতন নহে, নতুবা যাহার সহিত আজ পারিবারিক বিরোধ উগ্র হইয়া উঠিয়াছে, যাহার সহিত কোনকালেই পারিবারিক সৌহার্দ্য ছিল না, স্বেচ্ছায় আজ তাহার বাড়িতে যাইতে সে উদ্যত হইত না। কিন্তু একবারও তাহার মনে হইল না, মুক্তামালা স্বেচ্ছায় যে গ্লানি স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার মূলে আছে স্বামীর কল্যাণ কামনা। যদি তাহার অযাচিত সাক্ষাতের ফলে পারিবারিক বিরোধটা অংকুরেই বিনষ্ট হইয়া যায়, তবে তাহার স্বামী যে নিদারুণ মনঃকষ্ট হইতে উদ্ধার পাইবে--ইহাই কি তাহার মনের কামনা নয়? স্বামীর অনুপস্থিতিতে উদ্বিগ্ন হইয়া একাকী কলিকাতা হইতে চলিয়া আসিয়াছে, ইহাতে কি তাহার ভালবাসার ব্যাকুলতা প্রকাশ পায় না? এসব কোন কথাই নবীনের মনে উঠিল না। সে মুক্তামালাকে নিরস্ত করিল না বটে কিন্তু মনটা তাহার অপ্রসন্ন হইয়া রহিল। ভালোবাসার কথা যত সহজে বুঝিতে পারা যায়, ভালোবাসার বাস্তব প্রকাশ বুঝিয়া ওঠা যদি তত সহজ হইত, তবে সংসারের দুঃখ-কষ্টের ভার বুঝি অনেক লাঘব হইয়া যাইত।

মুক্তামালা একটি ঝি সঙ্গে করিয়া যখন দশানির অন্তঃপুরে গিয়া প্রবেশ করিল, কীর্তিনারায়ণের মাতা অম্বিকাদেবী তখন পুত্রবধূকে সঙ্গে করিয়া রান্নাঘরের বারান্দায় বসিয়া তরকারি কুটিতেছিলেন। হঠাৎ মুক্তামালাকে আসিতে দেখিয়া বিস্মিত আনন্দে শুধাইলেন, বৌমা তুমি কবে এলে? তারপরে পুত্রবধূর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, একখানা আসন দাও মা।

মুক্তামালা শাশুড়ী ও পুত্রবধূকে প্রণাম করিয়া আসনখানা গুটাইয়া রাখিয়া মেঝের বসিতে বসিতে বলিলেন--কাল সকালে এসেছি।

মুক্তামালা বিবাহের পরে বার দুই মাত্র দিন কয়েকের জন্য গ্রামে আসিয়াছিল। অম্বিকাদেবীর বা তাহার পুত্রবধূর সহিত তাহার পরিচয় ঘনিষ্ঠ নয়। এত স্বল্প পরিচয়ে পুরুষেরা পরস্পরকে মনে রাখিতে পারে না। পরস্পরকে মনে রাখিবার জন্য মেয়েদের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের দরকার হয় না। কিন্তু রহস্য এই যে, পরিচয় যত দীর্ঘকালেরই হোক না কেন, সে পরিচয় কখনো ঘনীভূত হইতে পারে না। বিবাহিত নারী স্বামী-পুত্র ব্যতীত নির্বান্ধব।

অম্বিকা দেবী বলিলেন--বৌমা, তোমার শরীর তো ভালো দেখছিনে। আমাদের এখানেই যেন ম্যালেরিয়া, কিন্তু কলকাতায় থেকেও তোমার শরীর কেন কৃশ? কলকাতা থেকে আসার পরে নবীনের শরীরও রোগা দেখেছিলাম, এখানে এসে তবু যেন খানিকটা সেরে উঠেছে। তারপরে হাসিয়া বলিলেন, যাই বলো বাপু, তোমাদের কলকাতা নামেই স্বাস্থ্যকর।

মুক্তামালা হাসিয়া বলিল--না, মা, আমি ভালোই আছি। তারপরে কীর্তিনারায়ণের স্ত্রীর দিকে তাকাইয়া বলিল--দিদির শরীর তো ভালো দেখছিনে।

নিজেকে আলোচনার লক্ষ্য হইতে দেখিয়া কীর্তিনারায়ণের স্ত্রী রুক্মিণী ঘোমটাখানি আরও একটু টানিয়া নামাইয়া দিল। ঘোমটার মস্ত সুবিধা এই যে, দেখা না দিয়াও প্রতিপক্ষকে বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। এইজনাই পুরুষের ঘোমটার বিরুদ্ধে এত আপত্তি এবং মেয়েদের ঘোমটার প্রতি এত আসক্তি।

অম্বিকাদেবী বঁটিখানা কাৎ করিয়া রাখিয়া বলিলেন, চলো মা ভালো হয়ে বসা যাক।

তাঁহারা তিনজনে শোবার দালানের বারান্দায় আসিয়া মাদুর পাতিয়া বসিলেন। অম্বিকাদেবী বলিলেন--নিজের গাঁয়ে এসেছ বৌমা, ভালই, কিন্তু তোমার অভিসন্ধি খারাপ নয় তো? আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে তুমি নবীনকে নিয়ে যাবার জন্যেই এসেছ।

মুক্তামালা বলিল--উনি কি আমার কথা শোনেন?

অম্বিকা বলিলেন--শুনলে বোধ করি নিয়েই যেতে, রুক্মিণী ঘোমটার আড়ালে দুইবার হাসিল।

এমন সময় কীর্তিনারায়ণের মেয়ে লক্ষ্মী দশ-পঁচিশ খেলিবার সঙ্গী সন্ধান করিতে আসিয়া নূতন লোক দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। নবাগন্তুকের সম্মুখে খেলুড়ি সন্ধান উচিত কি না, বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। লক্ষ্মীর বয়স দশ বৎসর।

অম্বিকা বলিলেন--লক্ষ্মী, এঁকে প্রণাম করো, তোমার কাকীমা হন।

লক্ষ্মী মুক্তামালাকে প্রণাম করিয়া তাহার গা ঘেঁসিয়া বসিয়া বলিল, কাকীমা, তুমি দশ-পঁচিশ খেলতে জানো।

সকলে হাসিয়া উঠিল। মুক্তামালা বলিল, জানি না, কিন্তু তুমি শিখিয়ে দিলে শিখে নিতে পারি।

--তবে চলো না, কাকীমা, আমি শিখিয়ে দেবো। এই বলিয়া সে তাহার হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল। আবার সকলে হাসিয়া উঠিল।

লক্ষ্মী বলিল--খুব সহজ শেখা। এই দেখো না, কড়িগুলো এইভাবে নিয়ে--এই পর্যন্ত বলিয়া কড়িগুলো নিক্ষেপ করিয়া ধরিবার কৌশল সে দেখাইতে আরম্ভ করিল। উৎক্ষিপ্ত কড়ির অনেক কয়টিকে ধরিয়া বলিয়া উঠিল--দেখলে তো! চলো, আমি শিখিয়ে দেবো, কোন ভয় নেই।

মুক্তা বলিল--তুমি থাকতে ভয় কি? কিন্তু আজ নয় মা, আর একদিন এসে খেলে যাবো, আজকে কাজ আছে।

লক্ষ্মী নিরস্ত হইল বটে, কিন্তু কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না, দশ-পঁচিশ খেলা ছাড়া মেয়ে মানুষের আর কি কাজ থাকিতে পারে?

অম্বিকা লক্ষ্মীকে বলিলেন--যাও মা, এখন আমরা গল্প করছি।

অম্বিকা যখন লক্ষ্মীর সহিত কথা বলিতেছিলেন, মুক্তামালা লক্ষ্য করিল, অম্বিকাদেবীর ছোট করিয়া ছাঁটা চুলগুলিতে পাক ধরিয়াছে, মুখশ্রীতে বার্ধক্যের শান্তি বিরাজিত, কিন্তু জরার গ্লানি এখনো দেখা দেয় নাই। কোন কোন নারী আছে, যাহাকে

[বোমাত্র 'মা' বলিয়া ডাকিতে ইচ্ছা করে, বকাদেবী সেই শ্রেণীর অন্তর্গত।

মুক্তামালা অম্বিকাদেবীকে লক্ষ্য করিয়া ল, বড়ঠাকুর বুঝি কাছারীতে বসেছেন? ক একবার প্রণাম করবার ইচ্ছা।

অম্বিকা বলিলেন, না এখনও সে ভিতরেই হ, তুমি একটু বোস, আমি ডেকে আনছি। বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

এইবার রুক্মিণী মুক্তামালার সহিত কথা বার অবকাশ পাইল। রুক্মিণী বলিল, ঁ, তোমাকে একটু নিরিবিলি পেয়েছি, টা কথা বলে নেই। এই যে গোলমাল বেঁধে ছে, এর জন্য ঠাকুরপোর কিছুমাত্র দোষ । আমরা সবাই জানি, কিন্তু কিছু বার উপায় কই? এ-গাঁয়ের সবাই জানে, দমিটা তার।

মুক্তামালা বলিল, তা হ'তে পারে। কিন্তু টা কাটতে যাওয়া তার উচিত হয়নি। তার ! একটু থামিয়া বলিল—অর্জুনের গাছটা, উপরে সবাই ওটাকে ভক্তি করতো।

এমন সময়ে কীর্তিনারায়ণকে লইয়া ম্বিকা প্রবেশ করিলেন, বলিলেন, ও বাড়ির মা তোমাকে প্রণাম করতে এসেছেন।

মুক্তামালা কীর্তিনারায়ণের পায়ের ধূলি য়া প্রণাম করিল।

কীর্তিনারায়ণ শুধাইল, বৌমার শরীর ল তো? মাঝে মাঝে গ্রামে আসতে হয়। কাতায় থাকলে চলবে কেন?

এসব কথার কি উত্তর দিবে মুক্তামালা য়া পাইল না; সে বুঝিল, এসব কথা রের আশায় লোকে বলে না, কিছু বলিতে তাই বলে।

কীর্তিনারায়ণ বাহিরে যাইবার জন্য রওনা ল, খানিকটা গিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, বৌমাকে বলে দিও দেউড়ি দিয়ে এ বাড়িতে স কাজটা তিনি ভাল করেন নি। যাবার য়ে যেন খিড়কি দিয়ে যান।

এবারে মুক্তামালা উত্তর দিল। সে বলিল, ড়কির পথ জঙ্গলে ভরা, তাই দেউড়ি দিয়ে াম।

কীর্তি বলিল, আমি জঙ্গল পরিষ্কার তে হুকুম দিয়ে দেবো। কিন্তু দেউড়ি দিয়ে সাটা আমি পছন্দ করিনে—আরু বলে একটা র্থ আছে। এ তোমাদের কলকাতা নয়। ই বলিয়া সে আবার রওনা হইল।

অম্বিকা বলিলেন, ওরে কীর্তি, একবার মার কাশী যাবার কথাটা ভেবে দেখিস্। বার তোকে বলেছি, তুই কানই দিস না।

কীর্তি বলিল, এবারও দিলাম না।

অম্বিকা বলিল—বয়স হ'ল কবে মরবো।

কীর্তি বলিল—সে কি মা, তুমি বয়সের থা তুললে আমারও যে বয়সের কথা মনে পড়ে যায়। না মা, তোমার কাশী যাওয়া হবে না। এই বলিয়া চটির শব্দে অন্দরমহল প্রতিধ্বনিত করিয়া প্রস্থান করিল।

এমন সময়ে লক্ষ্মী ছুটিয়া ঢুকিল, বলিল, কাকীমা, আমার বেঁজির ছানা দেখ। এই বলিয়া আঁচলের ভিতর হইতে একটি ছোট বেঁজির ছানা বাহির করিল।

লক্ষ্মী বলিল—দেখো, দেখো, কেমন পিট পিট করে তাকায়, আর সলতে দিয়ে দুধ চুষে খায়। বুঝলে কাকীমা এটা বড় হলে একে দুধ-কলা খাওয়াবো বলে আমি একটা কলা-গাছ পুঁতেছি।

সকলে হাসিয়া উঠিল। মুক্তা বলিল—আর দুধের জন্য একটা গাই পোষো।

সকলে আবার হাসিয়া উঠিল। কিন্তু লক্ষ্মীর কাছে কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার মতো বোধ হইল না, সে বলিল—কর্তা মা, একটা গাই কিনে দাও।

অম্বিকা বলিলেন—আমি কোথায় টাকা পাবো? তোর বাপকে বল।

এমন শুভকার্যে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব করা উচিত না ভাবিয়া বিনা ভূমিকায় বেঁজির ছানাটিকে তুলিয়া লইয়া লক্ষ্মী পিতার উদ্দেশ্যে ছুটিয়া প্রস্থান করিল।

বেলা অনেক হইয়াছে বলিয়া মুক্তামালা অম্বিকাকে প্রণাম করিয়া উঠিল। অম্বিকা বলিলেন, বৌমা এবার খিড়কি দিয়েই যেয়ো।

তাহাকে আগাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে রুক্মিণী তাহার সঙ্গে চলিল এবং খিড়কির কাছে আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল, তুমি মাঝে মাঝে এসো, আমাদের যাবার উপায় নেই।

বিস্মিত মুক্তামালা শুধাইল—কেন?

রুক্মিণী বলিল—হুকুম নেই।

মুক্তামালা পুনরপি শুধাইল—কার?

রুক্মিণী কোন উত্তর দিল না, চুপ করিয়া রহিল।

মুক্তামালা সবই বুঝিল। বুঝিল জমিদারির বিবাদ অন্তঃপুর অবধি তাহার নিষেধের কালো ছায়া নিক্ষেপ করিয়াছে। সে রুক্মিণীর মুখের দিকে ভালো করিয়া তাকাইতে পারিল না। তাড়াতাড়ি রওনা হইয়া পড়িল।

ক্রমশঃ

ক্যাক্টাস্ বা সিজ জাতীয় গাছ

শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন

ক্যাক্টাস গাছের সঙ্গে আমাদের অনেকেরই পরিচয় থাকা সম্ভব। পাড়াগাঁয়ে লোকে গরু ছাগল ভেড়া প্রভৃতি জন্তুর মুখ থেকে গাছপালা রক্ষার জন্য ক্যাক্টাস্ গাছের বেড়া দেয়। ক্যাক্টাসের সঙ্গে পরিচয় থাকলেও ওদের সম্বন্ধে আমাদের মনে বিশেষ ঔৎসুক্য বা কৌতূহল নেই। বরং ওদের সম্বন্ধে আমাদের মনে ভয় ও আতঙ্কের ভাবই বেশি। আতঙ্কের কারণ, ওদের গায়ের কাঁটা। ক্যাকটাস্ জাতীয় গাছের মধ্যে ফণি-মনসার সঙ্গেই আমাদের পরিচয় বেশি। যেখানে ওরা একবার জন্মায় সেখান থেকে ওদের তাড়ানো বা নির্মূল করা খুবই শক্ত। গরু ছাগল ভেড়া প্রভৃতি জন্তু ওদের কাছে ঘেঁষতে ভয় পায়, ওদের বেঁচে থাকবার জন্য জলেরও বিশেষ দরকার হয় না। সুতরাং ওদের মারে কে? ওরা যে জায়গার গাছ সে জায়গায় ওদের মারবারও প্রয়োজন হয় না। ক্যাকটাস্ বাঙলার ন্যায় এমন সুজলা সুফলা দেশের গাছ নয়। বারিহীন শুষ্ক মরুভূমিতে এদের জন্ম। বাঙলার ন্যায় এমন একটি নরম মাটির দেশে এরা কী করে এলো তা জানবার উপায় নেই। খুব সম্ভবতঃ কেউ হয়তো এদের ফুলে আকৃষ্ট হয়ে কোন এক সময়ে এদের অন্যস্থান হ'তে এদেশে এনে থাকবে। তারপর এদের বৃদ্ধি আর থামায় কে? একবার অস্ট্রেলিয়াতে এরূপ একটি ঘটনা ঘটেছিলো। আমেরিকা হতে এক ভদ্রলোক ফুলে আকৃষ্ট হ'য়ে টবে করে একটি ক্যাক্টাস্ গাছ নিজের দেশ অস্ট্রেলিয়ায় নিয়ে আসেন। গায়ে কাঁটা দেখে বেড়ার উপযোগী মনে করে তিনি সেই গাছটির বংশবৃদ্ধি ক'রে তাঁর ফসলের ক্ষেতের চারধারে লাগিয়ে দেন। এদের প্রশের পরিচয় ও বংশবৃদ্ধি করবার ক্ষমতার কথা তাঁর জানা ছিলো না। দেখতে দেখতে কিছুকালের মধ্যে সেই একটি গাছ কচুরীপানার ন্যায় বংশবৃদ্ধি করে চারদিকের জমি গ্রাস করতে আরম্ভ করলে। এক বৎসরের মধ্যে লক্ষাধিক বিঘা জমি এদের কবলে পতিত হলো। চাষীদের মহাবিপদ। কিছুতেই এদের আর ধ্বংস করা যায় না। তখন এদের জন্মভূমি আমেরিকায় লোক প্রেরণ করা হলো এদের ধ্বংসের উপায় সন্ধান করবার জন্য। সেস্থান হ'তে নিয়ে আসা হলো এক-জাতীয় কীট, সেই কীট সেদেশের ক্যাক্টাসের মহাশত্রু। ক্যাক্টাসের শাঁসালো অংশ খেয়ে এরা জীবন ধারণ করে। বংশবৃদ্ধি করবার ক্ষমতাও ওদের ক্যাক্টাসেরই মতো। উভয়ের মধ্যে আরম্ভ হলো জীবন মরণের লড়াই। অবশেষে ক্যাক্টাসকেই হার মানতে হলো। চাষীরা সেই কীটের সাহায্যে ক্যাক্টাসের কবল হতে সেই জমি পুনরায় উদ্ধার করে তাতে ফসল উৎপন্ন করতে সমর্থ হয়েছে।

ক্যাক্টাস মরুভূমির গাছ। এ পর্যন্ত পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে মরুভূমির মধ্যে প্রায় সহস্রাধিক ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ক্যাক্টাস্ গাছের সন্ধান পাওয়া গেছে। আমেরিকায় মেক্সিকো প্রদেশে এদের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশি। এদের আকার আয়তনও একরূপ নয়।
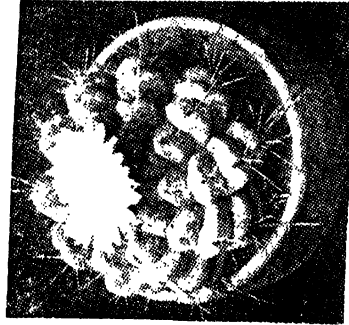
মেক্সিকো প্রদেশের এক জাতীয় অদ্ভুত ক্যাকটাস ও তার ফুল

কোন কোন জাতীয় গাছ আঙ্গুলের ন্যায় ক্ষুদ্র, আবার কোন কোন জাতীয় গাছ আয়তনে শাল-তালের ন্যায়ও উঁচু হয়। গড়নও এদের নানা রকমের নানা অদ্ভুত ধরণের। এদের কতক কতককে দূর হ'তে দেখলে হঠাৎ মনে হয় ডালপত্রহীন কতকগুলি নেড়া ঠুঁটো গাছ, যেন মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। ক্যাক্টাসের গায় ডালও নেই পাতাও নেই। পাতার জায়গা পূরণ করেছে কাঁটা, আর ডাল রূপান্তরিত হয়েছে হাতের তেলোর ন্যায় চ্যাপ্টা অঙ্গে (flattened joints)। কোন কোন ক্যাকটাসের গায় এসব অংশ গোলাকার বা শিরতোলাও হ'তে দেখা যায়।

পাতা নেই অথচ ক্যাক্টাস বেঁচে আছে শুধু বেঁচে থাকাই নয় মরুভূমির ন্যায় বারি-হীন শুষ্ক কঠিন মৃত্তিকায় সবুজের জয়ধ্বজা উড়িয়ে আহার ও পানীয় দানে মানুষ ও গো-ছাগল-ভেড়া প্রভৃতি জন্তু-জানোয়ারকে পরিতৃপ্ত করছে। কী ক'রে সম্ভব?

উদ্ভিদ জীবন ধারণ করে হাওয়া ও মাটি হ'তে খাদ্য সংগ্রহ ক'রে। মাটি হ'তে খাদ্য সংগ্রহের জন্য উদ্ভিদের জলের প্রয়োজন। জলের সঙ্গে মিশ্রিত না ক'রে গাছ কোন খাদ্যই মাটি হ'তে গ্রহণ করতে পারে না। অথচ মরুভূমিতে জলের একান্ত অভাব। সেখানে বৃষ্টির পরিমাণ অতি সামান্য। সেসব স্থানে সারা বছরে দু'চার পশলার বেশি বৃষ্টি হয় না। মরুভূমির গাছকে প্রাণ ধারণের জন্য সেই সামান্য বৃষ্টির জলের উপরই নির্ভর ক'রে থাকতে হয়। এই চেষ্টায় মরুভূমির গাছ অতিশয় সঞ্চয়ী হ'য়ে উঠেছে। বৃষ্টির জল ক্যাক্টাস্ সঞ্চয় ক'রে তার ডালের রূপান্তরিত অবস্থা প্রাপ্ত পটির (pad) ন্যায় স্থূল-অঙ্গে।

গাছ মাটি হ'তে যে জল শিকড় দিয়ে টেনে নেয় তার কতক পাতার ছিদ্র-পথ দিয়ে অবিরত বাষ্পাকারে বের হ'য়ে যায়। গাছকে বেঁচে থাকতে হ'লে সেই ব্যয় পূরণের জন্য মাটিতে প্রচুর জল থাকা প্রয়োজন। পূর্বেই বলা হয়েছে মরুভূমিতে জলের একান্ত অভাব। সেখানে পাতাল পর্যন্ত শিকড় চালিয়ে দিলেও এক ফোঁটা জল পাবার সম্ভাবনা নেই। সুতরাং ক্যাক্টাসের গায়ে সঞ্চিত জলকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য পাতার ছিদ্রপথে সেই জলের ব্যয়ের পথ বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। যার আয়ের পথ সংকীর্ণ তাকে বেঁচে থাকতে হ'লে মিতব্যয়ী হ'তে হয়। সেই চেষ্টায় মরুভূমিতে ক্যাক্টাস্ জাতীয় গাছের চেহারাই গেছে বদলে। পাতার ছিদ্রপথে জল বের হয়ে যায় বলে তাদের গায়ে পাতার বদলে হয়েছে কাঁটা, আর জল সঞ্চয় করে রাখবার জন্য ডাল পরিণত হয়েছে পটির ন্যায় স্থূল-অঙ্গে।

গাছের পাতা যত বেশি বড় ও চওড়া হবে তার গা হ'তে পাতার ছিদ্রপথ দিয়ে তত বেশি জল বের হবার সম্ভাবনা। সেইজন্য যেসব স্থানে বারিপাত বেশি হয় সাধারণত সেসব স্থানের অধিকাংশ গাছের পাতাই আকারে বড় ও চওড়া। কেননা সেসব স্থানে বৃষ্টির জলে মাটি সর্বদা ভিজে থাকায় গাছের গা হ'তে বেশি পরিমাণে জল বের হ'য়ে যাওয়া প্রয়োজন। গাছের গায় প্রচুর পরিমাণে জল

াবদ্ধ হ'য়ে থাকলে গাছ মাটি হ'তে শিকড় য়ে নতুন ক'রে খাবার টেনে নিতে পারে না। ননা সেই খাবার শিকড় দিয়ে টেনে নেবার য় গাছকে জলের সঙ্গে তা গুলে নিতে য়। অতিরিক্ত পরিমাণে জল গায় আবদ্ধ হ'য়ে কলে মাটি হ'তে শিকড় দিয়ে জলের সঙ্গে বার নিতে গাছের বাধা ঘটে। তাই ছিদ্রপথ য়ে জল দ্রুত বের হবার জন্য বারিবহুল ানে পাতার আকার হয় বড় ও চওড়া।

কিন্তু বারিহীন শুষ্ক কঠিন মরুভূমির বস্থা ঠিক এর উল্টো। এখানে জলের খরচ য় সঞ্চয়েরই বেশি প্রয়োজন। তাই মরুভূমির ছে পাতা একেবারেই নেই। তাই গাছের গায়ে াতার বদলে কাঁটা। কাঁটার গা দিয়ে খুব ামান্য পরিমাণে জলই বের হ'তে পারে। চোর পশলা বৃষ্টির সময় যেটুকু জল সঞ্চয় রে রাখতে পারে অভাবের সময় তাই ব্যবহার রে মরুভূমির গাছ বেঁচে থাকে।

পাতা কাঁটায় পরিণত হওয়ায় ক্যাক্টাস্ াতীয় গাছের গা হ'তে শুধু জল বহির্গত বার পথই যে রুদ্ধ হয়েছে তা নয়, ছাগল- ভড়া প্রভৃতি তৃণভোজী জন্তুর মুখ থেকে াত্মরক্ষা করতে সমর্থও হয়েছে। মরুভূমিতে বুজের খুবই অভাব। গায়ে কাঁটা না থাকলে াগল-ভেড়া প্রভৃতি জন্তু এদের খেয়ে মুড়িয়ে দতো। সেখানে ওদের জন্মাবার বা বেঁচে কেবার কোন সম্ভাবনা ছিলো না। পাহাড়ের উপর একেবারে খাড়া গা ঘেঁষে যে দু'এক াতীয় ক্যাক্টাস্ গাছ জন্মে আশ্চর্যের বিষয় াদের গায় কাঁটা নেই। সেরকম দুর্গম স্থান তৃণভোজী জন্তুর চরবার পক্ষে উপযোগী নয়। াজেই সেরকম স্থানে আত্মরক্ষার জন্য তাদের াঁটারও প্রয়োজন হয় না।

পাতা কাঁটায় পরিণত হওয়ায় মরুভূমিতে ক্যাক্টাস্ জাতীয় জলের অভাব দূর য়েছে এবং আত্মরক্ষার পথও সহজ হয়েছে কিন্তু গাছের যা প্রধান খাদ্য শ্বেতসার াতীয় খাদ্য তা সে পাবে কী ক'রে? কারণ গাছের পাতাতেই এই শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য তৈরি হয়। গাছ শিকড় দিয়ে মাটি হ'তে যে রস ও পাতার ছিদ্রপথ দিয়ে হাওয়া হ'তে যে অঙ্গার বাষ্প টেনে নেয় তা পাতার সবুজ পদার্থের (chlorophyl) সঙ্গে মিশ্রিত হ'য়ে সৌরতেজের শক্তিতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শ্বেতসারের পদার্থে পরিণত হয়। এই শ্বেতসার শুধু গাছেরই নয় জীব মাত্রেরই প্রধান খাদ্য। কিন্তু তা তৈরি করবার শক্তি একমাত্র উদ্ভিদ ভিন্ন অন্য কোন জীবের নেই। কেননা শ্বেতসার তৈরি করবার প্রধান উপকরণ গাছের পাতার ক্লোরাফিল্ নামক সবুজ পদার্থ। ক্লোরাফিল্ ভিন্ন শ্বেতসার পদার্থ তৈরি হ'তে পারে না।

ক্যাক্টাসের গায়ে পাতা নেই কিন্তু বেঁচে থাকবার জন্য পাতার সবুজ পদার্থ বা ক্লোরফিল্ স্থানান্তরিত হয়েছে তার পটির ন্যায় স্থূল-অঙ্গে। তাই ক্যাক্টাসের গা পাতার ন্যায় সবুজ। যেসব গাছে পাতা আছে তাদের ডাল বা কান্ড ক্যাক্টাসের ন্যায় সবুজ নয়। ক্যাক্টাস্ তার প্রধান খাদ্য শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ তৈরি করে পাতার পরিবর্তে তার সবুজ স্থূল-অঙ্গে। তার জন্য যে সৌরতেজের প্রয়োজন মরুভূমিতে সে তা পায় প্রচুর পরিমাণেই। জল তো তার গায়েই সঞ্চিত থাকে। সুতরাং গায়ে পাতা না থাকলেও মরুভূমিতে তার খাদ্য সৃজনের বাধা ঘটে না।

এক শ্রেণী ক্যাকটাসের ফুল

ক্যাক্টাসের গায়ের কাঁটা দেখে আমাদের মনে আতঙ্কের সঞ্চার হলেও মরুপ্রান্তরের কোন স্থানে অধিবাসীদের ক্যাক্টাসের মত এমন বন্ধু আর কে? পথে চলতে চলতে যখন তৃষ্ণা পায় তখন ক্যাকটাসের কচি অঙ্গ কেটে কয়েক খন্ড মুখে পুরে চিবোও, মুখ জলে ভরে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে তৃষ্ণাও নিবারণ হবে। ক্যাক্টাস্ গাছ কেটে তার ভিতরের শাঁস থেঁতলে হাতের মুঠোয় পুরে জোরে চাপ দিলে তার ভিতর হ'তে যে জল বা রস বের হয় তা খেতে ঈষৎ তিক্ত হোলেও বেশ সুস্বাদু ও ঠান্ডা। সে দেশের অধিবাসীরা ক্যাক্টাস্ গাছের খানিকটা অংশ কেটে মাঝে একটা ফুটো ক'রে দু'খন্ড পাথরের উপর তা বসিয়ে দুধারের কর্তিত অংশের ধারে আগুন জেলে দেয়। তখন মাঝের ফুটোর নীচে পাত্র ধরলে ক্যাক্টাসের গা থেকে ফোটা ফোটা জল প'ড়ে পাত্র একেবারে ভরে যায়। মরুভূমির পথিক সেই জল পান ক'রে তৃষ্ণা নিবারণ করে।

সে দেশের লোক ক্যাক্টাস্ গাছ ব্যবহার করে নানা কাজে। ক্যাক্টাসের গুঁড়ি দিয়ে সে দেশের লোকেরা তাদের ঘরের খুঁটি করে; খাট, টেবিল, চেয়ারের পায়া তৈরী হয় গুঁড়ির শক্ত কাঠে। আমরা গাড়ির বা নৌকোর ছই যেমন তৈরি করি বাঁশ দিয়ে, সে দেশের লোক তাদের গাড়ির ছই তৈরি করে ক্যাক্টাসের কাঠ দিয়ে। এসব ক্যাক্টাস্ একটু ভিন্ন জাতের—আমাদের দেশের ফণিমনসার মতো এদের গা তেমন চেপ্টা নয়, লম্বায় এরা হয় প্রায় ৫০।৬০ ফুট, কান্ডের আকৃতি গোল আর ধারে ধারে শির তোলো।

আমেরিকার উদ্ভিদের যাদুকর বুরব্যাঙ্ক (Burbank) সাহেব বহুদিনের সাধনায় এক-জাতের ফণিমনসাকে কণ্টকহীন করেছে। সে জাতের ক্যাক্টাস্ এখন মানুষ গরু ঘোড়া ছাগল ভেড়ার অতি প্রিয় খাদ্য। এর কচি অংশ এখন ভেজে খাওয়া যায়, সিদ্ধ ক'রে খাওয়া যায়, কাঁচাও অন্যান্য সব্জীর সঙ্গে মিশিয়ে বিলিতি স্যালাড্ জাতীয় খাদ্যে পরিণত করা যায়।

ক্যাক্টাসের ফুল দেখতে অতি সুন্দর, ফলও অতি সুমিষ্ট ও রসালো। ফুলের মধ্যে সাদা, হলদে, গাঢ় গোলাপী, গাঢ় লাল প্রভৃতি বিচিত্র বর্ণের বাহার দেখতে পাওয়া যায়। কোন কোন ফুলের গন্ধ বেশ সুমিষ্ট। ফলের গায়ও দেখতে পাওয়া যায় উজ্জ্বল রং—কোন কোন জাতীয় ক্যাক্টাসের ফল নানা কারুকার্যে শোভিত। মেক্সিকো ও সিসিলি দ্বীপের কোন কোন স্থানে বৎসরের যে সময়ে ক্যাক্টাস্ ফল পাকে সে সময়ে সে সব স্থানের অধিবাসীদের সেই ফলই হয় প্রধান জীবিকা। খুব সকালে সূর্যোদয়ের পূর্বেই ওরা গাছ থেকে ফল পেড়ে আনে। তাতে ফলগুলি বেশ ঠান্ডা থাকে। সেই-সব ফলের রস দিয়ে ওরা একজাতীয় মদও তৈরী করে।

ক্যাক্টাস্ গাছের চেহারা চিরকালই এরূপ ছিলো না। একসময় দেখতে এরাও ছিল অন্যান্য গাছের ন্যায়—গা ছিলো পাতা, ডালে ভরা। তখন তাদের প্রধান শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য তাদের পাতায়ই তৈরী হতো। তারপর ভাগ্য-বিপর্যয়ে তাদের এই রূপান্তর গ্রহণ করতে হয়। হয়তো কোন কারণে সে সব জায়গায় বারিপাতের পরিমাণ কমে যায়, দেশ হয়ে পড়ে শুষ্ক কঠিন নীরস। যে সব উদ্ভিদ প্রাণশক্তিতে ছিলো দুর্বল তারা গেলো মরে, কিন্তু তারাই সেই প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রামে জয়ী হয়ে শেষ পর্যন্ত টিকে রইলো। কিন্তু তাদের চেহারা গেল বদলে, তারাই আজ ক্যাক্টাস জাতীয় গাছ।

ইরাণীয় শিল্প ও ভাস্কর্য

অ-ম-ব

প্রাচীন ইরাণ ছিল স্বয়ংসম্পন্ন দেশ। এর হাজার হাজার বৎসরের ইতিহাসে সে পাশ্চাত্যের সম্পদে সম্পদশালী হয়েছে কিংবা পাশ্চাত্যের দাবীতে নিজের সম্পদহানি করেছে, এমন নজির নেই। অন্যান্য সম্পদের ন্যায় শিল্প ও ভাস্কর্যসম্পদও এর সম্পূর্ণ আপন জিনিস; এতে কোন কোন ক্ষেত্রে বাহিরের, বিশেষ করে পাশ্চাত্যের প্রভাব হয়ত কিছু কিছু পড়েছে, কিন্তু এর প্রাণবস্তুকে কোথাও বিকৃত করতে পারে নি।

এখানে ইরাণের খাঁটি শিল্প ও ভাস্কর্যের কিছু কিছু নিদর্শন দেওয়া গেল। প্রাচীন ইরাণের শিল্পী ও ভাস্করেরা নিজ নিজ স্বপ্নকে পাথর খুদে কেমন সুন্দর রূপ দিয়ে গেছে, এতে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

ইরাণের রাজধানী শাপুর নগরীর প্রাচীন প্রাসাদটিতে ভাস্করেরা কারুশিল্পের চমক সৃষ্টি করে রেখেছে। এর প্যানেলের গায়ে অষ্টকোণ বেষ্টণীর মধ্যে লতা-দণ্ডে আঙ্গুর-পত্রের চিত্রণ দেখতে পাওয়া যায়। একে ইরাণী ঐতিহ্যের একটি সূক্ষ্ম প্রতিদান বলা চলে। কিন্তু আর একটি প্যানেলের চতুষ্কোণীর গায়ে একটি গোলাকৃতি বলয় মধ্যে শতদল পদ্মের যে দলগুলি অঙ্কিত রয়েছে, তাতে খাঁটি এশিয়াটিক সংস্কৃতির সর্বোৎকৃষ্ট ছাপ পড়েছে। উক্ত প্রাচীন, ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাসাদগাত্রে সেকালের ভাস্করেরা যে যাদু সৃষ্টি করে গেছে শাপুরে প্রাপ্ত অন্যান্য স্মৃতিসৌধের গায়েও সে যাদুর চমক দেখতে পাওয়া যায়।

আর কতকগুলো প্যানেলে পোর্ট্রেট খোদিত হয়েছে। সম্ভবতঃ সেগুলি রাজ-পরিবারের লোকজনের মূর্তি। শুধু মস্তক খোদাই করার পর চিবুকের নিম্নে এসে ভাস্করের নির্মাণ-যন্ত্র থেমে গেছে—শরীরের বাকী অংশের খোদাই আর হয় নি। একটি প্যানেলে মানুষের ত্রিকালের অবস্থা বর্ণিত আছে; যথা, শ্বেতকেশশ্মশ্রুমণ্ডিত বৃদ্ধ, মধ্যবয়সী নর (কিংবা নারী) এবং যুবক (কিংবা যুবতী)। পোর্ট্রেটগুলি এমনি নৈপুণ্যের সঙ্গে খোদাই করা হয়েছে যে, তৎকালের শিল্পচাতুর্য যে উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছেছিল, এতে তা অনায়াসে বোঝা যায়।

একটি চিত্রে পশুশৃঙ্গযুক্ত মস্তকাবরণ দেখা যাচ্ছে। এটি সম্ভবতঃ কোন যুবরাজের মূর্তি। এইরকম একটি মস্তকাবরণযুক্ত, স্বর্ণ ও মূল্যবান প্রস্তরখচিত পোষাক রাজা দ্বিতীয় শাপুর (৩০৯-৩৭৯ খৃঃ পূঃ) পরিধান করতেন।

শাপুরে আরো যে সমস্ত শিল্প ও
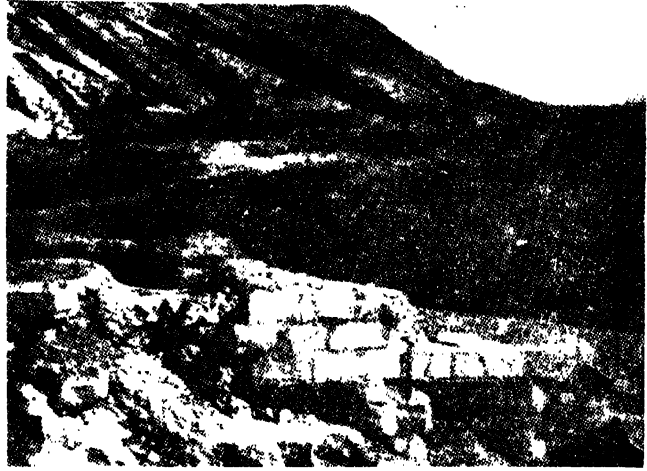
প্রায় দুই সহস্র বৎসরের বহু ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত শাপুর প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ
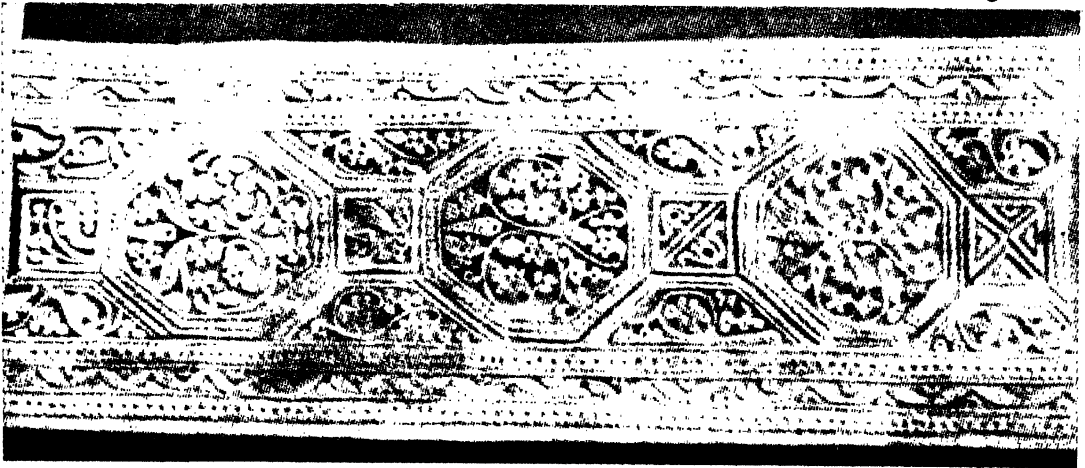
শাপুর প্রাসাদগাত্রে নিখুঁৎ ইরাণীয় কারুকার্যে অষ্টকোণ বলয় মধ্যে আঙ্গুর-পত্রের চিত্রণ ইরাণের নিজস্ব ঐতিহ্যের সাক্ষ্য দেয়

পশুশৃংগযুক্ত মস্তকাবরণ —রাজপুরুষের চিহ্ন
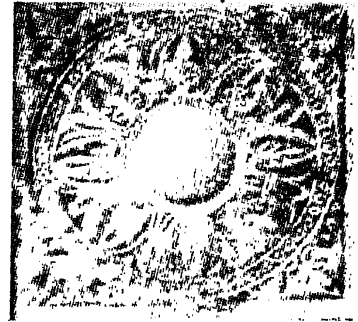
তৃতীয় শতকের শাপুর প্রাসাদগাত্রে উৎকীর্ণ পদ্ম

[ভা]স্কর্যসম্পদ আবিষ্কৃত হয়েছে, তাদের [নি]র্মাণকার্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব পড়েছিল কিংবা [এ]শিয়া-প্রভাবাধীনে সেগুলি নির্মিত এ নিয়ে [ত]র্ক ওঠে। এর মীমাংসা করতে হলে [শা]পুরের রাজা ১ম শাপুরের সময়ের শিল্প-[ভা]স্কর্য সম্পদগুলিকে পরীক্ষা করে দেখতে [হ]বে। প্রথমেই উল্লেখ করতে হবে সেখানকার [বি]রাট অগ্নিদেবের মন্দিরটিকে। এর নক্সা খাঁটি ইরাণীয়; এবং এর গম্বুজে ও অন্যান্য অংশাদির মধ্যে প্রাচীন প্রাচী-র সুদূরতর অতীতের ছাপ শিল্পীর স্বপ্নে ধরা দিয়েছিল। মনীষী মানি একটি বিশ্ব-জনীন ধর্মের স্থাপয়িতা হিসাবে শ্রদ্ধেয় ছিলেন। এই মানিকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে রক্ষা করেছিলেন রাজা ১ম শাপুর।

সর্ব ধর্মের সৃষ্টিভূমি এশিয়া; প্রেম মৈত্রী ও মানবতার বাণী চিরকাল প্রচার করেছে এশিয়া। সর্বধর্মে সমভাব, সর্বধর্মে জীবের মুক্তি এবং ঐহিক ও পারত্রিক শান্তির বাণী প্রচার করেছে এশিয়া। ঋষি লাউৎসে, বুদ্ধ, মানি, জরথুস্ত্র, এ'রা একদিকে চীন আবেক দিকে ইরাণ—এই বিরাট ভূখণ্ডকে করে গিয়েছেন ধর্মে ও মহত্ত্বে সমুন্নত। রাজা ১ম শাপুরের সমকালীন, তৃতীয় শতাব্দীর ইরাণীয় চিত্র-ভাস্কর্যে দেখতে পাই সেই এশিয়ারই শান্তিময় স্বপ্নের রূপায়ণ।

মানবের তিন অবস্থা—তারুণ্য

মানবের তিন অবস্থা—বার্ধক্য

"দেশ"-এর নিয়মাবলী

বার্ষিক মূল্য—১৩, ষাণ্মাসিক—৬॥০

'দেশ' পত্রিকার বিজ্ঞাপনের হার সাধারণত নিম্নলিখিতরূপঃ—
সাময়িক বিজ্ঞাপন—৪, টাকা প্রতি ইঞ্চি প্রতিবার
বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ বিজ্ঞাপন বিভাগ হইতে জ্ঞাতব্য।

সম্পাদক—"দেশ", ১নং বর্মণ স্ট্রীট কলিকাতা।

অসুখ হলে প্রায় সকলেই বড় বিরক্ত হয়, বড়ই অসুস্থ হয়ে পড়ে। কিন্তু আমার অসুখ হলে আমি ভয়ানক সুস্থ বোধ করি, ভয়ানক আনন্দিত হই আমি। আমাদের কাজে-বাঁধা এই জটিলতামর অসুস্থ জীবনের মধ্যে সুস্থ হবার সুযোগ অসুখের মত আর কেউ দেয় না। বিনা কৈফিয়তে চিৎপাত শুয়ে থাকার, কোন কাজ না করার, বিছানার কাছে প্রতিটি ক্ষিদের মুখে যথাযোগ্য খাদ্যের জোগান পাওয়ার এমন অপূর্ব সুযোগ আর কিছুতে পাওয়া যায় না। তাই, মাঝে কিছুদিন অসুখ না করলে আমি ভয়ানক চিন্তিত হয়ে পড়ি।

আকাশের অপর্যাপ্ত অন্ধকারের মাঝে মাঝে যেমন তারার ইঙ্গিত, আমাদের জীবনের অপর্যাপ্ত দুঃখের অন্ধকারে তেমনি অসুখের সঙ্কেত আসে। চোখে আলোর ইসারা দেখতে পাই আমরা। অসুখ কথাটির উৎপত্তি কোথা থেকে, তা ঠিক জানিনে। তবে, এটা অনুমান করি—সুখের সঙ্গে এর অর্থগত কোন যোগ নেই। এটা তো অ-সুখ নয়,—আসলে এ-যে সুখেরই নামান্তর।

আসলে, একঘেয়ে কোন কিছুই আমি পছন্দ করিনে। একটানা অনেকদিন ধরে কাজকর্মে ব্যস্ত থাকা, চলাফেরা করা, বৈঠকী আলাপে মশগুল হয়ে থাকা,—এটা কি জীবন? বৈচিত্র্যময় জীবন ধারণ করতে হলে অসুখের সাক্ষাৎ মাঝে মাঝে অবশ্যই চাই। তাই, অসুখ করলে আমি বড় সুস্থবোধ করি।

'আমার অসুখ'—এ কথাটা কাউকে বলতে বড় আরাম লাগে আমার। এই মধ্যবিত্ত অনাড়ম্বর জীবনের মধ্যে ওইটুকুই যেন বাদশাহী ঘোষণা। 'আমার অসুখ'—অর্থাৎ তোমরা আমাকে বিরক্ত করো না, তোমরা আমার সময় নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে এসো না, তোমরা আমাকে একা থাকতে দাও। এতগুলো কথা এত সংক্ষেপে জানবার অন্য কোন ভাষা নেই। কত অল্প সময়ের মধ্যে কতবড় নিষ্কৃতি এনে দেয় এই অসুখ। আমার যে অসুখ, এটা নিজস্ব আমারি।—আমার নিজস্ব হলেও, তার আড়ালে এটুকু দাবী থাকে যে, তোমরা আমার কথা একটু ভাবো।

অসুখ করলে আমার মনে হয় আমি যেন কর্মক্লান্ত বিরাট কোন এক মহাসাগরের পরপারের একখণ্ড নির্জন দ্বীপ। আমার রোগশয্যার চারিদিকে অ-কর্মের জলতরঙ্গ বাজতে থাকে। অগুন্তি নারিকেল কুঞ্জের স্বপ্ন রচনা করি আমি। আমি একা, আমি একক হয়ে যাই পৃথিবী থেকে। ঘড়ির কাঁটার যাবতীয় সময় এসে যায় আমার একার আয়ত্তে। আমি শুয়ে শুয়ে ভাবতে পারি, যা আমার অভিরুচি। আকাশ আর বাতাস নিয়ে যত খুসি মাল্য রচনা করার অবসর ঘটে আমার। কর্মের কলকোলাহল নেই, কর্তব্যের আপিসী তাগাদা নেই, যানবাহনের সঙ্গে পাল্লা রেখে দৌড়ঝাঁপ নেই সে এক পরম প্রশান্ত অবসর। প্রতিটি মুহূর্তে নিয়ে আমি খেলা করতে পারি, চোখ বুজে জেগে থাকতে পারি, তাকিয়ে তাকিয়ে ঘুমিয়ে থাকতে পারি। উদ্বেগ অশান্তির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার এমন ওষুধ আর নেই।

যা কিছু চাওয়া যায়, তাই কি কেউ পায়? আমার জীবনেও অভাব অবশ্য আছে বিস্তর, কিন্তু একটি অভাব থেকে আমি বঞ্চিত। অসুখের অভাব আমার নেই। মাঝে মাঝেই আমার অসুখ হয়, সুস্থ হবার সুযোগ জীবনে আমার অনেক ঘটেছে ও এখনো ঘটছে।

সম্প্রতি অসুখ হয়েছিলো আমার। অতি সংক্ষিপ্ত অসুখ। অসুখ অবশ্য সব সময়েই সংক্ষিপ্ত,—তা না হলে তো ওর নাম হয়ে যায় রোগ। যাই হোক, এই তিনদিনের অসুখে এমন সুস্থ বোধ করেছি, এমন আরাম পেয়েছি যে, কর্মময় জটিল জীবনে যে কথা ভেবে ঠিক করতে প্রায় বছর ঘুরে যেতো, তা ভেবে ঠিক করার সুযোগ এই তিনদিনেই ঘটে গেছে। অনেক কাজ এগিয়ে গেছে আমার।

তাই অসুখ করলে আমার বড় অহঙ্কার হয়। মনে হয়, আমি যেন আর সাধারণ পর্যায়ের মানুষ নই। আমি যেন সবার থেকে স্বতন্ত্র, সবার থেকে পৃথক। আমি একা, অর্থাৎ আমি একক—আমি অদ্বিতীয়। বিছানা-বালিশেই অধীশ্বর হয়ে যাই আমি। শুধু বিছানা-বালিশের কেন, আমি যেন মনার্ক অব অল। প্রকৃতপক্ষে ঘটনাও ঘটে তাই। আমার চোখের ইসারায়, আঙ্গুলের ইঙ্গিতে চলাফেরা করে সবাই। তিনবার ডেকে যার সাড়া পেতাম না, সে-ই আমার তুড়ি শুনে ছুটে আসে। ডেকে ডেকে জবাব পেতাম না যার, বিনা ডাকে সে-ই এসে জিজ্ঞাসা করে ডাকছিলাম কিনা। ক্ষিদে পেয়েছে কিনা, ক্ষিদে পাচ্ছে না কেন—অনবরত জবাব দিতে হয় এমন সব প্রশ্নের। দুদ্দাড় করে কেউ ছুটোছুটি করে না বারান্দায়, হুটপাট করে ঘরে ঢোকে না কেউ। সবার চলনে সবার বলনে এমনি একটা অপরূপ গাম্ভীর্য এনে দেয় আমার অসুখ।

রাজ্যহীন রাজত্বের অধীশ্বর হয়ে লাজ নেই,—বলেন কি? রাজ্য দিয়ে দরকার কি, রাজত্ব

যদি থাকে, তার আধিপত্যি করতে আপত্তি কেন আপনাদের? অসুখ করলে আমার ঘরটুকু আমার রাজত্ব হয়ে দাঁড়ায়। জানিনে, আপনারা আপনাদের অসুখের রাজদণ্ড হাতে নিয়ে আপনাদের ঘরকে রাজত্বে রূপান্তর করতে পারেন কিনা। না পারলে, সেটা আপনার অক্ষমতা নয়, আপনার অসুখের সেটা গাফিলি। অসুখ এসে আপনাদের অসুস্থ করেই সে কৃতার্থ হয়ে যায়, আপনাকে সুস্থ করার দায়িত্ব যে তার, আপনাকে চাঙ্গা করার ভার যে তার ওপর, সে দিকে খেয়ালই তার তাই থাকে না। এর জন্যে দায়ী করবো আপনাকে। অসুখকে উপযুক্ত-ভাবে ব্যবহার করতে আপনারা চান না। তাকেই আত্মসমর্পণ করাবেন, কিন্তু তা না করে তারি কাছে সারেন্ডার করেন আপনারা। অসুখকে যদি রাজদণ্ড হিসেবেই ব্যবহার করতে না পারলেন, অসুখকে দিয়ে যদি আপনার কাজ এগিয়ে নিতেই না পারলেন,—তাহ'লে অসুখ যে আপনাদের হয় কেন, ভেবে পাইনে।

সত্যিই তো যার যা সহ্য হয় না, তাকে দিয়ে তা গলাধঃকরণ করিয়ে লাভ কি? এতে হিতে বিপরীত হয়ে যায়। অসুখকে উপযুক্ত কাজে নিয়োগ করাতে না পারলে অসুখ স্বপ্রতিষ্ঠ হতে চেষ্টা করে। ফলে, তার আলিঙ্গন আক্রমণের সামিল হয়ে দাঁড়ায়। তাই আমার মনে হয়, যার-তার অসুখ যেন না করে। রোগে আক্রান্ত হবার অধিকারী অবশ্য সকলেই। কিন্তু অসুখ, এ যে আলাদা পৃথিবীর একটুকরো আশীর্বাদের ভগ্নাংশ। যারা এ আশীর্বাদকে শিরোধার্য করতে না জানে, তাদের অসুখ হবার কোনো অধিকার অতএব নেই। অসুখে অসুস্থ হয়, এমন কেউ যদি বলে যে, তার অসুখ হ'য়েছে—আমি সে কথা বিশ্বাস তাই করিনে। আমি জানি তার অসুখ হয়নি, তার হ'য়েছে রোগ। অসুখ কথাটির ওপর নানা রকম অবিচার হ'য়ে আসছে অনেক-দিন থেকে। এ অবিচার অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার। প্রথমতঃ অসুখ কথাটির যথাযোগ্য প্রয়োগ হ'চ্ছে না, বেশীর ভাগই অস্থানে এর অপপ্রয়োগ হ'চ্ছে; দ্বিতীয়ত, অসুখ শব্দটিই আপত্তিকর, নামটা বিভ্রান্তিজনক—যেন সুখের এ শত্রুপনা। আমার ব্যক্তিগত আবেদন এই—অবিলম্বে এর নাম বদল করা দরকার।

অসুখের মতন এমন সুখ আর আছে কিসে? আমাকে এ নিয়ে যায় কত সুদূর সুখের রাজ্যে। এই কর্ম কোলাহল, দৈনন্দিন ঠেলাঠেলি, প্রাত্যহিক কর্তব্য পালন ইত্যাদি নানারকম ঝঞ্ঝাটের হাত থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় কর্মহীন, উদ্বেগহীন এক নির্জন দ্বীপে। আমি সেখানে সমুদ্রের আধো-ঠাণ্ডা বালির ওপর পিঠ দিয়ে প্রকাণ্ড একটি আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকি। চারিদিকে গভীর কালো সমুদ্রের জল, চোখের সামনে নীল নির্মেঘ আকাশ। তীরে মৃদু আঘাত দিয়ে দিয়ে ঢেউ ভেঙে ভেঙে পড়ে। সেই জলতরঙ্গে কান পেতে আমি অপার্থিব সঙ্গীতের স্বাদ চাখতে থাকি। চারদিকে নোনতা বাতাস বয়ে চলে এলোমেলো, আকাশে আর বাতাসে একাকার হ'য়ে যায় চারদিক। দূরে ওই নারিকেলকুঞ্জ; ওই লবঙ্গ বন। আমার পৃথিবী পরিক্রমার পর পরিব্রাজকের মত আমি যেন এসে গেছি স্বপ্নাতীত এক কল্পলোকে। এখানে কাজ নেই, দুঃখ নেই, বোঝা নেই, কেবল স্বপ্ন আর কেবল কল্পনার ভূখণ্ড এটা।

কিন্তু একি, হঠাৎ স্বপ্ন যায় ভেঙে, কল্পনা হ'য়ে যায় ধূলিসাৎ। যা ছিলো পিঠের নিচের নরম বালুকা, তা হ'য়ে ওঠে বিছানার স্তূপ। যা ছিলো আকাশ, তা হয় ঘরের সিলিঙ। জলতরঙ্গ শুনছিলাম যেটা, সেটা পেয়ালা আর চামচের সংঘর্ষ। 'ভোর হয়েছে, চা রেডি।' এই কঠিন কণ্ঠ ধ্বনিতে চমকে উঠি। আর নাকি আমার অসুখ নেই। আজ থেকে আবার আমি সজাগ, আবার স্বাভাবিক, আবার সাধারণ।

কোমরে বেল্ট ক'ষে, গলায় টাইট ক'রে টাই বেঁধে, বুট ঠুকে চললো তবে কর্ম-প্রসাধন। ঘড়ির কাঁটা রেল গাড়ীর মত বেগে ধেয়ে চ'লেছে, পাল্লা দিতে হবে তার সঙ্গে। রসনার বসে ভিজিয়ে জিরিয়ে জিরিয়ে খাবার আর সময় কই? তাড়াতাড়িতে হাত ঘড়িটা বাঁধতে ভুল হ'য়ে গেলো, মনিব্যাগ নিয়েছি কি না তিনটি পকেট তিনবার থাবড়ে পরখ ক'রে নিতে হ'লো, আপিসের চাবি, আর সেই ফাইলটা? ভাববার সময় নেই, দাঁড়াবার ফুরসৎ নেই, যা যা সঙ্গে নিইনি ঝটঝট দিয়ে দাও সঙ্গে।

দৌড়ে বেরিয়ে এসেছি রাজপথে। জীবন ধারণ সুরু হ'য়েছে আমার। বাইরে কর্মের এত গর্জন এত কোলাহল, তার মাঝে হৃৎপিণ্ডটা চলছে কি না তার সাড়া পাচ্ছিনে। ছুটে গিয়ে ধরলাম একটা চলন্ত গাড়ীর লোহার রড চেপে। উল্কার মত ব'য়ে চলেছি কর্মের স্রোতে।

ভাবছি, আবার অসুখ কবে যে করবে!

যাযাবর

সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত

জীবনদ্বন্দ্বে-সূচনায় শেষে প্রশ্ন,
সমাধান কথা গুরুদায়িত্ব ভার—
অতএব উচ্ছৃঙ্খল খেয়াল এবার
অট্টহাস্যে দেখে উদ্ধত স্বপ্ন।

বিক্ষুব্ধ সে খণ্ড মেঘ কভু কি আকাশে
নিবিড় সুনীলে, কিছু বিশ্রাম চায়?
মানুষের কাহিনীর ইতিবৃত্ত প্রায়
বিভ্রান্ত বিচিত্ররূপে হাসে।

স্নেহ-নীড় রচি স্বপ্নসাধের তীরে
দুর্বার ঢেউয়ে অতলে লুপ্ত হয়।
বারে বারে শুনি আপনার পরাজয়
দুর্যোগ আছে বায়ুমৃত্তিকা ঘিরে।

তবু-ত দেখেছি সৃষ্টির বিস্ময়,
রূপময়তায় মহা এক মধু মাসে।
সৃজনের লেখা তৃণে ও গুল্মে ভাসে—
উদার পক্ষে ফিনিক্স স্বপ্নময়।

যাযাবর জীব অনিয়ম উচ্ছ্বাসে
এখনো ছড়ায় রাজব্যাধি আর ভয়
আকাঙ্ক্ষা তার বিষাক্ত নিঃশ্বাসে
অন্তিমেতেও ইতস্ততঃ রয়।

নীতিহীন উল্লাসেরা বারে বারে আসে
ক্রূর সংস্কার, মূলোৎপাটন দায়—
শৃঙ্খলার সুনির্মল সুস্থির প্রকাশ
যাযাবর জীবনের আঘাত ঘনায়।

দক্ষিণ মেরুতে মার্কিন অভিযাত্রিদল

দক্ষিণ মেরু-অভিযান

অমরেন্দ্রকুমার সেন

গত যুদ্ধের সময় আমরা অন্তত মানচিত্রে পৃথিবীর সব দেশগুলি নিয়ে ব্যস্ত ছিলুম, যার মধ্যে দক্ষিণ মেরু সম্পূর্ণ বাদ ছিল। যুদ্ধ মিটে গেল, আমাদের আবার মানচিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হ'ল এবার দক্ষিণ মেরুর দিকে। কোথায় বুগেনভিল, কোথায় নারভিক, আবার কোথায় সাইপান এসব কোথায় আমরা. যেমন যুদ্ধের আগে জানতুম না, তেমনি এখন জানতে হচ্ছে দক্ষিণ মেরুতে কোথায় ভিক্টোরিয়া ল্যান্ড, আর কোথায় বা গ্রেহাম ল্যাণ্ড, যদিও সেখানে ল্যাণ্ডের পরিবর্তে 'আইস' (বরফ) বললেই বোধহয় ভাল হত। যাই হোক এখন ঐ মেরুপ্রদেশে কয়েকটি জাতি কয়েকটি অভিযান প্রেরণ করছেন, সেইজন্য আমাদেরও দৃষ্টি আপাতত ঐ দিকেই নিবন্ধ হয়েছে।

দক্ষিণ মেরু আবিষ্কার করেন নরওয়ের নাবিকবীর অ্যামুণ্ডসেন; তিনি দক্ষিণ মেরু বিন্দুতে পেঁৗছেছিলেন। তাঁর কিছুদিন পরে ইংরেজ নৌ-বীর ক্যাপ্টেন স্কটও দক্ষিণ মেরু বিন্দুতে পেঁৗছেছিলেন, কিন্তু তিনি এবং তাঁর তিনজন সঙ্গী দক্ষিণ মেরু থেকে জীবিত অবস্থায় ফিরে আসতে পারেননি। সে কাহিনী বড়ই করুণ।

আমাদের দেশের জলহাওয়া যেমন উষ্ণমণ্ডলীয় (ট্রপিক্যাল) দক্ষিণ মেরুর জলহাওয়াও নাকি একদিন ঐ রকম উষ্ণমণ্ডলীয় ছিল, অবশ্য কয়েক লক্ষ বৎসর আগে। এর প্রমাণস্বরূপ বলা হয় যে, যদিও কম পরিমাণে;—সেখানে কয়লা পাওয়া যায়। একদা নিশ্চয় সেখানে বড় বড় গাছ জন্মাতো যেজন্য উষ্ণমণ্ডলীয় জলহাওয়ার আবশ্যক এবং গাছ যদি না জন্মে থাকে, তবে কি করে কয়লা দক্ষিণ মেরুতে এল? কয়লা ছাড়া আরও কয়েকটি খনিজ পদার্থ যেমন সোণা, রুপো, তামা, মলিবডিনাম ইত্যাদি পাওয়া যায়।

বরফের রাজ্য দক্ষিণ মেরুর বিস্তৃতি কিন্তু বড় কম নয়। আকারে প্রায় ইয়োরোপের সমান, ছয় লক্ষ বর্গমাইল, তটরেখা ধরে হাঁটলে চোদ্দ হাজার মাইল হাঁটতে হবে। তবে এখনও পর্যন্ত দক্ষিণ মেরুর মাত্র কয়েকটি স্থান ব্যতীত মানচিত্র তৈরী হয়নি। মহাদেশ হিসেবে বিচার করলে দক্ষিণ মেরু সর্বোচ্চ, গড়ে এর উচ্চতা পাঁচ হাজার ফিট, সর্বোচ্চ মালভূমির উচ্চতা দশ হাজার ফিট আর সর্বোচ্চ পর্বতচূড়ার উচ্চতা তেরো হাজার ফিট। অত্যন্ত কৌতূহলের বিষয় এই যে, দক্ষিণ মেরুতে একটি সক্রিয় আগ্নেয়গিরি আছে, যার নাম মাউণ্ট এরিবাস।

মেরু প্রদেশে যখন গ্রীষ্মকাল, তখন সেখানকার উষ্ণতা (শৈত্য?) ০ ডিগ্রি, আর শীতের সময় ০ ডিগ্রি থেকেও আরও ৯০ ডিগ্রি পর্যন্ত নেমে যায়। দক্ষিণ মেরুতে তখন যে সমস্ত লোক কোন প্রয়োজনে থাকে, তারা তখন বরফের গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে আশ্রয় নেয় কেননা বায়রের শৈত্য যখন ৯০ ডিগ্রি, তখন বরফ ০ ডিগ্রি, অতএব কিছু গরম। দক্ষিণ মেরুর ঝড় বিখ্যাত, ঝড়ের গতি ২০০ শত মাইল পর্যন্ত পেঁৗছয়। ক্যাপ্টেন স্কট এই ঝড়ের কবলে পড়েই প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন।

দক্ষিণ মেরুতে পেঙ্গুইন ছাড়া আর কোন প্রাণী আছে বলে জানা নেই, জলে অবশ্য সীল ও তিমি আছে। গাছের ত' কোন চিহ্নই নেই; একেবারে বরফের মরুভূমি।

তবে এ হেন নিষ্প্রাণ রাজ্যে অভিযান কেন? শোনা যাচ্ছে, নয়টি জাতি বিরাট অভিযানের ব্যবস্থা করছেন, তার মধ্যে দুটি অভিযাত্রিক দল সেখানে পেঁৗছে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে; কিন্তু কেন? কিসের আশায়?

উত্তরস্বরূপ অনেকেই বলছেন যে, ইউরেনিয়াম এবং অন্যান্য খনিজ পদার্থের সন্ধানে এই অভিযাত্রিক দল সেখানে কাজ করবে। কিন্তু একমাত্র এই কারণ বিশ্বাসযোগ্য নয়; কারণ সেখানে ইউরেনিয়াম পাওয়া যেতে পারে, এমন কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি; তাছাড়া যে কোন খনিজ

মার্কিন অভিযাত্রিদলের সর্বাধিনায়ক রিয়ার-অ্যাডমিরাল বায়ার্ড

পদার্থ পাওয়া যাক না কেন, সেটি খনি থেকে তুলতে হলে আগে অন্তত চার হাজার ফিট গভীর বরফ কেটে তুলতে হবে, তারপর আরও কত খুঁড়ে অভীষ্ট জিনিস পাওয়া যাবে কে জানে? নিকটতম মানুষের আবাসস্থল থেকে বহুদূরে, বরফ, শীত ও ঝড়ের রাজ্যে খনিজ দ্রব্য তুলতে "মজুরী পোষাবে কি?" তবে ব্যবসায় সংক্রান্ত একটা কাজ সেখানে চলতে পারে, যার একচেটিয়া অধিকার মেরু প্রদেশের আছে, তা হ'ল তিমি শিকার। তিমি মাছ থেকে যে তেল পাওয়া যায়, তা থেকে মার্গারিন এবং গ্লিসারিন ইত্যাদি তৈরী হয় যার মূল্য কয়েক কোটি পাউণ্ড। অবশ্য তিমি শিকার যে ইচ্ছে সেই করতে পারে না, এর জন্য কয়েকটি জাতির মধ্যে চুক্তি আছে এবং বৎসরে কয়টি তিমি শিকার করা হবে, তার জন্য ভারপ্রাপ্ত কমিটির নির্দেশ মেনে চলতে হয়। দক্ষিণ মেরুতে যে "ব্লু হোয়েল" পাওয়া যায়, সেই-গুলি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, লম্বায় একশত ফিট এবং ওজনে দুশো টন পর্যন্ত হয়। বেচারী তিমিরা! যুদ্ধের কয়েক বছর তারা নিশ্চিন্ত ছিল, আবার তাদের মারবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

দক্ষিণ মেরুর যে কয়টি আবিষ্কৃত স্থান—যেমন, গ্রেহামল্যাণ্ড, ফকল্যাণ্ড আইল্যাণ্ড ডিপেণ্ডেন্সি, ভিক্টোরিয়া ল্যাণ্ড, সাউথ অর্কনি, সাউথ জর্জিয়া দ্বীপ, কোটস্‌ল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশগুলি যেখানে মানুষের যাওয়া-আসা আছে, সে সব দেশগুলির ওপর অনেকেরই দাবী আছে, যেমন ইংলণ্ড, নিউজিলাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, আর্জেণ্টিনা, চিলি ইত্যাদি। কয়েকটি স্থানে আবার ব্রিটেনের ডাক টিকিটের প্রচলন আছে। যাই হোক এখন ঐ সব দেশগুলি এবং মার্কিন যুক্তরাজ্য, সুইডেন, নরওয়ে এবং রাশিয়া সকলেই দক্ষিণ মেরুতে অভিযাত্রিক দল প্রেরণ করছেন।

এই সমস্ত অভিযাত্রিক দলের সঙ্গে অনেক জন বৈজ্ঞানিকও আছেন, কেউ আবহাওয়া-তত্ত্ববিদ্‌, কেউ প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌, কেউ ভূতত্ত্ববিদ অবার কেউ আর কিছু, তাঁরা মেরুপ্রদেশে নিজ নিজ বিষয়ে নানারকম বৈজ্ঞানিক গবেষণা করবেন, তার ফল অবশ্য একদা প্রকাশ পাবে। দক্ষিণ মেরুতে একটি উপত্যকা আছে, যেখানে বরফ নেই এর কারণ অনুসন্ধান করবার জন্য সুইডেনের একটি দল সেখানে বর্তমান বৎসরের শেষে যাবে। এই বরফহীন উপত্যকাটি বিমান থেকে আবিষ্কার করেছিল একটি জার্মান দল ১৯৪২ সালে।

দক্ষিণ মেরু একটি ঝড়ের কেন্দ্র। দক্ষিণ অ্যাটলাণ্টিক ও দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের আবহাওয়া দক্ষিণ মেরুর ওপর নির্ভর করে,
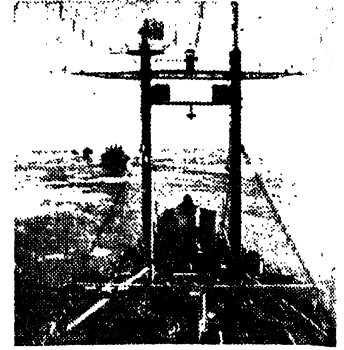
দক্ষিণ মেরুতে বরফের মধ্য দিয়ে মার্কিন অভিযাত্রিদলের জাহাজগুলি অগ্রসর হচ্ছে

অভিযাত্রীদলের ব্যবহৃত একটি হেলিকপ্টার

অতএব যদি দক্ষিণ মেরুতে কয়েকটি আবহাওয়ার কেন্দ্র বসানো যায়, তাহলে উপরোক্ত সমুদ্র অঞ্চলের নাবিকদের সঠিক আবহাওয়া জানিয়ে দিতে পারা যাবে।

অনেকের মতে আবার দক্ষিণ মেরু নাকি অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর স্থান, বহু রোগের জীবাণু অত শীতে নাকি বাঁচতে পারে না। পূর্বে অভিযাত্রিক দলের সঙ্গে যে সকল ক্ষয়রোগী দক্ষিণ মেরুতে গিয়েছিল, তারা নাকি আশ্চর্য রকম তাড়াতাড়ি সেরে উঠেছে।

মার্কিন যুক্তরাজ্য কর্তৃক প্রেরিত অভিযাত্রিক দলটি দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছে গিয়ে তাদের কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে। এত বড় দল মেরু অভিযানে কখনও যায়নি, বলতে গেলে বলতে গেলে কেন সত্যসত্যই তারা সেখানে একটি সৈন্যদল প্রেরণ করেছে। এই দলের নাম "টাস্ক ফোর্স ৬৮।" সমগ্র দলটিতে আছে ১৩টি জাহাজ, তিনটি প্রধান দলে বিভক্ত হয়ে। তার মধ্যে বিমানবাহী জাহাজ, ডুবোজাহাজ, বরফ-ভাঙা জাহাজ, তৈলবাহী, মালবাহী এবং আরও কয়েক প্রকার জাহাজ আছে। এ ছাড়া হেলি-কপ্টার ও বিমান আছে। বিমান সাহায্যে

...রু প্রদেশের মানচিত্র প্রস্তুত করবার চেষ্টা করা হবে এবং বিমান থেকে ম্যাগনেটোমিটার নামক যন্ত্র ঝুলিয়ে জমির অভ্যন্তরের চুম্বকত্ব পরীক্ষা করে খনিজ পদার্থেরও সন্ধান করা হবে। সমস্ত দলটিতে চার হাজার লোক আছে, তার মধ্যে ২৫ জন কৃতবিদ্য বৈজ্ঞানিক এবং প্রায় ৩০০ জন সহকারী। এই দলটি মেরু প্রদেশে চার থেকে পাঁচ মাস পর্যন্ত থাকবে। অভিযাত্রিক বাহিনীর কর্ণধার নিযুক্ত হয়েছেন রিয়ার অ্যাডমিরাল রিচার্ড এচ্ ক্রুজেন; কিন্তু সর্বাধিনায়ক হ'লেন রিয়ার অ্যাডমিরাল রিচার্ড ই বায়ার্ড—যিনি দক্ষিণ মেরুতে আরও তিনবার গিয়েছিলেন।

এই অভিযাত্রী দলের মুখ্য উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, মেরুপ্রদেশে সৈন্যবাহিনী ও তাদের সাজসরঞ্জাম পরীক্ষা করা এবং তাদের সেইমত শিক্ষা দেওয়া। নৌ-বিদ্যার এমন কৌশল আয়ত্ত করা, যার দ্বারা অনুরূপ স্থানে নৌ-ঘাঁটি স্থাপন করা যায়। ভূতত্ত্ব, ভৌগোলিক ও আবহাওয়াতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করা।

দেখা যাক্, এই সমস্ত অভিযানের ফলাফল কি হয়। পরমাণু-শক্তি সাহায্যে মেরুপ্রদেশের আবহাওয়ার পরিবর্তনের কোন চেষ্টা করা হবে কিনা, তাও লক্ষণীয়।

নীরবতার প্রান্তে

(একাঙ্কিকা)

এন্টার ই গলরেথ্

(ওয়াশিংটন সহরে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুলাই লেখকের জন্ম। ওয়াশিংটন নাট্য-সংঘের সভ্যদের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতায় এই নাটিকাটি শ্রেষ্ঠ ব'লে গণ্য হয়।)

দৃশ্যপট : সুদূর মেরুর একটি দ্বীপে একটি ছোট্ট কাঠের বাড়ি। পিছনে সদর দরজা, জানালা নেই। ডান পাশে বাড়ির মধ্যে যাবার দরজা। একটি আরাম চেয়ার আছে, তা ছাড়া দুটি কাঠের বাক্স চেয়ার ও আলমারি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ঘরের মাঝখানে একটি টেবিল। বাঁদিকে একটি স্টোভ।

কোল্ টেবিলের সামনে ব'সে ঘরের আলোয় তাস নাড়াচাড়া করছে। 'ম্যাকরেডি' তার পিছনে পায়চারিতে ব্যস্ত। দুজনেরই পরণে ভারি সোয়েটার আর বুট, দেয়ালে ঝুলছে ফারকোট আর দস্তানা।

পর্দা উঠলে এক মিনিট সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ।

* * * * *

ম্যাকরেডি। ঈশ্বরের দোহাই, কোল, একটা কথা বলো। এই থমথমে ভাবটা কেটে যাক। এবার শীতকালে আমার দেশে ফিরে যেতে বড় ইচ্ছে করছে...তোমার করছে না?

কোল। ইংলণ্ড আর আমার দেশ নয়...না, আমি এই বরফঝড়ের বাসায় আরো কবছর থাকব, সব দেখব আমি।

ম্যাকরেডি। আমাদের জিনিসপত্র নিয়ে আবার নৌকো আসতে দেরী আছে।

কোল। আগামী গ্রীষ্মকালের মধ্যে না এলেও আমাদের চলবে, যথেষ্টই আছে আপাততঃ।

ম্যাকরেডি। যদি নৌকো আসে, তবে আমি সেই সঙ্গে ফিরে যাব; তুমিও যাবে।

কোল। অসম্ভব।

ম্যাকরেডি। এ শীতকালটা আমাদের এখানে থাকা না থাকায় কিছুই আসে যায় না। কেউ কিছু বলবে না।

কোল। বেশ তুমি তবে যাও। আমার দিন কাটানোর জন্যে অনেক তামাক রইলো।

ম্যাকরেডি। তোমায় একা ফেলে যাব? ধরো, যদি তোমার অসুখ করে?

কোল। গত আট বছরের মধ্যে আমার অসুখ হয়নি।

ম্যাকরেডি। কিন্তু, আমাদের ফিরে যাওয়া এবার দরকার। সভ্য দেশের মুখ আবার না দেখলে শিগগিরই আমরা এক জোড়া বুনো মানুষ ব'নে যাবে।

কোল। [ঈষৎ কঠিন স্বরে] সামান্য শীত-গ্রীষ্মের জন্যে, অথবা লোকালয় থেকে ছশো মাইল দূরে থাকার দরুণ যারা মুষড়ে পড়ে, সে দলের লোক আমরা নই, এ তুমিও জানো, আমিও জানি।

ম্যাকরেডি [অপ্রতিভ] এই চুপচাপ ভাবটা যে অসহ্য, কোল!

কোল। ওতে আমার কিছু হয় না। এ আমাকে বহুদিন ধ'রে সইতে হয়েছে।

ম্যাকরেডি। আমারও তো দুবছর হ'য়ে গেলো, কিন্তু আমার আর ভালো লাগছে না। আমি শহরের মুখ দেখতে চাই—পুরুষ নারী শিশুদের মুখ। ম্যান্‌চেস্টারে আমার দুই ভগ্নে আছে—একটি ন' বছরের, আরেকটির বয়েস বারো। তাদের আজ রাতে দেখার জন্যে আমি জগৎটাও দিয়ে দিতে পারি। তুমি কী অদ্ভুত—ফিরে যেতে চাও না!

কোল। [দ্বিধান্বিত] ম্যাক, আমার ফেরার উপায় নেই।

ম্যাকরেডি। [সবিস্ময়ে] যাঃ! আমি বিশ্বাস করি না।

কোল। তুমি কি 'ডার্টন অভিযানের' নাম শুনেছো?

ম্যাকরেডি। শুনেছি ব'লে মনে হচ্ছে—হ্যাঁ, স্যর গিলবার্ট ডার্টন—সে তো বছর দশেক আগে। তারা তো আর ফিরতে পারেনি—তাই না?

কোল। না, দলটা আর ফেরেনি। আমিই ডার্টন।

ম্যাকরেডি। স্যর গিলবার্ট ডার্টন!

কোল। হ্যাঁ। আমার জাহাজ হারিয়ে গিয়েছিল। সে গেলো প্রথম বিপদ। ছোট্ট নৌকোগুলি বরফ ঠেলে যেতে পারলো না, আর আমাদের পাঁচজনে সাহায্যের জন্যে বেরোবার আগেই খাবার এলো ফুরিয়ে। কয়েকদিন আমরা এগোলাম, তারপরে এলো বরফ ঝড়। সে কালকের ঝড়ের দশগুণ। খাবার সামান্য, আমরাও এত দুর্বল হয়ে পড়লাম যে, নৌকো ব'য়ে যাওয়াও অসম্ভব হ'য়ে পড়লো। একদিন এক ঝড়ে সেটা এই দ্বীপের গায়ে আছড়ে পড়লো। আমিই বেঁচে গেলাম, আর কেউ বাঁচলো না, লটার তখন এখানে ছিলো, সে আমাকে রাখলো। সে জানতো না আমি কে। ছ মাস বাদে একটা তিমিশিকারী জাহাজ লাগলো, শুনলাম আমাদের জন্যে একদল এসেছিলো, কিন্তু বড্ড দেরি ক'রে। সেই জাহাজে বুয়েনোস আয়ার্স-এর এক হাসপাতালে গেলাম। কয়েক মাস পরে যখন সেরে উঠেছি, জানলাম ডার্টন অভিযান সম্পূর্ণ নিষ্ফল ব'লে ধ'রে নেওয়া হয়েছে, আর আমার জায়গাও গেছে দখল হ'য়ে—আমি বেঁচেও এক রকম মরে আছি।

ম্যাকরেডি। তার মানে?

কোল। লণ্ডনের এক খবরের কাগজে পড়লাম লেডি ডার্টনের বিয়ে হবে ক্যারুদার্স নামে একজনের সঙ্গে।

ম্যাকরেডি। আর তুমি কিছু করলে না?

কোল। কেউ জানতেও পারলো না। আমি 'আর্নস্ট কোল' নাম নিয়ে এখানে বসত গাড়বার জন্যে ফিরে এলাম।

ম্যাকরেডি। শেষে এই হোলো?

কোল। ঠিকই হয়েছে। সুন্দর একটি মেয়েকে

আমি তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখের দিনগুলি নির্জনে অপেক্ষা ক'রে কাটাতে বলেছিলাম বুকের ভেতর সব সময় একটা আশঙ্কা নিয়ে। অভিযাত্রিকের স্ত্রীদের এমনিই দশা। আর আমার কোনো অধিকার ছিলো না ফিরে এসে তার সুখের মাঝখানে বাধা হ'য়ে দাঁড়াবার। তাই আমি মনস্থির ক'রে ফেললাম, তবে নিজের দাবী ছাড়তে মনের সঙ্গে অনেক লড়াই করতে হয়েছে।

ম্যাকেরিড। কোনো ছেলেপুলে ছিলো?

কোল। হ্যাঁ, একটি ছেলে। গতবার তাকে ষোলো বছরে পড়তে দেখে এসেছিলাম। সামনের অভিযানে তাকে আমার সঙ্গে আনবার ইচ্ছে ছিলো। এত বছর বিচ্ছেদের দুঃখ সে কয়মাসের সান্নিধ্যে শুধরে যেতো। আশা ছিলো, সেও পর্যটক হ'য়ে আমাকে সাহায্য করবে। কিন্তু বাধা হোলো তার মায়ের সুখ—আমি তার মাঝে পড়তে পারলাম না।...ওঃ, তাকে দেখতে আমার কী রকম ইচ্ছে হয়।

ম্যাকরেডি। তারপরে তুমি তাকে আর দেখোনি?

কোল। না, আমি তো আর ফিরতে পারলাম না। ফিরলে আমাকে চিনে ফেলা সম্ভব হোতো। সেই ভয়েই আমি এখানে চ'লে এলাম। লটার চ'লে গিয়েছিলো, আমিই এ ঘাঁটিতে তার জায়গা নিলাম।

ম্যাকরেডি। সব ভুল হয়েছে কোল! তুমি এত বড় একজন লোক, নিজের জীবনকে এভাবে নষ্ট করতে পারো না! তুমি ভুল করেছো।

কোল। আর কিছুই করবার ছিলো না। আমার যে স্মৃতি তাদের মনে রইলো, তাতে তাদের লজ্জার কিছু নেই...এখন আমি ইংলণ্ডের কথা খুব কমই ভাবি। এই সুদূরত্ব, এই নীরবতা আমাকে সব ভুলিয়ে রাখে। আমি কেবল ভাবি সেই কাজের কথা, যে কাজ ছিলো আমার প্রাণ, যে কাজ আজও অন্যে চালাচ্ছে—সে ভাবনা ক্ষুধাতৃষ্ণার চেয়েও বেশি।

ম্যাকরেডি। কালে সবই বদলে যায়। ইংলণ্ডে হয় তো সব ঘটনা এখন অন্য রকম হয়ে গিয়েছে। তোমার ফিরবার হয়তো কোনো পথ থাকতে পারে। যদি না থাকে পৃথিবী বিশাল —আমেরিকায় তুমি তোমার কাজ করতে পারো!

কোল। সে কাজ আর আমি নিতে পারি না। যখনই হোক, এমন লোকের সঙ্গে আমার দেখা হবে, যে আমাকে চিনে ফেলবেই।

ম্যাকরেডি। যদি আমার সঙ্গে তুমি ফিরতে?

কোল। আমার জন্যে ভেবো না ম্যাক! কোনো লাভ নেই! আমার একমাত্র স্থান এইখানে, এই চিরতুহিনের রাজ্য জয়ের ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষা প্রাণের মধ্যে নিয়ে। একদিন জানবো রেমেনসেন বা কুর্সেল হয়তো সে অভিযান সমাপ্ত করেছে।

ম্যাকরেডি। এখান থেকে তোমর একবার বাইরে যাওয়া উচিত।

কোল। (হতাশভাবে) উচিত ছিলো আমার দশ বছর আগে সঙ্গীদের সঙ্গে ডুবে মরা।

ম্যাকরেডি। এই দেখো। এই হতচ্ছাড়া নিস্তব্ধতাই তোমায় এ রকম কথা বলায়।

কোল। আবার এই নিস্তব্ধতাই সব সময় আমায় ফিরে ফিরে ডাকে।

(ম্যাকরেডি আর যুক্তি পেলো না। কিছুক্ষণ সব চুপ। ম্যাকরেডি একখানা বই নিয়ে আলোর তলায় এসে পড়তে লাগলো।)

ম্যাকরেডি। আমার বোধ হয় ওরা এইবারে জাহাজ পাঠাবে। ইদানীং জাহাজ খুব কমই এসেছে। বড় অদ্ভুত সময়, না?

কোল। এরকম সময় বহুদিনের মধ্যে পড়েনি। আমি কখনো এ রকম দেখিনি। দু সপ্তাহ আগে আমরা জ'মে যেতে পারতাম।

ম্যাকরেডি। দক্ষিণ এখন সব বেশ শক্ত হয়ে এসেছে বোধ হয়। কালকের ঝড়টা শীতের ঝড়ের মতই তো মনে হোলো!

কোল। তখন এরকম সময় থাকলে আমি সফল হ'তে পারতাম; এখানের হালচাল আমার জানা।...কী বিরাট স্বপ্ন—ঐ স্তব্ধতার মধ্য দিয়ে পৃথিবীর প্রান্তসীমা পার হওয়া! শুধু এই বছরেই ঠিক লোকে পারতে পারে। [বাইরে ডার্টনের গলার শব্দ] শুনছেন? কে আছেন?

কোল। ও কী?

ম্যাকরেডি। [দরজা খুলে] দুজন। একজন হয় জমে গেছে, নয়তো ব্যথা পেয়েছে।

[দোর গোড়ায় ডার্টন ও জনসন দেখা দিলো। দুজনেই ত্রিশের নীচে। ডার্টনের জামা কাপড় ভালো অবস্থাতেই আছে, লোমের অদ্ভুত পোষাকেও তাকে সুন্দর দেখাচ্ছে। জনসন ডার্টনের কাঁধে হাত দিয়ে আছে, ডার্টন তাকে ব'য়ে এনেছে বললেই হয়। তার কপালে একটা রক্তাক্ত ক্ষত, তাকে দেখতেও অনেকটা জীর্ণ।]

কোল। কী হয়েছে?

ডার্টন। বেশি কিছু নয়। ওদিকের মাটিটা তেমন ভালো নয়, প'ড়ে গিয়ে কেটেছে।

[ম্যাকরেডি জনসনকে ধ'রে শুইয়ে দিলো]

কোল। [অন্য ঘরে যেতে যেতে] কোনো ভয় নেই, আমরা সারিয়ে দিচ্ছি।

[ডার্টন জনসনের টুপি খুলতে জনসন আর্তনাদ ক'রে উঠলো]

ডার্টন। লাগলো বন্ধু? আচ্ছা এবার ঠিক আছে?

ম্যাকরেডি। তোমার সঙ্গীকে কোলের হাতে ছেড়ে দিলেই ভালো। ও বেশ ভালো ডাক্ত...

কোল [একটা বাক্স ও ব্যাণ্ডেজ নিয়ে ফি... এলো] আমি এই ব্যাণ্ডেজটা লাগিয়ে দি... গরম কিছু খেয়ে ফেলো।

[ডার্টন দস্তানা খুললো ও ম্যাকরে... তাকে এক পেয়ালা গরম সুপ এনে দি... স্টোভের ওপর থেকে]

ডার্টন। ধন্যবাদ, অশেষ ধন্যবাদ। [করমর্দ...]

ম্যাকরেডি। কী করে ওখানে এসে পড়... তোমরা?

ডার্টন। আমি এসেছি গত বছর যে দলটা... ফেলে গিয়েছিলাম, তাদের ফিরিয়ে নিতে... জনসন তাদেরই একজন। কিন্তু জাহাজ অতদ... আসতে পারে না, কাজেই নৌকোয় ক'রে দশজ... গেলাম। সবাইকেই পেলাম, কিন্তু কালকে... ঝড়ে জাহাজ থেকে দূরে দ্বীপের উল্টোদি... গিয়ে পড়লাম। এখন অন্যেরা জাহাজ এ... তুলে না নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত তাঁবু গেড়ে ব'... থাকবে।

কোল। এর নাম পার্কার দ্বীপ।

ডার্টন। হ্যাঁ! আমরা জানতাম না এখা... লোক থাকে। আপনাদের আলো দেখে জনস... এদিকে এলো। দুর্ঘটনার আগেই ও খু... ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলো। গত বছর থেকে... ওদের খুব খারাপ সময় গেছে। আমরা খু... শীগগির তো পৌঁছোতে পারিনি।...আপনার এখানে একেবারে একা?

ম্যাকরেডি। পেঙ্গুইন আর তিমির তে... আনবার জন্যে কোম্পানী মাঝে মাঝে একজ... লোক পাঠায়। তখন ছাড়া আর সব সম... আমরা একলাই। আর কোন জাহাজ আসেনি...

ডার্টন। অনেকদিন আছেন?

ম্যাকরেডি। কোল আছে আট বছর আমি মাত্র দু'বছর।

ডার্টন। এটা দক্ষিণ মেরুর প্রান্তসীমা থেকে কত দূরে?

ম্যাকরেডি। এইটাই ঠিক প্রান্তসীমা।

ডার্টন। (নিজের মনে) নীরবতার প্রান্ত...

কোল। (তার কাছে এসে) আমিও ঐ নাম দিয়েছি—কী অন্তহীন এই ধবল-স্তব্ধতা!

ডার্টন। সত্যিই, কুমেরুর কথা কেউ ভুলতে পারে না—আগুনবরণ সূর্যোদয়, নিশীথ রাতে তুষারের ওপর নীল জ্যোৎস্না—মেরু-জ্যোতির আলোকপট—যে দেখবে, সে আর ভুলবে না।

কোল। এই নির্জনতাই তাকে বারে বারে এখানে ডেকে আনে। জীবনের কোন কোলাহল এখানে নেই। কেবল চিরপ্রতীক্ষমান প্রকৃতির অনন্ত শান্তি! মনে হয়, সব সময়ে আমরা যেন সেই উত্তরের কাছে এসেছি।

ম্যাকরেডি। কিসের উত্তর?

কোল (ডার্টনকে)। ম্যাকরেডি প্রেস-বিটেরিয়ান।

ম্যাকরেডি। তার সংগে এর কি সম্বন্ধ?

কোল। কিছুই না।

ডার্টন (স্টোভের দিকে তাকিয়ে হেসে টুপি তুলে কোলকে)। আপনি কি এর ওপারেও গেয়েছেন? [কোল ইতস্তত, জনসন ন'ড়ে চ'ড়ে উঠলো।]

জনসন। ডার্টন আছো? ডার্টন!

[কোল চমকে ওঠে, মুখের ভাবে ভয় ও বিস্ময়। তারপর ডার্টন সেদিকে এগিয়ে গেলে স বুঝতে পারলো।]

ডার্টন। শুয়ে পড়ো জনসন। সব ঠিক আছে।

জনসন। আমার মনে হচ্ছিলো, যেন পৃথিবীতে ফিরে গেছি। তুমি যেন আমাদের খুঁজেতে আসোনি।

ডার্টন। না, না, এই তো আমি। ঠাণ্ডা লাগছে?

জনসন। জমে গেছি প্রায়। কিছু খেতে দিতে পারো না?

[ম্যাকরেডি একটা পেয়ালা ভরলো]

ডার্টন। হ্যাঁ, এখন তুমি যত ইচ্ছে খেতে পারো। কেবল প্রথমে একটু সাবধান হয়েছিলাম, বুঝলে না?

[জনসনকে পেয়ালাটা দিলো। সে শুধু ডার্টনের হাত চেপে ধরলো]

জনসন। তাহলে তুমি এসেছো, ডার্টন!

ডার্টন। হ্যাঁ, এই তো আমি! কি পাগল; এখন খাও কিছু।

[কোল আলো থেকে দূরে জানলার বাইরে তাকিয়ে থাকে। তার স্বর বিকৃত হ'য়ে গেছে, কষ্ট ক'রে স্বাভাবিক করতে হচ্ছে।]

কোল। তোমরা কি মেরুতে পেঁছোবার চেষ্টা করছিলে?

ডার্টন। হ্যাঁ, এই চতুর্থ চেষ্টা।

কোল। তোমাদের?

ডার্টন। না, আমার বাবা প্রথম অভিযান করেছিলেন। আপনারা বোধ হয় ডার্টন অভিযানের নাম শুনেছেন?—সে আজ দশ বছর হোলো।

ম্যাকরেডি (তাড়াতাড়ি)। হ্যাঁ, আমি শুনেছি।

ডার্টন। তিনি করতে পারেন নি, ফিরেও আসেন নি। তাঁর পরে আরও দুজন চেষ্টা করেছেন—রেমেনসেন আর কুর্সেল।

কোল। তাঁরা—

ডার্টন। তাঁদেরও ফিরে আসতে হয়েছিল। আমাদের এবার বেশ সুসময় ও সৌভাগ্য বলতে হবে। কারণ, আমরা পেরেছি।

কোল। মানে তোমরা—

ডার্টন। গত মাসে আমরা 'রস'সমুদ্রে গিয়ে পড়লাম। জনসনদের দল থেকে আমরা আলাদা হ'য়ে গিয়েছিলাম, ওদের ধরবার জন্যে তাড়াহুড়ো করতে হোলো। ভেবেছিলাম, কিছু অনিষ্ট হয়েছে, হোলোও তাই। গিয়ে দেখি, ওদের জাহাজ বরফে আটকেছে এক সপ্তাহ ধরে, তারপর চুরমার হ'য়ে গেছে।

কোল। তোমরা তো তবে প্রায় নির্বিঘ্নেই এসেছো।

ডার্টন। তা বটে। আমাদের প্রত্যেকেরই ভাগ্য ভালো।

কোল। [এগিয়ে এসে তার কাঁধে হাত দিতে গিয়ে থেমে গেলো] চমৎকার!

ডার্টন। ধন্যবাদ।

কোল। তুমি আজ জয়ী। এই নিস্তব্ধ ভীষণতার দুর্গের মধ্য হতে তুমি নিরাপদে বেরিয়ে এসেছো।

ম্যাকরেডি। কি অদ্ভুত!

ডার্টন (অন্য অর্থ ক'রে) অদ্ভুতই। যারা যুগে যুগে এর সংগে মুখোমুখি যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছে, তাদের আত্মাই আমাকে ডেকে এনেছে এত দূরে। মনে হচ্ছে আজ আমি বাবার অসমাপ্ত কাজ শেষ করেছি। [দূরে গোলমাল] ঐ......ওরা পথ খুঁজে পেয়েছে। এবারে আমাকে যেতে হবে। জনসন বোধ হয় হাঁটতে পারবে না।

ম্যাকরেডি। ওকে এখানে একটু রেখে যাও না।

ডার্টন। ধন্যবাদ! ওর একটু ঘুম দরকার। আমি ব্যস্ত থাকব, আসতে তো পারব না, আধ ঘণ্টার মধ্যে আর একজনকে পাঠিয়ে দেব।

ম্যাকরেডি। দলটাকে দেখতে পেলে আমার আনন্দ হত। জনসনকে নিয়ে আমি যেতে পারি না?

কোল। আর তোমাদের জাহাজে আর একজন লোকের ব্যবস্থা—

ডার্টন—আপনি? সানন্দে নিয়ে যাব।

কোল। না, ম্যাকরেডি কোম্পানীর জাহাজে ফিরে যেতে চাইছিলো। আমি এখানেই থাকব।

ডার্টন (ম্যাকরেডিকে)। বেশ আপনার জন্যে অপেক্ষা করব। (কোলকে) বিদায় মিঃ কোল।

কোল। বিদায় বৎস। [দরজায় দাঁড়িয়ে তার যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে]।

ম্যাকরেডি। তোমার ছেলে?

কোল। হ্যাঁ। আমার কাজ সারা করেছে আমারই ছেলে।

ম্যাকরেডি। ওঃ, সব ভুল করেছো। কেন—[কোল শোনে না]

কোল। (টেবিলের ধারে ব'সে ধীরে ধীরে তাসের প্যাকেটটা তুলে নিয়ে) মজার নয় ম্যাক? ও আমায় ডাকলো 'মিঃ কোল।'

[পটক্ষেপ]

অনুবাদক—শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়

প্রপাগান্ডা

গত সংখ্যায় আমি গুজব সম্বন্ধে লিখেছি। গুজব যে মানুষকে কিভাবে জব্দ করে, তা আপনারা আগেও দেখেছেন, এখনও দেখছেন। কলকাতায় যে নতুন করে দাঙ্গা শুরু হয়েছে সুরাবর্দী সাহেব বলেছেন সেটাও মিথ্যে জনরবের ফলেই হয়েছে। একটা কমেডি অফ এরার থেকে নাকি এই ট্রাজেডির উৎপত্তি হয়েছে। সুরাবর্দী সাহেব যে নিজেই গুজবাক্রান্ত হয়েছেন, এই বিবৃতিটি তার প্রমাণ; কারণ ঘটনা সম্বন্ধে তাঁর এই বিশ্লেষণ বিশ্বাস করা কঠিন। আইন এবং শৃংখলা রক্ষার ভার যাঁর ওপরে ন্যস্ত, তিনি নিজেই যদি বে-আইনী গুজবের শৃংখলে আটকা পড়েন, তবে কে আমাদের রক্ষা করবে ?

বে-আইনী খবর রটনাকেই বলে গুজব, আর আইন বাঁচিয়ে রটনা করলে সেটা হয় প্রপাগান্ডা। সত্য-মিথ্যার বিচারে দুটোই সমান, দুটোই অতিশয়োক্তি। বরং গুজবের মধ্যে যদিবা সত্যের অংশ কিছুটা থাকে, প্রপাগান্ডা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্জলা মিথ্যা। গুজব এবং প্রপাগান্ডা দুইয়েরই মূলধন মানুষের credulity, বারম্বার একটা কথা শুনে শুনে শেষ পর্যন্ত লোকে বিশ্বাস করবেই। দুটোর মধ্যে অবশ্যই খানিকটা তফাৎ আছে। গুজব রটিয়ে যে তৃপ্তি পাওয়া যায়, সেটা কেবলমাত্র মানসিক। আর প্রপাগান্ডা থেকে যে লাভ বা তৃপ্তি, সেটা আর্থিক, অন্তত স্বার্থগত তো বটেই। প্রপাগান্ডার মধ্যে প্রাপ্য গন্ডাটাই বড় কথা।

গুজব এবং বিজ্ঞাপনী ইস্তাহার—দুটোর মধ্যেই ক্ষীরের চাইতে অম্বুর প্রাধান্য। বিনা বিচারে যদি বিশ্বাস করেন তো শেষ পর্যন্ত ঠকতে হবেই। বিজ্ঞাপনদৃষ্টে ওষুধ খেয়ে কোন স্থূলাঙ্গিনী কৃশতনু হয়েছেন বলে আমার জানা নেই। আর বিজ্ঞাপনের বহর দেখে যাঁরা কেশ তৈল ব্যবহার করেন, তাঁদের মাথায় শেষ পর্যন্ত কেশ থাকে কিনা, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। তবু তেমন বিজ্ঞাপন দেখলে লোভ সামলানো কঠিন। অলকানন্দ তেল মাখবার পর থেকে চুল সামলানো এক দায় হয়েছে, বোধ করি স্বয়ং দশভুজার পক্ষেও দুঃসাধ্য হত। এমন কথা শুনবার পরে আজানুলম্বিত মেঘবরণ কেশ রাজকন্যা বোধ হয় স্থির থাকতে পারেন না। বর্ণবিন্যাসের জন্য যাঁরা স্নো-পাউডার ব্যবহার করেন, তাঁদের সত্যি সত্যি বর্ণসৌষ্ঠব বৃদ্ধি হয় কিনা, আমি জানি না। বিধাতা নিজ হাতে জন্ম মুহূর্তে যাদের মুখে কালি মাখিয়ে দিয়েছেন, তারা বোধ করি, প্রহসনটাকে ষোল আনা পূর্ণ করবার জন্যেই স্বহস্তে নিজ মুখে চূণ মাখে।

লোকে বলে এটা বিজ্ঞানের যুগ, আমি বলি বিজ্ঞাপনের যুগ। কলকাতা শহরের অষ্টেপৃষ্ঠে ললাটে বিজ্ঞাপনের ছাপ। ট্রামে, বাসে, সিনেমায়, দেয়ালের গায়ে অসংখ্য দ্রব্যের নামাবলি গায়ে জড়িয়ে কলকাতা শহর দাঁড়িয়ে আছে। শহরটাকে যদি মানুষের আকৃতিতে কল্পনা করা যেত, তবে তার চেহারা বোধ করি হত চিন্তামণি দাঁতের মাজনওয়ালার মতো। পাইড পাইপারের ন্যায় নানা বর্ণের জামা গায়ে তারস্বরে ছড়া কেটে নেচে-কুঁদে গান করছে। শহরময় বিজ্ঞাপনের নিঃশব্দ কথাগুলি হঠাৎ যদি সশব্দ হয়ে ওঠে, তবে তার অট্টরোলে শহরের আর সব শব্দ ছাপিয়ে যাবে। কাকে ছেড়ে তখন কার কথা শুনব? টাওয়ার অফ ব্যাবেল আর কাকে বলে! এ সম্পর্কে আর একটা কথাও মনে হচ্ছে। যে দেশে আদ্দেক লোক খেতে-পরতে পায় না, নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসও সংগ্রহ করতে পারে না, সে দেশে অনাবশ্যক বিলাস দ্রব্যের এই বিপুল আয়োজন এবং বিজ্ঞাপন কেমন যেন দৃষ্টিকটু ঠেকে।

তথাপি একথা স্বীকার করতেই হবে যে, বিজ্ঞাপন এ-যুগের সবচেয়ে বড় আর্ট। একযাত্রায় মানুষের মন এবং ধন হরণ করবার এইটিই শ্রেষ্ঠ উপায়। কেউ যদি বলেন, ধনে-প্রাণে মারবার চেষ্টা, তবে সেটা অবশ্যই বিজ্ঞাপন-বিরোধী প্রপাগান্ডা হয়ে দাঁড়াবে। আমি বিজ্ঞাপনবিরোধী নই, বরং আমি বিজ্ঞাপন-শিল্পের একজন সমঝদার। মাসিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের পাতা ওল্টানো আমার অভ্যেস, অবসর বিনোদনের পক্ষে চমৎকার উপায়। অনেক লোককে অতিশয় মনোযোগের সঙ্গে গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার বিজ্ঞাপন পড়তে দেখেছি। ইদানীং বাঙলা দেশে বিজ্ঞাপন শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। মাসিক পত্রিকার পাতা ওলটালে চমৎকার সব বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে। আভ্যন্তরীণ বিষয়বস্তুর চাইতে বাহি[...] বিজ্ঞাপন কিছুমাত্র কম চিত্তাকর্ষক নয়। [...] কারণ এসব বিজ্ঞাপন কৃতী সাহিত্যিকদের লে[...] বিজ্ঞাপনের ছবি কুশলী শিল্পীর হাতে আঁ[...] ব্যবসায়ীরা সাহিত্য এবং শিল্পকে নিজে[...] বাহন করেছেন। এটি সুলক্ষণ। সাধা[...] বিজ্ঞাপনের ভেতর দিয়ে জনসাধারণের রু[...] মার্জিত হবে। কেউ যেন মনে না করেন [...] সাহিতিক এবং শিল্পীরা ব্যবসায়ীদের কা[...] আত্মবিক্রয় করছেন। বরং ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপন হবে জনশিক্ষার বাহন।

আজকাল বহু বিজ্ঞাপনের মধ্যেই সাহিত্য[...] প্রসাদগুণ দেখতে পাওয়া যায়। বাঙলা দে[...] ঘৃতের বিকারের সঙ্গে যকৃতের বিকার [...] দিয়েছে—এ ধরণের কথা আমাদের স্বাস্থ্য বিষয়[...] প্রবন্ধে কক্ষনো পাবেন না। বাঙলা দেশে বহু প্রচারিত কোন একটি ঘি-ব্যবসায়ে[...] বিজ্ঞাপনেই পাবেন, কারণ সে বিজ্ঞাপনে[...] ভাষাটা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের লেখা। সে ঘি আপনারা, সবাই খেয়েছেন, আমিও খেয়েছি সেই ঘির লুচি বাসি হলেও আমি খেয়ে থাকি। ভেজাল-প্লাবিত বাজারে এই ঘি অমৃত সমান—এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। কিন্তু তাই বলে উক্ত ঘৃত যকৃতের বিকৃতি রোধ করবে, এমন কথা রবীন্দ্রনাথের সার্টিফিকেট সত্ত্বেও বিশ্বাস করব না। কারণ এ দুর্দিনে যকৃতের বিকৃতি শোধন করা কেবলমাত্র আপন সুকৃতির উপরে নির্ভর করে। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। বিজ্ঞাপনে খানিকটা অতিশয়োক্তি থাকবেই। কবিদের যেমন poetic license, ব্যবসায়ীদের অত্যুক্তিটা তেমনি traders' license. কাজল কালির কালিমা বিদেশী কোনো কালির চাইতে কম নয়। খুব সত্যি কথা। কিন্তু সেই কালিমার সঙ্গে যদি কিছুমাত্র জড়িমা থাকে, তবে কিন্তু কালির কৌলিন্য অবশ্যই নষ্ট হবে।

বিলিতি বিজ্ঞাপনের কলকৌশল দেখে আগে খুব হিংসে হত। সে তুলনায় আমাদের বিজ্ঞাপন ছিল অত্যন্ত স্থূল এবং শ্রীহীন। অর্জুনের গান্ডীবের পাশে ভীমের গদার মতো। এখন আর আমার মনে কোনো খেদ নেই। শুক-শারীর দ্বন্দ্ব ছিল আমাদের কাব্যের কথা। সুখ এবং শাড়ির দ্বন্দ্ব আমাদের ঘরের কথা, বাস্তব জীবনের কথা। কিন্তু বিজ্ঞাপনী প্রতিভা সুখ-শাড়িকে কাব্যের গৌরব দিয়েছে।

প্রপাগান্ডা সম্বন্ধে যত কথা বলব ভেবেছিলাম, এখনও তার কিছুই বলা হয়নি; এটা মোটে তার মুখবন্ধ। বারান্তরে বলবার আশা রইলো।

মামলার সাক্ষী ঘোড়া!

সম্প্রতি ক্যালিফোর্ণিয়ার এক খবরে জানা গেছে যে সেখানে এক ঘোড়াকে এক মামলার সাক্ষীরূপে উপস্থিত করে অপরাধী খালাস পেয়েছে। মামলাটা হয় ক্যালিফোর্ণিয়ার এলবার্ট প্রাইস হলে একটি লোকের বিরুদ্ধে এই অভিযোগে যে তিনি তার পোষা একটি ঘোড়ার উপর অমানুষিক নির্যাতন করেন। মামলার আসামী ঐ অভিযোগ অস্বীকার করে বলে যে ব্যাপারটা আগাগোড়া মিথ্যে—কারণ তার ঐ ঘোড়াটি তাকে এমন ভালবাসে যে সে ঐ ঘোড়াকে তার সঙ্গে যেখানে যেতে আজ্ঞা করবে—সেখানেই যাবে। তারপর এলবার্ট কোর্টে তার ঘোড়াটিকে হাজির করলো—এবং বিচারপতির সামনে ঘোড়াটিকে বললে তাকে অনুসরণ করতে—ঘোড়াটি তার মালিকের আদেশমত—মালিকের পিছু পিছু তার বাড়ীতে চলে গেল। এই সাক্ষ্য প্রমাণের বলে মামলাটি বাতিল করে অপরাধীকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

বিয়ে-বাড়ীর আজব ভোজ

পৃথিবীর সব দেশেই বিবাহ উৎসবকে উপলক্ষ্য করে নেমন্তন্ন, ভোজসভা বা লুচি মেঠাই বিতরণ ইত্যাদি গোছের একটা না একটা খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হয়, তা হয়তো আপনারা সবাই জানেন

এবং এটাও জানেন যে, কনট্রোল ব্যবস্থার চোখে ধুলো দিয়ে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কিভাবে ভয়ে ভয়ে নেমন্তন্ন খেতে হয় এবং খাওয়াতে হয়। যাই হোক আমি যে বিয়ে বাড়ীর ভোজের খবরটি শোনাব—সেখানকার নিমন্ত্রিত অতিথিদের ওসব বালাই দেখা দেয়নি। পর্তুগালের রাজধানী লিসবন সহরে একটি বিয়ে বাড়ীতে সম্প্রতি এই আজব ভোজটি হয়ে গিয়েছে বলে খবর পেয়েছি। বিয়ে বাড়ীতে মাত্র আশীটি অতিথি নিমন্ত্রণ খেতে হাজির হয়েছিলেন এবং তাঁরা দেখিয়ে দিয়েছেন কাকে বলে নিমন্ত্রণ খাওয়া। আশীটি লোকে খেতে বসে যা খেয়েছেন তার হিসাবটি জেনে রাখুন—৩॥ মণ শুয়োরের মাংস, ৪০টা মুরগী, ১২টা হাঁস, ৩০টা খরগোস; ৩০ সের গোমাংস, ১ মণ চালের ভাত, ৩০ সের মিষ্টান্ন, ১২০টি বড় পাঁউরুটি এবং ১১৪ গ্যালন মদ্য। নেমন্তন্ন খাওয়া একেই বলে—আর একেই বলে আজব ভোজ! নয় কি?

অভিনব আস্তানা

ঘরবাড়ীর অভাব—ঘরবাড়ী তৈরীর মালমশলা চুণ, সুরকী, ইট, পাথর; লোহা-লক্কড়ের অভাব শুধু এদেশে যে তা নয়। পৃথিবীর সব দেশেই বাড়ী ভাড়া পাওয়া, বাড়ী তৈরী করা ইত্যাদি মহাসমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কত মানুষ যে যুদ্ধ দাঙ্গা লড়াই বিপ্লবের ফলে গৃহহারা হয়ে—অবর্ণনীয় অসুবিধা ভোগ করছে—এবং তারা মাথা গোঁজবার মত একটু ঠাঁই পাওয়ার জন্য কতই না বুদ্ধি খাটাচ্ছে। এই রকম দু'চারটে খবর আমি যোগাড় করেছি আপনাদের জন্যে—মিথ্যে কাহিনী ব'লে সেগুলিকে উড়িয়ে দেবেন না। প্রথমে জেনে রাখুন বৃটেনের এসেক্স প্রদেশের ব্রেইনট্রি অঞ্চলের একটি ভদ্র পরিবার বাসার অভাবে পুরানো পড়ো একটা সিংহের খাঁচাতেই আস্তানা নিয়ে দিন কাটাচ্ছে। আমেরিকার এক জাহাজের ক্যাপ্টেন সে এক অকেজো বয়লারের চোঙার ভিতরটা রঙ করে নিয়ে সেখানেই আস্তানা বেঁধেছে। কিন্তু সবচেয়ে কৃতিত্ব ও ধৈর্য দেখিয়েছে উইলিয়াম পেক্ বলে এক ইংরেজ—তিনি মদের খালি বোতল সংগ্রহ করে করে তারই গাঁথনী গেঁথে গেঁথে একটা ঘর তৈরী করে তাতেই বসবাস করছেন। ঘরটি তৈরী করতে পাঁচ হাজার খালি বোতল—চুণ, সুরকী, সিমেণ্ট ও কিছু লোহার পাত লেগেছে।

হে বিদায়ী!

রথীন্দ্র ঘটক চৌধুরী

হে বিদায়ী, তোমার উদ্দেশে
স্বস্তির নিঃশ্বাস পাঠালেম।
আহত মনের কাছে
তোমার প্রাপ্যের শেষ অবশিষ্টটুকু
ভর্ৎসনার মন্দ্র উচ্চারণে
পরিশোধ করে দিয়ে ঋণমুক্ত আমি।
হে বিদায়ী, তোমার কীর্তির
স্মৃতিচিহ্ন শতাব্দির বুকে
বহু দিন আঁকা রবে;
ঘুমন্ত শিশুর চোখে এনে দিবে আর্তজাগরণ,
দুঃস্বপ্নের ঘোরে
নারীর কোমল বক্ষে কান্নারোল হবে আবর্তিত;
হে বিদায়ী, বহুদিন বেঁচে রবে তুমি
নারী ও শিশুর অভিশাপে,
তোমার সৃষ্টির চেয়ে তুমি যে মহৎ
মানুষের হাড়ে হাড়ে নিঃশব্দে সে কথা রবে গাঁথা।
তোমারে স্মরণ করে কামারের হাতের হাতুড়ী
ঘা দেবে অনেক জোরে,
কৃষকের কাস্তে হবে দ্বিগুণ ধারালো,
দাঁড়ী দেবে কসে দাঁড়ে টান,
শিশুর শিথিল মুঠি দৃঢ় হবে তোমার স্মরণে।
হে বিদায়ী, নমস্কার আজ নমস্কার,
তোমার উদ্দেশে
স্বস্তির নিঃশ্বাস পাঠালেম।

সাথী

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

একদা যে ছিনু তব সাথী—
আজ যবে রাতি
আসিবে লজ্জার মত চারিদিকে ঘিরে,
ভয়াকুল ফিরে
চাবে যবে কারো হাতে আত্ম সমর্পিবারে,
দ্বিধা দুর্নিবারে
পাবে না ক' কোন দিকে পথ,
সকল জগৎ
আবরিয়া রবে ক্ষুণ্ণ মনে—
সেই ক্ষণে,—
মম চিরপ্রিয়,
আমারে স্মরিয়ো।
একদা যে ছিনু তব সাথী—
পথে সাথে মাতি'
অন্যমনে যা দিয়েছ তার
ভাব নাই বিনিময়ে পাবে অধিকার,
যা দিয়েছ চাহ নাই ফিরে,
সেই সব বসন্ত সমীরে;
আকুল হইয়া ঘুরে আমার মাঝারে;
একদিন লয়েছিলে যারে
আজো সে রহিল কাছে, যদি ভালো লাগে,
যদি ব্যথা জাগে,—
মম চিরপ্রিয়,
অন্ধকারে তাহারে বরিয়ো।

বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ শোভাযাত্রাসহকারে সম্মেলনস্থলে যাইতেছেন

ব্রহ্মদেশীয় প্রতিনিধি দল

মালয়ের প্রতিনিধিবৃন্দ
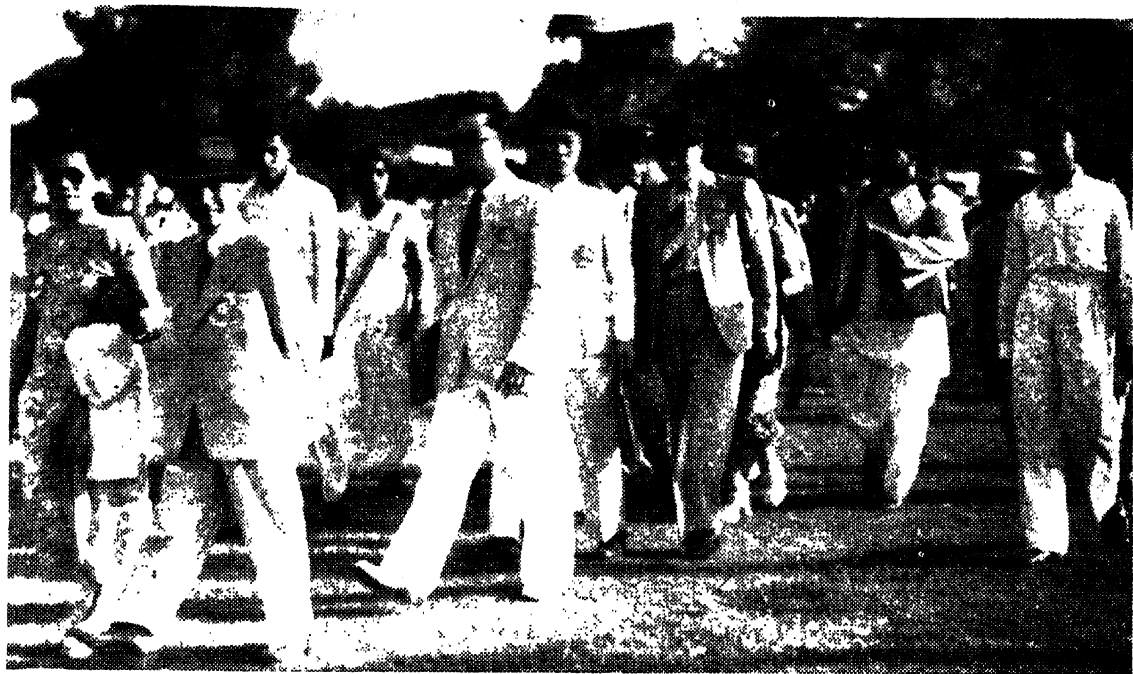
আন্তঃএশিয়া সম্মেলন : সম্মেলন-স্থল অভিমুখে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবর্গ

পণ্ডিত নেহরু, শ্রীযুক্তা নাইডু এবং স্যার শ্রীরাম প্রতিনিধিগণকে অভ্যর্থনা করিতেছেন।

বাঙলায় সাম্প্রদায়িক অবস্থা যে শান্তি স্থায়ী করিবার মত হয় নাই, তাহার লক্ষণ দেখা গিয়াছে। গান্ধীজী দীর্ঘকাল অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করিয়া উপদ্রুত পূর্ববঙ্গে থাকিয়াও বিহারে যাইবার সময় স্বীকার করিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাঁহা কার্য সমাপ্ত হয় নাই—অর্থাৎ অহিংস নীতির পরীক্ষায় জয় তখনও হয় নাই। তিনি পূর্ববঙ্গের উপদ্রুত স্থানে যাইয়া প্রথমে বলিয়াছিলেন বটে, তিনি সে পরীক্ষা শেষ না করিয়া অন্যত্র যাইবেন না, কিন্তু তাহার পরে বিহারের ব্যাপারে তাঁহার পক্ষেও সেই কথা রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই।

পূর্ববঙ্গের উপদ্রুত স্থানসমূহে অগ্নি যে নির্বাপিত হয় নাই, তাহার প্রমাণ যেমন মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়, কলিকাতাতেও তেমনই যে স্বাভাবিক অবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হয় নাই, তাহা বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রধান সচিব মিস্টার সুরাবর্দী স্বীকার করিয়াছিলেন। ইহা যে সরকারের পক্ষে কত লজ্জার কথা, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

অল্পদিন পূর্বে বগুড়া হইতে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল, তাহা উপেক্ষনীয় নহে। বগুড়া হইতে উপদ্রুত লোক কলিকাতায় পলাইয়াও আসিয়াছেন।

তাহার পরে কলিকাতায় আবার উপদ্রব দেখা দিয়াছে।

এই উপদ্রবের অব্যবহিত পূর্বে—গত ২৩শে মার্চ মুসলমানগণ "পাকিস্থান দিবস" পালন করেন। উহাতে কিরূপ বিপদ ঘটিতে পারে তাহা অনুমান করিয়া গান্ধীজী নোয়াখালি অঞ্চলে উহার অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করিবার জন্য বাঙলার সচিব সঙ্ঘকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। যে দিন মুসলমানগণ "পাকিস্থান দিবস" ঘোষণা করেন, বিহারে সেই দিনই "পাঞ্জাব দিবস" অনুষ্ঠিত হইবে ঘোষিত হইয়াছিল। বিহার সরকার উভয় অনুষ্ঠানই নিষিদ্ধ করেন। বাঙলা সরকার কিন্তু তাহা করেন নাই। তাঁহারা কেবল এক বিবৃতি প্রচার করিয়া বলিয়াছিলেন, যে সকল স্থানে ১৪৪ ধারা জারী করা হইয়াছে, সে সকল স্থানে তাহার ব্যবস্থা দৃঢ়তা সহকারে পালিত হইবে অর্থাৎ শোভাযাত্রা ও প্রকাশ্য স্থানে সভাদি হইবে না' আর মুসলিম লীগের সর্বাধ্যক্ষ মিস্টার জিন্না নির্দেশ দিয়াছিলেন—নিরুপদ্রবভাবে অনুষ্ঠান হইবে।

২৩শে মার্চ "পাকিস্থান দিবস" অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন 'আজাদ' সংবাদ প্রকাশ করেনঃ—

"২৩শে মার্চ, রবিবার পাকিস্থান দিবসে কলিকাতা অপূর্ব আনন্দমুখর ও আলোক

সজ্জায় সুসজ্জিত হয়। সোবেহ সাদেকের সময় মোয়াজ্জেমের মধুর আজান ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠে সমগ্র শহর—ভোর না হইতেই প্রতিটি বাসগৃহ দোকান, হোটেল, রেস্তোরাঁ, ব্যবসায়ীদের অফিস, বিভিন্ন প্রকারের জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান গৃহ, বিদ্যালয়, ছাত্রাবাস প্রভৃতির উপর উত্তোলিত হয় আলহেলালী সবুজ লীগ পতাকা।" ইত্যাদি।

কলিকাতায় মুসলমানের সংখ্যা কত অল্প তাহা বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়—"প্রতিটি বাসগৃহ, দোকান"—ইত্যাদিতে লীগ পতাকা উত্তোলিত হওয়া অসম্ভব এবং বর্ণনাটি সত্য হইতে পারে না। তবে কোন্ উদ্দেশ্যে এইরূপ অসত্য সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে গবেষণার প্রয়োজন নাই। ইহা স্বপ্ন; কিন্তু ইহা সফল হওয়াই লীগপন্থী মুসলমানদিগের ইচ্ছা।

সেদিন কলিকাতায় মুসলিম লীগ পন্থীদিগের সভাও হইয়াছিল। একটি সভায় স্বয়ং মিস্টার সুরাবর্দী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি পাকিস্থান মাহাত্ম্য কীর্তন না করিয়া মুসলমানদিগকে পাকিস্থানের ভাবে ভাবিত হইতে ও কাজ করিতে বদুপদেশ দিয়াছিলেন। পাকিস্তানের ভাবে কাজ করা কি তাহা তিনি বলেন নাই বটে, কিন্তু নোয়াখালিতে পাকিস্তানীরা যে ধ্বনি তুলিয়াছিল—

"লড়কে লেঙ্গে পাকিস্থান"
"মারকে লেঙ্গে পাকিস্থান"

তাহার উল্লেখ আচার্য কৃপালনী তাঁহার বিবৃতিতে করিয়াছেন। মিস্টার সুরাবর্দী বাঙলাকে বিভক্ত করিবার যে প্রস্তাব হিন্দুদিগের দ্বারা আলোচিত হইতেছে, তাহার বিরোধিতা করিয়া বলেন—তাঁহারা কখনই বঙ্গ বিভাগে সম্মত হইতে পারেন না।

পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাতে মুসলমানাতিরিক্ত অধিবাসিগণের অবস্থা কি হইবে, তাহা বাঙলার অবস্থা দেখিয়াই সমগ্র জগতের লোক সহজে অনুমান করিতে পারেন। তাহা অনুমান নহে, অনুভব করিয়া বাঙলার হিন্দুদিগের মধ্যে বাঙলাকে বিভক্ত করিবার প্রস্তাব উঠিয়াছে।

কংগ্রেস পাঞ্জাব বিভক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন—বাঙলাও যে বিভক্ত করা যায়, সে ভাব আচার্য কৃপালনী প্রকাশ করিয়াছেন। স্মরণ রাখিতে হইবে আচার্য কৃপালনী ও শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী উভয়েই গান্ধীজীর অহিংস মন্ত্রে দীক্ষিত। তাঁহারা উভয়েই পূর্ববঙ্গের উপদ্রুত অঞ্চল দেখিয়াছেন। তাহা দেখিয়া যে আচার্য কৃপালনী বলিয়াছেন, বাঙলাকেও বিভাগ করা যায়, তাহার কারণ, তিনি—অন্ততঃ বর্তমান অবস্থায় দুই সম্প্রদায়ে সম্প্রীতি সংস্থাপনের পথ বিঘ্নবহুল বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন। গান্ধীজী যদিও সম্প্রদায় ভেদে বাসস্থান ভেদে বিরোধী তথাপি তিনিও একবার বলিয়াছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় যদি সংখ্যালঘিষ্ঠকে সহ করিতে অসম্মত হয়, তবে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা হইলে, সংখ্যালঘিষ্ঠের পক্ষে স্থান ত্যাগ সম্ভব।

যে স্থানে মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ তথায় যে তাহারা অ-মুসলমানদিগের বাস চাহে না—এমন কি তাহাদিগের বাসের অধিকারও অস্বীকার করে, তাহার পরিচয় সিন্ধু প্রদেশে পাওয়া গিয়াছে। তথায় ব্যবস্থা পরিষদে একজন লীগপন্থী অনায়াসে বলিয়াছিলেন সিন্ধু মুসলমান প্রদেশ; তথায় কাফেরদিগের স্থান নাই। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছিলেন মুসলমান যদি মদ্যপ ও দুর্নীতিপরায়ণ হয় তবুও সে গান্ধীর অপেক্ষা বরণীয়।

বাঙলায় "পাকিস্থান দিবস" অনুষ্ঠিত হইবার পরেই কলিকাতায় আবার যে উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে, তাহা আশঙ্কার বিষয়। কারণ "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে" কলিকাতায় যে উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছিল, তাহাই বাঙলার মুসলমান প্রধান অংশে আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছিল।

বঙ্গ বিভাগ বিরোধী আন্দোলনের সময় প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে পূর্ববঙ্গে যখন ছোট লাট স্যার ব্যামফাইল্ড ফুলারের শাসনকালে হিন্দুদিগের উপর উপদ্রব হয়, তখন ডক্টর রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় কংগ্রেসের মঞ্চ হইতে বলিয়াছিলেন, সাম্প্রদায়িকতা-দানবকে ডাকিয়া আনা সহজ, তাহাকে বিতাড়িত করা দুষ্কর। তাহা কত সত্য তাহা আমরা এই প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল বিশেষভাবেই অনুভব করিতেছি। মিস্টার জিন্না কেবলই বলিতেছেন, পাকিস্থান না পাইলে মুসলমানরা কিছুতেই সন্তুষ্ট হইবে না—সে জন্য তাহারা সর্বপ্রকার

চেষ্টা করিবে। কলিকাতায় "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস" অনুষ্ঠিত হইবার কয়দিন পূর্বে খাজা নাজিমুদ্দীন বলিয়াছিলেন—মুসলিম লীগ শতাধিক উপায়ে সরকারকে বিব্রত করিতে পারে; বিশেষ মুসলিম লীগ অহিংস নীতি-পরায়ণ নহে। তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পূর্ববঙ্গে মুসলমানরা দিয়াছে। কুমারী মুরিয়েল লেস্টার বলিয়াছেন, স্ত্রীর সম্মুখে স্বামীকে হত্যা করিয়া বিধবাকে বলপূর্বক বিবাহে বাধ্য করাও হইয়াছিল।

পাঞ্জাবে উপদ্রব যে অমুসলমানদিগের উপরেই অধিক হইয়াছে, তাহা শিখ-নেতা মাস্টার তারা সিংহ সুস্পষ্টরূপে বলিয়াছেন। পাঞ্জাবে যে "ব্যক্তি স্বাধীনতার" ছল ধরিয়া আইন ভঙ্গ আন্দোলন মুসলিম লীগের নেতারা করিয়াছিলেন এবং গভর্নর স্যার ইভান জেনকিন্স সম্মিলিত সচিব সঙ্ঘের মুসলমান প্রধান সচিবকে পদত্যাগে প্ররোচিত করিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার পর পাঞ্জাবে যাহা ঘটিয়াছে সে সম্বন্ধে সর্দার বলদেব সিংহ বলিয়াছেন, পাঞ্জাবের উপদ্রব নোয়াখালির উপদ্রবকেও নিষ্প্রভ করিয়াছে। উভয় স্থানেই একই সম্প্রদায়ের লোক উপদ্রবকারী, আর উপদ্রবের প্রকৃতিও একইরূপ।

জানা গিয়াছে, বাঙলায় যখন উপদ্রব হয়, তখন বড়লাট লর্ড ওয়াভেলই শাসন পরিষদের সদস্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে ও স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে কলিকাতায় আসিতে দেন নাই। কিন্তু পাঞ্জাবে মুসলিম লীগের দলপতি শাসন-পরিষদের সদস্যগণের অবারিত-গতি।

বাঙলার প্রধান সচিব মিস্টার সুরাবর্দী ১৬ই আগস্ট বোধ হয় লালবাজার পুলিশ আফিসের কণ্ট্রোল রুমের বাহিরে আসিয়া শেষ রাত্রিতে বলিয়াছেন, অবস্থার উন্নতি সাধিত হইয়াছে! তিনিই ত্রিপুরা জিলায় উপদ্রব আত্মপ্রকাশ করিবার ২।৩ দিন মাত্র পূর্বে কলিকাতায় বলিয়াছিলেন, উপদ্রব কিছুতেই নোয়াখালির সীমা অতিক্রম করিয়া ত্রিপুরায় প্রবেশ করিতে পারিবে না। এবারও তিনি বুধবারে কলিকাতায় হাঙ্গামা আরম্ভ হইবার পরদিন অনায়াসে বলিয়াছিলেন, কলিকাতায় অবস্থার উন্নতি লক্ষ্য করা যাইতেছে। অথচ পরদিন বহু ভয়াবহ ঘটনার উল্লেখ ব্যবস্থা-পরিষদে হইলে তিনি বলিতে দ্বিধানুভব করেন নাই—তিনি সে সকল স্বীকারও করেন না, অস্বীকারও করেন না।

এবার কলিকাতায় উপদ্রবের কারণ তিনি যাহা নির্দেশ করিয়াছিলেন, তাহাও বিস্ময়কর। কোন বারাঙ্গণাবাসে একটি স্ত্রীলোক ও তাহার সন্তান নিহত হয়। মিস্টার সুরাবর্দী বলেন—নিহত নারী যে সম্প্রদায়ের লোক ছিল, তাহাকে সেই সম্প্রদায়ের লোক মনে না করিয়া অপর সম্প্রদায়ের কতকগুলি লোক তাহাকে তাহাদিগের সম্প্রদায়ের মনে করে এবং তাহাতেই হাঙ্গামা আরম্ভ হয়। যিনি এইরূপ কারণের উল্লেখ করিতে পারেন, তাঁহার কথা লইয়া বিচার করিতেও লজ্জাবোধ হয়। শহরের একটি বারাঙ্গণাবাসে এক অজ্ঞাতকুলশীলার হত্যায় সমগ্র শহরে হাঙ্গামা আরম্ভ হইতে পারে, ইহা যে মিস্টার সুরাবর্দী সত্যসত্যই বিশ্বাস করেন, এমন মনে হয় না। তবে তিনি সেকথা বলিলে হয়ত বাঙলার গভর্নর স্যার ফ্রেডরিক বারোজ তাহা বিশ্বাস করিতে পারেন। বাঙলার লোক তাহা বিশ্বাস করিবে না।

"প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে" যে হাঙ্গামা আরম্ভ হইয়াছিল, তাহাতে কলিকাতায় শান্তি স্থাপনের জন্য যথাকালে সৈনিকদিগের সাহায্য গৃহীত হয় নাই। ব্রিগেডিয়ার সেক্সস্মিথ তাহা বলিয়াছিলেন। এবারও বিলম্বে ২টি অঞ্চলে সৈনিকদিগকে কার্য-ভার প্রদান করা হইয়াছিল। প্রথমে মিস্টার সুরাবর্দী বলেন, সৈনিকরা মজুদ আছে—যদি অবস্থার আরও অবনতি ঘটে, তবে অবশ্যই তাহাদিগের সাহায্য গৃহীত হইবে। অবস্থা তখনই শোচনীয়। অথচ তখনও মিস্টার সুরাবর্দী অদ্ভুত যুক্তির অবতারণা করিতেছিলেন—সৈনিকদিগকে কার্যভার দিলে লোক মনে করিবে, অবস্থা নিশ্চয়ই অবনতিপ্রাপ্ত হইয়াছে; তাহাতে ভয় দূর হইবে না—ভয় বর্ধিতই হইবে।

সকলেই জানেন যাহাতে অবস্থার অবনতি না হয় এবং লোকের মনে আস্থার সঞ্চার হয়, সেইজন্যই সৈন্যদিগের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। কিন্তু মিস্টার সুরাবর্দীর মত অন্যরূপ। অনেক বিষয়েই আমরা ইহা লক্ষ্য করি।

পাঞ্জাবের কোন শিখনেতা বলিয়াছেন—যতদিন আমরা স্বাধীনতা লাভ না করিব, ততদিন পাঞ্জাবের বর্তমান অশান্তির অবসান হইবে না। বাঙলা সম্বন্ধেও কি তাহাই মনে করিতে হইবে? যে সাম্প্রদায়িকতা জাতীয়তার বিরোধী এবং সেইজন্য জাতির মুক্তির শত্রু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কৌশলে এদেশে সেই সাম্প্রদায়িকতা জাতির মুক্তিপথ বিঘ্নবহুল করিতেছে—সেই হীন কৌশলই মুসলিম লীগের সৃষ্টির কারণ। মুসলিম লীগ ধর্মমতকে রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রেরণায় পরিণত করিয়া কেবল যে ধর্মের সম্ভ্রম ক্ষুণ্ণ করিতেছে, তাহাই নহে, পরন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেশের অশেষ অকল্যাণ সাধন করিতেছে। লীগ ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করিয়া দুর্বল করিতে চাহিতেছে এবং সম্প্রদায়কে জাতি বলিয়া মনে করিতেছে।

বাঙলায় জাতীয়তার জন্য হিন্দুরা অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করিয়া দেশের মুক্তির উপায় করিয়াছেন; আজ যখন সেই মুক্তির সাধনা সিদ্ধির সিংহদ্বারে উপনীত হইয়াছে, সেই সময়ে মুসলিম লীগ তাহা ব্যর্থ করিবার জন্য চেষ্টিত। যে কয়টি প্রদেশে মুসলমানগণ সংখ্যায় অধিক, সে কয়টি প্রদেশেই লীগ বিবাদ ঘটাইয়া জাতীয়তার ক্ষতি করিতে বদ্ধপরিকর। আর খাজা নাজিমুদ্দীনও বলিয়াছেন—লীগ অহিংস-নীতিপরায়ণ নহে। সেইজন্যই "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্থান", "মারকে লেঙ্গে পাকিস্থানে' পরিণত হতে বিলম্ব হয় নাই। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী-দিগের কৌশলে রচিত সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থায় "রাজশক্তি" হস্তগত করিয়া এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ইংরেজ শাসকদিগের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ সাহায্য লাভ করিয়া মুসলিম লীগ সাম্প্রদায়িকতাকে জাতীয়তার স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছে।

কোন মহৎ কার্য যখন সিদ্ধির সম্মুখীন হয়, তখনই দেখা যায় তাহার উপরে বজ্রগর্ভ বিপদের কালমেঘে তাহার ধ্বংস সাধনে উদ্যত। ভারতবর্ষের মুক্তি-সংগ্রামেও আমরা তাহাই লক্ষ্য করিতেছি।

সেইজন্যই আমাদিগকে আরও সতর্ক, আরও ত্যাগী, আরও একনিষ্ঠ হইয়া সাধনা করিতে হইবে।

যে বাঙালী এদেশে জাতীয়তার প্রতিষ্ঠায় কোন ত্যাগ স্বীকারেই দ্বিধানুভব করে নাই—যে বাঙালী ভারতবর্ষের মুক্তি-সংগ্রামে জয়যাত্রার বাহিনী পুরোভাগে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে—যে বাঙালীর কণ্ঠে মাতৃমন্ত্র সর্বাপেক্ষা উচ্চরবে ধ্বনিত হইয়াছে, সে বাঙালীকে আজ আপনার অভিজ্ঞতায় নূতন উদ্যম ও উৎসাহ লাভ করিয়া আবার মুক্তি-সাধনায় নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। "দিন আগত ঐ!" ব্যর্থতাকে দলিত করিয়া আমাদিগকে সাফল্য লাভ করিতে হইবে।

বৈদেশিক ভারত : আন্তরেশীয় কনফারেন্স

বৈদেশিক ভারতের পক্ষে বর্তমানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল দিল্লীতে আহূত আন্তরেশীয় সম্মেলন বা এশিয়াবাসী দেশগুলির সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনের সম্মেলন।

এই সম্মেলন ডাকার একটি ক্ষুদ্র ইতিহাস আছে এবং তার সঙ্গে বর্তমান ভারতের বৈদেশিক বোধের কিছু যোগাযোগ আছে।

যদিও এই সম্মেলনের সঙ্গে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু প্রমুখ খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের নাম যুক্ত আছে, তবুও এটি ঠিক সরকারীভাবে কংগ্রেসী ব্যাপার নয়। এর মূলে হ'ল দিল্লীর 'ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ ওয়ার্লড এফেয়ার্স' নামক একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান। বৈদেশিক ভারতের আলোচনায় এই মূল্যবান প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় জেনে রাখা দরকার। কিছুকাল থেকেই যে এদেশের রাষ্ট্রনৈতিক মহলে কংগ্রেসের বাইরেও বৈদেশিক রাষ্ট্রনীতির বোধ ক্রমশ বেশ ভালোভাবে বাড়ছে, দিল্লীর 'ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ ওয়ার্লড এফেয়ার্স' তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এবং সভাপতি হলেন, স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু; সহকারী সভাপতি আটজন : পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, স্যার গোপালস্বামী আয়াঙ্গার, স্যর মহারাজ সিং, স্যর সি পি রামস্বামী আয়ার, ডাঃ কুঞ্জরু, ডাঃ জাকির হুসেন ও স্যর মরিস গওয়ার। এর কোষাধ্যক্ষ হলেন শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার ও সেক্রেটারী ডাঃ এ আপ্পাডোরাই। কার্য-নির্বাহক কমিটির সভ্য ও সভ্যা হলেন ৩২ জন, তার মধ্যে ডাঃ অমরনাথ ঝা, মিঃ এম আর এ বগ, শ্রীদেবীদাস গান্ধী, স্যর পদমপৎ সংহানিয়া, মিঃ গুরুমুখ নিহাল সিং, মিঃ এম আর মাসানী, মিঃ পি এন সাপ্রু, ডাঃ বি এন াঙগুলী, মিঃ কে সি নিয়োগী, শ্রীযুক্তা রেণুকা ায় প্রভৃতি।

যুদ্ধ শেষ হবার আগে থেকেই এদেশে ন্তর্জাতিক বোধ বাড়ছিল। কংগ্রেসী নেতারা থন জেলে সেই সময়েই, ১৯৪৩ সালের ৪শে আগস্ট তারিখে সার্ভেণ্টস অফ ইণ্ডিয়া সাসাইটির সভাপতি ডাঃ কুঞ্জরু ও কাউন্সিল ফ স্টেটের সদস্য মিঃ পি এন সাপ্রুর স্বাক্ষরে ারতে আন্তর্জাতিক বা বৈদেশিক ব্যাপারের স্তব আলোচনার উদ্দেশ্যে একটি প্রতিষ্ঠান থাপনের প্রস্তাব করে এক ইস্তাহার প্রকাশিত য়। তারই ফলে ১৯৪৩ সালের ২১শে ডেম্বর তারিখে নয়াদিল্লীতে উল্লিখিত

'ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ ফরেন এফেয়ার্স' স্থাপিত হয়।

এই 'কাউন্সিল'ই প্রায় এক বছর আগে আলোচ্য 'আন্তরেশীয় সম্মেলন' আহ্বান করবার প্রস্তাব করেন। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য হ'ল, এশিয়ার প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের (পুরুষ ও নারী) একত্র করা, যাতে এশিয়ার সব দেশে যে সব সাধারণ (Common) সমস্যা আছে সেই বিষয়ে আলোচনা করা।

ঐ উদ্দেশ্যে 'কাউন্সিল' একটি বিশেষ কমিটি নিয়োগ করেন। তাঁরাই এই সম্মেলন ডেকেছেন। সুতরাং এই আহ্বানের মূলে সকল সম্প্রদায়ের, সকল ধর্মের এবং সকল দলের লোকই আছেন।

আন্তরেশীয় সম্মেলন : লীগের অসম্মতি

তা সত্ত্বেও মুসলিম লীগ এতে যোগ দেয়নি।

পণ্ডিত নেহরু, জেল থেকে বেরুবার পর এই কাউন্সিলে যোগ দেন এবং প্রস্তাবিত আন্তরেশীয় সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য তিনি মিঃ জিন্নাকে ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে অনুরোধ করেন। জিন্না সাহেব ঐ বিষয় সংক্রান্ত কাগজপত্র চেয়ে পাঠান, কিন্তু সেগুলি পাবার পরে আর কোনো উচ্চবাচ্য করেননি। ইতিমধ্যে গত ডিসেম্বর মাসে মিঃ জিন্না যখন বিলেত যান, তখন ফিরবার পথে মিশর প্রভৃতি কয়েকটি মুসলমান দেশে পাকিস্থান প্রচার করতে গিয়ে থাবড়া খান। সম্ভবত চেষ্টায় ছিলেন, মধ্য প্রাচ্যের মুসলমান রাষ্ট্রগুলিকে ঠিকভাবে ভজাতে পারলে তারা প্রস্তাবিত সম্মেলনে যোগ দেবে না এবং মুসলিম লীগের নেতৃত্বে একটি পৃথক সম্মেলন করবে।

দেখা যাচ্ছে, সে বিষয়ে জিন্না সাহেব সুবিধা করতে পারেননি। নিমন্ত্রিত প্রায় সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্রই আন্তরেশীয় সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন, শুধু ট্রান্সজর্ডানিয়া ও সুদান ছাড়া। এখানে স্মরণে রাখতে হবে, ট্রান্সজর্ডানিয়া হ'ল অত্যন্ত আধুনিক একটি কৃত্রিম রাষ্ট্র, প্রত্যক্ষভাবে বৃটিশের সৃষ্টি এবং সুদানের আসল শাসনকর্তা হ'লেন একজন বৃটিশ গভর্নর যিনি সুদানে পাকিস্থানী নীতি চালাচ্ছেন যেখানকার কয়েকজন দেশদ্রোহী অনুগ্রহভোজী মুসলমানের সাহায্যে। সম্ভবত এঁরাই হ'লেন মিঃ জিন্নার একমাত্র ভরসা, যে জন্যে মুসলিম লীগ আন্তরেশীয় সম্মেলন বর্জন করেছেন।

আন্তরেশীয় সম্মেলন : বিলাতী আপত্তি

মুসলিম লীগের ন্যায় এক শ্রেণীর বিলাতী মত এই সম্মেলনের ঘোর বিরোধী। তাঁরা গোড়ায় ধুয়া তুলেছিলেন 'প্যান-এশিয়া' ভীতির। পশ্চিমের শোষক জাতিরা প্রাচ্য জাতিদের কোনো প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব বা মিলন সহ্য করতে পারে না। তারা তৎক্ষণাৎ মনে করে যে, তার দ্বারা প্রাচ্য জাতিগুলি পাশ্চাত্য জাতিগুলির একচেটিয়া শোষণের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে। সুতরাং তাদের কাছে আন্তরেশীয় সম্মেলন হল পশ্চিমের প্রতি প্রাচ্যের চ্যালেঞ্জ বা 'প্যান-এশিয়ানিজম'। পণ্ডিতজী যখন তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতায় পরিষ্কারভাবে বললেন যে, এর পিছনে ঐরূপ কোনো মৎলব নেই, এটা সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্মেলন মাত্র, তারপর থেকে বিলাতী কাগজগুলি ধুয়া তুলেছে যে এই সম্মেলন হ'ল মুসলিম লীগকে চ্যালেঞ্জ করা, এর দ্বারা ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাড়বে।

বর্তমানে বিভিন্ন প্রদেশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বৃদ্ধির মূলে এই বিলাতী উস্কানী কতখানি সাহায্য করছে তা আপাতত বলা কঠিন, তবে লীগ-বৃটিশের আঁতাতের পরিচয় এর আগে অনেক পাওয়া গিয়েছে।

সম্মিলিত জাতি সংঘ : অর্থনৈতিক সংসদ

সম্মিলিত জাতি সঙ্ঘের অর্থনৈতিক ও সোশ্যাল কাউন্সিল সম্প্রতি দুইটি অর্থনৈতিক 'কমিশনের' (Comission) প্রস্তাব মঞ্জুর করেছেন, একটি ইউরোপের জন্য অন্যটি সুদূর প্রাচ্যের জন্য। এঁদের কাজ হবে বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পুনর্গঠনের জন্য সম্মিলিতভাবে পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা করা অবশ্য সেই সেই দেশের স্থানীয় গভর্নমেণ্টের অনুমতি নিয়ে।

এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হ'ল যে, এই প্রস্তাব সম্পর্কে রাশিয়া দশটি সংশোধক প্রস্তাব এনেছিল, তার প্রত্যেকটিতে রাশিয়া হেরেছে। আমরা কয়েক সপ্তাহ আগে বলেছিলাম যে, আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতির বর্তমান পরিস্থিতিতে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিপুঞ্জ যুদ্ধের পর থেকেই চেষ্টা করছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাশিয়ার বিরুদ্ধে একটা 'ব্লক' তৈরী করতে, যাতে সম্মিলিত জাতি সঙ্ঘে এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সম্মেলনে রাশিয়া ভোটে হেরে যায়। এই ব্লক গঠন প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে এবং এই জোট বাঁধার বিরুদ্ধে প্রায় সমস্ত বাধাই অপসারিত হয়েছে, একটি বিষয় ছাড়া। সে বিষয়টার কথা আজকে বলা সম্ভব নয়।

মস্কো কনফারেন্স

আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া এই বৃহৎ চতুঃশক্তির পররাষ্ট্র সচিবদের যে সম্মেলন বর্তমানে মস্কোতে চলেছে, তাতেও দেখা যাচ্ছে, রাশিয়াকে একে একে অনেক বিষয়ে বাকী তিনজনের কাছে কিছু কিছু দাবী ছাড়তে হচ্ছে।

চীন সম্বন্ধে যে আলোচনার দাবী রাশিয়া এনেছিল, সে দাবী টেকে নি। এমন কি বেসরকারীভাবে আলোচনায় যে প্রস্তাব রাশিয়া আনল, তাও টিকলো না।

অস্ট্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে অস্ট্রিয়াতে কোন্ কোন্ সম্পত্তি (শিল্প প্রভৃতি) জার্মান মালিকানার অন্তর্ভুক্ত, তার সংজ্ঞা নিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে অন্য তিন শক্তির মতভেদ হয়েছিল। এ বিষয়ে কোনও পাকাপাকি মীমাংসা হয়নি এবং রাশিয়ার ব্যাখ্যাও গৃহীত হয়নি।

সম্প্রতি জার্মানী সম্বন্ধে মস্কো কনফারেন্সে আলোচনা উঠেছে। এই আলোচনা প্রধানত তিনভাগে হবে: (১) জার্মানীর বিভিন্ন এলাকার অর্থনৈতিক ঐক্য ও ক্ষতিপূরণ (২) সামরিক ব্যবস্থাগুলির অবসান ঘটানো বা 'ডিমিলিটারিজেশন' এবং (৩) জার্মানীর অস্থায়ী গভর্নমেণ্ট সম্বন্ধে একটা খসড়া প্রস্তুতের ব্যবস্থা করা। এই সব বিষয়ে মন্ত্রি-মণ্ডলের মধ্যে একটা সাময়িক মিল হয়েছে, অবশ্য সেটা বিষয়গুলি সম্বন্ধে নয়, বিষয়গুলি আলোচনা হবে কি না এবং তার প্রণালী সম্বন্ধে। একথা উল্লেখ করলাম এই জন্য যে, রাশিয়ার সঙ্গে বে-মিলটাই এখন আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতির প্রধান লক্ষণ এবং সেই বে-মিল ক্রমশ বাড়বার বা বাড়াবার পথেই চলেছে, সুতরাং সামান্য মাত্র মিলও যেখানে ঘটছে সেখানে সেটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয়। এই মিল বা বে-মিলের উপর আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতির ভবিষ্যৎ গতি নির্ভর করছে।

ফ্রান্স

ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের সন্ধিপত্র সমর্থন বা ratify করা নিয়ে ফরাসী ব্যবস্থা পরিষদে অনেক গণ্ডগোল হয়ে গিয়েছে। এই গণ্ডগোলের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ছিল ভিয়েৎনামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালনার সামরিক ব্যয় মঞ্জুরের বিষয়। গণ্ডগোল এতদূরে বেড়েছিল যে মাঝখানে গভর্নমেণ্টের পতন প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। এই গণ্ডগোলের প্রধান কারণ ফরাসী কমিউনিস্টদের সঙ্গে দক্ষিণ পন্থীদের বিরোধ। কমিউনিস্টরা গোড়া থেকেই ভিয়েৎনামের সঙ্গে যুদ্ধের বিরোধী। তারা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেবে ঠিক হয়, পরে আপোষে তারা নিরপেক্ষ থাকে, গভর্নমেণ্ট আসন্ন পতন থেকে বেঁচে যায়।

সম্প্রতি ফ্রান্সে কমিউনিস্টদের ক্ষমতা খর্ব করার চেষ্টা চলেছে।

ভিয়েৎনাম ও ফ্রান্স

ভিয়েৎনাম সম্বন্ধে ফ্রান্স আনামের ভূতপূর্ব সিংহাসন ত্যাগী সম্রাট বাও-দাইকে আহ্বান করেছেন। এই বাও-দাইএর ইতিহাস আমরা পূর্বে এক সংখ্যায় দিয়েছিলাম। ফ্রান্স বলতে চায় যে, ডাঃ হো-চি-মিন সর্ববাদীসম্মত নেতা নন, ভিয়েৎনামীরা যুদ্ধ চায় না। সুতরাং ফরাসী গভর্নমেণ্ট ঠিক ইংরেজের মতই ভেদ সৃষ্টি করবার জন্যে বাও-দাইয়ের শরণাপন্ন হচ্ছেন।

তবে বাও-দাই ইতিপূর্বে অনেক তেজস্বিতা দেখিয়েছেন। প্রজাশক্তির ইচ্ছার মর্যাদা দিয়ে তিনি সিংহাসন ত্যাগ করেছিলেন এবং ঘোষণা করেছিলেন, বিদেশী শক্তির হাতে পুতুল রাজা হওয়া অপেক্ষা স্বাধীন দেশের সামান্য নাগরিক হয়ে থাকা অনেক গৌরবের বিষয়। তাঁকেই আজ ফরাসী গভর্নমেণ্ট ডাকছেন আনামের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভেদ-সৃষ্টি করবার জন্য। তিনি এখন হংকং-এ নির্বাসিত।

সম্প্রতি তিনি এই আহ্বানে ফিরতে রাজী হয়েছেন, তবে তাঁর 'নিজের সর্তে'। সে সর্ত কি, তা জানান নি, শুধু জানিয়েছেন যে, সমস্ত আনাম, কোচিন-চীন ও টংকিং নিয়ে (অর্থাৎ সমগ্র ইন্দো-চীন নিয়ে) একটা সম্মিলিত রাষ্ট্র গঠন হল সেই সব সর্তের অন্তর্গত।

দেখা যাক ইঙ্গ-ফরাসী চুক্তির ফলে উভয় দেশের সাম্রাজ্যবাদী কূটবুদ্ধির আঁতাত কতটা হয়েছে।

১৮ই চৈত্র, ১৩৫৩ — যো

সাহিত্য-সংবাদ

সাতক্ষীরা (খুলনা) শিশু মধুভাণ্ড

(১) আগামী বৈশাখ মাসে সাতক্ষীরায় (খুলনা) শিশু মধুভাণ্ডের সপ্তম বার্ষিক সম্মেলন উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। তজ্জন্য সপ্তাহকালব্যাপী সাহিত্য-সভা, শিল্প-প্রদর্শনী, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা প্রভৃতির ব্যবস্থা হইবে। ১৬ বৎসর বয়স পর্যন্ত বালক-বালিকাদের নিকট হইতে যে-কোন প্রকারের শিল্পদ্রব্য এবং ৬ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুদের জন্য তাহাদের অভিভাবকদের নিকট হইতে উক্ত শিশুদের স্বাস্থ্য-বিবরণী (দৈহিক মাপ, ওজন, শারীরিক গঠন প্রভৃতি) পাঠাইতে অনুরোধ করা যাইতেছে। কোন প্রবেশমূল্য নাই। প্রত্যেক বিষয়ে অনেকগুলি পুরস্কার আছে। উক্ত শিল্পদ্রব্য ও স্বাস্থ্য-বিবরণী আগামী ৩০শে চৈত্র, ১৩৫৩-এর মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

(২) "শরৎকালের বাঙলা" নামক পূর্বঘোষিত প্রবন্ধের পুরস্কার-প্রাপকদের নাম আগামী ২৫শে চৈত্রের মধ্যে বিভিন্ন পত্রিকায় ঘোষিত হইবে ও পত্রযোগে পুরস্কার-প্রাপকদের নিকট জানান হইবে।

শ্রীঅশোককুমার ভঞ্জ চৌধুরী, সম্পাদক—শিশু মধুভাণ্ড, পোঃ সাতক্ষীরা, জেলা খুলনা।

আন্তঃবিদ্যালয় আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

নববর্ষ উপলক্ষে শেষা সাহিত্য সম্মিলনীর উদ্যোগে আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হইবে। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণই যোগদান করিতে পারিবেন। প্রবেশ-মূল্য নাই। ৩০শে চৈত্র (১৩৫৩) তারিখের মধ্যে প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর প্রমাণপত্র সহ নিম্নলিখিত ঠিকানায় নাম পাঠাইতে হইবে। নির্ধারিত তারিখের পর আবেদনপত্র গ্রাহ্য হইবে না। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীকে পুরস্কৃত করা হইবে।

বিষয়ঃ—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের "বিশ্বদেব" কবিতা।

সম্পাদক—শেষা সাহিত্য সম্মিলনী, ১বি, সীতাকান্ত ব্যানার্জী লেন, কলিকাতা—৫।

খেলাধূলা

ফুটবল

বাঙলার ফুটবল খেলার মরসুম আগত প্রায়। অথচ এখনও পর্যন্ত ফুটবল খেলার কোনই তোড়জোড় হইতে দেখা যাইতেছে না। এই সময় অন্যান্য বৎসর খেলার মাঠে রীতিমত সোরগোল পড়িয়াছে। খেলোয়াড়দের দল পরিবর্তনের হিড়িক, বিভিন্ন ক্লাবের পাণ্ডাদের ছুটাছুটি, পরিচালকমণ্ডলীর ঘন ঘন সভা অনেক কিছুই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু এইবার এখনও পর্যন্ত তাহার কোন কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। দল পরিবর্তনের শেষ দিনে মাত্র ৭২ জন খেলোয়াড়ের দরখাস্ত আই এফ এ অফিসে দাখিল হইয়াছে। পরিচালকমণ্ডলী উহার পরে আর দরখাস্ত গ্রহণ করিবেন না বলিয়া ঘোষণা করেন নাই। সেইজন্য মনে হইতেছে আবেদন পেশ করিবার পথ এখনও খোলা আছে। বাঙলার ফুটবল খেলার মধ্যে এই যে শৈথিল্য দেখা দিয়াছে তাহার প্রধান কারণ হইতেছে পরিচালকমণ্ডলীর হঠাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ—"প্রতিযোগিতামূলক" ফুটবল খেলা এই বৎসর হইবে না। প্রধান কারণ হিসাবে দেশের ও মাঠের অস্বাভাবিক সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাবের কথা উল্লেখ করা হয়। এই প্রস্তাব যখন পাশ হয় তখন দেশের আবহাওয়া সত্যই ভাল ছিল। সেইজন্য প্রস্তাব পাশ হইবার সঙ্গে সঙ্গে বহুস্থান হইতে বহু খেলোয়াড় ও ক্রীড়ামোদী ইহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। এমন কি রাজস্থান ক্লাব আই এফ এ'র পরিচালকমণ্ডলীকে ঐ প্রস্তাব পুনর্বিবেচনার জন্য তুলিতে অনুরোধ করেন। আই এফ এ'র পরিচালকমণ্ডলী ঐ আবেদন অগ্রাহ্য করেন না। স্থির হয় ২রা এপ্রিল আলোচনা হইবে। ঠিক ইহার কয়েকদিন পূর্ব হইতে কলিকাতায় পুনরায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধিয়া নাগরিক জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলে। ফলে পরিচালকমণ্ডলী আলোচনার দিন পিছাইয়া দেন। এই আলোচনার ফল কি হইবে বলা কঠিন। তবে বর্তমানে দেশের মধ্যে যে বিষাক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি হইয়াছে তাহা সহজে প্রশমিত হইবে বলিয়া মনে হয় না। সেইজন্য আশঙ্কা হয় প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল খেলা হইবার যে সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল তাহা বোধ হয় শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হইবে না। যদি না হয় বাঙলার ফুটবল খেলোয়াড়দের প্রকৃতই দুর্ভাগ্যের কারণ হইবে।

নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশন সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সাধারণ বার্ষিক সভায় স্থির করিয়াছেন আগামী বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানে ভারতীয় ফুটবল দল প্রেরণ করিবেন। এই ব্যবস্থা কার্যকরী করিবার জন্য একটি বিশেষ কমিটিও গঠন করিয়াছেন। বাঙলার প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল খেলা বন্ধ থাকায় বাঙলার অনেক খেলোয়াড়ই এই ভারতীয় ফুটবল দলে স্থান পাইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবেন। অষ্ট্রেলিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন একটি দল ভারতে প্রেরণ করিতে চাহিয়াছেন। ফেডারেশন কতকগুলি সর্তে ঐ দলের ভ্রমণ অনুমোদন করিয়াছেন। অষ্ট্রেলিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন যদি ঐ সকল সর্ত মানিয়া আসিতে রাজি হন তখন বাঙলার খেলোয়াড়গণের অনেকেই অনুশীলনের অভাবে ইহাদের বিরুদ্ধে খেলিবার সুযোগ পাইবেন না। এমন কি যদি সৌভাগ্যবশতঃ সুযোগ আসে তাহা হইলেও অনভ্যাসবশতঃ নিজ শক্তি অনুযায়ী কৌশল প্রদর্শন করিতে পারিবেন না। বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানে একটি চৈনিক ফুটবল দল যোগদান করিবে। এই দল লণ্ডন যাইবার পথে ভারতে কয়েকটি প্রদর্শনী খেলায় যোগদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে। ফেডারেশন উহার ব্যবস্থা পশ্চিম ভারত ফুটবল এসোসিয়েশনকে করিতে বলিয়াছেন। অর্থাৎ চৈনিক ফুটবল দল বাঙলায় পদার্পণ করিবেন না। ১৯৩৬ সালে বাঙলার খেলোয়াড়গণ ও ক্রীড়ামোদিগণ যেরূপভাবে চৈনিক ফুটবল দলের খেলা দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন এইবারের অস্বাভাবিক অবস্থার জন্য তাহা হইতে বঞ্চিত হইলেন। সারা ভারতের ফুটবল খেলার সকল উৎসাহের কেন্দ্রস্থল বলিয়া যে গর্ব বাঙালী খেলোয়াড় ও পরিচালকগণ করিতেন তাহা বোধ হয় আর থাকিল না।

সন্তরণ

গত বৎসর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা বাঙলার সন্তরণ বিভাগের মূলে কুঠারাঘাত করে। সাঁতারুগণ অনুশীলন আরম্ভ করিয়া ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। পরিচালকগণ সাধারণ পুস্করিণীতে অনুষ্ঠান করা বিপজ্জনক বিবেচনায় বাধ্য হইয়া সব অনুষ্ঠান বন্ধ করিয়া দেন। এই বৎসর সবে মাত্র উৎসাহী সাঁতারুগণ জলে নামিতে আরম্ভ করিয়াছেন এই সময় পুনরায় গত বৎসরের ন্যায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা দেখা দিল। সেইজন্য আশঙ্কা হয় এইবারেও গত বৎসরের ন্যায় সন্তরণের সব কিছু অনুষ্ঠান বন্ধ থাকিবে।

যদি কলিকাতায় কয়েকটি সন্তরণ "পুল" থাকিত তাহা হইলে সাঁতারু ও পরিচালকদের এই বাধার সম্মুখীন হইতে হইত না। বোম্বাইতে বহুবার দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়াছে ও হইতেছে; কিন্তু সাঁতারুগণ ও পরিচালকগণ নিশ্চিন্ত মনে কার্য করিয়া যাইতেছেন। একটি সাধারণ সন্তরণ পুল তৈয়ারী করিতে ৫০ হাজার টাকার অধিক লাগে না। বাঙলায় এমন কোন সহৃদয় ব্যক্তি কি নাই, যিনি এই অভাবটি পূরণ করিতে পারেন? বাঙলার সাঁতারুগণ এখনও পর্যন্ত ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গর্ব করিতে পারেন। কিন্তু বৎসরের পর বৎসর যদি অনুশীলন ও অনুষ্ঠান বন্ধ থাকে, তবে এই গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হইবে না।

নববর্ষ উৎসব

নববর্ষ উৎসব বর্তমানে বাঙালীর জাতীয় উৎসবে পরিণত হইয়াছে। সারা বাঙলার কথা ছাড়িয়া দিলেও প্রবাসী বাঙালী যে যেখানে আছেন সকলেই আগামী পহেলা বৈশাখের দিন কিভাবে উৎসব পালন করিবেন এই আলাপ আলোচনায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সকলেই নিখিল বঙ্গ নববর্ষ উৎসব সমিতির কর্মসূচী অনুসরণ করিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া পড়িয়াছেন। এই জন্যই শত শত পত্র প্রবাসী বাঙালী সমাজ হইতে নিখিল বঙ্গ নববর্ষ উৎসব সমিতির কেন্দ্রীয় অফিসে জমা হইতেছে। ইহা খুবই আনন্দের বিষয়। বাঙালীর জাতীয় উৎসব বলিতে কিছুই ছিল না—নববর্ষ উৎসব এক নূতন পথের সন্ধান দিল।

নববর্ষ উৎসবের উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখিয়া মনে পড়িতেছে দীর্ঘ ১৭ বৎসর আগের কথা। হাওড়ার এক নিভৃত ঘরে বসিয়া কয়েকটি ব্যায়ামোৎসাহী যে উৎসবের সূচনা করেন তখন তাহাদের কত লাঞ্ছনা, কত ভ্রূকুটি না সহ্য করিতে হইয়াছে। কেহ অর্থ দিয়া সাহায্য করে নাই, নিজেরাই সাধ্যমত নিজেদের মধ্যে অর্থ সংগ্রহ করিয়া অনুষ্ঠান চালাইয়াছেন। ১৯৩৪ সালে সর্বপ্রথম যখন হাওড়া ময়দানে প্রকাশ্য অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিলেন কত লোকে কতই না কটূক্তি করিল। ইহাদের কেহই প্রচারে সাহায্য করিল না। একমাত্র 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও "দেশ" প্রচার বিষয়ে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল। এই দুই কাগজ এতদূর ভবিষ্যদ্বাণী করিল "ইহা একদিন জাতীয় অনুষ্ঠান হইতে বাধ্য।" সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিল "বিচ্ছিন্ন বাঙালী জাতিকে একতা, মৈত্রী ও সাম্যের বন্ধনে বাঁধিতে হইলে এইরূপ অনুষ্ঠানের বিশেষ প্রয়োজন আছে।" বর্তমানে আমরা দেখিয়া প্রকৃতই আনন্দিত যে আমাদের সেই উক্তি এতদিনে দেশবাসীর অন্তর স্পর্শ করিতে সক্ষম হইয়াছে। তবে এই সঙ্গে নববর্ষ উৎসবের একনিষ্ঠ প্রবর্তকদের প্রশংসা না করিয়া পারি না। তাঁহারা বহু বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও কর্মক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়েন নাই। ইহাদের পরেই জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি-সঙ্ঘের কর্মকুশলতার উল্লেখ করিতে হয়। বর্তমানে ইহা যে সারা বাঙলার ও প্রবাসী বাঙালীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে তাহার জন্য এই সঙ্ঘের পরিচালকগণ বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ।
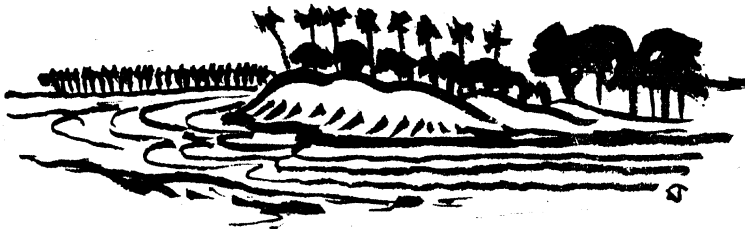
আগস্ট দাঙ্গার দরুণ ক্ষতির পর চলচ্চিত্র ব্যবসা সবে একটু স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসছে আর ঠিক সেই সময়ে বাধলো আবার দাঙ্গা। এবারও ব্যবসার তিনটি বিভাগই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যে সব অঞ্চলে সান্ধ্য আইন বলবৎ রাখা হয়েছে তার মধ্যে এক সম্প্রদায় অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে দিনে একটির বেশী প্রদর্শনী হতে পারছে না, কয়েকটি সিনেমাকে বন্ধও রাখতে হয়েছে। সান্ধ্য আইন

কারবার প্রডাকসন্সের 'সাজাহান' চিত্রে রাগিনী

বহির্ভূত এলাকাগুলিতে পূর্ববৎ তিনটি প্রদর্শনীই হচ্ছে বটে, তবে সন্ধ্যে এবং রাত্রির প্রদর্শনীতে দর্শক সমাগম পূর্ববৎ নয়। স্টুডিওগুলি প্রায় বন্ধই রয়েছে। যদিও স্টুডিওগুলির সবকটিই উপদ্রুত অঞ্চলের বাইরে এবং অনেকের পক্ষেই নির্বিঘ্নে ছবি তোলা সম্ভব হলেও মানসিক উত্তেজনা, অশান্তি এবং আতঙ্ক লোককে এমনিভাবে পেয়ে বসেছে যে, কারুর পক্ষে কোন কাজ করা সম্ভবই হচ্ছে না। আগস্টের জের গত বছরের দরুণ প্রচুরসংখ্যক ছবি জমে গিয়েছে, তাছাড়া নির্মীয়মান বহু ছবি সেই যে বন্ধ হয়েছিল, তারপর সে ধাক্কা সামলে চিত্রগ্রহণ আজও সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হয়নি। ছবি থেকে আমদানী শুধু শহরেই নয়, মফঃস্বলেও কমে গিয়েছে। দেখে শুনে অনেকে ছবির ব্যবসায় পা বাড়িয়েও শেষে পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল, এখন তাদের পুনরাবির্ভাব সম্ভাবনা এবারের দাঙ্গায় একেবারেই মিলিয়ে গেল। নতুন নতুন সিনেমা ও স্টুডিও তৈরীর যে হিড়িক দেখা দিয়েছিল, আগস্টের পর সেদিকে লোকের উৎসাহ একেই কমে গিয়েছিল, তার ওপর এ দাঙ্গায় সে উৎসাহ সম্পূর্ণরূপে উপে যাওয়া অসম্ভব নয়। যুদ্ধের দরুণ চলচ্চিত্র

রঙ্গজগৎ

ব্যবসার যেমন উন্নতি হ'য়েছিল, গত ক'মাসের অরাজকতায় তার অনেকখানিই অবনতি হয়েছে। যদিও যুদ্ধপূর্বকালের চেয়ে এখনকার আমদানী অনেক পরিমাণ বেশীই আছে এত উপদ্রব সত্ত্বেও এবং হয়তো অবস্থা শান্ত হলে আমদানীরও উন্নতি হবে; কিন্তু আতঙ্কভাব কেটে ব্যবসার প্রসার চেষ্টা বহুকালের জন্যে পিছিয়ে পড়লো। এ অবস্থায় চিত্রনির্মাতাদের বিশেষভাবে সতর্ক হওয়া দরকার হয়েছে। ছবির খরচ একান্তভাবেই কমিয়ে ফেলতে হবে। পূর্ববঙ্গ ও আসামে বাঙলা ছবির বাজার তো একেবারেই অনিশ্চিত এবং বেশ কিছুকাল বাঙলা ছবিকে শুধু পশ্চিমবঙ্গের ওপরই নির্ভর করে থাকতে হবে; সুতরাং খরচও নির্ধারিত হওয়া চাই সেই অনুপাতে। অবস্থা যদিও ভারতের সর্বত্রই সমান, তবে হিন্দী ছবির ভারতব্যাপী বাজার থাকায় বাঙলা ছবির চেয়ে ওতে লোকসান হবার সম্ভাবনা কম—এখনকার অবস্থার সঙ্গে একখানা ক'রে হিন্দী সংস্করণ রাখা তাই ভালই হবে। ভারতের যাবতীয় শিল্পের মধ্যে দাঙ্গার জন্যে চলচ্চিত্র শিল্পই সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়েছে, অথচ যুদ্ধের পর এই শিল্পটিরই প্রসার সম্ভাবনা ছিল সবচেয়ে উজ্জ্বল।

* * * * *

বেতারের সংবাদ প্রচার অনুষ্ঠানটি সরাসরিভাবে স্থানীয় কেন্দ্র থেকেই হওয়াটা যে কত বাঞ্ছনীয়, এই দাঙ্গার ব্যাপারে তা অত্যন্ত স্পষ্ট হ'য়ে ধরা পড়েছে। এবারের দাঙ্গা আরম্ভ হওয়ার দিন খবরের অসামঞ্জস্য জনসাধারণকেই শুধু নয়, শাসন পরিষদের নেতাদেরও পর্যন্ত আলোচনার বিষয় হ'য়েছে; যার ফলে প্রধান মন্ত্রী আশ্বাস দিতে বাধ্য হ'য়েছেন যে, তিনি স্থানীয় কেন্দ্র থেকেই সরাসরি খবর প্রচারের ব্যবস্থার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা বলবেন। এই ব্যাপার নিয়ে অনেকদিন ধ'রেই কথা উঠেছে, কিন্তু শত যুক্তি সত্ত্বেও এর অত্যাবশ্যকীয়তা কর্তৃপক্ষের মগজে পেঁছিতে পারেনি। যুদ্ধের সময় খবর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জন্যে খবর প্রচার কেন্দ্রীভূত করার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু যুদ্ধের পর প্রত্যেক প্রদেশই স্বতন্ত্রভাবে স্ব স্ব শাসনব্যবস্থার অধীনে চালিত হতে থাকায় ঘটনা এবং খবরের ধারাও গিয়েছে বদলে। সব জায়গার সব খবর একই ছাঁচে ঢেলে পরিবেশন করার তাই কোন মানে হয় না, অথচ একই কেন্দ্র থেকে যদি সব জায়গার খবর প্রচার করা হয়, তাহলে ভিন্ন ভিন্ন জায়গার জন্যে ভিন্ন ভিন্ন ছাঁচের ব্যবস্থা করাও হয়তো সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে প্রতি বেতার-প্রচার স্টেশনেই নিজস্ব খবর প্রচার-ব্যবস্থা থাকা একান্তভাবেই দরকার। দিল্লী রাজধানী হিসেবে যদি সব জায়গার খবর প্রচারের কেন্দ্র হয়ে থাকতে চায় তো থাকুক, কিন্তু সেই সঙ্গে প্রতি প্রদেশের নিজস্ব খবর প্রচার-ব্যবস্থা থাকতেই বা দোষ কি? বেতারের মুখ্য প্রয়োজনীয়তা হচ্ছে খবর প্রচার নিয়েই, কিন্তু সেই কাজেই যদি ফাঁকি থেকে যায়, তাহলে বেতারের সার্থকতা আর কিসে?

মিনার্ভা মুভিটোনের 'শমা' চিত্রে মেহতাব

বিবিধ

কলকাতায় বর্তমানে প্রায় ষাটজন পরিচালক ছবি তোলার কাজে রত আছেন, যার মধ্যে প্রায় পঁচিশজন একেবারে নবাগত।

* * * * *

বেলজিয়াম সরকার আগামী জুন মাসে ব্রাসেলসে একটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে; এর জন্যে ওখানকার সরকারি তহবিল থেকে ব্যয় করা হবে প্রায় দেড় কোটি টাকা।

* * *

ভারতীয় ছবি যে কতখানি অসার তা বোঝা যায় এই থেকে যে, আন্তঃ-এশিয়া সম্মেলনের মত এত বড় একটা অনুষ্ঠানে আগত প্রতিনিধিদের সামনে কোন একখানি ছবিও দেখাবার ব্যবস্থা করতে কেউ অনুপ্রাণিত হয়নি।

* * *

অভিনেত্রী কৌশল্যার সঙ্গে অভিনেতা ব্রহ্মানন্দের বিবাহ পাকাপাকিভাবে ঠিক হয়ে গেছে; অনুষ্ঠানটি এই মাসেই সম্পন্ন হবার কথা আছে। কৌশল্যা সম্প্রতি কলকাতায় ন্যাশনাল সাউণ্ড স্টুডিওতে গৃহীত তারাশঙ্করের 'পথের ডাক'এর হিন্দী সংস্করণে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করছেন।

দিল্লীতে 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্য অভিনয়

এশিয়া মহাসম্মেলনে আগত এশিয়ার বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবৃন্দের উপস্থিতিতে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদল কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা' অভিনীত হয়। জাভা, বালি, সিংহলের কাণ্ডি, ভারতের কথাকলি, মণিপুরী প্রভৃতি নৃত্যপদ্ধতির সমন্বয়ে এবং সংগীতের মাধুর্যে রসোত্তীর্ণ অভিনয় বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের মুগ্ধ ও অভিভূত করে। এখানে অভিনয়ের কয়েকটি বিশেষ দৃশ্যের আলোকচিত্র মুদ্রিত হইল।

দেশী সংবাদ

২৪শে মার্চ—ভারতের নূতন বড়লাট লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন আজ শপথ গ্রহণ করেন। উহার পর এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় তিনি বলেন যে, ১৯৪৮ সালের জুন মাস নাগাদ বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে দৃঢ়সংকল্প। সুতরাং আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই একটি মীমাংসায় অবশ্যই পৌঁছিতে হইবে।

বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দি এক সাক্ষাৎকার প্রসংগে বংগ বিভাগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন এবং বংগ বিভাগের পাল্টা হিসাবেই তিনি একটি সম্মিলিত মন্ত্রিসভা গঠনের উপর জোর দিতেছেন,—এই কথা অস্বীকার করেন।

নোয়াখালির সংবাদে প্রকাশ, এতাবৎ নোয়াখালির হাঙ্গামা সম্পর্কে ৯৯০ জনের মধ্যে ৭৫২ জন জামিনে খালাস পাইয়াছে। ৫৯ জনকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এবং মাত্র ১৭৯ জন এখনও জেল হাজতে আছে।

২৫শে মার্চ—কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে অর্থ-সচিব মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁ ঘোষণা করেন যে, বিশেষ বিবেচনার পর গভর্নমেণ্ট নিম্নোক্ত মর্মে মুনাফা-কর সংক্রান্ত প্রস্তাবসমূহ মানিয়া লইতে সম্মত হইয়াছেন—ইতিপূর্বে বিলে বিহিত করভার হ্রাস করা সম্পর্কে শতকরা যথাক্রমে ৬৲ টাকা ও ৫৲ টাকা করার পরিবর্তে একই হারে শতকরা ৬৲ টাকা করার প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হইবে এবং ব্যবসায় হইতে অর্জিত মুনাফার উপর শতকরা ২৫৲ টাকা হারে কর নির্ধারণ করার পরিবর্তে গভর্নমেণ্ট শতকরা ১৬৲ টাকা সাড়ে দশ আনা করিবার পক্ষপাতী।

আজ নয়াদিল্লীতে ইতস্তত আক্রমণের ফলে পাঁচজন লোক আহত হয়। তন্মধ্যে একজনের মৃত্যু হইয়াছে।

আসাম ব্যবস্থা পরিষদে অধ্যাপক পি সারওয়ান মন্দিরা সংরক্ষিত গোচারণ ভূমি সংক্রান্ত ঘটনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রীযুত বসন্তকুমার দাস বলেন যে, বড়পেটা মহকুমায় পুলিশের গুলীতে ৯ জন নিহত হইয়াছে এবং ৮ জন আহত হইয়াছে। নিহতদের মধ্যে একজন স্ত্রীলোকও আছে।

২৬শে মার্চ—কলিকাতায় পুনরায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা দেখা দেয় এবং বিভিন্ন ঘটনায় ১২ জন নিহত এবং শতাধিক লোক আহত হয়। পুলিশ কতকগুলি ক্ষেত্রে কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করে এবং কয়েকবার গুলীও চালায়। কলিকাতার পুলিশ কমিশনার সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে জোড়াসাঁকো, বড়বাজার, আমহার্স্ট স্ট্রীট, বহুবাজার মুচিপাড়া এবং তালতলা থানার এলাকাগুলিতে অদ্য বুধবার হইতে আরম্ভ করিয়া দুই দিনের জন্য সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা হইতে সকাল ৮ ঘটিকার সময়কাল পর্যন্ত সান্ধ্য আইন জারী করেন।

পোর্ট শ্রমিক ও অন্যান্য ধর্মঘটরত শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপনের জন্য ইতিপূর্বে বংগীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস আগামী ২৮শে মার্চ যে সাধারণ ধর্মঘট পালনের ব্যবস্থা করিয়াছিল, তাহা স্থগিত রাখা হইয়াছে।

বড়লাট লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন নয়াদিল্লীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মহাত্মা গান্ধী ও মিঃ জিন্নাকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন বলিয়া সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে।

পাটনায় পুলিশের বিদ্রোহ চরম অবস্থায় উপনীত হয়। একদল সৈন্য ও একদল বিদ্রোহী পুলিশ পরস্পরের প্রতি গুলী বর্ষণ করে। গুলী

বর্ষণের ফলে দুইজন পুলিশ নিহত ও একজন আহত হইয়াছে।

২৭শে মার্চ—আজ কলিকাতায় হাঙ্গামার ফলে ৪ জন নিহত ও ৪০ জন আহত হয়।

নয়াদিল্লীতে আন্তঃএশিয়া সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে জাতিগত সমস্যা ও দেশান্তরে বসবাস সম্পর্কে ৪ দফাযুক্ত একটি রিপোর্ট গৃহীত হইয়াছে।

২৮শে মার্চ—কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে দাঙ্গা-হাঙ্গামার ঘটনাবলীতে দশ জন নিহত এবং শতাধিক আহত হয়। এই সংখ্যা সরকারীভাবে সমর্থিত হয় নাই। এইদিন আরও একটি এলাকায়, যথা—মাণিকতলায় সান্ধ্য আইনের আদেশ জারী করা হয়।

বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি অধ্যাপক আবদুল বারিকে পাটনা হইতে প্রায় ১৮ মাইল পূর্বে খসরুপুরে গুলী করিয়া হত্যা করা হইয়াছে। অধ্যাপক বারি যখন গাড়িতে করিয়া যাইতেছিলেন, তখন তাঁহাকে গুলী করা হয়।

নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় সরকার বহিরাগতদের উচ্ছেদ সম্পর্কে প্রয়োজন হইলে আসাম সরকারকে সৈন্য দিয়া সাহায্য করিবার জন্য ইস্টার্ন কম্যাণ্ডকে নির্দেশ দিয়া এক আদেশ জারী করিয়াছেন। আরও জানা গিয়াছে যে, গোচারণের জন্য সংরক্ষিত আসামের পশ্চিম সীমান্তের কয়েকটি অঞ্চলে জনতার অভিযান চলিয়াছে। বাঙলা প্রদেশ হইতে বে-আইনীভাবে বসবাসের জন্য হাজার হাজার লোক আসামে প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

গয়ায় সৈন্যদলের সহিত বিদ্রোহী পুলিশদের তীব্র সংঘর্ষ হয়। উহার ফলে ৫ জন বিদ্রোহী পুলিশ নিহত এবং উভয়পক্ষে কয়েকজন আহত হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে অর্থ বিল বিনা ভোটে গৃহীত হইয়াছে।

২৯শে মার্চ—কলিকাতা শহরে দাঙ্গা-হাঙ্গামা জনিত অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। মধ্যরাত্রি পর্যন্ত সারাদিনের নানাবিধ হাঙ্গামার ঘটনায় এই-দিন ১৮ জন মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং শতাধিক লোক আহত হয়। হতাহতের এই সংখ্যা সরকারীভাবে সমর্থিত হয় নাই।

নয়াদিল্লীতে রাষ্ট্রীয় পরিষদে শ্রীযুত এস কে রায়চৌধুরী বাঙলা প্রদেশ বিভক্ত হইবে কিনা, এই প্রশ্নের মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত বাঙলা গভর্নমেণ্টকে কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের অর্থ সাহায্য প্রদান স্থগিত রাখিতে বলেন। শ্রীযুত রায় চৌধুরী প্রাদেশিক গভর্নরকে অবিলম্বে বাঙলা প্রদেশে দুইটি আঞ্চলিক মন্ত্রিসভা গঠনের নির্দেশ দিতেও প্রস্তাব করেন।

৩০শে মার্চ—বোম্বাই ও রাঁচিতে অকস্মাৎ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হইয়াছে। রাঁচিতে দাঙ্গার ফলে ৫ জন নিহত ও ১০ জন আহত হইয়াছে।

মহাত্মা গান্ধীর পরামর্শক্রমে বিহারের ধর্মঘট-কারী পুলিশের নেতা শ্রীযুত রামানন্দ তেওয়ারী কর্তৃপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।

আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির এক সভায় আসামের সমস্ত জেলায় আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

৩১শে মার্চ—কলিকাতা শহরে বিভিন্ন হাঙ্গামার ঘটনায় ৭ জন নিহত এবং প্রায় ৫০ জন আহত হয়। এই দিন হাওড়ার অবস্থা অতিশয় খারাপের দিকে যায় এবং সেখানে অন্যূন ১৪ জনের মৃত্যু ঘটে এবং দেড় শতাধিক লোক অল্প বিস্তর আহত হয়। হতাহতের সংখ্যাগুলি সরকারীভাবে সমর্থিত হয় নাই।

নয়াদিল্লীতে বড়লাট লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের সহিত মহাত্মা গান্ধীর সাক্ষাৎকার হয়। প্রায় সওয়া দুই ঘণ্টাকাল তাঁহাদের মধ্যে আলোচনা হয়।

ভারত ও বৃটিশ সরকারের মধ্যে সম্পাদিত অর্থনৈতিক চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়াতে আগামী-কল্য হইতে যুদ্ধ-পূর্বকালের ন্যায় দেশরক্ষার ব্যয়-ভার সম্পূর্ণভাবে ভারত সরকারকেই বহন করিতে হইবে। অবশ্য ভারতের বাহিরে নিযুক্ত ভারতীয় সৈন্যদের ব্যয়ভার যথাযোগ্যভাবে বৃটিশ সরকার হইতে আদায় করা হইবে।

ইন্দোনেশিয়ার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ সুলতান শারীর আন্তঃএশিয়া সম্মেলনে যোগদানের জন্য নয়াদিল্লীতে পেঁৗছেন।

বোম্বাইয়ে ছুরিকাহত হওয়ার ফলে ৭ জনের মৃত্যু এবং ১২ জন জখম হইয়াছে।

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র গত ৮ই ডিসেম্বর তারিখের সংস্করণে মালদহ জেলাস্থ চাপাই-নবাবগঞ্জের কোন ধর্মস্থান অপবিত্রকরণের সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় ১৯৪৬ সালের ৬নং বঙ্গীয় বিশেষ ক্ষমতা অর্ডিন্যান্স অনুসারে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত পত্রিকার সম্পাদককে দুই শত টাকা অর্থদণ্ড অন্যথায় দুই মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং মুদ্রাকর ও প্রকাশককে ৫০৲ টাকা অর্থদণ্ড অন্যথায় দুই সপ্তাহ সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

বিদেশী সংবাদ

২৫শে মার্চ—আজ বাটাভিয়ায় ওলন্দাজ সরকারের অধীনে ইন্দোনেশিয়ান যুক্তরাষ্ট্র গঠনের ভিত্তিতে ওলন্দাজ-ইন্দোনেশিয়ান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

৩০শে মার্চ—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌসচিব মিঃ জেমস ফরেস্টল গত রাত্রে এক বক্তৃতায় ঘোষণা করেন যে, যে সকল জাতি তাহাদের স্বাধীনতা বজায় রাখিতে ইচ্ছুক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহাদিগকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং প্রয়োজন হইলে সামরিক সাহায্যদান করিবে।

মার্কিণ বিরোধী কার্যকলাপ সম্পর্কে তদন্তের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত কমিটি এই মর্মে এক রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের কম্যুনিষ্ট পার্টি যে সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের দালাল উহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

অদ্য বৃটিশ দখলকার বাহিনী পূর্বে ইতালী অধিকৃত দোদেকানীজ দ্বীপপুঞ্জ গ্রীসের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন।

গত ২৯শে মার্চ চীনের ভারতীয় দূত মিঃ কে ডি মেনন পরিচয়পত্র প্রদানকালে যে বক্তৃতা দেন, তাহার উত্তরে জেনারেল চিয়াং কাইশেক ভারতের প্রতি এক অভিনন্দন বাণী প্রদান করেন। ভারতে বৃটিশ শাসন অবসানের শেষ দিন ধার্য হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করিয়া তিনি বলেন যে, ভারত ও চীন একই আদর্শে অনুপ্রাণিত।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক:—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড ১নং বর্মণ স্ট্রীট কলিকাতা।

দেশ

সূচীপত্র

'অ্যাসপ্রো'
পাওয়া যাচ্ছে!
ASPRO
MADE IN ENGLAND

সতীশ কবিরাজের
শ্বাসারি
হাঁপানি ও ব্রঙ্কাইটিসে
কবিরাজ
এস, সি, শর্মা এণ্ড সন্স

কেশ বিন্যাসে
মোহিনী
কেশতৈল
ওরিয়েন্টাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ কলিকাতা

CARAVAN
ক্যারাভ্যান 'এয়ার-কণ্ডিশন' করা সিগারেট
ন্যাশনাল টোব্যাকো কোম্পানী অফ্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড
ACI. C. 43

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন   সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

চতুর্দশ বর্ষ]   শনিবার, ২৯শে চৈত্র, ১৩৫৩ সাল।   Saturday, 12th April, 1947.   [২৩শ সংখ্যা

তীয় সপ্তাহ—

৬ই এপ্রিল জাতীয় সপ্তাহের সূচনা এবং ইই এপ্রিল তাহার পরিসমাপ্তির দিন। টাশ বৎসর পূর্বে গান্ধীজী ব্যক্তি-ধীনতার বিরোধী রাওলাট আইন ান্য করিবার পথে এই দিনে তে স্বাধীনতা-সংগ্রামে বলিষ্ঠ এবং প্রাণ- প্রেরণায় উদ্দীপিত করেন। জগতের ঠ মানবের নেতৃত্বে ভারতের রাজনীতিক না সেদিন এক অভিনব ধারা য়া প্রবাহিত হয়। ১৩ই এপ্রিলের ৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে হিন্দু-লমান এবং শিখের উষ্ণ শোণিতে বীর র যে বীজ উপ্ত হইয়াছিল, ১৯২১ সালে হাই অসহযোগ আন্দোলনের আকারে সমুদ্রহিমাচল আলোড়িত করে। ১৯৩০ লে গান্ধীজীর নেতৃত্বে স্বাধীনতার সংগ্রাম-পানায় প্রমত্ত হইয়া ভারতের সহস্র সহস্র সন্তান কারাবরণ করেন। ১৯৩২-৩৪ লে আইন অমান্য আন্দোলনের পথে ভারতের শক্তি ব্রিটিশের সঙগীন এবং গুলীর মুখে অপ্রতিহত থাকিয়া পশুবলকে ব্যর্থ রয়া দেয়। ১৯৪২ সালের ঐতিহাসিক াস্ট-বিপ্লবও সেই আন্দোলনের ধারাবাহিক-ই চরম পরিণতি। অন্যান্য দেশের স্বাধী-া-সংগ্রামের ইতিহাসেরই ন্যায় ভারতের ধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসের সমগ্র অধ্যায়ও ধর ধারায় রঞ্জিত; বস্তুত, রক্তদান ব্যতীত ন জাতিই স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারে সুতরাং ভারতকেও স্বাধীনতার রক্ত দিতে হইয়াছে এবং র ও হিংস্র বিজেতার বজ্র পাতিয়া লইতে হইয়াছে। কিন্তু স্বাধী-ার সাধনায় এই রক্ত দান এবং নির্যাতন ও না বরণ কোনদিন বৃথা যায় না; ভারতের ও তাহা ব্যর্থ হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের দ্বারা পরি-ত প্রাণপাতী এই সুদীর্ঘ সংগ্রামের সাফল্য-সূত্রে আজ ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতার তোরণ-দ্বারে সমাগত হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ-লিপ্সায় ইংরেজ সকলের সেরা। প্রবল স্বার্থলিপ্সু এই ব্রিটিশ জাতি আজ যে ভারত ছাড়িয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছে কংগ্রেসের অপরিমিত আত্মাবদানে প্রদীপ্ত সংগ্রামই তাহার মূলে রহিয়াছে। কংগ্রেসই আঘাতের উপর ক্রমাগত আঘাত হানিয়া ব্রিটিশ স্বার্থের বজ্র-মুষ্টি শিথিল করিয়া দিয়াছে। আর ১৪ মাস মাত্র বাকী, এই সময়ের পরই ভারতের পরিপূর্ণ শাসন কর্তৃত্ব ভারতবাসীদের হাতে আসিবে। সুতরাং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে ভারতের স্বাধীনতা-প্রয়াসী সন্তানদের সংগ্রাম শেষ হইয়া আসিয়াছে বলা যায়। কিন্তু প্রত্যক্ষ সংগ্রামের এইভাবে পরিসমাপ্তি ঘটিলেও পরোক্ষ সংগ্রামের সম্ভাবনা এখনও রহিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদীদের কূটনীতির খেলা যে আরও কিছুদিন চলিবে, এমন আশঙ্কার কারণ অদ্যাপি নিঃশেষে তিরোহিত হয় নাই। ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িকতা এবং প্রগতি-বিরোধী শক্তি জাগ্রত করিয়া তাহারা ভারতের শোণিত শোষণের রন্ধ্রপথ এখনও উন্মুক্ত রাখিতে চেষ্টা করিবে, ইহা স্বাভাবিক। আজ আমাদিগকে এ সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে; এবং ভারতের স্বাধীনতার শত্রুদের দ্বারা প্ররোচিত হিংস্র সেই আত্মঘাতী বর্বরতার গতি রোধ করিবার জন্য বীরের মত দাঁড়াইতে হইবে। এক্ষেত্রে কোনরূপ ভীরুতায় যেন আমরা কম্পিত না হই এবং নিজেদের আদর্শ অপরিম্লান রাখিবার জন্য কোনরূপ ত্যাগ-স্বীকারে সঙ্কুচিত না হই। জাতীয় সপ্তাহের বীর্যময় স্মৃতি আমাদিগকে এই সত্য সঙ্কল্পে উদ্দীপ্ত করুক।

নবীন বঙ্গের সাধনা—

বাঙলা দেশকে আমরা মরিতে দিব না। প্রকৃতপক্ষে দশ বৎসরকাল মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক শাসনে থাকিয়া বাঙলাদেশ বর্তমানে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে আসিয়া পেঁ'ছিয়াছে। জাতীয়তার আদর্শই বাঙলার প্রাণ। এখানকার ঐতিহাসিক সাধনা এবং সংস্কৃতি জাতীয়তা এবং সংহতিকেই মূল শক্তি স্বরূপে গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। বাঙলার মনীষা সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে সমগ্র ভারতের জাতীয়তার উদার আদর্শকে উদ্দীপ্ত করিয়াছে এবং এ দাবী আমরা সম্পূর্ণভাবেই করিতে পারি যে, এই পথে ভারতের রাষ্ট্রীয় চেতনা গড়িয়া তুলিয়াছে বাঙালী। সুদূর অতীতের কথা উত্থাপন করিতে চাহি না; মহাপ্রভু এবং তাঁহার পার্ষদ-গণের প্রেমময় প্রসঙ্গও হয়ত এক্ষেত্রে একান্ত আধ্যাত্মিক বলিয়া কিছু অবান্তর হইবে; কিন্তু রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র আধুনিক ভারতের জাগর্তি এবং তাহার মূলীভূত সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূলে ইঁহাদের সাধনা সর্বাঙ্গীন-ভাবে কাজ করিয়াছে। ভারতের রাষ্ট্রীয় সাধনার ক্ষেত্রে বাঙলার অবদান এই জাতীয়তাবাদ, ইহাই যদি আজ নষ্ট হয়, তবে বাঙলার থাকিল কি? বলা বাহুল্য, লীগ শাসনের নির্বিবেক ধর্মান্ধ বর্বর সাম্প্রদায়িক প্রতিবেশে বাঙলা তাহার এই প্রাণধর্মই হারাইতে বসিয়াছে এবং ভয়াবহ পরধর্ম তাহার আত্মাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। বাঙলার আকাশে আজ আর অবাধে বাতাস বহে না; বাঙলার শান্ত শ্যামল দিকচক্রবাল লীগের প্ররোচিত সম্প্রদায়িকতার ধূম্রজালে আঁধার হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুত সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার এবং নিপীড়নই লীগের শাসননীতির

প্রধান লক্ষ্য হইয়া পড়িয়াছে। নতুবা তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা বজায় থাকে না, লীগের দলের সাধের মন্ত্রিগিরির তক্তাউস টলায়মান হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানের স্বপ্ন ভাঙিয়া যায়। সুতরাং পাকিস্তানের দায়েই লীগ মন্ত্রিমণ্ডল চাই। আবার লীগ মন্ত্রিমণ্ডল বজায় রাখিবার দায়ে উৎকট সাম্প্রদায়িকতা বাঙলার শাসন-বিভাগে সর্বদা প্রকট রাখা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। বলা বাহুল্য, উদার মানবতার কোন আদর্শ সাম্প্রদায়িক স্বার্থের এমন হিংস্র প্রতিবেশের মধ্যে সঞ্জীবিত থাকিতে পারে না এবং এই অবস্থার যে কোনরূপ পরিবর্তন ঘটিবে, সুদূর ভবিষ্যতেও এমন কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। এরূপ অবস্থায় বাঙলায় প্রাণধর্ম যদি বজায় রাখিতে হয়, তবে লীগ-শাসনের এই বিষাক্ত প্রভাব হইতে তাহাকে মুক্ত করা ছাড়া উপায়ান্তর নাই। এই দিক হইতেই আজ বঙ্গবিভাগের দাবী অনিবার্য আকারে দেখা দিয়াছে। বস্তুত, ইহা বিভাগ বা বাঙলাকে খণ্ড করা নয়, বাঙলার অখণ্ড জাতীয়তার প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখা এবং সেই প্রাণপূর্ণ সংস্কৃতির আদর্শকে অপরিম্লান রাখার জন্যই ইহা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। ফলত, বাঙলা বিভক্ত হইতে চাহে না, তাহার চিরন্তন আদর্শ অখণ্ড ভারতের জাতীয়তার সূত্রেই সে সংহত এবং সমগ্র ভারতের সহিত সংযুক্ত থাকিতে চায়। প্রকৃতপক্ষে বাঙালী আজ যে দাবী করিতেছে, ভৌগোলিক আকারের এই যে বঙ্গ বিভাগ, এই বিভাগের ভিতর দিয়া বাঙলা সমধিক শক্তিশালীভাবে নিজের জাতীয়তার প্রভাব সম্প্রসারিত করিতে সমর্থ হইবে; অন্যথায় সে শক্তি তাহার থাকিবে না। এই দিক হইতে আমরা বঙ্গ বিভাগ সমর্থন করি এবং বাঙলায় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি সম্প্রতি এ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হইয়াছে মনে করি। আমরাও বলি, বাঙলার বর্তমান লীগ গভর্নমেণ্ট বাঙলা দেশকে ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডীর মধ্যে ফেলিয়া স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত করিতে চাহে, কিছুতেই বাঙালী ইহাতে রাজী নয়। বাঙলার যে অংশ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে থাকিতে চায়, তাহাকে সে অধিকার দেওয়া হউক এবং সেই অংশ লইয়া একটি পূর্ণাঙ্গ প্রদেশ গঠন করা হউক। বলা বাহুল্য, নবগঠিত এই বাঙলা প্রদেশে সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান থাকিবে না। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় নিজেদের ক্ষতি স্বীকার করিয়াও সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থে অবহিত থাকিবেন। বাঙলার উদার সংস্কৃতিরই ইহা অঙ্গ, সুতরাং লীগের সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধ প্রভাব হইতে বিমুক্ত বাঙলায় সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থহানির আশঙ্কা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠিবারই কারণ নাই। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান বাঙলায় সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার উৎপীড়নের আবহাওয়া লীগই সৃষ্টি করিয়াছে; নতুবা বাঙলার এ জিনিস ছিল না। নবগঠিত বাঙলা নিজেদের প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থ সযত্নে এবং শ্রদ্ধার সহিত রক্ষা করিবে; শুধু তাহাই নহে, বাঙলার লীগ প্রভাবাধীন অংশে ও যাহাতে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকে, তৎপ্রতি আগ্রহপরায়ণ থাকিবে। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুর সংখ্যা অধিক; তথাপি বর্তমান অবস্থায় পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে রক্ষা করিবার কোন শক্তি তাঁহাদের নাই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ যদি বাঙলার অপর কতক অংশ লইয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হয়, তবে তাহার এমন অসহায়ত্ব থাকিবে না। নূতন মনোবলে সে মাথা তুলিয়া উঠিবে। পশ্চিমবঙ্গের এই মনোবল পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মনেও শক্তি সঞ্চার করিবে এবং সংস্কৃতির মূলীভূত সেই শক্তি সর্বাঙ্গীন আকারে ভৌগোলিক রেখা অতিক্রম করিয়া পূর্ব ও পশ্চিম সর্বত্র সম্প্রসারিত হইবে।

আবার নোয়াখালি

নোয়াখালি হইতে পুনরায় নানারকম অশান্তি ও উপদ্রবের আতঙ্কজনক সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। সম্প্রতি শ্রীযুত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত এবং শ্রীযুত হারাণ ঘোষ-চৌধুরী সেখানকার অবস্থার প্রতি গান্ধীজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। গান্ধীজী উত্তরে তারযোগে জানাইয়াছেন—"অবস্থা যেরূপ মনে হইতেছে, তাহাতে সকলকে ঐ স্থান ত্যাগ করিতে হইবে, না হয় ধর্মোন্মত্ততার আগুনে পুড়িয়া মরিতে হইবে।" মিঃ সুরাবর্দী এবং তাঁহার হোম. ডিপার্টমেণ্ট যাহাই বলুন, এ সংবাদ আমরা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন মনে করিতে পারি না এবং তাঁহাদের কথাই বেদবাক্য বলিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহি। আমরা অনেকবার বলিয়াছি, সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট সত্তাকে বাঙলার একটা ব্যাপক অঞ্চলে পশুবলে পিষ্ট করিবার অভিসন্ধিপূর্ণ পরিকল্পনা লইয়াই নোয়াখালিতে লীগের তরফ হইতে অরাজকতা জাগাইয়া তোলা হয়। সেই কর্মপদ্ধতি ক্রমিকভাবে আজও যে কার্যে পরিণত করা হইতেছে এবং ইহার পিছনে মন্ত্রিমণ্ডলেরও প্রশ্রয় রহিয়াছে, নোয়াখালির অবস্থাদৃষ্টে এই সত্য সুস্পষ্ট হইয়া পড়ে। বস্তুত সভ্য-শাসন বাঙলা হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে এবং তৎপরিবর্তে বন্য বর্বরের বিভীষিকা এখানে সম্প্রসারিত হইতেছে। বাঙলা দেশের শাসন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ যে ধারায় চলিতেছে, তাহাতে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার হ যে কোন অপরাধের অনুষ্ঠানই এখানক মন্ত্রিমণ্ডল এবং তাঁহাদের অনুগত শাসক দৃষ্টিতে দূষণীয় নয়। লীগ মন্ত্রীরা পাকিস্থ দাপটে মাতিয়া সংখ্যালঘিষ্ঠদের সম্বন্ধে ন নীতি কোন কিছুই গ্রাহ্য করিতেছেন এবং গভর্নর নিয়মতান্ত্রিকতার জ নিজেকে জড়াইয়া তিনি যে কত বড় জড়বু পদে পদে তাহাই প্রতিপন্ন করিতেছে সারোয়ার্দি-বারোজ শাসনের এই সংকট হইতে বাঙলার সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদা বাঁচাইবে কে? আমরা নিশ্চিত এই সত্য উপলব্ধি করিতেছি বাঁচাইবার কেহ নাই। আজ বাঙলার সং লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে নিজেদের বীর্যব বাঁচিতে হইবে। বাঙালীকে বুঝিতে হ যে, প্রাণ যদি দিতেই হয় মনুষ্যত্বের আদর্শের প্রেরণা অন্তরে ল দৌরাত্ম্যের গতি প্রতিহত করিয়া বীরের প্রাণ দান করাই শ্রেয়ঃ। দুর্বলতাই এ সবচেয়ে বড় অপরাধ। যে দুর্বল ভগবানই তাহাকে রক্ষা করেন না। জাতি সমাজকে বাঁচাইবার জন্য অতীতে বাঙা মনীষা ও বীর্য যেমন বৈপ্লবিক অগ্নি প্রেরণায় কার্যকরী হইয়াছিল, বর্তমান নি কালেও বাঙলার ব্যথিত মানবাত্মা মনীষার জাগরণ ও অকুতোভয় বী পুরুষদের অভ্যুত্থানেরই প্রতীক্ষা করি বাঙালী আজ বীরের রত করুক; অশ্রু বর্ষণ করিবার ত নাই; জাতির জন্য, সমাজের জন্য, স জন্য সংগ্রামপ্রয়াসী সাহসী সন্তানদেরই জননী নিরত কামনা করিতেছেন। আমাদি যদি বাঁচিতে হয়, তবে ভীরু-জীবনের দুর্গ দুর্গতি লইয়া যেন আমরা না বাঁচি।

কলিকাতার শান্তি

আজ কয়েকদিন হইল কলিকাতা এবং শ তলীতে অপেক্ষাকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয় কিন্তু আমরা এই শান্তিকে জীবনের শ বলিব না। এ শান্তি ভীত এবং মৃতের জ শান্তি। কার্যতঃ বাঙলার রাজধানীতে উৎ বাতি নিভিয়া গিয়াছে, একটা অব্যক্ত উদ্ব শহরবাসীর মন সর্বদা আচ্ছন্ন। কখন কি কেহ বলিতে পারে না, এমনই অবস্থা। কেবল একদিক হইতেই নয়, গুণ্ডাদের ছ ছোরার ভয় তো আছেই, কোন মুহ কপটাচারীদের দুরভিসন্ধির ইঙ্গিতে ভা ভিগণীর ছাড়িয়া বাহির হইবে, কিছুই স্থি নাই; কিন্তু পুলিসের ভয় ততোধি গুণ্ডাদের উপদ্রব হইতে বাঁচিবার উপায় আছে, কিন্তু এই কয়েকদিনের তিক্ত অভিজ্ঞ

কলিকাতা শহরবাসী বাঙলার সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় এই সত্য মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছে যে, সশস্ত্র শান্তিরক্ষাকারী পুলিসের উপদ্রব হইতে বাঁচিবার কোন উপায় তাহাদের নাই। বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী আমাদিগকে শান্তি ও প্রীতির কথা শুনাইয়া থাকেন। এবারও কয়েকদিন আমরা তাঁহার মুখে সে কথা শুনিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। সুরাবর্দী সাহেবের মতে কলিকাতার সাম্প্রতিক দাঙ্গাহাঙ্গামার আতঙ্ক পূর্বের মত ব্যাপক হয় নাই এবং কোন সম্প্রদায় ঘরবাড়ি ছাড়িয়া যায় নাই। সুরাবর্দী-চরিত্রের বিশেষত্ব এই যে, তিনি কথায় যাহাই বলুন না কেন, নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য সর্বাবস্থায় সমান নির্বিকার চিত্তে অসঙ্কোচে এবং অনন্যলক্ষ্যে চলিতে পারেন এবং এই দিক হইতে তাঁহার চাতুর্যপূর্ণ নীতির সার্থকতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ পোষণ করা চলে না। বাঙলা দেশের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে অন্তরে বৈষম্যমূলক মনোভাব একান্তরূপে পোষণ করিয়া এবং তদ্দ্বারা প্রভাবিত উপলার স্বার্থের ক্রূর নীতি নিয়ন্ত্রণে দৃঢ় থাকিয়া মিঃ সুরাবর্দী যখন পারস্পরিক শান্তি ও সদিচ্ছার কথা অভিব্যক্ত করেন তখন তাঁহার এই বিবেকবিহীন নির্লজ্জতায় একটা সঙ্কল্প-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় এবং বোধ যায় সত্যই তিনি একজন শক্ত মানুষ। কিন্তু ভুক্তভোগী যাহারা, তাহাদের কাছে, সুরাবর্দী সাহেবের চাতুর্যের মূলীভূত নির্মমতা তাঁহার ভাষা-ভঙ্গীময় কৃত্রিম অভিনয়ের আবরণ হইতে সর্বাংশেই উন্মুক্ত হইয়া পড়ে। এক্ষেত্রেও তিনি যাহাই বলুন, শহরে আতঙ্কের ভাব সর্বত্র রহিয়াছে এবং শহরের কয়েকটি অঞ্চলের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় ঘরবাড়ি ছাড়িয়া পলাইয়াছে এবং এখনও পলাইতেছে। তবে এসম্বন্ধে একটা বক্তব্য এই যে, গুণ্ডার আতঙ্ক অপেক্ষা সুরাবর্দী সাহেবের প্রশ্রয়প্রাপ্ত পাঠান পুলিসের অত্যাচার বর্তমানে আতঙ্ক সমধিক হইয়া উঠিয়াছে। প্রকাশ্যভাবে পুলিস অশান্তি দমনের নামে শহরের বুকে সম্প্রদায় বিশেষের উপর যে অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিয়াছে, তাহার তুলনা মিলে না। সে সব নিষ্ঠুর অত্যাচারের কথা শুনিলে মানুষ যে তাহার রক্ত গরম হইয়া উঠে। চিৎপুর অঞ্চলের একটি হিন্দু বস্তীতে দুর্বৃত্তেরা আগুন ধরাইয়া দেয়, পুলিস গিয়া অগ্নিকাণ্ডে বিপন্নদের উপরই গুলী বর্ষণ করে। স্থানীয় থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগার উপস্থিতিতেই সমগ্র পুলিসের এই দৌরাত্ম্য অনুষ্ঠিত হয়। বেলিয়াঘাটা থানার এলাকাধীন মাণিকতলা অঞ্চলের একটি গৃহে পুলিস খানাতল্লাসীর নামে যে উপদ্রব করিয়াছে, কোন সভাদেশের গভর্নমেণ্টে তাহা সম্ভব হইতে পারে না। তাহারা শিশু এবং মহিলাদিগকেও আঘাত করিতে ইতস্তত করে নাই। একটি অন্তঃসত্ত্বা মহিলা পুলিসের প্রহারে অজ্ঞান হইয়া পড়েন। বস্তুতঃ ছোরাধারী গুণ্ডারাও সম্ভবতঃ এতটা অমানুষ বর্বর অত্যাচার করিতে হয়ত লজ্জাবোধ করিত। প্রকৃতপক্ষে সুরাবর্দী সাহেবের পাঠান পুলিস দল নিতান্ত নরপশুদিগকেও ছাড়াইয়া যাইতেছে। ইহারা খানাতল্লাসীর অছিলায় লোকের বাড়ির দরজা ভাঙিয়া ভিতরে ঢুকিতেছে। শহরের ভদ্রপল্লীর কয়েকটি বোর্ডিংয়ে কয়েকদিন ধরিয়া পুলিসের তাণ্ডব চলিয়াছে। তাহারা নির্বিচারে ভদ্রলোকদিগকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। থানায় এসব ভদ্রলোকদের উপর নানারূপ দুর্ব্যবহার অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়াও অভিযোগ। কয়েকদিন আগে দিল্লীর 'হিন্দুস্থান টাইমস' পত্রের কলিকাতার সংবাদদাতার অফিসে ঢুকিয়া পুলিস কিরূপ অত্যাচার করে, তিনি সংবাদপত্রের একটি বিবৃতি প্রদান সূত্রে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। ভদ্রলোক বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত বোধ হয়, ইহাই তাঁহার প্রধান অপরাধ। কলিকাতা পুলিসের নূতন বিধানে দেখিতেছি, যাহারা প্রকৃত গুণ্ডা, তাহারা নির্বিবাদেই দৌরাত্ম্য চালাইতেছে: পক্ষান্তরে তাহাদের চেয়ে সম্প্রদায় বিশেষের নিরপরাধ ব্যক্তি এমন কি, নারী এবং শিশুও পুলিসের দৃষ্টিতে বেশী অপরাধকারী বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। শহরের বর্তমান শান্তির পটভূমিকা এইরূপ। এমন অবস্থায় শহরে যদি খুন জখম, প্রভৃতি ঘটনার সংখ্যা সত্যই হ্রাস পাইয়া থাকে, তবে আমরা এই কথাই বলিব যে, পুলিশের চেষ্টার ফলে তাহা ঘটে নাই। প্রকৃতপক্ষে পুলিসের কার্য শান্তির সহায়ক হয় নাই। পক্ষান্তরে সম্প্রদায়-বিশেষের প্রতি নিষ্ঠুর উৎপীড়ন চালাইয়া তাহারা অশান্তি, উত্তেজনা এবং ত্রাসের আবহাওয়াই সৃষ্টি করিয়াছে। মোটের উপর শহরের সাময়িক এই স্তব্ধতাকে আমরা শান্তি বলিতে সাহসী হইতেছি না। শহরে যদি প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তবে পুলিস বিভাগে সাম্প্রদায়িকতার নীতিকে আগে উৎখাত করিতে হইবে ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

বাঙলায় সাহিত্য-সাধনা

সম্প্রতি কলিকাতা শহরে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের চতুর্বিংশতিতম অধিবেশন হইয়া গেল। প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন প্রবাসী বাঙালীগণের সঙ্গে স্বদেশবাসী বাঙালী সমাজের প্রধান যোগসূত্র। বৎসরান্তে ইহার অধিবেশন উপলক্ষে প্রবাসী ও স্বদেশবাসী বাঙালীরা মিলিত হইয়া থাকেন এবং পরস্পরের মধ্যে ভাব-বিনিময় করেন। এইভাবে সমগ্র ভারতের সঙ্গে এই সম্মেলন বাঙালী সমাজের সংস্কৃতির পথে সংযোগ রক্ষা করিতেছে। বলা বাহুল্য, পারস্পরিক সংবেদনা এবং মনোভাবের সঙ্গতিই বাঙলার সংস্কৃতির মর্মকথা। বাঙলা দেশের সাহিত্যে এই সংস্কৃতিরই সর্বতোময় অভিব্যঞ্জনা সাধিত হইয়াছে এবং সংস্কৃতির এই সম্পদে বাঙলা সাহিত্য ভারতে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে। মানব-সংস্কৃতির সমুন্নত মহিমার প্রাণবলে উজ্জ্বল এই বাঙলা সাহিত্য বাঙালী জাতির রাজনীতিক অগ্রগতির মূলেও সকল শক্তি সঞ্চার করিয়াছে। শুধু ইহাই নয়, সমগ্র ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাঙলার আত্মত্যাগী সন্তান দলের প্রভাব সূত্রে এই সাহিত্যই প্রত্যক্ষভাবে প্রেরণা যোগাইয়াছে। সেই প্রেরণায় ভারতে নবযুগের উদ্বোধন ঘটিয়াছে। আজ বাঙলার বড়ই বিপদ সমুপস্থিত। বাঙলার সেই সংস্কৃতি মধ্যযুগীয় সাম্প্রদায়িকতায় অভিদ্রুত হইবে, এইরূপ আশঙ্কা চারিদিক হইতে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। বাঙলার সংস্কৃতিকে সাম্প্রদায়িকতার এই বিষময় প্রভাব হইতে মুক্ত রাখিতে না পারিলে বাঙালী জাতির গর্ব করিবার কিছুই থাকিবে না এবং এই বাঙলা দেশ বন্য বর্বরের হানাহানির ক্ষেত্রে পরিণত হইবে। সম্মেলনে সমাগত প্রতিনিধিগণ সকলেই এজন্য আতঙ্ক প্রকাশ করিয়াছেন। ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য শাখার সভাপতিস্বরূপে ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি মনীষিবর্গ এই দিকে জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। বস্তুত সাহিত্যিকদের উপরই জাতির ভবিষ্যৎ বিশেষভাবে নির্ভর করে এব[ং] প্রধানতঃ তাঁহাদেরই প্রাণপূর্ণ সাধনায় বাঙলা দেশ এই বর্বরতার উপদ্রব হইতে স্থায়িভাবে উদ্ধার পাইতে পারে। সাহিত্যিকগণই জাতি[র] মর্মমূলে বাঙলার সংস্কৃতির উদার বল[কে] উচ্ছল করিয়া তুলিয়া বাঙলার বর্তমা[ন] বিপদকে প্রতিহত করিতে পারেন। জাতি[র] প্রাণধারার সঙ্গে সাহিত্যের এই নিবি[ড়] ঘনিষ্ঠতা সাধনের প্রয়োজনীয়তার দিকটা শ্রীযু[ক্ত] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহ[ার] অভিভাষণে সুন্দরভাবে অভিব্যক্ত করিয়াছেন[।] সাহিত্যই জগতের বিভিন্ন জাতিকে যুগে যু[গে] দুর্গতির মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছে এ[বং] জাতির অন্তরে বিপ্লবের বেদনা জাগাইয়া ম[রা] নদীতে জোয়ারের জল বহাইয়া আনিয়াছে[।] বঙ্গ সাহিত্য-মন্দিরের সেবা-ব্রতী সাধক[দের] প্রাণ-রসের প্রাচুর্যে জাতির বর্তমান অবস[াদ] এবং অবীর্য দূরীভূত হইবে; বাঙালী আ[বার] নূতন শক্তিতে জাগিয়া উঠিবে।

বড়লাট-প্রাসাদে প্রথম সাক্ষাৎকালে বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ও তাঁহার পত্নীর সঙ্গে মহাত্মাজী।

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় সপ্তাহ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ভাঙ্গী কলোনীতে সূত্রযজ্ঞ অনুষ্ঠান পরিচালনা করিতেছেন।

এসিয়া মহাসম্মেলনে গান্ধীজী
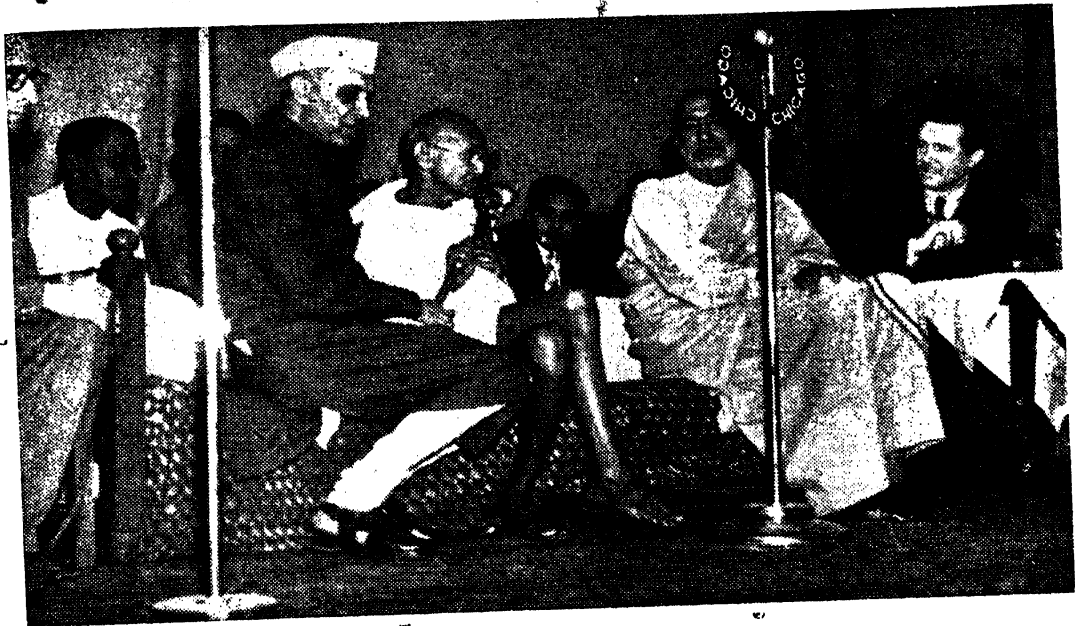
এশিয়া মহাসম্মেলনে সীমান্ত গান্ধী, পণ্ডিত নেহরু ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দসহ মহাত্মা গান্ধী

মহাত্মা গান্ধী এশিয়া মহাসম্মেলনের শেষ দিবসের অধিবেশনে বক্তৃতা করিতেছেন

খুড়ো ট্রাকে চাড়য়াই বলিলেন—"একতাই সর্বনাশের মূল।" আমরা তাঁর মুখের দিকে বিমূঢ়ের মত তাকাইতেই তিনি বলিলেন—এইটি খুড়োর উক্তি নয়, রীতিমত মহাজন বাক্য, বলিয়াছেন কায়েদে আজম—United India will only result in

destruction. অতঃপর সদা মিথ্যা কথা কহিবে, চুরি করা বড় পুণ্য, ইত্যাদি যুগোপযোগী উপদেশামৃত বিতরণ করিলেই উন্মার্গগামী মানবসন্তানের সত্যিকারের কল্যাণ হইবে।"

* * * *

ফিরোজ খাঁ নুন বলিয়াছেন—

"Muslim League Workers in the Punjab left no stone unturned to promote good relation among all sections of the Punjabis"

খুড়ো বলিলেন—Good relationএর জন্য কিনা জানি না তবে প্রতিটি ইট যে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া তছনছ করা হইয়াছে তা দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চলের লোকালয়গুলির ছবি দেখিয়াই বুঝিয়াছি।

* * * *

উড়িষ্যা পরিষদের অধিবেশনের সময় হঠাৎ পরিষদগৃহে নাকি একটি পেচকের আবির্ভাব হয়। ইনি কোন্ Constituencyর প্রতিনিধি তা সংবাদে বলা হয় নাই। "বাঙলার পরিষদ ভবনগুলি এখন শূন্য; পেচকীস্থানের প্রতিনিধিরা এই সুযোগ গ্রহণ করিলে উপকৃত হইবেন"—মন্তব্য খুড়োর।

* * *

বাংলায় ১২০০০০ শিক্ষক ২রা এপ্রিল হইতে ধর্মঘট করিয়াছেন। শুনিয়াছিলাম এই ধর্মঘট আরম্ভ করা হইবে ১লা এপ্রিল হইতে। কিন্তু পাছে ইহাকে কর্তৃপক্ষ ১লা এপ্রিলের পরিহাস মাত্র মনে করেন তাই হয়ত শেষ পর্যন্ত ধর্মঘটের তারিখ বদল করা হইয়াছে। ইহার পরও যদি সরকার এ সম্বন্ধে উদাসীন থাকেন তাহা হইলে All fools dayর গণ্ডী কোন তারিখের অনুশাসন মানিবে না!!

* * * *

লক্ষ্ণৌতে পনেরজন 'রাজা'—১৪৪ ধারা আইন অমান্য করিয়াছেন। এই "রাজন্যবর্গ" তপশীলী সম্প্রদায়ের পোনর জন লোক মাত্র। পিতৃপরিচয়ে সকলেই বলিয়াছেন তাঁহাদের পিতা অচ্যুতানন্দ। এই রাজা রাজা খেলটায় হয়ত রাজভোজদের সায় আছে। খুড়ো বলিলেন—"এই ঘটনায় একটি নৃত্য-

সম্বলিত থিয়েটার সঙ্গীতের কথা মনে পড়িল—

আমি বাদশা বনেছি
আমি বেগম সেজেছি
বাদশা বেগম ঝম্‌ঝমাঝম্ বাজিয়ে চলেছি—

এই ঝম্ ঝমাঝমের একটু ব্যবস্থা করিলেই "রাজকীয়" নৃত্য ছন্দমধুর হইয়া উঠে। কথাটা ডাঃ আম্বেদকার ও রাজভোজ মহাশয় বিবেচনা করিয়া দেখিবেন!"

* * * * *

কলিকাতায় সম্প্রতি Services Exhibition হইয়া গেল। যুদ্ধের সময় ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রের অভিনব সমাবেশ দেখিয়া আমরা আনন্দিত এবং উপকৃত হইলাম। এই সঙ্গে 'জীপের' খেলাটা জমাইয়া তুলিলে Exhibi-

tion পূর্ণ হইত—কেননা যুদ্ধের সময়ে জীপের Stratagic এবং Tragic অবদান নিতান্ত সামান্য নয়।
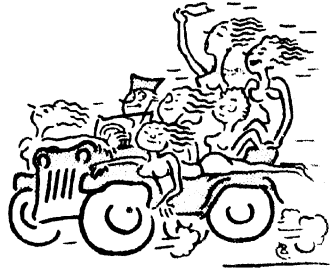
* * *

একটি সংবাদে প্রকাশ, জার্মানীতে খাদ্য সমস্যার জন্য ১৮৬ জন নরনারী (জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, দুই মাসে) আত্মহত্যা করিয়াছেন—আর প্রেমের ব্যাপারে আত্মহত্যা করিয়াছেন মাত্র ১৯ জন। খুড়ো বলিলেন "জার্মানীর সত্যই অধঃপতন হইল, প্রেমের চাইতে খাদ্যকেই তারা বড় করিয়া দেখিলেন।"

* * * * *

সম্প্রতি নেপোলিয়ান বোনাপার্টের মাথার চুল নাকি খুব উচ্চ মূল্যে বিক্রী হইয়াছে বলিয়া একটি সংবাদ প্রকাশ হইয়াছে। "তাঁহারও কি আমাদের মত দেনা দায় ছিল?" —জিজ্ঞাসা করেন খুড়ো।

* * * *

বৃটিশের বৈজ্ঞানিকরা পনের বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া নাকি সম্প্রতি Fire proof Fabric আবিষ্কার করিয়াছে। "Fabric-এর বালাই আমাদের নাই। সুতরাং এই আবিষ্কারে আমাদের কোন উপকার হইবে না। তার চাইতে Fire-proof বাড়ী এবং কুঁড়েঘর আবিষ্কারের সন্ধান জানিতে পারিলে আমাদের উপকার হইত। কলিকাতায় সম্প্রতি এই দুইটি বস্তুর উপরই বৈশ্বানরের বিশেষ লোভ পরিলক্ষিত হইতেছে"—বলেন বিশু খুড়ো।

অশ্বত্থের অভিশাপ

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

(৫)

সেদিন নবীননারায়ণ তখনো অন্দর ছাড়িয়া বৈঠকখানায় আসিয়া বসে নাই, এমন সময়ে কাছারী বাড়িতে একটা গোলমাল শুনিতে পাইয়া কাছারীতে আসিয়া উপস্থিত হইল, শুধাইল—ব্যাপার কি? এত সকালেই কি হল আবার।

কেহ কোন উত্তর দিল না।

নবীন বলিল—তাহলে কিছু হয়নি, তবে গোল হচ্ছিল কিসের?

তখন নিরুপায় যোগেশ বলিল—হুজুর বড়ই বিপদ হয়ে গিয়েছে। বাজুবন্দ মহাল থেকে লাটের টাকা আসছিল, মাত্র দু'জন পাইক সংগে ছিল, দশানির লাঠিয়ালে সব লুটে নিয়েছে।

ঘটনা শুনিয়া নবীন একমুহূর্ত নিস্তব্ধ হইয়া থাকিল, তারপরেই পূর্ব অভ্যাসমতো হাঁকিল—মিলন সর্দার—

কিন্তু আজ সেই ডাকের উত্তরে ছায়াবৎ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল না। তার বদলে রর ভাই সোনা সম্মুখে আসিয়া লাঠি-যোগে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল, বলিল—জুর।

নবীন বলিল—ওরা লাটের টাকা লুটে য়ে গিয়েছে। সহ্য করবো নাকি? কি বলিস?

মিলন সর্দার হইলে কোন কথা না বলিয়া র একটা সেলাম মাত্র করিয়া প্রস্থান করিত। ন্তু সোনা কথা বলার সুযোগ পরিত্যাগ রতে পারে না। সে বলিল—হুজুর, এরই া ভাবনা! তুমি চুপ করে বসে দেখো। মরা গিয়ে মাদি কুটকে মেরে এখনি ফিরে সছি। এই বলিয়া সে প্রস্থান করিল।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, রাগা ইহাদের চালান দিয়াছিল। কিন্তু দানি ও ছ'আনি জামিন হইয়া নিজ নিজ ঠিয়ালদের মুক্ত করিয়া আনিয়াছিল।

* * *

দশানির কাছারীর উঠানে কীর্তিবাবু র্বে পদচারণ করিয়া ফিরিতেছিল, গোবর-দার উপরে উন্নতচূড়, স্ফীতবক্ষ মোরগ-াজের মতো। হাতে তাহার প্রকাণ্ড একখানা মের দাঁতন। সেখানাকে সবলে দন্তপংক্তির তাই ঘষিতেছিল— সোমে আসিয়া বেহালার কী২

উত্তাল ছড় যেমন থামিতে চায়, অনেকটা তেমনি। হঠাৎ কীর্তি বলিয়া উঠিল—সাবাস্ ইদ্রিস, সাবাস গফুর! হ্যাঁ, বাহাদুর বটে! দুর্গা ওই বড় দুটো তোড়া ওদের দু'জনকে দাও! এই তো মরদের মতো কাজ! আলিবর্দি যা করতে পারেনি, ওরা করেছে।

শীতের রৌদ্রে উঠানের মধ্যে বসিয়া ইদ্রিস, গফুর, তেওয়ারি, ধনঞ্জয় প্রভৃতি রোদ পোহাইতে পোহাইতে জিরাইতেছিল। পাশে তাহাদের লাঠিগুলো পড়িয়া আছে। কাছারীর বারান্দায় ছোট বড় কয়েকটি টাকার তোড়া। ইহারাই আজ শেষ রাত্রে ছ'আনির লাটের টাকা লুটিয়া আনিয়াছে। তাহারা নিজেদের মধ্যে মৃদুস্বরে কথা বলিতেছিল।

সহসা আলিবর্দির কথা মনে পড়িতেই কীর্তিনারায়ণ তাহার প্রতি একপ্রকার অব্যক্ত ক্রোধ অনুভব করিল। সে যে মরিয়াছে, তজ্জন্য কীর্তি দুঃখিত নয়, কারণ মানুষ তো একদিন মরিবেই। কিন্তু তৎপূর্বে সে যে অশথতলাটা তাহার দখলে না আনিয়া দিয়া মরিল—তাহার এ-অপরাধ কীর্তি আজিও ক্ষমা করিতে পারে নাই। কীর্তি ইহাকে একপ্রকার বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়া মনে করে। সে অনেক সময়ে ভাবিয়াছে, বেটা নেইমান। এতদিন তাহাকে ভাত-কাপড় দিয়া পুষিলাম, সে কি এইভাবে ফাঁকি দিবার জন্যই! ভাবিতে ভাবিতে তাহার কপালের শিরা স্ফীত হইয়া উঠিত—ইস, তাহাকে যদি একবার পাইতাম। কিন্তু তাহাকে আর পাইবার উপায় নাই জানিয়া অব্যক্ত, অচরিতার্থ ক্রোধে সে পুড়িয়া মরিত।

কীর্তি বলিল—হ্যাঁ, ওদের বড় দুটো তোড়া, আর বাকি সকলকে সমানভাবে ভাগ করে দাও! একটু থামিয়া বলিল—ওরা তখন কি করলো গফুর।

গফুর বলিল—কি আর করবে কর্তা। তোড়া ফেলে দিয়ে বেতবনে গিয়ে ঢুকলো!

—বেতবনে গিয়ে ঢুকলো! আহা বেচারা-দের গা নিশ্চয় কেটে গিয়েছে! হাঃ হাঃ করিয়া কীর্তিবাবুর সে কি প্লীহা-কম্প হাসি!

এই বর্ণনাটা সকাল হইতে না-হোক পঞ্চাশবার সে শুনিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই তৃপ্তি হয় না!

—কেন বেতবনে কেন? তাদের সোনা

এম-এ পাশ করা ছোটবাবু বোধ হয় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে চিঠি লিখছে? —হাঃ হাঃ! বাস এ এম-এ পাশ করা নয়, জমিদারি করা। হাঃ হাঃ—কীর্তিবাবুর হাসি আর থামিতেই চায় না।

দুর্গাদাস গুণিবার উদ্দেশ্যে একটি তোড়ার মুখ খুলিতেই চিক্কণ শুভ্র, শীতল টাকাগুলি ইস্কুল-ছুটি-পাওয়া বন্ধনমুক্ত বালক দলের মতো মেঝেয় লাফাইয়া দিয়া পড়িয়া গড়াইয়া ছুটিয়া চলিতে আরম্ভ করিল, আর লাঠিয়ালের দল লুব্ধ নেত্রে, লুব্ধ কর্ণে, লুব্ধ নাসিকায় তাহাদের রূপ, রব ও গন্ধ গ্রহণ করিতে থাকিল। টাকার একপ্রকার অতীন্দ্রিয় গন্ধ আছে, সেই সৌরভে লুব্ধ হইয়া মানব- মৌমাছি দেশবিদেশ হইতে ছুটিয়া আসে। সকলে যখন এইভাবে ব্যস্ত, তখন এক কাণ্ড ঘটিল। খোলা দেউড়ি দিয়া কালবৈশাখীর অতর্কতায় ছ'আনির লাঠিয়ালেরা ঢুকিয়া পড়িল। ব্যাপারটা কি হইতেছে, সকলে ভালো করিয়া বুঝিবার আগেই তাহারা দশানির লোকগুলাকে জখম করিয়া, তোড়াগুলি তুলিয়া লইয়া মানবদেহী ঘূর্ণির মতো প্রস্থান করিল।

দশানির লোক যখন ওরে লাঠি ধর ধর গেলো গেলো, মার মার রব তুলিয়াছে তখন বিজয়ী ছ'আনির লাঠিয়ালের দল প্রায় তাহাদের কাছারীতে গিয়া পৌঁছিয়াছে। হঠাৎ আসা কালবৈশাখী হঠাৎ থামিয়া গেলে গ্রামের যেমন দশা হয় দশানির উঠানেরও তেমনি দশা। গফুর মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছে—তাহার হাত রক্তে ভেজা, ইদ্রিসের পা এমন ভাঙিয়াছে যে সে মূর্ছিত, তেওয়ারি ধনঞ্জয় সকলেই ধরাশায়ী। তোড়ার একটাও নাই। কেবল গোটা কয়েক টাকা অদৃষ্টের বিদ্রূপ-হাস্যের মতো ইতস্তত পড়িয়া চক চক করিতেছে।

কীর্তি হাঁকিল—দুর্গা কোথায়?

দুর্গাদাস কাছারীর তক্তপোষের তলা হইতে উঁকি মারিয়া বলিল—হুজুর, আমি এখানে। দুর্গাদাস দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছে যে ঢাল বলো, তরোয়াল বলো, শড়কি বন্দুক যাহাই বলো, আত্মরক্ষা করিতে তক্ত-পোষের কুক্ষিতলই শ্রেষ্ঠ আশ্রয়, ইহা একাধারে চরম আশ্রয় ও অস্ত্র।

লাঞ্ছিত কীর্তিনারায়ণ মুহূর্তকাল নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিয়া নিজ শয়নকক্ষে গিয়া সশব্দে দ্বার বন্ধ করিল।

* * * * *

ঘরে ঢুকিতেই ড্রেসিং টেবিলের প্রকাণ্ড আয়নাখানায় নিজের ছায়া দেখিবামাত্র ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়া কীর্তিনারায়ণ সেখানাকে চুরমার করিয়া ভাঙিয়া ফেলিল। কিন্তু অজস্র ভাঙা টুকরায় তাহার অজস্র প্রতিবিম্ব ঘরময় ছড়াইতে লাগিল। ক্ষিপ্ত কীর্তিনারায়ণ সমস্ত খণ্ডগুলিকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ধুলোতে পরিণত করিয়া দিল। আর কিছুই নয়, নিজের

ছায়াকে আঘাত করিয়া নিজেকেই মারিতে সে আজ উদ্যত। কীর্তিনারায়ণ নিজেকে কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিতেছে না। আয়না-খানাকে নিঃশেষে ভাঙিয়া ফেলিয়া রুদ্ধ ঘরে একাকী সে পায়চারি করিয়া ফিরিতে লাগিল। খাওয়ার সময়ে বাহির হইল না দেখিয়া মা আসিয়া ডাকিলেন, কীর্তি বলিল খাইবার ক্ষুধা নাই। স্ত্রী আসিয়া ডাকিল কোন উত্তর করিল না। মেয়ে আসিয়া ডাকিয়া উত্তর পাইল—খেলা করিতে যাও। তিনদিন তিন রাত্রির মধ্যে কীর্তিনারায়ণ ঘর হইতে বাহির হইল না।

তিন দিন পরে কীর্তিনারায়ণ বাহির হইয়া বৈঠকখানায় আসিয়া বসিল। লোকে বুঝিল এবারের মতো বড়বাবুর চট্‌কা ভাঙিয়াছে, তার অধিক কেহ বুঝিল না। সেদিনের লাঞ্ছনার প্রতিশোধের ব্যবস্থা সে মনে মনে করিয়া ফেলিয়াছে, তাই এই শান্তির আভাস, সংকল্প সিদ্ধির দূত।

ছ'আনির পুকুরপারে কয়েক ঘর প্রজা আছে, জেলে ছুতোর কামার। তাহারা ছ'আনির অনেকদিনের প্রজা। বিনা খাজনায় বাস করে, ছ'আনির বিপদ আপদে তাহারাই প্রথম সাড়া দেয়। একেবারে কেনা! কীর্তি অনেকবার তাহাদের নিজের জমিতে উঠাইয়া আনিতে চেষ্টা করিয়াছে। প্রজার যে তাহার অভাব এমন নয়। কিন্তু শরীকের একটা ক্ষতি হইলেই তাহার লাভ। বিশেষ সে নিজে কাহাকেও সেবা করে না, তাহারো মঙ্গল কামনা করে না, তাই অপরে নবীনকে বিশ্বাস করিতেছে, নবীনের মঙ্গল কামনা করিতেছে ইহা তাহার অসহ্য। অথচ প্রজাগুলি এমন নির্বোধ ও গোঁয়ার যে কিছুতেই দশানির মাটিতে উঠিয়া আসিতে সম্মত নয়, না লোভের টানে, না লাভের আশায়, না ভয়ের তাড়ায়।

পুকুরপারের প্রজাদের প্রধান বৃদ্ধ রঘু দাস। তাহাকে নড়াইতে পারিলেই সকলে নড়ে। বৃদ্ধ নিজে সংসারের স্রোতে শিথিল দাঁতটির মতো নড়বড় করিতেছে—অথচ স্বভাবটা তাহার এমনি উৎকট অনড় যে কি আর বলিব। শেষ বারের কথা এখনো কীর্তিনারায়ণের মনে আছে।

রঘু দাস আসিয়া লম্বা হইয়া দণ্ডবৎ করিল, তারপরে কীর্তির পায়ের ধুলা লইয়া কপালে জিহ্বায় ও বক্ষস্থলে ঠেকাইয়া পোষখানার কাছে আলগোছে বসিয়া শুধাইল—কর্তার শরীর ভালো তো!

কীর্তির প্রস্তাব শুনিয়া সে জিভ কাটিয়া বলিল—ওকথা শুনতে নেই! তারপরে বলিল—যাতে মূলো লাগায়, কুমাসই বা মাটিতে থাকে, তবু তাকে টেনে তুলতে গেলে সহজে কি মাটি ছাড়তে চায়! আর আমরা কত পুরুষ ওই মাটিতে বাস করছি, এত সহজে কি ওঠা যায়। ওই মাটির সঙ্গে যে রক্তের সম্বন্ধ দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

কীর্তি মনে মনে বলে তোমার মুণ্ডুটা যদি মূলোর মতো টেনে ছিঁড়ে ফেলতে পারি তবেই মনের দুঃখ দূর হয়। বাহিরে হাসিয়া বলে—তা তো বটেই, সেই জন্যেই বলছি, যত খরচ লাগে সব পাবে। ঘর ভেঙে আনবার খরচ, নতুন ঘর তুলবার খরচ, সব।

রঘু বলে, ঘর যদি তুলতেই হবে, তবে আর কষ্ট করে ভাঙা কেন?

তারপরে বলে—না হুজুর, ও পারবো না। আমরা যেখানেই থাকি না কেন, দশানি, ছ'আনি দুই-ই আমাদের মনিব। এই বলিয়া আবার সে দীর্ঘ দণ্ডবৎ করিয়া পায়ের ধুলা লইয়া প্রস্থান করে। কীর্তি মনে মনে হাসে, লম্বা দণ্ডবতে ভুলিবার লোক সে নয়।

কীর্তিনারায়ণ বেশ জানে ছ'আনির পুকুরপারের ওই কয় ঘর প্রজাকে আগে জব্দ করিতে না পারিলে কিছুতেই ছ'আনিকে কাবু করা যাইবে না। ওরা ছ'আনির পক্ষে লাঠি ধরিতেও যেমন উদ্যত, মিথ্যা সাক্ষী দিতেও তেমনি প্রস্তুত, বিপদে সম্পদে ওরাই সকলের আগে আসিয়া দাঁড়ায়।

তিনদিন ঘরে বন্ধ থাকিয়া কীর্তি সংকল্প করিয়াছে যে পুকুরপারের প্রজাদের অনিষ্ট সাধন করিয়া সে লাঞ্ছনার প্রতিশোধ লইবে। ওরা নবীননারায়ণের প্রিয়। প্রত্যক্ষত নবীন পর্যন্ত তাহার হাত পৌঁছিবে না সত্য, কিন্তু শত্রুর প্রিয়জনকে আঘাত করাও পরোক্ষে তাহাকে আঘাত করা ছাড়া আর কি! পরোক্ষ প্রত্যক্ষের ছায়া। এই সংকল্প করিবার পরেই তাহার মন অনেকটা শান্ত হইয়াছে, সে ঘর হইতে বাহির হইয়াছে।

(৬)

তখনো সূর্যোদয়ের অনেক বিলম্ব। পূর্বাকাশ তখনো জড়তার প্রলেপে একাকার, কেবল মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিলে বুঝিতে পারা যায় পূর্বাশার পালঙ্কে উষা একবার করিয়া চোখ মেলিতেছে, আবার আলস্যে তখনি তাহার চোখ জড়াইয়া আসিতেছে। নিশান্তের অন্ধকারের সহিত ধরাতলের কুয়াশা মিলিত হইয়া শীত রাত্রির স্বচ্ছতা আবিল হইয়া উঠিয়াছে। নিদ্রিত গৃহস্থ গাত্রাবরণের উপরে আরও একটা কিছু টানিয়া লইবার জন্য ঘুমের মধ্যে একবার করিয়া হাতড়াইতেছে।

গোহালে গাভীর দল চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, এক আধবার ডাকিতেছে, বাছুরটি মাতার গল-কম্বলের নিকট ঘনিষ্ঠতরভাবে ঘেঁসিয়া দাঁড়াইতেছে। ঘরের দাওয়ায় বৃদ্ধ অন্ধকারের মধ্যে তামাক ও কল্কে খুঁজিতেছে। নদীর পরপারে মুসলমান পল্লীতে কুক্কুটের দল দ্বিধা-বিভক্ত স্বরের তীক্ষ্ন ত্রিশূলের দ্বারা অন্ধকারকে আক্রমণ করিয়া অপসারিত করিতে নিযুক্ত। দোয়েল তখনো ডাকিতে আরম্ভ করে নাই, ফিঙা দম্পতি ভাবিয়া পাইতেছে না ডাকা উচিত হইবে কিনা। এতক্ষণে ঘুমের অবকাশ মিলিল ভাবিয়া হুতুমটা নীরব। পেঁচক চক্ষু দুইটি বারম্বার আবর্তিত করিয়া এইমাত্র বুঝিতে পারিয়াছে তাহার নিশা জাগরণের পালা সমাপ্ত হইয়াছে। দীর্ঘ রাত্রির শিশির সম্পাতে পথের ধুলো সিক্ত; শটিভাটির জঙ্গল হইতে একটি উদ্ভিজ্জ সুবাস উত্থিত, হাঁড়ি পূর্ণ হইয়া খেজুররসের উদ্বৃত্ত ধারা গাছের গা বাহিয়া গড়াইতেছে—তাহারি স্নিগ্ধ মদির গন্ধ, জলাশয় হইতে উদ্গত সূক্ষ্ম একপ্রকার ধূমল কুয়াশা, সবশুদ্ধ মিলিয়া শীতরাত্রির আরামের নিদ্রাভঙ্গের পূর্বে প্রকৃতি ও মানুষে আর একটু ঘুমাইয়া লইবার জন্য যেন উপর আচ্ছাদনের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

ছ'আনির পুকুরপারের ক্ষুদ্র জনপল্লীটিতে অবশ্য এই একই অবস্থা। এমন সময়ে সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল, আগুন, আগুন! প্রথমে সকলে চীৎকার করিয়াছে বলিলে ভুল হইবে, কে একজন করিয়াছিল—কিন্তু মুহূর্তে সমস্ত পাড়া এককণ্ঠে আর্তনাদ করিয়া উঠিল আগুন, আগুন।

মানুষের স্বভাব এই যে, সমস্ত সংকটের মুহূর্তেও সংকটের প্রতিকারের উপায় অপেক্ষা তাহার কারণ সম্বন্ধে প্রশ্নটাই তাহার মনে আগে উত্থিত হয়! সকলেই পরস্পরকে শুধাইতে লাগিল—কে লাগাইল? কেমন করিয়া লাগিল! একজন বলিল—বৃদ্ধ রঘু দাসের কাজ—ভোর রাত্রে উঠিয়া তামাক খাওয়া তাহার অভ্যাস। অপর একজন বলিল—না, না, রামাদের গোয়ালে আগুন লাগিয়াছে।

তারপরে হুড়োহুড়ি, ছুটাছুটি, দৌড়-ঝাপ। ঘর হইতে বাহির কর দেখ দেখ সর্বনাশ, মাগো—কি পাপে এমন হইল!

তারপরে কিছু কিছু কাজ আরম্ভ হইল, জ্বলন্ত গৃহের চাল কাটিয়া নামানো, এখনো যে-সব ঘর জ্বলিতে সুরু করে নাই তাহাদের মালপত্র বাহিরে আনিয়া ফেলা। দেখিতে দেখিতে পুকুরপার কাঁথা, লেপ, তোষক, তৈজসপত্রে ভরিয়া উঠিল। দুখি কৈবর্তের ছোট ছেলেটা ঘুমের চোখে উঠিয়া আসিয়া লেপ তোষকের সুগভীর আশ্রয়ে আত্মগোপন করিল—এত লেপ, তোষক সে কখনো পায় নাই—একবার তাহার মনে হইল, রোজ কেন আগুন লাগে না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সকলে বুঝিতে পারিল, আগুন কেমন করিয়া লাগিয়াছে। পাড়ার ঠিক বাহিরেই দশানির লাঠিয়ালদের লাঠি হাতে পাহারা দিতে দেখা গিয়াছিল। লোকজন জাগিয়া ওঠাতে আর উদ্দেশ্য সিদ্ধি হওয়াতে তাহারা এখন অন্তর্হিত।

ছুতোরদের বিনোদিনী ঘুম হইতে

জাগিয়াই ছুটিয়া বাহিরে আসিয়াছিল—হঠাৎ তাহার মনে হইল, শিশুপুত্রটিকে ঘরের মধ্যে ফেলিয়া আসিয়াছে। অমনি সে উন্মত্তের মতো জ্বলন্ত গৃহের দিকে ছুটিল—রাখ, রাখ, ধর, ধর করিয়া সকলে অগ্রসর হইবার আগেই সে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। বিনোদিনী ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, তাহার শিশুপুত্র বিছানায় জাগিয়া শুইয়া চালের দিকে তাকাইয়া আঙুল নাড়িয়া খেলিতেছে, বিনোদিনী তাকাইয়া দেখিল চালের খড়ের মধ্যে আগুনের কাঁচ কাঁচ শিখাগুলি কোনো জ্যোতির্ময় দেব বালকের লীলায়িত অঙ্গুলির মতো নড়িতেছে। বিনোদিনীর শিশুটির আনন্দের অবধি নাই, মানবশিশু দেবশিশুকে খেলার সঙ্গী পাইয়াছে। বিনোদিনী একটানে তাহার পুত্রকে শয্যা হইতে তুলিয়া লইয়া দিব্যোন্মাদের মতো ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। নিরাপদ স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়া তাহার মনে হইল—তাহার জগৎ রক্ষা পাইয়াছে—আর সমস্ত নষ্ট হইয়া যায় যাক। সে ছেলেটিকে কোলে লইয়া নাচাইতে লাগিল। এমন সময়ে জ্যাঠোরদের বাদলি বলিল—ও বিনোদিনী, তোর শাড়ী গেল কোথায়? বিনোদিনী আচম্বিতে নিজের দিকে চাহিয়া সমস্ত বুঝিতে পারিল, পুত্রকে উদ্ধার করিতে গিয়া তাহার কি দুরবস্থা ঘটিয়াছে। অমনি সে বসিয়া পড়িয়া পুত্রকে চড়ের পরে চড় মারিয়া কাঁদাইয়া ফেলিল—আ লক্ষ্মীছাড়া, হারামজাদা! জন্মের পরেই বাপকে খেয়েছিস, আর আজ আমার যা নয় করবার তাই করলি। পরে কাঁদিয়া ফেলিল, সে-ও কাঁদিতে লাগিল। বাদলি একখানা কাপড় আনিয়া দিল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই জোড়াদীঘির সমস্ত লোক পুকুরপারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাদের চেষ্টায় অল্প কয়েকখানি ঘর রক্ষা পাইল, বাকি সমস্তই পুড়িয়া নষ্ট হইল। জিনিসপত্র কিছু কিছু রক্ষা পাইয়াছিল, প্রাণে কেহ মরে নাই। নবীন নারায়ণ নিজে আসিয়া সময়োচিত তদ্বির তদারক ও বিলি ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

* * *

পুকুরপারে যখন আগুন জ্বলিতেছিল কীর্তিনারায়ণ দোতলার ছাদে দাঁড়াইয়া তাহা দেখিতেছিল। এ অগ্নিকাণ্ড তাহার দ্বারাই পরিকল্পিত এবং অনুষ্ঠিত, কাজেই আগুন জ্বলিয়া উঠিবার কিছু আগেই সে ছাদের উপরে উঠিয়া অপেক্ষা করিতেছিল—এক মুহূর্তও সে বঞ্চিত হইতে চাহে না। আগুনের প্রথম শিখাটি দেখা দিবামাত্র তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তারপরে আগুন যতই প্রবল হইতে লাগিল, তাহার উল্লাসও ততই বাড়িতে লাগিল। ছাদের উপরে আর কেহ ছিল না, তাই তাহার এই অমানুষিক উল্লাস কেহ লক্ষ্য করিল না। কীর্তিনারায়ণ ছাদের আলিসার উপরে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া গুন গুন সুরে একটা গান করিতে করিতে পা দিয়া তাল ঠুকিতে লাগিল। আগুন আর একটা ঘরে ছড়াইয়া পড়ে, শিখা লাফাইয়া ওঠে, বাঁশের গিরা ফাটিবার শব্দ ও গৃহস্থের আর্তনাদ একত্র মিলিত হইয়া একটা দুর্বোধ্য বেদনার সৃষ্টি করে, কীর্তিনারায়ণের গানের কোন ব্যাঘাত হয় না—বরঞ্চ সেদিনের অপমানের প্রতিশোধ হইতেছে ভাবিয়া সে খুশী হইয়া ওঠে। অবশেষে আগুন নিভিয়া আসিলে একটা দীর্ঘ-শ্বাস ফেলিয়া কীর্তিনারায়ণ ছাদ হইতে নামিয়া আসিল। ছাদে থাকিয়া আর লাভ কি—দেখিবার আর কি আছে?

আগুন লাগিবার সংবাদ পাইবামাত্র নবীন নারায়ণ পাইক বরকন্দাজ লইয়া পুকুরপারে রওনা হইয়া গেল। যাইবার সময়ে সে মুক্তামালাকে ঘুম হইতে ঠেলিয়া তুলিয়া দিয়াছিল, বলিয়াছিল, আমি চললাম, তুমি জেগেই থেকো, যদিচ কোন ভয় নেই।

স্বামী চলিয়া গেলে সে তেতালার ছাদে আসিয়া দাঁড়াইল—সেখানে দাঁড়াইলে অগ্নিকাণ্ডের সমস্তটা বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। জগার মা নামে নবীনের এক পুরাতন ঝি ছিল, সে জোড়াদীঘির বাড়িতেই থাকিত। সেই জগার মা মুক্তামালার সঙ্গে ছাদের উপরে আসিয়াছিল। মুক্তা আলিসায় বাম হাতের কনুই রাখিয়া ভীত-বিস্ময়ে তাকাইয়া রহিল। সে শুধাইল—জগার মা, কি করে আগুন লাগলো বলতে পারো?

জগার মা বলিল—কে না জানে? ও-বাড়ির ছোটবাবু লাগিয়েছেন?

মুক্তামালা ভর্ৎসনার স্বরে বলিল—তিনি কেন লাগাতে যাবেন?

জগার মা হাসিয়া বলিল—আরও কিছুদিন এখানে থাকো বৌমা, তারপরে বুঝবে যে গাঁয়ে কিসে কি হয়? এ তোমার কলকাতা নয় মা।

এমন সময়ে আগুন আরও কয়েকখানি গৃহ গ্রাস করিয়া প্রচণ্ড শিখায় উল্লসিত হইয়া উঠিল পুকুরের কালি-ঢালা জলতলে গলন্ত স্বর্ণের প্রলেপ বিস্তারিত হইয়া গেল, চারিদিকের গাছপালা দিবাভাগের মতো দৃশ্যমান হইয়া উঠিল, ধূম ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আকাশের অনেকটা উঁচুতে উঠিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

মুক্তামালা বলিল—আজ বোধহয় গ্রাম রক্ষা পাবে না। কেহ উত্তর দিল না। সে ফিরিয়া দেখিল, জগার মা নাই। তখন আবার সে ভীতি বিহ্বলনেত্রে তাকাইয়া রহিল। অগ্নিকাণ্ডের পটে জনতার গতিবিধি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, এমন কি লোক চেনাও অসম্ভব নয়। হঠাৎ পায়ের শব্দ পাইয়া মুক্তামালা দেখিল, জগার মা আসিয়াছে এবং কাপড়ের তল হইতে একখানা আয়না বাহির করিতেছে। মুক্তা একটু রাগতভাবে বলিল—জগার মা এই কি তোমার মুখ দেখবার সময় হলো?

জগার মা বলিল—দাঁড়াও না বৌমা। মুখ আমি দেখবো কেন? ব্রহ্মা মুখ দেখবেন।

এই বলিয়া সে আয়নাখানাকে অগ্নিকাণ্ডের অভিমুখে ধরিল। মুক্তামালা বলিল—ও কি হচ্ছে?

জগার মা বলিল—আয়নায় নিজের লকলকে জিভ দেখলে ব্রহ্মা জিভ সংযত করেন।

মুক্তামালা বিস্ময়ে ও বিরক্তিতে বলিল—এমন তো কখনো শুনিনি।

জগার মা বুঝিল, এই শহুরে মেয়ে নিতান্ত নাবালক ও নির্বোধ, আধি-দৈবিককে বশ করিবার কোন পন্থাই অবগত নয়। সে খানিকটা তাচ্ছিল্য ও খানিকটা বাৎসল্য মিশাইয়া বলিল—এমনি করে আমি কত আগুন নেভালাম। তুমি চুপ করে দেখো না।

এই বলিয়া সে দর্পণখানাকে অধিকতর কৌশলের সহিত আগুনের দিকে দেখাইতে লাগিল।

ইহার অনেক পরে আগুন নিভিয়া গেলে জগার মা সগর্বে বলিয়াছিল, দেখলে তো ব্রহ্মা জিহ্বা সংযত করলেন কিনা?

এত দুঃখের মধ্যেও মুক্তার হাসি পাইল, সে বলিল, সংযত না করে তিনি আর করে কি? আর খাদ্য কোথায়? ঘরগুলো তো নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে।

জগার মা অপ্রস্তুত হইবার নয়, সপ্রতিভভাবে উত্তর দিল—কিন্তু গাঁয়ের ঘরগুলো তো ছিল।

এই বলিয়া সে দ্রুত চলিয়া গেল—ভাব ইহার আর কি উত্তর থাকিতে পারে—অতএব খামকা দাঁড়াইয়া থাকিয়া আর কি ফল?

প্রজ্বলিত অগ্নির আভাতে প্রোজ্জ্বল মুক্তামালার মুখে ভীতি, বিস্ময়, ক্রোধসঞ্চার ভাবের মতো মুহুর্মুহু সঞ্চরণ করিতেছিল কিন্তু সে মুখের স্থায়ী ভাব করুণা—সে শেষ রাত্রির অন্ধকারে, গৃহদাহের দাবানলে অকাল নিদ্রাভঙ্গের ক্লান্তিতে, অকারণ সর্বনাশের পরিপ্রেক্ষিতে, ঈষৎ বিস্রস্তঅঞ্চলা, শিথিল কুন্তলা, অনবগুণ্ঠিতা মুক্তামালাকে 'মূর্তিমতী করুণার' মতো বোধ হইতেছিল। কথা সর্বনাশকে সে এত নিকটে দেখে নাই, সর্বনাশের কথা এতদিন সে পুস্তকে পড়িয়াছে—আজ সে সর্বনাশের তীরে সমুপস্থিত।

ক্রমে আগুন নিভিয়া গেল চারিদিক ঘনতর অন্ধকারে নিমজ্জিত হইল। তারপর সেই অন্ধকারের পটে পূর্বাকাশ কপোতধূসর হইল, কপোতধূসরে শুক্তির স্বচ্ছতা দেখা দিল, শুক্তির স্বচ্ছতায় অশোক কিশলয়ের রং ধরি ধরিতে অবশেষে দাড়িম্বকুসুমকরুণ তপন ললাট ফলকে দৃশ্যমান হইয়া উঠিল—তবু সেইখানেই স্থানুবৎ দাঁড়াইয়া থাকিল, নড়িবার কথা তাহার মনেও হইল না।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

কুন্দগ্রামের মাঠে মাঠে বসন্তের সাড়া পড়ে গেছে। ফুলে ফুলে ঢাকা পড়েছে ধরণীর ধূসরতা। দখিনা বাতাসের কর-স্পর্শে কুয়াশার চিহ্নটুকুও হয়েছে অবলুপ্ত। এক প্রান্তে প্রাচীন অশ্বত্থবৃক্ষ নিজের পানে চেয়ে সরমে রাঙা হয়ে উঠেছে।

কুন্দগ্রামে মধ্যাহ্নের সূর্য তখনও মাঠের বুকে নামেনি। অশ্বত্থ গাছের কচি পাতার আড়াল থেকে কোকিলের কলগীতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, দূরে একটা অশোক গাছের রক্তিম আভা দিনের আলোকে যেন বিদ্রূপ করছে। মাঠের পথে দেখা যাচ্ছে মাত্র একটি প্রাণী, কুন্দগ্রামের সুদেব মণ্ডলের মেয়ে রূপসী। রূপসীর হাতে একটা ছোট পুঁটলি। মাঠের মধ্যে দেখা সুদেবের সঙ্গে, কাস্তে হাতে সুদেব দাঁড়াল।

—কুথা চল্লি এই সাত-সকালে?

ফিক করে হেসে রূপসী বলল,—হুই ওপাড়ার পিসীর বাড়ি ডিম নিয়ে। কাল হাঁসটা আজ সাতটা ডিম পেড়েছে বাবা।

গর্বের সুরে সুদেব সঙ্গীদের বলল,—উয়োর ইদিকে উস্তাদি খুব। কুঁদগাঁর কুলু চাষীর হাঁসে সাত-সাতটা ডিম পাড়ে না। গাঁয়ের সব লোক উয়োর কাছে যায়, কি করে হাঁস পালতে হয়। এই সিদিন আমাকে দিল ডিম-বেচা পাঁচকুড়ি টাকা, হেলে বলদ কিনলাম এক জোড়া।

সঙ্গীদের মধ্যে একজন বলল,—মেয়ের পোষাকের বাহার আছে খুব।

হঠাৎ রেগে উঠল সুদেব, বলল,—থাকবে না! উ কি তুদের ঘরের মেয়েদের মত! উ, কি বলে রোজকার করে রীতিমত, শউরে যায়, শাড়ী কাপড় কিনে আনে।

চাষীদের কথাবার্তা উপেক্ষা করে রূপসী এগিয়ে চলল। নিজের শাড়ীখানার দিকে তাকিয়ে ফিক করে হাসল একবার। ফিকে নীল রঙের শাড়ী, তাকে মানিয়েছে বেশ। শহরে এই রকম কাপড় পরা অনেক মেয়ে সে দেখেছে। আঁচল খুলে ছোট একটা আয়না বের করল রূপসী। অশোক ফুলের রক্তবর্ণ লুটিয়ে পড়েছে তার দেহের অনাবৃত অংশে। কপাল
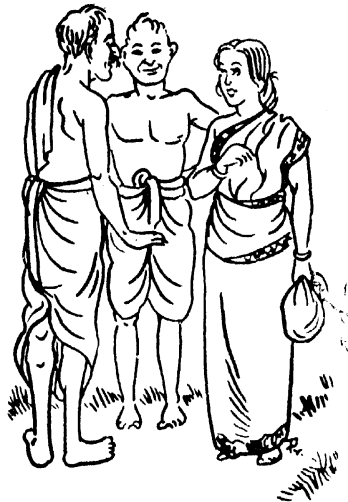
একজন বলল, "মেয়ের পোষাকের বাহার আছে খুব!"

ঘামে ভিজে গেছে। আঁচল দিয়ে মুখ মুছে রূপসী মুগ্ধনেত্রে চেয়ে রইল আরশীর দিকে।

কুন্দগ্রামের সবচেয়ে সুশ্রী মেয়ে রূপসী। গ্রামের যুবকরা সকলেই চায় তাকে বিয়ে করতে। গোধূলির আলো মিলিয়ে না যেতেই চাষীযুবকরা ভিড় করে তাদের বাড়ীতে। কৈফিয়ত একটা তারা নিজে থেকেই দেয় সুদেবকে।—তুমার গপ্পো ভারী সরেশ গো সুদেব খুড়ো। মঠের শাঁকচুন্নির সেই গপ্পোটা বল আর একবার। একমাত্র রূপসী জানে তারা কেন আসে। গল্প ত শোনে খুব, চারিদিক থেকে লুব্ধনেত্রের ক্ষুধিত দৃষ্টি তার কর্মনিরত মূর্তিকে যেন গ্রাস করে। অযাচিত বিবাহের প্রস্তাব তার কাছে এসেছে একাধিকবার, কিন্তু সব সে হেলাভরে করেছে প্রত্যাখ্যান।

সম্প্রতি একটি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে রূপসী। প্রেমপ্রার্থী যুবকদের সে তুলে নেয় আশার সপ্তসোপানে, তারপর একদিন তারা রূপসীর বিদ্রূপবাণে জর্জরিত হয়ে রণে ভঙ্গ দেয়। ছিদাম মণ্ডলের ছেলে অর্জুনের দুর্গতির কথা মনে আছে সকলেরই। তবু কুন্দগ্রামের চাষী যুবকরা সুদেবের কুটীরের মায়া কাটিয়ে উঠতে পারে না। রৌদ্রস্নাত কর্মমুখর দিন-গুলির অবসরে ছায়াঘেরা এক কুটীরপ্রাঙ্গণে তন্বী কিশোরীর অচঞ্চল মূর্তি তাদের কল্পনাকে বিহ্বল করে তোলে। রূপসীর উদ্দেশে শস্যাকর্তনরত অর্জুনের অভিশাপবাণী তাদের বিচলিত করে না।

সকলেই জানে অর্জুনের দুর্দশার কথা। নিরালা এক সন্ধ্যায় রূপসীকে প্রেম নিবেদন করেছিল অর্জুন। মেয়ের চোখে মুখে ফুটে উঠল বিষম একটা আতঙ্কের ছাপ। তারপরই সে এক বালতি জল উপুড় করে ঢেলে দিল অর্জুনের মাথায়। বিস্মিত অর্জুনকে কথা বলবার অবকাশ না দিয়ে সে বলে উঠল,—কি ভয়ই না তুমি দেখাতে পার, মিরগীর ব্যামো আছে নাকি তোমার!

আজ পথ চলতে সেদিনের সেই কাহিনী মনে হওয়াতে হেসে গড়িয়ে পড়ল রূপসী। একটিবার মাত্র প্রেমের কুঁড়ি তার হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। কুন্দগ্রামের নিতাই মোড়লের ছেলে বলাই একদিন দেখা দিল তার প্রেমভিক্ষুরূপে। বলাই ছিল রূপসীর বাল্যসঙ্গী, কুন্দগ্রামের মাঠে ঘাটে তাদের দুরন্তপনার চিহ্ন মুছে যায়নি। বলাই-এর তালপুকুরে মাছ ধরার সঙ্গী ছিল রূপসী, গাজনের মেলায় নাগরদোলায় পাক খেয়েছে কতদিন তারা একসঙ্গে। যৌবন যখন তার পশরার ডালা নিয়ে উপস্থিত হল রূপসীর কাছে, তার সর্বাগ্রে মনে পড়ল বলাইকে। কিন্তু, রূপসী বিস্ময়ে ভেঙে পড়ল,—সেদিন বলাইকে হতাশ হয়ে ফিরতে হয়েছিল। তারপর দুজনের দেখা হয়েছে কতবার গ্রামপথে, সসঙ্কোচে পাশ কাটিয়ে চলে গেছে দুজনেই।

এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল রূপসী। সামনে বিরাট একটি বাঁক, কালকাসুন্দি ঝোপের আবরণে পথ পড়েছে ঢাকা। ধূলিধূসরিত পথ, বাঁক অতিক্রম করে পিসীর বাড়ি পৌঁছতে

এখনও এক ক্রোশ বাকী। শাড়ীটার দিকে একবার তাকাল রূপসী, পাড়ের কাছে ধূলো পুরু হয়ে জমে গেছে এরি মধ্যে। ঝোপঝাড় পেরিয়ে কৃষকদের ক্ষেতের মধ্য দিয়ে পথ চললে সময় সংক্ষিপ্ত হবে অনেকটা।

রূপসী চিন্তা করতে লাগল।—কিন্তু সামনের ক্ষেতটা ত হচ্ছে বলাইদের। পাতলা করে ইঁট সাজিয়ে কাঁচা দেয়াল তুলেছে ওরা ক্ষেতের চারদিকে। একটু অসাবধানে ডিঙোতে গেলেই পাঁচিল যাবে পড়ে। ওদিক ছাড়া পথও নেই। যেতেই হবে আমাকে পাঁচিল টপ্‌কে। গরম আর ধূলোয় কাপড়খানা গেল! কেই বা এখন আছে ওখানে, এত সকালে বলাইরা মাঠে আসে না।

আয়নাখানা আর একবার বার করে মুখের সামনে ধরল রূপসী। —এঃ, কি বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে মুখখানা! আর দ্বিধা না করে আঁচল দিয়ে মুখ মুছে রূপসী পথ থেকে নেমে পড়ল। কয়েক পা এগিয়ে বলাইদের ক্ষেতের নীচু প্রাচীর, শ্যামল শস্যপূর্ণ ক্ষেত রূপসীর চোখে যেন শান্তির প্রলেপ বিছিয়ে দিল।

প্রাচীর পার হতে হবে এবার। চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিল সে। তারপর কাপড় তুলে প্রাচীরের উপর দিয়ে প্রাণপণে দিল এক লাফ। কিন্তু হিসাবে ভুল হয়েছিল রূপসীর। তার সমস্ত সতর্কতা অগ্রাহ্য করে প্রাচীরের এক অংশ সশব্দে ভেঙ্গে পড়ল, সভয়ে আর্তনাদ করে সে পড়ল ছিটকে, আর তার পুঁটলি শস্যক্ষেতের খানিকটা অংশ ধ্বংস করে দিল।

ভয়ে অভিভূত হয়ে কোনরকমে উঠে দাঁড়াল রূপসী। পরমুহূর্তেই দুষ্টামির হাসিতে ভরে গেল তার মুখ।

—খুব জব্দ করে দিলাম বলাইকে। ইঁট সাজাতে হবে আবার! আর কারুর পাঁচিল হলে অবশ্যি দুঃখ হত মনে, কিন্তু বলাই—হুঁ, আমার সঙ্গে লাগতে এসো!

রূপসী তৃপ্তির হাসিতে মাঠের বুক ভরিয়ে তুলল। হঠাৎ হাসির পরিবর্তে অস্ফুট একটা ভীত চীৎকার বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে। রূপসীর সামনে দাঁড়িয়ে স্বয়ং বলাই মণ্ডল। মুখে তার অদ্ভুত হাসি। দৈত্যের মত সে যেন পথ আগলিয়ে দাঁড়িয়েছে রূপসীর সামনে।

উল্টো পথে ছুটতে আরম্ভ করল রূপসী, দ্রুত পদক্ষেপে বলাই তাকে অনুসরণ করল।

—তোমার কথা সব আমি শুনেছি রূপসী! কি রকম মেয়ে তুমি, শুধুশুধু আমার লোকসান করে হাসাহাসি করচ। ভেবে কি জান, আমার দেয়াল ভেঙ্গে ছাড়া পাচ্ছ না অত সোজায়। দেয়াল গড়ে দিতে হবে তোমাকে।

বলাই-এর দৃঢ় কণ্ঠস্বরে ফিরে দাঁড়াল রূপসী। সেইরকম চড়া সুরে সে বলল,—যার দেয়াল সে গড়বে, আমার বয়ে গেছে।

—গড়বে না তুমি! বলাইকে তাহলে চেন না, তোমাকে দিয়ে এই দেয়াল তুলিয়ে তবে ছাড়ব।

তোমাকে দিয়ে এই দেয়াল তুলিয়ে তবে ছাড়ব!

রাগে মুখ লাল হয়ে গেল রূপসীর।—মোর বাপই পারবে না আর তুমি! বিদ্রূপের হাসি হেসে সে বলল,—পথ ছাড়; এই তোমার মুখের ওপর বলচি, দেয়াল তুলতে পারব না।

—সি-টি হবে না। আমার জমিতে ঢুকেচ তুমি ক্যানে? সরকারী রাস্তা ছিল না? ভাল চাও ত পাঁচিলের ইঁট কখানা সাজিয়ে দাও, নইলে আমি এই চল্লাম থানায়।

প্রায় কাঁদকাঁদ সুরে রূপসী বলল,—তোমাকেও মজা দেখাচ্ছি আমি। ইখান থেকে চেঁচিয়ে মানুষ জড় করে বলব, মেয়েনোকের গায়ে হাত তুলেচ তুমি।

—যত পার চেঁচাও তুমি। এ দিগরে একটা মানুষও তোমার ডাকে এখন সাড়া দেবে না। পরের জমিতে ঢুকে তার নোকসান করার মজাটা দ্যাখ এবার।

গর্ব বিসর্জন দিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল রূপসী। —ইঃ, বলাই মোড়ল, তোমার শরীলে মায়াদয়া নেই একটুক্। দেয়াল তোলার কাজ ত মিস্তিরির, আমি কি জানি!

পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাল বলাই রূপসীর দিকে। সিদিনকার কথা তোমার মনে আছে; আমার গুমোর তুমি ভেঙেছিলে, আজ তোমার দপ্‌পো চুন্ন করব আমি। কাজে লেগে যাও এখন, ইঁটগুলো সাজিয়ে দাও।

বলাইয়ের প্রেম-প্রত্যাখ্যানের পর রূপসী এই প্রথম ভাল করে দেখছিল তাকে। সবুজ বাঙলা দেশের শ্যামকান্তি কৃষকসন্তান। পেশী-স্ফীত সুদীর্ঘ শরীর সংপৃক্ত হয়েছে প্রভাতের আলো আর ক্লান্তির ধারিধারায়। সারা মুখে দৃঢ়তার ছাপ, ঘামে ভিজা দেহ। রূপসীর মনে হল, কুন্দগ্রামে বলাইয়ের চেয়ে সুপুরুষ তার চোখে আর পড়েনি।

চট করে শাড়ির আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে নিল রূপসী। ঠোঁট তার কাঁপছে, চোখে জল শুকিয়ে গেছে। দৃষ্টি হয়েছে উজ্জ্বলতর, হাসিকান্নার দোলায় দুলছে তার সমস্ত সত্তা।

ফিস ফিস করে সে বলল—তোমার গুমোর আমি আজও ভাঙব। কুন্দগাঁর আর কোন মানুষের ওপর এত রাগ নেই আমার। সব পার তুমি, আমাকে খুন করতেও পার।

মুক্তকণ্ঠে হেসে উঠল বলাই। —বেশ কথা বলতে পার তুমি রূপসী। যাক, শক্ত কাজের ভার আমি নিচ্ছি। হাল্কা ইঁট ক'খানা তুমি আন, ভারী ক'টা আমি।

নিঃশব্দে কাজ আরম্ভ করল তারা। কিন্তু রূপসী যেন কাজে ফাঁকি দিচ্ছে। ছোট এক-খানা ইঁট তুলে আনতে তার লাগছে এক যুগ, কৌতুকস্নিগ্ধ হাসি বলাইয়ের মুখে।

—অমনধারা গোঁজের মত মুখ করে কাজ করা যায়! কথা দু-একটা বললে তোমার জাত যাবে না।

বলাইয়ের অনুযোগে সাড়া দিল না রূপসী, শুধু ইঁটের স্তূপের কাছে বসে পড়ল।

স্থিরদৃষ্টিতে বলাই তাকাল তার দিকে। প্রথম বসন্তের রৌদ্রে তার স্বেদাক্ত মুখ চকচক করছে, মাথার কাঁটা আল্গা হয়ে খোঁপা প্রায় এলিয়ে পড়েছে ঘাড়ের উপর। দু-হাতের কনুই পর্যন্ত ধূলায় ভরে গেছে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবার কাজে লাগল বলাই। কিন্তু কাজ শেষ হতে ঢের দেরী এখনও। রূপসীর ঘামে ভিজা মুখ সব গোলমাল করে দিল।

দুসার ইঁট সাজিয়ে বলাই বলল—এ শেষ হতে সারা দিনটা লাগবে। রাখ তোমার ইঁট এখন। ক্ষিদেয় পেটের নাড়ী পাক দিচ্ছে। ভাত-তরকারী আছে আমার সঙ্গে, খেয়ে নিই দুজনে। পেট ভরবে না অবিশ্যি, তা হোকগে।

চোখ নামিয়ে রূপসী বলল—নাঃ, আমার লজ্জা করে পুরুষ মানুষের সামনে খেতে। তারপর, — কি বলে—লোকে জানলে বলবে কি! তুমি যাই বল, আমি খেতে পারব না তোমার সঙ্গে।

স্বর একটু চড়িয়ে বলাই বলল—খেতেই হবে তোমাকে। আমি ছাড়া তোমার খাওয়া কেউ জানতে পারবে না।

খেতে বসল দুজনে। কিন্তু রূপসীর গলা দিয়ে ভাত আর নামে না। পরপুরুষের সঙ্গে এক থালায় খাওয়া সে কোনদিন কল্পনা করেনি। নিজের ভাগ নিমেষের মধ্যে শেষ করে বলাই বলল—খেয়ে নাও ভাত কটা! ও, লজ্জা লাগচে বুঝি! আচ্ছা, এই আমি বসলাম পিছন ফিরে, খাও এবার।

থালা সরিয়ে রূপসী বলল—আর পারব না।

—পারবা ক্যান্। বড়লোকের বিটি তুমি! এই বাজারে এত ভাত নষ্ট করতে পার বটে। আমাদের ওসব সহ্য হয় না।

রূপসীর অর্ধভুক্ত ভাত বলাই সশব্দে খেতে শুরু করে দিল। তার উচ্ছিষ্ট বলাইকে খেতে দেখে মনের মধ্যে একটা নূতন অনুভূতি বোধ করল রূপসী। আড়চোখে সে তাকাল বলাইয়ের দিকে। পুলকভরা হাসি পুরুষের মুখে; রুক্ষতা কাঠিন্য যেন অপসৃত হয়েছে যাদুমন্ত্রবলে। বলাইয়ের সমস্ত দেহ-মন যেন প্রচার করছে অকথিত একটা বাণী—আমি আনন্দিত।

রূপসী বলল—বেলা গড়িয়ে গেল, দেয়ালের কাজ শেষ করে যাই এবার।

—উঁহু, সিটি হবে না, গপ্পো করি এস দুজনায়। বলাই একটা বিঁড়ি ধরিয়ে বলল—ছেলেবেলার ব্যাপার মনে আছে সব, না ভুলে মেরে দিয়েছ! হুঁই বাবলার বনে তোমার পায়ে গেল মস্ত একটা কাঁটা ফুটে, আমি কাঁধে করে বাড়ি পেঁছে দিলাম তোমাকে। নাগরদোলায় পাক খেতে গিয়ে তুমি ভয়ে জড়িয়ে ধরতে আমাকে।

বলাইয়ের উচ্ছ্বাসে রূপসী সাড়া দিল না। সে উঠে ইঁট সংগ্রহের কাজে মন দিল আবার।

পূর্বেকার শ্লথতা তার অন্তর্হিত হয়েছে, পরিপূর্ণ উদ্যমে কাজ আরম্ভ করল সে। কিন্তু এবার পট-পরিবর্তন হল। কাজে শৈথিল্য এল বলাইয়ের। একখানা ইঁট সাজাতে সে যেন হয়রাণ হয়ে যায়। রূপসীর আনা পাতলা ইঁট অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করে বসিয়ে দেয়।

কাজ যখন শেষ হল, বেলা তখন প্রায় সারা হয়ে এসেছে। শেষ ইঁটখানা বসিয়ে উঠে দাঁড়াল বলাই, আর রূপসী ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। চমকে ফিরে দাঁড়াল বলাই।

তোমাকে ভালবাসি বলেই ত এমনটি করিয়ে নিলাম

—ইকি! কাঁদছ ক্যানে? এই মেয়ে, কা না। অবিশ্যি তোমাকে আমি খাটিয়ে নিল বড়, তা মেহনতও হয়েছে খুব। এবারে যা যাও তুমি। মেহনত আমারও কম হয়নি, বেলা অবধি মাঠে থাকিনি কোনদিন।

চোখ মুছে বাড়ির পথে পা বাড়াল রূপস মুখে তার কথাটি নেই, মাথা ঝুঁকে পড় বুকের কাছে। বলাই ভাবতে লাগল—নাঃ, নিষ্ঠুরের মত ব্যবহার করেছি আমি। অ কঠিন না হলেও চলত। কী একটা অ মমতায় বলাইয়ের বুক ভরে গেল।

দূরে দেখা যাচ্ছে রূপসীর মন্থর গ জোরে পা চালিয়ে বলাই তার পাশে দাঁড়

প্রায় চীৎকার করে সে বলল—কাজটা খারাপ হল রূপসী; রাগের মাথায় খা নিলাম তোমাকে।

দু-হাত প্রসারিত করল রূপসী। করতল রক্তাক্ত, ধূলিধূসরিত। বলাই উ চীৎকার করে বলল—উঃ, একি হয়েছে রূপ আমাকে ক্ষমা করতে পারবে না?

ছায়া সরে গেল রূপসীর মুখ থে বিচলিত সুরে সে বলল—অন্যায় আ হয়েছে। তোমার দেয়াল শুদ্ধশুদ্ধি দিলাম।

আরও কাছে সরে এল বলাই। রূপ হাত ধরে বলল—তোমাকে ভালবাসি বলে এমনটি করিয়ে নিলাম।

রূপসী নির্বাক। বলাইয়ের কাম সারা শরীর তার থরথর করে কাঁ অবরুদ্ধ কামনা মুক্ত হতে চাইছে বি আবেগে। সে বসে পড়ল ধূলিধূসরিত প প্রান্তে।

হে অভিযাত্রী

নির্মাল্য বসু

হে অভিযাত্রী
পোহাল রাত্রি—
শেষ তিমিরের আশীর্বাদ
লও এইবার বাঁধনছিন্ন ভরে দু'হাত।
সুপ্রভাত।

বক্ষ রক্ত রঙীণ ধন্য দিগন্ত
ক্ষয় নাই তার—প্রতিটি বিন্দু অনন্ত
সূচনা করেছে মহাজীবনের প্রতিষ্ঠা
শৃঙ্খলহীন—মুক্ত—স্বাধীন—শ্রীমন্ত।

হয়েছে তোমার শেষ তর্পণ বেদীতলে—
মহাসিদ্ধির প্রসাদ পেয়েছো

আকণ্ঠ পিয়ে হলাহলে;
উদয় অচলে তারি সংবাদ
এনেছো নতুন অরুণোদয়—
হে নীলকণ্ঠ—হে নির্ভয়।

বিশ্বসভায় পেয়েছো মহান্ সনন্দ,
নবজীবনের আনন্দ
তব অভিষেক ঘোষণা করিছে
হে বিজয়ী।
পূর্ণ তোমার যজ্ঞফল।
নিভেছে নিভেছে বাড়বানল।
ছিন্নভিন্ন লাঞ্ছিত এই ধরাতলে
এবার ছিটাও শান্তি জল॥

আপনি যদি শীঘ্রই দিল্লী বেড়াতে আসেন, কুতুব, লালকিল্লা ও রাজকীয় দপ্তরে হুজুরের খাস কামরা দেখার পর কিচেনার রোড যেতে একশ' ছিয়াশির কামরা দেখতে ভুলবেন না। জীবনে বহু আশ্চর্য আর নামকরা জিনিস ও অভিজ্ঞতার সাক্ষাৎ-ছোঁয়াচে এসেছি জননীর স্নেহ, রমণীর প্রেম, কুমারীর নবীন প্রীতি থেকে শুরু করে কণ্ট্রোলের চালের দোকানে রেশনসংগ্রহ তক। তবুও হর্ষদার সঙ্গে প্রথম পরিচিত হয়ে মনে হল, অভিজ্ঞতার গঙ্গোত্রীতে অবগাহন করে উঠলুম। আর সেই থেকে কেমন একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, শনিবার সন্ধ্যায় কিম্বা রবিবার সকালে প্রতি সপ্তাহে একশ' ছিয়াশির কামরার বাসিন্দা শ্রীহর্ষনাথ পাকড়াশির সন্দর্শনে আমি যাই। শ্রীকৃষ্ণের শতনামের মতো নানা নামে লোকে তাঁকে ডাকে—দাদু, জ্যেঠামশায়, কাকাবাবু, দাদা—কিন্তু সবচেয়ে জনপ্রিয় ডাক হল হর্ষদা। অবশ্য এ-নামকরণ, প্রসার ও প্রচার করেন আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু গুলবাবা। তাঁর আসল নামটা গোপন করা গেল। তিনি ইউনাইটেড প্রেসের একজন সাংবাদিক বা রিপোর্টার। বছরের মধ্যে ছ' মাস সিমলা ছ মাস লাহোর থাকতে হয়। সিমলাতেই তাঁর সঙ্গে আলাপ, মাঝে-মাঝে দিল্লীতে এলে হাজার কাজের মধ্যে কোনো সময় করে আমার সঙ্গে দেখা করেন। গুলবাবার নাম আমারই দেওয়া। যদিচ গুল না দেওয়াই গুলবাবার স্বভাব। তিনি অর্থাৎ লোককে অতি চাল মেরে কাবু করেন আসলে তাঁকে গুলঘু বলাই উচিত অর্থাৎ গুল হনন করেন যিনি। মানের দিক দিয়ে যুৎসই লাগসৈ হলেও 'কানের' দিকে থেকে একটু বড়ো শ্রুতিকটু। তাই নানা ভেবেচিন্তে গুলবাবা নাম বহাল রেখেছি। মৌনীবাবা, পাহাড়ীবাবা, সাধুবাবার মতোন আমার দেওয়া এই নামের মধ্যে একাধারে সাধুত্বের সঙ্গে পবিত্র পুরুষের আবেদন আছে। এমন কি গুলবাবার স্ত্রী আর আমার এককালের সহপাঠিনী নীলিমা, কালো বাজার থেকে কয়েক বোতল হরলিক্স সংগ্রহের অনুরোধ জানিয়ে একখানি চিঠি লিখেছিলেন, তাতে এও ছিল : গুলবাবা আমার শুভ কামনা ও প্রীতি-নমস্কার জানবেন। সুতরাং গুলবাবা তাঁর স্ত্রীর কাছেও ঐ নামেই প্রসিদ্ধ। আর এই গুলবাবার সৌজন্যে আমার হর্ষদার সঙ্গে আলাপ। সেই থেকে একশ ছিয়াশির কামরায় কি-বসন্ত কি-শরতে বহুবার যাতায়াত করেছি—কোনো সপ্তাহ বাদ দিইনি। অদ্ভুত আকর্ষণ হল এই ঘরটির। —বিশেষ করে ওঘরের আড্ডার। হর্ষদা আর হর্ষদাকে কেন্দ্র করে হাজারো মানুষের সংস্পর্শে এসেছি। তারা সকলেই প্রায় এক একটা 'ক্যারাক্টার'—কিন্তু হর্ষদার তুলনায় তাঁরা নিষ্প্রভ, চাঁদের সভায় তারার দল। হর্ষদা একাধারে অনন্য আবার অতি সাধারণ, বিশ্বাসপ্রবণ, তার্কিক সোচ্চারিত ও একান্ত নীরব।

সত্যিই ঘোড়ার মতোন তাঁর অদম্য প্রাণশক্তি, ঘোড়ার মতোই কষ্টসহিষ্ণু। বায়রন সম্পর্কে গ্যেটে যা বলেছেন হর্ষদা সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে—তিনি ভাবতে বসলেই শিশু হয়ে যান। অভিজ্ঞতা মানুষের বয়স সাপেক্ষ, কিন্তু বয়স বাড়লেই অভিজ্ঞতা বাড়ে—একথা সকল ক্ষেত্রে হলপ নিয়ে বলা চলে না। আবার যদি মনে করি হর্ষদা পিটারপ্যানের মতো বাড়বেন না বলেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তাহলে ভুল হবে। কেননা তিনি নিজের মস্ত বড়ো সমালোচক বা সচেতন পর্যবেক্ষক নন। আবার তাকে না হলে কোনো হসটেল বা দপ্তর একেবারে প্রাণহীন হয়ে যাবে —কোনো ভোজের টেবিলে বিশেষ একজাতীয় মদের মতোন তিনি আবশ্যিক বা ম্যাসকটের মতো প্রয়োজনীয়। হর্ষদা নানা মানুষ দেখেছেন নানা দেশ ঘুরেছেন সুদূর বর্মা থেকে সিমলে পাহাড়—না লোকের না দেশের না সময়ের ছাপ পড়েছে ওঁর উপর; তাঁর চরিত্র আজ অনাকৃত আর আনকোরা এবং অনাকৃত চিরদিন রইবে।

ব্যক্তিগতভাবে আমি বেজায় লাজুক, মানুষের সঙ্গে কথা কইতে গেলে, বিশেষ করে মেয়েদের সঙ্গে আমার মুখ খোলে না, ঘেমে উঠি মাথা ধুলিয়ে উঠে বিশ্রী নির্বোধের মতো লাগে। অথচ হর্ষদা মেয়েদের সভায় একাই প্রকাশ। সকল মেয়ের কাছেই তিনি প্রিয় মানে যাকে বলে লোকপ্রিয়। মেয়েদের জন্য রঙিন ব্লাউজের ছিট ছোটোদের জন্য চকোলেট আর লজেন্স, চা-পায়ী আতিথ্যপরায়ণ কর্তাদের জন্য চায়ের চিনি, মিলিটারী ক্যানটিন থেকে সস্তা অথচ সুন্দর দৈনন্দিন জীবনের অজস্র টুকিটাকি, তিনি পরিবেশন করে বেড়ান। ফাদার সান্টাক্লজের পরেই, তিনি দিল্লীর বাঙালী মহলে বিশেষ করে মেয়েছেলে আর ছেলেমেয়ের কাছে চির আদরণীয়। যেহেতু মেয়েছেলে আর ছেলেমেয়েদের অভিভাবকেরা দারাপুত্রপরিবারের উপর একান্ত অনুরক্ত আর তারাই যখন হর্ষদা-ভক্ত, তখন হর্ষদাকে ভাল না বেসে তাঁরাও থাকতে পারেন না। সীজারের স্ত্রীর মতোন হর্ষদার চরিত্র সন্দেহের অতীত—অনিন্দনীয়। একদা প্রশ্ন করেছিলুম মেয়েদের সঙ্গে সাফল্যের আপনার গোপন কথাটি কি? বল্লেন দুটি কথা : শুদ্ধ অন্তঃকরণ। জানি তাঁর মতোন গীতা পাঠ, কালী স্তোত্র আওড়ানো, ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক, ব্রহ্মচর্য, ব্যায়াম আর আপিসের ঘণ্টার শেষে তিমারপুর থেকে ভোগল, সব্জীমণ্ডী থেকে পুষা—বাইক কষে চষে বেড়ানো আমার দ্বারা সম্ভব নয়। মেয়ে হলে সেজন্য জনপ্রিয় হবার আশাও নেই। শুধু কি তাই? সাময়িক বাঙলা আর অল্পবিস্তর ইংরেজি সাহিত্যে পড়াশুনা আশ্চর্য রকমের গভীর ও বিস্তৃত। যে-কোনো আধুনিক শিক্ষিত ভদ্রব্যক্তির বিস্ময় উৎপাদন করবে। আবাসিকেরা আমায় বলেছেন, তাঁর ঘরে রাত্রি তিনটে অবধি আলো জ্বলে। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে তিনি খাঁটি স্বদেশী বা দেশাত্মপ্রাণ মাতৃভাষা অর্থাৎ খাঁটি বিক্রমপুরী বুলি ছাড়া কোন ভাষা ঠিকমত উচ্চারণ করতে পারেন না। হর্ষদার কণ্ঠ কম্বুগ্রীব, স্বর উদাত্ত, দশজন লোকের সঙ্গে আলাপ করতে দেখে মনে হয়, তিনি যেন শ্রদ্ধানন্দপার্কে দশহাজারী জনসভায় বক্তৃতা করছেন। তাঁর কথা বলার ঢঙ হল আলাদা, যাকে হিন্দীতে বলে প্যারা অর্থাৎ মিষ্টি। কথায় স্পুনারিকতার (Spoonerism) হাস্যাবহ ছিট আছে। গাছের অজস্র সবুজ পাতা যেমন স্বতস্ফূর্ত, নিজের মধ্যেই পরিপূর্ণ হর্ষদার কথামাত্রই স্বতস্ফূর্ত—কলকাতার লোকের মতো ইনিয়ে বিনিয়ে প্যাঁচালো, চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলা তাঁর অভ্যাস নয়। ধরুন টিকটিকির দাম্পত্য জীবন নিয়ে কীটতত্ত্বের ব্যাখ্যান করছেন। তিনি টিকটিকির বদলে বেমালুম বলে বসলেন টিটকিরি আর যেখানে টিটকিরির দরকার সেখানে ফস করে বললেন গিটকিরি। আবার গানের জলসায় গিটকিরির বদলে অম্লান বদনে বলবেন কিরগিট। বোরখা তিনি উচ্চারণ করেন বোখড়া :—বোরখা পরিহিতা মহিলা, এককথায় তিনি বলেন বোখড়ী। আমারও মাঝে মাঝে এই অনির্বচনীয় কথামালার অর্থ উদ্ঘাটন করতে মুসকিল হত, কিন্তু একজন পার্ষদ আর আমার বন্ধু শ্রীবিষাদকুমার চাকী ম'শায়ের সৌজন্যে হর্ষদা ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক পরিভাষা শিক্ষালাভ করেছি। যেমন মাঝে একদিন আমার নতুন বর্ষাতি দেখে হর্ষদা প্রশ্ন করলেন এ কিরপলটির দাম কত? শব্দটির অর্থ হৃদয়ঙ্গম না করে বুঝলুম এটা বর্ষাতি সম্পৃক্ত—বললুম পঁচিশ টাকা। পরে চাকী ম'শায়কে প্রশ্ন করে জেনেছি কিরপল মানে তিরপল অর্থাৎ ত্রিপল। সবচেয়ে মজার শিখের কৃপাণ, হর্ষদার ভাষায় তিরনামী। এ ছাড়া ইংরেজি-বাঙলার নানা 'হাউলার' হর্ষদার আছে। যে মাংস খাবার, হর্ষদা বলেন ফ্রেশ, আর বড়ো বড়ো মাছের ইংরিজি 'বিগ্ লিগ্ ফিশ'। রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম টিকিট কিনতে গিয়ে হর্ষদা প্ল্যাটফর্ম স্ট্যাম্প চান আর ডাকঘরে ঠিক তার উল্টোটি

দাবী করে বসেন পোস্টেজ টিকিট। হর্ষদার বাচনিক ভঙ্গি আর ব্যাকরণ, 'প্রণয়ের সন্ধ্যা-ভাষা'র মতো (little language of love) আমাকে মধুর উজ্জ্বল রসের আস্বাদন দেয় আর সেটা যে আপনাদের গুছিয়ে, বেশ মৌজ করে বলার মতো ভাষা আর কলম ঈশ্বর আমাকে দেননি। আমার এক বান্ধবী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে এক থিসিস্ পেশ করেছেন তার একটি সুবৃহৎ অধ্যায় (অবশ্য আমার তাতে হাত আছে) HORSEDAISM বা হর্ষদা ঘটিত ভাষা বিকৃতি সম্পর্কে নিয়োজিত। থিসিস্‌গুলো বাঙলী পণ্ডিতেরা ঘাবড়েছেন, গম্ভীর হয়েছেন শেষতক মেনেও নিয়েছেন।

পঁয়তাল্লিশের পরেও, হর্ষদার মতো অফুরন্ত বিশ্বাস আর প্রাণশক্তি বাঙালী মনীষীর মধ্যেও দুর্লভ। মনে হয় মঙ্গল-কাব্যের মধ্যযুগের বাঙলা থেকে হর্ষদা যেন হঠাৎ উঠে এসেছেন। নাটকীয় বস্তুর সঙ্গে মঙ্গল-কাব্যের যাবতীয় লক্ষণ তার উপর বর্তেছে। ভূত ভগবান কুসংস্কার গাল-গল্প কিছুই তিনি বর্জন করেন না, অবিশ্বাস করেন না। হাঁ অমন হাসি কাউকে হাসতে দেখিনি প্রাণখোলা দরাজ আন্তরিক হাসি। পরলোক-গত স্যাডলার ওনাকে দেখলে লুফে নিতেন, বাঙালী হাসতে জানে না—এ মন্তব্য পরিহার করতে হত। পাণ্ডিত্য বা ক্ষুরধার বুদ্ধির সম্বল হর্ষদার নেই কিন্তু মেয়েদের মতোন তাঁর একটা সহজ অতীন্দ্রিয় জ্ঞান আছে যা দিয়ে মানুষ বাছাই করতে ঠকেন না। হর্ষদাকে ভাল লাগে বলেই, হর্ষদার কথা বলতে ভালবাসি। এক পেয়ালা চা বা আধখানা সিগারেট আজ পর্যন্ত হর্ষদার কাছ থেকে খাইনি; অদ্ভুত তাঁর আকর্ষণ একবার আলাপ করলে নাওয়া-খাওয়ার কথা, মনে থাকে না। অদ্ভুত বন্ধু-বৎসল, রসিক আর মজলিশী জীব হলেন হর্ষদা —একশোছিয়াশি কম্বরার যেন প্রাণ। ছোট-খাট ক্ষৌরচিক্কণ মোটসোটা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের মানুষটির হাল্কা বাদামী রঙের চোখ, শরৎকালের রোদে-ভেজা সমুদ্রের মতোন চঞ্চল, অস্থির প্রাণময়। তাঁর মনের রঙ, পোষাকেও মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। সাদা ও ব্রাউন কম্বিনেশন জুতো, হলুদমোজা, লাল আর কালোর চেক দেওয়া সার্ট, নেভী-নীল সার্ট, টকটকে লাল টাই, সাদা কাশ্মীরী টুইডের গল্ফ কোট। এই পোষাকে তাঁকে মোটেই উদ্ভট বা গ্রোটেস্ক দেখায় না। যেন—এমনটি ঠিক না হলেই হর্ষদাকে মানায় না।

তাঁর পারিবারিক জীবন সম্পর্কে আমি কুতূহলী নই, শুনেছি বিক্রমপুরের কোন নদীর পারে বৌদি থাকেন; এও শুনেছি তিনি সুন্দরী বুদ্ধিমতী—তবে হর্ষদার মতো জান্তব প্রাণপ্রাচুর্যে তিনি উচ্ছ্বসিত কিনা—জানি না। যে-মানুষ জনপ্রিয় হয় সে বোধকরি চণ্ডীদাসের বালাই নিয়ে, পরকেই আপন করে, আর আপনকে পর। হাসি দেখে মনে হয়, হর্ষদার জীবনে কোনো দুঃখ, কোনো দৈন্য বা শূন্য নেই। কখনো মন খারাপ হলে, গতানুগতিকতার ভোঁতা খোঁচা খেলে, মাসের শেষে পকেট শূন্য হয়ে এলে, উপরওলার অহেতুক নির্বোধ বাক্যবাণে জর্জরিত হলে—হর্ষদার দরাজ প্রাণখোলা হাসির আওয়াজ আর একশোছিয়াশির কামরার ঢালা আড্ডার কথা ভাবি সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী আবার সবুজ সরস ও প্রাণময় হয়ে উঠে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে বলি, নিছক বেঁচে থাকাটাই আশ্চর্য সুন্দর—To be alive is very heaven.

"পাকিস্থান দিবস" অনুষ্ঠিত হইবার পর হইতেই কলিকাতায় ও কলিকাতার উপকণ্ঠে শেষ গঙ্গার পরপারে হাওড়ায় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ আবার অশান্তি তীব্র করিয়া তুলিয়াছে। হাওড়ায় অশান্তির গুরুত্ব আর গোপন থাকিতেছে না এবং উত্তরবঙ্গে অশান্তি ব্যাপ্তিলাভ করিয়াছে। গান্ধীজীর পূর্ব-বঙ্গের উপদ্রুত স্থান ত্যাগের পরে তথায় অবস্থার দ্রুত অবনতি হইয়াছে।

এবার কলিকাতায় ও হাওড়ায় ঘটনার ...শিষ্ট—পুলিসের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উপস্থাপিত হইতেছে—সে সম্বন্ধে মামলাও উপস্থাপিত হইতেছে। কিছুদিন হইতে যে বাঙলার মুসলিম লীগ সচিব সঙ্ঘ সরকারী চাকরীতে—গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে মুসলমান কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছেন, সে ...য় বহুবার আলোচিত হইয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতা পুলিসে যে সকল 'পাঠান' আমদানী করা হইয়াছে, ● এবার তাহাদিগের সম্বন্ধে অভিযোগই অধিক। আর কোন কোন মুসলমান দারোগার বিরুদ্ধে অভিযোগও অল্প ...ল নহে।

এই অশান্তির ব্যাপ্তিতে লোক অন্য দিকে আশানুরূপ মনোযোগ দিতে পারিতেছে না। কিন্তু দেখা যাইতেছে, অন্যান্য দিকেও অবস্থা শোচনীয়। বাঙলা সরকারের সরবরাহ বিভাগ ...রূপ অযোগ্যতার পরিচয় দিয়াছে ও ...তেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। যে ইউরোপীয় দল ব্যবস্থা পরিষদে ও ব্যবস্থাপক সভায় অবাধে মুসলিম লীগ সচিব সঙ্ঘের সমর্থন করেন, সেই দলের নেতাও বলিয়াছেন—এই বিভাগের জন্য বৎসরে ৬ কোটি টাকা ব্যয়ের বিনিময়ে বাঙলা কি পাইতেছে? এই বিভাগ দীর্ঘকাল নিয়ন্ত্রণের নামে বাঙলার লোককে ...বিশুদ্ধ সরিষার তৈল সরবরাহ করিয়া আসিয়াছেন—ক্রমে তাহাও আর সরবরাহ করিতে না পারিয়া অর্ধেক পরিমাণ চীনা বাদামের তৈল দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতিও পালন করিতে ...হইয়া শেষে সরিষার তৈল নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে বাজারে বিশুদ্ধ ও 'বাজার চলন' সরিষার তৈলের অভাব দূর হইয়াছে। অর্থাৎ বাঙলার বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগ দেশের লোকের অর্থ ...ধে ব্যয় করিয়া যাহা করিতে পারেন নাই, ...ব্যবসায়ীরা নিয়ন্ত্রণ-মুক্তির সপ্তাহকাল মধ্যে ...তা সুসম্পন্ন করিয়া দেখাইয়াছেন—বেসামরিক সরবরাহ বিভাগ অযোগ্য এবং সে বিভাগের জন্য যে অর্থব্যয় হয়, তাহা অপব্যয় বলা অসঙ্গত● নহে।

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের দূর্ভিক্ষের সময় দেখা

গিয়াছিল, সচিব সঙ্ঘ নিরন্নের অন্ন সংগ্রহের কার্যেও প্রভূত লাভের লোভ সম্বরণ করেন নাই।

বাঙলায় নৌকা নির্মাণের ব্যাপারে যে আজও বহু প্রতারককে মামলা সোপর্দ করা হয় নাই—তাহাও বাঙলা সরকারের পক্ষে কলঙ্কের কথা ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। সরবরাহ বিভাগ যে এখন "ঘর পোড়ার কাঠ" হিসাবে ঐ ব্যাপার হইতে অর্থলাভের চেষ্টা করিতেছেন, তাহা বাঙলা সরকারের অর্থসচিবই সেদিন ব্যবস্থা পরিষদে স্বীকার করিয়াছেন।

বস্ত্রের অভাব এখনও সমভাবেই অনুভূত হইতেছে। এই অভাবের কারণ অনুসন্ধান করিল বুঝিতে বিলম্ব হয় না—অব্যবস্থাই ইহার অন্যতম প্রধান কারণ।

বাঙলার লোক মুসলিম লীগ সচিব সঙ্ঘের সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট ব্যবস্থায় ও ব্যবহারে বিরত হইয়া মনে করিতেছেন, বাঙলাকে পূর্ব ও পশ্চিম দুই ভাগে বিভক্ত করিতে না পারিলে বাঙালী হিন্দুর সর্বনাশ হইতে অব্যাহতি লাভের আর উপায় নাই। বৃটিশ সরকারের সাম্প্রতিক বিবৃতি সে বিষয়ে লোককে বিশেষ সচেতন করিয়া তুলিয়াছে। কারণ, মুসলিম লীগ সচিব সঙ্ঘের অধীন থাকিলে বাঙলার পক্ষে পাকিস্থানের অংশ হইয়া সাম্প্রদায়িকতার দুর্নীতি ভোগ করিতে হইবে—স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র সঙ্ঘে বাঙলার স্থান হইবে না। বাঙলার হিন্দুই সর্ববিধ ত্যাগ স্বীকার করিয়া—প্রাণ পর্যন্ত দিয়া দেশে স্বাধীনতার সংগ্রাম প্রবর্তিত করিয়াছে; কাজেই তাহাদিগের পক্ষে স্বাধীনতায় বঞ্চিত থাকিবার কল্পনা যে বেদনাদায়ক, তাহা বলা বাহুল্য।

আর মুসলিম লীগ সচিব সঙ্ঘ যেভাবে কাজ করিতেছেন, তাহাতে দেশে যে বিপ্লবপন্থী আন্দোলন আবার আত্মপ্রকাশ করে নাই—সে কেবল কংগ্রেস কর্তৃক অহিংসনীতি গ্রহণে।

দেখা গিয়াছে, বাঙলায় গভর্নর সংখ্যালঘিষ্ঠদিগের সম্বন্ধে তাঁহার কর্তব্য পালন করিতেছেন না। তিনি যেভাবে নোয়াখালির ব্যাপারের বিবরণে সত্য বিকৃত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি আর দেশের লোকের আস্থাভাজন নহেন।

কিন্তু ভারতশাসন আইনের ব্যবস্থায় যে প্রদেশে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত, সে প্রদেশ সম্বন্ধে পার্লামেণ্ট দায়িত্ব স্বীকার করিতে পারেন না। সে প্রদেশের দায়িত্ব সচিব সঙ্ঘের—সচিব সঙ্ঘের কার্যে কেবল গভর্নর হস্তক্ষেপ করিতে পারেন; আর বড়লাট প্রাদেশিক গভর্নরকে নির্দেশ দিতে পারেন। বাঙলায় সচিব সঙ্ঘ সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট; গভর্নর সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্পর্কে দায়িত্ব পালনবিমুখ; আর বড়লাট লর্ড ওয়াভেল যে বাঙলার গভর্নরকে সচিব সঙ্ঘের পরিবর্তন করিতে বলেন নাই, তাহা আমরা দেখিয়াছি। পাঞ্জাবেরও সেই দুরবস্থা ছিল। কিন্তু রক্তসিক্ত পথ যত অবাঞ্ছিতই কেন হউক না—সেই পথ অবলম্বিত হওয়ায় তথায় ভারতশাসন আইনের ৯৩ ধারা জারী হওয়ায় সে প্রদেশে পার্লামেণ্টের দায়িত্ব হইয়াছে। বাঙলায় যে নরহত্যা, লুণ্ঠন, গৃহ-দাহ, নারীহরণ প্রভৃতি হইয়াছে, সে সবই "একতরফা" বলা যায়। এই শোচনীয় অবস্থায় যখন সার ফ্রেডরিক বারোজকে বাঙলা ত্যাগ করানও বাঙলার হিন্দুদিগের আন্দোলনের দ্বারা হইবে না, তখন বাঙলায় উপদ্রব কত প্রবল, অনাচার কিরূপ অসহনীয় এবং অত্যাচার কত ক্রমবর্ধনশীল, তাহা বৃটিশ সরকারের নিকট প্রতিপন্ন করিতে হইবে। সে কাজ কেবল সভায় প্রস্তাব গ্রহণের দ্বারা হইবে না। তাহার জন্য সকল প্রমাণ একসঙ্গে রাখিয়া এমনভাবে দিতে হইবে যে, বিলাতের ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোক তাহার গুরুত্ব বুঝিতে পারে।

শাসন-সংস্কারে প্রবর্তিত ব্যবস্থায় মুসলিম লীগ সচিব সঙ্ঘ বাঙলায় কিরূপ অবাঞ্ছনীয় কাজ করিয়া আসিয়াছেন ও আসিতেছেন, তাহা দেখাইবার সকল দিকেই প্রমাণ সংগ্রহ করিতে হইবে:—

(১) কিভাবে তাঁহারা সরকারী চাকরীতে মুসলমান-বাহুল্য করিতেছেন।

রৌলণ্ডস কমিটি বলিয়াছেন—দুর্নীতি সরকারী চাকরীয়াদিগকেও দুষ্ট করিয়াছে। এই দুর্নীতির উৎস কোথায় এবং ইহার জন্য মুসলিম লীগ সচিব সঙ্ঘ কত দায়ী, তাহা প্রমাণের দ্বারা দেখাইয়া দিতে হইবে।

(২) দুর্নীতি দমন করা ত পরের কথা, মুসলিম লীগ সচিব সঙ্ঘ কিরূপে তাহা দমন করিতে অনিচ্ছুক, তাহার প্রমাণসমূহ একস্থানে সংগ্রহ করিয়া দিতে হইবে।

নৌকা নির্মাণ ব্যাপারে যে অনুসন্ধান করা হইবে বলা হইয়াছিল, এক বৎসরেও তাহা করা হয় নাই। কোটি কোটি টাকার অপব্যয় অনায়াসে "ধামা চাপা" দেওয়া হইয়াছে।

দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে দেখা যায়—মুসলিম লীগ সচিব সঙ্ঘ:—

(ক) বিশেষ প্রয়োজনে ও জনগণের স্বার্থ অবজ্ঞা করিয়া সম্মিলিত সচিব সংঘ গঠনের পথ বিঘ্নাস্তৃত করিয়াছিলেন;

(খ) চাকরীয়া নিয়োগ সাম্প্রদায়িক সংখ্যা রক্ষার জন্য যথাকালে খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়ের দোকান খুলিতে বিলম্ব করায় অনাহারে লোক মরিয়াছিল;

(গ) খাদ্যশস্য ক্রয়ে এজেণ্ট নিয়োগের অপকারিতা প্রতিপন্ন হইলেও এজেণ্ট নিয়োগে বিরত হয়েন নাই;

(ঘ) ব্যবস্থাদোষে খাদ্যদ্রব্য নষ্ট করিয়াছিলেন;

(ঙ) খাদ্যদ্রব্য ক্রয়বিক্রয়ে লাভের লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই;

(চ) ব্যবস্থার দোষে দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়াছিলেন। কিভাবে মুসলিম লীগ অযোগ্য লোককে দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যের ব্যবসার ছাড় দিবার ভার অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনের কর্মচারীদিগকে দিয়া দুর্নীতির পথ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ সরকারী রিপোর্টেই পাওয়া যায়।

(৩) মুসলিম লীগ সচিব সংঘ যে বিচারের কার্যেও হস্তক্ষেপ করিয়াছেন—তাহার বহু প্রমাণ আছে।

বর্তমান অশান্তির সময়েও একাধিক মুসলমান রাজকর্মচারীর বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে কাজ করার অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।

মুসলিম লীগ সচিব সংঘের নিকট যে সম্প্রদায়বিশেষের ব্যক্তিস্বাধীনতা অবজ্ঞেয় তাহা তাঁহাদিগের নির্দেশে ও আদেশে—বিশেষ ব্যবহারে বুঝিতে পারা যায়।

মুসলিম লীগের "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম" দিবসের সময় যে বাঙলার প্রধান সচিবের নামে বহু পরিমাণ পেট্রোলের "কুপন" বাহির হইয়াছিল তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব-বঙ্গের উপদ্রুত স্থানসমূহে যে বাড়িতে পেট্রল দিয়া অগ্নিযোগ করা হইয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে কুমারী মুরিয়েল লিস্টার বলিয়াছিলেন—পেট্রল নিয়ন্ত্রিত—কে তাহা গ্রামে দিয়াছিল—কোথা হইতে তাহা পাওয়া গিয়াছিল?

এবার কলিকাতার হাঙ্গামার সময়েও পেট্রল দিয়া বসতি জ্বালাইবার অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।

কলিকাতায় ১৬ই আগস্ট তারিখে যে হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হয়, তাহা জানিয়াও বাঙলার গভর্নর সচিব সংঘের পরিবর্তন ঘটান প্রয়োজন বা কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। বড়লাট লর্ড ওয়াভেল যে সে বিষয়ে তাঁহাকে কোন নির্দেশ দেন নাই, তাহাও অনুমান করা অসঙ্গত নহে। অথচ বাঙলার মুসলিম লীগ সচিব সংঘের প্রধান সচিবই বাঙলায় স্বতন্ত্র সমান্তরাল সরকার প্রতিষ্ঠার কথা বলিয়াছিলেন।

কেন্দ্রী পরিষদে ও রাষ্ট্রীয় পরিষদে যে সকল বাঙালী সদস্য আছেন, তাঁহারা বাঙলাকে বিভাগ—অন্তত দুইটি বিভিন্ন সচিব সংঘের অধীন করিবার জন্য লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের নিকট যে পত্র লিখিবেন স্থির করিয়াছেন, তাহা প্রেরিত না হইবার কারণ—পশ্চিমবঙ্গের কয়জন প্রতিনিধি তাহাতে স্বাক্ষর দেন নাই। পূর্ববঙ্গের প্রতিনিধিরা সকলেই—এমন কি জমিদারদিগের প্রতিনিধি এবং ব্যবসায়ীদিগের প্রতিনিধিও তাহাতে স্বাক্ষর দিতে সম্মত। কেন পশ্চিমবঙ্গের কয়জন প্রতিনিধি স্বাক্ষর দান করেন নাই, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তাঁহারা কংগ্রেসের পক্ষ হইতে নির্বাচিত। কংগ্রেস সুস্পষ্টরূপে মত ব্যক্ত না করা পর্যন্ত তাঁহারা দলের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিতে অসম্মত।

যদি আমাদিগের এই অনুমান সত্য হয়, তবে সেজন্য তাঁহাদিগের প্রশংসাই করিতে হয়।

আমাদিগের বিশ্বাস, এইবার কংগ্রেস বঙ্গ-বিভাগ সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া মত প্রকাশ প্রয়োজন মনে করিবেন। ইতিপূর্বেই আচার্য কৃপালনী বাঙলা বিভাগের অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন। কংগ্রেস পাঞ্জাব বিভক্ত করিবার প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জওহরলাল নেহরু প্রদেশ বিভক্ত করিবার পূর্বে পাঞ্জাবকে ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়া একই সরকারের অধীনে বিভিন্ন সচিব সংঘের অধীনস্থ করিবার পরিকল্পনা করিয়াছেন। বাঙলা সম্বন্ধেও বাঙলার হিন্দুদিগের একাংশ ঐরূপ পরিকল্পনা করিয়াছেন। ইহার সুবিধা এই যে, আপাতত বিবাদের কারণ দূর হয় এবং পরে প্রয়োজন উপস্থিত হইলে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ গঠনের সুযোগ পাওয়া যায়।

বাঙলার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এতদিন বিভাগের অনুকূলে মত প্রকাশ করেন নাই বটে; কিন্তু কলিকাতায় পুনরায় অশান্তির উদ্ভবে ও পূর্ববঙ্গে অশান্তির অগ্নি আবার ধূমায়িত হওয়ায় তাঁহারাও ৪ঠা মার্চ বিভাগের সমর্থন করিয়াছেন।

গত ১০ বৎসরে মুসলিম লীগ সচিব সংঘ যত সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট আইন—ব্যবস্থা পরিষদে সংখ্যাধিক্যের বলে বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, সেই সকলের বিষয় বিবেচনা করিলেই এ বিষয়ে কর্তব্য স্থির করিবার পথ সুগম হইবে।

বাঙলার আজ দুর্দিন। বাঙলার হিন্দু—সমগ্র ভারতের হিন্দুরই মত—জাতীয়তার জন্য কোনরূপে অধিকার সাম্প্রদায়িকভাবে সম্ভোগের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে নাই। কিন্তু মুসলিম লীগ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্ট বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেই লীগের জাতীয়তাবিরোধী অসঙ্গত দাবী দিন দিন বিবর্ধিত হইয়াছে। বৃটিশ সরকার মুখে বলিয়াছেন বটে—"পাকিস্থান অসম্ভব, কিন্তু কার্যত "পাকিস্থান" প্রতিষ্ঠার পথই মুক্ত করিয়াছেন। এমন কি লর্ড ওয়াভেল মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়া মুসলিম লীগের প্রতিনিধিদিগকে নূতন শাসন পরিষদে গ্রহণে অন্য সদস্যদিগের সম্মতি লইয়াছিলেন।

মুসলিম লীগ পাঞ্জাবে মুসলিম লীগ সচিব সংঘ লাভের জন্য যে অরাজকতার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার জন্যই বৃটিশ সরকারের তাঁহাদিগের অভিপ্রায় ঘৃণ্য মনে করা সঙ্গত। সিন্ধু প্রদেশে যাহা হইতেছে, তাহা যেমন, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অবস্থাও তেমনই লক্ষ করিবার বিষয়।

কংগ্রেস বাঙলার সম্বন্ধে যে মতই কেন প্রকাশ করুন না পার্লামেণ্ট ব্যতীত বাঙলার হিন্দুর অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা আইনত কাহারও নাই। সেইজন্য গত ১০ বৎসরে মুসলিম লীগ সচিব সংঘের অধীনে বাঙলার সংখ্যাল্প হিন্দু সম্প্রদায় ও অন্য জাতীয়তাবাদী দল সকল যে দুরবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, তাহার বিস্তৃত ও প্রামাণ্য বিবরণ প্রকাশ প্রয়োজন।

তাহা কেবল বাঙলার হিন্দুকে রক্ষা করিবার জন্যই প্রয়োজন নহে—পরন্তু ভবিষ্যৎ ভারতের ব্যবস্থা নির্ধারণেও তাহার প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক।

বর্ণ-বিদ্বেষ

শ্রীসুলতা কর, এম এ
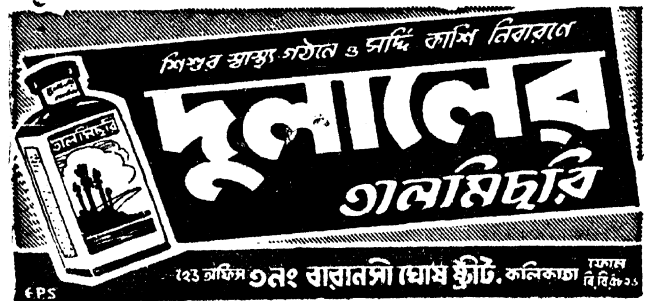
ঝাড়ুদার বুড়ো এণ্টনীকে সবাই চেনে। যেখানেই নর্দমার মুখে জঞ্জাল জমে রয়েছে, যেখানেই খানাখন্দে দুর্গন্ধ মল স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে সেখানেই দেখা যাবে ঝাড়ুদার এণ্টনী ঝাড়ু হাতে দাঁড়িয়ে ভুরু কুঁচকে নিজের মনে গজগজ করছে। মুখে সে যতই বিরক্তি দেখাক তার মতন সাধু আর পরিশ্রমী লোক দেখা যেত না সেজন্য পাড়ার সকলেই তাকে ভালবাসত।

একদিন সকালে পাড়ার লোকেরা তাকে জিজ্ঞাসা করল—"আচ্ছা এণ্টনী, বুড়ো বয়সে তুমি এই খারাপ কাজে এত খাটছ কেন?"

এণ্টনী বলল—"কি আর করব বলুন। এই কাজ করেইত ছেলেদের মানুষ করলাম। আমার পাঁচ ছেলে বিয়ে করে দেশ ছেড়ে চলে গেল, সেও তো আপনারা জানেনই।" পাড়ার লোকেরা হাসতে হাসতে বলল—"বিয়ে করে ছেলেরা গ্রাম ছেড়ে চলে গেল, বুড়ো বাপকে সাহায্য করল না। তুমি বাধা দিতে পারলে না?"

এই কথা শুনে বুড়ো এণ্টনী রেগে উঠে বলল "অমন কথা বলবেন না, আমি দাঁড়াব আমার ছেলেদের জীবনের পথে। আমার মা বাপ এইরকম ভুল করেছিলেন বলেই ত আজ গেঁয়ো ঝাড়ুদার হয়েছি নইলে বড় ব্যবসাদার হতে পারতাম।" এই শুনে পাড়ার লোকেরা বলল—"এণ্টনী তোমার জীবনের গল্প আমাদের শোনাও।"

এণ্টনী একটি রাস্তার পাথরের উপর বসে পড়ে বলতে আরম্ভ করল ঃ—

হাভার নামে একটা ছোট পাড়াগাঁয়ে আমি জন্মালাম। আমার মা বাপের আমি ছিলাম একমাত্র ছেলে। কাজেই তাঁরাও আমাকে যেমন আদর দিতেন আমিও তেমনি তাঁদের কথা মেনে চলতাম। ছোটবেলা থেকে কখনও আমি মা বাবার কোন কথার অবাধ্য হতে পারিনি। যখন আমার বয়স তেইশ চব্বিশ বছর, তখন হাভারের কাছাকাছি একটা ছোট সহরে ভাল মিলিটারী কাজ পেয়ে গেলাম। সময়টা খুব ভাল কাটতে লাগল। একে তরুণ বয়স তাতে ভাল চাকরী। সে সময় একটা খেয়াল আমার খুব বেড়ে গেছল। কাজে ছুটি পেলেই নদীর জেটীর ধারে ঘুরে বেড়াতাম। সেখানে তাঁবু খাটিয়ে পাখীওলারা বসে থাকত। জাহাজ থেকে দেশ বিদেশের কত রকম বেরকমের পাখী আসত। আমি ঘুরে বেড়াতাম আর অবাক হয়ে দেখতাম।

একদিন সকালে অভ্যাসমত পাখীর খাঁচার পাশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছি এমন সময় একটা ছোট হোটেল ঘরের দরজা খুলে গেল। এক নিগ্রো তরুণী দরজা খুলে পাশে এসে দাঁড়াল। কি আশ্চর্য সুন্দর তার দুটি চোখ আর কি সুঠাম লাবণ্যভরা দেহ। আমি সব ভুলে অবাক হয়ে মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে রইলাম, সেও অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকাতে লাগল। এমনি-ভাবে দুজনে দুজনের মুখের দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে ছিলাম জানি না, হঠাৎ দুজনেরই ভারী লজ্জা হ'ল। মেয়েটি ঝাড়ু দিয়ে হোটেল ঘর ঝাঁট দিতে আরম্ভ করল। আমিও বাড়ীর পথে ফিরে চললাম, সারা পথ কিন্তু নিগ্রো তরুণীর সুন্দর মুখখানি মনে পড়তে লাগল।

এরপর থেকে আমার কি হল কে জানে। সকালে বিকালে যখনি সময় পেতাম হোটেল ঘরের চারপাশে ঘুরে বেড়াতাম, পাখীর নেশা কেটে গিয়ে নিগ্রো তরুণীর নেশায় মশগুল হয়ে উঠলাম। জানলার ফাঁক দিয়ে দেখতাম কখনও বা সে নাবিকদের চা ঢেলে দিচ্ছে কখনও বা দেখতাম চায়ের বাসন ধুচ্ছে।

কাজ করতে করতে আমাকে দেখতে পেলেই সে মিষ্টি হেসে উঠত। কালো ঠোঁটের নীচে সাদা দাঁতগুলি মুক্তোর মত ঝলসে উঠত। ক্রমে আমি বুঝলাম যে তরুণী আমায় ভালবাসে। এরপর থেকে সময় পেলেই আর পকেটে পয়সা থাকলেই আমি সাহস করে হোটেলে ঢুকে পড়ে লেমনেড, সিরাপ, চা খেতাম। নিগ্রো তরুণীর নাম ছিল লিলি। কালো পাথরের তৈরী দেবীমূর্তির মত এগিয়ে এসে যখন সে তার কালো হাতে লাল সিরাপ আমার বাটীতে ঢেলে দিত, তখন আমার মনটা যে কি আনন্দে ভরে উঠত কি বলব। সারাদিন ধরে আমি তার সেই মূর্তিখানি ভাবতাম। মনে হত আমি বুঝি আর এই মাটীর পৃথিবীতে নাই।

মাসখানেকের মধ্যে আমরা দুজনে দুজনের প্রাণের বন্ধু হয়ে উঠলাম। আমি অবাক হয়ে দেখতাম সে কত লেখাপড়া শিখেছে, কি সুন্দর ফরাসী ভাষায় কথা বলছে, আর কি মার্জিত ব্যবহার। তার দুঃখময় জীবনকাহিনী সে আমাকে শুনিয়েছিল। যখন সে ছ'মাসের শিশু তখন তার মা বাপ তাকে পথের ধারে ফেলে রেখে চলে গেছল। কেউ যখন শিশুটির ভার নিতে চাইল না, তখন ফলওয়ালী তাকে বুকে করে নিজের ঘরে কুড়িয়ে আনল। নিজের মেয়ের মত সযত্নে মানুষ করল। যদিও সে নিজে অশিক্ষিতা ছিল তবু লিলিকে লেখা-পড়া শেখাল, ভদ্রমহিলার উপযুক্ত আচার ব্যবহার শেখাল। মারা যাবার সময় তাকে কিছু টাকাও দিয়ে গেল।

নিগ্রো তরুণীর এই করুণ জীবন কাহিনী শুনে আমার মন তার উপর আরও আকৃষ্ট হল। এক শুভ সন্ধ্যায় আমি আমার এতদিনের গোপন মনোভাব ব্যক্ত করে বললাম—"লিলি এস আমরা বিবাহিত হই।" আনন্দে বিস্ময়ে লিলির কালো চোখের তারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মুখখানি লজ্জায় গৌরবে কি সু... যে দেখাতে লাগল। অবাক হয়ে বলল—"... বলছ এণ্টনী, এত সৌভাগ্য কি আমার ... পারে?"

আমি দৃঢ়স্বরে বললাম—"নিশ্চয়ই তোমায় বিয়ে করব। মাত্র একটি বাধা সে হল মা বাবার মত পাওয়া। জানতই বেলা থেকে আমি সব সময় তাঁদের কথা চলি। কিন্তু সেজন্য ভেব না, আজই বাড়ী যাব। এই বিয়েতে তাঁদের মত আ... করে তবে ফিরব।" সেদিনই আমি বেরিয়ে পড়লাম। বিকালে মা বাবা যখন গাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম করছেন, দুজনেরই মন বেশ খুশী হয়ে রয়েছে তখন আমি বললাম—"শহরে এবার আমি একটি মেয়ে দেখেছি, মেয়েটি সব দিক দিয়ে এত ভাল যে ঠিক করেছি তাকেই বিয়ে করব। আপনারাও তাকে পেলে খুশী হবেন।"

আমার কথা শুনে মা বাবা উৎসুক হয়ে উঠে আমাকে মেয়েটির সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করতে আরম্ভ করলেন। আমিও লিলির গুণের কথা তাঁদের খুলে বলতে আরম্ভ করলাম। গায়ের কালো রংয়ের কথাটা প্রথমে বললাম না।

বললাম—"যদিও মেয়েটি হোটেলে পরি-চারিকার কাজ করছে তবু তার মত গুণ বড় ঘরের শিক্ষিতা মেয়ের মধ্যেও পাওয়া যাবে না। একদিকে কি সুন্দর ফরাসী ভাষায় কথা বলে কত লেখাপড়া জানে আবার অন্যদিকে এমন পরিশ্রমী এমন হিসাবী যে আপনারা দেখে অবাক হয়ে যাবেন। ও যদি সংসার চালায় তাহলে সংসারের শ্রী সম্পদ যে কত বেড়ে যাবে বলতে পারি না। আর হোটেলে কাজ করে বলে যে গরীব তাও নয়। যে ফলওয়ালী

লিলিকে মানুষ করেছে সে অনেক টাকা ওকে দিয়ে গেছে।

আমার কথা শুনে মা বাবা দুজনেই খুশী হয়ে উঠে মত দিতে যাচ্ছিলেন, তখন আমি আস্তে আস্তে আসল কথাটি বললাম।

অল্প একটু হেসে যেন ব্যাপারটা কিছুই নয় এমনিভাবে বললাম—"কিন্তু একটা জিনিসে হয়ত আপনাদের আপত্তি হতে পারে। তার গায়ের রং আপনাদের মত সাদা নয়। সে নিগ্রো তরুণী।"

মা বাবা অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন—সাদা নয় বলতে কি বোঝায়, নিগ্রো বলতে কি বোঝায় বুঝতে পারলেন না। যাতে তাঁদের মনে কোন খারাপ ধারণা না হয় তেমনি করে আমি তাঁদের বোঝাতে লাগলাম। বললাম—"বইয়ে কালো ছেলে মেয়ের ছবিত আপনারা দেখেছেন তেমনি আর কি।"

আমার এই কথায় তাঁরা যেন আরও ভ্যাবাচ্যাকা হয়ে গেলেন। বাবা চোখ বড় বড় করে দিয়ে বলতে লাগলেন—"এ্যাঁ বলিস কি রে, উল্লেখ বইয়ের সেই কুচকুচে কালো মেয়ে?"

এমন ভাবে বললেন যেন আমি সাক্ষাৎ শয়তানকে কার্যে করতে চাইছি।

প্রমাণ হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন—"কালো? বজ্র কালো, মাথা থেকে পা পর্যন্ত মুসলমান"

কাজ রেখে বললাম—"হ্যাঁ, তাতে কি হয়েছে, আপনারও তো মাথা থেকে পা পর্যন্ত সাদা।"

স্পষ্ট বাবাকে বললাম—"অতটা কালো নয়। এমন কালো নয় যে আপনি দেখে ভয় পাবেন। পাদ্রী সাহেবের গাউনও তো কালো। কিন্তু কালো পোষাক পরা তাঁর চেহারা দেখে আপনাদের ভয় হয় না ভক্তি হয়?"

বাবা দ্বিধার সঙ্গে ঘাড় নেড়ে বললেন—"উঁ হুঁ আমার মনে হচ্ছে ব্যাপারটা সুবিধার হবে না।"

"কেন মিছামিছি অত ভাবছেন, দুদিনেই দেখবেন তাকে কতো ভাল লাগবে, গায়ের রংয়ের কথা মনেই পড়বে না।" সবশেষে অতি কষ্টে তাঁরা এই সর্তে রাজী হলেন যে আগে তাঁরা মেয়েটিকে নিজেদের চোখে দেখবেন, তারপরে ঠিক হবে যে ওই মেয়ে তাঁদের পরিবারে আনা চলে কি না। অগ্যত্যা তাতেই আমি রাজী হলাম। শহরে ফিরে এসে সব কথা লিলিকে খুলে বললাম। সে ত তখুনি আমাদের বাড়ী যেতে রাজী হয়ে গেল। দুএকদিনের মধ্যে তাকে নিয়ে চললাম গ্রামের বাড়ীতে মা বাবার কাছে।

যাবার সময় লিলি তার সবচেয়ে ভাল পোষাক পরল। ঝকঝকে রুপোলী পোষাকে কি সুন্দর তাকে দেখাচ্ছিল। কিন্তু স্টেশানের প্ল্যাটফর্মে পেঁৗছে দেখি দলে দলে লোক তার দিকে চেয়ে হাসতে আরম্ভ করেছে। ট্রেণের থার্ড ক্লাস কামরায় একটা বেঞ্চে দুজনে পাশাপাশি বসলাম। চেয়ে দেখি যত গরীব লোক চাষা মুটে সব এক দৃষ্টে তাকে দেখছে আর হাসছে। পিছনের বেঞ্চের লোকেরা তাকে দেখবার জন্য ভীড় করে দাঁড়িয়ে উঠল।

এইসব দেখে শুনে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। মা বাবার লিলিকে কেমন লাগবে কে জানে ভাবতে ভাবতে মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল।

ট্রেণ থামল। জানলা দিয়ে দেখলাম ঘোড়ার লাগাম হাতে করে বাবা প্ল্যাটফর্মের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আর মা প্ল্যাটফর্ম পার হয়ে এগিয়ে আসছেন। লিলির হাত ধরে তাঁদের সামনে এগিয়ে গেলাম। নিগ্রো তরুণীর কালো রং দেখে মা এমন হতভম্ব হয়ে গেলেন যে মুখ দিয়ে তাঁর একটিও কথা বেরোল না আর বাবা মাথা নীচু করে ঘোড়ার পিঠ চাপড়াতে আরম্ভ করলেন। আমি কিন্তু তাঁদের ভাবান্তর দেখে ভয় পেলাম না; ছুটে এগিয়ে এসে তাঁদের স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে লিলির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। বললাম—"এই দেখুন মেয়েটিকে। রং কালো বটে কিন্তু দুদিন যদি এর সঙ্গে থাকেন তাহলে বুঝবেন এত গুণের মেয়ে কোথাও পাওয়া যায় না। এখন এগিয়ে এসে ওর সঙ্গে কথা বলুন, নইলে ওর মনে কি রকম কষ্ট হবে বলুন ত।"

মা অতি কষ্টে বললেন—"এস বাছা।" বাবা টুপিটা তুলে ধরে সম্ভাষণ জানালেন।

সবাই মিলে ঘোড়ার গাড়ীতে উঠে বসলাম।

মা আর একটিও কথা বললেন না, থেকে থেকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে লিলির দিকে চাইতে লাগলেন।

এমনি করে চারজনেই চুপচাপ বসে আছি, গাড়ী ছুটে চলেছে, শেষে আর থাকতে না পেরে মাকে বললাম—"মা আপনি কি ওর সঙ্গে কথা বলবেন না।"

মা গম্ভীর হয়ে বললেন—"কথা বলবার ঢের সময় পাওয়া যাবে।"

বললাম—"কেন মা, সেই মুরগী আর তার আটটা ডিমের গল্প শুনিয়ে দিন না।"

মায়ের পোষা মুরগীর আটটা ডিম চুরি করতে এসে কেমন করে চোর ধরা পড়েছিল, সেই গল্পটা মায়ের এত প্রিয় ছিল যে বাড়ীতে যে আসত তাকেই গল্পটা শুনিয়ে দিয়ে নিজেও হাসতেন আর তারাও হাসত। আজ কিন্তু মায়ের মুখভার কমল না, কাজেই আমি গল্পটা লিলিকে শোনাতে আরম্ভ করলাম। গল্পটার যেই মাঝামাঝি পেঁৗছেচি অমনি বাবা হেসে উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গে লিলিও খিলখিল করে হেসে উঠল, মা আর থাকতে না পেরে ওদের সঙ্গে যোগ দিয়ে হেসে উঠলেন। এতক্ষণ পর লিলির সঙ্গে ওঁদের ভাব হল।

ঘণ্টাখানেক বাদে বাড়ী পেঁৗছালাম। বা পেঁৗছেই লিলি একটুও বিশ্রাম না ক রান্নাঘরে ঢুকে মা বাবার জন্য, সুন্দর সু রান্না করতে আরম্ভ করল। মা একটু বিশ্র করে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন। গিয়ে যখ দেখলেন লিলি রান্নাঘর পরিষ্কার ক গুছিয়ে তাঁদের জন্য সুন্দর সুন্দর রা করছে তখন তাঁর মন এই পরিশ্রমী মেয়েটি উপর খুব প্রসন্ন হয়ে উঠল। নিজেও ছিলে তিনি পরিশ্রমী, সুগৃহিণী। খানিকবা সবাই মিলে খেতে বসা হল। লিলির হাতে চমৎকার রান্না খেয়ে মা বাবা দুজনেই এ খুশী হয়ে উঠলেন মুখে তাঁদের এমন হা ফুটে উঠল যে আমার মনে হল বুঝি ওঁদে মনের সব গ্লানি কেটে গেছে। বিকা বেড়াবার সময় বাবাকে জিগেস করলাম "আচ্ছ বাবা, এখন আপনার কি মনে হচ্ছে?" বা ইতস্ততঃ করতে লাগলেন, বুঝতে পারলা মনে মনে রাজী হলেও মুখে স্বীকার কর পারছেন না। বললেন—"আমি এখনও কি ঠিক করতে পারিনি, তোমার মাকে জিজ্ঞা করো।" মাকে বললাম—"মা সত্যি করে বল লিলিকে কেমন লাগছে?"

মা বললেন—"বাছা, সত্যি বলছি ওর গু অনেক। এত গুণ অনেক বড় ঘরের মে ভিতরেও দেখা যায় না। কিন্তু কি করব ও ওর গায়ের কালো রং আমি সহ্য কর পারছি না। কি ভয়ানক কালো বল ত, ঠি যেন শয়তানের মত।"

মার কথা শুনে আমার বুকের ভিতর দুঃখের ঝড় বয়ে গেল। কেন না জানতাম মা জেদ কিছুতেই টলে না, একবার তিনি বলেন কিছুতেই তার অন্যথা হয় না।

অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম—লিলি ক সহজে আমার হৃদয় জয় করল, কিন্তু মার ম কি এমনই পাষাণ যে কিছুতেই তা গলল না

সেদিন বিকালে বেড়িয়ে ফেরবার সম চারজনেই বিমর্ষ হয়ে নানাকথা ভাব লাগলাম, সারাদিনের হাসিখুশী কোথা চলে গেল।

তারপর রাস্তার দৃশ্য কি অসহ্য বিরক্তি কর। যখনি কোন চাষার বাড়ীর দরজার সাম পেঁৗছচ্ছি তখনি চাষার বৌ, ছেলেমেয়ে ছু আসছে কালো মেয়ে দেখবার জন্য। এক লম্বা ক্ষেত পার হতে গিয়ে দেখি যে এপা ওপাশ থেকে দল বেঁধে গ্রামের সব ছেলেমে ছুটে আসছে। লিলির গায়ের রং দেখে হে লুটিয়ে পড়ছে, ছোট ছোট ছেলেদের কো তুলে দেখাচ্ছে, দূরের লোকদের দেখবার জ ইসারা করে ডাকছে। ঠিক যেন গ্রামের এক মেলা বসেছে আর সেখানে বাঁদর নাচ দেখা হচ্ছে। বেচারী লিলির চোখে জল এসে গেল ভিড় ক্রমেই বাড়ছে দেখে মা বাবা দুজনে

লজ্জায় আমাদের ফেলে রেখে ছুটে বাড়ীতে পালিয়ে গেলেন। এই সব দেখেশুনে রাগে আমার চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠছিল, ইচ্ছা হচ্ছিল ছুটে গিয়ে সবাইকে গুলী করে মারি। বাড়ী ফিরে শোবার ঘরে ঢুকে হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়লাম। চোখের জল চেপে লিলি কাঁদো কাঁদো সুরে বলল—"কি হবে এণ্টনী, মা বাবার কি মত হবে না, আমি কি তোমার সঙ্গে থাকতে পাব না?" কি উত্তর দেব ভেবে পেলাম না, দুঃখে ব্যথায় বুক আমার ভেঙ্গে যাচ্ছিল, মাথা নীচু করে বললাম—"লিলি ভয় পেয়ো না, এখন ওঁদের মত হ'ল না। কিন্তু ভবিষ্যতে ভগবান আমাদের সহায় হবেন।" লিলি বিছানায় শুয়ে পড়ে বুকফাটা কান্না কাঁদতে লাগল। হাত জোড় করে ভগবানকে বললাম—"হে ভগবান, তুমি কি কেবল সাদা মানুষেরই ভগবান। মানুষ যদি কালো হয়, তবে কি সে তোমার দয়া পাবে না। আর তাই যদি হবে, তবে সাদা ছেলের বুকের ভিতর কালো মেয়ের জন্য এত ভালবাসা দিলে কেন?"

লিলি একটু পরে ধৈর্য ধরে উঠল। চোখের জল মুছে ফেলে সারাদিন ধরে মার পিছন পিছন ঘুরে সংসারের কাজ পরিপাটী করে করে দিল। মা বাধা দিতে গেলে বলতে লাগল—"আমি ত আর বেশীক্ষণ থাকব না মা, আমাকে দয়া করে করতে দিন।"

মার মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম মার মন একেবারে গলে গেছে, নিজেই আমাকে ডেকে অনুতপ্ত সুরে বলতে লাগলেন—"এণ্টনী, লিলি যে কত ভাল মেয়ে সে আমি বুঝতে পারছি। ও বৌ হ'লে আমার ঘর আলো হ'ত। কিন্তু কি করব বাছা, ভগবান কেন ওর গায়ের রং কালো করলেন। কালো রংয়ের বৌ আমার পরিবারে আনলে সমাজে কি করে মুখ দেখাব?"

আমি উত্তর না দিয়ে মাথা নীচু করে চলে এলাম, জানতাম কিছুতেই মায়ের মত হবে না। পরদিন আমি তাকে বিদায় দিলাম। গাড়ী ছাড়ার আগের মুহূর্তে দুজনে দুজনের মুখের দিকে চেয়ে যে দুঃখ ব্যথা পেলাম তা আজও মন থেকে মুছে যায়নি। তারপর অনেক বছর ধরে মা বাবার মত করাবার জন্য অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু বৃথা। যাদের গায়ের রং সাদা তারা কালো রংয়ের গ্লানি কিছুতেই ভুলতে পারে না।

আমি আবার বিয়ে করেছি বটে, কিন্তু লিলিকে আজও ভুলতে পারিনি। সে আমার মনে যত আনন্দ দিয়েছিল পৃথিবীতে আর কেউ তত আনন্দ দিতে পারেনি।

তাকে হারাবার পর থেকে আমি আর কোন বড় কাজেই উৎসাহ পাই না। কোন রকমে জীবন কাটিয়ে যাচ্ছি। তাকে যদি পেতাম তাহলে আজ আমি ঝাড়ুদার না হয়ে বড় ব্যবসাদার হতে পারতাম।

এই হ'ল আমার জীবন কাহিনী। এখন বলুন ত কোন মা বাবার কি উচিত ছেলের বিয়ের সময় তার মনোমত পাত্রী নির্বাচনে বাধা দেওয়া, আর এই যে আমাদের জাতির উৎকট বর্ণবিদ্বেষ এটাও কি ভাল?"

গল্প শেষ করে ম্লানমুখে এণ্টনী সন্ধ্যার ধোঁয়াটে অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইল।

শ্রোতারা তার প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারল না। **(বিদেশী গল্পের ছায়া নিয়ে)**

সদাব্রতের আনন্দ

স্টিফেন্ লিকক্

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে সবে ঘরের বাইরে পা বাড়িয়েছি অমনি হোটেলের খানসামা সেলাম ঠুকে কুশল প্রশ্ন করে—"সেলাম হুজুর।"

তার জবাবে বল্‌তে হয়—"বহুত্ আচ্ছা, এই নাও তোমার চার পয়সা বর্কশিশ।"

পয়লা নম্বর বর্কশিশের পালা চুকিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নাম্‌তে যাবো, এমন সময়ে হোটেলের দাসী কোথা থেকে এসে হাজির—"এই যে দাদাবাবু, পেন্নাম"—ব'লে কপালে হাত তুলে বলে—"আজকের সকালটা ভারি সুন্দর, তাই না?"

তার জবাবে স্বীকার করতেই হয়—"সত্যি কি চমৎকার!......হ্যাঁ দ্যাখো, এই দু'আনা পয়সা তোমাকে নিতেই হবে—এত ভালো কথা বল্‌লে যখন—।"

বড় খানসামা হাত কচলে বল্‌লে—"আহা আজকের এই রোদে ঝল্‌মল আকাশের দিকে একবার চেয়ে দেখুন হুজুর! আজ্ঞে আপনার বেশ ভালো ঘুম হয়েছিল ত রাতে?"

বল্‌লাম—"হাঁ খুব সুনিদ্রা—তা এর জন্যে এখুনি তোমায় কিন্তু বাপু তিন আনা পয়সা দেবো, হ্যাঁ, নিতে হবে বই কি। না, না, কোনো আপত্তি তোমার শুন্‌তে চাই না। এ একেবারে একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। সত্যি, আমার ভালো ঘুম হ'লেই আমি পয়সা দিতে ভালোবাসি!"

সে ভাব গদগদ কণ্ঠে বলে—"আপনার বড় দয়ার শরীর হুজুর!"

দয়ার শরীর—আমার? একথা অন্তত আমি বিশ্বাস করি না। এখনই যদি ফরমাস করতাম চা অথবা কফির জন্যে, তাহলে ও শাপশাপান্ত করত মনে মনে—বল্‌ত, পৃথিবীতে আমার মত পাজী মানুষ আর হয় না।

ওরা এইরূপেই অভ্যস্ত—বয়স সকলেরই হয়েছে, পুরোদস্তুর বড় মানুষ ওরা, তবু কেমন হনুমানের মত কালো রং-এর জামাজোব্বা প'রে দাঁড়িয়ে থাকে সকাল বেলায়—সেলাম করে, আর যা দু'চার গণ্ডা পয়সা পায় অম্লানবদনে পকেটজাত করে—তারপর আবার দু'দফা কুর্নিশ করে। ওরা যদি বলে 'সুপ্রভাত' অমনি তোমায় দু'আনা বর্কশিশ করতে হবে। আর যদি তুমি জিগ্যেস কর' ক'টা বেজেছে—তাহ'লে তার দাম দু'আনা। তাছাড়া যদি এমনি খোশ গল্প করবার বাসনা হয় তোমার, তবে জেনে রাখো [illegible] কথা পিছু গড়ে এক আনা থেকে ছপয়সা খরচ পড়বে। আমি বল্‌ছি প্যারিসের কথা—ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস।

প্যারিসের মজাই এই সারাদিন কেবল বর্কশিশ গুণতে গুণতে হাঁপিয়ে উঠ্‌তে হয়। হয়ত এমন কিছু সাংঘাতিক রকমের মোটা খরচ নয় এটা, কিন্তু বার বার এত খুচ্‌রোর হিসেব সামলে চল্‌তে গেলে মাথা খারাপ হয়ে যায়।

সত্যি পৃথিবীতে কোনো আনন্দই নিরঙ্কুশ নয়। গোলাপে যেমন সৌন্দর্য আছে তেমনি সেখানে কাঁটা রয়েছে। মোদ্দা প্যারিসের আনন্দ উৎসবের কাঁটা হচ্ছে ওই বর্কশিশের বালাই। কতকগুলো বুড়ো ধাড়ি লোককে অনর্থক এই খয়রাত করতে হবে—আসলে এ লোকগুলো কুঁড়ের হদ্দ, এতটুকু কাজ এদের দিয়ে পাবে সে আশা মোটেই ক'র না। স্রেফ দানের আনন্দ পাওয়ার জন্যই এদের পয়সা দেবে তুমি।

হয়ত সারাদিনের সমস্ত বর্কশিশ যোগ দিয়ে দেখলে মারাত্মক মোটা খরচা বলে মনে হবে না। চাই কি একসঙ্গে থেকে টাকাটা যদি দিয়ে রেহাই পাওয়া যেতো ত দিয়ে দিতাম খুশি মনে।

প্যারিসের পথে বেরুতে হ'লেই সব রকমের রেজগি সঙ্গে নিতে হবে—মানে যে পরিমাণ রেজগি নিয়ে বেরুতে হয় তা দিয়ে স্বচ্ছন্দে একটা ছোটখাট ব্যাঙ্ক খুল্‌তে পারো তুমি। তাছাড়া অন্যান্য কেনাকাটার জন্যে চাই সোনার মোহর, কাগজের নোট। অর্থাৎ তোমার পকেটগুলো তামা-দস্তা-রুপো-সোনা-কাগজে মিলে পোদ্দারের দোকান হয়ে দাঁড়াবে। গাড়োয়ান থেকে শুরু করে, দরোয়ান, খানসামা, আরদালি, খবর কাগজওয়ালা, ভিখারী—যার সঙ্গে দেখা হবে তার হাতেই কিছু কিছু ক'রে এই ভার তুলে দিয়ে নিজের বোঝা হাল্কা করতে হবে তোমায়। কিন্তু পথে যখন তুমি বেরিয়েছ তখন সঞ্চরমান টাকশাল হ'তেই হবে তোমায়। এছাড়া উপায়ান্তর নেই।

কি রকম? বলি—। ধরো তুমি নাট্যমন্দিরে গেছ, একখানা প্রোগ্রাম কিন্‌লে দশ পয়সা, তার সঙ্গে তোমায় আর তিন পয়সা দিতে হবে বিক্রেতাকে, বর্কশিশ। তারপর একজন তোমায় তোমার আসনে বসিয়ে দেবে,—তাকে দাও দু'পয়সা। একটা বুড়িকে খামোকো দু'পয়সা দিতে হ'ল ত! একবার ভাবো দেখি। এদিকে তোমার হোটেলের কথাই ধর না কেন। তুমি ঘণ্টা বাজাতেই এসে হাজির হ'ল লালকোর্তা আঁটা এক খানসামা—তুমি তাকে বল্‌লে—"আমি চান করব।"

সে অমনি হোটেলের দাসীকে খবর দেবে। সত্যি তোমার হয়ে সে যে খবরটা দিল, এ বড় কম কথা নয়, অতএব এর জন্যে তাকে দাও দু'পয়সা সেলামী।

এল ঝি,—"দাদাবাবু, আমায় ডেকেছেন?"

তার পোষাকে আশাকে যে আভিজাত্য তার মূল্য সামান্য নয়, আমাদের মত সাধারণ গৃহস্থ ঘরের মেয়েরা এসব পোষাক কখনও চোখে দ্যাখেনি। তবে হ্যাঁ এর প্রতিটি নিশ্বাসের মূল্য চার পয়সা। চারটে পয়সা দিলেই ও খুশিতে নুয়ে পড়বে। আর ওকে যদি চার আনা পয়সা দাও তবে স্রেফ মেঝেতে গড় হয়ে পেন্নাম ক'রে তোমার জুতো জিভ দিয়ে সাফ ক'রে দেবে। হাঁ আমি জানি যে—সত্যি দেখেছি এরকম ঘটনা। অর্থাৎ তোমার স্নানে ইচ্ছা প্রকাশ ক'রেছ তুমি—সত্যিকারের যথার্থ ফরাসী কায়দা দুরস্ত হোটেলে স্নান ব্যাপারটা খুব তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের ব্যাপার নয় মশাই দস্তুরমত সাড়া পড়ে যায়।—দাসী যখন দেখল, তোমার স্নানের ব্যাপারে চারটে পয়সা হস্তগত হয়েছে—(তেমন তেমন ক্ষেত্রে ছ'পয়সাও হয়)—তখন সে তোমার স্নানের ব্যবস্থা করবার জন্য হুকুম দেবে। আরও দু'পয়সা দিলে পরে সে তোমার কাছে হোটেলের অধস্তন ঝিকে পাঠিয়ে দেবে। অবিশ্যি এরা সবাই তোমার ঘরের পাশের বারান্দায় থাকে—সব সময়েই থাকে, তাতে কিছু এসে যায় না। সমস্তটাই ধারাবাহিকভাবে চলে।

হ্যাঁ অধস্তন ঝি—তোমার স্নানের ব্যবস্থা করে দেবে, আর কোনো হাঙ্গামা নেই। অর্থাৎ সে গিয়ে স্নানের ঘরের দরজাটা খুলে দেবে। দরজায় তালা দেওয়া ছিল না—এমনি ভেজানো ছিল। দরজাটা খুলে দিয়ে, কলের মুখটা ঘুরিয়ে দেবে। অবিশ্যি এর জন্যে—তোমার যদি কিছুমাত্র মনুষ্যত্ব থাকে তাহলে তুমি অন্তত ঝিকে তিন আনা পয়সা দেবে।

এরা সারাদিনে যা রোজগার করে, দিনান্তে তার ব্যয় শুরু করে। অর্থাৎ দিনের কাজ ফুরোলে খানসামা তার সাজপোষাক বদলে হয়ত কোনো সস্তার থিয়েটারে গেল, সেখানে কিন্তু সে-ই আর একজনকে বকশিশ করছে দেখা গেল। আর ঝিয়েরাও যায় বইকি—আমোদ প্রমোদ বাদ দিয়ে পারিসে থাকা যায়?...... এমনি ক'রে প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক পরস্পর পরস্পরের বকশিশের ওপর দিন কাটায়।

আমি পারিসে আসবার সময় সৌভাগ্যক্রমে এখানকার রিপাব্লিকের প্রেসিডেন্টের কাছে লেখা পরিচয়পত্র পেয়ে গেছি। অবশ্য এরকম পরিচয়পত্র পাওয়াটা আমাদের মত অধ্যাপকের পক্ষে এমন কিছু আশ্চর্য ব্যাপার নয়,—তেমন গৌরবজনকও মনে করি না,—বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আমি। এ চিঠিখানা কিন্তু আমি কোনো কাজেই লাগানো দরকার নেই মনে ক'রে ফেলে রেখেছি। কী হবে ছাই প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা ক'রে! কী জানি, যদি সেও আবার বকশিশ চায়? তাকে ত আর দু'চার আনা দিলে হবে না—অন্তত পাঁচটা টাকার কমে দেওয়া চলে না। আর, যদি নবাগত আগন্তুক দেখে প্রেসিডেন্টের দু'চারটা মন্ত্রী এসে হাজির হয়—ধরা যাক তিনজন মন্ত্রী, মাথাপিছু দু'টাকা অর্থাৎ তিন দু'গুণে ছয়, ছ'ছ'টা টাকা। তাহলে তোমার হ'ল গিয়ে ফরাসী গভর্নমেন্টের সঙ্গে দশ মিনিট কথা বলার মূল্য মোট এগারো টাকা। নাঃ, অত হাঙ্গামায় কাজ কী!

অনেক দেখে শুনে, শেষে মনে হ'ল একটি মাত্র জায়গায় আমি স্বচ্ছন্দে যেতে পারি, সেখানে বকশিশের বালাই নেই—সে হচ্ছে ব্রিটিশ দূতাবাস। সেখানে ওরা এসব হতে দেয় না। শুধু যে কেরাণীদেরই ঘুষ বা বকশিশ নেওয়া বারণ তা নয়, স্বয়ং রাজদূতেরও এতটুকু উপহার নেওয়া রীতিমত নিষিদ্ধ। আর তারা এসব খুব মেনে চলে জানি।

আগে জানতাম না যে বর্তমান রাজদূতটি আমারই এক বন্ধু—পারিসে এসে সেটা বুঝলাম।

আমি কোনো কথা গোপন করব না। আসলে আমার কিছু বইটই পড়া দরকার এখানকার ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে। তা এমনিতে যে কোনো ফরাসীর সে অধিকার আছে এছাড়া বাইরের লোকেদের সেখানে যাবার নিয়ম নেই।

তবে, যদি কোন বিদেশী রাজদূতের বন্ধু তিনি হন, তাহলে তিনিও উক্ত ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে বই পড়তে পারেন। অতএব এখানকার দূতেদের বন্ধু অর্থাৎ গিয়ে একখানি বন্ধুত্বের স্বীকৃতি আসা দরকার। কাজে কা আমার বন্ধু। অবশ্য এ স্থায়ী কি অস্থায়ী, তা বল কারণ এই প্রথম পরিচয় হ

যাই হোক, দূতাবা আনতে।

১৯০৮
মবিবর্তন
সালে চাতরা
র দৈর্ঘ্য ছিল
র পরে অর্থাৎ
ড় দাঁড়ায় ১৫০
খনও থামেনি।
পরিবর্তন ও দৈর্ঘ্যে
ধারদ পণ্ডিতবৃন্দ
কারণ অবশ্য আগেই
কারণ বিবৃত
olloy), তাই ইহাকে
v's Theory নামে
নি বলেছেন যে,
স পাহাড় হতেই
অন্য নদী

প্রথমেই যার সংগে দেখা হ'ল, সে ছোকরা বোধ হয় সেক্রেটারী—চমৎকার তার কথাবার্তা, যথার্থ ভদ্রলোক। সে আমার কার্ডখানি নিয়ে ভেতরে চলে গেল। আধ ঘণ্টা স্রেফ একা বসে রইলাম, সে ছোকরা আর ফেরে না ব্যাপার কি! হ্যাঁ, সে যে যথার্থ ভদ্রলোক তাতে ভুল নেই—কারণ, আধ ঘণ্টা পার করে সে ফিরল এক মুহূর্তের জন্য। বিনীত নমস্কার বিনিময় হ'ল আবার।—সে বললে, আজকের "সেলা" বেশ সুন্দর।......পারিসে আসার পর

তার কথাটা এতবার শুনতে হয়েছে যে, এর

এই নাও তে খেতে এতটুকু দেরী হয় না আমার।

পয়লা ন-টে হাত দিয়ে একটা টাকা বার

সিঁড়ি দিয়ে নঁ যুবকটির চেহারায় এমন

হোটেলের দাসী ধোপ রয়েছে যে, হঠাৎ এভাবে

"এই যে দাদাবাবু, টা কেমন বাধ বাধ ঠেকল,

হাত তুলে বলে—" সত্যি ভারি চমৎকার দিন

সুন্দর, তাই না?" রাদ আর কিছুদিন থাকে

'তার জবাবে স্বা খুবই ভালো হবে......।

কি চমৎকার!......হ্যাঁ ল—গত সপ্তাহের অমুক

পয়সা তোমাকে নিতে

বললে যখন—।" তা অবিশ্যি দেখিনি, তবে

বড় খানসামা হ ই কাগজের একটা সংখ্যা

আজকের এই রোদে য়েছিল, চমৎকার কাগজ।

একবার চেয়ে দে া হয়ে চলে গেল।

বেশ ভালো ঘ ফিরল এঘরে, হাতে চিঠি নিয়ে।

আমাকে দুত মহাশয় বন্ধু হিসেবে দিন জানেন এ সেই পত্র। এর মধ্যে ওরা চিঠি ছাপিয়ে নিয়ে এল। চিঠিতে লেখা আছে যে, আমরা অনেকদিনের বন্ধু এবং আমাকে যদি লাইব্রেরীতে পড়বার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়, তাহলে দুতমহাশয় খুব খুশি হবেন। চিঠিখানায় সবই লেখা আছে, কেবল আমার নামের জায়গাটুকু ফাঁকা রয়েছে।

আহা বেচারী, আমার জন্যে অনেক ক'রল—অতএব যুবকটিকে কিছু দেওয়া বিশেষ দরকার। কিন্তু তার অচঞ্চল মুখের দিকে তাকিয়ে আমি একটু ইতস্তত করি।

পকেট থেকে টাকাটা আবার বার করে বললাম "দেখুন, আপনি যদি কিছু মনে না করেন—আপনার আচার-ব্যবহারে আমার বিশ্বাস হয়েছে, আপনি বিশিষ্ট ভদ্রলোক। যাক সেকথা, এখন এই একটি টাকা নিয়ে আমায় ধন্য করুন।

সে একটু সংকোচ বোধ করে যেন—"আজ্ঞে মাপ করবেন। নিতে পারলে খুশি হ'তাম, কিন্তু নেবো না।"

আমি বললাম, "দেখুন, আপনার ব্যবহারে আমি খুশি হয়েছি, আপনি আমার এতবড একটা উপকার করলেন। আপনার কথা আমার মনে থাকবে। যদি কোনদিন কানাডার শাসনতন্ত্রে নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে দাঁড়াতে চান, আমায় জানাবেন, আমি সব ব্যবস্থা করে দেবো।

বেরুবার পথে দেখি, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং দুত মহাশয়। চেহারা এবং পোষাক দেখেই আমি চিনতে পারি, ইনিই খোদকর্তা। তিনি যেন দরজাটা খুলে দেবেন ব'লে অপেক্ষা করছেন। তখনও আমার হাতে সেই টাকাটা রয়েছে। লোকটাকে দেখেই মনে হ'ল—এই সুযোগ।

আমি বললাম—দেখুন, হুজুর—সারা পারিসে একমাত্র আপনিই বর্কশিশ নিতে অনিচ্ছুক, তা আমি ভালো করেই জানি। তা আমি কিন্তু এটা জোর করেই দিচ্ছি, না না আপনাকে নিতেই হবে।

দিলাম তাঁর হাতে টাকাটা গুঁজে।

দুত বললেন—"ধন্যবাদ,—"

আর আমার কিছু বলবার রইল না। এইখানেই সে ব্যাপারের শেষ করি।

অনুবাদক—গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

কুশীর বাঁধ

সিদ্ধানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বি এস-সি, বি ই

পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ বাঁধ হ'ল আমেরিকার Boulder Dam যার পরিকল্পনা এবং নির্মাণ করেছেন মিঃ জে এল সেভেজ (J. L. Savage)। ইহার উচ্চতা সাতশ' ছাব্বিশ ফিট (726 FT.)। নেপালের কুশী নদীর উপর বাঁধ নির্মাণের যে পরিকল্পনা ভারত সরকার করেছেন, তা কার্যকরী হলে, এইটিই পৃথিবীর সর্বোচ্চ বাঁধ বলে পরিগণিত হবে। উচ্চতায় এই বাঁধ হবে ৭৫০ ফিট এবং নির্মাণ করতে যে অর্থ ব্যয় হবে তার পরিমাণ অন্তত ১০০ কোটি টাকা।

কুশী নদী সম্পর্কে মন্তব্য করতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় যে ভারতের যত দুষ্ট স্বভাব এবং দুর্ধর্ষ প্রকৃতির নদী আছে, কুশী হল তাদের মধ্যে সর্বপ্রধান। কুশী তার গতিপথ গত দুশতাব্দী ধরে অনবরতই বদলেছে আর তা ক্রমাগতই পশ্চিম দিকে আসছে সরে। এই সময়ে কত নগর, কত গ্রাম, কত মানুষ, কত প্রাণী, কত অর্থ, কত শ্রম যে এই কুশী নদী নষ্ট করেছে তার আর ইয়ত্তা নেই। সহস্র সহস্র মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়েছে এই কুশী। কুশী নদী বিহারের তিন হাজার বর্গ মাইল জমি আর নেপালের পাঁচ শ বর্গ মাইল ভূমি বরবাদ করেছে। বর্ষার প্রারম্ভে কুশীর বুক একদিন হঠাৎ উথলে উঠে জলধারা উপচে পড়ে আশে পাশের গ্রাম, নগর ভাসিয়ে দেয়। চব্বিশ ঘণ্টায় কখনও কখনও কুশীর জলধারার উচ্চতা এমন কি ত্রিশ ফিট (৩০ ফুট) পর্যন্ত বাড়তে দেখা গিয়েছে। সময় সময় এই জলপ্লাবন কূল থেকে বিশ মাইল পর্যন্ত প্রসারিত হয়। নদী বিষারদ পণ্ডিতগণ বলেছেন, জলস্রোতের সঙ্গে অত্যধিক পলি থাকাই হল কুশীর এত দ্রুত গতিপথ পরিবর্তনের প্রধান কারণ। পরীক্ষা এবং হিসাবের ফলে জানা গেছে যে কুশী বছরে সাড়ে পাঁচ কোটি টন (৫৫,০০০,০০০ টন) পলি গঙ্গায় বহন করে আনে।

কুশী নদী গঠিত হয়েছে তিনটি উপনদী নিয়ে, (১) তম্বর (Tambar) এর উৎপত্তি এভারেস্টের পাদদেশে এবং দৈর্ঘ্যে এই নদী প্রায় ১০০ মাইল।

(২) অরুণ (Arun)—তিব্বত এবং এভারেস্টের পাদদেশে ইহার জন্ম এবং দৈর্ঘ্যে ইহা প্রায় ১৫০ মাইল।

(৩) সূর্যকুশী (Sun Kosi)—ইহা উৎপন্ন হয়েছে নেপালে এবং দীর্ঘতায় ইহা ৫০ মাইল।

এই তিনটি উপনদী পরস্পর একই সঙ্গে মিলিত হয়েছে নেপালের চাতরার কাছে। এই সঙ্গমের অব্যবহিত পরেই কুশী প্রবাহিত হয়েছে একটি পার্বত্য উপত্যকার মধ্য দিয়ে। এই উপত্যকার নামই চাতরা উপত্যকা (chatra Gorge) এবং এইখানেই বাঁধ তৈয়ারী পরিকল্পনা করেছেন বিশেষজ্ঞগণ ভারত সরকারের পক্ষ থেকে (১ম চিত্র)।

১ম চিত্র
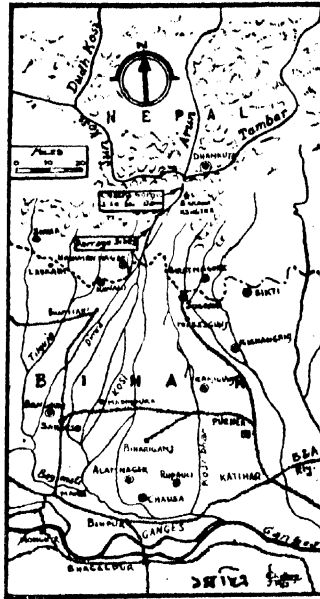
অনুমান করা হয় যে, এককালে কুশী নদী নাকি ব্রহ্মপুত্রে পড়েছিল—উত্তর কালে অবশ্য গঙ্গাতেই মেশে। কিন্তু এক সময়ে যে মহানন্দ এবং কুশীর মিল হয়েছিল সে সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নেই। তারপর পরবর্তীকালে কুশীর গতিপথ ক্রমাগতই পরিবর্তিত হতে থাকে। ১৭৩৬ সালে কুশী এবং গঙ্গার সঙ্গম হয়েছিল পূর্ণিয়ার কাছে আর ১৮৭৩—৯২ সালে চাতরা উপত্যকা থেকে প্রায় সোজাসুজি দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে কুশী গঙ্গায় মিশেছিল কার্সেলার (Kursela) নিকট যেখানে O. T. Railway পুল তৈরী করেছিল। তখন হতে কুশীর গতিপথ বছরে প্রায় এক মাইল করে মুঙ্গের এবং দারভাঙ্গার দিকে সরে আসতে থাকে। পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৯২২, ১৯২৬, এবং ১৯৩৩ হতে ১৯৩৮ সালের মধ্যে কুশীর গতিপথের ক্রমবিবর্তন ২নং চিত্রে দেখান হয়েছে। ১৮৯৪ সালে চাতরা থেকে কার্সেলার মধ্যে কুশী নদীর দৈর্ঘ্য ছিল ১০০ মাইল আর তার ৫০ বছর পরে অর্থাৎ ১৯৪৪ সালে ঐ দূরত্ব বেড়ে দাঁড়ায় ১৫০ মাইল। কুশীর এই দৈর্ঘ্য এখনও থামেনি।

নদীর এই গতিপথ পরিবর্তন ও দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধির কারণ নদী বিষারদ পণ্ডিতবৃন্দ নির্ণয় করেছেন। একটি কারণ অবশ্য আগেই বলা হয়েছে। অন্যতম কারণ বিবৃত করেছেন মলয় সাহেব (Molloy), তাই ইহাকে মলয়ের অনুজ্ঞা বা Molloy's Theory নামে অভিহিত করা হয়েছে। তিনি বলেছেন যে, নদী যখন উৎপন্ন হয়—তা সে পাহাড় হতেই হোক বা হ্রদ হতেই হোক কিংবা অন্য নদী হতেই হোক, তার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি থাকে। উৎপত্তিস্থল হতে নিবৃত্তি-স্থলের মধ্যে সেই শক্তি বা Energy ব্যয়িত হয় পলি বহন করে, গতিবেগে এবং বিভিন্ন কঠিন ভূমির উপর দিয়ে প্রবাহের সময় সংঘর্ষণে। বৎসরের বিভিন্ন কালে নদীর স্রোত এবং কলেবর ও আকৃতির তারতম্য ঘটে। নদীবাহিত পলিরও হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। আর নদীর শক্তির (Energy) পার্থক্যের দরুণই নদীর দীর্ঘতার হ্রাস-বৃদ্ধি, বন্যা, জলপ্লাবন প্রভৃতি দুর্যোগ ঘটে। কিন্তু কোন বিশেষ উপায়ে নদীর জলস্রোতকে আয়ত্তে রেখে যদি নদীর কলেবর, গতিবেগ এবং সেই অনুপাতে নদীবাহিত পলির পরিমাণ বছরের সকল সময়ের জন্যে একই রকম রাখা যায়—তারতম্য না ঘটে, তাহলে ঐ সকল দুর্যোগ ঘটতে পারে না এবং এই বশীভূত নদী শক্তির দ্বারা মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধন করতে পারে। ইহার একমাত্র উপায় হল আবশ্যকীয় স্থানে নদীর উপর কয়েকটি বাঁধ দেওয়া এবং নদীর জলধারাকে আয়ত্তে রেখে নিয়ন্ত্রণ করা।

এখন ভারত সরকারের বিশেষজ্ঞগণ যথা মিঃ সেভেজ, রায় বাহাদুর এ এন খোসলা (A. N. Khosla) প্রভৃতি কুশীর উপর বাঁধ

দেবার যে পরিকল্পনা করেছেন, তার ফলে কি কি সুফল ফলবে, তা একবার আলোচনা করা যাক।

(১) জল সংরক্ষণ—কুশীর উপর ৭৫০ ফুট উচ্চের বাঁধ দেওয়ার ফলে যে জলাশয় সৃষ্টি হবে, তাহাতে এক কোটি দশ লক্ষ একর ফুট পরিমাণ জল সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। যাহার ফলে বর্ষায় নদী হতে জল ধরে রাখা হবে আর তা গ্রীষ্মকালে প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করা হবে। আর সূক্ষ্ম পলির সাহায্যে শস্য উৎপাদনের পরিমাণও বাড়ান হবে। কুশীর জলপ্রবাহের সংগে যে ক্ষতিকর মোটা দানার পলি এবং বালি আছে, তা প্রবাহ হতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করাও সম্ভব হবে।

(২) বাঁধসংলগ্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে জলপ্রবাহের শক্তি হতে যে বিশাল পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তি আহরণ এবং নিষ্কাষণ করা হবে, তার পরিমাণ হবে একশ' আশী কোটি ভোল্ট—যাহা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ জলবিদ্যুতের (Hydro-Electric Power) কারখানা আমেরিকার Washington-এ অবস্থিত Grand Coole-এর বিদ্যুৎ-প্রবাহ সরবরাহের পরিমাণের সহিত সমান। এই পরিকল্পনা কার্যকরী হলে নেপাল, বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা এবং যুক্তপ্রদেশের গ্রামাঞ্চলে পর্যন্ত সস্তায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

(৩) নেপালের তেরাই অঞ্চলে কুশী নদীর উপর Barrage নির্মাণ হবে, যাহার ফলে অন্যান্য শাখা নদীগুলি নিয়ন্ত্রিত হবে এবং দুটি খালের সাহায্যে অন্ততঃপক্ষে দশ লক্ষ একর ভূমিতে জলসেচনের সুসংবদ্ধ ব্যবস্থা কার্যকরী হবে।

(৪) বিহারে—নেপাল রাজ্যের সীমান্তে কুশীর উপর আরও একটি Barrage নির্মাণ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে, যাহার ফলে কুশীর দুধারে দুটি জলসেচের বাঁধের সাহায্যে প্রায় বিশ লক্ষ একর জমিতে জলসেচন হবে সুনির্দিষ্ট।

(৫) উচ্চভূমি, চাষাবাদের জমি প্রভৃতি নদীর প্রবাহে ক্ষয় পাওয়া থেকে সুসংরক্ষিত হবে। ইহা ছাড়া ম্যালেরিয়া নিবারণ, আবদ্ধ দূষিত জল জমা নিরাকরণ এবং নদীর জলে মাছের চাষ প্রভৃতি জনহিতকর, কল্যাণকর কাজ করা অসম্ভব হবে না।
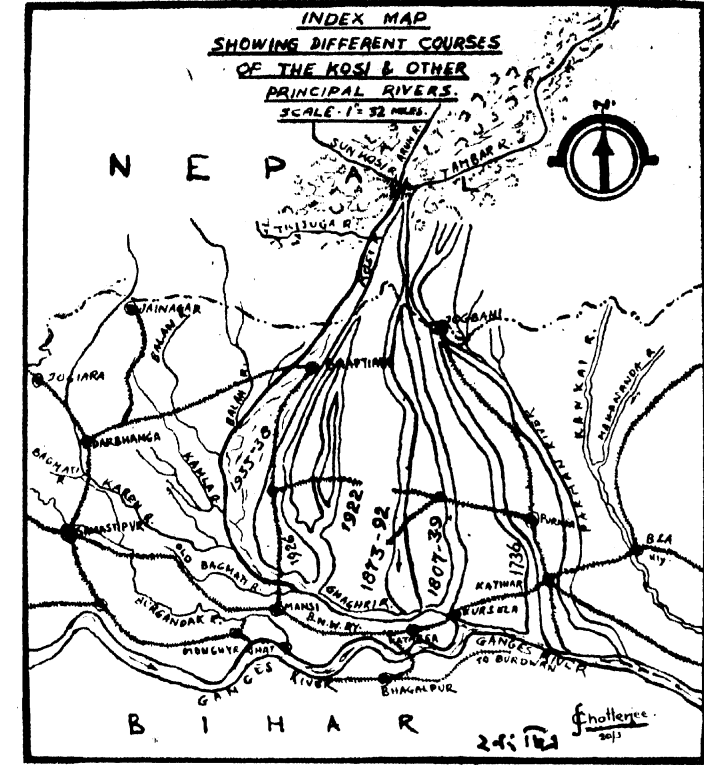
(৬) 'চাতরা-বাঁধের' ফলে নেপালে যে বিশাল জলাধার সৃষ্টি হবে, তাতে বিভিন্ন উৎকৃষ্ট মাছ জমিয়ে রাখা হবে এবং অজন্মা বা ঘাটতির সময়ে খাদ্য হিসাবে উহা ব্যবহার করা যেতে পারবে। অনুমান করা যেতে পারে যে, এই মাছের চাষে নেপাল সরকারের প্রচুর লাভের সম্ভাবনা, এমন কি ইহা একটি প্রধান ব্যবসার মধ্যে পরিগণিত হওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

(৭) নেপালে চাতরার বাঁধের জন্য জলপথে কলিকাতা হতে সোজা নেপালের রাজধানী প্রায় কাটামুণ্ড পর্যন্ত চলাচল করা সম্ভব হবে। নেপালের সহিত ভারতের এই যোগ একটি অভাবনীয় সম্ভাবনার ইংগিত করছে সন্দেহ নেই। ইহা নেপালের পার্বত্য এবং বনজ সম্পদ সস্তায় এবং অতি সহজে স্থানান্তরিত এবং রপ্তানির কাজে ব্যবহৃত হবে।

এই সম্পর্কে একটি কথা বলা আবশ্যক বলে মনে করি। নেপালের চাতরা এবং তেরাই অঞ্চল অত্যন্ত ভূকম্পনশীল। বিহারের যে ভীষণ ভূমিকম্প সংঘটিত হয়ে গেছে তার উৎপত্তি স্থান হল এই অঞ্চল। সেই জন্যে বিশেষজ্ঞগণ চাতরাবাঁধের নির্মাণে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। এই বাঁধ নির্মাণের জন্য জরিপ করা, নদী সম্পর্কীয় পরীক্ষা, নদীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা, যাহার উপর বাঁধের ভিত্তি হবে, তাহার গঠন প্রভৃতি প্রাথমিক কাজ এখন প্রায় সমাপ্তির পথে। অদূরভবিষ্যতে এই পরিকল্পনাটি কার্যকরী হতে দেখার আশায় আমরা রইলাম।
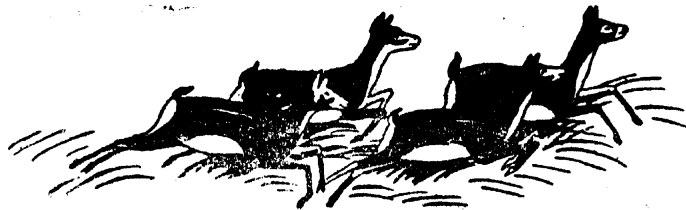
সমস্যাসঙ্কুল বাঙালী জীবন

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

আপনাদের নমস্কারযোগে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি, স্মিতসম্ভাষণে প্রীতি নিবেদন করি, ঐকান্তিক প্রার্থনায় কামনা জানাই, ভারতের বিভিন্ন অংশ থেকে সমাগত বৃহত্তর বঙ্গের প্রতিনিধিবর্গ ও বাঙলার প্রতিনিধিবর্গের এই সম্মেলন সুযোগ্য পুরোহিত মহোদয়গণের পরিচালনায় শুভফলপ্রদায়িনী হোক, পুরাকালের প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ যজ্ঞের মত। সে ফল থেকে এই মহা-সংকটের দিনে আমরা অপরাজেয় শক্তি, ধীর শুভবুদ্ধি, ধ্রুবলক্ষ্যের দিকনির্ণয়ে সুদূর-প্রসারী স্থির দৃষ্টি, আত্মার প্রতি চরম অবমাননাকর সংকটের বিহ্বলতাকে জয় করবার মত অটুট মনোবল যেন লাভ করতে পারি।

আপনারা আমাকে—বাঙলার কথা-সাহিত্যিককে, এই সম্মেলন-উদ্বোধনের ভার দিয়ে যে সম্মান প্রদান করেছেন, তার জন্য আমি আপনাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি। বাঙলার সৃষ্টিমূলক সাহিত্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-যুগের যে সমারোহ, সে বহুবৈচিত্র্যের সমৃদ্ধি আর নাই। সম্পূর্ণরূপে হতশ্রী এবং হৃত-গৌরব না হ'লেও সে ক্ষেত্রের উৎপাদনশক্তি ক্ষীণ হয়েছে; তবুও যে মন দিনে আমাকে এই গৌরবে গৌরবান্বিত করেছেন, তাতে আপনাদের সৃষ্টিমূলক সাহিত্যের প্রতি প্রীতি শ্রদ্ধা এবং প্রত্যাশাই প্রকাশ পেয়েছে। আমার দেশে একটি গল্প প্রচলিত আছে।—এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পরলোক গমন করেছিলেন, স্বল্প-বুদ্ধি এবং স্বল্প-বিদ্যাসম্পন্ন পুত্রকে রেখে। তাঁর তিরোধানের পর, দেশের যজমানেরা সেই পুত্রকেই পুরোহিতপদে বরণ করতে চাইলে কোন মতেই তাকে অব্যাহতি দিতে চাইলে না। তখন সেই ব্রাহ্মণপুত্র মনে মনে এই বাক্যটি ব'লে পৈতৃক পুরোহিতপদ গ্রহণ করেছিল, সে বলেছিল—আমি মন্ত্রহীন, আমি ক্রিয়াহীন, কিন্তু হে দেবতা, আমি ভক্তিহীন বা নিষ্ঠাহীন নই। এবং হে স্বর্গলোকস্থ পিতা, তোমার প্রসন্ন জ্ঞানময় দৃষ্টি আমার উপর প্রসারিত রয়েছে—এই বিশ্বাসেই আমি এ দায়িত্ব গ্রহণ করছি। আমারও ভরসা তাই।

আর ভরসা, এ সম্মেলনের সুযোগ্য সভাপতিবৃন্দ। তাঁরাই এ যজ্ঞের পুরোহিত। আমার প্রাথমিক কর্মের মধ্যে ভুল-ত্রুটি থাকলে তাঁরা সে-সমস্ত সংশোধন করে নেবেন। মূল সম্মেলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয় সুপণ্ডিত, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত দিকপাল, বাঙলার রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি। সুতরাং বাঙলার রাষ্ট্রিক এবং সামাজিক জীবনের সমন্বয়ে গঠিত জাতীয় জীবনের সমস্যার ক্ষেত্রে যজ্ঞানুষ্ঠানে পৌরোহিত্যকর্মে তিনি অতি যোগ্য ব্যক্তি। এই সম্মেলনের বিশেষ অধিবেশন অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন। সেই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখো-পাধ্যায়। দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ বাঙলাদেশের

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সেবায় তিনি অক্লান্তকর্মী, মহত্ত্বে তিনি দেশ-পূজ্য, নির্ভীকতায় আন্তরিকতায় তিনি সত্য-সন্ধানী। তাঁকে আমি নমস্কার জানাই। সাহিত্য-শাখার সভাপতি ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যো-পাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠাখ্যাতি সুবিদিত, তাঁর মত পণ্ডিত, সাহিত্য-রসিক, বিচক্ষণ সমালোচক আজ জীবন ও সাহিত্যের গতিপথনির্ণয়ে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ পথের সন্ধান দিতে সমর্থ হবেন। বৃহত্তর-বঙ্গ শাখার সভাপতি রায় বাহাদুর হেমচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁদেরই অন্যতম ব্যক্তি, যাঁরা ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বাঙালী সমাজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে বৃহত্তর-বঙ্গ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছেন, এবং স্বকীয় কীর্তিতে কীর্তিমান হয়েছেন; সুতরাং যোগ্য ক্ষেত্রে যোগ্য ব্যক্তিই আসন পেয়েছেন। অর্থনীতি শাখায় ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় নবজীবনের সুযোগ্য পরিকল্পনা দেবেন, তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য দেশ-দেশান্তরে সমাদৃত। শিল্প-কলা শাখায় প্রবীণ এবং প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার মহাশয় প্রাচ্য শিল্পধারায় শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের সুযোগ্য অন্যতম পরবর্তী; আগামীকালের স্বাধীন-ভারতের শিল্পধারার গতিপথ নির্ণয়ে তিনি মঙ্গলজনক নির্দেশ দেবেন।

প্রথমেই একটি কথা ব'লে নিতে চাই যে, এই প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের বেদী-মূলে দাঁড়িয়ে অবশ্যই আমি ধারণা করবার অধিকারী এবং সেই ধারণার বশবর্তী হয়েই আমি বলছি যে, এই সম্মেলন হিন্দু এবং মুসলমানের মিলিত সম্মেলন। পণ্ডিতপ্রবর এস ওয়াজেদ আলি সাহেব সহকারী সভাপতি-মণ্ডলীর মধ্যে স্থান গ্রহণ করেছেন।

সমগ্র পৃথিবীই আজ সংকটের কালো ছায়ায় সমাচ্ছন্ন। দেশে, মহাদেশে, মহাসাগরের অভ্যন্তরে দ্বীপে দ্বীপে আজ বিপ্লবের ঝড় ব'য়ে চলেছে। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষে এই সংকট সর্বাপেক্ষা বেশী জটিলরূপে ঘোরালো হয়ে ঘনায়িত হয়েছে আসন্ন বিপর্যয়ের ইঙ্গিত নিয়ে। ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা দেশে এই সংকট সকলের চেয়ে ভীষণা-কার ধারণ করেছে। রক্তপাতে এখানকার মাটি উঠেছে ভিজে। বিপ্লবকে বহুকাল পূর্ব থেকে বাঙালী আবাহন ক'রে আসছে অতি আগ্রহের সঙ্গে। মন বাক্য এবং কায়া দিয়ে তপস্যা ক'রে আসছে। বাঙালী বৈদেশিক ভোগবিলাসকে বর্জন ক'রে কৃচ্ছ্র সাধন করেছে, বাংলার তরুণ সম্প্রদায় ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিয়েছে, বাংলার কবির কাব্যে উপন্যাসে, শিল্পীর শিল্পে, সবতাতেই তারই আহ্বান বাণী ধ্বনিত হয়েছে সাগ্নিক ব্রাহ্মণোচ্চারিত সিদ্ধমন্ত্রের মত। এই সমস্ত সাহিত্য-শিল্প এইজন্যই পেয়েছে চিরন্তনীর স্পর্শ; ফলে স্থায়ী মহৎ এবং সত্য সৃষ্টিতে পরিণত শিল্পীর শিল্পে, সবতাতেই তারই আহ্বান করেছি, শিক্ষায় সংস্কৃতিতে তাকে রূপ দিতে চেষ্টা করেছি, সমাজ-জীবনেও তাকে আকাঙ্ক্ষা করেছি। কিন্তু সমাজ-জীবনে তাকে চেয়েছি মাত্র, অর্থাৎ মনে মনে কামনা করেছি শুধু, জীবনে বাস্তবরূপে রূপায়িত করবার চেষ্টা করি নি, বরং বিপরীত আচরণ করেছি যদি বলি, তবেই বোধ করি সত্য বলা হবে।

আমরা উভয় সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট স্তরের ব্যক্তিরা, সেকালে ইংরেজী শিক্ষার মধ্য দিয়ে এই নূতন সংস্কৃতিকে ভাবনার মধ্যে গ্রহণ করেছিলাম। সেকালে রাজনীতির ক্ষেত্রে নানা আলাপ-আলোচনাও করেছিলাম, আপনাদের উত্তরাধিকারীদের, আত্মীয়স্বজনদের এই শিক্ষায় শিক্ষিত ক'রে তুলবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টাও করেছিলাম। আবার ব্রাহ্মধর্মের বিপ্লবাত্মক বর্ণহীন হিন্দুসমাজ গঠনের উদ্যোগে বাধা দিয়েছিলাম, তাকে বধ করতে চেয়েছিলাম, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ আন্দোলনকে ব্যর্থ করেছিলাম। অবহেলিত অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের ভাবনা আজও বাক্যেই নিবদ্ধ রেখেছি। শিক্ষিত হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে একত্রে কাজ করার বাধা-বাধকতায় যতটুকু মিলন ও মেলামেশার প্রয়োজন, তার চেয়ে এক-পা অগ্রসর হই নি;

মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও শিক্ষিতে অশিক্ষিতে মিলন ঘটে নি; ইসলামের মধ্যেও যে সাম্যের সূত্র আছে, তা ভারতবর্ষে বাদশাহ নবাব আমীর ওমরাহ জায়গীরদার সৃষ্টির ফলে, তাঁদের ও সাধারণ অশিক্ষিত কৃষক জনসাধারণের মধ্যে যে বৈষম্যের সৃষ্টি ঐতিহাসিক সত্য, তাও আজও পর্যন্ত দূরীভূত হয় নি। এই কারণেই বলছি, সমাজজীবনে বিপ্লবকে আমরা মনে মনেই চেয়েছি, কিন্তু বাস্তবে তার বিপরীত আচরণ করেছি। ঠিক এই কারণেই বিপ্লব যখন এল, তখন রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আসবার পূর্বেই সে মূর্ত হয়ে উঠেছে আমাদের সমাজ জীবনে—অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সমাজ জীবনে। সকল অপরাধের বোঝা অন্যায়ভাবে আপনার ঘাড়ে নেবার মানসিকতা আমার নাই। তৃতীয় পক্ষ এই অমিলনকে বিরোধে পরিণত করেছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে যে বিপ্লব তাকে, অর্থাৎ তৃতীয় পক্ষ ঐ ইংরেজকে, দহন করত, সেই আগুনের মুখ ঘুরিয়ে দিয়েছে সে হিন্দু-মুসলমান পল্লীর অব্যবহৃত ঘৃণা-বিদ্বেষের আবর্জনাপূর্ণ গলিপথে। **সাম্প্রদায়িকতার উগ্রতায় জর্জরিত হয়ে পণ্ডিত মুসলিম ইসলামী-বাংলা ভাষার সৃষ্টিকল্পে যে অশোভন উর্দুপ্রীতিদুষ্ট ভাষার সৃষ্টি করছেন তা কখনও শুভবুদ্ধির পরিচায়ক নয়, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সে শুধু ধ্বংসমূলক প্রচেষ্টা মাত্র।** হিন্দু-পরিচালিত পত্রিকায় **এর সমালোচনা গঠনমূলক নয়, বিরাগ ও অসহিষ্ণুতাপ্রসূত—একথা বলতেও আমি দ্বিধা করব না।** অপৌত্তলিক সংস্কৃতির ঐতিহ্য অনুযায়ী উপমার ব্যবহারে মুসলিম সাহিত্যিকের স্বকীয়তার অধিক প্রকাশ পাবারই সম্ভাবনা ছিল। হিন্দু এবং মুসলমানের পরস্পরের ঐতিহ্যসম্মত আধ্যাত্মিক ভাববিনিময়ের দ্বারাই বাংলার সংস্কৃতি পূর্ণাঙ্গ হবে, সে দিক দিয়ে বাংলা সাহিত্যের বহু সম্ভাবনা আছে, একটি বিশাল ক্ষেত্র তার আজও অনাবিষ্কৃত। কাজী নজরুলে ইসলামের প্রথম অভ্যুত্থানের সময় যে বিস্ময় সৃষ্ট হয়েছিল, সে তার আভাস মাত্র। মুসলমান সমাজে যে ব্যাপক শিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগ হচ্ছে, তা তার অনুপাতে কোন্ সম্প্রদায়ের কতখানি প্রাপ্য ছিল, সে সকল প্রশ্নকে পাশে রেখে, এই উদ্যম এবং চেষ্টাকে আমি অভিনন্দিত করি। সঙ্গে সঙ্গে তীব্র নিন্দাও করি সকল বাঙালীর জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা না করার জন্য। ভাবীকালে শিক্ষিত মুসলিম, উর্দু যাদের মাতৃভাষা, তারা স্বধর্মী হলেও সাহিত্য ও ভাষার পথে ও আসরে কখনই সেই ভিন্ন প্রদেশবাসীর অনুসরণকারী বা সর্বপশ্চাৎ আসনের স্থানাধিকারী হয়ে থাকতে চাইবেন না। অন্য দিকে যাঁরা সংস্কৃতি ও সাহিত্যের বিলুপ্তির আশঙ্কায় শঙ্কান্বিত হয়েছেন, তাঁদের সাহস অবলম্বন ক'রে বিবেচনা করতে বলি, ইতিহাসের কথা। মুসলমান-শাসনের মধ্যে বাস ক'রেও আমাদের ভাষা ও সাহিত্য আমরা রক্ষা ক'রে এসেছি। চিন্তিত হোন, চিন্তা করার প্রয়োজন আছে; কিন্তু আতঙ্কিত হব কেন?

এ বিপ্লবের বহ্নিকে আমরাই প্রজ্বলিত করেছি; সুদীর্ঘকাল ধ'রে বহু কর্ম বহু মন্ত্র রচনার ফলে সে যখন জ্বলেছে, তখন তার উত্তাপে ভীত হ'লে চলবে না। স্মরণ করতে হবে ক্ষুদিরামের ফাঁসি থেকে উনিশ শো বিয়াল্লিশ সালের আগষ্ট আন্দোলন এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কোহিমার পথে ভারতাভিযানের ইতিহাসকে। রামমোহন-বিবেকানন্দকে স্মরণ করতে হবে। বিদ্যাসাগর থেকে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করতে হবে। আজ তৃতীয় পক্ষের কৌশলে সে আগুন আমাদের ত্রুটি অবহেলার পথে আমাদেরই দগ্ধ করতে সমুদ্যত হয়েছে—এ কথা বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ। কিন্তু এই কালেই আপনাদের দৃষ্টি ফেরাতে বলি শ্রমিক-কৃষক-সংঘবদ্ধতার দিকে, বিভিন্ন ধর্মঘটগুলির দৃঢ়তার দিকে, কৃষক-আন্দোলনের নতুন দাবির দিকে। আজ হোক কাল হোক এ আগুন ফিরবে। ফিরবে তৃতীয় পক্ষের দিকেই, যে সমস্ত শ্রেণী ওই তৃতীয় পক্ষের স্বার্থের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন, তখন তাঁরাও তাতে পীড়িত হবেন। এ অনিবার্য।

পৃথিবীতে মানুষ আদর্শ লাভের জন্য তপস্যা করে, কিন্তু তবু পারিপার্শ্বিকের অনুকূলতা ও প্রতিকূলতায় পার্শ্ববর্তীদের বিরোধিতায় সহযোগিতায়, নানা অচিন্তনীয় অবহেলিত কারণ ও কার্যের ফলে এমন এক স্থানে উপনীত হয়, যাকে বলা যায় অনিবার্যতার পরিণতি। রাবণের অমরতার তপস্যার ফলের মধ্যে এই অনিবার্যতা লুকিয়ে থাকে স্ফটিকস্তম্ভ-মধ্যস্থ মৃত্যুবাণে সমুদ্রমন্থনের ফলের মধ্যে এই অনিবার্যতা আত্মপ্রকাশ করে অমৃতের সঙ্গে হলাহলের উত্থানে। নিয়তি নয়, অদৃষ্ট নয়, সন্ধান করলে দেখা যাবে কার্য-পরম্পরায়, ঘাতে প্রতিঘাতে সৃষ্ট অনিবার্যতার এই স্বরূপ। এই অনিবার্যতার গতিতেই মুসলমান ধনী-নির্ধনের বিরোধ সাম্প্রদায়িক বিরোধের সুযোগ দিয়ে কখনও নিবারণ করা যাবে না। হিন্দুর ধনীনির্ধনের বিরোধও না। হিন্দুর বিপদ সর্বাধিক। তার সমাজের মধ্যে দুটি কোণে মেঘ উঠছে। একদিকে ধনী ও নির্ধনের বিরোধ, অন্য দিকে স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্যের বিরোধ। বিগত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর আমি আশান্বিত হয়েছিলাম জাতিপাতের প্রায়শ্চিত্তবিধি সম্পর্কে পণ্ডিত ও সমাজনেতাদের উদারতা দেখে। ভেবেছিলাম, এই অসহনীয় আঘাতের ফলে যে চেতনা সঞ্চারিত হ'ল, সে আর আচ্ছন্ন হবে না। এই বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও সমাজবোধের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই চেতনা বহুযুগের সঞ্চিত ভ্রমাত্মক ভেদবুদ্ধির গ্লানি থেকে মুক্ত হবে। যার আসবার কথা ভয়ংকর বেশে, রক্তপাতের পথে, তাকে হঠাৎ সে পেলে বুঝি মনোহরের রূপে চৈতন্যময় প্রেমের পথে। কিন্তু তা হ'ল না। হয়তো এমন হয় না। অনিবার্য এইজন্যই অনিবার্য।

এইভাবে অনিবার্যতার পথে, বাংলার সংস্কৃতি ক্ষেত্রে—বাঙালীর আবাসভূমি আজ খণ্ডিত হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এ খণ্ডন মর্মান্তিক বেদনাদায়ক এবং আদর্শ-বিরোধী, এ কথা স্বীকার করতেই হবে; কিন্তু কার্য ও কারণে এ খণ্ডন অনিবার্য হয়ে উঠলে তাকে অস্বীকার করার উপায় কোথায়? যদিই তাই হয়, তাতেও হতাশ হবার কোনও কারণ আমি দেখি না। কারণ এই খণ্ডনই শেষ গঠন নয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন-সম্ভাবনা আজ মহাধ্বংসী যুদ্ধ সত্ত্বেও বেড়ে চলেছে। ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়েই চলেছে সৃষ্টি এবং সভ্যতা।

বাঙালীর জীবনে বহু সমস্যা দেখা দিয়েছে। তার তপস্যা নূতন সমস্যাভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে অনিচ্ছাকর ভ্রান্তি ও ইচ্ছাকৃত কৌশল অবলম্বনের ফলে; এবং সমগ্র পৃথিবীর সমস্যার ঘাত-প্রতিঘাত এসেও তার জীবনের সকল কর্মকে প্রভাবিত ক'রে, গতিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে, পৃথিবীর পরিণতির সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত ক'রে এই পরিণতিতে এনেছে। সুতরাং সকল সমস্যা সমাধানের প্রাক্কালে পৃথিবীর দ্বন্দ্বের কথা স্মরণ করুন। মহাকবি 'সভ্যতার সংকটে' যে আশ্বাস এবং আশা পোষণ করেছিলেন, তারই পুনরুক্তি ক'রে আমার বক্তব্য শেষ করব। তার আগে একান্তভাবে অনুরোধ জানাই এবং আশা করি, আপনারা সকল সমস্যার সমাধান করবেন, সংশয় বা ভীরুতা বা অন্ধবিশ্বাস কি জীর্ণ-সংস্কারবশে নয়, সমাধান করবেন প্রবল সাহসের সঙ্গে, মহৎ কল্যাণের অনুপ্রেরণায়, সত্যকে উপলব্ধি ক'রে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে অনিবার্যকে প্রত্যক্ষ ক'রে। সেই সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিই রবীন্দ্রনাথের আশার বাণী—"আশা করব মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম ক'রে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম ব'লে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ ব'লে মনে করি।......প্রবল-প্রতাপশালীরও ক্ষমতামদমত্ততা আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয়, তারই প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে।"

সর্বশেষে এই অপরাজিত মানুষের জয়যাত্রার মিছিলে যোগদানে সমুদ্যত বাঙালী জাতির জয় কামনা করি, বাঙালী জাগ্রত হোক, তার অবসাদ দূর হোক, তার ভীতি অপসারিত হোক, মনুষ্যত্বের সুদুর্লভ শক্তিতে ও বিক্রমে, পবিত্রতার তপস্যায়, সংস্কৃতির সঞ্জীবনীতে, দীপ্তিতে সে সেই প্রাণশক্তি লাভ করুক, যাকে বন্দনা করে ঋষিরা বলেছেন—

ইন্দ্রস্তং প্রাণ তেজসা রুদ্রোহসি পরিরক্ষিতা।
ত্বমন্তরিক্ষে চরসি সূর্যস্ত্বং জ্যোতিষাং পতিঃ॥

[প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে উদ্বোধন-কর্তার অভিভাষণ।]

বহুজাতির মিলনভূমি বঙ্গ

শ্রীহেমচন্দ্র বসু

পুরাতন আমাদের বাঙ্গলাদেশ। প্রাচীন আমরা বাঙ্গালী জাতি।

ঋগ্বেদের ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গ শব্দের প্রথম নির্দেশ পাই। অথর্ববেদ সংহিতায় বঙ্গদেশের উল্লেখ আছে। ভৃগুকথিত মনু-সংহিতায় তীর্থ ভিন্ন বঙ্গদেশে আসিলে প্রায়শ্চিত্ত করিবার ব্যবস্থা ছিল।

মহাভারতের সময়ে বঙ্গদেশ পুণ্ড্র, সুহ্ম এবং তাম্রলিপ্ত, এই তিন দেশ হইতে পৃথক দেশ ছিল (মহাঃ সভাঃ অঃ ২৯)। ভীমসেন মোদাগিরির (বর্তমান মুঙ্গের) পূর্বে পুণ্ড্রদেশ তৎপূর্বে বঙ্গদেশ দেখিয়াছিলেন (মহাঃ সভাঃ অঃ ২৯)। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে বঙ্গ ও কলিঙ্গাধিপতি আকর্ষ আসিয়াছিলেন। মহাঃ সভাঃ অঃ ৩৩)।

যযাতির চতুর্থ পুত্র অনুর আত্মজ বালির অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র পাঁচটি পুত্র ছিলেন। তাঁহাদের নাম হইতে পাঁচটি দেশের নামকরণ হইয়াছিল (বিষ্ণুপুরাণ ৪র্থ খন্ড ১ম অধ্যায়)। কলিঙ্গ বর্তমান উড়িষ্যা। আর চারিটি লইয়া বঙ্গদেশ।

পরিব্রাজক হিউ এন্ সঙের সময়ে বঙ্গ-দেশকে পাঁচটি বিভাগে তিনি বিভক্ত দেখিয়া-ছিলেন। (১) পুণ্ড্র বা উত্তর বঙ্গ (২) সমতট বা পূর্ব বঙ্গ (৩) কর্ণ সুবর্ণ বা পশ্চিম বঙ্গ (৪) তাম্রলিপ্ত বা দক্ষিণ বঙ্গ (৫) কামরূপ বা আসাম।

খৃষ্টীয় শতক আরম্ভের পর এই পাঁচটি ভাঙিয়া বঙ্গদেশ চারি প্রদেশে বিভক্ত হয়। বল্লাল সেন এই বিভাগ করেন। গঙ্গার উত্তর বিভাগ বরেন্দ্র ও বঙ্গ, দক্ষিণ দিকবর্তী বিভাগ রাঢ় ও বাগড়ি। বরেন্দ্র ও বঙ্গ যথাক্রমে ব্রহ্ম-পুত্রের উত্তর ও দক্ষিণদিকে অবস্থিত। রাঢ় ও বাগড়ি গঙ্গার শাখা জালাঙ্গী দ্বারা বিভক্ত। আদিশূরের সময় (৭৩২ খৃষ্টাব্দে) বঙ্গদেশ, রাঢ়, বঙ্গ ও বরেন্দ্র ও গৌড় এই চারিটী প্রদেশে বিভক্ত ছিল। (N.L.D.)

প্রত্নতাত্ত্বিক ভাউদাজির মতে ব্রহ্মপুত্র ও পদ্মার মধ্যবর্তী বিশাল ভূভাগই বঙ্গ নামে পরিচিত ছিল।

রাজা কেশব সেনের সময় বঙ্গদেশ পুণ্ড্র-বর্ধন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল (এসিয়াটিক সোসাইটি জার্ণেল, ১৯৩৮ পৃঃ ৪৫)। প্রত্ন-তাত্ত্বিক জজ পার্জিটার সাহেবের নির্দেশমতে বর্তমান মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, যশোহর, রাজ-সাহীর কিয়দংশ, পাবনা, ফরিদপুরে জেলাই বঙ্গ নামে পরিচিত (J. A. S. B. 1894. P-

শ্রীহেমচন্দ্র বসু
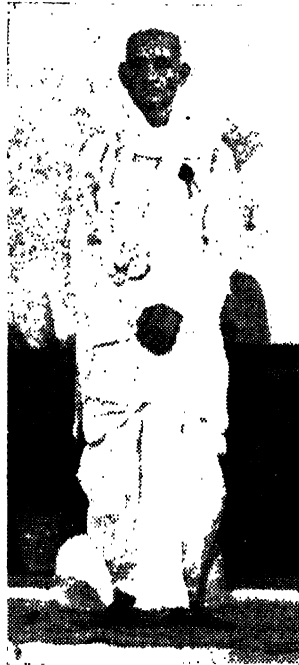
85)। ১০শ শতাব্দে বঙ্গদেশ "বাঙ্গলা" নামে অভিহিত হইত।

রঘুবংশে সুহ্মদেশ ও বঙ্গদেশ পৃথক্ রাজ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কালিদাস বঙ্গ-দেশের অধিবাসীদিগকে "নৌসাধনোদ্যতান্" বলিয়াছেন। রঘু বঙ্গরাজ্যের নৌবহর উৎখাত করিয়া গঙ্গামধ্যে দ্বীপপুঞ্জে জয়স্তম্ভ স্থাপন করেন। (রঘুবংশ ৪র্থ সর্গ ৩৬) পাল রাজা-দেরও নৌবহরের উল্লেখ তাঁহাদের অনুশাসনে পাওয়া যায়।

বঙ্গের ভূমি যেমন নানা দেশের কোমল পলিমাটির সঞ্চয়ন থেকে উদ্ভূত, জাতিও সেই-রূপ; এই নানা নদীর শাখা-প্রশাখা বাহিয়া আসিয়াছে নানা জাতি। আর্য-অনার্য, ভোট-কিরাত, মঙ্গোলীয় জাতি এখানে মিলিয়াছেন। গারো খাসিয়া চীন দ্রাবিড় আরও কত জাতির মিলন ঘটিয়াছে এই বঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের বাণী "হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন, শক হূন দল, পাঠান মোগল এক দেহে হ'ল লীন।" বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন, "কোলবংশীয় অনার্য, দ্রাবিড় বংশীয় অনার্য ও আর্য, এই তিন মিলিয়া বাঙ্গালী"। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বলিয়াছেন, "বাঙ্গলাদেশে কত জাতি মানুষের যে মিলন ঘটেছে, তা ব'লে শেষ করা যায় না। এখানে আর্য অনার্য, ভোট কিরাত প্রভৃতি মঙ্গোলিয়ান জাতি মিলেছে। মণিপুর দিয়ে শাণ-বাসী চীনেরা এসেছে। গারো-খাসিয়া কাছারী কোচ প্রভৃতি জাতি এখানে আছে। সাঁওতাল, ভীল, কোল প্রভৃতিরা রয়েছে। দ্রাবিড়-দের তো এটা একটা মূল আস্তানা। বহু মানবজাতির মিলনভূমি ব'লেই মানবতত্ত্ব সম্বন্ধে বাঙ্গালীরা এত সচেতন।" (পন্ডিত ক্ষিতি-মোহন সেন। বাঙ্গলার সাধনা, পৃঃ ১২)।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বাঙ্গালীর সংখ্যা

বাঙ্গালী চাকরী, পেশা, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি লইয়া যে দেশেই গিয়াছেন, তথায় উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। কর্মক্ষেত্রে সফলতা লাভ করিয়াছেন, এইরূপেই বৃহত্তর বঙ্গ গড়িয়া উঠিয়াছে। ১৯৩১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট অনুসারে ভারতে দেশে দেশে বাঙ্গালী কিরূপভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন, তাহার একটা তালিকা দিতেছি।

১৯৪১ সালের Census Report-এ এরূপ তালিকা দেওয়া নাই।

বাঙ্গালী

(১) আজমীর-মারবাড় ৪৩১, (২) আন্দামান নিকোবর দ্বীপ ১১৭১, (৩) আসাম ৩৯৬০৭১২, (৪) বেলুচিস্থান ৯৩, (৫) বাংলা ৪৬৩৯৩৮০২, (৬) বিহার ১৮১৬১৭২, (৭) উড়িষ্যা ৩৫৬২৫, (৮) বোম্বাই ৪২৯৮, (৯) এডেন ৩৫৬, (১০) ব্রহ্মদেশ ৩৭৬৯৯৪, (১১) মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ৫৩৩৫, (১২) দিল্লী ৬৬৩২, (১৩) মাদ্রাজ, ১৬৭২, (১৪) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ৪১৪, (১৫) পাঞ্জাব ২৪৯৭, (১৬) যুক্তপ্রদেশ ২৬৯৩১।

এমন অনেক স্থান ভারতে আছে, যেখানে ১ জনও বিহারী বা ১ জনও উড়িয়া নাই। মাত্র কুর্গ এবং বেলুচিস্থানের অন্তর্গত স্বাধীন রাজ্য ব্যতীত ভারতে এমন স্থান নাই যেখানে বাঙ্গালী নাই।

ইহা ব্যতীত প্রত্যেক প্রদেশান্তর্গত স্বাধীন রাজ্যগুলিতে বহু বাঙ্গালী বসবাস করিতেছেন।

(১৭) আসামের দেশীয় রাজ্য ৫৬৩১, (১৮) বরোদা রাজ্য ১৯৩, (১৯) বাংলার অন্তর্গত দেশীয় রাজ্য ৭৪০০৮৬, (২০) বিহার-উড়িষ্যা অন্তর্গত দেশীয় রাজ্য ৮৫৭৯০, (২১) বোম্বাই প্রদেশের দেশীয় রাজ্য ১৭, (২২) মধ্য ভারত এজেন্সী ৭২৭, (২৩) মধ্য প্রদেশের দেশীয় রাজ্য ৫৭২, (২৪) গোয়ালিয়ার রাজ্য ২৪২, (২৫) হায়দরাবাদ রাজ্য ১৯৫, (২৬) কাশ্মীর ৬৬, (২৭) মাদ্রাজ ষ্টেট এজেন্সী ১৭৬, কোচিন রাজ্য ৩, ত্রিভাঙ্কোর রাজ্য ১৬৭, মাদ্রাজ অন্তর্গত অন্যান্য রাজ্য ৬, (২৮) মহীশূর রাজ্য ২০৭, (২৯) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ অন্তর্গত এজেন্সী প্রভৃতি ২১, (৩০) পাঞ্জাব প্রদেশের দেশীয় রাজ্য ৩২, (৩১) পাঞ্জাব ষ্টেট এজেন্সী ১০৮, (৩২) রাজপুতনা এজেন্সী ৮১৮, (৩৩) সিকিম রাজ্য ১৮, (৩৪) যুক্ত প্রদেশের স্বাধীন রাজ্য ২৯৭, (৩৫) পশ্চিম ভারতের ষ্টেট এজেন্সী ৮২।

ক্রমশঃ অন্য দেশের লোক ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিল, যোগ্যতা লাভ করিতে লাগিল। তাহাতে একটি স্বার্থ-দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল। পূর্বে বাঙগালীদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত ছিল। এখন একটি শ্রেষ্ঠত্ব অধ্যাস বুদ্ধি (সুপিরিয়রিটী কমপ্লেক্স) লইয়া মনোমালিন্যের সঞ্চার হইল। তন্মধ্যে বিহারে এই মনোমালিন্য অধিক হইল। আমি বিহারের কথা বিশেষ করিয়া বলিব, কারণ বিহারে কয়েকটি সমস্যা আছে, যাহা অন্য প্রদেশে নাই।

বিহারবাসী বাঙগালীদের তালিকা আমি বিহার প্রদেশ অন্তর্ভুক্ত জিলা অনুসারে পৃথক দিতেছি।

পাটনা ডিভিসন—(১) পাটনা জেলা ৬৯৩৮, (২) গয়া জেলা ৮৪০, (৩) সাহাবাদ জেলা ৬১৮; **ত্রিহুত ডিভিসন**—(৪) সারণ জেলা ৮৫৭, (৫) চম্পারণ জেলা ৭৮৩, (৬) মজঃফরপুর জেলা ১৭৩২, (৭) দ্বারভাঙ্গা জেলা ৮১০; **ভাগলপুর ডিভিসন**—(৮) মুঙ্গের জেলা ৩৩২০, (৯) ভাগলপুর জেলা ৪৫৩৮, (১০) পূর্ণিয়া জেলা ১৪৭২৯৯, (১১) সাঁওতাল পরগণা ২৫২২০৩; **ছোটনাগপুর ডিভিসন**—(১২) হাজারিবাগ জেলা ১১২৭১, (১৩) রাঁচি জেলা ১৪১৭১, (১৪) পালামৌ জেলা ৫৮৬, (১৫) মানভূম জেলা ১২২২৬৮৯, (১৬) সিংহভূম জেলা ১৪৭৫১৭, (১৭) ছোটনাগপুরে ষ্টেট্স (দেশীয় রাজ্য) ৪৫৩৬৪।

১৯৩৫ সালে উড়িষ্যা বিহার হইতে বিচ্যুত হইয়া পৃথক হইয়া গেল। উড়িষ্যা প্রদেশে পূর্বে বাঙগালী অধিবাসী ছিল।

উড়িষ্যা ডিভিসন—(১৮) কটক জেলা ১৩৮৮০, (১৯) বালেশ্বর জেলা ১৬৯৪৯, (২০) আঙ্গুলে জেলা ১৭৬, (২১) পুরী জেলা ৩৭৪৯, (২২) সম্বলপুর জেলা ৮৭১, (২৩) উড়িষ্যার দেশীয় রাজাগুলি ৪০৪২৬।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ

পূর্বে সুবে বাংলা বলিলে বাঙগলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, ছোটনাগপুর সমন্বিত একটি দেশ বুঝাইত। উহা একজন Lt. Governor এঁর শাসনাধীনে ছিল। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বাঙগলাকে দ্বিধা বিভক্ত করেন। পূর্বে প্রদেশের নাম হইল পূর্ববঙ্গ ও আসাম। পশ্চিমে রহিল, অবশিষ্ট বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও ছোট-নাগপুর—নাম রহিল বঙ্গ, রাজধানী পূর্ববৎ রহিল কলিকাতায়। তখনও এদেশে জাতিগত অধিকার-দ্বন্দ্ব কিছুই ছিল না। ১৯১২ সালে ১লা এপ্রিল বিভক্ত বঙ্গ যখন পুনঃ যুক্ত হইল, তখন উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, বিহার পৃথক হইয়া হইল বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশ। ওদিকে আসাম স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হইল। বঙ্গের দুই অংশ জুড়িয়া হইল বঙ্গ। পাটনায় বিহারের রাজধানী হইল। বিহারের গবর্ণমেণ্ট অফিসগুলি উঠিয়া গেল পাটনায়।

এই সময়ে বাঙগলার অনেকখানি অংশ জোর করিয়া কাটিয়া, বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশে জুড়িয়া দেওয়া হইল। সমগ্র ছোটনাগপুর ডিভিসন, সাঁওতাল পরগণা এবং পূর্ণিয়া বিহার উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত করা হইল।

ঐ সময় হইতে বাঙগালী ও বিহারীর একটি স্বার্থদ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইল। বাঙগালীদের ডোমিসাইল সার্টিফিকেট লইবার প্রথা সুরু হইল। এতদিন বাঙগালীরা বাঙগলার বিশ্ববিদ্যালয়ে অবাধে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। সরকারী অফিসগুলি কলিকাতায় থাকায় চাকরীর অধিকাংশ তাঁহারা পাইতেছিলেন। এখন বিহারে ইউনিভারসিটি প্রতিষ্ঠিত হইল, বিহারীরা বিদ্যাশিক্ষা করিবার সমধিক সুযোগ পাইলেন। গবর্ণমেণ্ট ও অন্যান্য অফিসগুলি পাটনায় স্থাপিত হওয়ায়, বিহারীরা চাকরীও অধিক পাইতে লাগিলেন।

ঐ সময় বিহার উড়িষ্যায় বাঙগালী অধিবাসিগণ তাঁহাদের স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য 'বেঙ্গলী সেটেলার্স এসোসিয়েশন' নাম দিয়া একটি সমিতি গঠন করিলেন। উহার সহকারী সভাপতিরূপে আমি বাঙগালীর সেবা করিবার তখন সুযোগ পাইয়াছিলাম।

১৯৩৫ সালে গবর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট অনুসারে বিহার হইতে উড়িষ্যা বিচ্যুত হইয়া পৃথক প্রদেশে পরিণত হইল। আমাদের বেঙ্গলী সেটেলার্স এসোসিয়েশন দ্বিধা বিভক্ত হওয়ায় একেবারে উঠিয়া গেল। বিহার একটি গবর্ণরের অধীনে স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হইল। পূর্ণিয়া, সাঁওতাল পরগণা ও ছোটনাগপুর বিহারের অন্তর্ভুক্ত রহিয়া গেল।

মোগল সাম্রাজ্যে এ জেলাগুলি বিহারের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আইনী আকবরের সুবে বিহার সাতটি সরকারে বিভক্ত ছিল।

(১) সরকার বিহার—বর্তমান পাটনা ও গয়া জেলা। (২) সরকার মুঙ্গের—বর্তমান মুঙ্গের ও ভাগলপুর জেলা। (৩) সরকার চম্পারণ। (৪) সরকার হাজিপুর। (৫) সরকার সারণ। (৬) সরকার ত্রিহুত। (৭) সরকার রোটাস। পরবর্তী-কালে সরকার রোটাস বিভক্ত হইয়া সরকার রোটাস ও সরকার সাহাবাদ হইয়াছে। এ বিভাগে পূর্ণিয়া, সাঁওতাল পরগণা ও ছোটনাগপুরের কোন উল্লেখ নাই।

পূর্ণিয়ার সম্বন্ধে কোন কথা উঠিতে পারে না, কারণ পূর্ণিয়া সুবে বাঙগলার অন্তর্গত একটি পৃথক সরকার ছিল। আইনী আকবরী দ্বিতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা ১১৮ গ্র্যাণ্ট-এর পঞ্চম রিপোর্টে লিখিত আছে যে, সুবে বিহারের উত্তর দিকে পূর্ব সীমানা সুবে বাঙগলার পূর্ণিয়া জেলা। গ্রীয়ার্সন তাঁহার 'লিঙ্গুইষ্টিক সার্ভে অফ ইণ্ডিয়াতে' পূর্ণিয়ার পূর্বাঞ্চলের ভাষাকে 'নর্দার্ণ ডায়লেক্ট অফ বেঙ্গল' বলিয়াছেন।

১৯২১ সালে পূর্ণিয়ার সেন্সাসএ ভাষা লইয়া একটি গোলমাল হয়। তাহার ফলে অনেক বাঙগালীকে বিহারীই গণনা করা হইয়াছে।

সাঁওতাল পরগণা চিরদিনই বাঙগলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সাঁওতাল জেলা এক্ট ৩৭—১৮৫৫ অনুসারে ভাগলপুর ও বীরভূমের অংশ লইয়া গঠিত হয়। ইহা তদবধি বীরভূম জেলার অধীনে ছিল। বীরভূম জেলার জজ দুমকায় আসিয়া দায়রার মোকদ্দমার বিচার করিতেন। ১৯০১ সালের সেন্সাসে দেখা যায় যে, এই জেলার শতকরা ৫০ জন লোকের কম লোক হিন্দী ভাষাভাষী। ইহার অন্তর্গত রাজমহল পূর্বে বাঙগলার রাজধানী ছিল, পরে শাহসুজার সময়ে আবার রাজধানী হয়। রেগুলেশন অব ২৩শে নবেম্বর, ১৭৭৩ অনুসারে রাজমহল ও ভাগলপুর জিলা মুর্শিদাবাদ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পূর্বের মানচিত্র ও রিপোর্ট অনুযায়ী বাঙগলা বিহারের মধ্যে যে সীমানা নির্ধারিত ছিল, তাহাতে উত্তরে কুশী নদী ও নিম্নের তেলিয়াগড়ী গিরিসঙ্কট, সুবে বিহার ও সুবে বাঙগলার মধ্যবর্তী সীমানা ছিল। তাহা হইলে বেশ বোঝা যায়, রাজমহল, পাকুড়, দুমকা ও দেওঘর বাঙগলার অন্তর্গত ছিল।

বর্তমান ছোটনাগপুর পাঁচটি জিলায় বিভক্ত। ১। মানভূম; ২। সিংভূম ও ধলভূম; ৩। রাঁচি; ৪। হাজারিবাগ ও ৫। পালামৌ। পূর্বে মানভূম চিরদিনই বাঙগলার অংশ ছিল। ১৮৪৩ সালের পূর্বে জঙ্গলমহল একটি ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীনে পৃথক জেলা ছিল। উক্ত সালে উহা বিভক্ত করিয়া, কিছু অংশ বীরভূম জেলার সংলগ্ন করা হয় ও অবশিষ্ট অংশ লইয়া মানভূম জেলা গঠিত হয়। (রেগুলেশন ১৩, ১৮৩৩) তখন ধলভূম, মানভূম জেলার অন্তর্গত ছিল। পরে ১৮৪৩ সালে, ধলভূমকে সিংভূমের অন্তর্গত করা হয়। সুবর্ণরেখা নদী মানভূম ও ছোটনাগপুরের মধ্যের সীমানা ছিল। ইহা হইতে দেখা যায় মানভূম চিরদিনই বাঙগলার অংশ ছিল।

এক্ট ২০, ১৮১৪ অনুসারে মানভূমকে ছোটনগপুরের অন্তর্গত করা হয়। ১৮৩১ সালের সেন্সাস অনুসারে মানভূমে শতকরা ১৮ জন লোক হিন্দী ভাষাভাষী এবং সিংভূমে মাত্র শতকরা ৯ জন হিন্দী ভাষাভাষী। মানভূম জেলার লোকসংখ্যা ১৮১০৮৯০, তন্মধ্যে ১২২২৬৮৯ বাঙগালী, হিন্দী ভাষাভাষী মাত্র ৩২১৬৯০। সিংভূমের লোকসংখ্যা ৯২৯৮০২, বাঙগলা ভাষাভাষী ১৪৭৫১৭, হিন্দী ভাষাভাষী মাত্র ৮১০৫৭ জন। পাঁচটি রাজপরিবার দায়ভাগ আইন অনুসারে অনুশাসিত।

বর্তমান রাঁচি জেলার শতকরা ৫০ জনের অল্পসংখ্যক লোক হিন্দী ভাষাভাষী। রাঁচিই প্রকৃত ছোটনাগপুর, যাহার পূর্বে নাম ছিল কোক্রা। (Kokra). ইহা কখনও বিহারের অন্তর্গত ছিল না। রাঁচির আদিবাসীদের সহিত জাতিগত, ভাষাগত ও কৃষ্টিগত সৌসাদৃশ্য বিহারীদের নাই। পুরাতন ইতিহাস ও রিপোর্ট হইতে দেখিতে পাই যে, ছোটনাগপুরের হীরকের লোভে আকবরের সময় হইতে মুসলমানগণ বহুবার ছোটনাগপুর আক্রমণ করিয়াছে এবং হীরক লুণ্ঠন করিয়াছে। রাঁচি কখনও বিহারের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই।

পূর্বের রামগড় রাজ্য ছোটনাগপুরের অনেকখানি অংশ ব্যাপিয়া ছিল। মিঃ শোর-এর পঞ্চম রিপোর্ট অনুসারে রামগড় বাঙগলার অংশরূপে গণ্য ছিল (২য় খণ্ড পৃঃ ৯২)। বাঙগলার দেওয়ানী প্রাপ্তির পর ইংরেজের আমলে, রামগড় ও পাচটি বর্ধমান বিভাগের অন্তর্গত ছিল। মানভূমের ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে দেখিতে পাই যে, পাচটি পূর্বে বীরভূম জেলার অন্তর্গত ছিল। (মানভূম ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার পৃঃ ৬)

পালামৌ পূর্বে স্বাধীন রাজ্য ছিল, বিহারের অংশ ছিল না। পালামৌ ও হাজারিবাগ, এই দুইটি জেলা বিহার সংলগ্ন হওয়ায়, এই দুই জেলায় হিন্দী ভাষার অধিক প্রচলন আছে। তাহা ছাড়া এখানে কয়লা, অভ্র ও লোহের অনেক খনি থাকায়, বহু বিহারী কর্মোপলক্ষে এই দেশে বসবাস করিয়াছেন। উহাদের বাদ দিলে, খাস অধিবাসীদের সহিত বিহারীদের জাতিগত, ভাষাগত বা কৃষ্টিগত কোনও সৌসাদৃশ্য নাই। প্রাচীন ঝাড়খণ্ড রাজ্য ছোটনাগপুরের অনেকখানি লইয়া বিস্তৃত ছিল। আদিবাসীদের সহিত বিহারীদের কোনও বিষয়ে সৌসাদৃশ্য নাই। শ্রীচৈতন্য দক্ষিণ ভারতে যাইবার সময়ে ঝাড়-

...ন্ডের মধ্য দিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার কৃপায় ...ধিবাসীদের মধ্যে বৈষ্ণব ভাবধারা প্রচলিত ...য়াছে। 'রায়বাহাদুর শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরীর ...ড়ে' ও "মুন্ডা" পুস্তক দুইখানিতে আদি-...সীদের অনেক সঙ্গীত ও তাহার বাঙ্গলা ...বান্তর প্রকাশিত হইয়াছে। সেগুলি গৌড়ীয় ...বৈষ্ণব-ভাবপূর্ণ। এইসব বিবেচনা করিলে মনে ...য়, পূর্ণিয়া, সাঁওতাল পরগণা ও ছোটনাগ-...পুর বাংলার সহিত সংযুক্ত হওয়া উচিত। ...হারীদিগকে ছোটনাগপুরের অধিবাসিগণ ...দেশের লোক মনে করিতেন।

১৯৩১ সালের লোকগণনায় বিহারে ছিল ৩২৩৭৮৫৩৭। তন্মধ্যে বাঙ্গালী হইল ১৮১৬১৭২। ইহার মধ্যে যে অংশ ১৯১২ ...লে জোর করিয়া বাংলা হইতে কাটিয়া লওয়া ...য়াছিল, তাহার মধ্যে মানভূম, সিংভূম ...র্ণিয়া ও সাঁওতাল পরগণার বাঙ্গালীর, ...হারা বাংলা ছাড়িয়া বিহারে ...কাথাও যান নাই, তাঁহাদের সংখ্যা ১৭৬-...৭০৮। ইহারা ১৯১২ সালের ৩১শে মার্চ ...রে আহারাদির পর নিদ্রা গেলেন বাংলায় ...দের পূর্বপুরুষের বাসভূমিতে, এবং পর-...দিন ১লা এপ্রিল প্রাতে জাগিয়া দেখিলেন, ...তাঁহারা বিহারের প্রবাসী বাঙ্গালী হইয়াছেন! ১লা এপ্রিলের মাহাত্ম্য এমন অদ্ভুতভাবে ...কখনও ফলিতে দেখা যায় নাই! সঙ্গে সঙ্গে ডোমিসাইল সার্টিফিকেটের নিগড় গলায় বাঁধিয়া তাঁহারা জন্মগত বহুতর অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলেন।

আইন অনুসারে ইহা হইতে পারে না। ইহারা চিরদিনই "ডোমিসাইল অব ওরিজীন"এ ...বাস করিতেছেন, ইহারা বিহারে কি করিয়া ডোমিসাইলড হইবেন! যাঁহারা চিরদিনই তাঁহাদের Domicile of Origin-এ রহিয়া ...গেলেন, তাঁহাদের দেশ বিহারে পরিগণিত ...হইল তাঁহারা হইলেন বিহারী; সুতরাং মান-...ভূম প্রভৃতি অঞ্চলের লোককে প্রবাসী বাঙ্গালী ...বলা চলে না। রাজনৈতিক সংজ্ঞায় হয়তো তাঁহাদিগকে বাংলা ভাষা-ভাষী বিহারী ...বলা চলে। ইঁহাদের বাদ দিলে, বিহারে থাকে, ...মাত্র ৪৬৮৬৪ জন প্রবাসী বাঙ্গালী ইঁহারা বা ইঁহাদের পূর্বপুরুষ বাংলা ছাড়িয়া আসিয়া-...ছেন। এই পার্থক্য সত্ত্বেও মানভূম ইত্যাদি অঞ্চলের বাঙ্গালীরা প্রবাসী বাঙ্গালীর সকল অসুবিধা ভোগ করিতেছেন।

অবশ্য এই লোক গণনা বিশেষ ভ্রমপূর্ণ। বাঙ্গালী এসোসিয়েশন-এর পক্ষ হইতে আমরা Census করিয়াছি। তাহাতে বিহারের প্রত্যেক জেলায় ১৯৩১ সালের report অপেক্ষা অনেক অধিক সংখ্যক বাঙ্গালী পাইয়াছি। আমার মনে হয়, বিহারে বাঙ্গালী অধিবাসী ৩০ লক্ষেরও অধিক হইবে। এইরূপ অন্যান্য প্রদেশেও বাঙ্গালীর আদম-সুমারী সংখ্যাও ভ্রমপূর্ণ। যুক্ত প্রদেশে ২৫ হাজারের কিঞ্চিৎ বেশী বলিয়া উল্লেখ আছে, ইহা একেবারেই ভ্রমপূর্ণ। শুনিতে পাই এক কাশীধামে ত্রিশ হাজার বাঙ্গালীর বাস।

বাংলার ভূমি যাহা বিহারে সংযুক্ত হইয়াছে, তাহার কথা উপরে বলিয়াছি। ইহা ব্যতীত বাংলার অংশ বহুপূর্বে উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

মেদিনীপুর হইতে ১৫০টি ষ্টেট, পরিমাণ ১৯০ বর্গমাইল, যাহার রেভিনিউ ৩৪৮৩৫ টাকা, যাহা মেদিনীপুর জেলায় ৮টি পরগণায় অবস্থিত ছিল, তাহা ১৮৭৮ সালে সীমা নির্ধারণ করিবার ছলে বালেশ্বর জেলায় সংযুক্ত করা হইয়াছিল।

১৮০৩ সালে ইংরাজ যখন মারাঠাদের পরাজিত করিয়া উড়িষ্যা অধিকার করেন, তখন নাঙ্গালেশ্বর এবং সাতমালং পরগণার পরে সমস্ত পরগণাগুলি সেকালের বাঙ্গলার মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ইহাতো গেল, পশ্চিম সীমানার কথা, পূর্বদিকে এইরূপ অন্যায়ভাবে সিলেট জেলাকে বঙ্গ হইতে বিচ্যুত করিয়া, আসাম প্রদেশে সংযুক্ত করা হইয়াছে। সর্বংসহা বঙ্গ-জননী চিরদিনই এই অত্যাচার সহ্য করিয়া আসিতেছেন! উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বঙ্গো-পসাগর, সৌভাগ্যক্রমে সেজন্য এই দুই দিক অত্যাচারের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে।

পূর্ণিয়া জিলার ভাষা লইয়া একটা স্বতন্ত্র গোলমালের উল্লেখ পূর্বে করিয়াছি। ইহা বুঝিতে হইলে হিন্দুস্থানী ও হিন্দুস্থানী ভাষার সংজ্ঞা নিরূপণ করিতে হয়।

পূর্বে বাংলায় বিহারী এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দী-ভাষাভাষী ব্যক্তিকে হিন্দুস্থানী বলা হইত। আমরা হিন্দী ভাষার মধ্যে আর শ্রেণী বিভাগ করিতাম না। এবং হিন্দী ভাষাভাষীদের মধ্যে বিহারী ও যুক্ত প্রদেশবাসীর কোনও পার্থক্য করিতাম না। এখন ভারতে সর্বজনীন ভাষার সৃষ্টি করা হইতেছে, যাহার নাম হিন্দুস্থানী। মহাত্মা গান্ধী ইহার পৃষ্ঠপোষক। এই হিন্দুস্থানী ভাষা, হিন্দী ও উর্দু এবং প্রয়োজন হইলে অন্যান্য ভাষা হইতে শব্দ লইয়া একটা নূতন ভাষা সৃষ্টির চেষ্টা হইতেছে। এ সম্বন্ধে কংগ্রেস পক্ষ হইতে অনেক চেষ্টা ও আলো-চনা হইতেছে। ইহাই হইবে ভারতে লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা। আমি ইহার ভালমন্দ সম্বন্ধে আজ কিছুই বলিব না। সেন্সাস রিপোর্ট অনুসারে হিন্দুস্থানী ভাষা ইহা নহে এবং ইহা নবগঠিত ভাষা হইতে পারে না।

যদি ওয়েষ্টার্ণ হিন্দী ভাষাভাষী এবং ইষ্টার্ণ হিন্দী ভাষাভাষী পৃথক করা যায়, তাহা হইলে বাংলা ভাষাভাষী প্রত্যেকটি সংখ্যার অপেক্ষা অধিক হয়। পূর্ণিয়ায় ১৯২১ সাল হইতে এই ভাষার গোলমালে বাঙ্গালীর সমূহ ক্ষতি হইল। পূর্ণিয়ার পূর্বাঞ্চলে কিষণগঞ্জ বা শিরি-পুরিয়া নামে একটি ভাষা আছে। লিঙ্গুইষ্টিক সার্ভে অনুসারে ইহাকে নর্দারণ ডায়ালেক্ট অব বেঙ্গলী বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। তদনুসারে সেন্সাস গণনায় ১৯১১ সালে অনেক অধিক সংখ্যক অধি-বাসীকে বাঙ্গালী বলিয়া গণনা করা হইল। ১৯২১ সালে উহাদের মধ্যে ৬০০০০০ লোককে গণনা করা হইল। "হিন্দুস্থানী।"

নিম্নলিখিত Table দেখিলে বুঝিতে পারা যায়।

	১৯০১	১৯২১	১৯১১
হিন্দুস্থানী—			
	১১৮০১২৩	১৪৬৪৯৭১	১২০২৪৫৫
বাঙ্গালী—			
	১৪৭২১১	১০২০০৪	৭৪৯০১৮

ডোমিসাইল সার্টিফিকেট

উক্ত নব-বিভাগের পর নানা বিষয়ে আমাদের অসুবিধা হইতে লাগিল। বাঙ্গালীর উপর অনেক অবিচার হইতে লাগিল। এই সমস্ত অবিচার অসুবিধার সম্যক্ আলোচনা ও ইতি-কর্তব্যতা নির্ধারণ মানসে, বিহারের স্বনামধন্য ব্যারিস্টার মিঃ পি আর দাস মহাশয় ১৯৩৮ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী পাটনায় সভা আহ্বান করেন এবং বিহারের প্রবাসী বাঙ্গালীদের প্রতিনিধিবর্গ উক্ত সভায় উপস্থিত হয়েন। উক্ত সভায় বর্তমান 'বেঙ্গলী এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত করেন। বিহারপ্রবাসী বাঙ্গালীর অভাব, অসুবিধা আলোচনা ও তাহার দূরীকরণ, তাহাদের স্বত্ব-সংরক্ষণ, তাহাদের উন্নতির উপায় নির্ধারণ প্রভৃতি এই 'এসোসিয়েশনের' উদ্দেশ্য।

বিহারের ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের প্রবাসী বাঙ্গালীর চাকুরী ও বিদ্যা শিক্ষার প্রধান অন্তরায় তাহা—"ডোমিসাইল্ সার্টিফিকেট্"। ইহা না হইলে সরকারী চাকুরী পাওয়া প্রায় অসম্ভব। কলেজে ভর্তি হওয়াও দুরূহ। পরীক্ষায় বিশেষ সফলতা লাভ করিলেও বৃত্তি পাওয়া যায় না। কনট্রাক্ট পর্যন্ত পাওয়া কঠিন। এমন কি ইটকির যক্ষ্মা হাসপাতালেও এই ডোমিসাইল সার্টিফিকেট না দিলে বিহারবাসী বাঙ্গালীকে ভর্তি করিবে না। এই ডোমিসাইল সার্টিফিকেট বিহারের বাঙ্গালীর জীবনে এবং মরণে প্রতিবাদী। এই "ডোমিসাইল" সার্টিফিকেট উঠাইয়া দিবার জন্য 'বেঙ্গলী এসো-সিয়েশন' বরাবরই চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু সফলকাম হন নাই। সম্প্রতি গত ২৩শে জুন ১৯৪৬, রবিবার, "বিহার এসেম্বলিতে" এবিষয়ে আলোচনা হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ আশ্বাস দিয়াছেন, তিনি এই সম্বন্ধে সুবিচার করিবেন।

মানভূম অঞ্চলের বাঙ্গালীদের জন্য অনেক লেখাপড়া আমরা করিয়া আসিতেছি। সামান্য ফললাভ হইয়াছে, যে যে অংশ বাঙ্গলা হইতে ১৯১২ সালে বিহারে সংযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে "ডোমিসাইল সার্টিফিকেট" দিতে হইবে না, তবে "সার্টিফিকেট অব বার্থ" দিতে হইবে।

এখন যেমন আছে, তাহাতে "ডোমিসাইল সার্টিফিকেট" পাওয়াই কঠিন। আবেদনকারীর বিহারে নিজ বাড়ী থাকা প্রয়োজন। বাঙ্গলার সহিত সম্পর্ক থাকিবে না ও বাঙ্গলায় সম্পত্তি থাকিবে না। বাঙ্গলায় ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা থাকিলে হইবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

কংগ্রেসের প্রারম্ভ হইতে প্রাদেশিকতার বিরোধী ভূরি ভূরি প্রস্তাব আছে।

"ডোমিসাইল সার্টিফিকেট" পাইলেও চাকুরী এবং বিদ্যাশিক্ষার জন্য অন্তরায় আছে। চাকুরীতে যোগ্যতা অধিক হইলেও আমরা চাকুরী পাই না বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতেও নানা অসুবিধা আছে। মেডিক্যাল কলেজ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে বাঙ্গালী বিদ্যাশিক্ষার্থীর সংখ্যা নির্দিষ্ট আছে। সে অতি অল্প। ডোমিসাইল সার্টিফিকেট যুক্ত-প্রদেশেও আছে। কম বেশী অসুবিধা সর্বপ্রদেশেই আছে। যুক্তপ্রদেশে উর্দু পরীক্ষা দিয়া পাশ করিতে

হয়। বিহারে সম্প্রতি দেখিতেছি আবেদনকারীকে হিন্দী ভাষায় পরীক্ষা করা হইতেছে।

পণ্ডিত মতিলাল নেহরু কমিটি নির্দেশ করিয়াছেন যে, ভারতের প্রদেশগুলির সীমানা ভাষানুসারে নির্ধারিত হওয়া উচিত। তদনুসারে ১৯১২ সালে বাঙ্গলা হইতে যে অংশ জোর করিয়া কাটিয়া বিহারের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, তাহা বাঙ্গলাকে "ফেরৎ দেওয়া উচিত।"

প্রত্যেক প্রদেশেই বাঙ্গালীর এই অসুবিধা। যে সব প্রবাসী বাঙ্গালীর আত্মীয়স্বজন কলিকাতায় আছেন, তাঁহারা হয়তো ছেলেদের কলিকাতায় রাখিয়া বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারেন। তাহাও অধিক ব্যয়সাধ্য এবং অনেকক্ষেত্রেই সুবিধাজনক নহে। বিশেষতঃ ইহাতে আর একটি অসুবিধা আছে। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পাশ না করিলে বিহারে সরকারী চাকুরী সাধারণতঃ পাওয়া যায় না। ডোমিসাইল্ড সার্টিফিকেট দিবার সময় লেখাপড়া কোথায় শিখিয়াছে তাহাও বিবেচনা করা হয়। সুতরাং চারিদিকেই অসুবিধা আছে। ইহার একমাত্র প্রতিকার বাঙ্গালীদের নিজেদের স্কুল কলেজ স্থাপন করা।

বাঙ্গলা ভাষাকে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় রিকগ্‌নাইজড্ ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন ও তালিকাভুক্ত করিয়াছেন। বর্তমান নিয়মানুসারে বাঙ্গলা ভাষায় সমস্ত পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর দিবার নিয়ম হইয়াছে। কিন্তু সরকারী স্কুলকলেজগুলিতে বাঙ্গলা পড়াইবার ব্যবস্থা বিশেষ নাই। আমি বহুদিন হইতে মুঙ্গের জিলা স্কুলের পরিচালক সমিতির সভ্য আছি। অনেক চেষ্টা করিয়াও ব্যবস্থা করিতে পারি নাই। শিক্ষা বিভাগের এককথা প্রত্যেক শ্রেণীতে এত অল্পসংখ্যক বাঙ্গালী ছাত্র আছে যে, বাঙ্গালী মাষ্টার রাখা অসম্ভব! ইত্যাদি। বিহারী, হিন্দুস্থানী বা মুসলমান মাষ্টারের দ্বারা বাঙ্গলা পড়ান হয়। ফলে বাঙ্গালী ছেলে শিখিতেছে, tiger মানে শের এবং lion মানে বব্বর, কাজেই জাতি ক্রমশঃ বর্ব্বরত্ব প্রাপ্ত হইতেছে।

যুক্তপ্রদেশে সম্প্রতি নূতন অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। হাইস্কুল ও মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডে হাইস্কুল পরীক্ষার্থিগণের পক্ষে ইংরেজী ভিন্ন অন্য বিষয়ে উত্তর দিবার জন্য হিন্দী ও উর্দু ভাষার প্রবর্তন করা হয়। নানা আবেদন সত্ত্বেও বাঙ্গলা ভাষায় উত্তর দিবার অধিকার প্রদান করা হয় নাই। পূর্বে ইংরেজীতে উত্তর দিবার অধিকার ছিল, তাহাও এখন সভাপতির ইচ্ছা-সাপেক্ষ হইয়াছে। অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করিলে, অনুমতি না দিতেও পারেন। তাহা হইলে বাধ্য হইয়া বাঙ্গালী শিক্ষার্থীদিগকে হিন্দী বা উর্দু ভাষা ভালরূপে শিক্ষা করিতে হইবে। ইহাতে যে আমাদের শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ অসুবিধা ও ক্ষতি হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। উড়িষ্যার উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গলা ভাষাকে রিকগনাইজড্ ভার্ণাকুলার গণ্য করা হয় না। বাঙ্গালী নেতৃগণের এদিকে বিশেষ দৃষ্টিপাত করিতে হইবে।

আমি দেখিয়াছি, যদি প্রতি সহরে স্কুলগুলির বাঙ্গালী ছাত্রদের একত্র করা হয়, তাহাতে একটি স্বতন্ত্র স্কুল খুব চলে। মুঙ্গেরে এরূপ করা হইয়াছিল। তাহাতে বাঙ্গালী মাষ্টার বাঙ্গলা ভাষা পড়াইতেন। ইহা নানা কারণে হস্তান্তরিত হইয়া গেল। তাহার প্রধান কারণ, বাঙ্গালীদের অনৈক্য ও সহযোগিতার অভাব।

প্রবাসী বাঙ্গালীর আর্থিক অবস্থা বিশেষ চিন্তার কারণ হইয়াছে। অনেক বাঙ্গালী, যাহারা পূর্বে প্রবাসে থাকিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়াছেন আমি তাঁহাদের কথা বলিতেছি না। সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর অবস্থা আমাদের বিবেচ্য। দীর্ঘকাল প্রবাসে থাকায় অনেকের বাংলা দেশের ভদ্রাসন গুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সম্পত্তি যাহা ছিল অনেক স্থলে তাহা হস্তান্তর বা বেদখল হইয়া গিয়াছে। জন্মভূমি হইতে কোন আয়ের আশা নাই। অন্ন-সংস্থানের উপায় সাধারণতঃ পাঁচটি। (১) চাকরী, (২) শিল্প ও কল কারখানা, (৩) কৃষি, (৪) বাণিজ্য ব্যবসায়, (৫) পেশা ওকালতি, ডাক্তারি ইত্যাদি। এখন সব প্রদেশের লোক বেশী কম বিদ্যাশিক্ষা করিয়া যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে। তাহার উপর ডোমিসাইল্ড সার্টিফিকেটের বাধা আছে। এই সব কারণে প্রবাসী বাঙালী পূর্বের ন্যায় চাকরী পাইবে না। সুতরাং চাকরী বাদ দিয়া অন্ন-সংস্থানের উপায় করিতে হইবে। স্বাধীন পেশাগুলির কথা বলিব না। সেখানে গুণের আদর চিরদিনই থাকিবে। তবে সেখানেও সাম্প্রদায়িকতার ঢেউ প্রবেশ করিয়াছে। অবশিষ্ট তিনটি—কৃষি, শিল্প কল কারখানা এবং ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য অর্থের প্রয়োজন। বাঙালীর অনেক স্থলেই অর্থের অভাব। ভিক্ষা করিয়া বা চাঁদা তুলিয়া প্রয়োজন মত অর্থ সংগ্রহ হয় না। যৌথকারবার করিলে এ অসুবিধা থাকে না। তাহাও বাঙালীরা পারে না। প্রথমতঃ পাঁচজন বাঙালী এক হইয়া কাজ করিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ অনেকেরই প্রয়োজন মত টাকার সংস্থান নাই। আমার মনে হয়, প্রবাসী বাঙালীর নিজস্ব ব্যাঙ্ক হইলে অনেক সুবিধা হয়। আমি বেঙ্গলী এসোসিয়েশনে একটি প্রস্তাব দিয়াছিলাম। ব্যাঙ্কের উপস্বত্ব রিসার্ভ ফণ্ড ও সুদ বাদে যাহা থাকিবে, তাহা বাঙ্গালীর কৃষি, বাণিজ্য ব্যবসায়, কল কারখানার সাহায্যে ব্যয় করা চলে। তাহারই কিয়দংশ সাহায্যে কলেজ, স্কুল স্থাপন করা চলে। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন। প্রবাসী বাঙালীর জন্য ব্যাঙ্কের বিশেষজ্ঞেরা এবিষয়ে সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না, ইহা আমি বিশ্বাস করি।

১৯৩৮ সালে বিহারে বর্তমান "বেঙ্গলী এসোসিয়েশন" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯১১ সালে প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গলী সেটলার্স এসোসিয়েশন-এর ইহা রূপান্তর। বর্তমান সমিতিতে আমরা সমগ্র বিহারবাসী বাঙালীকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি। পূর্বে প্রবাসী ভিন্ন অন্য বাঙালী সভ্য ছিলেন না। ক্রমে এলাহাবাদ, লাহোর, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রদেশে বেঙ্গলী এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উদ্দেশ্য সকলেরই এক—জাতির সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ সঙ্গে সঙ্গে সর্ববিধ উন্নতি সাধন। আজ চতুর্বিংশ বৎসর হইল, প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন গড়িয়া উঠিয়াছে। বেঙ্গলী এসোসিয়েশন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া যাহা চেষ্টা করিতেছে, "প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন" সাহিত্য, বিজ্ঞান, ললিতকলার মধ্য দিয়া সেই বৃহত্তর বঙ্গই গড়িয়া তুলিতেছে। প্রথম প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক বলিয়া সরকারী কর্মচারিগণ তাহাতে প্রকাশ্যে যোগদান করিতে কুণ্ঠিত হয়েন। "প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে" সে অসুবিধা নাই। বাঙালীর অধিকার, বিদ্যাশিক্ষা ও স্বত্ব-সংরক্ষণ, অন্ন-সংস্থান এবং জাতির সর্ববিধ উন্নতির উপায় নির্ধারণ বেঙ্গলী এসোসিয়েশনের মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও গৌণভাবে জাতির সাহিত্য বিজ্ঞান, জাতির কৃষ্টির সম্প্রসারণ সম্বন্ধে এসোসিয়েশন পূর্ণ-সচেতন। প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন মুখ্যভাবে সাহিত্য বিজ্ঞান আলোচনার মধ্য দিয়া জাতির কৃষ্টি সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি করিয়া বৃহত্তর বঙ্গের উন্নতি সাধন করিতেছেন। বৃহত্তর-বঙ্গ-প্রতিষ্ঠায় বেঙ্গলী এসোসিয়েশন ক্ষত্রিয় পন্থা এবং প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন ব্রাহ্মণ পন্থা অবলম্বন করিলেও চরম লক্ষ্য একই। ব্রাহ্মণশক্তি ও ক্ষত্রিয় শক্তির মিলন চিরদিনই ভারতের কল্যাণের কারণ হইয়াছে।

শুধু প্রবাসী বাঙালী কেন, বাংলার বাঙ্গালীর আর্থিক অবস্থা চিন্তা করিলে মনে হয়, বাঙ্গালীর কর্মধারার আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। ইংরাজ অধিকারের প্রারম্ভ হইতে এতকাল বাঙ্গালী জ্ঞান-যজ্ঞে ব্রতী ছিলেন ও পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। বাঙালীর সর্বতোমুখী প্রতিভা আজ জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে।

তবে আজ বাঙালীর শুধু জ্ঞান-যজ্ঞেই ব্রতী হইলে চলিবে না। তাহাকে কর্ম-যজ্ঞে-ব্রতী হইতে হইবে। কর্ম-যজ্ঞের উপকরণগুলি সংগ্রহ করিতে হইবে। প্রবাসী বাঙালী সঙ্ঘ-বদ্ধভাবে কর্ম-পথে অগ্রসর হইলে সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। প্রয়োজন হইলে, মূল মাতৃভূমি বাংলার বিশেষজ্ঞগণের পরামর্শ ও সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। আশা করি, বাংলার বাঙালী ইহাতে পরাঙ্মুখ হইবেন না।

স্বতন্ত্র বঙ্গ প্রদেশ গঠন

বাংলার বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে একটি কথা উল্লেখ করা সমীচীন মনে করি। বিলাতের প্রধান মন্ত্রী অ্যাটলী মহোদয়ের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখের বাণী হইতে হিন্দু বাঙালীর মনে আশঙ্কা হইয়াছে যে, ১৯৪৮ সালের জুন মাসে ইংরাজ-রাজ বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতির মন্ত্রি-মণ্ডলীর হস্তে বঙ্গের রাজ্যভার প্রদান করিলে হিন্দু বাঙ্গালীর সংস্কৃতির ভাবধারা ও আদর্শগুলি নষ্ট হইয়া যাইবে। ইহার প্রতিকারকল্পে হিন্দু প্রধান পশ্চিম বাংলা ও উত্তর বঙ্গের দার্জিলিং ও জলপাইগুড়িসহ একটি পৃথক প্রদেশে পরিণত করিবার চেষ্টা হইতেছে। আমরা প্রবাসী বাঙ্গালী মুখ্যভাবে ইহাতে সংশ্লিষ্ট না হইলেও গৌণভাবে সংশ্লিষ্ট ইহা বলাই বাহুল্য; কারণ বাংলার সংস্কৃতি ও ভাবধারা প্রবাসী বাঙ্গালীর আদর্শ। সোণার বাংলা দ্বিখণ্ডিত হইবে ইহা ভাবিলেও মনে ব্যথা লাগে, ইহা সত্য এবং এরূপ বিভাগ হইলে পূর্ববঙ্গবাসী হিন্দু বাঙ্গালীদের অসুবিধা হইতে পারে ইহাও চিন্তার কারণ। কিন্তু বাংলা অখণ্ড থাকিলে হিন্দু বাঙ্গালীর সংস্কৃতি ভাবধারা ও আদর্শগুলির [illegible] অন্তরায় মনে হয়। সুতরাং সাম্প্রদায়িকতা শূন্য নব বঙ্গপ্রতিষ্ঠা ব্যতীত বাঙ্গালী হিন্দুর সংস্কৃতি প্রভৃতির রক্ষার অন্য পন্থা নাই। ছোটনাগপুর সাঁওতাল পরগণা, পূর্ণিয়া প্রভৃতির যে অংশ বাংলা হইতে অন্যায়ভাবে বিচ্যুত করা হইয়াছে সেগুলি পশ্চিম বঙ্গের সহিত সংযুক্ত করা উচিত। বাংলার মেদিনীপুর জেলার যে অংশ উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলার সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে, তাহা মেদিনীপুর জেলার সহিত পুনঃ সংযুক্ত হইয়া এই নব পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের অন্তর্গত হওয়া উচিত। এইরূপে নববঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহা বিশেষ সমৃদ্ধিশালী প্রদেশ হইবে এবং হিন্দু বাঙ্গালীর সংস্কৃতি, ভাবধারা ও আদর্শগুলি এই প্রদেশে সংরক্ষিত থাকিবে। এই প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন বাসরে ইহার স্বপক্ষে ও বিপক্ষের যুক্তিগুলির আলোচনা করার প্রয়োজন আমি দেখি না, কারণ আমার মনে হয় আমাদের গত্যন্তর নাই। আমি আমার ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করিলাম। এ সমস্যার সমাধান বাংলার নেতৃবর্গ ও সুধীমণ্ডলী করিবেন।*

---

*প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে বৃহত্তর বঙ্গ শাখার সভাপতির অভিভাষণ।

সমাজ ও সাহিত্য

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের উদ্যোক্তৃবর্গ আমার উপর সাহিত্যশাখা পরিচালনার গুরুভার ন্যস্ত করিয়া আমাকে যে পরিমাণে সম্মানিত করিয়াছেন, সেই পরিমাণে বিব্রতও করিয়াছেন। যাঁহারা এই সম্মেলনে আমাদের অতিথি, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও উপর এই দায়িত্ব অর্পিত হইলে সঙ্গত ও শোভন হইত। যাহা হউক, অভ্যাগত সুধীবৃন্দ আমার অযোগ্যতাপ্রসূত ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমার চক্ষে দেখিবেন, এই ভরসায় কার্যভার গ্রহণ করিতে সাহসী হইতেছি।

সম্মেলনের এই অধিবেশন প্রবাসী বাঙ্গালী সম্পর্কিত কয়েকটি বিশেষ সমস্যার আলোচনার জন্য আহূত হইয়াছে। সুতরাং এই প্রধান উদ্দেশ্যটি যাহাতে কর্মসূচীর দৈর্ঘ্য ও বাহুল্যে চাপা না পড়িয়া যায় সে দিকে সম্মেলন-সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তিরই অবহিত হওয়া প্রয়োজন। আমি সেইজন্য সাহিত্য সম্বন্ধে কোন সূক্ষ্ম তত্ত্বের উত্থাপন করিয়া বা দীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ করিয়া আপনাদের সংক্ষিপ্ত সময়কে সংক্ষিপ্ততর করিতে চাহি না। প্রবাসী বাঙ্গালী ভ্রাতৃবৃন্দের শিক্ষা-সংস্কৃতি আজ বিপন্ন ও বিঘ্নবহুল হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহাদের মাতৃভাষা বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থায় উহার যথাযোগ্য মর্যাদা হইতে বঞ্চিত হইতেছে। তাঁহাদের অর্থনৈতিক জীবনকেও বিপর্যস্ত করার চেষ্টা চলিতেছে। তাঁহাদের অবস্থা এখন মহাসমুদ্রের ঊর্মি-বিধ্বস্ত কয়েকটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপসমষ্টির ন্যায়—তরঙ্গের দারুণ অভিঘাতে তাঁহাদের সংকীর্ণ আশ্রয়ভূমি ক্রমশঃ ক্ষয়িত ও বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আসিতেছে। তাঁহারা এক জীবন-মরণ সমস্যার সন্ধিস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। জীবন-সংগ্রামে টিকিয়া থাকিবার প্রচেষ্টা তাঁহাদের সর্বাগ্রগণ্য দাবী ও কর্তব্য—নতুবা তাঁহাদের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব রাখা সম্ভবপর হইবে না। যে বাঙ্গালী এককালে বিভিন্ন প্রদেশে আধুনিক সভ্যতার অগ্রদূত ছিল, যাহার করধৃত জ্ঞানবর্তিকায় তাহার আশ্রয়স্থলের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইয়াছে, যে সমস্ত ভারতে রাজনৈতিক চেতনা ও স্বাধীনতাস্পৃহা জাগাইয়াছে ও সর্বপ্রথম উন্নততর জীবনাদর্শের সন্ধান দিয়াছে, অদৃষ্টের পরিহাসে সে আজ অবাঞ্ছিত, অনধিকার-প্রবেশকারী বলিয়া বিবেচিত হইতেছে ও সর্ববিষয়ে তাহার যাত্রাপথকে কণ্টকাকীর্ণ করার চেষ্টা চলিতেছে।

এই অবস্থা-সঙ্কটের মধ্যেই তাহাকে তাহার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিরূপিত করিতে হইবে—তাহার শিল্প, তাহার সাহিত্য, তাহার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ সমস্তই এই অনিবার্য প্রয়োজনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও এই প্রতিকূল পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং প্রবাসী বাঙ্গালীর সাহিত্যচর্চার যদি বাস্তব জীবনের সহিত যোগ থাকে, তবে ইহার উপর বর্তমান অবস্থা-সঙ্কটের ছায়াপাত অবশ্যম্ভাবী।

এখন প্রশ্ন এই যে, সাহিত্যের ভিতর দিয়া প্রবাসী বা স্বদেশবাসী উভয়বিধ বাঙ্গালীর

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবনে যে উদ্‌ভ্রান্তি ও অবসাদ আসিয়াছে তাহার প্রতিকারের কোন সূত্র মিলে কি না?

সাহিত্যের একটা বিশেষ কর্তব্যই হইল সমাজে সতেজ ভাবধারার প্রবাহ, বলিষ্ঠ প্রেরণার সঞ্চার। সাহিত্য অবসন্ন হৃদয়ে নূতন সঞ্জীবনী শক্তি আনে, কিংকর্তব্যবিমূঢ়, উদ্‌ভ্রান্ত মনে স্থির লক্ষ্যের সন্ধান দেয়; আমাদের সমস্ত উন্নত প্রবৃত্তি ও আদর্শবাদকে জাগরিত ও ব্যূহবদ্ধ করিয়া প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রায় নিয়োজিত করে। যে সাহিত্য কেবল সমসাময়িক জীবনের বিশৃঙ্খল বিমূঢ়তা, লক্ষ্যহীন, বিকল চিন্তাধারা ও কর্মপ্রচেষ্টার প্রতিচ্ছবি, তাহার কলাসৌন্দর্য থাকিতে পারে, কিন্তু কোন উচ্চতর অনুপ্রেরণা নাই। এই আদর্শে বিচার করিলে আমাদের অতি-আধুনিক সাহিত্য-সাধনার বিশেষ কোন সামাজিক মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না। সাহিত্যের সঙ্গে সুস্থ সমাজ-জীবনের বিচ্ছেদ—ইহাই আধুনিক সাহিত্যের একটা মর্মান্তিক সত্য। সমাজের সাধারণ স্তরের অপেক্ষা সাহিত্যলোকের স্তর উন্নততর হইবে ইহা ঠিক, কিন্তু তথাপি উভয়ের মধ্যে ব্যবধান যদি অনতিক্রম্য হয়, তবে উভয়েরই ক্ষতি।

এই দিক দিয়া আলোচনা করিলে স্বীকার করিতেই হইবে যে, সাহিত্য সমাজ-মনের উপর ইহার পূর্ব প্রভাব অনেকটা হারাইয়াছে। প্রাচীন সাহিত্য ত সমস্ত দেশের অন্তর-মৃণাল হইতে উদ্ভূত শতদল স্বরূপ—সমস্ত সমাজের আদর্শ, সমাজ-মনের অভীপ্সা, পার্থিব ত্রুটি-অপূর্ণতা বিচ্যুত হইয়া, লোকোত্তর, উৎকর্ষমণ্ডিত হইয়া ইহাতে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। সমাজমনের সহিত এই সাহিত্যের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধই ইহার সার্বভৌম আবেদনের মূল উৎস। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্য সমগ্র জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা, ইহার কাম্যতম আদর্শের বিরাট ভিত্তির উপর অভ্রভেদী মহিমায় দণ্ডায়মান। রামলক্ষ্মণের সৌভ্রাত্র, সীতার পাতিব্রত্য, যুধিষ্ঠিরের সত্যনিষ্ঠা ও ভ্রাতৃবৎসলতা, একলব্যের গুরুভক্তি, ভীষ্মের সত্যরক্ষার্থ কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন—এ সমস্ত সাহিত্যিক রূপ লইবার পূর্বে শত শত ভারতবাসীর অন্তরলোকে অনায়ত্ত সাধনার বিষয়, অপ্রাপণীয় আদর্শের অনুসরণরূপে সক্রিয় ছিল। বর্তমান সমাজ-মন-বিচ্ছিন্ন আত্মসর্বস্বতার যুগে এই অতি পরিচিত সত্যেরও নূতনভাবে উপলব্ধি করার প্রয়োজন আছে।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম উদ্ভব হইতেই এই ধারা অনুসৃত হইয়াছে। 'চর্যাপদে' বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রাচীন অধ্যাত্ম সাধনার একটা প্রকারভেদ, নির্বাণলাভের জন্য ব্যাকুল আগ্রহ সাধকের মনে যে হৃদয়াবেগ বহু শতাব্দী ধরিয়া সঞ্চিত করিয়াছিল, তাহাই গীতিকাব্যের রন্ধ্রপথে মুক্তিলাভ করিয়াছে। লেখক-গোষ্ঠী যে সাধনা-তত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাহা পাঠকমণ্ডলীর সুপরিচিত বলিয়া যুক্তি-তর্ক সাহায্যে প্রতিপাদনের ক্লেশ তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হয় নাই। অন্তরের নিবিড় অনুভূতি ছন্দোবন্ধে আত্মপ্রকাশ করিয়া সমধর্মী পাঠকের চিত্তে সঞ্চারিত হইয়াছে। বৈষ্ণব-গীতি কবিতার মধ্যেও লেখকের আধ্যাত্মিক আকূতি ও ভাব-রসধারা পূর্ব-পরিচয় ও আদর্শ-সাম্য হইতে উৎপন্ন সহানুভূতির প্রণালী বাহিয়া পাঠকের চিত্তে সহজ প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে লেখক ও পাঠকের মধ্যে যোগ স্থাপন করিতে কোন অপরিচয়ের বেড়া ডিঙ্গাইতে হয় নাই, রুচি ও আদর্শগত কোন অনৈক্য বাধা সৃষ্টি করে নাই। মঙ্গল-কাব্যগুলিতে নৈতিক আদর্শের মান অনেকটা খর্ব হইয়াছে, কিন্তু এখানেও লেখক ও পাঠক অনুভূতি ও বিশ্বাসের সমস্তরে দণ্ডায়মান।

চণ্ডী, শিব, মনসা প্রভৃতি দেবদেবীর পূজার প্রতি জনসাধারণের একটা স্বাভাবিক আগ্রহ ও প্রবণতা ছিল বলিয়াই সাহিত্যের ভিতর দিয়া এই নূতন পূজার প্রবর্তন, ভক্তি-রসের নূতন প্রকারের চরিতার্থতা এত সহজে সম্ভব হইয়াছিল। প্রত্যেক পালারচয়িতা তাঁহার গ্রন্থের প্রস্তাবনায় যে স্বপ্নাদেশপ্রাপ্তির ছলনার আশ্রয় লইয়াছেন, তাহা সমস্ত পাঠকবর্গের দ্বিধাহীন বিশ্বাসপ্রবণতা ও বদ্ধমূল সংস্কারের সমর্থন লাভ করিয়াছে।

প্রাক্-আধুনিক যুগের সাহিত্যে লেখক ও পাঠকের মধ্যে এই সম্পূর্ণ সম-প্রাণতার জন্যই ইহা জীবনের উপর এরূপ একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিল। জনসাধারণ এই সাহিত্যকে কোন ব্যক্তিবিশেষের মানস সৃষ্টিরূপে গ্রহণ করে নাই; ইহা হইতে রসগ্রহণ করিবার জন্য তাহাদিগকে ব্যক্তিত্বের দুর্গম দুর্গে প্রবেশের জন্য রন্ধ্রপথ অন্বেষণ করিতে হয় নাই। এ যেন তাহাদের মনের কথা, তাহাদেরই অন্তরের অভিলাষ, তাহাদের চির-জীবনের আকাঙ্ক্ষিত ফলপ্রাপ্তি; কবি ইহার সঙ্গে ভাষা ও সুরের ইন্দ্রজাল যোগ করিয়া, ইহাকে বহির্ঘটনায় কারাবন্ধ ও ভক্তি ও করুণ-রসে দ্রবীভূত করিয়া ইহাকে বিশিষ্ট রূপ ও বর্ধিত শক্তি দিয়াছেন। তাই এই সাহিত্যের আবেদনে পাঠক এত দ্বিধা-সংশয়হীন ঐকমত্যের সঙ্গে সাড়া দিয়াছে। কীর্তন, কথকতা, পাঁচালী, যাত্রা, কবিগান প্রভৃতি এই সাহিত্যের বিভিন্ন বিকাশ পাঠকের মনে যে নিবিড়, আত্মবিস্মৃত আনন্দের প্লাবন ছুটাইয়াছে, আধুনিক যুগে তাহার তুলনা মিলে না। অজ্ঞ অশিক্ষিত জনসাধারণ এই নির্মল সাহিত্য রসধারা পান করিয়া দিনের পর দিন ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলিয়াছে, জীবনের দুঃখ-ক্লেশ, বাস্তব অবস্থার পীড়নের উপর শান্তির স্নিগ্ধ প্রলেপ বিছাইয়াছে, বাহ্যজ্ঞানহীন তন্ময়তার সহিত তাহাদের সম্মুখে অভিনীত দৃশ্যের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। এই সাহিত্যের ভিতর দিয়া সমাজের নিম্নতম স্তরের মধ্যেও উপনিষদ-দর্শনের দুরূহ ধর্মতত্ত্ব সহজবোধরূপে সংক্রামিত হইয়াছে ও তাহাদের মধ্যে উচ্চস্তরের নীতিবোধ ও ধর্মনিষ্ঠা বদ্ধমূল হইয়াছে। এক কথায় সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধের যে আদর্শ আমাদের আকাঙ্ক্ষিত, এক্ষেত্রে তাহা পরিপূর্ণ সার্থকতালাভ করিয়াছে।

আধুনিক যুগে সমাজ ও সাহিত্যের মধ্যে বিচ্ছেদ-রেখা যে দীর্ঘতর হইতেছে, তাহার জন্য উভয়ের মধ্যে কাহাকেও দোষী করা যায় না—ইহা ক্রম-বর্ধমান মানস প্রগতিশীলতার অনিবার্য পরিণতি। আজ সমাজ মন তাহার অখণ্ড ঐক্য হারাইয়াছে; রুচির পার্থক্য তীক্ষ্ণতর ও বিচিত্রতর হইয়া পূর্বতন আদর্শ-সাম্যকে নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিদীর্ণ করিয়াছে। এখন একই ধরণের লেখা সকলকে সমানভাবে তৃপ্তি দিতে পারে না—সাহিত্যের মধ্যে এক জাতীয় গুণ সকলের রুচিকর হইয়া উঠে না। আমাদের সাহিত্যিক রুচি এখন ভোজন-বিলাসী হইয়া উঠিয়াছে; ইহা স্বাদ-বৈচিত্র্যের দাবী করে। মধ্য যুগের কাব্য সাহিত্যের পর্যুষিত অন্ন এখন আমাদের জিহ্বায় বিস্বাদ ও রসহীন ঠেকে। আমরা চাই পাশ্চাত্য ভাবধারার উগ্র মসলাযুক্ত নূতন খাদ্য প্রকরণ। এক হিসাবে ইহা উন্নতিরই চিহ্ন। আমাদের পূর্ব পুরুষদের যে কাব্য-পুরাণ ঘটিত কাহিনী শ্রবণে বা পাঠে ভক্তি ও করুণ রস উদ্বেলিত হইয়া উঠিত, তাহা অনেকটা জড়ধর্মী অভ্যাসের অনুবর্তনে। তাঁহাদের মনের একটি তন্ত্রী বারংবার আহত হইয়া এত স্পর্শকাতর হইয়া উঠিয়াছিল যে পরিচিত আবেদনের সামান্য মাত্র সংস্পর্শে ইহা অনেকটা যান্ত্রিক অচেতনতার সহিত ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিত। কিন্তু তাঁহাদের সঙ্কীর্ণ পরিচয়ের গণ্ডির বহির্ভূত বিষয়ের আলোচনা, কোনও নূতন সুরের আবেদন তাঁহাদের সমানুভূতিকে স্পর্শ করিতে পারিত না। ইহার সহিত তুলনায় আমাদের উপলব্ধির পরিধি ও গ্রহণশীলতার তীক্ষ্ণতা কত প্রভূত পরিমাণে বাড়িয়াছে। গানের কত বিচিত্র সুর, ছন্দের কত নূতন লীলা, রূপরস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধের প্রতি কত সূক্ষ্ম সচেতনতা, আলোচনার কত অভিনব ভঙ্গী, চিন্তা ও ভাবের কত নিগূঢ় প্রেরণা আজ আমাদের মানস লোকে তাহাদের অর্ঘোপচার পাঠাইতেছে। কিন্তু তথাপি আমাদের পূর্বগামীদের সহিত তুলনায় আমরা যে একদিকে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি তাহা নিঃসন্দেহ। সাহিত্যের আবেদনের ব্যাপ্তি যে পরিমাণে বাড়িয়াছে, ইহার গভীরতা সেই পরিমাণে কমিয়াছে। আজকাল সাহিত্য আমাদের ক্ষণিকের চিত্ত-বিনোদন, আমাদের জীবনের চরম আশ্রয় নয়। অধুনা যে নূতন আমোদ প্রমোদের প্রকরণ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতে আমরা খুঁজি একটু সুলভ উত্তেজনা, জীবনের গুরুভার ক্লান্তি ও অবসাদের ক্ষণিক বিস্মরণ। রঙ্গালয় ও চিত্রাভিনয়ের প্রেক্ষা গৃহের দ্বার হইতে যে হাজার দর্শক বাহির হইয়া আসে, তাহাদের নির্বিকার, ভাবলেশহীন মুখের দিকে তাকাইলেই তাহারা সেখানে কি পরিমাণ তৃপ্তি আহরণ করিয়াছে তাহা বুঝা যায়। এমন কি আমাদের যে মহিলাবৃন্দ স্বভাবতঃই কোমল ও সুকুমার হৃদয়বৃত্তিসম্পন্ন ও ভাবপ্রবণ, তাঁহাদের মনেও কোন গভীর রেখাপাত হয় না।

আমোদ-প্রমোদের কথা বাদ দিলেও আমাদের সাহিত্য-রসাস্বাদনের মধ্যেও অনুরূপ উদ্ভ্রান্তি ও লক্ষ্যহীনতার পরিচয় পাওয়া যায়।

সাহিত্য হইতে আমরা যে আনন্দ লাভ করি, তাহাকে জীবনের সঙ্গে গাঁথিয়া লইবার কোন প্রবণতা দেখা যায় না। মুহূর্তের আনন্দ চিত্তশুদ্ধি ও চরিত্র-গঠনের উপায় স্বরূপ ব্যবহৃত হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রচারিত স্বদেশ-প্রীতি হয়ত কেবল ভাবোচ্ছ্বাসরূপে আমাদের জীবনের অঙ্গীভূত হইয়াছে এইরূপ দাবী করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহার পিছনে যে কঠোর, জীবনব্যাপী সাধনার, যেরূপ অনলস কর্মানুষ্ঠানের নির্দেশ আছে, তাহা আমাদের কয়জনের জীবনে সার্থক হইয়াছে? দেশপ্রেমের এই নূতন ধর্ম আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জীবনে পুরাতন ধর্মকে কতকটা স্থানচ্যুত করিয়া হৃদয়বৃত্তির মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে সত্য; কিন্তু পুরাতন ধর্মের সহজ সর্বব্যাপী, অন্তরের গভীর স্তরে বদ্ধমূল প্রভাব ইহার এখনও অনায়ত্ত রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য আমাদের সম্মুখে যে অপরূপ সৌন্দর্য-লোক উদ্ঘাটিত করে, বাস্তব জীবনে তাহার বিশেষ প্রতিচ্ছায়া দৃষ্ট হয় না; তিনি তাঁহার অসংখ্য গীতি-কবিতার মধ্য দিয়া যে অমৃত নির্ঝর প্রবাহিত করেন, আমাদের জীবনের ভাঙ্গা-চোরা, ছিদ্র-বহুল মৃৎপাত্রে তাহাকে ধরিয়া রাখা যায় না। বৈষ্ণব কবিদের সহিত এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের তুলনা করিলে অনুকূল প্রতিবেশ সম্বন্ধে তাঁহারা যে অধিকতর সৌভাগ্যশালী ছিলেন, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইবে। চৈতন্যদেব প্রবর্তিত ভক্তিধর্মের প্লাবনে জনসাধারণের যে চিত্ত-ক্ষেত্র সরস ও উর্বরা হইয়াছিল তাহাই তাহাদিগকে বৈষ্ণব কবিতার রসগ্রহণে অধিকার দিয়াছিল। কাজেই বৈষ্ণব পদাবলী কেবল কাব্য রস পিপাসা নিবৃত্তির জন্য নহে, দৈনন্দিন জীবনের নিয়ামক শক্তিরূপে অধ্যাত্ম সাধনার প্রেরণারূপে গৃহীত হইয়াছিল—ইহার সুরে সুর মিলাইয়া অসংখ্য লোকের জীবনযাত্রার ছন্দ নিরূপিত হইয়াছিল। প্রবল ধর্মভাব লোকের হৃদয়ে যে রাজপথ প্রস্তুত করে, তাহার উপর দিয়া কাব্যের রস অবাধে বিজয়-অভিযানে অগ্রসর হয়। রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী ব্রাহ্মধর্ম সাধারণের চিত্তকে কতকটা ধর্মাভিমুখী করিয়াছিল সত্য; কিন্তু ইহার প্রভাব সেরূপ ব্যাপক ও বদ্ধমূল হয় নাই। ব্রাহ্মধর্মে মননশীলতাই মুখ্য উপাদান; হৃদয়াবেগের স্থান ইহাতে গৌণ। তা ছাড়া ইহা প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীরূপে আবির্ভূত হওয়ায় ইহার কার্য-কারিতা রক্ষণশীলতার প্রতিষেধে অনেকটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তির উপর যে অভিনব অধ্যাত্ম-বাদ আভাসে-ইঙ্গিতে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহার ব্যঞ্জনা এতই সূক্ষ্ম ও দুর্নিরীক্ষ্য, তাহার তত্ত্ব এতই কায়াহীন ও অনুভূতি-সাপেক্ষ যে, ইহা সাধারণ পাঠকের পক্ষে দুরধিগম্য। রবীন্দ্রনাথের ধর্ম-প্রেরণা কোন লোকোত্তর মহিমাসম্পন্ন অবতারে কেন্দ্রীভূত নয়; অসংখ্য ভক্তের জীবনাদর্শে ইহা স্থায়ীরূপ গ্রহণ করে নাই; নানা শিষ্য-প্রশিষ্যের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রচারকার্যে ইহা অবিস্মরণীয়ভাবে মর্মমূলে গ্রথিত হয় নাই। সুস্পষ্ট উপদেশ বাণীর নির্বিচার অনুসরণে ইহার অগ্রগতি বাধামুক্ত হয় নাই। এই সমস্ত কারণের সহিত সাহিত্যকে জীবনের নিয়ামক-রূপে গ্রহণ করার শক্তিও যে বর্তমান যুগের পাঠকের অনেক হ্রাস হইয়াছে এই কারণটি যোগ করিলে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রভাবের আপেক্ষিক ন্যূনতা সম্বন্ধে ধারণা পরিষ্কার হইবে।

এমন কি যে সমস্ত কবিতায় ও গদ্য প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ অনেকটা সুস্পষ্ট নির্দেশে মনুষ্যত্বের নূতন আদর্শ প্রচার করিয়াছেন, তাহাও যে আমাদের জীবনে বিশেষ কার্যকরী হইয়াছে তাহা বলা যায় না। যে গদ্গদ ভাবপ্রবণতা, যে সত্য-দৃষ্টিবিলোপী মোহাবেশ পৃথিবীর সাত কোটী নরনারীকে মনুষ্যত্বের একটা নিম্নতর স্তরে,

গালীত্বে আবদ্ধ রাখিয়াছে, তাহা হইতে াদের মুক্তির দিন এখনও দূরবর্তীই য়াছে। জীবনের উপর গভীরতর প্রভাব বাদ লও, কাব্য সাহিত্যের আর একটা গৌণতর াব আছে। কাব্যের সৌন্দর্য-সুষমা শিক্ষিত প্রদায়ের মনে একটা সুরুচি, সৌজন্য ও নীনতার ছাপ মুদ্রিত করে, একটা সাধারণ ত্মমার্জনার পরিণতি ঘটায়। এই মার্জিত, নুশীলিত চিত্তবৃত্তি, এই ভদ্র, সহৃদয় নাভাব শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে সাধারণ লোচনায় বক্তৃতা ও সাময়িক সাহিত্যে অভি-ক্ত হয়। ফরাসী সাহিত্য গণমনের উপর এই মস্ত বিষয়ে এতদূর প্রভাবশীল হইয়াছে যে, দেশের প্রত্যেক ব্যক্তির সামাজিক আচরণে, পরিচিতের সহিত আলাপ-আলোচনায় ও হিত্যের সর্ববিধ প্রচেষ্টায় এই সহজ ভদ্রতা, ই নাগরিক-সুলভ সরস, বিনয়-মধুর-কভঙ্গীটি পরিস্ফুট হয়। আমরা কিন্তু র্ধশতাব্দী ধরিয়া রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সুধা পান রিয়া তাঁহার ভাব-প্রকাশের ও তর্ক-বিতর্কের কুমার ভঙ্গীটির সহিত পরিচিত হইয়াও াহাকে মুখ-মিষ্টতাবলে যে গুণও অর্জন রিতে বিশেষ অগ্রসর হইতে পারিয়াছি কি না ন্দেহ। আমাদের সাহিত্যিক বাদ-বিতণ্ডা, ংবাদপত্র ও বক্তৃতার মধ্যে যে তীব্র আক্রমণাত্মক নোভাব, যে উৎকট পরমতাসহিষ্ণুতা ও প্রকাশ-ভঙ্গীর রূঢ়তা আত্মপ্রকাশ করে তাহাতে আমরা য রবীন্দ্রনাথের যুগে জন্মিয়াছি ও রবীন্দ্র-সংস্কৃতির অংশভাক্ ইহা সহজে বিশ্বাস য় না।

এই অবস্থার পক্ষ সমর্থনে কিছু বলার াছে। যে জাতি পরাধীনতায় পিষ্ট-দলিত, জীবন-সংগ্রামে শুধু বাঁচিয়া থাকিবার চেষ্টাতেই াহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত, তাহার পক্ষে আদব-কায়দার শিষ্টতা, বাহ্য ব্যবহার-রীতির সুষ্ঠুতার দিকে লক্ষ্য রাখিবার অবকাশ অতি অপ্রচুর। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আমাদের অন্তর দেশে অনুপ্রবিষ্ট হইবার এখনও যথেষ্ট সময় পায় নাই। কোন সমসাময়িক কবির রচনা জাতির অস্থি-মজ্জায় সংক্রামিত হইতে পারে না—তাহার জন্য প্রয়োজন বৃক্ষের পাতায় পাতায় গোপন রস-সঞ্চারের ন্যায় বহু শতাব্দীর নিঃশব্দ কার্যকারিতা। কাব্যরস এক চুমুকে পান করা যায় না—ইহাকে ধীরে ধীরে বিন্দু বিন্দু রিয়া রক্তপ্রবাহ ও হৃৎস্পন্দনের সহিত মিশাইতে হইবে। কিন্তু তথাপি এ সম্বন্ধে নিশ্চিত আত্মপ্রসাদের কোন স্থান নাই: এই বাধা-বিঘ্ন-সঙ্কুল, অন্তর্দ্বন্দ্বক্লিষ্ট পৃথিবীতে কোন উচ্চ আদর্শই জাতির ঐকান্তিক নিষ্ঠা ব্যতীত জীবনে বদ্ধমূল হইতে পারে না। কাল অপক্ষপাত ব্যবহার-সাম্যের সহিত শুভ ও অশুভ উভয়বিধ শক্তিকেই তুল্য আতিথেয়তা দেখায়—উভয়কেই প্রবল হইবার সমান সুযোগ দেয়। মানুষ ক্ষেত্রকর্ষণ না করিলে সয়তান ক্ষেত্রের মধ্যে আগাছা বপন করিবে। আজ হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতার পঙ্কিল স্রোত কূলপ্লাবী হইয়া বিশ্ব-বিধানের অন্তর্নিহিত ন্যায়নীতি ও শুভবুদ্ধিকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে উদ্যত। আজ সমাজ ও রাজনীতিক্ষেত্রে হানাহানি, মারামারি, বীভৎস লোলুপতা ও অসঙ্কোচ দস্যুবৃত্তি সাধারণ নিয়মে দাঁড়াইয়াছে। আজ আদর্শবাদ, আত্মত্যাগ ও ন্যায়নিষ্ঠা জীবনের কর্মক্ষেত্র হইতে নির্বাসিত হইয়া মনের এক বহিঃপ্রকাশহীন অন্ধকার কোণে সসঙ্কোচে আশ্রয় লইয়াছে। মানুষের স্বাভাবিক মিলন প্রবৃত্তি ও আপোষ মীমাংসা প্রবণতা আজ মতবিরোধের তীব্রতায়, ভেদ-বুদ্ধির কেন্দ্রাতিগ প্রভাবে শতধা বিচ্ছিন্ন ও বিপর্যস্ত। এখন যদি আমাদের জীবন ও সাহিত্যে অশুভের প্রতিষেধক যে সমস্ত শক্তি ক্রিয়াশীল তাহাদিগকে পূর্ণমাত্রায় উদ্বুদ্ধ করিয়া প্রতিরোধ সংগ্রামে নিযুক্ত করা না যায়, তবে ভবিষ্যতের আশাও বিলুপ্ত হইবে। ইউরোপ বহু শতাব্দী ধরিয়া অনেক মহা-মনীষী, কবি ও দার্শনিকের অমৃত-নিষ্যন্দিনী ভাবধারায় পুষ্ট হইয়াও রাজ্যবৃদ্ধি ও বাণিজ্য-বিস্তারের বিষয় হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। আমাদের অদৃষ্টাকাশে যে দুর্যোগের মেঘরাশি পুঞ্জীভূত হইতেছে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রতিভাদীপ্ত আদর্শবাদের বায়ুপ্রবাহে তাহা উড়াইতে পারিবেন কি না সন্দেহ।

এই পটভূমিকায় আমাদের প্রবাসী ভ্রাতৃবৃন্দ তাঁহাদের কর্মপন্থানির্বাচনে কতখানি সাহিত্যের উচ্চতর আদর্শবাদ ও ন্যায়নিষ্ঠতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইতে পারিবেন তাহা বলা কঠিন। তবে তাঁহাদের আজ যে এরূপ অনুপ্রেরণার বিশেষ প্রয়োজন আছে তাহা সুনিশ্চিত। একদিন বাঙ্গালা তাঁহাদিগকে নিজ সভ্যতা-সংস্কৃতির অগ্রদূতরূপে প্রতিবেশী প্রদেশে প্রেরণ করিয়াছিল—সেখানে তাঁহারা মাতৃভূমির এক সাংস্কৃতিক উপনিবেশ গঠন করিয়াছিলেন। আজ তাঁহারা আপনাদিগকে প্রবাসী নামে অভিহিত করিয়া কি মাতৃক্রোড়ে ফিরিবার ব্যাকুলতাই প্রকাশ করিতেছেন? তাঁহারা যে যে প্রদেশে নিজ স্থায়ী বাসভূমি রচনা করিয়াছেন, সেখানে তাঁহাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার-রক্ষার জন্য তাঁহারা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির সহানুভূতি ও আনুকূল্য পাইবেন এ আশ্বাস বাঙ্গলা তাঁহাদিগকে দিতে পারে। তাঁহাদের শিক্ষা-সংস্কৃতিরক্ষা ও জীবিকার্জনের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে বৈষম্যমূলক নীতি অবলম্বিত হইতেছে, সমস্ত বাঙ্গলার মিলিত কণ্ঠে তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হউক। কিন্তু শুধু প্রতিবাদ জ্ঞাপনের দ্বারাই এ সমস্যার চিরন্তন সমাধান হইবে না। যাহতে উচ্চতর জাতীয়তা-বাদের আদর্শে ক্ষুদ্র প্রাদেশিক হিংসাদ্বেষ বিলুপ্ত হয়, যাহাতে পরস্পরের ভ্রাতৃত্বমূলক মিলন ও সৌহার্দের দ্বারা বিরোধের বীজ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়, সেই কর্মপন্থা অবলম্বনই আমাদের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত। প্রবাসী বাঙ্গালীকে তাহার শ্রেষ্ঠত্বাভিমান বিসর্জন দিয়া সুখে-দুঃখে দেশের অধিবাসীর সঙ্গে একই প্রতিষ্ঠানভূমিতে দাঁড়াইতে হইবে; প্রেম ও স্বার্থত্যাগের দ্বারা তাহাদের সন্দেহ ও বিরোধিতাকে জয় করিতে হইবে। এই গণ-তন্ত্রের যুগে সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলে না—অন্য উপায়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মানস দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে। আশা করি কালের এই নির্দেশ মানিতে আমরা বৃথা আত্মাভিমানে সঙ্কুচিত হইব না। প্রবাসী ভ্রাতৃবৃন্দ সাহিত্য সেবার মধ্য দিয়া যুগপৎ অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে আমাদের মিলনের নূতন পথ রচনা করিতে ও বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধন করিতে পারেন। বিভিন্ন প্রদেশের সমাজ ও পরিবার জীবন ও রীতি-নীতির বৈশিষ্ট্য তাঁহাদের সাহিত্য সৃষ্টির উপাদান হইতে পারে; ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় যে নূতন ধরণের সাহিত্য রচিত হইতেছে তাহার অনুবাদের দ্বারা তাঁহারা বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ ও অন্যান্য প্রদেশবাসীর সহিত আমাদের অন্তরঙ্গ পরিচয় স্থাপনের সুবিধা করিতে পারেন। অন্যান্য প্রদেশের ভাষা শিক্ষা ও সাহিত্যরস আস্বাদনে আমরা যে খুব বেশী অগ্রসর হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। সীমাবদ্ধ জ্ঞান মানস সঙ্কীর্ণতা হৃদয়বৃত্তির সঙ্কীর্ণতার একটা মুখ্য হেতু জ্ঞানের অভাব সহানুভূতির অভাবের উৎপাদক। সাহিত্যরসের আদান-প্রদানের ভিতর দিয়া যে চিত্তের প্রসার জন্মিবে, যে মুক্তবায়ু প্রবাহ সঞ্চারিত হইবে, তাহাতে হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া যাইবে ও হিংসাদ্বেষের বীজাণু নষ্ট হইবে। অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্য বাংলার নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী; সুতরাং তাহাদের নিকট ঋণ গ্রহণে আমাদের অভিমান ক্ষুন্ন হইবে না। তাহারা আমাদের নিকট গ্রহণ করিয়াছে সাহিত্য রীতির আদর্শ; আমরা প্রতিদানে লইতে পারি বিষয়-বৈচিত্র্য। এ পর্যন্ত কোন প্রবাসী বাঙ্গালী সাহিত্যিক অন্য প্রাদেশিক ভাষায় সাহিত্য রচনা, এমন কি ঐ সাহিত্যের অনুবাদের প্রতিও বিশেষ অভিনিবিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। ভারতের ঐক্য শুধু রাজনৈতিক বিধি-ব্যবস্থায় সংসাধিত হইবে না—ইহার পিছনে চাই সত্যিকার সংস্কৃতিগত ও সাহিত্যিক প্রেরণা হইতে উদ্ভূত মিলন। এককালে সংস্কৃত সাহিত্য হিমাচল হইতে কুমারিকা পর্যন্ত এই বিরাট ভারতভূমিকে একই বৃন্তে ফোটা পুষ্পগুচ্ছের ন্যায় অখণ্ড ভাব-সংহতি দান করিয়াছিল; রাজনৈতিক বিচ্ছেদের দুস্তর ব্যবধানের উপর মানস মিলনের স্বর্ণ সেতু নির্মাণ করিয়াছিল। বর্তমান যুগের পরিবর্তিত পরিস্থিতির মধ্যে সাহিত্যকেই আবার সেই একীকরণের ভার লইতে হইবে। রাজনীতির বাস্তব প্রয়োজনে যাহার উদ্ভব, সাহিত্য-রস-সিঞ্চনে তাহার সর্বাঙ্গীণ পরিপুষ্টি সাধিত হইবে; মাটির রসে যে ফুল মুকুলিত হইয়াছে, বসন্ত-পবন-স্পর্শে তাহা পরিপূর্ণ, পেলব সৌন্দর্যে বিকশিত হইয়া উঠিবে।

অনুবাদ-সাহিত্য

অনেক দিন পরে সেদিন আমাদের সান্ধ্য-মজলিশে সাহিত্যালোচনা বেশ জমেছিল। আগে সাহিত্যটাই ছিল আমাদের মজলিশের প্রধান উপজীব্য। কিন্তু ইদানীং অর্থাৎ ফার্স্ট ব্যাটল অফ মৌলালির পর থেকে সভ্যদের অনেকেই অত্যন্ত রাজনীতি-প্রবণ হয়ে পড়েছেন। এখন প্রায় প্রতি আসরেই শুধু বঙ্গ-বিচ্ছেদ নয় বঙ্গ দেশের শব ব্যবচ্ছেদ পর্যন্ত হয়ে থাকে। গুপ্ত ঘাতকের ছোরা আর রাজনৈতিক ডাক্তারদের ছুরির আঘাতে বঙ্গ মাতার দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হবার যোগাড় হয়েছে। সুতরাং পূর্বাহ্নেই স্থির করে নিয়ে ছিলাম এবার আর রাজনীতির প্রসঙ্গ নয়, কারণ আমাদের এই আসরটি হিন্দুস্থানও নয় পাকিস্তানও নয়। স্বধর্ম এবং পরধর্ম দুটোই আমাদের কাছে ভয়াবহ। সাহিত্য জিনিসটার মস্ত সুবিধে—ওর জাত নেই আর সাহিত্যের যেটা ধর্ম সেটা হিন্দুরেও নয়, মুসলমানেরও নয়, সেটা সকল মানুষের। আমি তো আগেই বলেছি আমাদের আড্ডাটা একদিক থেকে শ্মশানের মতো—এখানে এলে সকলকে সমান হতে হয়।

সাহিত্যে যা কিছু সুন্দর তাতে সকল মানুষের সমান অধিকার এবং সে অধিকার অর্জনের একমাত্র পথ হ'ল অনুবাদের পথ। আমাদের আড্ডাটি ছোট, কিন্তু তাতে একাধিক ভাষাবিদ আছেন। তাঁরা কেউ কেউ ফরাসী জার্মান ইতালিয়ান ভাষার চর্চা করে থাকেন। ওঁরা সেদিন কয়েকটি অনুবাদ পাঠ করে শোনালেন, কিছু আমাদের দিশী ভাষা থেকে, কিছু বিদেশী ভাষা থেকে। আমি মাতৃভাষা এবং রাজভাষা ছাড়া আর কোনো ভাষা জানিনে। কাজেই আমি কিছুই লিখিনি, আমি ছিলাম শ্রোতা। কিন্তু রস উপভোগের বেলায় আমিই ভাগ বসিয়েছিলাম বেশী এবং পাঠান্তে যে আলোচনাটি হয়েছিল তাতে আমিই ছিলাম প্রধান বক্তা।

ইদানীং বাঙলা দেশে অনুবাদ সাহিত্যের দিকে বেশ একটা ঝোঁক এসেছে। দশ বছর আগেও এটা ছিল না। এর মূলে বাঙালী মনের একটি স্নবারির পরিচয় ছিল। প্রতিষ্ঠাপন্ন লেখকরা অপরের লেখা অনুবাদ করতে নারাজ ছিলেন, পাঠকরাও কন্টিনান্টাল সাহিত্য ইংরেজীর মারফতেই পড়তে ভালবাসতেন। বাঙলা ভাষায় অনুবাদ হলেও সে বই বাজারে চলত না। পাঠকরা ভুলে যেতেন যে তাঁরা যে টলস্টয়, ডস্টয়ভস্কি, টুর্গেনিভ, ইবসেন দোঁদে রোঁলা ইত্যাদি পাঠ করেন সেটাও আসল বস্তু নয়, নকল বস্তু, কেননা সেগুলোও ইংরেজী অনুবাদের মারফতেই পড়ছেন। কেউ যদি বলেন বাঙলার চাইতে ইংরেজিতেই রস উপভোগটা সহজসাধ্য তবে বলব তাঁরা মিথ্যে কথা বলছেন। মায়ের চাইতে মাসির আদরে যারা বেশী বিশ্বাস করে তাদের কেউ বুদ্ধিমান বলে না।

গত পাঁচ ছয় বছর ধরে বিদেশী সাহিত্য থেকে বাঙলা ভাষায় দেদার অনুবাদ হচ্ছে। এটি সত্যিই খুব সুলক্ষণ। বহু দেশের বহু চিন্তার ধারা এসে না মিশলে সাহিত্য কখনো পরিপুষ্ট হ'তে পারে না জীবন্ত সাহিত্য মাত্রকেই 'সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীর' হতে হবে। যে সাহিত্যে অনুবাদের স্থান নেই সে সাহিত্য বদ্ধ জলাশয়।

সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে শুধু যে অনুবাদের একটি বিশিষ্ট স্থান হয়েছে এমন নয়, আর একটি প্রধান সুলক্ষণ এই যে, বিশিষ্ট সাহিত্যিকেরা আত্মাভিমান ছেড়ে অনুবাদের কাজে হাত দিয়েছেন। এর খানিকটা কৃতিত্ব সিগনেট প্রেসের প্রাপ্য। প্রকাশনা শিল্পে তাঁরা নতুন নতুন দিকে আমাদের চোখ খুলে দিয়েছেন। ধীরে ধীরে অন্যান্য প্রকাশকরাও এ দিকে সচেতন হচ্ছেন। সাহিত্য পত্রিকাগুলিও এ বিষয়ে সহায়তা করছেন। অনুবাদের মারফৎ যাঁরা সুসাহিত্য পরিবেশন করতে শুরু করছেন তাঁরা পাঠক সমাজের কৃতজ্ঞতা ভাজন।

অন্যান্য দেশে কেবলমাত্র অনুবাদ করেই বহু লেখক সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। ফিটজারেল্ড ইংরেজ কবি সমাজে স্থান পেয়েছেন। কিন্তু ওমর খৈয়াম-এর অনুবাদ ছাড়া তিনি এমন কিছু কাব্য রচনা করেননি যার দৌলতে সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর আসন হতে পারত। রুষ সাহিত্য থেকে অনুবাদ করে কনস্টান্স গার্নেট যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। এরূপ দৃষ্টান্ত আরো দেওয়া যেতে পারে, বিশেষ করে আমাদের ঘরের কাছেও দৃষ্টান্তের অভাব নেই। শ্রীযুত কান্তি ঘোষ ওমর খৈয়ামের যে অনুবাদ আমাদের দিয়েছেন তাতে তাঁর কবিখ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হ'তে বাধ্য।

আমার মতে যিনি সত্যিকারের সাহিত্যিক, অনুবাদে একমাত্র তাঁরই অধিকার। যিনি সাহিত্য ধর্মী তিনিই সাহিত্যের মর্ম বুঝবেন। আনাড়ি লোক অনুবাদ করতে গেলে অনেক সময়ে মূল লেখার চরিত্রহানি ঘটে। মূলকে তাঁরা বিকৃত করেন বিকলাঙ্গ করেন নির্মূল করেন। একজন ইংরেজ লেখক বলেছেন—Translation is Treason. ভাষান্তর করতে গিয়ে যাঁরা মূল লেখার রূপান্তর করে ফেলেন তাঁরা রাজদ্রোহের অপরাধে অপরাধী। এজন্য যিনি অনুবাদের কাজ গ্রহণ করবেন তাঁকে এই গুরুদায়িত্বটি স্মরণ রাখতে হবে যে, কোনো মহা মনীষী তাঁর নিভৃত চিন্তাকে যে রূপ দান করেছেন অনুবাদকের হাতে যেন সে রূপের বিকৃতি না ঘটে। আমি নিজেও কিছু অনুবাদ করেছি। রসিক মহলে তার নানা রকম সমালোচনা হয়েছে। কেউ বলেছেন ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত ঠিক তেমনটি। আবার কেউ বলেছেন যেমনটি হওয়া উচিত তেমনটি নয়। মত-বিরোধ থাকবেই। তবে নিজের তরফ থেকে একথা আমি বলতে পারি—আমি সেই অনুবাদের কাজকে একটি sacred trust হিসাবে গ্রহণ করেছিলাম। যে গ্রন্থ আমি অনুবাদ করেছি বারম্বার পাঠান্তে যতক্ষণ না তার মর্মমূলে আমি পৌঁচেছি ততক্ষণ অনুবাদের কাজে আমি হাত দিইনি। আমার দিক থেকে শ্রদ্ধা বা নিষ্ঠার এতটুকু অভাব হয়নি।

কোন কোন অনুবাদক একেবারে কথায় কথায় অনুবাদ করে মূলের প্রতি নিষ্ঠা প্রদর্শন করেন। আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। আমার নিষ্ঠা বাক্যের প্রতি নয় বক্তব্যের প্রতি। The horse is a noble animal কথাটার বর্ণে বর্ণে অনুবাদ করতে গেলে উক্ত জন্তুটার গুণ-গরিমা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় বটে কিন্তু বক্তব্যটার মান থাকে না। এখানে অপর একজন ইংরেজ লেখকের কথা উদ্ধার করছি—Translation is like the wrong side of an embroidered cloth giving the design without the beauty.

দুঃখের বিষয় কোন কোন লেখকের অনুবাদ পড়ে দেখেছি—ঠিক এমব্রয়ডারির উল্টো পিঠের মতো এবরো খেবরো। এটাও এক ধরণের বিকৃতি। কারণ অনুবাদের ভাষা বলে আলাদা ভাষা নেই, অনুবাদের ভাষাকেও সাহিত্যের ভাষাই হতে হবে।

সিনেমার সুবর্ণ-জয়ন্তী

অমরেন্দ্রকুমার সেন

দেখতে দেখতে সিনেমা পঞ্চাশ বৎসর বয়সে পেশছল। তার নীরব সুবর্ণ-জয়ন্তী অনুষ্ঠান স্মরণ করিয়ে দিলে যে পৃথিবীতে নীরস রাজনীতি ছাড়া আরও কিছু সরস জিনিস আছে। পৃথিবীতে সিনেমার মত এত জনপ্রিয় আমোদ-প্রমোদ আর কিছু নেই। সর্ব বয়সের ও সর্বশ্রেণীর নরনারীর মনোহরণ করেছে এই সিনেমা।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ১৮৯৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কোন একটি সিনেমা তার দরজা খোলে, সেই হলো প্রথম সিনেমা গৃহ। সেই সিনেমা গৃহ নিশ্চয়ই আধুনিক সিনেমা গৃহের সমতুল্য ছিল না, এত ভাল বসবার আসন
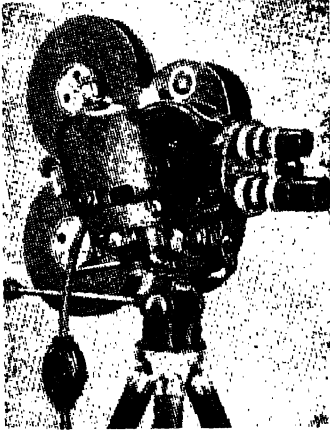
আধুনিক মোটর চালিত ক্যামেরা

ত' ছিলই না, সবাক ছবি দূরের কথা পর্দাতে ছবি এত ভাল প্রতিফলিতই হতো না। হয়ত তখন কোন সালর্স বয়ার অথবা কোন ইনগ্রিড বার্গম্যান (উয়োম্যান?) ছিল না; কিন্তু যা ছিল তাইতেই তারা খুশি ছিল।

আমাদের ঐতিহাসিকদের যদি সিনেমা ও তার যান্ত্রিক পরিণতির বিষয় অনুসন্ধান ক'রে একটি প্রবন্ধ রচনা করতে বলা হয়, তবে তাঁরা বোধ হয় গোলক ধাঁধায় পড়ে যাবেন, কারণ তাঁদের নানা পরস্পর বিরোধী মন্তব্যের ও ঘটনার সম্মুখীন হতে হবে এবং এই সংক্রান্ত নানা আবিষ্কার অনেক দেশ নিজেদের বলে দাবী করতেও পারেন। এই গোলমালের মধ্যে হয়ত শেষ পর্যন্ত খেই হারিয়ে যাবে। দশটি বিভিন্ন দেশ সিনেমা তাদের আবিষ্কার বলেও দাবী সমর্থন করে। তবে পৃথিবীতে গত পঞ্চাশ বৎসরে যত গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হয়েছে যেমন রেডিও, মোটর গাড়ী, বিমান, টেলিভিশন এবং এমন কি পরমাণু বিভাজন; এই সবের সম্পূর্ণ আবিষ্কার কোন একটি লোকের দ্বারা হয়নি, বহুদিন ধরে বহু ব্যক্তির ধাপে ধাপে গবেষণা আছে। শেষ রূপ হয়ত একজন ব্যক্তি দিয়েছেন এবং আবিষ্কারক রূপে তাঁর নামই অমর হয়ে রয়ে গিয়েছে। সিনেমা সম্বন্ধেও এই কথাই বলা চলে। আজ যে আমরা অল্প পয়সার বিনিময়ে আরামপ্রদ আসনে সুশীতল গৃহে বসে রূপালী পর্দায় হাসি 'কান্নার খেলা দেখি আর পশ্চাতে অনেক বিনিদ্র রজনীর পরিশ্রম লুক্কায়িত আছে, তার খোঁজ আর আমরা কয়জনেই বা রাখি। পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সিনেমার যদিও অনেক উন্নতি হয়েছে, তাহলেও অনেক উন্নতি এখনো হবে আশা করি। নির্বাক থেকে সবাক ছবি, সাদা-কালো থেকে রঙীন ছবি, হাতে আঁকা ছবি এবং আরও কত কিছুই না আমরা দেখছি, কিন্তু মনে হয় যে, শীঘ্রই ঘন-ক্ষেত্র বিশিষ্ট (থ্রি-ডাইমেনসানাল) এবং গন্ধ বিশিষ্ট ছবি আমরা দেখতে পাবো। কিছুদিন আগে অবশ্য ঘন-ক্ষেত্র বিশিষ্ট ছবি কলকাতায় দেখানো হয়েছিল; কিন্তু তা একরকম চশমা পরে দেখতে হতো। পরে হয়ত বিনা চশমাতেই আমরা এই-রকম ছবি দেখতে পাবো। তখন মনে হবে ছবির নায়ক-নায়িকা পর্দায় আবদ্ধ না থেকে দর্শকদের মধ্যে চলাফেরা করবে, আর সেই সংগে ছবি যদি গন্ধ-বিশিষ্ট হয়, তাহলে আর কিছুই না হোক্ নানাপ্রকার মার্কিন খাদ্যদ্রব্যের গন্ধেই ছবিঘরে বসে অর্ধেক ভোজন সম্পন্ন করতে পারবো। এখন থেকেই অনুরোধ জানিয়ে রাখি যে, সিনেমার কোন নায়ক অনুগ্রহ করে কড়া বর্মা চুরুটের ধূমপান যেন না করেন।

সিনেমার আবিষ্কার কাহিনী আলোচনা করবার আগে একটা জিনিস মনে রাখলে বোঝবার অনেক সুবিধা হবে। আমরা যদি আলোর দিকে কিছুক্ষণ এক দৃষ্টে চেয়ে থেকে হঠাৎ দৃষ্টি ফিরিয়ে নিই তাহলে সেইদিকে দৃষ্ট আলোর অনুরূপ একটি আলো ক্ষণিকের জন্য দেখা যায়। বৈজ্ঞানিকেরা এই জিনিসটিকে বলেন, "পার্সিসটেন্স অফ ভিশন", দৃষ্টির স্থিতি। কোন জিনিস দেখে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেও অক্ষিপটে তার ছাপ এক সেকেণ্ডের ষোলো ভাগের এক ভাগ সময় থাকে। বহুদিন আগে সার জন হার্সেল দৃষ্টির স্থিতি এক মজার পরীক্ষার দ্বারা দেখান। তিনি একটি কাগজের গোল চাকতির একদিকে একটি পাখী ও অপরদিকে একটি খাঁচা আঁকেন। যখন সেই চাকতিটি জোরে ঘোরানো হতো তখন মনে হতো পাখিটি বুঝি খাঁচার মধ্যে বসে আছে। এই দৃষ্টির স্থিতি সিনেমার ছবিতে আমাদের অজ্ঞাতে কাজ করে। সিনেমার ফিল্ম আমরা অনেকেই দেখেছি। তার ছবিগুলি পর পর দেখে গেলে হঠাৎ কোন পার্থক্য ধরা পড়ে না; কিন্তু পার্থক্য আছে; সে পার্থক্য ধরা পড়ে চলন্ত গতিশীল ছবির সৃষ্টি করে', রূপালি পর্দায়।

সে যুগের শ্রেষ্ঠ চিত্র-তারকা পার্ল হোয়াইট

চলন্ত ছবি সর্বপ্রথম সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেন একজন ফরাসী ভদ্রলোক ১৮২৯ সালে। তাঁর নাম গুস্তাভ প্লেটো। একটি দণ্ডকে বৃত্ত করে গোল একটি মোটা কাগজ লাগানো হ'ত, সেই কাগজে একটি স্পেন দেশীয় নর্তকীর ছবির কয়েকটি বিভিন্ন ভঙ্গিমা আঁকা থাকত, আর দেখবার জন্য আর একটি মোটা কাগজে কয়েকটি ছিদ্র থাকত। যখন সেই দণ্ডটি সাহায্যে মোটা গোল কাগজটিকে জোরে ঘোরানো হতো এবং সেই ছিদ্র দিয়ে দেখলে ছবির নর্তকীকে নৃত্যশীলা বলে মনে হতো। এই ধরণের জিনিসের এখনও প্রচলন আছে।

পথে ঘাটে অথবা মেলায় ফেরীওয়ালারা "দিল্লীকা খেল" বলে এখনও মাথায় করে বড় একটি টিনের গোল বাক্স নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, এবং ছেলের দল মহানন্দে তার সংগে ছোটাছুটি করে। আমরা বাল্যকালে অনেকেই মাত্র এক পয়সার বিনিময়ে এইরকম "দিল্লীকা খেল" অথবা "বম্বাইকা বায়োস্কোপ" দেখেছি। গুস্তাভ প্লেটো তাঁর যন্ত্রের নাম দিয়েছিলেন "ফেন্যাসিস্টোস্কোপ"। বলা বাহুল্য যন্ত্রটি সেকালে ছোট ছেলেদের খেলনা রূপেই ব্যবহৃত হতো।

এই খেলনা থেকেই অনেকে কৌতূহলাক্রান্ত হলেন। তাঁরা চেষ্টা করতে লাগলেন কি করে একঘেয়ে ছবি না দেখিয়ে নানারকমের অথচ আরও দীর্ঘ ছবি দেখানো যেতে পারে। উইলিয়ম স্ট্যামফার নামে একজন অস্ট্রিয়াবাসী প্লেটোর যন্ত্রের কিছু উন্নতিসাধন করলেন। তিনি ছবিগুলিকে আলোকিত করতে সক্ষম হলেন। তখনও আলোকচিত্র অথবা ফোটোগ্রাফী শিশু অবস্থায়, যা কিছু করা হতো সবই সাধারণ

সবাক সিনেমা দেখাবার জন্য শব্দযন্ত্র সহ প্রোজেক্টার

কাগজে হাতে এঁকে; আর এই সমস্ত ছবি একজনের বেশী লোক দেখতে পেত না। এই-রকম নানা গবেষণা ও পরীক্ষা করতে করতে এল ১৮৫৩ সাল। এই সময় আর একজন অস্ট্রিয়াবাসী আজকালকার ম্যাজিক লণ্ঠনের মতো দূরে দেওয়ালে ছবি বড় করে প্রলম্বিত (প্রোজেক্ট) করতে সক্ষম হলেন। তিনি একটি লম্বা পার্চমেন্ট কাগজে চর্বি মাখিয়ে তাকে প্রায় স্বচ্ছ করে' তাতে একটি নর্তকীর পর পর ভঙ্গীর কয়েকটি ছবি আঁকতেন। একটি বাক্সের মধ্যে আয়না দ্বারা জোর আলো প্রতিফলিত করবার ব্যবস্থা থাকত। তিনি সেই আলোর সামনে নর্তকীর ছবি জোরে এদিক থেকে ওদিকে দ্রুত চালনা করতেন। বাক্স থেকে একটি

একসংগে ছোট ও বড় ক্যামেরাতে ছবি তোলা হচ্ছে

ছিদ্রপথ দিয়ে দূরে দেওয়ালে আলো পড়ত, কিন্তু ছবিটিকে যখন সঞ্চালিত করা হ'তো তখন ঐ ছবি আরও বড় হয়ে' দেওয়ালে ত' পড়তই উপরন্তু মনে হত যে ছবিটি বুঝি নাচছে।

আরও সাত বৎসর কেটে গেল এল ১৮৬০ সাল। ফিলাডেলফিয়ার একজন উৎসাহী মার্কিন ইঞ্জিনিয়ার কোলম্যান সেলার্স এক প্রকার যন্ত্র আবিষ্কার করলেন যার নাম কিনেমাটোস্কোপ। এইটি প্রথম যন্ত্র যাতে আসল ফোটোগ্রাফ ব্যবহার করা হ'তো; ফোটোগ্রাফগুলি একটি চাকার সাহায্যে ঘোরানো হ'ত। ফল কিন্তু খুব সন্তোষজনক হয়নি, এতেও একসংগে একজনের বেশী লোক ছবি দেখতে পেতনা। লাভ যেটুকু হয়েছিল তা নামটি; আজকালকার সিনেমা অথবা বায়োস্কোপের কাছাকাছি নামটা।

কিনেমাটোস্কোপের পর এল মিউটোস্কোপ। মিউটোস্কোপে কিনেমাটোস্কোপ অপেক্ষা ছবি-গুলি আরও কিছু উজ্জ্বল ও স্পষ্ট দেখাতো। মিউটোস্কোপও শেষ পর্যন্ত গেল তারপর উদয় হল ফ্যাসমাট্রোপের। ফ্যাসমাট্রোপ আবিষ্কার করছিলেন হেনরী আর, হায়েল, তিনি এই যন্ত্রে কাচে ছাপা ছবি দেখাতেন, যেমন আজকাল আমরা সিনেমা ঘরে বিশ্রামের সময় স্লাইড দেখি। এগুলি সব কাচে ছাপা ছবি। কাচের কতকগুলি ছবি একটি চাকার সাহায্যে ঘুরিয়ে ও দেওয়ালে প্রলম্বিত করে কিছু গতিশীল করে ছবিগুলি দেখানো হ'ত। এই গতিশীল ছবির বিজ্ঞাপন স্বরূপ প্রচার করা হ'ত যে "ইহা একটি নূতন আবিষ্কার। এই যন্ত্র সাহায্যে পর্দায় জীবন্ত ছবি দেখাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। জীবন্ত মানুষের ন্যায়ই এই ছবির মানুষকে চলিতে ও দৌড়াইতে দেখা যাইবে।" এই যন্ত্রের একটি সুবিধা ছিল এই যে একাধিক ব্যক্তি একসংগে ছবিগুলি দেখতে পেত। অনেকে এইজন্য হায়েলকে সিনেমার আবিষ্কারক বলেন।

এইবার পর পর কয়েকটি আবিষ্কার হলো; প্রথম ফরাসী বৈজ্ঞানিক ম্যারে আবিষ্কৃত ডায়াফলি নামে একপ্রকার কাগজ যা আলোতে নষ্ট হয়ে যেত; তবে এই কাগজকে স্বচ্ছ করে তাইতে ছবি ছেপে যন্ত্র সাহায্যে প্রলম্বিত করা যেত। ময়ব্রিজ নামে একজন ইংরাজ পদার্থবিদ্ ক্রমিক আলোকচিত্র গ্রহণের কৌশল আবিষ্কার করলেন আর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হ'ল গুডউইন কর্তৃক সিলভার ব্রোমাইড মাখানো সেলুলয়েড ফিল্ম আবিষ্কার। গুডউইন এই ফিল্মের স্বত্ব তাঁর বন্ধু ফ্রিজ গ্রীনের নিকট বিক্রয় করেন, ফ্রিজ গ্রীন আবার ঐ ফিল্মের কিছু উন্নতিসাধন করে' বিখ্যাত জর্জ ইস্টম্যান কোডাকের নিকট বিক্রয় করেন। কোডাক অবশ্য ফিল্মের অনেক উন্নতি সাধন করেন এবং "ফিল্ম" নামটি তাঁরই দেওয়া।

১৮৯০ সালে এডিসন কিনেটোস্কোপ আবিষ্কার করেন, এই যন্ত্রের সাহায্যে কোডাক আবিষ্কৃত ফিল্ম ঘুরিয়ে দেখানো যেত। কিনেটোস্কোপের পর অধ্যাপক উডভিল ল্যাথামের প্যান্ট-অপ্টিকন আবিষ্কার। দুই

।শে ছিদ্রবিশিষ্ট ফিল্ম এই যন্ত্রেই প্রথম ।খানো হয়েছিল। এডিসনের যন্ত্র যখন ।ন্সে পেণছুল তখন লুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয় লুই অগস্ট এই যন্ত্রটিতে অত্যন্ত কৌতূহলী ।য়ে পড়েন। তাঁরা এডিসনের যন্ত্রের যথেষ্ট ।ন্নতিসাধন করেন এবং শেষ পর্যন্ত যে যন্ত্র ।াঁরা আবিষ্কার করেন তা আজকাল সিনেমা ।ন্ত্র অপেক্ষা বেশী তফাৎ নয়; সিনেমা যন্ত্র ।াবিষ্কারের শেষ গৌরব তাঁরাই অর্জন করেন। ।ধু তাই নয় তাঁরা সিনেমার ছবি গ্রহণ করবার একটি ক্যামেরাও আবিষ্কার করেন।

১৮৯৭ সালে নিউইয়র্কে প্রথম সিনেমা বাড়ির দ্বারোদ্ঘাটন হয় যার নাম ছিল "কীথস ইউনিয়ন স্কোয়ার থিয়েটার।" প্রথম সিনেমা চিত্র গৃহীত হয়েছিল এডিসনের ব্ল্যাক ম্যারিয়া নামক স্টুডিওতে। কর্বেট ও ফিট্‌জীমন্সের বক্সিংএর ছবি এবং "দি লাইফ অফ অ্যান অ্যামেরিকান ফায়ারম্যান" তার পরের ছবি। প্রথম গল্পবিশিষ্ট ছায়াছবির নাম "দি গ্রেট ট্রেণ রবারি"। এই ছবিখানি তুলেছিলেন এডিসনের একজন সহকারী এডুইন এস পোর্টার ১৯০৩ সালে, প্রধান ভূমিকায় জি এম অ্যান্ডারসন নামে জনৈক অভিনেতা অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

কলকাতায় একবার সিনেমা দেখানো হয়েছিল ময়দানে তাঁবুতে। গুরুজনদের কাছে শুনেছি একটি অগ্ন্যুৎপাতের ছবি দেখানো হ'ত, যেটি সম্পূর্ণ লাল রংএর ছিল। প্রথম যেদিন সেই ছবি দেখানো হয়েছিল, তাঁবুতে আগুন লেগেছে মনে করে' অনেকে পালিয়ে এসেছিল।

কাল রাত পার হ'য়ে আমরা

বিশ্বনাথ চৌধুরী

কালো রাত পার হয়ে আমরা
শিশু রোদ দূরে থেকে দেখেছি—
ঝিকমিক আকাশের চামড়া
ভালো লাগে—তাই ভালো বেসেছি।

অরণ্যে ঐ জাগে সূর্য
বুনো বাঘ ভয়ে মাথা নামালো,
তোমাদের যেতে হবে সেখানে
কাঁটা গাছে পথ যেথা ধারালো।

আকাশের সোনা নিতে সাধ আর
খুসি মনে ঘরে বসে ভাববে?
ভীরু হাতে তুলে ধরো তলোয়ার
প্রাণ দিয়ে তবে মান বাঁচবে।

প্রাণের প্রণামে রাঙা পতাকা
কালো রাত পার হয়ে বাতাসে
মুঠি মুঠি রোদ মেখে বলাকা—
তোমাদের ডাক দেয় আকাশে।

আকাশের ডাক শুনে বোঝ না?
তোমাদের ডাকে লাল সূর্য
বৃথা কাজ প'ড়ে থাক আজ না
কাঁটাপথে বাজে রণতূর্য।

প্রাণ দিয়ে মান পাই, এই বেশ
অনেক ভেবেছি সব ভাবা শেষ।

কালো রাত পার হয়ে আমরা
শিশু রোদ দূরে থেকে দেখেছি—
ঝিকমিক আকাশের চামড়া
ভালো লাগে তাই ভালো বেসেছি।

দেবী
য়।
চিত্র
জন্য
হারিবাগ
সখানেক

হিসেবী চোর

সম্প্রতি ডেনমার্ক থেকে একটি ভারী মজার চুরির সংবাদ জানা গেছে। ঐ খবরে জানা গেছে যে, এক চোর ডেনমার্কের গ্রিন্‌স্টেড্‌ বলে জায়গাটিতে কার্ল ক্রিস্টেনসেনের বাড়িতে ঢুকে ৭৫০০ ক্রোণার (সেখানকার চলতি মুদ্রা) চুরি করে। পরের দিন দেখা গেল, সেই চোর একটি চিঠির সঙ্গে ৭০০০ হাজার ক্রোণার ফেরৎ দিয়ে লিখে পাঠিয়েছে যে, তার অত বেশী অর্থের দরকার নেই—কাজেই যতটুকু দরকার ততটুকু রেখে বাকিটুকু ফেরৎ দেওয়া হলো।

কুকুর সতীন!

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র স্যান্‌ডিগো প্রদেশ থেকে ভারী মজার এক বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলার খবর পাওয়া গেছে। স্যান্‌ডিগোর মিসেস্‌ লিথা ...াগোনার তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগে ...া রুজু করেছেন যে, তাঁর স্বামী পোষা ...টিকে নিয়ে রোজ রাত্রে বিছানায় ঘুমোন এবং ...ই বিছানায় ঐ কুকুরটির পাশে তাঁকেও ...বরদস্তিতে শুতে বাধ্য করেন। মিসেস্‌ ...ার এতে আপত্তি করা সত্ত্বেও তাঁর স্বামী ...য় কান দেননা। বিচারপতি মামলার বিচার ...গয়ে প্রশ্ন করেন—"কুকুরটিকে বিছানায় নিয়ে ...াপনার এত আপত্তি কেন" মিসেস্‌ ...ার বলেন—"অন্য কিছু নয় কুকুরটির ...দেহে এঁটুলি পোকা ভর্তি।" সুখের বিষয় ...ষ পর্যন্ত মামলাটা আপোষে নিষ্পত্তি হয়ে গেছে।

পারিবারিক সংঘর্ষ

খবরের শিরোনামাটা দেখে যা মনে হচ্ছে—আসলে এ খবরটা কিন্তু তা নয়। খবরটা হচ্ছে ম্যাসাচুসেট্‌সের অন্তর্গত নিউবেরীপোর্টে একটা মোটর ট্রাকের সঙ্গে মন্থরগামী এক ট্রেনের সংঘর্ষ হয়। এই ঘটনায় ঐ ট্রাকের ড্রাইভার স্টান্‌লী মরিসন তার গাড়ি থামিয়ে—ভীষণ চটেমটে আস্তিন গুটিয়ে ইঞ্জিনের দিকে ছুটে যায়—ইচ্ছেটা ছিল তাঁর ইঞ্জিন ড্রাইভারকে বেশ ভাল করে শিক্ষা দিতে হবে। কিন্তু যখন ইঞ্জিনের কাছে ট্রাক ড্রাইভার মরিসন পৌঁছলেন তখন সব রাগ ঠান্ডা হয়ে গেল; কারণ, তিনি গিয়ে দেখেন যে, তাঁর বাবাই ঐ ট্রেণের ইঞ্জিনের ড্রাইভার! অতএব ঐ দুর্ঘটনাকে পারিবারিক সংঘর্ষ বলা যায় না কি?

মরণ-সওয়ারের নতুন অভিযান!

আপনারা নিশ্চয়ই জানেন গতির প্রতিযোগিতার জোরে মোটর ও মোটরবোট চালিয়ে স্যার ম্যাল্‌কম্‌ ক্যাম্পবেন সারা জগতের সবসেরা গতিবীর বলে খ্যাতি অর্জন করেছেন। ১৯৩৯ সালের ১৯শে আগস্ট লেক কনিস্টনের জলের ওপর দিয়ে তাঁর 'ব্লু-বার্ড' মোটরবোটকে ঘণ্টায় ১৪১·৭ মাইল বেগে চালিয়ে তিনি রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন। আবার ৬।৭ বছর পরে তিনি ঐ লেকের জলেই নতুন করে গতিবেগ শক্তি দেখাবার তোড়জোড় করছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। এবার তিনি তাঁর মোটরবোট 'ব্লু-বার্ড'কে নতুন রূপ দিচ্ছেন এবং সেটা জেট্‌-ইঞ্জিনে চলবে বলে শোনা যাচ্ছে। তাঁর এই নতুন যন্ত্রটি তৈরী করবার জন্য বৃটেনের বহু প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক একটি বছর পরিশ্রম করেছেন। এই নতুন 'ব্লু-বার্ড' বোটটি তৈরী হচ্ছে ডি হাভিলাণ্ড কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মেজর ফ্রাঙ্ক হাল্‌ফোর্ডের তত্ত্বাবধানে। শোনা যাচ্ছে, মে মাসেই স্যার ম্যাল্‌কমের এই বোটটির গতিবেগের নতুন পরীক্ষা হবে। ক্যাম্পবেন সাহেবকে মৃত্যুর পিঠে চেপে এই পরীক্ষা করতে হবে বলে শোনা যাচ্ছে; কারণ, মোটরবোটটিতে ৬০০ মাইল ঘণ্টায় দৌড়োবার শক্তিবিশিষ্ট বিমানপোতের ইঞ্জিনের মতই ইঞ্জিন বসানো হয়েছে।
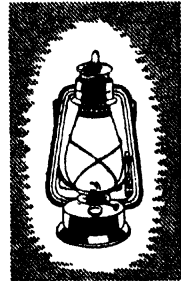
নিউ থিয়েটার্সের 'নার্স সিসি' চিত্রে ভারতী

তার পদানুসরণে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে; কিন্তু ভারতের সেই গৌরবকে মূর্ত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করে তোলার মত চলচ্চিত্রনির্মাণকারী কোথায়?

* * * * * * *

সম্প্রতি ভারতীয় শাসন-পরিষদের শ্রম-মন্ত্রী জগজীবন রাম এলাহাবাদে এক বক্তৃতায় শ্রমিকদের বেতনাদি সম্পর্কে সরকারি তরফ থেকে আশ্বাসের বাণী শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, শ্রমিকরা যাতে তাদের যোগ্য এবং ভালভাবে থাকার জন্য পারিশ্রমিক পায়, সেদিকে ভারত সরকারের দৃষ্টি থাকবে এবং সরকারি-ভাবে তার নির্দেশও দেওয়া হবে। এই নির্দেশ-গুলি শুধু যে ট্রেড ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে তা নয়, তার বাইরেরও প্রতিটি শ্রমিকের ক্ষেত্রেই কার্যকরী হবে এবং কোন প্রাইভেট শিল্প এ নির্দেশ অমান্য করার স্পর্ধা দেখালে সে শিল্পকে বন্ধ করে দিতে ভারত সরকার দ্বিধা করবে না। এই সূত্রে প্রথমেই আমরা শ্রম-মন্ত্রীর দৃষ্টি, চলচ্চিত্র শিল্পের প্রতি আকর্ষণ করছি। দু-পাঁচজন অভিনয়শিল্পী এবং বড় বড় কলাকুশলীর কথা বাদ দিলে চলচ্চিত্র শিল্পের অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ লোকই অত্যন্ত নগণ্য পারিশ্রমিক যেমন পায়, তেমনি তাদের চাকরীরও একেবারেই স্থিরতা নেই। এ-শিল্পটি কোন আইনের আওতায় না পড়ায় শিল্পপতিরা যদেচ্ছা আচরণ করে যায়, ফলে কলাকুশলী বা শিল্পী কারুরই জীবনে সিকিউরিটি বলে কিছু থাকে না। আমরা আশা করি, চলচ্চিত্র শিল্পের কর্মীদের অবস্থার উন্নয়ন সম্পর্কে শ্রমবিভাগ যত্নবান হবে।

বিবিধ

আমেরিকার মেট্রো গোল্ডুইন মায়ার ১৯৪৬ সালে উপার্জন করেছে ১৯ কোটি ডলার।

* * * * * * *

শান্তারাম আমেরিকায় যাবার ফলে এবং সেখানে ওর ভাল রকম প্রোপাগান্ডা হওয়ায় 'ডাঃ কোটনীশ, শকুন্তলা এবং পর্বত-পে-অপনা ডেরা' পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই মুক্তিলাভের ব্যবস্থা হতে পেরেছে।

* * * * * * *

কোটি টাকা মূলধনে গঠিত প্রিন্সেস পিকচার্স কর্পোরেশন দিল্লীতে তাদের স্টুডিও নির্মাণের উপযোগী এক বিরাট ভূখণ্ড যোগাড় করেছে এবং অনতিবিলম্বেই নির্মাণ কাজ আরম্ভ হবে।

* * * * * * *

নেতাজীর জীবনী অবলম্বনে বল্লভভাই প্যাটেলের প্রযোজনায় যে ছবিখানি গঠিত হচ্ছিল, গত সপ্তাহে বম্বেতে তার সেন্সর হয়ে গিয়েছে; শীঘ্রই ছবিখানি ভারতের সর্বত্র সাধারণ সমক্ষে মুক্তিলাভ করবে।

* * * * * * *

বম্বের বিখ্যাত মহাজন ফেমাস সিনে লেবরেটরী দখল করেছে বলে একটি খবর পাওয়া গিয়েছে।

* * * * * * *

মাদ্রাজে চলচ্চিত্র শিল্পের ওপর শতকরা ৩৩⅓ ভাগ প্রমোদ-কর বসাবার প্রস্তাব হয়েছে।

* * * * * * *

বটুকেশ্বর দালালের পরিচালনায় রজনী ফিল্ম কর্পোরেশনের 'চলার পথের' চিত্রগ্রহণ ন্যাশনাল সাউন্ড স্টুডিওতে অগ্রসর হচ্ছে; ছবিখানির আলোকচিত্র গ্রহণ করছেন রবীন মজুমদার; সুর-যোজনা করছেন সমরেশ চৌধুরী এবং প্রধান ভূমিকায় আছেন দেবী মুখোপাধ্যায়, বনানী চৌধুরী ও সমর রায়।

বোসার্ট পিকচার্সের 'প্রিয়তমা' চিত্রে নবাগতা অভিনেত্রী আরতি মজুমদার

* * * * * * *

সুবোধ ঘোষ রচিত নিউ থিয়েটার্স চিত্র 'অঞ্জনগড়ে'র কতকগুলি দৃশ্য তোলার জন্য পরিচালক বিমল রায় সদলে হাজারিবাগ গিয়েছেন। দৃশ্যগুলি তুলতে প্রায় মাসখানেক সময় লাগবে।

* * * *

সাংবাদিক পরিচালক খগেন রায় গত রামনবমীর দিনে ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে তার দ্বিতীয় ছবি 'উমার প্রেমে'র মহরৎকার্য সুসম্পন্ন ক'রেছেন।

* * *

অপর সাংবাদিক পরিচালক মনোজ ভঞ্জ তাঁর দ্বিতীয় ছবি রূপশ্রীর 'বুভুক্ষা'র চিত্র গ্রহণ কালি ফিল্মস ষ্টুডিওতে আরম্ভ ক'রেছেন।

* * *

সম্প্রতি প্যারিসের সিনেমাটোগ্রাফীক্ সোসাইটির সভ্যদের কাছে ইংরাজি ভাষায় প্রথম ভারতীয় ছবি 'কোর্ট ডান্সার' (রাজ-নর্তকী) দেখানো হয় এবং উচ্চ প্রশংসালাভে সমর্থ হয়।

হকি

বাঙলার হকি খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড খুবই নিম্নস্তরের হইয়াছে। আন্তঃপ্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতায় বাঙলা হকি দলের শোচনীয় পরাজয়ই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইহার পর এই মরসুমের সকল খেলা অনুষ্ঠিত হইলে অবস্থা পরিবর্তনের যেটুকু সম্ভাবনা ছিল হঠাৎ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা আরম্ভ হওয়ায় তাহাও একরূপ অন্তর্হিত হইতে বসিয়াছে। তবে এই অচল অবস্থা খুবই বেশী দিন থাকিবে বলিয়া আমরা আশা করি না। যে আগুন দেশের মধ্যে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তাহা প্রশমিত হইতে চলিয়াছে। পুলিশের কড়া আইন শিথিল শীঘ্রই হইবে। তখন হকি খেলা পূর্বের মতই অনুষ্ঠিত হইবে। হকি খেলা নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হউক ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

ফুটবল

বাঙলার প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল খেলা অনুষ্ঠানের পক্ষে যাঁহারা এতদিন আন্দোলন করিতেছিলেন তাঁহারা নীরবতা কেন অবলম্বন করিলেন বুঝিতে পারি না। বর্তমান অস্বাভাবিক অবস্থা চিরস্থায়ী হইতে পারে না। ইহার পরিবর্তন শীঘ্রই হইবে। বাঙলার ফুটবল পরিচালকগণকে খেলা অনুষ্ঠানের জন্য তাগিদ দিতেই হইবে। তাগিদ না দিলে ইহাদের কখনও সচল করা চলিবে না।

সম্প্রতি প্রকাশিত এক সংবাদে জানা গেল দক্ষিণ কলিকাতার কতিপয় বিশিষ্ট ক্রীড়ামোদী প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল খেলা অনুষ্ঠানের জন্য পুনরায় দক্ষিণ কলিকাতা স্পোর্টস ফেডারেশনকে সজীব করিয়া তুলিতেছেন। ইঁহারা যেভাবে অগ্রসর হইতেছেন তাহাতে আশা আছে দক্ষিণ কলিকাতার বিভিন্ন খেলার মাঠে ফুটবল খেলা বেশ জমিয়া উঠিবে। দক্ষিণ কলিকাতা স্পোর্টস ফেডারেশনের এই প্রচেষ্টা সত্যই প্রশংসনীয়। ইঁহারা বাঙলার ফুটবল খেলার ভবিষ্যৎ দুর্গতির কথা স্মরণ করিয়াই এইরূপ ভাবে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছেন। ইঁহারা প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত করিবেন অথচ বাঙলার পরিচালকগণ একেবারেই কিছু করিবেন না ইহা কি খুবই লজ্জার বিষয় নহে? যাহা দক্ষিণ কলিকাতা স্পোর্টস ফেডারেশনের ন্যায় একটা ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব হইল তাহা আই এফ এর মত শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব হইবে না ইহা আমাদের কল্পনাতীত।

ব্যাডমিণ্টন

বেঙ্গল ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশন পরিচালিত বেঙ্গল ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ানসিপ প্রতিযোগিতা দার্জিলিংয়ে বিশেষ সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বহুসংখ্যক খেলোয়াড় যোগদান করায় অধিকাংশ বিভাগে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বিভিন্ন খেলোয়াড়কে সাফল্যলাভ করিতে হইয়াছে। তবে অতি দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে কোন খেলোয়াড় একমাত্র হরিপদ গুহ ব্যতীত দর্শনযোগ্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারে

নাই। এই তরুণ খেলোয়াড়টি পুরুষদের সিংগলসে সেমি ফাইনালে পরাজয় বরণ করে। জুনিয়ার সিংগলসে চ্যাম্পিয়ান হয়। গত নিখিল ভারত ব্যাডমিণ্টন প্রতযোগিতায় এই জুনিয়ার বিভাগে রাণার্স আপ হইয়াছিল। সেই খেলায় যে গৌরব অর্জন করিয়াছিল এই প্রতিযোগিতায় তাহা ক্ষুন্ন করে নাই। অদূর ভবিষ্যতে এই তরুণ খেলোয়াড়টি বাঙলার চ্যাম্পিয়ান হইবে এই বিষয় আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা এই খেলোয়াড়টির উত্তোরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

গত দুই বৎসরের বাঙলার চ্যাম্পিয়ান সুনীল বসু পুনরায় সিংগলসে সাফল্যলাভ করিয়াছেন দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। ডাবলসেও গত বৎসরের অর্জিত গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। মিক্সড ডাবলসে পরাজিত হইয়াছেন একমাত্র সংগিনীর নৈরাশ্যজনক খেলার জন্য। তাহা না হইলে পুনরায় তিনটি বিভাগেই বিজয়ীর সম্মান লাভ করিতেন। তবে ইঁহাকে এক বিষয়ে সাবধান না করিয়া পারি না যে, ইনি স্বাস্থ্যোন্নতির দিকে অর্থাৎ শারীরিক শক্তি সঞ্চয়ের প্রতি দৃষ্টি না দিলে আগামী বৎসরেই অর্জিত গৌরব রক্ষা করিতে পারিবেন না। শ্রীযুত মনোজ গুহের নিকট হইতে আমরা অনেক কিছুই আশা করিয়াছিলাম। ইনি তাহা পূরণ করিতে পারিলেন না দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়াছি। চঞ্চলতাই ইহার সাফল্য লাভের বিশেষ অন্তরায় হইয়া পড়িয়াছে। দৃঢ়তাই সাফল্যে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়া থাকে, ইহা সকল সময় স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি।

মহিলা বিভাগে নবাগতা মিসেস বর্মা সিংগলস ও মিক্সড ডাবলসে সাফল্যলাভ করিয়াছেন। ডাবলসে সহযোগিনীই ইহাকে হতাশ করিয়াছে। ইহার আগমন বাঙলার মহিলা বিভাগের ব্যাডমিণ্টন খেলার কিছু উন্নতিলাভে সাহায্য করিবে বলিয়া আমাদের ধারণা। নিম্নে বিভিন্ন খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইলঃ—

খেলার ফলাফলঃ—

পুরুষদের সিংগলস ফাইনালঃ—সুনীল বসু ১৫—৫, ১৫—১১ গেমে মনোজ গুহকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস ফাইনালঃ—মনোজ গুহ ও মিসেস বর্মা ১৫—৬, ১৫—১ গেমে রণজিৎ বসু ও কুমারী পূরবী বসুকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস ফাইনালঃ—কুমারী পূরবী বসু ও কুমারী কণা বসু ১৫—১২, ৯—১৫ ও ১৭—১৪ গেমে মিসেস বর্মা ও মিসেস চ্যাটার্জিকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস ফাইনালঃ—সুনীল বসু ও পি ঘোষ ১৫—১১, ১৩—১৮, ১৫—১৩ গেমে মনোজ গুহ ও বিশু ব্যানার্জিকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিংগলস ফাইনালঃ—মিসেস শীলা বর্মা ১১—১, ১১—৩ গেমে কুমারী কণা বসুকে পরাজিত করেন।

বালকদের সিংগলস ফাইনালঃ—দিলীপ চ্যাটার্জি ১৫—২, ১৫—৪ গেমে [illegible] বসুকে পরাজিত করেন।

বালিকাদের সিংগলস ফাইনালঃ—কুমারী লীলা বসু ১১—২, ১১—১ গেমে কুমারী রাধারাণী সরকারকে পরাজিত করেন।

জুনিয়র সিংগলস ফাইনালঃ—হরিপদ গুহ ১৫—৩, ১৫—৩ গেমে সুকাকে পরাজিত করেন।

সন্তরণ

বাঙলার সাঁতারুদের কার্যকলাপ দেখিয়া আশঙ্কা হইতেছে, ইহরা এই বিভাগটি যাহাতে সত্য সত্যই সকল গৌরব হইতে বঞ্চিত হয় তাহার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছেন! তাহা না হইলে এইভাবে এসোসিয়েশন হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকা সত্ত্বেও ইহারা কোনরূপ উত্তেজনা অথবা আন্দোলন করিতেছেন না। অনেক বিশিষ্ট সাঁতার ক্লাবে গমন করিলে দেখা যায় তাস, পাশা, টেবিল টেনিস প্রভৃতি খেলা অনুষ্ঠিত হইতেছে। বাঙলার সাঁতারের উন্নতি কিরূপে হইবে অথবা বাঙলার সন্তরণ পরিচালকগণকে কিরূপে সচল করা যাইবে, এই সকল আলোচনা ইহাদের মনে এতটুকু জাগিতেছে না। উপরোক্ত খেলাগুলিতে যাঁহারা যোগদান করেন না তাদের দেখা যাইবে যুক্তিহীন অবান্তর "রাজা উজীর" মারিতেছেন। ইহা খুবই পরিতাপের বিষয়। আজ আমাদের বাধ্য হইয়াই বলিতে হইতেছে এই অবস্থা সৃষ্টির জন্য দায়ী বাঙলার পরিচালকগণ। ইহারা যে কতখানি সর্বনাশের পথ রচনা করিয়াছেন তাহার সীমা নির্দেশ করাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

মুষ্টিযুদ্ধ

বাঙলার মুষ্টিযুদ্ধ পরিচালনা লইয়া বেঙ্গল বক্সিং এসোসিয়েশন বনাম বেঙ্গল এমেচার বক্সিং ফেডারেশনের মধ্যে এতদিন যে দ্বন্দ্ব চলিয়াছে তাহা অবসানের জন্য চেষ্টা হইতেছে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। তবে যিনি এই মীমাংসার জন্য তোড়জোড় করিতেছেন তাঁহাকে আমরা বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিব যেন তিনি বাঙালীর সম্মান ক্ষুন্ন না করেন। এই কথা উল্লেখ করিবার আমাদের কোন প্রয়োজন হইত না, যদি না আমরা দেখিতাম যে তিনি অধিকাংশ অ-বাঙালীদের লইয়া এই কার্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন। এই সকল ব্যক্তিদের মধ্যে অধিকাংশই কোন মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিষ্ঠান বা সংঘের সহিত জড়িত নহেন। এমনকি এই বিষয় কোনরূপ জ্ঞান রাখেন কি না ইহাও আমাদের জানা নাই। যদি নূতন পরিচালকমণ্ডলী হয় আমরা যে সকল ক্লাব বা প্রতিষ্ঠান নিয়মিতভাবে মুষ্টিযুদ্ধ পরিচালনা করেন তাঁহাদের প্রতিনিধিত্ব দাবী করি। আশা করি উদ্যোক্তারা আমাদের এই অনুরোধ উপেক্ষা করিবেন না।

দেশী সংবাদ

১লা এপ্রিল—নয়াদিল্লীতে এশিয়া মহা-সম্মেলনের শেষ অধিবেশনের প্রথম বৈঠক হয়। অদ্যকার অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী ও ইন্দোনেশিয়ার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ সুলতান শারির যোগদান করেন। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষণে এশিয়ার ২২টি দেশের সমবেত প্রতিনিধিবৃন্দকে 'অখণ্ড বিশ্ব' গঠনের জন্য উদ্যোগী হইতে অনুরোধ করেন।

অতঃপর সম্মেলনের অধিবেশনে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন গ্রুপ কমিটির রিপোর্ট সংশোধিত আকারে গৃহীত হয়। উহাতে বলা হয় যে, এশিয়ার স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি পরাধীন দেশ-সমূহের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সম্ভাব্য সকল উপায়ে সাহায্য দান করিবে।

নয়াদিল্লীতে পুনরায় গান্ধী-বড়লাট সাক্ষাৎকার হয় এবং উভয়ের মধ্যে দুই ঘণ্টাকাল আলোচনা চলে।

আজ কলিকাতায় দাঙ্গা-হাঙ্গামার বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে ৬ জন নিহত এবং অনুমান ৪০ জন আহত হয় এবং হাওড়ায় হাঙ্গামার ফলে ৪ জন নিহত ও ২৫ জন আহত হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে মুনাফা কর বিল বিনা ডিভিসনে গৃহীত হইয়াছে। শ্রীযুত মনু সুবেদার কর্তৃক আনীত দুইটি প্রধান সংশোধন প্রস্তাব অর্থসচিব মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁ গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথম সংশোধন প্রস্তাবে মূলধনের শতকরা ছয় টাকা অব্যাহতি দিবার এবং দ্বিতীয় সংশোধন প্রস্তাবে শতকরা ২৫৲ টাকা কর ধার্য করার পরিবর্তে ১৬৲ টাকা সাড়ে দশ আনা কর নির্ধারণের সুপারিশ করা হয়।

২রা এপ্রিল—অদ্য কলিকাতায় দাঙ্গা-হাঙ্গামার বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে ৪ জন নিহত এবং ৩৮ জন আহত হয়।

শিক্ষকগণের দাবীসমূহ গভর্নমেণ্ট কর্তৃক স্বীকৃত না হওয়ায় প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের ১ লক্ষ ২০ হাজার শিক্ষক অদ্য হইতে ধর্মঘট করিয়াছেন।

নয়াদিল্লীতে এশিয়া মহাসম্মেলনের অধিবেশন সমাপ্ত হয়। অদ্যকার বৈঠকে 'নিখিল এশিয়া প্রতিষ্ঠান' নামক একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং ৮৫ জন সদস্য লইয়া একটি অস্থায়ী সাধারণ পরিষদ গঠিত হয়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন।

৩রা এপ্রিল—কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ঘোষণা করেন যে, ভারত সরকার আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দীদের বিষয় ফেডারেল কোর্টের বিচারপতিদের নিকট পেশ করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

আমেদাবাদে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল পাকিস্তানের তত্ত্বকে "একটি বিরাট পরিহাস" এবং এক "ছেলেখেলা" বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি বলেন, একমাত্র ন্যায়নীতির ভিত্তিতেই পাকিস্তান অর্জন সম্ভব, অস্ত্রশস্ত্র অথবা তরবারির সাহায্যে তাহা সম্ভব নহে।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও ডাঃ সুলতান শারির

নয়াদিল্লীতে মহাত্মা গান্ধী ও বড়লাটের মধ্যে পুনরায় সাক্ষাৎকার হয়—উভয়ের মধ্যে এই চতুর্থবার সাক্ষাৎ।

অদ্য রাষ্ট্রীয় পরিষদে শ্রীযুত সুশীলকুমার রায় চৌধুরী বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ ও বিবাহ নাকচের উদ্দেশ্যে এক বিল উত্থাপন করেন। বিলের উদ্দেশ্য বর্ণনায় বাঙ্গলার নোয়াখালী ও ত্রিপুরা জেলায় বলপূর্বক ব্যাপকভাবে ধর্মান্তরকরণ, নারীহরণ ও বিবাহের কথা উল্লেখ করিয়া এ সম্পর্কে আইনগত ব্যবস্থা ঘোষণা করিতে বলা হইয়াছে।

৪ঠা এপ্রিল—তারকেশ্বরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসম্মেলনের দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হয়। শ্রীযুত নির্মলচন্দ্র চ্যাটার্জি সভাপতিত্ব আসন গ্রহণ করেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্যকরী সমিতিতে এই মর্মে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, বাঙলার লীগ মন্ত্রিসভা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে রক্ষা করিতে এবং বাঙলা প্রদেশে শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখিতে অক্ষম হইয়াছে। কমিটির অভিমত এই যে, চূড়ান্ত ক্ষমতা হস্তান্তর সাপেক্ষ মধ্যবর্তী সময়ে অগৌণে আঞ্চলিক মন্ত্রিসভা গঠনই ইহার একমাত্র পরিবর্ত ব্যবস্থা। পাঞ্জাবের শাসন পরিচালনার জন্য যেরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছে, তদনুরূপ বাঙলায়ও দুইটি ভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের ইচ্ছানুযায়ী দুইটি অঞ্চলে শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা প্রয়োজন।

ধুবড়ীর সংবাদে প্রকাশ, গতকল্য মানকাচরে ১৪৪ ধারা অমান্য করিয়া এক শোভাযাত্রা পরিচালনার দায়ে আসাম মুসলিম লীগের সদস্য মোঃ আহম্মদ আলি চৌধুরী ও আসাম লীগের জেনারেল সেক্রেটারী মোঃ মহম্মদ আলিকে গ্রেপ্তার করা হয়।

তারকেশ্বরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসম্মেলন

৫ই এপ্রিল—কলিকাতায় আশুতোষ কলেজ হলে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের চতুর্বিংশ অধিবেশন আরম্ভ হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুত প্রমথনাথ ব্যানার্জি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিভাষণের পর শ্রীযুত তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার উদ্বোধন ভাষণ প্রদান করেন। অতঃপর প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের স্থায়ী সভাপতি শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত প্রবাসী বাঙালীদের সমস্যা সম্পর্কে বক্তৃতা করিলে পর মূল সভাপতি শ্রীযুত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার অভিভাষণ প্রদান করেন। মূল সভাপতির অভিভাষণের পর মহিলা শাখার অধিবেশন আরম্ভ হয়। লেডী রানু মুখার্জি উহার উদ্বোধন করেন এবং শ্রীযুক্তা হেমলতা ঠাকুর এই শাখার সভানেত্রীত্ব করেন। অতঃপর বৃহত্তর বঙ্গ শাখার অধিবেশনের সভাপতি রায় বাহাদুর হেমচন্দ্র বসু (মুঙ্গের) তাঁহার অভিভাষণ প্রদান করিলে প্রথম দিনের অধিবেশন শেষ হয়।

তারকেশ্বরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁহার ভাষণে এইরূপ মন্তব্য করেন যে, বাঙলা প্রদেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দুইটি প্রধান সম্প্রদায়কে শান্তি ও স্বাধীনতায় বাস করিতে দেওয়া ছাড়া সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের অন্য কোন উপায় নাই। সম্মেলনে বাঙলার হিন্দুদের জন্য একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কলিকাতা ও হাওড়া অঞ্চলে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হইয়াছে।

কলিকাতা বেলিয়াঘাটা অঞ্চলে অজ্ঞাত ব্যক্তির গুলীতে একটি ভবনের জনৈক রক্ষী নিহত হয়। হাওড়ায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা সম্পর্কে এক ব্যক্তি নিহত ও ৩১ জন আহত হয়।

কলিকাতায় মুচিপাড়া থানা এলাকার উত্তর প্রান্তে সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের বসতির সাধারণ সীমা রেখায় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি কর্তৃক নিক্ষিপ্ত কয়েকটি পটকা বিদারণের ফলে ২৮শে মার্চ হইতে ২রা এপ্রিলের মধ্যে নগরীর তিনটি সুবিখ্যাত ও সুবৃহৎ বোর্ডিংয়ের অনুমান ৫০ জন বোর্ডারকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত ব্যক্তিগণ সকলেই বাঙলার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

আসাম গভর্নমেন্টের উচ্ছেদ নীতির বিরুদ্ধে মুসলিম লীগের প্রস্তাবিত আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে শিলং-এ এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত গোপীনাথ বরদলৈ বলেন যে মুসলিম লীগের হুমকিতে আসাম গভর্নমেণ্ট দমিবেন না।

দার্জিলিং-এর সংবাদে প্রকাশ, গতকল্য ডুয়ার্সের মেটেলি থানার অন্তর্গত চালসার মঙ্গলবাড়ী হাটে একদল কৃষক প্রাপ্য ধান্যের অংশের জন্য সমবেত হইলে পুলিশ উহাদের উপর গুলী বর্ষণ করে। ফলে ৯ জন নিহত এবং বহুলোক আহত হয়।

নয়াদিল্লীতে মিঃ জিন্না ও বড়লাটের মধ্যে এক ঘণ্টা ৫০ মিনিটকাল আলোচনা হয়।

৬ই এপ্রিল—মহাত্মা গান্ধী অদ্য জাতীয় সপ্তাহের প্রথম দিনে ২৪ ঘণ্টাব্যাপী অনশন আরম্ভ করেন। হিন্দু-মুসলমান মিলন ও চরকার সাহায্যে স্বরাজ প্রতিষ্ঠাই তাঁহার এই অনশনের উদ্দেশ্য।

হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের জন্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত স্বায়ত্তশাসনশীল একটি স্বতন্ত্র বাঙলা প্রদেশ গঠিত হইবার পূর্বে বাঙলায় শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক ভিত্তিতে অগোণে দুইটি মন্ত্রিসভা গঠনের দাবী জানাইয়া অদ্য তারকেশ্বরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসম্মেলনের বিশেষ অধিবেশনের শেষ দিবসের বৈঠকে সর্বসম্মত একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টের স্বরাষ্ট্র সচিব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল কস্তুরবা জাতীয় স্মৃতি তহবিলের অর্থে রাস গ্রামে প্রথম প্রসূতি সদন ও হাসপাতালের ভিত্তি স্থাপন করেন।

কলিকাতায় আশুতোষ কলেজ হলে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের দ্বিতীয় দিবসে সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞান শাখার অধিবেশন সম্পন্ন হয়। ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য, শ্রীযুত অর্ধেন্দুকুমার গাঙ্গুলী শিল্প এবং ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী বিজ্ঞান শাখার সভাপতিত্ব করেন। উক্ত শাখাগুলির উদ্বোধন করেন, যথাক্রমে শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুত অতুলচন্দ্র বসু এবং ডাঃ হিমাংশুকুমার মিত্র।

বিদেশী সংবাদ

১লা এপ্রিল—জেনারেল ফ্রাঙ্কো এক ঘোষণায় বলেন যে, স্পেনে রাজতন্ত্র ঘোষণা করা হইবে। তিনি নিজে রাষ্ট্রনায়ক হইবেন এবং শাসনকার্যে সহায়তার জন্য একটি প্রতিনিধি পরিষদ গঠিত হইবে।

গ্রীসের রাজা দ্বিতীয় জর্জ পরলোক গমন করিয়াছেন। প্রায় সাড়ে ৫ বৎসর নির্বাসনে থাকার পর গত সেপ্টেম্বর মাসে তিনি সিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার ভ্রাতা প্রিন্স পল আজ গ্রীসের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

মাদাগাস্কারে যে গণ-আন্দোলন চলিতেছিল, তাহা বিদ্রোহের আকার ধারণ করিয়াছে। মাদাগাস্কারের সহস্রাধিক অধিবাসী বর্শা বল্লম প্রভৃতি লইয়া ফরাসী সৈন্য বাহিনীকে আক্রমণ করে। সংঘর্ষের ফলে ফরাসী সৈন্য বাহিনীর ২০ জন নিহত হয়।

২রা এপ্রিল—মস্কোতে প্রধান রাষ্ট্র চতুষ্টয়ের পররাষ্ট্র সচিবগণ জার্মানীর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কীয় সমগ্র প্রশ্নটি একটি বিশেষ কো-অর্ডিনেশন কমিটির হস্তে ন্যস্ত করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান ওয়াশিংটনে এক বক্তৃতায় বলেন যে, আমেরিকাবাসীদিগকে সর্বপ্রকার সশস্ত্র বা গোপন আক্রমণের বিরুদ্ধে সুনিশ্চিতরূপে দণ্ডায়মান হইতে হইবে।
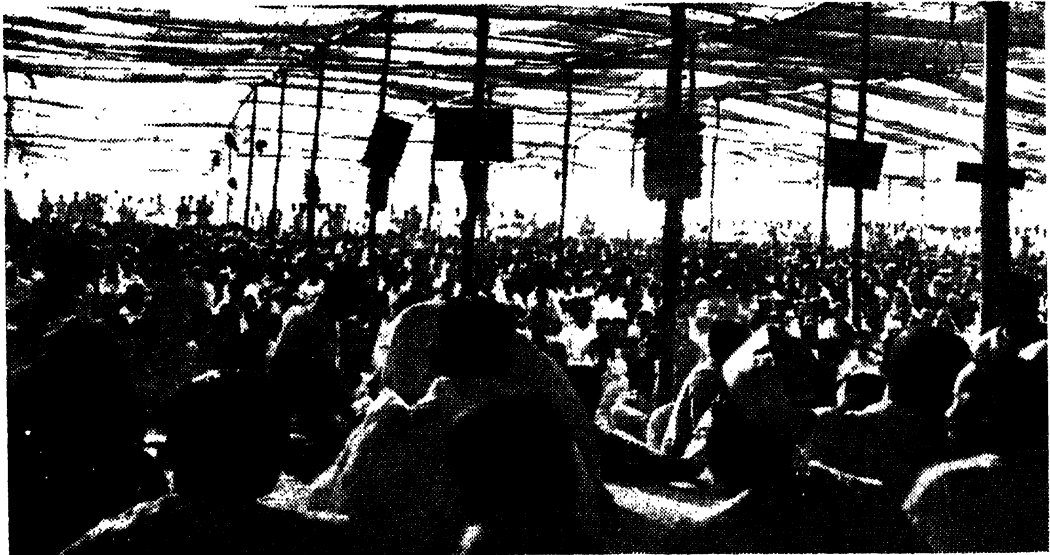
তারকেশ্বরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহা সম্মেলনের দৃশ্য

পুস্তক পরিচয়

রবীন্দ্রনাথের কথা—শ্রীহরিচরণ বন্দ্যো-
্যায়, বঙ্গীয় শব্দকোষ সংকলয়িতা,
বভারতী শিক্ষাভবনের ভূতপূর্ব সংস্কৃতা-
্যক, ইত্যাদি। সান্যাল এন্ড কোম্পানী,
১এ, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য
টাকা।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তিন শ্রেণীর পুস্তক
খিত হইয়াছে, সাহিত্য সমালোচনা, জীবনী
ং লেখকের ব্যক্তিগত ছাপ। প্রথম শ্রেণীতে
্ছে অজিতকুমার চক্রবর্তীর একাধিক গ্রন্থ,
হার রায়, শচীন সেন প্রভৃতির পুস্তক,
তীয় শ্রেণীর প্রধান গ্রন্থ প্রভাত মুখো-
ধ্যায়ের রবীন্দ্র-জীবনী, তৃতীয় শ্রেণীতে
লাপচারী রবীন্দ্রনাথ, মংপুতে রবীন্দ্রনাথ,
র্বাণ প্রভৃতি মহিলা লেখকগণের গ্রন্থ ও
জে মানুষ রবীন্দ্রনাথ, সেকালের রবীন্দ্রতীর্থ
ভৃতি শিলাইদহের স্মৃতিসূচক গ্রন্থ আছে।
র্তমান গ্রন্থ তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। লেখক
দীর্ঘকাল রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতীর
স্পর্শে অতিবাহিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ
র্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়া একক চেষ্টায় তিনি
াঙলা ভাষায় বৃহত্তম কোষগ্রন্থ সঙ্কলন
করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ব্যক্তিগত
াপ ও ধারণা প্রকাশের তাঁহার যেমন সুযোগ
াছে—এমন অল্প লোকেরই। এই গ্রন্থে
সই সুযোগের তিনি সদ্ব্যবহার করিয়াছেন।
বীন্দ্র জীবনে বিশেষজ্ঞ পাঠকও ইহা হইতে
ূতন কিছু শিখিবার পাইবেন। পুস্তক-
খানির বহুল প্রচার অবশ্য কাম্য।

সাহিত্য-সংবাদ

রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্মেলন

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও আগামী মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে উত্তর কলিকাতায় বিশিষ্ট সাহিত্যিকবৃন্দের সমাবেশে রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত অনুষ্ঠানে পাঠ করিবার জন্য শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী এবং সাহিত্যানুরাগিগণের নিকট হইতে (১) "রবীন্দ্র কাব্যে দর্শন" এবং ছাত্র-ছাত্রী ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে (২) "শিশুদের কবি রবীন্দ্রনাথ" শীর্ষক প্রবন্ধ দুইটি আহ্বান করা যাইতেছে। আবৃত্তি করিবার জন্য নিম্নলিখিত কবিতাগুলি মনোনীত করা হইয়াছে। প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষদের জন্য (১) এবার ফিরাও মোরে। (২) নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ। প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলাদের জন্য (১) দুঃসময় (২) উদ্বোধন। কিশোর-কিশোরীদের জন্য (১) প্রশ্ন। (২) ভারত তীর্থ। (৩) নববর্ষা। শিশুদের জন্য (১) বীর পুরুষ (২) ছুটির দিনে। এছাড়া রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও নৃত্য এই অনুষ্ঠানের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। প্রতিযোগিগণ বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন অথবা সাক্ষাৎ করুন।

প্রত্যেক প্রথম স্থানাধিকারী প্রতিযোগীকে সম্মেলন একটি করিয়া প্রশংসাপত্র ও একটি করিয়া রৌপ্য-পদক পুরস্কার দিবেন। প্রবন্ধ অথবা নাম পাঠাইতে হইলে সম্পাদক "রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্মেলন" অর্চনা কার্যালয়, অর্চনা ভবন, ৮বি, রমানাথ সাধু লেন; পোষ্ট অর্চনা কলিকাতা, এই ঠিকানা ব্যবহার করিবেন।

কর্তৃপক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে সম্মেলনের প্রধান কার্যালয়, ৮-৪এ, কাশী ঘোষ লেন; বিডন ষ্ট্রীটে বৈকাল পাঁচটা হইতে সাতটার মধ্যে সাক্ষাৎ করুন।

রচনা-প্রতিযোগিতা

প্রতি বিষয়েই দুটি করিয়া পুরস্কার। কোন প্রবেশ মূল্য নাই। লেখার নকল রাখিতে হইবে ফেরৎ দেওয়া সম্ভবপর নয়। পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা সঙ্ঘের হস্তলিখিত পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে পারিবে। ১। ছোট গল্প : বর্তমান বাঙলার নারী প্রগতি অবলম্বনে। ফুলস্ক্যাপ কাগজের পাঁচ পৃষ্ঠার মধ্যে লিখিতে হইবে। ২। প্রবন্ধ : স্বাধীন ভারতে সমাজের রূপ বা সমাজ ও নারী। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্বাধীনতা আন্দোলনে ছাত্রছাত্রীর কর্তব্য বা নেতাজীর বৈপ্লবিক জীবনী। স্কুলের সার্টিফিকেট চাই। ৩। সমালোচনা : শেষের কবিতা (রবীন্দ্রনাথ) আবৃত্তি বা অন্যান্য বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন। প্রবন্ধাদি পাঠাইবার শেষ তারিখ ২৭শে এপ্রিল '৪৭। সম্পাদক—'তরুণ-সঙ্ঘ', হাটখোলা, চন্দননগর।

যুদ্ধ থেমে যাওয়াটা ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পপতিদের কাছে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে বলতে হবে। যুদ্ধ চলার সময় তারা দুহাতে পয়সা উপায় করেছে এবং এত বেশী যে দুহাতে খরচ ক'রেও প্রচুর জমাবার সুযোগ পেয়েছে এবং 'এইকরবো', 'ঐ করবো' বলে লম্বা লম্বা কথা তারা উড়িয়েছে জেনেশুনেই যে কথার জায়গায় কাজের ইঙ্গিত কেউ দিলেই অনায়াসে যুদ্ধের দোহাই দিয়ে সেকথা উড়িয়ে দেওয়া যাবে। তাই তারা অনর্গল বড় বড় প্রতিজ্ঞা ক'রে গিয়েছে—আদর্শ স্টুডিও তৈরী করবো, স্টুডিওর কর্মী ও শিল্পীদের খাওয়া-পরার অভাব ঘুচিয়ে দেবো, কাঁচা মালের এমন বড় বড় কারখানা খুলে দেবো যে, বিদেশের ওপর মোটেই নির্ভর করতে হবে না, যন্ত্রপাতি তৈরীরও ব্যবস্থা হবে, উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করে কলাকুশলী ও শিল্পী গড়ে তোলার চেষ্টা হবে, গ্রামে গ্রামে প্রদর্শন-গৃহ হবে, তাছাড়া ছবিকে সম্পূর্ণরূপে দেশের কাজে নিয়োজিত করা তো হবেই—যুদ্ধটা একবার থামলে হয়! সেসব কথা শুনে শুনে দেশের লোকে ভারতীয় চিত্রশিল্পের ভবিষ্যতের কথা ভেবে উল্লসিত হয়ে উঠলো, দেশের অবস্থা যে সত্যাই ফিরে যাবে যুদ্ধ থামার সঙ্গেই, তাতে আর কারুর সন্দেহই রইলো না। অবশেষে যুদ্ধ সত্যিই থেমে গেল। লোকে উদগ্রীব হয়ে রইলো: কোনদিকের উন্নতি বা যুগান্তকারী নতুন কোন কিছু তাদের অজ্ঞাতে যেন না হয়ে যায়। কিন্তু দেখতে দেখতে তার পরও আরো বহু মাস কেটে গেল, দিন গুণতে গুণতে লোকে শেষে হতাশ হয়ে পড়লো, অবস্থা যথা-পূর্বই রয়ে গেল। তখন যারা লম্বা লম্বা কথা বলতো, এখন তারা দাঙ্গা ইত্যাদির ওপর সময় ঠেকিয়ে রাখার একটা অজুহাত পেয়ে গেলো—যদিও তাদের প্রায় সবায়েরই মুখোস খুলে আসল রূপ বেরিয়ে গেছে। দেশের এই নব-যুগের সূচনায় এই মিথ্যুকদের ঠাঁই নেই, এদের আর প্রশ্রয় দেওয়াও যায় না। নতুন যুগের নতুন চিন্তাধারা এবং নবপরিবেশের মধ্য দিয়ে যারা যেতে চায়, তাদেরই শুধু আসন থাকবে, বাকিরা জাহান্নমে যাক। এককালে কেউ কিছু করে থাকলেও তার সে সার্টি-ফিকেটও অচল বলে ধরতে হবে। সত্যিই যে আমরা নতুন জীবন লাভ করলাম, তারই আভাস ফুটিয়ে তুলতে যখন বর্তমান চিত্রশিল্পপতিরা অক্ষমতার পরিচয় দিচ্ছে, তখন নতুন জীবনকে জগতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার পথে চলচ্চিত্র যে কি পরিমাণ সহায়ক হবে, তা অনুমান করা শক্ত নয়। এখনকার শিল্পপতিরা পুরনো চালেই চলতে চাইছে এবং যুগ-পরিবর্তনের হাওয়া থেকে নিজেদের যথাসম্ভব বাঁচিয়ে রাখারই অদম্য চেষ্টা দেখা দিয়েছে এদের মধ্যে। ভারত আজ সমগ্র এশিয়ার গুরু পদে অধিষ্ঠিত—কৃষ্টিতে ঐতিহ্যে, সাহিত্যে, কলায়, সংগীতে এশিয়ার সমস্ত দেশ

নির্ভীক জাতীয় সাপ্তাহিক

"দেশ"

প্রতি সংখ্যা চারি আনা
বার্ষিক মূল্য—১৩৲ ষাণ্মাসিক—৬॥০
সাময়িক বিজ্ঞাপন
৪৲ টাকা প্রতি ইঞ্চি প্রতি বার
বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ বিজ্ঞাপন বিভাগ হইতে জানা যাইবে।
ঠিকানাঃ—আনন্দবাজার পত্রিকা
১নং বর্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক:—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা।

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

চতুর্দশ বর্ষ] শনিবার, ৫ই বৈশাখ, ১৩৫৪ সাল। Saturday, 19th April, 1947. [২৪শ সংখ্যা

বাঙ্গালীর নববর্ষ—

১৩৫৩ সাল অতিক্রান্ত হইয়া ৫৪ সালের গণনা আরম্ভ হইল; বস্তুতঃ অনন্ত ও অবিচ্ছিন্ন ধারা ধরিয়া কালস্রোত বহিয়া চলিয়াছে। শুধু আমাদের জীবনে অনুভূত বেদনার চেতনাতেই কালের সীমামূলক ধারণা জাগিয়া উঠে এবং মানুষে অতীতকে অতিক্রম করিয়া ভবিষ্যতের সুখস্বপ্ন রচনা করে। পুরাতনের জীর্ণত্বক ত্যাগ করিয়া সে নূতনকে বরণ করিয়া লইতে চায়। বর্তমানে বাঙলার বেদনার অন্ত নাই; দশ বৎসরের লীগ শাসন বাঙলার বুকে দুরন্ত বিভীষিকা বিস্তার করিয়াছে। অবশ্য পরাধীন জীবনে দুঃখ-দুর্দশা দৈনন্দিন ব্যাপার এবং সে হিসাবে বাঙ্গালীর দুঃখ-দুর্দশা পূর্বেও ছিল; কিন্তু লীগ শাসনে যে অবস্থা সৃষ্ট হইয়াছে, এমন অবস্থা কোন দিন বাঙলায় দেখা যায় নাই। এতদিন দুঃখে কষ্টেও বাঙালীর ঘরে শান্তি ছিল এবং তাহাদের দৈনন্দিন জীবন এমন বিভীষিকাময় ছিল না। লীগ শাসন বাঙলার সংসারে আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে। সেদিন জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস উপলক্ষ্যে দিল্লীর এক জনসভায় পণ্ডিত জওহরলাল বাঙলার এই দুর্দশার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সত্যই ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঘোষণার দিন হইতে বাঙালীর জীবনে বিভীষিকাময় এক অন্ধতম যুগ আরম্ভ হইয়াছে। কারণ কি বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না। জওহরলাল সে কারণ স্পষ্টভাবেই নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, দল বিশেষে সাম্প্রদায়িক অশান্তি সৃষ্টি করিয়া রাজনীতিক চাপ দিয়া নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে চায় এবং তাহারা বর্তমানে ব্রিটিশের ভারত ত্যাগে বিরোধী বলিয়াই এই-রূপ অনর্থ সৃষ্টি করিতেছে। বলা বাহুল্য, ১৬ই আগস্ট হইতে লীগ দলের দ্বারা বাঙলায় যে অগ্নিদাহ পর্ব শুরু হইয়াছে আজও তাহার নিবৃত্তি ঘটে নাই। বাঙলার দিকচক্রবালে সে আগুন জ্বলিতেছে এবং এই আগুনের দীপ্ত জ্বালা হইতে মশাল ধরাইয়া লইয়া লীগ বাহিনী আসামকে দগ্ধ করিবার প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হইয়াছে। লীগের ধর্মান্ধ চমূ জেহাদী জিগীর ছাড়িয়া বাঙলার পূর্ব প্রান্ত হইতে বীরদর্পে আসামের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে উদ্যত। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার আগুনে আসামকে পোড়াইয়া সেখানে পাকিস্থান বিস্তার করিতে হইলে বাঙলা দেশেও সে আগুন প্রজ্বলিত থাকা প্রয়োজন। লীগের এই রণনীতিক চাতুর্য ঘটনা-পরম্পরায় ক্রমেই উম্মুক্ত হইয়া পড়িতেছে। এমন অবস্থায় অদূর ভবিষ্যতে সুদিনের কোন সম্ভাবনাই আমরা দেখিতে পাইতেছি না। স্পষ্টই দেখিতেছি, সম্মুখে আরও সংকটের দিন রহিয়াছে। কিন্তু সংকটে আমরা ভীত হইব না। বাঙলার আত্মদাতা সন্তানগণের কঠোর সাধনা এই বিপদে আমাদিগকে উদ্দীপ্ত করিবে। তাঁহাদের রক্তদান আমরা ব্যর্থ হইতে দিব না। ভারতের সভ্যতা এবং ভারতের সংস্কৃতিকে তাঁহারা মহীয়ান্ করিয়াছেন। ভারতবর্ষকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী দেশে পরিণত করিবার প্রেরণা অন্তরে লইয়া তাঁহারা স্বাধীনতার হোমানল বাঙলায় উদ্বোধন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সে ব্রত আমরা উদ্‌যাপন করিব এবং নিজেদের বীর্যবলে সাম্প্রদায়িক এই ধর্মান্ধ বর্বরতার দৌরাত্ম্যকে প্রতিহত করিব। সেদিন পণ্ডিত জওহরলালও এমন আত্ম-প্রত্যয়ের অগ্নিময়ী বাণীতে জাতিকে উদ্দীপ্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "আমাদিগকে একসঙ্গে এক জাতি হিসাবে অগ্রসর হইতে হইবে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গত ২৮ বৎসরব্যাপী সংগ্রামে আমরা বহু আন্দোলন করিয়াছি এবং বহু স্বার্থ-ত্যাগ করিয়াছি।" বস্তুতঃ স্বাধীনতা-সংগ্রামে প্রাণপূর্ণ জাতীয়তার বলিষ্ঠ বিকাশ বাঙলা দেশে ইহার অনেক পূর্ব হইতেই হইয়াছে। সেই আলোকে আজও আমাদের ভবিষ্যতের পথ দেখিতে হইবে। এক্ষেত্রে পরানুগ্রহ-প্রত্যাশা বিড়ম্বনা মাত্র। বাঙলার প্রাণবান্ সন্তানগণের সাধনার আত্মমর্যাদাময় উদ্দীপনাই নববর্ষে আমাদের একমাত্র পাথেয়।

নববর্ষে বাঙলার প্রতি গান্ধীজী

নববর্ষের উদ্বোধনে বাঙালীর দিক্‌ চক্রবালে আশার ক্ষীণ আলোকও দেখা যাইতেছে না; পক্ষান্তরে অতীতে বেদনার চেতনাই তাহার ভবিষ্যৎকে ভয়াবহ করিয়া তুলিতেছে। বাঙালীর নববর্ষের স্মৃতি-সূত্রে গান্ধীজীর বুকেও বাঙলার এই বেদনা বাজিয়াছে। তিনি দিল্লী হইতে পাটনায় ফিরিয়া চৈত্র-সংক্রান্তির দিনে প্রার্থনা সভায় বলেন—'বাঙলা বর্ষপঞ্জী অনুসারে আগামীকল্য হইতে নূতন বর্ষের সূচনা হইবে। ঈশ্বর বাঙলাকে শান্তি দান করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা।' নোয়াখালির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া গান্ধীজী বলেন, "নোয়াখালির জনসাধারণের নিকট আমি অঙ্গীকার করিয়াছি যে, আমি নোয়াখালিতে হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর ব্রত পালন

করিব, অথবা শরীর পাত করিব। যদি বিহারের অধিবাসীরা আমাকে সাহায্য করেন এবং যদি বিহারের মুসলমানেরা উপলব্ধি করেন যে, হিন্দুরা তাহাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হইয়াছে, তাহা হইলে মুসলমানেরা আশ্বস্ত হইয়া এখানে পূর্বের ন্যায় বন্ধুভাবে বসবাস করিতে পারিবেন; তখন আমি নোয়াখালি যাইতে পারিব।" আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, বিহারের অবস্থা ঠিক নোয়াখালির মত নয়। সেখানে সাময়িক উত্তেজনা বশে একটা অনর্থ দেখা দেয়; কিন্তু নোয়াখালিতে লীগের সুনিশ্চিত পরিকল্পনা লইয়া অভিসন্ধিপূর্ণভাবে সাম্প্রদায়িকতাকে জাগাইয়া তোলা হইয়াছে। বিহারে গান্ধীজীর ইচ্ছা অচিরেই পূর্ণ হইবে, এই বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই; কিন্তু লীগের মূল নীতি পরিবর্তিত না হইলে লীগের প্রভাবে পরিচালিত নোয়াখালির সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটিবার কোন সম্ভাবনাই আমরা দেখি না। গান্ধীজী এক্ষেত্রে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে কর্তব্যের জন্য মৃত্যু বরণ করিতে প্রস্তুত থাকিবার পরামর্শ প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "ঈশ্বরের নামে দেশ সেবা এবং যদি প্রয়োজন হয়, তবে কর্তব্যরত অবস্থাতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করাই সেক্ষেত্রে কর্তব্য হইবে।" নববর্ষের প্রারম্ভে গান্ধীজীর এই বাণী আমরা যেন শিরোধার্য করিয়া লইতে পারি।

স্মরণে—

কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। ১৩৫০ সালের ৩০শে চৈত্র আনন্দবাজার পত্রিকা, হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড এবং 'দেশে'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয়কে আমরা হারাইয়াছি। প্রত্যেকটি বিলীয়মান বৎসরের অন্তিমক্ষণে আমাদের পরম হিতৈষী সুহৃৎ এবং পথপ্রদর্শক প্রফুল্লকুমারের বিয়োগজনিত বেদনা আমাদের অন্তরের অন্তস্তলে গভীরভাবে জাগিয়া উঠে। প্রফুল্লকুমার 'দেশে'র প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। 'দেশে'র সাধনাকে সর্বাংশে সার্থক করিতে প্রফুল্লকুমারের প্রাণপূর্ণ জীবনের অতন্দ্রিত আগ্রহ আমাদের অন্তরে সর্বদা উদ্দীপনা সঞ্চার করিত। বৈষ্ণব-সাধনার উদার অনুভূতির উপর প্রফুল্লকুমারের বলিষ্ঠ জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল; এবং তাহা প্রাণপূর্ণ প্রেরণায় সমাজ-সাধনার অভিমুখে সম্প্রসারিত হইত। প্রকৃতপক্ষে প্রফুল্লকুমারের বৈষ্ণবতায় মনোময় ভাবোদ্দীপ্তির পথে আত্মনিমজ্জনের চেয়ে আমাদের সামাজিক দুর্গতির বাস্তব প্রতীকার সাধনে বৈপ্লবিক বেদনারই সমধিক পরিচয় পাওয়া যাইত। আপনাকে অন্তরালে রাখিয়া নিরলস কর্মনিষ্ঠায় তিনি তাঁহার সমগ্র জীবনে সাহিত্য এবং সংবাদপত্র-সেবার ভিতর দিয়া মানব-সেবার সেই মহান্ আদর্শকে রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এমন সাধনা ব্যর্থ হইতে পারে না; বস্তুতঃ প্রফুল্লকুমারের সাধনা ব্যর্থ হয় নাই। 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' এবং 'দেশে'র সার্বজনীন প্রতিষ্ঠায় তাহা সার্থকতা লাভ করিয়াছে। পরাধীনতার প্রতিকূল প্রতিবেশের মধ্যে প্রতিপদে বাধা বিঘ্নের ভিতর দিয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে; প্রফুল্লকুমারের জীবনাদর্শের স্নেহপূর্ণ অবলম্বন লাভ না করিলে আমাদের পক্ষে ইহা সম্ভব হইত না। তিনি যে একান্ত প্রীতির বন্ধনে আমাদিগকে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহা কখনও বিস্মৃত হইতে পারি না। প্রফুল্লকুমার আমাদের স্মৃতিতে নিত্য জাগরূক রহিয়াছেন এবং এই স্মৃতির সূত্রেই আমরা তাঁহার প্রাণময় স্পর্শ লাভ করিতেছি এবং এই স্পর্শ কালজয়ী মহিমায় সমধিক একান্ত হইয়াই উঠিতেছে। ত্যাগময় এবং প্রেমময় জীবনের প্রভাব এমনই। প্রফুল্লকুমার আজ অমৃতময় জীবনে অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি সে অমৃতলোক হইতে তাঁহারই আরব্ধ ব্রত উদ্‌যাপনে আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করুন।

মিঃ সুরাবর্দীর দুঃসাহস

গত ১২ই এপ্রিল বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী নোয়াখালি এবং ত্রিপুরার শাসন বিভাগীয় কর্মচারীদিগকে লইয়া এক বৈঠক করেন। এই বৈঠকের পর তিনি বলিয়াছেন যে, নোয়াখালিতে আশঙ্কার কোন কারণ ঘটে নাই। তাঁহার মতে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত সতীশ দাশ গুপ্ত এবং শ্রীযুত হারাণ ঘোষ চৌধুরী মহাশয় গান্ধীজীর নিকট নোয়াখালির অবস্থা সম্বন্ধে যে উদ্বেগজনক সংবাদ প্রেরণ করেন, তাহা ভিত্তিহীন; শুধু তাহাই নহে, তাঁহাদের প্রদত্ত বিবরণের উপর ভিত্তি করিয়া গান্ধীজী যে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও অসমীচীন হইয়াছে। মিঃ সুরাবর্দী শুধু এইটুকু মন্তব্য করিয়াই সন্তুষ্ট হন নাই, তিনি আক্রোশভরে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব গান্ধীজীর আচরণ সম্বন্ধে নিতান্ত অসঙ্গত এবং ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্রোক্তি করিতেও ইতস্তত বোধ করেন নাই। কিন্তু ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। কারণ সত্যের সম্মুখীন হইবার মত সাহস মিঃ সুরাবর্দীর মত লোকের থাকা সম্ভব নয়। সে আলোকে তাঁহার স্বরূপগত সঙ্কীর্ণতা ও কপটাচারই উন্মুক্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং তাঁহার ভীরু চিত্ত অসহিষ্ণু উত্তেজনায় হিংস্রতার মুখোস খুলিয়া ফেলিয়াছে। সম্প্রদায় বিশেষের উপর অত্যাচার উৎপীড়নকে মিঃ সুরাবর্দী বরাবরই উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন, এবং সে ক্ষেত্রে অত্যাচার ও উৎপীড়নকারীদের অপরাধ তাঁহার দৃষ্টিতে যে গুণস্বরূপে প্রতিপন্ন হয়, ইহা আমাদের জানাই আছে। কিন্তু মানুষকে যাঁহারা মানুষ হিসাবে দেখেন এবং সাম্প্রদায়িকতার বিষে যাঁহাদের দৃষ্টি অন্ধ হয় নাই, তাঁহাদের বিচার মিঃ সুরাবর্দীর ন্যায় সংস্কারান্ধ হইবে, ইহা সম্ভব নয়। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশ গুপ্তের জীবন মানবতার বেদনায় উজ্জ্বল, মিঃ সুরাবর্দী তাঁহার দৃষ্টি কোথায় পাইবেন? গান্ধীজীর প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে তুলিতেই চাহি না। কিন্তু সুরে বাঙলার সর্বাধিকার হাতে পাইলেও সুরাবর্দী সাহেব যেন এ কথা স্মরণ রাখেন যে, মানবতার অনুভূতিকে তিনি বাঙলা দেশ হইতে উৎখাত করিতে পারেন না এবং তাঁহার ক্রোধান্ধ সাম্প্রদায়িক উত্তেজনায় বিচলিত না হইয়াও সত্যের মর্যাদা রাখিবার মত মানুষ বাঙলা দেশে এখনও আছে। এই সঙ্গে একথাও যেন তিনি বিস্মৃত না হন যে, লীগওয়ালাদের জেহাদী জিগীর সত্ত্বেও বাঙলার সংস্কৃতির মূলীভূত মানবতার মর্যাদা বোধ নষ্ট হয় নাই এবং এখনও বাঙলা দেশ মানুষ চিনে। সুতরাং মিঃ সুরাবর্দী এবং লীগের সাম্প্রদায়িক নীতিগত স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় অভিসন্ধিমূলকভাবে নিযুক্ত বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত কর্মচারীদের অভিমত যাহাই হউক, প্রকৃত সত্যকে সুদীর্ঘকাল প্রচ্ছন্ন রাখা চলিবে না। মিঃ সুরাবর্দীর বোঝা উচিত ছিল যে, সেখানকার আমলাতান্ত্রিক সাম্প্রদায়িকতার চক্রব্যূহ ভেদ করিয়া একদিন সত্য প্রকাশ হইবেই। বাঙলা দেশ স্বদেশপ্রাণ কর্মীদের কথা অগ্রাহ্য করিয়া মিঃ সুরাবর্দী কিংবা তাঁহার অনুগত অযোগ্য কর্মচারীদের উক্তি বেদবাক্য বলিয়া মানিয়া লইবে, তাঁহার পক্ষে এমন আশা করা শোভা পায় না! মিঃ সুরাবর্দী তম্বি করিয়াছেন অনেক রকম; অথচ ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় নোয়াখালির উপদ্রব সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে যে সব অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন, সেগুলির একটিরও প্রতিবাদ করিতে তাঁহার সাহসে কুলায় নাই। খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত আসামী নোয়াখালীতে এখনও সর্দারী করিয়া ফিরিতেছে এ তথ্যও বহুদিন হইতেই প্রকাশ পাইয়াছে। মিঃ সুরাবর্দী বলিয়াছেন, নোয়াখালি রাজনীতিক ফুটবলে পরিণত হয়, অর্থাৎ রাজনীতিক স্বার্থের চাপে নোয়াখালি বিপন্ন হয়, ইহা তিনি দেখিতে চাহেন না; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি নিজে কার্যত তাহাই করিতেছেন। লীগ রাজনীতির বাজীখেলায় নিজের প্রতিষ্ঠা পাছে নষ্ট হয় এবং মন্ত্রিগিরি হাতছাড়া হইয়া যায়, এই ভয়ে বিবেককে বিসর্জন দিয়া তাঁহাকে চলিতে

তেছে এবং তাঁহার অনুগত কর্মচারী দলও প্রভাবে চক্রের মত আবর্তিত হইতেছেন। রাজনীতির এই বিষময় প্রতিবেশ াইয়া উঠিতে না পারিলে বাঙলা দেশের তার নাই। মিঃ সুরাবদীর সাম্প্রদায়িকতান্ধ হইতে বাঙলার সংস্কৃতিগত মানবতাই লোকে বাঁচাইতে পারে। বস্তুতঃ মানবতার সেই দর্শ লইয়া যে সব কর্মী নোয়াখালিতে ছেন, জাতি তাঁহাদিগকেই শ্রদ্ধা করিবে। ক্তির জোরে একটা জাতির অন্তর অধিকার া যায় না. মিঃ সুরাবদী এখনও এই শিক্ষা ভ করুন এবং মানবতার প্রতি মর্যাদাবোধে হার হঠকারিতা সংযত করুন।

রাবর্দী শাসনে কলিকাতা—

গত ২৫শে মার্চ কলিকাতায় দাঙ্গা-াঙ্গামার সাম্প্রতিক পর্ব শুরু হয়, অদ্যাপি হার পরিসমাপ্তি ঘটিল না। বলা বাহুল্য ঙলার রাজধানী এবং এশিয়ার বৃহত্তম নগরী লিকাতাবাসীদের জীবনযাত্রা উপর্যুপরি রূপ অশান্তি ও উপদ্রবের ফলে উত্তরোত্তর সহ হইয়া উঠিতেছে। অবস্থা যেরূপ দ্রুত-র সঙ্গে অবনতির দিকে অগ্রসর হইতেছে, হাতে আশঙ্কা হয়, কিছুদিন পরে সহর াকের বাসের পক্ষে অযোগ্য হইয়া পড়িবে যাহারা এ অবস্থাতেও বাঁচিয়া কিবে তাহারাও মহামারীর কবলে ংসপ্রাপ্ত হইবে। প্রায় তিন মাস ধর্মঘটের এতদিনে ট্রাম চালাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ঙলার অপদার্থ লীগ মন্ত্রিমণ্ডল এই ধর্মঘটের র্যন্ত কোন একটা মীমাংসা করিতে ারেন নাই। জনবহুল কলিকাতায় ট্রামই াতায়াতের প্রধান অবলম্বন স্বরূপ। এই বস্থা বিপর্যস্ত হওয়াতে লোকের দারুণ র্দশা ঘটিয়াছে; এদিকে বাস চলাচলের ব্যবস্থাও নিয়ন্ত্রিত এবং সুপরিচালিতরূপে সম্ভব য় নাই। সহরের কুখ্যাত গুণ্ডা অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি এড়াইয়া সশঙ্ক গতিতে বাসের পথ করিতে হইতেছে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও গুণ্ডাদের অতর্কিত আক্রমণ হইতে বাস-যাত্রী একেবারে নিরাপদ নহে। বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী গুণ্ডা দমনের বীরত্বপূর্ণ অভিনয় যথেষ্টই করিয়া থাকেন; কিন্তু বিশেষ সম্প্রদায়ের গুণ্ডাদের আক্রমণ হইতে নিরাপদভাবে বাসের গতি নিয়ন্ত্রিত করিবার সামর্থ্যটুকু দেখাইবার বেলাতেও তাঁহাকে সংকুচিত হইতে দেখা যায়। কিছুদিন হইতেই কলিকাতা সহরের আবর্জনা পরিষ্কারের কাজে নিতান্ত অনিয়ম আরম্ভ হয়; সাম্প্রতিক দাঙ্গাহাঙ্গামায় সহর পরিষ্কারের ঝঞ্ঝাট একেবারে চুকিয়া গিয়াছে। কর্পোরেশনের আবর্জনা পরিষ্কারের গাড়ীগুলি যাহাতে নিয়মিতভাবে কাজ করিতে পারে, গভর্নমেণ্ট এরূপ ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। ইহার ফলে রাস্তায় রাস্তায় স্তূপীকৃত আবর্জনা পচিয়া শ্বাসরোধক পূতিগন্ধ বিস্তার করিতেছে। ইহার উপর, সহরে ময়লা জল সরবরাহও কিছুদিন হইতে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় যাহা অনিবার্য তাহাই দেখা দিয়াছে। কলেরা এবং উদরাময় ব্যাপক আকারে সহর ছাইয়া ফেলিতেছে। সরকারী রেশন ব্যবস্থার কৃপায় সহরবাসীর অন্নের অভাব বহুদিন হইতেই ছিল। আটা মিলে না, পাথর-মিশ্রিত চাউল; চিনি জীবনধারণের মাত্রার পক্ষে অনুপযুক্ত, ইহাতে লোকের স্বাস্থ্য পূর্ব হইতেই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, দাঙ্গা-হাঙ্গামার আতঙ্ক-কর প্রতিবেশের মধ্যে অবস্থানের উদ্বেগ সেই জীর্ণ স্বাস্থ্যের মূলে আঘাত হানিতেছে। সুরাবর্দী সাহেবের পোষ্যপুত্র পাঠান পুলিশের বেপরোয়া অত্যাচারের ভয়ে সহরবাসীদের বুকের রক্ত শুকাইয়া যাইতেছে। বাকী ছিল মহামারী। সেও সময় বুঝিয়া নিজ মাহাত্ম্য জারী করিতে চলিয়াছে। এখন তাহার কল্যাণে সহরবাসীর জীবন-সমস্যার সমাধান ঘটিলেই মিঃ সুরাবর্দীর পাকিস্থানী শাসনের মহিমা ইতিহাসে স্থায়ী আসন অধিকার করিবে। তিনি এবং তাঁহার অনুগতদল আত্মগর্বে অধীর হইয়া নিষ্ঠুর এবং বীভৎস আগ্রহে সম্ভবতঃ সেই দিনেরই স্বপ্ন দেখিতেছেন।

দিল্লীর আলোচনার গতি

লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেন বারংবার একথা ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনিই ভারতের শেষ বড়লাট। গান্ধীজীর নিকট তিনি ইহা চূড়ান্তভাবেই জানাইয়াছেন যে, ১৯৪৮ সালের ৩০শে জুন পর্যন্তই তাঁহার কার্যকালের মেয়াদ এবং ঐ তারিখের মধ্যেই তিনি ভারতবাসীদের হাতে ভারতের শাসনভার হস্তান্তর করিবেন। বড়লাটের এই কাজের উদ্যোগপর্ব এখনো চলিতেছে। নেতাদের সঙ্গে সভাপর্ব একরূপ শেষ হইয়াছে বলা চলে। তাহার পর বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নরদের সঙ্গেও আলোচনার পালার দুইদিনে পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। বড়লাটের সঙ্গে প্রাদেশিক গভর্নরদের সহিত কি পরামর্শ হইল, ভিতরের কথা আমরা কিছুই জানি না। দেখিলাম, ভারতের অন্য সব প্রদেশের গভর্নরগণই উক্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন; একমাত্র বাঙলার গভর্নরই উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার সেক্রেটারী বৈঠকে প্রতিনিধিত্ব করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ক্ষমতা হস্তান্তরের এই প্রারম্ভিক পর্যায়ে বাঙলার গুরুত্ব খুবই বেশী। কয়েক বৎসর হইতেই দেখিতেছি, বাঙলাই পাকিস্থানী নীতির মহড়ার প্রধান ক্ষেত্র স্বরূপে পরিণত হইয়াছে এবং পাকিস্থানী সংগ্রামের সব ঝড়ের প্রধান ধাক্কা বাঙলাকেই প্রথমে পোহাইতে হইতেছে। লীগের আসাম অভিযানের রণদুন্দুভিও বাঙলা সীমান্তে রচিত লীগের দুইটি কেল্লা হইতেই বাজিতে আরম্ভ করিয়াছে। সেনাপতিরা বাঙলার সদর আফিসে বসিয়াই রণনীতি পরিকল্পনা করিতেছেন এবং সৈন্য সরবরাহের ব্যবস্থা আঁটিতেছেন। এ সত্য একরূপে সুবিদিত যে, বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দীর অভয়হস্ত লীগ বাহিনীর রক্ষায় সর্বদা উদ্যত রহিয়াছে এবং বাঙলার গভর্নর বারোজ সাহেবের মৌনসম্মতি কার্যত এই অশান্তি সৃষ্টির পথে লীগের পক্ষে সহায়ক হইতেছে। বড়লাটের সঙ্গে গভর্নরদের বৈঠকের ফলে এ অবস্থার প্রতীকার ঘটিবে কি? যদি তাহা না হয়, রক্তপাতের পথই উন্মুক্ত হইবে এবং ভারতের ব্যাপক অঞ্চলে অন্তর্দ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিবে। দেখিতেছি, এতদিন পরে মিঃ জিন্না গান্ধীজীর সঙ্গে যুক্তভাবে হিংসামূলক কার্যের নিন্দা করিয়া এক বিবৃতি দিয়াছেন। এমন কাজ তাঁহার পক্ষে এই প্রথম। বোঝা যায়, বড়লাটের চাপে পড়িয়াই লীগ-নেতাকে এই কাজ করিতে হইয়াছে। কিন্তু লীগের মূলনীতির পরিবর্তন সাধন ব্যতীত অবস্থার স্থায়ী প্রতীকার ঘটিবে না। লীগ-নীতির পাকে পাকে অশান্তি জাগিয়া উঠিবে। অবশ্য ইংরেজ শাসকদের সেজন্য সঙ্কোচ নাই বা লজ্জা নাই। তাঁহারা ভেদনীতির পথেই ভারতে তাঁহাদের সাম্রাজ্যবাদ কায়েম করিয়াছেন। লর্ড মাউণ্টব্যাটেনও তেমন কলঙ্ক ভার বহন করিয়া ভারত হইতে অভিশপ্তভাবে বিদায় গ্রহণ করিতে চাহেন কি?

নববর্ষ উৎসবই বোধ হয় একমাত্র অনুষ্ঠান, যা পৃথিবীর সকল দেশে সকল জাতি সকল ধর্মের লোকেই সমান নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে থাকে। একটা বছর শেষ হয়ে আর এক বছর শুরু হোল, মহাকাল চলার পথে মোড় ঘুরে যেন নতুন পথ ধরলেন। সে পথে লুকিয়ে আছে কত নতুন সম্ভাবনা, কত অজানা ভবিষ্যতের লিখন, আশাবাদী মানুষ তাই নববর্ষের এই সন্ধিক্ষণে প্রার্থনা করে যেন পুরাতন বৎসরের যা কিছু গ্লানি, যা কিছু বিচ্ছেদ বেদনা সব যেন বিগত বৎসরের সঙ্গে সঙ্গেই লুপ্ত হয়ে যায়, যে বছর আসছে, তা যেন তার জীবনে নিয়ে আসে শুধু সমারোহ, শুধু আনন্দ, শুধু সাফল্য। অনেকের ধারণা বছরের প্রথম দিন যেমনভাবে কাটবে, সারা বছরও তেমনিভাবেই কাটবে। সুতরাং এমন একটি দিনকে মানুষ যে তার সবচেয়ে আনন্দের দিন বলে গ্রহণ করবে, তাতে আর সন্দেহ কি? নববর্ষে আনন্দ উৎসবটাই প্রধান ব্যাপার; কিন্তু অনেক দেশে এইদিনে অনেক রকম আঙ্গিক অনুষ্ঠানও প্রচলিত আছে। যেমন আমাদের দেশে ও আরও অনেক দেশেই দোকানদার ও ব্যবসায়ীরা এইদিনে বছরের দেনা-পাওনা সব চুকিয়ে নতুন করে হিসাবের খাতা আরম্ভ করেন। চীন ও জাপানে এইদিনে ঘরের অব্যবহার্য সমস্ত পুরানো জিনিস ছিঁড়ে ফেলা বা নষ্ট করা হয়। মোট কথা বছরের শুরুর দিনে সব কিছুই নতুন করে শুরু করাই এই সকল অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য।

বাঙলা দেশে নববর্ষ উৎসব কিছুদিন আগেও ব্যবসায়ী ও দোকানদারদের "হালখাতা"তেই সীমাবদ্ধ ছিল। জাতীয়তাবোধের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইংরাজদের অনুসরণ করে আমাদের নববর্ষকেও জাতীয় উৎসব বলে গ্রহণ করেছি। বাঙলা দেশে অনেক ব্যাপারের মত এ ব্যাপারেও অগ্রণী হন বোধ হয় ঠাকুর পরিবার, তারপর রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় শান্তি-নিকেতনে ১লা বৈশাখ যে নববর্ষ অনুষ্ঠান প্রবর্তিত হয়, তাহাই ক্রমে ক্রমে শিক্ষিত সম্প্রদায় ও জাতীয়তাবাদীদের মারফৎ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে নববর্ষ অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণত মেষ সংক্রান্তিতে নববর্ষ উদ্‌যাপিত হলেও দক্ষিণ মলয়ালামে ভাদ্র মাসে ও উত্তর মালয়ালামে আশ্বিন মাসে নববর্ষ উৎসব হয়। বার্মাতে বঙ্গাব্দ অনুযায়ী বৈশাখ মাসেই নববর্ষ পালন করা হয়। চট্টগ্রামে নববর্ষ উৎসব হয় মাঘী পূর্ণিমার দিনে। ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে ধূমধামের সঙ্গে নববর্ষ পালন করা হয় গুজরাতে, কার্তিক মাসে দেওয়ালির দিন। ভারতের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা নববর্ষ উদ্‌যাপন করেন বৈশাখ মাসের পূর্ণিমার দিন।

সকল দেশের সকল ধর্মের লোকেরা নববর্ষের দিনে আনন্দ করে থাকেন, কিন্তু ভারতবর্ষের পার্শীদের বেলায় তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। তারা এইদিন অনুশোচনা করে। বিগত বৎসরে কত অন্যায় বা পাপ করা হয়েছে ও আবার নতুন এক বছরে নতুন কত অন্যায় ও পাপের সঙ্গে এই প্রাণধারণের গ্লানি বহন করতে হবে এই ভেবে তারা অনুশোচনা করে। পার্শীদের "নওরোজ" বা নববর্ষ অনুষ্ঠান হয় তাদের পঞ্জিকার প্রথম মাস "ফরবার দিন" (ইং ২১শে সেপ্টেম্বর)-এর পয়লা তারিখে। ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশের মুসলমানেরা "মহরম" মাসের প্রথম দিনে, যে দিন প্রথম চাঁদ দেখা যায়, সেদিনই নববর্ষ পালন করে। এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দিনটি মুসলমানদের নিকট অতি পবিত্র। এই দিনেই হজরত মহম্মদ মক্কা থেকে মদিনায় পলায়ন করেন। মুসলমান মতে প্রথম নববর্ষ পালন করা হয় ৬২২ খৃঃ অব্দে ১৬ই জুলাই তারিখে।

ইহুদীদের নববর্ষ সাধারণভাবে অনুষ্ঠিত হয় "তিশরি" মাসের প্রথম দিনে (সেপ্টেম্বর ৬ হইতে অক্টোবর ৫)। কিন্তু তাদের ধর্মের বিধান অনুযায়ী নববর্ষ পালন করা হয় বসন্ত-কালে ২১শে মার্চ তারিখে। বর্তমানকালে কিন্তু গোঁড়া ইহুদীরা ছাড়া জনসাধারণ ক্রিশ্চিয়ান মতে ১লা জানুয়ারীই নববর্ষ পালন করে।

চীন ও জাপানে অতি প্রাচীনকাল থেকেই নববর্ষ উৎব বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে পালন করা হয়ে থাকে। চীনে ২১শে জানুয়ারী ও ১৯শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে যে দিন পূর্ণিমা তিথি পড়ে, সেইদিনই নববর্ষ উৎসব শুরু হয়। ভোর থেকে আনন্দ উৎসবে মুখরিত হয়ে ওঠে সমস্ত দেশ। কাগজের লণ্ঠন ও ড্রাগনে ছেয়ে ফেলে তারা বাড়িঘর। পূর্ণচন্দ্রের পূজা দেয় প্রত্যেক ঘরে ঘরে। বাড়ির সমস্ত অব্যবহার্য পুরানো জিনিস ছিঁড়ে নষ্ট করে ফেলে নতুন জামাকাপড় প'রে তারা বড় বড় কাগজের গরু তৈরী করে সেগুলো সমারোহ করে বহন করে নিয়ে যায় "তাইশাই" মন্দিরে। এই কাগজের গরুই তাদের নববর্ষের প্রধান মাঙ্গলিক চিহ্ন। তারপর সারারাত ধরে বাজী পোড়ানো চলে।

জাপানে নববর্ষ উৎসবই তাদের বছরের সবচেয়ে বড় উৎসব। জাপানে ফুলের খুব কদর; এইদিনে তারা সমস্ত দেশটাই যেন ফুল দিয়ে ঢেকে ফেলে। তার মধ্যে আবার শাদা শাদাটে আর ছাই রঙের ফুলেরই বেশী প্রাধান্য দেখা যায়। এ ছাড়া এই দিনে ওরা নতুন বাঁশগাছ পোঁতে আর বাঁশগাছের উপর ফুল দিয়ে সাজিয়ে পুজো করা হয়। চীনাদের মত এরাও সারারাত বাজী পোড়ায়।

বর্তমানে চীন ও জাপান ক্রিশ্চিয়ান মতে ১লা জানুয়ারীই সর্বজনীন নববর্ষ বলে গ্রহণ করেছে।

প্রাচীন গ্রীস ও রোমে ২১শে ডিসেম্বর তারিখে নববর্ষ পালন করা হ'ত। জুলিয়ান ক্যালেণ্ডারে নির্ধারিত ছিল ১লা জানুয়ারী। সমগ্র মধ্য ইউরোপে কিন্তু সাধারণত ২৫শে মার্চ তারিখে নববর্ষ পালন করা হ'ত। অ্যাংলো-স্যাক্সন ইংলণ্ডে আবার নববর্ষ হ'ত ২৫শে ডিসেম্বর। বিজয়ী উইলিয়ম নির্দেশ দেন ১লা জানুয়ারী তারিখে নববর্ষ পালন করতে। যা হোক শেষ পর্যন্ত গ্রেগারিয়ান ক্যালেণ্ডারও ১লা জানুয়ারীই নববর্ষ বলে মেনে নিয়েছিল। ১৭০০ খৃঃ অব্দে জার্মানী, ডেনমার্ক ও সুইডেনে ১লা জানুয়ারী নববর্ষ উৎসব পালন করা শুরু হয়। কিন্তু ইংলণ্ড তার অনেক পরে ১৭৫৩ খৃঃ অব্দে এই তারিখে নববর্ষ পালন করতে আরম্ভ করে। স্লাভ দেশগুলিতে আগে বিভিন্ন সময়ে নববর্ষ পালিত হ'ত, কিন্তু কয়েক শতক ধরে এরাও ১লা জানুয়ারীই নববর্ষ বলে মেনে নিয়েছে। ক্রিশ্চানদের বড়দিনের "ক্রিস্ট-মাস ট্রি" ১লা জানুয়ারী পর্যন্ত প্রত্যেকের ঘরে থাকে, ১লা জানুয়ারীর পরে সেগুলো ফেলে দেওয়া হয়। য়ুরোপে ৩১শে ডিসেম্বর মধ্য-রাত্রি থেকে নববর্ষ উৎসব শুরু হয়। ঘড়িতে রাত্রি ১২টা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশে আনন্দের হররা ছুটতে থাকে। গীর্জায় গীর্জায় প্রার্থনা হয়। প্রচুর মদ্যপান করে উচ্ছ্বসিত নরনারীর দল রাস্তায় বার হয়ে সারারাত নাচ-গান-হল্লা চালায়। রবারের বেলুন ফাটিয়ে, নানারকম মুখোস পরে যে যতপ্রকারে পারে আনন্দ প্রকাশ করে। শহরের সমস্ত সিনেমা-থিয়েটারগুলি মধ্যরাত্রির পর

শব "শো"র ব্যবস্থা করেন। ১লা জানুয়ারী রবেলা সৈন্যরা কুচকাওয়াজ দেখায়, ঘোড়-ড় বলনৃত্য প্রভৃতি ওদেশের সব আমোদেরই দিনে বিশেষ ব্যবস্থা থাকে। বন্ধুবান্ধব ত্মীয় প্রিয়জনেরা নববর্ষের অভিনন্দন কার্ড ঠিয়ে পরস্পরকে শুভেচ্ছা জানায়। গ্রামে এ সব আরও জোরসে চলে। সারাদিনরাত ন্যপান করে ও নেচে গেয়ে এরা বছরের প্রথম দিনটি আনন্দে ভরপুর করে রাখে।

নববর্ষ উৎসব শুধু সভ্য-জগতেই সীমাবদ্ধ নয়। অনেক আদিম জাতির ভিতরেও এর প্রচলন দেখা যায়। আফ্রিকার আদিম অধিবাসীরা বছরে দুবার করে নববর্ষ পালন করে। মেক্সিকোর "মায়া"-রাও তাদের বছরের প্রথম মাস "পোপ"-এর প্রথম দিন 'আক্‌বাল এ নববর্ষ উৎসব বেশ আড়ম্বর-সহকারে পালন করে থাকে।

প্রাচীন ইজিপশিয়ান ও ফিনিশিয়ানরা ৫৭০১ খৃঃ পূর্ব থেকে ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে নববর্ষ উৎসব পালন ক'রত।

ব্যাবিলোনিয়ানরা নববর্ষ পালন করা শুরু করে ২০০০ খৃঃ পূর্ব থেকে। ব্যাবিলোনিয়ান প্রথম মাসের নাম "নিশান"। সুমেরিয় প্রথম মাস 'বার্-জাগ্-গাঃ' ইংরেজি মার্চ এপ্রিল মাসে "নিশান" মাস পড়ে।

প্রাচীন আশীররাও ১০০০ খৃঃ পূর্ব থেকে তাদের বছরের প্রথম মাস "কার্‌রা"তে অথবা ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে নববর্ষ উৎসব পালন ক'রত।

নববর্ষ

অরুণ সরকার

এবারের নববর্ষ অজ্ঞাতের অগ্রদূত নহে;
সে আনিছে বহে
বহুদিন প্রত্যাশার অমৃত-বারতা—
স্বাধীনতা।
স্বপ্নে যারে দেখিয়াছি, বন্দনা করেছি যারে গানে
প্রাণে প্রাণে,
অনুভব করিয়াছি অন্তরের ব্যাকুল তিয়াষা,
এবারের নববর্ষে পূর্ণ হবে সে দুর্লভ আশা।
তবু যেন হেরি দিকে দিকে
বিদ্বেষের কালোমেঘে অলক্ষিতে কে দিয়াছে লিখে
কি অভিসম্পাত বাণী—আজিকার মঙ্গল প্রভাতে,
নিষ্করুণ হাতে।
প্রাণে মোর জাগিছে সংশয়
ভয় হয়—

বুঝি আশা ব্যর্থ হবে শেষে,
তীরে এসে
বুঝি তরী ফিরে যাবে আন্তরিণ ঝড়ের হাওয়ায়।
নাহি জানি হায়
পূর্ণতার দ্বারে এসে এ কি চির-ব্যর্থতার ভয়
কেন জাগে মিছে এ সংশয়!
জানি যবে সূর্য ওঠে, অন্ধকার কোন'মতে তারে
রোধিতে না পারে,
ক্ষণিকের তুচ্ছ বাধা ক্ষণিকে আপনি হবে ক্ষয়।
হে অতিথি দেহ বরাভয়
তব শুভ আবির্ভাবে ঘুচে যাক অমঙ্গল যত
পূর্ণ হোক ব্রত
ফুটুক ঊষার আলো প্রতীক্ষার কালরাত্রি শেষে
এ দুর্ভাগা দেশে।

বিদায়ী

আশ্‌রাফ সিদ্দিকী

শেষ হয়ে আসে তেরশ' তি'পান্ন।
তি'পান্ন! তুমি চলে যাও—চলে যাও!
বিদায়োপচার? মালা ও ঘৃতান্ন।
মরার খুলিতে মালিকা গেঁথেছি! নাও!

এ মহা ভারত শ্মশানে, তি'পান্ন!
মোরা কাপালিক! কাল্‌রাত ভয়ে কাঁপে,

চিতার আগুনে রেঁধেছি শবান্ন!
টাটকা লহুর পায়েশ রেঁধেছি, খাবে?

তি'পান্ন! দেখোঃ এ দেশ রক্তময়—
এ দেশ মেদেরঃ আমরা যে পরাধীন—
এ ধান মোদেরঃ মোরা যে অন্নহীন!
বিদায় বন্ধু—আর নয়, আর নয়!

তি'পান্ন, তুমি পথ ছাড়ো! চলে যাও।
এবার আলোর প্রভাত আসতে দাও॥

ভারতবর্ষ ঃ '৪৬–'৪৭

গোবিন্দ চক্রবর্তী

আমার পায়ের নীচে
আর মাটী ও জীবন কিছু নেই।
আজ আমি পৃথিবীর ত্যজ্যপুত্র।
ঘুলিয়ে উঠেছে সুমুখের বায়ুমণ্ডল
কার্বণ-ডায়োক্সাইডের শ্বাসরোধকারী শাসানিতে।
তার ছেঁড়া-ছেঁড়া দু'একটা টুকুরো
ধেয়ে ধেয়ে ছুটে আসছে এই এখেনেও
আমার আত্মলোকের মিনারে।
ওরা শাসাচ্ছে আমায়।
শাসাচ্ছে আমায়—নিভিয়ে দেবে
আমার এতকালের আলো!

ট'লছে বাড়িঘরের পাথুরে কংক্রীট ভিত।
সপ্ত পাতাল থেকে ছুটে এসেছে
মত্ত দানবের দল।
হাঙর, তিমি আর সিন্ধুঘোটকদের আপামর সমর্থনে
ওদের ভার হ'য়েছে ভারি।
শয়তানের লুণ্ঠনশালার সযত্ন-লালিত বর্বরযূথ
ওদের পানোন্মত্ত অসুস্থ দাপটে
আর রে-রে মার-মার শব্দে
ছিন্নভিন্ন, লণ্ডভণ্ড হ'য়ে গেল শ্যামজীবনের উপকূল।

আমি আলোকের প্রতিহারী।
আত্মলোকের এই নির্মেঘ নীল শূন্যে
নির্বাসিত মানবপুত্র
ব'সে আছি প্রেমের বর্তুলখানি হাতে।
দেবতার প্রথম শিশু মানুষ ঃ
বিবেকের প্রথম প্রতিনিধি মানুষ ঃ
সূর্যের আলোর প্রথম পতাকাবাহী মানুষ ঃ
আমার ধর্ম ঃ আলো—
আমার জাতি, গোত্র, জীবন ও দর্শন ঃ আলো।
ছন্নছাড়া মন্দ্রহারা বাউল
বারবার ঘা দিয়েছি জীবনের এই বৈরাগী একতারাটায়,
বারংবার গেয়ে গেছি এই একই পুরোণো গান ঃ
'আলোকং শরণং গচ্ছামি!'

ওরা শুনবে না,
ওরা মানবে না তা—
ওরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।
বিশ্বাসের দু'কূল দিলো ধ্বসে,
দখল করলো নগর-বন্দর,
খেল্‌লো হোলি কোটি করোটির পাত্রে
কবোষ্ণ শিশুর রক্তে।
মানুষ আর মানুষের ধর্ম,
জীবন আর জীবনবোধের ধর্ম,
ধর্ম আর ধর্মের মর্ম—
দুই হাতে করলো বেইজ্জৎ
ধর্মযুদ্ধের নামে।
আর চাই কি!

আমার হাসি পায়।
এই দারুণ দুর্যোগের রাত্রে,
এই উত্তাল জীবন-সমুদ্রের
প্রেতার্ত মরণ-দোলার তুফানচূড়ে দাঁড়িয়ে
হা হা ক'রে হেসে উঠি আমি।
কালপুরুষের বাঁকা তলোয়ারের সংকেত,
ঈশান কোণের মগ্ন বনের শন্‌শন্‌ হাওয়া,
টুকরো মেঘের পাঁজরে পাঁজরে চোরা বিদ্যুতের চমক—
ওরা চেনে না।
ধরণীর গর্ভকোষে
পিংগল ধাতুপুঞ্জের যে অনলবাহী তুরংগস্রোত—
তার বার্তা পৌঁছোয়নি এখনো ওদের কাণে।

বেঁধেছিলো ওরা প্রমিথিউসকে,
বিঁধেছিলো ওরা যীশুকে,
ইসলামের অরুণ দিশারীর পিছু পিছু
শাণিত বল্লম হাতে
ধাওয়া ক'রেছিলো ওরাই রাতের পর রাত।
ওদেরই উদগ্র রক্তচক্ষুর কঠিন কটাক্ষে
ভেসে প'ড়েছিলো আরব-সমুদ্রের কূলে কূলে, জরাথুস্ট্রের শিষ্যদল
বুকে নিয়ে 'জিন্দা-ভেস্‌তা'।
ওরা আবার শাসাচ্ছে আজ
হিন্দুস্থানের অমৃত-আত্মা ঃ
জাগ্রত এশিয়ার আলোক-সাধনার পাদপীঠ।
শাসাচ্ছে ওরা আমায়—
কেন তুলে ধ'রে আছি বাতি?
সেই অমোঘ আলোর চরম হেমশিল্প ঃ
'শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা'!

ভয় পাইনে ত' প্রাণ দিতে,
মহাকালের মহামহীরুহের সহস্র শাখার
একটি নামহীন অজ্ঞাত অখ্যাত ফুল—
কি-ই বা আমার দাম!
আপন হাতেই ধরে দিতে পারি
আমার রক্তে-রঙীন হৃদপিণ্ড।
তবু অন্তিম লগ্নেও এ'কথা নির্ভয়ে জানিয়ে যাবো ঃ
আমার পরও তারা আছে—
যারা আবার বাজাবে
আমারি হাতের ঝ'রে-পড়া বাঁশী।
মাটীর রক্তে ফোটাবে মণিমাণিকের ফুল—
হাসির মুক্তো দিয়ে মালা গাঁথবে আবার
মৃত্যুহীন মহাজীবনের।

অযাত্রা

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

আমার বন্ধুমহলে গণপতির মত অন্তরঙ্গ বন্ধু আর কেহ নাই। আমাদের একস্থানে জন্ম, একই স্থানে বাল্যকাল কাটিয়াছে। একই স্কুলে পড়িয়াছি।

স্কুলের পড়া শেষ হইলে কলেজে পড়িতে আমরা উভয়েই কলিকাতা যাই। সেখানেও একই কলেজে ভর্তি হই। একই মেসে বাসা নিই।

বর্ণপরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া কলেজ পর্যন্ত উভয়ে বরাবর একই ক্লাশে পড়িয়াছি। পরীক্ষায় পাশ করিয়াছি এক সঙ্গে। আবার ফেলও এক সঙ্গেই করিয়াছি। পড়াও ছাড়িয়াছি এক সঙ্গে।

তাহার পরবর্তী জীবনেও আমাদের বিচ্ছেদ হয় নাই। দুজনেই আমরা আমাদের জন্মস্থানে ফিরিয়া আসিয়াছি। চাকরি কেহই করি না। করার ইচ্ছাও আমাদের নাই। বাড়ির অবস্থা আমাদের মন্দ নহে। সুতরাং আড্ডা ও সাহিত্য-চর্চাতেই সময় কাটাইতেছি। মাঝে মাঝে দেশভ্রমণে বাহির হই। তাহাতেও এই মাণিকজোড়ের জোড় ভাঙে না।

সেদিন হঠাৎ গণপতি আসিয়া বলিল,—"ভাই, কাকার মেয়ের বিয়েতে যেতে হবে। কাকা অনেক করে যেতে লিখেচেন। চল এক সঙ্গে যাই।"

আমি অবাক হইয়া গেলাম! গণপতির কাকা আছে বলিয়া তো জানি না। কোনোদিন তাঁহাকে দেখি নাই। তাঁহার কথাও কখনো শুনি নাই!

গণপতি আমার ভাব দেখিয়া বলিল—"আমার কাকা আছেন বলে তুই যেমন জানতিস নি, আমিও তেমনি জানতাম না। তবে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তুই তো জানিস আমরা কুলীন। আমার ঠাকুর্দা নামজাদা লোক ছিলেন। অন্তত ত্রিশটি বিয়ে তিনি করেছিলেন। সুতরাং গোটা পনের কুড়ি কাকা থাকলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই; একটি তো অনায়াসেই থাকতে পারে।"

"সেই কাকা আজ শ্রীরামপুর থেকে নিজের পরিচয় দিয়ে পত্র লিখেছেন—মেয়ের বিয়ে। অবশ্য অবশ্য যাওয়া চাই।

অতি নিকট সম্পর্ক। তাঁর পিতা আমার পিতামহ! তিনি অবশ্য তাঁর দাদার নামে পত্র দিয়েছেন। দাদা যে বহুকাল গত হয়েছেন তা তাঁর জানা নাই। সে যাই হোক, তিনি তো তবু তাঁর দাদার নাম, ধাম ঠিকানা পর্যন্ত জানতেন। আমরা তো তাঁর অস্তিত্ব আছে বলেই জানতাম না। এইখানেই তাঁর জিৎ।"

এক ভদ্রলোক আস্তিন গুটাইয়া তুমুল চীৎকার করিতেছেন

বিয়ে বাড়িতে যাইবার উৎসাহ আমার খুবই। বিশেষ শ্রীরামপুর দেখি নাই। একটা নূতন জায়গা দেখিবার আগ্রহও কম ছিল না। আনন্দের সঙ্গেই রাজি হইলাম। বিয়ের দিন দুই আগেই আমরা যাত্রা করিলাম। রামপুর-হাট হইতে শ্রীরামপুরে।

ট্রেনে ভিড় মন্দ ছিল না। তবে বসিবার মত জায়গা পাইলাম, বন্ধুর কিন্তু তাহাতে সন্তোষ নাই। তাঁহার শুইবার জায়গা চাই। কেন না ট্রেনে উঠিলেই তাঁহার ঘুম পায়।

তিনি তাঁহার বুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের জোরে বাঙ্কের বাক্স বেডিংএর মধ্যে একটুখানি জায়গা উদ্ধার করিয়া তাহার মধ্যেই শুইয়া পড়িলেন। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নাক ডাকিতে লাগিল।

আমি বন্ধুর অভাবে আশ-পাশের যাত্রীদের মধ্যে আলাপ জমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু তাহা তেমন না জমায় নিরুপায় হইয়া বসিয়া বসিয়াই বন্ধুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিলাম।

এইভাবে নিরুপদ্রবেই আমাদের সময় কাটিতেছিল। মাত্র বর্ধমানে একবার নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। বড় স্টেশন। রীতিমত হট্টগোল। ঘুম ভাঙিবারই কথা। বিশেষ যখন বসিয়া ঘুমাইতেছি। কিন্তু তাহাতেও আমার ঘুম ভাঙে নাই। পরে চেকারের উৎপাতে ঘুম ভাঙে। টিকিট দুইখান আমার কাছেই ছিল, সুতরাং গণপতিকে জাগাইবার প্রয়োজন হয় নাই। বিরক্তির সহিত টিকিট দেখাইয়া পুনরায় সুপ্তিতে নিমগ্ন হই।

হঠাৎ এক বিষম হট্টগোলে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। চাহিয়া দেখি সে এক ভীষণ ব্যাপার। সমস্ত কামরায় রসগোল্লা পান্তুয়ার ছড়াছড়ি। জুতাগুলি পর্যন্ত রসে ও মিষ্টিতে ভরিয়া গিয়াছে। এক ভদ্রলোক আস্তিন গুটাইয়া তুমুল চীৎকার করিতেছেন। ঘটনাটি এইঃ—

তিনি তাঁহার মিষ্টির হাঁড়ি বাঙ্কে রাখিয়াছিলেন সেই বাঙ্কে যেখানে বন্ধুবর শুইয়া ছিলেন। তাহার পর যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে। নিদ্রিত গণপতির পায়ের ধাক্কায় মিষ্টির হাঁড়ি নীচে পড়িয়া গিয়াছে।

ব্যাপার গুরুতর। ভদ্রলোক একেবারে মারমুখো! মুখে তো যাহা আসিতেছে তাহাই বলিতেছেন। ঘটনার গুরুত্বে এবং তাঁহার দাপটে আমার ডানপিটে বন্ধু পর্যন্ত স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে।

আমি ভদ্রলোকের হাত ধরিয়া শান্ত করিতে গেলাম, কিন্তু ফল হইল বিপরীত। তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। তাহার পর তাঁহার মুখ হইতে যাহা বাহির হইতে লাগিল তাহার তুলনা নাই। বন্ধুর সহ্যশক্তি বোধহয় সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। সে হঠাৎ উগ্রমূর্তিতে নীচে নামিয়া তাঁহার হাত ধরিল। আর যায় কোথা? উত্তেজিত ভদ্রলোক তাহাকে এক চড় মারিয়া বসিল এবং সেই এক চড়েই বন্ধু বসিয়া পড়িল।

ইহার পর আমার পক্ষে ক্রোধ সম্বরণ অসম্ভব হইয়া উঠল, আমিও তাঁহাকে এক ঘুষি মারিলাম। কিন্তু তাহা তাঁহাকে লাগিল না। তাহার পূর্বেই কয়েকজনে আমার হাত ধরিয়া ফেলিয়াছে। তাঁহাকেও অন্যদিক হইতে কয়েকজন ধরিয়া ফেলিল। এই ধৃত অবস্থার

আমাদের বচসা বা বাগ্‌যুদ্ধ চলিতে লাগিল।

আমি বলিলাম—"আপনি কি রকম লোক মশায়? ভদ্রলোকের গায়ে হাত তোলেন! জিনিস গেছে তার দাম দিতাম!"

ভদ্রলোক রুখিয়া উঠিল—"ভারি পয়সা-ওয়ালা! কই দাও দাম!" ইহার পর আমি কিছু বলিবার পূর্বেই গণপতি গর্জিয়া উঠিল—"এই নে দাম!"

এক প্রচণ্ড ঘুষি তাহার নাকে আসিয়া পড়িল

ভদ্রলোক তাহার দিকে ফিরিবামাত্র যাহা পাইলেন তাহাকে আর যাহা বলা হউক 'মিষ্টির দাম' কখনই বলা চলে না! এক প্রচণ্ড ঘুষি তাঁহার নাকে আসিয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে নাক ভাঙিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল।

আমাকে এবং ঐ ভদ্রলোককে ধরিবার সময় যাত্রীদের গণপতির কথা মনে আসে নাই, তাহাতেই এই অনর্থ ঘটিল।

ভদ্রলোকের অর্ধমূর্ছিত অবস্থা। তাঁহাকে বেঞ্চে শোয়াইয়া কেহ বা নাকে মুখে জল ঢালিতেছে কেহ বা বাতাস করিতেছে। যাহা হউক শীঘ্রই ভদ্রলোককে কিছু সুস্থ মনে হইল। তিনি চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিলেন।

ইহার কিছু পরে গাড়ি চন্দননগরে পৌঁছিল। ভদ্রলোক উঠিয়া জিনিসপত্র (মিষ্টির হাঁড়ি বাদে) লইয়া নামিয়া পড়িলেন। কে একজন বলিয়া উঠিলেন—"উনি পুলিশে খবর দিতে গেলেন।"

তাহা শুনিয়া আমরা পুলিশের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। কিন্তু পুলিশ আসিল না। আসিল—শ্রীরামপুর। আমরা নামিয়া পড়িলাম।

নামিয়াই কিন্তু আবার এক মুশকিল বাধিল। গণপতি বলিয়া উঠিল—"যাঃ। কাকার নামটা মনে আসছে না।"

আমি তো অবাক! চড় মারিয়া বাপের নাম ভুলাইবার কথা বহুবার শুনিয়াছি, কিন্তু কাকার নাম ভুলাইবার কথা তো কখনো শুনি নাই।

এখন উপায়! কাকা এমন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি নহেন, যে বিনা নামে তাঁহার খোঁজ পাইব। এখন হয় কোনরকমে তাঁহার নাম মনে আনিতে হইবে, না হয়, ফিরিয়া যাইতে হইবে।

বন্ধু কিন্তু দমিবার পাত্র নহেন। বলিলেন—"সুটকেস খোল্! তার মধ্যে বোধ হয় তাঁর চিঠি আছে।"

আবার **বোধ হয়!** যাহা হউক, সুটকেস খুলিলাম। চিঠিও মিলিল এবং তাহার সঙ্গে নাম ও ঠিকানা পাওয়া গেলঃ—শ্রীসতীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়—চাতরা।

রিক্সা করিয়া রওনা হইলাম। পনের কুড়ি মিনিটের মধ্যেই বাড়ির সন্ধান মিলিল। বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলাম। একটি যুবক আমাদের অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। আমরা আমাদের পরিচয় দিলাম। সেও নিজের পরিচয় দিল—নাম উমাপ্রসন্ন, সতীপ্রসন্নের পুত্র, বিনীতভাবে আমাদিগকে প্রণাম করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

আমরা বসিয়া বসিয়া বাড়ির দেওয়ালে টাঙানো ছবিগুলি দেখিতেছি—হঠাৎ পায়ের শব্দে পিছন ফিরিলাম—ফিরিয়া যাহা দেখিলাম, সেরূপ যেন কাহাকেও দেখিতে না হয়! ট্রেনের সেই আহত ভদ্রলোক, আমাদের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। নাকটা বেশ ফুলিয়াছে।

উভয়পক্ষই পরস্পরের দিকে চাহিয়া আছি। কতক্ষণ জানি না। তিনিই প্রথম কথা বলিলেন—"এস বাবা এস! ভিতরে এস।" গণপতি উঠিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহাকে অনুসরণ করিল। আমি সেই অবসরে সরিয়া পড়িলাম। একরূপ ছুটিতে ছুটিতেই স্টেশনে আসিলাম, সম্মুখেই একখানা গাড়ি দাঁড়াইয়া। চড়িয়া পড়িলাম। গাড়িখানি হাওড়াগামী কুছ পরোয়া নাই। শ্রীরামপুর ছাড়িয়া পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্তে যাইতে প্রস্তুত আছি। এতো মাত্র হাওড়া।

আধঘণ্টার মধ্যেই হাওড়া পৌঁছালাম। খোঁজ লইয়া জানিলাম ১—৫৫তে রামপুর-হাটের গাড়ি মিলিবে। বারহরা প্যাসেঞ্জার, তখনও বহু সময় ছিল। স্নান সারিয়া কিছু খাইয়া তবে ধাত আসিল।

বন্ধু বিচ্ছেদে বিষণ্ণমনে গাড়িতে উঠিলাম। গাড়ি প্রায় গরুর গাড়ির গতিতে চলিয়াছে। বর্ধমানে আসিতেই কয়েক ঘণ্টা লাগিয়া গেল। মন বিমর্ষ। দেহ ক্লান্ত! নামিয়া প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করিতেছি। হঠাৎ চায়ের দোকানের দিকে নজর গেল। ওকে? গণপতি না?

গণপতিই বটে! বেশ নিশ্চিন্তভাবে চা খাইতেছে। আমার ডাক শুনিয়া চা ফেলিয়া ছুটিয়া আসিল। তাহার পর দুইজনে দুই-জনকে জড়াইয়া ধরিলাম। বন্ধু বলিলঃ—

"তুই তো সরে পড়লি। আমি যে অবস্থায় পড়লাম, তা আর কী বলবো! যাহোক কাকা আমাকে কাকীমার জিম্মায় দিয়ে সরে পড়লেন। কাকীমার আপ্যায়ন দেখে কে! মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে তিনি আমাকে ছোট শিশুটির মত আদর করতে লাগলেন।

"এস বাবা এস"

শেষে এক প্লেট মিষ্টি খেতে দিলেন, রসগোল্লা—পান্তুয়া! দেখেই তো আমার মন আরো খারাপ হয়ে গেল! আমি বলে উঠলাম—'কাকীমা, মাপ করবেন! আমি আবার চান না করে কিছু খাই না। বিশেষ গঙ্গার দেশে এসেছি—আগে গঙ্গাস্নানটা সেরে আসি!'

কাকীমা হাসতে হাসতে বল্লেন—'তা বেশ বাবা! কিন্তু তোমার তো সব অচেনা! উমা তোমার সঙ্গে যাক্!'

আমি নিরুপায় হয়ে মিথ্যে বল্লাম—'কাকীমা, আমি শ্রীরামপুরে এর আগেও কয়েকবার এসেছি। আমার পথঘাট সব চেনা। কারো সঙ্গে যাবার দরকার নাই।' বলেই সঙ্গে সঙ্গে সরে পড়ি। স্টেশনে এসে যে ট্রেন পাই তা হাওড়াগামী। তাতেই চড়ে পড়ি। সেখান থেকে শিবপুরে পিসিমার বাড়ি যাই। সেখানে স্নানাহার সেরে এই বারহরা প্যাসেঞ্জারে আসছি।"

আমার কথাও তাহাকে বলিলাম। তাহার পর দুই মাণিক জোড়ে গাড়িতে উঠিয়া পড়িলাম।

বাড়ি ফিরিয়া কি কৈফিয়ৎ দিব উভয়ে গাড়িতে বসিয়া তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

তারকেশ্বর

শ্রীসুধীরকুমার মিত্র

তারকেশ্বর শৈব-তীর্থ বলিয়া বঙ্গদেশের একটি পবিত্র পুণ্যস্থান; হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার অন্তর্গত অক্ষাংশ ২২°৫৩′ উত্তর এবং দ্রাঘিমাংশ ৮৮°৪′ পূর্বে অবস্থিত। ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডে (৭।৫৮) এই লিঙ্গের উল্লেখ থাকিলেও তারকেশ্বরের উৎপত্তি আধুনিক বলিয়া ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করিয়া থাকেন। প্রাচীন পুরাণ বা তন্ত্রাদিতেও তারকেশ্বরের কোন বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় না। রেনেলের ১৭৭৯—১৭৮১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত বঙ্গদেশের মানচিত্রে তারকেশ্বরের অস্তিত্ব নাই, তবে ১৮৩০—১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে বাঙলা সরকার বঙ্গদেশের যে জরীপ করাইয়াছিলেন, তাহাতে 'তারেশ্বরী' নামক একটি স্থানের উল্লেখ আছে দেখিতে পাওয়া যায়।

ষোড়শ শতাব্দীতে তারকেশ্বরের নিকটবর্তী দামুন্যা গ্রামে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী জন্মগ্রহণ করেন; তল্লিখিত চণ্ডীকাব্যে বঙ্গদেশের যাবতীয় তীর্থক্ষেত্রের উল্লেখ আছে, এমন কি, দামুন্যায় চক্রাদিত্য শিবের বিষয় তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তারকেশ্বরের বিষয় উক্ত চণ্ডীতে কোন উল্লেখ নাই বলিয়া পণ্ডিতগণ কালীঘাটের নকুলেশ্বরের ন্যায় তারকেশ্বরের উৎপত্তি আধুনিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমাদের বিশ্বাস এই যে, ষোড়শ শতাব্দীতে তারকেশ্বর প্রকটিত না হইলেও উক্ত স্থানেই তিনি ছিলেন, কিন্তু স্থানটি জঙ্গলাকীর্ণ ছিল বলিয়া উহা সর্বসাধারণের অগোচরে ছিল।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে অযোধ্যা প্রদেশের অন্তর্গত জেলা জৌনপুরের ডাভী পরগণার গোমতী তীরস্থ হরিহরপুর নামক স্থানে রাজা বিষ্ণুদাস নামে এক ক্ষত্রিয় ভূস্বামী ছিলেন। তিনি মুসলমানদের আধিপত্য অস্বীকারপূর্বক প্রায় পাঁচশত অনুচর ও কান্যকুব্জ হইতে একশত ব্রাহ্মণ সমভিব্যাহারে হুগলী জেলার অন্তর্গত হরিপালের নিকট রামনগর নামক স্থানে আসিয়া বসবাস করেন। তাঁহার বিস্তর লোকজন ও অস্ত্রশস্ত্র দেখিয়া স্থানীয় হরিপালের অধিবাসীবৃন্দ উঁহাদিগকে দস্যু মনে করিয়া বিশেষ ভয় পায় এবং তাহাদের বিরুদ্ধে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর নিকট অভিযোগ করে। নবাব সমক্ষে রাজা বিষ্ণুদাস স্বকীয় বৃত্তান্ত বলিয়া, তাঁহার কথা যে সত্য, তাহা প্রমাণার্থে তৎকালীন প্রথামত হস্তমধ্যে জ্বলন্ত লোহ শাবল ধারণপূর্বক অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বঙ্গদেশে বাসের অনুমতি প্রদান করেন এবং বর্তমান তারকেশ্বরের চার ক্রোশ দূরে রামনগর নামক স্থানে বসবাসের জন্য প্রায় দেড় হাজার বিঘা জমি (তৎকালীন পাঁচশত বিঘা) প্রদান করেন।

এই সম্বন্ধে সরকারী গ্রন্থ List of Ancient Monuments in Bengal নামক গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

"The supremacy of the Mahomedans, who invaded having deprived his residence of safety and comfort, the Raja came away and took up his abode in a jungle two miles from Tarakeswar, the side of village Ramnagar or Balagar in thana Haripal. 500 peoples of his own caste and 100 Brahmins of Kanuj came and settled with him but the inhabitants of the neighbourhood who suspected them of being robbers informed the Nawab of Bengal at Murshidabad of the arrival of persons in the locality: they were sent for and the Raja presented himself before the Nawab and declared that they were perfectly harmless people who wanted only some land to settle. The tradition says that as a proof of his innocence, Vishnu Das held in his hands a red hot iron bar without being injured in the least. His success in thus passing through the ordeal of fire not only led to his acquital but also procured for him from the Nawab a grant of 500 bighas of land in Bahirgora."

রাজা বিষ্ণুদাসের দেশত্যাগের কারণ সম্বন্ধে সরকারী গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। রাজা বিষ্ণুদাসের স্বদেশে (নবাব সাদৎ আলির) মুসলমানদের আধিপত্য অস্বীকার করিয়া বঙ্গদেশে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর অধীনে বাস করিবার কারণ কি? এই সম্বন্ধে শ্রীযুত মনোমোহন সিংহ-রায় মহাশয়ের অভিমত যে, কাশীর রাজা বলবন্ত সিংহের সহিত সংঘর্ষের জন্যই রাজা বিষ্ণুদাস দেশত্যাগ করেন। আমরাও তাঁহার অভিমত গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করি। তিনি এই সম্বন্ধে স্বর্গীয় দেওয়ান হরিনাথ রায়ের সহিত অনুসন্ধান করিয়া যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার মর্মার্থ উল্লিখিত হইল।

অযোধ্যার নবাব সাদৎ আলি বেনারস প্রভৃতি বিরানব্বইটি পরগণা তাঁহার বন্ধু মীর রোস্তম আলীকে বন্দোবস্ত করিয়া উক্ত প্রদেশের শাসনভার তাহার উপর অর্পণ করেন। রোস্তম আলী অলস ও রাজকার্যে অপটু ছিলেন বলিয়া নবাব তাহাকে অপসৃত করিয়া ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাপুরের জমিদার মনসারাম সিংহকে তৎপদে নিযুক্ত করেন। * তিনি বিচক্ষণ ও দক্ষ ব্যক্তি ছিলেন এবং তাহার পুত্র বলবন্ত সিংহের জন্য তিনি দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীরের নিকট হইতে 'রাজা' উপাধি অনুমোদিত করাইয়া লইয়া অযোধ্যার নবাবের অধীনতা অস্বীকারপূর্বক স্বাধীন হইলেন এবং তাহার রাজ্য সুরক্ষিত করিবার জন্য কাশীর মধ্যে একটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করিলেন।

অতঃপর রাজা বলবন্ত সিংহ স্থানীয়

তারকেশ্বর মন্দিরের সম্মুখ ভাগের দৃশ্য

* এই সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ মল্লিখিত 'কাশীর ইতিবৃত্ত' নামক প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে; দেশ—২৯শে ভাদ্র ১৩৫২, পৃঃ ২৩৩—২৩৬।

সর্দারগণকে স্ববশে আনিবার জন্য যুদ্ধ ঘোষণ করেন। এই উপলক্ষে ডোভী পরগণার অন্তর্গত হরিহরপুরের রাজা বিষ্ণুদাসের সহিত তাহার সংঘর্ষ হয় এবং কথিত আছে যে, হিয়াতী সিংহ নামক জনৈক ব্যক্তি ফৈজাবাদের পথে মনসারামকে নিহত করেন এবং তাহার ছিন্নমুণ্ড রাজা বলবন্ত সিংহের নিকট উপহারস্বরূপ পাঠাইয়া দেন। ইহার পর ঘোরতর যুদ্ধ হয়, কিন্তু ডোভীর রঘুবংশীয়দের পরাজিত করিতে না পারিয়া তিনি পানীয় জলের কূপমধ্যে বিষ দিয়া তাহাদিগকে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে বিরক্ত হইয়া রাজা বিষ্ণুদাস দেশত্যাগ করেন এবং হরিপালের নিকটবর্তী রামনগরে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। ডোভী রেলওয়ে স্টেশন হইতে হরিহরপুর গ্রাম মাত্র দুই মাইল দূরে অবস্থিত এবং অদ্যাপি হরিহরপুরে 'সতীকূপ' রহিয়াছে; রাজা বিষ্ণুদাসের জ্ঞাতিগণ বিবাহকালে উক্ত কূপের তটে ভোজন করিয়া অতীতে যাহারা বিষমিশ্রিত জল পান করিয়া দেহত্যাগ করে, তাহাদের স্মৃতি স্মরণ করে এবং বর্তমানে এইরূপ ভোজন তাহাদের বিবাহের কুলাচাররূপে পরিগণিত হইয়াছে।

যাহা হউক, রাজা বিষ্ণুদাস রামনগরে বাস করিতে লাগিলেন, তাঁহার ভারামল্ল নামে এক সংসারত্যাগী ভ্রাতা ছিলেন; তিনি জঙ্গলে যোগ সাধনা করিতেন। রাজার গুড়ে-ভাটা গ্রামের মুকুন্দরাম ঘোষ নামক একজন গো-রক্ষক ছিল এবং রাজবাটীর যাবতীয় গাভীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাহার উপর ন্যস্ত ছিল। কিংবদন্তী এইরূপ যে, কয়েকটি গাভী গভীর অরণ্য-মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি শিলাস্তম্ভের উপর তাহাদের বাঁট হইতে দুগ্ধ শূন্য করিয়া ফিরিয়া আসিত। মুকুন্দরাম গাভীদিগের শিলাখণ্ডের উপর দুগ্ধ দেওয়ার বিষয় রাজার ভ্রাতা ভারামল্লকে জ্ঞাপন করিলে তিনিও উক্ত স্থানে যাইয়া গাভীদিগের পশ্চাদনুসরণ করিয়া দেখিতে পান যে, এক শিলার মস্তকে গাভীগণ বাঁটের দুধ ঢালিয়া দিতেছে। এই সম্বন্ধে সরকারী গ্রন্থে এবং তারকনাথ মাহাত্ম্যে যাহা লিখিত আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল ঃ—

"It is said that while temporarily residing in the woods of Tarakeswar, then known by the name of Jote-Savaran, he observed that several kine entered deep into the jungle with udders full of milk but returned with empty ones. Anxious to discover the same, one day followed a kine and saw it discharging its milk at a stone having a hole on the surface."

একদা কপিলা যায় চরিবারে বন।
তার পিছে পিছে করে মুকুন্দ গমন॥
কপিলা ক্রমেতে যায় বনের ভিতর।
ধীরে ধীরে উপনীত যেখানে পাথর॥
আড়ালে মুকুন্দ থাকি করে দরশন।
পাথরের কাছে করে কপিলা গমন॥
বাঁট হৈতে দুগ্ধধারা পাথর উপরে।
কপিলা ফেলিছে তাহা অনর্গল ধারে॥
বুঝিল মুকুন্দ ইহা, পাথর ত নয়।
নিশ্চয় অনাদি লিঙ্গ শিব দয়াময়॥

ভারামল্ল রাজা বিষ্ণুদাসকে উক্ত শিলার সম্বন্ধে বলিলে তিনি রামনগরে উহাকে তুলিয়া আনিবার বন্দোবস্ত করেন এবং একদিন পঞ্চাশ হাত খনন করিয়া উহার মূল প্রাপ্ত না হওয়ায় খননকার্য পরদিনের জন্য স্থগিত থাকে। সেই রাত্রে রাজা বিষ্ণুদাস স্বপ্নে দেখিলেন যে, তারকনাথ যেন তাহাকে বলিতেছেন যে, আমি তারকেশ্বর শিব, কেহ আমাকে তুলিতে পারিবে না; কারণ গয়া গঙ্গা কাশী পর্যন্ত আমার প্রসার আছে। তুমি আমায় তুলিবার চেষ্টা করিও না, বরং এই স্থানেই আমার মন্দির তারকেশ্বরের মন্দির উক্ত স্থানেই নির্মাণ নির্মাণ করিয়া দাও। অতঃপর উভয় ভ্রাতা করিয়া দেন, পরবর্তীকালে মন্দির ভগ্ন হইলে বর্ধমানের মহারাজা মন্দির পুনঃনির্মাণ করিয়া দেন।

এই সম্বন্ধে সহদেব গোস্বামী 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহার কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইলঃ—

তারকেশ্বর শিব আমি কাননে বসতি।
অবনী ভেদিয়া বাছা আমার উৎপত্তি॥
অকারণ দুঃখ পায়া মোরে কেন খোঁড়।
গয়াগঙ্গা বারাণসী আদি মোর জড়॥

ভারামল্ল দেবতার সেবার জন্য এক হাজার তেইশ বিঘা জমি অর্পণ করেন এবং মুকুন্দরাম ঘোষের উপর যাবতীয় সেবার ভার অর্পিত হয়। মুকুন্দরাম তারকেশ্বরের প্রথম মোহান্ত; অনেকে ভারামল্লকে প্রথম মোহান্ত বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহা ভ্রমাত্মক। তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া অরণ্যের মধ্যে যোগ সাধনা করিতেন বলিয়া মুকুন্দের উপর দেব সেবা এবং মন্দির পরিচালনার ভার অর্পণ করা হয়। মুকুন্দরাম ইহার অল্পদিন পরেই দেহত্যাগ করেন এবং তাঁহার ভৌতিক দেহ মন্দিরের পূর্বদিকে সমাহিত করা হয়। ভারামল্লের জীবদ্দশাতেই মুকুন্দ গতাসু হন এবং নূতন মোহান্ত তাঁহার নির্দেশানুসারে নিযুক্ত হন। ভারামল্ল প্রথম মোহান্ত হইলে মুকুন্দের দেহরক্ষার পর তিনিই মোহান্ত থাকিতেন; নূতন মোহান্তের কোন প্রয়োজন হইত না।

Vishnu Das had a brother who having given up all worldly things, wandered about as a beggar near Vishnu Das's Palace (Hunter's Statistical Account of the Hooghly District).

তারকেশ্বরের আবির্ভাব সংবাদ সমগ্র বঙ্গ-দেশে প্রচারিত হইল এবং বঙ্গের নানা স্থান হইতে যাত্রিগণ জোত সভারাম নামক স্থানে সমাগত হইতে লাগিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই এই স্থান তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইল। তারকেশ্বর জাগ্রত দেবতা বলিয়া খ্যাত এবং শত সহস্র নরনারী এই স্থানে 'হত্যা' দিয়া দুঃসাধ্য ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলেন। অদ্যাপি বঙ্গবাসী ইহার নামে ভীত হইয়া থাকেন। প্রাচীনকালে যাতায়াতের বিশেষ অসুবিধা ছিল এবং যাত্রিগণকে বৈদ্যবাটী হইতে হাঁটিয়া যাইতে হইত বলিয়া বৈদ্যবাটীতে বাংলো নির্মিত হয় এবং ইহা বঙ্গের অন্যতম প্রাচীনতম বাংলো। (Rural Annals of Bengal) কলিকাতা হইতে তারকেশ্বরের দূরত্ব মাত্র ছত্রিশ মাইল; এই পথ হাঁটিয়া যাইবার সময় বহু যাত্রী দুর্দান্ত দস্যুদল কর্তৃক আক্রান্ত হইত এবং তাহাদের সর্বস্ব লুণ্ঠিত হইত। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে শেওড়াফুলি হইতে তারকেশ্বর পর্যন্ত নূতন রেলপথ নির্মিত হওয়ায় যাত্রিগণের দুঃখের লাঘব হইয়াছে।

তারকেশ্বরে দুঃসাধ্য রোগীর আরোগ্যলাভ সম্বন্ধে সরকারী গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে, নিম্নে তাহা উল্লিখিত হইলঃ

As time went on this temple fell into decay and over it the present one was built at the expense of the Burdwan Raja. People of all classes excepting the Mahomedans have from the very earliest days of the temple resorted to it for the cure of their diseases and lay prostrate before the divine image with a view to die of starvation at His feet if no remedy is suggested to them.

তারকেশ্বরের মন্দিরের পার্শ্বে পুষ্করিণীতে যে যাহা মনে করিয়া স্নান করিবে, তাহার সেই মনস্কামনা সিদ্ধ হয় বলিয়া, এই পুষ্করিণী "সিদ্ধপুকুর" বলিয়া খ্যাত। মুকুন্দ ঘোষের প[illegible] জগন্নাথ গিরি তারকেশ্বরের মোহান্ত পদে ব[illegible] হন; তিনি চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ তীর্থে যাইতে ছিলেন, পথিমধ্যে শুনিতে পাইলেন [illegible] রামনগরে অনাদি লিঙ্গের আবির্ভাব হইয়াছে চন্দ্রনাথও শৈবতীর্থ, তথায় যাইবার পূ[illegible] তিনি এই লিঙ্গের পূজা সমাপন করি[illegible] যাইবেন স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু এক বৃ[illegible] ব্রাহ্মণ আসিয়া তাহাকে যাইতে নিষেধ করে[illegible] এবং বৈশাখী পূর্ণিমা পর্যন্ত তাহা[illegible] তারকেশ্বরে থাকিতে অনুরোধ করেন। বৃদ্ধে[illegible] কথামত তিনি এই স্থানে থাকিয়া যান এ[illegible] বৈশাখী পূর্ণিমায় মুকুন্দরাম দেহরক্ষা করে[illegible] অতঃপর ভারামল্লের নির্দেশানুযায়ী তিনি [illegible] সেবক নিযুক্ত হন। তিনিই তারকেশ[illegible] মোহান্তদের পদ্ধতিতে পূজার প্রবর্তন করে[illegible]

হুগলী জেলার শেয়াখালার অন্ত[illegible] পাতুল-সন্ধিপুর নিবাসী গোবর্ধন রা[illegible] বর্তমান তারকেশ্বরের মন্দির নির্মাণ ক[illegible] দেন। বর্ধমানের মহারাজা কর্তৃক নি[illegible] মন্দিরটি ছোট ছিল বলিয়া যাত্রিগণের বি[illegible] অসুবিধা হইত; গোবর্ধন রক্ষিত ছোট মন্দি[illegible]

উপর বর্তমান বৃহৎ মন্দিরটি নির্মাণ করেন। মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলে দুইটি মন্দিরই দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে বালিগড়ের মহারাজা চিন্তামণি দে, দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্তি পাইয়া মন্দিরের সম্মুখস্থ নাটমন্দির নির্মাণ করিয়া দেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাধর সেন 'সিদ্ধপুকুরের' ঘাট বাঁধাইয়া দেন এবং ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে পূর্বোক্ত চিন্তামণি দে, তারকেশ্বরের বাজার এবং রাস্তাঘাট পাথর দিয়া বাঁধাইয়া দেন। বর্তমানে মারোয়াড়ী সম্প্রদায়ও যাত্রীদের সুবিধার জন্য কয়েকটি যাত্রি-নিবাস নির্মাণ করিয়াছে।

রাজা ভারামল্ল রায় প্রদত্ত তারকেশ্বরের সেবার জন্য ছাড়পত্রটি তারকেশ্বরের মোহান্তের প্রসিদ্ধ মামলার পেপার-বুক হইতে শ্রীজহরলাল বসু তাঁহার "বাঙলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে" প্রথম বাঙলা গদ্যের নমুনা হিসাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন; নিম্নে উক্ত ছাড়পত্রটি উদ্ধৃত হইল :

শ্রীশ্রীরাম

স্বস্তি সকল মংগলময় শ্রীশ্রী তারকেশ্বর ঠাকুর চরণ যুগলেষু—

দেবত্তর জমি পত্রহ মিদং কার্য্যনঞ্চাগে পরগণে বালিগড়ি ও সেনাবাগ দীঃ গ্রাম জোতশমন, ভত্তাপুর, নাগাদী সাহাপুর—এই সকল গ্রাম সেবার কারণ—জমি শালীশুনা হর্দ্দ মহদুদ দৌড় জাত জোত করিতে পার তাহা জোত করিবে—সেবাত শ্রীযুত মায়াগির ধুম্রপান মোহন্তীকে নিযুক্ত থাকিয়া ক্রিয়া যোতায়া শ্রীশ্রী সেবা করহ এ সকল জমির রাজস্ব সহিত দায় নাস্তি। ইতি সন ৭৮৫ সাল, ১০ই চৈত্র।

(স্বাক্ষর) শ্রীরাজা ভারামল্ল রায় (নাগরীতে)

তারকেশ্বরের মোহান্তগণ দশনামা সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারীরূপে দেব সেবা করিবেন ইহাই ভারামল্ল নির্দেশ দিয়া যান। তাহারা বিবাহ করিয়া সংসার করিতে পারিবেন না এবং মোহান্ত গতাসু হইলে, তাহার প্রধান শিষ্য মোহান্ত পদে অভিষিক্ত হইবেন, ইহাই চিরাচরিত প্রথা ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় বহু মোহান্ত সন্ন্যাসধর্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, স্ত্রী সংসর্গের দ্বারা কদাচারে নিযুক্ত হইয়া উক্ত পদের অমর্যাদা করেন। ধর্মের আবরণে মোহান্তগণ যে অধর্মের খেলা খেলিতেন, দরিদ্র প্রজাগণ সে অনাচারের প্রতিকারের চেষ্টা করিতে কোনদিন সাহসী হয় নাই। ১৩৩১ সালে স্বামী বিশ্বানন্দ নামক এক সন্ন্যাসী সর্বপ্রথম এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া প্রহৃত হন, কিন্তু তিনি তাহাতে ভীত না হইয়া স্বামী সচ্চিদানন্দের সহযোগিতায় দ্বিগুন উৎসাহে ইহা লইয়া আন্দোলন করেন। অতঃপর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় তারকেশ্বরের যাবতীয় ব্যাপার নিজহস্তে গ্রহণ করিয়া সুভাষচন্দ্র বসুর সহযোগে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করেন; ফলে তারকেশ্বরের সম্পত্তি সর্ব-সাধারণের সম্পত্তি বলিয়া আদালত হইতে সিদ্ধান্ত হয় এবং মোহান্তের প্রধান শিষ্য মোহান্তের 'গদি' প্রাপ্ত হইবেন, এই প্রথার বিলোপসাধন হয়।

পূর্বে প্রথানুযায়ী চতুর্দশ ব্যক্তি তারকেশ্বরের মোহান্ত হইয়াছিলেন নিম্নে তাঁহাদের নাম লিখিত হইল:

(১) মুকুন্দরাম ঘোষ, (২) জগন্নাথ গিরি, (৩) কমললোচন গিরি, (৪) শম্ভুচন্দ্র গিরি, (৫) গোপালচন্দ্র গিরি, (৬) রাধাকান্ত গিরি, (৭) গঙ্গাধর গিরি, (৮) প্রসাদচন্দ্র গিরি, (৯) পরশুরাম গিরি, (১০) শ্রীমন্ত গিরি, (১১) রঘুচন্দ্র গিরি, (১২) মাধবচন্দ্র গিরি, (১৩) সতীশচন্দ্র গিরি, (১৪) প্রভাতচন্দ্র গিরি।

যাত্রীদের বিশ্রামাগার : অদূরে ক্রুশ চিহ্নিত স্থানে মন্দির দেখা যাইতেছে

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে তারকেশ্বরের মোহান্ত শ্রীমন্ত গিরির ফাঁসি হয়; এই সম্বন্ধে 'সমাচার দর্পণ' পত্রে যে দুইটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইলঃ

"তারকেশ্বরের মহন্তের পুণ্য প্রকাশ—শুনা গেল যে তারকেশ্বর নিবাসী শ্রীমন্ত গিরি সন্ন্যাসী স্বীয় ধর্ম কর্ম সংস্থাপনার্থ এক বেশ্যা রাখিয়াছিলেন, তাহাতে জগন্নাথপুর নিবাসী রামসুন্দর নামক এক ব্যক্তি গোপের ব্রাহ্মণ ঐ বেশ্যার সহিত কি প্রকারে প্রসক্তি করিয়া ছদ্মভাবে গমনাগমন করিত। পরে সন্ন্যাসী তাহা জানিতে পারিয়া ২ চৈত্র [১২৩০] শনিবার রাত্রিযোগে সন্ধানপূর্বক হঠাৎ যাইয়া বেশ্যাকে কহিল যে একটু পানীয় জল আন আমার বড় পিপাসা হইয়াছে, তাহাতে বেশ্যা জল আনিতে গেলে সন্ন্যাসী সময় পাইয়া ঐ ব্রাহ্মণের বক্ষঃস্থলের উপর উঠিয়া তাহার উদরে এমত এক ছোরার আঘাত করিল যে, তাহাতে তাহার মঙ্গলবারে প্রাণ-বিয়োগ হইল পরে তথাকার দারোগা এই সমাচার শুনিয়া ঐ সন্ন্যাসীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে এইমাত্র শুনা গিয়াছে। (১৬ই চৈত্র ১২৩০)

ফাঁসি—পূর্বে প্রকাশ করা গিয়াছিল যে, তারকেশ্বরের শ্রীমন্তরাম গিরি এক বেশ্যার উপপতিকে খুন করিয়া ধরা পড়িয়াছিলেন, তাহাতে জিলা হুগলীর বিচারকর্তারা তাহাকে বিচারস্থলে আনাইয়া বারংবার জিজ্ঞাসা করাতে প্রাণভয়ে ভীত হইয়া তিনবার অস্বীকার করিলেন, কিন্তু ধর্মস্য সুক্ষ্মা গতিপ্রযুক্ত চতুর্থবারে স্বীকার করাতে শ্রীযুক্তেরা বহুতর আক্ষেপপূর্বক ফাঁসি হুকুম দিলেন তাহাতে ১৩ ভাদ্র তারিখে রীত্যনুসারে তাহার ফাঁসি হইয়া কর্মোপযুক্ত ফলপ্রাপ্তি হইয়াছে। (২৮শে ভাদ্র ১২৩১)"

ইহার পর মোহান্ত মাধব গিরি এলোকেশী নামক এক মহিলার সতীত্বনাশের অপরাধে কারাদণ্ডভোগ করেন; তাহার কারাবাসকালে তদীয় শিষ্য শ্যাম গিরি তাহার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি কারাগার হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া মোহান্তের গদিতে পুনরায় বসিতে চেষ্টা করিলে, শ্যাম গিরি আপত্তি করেন এবং উত্তর-পাড়ার মুখোপাধ্যায়গণও মাধব গিরির মোহান্ত হওয়াতে আপত্তি করেন, কিন্তু তিনি মোহান্তের গদি লইয়া মামলা করেন এবং নিজ পক্ষ সমর্থনকালে আদালতে বলেন, 'যেহেতু আমি দশনামা সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ভুক্ত, সেইহেতু আমার পরনারী গমনে কোন বাধা নাই; আমি ফৌজদারী জেল খাটিয়া আসিয়াছি, এইজন্য আমার মোহান্ত পদে পুনরায় বসিতে কোন

বাধা নাই।" এই মামলায় মাধব গিরি জয়ী হন।

মোহান্ত মাধব গিরির আচরণের কথা সমগ্র বঙ্গদেশে প্রচারিত হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় পুণ্যতীর্থে কুলবধূর সতীত্বনাশের পরও বঙ্গবাসী লম্পট মোহান্তকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হয় নাই। তৎকালে এই ব্যাপার লইয়া বহু নাটক, উপন্যাস এবং গান রচিত হয়। নিম্নে একটি গান উদ্ধৃত হইলঃ

মোহান্তের তেল নিবি যদি আয়।
ঐ তেল তৈয়ার হচ্ছে, হুগলীর জেলখানায়॥
যার পতি বিদেশে
তেল নিলে সে এক পিপে,
তেলের গুণে, মনের টানে,
পতি তার ঘরে ফিরে আসে।

মোহান্ত সতীশ গিরির সময়ে, তাহার অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া অনাচারী মোহান্তকে বিদূরিত করিবার জন্য সর্বপ্রথম স্বামী বিশ্বানন্দ এবং পণ্ডিত ধরানাথ ভট্টাচার্য আন্দোলন করেন। তারকেশ্বর মন্দির দেশবাসীর সম্পত্তি, মোহান্তের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে; সুতরাং তাহা পুনরুদ্ধারের জন্য সত্যাগ্রহ করা স্থির হয় এবং স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নিকট, কংগ্রেস যাহাতে সত্যাগ্রহের যাবতীয় ভার গ্রহণ করে তদ্বিষয়ে আবেদন করেন। তারকেশ্বরের ব্যাপার অনুসন্ধান করিবার জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি একটি 'অনুসন্ধান সমিতি' গঠন করেন এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, ডাঃ জে এম দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায়, পণ্ডিত ধরানাথ ভট্টাচার্য, শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং মৌলানা আক্রাম খাঁ উক্ত সমিতির সভ্য নির্বাচিত হন। ১৩৩১ সালে সিরাজগঞ্জ কনফারেন্সে কংগ্রেস সত্যাগ্রহের ভার গ্রহণ করে এবং মৌলানা আক্রাম খাঁ কার্য করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় ডাঃ প্রতাপচন্দ্র গুহরায়ের উপর কংগ্রেসের পক্ষে ভার প্রদান করা হয়।

স্বামী সচ্চিদানন্দ, স্বামী বিশ্বানন্দ, চিররঞ্জন দাস প্রভৃতি শতসহস্র যুবক তারকেশ্বরে সত্যাগ্রহ করিয়া কারাবরণ করেন। ২৭শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ সাল হইতে দেশবন্ধুর নেতৃত্বে চারি মাস যাবৎ এই সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলিবার পর, পরিশেষে মোহান্ত সতীশ গিরি বিতাড়িত হয় এবং প্রভাতচন্দ্র গিরি গদিতে বসেন। শ্রীযুক্ত ধরণীধর সিংহরায় প্রমুখ সাতজন ব্যক্তি মোহান্তের বিরুদ্ধে এক মামলা উপস্থিত করেন; কিন্তু মোহান্তের ভয়ে তাহার বিরুদ্ধে কেহই প্রথমে সাক্ষ্য দিতে রাজি হন নাই। শ্রীপতি হাজরা ও উমাপদ মোদক সর্বাগ্রে মোহান্তের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেন এবং তীর্থবাসী সিংহরায়ের নিকট হইতে মোহান্ত তাহার স্ত্রীকে চান বলিয়া তিনিও সাক্ষ্য দেন। পরিশেষে সত্যের জয় হয় এবং তারকেশ্বরের সম্পত্তি দেশবাসীর হস্তে আসে। বর্তমানে একটি কমিটি কর্তৃক মন্দির পরিচালিত হয় এবং মোহান্তের যোগ্যতা দেখিয়া হুগলীর ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয় শ্রীযুক্ত দণ্ডীস্বামীকে মোহান্ত নিযুক্ত করিয়াছেন। সম্পত্তি পরিচালনের জন্য পরিচালক সমিতি যে ব্যবস্থা করিবেন মোহান্ত তাহাই মানিয়া লইবেন এবং মোহান্তের পরিচালনে বা প্রজাবর্গের উপর যদি কোন অত্যাচার হয়, তাহা হইলে পরিচালনা সমিতি যথাকর্তব্য নির্ধারণ করিবেন এবং প্রয়োজন হইলে তাঁহারা মোহান্তকে বিতাড়িত করিয়া নূতন মোহান্তও নিয়োগ করিতে পারিবেন!

ভারামল্ল তারকনাথের সেবার জন্য যে বৃহৎ জমিদারী দিয়া যান, তাহার বার্ষিক আয় প্রায় দেড়লক্ষ টাকা; এতদ্ভিন্ন স্থাবর সম্পত্তি হইতে কুড়ি হাজার টাকা এবং যাত্রীদের দেয় প্রণামী হইতে প্রায় পঁচিশ হাজার টাকার উপর আয় হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ বিশ বৎসর যাবৎ নব-পরিচালনায় তারকেশ্বরের রাস্তাঘাটের বা ষ্টেশন হইতে মন্দির পর্যন্ত দুই পার্শ্বের কুটিরগুলির কোন উন্নতি হয় নাই। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে তারকেশ্বরের যে অবস্থা ছিল, আজও ঠিক সেইরূপই আছে। দেবতার সেবার জন্য পূর্বে পাঁচ হাজার টাকা মাসিক ব্যয় হইত, বর্তমানে উক্ত ব্যয় কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেবোত্তর সম্পত্তি হইতে সংস্কৃত টোল এবং একটি হাসপাতাল পরিচালন করা হয়। পল্লীসংস্কার দেশবন্ধুর শেষ জীবনের কামনা ছিল, কিন্তু অকালে লোকান্তরিত হওয়ায় তাঁহার সে আশা পূর্ণ হয় নাই। হয়ত দেশবন্ধু আর কিছুদিন জীবিত থাকিলে আমরা তারকেশ্বরের অন্য রূপ দেখিতাম। যাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় তারকেশ্বরের পরিচালনভার হস্তান্তরিত হইয়াছে, তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনায় যদি পরিচালকগণ এবং মোহান্ত মহারাজ তারকেশ্বরকে একটি আদর্শ পল্লীগ্রামে পরিণত করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার আশীষ পাইয়া দেশবাসী ধন্য ও কৃতার্থ হইবে।

পরিশেষে মহালিঙ্গার্চন নামক গ্রন্থে বঙ্গদেশের শৈবতীর্থ এবং তারকেশ্বর সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহা উল্লেখ করিয়া বর্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।*

ঝাড়খণ্ডে বৈদ্যনাথো বক্রেশ্বরস্তথৈবচ।
বীরভূমৌ সিদ্ধিনাথো রাঢ়ে চ তারকেশ্বর॥
ঘণ্টেশ্বরশ্চ দেবেশি রত্নাকর নদীতটে।
ভাগীরথী নদীতীরে কপালেশ্বর পরিত॥
ভদ্রেশ্বরশ্চ দেবেশি কল্যানেশ্বর ত্রবাহ।
নকুলেশ্বর কালীঘাটে শ্রীহট্টে হাটকেশ্বর॥

---

* প্রবন্ধান্তর্গত চিত্রগুলি শ্রীমতী অনুপমা দেবীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

আজি স্তব্ধ প্রবাস সন্ধ্যায়

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

আজি স্তব্ধ প্রবাস সন্ধ্যায়
যে কথা বলিতে চাই সে কথাটি হায়
লুপ্ত হয়ে গেছে কোথা; তাই এ নিমেষে
মোর যত ব্যাকুলতা তোমার উদ্দেশে
দিনু তারে সমর্পিয়া; মৌনতার বাধা
হয়ত বুঝিয়া তারে দিবে বা মর্যাদা।

আজি শান্ত প্রবাস প্রদোষে
আমি ভাবিতেছি যেথা দূরে আছ বসে
সেথা কি স্মরিছ মোরে; পাছে হেথাকার
যে মূক ব্যথার শান্তি নিঃশব্দ আঁধার
ছড়ায় অম্বর তলে তা করে করুণ
তোমার আকাশখানি উজ্জ্বল অরুণ।

আজি পূর্ণ প্রবাসের সাঁঝে
জীবনে যা কিছু সত্য ঐশ্বর্য বিরাজে
সবি যেন পাও তুমি, দীনতার দান
ডুবে থাক এ আঁধারে, আনন্দ সন্ধান
নিও গানে নবরূপে; যা কিছু পুরাণো
আমার থাকুক তাহা বেদনা ঝরানো।

অশ্বত্থের অভিশাপ

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

তৃতীয় খণ্ড

(১)

ইতিহাস পাঠে পাঠকের চিত্তে একটি বৃহৎ বিভ্রান্তি দেখা দেয়। ইতিহাস কি? রাজা মহারাজা সম্রাট সেনাপতিদের নামমালা/ কিন্তু সংসার তো কেবল ইঁহাদের লইয়াই নয়। কোন ইতিহাসের পাতায় কোনকালে যাহাদের নাম উঠিল না, সেই অকিঞ্চনের দলই যে সংসারের পনেরো আনা। ঐতিহাসিকগণ এই পনেরো আনার সন্ধান রাখেন না, তাঁহারা এক আনার সন্ধানী। মানুষের ইতিহাস যে মানুষকে তৃপ্তি দিতে পারে না সে তো এই কারণেই, তাই সে ইতিহাস ফেলিয়া সাহিত্যের আসরে আসে। ইতিহাস যদি কখনো ষোল আনার ব্যাপারী হইয়া ওঠে, তখন ইতিহাসে আর বিতৃষ্ণা থাকিবে না, কিম্বা তখন ইতিহাসও সাহিত্য সমর্থক হইয়া উঠিলে তাহাদের বর্তমান ভেদ ঘুচিয়া যাইবে।

পলাশীর যুদ্ধ একটি বৃহৎ ঘটনা, কিন্তু তাহার ইতিকথা কি লিখিত হইয়াছে? ঐতিহাসিক বলিবেন লিখিত হইয়াছে বই কি! তিনি খানকতক পুস্তকের নাম করিবেন। বইগুলি ইতিহাস বলিয়া যে পরিজ্ঞাত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেদিনকার সেই অকস্মাৎ বৃষ্টি ঘন আষাঢ় মাসের সন্ধ্যায় বৃদ্ধ কৃষাণ ক্ষেত হইতে ফিরিয়া আসিয়া, স্কন্ধ হইতে লাঙলটি নামাইয়া রাখিতে রাখিতে তাহার পত্নীকে পলাশীর যুদ্ধ সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছিল তাহা যদি জানিতে পারিতাম তবেই পলাশীর যুদ্ধের সত্যরূপ অর্থাৎ পূর্ণরূপ যথার্থ জানা হইত। সেদিনকার মেঘের গর্জন ও কামান গর্জন তাহার মনে যে ভীতি বিস্ময় বিহ্বলতার ভাব জাগ্রত করিয়া দিয়াছিল, আধিদৈবিকে ও আধিভৌতিকে যে অপ্রত্যাশিত মিলন ঘটাইয়া দিয়াছিল, তাহার প্রতিক্রিয়া না জানা অবধি পলাশীর ইতিহাস অসম্পূর্ণ।

কুরুক্ষেত্রের ইতিহাসের কথাই কি জানি? বেদব্যাস ও কৃষ্ণার্জুনের সদয় সহযোগিতা সত্ত্বেও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কতটুকু জানি? অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর কিছু কিছু সংবাদ পাই বটে, কিন্তু এই অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীকে কেন্দ্র করিয়া অষ্টাদশাধিক অক্ষৌহিণী নরনারী বালবৃদ্ধবণিতার যে অতি বৃহৎ সংসার তাহার কাহিনী কোথায়? কুশপত্তনের যে বালক দেখিল একদিন প্রভাতে তাহার পিতা অভ্যস্ত সময়ে হলস্কন্ধে করিয়া পরিচিত শস্যক্ষেত্রের দিকে না গিয়া অসি বর্ম-ধারণ করিয়া অজ্ঞাত দিগন্তের অভিমুখে যাত্রা করিল, তখন তাহার বালকচিত্তে অব্যক্ত আকারে যে বিপদের পূর্বাভায সূচিত হইয়া উঠিয়াছিল মহাকবির ভারতব্যাপী চিত্র পটে তাহার ইঙ্গিত কোথায়?

জনসাধারণ ইতিহাসের উপেক্ষিত। ময়ূর সিংহাসনের বিচিত্র বর্ণকলাপ তাহাকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। তাই ইতিহাসের খাস দরবার ছাড়িয়া উপেক্ষিত জনসাধারণ কাব্যের আম-দরবারে সমুপস্থিত, সেখানে ঠাসাঠাসি হইলেও সকলেরই বসিবার স্থান আছে, আর যে দুর্ভাগা নিতান্তই বসিতে পাইল না, দাঁড়াইয়া থাকিতে তাহার কোন বাধা নাই। ইতিহাসের শিল্পকলা গবাক্ষ আলোর এক-দেশদর্শী কিরণচ্ছটা, রাজন্যের উষ্ণীষ ও সামন্তের তরবারি ব্যতীত আর কিছু তাহা প্রকাশ করে না। কাব্যের শিল্পকলা পৌর্ণ-মাসীর আলোক-প্লাব। সূর্যের আলোর মতো তাহা প্রত্যক্ষ-ভাস্বর নয়, আলোছায়াতে জড়িত, কিন্তু ওই ছায়াই কি প্রমাণ করিয়া দেয় না যে একটা বস্তু আছে। জনসাধারণ সেই বাস্তব।

ইতিহাসের রত্ন পালঙ্কে সযত্ন লালিত রাজকুমারী থাকুন তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু মর্মর মণি-কুট্টিমে সখীদের রক্ত চরণের প্রতিফলন হইতে আপত্তি কেন? সখীর অস্তিত্ব ও সংখ্যা তো রাজপুত্রীর মাহাত্ম্যেরই প্রকাশ। আবার কক্ষপ্রাচীরে শিল্পীর তুলিকাসঞ্জাত নৈসর্গিক দৃশ্যাবলীর প্রতিই বা ঐতিহাসিক এত অকরুণ কেন? এই তিনে মিলিয়াই তো রাজপুত্রীর সম্যক ইতিহাস। একা রাজপুত্রী আপনার ভগ্নাংশ। ইতিহাসের নায়কদের ঘিরিয়া আছে অজ্ঞাতনামা জনসাধারণ, আবার এই দুইকে ঘিরিয়া আছে বিশ্ব প্রকৃতি, আর এই তিনে মিলিয়া মানুষের ইতিহাস।

২

ভোর হইতেই পুকুরপারের প্রজাগণ ছ'আনির বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। পুরুষেরা কাছারির উঠানে সমবেত হইল আর মেয়েরা ছেলেমেয়েদের লইয়া অন্তঃপুরের আঙিনায় গিয়া প্রবেশ করিল। তাহাদের জিনিসপত্রের অধিকাংশই পুড়িয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, সামান্য যা কিছু রক্ষা পাইয়াছিল সে সব পুকুর পারে এক স্থানে স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়া রহিল। কয়েক ঘণ্টার উত্তপ্ত অভিজ্ঞতায় তাহাদের চেহারা ও মুখের ভাব পঙ্গ-পালে-খাওয়া ক্ষেতের মত শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছিল।

বৃদ্ধ রঘু দাস কাছারির বারান্দায় হতাশ-ভাবে বসিয়া নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া যাইতেছে। তাহার একটা মুদ্রা দোষ ছিল গলার কণ্ঠী মালাটাকে আঙুল দিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেওয়া। শেষ রাত্রের তাড়া-হুড়ায় বেচারার কণ্ঠী ছিঁড়িয়া গিয়াছে, তাহার শীর্ণ অঙ্গুলি শূন্য কণ্ঠ বারংবার স্পর্শ করিতেছিল। অভ্যস্ত অভ্যাসের অভাবেই হোক আর রাত্রির অভিজ্ঞতার ফলেই হোক তাহার কণ্ঠস্বর অতিশয় ক্ষীণ। সে বলিতেছিল—দশানির কর্তা কতবার আমাকে ডাকিয়ে নিয়ে বলেছেন, রঘু তোরা উঠে আয়, তোদের জমি জিরেৎ দেবো, ঘরবাড়ী তৈয়ার করবার টাকা দেবো, সমস্ত ক্ষতিপূরণ করে দেবো। আমি বলেছি কর্তা মাপ ক'রো, ওটা পারবো না। দশানির কর্তা যে এমন ক'রে শোধ নেবে তা ভাবিনি। তাহার শ্রোতারা সকলেই ভুক্তভোগী, চিন্তা করিবার শক্তিও যেন তাহাদের লোপ পাইয়াছিল, তাহারা কোন উত্তর করে না, চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।

বৃদ্ধ রঘু দাস বলে, আমি ভোর রাত্রে উঠে কল্কের টীকে জ্বালিয়ে কেবল ফুঁ দিতে আরম্ভ করেছি, এমন সময়ে বাদালিদের বাড়ির দিকে দেখি কেমন যেন ধোঁয়া উঠছে। তারপরেই সর্বনাশ দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ল।

তারপরে কপালে হাত ঠেকাইয়া আপন মনে বলে—'অল্প পাপে চুরি, অনেক পাপে পুড়ি।' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলে—সব গেলো।

অন্তঃপুরের দৃশ্য ঠিক ইহার বিপরীত। মেয়ের সংখ্যা বাহির বাড়ির পুরুষদের চেয়ে বেশী নয়, কিন্তু কোলাহলের গাম্ভীর্যে তাহারা হাট বসাইয়া দিয়াছে। সকলেই কথা বলিতে

চায়, সকলেই অপরের আগে কথা বলিতে চায়, কেহ যে কাহারো কম নয়, তাহার ক্ষতিই যে সকলের অধিক প্রমাণ করিতে চায়, ফলে দুর্বোধ্য একটা হলহলার সৃষ্টি হইয়াছে। কেবল বিনোদিনী নীরব, সে শিশু পুত্রটিকে কোলে করিয়া একান্তে বসিয়া আছে। কিন্তু এই গোলমালের মধ্যে সবচেয়ে বেশী করিয়া চোখে পড়ে, বাদলির হাসি। বাদলি গোয়ালাদের মেয়ে, বয়স চোদ্দ পনেরো হয়তো খুব বেশী, পাৎলা শরীর, নাকটা ঈষৎ চেপ্টা, চুল কুঞ্চিত, একটা ডুরে শাড়ি আচ্ছা করিয়া কোমরে জড়াইয়া পরা তাহার অভ্যাস। অশথের পাতা যেমন একটু বাতাসের আভাস পাইবামাত্র কাঁপিতে থাকে, তেমনি অল্প কারণে এমন কি অকারণে হাসিয়া ওঠা তাহার অভ্যাস। আগুন লাগিলে সবাই যখন হায় হায় করিতেছিল তখনো তাহার হাসি থামে নাই। আজও তাহার হাসি থামিতে চাহিতেছে না। একজন বৃদ্ধা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—বাদলি এতো হাসবার কি পেলি। লোকের সর্বনাশ হ'ল আর তোর হাসি যে থামতেই চায় না।

বাদলি বলিল—না হেসে করি কি! তোমরা সবাই এক সঙ্গে কথা বলছ, বৌ-ঠাকরুন বুঝবেন কেমন ক'রে? এই বলিয়া সে মুক্তামালাকে দেখাইয়া দিল। মুক্তামালা নিকটেই বসিয়াছিল, কিন্তু এতক্ষণের চেষ্টাতেও জনতার সম্মিলিত বাক প্রচেষ্টার বিশেষ কিছুই সে বুঝিতে পারে নাই। নিজের কথা যে নিরর্থক নয় ইহাই প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে বাদলি বলিল—তাই নয় বৌ-ঠাকরুন?

মুক্তামালা কিছু বলিল না, শুধু হাসিল। অনেকক্ষণ পরে এই সে প্রথম হাসিল। শেষ রাত্রের অভিজ্ঞতার পরে তাহার মনের উপর একটা ধূম্র পর্দা পড়িয়া গিয়াছিল। বাদলির হাসিতে তাহার একটা প্রান্ত ঈষৎ উন্নীত হইল।

সকলেই বৌ-ঠাকরুনকে নিজের দুঃখটাই সবচেয়ে অসহ্য এই কথাই বুঝাইবার প্রয়াস করিতেছিল, এবারে কেমন যেন তাহাদের সন্দেহ হইল এতক্ষণের প্রয়াস সফল হয় নাই। তাই তাহারা উঠিয়া আসিয়া মুক্তামালাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

বাদলি বলিল—হাঁ, এবারে সবাই মিলে বৌ-ঠাকরুনকে ঠেসে ধরে দম বন্ধ করে দিয়ে মেরে ফেলো, তাহলেই চমৎকার হয়। এই বলিয়া হী হী করিয়া হাসিয়া উঠিল।

দুঃখে মানুষকে কাতর করিয়া ফেলে, কিন্তু তাহার দুঃখ কেহ বুঝিতেছে না এই বোধ মানুষকে অনেক সময়ে কঠিন করিয়া তোলে। বাদলির হাসিতে বিরক্ত হইয়া একজন বৃদ্ধা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, আমাদের হাসবার সময় কই? আমাদের যে সর্বনাশ হ'য়ে গিয়েছে।

বাদলি বলিল—সর্বনাশ তো হয়েইছে—কাঁদলে কি সব ফিরে আসবে?

পূর্বোক্ত বৃদ্ধা বলিল—হাসলেই কি সব ফিরে পাবে?

অপর একজন বলিল—পাবে গো পাবে, তেমন ক'রে হাসতে পারলে ফিরে পাওয়া যায়।

তাহার উক্তিতে অনেকেই হাসিয়া উঠিল, বাদলিও হাসিল।

বৃদ্ধাটি বলিল—আবার হাসি দেখো না! লজ্জার মাথা খেয়েছে।

স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, বাদলির জীবন-চরিতের কোন একটা ঘটনাকে লক্ষ্য করিয়া কথাগুলি বলা হইল, এবং ঘটনাটি সকলের অপরিজ্ঞাত নয়। সকলেই ভাবিয়াছিল লজ্জিত বাদলি হাসি থামাইবে, কিন্তু আশানুরূপ ফল ফলিল না।

নবীন ও মুক্তামালার চেষ্টায় দুর্গত প্রজাদের একটা সাময়িক বন্দোবস্ত হইয়া গেল। পুরুষেরা কাছারি বাড়িতে, মেয়েরা অন্দর মহলের একটা অংশে স্থান পাইল। তাহাদের ঘরবাড়ি জমিদার পক্ষ হইতে তৈয়ারী করিয়া দিবার ব্যবস্থা হইল এবং তাহা যাহাতে শীঘ্র হয় সে বিষয়ে নবীন নারায়ণ দৃষ্টি রাখিল।

মেয়েরা তাহাদের নির্দিষ্ট মহলে যাইবার সময়ে মুক্তামালা বাদলিকে বলিল—বাদলি, তুই আমার কাছে থাক।

বাদলি হাসিয়া উঠিয়া বলিল—দেখো মতির মা হাসলে কি ফল হয়? তোমরা কাঁদলে জায়গা পেলে কোথায় আর আমি হাসলাম জায়গা পেলাম কোথায়?

মতির মা রাগে গরগর করিতে করিতে বলিল—তুমি অনেক ঘরেই জায়গা পেয়েছ, আরও কত ঘরে জায়গা পাবে।

বাদলি হাসিয়া উঠিল।

মুক্তামালা শুধাইল—কি ব্যাপার রে বাদলি।

বাদলি বলিল—সে এক মজার ঘটনা বৌ-ঠাকরুন, তোমাকে বলবো এক সময়ে। শুনলে তুমিও হাসবে।

৩

পূর্বোক্ত অগ্নিকাণ্ডের পরে গ্রামের প্রজা-সাধারণ জমিদারগণের পক্ষভুক্ত হইয়া গেল। ছ'আনির প্রজাগণ অত্যাচারিত হইয়াছিল, কাজেই তাহারা যে প্রত্যক্ষত জমিদারের পক্ষ গ্রহণ করিয়া নিজেদের বলবৃদ্ধি করিবে ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই, আবার দশানির প্রজাগণ কতকটা বা ভবিষ্যৎ অত্যাচারের আশঙ্কায়, কতকটা বা ছ'আনির প্রজাদের ব্যবহারের প্রতিবাদে নিজ নিজ জমিদারের সহায় হইয়া দাঁড়াইল। গোড়ায় যাহা ছিল দুই শরিকের মধ্যে বিরোধ, প্রজা স্বার্থের সূত্র ধরিয়া অত্যল্পকালের মধ্যে তাহা সমস্ত গ্রামের বিরোধে পরিণত হইল। গ্রামের ইতিহাস অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে ইহাই ছিল স্বাভাবিক, ইহাই যেন গ্রামের বংশগত ধারা। এক সময়ে গ্রামের জমিদার ছিলেন গ্রামজীবনের নায়ক। সুকারণেই হোক আর কুকারণেই হোক আর অকারণেই হোক গ্রামের লোকে জমিদারকেই অনুসরণ করিত। তখন গ্রামের হীনতম ব্যক্তিটি হইতে প্রবলতম ব্যক্তি সমস্বার্থ ও সমবেদনার সূত্রে গ্রথিত ছিল, এক জায়গায় টান দিলে সমস্ত মালাটিতে টান পড়িত, গ্রামের দীনতম প্রজার গায়ে আঘাত লাগিলে সে আঘাত সঞ্চারিত হইয়া জমিদার পর্যন্ত গিয়া পৌঁছিত। এখন সূত্র ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, অক্ষগুটি শতভিন্ন স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়া ইতস্তত ভূলুণ্ঠিত, একটার আঘাত আর অন্যটাতে সঞ্চারিত হয় না। " ইহাই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের স্বর্গ। এখন সকলেই স্ব স্ব প্রধান, সকলেই স্বয়ম্পূর্ণ। 'আমি কাহারো উপরে নির্ভর করি না, আমি কাহারো পরোয়া রাখি না'—অলিখিত অক্ষরের অদৃশ্য এই চাপরাশ বহন করিয়া এখন আমরা সকলে ঘুরিতেছি। বাংলার পল্লী নদীমাতৃক ও জমিদার-পিতৃক। নদী মরিয়া জমিদার ধ্বংস হইয়া বাঙলার পল্লী এখন অনাথ। জমিদারগণের পক্ষ সমর্থন আমার উদ্দেশ্য নয়। কি হইয়াছে তাহা বর্ণনা করা শিল্পীর উদ্দেশ্য, কি হইতে পারিত, বা কি হওয়া উচিত ছিল তত্ত্বজ্ঞ তাহা বিচার করিবেন। বাঙলার পল্লী কোন্ কোন্ অবস্থা সোপান অতিক্রম করিয়া বর্তমান দুর্দশায় আসিয়া সমুপস্থিত তাহাই লিখিতে বসিয়াছি, একটি জমিদার বংশকে উপলক্ষ করিয়া সমস্ত জমিদারদের চিত্র আঁকিতে বসিয়াছি, তদধিক কোন অভিপ্রায় বা জমিদারগণকে সমর্থনের কোন উদ্দেশ্য আমার নাই। বিশেষ, জমিদারদের ধ্বংসের মূলে তাহাদের দুর্বুদ্ধি। তাহারা নিজেরাও ধ্বংস হইল, গ্রামগুলিকেও সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস করিয়া গেল। কিন্তু উভয়ের এই সহমরণেই প্রমাণিত হইয়া যায় যে এক সময়ে উভয়ে সহচর ছিল, সুখদুঃখের, উৎসব ব্যসনের। একই শ্মশানের অন্তিম ক্ষেত্রে উভয়ে আজ ধরাশয্যাশ্রয়ী। এই আত্মতন্ত্রজাত সমাজ-হীন সমাজতন্ত্র, ইহা আর যাহাই হোক, উন্নতি নয়, প্রগতি নয়, ইহা চিত্তের অসাড়তা, মানসিক মৃত্যু। সমবেদনার মহাদেশ লবণাম্বু-রাশির আঘাতে ছিন্নভিন্ন হইয়া আজ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের দ্বীপপুঞ্জের সৃষ্টি করিয়াছে—প্রত্যেকেই আমরা স্ব স্ব দ্বীপখণ্ডে বসিয়া অনন্য সহচর অভিনব রবিন্সনক্রুশোর মতো শুকের কণ্ঠে মানব ভাষা শুনিয়া জীবন ধন্য করিবার বৃথা চেষ্টায় নিযুক্ত! অপর ব্যক্তি এমনভাবে আমাদের জীবন পরিধির বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছে যে নিজের পদচিহ্নে অপরের আগমন আশঙ্কা করিয়া আমাদের চমকিত করিয়া তোলে! আমরা কোথায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি!

জমিদারদের বিবাদ প্রজাদের অবলম্বন গ্রা সমস্ত গ্রামে ছড়াইয়া পড়িল, ফলে র স্বস্তি ও শান্তি অন্তর্হিত হইল। আর একটা রাজকীয় উপলক্ষে প্রত্যেকে আপন ন ব্যক্তিগত আক্রোশ চরিতার্থ করিবারও টা সুযোগ পাইল। আজ ছ'আনির প্রধানের খোমার লুঠ হইয়া গেল, কাল দশানির কয়েক প্রজার বাড়ি পুড়িয়া গেল। একদিন দশানির খেয়াঘাটের নৌকাখানা নিমজ্জিত তারপর দিন ছ'আনির মৌখিয়ার হাট লুঠ গ্র যায়। এই রকমে উভয়পক্ষে অন্তহীন ত্যাচারের উত্তর প্রত্যুত্তর চলিতে থাকে। দুই ক্ষর প্রজারা নিজেদের দুর্দশার কাহিনী মদারগণের কর্ণগোচর করে, তাহাতে আবার হাদের মানসিক উত্তাপ বাড়িয়া যায়। মদারের অপমানে প্রজা রাগে, প্রজার দুর্দশায় মদার গরম হয়—এইভাবে প্রজা ও জমিদারের টপাকে সমস্ত গ্রামখানি দমে সিদ্ধ হইতে গিল।

এই গ্রামময় বিবাদে মেয়েরাও অংশ গ্রহণ রিল। অবশ্য পুরাকালের বীরাঙ্গনাদের মতো হারা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল না বা দীর্ঘ কুর কাটিয়া ধনুকের ছিলা প্রস্তুত করিয়া ল না—কিন্তু কেবল মানসিক উত্তাপের চারে তাহারা যে পুরাকালিনীদের অপেক্ষা কান অংশেই ন্যূন নয় তাহা শপথ করিয়া লিতে খুব বেশি সত্যপ্রিয়তার আবশ্যক করে া।

নদীর ঘাট মেয়েদের প্রধান রণাঙ্গন। কদিন স্নানকালে দশানির এক প্রজার পত্নীর য়ে ছ'আনির এক প্রজার পত্নীর জল ছিটিয়া াগিল—তখনি দুই বীরাঙ্গনাতে মহা-বচসা ারম্ভ হইল এবং সেই বচসার সূত্রে সমস্ত ক্ষিণপাড়ার নারীকুল উত্তাল হইয়া উঠিল, বশ্য সকলেই তখন মূল কারণটা বিস্মৃত হইয়া য়াছিল। সে এক কুরুক্ষেত্র কান্ড আর কি! দব্যাসের প্রতি ভক্তিতে আমি কাহারও চেয়ে ম নই, তৎসত্ত্বেও বলিব যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ল কারণটা তিনি উল্লেখ করিতে ভুলিয়া য়াছেন। হস্তিনাপুরের সরোবরঘাটে স্নান রবার সময়ে দ্রৌপদীর দাসীর জলের ছিটা শুচর ভানুমতীর দাসীর গায়ে পড়িয়াছিল। ই উপলক্ষে তাহাদের কলহ ক্রমে প্রভুপত্নী প্রভৃতে বৃহত্তর হইতে হইতে কুরুক্ষেত্রের ীর্ঘ অরণ্যের দাবাগ্নিতে পরিণত হইয়াছিল।

বিধাতা স্ত্রীলোকের দেহে শক্তি দেন নাই; ন্তু তৎপরিবর্তে তাহাদের মনে হিংস্রতা য়াছেন। বাঘ দুর্জয়, বাঘিনী অজেয়। রুষ সৈন্যের পরিবর্তে নারীবাহিনী রণক্ষেত্রে রিত হইলে যুদ্ধাবসান শীঘ্রতর হইত। নারী-হিনী পরস্পরের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ল্পতম সময়ে প্রতিপক্ষকে ছিন্নকণ্ঠ করিয়া লিত। যুদ্ধবন্দী ও যুদ্ধ-প্রত্যাবর্তিতের গুরুতর সমস্যার উদ্ভবই হইত না, যেহেতু নারীবাহিনীর জীবন থাকিতে কেহই ফিরিত না, কেহ কাহাকেও ছাড়িত না, পক্ষ প্রতিপক্ষ সকলেই সমানভাবে মরিয়া তবে ক্ষান্ত হইত। নারীর মনের হিংস্রতার অনুরূপ দেহে বল থাকিলে পৃথিবী এতদিনে নিষ্পুরুষ হইয়া যাইত। বিধাতা বীরত্ব ও সৌন্দর্য পুরুষে ও নারীর মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়াছেন। বীরত্ব ও সৌন্দর্য কি কখনো সম্মিলিত হইবে না?

(৪)

দুখি কৈবর্ত ছ'আনির তিন পুরুষের খানসামা। ছ'আনির বাড়িতে তাহার বাপ কাজ করিত, সে কাজ করিয়াছে, এখন তাহার ছেলেরা চাকরি করে। দুখি বৃদ্ধ হইয়া পড়িলে নবীননারায়ণ বলিয়াছিল—দুখি এবারে তুই অবসর নে, তোর ছেলেদের কাজে ঢুকিয়ে দে। দুখি কিছুতেই রাজী হয় নাই। তারপরে সে একেবারে যখন অশক্ত হইয়া পড়িল, তখনই কেবল সে অবসর গ্রহণ করিল—কিন্তু আসলের চেয়ে সুদ যেমন অনেক সময়ে ভারী হয়, তেমনি এক দুখির স্থান তাহার দুই পুত্র বালা ও কালা অধিকার করিয়া বসিল।

পেন্সন পাইবার আশা সত্ত্বেও দুখি কেন যে অবসর লইতে চাহে নাই, বলা বাহুল্য তাহার বিশেষ কারণ আছে। দুখির উপরে ছ'আনির সরকারী হাটবাজার করিবার ভার। হাটের পয়সা হইতে উদ্বৃত্ত দু-চার আনা সকলেই নেয়, কিন্তু 'দুখির টেকনিক ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। বাজারের টাকা পাইবামাত্র সে টাকায় সিকে আগেই ট্যাঁকে গুঁজিত। তারপরে হাট সারিয়া প্রথমে জমিদার বাড়িতে না গিয়া নিজের বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইত, ডাক দিত—ও বালা কালা বাবা এদিকে আয়। ছেলেরা আসিলে বলিত, নে হিসাব কর। টাকায় বারো আনা মাত্র সে খরচ করিয়াছে; কিন্তু হিসাব দিতে হইবে ষোল আনার। সেই হিসাবটা কষিয়া দিবার ভার ছিল ছেলেদের উপরে। ছেলেরা হিসাবে গোলমাল করিয়া ফেলিলে বলিত—এই বুঝি তোদের পাঠশালার শিক্ষা! নে, নে, ভালো করে হিসাব কর। না খেয়ে, না পরে পাঠশালার মাইনে দিই, সে তো এইসব কাজের জন্যই।

ছেলেরা পাঠশালায় এত সূক্ষ্ম হিসাব কষে কিনা জানি না। দুখি বলিত, এত সোজা। পাঁচ টাকা নিয়ে হাটে গিয়েছিলাম, পাঁচ সিকে আমি তুলে রেখেছি, তাহ'লে হাট করলাম পৌনে চার টাকার। এখন পৌনে চার টাকাকে সমান করে পাঁচ টাকার উপরে চেলে দে। বাস্। এত ভাবছিস কেন?

ছেলেরা প্রথমে প্রথমে ভুল করিত, এখন বেশ শিক্ষিত হইয়া উঠিয়াছে। বাপ তাহাদের বিদ্যা দেখিয়া যুগপৎ নিজেকে ও পাঠশালার পণ্ডিত মহাশয়কে ধন্যবাদ দেয়—আর মনে মনে বলে একেই তো বিদ্যা বলে। এইবার বুঝিতে পারা যাইবে দুখি কেন পেন্সন লইতে চায় নাই। যখন সে নিতান্ত অথর্ব হইয়া পড়িল, আর ছেলে দুটি একান্ত লায়েক হইয়া উঠিল, মাত্র তখনই সে তাহাদের সরকারে ভর্তি করিয়া দিয়া অবসর গ্রহণ করিল। এ রকম ক্ষেত্রে দুখি যে ছ'আনির প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিবে, তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই।

এ হেন দুখির বাড়ির সমুখে শলাপরামর্শ চলিতেছে। দুখি আছে, শ্রীচরণ আছে, আর আছে কানু গোয়ালা। শ্রীচরণ বলিতেছে—কাল ছোটবাবুর সঙ্গে দেখা। ছোটবাবু বলল—হাঁ রে, চরণ তোরা সব নাকি দশানির ভয়ে কাঁপতে শুরু করেছিস? আমি বললাম—কি যে কন কর্তা! কাঁপছে ওরাই, ওদের গাঁ কাঁপছে, হাতের লাঠি কাঁপছে, আমরা কেন কাঁপতে গেলাম। ছোটবাবু বললে—আচ্ছা দেখা যাবে, কে কত সাহসী, শীগ্গিরই পরীক্ষা হবে। আমি বললাম, কেন পরীক্ষা হ'তে কি বাকি আছে নাকি? মনে নেই সেবার! আমার ক্ষেতের ধান লুটে নেবার জন্যে দশানির দশজন লেঠেল গিয়েছিল। আমরা জন পাঁচেক। এমন তাড়া করলাম যে, তারা পালাবার পথ পায় না, পালাবার সময়ে লাঠিগুলো ফেলে রেখেই পালালো। আমি আর কানু, কি রে কানু, মনে নেই? গুনে দেখি বারোখানা লাঠি। আমরা ভাবলাম, এ কেমন হ'ল, দশজনে বারো-খানা লাঠি, সে কেমন কথা? তখন কানু বলে উঠল, দুখানা লাঠি ভেঙে চার টুকরো হয়ে গিয়েছে—তখন কানুর সে কি হাসি? কর্তা কানুকে তো জানো!

কানুর দন্তপঙ্‌ক্তি বিকশিত হইয়া উঠিবার উপক্রম করিল। দুখি সভয়ে বলিল—কানু, আমি বুড়ো মানুষ, পালাতে পারবো না বাবা। তোর যে আবার কিল-চড় মারা অভ্যাস!

কানু বলিল—ভয় নেই দাদা, কিল-চড়গুলো এবার দশানির জন্যে জমিয়ে রেখেছি।

তারপরে সে বলিল—একবার লাগলে হয়, আমি বুড়ো দুর্গাদাসের মাথার খুলিটা না ভেঙে ছাড়বো না। তারপরে এই মহৎ কর্তব্যের কারণ ব্যাখ্যা করিয়া সে বলিল—সেদিন আমার এক হাঁড়ি দই একা খেয়ে ফেললে। খাওয়া শেষ হলে যখন পয়সা চাইলাম, বুড়ো হেসে বলে কি না, পয়সা আবার কিরে? বুড়ো মানুষকে খাওয়ালি, আমি খুশী হলাম, তোকে মনে মনে আশীর্বাদ করলাম, পয়সা কি তার চেয়েও বড় হ'ল? বাবা কানু, পয়সা কেউ সঙ্গে করে আনেনি, কেউ সঙ্গে করে নিয়ে যাবে না। তারপরে আমার মাথায় হাত দিয়ে বলল—আশীর্বাদ করলাম, বাবা, আশীর্বাদ করলাম। বুঝলে দুখি দাদা, এবারে বুড়ো দাসের মাথার খুলিটা ভাঙবো, তারপরে অন্য কথা।

এবারে দুখি আরম্ভ করিল—বলিল, বাবা

আমি তো বুড়ো হ'য়ে পড়েছি, নিজের কিছু করবার শক্তি নেই। কিন্তু বাপ সকল, দশআনির হরু সেখ আমার জমির পাকা ধান কেটে নিয়ে গিয়েছে, সে অপমান আমার একলার নয়, তোমাদের সকলেরই। এবারে তার শোধ তোলা চাই।

শ্রীচরণ ও কানু দুইজনে একসংগে বলিল—তুমিই না হয় বুড়ো হ'য়ে পড়েছো, আমরা তো আর বুড়ো হইনি, এবারে হরু সেখের চৈতালি কি করে গোলায় ওঠে, একবার দেখে নেবো।

দুখি খুশী হইয়া বলিল—এই তো চাই। ছ'আনির একজনের অপমানে সকলেরই অপমান। জমিদারের অপমানে প্রজার অপমান, প্রজার অপমানে জমিদারের অসম্মান।

ব্যক্তিগত স্বার্থ ও বৃহত্তর কর্তব্যকে সমন্বয় করিয়া দুখি যে ব্যাখ্যা প্রদান করিল, তাহাতে শ্রীচরণ ও কানু উভয়েই নিজেদের অত্যন্ত শক্তিশালী অনুভব করিতে লাগিল। দু'জনেরই মনে হইল এই ব্যাখ্যার আকর্ষণে তাহাদের ব্যক্তিগত আক্রোশ ও ক্ষতি তাহার ক্ষুদ্র সীমা ছাড়াইয়া একটা মহত্তর মহিমা পাইয়াছে—এবারে তাহার জন্য প্রাণ খুলিয়া লড়াই করা যায় এবং অপরকেও তাহাতে যোগ দিতে আহ্বান করা চলে। কারণ এখন দুখির ধান কাটার দুঃখ, কানুর দধির মূল্য প্রভৃতি বস্তু আর তুচ্ছ নয়, যেসব কারণে জগতে ধর্মযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে, এসব তাহাদের অন্তর্গত।

দুখি বলিল—চরণ, বাবা, একটু তামাক খাও। শ্রীচরণ উঠিয়া তামাক সাজিয়া হুঁকাটি দুখির হাতে দিল।

এমন সময়ে সকলে দেখিতে পাইল, টোলের পোড়ো শশাঙ্ক বাজার হইতে ফিরিতেছে, তাহার এক হাতে একটি দোদুল্যমান নাবালক অলাবু, অপর হস্তে একটি কচুপাতার ঠোঙা, বোধ করি তন্মধ্যে কিছু কুচো চিংড়ি, কারণ অলাবুর অনিবার্য উপকরণরূপে উক্ত বস্তুটাই লোকপ্রসিদ্ধ।

দুখি বলিল—একবার দাদাঠাকুরকে ডাকোনা—

কানু বলিল—তার দরকার হবে না, তামাকের ধোঁয়া দেখেছে, পোড়ো ঠাকুর এল বলে।

কানুর কথাই সত্য। শশাঙ্ক ন্যায়শাস্ত্রের সহিত অপরিচিত নহে, যেহেতু ধোঁয়া দেখিয়াই সে অগ্নি অনুমান করিয়া লইয়াছে। শশাঙ্ক নিকটে আসিতেই সকলে বলিয়া উঠিল, এই যে দাদাঠাকুর, বসতে আজ্ঞা হোক। সে ইতস্তত লক্ষ্য করিয়া একটি উৎপাটিত গাব গাছের ডালের উপরে বসিয়া বলিল—তারপরে কি কথা হচ্ছিল? কই কিছু আছে নাকি? এই বলিয়া হুঁকোটার দিকে তাকাইল।

শ্রীচরণ হুঁকো হইতে কল্কেটা খসাইয়া কলাপাতায় জড়াইতে জড়াইতে বলিল—আমরা ছোটবাবুর কথা বলছিলাম।

ততক্ষণে শশাঙ্ক লাউ ও চিংড়ির ঠোঙা পাশে রাখিয়া দিয়াছে। শূন্য হাত দুইটি কপালে ঠেকাইয়া বলিল—আমাদের ছোটবাবুর মতো লোক হয়? দেবতা, দেবতা! যেমন

গরিমায় তেমনি দানে ধ্যানে। আহা ওই রকম একটা লোক গাঁয়ে থাকলে গ্রাম শাসনে থাকে।

শ্রীচরণ কল্কেটা অগ্রসর করিয়া বলিল—নাও দাদাঠাকুর।
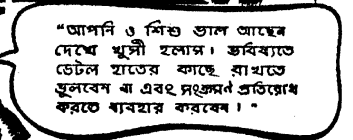
শশাঙ্ক কল্কেটি সন্তর্পণে ধরিয়া ঠাধরে স্থাপন করিয়া মরি-কি-বাঁচি ভাবে মারিল। সেই টানে কল্কের আগুন একবার করিয়া জ্বলিয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই ফট রিয়া একটি শব্দ হইল আর কল্কেটি চার ণ্ড বিভক্ত হইয়া গেল।

কানু বলিয়া উঠিল—দেখ দেখ চরণ হ্মতেজ কাকে বলে! কল্‌কে-ফাটানো দম চার আমার মতো শূদ্দুরের কি আছে? একেই লে ব্রহ্মতেজ; এতদিন কানে শুনেছিলাম, বার চোখে দেখলাম।

নিজের রসিকতায় সে নিজে হাসিয়া ঠিল, অমনি সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাতপাগুলি ঞ্চল হইয়া উঠিল, একটা প্রকাণ্ড কিল শশাঙ্কর ঠক মাথার উপরে পতনোন্মুখ হইয়াছিল এমন ময়ে কানুর মনে পড়িল, তাহার অনেকটা জমি শশাঙ্কর কাছে বাঁধা পড়িয়াছে, তাই কিলটাকে তির্যকভাবে শ্রীচরণের উদ্দেশ্যে চালাইয়া দিতে গিয়া দেখিল, সে নূতন কল্কে সংগ্রহের জন্য উঠিয়া গিয়াছে। কানুর লক্ষ্যভ্রষ্ট কিলটা ফিরিয়া আসিয়া তাহার নিজের বুকের উপরে মৃদু আঘাত করিয়া যাত্রা সমাপন করিল।

ইতিমধ্যে শ্রীচরণ নূতন কল্কেয় তামাক সাজিয়া আনিয়া শশাঙ্কর হাতে দিল। শশাঙ্ক ধূমচর্চার মনোনিবেশ করিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই এমন ধূম্রযবনিকার সৃষ্টি করিল যে সে নিজেই অদৃশ্য হইবার উপক্রম।

কানু ঘোষ শ্রীচরণকে বলিল—দেখ চরণ চন্দ্রগ্রহণ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।

শশাঙ্কর ধূমপান শেষ হইলে সে উদার-ভাবে কল্কেটি শ্রীচরণের দিকে অগ্রসর করিয়া দিল।

শ্রীচরণ বলিল—কিছু আছে নাকি দাদাঠাকুর—

কানু বলিল—তোর কল্কেটা যে আছে সেই ঢের। বাবা একেই বলে বামুন-চোষা হুঁকো আর কায়েত-চোষা গ্রাম! তারপরে শশাঙ্ককে লক্ষ্য করিয়া বলিল—আজ দেখালে বটে দাদাঠাকুর!

শশাঙ্ক বলিল—কানু এ আর কি দেখলি! তবু তো আমার গুরুকে দেখিসনি। না, না কেশরীর কথা বলছিনে। আমাদের গাঁয়ের তারণ পণ্ডিতের কথা বলছি, তিনি একবার আসরে বসে হুঁকোয় এমনি টান মারলেন যে হুঁকোর খোলটা ফেটে চৌচির! হাঁ গুণী লোক ছিলেন বটে তারণ পণ্ডিত।

এই বলিয়া শশাঙ্ক গুণী তারণ পণ্ডিতের উদ্দেশ্যে মাথায় হাত ঠেকাইল।

তারপরে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করিয়া বলিল—এবারে লেগে উঠলো, কি বলো? পুকুরপারের প্রজাদের ঘর জ্বালানো ছোটবাবু নিশ্চয় ভুলবেন না। দশানির দক্ষিণপাড়াটায় কবে যে আগুন লাগবে তাই ভাবছি। তুমি কি বলো দুখি?

দুখি বলিল—দাদাঠাকুর, ছোটবাবু কি করবেন, তা কি তোমাকে আমাকে জিজ্ঞাসা করে করবেন?

শশাঙ্ক বলিল—তা বটে, তবু তোমরা হলে তাঁর একেবারে আপনার লোক, তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম। ধরো না কেন, দশানির বাবু তো হরু সেখের সঙ্গে পরামর্শ না করে কিছু করেন না।

শ্রীচরণ বলিল—সকলের স্বভাব তো এক রকমের নয়। তা ঠাকুর পুকুরপারের বাড়িগুলো পুড়ে যাওয়ায় বাবুর চেয়ে তোমার কষ্ট কম হয়নি।

কানু হাসিয়া উঠিল।

সকলেই জানিত বাদলির উপরে শশাঙ্কর বিশেষ একটু টান ছিল। কিন্তু বাদলি এখন ছ'আনির অন্দরমহলে স্থান পাওয়ায় শশাঙ্কর কাছে অদৃশ্য হইয়া উঠিয়াছে।

সে বুঝিল ইহারা ছ'আনির মৎলব সম্বন্ধে অনেক কথাই জানে, কিন্তু তাহার কাছে সে-সব প্রকাশ করিতে রাজি নয়, তাই সে বলিয়া উঠিল—বেলা হল দেরী হলে ভট্টাচার্য-গৃহিণী বড় রাগারাগি করেন। তারপরে ব্যাখ্যা করিয়া বলিল—তোমরা তো কেশরীকেই জানো, কিন্তু বাবা কেশরিণীকে যদি জানতে। দেবী চৌধুরাণী হার মেনে যায়। এই বলিয়া সে লাউ ও চিংড়ির ঠোঙা সংগ্রহ করিয়া চিক্কণ টাকে রৌদ্র প্রতিফলিত করিতে করিতে টোলের দিকে যাত্রা করিল।

সে একটু দূরগত হইবামাত্র কানু বলিয়া উঠিল, বেটা গোয়েন্দা এ পক্ষের খবর নিয়ে ও পক্ষে দেয়, আবার ওপক্ষের খবর নিয়ে এপক্ষে আসে।

শ্রীচরণ বলিল—ঠাকুর সেইদিন বুঝতে পারবেন, যেদিন দুইপক্ষ একসঙ্গে চেপে ধরবে।

শশাঙ্ক লোকটাকে গাঁয়ের অনেকেই ভয় করে। টোলে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সে মহাজনী ব্যবসা চালাইয়া থাকে চড়া সুদে টাকা ধার দেয়, গ্রামের অনেকেরই জমিজমা তাহার কাছে দায়ে বন্ধ। সকলেরই তাহার উপরে রাগ, কিন্তু কেহই কিছু করিতে সাহস পায় না।

কানু বলিল—দুইপক্ষে একবার লেগে উঠলে হয়, আমি একবার দাদাঠাকুরকে দেখে নিই।

শ্রীচরণ জিভ কাটিয়া বলিল—আর যাই করিস, প্রাণে মারিস না বাপু। দলিল কবালা টাকাকড়ি যা পাস নিস কেউ দোষ দেবে না, আর এক কাজ করিস ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুলটা কেটে নিস কোনকালে কলম ধরে আর যাতে খত লিখতে না পারে। বুঝলি?

দুখি সব চুপ করিয়া শুনিতেছিল, এবারে সে মৌনভঙ্গ করিল, বলিল বিনা পয়সায় একটা মলম দিতে ভুলিস না। হাজার হোক বামুনের ছেলে তো—পরকাল আছে রে, পরকাল আছে।

কানু বলিল—পরকাল থাকলে কেউ শতকরা বারো টাকা সুদে চক্রবৃদ্ধি লিখিয়ে নেয়!

দুখি বলিল—তোরা সব ছেলে মানুষ, কিছু বুঝিস না। পরকাল আছে বলেই তো চড়া সুদ আদায় করে। পরকাল মানে ভবিষ্যৎ যেমন আজকার দিনের পরকাল কালকের দিন।

সকলে দুখির নূতন ব্যাখ্যায় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। (ক্রমশ)

বাঙলায় অশান্তির অবসান হইতেছে না। যাহাকে অস্বাভাবিক অবস্থা বলা হয়, তাহাই যেন বাঙলায় স্বাভাবিক অবস্থা হইয়া উঠিয়াছে। আর যখনই অশান্তি ও উপদ্রব প্রবল হয়, তখনই বাঙলার সচিবগণ তাহার গুরুত্ব অস্বীকার করিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। মুসলিম লীগের "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে" কলিকাতায় যে অশান্তির আরম্ভ হয়, তাহার সময় আমরা দেখিয়াছি, আরম্ভ দিবসে (১৬ই আগষ্ট, ১৯৪৬ খৃঃ) প্রধান সচিব রাত্রিকালে বলিয়াছিলেন—"অবস্থার সুস্পষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছে।" আর গত ১৭ই মার্চ প্রধানসচিবের অনুপস্থিতিতে তস্য সহসচিব মিস্টার মহম্মদ আলী বলিয়াছিলেন রবিবারে (১৬ই মার্চ) যে অশান্তির উদ্ভব হইয়াছিল, রাত্রি সাড়ে ১২টার মধ্যেই তাহার অবসান ঘটিয়াছিল। কিন্তু সেদিন যে অগ্নিশিখা-ব্যাপ্তিলাভে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহা এখনও নির্বাপিত হয় নাই। দিনের পর দিন যে সান্ধ্য আইনের স্থান ও সময় বর্ধিত করা হইতেছে, তাহাতেই একথা প্রতিপন্ন হয়।

"পাকিস্তান দিবস" অনুষ্ঠানের পরেই যখন কলিকাতায় হাঙ্গামা প্রবল হয়, তখনই আমরা মফঃস্বলে কি হইবে, তাহা মনে করিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাহার পরে কলিকাতার হাঙ্গামা সম্বন্ধে মিস্টার সুরাবদী দুই দফায় যে কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহারই উপযুক্ত। তাঁহার প্রথম কৈফিয়ৎ, সহরের কোন স্থানে কোন বারাঙ্গনাগৃহে কোন অজ্ঞাতনামা অভাগিনী সসন্তান নিহত হইয়াছিল। সে যে সম্প্রদায়ের লোক তাহাকে সেই সম্প্রদায়ের মনে না করিয়া অন্য সম্প্রদায়ের লোক তাহাকে স্বসম্প্রদায়ের মনে করিয়া হাঙ্গামা বাধায়! বাঙলার দুর্ভাগ্য—বর্তমান শাসন পদ্ধতিতে এইরূপ কারণ প্রদানকারী ব্যক্তিও প্রধানসচিব থাকিতে পারে—আর প্রাদেশিক গভর্নর বলিতে পারেন, সচিবদিগের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ সম্প্রীতিস্নিগ্ধ।

তাঁহার দ্বিতীয় কৈফিয়ৎ আরও রসোদ্দীপক। গত ৭ই এপ্রিল দিল্লী হইতে সংবাদ আসিয়াছিল নোয়াখালীর অবস্থা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র ঘোষ চৌধুরী—দুইজনের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া গান্ধীজী তার করিয়াছেন :—

সবিশেষ ও বেদনাজনক টেলিগ্রাম পাইয়াছি। মনে হয়—হয় স্থান ত্যাগ করিতে হইবে, নহে ত উগ্র-সাম্প্রদায়িকতার অনলে দগ্ধ হইতে হইবে।

সবিশেষ সংবাদ কলিকাতায় সংবাদপত্রে
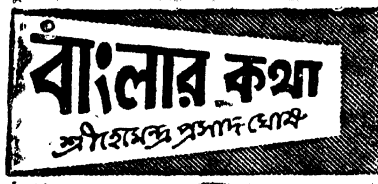
প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। কেন হয় নাই তাহা সহজেই অনুমেয়। পরদিন মিস্টার সুরাবদী যে বিবৃতি প্রদান করেন, তাহাতেই পাঠকগণ সে কারণের সন্ধান পাইবেন। তিনি বলেন :—

তিনি যে সংবাদ পাইয়াছেন, তাহাতে নোয়াখালীর অবস্থা স্বাভাবিক। সংবাদপত্রে যে অসমর্থিত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাহাতে অস্বাস্থ্যকর অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে তিনি দুঃখিত। তিনি যখনই শ্রীযুক্ত সতীশ দাশগুপ্তের, মহাত্মা গান্ধীর বা অন্য যে কোন ব্যক্তির নিকট হইতে কোনরূপ অত্যাচারের বা অপ্রীতিকর ঘটনার বা ভাবের সংবাদ পাইয়া থাকেন, তখনই তিনি আবশ্যক ব্যবস্থা করেন—অবস্থা পরীক্ষা করেন। কাজেই বিশেষরূপে পরীক্ষা না করিয়া এইরূপে সংবাদ প্রকাশ করা অত্যন্ত অসংগত। তাহাতে লোকের মনে উত্তেজনার উদ্ভব হয় এবং অবস্থার অবনতি ঘটিতে পারে। যে সব বিবৃতিতে সাম্প্রদায়িক সম্বন্ধ তিক্ত হয় সে সকলের প্রকাশ তিনি নিন্দনীয় মনে করেন; তিনি সংবাদপত্র-সমূহকে এবিষয়ে সতর্ক হইতে এবং যাঁহার নিকট হইতেই কোন সংবাদ পাওয়া যাউক না, তাহা প্রকাশে বিরত থাকিতে বলিয়াছেন। তিনি যে কারণ দেখাইয়াছেন, তাহার বীজ এই বিবৃতিতেই পাওয়া যায় :—

বৃহস্পতিবারে যে কলিকাতায় অবস্থার অত্যন্ত অবনতি ঘটিয়াছে, তাহা নোয়াখালী সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর টেলিগ্রাম প্রকাশের প্রত্যক্ষ ফল।

এতদিন গান্ধীজীর বিবৃতি প্রকাশে কোন বাধা ছিল না; কিন্তু এবার সুরাবদী সচিব-সঙ্ঘের আজ্ঞাবহ তাহাতেও সম্মত নহেন। কেন নহেন—তাহা তাঁহার প্রভুর উক্তিতেই বুঝিতে পারা যাইবে। তাঁহার জয় হউক। হয়ত ইহার পরে আবার কলিকাতার সংবাদপত্রগুলিকে "জব্দাও" করার পর্ব আরম্ভ হইবে।

সে যাহাই হউক আমরা দেখিয়াছি—মিস্টার সুরাবদীর উক্তি যে নির্ভরযোগ্য নহে তাহাই ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দেখাইয়াছেন।

শ্যামাপ্রসাদবাবু বলিয়াছেন মিস্টার সুরাবদী যে বলিয়াছেন, নোয়াখালীর অবস্থা স্বাভাবিক, তাহাতে তিনি বিস্মিত হইয়াছেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে আলোচনার পরে গত ২১শে মার্চ কয়জন হিন্দু ও মুসলমান সদস্য যে সম্মিলনে সমবেত হইয়াছিলেন, তাহাতে দুইটি বিষয় নির্ধারণ হয় :—

(১) সাহায্যদান শিবিরগুলি এখনই বন্ধ করা হইবে না।

(২) সম্মেলনের পূর্বে শ্যামাপ্রসাদবাবু প্রভৃতি সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচারের ও নির্যাতনের যে সকল সংবাদ পাইয়াছিলেন, প্রধানসচিব অবিলম্বে সে সকল সম্বন্ধে নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা করিবেন।

পরদিনই শ্যামাপ্রসাদবাবুকে দিল্লী যাইতে হয়। তিনি উপদ্রুত ব্যক্তিদিগের স্বজন ও নোয়াখালীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগের সহিত আলোচনা করিয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা-সমূহের তালিকা ও বিবরণ প্রস্তুত করিবার জন্য শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে অনুরোধ করিয়া দিল্লীতে গিয়াছিলেন তিনিও লুণ্ঠন, অগ্নিযোগ, নারী ধর্ষণ, সংখ্যাল্প সম্প্রদায়কে উৎপীড়নের প্রায় ৪০টি ঘটনার তালিকা প্রস্তুত করিয়া ২৪শে মার্চ তাহা মিস্টার সুরাবদীর নিকট প্রেরণ করেন। সেই প্রসঙ্গে বলা হয়, ১৯ জন লোকের হত্যা ব্যাপারে পুলিস যে ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করিতেছিল সে প্রকাশ্যভাবে শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব করিতেছিল, কিন্তু তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইতেছিল না।

শ্যামাপ্রসাদবাবু বলিয়াছেন :—

"মিস্টার সুরাবদী কিরূপ তদন্তের আদেশ করিয়াছেন, তাহা আমরাও জানি না, স্থানীয় উপদ্রুত ব্যক্তিরাও জানে না। তিনি যদি প্রতিশ্রুতি পালন না করিয়া থাকেন, তবে তাহাই বিশেষ নিন্দনীয়—কারণ, তাহা কর্তব্য চ্যুতি; আর তিনি সংবাদ পাইয়াও যে অজ্ঞতার ভাণ করিয়াছেন, তাহা আরও নিন্দনীয়।"

শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মিস্টার সুরাবদীকে কিছু জানান নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বলিয়াছেন :—

"আমরা জনসাধারণকে জানাইতেছি আমরা যে ৪০টি ঘটনার বিবরণ মিস্টার সুরাবদীকে দিয়াছিলাম, সে সকল সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থাই করা হয় নাই। উপদ্রুত ব্যক্তিরা বা নোয়াখালীর স্থানীয় লোকরা কোনরূপ তদন্ত সম্বন্ধে কোন সংবাদ পান নাই—অভিযোগের প্রমাণ উপস্থাপনের সুযোগও তাহাদিগকে দেওয়া হয় নাই।"

নির্মলবাবু আরও বলিয়াছেন—স্থান

লোকদিগের কর্মচারীদিগের প্রতি আস্থা নাই। এমন কি—

অতি ভয়াবহ অপকার্যের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত ফৌজদারী মামলা বাতিল করিবার সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা হইয়াছে। সুপরিচিত লীগ নেতারা অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে জামিনে মুক্তি দিবার জন্য জিদ করিয়াছেন। যাহারা গ্রেপ্তার হইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে শতকরা ৮০ জন খালাস পাইয়াছে—বহু অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা গ্রেপ্তার হয় নাই।

এই অবস্থায় যদি নোয়াখালী অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় সাহস পাইয়া আবার অত্যাচার আরম্ভ করিয়া থাকে, তবে তাহাতে বিস্ময়ের কি কারণ থাকিতে পারে?

এই প্রসঙ্গে বলা যায়, নোয়াখালীতে অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়া আচার্য কৃপালনী বলিয়াছেন—যখন তথায় সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপর উৎপীড়নের আয়োজন হইতেছিল, তখন কোন কোন স্থানীয় রাজকর্মচারী তাহার সমর্থন করিয়াছিলেন, কেহ কেহ উৎসাহও প্রদান করিয়াছিলেন! মুসলমানদিগের মধ্যে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, হিন্দুদিগকে উৎপীড়িত করিলে সরকার অপরাধীকে দণ্ডিত করিবেন না।

এই উক্তি যে অসম্ভব নহে, তাহার প্রমাণে বলা যায়,—বঙ্গ-বিভাগ বিরোধী আন্দোলন কালে একাধিক মোকদ্দমার রায়ে দেখা যায়—ঢোল সহরতে ও বিজ্ঞাপনে বলা হইয়াছিল—সরকার হিন্দুদিগের উপর উৎপীড়নের অবাধ অধিকার অন্য সম্প্রদায়ের লোককে দিয়াছেন!

মিস্টার সুরাবর্দীর ধৃষ্ট উক্তি গান্ধীজীর পক্ষেও বিরক্তিকর হইয়াছে। তিনি (গত ৯ই এপ্রিল) দিল্লীতে বলিয়াছেনঃ—

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র ঘোষ চৌধুরীর মত ত্যাগী কর্মীদিগের প্রদত্ত বিবরণ বর্জন করিয়া স্বীয় কর্মচারীদিগের বিবরণের প্রতীক্ষা করিলে চলিবে না। মিস্টার সুরাবর্দী যদি পারেন, তাঁহাদিগের প্রদত্ত বিবরণের প্রতিবাদ করুন। তিনি যদি মিস্টার সুরাবর্দীর স্থলাভিষিক্ত হইতেন, তবে নিঃস্বার্থ কর্মীদিগের প্রদত্ত বিবরণের সহিত তাঁহার কর্মচারীদিগের বিবরণের অসামঞ্জস্য দেখিলে তিনি কর্মচারীদিগকেই তিরস্কার করিতেন।

বলা বাহুল্য, গান্ধীজী যে এখনও মানুষের দৃষ্ট মনোভাব সংশোধিত হইতে পারে, তাহাই বিশ্বাস করেন।

যে টেলিগ্রামে নির্ভর করিয়া গান্ধীজী তাঁহার প্রথম টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছিলেন, তাহার পরবর্তী টেলিগ্রামে সতীশবাবু জানাইয়াছিলেন—অবস্থার আরও অবনতি ঘটিয়াছে।

গত ১১ই এপ্রিল গান্ধীজীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত প্যারীলাল টেলিফোনে তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন—নোয়াখালীতে অবস্থার আরও অবনতি ঘটিয়াছে।

গান্ধীজী পূর্বে নোয়াখালীতে অবস্থানকালে জানাইয়াছিলেন, কোন কোন স্থানে উপদ্রবকারীরা উপদ্রুত সম্প্রদায়ের লোককে জানাইয়াছিল—গান্ধীজী নোয়াখালী ত্যাগ করিলে উপদ্রব আরও বর্ধিত হইবে।

কলিকাতার অবস্থা সম্বন্ধে বাঙলা সরকারের বিবৃতিটি পাঠ করিলে বড় দুঃখেও হাসি পায়। গত ১১ই এপ্রিল তারিখে—

(১) বলা হইয়াছে, কলিকাতার অবস্থা পুলিসের আয়ত্তাধীন রহিয়াছে। মধ্যাহ্নের পর হইতে মাত্র (?) ৫টি দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে;

(২) পুলিস কমিশনার ঘোষণা করিয়াছেন, কলিকাতার দাঙ্গা—নরহত্যা প্রভৃতি ঘটিতেছে—সুতরাং ১২ই এপ্রিল হইতে ১৯শে এপ্রিল পর্যন্ত সান্ধ্য আইন বলবৎ থাকিবে।

আমরা পূর্বেই ১৯টি নরহত্যা সম্পর্কে পুলিসের দ্বারা অনুসৃত একজন লোককে শোভাযাত্রা পরিচালিত করিতে দেখা গিয়াছে—এই অভিযোগের উল্লেখ করিয়াছি। প্রকাশ গত ১০ই এপ্রিল তাহাকে কলিকাতাগামী চট্টগ্রাম ডাক গাড়ী হইতে পোড়াদহ স্টেশনে অবতরণ করিয়া পাবনাগামী ট্রেনের সন্ধান লইতে দেখা গিয়াছিল। পাবনার কোন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী নাকি তাহার আত্মীয়।

বাঙলা হইতে আসাম আক্রমণ করিবার জন্য মুসলীম লীগের যে আয়োজন চলিতেছে, তাহা যে বাঙলার মুসলীম লীগ সচিব-সঙ্ঘের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্য ব্যতীত হইতে পারে না, তাহা বলা বাহুল্য।

বাঙলার অন্যান্য স্থানের সংবাদও আতঙ্কজনক। গত ৭ই এপ্রিল নাটোরের নিকটবর্তী সিংড়া থানার এলাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের দ্বারা সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ভুক্ত এক ব্যক্তির দোকান লুণ্ঠিত হইয়াছে। বগুড়ার সংবাদ—গত ৪ঠা এপ্রিল সম্প্রদায় বিশেষের প্রায় ১২ জন লোক বগুড়া হইতে প্রায় ২০ মাইল দূরবর্তী নন্দীগ্রাম থানার এলাকাস্থ কোন বৃহৎ বাজারে যাইয়া কোন সাম্প্রদায়িক রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের জন্য স্থানীয় ব্যবসায়ীদিগের নিকট অর্থ চাহিয়াছিল। তাহারা কতকগুলি ধ্বনিও করিয়াছিল। সেই ঘটনার পরে কেহ কেহ ভয় পাইয়া পরিজনগণকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে প্রেরণ করিতে থাকেন। গত ৮ই এপ্রিল অস্ত্র সজ্জিত হইয়া বহু লোক বাজারে আসিয়া দোকানের দ্বার ভাঙ্গিয়া লুণ্ঠন করে।

গান্ধীজী যে সহসা দিল্লী হইতে বিহারে প্রত্যাবর্তন করিলেন, তাহার কারণ জানা যায় নাই বটে, কিন্তু এমনও হইতে পারে যে, কলিকাতায় ও নোয়াখালীতে আবার উপদ্রবের সংবাদে বিহারে হিন্দুদিগের মধ্যে উত্তেজনার উদ্ভব হইতেছে।

নোয়াখালীর সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় সম্বন্ধে কি তাঁহার শেষ উপদেশ—হয় স্থানত্যাগ করিতে হইবে, নহিলে ধর্মান্ধতার অনলে দগ্ধ হইতে হইবে?

স্মরণ রাখিতে হইবে, বাঙলায় যে গভর্নর আছেন, তিনি আপনার অস্তিত্বের পরিচয় দিতেও যেন চাহিতেছেন না; আর বাঙলার প্রধান-সচিবের মতে নোয়াখালীর যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাই (মুসলীম লীগের মতে?) স্বাভাবিক।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ও রাষ্ট্রীয় পরিষদে বাঙলার মুসলমানাতিরিক্ত প্রতিনিধিদিগের মধ্যে অধিকাংশ—পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র, নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রলাল খাঁন, ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী, ধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী চৌধুরী, আনন্দমোহন পোদ্দার, দেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, সুশীলকুমার রায় চৌধুরী, সুরবৎ সিংহ, সত্যেন্দ্রকুমার দাস, জ্যোৎস্না ঘোষাল বড়লাটকে জানাইয়াছেন—

পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গ লইয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘভুক্ত একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠিত করা হউক এবং যাহাতে আরও বিশৃঙ্খলা ও নরহত্যা নিবারিত হয় সেইজন্য অবিলম্বে বাঙলার দুই অংশের জন্য একই গভর্নরের অধীনে দুইটি স্বতন্ত্র সচিবসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত করা হউক।

প্রকাশ, কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির আসন্ন অধিবেশনে বাঙলা বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা হইবে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ইতোমধ্যেই বিভাগ সমর্থন করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

বর্তমান সচিবসঙ্ঘের অবসান ব্যতীত যে বাঙলায় শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা এবং লোকের সঙ্গত অধিকার সম্ভোগ অসম্ভব, তাহা আজ সকলেই স্বীকার করিতেছেন।

আধুনিক রাষ্ট্রে বিজ্ঞান

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী এম-এ, পি-এইচ-ডি, পি-আর-এস

বিজ্ঞান আধুনিক রাষ্ট্রের ঐশ্বর্য ও স্থায়িত্বের প্রধান ভিত্তি

আগামী বৎসর জুন মাসের মধ্যে ভারত স্বাধীন হইবে। ইহা ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ঘোষণা। খুবই আনন্দ ও গৌরবের কথা। দুই শত বৎসর পরে ভারতবাসী স্বাধীন জাতি-বৃন্দের মধ্যে এক গৌরবোজ্জ্বল স্থান লাভ করিবে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভ ও স্বাধীনতা রক্ষা করা এক কথা নহে। অন্তর্বিপ্লব ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য জল, স্থল ও অন্তরীক্ষে যুদ্ধোপযোগী জাতীয় সৈন্যবাহিনীর সৃজন ও শিক্ষা, সমরোপযোগী আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, এরোপ্লেন, যুদ্ধজাহাজ, সাবমেরিন ট্যাঙ্ক র‍্যাডার প্রভৃতি নির্মাণ অপরিহার্য। দেশকে আধুনিক যন্ত্র-শিল্পে প্রভূত পরিমাণে উন্নত করিতে হইবে ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইলে যুদ্ধজাহাজ ছাড়া বাণিজ্যোপযোগী বহু সহস্র জাহাজ প্রভৃতি নির্মাণ করিতে হইবে। উন্নত উপায়ে কৃষিকার্য পরিচালন করিয়া দেশে অন্নকষ্ট ও দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিতে হইবে। কিন্তু এ সমস্তই বিজ্ঞানের প্রচার, প্রসার ও গবেষণার উপর নির্ভর করিতেছে। শস্ত্রবিদ্যা, শিল্প বাণিজ্য কৃষি সবই আধুনিক কালে বিজ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। গ্রেট ব্রিটেন, আমেরিকা, রুশিয়া এবং গত বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে জার্মানী ও জাপান প্রভৃতি পৃথিবীর তাবৎ সমৃদ্ধ দেশ-সমূহ শুদ্ধ ও ফলিত বিজ্ঞানের আবাসস্থল। কিন্তু গত দুই শত বৎসরের পরাধীনতার ফল-নিরক্ষর এবং বিজ্ঞানের পঠন পাঠন মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মধ্যে নিবদ্ধ এবং ফলিত বিজ্ঞানের নামও কিছুদিন আগে পর্যন্ত বড় একটা শুনা যাইত না। যন্ত্রশিল্প প্রায় সমস্তই বিদেশী কোম্পানীর স্বরূপ ভারতের অধিবাসীরা অধিকাংশই হাতে পরিচালিত। ভারতের বহু কোটি টাকার বহির্বাণিজ্য প্রায় সমস্তই বিদেশীর হাতে এবং ভারতে ছাড়া পৃথিবীর সমস্ত জাতিবৃন্দের জাহাজ সমূহে তাবৎ আমদানী ও রপ্তানি দ্রব্য ভারতে আসে ও যায়। ভারতে মোটর গাড়ী, জাহাজ, এরোপ্লেন প্রভৃতি কিছুই প্রস্তুত হয় না। গত যুদ্ধের জন্য বাঙলা দেশে কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ে কয়েক শত কাঠের নৌকা প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু শুনিয়াছি সেগুলি একেবারে অব্যবহার্য, এমন কি সেগুলি জলেই ভাসিল না। দেশের লোক দুবেলা দুমুঠা খাইতে পায় না—কৃষিকার্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিচালিত হয় না বলিয়া। বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বিত না হওয়ায় পল্লীগ্রামগুলি বিশেষতঃ বঙ্গদেশের, ম্যালেরিয়া, বসন্ত, কলেরায় উৎসন্ন গেল।

বস্তুত—আধুনিক স্বাধীন দেশের স্থায়িত্বের প্রধান ভিত্তি বিজ্ঞান। আমেরিকা কর্তৃক আণবিক বোমা আবিষ্কৃত হওয়াতে কয়েক বৎসর স্থায়ী বিশ্বযুদ্ধ দুই দিনে থামিয়া গেল। সেদিন এক আমেরিকান বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন যে, আণবিক বোমা এখন এত মারাত্মকরূপে সৃজিত হইতেছে যে, মাত্র দুই দিনের যুদ্ধেই বহু লক্ষ লোক হতাহত হইবে। এই আণবিক অস্ত্র আবিষ্কার কল্পে বহু জার্মান, ইংরাজ, ডচ, আমেরিকান বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিয়াছেন এবং তাহাতে বহু কোটি টাকাও ব্যয়িত হইয়াছে ও হইতেছে। এইরূপ লোকক্ষয় দেখিয়া বহু দেশের বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলী প্রস্তাব করিয়াছেন যে, আণবিক শক্তি যুদ্ধে আদৌ ব্যবহৃত যেন না হয় এবং ভবিষ্যতে উহা যেন কেবল পৃথিবীর অধিবাসিবৃন্দের সুখ ও মঙ্গলার্থে এবং শিল্পের প্রসারকল্পেই ব্যবহৃত হয়।

আণবিক শক্তির আবিষ্কার কেবল দৃষ্টান্ত-স্বরূপ দিলাম। ইহার পূর্বে বাষ্পশক্তি, বৈদ্যুতিক শক্তি আবিষ্কৃত হওয়াতে শিল্প, কৃষি প্রভৃতির কত উন্নতি হইয়াছে। সে সকলের আলোচনা দুদশ পৃষ্ঠাব্যাপী অভিভাষণে সম্ভবপর নহে। ভারতের এখন প্রধান সমস্যা অন্নের সংস্থান। দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে ১৯৪২-'৩ সালে এক বঙ্গদেশে পঞ্চাশ লক্ষ লোক প্রাণ হারাইয়াছে। সেইজন্য এই খাদ্য-সঙ্কটকালে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণ কি পন্থা অবলম্বন করিতে বলেন তাহাই আলোচনা একটু বিশদভাবে করিতেছি। তবে মনে রাখিতে হইবে যে, আহারের সংস্থান যেমন রাষ্ট্রের সর্ব-প্রথম করণীয় কার্য, সুস্বাস্থ্য, শিল্প প্রভৃতির প্রতি গভীর মনোনিবেশ প্রদানও তদ্রূপ করণীয়।

খাদ্যসঙ্কট ও বৈজ্ঞানিকের কর্তব্য

অনেক বন্ধুবান্ধব জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন যে ভারতের দারুণ অন্নকষ্ট নিরাকরণকল্পে ভারতের বৈজ্ঞানিকেরা কি কিছু করিতে পারেন না? আমি সর্বদাই উত্তর প্রদান করিয়া থাকি—নিশ্চয়ই পারেন। খাদ্য বণ্টনের ভার সরকারের হাতে থাকে থাকুক কিন্তু উৎপাদনের প্রকৃষ্ট পন্থা আবিষ্কারের ভার বৈজ্ঞানিকের উপর থাকা একান্ত উচিত। ভারতের যেস্থানে একগাছি ধান্যশীর্ষ উৎপন্ন হইতেছে সেখানে বৈজ্ঞানিক চেষ্টা করিলে দুই, তিন বা ততোধিক সংখ্যক ধান্যশীর্ষ নিশ্চয়ই উৎপন্ন করিতে পারেন। তাহার নিশ্চিত প্রমাণ এই যে, যে সকল দেশে অধিকতর উন্নত উপায়ে ধান্য উৎপন্ন হয় সে সকল দেশে একর প্রতি উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ভারতে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ হইতে অনেক গুণ বেশী। প্রতি একর জমিতে গড়পড়তা ভারতে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ মাত্র ৮০০ পাউণ্ড। কিন্তু চীনদেশে উহার পরিমাণ ১৪০০ পাঃ, ইজিপ্টে ২০০০ পাঃ, জাপানে ২৩০০ পাঃ, এবং ইটালীতে ৩০০০ পাঃ। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য পরিচালিত হওয়াতে ইটালীতে একর প্রতি উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ভারতের উৎপন্ন অপেক্ষা প্রায় চারি গুণ বেশী।

ভারতের অপর প্রধান খাদ্য গম সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। একর প্রতি ভারতে উৎপন্ন গমের পরিমাণও প্রায় ৮০০ পাঃ, কিন্তু জার্মানীতে উৎপন্ন গমের পরিমাণ ২২০০ পাঃ।

এখন ধান্য, গম, দুগ্ধ মৎস্য ডিম্ব মাংস প্রভৃতি প্রত্যেক প্রধান প্রধান খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ বাড়াইতে হইলে কিরূপ বৈজ্ঞানিক প্রথা অবলম্বন করিতে হইবে তাহা আলোচনা করিতেছি। ব্যাপারটা খুবই বৃহৎ—অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনাই এক্ষেত্রে সম্ভবপর।

ধান্য ও গম

ভারতের প্রধান খাদ্যশস্য চাউল ও গমজাত দ্রব্য। ভারতের লোকসংখ্যা দ্রুতগতিতে প্রতি দশ বৎসরে পাঁচ কোটি হারে বাড়িতেছে। ইহাদের আহারের সংস্থান করিতে হইবে। ভারতবর্ষে উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্য সাধারণ বৎসরে প্রয়োজনের শতকরা ৩০ ভাগ কম উৎপন্ন হয়। ভারতে ৩৬ কোটি একর জমিতে আবাদ হয়, কিন্তু অনাবাদি জমির পরিমাণ ১৭ কোটি একর। এই অনাবাদি জমি চাষোপযোগী। উপযুক্ত পরিমাণ সার ও জল পাইলে অনাবাদি জমিগুলির চাষ হইতে পারে ও উৎপন্ন খাদ্যশস্যের পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগ বাড়িয়া যাইতে পারে।

অনাবাদি জমির চাষ ছাড়া নিম্নলিখিত বৈজ্ঞানিক প্রণালীগুলি অবলম্বিত হইলে ভারত জাত খাদ্যশস্যের পরিমাণ দ্বিগুণ এমন কি তিন-চারি গুণ বৃদ্ধি পাইতে পারে। যথা (১) পাট প্রভৃতির চাষের জমি কমাইয়া তাহাতে খাদ্যশস্য উৎপন্ন করা (২) প্রচুর ও সময়োচিত

জলের ব্যবস্থা, (৩) প্রচুর ও উপযুক্ত স্বাভাবিক ও রাসায়নিক সারের প্রয়োগ, (৪) উন্নত লাঙগল ও ট্রাকটার প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে মৃত্তিকার গভীর কর্ষণ, (৫) উন্নত প্রকারের বীজ সরবরাহ, (৬) কৃষি গবেষণাজাত তথ্যগুলির বহুবিস্তৃত প্রচারের ব্যবস্থা, (৭) অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা নিবারণকল্পে জমি সম্বন্ধে আইনের পরিবর্তন। ইহার এক একটি বিষয় সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা করিতে হইলে এক একখানি পুস্তিকা বা পুস্তক রচিত হইতে পারে। এখানে এক একটি বিষয়ে দুই একটি দৃষ্টান্ত দিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে হইবে।

প্রথমে ধরুন জল সরবরাহ। ধান্য অর্ধ জলজ শস্য। সময়োচিত ও প্রচুর জল সরবরাহের ব্যবস্থা না হইলে, জমিতে যত সারই দিন না কেন, জমি যতই গভীরভাবে কর্ষণ করুন না কেন, ধান জন্মিবে না। সেইজন্য জল সরবরাহের ব্যবস্থা প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। আকাশের জল হউক বা না হউক—তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকিলে মধ্যে মধ্যে অজন্মা হওয়া অপরিহার্য। সেইজন্য কূপ, পুষ্করিণী, খাল, বিল হইতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা বহুপরিমাণে বাড়াইতে হইবে—উপায়ান্তর নাই। নহিলে অজন্মা হইবেই। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে অবৃষ্টির বৎসর খাল, বিল, পুকুর কূপের জল চাষের পক্ষে মোটেই পর্যাপ্ত নহে। সেই সময় ইরিগেশন পয়ঃপ্রণালীর জলের একান্ত প্রয়োজন হয়। এইরূপ ইরিগেশন পয়ঃপ্রণালীর অভাবে অবৃষ্টির বৎসর অজন্মা হয়। সেইজন্য নদনদীর জল বন্ধ করিয়া দেশের সর্বত্র ইরিগেশন পয়ঃপ্রণালীর বহুল প্রবর্তন অজন্মা ও দুর্ভিক্ষ নিবারণের প্রথম ও প্রধান উপায়। দ্বিতীয় উপায় নাই। দাক্ষিণাত্যের কাবেরী নদীকে মেচুর ও মহিশূরে এই দুই স্থানে বাঁধিয়া সেই বন্ধ জল জমিতে ছাড়িয়া দিয়া বহু লক্ষ একর জমির চাষ হইতেছে। পাঞ্জাবের নদীগুলির উপর বাঁধ দিয়া, সেই জল জমির চাষের জন্য বহু পরিমাণে ব্যবহার হইতেছে। সিন্ধু প্রদেশ মরুভূমির দেশ। সক্কর ব্যারাজ (Sukkur Barrage) এর জলের দ্বারা সিন্ধুপ্রদেশে অনেক মরুভূমি অংশ চাষের উপযোগী হইতেছে। বাঙলা দেশে দামোদর প্রভৃতি বহু নদীর উপর বাঁধ বাঁধিয়া পয়ঃপ্রণালীর সাহায্যে মাঠে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করিতেই হইবে। এই বৈজ্ঞানিক যুগে বরুণের খামখেয়ালি কৃপার উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকা চলে না। পুরুষকার নিশ্চয়ই অবলম্বন করিতে হইবে। সুখের বিষয় বঙ্গদেশে দামোদর প্রভৃতি নদীর উপর বাঁধ দিয়া ইরিগেশন পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ পরিকল্পনা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে।

চাষের জন্য জলের পরই সারের স্থান। উপযুক্ত ও প্রচুর সার প্রয়োগ করিয়া ফসলের পরিমাণ দ্বিগুণ তিনগুণ নিশ্চয়ই বৃদ্ধি করা যায়। বিনা জল ও সারে কিছুই জন্মায় না। চাষ মানেই হইতেছে সারকে ফসলে পরিণত করা। কিন্তু আমাদের দেশে জমিতে নামমাত্র সার পড়ে। গোময়ই প্রায় একমাত্র সাররূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু অধিকাংশ গোময়ই গৃহস্থ পোড়াইয়া ফেলে। বাকিটা ছিটাফোঁটা হিসাবে জমিতে ছিটাইয়া দিয়া কৃষক জলদেবতা ও কপালের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকে। ইহা আর একদিনও চলা উচিত নহে। প্রয়োজন হইলে আইন করিয়া ঘুঁটে পোড়ান বন্ধই করিতে হইবে। ঘরে ঘরে গোবর ও অন্যান্য আবর্জনা দিয়া কম্পোণ্ট করান শিখাইতে হইবে। খইল, হাড়ের গুঁড়ো বা সুপার ফস্ফেট, সোরা, সোডিয়াম নাইট্রেট, এমোনিয়াম সালফেট প্রভৃতি রাসায়নিক সারের ব্যবহার অপরিহার্য।

সাহেবরা চা'র ব্যবসায়ে লক্ষ বা কোটিপতি হইয়া গেল। চা'ও গাছ। উহার চাষের জন্য এমোনিয়াম সালফেট বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নহিলে ফসল ভাল হয় না। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ভাল ফসলের জন্য ভারতে প্রতি বৎসর ৫০ লক্ষ টন এমোনিয়াম সালফেট প্রয়োজন। কিন্তু এখন ভারতে কয়েক শত টন মাত্র প্রস্তুত হয়। সম্প্রতি ভারত গভর্নমেণ্ট ধানবাদের নিকট সাড়ে তিন লক্ষ এবং দক্ষিণ ভারতে আরও সাড়ে তিন লক্ষ টন এমোনিয়াম সালফেট প্রস্তুত করিবার জন্য কারখানা স্থাপন করিবেন বলিয়াছেন। এখনও কিন্তু উহা জল্পনা কল্পনার রাজ্যেই রহিয়াছে। কবে যে উহা কার্যে পরিণত হইবে জানি না। পুনরায় বলি, উপযুক্ত সার প্রয়োগে সকল ফসলের পরিমাণ দ্বিগুণ বা তদপেক্ষা বেশীগুণ নিশ্চয়ই বাড়ান যায়।

তারপর ধরুন উন্নত বীজ বপন। ভারতবর্ষের নানাস্থানে বীজ সম্বন্ধে গবেষণা হইতেছে। পুসা গম, কইমব্যাটারের ইক্ষু, বিবিধ প্রকারের ধান্য প্রভৃতি উন্নত ধরণের বীজ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কৃষকেরা প্রায় সবই নিরক্ষর। তাহারা ইহার খবরই রাখে না। তাহাদিগকে শিখাইবার চেষ্টাও খুব কম। এই সকল উন্নত বীজ বপন করিলে ফসলের ফলন বাড়ে—কিন্তু অজ্ঞতাই অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে। ইহাদের ক্ষেতে গিয়া ইহাদিগকে হাতেকলমে না শিখাইলে গবেষণালব্ধ উন্নত বীজের দ্বারা শস্যের ফসল বাড়ান যাইবে না।

মৃত্তিকার গভীর খনন সম্বন্ধে বেশী বলিবার প্রয়োজন নাই। মান্ধাতা যখন আমাদের দেশে রাজা ছিলেন সেই সময় হইতে ভারতবর্ষে মৃত্তিকার উপরি ভাগের ৬ হইতে ৯ ইঞ্চি গভীর জমিই কর্ষিত হইতেছে। তাহার নিম্নের জমি অবিকৃত থাকিয়া যাইতেছে। বড়ই আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অন্ততঃ দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া সেই ৮।৯ ইঞ্চি গভীর জমি হইতেই ফসল উৎপন্ন করিবার চেষ্টা চলিতেছে। অন্যান্য উন্নত দেশে ট্রাকটার প্রভৃতি যন্ত্রচালিত আধুনিক লাঙগলের দ্বারা মৃত্তিকার নিম্নস্তর পর্যন্ত কর্ষিত হওয়াতে জমির উর্বরা শক্তি অনেক বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহার ফলে ফসলের বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আমাদের দেশে কৃষকের জমির পরিমাণ খুবই কম। এক একখানা ক্ষেত ২।৪ কাঠা বা বড় জোর দুই এক বিঘা। ফলে ট্রাকটার দ্বারা চাষ সাধারণতঃ অসম্ভব। দুইশত বা একশত বিঘা জমি সমবায় ও মিলিতভাবে কর্ষিত হইলে তবে ট্রাকটারের ব্যবহার চলিতে পারে। তা না হইলে সেই উপরকার ৬ বা ৯ ইঞ্চি জমিতে যা ফসল হয় তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। অন্ততঃ বলদবাহিত উন্নত ধরণের হিন্দুস্থান, শিবজুরু, সব-কাম প্রভৃতি লাঙগল ব্যবহৃত হইলে কতকটা উপকার হয়—জমি কতক পরিমাণে গভীরভাবে কর্ষিত হইতে পারে।

সেই সঙ্গে জমি সম্বন্ধে আইন না বদলাইলে ক্রমশঃ জমি শত সহস্র ভাগে টুকরা টুকরা হইয়া যাইতেছে। এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিতে বৈজ্ঞানিক প্রথায় কর্ষণ একেবারেই অসম্ভব। রাশিয়ায় সমস্ত জমি সরকারের বলিয়া সহস্র সহস্র ট্রাকটারের দ্বারা চাষ হইতেছে এবং সেইজন্য ফসলের পরিমাণও অনেক বাড়িতেছে। আমেরিকার কৃষিক্ষেত্রগুলি প্রায়ই একশত একরের কম হয় না। ২।৪ কাঠা জমির পৃথক পৃথক চাষ আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক কৃষি প্রবর্তনের একটি প্রধান অন্তরায়।

পাট প্রভৃতি পয়সার ফসলের চাষ না কমাইলে ও তাহার স্থানে ধান ও গম প্রভৃতি খাদ্যশস্য বপন না করিলে ভারতের উপযোগী খাদ্যশস্যের অভাবে লোক মারা যাইবে। আগে ত বাঁচা দরকার, তারপর ত পাট বেচিয়া টাকার কথা। অন্ততঃ পাটের জমিতে আরও একটা খাদ্যশস্য দ্বিতীয় ফসলরূপে চাষ করা একান্ত প্রয়োজন।

পোকায় অনেক বৎসর ফসল নষ্ট করে। অনেক প্রকার পোকা ফসলের শত্রু। পোকা নষ্ট করিবার অনেক বৈজ্ঞানিক প্রথা আবিষ্কৃত হইয়াছে। কৃষকেরা তাহা একেবারেই জানে না। পোকায় ফসল নষ্ট হইলে তাহা ভগবানের মার ও দুরদৃষ্ট বলিয়াই তাহারা ক্ষান্ত হয়। কিন্তু ফসলের শত্রুকেও যে বিনাশ করা যায়, এ তথ্য ওই অজ্ঞ কৃষককুলকে কে শিখাইবে?

উপরে যাহা উক্ত হইল তাহা ধান, গম, ইক্ষু প্রভৃতি সর্ববিধ খাদ্যশস্য সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। অনাবাদি জমির চাষ, জল, সার উন্নত বীজ, গভীর খনন, পাট প্রভৃতির পরিবর্তে খাদ্যশস্য বপন, জমি সংক্রান্ত আইন

আধুনিক রাষ্ট্রে বিজ্ঞান

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী এম-এ, পি-এইচ-ডি, পি-আর-এস

বিজ্ঞান আধুনিক রাষ্ট্রের ঐশ্বর্য ও স্থায়িত্বের প্রধান ভিত্তি

আগামী বৎসর জুন মাসের মধ্যে ভারত স্বাধীন হইবে। ইহা ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের ঘোষণা। খুবই আনন্দ ও গৌরবের কথা। দুই শত বৎসর পরে ভারতবাসী স্বাধীন জাতিবৃন্দের মধ্যে এক গৌরবোজ্জ্বল স্থান লাভ করিবে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভ ও স্বাধীনতা রক্ষা করা এক কথা নহে। অন্তর্বিপ্লব ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য জল, স্থল ও অন্তরীক্ষে যুদ্ধোপযোগী জাতীয় সৈন্যবাহিনীর সৃজন ও শিক্ষা, সমরোপযোগী আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, এরোপ্লেন, যুদ্ধজাহাজ, সাবমেরিন ট্যাঙ্ক র‍্যাডার প্রভৃতি নির্মাণ অপরিহার্য। দেশকে আধুনিক যন্ত্রশিল্পে প্রভূত পরিমাণে উন্নত করিতে হইবে ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইলে যুদ্ধজাহাজ ছাড়া বাণিজ্যোপযোগী বহু সহস্র জাহাজ প্রভৃতি নির্মাণ করিতে হইবে। উন্নত উপায়ে কৃষিকার্য পরিচালন করিয়া দেশে অন্নকষ্ট ও দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিতে হইবে। কিন্তু এ সমস্তই বিজ্ঞানের প্রচার, প্রসার ও গবেষণার উপর নির্ভর করিতেছে। শস্ত্রবিদ্যা, শিল্প বাণিজ্য কৃষি সবই আধুনিক কালে বিজ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। গ্রেট ব্রিটেন, আমেরিকা, রুশিয়া এবং গত বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে জার্মানী ও জাপান প্রভৃতি পৃথিবীর তাবৎ সমৃদ্ধ দেশসমূহ শুদ্ধ ও ফলিত বিজ্ঞানের আবাসস্থল। কিন্তু গত দুই শত বৎসরের পরাধীনতার ফল-নিরক্ষর এবং বিজ্ঞানের পঠন পাঠন মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মধ্যে নিবদ্ধ এবং ফলিত বিজ্ঞানের নামও কিছুদিন আগে পর্যন্ত বড় একটা শুনা যাইত না। যন্ত্রশিল্প প্রায় সমস্তই বিদেশী কোম্পানীর স্বরূপ ভারতের অধিবাসীরা অধিকাংশই হাতে পরিচালিত। ভারতের বহু কোটি টাকার বহির্বাণিজ্য প্রায় সমস্তই বিদেশীর হাতে এবং ভারতে ছাড়া পৃথিবীর সমস্ত জাতিবৃন্দের জাহাজ সমূহে তাবৎ আমদানী ও রপ্তানি দ্রব্য ভারতে আসে ও যায়। ভারতে মোটর গাড়ী, জাহাজ, এরোপ্লেন প্রভৃতি কিছুই প্রস্তুত হয় না। গত যুদ্ধের জন্য বাঙলা দেশে কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ে কয়েক শত কাঠের নৌকা প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু শুনিয়াছি সেগুলি একেবারে অব্যবহার্য, এমন কি সেগুলি জলেই ভাসিল না। দেশের লোক দুবেলা দুমুঠো খাইতে পায় না—কৃষিকার্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিচালিত হয় না বলিয়া। বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বিত না হওয়ায় পল্লীগ্রামগুলি বিশেষতঃ বঙ্গদেশের, ম্যালেরিয়া, বসন্ত, কলেরায় উৎসন্ন গেল।

বস্তুত—আধুনিক স্বাধীন দেশের স্থায়িত্বের প্রধান ভিত্তি বিজ্ঞান। আমেরিকা কর্তৃক আণবিক বোমা আবিষ্কৃত হওয়াতে কয়েক বৎসর স্থায়ী বিশ্বযুদ্ধ দুই দিনে থামিয়া গেল। সেদিন এক আমেরিকান বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন যে, আণবিক বোমা এখন এত মারাত্মকরূপে সৃজিত হইতেছে যে, মাত্র দুই দিনের যুদ্ধেই বহু লক্ষ লোক হতাহত হইবে। এই আণবিক অস্ত্র আবিষ্কার কল্পে বহু জার্মান, ইংরাজ, ডচ, আমেরিকান বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিয়াছেন এবং তাহাতে বহু কোটি টাকাও ব্যয়িত হইয়াছে ও হইতেছে। এইরূপ লোকক্ষয় দেখিয়া বহু দেশের বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী প্রস্তাব করিয়াছেন যে, আণবিক শক্তি যুদ্ধে আদৌ ব্যবহৃত যেন না হয় এবং ভবিষ্যতে উহা যেন কেবল পৃথিবীর অধিবাসিবৃন্দের সুখ ও মঙ্গলার্থে এবং শিল্পের প্রসারকল্পেই ব্যবহৃত হয়।

আণবিক শক্তির আবিষ্কার কেবল দৃষ্টান্তস্বরূপ দিলাম। ইহার পূর্বে বাষ্পশক্তি, বৈদ্যুতিক শক্তি আবিষ্কৃত হওয়াতে শিল্প, কৃষি প্রভৃতির কত উন্নতি হইয়াছে। সে সকলের আলোচনা দু'দশ পৃষ্ঠাব্যাপী অভিভাষণে সম্ভবপর নহে। ভারতের এখন প্রধান সমস্যা অন্নের সংস্থান। দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে ১৯৪২-'৩ সালে এক বঙ্গদেশে পঞ্চাশ লক্ষ লোক প্রাণ হারাইয়াছে। সেইজন্য এই খাদ্যসংকটকালে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণ কি পন্থা অবলম্বন করিতে বলেন তাহাই আলোচনা একটু বিশদভাবে করিতেছি। তবে মনে রাখিতে হইবে যে, আহারের সংস্থান যেমন রাষ্ট্রের সর্বপ্রথম করণীয় কার্য, সুস্বাস্থ্য, শিল্প প্রভৃতির প্রতি গভীর মনোনিবেশ প্রদানও তদ্রূপ করণীয়।

খাদ্যসংকট ও বৈজ্ঞানিকের কর্তব্য

অনেক বন্ধুবান্ধব জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন যে ভারতের দারুণ অন্নকষ্ট নিরাকরণকল্পে ভারতের বৈজ্ঞানিকেরা কি কিছু করিতে পারেন না? আমি সর্বদাই উত্তর প্রদান করিয়া থাকি—নিশ্চয়ই পারেন। খাদ্য বণ্টনের ভার সরকারের হাতে থাকে থাকুক কিন্তু উৎপাদনের প্রকৃষ্ট পন্থা আবিষ্কারের ভার বৈজ্ঞানিকের উপর থাকা একান্ত উচিত। ভারতের যেস্থানে একগাছি ধান্যশীর্ষ উৎপন্ন হইতেছে সেখানে বৈজ্ঞানিক চেষ্টা করিলে দুই, তিন বা ততোধিক সংখ্যক ধান্যশীর্ষ নিশ্চয়ই উৎপন্ন করিতে পারেন। তাহার নিশ্চিত প্রমাণ এই যে, যে সকল দেশে অধিকতর উন্নত উপায়ে ধান্য উৎপন্ন হয় সে সকল দেশে একর প্রতি উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ভারতে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ হইতে অনেক গুণ বেশী। প্রতি একর জমিতে গড়পড়তা ভারতে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ মাত্র ৮০০ পাউন্ড। কিন্তু চীনদেশে উহার পরিমাণ ১৪০০ পাঃ, ইজিপ্টে ২০০০ পাঃ, জাপানে ২৩০০ পাঃ, এবং ইটালীতে ৩০০০ পাঃ। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য পরিচালিত হওয়াতে ইটালীতে একর প্রতি উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ভারতের উৎপন্ন অপেক্ষা প্রায় চারি গুণ বেশী।

ভারতের অপর প্রধান খাদ্য গম সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। একর প্রতি ভারতে উৎপন্ন গমের পরিমাণও প্রায় ৮০০ পাঃ, কিন্তু জার্মানীতে উৎপন্ন গমের পরিমাণ ২২০০ পাঃ।

এখন ধান্য, গম, দুগ্ধ মৎস্য ডিম্ব মাংস প্রভৃতি প্রত্যেক প্রধান প্রধান খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ বাড়াইতে হইলে কিরূপ বৈজ্ঞানিক প্রথা অবলম্বন করিতে হইবে তাহা আলোচনা করিতেছি। ব্যাপারটা খুবই বৃহৎ—অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনাই এক্ষেত্রে সম্ভবপর।

ধান্য ও গম

ভারতের প্রধান খাদ্যশস্য চাউল ও গমজাত দ্রব্য। ভারতের লোকসংখ্যা দ্রুতগতিতে প্রতি দশ বৎসরে পাঁচ কোটি হারে বাড়িতেছে। ইহাদের আহারের সংস্থান করিতে হইবে। ভারতবর্ষে উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্য সাধারণ বৎসরে প্রয়োজনের শতকরা ৩০ ভাগ কম উৎপন্ন হয়। ভারতে ৩৬ কোটি একর জমিতে আবাদ হয়, কিন্তু অনাবাদি জমির পরিমাণ ১৭ কোটি একর। এই অনাবাদি জমি চাষোপযোগী। উপযুক্ত পরিমাণ সার ও জল পাইলে অনাবাদি জমিগুলির চাষ হইতে পারে ও উৎপন্ন খাদ্যশস্যের পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগ বাড়িয়া যাইতে পারে।

অনাবাদি জমির চাষ ছাড়া নিম্নলিখিত বৈজ্ঞানিক প্রণালীগুলি অবলম্বিত হইলে ভারতজাত খাদ্যশস্যের পরিমাণ দ্বিগুণ এমন কি তিন-চারি গুণ বৃদ্ধি পাইতে পারে। যথা (১) পাট প্রভৃতির চাষের জমি কমাইয়া তাহাতে খাদ্যশস্য উৎপন্ন করা (২) প্রচুর ও সময়োচিত

জলের ব্যবস্থা, (৩) প্রচুর ও উপযুক্ত স্বাভাবিক ও রাসায়নিক সারের প্রয়োগ, (৪) উন্নত লাঙগল ও ট্রাকটার প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে মৃত্তিকার গভীর কর্ষণ, (৫) উন্নত প্রকারের বীজ সরবরাহ, (৬) কৃষি গবেষণাজাত তথ্যগুলির বহুবিস্তৃত প্রচারের ব্যবস্থা, (৭) অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা নিবারণকল্পে জমি সম্বন্ধে আইনের পরিবর্তন। ইহার এক একটি বিষয় সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা করিতে হইলে এক একখানি পুস্তিকা বা পুস্তক রচিত হইতে পারে। এখানে এক একটি বিষয়ে দুই একটি দৃষ্টান্ত দিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে হইবে।

প্রথমে ধরুন জল সরবরাহ। ধান্য অর্ধ জলজ শস্য। সময়োচিত ও প্রচুর জল সরবরাহের ব্যবস্থা না হইলে, জমিতে যত সারই দিন না কেন, জমি যতই গভীরভাবে কর্ষণ করুন না কেন, ধান জন্মিবে না। সেইজন্য জল সরবরাহের ব্যবস্থা প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। আকাশের জল হউক বা না হউক—তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকিলে মধ্যে মধ্যে অজন্মা হওয়া অপরিহার্য। সেইজন্য কূপ, পুষ্করিণী, খাল, বিল হইতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা বহুপরিমাণে বাড়াইতে হইবে—উপায়ান্তর নাই। নহিলে অজন্মা হইবেই। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে অবৃষ্টির বৎসর খাল, বিল, পুকুর কূপের জল চাষের পক্ষে মোটেই পর্যাপ্ত নহে। সেই সময় ইরিগেশন পয়ঃপ্রণালীর জলের একান্ত প্রয়োজন হয়। এইরূপ ইরিগেশন পয়ঃপ্রণালীর অভাবে অবৃষ্টির বৎসর অজন্মা হয়। সেইজন্য নদনদীর জল বন্ধ করিয়া দেশের সর্বত্র ইরিগেশন পয়ঃপ্রণালীর বহুল প্রবর্তন অজন্মা ও দুর্ভিক্ষ নিবারণের প্রথম ও প্রধান উপায়। দ্বিতীয় উপায় নাই। দাক্ষিণাত্যের কাবেরী নদীকে মেচুর ও মহিশূরে এই দুই স্থানে বাঁধিয়া সেই বন্ধ জল জমিতে ছাড়িয়া দিয়া বহু লক্ষ একর জমির চাষ হইতেছে। পাঞ্জাবের নদীগুলির উপর বাঁধ দিয়া, সেই জল জমির চাষের জন্য বহু পরিমাণে ব্যবহার হইতেছে। সিন্ধু প্রদেশ মরুভূমির দেশ। সক্কর ব্যারাজ (Sukkur Barrage) এর জলের দ্বারা সিন্ধুপ্রদেশে অনেক মরুভূমি অংশ চাষের উপযোগী হইতেছে। বাঙলা দেশে দামোদর প্রভৃতি বহু নদীর উপর বাঁধ বাঁধিয়া পয়ঃপ্রণালীর সাহায্যে মাঠে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করিতেই হইবে। এই বৈজ্ঞানিক যুগে বরুণের খামখেয়ালি কৃপার উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকা চলে না। পুরুষকার নিশ্চয়ই অবলম্বন করিতে হইবে। সুখের বিষয় বঙ্গদেশে দামোদর প্রভৃতি নদীর উপর বাঁধ দিয়া ইরিগেশন পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ পরিকল্পনা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে।

চাষের জন্য জলের পরই সারের স্থান। উপযুক্ত ও প্রচুর সার প্রয়োগ করিয়া ফসলের পরিমাণ দ্বিগুণ তিনগুণ নিশ্চয়ই বৃদ্ধি করা যায়। বিনা জল ও সারে কিছুই জন্মায় না। চাষ মানেই হইতেছে সারকে ফসলে পরিণত করা। কিন্তু আমাদের দেশে জমিতে নামমাত্র সার পড়ে। গোময়ই প্রায় একমাত্র সাররূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু অধিকাংশ গোময়ই গৃহস্থ পোড়াইয়া ফেলে। বাকিটা ছিটাফোঁটা হিসাবে জমিতে ছিটাইয়া দিয়া কৃষক জলদেবতা ও কপালের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকে। ইহা আর একদিনও চলা উচিত নহে। প্রয়োজন হইলে আইন করিয়া ঘুঁটে পোড়ান বন্ধই করিতে হইবে। ঘরে ঘরে গোবর ও অন্যান্য আবর্জনা দিয়া কম্পোস্ট করান শিখাইতে হইবে। খইল, হাড়ের গুঁড়া বা সুপার ফস্ফেট, সোরা, সোডিয়াম নাইট্রেট, এমোনিয়াম সালফেট প্রভৃতি রাসায়নিক সারের ব্যবহার অপরিহার্য।

সাহেবেরা চা'র ব্যবসায়ে লক্ষ বা কোটিপতি হইয়া গেল। চা'ও গাছ। উহার চাষের জন্য এমোনিয়াম সালফেট বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নহিলে ফসল ভাল হয় না। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ভাল ফসলের জন্য ভারতে প্রতি বৎসর ৫০ লক্ষ টন এমোনিয়াম সালফেট প্রয়োজন। কিন্তু এখন ভারতে কয়েক শত টন মাত্র প্রস্তুত হয়। সম্প্রতি ভারত গভর্নমেণ্ট ধানবাদের নিকট সাড়ে তিন লক্ষ এবং দক্ষিণ ভারতে আরও সাড়ে তিন লক্ষ টন এমোনিয়াম সালফেট প্রস্তুত করিবার জন্য কারখানা স্থাপন করিবেন বলিয়াছেন। এখনও কিন্তু উহা জল্পনা কল্পনার রাজ্যেই রহিয়াছে। কবে যে উহা কার্যে পরিণত হইবে জানি না। পুনরায় বলি, উপযুক্ত সার প্রয়োগে সকল ফসলের পরিমাণ দ্বিগুণ বা তদপেক্ষা বেশীগুণ নিশ্চয়ই বাড়ান যায়।

তারপর ধরুন উন্নত বীজ বপন। ভারতবর্ষের নানাস্থানে বীজ সম্বন্ধে গবেষণা হইতেছে। পুসা গম, কইমব্যাটারের ইক্ষু, বিবিধ প্রকারের ধান্য প্রভৃতি উন্নত ধরণের বীজ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কৃষকেরা প্রায় সবই নিরক্ষর। তাহারা ইহার খবরই রাখে না। তাহাদিগকে শিখাইবার চেষ্টাও খুব কম। এই সকল উন্নত বীজ বপন করিলে ফসলের ফলন বাড়ে—কিন্তু অজ্ঞতাই অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে। ইহাদের ক্ষেতে গিয়া ইহাদিগকে হাতেকলমে না শিখাইলে গবেষণালব্ধ উন্নত বীজের দ্বারা শস্যের ফসল বাড়ান যাইবে না।

মৃত্তিকার গভীর খনন সম্বন্ধে বেশী বলিবার প্রয়োজন নাই। মান্ধাতা যখন আমাদের দেশে রাজা ছিলেন সেই সময় হইতে ভারতবর্ষে মৃত্তিকার উপরি ভাগের ৬ হইতে ৯ ইঞ্চি গভীর জমিই কর্ষিত হইতেছে। তাহার নিম্নের জমি অবিকৃত থাকিয়া যাইতেছে। বড়ই আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অন্ততঃ দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া সেই ৮।৯ ইঞ্চি গভীর জমি হইতেই ফসল উৎপন্ন করিবার চেষ্টা চলিতেছে। অন্যান্য উন্নত দেশে ট্রাকটার প্রভৃতি যন্ত্রচালিত আধুনিক লাঙগলের দ্বারা মৃত্তিকার নিম্নস্তর পর্যন্ত কর্ষিত হওয়াতে জমির উর্বরা শক্তি অনেক বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহার ফলে ফসলের বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আমাদের দেশে কৃষকের জমির পরিমাণ খুবই কম। এক একখানা ক্ষেত ২।৪ কাঠা বা বড় জোর দুই এক বিঘা। ফলে ট্রাকটার দ্বারা চাষ সাধারণতঃ অসম্ভব। দুইশত বা একশত বিঘা জমি সমবায় ও মিলিতভাবে কর্ষিত হইলে তবে ট্রাকটারের ব্যবহার চলিতে পারে। তা না হইলে সেই উপরকার ৬ বা ৯ ইঞ্চি জমিতে যা ফসল হয় তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। অন্ততঃ বলদবাহিত উন্নত ধরণের হিন্দুস্থান, শিবজনু, সব-কাম প্রভৃতি লাঙগল ব্যবহৃত হইলে কতকটা উপকার হয়—জমি কতক পরিমাণে গভীরভাবে কর্ষিত হইতে পারে।

সেই সঙ্গে জমি সম্বন্ধে আইন না বদলাইলে ক্রমশঃ জমি শত সহস্র ভাগে টুকরা টুকরা হইয়া যাইতেছে। এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিতে বৈজ্ঞানিক প্রথায় কর্ষণ একেবারেই অসম্ভব। রাশিয়ায় সমস্ত জমি সরকারের বলিয়া সহস্র সহস্র ট্রাকটারের দ্বারা চাষ হইতেছে এবং সেইজন্য ফসলের পরিমাণও অনেক বাড়িতেছে। আমেরিকার কৃষিক্ষেত্রগুলি প্রায়ই একশত একরের কম হয় না। ২।৪ কাঠা জমির পৃথক পৃথক চাষ আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক কৃষি প্রবর্তনের একটি প্রধান অন্তরায়।

পাট প্রভৃতি পয়সার ফসলের চাষ না কমাইলে ও তাহার স্থানে ধান ও গম প্রভৃতি খাদ্যশস্য বপন না করিলে ভারতের উপযোগী খাদ্যশস্যের অভাবে লোক মারা যাইবে। আগে ত বাঁচা দরকার, তারপর ত পাট বেচিয়া টাকার কথা। অন্ততঃ পাটের জমিতে আরও একটা খাদ্যশস্য দ্বিতীয় ফসলরূপে চাষ করা একান্ত প্রয়োজন।

পোকায় অনেক বৎসর ফসল নষ্ট করে। অনেক প্রকার পোকা ফসলের শত্রু। পোকা নষ্ট করিবার অনেক বৈজ্ঞানিক প্রথা আবিষ্কৃত হইয়াছে। কৃষকেরা তাহা একেবারেই জানে না। পোকায় ফসল নষ্ট হইলে তাহা ভগবানের মার ও দুরদৃষ্ট বলিয়াই তাহারা ক্ষান্ত হয়। কিন্তু ফসলের শত্রুকেও যে বিনাশ করা যায় এ তথ্য ওই অজ্ঞ কৃষককুলকে কে শিখাইবে?

উপরে যাহা উক্ত হইল তাহা ধান, গম, ইক্ষু প্রভৃতি সর্ববিধ খাদ্যশস্য সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। অনাবাদি জমির চাষ, জল, সার উন্নত বীজ, গভীর খনন, পাট প্রভৃতির পরিবর্তে খাদ্যশস্য বপন, জমি সংক্রান্ত আইন

পরিবর্তন, কৃষককে গবেষণার ফল সম্বন্ধে সচেতন করন, ফসলের শত্রুর বিনাশ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বিত হইলে ভারতের দুর্ভিক্ষের ভয় সম্পূর্ণ দূরীভূত হইবে ইহা নিশ্চিত সত্য। সর্বপ্রথম ও প্রধান প্রয়োজন হইতেছে জল ও সার—নদনদী বন্ধ করিয়া সারা দেশে ইরিগেশান প্রণালী খনন এবং কম্পোস্ট, খইল, সুপার ফস্ফেট এমোনিয়াম সলফেট প্রভৃতির বহুল ব্যবহার।

দুগ্ধ

তারপর ধরুন দুগ্ধ। দুগ্ধ দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। রোগা, শিশু, বৃদ্ধ, দুধ পাইতেছে না বা অতি অল্পই পাইতেছে। দেখা যায় ভারতে গাভীর অভাব নাই। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ভারতে ২০ কোটি গাভী আছে, অর্থাৎ দুজন লোক পিছু একটি করিয়া গাভী আছে। কিন্তু আমাদের দেশে গাভীর যা' চেহারা ও খোরাক তাহাতে গাভীপ্রতি দুধ হয় কত? গড়পড়তা আমাদের দেশের গাভী হইতে ২ পাঃ দুধ পাওয়া যায়, সেই জায়গায় নিউজিল্যাণ্ডে পাওয়া যায় ১৪ পাঃ, ইংলণ্ডে ১৫ পাঃ এবং হল্যাণ্ডে ২০·৫ পাঃ। অর্থাৎ ভারতের প্রত্যেক গাভী যে পরিমাণ দুধ দেয়, হল্যাণ্ড দেশের গাভী তাহা অপেক্ষা দশগুণের বেশী দুগ্ধ প্রদান করে। মাথা গুণিলে দেখা যায় যে, ভারতে পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ গাভী বিদ্যমান। কিন্তু জার্মানীতে ভারতের এক-অষ্টমাংশ সংখ্যক গাভী হইতে ভারতের সমপরিমাণ দুগ্ধ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ইহার প্রতিকারের দুইটি প্রধান উপায় আছে—প্রথম হইতেছে গাভীর জাতি (breed) বদলান, দ্বিতীয় হইতেছে উহাকে প্রচুর খাদ্য প্রদান। বাঙগলা দেশেই দেখিতেছি যে, পশ্চিমাঞ্চল হইতে আনীত গাভী প্রত্যহ ৮।১০ সের দুগ্ধ দেয়, আমাদের বাঙগলা দেশে গাভী মাত্র অর্ধ হইতে দুই তিন সের দুগ্ধ দেয়। সেইজন্য পশ্চিম হইতে আনীত গাভীর মূল্য বাঙগলা দেশের গাভীর মূল্য অপেক্ষা তিন চারিগুণ বেশী। ভারতের ভূতপূর্ব বড়লাট লর্ড লিনলিথগো ভারতবর্ষে আসিয়াই সর্বত্র উচ্চশ্রেণীর বলদ সরবরাহ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার সে চেষ্টা বিশেষ প্রসারলাভ করে নাই। কিন্তু এটা ধ্রুব সত্য এই যে, ভারতের গাভীর জাতির breed না বদলাইলে ভারতের দুগ্ধের পরিমাণ বাড়িবে না। এ সম্বন্ধে অনেক বৈজ্ঞানিক গবেষণা সরকারী কৃষি-বিভাগে হইয়াছে ও হইতেছে। এগুলি সর্বত্র গ্রহণ করিতেই হইবে।

দ্বিতীয় উপায় হইতেছে—গাভীকে প্রচুর খাদ্য প্রদান। বাঙগলায় একটা প্রবাদ আছে—'গরুর খাবার মুখে দুধ'। গরুকে যত বেশী পুষ্টিকর খাদ্য দিবেন, দুধ তত বেশী হইবে। সাধারণতঃ কিছু কুচান শুষ্ক খড়, অল্প খইল ও লবণ গরুর খাদ্য। ইহা পর্যাপ্ত নহে। কাঁচা ঘাস বা পশুখাদ্য তাহাকে দেওয়া একান্ত কর্তব্য। রাজসাহী কৃষিফার্মে দেখিলাম যে ক্ষেতে জোয়ার (miller) বপন করিয়া উহা বড় হইলে ফুল হইবার আগে কাটিয়া, উচ্চ একটা ইষ্টক নির্মিত টাওয়ারের ভিতরে রাখিয়া দিলে উহা সবুজ থাকে ও উহা গাভীর পুষ্টিকর খাদ্য। অনেক দেশে এরূপ প্রথা ও আইন আছে যে, প্রত্যেক কৃষক তাহার জমির অন্ততঃ এক-অষ্টমাংশে পশুখাদ্যের চাষ করিবে। পশুখাদ্যের চাষ আমাদের দেশে একপ্রকার অজ্ঞাত। উহা প্রবর্তিত না হইলে দুগ্ধের পরিমাণ বাড়িবে না।

অন্যান্য দেশে দুগ্ধ উৎপন্ন করিবার জন্য সহরের নিকটবর্তী স্থানে বড় বড় প্রতিষ্ঠান আছে। সেখানে ১০।১২ সের দুধ দেয় এইরূপ গাভীই পালিত হয়—নিকৃষ্টশ্রেণীর গাভী মোটেই পালিত হয় না। সেই সব গাভীর জন্য উপযুক্ত বলদও সেই সব প্রতিষ্ঠানে প্রতিপালিত হয়। ফলে সেই সকল প্রতিষ্ঠানে দুগ্ধের পরিমাণ খুব বেশী হয়। ট্রেণে করিয়া refrigerator-এর সাহায্যে সেই দুগ্ধ সহরে সরবরাহ করা হয়। আমাদের দেশে এইরূপ প্রতিষ্ঠান যতদিন না বহুল পরিমাণে শিক্ষিত যুবকগণ স্থাপন করিতেছেন ততদিন আমাদের দেশে দুগ্ধ সমস্যা যাইবে না।

মৎস্য

মৎস্য আমাদের বিশেষতঃ বাঙগালীর প্রিয় পুষ্টিকর খাদ্য। কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আমাদের দেশে মৎস্যের চাষ হয় না বলিয়া পুষ্করিণীতে মাছ তাড়াতাড়ি বাড়ে না। মানুষ ও গাভী প্রভৃতি পশুকে যেমন খাবার দেওয়া প্রয়োজন মাছকেও সেইরূপ খাবার যোগান দরকার। মৎস্যকে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য প্রদান করিলে কিরূপ তাড়াতাড়ি বাড়ে তাহা বাঙগলার মৎস্য বিভাগের ডিরেক্টার সম্প্রতি অতি নিশ্চয়তার সহিত দেখাইয়াছেন—১ ইঞ্চি কাতলার পোনা দেড় মাসে ৬॥ ইঞ্চি এবং ১½ ইঞ্চি রুইএর পোনা একমাসে ৭॥ ইঞ্চি লম্বা হইয়াছে। সচরাচর সাধারণ পুষ্করিণীতে মাছ এরূপ বড় হইতে এক বৎসরেরও অধিক সময় লাগে। তিনি আরও বিস্ময়কর একটি তথ্য সেদিন আবিষ্কার করিয়াছেন। বর্ষার সময় বাঙগলা দেশের ধান্যক্ষেত্রে তিন মাসকাল জল থাকে। সেই সময় সেই জলে তিনি রুই, কাতলার পোনা ছাড়িয়া মাছের চাষ করা যায় তাহা দেখাইয়াছেন। ধানের ক্ষেতের গোবরের সার, শেওলা, ময়লা প্রভৃতি খাইয়া মাছ খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। সেগুলিকে পরে পুষ্করিণীতে ছাড়িয়া দিয়া ১ ইঞ্চি কাতলা ১ মাস ২৫ দিনে ৮ ইঞ্চি ও ১½ ইঞ্চি রুই দেড় মাসে ৭½ ইঞ্চি হয়। সেদিন রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটীর এক সভায় তিনি উহা সকলকে দেখাইয়াছেন।

তাহা হইলে মৎস্য সম্বন্ধে প্রধান উন্নত উপায় হইবে—পুষ্করিণীতে মৎস্যকে প্রচুর আহার প্রদান। প্রচুর আহার দিলে ৭ মাসে মাছ ৭ সের হয়—একথা পড়িয়াছি। মৎস্যকে আহার দিবার কথা আমরা কখনও ভাবিই না। কিন্তু আহার না পাইলে যেমন মানুষের পুষ্টি হয় না, সেইরূপ উপযুক্ত ও প্রচুর আহার না পাইলে খাদ্যশস্য, মৎস্য, পশুপক্ষী, ছাগল গরু কিছুই বাড়ে না। মৎস্যের খাদ্য জলের PH value উপর নির্ভর করে। প্রধানতঃ খাদ্যশস্যের ফলনের জন্য যে সকল সার প্রয়োগ করা যায়—প্রমাণিত হইয়াছে যে তাহা মৎস্যখাদ্যরূপেও ব্যবহৃত হইতে পারে। গোময়, খইল, রাসায়নিক সার সবই মৎস্যখাদ্য। ভাত, ডাইল, তরিতরকারি মৎস্যখাদ্য। এ বিষয়ে বহু গবেষণা হইয়াছে। বিশেষভাবে জানিতে চাহিলে সরকারী মৎস্য বিভাগের ছাপা রিপোর্টে পাওয়া যায়।

কিন্তু আমরা যে মাছ খাই তাহা খাল, বিল, পুষ্করিণী ও নদীর মাছ। কিন্তু ভারতের তিনদিকে যে বিশাল সমুদ্র রহিয়াছে তাহাতে যে অনন্ত কোটি মৎস্য রহিয়াছে তাহা ধরিবার ও ধরিয়া তাহাদিগকে টাটকা অবস্থায় বাজারে আনিবার কোনও সুবন্দোবস্ত এতদিনেও হইল না। পুরী প্রভৃতি দুই এক স্থানে 'কাট্যামারান' নামক অতি প্রাচীন দড়ি বাঁধা তিনখণ্ড কাঠের নৌকায় সামুদ্রিক মৎস্য কিছু কিছু ধরার প্রথা আছে, কিন্তু অন্যান্য দেশে যন্ত্রচালিত শত শত ট্রলারে গভীর সমুদ্র হইতে মৎস্য আহৃত হয় এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে উহাদিগকে খাদ্যোপযোগী করিয়া দেশে বিদেশে প্রেরণ করা হয়। মৎস্য সেইজন্য আমাদের দেশে ক্রমেই বিরল হইয়া যাইতেছে। ভুলিয়া যাইলে চলিবে না যে সমুদ্র মৎস্যের অনন্ত আকর। শত শত ট্রলারে করিয়া গভীর সমুদ্র হইতে মৎস্য আহরণ করা অচিরে কল্পনার রাজ্য হইতে বাস্তবে পরিণত করিতেই হইবে।

ইন্‌কিউবেটারের সাহায্যে ডিম্ব হইতে পক্ষিশাবক সৃজন

হাঁস, মুরগী প্রভৃতি পক্ষী ও উহাদের ডিম্বের বহুল উৎপাদনের বৈজ্ঞানিক উপায়—ইন্‌কিউবেটার যন্ত্র ব্যবহার। ঐগুলি পুষ্টিকর খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। আমরা ইন্‌কিউবেটারের ব্যবহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ফল এই হইয়াছে যে কয়েকজন গৃহস্থ বিনা যন্ত্রের সাহায্যে এই সকল দ্রব্য যাহা উৎপন্ন করে তাহাই আমাদের একমাত্র সম্বল। যুদ্ধ বাধিলে যদি সরকার ইন্‌কিউবেটারের কার্যপদ্ধতি সকলকে শিখাইতেন ও হাজার হাজার ইন্-

কিউবেটার দেশে বিতরণ করিতেন, তাহা হইলে দেশে হাঁস. মুরগী ও উহাদের ডিম্বের অপ্রাচুর্য হইত না। অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ লক্ষ লক্ষ শুষ্ক ডিমের গুঁড়া পৃথিবীর সর্বত্র রপ্তানি করিয়া প্রভূত পরিমাণে লাভবান হইয়াছে। আর আমরা এক পয়সার ডিম আট পয়সায় কিনি। রাজসাহী প্রভৃতি কৃষিফার্মে Incubator এর কার্যপ্রণালী দেখিতে পাইবেন।

ছাগ ও মেষ পালন

ছাগ-মাংস আমরা অনেকেই খাই. কিন্তু ছাগ পালন করি না। ছাগ-দুগ্ধ মহাত্মা গান্ধীর প্রধান আহারীয়। ছাগলপালন সম্বন্ধে আমাদের অস্পৃহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। দুগ্ধ সমস্যার নিবারণ কল্পে ছাগদুগ্ধ কতকটা সাহায্যও করে। আমি আমার কলিকাতার বাড়িতে ও কলিকাতার সন্নিকটে আমার এক বাগানে ছাগ পালন করি। দেখিয়াছি যে একটা ছাগী বৎসরে দুইবার ছাগশিশু প্রসব করে। প্রত্যেকবারে ২।৩টা বাচ্চা হয়। ফল এই দাঁড়ায় যে একশত ছাগী এক বা দেড় বৎসরে পাঁচ ছয় শত ছাগছাগীতে পরিণত হয়। ইংরাজিতে বলিতে গেলে ছাগীপালনে ছাগবংশ Geometrical progression-এ বাড়িতে থাকে। কিন্তু এরূপ লাভবান ব্যবসা আমরা করি না। মেষপালনও লাভের জিনিস। মেষ পালনে তাহার গাত্রের লোম বা পশমও পাওয়া যায়। মেষ পালন ও তাহার মাংস রপ্তানি অস্ট্রেলিয়ার একটি প্রধান ব্যবসা। পশম অস্ট্রেলিয়া. তিব্বত প্রভৃতি দেশের একটি প্রধান সম্পদ। আমরা খাদ্য উৎপাদন সম্বন্ধে কিছুই বিশেষ করি না। কেবল হা হুতাশ করিয়া বেড়াইলে খাদ্যের পরিমাণ দেশে বাড়িবে না। দেশের যুবকগণ এই সকল ব্যবস্থা আরম্ভ করিলে তাহারাও লাভবান হইবেন. দেশেও খাদ্যের পরিমাণ বাড়িবে।

নিজের অভিজ্ঞতা

আমি বৈজ্ঞানিক। শুধু প্রচারই করি না, নিজে কিছু করিতে পারি কি না সে বিষয়ে চেষ্টা করাও আমার কাজ। গত যুদ্ধ বাধিতে বুঝা শক্ত হয় নাই যে খাদ্যদ্রব্যের অনটন পড়িবে। সঙ্গে সঙ্গে নিজের পরিবারের খাদ্য-সংস্থাপনের চেষ্টা করিতে হইল। তাহার বিবরণ কয়েকস্থলে পূর্বেই দিয়াছি—পুনরুক্তি করিলাম না। এখন আমি কলিকাতায় বসিয়াই তিনটা পুকুর করিয়াছি—মৎস্য পালন করি। বাগান করিয়াছি—বারমাস যে সময়ের যা শাকসব্জী জন্মে তাহা সুপ্রচুর ফুলকপি. বাঁধা-কপি, ওলকপি, বেগুন, শিম. লেবু. টমেটো, সজিনার ডাঁটা, উচ্ছে, লাউ, কুমড়া, পালং প্রভৃতি শাক ও চিচিঙ্গা ঝিঙ্গে আবাদ করি। আম, কাঁঠাল, নারিকেল, পেয়ারা. লিচু, কলা, পেঁপে, বেল প্রভৃতি ফল পাইয়া থাকি। কচি ও পাকা তাল দুই পাই। মালী আছে. তবে নিজেও মাটি কোপাই। রবিবার ও ছুটিছাটার দিনে স্ত্রী, ছেলেপুলে, নাতিনাতনী বৌ ঝি লইয়া বাগানে কাটাই। ইহাতে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। ভালো খাওয়া দাওয়াও চলে। যাঁহাদের পল্লী-গ্রামে বাড়ি তাঁহারা কিছু কিছু সব্জী আবাদ করেন কিন্তু বিস্তৃতভাবে ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাঁহারা যাহাতে ইহা করেন তাহার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।

শিল্প ও স্বাস্থ্য

শিল্প ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের সহিত ওতঃ-প্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু ইহাদের বিস্তৃত আলোচনার স্থান ও সময় পাইলাম না। বিদেশী জিনিসের রপ্তানি বন্ধ থাকাতে গত যুদ্ধের সময় দেশে অনেক নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভারতের বহু বৈজ্ঞানিক শিল্প সম্বন্ধে গবেষণায় রত ছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের অবসানে আবার বিদেশী দ্রব্যের মোহ জাগিয়াছে দেখিতেছি। বহু বিদেশজাত দ্রব্য আবার ভারতে আমদানি হইতেছে। ভারতের নূতন শিল্পগুলি যাহাতে উঠিয়া না যায় তাহার জন্য বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। সুখের বিষয় ভারতের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যতই বাড়িতেছে, ভারত ও প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টগুলি এ বিষয়ে ক্রম-বর্ধমান উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন। কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট ইতিমধ্যে প্রায় পাঁচশত শিক্ষিত যুবককে বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক শিল্পের জ্ঞান আহরণ করিবার জন্য আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে পাঠাইয়াছেন। উদ্দেশ্য যে ইঁহারা ফিরিয়া আসিলে দেশে উন্নত শিল্প প্রতিষ্ঠার সাহায্য করিবে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইতেছে। কয়েক কোটি টাকা খরচ করিয়া ভারতে National Physical Laboratory, National Chemical Laboratory, Fuel Research Laboratory, Glass & Ceramics Laboratory. প্রভৃতি স্থাপিত হইতেছে। দেশে এরোপ্লেন, মোটর, গাড়ি, জাহাজ, মেসিন টুল, লোকোমোটিভ প্রভৃতি যাহাতে প্রস্তুত হয় সে বিষয়ে চেষ্টা হইতেছে। ভারতীয় মোটর গাড়ি বাজারে ইতিমধ্যেই বাহির হইয়াছে। বড় স্কেলে প্ল্যানিং হইতেছে। স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইলে এগুলি সবই চাই।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সংঘবদ্ধ ও বড় রকমের চেষ্টা দেখিতেছি না। ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত, প্লেগ, যক্ষ্মা নিবারণকল্পে যে সকল উপায় অবলম্বিত হইতেছে তাহা নিতান্তই স্বল্প। ইহার জন্য কোটি কোটি মুদ্রা প্রয়োজন। বহু গবেষণার প্রয়োজন। গবেষণা কতক হইতেছে, কিন্তু ঐগুলি কাজে লাগাইবার উপযুক্ত পরিমাণ টাকাত দেখিতেছি না। দেশকে স্বাধীন রাখিতে হইলে দেশবাসীকে ব্যাধি-নির্মুক্ত রাখিতেই হইবে।

বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞান সম্বন্ধে সাময়িক পত্রিকার অভাব

বাঙলা ভাষা বর্তমানে পৃথিবীর অন্যতম ভাষারূপে গণ্য। বাঙলা ভাষায় দৈনিক সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকার সংখ্যাও অল্প নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কোন পত্রিকা নাই। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে (১৯০৯) ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভার (সায়েন্স এসোসিয়েশন) ছাত্রগণ "বিজ্ঞান-দর্পণ" নামক একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু ঐ পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পরিচালক ছিলেন। পত্রিকাখানি মাত্র দেড় বৎসর চলিয়াছিল। কিছুদিন পরে বিজ্ঞান-সভার তদানীন্তন সম্পাদক স্বর্গত ডাঃ অমৃত-লাল সরকার "বিজ্ঞান" নামক মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাখানি কয়েক বৎসর চলিয়াছিল। ইহার বহুদিন পরে ডক্টর সত্যচরণ লাহা "প্রকৃতি" নামে একখানি ত্রৈমাসিক পত্র প্রকাশ করেন। কয়েক বৎসর চালানর পর তিনিও উহা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এই বৈজ্ঞানিক যুগে সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রচারকল্পে মাতৃভাষায় বৈজ্ঞানিক পত্রিকা প্রকাশিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

সর্বশেষে আবার স্মরণ করাইয়া দিতে ইচ্ছা করি যে ভারত আজ স্বাধীনতার দ্বারে উপস্থিত। এখন এই লব্ধপ্রায় স্বাধীনতাকে লাভ ও অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে ভারতকে অচিরে কায়মনোবাক্যে বিজ্ঞানকে বরণ করিয়া লইতে হইবে। বিজ্ঞানই যখন সকল উন্নত রাষ্ট্রের প্রধান ভিত্তি, এবং কবির ভাষায় ভারত যখন বিশ্বমাঝে 'শ্রেষ্ঠ আসন' লইতে চলিয়াছে তখন তাহাকেও সেই একই পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে—নান্যা পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। *

---

*প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে বিজ্ঞান শাখার সভাপতির অভিভাষণ।

ক্ষমাহীন পাপ

(হাঙ্গেরীয় একাঙ্কিকা)

ফ্রাঞ্জ মলনার

[প্রসিদ্ধ হাঙ্গেরীয় নাট্যকার ফ্রাঞ্জ মলনারের একাধিক একাঙ্কিকার অনুবাদ ইতিপূর্বে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং এই প্রতিভাবান নাট্যশিল্পীর সঙ্গে 'দেশে'র পাঠক-পাঠিকারা পরিচিত।]

গ্রী**ষ্মকালীন** একটি হোটেলের বারান্দায় বসে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক তাঁর বিগত জীবনের প্রেমপাত্রী একজন ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ করছেন।

ভদ্রমহিলা ঃ তারপর তোমার জীবনে কে এল?

ভদ্রলোক ঃ সে ছিল সবচেয়ে বেশী নির্মম।

ভদ্রমহিলা ঃ সে তোমার কি করেছিল?

ভদ্রলোক ঃ কোন পুরুষের প্রতি কোন নারী সর্বাপেক্ষা বেশী নির্মম যে আচরণ করতে পারে সে তাই করেছিল।......কবিরা বলেন যে, বিশ্বাসঘাতকতা ক্ষমাহীন পাপ। কিন্তু সেটা হল মূলতঃ পুরুষের পাপ। নারী সর্বাপেক্ষা বড় যে পাপ করতে পারে সে তাই করেছিল।

ভদ্রমহিলা ঃ সে কি কথা? সে কি করেছিল?

ভদ্রলোক ঃ সে আমাকে সত্যকথা বলেছিল। [ভদ্রমহিলা শূন্য দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালেন] তুমি কি বুঝতে পারছ না যে নারীর কাছ থেকে সত্য কথা শুনতে পাওয়া পুরুষের কাছ থেকে বিশ্বাসঘাতকতা পাওয়ার মতই ঘৃণ্য? কিন্তু না, একথা বোঝার মত বয়েস তোমার হয়নি। আমি তোমাকে বুঝিয়ে বলছি। আমার টাকা এত বেশী ছিল যে আমি জীবনে নারী ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে মাথা ঘামাই নি। অন্য যুবকরা রাজনীতি, সমাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা শিল্পের চর্চা করেছে—কিন্তু আমি চিরকাল দ্যুমার উপন্যাসের নায়কের মতই জীবন কাটিয়েছি। আমার যৌবন কেটেছে সিল্ক, লেস, প্রেমচাপল্যপূর্ণ চোখ এবং উন্মুক্ত শ্বেত গ্রীবার পরিবেশের মধ্যে। তার ফলে আমার যখন ৩৪ বৎসর বয়েস হল তখন আমি নারীদের সকল কলা-কৌশল জেনে ফেলেছিলাম। মানুষ যেমন করে ছাপা কাগজ পড়ে, আমি তেমনি করে তাদের পড়তে পারতাম, জানালার মধ্য দিয়ে যেমন করে দেখা যায়, তেমনই করে তাদের সব মিথ্যা ও ছল চাতুরী দেখতে পেতাম। আমি জানতাম যে মেয়েরা পনের বছর বয়সে পাকা মিথ্যাবাদী হয়, কুড়ি বৎসর বয়সে তাদের মিথ্যা বলার কলাকৌশল আরও বেড়ে যায় আর ত্রিশ বৎসর বয়সে তারা অভ্যাস বশেই মিথ্যা বলতে শুরু করে।

ভদ্রমহিলা ঃ তাই নাকি?

ভদ্রলোক ঃ সত্যি তাই। কিন্তু আমার উপর তাদের মিথ্যা কথার কোন ফল ফলত না। মানুষ বয়েস ও অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই দুর্ভেদ্যতা অর্জন করে। অনেকগুলি শিক্ষা তাদের হৃদয়ে রীতিমত শিকড় গেড়ে বসে। প্রথমতঃ ধর—কোন মেয়েকে যদি বলা যায় ঃ "তুমি কি আমায় ভালবাস?" তবে সে হয় "হাঁ," নয়ত 'না' বলবে। মেয়েদের মুখের এই 'হাঁ' ও 'না'র প্রকৃত অর্থ ভেদ করতে আমার লেগেছিল চৌত্রিশটি বৎসর। যেমন ধর কোন মেয়ে হয়ত আমাকে বলল যে সে বাজার করতে বেরিয়েছিল—কিন্তু সে হয়ত প্রকৃতপক্ষে তখন কোন পুরুষের সঙ্গে বসে চা খাচ্ছিল। তবু সে কোন পুরুষের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছিল এই কথা আমায় বিশ্বাস করাতে চায় বলেই তার এ কথা বলা। বুঝলে তো?

ভদ্রমহিলা ঃ না।

ভদ্রলোক ঃ আমার ধারণা ছিল তুমি বুঝবে।

ভদ্রমহিলা ঃ কিন্তু আমি বলছি যে আমি বুঝিনি।

ভদ্রলোক ঃ হাঁ সে কথা আমি শুনেছি।

[কিছুক্ষণের জন্য উভয়েই নীরব রহিলেন]

ভদ্রমহিলা ঃ কিন্তু সেই নিষ্ঠুর রমণী—সে তোমার সঙ্গে কি করেছিল?

ভদ্রলোক ঃ সে প্রথম থেকেই আমার ভিতর বাহির সব দেখে ফেলেছিল। সে, বুঝেছিল যে, আমি অনভিজ্ঞ তরুণও নই—আবার সহজ-বিশ্বাসী বৃদ্ধও নই—আমি এমন একজন সন্দেহবাদী যাকে অন্যান্য নারী জ্ঞাতব্য সব কিছুই শিখিয়েছে। সে বুঝেছিল যে আমাকে প্রতারণা করা সহজ নয়।

ভদ্রমহিলা ঃ বুঝলাম।

ভদ্রলোক ঃ আমাদের দুজনের হৃদ্যতা হবার পর প্রথম দিকে সে প্রতারণার চেষ্টা করেছিল। সে সহজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে মিথ্যা কথা বলতে পারত। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করতাম ঃ "গতকাল তুমি পথে কোন পুরুষের সঙ্গে বেড়াচ্ছিলে?" সে এক মুহূর্তের জন্যেও দ্বিধাগ্রস্ত না হয়ে জবাব দিত ঃ "সে আমার স্বামীর ভাই।" পরে আমি আবিষ্কার করতাম যে, তার স্বামীর কোন ভাই-ই নেই। এ নিয়ে একটা দৃশ্যের সৃষ্টি হবার পর সে বলত ঃ "আমাকে আর যন্ত্রণা দিও না। আমি তোমাকে সত্য কথাই বলছি—সে লোকটা আমার প্রেমিক।"

ভদ্রমহিলা ঃ আর তুমি কি বলতে?

ভদ্রলোক ঃ আমি হেসে নিশ্চিন্ত হতাম। তার বহু পরে আমি হয়ত আবিষ্কার করতাম যে সে লোকটা সত্যই ওর প্রেমিক। ইত্যবসরে তার কৌশল কার্যকরী হয়েছিল। আমি তাকে বিশ্বাস করব না এ কথা ভালভাবে জেনেও সে আমাকে সত্য কথা বলত। আমার সম্বন্ধে এ ধরণের হীন সুযোগ নেওয়া তার উচিত হত না।

ভদ্রমহিলা ঃ তারপর কি হল?

ভদ্রলোক ঃ যা হল সেটা কিছুটা বিভ্রান্তিকর। একদিন সে আমাকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রাখল। ফিরে আসার পর সে এত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিল আমি জানতে চাইলাম। সে জবাব দিল ঃ "ডাঃ জিরুসের বাসায়।" সে কোথায় ছিল বলে তোমার মনে হয়?

ভদ্রমহিলা ঃ কোথায়?

ভদ্রলোক ঃ ডাঃ জিরুসের বাসাতেই ছিল। আর সেখানে কি করছিল বলতো?

ভদ্রমহিলা ঃ কি করছিল?

ভদ্রলোক ঃ ডাঃ জিরুসের আঁকা এচিং দেখছিল।

[ভদ্রলোক দীর্ঘশ্বাস ফেললেন]

ভদ্রমহিলা ঃ হাঁ।

ভদ্রলোক ঃ এইভাবে কিছুদিন পরে সে যা বলতে লাগল আমি তাই বিশ্বাস করতে লাগলাম। তারপর সে একদিন আমার কাছে স্বীকার করল যে একই বিকেলে সে দুইজন ভদ্রলোককে সঙ্গদান করেছে। আমি হাসলাম। মনে মনে বললাম ঃ "ওঃ, আমার প্রেমিকার আত্মবিশ্বাস দেখি খুব বেড়ে যাচ্ছে। তার সত্যতায় আমাকে বিশ্বাস করতে শিখিয়ে সে এবার আমাকে লক্ষ্যচ্যুত করার জন্যে এক আধটা মিথ্যা কথা বলাও শুরু করেছে দেখেছি!" কিন্তু পরে দেখলাম যে আমার সে ধারণা ভুল।

সেইদিনই আমি আবিষ্কার করলাম যে সে সত্যিই দুইজন ভদ্রলোককে সংগসুখ দিয়েছিল।

ভদ্রমহিলা ঃ মেয়েটি বেশ মজার তো!

ভদ্রলোক ঃ তা বটে! সে বেশ বড় পরিবারের মেয়ে ছিল। সে রাজ দরবারে বড় বড় উৎসবাদিতে যোগ দিত—রাষ্ট্রদূতেরা তার হস্ত চুম্বন করতেন—এই ধরণের সব ব্যাপার!

ভদ্রমহিলা ঃ তার স্বামী কি রকম ছিলেন?

ভদ্রলোক ঃ তিনি ছিলেন অসাধারণ বুদ্ধিমান লোক। তিনি আমাদের সবাইকে ফাঁকি দিয়েছিলেন। আমি প্রায়ই ভেবেছি যে, এটা তাঁর পক্ষে স্বার্থপরের মত কাজ হয়েছিল। তাঁর পরলোকপ্রাপ্তি ঘটেছিল।

ভদ্রমহিলা ঃ তাই নাকি! তারপর এই ধরণের সত্য কথনের ফল হল কি?

ভদ্রলোক ঃ আমার সব কিছু গুলিয়ে গেল। আমার যে আত্মবিশ্বাস ছিল তা বুদ্বুদের মত ভেঙেগ পড়ল। যে আমি নারীদের পুরোপুরি বুঝি বলে গর্ব করতাম, যে-আমি নারীদের সুকৌশলে বোনা মিথ্যার জাল ভেদ করতে পারি ভেবে আত্মপ্রসাদ অনুভব করতাম—সেই আমি প্রথম প্রেমিকার স্পর্শ-কাতর যে কোন সাধারণ তরুণের মত বোকা বলে প্রমাণিত হলাম নিজের কাছে। আমার মতবাদের মধ্যে যে অসত্য ছিল তা নিজের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল—অবশ্য তার মধ্যে কোন সান্ত্বনার কারণ ছিল না। আমি ভুল করে ধরে নিয়েছিলাম যে, মেয়েরা একটা বিশেষ ধারা অনুসারে মিথ্যা কথা বলে— কিন্তু বস্তুতঃ—

ভদ্রমহিলা ঃ কিন্তু বস্তুতঃ?

ভদ্রলোক ঃ কিন্তু বস্তুতঃ তারা কোন বিশেষ ধারা অনুসরণ করে চলে না। মনে কর তারা যদি পুরুষ মানুষের মত ধারাবিহীন হত, তবে তাদের এই নির্দিষ্ট ধারা না থাকার জন্যেই তাদের সকল কাজের খেই পাওয়া যেত। কিন্তু তাদের ব্যাপারটা অত সহজ নয়। তাদের কাজের ধারা নিছক মেয়েদের মতই......হাঁ, সে আমাকে নিজের দুর্বলতা বুঝতে বাধ্য করেছিল......ফলে তার সংগে এবং তার পরে আমার জীবনে যত নারী এসেছিল তাদের কারও সংগে আমি আর সাবধানী হবার চেষ্টা করি নি। আমার জীবনে একমাত্র যে নারীটি সত্য কথা বলেছিল সে তার পরবর্তিনীদের মিথ্যা বলার পথ সহজ করে দিয়ে গেছিল। ব্যাপারটা কৌতুককর নয় কি? তবু এই অভিজ্ঞতার একটা ভাল দিক না ছিল এমন নয়; এই অভিজ্ঞতা আমাকে একটা মূল্যবান শিক্ষা দিয়েছিল।

ভদ্রমহিলা ঃ সেই শিক্ষাটা কি?

ভদ্রলোক ঃ সে শিক্ষাটা হচ্ছে, মেয়েদের সঙ্গে নির্দিষ্ট একটা রুটিন মাফিক ব্যবহার না করার নির্দেশ। আমরা পুরুষেরা সর্বদাই এই ভুল করে থাকি। কিন্তু নারী কখনও বোকার মত কোন সাধারণ তত্ত্ব গড়ে তোলে না। সে কখনও বলে না ঃ "পুরুষেরা এই ধরণের কিংবা ওই ধরণের—তাদের সংগে এমনই ধরণের ব্যবহার করতে হয়।" না, নারী হচ্ছে সুকৌশলী গাড়ী-চালকের মত।

ভদ্রমহিলা ঃ তার মানে কি?

ভদ্রলোক ঃ তুমি তো জান গাড়ীর চালককে নিত্য নতুন বিপদের সংগে তাল ফেলে চলতে হয়। প্রতিবার গাড়ী চালাবার সময় সে ভিন্ন ভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়। সে দুইবার একই উপায়ে একই সমস্যার সমাধান করতে পারে না। আজ সে হয়ত পথের মোড়ে কোন ট্রামগাড়ীর সাক্ষাৎ পায় এবং নিজের গাড়ীর গতি বাড়িয়ে দিয়ে তার সামনে দিয়ে চলে যায়। আগামী কাল হয়ত আবার ঠিক একই পরিস্থিতিতে তাকে সংঘর্ষ এড়ানোর জন্যে জোরে গাড়ীর ব্রেক কসে গাড়ী থামাতে হয়। এক কথায় তাকে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হয়। আর মেয়েদের ব্যাপারটাও তাই। প্রত্যেক আসন্ন সংঘর্ষ তাদের কাছে নতুন নতুন সমস্যা এনে দেয়। কোথাও বা মিথ্যা বলে, কোথাও বা সত্য বলে তারা সে সংঘর্ষ এড়ায়।

ভদ্রমহিলা ঃ আমি বুঝি না তুমি সে জন্যে তাদের দোষ দেও কেন।

ভদ্রলোক ঃ দোষ দেই? প্রিয়তমে, এই কথাটি স্মরণ রেখো ঃ যে নারী পুরুষের সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাকে যন্ত্রণা দেয়, তাকে পথের ফকির করে, তাকে পরিত্যাগ করে, পুরুষ সে নারীকে ক্ষমা করতে পারে —কিন্তু যে নারী পুরুষকে তার নিজের মূর্খতা চোখে আংগুল দিয়ে দেখায় পুরুষ তাকে কখনও ক্ষমা করতে পারে না।

(যবনিকা)

অনুবাদক—**গোপাল ভৌমিক**

প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী তাঁর বেতার ভাষণে শুনাইয়াছেন,—"No leader any community wanted the

esent rioting to continue." খুড়ো বলেন—"তাহা হইলে কি আমরা বুঝিব যে st riotingটা কোন কোন নেতারা কামনা রিয়াছিলেন?"

* * * *

নব-নিযুক্ত বড়লাট বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করিয়া চলিয়া আসিবার সময় দে আজম বলিয়াছেন,—"I am entirely your hands"—জিন্নাজীর এই বে-হাত য়া যাওয়ার উক্তি শুনিয়া মেসার্স আমেরি-চল প্রমুখেরা না আবার গোসা করেন।

* * * *

"Morning News" অদূরে ভবিষ্যতে "Pakistan Time" রাখার জন্য পারিশ করিয়াছেন। "Pakistan Time"

নুসারে Morning News-এর Morning টায় হইবে সেই Newsটা জানাইয়া দিলে মরা এখন হইতেই ঘড়ির কাঁটার হিসাব নয়া বসিতে পারি।

* * * *

বড়লাট বাহাদুরের সঙ্গে তৃতীয় কিস্তি দেখা করার কথা উল্লেখ করিয়া সংবাদদাতা বলিতেছেন,—Mr. Jinnah held discussion with Lord Mountbatten after dinner.—আলোচনাটা নেহাৎ খেলো এবং হাল্কা স্তরের ছিল বলিয়াই কি উহার ব্যবস্থাটা খাওয়া-দাওয়ার পরে হইয়াছে, না, না আঁচাইয়া করিতে পারেন নাই বলিয়াই পরে হইয়াছে সংবাদে সেই কথার কোন উল্লেখ নাই।

* * * *

স্কটল্যান্ড হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে কোন মদের কারখানার একটি নলের মুখ ভুল পথে ঘুরাইয়া দেওয়ায় প্রায় আটশত গ্যালন মদ নাকি মদের জালায় না গিয়া একটি খালে গিয়া পড়িয়াছে। ফলে তিন মাইল পর্যন্ত খালের জল হুইস্কিতে পরিণত হইয়া যায়—and cattle, sheep, waterfowl, fish had a riotous Easter." সংবাদটি শুনিয়া আমাদের অকৃত্রিম স্বদেশী গাঁজা নিশ্চয়ই লজ্জায় অধোবদন হইবেন!—বলেন খুড়ো।

* * * *

একটি সংবাদে বলা হইয়াছে বিলাতে এখন "Cut your Smoke" Campaign চলিতেছে এবং মিঃ চার্চিল নাকি প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে সুদিন ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত, তিনি সিগারটা খুব কম করিয়া খাইবেন। খুড়ো বলিলেন,—"খুব ভালো কথা, ধোঁয়ার আড়াল কাটিয়া গেলে চোখের দৃষ্টিটা হয়ত খুলিতেও পারে!"

* * * *

সম্প্রতি আমাদের চিনির বরাদ্দ আরও কম করিয়া আধপোয়াতে আনিয়া ঠেকান হইয়াছে। সরকারী-বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে এই ব্যবস্থা নেহাৎ সাময়িক। চিনি-কামীরা ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়াছেন সন্দেহ নাই কিন্তু তাঁরা হয়ত খাদ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুই খোঁজ-খবর রাখেন না। চৈত্র এবং বৈশাখ এই দুই মাসের কথা উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে—"চৈত্রে গিমা তিতা, বৈশাখে ঘৃত নালিতা"। এই ছড়াটি লেখার সময় ভেজিটেবল ঘি আবিষ্কৃত হয় নাই; কিন্তু সে যাহা হউক এই তিতা খাওয়ার সময় চিনি খাওয়ার প্রশ্নই উঠিতে পারে না সুতরাং আমাদের সদাশয় গভর্নমেণ্ট প্রজাসাধারণের......ইত্যাদি ইত্যাদি!

* * * *

সিন্ধুর আবগারী মন্ত্রী বলিয়াছেন,—"The town of Hyderabad (Sind) is the wettest in the world"

—"তাই সিন্ধুকে শোষণ করিবার ইচ্ছা তাঁরা পোষণ করিতেছেন"—বলিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

স্টেটসম্যান কাগজে জনৈক পত্র প্রেরক প্রশ্ন করিয়াছেন—"why should a College teacher get less than a Deputy Magistrate?"—খুড়ো বলিলেন—অত্যন্ত সহজ প্রশ্ন। পত্র প্রেরক College Teacher হইয়া থাকিলে তাঁর ক্লাসের যে-কোন ছাত্রকে এই প্রশ্ন করিলেই দেখিবেন সে

অনায়াসে উত্তর লিখিবে—শিক্ষক মহাশয়গণ যে ধনের অধিকারী তাহা দানের ফলে ক্রমেই বর্ধিত হইতে থাকে—Ref. "যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে"—কিন্তু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদের ধনাগমের এই সুযোগ নাই বলিয়াই বেচারীদের দুই-পাঁচ টাকা বেশী ধরিয়া দেওয়া হয়—!

ফুংকার

ইন্দ্রানী সরকার

কাহিনীটা সেই গতানুগতিক কেরাণী জীবনের। অমলের বাবা পঞ্চানন চাটুজ্জে চিরকাল গ্রামে বাস করলেও জীবনযাত্রাটাকে সম্পূর্ণ গেঁয়ো করে নিতে পারেননি। নিজে তিনি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী না হলেও চিরকাল লেখাপড়া নিয়েই কাটিয়েছিলেন। জীবিকার জন্য তাঁকে কোনদিন চাকরী করতে হয়নি কারণ গ্রামের যে জমি-জমা তাঁর ছিল তাতেই তাঁর বেশ স্বচ্ছলভাবেই কেটে যেতো।

দুই মেয়ের পর তাঁর এই একমাত্র ছেলে অমল। মেয়েদের ভাল ঘরে বিয়ে দেওয়ার জন্য যে টাকার প্রয়োজন হয়েছিল তার ব্যবস্থা তিনি নিজের জমি-জমা বিক্রী ক'রেই করেছিলেন। ছেলে বড় হয়ে গ্রামের মাইনর স্কুলের পড়াশুনা শেষ করবার পর যখন পঞ্চানন চাটুজ্জে ছেলেকে আরও পড়াশুনা করবার জন্য কলকাতায় পাঠাবেন ঠিক করলেন তখন অমলের মা অন্নপূর্ণাদেবী স্বামীর কাছে এর বিরুদ্ধে একটা ক্ষীণ আপত্তি তুলেছিলেন। অন্নপূর্ণাদেবীর আপত্তি তোলার পক্ষে অবশ্য যুক্তি ভালই ছিল। দুই মেয়ের বিয়েতে খরচ হয়ে এখন সংসারের যা আয় দাঁড়িয়েছে তাতে আর অমলকে কলকাতায় রেখে খরচ করে পড়ান চলে না। গৃহিণীর আপত্তির কারণ শুনে অমলের বাবা একটু হেসে বলেছিলেন,—তা না হয় আমাদের একটু কষ্টে সৃষ্টে চালাতে হবে; তাই বলে অমলের মত ছেলে পড়াশুনার সুযোগটা পাবে না, তা কি হয়? পঞ্চানন চাটুজ্জে সেদিন অন্নপূর্ণাদেবীকে এও বলেছিলেন,—দেখছ কি গিন্নি অমল আমাদের চাটুজ্জে বংশের মুখ রাখবে। ভাল করে পাশ করে একটা ভাল চাকরী পেলে আমাদের তখন সব কষ্ট ঘুচবে। তখন তুমি আর আমি অমলের একটা বিয়ে দিয়ে তাকে সংসারী করে কাশী বাস করবো।

সেদিন পঞ্চানন চাটুজ্জের কথা শুনে ওপর থেকে বিধাতা পুরুষ হেসেছিলেন কি না সেটা আমাদের দেখার সুযোগ হয়নি। তবে পরের ঘটনা থেকে এটা বলতে পারা যায় যে, অমলের বাবার কোনো ইচ্ছাই সফল হয়নি এবং তা সফল হলো কি না সেটা দেখবার জন্য তাঁর অপেক্ষা করবার সময়ও হয়নি।

অমল কলকাতায় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করবার পরেই পঞ্চানন চাটুজ্জে হঠাৎ তিনদিনের জ্বরে মারা গেলেন। অমল তার বাবা মারা যাবার পর সংসারের অবস্থা বেশ ভাল করেই বুঝতে পারলো। তার বাবা যে কত কষ্ট করে তার লেখাপড়া শেখার টাকা জোগাচ্ছিলেন তাও সে এখন ভাল করেই বুঝলো। প্রথমে সে ঠিক করলো লেখাপড়া বন্ধ করে গাঁয়ে ফিরে যাবে, কিন্তু তাতেও বিশেষ সুবিধা হবে না দেখে কলকাতায় ছেলে পড়িয়ে পড়ার খরচ চালানই ঠিক করলো। অমল চিরকালই হিসাবী সেইজন্য তার ছেলে পড়ানর টাকাতেই তার কলকাতার খরচ চলে যেতে লাগলো।

কলকাতায় থাকার জন্য যেমন একদিকে অমলকে কষ্টে সৃষ্টে চালাতে হচ্ছিল তেমনি আর একদিকটা খুব সহজভাবেই চলে যাচ্ছিল। সেটা হচ্ছে তার পরীক্ষা পাশ করা। আই এ এবং বি এটা খুব কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করে তার এম এ পড়ার ইচ্ছে থাকলেও সে ইচ্ছা দমন করে সে চাকরীর খোঁজে উঠে পড়ে লেগে গেল। চাকরি তাকে যেমন করে হোক একটা জোগাড় করতেই হবে। কারন গ্রামের সম্পত্তি বলতে শুধু বাস্তু ভিটা ছাড়া আর কিছুই তখন অমলের ছিল না। অমলের বন্ধুবান্ধব এবং অধ্যাপকেরা যখন শুনলেন যে অমলের মত জলপানি পাওয়া ছেলে আর পড়াশুনা না করে চাকরি করবে ঠিক করেছে তখন সকলেই তাকে এম এটা পড়ার জন্য বলতে লাগলো আর তার সঙ্গে তার সামনে কল্পনায় অনেক বড় বড় ছবি আঁকতে লাগলো। অমল এদের কাউকে কিছু না বলে সেদিন শুধু একটু করুণভাবে হেসে তাদের কথার উত্তর দিয়েছিল। যাঁরা তার সত্যিকার অবস্থা জানতেন তাঁরাই শুধু সেদিন অমলের মুখের সেই হাসির মধ্যে তার মনের ব্যথাটা বুঝতে পেরেছিলেন।

চাকরির ক্ষেত্রে নেমে অমল দেখল যে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া খুব সহজ নয়। তাছাড়া এই পরীক্ষা পাশ করবার জন্য যে সমস্ত গুণ থাকা দরকার তার কোনটাই তার নেই। চাকরির যুদ্ধে নামবার আগে অমলের ধারণা ছিল পরীক্ষা পাশের এবং ভাল ভাল সার্টিফিকেটের জোরেই সে অনায়াসে একটা চাকরি জোগাড় করতে পারবে কিন্তু, কয়েকদিন অফিসে অফিসে ঘুরে বেড়াবার পর দারোয়ানের অথবা নেহাৎ ভাগ্য ভাল হলে বড়বাবুর মিষ্টি মধুর বুলিতে অমল তার চাকরি পাওয়া সম্বন্ধে এক রকম হতাশ হয়ে পড়ল। অমল দেখলো, চাকরীর ক্ষেত্রে পরীক্ষা পাশের কোন মূল্যই নেই। যেটা আসল দরকার সেটা হচ্ছে খোঁটার জোর। অমলের শুধু সেইটারই অভাব।

সেদিনও অমল প্রত্যেক দিনের মতই খুব ভোরে পাড়ার "গ্র্যাণ্ড টী স্টলে" হাফ কাপ চা খেয়ে পাড়ার ফ্রী রীডিং রুমে গিয়ে সংবাদ পত্রের বিজ্ঞাপনের কলমে দ্রুত চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার চোখ পড়ল এক সাহেবের অফিসে একটা কর্মখালি বিজ্ঞাপনের ওপর। ছোট সাহেবের নিজস্ব সহকারীর কাজ। বি এতে ইংরাজি অনার্স ছাড়া অন্য কোন প্রার্থীর দরখাস্ত বিবেচ্য নয়। অমলের হঠাৎ মনে হল চাকরি যেন ঠিক তারই জন্য। কিন্তু এ রকম চাকরি সে কত দেখেছে। বিজ্ঞাপন বার হবার দিন দেখা করতে গিয়ে শুনেছে লোক নেওয়া হয়ে গেছে। কি করে যে এত তাড়াতাড়ি নেওয়া হয়ে যায় আর এত তাড়াতাড়ি লোক জোটেই বা কোথা থেকে তা অমল আজও ভেবে পায়নি।

যাই হোক, অমল ঠিক করলো যদিও তার এই চাকরিটা পাবার কোনো আশা নেই তবু প্রত্যেকদিনের মত আজ একবার অফিসে গিয়ে দেখা করবে। দরখাস্ত দেওয়ার কথা লেখা থাকলেও অমল সেটা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছে আজকাল। কারণ সে জানে এতে শুধু শুধু সময় এবং পয়সা নষ্ট। প্রথম দিকে অমল চাকরির চেষ্টা করবার সময় দিনে অনেকগুলো দরখাস্ত পাঠাত এবং উত্তরের আশায় বসে বসে দিন গুণতো। পরে অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছে বিজ্ঞাপন দেখে সেইদিনই দেখা করতে গিয়ে শুনেছে—লোক ত নেওয়া হয়ে গেছে। সেখানে দরখাস্ত পাঠানোর কোনো মানে হয়?

অমল কাগজ থেকে চট্ করে তার তেলচিটে নোটবুকটায় অফিসের ঠিকানা লিখে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। মেসে ফিরে স্নান করে ঠাকুরকে তাড়াতাড়ি ভাত দিতে বললে। অমল আজ ঠিক করেছে, অফিসে কোন

...ণী আসবার আগেই সে গিয়ে দরজায় ...র থাকবে। লোক নেওয়া হয়ে গেছে ...যেন তাকে শুনতে না হয়।

...অফিসের দরজায় এসে অমল যখন পেঁছিল ...সে নটা বেজেছে। এমন সময় একজন ...ক আসতে দেখে দারওয়ান দয়াপরবশ হয়ে ...কি প্রয়োজন জানতে চাইলো। অমল ...হয়ে উত্তর করলো যে সে একবার ছোট ...রের সঙ্গে দেখা করতে চায়। দারওয়ান আপাদ মস্তক ভাল করে দেখে নিয়ে, কি যে মনে হলো সেই জানে, শুধু বললে—...সাথ আইয়ে, সাব আভভি অফিসমে। অমল ওরই মধ্যে একটু ফিটফাট হয়ে ...নের সঙ্গে সাহেবের দরজার সামনে ...য়ে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলো, "ভেতরে ...তে পারি কি?" ভেতর থেকে উত্তর এলো ...। এসো।

অমল যখন সাহেবের ঘর থেকে বের হলো ...তার মুখে হাসি ধরে না। চাকরি তার ...গেছে এবং সাহেব একেবারে নিজে লিখে নিয়োগ পত্র দিয়ে দিয়েছে। মাহিনা অবশ্য ...নয়, কেরাণীদের পক্ষে ৫০, টাকায় ...ভালই বলতে হবে।

তারপর থেকে অমলের দশটা পাঁচটা ...মত কেরাণী-জীবন শুরু হলো। এক ...রের ভিতর অন্নপূর্ণাদেবীর অনুরোধ ...তে না পেরে অমল একদিন টোপর মাথায় ...কল্পনাকে বধূরূপে ঘরে নিয়ে এলো। ...না খুব সাধারণ গৃহস্থ ঘরের মেয়ে, ...ে খুবই সাধারণ। কেরাণীর আবার দেখে-...ে বিয়ে করা। তবে কল্পনার চেহারায় এমন ...টি সৌম্য শান্ত ভাব ছিল, যার দরুণ ...র সকলেই বৌ দেখে প্রশংসা না করে ...লো না। চাকরি পাবার পর অমল মাসে ...বার দুবার করে গ্রামে মাকে দেখতে আসতো ...র বিয়ের পর সেটা নিয়মিতভাবে প্রত্যেক ...বারে গিয়ে দাঁড়াল। তাছাড়া সপ্তাহের ...। দুপক্ষেরই একটা করে পত্রের আদান-...নও ছুলো। কল্পনাকে পেয়ে অমল খুব ...ী হয়েছিল। কারণ বাইরে থেকে দেখলে শ্যামলা মেয়েটি মনকে ততটা আকর্ষণ ...তে না পারলেও তার মধুর ব্যবহার ...কেই আপনার করে নিতে পারতো। ...পূর্ণাদেবী বৌকে একদন্ড কাছছাড়া করতে ...তেন না যেন নিজেরই আর এক মেয়ে। ...কল্পনাও তাঁকে কোনদিনই বুঝতে দিতনা ...তিনি তার শাশুড়ী। যেন নিজেরই মা।

এই রকমভাবে আরও বছর দুই কেটে ...ল। অমলের সেই গতানুগতিকভাবে অফিস ...র প্রতি শনিবার বাড়ি যাওয়া আসা করেই ...দিন কাটছিল। নতুনের মধ্যে অন্নপূর্ণাদেবী ...ত কোলে পেয়ে যেন বৌকে আরও বেশী করে ভালবাসতে আরম্ভ করেছেন। চাকরির ব্যাপারেও অমলের কিছুটা সুবিধা হয়েছিল। কারণ তার সাহেব অমলের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে একটু বেশী মাইনে দিচ্ছিল। এছাড়া অমল একটা ছেলেও পড়াতে আরম্ভ করেছে। এইসব মিলিয়ে অমলের মাসে যা উপার্জন হয় তাতে তার সংসার একরকম করে চলে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে অমল শনিবার বাড়ি যাবার সময় কল্পনার জন্য কিছু কিনে নিয়ে যেতো, কয়েকবারের পর কল্পনা অমলকে বল্লে যে,—দেখ, এই সমস্ত অদরকারী জিনিসগুলো আর এনোনা তার চেয়ে বরং ঐ টাকাগুলো আমায় দিয়ে দিও। অমল প্রথম প্রথম একটু আপত্তি করত কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার আপত্তি টেকেনি। অমল তার-পর থেকে কল্পনার হাতে প্রত্যেক মাসেই কিছু কিছু করে দিতে আরম্ভ করলো। অমল কিন্তু কোনও দিনই এ সম্বন্ধে কল্পনাকে জিজ্ঞাসা করেনি, এই টাকা দিয়ে সে কি করছে।

এক শনিবার অমল বাড়ি আসতেই অন্নপূর্ণা দেবী অমলকে বল্লেন, "হ্যাঁরে, ধানের জমিটা যে তুই কিনবি তা আমায় কোনদিন বলিসনি তো?" অমল অবাক হয়ে বল্লে, "ধানের জমি আমি আবার কখন কিনেছি, তোমায় একথা বললেই বা কে?" তার মা একটু হেসে বল্লেন, "কেন, কল্পনা। সে তো গত সোমবার তুই চলে যাবার পরে আমার হাতে শ দেড়েক টাকা দিয়ে বল্লে, মা ওই দত্তদের একটা ছোট জমি ওরা বিক্রী করছে, শুনেলাম সেটা আমার শ্বশুরের জমি ছিল তা ওটা আপনিই কিনে রাখুন না কেন?" অমল মার কথা শুনে একটু হাসলো আর কোনও উত্তর দিল না। রাত্রি বেলা খাওয়া দাওয়ার পরে কল্পনা ঘরে শুতে এলে অমল তাকে কাছে টেনে এনে বল্লে, —"বারে! তুমি কিনছ জমি আর আমার নামে মাকে বলেছ যে আমি জমি কিনছি। তবে আমার তো মনে পড়ছে না কবে তোমায় টাকা দিয়েছি জমি কেনার জন্য।" কল্পনা উত্তর করলে "—টাকাটা না দিলেও টাকাটা তোমারই। আর তুমি না দিলেও তোমার টাকা থেকেই জোগাড় হয়েছে।" অনেক পীড়াপীড়ির পর কল্পনা অমলকে বল্লে, ওটা অমল প্রত্যেক মাসে তাকে যে টাকা দিত সেটা জমিয়ে এবং সংসার খরচ থেকে কিছু বাঁচিয়ে সম্ভব হয়েছে। অমল টাকা জমানর ইতিহাস শুনে আর কিছু বল্ল না শুধু কল্পনার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। কল্পনা অমলের তাকানর ভাব দেখে একটু হেসে বল্লে, "কি, একেবারে যে আকাশ থেকে পড়লে। দেখ, খোকা বড় হয়ে যদি দেখে, তার পূর্বপুরুষের শুধু এই ভিটা ছাড়া আর কিছু নেই অথচ প্রায় তিন পুরুষ ধরে আমরা এই গাঁয়ে বাস করছি তখন সেই বা কি ভাববে। যাক্ গে ওসব কথা, এখন

তোমার কলকাতার কথা বলো, খাওয়া দাওয়ার কষ্ট হচ্ছে না তো? যুদ্ধের জন্য যে রকম জিনিসপত্রের দর হু হু করে বাড়ছে তাতে সংসার চালান ক্রমেই কষ্টকর হয়ে উঠছে। রাস্তাঘাটে যখন চলাফেরা করো তখন একটু সাবধান হয়ো, যে রকম সব মিলিটারী লরী চলে।" ক্রমে রাত বেড়ে চলে; কল্পনা খোকাকে আরও ভাল করে কাছে টেনে অমলের পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। আবার তাকে ভোরে উঠেই কাজে লাগতে হবে।

সেদিন শনিবার। ছোট সাহেবের কাজ-গুলো সেরে অফিস থেকে ছাড়া পেতে অমলের একটু দেরী হয়ে গেল। অফিসের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলো এখনও যদি দৌড়ে গিয়ে মোড় থেকে বাসটা ধরতে পারে তাহলে সাড়ে চারটার ট্রেন পেতেও পারে। শিয়ালদার মোড়ে নেমে দেখে সময় আর নেই। এক দৌড়ে রাস্তা পেরিয়ে সোজা যদি দৌড়ান যায় তাহলে ট্রেনটা পেলেও পেতে পারে, আর তা না হলে সেই সাড়ে সাতটার ট্রেন। আর কিছু না ভেবে সোজা রাস্তার এপার থেকে ওপারে এক ছুটে পার হতে গিয়ে অমল শুধু শুনতে পেলো 'হাঁ হাঁ গেল গেল' বাস, বাকিটা অমলের বোঝবার কিংবা শোনবার সময় আর কোনওদিনই হয়নি। একটা মিলিটারী লরী অমলকে চাপা দিয়ে হাত কুড়ি দূরে গিয়ে দাঁড়াল।

রাস্তায় ভীড় জমে গেল। রাস্তার লোকদের সহানুভূতি এবং মিলিটারীর প্রতি গালাগালির মধ্যে এক সময় এ্যাম্বুলেন্স এসে অমলের থেঁতলান, রক্তমাখা মৃতদেহটা তুলে নিয়ে চলে গেল। সাদা মিলিটারী লরীর চালক একবার করুণার দৃষ্টিতে ভীড়ের দিকে তাকিয়ে সদর্পে গিয়ে নিজের লরীতে উঠে আবার পূর্ণ বেগে গাড়ী চালিয়ে দিল। কারণ যে সময়টা এখানে অযথা নষ্ট হল সেটা যদি আরও জোরে চালিয়ে পুষিয়ে নেওয়া যায়।

সন্ধ্যাবেলা তুলসীতলায় প্রদীপ দেখিয়ে কল্পনা একবার অন্ধকার পথের দিকে চেয়ে দেখলো—অমল এখনও এলো না। কেন। অমলের আসার সময়তো হয়ে গেছে। খুব কম দিনই অমল সাড়ে সাতটার ট্রেনে আসে আর যেদিন আসে সেদিন কল্পনাকে আগে থেকে পত্র লিখে জানিয়ে দেয়।

সাড়ে সাতটার ট্রেনেও যখন অমল এসে পৌঁছাল না তখন কল্পনা আর না থাকতে পেরে অন্নপূর্ণাদেবীর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলো। অন্নপূর্ণা দেবী তখন প্রদীপটা কাছে টেনে নিয়ে নাতিকে রামায়ণ পড়ে শোনাচ্ছিলেন। তাঁরও মন যে খুব অশান্ত হয়ে পড়েছে সেটা তাঁর রামায়ণ পড়া থেকেই বোঝা যাচ্ছি[ল]। কল্পনাকে কাছে আসতে দেখে অন্নপূর্ণা দে[বী] শুধু বললেন, "ও বোধহয় কোনো কা[জে] আটক পড়েছে, আর আমাদের জানাবার স[ময়] পায়নি তাই আজ আর এলোনা।" অবশ্য তি[নি] এটা মনে মনে বুঝেছিলেন যে, কল্পনাকে তি[নি] এই বলে ভোলাবার চেষ্টা করছেন। কারণ [এর] আগে অমলের এরকম কোনদিনই হয়নি। কা[জ] কর্ম চুকিয়ে কল্পনা প্রদীপটা ঘরের কুলুঙ্গি[তে] রেখে জানলার ধারে এসে চুপ করে দাঁড়া[লো]। দূরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ফুঁপি[য়ে] কেঁদে উঠলো। কিছুক্ষণ কাঁদবার পর তার ম[নে] হলো সে শুধু শুধু অমলের অমঙ্গল করছে[।] কাল নিশ্চয় অমল এসে পড়বে, আর তা না হ[লে] একটা খবরও আসবে।

কল্পনা ভাবল, নাঃ এবার প্রদীপটা নিভি[য়ে] শুয়ে পড়া যাক। হঠাৎ ঘরের মধ্যে এক ঝল[ক] দমকা হাওয়া ঢুকে প্রদীপের ক্ষীণ আলোটা[কে] নিভিয়ে দিয়ে ঘরটা অন্ধকার ক[রে] দিল। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে[ই] হোক আর অন্ধকারে ভয় পেয়েই হো[ক] সেই সঙ্গে খোকাও হঠাৎ চীৎকার ক[রে] কেঁদে উঠলো। কল্পনা তাড়াতাড়ি গি[য়ে] বিছানায় শুয়ে খোকাকে বুকের মধ্যে টে[নে] নিয়ে আবার হু হু করে কেঁদে উঠলো।

রক্তের লেখা—শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্তী প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান মডার্ণ বুক ডিপো, শ্রীহট্ট। কিংবা ডি এম লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

একখানি দেশপ্রেমমূলক ক্ষুদ্র নাটিকা। দেশ ও দশের জন্য আত্মবলিদানের একটি রক্তাক্ত চিত্র এই পুস্তিকায় অঙ্কিত করা হইয়াছে। ৬০।৪৭

কম্যুনিজম ও নারী—শ্রীনীলিমা দত্ত প্রণীত। গণবাণী পাবলিশিং হাউস, পি ৩১-এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

পুঁজিবাদী সমাজে নারীর অসহায়তার নানা চিত্র এই পুস্তিকায় বিবৃত করা হইয়াছে এবং সাম্যবাদী সমাজে নারী কতখানি সুখী হইবে তাহা দেখান হইয়াছে। ৫৮।৪৭

বঙ্গ বিভাগে জাতীয়তাবাদীর দৃষ্টি—শ্রীকেশবচন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত। প্রকাশক—উত্তর-পশ্চিম বঙ্গ প্রাদেশিক সমিতি, ৫৮নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য চারি আনা।

বঙ্গ বিভাগ যাহারা সমর্থন করেন, তাঁহারা নিজেদের যুক্তির সমর্থনে অনেক তথ্য এই পুস্তিকায় পাইবেন। ৫৯।৪৭

অনাগত সুদিনের তরে—শ্রীহেম কানুনগো প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—বর্মণ পাবলিশিং হাউস, ৭২, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা বারো আনা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২৬।

বাঙলার বিপ্লবী আন্দোলনের সম্পর্কিত বিস্তৃত গ্রন্থ "বাঙলায় বিপ্লব প্রচেষ্টার" রচয়িতা হিসাবে শ্রীযুত হেম কানুনগো বাঙালী পাঠকদের নিকট পরিচিত। তাঁহার প্রণীত নূতন গ্রন্থ 'অনাগত সুদিনের তরে' পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম। বইটি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। একটি রূপক আখ্যায়িকার ভিতর দিয়া চিন্তাশীল লেখক ভাবী বিশ্বপরিকল্পনার যে প্রতিচ্ছবি এই গ্রন্থে দিয়াছেন, তাহা পাঠকমাত্রেরই মনে নূতন চিন্তার উদ্রেক করিবে। রূপকের নায়িকা লীনা বিশ্ব হইতে স্বতন্ত্র, অনন্ত আকাশের কোন এক স্থানে ভাসমান অবস্থায় একটি কাল্পনিক সত্তার সহিত কথোপকথনে নিরত আছে। নূতন পৃথিবীর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় রূপ, উহাতে মন ও বুদ্ধির, জ্ঞান ও চৈতন্যের ক্রিয়া সম্পর্কে অতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা এই কাল্পনিক কথাবার্তার মধ্যে সুস্পষ্ট হইয়াছে।

ফরাসী মহা-বিপ্লব—শ্রীবিশ্বেশ্বর সেনগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত ও শ্রীব্রজবিহারী বর্মণ কর্তৃক প্রকাশিত; বর্মণ পাবলিশিং হাউস, ৭২, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য বার আনা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৩।

বইখানা আকারে ছোট হইলেও তথ্যাদির দিক দিয়া বিশেষ মূল্যবান। ইহা ফরাসী বিপ্লবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস মাত্রই নহে; কিরূপ পটভূমিকায় এত বড় মহাবিপ্লব সম্ভব হইয়াছে, তাহার বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবের বিবরণ ও উহা হইতে লব্ধ শিক্ষা অল্প কথায় গোছাইয়া ব[লা] হইয়াছে। বইটির ভাষা প্রাঞ্জল এবং সকলের পক্ষে[ই] বুঝিবার উপযোগী। অল্পের মধ্যে ফরাসী বিপ্লবে[র] একটি মোটামুটি প্রতিচ্ছবি এই বইটিতে পাওয়া যাইবে। ৪০।৪৭

কল-কল্লোল—শ্রীশিবদাস চক্রবর্তী প্রণীত[।] ষ্ট্যাণ্ডার্ড বুক কোম্পানী, ২১৬, কর্ণওয়ালি[শ] ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা আট আনা[।]

কল-কল্লোল কবিতার বই। প্রায় অর্ধশত কবি[তা] ইহাতে স্থান পাইয়াছে। কবিতাগুলি ছন্দ, ভাব [ও] ভাষার গুণে সুখপাঠ্য হইয়াছে।

ছোটদের বিদেশী গল্প সঞ্চয়ন—শ্রীমতী সুল[েখা] কর প্রণীত। এম সি সরকার এণ্ড সন্স লি[ঃ] কর্তৃক ১৪, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১॥০।

দেশ বিদেশের গল্প কথা মনোরম ভাষায় ও ভঙ্গীতে বালক-বালিকাগণের উপযোগী করিয়া লিখিত। পৃথিবীর যাবতীয় মানবের সুখ দুঃখের পরিচয় গল্প ও কাহিনীর ভিতর দিয়া বালকগণ যতই বেশী লাভ করিতে পারিবে তাহাদের মন ততই উদার ও দৃষ্টি স্বচ্ছ হইয়া উঠিবে। আলোচ্য পুস্তকখানি বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্রী সাহিত্য ক্ষেত্রে সুপরিচিতা। গল্পগুলির বাঙলা সংকলন তাঁহার কৃতিত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কিশোর-কিশোরীগণ ইহা পাঠে আনন্দ ও প্রেরণা লাভ করিবে ইহা বলাই বাহুল্য। ৫৭।৪৭

মানবের শিল্প-সৃষ্টি

অর্ধেন্দুকুমার গাঙ্গোপাধ্যায়

অনেকের বিশ্বাস যে শিল্পকলার চর্চা—
লমাত্র ধনী ও অর্থশালী মানুষের সৌখীন
য়োনা এবং তাঁরাই একমাত্র এই তথাকথিত
াসের অধিকারী। শিল্পসাধনার সহিত
া রাখা—উচ্চশিক্ষার একটা সহজ, সরল ও
ন পথ। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে শিল্পের পথে
ব লাভ করবার অধিকার সকলেরই আছে।
ও প্রতিমা-শিল্পের মারফৎ আমরা অনেক
চিন্তার ও উচ্চতর মানবিকতার অধিকার
চ করতে পারি।

নানা কারণে, আমাদের দেশের শিক্ষাতন্ত্রে
ল্পবিদ্যা ও শিল্পকলা—এখনও তার
যোগ্য আসন লাভ করতে পারে নাই।
াপি অন্য দেশের তুলনায় কলিকাতার বিশ্ব-
্যালয়ে শিল্পকলার সাধনা ও জ্ঞান অর্জনের
সুযোগ ও বন্দোবস্ত আছে ভারতের আর
নও বিশ্ববিদ্যালয়ে তা নাই। এই বিষয়ে
লা দেশের উচ্চশিক্ষার কর্ণ-
রগণ নিশ্চয় গর্ব করতে পারেন।
ঙলা দেশের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করে
রতের অন্যান্য প্রদেশের শিক্ষা-
দ্ধতিতে শিল্পকলার প্রতিষ্ঠার আয়োজন
রু হয়েছে। বোম্বাই প্রদেশের কংগ্রেসী
ন্ত্রসভা শিক্ষাপদ্ধতিতে শিল্পকলার স্থান
র্দেশের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিযুক্ত
রেছেন—এই কমিটির পরামর্শ অনুসারে
াম্বাই প্রদেশের শিক্ষাপদ্ধতিতে অনেক
ূতন আয়োজনের ব্যবস্থা হবে আশা করা
য়। সুদূরে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে এরূপ একটি
িল্প-শিক্ষার পরিকল্পনা ইতিমধ্যে মনোনীত
য়েছে এবং এই পরিকল্পনা অনুসারে—
একদল শিক্ষক বিশিষ্ট প্রকারের শিল্প-
শিক্ষার সাধনা আরম্ভ করেছেন। শিল্পকলার
বিশেষজ্ঞের জ্ঞান অর্জন করে এইসব নূতন
প্রণালীর শিক্ষকমণ্ডলী ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে নূতন
পদ্ধতির শিক্ষার প্রবর্তন করেছেন। এই নূতন
প্রণালীর শিক্ষাপদ্ধতির পরিকল্পনার
উদ্ভাবনায় একজন বাঙালীর বিশেষ অংশ ছিল
—এই সংবাদে আপনারা সকলে নিশ্চয়ই
আনন্দিত হবেন আমি আশা করি।

বাঙালীর কলা-শিল্পের সাধনার একটা
দিক আমাকে সর্বদাই পীড়া দেয়—সেটি হল
বাঙলার সাহিত্যিক মনীষীদের শিল্পকলার
আলোচনায় নিদারুণ আলস্য ও ঔদাসীন্য।
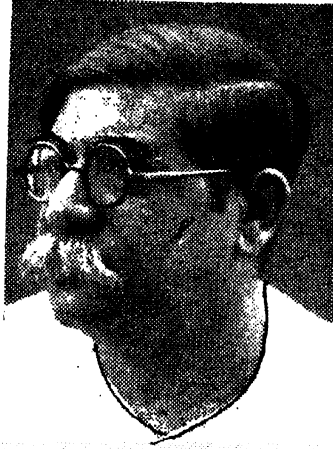
বাঙলা দেশের সাহিত্যিক ও কলাশিল্পীদের
মধ্যে এখনও বিশেষ কোনও যোগ স্থাপিত
হয়নি, বিশেষ কোনও আধ্যাত্মিক সম্পর্ক
এখনও গড়ে উঠেনি।

আচার্য অবনীন্দ্রনাথ আজ প্রায় পঞ্চাশ
বৎসর পূর্বে বাঙলাদেশে শিল্পকলার ক্ষেত্রে
এক নূতন আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিলেন—
সেই আন্দোলনের তরঙ্গ অতি অল্প সময়ের
মধ্যে ভারতের নানাস্থানে উচ্চকোলাহলের
সৃষ্টি করে এবং তাঁর একাধিক শিষ্য এই
নূতন আন্দোলনের নূতন বাণী নিয়ে
ভারতের নানা প্রদেশে আচার্যের প্রবর্তিত
পদ্ধতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। অবনীন্দ্র-
নাথের প্রদর্শিত পথে বাঙলার অসংখ্য শিল্পী
তাঁদের উৎকৃষ্ট সাধনার ফলে ভারতের কলা-
ক্ষেত্রের কৃষ্টিকে নানারূপে সফল করে
তুলেছেন। আজ সাহিত্য-সাধকদের তুলনায়
বাঙালী শিল্পকলার সাধকরা সংখ্যায় এবং
প্রতিভায় কোনও ক্রমেই কম নন। বাঙালীর
কৃষ্টির [illegible] বহু বাঙালী শিল্পীর প্রতিভায়
এবং সাধনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। জাতীয়
সাধনার একটি মূল্যবান অঙ্গ তাঁরা অক্লান্ত
পরিশ্রমে এবং নানা অর্থনৈতিক দৈন্যের মধ্যেও
পরিপূর্ণ করে তুলেছেন এবং তুলছেন।

কিন্তু এই সাধকদের উপযুক্ত সম্মান আমরা
এখনও দিতে পারিনি। তার প্রধান কারণ এই
যে বাঙলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও মনিষিগণ
বাঙলার শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের সাধনার গুণ বিচার
করবার যোগ্যতা অর্জন করতে চেষ্টা করেননি।
শিল্প সম্বন্ধে সুষ্ঠু ও সম্যক আলোচনা
বাঙলার বিস্তৃত সাহিত্যে এখনও দেখা দেয়নি।
আচার্য অবনীন্দ্রনাথের কয়েকখানি পুস্তিকার
এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত তাঁর
"শিল্প-প্রবন্ধাবলীর" পর বাঙলা সাহিত্যে
আর কোনও শিল্প সম্বন্ধে আলোচনার কোনও
উল্লেখযোগ্য পুস্তক অদ্যাবধি প্রকাশিত হয়
নি। বাঙলা সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রেই নানা
উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ, পুস্তকাদি আমরা পর্যাপ্ত
পরিমাণে পেয়ে থাকি, কিন্তু শিল্প
সমালোচনার ক্ষেত্রে আমাদের সাহিত্যিক
মনিষীদের ঔদাসীন্য অত্যন্ত আক্ষেপের
বিষয়। অন্যান্য সভ্যদেশে শিল্প-সাধনা ও
সমালোচনাকে আশ্রয় করে বিপুল সাহিত্য
গড়ে উঠেছে, কিন্তু এই বিষয়ে বাঙলা-
সাহিত্যের দৈন্য ও দারিদ্র্য অত্যন্ত শোচনীয়।

বাঙলার প্রতিভাশালী সাহিত্যিক মহাশয়রা
যদি দেশের শিল্পের দিকে একটু নজর দেন—
নিরক্ষর মূর্খ শিল্পীরা তাঁদের নিরক্ষর
ভাষায় কি মূল্যবান জাতীয় কৃষ্টির উপাদান
রচনা করেছেন, যদি তার কিছু কিছু
পরিচয় নিতে চেষ্টা করেন—তার প্রতিক্রিয়া
ও প্রতিধ্বনি সাহিত্যের মন্দিরে নূতন স্তব
রচনা করে, কথা-সরস্বতীর প্রতিমার নূতন ও
অভিনব অলংকার রচনা করে সাহিত্যের
অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে নূতন অর্চনায় মহিমান্বিত
করে তুলতে পারেন। বাঙলার সমৃদ্ধ
সাহিত্য নূতন রঙে, নূতন সজ্জায় উজ্জ্বল
হয়ে উঠবে—সাহিত্যের একটা অপরিপূর্ণ অঙ্গ
অচিরে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। এই আশা পোষণ
করে সাহিত্যসেবীদের মুখ চেয়ে উদ্‌গ্রীব হয়ে
বসে আছি। আমরা বহু চেষ্টাতেও আমাদের
সাহিত্যসেবী বন্ধুদের দেশের শিল্প-সৃষ্টির
সমাদর ও সমালোচনায় উদ্যোগী করতে পারি
নি। অনেক সাহিত্যসেবী বন্ধুদের ধরে
বেঁধে আমাদের ছবির মেলায় উপস্থিত
করেছি এবং আমাদের শিল্পী ভাইদের লিখিত
চিত্রপটাদি নিরীক্ষণ ও সমীক্ষণ করতে নানা
অনুরোধ করেছি; কিন্তু আশানুরূপ ফল
পাই নি। অনেক সময়ে দেখেছি যে আমার
সাহিত্যসেবী বন্ধুরা—ছবির প্রদর্শনীতে
'ডাঙগায় তোলা মাছের' মত অস্বস্তি অনুভব
করছেন,—অনেক সময়ে দেখেছি যে, ছবির
আবেদন উপেক্ষা করে, প্রদর্শনীর দেওয়ালে
লম্বমান চিত্রমালার দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে—
সাড়ির সৌন্দর্যে মণ্ডিত কোনও জীবন্ত চিত্র-

পটের সহিত সুমিষ্টালাপে ব্যস্ত,—নিরক্ষরের অক্ষরে লিখিত চিত্রপটের কথা শুনবার, শিল্পীর সহিত বোঝাপড়া করবার কোনও চেষ্টাই নাই। অশ্বকে জলাশয়ের কাছে উপস্থিত করতে পারি, কিন্তু তাকে জল খাওয়াতে পারি না। সাহিত্যিক পক্ষীরাজ মহাশয়রা—শিল্প-রসের জলাশয়ে কোনরূপ মনঃসংযোগ না করেই তীরের বেগে প্রদর্শনীর স্থান পরিত্যাগ করে ছুটে পালান। শিল্প-রচনার ফাঁদ পেতে তাঁদের ধরতে পারি না।

চিত্র সম্বন্ধে আমাদের সাহিত্যিক মহাশয়-দের এই যে বিমুখ ভাব একটা সমস্যার বিষয় হয়েছে। চিত্র-বিমুখ ও চিত্র-বিরোধী সাহিত্যিকদের লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

'ওরা ত জানে না তুলী আর রঙ্
কি কঠিন বশ করা—
আমাদের কাজ ওরা ভাবে মশ-করা॥''

শিল্পের ভাষা, শিল্পের ব্যাকরণ, শিল্পের অলঙ্কার-শাস্ত্র আমরা অনেকদিন বিস্মৃত হয়েছি। অথচ একটু চেষ্টা করে তা শিখে নিতে আমরা উদ্যোগী নই। নিরক্ষরের অক্ষরে লেখা শিল্পসৃষ্টি আমাদের চক্ষে দুর্ভেদ্য হেঁয়ালি মাত্র—রঙ-রেখায় হিজিবিজি তাদের অর্থ অনুসন্ধান করতে আমরা অসমর্থ এবং নারাজ। মানুষের কৃষ্টির ইতিহাসে মানুষের চাক্ষুষ শিল্পের সাধনা কত প্রাচীন তার আসন, কত সম্মানের স্থান অধিকার করে আছে—আজ আমরা সাহিত্য রচনার গর্বে তা ভুলতে বসেছি।

মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে উচ্চ সাধনার ইতিহাসে শিল্পের ভাষা সাহিত্যের ভাষা হতে অনেক প্রাচীনতা, অনেক শ্রেষ্ঠ সাধনার দাবী রাখে।

আজকের মানুষ নানা বিভিন্ন পথে বিভিন্ন ভাষায় আপনার মনের কথা প্রকাশ করে চলেছে। সে এখন কথা বলে, গল্প করে বক্তৃতা করে কথা কাটাকাটি করে, বকাবকি করে, 'বখেড়া' করে কলহ করে। সে এখন লেখে এবং পড়ে, সে এখন গান বাঁধে এবং গান গায়—কথার ভাষার উপর সুর জুড়ে দেয়; সঙ্গীতে আপনার মনের কথা, মনের ব্যথা ও আনন্দ—নানা সুরে, নানা ছন্দে নানা তালে-লয়ে প্রকাশ করে। মানুষ যে শুধু কালির আঁচড় দিয়ে লেখার খাতা ভর্তি করতে পারে তা নয়,—নানা রকমের নানা ছাঁদের রূপ আকৃতি চোখ দিয়ে দেখে, আর তুলীর আঁচড় দিয়ে নানা রঙ দিয়ে—নানা আকৃতি এবং রূপ—যেমন মানুষ, পশুপাখী, ফুল-ফল, গাছ-পাতা, পাহাড় পর্বত, নদনদী নানা সুন্দর রূপের আভাস, রেখার ভাষায় ফুটিয়ে তোলে—যা দেখে আমাদের চোখ জুড়োয় আমাদের মন কখনও আনন্দে নেচে ওঠে কখনও দুঃখে চোখের জল ফেলে এবং ঐ তুলীর আঁচড়ে লেখা ছবির ভাষার মধ্য দিয়ে—যে ছবি 'লিখেছে' সেই চিত্রকরের অনেক মনের কথা, অনেক হর্ষ-বিষাদের ইতিহাস আমরা পড়ে নিতে পারি—এবং সেই সব পটে লেখা কথার বিচার করে—যে ছবি লিখেছে সেই ছবির কারিগরকে সেই 'পটকার'কে বাহবা দিই বা নিন্দা করি পুরস্কার দিই কিংবা তিরস্কার করি।

মানুষের মনের কথা বলবার আর একটি ভাষা দেখতে পাচ্ছি—সেটা হ'ল অঙ্গ-ভঙ্গীর ভাষা,—নিস্তব্ধের ভাষা। মাথা নেড়ে, ঘাড় বেঁকিয়ে ও ঘুরিয়ে নানা ইঙ্গিত ও ইসারা দিয়ে—আমরা অনেক কথা বলতে পারি। এই অঙ্গভঙ্গীর ভাষা,—সুর, তাল ও ছন্দে জুড়ে দিয়ে নটনটী ও নর্তকীরা নাচের চলন্ত ভাষায় আমাদের আনন্দ দেয়—আমাদের চেতন করে তোলে, নাচিয়ে তোলে, কখনও কখনও ঈশ্বরের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেয়, ভগবানের আরাধনার দিকে পথ দেখিয়ে দেয়।

কিন্তু আজ এই যে যীশু খৃষ্টের তিরো-ধানের ১৯৪৬ বৎসর পরে,—মানুষ যে এই নানা পথে, নানা রকমের ভাষায় আপনাকে প্রকাশ করতে শিখেছে—এই যে কথাবার্তা চালাচ্ছে—এই যে বোঝাপড়ার নানা পথ শিখে নিয়েছে—এই সব স্বতন্ত্র পথ, স্বতন্ত্র ভাষা, একসঙ্গে দখল করতে পারে নি মানুষ। এক একটি ভাষা শিখে নিতে মানুষের হাজারে হাজার বছর লেগেছে। আর সকলের চেয়ে পুরানো ভাষা হল অংগভঙ্গীর ভাষা—আর রঙ তুলী দিয়ে ছবি আঁকবার ভাষা,—রূপ লেখবার ভাষা। এই দুই ভাষা শেখবার অনেক হাজার বৎসর পরে—মানুষ কথা বলতে শিখেছে—কথা বলবার উপযুক্ত শব্দ আবিষ্কার করেছে। এই কথা বলতে শেখবার আগের যুগে, তার দুটি মাত্র ভাষা ছিল—অঙ্গ-ভঙ্গীর ভাষা আর ছবি লেখবার ভাষা। সেই যুগ হ'ল খৃস্টের জন্মাবার বিশ হাজার বছর আগেকার যুগ। তখন না ছিল কথা, না ছিল গান, না ছিল কোনও লেখাপড়ার ভাষা। তখন মানুষের মুখে ভাষা ফোটে নি—তখন কথা চলত ঘাড় নেড়ে, আর হাত ঘুরিয়ে।

তখন মানুষ কেবল শুনছে—প্রকৃতি দেবীর কোলে বসে—নানা পশুপক্ষীর ডাক, বুলি, আর সুমধুর সংগীত, নানা গাছপাতার মর্মর-ধ্বনি—চুপি চুপি 'ফিস ফিস' কথা, নানা নদ-নদীর আর নির্ঝরিণীর ছুটে চলার কলতান—জলের তরঙ্গের নাচের সুললিত সংগীত। তখন মানুষ কেবল দেখেছে—স্বভাবের নানা রূপ, নানা ছাঁদ, নানা রঙ, নানা রূপ-রেখার আঁকা-বাঁকা ছন্দ—গাছের ডালের উপর সবুজ রঙে আঁকা পাতার পর পাতার সারি, নিস্তব্ধ পাহাড়ের গায়ে-গায়ে চলন্ত সীমা-রেখার নানা রকমের চলাচলির ছাঁদে গাঁথা সোজা ও বাঁকা রেখার নানা তরঙ্গ—যেগুলি কোথাও বা রোদে ফুটে উঠেছে, কোথাও বা কুয়াশায়, কোথাও বা গাছের ছায়ায় মিলিয়ে গেছে—চোখ যার নাগাল পেতে হয়রান হয়ে যায়। তখন মানুষ কেবল দেখছে ঘাসের মাঠে চরছে যেসব হরিণ—যাদের ঘাড়-পিঠ নুয়ে গেয়ে ধনুকের মত বাঁকা দেখায়—কেননা তার মুখ লেগে রয়েছে মাটিতে, যেখানে তারা চোখ বুজে মনের সুখে ঘাস চিবুচ্ছে। আর তার ঘাস চিবোনর ভঙ্গীতে নড়ে উঠছে, কেঁপে উঠছে, দুলে উঠছে তার মাথার দুটো শিং—গাছের ডালের মত নানা শাখায় বিভক্ত থাকে থাকে সাজান—রূপ-রেখার অপরূপ ছন্দ। হরিণ যখন ঘাস খায় তখন সে নিশ্চল—পটে-আঁকা ছবিটির মত—দূর থেকে বোঝা যায় না—জীবন্ত জীব, না কোনও গাছের ডাল—না আর কিছু। কিন্তু ঘাস চিবুতে গেলে মাথা নড়ে—আর রেখার সারি নিয়ে দুলে দুলে উঠে মাথার শিং। তখন শিকারী দূরে থেকে বুঝতে পারে যে, সেটি প্রকৃতির পটে লেখা কোনও রূপের মরীচিকা নয়—শিকারীর শিকারের বস্তু—রক্ত-মাংসে গাঁথা—তার আহারের সামগ্রী, তার ক্ষুধা নিবারণের অতি প্রয়োজনীয় ঔষধ। শিকারী তখন ঐ ঘাসের মাঠে চরছে যে-সব হরিণ তাদের লক্ষ্য করে' তার পাথরের সেই সেকেলে অস্ত্র ছুড়ে মারে, তখন তার হাতে আর কোনও অস্ত্র নেই—নেই কোনও তীর, নেই কোনও বল্লম, নেই কোনও বন্দুক—কারণ সেটা লোহা, তামা প্রভৃতি ধাতু আবিষ্কারের বহু আগেকার যুগ, সেই প্রাচীন প্রস্তর যুগের কথা। যাই হোক্, শিকারীর হাতের সেই পাথরের বাণ ছুটে গেল সেই হরিণ মারতে—কিন্তু হরিণ এক লাফে বিশ হাত লাফিয়ে পড়ে' আপনার প্রাণ বাঁচালে,—ছুটে পালাল শিকারীর পাথরের অস্ত্রের নাগালের বাইরে। শিকারী হতাশের দুঃখে, তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে কপালে চোখ তুলে ব্যগ্র হয়ে দেখে নিলে—হরিণের সেই পেটের ভেতর থেকে বার করা পা-ছুটোনোর শীঘ্রগতি—সেই সোজা লাইনের আঁক কেটে আকাশ-মার্গে—এক নূতন ভঙ্গীতে পালানোর ছবি। সেই ছবি তার চোখে, তর মনে, তার হৃদয়-পটে গভীর রেখায় আঁকা হয়ে রইল। কিন্তু শিকারীর পেটে ক্ষুধা, আর হাতে হরিণ-শিকারের পাথরের ছুঁচালো অস্ত্র, আর তার মনে লক্ষ্য-ভ্রষ্টের দুঃখ আর অভিমান। সে আর এক ঘাস-খেকো হরিণকে লক্ষ্য করে আবার ছুঁড়ে মারলে তার সেই সেকেলে পাথরের তীর। এবারও সে লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হ'ল। আকাশের চিত্র-পটে, আর তার অন্তরের চিত্র-পটে আবার ফুটে উঠল—সেই সোজা লাইন-কাটা হরিণের লাফ ও পালানোর সুন্দর-লীলা-চিত্র। এই রকম বার বার পরাস্ত হ'য়ে সে কেবলই দেখতে পেলে—সেই এক-একটি হরিণের ছুটে পালানোর

র চঞ্চল-চিত্র—সোজা লাইনে আঁকা, গতিলীলার আশ্চর্য চলৎ-চিত্র।

শিকারী ফিরে এল, সন্ধ্যার অন্ধকারে— আবাসে,—যেখানে অপেক্ষা ক'রে তার স্ত্রী, তার ছেলে-মেয়ে, বুড়ো বাপ-মা,—অন্ধকার গুহায় আলো জেবলে, শিকারীর হরিণ-নিয়ে ফিরে আসবার আশায়। শিকারী হাতের উপর, তার খালি পিঠের উপর পড়ল—নিরাশার ভর্ৎসনা, তিরস্কারের ী-আস্ফালন,—রাগের হাত-নাড়া মুখ- —অপমানের অস্ফুট-ধ্বনি; নানা কণ্ঠ ফুটে উঠল প্রতিবাদের অস্ফুট-ভাষার হল;—শিকারীকে করে দিলে মন-মরা। রী গুহার এক কোণে গিয়ে চুপ করে বসে —দেওয়ালের দিকে মুখ করে, আর তার রগণের দিকে পিঠ ফিরিয়ে, তার নিষ্ফল রের অবসাদ নিয়ে, তার নিরাশার দুঃখ, তার মনের অন্ধকার নিয়ে। সেই অন্ধকার করে' তার মানস-পটে কেবলই ভেসে লাগল—সেই পেটের ভিতর থেকে পা-করা হরিণদের প্রাণ-বাঁচানো লাফ আর চলার আশ্চর্য চলৎ-চিত্র,—সেই উদ্দাম-; যা শিকারীর হাতে ছোড়া ভোঁতা র তীরকে পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ করেছে— আকাশপটে আশ্চর্য গতিভঙ্গীর অপরূপ লিখে দিয়েছে—যে ছবিটি শিকারীর ক্ষ্ন চোখের মধ্য দয়ে তার মনের ক্যামেরায় কেটে মুদ্রিত হয়ে গেছে।

তখন শিকারীর মনে এক নতুন ফন্দী জেগে । সে ভাবলে যদি এই লাফ-মারা হরিণের তার গুহার দেওয়ালে কোনও রকমে কে রাখতে পারে তাহলে সেই ছবির —সেই নকলের যন্ত্রে ও যাদুতে আসলটাকে আনতে পারবে সে কাল সকালে, ঐ গুহার রে। এই যাদু বানাবার নেশায় শিকারীর আঁকবার কৌশল ফুটে উঠল। তখনও দিনের প্রখর আলোতে দেখা, তীক্ষ্ন চোখের তে চিত্ত-গত করা, সেই লাফ-মারা হরিণের , তার চিত্তের ফলকে, তার মানস-পটে স্পষ্ট রয়েছে—সুতরাং ঐ শিকারী চিত্র-শিল্পী ই চোখে দেখা ছবির স্মৃতি অবলম্বন করে' সামনের পোড়া কাঠের কয়লার লেখনীর য়ে ক্ষিপ্র হস্তে, অনায়াসে, লিখে ফেললে র দেওয়ালে, তাহার মানস-পটে মুদ্রিত— লম্ফমান হরিণের পলায়নের প্রাকৃতিক চিত্র যের চিত্র-শিল্পের ইতিহাসে জন্ম নিলে দিম কালের এই প্রথম চাক্ষুষ-চিত্র,—আর শিল্পী,—যার রূপ গ্রহণের দৃষ্টিশক্তি ছিল তীক্ষ্ন, যার রূপের স্মরণশক্তি ছিল প্রখর, যার ছবি আঁকবার হাত ছিল শক্তিমান। সেই ইতিহাসের নাগালের অনেক হাজার বছর আগের মানুষের পটুতা ছিল অপরিসীম। কেবল ছিল না তার হাতে বিজ্ঞানের বিদ্যায় গড়া তুলীপালখের সূক্ষ্ম লেখনী, কিংবা রং তৈয়ারী করার পরিণত রসায়নের বিদ্যা। কিন্তু, সেই পোড়া কাঠের মোটা লেখনী দিয়ে সেই আদিম যুগের প্রথম চিত্রকর, যে 'হরিণের চিত্র' বিশ হাজার বছর আগে লিখে গেছে—তার গুহার দেওয়ালে, তার আশ্চর্য রূপ-রেখা, তার শক্তিমান রেখা-ভঙ্গী তার লাইনের দৌড়, তার গতি-লীলার হুবহু চমৎকার চলচ্চিত্র, আজও মুগ্ধ করে রেখেছে আমাদের এই সভ্যতার যুগের সমস্ত কলা-কুশলী রসবিদগণের আকর্ণ-বিস্তৃত ও বিস্ফারিত রূপ ও রস-দৃষ্টি।

তারপর, যুগের পর যুগ, হাজার বছর চলে গেছে, যে-সব যুগের কোলে কোলে জেগে উঠেছে, নানা শক্তি নিয়ে, নানা সূক্ষ্ম-দৃষ্টি নিয়ে, নানা বিজ্ঞান, নানা তুলী কলমের নানা সাধন, নানা অস্ত্র নিয়ে, নানা ওস্তাদী নিয়ে, নানা দেশের নানা কুশলী পশু-শিল্পী,—যাঁরা যাবজ্জীবন ধরে' পশুর চিত্রলেখা 'পেশায়' পরিণত করেছেন এবং যাঁদের পশু-চিত্র সভ্য জগতের নানা চিত্রশালার বড় বড় ভিত্তি-প্রসারের অনেকখানি জায়গা দখল করে রয়েছে—ইংলণ্ডের ল্যাণ্ডসীয়র, ফ্রান্সের রোজা বনুর, জাপানের সোসেন, মোগলাই ভারতের মনসুর।

কিন্তু এই বিশ হাজার বছর আগে চিত্রিত, এই বর্বর-শিল্পের প্রথম অধ্যায়ের আগে লেখা, —ঐ আদিম যুগের আদিম চিত্রকরের মোটা লেখনীতে লেখা—সেই হরিণের লাফ দিয়ে ছুটে চলার চিত্র—চিত্র-শিল্পের ইতিহাসের প্রথম আলেখ্য-পট পরের যুগের পৃথিবীর সমস্ত পশু-চিত্রের সমস্ত পটকে পরাস্ত করে' বয়স ও গুণের দাবিতে প্রথম স্থান অধিকার করে রয়েছে।

এই জাতীয় পশু-চিত্রের সর্বপ্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় ফরাসী দেশের 'হোৎ গারোণ' জেলায় একটি পাহাড়ের গুহার দেওয়ালে। পাহাড়টির নাম 'ওরিনাক্' (Aurignac)। তাই থেকে এই যুগের সভ্যতা ও শিল্পকলার নাম হয়েছে—'ওরিনাকীয়' বা 'ওরিনাসীয়' (Aurignacian) এই যুগ হল, প্রাচীন প্রস্তর-যুগের প্রথম-পাদ—আজ থেকে বিশ হাজার থেকে দশ হাজার বৎসর আগেকার সময়।

ভাববার কথা এই যে তখন মানুষের কথা বলার, কোনও ভাব প্রকাশ করবার আর কোনও ভাষা ছিল না। এই ছবির ভাষা, এই রং-রেখার ভাষা ছাড়া অন্য কোনও ভাষার সৃষ্টি হয় নি। কথা বলবার জন্য বুক ফাটছে, কিন্তু মুখ ফুটছে না। এই কারণে, শ্রবণ-পথের বস্তু ও বিষয়গুলো, চাক্ষুষ পথে আত্মপ্রকাশ করেছে। সেই যুগে মানুষ যা-কিছু শুনেছে, সমস্তই চাক্ষুষ ছবির লেখাতে পরিণত করছে, প্রকাশ করছে। সেই প্রাচীন ইতিহাসের নাগালের বাইরের যুগে, মানুষের কান প্রকৃতি-দেবীর কোলে বসে নানা মধুর সঙ্গীত ধ্বনি শুনেছে —নদ-নদীর উত্থান-পতনের তরঙ্গের কলতান, ঝরণার কুলু-কুলু ধ্বনি, গাছের ডালের উপর পাখীদের ঐক্যতান। কিন্তু, স্বরের পথে, সুরের পথে, গলার ভাষার পথে তার প্রকাশের উপায় নাই।

এই সব সঙ্গীতের লহর, সুরের ঐক্যতান, চোখের পথে ছবির অক্ষরে প্রকাশ হচ্ছিল, অপরূপ রেখায় রূপ পাচ্ছিল—আদিম যুগের বর্বর মানুষের নানা চিত্রাবলীতে, গুহার দেওয়ালে, শিকার-করা হরিণের হাড়ের উপরে লেখা খাঁজকাটা নক্সায়, নিত্য ব্যবহারের মাটির ভাঁড়-খুরির উপরে লেখা নানা মাঙ্গলিক চিত্রে, পূজা-স্থানের যাদু-বিদ্যার অনুষ্ঠানের জন্য লিখিত নানা সাঙ্কেতিক ও মাঙ্গলিক 'স্বস্তিকে'র আলপনায়।

এইরূপে কানে শোনা বস্তুগুলোও চোখের পথে চাক্ষুষ আলপনায় আত্মপ্রকাশ করছিল। কারণ, তখন কথার ভাষার অভাবে, কানের পথে পাওয়া জিনিসগুলোর, চোখের পথে হাঁটা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। তাই, 'নয়ন হলো শ্রবণ তখন'। একজন পারস্য দেশের কবি কথাটা বেশ সরস ভাষায় বুঝিয়েছেনঃ—

"গগন তবে সগৌরবে
গানের ধ্বনি উঠিল যবে জাগি',—
নয়ন হোলো শ্রবণ তবে,
দরশ ফিরে পরশ তারই লাগি।
বাজিল বীণা নিখিল নভে,—
সুরের ধারা ভরিল দশ দিক্,—
শ্রবণ হোলো নয়ন তবে,
শুনিছে আঁখি অধীর অনিমিখ॥*

---

*প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে শিল্প শাখার সভাপতির অভিভাষণ।

সাহিত্য প্রসঙ্গ

বাঙ্গলার প্রয়োজন ও সাহিত্য

—পৃথ্বীরাজ—

(১)

বাংলাদেশে এবং সাহিত্যে "গণ-সাহিত্য" ব'লে একটা কথা বেশ কিছুদিন ধরে আসর জমিয়ে তুলেছে,—অনেকটা চাঞ্চল্যেরই সঙ্গে। এ নিয়ে বিতণ্ডার অন্ত নাই! একটা বিশিষ্ট সাহিত্যিক সম্প্রদায় ("কল্লোল"-যুগ ও তার উত্তর-সাধকদল) এই নূতন (?) চিন্তাধারার প্রথম উদ্গাতার দাবী নিয়ে তার একটা ভাষ্য দিয়েছেন। পরবর্তীকালে অন্যান্য বিভিন্ন দিক হ'তে ব্যষ্টি কিংবা সমষ্টিগতভাবে নূতন হ'তে নূতনতর অর্থকরণ প্রসঙ্গে পূর্ব ধারণার মূলে ঘাত-প্রতিঘাতের চেষ্টা হয়েছে। বেশ কয়বারের পর আর একবারের মত এ আলোচনা নূতন ক'রে মাথা চাড়া দিয়া উঠতে চাইছে এবারে! আজ যখন দুরতিক্রম্য সমস্যার জটিলতা-জালে বাঙলার গণ-জীবন সমাচ্ছন্ন, তখন মুক্তি-সহায়তায় কোনও কিছুই কি করবার নাই তার সাহিত্যের? এ প্রশ্ন অনেককেই উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে তুলেছে দেখতে পাই! আর জাতীয় জীবনের এই চরমতম বিপর্যয়ক্ষণে বাঙলার সাহিত্য এবং সাহিত্যিকবৃন্দের পক্ষে জাতীয় প্রয়োজনের সহায়তা করবার কোনও অবকাশ আছে কি না — অনেক মতানৈক্যের জটিলতা অতিক্রম ক'রে তার সত্য সমাধানটি লাভের জন্য বাঙলার জাতীয় তথা "গণ-সাহিত্যের" স্বরূপ এবং বিবর্তনের ইতিহাস উদ্ঘাটন অপরিহার্য ব'লে মনে করি; তাই এ লিখন-প্রয়াস।

গণ-সাহিত্য বলতে প্রথমেই হয়ত বুঝি গণ-প্রয়োজন সাধন-উদ্দেশে সৃষ্ট সাহিত্যকে। এখানে সাহিত্য তথা শিল্পমাত্রেরই নিরালম্ব সর্বজনীনতার তর্ক তুলবো না,—কারণ, বিশেষ ক'রে সাহিত্যের দেশ-কাল-পাত্র নিরপেক্ষ প্রয়োজনাতিরিক্ত শাশ্বত রূপের সঙ্গে দেশ-কাল-পাত্রের প্রয়োজন-সর্বস্ব একটা অব্যবহিত হ'লেও অপরিহার্য মূল্যও যে ওতঃপ্রোতভাবে মিশে আছে,—বাঙলাদেশেও তা চূড়ান্তরূপে স্বীকৃত হয়েছে "কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘ", "প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ", "গণনাট্য পরিষৎ" ইত্যাদি নানা মত ও পন্থাবলম্বী শিল্পী সম্প্রদায়ের (Schools of Artists) সংগঠনে! কিন্তু এ প্রসঙ্গে সাহিত্য তথা শিল্পের গণ-প্রয়োজন-সাধনের সম্ভাবনার সীমা নির্দেশ এবং স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

যুগ যুগ ধরে নিখিল মানব কর্মবিকাশের পথে নিত্য নূতন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে,—যে চলার এই মুহূর্তের প্রত্যক্ষতম সাক্ষ্যরূপে উদ্ভূত হয়েছি আমরা,—আমাদের চারপাশের বস্তুজগত! এ চলার পরিণাম সবটুকুই বস্তু-সর্বস্ব কি না, সে তর্ক তুলবো না; কিন্তু এর সম্ভাবনা-মূলে নিহিত আছে যে দুর্বার আবেগ, তার সবখানিই না হ'লেও অনেকখানিই ভাব-সর্বস্ব আদর্শ যে তার সন্দেহ নাই। উৎকট বস্তু-সর্বস্বতার দম্ভমুখর Dialectic Materialismও আদর্শ বই কি? কিন্তু সে যাক্‌, যে কথা বলছিলাম,—জাতির সামনে তার চলার আদর্শ তথা ভাবের সৃষ্টি করতে পারাতেই জাতীয় শিল্পের প্রয়োজনীয়তার সার্থকতা। অসংখ্য জটিলতা-জর্জর জীবনের পথে চলতে চলতে মানুষ হঠাৎ সে পথ হারিয়ে ফেলে—সমস্যার সর্বনাশকর অন্ধকারে! সেই অন্ধকারের বিপর্যয়কে অতিক্রম ক'রে যাবার প্রত্যক্ষ প্রেরণা-রূপে আদর্শকে আলোকিত ক'রে তুলে ভঙ্গুর সমাজ তথা জাতীয় জীবনকে মৃত্যুর হাত হ'তে রক্ষা করাই গণ-সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অতীতে ফরাসী, জার্মান, ইংরেজ এবং রুশিয়ের সাহিত্যই যে জাতীয় জীবনের আদর্শ সৃষ্টিপথে জাতীয় অগ্রগতিকে সার্থক ক'রে তুলেছে, তা নয়—আমাদের বাঙলার সাহিত্য এবং সাহিত্যিকও এই সাধনায় পশ্চাৎপদ নাই। অব্যবহিত পূর্ববর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের ভাবদৃষ্টি-মূলেই গড়ে উঠেছিল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, তথা জাতীয় কংগ্রেসের প্রায় গত অর্ধশতাব্দীব্যাপী বিদ্রোহী জীবনের ইতিহাস। কিন্তু বাঙলা সাহিত্যের এই সত্যস্বরূপ উপলব্ধির জন্য প্রয়োজন তার উদ্ভব এবং ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা।

গণ-সাহিত্যের পূর্ব-পরিকল্পিত অভিধা এবং স্বরূপ নিয়ে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় প্রবৃত্ত হলে স্পষ্টই মনে হয়,—সাহিত্যের এই বিশিষ্ট স্বরূপটিকে বাঙলা সাহিত্য প্রথম হইতেই স্বীকার করে নিয়েছিল—"গণ-সাহিত্য" নামটির আড়ম্বর পরবর্তীকালের আত্মবিস্মৃতিরই অবশ্যম্ভাবী ফল। "সাহিত্য" নামটির মধ্যেই সহিতত্ব—তথা যে মিলন "শুধু ভাবে ভাবে, ভাষায় ভাষায়, গ্রন্থে গ্রন্থে মিলন নয়—দূরের সহিত নিকটের, মানুষের সহিত মানুষের, অতীতের সহিত বর্তমানের অঙ্গাঙ্গী যোগ সাধন"—তার যে সহজ অনুভূতিটি অনুস্যূত হয়ে আছে তাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় সাহিত্য বলতে বাঙলাদেশ "নিছক গণ-সাহিত্য"কেই বুঝেছিল;—সাহিত্যের আদিমতম নিদর্শন "চর্যাচর্য বিনিশ্চয়" হতেই নিখিল জাতির আদ্যন্ত সংস্কৃতির সংহত রূপ সৃষ্টির সাধনায় ব্যাপৃত হয়েছিল।

সংস্কৃতের পাণ্ডিত্যাভিমানী আভিজাত্য যখন জাতীয় জীবনের উচ্চ এবং নীচের বিভেদ উত্তুঙ্গ করে তুলেছিল, তখনই 'উচ্চের' হৃদয়-ভাবকে 'নীচের' হৃদয়-সঞ্চারিত করে দেবার ব্রত নিয়ে আবির্ভূত হলেন বাঙলার প্রথম শিল্পী সম্প্রদায়। বৌদ্ধ বজ্রযান সহজ-সাধক সম্প্রদায়ের সাধনায় সকল ঐকান্তিকতা—দর্শনের সকল জটিলতাকে মুক্তি দিতে গিয়ে অবলম্বন করলেন এঁরা সাধারণের মুখের সদ্যোজাত অতি অসম্পূর্ণ একটি ভাষাকে—তত্ত্বালোচনার পাণ্ডিত্য পরিত্যাগ করে অবলম্বন করলেন সংগীত-ঝঙ্কারকে—এইখানেই শুরু হল শিল্পের সাধারণীকরণ; শিল্পের এই জাতীয় মূর্তি গঠনে শিল্পীর পক্ষে অপরিহার্য সহায় হোল তাঁর পরিবেশ—পারিপার্শ্বিক জীবন! আজকার সুবিশাল পদ্মা হয়ত সেদিন অতিক্ষুদ্র খাল মাত্র—কিন্তু তাতে কি এসে যায়,—কবি জানেন, ছোট হোক, বড় হোক—বাঙলার নাড়ীর সঙ্গে সে যুক্ত—তাই বাঙলার কবিগুরুর মত আদি কবির রচনার পক্ষেও সে ছিল অপরিহার্য! আজকার মত সেদিনও পদ্মাতীরে—তার চার-পাশে—বাঙলার পল্লীগভীরে—যাযাবর বেদে, ডোম ইত্যাদি অন্ত্যজ সম্প্রদায় বাস করত; আজকার মতই বাঁশ-বেত দিয়ে তৈরী করত তারা অজস্র অকিঞ্চিৎকর প্রয়োজনের শিল্প; আজকার মতই মদ্যপান এবং আনুষঙ্গিক নানা-রকম সহজলভ্য অগভীর আনন্দ এবং উপভোগে মেতে থাকত। ধর্মের গান গাইতে গিয়েও বাঙলার শিল্পী এদের পরিত্যাগ করতে পারেন নি,—এরা যে বাঙলার জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। আজ জাতীয় জীবনস্বরূপ এই গণ-সাধারণকে জাতীয় সংস্কৃতি হ'তে সম্পূর্ণ নির্বাসিত করেই দেখা দিয়েছে আমাদের সর্বনাশ। কিন্তু এ আলোচনা এখন নয়;—বাঙলা সাহিত্য ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়ের সৃষ্টিমাত্রই যে এমনি গণ-অভিমুখী ছিল,—খনা এবং ডাকের বচন তার দ্বিতীয় প্রমাণ।—বাঙলার কবিতা বাঙলার গণজীবনের প্রয়োজনকে তার কামনার অনুরূপ ছন্দোরূপ দান করেছে। সে যুগের রূপকথাও ছিল সমাজ-জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার পরোক্ষ আলেখ্য।

তারপর এল দ্বিতীয় অধ্যায়—বাঙলা সাহিত্য ইতিহাসের মধ্যযুগ। মুসলমান আক্রমণে বাঙলার রাষ্ট্র এবং সমাজ-ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হ'ল। এই বিপর্যয়কে অবলম্বন করে গড়ে উঠ্‌ল নূতন আদর্শে উদ্বুদ্ধ নূতন যুগ। এই নূতন যুগকে মুক্তি দিল দুইটি শিল্পী সাধনা—শিল্পী দুজন, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি আজকার মতই জিঘাংসা বৃত্তিতে যখন উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল, সেদিনের বাঙলার রাজা এবং প্রজার শক্তি, তখনই মানস পরিবর্তনের একমা

রূপায়রূপে চিরন্তন প্রেমবন্ধনকেই এ'রা আহবান করেছিলেন। সেই আহবানে সাড়া দিলেন নিখিল প্রেম-মৈত্রীর শ্রেষ্ঠ অবতার—আবির্ভূত হলেন শ্রীচৈতন্য দেব। আজও বাঙলার পক্ষে যখন সেই মৃত্যু-ধ্বংসকারী প্রেমের প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে, আর এই অপরিহার্য যখন আধুনিক বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রেম-বিগ্রহকে আহবান করেছে মৃত্যুপণ সাধনায়; তখনও বাঙলার সমসাময়িক সাহিত্য তাঁর সার্থক সহায়তায়ও অগ্রসর হতে পারে নি,—তাই আমাদের এ দুর্গতি। কিন্তু সে আলোচনাও পরে হবে, আমরা বলছিলাম—চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির সাহিত্য-সাধনায় যে গণ-প্রয়োজন সর্বজনীন প্রেমের আদর্শের আবেগে নীহারিকা রূপে ঝলমল করছিল,—চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে তাই প্রত্যক্ষ সত্যরূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বঙ্কিম যেমন বঙ্গভঙ্গের, চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি তেমনি বাঙলাদেশে চৈতন্য যুগের সম্ভাবনার কবি! যদিও ধর্মকে অবলম্বন করেই এই শ্রেণীর সাহিত্যও প্রথম প্রকাশলাভ করেছিল—তবু তার পেছনে গণ-প্রয়োজনের অনুগমনে শিল্পীর যে আন্তরিকতা অনুস্যূত হয়েছিল—যে আন্তরিকতা ব্রজের যুগল দেবতাকে গঙ্গা-তীরের "আহীর-পল্লীর" বালক-বালিকায় পরিণত করেছিল (কৃঃ কীঃ)—তারই ফলে সম্প্রদায়কে অবলম্বন করেও বৈষ্ণব গীতি বাঙলার মাটিতে সার্বজনীনতা লাভ করেছিল। সে ছিল বাঙলার সার্থক গণ-সাহিত্য—শুধু প্রয়োজনই নয়, যুগ যুগ ধরে হিন্দু-মুসলমান, ধনী-দরিদ্র, বালক-বৃদ্ধনির্বিশেষে বাঙলার গণ-জীবনের রস-কামনাকে সে উদ্বুদ্ধ চরিতার্থ করেছে। নোয়াখালিতে যে মুসলমান সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতার উন্মত্ত পাশবিকতায় প্রতিবেশী হিন্দুর টুটি চেপে ধরেছিল,—সেও হয়ত আজও বৈষ্ণব-প্রেমগীতি গান করে দ্বিপ্রাহরিক গোচারণকে সরস করে তোলে—সাহিত্যের সার্বজনীন সার্থকতার এর চেয়ে উৎকৃষ্ট আদর্শও কি হতে পারে?

কিন্তু এ যুগের সাহিত্যের ব্যবহারিক সার্থকতা এখানেই শেষ নয়। সে যুগে ক্ষমতাবানের রাজ্যলিপ্সা বাঙলার রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে পৌনঃপুনিক আঘাতের বিপর্যয় ঘনিয়ে তুলেছিল। এই রাজ্য ভাঙা-গড়ার ক্ষয়-ক্ষতি হ'তে বাঙলার সংস্কৃতি তথা জাতীয় জীবনকে যে রক্ষা করেছিল, সেও তার সাহিত্য। আজ আমরা গণ-প্রয়োজনকে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত করেছি। কিন্তু বাঙলা দেশে যে দীর্ঘদিন ধ'রে স্বরাষ্ট্র লুপ্ত হয়েছিল, সেকথা অস্বীকার করবার উপায় নাই। অথচ তবু বাঙালী জাতি কখনও আজকার মত মুমূর্ষু হয়ে পড়েনি—তার সাংস্কৃতিক ঐক্য তাকে রক্ষা করেছিল। রাষ্ট্রীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাঙলা দেশ সমাজ-বন্ধনে সংগঠিত হয়েছিল। আর এই সমাজ-বোধের প্রথম প্রকাশ এবং সাংস্কৃতিক সংহতির সূচনা দুইই দেখা দেয় মধ্যযুগীয়, অনুবাদ, (রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত) জীবনী (চৈতন্য, অদ্বৈত ইত্যাদি) এবং পরে মংগল সাহিত্যগুলোকে অবলম্বন করে।

ইতিপূর্বে চর্যা এবং পরবর্তী সাহিত্যে বাঙালীর যে জীবনকে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, তার মধ্যে সমাজ অপেক্ষা ব্যক্তিগত অনুভূতির (Subjectivism) পরিচয় অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। কিন্তু বিশেষ করে চৈতন্য পরবর্তী পূর্বকথিত তিন শ্রেণীর সাহিত্য রচনার মধ্যে বাঙলার সমাজ-চেতনা বস্তু স্বতন্ত্র (objective)রূপে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। রসসৃষ্টির সংগে মধ্যযুগের বাঙালী কবি সমসাময়িক সমাজ-জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সম্ভাবনা সংস্কৃতিকে প্রত্যক্ষ চিত্ররূপ দান করেছিলেন। গায়েনের কণ্ঠে একই আসরে বসে ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিতনির্বিশেষে সকল ধর্ম এবং সম্প্রদায়ের নরনারী সেই কাব্য-কথা উপভোগ ক'রত,—উপলব্ধির মধ্যে। এই উপলব্ধির গভীরতা এমনই সার্বজনীন ছিল যে, বাঙলার সকল শ্রেণীর নরনারীতে সে এক অপূর্ব ভাবৈক্যে সংগ্রথিত করে তুলেছিল। বর্ণশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ হতে ফুল্লরার মত অক্ষরজ্ঞান-হীনা অন্ত্যজ ব্যাধযুবতী পর্যন্ত, সকলেরই চিন্তাধারা একই আদর্শে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে,—সকলেই একভাবে ভেবেছে, এক পথে চলেছে। রাষ্ট্রক্ষমতা কিংবা অন্য যে কোনও বহিঃশক্তির পক্ষে,—সে যতই প্রবল হোক—অন্তরের সে নিভৃত রাজ্যে প্রবেশ করে বিভেদ সৃষ্টির ক্ষমতা ছিল না। বাঙলার সাহিত্য আজ সেই সার্বজনীন ঐক্য-সাধনার পথ পরিত্যাগ করেছে। কিন্তু সেকথা পরে হবে—আমরা বলছিলাম, ষোড়শ শতাব্দী হতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্য নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গণ-প্রয়োজনের অনুগমন তথা সাংস্কৃতিক ভাবৈক্য সৃষ্টির স্বাভাবিক আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রেখে অগ্রসর হয়েছে।

তারপরেই এল বাঙলার চরমতম দুর্দিন। বাঙলার প্রাচীন সংস্কৃতির অবলম্বন তার সমাজ ব্যবস্থা চূর্ণ হল, নবাগত বৃটিশ বণিক শক্তির বিভেদ দৃষ্টিকারী ক্ষমতার আবির্ভাবে প্রাচীন গ্রাম্য সামাজিকতার পরিবর্তে গড়ে উঠতে লাগল অর্থলোলুপ নূতন নাগরিক সভ্যতা (?)—সমাজের উঁচু এবং নীচুতে ঘটল গভীর বিচ্ছেদ। গণজীবনের সংগে গণ-সাহিত্যেরও ঘটল মৃত্যু, নূতন সংস্কৃতির উদ্বোধনের নূতন প্রয়োজন সাধন জন্য নূতন প্রতিভার আবির্ভাব আর হল না। তাই কবিগানের মধ্য দিয়ে নিছক অর্থলোলুপতায় শিল্প জাতীয় জীবনের সংগ হারিয়ে উপসংগী-রূপে বিন্দুমাত্র মর্যাদার অভাবে এগিয়ে চলল মৃত্যুর মুখে!

স্বাভাবিক উপায়ে এ মৃত্যু হতে জাতির মুক্তি কি করে কখন হত জানি না; কিন্তু মুক্তি এল এবারে নূতন পথে বিদেশী যুবক ডিরোজিওর বাগ্মিতায়। নূতন পথ প্রদর্শনের কর্তব্য হতে বিচ্যুত হলেও বাঙলার পরম সৌভাগ্য, তার সাহিত্য সেদিনও তার প্রয়োজনের অনুগমনটুকুও করতে পেরেছিল। আর এই নবপ্রয়োজনের শ্রেষ্ঠতম বাণীমূর্তি নবজাত বাঙালী জাতীয়তার প্রথম উদ্গাতা বিদ্রোহী কবি মধুসূদন। বিজাতীয়তার প্রতারণায় অধঃপতিত জাতি সেদিন হঠাৎ জেগে উঠে উৎকট "Nation" রাজের নেশায় মেতে উঠেছিল,—থিয়েটার করে নাম দিত National theatre—আহার বিহার সব কিছুতেই ছিল একটা National ঢং।

ইতিপূর্বে বৃটিশ রাষ্ট্রশক্তির যে বিভেদ সৃষ্টিকর কৌশলের কথা উল্লেখ করেছি, তারই ফলে সাহিত্য, জাতি, তথা সমষ্টিকে পরিত্যাগ করে ব্যষ্টি-সর্বস্ব, আত্মপরায়ণ হয়ে পড়ে। কিন্তু নবজাগৃতির উৎকট প্রয়োজনবোধ বিচ্ছিন্নদিনের জন্য ব্যক্তি সর্বস্বতাকে সমষ্টি-কামনার পথে নিয়ন্ত্রিত করেছিল। তারই ফলে নবীনচন্দ্রের মত আত্মপরায়ণ কবিকেও প্রথম "অবকাশ-রঞ্জিনী" রচনার পর "অনবকাশ সাধন" নবযুগ প্রয়োজনের নবমহাভারত রচনায় প্রয়াসী হতে হয়েছিল।

এই যুগের প্রয়োজন-বোধের উত্তরাধিকার নিয়েই আবির্ভূত হলেন জাতীয়শিল্পী ঋষি বঙ্কিম। মধুসূদনের যুগ প্রয়োজনের তাড়নায় যে মুক্তিপথকে কামনা করেছিল, বঙ্কিম এলেন তাকেই প্রত্যক্ষ রূপ দিতে। বঙ্কিম বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সম্ভাবনা যুগের শিল্পী।

কিন্তু বঙ্কিমের সম-সময়েই প্রায় অপেক্ষাকৃত অল্প আবেগপ্রবণ দুর্বলতর কবিশক্তি সাহিত্যে পুরাতন আত্মপরায়ণতার সাধনায় অগ্রসর হয়েছিল—বিহারীলাল বাঙলার চূড়ান্ত আত্মপরায়ণ কবি। কিন্তু বিহারীলালের অক্ষমতা যাকে পূর্ণতা দান করতে পারে নি, তাকেই সম্পূর্ণ করল রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। বাঙলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যপ্রতিভা তার আত্ম-পরায়ণতার জন্য দায়ী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন জীবনশিল্পী; বিহারীলালের মত প্রতিভা তাঁর উন্মার্গগামী হয়ে পড়বার অবকাশ পায়নি, শৈশব-পরিবেশের তীব্র উপকরণ তাড়নায়। তাই আত্মপরায়ণ হলেও প্রতিভা ছিল তাঁর ব্যক্তি এবং বস্তুতন্ত্রের সীমারেখায় আন্দোলিত। যখনই বহির্জগতে আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছে, তটবর্তী আত্মস্থ কবিচিত্তে লেগেছে তার আঘাত, আর স্রোতের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছে তাঁকে তখনই, স্রোতের টানে। রবীন্দ্র প্রতিভার বস্তুপরায়ণতা সকল

শক্তি নিয়ে জাতীয় প্রয়োজনের অনুগমনই করেছে, নূতন প্রয়োজন বোধের ভাবাবেগ সৃষ্টি করতে পারেনি,—রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গের সূচনা এবং পরিণতি যুগের কবি।

রবীন্দ্র যুগের কর্মব্যস্ততার মধ্যে দেখা দিলেন শরৎচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথে নূতন প্রয়োজন-বোধের যেদিকটায় অনবধান ছিল, শরৎচন্দ্র তারই প্রতি করলেন অঙ্গুলি সংকেত। রবীন্দ্র-নাথ যুগের অনুগমনে জাতীয় প্রয়োজনকে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, শরৎচন্দ্র রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ অজস্র সামাজিক প্রয়োজনকে মুক্তিদান করলেন। কিন্তু শরৎ-চন্দ্রের দৃষ্টিতে প্রয়োজন বোধটাই ছিল প্রত্যক্ষ —তার সমাধানের আদর্শকে তিনি খুঁজে পান নি,—শরৎচন্দ্রের শেষ প্রশ্নের উত্তর নাই।

কিন্তু এইখানেই শেষ। এরপরে জাতীয় প্রয়োজন বোধটুকুর প্রতিও বাঙলার সাহিত্যিক-বৃন্দ অনবহিত হয়ে পড়লেন। রবীন্দ্র প্রতিভার অনতিক্রম্য প্রভাবের অনুগমনে তাঁরা ব্যক্তি স্বতন্ত্র সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের তীব্র জীবনানুভূতি তাঁদের ছিল না, তাই সাহিত্য হোল আত্মবিলাসী। রসক্ষরণের ব্যাঘাত তাতে হোল না, কিন্তু একাকীত্বের আনন্দে সৃষ্ট সাহিত্য, একাকীত্বের রস কামনাকেই সঙ্গ দান করল—সার্বজনীন চিন্তাধারার সংহতি তথা জাতীয় সংস্কৃতির ঐক্য বিধান করতে পারল না, বাঙলায় দেখা দিল মত বিভিন্নতা। যত লোক, তত মতবাদের সৃষ্টি হল, ঘরে ঘরে জমে উঠল নিত্যনূতন দলের ভীড়। তাই এই বিভেদের মধ্যে ঐক্য-সাধনার ঐকান্তিক প্রয়োজনবোধে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে মিলিত হয়েছেন আমাদের শিল্পী সংঘ, কিন্তু পুরাতনের পুনরাবৃত্তি পথে নূতন প্রয়োজনে কোথায় ফাঁকি পড়ে গেল, অনাগত-কালে তার আলোচনা করবার প্রস্তুতিরূপে এইখানেই শেষ করি এই পটভূমিকা।

আন্তর্জাতিক সম্মেলন :

এগারো দিন অধিবেশনের পর গত ২রা এপ্রিল নয়াদিল্লীতে আন্তরেশীয় সম্মেলন শেষ হ'ল। ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে যাঁরা বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর ও সম্মেলনের সভানেত্রী শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর বক্তৃতা উল্লেখযোগ্য। বহুদিন পরে গান্ধীজী ইংরেজীতে বক্তৃতা দিলেন। তাঁর বক্তৃতার প্রধান বিষয় হ'ল, সত্য ও প্রেমের উপর সমগ্র এশিয়াকে মিলতে হবে, এইটিই হ'ল এশিয়ার বাণী, এশিয়াকে এই বাণীই বহন ক'রে নিয়ে যেতে হবে পশ্চিমের জাতিগুলির কাছে, তবেই পৃথিবীতে শান্তি আসবে।

পণ্ডিতজী বলেন, এই মহাসম্মেলন এশিয়ার ইতিহাসে তথা সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে একটি যুগসন্ধির লক্ষণ স্বরূপ। কারণ, বর্তমানে পৃথিবীর ইতিহাসের ভারকেন্দ্র ইউরোপ থেকে সরে' এশিয়াতে আসছে। সুতরাং আজ সমস্ত এশিয়াবাসী জাতিকে কেবলমাত্র তাদের নিজস্ব একটা সংকীর্ণ জাতীয়তা বোধের দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়ে থাকলে চলবে না, প্রত্যেকের মধ্যে একটা আন্তরেশীয় ঐক্যের বোধ জন্মাতে হবে। তাহলেই একটা আন্ত-র্জাতিক বোধ, সমগ্র মানবজাতি নিয়ে একটা পৃথিবী, এই বোধ জাগবে। ইউরোপীয় সভ্যতার অবদানকে স্বীকার ক'রে তিনি বলেন যে তার মধ্যে যে অভাব-ত্রুটি রয়েছে তাকে পূরণ করতে হবে এশীয় সভ্যতার সত্য ও প্রেমের নীতির দ্বারা। এতকাল এশিয়া পশ্চিমের জাতিগুলির সাম্রাজ্য স্থাপনের ও শোষণের ক্ষেত্র মাত্র ছিল, সেই যুগ বদলিয়ে দিতে হবে।

সবচেয়ে মূল্যবান যে-কথা পণ্ডিত নেহরু বলেছেন সেটি হল এই যে, আজ দারিদ্র্য ভারতের সবচেয়ে বড় সমস্যা, স্বাধীনতা লাভ করলেও সে-সমস্যা থেকে যেতে পারে। শুধু ভারতের নয়, এশিয়ার বহু দেশেও আজ ঐ একই সমস্যা। সুতরাং সমগ্র এশিয়াকে এক হতে হবে এই সাধারণ সমস্যার মীমাংসা করবার জন্য। এই ঐক্যকে গড়ে তুলতে হবে একেবারে নীচের তলা থেকে।

অধিবেশনের দশ এগারো দিনের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিনিধিদের কতকগুলি গোল টেবিল বৈঠক বসে। বিষয়গুলি প্রধানত বিজ্ঞান বিষয়ে সহযোগিতা, সাংস্কৃতিক সহযোগিতা, নারীদের মর্যাদার উন্নতি, সমাজ-সেবা, শিল্প ও কৃষি বিষয়ক উন্নয়ন ও শ্রমিক কল্যাণ। সাধারণ ভাষা আপাতত ইংরেজী বলেই স্থির হয়েছে।

সমগ্র অধিবেশন সম্বন্ধে কয়েকটি লক্ষ্য করবার বিষয় আছে।

প্রথম, অতি অল্প সময়ে প্রায় বিনা মত-বিরোধে, ঝগড়া-ঝাঁটি ছাড়া কর্মসূচীতে যা-যা ছিল তার প্রত্যেকটির সুচারু ভাবে সম্পাদন। এর সঙ্গে পাশ্চাত্য জাতিদের প্রতিষ্ঠান সম্মিলিত জাতিসংঘের অধিবেশনগুলি তুলনীয়।

দ্বিতীয়, বিদ্বেষের অভাব। যদিও এটা প্রাচ্য মহাসম্মেলন এবং প্রাচ্য সংস্কৃতি ও সভ্যতার উপর এর ভিত্তি, তবুও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি কোনও অপমানসূচক মন্তব্য করা বা তার প্রতি বিদ্বেষভাব প্রচার করা হয় নি, শুধু তাই নয়, পাশ্চাত্য সভ্যতার অবদান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার ক'রে তার অভাবকে এশিয়ার সভ্যতা দিয়ে পূরণ করবার কথা হয়েছে।

তৃতীয়, প্রধানত বন্ধু সম্মেলন হিসেবে এর কাজ চালানো হয়েছে। পরস্পর আলাপ-আলোচনা ও পরিচয়, এইটিই ছিল এর প্রধান লক্ষণ। উল্লেখযোগ্য যে, এতগুলি গোল টেবিল বৈঠক হ'ল, কিন্তু একটিও "প্রস্তাব" গৃহীত হয় নি। একবারমাত্র আজারবাইজানের প্রতিনিধি প্রস্তাব করবার চেষ্টা করেছিলেন যে, মহাসম্মেলনে যা-যা নীতি স্থির হ'ল সেগুলি যে যার দেশে গিয়ে যেন কাজে পরিণত করবার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে-প্রস্তাব বাতিল করা হয়।

আন্তরেশীয় প্রতিষ্ঠান :

স্থির হয়েছে, আগামী মহাসম্মেলন হবে চীন দেশে এবং এখনই একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান করা হ'ল তার নাম আন্তরেশীয় প্রতিষ্ঠান বা 'এশিয়ান্ রিলেশনস অর্গ্যানিজেশন্' (ARO)

তার জন্য একটি অস্থায়ী জেনারেল কাউন্সিল গঠিত হয়েছে। সর্বসম্মতিক্রমে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি মনোনীত হ'লেন। অর্থাৎ আন্তরেশীয় ঐক্য আন্দোলনে সমগ্র এশিয়া আজ ভারতের নেতৃত্ব স্বেচ্ছায় বরণ করে নিল।

এই কাউন্সিলের প্রধান কাজ হবে, এশিয়ার প্রত্যেক দেশে এর শাখা কেন্দ্র স্থাপন করা গভর্ন-মেন্টের বাহিরে। এই প্রতিষ্ঠান, কেন্দ্রে বা শাখাগুলির মারফৎ কোনও রাষ্ট্রনৈতিক প্রচার-কার্য চালাবে না। এর কাজ হবে প্রধানত তিনদিকে : এশিয়ার সমস্যাগুলি কি তা নির্ধারণ করা ও সেগুলি বুঝবার চেষ্টা করা, (২) এশিয়ার বিভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে বন্ধুভাব স্থাপন করা বা বাড়ানো এবং (৩) তাদের কল্যাণ ও অগ্রগতি বৃদ্ধি করা।

বিভিন্ন দেশে শাখা কেন্দ্র স্থাপনের পর প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী গঠনতন্ত্র রচিত হবে। সেই সময়ে বর্তমানের অস্থায়ী পরিষদের জায়গায় একটি স্থায়ী পরিষদ গঠিত হবে। আশা করা যায় চীনে মহাসম্মেলনের আগামী দ্বিতীয় অধিবেশনের পূর্বেই এই সব কাজ শেষ হবে। অবশ্য ইতিমধ্যে মহাসম্মেলন আর না হলেও একাধিক 'রিজ্যনাল কনফারেন্স' বা আঞ্চলিক সম্মেলন হতে পারে।

পণ্ডিত নেহর্ তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন, কনফারেন্স শেষ হ'ল, এইবার কাজের পালা সুর্ হ'ল।

ভারতবর্ষ ও রাশিয়া ঃ কূটনৈতিক সম্বন্ধ

সম্প্রতি মস্কো বেতার থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ভারত এবং এশিয়ার মধ্যে কূটনৈতিক মিশন বিনিময় করা হবে। এই মিশনগুলির পদ-মর্যাদা রাষ্ট্রদূতের সমানই হবে। সুতরাং একে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্রদূত বিনিময় হবে বলেই ধরে নিতে হবে। বেতারে আরো বলা হয়েছে যে, শীঘ্রই এ সম্বন্ধে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হবে।

অন্তর্বর্তী সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই কতকগুলি বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতবর্ষের কূটনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে এবং সেই সেই রাষ্ট্রে ভারতের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হয়েছেন। এইভাবে মার্কিন, চীন, ফ্রান্স প্রভৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে।

এই বিষয়ে একটি জিনিষ লক্ষ্য করা যায়। আজ আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতিতে দেখা যায়, জগতের রাষ্ট্রগুলি মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত। একটি হ'ল রাশিয়া ও তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত অথবা তার সীমান্তবাসী কতকগুলি রাষ্ট্র যেমন, পোলাণ্ড, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, যুগোস্লাভিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া প্রভৃতি। দ্বিতীয় দলটি হ'ল রুশ-বিরোধী 'ওয়েস্টার্ণ ব্লক' নামে সাধারণত পরিচিত রাষ্ট্রপুঞ্জ, যেমন, ফ্রান্স, চীন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, গ্রীস প্রভৃতি। এদের নেতা হল আমেরিকা ও ইংলণ্ড—কার্যত আমেরিকা। এর মধ্যে প্রধানত পাওয়া যায় বৃটিশ সাম্রাজ্যের দেশগুলি ও আমেরিকার তাঁবেদার বা আমেরিকার নিকট খাতক দেশগুলি। বর্তমানে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে এদের ভোটই বেশী।

ভারতবর্ষ এতকাল একপক্ষের অর্থাৎ ইঙ্গ-মার্কিণ নেতৃত্বে চালিত দেশগুলির সঙ্গেই কূটনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন করে আসছিল। সুতরাং সেই দিক থেকে দেখলে রাশিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন বিষয়ে উল্লিখিত ঘোষণার গুরুত্ব খুব বেশী। যদি সত্য সত্য ঐ উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্রদূত বিনিময় হয় তবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এবং ভারতের পক্ষেও তার ফল সুদূরপ্রসারী হবে। এই ব্যবস্থার ঐতিহাসিক মূল্য কত বেশী সেটি এই থেকেই বোঝা যাবে যে, এতকাল আমেরিকা প্রভৃতি অন্যান্য দেশের কনসাল প্রভৃতিরা ভারতে ছিলেন, কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ার কোনও রাষ্ট্রীয় অফিস এদেশে খুলতে দেওয়া হয় নি।

ভারতবর্ষ ও রাশিয়া ঃ কারিয়াপ্পার মন্তব্য

ঠিক যে সময়ে ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে কূটনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপিত হবে বলে স্থির হয়েছে, সেই সময়েই একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে।

ব্রিগেডিয়ার কারিয়াপ্পা ভারতীয় সেনা-বাহিনীতে ভারতীয় অফিসারদের মধ্যে সর্বোচ্চ পদের অধিকারী। জনরব, ফীল্ড মার্শাল অকিনলেকের পরে তিনিই হবেন ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম ভারতীয় জঙ্গীলাট বা প্রধান সেনাপতি। কিছুকাল আগে তিনি বিলাতে গিয়েছিলেন সেখানকার ইম্পিরিয়াল ডিফেন্স কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত করতে। সম্প্রতি বিলাতের সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, বিলাতে ভবিষ্যৎ ভারত রক্ষা বিষয়ে বৃটিশ ও আমেরিকান উচ্চপদস্থ সামরিক স্টাফের একটি গোপন বৈঠক বসে। সেই বৈঠকে ব্রিগেডিয়ার কারিয়াপ্পাও উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে নাকি আমেরিকার তরফ থেকে ভারতকে তার সামরিক রক্ষা বিষয়ে সাহায্য দানের কথা বলা হয়েছে। গ্রীসে ও তুর্কীতে যে-নীতিতে মার্কিণ "সাহায্য" দেওয়া হবে বলে বুঝতে পারা যাচ্ছে ভারতের বেলাও এই স্বতঃপ্রবৃত্ত "সাহায্য" যদি একই নীতিতে দেওয়া হয়, তবে ভাববার কথা। যাই হোক এই সম্পর্কে আর একটি কথা যা প্রকাশ পেয়েছে সেইটেই বেশী গুরুত্বপূর্ণ। প্রকাশ, বৈঠকের পরে নাকি ব্রিগেডিয়ার কোনও কোনও মহলে বিশেষত কয়েকজন ভারতীয় ছাত্রের কাছে এই মত প্রকাশ করেছেন যে, 'রাশিয়া ভারতের শত্রুদেশ।'

কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্তর্বর্তী সরকারের ভাইস প্রেসিডেণ্ট ও পররাষ্ট্রসচিব পণ্ডিত জওহরলাল নেহর্ এবং বিভিন্ন দেশে অধুনা নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূতেরা অতি পরিষ্কার ভাষায় একাধিকবার ভারতের বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে এই বলে ঘোষণা করেছেন যে, 'ভারতের কোনও শত্রুদেশ নেই। ভারতবর্ষ সব দেশের সঙ্গেই শান্তি ও মৈত্রীর বন্ধনে বাস করতে চায়।' সুতরাং দেখা যায় প্রকাশ্যভাবে ঘোষিত ভারতীয় বৈদেশিক নীতি ও বৃগেডিয়ার কারিয়াপ্পার প্রচারিত নীতি পরস্পর বিরোধী।

ঠিক যে-সময়ে রাশিয়ায় ও ভারতে কূটনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপিত হ'তে চলেছে, সেই সময়েই ব্রিগেডিয়ার কারিয়াপ্পার মতো একজন দায়িত্বপূর্ণ উচ্চপদস্থ সরকারী ও সামরিক কর্মচারীর প্রকাশ্য উক্তি সেই সম্বন্ধ স্থাপনে ব্যাঘাত জন্মাতে পারে।

আমেরিকা, গ্রীস ও তুর্কী

আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট যখন গ্রীস ও তুর্কীকে চল্লিশ কোটি ডলার সাহায্য দানের প্রস্তাব করেন, তখনই আমরা বলেছিলাম যে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এর ফল সুদূরপ্রসারী হবে। হয়েছেও তাই। এই ঘোষণার পরেই নূতন সাহসে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে স্পেনের ডিক্টেটর ফ্রাঙ্কো একটি ঘোষণা করেছেন এবং ফরাসী রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে পুনরায় অবতীর্ণ হয়েছেন জেনারেল দ্য গল্। পোলাণ্ডের ও রাশিয়ার সীমান্তে পোলাণ্ডের দেশরক্ষার সহ-সচিব জেনারেল স্বিরজেস্কি পোলাণ্ডের প্রতিক্রিয়াশীল গুপ্তদল কর্তৃক নিহত হয়েছেন। এই বিষয়ে পোলাণ্ডের রাষ্ট্রিক মহলের অভিমত হ'ল যে, ট্রুম্যান কর্তৃক গ্রীস ও তুর্কী সম্বন্ধীয় ঘোষণার জন্য পৃথিবীর প্রতিক্রিয়াশীল গণতন্ত্র-বিরোধী দলগুলির মধ্যে যে নূতন আশার সঞ্চার হয়েছে, এই ঘটনা তারই অন্যতম প্রমাণ।

যাই হোক্ ঐ সম্পর্কে মস্কো সম্মেলনে মঃ মলোটভ্ আপত্তি ক'রে বলেন যে, ট্রুম্যানের এই ঘোষণার দ্বারা সম্মিলিত জাতিসংঘকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে এবং গ্রীসের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। তা ছাড়া এই সাহায্য সম্পর্কে প্রস্তাব করা হয়েছে যে, সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের তরফ থেকে গ্রীসের সীমান্তে একটি স্থায়ী পাহারাদার কমিশন বসিয়ে রাখা হোক্, সে বিষয়েও আপত্তি তুলে মলোটভ্ বলেন যে, ঐরূপ কমিশনের প্রস্তাব এখন করা অন্যায়; কারণ সম্মিলিত জাতিসংঘ কর্তৃক গ্রীসের ব্যাপার নিয়ে যে তদন্ত কমিশন কাজ করছে, তাদের রিপোর্ট বেরুনো পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত। নইলে ঐ প্রস্তাবের দ্বারা ঐ তদন্ত কমিশনের বিরুদ্ধে জনমত উত্তেজিত করা হয়। মলোটভের মতে যদি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের তরফ থেকে কোনো স্থায়ী কমিশন বসাতেই হয়, তবে এমন কমিশন বসানো দরকার, যারা তদারক করবে যে, আমেরিকার এই সাহায্য দ্বারা গ্রীসের জনগণের প্রকৃত উপকার হচ্ছে, না তার অপব্যয় হচ্ছে।

পোলাণ্ড এই ব'লে আপত্তি জানিয়েছে যে, আমেরিকার এই সাহায্য দানের অর্থ হ'ল গ্রীসের গৃহযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা। তা ছাড়া তুর্কীকে কোনও সাহায্যের অর্থ হয় না; কারণ গত মহাযুদ্ধে তুর্কীর আচরণ সন্দেহজনক ছিল। বুলগেরিয়া, যুগোশ্লাভিয়াও আপত্তি জানায়।

ইংলণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, গ্রীস, চীন প্রভৃতি ট্রুম্যানের প্রস্তাবের সমর্থন করে। এ বিষয়ে আগামীবারে বিস্তৃততর আলোচনা করব।

তমাল গাছ

গাছপালা ফুল লতা পাতা সম্বন্ধে আমার অজ্ঞতা বড়ই লজ্জাকর। খুব সাধারণ গাছপালা আমি চিনিনে, যে ফুলের গন্ধ অতি প্রিয় তারও নাম জানিনে। বন্ধুরা এই নিয়ে আমাকে পরিহাস করতে ছাড়েন না। আমিও ছাড়ি না। বলি, আমার প্রকৃতিটা মনুষ্য প্রকৃতি, বন্য প্রকৃতি নয়। স্বভাবটা যদি বুনো হ'ত তবেই গাছপালার খবর রাখা স্বাভাবিক হ'ত। কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়, মানুষকে বাদ দিয়ে আমি গাছপালার রূপ ঠিক বুঝতে পারিনে। যেখানে জনমানব নেই আমার মতে সেখানে প্রকৃতির কোনো রূপ নেই। মানুষ সুন্দর বলেই প্রকৃতি সুন্দর। মানুষ না থাকলে শ্যামা ধরণীও মরুভূমি সদৃশ হ'ত। এই মনোভাবের ফলে প্রকৃতির সঙ্গে আমার যোগ কোনোকালেই তেমন নিবিড় হতে পারেনি। প্রকৃতি দেবীর সঙ্গে আমার যা কিছু পরিচয় সবই রবীন্দ্রনাথের গান কবিতার মধ্য দিয়ে—বিশেষ করে গান। পথের পাঁচালী অতি সুখপাঠ্য গ্রন্থ। কিন্তু পথের পাঁচালীর মতো বই আমার মতো লোকের পক্ষে লেখা অসম্ভব হ'ত। কারণ সে বই-এর একমাত্র অপুকেই আমি চিনি। তার চার পাশে যে বনভূমির ভূমিকা তা আমার কাছে একেবারে অজ্ঞাত।

ইদানীং আমি যে স্থানটিতে বাস করছি সেখানকার বৃক্ষবৈচিত্র্য অপূর্ব। ছোট্ট একটু য়ায়গায় এত বিচিত্র রকমের গাছ কোথাও বড় একটা দেখা যায় না। বলা বাহুল্য, এটি বোটানিকেল গার্ডেন নয়। আর এখানকার ফুলের বৈচিত্র্য অধিকতর বিস্ময়কর। প্রতি ঋতুর বিচিত্র ফুল সম্ভার অকস্মাৎ আপন সৌগন্ধে ঋতু পরিবর্তনের বার্তা জানিয়ে দিয়ে যায়। বলতে গেলে এখানে এসেই প্রকৃতি দেবীর সঙ্গে আমার যা কিছু পরিচয় ঘটল এবং সে পরিচয়টি ক্রমে ক্রমে সখ্যে পরিণত হতে পারে।

বৃক্ষলতা সম্বন্ধে আমার সাধারণ ঔদাসীন্য আমি পূর্বাহ্নেই কবুল করেছি। কিন্তু একটি গাছ সম্বন্ধে বরাবর আমার মনে একটি অসাধারণ কৌতুহল ছিল, আজ পর্যন্তও সে কৌতূহল নিবৃত্ত হয়নি। আমি তমাল গাছ কখনো দেখিনি। বাঙলা দেশ বৈষ্ণব পদাবলীর দেশ। তমাল নামটা শুধু আমার মনে কেন বাঙালী মাত্রেরই মনে এক ধরণের মোহের সঞ্চার করে। বিশেষ করে এমন সুন্দর নাম কোত্থেকে এল? যিনি দিয়েছেন তিনি নিশ্চয় মহাকবি। রবীন্দ্রনাথ রেবা, শিপ্রা, বেত্রবতী ইত্যাদি নামের প্রশংসা করেছেন। শাল, পিয়াল, শিমুল, তমাল নামকরণ শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

যদিচ ধর্মে আমার মতি নেই, তীর্থভ্রমণে স্পৃহা নেই তথাপি ভেবে রেখেছিলাম, আর কিছু না হোক কেবল তমাল গাছ দেখবার জন্যই একবার বৃন্দাবনধামে আমাকে যেতে হবে। ইতিমধ্যে ভাবছিলুম, 'দেশ' পত্রিকার মারফৎ আমার সহৃদয় পাঠকদের কাছে একটি আবেদন জানাব তাঁরা কেউ নিকটতর কোনো স্থানে তমাল বৃক্ষের অস্তিত্ব সংবাদ দিতে পারেন কিনা। সত্যি সত্যি লিখব ভাবছি এমন সময়—থাক্ সে কথা পরে বলব।

মানুষের জীবনে অনেক মোহ থাকে। বয়স বাড়বার সঙ্গ সঙ্গে একটি একটি করে মোহ ঘুচে যায়—আর জীবন নীরস হয়ে আসে। মোহ-ই জীবন, মোহ-মুক্তির নাম মৃত্যু। যেতে যেতে আমার এখন ঐ একটি মোহে এসে ঠেকেছে। অল্প বয়সে মন যখন অতিমাত্রায় সেণ্টিমেণ্টাল ছিল তখন আমার উপন্যাসে নায়কের নাম দিয়েছিলাম তমাল। সেদিন তমাল সম্বন্ধে আমার দুর্বলতা যতখানি ছিল আজও প্রায় ততখানিই আছে।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে যত কিছু রম্য বস্তু উদ্ধার করেছিলেন। কিন্তু পাছে জীবনের সব মোহ ঘুচে যায় এজন্য রিজার্ভ তহবিলে রেখেছিলেন ইয়ারো নদীর সুরম্য তীরভূমি। রইল সেটি লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে তোলা দুর্গম সংসারের একমাত্র পাথেয়। পণ করেছিলেন, ইয়ারো নদীর মানস মূর্তিটিকে চাক্ষুষ মূর্তিতে দেখে অমূল্যকে মূল্যহীন করবেন না। মনে সান্ত্বনা থাকবে—এখনও সংসারে রয়েছে দেখবার মতো বস্তু। হায়রে মানুষের মন, কিছুতেই কৌতূহল নিবৃত্তি হয় না। অদৃষ্টপূর্ব ইয়ারোকে গিয়েছেন দেখতে। ফল যা হবার তাই হয়েছে, কবি নিরাশ হয়েছেন। Is this Yarrow! প্রথম লাইনেই আর্তকণ্ঠের আভাস।

সেদিন পড়ছিলাম রবার্ট লিণ্ড-এর প্রবন্ধ পুস্তক। তিনিও একটি অনুরূপ মোহের কথা বলেছেন—তাঁর মোহটি মৎসরাঙ্গা নামক পক্ষী সম্বন্ধে। মাছরাঙ্গার রূপ বর্ণনা শুনে উক্ত পাখী দেখবার জন্য তাঁর কৌতূহলের অন্ত ছিল না। হঠাৎ একদিন এক বন্ধু ব্যক্তি এসে বললেন, পথে আসতে আসতে একটি মাছরাঙ্গা পাখী এক্ষণি দেখে এলেন। লিণ্ড অবাক। যে পাখীর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় তিনি বহু বৎসর কাটিয়ে দিয়েছেন সেই পাখী তাঁরই গৃহের কয়েক শত গজের মধ্যে নদীতীরে মৎস সন্ধানে ব্যাপৃত। লিণ্ড তৎক্ষণাৎ বন্ধুকে নিয়ে উক্ত পাখীর দর্শন মানসে বেরোলেন। দর্শন পেলেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতো তিনি নিরাশ হননি। পক্ষীর বর্ণসমারোহে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কবি জনোচিত ভাষায় পাখীটিকে আখ্যা দিয়েছেন—**winged rainbow.**

আচ্ছা, এবার তবে আমার কথাটা বলি। এই সেদিন বৃক্ষতত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের এক বন্ধু আমাকে একেবারে অবাক করে দিয়ে জানালেন যে, আমারই গৃহের অনধিক পঞ্চাশ গজের মধ্যে একটি তমাল গাছ অবস্থিত। এত বড় একটা বিস্ময়ের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। তৎক্ষণাৎ আমার এতকালের মানসমূর্তিটিকে দেখতে গেলুম। কি বলব আপনাদের, ওয়ার্ডসওয়ার্থও এত বড় আঘাত পাননি। তমাল গাছ এই! এত সাধারণ দেখতে! পাশের গাব গাছটি যে এর চাইতে শতগুণে দেখতে ভালো। লালচে কচি পাতাগুলো সোনার ঝালরের মতো ঝুলছে। আর কি কুৎসিত মূর্তি ঐ তমাল গাছের। শ্রীরাধা তমাল দেখে কৃষ্ণ বলে ভ্রম করতেন। মরিলে বাঁধিয়া রেখো তমালেরই ডালে। বাবাঃ আমি শ্রীরাধা নই, কিন্তু আমার রসবোধ শ্রীরাধার চাইতে কিছুমাত্র কম নয়। সুতরাং বন্ধু-বান্ধবকে বলে রাখছি, আমি মরলে অন্ততঃ তমাল কাঠ দিয়ে আমাকে যেন পোড়ানো না হয়। তমাল দর্শন করে লাভের মধ্যে মনে হচ্ছে একটি মহামূল্য সম্পদ হারিয়ে ফেলেছি। মিছিমিছি সেণ্টিমেণ্টাল হতে গিয়ে বোকা বনেছি। আসল কথা, বৃন্দাবনে তমাল বৃক্ষের আধিক্য সেজন্যেই ওটা বৈষ্ণব কাব্যে অতখানি স্থান পেয়েছে। সেখানে যদি প্রচুর পরিমাণে গাব কিম্বা তেঁতুল গাছ থাকত তবে গাব তেঁতুলই বৈষ্ণব কাব্যে আসন পেত। কিন্তু যতই বলি, মনটা একবার ধাক্কা খেলে সহজে সামলে উঠতে পারে না। তমালের তামাসাটা কিছুতেই মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছিলাম না। আমাদের এখানে একজন বৃক্ষতত্ত্ববিদ আছেন। একদিন তাঁর কাছে কথাটা পাড়লুম। তিনি অবাক হয়ে বললেন, বলেন কি, এখানে তমাল গাছ আছে বলে তো জানিনে। আমি ততোধিক বিস্মিত। তবে যে—। উনি বললেন, আচ্ছা। চলুন দেখেই আসি। আমার গৃহসংলগ্ন বৃন্দাবনধামে তাঁকে নিয়ে এলুম। বৃক্ষটি দেখেই তিনি উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন—আপনিও যেমন, এটা তো কামরাঙ্গা গাছ। কামরাঙ্গা! এ্যাঁ; ফলের মধ্যে নিকৃষ্টতম ফল। সেই বৃক্ষকে কিনা তমাল বলে বর্ণনা। এত বড় ভুল। কি করে সম্ভব? না ইচ্ছাকৃত পরিহাস। ভেবে ভেবে সম্প্রতি এর একটা কিনারা করেছি। তমাল নামটা রোমাণ্টিক, কামরাঙ্গা নামটা ততোধিক রোমাণ্টিক। তমালের রোমাণ্টিসিজম্ রাধাকৃষ্ণের স্মৃতি-বিজড়নে; আর কামরাঙ্গার মহিমা শব্দ এবং অর্থের সংপৃক্তিতে।

হকি

বাঙলার হকি খেলা সত্য সত্যই বন্ধ হইয়া গেল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা একটু কমিয়া পুনরায় বাড়িয়া গেল। শান্তিরক্ষকদের কড়া আইন, জবরদস্ত হুসিয়ারী কিছুই করিতে পারিল না। হকি খেলা ক্ষতিগ্রস্ত হইল। ইহা খুবই দুঃখের বিষয়। তবে এই প্রসঙ্গে একটি কথা আমরা না বলিয়া কিছুতেই পারিতেছি না যে, বোম্বাইতে শত দাঙ্গা শত হাঙ্গামা থাকা সত্ত্বেও কোন সময়েই খেলাধূলা ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই—অথচ বাঙলা দেশে কেন হইল?

বাঙলার হকি পরিচালকগণ এক সভায় মিলিত হইয়া বেটন হকি কাপ ও লীগের অবশিষ্ট খেলা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা প্রস্তাবের মধ্যে আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, প্রথম শ্রেণীর যে সকল দল বর্তমান অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যেও খেলিতে প্রস্তুত আছেন, তাঁহারা যদি পরিচালকমণ্ডলীকে জানান তাহা হইলে একটি বিশেষ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইবে। পরিচালকগণের উদ্দেশ্য ভালই তবে কোন দল খেলিবার জন্য অগ্রসর হইবেন বলিয়া মনে হয় না।

ব্যাডমিণ্টন

ভারতীয় ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড়দ্বয় প্রকাশনাথ ও দেবীন্দরমোহন প্যারীতে বিশ্ব ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় ও কোপেনহেগেনে আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জন করিতে না পারিলেও কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। এই কৃতিত্বের প্রশংসা করিতে গিয়া কোন এক বৈদেশিক সংবাদ-পত্রসেবী ভারতকে ব্যাডমিণ্টন খেলায় শীর্ষ স্থানে বসাইয়া দেন। ইহার ফলেই সম্প্রতি দেখা যাইতেছে কতকগুলি সাংবাদিকের মধ্যে বাদানুবাদ আরম্ভ হইয়াছে। মালয় হইতে কয়েকজন নাকি ভীষণ প্রতিবাদ জানাইয়াছেন এবং জোর করিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন তাঁহারা শ্রেষ্ঠ। ভারতীয় খেলোয়াড়দের প্রশংসাকারী সাংবাদিক বেচারী অগত্যা ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ফেলিয়াছেন। ইহার আচরণ অনেকে সমর্থন করিতে পারিতেছেন না। সকলেই বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, "লড়াই হোক পরে ফলাফল দেখা যাইবে।" আমরাও সেইজন্য বলি লড়াইয়ের ব্যবস্থা হোক। মালয়ের ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড়গণ যখন শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিতেছেন তখন তাঁহারাই এই অনুষ্ঠানের উদ্যোগী হউন। সারা-পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের আহ্বান করুন। ভারতের ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড়গণও সেই আহ্বানে নিশ্চয় সাড়া দিবেন। তখন ক্রীড়াক্ষেত্রে লড়াই করিয়া যাঁহারা শ্রেষ্ঠ তাঁহারা নিশ্চয় সাফল্যলাভ করিবেন। বাক্‌বিতণ্ডা করিয়া কখনও কোন সমস্যার সমাধান হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। বরং এইরূপ বাকবিতণ্ডা জটিলতাই বৃদ্ধি করে। সেইজন্য আমাদের মনে হয় বাদানুবাদ বন্ধ করিয়া এক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হইলেই ভাল হয়।

ফুটবল

ফুটবল খেলা নিয়মিতভাবে কলিকাতার মাঠে হইবে এই ভরসা কেহই দিতে পারে না। তবে খেলা একেবারেই বন্ধ থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। প্রথম শ্রেণীর কয়েকটি বিশেষ ক্লাব ইতিপূর্বেও প্রতিযোগিতামূলক খেলার অনুষ্ঠানের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন এখনও করিতেছেন। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ইতিমধ্যে ত্রিভেন্দ্রামে ফুটবল প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া সাফল্যলাভ করিয়াছেন। মোহন-বাগান দলও মাদুরায় গোল্ড কাপ খেলিতে যাইতেছেন। ইহার পরই এই দুইটি দলের বোম্বাইতে রোভার্স কাপ প্রতিযোগিতায় যোগদানের সম্ভাবনা আছে। এই দুইটি ক্লাবের খেলোয়াড়গণ বহু বাধা ও বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে মাঠে অনুশীলনে যোগদান করিতেছেন। এদিকে জুনিয়ার ক্লাবের কতকগুলি পরিচালক একত্র হইয়া অনুষ্ঠানের পক্ষে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। আই এফ এর পরিচালকমণ্ডলী খেলা অনুষ্ঠান সম্পর্কে শীঘ্রই এক সভা আহ্বান করিবেন—আশা হয় যে বন্ধের ব্যবস্থা পূর্বে হইয়াছিল তাহা বাতিল হইয়া যাইবে।

দক্ষিণ কলিকাতার বিশিষ্ট ক্রীড়ামোদিগণ পুনরায় ফেডারেশনকে সজীব করিয়া তুলিতেছেন। ইহারা যেভাবে সকল দলের মধ্যে উৎসাহ সঞ্চার করিতে সক্ষম হইয়াছেন তাহাতে মনে হয় ফুটবল খেলা বেশ জমিয়া উঠিবে। ইহাদের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হউক ইহাই আমাদের আন্তরিক বাসনা।

সন্তরণ

কলিকাতার অধিকাংশ সন্তরণ প্রতিষ্ঠান যে সকল অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত সে সকল স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা কোনরূপ বাধা সৃষ্টি করিতে পারে না। অথচ দেখিয়া আশ্চর্য হইতে হইতেছে যে, এখনও পর্যন্ত এই সকল প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণ সন্তরণ অনুশীলনেরই ব্যবস্থা করেন নাই। কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ইতিপূর্বে কোনদিন সন্তরণ বিষয় কোনরূপ উৎসাহ প্রদর্শন করিতেন না। সম্প্রতি ইহারা সন্তরণের বিভাগ ভালভাবে চালাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। দেখা যাক এই সকল অখ্যাত, অজ্ঞাত ক্লাবের তৎপরতা দেখিয়া খ্যাতিসম্পন্ন অভিজ্ঞ ক্লাবের পরিচালকগণের জ্ঞান সঞ্চার হয় কিনা?

ভারতের সন্তরণ পরিচালনা বিষয়টি লইয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া নিখিল ভারত অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সহিত ন্যাশনাল সুইমিং এসোসিয়েশনের দ্বন্দ্ব চলিতেছে। সম্প্রতি শোনা গেল দেশের কোন বিশিষ্ট নেতা নাকি ইহার মীমাংসার জন্য হস্তক্ষেপ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। এই সংবাদ যদি সত্য হয় খুবই ভাল। তবে এই নেতাকে অনুরোধ করিব, তিনি যেন প্রকৃত সন্তরণ লইয়া যে সকল প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি আছেন তাঁহাদের উপরই এই বিভাগের ভার দেন। যাঁহারা বহু বিষয় লইয়া পাণ্ডাগিরি করিয়া থাকেন তাঁহাদের আর এই সন্তরণে পাণ্ডা-গিরি না করিলেই বোধ হয় ভাল হয়। বিশ্ব-অলিম্পিক অনুষ্ঠান আগামী বৎসরে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত হইতেছে। এই অনুষ্ঠানে ভারতীয় সাঁতারুগণ যোগদান করিতে পারেন যদি দুই এক মাসের মধ্যে পরিচালনা দ্বন্দ্বের অবসান হয়। আমরা আশা করি, এই বিষয়টি স্মরণ করিয়া শীঘ্র মীমাংসার একটা ব্যবস্থা হইবে।

জাতীয় খেলাধূলা

বঙ্গীয় প্রাদেশিক জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সঙ্ঘ নিখিল ভারত ব্যায়াম শিক্ষা সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনের ভার লইয়াছিলেন। দেশের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য তাঁহারা ঐ গুরুদায়িত্ব ত্যাগ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তবে সেই সঙ্গে আরও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন আগামী ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যায়াম সম্মেলনের ব্যবস্থা করিবেন। ১০।১২ বৎসর পূর্বে এইরূপ এক সম্মেলন কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে হইয়াছিল। অনেক প্রস্তাবই এই সম্মেলনে পাশ হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় কোনটিই কার্যকরী করিবার জন্য উক্ত সম্মেলনের উদ্যোক্তারা করেন নাই।

জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সঙ্ঘের পরিচালকগণকে আমরা যত দূর জানি তাহাতে তাঁহারা প্রস্তাব গ্রহণ করিলে কখনও কার্যকরী না করিয়া ছাড়েন না। এই প্রসঙ্গে তাঁহাদের জাতীয় খেলাধূলার প্রসার ও প্রচারের ব্যবস্থা, বিভিন্ন জেলার ব্যায়াম প্রতিষ্ঠানকে একত্র করিয়া জেলা সঙ্ঘ গঠন, প্রত্যেক জেলায় উৎসাহী ব্যায়ামব্রতীদের একত্র করিয়া ব্যায়াম শিক্ষাশিবির স্থাপন, সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইতেছে ইহাদের নিখিল বঙ্গ নববর্ষ উৎসব পরিচালনা। জাতীয় জীবনকে নিয়ম ও শৃঙ্খলার মধ্যে আনিবার জন্য ইহারা যে নবপন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, ভারতের অন্য কোন প্রতিষ্ঠান তাহা করে নাই এবং করিতে চেষ্টা করিলেও ইহারা যে পরিমাণ সাফল্য অর্জন করিয়াছেন কেহই করিতে সক্ষম হন নাই, ইহা আমরা জোর করিয়াই বলিব। এই সঙ্ঘের কর্মীদের বিশেষত্ব হইতেছে যে প্রত্যেকে নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়া দেশের স্বার্থকে বড় করিয়া দেখিয়া থাকেন। ইহারা প্রকৃতই দেশের সুসন্তান।

[illegible] বান্ধব ব্যায়াম সমিতির বালিকাগণ ব্রতচারী নৃত্য করিতেছেন

দেশী সংবাদ

৭ই এপ্রিল—নোয়াখালিতে বে-আইনী কার্য-কলাপ এবং অগ্নিসংযোগাদি ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে—শ্রীযুত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত এবং শ্রীযুত হারাণ ঘোষ চৌধুরীর নিকট হইতে তারযোগে এইরূপ সংবাদ পাইয়া মহাত্মা গান্ধী তাঁহাদের নিকট এবং বাঙলার প্রধান মন্ত্রীর নিকট এই মর্মে তার করিয়াছেন যে, অবস্থা যেরূপ মনে হইতেছে, তাহাতে সকলকে ঐ স্থান ত্যাগ করিতে হইবে; না হয় ধর্মোন্মত্ততার আগুনে পুড়িয়া মরিতে হইবে।

শিলংয়ের সংবাদে প্রকাশ, আসাম-বঙ্গ সীমান্ত হইতে বহুসংখ্যক বহিরাগতের ব্যাপক আন্দোলনের সংবাদ আসাম সরকারের নিকট পৌঁছিয়াছে। গত কয়েকদিন যাবৎ মানকাচরের নিকট পূর্ব পাকিস্থান কিল্লায় কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইরূপ মনে হইতেছে যে, মুসলিম লীগের বহু-ঘোষিত আসাম অভিযান পুরা দমে চালাইবার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, দিল্লী শহর হইতে মোটরযোগে এক ঘণ্টায় যাওয়া যায় এইরূপ একটি অঞ্চলে একটি পালিত মহিষ চুরি হইতে উদ্ভূত সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার ফলে ২২খানি গ্রাম ভস্মীভূত এবং ৯০ জন লোক নিহত হইয়াছে।

কলিকাতায় প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের চতুর্বিংশ ও বিশেষ অধিবেশন সমাপ্ত হয়। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিশেষ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। বাঙলার নিজস্ব সংস্কৃতি, সাহিত্য ও ভাষার গতি অব্যাহত রাখার জন্য অধিকাংশ হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চল লইয়া একটি পৃথক প্রদেশ গঠনের দাবী জানাইয়া সম্মেলনে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৮ই এপ্রিল—কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট (সংশোধন) বিল গৃহীত হয়। বর্তমান বিল দ্বারা উক্ত এ্যাক্টের ৪০।৪১ ধারা বাতিল করা হইয়াছে। উক্ত ধারাদ্বয়ের বিধানানুসারে ভারতীয় মুদ্রার সম্পর্ক ষ্টার্লিং-এর সহিত রাখা হইয়াছিল। এক্ষণে তৎপরিবর্তে আন্তর্জাতিক তহবিলের সদস্যভুক্ত প্রত্যেক রাষ্ট্রের মুদ্রার সহিত সম্পর্ক রাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

শ্রীরামপুরের সংবাদে প্রকাশ, গতকল্য ভদ্রেশ্বর থানার এলাকাধীন এক শিল্পাঞ্চলে পুলিশের গুলীচালনার ফলে ৬ জন নিহত এবং ২০ জন আহত হইয়াছে।

গোয়েন্দা বিভাগের ইন্সপেক্টর মিঃ আবু ইউসুফ কলিকাতা জেনারেল পোষ্ট অফিসে বড় বড় ছোরা ভর্তি ১৬৬টি পার্শেল আটক করেন। এগুলি স্থানীয় কোন ব্যাঙ্ক এবং ক্যানিং ষ্ট্রীট, এজরা ষ্ট্রীট, কলুটোলা প্রভৃতি অঞ্চলের কয়েকটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের নামে ওয়াজিরাবাদ, নিজামাবাদ এবং বোম্বাই হইতে প্রেরণ করা হইয়াছিল।

পাটনায় নিখিল ভারত অনুন্নত সম্প্রদায় লীগের ১০ম বার্ষিক অধিবেশন হয়। গণ-পরিষদের সদস্য শ্রীযুত এইচ জে খাণ্ডেলকর সভাপতির ভাষণে এইরূপ মন্তব্য করেন যে, মুসলিম লীগের সহিত সহযোগিতা করার অর্থ রাজনৈতিক আত্মহত্যার নামান্তর। তিনি বলেন যে, মুসলমানদের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে হিন্দুদিগকে সম্পূর্ণরূপে অস্পৃশ্যতা বর্জন করিতে হইবে।

বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী ঘোষণা করেন যে, বাঙলা সরকার কলিকাতা সহরের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষাকল্পে পুলিশের শক্তি বৃদ্ধি হেতু যে ব্যয় হইবে, তাহা নির্বাহের জন্য কলিকাতার নাগরিকগণের নিকট হইতে কর ধার্যের প্রস্তাব বিবেচনা করিতেছেন।

৯ই এপ্রিল—কলিকাতার পুলিশ কমিশনার ১০ই এপ্রিল ভোর হইতে ১১ই এপ্রিল সকাল ৬টা পর্যন্ত বড়বাজার ও জোড়াসাঁকো থানা এলাকায় ২৫ ঘণ্টা স্থায়ী সান্ধ্য আইন জারী করেন। এই দিন কলিকাতায় দাঙ্গাহাঙ্গামার ঘটনায় ৩ জন নিহত ও ১৭ জন আহত হয়। পুলিশ বহুবাজার থানা অঞ্চলে ৮টি মৃতদেহ উদ্ধার করে।

১১ই এপ্রিল—কেন্দ্রীয় আইন সভায় প্রেরিত বাঙলার ১১ জন প্রতিনিধি বড়লাট লর্ড মাউণ্ট-ব্যাটেনের নিকট এক স্মারকলিপি পেশ করিয়া "পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গ" লইয়া ভারতীয় ইউনিয়নের অভ্যন্তরে একটি স্বতন্ত্র ও স্বায়ংশাসিত প্রদেশ গঠনের অনুরোধ জানাইয়াছেন।

ধুবড়ীর সংবাদে প্রকাশ, ৭ই এপ্রিল এক জনতা মানকাচরে থানা আক্রমণ করিয়াছিল। গোয়ালপাড়া ও গারো পাহাড় অঞ্চলের ডেপুটী কমিশনার মানকাচরে চলিয়া গিয়াছেন।

বগুড়ার সংবাদে প্রকাশ, প্রায় দুই শত লোক লাঠি এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বগুড়া হইতে কুড়ি মাইল দূরবর্তী একটি বাজার আক্রমণ করে। বার তেরটি দোকান লুণ্ঠিত হইয়াছে। পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়াছেন। কয়েকটি পরিবারকে অন্যত্র প্রেরণ করা হইয়াছে।

১২ই এপ্রিল—ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, দাঙ্গা দুর্গতদের মধ্যে বিপদাশংকার কথা জানাইয়া নোয়াখালির অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জামান আই সি এস স্বয়ং গভর্নমেণ্টের নিকট এক রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন—এই মর্মে তিনি অদ্য নোয়াখালি হইতে সংবাদ পাইয়াছেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার সভাপতি শ্রীযুত এন সি চট্টোপাধ্যায় চৌমুহনী হইতে এক তারে জানাইয়াছেন যে, "নোয়াখালির অবস্থা সঙ্গীন গুরুতর। উপদ্রব রেল লাইনের পূর্বদিকে বিস্তৃত হইতেছে। বুধবার রাত্রে চৌমুহনীর নিকটবর্তী গ্রামসমূহ আক্রান্ত, লুণ্ঠিত ও অগ্নিদগ্ধ হইয়াছে। গৃহের অধিবাসীরা প্রহৃত হইয়াছে এবং একজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে আছে। এ পর্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই বা কোনও ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই।"

মহাত্মা গান্ধী নয়াদিল্লী হইতে পাটনা রওনা হইয়াছেন। নয়াদিল্লী ত্যাগের প্রাক্কালে মহাত্মা গান্ধী অদ্য পুনরায় বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

ধুবড়ীর সংবাদে প্রকাশ, ৮ই এপ্রিল জনতা মানকাচরের থানা আক্রমণ করিলে পুলিস ১৪৪ ধারা অমান্যকারীদের উপর লাঠিচার্জ করে। অনুমান ৬ জন লোক আহত হইয়াছে। হবিগঞ্জে (আসাম) আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা হিসাবে এক বিরাট শোভাযাত্রা বাহির করা হয়। ট্রেজারী দালানের উপর লীগ পতাকা উড্ডীন করিবারও চেষ্টা হইয়াছিল। ট্রেজারীর একজন প্রহরী এক রাউণ্ড গুলী ছোড়ে। একজন সামান্য আহত হইয়াছে।

১৪ই এপ্রিল—গৌহাটীতে জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে আসামের রাজস্ব ও অর্থসচিব শ্রীযুত বিষ্ণুরাম মেধী আসামকে পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য মুসলিম লীগের প্রচেষ্টায় বাঙলা গবর্ণমেণ্টের সাহায্যদানের কথা উল্লেখ করিয়া এইরূপ অভিযোগ করেন যে, বাঙলা গবর্ণমেণ্ট আসাম আক্রমণে সাহায্যের জন্য রেশন সরবরাহ করিতেছেন।

মধ্য কলিকাতার কোন কোন অংশে হাঙ্গামা বাধিবার ফলে বহুবাজার থানা এলাকায় ৩২ ঘণ্টা ব্যাপী সান্ধ্য আইন প্রয়োগ করা হইয়াছে। আজ কলিকাতায় হাঙ্গামা বিভিন্ন ঘটনায় দুইজন নিহত ও ১৭ জন আহত হয়।

আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেণ্ট মৌলানা তায়েবুল্লা মুসলিম লীগের আসাম আক্রমণ আন্দোলনকে তীব্র রাজনৈতিক হতাশার অভিব্যক্তি বলিয়া বর্ণনা করেন।

শ্রীযুত সন্তোষকুমার সিংহ এম এল এ ও শ্রীযুত শরৎচন্দ্র সিংহ এম এল এ আসামের মানকাচর পরিদর্শন করিয়া এক যুক্ত বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, মুসলিম ন্যাশন্যাল গার্ডের লোকেরা হিন্দু ব্যবসায়ীদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাঁহাদের নিকট হইতে লীগ তহবিলের জন্য বলপূর্বক অর্থ আদায় করিতেছে।

অমৃতসরে অনুমান পাঁচশত শিখ নেতা পাঞ্জাবের ২৯টি জেলা হইতে স্বর্ণ মন্দিরে সমবেত হইয়া ধর্মের নামে এই শপথ গ্রহণ করেন যে, পাকিস্থানের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া তাহারা জীবন-পাত করিবেন।

বিদেশী সংবাদ

৭ই এপ্রিল—রুশ সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান-গুলি অদ্য চীন ও জার্মানী সম্বন্ধে অবলম্বিত মার্কিণ নীতির বিরুদ্ধে কতকগুলি অভিযোগ করিয়াছেন।

রুশ পররাষ্ট্র সচিব মঃ মলোটভ এবং মার্কিন রাষ্ট্র সচিব মিঃ জর্জ মার্শালের মধ্যে যে সকল পত্র বিনিময় হইয়াছে, টাস নিউজ এজেন্সী তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। মঃ মলোটভ তাঁহার পত্রে এই মন্তব্য করিয়াছেন যে, চীনে বৈদেশিক সৈন্য থাকিলে গৃহ যুদ্ধে উস্কানী দেওয়া হইবে।

মস্কো রেডিওতে চীনের সরকারী সৈন্যদলকে সাহায্য করা এবং চীনের প্রধান প্রধান সহরের নিকট মার্কিন বিমান ঘাঁটি স্থাপন করার জন্য আমেরিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছে। আমেরিকার সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হিসাবে জানা যায় যে, জাপানের আত্মসমর্পণের পর হইতে এপর্যন্ত চীনকে চারিশত কোটি ডলার মূল্যের যুদ্ধের সরঞ্জাম সরবরাহ করা হইয়াছে।

৮ই এপ্রিল—বিশ্ববিখ্যাত মোটর গাড়ী নির্মাতা মিঃ হেনরী ফোর্ড পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৩ বৎসর হইয়াছিল।

১০ই এপ্রিল—এথেন্সের সংবাদে প্রকাশ, দক্ষিণ-পশ্চিম গ্রীসের এব্রিটানিয়া প্রদেশে গ্রীক বাহিনী ও গ্রীক গেরিলা বাহিনীর মধ্যে দুইদিনব্যাপী যুদ্ধের ফলে গেরিলা বাহিনীর একশত জন নিহত, ৭০ জন আহত ও ৭০ জন কারারুদ্ধ হইয়াছে।

১৩ই এপ্রিল—মস্কো বেতারে অদ্য ঘোষণা করা হয় যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং ভারতবর্ষ উভয় দেশেই রাষ্ট্রদূতের মর্যাদাসম্পন্ন কূটনীতিক প্রতিনিধি বিনিময়ের ব্যবস্থা চলিতেছে।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্ম্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন   সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

চতুর্দশ বর্ষ]   শনিবার, ১২ই বৈশাখ, ১৩৫৪ সাল।   Saturday, 26th April, 1947.   [২৫শ সংখ্যা

লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের সমস্যা

ভারতের নূতন বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন রাজনীতিক আলোচনার পর্ব সমাধা করিয়া ফেলিয়াছেন। এখন প্রকৃত কাজ করিবার পালা। বিভিন্নদলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সুদীর্ঘ আলোচনার ফলে বড়লাট কি সিদ্ধান্তে পেঁাছিয়াছেন, আমরা জানি না, তবে ভারতীয় সমস্যার সোজাসুজি সমাধানের কোন পথ তাঁহার কাছে উন্মুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। মিঃ জিন্না তাঁহার দাবীতে অটল আছেন। তিনি পাকিস্থান না পাইলে কিছুতেই সন্তুষ্ট হইবেন না; পক্ষান্তরে তিনি নাকি বড়লাটের সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁহাকেও এই কথা শুনাইয়া দিয়াছেন যে, যদি ঐ দাবী পূর্ণ না হয়, তবে ভারতবর্ষে এরূপ ভয়াবহ রক্তপাতবহুল গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইবে যে এসিয়ার ইতিহাসে কোনদিন তাহা ঘটে নাই। বলা বাহুল্য মিঃ জিন্নার এই হুমকি নূতন কিছু নয় এবং একমাত্র এইরূপ বিভীষিকা সৃষ্টির সাহায্যে মিঃ জিন্না এবং তাঁহার অনুগতগণ পাকিস্থানী জিদ পরিতৃপ্ত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাহার ফলে সমগ্র ভারতবর্ষে মধ্যযুগীয় বর্বরতার উদ্দাম লীলা আরম্ভ হইয়াছে। সে তাণ্ডবে বাঙলাদেশ বিধ্বস্ত হইয়াছে, পাঞ্জাবে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অশান্তির লেলিহান বহ্নিশিখা বিস্তারলাভ করিয়াছে। এদিকে আসামের উপরও পশুবলের দৌরাত্ম্য-স্রোত প্রবাহিত করিবার উদ্দেশ্যে ক্রমিক চেষ্টা চলিতেছে। সুতরাং মিঃ জিন্না নিবৃত্ত হইবার নহেন; শুধু তাহাই নহে, বস্তুতঃ দীর্ঘদিন ধরিয়া ক্রমাগত বিদ্বেষ প্রচারের ফলে তাঁহার অনুগত দলের মনে তিনি যে দানব বৃত্তিকে জাগাইয়া তুলিয়াছেন, এখন পারস্পরিক শান্তি ও সৌহার্দ্যের বুলি মুখে আওড়াইয়াও সে দৈত্যবৃত্তি শান্ত করিবার শক্তি তাঁহার নিজেরও নাই বলিয়া মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে মিঃ জিন্না আন্তরিকভাবে তাহা কামনাও করেন না। তিনি স্থিরমস্তিষ্ক রাজনীতিক; বিশেষ বুদ্ধি-বিবেচনা প্রয়োগ করিয়াই পাকিস্থানী পথ তিনি ধরিয়াছেন; সুতরাং যুক্তি-বুদ্ধির সাহায্যে তাঁহার মতিগতির পরিবর্তন সম্ভব হইবে, এমন আশা করা ভুল। আমরা পূর্বেও বহুবার বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে, নিজেদের প্রগতি-বিরোধী নীতির অন্তর্নিহিত অনিষ্টকারিতা যেদিন তাঁহাদের নিজেদিগকে শক্তভাবে আঘাত করিবে শুধু সেই দিনই লীগওয়ালাদের চৈতন্য ঘটিবে, তৎপূর্বে নয়। এরূপ অবস্থায় পাঞ্জাব এবং বাঙলা ভাগ করিয়া দেওয়াই প্রকৃষ্ট পন্থা। পাঞ্জাবের শিখপ্রধান অঞ্চল কিছুতেই লীগ পরিচালিত মন্ত্রিমণ্ডল মানিয়া লইবে না, একথা জানাইয়া দিয়াছে। পাঞ্জাবীরা শক্তিশালী জাতি। তাহারা আদর্শের জন্য প্রাণ দিতে জানে। ভারতের ইতিহাসে শিখ জাতির সে কার্যের পরিচয় রহিয়াছে। এমন শক্ত জাতিকে ফন্দীতে ফেলিয়া কাজ বাগাইবার কোন সুবিধা লীগ পাইবে না; শুধু তাহাই নয়, অন্য কাহারও মাতব্বরী বা সর্দারীও শিখেরা স্বীকার করিয়া লইতে রাজী নয়। অবস্থা এইরূপ বুঝিয়া পাঞ্জাব-ব্যবচ্ছেদ ইহার মধ্যেই একরকম স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। পঞ্জাব যে দাবী লইয়া দাঁড়াইয়াছে, জাতীয়তাবাদী বাঙলারও সেই একই দাবী। বাঙলার জাতীয়তাবাদী সন্তানগণ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রদূত। স্বদেশপ্রেমের উদার অগ্নিময় আদর্শ এই বাঙলা হইতেই ভারতের অন্যত্র সম্প্রসারিত হইয়াছে। দেখা যায়, ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের বৈপ্লবিক সাধনায় পাঞ্জাবের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা এক হইয়া অগ্রসর হইয়াছে। বস্তুত পাঞ্জাব এবং বাঙলার সমস্যা একই ধরণের। সুতরাং উভয় প্রদেশের সমস্যা সমাধানের পথও একই রকমের হইবে। মুসলিম লীগের সঙ্গে ঐক্য এবং মৈত্রীর প্রচেষ্টা অনেক রকমেই করা হইল; কিন্তু অবশেষে ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, লীগের সঙ্গে বাঙলার জাতীয়তাবাদের আদর্শ কিছুতেই খাপ খাইবে না। সুতরাং আমাদের দাবী পাঞ্জাবের ন্যায় বাঙলা দেশকেও ভাগ করিয়া দেওয়া হউক। নতুবা বাঙলার সমুন্নত শিক্ষা এবং সংস্কৃতিকে বাঁচাইয়া রাখিবার কোন উপায় নাই। অবস্থা যদি এইরূপ চলে তবে সাম্প্রদায়িকতার তাণ্ডবে বাঙলার যুগব্যাপী সাধনার সব চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া যাইবে এবং বাঙলা দেশ হিংস্র বর্বরের বাসভূমিতে পরিণত হইবে। আজ বাঙলার স্বদেশপ্রেমিক সন্তানগণ এই সর্বনাশকে প্রতিরুদ্ধ করিতে দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহারা বাঙলায় আজ লীগ-প্রভাব-বিনির্মুক্ত স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিবেন এবং তাঁহাদের সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে তাঁহারা প্রস্তুত। বস্তুত সমুদ্রে যাহার শয্যা, শিশিরে তাহাদের ভয় কি? লীগ-শাসনের দৌরাত্ম্যে, দুর্নীতি এবং পীড়নে আজ সুস্থ জনমতের প্রভাব বাঙলার শাসন-বিভাগ হইতে নির্বাসিত হইয়াছে। বাঙলার বুকে সাম্প্রদায়িকতা ক্ষিপ্ত প্রেত ও পিশাচ দলের নৃত্য আরম্ভ হইয়াছে। এই মর্মান্তিক অবস্থার প্রতীকার সাধনের জন্য যদি কিছুদিনের জন্য দুঃখকষ্ট বরণ করিয়া লইতে হয়, এবং ত্যাগ স্বীকার

করিতে হয়, জাতীয়তাবাদী বাঙলা তাহাতে পশ্চাৎপদ হইবে না। বাস্তবিকপক্ষে আমরা আমাদের এই দাবী সম্পর্কে লীগের সঙ্গে কোনরূপ গোঁজামিলের মধ্যে যাইতেই প্রস্তুত নহি। লীগওয়ালাদের সংকীর্ণ এবং কুটিল মনোবৃত্তিতে যে বিষ পাকিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে তাহাদের সম্পর্ক সর্বতোভাবে পরিবর্জন করাই শ্রেয়। তবেই স্বাধীন প্রতিবেশের মধ্যে বাঙলার সংস্কৃতি, স্বাভাবিক শক্তি পরিস্ফূর্ত হইবে এবং সেই শক্তি সর্বত্র বাঙলার উদার আদর্শকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবে এবং শুধু সেই পথেই লীগওয়ালাদের বাঙলার সংখ্যাগরিষ্ঠকে বিচূর্ণ করিবার স্পর্ধা খর্ব হইয়া আসিবে। সত্যই, তাহাদের বর্বর ধর্মান্ধতা যেরূপ উদ্দামবেগে অগ্রসর হইতেছে, অন্য কোনরূপ সাময়িক ব্যবস্থায় তাহা সংযত করিবার উপায় নাই। বাঙলার জাতীয়তাবাদীরা আজ স্থিরসংকল্প হইয়াছেন। বাঙলার কংগ্রেসও তাঁহাদের দাবী দৃঢ়তার সঙ্গে সমর্থন করিতেছেন। এ দাবী প্রতিহত করা সম্ভব হইবে না। বাঙলা তাহার প্রাণশক্তি এখনও হারায় নাই। এতদিন যাহারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের স্পর্ধা বিচূর্ণ করিয়াছিল, লীগমন্ত্রিমণ্ডলের স্পর্ধা এবং ঔদ্ধত্যকে খর্ব করিবার সামর্থ্যও তাহাদের আছে। বস্তুত লীগ শাসনে বাঙলার জাতীয়তাবাদ এবং তাহার শিক্ষা সংস্কৃতির ও প্রাণধর্মের উপর এতটা দৌরাত্ম্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে যে, তাহা সহনশীলতার সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। অবিলম্বে এই অবস্থার প্রতীকার সাধিত না হইলে বিক্ষোভের আগুন জ্বলিয়া উঠিবে। সুতরাং কালবিলম্ব না করিয়া বাঙলাকে চূড়ান্তরূপে দুইটি প্রদেশে বিভক্ত করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হউক এবং যে পর্যন্ত সে ব্যবস্থা কার্যকর না হয়, ততদিনের জন্য স্বাতন্ত্র্যকামী বাঙলার জন্য একটি আঞ্চলিক মন্ত্রিসভা গঠন করা হউক।

পণ্ডিত নেহরুর সতর্কবাণী

গোয়ালিয়রে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত প্রজা সম্মেলনের অধিবেশনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন, কয়েকটি কারণে তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি স্পষ্ট ভাষাতেই একথা বলিয়াছেন যে, ভারতের রাজনীতিক ক্ষেত্রে বর্তমানে দুইটি শক্তির সংঘর্ষ চলিতেছে। একটি শক্তি ভারতের ভৌগোলিক এবং রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও সংহতি শক্তিকে দৃঢ় করিতে তৎপর, অপরটি জাতির শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্যে অশান্তিকর প্রতিবেশ সৃষ্টিতে সাহায্য করিতেছে। কংগ্রেস জাতিকে সংহত করিতে চায়; পক্ষান্তরে মোসলেম লীগ কতকগুলি দেশীয় রাজ্য, ভারত গভর্নমেণ্টের রাজনীতিক বিভাগ ও বিদেশী আমলাতন্ত্রের সঙ্গে যোগ দিয়া ভারতবর্ষকে বহু ভাগে বিভক্ত করিবার জন্য কূটনৈতিক সৌহার্দ্যে মিলিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, স্বাধীনতা লাভে জাতির অগ্রগতির পথে আজ ইহারা নানাভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতেছে। পণ্ডিতজী সত্যই বলিয়াছেন, যদি এই সব প্রতিবন্ধকতা না ঘটিত তবে ভারতবর্ষ ইহার মধ্যেই শক্তি এবং সমৃদ্ধির পথে অনেকটা অগ্রসর হইত। কিন্তু স্বাধীনতার পথ কোথায়ও সুগম হয় না; বিঘ্ন বিপদের ভিতর দিয়াই সে পথে অগ্রসর হইতে হয়। পণ্ডিতজী জাতিকে উৎসাহিত করিয়া বলিয়াছেন,—"ভারতের অধিকাংশই হউক, বা তিন-চতুর্থাংশই হউক, একটি অংশকে আমরা স্বাধীন করিবই, তারপর অবশিষ্ট অংশের স্বাধীনতার ব্যবস্থার কথা ভাবিব।" পণ্ডিতজীর উক্তির তাৎপর্য এই যে, ভেদবাদীদের ষড়যন্ত্রে যদি ভারতের কোন অংশ পৃথক হইয়া যায় তবু উক্ত রাষ্ট্রের নির্যাতিত এবং নিপীড়িত জন-সমাজের কথা জাতীয়তাবাদী ভারতবর্ষ ভুলিয়া যাইবে না। স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ভারত অখণ্ড রাষ্ট্রীয়তার উদার আদর্শকে সম্প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিবে। সুতরাং ইংরেজ সরিয়া গেলেই ভেদবাদীরা তাঁহাদের স্বৈরাচার অবাধে চালাইবার অবসর পাইবেন এবং একটা লণ্ডভণ্ড অবস্থা সৃষ্টি করিয়া নিজেদের হিংস্র পিপাসা পূর্ণ করিবেন বলিয়া যে আশায় উদ্দীপ্ত হইয়াছেন, তাহার দৌড় বড় বেশী দূরে নয়। পণ্ডিত জওহরলাল স্পষ্ট ভাষায় ইহাদিগকে সমঝাইয়া দিয়াছেন যে, যুগোচিত কর্তব্যবোধে প্রণোদিত ভারত প্রগতি-বিরোধী দুষ্প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে অনলস উদ্যমে প্রবৃত্ত হইবে। পণ্ডিতজীর উক্তি অনুসারে ভারতবর্ষকে যাহারা বিচ্ছিন্ন এবং বিভক্ত করিতে চাহিতেছে প্রকৃতপক্ষে তাহারা বৃহত্তর স্বার্থের দিক হইতে জনসাধারণের শত্রুর ভূমিকাই গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু রক্তের আস্বাদ পাইলে বাঘের হিংস্রতা বাড়িয়াই যায়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ক্রমাগত প্রশ্রয় পাইয়া এইসব ভেদবাদী আজ উদ্দাম হইয়া পড়িয়াছে। ইংরেজ প্রভুর পাদপদ্ম ঘিরিয়া ইহারা কিছুকাল লেজ নাড়িতে চাহিবেই এবং যুক্তি বুদ্ধি বা উপদেশে ইহারা ইহাদের এই হিংস্র মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করিবে না। সুতরাং আজ আকস্মিকভাবে পণ্ডিতজীর সতর্কবাণীতে তাহাদের চৈতন্য সম্পাদন হইবে আমরা এমন আশা করি না। ভারতের সুমহান ত্যাগী সন্তানের এই বাণীতে জাতীয়তাবাদী ভারত অনুপ্রেরণা লাভ করিবে এবং নিজেদের কর্তব্য প্রতিপালনে অকুতোভয় সংকল্পশক্তির সহিত অগ্রসর হইবে, বর্তমানের সঙ্কট মুহূর্তে ইহাই আমাদের মনে আশার সঞ্চার করিতেছে।

সুরাবর্দীর মুখে শান্তির বাণী

বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মাঝে মাঝেই আমাদিগকে শান্তির বাণী শুনাইয়া থাকেন। সম্প্রতি তিনি আমাদিগকে কয়েক প্রস্থ এইরূপ শান্তির বাণী শুনাইয়াছেন। কলিকাতার যে সমস্ত হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণের উপর মারপিট, বোমা নিক্ষেপ, আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ, এসিড নিক্ষেপ, পথচারীর উপর ছুরিকাঘাত প্রভৃতি কার্য করিতেছে, তাহাদিগকে ঐসব কাজ বন্ধ করিবার জন্য মিঃ সুরাবর্দী সনির্বন্ধভাবে অনুরোধ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, সুরাবর্দী সাহেব পূর্বেও এইরূপ অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু দেখা যায়, তাঁহার অনুরোধে কোনই কাজ হয় না। বিশেষত, ইহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে যে বাঙলার যে সম্প্রদায়ের উপর মিঃ সুরাবর্দী নিজের প্রভাব আছে বলিয়া মনে করেন তাহারাও তাঁহার কথা গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করে না। নোয়াখালির ব্যাপক অরাজকতা এবং অশান্তিই ইহার প্রমাণ। ইহার কারণ কি? প্রকৃত কারণ এই যে মিঃ সুরাবর্দী মুখে যাহা বলেন তাহা কার্যে পরিণত করিবার আন্তরিকতা তাঁহার নাই। লীগের সাম্প্রদায়িকতামূলক নীতি অনুসারেই তাঁহাকে কাজ করিতে হয়। আলোচ্য বিবৃতিতেও দেখিতেছি, মিঃ সুরাবর্দী হিন্দু মুসলমানকে ভ্রাতৃভাবে চলিতে পরামর্শ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু লীগের বাস্তব স্বার্থ এই ভ্রাতৃভাবকে স্বীকার করিয়া লয় না। ভেদ বিদ্বেষের ভাবকে জিয়াইয়া রাখিয়াই লীগের দাবীর জোর বাড়াইতে হয়। লীগের নীতিগত এই সংকীর্ণতা লীগ-পরিচালিত মন্ত্রিমণ্ডলের শাসন-নীতিকে কলুষিত করিয়া ফেলিয়াছে। মিঃ সুরাবর্দী নিজের অন্তরকে প্রশ্ন করিলেই এই সত্য উপলব্ধি করিবেন। তিনি সেদিনও কলিকাতার অশান্তি সম্পর্কে আমাদিগকে এই বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন যে, যখনই কোন ঘটনা ঘটে, তখনই গভর্নমেণ্ট ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া থাকেন; সুতরাং জনসাধারণের উদ্বেগ বোধ করিবার কোন কারণ নাই। মিঃ সুরাবর্দীর এই উক্তি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, তাঁহার গভর্নমেণ্ট যদি সত্যই যথাযথভাবে অশান্তি দমনে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন, তবে শহরের বর্তমান অশান্তি অনেকদিন পূর্বেই উপশমিত হইত। মিঃ সুরাবর্দীর গভর্নমেণ্ট অশান্তি সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন ইহা সত্য, কিন্তু যেভাবে এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে, তাহাতে অশান্তির কারণ দূর হইতেছে না; পক্ষান্তরে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার দোষদুষ্ট বিচারবিমূঢ় বৈষম্যমূলক বিধানের ফলে জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্ক এবং বিক্ষোভের ভাবই বৃদ্ধি পাইতেছে। বলা বাহুল্য, এই সব

অশান্তি এবং অরাজকতা দমনে গবর্ণমেণ্টের সম্প্রদায়-বিশেষের কর্মচারীরাই বাঙলা গভর্নমেণ্টের প্রধান অবলম্বন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙলার প্রধান মন্ত্রী বস্তুত মুসলিম লীগ-ভুক্তদের অন্যতম নায়ক ব্যতীত অন্য কিছু নহেন। লীগের শাসনের ফলে লোকে নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারিয়াছে যে, সমগ্র বাঙলা দেশটাকে তিনি একটিমাত্র সম্প্রদায়ের ভোগোত্তরে পরিণত করিতে বদ্ধপরিকর। তাঁহার এই প্রক্রিয়া বিবিধ উপায়ে সাধিত হইতে চলিয়াছে। আইনসভার কর্তব্যাকর্তব্যজ্ঞানহীন পাশবিক সংখ্যাধিক্যের সহযোগে তিনি সম্প্রদায়বিশেষের জিঘাংসা বৃত্তি তুষ্ট করিবার উপযুক্ত আইন পাশ করাইয়া লইতেছেন। আবার সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে প্রশ্রয় দিয়া অপর সম্প্রদায়ের নিগ্রহের দায়িত্বও তিনি এড়াইতে পারেন না। বস্তুত মিঃ সুরাবর্দীর মনে সেজন্য কোনরূপ সঙ্কোচ আছে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। ইহার পরেও যখন তিনি ভ্রাতৃভাবের কথা বলেন, হিন্দু মুসলমানকে ভ্রাতার ন্যায় আচরণ করিতে উপদেশ দেন, তখন আমাদের মনে তাঁহার ধৃষ্টতা এবং ভণ্ডামিতে বিক্ষোভই সৃষ্ট হয়।

বাঙলায় লুঠের রাজত্ব—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের কংগ্রেসী দল অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নিকট বাঙলার লীগ মন্ত্রিসভার কার্যাবলীর উল্লেখ করিয়া সম্প্রতি একখানি স্মারকলিপি প্রেরণ করিয়াছেন। কংগ্রেস সদস্যগণ যে সকল অভিযোগ করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটি তথ্য হয় সরকারী নথিপত্র হইতে নয়তো অন্যান্য একান্ত নির্ভরযোগ্য সূত্রে সংগৃহীত হইয়াছে। বাঙলার আর্থিক অবস্থার বর্তমানে যে শোচনীয় দৈন্য দেখা দিয়াছে, স্মারকলিপিতে সুনির্দিষ্টভাবে তাহার কতকগুলি কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে; লীগ-শাসনে বাঙলা দেশে কয়েক বৎসর হইতে রীতিমত লুঠের রাজত্ব চলিতেছে, একথা সকলেই জানেন। স্মারকলিপির স্বাক্ষরকারীরা এই সত্যকে নির্মমভাবে উন্মুক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা অকাট্য প্রমাণ এবং যুক্তি প্রয়োগে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, মন্ত্রীরা প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই স্বজন প্রতিপালন ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থকে বড় করিয়া দেখিয়াছেন এবং যোগ্যতার সমাদর তাঁহাদের কাছে একটুও নাই। বাঙলা গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নৌকা-নির্মাণের খাতে ৩ কোটি টাকা লোকসান দেওয়ার বিচিত্র কাহিনী হইতে আরম্ভ করিয়া সরবরাহ বিভাগের অনেক কীর্তির কথাই এই স্মারকলিপিতে আছে। কোটি কোটি টাকা খরচ হইতেছে, অথচ কোথায় কি-কিভাবে খরচ হইল পরিষ্কারভাবে বুঝিবার উপায় নাই। এই বিষয়ে একাউণ্টেণ্ট-জেনারেল যে সকল গুরুতর অভিযোগ করিয়াছেন, তাহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। শিক্ষা বিভাগে সাম্প্রদায়িকতা সম্প্রসারিত করিবার জন্য বাঙলার বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডল কিরূপ অনাবশ্যকরূপে জনসাধারণের অর্থের অপব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এই বৎসরের বাজেটেই সে সত্য প্রকট। স্মারকলিপির স্বাক্ষরকারীরা কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন যে, বাঙলা গভর্নমেণ্টের বর্তমান নীতিগুলি সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁহারা যেন বাঙলা গভর্নমেণ্টকে কোন অর্থ সাহায্য না করেন। জনসাধারণের শোণিতসম অর্থের যাহাতে অপব্যয় না হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবার নৈতিক দায়িত্ব কংগ্রেসের রহিয়াছে, বাঙলার ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসী দল তাঁহাদের সে কর্তব্য প্রতিপালন করিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। কার্যত এ অবস্থায় বাঙলা গভর্নমেণ্টকে অর্থ সাহায্য করা দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া ছাড়া অন্য কিছু নয়। অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্ট এ বিষয়ে অবহিত হইবেন বলিয়াই আমরা আশা করি।

বাঙলায় হিটলারী শাসন

মিঃ সুরাবর্দী বাঙলার প্রধান মন্ত্রী। তিনি মুসলিম লীগের অন্যতম নেতা। মিঃ জিন্নার সঙ্গে তাঁহার সদাসর্বদা দহরম-মহরম চলে। বাঙলা দেশে পাকিস্থানী মহিমা পুরাদস্তুর প্রকট করিবার জন্য তাঁহার আগ্রহের অন্ত নাই। বাঙলার সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থকে পিষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে সুরাবর্দী সাহেবের উৎকট উদ্যম হিটলারী জবরদস্তিকেও ছাড়াইয়া চলিয়াছে। পুলিশের তৎপরতা সম্পর্কিত সংবাদ প্রকাশের উপর সম্প্রতি নূতন দফায় কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ মিঃ সুরাবর্দীর এই স্বৈরাচারিতার পূর্ণ স্বরূপ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। বাঙলার সুস্থ এবং সবল জনমতের অভিব্যক্তিকে মিঃ সুরাবর্দী চাপিয়া মারিতে দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়াছেন। তিনি তাঁহার সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট শাসননীতি সম্পর্কিত অপকীর্তি প্রকাশ পায়, ইহা সহ্য করিতে পারেন না; কারণ তাহা তাঁহার কিংবা লীগ দলের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে অনুকূল নহে; সুতরাং সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে প্রয়োজন। সুরাবর্দী সাহেব সে ব্যবস্থা অবশ্য পূর্ব হইতেই পাকা করিয়াছিলেন; কিন্তু সম্প্রতি তাঁহার লীগ-শাসনের বিরুদ্ধে বাঙলার প্রগতিবাদী জনসমাজে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দিতেছে। এখন মিঃ সুরাবর্দী তাঁহার স্বৈরাচারের শেষ অস্ত্র প্রয়োগে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি এই হুকুমনামা প্রচার করিয়াছেন যে, সরকারী পরীক্ষকদের নিকট হইতে পাশ করাইয়া না লইয়া কোন সংবাদপত্রে পুলিশের কার্য সম্পর্কে সমালোচনামূলক কোন সংবাদ বা মন্তব্য প্রকাশিত হইতে পারিবে না। মিঃ সুরাবর্দীর ঔদ্ধত্যের সীমা নাই। বাঙলা দেশের সাংবাদিকগণ এবং সম্পাদকদের মাথায় কোন রকম বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, তিনি তাহা মানে করেন না। ইঁহারা দেশের স্বার্থ কিছুই বুঝেন না; বাঙলা দেশের শান্তি কিসে রক্ষিত হয় কিংবা প্রতিষ্ঠিত থাকে, সুরাবর্দীর মতে সে জ্ঞান ইঁহাদের নাই। সব জ্ঞান ও বিদ্যা মিঃ সুরাবর্দী এবং তাঁহার অনুগতদের কুটচক্রের মধ্যেই নিবদ্ধ। সুতরাং বাঙলা দেশের সম্পাদকদিগকে এতদিন পরে মিঃ সুরাবর্দীর মাস্টারী মানিয়া লইতে হইবে। যাঁহাদের সুদীর্ঘ সংবাদ-সাধনার প্রভাবে বাঙলা দেশের রাজনীতিক জীবনের বর্তমান অগ্রগতি অনেকখানি সম্ভব হইয়াছে বলা চলে, বাঙলা দেশের স্বার্থ এবং কল্যাণ সম্পর্কে তাঁহাদিগকে এতদিন পরে সুরাবর্দী সাহেবের সাম্প্রদায়িকতান্ধ অপদার্থ এবং অযোগ্য চেলা-চামুণ্ডাদের কাছে শিক্ষানবিশী করিতে হইবে। সরকারী পরীক্ষকেরা পুলিশের সঙ্গত সমালোচনা প্রকাশে বাধা দিবেন না, সুরাবর্দী সাহেব মুরুব্বিয়ানার সুরে আমাদিগকে একথা জানাইয়া দিয়াছেন। এই কৃপার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ; কিন্তু এতদ্দ্বারা বাঙলার সাংবাদিক এবং সম্পাদকদিগকে মিঃ সুরাবর্দী সাক্ষাৎ-সম্পর্কে অবমাননা করিয়াছেন বলিয়াই আমরা মনে করি। কিন্তু তাঁহার বিবেকে কিছুই বাধে না। প্রধান মন্ত্রিগিরির পদগত স্বার্থগৃধ্নুতা এবং পাকিস্থানী মনোবৃত্তিতে উত্তপ্ত অতি জঘন্য হীন সাম্প্রদায়িকতা এই দুইয়ে জড়িতভাবে সুরাবর্দীর নীতিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। মিঃ সুরাবর্দী পুলিশ বাহিনীকে চাঙ্গা রাখিবার দায়ে পড়িয়াছেন। বর্তমানে এ-দায় মিঃ সুরাবর্দীর কাছে যে বড় দায়, তাঁহার এই যুক্তির তাৎপর্য আমরাও উপলব্ধি করি। কিন্তু সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করিয়া তিনি তাঁহার মতলব হাসিল করিতে পারিবেন না, আমরা তাঁহাকে সোজা এই কথা বলিয়া দিতেছি। বাঙলার সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে তিনি দাবাইয়া রাখিয়া যাহা খুসী চালাইয়া যাইবেন মনে করিয়াছেন। ইহার ফলে বাঙলা দেশে পাকিস্থানী উদ্যম খতম হইয়া যাইবে তিনি একথা যেন স্মরণ রাখেন। বাঙালী এখনও মরে নাই। লীগ-শাসনের দশ বৎসরব্যাপী কুশাসনের পরও জাগ্রত রাজনীতিক জীবনের চেতনা এখনও যে বাঙলার বুকে আছে, বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদে গত ২৩শে এপ্রিল কলিকাতার সর্বজনীন হরতালের বিরাট সফলতাই তাহা ফলে সমুদ্ভূত বর্বর দৌরাত্ম্যের প্রমাণিত হইয়াছে।

শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু কর্তৃক অঙ্কিত স্কেচ

চকিত হরিণী

মধ্যাহ্নে

[শ্রীগোলকবিহারী দাসের সৌজন্যে]
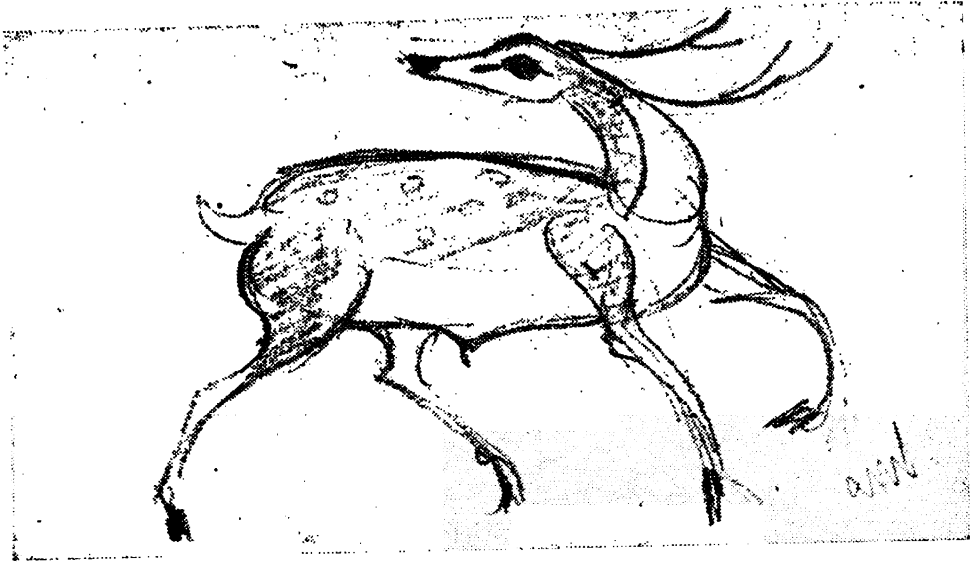
সুরাবর্দী সাহেব তাঁহার এক নির্দেশে বলিয়াছেন—Calcutta must keep its head cool.—খুড়ো তাঁহার নির্দেশে বলিতেছেন—“মাথা ঠাণ্ডা রাখিবার অমোঘ ঔষধ ‘মধ্যম নারায়ণ’ কিন্তু ঔষধটা নারায়ণ নাম কলঙ্কিত হওয়ায় কেহ কেহ তাহা ব্যবহার করিতে চাহিতেছেন না; সুতরাং তাঁহাদের কাছে এই মাথা ঠাণ্ডা রাখার নির্দেশ “মাথা আর মুণ্ডু” বলিয়াই গ্রাহ্য হইবে।

*   *   *   *

আন্ত এশিয়া সম্মেলনে রুশিয়ার যে সব প্রতিনিধি যোগদান করিয়াছিলেন মিঃ সুরাবর্দী তাঁহাদিগকে চা-পানে আপ্যায়িত করেন। এই চা-সম্মেলনে রুশিয়ার উন্নতির কথা উল্লেখ করিয়া সুরাবর্দী সাহেব বলিয়াছেন, “The progress would not have been possible but for the initial toil and labour which they put in.” কিন্তু দেশটা রুশিয়া বলিয়াই শুধু toil আর labour দিয়া উন্নতি সম্ভব হইয়াছে, আমাদের দেশের মত বেখাপ্পা, বেয়াড়া দেশে এক “লড়কে লেঙ্গে” নীতি ছাড়া কোন উন্নতিই সম্ভব নয়!

*   *   *   *

মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন—“দেশের শাসনতন্ত্র পরিচালনায় সমস্ত সমাজ হইতে উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়োগ করিলে India will be a unique land where there will be no sorrow nor any sigh”. খুড়ো বলিলেন—মহাত্মাজী সমস্তই ভাবিলেন কিন্তু উল্লিখিত পরিস্থিতিতে Sorrows of Satan-এর কথা ভাবিতে পারিলেন না!

*   *   *   *

সহযোগী ‘অমৃতবাজার’ দেশের চারিদিকে সাম্প্রদায়িক তাণ্ডবের বীভৎস চিত্র অঙ্কন করিয়া প্রশ্ন করিয়াছেন—

“Those are the “hands” but whose is the ‘voice”?—খুড়ো বলিলেন—“উত্তর অতি সহজ,—His master's voice!”

*   *   *   *

হবিগঞ্জের এক সংবাদে প্রকাশ যে, সেখানে একটি টিউবওয়েল হইতে নাকি জলের বদলে শুধু আগুন বাহির হইয়া আসিতেছে। অতঃপর ধরণী দ্বিধা হও বলিয়া পাতালে

প্রবেশ করিয়াও স্বস্তি নাই—সেখানেও arson!

*   *   *   *

ভারত এতদিন World's Swimming Champianship প্রতিযোগিতায় যোগদানের অধিকার অর্জন করে নাই। শুনিলাম এ সম্বন্ধে কিছু একটা ব্যবস্থা করিয়া দেওয়ার জন্য নাকি পণ্ডিত জওহরলালকে

অনুরোধ করা হইয়াছে এবং পণ্ডিতজী কিছু করিবেন বলিয়া নাকি ভরসাও দিয়াছেন। আমরাও দেশব্যাপী প্লাবনে তাঁহার মুখের দিকেই চাহিয়া আছি, আর বলিতেছি—“কত-কাল পরে, বল ভারত রে, দুখ সাগর সাঁতারি পার হবে!”

*   *   *   *

আজ কতক দিন হইল Sun Spot নিয়া কলিকাতায় খুব হৈ চৈ চলিতেছে। কেহ কেহ নাকি ঐ Spot-এর মধ্যে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের পতাকা আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন সুতরাং অতঃপর কতক দিনের মধ্যে সূর্য-স্থান নিয়া ভাগাভাগির দাবী ওঠাও অসম্ভব নয়—বেচারী সূর্যমুখী!

*   *   *   *

দিল্লীতে কয়দিন ঘোল পাওয়া যাইতেছে না—জানাইতেছেন হিন্দুস্থান টাইমস। খুড়ো বলিলেন—“এই ঘোল কাহারা খাইতেছেন সহযোগী সেই সংবাদটি জানাইলে ভাল হইত!”

*   *   *   *

মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নেতাদের সঙ্গে দেখা করার পর লর্ড মাউণ্টব্যাটেন প্রাদেশিক লাট সাহেবদের সঙ্গে দেখা করিয়াছেন। “এইবারে যদি লাটে উঠার সংবাদ পাওয়া যায়!”—বলেন বিশু খুড়ো।

*   *   *   *

বিলাতে তামাকের উপর আমদানী শুল্ক ধার্য করা হইয়াছে। “১৯৪৮ সালে যাঁরা দেশে ফিরিয়া যাইবেন তাঁহাদের “কল্কে” বন্ধের জন্যই কি এই ফিকির?—নিঃশেষিত নিভিটায় টান দিয়া বলিলেন—বিশু খুড়ো।

*   *   *   *

রূপার টাকার বদলে শীঘ্রই নিকেলের টাকার নাকি প্রবর্তন করা হইবে। আমাদের কাছে টাকা মাটি আর মাটি টাকা—“সুতরাং” খুড়ো কবিতায় বলিলেন—“হে নিকেল, তুমি মোরে কি দেখাও ভয়!”

*   *   *   *

এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিঃ হেনরি ওয়ালেস বলিয়াছেন,—আবার যদি যুদ্ধ বাধে, তবে পৃথিবীর খরচ হইবে এক ট্রিলিয়ন ডলার। খরচটা ঠিক কত হইবে তাহা যাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহাদের অবগতির জন্য জানাইতেছি—ট্রিলিয়ন ডলার মানে ১০০০,000,000,000,000,000 ডলার; ইহাকে তিন দিয়া গুণ করিলে (একটু ভুল অবশ্য

থাকিয়া গেল, তাহাতে কিছু যায় আসে না) যে গুণফল হইবে তত টাকা। পাঠক এইবার নিশ্চয়ই বুঝিলেন এবং এই কথাও হয়ত বুঝিলেন যে গত দুই যুদ্ধের পর পৃথিবী বেশ সেয়ানা হইয়াছে। মাত্র এক ট্রিলিয়ন খরচ করিয়া সস্তায় কিস্তি মাৎ করার তালে আছে!

বাঙ্গালীর নববর্ষ উৎসব

নয়াদিল্লী কালীবাড়ীতে বাঙালীদের নববর্ষোৎসবে
পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও শ্রীযুক্ত জগজীবন রাম

নিখিল বঙ্গ নববর্ষ উৎসব সমিতির বরাহনগর কেন্দ্রের অনুষ্ঠান

বরাহনগর নববর্ষ উৎসবে বালিকাদের সম্মিলিত ব্যায়ামের দৃশ্য

(৫)

সন্ধ্যাবেলা শশাঙ্ক হর্ সেখের বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। হর্ সেখ শানির একজন প্রধান প্রজা। দশানের বিপদে াপদে সে সর্বদাই জমিদারের পার্শ্বে গিয়া াঁড়ায়। তাহার অবস্থা বেশ ভালো। তাহার গোলাভরা ধান, গোয়াল-ভরা গরু, কৃষাণ ও াকর-বাকরে অনেকগুলি লোক তাহার বাড়িতে, ক্ষিণপাড়ার অনেকটা জুড়িয়া তাহার বাড়ি-ঘর। রু এখন বৃদ্ধ হইয়াছে। যে-পরিমাণে তাহার াকাকড়ি, তাহারই বিপরীত পরিমাণে মুখে াহার দন্তের অভাব। দাঁত থাকিবার সুবিধা সর্বজনবিদিত, কিন্তু না থাকিবার সুবিধাও অল্প নহে। দন্তপঙ্‌ক্তি মানুষের হাসির পক্ষে একটা বাধা। প্রাণখোলা হাসি দাঁতের বাঁধে াধাগ্রস্ত হয়, হরুর দাঁত না থাকায় সমস্তটা হাসি অবাধে বাহির হইতে পারে। শিশু ও বৃদ্ধের হাসি, কান্না প্রধান অস্ত্র; দাঁত না থাকায় এই অস্ত্র নির্বাধে আত্মপ্রকাশ করে, তাহা ছাড়া হরুর বাম গালে, চোখের ঠিক নীচেই মস্ত একটা আঁচিল। যখন সে হাসিত, ওই আঁচিলটা তালে তালে হাসির তাল রক্ষা করিত। আর যখন সে কাঁদিত, অশ্রুস্রোত অবাধে না পড়িয়া আঁচিলে বাধা পাইয়া দ্বিধাভক্ত হইয়া ঝরিত। হরু বলিত, হিন্দুস্থানে থাকি, তাই আমার চোখে গঙ্গা-যমুনা ঝরে। আবার যখন সে রাত্রিবেলা খাইতে বসিত, কেরোসিনের ডিবের আলোয় আঁচিলের ছায়াটা গিয়া তাহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া সুড়সুড়ি দিত। দুপুর রোদে সে নড়িলে চড়িলে আঁচিলের ছায়াটা ঘড়ির কাঁটার মতো তাহার গালের উপর ঘুরিত। হরু বলিত, আল্লা ঘড়িসুদ্ধ হরু সেখকে জন্ম দিয়েছেন, তিনি জানতেন কিনা হরু গাঁয়ের প্রধান হবে। শ্রোতারা অবিশ্বাসের ভাব প্রদর্শন করিলে সে বলিত, অবিশ্বাস করছ? আচ্ছা বলো, মুসলমানের আল্লা, হিন্দুর হরি সর্বজ্ঞ কিনা? শ্রোতারা অস্বীকার করিতে পারিত না। হরুর দিলখোলা হাসি দন্তহীন ওষ্ঠাধর বাহিয়া অবাধে নির্গলিত হইয়া তাহার দার্শনিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়া দিত।

আমরা এমন কথা বলিতেছি না যে, হরুর চরিত্রে কোন দোষত্রুটি ছিল না। মোটেই না। তবে স্বীকার না করিয়া পারিতেছি না যে, হরুর চরিত্রে ছোটখাটো দোষত্রুটি থাকিলেও একটি মহৎ গুণ ছিল, সেটি তাহার একটি নিয়মচর্যা। সন্ধ্যাবেলা সে বৈঠকখানার দাওয়ায় বসিয়া গাঁজার কল্কেটি ধরাইবেই। এই নিয়মের অনাথা হইবার উপায় ছিল না। পৃথিবী রসাতলেই যাক, আর আকাশ ভাঙিয়াই পড়ুক, কেহ কখনো ইহার অনাথা হইতে দেখে নাই। কেবল একটিবার মাত্র ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল, কিন্তু পন্ডিতেরা বলেন, নিয়মের ব্যতিক্রম প্রকারান্তরে নিয়মের অমোঘতারই প্রমাণ।

সে অনেক দিন আগের কথা। নিয়মিত সময়ে হরু কল্কেটি ধরাইতে যাইবে এমন সময়ে খবর আসিল যে, জোড়াদীঘির বাজারে আগুন লাগিয়াছে, অমনি সে কল্কে রাখিয়া বাজারের দিকে ছুটিল। বাজারে লোক কম জড়ো হয় নাই, কিন্তু কিছুই রক্ষা পাইল না। কেবল মৌতাতিদের ঐক্যবদ্ধ শৃঙ্খলায় এবং প্রাণপণ-করা দক্ষতায় মদের ভাটি ও আবগারির দোকানখানি রক্ষা পাইল। এই ঘটনা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। সাধারণতঃ লোকের ধারণা এই যে, মৌতাতিগণ অকর্মণ্য ও অপদার্থ। কিন্তু জোড়াদীঘির বাজারের সেই অগ্নিকান্ড নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়া দিয়াছে, উপযুক্ত কারণ উপস্থিত হইলে নেশারুগণ যে একতা ও কর্ম-কৌশল দেখাইতে পারে, তাহা সর্বসাধারণের অনুকরণের স্থল। তবে যে সাধারণতঃ তাহারা নিষ্ক্রিয়—তার অর্থ উপযুক্ত কারণ সদাসর্বদা সুলভ নহে। তজ্জন্য মৌতাতিগণকে দোষী করা চলে না।

সচরাচর মাতাল, গাঁজিল ও অহিফেনসেবি-গণ পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। গাঁজিলগণ মাতালকে ভয় করে। আর অহিফেনসেবীরা দুইজনেরই ভয়ে অস্থির। কিন্তু সেদিন তাহারা চিরদিনের বৈরী ও ভীতি বিস্মৃত হইয়া শৃঙ্খলাচালিত সৈন্যবাহিনীর মতো সেই জতুগৃহে প্রবেশ করিল এবং জোড়াদীঘির সকলের সপ্রশংস বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখ দিয়া মদের পিপে গাঁজার থলে এবং আফিমের বাক্স টানিয়া লইয়া বাহির হইয়া আসিল। সকলে বলাবলি করিতে লাগিল, ওরাও মানুষ এবং অবশেষে নিজেদের নিষ্ক্রিয়তায় আত্মধিক্কার করিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইল—ওরাই মানুষ। সকলে এই ধারণা লইয়া ফিরিয়া আসিল যে, নেশা ছাড়া মানুষে কখনো কোন মহৎ কর্ম করে নাই, করিতে পারে না, করা সম্ভব নয়। তাহাদের বিশ্বাস জন্মিয়া গেল, জগতে যেখানে যত মহাপুরুষ ছিলেন, গোপনে গোপনে তাঁহারা নেশা করিতেন। অতঃপর জোড়াদীঘির নেশারুর সংখ্যা বাড়িয়া-ছিল কিনা জানি না, কিন্তু না বাড়িলে বলিতে হইবে তাহাদের বিশ্বাসে ও আচরণে ঐক্য নাই।

তারপরে মৌতাতিগণ নেশার বস্তু লইয়া গিয়া নদীর ধারে একান্তে বসিল এবং নেশার চর্চায় আত্মনিয়োগ করিল। পেটে মদ ও আফিম পড়িবামাত্র এবং গাঁজার ধোঁয়া মগজে প্রবেশ করিবামাত্র পট পরিবর্তন ঘটিয়া গেল।

মাতালদের ধারণা হইল—তাহারা বিহঙ্গ। কে একজন চীৎকার করিয়া উঠিল—কোন্ শালা বলে আমরা পা দিয়া হাঁটি। বেটারা কি চোখ দিয়া দেখে না—এই দেখো কেমন আমরা উড়িতেছি।

পার্শ্ববর্তী অহিফেনসেবীদের তখন ধারণা জন্মিয়াছে যে, তাহারা কুমীর ছাড়া আর কিছু নয়, তাই তাহারা কুমীরের মতো বুক দিয়া হাঁটিতে চেষ্টা করিতেছে। একজন মাতাল একজন অহিফেনসেবীকে বলিল—আয় বেটা আমার সঙ্গে, তোদের উড়তে শেখাই। কিন্তু অহিফেনব্রতীরা তাহাদের নবলব্ধ চাল ছাড়িতে রাজী হইল না, তাহাদের পিঠে মাতালদের কিল চড় পড়িতে লাগিল। অহিফেনসেবীরা বিরক্ত হইয়া ভাবিতে লাগিল - মাছগুলো বড়ই বেয়াদব, অযথা এমন করিয়া ঠোকরায় কেন?

অদূরে গাঁজার ধোঁয়া তখন গাঁজিলদের মগজে চড়িয়া বিশ্বসংসারকে নস্যাৎ করিয়া দিয়াছে। তাহারা প্রত্যেকেই তখন সংসার-আকাশের এক একজন পরমহংস। বলা বাহুল্য এই দলের মধ্যে অন্যতম হরু সেখ। সে বলিয়া উঠিল—যাঃ শালা! এই আমি সংসার ছেড়ে বনে চল্লাম। এই বলিয়া সোজা সে বাড়িতে চলিয়া আসিয়া কাঁথা কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল।

এ হেন হরু সেখের বাড়িতে শশাঙ্ক প্রবেশ

বুঝলে বৌ-ঠাকরুণ, আমি আবার বোকা-হাবা, নিলাম শাড়িখানা। তারপরে বিনোদিনী শাড়ি-খানা দেখে শুধোলো—এ শাড়ি কোথায় পেলিরে বাদলি। আমি সব বললাম। শুনেই সে মুচকে হাসলো। সেই হাসিতে আমার কেমন সন্দেহ হল। তারপর থেকে শশাঙ্ক ঠাকুরকে আমি এড়িয়ে চলতে লাগলাম। কিন্তু আমি এড়িয়ে চললে কি হবে—বিনোদিনী যখন জানলো—গাঁয়ের সকলেই জানলো। ওই ওর স্বভাব, কোন কথা ওর পেটে থাকে না। আমার বড় রাগ হল ঠাকুরের উপরে। সেদিন ক্ষীরপুরের মেলা, আমাদের পাড়ার সব্বাই গিয়েছে মেলা দেখতে। এমন সময়ে ঠাকুর দুটো আম হাতে করে আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। বলল—বাদলি এই নে আম, নুন লঙ্কা দিয়ে খাস। তারপরে দাওয়ায় বসে বলল—একটু তামাক খাওয়া বাদলি। আমি বললাম—এখানে কেন ঠাকুর ভিতরে গিয়ে বসো। ঠাকুর যেমনি ভিতরে গিয়েছে, অমনি আমি ঝনাৎ করে ঘরের শিকল তুলে দিয়ে দৌড়, ভাবলাম মনে মনে থাকো ঠাকুর কিছুক্ষণ বন্ধ হয়ে।

মুক্তামালা শুধাইল হাঁরে তোর তো সাহস কম নয়। তারপরে কি হল?

বাদলি বলিল—তখন প্রায় সন্ধ্যা হয় হয় ভাবলাম এবার শিকল খুলে দিই গিয়ে—ঠাকুরের নিশ্চয় এতক্ষণ খুব শিক্ষা হয়েছে। শিকল খুলে ঘরে ঢুকে দেখি, ওমা কেউ নেই। এখানে দেখি, সেখানে দেখি, তক্তপোষের তলায় দেখি, কোথাও কেউ নেই—সব হাওয়া হয়ে গিয়েছে। গালে হাত দিয়ে ভাবি কি হল? এমন সময়ে উপরে নজর পড়লো—চালের খড় যেন একটু আলগা। ভালো করে চেয়ে দেখি যা ভেবেছি ঠিক তাই। চালের খড় সরিয়ে ঠাকুর পালিয়েছে। বুঝলে বৌ-ঠাকরুণ, আমি জব্দ করবো ভেবেছিলাম, আমি নিজেই জব্দ হয়ে গেলাম।

মুক্তামালা শুধায়—তোর লজ্জা করলো না বাদলি?

বাদলি বলে—লজ্জা করবারই তো কথা। কিন্তু সবাই এ নিয়ে এতো হাসাহাসি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগলো যে সকলের উপর আমার রাগ হল। মনে মনে ঠিক করলাম যে, আমি লজ্জা না পেলেই ওরা জব্দ হবে। তাই জোর করে আমিও হাসতে শুরু করলাম, ছয়কে নয় করে বানিয়ে সকলকে শোনাতে লাগলাম। বৌ-ঠাকরুণ, যার ভাঙা ঘর তার কি বৃষ্টির জলকে ভয় করলে চলে? ফুটো চাল দিয়ে যখন জল পড়ে—তখন ভাবতে হয় যে ওই ফুটো দিয়ে চাঁদের আলোও তো আসে।

মুক্তামালার ভারি বিস্ময় বোধ হয় এই মেয়েটির কথায় ও ব্যবহারে। যাতে আর দশজন লজ্জিত হইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইত তাহার প্রতি মেয়েটির কি সহজ ভাব। বিষয়টা যে লজ্জার তাহা সে জানে, কিন্তু এই অসহায় বালিকার লজ্জা পাইবার অবকাশ কোথায়? কেহ তাহাকে কিছুমাত্র সাহায্য করিবে না, রক্ষা করিতে অগ্রসর হইবে না, বরঞ্চ জব্দ করিবার সুযোগ সন্ধান করিতেছে—এরকম ক্ষেত্রে লজ্জার ভারে সে যে ভাঙিয়া পড়ে নাই, ইহাতে তাহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। যে-স্রোত এই বালিকাকে বানচাল করিয়া দিতে পারিত, তাহাকে নিজের অনুকূলে করিয়া লইয়া সে কেমন কৌশলে নৌকা ভাসাইয়া দিয়াছে। এই মেয়েটির মধ্যে কিছু অসাধারণত্ব আছে বলিয়াই মুক্তামালার নির্জন পল্লীবাসে সে তাহার প্রধান আশ্রয় হইয়া উঠিল।

নবীননারায়ণের সাহচর্য্য মুক্তামালা অধিকক্ষণ পাইত না। একে তো পল্লীগ্রামের সমাজে স্বামী-স্ত্রীর অবাধ মেলামেশার সুযোগ বিরল, তার উপরে নবীন তাহার স্বভাববিরুদ্ধ কর্মস্রোতের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছে। সকালবেলা সে কাছারীতে গিয়া বসিত, কর্মচারী ও প্রজাদের সঙ্গে কথাবার্তায়, মহকুমা ও সদর হইতে আগত উকীল মোক্তারদের সহিত পরামর্শে অনেকটা সময় তাহার যায়। দুপুর বেলা খানিকটা বিশ্রামের পরে আবার লোক-জনের সঙ্গে দেখা শুনায়, শলাপরামর্শে সন্ধ্যা অতিবাহিত হইয়া যাইত। সারাদিনের পরিশ্রমে ও বিরক্তিতে তাহার নিদ্রা আসিতে বিলম্ব হইত না। কাজেই সারা দীর্ঘদিন মুক্তামালা একাকী। তাহার প্রধান সংগী বাদলি। আর ওই পুরাতন বৃদ্ধা ঝি জগার মা। এই দাসীটি বহুকাল হইল ছ'আনির বাড়িতে আছে। নবীনকে শৈশবে সে মানুষ করিয়াছে। দাসী ও গৃহকর্ত্রীর মাঝামাঝি স্তরে সে বিরাজমান। ছ'আনির বাড়ির, ছ'আনির জমিদারদের অনেক পুরাতন কাহিনী তাহার পরিজ্ঞাত। অবসর সময়ে মুক্তামালা তাহার কাছে শ্বশুরকুলের প্রাচীন কাহিনী শুনিত। সময় কাটিত। তাহা ছাড়া এইসব অদৃশ্যসূত্রের সঙ্গে নিজের জীবনকে গ্রথিত করিয়া ছ'আনির অতীত ইতিহাসের অন্তর্গত হইবার চেষ্টায় সে এক প্রকার আনন্দ, একপ্রকার গৌরব অনুভব করিত। মেয়েরা পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের দুকূলে সংযত নদী। কুলপ্লাবিনীগণ শিল্পীর কাম্য হইতে পারে, সংসারের তাহারা কেহ নয়।

(ক্রমশ)

. তাই অতিরিক্ত ক্লান্ত
ন্স থেকে ফিরে এসে
রকার মনে হোল।
রী সুন্দর হয়েছে,
মনোজ্ঞ। আমি
া।
য়ে বিনয়

সেয়ানে সেয়ানে

লিওনার্ড মেরিক

রবিসন এবং কুইন কোয়ার্ট দুজনেই প্রণয়প্রার্থী ম্যাডময়জেল ব্রুয়েটের। ডময়জেল ব্রুয়েট হাস্যলাস্যময়ী তরুণী, দর্শনা অভিনেত্রী আর তাঁরা দুজন রঙ্গপ্রিয় সারসবিলাসী মঞ্চশিল্পী এবং তিনজনই থিয়েটার সুপ্রিম' বলে প্যারিসের একটি রঙ্গায়ের পাদপ্রদীপ অলংকৃত করেন। রবিসনের স্যকৌতুক এতই জনপ্রিয় যে মঞ্চে অবতরণ রবামাত্রই এবং অভিনেয় চরিত্রের কোনো কথা লার আগেই প্রেক্ষাগৃহ হাস্যমুখর হয়ে ওঠে। ইন কোয়ার্টও সমানভাবে সম্বর্ধিত এবং র্শকগণের অত্যন্ত অভিপ্রেত অভিনেতা. ঞ্চে তাঁর নির্বাক অভিবাদনও সমাগত নসাধারণকে কলহাস্যে মাতিয়ে তোলে।

পেশাদারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাদ দিলে তাঁরা জন অতি ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ বন্ধু মাণিকজোড়ও বলা চলে। অপরদিকে এই দুই বন্ধু কই শিল্পী তরুণীর প্রণয়প্রার্থী এবং পরিণয়প্রার্থীও বটে! তরুণী অভিনেত্রীও জনের প্রতিই সমান কৃপাদৃষ্টি এবং অনুরাগ ষ্টি করে চলেন. মান অভিমান. মেঘ ও রৌদ্র. লনা ও আদরের পালা নিত্যই চলে দুজনারই ঙ্গে। তিনি সমানভাবেই প্রশ্রয় দেন প্রেমার্ত অনুভূতি নিবেদন করেন দুজনকেই। শেষ পর্যন্ত কিন্তু দুজনাই অস্থির হয়ে ওঠেন াঞ্ছিতা দয়িতার প্রাণের অন্তরতম কথাটি—শেষ উত্তরটি—স্বয়ংবর নির্বাচনের আশা ও আশংকাভরা বার্তাটি জানার ব্যাকুল আগ্রহে। মিনতিমাখা তাঁদের ব্যগ্র কৌতূহলে তরুণীরও ধৈর্য হারায়। চুপি চুপি পৃথকভাবে দুজনকে আপন নিকুঞ্জে ডেকে মধুর সোহাগ বচনে তিনি জানিয়ে দেন তাঁর মনের গোপন কথাটি দুজনের মধ্যে যিনি অধিক জনপ্রিয় এবং জনসমাদৃত অভিনেতার গৌরব অর্জন করবেন লীলাময়ী তরুণীর প্রিয়তমের পদে অভিষিক্ত হবার, তাঁর দেওয়া বরমাল্য পাওয়ার দুর্লভ গর্ব হবে তাঁরই।

'বীর হস্তে বরমাল্য লব একদিন'—প্রাণভরা এ সাধ থাকলে কি হবে, একথা শুনে ত দুজনেরই চক্ষুস্থির। দু'জনের অভিনয়-প্রতিভার উৎকর্ষ তুলনা করে অভিমত দেবে কে? মঞ্চে এমন অন্য কোনো অভিনেতা অভিনেত্রী নেই, এমন কোনো সমালোচক বা সম্পাদক নেই যিনি এই দুরূহ প্রতিযোগিতার কোনো মীমাংসা করে দিতে পারেন। কেবল ব্রুয়েটের মত খেয়ালী তরুণীই এমনি ধারা অদ্ভুত প্রসঙ্গ তুলতে পারে। অসহায় ভাবে আমতা আমতা করেন রবিসনঃ কিন্তু এ প্রশ্নের কি ক'রে সমাধান হবে, সুজেন? কার মতামতকে তুমি গ্রহণ করবে?,

—সত্যিই ত, এ ব্যাপারে চূড়ান্ত মীমাংসা হবে কি ভাবে? বিস্ময়াকুল কুইনকোয়ার্ট সায় দেন, এ বিচারের ভার দেবে কাকে?

—কেন, প্যারিসই বিচার ক'রে মীমাংসা করে দেবে, অম্লান বদনে ঘাড় দুলিয়ে জবাব দেন চিত্তহারিণী সুজেন ব্রুয়েট. আমাদের ব্রত হোলো জনগণের সেবা করা, তাঁদের আনন্দের খোরাক জোগানো, অতএব দর্শক সম্প্রদায়ের অভিমতই চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করবো।

লাবণ্যময়ী মঞ্চাভিনেত্রীর এ আর এক বিলাস, রূপসীর এ এক অভিনব কৌশল রূপ-দগ্ধ রূপমুগ্ধ প্রার্থীকে এড়িয়ে যাবার। নইলে এমন তাজ্জব ফন্দীও মাথায় আসে কারো। ভাবেন আশান্বিত দুজনাই। কিন্তু ভেবে কূল-কিনারা পাননা। দর্শক সম্প্রদায় দুজনকেই সমান সম্বর্ধনা জানিয়ে থাকেন, দুজনের প্রতিভাকেই স্বীকার করেন। কাজেই প্যারিসের ওপর বিচারের ভার ছেড়ে দেওয়াও যা' ব্যাপারটাকে মুলতুবী রাখাও তাই। কোনো উপায় খুঁজে পাননা কেউ।

সেদিন দুই বন্ধুতে অতি পরিচিত কাফেতে বসে। নতুন নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার দরুণ শীঘ্রই বেশ কিছুদিন অভিনয় বন্ধ থাকবে।—ব্যাপারটা নিজেদের মধ্যেই আমরা মিটিয়ে ফেলি. সুরু করলেন রবিসন. নাও, ধরো একটা সিগারেট। তাহ'লে সমস্তটা মিলিয়ে দাঁড়াচ্ছে এই, তুমি অভিনেতা অতএব তুমি নিজেকে আমার চেয়ে অনেক বেশি অভিনয় প্রতিভাবান বলে মনে করো। আবার আমিও তাই। এই গেল আমাদের শিল্পী জীবনের কথা। কিন্তু অন্যদিকে দেখো, আমরা এই দুনিয়ার মানুষ ত বটে এবং সেই কারণেই এটা আমাদের সহজেই বুঝে দেখা উচিত যে, এই ভাবে পাল্লা দিতে দিতে আর লোকের কাছে হাসি এবং কৌতুকের পাত্র হয়ে হয়ে একদিন জীবনের রিক্ত প্রান্তে গিয়ে পেঁছোবো, তবু সেদিনও পর্যন্ত আমাদের একজনের ওপর আর একজনের টেক্কা দেওয়ার চূড়ান্ত ফলাফল এমনি অমীমাংসিতই থেকে যাবে।

হ্যাঁ, ঠিকই ত—। চিন্তাকুল কুইন কোয়ার্টও এ বিষয়ে একমত।

—কিন্তু, একটা মুস্কিল হচ্ছে এই যে, রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষ কিছুতেই আমাদের নিজের উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠার এমনি ধারা কোনো সুযোগ দিতে কিছুতেই রাজী হবেন না। তাই নয় কি?

এবারও কুইন কোয়ার্ট সায় দিয়ে বলেন, আচ্ছা, তা' হ'লে আর কি উপায় তুমি বাৎলাতে পারো?

—কেন? মঞ্চের ওপর এবং আমাদের নির্দিষ্ট রঙ্গালয়ের ভিতর সে সুযোগ আমরা নাই বা পেলাম, আমরা তার বাইরেই সে সুবিধে খুঁজে নেবার চেষ্টা করব। রবিসনের সাবলীল উত্তর।

—ঘরোয়া কোনো অভিনয়ের কথা বলছ? বেশ, ভালো কথা, কিন্তু এমনধারা অভিনয়ে তুমি সারা প্যারিসের মতামত পাচ্ছ কি ক'রে? সেখানে ত আর সাধারণ দর্শক সম্প্রদায়কে পাবে না, বড় জোর মুষ্টিমেয় জনকয়েক নির্বাচিত সমঝদারকে জড়ো করতে পারো।

—আঃ, এই তো আর এক ফ্যাসাদ হোলো। বিরক্তি দমন করতে পারেন না রবিসন।

দুজনে চুপ ক'রে ভোজ্য বস্তুতে মন দেন। আশ পাশ থেকে কয়েক জোড়া চোখ তাঁদের ছোট্ট টেবিলটির দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে। পথ-চলা লোকে তাঁদের দিকে দৃষ্টি পড়ায় ব'লে যায়, 'ঐ যে হাসির রাজা মাণিক-জোড় ব'সে রয়েছেন, ও'রা সত্যিই কি আমুদে আর স্ফূর্তিবাজ।' কিন্তু হাস্যরসিক নট দুজনের অন্তরে তখন যে দুর্ভাবনা আর দুশ্চিন্তা তার কোনো খবরই ছিল না তাদের জানা।

—তা হ'লে করা যায় কি? ভোজ্য বস্তু থেকে ক্ষণেক মনোযোগ সরিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন কুইন কোয়ার্ট।

রবিসন বড় বড় চোখদুটি পাকিয়ে থাকেন। কিন্তু ওদিকে পথচলা জনতার মধ্যে একজন তাঁদের সহজেই চিনতে পেরে থেমে গিয়ে তাকিয়ে আছে। এটা তাঁদের নজরেই পড়েনি। এতই তাঁরা তখন বিভোর নিজেদের চিন্তায় অথবা দুশ্চিন্তায়। লোকটি বেশ লম্বা এবং বলিষ্ঠ গড়নের, গায়ে সাদামাটা কালো পোষাক।

বুঝলে বৌ-ঠাকরুণ, আমি আবার বোকা-হাবা, নিলাম শাড়িখানা। তারপরে বিনোদিনী শাড়িখানা দেখে শুধোলো—এ শাড়ি কোথায় পেলিরে বাদলি। আমি সব বললাম। শুনেই সে মুচকে হাসলো। সেই হাসিতে আমার কেমন সন্দেহ হল। তারপর থেকে শশাঙ্ক ঠাকুরকে আমি এড়িয়ে চলতে লাগলাম। কিন্তু আমি এড়িয়ে চললে কি হবে—বিনোদিনী যখন জানলো—গাঁয়ের সকলেই জানলো। ওই ওর স্বভাব, কোন কথা ওর পেটে থাকে না। আমার বড় রাগ হল ঠাকুরের উপরে। সেদিন ক্ষীরপুরের মেলা, আমাদের পাড়ার সব্বাই গিয়েছে মেলা দেখতে। এমন সময়ে ঠাকুর দুটো আম হাতে করে আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। বলল—বাদলি এই নে আম, নুন লঙ্কা দিয়ে খাস। তারপরে দাওয়ায় বসে বলল—একটু তামাক খাওয়া বাদলি। আমি বললাম—এখানে কেন ঠাকুর ভিতরে গিয়ে বসো। ঠাকুর যেমনি ভিতরে গিয়েছে, অমনি আমি ঝনাৎ করে ঘরের শিকল তুলে দিয়ে দৌড়, ভাবলাম মনে মনে থাকো ঠাকুর কিছুক্ষণ বন্ধ হয়ে।

মুক্তামালা শুধাইল হাঁরে তোর তো সাহস কম নয়। তারপরে কি হল?

বাদলি বলিল—তখন প্রায় সন্ধ্যা হয় হয় ভাবলাম এবার শিকল খুলে দিই গিয়ে—ঠাকুরের নিশ্চয় এতক্ষণ খুব শিক্ষা হয়েছে। শিকল খুলে ঘরে ঢুকে দেখি, ওমা কেউ নেই। এখানে দেখি, সেখানে দেখি, তক্তপোষের তলায় দেখি, কোথাও কেউ নেই—সব হাওয়া হয়ে গিয়েছে। গালে হাত দিয়ে ভাবি কি হল? এমন সময়ে উপরে নজর পড়লো—চালের খড় যেন একটু আলগা। ভালো করে চেয়ে দেখি যা ভেবেছি ঠিক তাই। চালের খড় সরিয়ে ঠাকুর পালিয়েছে। বুঝলে বৌ-ঠাকরুণ, আমি জব্দ করবো ভেবেছিলাম, আমি নিজেই জব্দ হয়ে গেলাম।

মুক্তামালা শুধায়—তোর লজ্জা করলো না বাদলি?

বাদলি বলে—লজ্জা করবারই তো কথা। কিন্তু সবাই এ নিয়ে এতো হাসাহাসি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগলো যে সকলের উপর আমার রাগ হল। মনে মনে ঠিক করলাম যে, আমি লজ্জা না পেলেই ওরা জব্দ হবে। তাই জোর করে আমিও হাসতে শুরু করলাম, ছয়কে নয় করে বানিয়ে সকলকে শোনাতে লাগলাম। বৌ-ঠাকরুণ, যার ভাঙা ঘর তার কি বৃষ্টির জলকে ভয় করলে চলে? ফুটো চাল দিয়ে যখন জল পড়ে—তখন ভাবতে হয় যে ওই ফুটো দিয়ে চাঁদের আলোও তো আসে।

মুক্তামালার ভারি বিস্ময় বোধ হয় এই মেয়েটির কথায় ও ব্যবহারে। যাতে আর দশজন লজ্জিত হইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইত তাহার প্রতি মেয়েটির কি সহজ ভাব। বিষয়টা যে লজ্জার তাহা সে জানে, কিন্তু এই অসহায় বালিকার লজ্জা পাইবার অবকাশ কোথায়? কেহ তাহাকে কিছুমাত্র সাহায্য করিবে না, রক্ষা করিতে অগ্রসর হইবে না, বরঞ্চ জব্দ করিবার সুযোগ সন্ধান করিতেছে—এরকম ক্ষেত্রে লজ্জার ভারে সে যে ভাঙিয়া পড়ে নাই, ইহাতে তাহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। যে-স্রোত এই বালিকাকে বানচাল করিয়া দিতে পারিত, তাহাকে নিজের অনুকূলে করিয়া লইয়া সে কেমন কৌশলে নৌকা ভাসাইয়া দিয়াছে। এই মেয়েটির মধ্যে কিছু অসাধারণত্ব আছে বলিয়াই মুক্তামালার নির্জন পল্লীবাসে সে তাহার প্রধান আশ্রয় হইয়া উঠিল।

নবীননারায়ণের সাহচর্য্য মুক্তামালা অধিকক্ষণ পাইত না। একে তো পল্লীগ্রামের সমাজে স্বামী-স্ত্রীর অবাধ মেলামেশার সুযোগ বিরল, তার উপরে নবীন তাহার স্বভাববিরুদ্ধ কর্মস্রোতের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছে। সকালবেলা সে কাছারীতে গিয়া বসিত, কর্মচারী ও প্রজাদের সংগে কথাবার্তায়, মহকুমা ও সদর হইতে আগত উকীল মোক্তারদের সহিত পরামর্শে অনেকটা সময় তাহার যায়। দুপুর বেলা খানিকটা বিশ্রামের পরে আবার লোকজনের সংগে দেখা শুনায়, শলাপরামর্শে সন্ধ্যা অতিবাহিত হইয়া যাইত। সারাদিনের পরিশ্রমে ও বিরক্তিতে তাহার নিদ্রা আসিতে বিলম্ব হইত না। কাজেই সারা দীর্ঘদিন মুক্তামালা একাকী। তাহার প্রধান সংগী বাদলি। আর ওই পুরাতন বৃদ্ধা ঝি জগার মা। এই দাসীটি বহুকাল হইল ছ'আনির বাড়িতে আছে। নবীনকে শৈশবে সে মানুষ করিয়াছে। দাসী ও গৃহকর্ত্রীর মাঝামাঝি স্তরে সে বিরাজমান। ছ'আনির বাড়ির, ছ'আনির জমিদারদের অনেক পুরাতন কাহিনী তাহার পরিজ্ঞাত। অবসর সময়ে মুক্তামালা তাহার কাছে শ্বশুরকুলের প্রাচীন কাহিনী শুনিত। সময় কাটিত। তাহা ছাড়া এইসব অদৃশ্যসূত্রের সংগে নিজের জীবনকে গ্রথিত করিয়া ছ'আনির অতীত ইতিহাসের অন্তর্গত হইবার চেষ্টায় সে এক প্রকার আনন্দ, একপ্রকার গৌরব অনুভব করিত। মেয়েরা পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের দুকূলে সংযত নদী। কুলপ্লাবিনিগণ শিল্পীর কাম্য হইতে পারে, সংসারের তাহারা কেহ নয়।

(ক্রমশ)

. তাই অতিরিক্ত ক্লান্ত
স্ন থেকে ফিরে এসে
রকার মনে হোল।
রী সুন্দর হয়েছে,
মনোজ্ঞ। আমি
।
য়ে বিনয়

সেয়ানে সেয়ানে

লিওনার্ড মেরিক

রবিসন এবং কুইন কোয়ার্ট দুজনেই প্রণয়প্রার্থী ম্যাডময়জেল ব্রুয়েটের। ডময়জেল ব্রুয়েট হাস্যলাস্যময়ী তরুণী, দর্শনা অভিনেত্রী আর তাঁরা দুজন রঙ্গপ্রিয় সারসবিলাসী মঞ্চশিল্পী এবং তিনজনই ব্রয়েটার সুপ্রিম' বলে প্যারিসের একটি রঙ্গা-য়ের পাদপ্রদীপ অলংকৃত করেন। রবিসনের স্যকৌতুক এতই জনপ্রিয় যে মঞ্চে অবতরণ রবামাত্রই এবং অভিনেয় চরিত্রের কোনো কথা লার আগেই প্রেক্ষাগৃহ হাস্যমুখর হয়ে ওঠে। ইন কোয়ার্টও সমানভাবে সম্বর্ধিত এবং র্শকগণের অত্যন্ত অভিপ্রেত অভিনেতা. ঞ্চে তাঁর নির্বাক অভিবাদনও সমাগত নসাধারণকে কলহাস্যে মাতিয়ে তোলে।

পেশাদারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাদ দিলে তাঁরা জন অতি ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ বন্ধু মাণিক-জোড়ও বলা চলে। অপরদিকে এই দুই বন্ধু কই শিল্পী তরুণীর প্রণয়প্রার্থী এবং রিণয়প্রার্থীও বটে! তরুণী অভিনেত্রীও জনের প্রতিই সমান কৃপাদৃষ্টি এবং অনুরাগ ষ্টি করে চলেন. মান অভিমান. মেঘ ও রৌদ্র. লনা ও আদরের পালা নিত্যই চলে দুজনারই ঙ্গে। তিনি সমানভাবেই প্রশ্রয় দেন প্রেমার্ত অনুভূতি নিবেদন করেন দুজনকেই। শেষ পর্যন্ত কিন্তু দুজনাই অস্থির হয়ে ওঠেন বাঞ্ছিতা দয়িতার প্রাণের অন্তরতম কথাটি—শেষ উত্তরটি—স্বয়ংবর নির্বাচনের আশা ও আশংকাভরা বার্তাটি জানার ব্যাকুল আগ্রহে। নির্নাতমাখা তাঁদের ব্যগ্র কৌতূহলে তরুণীরও ধৈর্য হারায়। চুপি চুপি পৃথকভাবে দুজনকে আপন নিকুঞ্জে ডেকে মধুর সোহাগ বচনে তিনি জানিয়ে দেন তাঁর মনের গোপন কথাটি দুজনের মধ্যে যিনি অধিক জনপ্রিয় এবং জনসমাদৃত অভিনেতার গৌরব অর্জন করবেন লীলাময়ী তরুণীর প্রিয়তমের পদে অভিষিক্ত হবার, তাঁর দেওয়া বরমাল্য পাওয়ার দুর্লভ গর্ব হবে তাঁরই।

'বীর হস্তে বরমাল্য লব একদিন'—প্রাণভরা এ সাধ থাকলে কি হবে, একথা শুনে ত দুজনেরই চক্ষুস্থির। দু'জনের অভিনয়-প্রতিভার উৎকর্ষ তুলনা করে অভিমত দেবে কে? মঞ্চে এমন অন্য কোনো অভিনেতা অভিনেত্রী নেই, এমন কোনো সমালোচক বা সম্পাদক নেই যিনি এই দুরূহ প্রতিযোগিতার কোনো মীমাংসা করে দিতে পারেন। কেবল ব্রুয়েটের মত খেয়ালী তরুণীই এমনি ধারা অদ্ভুত প্রসঙ্গ তুলতে পারে। অসহায় ভাবে আমতা আমতা করেন রবিসনঃ কিন্তু এ প্রশ্নের কি ক'রে সমাধান হবে, সুজেন? কার মতামতকে তুমি গ্রহণ করবে?,

—সত্যিই ত, এ ব্যাপারে চূড়ান্ত মীমাংসা হবে কি ভাবে? বিস্ময়াকুল কুইনকোয়ার্ট সায় দেন, এ বিচারের ভার দেবে কাকে?

—কেন, প্যারিসই বিচার ক'রে মীমাংসা করে দেবে, অম্লান বদনে ঘাড় দুলিয়ে জবাব দেন চিত্তহারিণী সুজেন ব্রুয়েট, আমাদের ব্রত হোলো জনগণের সেবা করা, তাঁদের আনন্দের খোরাক জোগানো, অতএব দর্শক সম্প্রদায়ের অভিমতই চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করবো।

লাবণ্যময়ী মঞ্চাভিনেত্রীর এ আর এক বিলাস, রূপসীর এ এক অভিনব কৌশল রূপ-দগ্ধ রূপমুগ্ধ প্রার্থীকে এড়িয়ে যাবার। নইলে এমন তাজ্জব ফন্দীও মাথায় আসে কারো। ভাবেন আশান্বিত দুজনাই। কিন্তু ভেবে কুল-কিনারা পাননা। দর্শক সম্প্রদায় দুজনকেই সমান সম্বর্ধনা জানিয়ে থাকেন, দুজনের প্রতিভাকেই স্বীকার করেন। কাজেই প্যারিসের ওপর বিচারের ভার ছেড়ে দেওয়াও যা' ব্যাপারটাকে মুলতুবী রাখাও তাই। কোনো উপায় খুঁজে পাননা কেউ।

সেদিন দুই বন্ধুতে অতি পরিচিত কাফেতে বসে। নতুন নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার দরুণ শীঘ্রই বেশ কিছুদিন অভিনয় বন্ধ থাকবে।—ব্যাপারটা নিজেদের মধ্যেই আমরা মিটিয়ে ফেলি. সুরু করলেন রবিসন, নাও ধরো একটা সিগারেট। তাহ'লে সমস্তটা মিলিয়ে দাঁড়াচ্ছে এই, তুমি অভিনেতা অতএব তুমি নিজেকে আমার চেয়ে অনেক বেশি অভিনয় প্রতিভাবান বলে মনে করো। আবার আমিও তাই। এই গেল আমাদের শিল্পী জীবনের কথা। কিন্তু অন্যদিকে দেখো, আমরা এই দুনিয়ার মানুষ ত বটে এবং সেই কারণেই এটা আমাদের সহজেই বুঝে দেখা উচিত যে, এই ভাবে পাল্লা দিতে দিতে আর লোকের কাছে হাসি এবং কৌতুকের পাত্র হয়ে হয়ে একদিন জীবনের রিক্ত প্রান্তে গিয়ে পৌঁছোবো, তবু সেদিনও পর্যন্ত আমাদের একজনের ওপর আর একজনের টেক্কা দেওয়ার চূড়ান্ত ফলাফল এমনি অমীমাংসিতই থেকে যাবে।

হ্যাঁ, ঠিকই ত—। চিন্তাকুল কুইন কোয়ার্টও এ বিষয়ে একমত।

—কিন্তু, একটা মুস্কিল হচ্ছে এই যে, রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষ কিছুতেই আমাদের নিজের উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠার এমনি ধারা কোনো সুযোগ দিতে কিছুতেই রাজী হবেন না। তাই নয় কি?

এবারও কুইন কোয়ার্ট সায় দিয়ে বলেন, আচ্ছা, তা' হ'লে আর কি উপায় তুমি বাৎলাতে পারো?

—কেন? মঞ্চের ওপর এবং আমাদের নির্দিষ্ট রঙ্গালয়ের ভিতর সে সুযোগ আমরা নাই বা পেলাম, আমরা তার বাইরেই সে সুবিধে খুঁজে নেবার চেষ্টা করব। রবিসনের সাবলীল উত্তর।

—ঘরোয়া কোনো অভিনয়ের কথা বলছ? বেশ, ভালো কথা, কিন্তু এমনধারা অভিনয়ে তুমি সারা প্যারিসের মতামত পাচ্ছ কি ক'রে? সেখানে ত আর সাধারণ দর্শক সম্প্রদায়কে পাবে না, বড় জোর মুষ্টিমেয় জনকয়েক নির্বাচিত সমঝদারকে জড়ো করতে পারো।

—আঃ, এই তো আর এক ফ্যাসাদ হোলো। বিরক্তি দমন করতে পারেন না রবিসন।

দুজনে চুপ ক'রে ভোজ্য বস্তুতে মন দেন। আশ পাশ থেকে কয়েক জোড়া চোখ তাঁদের ছোট্ট টেবিলটির দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে। পথ-চলা লোকে তাঁদের দিকে দৃষ্টি পড়ায় ব'লে যায়, 'ঐ যে হাসির রাজা মাণিক-জোড় ব'সে রয়েছেন, ও'রা সত্যিই কি আমুদে আর স্ফূর্তিবাজ।' কিন্তু হাস্যরসিক নট দুজনের অন্তরে তখন যে দুর্ভাবনা আর দুশ্চিন্তা তার কোনো খবরই ছিল না তাদের জানা।

—তা হ'লে করা যায় কি? ভোজ্য বস্তু থেকে ক্ষণেক মনোযোগ সরিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন কুইন কোয়ার্ট।

রবিসন বড় বড় চোখদুটি পাকিয়ে থাকেন। কিন্তু ওদিকে পথচলা জনতার মধ্যে একজন তাঁদের সহজেই চিনতে পেরে থেমে গিয়ে তাকিয়ে আছে। এটা তাঁদের নজরেই পড়েনি। এতই তা'রা তখন বিভোর নিজেদের চিন্তায় অথবা দুশ্চিন্তায়। লোকটি বেশ লম্বা এবং বলিষ্ঠ গড়নের, গায়ে সাদামাটা কালো পোষাক।

...ন সঞ্চয় ক'রে এবারে
বুঝলে বৌ-ঠাকরুণ, আ... ...সে তাঁদের ওপর এবং
নিলাম শাড়িখানা। তার ...ঃ মশায়রা কিছু মনে
খানা দেখে শুধোলো—ও ...দের একটু বিরক্ত করতে
বাদলি। আমি সব ক... ...দের কাছ থেকে দুটো পরামর্শ
হাসলো। সেই হা... ...তার জন্যে যৎসামান্য কিছু
হল। তারপর ...মি দিতে পারি। তা' হ'লে ব্যাপারটা
এড়িয়ে চলতে... বলি?
চললে ক... —দেখুন, আমরা এখন আমাদের নতুন
গাঁয়ের... নাটকের ভূমিকা চিন্তাতেই আচ্ছন্ন রয়েছি।
কে... আপনি বরং অন্য আর এক সময়ে আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন। সেই ভাল, কি বলেন? ব'লে রবিসন জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকিয়ে থাকেন আগন্তুকের মুখের দিকে। লোকটিও অপ্রতিভ না হ'য়ে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, আহা, সময় যে নেই, সেই ত হয়েছে মুস্কিল। আমিও আমার সব শেষের ভূমিকা চিন্তাতেই ব্যাকুল এবং এ পর্যন্ত এই হবে আমার সব প্রথম সবাক ভূমিকায় অভিবাদন। অথচ আমি গত বিশ বছর ধ'রে এমনিধারা জনসাধারণের চোখের ওপর রয়েছি।

—কি বললেন? বিশ বছর ধ'রে আপনি নাট্যনৈপুণ্য দেখিয়ে আসছেন? সহাস্য মুখ-ভঙ্গীতে প্রশ্ন করেন কুইন কোয়ার্ট।

—না, মশায়, তা নয়। গম্ভীরভাবে উত্তর দেয় আগন্তুক লোকটি, আমি কাজ করতাম জল্লাদের. এবং সে চাকরীতে এই সবেমাত্র ইস্তফা দিয়েছি। সেই চাকরীর বিভীষিকা এবং আতঙ্ককর ক্রিয়াকান্ড নিয়ে বক্তৃতা দেবার ঠিক করেছি।

তাঁরা দুজন আচমকা ভয়ে বিচলিত হ'য়ে ওঠেন। মুখে কথা সরে না। অদূরে বাহিরের সূর্যের আলোয় যেন হঠাৎ গিলোটিনের কালো ছায়া নড়েচড়ে ওঠে। লোকটি আবার ব'লে চলে, আমার নাম জ্যাকুয়েস রোক্স, আপনারা ঐ যাকে বলেন 'মঞ্চভয়', আমাকেও পেয়ে বসেছে তাই। অথচ এই আমিই কোনো ভয়ই জানতাম না কোনোদিন! ভাবুন ত, কি আশ্চর্য! পায়চারি করতে করতে বক্তৃতাটা যতবারই রপ্ত করতে যাচ্ছি ততই যেন হাত পা আড়ষ্ট হ'য়ে আসছে।

—আচ্ছা, বসুন আপনি, অভয় দেন রবিসন, কিন্তু আপনি চাকরী ছাড়লেন কেন?

—কেন না, আমি সত্যের সন্ধান পেয়েছি। প্রাণদন্ডের শাস্তিটা মোটেই ঠিক নয় বুঝতে পেরেছি। এটা অত্যন্ত জঘন্য একটা পাপ কাজ, এটা তুলে দেওয়াই উচিত।

—আপনার বিবেকের সঙ্কোচ এবং তাড়না এটা বলুন তা' হ'লে!

—যা' বলেন তাই।

—বেশ! তবে এই ধরণের বক্তৃতায় নাটকীয়তার অবকাশ বা সম্ভাবনা আছে কোথায়? আর সে বক্তৃতার বক্তব্যটাই বা কি? রবিসন কৌতূহল প্রকাশ করেন।

—কেন? তাতে থাকবে আমার জীবনের কাহিনী—আমার যৌবন, আমার দারিদ্র্য, জল্লাদ জীবনের ভীষণ নারকীয় অভিজ্ঞতা আর আমার এই অনুশোচনা এবং মনস্তাপের কথা।

চমৎকার, লাফিয়ে ওঠেন রবিসন, যাদের একদিন মৃত্যুর পথে ঠেলেছিলেন আপনি আজ তাদেরই ভূত আপনাকে বক্তৃতামঞ্চের দিকে ঠেলা মারছে! ব'লে তিনি প্রচণ্ড এক ঘুষি কষালেন সামনের টেবিলের ওপর। আবার বলেনঃ আচ্ছা, যেখানে বক্তৃতা দেবেন সেখানে আপনাকে চেনেন সকলে?

—আমার নাম তাঁরা জানেন বই কি! লোকটির নিরীহ উত্তর।

—না, আমি বলছি আপনাকে তাঁরা সামনাসামনি চেনেন নাকি? সেখানে আপনার পরিচিত কেউ নেই?

—না। কিন্তু কেন বলুন ত?

—সেখানে তা' হ'লে কেউই আপনাকে চিনতে পারবে না?

—খুব সম্ভব নয়, তেমন ত মনে হয় না।

—বেশ! আমি আপনার হ'য়ে সেখানে বক্তৃতা করবো আর তার জন্যে পাঁচশো ফ্রাঙ্ক আপনি পাবেন!

—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। লোকটির বিস্ময়াহত স্বীকৃতি।

—খুব শক্ত একটা চরিত্রে অভিনয় করার আমার ভারী সখ। আপনি পরের দিন বুঝিয়ে বলতে পারবেন, যে আপনি ট্রেণ ফেল করেছিলেন অথবা শরীর অসুস্থ ছিল এমনি অন্য কোন একটা যা' হোক অজুহাত এবং আমি আপনার হ'য়ে বক্তৃতা করে এসেছি এটাও নিশ্চয়ই আপনার জানা থাকার কথা হবে না, অন্ততঃ সেই ভাব আপনি অতি স্বচ্ছন্দেই দেখাতে পারবেন। অবিশ্যি তার জন্যে হাঙ্গামা পোয়াবার দায়িত্ব রইল আমার। হাঙ্গামা কিছুমাত্রই এতে নেই। তা' হ'লে রাজী আপনি, কি বলেন?

—তা' হ'লে কিন্তু আমার প্রাপ্তির অঙ্কটা দ্বিগুণ করে দেওয়া উচিত হয় নাকি? লোকটি রহস্য করে।

—যাঃ আবার দোকানদারি করে! খবরের কাগজে আমার এই নতুন মস্করা করার কাহিনী হৈ হৈ ক'রে বেরোবে আর সারা প্যারিস অবাক হ'য়ে যাবে এই ভেবে যে, এই আমি রবিসন কিনা জ্যাকুয়েস রোক্সের হ'য়ে তারই বদলে তারই ভূমিকায় নিখুঁত বক্তৃতা ক'রে এসেছি। শুধু তাই নয়, সেই বক্তৃতায় সমবেত বিপুল জনসাধারণকে রোমাঞ্চিত ও শিহরিত ক'রে দিয়েছি। শত শত লোকে আপনার এই বক্তৃতাটির কথা বহু দিন ধ'রে বলাবলি ক'রে বেড়াবে, তারা ভুলতেই পারবে না আপনার যত কথা, যত কাহিনী। ভেবে দেখুন, আপনি নিজে এটি করলে এমন ফল হবে না, বক্তৃতাটা এমন হৃদয়গ্রাহী, এমন চিত্তস্পর্শী কখনই হ'তে পারে না। কাজেই ধরতে গেলে আমিই ত আপনার বিজ্ঞাপন আর প্রচারের ঢাক বয়ে বেড়াবো, অথচ তার জন্যে আপনার খরচটি নেই, উল্টে আমি আপনাকে যথাসম্ভব মূল্য ধ'রে দিচ্ছি। তা' হলে রাজী ত?

—রাজী না হয়ে আর উপায় কি? ভনিতা করলে রোক্স। ব্যাপার বৃত্তান্ত দেখে শুনে কুইন কোয়ার্টের ত চক্ষু স্থির! বুক তাঁর দুরুদুরু ক'রে ওঠে অজানা আশঙ্কায়। ভূমিকাটির সম্বন্ধে রবিসনের কল্পনা ও ধারণা যেমন পরিষ্কার অভিনয়ও যে সে রকম চিত্তাকর্ষক হবে না কে বলবে? তাঁর পায়ের তলা থেকে যেন মাটি স'রে যাচ্ছে। সেদিন সন্ধ্যা-বেলা থিয়েটারে কুইন কোয়ার্ট সুজেনের পাশে পাশে কাছে কাছে বিমর্ষ মুখে ঘুরে বেড়ালেন, অভিনয়ও তাঁর তেমন জমল না, বাচালের চরিত্রে নেমেছেন তিনি মঞ্চে অথচ কেবলি তিনি মনে করছেন, 'রোমিও'র ভূমিকা অভিনয় করতেই তিনি আজ দর্শককে অভিবাদন জানিয়েছেন। অদ্ভুত সেই 'রোমিও'-অনুভূতি!

আর ওদিকে রবিসনের কি উত্তেজনা আর উল্লাস, উৎফুল্ল আশা আর উদ্বেগময় আশঙ্কা। আশানুরূপ সাড়া যদি তিনি সঞ্চার করতে পারেন জনসাধারণের অন্তরে অন্তরে, তবে আর কুইন কোয়ার্টকে ভয়টা কিসের? এরও পর আর বাছাধনকে টেক্কা দিতে হচ্ছে না। সুজেনের কাছে তিনি সগর্বে তাঁর মতলব ঘোষণা করলেন, শুনে তিনিও মজা দেখবার জন্য বক্তৃতা সভায় হাজির থাকবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এ ইচ্ছা জানালেন কুইন কোয়ার্টও। সারা রাত ধ'রে রবিসন উঠে প'ড়ে লেগে থাকেন মহলা দিতে।

কিন্তু রবিসনের এই জয়ের সম্ভাবনায় সুজেন ব্রুয়েট যে খুব খুসী তা' বোঝা যায় না। বরং এই সময় তিনি কুইন কোয়ার্টকে আরো বেশী ক'রে আদর এবং সোহাগ জানাতে থাকেন। যাই হোক নির্দিষ্ট দিনে তিনজনেই বক্তৃতা সভায় হাজির। নিজের চেহারাটি হুবহু জ্যাকুয়েস রোক্সের মত দেখাবার দিকে রবিসনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। তার জন্যে প্রয়োজনীয় যত কিছু সাজসজ্জায় কিছুমাত্র কার্পণ্য নেই তাঁর। বক্তৃতা হলে পৌঁছতেই ব্যবস্থাপকেরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। ভীড় জমতে থাকে, ওদিকে বিশ্রাম ঘরে বসে রবিসন সিগারেট টানছেন। দেখতে দেখতে হলঘরে লোকে লোকারণ্য হ'য়ে যায়। আটটার সময় তিনি উঠলেন বক্তৃতা-মঞ্চে। আশপাশে একবার প্রথমটা তাকিয়ে দেখে নিলেন। হ্যাঁ, ঐ যে তৃতীয় সারিতে পাশাপাশি বসে রয়েছে কুইন কোয়ার্ট আর সুজেন ব্রুয়েট। একবার তাঁদের দিকে কটাক্ষপাত করার লোভ তিনি সামলাতে পারেন না।

'সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ ও মহিলাবৃন্দ'—

রবিসন বক্তৃতা শুরু করলেন, অগণিত চোখ গিয়ে পড়লো তাঁর ওপর, রইলো স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে। ঘাতকের কণ্ঠস্বরও শোক-

মণ্ডলীর চোখে এবং কানে মোহময় আবেশ বুলিয়ে দিয়ে যায়। পুরুষেরা পরম উপভোগের হাসিতে পরস্পরের গায়ে ঠেলা দিয়ে প্রশংসাসূচক ভাব প্রকাশ করেন আর মেয়েরা বন্ধ দৃষ্টিতে একমনে তাকিয়ে বক্তার দিকে, তাঁদের চোখে মুখে রোমাঞ্চ আর শিহরণ, মোহ আর ভালো লাগার ভাব।

বক্তৃতার প্রথমাংশ অতি শান্ত এবং সংযত, যাতে বরং হাস্যকর বিষয়বস্তুও রয়েছে যেখানে তিনি বর্ণনা দিয়ে চলেছেন তাঁর ছেলেবেলার কল্পিত এবং বিচিত্র যত অভিজ্ঞতার। খিল খল ক'রে হেসে ওঠে জনতা, আবার তাকায় পরস্পরের মুখের দিকে কেমন একটা অনুনয়সূচক সমাহিত ভাব নিয়ে, যেন এইরকম একজন নরদানবের পক্ষে তাদের হাসাবার ধৃষ্টতা ও স্পর্ধায় তারা অত্যন্ত বিরক্ত এবং মর্মাহত। সুজেন ফিসফিস করেন কুইন কোয়ার্টের কানে কানে ঃ বড্ড বেশী রঙতামাসা হয়ে যাচ্ছে, ঠিক তারেও ঘা দিতে পারেনি, ঠিক সুরও আই পাচ্ছি না।

কুইন কোয়ার্টও বিষণ্ণ সুরে চাপা গলায় জবাব দেন ঃ আহা, দ্যাখোই না! একেবারে উল্টো সুরে আসতে হবে বলেই ও শ্রোতার মনটাকে তৈরী ক'রে রাখছে, আবেদন সঞ্চারের এটা এক অব্যর্থ কৌশল...। খাদ থেকে একেবারে চড়া পর্দায় চড়াবে।

কুইন কোয়ার্টের অনুমান মিথ্যা নয়। বক্তার প্রসন্ন মেজাজটি আর বেশীক্ষণ রইল না, ক্রমশঃ সেই তামাসাপ্রিয় হাসিখুসীর ভাবটি তাঁর কণ্ঠস্বর থেকে বিলীন হ'য়ে এলো, হাস্যরসাত্মক কাহিনী ও ঘটনাও এলো শেষ হ'য়ে, বর্ণনা এবং বৃত্তান্ত হ'য়ে ওঠে লোমহর্ষক, বীভৎস এবং বিভীষিকাময়। সমস্ত হলটি যেন ক্রোধে আর উত্তেজনায় শিউরে ওঠে। গভীর বিতৃষ্ণায় ঘাড় নামিয়ে নেয় সমবেত শ্রোতা, উৎকণ্ঠায় তাদের মুখ ফ্যাকাশে হ'য়ে গেছে। ওদিকে বক্তা অবিকল প্রাণস্পর্শী বর্ণনা দিয়ে চলেছেন অপরাধী এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত জনের ক্ষোভ আর দুঃখ, মর্মভেদী আকুলতা আর তীব্র বেদনার। এই সব হতভাগার অপরাধের পূর্ণ বিবরণ, এবং মৃত্যুর মুখে যাওয়ার পূর্বক্ষণের, শেষ কয়েক মুহূর্তের অপরাধীর আনুপূর্বিক ছবি এঁকে চলেছেন তিনি। সেই সঙ্গে প্রতিধ্বনিত হ'য়ে ওঠে তাঁর করুণ আক্ষেপ এবং বিলাপ, অনুশোচনা এবং নিরুপায় কাতরোক্তি। 'আমি খুনী, আমি হত্যাকারী, আমি নরঘাতক—আমি—আমি—' বলতে বলতে বক্তা দীর্ঘশ্বাসে এবং বুক জোড়া কান্নায় ভেঙে পড়েন। সারা হল জুড়ে তখন একটা থমথমে অসহায় নিস্তব্ধতা, কান পাতলে পিন পড়ার শব্দও স্বচ্ছন্দে শোনা যায়।

তিনি যখন শেষ করলেন তখন কোনো হাততালি পড়েনি। এতেই তাঁর বক্তৃতার সাফল্য সূচিত হলো। গভীর নীরবতার মধ্যে তিনি সমবেত জনতাকে অভিবাদন জানিয়ে আস্তে আস্তে বিদায় নিলেন মঞ্চ থেকে। তখনও অবধি হলে কেউ নড়ে চড়ে নি, কেবল সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা ভীড় ক'রে এসে জ্যাকুয়েস রোক্সকে সপ্রশংস সম্বর্ধনা এবং সমবেদনা জানাতে এলেন।

রবিসন জিতে গেছেন! আর কি! কেল্লা ফতে! কুইন কোয়ার্ট তাঁর বক্তৃতার এবং অসামান্য রূপদক্ষতার প্রশংসায় ত পঞ্চমুখ। সুজেনের গদগদ প্রশংসাবাণীও কি আবেগময়ী আর মিষ্টি! এ ছাড়া আরও একজনের কাছ থেকে এলো অভিনন্দন। একখানি কার্ড পাঠিয়েছেন টেভেনিনের মার্কুইস, তাঁর বাড়িতে মিস্টার রোক্সকে নিমন্ত্রণ করেছেন তিনি, তাঁর সঙ্গে তিনি দেখা করতে চান।

আপন মনে উল্লসিত হ'য়ে ওঠেন রবিসন! অভিজাত সম্প্রদায়েও গণ্যমান্য লোকের কাছ থেকে এসেছে তাঁর নিমন্ত্রণ। এতেই বোঝা যাচ্ছে তিনি লোকের মনে কি অদ্ভুত আবেদন সঞ্চার করতে পেরেছেন।

—কিন্তু লোকটি কে? জিগ্যেস করেন কুইন কোয়ার্ট, টেভেনিনের মার্কুইসের নাম কখনো শুনেছি বলে ত মনে পড়ে না।

—তুমি শুনেছো কি শোনোনি তাতে কিছু আসে যায় না, উত্তর দেন রবিসন গর্ব ও ঈর্ষাভরা দৃষ্টিতে, তিনি একজন মার্কুইস এবং তিনি আমার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করার জন্যে ব্যগ্র হ'য়ে উঠেছেন এইটিই প্রধান কথা। এটা একটা মস্ত বড় সম্মান একথা না মেনে উপায় নেই। অবশ্যই যাবো আমি।

কিন্তু অভিজাত ভদ্রলোকটির বাড়িতে পেঁৗছে তাঁর অত্যন্ত সাদাসিধা সাধারণ আস্তানা দেখে রবিসনের কেমন কেমন ঠেকে। একজন চাষাভূষো শ্রেণীর লোক এসে তাঁকে অভ্যর্থনা ক'রে ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসাল। যে ঘরে তিনি বসলেন, তার আসবাবপত্তর দেখে রবিসনের মন একেবারে দমে গেল। একটি ছোট টেবিল, তার ওপর অতি সাধারণ মদের পাত্র আর গুটিকয়েক মোমবাতি এবং টেবিলের ধারে খানকয়েক মান্ধাতার আমলের পুরোণো চেয়ার। এর চেয়ে সুজেনের সঙ্গে আজকের নৈশ ভোজন পর্বটা কি চমৎকারভাবে জমত ভেবে রবিসন রীতিমত মনমরা হ'য়ে পড়েন।

বহুক্ষণ পরে দরজা ঠেলে ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। জরাজীর্ণ বৃদ্ধ—কোনোগতিকে টেনে টেনে পা ফেলে তিনি চলেন। চামড়া কুঞ্চিত, মুখ বিবর্ণ ম্লান, চুল ধবধবে সাদা। আর এই শ্রীহীন মুখখানির ভিতর থেকে যেন উঁকি মারছে এক জোড়া অদ্ভুত চোখ—বিকৃত-মস্তিষ্কের চোখের মতন।

—মাপ করবেন মশায়, আমার একটু দেরী হয়ে গেছে। আজ সন্ধ্যেবেলার এই পরিশ্রম আমার অভ্যস্ত নয় কিনা, তাই অতিরিক্ত ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি। তাই হল থেকে ফিরে এসে একবার ডাক্তার দেখানোর দরকার মনে হোল। হ্যাঁ, আপনার বক্তৃতাটি ভারী সুন্দর হয়েছে, অদ্ভুত, যেমন শিক্ষাপ্রদ, তেমনি মনোজ্ঞ। আমি ত কখনো তা' ভুলতে পারবো না।

রবিসন উঠে দাঁড়িয়ে ঘাড় নামিয়ে বিনয় এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

—বসুন, মিস্টার রোক্স, দাঁড়িয়ে কেন? আপনাকে ভালো মদ কিছুটা পান করাই। আমি নিজে মদ ছুঁতে পাই না, ডাক্তারের বারণ কিনা।

আস্তে আস্তে বলে রবিসন, মার্কুইসের আতিথ্য গ্রহণ করা একটা সৌভাগ্য, একটা খ্যাতির ও সম্মানের কথা।

আঃ, বললেন মার্কুইস দীর্ঘশ্বাস ফেলে, তা ছাড়া শীঘ্রই আমি রিপাবলিকেও নির্বাচিত হচ্ছি। আর আপনাকে এখানে আসার অনুরোধ করার একমাত্র কারণ আপনার হতভাগ্য জীবন ও অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আলোচনা করা—বিশেষ কোনো একটি অভিজ্ঞতার সম্বন্ধে আরো বেশী ক'রে। আপনি বক্তৃতায় 'ভিক্টর লেসিওর' বলে একজনের প্রাণদণ্ডের কথা উল্লেখ করলেন না? আহা বেচারী! কি শোচনীয়ভাবেই তার জীবনলীলা শেষ হোলো!

—হতভাগা, আমি যাদের এমনি চালান দিয়েছি তাদের মধ্যে বোধ হয় সবচেয়ে তেজস্বী আর সাহসী, নির্ভীক, বীর—। মদের পাত্রে চুমুক দিতে দিতে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠেন রবিসন।

—এতটুকুও ভয় পায়নি সে, তাই না? তাঁকে কথা শেষ করতে না দিয়ে মার্কুইস বলেন, সে ত বীরের মত গিলোটিনের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলো না?

—হ্যাঁ, বীর্যবান নির্ভীক উদ্দাম পুরুষের মত। কথার পিঠেই কথা যোগ করেন রবিসন। অথচ তিনি এই বীর পুরুষটির সম্বন্ধে জানতেন না কিছুই।

—চমৎকার, উৎসাহের সুরে ফেটে পড়েন মার্কুইস, এই তো চাই, এইটাই ত সকলে আশা করেছিলো তার কাছ থেকে। তার চেয়ে নির্ভীকভাবে মৃত্যুবরণ করতে তা' হ'লে আপনি আর কাউকে দেখেন নি? তার স্বরে ছিলো একটা গভীর গর্ব ও আনন্দের আভাস যা চিনতে ভুল হবার নয়, তাই না?

—ঠিক তাই, তার সাহস এবং মৃত্যুকে হেলায় জয় করার অসীম শক্তির কথা আমি চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবো। শ্রদ্ধায় মুখরিত হ'য়ে ওঠেন রবিসন স্তম্ভিতভাবে।

—কিন্তু তখন কি এই সাহস এই বীর্যকে আপনি শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন?

—ক্ষমা করবেন আমাকে মার্কুইস, মাপ

চাইছি। ঠিক বুঝতে পারলাম না কথাটা আপনার।

—বলছি. তখন এ শ্রদ্ধা আপনার কোথায় ছিল? তখন কি অকারণ অবারণ নির্যাতন থেকে তাকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন?

—নির্যাতন আপনি বলছেন কাকে? এক কোপেই ত—নিশ্চল প্রশান্ত মৃত্যু।

অতিথি-সেবক অধৈর্য হওয়ার ভাব দেখালেন, তারপর বললেন, আমি বলছি মানসিক নির্যাতনের কথা, দৈহিক নয়। একজন সম্পূর্ণ নিরপরাধ নির্দোষ লোককে এইরকম ঘৃণিত জঘন্য মরণের পথে ঠেলে দিলে তার মনের মধ্যে যে সীমাহীন ক্ষোভ, লজ্জা, রাগ আর অশান্তির আগুন জেগে ওঠে তা কি আপনি বুঝতে পারেন না?

—নিরপরাধ! হ্যাঁ, সকলে বলাবলি করেছিলো বটে যে, সে সম্পূর্ণ নির্দোষ, একান্তভাবেই নিরপরাধ।

—সে বিষয়ে আমারও কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু ভিক্টর তবু সত্য কথাটাই বলেছিল, তাই তার ঐ শাস্তি, আমি জানি। আমারই ত ছেলে।

—আপনার ছেলে? ভয়চকিত রবিসন থতমত খেয়ে অসহায়ের মতন প্রশ্ন করেন।

—হ্যাঁ, আমার একমাত্র ছেলে, পৃথিবীতে ঐ আমার একমাত্র আদরের জিনিষ, আমার সাত রাজার ধন মাণিক, আমার শিবরাত্রের সলতে। হ্যাঁ, সে ছিলো নির্দোষ, নিরীহ, মিস্টার রোক্স। আর এই আপনিই তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছেন—আপনারই হাতে তার মৃত্যু ঘটেছে—।

—আমি—আমি—কিন্তু আমি ত আইনের দাস, আইনের কল ছাড়া আর কিছু নই। ঢোক গিলতে থাকেন রবিসন, আমি তার বরাতের জন্যে নিজে দায়ী নই।

—কিন্তু আপনি ভারী গম্ভীর চালে বক্তৃতাটি দিয়েছেন মিস্টার রোক্স, বললেন মার্কুইস মজা ক'রে, যা' কিছু আপনি বলেছেন সকল বুঝিয়ে আমি আপনার সঙ্গে একমত। "আপনিই তার খুনী, হত্যাকারী, নরঘাতক", কেমন, এই কথাই বলেননি আপনি? আশা করি সুরা আপনার বেশ ভালই লাগছে, দিব্যি পছন্দসই, নয় মিস্টার রোক্স? আহা, ওটুকু আর রাখবেন না, নষ্ট করবেন না। সবটুকুই চালিয়ে দিন।

—এ্যা, মদের কথা কি বললেন? হাঁপিয়ে ওঠেন হাস্যশিল্পী রসিক অভিনেতা। অমনি চমকে লাফিয়ে ওঠেন, সারা দেহে তাঁর প্রবল কাঁপুনি। বুঝতে পারলেন সময় তাঁর ঘনিয়ে আসছে। বৃদ্ধ নির্বিকার নিশ্চিন্তভাবে জবাব দিলেন, হ্যাঁ, ও মদে বিষ মেশানো ছিল, আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আপনার ইহলীলা শেষ।

—হায় ভগবান! রবিসনের অন্তর্ভেদী খেদোক্তি। ইতিমধ্যেই তাঁর দেহের মধ্যে কেমন একটা তীব্র বিচিত্র অনুভূতির স্পর্শ পেয়েছেন। রক্ত যেন সারা দেহে জমাট বেঁধে আসছে, সারা অঙ্গ নিথর, নিঝুম, চোখের সামনে সব ছায়া, সব বর্ণহীন, সব ধোঁয়া।

—আপনাকে আমার কিছুমাত্র ভয় নেই, বলেন বৃদ্ধ প্রসন্নমুখে, আমি অবিশ্যি দুর্বল, শক্তিও নেই আত্মরক্ষার মত কিন্তু আপনি আমাকে আক্রমণ করলেও আপনার বিশেষ কিছু লাভ নেই। আক্রমণ করার আগেই আপনি অজ্ঞান হ'য়ে পড়বেন। আপনার মরণ এলো ব'লে।

কয়েক মুহূর্তে তাঁরা পরস্পরের মুখের দিকে বোকার মত চেয়ে রইলেন। অভিনেতা ভয়ে আতঙ্কে আড়ষ্ট নিশ্চল আর অতিথি-সেবক পাগলের হাসি হাসছেন। এবং তারপরে 'পাগলা-অতিথি-সেবক ধীরে ধীরে এক এক করে তাঁর রূপসজ্জার উপকরণগুলি খুলে ফেলতে লেগেছেন। শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ মার্কুইসের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন রবিসনের চোখের ওপর তাঁরই একমাত্র অন্তরঙ্গ বন্ধু কুইন কোয়ার্ট। দেখে রবিসনের ঝিমিয়ে-পড়া চেতনা আবার ফিরে আসে, নিস্তেজ ম্লান চোখ দুটিতে হতভম্ব বিস্ময়ের আলো। ততক্ষণে ঘরদোরময় বাড়ীতে বহু লোক হয়েছে জড়ো মজা দেখতে।

এরপর যখন সমস্ত কাহিনী ছেপে বেরুলো পরের দিনের খবরের কাগজে তখন সারা প্যারিসে আর কারও জানতে বাকী রইলো না। সেদিন যারা 'মার্কুইস'এর বাড়ীতে জড়ো হ'য়ে ঘটনাটি উপভোগ করেছে সেই সব প্রত্যক্ষদর্শী এবং খবরের কাগজের পাঠক-পাঠিকা এই দুই শিল্পীর যত অনুরক্ত ভক্তজন সমস্বরে বাহবা দিলে কুইন কোয়ার্টের অভিনয়-ক্ষমতাকে। কেননা, রবিসন ভাঁওতা দিয়েছেন প্রতারণা করেছেন দর্শক সাধারণকে আর কুইন কোয়ার্ট ঠকিয়েছেন সেই রবিসনকেই। অতএব রবিসনের আর কিছু বলার রইলো না।

কেবল কুইন কোয়ার্ট এবং সুজেন ব্রুয়েটের বিয়েতে জাঁকালো উপহার দিয়ে এবং বিবাহ-বাসরে রঙ্ তামাসা ক'রে নিজের কর্তব্য শেষ করলেন রবিসন। আর নিজের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের একমাত্র চেষ্টাও সেই সঙ্গে।

অনুবাদক—গৌরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম-এ
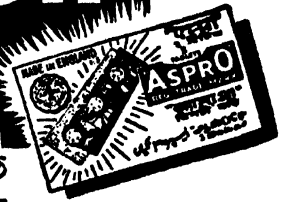
লাল ডাঙাটার ওপারে শুরু হয়েছে কাটা বনের পরিক্রমা। ছোট্ট কোঁকড়ানো কেঁদ গাছের মরাডালে কচি পাতার নেতুন সারা ক্রমশ মিলিয়ে গেছে অরণ্যের সীমা-রেখায়। সারা পথটা কাঁকুরে মাটিতে চলে দুটো যেন ছ্যাঁদা হয়ে গেছে। দূরে দূরে শালবনের ফাঁকে দেখা যায় মিলিটারী ব্যারাক-গুলো। তীব্র রোদে কোথায় বা চিকমিক করে হ্যাঙারের বাইরে ছোট বড় প্লেনের ডানাগুলো। সারা অঞ্চলটার সকল গ্রামেই বেশ একটা পরিবর্তন। কেমন যেন ছন্নছাড়া ভাব; বৈশাখের খররোদে চলেছে রিলিফ ওয়ার্কে মেডিকেল রিলিফ কোরের সেকেণ্ড ইউনিট। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে আসে, বনের ফল যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে। সরু মাটির রাস্তাটা ক্যাটার-পিলার ট্রাক্টরে আঁচড়ে এবড়ো-খেবড়ো হয়ে গেছে অকর্ষিতা কুমারী মৃত্তিকার দেহ-তৃপ। অন্য বছর পিয়াল গাছগুলোর প্রান্তে থলো থলো হয়ে নুয়ে পড়ত সুপক্ক হলদে পিয়াল ফলের রাশি। টক-মিষ্টি স্বাদে ভরপুর। কোথায় সে সব আজ? কোন রুদ্রের আবির্ভাবে লুকিয়ে গেল সব আরণ্যক ঐশ্বর্য।

এগিয়ে চলেছে মোটঘাট কাঁধে করে: বাড়ুলী নদীর ধারে জনহীন গ্রামখানার দিকে এগিয়ে আসছে তারা। উপত্যকার আশেপাশের ক্ষেতে বৈশাখের বর্ষণ-মেঘের জল শুকিয়ে সারা হয়ে গেছে। অন্য বছর দেখা যায় হলদে রঙকাটা মৃত্তিকা লাঙলের ফলায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত। মিষ্টি সোঁদা গন্ধ মনে আনতো কোন উন্মাদনার আভাস। লকলকে বীজধানের চারা আশার আলোয় ঝলমল করে প্রথম নয়ন মেলত ধরিত্রীর কোলে। আজ কোথায় তারা? তারা কি ভুলে গেছে মাটিতে মাটিতে কার সজল আহ্বান ধ্বনি? তারা কি বর্ষণমেঘের কাজল কালো ছায়ার পথরেখা খুঁজে পায়নি?

সারা গ্রামে একটা লোকও নেই। কতক মন্বন্তরের তাড়নায় বার হয়ে গেছে দূরে দূরান্তরের পানে। মেদিনীপুর না হয় খড়গপুরের কারখানায়। নয়ত বা হাঁটা পথে তমলুক বাগনান হয়ে কলকাতার দিকে কোন মহাকালের হাতছানিতে। ঢুকতে যাবে গ্রামে—কাদের কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠে তারা। সঙ্গীন বাগিয়ে এগিয়ে আসে জি-এম-পি'র দল। রাইফেলে হেলান দিয়ে আঙুলে বাড়িয়ে দেখিয়ে দেয়—"গো—গো—"

গ্রামে প্রবেশ নিষেধ। মিলিটারী রিকুই-জিসন করেছে। নদীর ওপারে বিশাল সেনাব্যারাক—মাইলের পর মাইল জুড়ে। নদীর বুকে বালির রাশি সরিয়ে বিশাল ঘের করে কয়েকটা মোটা পাইপ লাগিয়ে বয়লার পাম্প বসান হয়েছে।

গ্রামের বাইরে ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছটার নীচে একটু জিরোবে তারও উপায় নেই। দাঁত বার করে তারা যেন কি বলাবলি করছে। দেশের মাটিতে বসে একটু বিশ্রাম করবে, তারও উপায় নেই। কোন দাবীই নেই—তোমাদের কোন অধিকার আজ নেই ও মাটিতে। বাধ্য হয়েই উঠে পড়ে রিলিফ ওয়ার্কারের দল। ঘুরে পথে চাঁদপাড়া—চন্দ্রকোণার দিকে এগোতে হবে। কানে আসে গ্রামখানার বুক হতে ক্যাটার পিলার ট্রাকের শব্দ—ডিনামাইটের গুরুগম্ভীর গর্জন। চলেছে বিজয়রথ—ওই হতভাগাদের শেষ সম্বলের উপর। যদিও কোনদিন কেউ প্রাণে বেঁচে জীর্ণ কঙ্কালখানা নিয়ে ফিরে আসে—দেখবে তাদের পূর্বপুরুষের স্মৃতিমাখা গৃহ-কোণ কোন পাশবিকতার অনলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

চাঁদপাড়ায় পেঁছল তারা—তখন রাত্রি কত জানে না। সুনীল বসে পড়ে গ্রামের বাইরে—নীরেন, প্রমথ ওরা সব গেছে গাঁয়ে কোন আস্তানার সন্ধানে। ছোট পথটায় শীর্ণ জীর্ণ জনতার ভিড়। সকলেই দলে দলে এগিয়ে চলেছে শহরের পানে। কি হবে—গ্রামে বসে বসে নিশ্চিত মৃত্যুর দিন গুণে।

সুনীল সবে চিঁড়ে আর পাটালীতে মিশিয়ে কোনরকমে চিবোবার চেষ্টা করে চলেছে,—দেখতে দেখতে তার চারিদিকে ছোট-খাট ভিড় জমে যায়। মুখে তুলবে কি করে। অস্পষ্ট অন্ধকারে স্পষ্ট দেখতে পায় সে ওদের চোখের নিষ্প্রভ আঁখিতারায় বুভুক্ষার সর্বহারা চাহনি। না দিলে হয়ত কেড়েও নেবে। জিল জিল করছে বুকের পাঁজরগুলো। একা তার ভয় লাগে মূর্তিমান প্রেতাত্মাগুলোর দিকে চাইতে। চিঁড়ে বাঁধা গামছার পুঁটুলিটা দূরে ছুঁড়ে রাস্তার নীচে ফেলে দেয়।

চলিষ্ণু কঙ্কালগুলো যেন ক্ষেপে উঠেছে। ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা পুঁটুলিটার উপর। কাদের আর্তনাদে ভরে যায় রাতের অন্ধকার। কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে একটা বুড়ো কার হাতের লাঠির ঘায়ে চীৎকার করে ওঠে বাঁ হাতে কপালটা টিপে ধরে। দাঁড়াতে পারে না। কপালের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে শেষ সঞ্চিত রক্তকণা। কাটা পাঁঠার মত ছটফট করতে থাকে। নিশ্চুপ হয়ে আসে তার আর্তনাদ; স্থির হয়ে যায় ক্রমশ বুড়ো।

মুখটা ফিরিয়ে নেয় সুনীল। চোখের সামনে এমনি করে কাউকে মরতে মানুষকে দেখেনি। শুনেছিল,—আজ দেখল।

কার অপরাধে সে মরল?

এ প্রশ্নের উত্তর মেলেনি আজও। যেদিন উত্তর পাবার দিন আসবে—সেদিন আর এরা থাকবে না। তবুও এদের প্রতিটির মৃত্যু, একশ্রেণীকে উত্তর দিতে বাধ্য করবে। সেদিন ক্ষমা তার পাবে না। এদের প্রতিটি মৃত্যুর ঋণ শোধ করে দিতে হবে কড়ায়-গণ্ডায়।

দূরে দূরান্তর হতে এরা আসছে। যেখানে বাইরের কোন সাহায্যই পেঁছোয়নি, পেঁছাতে দেয়নি। ওরা মরুক, সমুদ্র-বনের মাঝে লড়াই করে যারা আজও বেঁচে রয়েছে—তাদের পেট-পুরে খেতে পাবার সুযোগ দিলে প্রভুদের বিরুদ্ধেই তারা লড়তে যাবে। তাই ওদের শক্তি এমনি করে তিলে তিলে মৃত্যু। তোমরা পৃথিবীর বুকে চালাও তোমাদের বিজয়রথ, আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়ার সর্বস্ব জুড়ে, কিন্তু মানুষের মুখের সামনে হতে তার গ্রাস ছিনিয়ে নিয়ে তিলে তিলে মারবার অধিকার কে দিয়েছে তোমায়? এতই যদি ভীরু, দূর দূরান্তরের উপনিবেশ হারাবার এতই যদি ভয় তোমাদের—এসো না, এদের বাঁচাতে দাও মানুষের দাবীতে।

প্রমথ আর সকলেই ফিরে আসছে—গ্রামে একটা বাড়িতে ঠাঁই মিলতে [illegible] থাকবার। সুনীলও যেন এখান হতে যেতে পারলে বাঁচে। ওদের চোখের তীব্র চাহনি হতে সরতে পারলে বাঁচে সে।

অস্পষ্ট অন্ধকারে দিনকয়েকের আস্তানাটায় চোখ বুলিয়ে নেয় সুনীল। কোন পরিবারের বাইরের বাড়ির একটা ঘর। দাওয়াতে বৃষ্টির জল চুঁইয়ে পড়ে খাল হয়ে গেছে। ঘরের মধ্যে জীর্ণ বাঁশ কাবারির ওপর কোনরকমে পচা খড়ের একটু প্রলেপ। ফাঁক দিয়ে দিব্যি দেখা যায় অসীম উদার তারাখচিত আকাশের নীলাঞ্চল। চারিদিকের পাঁচীল ছাওয়ান অভাবে গলে পড়েছে। উঠানে জন্মেছে আগাছার জঙ্গল। তাদের পায়ের শব্দ পেয়ে ওলবনের মধ্য দিয়ে কি যেন একটা সড় সড় করে সরে যায়। লাফ দিয়ে ওঠে প্রমথ; নীরেন হাসে।

—'ও কিছু নয়, সাপ-টাপ হবে বোধ হয়।'

উঁচু গয়েশ্বরী আর কয়েকটা শালপাতায় করে জোটে পোড়ামুড়ী আর কাঁচা লঙ্কা। সারাদিন না খাওয়া—পথচলার পরিশ্রম, খিদেতে নাড়ীগুলো চন চন করছে,—তাই যেন অমৃত মনে হয়। সামনে দাঁড়িয়ে বাড়ির কর্ত্রী, বর্ষীয়সী মা প্রবীণা, সারা দেহের মাঝে চোখ দুটোই যেন অস্বাভাবিক দ্যুতিসম্পন্ন। সুনীলের খাওয়া দেখে বলে ওঠেন—'বৌমা আর যদি মুড়ি থাকে—?'

সুনীল মাথা নাড়ে—'না—না—'

ঘরের দিকে চেয়েই মা বলে ওঠে—'তাছাড়া আর নাই বাছা, আজ ওরাও সব আসবে কিনা—"

"কারা?"

প্রমথের প্রশ্নে মা হঠাৎ চুপ করে যান; তাকে চুপ করতে দেখে সকলেই একটু বিস্মিতও হয়ে যায়। নীরবে মুড়ি চিবোতে থাকে তারা। সামান্য মুড়ি আর কাঁচা লঙ্কা, অজ্ঞাত কোন পাড়াগাঁয়ের এক মায়ের আদরে তাই যেন অপূর্ব স্বাদমাখা হয়ে যায়।

রাত্রি কত জানে না। সকলেই ঘুমে অচেতন। হঠাৎ উঠানে কাদের লঘু পায়ের শব্দ, চাপা কথাবার্তা শুনে ঘুম ভেঙে যায় সুনীলের। তার ঠেলায় প্রমথও উঠে পড়ে। জানলার ফাঁক দিয়ে কাদের যাতায়াত করতে দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়—'কারা ওরা?' রাতের অন্ধকার ভেদ করে কানে আসে মায়ের কণ্ঠস্বর। কি যেন বলছেন তাদের।

আবার সব চুপচাপ। ওরা একে একে মিলিয়ে গেছে রাতের অন্ধকারে। সুনীলের সারা মনে চিন্তার ছায়া, ঘুম আসে না।

আশে-পাশের গ্রামে বেশ যেন কিসের ছোঁয়া লেগেছে অনুভব করে তারা। যুবক ছেলে বড় একটা দেখা যায় না। রয়েছে গ্রামে ছেলে না হয় মেয়ের দল। মেডিকেল রিলিফ কোরের কর্মীদের কাজ তবুও কমে নাই। প্রায়ই দেখা যায় [illegible]—নয়ত ম্যালেরিয়া বা আর কিছুতেই [illegible] তারা।

ওরা আজ রাউণ্ডে বেরিয়েছে, বাড়ীতে রয়েছে সুনীল। কোন কেস পত্তর এখানে আসতে পারে। তা ছাড়া ওদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও করতে হবে তো। কোন রকমে তিনখানা ইট বার করে কাঠ দিয়ে উনুন জ্বালাবার কসরৎ করে হাঁড়িটা চাপিয়েছে। এতক্ষণ বেশ ছিল, কিন্তু ভাত নামাতে গিয়েই হয়েছে বিপদ। হাঁড়ি ভেঙে গেছে অথচ না নামালেও উপায় নাই। ভাত ধরে যাবে।

পোড়া ভাতের গন্ধ নাকে যেতেই মা একটু আশ্চর্য হয়ে যান। তাড়াতাড়ি বাহির বাড়িতে আসতেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়। তারই বাড়িতে থেকে রিলিফ ওয়ার্কে এসে হাত পুড়িয়ে খাবার আয়োজন। মনটা কেমন হয়ে যায়। আজ তাদের অভাব সত্য, কিন্তু এটুকু ত্যাগ করা অভ্যাস তাদের আছে।

—এসব কে করতে বলেছে তোমাকে?

আমতা আমতা করতে থাকে, ভাতের হাঁড়ির দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই বাধা দেন মা—থাক, হাতটা আর পোড়াতে হবে না, কি জবাব দেবে মায়ের কাছে বাড়ি গিয়ে—ওটা আমিই দেখছি।

সুনীল যেন সমস্যার হাত হতে রেহাই পায়। মা ফ্যান ঝাড়তে ব্যস্ত। বাইরে কার ডাক শুনে বার হয়ে আসে সুনীল। বিব্রত হয়ে যায় রিলিফ ওয়ার্কে এসে এসব হাঙ্গামা যে আসতে পারে, এ ধারণা তার ছিলনা। দারোগাবাবু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন তার দিকে। বলে চলেছেন তিনি—এ এলাকায় কার পারমিশনে এসেছেন আপনারা? জানেন 'প্রসিকিউট' করতে পারি আপনাদের।'

সুনীল বলবার চেষ্টা করে তাদের আগমনের উদ্দেশ্য কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে নয়—এসেছে তারা মেডিক্যাল রিলিফ ওয়ার্কে।

দারোগা ধমকে ওঠেন—"ওই একই কথা, আর কতজন এসেছেন? আজ সন্ধ্যায় থানায় যেতে হবে আপনাদের—"

হঠাৎ মাকে বার হয়ে আসতে দেখে দারোগা সাহেব একটু অপ্রস্তুত হয়ে যান। সুনীলও মাকে এমনভাবে আসতে দেখে একটু অবাকই হয়ে যায়! দারোগা সাহেব কি যেন বলবার চেষ্টা করে আপনা হতেই সরে যান। সুনীল মায়ের তেজোদৃপ্ত মূর্তির দিকে চেয়ে থাকে!

মা বলে চলেছেন—"কুকুর কোথাকার—"

বিচিত্র এদেশের মাটি, প্রতিটি আবাল-বৃদ্ধবনিতার মনে কি যেন আশার আলো! কোন দুর্বার শক্তিতে এরা মাথা তুলে দাঁড়াতে চায়। কোন পাশবিক শক্তিই এদের মনের অদম্য উৎসাহ নিভিয়ে দিতে পারে না! এর গহন অরণ্য পার্বত্য বন্ধুর মৃত্তিকার বুকে বন-গড়ানি গভীর খাল-খন্দ-প্রকৃতির বাধা-বিপত্তি আজ এদিকে সাহায্য করছে বাঁচবার নোতুন আলোর।

কালকের রাত্রির ঘটনাটা মাকে বলতেই তিনি যেন কেমন হয়ে যান! খানিকক্ষণ ওদের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলে চলেন তাদের কাহিনী! কারা ওরা?

বন্ধুর মৃত্তিকাকে কি যেন অপূর্ব মায়ায় ওরা ভালবেসে ফেলেছিল জানে না! এই নদী কঠিন কাইসারাইট কলো-মাইটের সম্পদভরা মৃত্তিকা—ঘন সবুজ দিগন্ত ছোঁয়া শালবনসীমা শস্যশ্যামল ক্ষেত তাদের শিরার রক্ত। এরই বুকে চলবে বিদেশীর অধিকার—তারই সন্তানদের উপর চলবে এ তাদের উদ্ধত রক্তচক্ষুর আস্ফালন—কোন্ আইনে? সেই বাঁধন-ছেঁড়ার মুক্তি-যজ্ঞের আহ্বানে সাড়া দিল দেশের প্রতিটি যুবক—প্রতিটি নারী—প্রতিটি মা!

দলে দলে গ্রাম ছেড়ে যোগ দিল তার মুক্তিব্রতে! আর সে বাড়ির ছেলে নয়, দেশ-মাতৃকার সন্তান! কত স্ত্রী এগিয়ে দিল তাদের স্বামীকে—মা বিদায় দিলেন ছেলেকে—নিরক্ষর কৃষক সেও এগিয়ে এল! হলুদে রঙ করা কাপড় পরিয়ে সদ্যস্নাত পুত্রকে মালা পরিয়ে নাম লিখিয়ে দিয়ে গেল তেরঙা ঝাণ্ডা খাড়া করা অফিসে!

"প্রমথ-সুনীল ভাবে আজ তারা কোথায় সামান্য একটু ত্যাগ স্বীকার করে দিনকতক কলকাতার বাইরে এসে সেবা করে দেশোদ্ধার করে যাবে! আর এরা? এদের সাধনা কত বড়? কে জানে এ-সাধনার সিদ্ধিলাভ হবে কবে? রাত্রির তমিস্রা কি দিনের সোনালি আলোয় ঝলমল করে উঠবে না?

......মা বলে চলেছেন! আজও তাঁর চোখের সামনে ভাসে কত দুঃখ-দারিদ্র্য অত্যাচারের কাহিনী। বড়ছেলে পাঁচ বৎসর পর হিজলী জেল হতে খালাস পেল, বৌমার কত আশা, কত আনন্দ, আবার তাদের সংসার ফুলে-ফলে ভরে উঠবে! মায়ের মনে আশার আলো; ছোট ছেলে তিমিরও পাশ দিয়েছে মেদিনীপুর কলেজ হতে!

......হঠাৎ এমনি দিনে সাড়া পড়ল আবার দিকে দিকে মহামরণের আহ্বান। পর পর দুবছর অজন্মা। কাঁসাইয়ের বানে ভেসে গেল বাড়িঘর, মাঠের লকলকে ধানের চারা হলদে হয়ে পচে গেল চোখের উপর, গাছের গায়ে লাগল এসে দূর-দূরান্তরের গ্রামের পচা বিকৃত মৃতদেহের রাশি। এল শকুনযূথের মহামেলা!

মহামারী-মন্বন্তর, সর্বনাশার দল আবার বার হল পথে। জীবনের শেষ নিঃশ্বাসে বিষিয়ে উঠল মহাব্যোম। এও সহ্য হয়েছিল। কিন্তু দলে দলে যেদিন বিতাড়িত হল তারা তাদের গ্রাম হতে স্ত্রীপুরুষের হাত ধরে; নিঃসহায় পিছনে পড়ে রইল শস্যশ্যামল উর্বর ক্ষেত ফসলের ইসারা—আগত যুদ্ধের সমারোহে তারা পরিণত হল প্রাণহীন ল্যাণ্ডিং গ্রাউণ্ড না হয় মেটে রংয়ের ব্যারাকের সারিতে!

এমনি দিনে সর্বহারা দেশের বুকে জাগল আবার ঝড়ের সংকেত; ঘরে-বাইরের ক্রমাগত আঘাত আজ এগিয়ে দিয়েছে তাদের শেষ আঘাত হানার সংকল্পে। গ্রামে গ্রামে চলেছে দুর্ভিক্ষ মহামারীর করাল স্পর্শ, দেশের কঠিন শাসনভার, তারই মাঝে চলেছে সর্বহারা অভিযান। মায়ের অশ্রুধারা—বীরের রক্তস্রোত সবকিছু মিলে বন্ধুর পথরেখা বিস্তারিত হয়েছে দূর-দূরান্তরে!

মা চুপ করেন। সুনীল-প্রমথ যেন স্ব-

দেখছে। তারা স্বপ্নেও কল্পনা করেনি নিরীহ গ্রামের রোগপ্রপীড়িত আর্তদের অন্তরালে রয়েছে আরও কোন মুক্তিব্রতের পূজারীর দল।

রাত্রি কত জানে না। সারা গাঁখানার বুকে নেমে এসেছে নিথর নীরবতা। মাঝে মাঝে দু-একটা কুকুর সচকিত করে তোলে রাতের স্বপনালু নিদ্রা। আবার সব চুপ চাপ! মুখ বুজে সারা পৃথিবী যেন আগামী ধ্বংসপুরীর রূপকথা শোনে।

......মোমবাতি জ্বালিয়ে ওষুধের ফর্দটা শেষ করে চলেছে সুনীল। পাশে খবরের কাগজখানা পড়ে রয়েছে......ওটা যেন কোন নেশার স্বাদ এনে দেয় সারা মনে। মাটির বুক হতে মৃতদেহের পূতিগন্ধ এখনও যায়নি! চোখ বুজে মনে পড়ে বাঙলার মন্বন্তরের অশ্রুসজল দৃশ্য। তারই মাঝে জন্ম নিয়েছে কোন্ মহাকাল—গলিত শবাস্থির মাঝে কোন্ দধিচীর হাড় লুকোন ছিল আজ তাই বজ্র হয়ে উঠেছে।

সারা ভারতের বুকে লেগেছে বিপ্লবের ছোঁয়া, আকাশ-বাতাস ভরে গেছে টিয়ার গ্যাস—লুইস গানের বিষাক্ত বারুদের গন্ধে! বেলগাঁ—বিহার—বোম্বাই সারা দেশে সেই বাঁধন-ছেঁড়ার সমারোহ। তার ছোঁয়া হতে বাঙলাও বাদ যায়নি। গভীর ঘুম তার কোন্ ঘুম-ভাঙানিয়া গানে ভেঙে গেছে। তারও পথে-প্রান্তরে উন্মত্ত জনতার বিক্ষোভ। আকাশ হতে বুভুক্ষু দৃষ্টিতে নেমে আসে বোমারু বিমানের ঝাঁক। পথ নাই, আকাশ হতেই ঝলকে ঝলকে মৃত্যুবিষ ছড়িয়ে যায়।

দূর দিগন্ত কিসের আলোয় রাঙা হয়ে গেল। নীরবতা ভেদ করে কানে আসে কিসের তীক্ষ্ন শব্দ; কোলাহল ক্রমশ মিলিয়ে গেল। গ্রামের পথটা মুহূর্তের মধ্যে সচকিত করে বার হয়ে গেল একটা লরী, আবার সব নীরব।

একা সুনীলের মনটা কেমন করে ওঠে। ওরা ঘুমুচ্ছে—একা জেগে আছে সে। মোমবাতি নিভিয়ে দিয়ে চোখ বুজবার চেষ্টা করে।

সহসা দরজায় কাদের করাঘাতে ঘুম ভেঙে যায় সুনীলের। ধড়মড় করে উঠে বার হয়ে আসতেই একটু বিস্মিত হয়ে যায়। মা দাঁড়িয়ে—ও-পাশে আরও দুজন। অস্পষ্ট অন্ধকারে ঠিক চেনা গেল না। মায়ের কণ্ঠস্বর কেমন যেন অস্বাভাবিক রকম ভারী। একজন এগিয়ে আসে। তাকে যেতে হবে একবার এখুনিই, বিশেষ দরকার। আশ্চর্য হয়ে যায় সুনীল, মায়ের ব্যাকুল অনুরোধ, না—সে যাবেই। এই গভীর নিশীথেই অপরিচিত দুজনের সঙ্গেই যাবে। তাদেরই একজন ডাক্তারী ব্যাগ—ওষুধপত্রগুলো তুলে নেয়। সুনীল দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বার হয়ে গেল।

রাস্তাটা ছেড়ে চলেছে তারা। মাঝে মাঝে হাঁটুভর জলকাদা। সাঁকো আর একটাও আস্ত নাই। কারা উড়িয়ে দিয়েছে। সামনে দূরে দিগন্তে একটা আলো কয়েকবার নিভছে-জ্বলছে ক্রমাগত। ঠিক টেলিগ্রাফের কোডের মত—টরে টক্কা!...জ্বলল নিভে গেল; আবার!...আবার!!

আলোটা দেখেই সঙ্গের দুজন ছেলে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে আলোর নীচে কাদা ঘাসের মধ্যেই সুনীলও বাধ্য হয়ে শুয়ে পড়ে। আলোটা নিভে গেছে দূরে!! রাস্তায় শোনা যায় কিসের গুরু গুরু গর্জন সারি সারি চলেছে কয়েকটা পুলিশের গাড়ির তীব্র হেড-লাইটের সন্ধানী আলো, ঘুরে বেড়ায় চারিপাশে, নিশ্বাস বন্ধ করে পড়ে থাকে তারা। এগিয়ে চলল গাড়িগুলো।

কতক্ষণ চলেছিল জানে না। ঘন বনটার মধ্যে ঢুকে গাটা ছম ছম করে ওঠে সুনীলের। সঙ্গের ছেলেটি বলে ওঠে, ভয় নাই; জন্তু-জানোয়ার নাই এখানে।

কোমরের কাছ হতে কি একটা টেনে বার করে সে। কালো ছোট পদার্থটা। চমকে ওঠে সুনীল! রিভলবারই হবে বোধ হয়।

জায়গাটা বোধ হয় 'সোল' কাছিমের পিঠের মত নেমে গেছে। এই ঠাঁইটুকুতেই শালগাছ-গুলো বিশাল দীর্ঘ হয়ে উঠেছে। কোনরকমে ঠেলে প্রবেশ করতে হয়। সামনেই কাকে এগিয়ে আসতে দেখে থমকে দাঁড়ায় সুনীল। সঙ্গে ছেলে দুজনকে দেখে সে পথ ছেড়ে দিল। এগিয়ে চলল তারা।

খড়ের ছোট ঘরখানায় পড়ে রয়েছে কার অচেতন দেহ। কাঁচের তেলের প্রদীপটা ম্লান লালাভ শিখায় ভরিয়ে তুলেছে ঘরটা; কাপড়টা তুলতেই চমকে ওঠে সুনীল। তীক্ষ্ন বুলেটটা পাঁজরের পাশ দিয়ে ঢুকে পিঠের নীচে বার হয়ে গেছে। দমদম বুলেটই হবে বোধ হয়। কাপড়টা রাঙা হয়ে গেছে। মাটির কাছে ফোঁটা ফোঁটা জমাট রক্তের দাগ!

করবার কিছুই নাই। শেষ নিঃশ্বাস বার হয়ে গেছে অজ্ঞাতেই। জীবনের শেষ রক্ত-বিন্দু দিয়ে এঁকে গেল মাটির বুকে তার স্বার্থ-ত্যাগের ইতিহাস। ব্যাণ্ডেজটা শেষ সময় খুলে দেয় সে। রক্তে ভেজা আইডোফরম গজটা পড়ে থাকে মাটিতে। সুনীলের চোখে আসে অশ্রু-রেখা! সব শেষ।

নীরবে বার হয়ে আসে মাথা নামিয়ে। প্রভাতের আলো বনের উপর সবে ফুটে উঠেছে। পাখীর ঘুমভাঙা শব্দে জেগে ওঠে আরণ্যক দেবতা। আটচালার উপর তেরঙ্গা নিশানটা অর্ধেক নামিয়ে দেওয়া হ'ল কোন শহীদের শোকচিহ্নরূপে!

ধীরে ধীরে বাইরের জগতে পা বাড়াল সুনীল।

কোনদিনই ভুলতে পারবে না সুনীল। সভ্যজগৎ কোনদিনই জানবে না ওদের। কোনদিনই ওদের রক্তে রঞ্জিত ইতিহাস পৌঁছবে না জাতির কাণে। তবু ও তাদের ভুলতে পারবে না। সভ্যজগতের হাসপাতালের এণ্টিসেপটিক—ক্লোরোফরম্, স্কিলফুল অপারেশন কোনদিনই তাদের জীবনে আসবে না—এমনি করেই বনে পর্বতে তিলে তিলে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে দেশের মৃত্তিকা উর্বরা করে যাবে। আজ তাদেরই কাছে মাথা নীচু করে নিজেকে ধন্য মনে করে।

ক্লান্ত পাদবিক্ষেপে এগিয়ে চলে গ্রামের দিকে। সারা রাস্তাটায় একটা চাঞ্চল্য। বার কয়েক তাকে থামিয়ে পুলিস জিজ্ঞাসাবাদ করে। চারিদিকে বেশ একটা উত্তেজনার ভাব—আকাশ-পথে কয়েকটা প্লেন খুব নীচু হয়ে ঘুরে বেড়ায় কিসের সন্ধানে।

গ্রামেও বেশ একটা সন্ত্রস্ত ভাব। প্রমথ ওরা সকলে বেশ খোঁজাখুঁজিই শুরু করেছে তার জন্য। কোথায় গেছে, কখন গেছে। তাকে ফিরতে দেখে সকলেই শান্ত হয়; কিন্তু কালকের রাত্রের কাহিনীটা প্রকাশ করে না সুনীল—চুপ করেই যায়। কে জানে যদি ছড়িয়ে যায়—পুলিসের কানেও যাবার ভয় আছে।

বাড়ির ভিতর হতে মাও শশব্যস্তে বার হয়ে আসেন। তাকে দেখেই চমকে ওঠে সুনীল। তার সারা মুখে চোখে থমথমে ভাব, চোখ দুটো লাল। হয়ত কাঁদছিলেনই। তার ডাকে বাড়ির ভিতরে গেল সুনীল।

ভিতরে পা দিয়েই নীরব কান্নার শব্দে সচকিত হয়ে যায়। বৌদি কাঁদছে; তাকে দেখলে চেনা যায় না। শাড়ির বদলে পরণে আজ থান। হাতের শাঁখা নোয়া নাই। দাওয়ায় বসে রয়েছে কালকের রাত্রের সেই ছেলেটি—তিমির। তার অশ্রুপূর্ণ চোখে আজ প্রতিহিংসার তীব্র জ্যোতি! ধীরে ধীরে ব্যাপারটা বুঝতে পারে।

ছেলের শোচনীয় মৃত্যু সংবাদ। মা একবার চোখে দেখতেও পেল না। স্ত্রীর চোখের জল—চোখে মিলিয়ে গেল।......মা নীরবে চোখ মোছেন। সুনীলের চোখে ভেসে ওঠে রক্ত-রঞ্জিত কার শেষাবশেষ। দুঃখেও আজ কাঁদবার উপায় নাই। দুপুরেই চলে [illegible] তিমির, আজ তাদের অনেক কায। এর প্র[illegible] আছেই।

সারা গ্রামে তোলপাড় চলছে। [illegible] কাল রাত্রে কনভয়ের উপর কোথা হতে আক্রমণ করে কারা গাড়ি সব জ্বালিয়ে দিয়েছে। লুঠ করে নিয়েছে রসদপত্র, কিছু অস্ত্রশস্ত্রও। অপরাধীর সন্ধানে পুলিস ব্যস্ত। গাড়ি গাড়ি সৈন্য সদর্পে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জিপগুলো তীব্র-বেগে ছুটোছুটি করছে ব্যস্তসমস্তভাবে। গ্রামখানাতে শুরু হয়েছে খানাতল্লাস।

পুলিসের সামনে মাকে আসতে দেখে রূঢ়-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন অফিসার—"ছেলেরা কোথায়?"

'জানি না।'

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন অফিসার মায়ের দিকে। সুনীলদের ওষুধের বাক্স সাজসরঞ্জামগুলো ঘেঁটে-ঘুঁটে দেখতে থাকেন। টবের বাক্সবেঝাই ওষুধগুলো জুতোর ঠোক্করে নড়ে ওঠে! তাদের সন্ধানই শেষ হয় না। যাবার আগে ভাল করে শাসিয়ে যায়—

'You will not be spared even—'

সুনীলরা দাঁড়িয়ে থাকে নীরবে।

যাবার আগে তারা কয়েকজন বুড়োকেই টেনে নিয়ে গেল। যেমন করে হোক একটা কিনারা করতেই হবে।

বাড়িতে জমায়েত হয়েছে গ্রামের আবালবৃদ্ধ-বণিতা। সারা গ্রামে সমর্থ পুরুষ বলতে কেউ নাই। মা সকলকে বোঝাবার চেষ্টা করেন। কারুর চোখে জল, কেউবা নীরবে কেঁদে চলে। এমন শ্মশানপুরীতে বাস করা অসম্ভব। দু'চারদিন পর না খেয়েই মরতে হবে। এই সময় গ্রাম ছেড়ে যাওয়াই ভাল। প্রতিবাদ করেন মা—

"না! না খেয়ে মরব—তবুও ওদের অত্যাচারে গ্রাম ছাড়ব না। যার জন্য আজ আমাদের ছেলেরা দলে দলে বুক পেতে দিয়েছে ওদের গুলীর সামনে, তাদেরই মা হয়ে আমরা যাব ভিক্ষে করতে ওদেরই দরজায়—?"

সকলেই নীরব।

নির্জন গ্রামখানার বুকে নেমে আসে রাতের অন্ধকার। পথে কেউ নাই। যেন কোন পরিত্যক্ত গ্রাম। যুদ্ধ-সীমানায় কোন এক জনহীন গ্রামের মতই নির্জন—নীরব, মৃত ওই গাঁখানা। ছেলেগুলোও কাঁদতে ভুলে গেছে। কুকুরগুলোও নীরব। রাতের তারা ওঠে শিউরে। মুখ বুজে প্রতীক্ষা করে তারা কোন আগত রুদ্র-ভৈরবের তাণ্ডব নর্তনের।

কানে আসে তখনও কার চাপা কান্নার শব্দ। সত্যই বৌদির জন্য দুঃখ হয়। তবে জীবনের আদর্শ কি নিজেকে ছাপিয়েও বড় হয়ে উঠেছে। কোন্ আশার আলোয় কাটবে তার সারাজীবন। তাই আজকের রাতের আঁধারে ওর [illegible]হীন ক্রন্দন সব কিছু ছাপিয়ে প্রকাশ হয়ে ওঠে। ময়ের সামনে আছে কোন আলোকোজ্জ্বল সোনার দেশের কল্পনা, তিমিরের সামনে রয়েছে মুক্তির আস্বাদ, আর ওর?—বালুচরের খেলাঘর নদীর ঢেউএ ভেসে গেছে। শেষ ফাল্গুনের ঝরে-পড়া ফুলদল শুধু বিদায় গানই গেয়ে যায়। তাই ও কাঁদে—

ওকি! কান্নার শব্দ ছাপিয়ে আসে কানে কাদের সমবেত কণ্ঠের জয়ধ্বনি। রাতের অন্ধকার ওঠে শিউরে। দরজা খুলে বার হয়ে আসে তারা। আগুনের লেলিহান শিখায় সারা আকাশ ছেয়ে গেছে! বাঁশের গাঁটফাটার শব্দ। মাঝে মাঝে কোথা হ'তে শোনা যায় ক্রুদ্ধ রাইফেলের গর্জনধ্বনি! জয়ের আনন্দে ওরা মাতাল হয়ে গেছে।

থানা—রেজেষ্ট্রী—অফিস ব্যারাকগুলো দেখতে দেখতে জ্বলে ওঠে। আকাশের বুকে শোনা যায় জঙ্গী বিমানের ক্রুদ্ধ গর্জন! যে যেদিকে পারে সরে পড়ে! নৈশ অন্ধকারে শোনা যায় মেসিনগানের শব্দ—কট্ কট্ কট্-কট্। প্রত্যুত্তর দেয় জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড হ'তে বাঁশের গেরো ফাটার শব্দ!

মায়ের কণ্ঠস্বরে সচকিত হ'য়ে ওঠে তারা। এখুনিই বার হ'য়ে যেতে হবে।

কাল সকালে আসবে পুলিশ — হয়ত মিলিটারী। চলবে শাসনের শান্তিরক্ষার মহড়া। হাঁটাপথে বার হয়ে যেতে হবে। চাঁদপাড়া—চন্দ্রকোণা—গড়বেতা সব পথটাই জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে যাবার সুবিধা আছে। মায়ের আদেশ। তাদের বার হয়ে যেতেই হবে। তাদের জীবনের দাম অনেক।

সময় নাই।

আর কোন দিনই আসবে না হয়ত। তবুও তাদের মনে থাকবে এই কয়েকটি দিনের কাহিনী। যদি কোনদিন স্বাধীনতার পূজারী-দের দেখতে চাও—এদের মনে রেখ।

সরু পথটার দুদিকে শাল পলাশ বনের নিশানা। রাতের আকাশে শুকতারা তখনও দেখা দেয়নি। দপ্ দপ্ করে কাঁপছে মাথার উপর নীলাভ একটা তারার দ্যুতি। কোন্ দূর দিগন্তে শোনা যায় প্লেনের নীলাভ মিট্-মিটে আলোর অন্তরালে দুরু দুরু গর্জন, অজানা পথে পা বাড়ায় তারা।

গড়বেতার কাছে বগড়ী নদীর ধারে মশালের আলো ফুটে ওঠে। উঁচু ঘোঁণ্ড খাড়ির অতলে বহে চলেছে ক্ষীণস্রোতা নদীর রেখা। মাটির বুকে কেটে বসে গেছে। নীচু হতে স্তরে স্তরে উঠে গেছে কাইসারাইট—ডলোমাইট—কাইনাইট—পোর্সিলিনের চক্‌চকে স্তর। প্রকৃতির অক্ষয় সম্পদের রাশি—উপরে তার রক্তাক্ত গৈরিকের প্রলেপ।

সকালের সোনালী আলোয় মনে হয় তাদের এতদিন যেন কোন্ স্বপ্নপুরীতেই ছিল তারা, আজ ঘুম ভেঙ্গে গেছে। গাড়িখানা সশব্দে পুল পার হয়ে এগিয়ে চলে গড়বেতার পানে। সুনীলের মনটা সত্যিই কেমন করে ওঠে। কে জানে দূরে সেই বনভূমির অন্তরালে সামান্য গ্রামে এখন কি চলেছে।

* * * * * *

কাগজের পাতাগুলো ভরাট করে চলে দিনের পর দিন। দেশবিদেশে কোন্ উন্মত্ত জাগরণের কাহিনী। এত বড় বাঙলার মাঝে চাঁদপাড়া—নোতুনগাঁয়ের কোন নাম নেই। কেউ তাদের চেনে না।

......কয়েকটা মাস কেটে গেছে।

সেদিনের কথাগুলো সুনীলের মনে ভাসে স্বপ্নের মত। আজও ভুলতে পারেনি সেই রাত্রির দৃশ্য। রক্তাক্ত পাঁজরের পাশে বুলেটের দাগ। কুঁচড়া তেলের লালাভ ম্লান আলোয় আইডোফরম গজটা রাঙ্গা হয়ে ওঠে দেখতে দেখতে। রক্তে মাটির বুক ভিজে যায়।

হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারটা দেখলেই অকারণে কেমন যেন মনে পড়ে। যাদের জীবনের কোন দামই নেই, বাঁচে তারাই। যারা জীবনের জয়গান গেয়ে গেল যুগে যুগে তারা জীবনের মাঝেই টেনে যায় মৃত্যুর পরিক্রমা।

মেট্রনের ডাকে তৈরী হয়ে নেয়। একটা মেজর অপারেশন আছে। ক্লোরোফরম রেডি—পেসেণ্টের মুখের উপর গ্যাসমাস্কটা নেমে আসছে ধীরে ধীরে। বাঁ হাতটা গুলীতে ঘা হয়ে সেপটিক হয়ে গেছে। 'এম্পুট' করতেই হবে। স্পটলাইটের আলোয় পেসেণ্টের মুখখানার দিকে ভাল করে চাইতেই চমকে ওঠে। একি! হাতটা কেঁপে যায়! এমনি একটা ঘটনা ঘটেছিল চাঁদপাড়ার নির্জন বনে। প্রদীপের ম্লান আলোয় রক্তরঞ্জিত মাটির বুকে।

না, আজ সে আর তেমন হতে দেবে না। কপালে ফুটে ওঠে বিন্দু বিন্দু ঘামের রেখা, ক্ষিপ্রহস্তে মেট্রনের ট্রে হতে একটার পর একটা যন্ত্র তুলে নেয়।

ক'দিন পর জ্ঞান ফেরে তিমিরের।

অন্ধকার বনের ফাঁকে সরু রাস্তা। গ্রামের উপর চলেছে পাশবিক অত্যাচার। সারা গ্রামে আগুনের লেলিহান শিখা। কানে আসে কাদের আর্তনাদ। হয়ত তাদেরই মা, বোন, আরও কত কে। তারা কি দাঁড়িয়ে সহ্য করবে! না!!

রাইফেলগুলো গর্জে ওঠে সশব্দে। লক্ষ্য ব্যর্থ হয়নি। হাতের ট্রিগারটা টিপেই অনুভব করে তিমির ঘূর্ণায়মান সিসার তীক্ষ্ণধার বুলেটটা আটকে গেছে নরম যেন কিসের মধ্যে। অন্ধকারে ফুটে ওঠে আর্তনাদ।

পর পর চলে গুলীর শব্দ। বাঁ হাতটায় প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি।

কনুইয়ের কাছে সার্টটা ভিজে যায় রক্তে। তীব্র যন্ত্রণা। চোখের সামনে অসীম শূন্য। দাদার যন্ত্রণাকাতর রক্তরঞ্জিত সেই মূর্তি! মা—!! আর কিছু মনে নেই।

ক'দিন পর জ্ঞান ফিরেছিল মেদিনীপুর সদর হাসপাতালে। সে আজ দু'মাস আগেকার কথা।

বাঁ হাতটা অবশ হ'য়ে গেছে। বিক্ষোভকারীদের ক'জন পুলিশের গুলীতে আহত হয়েছিল; তিমির তাদেরই একজন।

বিছানায় বসে নীরবে শুনে যায় সুনীল তিমিরের কথাগুলো। জনহীন গ্রামগুলো আর নাই। কি ক'রে আগুন ছড়িয়ে পড়ে সারা গ্রামে। তিমির আরও কয়েকজন আহত হয় সেই রাত্রেই। অনেকেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল সেই অগ্নিশিখায়। মা তাদেরই একজন।

দু'চোখ যেন জ্বলজ্বল ক'রে ওঠে তিমিরের। উস্কোখুস্কো চুল — শুকনো চেহারা প্রতিহিংসার তীব্র জ্বালা! সুনীল কথাগুলো শুনে চুপ করে যায়। সেই রাত্রি হ'তে বৌদির কোন খোঁজ নেই। কে জানে সে বেঁচে আছে কি নেই, থাকলেও কোথায় কিভাবে আছে জানে না তারা।

সুনীলের বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বার হ'য়ে আসে অজ্ঞাতেই। এসব যেন তারই চোখের সামনে ফুটে উঠছে একে একে। এরা যে সব্বাই তার আত্মার আত্মীয়।

পঙ্গু অক্ষম তিমিরের শিরায় শিরায় বয় চঞ্চল রক্তস্রোত, প্রতিহিংসার জ্বালা। কঙ্কালের বুকে যেন প্রাণের জাগরণ। বলে ওঠে সেঃ —কেন বাঁচিয়ে তুললে ডাক্তার, কিসের আশায় বাঁচবো বলতে পারো?'

সুনীলের চোখে আশার জ্যোতি। কথাগুলো বলতে আজ সে আনন্দ পায়— যাদের জন্য শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে গিয়েছে তোমার দাদা, যার সাধনায় কেটেছে এতদিন সেই আগামী দিনের প্রথম আলো, আজ দেখা দিয়েছে তিমির! তোমাদের সাধনা আজ সার্থকতার পথে।"

কে জানে। চারিদিকে আজ সেই সাড়া। তাদেরই ভারতবর্ষ, তাদেরই মাটি—, তাদের দেশে বাঁচবে তারা মানুষের দাবীতে। দেশের শাসন-ভার আসছে তাদেরই হাতে।

...আজ যদি মা বেঁচে থাকত! কোথায় গেছে আজ দাদা! মায়ের অশ্রুজলে, শহীদের রক্তে —তাদের আত্মত্যাগে ত্রিবর্ণ পতাকার বেদীমূল দৃঢ়তর হ'য়ে উঠেছে!

...কী যেন ভেবে চলেছে তিমির!...

বাঙলার গভর্নর স্যর ফ্রেডারিক বারোজ শারীরিক অক্ষমতাহেতু দিল্লীতে গভর্নর-সম্মিলনে যোগদান করিতে যাইতে পারেন নাই। তিনি যেভাবে বাঙলার সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় সম্পর্কে তাঁহার কর্তব্য পালনে অক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, তিনি নোয়াখালি অঞ্চলে হাঙ্গামা সম্বন্ধে বিলাতে যে রিপোর্ট দিয়াছেন—তাহাতে তাঁহার মানসিক সুস্থতা সম্বন্ধেও লোকের সন্দেহ যে ঘটিতে পারে না, এমন বলা যায় না। আর তাঁহার সেই অক্ষমতার সুযোগ সুরাবর্দী সচিব সঙ্ঘ কিভাবে লইয়াছেন ও লইতেছেন, তাহা কাহারও অবিদিত থাকিতে পারে না।

সাম্প্রদায়িকতাদ্যোতক ব্যাপারে অভিযোগ উপস্থাপিত হইলে মিস্টার সুরাবর্দী অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে বলেন—লোকের কথায় বিশ্বাস করিবেন না। কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই জানেন, তাঁহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করা কেবল বাঙলারই নহে, সমগ্র ভারতের লোকের পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ, ১৯২৬ খৃস্টাব্দের কলিকাতার হাঙ্গামা হইতে লোক তাঁহার ভিত্তিহীন উক্তি করিবার প্রবণতার পরিচয় পাইয়া আসিয়াছে।

সেদিন তিনি বলিয়াছেন, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র ঘোষ চৌধুরীর নিকট হইতে নোয়াখালির অবস্থার বিবরণ পাইয়া গান্ধীজী যে তার করিয়াছেন, সংবাদপত্রে তাহা প্রকাশিত হওয়ায় কলিকাতায় হাঙ্গামার অবস্থার অবনতি ঘটিয়াছে। বলা বাহুল্য, সতীশবাবু তাঁহার নিকট যে তার পাঠাইয়াছিলেন, তাহা বাঙলার সংবাদপত্রে প্রকাশ করা তাঁহার অধীন কর্মচারীরা অসম্ভব করিয়াছিলেন। তাহার পরে মিস্টার সুরাবর্দী বলেন, তিনি স্থানীয় কর্মচারীদিগকে তাঁহার সহিত আলোচনা করিতে আসিবার জন্য তলব দিয়াছেন। সে তলবের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লোকের সন্দেহ নাই। আর তাহার পরে তিনি যে বিবৃতি [illegible], তাহা ধৃষ্টতায় অতুলনীয়। তিনি ঐ আলোচনার পরে যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে—

(১) তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারীদিগের ও নোয়াখালির মুসলমানদিগের প্রশংসা কীর্তন ও

(২) সতীশবাবুর ও গান্ধীজীর নিন্দা করা হইয়াছে।

সেই বিবৃতিতে অনায়াসে বলা হইয়াছে :—

তিনি কর্মচারীদিগের কথায় নির্ভর করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, সতীশবাবুর ও গান্ধীজীর মতের কোন ভিত্তি নাই। সতীশবাবু যে সংবাদ পাইয়াছেন, তাহার সত্যাসত্য বিচার না করিয়াই গান্ধীজীর নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। প্রত্যেক ঘটনা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে—সতীশবাবুর প্রেরিত সংবাদ ভিত্তিহীন। আর গান্ধীজীর স্বাভাবিক দৌর্বল্য এই যে, তাঁহার বন্ধু ও কর্মীরা যে সংবাদ দেন, বিচার বিবেচনা বিশ্লেষণ না করিয়া তিনি তাহাই বিশ্বাস করেন।

এই ধৃষ্ট উক্তির পরে তিনি গান্ধীজী প্রমুখ ব্যক্তিদিগকে অযাচিত উপদেশ দিয়াছেন—তাঁহারা যেন উত্তেজনাকারী উক্তি না করেন—তাহার ফল সর্বত্র বিষময় হইতে পারে।

গান্ধীজীর স্বাভাবিক দৌর্বল্য সম্বন্ধে মিস্টার সুরাবর্দী যে উক্তি করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে কোন কথা বলা আমরা অকারণ মনে করি। কারণ, এ দেশের লোক গান্ধীজীকেও জানেন আর মীণা পেশাওয়ারীর ব্যাপার হইতে মিস্টার সুরাবর্দীকেও জানেন। মিস্টার সুরাবর্দীর নিন্দা গান্ধীজীকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। গান্ধীজী নিশ্চয়ই তাহাতে কেবল হাসিয়া মনে করিবেন—এই সুরাবর্দীই একদিন আপনাকে তাঁহার পুত্র স্থানীয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন আর—ঈশপের উপকথার উপদেশ—দুরাত্মার কখন ছলের অভাব হয় না।

সতীশবাবু কিন্তু সুরাবর্দী-বিবৃতি সম্পর্কে এক বিবৃতি প্রদান প্রয়োজন মনে করিয়াছেন :—

তিনি বলিয়াছেন, এ পর্যন্ত তিনি সংবাদপত্রে কোন বিবৃতি প্রদান করেন নাই; কেবল নোয়াখালির ঘটনা সম্পর্কে স্থানীয় সরকারী কর্মচারীদিগকে ও প্রধান সচিবকে সংবাদ দিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে লিখিত পত্রের নকল গান্ধীজীকে পাঠাইয়া আসিয়াছেন। যাহাতে সরকার বিব্রত না হইয়া কাজ করিতে পারেন, সেই জন্যই তিনি কোন বিবৃতি প্রদান করেন নাই। প্রধান সচিব যে বলিয়াছেন, তিনি (সতীশবাবু) সংবাদপত্রে সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা মিথ্যা কথা। প্রধান সচিব জিলার সরকারী কর্মচারীদিগের নিকট হইতে যে সংবাদই কেন পাইয়া থাকুন না—গৃহদাহ, বয়কট, ভীতি প্রদর্শন চলিতেছে। তিনি গান্ধীজীকে ও প্রধান সচিবকে যে সকল তার করিয়াছেন, সে সকল সত্য ঘটনার সংবাদ ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রধান সচিব সে সকল ভিত্তিহীন বলিয়াছেন বটে কিন্তু সতীশবাবু সে বিষয়ে তাঁহার সহিত একমত নহেন। গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্যন্ত স্থানীয় পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে ৯৩টি ঘটনার বিষয় জানান হইয়াছে। সে সকলের বিবেচনা প্রয়োজন। সে সকল হইতে সাম্প্রদায়িক অবস্থার স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। শুনা যাইতেছে, গত অক্টোবর মাসের ঘটনা সম্পর্কে অধিকাংশ অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা চালান হইবে না। ইহা বিশেষ অস্বস্তিকর। যাহারা গ্রেপ্তার হয় নাই, তাহারা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদিগের কাজ বন্ধ করা প্রয়োজন।

সতীশবাবুর বিবৃতি যত মৃদুই কেন হউক না—তাহাতেই প্রধান সচিবের উক্তি যে মিথ্যা তাহা প্রতিপন্ন হয়। এখন জিজ্ঞাস্য; ইহার পরেও কি তাঁহার সহিত সহযোগে কাহারও প্রবৃত্তি হওয়া সম্ভব?

গত ফেব্রুয়ারী মাসের ১৪ই তারিখ হইতে এ পর্যন্ত সতীশবাবু যে ৯৩টি ঘটনার বিষয় জানাইয়াছেন, সে সকল কি প্রধান সচিব অনায়াসে অস্বীকার করিতে পারিবেন? অবশ্য তিনি না পারেন, এমন কাজ হয়ত নাই। কিন্তু লোক তাঁহার কথায় কিরূপে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে?

মিস্টার সুরাবর্দী কিরূপ উক্তি করিতে দ্বিধানুভব করেন না, তাহার পরিচয় কয়দিন মাত্র পূর্বেও পাওয়া গিয়াছে। তিনি যখন বলিয়াছিলেন, নোয়াখালির অবস্থা স্বাভাবিক, তখনই ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন। মিস্টার সুরাবর্দী বলিয়াছিলেন, তিনি যখনই কোন অপ্রীতিকর ঘটনার বা অবস্থার সংবাদ পাইয়া থাকেন, তখনই সে বিষয়ে আবশ্যক ব্যবস্থা করেন। গত ২৪শে মার্চ তারিখে শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লুণ্ঠন, গৃহদাহ, নারীধর্ষণ প্রভৃতির যে ৪০ দফা অভিযোগ মিস্টার সুরাবর্দীকে দিয়াছিলেন, সে সকল যেমন—সতীশবাবুর প্রেরিত ৯৩ দফা অভিযোগ কি তেমনই মিস্টার সুরাবর্দী পান নাই বলিয়া অব্যাহতি লাভ করিবেন, মনে করিতেছেন?

সম্প্রতি শ্রীযুত নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আবার নোয়াখালিতে গিয়াছিলেন। কেবল বাঙলার লোকই নহে—সমগ্র ভারতবর্ষের মুসলমানাতিরিক্ত ব্যক্তিরা তাঁহার বিবৃতির জন্য উদগ্রীব হইয়া থাকিবে। আমরা আশা করি, মিস্টার সুরাবর্দীর দপ্তরের নির্দেশে যদি সে বিবৃতি বাঙলায় প্রকাশ করা অসম্ভব হয়,

তাহা হইলেও অন্যান্য প্রদেশে সে বিবৃতি প্রকাশিত হইবে।

আজ যখন বাঙলাকে বিভক্ত করিবার প্রস্তাব ক্রমেই প্রবল হইতেছে, তখন তাহাতে বাধা প্রদান জন্য সুরাবর্দী সচিব সঙ্ঘের পরিবর্তন ঘটাইবার যত চেষ্টাই কেন হউক না আমরা জিজ্ঞাসা করি—তাঁহার সহিত কে বা কাহারা সচিব সঙ্ঘে যোগ দিতে সম্মত হইবেন?

গত কয়দিন কলিকাতায় যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা কি যে কোন সভ্য সরকারের পক্ষে বিশেষ কলঙ্কের বিষয় নহে?

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ২২শে অক্টোবর তারিখে বোম্বাই শহরে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বাঙলায় দুর্ভিক্ষের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন—ভারতবর্ষ ব্যতীত পৃথিবীর আর কোন্ দেশে দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু হইলেও সরকারকে সে জন্য দায়ী করা হয় না? তিনি বলিয়াছিলেন—যে সরকার সে জন্য দায়ী, সে সরকারের থাকিবার কোন অধিকার নাই। গত বৎসর তিনি বলিয়াছিলেন, বাঙলায় লক্ষ লক্ষ লোকের অনাহারে মৃত্যু অপেক্ষা বলপূর্বক লোককে ধর্মান্তরিত করা তাঁহাকে অধিক বেদনা দিয়াছে। যে সরকার তাহার প্রতীকার করেন নাই, সেই সরকারের সহিত কি কংগ্রেস পক্ষীয় লোক সহযোগ করিবেন?

কলিকাতায় মিস্টার সুরাবর্দীর সরকার পাঠান পুলিশ বহাল করিয়াছেন। কলিকাতার কতগুলি থানায় মুসলমান দারোগা নিযুক্ত করা হইয়াছে, তাহাও জানিবার বিষয়। যে ডেপুটি কমিশনার লোহাকে ব্যবস্থা পরিষদ গৃহের প্রাঙ্গণে একজন সদস্যকে প্রহার করিয়া সুরাবর্দীর আদেশে ত্রুটি স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তিনিই কেন্দ্রী পুলিশ আফিসে আসিয়াছেন। তিনি কোন সংবাদপত্রে তাঁহার প্রাসাদোপম গৃহ নির্মাণের কথা প্রকাশের জন্য মানহানির মামলা উপস্থাপিত করিয়াছেন—সে মামলার কারণ কি তাহা বিবেচ্য। মামলায় তিনি নিরপরাধ প্রতিপন্ন না হওয়া পর্যন্ত কি তাঁহাকে কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগে বিরত থাকাই লোক সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিবে না?

প্রায় পক্ষকাল হইতে কলিকাতায় পুলিশের —বিশেষ পাঠানদিগের সম্বন্ধে যে সকল অত্যাচারের অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে, সে সকল স্তম্ভিত হইতে হয়। পাঠানদিগকে অপসারণের দাবী করা হইয়াছে। আবার কলিকাতার ভূতপূর্ব মেয়র শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—যিনি নিকাশীপাড়ায় মুসলমানদিগকে সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, মুসলমান পাঠানদিগকে বহাল রাখিয়া হিন্দু গুর্খাদিগকে কলিকাতায় হাঙ্গামা দমন কার্য হইতে অবসর দিবার চেষ্টার বিষয় তিনি অবগত হইয়াছেন।

গত পক্ষকালের মধ্যে কলিকাতায় শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার কার্যে যাহারা নিযুক্ত, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে কত অভিযোগ আদালতে উপস্থাপিত হইয়াছে, আমরা আশা করি তাহা লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। যদি না করিয়া থাকে তবে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কি সে বিষয়ে তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট করিবেন?

কলিকাতায় যোগীপাড়ায় গৃহস্থদিগের প্রতি অত্যাচারের যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহার পরে ১০০ নম্বর হ্যারিসন রোডের ঘটনার বিষয় আজ সর্বত্র ঘৃণার সঞ্চার করিয়াছে। অভিযোগ, রাজপথে একটি হাত বোমা নিক্ষেপের পরে প্রায় ১২ জন সশস্ত্র পঞ্জাবী পুলিশ রাত্রি সাড়ে ১০টার সময় ঐ গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহস্থদিগের উপর অকথ্য অত্যাচার করে—একজন মহিলা ধর্ষিতাও হইয়াছিলেন। সর্বসমেত ১৫ জন আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে চিকিৎসার্থ লওয়া হয়। ধর্ষিতা নারীর বিবৃতির পরে তিনি অত্যাচারীকে সনাক্তও করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। ঘটনার তারিখ ১৫ই এপ্রিল। ১৮ই এপ্রিল ব্যবস্থা পরিষদে ঐ বিষয় উত্থাপিত হইলে—তখনও তিনি সবিশেষ সংবাদ লাভ করেন নাই! তিনি বলেন, সরকার সত্য নির্ধারণের জন্য বিশেষ তদন্ত করিতেছেন।

আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি—এক বৎসর পূর্বে তাঁহার সরকার যে নৌকা নির্মাণে বহু অর্থের অপব্যয়ের বা অপসারণের বিষয়ে তদন্ত করিবেন প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, সে প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হইয়াছে কি? নৌকা নির্মাণের জন্য সচিব পত্নী, সচিবদিগের আত্মীয় প্রভৃতি যে ঠিকাদার হইয়া অর্থ লাভ করিয়াছিলেন তাহা ব্যবস্থাপক সভায় বলা হয় এবং ঠিকাদারদিগের নামও প্রকাশ করা হয়। কিন্তু তাহার কোন প্রতীকার হইয়াছে কি?

মেডিকাল কলেজের হাসপাতাল ও থানা সচিব সঙ্ঘের অধীন হইলেও ঘটনার কি বিবরণ সরকার দিবেন?

কলিকাতায় ও হাওড়ায় এখনও অশান্তি ও উপদ্রব চলিতেছে।

গান্ধীজী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তকে যে টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছেন, তাহাতেই প্রকারান্তরে স্বীকৃত হইয়াছে নোয়াখালি অঞ্চলে তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। কলিকাতার অবস্থায় সরকারের শান্তি স্থাপনে অক্ষমতার পরিচয় প্রকট হইয়াছে। কেবল সরকার তাহা গোপন করিবার জন্যই সচেষ্ট।

মধ্যে মধ্যে বোমা নিক্ষেপের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। কোন সম্প্রদায়ের লোক বোমা নিক্ষেপ করিতেছে সে বিষয়ে যেমন সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে, তেমনই উভয় সম্প্রদায়েই উপদ্রব প্রবণতা বর্ধিত হইতেছে কি না, তাহাও বলা দুঃসাধ্য।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে যে অবস্থার আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার কথা বিবেচনা করিলে এ বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, অবস্থা ক্রমেই ভয়াবহ হইয়া উঠিতেছে।

কলিকাতার হাঙ্গামা তদন্ত কমিশন—কার্য স্থগিত রাখিবার সময় যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাও কি ব্যর্থতা ব্যঞ্জক বলা যায় না? তাঁহারা যে কাজ করিবার ভার পাইয়াছিলেন, সেই কাজ যথাবুদ্ধি সুসম্পন্ন করাই কি তাঁহারা কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন না?

মিস্টার সুরাবর্দীর সংবাদপত্রের প্রতি মনোভাবের পরিচয় বাঙলার লোক অনেক পাইয়াছেন। সম্প্রতি তিনি বলিয়াছেন—গান্ধীজী নোয়াখালির অবস্থা সম্পর্কে যে তার করিয়াছেন, সংবাদপত্রে তাহা প্রকাশের ফলেই কলিকাতায় হাঙ্গামা বর্ধিত হইয়াছে!

তখনই বুঝা গিয়াছিল, তিনি আবার সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সঙ্কোচের পরিকল্পনা করিতেছিলেন। গত ১৮ই এপ্রিল তাঁহার অধীন সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের দ্বিতীয় অতিরিক্ত সেক্রেটারী সংবাদপত্রসমূহের সম্পাদকদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন—

সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার ও পুলিশের বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগের জন্য নালিশের বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে। সম্পাদকগণের হয়ত বিশ্বাস, বাঙলা সরকার সংবাদপত্র সম্পর্কে যে সব আইন করিয়াছেন ও আদেশ জারী করিয়াছেন, আদালতের কার্যবিবরণ তাহার আঘাত হইতে অব্যাহতি লাভ করে। কিন্তু সে বিশ্বাস ভুল। আদালতে মামলার বিবরণও ঐ সকল আইনের ও আদেশের বেড়াজালে ধরা পড়ে।

অতএব সাবধান।

তাহার পরে বলা হইয়াছে, ঐ সকল বিবরণ প্রকাশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিপন্ন হয়। অপরাধের বিস্তৃত বিবরণ, আক্রমণকারীর ও আক্রান্তের নাম, নির্দিষ্ট অঞ্চলের নামোল্লেখ সাম্প্রদায়িক সম্বন্ধ তিক্ত করে। অতএব সে সকল প্রকাশ করা নিষিদ্ধ।

এই নির্দেশ যে সর্বতোভাবে বাঙলার মুসলিম লীগ সচিবসঙ্ঘের উপযুক্ত তাহা বলা বাহুল্য।

ডাক্তার হিসাবে আমার একটি উপদেশ...
"ধাত্রীর কাছে জানলাম আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেই আপনার একটি নব শিশু আসছে। খুব আনন্দের কথা। কিন্তু আপনার স্ত্রীকে বিপদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য আজই ঘরে এক শিশি ডেটল নিয়ে রাখবেন।"
পরে
"ডাক্তারের নির্দেশ মত এই ডেটলের শিশিটি এনে রেখেছি। তিনি বলছিলেন বীজানু সংক্রমনের হাত থেকে এটি তাকে রক্ষা করবে।"
"ডাক্তারের কথামত কাজ করে খুব বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। প্রত্যেকটি লোকের কর্তব্য তাঁর স্ত্রীকে সন্তান-প্রসবের পর রোগবীজানুর আক্রমন থেকে রক্ষা করা। ডেটল সত্যি শ্রেষ্ঠ বীজানু প্রতিষেধক।"

'DETTOL'
TRADE MARK

প্র. না. বি.

আমাদের পাড়ার ভুলু সকাল হইতে ভাবিতেছিল আজ সে দি 'হেভেন' সিনেমায় ছবি দেখিতে যাইবে। সেই মহৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া সে যাত্রাও করিয়াছিল—কিন্তু সিনেমা অবধি পেঁাছিবার আগেই সম্প্রদায়বিশেষের ছুরিকাঘাতে আহত হইয়া সে সোজা স্বর্গে চলিয়া গেল। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, এত স্থান থাকিতে ভুলু স্বর্গে গেল কেন? প্রথমত আমরা প্রাচীন কুসংস্কারের বশে ব্রহ্মাণ্ডে যত স্থান আছে বলিয়া ভাবি, বস্তুত তত স্থান নাই। জগতে তিনটি মাত্র স্থান আছে, স্বর্গ, নরক ও সিনেমা। দ্বিতীয়ত, শাস্ত্রে বলিয়াছে 'যাদৃশী ভাবনা যস্য' বাকিটুকু সকলেরই জানা আছে। শাস্ত্র জানিতে আজকাল আর শাস্ত্রজ্ঞ হইবার প্রয়োজন করে না। ভুলুর ভাবনা ছিল দি হেভেন-এর জন্য—কাজেই সে মূল 'হেভেন' অর্থাৎ স্বর্গে চলিয়া গেল। ইহাতে ভুলু খুব যে বেশী খুশী হইয়াছিল, বলিতে পারি না—কে-ই বা হয়?

যাই হোক, সে যাত্রাপথের প্রান্তে দেখিতে পাইল প্রাচীর-ঘেরা জেলখানার মত একটা জায়গা, তবে তার দরজা একেবারে উন্মুক্ত। সে সোজা ঢুকিয়া পড়িল। সে দেখিল রাস্তার দুই পাশে বড় বড় সব বাড়ি—তাহাদের গায়ে 'টু লেট' লেখা কাঠের খণ্ড স্বর্গীয় বাতাসে দুলিয়া ঠুক ঠাক শব্দ করিতেছে। ওই শব্দটুকু শুনিয়া ভুলু বুঝিতে পারিল স্থানটার নিস্তব্ধতা কি গভীর। তখন তাহার প্রথম চৈতন্য হইল যে, আশেপাশে কোথাও লোকজন নাই। সে ভাবিল—এ কোথায় আসিলাম? কলিকাতা শহর নিশ্চয় নয়, সেখানে তো এমন করিয়া 'টু লেট'-এর মাদুলি বাতাসে দোলে না।

কিছুদূরে আসিয়া সে দেখিল, একটি বৃদ্ধ বড় একটা গাছের ছায়ায় চারপায়ার উপর আরামে ঘুমাইতেছে। আরও একটু কাছে আসিলে দেখিল, একি কাণ্ড। গাছের ডালে বাঁধা একটি ভাঁড়ের যুগল রন্ধ্র-নির্গত কি একটা বস্তু ফোঁটা ফোঁটা তাহার দুই নাসারন্ধ্রে পড়িতেছে। একটু হাতে লইয়া শুঁকিয়া দেখিয়া ভুলু বুঝিল উহা আর কিছুই নয়, পৃথিবীতে যাহা শর্ষপ তৈল বলিয়া এক সময়ে বিখ্যাত ছিল, সেই বস্তু। বৃদ্ধের অটোমেটিক নিদ্রা-কৌশল দেখিয়া ভুলু বিস্মিত হইয়া গেল, ভাবিল ইহার পরিচয় না লইয়া যাওয়া হইবে না। নাকে তেল দিয়া ঘুমানো মনুষ্য-জীবনের আদর্শ। কিন্তু নাকে তৈল নিষেক করিতেও একটু পরিশ্রম করিতে হয়—বৃদ্ধ তাহাও বাতিল করিয়া দিয়াছে। ভুলু মনে মনে বলিতে লাগিল ধন্য কৌশল, ধন্য প্রতিভা।

ভুলু বুঝিয়া উঠিতে পারিল না সে কোথায় আসিয়াছে। তখন সে অনেক কৌশল ও অনেক প্রযত্ন করিয়া বৃদ্ধের ঘুম ভাঙাইল। বিরক্ত বৃদ্ধ বলিল—বাপু, একটু বিশ্রাম করিতেছিলাম, তা বুঝি পছন্দ হইল না।

ভুলু বলিল—মহাশয়, চটিবেন না। এ আমি কোথায় আসিয়াছি?

বৃদ্ধ বলিল—এ স্থানের নাম স্বর্গ!

সেখানেত এমন করিয়া To-let-এর মাদুলি বাতাসে দোলে না

কি একটা বস্তু ফোঁটা ফোঁটা তাহার দুই নাসারন্ধ্রে পড়িতেছে

ভুলু পুনরপি শুধাইল—ইহাই কি 'হেভেন?'

বৃদ্ধ বলিল—'হেভেন'ও বলিতে পারো—তবে আমরা স্বর্গ নামটিই পছন্দ করি।

তখন ভুলু বলিল—কিন্তু ছবি কোথায়? কখন ছবি দেখানো হইবে?

বৃদ্ধ বলিল—ছবি আবার কি? যাহা দেখিতেছ তাহাই কি যথেষ্ট নয়?

ভুলু বলিল—আমরা গৌড়বাসী। ছবির পর্দায় কোন বস্তু অনূদিত না দেখিলে আমাদের বোধগম্য হয় না—আমরা জাত-শিল্পী কি না।

নিদ্রাভঙ্গজনিত বিরক্তিভরে বৃদ্ধ বলিল—ছবিটবি এখানে নাই। আর থাকিবেই বা কি প্রকারে? লোকজন কি এখানে কেউ আছে? বাড়িঘর সব খালি দেখিতেছ না? আমি একাই আছি।

ভুলু শুধাইল—মহাশয়ের নাম কি?

বৃদ্ধ বলিল—ব্রহ্মা।

ভুলু চমকাইয়া বলিল—কোন্ ব্রহ্মা?

—ব্রহ্মা আবার কয়জন? সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা।

ভুলু তখন পা ছড়াইয়া বসিয়া উচ্চৈস্বরে বিলাপ করিতে শুরু করিল—এ কোথায় এনু গো? এখানে সিনেমা নেই। এর চেয়ে যে সাঁওতাল পরগণার মাঠ অনেক ভালো। ওগো, ব্রহ্মা তুমি আমাকে কলকাতা শহরে রেখে এসো গো।

তারপরে সে আরম্ভ করিল—

'তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি, তুমি মর্ম
তোমারি প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।'

ভাবের আবেগে কথাগুলি কিছু উল্টাপাল্টা হইয়া গেল।

ব্রহ্মা শুধাইল—ও আবার কি?

ভুলু বলিল—আমাদের জাতীয় সংগীত। খোঁড়া লোক যেমন লাঠি না হইলে চলিতে পারে না, আমরা তেমনি জাতীয় সংগীত ছাড়া বিলাপ করিতে পারি না।

সে আবার আরম্ভ করিল—

'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমলদলবিহারিণী
নমামি তারিণীং
রিপুদল বারিণীং
বহুবল ধারিণীং মাতরং।'

ব্রহ্মা মহেন্দ্র সিংহের মতো প্রশ্ন করিল—কে তোমাদের মা?

গদগদকণ্ঠে ভুলু বলিল—সি-নে-মা।

ব্রহ্মা তাহার মাতৃভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া মনে মনে বলিল—ধন্য মাতৃভক্তি। নিজের মাতা নাই মনে করিয়া তাহার ক্ষোভ হইতে লাগিল। প্রকাশ্যে বলিল—ধন্য তোমার মাতৃভক্তি।

ভুলু বলিল—আমরা গৌড়বাসী! আমাদের মারো, কাটো অনশনে রাখো manhole-এ নিক্ষেপ করো, আমাদের উপর প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ চালাও, সমস্ত দেশটাকে 'নোয়াখালি' করিয়া দাও, কিছুতেই আমাদের দুঃখ নাই—কিন্তু সিনেমায় হস্তক্ষেপ করিলে আমরা সহ্য করিব না কারণ—'তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি, তুমি মর্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।'

সে বলিল—কলিকাতায় এখন সাঁঝবাতি আইন চলিতেছে তাহাতে আমাদের ক্ষতি নাই—বরঞ্চ লাভ, কারণ অধিকাংশের ঘরে সাঁঝবাতি জ্বালিবার তৈলেরই অভাব—কিন্তু ওই আইনের ফলে সিনেমার একটা 'শো' বন্ধ হইয়া গিয়াছে—এ দুঃখ তাহারা কোথায় রাখিবে?

ব্রহ্মা শুধাইল—তখন গৌড়বাসীরা কি করে?

—কি আর করিবে? অগত্যা ওই সময়টা তাহারা দেশের বিষয় চিন্তা করিয়া কাটায়।

ব্রহ্মা বলিল—ওই যে নোয়াখালির উল্লেখ করিলে সেখানে যাওনা কেন?

ভুলু বলিল—সেখানে যে সিনেমা নাই। তারপরে সোৎসাহে শুরু করিল—সেখানে গোটা কতক সিনেমা খুলিয়া দাও, দেখো আমরা যাই কি না যাই?

—সেখানে কেহই কি যায় নাই?

—একটা আটাত্তর বৎসরের বৃদ্ধ গিয়াছে কিন্তু লজ্জার কথা কি আর বলিব, শুনিয়াছি তোমরা অন্তর্যামী না বলিলেও জানিবে, তাই বলিয়াই ফেলি—সে লোকটা চার্লি চ্যাপলিনের নাম অবধি শোনে নাই।

ব্রহ্মা বলিল—আমিও এই প্রথম শুনিলাম।

ভুলু সরোষে বলিল—তবে তুমিও নোয়াখালি যাও।

তারপরে পুনরায় করুণ বেহাগে আরম্ভ

তবে তুমি নোয়াখালি যাও

করিল—ওগো, এ কোথায় এনুগো—আমাকে কলকেতায় রেখে এসো।

ব্রহ্মা বিরক্ত হইয়া ভুলুকে এক চড় মারিল। সে শুকনো পাতার মতো উড়িতে উড়িতে কলিকাতায় চলিল। ব্রহ্মা নিজে নোয়াখালি চলিল।

* * * * * *

ভুলু হাসপাতালে পাশ ফিরিল। ডাক্তার বলিল—এ যাত্রা বোধ করি বাঁচিয়া উঠিল।

ব্রহ্মা নোয়াখালির চৌমুহানি নামক স্থানে আসিয়া পৌঁছিল।

ব্রহ্মা চৌমুহানি পৌঁছিয়া দেখিল ভারি এক সভা বসিয়াছে। কুম্ভীর খাঁ নামে এক উজীর বক্তৃতা করিতেছে। সে বুক চাপড়াইতেছে আর বলিতেছে—হায়, হায় এমন কাজ কে করিল? কে এমন সর্বনাশ করিয়া গেল? আমরা বহু অনুসন্ধান করিয়াছি—কিন্তু আসামীদের খুঁজিয়া পাইলাম না। এ সমস্তই বহিরাগতের কাজ। বাহির হইতে গুণ্ডাদল আসিয়া এই কাজ করিয়া গিয়াছে। এখানকার সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় একেবারে নিরপরাধ—তাই তাহাদের গ্রেপ্তার করি নাই। বিশ্বাস না হয়—

—তাহাদের গ্রেপ্তার করি নাই

দেখিয়া এসো এখনো তাহারা আগের মতো শান্তভাবে চাষবাস করিতেছে। তোমরা তাহাদের কিছু বলিও না—তাহারা সম্পূর্ণ নির্দোষ।

সে এইসব কথা বলিতেছে—আর তাহার চোখ হইতে অবিরল জলধারা পড়িতেছে—সেই জল-প্রবাহ খাল বাহিয়া ছুটিয়াছে এবং একটি বৃহৎ কুণ্ডে আসিয়া সঞ্চিত হইতেছে। সেখানে একদল লোক, বোধহয় তাহারা বহিরাগত গুণ্ডার দল, ছুরি ছোরা, তলোয়ার, লোহার দণ্ড প্রভৃতি ধুইতেছে। তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র রক্তে লাল। সেই রক্তে কুণ্ডের জল লাল হইয়া উঠিয়াছে। আর একদল লোক সেই রক্তবর্ণ জল শিশি, বোতলে ভরিয়া প্রস্থান করিতেছে। তাহারা হাঁকিয়া বলিতেছে অতি উত্তম রক্তবর্ধক সালসা, মূল্য বোতল প্রতি এক টাকা মাত্র। এই সালসা পান করিলে রক্তাল্প ব্যক্তির রক্তবর্ধন হইবে। একেবারে অব্যর্থ। কিনিয়া লও। বিলম্বে ফুরাইয়া যাইবে!

ব্রহ্মা বুঝিল—হাঁ, ইহাদের তুলনা নাই। সে যে মানুষ না হইয়া নিতান্ত দেবতা হইয়া জন্মাইয়াছে সেজন্য সে দুঃখ অনুভব করিতে লাগিল।

ব্রহ্মা চারিদিকে হাজার, হাজার দুর্গতের দেখা পাইল। তাহার মধ্যে অধিকাংশই স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধ। তাহাদের মধ্যে অনেকের গায়েই আঘাতের চিহ্ন, কিন্তু কাহারো গায়ে বস্ত্রের চিহ্ন নাই। তাহারা শীতে কাঁপিতেছে, ক্ষুধায় কাঁদিতেছে, ভয়ে শিহরিয়া উঠিতেছে—বলির পশুর মতো তাহাদের মুখে একপ্রকার অসহায় ভীতির ভাব।

ব্রহ্মা আর একটু অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইল সারি সারি তাঁবু পড়িয়াছে—একশতের

আমাদের Ideologyটা তোমাদের বুঝাইয়া দিই

কাছাকাছি হইবে। সেখানে দলে দলে যুবক-যুবতী নানা বর্ণের 'ব্যাজ' ধারণ করিয়া উপস্থিত—সকাল বেলায় তাহারা গ্রামোফোন সংগীত সহকারে চা ও বিস্কুট গলাধঃকরণ করিতেছে। ব্রহ্মাকে দেখিবামাত্র কয়েকজন যুবক-যুবতী ছুটিয়া আসিয়া তাহার ঘাড়ের উপরে পড়িল—বলিল—আমাদের তাঁবুতে এসো। আমাদের Ideology-টা তোমাকে বুঝাইয়া দিই। এই বলিয়া পকেট হইতে একটি ফুটো পয়সা বাহির করিয়া বুঝাইতে লাগিল—বুড়ো, ছোটবেলায় তোমার ঠাকুর-মার কাছে নিশ্চয় শুনিয়াছ যে বাসুকীর মাথায় পৃথিবী ন্যস্ত। তাহা নিতান্তই ঠাকুর-মার উপকথা। পৃথিবী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এই পয়সার উপরে। ইহার নাম 'জগতের আর্থিক ব্যাখ্যা'। তুমি যদি আমাদের ক্যাম্পে আগমন করো—তবে এই সব দুরূহ তত্ত্ব তোমাকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিব আর সঙ্গে সঙ্গে একখানি রাশিয়ান কম্বল পাইবে—আর যদি উহাদের ক্যাম্পে যাও, তবে তোমার দুর্গতির অন্ত থাকিবে না, ক্যাপিট্যালিস্টদের চাপে তোমার জীবনান্ত ঘটিবে।

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্বেই চার-পাঁচজন যুবক আসিয়া তাহার হাত ধরিল—এসো, এসো, বুড়ো আমাদের ক্যাম্পে।

একজন তাহার একখানি ছবি তুলিয়া লইল। আর একজন কাগজ-কলম লইয়া প্রস্তুত হইয়া বসিল—একটা বিবৃতি দাও। ছবি শুদ্ধ আমরা ছাপাইয়া দিব।

ব্রহ্মা কিংকর্তব্য স্থির করিবার পূর্বেই আরও পাঁচ সাত দল আসিয়া তীর্থের পাণ্ডার মতো তাহাকে লইয়া টানাটানি শুরু করিয়া দিল। তাহাদের মধ্যে যাহার দৈহিক শক্তি সবচেয়ে বেশি সে ব্রহ্মাকে টানিয়া লইয়া নিজেদের ক্যাম্পে গিয়া উপস্থিত হইল। ব্রহ্মা একখানি ভাঙা চেয়ারের উপরে বসিল। যুবকটি তাহাকে নিজেদের Ideology বুঝাইতে লাগিল।

ব্রহ্মা বলিল—কিছু খাইতে পাইব কি?

যুবকটি বলিল—বৃদ্ধ, তুমি নিতান্তই সাম্রাজ্যবাদী। নতুবা এমন Ideologyর ব্যাখ্যার সময়ে তোমার খাদ্যের কথা মনে পড়ে?

ব্রহ্মা বলিল—কেন, বাপু, তোমরা ত বেশ খাইতেছ।

সত্য সত্যই তাঁবুর এক দিকে বসিয়া কয়েকজন লোক cheese দিয়া পাঁউরুটি খাইতেছিল।

ব্রহ্মা বলিল—Ideologyর চেয়ে এখন কি খাদ্যের প্রয়োজন বেশি নয়?

যুবকটি বলিল—অন্ন, বস্ত্র এবং ঔষধের ব্যবস্থাও আছে।

—কোথায়?

—শ্রীরামপুরে

—কে করিতেছেন?

—তিনি

—ব্রহ্মা শুধাইল—তাঁহার বয়স কত?

—আটাত্তর বৎসর

ব্রহ্মা শুধাইল—তবে তোমরা কি করিতেছ?

যুবকটি বলিল—আমরা Ideology প্রচার করিতেছি। তত্ত্ব প্রচার করিবার এমন সুযোগ আর পাইব কোথায়? দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা এবং সাম্প্রদায়িক অত্যাচার Ideology প্রচারের প্রশস্ততম সময়। অন্য সময়ে লোকে এসব কথায় কাণ দিতে চায় না, চাষবাস লইয়াই থাকে। এখন তাহারা এসব না শুনিয়া যায় কোথায়?

—তোমরা জাতির দুর্দশার কথা ভুলিয়া গিয়াছ বলিয়াই মনে হইতেছে—

যুবকটি সদম্ভে বলিল—কখনোই না। দেখনা আমি কি রকম জাতীয় সংগীত গাহিতে পারি—এই বলিয়া সে তাল লয় সংযোগে আরম্ভ করিল—

> "সুজলাং সুফলাং মাতরম্
> মাতরম্। মা—মা—মা—মা—
> আ—আ—আ— চা—চা—চা—চা"

তাহার চা—চা—আহ্বান শুনিয়া একজন উর্দিপরা আরদালি দ্রুত চা, বিস্কুট লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল।

যুবকটি চায়ের কাপে মনোনিবেশ করিতেই ব্রহ্মা তাঁবু হইতে বাহির হইয়া ছুটিয়া পলাইতে লাগিল। তাঁবুর সকলে তাহার পিছনে পিছনে ছুটিল—বলিতে লাগিল—গেল গেল লোকটা, বিবৃতি না দিয়াই গেল। কেহ বলিল—লোকটা বোধকরি কুম্ভীর খাঁ-র চর, কেহ বলিল—সাম্রাজ্যবাদীর লোক। সকলেই বলিল—আজকালকার দিনে কৃতজ্ঞতার একেবারেই অভাব। তখন কৃতঘ্নতার শোক ভুলিবার উদ্দেশ্যে সকলে জাতীয় সংগীত সহযোগে প্রাতঃকালীন দশম পেয়ালা চায়ে মনোনিবেশ করিল। ধাবমান ব্রহ্মার কাণে দূরে হইতে আসিতেছিল—মা—মা—মা—চা—চা—চা।

ব্রহ্মা ছুটিতে ছুটিতে দেখিতে পাইল চারিদিকে দগ্ধ পল্লীর অবশেষ, নরকঙ্কাল আর নর-করোটি। ব্রহ্মা দেখিল বৃহৎ সব অট্টালিকা অর্ধদগ্ধ—বিপণি ও বাজার লুণ্ঠিত, এমন কি সুপারির বাগানগুলি পর্যন্ত অগ্নিতে ঝলসিত হইয়া দণ্ডায়মান। ব্রহ্মা বুঝিল এ সমস্তই বহিরাগত দুর্বৃত্তের কাণ্ড। ছুটিতে

সন্ধ্যার ছায়াচ্ছন্ন দিগন্তের দিকে চলিয়াছে—
—নিঃসঙ্গ—নিস্তব্ধ।

ছুটিতে সে একটি ছোট্ট গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে গ্রামটিও বহিরাগতের উপদ্রবে ধর্ষিত। সেখানে ছোট একখানি টিনের চালাঘরে একজন বৃদ্ধকে উপবিষ্ট দেখিল—তাহার নিকটে কয়েকজন মানুষের ভগ্নাবশেষ। চারিদিকের ধ্বংস ও অস্থিরতার মধ্যে বৃদ্ধের অতুলনীয় স্থিরতা ও শান্তি একপ্রকার অপার্থিব মোহ বিস্তার করিয়াছে। তাহার মনে হইল এই বৃদ্ধ কে? তাহার মস্তক মুণ্ডিত, কটিলগ্ন শুভ্র বাস, নগ্ন গাত্র। হস্তিনাপুরের ধ্বংসের উপরে করুণ সন্ধ্যা তারার মতো তাহার চক্ষু দুইটি অপরিমেয় সান্ত্বনা বিস্তার করিতেছে। ব্রহ্মা তাহার কাছে গিয়া বলিল—আমাকে তোমার Ideology-টা একটু বুঝাইয়া দাও।

বৃদ্ধ তাহাকে দেখিয়া লইয়া একজন সঙ্গীকে বলিল—নির্মলকুমার, এই ভাইকে খাদ্য দাও।

ব্রহ্মা চমকাইয়া উঠিল—এ পর্যন্ত খাদ্যের কথা কেহ তাহাকে বলে নাই—সবাই তত্ত্বের কথা মাত্র বলিয়াছে। বিস্মিত ব্রহ্মা বলিল—একবার জাতীয় সঙ্গীতটা শুনিতে পাই না!

বৃদ্ধ বলিল—এই ভাইকে একখানা কম্বল দাও।

—কম্বল? জাতীয় সঙ্গীত নয়?

তাহার বিস্ময় দেখিয়া বৃদ্ধ বলিল—দুর্গতের নিকটে অন্নবস্ত্ররূপ ব্যতীত ভগবানের অন্য কোন রূপ নাই। ব্রহ্মা আহার সমাধা করিলে ও কম্বল গায়ে দিলে বৃদ্ধ একখানি লাঠি ও একটি পুঁটুলি লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। ব্রহ্মা দেখিল—বৃদ্ধটি সুপারির গাছের সাঁকো পার হইয়া মাঠ ভাঙিয়া সন্ধ্যার ছায়াঘন দিগন্তের দিকে চলিয়াছে—নিঃসঙ্গ, নিস্তব্ধ।

তাহার মনে হইল বৃদ্ধের উন্নত মস্তক আকাশে গিয়া ঠেকিয়াছে—সমস্ত পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ আচ্ছন্ন করিয়া কেবল সেই দিব্য-মূর্তিটি মাত্র আছে—আর কিছুই নাই—আর সবই যেন মায়া। তখন তাহার মনে হইল, সবাই এই বৃদ্ধটির কথাই বলিয়াছিল—সবাই এই একক বৃদ্ধের উপরে সেবার ভার দিয়া Ideology ও জাতীয় সঙ্গীত প্রচার করিতেছে।

ব্রহ্মা হঠাৎ হাসিয়া উঠিল। বিশ্বসৃষ্টির পর হইতে সে হাসিতে ভুলিয়া গিয়াছিল—এই সে প্রথম হাসিল। সে হাসির আঘাতে মানস সরোবরে ঢেউ উঠিল, আকাশে তারা ফুটিল তারায় জ্যোতি ফুটিল, পৃথিবী হরিৎ হইল, আকাশ নীল হইল, স্বর্গচ্যুত দেবতারা আবার স্বর্গে ফিরিয়া অধিষ্ঠিত হইল—মানুষ আবার মনুষ্যত্ব লাভ করিল। ব্রহ্মাণ্ড চটকা ভাঙিয়া জাগ্রত হইয়া উঠিল। সেই হাসির আঘাতে নির্বাসিত সত্য, সৌন্দর্য, আনন্দ মানুষের অন্তরে পুনঃ স্থাপিত হইল। সেই হাসির দিব্য জ্যোতিতে মানুষ দিব্যদৃষ্টি পাইল। ব্রহ্মার হাসিতে ব্রহ্মাণ্ড পুনরায় স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইল—মানুষের নবজন্ম লাভ ঘটিল। সেই হাসি বিশ্বে এখনো ধ্বনিত হইতেছে—কবি ও সাধকগণের দিব্যকর্ণ তাহা শুনিতে পায়।

সমসেট মমকে কেন পছন্দ করি?

মণি বাগচি

রোঁলা, রাসেল, হাক্সলে এবং ই এম ফরস্টারের পর সমসেট মমই উল্লেখযোগ্য লেখক যিনি ভারতবর্ষকে ভালোবেসেছেন মনে-প্রাণে। ভারতের সুপ্রাচীন আধ্যাত্মিকতা যেমন তার প্রভাব বিস্তার করেছে এ'দের প্রত্যেকের মনে এবং চিন্তায়, সেই সঙ্গে এদেশের বৈচিত্র্যেও এ'রা মুগ্ধ। ইংল্যাণ্ডের আর কোনো ঔপন্যাসিক আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এত গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেননি যেমন ক'রেছেন মম। এই প্রাচ্য-প্রীতি অনেক বিদেশী লেখকের কাছেই একটা নিছক বিলাসিতা, কিন্তু সমর্সেট মমের এই বিষয়ে আন্তরিকতা যে কত গভীর এবং ব্যাপক তা ত'ার নিজের কথাতেই প্রকাশ পেয়েছে অতি সুন্দরভাবে। বিগত মহাযুদ্ধের পর রাজদূতের কার্য থেকে অবসর নিয়ে মম যখন ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন, সেই সময় (নভেম্বর, ১৯৪৬) "হোরাইজন" পত্রিকার সম্পাদক সিরিল কনোলি ত'ার সঙ্গে দেখা করেন এবং সাহিত্য-প্রসঙ্গে সিরিল কনোলি ত'াকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনার মতে ইংলণ্ডের তরুণ সাহিত্যিকদের এখন কোন্ দেশে গিয়ে লেখার জন্যে উপকরণ সংগ্রহ করা উচিত?" এই প্রশ্নের উত্তরেই মম ত'াকে অন্যান্য কথার পরে বলেছিলেনঃ

> "But India—that is above all the place.... Nothing is so fascinating as the Indian mind and the Indian intelligence....there are quite extraordinary people to be met, absolutely remarkable. We know nothing about them and we have never made the real effort to understand."

এই কথা ইংলণ্ডের আর কোনো ঔপন্যাসিকের মুখ থেকে আমরা আজ পর্যন্ত শুনিনি এবং এই কথা অকপটে বলেছেন ব'লেই

সমর্সেট মম

মি মমকে পছন্দ করি ব্যক্তিগতভাবে। এম ফরস্টার যে দৃষ্টি নিয়ে ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের লোককে দেখেছিলেন এবং বুঝেছিলেন—"A passage to India" বইতে তিনি তা লিপিবদ্ধ করেছেন অতি সুন্দরভাবে। ইউরোপ ও আমেরিকার অনেকেই তো এদেশ দেখতে এসেছেন, এবং তাঁদের অনেকেই অনেক কিছু লিখেছেন এদেশ নিয়ে। কিন্তু স তো সৌখীন পর্যটকের বিবরণ মাত্র; কিম্বা মিস্ মেয়ো অথবা বেভার্লি নিকোলসের নির্জলা কুৎসা রটনা। তাঁদের কেউই ভারতের অন্তর্লোকে প্রবেশ করবার চেষ্টা করেননি এবং বুঝবার চেষ্টা করেননি বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ-গান্ধীর ভারতবর্ষের আত্মার মহিমা। মমের অধুনা প্রকাশিত "Razor's Edge" উপন্যাসখানি (যা একমাত্র আমেরিকাতেই বিক্রী হয়েছে ১০ লক্ষ কপি!) মূলতঃ ভারতের আধ্যাত্মিকতার পটভূমিকায় বিরচিত। এমন কি বইটির নামকরণ পর্যন্ত তিনি ক'রেছেন কঠোপনিষদের একটি শ্লোকের অংশ থেকেই—"ক্ষুরস্য ধারা।" এই উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়েই তিনি সাফ্ বলেছেন বড় গলা ক'রে যে, এ নভেলে তিনি প্রায় কিছুই কল্পনা করেননি—এর প্রায় আগাগোড়াই কানা—কল্পনার দিক থেকে। লেছেন—"I have invented nothing"। যে কোনও তীক্ষ্ণধী ও ভাবুক মন এ বই পড়লে মুগ্ধ হবেই। শুধু গল্প বা চরিত্র-চিত্রণের জন্যেই নয়, (এক্ষেত্রে তিনি তো একজন বড় ওস্তাদ।) ভাষার প্রসাদগুণের জন্যেও নয় (যেখানে তিনি পাঠকের কাছে সাধারণত বোধ্য।) এই উপন্যাসখানিতে কল্পনার সঙ্গে তিনি যতখানি বাস্তবকে মিশ খাইয়েছেন ততখানি বাস্তবের গুরুভার আর কোনো কথা-সাহিত্যেই স্বাধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'তে পারেনি। এই "Razor's Edge" পড়তে পড়তে তাঁর অপরূপ ব্যক্তিত্ব যেন চোখের সামনে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে—এত স্পষ্ট যে আশ্চর্য হতে হয় তাঁর অঙ্কন-প্রতিভায় ও ঔদার্যে। মমের সৃষ্ট চরিত্রগুলো থেকে এই উপন্যাসের নায়ক ল্যারিল ডাররেল এত স্বতন্ত্র যে, মনে হয়

"He is one of the few characters in the long and crowded portrait gallery of Maugham's that has not been splashed with the pungent and excoriating wit he is so notorious for."

এই বইখানা তিনি লেখেন বিশেষ ক'রে আমেরিকার তরুণদের উদ্দেশে। এর নায়কও তাই একজন আমেরিকান। ডলার-রৌপ্য সায়ন সেবন ক'রে এখনকার আমেরিকার ছেলেমেয়েদের যে নৈতিক রূপান্তর ঘটেছে মমের তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাই ধরা পড়েছে এবং তাই প্রকাশ পেয়েছে এই উপন্যাসের প্রতিটি কথায়। মমকে যখন সিরিল কনোলি জিজ্ঞাসা করেন—"এই রকম রিলিজিয়স্ মোটিভ্ নিয়ে লেখার জন্যেই কি এই বইখানা (Razor's Edge) আমেরিকানদের এত ভালো লেগেছে, মনে করেন?"—উত্তরে মম্ বলেছিলেনঃ

"Yes: the Americans are dissatisfied with their philosophy of life. Power, money, success have not given them the results they hoped."

তাই তাদের সামনে ভারতের ব্রহ্মণ্য ধর্মের মহিমা (যা তিনি আমেরিকাতে থাকবার সময় রামকৃষ্ণ মিশনের একজন স্বামীজীর কাছ থেকে জেনেছিলেন) তিনি তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন এই বিচিত্র জীবনী-বাহী উপন্যাসখানির ভেতর দিয়ে।

মমকে পছন্দ করি আরও এক কারণে। সেটি হোলো তাঁর সহৃদয় প্রকৃতি। কথা-সাহিত্যে তিনি একজন রিয়ালিষ্ট কি সিনিক্ এ তর্ক আমি তুলতে চাইনে এখানে। লোকটির মানস-গঠন স্বতন্ত্র রকমের। একটু উদাসী প্রকৃতির, কিন্তু তাই ব'লে বেদান্তের মায়াবাদ পুরোপুরি মেনে নিয়ে পৃথিবীর মানুষকে তিনি উপেক্ষা করেননি কোনও দিন। বলেছি, তিনি সহৃদয় মানুষ। আত্মকেন্দ্র বটে, কিন্তু স্বভাবে অকৃতজ্ঞ নন্, তীক্ষ্ণদৃষ্টি বটে, কিন্তু শুধু ব্রণান্বেষীই নন্। তিনি মানুষের ও জগতের নানা নিহিত সৌন্দর্য সম্বন্ধেও পূর্ণ সচেতন। তাই তিনি লিখেছেনঃ ("SUMMING UP"—৫৮ পৃষ্ঠা) "আমাকে অনেকে বলেন সিনিক্। মানুষ যত খারাপ, আমি নাকি তাকে তার চেয়েও খারাপ ক'রে এঁকেছি। আমার মনে হয় না, এ-অভিযোগের ভিত্তি আছে। আমি যা করেছি তা এই যে, মানুষের চরিত্রের এমন অনেক গুণাগুণকে বড় ক'রে দেখিয়েছি, যাদেরকে লোকে দেখেও দেখ্তে চান না।"

প্রতিভার চেয়ে বড় কথা হোলো সদাশয়তা —এই কথা এ যুগে বল্তে পেরেছেন একমাত্র সমর্সেট মম্। তাঁর এই মনোবৃত্তিকে নিয়ে সমালোচকরা হাসাহাসি করেছেন। কিন্তু এই কথা আজ তাঁরা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, মম্ আমাদের অনেক কিছু দেখ্তে শিখিয়েছেন, তাঁর মৌলিক চিন্তাশক্তির উজ্জ্বলতায় আমাদের অনেক গতানুগতিকতার পথ মেরে দিয়েছেন; সকলের ওপর মানুষকে বুঝতে, চিনতে ও জানতে শিখিয়েছেন তাঁর ক্ষুরধার বিশ্লেষণে ও নৈতিকতায়। অসাধারণ তাঁর পর্যবেক্ষণ শক্তি। মধ্যজীবনে যখন তিনি প্রাচ্য দেশে ঘুরে বেড়াতেন তখন সৌখীন পর্যটকের দৃষ্টি দিয়ে তিনি তাঁর আশেপাশের মানুষকে দেখ্তেন না। দেখ্তেন সেই স্বচ্ছ চোখ দিয়ে যে চোখের দৃষ্টিশক্তি মাইক্রোস্কোপের দৃষ্টিশক্তিকেও অনেক ক্ষেত্রে হার মানায়। তাই এই মানুষটির চোখ দুটি সত্যিই অসাধারণ—অতল অবগাহী যেমন অসাধারণ তাঁর মনটি। সেইজন্যেই মম্ বলে থাকেন—"দেখ্তে জানা চাই"—

"But you must know how to look. And it is not nearly so easy."

এই রকম দেখার শক্তি ছিল আরেকজনের—গোর্কির। এবং এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গোর্কির সেই প্রসিদ্ধ কথাটিঃ

"Literature is the all-seeing eye of the world, an eye whose glance pierces the deepest secrets of human spirit."

মমকে তাই পছন্দ করি তাঁর এই রকম অসাধারণ দৃষ্টিশক্তির জন্যে। এই কারণেই সম্ভবত তাঁকে অনেক সমালোচকই সহ্য করতে পারেন না, তাঁর অনুরাগী পাঠকের সংখ্যাও তাই কম। আর্টসর্বস্বতাই যে তাঁর জীবনের প্রধান বাণী হয়ে ওঠেনি—তারও মূলে আছে তাঁর এই দৃষ্টিশক্তি। "আর্টের পরিসমাপ্তি সৌন্দর্য নয়—ন্যায়কর্মে—" এমন কথা ইংলণ্ডের আর কোন ঔপন্যাসিক বলেছেন আত্মপ্রত্যয়ের ভূমিতে দাঁড়িয়ে? অথচ মম্ একজন সুদক্ষ সুকুমার শিল্পী এবং গলসওয়ার্দি প্রমুখ অনেকের চেয়েই নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠতর শিল্পী। তাঁর উপন্যাসের কথা নাই বা তুললাম। বিংশ শতকে এত উৎকৃষ্ট ছোট গল্প আর কেউ লিখেছেন? সত্যিই তাঁর প্রতিভার পরিমাপ খুব সহজসাধ্য কাজ নয়। মমের লেখা পড়বার আগে বুঝতে হবে এই মানুষটার মানস-গঠন এবং সে জিনিসও বুঝতে হবে তাঁর চোখের ভেতর তাকিয়ে, যে চোখ সম্বন্ধে সিরিল কনোলি লিখেছেনঃ "formidable glance from his iceberg eyes—" যে চোখের দৃষ্টিপথে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে মানুষের অন্তঃস্তলের সুনিভৃত অংশ পর্যন্ত। মমকে পছন্দ করি তিনি ঐ চক্ষুষ্মান লেখক ব'লেই।

গতির উপাসক

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

ভারতবর্ষ চিরদিনই প্রাণ ও গতির উপাসক। বেদের বাণীতে, উপনিষদের গূঢ় উপদেশে, বৌদ্ধ ও জৈন সাধনায়, এই গতি-মুক্তিরই পূজা করা হয়েছে। মধ্য যুগেও সন্ত-সাধকেরা গতি ও বীর্যেরই সাধনা চেয়েছেন। এই যুগেও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই গতিরই জয়জয়কার দেখতে পাই। তাঁর প্রথম বয়স থেকে তাঁর অবসান পর্যন্ত তিনি গতি ও মুক্তিরই জয়গান করে গেছেন।

সন্ধ্যা সঙ্গীতের (১৮৮২) 'পরিত্যক্ত' কবিতায় কবির দুঃখ এই যে সবাই তাঁকে ফেলে চলে গেল।

প্রভাত সঙ্গীতের (১৮৮৩) আহ্বান সঙ্গীতে তিনি জগদ্ব্যাপী 'চলে আয় আয়' ডাক শুনচেন। তাই তিনি নিজেকে বলচেন—

বাহির হইয়া আয়।

"নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" তো গতিরই জয়-গীতি। কঠিন নিশ্চল তুষার গলেছে। ঝরণা জেগেছে। তার মনে মনে বাসনা।

আমি যাব আমি যাব
গাহিব করুণা গান।

প্রভাত সঙ্গীতের "স্রোত" কবিতায় তিনি বলেছেন—

জগৎ স্রোতে ভেসে চল, যে যেথা আছ ভাই।
চলেছে যেথা রবি শশী চলরে সেথা যাই।

মানসীর (১৮৯০) "দুরন্ত আশা" কবিতায় কবির মনে জাগচে,

কোথাও যদি ছুটিতে পাই
বাঁচিয়া যাই তবে
ভব্যতার গণ্ডী মাঝে
শান্তি নাহি মানি।

সোনার তরীতে (১৮৯৪) "যেতে নাহি দিব" কবিতাতেও যাওয়ারই জয়গান।

তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।

"নিরুদ্দেশ যাত্রা" কবিতায় মনে প্রশ্ন জাগছে—

চলেছি কিসের অন্বেষণে?

চিত্রায় (১৮৯৬) "সিন্ধু পারে" কবিতায় অবগুণ্ঠিতা অপরিচিতা বধূর সঙ্গে চলতে চলতে তিনি দেখচেন,

অফুরান পথ অফুরান রাতি, অজানা নূতন ঠাঁই।

কল্পনার প্রথম কবিতাই দুঃসময় (১৮৯৭)।

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে
সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহাআশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে,
দিগ দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা,
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা। কল্পনা

কল্পনায় (১৯০০) বর্ষশেষ কবিতাটি তো বৈদিক ঋষিদের আর্ষ বেগেই লেখা। তার ব্যাকুল প্রার্থনা,

শ্যেন সম অকস্মাৎ ছিন্ন করে ঊর্ধ্বে লয়ে যাও
পঙ্ককুণ্ড হতে।

এর পরই লেখা তাঁর "সাগর সঙ্গম" (১৯০১) কবিতা, যদিও তা প্রকাশিত হয়েছে পরবর্তীতে। তাতে তিনি নিজেকে পথিক বলে জেনেই প্রশ্ন করচেন

হে পথিক কোনখানে
চলেছো কাহার পানে?

নৈবেদ্যে (১৯০১) তিনি বুঝেছেন এই পৃথিবীতে তিনি তীর্থযাত্রীর মতই এসেছেন

কোথা হতে আসিয়াছি নাহি পড়ে মনে
অগণ্য যাত্রীর সাথে সাথে তীর্থ দরশনে
এই বসুন্ধরা তলে;

কাজেই,

দুর্গম পথের প্রান্তে পান্থশালা পরে
.................ভাবাবেশ ভরে,
রস পানে হতজ্ঞান.........

হয়ে থাকলে চলবে না। এখন তাই ব্যাকুল প্রশ্ন,

কোথা যাত্রী, কোথা পথ, কোথায় রে দিশা।

খেয়া গ্রন্থের (১৯০৬) "শেষ খেয়া" কবিতায় তাঁর ব্যাকুল প্রার্থনা,

ওরে আয়!
আমায় নিয়ে যাবি কেরে
দিন-শেষের শেষ খেয়ায়?

"ঘাটের পথে" তিনি শুনচেন

ঘর-বাহিরের মাঝখানে রহি
ঐ পথ ডাকে মোরে।

পথের সেই ডাকে যদি তার যাওয়া না-ও হয় তবু "ঘাটে" বসে তাঁর সান্ত্বনা,

যে হাওয়াতে চলত তরী
অঙ্গেতে সেই লাগাই হাওয়া।

"পথের শেষ" কবিতায় দেখা যায় পথের নেশা তাঁর লেগেছিল। তাই তিনি অনুভব করেছিলেন,

নিত্য কেবল এগিয়ে চলার সুখ,
বাহির হওয়ায় অনন্ত কৌতুক,

"সমুদ্রে" কবিতায় দেখা যাচ্চে তিনি বলছেন,

ভাসিয়ে দিলেম নৌকাখানি
কোথায় আমার যেতে হবে
সে কথা কি কিছুই জানি?

"খেয়া" কবিতায় তিনি এপার-ওপার করা খেয়ার নেয়েকে দেখেই মুগ্ধ।

শারদোৎসবে (১৯০৮) সন্ন্যাসীর সঙ্গে ছেলের দলে তিনিও বের হয়ে যেতে চান। তাঁর সাধ,

যাব না আর ঘরে রে ভাই যাব না আর ঘরে
আকাশ ভেঙে বাহিরকে আজ নেব রে লুঠ করে।

তাঁর মুগ্ধ নয়ন দেখছে জীবনের চলন্ত নৌকার,

অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া।

শিশু গ্রন্থের (১৯০৯) "নৌকা যাত্রা", "ছুটির দিনে" 'বনবাস' "মাতৃ বৎসল", 'কাগজের নৌকা' প্রভৃতি কবিতায় সেই দেশ-দেশান্তর ও কাল-কালান্তরেরই নানা মুগ্ধ চিত্র।

"নদী" কবিতাটি তো আবার তাঁর নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের মতই গতি ও মুক্তির কামনায় ভরপুর।

গীতাঞ্জলীতেও (১৯১০) সেই একই কথা, গতি ও মুক্তির দিকে ব্যাকুলভাবে চাওয়া। জন্ম জন্মের সাথীকে কবি বলচেন,

কথা ছিল এক তরীতে কেবল তুমি আমি
যাব অকারণে ভেসে ভেসে ভেসে;
ত্রিভুবনে জানবে না কেউ আমরা তীর্থগামী
কোথায় চলব মোরা কোন্ মুখে কোন্ দেশে।

এই গানটিতে হাজার হাজার বছর আগেকার ঋষি বসিষ্ঠের একটি ব্যাকুল গান মনে পড়ে, "হে দেবতা সে আনন্দের দিন আমাদের কোথায় গেল, যখন তোমরা দুজনে এক নৌকায় যাত্রা করে সাগরের মাঝে পাড়ি ধরতাম যখন জলের তরঙ্গের উপর দিয়ে আমরা চলতাম, যখন এক দোলাতে উভয়ে আনন্দে দোল খেতাম।"

আ যদ্ রুহাব বরুণশ্চ নাবং
প্র যৎ সমুদ্রম্ ঈরয়াব মধ্যং।
অধি চদপাং স্নুভিশ্চরাব
প্র প্রেংখ ঈংখয়াবহৈ শুভে কম্॥

(ঋগ্বেদ, ৭, ৮৮, ৩)

সেই প্রেম আমাদের আজ গেল কোথায়?

ক ত্যানি নৌ সখ্যা বভূবুঃ॥ (ঐ—৫)

জীবননাথই তো জন্ম মরণের পরিপূর্ণতার স্বামী। তাঁর সঙ্গে এক সাথে আনন্দযাত্রার গান গেয়েই তো কবির জন্ম জন্মান্তরের যাত্রার আরম্ভ। সে কোন সুদূর অতীতের কথা,

কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে—
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।

সেদিন আপন প্রেমের ব্যাকুলতায় কারও জন্য প্রতীক্ষা করিনি,

একলা আমি বাহির হলেম তোমার অভিসারে।

এখনো যেন তাই কবি তাঁর পথের সাথীর পদধ্বনিরই প্রতীক্ষা করচেন। ভয় নেই, অনন্ত কালের মধ্য দিয়েও তাঁর পদধ্বনি ক্রমাগতই শোনা যাচ্চে,

তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি।
ঐ যে আসে, আসে, আসে।
যুগে যুগে পলে পলে দিন রজনী
সে যে আসে, আসে, আসে।

এই গানটিতে মীরাবাঈর বিখ্যাত ভজনটি মনে পড়ে,

সুনী মৈঁ হরি আবনকী আবাজ॥

যেদিন কবি তাঁর জীবন নৌকার কর্ণধারকে দেখতে পেয়েছেন সেদিন তাঁকে অনন্ত সাগর পাড়ি দেবার ডাকের কথাই জিজ্ঞাসা করেছেন,

ওরে মাঝি
ওরে আমার মানব জীবনতরীর মাঝি,
শুনতে কি পাস্ দূরের থেকে
পারের বাঁশি উঠ্ছে বাজি।

যাবার সময়েও সবার কাছে যাত্রী বলেই কবি আপন পরিচয় দিয়ে যেতে চান।

যাত্রী আমি ওরে।
আকাশ আমায় ডাকে দূরের পানে
ভাবাবিহীন অজানিতের গানে,
সকাল সাঁঝে পরাণ মম টানে
কাহার বাঁশি এমন গভীর স্বরে।

অপার অনন্ত বিশ্বলোকে যাত্রার জন্য এই ব্যাকুলতাই মানুষের নিত্য ধর্ম। আমরা সেই মানুষকেই শাস্ত্র আচার ও সংস্কারের নানা চাপে পিষে মেরে ফেলি। কিন্তু শিশুর মধ্যে সেই চাপ নেই। তার কানে বাহিরের ডাক তাই এত প্রবল। বাইরে নিয়ে গেলেই ক্রন্দনরত শিশু চুপ করে। শিশুর চিত্তে বাইরের এই শাশ্বত আহ্বানকে কবি দেখিয়েছেন তাঁর ডাক-ঘরের অমলের মধ্যে। তাই অমলের কথা—

"ঐ পাহাড়টা পার হয়ে চলে যাই।"

"পৃথিবীটা কথা কইতে পারে না, তাই অমনি করে নীল আকাশে হাত তুলে ডাকচে।...... পণ্ডিতেরা বুঝি শুনতে পায় না।"

মাধব দত্ত, মোড়ল হলেন বৃদ্ধ। কবিরাজ হলেন পণ্ডিত। তাই তাঁরা সে ডাক শোনেন না। সে শক্তি তাঁরা হারিয়েছেন। সাধনার দ্বারা ঠাকুরদা এখনও তাঁর তারুণ্য ধরে রেখেছেন, তাই তিনি এই ডাক এখনও শুনতে পান।

ডাকঘরের কিছুদিন পরেই রবীন্দ্রনাথের অচলায়তন (১৯১২) বের হয়। অচলায়তনের পঞ্চক ঝুনো হয়নি। মহাপঞ্চক, উপাচার্য প্রভৃতিরা ঝুনো হয়ে অকালেই সব হারিয়েছেন। আচার্যের মধ্যে তখনও পাথর-চাপা তারুণ্যটুকু রয়েছে। দাদাঠাকুরের তো কথাই নেই। অচলায়তনের মধ্যে সচল গতির বাণী তাঁরাই দিয়েছেন। অচলায়তনের গানগুলি সব চলারই গান, তার প্রথম গানই,

তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে
কেউ তা জানে না।

তাই কবির ব্যাকুল মন

দূরে কোথায় দূরে দূরে
যেতে চায় কোন্ অচিন্ পুরে।

পঞ্চকের মনের বেদনা,

কেমনে রহি ঘরে
মন যে কেমন করে

তাই পঞ্চক গাইচেন,

পালে আমার লাগলো হাওয়া
হবে আমার সাগর যাওয়া
......পাগলামি আজ লাগল পাখায়
পাখী কি আর থাকবে শাখায়
দিকে দিকে সাড়া যে পাই রে।

তাঁর অন্তরের ব্যাকুল প্রার্থনা,

আমায় ছেড়ে দেরে দেরে।

তাই তাঁর কণ্ঠে ক্রমাগতই শোনা যায় পথের গান,

এপথ গেছে কোনখানে গো কোনখানে
তা কে জানে তা কে জানে!
যায় সে কাহার সন্ধানে
তা কে জানে তা কে জানে!

এই যাবার আনন্দেই তিনি সব ভয় হতে সব বন্ধন হতে মুক্ত হয়েছেন,

আর নহে আর নয়।
আমি করিনে আর ভয়।
আমি সকল দুয়ার খুলেছি আজ
যাব সকলময়।

তাই শোণপাংশুদের কাছে পথের কাঁটা, পথের সাগর, পথের গিরিকে আর ভয় কিসের?

ছুটি পথের কাঁটা পায়ে দলে'
সাগরগিরি লঙ্ঘি।

উৎসর্গ গ্রন্থে (১৯১৪) দেখা যাচ্চে কবি বলচেন,

কেবল তব মুখের পানে চাহিয়া
বাহির হনু তিমির রাতে তরণীখানি বাহিয়া।

এই বাহির হবার কারণও কবি জানিয়েছেন,

আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী!

এই এমনি করেই চলেছে

চিরকাল একি লীলা গো
অনন্ত কলরোল!

*   *   *

এইমত চলে চিরকাল গো,
শুধু যাওয়া, শুধু আসা।

এমনি করে যিনি তাঁকে পথের পথিকই করেছেন তাঁর কাছেও কবির কোনো অভিযোগ নেই।

পথের পথিক করেছ আমায়
সেই ভালো, ওগো সেই ভালো!
ঝড়ের মুখে যে ফেলেছ আমায়
সেই ভালো, ওগো সেই ভালো!

এই চলা চলতে চলতেই জন্ম-মরণের মধ্য দিয়ে আমরা

......নব নব মৃত্যুপথে
তোমারে পূজিতে যাব জগতে জগতে।

গীতিমাল্যেও (১৯১৪) কবি এই যাত্রার কথাই বার বার উল্লেখ করেছেন। কবি বলেছেন,

অনেক কালের যাত্রা আমার
অনেক দূরের পথে।
প্রথম বাহির হয়েছিলেম
প্রথম আলোর রথে।

এইখানে আমরা মধ্যযুগের সন্ত-সাধকদেরই ব্যাকুলতাই যেন শুনতে পাই।

যখন তিনি গাইলেন,

আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ।

তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম,

"ওগো পথিক, দিনের শেষে
যাত্রা তোমার সে কোন দেশে
এ পথ গেছে কোনখানে?"

তখন তিনি গাইলেন,

কে জানে ভাই কে জানে।

শুধু অজানা প্রেমের মন্দের টানে তিনি চলেছেন।

এখন থেকে যাবার সময় বড় করুণ সুরে তিনি বিদায় চাইচেন।

পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহ ভাই
সবারে আমি প্রণাম করে যাই।
পড়েছে ডাক চলেছি আমি তাই
সবারে আমি প্রণাম করে যাই।

তাই তার সকলের প্রতি অনুরোধ কেউ যেন তাঁর পথ রোধ না করে। সবাই যেন যাত্রায় শুভ প্রার্থনাই করে।

এবার তোরা আমার যাবার বেলাতে
সবাই জয়ধ্বনি কর।

সবার শুভ আশীর্বাদ নিয়ে অবিলম্বে তিনি বেরিয়ে যেতে চান। আর তিনি বৃথা বিলম্ব করতে নারাজ।

এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার
এই তরী
তীরে বসে যায় গো বেলা
মরি গো মরি।

গীতিমাল্যের পরে সেই বছরেই রবীন্দ্রনাথের গীতালি (১৯১৪) বের হয়। তারও প্রধান কথা, পথ চলতে যদি কখনো ক্লান্ত আসে তবে প্রভু যেন ক্ষমা করেন।

ক্লান্তি আমার ক্ষমা কর প্রভু
পথে যদি পিছিয়ে পড়ি কভু'

ক্ষমা প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলচেন,

আমার আর হবে না দেরী
আমি শুনেচি ঐ বাজে তোমার ভেরী।

বার বার তিনি আপন মনকে বলচেন, কোথাও বদ্ধ হয়ে গতিহীন হয়ে থাকলে চলবে না,

এই কথাটা ধরে রাখিস
মুক্তি তোরে পেতেই হবে।
যে পথ গেছে পারের পানে
সে পথে তোর যেতেই হবে।

নিজে যখন সব বাঁধন খুলচেন তার আগেই তাঁর গানকে তিনি সম্মুখে ভাসিয়ে দিচ্চেন। তাকেই বাধা হয়ে তার পিছে পিছে তাঁকেও বের হতে হবে। গানের নৌকা বেয়েই যে, তাঁর লোক-লোকান্তরের যাত্রা।

কুল হ'তে মোর গানের তরী
দিলেম খুলে,
সাগর মাঝে ভাসিয়ে দিলেম
পালটি তুলে।

পথকে আমাদের ভয় কিসের? আমরা যে চিরদিন পথ বেয়েই চলেছি। সে কথা ভুললে চলবে কেন?

আমি পথিক পথ যে আমার সাথী
বাহির হলেম কবে সে নাই মনে।

সবাই যখন কবিকে জিজ্ঞাসা করে, অনন্তকাল ধরে পথে পথেই তো চলেছ। কোন সুদূর কালে তবে তাঁকে পাবে? তাতে তিনি বলেন, "তিনিও যে আমার পথে চলার সঙ্গী।

পথে চলতে চলতেই তাঁকে পেয়ে চলেছি।" তাই তাঁর গান,

পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে,
পথে চলা সেই তো তোমার পাওয়া।

"হে পথের সঙ্গী, পথিক বন্ধু আমার, পথিক জনের পথে-উপহৃতে নমস্কারই বুঝি তোমার ভালো লাগে।"

পথের সাথী, নমি বারম্বার
পথিক জনের লহ নমস্কার।

তিনি তো রয়েছেন আমারই সঙ্গে সঙ্গে। তাই পথে ঝড় এসে যদি নৌকো ডুবেও যায় তবেও ক্ষতি নেই।

তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে
টুকরো করে কাছি
আমি ডুবতে রাজি আছি

এইখানে বাউলদের একটি গান মনে পড়ে—
"কূল না দিয়া ডুবাও যদি তাতেই আমি রাজি।"

গীতালীর বছর দুই পরে বের হলো **ফাল্গুনী** (১৯১৬) তাতেও তাঁর চলার ব্যাকুলতা পুরোপুরি বেজে উঠেছে। যখন গতিহীন জড়ের দল বলচে,

মোরা চলবো না
আমরা তো এই প্রাণের টলায় টলবো না।

তখন সচল প্রাণবন্তদের গান—

চলি গো চলি গো যাই গো চলে

*   *   *   *

পথিকভুবন ভালবাসে পথিক জনেরে।

বৃক্ষ তো দেখতে অচল। কিন্তু বৃক্ষও তার ফলে ফুলে চলছে। তার মধ্যেও গভীর প্রাণের একটি চলা আছে—

আমি সদা অচল থাকি
গভীর চলা গোপন রাখি।

নদীর মত চলতে পারে না বলে বৃক্ষের দুঃখ। নদীর কলগীতিময়ী গতির আনন্দ বৃক্ষের কোথায়?

ওগো নদী, চলার বেগে
পাগলপারা
পথে পথে বাহির হয়ে
আপনহারা।

ফাল্গুনীর কিছুদিন পরেই সেই বছরেই রবীন্দ্রনাথের **বলাকা** (১৯১৬) বাহির হয়। তাতে তো তিনি একেবারে গতিরই জয়গান করেছেন। যে বলাকার নামে গ্রন্থের নাম সেই বলাকা তো মানস-লোকের যাত্রী, নিরন্তর তাদের পাখায় আওয়াজই শোনা যায় আর আমাদের মনকে ব্যাকুল করে। তাদের সম্বোধন করেই কবি বলচেন,

হে হংস বলাকা,

আজ রাত্রে মোর কাছে খুলে দিলে স্তব্ধতার ঢাকা।
ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্যে নিখিলের এ পাথার গানে—
হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।

উপরে চলেছে বলাকা, আর নীচে চলেছে বিরাট নদীর অদৃশ্য নিঃশব্দ জল। নিরবধি 'বিশ্বনদী' চলেছে। এক মুহূর্ত তার গতি বন্ধ হলেই সর্বনাশ।

যদি তুমি মুহূর্তের তরে ক্লান্তি ভরে
দাঁড়াও থমকি' তখনি চমকি'
উচ্ছিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে।

তোমার এই নৃত্য মন্দাকিনীই—

তুলিতেছে শুচি করি
মৃত্যু স্নানে বিশ্বের জীবন।

তাই আমরা—

পুণ্য হই সে চলার স্নানে।

*   *   *   *

ওগো আমি যাত্রী তাই
চিরদিন সম্মুখের পানে চাই।
এই পবিত্রতা এই জীবন পাবার জন্যই—
এই দেহটির ভেলা নিয়ে দিয়েছি সাঁতার গো

*   *   *   *

আমি যে অজানার যাত্রী সেই আমার আনন্দ।
অজানা মোর হালের মাঝি, অজানাই তো মুক্তি।

তাই বন্ধন-দেবতার কাছে আমাদের প্রণতি দিতে পারবো না।

শিকল দেবীর ঐ সে পূজাবেদী
চিরকাল কি রইবে খাড়া?

সেই বন্ধন-দেবতাকে অগ্রাহ্য করেই সামনে চলতে হবে—

আমরা চলি সমুখ পানে,
কে আমাদের বাঁধবে?

পূরবীতে (১৯২৫) "বিজয়ী" কবিতায় রবীন্দ্রনাথের দুঃখ এইজন্য যে বিজয়ীর দল জগতের কল্যাণগতির পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়েছে। তাতে বিশ্ব-ছন্দ ব্যাহত হয়েছে।

"যাত্রা" কবিতায়—

কবি বলে, যাত্রী আমি, চলিব রাত্রির নিমন্ত্রণে
যেখানে সে চিরন্তন দেয়ালির উৎসব প্রাঙ্গণে
মৃত্যুদূত নিয়ে গেছে আমার উৎসব দীপগুলি।

যখন চলা বন্ধ করে আমরা থাকি, তখনও—

চকিত চলার ক্বচিৎ হাওয়ায়
মন কেমন করে।

পূরবী বইখানার অর্ধেকের বেশি অংশটির নামই পথিক। তার মধ্যে পথের সুরটিই প্রধান। দূরে না গেলে আমরা মর্মের দ্বার পাই না।

তুমি খুঁজে পাবে প্রিয়ে, দূরে গিয়ে
মর্মের নিকটতম দ্বার।

এই কথাতে মনে পড়ে অথর্বের বাণী—
অংতি সংতং ন জহয়তি অংতি সংতং ন পশ্যতি।

যাত্রার সাথীরা যে ছেড়ে চলে যায় সে-ই তো জীবনের বেদনা।

ওরে পান্থ, কোথা তোর দিনান্তের যাত্রা-সহচরী?

তাই অনেক সময় ব্যাকুলতায় বলতে হয়—

চলে এলাম একা।

ঝড়কেও তিনি বলেছেন, "আমি-তুমি উভয়েই এক পথের পথিক।"

তুমি পান্থ, আমি পান্থ,
জয়, জয়, জয়।

অগতির গতি পরমেশ্বর আমাদের জীবনের সাথী। চিরদিন পথে চলার ডাকই তিনি ডেকে যান। চিরকাল সেই ডাক শোনা যায়।

দোসর আমার, দোসর ওগো, কোথা থেকে
কোন শিশুকাল হ'তে আমায় গেলে ডেকে।

'সমাপন, বৈতরণী ও প্রাণগঙ্গা' কবিতায় আগাগোড়া যাত্রারই ইঙ্গিত।

"প্রবাহিনী" কবিতায় দুর্গম দূর শৈল-শিখরে তুষার হয়ে স্তব্ধ মহিমায় কবি নিশ্চল নীরব থাকতে চান না। তার চেয়ে তিনি ঝরণা হয়ে লোকালয়ে নেবে সবার সেবায় ও সঙ্গ-সৌভাগ্যে ধন্য হতে চান।

দুর্গম দূর শৈলশিরের
স্তব্ধ তুষার নই তো আমি,
আপ্‌না হারা ঝরণা-ধারা
ধূলির ধরায় যাই যে নামি'।

মহুয়া গ্রন্থে (১৯২৯) দেখি কবি তাঁর প্রিয় পথের সব সাথীদের ছেড়ে যাবার ভয়ও করেন না। প্রিয়তম ও তিনি এই দুইজনেই যে এক সঙ্গে পথে বের হয়েছেন। তাই "নির্ভয়" কবিতায় দেখি—

পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি
ছিন্ন পালের কাছি
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব
তুমি আছ আমি আছি।

"পথের বাঁধনেই' দুইজন পরস্পরে বদ্ধ।

পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি,
আমরা দুজনে চল্‌তি হাওয়ার পন্থী।

কবি যদি কোনো কারণে তরুর মত স্তব্ধ অচল হয়ে থাকতেও বাধ্য হন তবু তিনি পথচারী তীর্থযাত্রীদের যাত্রার কল্যাণের অংশ-ভাগী হতে চান। তরুর মত যথাসাধ্য তাঁদের পূজার উপকরণ তিনি যোগাতে উদ্যত।

হে তীর্থগামী তব সাধনার
অংশ কিছু বা রহিল আমার
পথ পাশে আমি তব যাত্রার
রহিব সাক্ষীরূপে।
তোমার পূজায় মোর কিছু যায়
ফুলের গন্ধধূপে।

"মুক্তরূপ" কবিতায় তিনি বলতে চান যে

*   *   *   *   *   *

"যাকে দেখতে চাই তাকে স্তব্ধ করে দেখলে তো তার পরিচয় ঠিক মিলবে না। তাকে যাত্রীরূপেই দেখা চাই।"

তোমারে আপন কোণে স্তব্ধ করি যবে
পূর্ণরূপে দেখি না তোমায়।

তাই তিনি সর্ব যাত্রীকেই আশীর্বাদ করেন

আমার প্রাণের শক্তি প্রাণে তব লহ
যাত্রা তব ধন্য হোক।

যে জন অচল হয়ে থাকতে চায় তাকেও কাল অচল থাকতে দিতে নারাজ। তাই বিদায় কবিতায় কবি বলেন,

সেই ধাবমান কাল,
জড়ায়ে ধরিল মোরে ফেলি তার জাল
তুলি নিল দ্রুত রথে

তাই—

কালের যাত্রায়।
হে বন্ধু বিদায়॥

পরিশেষ গ্রন্থে (১৯৩২) **"মুক্তি"** কবিতায় তিনি আপন অহমিকার গণ্ডীর মধ্য হতে পালাবার পথ খুঁজচেন।

আপনার কাছ হ'তে বহু দূরে পালাবার লাগি
হে সুন্দর, হে অলক্ষ্য, তোমার প্রসাদ আমি মাগি,
তোমার আহ্বান-বাণী।

কাজেই তাঁর প্রার্থনা—

আমারে বাহির করো।

বর্ষশেষ কবিতায় কবি বলচেন যাত্রা থামলেই যে মৃত্যু।

যাত্রা হয়ে আসে সারা,—আয়ুর পশ্চিম পথ শেষে
ঘনায় মৃত্যুর ছায়া এসে।

'ধাবমান' কবিতায় দেখা যাচ্ছে চলার চঞ্চলতাই বিশ্বের সৌন্দর্য-মাধুরীর মূল উৎস।

নিরন্তন ধাবমান চঞ্চল মাধুরী।

"যাত্রী" কবিতায় কবি সর্বলোক-যাত্রার সঙ্গে সমান ছন্দে চলতে বলেন।

সেখানে সবার সাথে নির্বিকার চলে এক সারে।

পুনশ্চ (১৯৩২) গ্রন্থে (৮নং কবিতায়) দেখি—

তরুণের দল ডাক দিল, "চলো যাত্রা করি,
প্রেমের তীর্থে, শক্তির তীর্থে"

(১৯৩৫) শেষ সপ্তকে (নং ৩৪) দেখা গেল তিনি অতীতকালের মধ্য দিয়ে পথিকের মত চলতে চলতে অনেক কিছু দেখেছেন।

পথিক আমি। পথ চলতে চলতে দেখেছি
পুরাণে কীর্তিত কত দেশ আজ কীর্তি-নিঃস্ব।

অনাগত যুগ হতেও কল্পনাবলে তিনি যেন ভেসে এসেছেন (২৩নং) এমনও উপলব্ধি করেছেন। কল্পনা করে বলেছেন,

অনাগত যুগ থেকে—

তীর্থযাত্রী আমি ভেসে এসেছি মন্ত্র বলে।

'বীথিকায়' (১৯৩৫) নবপরিচয় কবিতায় কবি যেন লোকান্তর হতে জন্মতরী বেয়ে এলেন।

জন্ম মোর বাহি যবে
খেয়ার তরী এল ভবে

তিনি বিশ্বলোকের। ঘরের কোনের মানুষ হলে এত আনন্দের অধিকার তাঁর হোতো না।

'যাত্রা' কবিতায় তিনি দেখচেন,

যে আনন্দ আজি মোর শিরায় শিরায় বহে,
গৃহের কোণের তাহা নহে।

এখানকার এই ক্ষণিক ঘরে—

অনাদিকালের পান্থ কিছুকাল করিবে বিশ্রাম।

এই কবিতাটি কবীরের পুনর্জন্মের বিখ্যাত কবিতাটি মনে পড়ে।

"পথিক" কবিতায় কবি বুঝতে পেরেছেন,

আমি যে পথিক চলিয়াছি পথ বেয়ে
দূরের আকাশে চেয়ে।

১৯৩৭ সালের কঠিন রোগে মৃত্যুবৎ কয়দিনব্যাপী মোহের পর কবি তাঁর নব উপলব্ধি নিয়ে **'প্রান্তিক'** লিখলেন। তিনি লিখচেন—

......বন্ধমুক্ত আপনারে লভিলাম
সুদূর অন্তরাকাশে ছায়াপথ পার হয়ে গিয়ে
অলোক আলোক তীর্থে সূক্ষ্মতম বিলয়ের তটে।

তার তিন সংখ্যক কবিতায় তিনি দেখচেন—

অজ্ঞাত সুদীর্ঘ পথ অতি দূর নিঃসঙ্গের দেশে।

মৃত্যুতে যেন তাঁর যাত্রা—

পূর্ব ইতিহাস ধৌত অকলঙ্ক প্রথমের পানে।
(৪নং কবিতা)

তিনি শুনেছেন,—

..........ভয়মুক্ত পথিকের
বাঁশিতে বেজেছে ধ্বনি, আমি তারি হব অনুগামী।
(৪নং)

আপন জীবন কর্ণধারের কাছে তাঁর প্রার্থনা,—

বহু রণক্ষেত্র তুমি করিয়াছ পার, আজি লয়ে যাও
মৃত্যুর সংগ্রাম শেষে নবতর বিজয় যাত্রায়।
(৭নং)

তিনি আপনার দেহকেও যেন কালস্রোতে ভেসে যেতে দেখচেন,

দেহ মোর ভেসে যায় কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি।
...ছায়া হয়ে বিন্দু হয়ে মিলে যায় দেহ
অন্তহীন তমিস্রায়।
(৯নং)

সময় হলে একদিন চরিতার্থ হবে তোমার—
শেষ যাত্রা শেষ নিমন্ত্রণ। (১০নং)

চেয়ে দেখ,

...........তোমার সম্মুখ দিকে
আত্মার যাত্রার পন্থ গেছে চলি অনন্তের পারে
সেথা তুমি একা যাত্রী, অফুরন্ত এ মহাবিস্ময়।
(১৩নং)

যাবার সময়ে এই পৃথিবীকে ও তার অধিদেবতাকে তাঁদের যোগ্য নমস্কার দিয়ে যেতে হবে।

যাবার সময় হোলো বিহঙ্গের। এখনি কুলায়
রিক্ত হবে।.........
....................এপারের ক্লান্ত যাত্রা গেলে থামি
ক্ষণতরে পশ্চাতে ফিরিয়া মোর নম্র নমস্কারে
বন্দনা করিয়া যাব এ জন্মের অধিদেবতারে॥
(১৪নং)

আজ পৃথিবী হতে বিদায়ের দিনে তিনি শুনচেন,

.........আজি মুক্তি মন্ত্র গায়
আমার বক্ষের মাঝে দূরের পথিক চিত্ত মম
সংসার যাত্রার পথে সহমরণের বধূ সম।
(১৫নং)

সেঁজুতিতে (১৯৩৮) তিনি দেখচেন—

ছুটেছে প্রাণের ধারা।
সে ধারার বেগ লেগেছে আমার মনে
(পত্রোত্তর)

"যাবার মুখে" তিনি বলচেন—

যায় যদি তবে যাক,
এল যদি শেষ ডাক,—

তাঁর বলতে সংকোচ নেই—

যাত্রা আমার নৃত্য পাগল নটরাজের পিছে।
(অমর্ত)

পলায়নী, তীর্থযাত্রিনী, ঘর ছাড়া প্রভৃতি কবিতাতেও সেই যাত্রারই সুর বাজচে।

সানাইর (১৯৪০) প্রথম কবিতাটিতেই তিনি স্বীকার করচেন,

সুদূরের পানে চাওয়া উৎকণ্ঠিত আমি
মন সেই আঘাটায় তীর্থপথগামী।

"মানসী" কবিতায় দেখি তাঁর

মনখানা উড়ো পক্ষী
বাদলা হাওয়ায় দিকে দিকে ধায়
অজানার পানে লক্ষ্যি।

"রোগশয্যা" (১৯৪০) যখন কবি লেখেন তখন তিনি চলাফেরা করিতে অক্ষম। তখনও তিনি অনিঃশেসে প্রাণের গতিতে মুগ্ধ। নিরন্তর সে লোকলোকান্তরের খেয়া পার হয়ে যাচ্ছে।

অনিঃশেষ প্রাণ
অনিঃশেষ মরণের স্রোতে ভাসমান,
পদে পদে সঙ্কটে সঙ্কটে
নামহীন সমুদ্রের উদ্দেশ বিহীন কোন্ তটে
পৌঁছিবারে অবিশ্রান্ত বাহিতেছে খেয়া,
কোন্ সে অলক্ষ্যে পাড়ি-দেয়া
মর্মে বসি দিতেছে আদেশ,
নাহি তার শেষ।
চলিতেছে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি প্রাণী
এই শুধু জানি। (নং ২)

চিত্রা গ্রন্থের "সিন্ধুপারে" কবিতায় কবি লিখেছিলেন অবগুণ্ঠিত বধূরূপে এসে জীবন-দেবতা জন্মজন্মান্তরের দ্বার পার করে নিয়ে যান। রোগশয্যাতে সেই তাঁর লোক-লোকান্তর-পার-করা বধূরূপটি কবি আর একবার জীবনের শেষে নিবিড় করে দেখচেন।

বরের চরম দান মরণের বধূ
দক্ষিণ বাহুতে বাহি চলিয়াছে যুগান্তের পানে।
(৩৭নং)

এর কিছুদিন পরেই রবীন্দ্রনাথের **আরোগ্য** (১৯৪১) বের হলো। এই আরোগ্যে তিনি শয্যাত্যাগ করতে পারেননি। শুধু ডাক্তার বৈদ্যের হাঙ্গামা থেকে একটু মুক্তি তিনি পেয়েছেন। সেই বৎসরেই তিনি ইহলোক হতে বিদায় নেবেন। তখন তাঁর—

ক্ষণে ক্ষণে মনে হয় যাত্রার সময় বুঝি এল
সময় যাবার
শান্ত হোক স্তব্ধ হোক,

আরোগ্যের দুইমাস পরে আর মৃত্যুর তিন মাস পূর্বে বের হলো রবীন্দ্রনাথের **"জন্মদিনে"** (১৯৪১)। জন্মদিনের কথা বলতে গিয়ে প্রথম কবিতাটিতেই তিনি সুদূরকে অন্তরে নিবিড় করে দেখলেন।

আজি এই জন্মদিনে
দূরত্বের অনুভব অন্তরে নিবিড় হয়ে এল।

নিজেকে তিনি দেখলেন—

অলক্ষ্য পথের যাত্রী অজানা তাহার পরিণাম।
আজি এই জন্মদিনে
দূরের পথিক সেই তাহারি শুনিনু পদক্ষেপ
নির্জন সমুদ্র তীর হতে। (১নং)

জন্মদিনের ঘটে তিনি দেশদেশান্তরের ও লোক-লোকান্তরের নানা বিচিত্র আনন্দ-রস যেন সংগ্রহ করে প্রেমময়কে অভিষেক করতে চলেছেন।

জন্মবাসরের ঘটে
নানা তীর্থে পুণ্যতীর্থ বারি
করিয়াছি আহরণ, একথা রহিল মোর মনে।
(৩নং)

লোকান্তরে নিমন্ত্রণ করার দূত তখন তাঁর দ্বারে সমাগত। তাই অকুল সিন্ধুকে প্রণতি জানাবার জন্য এই ডাক। তার আগে এখান থেকেও তো বিদায় নিতে হবে।

সেই অজানার দূত আজি মোরে নিয়ে যায় দূরে
অকূল সিন্ধুরে
নিবেদন করিতে প্রণাম
মন তাই বলিতেছে আমি চলিলাম। (১২নং)

যাবার আগে তিনি পৃথিবীর সব সঙ্কীর্ণ পরিচয় মুছে ফেলে সরল সহজ মানুষ হয়ে যাত্রা করতে চান। অথর্ব বেদে এমন সংস্কারহীন মানুষকে ব্রাত্য বলে। ব্রাত্যের মতই তাঁর বাণী—

বাঁধন বাহিয়ে মোর চলমান বাসা
ভেসে চলে তীর হতে তীরে।
আমি ব্রাত্য আমি পথচারী॥ (২৮নং)

কবির তিরোধানের পর তাঁর শেষ কয়টি কবিতা ও গান **শেষ লেখা** (১৯৪১ সালে) বের হয়। মৃত্যুকে তিনি কোনোদিন চরম বিনষ্টি বলে মনে করেননি। মৃত্যু ছিল তাঁর দৃষ্টিতে নবলোকের অমৃতের দ্বার।

রাহুর মতন মৃত্যু
শুধু ফেলে ছায়া
পারে না করিতে গ্রাস জীবনের স্বর্গীয় অমৃত
জড়ের কবলে
একথা নিশ্চয় মনে জানি।

(২নং)

তাঁর মৃত্যুর পরে যে গানে তাঁর শেষ বিদায় হবে সে তিনি আগেই রচনা করে রেখে গিয়েছিলেন,

সমুখে শান্তি-পারাবার
ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।
তুমি হবে চিরসাথী,
লও লও হে ক্রোড়পাতি
অসীমের পথে জ্বলিবে
জ্যোতি ধ্রুবতারকার।
মুক্তিদাতা, তোমার ক্ষমা তোমার দয়া,
হবে চিরপাথেয় চিরযাত্রার।
হয় যেন মর্ত্যের বন্ধন ক্ষয়,
বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি' লয়,
পায় অন্তরে নির্ভয় পরিচয়
মহা অজানার॥ (১নং)

বিজ্ঞান ও মানব কল্যাণ

ডাঃ হিমাংশুকুমার মিত্র

হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে বছর দেড়েক আগে আণবিক বোমা ফেলা হয়। সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় দুটো বড় শহরের অস্তিত্ব প্রায় লোপ, আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সহসা যবনিকা পতন। তথাকথিত সম্মিলিত জাতিদের মধ্যে জয়োল্লাসের ফোয়ারা ছুটতে লাগল।—উল্লাসের একটা প্রধান কারণ এই যে, জাপানের স্পর্ধা চূর্ণবিচূর্ণ করা হয়েছে। কিন্তু একথাও এখানে জিজ্ঞাস্য—সারা পৃথিবী বিবেক কি তখন লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল? না coloured race এর চরম দুঃখ ও কষ্ট শ্বেতাঙ্গের বিবেক বা শুভবুদ্ধিকে কিছুমাত্র বিচলিতও করতে পারে না? এই অস্ত্রের নিষ্ঠুর শক্তির পরিচয় যে তাঁদের জানা ছিল না তা নয়—আমেরিকার Texas মরুভূমিতে আণবিক বোমার পরখের সময় তার নির্মম মূর্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ তাঁদের ঘটেছিল।

উপরোক্ত জয়োল্লাসের ঢেউ যেন হঠাৎ ভেঙ্গে ভেঙ্গে গেল। আণবিক বোমা যে দু-মুখো সাপ এটা ক্রমশঃই প্রতীয়মান হতে লাগল।

যাক, সে কথা। হিরোসিমার উপর এই বোমা প্রয়োগের আর একটা দিক আছে। এই ঘটনাটা জোর গলায় জানিয়ে গেল—পৃথিবীতে একটা নতুন যুগের সূচনা হয়েছে—যে যুগটাকে বলা হচ্ছে আণবিক শক্তির যুগ। এ যুগের যে কয়েকটা বিশেষত্ব আছে তা আমরা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারি নি। প্রথম আঘাতে এর বিভীষিকা আমাদের মনকে তোলপাড় করেছিল সত্য, কিন্তু আবার যেন একটা সুষুপ্তি এসে গেছে, দৈনন্দিন কাজের মাঝে 'Pre-atomic' যুগের মনোভাবের পরিচয় মিলছে।

কোমর বেঁধে আমরা লেগে গেছি মারামারি করতে—মুসলমান মারছেন হিন্দুকে আর হিন্দু নিচ্ছেন তার প্রতিশোধ মুসলমানকে মেরে। কেউ বলছেন বাঙলাকে ফের ভাঙ্গ, আর কেউ বা ততোধিক গলা ফাটিয়ে বলছেন ভেঙ্গ না। ভারতকে হিন্দুস্থান, পাকিস্থান এবং রাজস্থানে ভাগ করবার একটা প্রকাণ্ড চক্রান্ত চলছে। কে জানে আমাদের চেয়েও আরও বুদ্ধিমান কেউ ঠিক এই সময় এই তিনটি স্থানের উপর কয়েকটা আণবিক বোমা ছেড়ে তাঁর নিজ স্থানরূপে দখল করবার ফন্দি না আঁটছেন? আন্তর্জাতিক বৈঠকে দেখছি সেই পুরাতন পন্থা—শক্তিশালী জাতি তাঁর দিকে টেনে নিচ্ছেন অনেক ছোট ছোট জাতিকে—পাকাচ্ছেন একটা বড় রকমের দল; উদ্দেশ্য হচ্ছে বিপক্ষের শক্তিশালী জাতিকে দাবিয়ে রাখতে তিনিও হয়ত ঐ একই চাল চালছেন। ফলে আন্তর্জাতিক দাবাবড়ের ছকে পরিস্ফুট হয়ে উঠছে সোভিয়েট ও Yankee স্থান। আণবিক শক্তির যুগ যে দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের কাছ থেকে দাবী করে তার কোন চিহ্নই আমাদের ব্যবহারে দেখা যাচ্ছে না।

পূর্বে এ যুগের বিশেষত্ব সম্বন্ধে বলেছি। যেভাবে আণবিক শক্তির যুগের অবতারণা ঘটান হয়েছে তা বাষ্প (Steam) বা বিদ্যুৎ (Electricity) যুগের বিকাশের ইতিহাস থেকে ভিন্ন। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের বিশেষ করে যে বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানকে নিত্য নৈমিত্তিক কাজে লাগান তাঁর জিজ্ঞাস্য এই, মানবজাতির উপর প্রথমোক্ত যুগের প্রভাবের সঙ্গে বাষ্প ও বিদ্যুৎ যুগের প্রভাবের মূলতঃ কোন প্রভেদ আছে কি? জেমস ওয়াট চা খেতে খেতে দেখলেন চায়ের জল যে পাত্রে ফোটান হচ্ছে তার ঢাকনাটি জলের বাষ্পের চাপে লাফিয়ে উঠছে। ওয়াট বাষ্পের শক্তির পরিচয় পেয়ে তাকে কার্যকরী করবার জন্য উৎসুক হলেন। ফলে স্টীম এঞ্জিনএর সৃষ্টি হোল। স্টীম এঞ্জিনকে আমরা লাগাচ্ছি এখন রেলগাড়ী টানতে, কারখানার নানা কল-কব্জা ঘোরাতে। ওয়াটসএর পরিকল্পনা এবং স্টীমএর পূর্ণ বিকাশের মধ্যে রয়ে গেছে, বেশ কয়েকটা বছরের ব্যবধান। বিদ্যুৎ যুগের ইতিহাসও অনেকটা এইরূপ। থেলস (Thales) রজনকে সিল্কের কাপড়ের সঙ্গে ঘসতে গিয়ে প্রথমে পেলেন বৈদ্যুতিক শক্তির পরিচয়, সেটা হল খৃষ্টপূর্ব ৬০০ বৎসর আগেকার কথা। এখন আমরা ঘরে একটা বোতাম টিপলেই আলো জ্বালাই, পাখা ঘোরাই এবং বিদ্যুৎকে নিজের চাকরের মত খাটিয়ে নিই। কিন্তু এসব করতেও লেগেছে আমাদের অনেক সময়।

আণবিক শক্তিকে কাজে লাগাতে এত দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানের দরকার হয়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তাড়নায় পদার্থবিদ্যার এক জটিল মূল-নীতির আবিষ্কারের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চেষ্টা চলতে লাগল তাকে প্রয়োগ করতে—তাকে কার্যকরী করতে। যদিও দুঃখের বিষয়, এই প্রয়োগের ফল হল মহাধ্বংসের মূর্তি। সাধারণতঃ এই ধরণের মূল-নীতি বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থেকে যায় বা বড়জোর তাঁর বৈজ্ঞানিক মাসিক পত্রিকায় লিপিবদ্ধ হয়ে পড়ে থাকে। তাকে মানুষের কাজে লাগাতে কেউ বড় চেষ্টা করে না।

এক্ষেত্রে কিন্তু তার ব্যতিক্রম ঘটল। আমেরিকানরা আণবিক শক্তি কার্যকরী করবার প্রচেষ্টার পরিকল্পনা নাম দিলেন 'Manhattan Project'। পরিকল্পনার উদ্দেশ্য যাতে এর নাম থেকে ধরা না পড়ে, সেইজন্য হল এই মেকী নামকরণ। যুদ্ধের সময় এইরূপ সাঙ্কেতিক নামের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। সাধারণতঃ রাজনীতিজ্ঞরা বা দেশের নেতারা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কি ঘটছে বা

না ঘটছে, তা নিয়ে মাথা ঘামান না—যদিও বা ঘামান, তাহলে বিজ্ঞানের প্রসারের বাধা দেবার জন্যেই। এই ক্ষেত্রে কিন্তু ঘটল অন্যরূপ। আইনস্টাইন ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টকে জার্মানীর হানস (Hans) ও সহকর্মীদের এবং ডেনমার্কের Neils Bohr প্রভৃতির পরমাণু বিশ্লেষণের (Neuclear fission) পরথের কথা জানান। তৎসংশ্লিষ্ট আণবিক শক্তির কথাও তাঁকে বুঝিয়ে বলেন এবং এই শক্তির প্রয়োগের সম্ভাবনার সম্বন্ধেও তাঁকে সচেতন করেন। মানহাট্টান পরিকল্পনার পরিসূচনার কৃতিত্ব প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টকে দেওয়া হয়ে থাকে; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যে লোক ডুবে যাচ্ছে, সে কি সামান্য খড়কাটিও আঁকড়ে ধরে বাঁচবার চেষ্টা করে না? হিটলার ও তোজোর একত্র বিক্রমে রুজভেল্ট প্রায় নিমজ্জমান হয়েছিলেন। আইনস্টাইনের ইঙ্গিত তাঁর কাছে এই ক্ষুদ্র তৃণরাশির মত। আমেরিকানদের রয়েছে বিশাল Industrial Machinery, যার বিশালতা প্রত্যক্ষ না দেখলে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট লাগিয়ে দিলেন এই Industrial Machinery.

আণবিক শক্তিকে কার্যকরী করবার জন্য হিটলারের নিবুদ্ধিতায় হানস্, Bohr প্রভৃতিকে ইউরোপ ছেড়ে আমেরিকায় আশ্রয় নিতে হয়েছিল। তাঁদের এবং ইংলণ্ড ও আমেরিকার অন্যান্য আণবিক বৈজ্ঞানিকদের এক রকম বাধ্যই করা হল মানহাট্টান পরিকল্পনার পক্ষে কাজ করতে। এই পরিকল্পনার ফলেই এত শীঘ্র আণবিক বোমার প্রয়োগ সম্ভবপর হল।

যে বৈজ্ঞানিক অনুষ্ঠান ও শিল্প গড়ে উঠলো আণবিক শক্তির প্রয়োগের জন্য—তাতে ছিলেন সকল রকমের বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনিয়ার-পদার্থবিদ, রাসায়নিক, চিকিৎসক ও মনোবিজ্ঞানবিদ প্রভৃতি কেউই বাদ যান নি। যে কোন বৈজ্ঞানিকের পক্ষে এই অনুষ্ঠানের গর্বে গর্বিত হওয়া এবং নৈপুণ্যে আনন্দলাভ করা স্বাভাবিক। কিন্তু সব বৈজ্ঞানিকই নতমস্তকে অনুতাপ করতে বাধ্য যে তাঁরা আণবিক শক্তির প্রয়োগে সহায়তা করলেন—নিদারুণ ধ্বংসলীলার মধ্য দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি করে। বাষ্পের যুগ (Steam age) Slumsএর সৃষ্টি করে সব দেশে। লেনিন চেয়েছিলেন বৈদ্যুতিক শক্তিকে সাধারণ মানুষের কার্য ও কষ্ট লাঘব করবার সহায়তা করতে কিন্তু বৈদ্যুতিক শক্তির যুগ সাধারণ মানুষের ভাগ্য ফেরাতে পারেনি। আর এখন আণবিক শক্তির অবতারণা হল কি না সমগ্র মানব জাতিকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে? সমগ্র মানব জাতিকে কি এখন হতে এই ধ্বংসের বিভীষিকা সামনে রেখে চলতে হবে?

তাই কিছুক্ষণ আগে জিজ্ঞাসা করছিলাম আণবিক শক্তির যুগের প্রভাব কি বাষ্প যুগের বা বৈদ্যুতিক যুগের প্রভাব থেকে ভিন্ন? সাধারণ মানুষ জিজ্ঞাসা করতে পারে বিজ্ঞানের উন্নতি আর তার প্রয়োগের ফল যদি আরও দুর্ভাগ্যের সৃষ্টি করে তাহলে এইরূপ বিজ্ঞানের প্রসারের কি দরকার এবং প্রসার যত না হয় ততই মঙ্গল। বিজ্ঞানের ইতিহাসের আদিম যুগ থেকে বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানের রহস্য আবিষ্কার করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। সে আবিষ্কার কিভাবে প্রয়োগ করা হবে সে বিষয়ে মন দেওয়া তাঁর কাজ ছিল না। ফলে প্রয়োগ করার ভারটা তাঁর হাতের নাগালের বাইরে গেছে। এ বিষয়ে তাঁর নিশ্চেষ্টতা, নির্বিকার মনোভাব বা অক্ষমতার ফলে বিজ্ঞানকে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে যুগ যুগান্তর থেকে নানারকম অপব্যবহারে। তাই সাধারণের মনে যদি এই বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়ে থাকে যে পৃথিবীর সব কিছু দুঃখকষ্টের মূলে রয়েছে বিজ্ঞানের প্রসার আর তার পেছনে রয়েছে বৈজ্ঞানিকের দুষ্ট বুদ্ধি—সেটা কি নিতান্তই অমূলক? এই মিথ্যা ধারণা যদি ভাঙতে হয় তবে বৈজ্ঞানিককে এতদিনকার নির্বিকার মনোভাব ছেড়ে বিজ্ঞানের প্রয়োগ ব্যাপারে একটা বিশেষ অংশ নিতে হবে—সর্বপ্রথমে দেখতে হবে বিজ্ঞানের যে সব মূলনীতি তিনি আবিষ্কার করেন তার প্রয়োগের অধিকার থাকবে শুধু তাঁরই। যুগ যুগান্তর থেকে যে অধিকার তিনি অবহেলায় হারিয়েছেন তাকে ফিরিয়ে পাওয়া সহজসাধ্য হবে না।

সুখের বিষয় এই যে, তাঁরা এখন এ বিষয়ে কিছুটা সচেতন হয়েছেন এবং তার আভাস কিছু কিছু পাওয়া যাচ্ছে। আণবিক যুগের কয়েকটা বিশেষত্ব পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এর অবতারণা সংশ্লিষ্ট একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার আছে। হিরোসিমায় আণবিক বোমা ফাটাবার কিছু পরেই আণবিক বৈজ্ঞানিকদের শিবিরে চাঞ্চল্যের চিহ্ন দেখা গেল। তাঁরা আণবিক শক্তির এই অপব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেন। তাঁরা ঘোষণা করলেন এই অপব্যবহার বন্ধ না হলে আণবিক শক্তির প্রসারে তাঁদের সাহায্য পাওয়া যাবে না। তাঁদের এই দাবী সত্যই প্রশংসনীয়, কিন্তু তাঁদের জিজ্ঞাসা করি এই দাবীটা আরও কিছু পূর্বে পেশ করা কি উচিত ছিল না? কেন তাঁদের সম্মিলিত চেষ্টা দ্বারা নাগাসাকি ও হিরোসিমায় মানুষের হিংসার ও উন্মত্ততার যে বীভৎসরূপ দেখা দিয়েছিল তাকে বাধা দেবার চেষ্টা তাঁরা করেননি? মানুষ যে পশুর চেয়ে হীন ও দানবের চেয়ে নির্মম এই কলঙ্কপূর্ণ পরিচয়ের হাত থেকে তাকে কেন ত্রাণ করলেন না? জানি তাঁদের পক্ষে বলা হবে তখন যে যুদ্ধ চলছিল তার মধ্যে এ রকম একটা দাবী পেশ করলেও কার্যকরী হত না। যুদ্ধরত জাতির নেতাগণ এঁদের দাবী ত অগ্রাহ্য করতেনই উপরন্তু তাঁদের কারাদণ্ড মৃত্যুদণ্ড কোন দণ্ডেরই হাত থেকে হয়ত অব্যাহতি মিলত না। তাঁদের বাধা ও বিঘ্ন যে অনেক একথা অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু তবুও উত্তরে বলব তবে কি এই প্রতিবাদ অর্থহীন? আর যদি ইংরাজ আমেরিকা রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বাধে, এই প্রতিবাদের কথা ভুলে গিয়ে লেগে যাবেন কি তাঁরা নিষ্ঠুরতর হিরোসিমার পুনরাবৃত্তিতে? এ আশঙ্কা যে নিতান্ত অহেতুক নয় তার প্রমাণ বিকিনি দ্বীপপুঞ্জের উপর আণবিক বোমার ধ্বংসের ক্ষমতার নূতন করে পরখে। যুদ্ধ শেষ হবার এক বৎসরের পূর্বেই আবার এক বিশাল পরখের বন্দোবস্ত—বিশালতায় সে বোধ করি পরিকল্পনাকেও হার মানায়।

বিকিনির পরখ সম্বন্ধে ফ্রাঙ্ক ডবলিউ প্রেস্টন আমেরিকার গ্লাস ইণ্ডাস্টী নামক মাসিকে এক প্রবন্ধ লিখেছেন—তার নাম দিয়েছেন "Rehearsal for Doomsday" বা "ধ্বংসলীলার মহড়া।" অনেক খাঁটি কথা আছে এই প্রবন্ধের মধ্যে যদিও তাঁর নৈরাশ্য-সূচক চিন্তাধারার বা শ্লেষাত্মক মনোভাবের সঙ্গে আমাদের মন সায় দিতে চায় না। প্রেস্টন বাইবেল থেকে পিটারের বাণী এবং সেক্সপিয়রের 'টেমপেস্ট' থেকে কিঞ্চিৎ অংশ উদ্ধৃত করেছেন। পিটার এবং সেক্সপিয়ার দুজনেই মত প্রকাশ করেছেন যে, পৃথিবীর শেষ বা ধ্বংস হবে এক বিরাট আগুন লাগার ফলে। প্রেস্টন আরও উল্লেখ করেছেন যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পদার্থবিদদের মত ছিল যে, থার্মোডিনামিক্স-এর দ্বিতীয় নিয়ম অনুযায়ী (Second Law of Thermodynamics) আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শেষ হবে আগুনের উত্তাপের প্রকোপে নয় বরং ঠাণ্ডার চাপে। লর্ড কেলভিন প্রমুখ পদার্থবিদদের ধারণা এই ছিল যে, ব্রহ্মাণ্ড ক্রমশঃই শীতল হয়ে আসবে ক্রমশঃ তার 'তাপ' absolute zeroর কাছে এসে পেঁছাবে; সেখানে তখন কোনরূপ জীবের পক্ষে বাঁচা সম্ভবপর হবে না। প্রেস্টন সূক্ষ্ম, চুলচেরা বিচার করে দেখিয়েছেন পিটারের এবং লর্ড কেলভিনের মত পরস্পর বিরোধী নয়। পৃথিবীটা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় মাত্র বালি-কণার তুল্য। এই ক্ষুদ্র অংশ হয়ত পিটারের মত অনুযায়ী আগুনের তাপে দ্রব হয়ে যাবে এমন কি বাষ্পে পরিণত হবে; তারপর হয়ত কেলভিনের কল্পিত মতে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ঠাণ্ডা হতে হতে absolute zeroএর দিকে চলতে থাকবে। তারপর প্রেস্টন করেছেন একটা সুতীব্র কটাক্ষ "পৃথিবীর লয় যে প্রকৃতির

স্বাভাবিক নিয়ম ব্যতিক্রম করে আদৌ ঘটতে পারে এটা পিটার, সেক্সপিয়ার বা কেলভিনের ধারণার একেবারেই অতীত—তাঁরা নিশ্চয়ই কল্পনা করতে পারেননি যে, ধ্বংসটা আনা হবে কৃত্রিম উপায়ে আমেরিকার গভর্নমেন্টের খরচে!!" এখানে বলে রাখা ভাল যে, আণবিক বিশ্লেষণের (Neuclear fission-এর) সময় একটা chain reactionএর সৃষ্টি হয় অর্থাৎ এক অণুর বিনাশের পর অন্য অণুর সৃষ্টি হয় তার বিনাশ হয় তৎক্ষণাৎ এবং তার জায়গায় আসে আর এক অণু ইত্যাদি। বিকিনির পরখের সময় অনেক বৈজ্ঞানিকের আশংকা ছিল এই chain reactionকে থামান যাবে কি না।

প্রেস্টন আর একটা বিভীষিকা দেখিয়েছেন। সূর্যের উপর যে Neuclear fission—আণবিক বিশ্লেষণ চলছে তার গতি নাকি পৃথিবী থেকে আণবিক বৈজ্ঞানিক বদলাতে পারবে না। তার ফলে আমাদের গ্রীষ্মের উত্তাপ আরও প্রখর করা যেতে পারবে—২০° temperature তোলাটা কিছু অসম্ভব হবে না; ফলে heat stroke এ পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে এক সঙ্গে মেরে ফেলা অসম্ভব হবে না। প্রেস্টন বিদ্রূপ করে বলেছেন হয়ত দগ্ধে মারার ফলে এই জীবশূন্য পৃথিবীতে আবার ডারউইন কল্পিত evolution-এর ফলেই নতুন মানুষ গড়ে উঠবে যে মানুষ হবে নীচ বুদ্ধি বর্জিত—যে সত্যই হবে মানুষ নামের উপযোগী।

প্রেস্টনের বাণী নৈরাশ্যের বাণী। আণবিক শক্তির একটা ধ্বংসের দিক যেমন আছে তার একটা সৃষ্টির দিকও আছে। আণবিক শক্তিকে ঠিকমত প্রয়োগ করলে অনেক লোক-হিতকর কার্য করান যেতে পারে। দুটো আঙুলের মধ্যে যে কয়লার টুকরাটা ধরা যায় তা থেকে আণবিক বিশ্লেষণ করে যে পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হতে পারে, কয়েক গাড়ী কয়লা বয়লারে মামুলি উপায়ে পুড়িয়ে পাওয়া যায় তারচেয়ে অনেক কম শক্তি। Atomicfission চিকিৎসকদের হাতে এনে দিয়েছে অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি সারাবার পন্থা। অতুল ঐশ্বর্য এনে দিতে পারে আমাদের এই নব আবিষ্কৃত আণবিক শক্তি।

নব আবিষ্কৃত বিজ্ঞানের মূলনীতি দাবী করে থাকে আমাদের কাজ থেকে অনেক আমূল পরিবর্তনের—আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের, সমাজ পদ্ধতির, অর্থনীতি শাস্ত্রের এবং আরও অনেক কিছু। সে দাবীর তালে তাল দিয়ে যেতে পারলে এই বিজ্ঞান প্রসারের যুগে অনেক বেসুরো রাগিণী আমাদের শুনতে হত না। সে দাবী মেটাতে পারিনি বলেই না দেখছি চতুর্দিকে আমাদের উপহাস-জনক ব্যবহার, আর অসমঞ্জস অবস্থার সৃষ্টির? বোধ করি কয়েকটা মাত্র তাদের তালিকা দিতে গেলেও আমাদের কেটে যাবে অনেকটা সময়।

তার মধ্যে সবচেয়ে গোলযোগ বেধেছে আমাদের যুগে অর্থনীতির ক্ষেত্রে। বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে আমরা বাড়িয়েছি আমাদের ধন-সম্পদ, কিন্তু সেই সম্পদ ভাগের বেলায় বিজ্ঞানের আশ্রয় নিইনি আমরা। সম্পদ বণ্টন ব্যাপারটা যে বিজ্ঞান সাপেক্ষ সেটা আমরা এখনও সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করতে পারিনি। তাই দেখি বিজ্ঞানের প্রয়োগ ফলে সামান্য কয়েকজন লোক হচ্ছেন বিপুল সম্পদের অধিকারী যাঁদের আমরা মালিক বলি। সংখ্যা-গরিষ্ঠ অনেকে যারা এই সম্পদ সঞ্চয়নে সাহায্য করেছেন তারা হয়েছেন দিন দিন নিঃস্বতর যাঁদের আমরা বলি শ্রমিক। ফলে সৃষ্টি হচ্ছে

...ক আর শ্রমিকের চিরন্তন সঙ্ঘর্ষ। শ্রমিক ...ত সাধারণ মানুষ দোষ দিচ্ছে বৈজ্ঞানিককে। আবিষ্কৃত কলকব্জাই নাকি তার দুর্ভাগ্যের ...ণ, তাকে বস্তির মধ্যে থাকতে হয়, যথেষ্ট পরিমাণ অন্ন জোটে না তাকে সব ... থাকবার জন্য মদখেয়ে মাতাল হোতে হয়। ... মালিক কি ভাবছেন? হয়ত তিনি মনে ... সন্তুষ্ট হচ্ছেন যে, বৈজ্ঞানিক তাঁর ন্যায্য ...ত তার কাছ থেকে চাইছেনই না বরং তাঁর ...বিষ্কার ভাণ্গিয়ে খাবার পথে বাধাও দিচ্ছেন হয়ত তিনি বৈজ্ঞানিকের ওপর বিরক্তও ...ছন ভাবছেন কেন সে আরও নতুন আবিষ্কার ... ধনভাণ্ডার আরও ভারী করে দিচ্ছে না?

বেকার সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা কাছ ...ক দেখবার সুযোগ একবার হয়েছিল। ...২৯ সালে আমেরিকার প্রসিদ্ধ ওয়াল ...টের শেয়ারের বাজারে হঠাৎ যেন উল্কাপাত ... এক তাণ্ডব নৃত্যের সৃষ্টি করল। তখন ...ম আমেরিকায়, দেখলুম কত অদল বদল। ...খ দুঃখ হল, হাজার হাজার লোক, যারা ধনী ... রাতারাতি হয়ে গেল ভিখারী। শেয়ারের ... অনেক পড়ে গেল, তার পরেই একে একে ...রখানা বন্ধ হতে লাগল। দুদিন আগে ...টরে চড়ে যাঁরা কারখানায় কাজ করতে যেতেন, ...রা গিয়ে দাঁড়ালেন লম্বা সারি দিয়ে, লঙ্গর-...নার কাছে এক টুকরা রুটি বা এক পেয়ালা ...up-এর জন্যে। দেশব্যাপী এল একটা ...রাট বেকার সমস্যা। আমেরিকার ব্যাঙ্কে ...েছি, সে সময় পৃথিবীর বেশীর ভাগ সোনা ...য়ে আটকে ছিল। কারখানার গুদামে ...দামে নষ্ট হচ্ছিল তৈরী মাল।

কি করে এই সামঞ্জস্যবিহীন অবস্থার ...তিকার হতে পারে, তাই নিয়ে পড়ে গেল ...শময় সাড়া। কিন্তু প্রতিকারের ব্যবস্থার ...না দেখে আশ্চর্য হয়েছিলুম, বাস্তবিকই ...গুলো প্রতিকারের ব্যবস্থা না পাগলের ...লাপ? রোগটা ঠিক হল অত্যুৎপাদন (over production)। কাজেই হঠাৎ এদিকে ...দিকে বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি দেখলুম—"রুটি ...শী করে খাও", "আরও দুধ পান কর", টাকা খরচ করে এটা ওটা আরও বেশী করে ...রিদ কর", টাকা হাত না বদলালে, মাল না ...ইলে, কারখানা নতুন মাল তৈরী করবে না, ...র বেকার সমস্যারও সমাধান হবে না। এসব ...না হল যাদের উদ্দেশ্যে, তাদের হাতে টাকা ... দূরের কথা, পয়সাও একটা ছিল না, যারা ...টুকরা রুটি বা এক ফোঁটা দুধ পেলে বর্তে ...ত। মেয়েরা বিদেশে অনেকেই খেটে খান। ...দের উপদেশ দেওয়া হল, কাজ ছেড়ে ঘরে ...রতে—আশা যে, তাহলে কয়েকটি বেকার ...রের অন্ন সমস্যার বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। ...তই না স্তোক বাক্য তাদের কানে ঢালতে ...াগল খবরের কাগজ, রেডিও ও pulpit—পালা করে। তাঁরা যে গৃহিণী—তাঁদের চরম বিকাশ যে গৃহেই, তাঁদের কি সাজে বাইরে যাওয়া? over production বা অত্যুৎপাদন বলে যখন রোগটা ধরে নেওয়া হল, মালগুলো তাড়াতাড়ি কি করে খরচ করে ফেলতে পারা যায়, তখন তারই চললো বিধি ব্যবস্থা। খরচ করতে গিয়ে জিনিষ নষ্ট করতেও ছাড়লোনা। এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটেছিল এই সময়ে সিকাগো সহরে। ডিম বিক্রি হচ্ছে না, তাই ডিমের এক আড়ৎদার (আড়ৎ অর্থে এখানে বুঝতে হবে এক ২৫ বা ৩০ তলা বাড়ি, সেটার মধ্যে অসংখ্য ডিম রাখার বন্দোবস্ত আছে) এক নতুন ফিকির বের করলেন ডিমের চাহিদা বাড়াবার জন্যে। লোক ভাড়া করে প্রতিযোগিতা চালান হতে লাগল, ডিম ভাঙ্গবার। সবচেয়ে যে বেশী ভাঙ্গল, সেই পেল প্রথম পুরস্কার। Boiler-এ, এই সময় কয়লা না পুড়িয়ে Coffee পোড়ানর কথা আপনারা অনেকেই শুনেছেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কেউ তো বললো না যে, এই ডিম আর Coffee একটু দূরে লঙ্গরখানার সামনে, সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে-ছিল যে বুভুক্ষু বেকারের দল, তাদের পেটে ফেলে দিয়ে নষ্ট (?) করতে। যেখানে তাদের নিজেদেরই এতলোক অভুক্ত অবস্থায় রইল.—তখন রোগটাকে over production না বলে under consumption বললেই কি ঠিক হত না?

তারপর শোনা গেল উল্টো সুর, এখন বলা হচ্ছে, "রেল গাড়ি চড়ো না", "খাওয়াটা কমিয়ে দাও", "সাবানের শেষ কুচিটাও ফেলো না, নতুনটার সঙ্গে লেপ্টে দিয়ে ব্যবহার করো"। হঠাৎ সুসম খাদ্যের (balanced diet) প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনেক উপদেশ শুনতে পাচ্ছি। Ration-এর সঙ্গে, চাল বলে যে জিনিসটাকে দেওয়া হচ্ছে তাতে নাকি উপকারী অনেক ভিটামিন লুকিয়ে রয়েছে—আমরা কেন যে সে গুলো খুঁজে নিচ্ছি না সেইটাই নাকি হচ্ছে পরম আশ্চর্যের বিষয়, এখন আর মেয়েদের উপদেশ দেওয়া হয় না ঘরের শোভা বাড়াতে। কারখানায় কাজ কোরে truck চালিয়ে anti air craft gun post-এ কাজ নিয়ে পেয়ে গেলেন তাঁরা এখন অনেক বাহবা। এখন আর টাকা খরচ করতে কেউ বলে না, বলে জমিয়ে রাখতে, নইলে inflation নামে একটা দানবের সৃষ্টি হবে। অর্থনীতি শাস্ত্রের মার প্যাঁচ আমি বুঝিনা, আর এসব উপদেশ অমান্য করতেও আমি কারুকে বলছি না। কিন্তু এই উপদেশের আর পাল্টা উপদেশের ফর্দ শুনতে শুনতে আমাদের যে হোতে চলেছে প্রাণান্ত। জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়, বাপু! তোমরা কি? আজ যাকে ধর্ম বলছ, কাল তাকে বলছ অধর্ম। তোমাদের এই বাতুলের পরামর্শ শুনতে শুনতে আমরাও প্রায় হয়েছি পাগল, আর পৃথিবীটা হয়ে উঠেছে একটা পাগলা গারদ।

একটা কথা সেটা নিতান্ত অবান্তর নাও

হোতে পারে এখানে বলে রাখি—যুদ্ধশেষের কিছু পূর্বেই একটা বিলাতী বৈজ্ঞানিক মাসিকে এক প্রবন্ধে দেখাবার চেষ্টা হয়েছে যে মেয়েরা কারখানার কাজে পুরুষ অপেক্ষা অনেক কম পটু। পড়ে মনে হল লেখক অথবা যাঁদের হোয়ে এই প্রবন্ধটি লিখেছেন তাঁরা—আবার একটা বেকার সমস্যার বিভীষিকা দেখছেন। মেয়েদের বোধ হয় "ঘরে শোভা" বাড়ানর শীঘ্রই প্রয়োজন হবে—তারই বুঝি এই ভূমিকা।

বেকার সমস্যার সমাধানের সময় দেখেছিলুম তার দায়িত্বটা বৈজ্ঞানিকের ঘাড়ের উপর চাপবার বেশ একটা চেষ্টা চলেছিল। অনেকে বলতেন বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে যে সব কাজ দশজনের দ্বারা করা হত এখন করা হয় হয়ত একজন বা দুজনের দ্বারা—ফলে অনেকগুলি লোক বেকার হয়ে গেল। তাই আমেরিকার মত বিজ্ঞানে অগ্রগামী জাতের মধ্যেও প্রশ্ন উঠেছিল মৌলিক গবেষণা কয়েক বৎসরের জন্য স্থগিত রাখা উচিত কি না। যুদ্ধের শেষের দিকে সম্মিলিত জাতি শাসিয়ে রেখেছিলেন যে Axis Power-এর পরাজয়ের পর তাঁদের দেশে মৌলিক গবেষণা বন্ধ করে দেবেন। সেটা যে ভুয়ো দেখান কথা নয়, তাঁদের কার্যকলাপেই তার বেশ পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। বিজয়ী সম্মিলিত জাতি বৈজ্ঞানিকদের হঠাৎ উঠিয়ে দিলেন সুন্দরী ললনার স্তরে। বিজয়ীরা আগের দিনে চুরি করত বিজিতদের মেয়েদের। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে দেখলুম যে, সম্মিলিত জাতিদের মধ্যে একটা রেষারেষি লেগে গিয়েছে Axis Power-এর বৈজ্ঞানিক চুরির ব্যাপারে। রুশিয়া নাকি কয়েকজন জার্মান বৈজ্ঞানিককে কোন 'হারেমে' লুকিয়ে রেখেছে, তার সঠিক খবর আজও পাওয়া যাচ্ছে না। আমেরিকা, জার্মান টেকনিসিয়ানদের সরাসরি মার্কিন দেশে নিয়ে গিয়ে হাজির করেছেন। আর দেখছি ইংরেজ-আমেরিকানরা যুদ্ধের পর বৈজ্ঞানিক মিশন পাঠাচ্ছেন, জার্মানী জাপানে—তাঁদের বৈজ্ঞানিকদের কাছে—ভুলিয়ে ভালিয়ে বৈজ্ঞানিক গুপ্ত রহস্য তাঁদের কাছ থেকে বের করবার জন্য।

বৈজ্ঞানিক তাঁর আবিষ্কারের যাতে অপব্যবহার না হয়, সে বিষয়ে কৃতসঙ্কল্প। আমেরিকার আণবিক বৈজ্ঞানিকরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছেন। তাঁদের সংগঠনের নাম Federation of Atom Bomb Scientists. তাঁদের উদ্দেশ্য, দেশের লোককে, বিশেষ করে দেশের নেতা ও রাজনীতিজ্ঞদের আণবিক শক্তির অপব্যবহারের পরিণাম সম্বন্ধে সচেতন করা। এই উদ্দেশ্য মহান হলেও এ'দের চেষ্টার পরিমাণ যথেষ্ট নয়। এ'দের কার্যের গতি এত মন্থর হলে চলবে না—যাঁরা ফিলিপ মরিসন-এর 'If (Atom) the bomb gets out of hand' শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করেছেন তাঁরা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করবেন যে তৎপরতার যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। আণবিক অস্ত্রশস্ত্র পরবর্তী যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য একটা বেশ রেষারেষি চলছে। এরকম যুদ্ধ একবার বাধলে সারা পৃথিবী কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। তাই বৈজ্ঞানিক সঙ্ঘকে মন দিতে হবে কি করে তাঁদের হাতে সত্যিকারের ক্ষমতা আসতে পারে। অবৈজ্ঞানিকরা চালাচ্ছেন সব দেশের রাজত্ব। তাঁদের হাত থেকে কেড়ে নিতে হবে রাজত্বের ভার। সব দেশের গবর্ণমেণ্ট যখন বৈজ্ঞানিকের দ্বারা চালিত হবে, আন্তর্জাতিক সম্মেলনের বৈঠক তখনই হবে সার্থক। এই বৈঠকে থাকবেন কেবল বৈজ্ঞানিক—আর সমস্যার বিচার হবে বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে—কোন বিশেষ জাতির স্বার্থের মাপকাঠি দিয়ে নয়। বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে সর্বাগ্রে মাপা হবে সাধারণ মানুষ জাতির কল্যাণ—সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ। আণবিক শক্তির অপব্যবহারের চক্রান্ত করবার অবকাশ থাকবে না সে বৈঠকে—চলে যাবে সময়—আণবিক শক্তিকে মঙ্গল অনুষ্ঠানে লাগাতে ও সম্পদ বাড়াতে। সে সম্পদ হবে এত অতুল ও অফুরন্ত যে সমগ্র মানবজাতির ভোগের পরও থেকে যাবে উদ্বৃত্ত।

কিন্তু বৈজ্ঞানিকের হাতে ক্ষমতা আনা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়—বাধা ও বিঘ্ন অনেক। এ যেন বামনের চাঁদে হাত দেবার চেষ্টা। কিন্তু বৈজ্ঞানিক শুধু চাঁদে হাত দেওয়া নয়—উড়োজাহাজে চাঁদে গিয়ে পৌঁছবার কল্পনাকে শীঘ্রই বাস্তবে পরিণত করবেন। এ যদি সম্ভব হয় তাঁর উচিত হবে তাঁর সঙ্গে নিয়ে যাওয়া তাঁদের যাঁরা এই পৃথিবী খণ্ড খণ্ড করে ভাগ করতে ব্যস্ত হয়েছেন—যাঁরা চান Yankeeস্থান, Sovietস্থান, ইহুদীস্থান, পাকিস্থান প্রভৃতি। চাঁদের দেশ থেকে সারা ব্রহ্মাণ্ডের রূপ হয়ত দৃষ্টিগোচর হবে তাঁদের—আর তার সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করবেন তাঁরা Preston-এর উক্তির তাৎপর্য—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় আমাদের পৃথিবীটা বালির কণার মত। তাকে আবার খণ্ড খণ্ড করে ভাগ করার চেষ্টাটা নিছক পাগলামি ছাড়া আর কি? চাঁদের দেশ থেকে তাঁদের হয়ত আরও প্রতীয়মান হতে পারে যে প্রাক্-আণবিক যুগের মহাপুরুষদের চরম আদর্শ ছিল অখণ্ড জগতের সৃষ্টি, কিন্তু আণবিক যুগের আদর্শ হওয়া উচিত অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। ফিরে এসে হয়ত তাঁরা সেই আদর্শকে কার্যকরী করতে গিয়ে প্রথমে অখণ্ড জগতের সৃষ্টিতে মন দিতে বাধ্য হবেন। এই সৃষ্টির জন্য যে মহাশক্তির দরকার তা বৈজ্ঞানিকের বিশেষ করে আণবিক বৈজ্ঞানিক ছাড়া আর কার আছে? তাঁদের এই মহদনুষ্ঠানের পুরোহিত হবেন বৈজ্ঞানিক—আর ফলে পৃথিবীতে আসবে সত্যিকারের বিজ্ঞানের যুগ—যার পূজারী হবেন বৈজ্ঞানিক।

সার্থক হউক আজিকার আমাদের এই বিজ্ঞান সভার অধিবেশন—সেই বৈজ্ঞানিক যুগের পথ নির্দেশ করে। জয় হিন্দ।

---

* **প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে বিজ্ঞান শাখার উদ্বোধন বক্তৃতা।**

সাহিত্য-সংবাদ

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

রবীন্দ্র সাহিত্যের কয়েকটি বিভিন্ন দিক লইয়া সিরাজগঞ্জ সাহিত্য-চক্রের উদ্যোগে পাবনা জেলার কলেজ ও স্কুলগুলির ছাত্র-ছাত্রীদিগের মধ্যে এক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হইতেছে। প্রবন্ধের বিষয়ঃ—

(১) কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য—"জাতীয়তার কবি রবীন্দ্রনাথ"।

(২) স্কুলের নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য—"শিশু সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ"।

(৩) স্কুলের সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য—"বালক রবীন্দ্রনাথ"।

প্রবন্ধ ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিতে হইবে। কলেজের প্রবন্ধ পাঁচ পৃষ্ঠার এবং স্কুলের প্রবন্ধ চার পৃষ্ঠার অনধিক হইতে হইবে। প্রবন্ধের উপর নিজ নিজ স্কুল অথবা কলেজের প্রধান শিক্ষক অথবা অধ্যক্ষ মহাশয়কে দিয়া উহা স্বরচিত এই মর্মে লিখাইয়া লইতে হইবে। প্রবন্ধ নিম্ন ঠিকানায় আগামী ১৬ই বৈশাখের (ইংরাজি ৩০শে এপ্রিল মধ্যে পৌঁছাইতে হইবে। প্রতি বিভাগে দুইটি করিয়া পুরস্কার দেওয়া হইবে। বিশ্বমঙ্গল দাশ, সম্পাদক, সিরাজগঞ্জ সাহিত্য-চক্র, পোঃ সিরাজগঞ্জ (পাবনা)।

ছবির ভাষা এখনকার দিনে কি হওয়া উচিত এ নিয়ে কথা উঠেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষ ক'রে এশিয়ার প্রতিবেশী দেশ-সমূহে যদি ভারতীয় ছবি দেখাবার ব্যবস্থা ক'রতো হয়তো সে সব ছবি যে যে দেশে দেখানো হবে সেই সেই দেশের ভাষায় অথবা ইংরিজীর মত কোন আন্তর্জাতিক ভাষায় তোলা হবে এই নিয়ে অনেক উদ্যোগী একটু চিন্তিত হ'য়ে পড়েছে। কিন্তু সেটা নিরর্থক। কারণ আর্টের একটা নিজস্ব ভাষা আছে এবং তা সর্বজনীন। তাই ইংরেজের আঁকা ছবি কোন ভারতীয়ের পক্ষে দেখা, বিচার করা এবং উপভোগ করা অসম্ভব হ'য়ে ওঠে না—আবার অবনীন্দ্রনাথের ছবিও ইউরোপে তারিফ পায়। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও ঐ কথাই খাটে। ভাষার জন্যে যে কোন দেশের ছবি ভিন্ন যে কোন দেশের দর্শকদের কাছে আদর পাওয়া থেকে বঞ্চিত হ'য়েছে এমন উদাহরণ পাওয়া যায় না। যুদ্ধের সময় বহু দেশের বহু ভাষাভাষি লোক কলকাতায় এসেছিল এবং তাদের বহুজনকে ভারতীয় ছবিঘরে যেতে দেখা গিয়েছিল। ছবি সম্পর্কে তাদের অনেককে প্রশ্ন ক'রে দেখা গিয়েছে যে, কাহিনী বুঝতে এবং রসোপলব্ধি ব্যাপারে বড় একটা কারুরই কোন অসুবিধে হয়নি—ছবি অনুযায়ী তারা তারিফ করেছে আবার খারাপ ছবির বেলায় প্রশংসা না করতেও তারা কেউ কুণ্ঠিত হয়নি। বম্বের ছবি যে বাঙলাদেশকে ছেয়ে রয়েছে তাতো বাঙালী দর্শকদের জন্যেই; বরং বহু বম্বের ছবির প্রদর্শন রেকর্ড বাঙলাদেশেই হ'তে পেরেছে. ভাষার প্রশ্ন থাকলে তা কি সম্ভব হ'তে পারতো কোনক্রমেই? ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে তোলা ভিন্ন ভিন্ন ভাষার ছবি আমেরিকা থেকে বহু পুরস্কার পেয়েছে অনেকবার; আমেরিকায় তোলা ইংরিজী ছবি রাশিয়া থেকে প্রাইজ নিয়ে আসে; রাশিয়ার ভাষায় তোলা ছবি আমরাও দেখেছি এবং গুণাগুণ যথাযথ বিচার করেছি। মাত্র মাস কয়েক আগেও বম্বেতে হিন্দী ভাষায় তোলা 'নীচানগর' নামক ছবিখানি ইউরোপে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতায় ভিন্ন ভাষাভাষীদের বিচারের জোরেই অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি ব'লে স্বীকৃত হ'য়েচে। শান্তারামের হিন্দী ছবি 'শকুন্তলা' ও 'পর্বত পে অপ্না ডেরা' আমেরিকা ও ইউরোপের বহু দেশে দেখাবার আয়োজন হ'য়েচে এবং যারা সে আয়োজনের ভার নিয়েচে তারা সবাই বিদেশী এবং নিশ্চয়ই তারা ছবিগুলি দেখার পর বুঝে সুঝেই এ কাজে হাত দিয়েচে। ভাষা যে সত্যিই ছবির রসোপভোগে প্রতিবন্ধক হয় না তার আরও অনেক প্রমাণই দেওয়া যেতে পারে। যে কোন দেশে যে কোন ভাষায় তোলা ছবি যদি বাস্তবিকই তাতে রস থাকে তাহলে অন্য যে কোন দেশেও তা সমাদৃত হয়। সুতরাং আন্ত-

র্জাতিক ছবি তোলায় ব্রতীরা ভাষাটাকে একটা সমস্যা বলে না ধরলে পারেন। রসপুষ্ট সুষ্ঠু সুন্দর ছবি যদি এ দেশের লোককে খুশী করে তাহলে তা পৃথিবীর যে কোন দেশে প্রশংসা লাভ করতে সমর্থ হবে।

* * * *

দাঙ্গার দরুণ যে চলচ্চিত্র শিল্প কি পরিমাণ কাহিল হয়ে পড়েছে তার স্পষ্ট প্রমাণ বম্বের স্টুডিওগুলির অবস্থা থেকে বুঝতে পারা যাচ্ছে। প্রায় সব স্টুডিওতেই লোক ছাঁটাই আরম্ভ হ'য়েছে। বেকার কলাকুশলী ও শিল্পী যা কয়েক দিন মাত্র পূর্বেও খুঁজে বের করতে হতো, আজ দলে দলে চা আর

কে পিকচার্সের 'মাতৃস্মৃতি' চিত্রে প্রতিমা দাশগুপ্তা

কফিখানার আড্ডায় আশ্রয় নিতে দেখা যাচ্ছে। একটা স্টুডিওর ৬০০ জন কর্মীর মধ্যে মাত্র প্রধান শব্দযন্ত্রী ও আলোকচিত্র শিল্পীকে নিয়ে ৫০ জনকে রেখে বাকী সবাইকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বড় বড় নামকরা কলাকুশলী ও অভিনয় শিল্পীরা কাজের জন্যে এদোর-ওদোর ক'রচে, আর না হয়তো পূর্বসঞ্চিত অর্থের জোর থাকলে সুদিনের পুনরাগমন প্রতীক্ষায় স্বগৃহে অন্তরীণ অবস্থায় কালাতিপাত ক'রচে। একসঙ্গে চার পাঁচখানা ছবিতে গত ক'বছর ধরে যারা কাজ করে এসেছে তাদের অধিকাংশই এখন বেকার এবং নতুন কোন চুক্তি এমন কি আগেকার চেয়ে ১০০ কি ২০০ ভাগ কম টাকাতেও কাজ পাবার আশায় উদ্গ্রীব হ'য়ে প্রতীক্ষা করছে। বম্বের চিত্র নির্মাণ শিল্পের শতকরা ৮০ জনই আজ কর্মহীন বেকার হয়ে পড়েছে। কলকাতার অবস্থা অবশ্য এখনও অতটা খারাপ হয়নি কিন্তু আস্তে আস্তে যে খারাপের দিকেই যাচ্ছে তার প্রমাণ পাওয়া শক্ত নয় এবং আর কিছুদিন এখনকার মত অরাজক অবস্থা চলতে থাকলে বম্বের সমানই হয়ে দাঁড়াবে।

বর্তমানের দুঃসময়ে ছবি তোলার ব্যবসা চালু রাখতে গেলে ছবির খরচ অনেক কমিয়ে ফেলা দরকার। এই কথা স্মরণ রেখে বম্বের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান সমবায় নীতিতে ছবি তুলছে। ছবিতে যে কেউই যা কিছু কাজ করুক তার একটা অংশ রাখা হয় এবং তার বদলে সে ব্যক্তি পারিশ্রমিক নেয় ঠিক খরচ চলাবার মত টাকা।

* * *

অশোককুমার বোধ হয় কলকাতাতেই পাকাপাকিভাবে থাকবার সঙ্কল্প ক'রেছেন; কারণ এখানে 'চন্দ্রশেখর'-এর পরই দেবকীবাবুর অপর ছবি 'বিষ্ণুপ্রিয়া'য় অভিনয় করতে তিনি রাজী হয়েছেন বলে শোনা গেল। অপর দিকে বম্বের কোন নতুন ছবিতে তাঁর নাম দেখা যাচ্ছে না।

* * *

'দি গ্রেট ডিক্টেটরে'র পর ৬ বছর বাদে চার্লি চ্যাপলিন তাঁর একখানি ছবি 'মঁসিয়ে ভারদু' তোলা শেষ ক'রেছেন। ছবিখানি এই বছরেই মুক্তিলাভ করবে। ছবিতে ২৬ জন বাকিয়ে অভিনেতা থাকলেও নাম করাদের মধ্যে আছেন চার্লি নিজে এবং মার্থা রে।

* * * * * *

ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রযোজক প্রতিষ্ঠানের মুখপত্রের মতে ১৯৪৬ সালে সমগ্র ভারতে মোট ১৯৮ খানি ছবি তোলা হ'য়েছে—১৯৪৫ সালে তোলা হয়েছিল ৯৯, '৪৪ সালে ১২৪ এবং '৪৩ সালে ১৪৯ খানি।

* * * *

বম্বেতে মাদক বর্জন আইন প্রবর্তিত হওয়ায় ওখানকার সেন্সর এই নিয়ম করেছে যে, অতঃপর বম্বেতে তোলা কোন ছবিতে মাদকদ্রব্য ব্যবহারের কোন দৃশ্য থাকতে পারবে না। বম্বের বাইরে তোলা অথবা বিদেশী ছবিতে তেমন কোন দৃশ্য থাকলে কেটে বাদ দিতে হবে। তবে যদি মাদকদ্রব্যের অপকারিতা দেখাবার জন্য কোন দৃশ্যের অবতারণা করা থাকে তাহলে তার ওপরে এ আইন প্রযুক্ত হবে না।

জনৈকা পাঠিকার প্রতি

সম্প্রতি জনৈকা পাঠিকা 'দেশ' সম্পাদকের নিকট যে চিঠি লিখেছেন সম্পাদক মশায় সেটি আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সম্পাদক মশায়ের নামে চিঠি সুতরাং জবাব দেবার দায়িত্ব তাঁরই। তথাপি তিনি যখন চিঠিখানা আমার কাছে পাঠিয়েছেন তখন আমাকে যথা-কর্তব্য 'খাতা'র মারফতেই করতে হচ্ছে। প্রথমেই 'জনৈকা পাঠিকা'র প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আবশ্যক। কারণ, উক্ত চিঠিতে তিনি ইন্দ্রজিতের খাতার অজস্র প্রশংসা করেছেন। বলেছেন, ইন্দ্রজিতের লেখা পড়ে তিনি প্রচুর আনন্দ পাচ্ছেন। আমার খাতা তাঁকে মনের খোরাক যোগাচ্ছে, বিশেষ কি, এর থেকে তিনি সত্যের সন্ধান পাচ্ছেন। এর চাইতে বড় প্রশংসা কেউ আশা করতে পারে না। আমার খাতার মুখবন্ধেই আমি বলে নিয়েছি যে আমি অতিশয় প্রশংসালোভী মানুষ। পরের মুখে নিজের গুণকীর্তন শুনতে আমার ভারি ভালো লাগে। দুঃখের বিষয় প্রশংসাকাতর বাঙলাদেশে ঐ জিনিসটি বড়ই দুর্লভ। সামান্য মুখের কথা খরচা করেও কেউ কারো প্রশংসা করতে চায় না। এহেন বাঙলা-দেশে জনৈকা পাঠিকার কাছ থেকে এতাদৃশ প্রশংসা লাভ করে আমি কিরূপ গর্বিত এবং অহংকৃত বোধ করছি তা আপনারা অনুমান করতে পারেন।

কেবলমাত্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেই যদি লেখিকার পত্রের জবাব হয়ে যেত তবে কোনো মুস্কিলই ছিল না। কিন্তু 'জনৈকা পাঠিকা' যথারীতি গুণগান করবার পরে সম্পাদকের কাছে ইন্দ্রজিতের পরিচয়টি জানতে চেয়েছেন—"এই অজ্ঞাত লেখকের নামটি জানিতে বড়ই ইচ্ছা করে। আশা করি নাম প্রকাশে লেখকের নিজের কোন আপত্তি নাই।" এখানে বলা প্রয়োজন যে 'জনৈকা পাঠিকা' কিন্তু নিজের নামটি আমাদের জানান নি। যাহোক, ছদ্ম-নামা লেখকের নাম প্রকাশ সম্বন্ধে জার্নালিস্টিক রীতিনীতি আমার জানা নেই। সে সব সম্পাদক মশায়ের জানবার কথা। আমি শুধু গান্ধীজীর ভাষায় বলতে পারি—I am editor's prisoner কিম্বা আপনারা চান তো রেশিও রক্ষা করে জিন্না সাহেবের মতো বলব—I am entirely in the editor's hands.

কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি একদিক থেকে পত্র লেখিকা আমাকে নিরাশ করেছেন। আমি ভাবছিলাম যিনি আমার লেখার অত প্রশংসা করেছেন তিনি তো আমার লেখার মধ্যেই আমার পরিচয় পেয়েছেন। আমি গোড়াতেই বলে নিয়েছিলাম—ছদ্মনামের আড়ালে আমার আসল রূপটা ক্রমশ প্রকাশ্য। খাতার পাতায় আমি
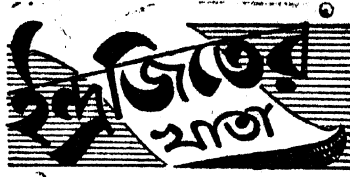
বরাবর সেই আত্মপ্রকাশের চেষ্টাই করেছি। পরিচয় বলতে আমি বুঝি—ব্যক্তিত্বের পরিচয়। দোষে গুণে মিলিয়ে—যে গোটা মানুষটা ইন্দ্রজিৎ নাম ধারণ করেছে সে নিজেকে গোপন করবার কোনই চেষ্টা করে নি। তার সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বটিকে খুব স্পষ্ট করেই খাতার পাতায় তুলে ধরেছে। এখন জানতে যা বাকী আছে সেটা কেবলমাত্র পিতামাতার দেওয়া অন্ন-প্রাশনের নামটি। কিন্তু সেই নামটা কি একটা পরিচয়?

বলেছি তো দোষ গুণ মিলিয়ে মানুষের আসল পরিচয়। অবশ্য আর সবার মতো আমার দোষগুলিও আমি যথাসম্ভব ঢেকে রাখবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু বুদ্ধির দোষে তার সবই প্রায় ফাঁস হয়ে গেছে। অপর পক্ষে আমার যৎসামান্য গুণাবলী যা আছে তা গোপন করবার কোনই চেষ্টা করিনি। বরং বারম্বার সেগুলির উল্লেখ করেছি। এই ধরনে আমার সর্বপ্রধান গুণ হচ্ছে—আমি ধার্মিক ব্যক্তি নই। এখন আমার নাম যদি হত ধর্মদাস তবে সেটা কি আমার যথার্থ পরিচয় হত? আপনারা এও জানেন যে আমি পণ্ডিত ব্যক্তি নই, অথচ আমার নাম যদি হয় বিদ্যাধর ভট্টাচার্য তবে সেটা ও কি মিথ্যা পরিচয় হত না? এ ছাড়া আমার আর একটি উল্লেখযোগ্য গুণ আছে—আমি পারৎপক্ষে সত্য কথা বলি না। এহেন ব্যক্তির নাম সত্যভূষণ হলে সেটাও সত্যের অপলাপই হত। তাহলেই দেখছেন নাম সম্বন্ধে শেষ কথা সেক্সপিয়রই বলে গেছেন—what's in a name? এইতো দেখুন না 'জনৈকা পাঠিকা' চিঠিতে তাঁর নাম দেন নি; কিন্তু তাতে তো কোন ক্ষতি হয়নি। তিনি যে আমার একজন রসগ্রাহী পাঠিকা তাতেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। নিশ্চয় কোথাও আমাদের চিন্তার কিম্বা দৃষ্টিভঙ্গির মিল রয়েছে নইলে ইন্দ্রজিতের লেখা তাঁর কাছে ভালো লাগবে কেন? সুতরাং তাঁর নাম জানবার বিন্দুমাত্র কৌতূহল আমার মনে নেই। তাঁকে না দেখেও নাম না জেনেও আমি তাঁকে আমার বন্ধুমহলের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছি।

পত্রে লেখিকা আরো বলেছেন যে তাঁর মতো অনেক পাঠক পাঠিকা নিশ্চয় ইন্দ্রজিতের নাম এবং পরিচয় জানবার জন্য কৌতূহলী হয়ে আছেন। এ বিষয়ে আমি তাঁর সঙ্গে একমত নই। তা হলে এখানে আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথাটা বলি। আমার একজন প্রতিবেশী আমার কাছ থেকে 'দেশ' পত্রিকা নিয়ে নিয়মিত পড়ে থাকেন। তাঁর সঙ্গে নানা লেখা সম্বন্ধে আলোচনাও হয়েছে, কিন্তু ইন্দ্রজিতের খাতা নিয়ে কোনোদিন কিছুমাত্র কৌতূহল তিনি প্রকাশ করেন নি। ঐ খাতা কে লিখচেন কখনও জিজ্ঞেস করেন নি। হয় তিনি ও জিনিসটা পড়েন না কিম্বা পড়লেও ওঁর ভালো লাগে না। অপর এক ভদ্রলোক কি করে জানতে পেরেছেন যে জিনিসটা আমারই লেখা। এই সেদিন যখন তাঁর সঙ্গে দেখা হল জিজ্ঞেস করলেন, এই যে, আপনার ইন্দ্রজিতের খাতা এখনও চলচে তো? তা হলেই দেখচেন উনি বোধহয় কোনোদিন 'দেশ'এর পাতা উল্টেও দেখেন না।

যাক্ আজকে যখন নামের কথাই উঠল তখন এ সম্পর্কে আরো দু'একটা কথা বলি পিতামাতা আমাকে যে নামটা দিয়েছেন সে নামে বাঙলাদেশে একজন অতি বিখ্যাত ব্যক্তি আমার পূর্বেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শুধু নামের প্রথমার্ধ নয় একেবারে পদবী সমেত তাঁর সঙ্গে আমার নামের হুবহু মিল আছে। বিখ্যাত ব্যক্তির নামানুসারে নাম রাখা অত্যন্ত ভুল। কারণ ঐ নামের সঙ্গে যা কিছু খ্যাতি প্রতিষ্ঠা সমস্তই তাঁরই কবলিকৃত। তিনি একাধারে পণ্ডিত সাহিত্যিক এবং দার্শনিক। আমি এই তিন-এর একটাও নই। আমি অকৃতী এবং অধম সেটা ঐ নামের দরুণই আরো বেশী করে প্রকট হয়ে উঠেছে। তিনি অদ্বিতীয়, আমি দ্বিতীয়। অদ্বিতীয়ের কাছে দ্বিতীয়ের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। তাঁর খ্যাতি আমার খ্যাতির পথরোধ করেছে। আমার জীবনে চিরকাল এই দুঃখটি থেকে যাবে যে আমি স্বনামধন্য নই, পরনামধন্য। সেটা একরকমের কলঙ্কই বলা যায়। চন্দ্রের নিজের আলো নেই সূর্যের আলোতে শোভা পায়। চাঁদের কলঙ্ক বলে একটা কথা আছে। বৈজ্ঞানিকেরা তার যে ব্যাখ্যাই করুন না কেন চাঁদের যে নিজস্ব আলো নেই সেটাই তার সবচেয়ে বড় কলঙ্ক আমারও হয়েছে সেই দশা। আমার একখানা ক্ষুদ্র উপন্যাস যখন প্রথমে বের হল তখন অনেকে অবাক হয়ে বলেছিলেন, একি! উনি আবার উপন্যাস লিখতে শুরু করলেন কবে? উনি তো বেদবেদান্ত গীতার ভাষ্য লিখতেন, জানি।

যাক, আত্মপরিচয়ের কাহিনীটা এখানেই শেষ করি। অনেক সুস্পষ্ট ইংগিত আছে। তথাপি জানিনা পাঠক পাঠিকারা এটাকে অন্নদার আত্মপরিচয়ের মতো হেঁয়ালি মনে করবেন কিনা।

হকি

বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ বাঙলার হকি খেলা চালু রাখিবার জন্য নূতন লীগ খেলা প্রবর্তন করিতেছেন এই সংবাদ প্রচারিত হইলে হকি খেলোয়াড়গণ নৈরাশ্যময় ঘন অন্ধকারের মধ্যে ক্ষীণ আশার আলো দেখিতে পাইলেন। কিন্তু ঠিক তাহার পরেই নূতন লীগের বিভিন্ন দলের যখন নাম প্রকাশিত হইল—তাঁহাদের ভগ্নহৃত করিল। তাঁহারা কিছুতেই উপলব্ধি করিতে পারিলেন না এইরূপভাবে অধিকাংশ অ-বাঙালী খেলোয়াড় দ্বারা দল গঠন করিয়া লীগ খেলাইয়া পরিচালকগণ কি উদ্দেশ্য সফল করিতে চান? ইহার দ্বারা বাঙালী খেলোয়াড়দের তো কোনই উপকার হইবে না? তাঁহারা যেরূপভাবে খেলা হইতে বঞ্চিত ছিলেন সেইরূপ থাকিলেন।

বাঙালী হকি খেলোয়াড়গণের এই ধারণা খুব অন্যায় তাহা আমরা বলি না। আমাদের যতদূর ধারণা অধিকাংশ বাঙালী খেলোয়াড়গণ যে সকল অঞ্চলে থাকেন তাহা কড়া সাধ্য আইনের কবলে আছে বলিয়াই পরিচালকবর্গকে ঐ সকল খেলোয়াড়দের দলভুক্ত করা সম্ভব হয় নাই। তবে একটি বিষয়ের বিশেষ করিয়া দলের নাম করণের তীব্র প্রতিবাদ না করিয়া আমরা পারি না। দেশের বর্তমান দ্রুত পরিবর্তনের দিনে যাঁহারা এখনও পর্যন্ত বিদেশের দিকে তাকাইয়া আছেন তাঁহাদের দেশের প্রকৃত হিতাকাঙ্খী বলিয়া আমরা গণ্য করি না। বাঙলার মাঠে খেলা হইবে, অনেক বাঙালী খেলোয়াড়ও খেলিবেন, সেইরূপ ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি দলের নাম বিদেশী হওয়া কোনরূপেই বাঞ্ছনীয় হয় নাই। কোন একজন বিশিষ্ট ক্রীড়ামোদী আলোচনার সময় বলিয়াছেন "বাঙলার হকি পরিচালকগণ ভুল করিয়া বাঙলাদেশে আসিয়া পড়িয়াছেন, ইঁহাদের ইংলণ্ডে বাস করা উচিত ছিল।" এই উক্তি আমরা সমর্থন করি না, তবে সাধারণ ক্রীড়ামোদিগণের মনে সন্দেহ উদ্রেক হইবার যথেষ্ট কারণ যে হইয়াছে ইহা স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য। বাঙলার হকি পরিচালকগণকে আমরা অনুরোধ করিব তাঁহারা যেন অনতিবিলম্বে সমস্ত দলের নাম পরিবর্তন করেন। যদি তাহা না করেন দেশের জনসাধারণের শ্রদ্ধা তাঁহারা হারাইবেন ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

ভারতীয় হকি দল

আগামী বৎসর লণ্ডনে যে বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠান হইবে তাহাতে ভারতীয় হকি দল প্রেরণ করা হইবে স্থির হইয়াছে। এই দল নির্বাচন উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন দলের ২২ জন খেলোয়াড়কে মনোনীত করা হইয়াছে। এই ২২ জন খেলোয়াড়কে ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শনী খেলায় যোগদান করিতে বাধ্য করা হইতেছে। এই সকল প্রদর্শনী খেলার ফলাফল দেখিয়া মনে হইতেছে ভারতীয় দল খুব শক্তিশালী হয় নাই। যে ২২ জন খেলোয়াড় বাছিয়া লওয়া হইয়াছে তাহা হইতে অনেকগুলি খেলোয়াড়কেই বাদ দেওয়া উচিত। নন্দী, দারা প্রভৃতি খেলোয়াড়গণকে এই দলভুক্ত করা উচিত। এমন কি দলের পরিচালনার ভার দারার উপরই দেওয়া উচিত। এই বিষয়ে তিনি যে দক্ষ তাহার প্রমাণ তিনি ন্যাশনাল হকি চ্যাম্পিয়ানসিপ আন্তঃ প্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতায় দিয়াছেন। তাঁহার সুপরিচালনার জন্যই পাঞ্জাব দল ঐ প্রতিযোগিতায় সাফল্যলাভ করে। বর্তমানে যিনি ভারতীয় হকি ফেডারেশন দল পরিচালনা করিতেছেন তাঁহাকে 'দারার' সহযোগী হিসাবে রাখা যাইতে পারে। এইরূপ ব্যবস্থা করিলে উক্ত অধিনায়কের কোন আপত্তি হইতে পারে না। যদি তিনি কোনরূপ কিছু করেন তবে আমরা বলিতে বাধ্য হইব যে, তাঁহার মধ্যে প্রকৃত খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তির যথেষ্ট অভাব আছে।

সন্তরণ

কলিকাতার বিশিষ্ট সন্তরণ প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালকগণ নিয়মিতভাবে সন্তরণ অনুশীলন ও শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য তোড়জোড় করিতেছেন দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। এই সকল পরিচালক এত শীঘ্র সফল হইবেন আমাদের ধারণা ছিল না। অনুশীলন ও শিক্ষার যখন ব্যবস্থা হইয়াছে তখন বিভিন্ন প্রতিযোগিতাও বন্ধ থাকিবে বলিয়া মনে হয় না।

নববর্ষ উৎসব

জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের প্রবর্তিত নিখিল বঙ্গ নববর্ষ উৎসব সমিতির কর্মসূচী অনুসরণ করিয়া বাঙলায় ও বাঙলার বাহিরে বহু স্থানেই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই সকল অনুষ্ঠানে যাঁহারাই যোগদান করিয়াছেন তাঁহারাই উচ্ছ্বসিত ভাষায় উৎসবের প্রবর্তককে প্রশংসা করিয়াছেন। দিল্লীর অনুষ্ঠানে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, শ্রীযুক্ত জগজীবন রাম প্রভৃতি ভারতের বিশিষ্ট নেতাগণ যোগদান করেন। পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন, "বাঙলার সম্মুখে অগ্নি পরীক্ষার সময় উপস্থিত। অসুবিধাসমূহ দুরতিক্রম্য মনে হইলেও বাঙালীরা যেন নিরুৎসাহ না হন। তাঁহাদিগকে সাহস ও দৃঢ়সংকল্প লইয়াই বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে, কেবলমাত্র তখনই তাঁহারা সমস্যার সমাধান করিতে পারিবেন।" ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলিয়াছেন, "বাঙলা একদিন সমস্ত ভারতবর্ষের পরিচালক ও পথ প্রদর্শক ছিল। কাজেই বাঙলা তাহার নিজের জন্য পথ আবিষ্কার করিতে পারিবে না এবং পথের সন্ধানে অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইবে আমি কখনই ইহা বিশ্বাস করি না।" শ্রীযুত জগজীবন রাম বলিয়াছেন, "বাঙলার ইতিহাসকেই ভারতের ইতিহাস বলিয়া জ্ঞান করা হইত। বাঙলা বর্তমানে বিপদাপন্ন। কিন্তু সাহস ও কৌশলের সাহায্যে এই বিপদোত্তীর্ণ হইতে হইবে।" নববর্ষ উৎসবে যোগদান করিয়া এই সকল নেতা যে বাণী দিয়াছেন নিখিল বঙ্গ নববর্ষ উৎসব সমিতির যাঁহারা পরিচালক তাঁহারা এই সকল উক্তি শুনিয়া কোনরূপ আশ্চর্য হন নাই। বাঙালীর সব কিছুই আছে কেবল অভাব নিয়মানুবর্তিতা ও শৃংখলার। এই দুইটি অভাব যাহাতে সহজে বাঙালী জাতীর জীবন হইতে বিদূরিত হয় এই মহৎ উদ্দেশ্য লইয়াই জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তিসংঘ এই "নিখিল বঙ্গ নববর্ষ উৎসবের" কর্মসূচী রচনা করিয়াছেন। এই দিক দিয়া প্রবর্তকগণ কতখানি সফলতা লাভ করিয়াছেন তাহা ঐ সকল নেতা ভাল করিয়াই উপলব্ধি করিতেন যদি দক্ষিণ কলিকাতা, বরাহনগর, কাশী প্রভৃতি অনুষ্ঠানে তাঁহারা উপস্থিত থাকিতেন। এই সকল অনুষ্ঠানে হাজার হাজার বাঙালী বালক-বালিকা যুবক-যুবতী যোগদান করিয়া চরম নিয়মানুবর্তিতা ও শৃংখলার পরিচয় দিয়াছেন। বাঙলা ও বাঙলার বাহিরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আট লক্ষের উপর বালক-বালিকা ও যুবক-যুবতী কর্মসূচীর অংশ গ্রহণ করেন। ইহা ছাড়া দর্শক হিসাবে কত লক্ষ বাঙালী সকল অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বলা কঠিন। বৎসরের একদিন এতগুলি বাঙালী একত্র হইয়া একই কর্মসূচী অনুসরণ ও অবলোকন করিলেন ইহা খুবই আনন্দের কথা। সুযোগ সুবিধা পাইলে বাঙালী একতার চরম পরাকাষ্ঠা দেখাইতে পারিবে তাহার প্রমাণ নববর্ষ উৎসবের মধ্য দিয়া পাওয়া গেল। যাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, একনিষ্ঠ কর্মকুশলতার ফলে বাঙালী জাতীয় জীবন নূতনভাবে গঠিত হইতে চলিয়াছে তাঁহারা প্রকৃতই ধন্য।

অলিম্পিক

আগামী বৎসরের ২৯শে জুলাই হইতে লণ্ডনে বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানের কর্মসূচী আরম্ভ হইবে। এই অনুষ্ঠান পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের ৫৩টি দেশের প্রতিনিধি যোগদান করিবে। রাশিয়া এখনও দলভুক্ত হয় নাই। তবে শীঘ্রই দলভুক্ত হইবে বলিয়া পরিচালকগণ আশা করিতেছেন। কেবল দুইটি দেশকে আমন্ত্রণ করা হয় নাই—জার্মানী ও জাপানকে। ইহাদের প্রধান দোষ ইহারা শত্রুর দেশ বলিয়া গণ্য। ব্যারন কুবারতাঁ যিনি এই বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানের প্রবর্তক তিনি জীবিত থাকিলে জার্মান ও জাপানকে দূরে রাখা সমর্থন করিতেন বলিয়া মনে হয় না। তিনি সকল দেশের সকল ব্যায়ামকারীকে মৈত্রী ও সৌখ্য বন্ধনে আবদ্ধ করিবার জন্যই অলিম্পিক অনুষ্ঠান প্রবর্তন করেন। কিন্তু জার্মান ও জাপানকে দূরে রাখিয়া পরিচালকগণ সেই মহৎ উদ্দেশ্যে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। ইহার প্রতিবাদে ভারতের ইহাতে যোগদান না করাই উচিত।

দেশী সংবাদ

১৫ই এপ্রিল—মহাত্মা গান্ধী ও মিঃ জিন্না হিংসাত্মক কার্যকলাপের নিন্দা করিয়া অদ্য এক যুক্ত আবেদন প্রচার করেন। এই আবেদন প্রচারে বড়লাট উদ্যোগী হন।

গৌহাটির সংবাদে প্রকাশ, একখানা মানচিত্র দৃষ্টে জানা যায় যে, আসাম-বঙ্গ লীগ কর্মপরিষদ আসাম আক্রমণের জন্য তিনটি 'অভিযান পথ' নির্দিষ্ট করিয়াছেন এবং আসামের পশ্চিম সীমান্তে তিনটি 'অগ্রবর্তী ঘাঁটি' প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই ঘাঁটিগুলিকে লীগওয়ালারা কেল্লা বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। ইহার একটি ঘাঁটি রংপুর জেলায় মানকাচরের নিকট এবং অপর দুইটি ময়মনসিংহ জেলার পূর্ব ও উত্তর সীমায় অবস্থিত।

পাঞ্জাব ত্যাগ করিবার নির্দেশ দিয়া মিঃ ভাঃ হিন্দু মহাসভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেশপাণ্ডের উপর যে আদেশ জারী করা হইয়াছিল, তাহা অমান্য করার অভিযোগে লাহোরের স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত দেশপাণ্ডের প্রতি ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

১৬ই এপ্রিল—অদ্য কলিকাতায় ট্রামকর্মীদের এক সভায় ৮৬ দিনের ট্রাম ধর্মঘট প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হয়।

অদ্য মধ্য কলিকাতায় একদল সশস্ত্র পাঞ্জাবী পুলিশের গুলীতে তিন ব্যক্তি আহত হয়। তন্মধ্যে একজনের অবস্থা আশংকাজনক।

বে-আইনী ও হিংসাত্মক কার্যের নিন্দা করিয়া মহাত্মা গান্ধী ও মিঃ এম এ জিন্না যে যুক্ত আবেদন প্রচার করিয়াছেন, অদ্য নয়াদিল্লীতে রাষ্ট্রীয় পরিষদে তাহা সমর্থন করা হয়।

১৭ই এপ্রিল—পেশোয়ারের সংবাদে প্রকাশ, গত মঙ্গলবার ডেরা-ইসমাইল-খানে প্রায় চারি শত দোকান ও গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে। ইহা ছাড়া একটি সিনেমা হল, টাউন হল, দুইটি ধর্মস্থান, একটি কলেজ ও একটি বিদ্যালয় ভস্মীভূত হইয়াছে। বান্নুতে একটি আদালত ও মিউনিসিপ্যাল অফিসের ক্ষতি হয়।

নয়াদিল্লীতে বড়লাটের সহিত কংগ্রেস সভাপতি আচার্য কৃপালনীর দ্বিতীয় বার সাক্ষাৎকার হয়। এই সাক্ষাৎকারের সময় বৃটিশের ভারত ত্যাগ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট আলোচনা আরম্ভ হয়।

১৮ই এপ্রিল—নয়াদিল্লীর এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, অদ্য সকালে বড়লাট তাঁহার প্রাসাদে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্য এক বৈঠকের আয়োজন করেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গবর্ণর স্যার ওলাফ ক্যারো ও সীমান্ত প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ খান সাহেব উক্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত বৈঠকে গান্ধী-জিন্না আবেদনের সূত্র অবলম্বন করিয়া আলোচনা চলে এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ইহাকে কার্যকরী করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

অদ্য শিখ নেতা মাষ্টার তারা সিং, সর্দার বলদেব সিং ও জ্ঞানী কর্তার সিং বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার সহিত ১ ঘণ্টা ৪১ মিনিট-কাল আলোচনা করেন। তাঁহারা বড়লাটকে শিখদের

অভিমত জ্ঞাপন করেন। জানা গিয়াছে যে, শিখ নেতাগণ সাম্প্রদায়িক সমস্যার স্থায়ী সমাধান হিসাবে চেনাব নদীর তীর পর্যন্ত সীমারেখা করিয়া পাঞ্জাব বিভাগের দাবী করেন।

জানা গিয়াছে যে, বঙ্গীয় লীগ মন্ত্রিমণ্ডলের প্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের ধারাসমূহ রচনার জন্য শিক্ষাসচিবের দপ্তর কর্তৃক দ্বিতীয় দফায় নূতন প্রস্তাবসমূহ রচিত হইয়াছে। আরও জানা গিয়াছে যে, নূতন প্রস্তাবসমূহ আগেকার প্রস্তাবগুলি অপেক্ষা প্রকৃতি ও গঠনের দিক দিয়া বেশী সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল।

১৯শে এপ্রিল—নাগপুরের 'মহারাষ্ট্র' পত্রিকার ইরাকস্থ বিশেষ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, ভারতে নারী বিক্রয়ের এক বা একাধিক প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। উক্ত সংবাদদাতা কলিকাতার একটি বাঙালী মেয়ে এবং সিন্ধুর একটি বিবাহিতা গুজরাটী মহিলার অপহরণ কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন।

১৯শে এপ্রিল—গোয়ালিয়রে দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ঘোষণা করেন যে,—"ভারতের যে দেশীয় রাজ্য এখন গণপরিষদে যোগ দিবে না, দেশ সেই রাজ্যকে বিদ্রোহী রাজ্য বলিয়া গণ্য করিবে।"

নোয়াখালি জেলা কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী চৌমুহনী হইতে তারযোগে জানাইতেছেন যে, বিগত রাত্রিতে একদল দুর্বৃত্ত বেগমগঞ্জ থানা এলাকার আহ্লাদীনগর গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তির গৃহে হানা দিয়া গৃহস্বামীর স্ত্রীকে হত্যা করে। গৃহস্বামীও গুরুতররূপে আহত হইয়াছেন।

শিলংয়ের সংবাদে প্রকাশ, আসাম পুলিশ বহুসংখ্যক আগ্নেয়াস্ত্র ও হাতবোমা প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রকাশ, যাহারা আসামে ব্যাপক আন্দোলন চালাইতেছে, সেই বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীদের নিকট ঐগুলি মজুত ছিল।

নোয়াখালির অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটিতেছে বলিয়া মহাত্মা গান্ধী বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দীর সহিত নোয়াখালির অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য বিহারের উন্নয়ন সচিব ডাঃ সৈয়দ মামুদকে কলিকাতায় পাঠাইয়াছেন।

কলিকাতায় হাঙ্গামা ঘটিত ঘটনায় তিনজন নিহত এবং ৪০ জন আহত হয়। এই হিসাব সরকারীভাবে সমর্থিত হয় নাই।

শ্রীহট্টের করিমগঞ্জে ১৫ জন মুসলিম লীগ-কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

২০শে এপ্রিল—বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সমিতি প্রদেশে সাম্প্রদায়িক অবস্থার ক্রমাবনতি এবং কলিকাতায় ও প্রদেশের অন্যান্য স্থানে আইনানুগ নাগরিকদের ধনপ্রাণ রক্ষায় বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর অক্ষমতায় উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। প্রস্তাবে দাবী করা হইয়াছে যে, বাঙলা দুইটি প্রদেশে বিভক্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রদেশে আঞ্চলিক মন্ত্রিসভা গঠন করিতে হইবে।

কলিকাতার অবস্থার অবনতি ঘটায় ওয়াটগঞ্জ ও বেনিয়াপুকুর থানায় রবিবার হইতে ২৬শে এপ্রিল পর্যন্ত ৭ দিনের জন্য সন্ধ্যা ৭টা হইতে সকাল ৬টা পর্যন্ত সান্ধ্য আইন জারী করা হইয়াছে। আজ ইতস্তত আক্রমণের ফলে কলিকাতায় একজন মারা যায় ও ১৯ জন আহত হয়।

ওয়াজিরিস্থানে কালিকুরমে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বিভিন্ন মমন্দ ও ওয়াজির উপজাতির জির্গার যুক্ত অধিবেশনে একটি প্রস্তাবে মাসুদ জাতির এলাকা হইতে ওয়াজিরিস্থান হইতে সমস্ত বৃটিশ সৈন্য অপসারণ করিবার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট দাবী জানান হইয়াছে। আর একটি প্রস্তাবে যে সমস্ত দল স্বাধীনতার জন্য বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছে, তাহাদের সমর্থন করা হইয়াছে।

কানপুরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ২৪ ঘণ্টায় ৬ জন হত এবং ৭ জন আহত হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

১৬ই এপ্রিল—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস সহরে এক জাহাজে, এক রাসায়নিক কারখানায় এবং কয়েকটি তৈলের ট্যাঙ্কে বিস্ফোরণ হওয়ায় ১২ শত লোক নিহত এবং কয়েক হাজার লোক আহত হইয়াছে বলিয়া আশংকা করা হইতেছে।

১৭ই এপ্রিল—ভারত সচিব লর্ড পেথিক লরেন্স পদত্যাগ করিয়াছেন এবং তাঁহার স্থলে লর্ড লিষ্টওয়েল ভারত সচিব নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে।

১৮ই এপ্রিল—প্রসিদ্ধ জার্মান নৌঘাঁটি হেলিগোল্যাণ্ড অদ্য বিস্ফোরণ দ্বারা বিধ্বস্ত হইয়াছে। তজ্জন্য প্রায় সাত হাজার টন বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহৃত হইয়াছে। উহা জার্মানগণ কর্তৃক প্রস্তুত সুড়ঙ্গসমূহে রাখা হইয়াছিল। ৯ মাইল দূরবর্তী বৃটিশ রণতরীসমূহ হইতে রেডিও এবং বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যে ঐ বিস্ফোরণ ঘটান হয়।

২০শে এপ্রিল—ডেনমার্কের রাজা খ্রিশ্চিয়ান পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র প্রিন্স ফ্রেডারিক সিংহাসনলাভ করিয়াছেন।

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন
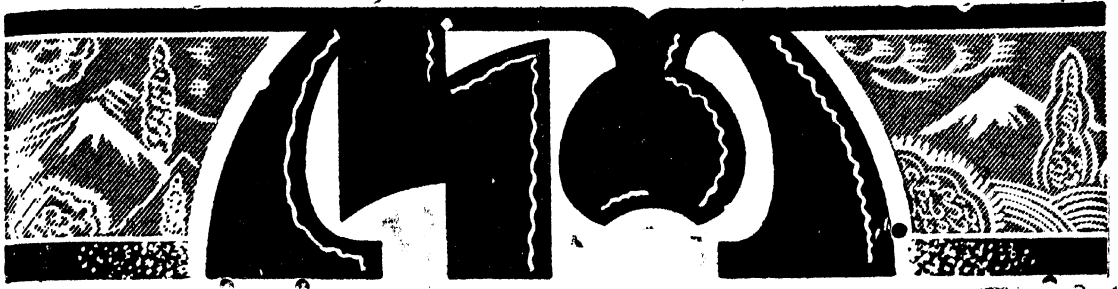
সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

চতুর্দশ বর্ষ] শনিবার, ১৯শে বৈশাখ, ১৩৫৪ সাল। Saturday, 3rd. May, 1947. [২৬শ সংখ্যা

তন্ত্র বাঙলা দাবী

সম্প্রতি বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী "ঐক্যবন্ধ, অবিভক্ত ও সার্বভৌম বাঙলা দেশ" গঠন করিবার উদ্দেশ্যে অনুরোধ করিয়া একটি বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। "বাঙালী হিন্দুরা আজ পৃথক রাষ্ট্র কেন চাহে?" সুরাবর্দী সাহেব যেন আকাশ হইতে পড়িয়া সেদিন দিল্লীতে বসিয়া এই প্রশ্ন উপস্থাপন করেন। মনের অগোচর কোন পাপ নাই। তাঁহার মনই পরবর্তী প্রশ্নের আকারে পূর্ব প্রশ্নের উত্তর দিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—"তাহাদের সংস্কৃতি, ধর্ম, ভাষা কি বর্তমান সময়ে বিপন্ন হইয়াছে কিংবা ভবিষ্যতে বিপন্ন হইবে বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেছেন?" সুরাবর্দী সাহেবের এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমরা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। মুসলিম লীগের দশ বৎসরব্যাপী শাসন বাঙলা দেশকে কোথায় লইয়া ফেলিয়াছে মানবতার কিছুমাত্র চেতনা, সভ্যতা এবং সংস্কৃতির জন্য যাহার বিন্দুমাত্র বেদনা আছে তাঁহারা প্রত্যেকেই মর্মান্তিকভাবে তাহা উপলব্ধি করিতেছেন। ইতর স্বার্থের পিপাসা যাহাকে একান্ত নিষ্ঠুর করিয়াছে, দানব-বৃত্তির জিঘাংসায় সভ্যতা এবং সংস্কৃতির সকল রকম প্রভাব যাহার অন্তর হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে, একমাত্র সে-ই বাঙলার এই নিদারুণ দুর্দশাকে উপেক্ষা করিতে পারে। মিঃ সুরাবর্দী বাঙলার বাহিরের লোককে ধোঁকা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সেজন্য তিনি ভাবের ঘরে চুরি করিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে বাঙলার বুকের বেদনা তাহাতে যাইবে না কিংবা সত্য যাহা তাহাও মিথ্যা হইবে না। সুরাবর্দী সাহেব নিজে ভাল রকমেই জানেন, তিনি যে দলের অনুগত সেই লীগ দলই বাঙলার সকল দুর্দশার মূল কারণ সৃষ্টি করিয়াছে। তাহারা ভেদনীতি আগুনে বাঙলাকে জ্বালাইয়া দিয়াছে। তাহাদেরই নৃশংস নিষ্ঠুর নরঘাতী জেহাদী ও জল্লাদী জিগীরে শ্যাম শান্ত বাঙলার বুক হইতে শান্তি চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। শুধু তাই নহে, আমরা একথাও বলিব যে, মিঃ সুরাবর্দী নিজেই বর্তমান বাঙলার এই দুর্দশার জন্য প্রত্যক্ষ-ভাবে দায়ী। তাঁহার গভর্নমেণ্টই লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামকে সমর্থন করিয়াছে। মিঃ সুরাবর্দীর অধীনস্থ মন্ত্রিমণ্ডলই সংগ্রামের সেই ঘোষণার পিছনে সরকারী ছাপ দিয়া মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতাকে প্রশ্রয় দিয়াছে। গুণ্ডার দল তাহা-দের জন্যই আস্কারা পাইয়াছে। মিঃ সুরাবর্দী লীগের ধ্বজ-দণ্ড ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। এই লীগের চমূদল তাঁহারই শাসনের আওতায় থাকিয়া নিজামাবাদ এবং ওয়াজিরাবাদী ছুরি-ছোরার স্বচ্ছন্দ সাহায্য পাইয়াছে এবং বাঙলার বুক নির্দোষের রক্তে সিক্ত করিয়াছে। মিঃ সুরাবর্দী এই দৌরাত্ম্যের প্রতিরোধ করিতে পারেন নাই এবং এখনও পারিতেছেন না। লীগের সাম্প্রদায়িকতামূলক ভেদ নীতি, এপথে অন্তরায় সৃষ্টি করিতেছে। সে নীতির ফলে বাঙলা দেশে উত্তরোত্তর মধ্যযুগীয় বর্বর সাম্প্র-দায়িকতান্ধ গুণ্ডাদের অনুকূল প্রতিবেশ গড়িয়া উঠিতেছে। লীগের নীতির মহিমা গুণ্ডাদের প্রতি দরদের দুর্বলতায় বাংলার শাসন বিভাগে নিরপেক্ষ ন্যায়ের মর্যাদাকে নষ্ট করিতেছে। বস্তুত মিঃ সুরাবর্দী স্বয়ং কিংবা তাঁহার মুখপাত্র স্বরূপে মিঃ মহম্মদ আলী শান্তি এবং শৃঙ্খলা রক্ষা সম্পর্কে যত যাহাই বলুন না কেন, লীগের নীতিচক্র বাঙলার সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্র-দায়কে নির্মমভাবে পেষণ করিয়াই চলিয়াছে। লীগ-নীতির প্রতি আনুগত্যে একান্ত থাকিয়া এবং সে নীতি প্রতিপালনে অন্তরের অন্তঃস্তলে উগ্রতা প্রধূমিত রাখিয়া সরাবর্দী সাহেব আজ বাঙলার প্রতি দরদের অভিনয় করিতেছেন। তিনি অখণ্ড ঐক্যবন্ধ বাঙলার কথা বার বার আওড়াইতেছেন। তিনি কতখানি নির্লজ্জ ইহাতেই বোঝা যায়। তাঁহার বোঝা উচিত ছিল যে, বাঙলায় জাতীয়তাবাদীরা অখণ্ড বাঙলার জন্য সংগ্রাম করিয়াছে। তাহাদের আদর্শে সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান নাই। সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা হইতে মুক্ত উদার আদর্শই বাঙলার সংস্কৃতিকে সমুন্নীত করিয়াছে। তাহার সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। মুসলিম লীগ বাঙলার সেই জাতীয়তাবাদের আদর্শকে সংকীর্ণতার বর্বর হিংস্রতায় আক্রমণ করিয়াছে এবং এইভাবে সে বাঙলার বুকে ছুরি বসাইয়াছে। বস্তুতঃ বাঙলার জাতীয়তাবাদের উদার আদর্শের প্রতি মিঃ সুরাবর্দীর বিন্দু-মাত্র সহানুভূতি নাই। তিনি সুচতুর লোক। বাঙালী হিন্দুদিগকে তিনি মনোমুগ্ধকর ফাঁকা কথার দ্বারা প্রবঞ্চিত করিতে চাহিয়াছেন। এইভাবে সুবে বাঙলার সর্দারী মহিমায় তিনি উদ্দৃপ্ত হইবেন; তিনি বাঙলার সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে পিষ্ট করিবেন এবং বাঙলার বিপুল হিন্দু সমাজকে লীগের ক্রীতদাসে পরিণত করিয়া আত্মগর্ব চরিতার্থ করিবেন, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। তাঁহার এই প্রতারণা জাতীয়তাবাদী বাঙলা ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিবে।

বাঙলার সংস্কৃতির অখণ্ডতা

মিঃ সুরাবর্দী তাঁহার সাম্প্রতিক বিবৃতিতে পাকিস্থানী বাঙলার সুখের স্বপ্ন দেখাইয়াছেন। বাঙালী জাতির জন্য তাঁহার অন্তরে দরদ কতখানি আমাদের জানিতে বাকী নাই। বাঙালী জাতির দুঃখে মিঃ সুরাবর্দীর বুক চোখের জলে ভাসিয়া যাইতেছে, এইজন্যই তিনি বিহার হইতে মুসলমানদিগকে আনিয়া পশ্চিমবঙ্গে দৈনিক ৪২ হাজার টাকা ব্যয়ে তাহাদের জন্য লাখরাজের ব্যবস্থা করিতেছেন; বাঙালী জাতির জন্য তাঁহার অন্তর বেদনায় ব্যাকুল হইয়াছে, এইজন্য পাঞ্জাব হইতে কুপোষ্যের দল আমদানী করিয়া শহরের বুকে অত্যাচার এবং অনাচারের স্রোত তিনি প্রবাহিত করিয়াছেন। অ-বাঙালী এইসব সরকারী কুপোষ্যদের কাছে শহরের বাঙালী অধিবাসীদের গৃহের শান্তি আজ বিপর্যস্ত, নারীর সতীত্ব বিপন্ন। সুরাবর্দী সাহেব প্রধান মন্ত্রী থাকিতে বাঙলার ভবিষ্যৎ? আমরা বলিব, বর্তমান অবস্থার ভিত্তিতে সুখকর কোন ভবিষ্যৎ গড়িয়া উঠিতে পারে না। বস্তুত লীগ বর্তমানে বাঙলাকে যে অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অবলম্বন করিয়া এবং সেই পথে লীগের চেলা-চামুণ্ডাদিগকে শাসন কর্তৃত্ব হইতে বিতাড়িত করিয়াই বাঙলার ভবিষ্যৎ গঠন করা সম্ভব হইতে পারে। লীগের শাসননীতিকে বরদাস্ত করিলে বাঙলার সর্বনাশ সুনিশ্চিত। সেক্ষেত্রে বাঙলার সভ্যতা এবং সংস্কৃতির কিছুমাত্রও থাকিবে না। সুরাবর্দী সাহেব আমাদিগকে মধুর ভাষায় শুনাইয়াছেন যে, বাঙলার হিন্দুদের অধিকাংশের তো দূরের কথা, পশ্চিম বঙ্গেরও অধিকাংশ হিন্দু বাঙলা বিভাগ চাহে না। কারণ, বাঙলার সকল অংশের হিন্দুদের সংস্কৃতির বন্ধন এমনই যে, ক্ষমতা লাভের আশায় সে বন্ধন তাহারা ছিন্ন করিতে পারে না। মিঃ সুরাবর্দীর এই কথার উত্তরে আমরা ইহাই বলিব যে, বাঙলার সকল অংশের হিন্দুদের সংস্কৃতির বন্ধন নিবিড় ইহা সত্য এবং সেইজন্যই বাঙালী আজ স্বতন্ত্র বাঙলা দাবী করিতেছে। নিজেদের সংস্কৃতিকে বাঁচাইয়া রাখিবার বেদনাই পূর্ব এবং পশ্চিম-বঙ্গকে এই দাবীর সমর্থনে সমভাবে সচেতন করিয়া তুলিয়াছে। বাঙলার জাতীয়তাবাদীরা বুঝিয়াছে পশ্চিম বাঙলাকে স্বতন্ত্র করিয়া বাঙলার নিজস্ব সংস্কৃতি যদি অব্যাহত রাখা যায়, তবে পূর্ব বঙ্গও সেই সংস্কৃতির শক্তিতে সঞ্জীবিত থাকিবে এবং লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটের নির্বিবেক বর্বরতার প্রভাব শিথিল হইয়া পড়িবে। তখন সংস্কৃতির বন্ধনে সমবেদনায় জাগ্রত স্বতন্ত্র বঙ্গের বলে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় বলীয়ান থাকিবে এবং বর্বরতা সেখানে মাথা তুলিতে সাহস পাইবে না। মিঃ সুরাবর্দী এক্ষেত্রে বঙ্গ বিভাগকামীদের ক্ষমতা লাভের পরিচয় পাইয়াছেন। সেক্ষেত্রে লীগকেই তিনি এক-চেটিয়া রাখিতে চাহেন। আমরা বলি, স্বাতন্ত্র্যকামী বাঙলা সত্যই আজ ক্ষমতা চায়; কিন্তু সে ক্ষমতা লীগের সাম্প্রদায়িকতামূলক ধর্মান্ধ স্বেচ্ছাচারিতা নয়, বাঙলার উদার অসাম্প্রদায়িক আদর্শ সঞ্জীবিত রাখিবার ক্ষমতা, সমগ্র ভারতের অখণ্ড রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার সহিত সংহত থাকিয়া দেশকে সমৃদ্ধ এবং সমন্নত করিবার ক্ষমতা। সত্যই জাগ্রত নবীন বাঙলা আজ ক্ষমতা চায়, তাহা মিঃ সুরাবর্দীর ও তাহার অনুগত দলের উপদ্রব বিধ্বস্ত করিবার ক্ষমতা। বাঙালী আজ স্থির বুঝিয়াছে যে, বাঙলার স্বাতন্ত্র্য দাবী ভিন্ন তাহাদের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার অন্য পথ নাই। বাঙালী আজ মর্মে মর্মে এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছে যে, একমাত্র বাঙলার এই স্বাতন্ত্র্য দাবীর পথেই পাকিস্থানী জল্লাদী জিগীর ঠাণ্ডা হইয়া আসিবে। মিঃ সুরাবর্দীর কথা আমরা স্বীকার করি—"হিন্দু যুবকেরা উন্নত, তাহারা তাহাদের অধিকার জানে এবং কিভাবে দাবী আদায় করিতে হয়, তাহাও জানে।" হাঁ, জানে বলিয়াই তো স্বাতন্ত্র্যের দাবী উঠিয়াছে। কংগ্রেসের ভিতর দিয়া বাঙলার যুবকদের দাবীই বরাবর স্বাধীনতা সংগ্রামে সমগ্রভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। কংগ্রেস আজ বঙ্গ বিভাগ দাবী করিতেছে, বাঙলার যুবকদের বলিষ্ঠ প্রেরণাই সে দাবীর পশ্চাতে রহিয়াছে এবং সুরাবর্দী সাহেবের কোন ছল, চাতুরী এখানে খাটিবে না। বস্তুতঃ বাঙলার সভ্যতা, সংস্কৃতি সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার অধিকার মিঃ সুরাবর্দীর নাই। তিনি তাঁহার ধর্মান্ধ চেলাচামুণ্ডাদিগকে লইয়া পাকিস্থানী স্বপ্নে বিভোর থাকুন, আমরা কিছুই বলিব না। কিন্তু লীগ নীতির ধ্বজাধারীর মুখে বাঙলার যুবকদের ত্যাগ এবং আদর্শ সম্বন্ধে কোন কথা শোভা পায় না।

ভবিষ্যতের সূচনা

গত ১৪ই বৈশাখ সোমবার হইতে গণ-পরিষদের তৃতীয় অধিবেশন আরম্ভ হয়। বর্তমান অধিবেশনের বিশেষত্ব এই যে, দেশীয় রাজ্যের কতিপয় প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগদান করিয়াছেন। পরিষদের বর্তমান অধিবেশনের উদ্বোধনে সভাপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁহার বক্তৃতায় একটি নূতন কথা বলিয়াছেন; কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, শুধু ভারত-বিভাগই নয়, কয়েকটি প্রদেশও সম্ভবত বিভক্ত করা হইবে, সেজন্য আমাদিগকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। সুতরাং অল্প কিছু দিনের মধ্যেই ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষরূপ পরিবর্তন ঘটিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কেহ কেহ মনে করিতেছেন যে, আগামী তিন-চার সপ্তাহের মধ্যেই ভারতবর্ষের রাজনীতিক ভবিষ্যৎ স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট আকার গ্রহণ করিবে। ইহা মনে রাখিয়াই কয়েকদিন অধিবেশনের পরই গণ-পরিষদের কার্য স্থগিত রাখা হইতেছে। স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে, লর্ড মাউণ্টব্যাটেন অতঃপর প্রত্যক্ষভাবে বৃটিশের ভারত ত্যাগের পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। এই সম্পর্কে ইহাও শোনা যাইতেছে যে, মিঃ জিন্না বাঙলা ও পাঞ্জাব প্রদেশ বিভক্ত করিবার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন এবং সেইভাবেই তিনি তাঁহার পাকিস্থানী জিদ বজায় রাখিতে চাহেন। আরও শোনা যাইতেছে, বাঙলা দেশে সত্বরই ৯৩ ধারার শাসন প্রবর্তিত হইবে এবং গভর্নর স্যার ফ্রেডারিক বারোজ সত্বরই দেশে ফিরিবেন। আমাদের নিজেদের কথা বলিতে গেলে বর্তমান লীগ-শাসনের চেয়ে ৯৩ ধারার আমলও আমরা শ্রেয়স্কর মনে করি এবং স্যার ফ্রেডারিক বারোজের বিদায় আমরা আনন্দের সঙ্গে সমর্থন করি। তিনি নিতান্ত অযোগ্যতা এবং অকর্মণ্যতারই পরিচয় দিয়াছেন। সুস্পষ্ট কর্তব্যবিমুখতার গ্লানিতে তাঁহার শাসন বাঙলার ইতিহাসে চিরদিন কলঙ্কিত হইয়া থাকিবে। প্রকৃতপক্ষে বাঙলা দেশে গভর্নর হিসাবে লীগ মন্ত্রীদের হস্তে পুত্তলিকাবৎ এই ব্যক্তি থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল। তারপর বঙ্গ বিভাগের দাবী যত সত্বর পূর্ণ হয়, দেশের পক্ষে তাহাই মঙ্গলজনক। বাঙলা দেশ কোনক্রমেই পাকিস্থানওয়ালাদের প্রভুত্ব মানিয়া লইবে না। ভারতের অখণ্ড জাতীয়তার বেদীমূলে বাঙলার অসামান্য আত্মদান ভারতের ইতিহাসকে উজ্জ্বল করিয়াছে। সেই বাঙলার জাতীয়তাবাদী সন্তানগণ পাকিস্থানী গুণ্ডাগিরির মহিমায় পরিস্ফীত লীগ-প্রভুদের পদরজ মস্তকে ধারণ করিতে কিছুতেই রাজী হইবে না, আদর্শ অম্লান রাখিয়া তাহার চেয়ে তাহাদের পক্ষে মৃত্যুও শ্রেয়স্কর। বস্তুতঃ ভারতের রাজনীতিক ক্ষেত্রে এই আসন্ন পরিবর্তনের মুখে বাঙলা তাহার কর্তব্য বিস্মৃত হইবে না। সে তাহার সংস্কৃতির মূলীভূত জাতীয়তার আদর্শকেই উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিবে। লীগ-দুঃশাসনের ধ্বংসস্তূপ হইতে সমুত্থিত সেই তরুণ বাঙলা ভারতের নূতন ভবিষ্যৎ গঠনের অগ্রদূত হইয়া চলিবে। আমাদের মনে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বীরের রক্তধারায় বাঙলার প্রতি ধূলা-বিন্দুতে প্রাণরস সম্পূটিত রহিয়াছে, সুতরাং লীগ-ওয়ালাদের বিভীষিকাময় বর্বরতা এবং দৌরাত্ম্য কিছুতেই বাঙলার প্রাণ-ধর্মকে পিষ্ট করিতে সমর্থ হইবে না।

শহরের অবস্থা

সাম্প্রতিক অশান্তি এক মাসের অতীত হইল; কিন্তু অদ্যাপি শহরে স্বাভাবিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। মৌলবী ফজলুল হক সম্প্রতি একটি বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, বাঙলাদেশে যে লাট সাহেব কেহ আছেন, একথা লোকে ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু এতদিন পরে লাট সাহেবের আমরা একটু সাড়া পাইয়াছি। তিনি সেদিন ঘন্টাখানেকের জন্য লাট প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়াছেন, এবং লালবাজারে গিয়া পুলিশ বাহিনীর সম্মুখে এক বক্তৃতাও দিয়াছেন। সেই বক্তৃতাতে তিনি কি বলিয়াছেন আমরা জানি না, আমাদের জন্য তাঁহার কোন চিন্তা আছে বলিয়া মনে হয় না। সব ভার মন্ত্রীদের উপরই রহিয়াছে এবং মন্ত্রীরা যথারীতি আমাদিগকে উপদেশামৃত-দানে কৃতার্থ করিতেছেন। মিঃ সুরাবদীর অনুপস্থিতিতে অন্যতম মন্ত্রী মিঃ মহম্মদ আলী আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, দাঙ্গা নিবারণের জন্য তিনি চূড়ান্তরূপ কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। কিন্তু এই কঠোর ব্যবস্থা কাহাদের বিরুদ্ধে? বলা বাহুল্য, মিঃ সুরাবদী কিংবা তাঁহার স্থলাধিকারী এই সব মহাপুরুষদের এ ধরণের হুমকীতে দাঙ্গা-কারীরা কিছুমাত্র ভীত হইবে না; কারণ, তাহারা সরকারী দাঙ্গা দমনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিমধ্যেই ভাল করিয়া বুঝিয়া লইয়াছে। শহরে দাঙ্গা দমনের সরকারী কঠোর ব্যবস্থা সত্য প্রকৃতপক্ষে উপদ্রবকারী তাহাদের উপর প্রযুক্ত হয় না, পক্ষান্তরে শান্তিকামী শহর-বাসীদিগকেই সেজন্য যত রকমের দুর্ভোগ পোহাইতে হয়। গুণ্ডারা ছুরি চালাইয়া নির্দোষ পথচারীদিগকে হত্যা করে, সরকারী গুলী তাহাদের দিকে চলে না। শান্তিকামী অধিবাসীদের অঞ্চলে দুর্বৃত্ত গুণ্ডা কিংবা তাহাদের প্ররোচক দল বোমা ছোড়ে কিংবা পটকা ফাটায়, তিন দিন তিন রাত্রি সান্ধ্য আইনের প্রতাপে নির্দোষ নর-নারী নিরর্থক ঘরবন্দী অবস্থায় নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে। ধরপাকড়, খানাতল্লাসী সরকারী নীতির কঠোরতার গতি একই দিকে এবং একই উদ্দেশ্যে প্রধাবিত হইয়া থাকে। শহরের অশান্তি দমিত না হইবার মূল কারণ এইখানে রহিয়াছে। সুতরাং দাঙ্গা দমনে কঠোরতার ফাঁকা বুলি মন্ত্রীদের মুখে শুনিলে আমাদের কোন আশ্বস্তির কারণ ঘটে না। বস্তুত তাঁহাদের কথার অর্থ এখন সাধারণে অন্যরূপ বুঝিয়া লয়। এরূপ অবস্থায় মন্ত্রীদের যদি কিছু বলিবার থাকে, তাঁহাদের যাহারা অন্তরঙ্গ তাহাদেরই বলুন, শান্তির মহিমা কীর্তনে তাহাদিগকে মুগ্ধ করুন। আমাদের কাছে অনর্থক বিবৃতি না দিলেই তাঁহাদের শ্রম লাঘব হইবে এবং তাঁহারা সঞ্চিত শক্তির সাহায্যে সর্বাধিকভাবে মস্তিষ্ক সঞ্চালনের দ্বারা বাঙলায় পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করিতে সমর্থ হইবেন।

নৃশংস হত্যাকাণ্ড

গত ১১ই বৈশাখ শুক্রবার কলিকাতা সহরের অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ক্যাপ্টেন পি কে সেনগুপ্ত আততায়ীর গুলীতে নিহত হইয়াছেন। প্রকাশ, ক্যাপ্টেন সেনগুপ্ত তাঁহার পার্কসার্কাসস্থ বাসভবনে রোগী দেখিতেছিলেন, তখন কয়েকজন লোক ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করিবার অছিলায় তাঁহার গৃহে প্রবেশ করে। আগন্তুক ব্যক্তিদের মধ্যে একজন গুলী করিয়া ক্যাপ্টেন সেন গুপ্তকে হত্যা করে। ক্যাপ্টেন সেন গুপ্তের এই নির্মম হত্যাকাণ্ড আমা-দিগকে মর্মান্তিকভাবে আহত করিয়াছে। তিনি অতি উদারহৃদয় ছিলেন। একান্ত অমায়িক এবং সদাপ্রফুল্ল সেনগুপ্তের সংশ্রবে যিনি একদিন গিয়াছেন তিনি তাঁহার মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছেন। ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত টাঙ্গাইল মহকুমার সাকরাইল গ্রামে ইঁহাদের নিবাস। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় কৃষ্ণকুমার সেনগুপ্ত জজীয়তি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া পার্কসার্কাসে বসবাস করিতে থাকেন। এই অঞ্চলে এ পরিবার অল্প দিনের মধ্যেই প্রতিষ্ঠাবান এবং সর্বজনপ্রিয় হইয়াছিলেন। ক্যাপ্টেন সেনগুপ্তের পরহিতৈষণা জন-সমাজে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। অর্থকে তিনি জীবনের মুখ্য অবলম্বন স্বরূপে দেখেন নাই। সেবাই তাঁহার মুখ্য ব্রত ছিল। তাঁহার প্রতি কেহ কোন বিদ্বেষ বুদ্ধি পোষণ করিতে পারে, ইহা ধারণার অতীত ছিল। সর্ব সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহার বুদ্ধি এমন উদার ছিল যে, মানব প্রকৃতিকে তিনি সন্দেহ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এজন্য পার্কসার্কাস অঞ্চল, তিনি যে সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তাহাদের পক্ষে নিরাপদ নহে, ইহা দেখিয়াও তিনি সে স্থান পরিত্যাগ করেন নাই। সহরের প্রতিবেশে নরঘাতী উন্মাদনা আজ এমনই বীভৎস উগ্রতা লাভ করিয়াছে যে, এমন এক-জন একান্ত পরসেবাব্রতী যুবকের প্রাণ হরণের মত বিশ্বাসঘাতকতার ক্ষেত্রেও আততায়ীদের হস্ত কম্পিত হয় নাই। তাহারা প্রকাশ্য দিবা-লোকে সরিয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছে। ক্যাপ্টেন সেনগুপ্তের জীবন কুসুম পরসেবার পবিত্র ব্রত সাধনের ক্ষেত্রেই অকালে ঝরিয়া পড়িল। বাঙলার পক্ষে ইহা বড়ই দুর্দশার কথা। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা স্বজনের বিয়োগ ব্যথায় একান্ত মর্মাহত হইয়াছি। শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দিবার মত ভাষা আমাদের নাই। ভগবান তাঁহাদের অন্তরে শান্তি প্রদান করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

পূর্ব 'পাকিস্থান কেল্লা'র খবর—

আসাম গভর্নমেণ্টের সঙ্গে লীগওয়ালাদের বহিরাগত উচ্ছেদ নীতি সম্পর্কে মীমাংসার যে আলোচনা চলিতেছিল, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। লীগের সমর-দপ্তর সংগ্রাম চালাইয়া যাইবার হুকুম দিয়াছেন। এই সঙ্গে মানকাচরে অবস্থিত পূর্ব পাকিস্থানী কেল্লা হইতে সামরিক তৎ-পরতার নূতন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। বাঙলা গভর্নমেণ্ট এই কেল্লা ভাঙ্গিয়া দিবেন বলিয়া বরদলুই গভর্নমেণ্টের নিকট প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু এ পর্যন্ত সে প্রতিশ্রুতি কার্যে পরিণত করা হয় নাই এবং অদূর ভবিষ্যতে যে হইবে এমন সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে না; পক্ষান্তরে সম্প্রতি আমাদের কোন সহযোগী মানকাচরের কেল্লা হইতে লিখিত দুইখানা চিঠির যে প্রতিলিপি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে কেল্লার কাজ পুরাদস্তুর চলিতেছে, ইহাই বোঝা যায়। কেল্লা হইতে কলিকাতায় লিখিত এই দুইখানা চিঠিতে ৬টা রিভলবার, ৬টা রাইফেল, চাহিয়া পাঠানো হইয়াছে। ইহা ছাড়া, হাতবোমা রিভলবার প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে পারে, এমন লোকেরও যে সেখানে খুব প্রয়োজন ইহাও জানানো হইয়াছে। কিন্তু কলিকাতায় এই সব জিনিসের যেরূপ টান পড়িয়াছে তাহাতে পত্র-লেখকের বন্ধুর পক্ষে তাঁহার নিতান্ত সঙ্গত অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব হইবে কিনা জানি না; তবে, ঐগুলির অভাবেও কেল্লার কাজ বন্ধ থাকিবে না। পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন,—সেখানে তীর, ছোরা, প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে, এবং সেগুলি চালনার কৌশল শিক্ষাদান করা হইতেছে। এমন বীর বাহিনী সংগঠিত থাকিতে লীগ-ওয়ালারা শান্তির পথে যাইতে রাজী হইবে না সহজেই বোঝা যায়। স্যার আকবর হায়দরী গভর্নর হইয়া আসামের শাসনভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নীতি কোন পথে চলিবে কে জানে? পূর্ব পাকিস্থানী কেল্লার এই রণ-সমুদ্যম ইহার মধ্যে রংপুর জেলার কোন কোন অঞ্চলে জেহাদী জোস্ জাগাইয়া তুলিতেছে, বাঙলার বর্তমান অবস্থায় ইহা বিশেষ আশঙ্কার কথা।

দেশসেবকের পরলোকগমন

শ্রীযুত অরুণকুমার চন্দের অকাল মৃত্যুতে দেশের সর্বত্র ব্যথার সঞ্চার হইয়াছে। চন্দ মহাশয় আসামের রাজনীতিক ক্ষেত্রে প্রাণময় পুরুষ ছিলেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গকে আমাদের গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

বিশ্রাম

শিল্পী : শ্রীনন্দলাল বসু

শ্রীগোলকবিহারী দাসের সৌজন্যে

শহরের পথে আবার ট্রাম চলিতেছে। নববর্ষের এই তৎনগদ ফলকে যাত্রীরা হাতে হাতে স্বর্গলাভের সামিল বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছে। ট্রাম ধর্মঘটের সফল পরিসমাপ্তির প্রশংসা কাহার প্রাপ্য এই নিয়া ছোটখাটো গোলযোগের যে সংবাদ আমরা শুনিয়াছি

তাহাতে গলাযোগ করিবার ইচ্ছা আমাদের নাই। তবে একটা কথা শুধু বলিবার আছে। ধর্মঘটের সময় আমরা শ্রমিকের "ঘটে" যথাসাধ্য কিঞ্চিৎ কাঞ্চন-মূল্য দান করিয়াছি। ধর্মঘটের অবসানে জানুয়ারীর শেষের কয়দিনের ক্রেতাদের "পাশ" আর চলিবে না শুনিয়া এপ্রিলের বাকী কয়দিন আমরা কোম্পানীর "ঘটে"ও কাঞ্চন মূল্য দিতে দ্বিধা করিতেছি না। দাতা শতংজীবিতু না হউক অন্তত যাত্রীজী জিন্দাবাদটা আশা করিয়াছিলাম!

* * * * * *

পেশোয়ারের এক সংবাদে প্রকাশ লীগওয়ালারা নাকি ক্যান্টনমেন্ট ও নৌশেরা রেলওয়ে স্টেশনের বুকিং অফিসে ঢুকিয়া যাত্রীদিগকে "পাকিস্তানী টিকিট" বিক্রয় করিয়াছে। অনুমান করা শক্ত নয় এই ব্যাপারে যাত্রীরা ক্ষুন্ন হইয়াছেন কেননা কতকদিন আগে লীগ তার চেলা চামুণ্ডাদের বিনা টিকিটে ভ্রমণেরই আশ্বাস দিয়াছিলেন, এখন কি তবে তাঁরা গাছে তুলিয়া মই কাড়িয়া নিতে চাহিতেছেন?

* * * * * *

আর একটি সংবাদে প্রকাশ করাচীতে নাকি পাকিস্তানী নোট চালু করা হইতেছে। শুনিলাম নোটের একদিকে পাকিস্তানের এলাকার মানচিত্র, অন্যদিকে কায়েদে আজমের রাজমুকুট পরিহিত ছবি, নোট issue করিয়াছেন Reserve Bank of Pakistan, স্বাক্ষর করিয়াছেন লিয়াকৎ আলি। সব ব্যবস্থাই পাকা, এখন বাজারে চলতি নোটগুলিকে "জাল" বলিয়া ঘোষণা করার অপেক্ষা মাত্র!

* * * * *

বিহারের শান্তি-শফরে গান্ধীজীর যত ফটো তোলা হইয়াছে বিহার সরকার সাধারণের নিকট হইতে সেইগুলি চাহিয়া নিতেছেন,—উদ্দেশ্য সেই সব ফটো একসঙ্গে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা। খুড়ো বলিলেন—"একটি অসমর্থিত সংবাদে প্রকাশ যে, কায়েদে আজমের Peace missionএর ভ্রমণের ছবিও নাকি আহ্বান করা হইয়াছে কিন্তু কোন response পাওয়া যাইতেছে না, বোধ হয় Camera cannot lie বলিয়াই"!

* * * *

পণ্ডিত নেহেরু বাংলাকে to face troubles with courage বলিয়া উৎসাহ দিয়াছেন। খুড়ো বলিলেন—"বাঙলা বিপদ face করিতে রাজী আছে কিন্তু মুস্কিল
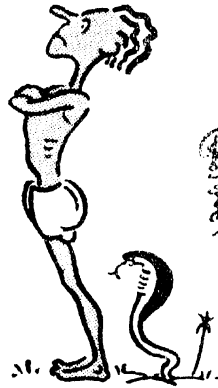
এই যে—বাংলার সাম্প্রতিক বিপদ আসিতেছে সব পশ্চাৎ দিক হইতে; এই সম্বন্ধে পণ্ডিতজীর নির্দেশ লাভ করিতে পারিলে বাংলা উপকৃত হইত!

* * * *

ষ্ট্যালিন অভিযোগ করিয়াছেন যে, কোন কোন বিদেশী সংবাদদাতা নাকি "Depicted Soviet Government as a sort of zoological garden"—উক্ত সংবাদদাতাদের গভর্নমেণ্ট "a sort of museum" বলিয়া কবে ঘোষণা করা হইবে আমরা তা শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম।

"অর্থাৎ নারদ, নারদ বলিবার জন্য সকলেই রসনায় শান দিতেছে"—বলিলেন বিশু খুড়ো।

* * * * *

একটি বেসরকারী সাম্প্রতিক ঘোষণায় আমরা ভাবী স্বদেশী গবর্ণরদের নামের তালিকা দেখিলাম। ডাঃ আম্বেদকার ছাড়া

তাঁহাদের সকলেই "মহাশয়" ব্যক্তি অর্থাৎ "Sir"—বলেন বিশুখুড়ো।

* * *

সিডনীর এক লটারী খেলার প্রথম পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছে a block of nine flats, আমাদের কলিকাতায় মালিকানার জন্য নয়, শুধু একটি Flat ভাড়া পাওয়া যাইবে এই ঘোষণাতেই অনেক টিকিট বিক্রয় হইতে পারে। রেঞ্জারস্ ক্লাব কথাটা ভাবিয়া দেখিবেন।

* * * *

একটি সংবাদে প্রকাশ, অস্ট্রেলিয়াতে নাকি দুই হাজার রকম পিঁপড়ে আছে। "লাভের গুড় যে পিঁপড়েতে খাইয়া শেষ করে তারা হয়ত অস্ট্রেলিয়ায় নাই"—বলেন খুড়ো।

* * * * *

বৃটেনে নাকি "Stone lung" নামে একটি নূতন রোগ দেখা দিয়াছে। বৃটেনের সঙ্গে যারা "দিলু" দেওয়া-নেওয়ার ব্যবসা করেন, তাঁদের পক্ষে এখন—"মেরা দিল্ল লেকে সিসেকি তেরেসে পাথরপে দে মারা" বলা ছাড়া হয়ত আর উপায় নাই।

* * * * *

বঙ্গ-বিভাগ সম্বন্ধে খুড়োর মতামত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—"বঙ্গ বিভাগ হইলে মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গলএর মধ্যে পরস্পর কি সম্বন্ধ দাঁড়াইবে সেই কথাটা খোলাসা না হওয়া পর্যন্ত আমি ভালমন্দ কিছুই বলিতে পারিতেছি না!"

গোড়াতেই বলে রাখছি এবার আমি ভয়ানক গম্ভীর কথা বলব। আমি সাধারণত যে সব কথা বলে থাকি সে সব কথা গম্ভীর নয় এমন অবশ্যই বলা চলে না। অথচ সেদিন আমার একজন বন্ধু বললেন, serio-comic লেখা হিসেবে এগুলো চমৎকার হচ্ছে। দেখুন তো, আমি আবার কমিক কথা কখন বললাম! ও জিনিসটা আমার স্বভাবেই নেই। আমি কথা বলে লোক হাসাতে প্রস্তুত নই। একথা অবশ্য স্বীকার করব যে আমি অনেক গম্ভীর কথা হাল্কা সুরে বলেছি, কিন্তু তাতে যদি কথার ওজন কমে গিয়ে থাকে তবে সেটা আমারই দুর্ভাগ্য বলতে হবে। স্থির করেছি এবারে অন্ততঃ গভীর কথা গভীর সুরেই বলব; তার কারণ এবার আমি রাজনীতি আলোচনা করব। আপনারা গোড়াতেই বলবেন রাজনীতিটা আবার গম্ভীর ব্যাপার হ'ল কবে থেকে। রাজনীতি নিয়েই তো দেশে যত ছেলেখেলা চলচে। সেটা খুবই সত্যি কথা। রাজনীতিকে যত লঘু করে তুলবেন তার ফল তত গুরুতর হবে। রাজনীতি নিয়ে যাঁরা ছেলেখেলা করেন তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে রাজদ্রোহী। দেখা গেছে, কোনো রকম নীতির যে ধার ধারে না সেই রাজনীতিতে হাত পাকায়। Politics is the last resort of a scoundrel—একথা যিনি বলেছিলেন তিনি নিশ্চয় সর্বদর্শী ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ ছিলেন।

অযথা বাগবিস্তার না করে আমার বক্তব্যটি এখন আপনাদের কাছে নিবেদন করছি। আর ঠিক এক বৎসর পরে ইংরেজ এদেশের শাসনভার দেশবাসীর হাতে অর্পণ করবে। প্রশ্ন উঠেছে কার হাতে শাসন ক্ষমতা দেবে। প্রশ্ন উঠবার কথাই নয়। স্বাধীনতার পুরস্কার তাদেরই প্রাপ্য যারা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছে, প্রাণপাত করেছে, স্বার্থত্যাগ করেছে, অশেষ দুঃখ বরণ করেছে,—এক কথায় স্বাধীনতার মূল্য যারা দিয়েছে। কিন্তু ইংরেজ বহু পূর্ব থেকেই তার মোক্ষম চাল চেলে রেখেছে। নিজে থেকেই ঐ প্রশ্ন তুলেছে। জানে, বহু ভাগীদার, বহু দাবীদার জুটে যাবে। সব চেয়ে যে নিশ্চেষ্ট, স্বাধীনতার যুদ্ধে যার contribution—nil তারই সব চেয়ে বড় গলায় দাবী। এ দাবীটা প্রকারান্তরে ইংরেজেরই। এক দোর দিয়ে বেরিয়ে ও আরেক দোর দিয়ে ঢুকতে চায়। স্বভাব যাবে কোথায়? চৌর্যবৃত্তি ওর অস্থি-মজ্জায়। একদা ক্লাইভ মির্জাফরের গোপন ষড়যন্ত্রে যে সাম্রাজ্যের সূত্রপাত হয়েছিল, মুসলিম লীগ আর ক্লাইভ স্ট্রীটের ষড়যন্ত্রে সেই সাম্রাজ্যের ভগ্নাবশেষ আগলাবার চেষ্টা হচ্ছে। কত বড় বৃথা চেষ্টা ইংরেজ যদি বুঝত তবে এমন নির্লজ্জভাবে আপন স্বরূপকে সর্বসমক্ষে উদ্ঘাটিত করত না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন স্বয়ং বিধাতাও রোধ করতে পারেন না; চার্চিল তো কোন ছার। বিধাতার বিধানের চাইতেও বড়—ইতিহাসের অমোঘ বিধান। ইতিহাসের অভ্রান্ত লিখন আজ আকাশে বাতাসে। পৃথিবীতে নূতন যুগ আসচে। চারশো বছর আগে পৃথিবীতে আরেকবার এসেছিল নব চেতনা—Fall of Constantinople থেকে তার শুরু। আজকে আবার হয়েছে নতুন যুগের সূচনা। তার শুরু —Fall of British Empire থেকে। বলতে গেলে এত বড় যুগ পৃথিবীতে ইতিপূর্বে আসে নি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসানের সঙ্গে পৃথিবীর বৃহত্তম বর্বরতার অবসান হবে।

ইংরেজের দিক থেকে তার সাম্রাজ্যের পতনের চাইতে বেশি শোকাবহ ঘটনা ইংরেজ চরিত্রের অধঃপতন। মনুষ্যত্বের বিচারে ইংরেজের এতোখানি পতন ইতিপূর্বে হয়নি। মেকলে সাহেব বাঙালীর প্রতি আক্রোশবশত একদা যে ভাষা ব্যবহার করেছিলেন সেই সব দোষ—bribery, jobbery, chicanery ইত্যাদি ভারতবর্ষস্থিত ইংরেজ চরিত্রকে যেমন কলঙ্কিত করেছে এমন আর কাউকে নয়। শাসকশ্রেণীর অধঃপতনে শাসিতের অধঃপতন অনিবার্য। দেশের চতুর্দিকে তার দুঃসহ প্রমাণ বিস্তৃত। ভারতভূমিকে সে শ্মশানভূমিতে পরিণত করে যাচ্ছে। একমাত্র রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই সেই শ্মশান দৃশ্যের বর্ণনা করা চলে —একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্ক শয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে। কোন ভারতবর্ষকে সে পেছনে ত্যাগ করে যাচ্ছে, কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে?

তা ছাড়া সর্বনাশে সমুৎপন্নে বুদ্ধিনাশ হতে বাধ্য। ভারতবর্ষের সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষা না করলে ইংরেজের ভবিষ্যত অন্ধকার। একথা ইংরেজ ভালো করেই জানে, মুখে বলেও। সুতরাং বন্ধুত্ব রক্ষা করতে হলে তাদের সঙ্গেই করতে হবে, যাদের সে আপন ব্যবহারে বৈরী করে তুলেছিল। কিন্তু নিতান্ত নির্বোধের মতো ইংরেজ সখ্য স্থাপন কর্চ্ছে এক নগণ্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে। দেশের বৃহত্তম অংশের বন্ধুতাকে সে উপেক্ষা কর্চ্ছে। যোগ্যের চাইতে অযোগ্যের প্রতিই তার স্বাভাবিক প্রবণতা। এর ফল বিষময় হতে বাধ্য। পাকিস্থান ইংরেজ বাণিজ্যের গোরস্থান হবে।

মুসলিম সমাজের প্রতিও আমার একটি নিবেদন আছে। শতাধিক বৎসর পূর্বে আমাদের দেশে পাশ্চাত্যশিক্ষা সংস্কৃতির যে ঢেউ এসেছিল মুসলমান সমাজ সেদিন তাকে স্বীকার করেনি, যুগের সঙ্গে পা ফেলে চলেনি। সে জন্য আমাদের মুসলমান ভ্রাতারা অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় অন্তত পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে পড়েছিলেন। ফলে কেবলি বলেছেন তাঁরা suppressed, depressed ইত্যাদি নিজেদের কর্মফলেই এই দুর্ভোগ হয়েছে আজকে ইতিহাসের আর এক অধ্যায় শুরু হচ্ছে। এবারও মুসলমান সমাজ সেই ভুলটি করছেন। বাইরের জগৎ থেকে মুখ ফিরিয়ে পাকিস্থানের দেয়ালের মধ্যে নিজেই নিজেকে একঘরে করে রাখছেন। ইতিহাসের সমস্ত শিক্ষাকে তাঁরা অস্বীকার করছেন। কিন্তু History takes ruthless revenge on those who ignore the lessons of history মুসলিম লীগ মুসলমান সমাজকে আরো পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

আমার শেষ নিবেদন কংগ্রেসের নিকট গত ষাট বছর ধরে কংগ্রেস স্বাধীনতার জন্য অবিরাম সংগ্রাম করেছে। আজ জয়ের পুরস্কার হাতের কাছে এসেছে। শুধু হাত বাড়িয়ে নেবার অপেক্ষা। কিন্তু একাধিক হাত এগিয়ে এসেছে। স্বাধীনতা জিনিসটা একটা সম্পূর্ণ জিনিস। ওকে ভাগ ভাগ করে বিলিয়ে দিলে গেলে সেটা আর স্বাধীনতা থাকে না। খণ্ডিত বিভক্ত স্বাধীনতার নামই পরাধীনতা। নইলে ইংরেজের আমলেও কি কিছু কিছু স্বাধীনতা আমরা ভোগ করিনি? কিন্তু সবটা মিলিয়ে ওটা পরাধীনতা বই আর কি?

যাহোক স্বাধীনতা যখন হাতের নাগালের মধ্যে তখন বলতে হবে কংগ্রেসের ষাট বছরের সাধনা পূর্ণ হয়েছে, কংগ্রেসের কর্তব্য সমাপ্ত হয়েছে। এখন সমস্ত ভারতবাসীকে আহ্বান করে কংগ্রেস নেতারা—কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে dissolve করে দিন। ছোট বড় মাঝারি সমস্ত দলকে তাঁরা আহ্বান করুন কেউ বাদ থাকবে না—মুসলিম লীগ, হিন্দু-মহাসভা, আকালী শিখ, জামিয়াৎ, মজলিশি আরহার, মোমিন খাকসার, ফরওয়ার্ড ব্লক, সোস্যালিস্ট কমিউনিস্ট, সকলে নিজ নিজ দল dissolve করে এক যায়গায় মিলিত হোক, সকলে মিলে একটিমাত্র পার্টি গঠিত হোক—India National Party। জানি মুসলিম লীগ এ আহ্বানে সাড়া দেবে না। লীগ 'না' ছাড়া ও আজ পর্যন্ত কোন ব্যাপারেই বলেনি। লীগ আসে না আসুক। যে isolated হয়ে থাকে তাকে স্বভাবতঃই encircled হতে হবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস অন্যান্য সব দল থেকে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যাবে। এদের সকলের মিলিত দাবীকে রোধ করবার শক্তি ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের নাই। এই মিলিত দলের হাতেই শাসন-ভার অর্পণ করতে হবে। শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণও অনুরূপ কথা বলেছেন কিন্তু তিনি চান ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ১৯৪৮-এর জুনে কংগ্রেস নিজ প্রতিষ্ঠানকে dissolve করুক। আমরা বলি ক্ষমতা হস্তান্তরের পথ সহজ এবং কণ্টকমুক্ত করবার জন্য ১৯৪৭ এর জুনেই কংগ্রেস নিজেকে dissolve করুক।

(৭)

সন্ধ্যাবেলা ছাদের উপর বসিয়া জগার মা পুরানো দিনের গল্প বলে, মুক্তামালা অবাক হইয়া শোনে, পাশে বসিয়া থাকে নির্বাক দলি।

জগার মা বলে—বৌমা, এ আর কি মারামারি দেখছ? আমরা যেসব কাণ্ড বয়সকালে দেখেছি, তার তুলনায় এসব তো ছেলেখেলা। নবীন তো আর জমিদার সেজে বসলো না, লেখাপড়া শিখে সে ওই কেমন এক রকম হয়ে গিয়েছে। মামলা-মোকদ্দমা হতো তোমার শ্বশুরের সময়ে। বাপরে বাপ, সে কি কাণ্ড, মনে পড়লে এখনও গা-টা শিউরে ওঠে।

এই বলিয়া সে আরও ঘনিষ্ঠ হইয়া বসিয়া বলে—এক দিনকার কথা মনে পড়ছে। সকাল বেলায় কেবল উঠেছি, তখনও মুখে-চোখে জল দিইনি, এমন সময়ে কিছু না হবে তো জনপঞ্চাশ লাঠিয়াল এসে পড়লো কাছারী বাড়িতে। আমাদের লোকজন তৈরি ছিল না, আর ছিলই বা কে? মিলন সর্দার সেদিন মহাল শাসন করতে গিয়েছিল। সেই খবর পেয়েই সাহস করে দশানির লোক এসে পড়েছে। সব লুটে নিয়ে যায় আর কি? তখন তোমার শ্বশুর নিত্যনারায়ণ, আহা মহাপুরুষ স্বর্গে গিয়েছেন—এই বলিয়া সে কপালে হাত ঠেকাইল—তিনি দাঁড়ালেন ছাদের উপরে দোনালা বন্দুক হাতে করে—গুড়ুম, দুড়ুম, দুম্ ......

দু-চার মিনিটের মধ্যেই দশানির জন পাঁচ-ছয় পড়লো, বাকিরা সবাই পলাতক, যেমন হঠাৎ এসেছিল, তেমনি হঠাৎ সরে পড়লো। তখন ছ'আনির লোকজন এসে লাসগুলো পুঁতে ফেলল—ওই ওইখানে, গোলাবাড়ির উঠোনে।

তারপরে একটু থামিয়া পুনরায় বলে, বৌমা, তোমার বাড়ি এত বড় দেখছ—কিন্তু এই এত বড় রাবণের পুরীর যেখানেই খোঁড়ো না কেন, মানুষের কঙ্কাল, দশানির লেঠেল আর রক্তদহের লেঠেলের কঙ্কাল। ওই যে পুকুর দেখছ—শুনেছি ওই পুকুর খোঁড়বার সময়ে কোদাল বসতেই চায় না। কোদাল পড়তেই শব্দ হয় ঠক্-ঠক্, ঠন্-ঠন্, কঙ্কালে আর লোহায় সে কি আড়াআড়ি। পদ্মাপারের যেসব মজুর পুকুর খুঁড়তে এসেছিল—ভয় পেয়ে তারা পালালো, বলল, না কর্তা, এতো পুকুর খোঁড়া নয় এ যে গোরস্থান খোঁড়া, আমরা পারবো না।

এই পর্যন্ত বলিয়া সে একটু দম নেয়, তারপরে গল্পের পূর্বসূত্র অনুসরণ করিয়া আবার বলে, দশানির লেঠেল তো পালালো। আমরা শুনলাম, রাত্রে ওরা এসে আমাদের বাড়ি লুট করবে। সে কি ভয় আমাদের। আমরা করলাম কি জানো, মেয়ে-ছেলে সবাই মিলে, এখনই না-হয় বাড়ি খাঁ-খাঁ করছে, তোমার শ্বশুর-শাশুড়ী বেঁচে থাকতে বাড়িতে লোক ধরতো না, আমরা সবাই মিলে, সন্ধ্যাবেলা ওই তেতালায় গিয়ে চড়লাম। নবীনের বয়স তখন আড়াই, আমি নিজে তাকে কোলে নিলাম, এমন কি তোমার শাশুড়ীর কোলেও দিলাম না, বললাম, না বউ তুমি নিজেকে সামলাও তাহলেই হবে। সবাই মিলে তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে তেতালায় গিয়ে চাপলাম।

তারপরে তেতালার ব্যাখ্যা করিয়া বলে ওখানে এখন আর কেউ থাকে না, বড় ভূমিকম্পে ফাট ধ'রে গিয়েছে কি না! তারপরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলে ফাট না ধরলেই বা কি, থাকবার লোক কোথায়? নবীন তো আর গাঁয়ে বসলো না, এত বড় পৈত্রিক বাড়িঘর পড়ে রইলো, সে থাকলো কি না কলকাতার পায়রা খুপি এক বাড়িতে।

বুঝলে বৌমা, আমরা তো গিয়ে বসলাম, নবীনকে শোয়ালাম আমার কাছেই, আমি লুকিয়ে লুকিয়ে ওর জন্যে বিছানা বালিশ নিয়ে গিয়েছিলাম। অতটুকু কচি ছেলে গিয়ে শুধু মাদুরের উপর শুতে পারে। বাড়ি ভরে গেল আমাদের পাইক বরকন্দাজ লাঠিয়াল আর প্রজাতে। ছাদের উপর রাশি রাশি ইটপাটকেল, খেজুরের কাঁটা জড়ো করা হ'ল, তা ছাড়া বন্দুকতো ছিলই। আমরা সর্বদাই ভাবছি, এই আসে কি ওই আসে। একটু শব্দ হয়, আর সবাই বলে ওঠে, ওই এলো। এমনি ক'রে প্রহর গুণে গুণে রাত ফরসা হ'য়ে এলো। ওরা আর এলো না। আর আসবেই বা কোন্ ভরসায়, সকাল বেলাতেই যে পাঁচজন খুন হ'য়েছে।

এই পর্যন্ত বলিয়া সে থামে। তারপরে টীকা করিয়া বলে এই সব দিন আমরা পাড়ি দিয়েছি, তাই এখনকার হাঙ্গামাকে আর হাঙ্গামা বলেই মনে হয় না। কর্তাদের সাহস কি এখনকার বাবুদের আছে? নবীন তো এ সব পছন্দই করে না, কীর্তিই বা কর্তাদের সাহস পাবে কোথায়? তা ছাড়া দিনকালও বদলে গিয়েছে বৌমা, তখন কর্তারা ম্যাজিস্টেট সাহেবকেও গ্রাহ্য করতো না। দারোগারা তো সামনে এসে হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতো। এখন সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই।

গল্পের স্রোতের অগ্রগতির সঙ্গে রাত্রির অন্ধকার অধিকতর ঘনীভূত হইয়া আসিত, সেই তমিস্রার পটে দিনের আলোয় যাহা মিথ্যা সেই বর্ধিতজ্যোতি নক্ষত্রগুলি একমাত্র সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইতে থাকিত, আর সেই পরিপ্রেক্ষিতে অতীত যুগের কাহিনীর প্রেতচ্ছায়াকে সজীব অপেক্ষাও অধিক জীবিত মনে হইত - মুক্তামালা ভয়ে বিস্ময়ে সব নিস্তব্ধ হইয়া শুনিয়া যাইত।

জগার মার কাহিনীস্রোত স্তিমিত হইয়া আসিলে মুক্তামালা অর্ধস্ফুটভাবে বলিত, জগার মা, তোমার কাছে অনেকবার রক্তদহের সঙ্গে গোলমালের কথা শুনেছি—কি হ'য়েছিল খুলে বলো না।

জগার মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিত, সে কি আজকার কথা মা! আমার জন্মের অগোচর। এ সব শুনেছি বাবার মুখে, তিনি শুনেছিলেন কর্তার মুখে, কর্তা ছিলেন সেই দাঙ্গায় একজন প্রধান। সমস্ত যখন ভাবি মা, অবাক লাগে। এই তো সেদিন বাবাকে দেখলুম, লিচু গাছ তলায় বসে' স্নানের আগে তেল মাখতেন—মনে হয় যেন এই সেদিনের কথা। আজ সেই লিচু গাছটা অবধি গিয়েছে কোথায়! যেন কত যুগ আগেকার ঘটনা। আজ আমার বয়স হ'লো আশী—এই তো সেদিন বাবা আমাকে আকাশে ছুঁড়ে দিয়ে দুই হাতে ধরে ফেলতেন। ছুঁড়ে দেব'র সময়ে আমার সে কি ভয়, আবার হাতে ধরা পড়ে সে কি খিল খিল হাসি। কখনো মনে হয় সে

আজকার কথা, কখনো মনে হয় যেন আর এক যুগের, আর এক জন্মের, আর একজনের জীবনের কথা। কিছু বুঝতে না পেরে অবাক হ'য়ে বসে ভাবি।...

...রক্তদহের কথা জিজ্ঞাসা করছিলে মা! তবে শোনো। এই বলিয়া সে আরম্ভ করে—এই বংশে অনেককাল আগে দর্পনারায়ণ নামে এক জমিদার ছিলেন। ছেলে বেলাতেই তার পিতা-মাতার মৃত্যু হ'য়েছিল—সংসারের কর্তা ছিলেন তার পিতামহ উদয় নারায়ণ। উদয় নারায়ণ-রূপে ছিলেন সুপুরুষ। গুণে ছিলেন মহা-পুরুষ, যেমন দীর্ঘ আকার, তেমনি উজ্জ্বল বর্ণ, যেন তিনি এ যুগের লোক নন, রামায়ণ মহাভারতের আমলের বীর পুরুষ। দর্পনারায়ণ তাঁর আদরের নাতি। নাতির বয়স হ'লে তিনি তার বিবাহের জন্য এক পাত্রী স্থির করলেন। রক্তদহের জমিদারের একমাত্র সন্তান ইন্দ্রাণীর সঙ্গে। ইন্দ্রাণী যেন নব প্রজ্বলিত আগুনের শিখা দিয়ে তৈরী, কিংশুকের মতো কোমল, অথচ তেজস্বিনী। এমন সুন্দর, এমন তেজো-ময়ী মেয়ে মানুষের ঘরে ঘরে প্রতি বৎসর জন্মগ্রহণ করে না।

জগার মা একটু থামিয়া বলে, ইন্দ্রাণীকে দেখিনি, কেমন করে আর দেখবো, সে যে অনেককাল আগেকার কথা, কিন্তু আমার কেন যেন মনে হয় দেখতে অনেকটা তোমার মতো ছিল, তোমার মতোই শান্ত, আবার তোমার মতোই কঠিন। অন্ধকারের মধ্যে মুক্তামালার মুখ লাল হইয়া ওঠে, কেহ দেখিতে পায় না।

জগার মা আবার বলিয়া চলে। বিয়ের কথা-বার্তা স্থির, এমন কি দিন-ক্ষণও একরকম ঠিক। এমন সময়ে স্বরূপ সর্দারের হল মৃত্যু। স্বরূপ সর্দার ছিল বাড়ির সবচেয়ে পুরোনো, সবচেয়ে বড়ো লাঠিয়াল। তার কাছেই দর্প-নারায়ণের লাঠি খেলায় হাতেখড়ি। মৃত্যুকালে স্বরূপ তার দাদাবাবুকে বিশেষ করে অনুরোধ করেছিল, তার অস্থি যেন গঙ্গায় দেওয়া হয়—আর দাদাবাবু কষ্ট করে নিজে গিয়ে যেন দিয়ে আসে। স্বরূপের মনে মনে ভয় ছিল আমলা-কর্মচারীর উপরে ভার দিলে তারা কি আর মুর্শিদাবাদ অবধি যাবে, কোথায় কোন্ বিলে খালে ফেলে দিয়ে এসে বলবে—গঙ্গায় দিয়ে এলাম।

স্বরূপের অস্থি গঙ্গায় দেবার উদ্দেশ্যে দর্পনারায়ণ নৌকা সাজিয়ে রওনা হল। স্থির হল, ফিরে আসলে রক্তদহের রক্তকমলের সঙ্গে বিবাহ হবে। বুড়ো উদয়নারায়ণ ঠাট্টা করে ভাবী নাতবৌকে রক্তদহের রক্তকমল বলতেন।

জগার মা বলে, কিন্তু বৌমা, মানুষে যেমন ভাবে সব সময়ে ঠিক তেমনটি কি হয়? ওদিকে দর্পনারায়ণ স্বরূপের অস্থি গঙ্গায় দিয়ে যখন ফিরে আসবে তখন এক কাণ্ড ঘটলো। একদিন রাত্রিবেলা মাঠের মধ্যে একটি মেয়ের চীৎকার শুনতে পেয়ে সেদিকে দর্পনারায়ণ রওনা হল। কিছু দূর গিয়ে সে দেখতে পেলো যে, একটি তাঁবু। সেই তাঁবুতে ঢুকে দেখলো এক মাতাল, পরে জানা গিয়েছিল পরন্তপ রায় তার নাম; সে-ও এক গ্রামের জমিদার, একটি মেয়ের উপর অত্যাচার করতে উদ্যত। দর্পনারায়ণ মাতালটাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে মেয়েটিকে উদ্ধার করে নিয়ে নিজের নৌকায় ফিরে এলো। মেয়েটির নাম বনমালা। মেয়েটি ভদ্রবংশের, জোড়াদীঘির চৌধুরীদের সমান কুলের, একই সমাজের লোক। দর্পনারায়ণ তাকে বিবাহ করে ফিরলো। এই নিয়ে অনেক কাল তার বাদ-বিসম্বাদ চলেছিল বৃদ্ধ উদয়নারায়ণের সঙ্গে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ নাতি ও নাতবৌকে ঘরে নিলেন। না নিয়েই বা পারবেন কেন? পিতৃমাতৃহীন একমাত্র নাতি, বংশের সেই তো একমাত্র ধারক। কিন্তু এই ঘটনার ফলে ইন্দ্রাণীর সঙ্গে বিবাহ ভেঙে গেল। অবশ্য সেকালে দুটো বিবাহে আপত্তি ছিল না, কিন্তু বৌমা, ইন্দ্রাণী সতীনের ঘর করবার জন্য জন্মে নি। ইন্দ্রের সিংহাসনে বসিয়ে দিলে যাকে বে-মানান হয় না, সতীনের পালঙ্কে সে কি বসতে পারে?

কিন্তু ওতেই বাধলো গোল। ইন্দ্রাণী এই অপমান ভুলতে পারলো না। তার প্রতিহিংসার আগুনে যে দাবানল জ্বলল—তাতে রক্তদহ ও জোড়াদীঘির অনেকখানি না পুড়ে নিভল না।

তারপরে বলে, কিন্তু আজ আর নয় মা, অনেক রাত হয়েছে। সময় পাইতো আর একদিন বাকীটুকু শেষ করবো। এবারে উঠি। তারপরে বলে, ও-বাদলি হাতটা ধরে টেনে তোল মা অনেকক্ষণ বসে থেকে পা দুটো শক্ত হয়ে গিয়েছে। বাদলির দ্বারা তুলিত হইয়া জগার মা নীচে নামিয়া যায়। এমন সময়ে নবীন-নারায়ণ উপরে আসে, বলে, কি তোমার গল্প-শোনা শেষ হল? লজ্জিত বাদলি হাসিয়া অন্ধকারে মুক্তামালার উদ্দেশ্যে জিভ দেখাইয়া দুড় দুড় করিয়া প্রস্থান করে। অবশেষে স্বামী-স্ত্রী শয়নকক্ষের দিকে চলিয়া যায়। কিন্তু মুক্তামালার ঘুম আসে না। স্বপ্নের সূক্ষ্ম কারুকার্যকরা জাগরণের শুভ্র পটের উপরে ইন্দ্রাণী ও বনমালা অদৃষ্টের নিপুণ হস্ত নিক্ষিপ্ত মাকুদ্বয়ের মতো ছুটাছুটি করিয়া রক্তিম রেশমের সূত্রে কাহিনীর মায়া-জাল বুনিয়া তুলিতে থাকে। মুক্তামালা ভাবে, কোথায় ছিল ইন্দ্রাণী, কোথায় ছিল বনমালা, কত কাল আগে কত বহুদূরে—আর আজকার দিনের মুক্তামালা, সেদিন যার অস্তিত্ব মাত্র ছিল না। অদৃষ্ট-হস্ত সংসার সমুদ্রে কী এক আবর্ত রচনা করিল—অমনি দূরাপহত অচিন্তিত সংসর্গ তৃণখণ্ডের মতো ইন্দ্রাণী, বনমালা, মুক্তামালা আসিয়া সেই আবর্তচক্রে পাক খাইতে লাগিল। কি অসীম বিস্ময়, কি অভাবনীয় ভূমিকা। মুক্তামালার আর কিছুতেই ঘুম আসে না। কাহিনীর অশ্রুতদিগন্ত অভিমুখে তাহার মন ছুটিয়া যায়। সে স্থির করে—আগামী কালই জগার মার নিকট হইতে অবশিষ্টটুকু শুনিতে হইবে। সংকল্পে শান্তি আসে, শান্তিতে নিদ্রা আসে, নিদ্রায় স্বপ্ন আসে। 'মুক্তামালার স্বপ্নের খবর আমরা কি রাখি? নিজের স্বপ্নের সংবাদই মানুষে রাখিতে পারে না—তাহাতে' আবার অপরের?

* * * *

তারায়ভরা আকাশের নীচে ছাদের উপরে বসিয়া জগার মা গল্প বলিয়া যায়, মুক্তামালা ও বাদলি অবাক হইয়া বসিয়া শোনে। জগার মা বলে—এদিকে পরন্তপ রায় প্রতিজ্ঞা করে বসলো যেমন ক'রেই হোক অপমানের প্রতিশোধ নিতে হবে। মুখের ব্যাঙ কেড়ে নেওয়া সাপের মতো সে দর্পনারায়ণকে খুঁজে বেড়াতে লাগলো। তখনকার দিনে রেল গাড়ী ছিল না, নৌকোয় যাতায়াত করতে হ'ত। নৌকো ক'রে যেতে যেতে সে রক্তদহের ঘাটে এসে পৌঁছলো। সেখানে এসে হ'ল তার গুরুতর ব্যাধি। রক্তদহের জমিদারের বাড়িতে সে আশ্রয় নিতে বাধ্য হল। তারপরের সব ঘটনা মনে নেই মা, শুনেছিলাম অনেককাল আগে, এখন ভুলে গিয়েছি। ফল কথা, ইন্দ্রাণীর সঙ্গে পরন্তপের বিয়ে হ'ল। এই বিয়ের কারণ কি জানো? ইন্দ্রাণী বুঝতে পেরেছিল পরন্তপ শক্তিশালী পুরুষ, তাকে আশ্রয় করলে নিজের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার সুযোগ হবে। আবার পরন্তপ বুঝেছিল ইন্দ্রাণীর টাকাকড়ি বিনা তার উদ্দেশ্য সিদ্ধি সম্ভব নয়। দুজনেরই রাগ দর্পনারায়ণের উপরে। কিন্তু কেন যে রাগ, একজনের মনের কথা অপরে জানতে পারেনি।

জগার মা বলিয়া চলে আর মুক্তামালা প্রাচীনদিনের সেই নিশ্বাসরোধকরা কাহিনী শোনে।

তারপরে রক্তদহের সঙ্গে জোড়াদীঘির ঝগড়া বিবাদ মারামারিতে পরিণত হল'। তখনকার-কালে জজ ম্যাজিস্টর পুলিশ সাহেব ছিল না বললেই হয়। জোড়াদীঘির জমিদারেরা কয়েক ভাই এমন হাজার দুই হাজার লোক নিয়ে গিয়ে রক্তদহের বাড়ি আক্রমণ করলো। এমন চললো অনেক কাল ধরে। শেষে তারা বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ে পরন্তপ রায়কে বেধে নিয়ে চলে এলো জোড়াদীঘিতে। ওদিকে ইন্দ্রাণী সদরে খবর পাঠালো। ম্যাজিস্টর সাহেব সেপাই নিয়ে এসে জোড়াদীঘির বাড়িতে ঢুকলো। কিন্তু পরন্তপ রায়কে পেলো না। স্বামীর মঙ্গল কামনায় বনমালা তাকে লুকিয়ে আগেই মুক্তি দিয়েছিল। সাহেব পরন্তপকে পেলো না বটে কিন্তু দর্পনারায়ণকে কিছুতেই ছাড়লো না তাকে চালান দিলো। তার সাত বছরের মেয়াদ

। দর্পনারায়ণের সঙ্গে অন্য দুই শরিকের য়েরও কয়েদ হয়েছিল—তাদের কিন্তু দোষ য় না। তাই গাঁয়ে এখনো ছড়া প্রচলিত আছে 'বিনা দোষে মারা পোলো রঘু, কৃষ্ণধন।" ই হাঙ্গামায় জোড়াদীঘির জমিদারীর নকটা নষ্ট হয়ে গেল। ইন্দ্রাণী তার পরেও নককাল বেঁচে ছিল, শুনেছি তার এক মেয়ে রাছিল. সেই মেয়ের বিয়েতেও নাকি কি টা ভারি গোলমাল হয়েছিল।

এই পর্যন্ত বলিয়া সে থামে। গল্প থামিয়া লেও ছাদের বায়ুমণ্ডল কাহিনীর ঘাত-তিঘাতের নিঃশব্দ বৈদ্যুতে থমথম করিতে কে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কেহ কথা বলিতে রে না।

মুক্তামালা শুইতে যায়—কিন্তু ঘুম আসে । গল্পে-শোনা বীরপুরুষেরা, দর্পনারায়ণ ও রন্তপ আর তাহাদের অস্ত্রধারী নুচরগণ তাহার মনের মধ্যে সদর্পে পদ-রণা করিয়া বেড়ায়। রামায়ণ-মহাভারতের ীরপুরুষগণের কথা সে জানে, দেশান্তরের ীরপুরুষগণের কাহিনীও সে পড়িয়াছে—কন্তু দর্পনারায়ণ ও পরন্তপ তাহাদের হইতে বতন্ত্র—ইহারা যে একেবারে তাহার ঘরের ানুষ। সেই বংশেরই বধূ বলিয়া হঠাৎ সে একপ্রকার গৌরব অনুভব করে—কিছুকাল ূর্বেও যাহা তাহার কল্পনাতীত ছিল। তাহার নিদ্র চোখ অকস্মাৎ দেখিতে পায়, ঠিক পাশেই নিদ্রিত নবীননারায়ণ। সে অবাক হইয়া দেখে, বামীকে যেন নূতন করিয়া দেখিতে পায়। নে হয়, সে কেবল তাহার স্বামী নয়, এক প্রাচীন জমিদার বংশের রক্ত ও গৌরবময় কীর্তি ধারার ধারক। যে-ছিল তাহার একান্ত আপনার, মুহূর্তে সে আবহমান কালের ঐতিহ্য-শৃঙ্খলার একতম গ্রন্থিতে পরিণত হইয়া এক অনাদ্যন্তরূপে আত্মপ্রকাশ করে। স্বামীর প্রতি সুগভীর প্রেমের সহিত এক প্রকার অনির্বচনীয় গৌরবময় শ্লাঘার ভাব জড়িত হয়। সেই বিশ্রুতনিদ্র সুঠাম সবল পুরুষ-দেহের দিকে চাহিয়া তাহার চোখের পলক পড়িতে চায় না. চোখে জল ভরিয়া ওঠে। জলের বাধায় দৃষ্টি যখন আর চলে না, তখন সে নীরবে অতিশয় সন্তর্পণে নবীননারায়ণের ললাটে একটি চুম্বনের চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দেয়। দুই ফোঁটা চোখের জল প্রহরী যুগলের মতো সেই চিহ্নটিকে পাহারা দিতে থাকে। তারপরে মুক্তামালা যখন ঘুমাইয়া পড়ে—আকাশের তারাগুলি তখনও ঘুমায় না।

৮

আমরা যখন এই কাহিনীর সূত্রপাত করি, তখন ছিল কার্তিক মাস, শীতের প্রারম্ভ; তারপরে দীর্ঘ শীতকাল অতিক্রম করিয়া আমরা গ্রীষ্মের পুরোভাগে চৈত্র মাসে আসিয়া পৌঁছিয়াছি।

বাঙলার শীত তীব্র নয়, তাহাতে বসন্তের মৃদু মাধুর্য সুনিয়ন্ত্রিতভাবে মিশ্রিত, বসন্ত যদি ঋতু পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ হয়, তবে শীতকালই বাঙলা দেশের বসন্ত ঋতু। এই সময়ে খেজুর রসের স্নিগ্ধ মদিরতার সহিত দিগন্তপ্রসারী শর্ষে ক্ষেতের পীতপ্রদীপ্ত পুষ্পরাশির মদ-বিহ্বল সৌগন্ধ্য জড়িত হইয়া রূপকথার রোমান্সের সৃষ্টি করে। আর তখন মদালসা মধ্যাহ্নলক্ষ্মী তন্দ্রাভরে আতপ্ত রৌদ্রটিতে আপন কনক-চিক্কণ দেহ এলাইয়া দিয়া রাত্রির বিস্মৃতপ্রায় স্বপ্নটিকে ধ্যান করিতে করিতে অন্যমনা। নির্জন বকুল শাখার ঘুঘুর করুণ কাকলি কোন্ নিস্তব্ধতার মধুচক্র নিঃসৃত সুধাবিন্দুর মতো ক্ষরিত হইয়া তাহার স্বপ্ন-সন্ধানী নেত্রদ্বয়কে ক্রমে অধিকতর নিমীলিত করিয়া দিতে থাকে।

পৌষের শেষে বাদামের পাতাগুলি রক্ত-চন্দনের আভায় লাল হইয়া ওঠে, সুরক্তিম কুলগুলি নিবিড় পল্লবপ্রচ্ছায়ে বনানীর দুলের মতো প্রতিভাত, হলুদের ভুঁই পীতাভ পাতায় ভরিয়া যায়; শর্ষে ক্ষেতে ফুল-ঝরিয়া পড়া দানা-বাঁধা শস্য শীর্ষে দেখা দিতে থাকে, আর উত্তর বায়ু নির্বিচারে বিভিন্ন তরু শ্রেণীর পাতা ঝরাইয়া মরমর ঝরঝর করিয়া বহিয়া যায়। মাঠে গাভীর রব, রাখালের কণ্ঠ, অদূর-বর্তী কাঠঠোকরার স্বর, নদীতে খেয়া নৌকার মৃদু আর্তনাদ বিশ্বব্যাপী নিস্তব্ধতার পর্দায় বাধাপ্রাপ্ত হইয়া মৃদুতর হইয়া অপার্থিব সুরসঙ্গতিরূপে কাণে আসিয়া পৌঁছায়।

তারপরে আসে নূতন কিশলয়ের কাল। প্রথমে পূর্বমুখী আমের শাখাগুলিতে মুকুল জাগে, কাঁঠালের পল্লবে ঘন চিক্কণতা দেখা দেয়, লিচুর গাছে স্বচ্ছ সবুজ আভা ফুটিয়া ওঠে, ক্রমে আর এগাছে ওগাছে ভেদাভেদ করা যায় না—সকলে একযোগে, এক সঙ্গে, পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া পত্রদীপালি রচনায় মন দেয়—উদ্ভিদ্ রাজ্যে সে এক মহা আড়ম্বর। বৈশাখের প্রারম্ভে বাঙলার উদ্ভিদ্ জগৎ রসানে মার্জিত দীপ্তোজ্জ্বল ঘন-মসৃণ পল্লব-জালে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। নিমের ফুলের লঘু সুগন্ধ আর লেবুফুলের মদির সুগন্ধ কার্পাস সূত্র আর রেশম সূত্রের স্থূল-সূক্ষ্ম টানা-পোড়েনে সমাপ্তপ্রসাধন বনলক্ষ্মীর ওড়নাখানি বুনিয়া শেষ করিতে অতিশয় প্রযত্ন করে। কৃষ্ণচূড়ার সীমন্তরাগের প্রান্তে সেই ওড়নাখানি আলগোছে বিন্যস্ত করিয়া প্রস্তুত হইবার জন্য বনলক্ষ্মী চঞ্চল হইয়া ওঠেন।

জোড়াদীঘির উদ্ভিজ্জ জগতের উপকূল নূতন ঐশ্বর্যের জোয়ারে কানায় কানায় পূর্ণ, কেবল ভূপাতিত বৃদ্ধ অশ্বত্থের স্থানে শূন্য আকাশটা সুবৃহৎ একটা গহ্বরমুখের মতো রিক্ত, ভয়াল ভবিষ্যতের অনিশ্চিত সংকেতে থমথমে। লোকে সেদিকে মুখ তুলিয়াই ভয়ে চোখ নামাইয়া নেয়, পারিতে সেদিকে কেহ তাকায় না, সে পথটাই এখন পরিত্যক্তপ্রায়। সমস্ত গ্রামসুস্তার মধ্যে ওই একটা সুগভীর ক্ষত স্থান, স্বভাবের নিয়মে ভরিয়া উঠিবার কোন লক্ষণ এখনো প্রকাশ পায় নাই। ভবিষ্যতের ব্যাদিত বদনের মতো ওই ক্রূরগর্ভ শূন্যটা গ্রামের দিকে নির্নিমেষে তাকাইয়া থাকে।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

দুইটি কবিতার বই

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

সে অনেক দিন আগের কথা, কোন এক মাসিক পত্রে, একটি কবিতা পড়িয়া চমকিয়া উঠিলাম। লেখকের নাম কানাই সামন্ত। প্রথমে মনে হইল কানাই সামন্ত নিবারণ চক্রবর্তী জাতীয় একটা ছদ্ম নাম। পরিচিত কোন বন্ধুর কাছে শুনিলাম ওই নামে একজন ব্যক্তি সত্যই আছেন, তিনি কবিও বটে। তারপরে সামন্ত কবির সঙ্গে পরিচয় ঘটিল এবং তাঁহার অমুদ্রিত কাব্যভাণ্ডার হইতে কাব্যধারা পান করিলাম। সেই হইতে আমার বিশ্বাস যে কানাই সামন্তর কবি-প্রতিভা সামান্য নয়। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে সাধারণ পাঠকের অধিকাংশই তাঁহার নাম জানে না। ইহা বিস্ময়ের হইলেও অপ্রত্যাশিত নয়। কারণ সরস্বতীর বীণা লইয়া লাঠিবাজি করিতে না পারিলে এখন লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় না। কানাই সামন্ত সরস্বতীর বীণার নিভৃত সাধক, তাহাকে লাঠি করিয়া পাঠকের মাথায় আঘাত করিতে তিনি রাজি হইবেন না। কিন্তু যে কাল পড়িয়াছে তাহাতে মাথায় আঘাত ছাড়া পাঠকের কিছুতেই চৈতন্য হয় না। মাথায় আঘাত মানে তাহার বুদ্ধিতে আঘাত। আধুনিক নারী যেমন পুরুষোচিত গুণের সাধনায় ব্যস্ত, আধুনিক কবিতা তেমনি বুদ্ধিজীবিনী হইয়া উঠিতে সচেষ্ট। বুদ্ধিবৃত্তি বিশেষভাবে গদ্যের গুণ, তাই আজকার অধিকাংশ কবিতাই গদ্যকবিতা, তাহা গদ্যছাঁদেই লিখিত হোক্, কি পদ্যেই লিখিত হোক। অথচ পদ্য যে বুদ্ধিবিরহিত এমন নয়, তাহাতে বুদ্ধিটা প্রখরভাবে দীপ্তি পায় না, এই মাত্র। চাঁদের আলোও সূর্যেরই আলো। কানাই সামন্ত স্বল্পজ্ঞাত, তাহার কারণ তিনি কবিতাচন্দ্রমার চকোর।

সম্প্রতি যে দুইখানি কাব্যগ্রন্থ তিনি প্রকাশ করিলেন গ্রন্থাকারে ইহাই তাঁহার প্রথম আত্মপ্রকাশ; তাহাতে তাঁহার কবি প্রতিভার পরিপূর্ণ পরিচয় আছে।

চিত্রোৎপলা গদ্যকবিতার সমষ্টি। অনেকগুলি কবিতায় গল্পের আভাস আছে, অধিকাংশই সোজাসুজি লিরিক। এইমাত্র গদ্যকবিতার যে বুদ্ধিবৃত্ত লক্ষণের কথা বলিয়াছি তাহা বিস্মৃত হই নাই। কানাই সামন্তর গদ্যকবিতা গদ্যে লিখিত হইলেও কবিতা, গদ্য তাহার বহিরঙ্গের পরিচয় মাত্র, অন্তরে কবিতার চিরন্তনী সত্তা বিরাজমান, এ যেন চিত্রাঙ্গদার পুরুষের বেশ ধারণ। মণিপুর-রাজদুহিতার মৃগমর্দিনী ব্যবহার সত্ত্বেও অভিজ্ঞ পাঠকের সন্দেহ উদ্রিক্ত হইতে থাকে যে কোথাও একটা রহস্য রহিয়া গিয়াছে। অবশ্য, পার্থ তাহা বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু কাব্যতত্ত্বে যে তাহার বিশেষ অধিকার ছিল এমন প্রমাণ তো মহাভারতেও নাই। আমাদের বিশ্বাস পার্থসারথি কখনো এরূপ ভুল করিতেন না।

পুরাতনকে আবিষ্কার করাই কবির লক্ষ্য। পৃথিবী পুরাতন, মানুষের হৃদয় পুরাতন, এই দুই পুরাতনের বিবাহবন্ধন-সাধনে কবিরা নিযুক্ত। কিন্তু রহস্য এই যে, কবিদের আবিষ্কারের দ্বারাই, কবিদৃষ্টির জ্যোতিঃপ্লাবনের অভিষেকেই পুরাতন নূতন বলিয়া মনে হয়। নূতনের সন্ধান বৈজ্ঞানিক, উন্মাদ ও যুগান্তকারী লেখকগণ করুন আমাদের আপত্তি নাই, কিন্তু যেন তাহাদের camp-follower না হইয়া চিরপুরাতনের সন্ধানে নিযুক্ত থাকে। সে যদি কবি হয় অর্থাৎ তাহার যদি প্রেমের দৃষ্টি থাকে তবে পুরাতন তাহার জীর্ণতার মুখোস অপসারিত করিয়া চিরন্তনরূপে দেখা দিবেই। আধুনিকতার মুখ দেখিতে দেখিতে গতকালের ছাপে 'Dead Letter' অফিসের খামের মতো ভরিয়া ওঠে, নূতন বড় শীঘ্র পুরাতন হয়। কিন্তু কালসমুদ্রের রহস্যতল ভেদ করিয়া যে লক্ষ্মী, যে উর্বশী, উঠিয়াছেন তাঁহারা অবশ্যই পুরাতন, কিন্তু পুরানো নহেন। কবিতা সেই পুরাতনেরই সাধনা করে, অধুনাতনের নহে।

কোন্ দুর্বিপাকে জানি না বাঙালী কবিরা এই মূল কথাটা ভুলিয়া গিয়াছেন, বোধ করি তাঁহাদের বৈদেশিক অগ্রজদের দৃষ্টান্তের ফলেই, কারণ বিদেশের সাহিত্যেও এই ঝোঁকটা আজ প্রবল।

বাঙলাসাহিত্যের আশা ও আশ্বাসের কথা এই যে, কানাই সামন্ত এ কথাটা ভোলেন নাই। পুরাতনের বিষয়ে তিনি চমৎকার অনুভব করিয়াছেন, নিজের আবিষ্কারে নিজেই চমকিয়া উঠিয়াছেন, এ কী! কলম্বাস গাছের ছিন্ন শাখা কখনো দেখেন নাই, এমন নয়, কিন্তু দেশকালের বিশেষ সমন্বয়ে হঠাৎ একদিন অকূল সমুদ্রে ভাসমান একটি ছিন্ন শাখা দেখিয়া তাঁহাকে চমকিয়া উঠিতে হইয়াছিল। কবিমাত্রেই কালসমুদ্রের কলম্বাস। কিন্তু ভাষ্যে প্রয়োজন কি? কবির একটি কবিতা পড়া যাক্।—

বারে বারে চমক লেগেছে চমৎকৃত প্রাণে
নয়ন বাতায়নে এসে বলেছে যখন, মরি! মরি!
কখনো তো দেখিনি এ জগৎ! অথচ,
এই পথ দিয়ে গেছি সকাল-সন্ধ্যায়,
এই কোকিল ডেকেছে এই চূতশাখায়,
ধুলোয় মিশেছে এই পুষ্পপরাগ অলক্ষ্যে
ঝরে ঝরে।
কখনো তো দেখিনি এ জগৎ!

এমন প্রভাত হয়েছে এমন নদীকূলে,
এমন চাঁদ উঠেছে এমন নির্মল নীলিমাতে,
বালুবেলায় এই নীরধারা
অস্ফুট কলস্বরে বয়ে গেছে যুগ যুগ
রাত জাগা দখিনাবাতাসে এই নারিকেলক
স্বপ্নে কথা কয়েছে।
তবুও দেখিনি এ জগৎ॥

বুঝি বা ঘুমিয়ে আছি সারা জীবন।
বুঝি আমার জাগতে জাগতে
জাগা আজও হয়নি। •
ঐ নারিকেল গাছের মতো স্বপ্নে কথা কয়েছি
নিঝুম নির্জন রাতে,
দেখিনি তারা, দেখিনি চাঁদ,
দেখিনি সূর্য,
সাগরগামিনী গঙ্গার ধারায় ধারায়
দেখিনি কেমন কাঁপে আমার ছায়াখানি
সোনাঢালা দুপুরবেলায়॥

সুপ্তির পর সুপ্তি,
স্বপ্নকে ঘিরে স্বপ্ন।
কবে হবে জাগরণ?
কবে দেখব একটি ঘাস, একটু ধুলো?

কবিতাটির নাম স্বপ্নচমৎকার। কবি পুরাতন পৃথিবীকে যেন হঠাৎ নূতন করিয়া যেন হঠাৎ প্রথমবারের জন্য দেখিতে পাইলেন যাহা লক্ষযুগের পুরাতন প্রেমের আলোকে তাহা নূতন বলিয়া প্রতিভাত হইল, কেননা প্রেম যেখানে বিদ্যমান কাল সেখানে পরাজিত কালনাগের নমিত ফণার উপরে কিশোর প্রেমিক দণ্ডায়মান। বিদ্যাপতি ঠিক এই ভাবটিই প্রকাশ করিয়াছেন, জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল। একটিমাত্র জন্মকে তুচ্ছ মনে হওয়াতে তাঁহাকে বলিতে হইয়াছে লাখ লাখ যুগ হিয়া হিয়ে রাখনু। তবু তৃপ্তি হয় না, প্রিয়তম কখনো পুরাতন হইল না, কারণ প্রেম যে অন্তর ও ইন্দ্রিয়গ্রামকে আবিষ্ট করিয়া বিদ্যমান।

সাহিত্যের প্রতি, শিল্পের প্রতি একটা অশ্রদ্ধার যে ভাব প্রায় যুগলক্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে কানাই সামন্তর কাব্যে তাহার কোন চিহ্ন নাই। বর্তমানে শিল্প সর্বগ্রাসী রাজ

ীতির অন্যতম বাহন মাত্র, যেমন বাহন সংবাদ-
্র, যেমন বাহন বেতারবার্তা, যেমন বাহন কল
মান ও কূটনীতি। শিল্প আর জীবনোপ-
ব্ধির উপায় নয়। কিন্তু শ্রেষ্ঠ শিল্প
ীবনোপলব্ধির সহায়ক, তাহার কম নহে তাহার
ধিক আর কি হওয়া সম্ভব? কানাই সামন্তর
াছে শিল্প জীবনোপলব্ধির সহায়। এই-
ানেই তাঁহার প্রভেদ আধুনিক অন্যান্য কবিদের
হিত, এবং ঠিক এই কারণেই আমার আশঙ্কা
াটুরে পাঠকের পক্ষে তাঁহার কবিতা ভালো
াগিবার আশা নাই। কিন্তু চিন্তাশীল,
ুতদৃষ্টিসম্পন্ন পাঠকের এ কবিতা ভালো না
াগিয়া উপায় নাই।

গীতমঞ্জরী আঠারোটি গানের সমষ্টি। যে
ীরিকগণ গদ্যছন্দে 'উপলব্যথিতগতি' হইয়া
চত্রোৎপলায় ধীরে প্রবাহিত তাহাই 'ইন্ধনহীন'
শিখার' মতো গীতমঞ্জরীতে প্রবাহিত। গদ্য-
ছন্দে কবি যে দায়িত্বের ভারে কিঞ্চিৎ বিব্রত,
গীতমঞ্জরীতে তাহার কিছুই অবশিষ্ট নাই। গান
কয়টি তৃণোদ্যানের শিশিরচিক্কণ প্রজাপতির
পাখার মতো রৌদ্রে কাঁপিতেছে।

কানাই সামন্তর কবিতার গুণ ব্যাখ্যা
করিতে গেলে অনেকটা সময় লাগিবে, কারণ,
গুণ অল্প নয়। তাঁহার উপমা রচনার শক্তি
ছত্রে ছত্রে ছবি আঁকিবার ক্ষমতা (কানাই বাবু
চিত্রকরও বটে), ভাষার প্রৌঢ়তা, ছন্দের সূক্ষ্ম
কান, অনেক কথা বলা চলে। কিন্তু এ সমস্ত
থাকা সত্ত্বেও যদি কবি-প্রাণ না থাকে, তবে
সমস্তই বৃথা হইতে পারে। কানাই বাবুতে সেই
কবি-প্রাণের প্রাচুর্য বিদ্যমান।

কিন্তু আমার নিজের বিশ্বাস কবি কানাই
সামন্তর শ্রেষ্ঠ পরিচয় বহন করিতেছে তাঁহার
অমুদ্রিত পদ্যকবিতাগুলি। সেগুলিকে এখনো
কেন তিনি কৃপণের গুপ্তধনের মতো লুক্কায়িত
রাখিয়া পাঠককে বঞ্চিত করিতেছেন জানি না।
অচিরে সেগুলি প্রকাশের ব্যবস্থা করিলে
বাঙলাসাহিত্য সমৃদ্ধ হইবে। আমার নিজের
ধারণা, কানাই সামন্তর কবি-প্রতিভা অনন্য-
সাধারণ। ইহাকে অকারণ স্পর্ধা মনে করিবার
পূর্বে পাঠকের তাঁহার কবিতাগুলি শ্রদ্ধার
সহিত পড়িয়া দেখা উচিত। বলা বাহুল্য, বই
দুইখানির ছাপা বাঁধাই ইত্যাদি, যে সব কারণে
সাধারণত বই বিক্রয় হয়, মনোরম।

চিত্রোৎপলা, গীতমঞ্জরী, লেখক কানাই সামন্ত। প্রকাশক সাহিত্যিকা, ১২৩ আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য যথাক্রমে আড়াই টাকা ও এক টাকা।

কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষিপরিকল্পনা বনাম বাংলা সরকার

শ্রীমনকুমার সেন

কিছুকাল পূর্বে নয়াদিল্লীতে প্রাদেশিক খাদ্যসচিবদের এক সম্মেলনে ভারত গভর্নমেণ্টের খাদ্যসচিব ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি পরিকল্পনা ও উহার মূল নীতির বিশদ বিবরণ প্রদান করেন। 'অধিকতর খাদ্য ফলাও' আন্দোলনের সমালোচনা প্রসঙ্গে ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ কয়েকটি মূল্যবান উক্তি করেন। বস্তুত এতাবৎকাল সরকারের 'খাদ্য উৎপাদন আন্দোলন' আশানুরূপ সাফল্য-লাভ না করার মূলে যে সকল বাস্তব কারণ রহিয়াছে ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাহারই সুনিপুণ বিশ্লেষণ করেন।

'পঞ্চাশের মহামন্বন্তরে'র বিভীষিকা হইতে দেশবাসী মুক্ত হইতে পারে নাই। বিশেষ করিয়া, মধ্যবর্তী গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের সুযোগ্য পরিচালনায় ও নির্দেশে কংগ্রেস শাসিত সমস্ত প্রদেশগুলিতে কৃষি-উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রভৃত কার্যকরী হইয়াছে এবং 'খাদ্য উৎপাদন আন্দোলন'ও সার্থক হইতে চলিয়াছে। দুর্ভাগ্যবশত, বাঙলা 'যে তিমিরে সেই তিমিরেই' রহিয়া গিয়াছে। প্রগতিবিরোধী লীগদল সমগ্র ভারতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান-বিরোধী ও অনৈতিহাসিক পাকিস্থান আন্দোলন চালাইতেছে, বাঙলায় মিঃ সুরাবর্দী তাঁহার নেতৃত্বে স্মাসীন থাকিয়া লীগ হাই কমাণ্ডের নির্দেশক্রমে কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত অসহযোগিতা করিতেছেন। ফলে, তাঁহার গভর্নমেণ্ট একান্ত বশংবদের ন্যায় লীগ নীতি অনুসরণ করিলেও বাঙলার জনসাধারণকে জীবনধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দুর্মূল্যতা ও দুষ্প্রাপ্যতার অপরিসীম লাঞ্ছনা ও নিপীড়ন হইতে কিছুমাত্র রক্ষা করিতে পারিতেছে না।

ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের তৎপর ব্যবস্থার ফলে দুর্ভিক্ষের গভীর কৃষ্ণমেঘ ছায়াপাত করিতে পারে নাই; কেন্দ্রীয় সরকার বিদেশ হইতে সাধ্যমত খাদ্য আমদানী করিয়া দুর্ভিক্ষাবস্থার প্রতিরোধ করিয়াছেন। বিভিন্ন প্রদেশের বর্তমান খাদ্যমূল্য ও সংখ্যাসূচীর (Index) তুলনামূলক বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, বাঙলাদেশই সর্বপশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। আমরা দৈনন্দিন বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলের ধান চাউলের যে মূল্যবৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহা সবিশেষ উদ্বেগজনক। হৈমন্তিক ফসলের অত্যল্পকাল পরেই চাউলের মূল্য ২০৲ হইতে ৩৫৲ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়া এক অভাবনীয় ব্যাপার এবং ইহা এক গুরুতর পরিস্থিতির সূচনা করিতেছে। দুর্ভাগ্যবশত বাঙলার রাজনৈতিক সমস্যাগুলি এইরূপ ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে, আর্থিক সংকটের প্রতি গণ-প্রতিনিধিগণ উপযুক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার অবকাশ পাইতেছেন না। আর যাঁহারা শাসন-রশ্মি ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের দুর্নীতিসঞ্জাত আঠার কোটি টাকার ঘাট্‌তি বাজেট লইয়া ভিক্ষাভাণ্ড হস্তে কেন্দ্রীয় সরকারের কৃপাপ্রার্থী হইলেও খাদ্য ইত্যাদির ব্যাপারে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া 'স্বাধীন বাঙলা'র গোড়া পত্তন করিতেছেন। বাঙলার লীগ গভর্নমেণ্টের এই অদূরদর্শিতার ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুণ্ডামী প্রবিষ্ট হইয়াছে, আর বাঙলার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে ধ্বসিয়া পড়িতেছে।

১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে বিলাতে তৎকালীন ভারত সচিব মিঃ আমেরী ভারতের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে আমেরিকার ইউনাইটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট একটি উক্তি করিয়াছিলেন, এই প্রসঙ্গে আমাদের তাহা মনে পড়িতেছে। আমেরী বলিয়াছিলেন, "১৯৪২ সালের শেষ ভাগে বিভিন্ন প্রদেশে, বিশেষত যে সকল অঞ্চল ব্রহ্মদেশের চাউলের উপর নির্ভরশীল, সেই সকল অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ ঘটিবে বলিয়া আশঙ্কা করা হয়। কিন্তু **কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় প্রদেশগুলি বিপদকে দূরে রাখিতে পারিয়াছিল,** তাহা না হইলে ঐ সকল প্রদেশে বাঙলার দুর্ভিক্ষ অপেক্ষাও ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইতে পারিত। সেই সময় বাঙলা সরকার প্রধান মন্ত্রীর মারফত ঘোষণা করেন—**বাঙলা নিজেই নিজেকে রক্ষা করিতে পারিবে।**"

দেখা যাইতেছে, তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজীমুদ্দিন যে অপব্যবস্থা ও দুর্নীতিপূর্ণ কার্যকলাপের দ্বারা বাঙলার পঞ্চাশ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটাইয়াছিলেন, বর্তমানে মিঃ সুরাবর্দীও সেই একই পন্থা অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। ইহার অনিবার্য পরিণাম সম্বন্ধে আমাদের কিছুমাত্র সংশয় নাই।

এইক্ষণে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের স্থায়ী ব্যবস্থাগুলির কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

স্থায়ী ব্যবস্থা (Long-term plan) হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন এবং প্রাদেশিক গভর্নমেন্টগুলির সহযোগিতায় এই পরিকল্পনাকে সর্বতোভাবে কার্যকরী ও সার্থক করিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইতেছেন। স্থায়ীভাবে ভারতের খাদ্যাভাবের প্রতিবিধান করিতে হইলে এই ব্যবস্থাটির উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। ভিক্ষার দ্বারা বরাবর উদর পূর্তি করা চলে না; ভারতের ৪০ কোটি নরনারীর খাদ্য ভারতেই উৎপন্ন করিতে হইবে, এই সংকল্প নিয়াই কেন্দ্রীয় সরকার উক্ত পরিকল্পনাটি রচনা করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, বর্তমানে যেখানে একর প্রতি গড়ে দশ মণ খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়, সেখানে গড়ে এগার মণ খাদ্যশস্য উৎপন্নের ব্যবস্থা করিলে ঘাটতি নিবারিত হইতে পারে। এবং এই অধিকতর উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন,—উন্নত ধরণের চাষবাসের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি, উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থা ও উৎকৃষ্ট শস্যবীজ সরবরাহ। কেন্দ্রীয় সরকার সার ইত্যাদির রপ্তানি ইতিমধ্যেই নিষিদ্ধ করিয়াছেন। এবং প্রদেশে প্রদেশে বিভিন্ন ব্যবস্থাধীন সার প্রস্তুত ও সরবরাহের ব্যাপক ব্যবস্থা করিয়াছেন। কতিপয় পরিকল্পনানুসারে কার্য করিবার ফলে 'কম্পোস্ট' সারের উৎপাদন ১৯৪৩-৪৪ সালের ৬০০০ হাজার টন হইতে ১৯৪৫-৪৬ সালে ১,৩৬,০০০ টন পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়; বর্তমান বৎসরে এই সংখ্যা ১,১৫০,০০০ টন পর্যন্ত উন্নীত হইবে আশা করা যায়। কৃষি-উন্নয়নের বিশেষ সহায়ক 'সুপার ফস্‌ফেট' (Super phosphate)-এর উৎপাদন ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত মোটেই ছিল না; সেই স্থলে বর্তমানে ইহার বার্ষিক উৎপাদন ২৫,০০০ টন। অন্যতম মূল্যবান সার 'এম্যানিয়া-সালফেট' প্রস্তুতেরও ব্যাপক ব্যবস্থা হইয়াছে এবং অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে এই সার উদ্বৃত্ত অঞ্চল হইতে ঘাটতি অঞ্চলগুলিতে সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ত্রিবাঙ্কুরে কেন্দ্রীয় সরকার সার প্রস্তুতের যে কারখানা স্থাপন করিয়াছেন, এই বৎসরের মধ্যভাগেই তাহার কাজ আরম্ভ হইবে। ১৯৪৩-৪৪ সাল ও ১৯৪৪-১৯৪৫ সালে প্রায় ১১০,০০০ টন সার বিদেশ হইতে আমদানী করা হইয়াছিল; চলতি বৎসরে তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ১,৮০,০০০ টন হইবে আশা করা যাইতেছে। প্রস্তাবিত বিহারের কারখানাটি হইতেও ১৯৪৯ সাল হইতে বাৎসরিক ৩৫০,০০০ টন সার পাওয়া যাইবে। এতদ্ব্যতীত কৃষি-গবেষণা সংখ্যাবিজ্ঞানের প্রয়োগ-প্রণালী উন্নততর করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ভারতীয় কৃষি-গবেষণা পরিষদের (Indian Council of Agricultural Research) মারফত কার্য চালাইতেছেন। এই পরিষদের কৃষি-সংখ্যা-বিজ্ঞান শাখা উক্ত বিষয়ে উচ্চতর কার্যকরী শিক্ষা ও শিক্ষালাভান্তে শিক্ষার্থীদের বৃত্তি ও 'ডিপ্লোমা' দিবার ব্যবস্থা চালাইতেছেন। ইহা ছাড়া কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি কর্মচারিগণ এবং বিভিন্ন কৃষি-প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদেরও শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। তাঁহাদের সহিত অসহযোগনীতির ফলে বাঙলায় স-পারিষদ মিঃ সুরাবর্দী সাহেব যে এই সমস্ত সংবাদ রাখেন না বা কেন্দ্রীয় সরকারের জনকল্যাণমূলক পরিকল্পনার প্রতি কিছুমাত্র শ্রদ্ধা পোষণ করেন না, তাহা বাঙলার অপদার্থ কৃষি বিভাগটির কার্যকলাপ হইতেই প্রমাণিত হয়। মেদিনীপুরের যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটটি তথাকার ঘূর্ণিবাত্যার সময়ে নিরাশ্রয় ও দুর্গতদের প্রতি অমানুষিক হৃদয়-হীনতা ও বর্বরতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তিনিই গত কয়েক বৎসর যাবৎ বাঙলার কৃষি বিভাগের ডিরেক্টরের পদ অলংকৃত করিয়া আছেন। সুতরাং ইঁহার হাত দিয়া যে জনসাধারণের লক্ষ লক্ষ টাকা কৃষি উন্নয়নের নামে অপব্যয় হইতেছে, তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। এই প্রসংগে কিছুদিন পূর্বে 'ভারত' পত্রিকায় জনৈক ভদ্রলোক যে পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই পত্রে ভদ্রলোক জানাইয়াছেন যে, ময়মনসিংহের সরকারী কৃষি ফার্ম হইতে চীনাবাদামের যে বীজ তাঁহারা পাইলেন, শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, তাহা বাজারের নিকৃষ্টতম বীজ হইতেও অধম। অথচ ফার্মের কর্মকর্তারা উহাকেই সর্বোৎকৃষ্ট বীজ বলিয়া ধাপ্পা দিয়া আসিতেছেন। গত দুই বৎসর সরকারী ফার্ম হইতে যাঁহারাই কপি ইত্যাদি তরকারীর বীজ আনিয়াছেন, তাঁহারাই বলিয়াছেন, ফুলকপির বীজ হইতে বাঁধাকপির চারা বাহির হইয়াছে। যে চারাতে কার্তিক মাসে ফুলকপি হওয়ার কথা, তাহাতে ফুলকপি হইয়াছে মাঘ মাসে। আরও প্রকাশ, সরকারী দ্রব্যগুণে তরকারী গাছে মরশুমী ফুল ফুটিতেও দেখা গিয়াছে।

ময়মনসিংহের কলমাকান্দা অঞ্চলটি সরিষা উৎপাদনের জন্য খ্যাত। জনৈক সরকারী কর্মচারী ঐ অঞ্চলে প্রচার করিয়া আসেন যে, সরকারের কাছে এক বিশেষ শ্রেণীর উৎকৃষ্ট সরিষার বীজ রহিয়াছে, উহার দামও অপেক্ষাকৃত সস্তা। কৃষকেরা ঐ বীজের নিমিত্ত আবেদন জানাইলঃ কিছুকাল প্রতিশ্রুতির উপর প্রতিশ্রুতি দিয়া সেই সরকারী কর্মচারীটি জানাইলেন যে, নারায়ণগঞ্জ শহরের এক বিশেষ দোকানে ঐ বীজ পাওয়া যাইবে। বলা বাহুল্য, ময়মনসিংহ হইতে শতাধিক মাইল পথ অতিক্রম করিয়া ঐ 'বিশেষ দোকান' হইতে সরকারের 'বিশেষ ধরণের' উৎকৃষ্ট বীজ আনাইতে কৃষকদের উৎসাহ বা সামর্থ্য হইল না। আর আনা হইলেও ঐ বীজে সরিষা ফলিত কি গাঁদা ফুল ফুটিত, সে বিষয়েও সন্দেহ আছে।

এই একটিমাত্র দৃষ্টান্ত হইতে বাঙলার কৃষি বিভাগের কার্যকারিতা ও সততার নমুনা পাওয়া যায়।

সে যাহা হউক, প্রদেশে প্রদেশে স্বতন্ত্র ব্যবস্থায়ই হউক, আর সমগ্র দেশে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি পরিকল্পনাধীনই হউক, কৃষি উন্নয়নের ব্যাপক ব্যবস্থার আশু প্রয়োজন। নচেৎ অনুন্নত অর্থনৈতিক অবস্থার করতলগত জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশটি রাজনৈতিক অগ্রগতির পথে বিরাট অন্তরায়ের সৃষ্টি করিবে।

কৃষি উন্নয়নের যে কোন পরিকল্পনা সার্থকরূপে কার্যকরী করিতে হইলে কৃষিজীবীর স্বার্থ তাহাতে সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। সুখের বিষয়, উল্লিখিত পরিকল্পনায় এই বিষয়টির উপর উপযুক্ত গুরুত্ব স্থাপন করিয়া ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ পদোচিত যোগ্যতা ও বাস্তব দৃষ্টিশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। কৃষক প্রাণান্তকর শ্রম করিয়া খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিবে। তৎপরিবর্তে তাহার স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হওয়া অত্যাবশ্যক। ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদও এই প্রশ্নটির গুরুত্ব কিছুমাত্র লঘু করিয়া দেখেন নাই। কৃষিজাত মূল্য নিয়ন্ত্রণ পরিষদ ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী করিবার যে প্রতিষ্ঠানের বিষয় রাজেন্দ্রপ্রসাদ বিশ্লেষণ করিয়াছেন, কৃষিজীবীর স্বার্থ সংরক্ষণই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য। কেন্দ্রীয় সরকারের উপদেশক্রমে গঠিত কৃষ্ণমাচারী কমিটি এই সম্বন্ধে যে সকল প্রস্তাব ও সুপারিশ উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা বিশেষরূপে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

ভারতে, বিশেষ করিয়া বাঙলায় কৃষি সম্পর্কিত বাজার সমস্যাটি অতি প্রবল। কৃষকের উৎপাদিত খাদ্যশস্যের উন্নততর "বাজারীকরণ" বা বিক্রয় ব্যবস্থা না হইলে কৃষক ন্যায্য পণ্যমূল্য পাইবে না, অধিকতর খাদ্য উৎপাদনের ব্যাপারেও উৎসাহ বোধ করিবে না।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতবর্ষ প্রধানত কৃষি-কেন্দ্রিক দেশ হইলেও একর প্রতি চাষের ফলন অন্যান্য দেশের তুলনায় অতি অল্প। তাহার উপর কৃষিজাত পণ্যসামগ্রীর দোষত্রুটি-বহুল বিক্রয়-ব্যবস্থার ফলে চাষীর ভাগ্যে অত্যল্প মুনাফাও জুটে না। পল্লীঅঞ্চল হইতে দূরে থাকায় দেশবাসী অনেকেরই এই অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক সুস্পষ্ট ধারণা নাই। অথচ অন্য কোন উল্লেখযোগ্য আয়ের পন্থা না থাকাতে বহুস্থলেই কৃষিজাত পণ্যাদি বিক্রয় করিয়াই কৃষককে খাজনা ও অন্যান্য আবশ্যকীয় ব্যয়াদি মিটাইতে হয়।

কৃষিজাত দ্রব্যাদি যে ব্যবস্থার মধ্য দিয়া ভোগী খরিদ্দারের (consumer) হাতে পৌঁছায়, তাহা আদৌ সুসংবদ্ধ বা সুনিয়ন্ত্রিত নহে। বাজারের ক্রয়-বিক্রয় নীতিও অতিশয় জটিল। গ্রাম্য-বাজারে বেনিয়া বা বেপারীর স্থান সর্বাগ্রে। কৃষকদের অধিকাংশই সঙ্গতি-হীনতাবশত যানবাহন সমস্যায় পড়িয়াও অল্প-মূল্যেই শস্যাদি ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। সাধারণ কৃষক হইতে কাঁচা ও পাকা আড়তদার পর্যন্ত খাদ্যশস্যাদি কয়েকটি পর্যায় অতিক্রম করিয়া আসে এবং উৎপাদনকারী কৃষক পায় অতিনিম্ন মূল্য। আড়তদারেরা বৃহত্তর বাজারের সহিত যোগসূত্র রক্ষা করিয়া গ্রাম্য মোকামের শস্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করে। তাহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, কৃষিজীবীর মুনাফা কিছুমাত্র হয় না বলিলেই চলে। ফড়িয়া, বেপারী ও আড়ত-দারের ঋণদ ব্যবস্থার ফলে বীজ-বপনের সময়কালে কৃষকের হাতে বিক্রয়যোগ্য খাদ্যশস্যাদি যখন ন্যূনতম থাকে বা মোটেই থাকে না, তখন শস্যমূল্য সর্বাধিক বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে ফসলকালে, খাজনা পরিশোধের সময়ে অথবা অন্যান্য প্রয়োজনীয় মুহূর্তগুলিতে কৃষকের নগদ টাকার প্রয়োজন যখন সর্বাধিক তীব্র, তখন শস্যমূল্যে ন্যূনতম হয়। সুতরাং ক্রয় ব্যবস্থার যথাযোগ্য উন্নতিসাধন না হইলে কৃষকের দুরবস্থার অবসান হইবে না। সরকারের খাদ্য আন্দোলনও অঙ্কুরেই বিনাশ-প্রাপ্ত হইবে। বস্তুত এই বৃহৎ ত্রুটির দরুণই এই পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক গভর্নমেন্টের খাদ্য উৎপাদন আন্দোলন আশানুরূপ সাফল্য-লাভ করিতে পারে নাই। অবশ্য বিক্রয়-ব্যবস্থার ব্যাপারে কতকগুলি বাধাবিঘ্নও রহিয়াছে— যানবাহন সমস্যা তাহাদের অন্যতম। যানবাহনের অধিক প্রসার ও সমুন্নতি ঘটিলে অস্বচ্ছল অবস্থাসম্পন্ন ও স্বল্পোৎপাদনকারী কৃষক ফসলের বাজারের বর্তমান দালাল ও অন্যান্য মধ্যস্থজাতীয় কারবারীদের চতুর ক্রয় ব্যবস্থা হইতে কিছু পরিমাণ মুক্তিলাভ করিতে পারে। যানবাহনের পরেই বিক্রয় ব্যবস্থার ব্যাপারে কৃষকের অজ্ঞতা ও প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহের জন্য সমবায় ব্যাঙ্ক (Co-operative Bank)-এর সংখ্যাল্পতা দ্বিতীয় প্রধান সমস্যা। গ্রামে মূলত সুদখোর মহাজন ও সমবায় ব্যাঙ্ক, ইঁহারা কৃষককে টাকা ধার দিয়া থাকেন। ঋণ সালিশী বোর্ড স্থাপনের ফলে এবং অন্যান্য সাম্প্রদায়িক ও অসাম্প্রদায়িক কারণে (তাহাদের মধ্যে সর্বাধুনিক হিসাবে প্রস্তাবিত 'তে-ভাগা আইন'-এর কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে) মহাজনের নিকট হইতে ধার পাইবার সম্ভাবনা লুপ্ত হইয়াছে বা অচিরেই সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইবে। আর সেই সম্ভাবনা থাকিলেও তাহা পুরুষানুক্রমে বিপুল ঋণভার হইয়া কৃষককে নিপীড়িত করে। এই বিষয়ে 'দেশ'—৮ই মার্চের সংখ্যায় শ্রীযুত দীনবন্ধু দাস বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। সমবায় ব্যাঙ্কগুলির বাৎসরিক বিবরণী পাঠ করিলেই প্রতীয়মান হয় যে উহারা আশানুরূপ সফলতা লাভ করিতে পারে নাই। এই ব্যর্থতার প্রধান কারণ পল্লীবাসী কৃষকের নিরক্ষরতা। ব্যাঙ্কের কর্ম-প্রণালী ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাহাদের অনেকেই সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। কৃষিজীবীদিগকে সাহায্য করিবার জন্য ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটি পৃথক বিভাগ রহিয়াছে। কৃষিশিল্পের সমুদয় প্রয়োজনীয় তথ্যানুধাবন ও কৃষি-জীবীদিগকে সাহায্য করিবার জন্য একটি কর্মপন্থার অনুসরণ এই বিভাগের দায়িত্ব। কেন্দ্রীয় সরকারের এ বিভাগটির প্রতি অধিকতর মনোযোগী হওয়া আশু প্রয়োজন বলিয়া আমরা মনে করি।

ইহার পরেই দেশীয় গ্রাম্য ব্যাঙ্কগুলির প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যাইতে পারে। যদিও ইহারা শস্য বাজারে পোঁছাইয়া দিবার জন্য টাকা ঋণ দিয়া কৃষককে সাহায্য করিয়া থাকে, তথাপি কৃষকের সহিত সরাসরি বা সাক্ষাৎ সংযোগ না থাকাতে এই ব্যবস্থা তেমন প্রসার লাভ করে নাই। বলা বাহুল্য, এই সমস্ত ব্যাঙ্ক ব্যবসায় উদ্দেশ্যে প্রণোদিত—সরকারের কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনার সহিত ইহারা প্রত্যক্ষরূপে সংযুক্ত নহে।

কৃষিজীবীর স্বার্থ সংরক্ষণ করিয়া কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনা সার্থক করিতে হইলে সরকারকে অবিলম্বে এই সমস্যা দুইটি সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হইয়া প্রয়োজনানুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। কৃষক বিক্রীত পণ্যের মূল্য ও সর্বশেষ স্তরে ভোগী খরিদ্দারক্রীত পণ্য মূল্যের মধ্যে যে বিরাট অস্বাস্থ্যকর পার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা বিশেষভাবে সংকুচিত করিতে হইবে। কৃষক ও খরিদ্দারের মধ্যবর্তী দালাল ও মহাজনগণ বিপুল অর্থ পকেটস্থ করিয়া থাকেন। এই ব্যবস্থার আমূলে পরিবর্তন আবশ্যক বলিয়া আমরা মনে করি।

উপসংহারে বাঙলায় চাউলের অগ্নিমূল্য সম্বন্ধে আমরা একটি কথা বলিতে চাই। বাঙলার শস্যাগার বলিয়া খ্যাত বরিশাল জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে চাউলের যে অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে, তাহার কারণ কি? চোরা-বাজারীরা বে-আইনীভাবে বিপুল পরিমাণে চাউল রপ্তানী করিতেছে, বাঙলা সরকার সে সংবাদ রাখেন কি? সরকার পক্ষের কেহ কেহ এইরূপ ইঙ্গিত করেন যে, এই অধিক মূল্যের সুযোগে বিক্রয়কারী কৃষক লাভবান হইতেছে! অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একথা আদৌ সত্য নহে। সরকার নিয়ন্ত্রিত মূল্য ও চোরা কারবারী প্রদত্ত মূল্যের মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান তাহার সুযোগে লাভবান যাহারা হয় তাহারা ফড়িয়া ও বেপারীর দল; অসৎ সরকারী কর্মচারীদের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

স্বপ্ন

শ্রীনির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য এম এ

"I had a dream
which was not all a dream"
—Byron.

আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম
তিমিরময়ী রাত্রে—
আমার অর্ধদগ্ধ লুণ্ঠিত কুঁড়ের ভূমিশয্যায় শুয়েঃ
নূতন পৃথিবীর, আমাদের সুখী সন্তান-সন্ততির!
তার সবটুকুই স্বপ্ন কি?
এমন সুন্দর! তার সব কিছুই অলীক কি?

বন্ধু, আমার স্বপ্নের ফসল ফলবে কবে?
নূতন সূর্যোদয়ে অমারজনীর দ্বার ভাঙবে না কি?

আমার স্বপ্নের সবটুকুই স্বপ্ন নয়—
পৃথিবী নবতর রূপ নেবে,
মানুষ সুখী হবে, হিংসা ভুলবে
এতো বাজে বুজরুকী নয়, ভ্রান্তি নয়।

দেখছো কি চেয়ে মহাযোগী তপস্যায় রত,
আমার স্বপ্ন সফল হবে॥

বই না মাণিক !

সম্প্রতি আমেরিকার এক খবরে জানা গেল যে, সেখানে এক নীলামে একটি পুরানো বাইবেল বিক্রী হয়েছে বাইশ হাজার পাউণ্ড দামে—অর্থাৎ প্রায় সাড়ে তিন লাখ টাকায়। এই প্রাচীন বাইবেলটি ১৪৫৫ খৃস্টাব্দে জার্মানীতে ছাপা হয়—প্রথম টাইপ আবিষ্কার কর্তা গুটেনবার্গের তৈরী ছাপার অক্ষর থেকে। বাইবেলটি কিনেছেন মিঃ আর্নেস্ট ম্যাসন বলে এক ধনী ও সাহিত্যরসিক।

সাধু চোর !

সম্প্রতি লণ্ডনের এক খবরে জানা গেছে যে, ম্যাসাচুসেটসের অন্তর্গত স্প্রিংফিল্ড ব'লে জায়গাটির এক বাড়ীতে ঢুকে স্ট্যানলী বোকান নামে এক চোর ঐ বাড়ির মালিকের সিন্দুক ভাঙছিল। সিন্দুক ভাঙা যখন প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে, হঠাৎ তখন চোরটা যেন কেমন ঘাবড়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার খেয়াল হলো যে, চুরি বা অপরাধ ক'রে শেষ পর্যন্ত লাভবান হওয়া যায় না! যেমনি এই খেয়াল হওয়া, সঙ্গে সঙ্গে অমনি চোরটি ঐ বাড়ি থেকেই পুলিসকে টেলিফোন ক'রে জানালে যে, পুলিস যেন ঐ বাড়িতে এখনই হানা দিয়ে তাকে ধরে নিয়ে যায়।

অতি সাবধানী যাত্রী

ট্রেণে চেপে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে হ'লে যাঁরা বিশেষ সাবধানী তাঁরা বেশ কয়েক ঘণ্টা আগেই স্টেশনে গিয়ে হাজির হন, এটা হয়তো দেখে থাকবেন। কয়েক দিন আগে এই রকম দুটি বিশেষ সাবধানী মহিলা-যাত্রী আমেরিকার অন্তর্গত রেজিনা থেকে মাসকাটুন যাবেন ব'লে স্টেশনে এসে হাজির হন সন্ধ্যেবেলা; ঐ রাত্রেই গাড়ি ছাড়ার কথা — কাজেই বিছানা বিছিয়ে দুজনে গাড়িতে উঠে দিব্যি এক ঘুম দিলেন। দুঃখের বিষয়, অতিরিক্ত বরফ পড়ার ফলে ঐ গাড়িটি সে রাত্রে আর যাত্রা শুরু করলে না। এক ঘুমে রাত কাবার ক'রে দিয়ে ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে মহিলা-যাত্রী দুটি দেখেন, গাড়ি তখনও রেজিনা স্টেশনেই দাঁড়িয়ে আছে। বরফে গাড়ি ঢেকে রয়েছে। তাঁরা তাই গাড়ি থেকে নেমে প্রাতরাশ বা ব্রেকফাস্ট করতে গেলেন। ফিরে এসে দেখেন, গাড়ি ছেড়ে গিয়েছে। খবরটা মজার নয় কি?
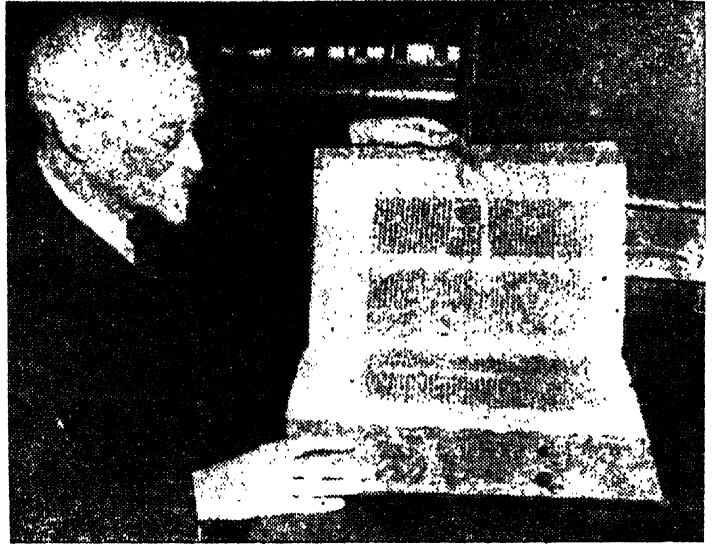
হাতীর হাঁচি সারলো কিসে ?

লণ্ডনের চিড়িয়াখানায় "রাণী" নামে একটি ভারতীয় হাতী আছে। জানা গেছে, কয়েকদিন আগে ইংলণ্ডে যখন ভীষণ তুষারপাত হচ্ছিল, তখন ঠাণ্ডা লেগে ঐ হাতী বেচারীর ভীষণ সর্দি হয় এবং সর্দির ফলে হাতীটি অনবরত হাঁচছিল এবং তার ফলে বেচারী হাতী রীতিমত কাবুও হ'য়ে পড়েছিল। অথচ কোনও ওষুধেই তেমন সুফল পাওয়া গেল না। শেষে ঐ হাতীর রক্ষক অর্থাৎ হাতীটির তদ্বির তদারকের ভার যার ওপরে ছিল, সে করলে কি এক পাট 'রম্' এনে গিলিয়ে দিলে হাতীটিকে। 'রম্' পান ক'রেই নাকি হাতীটির হাঁচি এবং সর্দির উপশম হয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে। সর্দি হ'লেই যাঁরা হাঁচতে শুরু করেন, তাঁরা এ দাওয়াইটা পরীক্ষা ক'রে দেখবেন নাকি!

সাড়ে তিন লাখ টাকা দামের বাইবেল

অক্ষর পরিচয়ের বিপদ !

সম্প্রতি ওয়াশিংটনের অলিম্পিয়া ব'লে জায়গাটি থেকে এই মর্মে এক খবর পাওয়া গেছে যে, সেখানকার এক নিরক্ষর কয়েদীকে কোনও এক স্টেট-সংশোধনাগারে রেখে লিখতে পড়তে শেখানো হয়েছিল এবং এইভাবে উৎসাহের সঙ্গে লেখাপড়া শেখার জন্য তার আটক থাকার মেয়াদও কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং তারই পুরস্কারস্বরূপে কিছু দিন আগে ঐ কয়েদীকে মুক্তি দেওয়াও হয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি আবার তাকে জেলে আসতে হয়েছে! এবার সে ধরা পড়েছে জাল সই করার অপরাধে। তাই সে আপশোষ ক'রে জেল কর্তৃপক্ষকে বলেছে তোমরা লিখতে পড়তে সই করতে শিখিয়েছিলে ব'লেই তো আজ আমায় আবার জেলে আসতে হ'লো। নিরক্ষর থাকাই ছিল ভালো।

অন্তরালে

জ্যোতিরিন্দ্র রায়

সমীর তরঙ্গদল
উন্মদ চঞ্চল
　　গন্ধহীন ধরণীর বুকে,
কুসুম আপনা ভুলি
সৌরভ দিল ঢালি
　　সমীরের জয় দিকে দিকে।

উদ্দাম উন্মত্ত নর
অশ্রুভেরে নাহি ডর
　　দম্ভ ভরে চলে উল্লাসে।
মঙ্গল মাধুরী ভার
নারী আনে পথে তার
　　তবু নর পূজ্য ইতিহাসে!

টীল থেকে কাপে চা ঢালতে ঢালতে বন্ধুর স্ত্রী বললেন, 'ভালো কথা, নার জন্য চমৎকার একটি খবর আছে। একটু হলেই ভুলে গিয়েছিলাম।'

বললাম, 'তাহলে খবরটা এবার বলুন, র কখন ভুলে যাবেন তার ঠিক কি।'

বান্ধবী মুখ টিপে মধুর ভঙ্গিতে হাসলেন, রটি না শুনেই গরজে ফেটে পড়ছেন; লে না জানি কি-ই করবেন।'

বললাম, 'তেমন অদ্ভুত কি আর করতে ব। এখন ফেটে চৌচির হচ্ছি, তখন বড় র চূর্ণবিচূর্ণ হব।'

বান্ধবী গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আপনি রে ভয় দেখাচ্ছেন তাতে খবর তো তেই আপনাকে আর বলতে পারি না। য় অত কাচের টুকরো কুড়োবে কে, নার বন্ধুই বা কি ভাববেন এসে।'

হাল ছেড়ে দিয়ে বললাম, 'তাহলে থাক, বন না।'

বান্ধবী বললেন, 'রাগ করবেন না, শুনুন। টা হচ্ছে একটি মেয়ে আপনাকে দেখতে ।'

'বলেন কি।'

বান্ধবী বললেন, 'হ্যাঁ, অনেকদিন ধ'রেই ছ, আমার মনে ছিল না। আপনার বই ভারি ভালো লেগেছে তার। আপনার সে ণ ভক্ত।'

বললাম, 'দেখুন, অমন ক'রে বলবেন না, লে চূর্ণবিচূর্ণ হওয়া ছাড়া সত্যিই আমার কোন উপায়ান্তর থাকবে না।'

'না না ঠাট্টা নয়, এই কালও কত কাকুতি তি করেছে। চলুন না ওঘরে ওই জানলার গিয়ে দাঁড়াইলেই হবে।'

বললাম, 'জানলার কাছে কেন।'

বান্ধবী বললেন, 'ও জানলা থেকে ওদের বাড়ির সব দেখা যায়। আর জানলার কাছাকাছিই ও থাকে। দাঁড়ালেই দেখতে পারবে।'

বললাম, 'আপনি কি ক্ষেপে গেলেন?'

বান্ধবী হাসলেন, 'কেন, ক্ষেপব কেন? প্রস্তাবটি আপনার কাছে কি খুবই অসম্ভব লাগছে। জানলায় কি বারান্দায় দাঁড়িয়ে নামজাদা রাজনৈতিক নেতারা জনতাকে দর্শন দিতে পারেন আর ছোটখাট রাজনৈতিক লেখক না হয় একজনকেই দর্শন দিলেন। তাতে কি দোষ। আসলে জন আর জনতা দুই-ই তো Singular Number.'

বললাম, 'ব্যাকরণে আপনার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। কিন্তু রক্ষা করুন, ওসব থাক। অনুমতি দিন তো এবার বরং আমি উঠি।'

'না না না, উঠবেন কেন। বসুন, ওকে খবর দি। বেশ তো, জানলা টানলা পছন্দ না করেন সদর দোর দিয়েই ওকে নিয়ে আসব। তাতে আর কি হয়েছে। আপনি ততক্ষণে আর এক কাপ চা খান। আমার মোটেই দেরি হবে না।'

বলে বান্ধবী সামনের ঘরে চলে গেলেন; খবরটা বোধ হয় জানলা পথেই পাঠাবেন।

গায়ে গায়ে মেশা ফ্লাট বাড়ি পায়রার খোপের মত চারদিকে অজস্র ঘর। স্থানের এতটুকু অপচয় হয়নি কোথাও। মিতব্যয়ের অন্ত নেই। শহর হাজার হাজার মানুষকে একেবারে কাছাকাছি মুখোমুখি এনে দিয়েছে। মিলে মিশে গুঁজে ঠেসে গা ঘেঁষে বাস করো। ফাঁক রেখোনা, ব্যবধান রেখোনা মানুষে মানুষে। একের নিঃশ্বাস আর একজনের কানে এসে লাগুক, একজনের চোখের সামনে আর একজনের মুখ ভেসে থাকুক সব সময়। যাতে কেউ কাউকে ভুলে না যাও, ভুলতে না পারো। আশ্চর্য, তবু ভুলি। তবু অন্তরঙ্গতা বাড়ে না। গায়ে গায়ে ধাক্কা লাগে, গায়ে গায়ে ছোঁয়া লাগে না। স্পর্শ বাঁচিয়ে চলি, চোখ এড়িয়ে চলি। ভ্রূ কুঁচকে নাক সিঁটকে দুহাতে ঠেলি প্রতিবেশীর ভিড়। শহরের জনতায় প্রিয়জনকে হারাই, হৃদয়মনকে খুঁজে পাই না।

বান্ধবী ফিরে এলেন, 'খবর পাঠিয়েছি। এক্ষুণি আসছে। শুনে কি খুশী। সত্যি, এমন ভক্ত বোধ হয় আপনার আর নেই।'

বান্ধবী আবার একটু মুখ মুচকে হাসলেন।

সন্ধ্যার আগে অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে আরো দু'এক জায়গায় দেখা-সাক্ষাতের প্রয়োজন আছে। তার জন্য এখনই ওঠা দরকার। অমনিতেই একটু দেরি হয়ে গেছে। আরো বিলম্ব হলে যাত্রা নিষ্ফলা হবার আশঙ্কা। তবু উঠি উঠি ক'রেও চেয়ার ছেড়ে ঠিক উঠে আসতে পারলাম না। বলতে আপত্তি নেই অনুকূল পাঠকপাঠিকাদের প্রতি আমার অনুরক্তি বড় প্রবল। কারো মুখ থেকে যদি শুনি 'আপনার লেখাটি বেশ লাগল' সে মুখকে তৎক্ষণাৎ পৃথিবীর সুন্দরতম মুখ বলে আমার মনে হয়। আর ভাবি, তাইতো আমার রচনা তো এঁরই জন্য অপেক্ষা করছিল। লিপির সাংকেতিকতা তাহলে এঁরই কাছে উন্মোচিত হয়েছে। আঙুলের ছোঁয়া লেগে পাপড়ি মেলেছে অক্ষরের কোরক।

কিন্তু পাঁচ মিনিট গেল, দশ মিনিট গেল পাঠিকার আসবার কোন লক্ষণ নেই। কিঞ্চিৎ অসহিষ্ণু হয়ে উঠলাম। কাজ আছে বাইরে।

বললাম, 'দেখুন, সহৃদয় পাঠকপাঠিকার জন্য সুলেখককে নিরবধিকাল ধ'রে অপেক্ষা করতে হয়, ধৈর্য হারালে চলে না। কিন্তু আজ আমার একটু তাড়া আছে।'

বান্ধবী বললেন, 'আর আপনাকে খেদ করতে হবে না। এসে গেছে।' তিনি দোরের দিকে তাকালেন, 'এই যে, শিগ্‌গির এস। এত দেরি করতে হয়। উনি তো চলেই যাচ্ছিলেন। বসো।' সঙ্গে সঙ্গে বান্ধবী পরস্পরের কাছে নামও ঘোষণা করলেন, 'লেখা মৈত্র, নিরুপম মজুমদার। এঁরই কথা বলছিলাম।'

বলে পর্যায়ক্রমে তিনি আমাদের দুজনের দিকেই তাকালেন। দেখলাম আমার বান্ধবী শুধু অতিভাষিণীই নন, মিতভাষিণীও হতে পারেন।

ছোট্ট নমস্কার সেরে মেয়েটি ততক্ষণে সামনের চেয়ারে আসন নিয়েছে। পনের ষোল বছরের তন্বী কিশোরী। পিঠের ওপর সুদীর্ঘ বেণী। রচনায় নৈপুণ্য আছে। মনে হোল বৈকালিক প্রসাধনেই এতক্ষণ যা ওর দেরি

'লে মন্থরতার চাইতে সর্বাঙ্গে
ই বেশি পরিস্ফুট। ওভ্যাল
মুখশ্রীতে একটি সহজ কমনীয়
কিন্তু সবচেয়ে বিস্মিত হলাম
ওর চোখের দিকে তাকিয়ে। কালো বড় বড় দুটি চোখ থেকে কৌতূহল যেন উপচে পড়েছে।

তবু মনে মনে খানিকটা হতাশ হলাম। আমার রচনার সমঝদার সাধারণত শ্মশ্রুবান প্রৌঢ়েরা। এখনকার দিনে তাঁদের মুখে শ্মশ্রু ঠিক থাকে না কিন্তু নিখুঁত ক্ষৌর কার্যের পরও শ্মশ্রুর ঘন আভাস অক্ষুণ্ণ থাকে। আর সেই আভাসের মধ্যে মিশে থাকে বুদ্ধি আর অভিজ্ঞতার ছাপ। রেখা সঙ্কুল মুখে আমি বিজ্ঞতার দেখা পাই। পাঠিকাদের মুখে অবশ্য অনুরূপ শ্মশ্রুর আভাস আশা করতে পারি না কিন্তু কিঞ্চিৎ পরিণত বয়সের ছাপ দেখলে ভরসা পাই। তা সত্ত্বেও একেবারে পুরোপুরি নৈরাশ্যই যে এল তা নয়, বরং কৌতূহল ঘেঁষা আশা অনেকখানিই অবশিষ্ট রইল। শোনাই যাক না আমার রচনা সম্বন্ধে এই কিশোরীটির মতামত। একটু শুনলেই তো বুঝতে পারব আমার বক্তব্য এর কাছে টেলিগ্রাফের সাংকেতিক টরেটক্কাই রয়ে গেছে না সেই দুরূহ দুর্বোধ শব্দ জালের ভিতর থেকে সত্যিই ধরা পড়েছে কোন শুভবার্তা।

কিন্তু লেখা আমার দিকে তাকিয়ে আছে তো আছেই, কিছু যে বলবে এমন কোন লক্ষণ দেখছি না।

অগত্যা আমিই শুরু করলাম, 'মীনা দেবী বলছিলেন আপনার নাকি প্রচুর পড়াশুনোর অভ্যাস আছে। আর আমার লেখা বইপত্রও নাকি কিছু কিছু পড়েছেন আপনি।'

প্রাইভেট টুইশান ক'রে ক'রে বয়ঃস্থা ছাত্রীদেরও 'তুমি' বলা অভ্যাস হয়ে গেছে। এর চেয়ে বেশি সম্মান দেখালে শাসন চলে না। এক্ষেত্রেও মুখ থেকে তুমিই বেরিয়ে আসছিল তাড়াতাড়ি শব্দটি পালটে নিলাম। কেননা, বাঙলাদেশে একটি মেয়ের পনের ষোল বছর নিতান্ত কম বয়স নয়। ধাঁ ক'রে অপরাধ নিয়ে বসতে পারে। তাছাড়া অপরিচিত একটি কিশোরীকে প্রথম সম্বোধনেই তুমি বলবার মত বয়সের দাবী এখনো ঠিক করতে পারি না। কিন্তু কেবল সম্বোধনই নয়, কথার ভঙ্গিতে কিঞ্চিৎ বেশি মাত্রায় শিষ্টাচার মাখাবার আরো একটু কারণ ছিল। শত হ'লেও মেয়েটি আমার পাঠিকা, সমালোচিকা। সৌজন্যে শিষ্টাচারে যতখানি খুশী করে রাখা যায় ততই ভালো।

কিন্তু আমার কথা শুনে লেখা যেন চঞ্চল হয়ে উঠল, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে বলল, 'মীনা দি বলেছে একথা?'

বললাম, 'হ্যাঁ, তার কাছেই তো শুনলাম।'

'মিথ্যুক, মহা মিথ্যুক।'

আমি বিস্মিত হয়ে বান্ধবীর দিকে তাকাতে গেলাম। কিন্তু দেখলাম তিনি এখানে নেই। কখন এক ফাঁকে উঠে পাশের দোর দিয়ে অন্য ঘরে চলে গেছেন।

একটু বিব্রত এবং অপ্রতিভ হয়ে বললাম, 'দেখুন, ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না, মীনা দেবীর কথাগুলির মধ্যে কোনটা মিথ্যা। যাই হোক, আমার বই আপনার ভালো লাগে একথা যদি সত্য হয় তাহ'লে তাঁর অন্য কোন অসত্যে আপাতত আমাদের কিছু এসে যায় না, কি বলেন? আশা করি তাঁর ও-কথাটা অন্তত মিথ্যা নয়।'

লেখার সুন্দর গৌরবর্ণ মুখ যেন আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। যেন এক অপরিসীম আনন্দ অনুভব করছে ও দেহে মনে। দোলনায়

কথাটা হচ্ছে একটি মেয়ে আপনাকে দেখতে চায়

দুলছে ঘুরছে 'এমনি একটা স্ফূর্তির' ভাব ওর মুখে। লেখা বলল, 'আমি ঠিকই আন্দাজ করেছিলাম।'

কথাটা আমার প্রশ্নের জবাব নয়। তাই একটু বিস্মিত হয়ে বললাম, 'কিসের আন্দাজ।'

'একজন লেখক ঠিক এই রকম করেই কথা বলবেন আমি ভেবেছিলাম। আমার ধারণার সঙ্গে অবিকল মিলে গেছে। নাটক নভেল না পড়লে হবে কি আমি ঠিক বুঝতে পারি তার ভিতরেও এই ধরণেই কথাবার্তা চলে।'

এতক্ষণে বুঝলাম ও যে দোলনায় দুলছিল সে দোলনা আমার কথার। কিন্তু একটা কথা খট ক'রে আমার কানে লাগল। একটু ক্ষুব্ধ একটু বিস্মিত হয়ে বললাম, 'নাটক নভেল পড়েন না মানে! তাহ'লে আমার বইও—'

লেখা বলল, 'না আপনার বইয়ের একখানাও আমি পড়তে পারিনি। অথচ এমন চমৎকার দেখতে, দেখলেই পড়বার লোভ হয়। হাতে করলেই বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করতে থাকে।'

নিঃশ্বাস ছেড়ে বললাম, 'তাহ'লে পড়েননি কেন।'

লেখা বলল, 'ভালো মানুষ যাহোক। বাড়িতে পড়তে দিলে তো। দাদা, বউদি মা চব্বিশ ঘণ্টা কেউ না কেউ গার্ড দিচ্ছেন। একদিন আপনার 'নীলপর্দা' বইখানার একটা পাতা কেবল খুলেছি মা তো যা তা নয় বলে বকলেনই, দাদা গিয়ে নালিশ ক'রে এলেন স্কুলে। এমন সৃষ্টি ছাড়া স্কুলও আপনি দুটি পাবেন না। এত শাসন এত কড়াকড়ি আজকাল কোনখানে নেই। ফার্স্ট ক্লাসের মেয়েদের তবু বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের দু'একখানা বই বেছে বেছে দেওয়া হয়, কিন্তু সেকেণ্ড ক্লাসে একখানাও নয়।'

বললাম, 'আপনি বুঝি সেকেণ্ড ক্লাসে।'

লেখা একটু যেন লজ্জিত হ'ল. বলল, 'থাকতাম না। কিন্তু সেই বোমার হিড়িকে দুটি বচ্ছর নষ্ট হয়ে গেল। না হলে এবার ফার্স্ট ইয়ার চলত। যত খুশি গল্প উপন্যাস পড়তে পারতাম। একবার কলেজে ঢুকলে কি আর বাধা মানতাম কারো।'

বললাম, 'তখন আপনাকে হয়তো আর কেউ বাধা দিতেও সাহস পেত না।' লেখা খুশী হয়ে বলল, 'ঠিক বলেছেন। এক একবার কি মনে হয় জানেন স্কুলে গিয়েই ভুল করেছি।'

'কেন।'

'এই বউদির কথাই ধরুন না। বয়সে আমার চেয়ে বড়জোর বছর তিনেকের বড় হ'বে। অথচ নাটক নভেল পড়ছে বোধ হয় সাত আট বছর ধরে। কোনদিন স্কুলের ছাত্রী ছিল না কি না। তাই চিরকালই কলেজের ছাত্রীর সুবিধা পেয়ে আসছে। আর বিয়ে হয়ে গেলে তো এসব বিধিনিষেধের বালাইই নেই কিনা।'

বললাম, 'তা ঠিক। তবে ওসব বিধি-নিষেধের বালাই একদিন সবার বেলাই ওঠে এই যা ভরসা।'

লেখার সুগৌর মুখে যেন সিঁদুরের ছোপ লাগল, মৃদুস্বরে বলল, 'যান।' পরমুহূর্তেই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সপ্রতিভভাবে বলল, 'আচ্ছা, বিয়ের পরেও লোকে নভেল পড়ে কেন বলতে পারেন? তখন আর ওর মধ্যে নতুন কি থাকে?'

হেসে বললাম, 'আপনার তো বিয়েও হয়নি, নভেলও পড়েননি। কি ক'রে জানলেন নভেলে বিয়ের পরেও নতুন কিছু থাকে কি থাকে না।'

লজ্জিত হয়ে লেখা এবার একটু কাল চুপ ক'রে রইল তারপর বলল, 'কি' যে বলেন। না পড়লেও কিছু কিছু বুঝি, আর আন্দাজ করা যায় না! দেখছি তো দাদা বউদিকে। আর উপন্যাস না পড়লেও একজন ঔপন্যাসিককে তো চাক্ষুষ দেখলাম। আর্টিস্ট দেখেছি অভিনেতা দেখেছি অবশ্য এত কাছে বসে নয়।

ক বাকি ছিল। এবার দেখলাম, শুধু দেখা রীতিমত কথা বললাম তার সঙ্গে, আলাপ াম। কি যে ভালো লাগছে, কি আর বলব নাকে। দুঃখ এই কেউ সাক্ষী রইল না। দর মেয়েরা ভাববে সব আমার বানানো । মীনাদি তো আর স্কুলে গিয়ে বলে বে না।'

'ও মীনাদি, এতক্ষণ ধ'রে করছেন কি রে। আসুন না।'

মীনা দেবী সাড়া দিয়ে বললেন, 'যাচ্ছি খা। মেয়ে বড় বিরক্ত করছে। খাইয়ে আসছি ক।'

লেখা আবার বলল, 'দেখুন একটা কথা বে আমার ভারি মজা লাগছে।'

'কি রকম।'

'যাঁর গল্প-উপন্যাস আমার ছোঁয়াও দোষ, ার সঙ্গে কতক্ষণ ধরে গল্প করছি। মা আর দা-বউদির ওপর খুব শোধ নেওয়া হোল, কি লেন। জানালে বকুনি খেতে হবে, কিন্তু না নালেও যেন মজা হয় না।'

এর কি জবাব দেব ভেবে পেলাম না, একটু প করে থেকে বললাম, 'এবার আমাকে উঠতে বে। খুব খুশী হলাম আপনার সঙ্গে আলাপ রে।'

লেখা বলল, 'আমি যা খুশী হয়েছি তত-খানি নিশ্চয়ই নয়। দেখুন, কিছু যদি মনে া করেন, আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করব আপনাকে।'

'বলুন।'

'মীনাদি বলছিল লোকে যেমন গল্প-উপন্যাস পড়ে আপনারা নাকি তেমনি করে আমাদেরও মানে আপনাদের ভবিষ্যৎ পাঠক-পাঠিকাদেরও পাঠ করেন। তারপর ফের সেই কথাই নাকি বইতে লিখে তাদের পড়তে দেন। সত্যি নাকি?'

বললাম, 'আপনি তো জানেনই, আপনার মীনাদি অনেক মিথ্যা কথা বলেন। সব কথাই কি আর বইতে ওঠে? সবাইকে নিয়েই কি আর গল্প হয়?

কথাটা শুনে লেখা যেন খুশী হল না, বলল, 'কেন হবে না? আমার তো মনে হয়, হয়। লিখতে জানলেই হয়। এই যে আমরা কথা বলছি, এ নিয়েও তো ইচ্ছা করলে আপনি লিখতে পারেন।'

হেসে বললাম 'আপনার বুঝি তাই ইচ্ছা?'

লেখা আরক্ত মুখে বলল, 'আহা-হা, আমি যেন তাই বলছি?'

বললাম, 'বললেও পারতাম না। অত ভাল তো লিখতে জানি না।'

লেখা মুখ ভার করে বলে, 'থাক থাক, আর মিথ্যা বিনয় করবেন না আমার কাছে। আমি যেন মাথার দিব্যি দিচ্ছি আপনাকে, লিখবেন না তাই বলুন। এত জনের এত কথা লিখতে পারেন, আর আমার বেলাতেই সাধু সাজা হচ্ছে —লিখতে জানি না।'

অসহায়ভাবে বললাম, 'আচ্ছা চেষ্টা করে দেখব।'

লেখা উৎসাহ দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'চেষ্টা করলেই আপনি পারবেন। আমি জানি, আপনি সত্যিই খুব ভালো লেখক।'

'কি করে জানলেন। আপনি তো আর আমার লেখা পড়েন নি।'

লেখা পরম আত্মপ্রত্যয়ে মুখ মুচকে হাসল, 'নাই-বা পড়লাম। এতক্ষণ আলাপের পরও জানবার বুঝবার যেন আর কিছু বাকি থাকে। আপনি বুঝি ভাবেন, লেখকরাই শুধু তাঁর পাঠক-পাঠিকাদের পাঠ করেন, তার উল্টোটা আর হয় না।'

বললাম, 'আজ বোধ হয় হোল। আচ্ছা, গল্প-উপন্যাসের নায়িকা হওয়ার আপনার বুঝি খুব সখ?'

লেখা একবার দোরের দিকে তাকিয়ে দেখল কেউ আসছে কিনা, তারপর মৃদু লজ্জিতহাস্যে বলল, 'সে সখ কার না থাকে বলুন। কিন্তু ছোট ছোট গল্প নয়, বেশ বড়, রীতিমত সাংঘাতিক একখানা উপন্যাস লিখবেন বুঝলেন? লিখে রেখে যাবেন মীনাদির কাছে। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে এসে পড়ব। সত্যি এত মজা লাগছে ভেবে। যেন সে উপন্যাস আমি এখনই পড়ছি।'

লেখার আনন্দোজ্জ্বল মুখে আমি এবার সত্যিই পাঠিকাকে দেখতে পেলাম।

লেখা সানন্দে পরম পরিতৃপ্তিতে আবার আমার মুখের দিকে তাকাল, 'চলি এবার। বাড়িতে হয়তো এতক্ষণ খোঁজাখুঁজি পড়ে গেছে। একটুকাল যদি বাইরে থাকার জো থাকে। নমস্কার। মনে থাকবে তো আমার কথা? ভুলবেন না তো? আমি মীনাদির কাছে রোজ এসে খোঁজ নেব।'

দ্রুত চঞ্চল পায়ে লেখা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মেয়ে কোলে বান্ধবী এসে ঘরে ঢুকলেন, 'কিছু মনে করবেন না। এতক্ষণ একা একা ও-ঘরে হাসতে হাসতে মরে যাচ্ছিলাম। জানলার ধারে দাঁড়ালে সবই দেখা-শোনা যায় কিনা।'

কিন্তু ছোটখাট গল্প নয়, বেশ বড় রীতিমত সাংঘাতিক একটা উপন্যাস লিখবেন বুঝলেন?

বললাম, 'এখানে বসে বসে দেখলেই পারতেন।'

বান্ধবী বললেন, 'তাহলে মরেই যেতাম। ওই তো একফোঁটা মেয়ে। কিন্তু ভাব-ভঙ্গিটা দেখলেন তো? এমন ইঁচড়েপক্ক আমি আর জীবনে দেখিনি। এবার বুঝুন মজা। লিখুন উপন্যাস। নায়িকা যখন পেলেন, তখন আর উপন্যাস লিখতে কি।'

বললাম, 'তা সত্যি। কিন্তু জীবন নিয়ে উপন্যাস ও নিজেই বানাতে শুরু করেছে মীনাদেবী। আমি একটি ছোট গল্পের চেষ্টা করে দেখব মাত্র।'

বান্ধবী বললেন, 'পড়তে দেবেন কিন্তু।'

বললাম, 'দেব, তবে পাঠ্য হবে কিনা জানিনা।'

যখন মিস্টার সুরাবর্দী বলেন, **গান্ধীজী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র** দাশগুপ্তকে যে তার **করিয়াছিলেন**, তাহা সংবাদপত্রে প্রকাশ **ফলেই কলিকাতায়** অশান্তি আবার প্রবল হয়, তখন**ই আমরা** সন্দেহ করিয়াছিলাম, তিনি সংবাদপ**ত্রের কণ্ঠরোধের** নূতন ছল **সন্ধান** করিতেছিলেন। **মুসলীম** লীগের "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে" **কলিকাতায়** যে অশান্তির উদ্ভব হয়, তাহাতে **মুসলমানদিগের অপরাধ কিরূপ তাহা ২৪ পরগণার** তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট হাঙ্গামা তদন্ত **কমিশনের** সাক্ষ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। কলিকাতার ঘটনার গুরুত্ব সম্বন্ধে বাঙলা সরকারের প্রাক্তন **চীফ** সেক্রেটারী ও পরে মধ্যপ্রদেশের গভর্নর **স্যার** হেনরী টোয়াইনাম বলিয়াছেন—যদিও **সরকারী** বিবরণে হতাহতের সংখ্যা ৪ হাজার **মাত্র** বলা হইয়াছে, তথাপি বলা যায়—ঐ সংখ্যা ৪০ হাজার হইবে। তিনি বলেন, তিনি জানেন, **কলিকাতার** রাজপথে ৪ **হাজার** শব **গণিত হইয়াছিল**; তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক শব গঙ্গায় **নিক্ষিপ্ত হয়**।

কলিকাতার হাঙ্গামায় মুসলীম লীগ পক্ষ **সমর্থনের ছলে** মিস্টার লিয়াকৎ আলী খাঁ যে **ইঙ্গিত** করিয়াছিলেন, তাহার পরেই নোয়া**খালীতে** সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে আক্রমণ। তিনি **বলিয়াছিলেন**, আঘাত করা যদি মুসলমান**দিগের** অভিপ্রেত হইত, তবে তাহারা অবশ্যই যে **স্থানে** তাহারা সংখ্যায় অধিক ও অধিক প্রস্তুত **তথায়** আক্রমণ করিত। নোয়াখালীতে তাহারা **সংখ্যায়** অত্যন্ত অধিক এবং তাহারা কিরূপ **প্রস্তুত হইয়াছিল**, তাহা আচার্য কৃপালনী **বলিয়াছেন**। তথায় আক্রমণ যে পরিকল্পনানু**যায়ী** এবং ঘটনা সম্বন্ধে স্যার ফ্রেডারিক **বারোজের** বিবরণ যে নির্ভরযোগ্য নহে, তাহা **বিশেষভাবেই** প্রতিপন্ন হইয়াছে। বিশেষ **কুমারী** মুরিয়েল লেস্টার যে জিজ্ঞাসা করিয়া**ছেন**—কে বা কাহারা তথায় গৃহদাহের জন্য **দুষ্প্রাপ্য** পেট্রল যোগাইয়াছিল এবং কিরূপে **তথায় পেট্রল** প্রয়োগের জন্য স্টীরাপ পাম্প **বিতরিত হইয়াছিল**?—তাহার উত্তর প্রত্যুৎপন্ন**মতি** মিস্টার সুরাবর্দীও দিতে পারেন নাই।

নোয়াখালীর ঘটনার বিবরণ কলিকাতায় **প্রাপ্তির** সঙ্গে সঙ্গেই সংবাদ প্রকাশের পথ **সঙ্কুচিত** করিবার জন্য প্রধান-সচিব ব্যবস্থা **করিতে** আরম্ভ করেন। তিনি যে ত্রিপুরায় **আক্রমণ** আরম্ভ হইবার কয়দিন পূর্বেও **কলিকাতায়** সাংবাদিকদিগকে বলিয়াছিলেন, **তাঁহার সরকারের** সুব্যবস্থায় আক্রমণ নোয়াখালী **সীমা** অতিক্রম করিয়া ত্রিপুরা জিলায় প্রবেশ **করিতে** পারিবে না, তাহা লোককে ভুলাইবার **জন্য** কি না, তাহাই বা কে বলিতে পারে?
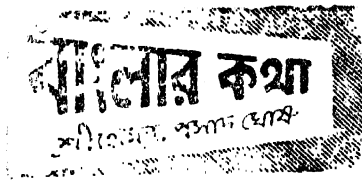
সংবাদপত্রে যথাযথ সংবাদ প্রকাশ কাহারা ভয় করে, তাহা সকলেই জানেন।

মিস্টার সুরাবর্দীর লজ্জা ভয়ও নাই। তিনি পুলিসের আদালতে উপস্থাপিত অভিযোগ প্রকাশেও বাধা দিতে বদ্ধপরিকর। গত ১৮ই এপ্রিল—স্বরাষ্ট্র বিভাগ এক পত্র লিখিয়া সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগকে তাঁহাদিগের বিপদের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিয়াছেনঃ—

"কোন কোন সংবাদপত্রে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা সম্পর্কিত ব্যাপারের ও পুলিসের অত্যাচারের অভিযোগের বিস্তৃত বিবরণযুক্ত আবেদনের বিষয় প্রকাশিত হইতেছে। সম্পাদকগণের বোধ হয় বিশ্বাস, আদালতের কার্যবিবরণ প্রকাশ করিলে সংবাদপত্র সম্বন্ধীয় আইনে বা সরকারের আদেশে অপরাধী হইতে হয় না। কিন্তু সে বিশ্বাস ভ্রান্ত। আদালতের কার্যবিবরণ প্রকাশ করিবার সম্পূর্ণ অধিকার কাহারও নাই। সে সকল প্রকাশও আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আশা করা যায়, এইসব সংবাদ প্রকাশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কিরূপ বিরোধী সম্পাদকগণ তাহা বুঝেন। অপরাধের বিস্তৃত বিবরণ, আক্রমণকারীদিগের ও আক্রান্তদিগের নাম, নিষিদ্ধ অঞ্চলের নাম প্রকাশ এ সকলের দ্বারা সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি প্রবল হয়। ঐ সকল প্রকাশ বাঙলা সরকারের গত ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর তারিখের ৫৩৮ নম্বর আদেশানুসারে মামলার কারণ হয়।"

এই পত্রেই বুঝা যায়, যে সকল বিষয় প্রকাশ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, সে সকল সংবাদপত্র সম্বন্ধীয় আইনে অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না—বাঙলা সরকার নোয়াখালী ত্রিপুরার ঘটনাসমূহের পরে যে আদেশ জারি করিয়াছেন, তাহার দ্বারাই সে সকল প্রকাশ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

সম্প্রতি বাঙলা সরকারের এক প্রেস নোটে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আরও সঙ্কুচিত করা হইল—

"পুলিসের সম্বন্ধে সংবাদপত্রে যে তীব্র আক্রমণ হইতেছে, বাঙলা সরকার উৎকণ্ঠা-সহকারে তাহা দেখিয়াছেন। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, এইরূপ আক্রমণে পুলিসে চাকরীয়া প্রাপ্তির, পুলিসের শিক্ষার, শৃঙ্খলার ও ব্যবস্থার অসুবিধা ঘটিবে এবং পুলিসের নৈতিকতা ক্ষুণ্ণ হইবে। প্রদেশের মঙ্গলের জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন ও নির্ভরযোগ্য পুলিসের প্রয়োজন যত অধিক তত আর কখন নহে। সরকার সংবাদপত্রে আক্রমণের দ্বারা, পুলিস শৃঙ্খলা ক্ষুণ্ণ হইতে দিবে না। অবস্থা যেরূপ গুরুত্বপূর্ণ তাহাতে অবিলম্বে ব্যবস্থা করিতে হইবে। কাজেই সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন পুলিসের কার্য সম্বন্ধীয় যে সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহা নিয়ন্ত্রিত করা হইবে। বাঙলায় পুলিসের কার্য সম্বন্ধে সংবাদ ও মন্তব্য প্রকাশের পূর্বে অনুমোদিত করাইয়া লইতে হইবে।"

কোথায় কাহার দ্বারা সংবাদ অনুমোদিত করাইয়া লইতে হইবে, তাহাতে কিছুই আইসে যায় না। কিন্তু যে কর্মচারী মিসেস সুরাবর্দীর বিদেশ গমনের ছাড় দিয়া ভারত সরকারের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য হয়েন, তিনিও সংবাদ নিয়ন্ত্রণের ভার পাইতে পারেন—তিনি ক্ষমতার ব্যবহার করিতে পারেন কি অপব্যবহার করিতে তৎপর হইতে পারেন, তাহা কে বলিতে পারে?

সংবাদপত্রে সংবাদ ও মন্তব্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা যখন করা হইয়াছে, তখন ব্যবস্থা পরিষদ চলিতেছে; কিন্তু সচিবগণ সে বিষয়ে ব্যবস্থা পরিষদের মত গ্রহণ প্রয়োজনও মনে করেন নাই—অথচ ব্যবস্থা পরিষদে তাঁহাদিগের যে সংখ্যাধিক্য আছে, তাহার বলে তাঁহারা যে কোন প্রস্তাব অনুমোদিত করিয়া লইতে পারেন।

ব্যবস্থা পরিষদে যে উক্তি করা হয়, তাহা আইনের আমলে আসে না বটে, কিন্তু মিস্টার সুরাবর্দী বলিয়াছেন—ব্যবস্থা পরিষদের কোন উক্তি যদি সরকারের আইনের বা আদেশের নির্ধারণ লঙ্ঘন করে, তবে সংবাদপত্র তাহা প্রকাশ করিলে দণ্ডনীয় হইবেন।

ব্যবস্থা পরিষদের বা ব্যবস্থাপক সভার অধিকার কতটুকু, তাহার পরিচয়ও ব্যবস্থাপক সভায় ১০০নং হ্যারিসন রোডের ঘটনার আলোচনা চেষ্টা প্রসঙ্গে পাওয়া গিয়াছে। ঘটনাটি বিচারাধীন বলিয়া মিস্টার সুরাবর্দী আলোচনা হইতে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা করিলে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, আসামীরা কি মামলা সোপর্দ হইয়াছে? তখন তিনি বলেন—তিনি সেইরূপ সংবাদ পাইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রথার এক ব্যাখ্যাও প্রদান করেন—সরকার যদি বলেন, আসামীদিগকে মামলা সোপর্দ করা হইবে, তাহা হইলেও মামলা "বিচারাধীন" হয়। এই ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য কি না, তাহা ব্যবহারাজীবরাই বলিতে পারেন।

তাহার পরে মিস্টার সুরাবর্দী ব্যবস্থা

ষদে হরতাল সম্পর্কে যে বিবৃতি প্রদান য়ছেন, তাহা বিচারে কোনরূপ প্রভাব তার করিতে পারে কি না, তাহাও বিবেচ্য। ন বলিয়াছেন—অসমর্থিত বিবৃতির বনিয়াদে বলা হইয়াছে, তাহা কেহ কেহ অত্যন্ত ম্ভব মনে করিতে পারেন—সাক্ষ্য পরস্পর-রাধী বলিয়াও বিবেচিত হইতে পারে।

এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ বিচারে বিভ্রাট ইতে পারে কিনা, তাহা কে বলিবে?

সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ চেষ্টা যত সফল , ততই যে অতিরঞ্জিত সংবাদ প্রচার অধিক , তাহা সহজ বুদ্ধিতে বুঝিতে কষ্ট হয় । আর যে সংবাদ বাঙলায় সংবাদপত্রে শ করা যাইবে না, তাহা যে আসামে, বিহারে ড়িষ্যায় ও অন্যান্য প্রদেশে সংবাদপত্রে প্রকাশ যাইবে, তাহা বলা বাহুল্য। সে সকল বাদপত্র কি বাঙলায় আসিবে না?

জনসাধারণের পক্ষ হইতে গত ২৩শে এপ্রিল কাতায় হরতাল ঘোষিত হইয়াছিল। যেরূপ ষ্ঠ, সম্পূর্ণ ও নিরুপদ্রবভাবে হরতাল পালিত য়াছে, তাহা মিস্টার সুরাবর্দীর বিশেষ চেষ্টার কারণ হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, নি যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহার পরে তাল করিবার কোন কারণ ছিল না এবং মন অবস্থায় হরতালের ফলে হাঙ্গামা নিবার্য বুঝিয়াও হরতাল করিতে বলা য়াছিল।

তাঁহার বিবৃতি সম্পর্কে আমরা তাঁহাকে একটি কথা বিশেষভাবে মনে করিতে অনুরোধ করিব। তিনি আজ বাঙলার প্রধান সচিব হইলেও লোক যদি তাঁহার কৃতকার্যের বিষয় স্মরণ ও বিবেচনা করিয়া তাঁহার উক্তিতে নির্ভর করিতে অসম্মত হয়, তবে কি তিনি তাহাদিগকে দোষ দিতে পারেন?

তিনি অকারণে গত ১৬ই আগস্ট হরতাল ঘোষণা করিয়াছিলেন। সেইদিন হরতাল ঘোষিত হওয়ায় যে সংঘর্ষ অনিবার্য ছিল, তাহা ব্যবস্থা পরিষদে সচিব মহম্মদ আলী স্বীকার করিয়াছিলেন। তাহা জানিয়াও মিস্টার সুরাবর্দী হরতাল ঘোষণা করিয়াছিলেন—বাঙলার গভর্নর তাহাতে বাধা দেন নাই। সেই হরতালের ফলে যে সংঘর্ষ হয়, তাহাতে হতাহতের সংখ্যা—মধ্যপ্রদেশের ভূতপূর্ব গভর্নর স্যার হেনরী টোয়াইনামের বিবৃতি অনুসারে ৪০ হাজার। কলিকাতার পূর্ববর্তী পক্ষাধিককালের বিবরণও পাঠ করিলে একথা অস্বীকার করা যায় না যে, এই হরতালে কোনরূপ অতিরিক্ত হাঙ্গামা হয় নাই। তাহার কারণ কি, তাহা সকলেই জানেন।

১৬ই আগস্টের হরতালে যে হাঙ্গামার আরম্ভ, তাহাতে দেখা গিয়াছে—কালকাতার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে ৪।৫ শত লোক (ইহারা সম্প্রদায়বিশেষভুক্ত) থানা আক্রমণ করিয়া ১৫ জন আসামীকে ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছিল। তাঁহার আহূত হরতালের সেই ঘটনার সহিত গত ২৩শে এপ্রিলের হরতালের ঘটনাসমূহের তুলনা করিলেও কি তিনি বলিতে পারেন, এই হরতালে কোনরূপ অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়াছিল?

বাঙলা সরকার দিনের পর দিন অধিক অঞ্চলে দীর্ঘকাল সাধারণ কার্য বন্ধ রাখিবার আদেশ জারী করিতেছেন। কিন্তু যে সকল অঞ্চলে সে আদেশ জারী হয়, সে সকল প্রতিরোধার্থ না প্রতিশোধদ্যোতক না অন্য কিছু, তাহা কে বলিবে? তবে সে সকল অঞ্চলে যদি হাসপাতাল থাকে, তবে তাহাও যে আদেশ হইতে অব্যাহতি লাভ করে না, ইহা যেমন সত্য—যদি ব্যবস্থা পরিষদের কোন সদস্য ঐ স্থানে বাস করেন, তিনিও যে তেমনই কার্যে যোগ দিতে পারেন না, ইহা আমরা লক্ষ্য করিতেছি। সে অবস্থায় কি ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন অসিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না? অধিবেশন বন্ধ করিবার জন্য কি আদালত নিদেশ দিতে পারেন না? হাসপাতালের রোগীদিগের সম্বন্ধে যে মিস্টার সুরাবর্দী ও তাঁহার সহ-সচিবগণ কোনরূপ বিবেচনা করেন—সে আশা না হয় না-ই করিলাম।

বাঙলার এই অবস্থার অবসান কি বর্তমান সম্প্রদায়কত দৃঢ় সাচব সঙ্ঘের অবসান ব্যতীত হইতে পারে?

দি সায়েন্স অব পামিস্ট্রি—দেবাচার্য, এম এ, ভূষণ প্রণীত। অমিয়রঞ্জন মুখার্জি, ২নং লেজ স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। ল্য ৭ টাকা।

গ্রন্থকার পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি পূর্বে অর্থনীতি শাস্ত্রে অধ্যাপনা করিতেন। হস্তরেখাবিদ-রূপে তিনি অতঃপর ভারতের সর্বত্র খ্যাতি অর্জন রিয়াছেন। মনস্তত্ত্বের দিক হইতে মানুষের বনের গতি প্রকৃতি এবং তদনুযায়ী জীবন রিচালনার সার্থকতা নির্ণয়ে গ্রন্থকারের বিদ্যা-র পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুতঃ জীবনের চ্ছিন্ন ঘটনার চেয়ে সমগ্রভাবে জীবন নিয়ন্ত্রণে জ্ঞানিক গতি বিশ্লেষণই তাঁহার ঘটনা-রীতি শিষ্ট্য বলিয়া মনে হয়। কর-রেখা আলোচনার তর দিয়া তিনি মানুষের মনের আলোকে তাহার গ্র জীবন অনুধ্যানে আনিয়া সত্য দর্শনের কৌশল আলোচ্য গ্রন্থে বিশেষ পুণতার সহিত অভিব্যক্ত করিয়াছেন। কতকলি হাফটোন চিত্রের সাহায্যে কররেখা সন্নিবেশ ৎপর্য প্রদর্শিত হওয়াতে এইরূপ দুরূহ ষয়টিও সাধারণের বুঝিবার পক্ষে সহজ য়াছে। পুস্তকের কাগজ, ছাপা এবং বাঁধাই সংসাহ।

কুর পালা:—(উপন্যাস) শ্রীরমেশচন্দ্র সেন ণীত। সোল এজেণ্ট—দেশপ্রিয় গ্রন্থালয়। ৬৯, শকতলা স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য সাড়ে তিন টা।

গ্রন্থকার কবিরাজ শ্রীযুত রমেশচন্দ্র সেন মহাশয় বাঙ্গলা সাহিত্যে সুপরিচিত। এদেশের জনসাধারণের অন্তরের কথাটি দরদের সঙ্গে বলিবার ক্ষমতা রমেশবাবুর আছে। শতাব্দী, ঘৃত ও অমৃত, চক্রবাক্ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তিনি সে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার "কুর পালা" পাঠ করিয়া আমরা পরিতৃপ্ত হইয়াছি। কংগ্রেস আন্দোলনের পটভূমিকায় আলোচ্য উপন্যাসখানি লিখিত হইয়াছে। বাঙলার পল্লীর নিভৃত অঞ্চলে জাতীয় আন্দোলনের ধারা কিভাবে সমাজ-জীবনে প্রাণময়স্পন্দন সৃষ্টি করিয়াছিল, গ্রন্থকার নিপুণতার সঙ্গে তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। দেশ-প্রেমের জ্বালাময় বেদনা ২৮৪ পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ এই উপন্যাসখানির আদ্যন্ত উদ্ঘাটিত করিয়াছে এবং দেশের দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতিকে জাতীয়তার একটি হৃদ্যতাময় প্রেরণায় বলিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। পল্লীর ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশে হিন্দু এবং মুসলমানের পারস্পরিক সৌহার্দ্যের যে চিত্র তিনি উভয় সম্প্রদায়ের কতকগুলি দরিদ্র নরনারীর চরিত্রের সরস বিন্যাসে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে জনচিত্তের সংবেদনময় সবল সাচ্ছন্দ্য এবং আন্তরিকতার অনাবিল মাধুর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। পরাধীন জীবনের অর্থনৈতিক শোষণগত পরাধীনতার দৈন্য হইতে জাতিকে মুক্ত করিবার জন্য গ্রন্থকার তাঁহার লেখায় যে বিদ্রোহের সুর বাজাইয়া তুলিয়াছেন, তাহা জাতির ভবিষ্যৎ পথনির্ণয়ে বিশেষভাবে সাহায্য করিবে। রমেশবাবুর এই উপন্যাস বাঙলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিবে বলিয়া আমরা মনে করি।

অধ্যাত্মতত্ত্ব কৌমুদী—ডাক্তার শ্রীকুঞ্জেশ্বর মিশ্র প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—পি মিশ্র, ১৩১এ, অখিল মিস্ত্রী লেন, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

আলোচ্য পুস্তকখানি অধ্যাত্মমূলক। গ্রন্থকার শব্দব্রহ্ম রামায়ণের লঙ্কা, ভাগীরথী গঙ্গার উৎপত্তি, শক্তিতত্ত্ব, রুদ্র বা শিব, দক্ষযজ্ঞ, দুর্গাপূজা-তত্ত্ব, গায়ত্রী, রাসলীলার বৈদিক সূত্র প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। এই সব আলোচনা তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

এসলামের শিক্ষা, প্রথমভাগ—মোহম্মদ মনিরুজ্জমান এসলামাবাদী প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—ছুফী আহামদ আজাদ এসলামাবাদী, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম। মূল্য ছয় আনা।

গ্রন্থকার বাঙ্গালী সমাজে সুপরিচিত। তিনি সুপণ্ডিত ব্যক্তি এবং একজন ত্যাগী কর্মী। পুস্তকখানি পাঠ করিলে এ সমাজের সাম্য, মৈত্রী এবং মানবতার মহান্ আদর্শ অন্তরে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। বর্তমানে লীগ সাম্প্রদায়িকতার দুর্দিনে এমন পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

মোটর গাড়ীর পঞ্চাশ বৎসর

শ্রীঅমরেন্দ্রকুমার সেন

কলকাতার কোনো প্রধান রাস্তায় দাঁড়ালে চোখের সামনে দিয়ে কত রকমেরই না মোটরযান কত রকমেরই না হর্ণ বাজিয়ে ব্যস্ত-ভাবে এদিক থেকে ওদিকে চলে যাচ্ছে; কোনোটা বিউইক, কোনোটা স্টুডবেকার, কোনোটা শেভ্রলে, আবার কোনোটা নতুনতম কাইজার-ফ্রেজার। আধুনিক মোটর যানগুলিকে দেখলে তার মালিককে হিংসা হয় কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর আগেকার মোটর যানের মালিককে দেখলে করুণার উদ্রেকই হ'ত, আর সে মোটরযান হিংসাকে দূরীভূত করত।

গত বৎসর মোটর যান তার পঞ্চাশ বৎসর বয়স পূর্ণ করেছে। মার্কিণ মুল্লুকের দুটি প্রধান শিল্প, সিনেমা ও মোটর, প্রায় একই সময়ে তাদের সুবর্ণ-জয়ন্তী পালন করল। এই উপলক্ষে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের শিল্প নগরী ডেট্রয়েটে এক বিশেষ উৎসব হয়েছিল। এই উৎসবের প্রধান আকর্ষণ ছিল প্রাচীন ও নবীন মোটর গাড়ীর এক শোভাযাত্রা ও প্রধান মোটর শিল্পপতিগণের এক মিলন উৎসব যাতে হেনরী ফোর্ড প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

মোটর গাড়ির সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে ডেট্রয়েটের রাস্তায় প্রাচীনতম থেকে নবীনতম গাড়ির শোভাযাত্রা

আধুনিক মোটরযান

কৃত্রিম উপায়ে প্রচণ্ড শক্তি, যা মানুষ প্রথম আবিষ্কার করে তা বোধ হয় কামান। এই কামানের দ্বারা তেরো শতকে চেঙ্গিস খান চীন সাগরের কূল থেকে অস্ট্রিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ভূমিখণ্ড জয় করেছিলেন। এই কামান দেখেই বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ব্যক্তির মনে আকাঙ্ক্ষা জাগে কৃত্রিম উপায়ে কল্যাণকর শক্তি উৎপাদন করার।

১৬৮০ সাল থেকে চেষ্টা সুরু হয়। এমন যন্ত্র তৈরী করতে চেষ্টা করেন ক্রিশ্চিয়ান হয়-গেন্স বারুদের সাহায্যে; যা মানুষের পরিশ্রম লাঘব করতে পারবে। কেটে গেল আরও একশত বৎসর। ইংলণ্ডের জন স্ট্রিট বারুদের পরিবর্তে তার্পিন তেল ব্যবহার করে' একটি ইঞ্জিন প্রস্তুত কবার চেষ্টা করলেন, সে ইঞ্জিনের কার্বুরেটর ছিল, স্পার্কপ্লাগ অবশ্য ছিল না; তার পরিবর্তে একটি অগ্নিশিক্ষা জ্বালাবার পলতে ছিল, অনেকটা সিগারেট লাইটারের মতো। এই ইঞ্জিন খানি থেকে জল পাম্প করে' তুলতে পারত।

জন স্ট্রিটের পর ফ্রান্সের লি বন একটি ইঞ্জিন তৈরী করতে চেষ্টা করলেন। তিনি ইঞ্জিন চালাবার জন্য হাওয়া মিশ্রিত তেলের গ্যাসকে জ্বালাবার জন্য 'বৈদ্যুতিক-শিখা' আবিষ্কার করেন। তিনি যা তৈরী করেছিলেন তাকে 'মোটর' বলা যেতে পারে, তবে মোটর গাড়ী নয়। তখনও পর্যন্ত পেট্রল নামক তেলের খবর লোকের জানা ছিল না। ১৮৫০ থেকে পেট্রল নিয়ে গবেষণা আরম্ভ হয়।

১৮৭৬ সালে জার্মানীর এন এ অটো, জন স্ট্রিট ও লি বন অপেক্ষা উন্নত সংস্করণের ইঞ্জিন তৈরী করেন। এতদিন পর্যন্ত ঘোড়াহীন কোনো গাড়ী ছিল না এবং কোনো প্রকার যান্ত্রিক গাড়ী বলতে রেলওয়ে ইঞ্জিনই ছিল, তবে তা রাস্তা দিয়ে চলত না।

প্রথম মোটর চালিত যান আবিষ্কার করেন
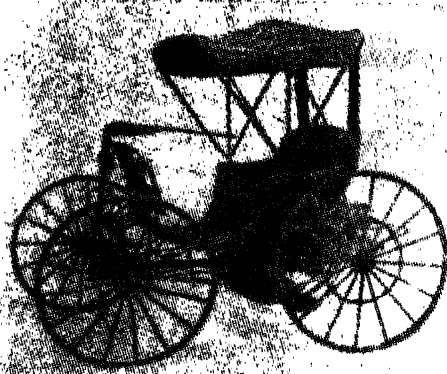
আমেরিকায় তৈরী প্রথম মোটর গাড়ী—১৮৯৩ সাল
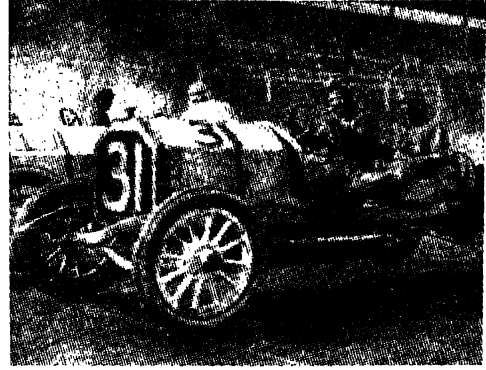
১৯০৯ সালে মোটর রেস। গাড়ীখানির নাম হ'ল বিউইক। স্টিয়ারিং ধরে বসে আছেন লুই শেভ্‌রলে
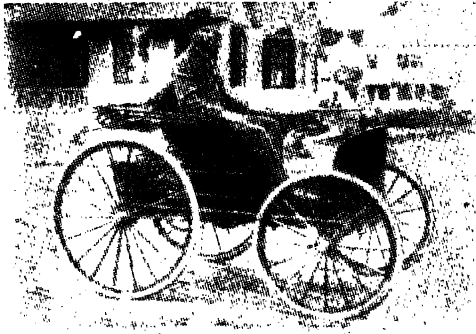
চার্লস ডুরিয়া তাঁর তৈরী একখানি গাড়ী চালাচ্ছেন
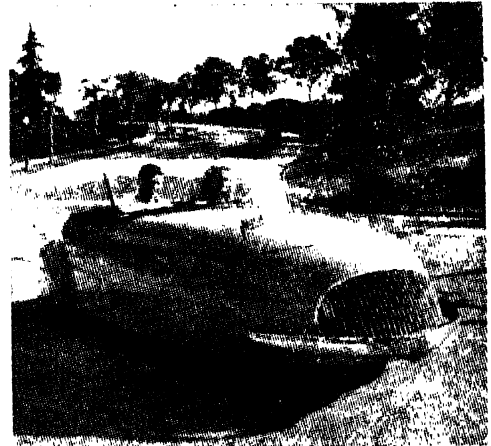
একটি অতি আধুনিক মডেলের মোটর গাড়ী
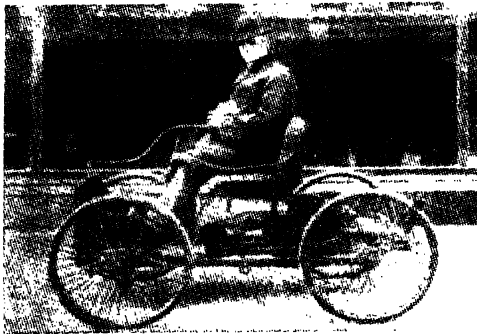
১৮৯৬ সালে হেনরী ফোর্ড তাঁর প্রথম তৈরী মোটর গাড়ী চালাচ্ছেন
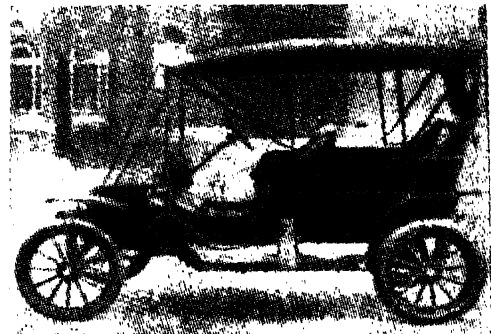
১৯০৯ মডেলের ফোর্ড গাড়ী। তৈরী করতে খরচ পড়ত সাড়ে আটশ ডলার

জার্মানীর উরটেমবার্গের গট্লিব ডেমলার। তিনি যে গাড়ী নির্মাণ করেছিলেন, তাঁর মেয়ের নাম অনুসারে সেই গাড়ীর নাম দিয়েছিলেন মার্সিডিজ। ডেমলারের নামেও গাড়ী আছে এবং সে গাড়ী রোলস রয়েস ব্যতীত সর্বশ্রেষ্ঠ। গট্লিব ডেমলার অটোর কারখানায় কাজ করতেন এবং বাড়িতে নিজেও কিছু কিছু কাজ করতেন। ডেমলারের বয়স যখন পঞ্চাশ বৎসর তখন তিনি নিজের একটি কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এই কারখানায় মার্সিডিজ নামে যে মোটর গাড়ী প্রস্তুত করেন সে গাড়ীর গিয়ার ছিল, ক্লাচ ছিল। কার্বুরেটর ছিল, সিলিণ্ডার ছিল এবং সিলিণ্ডারকে ঠাণ্ডা করবার জন্য জলাধারও ছিল। এই গাড়ীর ইঞ্জিন পশ্চাৎ দিকে থাকত।

ডেমলারের সমসাময়িক তাঁরই একজন স্বদেশবাসী কার্ল বেঞ্জ একটি পেট্রলের মোটর চালিত তিন চাকার সাইকেল নির্মাণ করেন। এই গাড়ীতে রবারের টায়ার ব্যবহৃত হ'তো এবং ইঞ্জিন মার্সিডিজ গাড়ীর মতোই পশ্চাৎ দিকেই থাকত।

লি বনের পর ফরাসীরা এতদিন চুপচাপ মোটর ইঞ্জিনের ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করছিল। ১৮৮৬ সালে লেভাসর নামে একজন ফরাসী তাঁর দেশের জন্য জার্মাণ গাড়ীর পেটেণ্ট সংগ্রহ করেন। পানার নামে একজন ধনী ব্যক্তির সাহায্যে তিনি একটি কারখানা স্থাপন করেন। সেই কারখানায় তিনি যে গাড়ী তৈরী করলেন তা জার্মাণ গাড়ী অপেক্ষা অনেক ভাল। গাড়ীর ইঞ্জিন ও রেডিয়েটর তিনি সামনের দিকে নিয়ে আসেন যাতে ঝাঁকুনি কম লাগে, সেজন্য তিনি স্প্রিং ব্যবহার প্রবর্তন করেন। তাঁর সে গাড়ী নেহাৎ ছেলেখেলার মতো ছিল না।

মোটর চালিত যানের খবর যখন অ্যাটলাণ্টিক সমুদ্রের অপর পারে মার্কিণ দেশে পৌঁছুলো তখন সেখানে তুমুল উত্তেজনার সঞ্চার হ'লো। যার যে কোনোও রকম একটা কারখানা আছে তা সে ছোটই হোক আর বড়ই হোক, সে ঘোড়াহীন যান তৈরী করতে উঠে পড়ে লেগে গেল। অ্যামেরিকায় প্রথম মোটর গাড়ী নির্মাণের চেষ্টা সুরু হয় ১৮৯৭ সালে; রচেস্টারের জর্জ বি সেলডন প্রথম মোটরযান নির্মাণ করেন; তবে অনেকের মতে চার্লস ই ডুরিয়া ও তাঁর ভাই ফ্রাঙ্ক অ্যামেরিকায় প্রথম পেট্রল চালিত এবং হাওয়া পূর্ণ টায়ার ওয়ালা মোটরযান প্রস্তুত করেন। তবে মোটর শিল্পে অ্যামেরিকা যে স্থান অধিকার করেছে হয়ত তা থেকে সে বঞ্চিত থাকত যদি না হেনরী ফোর্ড ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'তেন।

১৮৯৩ সালের চিকাগো নিখিল বিশ্ব প্রদর্শনীতে দেখানো হয় একখানি জার্মানীর বেঞ্জ গাড়ী। এই বেঞ্জ গাড়ী অ্যামেরিকার মোটর নির্মেতাদের মনে ও কার্যে নতুন উৎসাহের সঞ্চার করেছিল, কারণ তখনও পর্যন্ত অ্যামেরিকায় অমন সুন্দর একখানিও গাড়ী তৈরী হয়নি। তিন বৎসর পরে ডুরিয়া ভাইয়েরা ভাল মোটর গাড়ী তৈরী করতে আরম্ভ করেন। সে সময়ে অ্যামেরিকায় প্রথম যে মোটর দৌড়ের প্রতিযোগিতা হয়েছিল তাতে ডুরিয়া ভাইয়েরা প্রথম হয়েছিলেন, তাঁদের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় দশ মাইল। এর পর তাঁরা দুখানি গাড়ী নিয়ে ইংলণ্ড যান। সেখানে তাঁরা লণ্ডন থেকে ব্রাইটন পর্যন্ত, পঞ্চাশ মাইল, এক মোটর দৌড়ে প্রতিযোগিতা করেন।। বলা বাহুল্য তাঁরা প্রথম হয়েছিলেন। যিনি দ্বিতীয় হয়েছিলেন তিনি ডুরিয়া ভাইদের গাড়ীর এক ঘণ্টা পরে পৌঁছেছিলেন। ঘোড়াহীন গাড়ীর এই গতিতে সকলেই বিস্মিত হ'ন। মোটর শিল্পে হেনরী ফোর্ডের যে স্থান সে স্থানে থাকা উচিত ছিল ডুরিয়া ভাইদের, কিন্তু তাঁরা যত ভালো গাড়ী তৈরী করতে পারতেন, ব্যবসাটা তত ভাল বুঝতেন না। আরও অনেকেই মোটর শিল্পে যোগদান করেন, কিন্তু বেশীর ভাগই পরাজয় বরণ করেছেন, রয়ে গেছেন ডজ ব্রাদার্স ও জন এন উইলি যাঁরা একদা সাইকেল তৈরী করতেন, এল উড জোন্স যিনি গলাতেন ধাতু ষ্টুডবেকার ভাইয়েরা যাঁদের ছিল কামারশালা। এঁরা হলেন পথ প্রদর্শক। কিন্তু এঁদের সকলকে ছাপিয়ে ওঠেন হেনরী ফোর্ড।

হেনরী ফোর্ড যখন বালক তখন থেকেই যা কিছু যান্ত্রিক তাই তাঁকে আকর্ষণ করত। একটা ঘড়ীর সব যন্ত্রপাতি খুলে নিয়ে আবার সব ঠিকমতো বসিয়ে দেওয়া তাঁর পক্ষে মোটেই শক্ত ছিল না। তখন একদা তাঁর ইচ্ছা হয়েছিল তিনি সস্তায় ঘড়ী তৈরী করে বিক্রয় করবেন। প্রতিবেশীদের ঘড়ী খারাপ হ'লে তিনি মেরামত করে দিতেন। ফোর্ডের বাবা ছিলেন চাষী। তাঁর অনিচ্ছাতেই ফোর্ড যন্ত্র নগরী ডেট্রয়েটে এসে একটি ছোট কারখানায় চাকরী গ্রহণ করেন। খাটতে হ'তো ১৪ ঘণ্টা। বেতন ছিল সাড়ে চার ডলার। এই লোকই এক পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী বলে পরিগণি হয়েছিলেন। ফোর্ড ক্রমে নানা প্রকার যন্ত্রপা ও ইঞ্জিনের সঙ্গে পরিচিত হ'তে লাগলেন স্টিম ইঞ্জিন থেকে আরম্ভ করে ট্রাক্টর পর্যন্ত ফোর্ডের প্রতিভার বিকাশ হ'ল যখন ডেট্রয়ে এডিসন কোম্পানীর অধীনে কার্য গ্রহণ ক একটি পেট্রল ইঞ্জিন তৈরী করতে আরম্ভ করলেন। পরে তিনি এই চাকরী ত্যাগ ক নিজের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ফোর্ড মো তৈরী করে প্রথম যেদিন চালিয়েছিলেন সময় তখন ছিল রাত্রি এবং বৃষ্টিও পড়ছিল স্বামীকে বৃষ্টি থেকে বাঁচাবার জন্য মিসে ফোর্ড ছাতা খুলে স্বামীর মাথার ওপর ধ মোটর গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে দৌড়েছিলেন। এ ঘটনা ঘটেছিল ১৮৯৩ সালে।

মোটর গাড়ীর যে আরও উন্নতি করা যা যেমন আরামপ্রদ আসন ও দ্রুতগতি এবং এ সমস্ত উন্নতিসাধন করে মোটর গাড়ীে মানুষের নিত্যব্যবহার্য যন্ত্ররূপে ব্যবহার ক যায়; এই তথ্য বোঝাতে ফোর্ডের দশ বৎস লেগেছিল। তারপর থেকে মোটর গাড় দ্রুত উন্নতি সুরু হ'লো এবং প্রতি বৎস নতুন নতুন উন্নতির চেষ্টা করা হচ্ছে। মডে পুরণো হয়ে গেলে মালিকেরা নতুন মডেলে জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

ভয়

সৌমিত্রশংকর দাশগুপ্ত

অন্তর অরণ্যবর্ত্মে সংগীহীন একা
রাত্রি অন্ধকারে: ভয় দিয়েছিল দেখা।
শেষহীন সেই পথে নিজের দেখিনু চুপে চুপে
যেন কত বিভীষিকা আমার আপন বহুরূপে
সুপ্ত ছিল। পেল প্রাণ: চমকিনু বীভৎস প্রকাশে,
অসহায় হ'ল মন—রুদ্ধগতি আপনার ত্রাসে।
কবে কার নীচ ঈর্ষা, ক্রূর ক্রোধ, ক্লেদ অনিবার

গুহাস্থিত পশুমত গুপ্ত রাখে স্বরূপ তাহার—
অন্ধকার বাহিরায় প্রেতাকৃতি ছায়ার মতন
কুজ্ঝটিকা দূরে যায় খসে আবরণ।
ছলনার মিথ্যা সাজ, বিকৃতির ভদ্র অভিনয়—
লুব্ধ হয়ে গ্রাস করে মানুষের সত্য পরিচয়।
যখনি তা স্পষ্ট হয় নগ্নতার প্রকাশ্য আলোকে
মানুষেরে করি ভয়; অনুতপ্ত আত্মকৃত শোকে।

আদিবাসী কথাটি নতুন। বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের পর্কে ভারতের কতগুলি শ্রেণী ও সমাজের ন নামকরণ হয়েছে, সাধারণত যাঁদের আদিম ধিবাসী (aborigines) বলা হতো, ধুনিক সমাজতাত্ত্বিক পরিভাষায় তাঁদেরই দিবাসী বলা হয়েছে। ভারতের নীবিধৌত শস্যশ্যামল উর্বর অঞ্চলে আদি-সীদের দেখা যায় না। গিরিবহুল আরণ্য ঞ্চলের নিভৃত ক্রোড়ে আদিবাসীরা আশ্রয় য়েছে। আধুনিক ভারতের বড় বড় ট্রাঙ্ক ডে, ট্রেনে, মোটরে বা স্টীমারে এঁদের আপনি যাত্রী হিসাবে পাবেন না। আপনি আধুনিক রতীয়, আপনি আর্য সংস্কৃতির মানুষ, পনার জীবনচর্যার পথ একমাত্র আপনারই জস্ব। আদিবাসীরা আজও এই পথ থেকে রে সরে রয়েছে।

ভারতবর্ষ নাকি বহু বিভিন্ন সংস্কৃতির লনের ভূমি, বহু বিভিন্ন নরগোষ্ঠী, শক হূণ দল এখানে এক দেহে লীন হয়েছে। একথা সত্য। কিন্তু ংশিকভাবে সত্য এবং আমরা বোধ হয় টা শ্রুতিমধুর থিয়োরী হিসাবে এই আংশিক ত্যটাকে বড় বেশী জোর গলায় প্রচার করেছি। রণ, চোখের সামনেই ঐ বিদেশী প্রমাণের ক্ষী রয়ে গেছে, ভারতের আড়াই কোটি দিবাসী। হাজার হাজার বছর ধরে আর্য-রত এবং আদি-ভারত একই ভৌগোলিক মার মধ্যে থেকেও একসঙ্গে মিশতে পারেনি। হয়েছে শোণিত-সমন্বয়, না হয়েছে সাংস্কৃতিক মন্বয়। আধুনিক সভ্য ভারতীয়ের টাটানগরে শ শতাব্দীর ইস্পাত-সভ্যতা তপ্ত জ্যোতির জ্বল জ্বল করছে, কিন্তু তারই চার পাশে ভূমির শালের বনে আজও আদিবাসী হোর পাথুরে কুঠার কাঁধে নিয়ে উলঙ্গ হয়ে রে বেড়ায়, কুটীর নির্মাণের পদ্ধতি পর্যন্ত নে না। ইস্পাত সভ্যতার পাশেই মূর্তিমান রযুগ।

ভারতবর্ষের জীবনে বহু রাজনৈতিক এবং মাজিক বিপ্লবের সংঘটন হয়েছে। কিন্তু ভারতের সময় থেকে আজ পর্যন্ত এমন কটা ঐতিহাসিক প্রমাণের সাক্ষাৎ আমরা পাই যাতে বিশ্বাস করা যেতে পারে যে, ভারতের আদিবাসীকে আর্য ভারতবর্ষ আপন করে নেবার চেষ্টা করেছে। বীর পার্থ আদিবাসী-দুহিতা উলূপীকে এবং মধ্যম পান্ডব বৃকোদর হিড়িম্বাকে সাময়িকভাবে সহচরীরূপে গ্রহণ করেছিলেন, ঠিক ধর্মপত্নীর মর্যাদা দিয়ে গ্রহণ করেননি। ইন্দ্রপ্রস্থে বা হস্তিনাপুরের আর্য-গরিমায় ফিরে এসে তাঁরা নির্বাসিত জীবনের সুখ-সহচরীকে ভুলে গিয়েছিলেন। আর্য-ভারত যে আভিজাত্যের গর্বে আদিবাসী সমাজকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল, আজও সেই ব্যবধান দূর হয়নি। আর্যয়ানার মধ্যে একরকম জাতিগত ঔদ্ধত্য আছে, আধুনিক শিক্ষিত ভারতবাসী বুদ্ধির দিক দিয়ে উদারনীতিক হলেও এই বনিয়াদী জাতি-গর্ব (Race-Pride) তার রুচিকে অজ্ঞাতসারে গ্রাস করে আছে। ঊনিশ ও বিশ শতকের ভারতবর্ষ নতুন সাহিত্যে শিল্প ও সমাজ-সংস্কারের ভারতবর্ষ। কিন্তু এর মধ্যেও বিশেষভাবে একটা বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়। আদিবাসী সমাজকে আপন সমাজ বলে মনে করতে পেরেছেন, আধুনিক ভারতীয় তাঁর সাহিত্যের দর্পণে তার প্রমাণ প্রতিফলিত করতে পারেন নি। ভারতে এত সমাজ-সংস্কারের আন্দোলন হয়ে গেল, কিন্তু আদিবাসী সমাজকে নিয়ে নয়। এ বিষয়ে যে কিছু কিছু করণীয় দায়িত্ব আছে, তা মাত্র সম্প্রতি রাজনৈতিক উদারতাবাদের জন্য কিছু কিছু দেখা দিয়েছে।

"কাককৃষ্ণ হ্রস্বাঙ্গ হ্রস্ববাহু মহাহনু হ্রস্ব-পানি নিম্ননাসাগ্র রক্তাক্ষ তাম্রমূর্ধজ"—ভাগবত পুরাণ ভারতের আদিম অধিবাসীকে সর্বদিক দিয়ে হ্রস্ব করে ছেড়েছেন। বলা বাহুল্য এ ধরণের উক্তি সেই প্রাচীনকালের আর্য ভারতীয়ের জাতি-গর্বের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এই গাত্রবর্ণের গর্ব অথবা শোণিতের ঔদ্ধত্য পৃথিবীর সভ্যতাকে বহুভাবে বিড়ম্বিত করেছে। নিগ্রোর প্রতি ইয়াঙ্কির মনোভাব প্রবাসী ভারতীয়ের প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকায় দো-আঁসলা বুয়র-ইংরাজের মনোভাব, আজও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, মানুষের মন থেকে জাতি-গর্বের প্রাচীন বিষ এখনো দূরীভূত হয়নি। মানুষের প্রতি মানুষের বিদ্বেষকে প্রবল করবার একটা বড় উপায় এই জাতি-গর্ববাদ। হিটলার তাঁর স্বজাতিকে জাতি-গর্বে দীক্ষা দেবার জন্য আর্যামিকে কূটনীতিরূপে গ্রহণ করেছিলেন। প্রাচীন আর্যের কাছে প্রতিপক্ষ মাত্রই যেমন 'দস্যু' ছিল, হিটলারের কাছে প্রতিপক্ষ মাত্রই 'ইহুদী।' ভারতীয় শাস্ত্রকারেরাও 'শ্বপচাধম' বলে যে একটা গালাগালি তৈরী করেছিলেন, সেটাও বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, তাঁদের মনের গভীরে জাতিগর্ববাদের একটা ভয়ানক সংস্কার ছিল।

ভারতের আদিবাসী সমাজকেও চলতি কথায় পাহাড়িয়া বুনো জংলী ইত্যাদি আখ্যা আজও দেওয়া হয়ে থাকে। ভারতের আদি-বাসীদেরও যে একটা সংস্কৃতি আছে, সে সম্বন্ধে কোন সম্যক ধারণা সাধারণত আধুনিক ভারতীয়েরা পোষণ করেন না, কারণ সে সম্বন্ধে কোন খোঁজও তাঁরা রাখেন না। কিন্তু খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে, ঠিক আধুনিক ভারতীয়ের মতই আদিবাসী সমাজের মধ্যেও সাংস্কৃতিক উত্থান-পতন ও পরিবর্তন হয়ে চলেছে। কোথাও অনড় প্রাচীন ব্যবস্থা ও বিধানের মধ্যে এরা অচল হয়ে আছে, কোথাও নিজস্ব সংস্কৃতির ঐশ্বর্যকে হারিয়ে এরা আগের তুলনায় দীন হয়ে পড়েছে এবং কোথাও বা আধুনিক যুগের রীতিনীতির সঙ্গে কিছুটা খাপ খাইয়ে একটা পরিবর্তনকে বরণ করে নেবার চেষ্টা চলেছে।

এরাই আদিবাসী, ভারতের ভূমিজ সন্তান। আর্য আগমনের বহু পূর্বে এরাই ভারতের প্রস্তর-সভ্যতার প্রথমবোধিকা রচনা করেছিল। কিন্তু আদিবাসী বললে কি বোঝায়? আর্যেরা বহিরাগত, কিন্তু আদিবাসীরা ভারতেই উদ্ভূত? না, ঠিক একথা বললে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ হবে। নৃতাত্ত্বিকেরা বলেন, আদি-বাসীরাও বহিরাগত। আর্য আগমনের বহু পূর্বেই ভারতে এরা এসেছিলেন। ভাষা-তাত্ত্বিকেরাও এই তত্ত্ব সমর্থন করেন। সুতরাং ভারতের একেবারে খাঁটি ভূমিজ (Autochthones) সন্তান যে কে, তা বলা দুষ্কর। অতিদূর অতীতে ভারতভূমি কি একেবারেই নরহীন ছিল? সবাই বাইরে থেকে এসেছে? বিজ্ঞানী গবেষকমহল বলেন হ্যাঁ, আদিবাসী নামে আখ্যাত নৃজাতির জাতিও ভারতের বাইরে থেকে এসেছে। অতিদূর অতীতে অন্যান্য ভূখণ্ডের মত ভারতের মাটিতেও হয়তো এক শ্রেণীর দ্বিপদ মনুষ্যচর প্রাণী নিজেদের জন্তুদশা থেকে কালক্রমে বিবর্তিত হয়ে নরদশা লাভ করেছিল। কিন্তু তার কোন বিশিষ্ট প্রমাণ আজ খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়, যুগব্যাপী এক একটি বিরাট বংশপ্লাবনের ইতিহাসে সেই যথার্থ আদি ভারতীয়ের শোণিত একেবারে ধারা হারিয়ে ফেলেছে। সুতরাং আদিবাসী বলতে বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রাচীন বনিয়াদী অধিবাসীই বোঝায়।

আর্যেরা ভারতে পরে এলেও তাঁরাই ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠাতা। পঞ্চসিন্ধু, যমুনা, গঙ্গা ও নর্মদা, কাবেরীর উপকূলে আর্য

অভিযাত্রীর কাছে ছেড়ে দিয়ে আদিবাসী দুর্গম গিরিকন্দরে ও অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেই সুপ্রাচীন কালে আর্য ও অনার্যের রাজনৈতিক সংঘর্ষের পরিচয় পুরাণকারের লেখায় অবশ্যই কিছু কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু সমন্বয়ের বিশ্বাস্য প্রমাণ পাওয়া দুষ্কর। রাজা রামচন্দ্রের কাহিনী থেকে নজীর তুলে অনেকে বলতে পারেন যে, সেই বিখ্যাত আর্য রাজা গুহক চণ্ডালকেও মিতা করেছিলেন এবং হনুমানকেও একনিষ্ঠ সহায়ক বন্ধুরূপে স্থাপন ক'রে নিতে পেরেছিলেন। কিন্তু রামায়ণ কাহিনীর ঐতিহাসিক তাৎপর্য মোটামুটি এই দাঁড়ায় যে, এক আর্য রাজা রাবণশাসিত এক অনার্য রাষ্ট্রশক্তিকে দমন করবার জন্যে হনুমান গুহক প্রভৃতি কয়েকটি অনার্য দলপতিকে মাত্র যুদ্ধবন্ধুরূপে (Ally) গ্রহণ করেছিলেন। সেটা রাজনৈতিক সৌহার্দ্য মাত্র ছিল, সংস্কৃতিক সৌহার্দ্য নয়। আর্যেরা যে সে দিনের অনার্যকে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিজেদের মত সমান স্তরে টেনে তুলবার জন্যে মোটেই আগ্রহান্বিত ছিলেন না, বরং এ বিষয়ে তাঁদের যথেষ্ট মনোবল ও উদারতার কার্পণ্য ছিল। তার সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত একলব্যের কাহিনীর মধ্যে মর্মান্তিক ট্রাজেডিরূপে কীর্তিত হয়ে রয়েছে। ধনুর্বিদ আচার্য দ্রোণ একলব্যকে বিদ্যা দান করতে রাজী হননি। তবু একলব্য নিজের নিষ্ঠার জোরে এবং মনে মনে দ্রোণকেই গুরু বলে মেনে নিয়ে দ্রোণশিষ্য অর্জুনের চেয়ে দক্ষতর ধানুকী হয়ে ওঠে। আর্য দ্রোণ তাঁর আর্য-শিষ্য অর্জুনের শ্রেষ্ঠত্ব অটুট রাখার জন্যে অনার্য একলব্যের কাছে গুরুদক্ষিণাস্বরূপ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আদায় করে নিলেন। আর্য কূটনীতির জঘন্যতম দৃষ্টান্ত! এক কথায় বলতে পারা যায়, আচার্য দ্রোণ কৌশলে একলব্যকে চিরতরে পঙ্গু করে দিলেন।

একলব্যের বেদনা আজও আড়াই কোটী আদিবাসীর চিত্তের গভীরে লুকিয়ে রয়েছে। আর্য ভারতের উপেক্ষায় ধিক্কৃত হয়ে ছায়াবৃত অরণ্যের আড়ালে আজও তারা বিদ্যাহীন নিঃস্ব জীবনের ভার বহন করে চলেছে। হাজার হাজার বছর পরে খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীতে আর্য ভারতের সৌহার্দ্যের আহ্বান মাত্র ক্ষীণস্বরে ঘোষিত হয়ে আদিবাসীদের কানে পৌঁছতে আরম্ভ করেছে। আদিবাসীরা কেউ এ ডাকের অর্থ বুঝতে পারে কেউ বুঝতে পারে না, অনেকেই সংশয় করে। কিন্তু বোধ হয়, ঠিক ডাকার মত ডাকতে পারা যাচ্ছে না। কেমন করে ডাকলে আড়াই কোটী বনিয়াদী ভারতসন্তান সাড়া দিয়ে যাগযজ্ঞাদি সম্পাদনের বেড়া অতিক্রম ক'রে বৃহৎ ভারতের জনতার উৎসব অঙ্গনে মিলিত হতে পারবে, সেটাই আজকের দিনের সমস্যা। এই হলো আদিবাসী-সমস্যা। শ্রীঅমৃতলাল ঠক্করের মত জনসেবক সংখ্যায় ক'জনই বা আছেন এবং মহাত্মা গান্ধীর গঠনমূলক কর্মবিধির অন্যতম আদিবাসী-সেবাকে ক'জন কংগ্রেসকর্মী ব্রতরূপে গ্রহণ করেছেন? মোট কথা হলো, এদিক দিয়ে জাতীয় উদ্যোগে যথার্থ কোন কাজই হয়নি।

এ পর্যন্ত যেসব মন্তব্য করা হলো, তার মধ্যে আর্য-ভারতের নিন্দার দিকটার কথা বেশী করে বলা হয়েছে। কিন্তু আর্য-ভারতের একটা বিশিষ্ট প্রশংসনীয় চরিত্রের কথা বলা হয়নি। আজ হাজার হাজার বছর ধরে আর্য-ভারত ও আদিবাসী-ভারত পাশাপাশিই রয়েছে। আর্য-ভারত আভিজাত্যের কারণে আদিবাসীদের সংস্রব থেকে দূরে সরে আছে, কিন্তু এর মধ্যে হিংস্রতা নেই। আধুনিক যুগের য়ুরোপীয় সভ্যের দল যেখানে উপনিবেশ স্থাপন করেছেন, সেখানে আদিবাসী সমাজকে পাইকারী সংহারের দ্বারা ধ্বংস করতে তাঁরা একটুও দ্বিধা করেন নি। "আমেরিকার প্রথম শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশিকদের যে কেহ একটি রেড ইণ্ডিয়ানের মাথা কলোনী অফিসে জমা দিতে পারলে, তার জন্যে আড়াই পাউণ্ড পুরস্কার বরাদ্দ ছিল।" ভারতের প্রথম আর্য অভিযাত্রীরা তাদের প্রথম বর্বর জীবনের হিংস্রতায় হয়তো সেই অতিদূর অতীত ভারতের অনার্যদের সম্বন্ধে ঠিক সতর শতকের খৃষ্টধর্মী য়ুরোপীয় উপনিবেশিকের মত সংহারনীতি গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ভারতে একটা সভ্যতার পত্তন হবার পর অন্ততঃ বিগত পাঁচ ছয় হাজার বছরের মধ্যে আদিবাসীদের প্রতি ঠিক এই ধরণের জহ্লাদী আচরণ আর হয়নি। এটা অবশ্যই ভারতীয় সভ্যতার একটি গৌরবময় বৈশিষ্ট্য।

আর একটা পূর্বোক্ত মন্তব্য সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলা দরকার। আধুনিক শিক্ষিত ভারতীয় সমাজের চিন্তা ও কর্মক্ষেত্র থেকে আদিবাসীরা দূরে সরে আছে, এটা একেবারে সম্পূর্ণ সত্য নয়; মোটামুটিভাবে সত্য। অসহযোগ আন্দোলনে আইন অমান্য আন্দোলনে এবং আগস্ট-সংগ্রামেও নিখিল ভারতের মুক্তি-সাধনায় কোন কোন অঞ্চলের আদিবাসীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও আত্মোৎসর্গ বিস্মৃত হবার নয়। তা ছাড়া ভারতের ব্রিটিশ যুগের ইতিহাসে বহু ঘটনার স্বাক্ষর রয়েছে, যাতে প্রমাণিত হয় যে ভারতের আদিবাসী সমাজ মারাঠা ইত্যাদি ভারতীয় রাষ্ট্রশক্তির মতই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে আঘাত দিয়ে হঠিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আদিবাসীর উদ্যোগে পরিচালিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এই সংগ্রামের ইতিহাসকে শিক্ষিত ভারতীয়েরা যথার্থ সমাদরের সঙ্গে স্মরণ করেন না। সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে আরম্ভ ক'রে অসহযোগ আন্দোলনের আরম্ভকাল পর্যন্ত আধুনিক ভারতবর্ষ ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে একেবারে কোন প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করেনি। কিন্তু আদিবাসীরা করেছে। আদিবাসীদের এক এক বিচ্ছিন্ন অভ্যুত্থান যদিও ব্রিটিশ অস্ত্রশক্তির সাহায্যে সহজেই দমিত হয়েছে, কিন্তু তার জন্যে আদিবাসীর ঐতিহাসিক গৌরব ছোট হয়নি।

আদিবাসী অঞ্চল ও জনসংখ্যা

আদিবাসীদের জনসংখ্যা আড়াই কোটি ভারতের জনসংখ্যার অনুপাত ধরে বলা যেতে পারে শতকরা সাড়ে ছয়। অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বোম্বাই প্রদেশেই আদিবাসীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী, শতকরা সাতের উপর। খান্দে থানা, কোলাবা, পাঁচমহল, উত্তর গুজরাট এ নাসিক অঞ্চলে এরা লাখে লাখে বাস করে। ১৯০০ সালে দুর্ভিক্ষের প্রকোপে হাজার হাজার আদিবাসী উক্ত অঞ্চল ছেড়ে সিন্ধুপ্রদেশের ম অঞ্চল থর ও পার্দারে পর্যন্ত চলে যেতে ব হয়েছে। প্রাচীনকালে অভ্যাগত আর্যদের আগমনে একবার নদী-সিক্ত উর্বর উত্তর বসতি ছেড়ে দিয়ে আদিবাসীকে দ উপলবন্ধুর অরণ্য অঞ্চলে আশ্রয় নিতে হ ছিল। তারপর থেকে শস্য ও শিকা দুর্ভিক্ষের তাড়নায় আদিবাসীকে যুগ ধরে স্থান থেকে স্থানান্তরে চলে যেতে হবে এবং আদিবাসীদের জীবনে আজও যাযাবর অস্থিরতা লেগেই আছে। যাযাবরত্বের কার আদিবাসীদের সংস্কৃতিগত উন্নতি ভয়ানকভ ব্যাহত হয়েছে।

১৯৩১ সালের আদমসুমারীর বি অনুসারে আদিবাসীদের জনসংখ্যার এই হি পাওয়া যায়——

প্রদেশ	জনসংখ্যা
(১) আসাম	১৬,৭৮,৪
(২) বাঙলা	১৯,২৭,২
(৩) বিহার ও উড়িষ্যা ...	৬৬,৮১,২
(৪) মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ...	৪০,৬৫,২
(৫) বোম্বাই ও সিন্ধু ...	২৮,৪১,০
(৬) মাদ্রাজ	১২,৬২,৩
(৭) অন্যান্য অঞ্চল ...	৪,৩০,৫
মোট ...	১,৮৮,৮৬,২

দেশীয় রাজ্য	জনসংখ্যা
(১) মধ্যভারত এজেন্সী ...	১[illegible],৪২,০
(২) রাজপুতানা এজেন্সী ...	৮,০২,১
(৩) পশ্চিম ভারত এজেন্সী	৪,৯৫,৮
(৪) বরোদা	৩,১৩,২
(৫) গোয়ালিয়র ...	২,৮১,০
(৬) হায়দরাবাদ ...	২,২২,৮
(৭) অন্যান্য	৬৪,০
মোট ...	৩৫,২১,২

শ এবং দেশীয় রাজ্যের জনসংখ্যা যোগ লে মোট আদিবাসীর সংখ্যা দাঁড়ায় ২৪,০৭,৪৯২।

নিম্নে প্রদেশ ও জিলা অনুসারে বিভিন্ন গোষ্ঠীর আসিবাসীদের জনসংখ্যার হিসাব দেওয়া হল। সব জেলার নাম না দিয়ে মাত্র সেইগুলির নাম উল্লেখ করা হলো, যেখানে আদিবাসীর জনসংখ্যা অন্তত পঁচিশ হাজারের কম নয়। (১৯৩১ সালের আদম সুমারীর হিসাব)।

গোষ্ঠী	জনসংখ্যা	প্রধান বসতি অঞ্চল
সাম ঃ		
) গারো	১,৯৩,৪৭৩	গারো পাহাড়, গোয়ালপাড়া
) কাছাড়ি	৩,৪২,২৯৭	গোয়ালপাড়া, কামরূপ, দারাং, লক্ষ্মীপুর, কাছাড়
) খাসি	১,৭১,৯৫৭	খাসি রাজ্য, খাসি পাহাড়, জয়ন্তিয়া পাহাড়
) লুসাই	১,১৪,১৫৮	লুসাই পাহাড়
) মিকির	১,২৯,৭৯৭	নওগাঁ, শিবসাগর, খাসি পাহাড়, জয়ন্তিয়া পাহাড়
) নাগা	২,৬৮,৩০৩	নাগা পাহাড়, মণিপুর রাজ্য
ঙলা ঃ		
) চাকমা	১,৩৫,৫০৮	পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম
) মুণ্ডা	১,০৮,৬৮৬	চব্বিশ পরগণা, জলপাইগুড়ি
) ওঁরাও	২,২৮,১৬১	জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর
১০) সাঁওতাল	৭,৯৬,৬৫৬	বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলি, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, মালদা
১১) টিপ্রা	২,০৩,০৬৯	পার্বত্য চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা রাজ্য
হার ও উড়িষ্যা ঃ		
১২) ভুঁইয়া	৬,২৫,৮২৪	গয়া, ভাগলপুর, সাঁওতাল পরগণা, হাজারিবাগ, পালামৌ, মানভূম, উড়িষ্যা রাজ্যসমূহ
১৩) ভূমিজ	২,৭৪,০৫৮	মানভূম, সিংভূম, উড়িষ্যা রাজ্য
১৪) গোন্দ	৯,৫৫,৭৫২	সম্বলপুর, উড়িষ্যা রাজ্যসমূহ
১৫) হো	৫,২৩,১৫৮	সিংভূম, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্য
১৬) খাড়িয়া	১,৪৬,০৩৭	রাঁচি, উড়িষ্যার রাজ্যসমূহ
১৭) খোন্দ	৩,১৫,৭০৯	আঙ্গুল, উড়িষ্যার রাজ্যসমূহ
১৮) মুণ্ডা	৫,৪৯,৭৬৪	রাঁচি, সিংভূম, উড়িষ্যা রাজ্যসমূহ
১৯) ওঁরাও	৬,৩৭,১১১	রাঁচি, পালামৌ, উড়িষ্যার রাজ্যসমূহ
২০) সাঁওতাল	১৭,১২,১৩৩	মুঙ্গের, ভাগলপুর, পূর্ণিয়া, সাঁওতাল পরগণা, হাজারিবাগ, মানভূম, সিংভূম, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যসমূহ
২১) শবর	২,৪৪,৬৭৮	কটক, পুরী, সম্বলপুর এবং উড়িষ্যার রাজ্যসমূহ
াদ্রাজ ঃ		
২২) খোন্দ	৪,২৫,০৬৯	গঞ্জাম, ভিজাগাপট্টম
২৩) পরাজ	১,২৩,১০০	ভিজাগাপট্টমের কোরাপুট এজেন্সি
২৪) শবর	২,১১,৭৮১	ভিজাগাপট্টম, গঞ্জাম
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার		
(২৫) গোন্দ	২২,৬১,১৩৮	সওগর, ডামো, জব্বলপুর, মান্দলা, সেওনি, নরসিংহপুর, হোসাঙ্গাবাদ, বেতুল, ছিন্দওয়ারা, ওয়ার্দা, নাগপুর, চন্দা, ভাণ্ডারা, বলাঘাট, রায়পুর, বিলাসপুর, দুর্গ, অমরাবতী, ইয়োটমল এবং বস্তার ও কাংকের রাজ্য
(২৬) কাওয়ার	২,৮৭,১৫৬	রায়পুর, বিলাসপুর এবং রায়গড় ও সরগুজা রাজ্য
(২৭) কোর্কু	১,৭৬,৬১৬	হোসাঙ্গাবাদ, নিমার, বেতুল, অমরাবতী
(২৮) পরধান	১,১৯,৫৫৫	মান্থলা, সেওনি, চন্দা, ইয়োটমল
বোম্বাই ও সিন্ধু ঃ—		
(২৯) ভীল	৭,৭৬,৯৭৫	পাঁচমহল, আমেদনগড়, পূর্ব ও পশ্চিম খান্দেশ, নাসিক, থর এবং পার্কার জিলা, মহীকণ্ঠ এবং রেবাকণ্ঠ এজেন্সি
(৩০) ধোড়িয়া	১,৩৯,৩০৯	সুরাট জিলা ও এজেন্সি
(৩১) দুবলা ও তালাবিয়া	১,৪৪,৬৪৪	সুরাট
(৩২) নাইক্ড়া	১,০১,৯৫৪	পাঁচমহল, সুরাট, রেবাকণ্ঠ এজেন্সি
(৩৩) ঠাকুর	১,১৬,৫৯১	থানা, নাসিক, কোলাবা
(৩৪) বর্লি	২,০৬,৫৫১	থানা, নাসিক, সুরাট এজেন্সি ও জওহার রাজ্য
যুক্তপ্রদেশ ঃ—		
(৩৫) গোন্দ	১,২১,৫২৯	বালিয়া, গোরখপুর
রাজপুতানা রাজ্যসমূহ		
(৩৬) ভীল	৬,৫৫,৬৪৭	বনসোয়ারা, ডুঙ্গারপুর, মারবাড় ও মেবার রাজ্য
মধ্যভারত রাজ্যসমূহ ঃ—		
(৩৭) ভীল	৩,৬৩,১২৪	ইন্দোর, রতলম, ধর ও ঝাবুয়া রাজ্য
(৩৮) গোন্দ	২,৮২,৩৯৭	রেওয়া ও ভোপাল রাজ্য
(৩৯) কোল	২,০০,২৪৯	রেওয়া রাজ্য

উপরের তালিকা ব্যতীত আরও অনেক আদিবাসী গোষ্ঠী আছে, যাদের সংখ্যা ১ লক্ষের নীচে কিন্তু ৮৫ হাজারের ওপর। যথা:

(১) মিরি	সংখ্যা	৮৫,০৩৮	আসাম
(২) কুকি	,,	৯১,৬৯০	আসাম
(৩) হলবা	,,	৯২,৭৮৪	বোম্বাই
(৪) কট্কারি	,,	৮৭,৭৮৪	বোম্বাই
(৫) কোণ্ডা-ডোরা	,,	৮৫,৯৫২	মাদ্রাজ
(৬) কোইয়া	..	৯৫,৮১৮	মাদ্রাজ

শিক্ষা ও লিখন-পঠন ক্ষমতা

প্রায় আড়াই কোটি আদিবাসীর সমাজে শিক্ষার প্রসার যা হয়েছে, তা অতি অকিঞ্চিৎকর। মোটের ওপর আদিবাসী সমাজকে নিরক্ষর সমাজ বলা যেতে পারে।

১৯৩১ সালের আদম সুমারীতে কয়েকটি প্রদেশের ৭৬,১৯,৮০৩ সংখ্যক আদিবাসী সম্বন্ধে লিখন-পঠন ক্ষমতার অনুসন্ধান করা হয়েছিল। এই ৭৬ লক্ষের ওপর আদিবাসীর মধ্যে মাত্র ৪৪,৩৫৯ জন লিখন-পঠনক্ষম লোক পাওয়া গিয়েছিল, অর্থাৎ জনসংখ্যা অনুপাতে শতকরা মাত্র ০·৫৮ জন। প্রদেশ অনুসারে আদিবাসীদের মধ্যে লিখন-পঠনক্ষম লোকের সংখ্যা হলো আসামে শতকরা ১·৪, বাঙলা শতকরা ০·৭, বিহার ও উড়িষ্যা শতকরা ০·৫, মধ্যপ্রদেশে শতকরা ০·৫ মাত্র।

১৯১১ সালের আদম সুমারির রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, কটকারি গোষ্ঠীর মধ্যে হাজারে তিনজন এবং ভীলদের মধ্যে হাজারে ৪ জন লিখনপঠনক্ষম ছিল। এর সঙ্গে ভারতের আর একটি অনুন্নত সমাজের অর্থাৎ হরিজন সমাজের তুলনা করা যেতে পারে। ১৯২১ সালের আদম সুমারির রিপোর্ট অনুযায়ী হরিজন [illegible] মধ্যে প্রতি হাজারে ২৩ জন এবং ভাঙ্গিদের মধ্যে প্রতি হাজারে ২৮ জন লিখনপঠনক্ষম লোক ছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, অতি-অনুন্নত হরিজন সমাজও শিক্ষার ক্ষেত্রে আদিবাসীদের চেয়ে সাত গুণ উন্নত।

এ পর্যন্ত মাত্র আদিবাসীদের লিখনপঠন ক্ষমতা (literacy) সম্বন্ধে বলা হলো এবং তারই এই দশা! উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে না বলাই ভাল. উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্র আদিবাসীদের কাছে বলতে গেলে একরকম নিষিদ্ধ এলাকা হয়েই রয়েছে। অতি অল্পসংখ্যক কয়েকজন উচ্চ-শিক্ষিত আদিবাসীর সাক্ষাৎ আমরা পাই এবং তাঁরা যে শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছেন সেটা একটা আকস্মিক সৌভাগ্য মাত্র, ভারত গবর্ণমেণ্টের সুনির্দিষ্ট কোন ব্যবস্থার ফল নয়। খৃষ্টান মিশনারী সম্প্রদায় কিছু কিছু মধ্য ও উচ্চ স্কুল স্থাপন করে আদিবাসীদের মধ্যে কয়েকজনকে শিক্ষিত হবার সুযোগ দিয়েছেন। কিন্তু এটা নিতান্ত একপেশে সেবাধর্মের ব্যাপার, মাত্র খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত আদিবাসী পাদরী সাহেবদের অনুগ্রহ লাভ করবার অধিকারী, আর কেউ নন। আসামের খাসি সমাজে এবং ছোটনাগপুরের মুণ্ডা ও ওঁরাও সমাজে উচ্চশিক্ষিত পুরুষ এবং নারীও আছেন। ভাই অমৃতলাল ঠক্কর (বিখ্যাত জন-সেবক ঠক্কর বাপা নামে যিনি পরিচিত) লিখেছেন—"ভীল সেবামণ্ডলের উদ্যোগে একটি ভীল মেয়ে ১৯৪০ সালে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়ে এবং পাশ করে কলেজে ভর্তি হয়েছে, সম্ভবত এই ভীল মেয়েটিই অ-খৃষ্টান ভীলেদের মধ্যে প্রথম, যে কলেজে ভর্তি হলো।"

আদিবাসীদের ভাষা

আদিবাসীদের মধ্যে এমন অনেক গোষ্ঠী আছে, যারা তাদের প্রাক্তন 'জাতীয় ভাষা' হারিয়ে ফেলেছে অথবা বিস্মৃত হয়েছে এবং নতুন একটা ভাষা (হিন্দী বা উড়িয়া ইত্যাদি) গ্রহণ করেছে। এছাড়া প্রত্যেক গোষ্ঠীর ভাষার মধ্যে আধুনিক ভারতীয় ভাষার প্রভাব (শব্দ ও ব্যাকরণ) খুবই বেশী বেড়েছে এবং দিন দিন বেড়ে চলেছে। বর্তমানে আদিবাসীদের মধ্যে মোটামুটি ৩৪ রকম বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত। কিন্তু এই ৩৪টি বিভিন্ন ভাষা মূল-ভাষা নয়, প্রায় সবগুলিই দুটি প্রধান মূল-ভাষার অন্তর্গত বিভিন্ন উপ-ভাষা (dialect) মাত্র।

(১) মূল-ভাষা মন্ খমের—এই মন্ খমের গ্রুপের মধ্যে নয়টি উপভাষা (Dialect) আছে। প্রধান আসামের আদিবাসীদের মধ্যে এই ভাষা প্রচলিত।

(২) মূল-ভাষা মুণ্ডারি—এই মুণ্ডারি গ্রুপের মধ্যে সাতটি উপভাষা আছে এবং ছোট-নাগপুর, মধ্যভারত ও উত্তর ভারত অঞ্চলে বেশী প্রচলিত।

(৩) মূল-ভাষা দ্রাবিড়—দ্রাবিড় গ্রুপের মধ্যে পনেরটি বিভিন্ন উপভাষা আছে, যা উড়িষ্যা ও দাক্ষিণাত্যের আদিবাসীদের মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত।

ভীলেরা ও ভুঁইয়ারা আজকাল হিন্দী ভাষা ব্যবহার করে। অনেক আদিবাসী গোষ্ঠী আছে, যারা উড়িয়া বাঙলা ও মগাহি প্রভৃতি আর্য ভাষার (Indo-European Group) একটা বিকৃত রূপ ভাষা হিসাবে গ্রহণ করেছে। রাজমহলের মালা পাহাড়িয়া আদিবাসীদের ভাষা বস্তুত বিকৃত বাঙলা ভাষা মাত্র।

ভারত শাসন-ব্যবস্থায় আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন বিধান অনুসারে পৃথক নির্বাচন প্রথার দ্বারা আদিবাসীদের জন্য আইনসভায় কতগুলি আসন সংরক্ষিত (Reserved) হয়েছে। এই সংরক্ষিত আসন সংখ্যা মোট ২৪টি। যথা—

প্রদেশ	আদিবাসীদের সংরক্ষিত আ
(১) আসাম	৯
(২) বিহার	৭
(৩) উড়িষ্যা	৫
(৪) বোম্বাই	১
(৫) মাদ্রাজ	১
(৬) মধ্যপ্রদেশ	১
মোট	২৪

বাঙলা প্রদেশে আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষিত আসন একটিও নেই, যদিও বাঙলায় আদিবাসীর সংখ্যা ১৯ লক্ষের ওপর। দেশীয় রাজ্যগুলির শাসন-ব্যবস্থার কথা না বলাই ভাল, সেখানে সাধারণ শিক্ষিত প্রজা সমাজেরই প্রতিনিধিত্ব যা আছে তা না থাকারই মত, আদিবাসীদের কথা তো ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।

এ প্রসঙ্গে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের মনোভাব সম্পর্কে আদিবাসীদের পক্ষ থেকে একটা অভিযোগ করবার সংগত কারণ আছে। আদিবাসীদের রাষ্ট্রীয় অধিকার নিয়ে জাতীয়তাবাদীরা বলতে গেলে কোন আন্দোলনই করেন নি, যেমন হরিজনদের জমির সম্পর্কে হয়েছে। মধ্যপ্রদেশে আদিবাসীদের সংখ্যা প্রায় হরিজনদের সংখ্যার সমান, কিন্তু মধ্যপ্রদেশের আইনসভায় আদিবাসীদের জন্য একটি আসন সংরক্ষিত এবং হরিজনদের বেলায় কুড়িটি আসন সংরক্ষিত। উড়িষ্যাতে যদিও আদিবাসী-দের জন্য পাঁচটি আসন সংরক্ষিত, কিন্তু এর মধ্যে চারটি আসনের প্রতিনিধি স্বয়ং গবর্ণ-মেণ্ট মনোনীত (Nominate) করেন। আইনসভায় মনোনয়নের ব্যাপার কোন প্রদেশেই নেই এবং কোন সম্প্রদায়ের জন্যই নেই, মাত্র আদিবাসীদের বেলায় উড়িষ্যায় এই বিচিত্র গণতন্ত্রবিরোধী ব্যবস্থা চালু রাখা হয়েছে।

লোক্যাল বোর্ড ইত্যাদি স্বায়ত্তশাসন-মূলক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আদিবাসীদের প্রতিনিধি গ্রহণ করবার কোন পদ্ধতিই নেই। সম্প্রতি বোম্বাই গবর্ণমেণ্টে এ বিষয়ে কিছুটা অগ্রসরশীলতার প্রমাণ দিয়েছেন।

বাঙ্গালীর শক্তির সাহিত্যিক উৎস

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

মানভূমের মাননীয়দের এবং কল্যাণীয়দের সংগে মিলিত হবার এই সুযোগটি পেয়ে আমি আজ বিশেষ আত্মপ্রসাদ অনুভব করছি এবং সেজন্যে আপনাদের আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বাঙলাকে ঘেরে মানভূম-ধলভূম-বীরভূমের এই যে উচ্চাবচ বৃত্তাভাস, এটা আমাকে মুগ্ধ করে, এর বাইরের কাব্য দিয়াও আবার এর অন্তরের কাব্য দিয়াও,—সুখদুঃখে রূপায়িত মানুষের জীবনের সংগে এর কোথায় এক ছন্দগত মিল আছে। এ ছাড়া, বাঙলা-বিহারের পারস্পরিক সম্বন্ধের মধ্যে আপনাদের এই ভূমিখণ্ডটুকু একটা বড় বিশিষ্ট জায়গা নিয়ে রয়েছে বলে এ সম্বন্ধে আমার মনের একটা কৌতূহল আছে। শুধু কৌতূহল বললে সবটা বলা হয় না। মূল অংগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বার জন্যে এর সম্বন্ধে একটা বেদনা জেগে থাকে মনে, আবার সেই সংগে আরেক কথা ভেবে খানিকটা কৃতজ্ঞতাও। বাঙলার এই প্রত্যন্তদেশ নিজে বঞ্চিত হয়েও বিহারপ্রবাসী বাঙালীকে বিহারে তবুও খানিকটা জোর দিয়েছে; এই সংখ্যানুপাতের যোগে এই ভূমিখণ্ডই আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে—[illegible] পাঁচ বলে বেহারে বাঙালীর গণনা এখন কেউ শুনুক না শুনুক তবু একটু গলা খাঁকারি দিয়ে মাঝে মাঝে অস্তিত্ব জানাই, এই ভূমিখণ্ডটুকু না থাকলে যে কিভাবে একেবারেই নগণ্য হয়ে পড়তাম ভাবতেও সাহস হয় না।

আপনাদের এদিকে অল্প দিনের মধ্যে দুবার আমায় সাহিত্যের আলোচনা প্রসংগে আসতে হোল। যেমন দেশ এটা তাতে সাহিত্য-প্রবণতা যদি এখানে একটু বেশী হয় তো বিস্মিত হব না, তবে যেমন সময় তাতে শুধু রসচর্চার খেয়ালে যদি আপনারা সাহিত্য নিয়ে মশগুল থাকেন তো শুধু আশ্চর্য নয়, ক্ষোভের কারণ বলেও মনে হবে সেটা আমার। দিনকতক আগে জামসেদপুরেও এই ধরণেরই কথা বলেছি আমি, এবং সাহিত্যের মঞ্চ থেকে রসের কথা আওড়াবার যে চিরাচরিত প্রথা আছে সেটা এড়িয়ে গেছি। বাঙালীর জীবনে আজ যে সমস্যা উপস্থিত হয়েছে তার জোড়া আমি তার সমস্ত ইতিহাস ঘেটে খুঁজে পাচ্ছি না। বিপদ নানারকমই এসেছে, কিন্তু একটা অংশকে এরকমভাবে নিশ্চিহ্ন করে মুছে দেবার সম্ভাবনা নিয়ে কোন বিপদ এরআগে কখন এসেছে বলে আমার মনে পড়ছে না। আজ এমনই বিপদ যে, এই শতাব্দীর গোড়ায় বাঙালী যে গোড়ার কথাটা নিয়ে মুক্তিমন্ত্রের সাধনা শুরু করেছিল, সেটাও যেন ফিকে হয়ে পড়েছে। অবস্থা এমনই সঙ্গীন যে, আমরা সেদিন যা চেয়েছিলাম আজ তা ফিরিয়ে দেবার জন্যে ঝুলোঝুলি লাগিয়েছি। কেননা মনে হচ্ছে বাঁচবার জন্যে এখন সেইটিই দরকার হয়ে পড়েছে, অন্তত বেশির ভাগ হিন্দু বাঙালীর এখন তাই হচ্ছে মনে। তাঁরা বলছেন বাঁচবার জন্যে এখন হিন্দু বাঙলাকে আলাদা হতেই হবে। এর বিরুদ্ধেও কিছু কিছু রয়েছেন। কাঁরা ঠিক কাঁরা অঠিক সে নিয়ে তর্ক করব না আমি। আমি শুধু একটা জিনিস দেখছি—বাঙালী শোচনীয়ভাবে শক্তি-হীন হয়ে পড়েছে—কোন আন্দোলনই সেই দুর্ধর্ষ আবেগ আর বলিষ্ঠতার সংগে চালাবার সে ক্ষমতা সে হারিয়ে বসে আছে যা তাকে সমস্ত ভারতে একদিন বিশিষ্ট করে তুলেছিল। বাঙালীর সামনে এখন দুটো সমস্যা—বাঙলাকে এক রেখে বেঁচে থাকবার চেষ্টা আর বাঙলাকে দ্বিখণ্ডিত করে বেঁচে থাকবার চেষ্টা। এটা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না যে, বাঙলাকে এক রেখে বেঁচে থাকবার চেষ্টাই বেশি আত্ম-গৌরবময় এবং দ্বিখণ্ডিত করবার মধ্যে একটা পরাজয়মন্যতা আছে—ইংরাজিতে যাকে বলা হয় Defeatism বা Escapism. কিন্তু আমি যতটুকু ভেবে দেখেছি তাতে মনে হয় প্রথম রকমের চেষ্টা করবার ক্ষমতা আপাতত বাঙালীর একেবারেই নেই, আর দ্বিতীয় রকমের চেষ্টাতেও সে যদি উপযোগী শক্তি, সংঘবদ্ধতা, ত্যাগ এবং সহনশীলতার পরিচয় দিতে পারে তো সেটাও একটা অভাবনীয় ব্যাপারের মধ্যেই ধরতে হবে।

বাঙালীর এই শোচনীয় শক্তি হ্রাসের কারণ কি?

একটা জাতির জীবনের ধারাকে অনেকগুলি কারণই নিয়ন্ত্রিত করে—তার মধ্যে কোনটি ধর্মগত, কোনটি রাজনৈতিক কোনটি অর্থনৈতিক এবং কোনটি সাহিত্যিক। সাহিত্যের আলোচনায় আমরা আজ সমবেত হয়েছি সুতরাং আর সব বাদ দিয়ে বা প্রসংগক্রমে যতটুকু আসে ততটুকুই উল্লেখ করে সাহিত্যের দিক থেকে বাঙালীর জীবনের ধারাকে বিচার করে দেখবার একটু চেষ্টা করতে পারি।

ধর্ম এবং সাহিত্য এক সময় ছিল অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত সেই সময় একটির উল্লেখ করলে অপরটিও প্রায় এসে পড়ত। সেই দিক দিয়ে দেখতে গেলে পৌরাণিক ধর্ম এবং পুরাণাশ্রয়ী সাহিত্য—যা 'রামায়ণ মহাভারত'রূপ কাব্য সাহিত্যে বিকশিত হয়ে ওঠে, তাই অল্প-দিন আগে পর্যন্ত বাঙালীর জীবনকে সম্পূর্ণ-ভাবে প্রভাবিত করে এসেছে। রামায়ণ আর মহা-ভারত, আর পরবর্তী যুগে এই দুই মহাকাব্যকে আশ্রয় করে পৃথিবীর যে বিরাটতম সাহিত্য, সময় বা বিস্তৃতি—কোন দিক দিয়েই তার বিরাটত্বকে মেপে ওঠা যায় না। এই সাহিত্যের প্রভাবও স্বভাবতই সেই অনুপাতে বিরাট। একথা প্রায় নিঃসংকোচে বলা যায় যে, বাঙালী যে সময় থেকে একটি জাতি বলে পরিগণিত হয়েছে সেই সময় থেকেই এই পৌরাণিক ধর্ম আর পুরাণাশ্রয়ী সাহিত্যের প্রভাবে পড়ে গেছে। যে সাহিত্য আর ধর্ম ভারতের বাইরে বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল, ভারতের মধ্যে থেকে তার প্রভাবে না পড়বার কথাই আসে না। সুখে, দুঃখে, বিজয়ে, পরাজয়ে বাঙালীর জাতীয় জীবন এই পটভূমিকায় উঠেছে নড়ে। এরই মধ্যে নানা সাম্প্রদায়িক ধর্মেরও উত্থানপতন হয়েছে। কোনটা সমাজের নিম্নস্তর আশ্রয় করে, কোনটা সমাজের উচ্চস্তর আশ্রয় করে, কোনটা আবার সমাজকে সমগ্র-ভাবেই আশ্রয় করে। কোনটা অল্পায়ু, কোনটা যুগ যুগ ধরে পরিব্যাপ্ত থাকবার ক্ষমতা নিয়ে, নাথ ধর্ম, বৌদ্ধ, তন্ত্র, আউল, বাউল, রামানুজীয় বৈষ্ণব, গৌড়ীয় বৈষ্ণব, এদেরও বিভিন্ন শাখা; কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করবার বিষয় যে এসবের মধ্যে সবচেয়ে যেগুলা বিদ্রোহাত্মক সেগুলোও ঐ পুরাণ আর পুরাণাশ্রয়ী সাহিত্যের গণ্ডী এড়িয়ে যেতে পারেনি। এইসব ধর্ম বাঙালী কবির মনকে নব নব ভাবে অনুরঞ্জিত করেছে, গাথা, পাঁচালির সৃষ্টি হয়েছে তারপর সেই লোক সাহিত্যের সাহায্যে বাঙালীর জীবনকে ব্যাপকভাবে অনুভাবিত করেছে। কিন্তু মূল সুরটি কখনও বদলাতে পারেনি, বরং যতদিন গেছে ততই নিজের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে সেই মূল সুরে ফিরে এসেছে, কতকগুলো একেবারে বিলীন হয়ে গেছে। সাহিত্যের দিক থেকে বলতে গেলে—সেই যুগ্ম মহাকাব্য রামায়ণ মহাভারতেরই জয় জয়কার শেষ পর্যন্ত। বাংলায় এই সাহিত্যের যে কত প্রভাব তা এই থেকেই বোঝা যাবে যে, বাইরে থেকে এসে এবং রাজধর্ম হয়ে মুসলমান ধর্মও জাতীয় মনকে এর প্রভাব থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি। মুসলমান রাজত্বের সময়েও বিশিষ্ট যেসব বাঙালী মুসলমান কবি তাঁদের কণ্ঠে এই সুরই অনুরণিত হয়ে উঠেছে। এই সাহিত্যিক প্রভাব ইংরাজ আমলের গোড়া পর্যন্ত সমানভাবে চলে আসে। 'সমানভাবে' কথাটা দিয়ে আমি বোঝাতে চাই প্রায় অবিচ্ছিন্ন ভাবে, কিন্তু জাতীয় জীবনের উপর সেই

একইরকম অব্যাহত প্রভাব নিয়ে নয়। সে প্রভাব যে অনেকদিন থেকে নিস্তেজ হয়ে এসেছিল ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেবে। এটা হতে বাধ্য, বরং প্রভাবটা যে এতদিন ছিল ব্যাপ্ত সেইটেই পরম বিস্ময়ের কথা। জীবন গতিশীল, সেইজন্য পরিবর্তনশীল। জীবনের এই নিতান্ত সাধারণ নিয়মেই রামায়ণ মহাভারত পুরাণ সাহিত্যের আদর্শ থেকে পরবর্তী আদর্শ ধীরে ধীরে যাচ্ছিল বদলে, শেষে এমন হয়ে দাঁড়াচ্ছিল, ও সাহিত্য কম-বেশ করে একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল, নিজের রস দিয়ে আগেকার মত জীবনকে আর তেমন করে পুষ্ট করতে পারছিল না। সাহিত্যের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ লেন-দেনের সম্বন্ধ হওয়া দরকার। মানুষ পরিবর্তিত অবস্থার মধ্যে নিজের জীবনের বৈচিত্র্য দিয়ে করবে সাহিত্যের সৃষ্টি, সাহিত্য নিজের রস দিয়ে করবে মানুষকে পুষ্ট। রামায়ণ মহাভারতের আদর্শ নিতান্তই বিপুল, বিরাট, যুগপ্রসারী তাই এতদিন ছিল টেঁকে, আছেও এখনও; তবুও ক্রমে ক্রমে এমন একটা ভাব এসেই পড়েছে যে, যখন সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই, তখন সে অনুপস্থিতের সুখ দুঃখের কথা তুলে আর ফল কি?......... এই মনোভাবের জন্য দুঃখিত হওয়া চলে কিন্তু সমাজের ওপর চাবুক ওঠানো মোটেই চলে না। যে সময় সাহিত্য আর জীবনের মধ্যেকার যোগ এইরকম দুর্বল হয়ে এসেছে, সেই সময় বরাবর পশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব এসে পড়ল আমাদের ওপর। বাঙালীর মন একটা পরিবর্তনের জন্য উন্মুখ হয়েই ছিল, বিপুল আগ্রহের সঙ্গেই সাহিত্যের এই নতুন ধারাকে আমন্ত্রণ করে নিলে। জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের আবার মহামিলনের যুগ এল, জীবন সাহিত্যে রূপান্তরিত হোল এবং ধরিত্রীর নিজের রসই যেমন মেঘ হয়ে আবার তাকে নতুন করে পুষ্ট করে, বাঙালীর সাহিত্যও আবার তাকে সেইভাবে নতুন করে সঞ্জীবিত করে তুললে। এই পরিবর্তনের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয় এখানে, তার দরকারও নেই। মোট কথা ইংরেজ আসা থেকে ইংরাজের যাওয়ার সময় পর্যন্ত (অবশ্য যদি ও'রা যানই) এই প্রায় দু'শ বছরের গোড়ার খানিকটা বাদ দিয়ে যে সময়টুকু থাকে তাতে বাঙলা সাহিত্যের যে বিস্ময়কর উন্নতি হয়েছে তা যে কোন দেশের সাহিত্যের পক্ষেই গৌরবজনক। এখন দেখা যাক এই সাহিত্য আমাদের জীবনকে কিভাবে প্রভাবিত এবং পরিচালিত করেছে।

সুবিধের জন্যে বেশি খুঁটিনাটিতে না গিয়ে নব-বাঙলার ছয় জন দিকপালের নাম করেই নিরস্ত হচ্ছি। এরা ছয় জনেই এক একটি স্কুলের প্রবর্তক। এ'দের সৃষ্টিরও খুঁটিনাটিতে যাব না, শুধু সেই সৃষ্টির মূলে সুরটি কিভাবে আমাদের জাতীয় জীবনকে প্রভাবিত করেছে মাত্র সেইটুকুই দেখাবার চেষ্টা করব, কেননা আমার উদ্দেশ্যের পক্ষে সেইটুকুই যথেষ্ট। এ'রা যথাক্রমে রামমোহন (১৭৭৪—১৮৩৩), মাইকেল (১৮২৪—১৮৭৩), বঙ্কিম (১৮৩৮—১৮৯৪), বিবেকানন্দ (১৮৬২—১৯০২), শরৎচন্দ্র (১৮৭৬—১৯৩৮) এবং রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১—১৯৪১)। এ'দের মধ্যে শুদ্ধ সাহিত্যিক বলতে আছেন ৪ জন। রামমোহন এবং বিবেকানন্দ সাহিত্যিক সংজ্ঞার মধ্যে পড়েন না, একজন ধর্ম প্রবর্তক এবং কর্মী, অপর জন ধর্মপ্রচারক এবং কর্মী। নূতন বাঙলা গড়ায় এ'দের দান অপরিসীম বলে এ'দের তালিকাভুক্ত না করে উপায় নেই। রামমোহন সব দিক দিয়েই বাঙালীর নবচেতনার প্রতীক, যে বাঁধ আমাদের বাইরের জগৎ থেকে আলাদা করে রেখেছিল তাতে প্রথম কোপটি তিনিই দেন। সেই দিক দিয়ে তাঁকে পুরোধা বলা চলে। বিবেকানন্দের কথা যথাস্থানে বলব।

নিছক সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে যাঁরা বাঙালীকে প্রভাবিত করেছেন তাঁদের মধ্যে তাহলে রইলেন—মাইকেল, বঙ্কিম, শরৎ আর রবীন্দ্রনাথ। এর মধ্যে আবার মাইকেল বাঙালীর সাহিত্যকে প্রভাবিত করলেও তার জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করতে পারেন নি, এক তাঁর বিদ্রোহী জীবন যেটুকু প্রভাবিত করেছে সেটুকু ছাড়া। তার কারণ সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে জাতীয় জীবনকে প্রভাবিত করা তাঁর তেমন উদ্দেশ্যও ছিল না, তা ভিন্ন তাঁর সাহিত্যের উপজীব্যও ছিল সেই পুরাণ মহাকাব্য সাহিত্য যা জীবন থেকে অনেক দূরে পড়ে গিয়েছিল।

বাকি রইলেন তিন জন, বঙ্কিম, শরৎ আর রবীন্দ্র। আমি এ'দের সঙ্গে যুক্ত করব বিবেকানন্দকে, তারপর দুটি যুগ ধরে একটু বিশদভাবে আলোচনা করবার চেষ্টা করব, প্রথম যুগে বঙ্কিম বিবেকানন্দ, দ্বিতীয় যুগে শরৎ রবীন্দ্র।

এইখানে আর একবার মনে করিয়ে দিই যে, বাঙালীর শক্তির বিষয় নিয়েই আমি আমার এই নিবন্ধিকা আরম্ভ করেছি। এ'দের সাহিত্যের রসের দিকটা আমার আলোচ্য নয়, আমি শুধু দেখাব শক্তি সংগ্রহে এ'দের সাহিত্য কি করেছে সাহায্য, কি ধরনের সে শক্তি বা চেতনা এবং জাতীয় জীবনে তার পরিণাম কি হয়েছে।

বঙ্কিমের মতো তীব্র স্বাদেশিকতা নিয়ে কোন সাহিত্যিকই আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নি, এ-কথা স্বচ্ছন্দেই বলা যেতে পারে। শুধু এ বিষয়ে তিনি পথিকৃতই নয়, এ বিষয়ে তিনি এখনও অনতিক্রান্ত। তাঁর বিরাট জীবনের পরিধি মাত্র ছাপ্পান্ন বৎসর, এর মধ্যে সাহিত্য চেতনা হওয়া থেকে জীবন-চৈতন্যের অবলুপ্তি পর্যন্ত কি করে তাঁর জাত নিজের ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে একটা জাতির মতো জাতি হয়ে দাঁড়িয়ে উঠবে এই ছিল জপমন্ত্র। কি উপন্যাস, কি ধর্মতত্ত্ব, কি সমাজতত্ত্ব, কি satire—সমস্তর মধ্যে ছত্রে ছত্রে তাঁর যেন এই একই ব্যাকুলতা—বাঙালী তুমি নিজেকে চেনো, নিজেকে শোধরাও জগৎ-সমক্ষে মাথা উঁচু করে দাঁড়াও। তাঁর লেখা ভিন্ন ভিন্ন রূপে, ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে সবই যেন শক্তির মন্ত্র। বঙ্কিমের সাহিত্য উদ্দেশ্যমূলক সাহিত্য আর সে উদ্দেশ্য মাত্র এক—ঐ বাঙালীকে

সচেতন করে তোলা। এই উদ্দেশ্যের পথে চলতে চলতে তিনি যে সবচেয়ে বড় আবিষ্ক্রিয়ায় এসে পেঁছুলেন তা এই যে একেবারে সিধা হয়ে দাঁড়াতে হলে সব প্রথমে দরকার বৈদেশিক শাসনের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে হবে। আমি এ বলছি না যে আর সব চিন্তাবীর এ বিষয়ে অনবহিত ছিলেন; তবে একথা অস্বীকার করা যায় না যে ইংরাজ আসাতে কৃষ্টির দিক দিয়ে যে সমৃদ্ধি এসেছিল দেশে—শুধু কৃষ্টি কেন, প্রায় সবদিক দিয়েই—অন্তত বহিঃত—তারই মোহে কমবেশ করে সবাই ছিলেন তৎচ্ছন্ন। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ হয়। বাঙালীর তাতে কোন অংশ ছিল না, বরঞ্চ বাঙালী ব্যাপারটাকে যদি তার সুখের মাঝে, তার উন্নতির মাঝে একটা দুর্যোগ বলেই মনে করে থাকে তো আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। এই সময় তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র, এক বৎসর পরেই বি এ পাস করে ডেপুটি হয়ে বাহির হন। বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের এই প্রথম বিদ্রোহ যে এই মনীষী যুবকের মনে গভীর রেখাপাত করে থাকবে এ কথায় সন্দেহ থাকতে পারে না। এই বাঙলারই অপর সন্তান নেতাজী সুভাষচন্দ্র ঠিক বাষট্টি বৎসর পরে এই চাকরি সম্পর্কে যে সম্মান ত্যাগ স্বীকার করেন, সেরকম চোখ ঝলসানো একটা ব্যাপার বঙ্কিম করেন নি—নানা কারণেই সেটা সম্ভব ছিল না তখন, তবে এই বিদ্রোহ তিনি অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর যা অস্ত্র অর্থাৎ বাঙলার সবচেয়ে শক্তিমান লেখনী তাকে তিনি সেই দিকেই চালিয়ে নেতাজীর যুগের গোড়াপত্তন করে গিয়েছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহ নিয়ে তিনি কিছু লিখে যান নি। গবর্ণমেণ্টের চাকরি করতে করতে সেটা সম্ভব ছিল না; কিন্তু উত্তর জীবনে অর্থাৎ চাকরি থেকে অবসর নিয়ে কি তাঁর পরিকল্পনা ছিল কে জানে? বঙ্কিমের চাকরি জীবন একেবারে নিরবচ্ছিন্ন খাটুনির জীবন ছিল বলে লেখার অনেক প্ল্যানই তিনি উত্তর জীবনের জন্য রেখে থুয়েছিলেন। তিনি বলতেনই আমায় নব্বই পার্সেণ্ট খাটতে হয়, ন' পার্সেণ্ট পড়ি আর মাত্র এক পার্সেণ্ট লিখতে পাই।

সিপাহী বিদ্রোহ নিয়ে না লিখুন বা লিখতে পারুন, সিপাহী বিদ্রোহের যা spirit বা মর্মকথা তা তিনি তারও বাঙালীর মতন করে বাঙালীর হাতে দিয়ে গেলেন। আনন্দমঠের কথা বলছি। জাতীয়তার দিক দিয়ে এই গ্রন্থ সাহিত্যে বাঙালীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ; এইখানে বঙ্কিমের জীবনের যা মিলন তা পার্তায় বিকশিত হয়ে উঠেছে; বঙ্কিম সাহিত্যিকের আসন থেকে একেবারে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির আসনে উঠে এসেছেন।

বঙ্কিমের সঙ্গে রেখেছি বিবেকানন্দকে। বিবেকানন্দকে সাধারণভাবে সাহিত্যিক বলা যায় না, তবুও বিশেষ অর্থে তিনি সাহিত্যিক বৈকি। তাঁর সরস্বতী ছিলেন কণ্ঠে, তিনি সাহিত্য লিখে যান নি, সাহিত্য বলে গেছেন; আর সে যে কি বিরাট, তার মন্ত্র যে কি গম্ভীর, তা যাঁরাই তাঁর ভাষণ পড়েছেন, তাঁরাই অবগত আছেন। বঙ্কিমের সঙ্গে বিবেকানন্দের সাদৃশ্য এইখানে যে, তাঁরও সব কাজ, সব ভাষণের একই উদ্দেশ্য, জাতিকে শক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত করা। এর জন্যে বঙ্কিম মূলত সাহায্য নিয়েছিলেন ইতিহাসের, আত্ম-

বিস্মৃত বাঙালীকে পুরোনো কথা মনে করিয়ে দিয়ে নূতন পথের সন্ধান দিয়েছিলেন; বিবেকানন্দ সাহায্য নিয়েছিলেন ধর্মের। শক্তির মন্ত্রেই জাতীয় জীবনের মূলমন্ত্র—একথা জাতির মর্মে মর্মে এ'রা যেমন করে সাঁদ করিয়ে দিয়েছিলেন, তেমন করে আর যে কেউই করেন নি, একথা নির্ভয়েই বলা চলে।
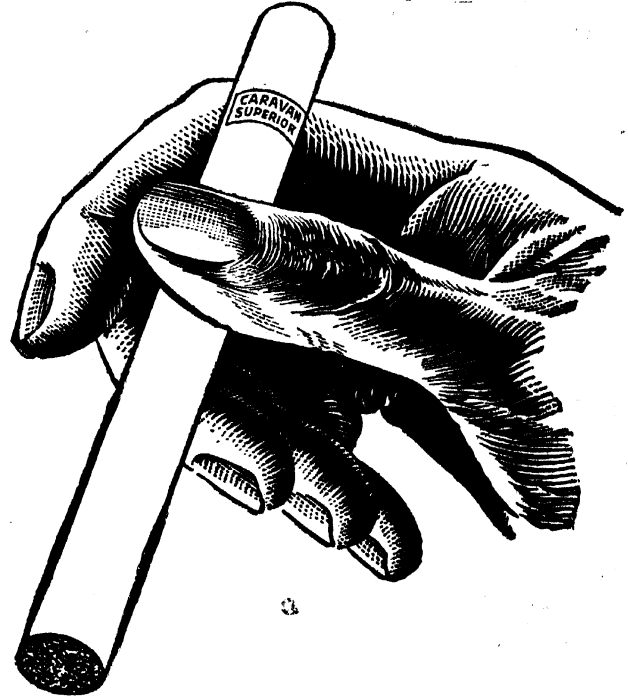
সে মন্ত্রের ফল যেন সঙ্গে সঙ্গেই ফলল। বঙ্কিমের তিরোভাবের সাল ১৮৯৪, বিবেকানন্দের ১৯০২। একেবারে ১৯০০ সাল থেকেই বাঙালী ঐ মন্ত্রকে জীবনে ফলিত করবার জন্যে অগ্নিশিখার মতো উঠল গনগনিয়ে জ্বলে। একটু কিছুর ছিল দরকার, অন্তরের উদ্দীপনায় চঞ্চল বাঙালী বঙ্গভঙ্গের মধ্যে পেলে সেই 'একটু কিছু'। বঙ্কিম-বিবেকানন্দের যুগ, এখন পর্যন্ত বাঙালীর সমস্ত ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবময় যুগ আরম্ভ হয়ে গেল। এই যুগের খুঁটিনাটির সঙ্গে আমার নিবন্ধিকার কোন সম্বন্ধ নেই। এই যুগটিকে নিয়ে এসেছিল মূলত বাঙলা সাহিত্যই, এই কথাটুকু বলাই আমার উদ্দেশ্য; কি করে নিয়ে এসেছিল, তার একটু আভাস দিলাম তার সঙ্গে। ত্যাগে, সংকল্পে, নিষ্ঠায় বাঙালী এই যুগে ব্রহ্মণ্য এবং ক্ষাত্র ধর্মের কি অপূর্ব সমাবেশ দেখিয়ে গেছে, তা আপনাদের মধ্যে অনেকেই সাক্ষাৎভাবে অবগত আছেন।

বাঙলার এই যুগটি শেষ হয় প্রায় ১৯১৫ থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে। আপনারা একটু আপত্তি করবেন বোধ হয়, বলবেন—বাঃ, তারপরে কি বাঙালী আর কিছুই করেন নি? করেছিল বৈকি। নৈলে চিত্তরঞ্জন-সুভাষ কোথা থেকে এলো। কিন্তু বঙ্কিম-বিবেকানন্দের যুগ গেলই। একথা কি অস্বীকার করা যায় যে পড়ে' মার খাবার মন্ত্রটা আলিপুর বম্ কেসের পরিচালক চিত্তরঞ্জনও নিতে পারেন নি মনে-প্রাণে, আজাদ হিন্দ ফৌজের অধিনায়ক সুভাষও নিতে পারেন নি?

কেন যে গেল এ-যুগটা বলা খুব সহজ নয়। একটা কারণ এই যে, বাঙালীর প্রাদেশিক আন্দোলনটা যখন নিখিল ভারতীয় হয়ে উঠল, তখন সেই নিখিল ভারতের কেন্দ্র থেকে একটা বিপরীতমুখী আন্দোলন তাকে গ্রাস করলে। এই এক। দ্বিতীয় কারণ, বাঙালী তার সাহিত্য থেকে আর নূতন করে সে প্রেরণা পেলে না। শরৎ-রবীন্দ্রের যুগ অন্য ধরণের ভাব-ধারা নিয়ে হোল উপস্থিত।

এও যে কেন হোল, তার কারণ সাহিত্যের একটা ইতিহাস আছে। শুধু লক্ষ্মীই নয়, সরস্বতীও কম চঞ্চলা নয়; নিত্যই নব-নব পথে তাঁর উন্মেষ। তাই সংকীর্ণ জাতীয়তার মধ্যে বা জাতীয়তার সেই একই কথা নিয়ে তিনি আর পড়ে থাকতে চাইলেন না। শরৎ জাতীয় জীবনের আর একটা বেদনার দিক করলেন উদ্ঘাটন—সমাজে নারীর জীবনের ট্র্যাজেডির দিক, তাঁর সূক্ষ্ম অমর লেখনীতে নারী-মনের সূক্ষ্মতম বেদনাটি তুললেন ফুটিয়ে; সমস্ত গ্লানির মধ্যে তাঁর অন্তরের অম্লান সত্যটিকে তুললেন ফুটিয়ে; বাঙলার রবীন্দ্রনাথ মহা-মানবিকতার মন্ত্র নিয়ে বিশ্বের রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠলেন।

সবই হোল, কিন্তু যখন আশা করা গেল, বঙ্কিম-বিবেকানন্দের বাঙালী আরও বড় হয়ে উঠতে বসেছে, তখন দেখা গেল—সে আরও গেছে নেমে। এও ঐতিহাসিক সত্য, কিন্তু কেন হোল? শরতের কান্নার ফল তবুও হয়েছে,—বাঙলার নারী জেগেছে,-যতই অল্প করে হোক। কিন্তু পৌরুষ কোথায়? যে বাঙালী বিশ্ব-মানবিকতার ভূমা-গৌরবে বিকশিত হয়ে উঠবে বলে আশা করেছিলেন, তার নিজের মানবিকতার সে অবলুপ্তি ঘটতে বসেছে।

কি কারণ? প্রতিভা যতই বিপুল, সে ততই বেশি করে যুগের আগে জন্মায়, সেই-জন্যেই কি বাঙালী রবীন্দ্র-প্রতিভার নাগাল পেলে না?

না, বঙ্কিম-বিবেকানন্দের মন্ত্রের সাধনাই তার আরও ছিল প্রয়োজন, মানবত্বে পরিপূর্ণ হবার আগেই সে বিশ্বমানবত্বের স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছে।

রবীন্দ্রনাথের বাণীই যে মানবাত্মার চরম লক্ষ্য, মানব-প্রতিভার সবচেয়ে বড় সিদ্ধি, সে কথা কে অস্বীকার করবে?

তবে আজ বাঙলা মরতে বসেছে নিজের ঘরের অন্ন খেতে না পেয়ে, নিজের ঘর থেকে বিতাড়িত হয়ে, আজ বঙ্কিম-বিবেকানন্দকেই ফিরিয়ে আনা কি বেশি দরকার হয়ে ওঠেনি?

(পুরুলিয়া 'মাঙ্গলিক সাহিত্য বীথি'র দশম অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ)

—•×:×•—

প্রবন্ধ ও চিত্র প্রতিযোগিতা

পানিয়া-সারদাবাড় হিতসাধন সমিতির উদ্যোগে (১) অস্পৃশ্যতা ও তাহার কুফল, (২) সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান শীর্ষক দুইটি প্রবন্ধ এবং ১০"×৬" পরিমিত বীরাসনে উপবিষ্ট মহাত্মা গান্ধীর রঙিন আলেখ্য চিত্র প্রতিযোগিতা হইবে, প্রত্যেক বিষয়ের শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীকে একটি করিয়া রৌপ্যপদক পুরস্কার দেওয়া হইবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রচারিত হইবে। প্রবন্ধ ও চিত্র আগামী ৩০শে বৈশাখ, ১৩৫৪ মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। শ্রীসুরেশচন্দ্র মাল, সম্পাদক, পানিয়া-সারদাবাড় হিতসাধন সমিতি, পোঃ আড়গোয়াল, জিলা মেদিনীপুর।

হকি

বাঙলার হকি পরিচালকগণ নূতন হকি লীগ প্রবর্তন লইয়া যেরূপ হৈ চৈ করিলেন তাহাতে সাধারণ ক্রীড়ামোদী ভাবিল কত কি না হইবে। কলিকাতার মাঠ পুনরায় হকি খেলায় ভরিয়া যাইবে। খেলোয়াড় ও দর্শকদের আনন্দ কোলাহলে মাঠ মুখরিত হইয়া উঠিবে। কিন্তু আমরা জানিতাম তোড়জোড়ই সার। মাঠের অবস্থার কোনই পরিবর্তন হইবে না। ঠিক হইয়াছেও তাই। সেইজন্য বলিতে ইচ্ছা করে এই প্রহসন করিবার হকি পরিচালকদের কি দরকার ছিল?

ভারতীয় হকি ফেডারেশন ভারতীয় দল মনোনয়ন উপলক্ষে যখন কতকগুলি খেলোয়াড়ের নাম প্রকাশ করেন ও প্রচার করেন যে ঐ সকল খেলোয়াড়দের মধ্য হইতেই বিশ্বঅলিম্পিক অনুষ্ঠানের ভারতীয় হকি দল গঠন করা হইবে, তখনই আমরা বলিয়াছিলাম নির্বাচন ঠিক হয় নাই। ভারতের কয়েকজন বিশিষ্ট খেলোয়াড় দল হইতে বাদ পড়িয়াছেন। ঐ সকল খেলোয়াড়দের দলভুক্ত না করিলে ভারতীয় দল শক্তিশালী হইবে না। আমাদের সেই উক্তি উপেক্ষিত হইল। কিন্তু আমরা যে ঠিক কথাই বলিয়াছিলাম বর্তমানে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। ভারতীয় হকি ফেডারেশন দল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বাহির হইয়া সুনাম অর্জন করিতে পারিতেছে না। প্রথম প্রথম শক্তিহীন দলের বিরুদ্ধে খেলিয়া সাফল্যলাভ করিলেও বোম্বাই, মহীশূর প্রভৃতি দলের নিকট পরাজয় বরণ করিয়াছে। অনেকেই বলিতেছেন, "বোম্বাই ও মহীশূর দলে এইরূপ কয়েকজন খেলোয়াড় আছেন যাঁহাদের ভারতীয় দলে স্থান দেওয়া উচিত। উঁহারা দলভুক্ত হইলে দলের শক্তি বৃদ্ধি পাইবে", আমরা ইহা জানিতাম। এই সকল পরাজয় ভারতীয় হকি ফেডারেশনের কর্তৃপক্ষের জ্ঞানচক্ষু খুলিতে সক্ষম হয় কি না দেখিতে চাই।

বাঙলার হকি দল আন্তঃপ্রাদেশিক ও ন্যাশনাল হকি চ্যাম্পিয়ানসিপে শোচনীয় পরাজয় বরণ করিল অথচ সেই বাঙলার মহিলা হকি দল মহিলাদের ন্যাশনাল হকি চ্যাম্পিয়ানসিপে খুব ভাল ফল প্রদর্শন করিয়াছে। ফাইনালে উন্নীত হইয়াছে। চ্যাম্পিয়ান হইবারও সম্ভাবনা আছে। যদি সাফল্যলাভ করে, বাঙলার পুরুষ হকি খেলোয়াড়দের কি অবস্থা হইবে তাই চিন্তা করিতেছি।

টেনিস

ভারতীয় টেনিস খেলোয়াড়গণ এখনও পর্যন্ত ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার খেলায় যোগদান করেন নাই। তবে ইতিমধ্যেই ইউরোপের মধ্যে ইহারা বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই চাঞ্চল্যের প্রধান কারণ বেলজিয়াম দলের সহিত প্রদর্শনী খেলায় যোগদান করিয়া সাফল্যলাভ করিয়াছেন। এই খেলা ব্রাসেলসে হয়। পাঁচটি সিংগলস ও দুইটি ডাবলস খেলা হয়। ভারতীয় খেলোয়াড়গণ দুইটি সিংগলস ও দুইটি ডাবলস খেলায় জয়লাভ করেন। অপর দিকে বেলজিয়াম খেলোয়াড়গণ তিনটি সিংগলস খেলায় জয়ী হন। এই খেলায় ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে সুমন্ত মিশ্র, জিমি মেটা ও ইফতিকার আমেদের খেলা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুমন্ত মিশ্র অনেক ইউরোপীয় খেলোয়াড়কে যে বিব্রত করিবেন ইহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। ব্রিটিশ হার্ডকোর্ট টেনিস প্রতিযোগিতায় ভারতীয় খেলোয়াড়গণ যোগদান করিয়াছেন। এই প্রতিযোগিতায় ইউরোপ ও অষ্ট্রেলিয়ার কয়েকজন খ্যাতনামা খেলোয়াড় খেলিবেন। ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় ভারতীয় খেলোয়াড়গণ কিরূপ ফলাফল করিবেন তাহার কিছুটা এই প্রতিযোগিতা হইতে উপলব্ধি করা যাইবে। নিম্নে বেলজিয়াম ও ভারতীয় দলের প্রদর্শনী খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইল:—

সিংগলস

ফিলিপ ওয়াসার (বেলজিয়াম) ৭—৫, ৭—৫, ৭—৫ গেমে সুমন্ত মিশ্রকে (ভারতবর্ষ) পরাজিত করে।

ভ্যানডেন ইন্দে (বেলজিয়াম) ৩—৬, ৬—২, ৬—২, ৬—৪, গেমে দিলীপ বসুকে (ভারতবর্ষ) পরাজিত করে।

গউস মহম্মদ (ভারতবর্ষ) ৬—৩, ৬—৩, ৫—৭, ৬—১ গেমে জ্যাকুস পেঁতেনকে (বেলজিয়াম) পরাজিত করে।

জিন মেটা (ভারতবর্ষ) ৬—২, ৮—৬ গেমে জিন পিরিডি বোডুকে (বেলজিয়াম) পরাজিত করে।

পিরি গিলহ্যাণ্ড (বেলজিয়াম) ৬—৩, ৬—২ গেমে ইফতিকার আমেদকে (ভারতবর্ষ) পরাজিত করে।

ডাবলস্

দিলীপ বসু ও ইফতিকার আমেদ (ভারতবর্ষ) ২—৬, ৬—৪, ৭—৫ ৬—৪ ৬—২ গেমে পিরি গিলহ্যাণ্ড ও জ্যাকুস পেঁতেনকে (বেলজিয়াম) পরাজিত করেন।

সুমন্ত মিশ্র ও জিম মেটা (ভারতবর্ষ) ৬—৩, ৪—৬, ৬—৪ ৬—২ গেমে ভ্যানডেন ইন্দে ও ফিলিপ ওয়াসারকে (বেলজিয়াম) পরাজিত করেন।

ব্যাডমিণ্টন

ভারতীয় ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড়গণ ইউরোপের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সাফল্যলাভ করিতে না পারিলেও কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহার ফলে ভারতীয় ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড়দের আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে সুনাম বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, টমাস কাপের আঞ্চলিক প্রতিযোগিতার বিষয় লইয়া ভারতের সহিত আলোচনা না করিয়া আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টন ফেডারেশন মালয়ের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছেন। এমন কি মালয়েই পূর্বাঞ্চল বা
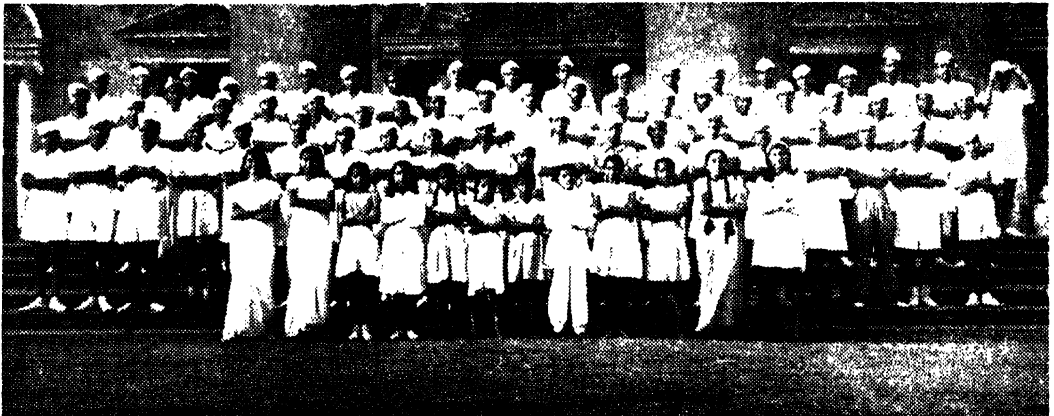
জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তিসংঘের পরিচালিত হাওড়া জেলা ব্যায়াম শিক্ষা শিবিরের যোগদানকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সভ্য ও সভ্যাগণ।

প্যাসিফিক জোনের খেলা হইবে বলিয়াও নাকি স্থির হইয়াছে। ভারতবর্ষকে এই অঞ্চল হইতে বাদ দিয়া ইউরোপীয় অঞ্চলে টানিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে। এইরূপ করিবার নজীর হিসাবে বলা হইয়াছে, প্রথম অঞ্চলেই দুইটি শক্তিশালী দলকে পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে না দিয়া শেষ মীমাংসার জন্য দুইটি দল যাহাতে মিলিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যুক্তি খুব আনন্দদায়ক সন্দেহ নাই, তবে আমাদের আপত্তি হইতেছে যে, দেশ এখনও পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ক্রীড়াতেও নিজের শক্তি ও সামর্থ্যের পরিচয় দিতে পারে নাই, তাহাদের কোনরূপে দায়িত্বপূর্ণ কার্যের ভার দেওয়া অর্থে পক্ষপাতিত্ব করা ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। আমরা আশা করি, ভারতীয় ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ এই ব্যবস্থা সহজে হজম করিয়া লইবেন না।

জাতীয় খেলাধূলা

জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তিসংঘের পরিচালকগণ গত পাঁচ মাসের মধ্যে বাংলার চারিটি জেলায় চারিটি ব্যায়াম শিক্ষা শিবির স্থাপন করেন। এই সকল শিক্ষা শিবিরের কোন সার্থকতা নাই এইরূপ মন্তব্য কেহ কেহ করিতেছেন ও করিয়াছেন বলিয়া আমরা শুনিলাম। ইহাদের তীব্র প্রতিবাদ করিবার আমাদের ইচ্ছা নাই। কেবল এই সকল শিক্ষা শিবির কি করিয়াছে, তাহা বলিলেই সকলেই উপলব্ধি করিবেন, ইহা কতখানি মহৎ কার্য করিতেছে। এই সকল শিক্ষা শিবির এক একটি জেলার মধ্যে স্থাপিত হওয়ায় প্রত্যেক জেলার প্রত্যেক ক্লাব পরিচালকগণ পরস্পরকে জানিবার ও চিনিবার সুযোগ পাইয়াছে। একসঙ্গে কিরূপে কার্য করিতে হয় এবং কার্য করিলে প্রত্যেকটি সঙ্ঘ কিরূপে উন্নতিলাভ করিতে পারে, তাহার পরিচয় পাইয়াছেন। নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা কিরূপে সহজে শিক্ষা করা যায়, তাহার উপায় দেখিতে পাইয়াছেন। ইহা ছাড়া এই সকল শিবিরে শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থিনীদের সহজ, সরল, সুশৃঙ্খল জীবনযাপন দেখিয়া অনেকেই মুগ্ধ হইয়াছেন। এই শিবিরে যেরূপ একদিকে নিয়ম ও শৃঙ্খলা শিক্ষা দিবার জন্য কড়া সামরিক আইন-কানুন আছে, অপর দিকে তেমনি ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য, সাম্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য প্রচুর আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা আছে। ব্যায়াম ও খেলা-ধূলা ছাড়া, সংগঠন, নৈতিক শিক্ষা, নিত্য-নৈমিত্তিক জীবন-যাপনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এই সকল ব্যায়াম শিক্ষা কেন্দ্রে বিভিন্ন জেলার প্রায় চারি শতাধিক প্রতিষ্ঠানের সহস্রাধিক প্রতিনিধি যোগদান করিয়াছে। সকল জেলায় যাহাতে এইরূপ শিবির স্থাপিত হয়, ইহার জন্য প্রতিদিন শত শত পত্র কেন্দ্রীয় অফিসে আসিতেছে। এমন কি বাংলার বহু মহিলা প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত কেবল মহিলাদের জন্য এইরূপ শিবির স্থাপনের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তিসংঘ স্থির করিয়াছেন, মহিলাদের এই আবেদন পূরণ করিবেন। শীঘ্রই এইরূপ শিবির প্রতিষ্ঠিত হইবে।

এই যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা বাঙলাদেশে জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তিসংঘ সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা কি সম্পূর্ণ নিরর্থক?

ছেঁড়া কাঁথায় লাখ টাকার স্বপ্ন

কানাই সামন্ত

লক্ষ টাকার স্বপনটারে নিতান্ত, মন, করবে মাটি?
চিৎপুর এবং চাঁদনি বাজার করো কেবল হাঁটাহাঁটি!
ছিন্নকন্থা হায় কী মন্দ!
হয় না তোমার তা পছন্দ।
নিশিদিবস সেই তো ধন্দ
মিলবে কোথায় তোষক বালিশ মশারি আর শীতলপাটি।
লক্ষ টাকার স্বপনটারে নিতান্ত কি করবে মাটি?

ওরে অবোধ, ঘুম যে ভালো নিঠুর জাগরণের চেয়ে—
দোলায় গজমোতির মালা কণ্ঠে পরীরাজার মেয়ে।
জেগে থাকলেই ক্ষুৎপিপাসা,
দুঃখশঙ্কা, সুখের আশা,
মাসান্তে, ভাই, চোকাও বাসা-
ভাড়া এবং মহাজনের চরণপদ্মে পড়ো যেয়ে;
ছেঁড়া কাঁথাই তোমার ভালো ধারের মাল ঐ গদির চেয়ে।

কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে পড়ে কিন্তু রইবে পিছে।
উপরেতে তুমিই চড়ো, কেউ না কেউ তো রইবে নীচে।
তার চেয়ে শোন্ সুযুক্তি শোন্
ছেঁড়া কাঁথায় দ্যাখরে স্বপন।
আগুন লাগুক, ক্ষতি কী, মন—
পিপুফিশুর জীবনবৃত্ত আদ্যোপান্ত সব কি মিছে?
কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে কারে তুমি ফেলবে পিছে?

দেশী সংবাদ

২১শে এপ্রিল—বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন রাজস্ব সচিব মিঃ ফজলুর রহমান বঙ্গীয় সরকারের জমি দখল ও প্রজাস্বত্ব বিল (সাধারণভাবে পরিচিত 'জমিদারী প্রথা বিলোপ বিল') উত্থাপন করিয়া বিলটি একটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ করিবার প্রস্তাব করেন।

২১শে এপ্রিল—বাঙলা প্রদেশে পুলিশ বাহিনীর কার্যকলাপের সমালোচনা করিয়া যে সকল সংবাদ ও মন্তব্য সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হইবে, তাহা প্রকাশের পূর্বে পরীক্ষা করাইয়া লইবার জন্য বাঙলা গভর্নমেণ্ট সংবাদপত্রসমূহের উপর আদেশ জারী করিয়াছেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে এক প্রশ্নের উত্তরে পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী মিঃ কে নসরুল্লা বলেন যে, কলিকাতা দাঙ্গা সম্পর্কে কলিকাতা অধিবাসীদের উপর মোট ধার্য পাইকারী জরিমানার মধ্যে হিন্দুদের উপর ৪,১৬,৫০০, মুসলমানদের উপর ২,২৪,৫০০ এবং অমুসলমানের উপর ৯১,০০০, টাকা ধার্য হইয়াছে।

২২শে এপ্রিল—বাঙলা গভর্নমেণ্টের প্রধান মন্ত্রী মিঃ এইচ এস সুরাবর্দী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে বলেন যে, সমগ্র পুলিশ বাহিনীর মধ্যে দুইজন পাঞ্জাবী মুসলমানের বিরুদ্ধে অভিযোগ আরোপিত হইয়াছে, তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং বিচারের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। বিগত ১৪ই এপ্রিল তারিখের ১০০নং হ্যারিসন রোডের ঘটনা লইয়া কংগ্রেসী দলের মুলতুবী প্রস্তাব সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী উপরোক্ত বিবৃতি দেন।

নিখিল ভারত মোমিন সম্মেলনের সভাপতি মিঃ জহিরুদ্দীন মোমিনদের মুসলিম লীগে যোগদান করিতে পরামর্শ দিয়া গত ১৯শে মার্চ একটি বিবৃতি দেওয়ায় নিখিল ভারত মোমিন সম্মেলনের ওয়ার্কিং কমিটি তাঁহাকে সসপেণ্ড করিয়াছেন। বিহারের মন্ত্রী ও মোমিন সম্মেলনের ভাইস প্রেসিডেণ্ট মিঃ আবদুল কায়ুম আনসারী সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন।

বাঙলার পুলিশ বাহিনীর কার্যকলাপের সমালোচনাসূচক সকল সংবাদ ও মন্তব্য সংবাদপত্রে প্রকাশের পূর্বে পরীক্ষা করাইয়া লইতে হইবে বলিয়া বঙ্গীয় সরকার যে আদেশ জারী করিয়াছেন, আজ বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে কংগ্রেস দল কর্তৃক উত্থাপিত এক মুলতুবী প্রস্তাবের সাহায্যে তৎসম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এতৎপ্রসঙ্গে বিরোধী দলের পক্ষ হইতে এই দাবী উত্থাপন করা হয় যে, কলিকাতা পুলিশের সশস্ত্র বাহিনীর পাঞ্জাবী পুলিশ দল ভাঙ্গিয়া দেওয়া হউক।

সীমান্ত সরকারের এক ইস্তাহারে প্রকাশ যে, ডেরাইসমাইল খানের অবস্থা এখনও খুবই সঙ্কটজনক। উক্ত জেলার কয়েকটি গ্রাম হইতে অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন, হত্যা ও বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করণ প্রভৃতির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

কলিকাতা সহরে বিক্ষিপ্ত ঘটনায় দুইজন নিহত ও ২০ জন আহত হয়। এই হিসাব সরকারীভাবে সমর্থিত হয় নাই।

আসাম গভর্নমেণ্টের স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রীযুত বসন্তকুমার দাস এক বিবৃতিতে বলেন যে, আসাম আক্রমণ করিবার জন্য মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড দল বাঙ্গলা সীমান্তে যে সকল অগ্রগামী ঘাঁটি প্রস্তুত করিয়াছে, তাহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে বলিয়া বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তাহা এখনও কার্যে পরিণত হয় নাই।

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

ধীরেন্দ্র স্মৃতি ভাণ্ডার

আমাদের সহকর্মী, পরম সুহৃদ, বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভ্য, ঢাকা জিলা রাষ্ট্রীয় সমিতির ভূতপূর্ব সম্পাদক, "সোনার বাংলা'র সহকারী সম্পাদক ও ত্যাগব্রতী লাঞ্ছিত একনিষ্ঠ দেশসেবক শ্রীযুত ধীরেন্দ্রচন্দ্র সেনের শোচনীয় মৃত্যুতে তাঁহার একমাত্র প্রিয়তমা নাবালিকা বিধবা কন্যা আজ পিতৃ, মাতৃ ও স্বামীহারা হইয়া বর্তমানে অসহায় অবস্থায় পতিত হইয়াছেন। ধীরেন্দ্রবাবুর অমর আত্মার শান্তি এই অসহায়া ও সর্বসুখবঞ্চিতা প্রিয়তমা কন্যাটির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের সুব্যবস্থার উপরই নির্ভর করিতেছে।

ঢাকার সাংবাদিকদের এক সভায় এই উদ্দেশ্যে "ধীরেন্দ্র-স্মৃতি ভাণ্ডার" স্থাপিত হইয়াছে। সহৃদয় সংবাদপত্রসেবী, সংবাদপত্র মালিক ও দেশবাসীর নিকট উক্ত তহবিলে অর্থ সাহায্যের জন্য ঢাকার সংবাদপত্রসেবীদের পক্ষ হইতে আবেদন জানান হইতেছে। আশা করি তাঁহারা এই আবেদনে সাড়া দিয়া মুক্ত হস্তে দান করিয়া ধীরেন্দ্রবাবুর আত্মার শান্তি ও কল্যাণে সাহায্য করিবেন।

সকল অর্থ-সাহায্য নিম্নঠিকানায় পাঠাইবেন ঃ—

ম্যানেজার, সোণার বাংলা, ঢাকা।

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

গৌহাটির সংবাদে প্রকাশ, প্রদেশের সীমা পুনর্নির্ধারণকালে উত্তর বঙ্গের কয়েকটি হিন্দুপ্রধান অঞ্চল এবং দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের আসামের সংলগ্ন অঞ্চল আসামের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য সেখানে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সভাপতিত্বে দিল্লীর প্রবাসী বাঙ্গালীদের এক সাধারণ সভায় এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, লীগ মন্ত্রিসভার আমলে বাঙ্গালী হিন্দুদিগকে যে বর্ণনাতীত দুঃখক্লেশ সহ্য করিতে হইতেছে, তাহা বড়লাটের গোচরীভূত করার জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজের মেজর এ সি চ্যাটার্জির নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল পাঠান হউক।

ঢাকার সংবাদে প্রকাশ, গত ২০শে এপ্রিল এক জনসভায় পাইকারার কোন ঘটনার নিন্দা করিয়া উত্তেজনামূলক বক্তৃতা করার অভিযোগে শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য, অধ্যাপক অতুল সেন এবং অপর পাঁচজনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করা হইয়াছে। ঢাকা জিলা মুসলিম লীগের সেক্রেটারী মিঃ সামসুদ্দিন আমেদকে ইতিপূর্বেই অনুরূপ অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

২৩শে এপ্রিল—কলিকাতায় পুলিশের জুলুমের অভিযোগে অদ্য সহরে পূর্ণ হরতাল পালন করা হয়। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, দোকান বাজার, সকল প্রকার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং সমস্ত জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের কার্যালয়গুলি এইদিন বন্ধ ছিল।

বোম্বাইয়ের সংবাদে প্রকাশ, ছোরা মারার জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান দিয়া বোম্বাই জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স (পরে উহার স্থলে বোম্বাই ব্যবস্থা পরিষদে গৃহীত একটি আইন প্রবর্তিত হয়) জারী হইবার পর বোম্বাই সহরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অংশ গ্রহণের অপরাধে ৩ ব্যক্তির প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

২৬শে এপ্রিল—শ্রীহট্টের সংবাদে প্রকাশ, শ্রীহট্ট সদর থানা অঞ্চলে এক জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিসের গুলী চালনার ফলে ছয়জন আহত হয়। আহতদের মধ্যে একজন পরে মারা গিয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে সরকার বিরোধীদল একযোগে পরিষদ কক্ষ হইতে বাহির হইয়া যান। কলিকাতার কোন এক অঞ্চলে সংঘটিত এক ঘটনা সম্বন্ধে পুলিশের আচরণ সম্পর্কিত অভিযোগের আলোচনার জন্য এইদিন কংগ্রেস দল এক মুলতুবী প্রস্তাবের নোটিশ দেন এবং উহাতে স্পীকার সম্মতি দেন না। অতঃপর উপরোক্ত ঘটনা ঘটে।

কলিকাতায় বিভিন্ন ঘটনায় ৪ জন নিহত ও ৩২ জন আহত হয়।

দিল্লীতে বিভিন্ন ঘটনায় ৪ জন হত ও ৯ জন আহত হয়।

২৫শে এপ্রিল কলিকাতার সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামাজনিত পরিস্থিতির অবনতি ঘটে এবং মোট ১৮ জন নিহত এবং প্রায় ৯০ জন আহত হয়। এই সংখ্যা সরকারীভাবে সমর্থিত হয় নাই। পুলিশ প্রায় ১২টি ক্ষেত্রে ৪০ বারেরও অধিক গুলী চালায়। ফলে ২ ব্যক্তি নিহত হয়। এইদিন বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে ২ শতাধিক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। ক্যাপ্টেন পি কে সেনগুপ্ত তাঁহার স্বীয় বাসভবনে রোগী দেখিবার কালে গুলীবিদ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। পুলিশ কমিশনার বেলেঘাটা ও মানিকতলা থানা এলাকা দুইটিতে শনিবার সকাল ৬ ঘটিকা হইতে রবিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা পর্যন্ত (৩৯ ঘণ্টা) সান্ধ্য আইন জারী করেন।

২৬শে এপ্রিল—কলিকাতার হাঙ্গামায় ছয়জন নিহত ও ৪২ জন আহত হয়। ইহা ছাড়া পূর্ব দিনের ঘটনায় আহত ছয়জন ঐদিন হাসপাতালে মারা যায়। পুলিশ কমিশনার মুচিপাড়া, ইণ্টালী ও বেনিয়াপুকুর থানার কোন কোন অঞ্চলে একটানা ৩৫ ঘণ্টা সান্ধ্য আইন জারী করেন।

শিলংয়ের সংবাদে প্রকাশ, আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কর্মপরিষদ দুই দিন আলোচনার পর বরদলৈ-সাদুল্লা আপোষ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

হুগলী জেলার শ্রীরামপুরে কলিকাতা ও বর্ধমান বিভাগের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের এক সম্মেলন হয়। সম্মেলনে বাঙ্গলা দেশে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অধীন একটি স্বতন্ত্র নূতন প্রদেশ গঠনের দাবী করিয়া সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

আসামের বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের অন্যতম সদস্য শ্রীযুত অরুণকুমার চন্দ পরলোকগমন করিয়াছেন।

২৭শে এপ্রিল—কলিকাতার হাঙ্গামায় তিন ব্যক্তি মারা যায় এবং ২১ জন আহত হয়।

কুমারী মৃদুলা সরাভাই অদ্য পাটনায় পৌঁছেন, তিনি বলেন যে, বাঙ্গলা ও পাঞ্জাব বিভাগ অবশ্যম্ভাবী। ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত করা হইবে এবং তজ্জন্য মহাত্মা গান্ধীর অধিবেশনে উপস্থিত অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ায় তিনি ৩০শে এপ্রিল দিল্লী যাইতেছেন।

গোয়ালপাড়ার সংবাদে প্রকাশ, গত ২৪শে এপ্রিল ব্রহ্মপুত্রের সমগ্র চর এলাকা হইতে অনুমান ৬।৭ হাজার মুসলমান কোন লীগ নায়কের নেতৃত্বে গোয়ালপাড়া হইতে ৩০ মাইল দূরবর্তী লক্ষ্মীপুর সহরে দলবদ্ধভাবে প্রবেশ করে। তথায় বিরাট শোভাযাত্রার আকারে উহারা সরকারী দালানগুলিতে লীগ পতাকা উত্তোলন করার অভিপ্রায়ে অগ্রসর হইলে শোভাযাত্রার একজন নায়ককে গ্রেপ্তার করা হয়।

বিদেশী সংবাদ

২০শে এপ্রিল—নবনিযুক্ত ভারত সচিব লর্ড লিষ্টওয়েল ভারত ও ব্রহ্মের জনসাধারণের উদ্দেশে এক বিবৃতিতে বলেন যে, দ্রুত ও শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং ভারত ও ব্রহ্মের সহিত বৃটেনের স্থায়ী মৈত্রী-বন্ধন প্রতিষ্ঠা যাহাতে হয়, তাহাই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য হইবে।

২৪শে এপ্রিল—মস্কোতে পররাষ্ট্র সচিব সম্মেলনের অধিবেশন শেষ হইয়াছে।

২৫শে এপ্রিল—নানকিংয়ের সংবাদে প্রকাশ, সরকারী সৈন্যদল সানটুং-এ এক বিরাট সাফল্যলাভ করিয়াছে এবং কমিউনিষ্ট আর্মির প্রধান যুদ্ধঘাঁটি মেনগিন দখল করিয়াছে।

২৬শে এপ্রিল—গত শুক্রবার মিঃ চার্চিল প্রাইমরোজ লীগে যে বক্তৃতা করেন, তাহার উত্তরে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী স্কটল্যাণ্ড ট্রেড ইউনিয়ন কাউন্সিলে এক বক্তৃতায় বলেন, মিঃ চার্চিলের মনের ভাব এই যে, বৃটিশের পক্ষে ভারতে ৫০ বৎসর পূর্বেকার নীতি বর্তমানেও আঁকড়াইয়া থাকা সম্ভব। গত কয়েক যুগ ধরিয়া সমগ্র এশিয়ায় যে স্বাধীনতা আন্দোলন ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে; মিঃ চার্চিল তাহা উপেক্ষা করিতেছেন। উপসংহারে মিঃ এটলী এরূপ অভিযোগ করেন যে, রক্ষণশীল নেতা মিঃ চার্চিল বৃটেনের অধিবাসীদের অশেষ দুর্গতির পথে টানিয়া আনিয়াছেন।

২৬শে এপ্রিল—কলম্বোর সংবাদে প্রকাশ, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর মালবাহী জাহাজ 'হার্ডে এডামসন' নিখোঁজ হইয়াছে। উক্ত জাহাজে যে ২৫০ জন যাত্রী ছিল, তাহাদের অদৃষ্টে কি ঘটিয়াছে তাহা এখনও জানা যায় নাই। ব্রহ্মদেশের টেনাসেরিম উপকূলের সন্নিকটে একখানি জাহাজের ধ্বংসাবশেষ বিমান হইতে দেখা গিয়াছে।

জয়ধ্বনি

রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী

ঢেউ ওঠে দশ দিক হতে
আকাশ পাতাল মাটি ফেনপুঞ্জে হয় আবর্তিতঃ
স্তব্ধ চোখ প্রসারিত করি
দশ দিকে পেতে দিই শিরা উপশিরা—
ধ্বনির উত্তাল স্রোত চেতনায় নামে
সমুৎসুক কান পেতে থাকি।
উৎক্রান্ত যুগের দ্বারে জনতার ভিড়,
সহস্রের কল কোলাহল,
রক্তমাখা সূর্যরশ্মি ধোয়ায় মৃত্তিকাঃ
রক্তিম দিগন্ত জোড়া ইতিহাস চোখ মেলে থাকে।
ক্ষেত ভরা সোনার আসন—
স্বপ্ন হয়ে ঘরে আসে কিষাণের গোলায় গোলায়,
কলরব মাখা পথঘাট
রক্তরশ্মি মাখা মাটি,—চোখে মুখে নতুন সম্পদ,
ঘরে ঘরে নবান্ন উৎসব।

এ মুহূর্তে আগামীর দ্বার খোলে মুক্তির আবেগে—
জয়ধ্বনি ওঠে দশ দিকে।

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

(১৪শ সংখ্যা হইতে ২৬শ সংখ্যা পর্যন্ত)

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

চতুর্দশ বর্ষ | শনিবার, ২৬শে বৈশাখ, ১৩৫৪ সাল। Saturday, 10th May, 1947. | ২৭শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

অখণ্ড বাঙলা ?

অখণ্ড-অবিভক্ত বাঙলা সম্পর্কে বাঙলার মোস্লেম লীগ সেক্রেটারী মিঃ আবুল হাশেম সংবাদপত্রে যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন, তাহা মন দিয়া পাঠ করিয়াছি। তাঁহার উক্তির মধ্যে অনেক সত্য কথা আছে, এই কথাগুলি জাতীয়তাবাদী এবং স্বাধীনতাকামী বাঙলারই কথা। বাঙালী হিন্দু আজ কেন বঙ্গ-বিভাগ চাহিতেছে, এই কথা বলিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছেন। তিনি বাঙালী যুবকদের ১৯০৫ সালের কথা স্মরণ করাইয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, চিত্তরঞ্জন, আশুতোষ ও সুভাষচন্দ্রের কথা স্মরণ করাইয়াছেন। বাঙলার দেশাত্মবোধের কথা, রাজনৈতিক চেতনার কথা—স্বাধীনতার সঙ্কল্পনিষ্ঠার কথা স্মরণ করাইয়াছেন। এই বাঙলাই যে সমগ্র ভারতের পথপ্রদর্শক—সেই গৌরবের কথা স্মরণ করাইতেও তিনি বিস্মৃত হন নাই। এমন যে বাঙলার হিন্দু, তাহারা আজ স্বতন্ত্র হিন্দু প্রদেশ গঠন করিতে কেন উৎসাহ বোধ করিতেছে—বিস্মিত হইয়া এই প্রশ্নই তিনি করিয়াছেন। সমস্যা সমাধানের পক্ষে জাতীয়তা এবং জ্বলন্ত দেশাত্মবোধই যে একান্ত আবশ্যক, এ সত্যও তিনি স্বীকার করিতেছেন। আমরা ধরিয়া লইতেছি, তাঁহার উক্তি আন্তরিক। বাঙলার হিন্দু কেন আজ বাঙলায় নূতন প্রদেশ চাহিতেছে? স্বাধীনতার উপাসক বাঙলা পূর্ণরূপে সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করিয়াই স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্রতী হইয়াছিল। তাহারা কোনও কেবল হিন্দুর স্বাধীনতা চাহে নাই, সমগ্রের স্বাধীনতাই চাহিয়াছে। ব্রিটিশ ভেদনীতির প্রশ্রয়ে যখন সাম্প্রদায়িক পাণ্ডাগণ মাথা তুলিতেছিল, তখনও তাহারা হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের কথাই বলিয়াছে। তাহার জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে, তাহার কাব্যে, সাহিত্যে, সংগীতে তাহারই অজস্র চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। ইংরেজ তাহার স্বদেশের জন্য এই সত্যই মানিয়া লইয়াছে: "The more we feel for our country, the less we feel for our sect." কিন্তু ভারতের বেলায় সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক চেতনাকেই সে বহু মান দান করিয়া ক্রমে ক্রমে 'পাকিস্থানে' আনিয়া ঠেকাইয়াছে। জাতীয়তাবাদী বাঙালী বরাবরই একথা বলিয়াছে: সাম্প্রদায়িকতা একটা কুসংস্কার। দেশাত্মবোধের দ্বারাই তাহার অবসান ঘটে। "আমরা দেশকে যতই ভালবাসিতে পারিব, সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্র চেতনা ততই দূর হইয়া যাইবে।" স্বাধীনতাকামী বাঙালী এই আশা বহুদিন পোষণ করিয়াছে যে, দেশাত্ম-বুদ্ধি জাগ্রত হইলে এক শ্রেণীর মুসলমানের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িকতা মাথা তুলিয়াছে, তাহাও দূর হইয়া যাইবে। তখন তাহারাও ভাবিতে অভ্যস্ত হইবে, তাহারা আগে বাঙালী, ভারতবাসী, পরে মুসলমান। স্বাধীনতাকামী বাঙলার জাতীয়তাবোধ এবং দেশপ্রাণতা সম্প্রদায় বা 'ধর্ম'কে অবলম্বন করিয়া দেখা দেয় নাই। স্বদেশকে আশ্রয় করিয়াই দেখা দিয়াছে।

কিন্তু মিঃ আবুল হাশেম কি জানেন না, স্বাধীনতাকামী বাঙালীর সেই আশা তাহারাই ভেদনীতির জয়ধ্বনি করিয়া কিভাবে বিফল করিয়া দিয়াছেন? বাঙালীর দেশাত্মবোধের কথা তিনি আজ বলিতেছেন। কিন্তু মুসলিম লীগের সংবাদপত্রগুলি কি প্রতিদিন এই দেশাত্মবোধকেই "হিন্দু জাতীয়তা" "হিন্দুর দেশাত্মবোধ" বলিয়া বিদ্রূপ করে নাই? বাঙলার হিন্দুর যাহা ছিল সমগ্রের সাধনা, তাহাই কি তাহারা অস্বীকার করিয়া মূঢ়তা প্রদর্শন করে নাই? বাঙলার রাজনৈতিক সাধনার কথা নাই তুলিলাম, বাঙলার স্বদেশী সাধনার যাত্রা-ভঙ্গ করিবার জন্যই স্বীয় সম্প্রদায়ের স্বার্থের নাসিকাচ্ছেদেও কি তাঁহারা কৃতিত্ব দেখান নাই? "স্বদেশীর" প্রেরণায় কংগ্রেস সেবকগণ যখন বিদেশী বর্জনে সচেষ্ট, তখনও তাঁহারা এই 'স্বদেশী' প্রয়াস 'হিন্দু' প্রয়াস বলিয়া বাধা দিয়াছেন। স্বদেশীর প্রেরণায় হিন্দু যেখানে খদ্দর ও দেশী বস্ত্র গ্রহণ করিয়াছে, তখন তাঁহারা বিদেশী বস্ত্র ক্রয় করিয়া বাহাদুরী দেখাইয়াছেন। হিন্দু যখন দেশবাসীর তৈরী বলিয়া বিড়ি টানিয়াছে, তখন শিক্ষিত তাঁহারা বিদেশী সিগারেট ফুঁকিয়া 'স্বাতন্ত্র্য' বজায় রাখিয়াছেন—অথচ বিড়ি তৈরী করিয়া কত দরিদ্র মুসলমানই না অন্ন সংস্থান করিত, মুসলমান তাঁতীদের বেলায়ও তাঁহারা তেমন উপেক্ষাই করিয়াছেন। এইভাবে ব্রিটিশ ভেদনীতিকে তাঁহারা জয়মাল্য দান করিয়াছেন।

তারপর স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থায় সাম্প্রদায়িকতাকেই রাজনীতি ক্ষেত্রে ছাড়পত্র দান করিয়া গোটা শাসনযন্ত্রে সেই বিষ ঢুকাইয়া দিয়াছেন। আজ মিঃ আবুল হাশেম বলিতেছেন: বাঙলার ভৌগোলিক সংস্থান, জল, বায়ু বাঙলাকে এমন বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে যে, বাঙলার হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতি ও জীবনের ধারা বিস্ময়কররূপে এক হইয়া রহিয়াছে। বাঙলার হিন্দুর নিকট ইহা অজ্ঞাত নহে।

কিন্তু মুসলিম লীগ নায়কের কি ইহাই দাবী নহে যে, হিন্দু-মুসলমান স্বতন্ত্র জাতি, তাহাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ ও আদর্শ সম্পূর্ণ ভিন্ন, কোথাও ঐক্য নাই—পরন্তু বিরোধ বিদ্যমান? এই অবস্থায় বাঙলার লীগ সেক্রেটারীর এই ঐক্যবোধের কথার মূল্য কতটুকু? বাঙলায় হিন্দু-মুসলমান শাসনক্ষেত্রে সমান অংশীদার হইবে, যুক্ত-নির্বাচন হইবে—এমন কথাও তিনি বলিয়াছেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই তাঁহার ঐক্যের আহ্বানে মুসলিম লীগের মুখপত্রগুলি তাঁহার শ্রাদ্ধ করিতেছে। বাঙলায় লীগদলের সভাপতি-রূপে মৌলানা আক্রাম খাঁ মিঃ আবুল হাশেমের উক্তির যে কোন মূল্য নাই, ভাবী বাঙলা সম্পর্কে কোন নির্দেশ দিবার অধিকার যে একমাত্র কায়েদে আজম জিন্নারই আছে, তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন এবং হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবোধ সম্পর্কে মুসলমানগণকে বিভ্রান্ত না হইতে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। আমাদের কথা—'গোড়া' তাঁহারাই কাটিয়াছেন, এখন আগায় কিঞ্চিৎ জল সিঞ্চনে গাছ 'জোড়া' লাগিবে না। আর এই সত্য কে অস্বীকার করিতে পারে যে, খণ্ডিত ভারতে বাঙলার হিন্দু অখণ্ড বাঙলার সাধনাকে আত্মহত্যা বলিয়াই মনে করিবে? ভারত খণ্ডন যদি নিয়তিই হয় তাহা হইলে বাঙলার হিন্দু ভারতীয় ইউনিয়নের সঙ্গেই যুক্ত থাকিবে। ভারতীয় ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত থাকিবার জন্যই বাঙলায় নূতন প্রদেশ অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। অখণ্ড ভারত ভিন্ন অখণ্ড বাঙলার প্রস্তাব নিতান্ত অসার এবং ভাঁওতা বলিয়াই বাঙলার হিন্দু মনে করে।

বংগ-বিভাগে মিঃ জিন্নার আপত্তি

বাঙলা ও পাঞ্জাবে স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের দাবী প্রতিষ্ঠিত হইতে যাইতেছে দেখিয়া লীগনেতা মিঃ জিন্না বেসামাল হইয়া উঠিয়াছেন এবং কতকগুলি অসংলগ্ন কথা বলিয়া গায়ের জ্বালা মিটাইয়াছেন। স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের দাবীর বিরুদ্ধে তাঁহার যুক্তিগুলি যে অসার এবং স্ব-বিরোধী ইহা মিঃ জিন্নার অধিক কেহ জানে না। তাই যুক্তির পথ তিনি মাড়ান নাই, কতকটা গায়ের জোরে হুঙ্কার ছাড়িয়াছেন—আর বড়লাটকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন, স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের দাবীতে যেন তিনি কর্ণপাত না করেন। বলা বাহুল্য, বড়লাটকে সতর্ক করার অর্থ লীগপন্থিগণ ইহাতে সম্মত হইবে না, সুতরাং লীগপন্থীদের অনভিমতে যেন তিনি (বড়লাট) প্রদেশ-বিভাগের দাবীতে সম্মত না হন। কায়েদে আজমের সেই পুরাতন আবদারঃ হিন্দু-মুসলমান দুইটি স্বতন্ত্র জাতি। এই দুইটি স্বতন্ত্র জাতির দুইটি স্বতন্ত্র বাসভূমি চাই। ভারতবর্ষে মুসলমান সংখ্যালঘু। তাই তাহাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষা করিতে হইলে—স্বতন্ত্র সার্বভৌম রাষ্ট্র চাই। অন্যথায় সংখ্যাগুরু হিন্দুর অধীন হইয়া তাহাকে চিরকাল নিপীড়িত হইতে হইবে, হিন্দুর দাসত্ব করিতে হইবে। ভারতের জাতীয়তা একটা মিথ্যা বস্তু, হিন্দু-মুসলমানে কোথাও স্বার্থের ঐক্য নাই, বরং বিরোধ বিদ্যমান। এই অবস্থায় সংখ্যালঘু মুসলমানকে স্বতন্ত্র বাসভূমি গঠন করিয়া স্বতন্ত্র রাষ্ট্র স্থাপন করিতেই হইবে। অর্থাৎ ভারতের জনসমষ্টির শতকরা ২৪ জন মুসলমান হইলেও তাহাদের জন্য পাকিস্থান চাই—সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু এবং বাঙলা ও আসাম লইয়া হইবে সেই পাকিস্থান। অর্থাৎ শতকরা ২৪ জনের দাবীপূরণ করিতে ভারত খণ্ডন করিতেই হইবে। কিন্তু বাঙলা বিভাগ করা চলিবে না। তাহার অর্থ, যে কারণে ২৪ জনের জন্য ভারত-বিভাগ প্রয়োজন, সেই একই কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও—শতকরা ৪৫ জন হিন্দুর জন্য বঙ্গ-বিভাগ করা চলিতে পারে না। স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া মুসলমানের স্বতন্ত্র বাসভূমি ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র চাই, কিন্তু স্বতন্ত্র জাতি হইলেও বাঙলার হিন্দুর বেলায় তাহা হইবে না। ইহা মামারবাড়ির আবদার হইতে পারে, কিন্তু বাঙলার হিন্দু এবং পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখ তাহা মানিতে যাইবে কোন্ দুঃখে? মিঃ জিন্নার অযৌক্তিক ও অবাস্তব দাবীর খাতিরে যদি ভারত খণ্ডিতই হয়—তাহা হইলে বাঙলার যে অঞ্চলে হিন্দুর সংখ্যাধিক্য সেই অঞ্চলে হিন্দুর বাসভূমি ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের দাবী ঠেকাইতে পারে কে? বাঙলা ও পাঞ্জাব বিভাগে মিঃ জিন্নার অযৌক্তিক আপত্তিতে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ যে উত্তর দিয়াছেন—তাহাই চরম উত্তর। ভারত খণ্ডন কংগ্রেস চাহে নাই, হিন্দু চাহে নাই। ইহা একমাত্র মিঃ জিন্নারই অশুভ প্রয়াসের ফলে ঘটিতে যাইতেছে। যদি, জিন্না সাহেবের যুক্তি অনুযায়ী, ইহাই সত্য হয় যে, বিভাগ ভিন্ন ভারতের শান্তি নাই, তাহা হইলে সেই বিভাগ প্রদেশেও অনিবার্য হইবে। বিরোধের কোন সুযোগই কোথাও রাখা হইবে না।

মিঃ জিন্নার দাবী গোটা বাঙলাই হইবে মুসলমানের বাসভূমি। হিন্দু যদি হিন্দুর বাসভূমিতে যাইতে চাহে, তবে যুক্তপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ বা অন্য হিন্দুপ্রধান অঞ্চলে গিয়া বাসা বাঁধুক। হিন্দু যদি বাঙলায় থাকে, তবে তাহাকে নিজ বাসভূমে পরবাসীরূপে পাকিস্থানী শাসনে শোষিত ও নিপীড়িত হইয়াই থাকিতে হইবে। এই অধীনতা ও অমর্যাদাই তাহার নিয়তি। মিঃ জিন্নার ইহা নিতান্তই দুঃস্বপ্ন।

মিঃ জিন্নার হিন্দুপ্রধান আসামকেও পাকিস্থানের অন্তর্গত করিবার দাবীর মতো নির্লজ্জ দাবী অন্যের পক্ষে কল্পনা করাও শক্ত। বহুকাল বৃটিশ প্রশ্রয়ে অসঙ্গত দাবী তুলিয়া এবং তাহাই মূল্যে লাভ করে দেখিয়াই আসামের উপর দাবী উপস্থিত করিতে তাঁহার বাধে নাই।

সীমান্তের গভর্নর

সীমান্তের কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল যতই জনপ্রিয় এবং গণতন্ত্রসম্মত হউক সীমান্তের গভর্নর স্যার ওলাফ কারোর তাহা যে সহ্য হইতেছে না, পাকেচক্রে তিনি লীগদলীয় তাঁবেদার মন্ত্রিমণ্ডলকে কামনা করেন—ইহা বহুদিন হইতেই শুনিয়া আসিতেছি। সীমান্ত প্রদেশের বর্তমান অশান্তির মূলে যে গভর্নরের এবং তাঁহার সমর্থনপুষ্ট কতিপয় সরকারী আমলা আচরণ কার্য করিয়াছে এইরূপ অভিযোগ ইতিপূর্বেই শুনা গিয়াছে।

সীমান্তের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ রিপোর্ট দাখিলের জন্য কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক আচার্য যুগলকিশোর, দেওয়ান চমনলালকে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু অনুরোধ করিয়াছিলেন। তদনুযায়ী তাঁহারা সীমান্তের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া সম্প্রতি যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ, সীমান্তের গভর্নর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাঁহার আচরণের দ্বারাই মুসলিম লীগকে উৎসাহিত করিয়াছেন। সীমান্তের বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলকে অপসারণের জন্য লীগ দল আইন বিগর্হিত কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে, নৃশংসতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে। লীগের আন্দোলন আরম্ভ হইবার পর শত শত লোক খুন হইয়াছে। শত শত গৃহ ও দোকান ভস্মীভূত হইয়াছে। কিন্তু গবর্নর ও তাঁহার সমর্থনপুষ্ট আমলাতন্ত্রের আচরণে দুষ্কৃতকারীদের দমন করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে।

একটি জনপ্রিয় মন্ত্রিমণ্ডলকে অপসারণের জন্য প্রদেশের গবর্নরের ষড়যন্ত্র ও শাসনতান্ত্রিক অভিপ্রায়-বিরোধী কার্য নূতন নহে, কিন্তু সীমান্তের গবর্নরের ও তাঁহার সমর্থনপুষ্ট আমলাগণের আচরণের মতো নিন্দিত আচরণ ইতিপূর্বে কোথাও হয় নাই। এই গভর্নরের ভরসায়ই লীগ মনে করে যে, সীমান্তে শীঘ্রই ৯৩ ধারা শাসন প্রবর্তিত হইবে। ৯৩ ধারা আসন্ন কথা প্রচার করিয়া লীগ অনুচরদের দুষ্কার্যে উৎসাহ দান করা হইতেছে। কিন্তু সীমান্তে ৯৩ ধারা প্রয়োগের কোন কারণই নাই। ইহাই সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, স্যার ওলাফ কারোর অপসারণই সীমান্তে শান্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষে অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। মাউণ্টব্যাটেন এই সম্পর্কে কিভাবে কর্তব্য পালন করিবেন—তাহা দেখিবার।

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের মহাকবিদের অন্যতম। ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস ও তুলসীদাসের নামের সহিত তাঁহার নাম চিরকালের জন্য গ্রথিত হইয়া এই নামমালাকে নূতন দীপ্তি ও মহত্ত্বদান করিয়াছে। ব্যাস বাল্মীকির পৌরাণিক যুগ হইতে কালিদাস ও তুলসীদাসের প্রাচীন ও মধ্যযুগ, ভারতীয় প্রতিভার যে জ্যোতিতে ভাস্বর ছিল রবি-প্রতিভায় তাহাই প্রতিভাসিত। ভারতের পক্ষে এই আলোক নূতনও নহে, পুরাতনও নহে, চিরন্তন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় ভারতের পুরাণী-প্রজ্ঞা ও পুরাণী-প্রতিভা নূতন করিয়া দেখা দিয়াছে মাত্র। এ বিষয়ে সব সময়ে আমরা সচেতন নই কিন্তু পরোক্ষ চৈতন্য কোথায় যাইবে? যখন আমরা রবীন্দ্রনাথকে লইয়া গৌরব করি, রবীন্দ্র-প্রতিভার মহত্ত্ব স্বীকার করি—তখন কি প্রকারান্তরে ভারতীয় পুরাণী-প্রজ্ঞা ও প্রতিভার গৌরব ও মহত্ত্বকেই প্রচার করি না?

পূর্বোক্ত মহাকবিগণের কাব্যধারায় ঐতিহ্যের যে অবিচ্ছিন্নতা বিদ্যমান তাহাই চরমভাবে প্রমাণ করিয়া দেয় ভারতবর্ষ এক ও অখণ্ড এবং তাহা অবিভাজ্য। মৃন্ময় ভূখণ্ডকেই বিভক্ত করা যায়—চিন্ময় ভাব অখণ্ড ও অবিভাজ্য। ভারতবর্ষ যেভাবে একটি ভৌগোলিক ভূখণ্ড তাহার চেয়ে অনেক অধিক পরিমাণে, অনেক সত্যতরভাবে সে একটি আইডিয়া। ভারতবর্ষের বাণীরূপেই যথার্থ ভারতবর্ষ—ইহাই ভারতবর্ষের স্বরূপ। আর এই সব মহাকবিগণ সেই বাণীরূপের সাধক ও শিল্পী, সেই বাণীরূপের রূপদক্ষ ও প্রকাশক।

রবীন্দ্র সাহিত্য বহু শিক্ষার দৃষ্টান্তস্থল। কিন্তু সবচেয়ে অধিকভাবে যে শিক্ষা এই দিব্য সাহিত্য হইতে পাওয়া যায়, তাহা এই যে চিন্ময় ভারতবর্ষ অখণ্ড ও শাশ্বত। এই দেশের উপরে ইতিহাস অল্প আঘাত করে নাই; দেশীয় বিদেশীয় ক্ষুদ্র বৃহৎ কত সংঘাতই না এই দেশকে বিপর্যস্ত করিয়াছে। এইসব আঘাতের ফলে মৌর্য, গুপ্ত, মোগল প্রভৃতি সুগঠিত সাম্রাজ্য ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে, ইংরাজের সাম্রাজ্যও আজ ভাঙ্গিয়া পড়িবার মুখে। কিন্তু এই দেশের মহাকবিগণ যে চিন্ময় বাণীরূপ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা আজও অক্ষত ও নবপ্রতিম। এ দেশের রাজনীতিক ও সম্রাটদের অপেক্ষা সাধক ও শিল্পীদের কীর্তি অধিকতর সুগঠিত। ইহা সর্বদেশ প্রযোজ্য সত্য নহে। গ্রীস দেশ এক সময়ে স্বল্পকাল স্থায়ী ইতিহাসের উৎসবে অনেক উজ্জ্বল দীপ জ্বালিয়াছিল। সে-সব দীপের অনেকগুলিই অতুলনীয়। সে-সব আজিও মানুষের গৃহ আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু সে গ্রীস আজ কোথায়? গ্রীক মনীষীগণ এমন একটি অক্ষয় অবিভাজ্য চিন্ময়রূপে প্রস্তুত করিতে পারে নাই, যাহা দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের সহিত সমান্তরভাবে প্রবাহিত। তাঁহাদের প্রতিভা অনেক পরিমাণে তাঁহাদের ব্যক্তিগত সম্পদ। ব্যক্তিগত প্রতিভাকে জাতিগত সত্তার মধ্যে বিলীন করিয়া দিতে পারিলে তবেই মৃন্ময় দেশের দোসরভাবে চিন্ময় দেশ গড়িয়া তুলিতে পারা যায়। এই দিক হইতে বিচার করিলে ভারতীয় প্রতিভা গ্রীক প্রতিভার অপেক্ষা উচ্চতর স্তরের শক্তি।

তাই আজ যখন ভারত খণ্ডনের আশঙ্কা মহাকালের খড়্গের মতো দেশবাসীর মস্তকের উপরে উদ্যত, তখন সবচেয়ে বেশি করিয়া মনে পড়িতেছে এইসব মহাকবিদের নাম—ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, তুলসীদাস ও রবীন্দ্রনাথের নাম। কিন্তু শুধু আশঙ্কা বলিলে যথেষ্ট হইবে না, ওই সঙ্গে আশাও বলিতে হইবে। ভৌগোলিক ভারতবর্ষ কখনো কখনো বিভক্ত হইয়াছে, কিন্তু সেই বিভাজনে তাহার চিন্ময়রূপে কখনো আহত হয় নাই, তাহাতে কখনো দ্বিধার চিহ্ন পড়ে নাই। এই চিন্ময় ভারতবর্ষ যতক্ষণ না পীড়িত হইতেছে, দ্বিধাগ্রস্ত হইতেছে, ততক্ষণ ভূগোলের সাময়িক দ্বিধায় সত্যকার আশংকার কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না।

ভারতের চিন্ময় রূপের প্রসঙ্গে বাঙলা দেশের অংশ বিশেষকে ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত করিবার যে দাবী উঠিয়াছে, তাহাতে আসিয়া পড়িলাম। এই দাবীকে সংক্ষেপে বলিতে পারা যায়, ভারতভুক্তি। ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকার অর্থ চিন্ময় ভারত হইতে নির্বাসিত থাকা। হঠাৎ মনে হইতে পারে যে বাঙালী এক সময়ে বঙ্গভঙ্গ রদ করিবার জন্য কত কাণ্ডই না করিয়াছিল—আজ সে তাহার বিপরীত কার্যে উদ্যত। ইহা কি ইতিহাসের একটি বিড়ম্বনা নয়? রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ছিলেন বঙ্গভঙ্গ রদের অন্যতম ভাবনেতা। আমরা কি রবীন্দ্রনাথের পদচিহ্নিত পথের বিপরীতে যাত্রা করিতেছি না? এই জাতীয় চিন্তা স্বল্প প্রণিধানের ফল। বঙ্গভঙ্গ রদের মূলে ছিল বাঙালীর সংস্কৃতিকে রক্ষা করিবার চেষ্টা। আর আজ যে ভারতভুক্তির দাবী উত্থাপিত হইয়াছে, তাহারও মূলে কি ওই একই ইচ্ছা কাজ করিতেছে না? বাঙালীর সংস্কৃতি যাহার অপর নাম ভারতীয় সংস্কৃতি তাহাকে রক্ষা করা, ভারতবর্ষরূপে তাহার উৎপত্তিস্থলের সহিত তাহাকে সংযুক্ত করিয়া রাখাই কি এই প্রচেষ্টার মূল কথা নয়? তবে এই দুইয়ে প্রভেদ কোথায়? বিরোধ কোথায়? দুই-ই এক—আকৃতিতে ভিন্ন প্রকৃতিতে এক। তাহাই কি নয়?

আজ রবীন্দ্রনাথের পুণ্য জন্মতিথি উপলক্ষে এক চিন্তার কৌতূহল জন্মিতেছে—আজ আমাদের সৌভাগ্যক্রমে মহাকবি জীবিত রূপে বিরাজমান থাকিলে তিনি কিভাবে ইহার সমাধান করিতেন? বলা বাহুল্য, চিন্তাশীল বাঙালী ও ভারতীয়গণ এই প্রশ্নের সমাধানের আশায় তাঁহার উদার দ্বারে সমবেত হইতেন। তখন বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাবনেতা কি উত্তর দিতেন? তিনি কি তাঁহার কৃতকীর্তির বিরুদ্ধাচার করিতেন?

কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, বঙ্গভঙ্গ রদ ও ভারতভুক্তি সমস্যা বস্তুত একই সমস্যা। আর মনে রাখিতে হইবে রবীন্দ্রনাথের জন্মস্থান বাঙলাদেশ হইলেও তাঁহার ভাবমাতৃভূমি ভারতবর্ষ। তিনি ভারতের চিন্ময়রূপকারদের অন্যতম। মনে রাখিতে হইবে যাঁহাদের প্রতিভার ফলে ও সাধনার সাফল্যে ভারতবর্ষ একীভূত হইয়া বিরাজ করিতেছে, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। এতগুলি কথা স্মরণ রাখিলে রবীন্দ্রনাথ কি উত্তর দিতেন তাহা অনুমান করিয়া লওয়া কঠিন নয়। মৃন্ময় রূপের অখণ্ডতা রক্ষা করিতে গিয়া চিন্ময় রূপকে খণ্ডিত করিবার উপদেশ নিশ্চয় তিনি দিতেন না। তাঁহার প্রতিভা ও সাহিত্যের সামান্য অংশও যদি বুঝিয়া থাকি, তবে বলিতে পারি ভারতবর্ষের চিন্ময়রূপের অখণ্ডতা রক্ষার উদ্দেশ্যে ভারতভুক্তি দাবীকে তিনি অন্তরের আশীর্বাদ দিয়া ধন্য করিতেন। এমন যে করিতেন তাহার কারণ তিনি নিজেই যে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি। যে ভূখণ্ডে তাঁহার পাদপীঠ ন্যস্ত তাহা বাঙলা হইতে পারে, কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষই যে তাঁহার সাধনার পটভূমি, তাঁহার মানসিক আকাশ। ইহার বিপরীত কথা বলা যে তাঁহার সমগ্র জীবনের সাধনার ব্যতিক্রম।

রবীন্দ্রনাথ ভারতের মহাকবি, তিনি পৃথিবীর মহাকবিদের অন্যতম, তিনি বাঙলা দেশকে ভারতচেতন করিয়াছেন, ভারতবর্ষকে পৃথিবীর সহিত গ্রথিত করিয়াছেন, পৃথিবীকে নূতন দিগ্দর্শন দিয়াছেন; তিনি স্বদেশবাসীকে উচ্চতর পদবীতে উন্নত করিয়াছেন আর বিশ্ববাসীকে ভারতসমুদ্রের তীরে আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন। এ যুগের যে দুইজন বিরাট পুরুষের সাধনা ও প্রতিভা ভারতবর্ষের প্রতীক ও প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের অন্যতর। ভারতীয় সংস্কৃতি যে এক ও অখণ্ডনীয়—রবীন্দ্রনাথই তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। ভারতীয় সংস্কৃতির এক ও অবিভাজ্যতার স্বপক্ষে যে-সব যুক্তি আছে রবীন্দ্রনাথই তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ যুক্তি। ভারতবর্ষের চিন্ময় সত্তার অখণ্ডতার তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ আশা। আজ তাঁহার শুভ জন্ম তিথিতে সেই প্রমাণ, যুক্তি ও আশা স্মরণ করিয়া কবিগুরুর উদ্দেশ্যে আমাদের প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি।

পঁচিশে বৈশাখ

চির নূতনেরে দিল ডাক
পঁচিশে বৈশাখ।

চারিদিকে যা অট্টকলরোল, ভয় হয় বুঝিবা এবার পঁচিশে বৈশাখের ডাক বাঙলাদেশ শুনতে পাবে না। মারণলীলার তান্ডবে জীবনের জয়গান হয়ত কাণে এসে পেঁছিবে না। সত্যি যদি না পেঁাছে তবে বুঝতে হবে বাঙলা দেশ যথার্থই মরেছে। ভেদ বিভেদ কলহ সমস্ত ভুলে সমগ্র বঙ্গদেশ অন্তত আজকের দিনটিতে নত মস্তকে পঁচিশে বৈশাখকে স্মরণ করুক। অন্তত একটি দিনের জন্য—সকল বাক্য, সকল শব্দ হউক স্তব্ধ।

যে দেশে মৃত্যু অতি সুলভ সে দেশে জীবনও সুলভ। এহেন দেশের লোক মহামানবের জন্ম মুহূর্তকে কখনো যথার্থ মূল্য দিতে শেখে না। প্রতিদিনের অসংখ্য জন্ম মৃত্যুর মতো সেটাকে সাধারন ঘটনা বলে গ্রহণ করে। জানে না যে মহামানবের আবির্ভাব একটা অতি প্রাকৃতিক phenomenon, যে ব্যক্তির আগমনে তাঁর সমকালীন পৃথিবী তোলপাড় হতে বাধ্য, তাঁর জন্ম মুহূর্ত পূর্বাহ্নে কোনো প্রাকৃতিক fanfare-এর দ্বারা ঘোষিত হলে তবেই বোধহয় সাধারণ মানুষের চৈতন্যোদয় হতে পারে—যিশু খৃষ্টের জন্ম মুহূর্তে যেমন আকাশে নতুন নক্ষত্রোদয়ের কিম্বদন্তী আছে। রবীন্দ্রনাথ নিজে যে ভাষায় মহামানবের আগমন ঘোষণা করেছেন তার মধ্যে আমি যে phenomenon-এর কথা বলেছি তার আভাস আছে—দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে, মর্তধূলির ঘাসে ঘাসে। শুধু মর্তধূলির ঘাসে ঘাসে নয়, ছ'কোটি বাঙালীর দেহে মনে সেই রোমাঞ্চ লাগুক।

অপরের কথা জানিনে। আমি বাঙালী, রবীন্দ্র যুগের বাঙালী, পঁচিশে বৈশাখের রোমাঞ্চ আমার রক্তের মধ্যে সঞ্চারিত। বর্ষে বর্ষে সেই চির নূতনের ডাক আমার মনে যে রোমাঞ্চ জাগায় আমার পাঠক পাঠিকাদের কাছে সে কথাটি প্রাণ খুলে বলতে না পারলে মনে শান্তি পাইনে।

রবীন্দ্রনাথ বাঙলা সাহিত্যের জন্য কি করেছেন, বাঙালী জাতি তথা ভারতবাসীর গৌরব কতখানি বৃদ্ধি করেছেন এবং দেশ কালের ভূমিকা পার হয়ে তাঁর বাণী ভবিষ্যৎ মানবকে কতখানি উদ্বুদ্ধ করবে সে সব তত্ত্বের আলোচনা পণ্ডিতেরা করবেন। আমি তার ধার দিয়েও যাব না। কারণ আমার এ লেখা ইস্কুল-পাঠ্য পুস্তকে ছাপা হবার আশা রাখি না। আমি শুধু আমার নিজের কথাই বলতে পারি,

এবং সে কথা বলতে গেলে চল্লিশ বছরের উজান ঠেলে আমার জীবনের প্রত্যুষ মুহূর্তে গিয়ে পেঁাছতে হয়।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে আমার জন্ম। আন্দোলনের বন্যা যখন কূল ছাপিয়ে বাঙালীর ঘরে ঘরে প্রবেশ করেছে আমি তখন নিতান্ত শিশু। আমাদের পরিবারে সেই আন্দোলনের ঢেউ প্রবল বেগে প্রবেশ করেছিল। পিতা ছিলেন উৎসাহী কর্মী। রবীন্দ্রনাথ রচিত স্বদেশী উন্মাদনা সঙ্গীতে বাঙালী অন্তঃপুর তখন মুখরিত। সেই গান গেয়ে আমাকে ঘুম পাড়ানো হত। অবশ্য সেগুলো ঘুমপাড়ানি গান নয় বরং ঘুম-ভাঙানি গান। নিশ্চয় ঐ গান শুনেই আবার আমার ঘুম ভাঙত। বাঙলা দেশের সেই নব-অভিজ্ঞানের ইতিহাস আমার শিশু মনকে রঞ্জিত করেছিল। প্রথম আন্দোলনের ঢেউ ক্রমে স্তিমিত হয়ে এলেও বহুকাল পর্যন্ত তার স্রোত আমাদের পরিবারের মধ্যে প্রবাহিত ছিল। আমার পিতা দেবধর্ম মানেন না। কিন্তু মনে আছে বালক বয়সে আমরা ভাই-বোনেরা মিলে সকাল সন্ধ্যায় একটি প্রার্থনা মন্ত্র উচ্চারণ করতাম। সে মন্ত্র সংস্কৃত ভাষায় লেখা নয়, লেখা রবীন্দ্রনাথের বাঙলা ভাষায়—বাঙলার মাটি, বাঙলার জল ইত্যাদি। বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন এক হউক, এক হউক, এক হউক, হে ভগবান। (আজকের দিনে এই প্রার্থনা বাক্য আরো বেশি সত্য হয়ে উঠেছে। যাঁরা খাঁটি নির্জলা সত্যিকারের বাঙালী তারা যথার্থই এক হবে। আর যারা মেকি বাঙালী, যারা নিজেদের ভিন্ন জাতীয় বলে মনে করে তারা আলাদা হয়ে যাক্, তাতে বাঙালীর কল্যাণ হবে।) যাক্ যে কথা বলছিলাম। তখনও আমার শিশু মনে রবীন্দ্রনাথের ছবি অস্পষ্ট। কিন্তু সেদিনের কথা ভুলব না যেদিন প্রথম পড়েছিলাম—নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ। বালক মনের সে কি বিস্ময়! চ্যাপম্যান্-এর হোমার পড়ে কিটস্ এর যে বিস্ময় একমাত্র তারই সঙ্গে এর তুলনা হতে পারে। এ কি আশ্চর্য কবিতা—এর প্রতি কথা, প্রতি ছত্র যে আমারই মনের কথা। এ কবিতাটা নিতান্ত আমারই লেখা উচিত ছিল। বেশ মনে আছে মনে মনে বিষম ক্রোধ হয়েছিল।

আমি নেহাৎ বয়সে ছোট, তারই সুবিধে নিয়ে ভদ্রলোক কিনা আমার মনের কথা সব আগে ভাগেই বলে বসে আছেন। এ যে বিষম জবরদস্তি। নির্বোধ বালকের ক্রোধ শান্ত হতে অনেক দিন লেগেছিল। কিন্তু রাগের পশ্চাতে আরেকটা রাগ থাকে, তাকে বলে অনুরাগ। যিনি আমাদের অন্তরের কথা জানেন তাঁকে আমরা বলি অন্তর্যামী। সেদিন আমি তাঁকে অন্তর্যামীর আসনে বসিয়েছি। সেজন্যই তো বলেছি পঁচিশে বৈশাখের ডাক আমার রক্তের মধ্যে সঞ্চারিত। এমন একান্ত আপনার মানুষ বলে আর কাউকে জানিনি। কারণ তিনি আমার ঘুমপাড়ানি গানের সঙ্গে জড়িত, আমার শিশু মনের প্রার্থনা তাঁর ভাষায় উচ্চারিত, আমার কৈশোর স্বপ্ন তাঁর কাব্যে রূপান্তরিত।

মনে আছে কলেজে যখন পড়তুম তখন সহপাঠী এক বন্ধু একদা জিগগেস করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের সব চেয়ে বড় দান কি বলতো? যে কোনো পণ্ডিত ব্যক্তির এমন প্রশ্নে থতমত খেয়ে যাবার কথা। কিন্তু তখন বয়স অল্প। কোনো প্রশ্নকেই ভয় করি না এবং জবাব দিতেও বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় না। তৎক্ষণাৎ বল্লুম, এই মৃত-যৌবন দেশে রবীন্দ্রনাথ যৌবন এনে দিয়েছেন। সেদিন এই জবাবটির মধ্যে জ্ঞানবুদ্ধির চাইতে প্রগলভতাই ছিল বেশী। আজকে চল্লিশ উত্তীর্ণ করে দিয়ে সেই প্রগলভতা অনেক পরিমাণে স্তিমিত হয়ে এসেছে। কিন্তু আজও যদি কেউ ঐ প্রশ্ন জিগগেস করে তবে বিনা দ্বিধায় ঐ একই জবাব দেব। কারণ এখন মনে প্রাণে সেই সত্যকে অনুভব করেছি। যে দেশের লোকে কথায় কথায় বলে মরলেই বাঁচি সেই অর্ধমৃত দেশে রূপে রসে গন্ধে বৈচিত্র্যে জীবনকে মনোহর করে তিনিই প্রথম দেখিয়েছেন। জীবনের পাত্র পূর্ণ করে তিনি অমৃত বিতরণ করেছেন, আমরা অঞ্জলি ভরে পান করেছি। গত অর্ধশতাব্দি কাল ধরে বাঙালীর যে প্রাণশক্তি দিকে দিকে স্ফুরিত হয়েছিল তার প্রধান উৎস রবীন্দ্র কাব্য নির্ঝর। ঐ দেখুন, বাঙালীকে তিনি কি দিয়েছেন সে কথা বলবার কথাই ছিল না। আমি কি পেয়েছি সে কথা বলবার জন্যই আজকের লেখা। সেই কথাটি বলে শেষ করি। কিন্তু অক্ষম আমার লেখনী। সে কথাটি রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলতে হবে—

—হাত ধরে মোরে তুমি
লয়ে গেছ সৌন্দর্যের সে নন্দন ভূমি
অমৃত আলয়ে। সেথা আমি জ্যোতিষ্মান
অক্ষয়-যৌবন-ময় দেবতা সমান
সেথা মোর লাবণ্যের নাহি পরিসীমা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সংকলিত রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী অনুসারে রবীন্দ্রনাথ-রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ২৮৩। এই বিশাল গ্রন্থরাজির অন্তর্ভুক্ত হয় নাই রবীন্দ্রনাথের এরূপ অনেক বহুমূল্য রচনা এখনো নানা পুরাতন সাময়িক পত্রে—অনেকগুলি স্বাক্ষরহীনতার অন্তরালে—লুপ্তপ্রায় হইয়া আছে। এইরূপ অনেকগুলি রচনা আমরা বিশ্বভারতীর অনুমতি অনুসারে ইতিপূর্বে 'দেশ' পত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করিয়াছি। রবীন্দ্র-জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বর্তমান সংখ্যায় এইরূপ আর দুইটি রচনা প্রকাশিত হইল; ইহার একটি স্বাক্ষরহীন হইলেও স্পষ্টতই রবীন্দ্র-রচনা। শ্রীপুলিনবিহারী সেন এই রচনা দুইটি আমাদের সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। ১২৯২ সালের 'ভারতী' পত্রিকায় এ দুইটি প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার কিছুদিন পূর্বেই মৃত্যুর সহিত তাঁহার "স্থায়ী পরিচয়" হইয়াছে—এই রচনাগুলিতেও সে পরিচয়ের চিহ্ন আছে, "শোকের ঝটিকায় সমস্ত ভূমিসাৎ হইয়া......অনন্তের রাজপথে বাহির হইয়া পড়ি'বার বেদনার প্রকাশ আছে। —সম্পাদক, "দেশ"]

১

আমি মাঝে মাঝে ভাবি, এই পৃথিবী কত লক্ষ কোটি মানুষের কত মায়া কত ভালবাসা দিয়া জড়ান। কত যুগযুগান্তর হইতে কত লোক এই পৃথিবীর চারিদিকে তাহাদের ভালবাসার জাল গাঁথিয়া আসিতেছে! মানুষ যেটুকু ভূমিখণ্ডে বাস করে, সেটুকুকে বড়ই ভালবাসে। সেইটুকুর মধ্যে চারিদিকে গাছটি পালাটি, ছেলেটি, মেয়েটি, তাহার ভালবাসার কত জিনিষপত্র দেখিতে দেখিতে জাগিয়া উঠে; তাহার প্রেমের প্রভাবে সেইটুকু ভূমিখণ্ড কেমন মায়ের মত মূর্তি ধারণ করে, কেমন পবিত্র হইয়া উঠে, মানুষের হৃদয়ের আবির্ভাবে বন্য প্রকৃতির কঠিন মৃত্তিকা লক্ষ্মীর পদতলস্থ শতদলের মত কেমন অপূর্ব সৌন্দর্য প্রাপ্ত হয়! ছেলেপিলেদের কোলে করিয়া মানুষ যে গাছের তলাটিতে বসে, সে গাছটিকে মানুষ কত ভালবাসে, প্রণয়িনীকে পাশে লইয়া মানুষ যে আকাশের দিকে চায়, সেই আকাশের প্রতি তাহার প্রেম কেমন প্রসারিত হইয়া যায়? যেখানেই মানুষ প্রেম রোপণ করে, দেখিতে দেখিতে সেই স্থান প্রেমের শস্যে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। মানুষ চলিয়া যায়, কিন্তু তাহার প্রেমের পাশে পৃথিবীকে সে বাঁধিয়া রাখিয়া যায়। সে ভালবাসিয়া যে গাছটি রোপণ করিয়াছিল, সে গাছটি রহিয়া গেছে, তাহার ঘরবাড়িটি আছে, ভালবাসিয়া সে কত কাজ করিয়াছে সে কাজগুলি আছে—জয়দেব তাঁহার কেন্দুবিল্ব গ্রামের ...নে বসিয়া ভালবাসিয়া কতদিন মেঘের দিকে চাহিয়া গিয়াছেন, তিনি নাই কিন্তু তাঁহার সেই বহুদিনসঞ্চিত ভালবাসা একটি গানের সুরে রাখিয়া গিয়াছেন—মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্বনবৈঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ। অতীত কালের সংখ্যাতীত মৃত মনুষ্যের প্রেমে পৃথিবী আচ্ছন্ন: সমস্ত নগর গ্রাম কানন ক্ষেত্রে বিস্মৃত মনুষ্যের প্রেম শত সহস্র আকারে শরীর ধারণ করিয়া আছে, শত সহস্র আকারে বিচরণ করিতেছে। মৃত মনুষ্যের প্রেম ছায়ার মত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে; আমাদের সঙ্গে শয়ন করিতেছে; আমাদের সঙ্গে উত্থান করিতেছে।

২

আমরাও সেই মৃত মনুষ্যের প্রেম, নানা ব্যক্তি-আকারে বিকশিত। আমাদের এক-একজনের মধ্যে অতীতকালের কত কোটি কোটি মাতার মাতৃস্নেহ, কত কোটি কোটি পিতার পিতৃস্নেহ, কত কোটি কোটি মনুষ্যের প্রণয় প্রেম সৌহার্দ্য পুঞ্জীভূত হইয়া জীবন লাভ করিয়া বিরাজ করিতেছে। কত বিস্মৃত যুগযুগান্তর আমার মধ্যে আজ আবির্ভূত। তাই যখন শুনি আমাদের অতি প্রাচীন পূর্বপুরুষদের সময়েও "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে মেঘমাশ্লিষ্ট সানু" দেখা যাইত, তখন এমন অপূর্ব আনন্দ লাভ করি! তখন আমরা আমাদের আপনাদের মধ্যে আমাদের সেই পূর্বপুরুষদিগকে অনুভব করিতে পাই, তাঁহাদের সেই মেঘ-দেখার সুখ আমাদের আপনাদের মধ্যে লাভ করি, বুঝিতে পারি আমাদের পূর্বপুরুষদিগের সহিত আমরা বিচ্ছিন্ন নহি। যাঁহারা গেছেন তাঁহারাও আছেন।

৩

মানুষের প্রেম যেন জড়পদার্থের সঙ্গেও লিপ্ত হইয়া যাইতে পারে। নূতন বাড়ির চেয়ে যে বাড়িতে দুইপুরুষে বাস করিয়াছে, সেই বাড়ির যেন বিশেষ একটা কি মাহাত্ম্য আছে! মানুষের প্রেম যেন তাহার ইঁটকাঠের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আছে এমনি বোধ হয়। বিজনে অরণ্যের বৃক্ষ নিতান্ত শূন্য, কিন্তু যে বৃক্ষের দিকে একজন মানুষে চাহিয়াছে, সে বৃক্ষে সে মানুষের চাহনি যেন জড়িত হইয়া গেছে। বহুদিন হইতে যে গাছের তলায় রৌদ্রের বেলায় মানুষ বসে, সে গাছে যেমন হরিৎবর্ণ আছে তেমনি মনুষ্যত্বের অংশ আছে। স্বদেশের আকাশ আমাদের সেই পূর্বপুরুষদিগের প্রেমে পরিপূর্ণ—

আমাদের পূর্বপুরুষদিগের নেত্রের আভা আমাদের স্বদেশ-আকাশের তারকার জ্যোতিতে জড়িত। স্বদেশের বিজনে আমাদের শত সহস্র সংগীরা বাস করিতেছেন. স্বদেশ আমাদের দীর্ঘজীবন, আমাদের শত সহস্র বৎসর পরমায়ু।

৪

ছেলেবেলা হইতে দেখিয়া আসিতেছি আমাদের বাড়ির প্রাচীরের কাছে ঐ প্রাচীন নারিকেল গাছগুলি সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে। যখনি ঐ গাছগুলিকে দেখি, তখনি উহাদিগকে রহস্য-পরিপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। উহারা যেন অনেক কথা জানে! তা নহিলে উহারা অমন নিস্তব্ধ দাঁড়াইয়া আছে কেন? বাতাসে অমন ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িতেছে কেন? পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার সময়ে উহাদের মাথার উপর-কার ডালপালার মধ্যে অমন অন্ধকার কেন? গাছেরা বাস্তবিক রহস্যময়! উহারা যেন বহুদিন দাঁড়াইয়া তপস্যা করিতেছে! এ পৃথিবীতে সকলেই আনাগোনা করিতেছে, কিন্তু আনাগোনার রহস্য কেহই ভেদ করিতে পারিতেছে না। বৃক্ষের মত যাহারা মাঝখানে খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহারাই যেন এই অবিশ্রাম আনাগোনার রহস্য জানে। চারিদিকে কত-কে আসিতেছে যাইতেছে, উহারা সমস্তই দেখিতেছে, বর্ষার ধারায়, সূর্যকিরণে, চন্দ্রালোকে আপনার গাম্ভীর্য লইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

৫

ছেলেবেলায় এককালে যাহারা এই গাছের তলায় খেলা করিয়াছে, যাহাদের খেলা একেবারে সাঙ্গ হইয়া গেছে, আজ এ গাছ তাহাদের কথা কিছুই বলিতেছে না কেন? আরও কত দ্বিপ্রহর রাতে এমনি ভাঙ্গা মেঘের মধ্য হইতে ভাঙ্গা চাঁদের আলো নিদ্রাকুল নেত্রে পরাজিত চেতনার মত অন্ধকারের এখানে সেখানে একটু আধটু জড়াইয়া যাইতেছিল; তেমন রাত্রে কেহ কেহ এই জানালা হইতে নিদ্রাহীন নেত্রে ঐ রহস্যময় বৃক্ষশ্রেণীর দিকে চাহিয়াছিল, সে কথা ইহারা আজ মানিতেছে না কেন? সে যে কি ভাবে, কি মনে করিয়া জীবনের কোন্ কাজের মধ্যে থাকিয়া ঐ গাছের দিকে,—গাছ অতিক্রম করিয়া ঐ আকাশের দিকে চাহিয়াছিল, ঐ গাছে ঐ আকাশে তাহার কোন আভাসই পাই না কেন? যেন এমন জ্যোৎস্না আজ প্রথম হইয়াছে, যেন এ বাতায়ন হইতে আমিই উহাদিগকে আজ প্রথম দেখিতেছি, যেন কোন মানুষের জীবনের কোন কাহিনীর সহিত এ গাছ জড়িত নহে। কিন্তু একথা ঠিক নয়! ঐ দেখ, উহারা যেন দীর্ঘ হইয়া মেঘের দিকে মাথা তুলিয়া সেই দূরে অতীতের পানেই চাহিয়া আছে! উহাদের ধীর গম্ভীর ঝর্ ঝর্ শব্দে সেই প্রাচীন কালের কাহিনী যেন ধ্বনিত হইতেছে, আমিই কেবল সকল কথা বুঝিতে পারিতেছি না। উহাদের ধ্যাননেত্রের কাছে অতীতকালের সুখদুঃখপূর্ণ দৃষ্টিগুলি বিরাজ করিতেছে, আমিই কেবল সেই দৃষ্টির বিনিময় দেখিতে পাইতেছি না! আজিকার এই জ্যোৎস্না রাত্রির মধ্যে এমন কত রাত্রি আছে: তাহাদের কত আলো-আঁধার লইয়া এই গাছের চারিদিকে তাহারা ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই ঐ ছায়ালোকে বেষ্টিত স্তব্ধ প্রাচীন বৃক্ষশ্রেণীর দিকে চাহিয়া আমার হৃদয় গাম্ভীর্যে পরিপূর্ণ হইয়া যাইতেছে।

৬

শোকে মানুষকে উদাস করিয়া দেয়, অর্থাৎ স্বাধীন করিয়া দেয়। এতদিন জগৎসংসারের প্রত্যেক ক্ষুদ্র জিনিষ আমাদের মাথার উপর ভারের মত চাপিয়া ছিল, আজ শোকের সময় সহসা যেন সমস্ত মাথার উপর হইতে উঠিয়া যায়। চন্দ্র সূর্য আকাশ আর আমাদিগকে ঘেরিয়া রাখে না, সুখ দুঃখ আশা আর আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখে না, ক্ষুদ্র জিনিষের গুরুত্ব একেবারে চলিয়া যায়। তখন এক মুহূর্তে আবিষ্কার করি যে আমরা স্বাধীন। যাহাকে এতদিন বন্ধন মনে করিয়াছিলাম তাহা ত বন্ধন নহে, তাহা ত লূতা-তন্তুর মত বাতাসে ছিঁড়িয়া গেল, বুঝিলাম বন্ধন কোথাও নাই; ধরা না দিলে কেহ কাহাকেও ধরিয়া রাখিতে পারে না; যাহারা বলে আমি তোমাকে বাঁধিয়াছি, তাহারা নিতান্তই ফাঁকি দিতেছে। প্রতিদিনের সুখদুঃখ, প্রতিদিনের ধূলিরাশি আমাদের চারিদিকে ভিত্তি রচনা করিয়া দেয়, শোকের এক ঝটিকায় সে সমস্ত ভূমিসাৎ হইয়া যায়, আমরা অনন্তের রাজপথে বাহির হইয়া পড়ি। এতদিন আমরা প্রতিদিনের মানুষ ছিলাম, এখন আমরা অনন্তকালের জীব; এতদিন আমরা বাড়িঘর দুয়ারের জীব ছিলাম, এখন আমরা অনন্ত জগতের সীমাহীনতার মধ্যে বাস করি। যাহাদিগকে নিতান্ত আপনার মনে করিয়াছিলাম, তাহারা তত আপনার নহে, সেইজন্য তাহাদিগকে বেশী করিয়া আদর করি, মনে করি এ পান্থশালা হইতে কে কবে কোন্ পথে যাত্রা করিব, এ দুর্দিনের সৌহার্দ্যে যেন বিচ্ছেদ বা অসম্পূর্ণতা না থাকে। যাহাদিগকে নিতান্ত পর মনে করিতাম, তাহারা তত পর নহে, এই জন্য তাহাদিগকে ঘরে ডাকিয়া আনিতে ইচ্ছা করে। এতদিন আমার চারিদিকে একটা গণ্ডী আঁকা ছিল, সে রেখাটাকে দৃঢ় প্রাচীরের অপেক্ষা কঠিন মনে হইত, হঠাৎ উল্লঙ্ঘন করিয়া দেখি, সেটা কিছুই নহে, গণ্ডীর ভিতরেও যেমন বাহিরেও তেমন। আপনিও যেমন পরও তেমনি। আপনার লোকও চিরদিনের তরে পর হইয়া যায়, তখন একজন পথিকের সহিত যে সম্বন্ধ, তাহার সহিত সে সম্বন্ধও থাকে না।

৭

সচরাচর লোকে মাকড়সার জালের সহিত আমাদের জীবনের তুলনা দিয়া থাকে। কথাটা পুরাণো হইয়া গিয়াছে বলিয়া তাহা যে কতটা সত্য তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। বন্ধনই আমাদের বাসস্থান। বন্ধন না থাকিলে আমরা নিরাশ্রয়। সে বন্ধন আমরা নিজের ভিতর হইতে রচনা করি। বন্ধন রচনা করা আমাদের এমনি স্বাভাবিক যে একবার জাল ছিঁড়িয়া গেলে দেখিতে দেখিতে আবার শত শত বন্ধন বিস্তার করি, জাল যে ছেঁড়ে একথা একেবারে ভুলিয়া যাই। যেখানেই যাই সেখানেই আমাদের বন্ধন জড়াইতে থাকি সেখানকার মানুষে, সেখানকার রাস্তায় ঘাটে, সেখানকার আচারে ব্যবহারে, সেখানকার ইতিহাসে, আমাদের জালের শত শত সূত্র লগ্ন করিয়া দিই, মাঝখানে আমরা মস্ত হইয়া বিরাজ করি। কাছে একটা কিছু পাইলেই হইল। এমনি আমরা মাকড়সা জাতি!

৮

সংসারে লিপ্ত না থাকিলে তবেই ভালরূপে সংসারের কা[illegible] করা যায়। নহিলে চোখে ধূলা লাগে, হৃদয়ে আঘাত লাগে, পা[illegible] বাধা লাগে। মহৎ লোকেরা আপন আপন মহত্ত্বের উচ্চ শিখ[illegible] দাঁড়াইয়া থাকেন, চারিদিকের ছোটখাট খুঁটিনাটি অতিক্রম করি[illegible] তাঁহারা দেখিতে পান। ক্ষুদ্র সকল বৃহৎ হইয়া তাঁহাদিগকে ব[illegible] দিতে পারে না। তাঁহাদের বৃহত্ত্ববশত চতুর্দিক হইতে তাঁহ[illegible] বিচ্ছিন্ন আছেন বলিয়াই চতুর্দিকের প্রতি তাঁহাদের প্রকৃত মমতা আ[illegible] যে ব্যক্তি সংসারের আবর্তের মধ্যস্থলে ঘুরিতেছে, সে কেবল আপ[illegible]

সহিত পরের সম্বন্ধ দেখিতে পায়, কিন্তু মহৎ যে সে আপনা হইতে বিযুক্ত করিয়া পরকে দেখিতে পায়, এইজন্য পরকে সে-ই বুঝিতে পারে। কাজ সেই করিতে পারে। হাতের শৃঙ্খল সেই ছিঁড়িয়াছে। প্রত্যেক পদক্ষেপে যে ব্যক্তি সহস্র ক্ষুদ্রকে অতিক্রম করিতে না পারে, প্রত্যেক ক্ষুদ্র উঁচুনীচুতে যাহার পা বাধিয়া যায় সে আর চলিবে কি করিয়া! সংসারের সুখে-দুঃখে যাহারা ভারাক্রান্ত, সংসারপথের প্রত্যেক সূচ্যগ্রভূমি তাহাদিগকে মাড়াইয়া চলিতে হয়। এইজন্য ঘর হইতে আঙিনা তাহাদের বিদেশ, আপনার সাড়ে তিন হাতের বাহিরে তাহাদের পর। এইজন্য তাহারা দূর দেশের কথা, জগতের বৃহত্ত্বের কথা, সত্যের অসীমত্বের কথা বিশ্বাস করিতে পারে না। আপনার খেলঘটির মধ্যে তাহাদের সমস্ত বিশ্বাস বদ্ধ। অসীম জগৎসংসারের অপেক্ষা আপনার চারিদিকের বাঁশের বেড়া ও খড়ের চাল তাহাদের নিকট অধিক সত্য।

শোকে আমাদের সংসারের ভার লাঘব করিয়া দেয়, আমাদের চরণের বেড়ি খুলিয়া দেয়, সংসারের অবিশ্রাম মাধ্যাকর্ষণ রজ্জু যেন ছিন্ন করিয়া দেয়। আমরা সংসারের সহিত নির্লিপ্ত হই। এইজন্য শোকে আমরা মহত্ত্ব উপার্জন করি। এইজন্য বিধবারা মহৎ। এইজন্য বিধবারা সংসারের কাজ অধিক করিতে পারে।

৯

মানুষের মধ্যে উদারতা এবং সংকীর্ণতা দুই থাকা চাই, কারণ তাহাই স্বাভাবিক। উদারতা এবং সংকীর্ণতার মিলনে জগত সৃষ্ট! অসীম ভাব সীমাবদ্ধ আকারে প্রকাশ হওয়ার অর্থই জগৎ। পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হওয়ার অর্থ মৃত্যু, একত্ব প্রাপ্ত হওয়ার অর্থ জীবন। অর্থাৎ, পঞ্চ একে পরিণত হওয়া, বৃহৎ ক্ষুদ্রে পরিণত হওয়াই সৃষ্টি। অতএব একাধারে ক্ষুদ্র বৃহৎ, উদারতা সংকীর্ণতা থাকাই স্বাভাবিক, ইহার বিপরীত হওয়াই অস্বাভাবিক। প্রকৃতিতে আকর্ষণ বিকর্ষণ মেলামেশা করিয়া থাকে, কেন্দ্রানুগ এবং কেন্দ্রাতিগ শক্তি এক সঙ্গে কাজ করে, ঐক্য এবং অনৈক্য এক গৃহে বাস করে। দুই বিপরীতের মিলনই এই বিশ্ব। মনুষ্য এই বিশ্ব-নিয়মের বাহিরে থাকে না। মনুষ্যও বৃহৎ এবং ক্ষুদ্রের মিলনস্থল। মনুষ্য, আপনাতে না থাকিলে, পরের দিকে যাইতে পারে না, সীমাবদ্ধ না হইলে সে অসীমের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে না, অনন্তকালে থাকিলে সে কোন-কালে হইতেই পারিত না।

১০

আমরা বদ্ধ না হইলে মুক্ত হইতে পাই না। ইংরাজিতে যাহাকে Freedom বলে তাহা আমাদের নাই, বাঙ্গালায় যাহাকে স্বাধীনতা বলে তাহা আমাদের আছে। কঠিনতর অধীনতাকেই স্বাধীনতা বলে। সর্বং পরবশং দুঃখং সর্বমাত্মবশং সুখং। কিন্তু পরের অধীন হওয়াই সহজ আপনার অধীন হওয়াই শক্ত।

স্বাধীনতার অর্থ আপনার অর্থাৎ একের অধীনতা, অধীনতার অর্থ পরের অর্থাৎ সহস্রের অধীনতা। যাহার গৃহ নাই, তাহাকে কখন গাছতলে, কখন মাঠে, কখন খড়ের গাদায়, কখন দয়াবানের কুটীরে আশ্রয় লইতে হয়; যাহার গৃহ আছে সে সংসারের অসংখ্যের মধ্যে ব্যাকুল নহে; তাহার এক ধ্রুব আশ্রয় আছে। যে নৌকা হালের অধীন নহে সে কিছু স্বাধীন বলিয়া গর্ব করিতে পারে না, কারণ সে শত সহস্র তরঙ্গের অধীন। যে দ্রব্য পৃথিবীর ভারাকর্ষণের অধীনতাকে উপেক্ষা করে, তাহাকে প্রত্যেক সামান্য বায়ু হিল্লোলের অধীনতায় দশদিকে ঘুরিয়া মরিতে হইবে। অসীম জগৎসমুদ্রে অগণ্য তরঙ্গ, এখানে স্বাধীনতা ব্যতীত আমাদের গতি নাই। অতএব, স্বাধীনতা অর্থে বন্ধনমুক্তি নহে, স্বাধীনতার অর্থ নোঙরের শৃঙ্খল গলায় বাঁধিয়া রাখা।

১১

যাহাদের সহিত চোখের দেখা মুখের আলাপ মাত্র, তাহাদের সহিত আমরা চিরদিন নির্বিরোধে কাটাইয়া দিতে পারি বিবাদ হইলেও তাহার পরদিন আবার তাহাদের সহিত হাসামুখে কথা কওয়া যায়, ভদ্রতা রক্ষা করিয়া চলা যায়। কিন্তু যেখানে গভীর প্রেম ছিল, সেখানে যদি বিচ্ছেদ হয় ত হাসিমুখে কথা কহা আর চলে না, ভদ্রতা রক্ষা আর হয় না। অনেক সময়ে উচ্চশ্রেণীর জীবের গাত্রে একটা আঁচড় লাগিলে সে মরিয়া যায় আর নিকৃষ্ট পুরুভুজকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেও সেই বিচ্ছিন্ন অংশ খেলাইয়া বেড়ায়। নিকৃষ্ট প্রেমের বন্ধনও এইরূপ বিচ্ছিন্ন হইলেও বাঁচিয়া থাকে।

১২

অনেক বড় মানুষ দেখা যায় তাহা ক্রমাগত আপনাদের চারিদিকে বিপুল মাংসরাশি সঞ্চয় করিতে থাকে, অতিশয় স্ফীত হইয়া সমাজের সামঞ্জস্য নষ্ট করে। আমার ত বোধ হয় এইরূপ বিপুল স্ফীতির যুগ পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইতেছে। এরূপ প্রচুর মাংসস্তূপ, প্রকাণ্ড জড়তা ও অসাড়তা এখনকার দিনের উপযোগী নহে। এককালে ম্যামথ্ ম্যাস্টডন্ হস্তিকায় ভেক, প্রকাণ্ডকায় সরীসৃপগণ পৃথিবীর জলস্থল অধিকার করিয়াছিল। এখন সে সকল মাংসপিণ্ডের লোপ হইয়া গেছে ও যাইতেছে। এখন পরিমিত দেহ ও সূক্ষ্মস্নায়ু জীবদিগের রাজত্ব। এখন সুমহৎ জড় পদার্থেরা অন্তর্ধান করিলেই পৃথিবীর ভার লাঘব হয়।

১৩

সেদিন আমাকে একজন বন্ধু জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, নূতন কবির আর আবশ্যক কি? পুরাতন কবির কবিতা ত বিস্তর আছে। নূতন কথা এমনিই কি বলা হইতেছে? এখন পুরাতন লইয়াই কাজ চলিয়া যায়।

সকল গরুই ত জাবর কাটিয়া থাকে, কিন্তু তাই বলিয়া ঘাস বন্ধ করিলে জাবর কাটাও বেশী দিন চলে না। নূতনই পুরাতনকে রক্ষা করিয়া থাকে। নূতনের মধ্যেই পুরাতন বাঁচিয়া থাকে, পুরাতনের মধ্যেই নূতন বাস করে। পুরাতন বৃক্ষ যে প্রতিদিন নূতন পাতা নূতন ফুল নূতন ডালপালা উৎপন্ন করে তাহার কারণ তাহার জীবন আছে। যেদিন সে আর নূতন গ্রহণ করিতে পারিবে না ও নূতন দান করিতে পারিবে না সেই দিনই তাহার মৃত্যু হইবে। নূতনে পুরাতনে বিচ্ছেদ হইলেই জীবনের অবসান। যেদিন দেখিব পৃথিবীতে নূতন কবি আর উঠিতেছে না, সে দিন জানিব পুরাতন কবিদের মৃত্যু হইয়াছে।

আমাদের হৃদয়ের সহিত প্রাচীন কবিতার যোগ-রক্ষা প্রবাহ-রক্ষা করিতেছে কে? নূতন কবিতা। নূতন কবিতা শুষ্ক হইয়া গেলে আমরা কোন্ স্রোত বাহিয়া পুরাতনের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইব? আমাদের মধ্যেকার এ দীর্ঘ ব্যবধান অবিশ্রাম লোপ করিয়া রাখিতেছে কে? নূতন কবিতা।

জগৎ হইতে সঙ্গীতের প্রবাহ লোপ করিতে কে চাহে? নূতন বসন্তের নূতন পাখীর গান বন্ধ করিতে কে চাহে! বসন্ত যদি পুরাতন গানকে প্রতি বৎসর নূতন করিয়া না গাওয়াইত, পুরাতন ফুলকে প্রতি বৎসর নূতন করিয়া না ফুটাইত তবে ত নূতনও থাকিত না পুরাতনও থাকিত না, থাকিত কেবল শূন্যতা, মরুভূমি।

—ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৯২ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[খ]

১

এক "আমি" মাঝে আসাতেই প্রকৃতিতে কত গোলযোগ ঘটিয়াছে দেখ। "আমি"কে যেমনই লোপ করিয়া ফেলিবে, অমনি প্রকৃতির পূর্বে পশ্চিমে, অতীত ভবিষ্যতে, অন্তর বাহিরে গলাগলি এক হইয়া যাইবে। "আমি" আসাতেই প্রকৃতির মধ্যে এত গৃহবিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। কাহাকেও বা আমি আমার পশ্চাতে ফেলিয়াছি, কাহাকেও বা আমার সম্মুখে ধরিয়াছি, কাহাকেও বা আমার দক্ষিণে বসাইয়াছি, কাহাকেও বা আমার বামে রাখিয়াছি। মনে করিতেছি, আমার পিঠের দিক এবং আমার পেটের দিক চিরকাল স্বভাবতই স্বতন্ত্র, কারণ জগতের আর সমস্তের প্রতি আমার অবিশ্বাস হইতে পারে, কিন্তু "আমার পিঠ" ও "আমার পেট" এ আমি কিছুতেই ভুলিতে পারি না। "আমি"কে যে যত দূরে সরাইয়াছে জগতের মধ্যে সে ততই সাম্য দেখিয়াছে। যেখানে যত বিবাদ, যত অনৈক্য, যত বিশৃঙ্খলা, "আমি"টাই সকল নষ্টের গোড়া, যত প্রেম, যত সদ্ভাব, যত শান্তি, আমার বিলোপই তাহার কারণ।

২

উদরের ভিতরকার একটা অংশই যে কেবল পাকযন্ত্র তাহা নহে, আমাদের মন ইন্দ্রিয় প্রভৃতি যাহা কিছু আছে সমস্তই আমাদের পাকযন্ত্র। ইহারা সমস্ত জগৎকে আমাদের উপযোগী করিয়া বানাইয়া লয়। আমাদের যাহা যতটুকু যেরূপ আকারে আবশ্যক, ইহাদের সাহায্যে আমরা কেবল তাহাই দেখি, তাহাই শুনি, তাহাই পাই, তাহাই ভাবি। অসীম জগৎ আমাদের হাত এড়াইয়া কোথায় বিরাজ করিতেছে। আমাদের যে জগদ্দৃশ্য, জগৎজ্ঞান, তাহা, আমাদের ভুক্ত জগৎ, পরিপাকপ্রাপ্ত জগতের বিকার, তাহা আমাদের উপযোগী রক্ত মাত্র, আমাদের ইন্দ্রিয় মনের কারখানায় প্রস্তুত হইয়া আমাদের ইন্দ্রিয় মনের মধ্যেই প্রবাহিত হইতেছে। তাহা প্রকৃত জগৎ নয়, অসীম জগৎ নহে।

৩

আমরা সকলে বাতায়নের পাশে বসিয়া আছি। আমরা বাতায়নের ভিতর হইতে দেখি, বাতায়নের বাহিরে গিয়া দেখিতে পাই না। এইজন্য নানা লোক নানা রকম দেখে। কেহ এ পাশ দেখে কেহ ও পাশ দেখে, কাহারো দক্ষিণে জানলা কাহারো উত্তরে জানলা। এই আশপাশ দেখিয়া, খানিকটা ভুল দেখিয়া, খানিকটা না দেখিয়া যত আমাদের ভালবাসা ঘৃণা, যত আমাদের তর্কবিতর্ক। এককেটি মানুষ এককেটি খড়খড়ি খুলিয়া বসিয়া আছি, কেহবা হাসিতেছি কেহবা নিশ্বাস ফেলিতেছি। জানলার ভিতরকার ঐ মুখগুলি কেহ যদি আঁকিতে পারিত! পৃথিবীর রাস্তার দুই ধারে ঐ সকল অন্তঃপুরবাসী মুখের কতই ভাব, কতই ভঙ্গী! সবাই ছবির মত বসিয়া কতই ছবি দেখিতেছে!

৪

"সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর!" কারণ অনেক সত্য কথা কে বলিতে পারে! স্থূল কারাগারের ফুটাফাটা দিয়া সত্যের দুই একটা রশ্মিরেখা শুভলগ্নে দৈবাৎ দেখিতে পাই। একটুখানি সত্যের চতুর্দিকে পুঞ্জীভূত অন্ধকার থাকিয়া যায়। সংশয় নিশীথের একটি ছিদ্রের মধ্য দিয়া বিশ্বাসকে তারার মত দেখিতে পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি মনে করে সত্যকে ফলাও করিয়া তুলিতে হইবে—তাহাকে বৃহৎ করিয়া একটা বিস্তৃত তন্ত্রের মত শাস্ত্রের মত গড়িয়া তুলিতে হইবে—প্রলোভনে এবং দায়ে পড়িয়া সে ব্যক্তি একটি সত্যের সহিত অনেক মিথ্যা মিশাল দেয়। সে আপনার কাছে আপনি প্রবঞ্চিত হয়। সত্য হীরার মত একটুখানি পাওয়া যায়, কিন্তু যা পাই তাই ভাল। কত মূল্যবান সত্যের কণিকা সঙ্গদোষে মারা পড়িয়াছে।

৫

ব্যাপ্ত হইলে যাহা অন্ধকার, সংহত হইলে তাহা আলোক; আরো সংহত হইলে তাহা অগ্নি। বৃহত্ত্বই জড়ত্ব। সংক্ষেপ সংহতিই প্রাণ। সংহত হইলেই তেজ, প্রাণ, আকার, ব্যক্তি জাগ্রত হইয়া উঠে। আমরা জড়োপাসক শক্তি-উপাসক বলিয়া বৃহত্ত্বের উপাসনা করিয়া থাকি। বৃহত্ত্বে অভিভূত হইয়া যাই। কিন্তু বৃহৎ অপেক্ষা ক্ষুদ্র অধিক আশ্চর্য। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বাষ্পরাশি অপেক্ষা এক বিন্দু জল আশ্চর্য। সুবিস্তৃত নীহারিকা অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত সৌর জগৎ আশ্চর্য। আরম্ভ বৃহৎ পরিণাম ক্ষুদ্র। আবর্তের মুখে অতি বৃহৎ আবর্তের শেষে একটি বিন্দুমাত্র। সুবিশাল জগৎ ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই ক্ষুদ্রত্বের দিকে বিন্দুত্বের দিকে যাইতেছে কি না কে জানে! কেন্দ্রের মহৎ আকর্ষণে পরিধি সংক্ষিপ্ত হইয়া কেন্দ্রত্বে আত্মবিসর্জন করিতে যাইতেছে কি না কে জানে!

৬

যত বৃহৎ হই তত দেশকালের অধীন হইতে হয়। আয়তন লইয়া আমাদিগকে কেবল যুদ্ধ করিতে হয়। কাহার সঙ্গে? দানব কাল ও দানব দেশের সঙ্গে। দেশকাল বলে—আয়তন আমার; আমার জিনিষ আমাকে ফিরাইয়া দাও। অবিশ্রাম লড়াই করিয়া অবশেষে কাড়িয়া লয়। শ্মশানক্ষেত্রে তাহার ডিক্রি জারি হয়। আমাদের ক্ষুদ্র আয়তন মহা-আয়তনে মিশিয়া যায়।

৭

কিন্তু আমরা জানি আমরা মৃত্যুকে জিতিব। অর্থাৎ দেশকালকে অতিক্রম করিব। মনুষ্যের অভ্যন্তরে এক সেনাপতি আছে সে দৃঢ়বিশ্বাসে যুদ্ধ করিতেছে। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মরিতেছে কিন্তু যুদ্ধের বিরাম নাই। অনেক মরিয়া তবে বাঁচিবার উপায় বাহির হইবে। আমরা সংহতিকে অধিকার করিয়া ব্যাপ্তিকে জিতিব মনুষ্যত্বের এই সাধনা।

৮

সংহতিকে অধিকার করাই শক্ত। আমাদের হৃদয় মন বাষ্পের মত চারিদিকে ছড়াইয়া আছে। হু হু করিয়া ব্যাপ্ত হইয়া পড়া যে বাষ্পের স্বাভাবিক গুণ—আমরাও তেমনি স্বভাবতই চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ি—অভ্যন্তরে সুদৃঢ় আকর্ষণ শক্তি না থাকিলে আমার হইয়া আমরা পর হইয়া যাই। আমাকে বিন্দুতে নিবিষ্ট করা শক্ত। যোগীরা এই বিন্দুমাত্রে স্থায়ী হইবার জন্য বৃহৎ সংসারের আশ্রয় ছাড়িয়াছেন। সূচ্যগ্রস্থানের জন্যই তাঁহাদের লড়াই। তাঁহারা বিন্দুর বলে ব্যাপককে অধিকার করিবেন। সংকীর্ণতার দ্বারা বিকীর্ণতা লাভ করিবেন।

৯

সংহত দীপশিখা তাহার আলোকে সমস্ত গৃহ অধিকার করে কিন্তু সেই শিখা যখন প্রচ্ছন্ন উত্তাপ আকারে গৃহের কাঠে, উপকরণে

ইতস্তত ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, তখন গৃহই তাহাকে বধ করিয়া রাখে, সে জাগিতে পায় না। যতটা ব্যাপ্ত হইব ততটা অধিকার করিব এইরূপ কেহ কেহ মনে করেন। কিন্তু ইহার উল্টাটাই ঠিক। অর্থাৎ যতটা ব্যাপ্ত হইবে তুমি ততই অধিকৃত হইবে। কিন্তু চারিদিক হইতে আপনাকে প্রত্যাহার করিয়া যখন বহ্নিশিখার মত স্বতন্ত্র দীপ্তি পাইবে, তখন তোমার সেই প্রখর স্বাতন্ত্র্যের জ্যোতিতে চারিদিক উজ্জ্বল রূপে অধিকার করিতে পারিবে কাহারও কাহারও মত।

১০

য়ুরোপীয় সভ্যতার চরম—ব্যাপ্তি, অর্থাৎ বিজ্ঞানশাস্ত্র—ভারতবর্ষীয় সভ্যতার চরম সংহতি, অর্থাৎ অধ্যাত্মযোগ। য়ুরোপীয়েরা প্রকৃতির সহিত সন্ধি করিতে চান ভারতবর্ষীয়েরা প্রকৃতিকে জয় করিতে চান। প্রাণশক্তি, মানসশক্তি, অধ্যাত্মশক্তিকে সংহত করিতে পারিলে বিরাট প্রকৃতিকে জয় করা যায়। এই কি যোগশাস্ত্র?

১১

আমার কোন বন্ধু লিখিয়াছেন—অতীতকাল অমরাবতী। আমি তাহার অর্থ এই বুঝি যে, অতীতে যাহারা বাস করে তাহারা অমর। অতীতে অমৃত আছে। অতীত সংক্ষিপ্ত। বর্তমান কেবল কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুহূর্ত, অতীতকালে সেই মুহূর্তরাশি সংহত হইয়া যায়। বর্তমান ত্রিশটা পৃথক দিন, অতীত একটা সমগ্র মাস। বর্তমান বিচ্ছিন্ন, অতীত সমগ্র। যাহাকে প্রত্যেক বর্তমান মুহূর্তে দেখি আমরা প্রতিক্ষণে তাহার মৃত্যুই দেখিতে পাই, যাহাকে অতীতে দেখি তাহার অমরতা দেখিতে পাই।

১২

আরম্ভের মধ্যে পূর্ণতার ছবি ও সমাধানেই অসম্পূর্ণতা—মানুষের সকল কাজেই প্রায় বিধাতার এই অভিশাপ। যখন গড়িতে আরম্ভ করি তখন প্রতিমা চোখের সম্মুখে জাগিয়া থাকে, যখন শেষ করিয়া ফেলি তখন দেখি তাহা ভাঙিগয়া গেছে। সুদূর গৃহাভিমুখে যখন যাত্রা আরম্ভ করি তখন গৃহের প্রতি এত টান যে, গৃহ যেন প্রত্যক্ষ, আর পথ প্রান্তে যখন যাত্রা শেষ করি তখন পথের প্রতি এত মায়া যে গৃহ আর মনে পড়ে না। যাহাকে আশা করি তাহাকে যতখানি পাই আশা পূর্ণ হইলে তাহাকে আর ততখানি পাই না। অর্থাৎ, চাহিলে যতখানি পাই, পাইলে ততখানি পাই না। যখন মুকুল ছিল তখন ছিল ভাল, ফলের আশা তাহার মধ্যে ছিল, যখন মাটিতে পড়িয়াছে তখন দেখি মাটি হইয়াছে ফল ধরে নাই। এইজন্য আরম্ভ দিনের স্মৃতি আমাদের নিকট এত মনোহর, এইজন্য সমাপ্তির দিনে আমরা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া থাকি, নিঃশ্বাস ফেলি। জন্মদিনে যে বাঁশি বাজে সে বাঁশি প্রতিদিন বাজে না। অশ্রুনেত্রে আমরা প্রতিদিন দেখিতেছি উপায়ের দ্বারা উদ্দেশ্য নষ্ট হইতেছে। বাঁশি গানকে বধ করিতেছে। হাতের দ্বারা হাতের কাজ আঘাত পাইতেছে।

১৩

আসল কথা, শেষ মানুষের হাতে নাই। "শেষ হইল" বলিয়া যে আমরা দুঃখ করি তাহার অর্থ এই—"শেষ হয় নাই তবুও শেষ হইল! আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে অথচ চেষ্টার অবসান হইল।" এইজন্য মানুষের কাছে শেষের অর্থ দুঃখ। কারণ মানুষের সম্পূর্ণতার অর্থ অসম্পূর্ণতা।

১৪

জীবনের কাজ দেখিয়া সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি কাহার হয় জানি না—যাহার হয় সে আপনাকে চেনে নাই। সে আপনার চেয়ে আপনাকে ছোট বলিয়া জানে। সে জানে না সে যে কাজ করিয়াছে তাহা অপেক্ষা বড় কাজ করিতে আসিয়াছিল। সে আপনাকে ছোট করিয়া লইয়াছে বলিয়াই আপনাকে এত বড় মনে করে। মনুষ্যের পদমর্যাদা সে যদি যথার্থ বুঝিত তাহা হইলে এত তাহার অহঙ্কার থাকিত না।

১৫

আমি কি জানিতাম অবশেষে আমি খেলেনাওয়ালা হইব? প্রতিদিন একটা করিয়া কাঁচের পুতুল গড়িয়া সাধারণের খেলার জন্য যোগাইব! আমি কি জানি না আমার একেকটি কাজ আমারই একেকটি অংশ—আমারই জীবনের একেকটি দিন! দিনকে ছাড়িয়া দিলেই দিন চলিয়া যায়, কিন্তু দিনের কাজের মধ্যে দিনকে আটক করিয়া রাখা যায়। আমার জীবন ত কতকগুলি দিনের সমষ্টি, সেই জীবনকে যদি রাখিতে চাই তবে তাহার প্রত্যেক দিনকে কার্য আকারে পরিণত করিতে হইবে। কিন্তু আমি যে আমার সমস্ত দিনটি হাতে করিয়া লইয়া তাহাকে কেবল একটি পুতুল করিয়া তুলিতেছি—আমি কি জানি না আমার যতগুলি পুতুল ভাঙিগতেছে আমিই ভাঙিগয়া যাইতেছি! অবশেষে যখন একে একে সবগুলি ধূলিসাৎ হইয়া গেল তখন কি আমার সমস্ত জীবন বিফল হইয়া গেল না! এই চীনের পুতুলগুলি লইয়া আজ সকলে হাসিতেছে খেলিতেছে কাল যখন এগুলিকে অকাতরে পথের প্রান্তে ফেলিয়া দিবে তখন কি সেই হৃতগৌরব ভগ্ন কাচখণ্ডের সঙ্গে আমার সমস্ত মানব জন্মের বিসর্জন হইবে না! "আমি নিষ্ফল হইলাম" বলিয়া যে দুঃখ সে অপরিতৃপ্ত অহঙ্কারের দুঃখ নহে। ইহা নিজের হাতে নিজের একমাত্র আশা একমাত্র আদর্শকে বিসর্জন দিয়া প্রাণাধিকের বিনাশের জন্য শোক!

১৬

কারণ, আমার হৃদয়ের মধ্যস্থিত আদর্শ আমার চেয়ে বড়—তাহা আমার মনুষ্যত্ব। আমি আমার ধর্মজ্ঞানের হাতে একটি যন্ত্র মাত্র। সে আমাকে দিয়া তাহার কাজ করাইয়া লইতে চায়। আমার একমাত্র দুঃখ এই যে আমি তাহার উপযোগী নহি—আমার দ্বারা তাহার কাজ সম্পন্ন হয় না। আমি দুর্বল। তাহার কাজ করিতে গিয়া আমি ভাঙিগয়া যাই। কিন্তু সেই ভাঙিগয়া যাওয়াতে আনন্দ আছে। মনে এই সান্ত্বনা থাকে যে, তাহারই কাজে আমি ভাঙিগলাম। আমি নিষ্ফল হইলাম বলিতে বুঝায়, আমার প্রভুর কাজ হইল না। মনুষ্যত্ব আমাকে আশ্রয় করিয়া মগ্ন হইল। স্বামিন্, তোমার আদেশ পালন হইল না!

১৭

সাধারণের কাছ হইতে যে ব্যক্তি খ্যাতি উপহার পায় তাহার রক্ষা নাই। এ বিষকন্যার হাতে যদি মৃত্যু না হয় ত বন্দী হইতে হইবে। এই খ্যাতি তাপসের তপস্যা ভঙ্গ করিতে সাধকের সাধনায় ব্যাঘাত করিতে আসে। যে ব্যক্তি সাধারণের প্রিয় সাধারণ তাহার জন্য আফিম বরাদ্দ করিয়া দেয়, সাধারণের দাঁড়ে বসিয়া সে ঝিমাইতে থাকে; সে আগেকার মত তাহার ডানাদুটি লইয়া মেঘের দিকে তেমন করিয়া আর উড়িতে পারে না। তার পরে একদিন যখন খামখেয়ালি সাধারণ তাহার সাধের পাখীর বরাদ্দ বন্ধ করিয়া দিবে, তখন পাখীর গান বন্ধ তাহার প্রাণ কণ্ঠাগত।

ভারতী, ভাদ্র ১২৯২ **[স্বাক্ষরহীন]**

শিল্পী নন্দলাল বসু কর্তৃক অঙ্কিত স্কেচ্

হিমালয়ের দৃশ্য

[শ্রীগোলকবিহারী দাসের সৌজন্যে]

বিজ্ঞান ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীঅমরেন্দ্রকুমার সেন

রবীন্দ্রনাথের জীবনের সপ্ততিবর্ষ পরিসমাপ্তি উপলক্ষে তাঁর দেশবাসী তাঁর প্রতি যে অর্ঘ্য প্রদান করেছিলেন তার উদ্বোধনী ছিল:

"তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।"

সত্যই রবীন্দ্রনাথ আমাদের বিস্মিত করে। কখনও মনে হয় তিনি দার্শনিক, কখনও মনে হয় তিনি কবি, কখনও মনে হয় তিনি শিল্পী এবং তিনি যে কি নন তাও ত' ভেবে ঠিক করা যায় না। বৈদেশিক কবিরা এক একজন এক এক বিষয়ে কবিতা লিখে বিখ্যাত; কেউ প্রেমের কবিতা, কেউ প্রকৃতির কবিতা, কেউ আবার ভক্তিমূলক কবিতা লিখে বিখ্যাত হয়েছেন; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জুড়ি পৃথিবীর কোনো দেশে কেউ নেই। তিনি সমস্ত রকমের কবিতা ত' লিখেছেনই, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ কিছুই বাদ দেননি এমনকি বিজ্ঞানকেও তিনি বাদ দেননি।

"সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়" রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালের রচনা, কিন্তু সেই বয়সেই আমাদের পৃথিবী এবং অন্য গ্রহ উপগ্রহগুলি সৃষ্টি হবার আগের যে অবস্থার বর্ণনা তিনি লিখেছেন তা যে কোনো বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখকের হিংসার উদ্রেক করে:

"বাষ্পে বাষ্পে করে ছুটোছুটি,
বাষ্পে বাষ্পে করে আলিঙ্গন।
অগ্নিময় কাতর হৃদয়
অগ্নিময় হৃদয়ে মিশিছে।
জ্বলিছে দ্বিগুণ অগ্নিরাশি
আঁধার হইতে চুর চুর।
অগ্নিময় মিলন হইতে,
জন্মিতেছে আগ্নেয় সন্তান,
অন্ধকার শূন্য মরু মাঝে
শত শত অগ্নি পরিবার
দিশে দিশে করিছে ভ্রমণ।"

তারপর একদা......

"থেমে এল প্রচণ্ড কল্লোল,
নিবে এল জ্বলন্ত উচ্ছ্বাস,
গ্রহগণ নিজ অশ্রুজলে
নিবাইল নিজের হুতাশ।
জগতের বাঁধিল সমাজ,
জগতের বাঁধিল সংসার......"

জগৎ সংসারের বিশেষ একটি পর্যায়ের এমন সুন্দর ছবি এত সহজ কথায় কে আর এঁকেছেন?

রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের সাধক নন, কিন্তু তিনি বিজ্ঞানের অত্যন্ত অনুগত ছাত্র, সেই বাল্যকাল থেকে। কবির বয়স তখন নয় দশ বছর; মাঝে মাঝে রবিবারে তাঁদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আসতেন সীতানাথ দত্ত মহাশয়। পুঁজি তাঁর বেশী ছিল না, কিন্তু বিজ্ঞানের অতি সাধারণ দু'একটি তত্ত্ব যখন দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিতেন তখন বালকের মন বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে যেত। আগুনে বসালে তলার জল গরমে হাল্কা হয়ে ওপরে ওঠে আর ওপরের ঠাণ্ডা ভারি জল নিচে নামতে থাকে। জল ফুটতে থাকার এই কারণটা যখন সীতানাথ দত্ত মহাশয় কাঠের গুঁড়োর-যোগে স্পষ্ট করে' **দিতেন তখন অনবচ্ছিন্ন** জলে একই কালে যে ওপরে **নীচে নিরন্তর ভেদ** ঘটতে পারে তারি বিস্ময়ের স্মৃতি রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত জাগরূক ছিল।

তারপর বয়স যখন আর একটু **বেশী** হ'লো তখন পিতৃদেবের সংগে **কবি ডালহৌসি** পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন। **সন্ধ্যাবেলায়** পিতৃদেব চৌকি আনিয়ে **ডাক-বাংলোর** আঙিনায় বসতেন। দেখতে দেখতে, **গিরি**-শৃঙ্গের বেড়া দেওয়া নিবিড় **নীল আকাশের** স্বচ্ছ অন্ধকারে তারাগুলি যেন **কাছে নেমে** আসত। মহর্ষি একে একে গ্রহ **নক্ষত্রগুলি** চিনিয়ে দিতেন; ঐ সপ্তর্ষিমণ্ডল। **সপ্তর্ষির** সাত ঋষির নাম পুলহ, ক্রতু, পুলস্ত্য, **অত্রি**, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ ও মরীচি। বশিষ্ঠের **খুব** কাছে ঐ যে ছোট্ট তারাটি টিপ্‌টিপ্ **করছে** ওর নাম হ'লো অরুন্ধতী। আরও কত **নক্ষত্র**, কি সুন্দর তাদের নাম, চিত্রা, স্বাতী, **কৃত্তিকা**। শুধু নক্ষত্র পরিচয় নয়, সূর্য থেকে **তাদের** কক্ষচক্রের দূরত্বমাত্রা, প্রদক্ষিণের **সময় এবং**

অন্যান্য বিবরণও তিনি শুনিয়ে দিতেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে তিনি যা ব'লে যেতেন তাই মনে ক'রে তখনকার কাঁচা হাতে একটা বড়ো প্রবন্ধ লিখেছিলেন। স্বাদ পেয়েছিলেন বলেই লিখেছিলেন।

বয়স আরো বেড়ে উঠল, কবি ইংরেজি ভাষা শিখেছেন, সহজবোধ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের বই যেখানে যত পেয়েছেন পড়তে ছাড়েননি। রবীন্দ্রনাথের কথাতেই বলিঃ—

"জ্যোতির্বিজ্ঞানের সহজ বই পড়তে লেগে গেলুম। এই বিষয়ের বই তখন কম বের হয়নি। স্যার রবার্ট বল-এর বড়ো বইটা আমাকে অত্যন্ত আনন্দ দিয়েছে। এই আনন্দের অনুসরণ করবার আকাঙ্ক্ষায় নিউকোম্বস্, ফ্লামারিয়' প্রভৃতি অনেক লেখকের অনেক বই পড়ে গেছি—গলাধঃকরণ করেছি শাঁস শুদ্ধ বীজ শুদ্ধ। তারপরে এক সময়ে সাহস করে' ধরেছিলুম প্রাণতত্ত্ব সম্বন্ধে হক্সলির এক সেট প্রবন্ধমালা। জ্যোতির্বিজ্ঞান আর প্রাণবিজ্ঞান কেবলি এই দুটি বিষয় নিয়ে আমার মন নাড়াচাড়া করেছে।"

বিজ্ঞানের বই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন মাত্র একখানি এবং এই একখানি বই থেকেই প্রমাণিত হয়েছে যে বিজ্ঞানের বই লিখতেও তাঁর সমান জুড়ি আমাদের দেশে আর কেউ আছে কিনা সন্দেহ। রবীন্দ্রনাথের সে বই-খানির নাম "বিশ্ব-পরিচয়।" বিশ্ব-পরিচয় থেকে একটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। কাব্যের ভাষায় এই বই জটিল বিষয় নিয়ে লেখা কিন্তু বুঝতে একটুও কষ্ট হয় না। এইবার পড়ুনঃ

"যে নক্ষত্র থেকে এই পৃথিবীর জন্ম, যার জ্যোতি এর প্রাণকে পালন করছে সে হচ্ছে সূর্য। এই সূর্য আমাদের চারদিকে আলোর পর্দা টাঙিয়ে দিয়েছে। পৃথিবীকে ছাড়িয়ে জগতে আর যে কিছু আছে তা দেখতে দিচ্ছে না। কিন্তু দিন শেষ হয়, সূর্য অস্ত যায়, আলোর ঢাকা যায় সরে', তখন অন্ধকার ছেয়ে বেড়িয়ে পড়ে অসংখ্য নক্ষত্র। বুঝতে পারি জগৎটার সীমানা পৃথিবী ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে গেছে। কিন্তু কতটা যে দূরে তা কেবল অনুভূতিতে ধরতে পারি না।"

রবীন্দ্রনাথের কাছে আমাদের অভিযোগ রয়ে' গেল যে কেবলমাত্র "বিশ্ব-পরিচয়" ছাড়া তিনি বিজ্ঞানের আর কোনো বই লিখলেন না যদিও তিনি বাঙলা সাহিত্যের এদিককার দৈন্য ঐ একখানি বই দ্বারা অনেকটা দূর করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন পর্যালোচনা করলে এই জিনিসটাই প্রতীয়মান হয় যে একটি সুন্দর বিজ্ঞানময় ধারার মধ্যে দিয়ে তিনি তাঁর দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত করতেন।

God claims from man a garland
made of flowers which are his own.

তরঙ্গের বাণী সিন্ধু চাহে বুঝাবারে,
ফেনায় ফেনিল লেখে, মুছে বারে বারে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০শে মে
১৯২৫

ভারত ও জাপান

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

ভারত ও এসিয়ার মিলন যজ্ঞে রবীন্দ্রনাথের স্থানটি কোথায়, তাহার সম্যক ঐতিহাসিক আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন। পাঠকের স্মরণ আছে, বিংশ শতকের প্রারম্ভভাগে জাগ্রত জাপানের তরুণ আদর্শবাদী শিল্পশাস্ত্রী ওকাকুরা Asia is one-এর স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। শিল্প ও ধর্মসাধনার দিক হইতে সমগ্র পূর্ব এসিয়ার যে একটি সাধারণ যোগসূত্র আছে, তাহারই তত্ত্বটি আবিষ্কারের জন্য তাঁহার এদেশে আসা। জাপানের ও ভারতের চিত্তের যোগ বন্ধনের আশায় তিনি আসেন স্বামী বিবেকানন্দকে জাপানে লইয়া যাইবার জন্য। তাঁহার ইচ্ছা ছিল ভারতের এই ত্যাগমূর্তি নরোত্তম সন্ন্যাসী জাপানের নবচেতনা স্বচক্ষে দেখিয়া আসেন; স্বামীজী তখন ভগ্নস্বাস্থ্য জাপানে তাঁহার যাওয়া হইল না।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখনো রুশ জাপানের যুদ্ধ সুদূরে—জাপানের শিল্পের মোহে তখনো বাঙালী ছাত্রর দল জাপানে যাইবার জন্য মাতিয়া উঠে নাই। তখন জাপান হইতে দুই একটি বিদ্যার্থী আসিতেছেন। ওকাকুরার ব্যবস্থায় নব প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে আসেন হোরি সান সংস্কৃত পড়িতে; তাইক্কান ও হিসিদা আসিলেন শিল্পকলা বুঝিতে। নূতন জাগ্রত জাপান বৌদ্ধধর্মকে রাষ্ট্রধর্মরূপে গ্রহণ করে নাই, অথচ উহাই ছিল জাতির অন্তরের ধর্ম। বৌদ্ধধর্মকে তাহারা পাইয়াছিল চীনা ভাষার মধ্য দিয়া; মূল সংস্কৃত ও পালি হইতে জানিবার সুযোগ তাহার বহু শতাব্দী হয় নাই। ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে নব্য জাপানের একদল যুবক বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন মানসে য়ুরোপের বিদ্যাকেন্দ্রে যান। ভারতবর্ষের কথা তাঁহাদের মনে হয় নাই এবং এদেশে সে অনুকূল স্থানও তখন ছিল না। বিংশ শতকের মুখে কিছুটা ধর্মপালের নিখিল বৌদ্ধ আন্দোলনের ফলে—কিছুটা ভারতের প্রতি আকর্ষণ হেতু—জাপানীদের দৃষ্টি গেল ভারতের বৌদ্ধ তীর্থে—মন গেল সংস্কৃত অধ্যয়নের দিকে। শান্তিনিকেতনে যে ও পূর্ব এসিয়ার বিস্মৃত আধ্যাত্মিক যোগকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার দিকে জাপানের ইহাই প্রথম প্রয়াস। প্রবাসী জাপানীর প্রথম আশ্রয় হইল ভাবী বিশ্বভারতীর কেন্দ্র শান্তিনিকেতনের আশ্রম।

ওকাকুরা জাপানের শিল্পাত্মার মধ্যে জাপানের সমগ্র সাধনাকে দেখিয়াছিলেন; তাঁহার

জাপানে রবীন্দ্রনাথ—১৯১৬

বিশ্বাস ছিল ভারতের শিল্পচিত্তকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিলে ভারতের সমগ্র অন্তরটি আপনা হইতে জাগ্রত হইবে। বাংলাদেশে আর্ট আন্দোলনের সূত্রপাত তখনো হয় নাই—অবনীন্দ্রনাথ ছবি আঁকিতেছেন বটে, কিন্তু ভারতের শিল্পাত্মার সন্ধান তখনো পান নাই। ওকাকুরা জাপানে ফিরিয়া গিয়া যেমন পাঠাইয়া দেন হোরি সানকে, তেমনি পাঠান দুইজন জাপানী ছাত্র আসিলেন—হোরি সান—সম্ভ্রান্ত সামুরাই বংশে তাঁহার জন্ম—ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রথম বিদেশী ছাত্র তিনি। হোরি না জানিতেন ইংরেজী, না জানিতেন অন্য কোনো ভারতীয় ভাষা। কিন্তু কী নিষ্ঠার সহিত জ্ঞানার্জন শুরু করেন! অকালে পঞ্জাব ভ্রমণে গিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। ঘটনাটি অতি সামান্য—এত সামান্য যে উল্লেখযোগ্য নহে; কিন্তু ভারতের

আর্টিস্টকে। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে সেই শিল্পীরা 'এদেশ দেখবে, নিজেরা ছবি এঁকে যাবে', এদেশের শিল্পীরা 'দেখতে' পাবে তাদের কাজ—তাদেরও উপকার হ'বে'—ভারতীয় শিল্পীদেরও কাজে লাগবে। (জোড়াসাঁকোর ধারে পৃঃ ১০২)

ওকাকুরা পাঠাইলেন তাইকান ও হিসিদাকে। তাইকানের বয়স তখন ৩৮ বৎসর (জ...১৮৬৮), হিসিদার বয়স খুবই কম। এই আর্টিস্টদ্বয় থাকিতেন বালিগঞ্জে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে—ওকাকুরাও সেখানে থাকিতেন। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ন্যায় নীরব আদর্শবাদীর জীবন-কথা বাঙলার বিচিত্র কাহিনীর মধ্যে আজ বিস্মৃত; কিন্তু তাঁহাকে স্মরণে না রাখা নানা কারণে বাঙালীর পক্ষে অকৃতজ্ঞতা হইবে। ওকাকুরার সংস্পর্শে আসিয়া দেশের যে নানা কাজের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ লিপ্ত হন—আর্ট তাহার অন্যতম। তিনি চিত্রশিল্পী ছিলেন না, তিনি ছিলেন সমঝদার জীবনরসিক—বিরাট এসিয়ার পটভূমিতে শিল্প ও অর্থনীতি রাজনীতিকে দেখিতেন। তাইকান ও হিসিদা সুরেন্দ্রনাথের বাড়িতে থাকেন—আপন মনে ছবি আঁকেন—মাস দুয়েক তাঁহারা ছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 'তাইকান আমায় লাইন ড্রয়িং শেখাত, কি করে তুলি টানতে হয়......তার কাছেই শিখলুম একটি লাইন কত ধীরে ধীরে টানে তারা! আমার কাছেও শিখত নানান টেকনিক।" (পৃঃ ১০৪)

ওকাকুরা **শিল্পশাস্ত্রী** ছিলেন—শিল্পী নহেন; এই নূতন আন্দোলনের প্রধান আচার্য ছিলেন হাসিমতো গোহো—তাইকান, হিসিদা প্রভৃতি তরুণ শিল্পীরা সকলেই হাসিমতোর শিষ্য। তাইকানরা যখন ফিরিয়া যান, তখন হাসিমতোর জন্য অবনীন্দ্রনাথ 'বুদ্ধের নির্বাণ' ছবিখানি উপঢৌকন পাঠান। হিসিদা ১৯১১ সালে জাপানে মারা যান।

*V. B. Q., Abanindra Number 1942 May P. 125.

অবনীন্দ্রনাথের তখন চিত্রকলার নানারূপ পরীক্ষা চলিতেছে। হ্যাভেল গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হইয়া আসিয়াছেন,—মধ্যযুগীয় চিত্রকলা ও স্থাপত্য ভাস্কর্যের সৌন্দর্যে তিনি মুগ্ধ; অবনীন্দ্রনাথকে সেই রহস্যলোকে লইয়া যাইতেছেন। হ্যাভেলের সমস্ত মনীষা ভারতের প্রাচীন শিল্পকলার পুনরভ্যুত্থানের জন্য নিয়োজিত; অবনীন্দ্রনাথও এই রাজপুত মুগল-কাংড়া চিত্ররীতি অনুসরণ করিতেছেন। জাপানী চিত্রকরদের সহায়তায় তাঁহার রীতির বেশ পরিবর্তন হইল; "The Japanese influence changed Abanindranath's technical process altogether."*

আমরা পূর্বে একস্থানে বলিয়াছি যে বাঙলাদেশের স্বদেশী আন্দোলনকে কেবলমাত্র Political agitation রূপে দেখিলে বিষয়টিকে অত্যন্ত লঘু করিয়া দেখা হইবে। জাতির অন্তরে বিপ্লবের যে সাড়া পড়িয়াছিল তাহাই ধর্মে, সাহিত্যে, শিল্পে, আর্টে, যুগপৎ তাহাদের প্রকাশ দেখা দিল। এই সময়েই হ্যাভেল, নিবেদিতা, উড্রফ, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ প্রমুখ শিল্পশাস্ত্রী ও শিল্পীদের উদ্যোগে কলিকাতায় Indian Art Society স্থাপিত হইল (১৯০৫)। কলিকাতার গবর্নমেণ্ট আর্ট স্কুল ত বহুকালের প্রতিষ্ঠান; সেখানে বিলাতী রীতিতেই শিক্ষাদীক্ষা হইত—দেশীয় চিত্রবিদ্যার স্থান সেখানে তখনো হয় নাই। এই নব আর্ট আন্দোলনের পূর্বে ভারতে কারুশিল্পকে কুটিরের মধ্যে সঞ্জীবিত করিবার যে চেষ্টা হইয়াছিল—সেক্ষেত্রে হ্যাভেলই ছিলেন অগ্রণী।

জাপানের শিল্পশাস্ত্রী ওকাকুরা

স্বদেশী আন্দোলনের সমকালীন এই নূতন আর্ট আন্দোলনের সময়েই জোড়াসাঁকোয় আসিলেন জাপানী চিত্রশিল্পী কাটসুটা ও শান্তিনিকেতনে আসিলেন জুজুৎসু বীর ও বর্ধকী সানো সান। অর্থাৎ জাপানের পাঁচ আঙুলের খেলায় যেখানে অশেষ সৌন্দর্য মথিত হইতেছে—আর তাহার সর্বাবয়বের লীলাকৌশলে যেখানে অসীম শক্তি সৃজিত হইতেছে—এই দুই বিদ্যাকে বাঙলাদেশ আহ্বান করিয়া আনিলেন। এই দুই বিদ্যাই বিনা ভাষায় শিখানো যায়—সুতরাং জুজুৎসুকে আমরা আর্ট রূপেই দেখিব।*

কাটসুটা জোড়াসাঁকোয় প্রায় তিন বৎসর ছিলেন। সানো শান্তিনিকেতনে অত দিন থাকেন নাই। এইসব ঘটনাকে দেশের পটভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে তাহারা অত্যন্ত তুচ্ছ—কিন্তু আমরা ভারত ও জাপানে তথা পূর্ব এসিয়ার সহিত যোগসূত্রে এগুলিকে দেখিতেছি। কাটসুটা অসংখ্য ছবি আঁকেন—সে সবের নমুনা এদেশে প্রায় নাই—কারণ পরযুগে জাপান গভর্নমেণ্ট মহার্ঘ মূল্যে সেসব কিনিয়া নিজ দেশে লইয়া যায়; তাহাদের আর্টিস্টের স্বহস্তে অঙ্কিত ছবি বিদেশে থাকিবে—ইহা তাহারা জাতির অগৌরব মনে করিত।

কাটসুটা ফিরিয়া যান ১৯০৮ সালে। এই সময়ে আসেন পরিব্রাজক কাওয়াগুচি। ইঁহারও সহিত অবনীন্দ্রনাথের ও রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা হয়। ১৯১১ সালে আসিলেন ওকাকুরা—ইহাই তাঁহার শেষ আসা। তখন তাঁহার শরীর জীর্ণ। প্রায়ই তিনি জোড়াসাঁকোর চিত্রশালায় যান—তখন অবনীন্দ্রনাথকে ঘিরিয়া চিত্রশিল্পীর দল গড়িয়াছে। এইবার আসিয়া ওকাকুরা দেখিলেন ভারতীয় চিত্রকরেরা ভারতের শিল্পাত্মাকে পাইয়াছে—শুধু তাহার দেহকে নহে; অর্থাৎ মধ্যযুগীয় চিত্রের অনুকরণ ও প্রাচীনের পথ অনুসরণ করিয়া তাহারা আর তৃপ্ত নহে—তাহারা ভারতের নব আর্ট আন্দোলনের সূচনা করিতেছে, নূতন শিল্পসৃষ্টিতে তাহারা তদ্গত হইতেছে। ওকাকুরা দেশে ফিরিবার সময় বলিয়াছিলেন—"দশ বছর আগে [১৯০১] যখন আমি এসেছিলাম তখন তোমাদের আজকালকার আর্ট বলে কিছুই দেখিনি। এবারে দেখছি তোমাদের আর্ট হবার দিকে আছে।" (জোড়াসাঁকোর ধারে পৃঃ ১০৭) ইণ্ডিয়ান আর্ট সোসাইটী স্থাপিত হইবার পর অবনীন্দ্রনাথকে ঘিরিয়া যে শিল্পীচক্র গড়িয়া উঠে তাহার মধ্যে যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের অনেকেই নামজাদা শিল্পী। নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার, সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, সামি উজমান, ক্ষিতীন্দ্র মজুমদার, হাকিম খাঁ, শৈলেন্দ্র দে, দুর্গেশ সিংহ, বেংকটাপ্পা, সুরেন্দ্রনাথ কর প্রভৃতি। মুকুল অবনীন্দ্রনাথের কাছে আসেন ১৯১২ সালে, ওকাকুরা ফিরিয়া যাইবার পরের বৎসর।

ওকাকুরা এই **শিল্পীচক্র** দেখিয়া আনন্দিত হইয়াই পূর্বোক্ত মন্তব্য করিয়াছিলেন। তাহারা যে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের ফরমাইসি পাশ্চাত্য শিল্পকলার অনুকরণ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া ভারতীয় চিত্রকলার দিকে দৃষ্টি দিয়াছে—আসবাবাদির আবর্জনা বিসর্জন দিয়া অত্যন্ত সরলভাবে শিল্পসাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে—ইহাই ওকাকুরার বিশেষ করিয়া ভাল লাগিয়াছিল। ইতিমধ্যে অবনীন্দ্রনাথ গৃহাভ্যন্তর সজ্জারও যুগান্তর আনিয়াছিলেন। উনি

* রবীন্দ্রনাথ বোলপুর হইতে লিখিতেছেন—"এখানে জাপান হইতে জুজুৎসু শিক্ষক আসিয়াছেন তাঁহার কাণ্ডকারখানা দেখিবার যোগ্য" [১৯০৫] স্মৃতি পৃঃ ৩৩

গৃহকে ইংরেজী আসবাব দ্বারা ঘরগুলিকে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত করিয়া তোলাই ছিল ধনীদের সৌখিনতা ও আভিজাত্যের পরিচায়ক—সুরুচি ও সৌন্দর্যের চর্চা কমই চোখে পড়িত।

ওকাকুরার পূর্বোক্ত মন্তব্যের গভীরতার কারণ ছিল; জাপানে তাঁহাকেও বহু বৎসর ধরিয়া পাশ্চাত্যের স্রোত ও প্রাচীনের বদ্ধতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল—তিনি জানিতেন শিল্পের মধ্যে আপনাকে পাওয়া ও প্রকাশ করা খুবই কঠিন অথচ সেইটিই হইতেছে শিল্পীর স্বধর্ম। জাপানের শিল্পকলা একদিন পশ্চিমের মোহে আপনাকে বিসর্জন দিতে বসিয়াছিল; য়ুরোপীয় চিত্রীদের অনুকরণে জাপানী চিত্রকরেরা নিজদেশেই যশস্বী হইলেন—যাহারা প্রাচীন পন্থা ছাড়িল না তাহারা সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা হইতে বঞ্চিত হইয়া মরিতে বসিল। জাপানের এই য়ুরোপীয়তার বিরুদ্ধে বিদেশী অধ্যাপক ফেনোলোসা কিভাবে সর্বপ্রথম জাপানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন সেকথা ইতিহাস-বেত্তাদের নিকট সুপরিচিত। গভর্নমেণ্ট এতকাল পাশ্চাত্য চিত্রকলার অন্ধ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন—এখন হইতে হইলেন প্রাচীন খাস জাপানী চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষক। আর্ট পাশ্চাত্যের অনুকরণ হইতে প্রাচীনের অনুবর্তনের ক্ষেত্রে রূপান্তরিত হইল। ওকাকুরা জাপানের আর্টকে এই উভয় প্রভাব হইতে মুক্তি দিবার জন্য যে আন্দোলন করেন—ইহা বাঙলা দেশের নূতন শিল্প আন্দোলনের অনুরূপ। ওকাকুরা জাপানী আর্টিস্টকে নূতন সৃষ্টি বাঁচবার জন্য আহ্বান করিলেন,—অনুকরণের পথে নহে, অনুবর্তনের পথেও নহে। ইহাতে জাপানী আর্টের মুক্তি হইল। কিন্তু শিন্টোধর্মী জাপান, পাশ্চাত্য মোহ-আবিষ্ট জাপান এই নূতন আর্ট আন্দোলনকে স্বীকার করে নাই। তাহারা একদিকে থাকিতে চায় অতীতের মূঢ়তার মধ্যে, আর অপর দিকে বড় হইতে চাহে অনুকরণ করিয়া।

১৯১১ সালে ওকাকুরা যখন বাঙলাদেশে আসিলেন—তখন দেখেন বাঙলার তরুণ শিল্পীদের মধ্যে মুক্তির হাওয়া বহিতেছে—রাজপুত, কাংড়া, মুগল, পারসিক চিত্রের মোহ জাল সম্পূর্ণ ছিন্ন না হইলেও—তাহার সম্ভাবনা তিনি অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বুঝিলেন শিল্পের মুক্তিতেই চিত্তের মুক্তি আনিবে—কারণ এই ভাষাহীন শব্দহীন নীরব সৃষ্টির বাণী সর্বমানবের অন্তরে প্রবেশ করিবে—এই আর্টের ক্ষেত্রেই নিখিলের মিলন সার্থক হইবে।

ওকাকুরা ভারতবর্ষ হইতে আমেরিকায় যান—সেখানে কবির সঙ্গে তাঁহার শেষ সাক্ষাৎ হয় ১৯১২ সালে—পর বৎসর তাঁহার মৃত্যু হয় জাপানে। কবি এইবার (১৯১৬) জাপানে বাস কালে ওকাকুরার বাড়িতে গিয়াছিলেন, সে জায়গাটা তাঁহার খুব ভালো লাগে। কিন্তু কবি জাপানে গিয়া এইটা বুঝিলেন যে, জাপানীরা ওকাকুরাকে চিনিতে পারে নাই। তিনি সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিতেছেন, "অনেক বড় বড় লোকের সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে দেখলুম—ওকাকুরার মত কারো প্রতিভা দেখতে পাইনি। বুদ্ধির দিকে এরা খুবই কাঁচা, এদের হাতের মধ্যেই সমস্ত মগজ।" (পত্র ১১ ভাদ্র ১৩২৩)।

ব্যক্তিগত পত্রে ১৯১৬ সালে কবি জাপানীদের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা সত্য কিনা—তাহা কাল প্রমাণ করিয়াছে। ওকাকুরা চীনের সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করিতেন—চীনের প্রতি জাপানের অবজ্ঞা ও অত্যাচার তিনি কোনো দিন সমর্থন করিতে পারেন নাই; জাপানের পাশ্চাত্য অনুকরণপ্রিয়তা ও বহির্মুখীনতাও তাঁহার অনুমোদন পায় নাই। এই সব কারণে জাপানের ভাগ্যনিয়ন্তারা এই আদর্শবাদী পুরুষটির প্রতি কখনো শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন নাই। যাহাই হউক জাপান বাসকালে জাপানী আর্টের অসংখ্য নিদর্শন দেখিবার সুযোগ কবি লাভ করেন; ওকাকুরা যে আর্ট সমিতি স্থাপন করেন (১৮৯৬), তাঁহার ছাত্ররা এসময়ে জাপানের সেরা শিল্পীরূপে খ্যাত। কবি জাপানের অন্যতম ধনী হারা সানের পল্লী আবাসে যখন বাস করিতেছেন, তখন হারার নিকট শুনিতে পান যে, টাইক্কান ও তানজান শিমোমুরা আধুনিক জাপানের দুই সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী। টাইক্কানকে কবি কলিকাতায় দেখিয়াছিলেন তেরো বৎসর পূর্বে—তিনি যে আজ এত বড় শিল্পী হইয়াছেন, তাহা কবি জানিতেন না। কবি লিখিতেছেন, "ছেলে মানুষের মত তাঁর (টাইক্কানের) সরলতা; তাঁর হাসি, তাঁর চারিদিককে হাসিয়ে রেখে দিয়েছে।......যতদিন টোকিওতে তাঁর বাড়িতে ছিলুম, আমি জানতেই পারিনি তিনি কত বড় শিল্পী।" (জাপান যাত্রী ১০৪)

নূতন আর্ট আন্দোলনের এই দুই সেরা শিল্পী আধুনিক য়ুরোপের নকল করেন না, প্রাচীন জাপানেরও না। তাঁহারা প্রথার বন্ধন হইতে জাপানের শিল্পকে মুক্তি দিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ এক পত্রে ইঁহাদের সম্বন্ধে লিখিতেছেন (৬ ভাদ্র ১৩২৩)—

"ইঁহাদের ছবি একদিকে খুব বড় আয়তনের, আর একদিকে খুব সুস্পষ্ট। কিছুমাত্র আশেপাশের বাজে জিনিস নেই। চিত্রকরের মাথায় যে আইডিয়াটা সকলের চেয়ে পরিস্ফুট কেবল মাত্র সেইটেকেই খুব জোরের সঙ্গে পটের উপর ফলিয়ে তোলা। সমস্ত মন দিয়ে এ ছবি না দেখে থাকবার জো নেই; কোথাও কিছুমাত্র লুকোচুরি কিংবা পাঁচ মিশেলি রং চং দেখা যায় না। ধবধবে প্রকাণ্ড শাদা পটের উপর অনেকখানি ফাঁকা, তার মধ্যে ছবিটি ভারি জোরের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকে। (চিঠিপত্র—২। পত্র—১৭) "তাতে না আছে বাহুল্য না আছে সৌখিনতা। তাতে যেমন একটা জোর আছে, তেমনি সংযম।" (জাপান—যাত্রী—১০৫)

জাপানের চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য দেখিয়া কবি মুগ্ধ। জাপানী জাতির স্বভাবসিদ্ধ সৌন্দর্যপ্রিয়তার সহিত নিজ দেশবাসীর দৈন্য স্বতই মনে উদিত হইতেছে। অবনীন্দ্রনাথকে লিখিতেছেন, "এরা সমস্ত জাত এই আর্টের কোলে মানুষ এদের সমস্ত জীবনটা এই আর্টের মধ্য দিয়ে কথা কচ্ছে।" (৮ ভাদ্র ১৩২৩)

ভারতীয় আর্টের সঙ্গে জাপানের আর্টের তুলনা করিয়া তিনি বড় শক্ত কথা অবনীন্দ্রনাথকে লিখিলেন—"এখানে এসে আমি প্রথম বুঝতে পারলুম যে, তোমাদের আর্ট ষোলো আনা সত্য হয়নি।" "আমাদের দেশের আর্টের পুনর্জীবন সঞ্চারের জন্য এখানকার সজীব আর্টের সংস্রব যে দরকার সে তোমরা বুঝতে পারবে না। আমাদের দেশে আর্টের হাওয়া বয়না, সমাজের জীবনের সঙ্গে আর্টের কোনো নাড়ির যোগ নেই—ওটা একটা উপরি জিনিস, হলেও হয়, না হলেও হয়, সেইজন্যে ওখানকার মাটি থেকে কখনই তোমরা পুরো খোরাক পেতে পারবে না।" (পত্র ৮ ভাদ্র) আর্টকে জাপানীরা জীবনে স্বীকার করিয়াছে; "জীবনটা সকল রকমে এরা সুন্দর করে তুলেচে—নিতান্ত ছোট খাটো বিষয়েও এদের লেশমাত্র অনাদর নেই—আমাদের সঙ্গে এইখানেই এদের সবচেয়ে তফাৎ।" [গগনেন্দ্রনাথকে লিখিত পত্র ৮ [ভাদ্র] ১৩২৩] কোন্ পথে বাঙলার চিত্রকলা যাইবে তাহাও যেন তিনি দেখিতে পাইয়া ইঙ্গিত করিতেছেন। রথীন্দ্রনাথকে লিখিতেছেন, "আমাদের নববঙ্গের চিত্রকলায় আর একটু জোর, সাহস এবং বৃহত্ত্ব দরকার আছে এই কথা বার বার মনে হয়েচে। আমরা অত্যন্ত বেশি ছোটখাটোর দিকে ঝোঁক দিয়েচি।" (চিঠি পত্র ২। ৬ ভাদ্র, ১৩২৩)

কবির ইচ্ছা ভারতীয় চিত্রশিল্পীরা জাপানে আসিয়া সেখানকার জীবন্ত আর্টকে দেখেন, নাহলে তাঁহার আশঙ্কা ভারতীয় আর্ট কুনো রকমের হইবে। (পৃ ৪৭) তিনি জাপান যাত্রীর পত্র-প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "বাঙলাদেশে আজ শিল্পকলার নূতন অভ্যুদয় হয়েচে, আমি সেই শিল্পীদের জাপানে আহ্বান করচি।" (পৃঃ ১০৪) কিন্তু কবি ও আদর্শবাদী হইলেও রবীন্দ্রনাথ জানেন যে তাঁহার এই আহ্বানে সাড়া দিতে পারার মধ্যে শিল্পীদের কত বাধা। "তাই শেষকালে অনেক ভেবেচিন্তে তাইক্কানের পরামর্শে আরাই নামক একটি আর্টিস্টকে কলিকাতায় বিচিত্রায় স্কুলে পাঠানো স্থির করিলেন। গগনেন্দ্রনাথকে লিখিতেছেন, "বাইরে থেকে একটা নূতন আঘাত পেলে আমাদের চেতনা বিশেষভাবে জেগে ওঠে। এই

আর্টিস্টের সংসর্গে অন্তত তোমাদের সেই উপকার হবে।...জাপানী তুলি টানার বিদ্যের তোমাদের ছেলেদের হাত পাকানো দরকার।" রথীন্দ্রনাথকে লিখিতেছেন, 'নন্দলালরা যদি এ'র কাছ থেকে খুব বড় আয়তনের পটের উপর জাপানী তুলির কাজ শিখে নিতে পারে তাহলে আমাদের আর্ট অনেকখানি বেড়ে উঠবে...।" (পৃঃ ৪৮) নন্দলাল বসু তখন বিচিত্রার সহিত যুক্ত।

রবীন্দ্রনাথ আরাইকে বিচিত্রায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শিমোমুরা ও তাইক্কানের দুইখানি খুব প্রকাণ্ড ছবি কপি করাইয়া পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন; কপি করাইতে ১৫০০, বার হয়, তাহা কবি দেন। আরাই জোড়াসাঁকোয় তিন বৎসর ছিলেন, সুতরাং ভাবের আদান প্রদান দীর্ঘকাল ধরিয়াই চলে এবং তাহার প্রভাবকে অস্বীকার করিতে পারা যাইবে না।

জাপানের আর্ট সম্বন্ধে কবি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি ঐ আর্টের অভাব কোনখানে তাহাও বিশ্লেষণ করিতেছেন। তিনি সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এক পত্রে লিখিতেছেন—

"জাপানটা ভাল করেই দেখেচি। তার কারণ এরা আমাকে এদের ঘরের মধ্যে ডেকে নিয়েছে। হঠাৎ বাইরের লোকের এতটা সুবিধে ঘটে না। এদের অনেক ভাল জিনিস দেখেচি। সাচেয়ে এদের সভ্য এবং দেশব্যাপী হচ্ছে এদের আর্ট। সে আর্ট একটা দিকে চূড়ান্ত সীমায় গেছে, কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে এদের আর্টের একটা অভাব আছে। এরা মানব হৃদয়ের গভীরতাকে স্পর্শ করে নি—এরা প্রকৃতিকে নিয়ে চূড়ান্ত করেছে। তোমাদের আর্টের ভিতর দিয়ে হৃদয়ের একটা আকৃতি প্রকাশ পায় সেই জন্যে তাকে লাইনের স্পষ্টতার চেয়ে রঙের আভাসের দিকে বেশী ঝোঁক দিতে হয়েচে। আমি ভেবে দেখেচি এইটাই ভারতবর্ষের দিক। ভারতবর্ষ রঙের গমক ভালবাসে—জাপানের আর্টে কালো-গোরার মিলনই প্রধান—এদের কাপড় চোপড়েও তাই। ভারতবর্ষের আর্ট যদি পুরো জোর সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে এগোতে পারে তাহলে গভীরতায় এবং ভাব-ব্যঞ্জনায় তার কাছে কেউ লাগবে না। কিন্তু দরকার হচ্ছে ওর মধ্যে জীবনের জোর পৌঁছানো—যাতে ও খুব ফলাও হয়ে উঠতে পারে। এখন যেন কেয়ারী করা ছোট ছোট ফুল গাছের বাগানের মত ওর চেহারা—বনস্পতির অরণ্য চাই যেখানে ক্ষণে ক্ষণে ঝড়ের রুদ্র বীণা বাজে। আমার বোধ হয় আয়তন নিতান্ত ছোট করলে ভাবের পরিমাণও ছোট হয়ে আসে। যাই হোক জাপানী আর্টের যতই বাহাদুরী থাক ওর পূর্ণতার সীমায় এসে ও পৌঁচেছে। কিন্তু আমাদের আর্টিস্টের তুলির সামনে অসীম ক্ষেত্র দেখতে পাচ্ছি। সরস্বতী চীন জাপানের কাছে উদ্যানের দরজা খুলে দিয়েছেন, আমাদের কাছে তাঁর অন্তঃপুরের দরজা খুলবে—এখানে রসের ভোজ। কিন্তু আমাদের এই রং-মহালের কারখানা জাপানীরা একেবারেই বুঝতেই পারে না—অথচ আমরা ওদের শিল্প-কলার ভিতরকার মাহাত্ম্য বেশ বুঝতে পারি। এর থেকেই মনে হচ্ছে জাপানী চিত্রকলার অতি পরিণতিই ওর পক্ষে বোঝা হয়ে উঠেচে—এখন ও আর চলবে না। পথের পাশে বসে পুনরাবৃত্তি করবে কিংবা বিলিতী ছবির নকল করতে লাগবে।"*

রবীন্দ্রনাথ ত্রিশ বৎসর পূর্বে বাঙলা দেশের আর্ট সম্বন্ধে যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, বাঙালী শিল্পীরা সে বিপদকে পাশ কাটাইয়া আসিয়াছে; তাহারা পশ্চিমের অনুকরণ বা প্রাচীনের অনুবর্তন পথ গ্রহণ করে নাই। রংমহালের কারখানায় তাহারাই বিপ্লব আনিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য স্রষ্টা হইলেও রূপ-দ্রষ্টা। তিনি জানিতেন আপনাকে যথার্থভাবে প্রকাশের মধ্যেই সাহিত্যিকের সাধনা ও সিদ্ধি। শিল্পের মধ্যেও সেই নীতি। শুধু পাঁচ আঙুলের কৌশলে শিল্প সৃষ্ট হয় না, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সর্বদ্বার উন্মুক্ত ও রুদ্ধ করিবে সহজ সাধনা মনের আয়ত্তাধীন হইলে শিল্প সাধকের সিদ্ধি নিশ্চিত। রবীন্দ্রনাথ রূপ-সাধক, তিনি শিল্পের সাধন চক্র গড়িয়াছেন বারে বারে। কলিকাতার বিচিত্রায় শিল্পচর্চার স্থানকে তিনি তাই এত বড়ো করিয়া দেখিয়া-ছিলেন; পরে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হইলে কলাভবনে তিনি শিল্প সাধকদের সাধনপীঠ গড়িয়াছেন। স্বাধীনতা হইল এই সাধনার মন্ত্র। সেই স্বাধীনতার মধ্যে কলাভবনের শিল্পীরা আপনাদের শিল্পাত্মাকে উপলব্ধি করিয়াছে; যে মুহূর্তে তাহারা আপনাকে পাইয়াছে সেই মুহূর্তে তাহারা নিজেকে সংস্কৃতিকে পাইয়াছে—তাহার শিল্পের মুক্তি হইয়াছে—বাঙলা দেশে শিল্পের নবজন্ম হইল সেই মুহূর্তে। এখানকার শিল্পীরা গতিকে অনুসরণ করে না, স্বাধীনভাবে পথ উন্মোচনের শিক্ষা পাইয়া সাহস ভরে আগাইয়া তাহার চলে।

*এই পত্রগুলি রবীন্দ্র ভবনে রক্ষিত আছে। অধ্যাপক শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এগুলি আমাকে তথা হইতে আনিয়া দেন।

স্বপ্ন-সাধ

নির্মাল্য বসু

যৌবন তবু তোমারি স্মৃতির জাল বুনে
বিস্মরণের কুঞ্জ করেছে শিল্পিতঃ
কবে চলে গেছো বহুদিন আগে—ফাল্গুনে—
মনে হয় যেন স্বপ্নের মতো—কল্পিত।

দ্রাক্ষাবনের হাওয়া লাগে আজো অচকিতে
মনে জেগে ওঠে রামধনুকের কল্পনা;
লাভ ও ক্ষতির হিসাব রাখিনা—সুচরিতে!
জীবনের হাটে মূল্য তাহারও অল্প না।

ছোট অধ্যায়—মধু যৌবনী একাঙ্ক—
কবে পড়ে গেছে ধূসর দিনের যবনিকা;
পাণ্ডুর মেঘে বিধুরিত ব্যথা অসংখ্য
জাগায় মানসে উজ্জয়িনীর মালবিকা।

সাধ শুধু ছিলো স্বর্গ রচিব হেথা হোথা—
বসরাই হাওয়া আজো আছে তবু সাকী কোথা?

মানব দরদী রবীন্দ্রনাথ

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

মানুষ আসে প্রথমে মাতৃগর্ভে তখন সে একমাত্র তাহার মাতার ধন। পৃথিবীতে জন্মমাত্র সে তার পরিবারের লোক। অন্নপ্রাশনের সঙ্গে সঙ্গে সে তার সমাজের মানুষ। তাই অন্নপ্রাশন কালে সমাজ মানুষকে অন্ন দেয় ও সে তাহা স্বীকার করে। ক্রমে জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গে সে তার দেশের ও জগতের সবার মধ্যেই স্থান লাভ করে।

মানুষের মধ্যে যাহারা সঙ্কীর্ণ ও স্বার্থপর তাহারা নিজেদের মানসিক প্রসার অনুসারে কেহ আপন পরিবারে, জাতিতে সম্প্রদায়ে বা দেশে বদ্ধ হইয়া পড়ে। বুদ্ধদেবের মত মুক্ত মানুষ ছিলেন বিশ্বমানবের। তাই তিনি বলেন, ব্রহ্ম-বিহার বলিতে বুঝিতে হইবে সর্বলোকের সঙ্গে যোগ ও মৈত্রী।

> মেত্তং চ সব্ব লোকস্মিন্
> মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং
> উদ্ধ অধো চ তিরিয়ঞ্চ
> অসম্বাধং আবর মসপত্তং

বুদ্ধদেবের সময়ে এদেশে বিচক্ষণ সমালোচকের দল ছিল কি না জানি না। থাকিলে তাঁর এই বিশ্বমৈত্রীর জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট গালাগালি খাইতে হইত। দেবদত্তের ও ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষুদের কাছে তিনি কম গালাগালি খান নাই। পরে হয়তো বুদ্ধের বিশ্বমৈত্রীর সাফল্য দেখিয়া তাহারাই বিশ্বমৈত্রীর সূচনার দাবী করিয়া থাকিবেন।

রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁহার বিশ্বমৈত্রীর কথা বলিলেন তখন তাঁহার প্রতি যে সব বিদ্রূপবাণ বর্ষিত হইয়াছিল তাহা এখনও পুরাতন সব মাসিক পত্রের ও খবরের কাগজের মধ্যে সন্ধান করিলেই মিলিবে। বিশ্বভারতী স্থাপনার বহু পূর্ব হইতেই "বিশ্ব" কথাটা একটা উপহাসের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছিল। জাতীয়তার উপরে আর কিছু বলিলেই যে তখন অপাংক্তেয় হইতে হইত তাহার বহু সাক্ষ্য পুরানো সব ফাইল ঘাঁটিলে মিলিবে।

ভারতবর্ষে নানাস্থানে তিনি তাঁর মহতী বাণী শুনাইয়া এশিয়া ও য়ুরোপে নানাস্থানে গেলেন ও বহু সম্মান পাইলেন। জাপান তো তাঁহাকে মাথায় তুলিয়া লইল। কিন্তু সেই জাপানকে যখন তিনি জাতীয়তার সংকীর্ণতা দেখাইয়া দিলেন তখন জাপানই কবির প্রতি বিমুখ হইয়া গেল। পাশ্চাত্য সব দেশেও এই অভিজ্ঞতা যে কবির কতক পরিমাণে না হইয়াছিল তাহা নহে। তবু তাঁহার সাহিত্যের অনুরাগী দলের মধ্যে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা কমে নাই।

পাশ্চাত্য দেশের সর্বগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদ দেখিয়া কবি ব্যথিত হইলেন। দেখিলেন এই আগুন নিভাইতে ধর্ম ও সংস্কৃতির শান্তি বারি চাই। ধর্মের প্রবর্তক মহাপুরুষদের উদ্ভব এশিয়াতে। অথচ এশিয়াই আজ সাম্রাজ্যবাদে নির্যাতিত। কাজেই এখন এশিয়ার কথা কে শুনিবে?

তিনি চাহিলেন এশিয়াতে জ্ঞান-বিজ্ঞান দীপ্ত জাপান যদি সারা এশিয়াকে জ্ঞান বিজ্ঞান দিয়া অগ্রসর করিয়া লয় তবে হয়ত বিজ্ঞান দীপ্ত এশিয়ার কথা পশ্চিমে বিকাইতে পারে। তাই তিনি জাপানে গিয়াই জাপানের সংকীর্ণ জাতীয়তার ও সাম্রাজ্যবাদের তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। জাপান তখন ভুল বুঝিল। কিন্তু যদি তখন সে সাবধান হইত তবে আজ আর তাহার এই দুর্গতি ঘটিতে পারিত না। যাহা হউক রবীন্দ্রনাথ সমস্ত পৃথিবীর কল্যাণের জন্য নির্যাতিত এশিয়াকে একটি শান্তিময় ও কল্যাণময় ঐক্যে উদ্বোধিত করিতে চাহিলেন।

সমস্ত জগতের কল্যাণ ও মৈত্রীই ছিল রবীন্দ্রনাথের কাম্য। তবু সাম্রাজ্যিকতায় সুরামত্ত পশ্চিমকে তখন বুঝাইয়া রাজি করা কঠিন মনে করিয়া তিনি চেষ্টা করিলেন সমস্ত এশিয়াকে যদি একত্র করিয়া মৈত্রীর বাণীকে শক্তিশালী করিয়া তোলা যায়। যদিও এখন এশিয়া নির্যাতিত, তবু এই মৈত্রীর বাণী এশিয়ায় পূর্ব গুরুদের কণ্ঠেই একদিন ধ্বনিত হইয়াছিল। এই যুগের আরম্ভেও রামমোহন এই বাণীরই অজ্ঞাত তাগিদে বাল্যকালে তিব্বতে যান ও যৌবনে পারসী আরবি ও হিব্রু সংস্কৃতিতে ভরপুর হইয়া ভারতীয় বাণী সহ যাত্রা করিয়া বিদেশেই দেহ রক্ষা করেন। জাপানের মনীষী ওকাকুরাও বলেন—এশিয়ার অখণ্ড একটি চিন্ময় ঐক্যকে কোনো ভৌগোলিক বাধায় ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে না। এশিয়া এক এবং সকলের কল্যাণই তাহার চরম সাধনীয়।

এশিয়ার পূর্ব গুরুদিগের পথে কবিও চলিলেন। য়ুরোপ হাসিল, জাপান রাগিল, দেশবাসীর দল উপহাস করিল। বহু উপহাসের মধ্যেও Internationalism Interdependance প্রভৃতি কথা রবীন্দ্রনাথই সকলের কাছে পরিচিত করাইলেন। বৃহত্তর ভারতের প্রথম পুরোহিত তিনি। দারুণ দারিদ্র্যের মধ্যেও বিশ্ব-ভারতীকে তিনি চীন-তিব্বত-আরব-পারস্যের সংস্কৃতির স্থান করিলেন। এজন্য লেভি-উইন্টারনিট্‌জ - ফর্মিকি - তুচ্চী - পুরদাউদ প্রভৃতি পণ্ডিতদের তিনি নানাদেশ হইতে ডাকিয়া আনিলেন। বৃদ্ধ বয়সে ভাঙ্গা শরীর লইয়া তিনি বার বার চীন জাপানে গিয়াছেন। যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, শ্যাম কম্বোডিয়া ইরাক ইরাণ আরব মিশর কাহাকেও তিনি উপেক্ষা

করেন নাই। কী কষ্টে সেই সব স্থান বৃদ্ধ বয়সেও তিনি ঘোরাঘুরি করিয়াছেন তাহা তিনিই জানেন। লোকে তাঁহার তখনকার চেষ্টাকে বৃথা পাগলামি মনে করিয়াছে।

জাপান ও পাশ্চাত্য দেশ যদিও তাহাদের জাতীয়তা বোধকে একটুও শিথিল হইতে দিতে রাজি হইল না তবু সেই সব দেশে রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী বন্ধুবর্গের অভাব ছিল না। ঘরে পরে নানা গঞ্জনার মধ্যে সেই সব বন্ধুগণের মৈত্রীই তাঁহার বৃহৎ সান্ত্বনা ছিল।

তবে যবদ্বীপ-শ্যাম-মিশর-ইরাণ-চীন প্রভৃতি নির্যাতিত দেশ তাঁহার সঙ্গে কম আত্মীয়তা করে নাই। চীনের ডাক্তার সান য়াত সেন ও ল্যাং চি চাও প্রভৃতির টানে ১৯২৪ সালে কবি চীন দেশে যান। কবি সেবার যে কয়জন বন্ধুকে সঙ্গে লইলেন তাহাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। সে আজ ২৩ বৎসর পূর্বেকার কথা। এখন এশিয়ার সঙ্গে যোগের প্রতি লোকের দৃষ্টি খুলিয়াছে। এবার কবির জন্মদিন উপলক্ষে সেই চীন যাত্রার সামান্য দুই একটি কথা যদি শুনাই তবে হয়তো লোকে তাহা স্নেহসহকারেই শুনিবেন।

১৯২৪, দোল পূর্ণিমার দিন যাত্রা করা গেল। চিরদিনই গঙ্গার শোভা কবির একান্ত অন্তরের বস্তু। সমুদ্রে পড়া পর্যন্ত কবি বাহিরেই কাটাইয়াছেন। দুই তীরের শোভা ও গঙ্গার ধারা দেখিয়া কবি বলিলেন, "আমি চিরদিনই গঙ্গার ভক্ত। এই দেশ এই গঙ্গা ছাড়িয়া আমার কোথাও যাইতে মন চাহে না। গঙ্গার শোভা দেখিলে আমি আত্মহারা হইয়া যাই। আমার নাড়ীতে গঙ্গার টান আছে।"

ব্রহ্ম, মালয়, সিঙ্গাপুর হইয়া চীনে হংকং পৌঁছিলাম। ডাক্তার সান য়াত সেন ক্যান্টন হইতে আপন সেক্রেটারী পাঠাইয়া জানাইলেন, "আমি পীড়িত শয্যাগত। নহিলে আমি স্বয়ং আপনাদের স্বাগত করিতে আসিতাম। তবু আমার সেক্রেটারীকে দিয়া এই কথাই বলিতে পাঠাইলাম যে আপনি যেন আমাকে দেখিবার জন্য ক্যান্টনে আসিয়া বৃথা বিলম্ব না করেন। উত্তর চীনেই এখন চীনের প্রাণ কেন্দ্র। সেখানে পিকিনেই আপনার কাজ আরম্ভ হওয়া উচিত। আমিও একটু ভাল হইলেই আপনার সঙ্গে গিয়া যোগ দিব।"

৭ই এপ্রিল আমরা হংকং পৌঁছিয়াছিলাম। তখনও সেখানে বেশ ঠান্ডা। আকাশ মেঘ ও কুয়াসায় ভরা। দার্জিলিঙের কুয়াসার কথা স্মরণ হইল। হংকং সহরের গোলমাল এড়াইবার জন্য Repulse Bay হোটেলে কবিগুরুর জন্য স্থান হইয়াছিল। ৮ই সকালে সান য়াত সেনের সেক্রেটারী সেইখানেই আসিয়া দেখা করিয়া গেলেন।

চীনে পদার্পণ করিয়াই মহাপুরুষ সান য়াত সেনের সহিত দেখা হইল না বলিয়া কবি দুঃখিত হইলেন। কিন্তু উপায় নাই, তিনি পীড়িত। তবু তাঁহারই নির্দেশ অনুসারে তাঁহারই সঙ্গে পরে মিলিত হওয়া যাইবে এই প্রত্যাশায় ৯ই ভোরে জাহাজে কবিগুরু হংকং ত্যাগ করিলেন।

ইহার পর হইতে চীনের কয়েকটি দিনের কথা বলা যাউক। তিনদিন সমুদ্রে কাটিল। প্রশান্ত মহাসাগরের শান্ত বিরাট তরঙ্গগুলি আমাদের দেহ ও প্রাণযন্ত্রকে দোলা দিয়া অস্থির করিয়া তুলিল। এতদিন কেহ সমুদ্র পীড়ার দেখা পান নাই। এখন আর কাহারও উড়ন্ত মাছ প্রভৃতি দেখিতে ভাল লাগিতেছে না। আরাম চেয়ারেই দিন কাটে, তরল খাদাই ভাল লাগে। ১২ই ভোরে য়াংসি নদীতে প্রবেশ করিতেই সকলে প্রকৃতিস্থ হইলেন। ১২ই এপ্রিল তারিখে মধ্যাহ্নে Shang Hai পৌঁছিলাম। বসন্ত শোভায় প্রকৃতি ভরপুর। চীনের বহু গণ্যমান্য লোক গুরুদেবকে স্বাগত করিতে জাহাজে উপস্থিত। কবি সু-সী-মোর সঙ্গে এখানেই আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় হইল। চীনের প্রকৃতি শোভায় কবিগুরুকে মুগ্ধ দেখিয়া চীন বন্ধুরা তাঁহাকে লইয়া বৈকালে সাততলা একটি Pagoda ও বৌদ্ধ মন্দিরে গেলেন। যতদূর মনে পড়ে ঐ Pagodaটির নাম Loongula। সেখানে বৌদ্ধ মন্দিরে বুদ্ধদেবের গম্ভীর আনন্দময় মূর্তি, অবলোকিতেশ্বরের শান্ত মূর্তি, মঞ্জুশ্রীর কল্যাণমূর্তি। চারিদিকে উদ্যানে পীচের, প্লামের ও নানা রকমের বেগুনি, লাল ও নানা বর্ণের ফুলে উৎসব লাগিয়া গিয়াছে। কবি সেই সৌন্দর্যসাগরে যেন ডুবিয়া গেলেন।

তাঁহার আনন্দ দেখিয়া চীন বন্ধুগণ ঠিক করিলেন কবিকে লইয়া প্রথমেই চীনের রমণীয় স্থান হ্যাংচাউ (Hangchow)র West Lake এ লইয়া যাইবেন। ১৪ই এপ্রিল আমাদের নববর্ষ অর্থাৎ ১লা বৈশাখ বলিয়া তাঁহারা পূর্বদিন ১৩ তারিখেই সব ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলেন। ১৪ই সকালেই আমরা সাংহাই হইতে হ্যাংচাউ রওয়ানা হইলাম। ট্রেনে বসিয়া প্রকৃতির রমণীয় শোভা দেখিতে লাগিলাম। আমাদের দেশের মতই মাঠের পরে চলিয়াছে মাঠ। সরিষার ফুলের মত পীত রঙের নানা রকমের ফুলে মাঠ সমাচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে বেগুনি ফুলের বাহার। মধ্যে মধ্যে ছোট নদী ও খাল আসিতেছে। সবই কানায় কানায় জলে ও শোভায় পূর্ণ। নৌকা, তাহার ছই ও মাঝি দেখিয়া পূর্ববঙ্গের কথা মনে হইতেছিল। নানা রকমের জাল ও পেলিকন (Pelican) পাখীর সাহায্যে মাছ ধরা চলিয়াছে। ধানের মড়াই, খড়ের ঘর, পুকুর, খাল, সেতু, তৃণে ও শস্যে ঢাকা মাঠ ও তার মধ্য দিয়া পায়ে হাঁটা পথ দেখিয়া আমাদেরই মনে হইতেছে যেন দেশেই ফিরিয়াছি। আজ পহেলা বৈশাখ বেলা ১২॥ টায় Chow স্টেশনে পৌঁছিলাম। চমৎকার রমণীয় হ্রদের তীরে আমাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। কি সুন্দর হ্রদের শোভা! হ্রদের মাঝে মাঝে ছোট ছোট দ্বীপ। দ্বীপগুলির মধ্যে মনোহর সব মন্দির ও উদ্যান। হ্রদের মধ্যে কয়েকটি মন্দির দেখিতে ঠিক আমাদের দেশের মত। তাহার মধ্যে ঠিক জাতীয় পদ্ধতিতে নির্মিত বজ্রকূট মন্দির বা শ্বেতনাগ মন্দির (Thunder Peak Pagoda বা White Snake Pagoda) কিছুদিন পরেই পড়িয়া নষ্ট হইয়া যায়। আমরা নববৎসরে এইসব রমণীয় দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। মনে হইল যেন আমরা বিদেশে নাই যেন আপন দেশে বসিয়াই নব বৎসরের উৎসব করিতেছি।

হ্রদের আর এক তীরে Ling yen বিহার। সেখানে খৃষ্টীয় ২৬০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি ভারতীয় এক সাধক আসিয়া (Hui li) সাধনায় জীবন ব্যতীত করেন। এখন তাহা একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। স্থানটি প্রকৃত শোভায় রমণীয়।

ভোর হইবার আগেই দেখিতেছি আমাদের বাড়ীর নীচ দিয়া, হ্রদের তীরে তীরে ভক্ত তীর্থযাত্রীর দল স্তব পাঠসহ নানা উপকরণ লইয়া চলিয়াছে সেই তীর্থে। ঠিক যেন মনে হইল কাশীতেই বসিয়া আছি। প্রভাতে উপাসনার অন্তে কবিগুরুকেও দেখিলাম এ সব দেখিয়া মুগ্ধ। এই সব দেখিতে দেখিতে মনে হইল তিনি যেন তাঁহার অন্তরের [illegible] কোন্ ধ্যানলোকে ডুবিয়া গিয়াছেন। পরদিন ভোরে এইসব দেখিয়া তিনি মনের [illegible] বলিলেন, "আমার মনে হইতেছে না যে, [illegible] কোন নূতন স্থানে আসিয়াছি। আমার [illegible] হইতেছে যেন কোন অতীত জন্মে [illegible] এইখানেই ছিলাম। সেই জন্মের নিগূঢ় বন্ধ এক "অবোধপূর্ব" যোগে আমার সঙ্গে এখা[illegible]কার অধ্যাত্ম সম্বন্ধ। তবে এই দেশের [illegible] কোন জায়গাটিতে আমার জন্মান্তরের নাড়ী যোগ তাহা ঠিক বুঝিতেছি না। তবু কি সেই সূত্রেই সারা দেশটাই আমার যেন [illegible] মনোহর মনে হইতেছে। এইসব জিনি[স] ভারতবর্ষে দেখিয়া অভ্যস্ত হইয়াছি বলিয়া হয়তো এখানে ইহা নূতন করিয়া দেখিতেছি [illegible] ভাল লাগিতেছে। সেই অতীতে এইখানে এ[ই]গুলি ভাল বাসিতে শিখিয়াছিলাম বলিয়া এইবার ভারতের মধ্যে জন্ম নিয়া এই[সব] জিনিস হয়তো ভাল লাগিয়াছে।"

জীবন-মৃত্যুর সূত্রের দ্বারা দেশ-দেশান্ত ও লোক-লোকান্তরকে যুক্ত করার কথা তি[নি] এই যে নূতন বলিলেন তাহা নহে। ২২ বৎ[সর] বয়সে তাঁহার প্রভাত সঙ্গীতে (অনন্তম[রণ]) তিনি গাহিয়াছেন—

"নব নব তারায় প্রবেশি।......
আমার মরণ ডোর দিয়ে
গে'থে দেব জগতের মালা।"

তখন বুঝিলাম সকল সংকীর্ণতার অতীত কবিগুরুর উদার মানবিকতার মূল কোথায়? যাঁহারা নিজেকে বিশেষ একটি দেশের মানুষ বলিয়াই জানেন, তাঁহারা হয় স্বার্থপরায়ণ হইয়া সেই দেশের সংকীর্ণ সীমাতেই আপনাকে সীমাবদ্ধ রাখেন, না হয় বড় জোর খানিকটা মহত্ত্ববশতঃ অন্যদের প্রতি একটু ভদ্রতা ও দাক্ষিণ্য দিয়াই নিজেদের খালাস মনে করেন। আপনাকে শুধু এই জন্মের আকস্মিক (accidental) পরিচয়ের দ্বারা এক দেশে বদ্ধ করিয়া রবীন্দ্রনাথ দেখেন না। জন্ম-জন্মান্তরে আপনাকে ব্যাপ্ত করিয়া নানা লোকে লোকান্তরে দেশে দেশান্তরে তিনি আপনার বিরাট আত্মাকে বাধাহীনভাবে উপলব্ধি করেন। তাই যখন তিনি যে কোন দেশের দুঃখ-দুর্দশার কথায় ব্যথিত হন, তখন তাঁহার মনে বাহির হইতে আগত মানুষের মধ্যে দুঃখ দয়া করার প্রবৃত্তি মাত্র থাকে না। সেই দেশের সঙ্গে তাঁহার যে "অবোধপূর্ব" পুরাতন নাড়ীর টান আছে, সেই টানের বলেই তিনি তাঁর অন্তরের যোগ বোধ করেন এবং মর্মান্তরে উপলব্ধ আপন বেদনা এত মর্মস্পর্শী বাণীতে প্রকাশ করিতে পারেন। তাঁহার বিশ্বমানবতার (Internationalism) মধ্যে তাঁহার সেই দেশ দেশান্তরের সঙ্গে জন্ম-জন্মান্তরে যোগযুক্ত বিরাট আমির যথার্থ পরিচয় মেলে।

এই "অবোধপূর্ব" জন্মান্তরের যোগের কথা রবীন্দ্রনাথই যে প্রথম বলিলেন তাহা নহে। আমাদের দেশে এই কথা অতি পুরাতন। কবি হিসাবেও কালিদাস বহু পূর্বেই বলিয়াছেন—এক একটি রম্য রূপে বা মধুর শব্দে আমাদের মন যে আরামের মধ্যেও ব্যাকুল হয় তাহার অর্থ আর কিছু নহে, সে অন্তরে অন্তরে বিস্মৃত অবোধপূর্ব পূর্ব-জন্মের ভালবাসা স্মরণ করে।

ভাবস্থির, জননান্তর, সৌহৃদ ও "অবোধ-পূর্ব" প্রভৃতি কথা কালিদাসেরই স্বরচিত শব্দ।

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্ পর্যুৎসুকী
ভবতি যৎসুখিতো দ্বিজজন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং ভাবস্থিরাণ
জননান্তর সৌহৃদানি॥
(অভিজ্ঞান শকুন্তল, ৫ম অঙ্ক ২)

এইসব কথা গুরুদেবও তাঁহার লেখাতে নানা স্থানে নানাভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। সোনার তরীতে তাঁহার বসুন্ধরা কবিতায় দেখি—

তোমার মৃত্তিকা সনে
আমারে মিলায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে, করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল——

তাহার পরে সেই কবিতাতেই আবার দেখি—
"ডাকে যেন মোরে
অব্যক্ত আহ্বান রবে শতবার করে'
সমস্ত ভুবন"
আবার তাহার পর দেখা যায়—
ওগো মাতৃভূমি,
যুগ যুগান্তের মহা মৃত্তিকা বন্ধন
সহসা কি ছি'ড়ে যাবে?"

এই জন্ম জন্মান্তরের যোগ রহিয়াছে বলিয়াই সমুদ্রের ভাষাহীন তরঙ্গেও কবি তাহার মর্ম কথাটি অনেক পরিমাণে বুঝিতে পারেন। আমাদের নাড়ীর স্পন্দনের সঙ্গে বিশ্বের স্পন্দনের গভীর প্রেম যোগ।

"মনে হয় অন্তরের মাঝখানে
নাড়ীতে যে রক্ত বহে সেও যেন ঐ ভাষা জানে।"
—সমুদ্রের প্রতি (সোনার তরী)।

চৈতালির "মধ্যাহ্ন" কবিতায় তো তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন—
"ফিরিয়া এসেছি যেন আদি জন্মস্থলে
বহুকাল পরে
ফিরে গেছি যেন কোন নবীন প্রভাতে
পূর্বজন্মে........"

শুধু কবিতার উচ্ছ্বাসেই তাঁহার এই ভাব ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা নহে। ব্যক্তিগতভাবে লিখিত পত্রেও এই সত্যটি তিনি বাঁধিয়া রাখিতে পারেন নাই। (See ছিন্ন পত্র, p ১৩২, ১৩১৯ সংস্করণ)।

Hangchow ওয়েষ্ট হ্রদের তীরে তাঁহার এই কথায় বুঝিলাম চীন দেশের প্রতি, শুধু চীন কেন জগতের সমস্ত দেশের প্রতি তাঁহার গভীর টানের মূলে আছে তাঁহার এক সর্বস্থানব্যাপী ও সর্বকালব্যাপী বিরাট আমিত্বের উপলব্ধি। এই সব নিগূঢ় কথা সকলের কাছে বলিবার মত নহে। চীনে সেবার তাঁহার কর্মসূচী ছিল একেবারে ঠাসা। তবু তাহার মধ্যেও আরও দুই একদিন তাঁহার কথাতে এই ভাবের পরিচয় পাইয়াছি। শ্যেনসি দেশ শেনশি (Shenshi) হইতে রওয়ানা হইয়া হ্যাংকাউ (Hankow) যাইতেছি। ২৫শে মে ভোর বেলা ঠিক পূর্ববঙ্গের মত সবুজ ও স্নিগ্ধ সজল ভাব দেখিয়া আমরাই মুগ্ধ হইয়া যেন কি ভাবিতেছি। পূর্ববঙ্গের লোক যখন শুকে পশ্চিম দেশ হইতে দেশে ফেরেন তখন ভোর বেলা গোয়ালন্দে পৌঁছিবার পূর্বে একটা সরস সৌন্দর্য যেমন তিনি দেখিতে পান, এই প্রকৃতি শোভাও দেখাইতেছিল কতকটা সেই রকম। সবই যেন বাঙলার শোভা। প্রভাতের উপাসনার অন্তে গুরুদেব তখন তাই আবার তুলিলেন চীনের সঙ্গে তাঁহার "অবোধ-পূর্ব" পূর্বতন নাড়ীর যোগের কথা।

হ্যাংকো আসিয়া আমরা য়াংসি নদীর অপর তীরে উ চাংগ (Woo chang) গেলাম। সেখানে তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতায় উন্মত্ত চীন দেশকে সাবধান করিয়া বলিলেন—"যে সভ্যতা বাহিরে চকচকে অথচ ভিতরে যার আদিম রাক্ষসবৃত্তি, তাহাতে যদি মুগ্ধ হও তবে মরিবে। তোমাদের চিরন্তন Perfection of Human ideal এর সুমহৎ শিক্ষা বিস্মৃত হোয়ো না"—ইত্যাদি

হ্যাংকো হইতে য়াংসি নদী দিয়া আমরা জাহাজে সাংহাই রওয়ানা হইলাম। চমৎকার দৃশ্য। ২৬শে মে তারিখে বৈকালে Kiukiangএ পৌঁছিলাম। বাণিজ্য প্রধান নগর। ফল তরী-তরকারী ও নানা শিল্পদ্রব্য এখানে প্রচুর। গল্প শুনিলাম এখানে নাকি পূর্বকালে পাথরের নৌকাতে করিয়া এক তিব্বতের সাধক আসেন। এখনও তাঁহার লৌহময়ী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। আমাদের দক্ষিণে Kuling পর্বত। পথে বিখ্যাত পর্বত তা গু শান (Ta Ku Shan) এবং শোও গু শান (Sho Ku Shan) সকলের চিত্ত হরণ করে।

২৭শে মে। প্রভাতটি চমৎকার। তীরে নৌকা, পাল প্রভৃতি দেখিয়া দেশের কথা মনে হয়। সকালে Wa Hu পৌঁছিলাম। এখানে কবি Li Tai poর স্মৃতি মন্দির। পদ্মার স্মৃতিতে ভরপুর হইয়া রবীন্দ্রনাথ গুন গুন করিয়া ভাটিয়ালী সুরে গান করিতেছিলেন। বাম তীরে দূরে একটি পোস্তা বাঁধান জায়গায় চমৎকার মন্দির দেখিয়া তিনি বলিলেন, "আমার মনে হয় এই অপূর্ব দৃশ্য আমি এই যে প্রথম দেখিলাম তাহা নহে। কোন সুদূর পূর্ব জন্মে যেন আমি এখানেই জন্মিয়া এই শোভার মধ্যেই প্রতিপালিত হইয়াছিলাম। আজও তাহার টান আমার নাড়ীর মধ্যে রহিয়াছে। এই গোটা চীন দেশই আমার যেন অত্যন্ত আপনার বলিয়া মনে হইতেছিল। তার মধ্যে বিশেষ করিয়া মুগ্ধ হইতেছি এই য়াংসি নদীর শোভা দেখিয়া। এখানে এই নদীর শোভা দেখিয়া মনে হইতেছে, হয়তো এখানেই কোথাও আমি একবার আসিয়াছিলাম সেই সূত্রেই এই সব আমার আপনার হইয়া গিয়াছে। সেই জন্য বাঙলা দেশের পদ্মা নদী আমাকে এমন করিয়া বাঁধিয়াছে। তাই এই দেশ আমার এত ভাল লাগে। এই সব কথা তো সকলকে বলা যায় না। এবার পিকিনে আমার জন্মোৎসব যে চীন দেশের বন্ধুরা করিলেন তাহাতে বলিতে ইচ্ছা হইতেছিল বিদেশের কবিকে যে তোমরা সম্মান করিতেছ তাহা সত্য নহে। তোমরা আমার আপন, তোমরা আমার এক মাতৃগর্ভে জাত ভাই, আপনার ভাইকেই এতদিনে নিজের ঘরে তোমরা সম্মান করিয়াছ। কিন্তু সে কথার প্রমাণ এখনই সম্মুখে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত নাই। অথচ যাহা আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছি তাহা আমি ভাষাতে বলিব কেমন করিয়া? তাই মনের কথা মনেই রহিল।"

১৯২৪ সালের ৮ই মে রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসবে পিকিনে চীন দেশীয় বন্ধুরা যে

বিরাট আয়োজন করিয়াছিলেন তাহার তুলনা হয় না। সেই প্রীতিতে মুগ্ধ হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "আজ আমি তোমাদের প্রেমে তোমাদের মধ্যে যেন নবজন্ম লাভ করিলাম। শুধু জন্মদিনের অনুষ্ঠান মাত্র হইল এই রকম কথা বলা চলিত না। প্রীতির ও আত্মীয়তার নির্মল উচ্ছ্বাসে তোমরা আমাকে নবজন্ম দান করিয়াছ, তোমরা আমাকে নূতন নাম ও নূতন বেশভূষা দিয়া আপন করিয়া লইয়াছ। আজ আমি তোমাদের এই আত্মীয়তার সৌভাগ্যে ধন্য।"

পিকিনে গণ্যমান্য লোকদের মধ্যে যে সব কথা কবিগুরু বলিলেন তাহাতে তাঁহার সৌজন্যের বাণী প্রচুর থাকিলেও "ভাব স্থির জননান্তর সৌহৃদ" বাণী নাই। সেই সব কথা সাধারণ কথোপকথনে চলে না। তাহা একমাত্র বলা যায় গানে বা কবিতায়। সোনারতরী চৈতালী প্রভৃতি কাব্যে তরুণ বয়সে যাহা তিনি লিখিয়াছেন, তাহা তো পূর্বেই দেখান হইয়াছে। গানের মধ্যেও তিনি এই কথা প্রকাশ করিয়াছেন—

"কত অজানারে জানাইলে তুমি কত ঘরে দিলে ঠাঁই
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু, পরকে করিলে ভাই।"

তাহার জীবনের পরিণততম বয়সের বাণীতেও দেখা যায়—

"এই আমি যুগে যুগান্তরে কত মূর্তি ধরে
কত নামে কত জন্ম কত মৃত্যু করে পারাপার
কত বারংবার।" "**আমি", পরিশেষ**

"বিরাটের মাঝে
একরূপে নাই হয়ে অন্যরূপে তাহাই বিরাজে।"
"ধাবমান", পরিশেষ।

তাই সকলকেই তিনি ডাক দিয়া বলিতে পারেন—

"আমি তো তোমাদেরি লোক।—
আর কিছু নয়,
এই হোক শেষ পরিচয়।"
(সেঁজুতি, পৃঃ ৫৫)

আরও স্পষ্ট করিয়া এই কথা তিনি বলিয়াছেন—

"বুঝিলাম এই জন্ম মোর
নব নব জন্মসূত্রে গাঁথা।"
(রোগশয্যায়, নং ২৩)

জন্মে জন্মে লোকে লোকে দেশে দেশে তিনি নব নব প্রেমযোগ উপলব্ধি করিয়াছেন। আবার এই জন্মেও যেখানেই তিনি গভীর প্রীতি পাইয়াছেন সেখানেও নব জন্ম লাভ করিয়াছেন,

"একথা বুঝিনু মনে
যেখানেই বন্ধু পাই সেখানেই নব জন্ম ঘটে।"
(জন্মদিনে, নং ৩)

চীন দেশে উভয়ভাবে তিনি আপনাকে ঘনিষ্ঠ যোগে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। প্রীতিতে নবজন্মের কথা তিনি ৮ই মে পিকিনের সভাস্থলে মুখে বলিয়াছেন। আর জন্ম জন্মান্তরের সেই কথা তিনি প্রকাশ্যভাবে না বলিলেও তাঁহার গভীর প্রীতিতে অনুরাগে, কর্মে ও বাণীতে প্রতিক্ষণেই চীনের সঙ্গে তাঁহার সেই অবোধপূর্ব যোগটি বার বার দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে এবং মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে তাহা তিনি ব্যক্তও করিয়াছেন।

তাই চীন দেশ হইতে ফিরিবার সময় "দেশমুখো" প্রবাসীর যে উৎসাহ তাহা তাঁহার মধ্যে দেখা গেল না। মনে হইল তিনি যেন কতকালের জন্ম সূত্রে নাড়ীতে নাড়ীতে যুক্ত আপন মাতৃভূমিখানিকে ছাড়িয়া অন্যত্র কোথায় চলিয়াছেন। তাই চীন ত্যাগের পূর্বে তাঁহার বিদায় প্রার্থনার মধ্যে এতখানি বেদনার ব্যাকুলতা ছিল। বাহিরে তিনি সম্বর্ধনা কথাতে তাঁহার এই প্রেমটি ব্যক্ত করিলেও তাঁহার অন্তরের গভীরে যে উদার প্রেম ছিল তাহার একটু আধটু আভাস পাইয়া আমরা ধন্য হইয়াছিলাম। সেই সব মুহূর্তে এই মহাপুরুষের সংস্পর্শে আমাদেরও মনের দেশকাল প্রভৃতি সকল সীমানা যেন বিগলিত হইয়া গিয়াছিল। আমাদের অন্তরাত্মা যেন সেই সব মহা মুহূর্তে তখনকার মত একটি অপূর্ব অসীম বিরাট মানবিকতার অমৃতময় আস্বাদ উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছিল।

দিনের আলোক যবে রাত্রির অতলে
হয়ে যায় হারা
আঁধারের ধ্যানবেদী দীপ্ত হয়ে জ্বলে
শত লক্ষ তারা।
আলোহীন বাহিরের আশাহীন দৈন্যের ক্ষতি
পূর্ণ করে দেয় যেন অন্তরের অন্তহীন জ্যোতি॥
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যাহার অন্ত্যপর্ব হইতেছে আত্মদ্বন্দ্বের ইতিহাস।

২

চৌধুরীদের বিশাল বাড়ির প্রাচীনতম অংশে একটি বেলগাছ আছে। বেলগাছটি সকল শরিকের এজমালি। কালক্রমে বাড়িঘর, গোলার জমিদারী সমস্তই ভাগ হইয়া গিয়াছে—কিন্তু বেলগাছটি ও তৎসংলগ্ন জমি ভাগ করিবার কথা কাহারও মনে ওঠে নাই। চৌধুরীদের আদিম একতার চিহ্নস্বরূপ বেলগাছটি এখনো এজমালি রহিয়া গিয়াছে।

জোড়াদীঘি গ্রামে পূর্বোক্ত অশ্বত্থ ও এই বেলগাছটি লোকচক্ষে দেবপদবীতে অধিষ্ঠিত। দুটিকেই লোকে ভক্তি করে, তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে অশ্বত্থ গাছ গ্রামের সাধারণের সম্পত্তি, আর বেলগাছটি জমিদারগণের নিজস্ব সম্পত্তি। নিছক প্রাচীনতার বিচারে বেলগাছটিই অধিকতর বনিয়াদি—কিন্তু অশ্বত্থ গাছ জোড়াদীঘি ও আশেপাশের বহু গ্রামের ভক্তির ফলে লোকচক্ষে যে পদবী লাভ করিয়াছিল, বেলগাছটির পক্ষে তাহা সম্ভব হয় নাই। ইহা চৌধুরীদের একান্তভাবে আপনার, জনশ্রুতি-বলে ইহার সহিত চৌধুরীবংশের প্রাচীনতম স্মৃতি ও পরবর্তী উন্নতি জড়িত।

গ্রামের বৃদ্ধদের কাছে এখনো শুনিতে পাওয়া যায়—এই বেলগাছের ইতিহাস। কিম্বদন্তীর ধারা তাহাদের স্মৃতির কমণ্ডলুতে সঞ্চিত হইয়া আছে। একদিন, বহুকাল আগে, চৌধুরীদের আদি পুরুষ পিঁপড়িয়া ওঝা এই গ্রামটি অতিক্রম করিয়া যাইতেছিল। গ্রাম তো ভারি, এ জোড়াদীঘি সে জোড়াদীঘি নয়। তখন থাকিবার মধ্যে ছিল ঘর কয় বেনে আর জোলা, আর নদীর ধারে ঘর দুই বৈদিক ব্রাহ্মণ। গ্রামের অধিকাংশ তখন ছিল গোচর মাঠ, বেনা বন আর আগাছা। নদীটা অবশ্য ছিল—কিন্তু বর্তমান খাতে নয়, এখন যেখানে বিল, সেখানে ছিল নদী, নদীর পুরাতন খাত বিলে পরিণত হইয়াছে। অনেক-কাল আগে লোকে বলে পাঁচশ বছর, হাজার বছর, লোকের স্মৃতিতে দুই-ই সমান, পিঁপড়িয়া ওঝা এই গ্রামের পথ দিয়া যাইতে-ছিল। চৈত্র মাসের দুপুরবেলা, প্রচণ্ড রোদ, ওঝার বিষম তৃষ্ণা পাইল। কিন্তু জল কোথায়? নদী দূরে, নিকটে জলাশয় নাই, বেনে বা জোলার জলগ্রহণ ঠাকুর করে না, কি কর্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া ঠাকুর চলিতেই লাগিল। মাথার উপরে গামছা, ঘামে ভেজা, সমস্ত শরীর বাহিয়া ঘাম পড়িতেছে। ওঝা ভাবিল আর বোধ হয় চলিতে পারিবে না, পথের মাঝেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবে। এমন

চতুর্থ খণ্ড

১

জোড়াদীঘির চৌধুরীদের ইতিহাস রূপান্তরে মানুষেরই ইতিহাস। মানুষের ইতিহাস কি বলিয়া দেয় না যে মানুষ ক্রমে বস্তুগত হইতে ব্যক্তিগত হইয়া উঠিতেছে? বহির্বিশ্ব হইতে ধীরে ধীরে সম্ভবত নিজের অগোচরে সে অন্তর্বিশ্বাভিমুখী হইয়া উঠিতেছে? স্থূল দৃষ্টিতে ইহাই মানুষের ইতিহাসের গতির লক্ষ্য।

সত্যযুগে স্বর্গে মর্ত্যে লড়াই চলিয়াছিল। ত্রেতাযুগের লড়াই-এর ক্ষেত্র মর্ত্যে, স্বর্গে মর্ত্যে নয় এবং যুযুধান পক্ষদ্বয়—মানুষ ও রাক্ষস, সত্যযুগের মতো দেবদানব নহে। দ্বাপরের লড়াই যে কেবল মানুষে মানুষে মাত্র তাহাই নয়, সে লড়াই ভাইয়ে ভাইয়ে, কুরু-পাণ্ডবে, একই রক্তধারাবাহী দুই পক্ষের মধ্যে। কলিকালে এই প্রক্রিয়া আরও ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিয়াছে। এবার লড়াই মানুষের নিজের সঙ্গে, নিজের মধ্যে, সে একাই যুযুধান পক্ষদ্বয়—সে একাই দেবদানব, রাম-রাবণ, কুরু-পাণ্ডব; তাহার হৃদয়ই হইতেছে স্বর্গ-মর্ত্য, লঙ্কাদ্বীপ এবং কুরুক্ষেত্র। বস্তুগত মানুষ ব্যক্তিগত মানুষ হইয়া উঠিয়াছে।

জোড়াদীঘির চৌধুরীদের ধারা পূর্বোক্তের অনুরূপ। এই বংশের সত্যযুগের ইতিহাস অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে তখন লড়াই ছিল আধিদৈবিকের সহিত। জোড়াদীঘির চৌধুরীদের আদি পুরুষগণ বন কাটিয়া, শ্বাপদ তাড়াইয়া, বিলখাল বুজাইয়া দিয়া, নদীর গতি ঘুরাইয়া দিয়া গ্রাম পত্তন করিয়াছিল। সেটা ছিল যেন স্বর্গে মর্ত্যে লড়াইয়ের অনুরূপ। তারপরে ত্রেতার আবির্ভাব তাহাদের বংশের ইতিহাসে। পার্শ্ববর্তী জমিদারগণের সহিত বাধিল তাহাদের সংঘর্ষ। বর্তমান কাহিনীতে আমরা জোড়াদীঘির দ্বাপরযুগে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এবারে ভাইয়ে ভাইয়ে, শরিকে শরিকে লড়াইয়ের পালা। কিন্তু এই ব্যক্তিমুখী গতির এখানেই সমাপ্তি নয়। সম্মুখে আছে ইহাদের কলিকাল—তখন জোড়াদীঘির জমিদারগণ আর বহির্বিশ্বগত কাহারো সহিত লড়াই করিতে সজ্জিত হইবে না। একাকী নির্জনে বসিয়া নিজের সহিত আত্মদ্বন্দ্ব করিতে থাকিবে।

এই আত্মদ্বন্দ্বের অপর নাম আত্মচিন্তা। রাজসিক স্তরে যাহা আত্মদ্বন্দ্ব, সাত্ত্বিক-স্তরে তাহাই আত্মচিন্তা, তামসিক স্তরে মানুষ দ্বন্দ্বও করে না, চিন্তাও করে না, কারণ তমসার আবরণে তখন সে নিজেকে আবিষ্কার করিতেই পারে নাই, মানুষ তখন জড়বস্তুর সামিল। তবে আত্মদ্বন্দ্বে ও আত্মচিন্তায় প্রধান প্রভেদ এই যে দ্বন্দ্বের মূলে আছে আত্মেতর কোন বস্তু, চিন্তার মূলে স্বয়ং আত্মা। বস্তুগত হইতে ব্যক্তিগত লক্ষ্যে যাত্রাপথে আত্মচিন্তা চরমতর রূপ। কিন্তু চরমতম না হইতেও পারে। এমন অবস্থা কল্পনাতীত নয় যখন আত্মা অবিভাজ্য হইয়া পড়ে, তখন দ্বন্দ্ব বা চিন্তার প্রয়োজনাভাব। সেই অবস্থা তামসিক অবস্থার ঠিক বিপরীত। তামসিক অবস্থা যদি মানবজীবনের সুমেরু হয়, এই অবস্থা মানব-জীবনের সুমেরু। কিন্তু এ অবস্থার সহিত আমাদের বিশেষ সম্বন্ধ নাই—এ অবস্থা যোগের অন্তর্গত, শিল্পের অন্তর্গত নয়। যোগী ও শিল্পী পৃথক জগতের লোক। শিল্পী জাগতিক, যোগী অতি-জাগতিক। জগৎ লইয়া আমাদের কারবার—যোগাভিজ্ঞতায় আমাদের আবশ্যক কি? আর আবশ্যক থাকিলেই বা জানিবার উপায় কই? যোগানুভূতি প্রকাশের অতীত। যদি কখনো কোথাও তাহা প্রকাশিত হইয়া থাকে—বুঝিতে হইবে তাহার স্বরূপ হইতে বিচ্যুত। যাহা স্বভাবত প্রকাশ নহে শিল্পীর তাহাতে প্রয়োজন কোথায়? কারণ প্রকাশই শিল্পের কার্য—অথবা প্রকাশই শিল্প।

ফল কথা, বর্তমান গ্রন্থ জোড়াদীঘির চৌধুরীদের ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের কুরুক্ষেত্রের ইতিহাস। বস্তুগত হইতে ব্যক্তিগত পথের উপান্ত পর্ব,

সময়ে এই বেলগাছটির তলায় ওঝা আসিয়া পড়িল। ভাবিল জল না মিলুক, একটু ছায়া তো মিলিবে। ঠাকুর বসিয়া পড়িয়া গামছা দিয়া নিজেকে বাতাস করিতে লাগিল। এমন সময়ে পদশব্দে পিছনে চাহিয়া দেখিল, একি! লাল পেড়ে শাড়িপরা লক্ষ্মীপ্রতিমার মতো একটি মেয়ে, এক হাতে তাহার কাঁসার ঘটিতে জল, এমন স্বচ্ছ আর শীতল যে দেখিলেই তৃষ্ণা নিবারণ হয়, অপর হাতে আধখানা বেল। ওঝা কি করিবে, কি শুধাইবে ভাবিতেছে, এমন সময়ে মেয়েটি জল দিয়া মাটি নিকাইয়া ঘটি ও বেল আধখানা সেখানে রাখিল, বলিল—ঠাকুর, বেলটুকু খেয়ে জল পান করো, তোমার নিশ্চয় খুব পিপাসা পেয়েছে।

ওঝার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল—এমেয়ে কি অন্তর্যামী, নতুবা তাহার কষ্ট বুঝিল কিরূপে আর এই জনপদহীন জনশূন্য মাঠের মধ্যে মেয়েটি আসিলই বা কোথা হইতে? এ মেয়ে কাহার ঝিয়ারি, কোথায় ইহার বাড়ি, নানা চিন্তা তাহার মনে উদিত হইতে লাগিল।

বিস্ময় একটু কাটিলে ওঝা শুধাইল, মা তুমি থাকো কোথায়? তোমার বাড়ি কোথায়?

মেয়েটি বলিল—এখানেই আমার বাড়ি, এই বেলতলাতেই আমি থাকি।

তারপরে থামিয়া বলিল—নাও, ঠাকুর, খেয়ে তৃষ্ণা দূর করো। এই বলিয়া সে যাইতে উদ্যত হইল। ওঝা বলিল—সে কি মা তুমি চললে? ঘটিটা নিয়ে যাও।

মেয়েটি বলিল—আমি এখনই আসছি, আমি না আসা অবধি তুমি এখানে থেকো। এই বলিয়া সে প্রস্থান করিল।

ঠাকুর বেলটুকু খাইল। বেল যে এমন মিষ্ট হইতে পারে, এমন সুস্বাদু হইতে পারে, সে জানিত না, যেন অমৃত। তারপরে জল পান করিল। আহা সে কি স্বাদ, শীতল, শ্রান্তিহরা। ফলে তাহার ক্ষুধা, জলে তাহার তৃষ্ণা দূর হইল। ঠাকুর ভাবিল এমন মিষ্ট জল আর ফল যে গ্রামের সে গ্রামের কেন এমন লক্ষ্মীছাড়ার দশা। এই রকম দশ কথা ভাবিতে ভাবিতে কখন যে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, ঠাকুর তাহা জানিতেও পারিল না।

ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া ঠাকুর স্বপ্ন দেখিল—সেই বেলগাছ তলায় মহাসমারোহে ঢাক, ঢোল, সানাই, কাঁসি বাজাইয়া, ধূপধুনা পুড়াইয়া দুর্গোৎসব পূজো আরম্ভ হইয়াছে। বেলগাছের ঠিক নীচে যথোপচারে সুসজ্জিত দুর্গা-প্রতিমা। কিন্তু একি, প্রতিমার আর সব মূর্তিই রহিয়াছে, কেবল দুর্গা মূর্তিটির অভাব। ওঝা বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল—এ কেমন ধারা। এমন সময়ে সে দেখিতে পাইল সেই মেয়েটি এদিকে আসিতেছে। ওঝা তাহাকে ডাকিবে ভাবিতেছে, এমন সময়ে দেখিল, মেয়েটি সোজা প্রতিমার নিকটে উপস্থিত হইল, আর সেই দুর্গাপ্রতিমার শূন্যস্থানে গিয়া দাঁড়াইল, এক পা অসুরের কাঁধে, এক পা সিংহের পিঠে। অমনি দ্বিগুণ উৎসাহে ঢাক ঢোল, কাঁসর ঘন্টা, শঙ্খ সানাই বাজিয়া উঠিল, জনতা হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল, ধূপধুনার সুগন্ধে বেলতলা আমোদিত হইয়া উঠিল। ঘুম ভাঙিয়া ঠাকুর লাফাইয়া উঠিল—তাহার সর্বশরীর বিস্ময়ে কণ্টকিত! একি দেখিলাম, কে আমাকে ছলনা করিয়া পালাইল! ভাবিতে ভাবিতে তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইতে থাকিল। ওঝা বুঝিতে পারিল এ বৃক্ষ যে সে বৃক্ষ নয়, ওঝা বুঝিতে পারিল এ গ্রাম যে সে গ্রাম নয়, ওঝা বুঝিতে পারিল, তাহার ভবিষ্যৎ সুমহৎ! ওঝা স্থির করিল এই বেলতলা ছাড়িয়া সে যাইবে না, দেবী-নারী ফিরিয়া না আসা অবধি তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিল।

পিঁপড়িয়া ওঝা সেই বেলতলাতে একখানি কুটীর তুলিল। সেই কুটীরেই কালক্রমে তাহার জীবনান্ত হইল। আবার কালক্রমে সেই আদিম পাতার কুটীর ত্রিশ চল্লিশ বিঘাব্যাপী চৌধুরী-গণের বাড়িঘর, বাগান জলাশয়ে পরিণত হইয়াছে। সেই দেবী-নারীর প্রসাদে পিঁপড়িয়া ওঝার পরবর্তী পুরুষ আজ জোড়াদীঘির প্রবল জমিদার বংশ। তাহাদের ইতিহাস সর্বজনবিদিত—যাহা অধিকাংশের অগোচর মাত্র তাহাই বলিলাম।

সেই বেলগাছটিকে কেন্দ্র করিয়া ধীরে ধীরে অট্টালিকার পরে অট্টালিকা উঠিয়াছে; মন্দির মণ্ডপ, তোষাখানা, কাছারীবাড়ি, অতিথিশালা বৈঠকখানা, পিলখানা, আস্তাবল, গোয়াল গোলাবাড়ি, বাড়িতে বাড়িতে গ্রামের সিকি অংশ অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে। তারপরে বংশ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি ও জমিদারী ভাগ হইয়া গিয়াছে। প্রথমে দুই ভাগ হইল দশানি, ছ'আনি, কালক্রমে দশানি ও ছ'আনিতেও ভাগ হইয়াছে। কিন্তু সেই বেলতলা ও তৎসংলগ্ন আদিম জমিটুকু ভাগ করিবার কথা কেহ কোনকালে ভাবে নাই, তাহা যে সম্ভব তাহাও বোধ করি চৌধুরীগণের কল্পনাতীত। এখন পর্যন্ত অবিভাজ্য আদি স্মৃতির চিহ্নস্বরূপ চৌধুরীদের দুর্গাপূজো এই বেলতলাতেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহাই সত্য, তবু স্বপ্নবৎ। সত্য পুরাতন হইলে স্বপ্ন বলিয়াই মনে হয়।

৩

একদিন সকালে কীর্তিনারায়ণ জহিরুল্লা সেখকে ডাকিয়া পাঠাইল। জহিরুল্লা সেখ গ্রামের একমাত্র রাজমিস্ত্রী।

কীর্তিনারায়ণের পিতা দীপ্তিনারায়ণের নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী বাড়িঘর মন্দির ইমারত গড়িবার সখ ছিল। তাঁহার পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করিতে পারে, এমন একজন রাজমিস্ত্রীর সন্ধান করিতে করিতে নিকটবর্তী হরিশপুর গ্রামে তিনি জহিরুল্লা সেখকে আবিষ্কার করিলেন। একটা মাস-মাহিনা স্থির করিয়া তাহাকে জোড়াদীঘিতে আনিলেন। এইবার স্বকীয় পরিকল্পনা অনুসারে নূতন মন্দির গড়িবার কাজ পূর্ণোদ্যমে চলিতে লাগিল। দীপ্তিনারায়ণ একখানি নক্সা দিয়া জহিরুল্লাকে মন্দির গাঁথিতে হুকুম করিলেন। জহিরুল্লা বাঁধা মাহিনার উল্লাসে মহাউৎসাহে কাজে লাগিয়া গেল। দীপ্তিনারায়ণ প্রকাণ্ড একটা মোড়া লইয়া নিকটে বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে তাহার কাজ দেখিতেন। সকালবেলা যেটুকু গাঁথা হইল, বিকাল বেলা সেটুকু ভাঙিয়া ফেলিবার হুকুম হইত, তারপরে চলিত আবার নতুনভাবে গাঁথা। বিকালবেলা দিবানিদ্রা শেষ করিয়া গোটাকয়েক পান মুখে দিয়া দীপ্তিনারায়ণ আসিয়া দাঁড়াইতেন, স্থির দৃষ্টিতে সবটা দেখিতেন। তারপরে বিপরীত দিক হইতে দেখিতেন, ঘাড় বাঁকাইয়া দেখিতেন, মোড়াতে বসিয়া দেখিতেন। যত রকম সম্ভব অসম্ভব কোণ হইতে দেখিয়া অসন্তুষ্টভাবে বলিতেন—উঁহু হ'ল না। জহিরুল্লা নিকটে আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকিত, কর্তা বলিতেন—উঁহু হ'ল না, মিস্ত্রি হ'ল না। দেয়ালটা পল তোলা হল না, ভেঙে ফেলো।

মিস্ত্রি দিনের কাজটুকু সন্ধ্যাবেলা ভাঙিয়া ফেলিত। পরদিন আবার তাহা নূতন করিয়া গড়িবার পালা। জোয়ারের জল যতই বাড়ুক একটা নির্দিষ্ট সীমা ছাড়াইতে পারে না, ভাঁটার টানে আবার নামিয়া আসে, তেমনি মন্দিরের উচ্চতা এক মানুষের অধিক উঁচু হইতে পারিল না, কর্তার অসন্তোষের আঘাতে ভাঙিয়া ফেলিতে হইত। যে মন্দির তিন মাসে গড়া হইত জহিরের গাঁথুনি ও কর্তার ভাঙুনিতে টানাটানি চলিতে চলিতে অবশেষে তাহা দেড় বৎসর পরে সমাপ্ত হইল। সেদিন কর্তার মুখে হাসি ফুটিল—তিনি খুশি হইয়া বলিয়া উঠিলেন, হাঁ, এইবারে হয়েছে। এই বলিয়া তিনি নিজে হইতে শালখানা লইয়া জহিরকে বকশিশ করিলেন। গাঁয়ের লোক কর্তার ও জহিরের যুগ্ম-কীর্তি দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। অবাক হইবারই কথা। কেননা, যে বস্তুটি দীর্ঘ অধ্যবসায়ের পরে গড়িয়া উঠিল তাহা মন্দির, মসজিদ, দুর্গ প্রাসাদ, জেলখানা ও নাটমন্দিরের একটা মিশ্র সংস্করণ। বহু উপজাতি ও বহু স্বার্থে বিভক্ত ও ব্যতিব্যস্ত ভারতবর্ষ কোন একটিমাত্র ইমারতকে যদি আশ্রয় করিতে পারেন, তবে তাহা এই নবগঠিত কীর্তিস্তম্ভ। হিন্দু জমিদারের পরিকল্পনা ও মুসলমান কারিগরের পরিশ্রমে প্রস্তুত।

এদিকে দেড় বৎসর পরে জহিরুল্লা

ভোর হ'লরে ফর্সা হ'ল,
দ্বলল উষার ফ্বল-দোলা।
আনকো আলোয় যায় দ্যাখা ওই
পদ্মকলির হাই-তোলা।
জাগল সাড়া নিদ মহলে
অ-থই নিথর পাথার জলে
আলপনা দ্যায় আলতো বাতাস,
ভোরাই স্বরে মন-ভোলা।

এখানে 'আনকো', আলতো! 'ভোরাই' শব্দ-গ্বলি নতুন হয়ে আমাদের কানে মিষ্টি লাগে না কি? অথবা,

প্বর্বদিকে মাঝরাতে ছোপ দিয়ে রাঙা।
রাতকাণা চাঁদ ওঠে আধখানা ভাঙা।

নিতান্ত চলতি শব্দগ্বলো যে এতো মধ্বর, কে জানত? শ্বধ্ব শব্দ যে কত মধ্বর হতে পারে, তা আমরা কবিতা পাঠেই ব্বঝতে পারি। কবিতা পাঠের এও একটা আনন্দ।

বলেছি যে কবিতায় একটা আবেগের ঝোঁক থাকে। এই আবেগের ফলে প্রকাশ করবার কায়দা বদলে যায়। গদ্যে যেভাবে বলব, কবিতায় সেভাবে বলব না। এই তাগিদের ফলেই কবিতায় প্রকাশ ভঙ্গী ইশারা ইঙ্গিতের অপেক্ষা রাখে, বর্ণনায় রঙ চড়াতে হয়। অর্থাৎ কবিতায় অলঙ্কারের লাবণ্য থাকবে।

তাই বলে অলঙ্কার শাস্ত্রের জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করতে চাই না। স্ববিধে এই যে, কাব্যে ব্যবহৃত অলঙ্কারের অনেকখানি হচ্ছে উপমা। উপমা জিনিসটা সকলেই ব্বঝতে পারি। কোন বস্তু দেখে বা শ্বনে মনে যে আবেগ আসে, সেই আবেগের উপলব্ধিতে সেই বস্তুকে আর তার নিজের টুকুর মধ্যেই গণ্ডীভূত করতে মন চায় না; তাকে অন্যের সঙ্গে তুলনা করে তার র্পের বর্ণনাকে আরো অনেক ইশারায় ভরিয়ে তুলতে পারলে তবে মন শান্ত হয়। চাঁদ-পানা ম্বখটি—কথাটা কবিরই স্ৃষ্টি। কোন ম্বখ দেখে ভাল লেগেছিল, কিন্তু ভাল লাগা সে ম্বখের সৌন্দর্য কী ক'রে প্রকাশ করা যায়। 'খ্বব ভাল', 'মধ্বর', 'অপর্প'—কোন বিশেষণই সে ভাললাগার আবেগকে যথাযথ প্রকাশ করে না। কবি তাই উপমার আশ্রয় নিলেন—চাঁদের সঙ্গে ম্বখটির তুলনা দিয়ে প্রকাশের সান্ত্বনা পেলেন। আমাদের অন্বভব করবার ক্ষেত্র অনেক প্রসারিত করে দিলেন; চাঁদ দেখে যে অনির্বচনীয় আনন্দ আমরা পাই, সেই আনন্দের ইশারা রয়েছে ঐ উপমায়। উপমাই অন্বভূতির ক্ষেত্র প্রসারিত করে, ইশারায় অনেক জিনিস প্রকাশ করে। উপমা তাই কবিদের এত প্রিয়। ইংলণ্ডে গিয়ে মাইকেল মধ্বস্বদন তাঁর প্রিয় বন্ধ্ব গৌরদাস বসাককে লেখেন, "এখন আমি জাহাজের সেই নাবিকের মত, যে ঝড়ের মধ্যে কোন একটা বন্দরে এসে আশ্রয় পেয়েছে। এই দেখ কেমন একটা উপমা দিলাম।"

ভাল উপমা যেমন চমক লাগায়, তেমনি আনন্দ দেয় তার অর্থবোধ।

সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হোলো—যেন খাপে ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার। (রবীন্দ্রনাথ)

নয়নে নয়নে কথা ভাল নাহি লাগে
আধ গ্লাস জল যেন নিদাঘের কালে।
(দেবেন্দ্রনাথ সেন)

কালো মেঘের রৌপ্য পাড়ে
ছবির মত রৌদ্রট্বক।
(কর্বণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়)

ব্বঝি সেথা রজনীর পরিতৃপ্ত
প্রেমের আবেশ
প্রভাত পদ্মের ভরে কেঁপে ওঠে তারার ম্বণাল।
(অজিত দত্ত)

প্রায় ক্ষেত্রে এই উপমা স্বক্ষ্মজালের মতো ভাবকে আশ্রয় করে থাকে। যেমন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বৈশাখ' কবিতাটিতে বৈশাখকে তপঃক্লিষ্ট

তপস্বীর সংগে তুলনা করে সমগ্র কবিতাটিতে সেই তপস্বীর প্রশস্তি গেয়েছেন।

অতীতকে সম্বোধন করে বলেছেন :

কথা কও, কথা কও।
যুগ যুগান্ত ঢালে তার কথা
তোমার সাগর-তলে,
কত জীবনের কত ধারা এসে
মিশায় তোমার জলে।
সেথা এসে তার স্রোত নাহি আর,
কল কল ভাষ নীরব তাহার,—
তরঙ্গ-হীন ভীষণ মৌন;
তুমি তারে কোথা লও?

উপমার পর কবিরা যা নিয়ে বিশেষভাবে নাড়াচাড়া করেন, তা হ'ল বিশেষণ। ইংরেজিতে একে বলে epithet. এই epithet রচনায় কবি Keats-এর ক্ষমতা বিশ্ববিখ্যাত। আমাদের কবি যখন লিখলেন, দিগন্ত-চমক-দেওয়া সূর্যাস্তের রশ্মি জ্বলোজ্বলো, তখন ঐ যৌগিক বিশেষণটি দিয়ে কবি মূর্ত করে তুললেন দিনের পর হঠাৎ অপরূপ হ'য়ে ওঠা দিগন্ত শেষে ঝিকমিকিয়ে ওঠা সূর্যাস্ত-রশ্মি। বড়ো কবিদের হাতে এই বিশেষণগুলি যথার্থ অপরূপ হ'য়ে ওঠে।

অধর করুণা মাখা
মিনতি-বেদনা-আঁকা
নীরবে চাহিয়া থাকা
বিদায়-খনে।

*　*　*

দশের ইচ্ছা বোঝাই করা এই জীবনটা টেনে টেনে শেষে
পৌঁছিনু আজ পথের প্রান্তে এসে।
(রবীন্দ্রনাথ)

*　*　*

রাত্রি জাগি চুপে চুপে কানে-কানে কথা-কওয়াটিরে
জাগালে অস্ফুটধ্বনি বাদলিকা ভিজানো তিমিরে।
(অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত)

*　*　*

খেজুর-ডেরায় আগুন দেওয়া রূপের জলুস্ তার
(মোহিতলাল মজুমদার)

কবিতা যদি ছন্দোবদ্ধ হয় তা'হলে ছন্দের তাল ও গতি পাঠকের মনকে প্রথমেই দোলা দিয়ে আকর্ষণ করে। এমন অনেক কবিতা আছে যা কেবলমাত্র ছন্দের মাধুর্যেই মন ভরিয়ে রাখে—তার অর্থ বা অন্য কোন কিছুর দিকে দৃষ্টি না দিলেও যেন চলে যায়। যেমন—

পারব না একলাটি আজ ঘরে পারব না রইতে।
চাঁদ ডাকে পাপিয়াকে দুটো কথা কইতে।
নিরালার কোল-ভরা, ফুল জাগে আলো-করা,
যেচে কার খুন্সুড়ি সইতে।
অথই পাথার পারা জোছনায় মাতোয়ারা
দিশেহারা হ'ল হাওয়া চৈতে।
(সত্যেন দত্ত)

*　*　*　*

ঝমর ঝমর ঝম, ঝমর ঝমর ঝম, বাজে ওই মল্!
হ'ল না রে ঘুরাইতে, প্রেম-চাবি ছুঁতে ছুঁতে,
না ছুঁইতে বাজে কেন সোহাগের কল?
ঝিল্লি সাথে নিশিকায় ঝাঁপ্‌তালে গীত গায়,
নিশি-মুখে ফুটে ওঠে গোলাপের দল।
রাজহংস কি কহিল, প্রাণ-কর্ণে কি গাহিল,
লজ্জা গেল;—দময়ন্তী-তনু টলমল্।
ঝমর ঝমর ঝম ঝমর ঝমর ঝম
তেমতি বধূর পায়ে বাজে ওই মল্।
(দেবেন্দ্রনাথ সেন)

পড়ে বুঝতে হ'বে এমন ধারণা নিয়ে কবিতা পাঠে মন দেবার প্রয়োজন নেই। কবিতা অনেকটা গানের মত—শোনার আনন্দটাও যথেষ্ট। ছন্দের তালে চিত্ত দুলে ওঠা, সুরের মিষ্টতায় ভাল লাগা, মধুর শব্দে চমক-লাগা—এও অনেক। ভালো কবিতা সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, "it can communicate before it can be understood" অর্থাৎ, বোধগম্য হবার আগেই ভালো কবিতা মনের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে। মাইকেল মধুসূদন কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে—যাঁকে তিনি গ্যারিক বলে আখ্যায়িত করতেন—যে চিঠি লেখেন, তাতে আছে, "আমার কবিতা পড়বার সময় এই কয়েকটি বিষয়ে নজর রাখবে—প্রথমে উপমা, দ্বিতীয় যে ভাষায় সে উপমা ও ভাব প্রকাশিত; তৃতীয়, প্রত্যেক শ্লোকের গতি; সবটা মিলিয়ে কি রকম হ'ল, সেদিকে দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন নেই।"

কোলেরিজও বলেছেন,—"Poetry gives most pleasure when only generally and not perfectly understood". অর্থাৎ, কবিতার চরম আনন্দদান তখনি ঘটে যখন তার সবটা বুঝি না। যখন সবটাই দিব্যি বুঝতে পারি, তখন কবিতা দাঁড়ায় পদ্যের পর্যায়ে যা নিতান্ত ছন্দের মিল। যেমন,—পাখিসব করে রব রাতি পোহাইল' অথবা 'যেজন দিবসে মনের হরষে জ্বালায় মোমের বাতি।"

অনেকে অনুযোগ করেন হালের অনেক কবিতা একেবারেই দুর্বোধ্য। এ অনুযোগের মূলে সত্য নেই বলব না। বিশেষ করে, Symbolist, অর্থাৎ প্রতীকী কবিরা উপমা-পুঞ্জের সাহায্যে সাধারণের বোধগম্য কোন সুনির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করাকে অনাবশ্যক জ্ঞান করেন। তাঁদের মতে কবিতার ধ্বনি ও রূপকল্পের সংগে একটি শৃঙ্খলিত ন্যায়যুক্ত সংগত অর্থ জুড়ে দিলে তার উপর অযথা ভার চাপিয়ে দেওয়া হয়। অতএব বুঝতেই পারছেন, কেন দুর্বোধ্য ঠেকে। আমি বলি, তবু পড়ে যান। যতোটুকু ভালো লাগে, যতটুকু বোঝেন তাতেই কাজ হবে। কতকগুলি নতুন জিনিস অবশ্য চোখে ঠেকবে। প্রথমত টেকনিকের নতুনত্ব, দ্বিতীয়ত শব্দ চয়ন ও উপমার নতুনত্ব। একজন আধুনিক কবি লিখেছেন—হরিণ সময় লাগামে বাঁধতে পারো?

আর একজন লিখেছেন :

আজকের এই রাত শান্ত সুরভিত
কীট্‌সের বাঞ্ছিত মৃত্যুর মতো।
তবু মাঝে মাঝে আঙুরের মতো জড়িয়ে যাওয়া
অন্ধকারের ফুলকি আগুন-লতা
ছেয়ে আসে সারা অংগে।

কীট্‌স-এর বাঞ্ছিত মৃত্যুর মতো রাতকে বুঝতে হ'লে কীট্‌স-এর ode to the nightingale কবিতাটির To cease upon midnight with no pain লাইনটা স্মরণ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। পাঠকের কাছ থেকে এই রকম দাবী করাটা হালের কবিরা প্রয়োজন মনে করেন। আদর্শ স্থাপন করেছেন ওপারের কবি T. S. Eliot, যাঁর Wasteland কাব্যগ্রন্থ পাঠকের কাছে সমগ্র ইংলণ্ডের সাহিত্য, ইউরোপীয় সাহিত্য, প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্য, বাইবেল, এমন কি সংস্কৃত জানার দাবী করে। শব্দচয়নের নতুনত্ব চোখে পড়বে নিচের উদ্ধৃত অংশে—

আয়ুর মুহূর্তগুলি
জীবনের চক্রপথে শত সূর্য রজত রেখায়
আবর্তিয়া ফেরে আজো প্রাগুষা-গোধূলি।

*　*　*

কে না জানে জীবনের উচ্চকিত শেষ।
তবু তারে ভুলে থাকা,
উড়ায়ে চঞ্চল পাখা
গতিক্ষু দিনের
রঙগীণ উত্তাল স্বপ্ন মহাজীবনের
প্রেম, আশা, মমত্বের কবোষ্ণ প্রসাদ
ইহাদের দেব না অপবাদ।

'আধুনিক' কবিতার ধরন-ধারণ একটা উপমা দিয়েই বলা যাক। 'আধুনিক' কবিতা হ'ল 'আধুনিক' মেয়েদের মত। এই দুইয়েরই মধ্যে তেজ আছে, দীপ্তি আছে, নিজেকে জাহির করার প্রগলভতা আছে, লালিত্য বর্জনের প্রয়াস আছে, কাঠিন্য আছে; আবার সব মিলিয়ে, সব ছাড়িয়ে কোথায় যেন একটা নতুন রূপের ভালো লাগাও আছে। এই ভালো লাগাটা আপনি টের পাবেন 'আধুনিক' কবিতার ক্রমশ পরিচয়ে—তার পাঠের অভ্যাসে।
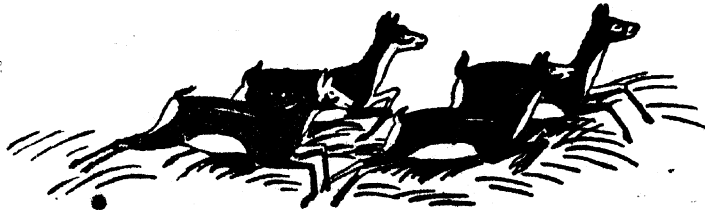
বাঙলাকে বিভক্ত করিবার আন্দোলন যত ব্যাপ্তি ও শক্তিলাভ করিতেছে বাঙলার মুসলিম লীগের প্রধানগণ ততই বিচলিত হইতেছেন। তাহার কারণ অবশ্য অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়—পশ্চিমবঙ্গ যদি স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হয়, তবে পাকিস্থানের কি হইবে?

বাঙলার হিন্দুরা যদি স্বতন্ত্র হিন্দুপ্রধান প্রদেশ লাভ করেন, তবে "পূর্ব পাকিস্থানের" কি হইবে? কিন্তু কেন তাঁহারা স্বতন্ত্র প্রদেশের দাবী করিতেছেন, তাহা কি মিস্টার সুরাবদী প্রভৃতি জানেন না? যদিও মিস্টার সুরাবদীকে যুক্তির দ্বারা কোন বিষয় বুঝাইবার চেষ্টা বৃথা তথাপি আমরা—সর্বসাধারণের অবগতির জন্য—বলিতে পারি গত ১৬ই অক্টোবর—নোয়াখালিতে মুসলিম লীগপন্থীদিগের উপদ্রব আরম্ভ হইবার সংবাদ কলিকাতায় পৌঁছিবার পরেই—তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছিলেন—নোয়াখালিতেই উপদ্রব সীমাবদ্ধ করিবার উপায় তাঁহার সরকার এমনভাবে অবলম্বন করিয়াছেন যে, উপদ্রব নোয়াখালি জিলার সীমা অতিক্রম করিয়া কোনরূপে ত্রিপুরা জিলায় প্রবেশ করিতে পারিবে না। আর গত ১লা মে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে সরকারপক্ষ স্বীকার করিয়াছেন—

অক্টোবর হইতে এ পর্যন্ত ত্রিপুরা জিলায় এক হাজার ৭ শত ১৮টি গৃহ ও ৬ হাজার ৫ শত ২৫ খানি কুটীর দগ্ধ এবং ২ হাজার ১ শত ৭০টি গৃহ লুণ্ঠিত হইয়াছে। হাঙ্গামায় ৪০ জনের ও সৈনিকের গুলীতে ১২ জনের মৃত্যু হইয়াছে। পুলিশের গুলীতে ১২ জন প্রাণ হারাইয়াছে। ৫ জন স্ত্রীলোক অপহৃত হইয়াছে। ৯ হাজার ৮ শত ৯৫ জন লোককে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হইয়াছে।

তাঁহার সুব্যবস্থায় ত্রিপুরা জিলায় কোন উপদ্রব হইতে পারিবে না, মিস্টার সুরাবদী সেই কথা বলিয়াছিলেন বলিয়াই আমরা ত্রিপুরা সম্বন্ধে সরকারের স্বীকৃত হিসাব উদ্ধৃত করিলাম। নোয়াখালির সম্বন্ধে সরকারের প্রদত্ত হিসাব—

গৃহদাহ—৮ শত ৮১; লুণ্ঠিত গৃহের সংখ্যা ২ হাজার ২ শত ৬৬; হাঙ্গামায় নিহত—একশত ৭৮ জন; পুলিশের ও সৈনিকের গুলীতে নিহতের সংখ্যা ৪২ জন; ২ জন স্ত্রীলোক অপহৃত; বলপূর্বক ধর্মান্তরিতের সংখ্যা জানা যায় নাই—তাহা যে হাজার হাজার তাহাতে সন্দেহ নাই।

উভয়ক্ষেত্রেই আহতের সংখ্যা প্রদান করা হয় নাই।

এই সঙ্গে আমরা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি যে, বাঙলার গভর্নর অক্টোবর মাসে বিলাতে যে রিপোর্ট পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন, বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণের অভিযোগ সরকার পাইয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় নই। তবে কি বুঝিতে হইবে তাহার পরে ত্রিপুরা জিলায় প্রায় ১০ হাজার ও নোয়াখালি জিলায় সহস্র সহস্র লোককে অর্থাৎ যখন অশান্তি দমন করিতে না পারা সরকারের অপরাধ বলিয়া বিবেচনার উপযুক্ত অযোগ্যতা সেই সময়ে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হইয়াছে?

বাঙলা দ্বিধাবিভক্ত না হইলে বাঙলায় যে সম্প্রদায় সংখ্যাধিক্য শাসনকার্য পরিচালিত করিবার অধিকার লাভ করিবে—সেই সম্প্রদায়ের শাসনে উদ্ধৃত ঘটনা ঘটিবার পরেও কি সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় আত্মরক্ষার জন্য স্বতন্ত্র প্রদেশের দাবী করা একান্ত প্রয়োজন মনে না করিয়া থাকিতে পারেন?

এবার বাঙলাকে বিভক্ত ভারতবর্ষে অবিভক্ত রাখিবার জন্য আন্দোলন মিস্টার সুরাবদী দিল্লীতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহাতে মনে করা যাইতে পারে, তিনি মুসলিম লীগের কর্তাদিগের অনুমোদিত প্রস্তাবই করিয়াছেন।

দিল্লীতে তিনি যখন বাঙলাকে অবিভক্ত রাখিবার প্রস্তাবের পক্ষে আবেগময়ী বক্তৃতা দেন, তখন একজন শ্রোতা জিজ্ঞাসা করেন, আজ তিনি যে বলিতেছেন, বাঙলায় হিন্দু-মুসলমানের একত্র বসবাসের কোনই বাধা নাই—ঠিক এক বৎসর পূর্বে দিল্লীতেই কি তিনি তাহার বিপরীত কথা বলেন নাই—তখন কি তিনি বলেন নাই, হিন্দুর সহিত মুসলমানের কোন বিষয়েই ঐক্য নাই? বাঙলায় হইলে হয়ত তিনি এইরূপ জিজ্ঞাসা বে-আইনী বলিতেন। কিন্তু দিল্লী বাঙলা নহে। সেইজন্য তিনি অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে বলেন—এক বৎসর পূর্বে তিনি কি বলিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্মরণ নাই—তবে সে একটা তুচ্ছ বক্তৃতা—আর এক বৎসরও অল্প সময় নহে।

কেবল তাহাই নহে—তিনি জিজ্ঞাসিত হইয়াও দুইটি বিষয়ে মত প্রকাশ করিতে অস্বীকার করেন। অবিভক্ত বাঙলা পাকিস্থানের অংশ হইবে কিনা সে সম্বন্ধে যেমন তথায় যৌথ-নির্বাচনপ্রথা প্রবর্তিত হইবে কিনা সে সম্বন্ধেও তিনি অনায়াসে বলেন—সে সব পরের কথা, পরে দেখা যাইবে।

ইহাতেই অবশ্য বুঝিতে পারা যায়, যে কোন উপায়ে বঙ্গ-বিভাগ বন্ধ রাখিতেই চেষ্টার বিশেষ উদ্দেশ্য আছে—সমগ্র বাঙলা সাম্প্রদায়িক সচিবসঙ্ঘের অধীন রাখিয়া সাম্প্রদায়িক স্বার্থসিদ্ধি করিতে হইবে।

শুনা যাইতেছে, এ বিষয়ে কলিকাতার ইংরেজদিগের সহিত ও মুসলিম লীগের মতের ঐক্য ঘটিয়াছে; ইউরোপীয় বণিকরা বলিতেছেন, পশ্চিমবঙ্গ স্বতন্ত্র ও প্রদেশ সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত হইলে তাঁহাদিগের শোষণ-নীতি পরিচালন আর সম্ভব হইবে না। কারণ, জাতীয়তা জাতির স্বার্থের জন্য চেষ্টা করিবে। এই জনরবে, ১৬ই আগস্ট যে হাঙ্গামা আরম্ভ হয়, তাহার সময় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর উক্তি মনে পড়ে। তিনি তখন বর্তমান গভর্নরের ও সচিবসঙ্ঘের অপসারণ দাবী করিয়া বলিয়াছিলেন—কয়দিনের ঘটনা পর্যালোচনা করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, যে ইউরোপীয় সম্প্রদায় প্রকৃত প্রস্তাবে এতদিন বাঙলা শাসন করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা এখনও—বর্তমান সচিবসঙ্ঘের দ্বারা আপনাদিগের সেই প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে ইচ্ছুক।

মিস্টার সুরাবদী দিল্লীতে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, বর্তমানে বাঙলায় হিন্দুরা তাঁহাদিগের সংখ্যা, সম্পত্তি, বিদ্যা প্রভৃতির তুলনায় আবশ্যক প্রাধান্য পাইতেছে না; কিন্তু তিনি বঙ্গ-বিভাগের বিরুদ্ধে কেবল এই যুক্তিই প্রদান করিয়াছেন যে, বাঙলা যখন (পাকিস্থানে?) সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন স্বতন্ত্র প্রদেশ হইবে, তখন অবশ্যই এ অবস্থা থাকিবে না; তখন সেই বাঙলায় "যে যা'র ভক্ষক সে তা'র রক্ষক" হইবে!

অবশ্য ইহাতে অনেকেরই 'হিতোপদেশের' বৃদ্ধ ব্যাঘ্রের গল্প মনে পড়িবে। সে যখন বার্ধক্যহেতু দৌড়াইয়া যাইয়া শিকার ধরিতে পারিত না, তখন নদীতীরে এক স্বর্ণবলয় লইয়া বসিয়া থাকিত, লোককে বলিত—সে অহিংস হইয়াছে, লোককে স্বর্ণবলয় দিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিবে। তাহার পর স্বর্ণবলয়ের লোভে লোক তাহার নিকটস্থ হইলে সে অনায়াসে তাহাকে ভক্ষণ করিত। মিস্টার সুরাবদী ভবিষ্যতের লোভ দেখাইয়া বর্তমানে

বাঙলার হিন্দুদিগকে সকল অনাচার ও অত্যাচার সহ্য করিতে প্ররোচিত করিতে চাহিতেছেন

দিল্লীতেও তিনি বলিয়াছেন—বাঙলা যখন স্বতন্ত্র স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হইবে, তখনও অবশ্য মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠতাহেতু অধিক অধিকার পাইবে।

কিন্তু তাঁহার সহকর্মী—বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সম্পাদক মিস্টার হাশিম তাঁহারও অধিক গিয়াছেন তিনি বলেন, বাঙলায়—অবশ্য অখণ্ড বাঙলায়—হিন্দু ও মুসলমান সকল বিষয়েই তুল্যাধিকার সম্ভোগ করুন।—কেবল তাহাই নহে—তিনি অনায়াসে বলিয়াছেন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় সেই প্রস্তাবই করিয়াছিলেন!

তিনি কিরূপে একথা বলিতে পারেন? ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে দাশ মহাশয়ের নেতৃত্বে বাঙলার স্বরাজ্য দল "স্বায়ত্ত শাসনের ভিত্তি স্থাপিত হইলে" বাঙলায় সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা কিরূপ হইবে, সে সম্বন্ধে এক পরিকল্পনা প্রচার করিয়াছিলেন: তাহাতে ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি বিভাগ স্বতন্ত্র নির্বাচন-ব্যবস্থায় কিরূপ হইবে, তাহা নিখিল ভারত চুক্তি সাপেক্ষ বলিয়া স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে, সরকারী চাকরীতে ও ধর্মসম্বন্ধীয় পরমত-সহিষ্ণুতা সম্পর্কে কতকগুলি প্রস্তাব করা হয়। তাহাতে তুল্যাধিকারের কথা ছিল না।

কেবল তাহাই নহে—তখন কংগ্রেস বা মুসলিম লীগ কেহই সেই পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নাই। লালা লাজপত রায় তখন করাচী হইতে সে পরিকল্পনায় বিশেষ আপত্তি করিয়া বলিয়াছিলেন—কংগ্রেসের পক্ষ হইতে কোন চুক্তি করিবার অধিকার স্বরাজ্য দলের থাকিতে পারে না এবং জাতীয় চুক্তি সম্পাদিত হইবার পূর্বে প্রাদেশিক চুক্তি অসঙ্গত ও অসিদ্ধ।

তখন যে সর্ত গৃহীত হয় নাই, আজ দীর্ঘ-কাল পরে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত অবস্থায় তাহার উল্লেখ করিয়া এবং দাশ মহাশয় যাহা বলেন নাই, তাহাই তাঁহার উক্তিতে আরোপ করিয়া বঙ্গ-বিভাগের আন্দোলনে বাঙলার নির্যাতন-পীড়িত বাঙালী হিন্দুকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা যে হীন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, তাহাতে কি কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে?

মিস্টার সুরাবর্দী সরকারের সকল শক্তির অধিকারী হইয়া কিরূপে বাঙলায় সম্প্রদায়-নির্বিশেষে শান্তি ও নির্বিঘ্নতা দিতে পারিয়াছেন, ব্যবস্থা পরিষদে গত আগস্ট মাসের উপদ্রব সম্পর্কে যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়।

তিনি ভবিষ্যৎ বাঙলার যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, বর্তমানে যে ব্যবহার পাওয়া গিয়াছে, তাহার পরেও কি তাহা সম্ভব বলিয়া বাঙলার মুসলমানাতিরিক্ত লোকেরা মনে করিতে পারেন?

বাঙলা বিভাগে মুসলিম লীগের এত আতঙ্ক ও আপত্তি কেন? তাঁহারা নিশ্চয়ই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাম শুনিয়াছেন। বাঙলা বিভাগ হইলে উভয় অংশে যেরূপ লোকসংখ্যা হইবে, তদপেক্ষা অনেক কম লোকসংখ্যা সেই যুক্তরাষ্ট্রের বহু রাষ্ট্রে আছে। সুতরাং সে দিক হইতে কোনরূপ যুক্তিসহ আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না।

জাতীয়তাবাদী বাঙালী মাত্রেরই দাবী—বাঙলা ভারতের রাষ্ট্রসংঘ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে না। অথচ তাহাতেই মুসলিম লীগের আপত্তি মিস্টার সুরাবর্দী প্রভৃতির আপত্তি। সে অবস্থায় জাতীয়তাবাদী বাঙালী মাত্রেরই পক্ষে প্রদেশ বিভাগের দাবী ব্যতীত উপায় কি?

মিস্টার সুরাবর্দী ভবিষ্যতের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়া লোককে বিভ্রান্ত করিয়াছেন, তাহা তিনি শাসন-ক্ষমতা লাভ করিয়াও কেন বর্তমানে দেখাইতে পারিতেছেন না? তিনি কি একথার কোন উত্তর দিতে পারিবেন?

তিনি হাস্যোদ্দীপক কৈফিয়ৎ দিয়াছেন—বর্তমানে বাঙলা সমগ্র ভারতের সহিত সংযুক্ত থাকাতেই যত অমঙ্গল ঘটিতেছে। আমরা তাঁহাকে বলিতে পারি—যখন নূতন শাসনপদ্ধতি প্রবর্তিত হয়, তখন যে ভারত সরকার কেবল বাঙলাকে বিপুল ঋণ হইতে মুক্তি দিয়াছিলেন, তাহাই নহে; পরন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে নূতন রাজস্বও দিয়াছিলেন। তথাপি বাঙলার সাম্প্রদায়িক সরকার আজ বাঙলার কিরূপ দুর্দশা ঘটাইয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সাম্প্রদায়িকতার বিষ বিসর্পণকারী সংবাদপত্রকে সরকারী তহবিল হইতে অর্থ সাহায্য দান হইতে আরম্ভ করিয়া বিহার হইতে আনীত মুসলমান-দিগের জন্য অবাধে লক্ষ লক্ষ টাকা অপব্যয়—এ সকলের জন্য কি কেন্দ্রী সরকারকে কোনরূপ দায়ী করা যায়?

আর আজ কলিকাতায়, নোয়াখালিতে, ত্রিপুরায়, বগুড়ায়, ময়মনসিংহে, ঢাকায় যে নারকীয় কাণ্ড ঘটিতেছে, সে সকলের জন্য কি কেন্দ্রী সরকারকে দায়ী করা যায়?

বাঙলা যখন অন্নাভাবে শীর্ণ, তখন যে গত ২০শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বাঙলা সরকার বিহার হইতে আনীত মুসলমানদিগের জন্য ২৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ব্যতীত বস্ত্রাদি বাবদে ২ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন, সেজন্য কি কেন্দ্রী সরকার দায়ী?

মিস্টার সুরাবর্দী অনায়াসে বলিয়াছেন—বাঙলাকে বিভক্ত করিবার দাবী সম্বন্ধে হিন্দুরা একমত নহেন। তিনি তপশীলভুক্ত হিন্দু-দিগকে জাতীয়তাবাদী হিন্দুদিগের দল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইবার চেষ্টাই করিতেছেন। তিনি কি আশা করেন, নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় তপশীলভুক্তগণ—হিন্দু বলিয়া যে অত্যাচারে জর্জরিত হইয়াছে, তাহা তাহারা বিস্মৃত হইতে পারে?

সাম্প্রদায়িকতার বিষের প্রতীকার করিবার কোন চেষ্টা কি মুসলিম লীগ বাঙলায় করিয়াছেন?

সুরাবর্দী কোম্পানীর উদ্দেশ্য কি, তাহা বুঝিয়া বাঙলার জাতীয়তাবাদীরা একযোগে কাজ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাহাই এখন তাঁহাদিগের অব্যাহতি লাভের একমাত্র উপায়। তাঁহাদিগকে একযোগে ইঙ্গ-মুসলিম ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিতে হইবে।

বাঙলার জাতীয়তাবাদীরা গত ১০ বৎসরের কুশাসনের ফলেই আজ বাঙলা বিভক্ত করিতে চাহিতেছে।

নিতান্ত নির্লজ্জভাবে মিস্টার সুরাবর্দী জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—বর্তমান ব্যবস্থায় কি হিন্দুদিগের সংস্কৃতি, ধর্ম ও ভাষা কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে? যিনি হিন্দুদিগের সংস্কৃতি, ধর্মাচরণের স্বাধীনতা ও ভাষা বিপন্ন করিবার কার্যে সহায় হইয়াও এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তাঁহাকে কি কোন যুক্তির দ্বারা বুঝাইবার আশা করা যায়? হিন্দুর সংস্কৃতি নষ্ট করাই যে বাঙলায় মুসলিম লীগের অভিপ্রেত, তাহা পদে পদে প্রতিপন্ন হইয়াছে ও হইতেছে। সর্দার প্যাটেল বলিয়াছেন, দুর্ভিক্ষে বাঙলায় ২০।২৫ লক্ষ লোকের মৃত্যু তাঁহাকে যত পীড়িত করিতে পারে নাই, নোয়াখালি, ত্রিপুরায় লোককে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করার সংবাদ তত পীড়িত করিয়াছে। আজ বাঙলার মুসলিম লীগ সরকার স্বীকার করিতেছেন, ত্রিপুরা জেলায় ৯ হাজার ৮ শত ৯৫ জন লোককে ও নোয়াখালি জিলায় সহস্র সহস্র লোককে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হইয়াছে। যাহাদিগকে ধর্মান্তরিত করা হইয়াছে, তাহারা হিন্দু; আর যাহারা তাহা করিয়াছে, তাহারা মুসলমান। বাঙলায় হিন্দুর ধর্ম বিপন্ন কিনা, ইহার পরেও কি তাহা বলিতে হইবে? বর্তমান সচিব সঙ্ঘের পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের কল্যাণে বাঙলা ভাষা যেরূপ রূপান্তরিত হইয়াছে ও হইতেছে, দুরন্ত বসন্ত রোগের ফলেও কোন সুন্দর শিশুর সেরূপ দারুণ রূপান্তর হইতে পারে না।

মিস্টার সুরাবর্দীর যুক্তির অসারতা সপ্রকাশ। সেরূপ যুক্তির দ্বারা তিনি কখনই বাঙলার জাতীয়তাবাদী হিন্দু-মুসলমানকে বিভ্রান্ত করিতে পারিবেন না।

[২]

ভারত গভর্নমেণ্টের সেন্সাস বা আদম সুমারীতে ধর্ম অনুসারে জনসংখ্যা গণনার চেষ্টা হয়ে থাকে। ভারতে হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ জৈন খৃষ্টান ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সমাজের জনসংখ্যা গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু আদিবাসীদের ধর্ম কি? ভারত গভর্নমেণ্ট এ সম্বন্ধে কোন, বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞা খোঁজ না করে 'অ্যানিমিজম' (Animism) কথাটির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন এবং সব আদিবাসীকে এই এক 'ধর্মমতের' কোঠায় তালিকাভুক্ত করেছেন। অ্যানিমিজের অর্থ 'জড়োপাসনা' বা 'ভূতপূজা' বা 'প্রেতবাদ'। আদিবাসীদের ধর্মবিশ্বাসকে সরাসরি এই আখ্যা দেওয়া যেতে পারে না। তাছাড়া এই আখ্যা দিলে তাদের বৈশিষ্ট্য এবং হিন্দুসমাজের ধর্মমত থেকে তাদের পার্থক্যও ঠিক বোঝা যায় না। কারণ অ্যানিমিজম বা জড়োপাসানা বা প্রেতবাদ বলতে যা বোঝায়, তা হিন্দুসমাজের বহু শ্রেণীর ধর্মাচরণের মধ্যেও মিশে রয়েছে। সুতরাং এ ধারণা মিথ্যে নয় যে, আদিবাসীদের ধর্ম সম্পর্কে 'জড়োপাসক' সংজ্ঞাটি কিছুটা জবরদস্তি করেই চাপানো হয়েছে।

আদিবাসীদের অ্যানিমিস্ট বা জড়োপাসক আখ্যা দেওয়ার পেছনে একটা ব্রিটিশ কূটনীতি যে ছিল, তা অনুমান করবার কারণ আছে। ভারতের হিন্দুসমাজকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কতভাগে ভাগ (Fragmentation) করা যায়, সে সম্বন্ধে ব্রিটিশ কূটনীতিবিশারদেরা অনেক চেষ্টা করেছেন। 'তপশীলী জাতি' (scheduled caste) নাম দিয়ে হিন্দুসমাজের একটা অংশকে পৃথক করবার চেষ্টা হয়েছে। যুক্তিস্বরূপ বলা হয়েছে যে, এরা হিন্দু হলেও নীতি 'অবনত শ্রেণীর হিন্দু' এবং এ'দের স্বার্থের জন্য বিশেষ সুবিধা ও সংরক্ষণের প্রয়োজন এবং এ'দের উপকার করবার জন্যেই সাধারণ হিন্দুসমাজ থেকে এদের ভিন্ন ক'রে বেছে নিয়ে একটা পৃথক্ নামকরণ হয়েছে। এ বিষয়ে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, ভারতের মুসলমান ও খৃষ্টান সমাজের মধ্যেও 'অবনত শ্রেণী' আছে, কিন্তু তাদের পৃথক্ করা হয়নি। কিন্তু হিন্দুর সমাজ-দেহকেই খণ্ডিত করবার রাজনৈতিক প্রয়াস বিশেষভাবে হয়েছে।

হিন্দু ধর্মের সংজ্ঞা এত ব্যাপক যে, তার মধ্যে একেশ্বরবাদী ও নিরাকারবাদী থেকে আরম্ভ করে ভূতপূজক পর্যন্ত সবারই স্থান আছে। হিন্দুধর্ম কথাটা সাংস্কৃতিক অর্থেই সবচেয়ে সত্য। কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নেহরু, মহর ডাঃ আম্বেদকর এবং কাছাড়ী শ্রীউপেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম বা ওঁরাও রায়সাহেব বন্দীরাম—হিন্দুধর্মের পরিধির মধ্যে এ'দের সবারই স্থান আছে। কিন্তু ভারত গভর্নমেণ্ট 'তপশীলী জাতি' নাম দিয়ে একটা বিভেদ আমদানী করলেন, তারপর আদিবাসীদের সম্বন্ধে অ্যানিমিস্ট বা জড়োপাসক নাম দিয়ে আর এক দফা বিভেদ ঢুকিয়ে দিলেন। তপশীলী জাতিরা যদি সামাজিক সংজ্ঞা অনুসারে 'অবনত হিন্দু' হয়ে থাকে, তবে আদিবাসীরাও 'অবনত হিন্দু'। কিন্তু ভারত গভর্নমেণ্ট আদিবাসীদের 'অবনত হিন্দু' বলতে রাজী নন, কারণ তাতেও হিন্দুসমাজের একটা ব্যাপক রূপ স্বীকৃত হয়ে যায়।

হিন্দুসমাজের কয়েকটি উচ্চবর্ণের অনুদার ও সংকীর্ণ আচরণের (দৃষ্টান্ত অস্পৃশ্যতা) জন্য তপশীলী জাতিদের মধ্যে অনেকের মনে মোটামুটি একটা হিন্দুসমাজবিরোধী বিক্ষোভ আজকাল দেখা দিয়েছে। কিন্তু তপশীলী জাতিরা নিজেদের হিন্দু বলতে কোন দ্বিধা করেন না এবং হিন্দুধর্মকে তাঁরা অবজ্ঞা করেন না। বর্ণহিন্দুবিরোধী মনোভাব এ'দের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠলেও, হিন্দুধর্ম-বিরোধী মনোভাব প্রবল হয়ে উঠতে পারেনি। সমস্যাটা বস্তুত ঘরোয়া বিবাদের মত এবং বিবাদটা সামাজিক। আদিবাসীদের মনোভাবের মধ্যেও একই ধরণের প্রতিক্রিয়ার প্রমাণ দেখতে পাওয়া যায়। আদিবাসীরা তাঁদের নিজস্ব উৎসব, পূজা-পদ্ধতি ও বিশ্বাস নিয়ে আছেন এবং তার মধ্যে বহু হিন্দু দেব-দেবীর পূজাপদ্ধতি ও হিন্দু-সুলভ ধর্মবিশ্বাসকেও তাঁরা নিজস্ব করে নিয়েছেন। আদিবাসীদের মনে হিন্দুধর্ম-বিরোধী কোন প্রতিক্রিয়া নেই। কিন্তু তথাপি, হিন্দুসমাজ-বিরোধী একটা বিক্ষোভ আছে। এক্ষেত্রেও বিক্ষোভের মূল কারণ হলো, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক।

হিন্দুসমাজের এই অভ্যন্তরীণ সামাজিক শ্রেণী-পার্থক্য ও বৈষম্যগুলির সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশ কূটনীতি হিন্দুসমাজকে তিন ভাগ করার চেষ্টা করেছে। 'তপশীল জাতিদের' ভিন্ন করা হয়েছে, কিন্তু এক্ষেত্রে তাদের সম্বন্ধে একটা নতুন ধর্ম আরোপ করার চেষ্টা সফল হয়নি, 'অবনত হিন্দু' নাম দিয়ে তাদের হিন্দুত্বকে যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে; কিন্তু আদিবাসীদের ক্ষেত্রে একটা নতুন ধর্ম (অ্যানিমিজম বা জড়োপাসনা) আরোপ করে একেবারে পৃথক্ করার চেষ্টা হয়েছে।

১৮৯১ সালে ভারতের সেন্সাস কমিশনের জে এ বেইন্‌স্ (J. A. Baines) বলেনঃ "বহু উপজাতীয় গোষ্ঠী (Tribal people) বর্তমানে হিন্দু হয়ে গেছে। এদের ধর্মমত এবং যারা এখনও অহিন্দু উপজাতীয়রূপে আছে, তাদের ধর্মমতের কোন ভেদরেখা টানতে পারা যায় না।"

স্যার হার্বার্ট রিজলি (Sir Herbert Risley) তাঁর ১৯১১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে বলেছেন ঃ "হিন্দুধর্ম এবং জড়োপাসানার (Animism) মধ্যে কোন স্পষ্ট পার্থক্য করা সম্ভব নয়। ....উপজাতীয় (Tribal) লোকেরা ধীরে ধীরে অল্প অল্প ক'রে হিন্দুত্ব গ্রহণ ক'রে চলেছে। সুতরাং ঠিক কতখানি এবং কি পরিমাণের হিন্দুধর্ম গ্রহণ করবার পর একজন উপজাতীয়কে হিন্দু বলা উচিত, সে সম্বন্ধে কোন একটা মাপ স্থির করা সম্ভব নয়।"

১৯২১ সালের বিহার ও উড়িষ্যার সেন্সাস্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ পি সি ট্যালেণ্টস্ (P. C. Tallents) বলেছেন ঃ "প্রত্যেক লোক গণনার সময় আমাদের একটা সমস্যায় পড়তে হয়েছে—এই সকল (আদিবাসী) লোকদের অবনত শ্রেণীর হিন্দুদের থেকে পৃথক ক'রে দেখা খুবই কঠিন হয়।"

১৯২১ সালের বোম্বাইয়ের সেন্সাস্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পরিষ্কারভাবে মন্তব্য করেছেন, "আমার বলতে কোন দ্বিধা নাই যে, অ্যানিমিজম বা জড়োপাসনা কথাটকে ধর্মের সংজ্ঞা হিসাবে একেবারে বাতিল ক'রে দেওয়া উচিত। যাদের এযাবৎ 'অ্যানিমিষ্ট' নামে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, তাদের সকলকেই হিন্দু নামে তালিকাভুক্ত করা উচিত।"

১৯২১ সালে ভারতের সেন্সাস কমিশনার মিঃ জে টি মার্টেন (J. T. Marten) তাঁর অভিমত খোলাখুলিভাবেই রিপোর্টে ঘোষণা করেছেনঃ "অবনত শ্রেণীর হিন্দুদের ধর্মমত আর একজন ভীল বা গোন্দের ধর্মমতের মধ্যে পার্থক্য করবার খুব সামানাই কারণ আছে।

উভয় সমাজই (অবনত হিন্দু এবং ভীল বা গোন্দ) প্রধানতঃ জড়োপাসক। পার্থক্য মাত্র এই যে, অবনত হিন্দু তার ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনকে হিন্দু সমাজব্যবস্থার অনুশাসনের মধ্যে এনেছে, ভীল বা গোন্দেরা এখনো তা পারেনি।"

১৯৩১ সালের সেন্সাস্ কমিশনার ডাঃ জে এইচ হাটন (Dr. J. H. Hutton) অ্যানিমিজম্ কথাটির ব্যবহারে আপত্তি করেন এবং তার বদলে 'উপজাতীয় ধর্মসমূহ' (Tribal Religions) এই একটা বর্গ কল্পনা করে আদিবাসীদের তার তালিকাভুক্ত করবার একটা চেষ্টা করেন। উপজাতীয় 'ধর্মসমূহ'—স্পষ্টতঃ ডাঃ হাটন বহুবচনের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, অর্থাৎ উপজাতীয়দের অনেকগুলি ধর্ম। উপজাতীয়দের 'বিশিষ্ট একটা ধর্ম' তিনি খুঁজে পাননি। ডাঃ হাটন একটা ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা করেছেন, যার যৌক্তিকতা অনেকেই স্বীকার করেন। তিনি বলেনঃ "১৯১১ সালের সেন্সাস্ রিপোর্টে উপজাতীয় ধর্মমতসমূহকে একটা 'আকারহীন' (Amorphous) ও অশিক্ষিত মনের আবছা কাল্পনিক কুসংস্কার বলে' যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তা আমি স্বীকার করি না। অতীতে এক সময় অস্ট্রো-এশিয়াটিক এবং অস্ট্রেলয়েড সংস্কৃতি এক বিরাট ভূখণ্ডের মধ্যে গড়ে উঠেছিল এবং তার মধ্যে যে একটি সুস্পষ্ট দর্শন ও সত্যিকারের ধর্মাচরণ ('A real riligious system and a definite philosophy) দেখা দিয়েছিল, বর্তমান আদিবাসীদের ধর্ম তারই ধ্বংসজনিত আবর্জনার মত টুকরা টুকরা নিদর্শন।" ডাঃ হাটনের ধারণা, বর্তমান হিন্দুধর্ম প্রধানতঃ ঋগ্বেদের ধর্ম ও আর্য-পূর্ব প্রচলিত ভারতীয় ধর্মবিশ্বাসগুলির সম্মিলিত রূপ। তিনি মনে করেন, "বর্তমানে উপজাতীয় বা আদিবাসীদের মধ্যে যেসব ধর্মমত প্রচলিত আছে, তা দেখে মনে হয় যে, সেগুলি বস্তুতঃ বাড়তি মাল (surplus material) মাত্র, যা হিন্দুত্বের মন্দিরদেহের সঙ্গে এখনো সংলগ্ন করা হয়নি।"

হিন্দুত্বের সঙ্গে আদিবাসীদের এতখানি ঐতিহাসিক ও ধর্মগত লেনদেন ও সমন্বয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করেও ডাঃ হাটন আদিবাসীদের হিন্দু বলতে রাজী হননি। এ সম্বন্ধে তিনি নিজে একটা মনগড়া যুক্তি দাঁড় করিয়েছেন। "যতক্ষণ না আদিবাসীরা ব্রাহ্মণ পুরোহিত গ্রহণ করে, গরুকে পবিত্র জীব মনে করে এবং হিন্দু মন্দিরের বিগ্রহ পূজা করে, ততক্ষণ আদিবাসীদের হিন্দু বলা ঠিক হবে না।" দেখা যাচ্ছে যে, ডাঃ হাটন হিন্দু ও আদিবাসী সমাজের মধ্যে ধর্মগত অজস্র সদৃশ্য ও সমন্বয়ের ইতিহাসটুকু লাভ ক'রেও কোথায় কোথায় দু' একটা পার্থক্য আছে, খুঁটে খুঁটে তাই বের করে ভেদবাদের ভিত্তিটা তৈরী করবার চেষ্টা করেছেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রেরণা ডাঃ হাটনের বৈজ্ঞানিক বিচারকে মাঝে মাঝে ব্যাহত করেছে। এসব সত্ত্বেও ডাঃ হাটনের মন্তব্যের মধ্যে আসল সত্যটুকু চাপা পড়তে পারেনি। তিনি শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেছেন: হিন্দুধর্ম এবং উপজাতীয় বা আদিবাসী ধর্মসমূহ, এই দুয়ের মধ্যে কোন ভেদরেখা টানা দুষ্কর। উপজাতীয়দের হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত করা সহজ। যে যে অঞ্চলে 'পাহাড়ী' বা 'জংলী' উপজাতীয়েরা তাদের দৈনন্দিন জীবন

ও জীবিকার সম্পর্কে হিন্দুদের সংস্পর্শে এসেছে, সেখানেই দেখা গিয়াছে যে, উপজাতীয়েরা তাদের প্রতিবেশী হিন্দুধর্ম থেকে অজস্রভাবে উপাদান আহরণ করে নিয়েছে; যদিও মনের দিক দিয়ে তাদের প্রাচীন চিন্তা-পদ্ধতি অপরিবর্তিত থেকে গেছে।"

ধর্ম ভাষা শোণিত এবং আচার—জাতিগত এইসব প্রধান ভিত্তিগুলির বিষয় বিশ্লেষণ করে দেখা যাক্, বর্তমান হিন্দুসমাজ এবং আদিবাসী সমাজের মধ্যে পার্থক্য কতখানি এবং সাদৃশ্য কতখানি।

প্রাচীন নৃতাত্ত্বিকদের মধ্যে ফরসাইথ (Forsyth) বলেছেন: "বৈগা ভীল গোন্দ কোল কোরকু এবং সাঁওতাল প্রভৃতি বিশিষ্ট উপজাতীয়ের মধ্যে কারা ভারতের প্রকৃত আদিম অধিবাসী অথবা কারা প্রথম ভারতে এসে বসতি স্থাপন করেছে, তা সম্ভবতঃ কখনই জানা যাবে না।......এদের আচার ধর্ম ও ভাষার সঙ্গে হিন্দুদের আচার ধর্ম ও ভাষা এমনভাবে মিশে গেছে যে, তাদের আদিম বৈশিষ্ট্য এখন খুঁজে বের করা অসম্ভব। আধুনিক হিন্দুধর্মাবলম্বী বিরাট জাতিগুলির সঙ্গে এরাও ক্রমশঃ যদিও মিশে যেতে চলেছে, তবুও এদের বর্তমান অবস্থা হিন্দুসমাজ থেকে অনেক ব্যাপারে বিশিষ্ট এবং পৃথক্।" (১) যাযাবরবৃত্তির কারণে এবং প্রাচীনকালের রাজনৈতিক কারণে আদিবাসী বহু গোষ্ঠী ভারতের এক স্থান ছেড়ে আর এক স্থানে বসতি স্থাপন করেছে। কখনো বা অভিযান করে দূরান্তরে উপনিবেশ স্থাপন করেছে। ব্র্যাডলে-বার্ট (Bradley-Birt) বলেন—"মুসলমান শাসনের শেষ দিকে পর্যন্ত পাহাড়িয়া সাঁওতাল এবং ভুইয়া প্রভৃতি আদিবাসী গোষ্ঠী বর্তমান সাঁওতাল পরগণার অধিত্যকা অঞ্চলে বসতির সন্ধানে দলে দলে আসা যাওয়া করেছে।" লাড়কা কোলেরা দক্ষিণে অভিযান করে ভুইয়াদের হটিয়ে দিয়ে সিংভূম অধিকার করে। (২)

কোরকু নামে আদিবাসী গোষ্ঠীটি বর্তমানে মধ্যপ্রদেশের মহাদেব পাহাড় অঞ্চলে বাস করে। এদের ভাষার সঙ্গে খেড়োয়ারী ভাষার (অর্থাৎ মুণ্ডারি অথাৎ সাঁওতালী বা কোলবর্গের ভাষা) সাদৃশ্য। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, খেড়োয়ারী ভাষী ছোটনাগপুরী আদিবাসী কুটুম্বের কাছ থেকে কোরকুরা বর্তমানে বহু দূরে সরে গেছে। এই দুই কুটুম্ব গোষ্ঠীর দুই উপনিবেশের মধ্যে সুবিস্তৃত দ্রাবিড়ভাষী গোন্দ অঞ্চল অবস্থিত।

ছোটনাগপুরের ওঁরাও এবং রাজমহলের পাহাড়িয়াদের মধ্যে এক শ্রেণী যে ভাষায় কথা বলে তাতে বোঝা যায় যে, তারা দূরে কর্ণাট অঞ্চল থেকে এসেছে। "গোন্দ এবং খোন্দেরা দক্ষিণে অবস্থিত অঞ্চল থেকে উত্তরে এগিয়ে গিয়ে মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যায় বসতি স্থাপন করে।......মধ্য প্রদেশের বৈগা গোষ্ঠী ছোটনাগপুরের ভুইয়াদের একটি শাখা। (রাসেল ও হীরালাল) কিন্তু বর্তমান বৈগারা হিন্দীভাষী এবং বর্তমান ভুইয়ারা পার্বত্য উড়িষ্যায় থাকে ও তারা উড়িয়াভাষী। ষষ্ঠ শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতে কতকগুলি হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হবার পর খোন্দেরা মধ্যপ্রদেশের পার্বত্য বা আরণ্য অঞ্চলে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। (রাসেল ও হীরালাল) দূর অতীতের কথা বাদ দিলেও নিকট অতীতের ইতিহাসে এমন অনেক ঘটনার সাক্ষ্য পাওয়া যায় যাতে প্রমাণিত হয় যে, মাঝে মাঝে দুর্বল হিন্দু উপনিবেশ বা রাজ্য অঞ্চলে অন্য স্থান থেকে এসে হিন্দুরা বসতি করে ফেলেছে এবং হিন্দুরা সরে গেছে। "এই অঞ্চলে (বিলাসপুর জমিদারী অঞ্চল) এককালে হিন্দু উপনিবেশ ছিল। এখানকার ধ্বংসপ্রাপ্ত নগর ও মন্দিরগুলি দশম ও দ্বাদশ শতকের নিদর্শন। ......এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, এই দেশ ১৬ এবং ১৭ শতাব্দীতে যেন আবার বর্বরতার মধ্যে পিছিয়ে যায়, সেসময় ছত্রিশগড় রাজবংশ তাদের স্বাধীনতা এবং ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল। রতনপুরের রাজপুত রাজশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ায় পাহাড়ী অঞ্চলে কতগুলি অনার্য গোষ্ঠীর দস্যু সর্দার প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং এদেরই সাফল্যের প্রেরণায় দলে দলে আদিম অধিবাসীরা এই অঞ্চলে আগমন করে এবং বর্তমানে তারাই এই অঞ্চল দখল করে রয়েছে। (১)

উল্লিখিত মন্তব্যগুলি থেকে এই প্রমাণিত হয় যে, ভারতের বর্তমান আদিবাসী গোষ্ঠীবর্গ যে যে অঞ্চলে বাস করছেন, তাঁরা সেখানকার "ভূমিজ" (Autochthones) সন্তান নন। উপনিবেশিকদের মত আদিবাসীরা দূর ও নিকট অতীতে স্থান থেকে স্থানান্তরে গিয়ে নূতন নূতন বসতি স্থাপন করেছে, এবং কালক্রমে এবং ঘটনাচক্রে আবার নতুন কোন স্থানে চলে গেছে। কিন্তু এ সত্ত্বেও কেউ হয়তো যুক্তি দেখাতে পারেন যে, বর্তমান অঞ্চল অনুসারে আদিবাসীরা হয়তো ঠিক সেই সেই অঞ্চলের "ভূমিজ" নয়, কিন্তু তারা ভারতের ভূমিজ সন্তান। অর্থাৎ তারা ভারতবর্ষেরই ভূমিজ আদিম অধিবাসী এবং ঘটনাচক্রে ভারতেরই একস্থান থেকে আর এক স্থানে বসতি স্থাপন করে বেড়িয়েছে। এই সিদ্ধান্তেরও একটু বিশ্লেষণ প্রয়োজন এবং এ বিষয়ে একমাত্র বৈজ্ঞানিক ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে বিশ্লেষণ করে সত্য নির্ধারণ সম্ভব।

পূর্বে বলা হয়েছে যে, কতগুলি আদিবাসী গোষ্ঠী আছে যারা হিন্দু-আর্য (Indo-Aryan) ভাষায় কথা বলে। যথা, ভীল বৈগা মালপাহাড়ীয়া ভুইয়া প্রভৃতি। অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, এরা পূর্বে ভিন্ন একটা 'নিজস্ব' জাতীয় ভাষায় কথা বলতো, পরে ঘটনাক্রমে এদের ভাষান্তর ঘটেছে। এদের কথা বাদ দিলেও বর্তমানে দেখা যায় যে, আদিবাসীদের মধ্যে প্রধান দুটি জাতীয় ভাষা রয়েছে। ওঁরাও, গোন্দ, খোন্দ এবং পাহাড়ীয়াদের একাংশ প্রধানতঃ দ্রাবিড়ভাষী। সাঁওতাল মুণ্ডা কোরকু প্রভৃতি খেড়োয়ারী ভাষী। এই দুই ভিন্ন ভাষাবলম্বী আদিবাসী সমাজ বিক্ষিপ্ত ভাবে ভারতের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। সুতরাং এদের মধ্যে কারা যে ভারতের প্রথম বসতিস্থাপক (Settler) তা আমরা জানি না। এক্ষেত্রে এই দুয়ের মধ্যে কাউকে আদিম অধিবাসী (Aborigine) বলা উচিত হবে কি?

আর্যদের, অর্থাৎ হিন্দু-আর্যদের যদি ভারতে বহিরাগত লোক (Imigrant) বলা যায়, তবে দ্রাবিড়ভাষী ও খেড়োয়াড়ীভাষী লোকদের সম্বন্ধেও তাই বলতে হয়—ডাঃ হাটন এই মত অবলম্বন করেন। তাঁর মতে দ্রাবিড়ভাষী ও খেড়োয়াড়ীভাষী উভয়েই ভারতে বহিরাগত। দ্রাবিড়ভাষীরা এসেছে সিন্ধুর ভেতর দিয়ে এবং খেড়োয়াড়ীভাষীরা পাঞ্জাবের ভেতর দিয়ে। ডাঃ হাটনের নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা হলো এই: ভারতের প্রথম অধিবাসী হলো নিগ্রোবটু (Negrito) গঠনের নরগোষ্ঠী, কিন্তু তাদের বৈশিষ্ট্যের কোন চিহ্ন ভারতে স্থায়ী হয়নি। এদের পরে ভারতে প্রায়-অস্ট্রেলয়েড (Proto-Australoid) নরগোষ্ঠীর আবির্ভাব এবং এদের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের ছাপ অপেক্ষাকৃত স্পষ্টভাবে ভারতে স্থায়ী হতে পেরেছে। বলতে গেলে এরাই ভারতের 'আদিম অধিবাসী' (Aborigine) ভারতের অতি প্রাচীন যুগের এই নিগ্রোবটু এবং প্রায় অস্ট্রেলয়েড নরগোষ্ঠীর ভাষা কি ছিল, তার কোন পরিচয় ও প্রমাণ আমরা জানি না। ভাষা হিসাবে প্রথম নরগোষ্ঠীর যে পরিচয় পাওয়া যায়, তারা হলো খেড়োয়ারি ভাষী মানুষ এবং এই ভাষা অস্ট্রো-এসিয়াটিকবর্গের (Austro-Asiatic) ভাষা। সুতরাং খেড়োয়ারি-ভাষীরা যে ভারতে বহিরাগত তা আমরা বিশ্বাস করতে পারি। ঠিক এইভাবেই দ্রাবিড়-ভাষী জাতি বাইরে থেকে ভারতে এসেছে, হিন্দু আর্য ভাষীরাও এসেছে।" সুতরাং আদিকাল থেকে ভারতে ভূমিষ্ঠ কোন ভারতীয় জাতির অস্তিত্ব কল্পনা করার মত কোন বাস্তব প্রমাণ নেই। আদিম অধিবাসী কথাটি বর্তমান

(1) The Highlands of Central India—Forsyth
(2) The story of an Indian upland —Bradley-Birt.

(1) Final Report on the Land Revenue Settlement of the Zamindari States of the Bilaspur District—Wills

ভারতের কোন বিশেষ জাতি সমাজ বা গোষ্ঠী সম্পর্কে প্রযোজ্য হতে পারে না।

ভারতে ব্রিটিশ শাসননীতির মধ্যে কি বিচিত্র ভেদবাদ গ্রহণ করা হয়েছে, 'আদিম অধিবাসী' থিওরী তার একটা প্রমাণ। কে কবে ভারতে প্রথম এসে বসতি করেছে, হাজার হাজার বছর পূর্বের বিস্মৃত ইতিহাসের রহস্যের মধ্যেই সে সত্য লুকিয়ে আছে। কিন্তু ব্রিটিশ নীতি প্রস্তর যুগেরও পূর্বের জীর্ণ ইতিহাসের কঙ্কাল ধরে টানাটানি করেছেন ভারতের জাতীয় ঐক্যকে খণ্ডিত করবার জন্য। ধর্মকে ভেদবাদের অজুহাত করে যেমন হিন্দু ও মুসলমানের পৃথক নির্বাচন (Seperate Electorate) প্রথা প্রবর্তন করা হয়েছে, তেমনি ভারতীয় সমাজের মধ্যে কারা প্রাচীন এবং কারা অর্বাচীন, এই কল্পিত পার্থক্যের অজুহাত করে আদিবাসীদেরও আধুনিক জাতিদেহ থেকে পৃথক করবার চেষ্টা হয়েছে। হিন্দু-মুসলমানকে যেমন পৃথক নির্বাচনের কৌশলে আদিবাসীদেরও তেমনি 'পৃথক অঞ্চলের' কৌশলে ভিন্ন করে রাখা হয়েছে। ভারতের যে যে অঞ্চল প্রধানতঃ আদিবাসীদের বাসভূমি সেই সব অঞ্চলগুলিকে 'তপশীলী জিলা' (Scheduled District), 'অনগ্রসর অঞ্চল (Backward Tract) এবং 'শাসন সংস্কার বহির্ভূত অঞ্চল' (Excluded Area) নাম দিয়ে বড়লাটের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে রাখা হয়েছে। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের নীতি অধিকাংশ আদিবাসী অঞ্চলে প্রচলিত নয়, কোন কোন অঞ্চলে আংশিকভাবে প্রচলিত। আধুনিক ভারতীয় সমাজ যে ব্যবস্থায় জীবন যাপন করছে আদিবাসী সমাজকে সেই ব্যবস্থা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। আদিবাসী সমাজকে 'বিশেষভাবে যত্ন করার' জন্য ব্রিটিশ অভিভাবক তাকে আধুনিক ভারতীয়ের সান্নিধ্য থেকে আড়াল ক'রে রেখেছেন। 'আদিম অধিবাসী' থিয়োরী এই কূটনীতির একটা বড় সহায়ক।

এই থিয়োরী নিতান্তই জবরদস্তির থিয়োরী। ইতিহাসের সত্য হলো আধুনিক হিন্দু সমাজের সঙ্গে আদিবাসী সমাজের একটা সম্পর্কের সূত্র ধীরে ধীরে, নানা ছোট বড় বাধা সত্ত্বেও, একটা ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগ স্থাপনের কাজ করে চলেছে। সাঁওতাল সমাজ ব্রাহ্মণকে ঘৃণা করে, কিন্তু বহু হিন্দু আচার এবং উৎসবকে তারা আপন করে নিয়েছে। ১৮৭১ সালে সাঁওতালদের মধ্যে একটা সংস্কার আন্দোলনের সাড়া জেগে ওঠে। এই আন্দোলনের প্রবর্তক জনৈক সাঁওতাল মনস্বী, নাম ভাগীরথ অব ভগীরথ। সংস্কারক ভগীরথের আন্দোলনের প্রধান বিষয়গুলি ছিল—শূকর এবং মুর্গী খাওয়া বন্ধ করতে হবে, মদ্য পান ত্যাগ করতে হবে এবং মারাং বুরু দেবতার পূজো ছেড়ে দিয়ে 'এক ঈশ্বর' বিশ্বাস করতে হবে। রিজলি সাহেবের মতে পশ্চিম বঙ্গের কুর্মি সমাজ বস্তুতঃ সাঁওতালদেরই একটি হিন্দুত্ব প্রাপ্ত শাখা। রাজমহল পাহাড়ের কটোরি নামে একটি পাহাড়িয়া গোষ্ঠীর শাখা সম্পূর্ণরূপে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেছে। ভুইয়ারা নিজেদের হিন্দু বলে মনে করে এবং ভুইয়া সমাজের অনেক 'দেশীয় রাজা' এবং জমিদারেরা ক্ষত্রিয়ত্বেরও দাবী করেন। মানভূমের

ভূমিজ কোলেরা হিন্দু হ'য়ে গেছে, বাঙলা বলে, হিন্দু ধর্মীয় আচার ব্যবহার গ্রহণ করেও এরা প্রাচীন গোষ্ঠীর নৃত্যগীতমুখর উৎসব অনুষ্ঠান গুলিকে অবশ্য ত্যাগ করেনি। উঁরাওদের মধ্যে 'টানা ভগত' আন্দোলন বিরাট জাতীয় আন্দোলনরূপে প্রসার লাভ করে। টানা ভগত আন্দোলনে ওঁরাওয়েরা যেসব মন্ত্র আবৃত্তি করে তা হিন্দী ভাষাতেই রচিত। টানা ভগত আন্দোলনের মধ্য দিয়া একটা জাতীয় জাগরণের ভাব ওঁরাও সমাজে প্রবল হয়ে উঠেছিল, এর উদ্দেশ্য রাজনৈতিক এবং সামাজিক এবং হিন্দু ধর্মের মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এ বিষয়ে প্রসঙ্গান্তরে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

ছোট নাগপুরের আদিবাসীদের মধ্যে কবির পন্থের প্রচারও হয়েছে। ১৯২১ সালের বিহার-উড়িষ্যার সেন্সাস রিপোর্টে স্বীকার করা হয়েছে যে, 'কবীর পন্থে ধর্মান্তরিত আদিবাসীদের চিন্তা ও জীবন যাপন প্রণালীতে বিশিষ্ট রকমের উন্নতিমূলক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।"

হিন্দু সামাজিক শ্রেণী বিভাগে 'অন্ত্যজ' বলে একটা কথা আছে। অন্ত্যজ সবার অধম, দীনের হতে দীন, ঘৃণিত। তবু তারা হিন্দু। আদিবাসী সমাজের অনেকে হিন্দু সমাজের এই 'অন্ত্যজ' প্রথাকে অত্যন্ত ভয় করে, কেননা আদিবাসীরা বৈষয়িক সম্পদে দীন হলেও তারা সামাজিক গণতন্ত্রে বর্ধিত মানুষ। হিন্দু সমাজে আদিবাসীকে আনতে হলে একটা না একটা শ্রেণী বা 'জাত' হয়েই আসতে হয়। দুঃখের বিষয়, এভাবে যারা এসেছে তাদের একেবারে ছোট জাত হয়েই আসতে হয়েছে। যদি 'ইতর' বা 'অন্ত্যজ' আসনগুলি ছাড়া আদিবাসীদের জন্য হিন্দু সমাজে আর একটু উচ্চ স্তরের আসন খোলা থাকতো, তবে বহুদিন পূর্বেই আদিবাসী সমাজ সমগ্রভাবে হিন্দু সমাজ দেহের অঙ্গীভূত হয়ে যেত। দুর্ভাগ্যের বিষয় তা হয়নি। বর্তমানের উড়িয়া-ভাষী খোন্দ সমাজকে উড়িয়া হিন্দুরা নিম্নের সমশ্রেণী বলে মনে করে থাকেন। কোন কোন ক্ষেত্রে হিন্দুর গোঁড়ামি এক আধটুকু শিথিল হয়েছে দেখা যায়। যেমন পুরীর শ্রীর জগন্নাথ মন্দিরের রন্ধনশালায় পাচকের কাজ করবার অধিকার লাভ করেছে। আধুনিক ভারতবর্ষের সহরগুলিতে মেথর এবং ধাঙড় সমাজের ইতিহাস যদি অনুসন্ধান করে কেউ দেখেন, তবে জানতে পারবেন কত হতভাগ্য আদিবাসী সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অসহায় অবস্থার জন্যই পুরীষবাহকের কাজ গ্রহণ করেছে। আবার অনেক আদিবাসী গোষ্ঠী আছে, যাদের মধ্যে এক একটা বড় অংশ হিন্দুত্ব গ্রহণ করেছে, তাদের একবারে 'অন্ত্যজ' হবার দুর্ভাগ্য হয়নি। কারণ, সংখ্যায় অনেক হওয়ায় এরা নিজস্ব একটা সমাজ রাখতে পেরেছে। খোন্দরের মধ্যে যারা হিন্দু হয়েছে, তারা রাজখোন্দ নামে পরিচিত। কোরকুদের মধ্যে যারা হিন্দু হয়েছে, তারা রাজ কোরকু নামে পরিচিত। ভীলেরাও হিন্দু হয়ে গেছে। টবগাদের মধ্যে যারা হিন্দু হয়ে গেছে, তাদের সমাজ চিনু-ঝোরার নামে পরিচিত। হিন্দুসমাজ এদের যেভাবেই গ্রহণ করে থাকুক, এরা নিজেরা কিন্তু নিজেদের অন্ত্যজ শ্রেণীর হিন্দু বলে মনে করে না। বরং এদের মধ্যেও উচ্চবর্ণ সুলভ জাতের গর্ব বেশ ভালভাবে দেখা দিয়েছে। রাজ কোরকু বা রাজ খোন্দেরা চামার বা মুসলমানদের ছোঁয়া খায় না। খান্দেশের ভীলেরা মহর চামার ও মুচী প্রভৃতি 'হরিজনের' হাতের ছোঁয়া রান্না-করা খাদ্য খায় না, যদিও মুচিরা ভীলেদের উচ্ছিষ্ট খেয়ে থাকে। মান্ধাতা পাহাড়ে দেব-মন্দিরের বিগ্রহের পূজারী ভীলবংশের লোক, ঠাকুর গোষ্ঠীর আদিবাসীর ধর্মকর্মে ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিয়োগ করতে আরম্ভ করেছে। কত্‌কারি আদিবাসী অহিন্দুর হাতের ছোঁয়া খাদ্য খায় না। এরা প্রতিবেশী হিন্দুর মত পন্ধরপুরে তীর্থযাত্রা করিতেও শিখেছে। বর্লি আদিবাসীরা বিবাহ অনুষ্ঠানে পর্যন্ত ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিয়োগ করছে। বর্ণ হিন্দুরা গৃহকর্মে বর্লিদের পরিচারকের কাজে নিযুক্ত করতে কোন দ্বিধা করেন না।

সুতরাং আদিবাসীদের সম্পর্কে যেমন অ্যানিমিষ্ট আখ্যা খাটে না, তেমনি আদিম অধিবাসী আখ্যাও খাটে না বরং বলতে পারা যায়—উপজাতীয় হিন্দু (Tribal Hindu) এবং এই উপজাতীয় হিন্দু বস্তুত 'অবনত হিন্দু' ছাড়া আর কিছু নয়।

ব্রিটিশ নৃতাত্ত্বিক এবং সমাজবিজ্ঞানী লেখকেরা অনেকে আদিবাসী সমাজের এই ঐতিহাসিক পরিচয়টুকু ধরতে পারেন নি। তাই অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, কেন আদিবাসীরা তাদের জংলী জীবনের সামাজিক স্বাধীনতা ছেড়ে দিয়ে হিন্দুসমাজের মধ্যে একটা নিম্নশ্রেণীর আসন গ্রহণ করবার জন্যও আগ্রহশীল? দরিদ্র ও অনগ্রসর আদিবাসীরা সামাজিক এবং বৈষয়িক উন্নতি কামনা করে, কিন্তু হিন্দুসমাজের মধ্যে একটা নিম্ন শ্রেণীর ঠাঁই গ্রহণ করে কি সেই উদ্দেশ্য সার্থক হয়? ব্রিটিশ সমালোচকেরা এর রহস্য বুঝে উঠতে পারেন না।

১৯৩১ সালের বিহার-উড়িষ্যা আদম শুমারির রিপোর্টে সেন্সাস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ লেসি (Lacey) লিখেছেন: ছোট-নাগপুরের কুর্মি মাহাতোরা এই বলে আন্দোলন আরম্ভ করেছে যে, কুর্মিরা ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব। আমার প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে, এই আন্দোলন কি কুর্মি মাহাতো সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর হবে?" ১৯৩১ সালের মধ্যপ্রদেশের সেন্সাস রিপোর্টে মিঃ সুবার্টও (Shoobert) এই ধরণের আদিবাসী দরদ প্রকাশ করেছেন— সামাজিক মর্যাদা উন্নত হবে, এই আশায় আদিবাসীরা হিন্দু বলে পরিচিত হতে চায়, কিন্তু সত্যি কি এ আশা সফল হবে? মিঃ এলুইন আদিবাসীদের কতকগুলি সংস্কার আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা করে এই মন্তব্য করেছেন যে—'এই সব আন্দোলনের দ্বারা আদিবাসীরা ইচ্ছে করেই তাদের সংস্কৃতি নষ্ট করেছে, এর ফলে বর্ণ হিন্দুরা তাদের শ্রদ্ধা করবে' এই তাদের আশা। (১) ডাঃ হাটন আরও বেশী দুঃখিত। "শোচনীয় ব্যাপার এই যে, আদিবাসী গোষ্ঠীরা হিন্দুসমাজের মধ্যে একটা 'জাত' (Caste) হবার জন্য এত আগ্রহশীল এই কারণে যে, এর ফলে তাদের সামাজিক মর্যাদা উন্নত হবে বলেই তারা মনে করে। কিন্তু এর ফলে সাধারণত আরও বেশী অধঃপতন হয়ে থাকে।" আর একজন সমালোচক, ও'ম্যালি, দুঃখ করে লিখেছেন—'শিক্ষাপ্রাপ্ত আদিবাসীরাই বেশী করে হিন্দুধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়ে'। (২)

ব্রিটিশ সমালোচকের উপরোক্ত মন্তব্যগুলি থেকে আদিবাসী দরদের প্রমাণ যতটা না পাওয়া যায়, হিন্দুসমাজবিরোধী উষ্মার প্রমাণ ততটা পাওয়া যায়। হিন্দু সমাজ গঠনের মধ্যে এমন কি বিশিষ্ট মহত্ত্ব বা শক্তি আছে যার জন্য আদিবাসীরা হিন্দুত্বের দিকে ঝুঁকে পড়ে? ব্রিটিশ সমালোচকেরা এ বিষয়ে বৈদেশিক দৃষ্টি নিয়ে একটু গভীরে গিয়ে অনুসন্ধান করেন না। 'জাত' (বা Caste System) নামে হিন্দুসমাজের একটা খারাপ প্রথার কথা তাহারা অবগত আছেন, এবং এই জানাটাই সর্বস্ব করে ব'সে আছেন, এ ছাড়া যেন হিন্দুসমাজের আর কোন সৎ বৈশিষ্ট্য নেই।

ব্রিটিশ সমালোচকের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক্। আধুনিক ভারতীয়েরা এই প্রশ্নের কি উত্তর দিতে পারেন? হিন্দুসমাজের জাতপ্রথা ও উচ্চনীচ বর্ণভেদ থাকা সত্ত্বেও কেন আদিবাসীরা হিন্দুত্বের প্রতি আগ্রহশীল? আদিবাসীদের হিন্দুত্ব গ্রহণের ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, সমগ্র ব্যাপারটা একতরফা উদ্যোগেই হয়েছে। আদিবাসীরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে হিন্দুসমাজের দিকে এগিয়ে এসেছে, হিন্দুত্ব গ্রহণ করেছে। তাদের হিন্দু সমাজে গ্রহণ করবার জন্য হিন্দুদের দিক থেকে কোন উদ্যোগ হয়নি। হিন্দুসমাজের বিরাট কাঠামোর মধ্যে যে স্তরে সম্ভব হয়েছে, সেই স্তরেই হিন্দুত্বপ্রয়াসী আদর্শবাদী নিজের গুণে এসে স্থান গ্রহণ করেছে। দ্রোণ একলব্যকে শিষ্যত্ব দিতে রাজী হয়নি, একলব্য তবু নিজের জেদে দ্রোণকে গুরুরূপে মনে মনে মেনে নিয়েছিল।

---

(1) The Baiga—By Verrier Elwin
(2) Modern India and the West—..O'Malley.

হিন্দুসমাজ ও আদিবাসী সমাজের পারস্পরিক মনোভাবের মধ্যে কতকটা দ্রোণ-একলব্য সম্পর্কের রীতি যেন রয়েছে।

যাই হোক্, ব্রিটিশ সমালোচকেরা তাদের খৃষ্টীয় সমাজদেহের ইস্পাত গঠন (Steel Frame) দেখে মনে করেন যে এর চেয়ে ভাল সমাজগঠন আর কি হতে পারে? হিন্দু-সমাজ গঠনকে তাঁরা নিতান্ত একটা জাতপ্রথা বিড়ম্বিত গোঁড়া পরিবর্তন বিমুখ সমাজ বলে মনে করেন। এটা তাঁদের একপেশে দৃষ্টির দুর্বলতা মাত্র। বহু বৈচিত্র্যে বহু বিরোধী রীতি-নীতির সামঞ্জস্য মিশ্রণে ও সমন্বয়ে; বহু ভাষা পরিচ্ছদ আচার উৎসব ইত্যাদি সাংস্কৃতিক ভূমিকার বিরাটত্বে অতি পরিব্যাপ্ত, অতি গভীর হিন্দুসমাজের সত্তায় পরিবর্তন ও আহরণের যে শক্তি আছে, সেটা দেশী বিদেশী অনেক সমালোচকেরা সহজে দেখতে পান না। হয়তো হিন্দু সমাজের এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই আদিবাসী সমাজ এর প্রতি আকৃষ্ট। আর যদি হিন্দু সমাজের কথা ছেড়ে দিই, তবে বলতে হয় হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যে এমন কিছু আছে যার জন্য আদিবাসী সমাজ হিন্দুসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়। হিন্দু সংস্কৃতিকেও আদিবাসীরা বৈদেশিক সংস্কৃতি বলে মনে করতে পারে না। কিন্তু জাতপ্রথাহীন বিখ্যাত খৃস্টীয় ও মুসলিম সংস্কৃতিকে আদিবাসীরা বৈদেশিক সংস্কৃতি বলে সহজেই বুঝতে পারে, কারণ এই দুই সংস্কৃতি আদিবাসীদের চিরকেলে ঐতিহাসিক রুচি সংস্কার ও বিশ্বাসকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার ও আঘাত করে। সামাজিক বিষয়ে হিন্দু যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে অনুদার ও সংকীর্ণ এবং সেই অনুপাতে দুর্বল, কিন্তু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে হিন্দু তেমনি উদার। হিন্দুর এই সাংস্কৃতিক চরিত্রের শক্তিকে ব্রিটিশ সমালোচকেরা বুঝে উঠতে পারে না। সামাজিক দিক দিয়ে হিন্দু নিজের যে দুর্বলতা ঘটিয়েছে সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে শক্তি অর্জন করে সেই ক্ষতি পূষিয়ে নিয়েছে। অহিন্দু আদিবাসীর বোঙা দেবতার শিলাবেদীকে অহিন্দু আদিবাসীর ডাইন ওঝা ও দেবকলিকে, অহিন্দু আদিবাসীর নাচগান উৎসব ব্রতকে উচ্ছেদ করার মত উচ্চধর্মীয় আবেগ কোন হিন্দু পোষণ করে না। এবিষয়ে খৃস্টান ও মুসলমানের মনোভাব ঠিক বিপরীত। বহু আদিবাসী গোষ্ঠী হিন্দু নাম গ্রহণ করেছে এবং হিন্দু বলে পরিচয় দিয়ে থাকে, কিন্তু সংস্কৃতির দিক দিয়ে তারা বিশুদ্ধ আদিবাসীই রয়ে গেছে—সেই গোষ্ঠীগত দেবতার পূজা, উৎসব ও সমাজ। তবু তারা নিজেদের হিন্দু বলে মনে করে, এবং হিন্দুরাও তাদের হিন্দু মনে করে—সামাজিক সঙ্কট হোক্ বা না হোক্। পরে সংস্কৃতিকে এইভাবে আপন বলে স্বীকার করে নেবার এবং নিজ সমাজে স্থান দেবার উদারতাই হিন্দুর বড় শক্তি। এ শক্তি খৃস্টান বা মুসলমান সমাজের মধ্যে নেই। আদিবাসী সমাজ তাদের দীর্ঘ অতীতের ইতিহাসে দেখে এসেছে যে, সম্পূর্ণ নিজস্ব সংস্কৃতি নিয়ে তারা অনায়াসে হিন্দু আখ্যা গ্রহণ ক'রে হিন্দু সমাজের কোন একটা স্তরে থাকতে পারে। এতে কোন বাধা নেই। হিন্দু সমাজ থেকেও কোন আপত্তি হয় না। ডাঃ হাটন, মিঃ মেসি ও মিঃ এলুইন প্রমুখ বিজ্ঞবর্গ হিন্দুর এই সাংস্কৃতিক উদারতার শক্তিকে বুঝতে পারেন না বলেই আদিবাসীদের 'শোচনীয়' হিন্দুঘেঁসা মনোভাব দেখে হায় হায় করে ওঠেন।
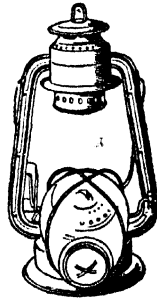
নিকেল মুদ্রা বনাম রৌপ্য মুদ্রা

শ্রীঅনিলকুমার বসু

বঙ্কিমচন্দ্র একদিন সখেদে উক্তি করিয়াছিলেন, "হায় লাঠি! তোমার দিন গিয়াছে।" ভারতের রঙ্গশালা হইতে রৌপ্য মুদ্রাকে অপসারণ করিয়া তাহার স্থানে নিকেল মুদ্রার প্রবেশ অনুমোদন করিয়া সম্প্রতি যে মুদ্রা আইন প্রণীত হইয়াছে, তাহাতে এই প্রশ্নই বোধ হয় পুনরুচ্চারিত হইতে পারে, "হায় রূপা! তোমার কি দিন গিয়াছে?" এই বিষয় নিয়া কেন্দ্রীয় আইন সভায় যে বিতর্কের অবতারণা হইয়াছিল তাহা অনুরাগী পাঠক নিশ্চয়ই অবগত আছেন। এই বিতর্ক সংকলিত হইলে বিরাগী পাঠকও উহার মাঝে প্রচুর হাস্যরসের সন্ধান পাইবেন। কেহ কেহ এই নিকেল মুদ্রাকে "নকলি মুদ্রা" আখ্যা দিয়াছেন, কেহ কেহ এরূপ প্রস্তাবও করিয়াছেন যে, নিকেল মুদ্রাই যদি চালু হয়, তবে তাহা একটু বর্ধিত আকারেই মুদ্রিত হোক যাহাতে প্রয়োজনমত জিনিসপত্রও মুদ্রার দ্বারা চাপা দেওয়া যাইতে পারে অর্থাৎ যাহাতে ঐ মুদ্রা paper-weightএরও কাজ চালাইতে পারে, কারণ তাহাদের মতে বর্তমান মুদ্রাস্ফীতির যুগে এক টাকায় একটি ভাল পেপার-ওয়েট কিনিতে পারা যায় না। ইহা ছাড়া ঐ মুদ্রায় 'রাজ শির' অঙ্কিত থাকিবে, না অর্থ-সচিবের কেশবিরল মস্তক মুদ্রিত হইবে, না অর্থসচিবের যৌথ সম্পাদকের মুণ্ড পশ্চাৎভাগে ও অগ্রভাগে অঙ্কিত হইবে, এই নিয়াও হাস্যকৌতুকের সৃষ্টি হইয়াছে, অবশ্য কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় নাই। ইহা ছাড়া নিকেল মুদ্রার সুবিধা দেখাইতে গিয়া এইরূপ যুক্তিও দেখান হইয়াছে যে, পকেটে নিকেল মুদ্রা নিয়া পকেটমারকে না আকৃষ্ট করিয়া অবাধে বিচরণ করার সুযোগ আছে, যাহা রৌপ্যমুদ্রার বেলা ছিল না। কারণ রৌপ্য মুদ্রার নূপুর-নিক্কণ অনেক পরস্বাপহারীদের যোগজ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কাজেই নিকেল মুদ্রার রৌপ্য মুদ্রাসুলভ মোহিনী রূপ না থাকায় দুর্বৃত্ত কর্তৃক অপহরণের সম্ভাবনা একটু কম। সে যাহাই হউক, নিকেল মুদ্রা প্রচলনের কি যৌক্তিকতা আছে তাহা একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাক্।

প্রথমত দেখা যাক নিকেলের মুদ্রা হিসাবে চালু হইবার যে সব প্রাথমিক গুণের আবশ্যক তাহা আছে কি না। প্রথম গুণ হইল মুদ্রার স্থায়িত্ব (durability)। এই বিষয়ে নিকেল ধাতু হিসাবে নির্গুণ নয়, কারণ নিকেল স্থায়িত্ব গুণমণ্ডিত—কাগজের মত ফুৎকারে উড়িয়া যায় না। ইহা ছাড়া নিকেল ধাতুর গুণসাম্য (homogeneity or uniformity in quality) বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। তদুপরি নিকেল মুদ্রা অনায়াসে চেনা যায় (cognisability) এবং স্বচ্ছন্দে পকেটে পুরিয়া চলাফেরা করা যায় (Portability)। এতদ্ব্যতীত নিকেল ধাতু প্রয়োজন মত ভাগ করিয়া লওয়া যায়—যাহাকে বলা যাইতে পারে বিভাজ্য গুণ (divisibility)। সর্বশেষ ধাতু হিসাবে নিকেলের একটা আলাদা মূল্যও আছে (Valuability)। কাজেই মুদ্রাসুলভ সর্বপ্রকার গুণের অধিকার নিকেল ধাতুর যখন রহিয়াছে, তখন নিকেল মুদ্রা প্রচলনে কোন আপত্তিই থাকিতে পারে না। এখন দেখা যাক, মুদ্রার সাহায্যে যে সব কাজ কারবার করা যায় তাহা সম্পাদন করিবার ক্ষমতা নিকেল মুদ্রার থাকিবে কি না। সরকারী ছাপ যখন নিকেল মুদ্রার পেছনে থাকিবে, তখন দৈনন্দিন ব্যাপারে নিকেল মুদ্রা গৃহীত হইবেই। (medium of exchange) সেই অবস্থায় নিকেল মুদ্রার মান দণ্ডেই বাজার দর নিরূপিত হইবে (measure of value), লেনদেন কারবার চুকাইবার জন্যও নিকেল মুদ্রা হস্তান্তরিত হইবে। (Standard of deferred payments) এখন প্রশ্ন হইল নিকেল মুদ্রা "Store of Value" রূপে কাজ করিবে কি না এই বিষয় কেহ কেহ নিকেল মুদ্রার শক্তি সম্বন্ধে সন্দিহান। কিন্তু ইহার উত্তরে এই বলা যায় যে, বর্তমান যুগে মুদ্রার এই দিকটা এখন আর ততখানি বিবেচ্য নয়। কারণ মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা (Purchasing power) অধিককালের জন্য অটুট রাখার বিষয়টাই অন্য সব দিকের গুরুত্বকে ছাপাইয়া গিয়াছে এবং বর্তমানকালে মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা শুধু উহার ধাতব মূল্যের উপরই নির্ভর করে না। লোকের বিশ্বাসের উপরই (confidence of the people) মুদ্রার স্থায়িত্ব অনেকখানি নির্ভর করে। মুদ্রার কোন আলাদা ধাতব মূল্য আছে কি না কিংবা ইহার পেছনে কোন ধাতুর পৃষ্ঠপোষকতা (metallic backing) রহিয়াছে কি না এই সব বিষয়ে জনসাধারণ ততটা মাথা ঘামায় না। যতক্ষণ পর্যন্ত জনসাধারণের নিজস্ব সরকারের উপর আস্থা থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ সব বিষয় তাহাদের বিবেচনার মধ্যে আসেই না। এবং বর্তমানকালের নিয়ন্ত্রিত মুদ্রা নীতির (managed currancy) প্রসাদ গুণে ধাতব পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতিরেকেও মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখা অনেকখানি সহজসাধ্য। অবশ্য এককালে মহম্মদ তোগলক তাম্র মুদ্রার প্রচলন করিতে গিয়া "পাগল রাজা" আখ্যা পাইয়াছিলেন, কিন্তু এখন "তে হি নো দিবসাঃ গতাঃ" "The old order changeth yielding place to new." কাজেই এককালে কি হইয়াছিল তাহার দ্বারা বর্তমান নীতির বিচার করা সব সময় যুক্তিসঙ্গত নয়। উদাহরণ স্বরূপ গ্রেট ব্রিটেনের কথাই ধরা যাইতে পারে। অগাধ ঋণ-সলিলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত গ্রেট ব্রিটেনের প্রচলিত স্টার্লিং মুদ্রার পিছনে, যাহা এখন বস্তুতঃপক্ষে কাগজ মুদ্রা, কোন ধাতুর বন্ধনই নাই। স্বচ্ছলতার অন্তরাল ও ধাতুর বন্ধন ব্যতিরেকেই যদি স্টার্লিং এখন পর্যন্ত সেই দেশবাসীর পূর্ণ আস্থা অর্জন করিতে পারে, তবে আমাদের দেশে নিকেল মুদ্রাই বা কেন রজত মুদ্রার স্থলাভিষিক্ত হইতে পারিবে না? জাতীয় সরকারের উপর অটুট বিশ্বাস ও জাতীয় শক্তির উপর দৃঢ় প্রত্যয় থাকিলে যে কোন মুদ্রাই বিনাক্লেশে প্রচলিত হইতে পারে, ইহা ছাড়া মুদ্রা সংক্রান্ত ব্যাপারে রজত-কাঞ্চনকেই শুধু কৌলিন্যের আসনে প্রতিষ্ঠা করা চলে না। কারণ আভ্যন্তরিক বিনিময় কার্যের জন্য স্বর্ণ-মুদ্রার প্রচলন অনেক সভ্য দেশেই লোপ পাইয়াছে। তদ্রূপ রৌপ্য মুদ্রার প্রচলনও এক-প্রকার গ্রেট ব্রিটেন হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে। কারণ রৌপ্য ধাতুটি বর্তমান আণবিক বোমার যুগে কৌশলী ধাতু (Strategic metal) হিসাবেই বেশী প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই টাঁকশালের রঙ্গমঞ্চে রৌপ্য মুদ্রার প্রবেশ পথে দীর্ঘকালের জন্য যবনিকাপাত হইতে চলিল। এই নীতি যে হঠাৎ অবলম্বিত হইয়াছে তাহা মনে করা ভুল হইবে। কারণ ১৯৪০ সালের মে মাসে শতকরা ৫০ ভাগ রৌপ্য, ৪০ ভাগ তামা, ৫ ভাগ নিকেল ও ৫ ভাগ দস্তা সংমিশ্রণে যে রাসায়নিক সিকি মুদ্রার প্রথম প্রচলন হইয়াছিল, সেই হইতেই রজতধাতুর বহুল ব্যবহার সংকোচনের প্রথম প্রচেষ্টার সূত্রপাত আমাদের দেশে হয়। তারপর সেই বৎসর আগস্ট মাসেই অনুরূপ আধুলির প্রচলনে আর এক ধাপ অগ্রসর হওয়া যায়। সর্বশেষে সেই বৎসর ডিসেম্বর মাসে অনুরূপ রাসায়নিক পদ্ধতিতে নূতন রূপার টাকা টাঁকশাল হইতে বাজারে চালু হয়। এই ভাবে টাকা, আধুলি ও সিকি মুদ্রা প্রস্তুত করিবার জন্য আমাদের দেশে ১৯৪০ সালের মে মাস হইতে ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসের মধ্যে আনুমানিক ৫৬৭ মিলিয়ান আউন্স রূপা ব্যবহৃত হয়। অপরদিকে যুদ্ধ-কালীন প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ভারতকে

আমেরিকার নিকট হইতে ২২৬ মিলিয়ান আউন্স রূপা ঋণ-ইজারায় (Lease-lend) ধার করিতে হইয়াছে, এই সর্তে যে যুদ্ধান্তে ঐ সব রূপা প্রতি আউন্স হিসাবে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। এদিকে দেখা যাইতেছে যে, রূপার দাম দিন দিন অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাইতেছে। একদিকে শিল্পকার্যে রৌপ্যের বহুল নিয়োগ ও অপরদিকে রৌপ্যোৎপাদনের স্বল্পতা—এই দুই কারণেই রূপার দাম যে আরও বৃদ্ধি পাইবে এরূপ আশঙ্কা করা একেবারে অমূলক নয়। এই অবস্থায় বাহির হইতে উচ্চ মূল্যে রূপা কিনিয়া উহা দ্বারা আমেরিকার ঋণ পরিশোধ করিতে গেলে ভারতবর্ষকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। কাজেই আভ্যন্তরিক রৌপ্য মুদ্রা তুলিয়া দিয়া তদ্বারা আমেরিকার নিকট হইতে গৃহীত ২২৬ মিলিয়ান আউন্স রূপা ফিরিয়া দেওয়া ছাড়া "নান্যেত্ব গতিরন্যথা" অর্থাৎ গত্যন্তর নাই। এবং অর্থনীতির দিক হইতে এই পথই একমাত্র সহজ ও প্রশস্ত পথ। মানু সুবেদার প্রমুখ কয়েকজন এইরূপ যুক্তি দেখাইয়াছেন যে, যে চুক্তি অনুসারে উক্ত রূপা আমেরিকার কাছ হইতে ধার নেওয়া হইয়াছিল সেই চুক্তির সংশোধনের জন্য ভারতের উচিত আমেরিকার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করা। কেহ কেহ এমনও বলেন যে, আমেরিকার কাছ হইতে যখন উক্ত ঋণ পরিশোধ করার তাগিদ আসে নাই, তখন আমাদের ঐ রূপা এখনই ফিরাইয়া দেওয়ার জন্য এত মাথা-ব্যথা কেন? মানু সুবেদারের যুক্তিটিই প্রথমে ধরা যাক্। তিনি বলিয়াছেন, ভারতের ঐ চুক্তির সংশোধিত প্রস্তাব আমেরিকার কাছে তোলা উচিত। কিন্তু এখন এই প্রশ্ন তুলিলে আন্তর্জাতিক লেনদেন কারবারে ভারতের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবে না কি? ভারত যখন একবার ঐ সর্তে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে, তখন ঐ চুক্তির সংশোধন প্রস্তাব, বর্তমানে তোলা তাঁর মর্যাদাহানিকর হইবে। কাজেই মানু সুবেদারের যুক্তি বর্তমান অবস্থায় অচল। দ্বিতীয়ত আমেরিকা আমাদের কাছ হইতে দেয় রূপা ফিরিয়া পাওয়ার দাবী এখনও জানায় নাই সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া দেনদারের নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকার কোন যৌক্তিকতা আছে কি? আমেরিকার চুপ করিয়া বসিয়া থাকার একটি নিগূঢ় কারণ রহিয়াছে। সম্প্রতি ভারত সরকার বাহির হইতে রজত-কাঞ্চনের আমদানির উপর যে বাধা নিষেধ আরোপ করিয়াছেন, তাহার প্রতিক্রিয়ার ফলে আমেরিকা'ত রূপার দাম অনেকখানি পড়িয়া গিয়াছে। কাজেই আবার ভারতকে তাগাদা দিলে ভারতের প্রত্যর্পিত রূপা আমদানির ফলে উহার মূল্য আরও পড়িয়া যাইতে পারে মনে করিয়া, আমেরিকা সেই দিকে কোন মনোযোগ দিতেছে না। এই অবস্থায় আমেরিকা যে কেন আমা-দিগকে রূপা ফেরৎ দিবার জন্য চাপ দিতেছে না তাহা সহজেই বোধগম্য। কাজেই এই যুক্তিও অবান্তর।

ইহা ছাড়া মানু সুবেদার আরও বলিয়াছেন যে, নিকেলের টাকা প্রচলন করিয়া এবং বর্তমান রূপার টাকা গলাইয়া ভারত সরকারকে প্রভূত ব্যয়ের সম্মুখীন হইতে হইবে। কিন্তু ভারত সরকারের পক্ষ হইতে প্রত্যুত্তরে বলা হইয়াছে যে, নিকেলের টাকা প্রস্তুত করিতে খরচ অত্যন্ত কম পড়িবে এবং এই ব্যয়ভার রৌপ্য মুদ্রা প্রস্তুত করিবার ১/৪০ ১/৫০ ভাগ। কাজেই ব্যয়ের দিক হইতেও নিকেলের টাকা প্রচলন করা অনেক সহজ ও যুক্তিসম্মত। কেহ কেহ বলেন, হিন্দু শাস্ত্রানুসারে ধর্মীয় কার্যে রৌপ্য-মুদ্রার প্রয়োজন। কাজেই রৌপ্য মুদ্রা অপসারণের ফলে অনেকের ধর্মজ্ঞানে ও আচারে আঘাত লাগিতে পারে। তদুত্তরে ভারত সরকারের পক্ষ হইতে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে যে, যদি বাস্তবিক এই সব উৎসবকার্যের জন্য এরূপ রৌপ্যমুদ্রার প্রয়োজন হয় এবং দেশ-বাসীর পক্ষ হইতে চাহিদা থাকে, তবে ট্যাঁকশাল হইতে এরূপ মুদ্রা প্রস্তুত করা অসম্ভব হইবে না। কাজেই সনাতনীদেরও ভয় পাইবার কিছুই নাই। তবে নিকেল মুদ্রা ব্যাপারেও একটি স্থায়ী অসুবিধা এই যে, রূপার ন্যায় নিকেলের জন্যও ভারতবর্ষকে অন্য দেশের মুখাপেক্ষী হইতে হইবে। কারণ ভারতে নিকেল উৎপাদন অপ্রচুর। পৃথিবীর মধ্যে কানাডাই সর্বাপেক্ষা বেশী নিকেল উৎপন্ন করে। কাজেই আমাদিগকে অনেক সময় কানাডার দ্বারে নিকেল ভিক্ষা করিতে হইবে। ইহা ছাড়া অন্যান্য দেশও ক্রমশ আভ্যন্তরিক লেনদেনের জন্য নিকেল মুদ্রা প্রচলনের দিকে বেশী যত্নশীল হইতেছে। কাজেই নিকেলের বহুল চাহিদার ফলে যদি উক্ত ধাতুর দাম বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে নিকেল মুদ্রা প্রচলনও ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়িবে। এইরূপ অবস্থার সত্যই যদি উদ্ভব হয়, তবে আমাদের নিকেলের চাইতেও কম ব্যয়সাধ্য ধাতুর মুদ্রা প্রচলনে উদ্যোগী হইতে হইবে। অর্থনীতিতে Gresham's Law-এর সূত্র অনুসারে "Bad money drives out good money" অর্থাৎ খারাপ টাকা ভাল টাকাকে বিতাড়িত করে। বর্তমান অবস্থায় মুদ্রা প্রচলন ব্যাপারেও এইরূপ বলিলে বোধ হয় ভুল হইবে না "Less valuable metal will drive out more valuable metal for coinage purposes" অর্থাৎ মুদ্রা প্রস্তুত ব্যাপারে সস্তার ধাতুই মহার্ঘ ধাতুর চাইতে বেশী ব্যবহৃত হইবে। মহম্মদ তোগলক যদি আজ বাঁচিয়া থাকিতেন তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইতেন যে তাঁহার স্বপ্ন, যাহা সেই সময়ে পাগলামি বলিয়া নিন্দিত হইয়াছিল, তাহাই আজ সফল হইতে চলিয়াছে।

প্রধান মন্ত্রী সুরাবর্দী সাহেব সার্বভৌম বাঙলার এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও অনেকেই তাঁহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছেন না। খুড়ো এই প্রসঙ্গটির উপর মন্তব্য করিয়া বলিলেন—"তার প্রথম কারণ তিনি রাজকুলের প্রতিনিধি,

সুতরাং বিশ্বাসং নৈব কর্তব্য—দ্বিতীয় কারণ, বাঙলার যে চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন, তা প্রায় রামরাজ্যেরই সমতুল্য। কিন্তু লীগ রামরাজ্যে বিশ্বাসী নহেন, শহীদ সাহেব এখনও লীগেরই শহীদ, সুতরাং এখানেও নৈব কর্তব্য—Q. E. D.!"

* * * *

মিঃ গজনফর আলি বলিয়াছেন—"The demand for partitioning of the Punjab and Bengal is the outcome of temporary anger"—"শুধু ভারত ব্যবচ্ছেদের দাবীটাই Permanent angerএর অনিবার্য পরিণতি"—রাগত হইয়াই বলেন বিশু খুড়ো, অবশ্যই ক্ষণিকের রাগ।

* * * *

কলিকাতায় সম্প্রতি যে হরতাল হইয়া গিয়াছে সহযোগী স্টেটসম্যান তাহাকে "হিন্দু হরতাল" আখ্যা দিয়াছেন। হরতালের জাতি নির্ণয়ের জন্য সহযোগীকে ধন্যবাদ;—"অতঃপর কোনদিন হিন্দু হরতালের forcible conversionএর খবর না পাইলেই বাঁচি"—বলেন খুড়ো।

* * * *

পাবনার এক সংবাদে প্রকাশ যে, সেখানে বিদ্যালয়সমূহে বৃহস্পতিবারে অর্ধেক এবং শুক্রবারে পুরো ছুটির ব্যবস্থা হইতেছে। বলা বাহুল্য এইটি পাকিস্থানী ব্যবস্থা। আমরা বলি সপ্তাহের সাতদিন শুক্রবার করিয়া দিলেই সব ল্যাঠা চুকিয়া যাইত—ছাত্ররাও প্রাণ ভরিয়া পাকিস্থান জিন্দাবাদ করিতে পারিত!

* * * *

সি আই, ডি পুলিশ নাকি করাচীতে কয়েকজন লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে, অভিযোগে প্রকাশ, তারা বিদেশ হইতে স্বর্ণ-মুদ্রা আমদানী করিতেছিল। খবরটি কাঞ্চন-ঘটিত। অতঃপর করাচী হইতে যারা কামিনী রপ্তানী করিতেছেন (কয়েকদিন আগে এক সংবাদে প্রকাশ) তাহাদিগকে অনুরূপ তৎপরতার সহিত গ্রেপ্তার করিলেই দুষ্কৃত-কারীদের কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করা হয়!

* * * *

"10,000 sterling awaits any Indian who can perform the Indian rope trick"—একটি ঘোষণা। "যাঁরা অদৃশ্য দড়িতে নিজের গলায় নিজে ফাঁসি পরিবার খেলা বিশ্ববাসীকে দেখাইতেছেন তাঁরা অচিরেই উক্ত ঘোষণার সুযোগ গ্রহণে তৎপর হউন"—মন্তব্য খুড়োর।

* * * *

মস্কো সম্মেলনের বিদায়ী সভায় মিঃ বেভিন নাকি বলিয়াছেন,—What the situation would be like if Stalin was the President of U.S. and Truman was the Chairman of the Council of Ministers of the U.S.S.R.—মিঃ বেভিনের মাথায় হঠাৎ এই আজগুবি প্রশ্ন কেন জাগিল তাহা বুঝিতে হইলে আগের সংবাদটি পড়িতে হয়—"Mr. Bevin participated in a score of toast"—সুতরাং কাজে কাজেই।

স্টালিন বলিতে পারিতেন—"এমন অবস্থা দাঁড়াইলে তুমি "সামু চাচা" বলিয়া কাহার গলা জড়াইয়া ধরিতে সে কথা তুমি-ই বল না"—কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই বেভিনের মত এতটা বেহেট হইয়া পড়েন নাই!

মিঃ চার্চিল নাকি রয়েল একাডেমির চিত্র প্রদর্শনীতে তাঁর নিজের আঁকা দুই-খানি ছবি পাঠাইয়াছেন। একটি ছবির নাম "Winter Sunshine". শীতের নিস্তেজ, নিষ্প্রভ সূর্যের পটভূমিকায় কি তিনি স্তিমিতরশ্মি সাম্রাজ্যবাদের ছবিই আঁকিয়া-

ছেন? "কিন্তু কু-লোকে যে তাঁকে liquidation-এর চিত্রশিল্পী আখ্যা দিবে"—বলেন খুড়ো।

* * * *

আমরা নব নির্বাচিত মেয়র এবং ডেপুটি মেয়রকে অভিনন্দন জানাইতেছি। আমাদের অভিযোগের তালিকা দীর্ঘ সুতরাং সে সব কথা উল্লেখ করিব না। তবে ডেপুটি মেয়র মহাশয়ের স্ব-সম্প্রদায়ের দৃষ্টি একটি ব্যাপারে আকর্ষণ করিতে চাই—ইউরোপীয়ান সম্প্রদায় মিঃ গফর্গিভয়ার নির্বাচনে বিরোধিতা করিয়াছেন। খুড়ো সোজা বাঙলায় বলিলেন—অর্থাৎ যাদের জন্য চুরি করা, দরকার হইলে তারাই চোর বলিয়া ডাকিতে কসুর করেন না। এই কথাটি মনে রাখিবেন এবং ময়ূরপুচ্ছ-গুলিকে ধাপার মাঠে প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন—জয় হিন্দ!

* * *

সংবাদপত্রের উপর প্রি-সেন্সরশিপ আদেশ প্রসঙ্গে সম্প্রতি পরিষদে যে বিতর্ক হইয়া গেল তাহাতে মিঃ সুরাবর্দী বলিয়াছেন, "we can allow the press to growl from beneath the muzzle but we cannot allow it to bite....and it is the bite that we have stopped."

খুড়ো বলিলেন, লর্ড নর্থক্লিফের মতানুসারে ইহাকেই বলে জোর খবর। তার ভাষার অনুকরণে বলা যায় "When a Government bite's a press that is not a news, but when a press bites a Government, that is a news".

এমনি করেই কলেরা ছড়ায়

শহরের অলিগলি থেকে গ্রাম্য হাটবাজার পর্যন্ত প্রায় সমস্ত লোকবহুল স্থানেই খাবার ফেরিওয়ালাদের দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু খুব কম লোকেই জানে, এদের কাছ থেকে খাবার কিনে খাওয়া কী বিপজ্জনক। কাটা ফলের ফেরিওয়ালার খোলা ঝুড়িতে ধুলো ও মাছির অবাধ গতি—মারাত্মক কলেরা জীবাণু সহজেই ও-সব জিনিষের মধ্যে ঢুকতে পায় এবং এইভাবে রোগ ছড়িয়ে পড়ে। এই সব ফেরিওয়ালাদের সম্পর্কে সাবধান হোন।

এর হাত থেকে বাঁচবার উপায়

- জীবাণুদুষ্ট, অস্বাস্থ্যকর ও গুরুপাক খাদ্য খাবেন না এবং দূষিত জল পান করবেন না।
- অতি পাকা বা না-পাকা ফল এবং পচা মাছ মাংস খাবেন না।
- বাজারে ধুলোবালিমাখা বীজাণুযুক্ত আইস্-ক্রীম, সরবৎ বা রুটি বিস্কুট ইত্যাদি খাবেন না।
- বাজার থেকে কেনা শাক-সব্জী এবং দৈনিক ব্যবহারের বাসনপত্র পটাসিয়াম পার্মাঙ্গানেট গোলা জলে বেশ করে ধুয়ে ফেলুন।

আজই কলেরার টীকা লউন

পাব্লিক হেল্থ ডিপার্টমেন্ট, গবর্ণমেন্ট অব্ বেঙ্গল, কর্তৃক প্রচারিত

BACPH 2-547

'বদন বরফুকন' চিত্রে বর্মী নর্তকীদল

অসমিয়া চিত্র 'বদন বরফুকন'

ইস্টার্ন মুভীজ লিমিটেডের অসমিয়া কথাচিত্র 'বদন বরফুকন' কিছুদিন আগে আমরা দেখে এসেছি। অসমিয়া ভাষায় এইটিই পঞ্চম চিত্র। বর্তমানে দেশের অশান্তি-পূর্ণ অবস্থার মধ্যে নানা অসুবিধার ভেতর দিয়ে কলকাতার স্টুডিওতে এদের ছবি তুলতে হয়েছে বলে যদিও এতে অনেক দোষ ত্রুটি রয়ে গেছে তবু নানা কারণে আমরা এই ছবিটি দেখে খুশী হয়েছি। প্রথমতঃ ইস্ট ইণ্ডিয়া আমলের আসামের রাজনীতিবিদ বদন বরফুকনের কাহিনী অবলম্বনে গৃহীত এই ছবি আসামের ইতিহাসের বেদনাময় অধ্যায় আমাদের সামনে ফুটে ওঠে। বদন বরফুকনের বিরুদ্ধে তৎকালীন রাজ্যলোভীর ষড়যন্ত্র কিভাবে আসামকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী হাতে তুলে দিল তার করুণ কাহিনী এই ছবিটিতে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তাছাড়া এই ছবির দৃশ্য-সজ্জায় সাজ-পোষাকে আসামের তৎকালীন সংস্কৃতি রুচি ও জীবনধারার মোটামুটি পরিচয় লাভ হয়। আসামের বহির্দৃশ্যগুলি ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, বিশেষ করে কামাখ্যা মন্দিরের দেয়াল-গাত্রে খোদিত মূর্তিসমূহ অসমিয়া প্রাচীন ভাস্কর্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন হয়ে ফুটে উঠেছে। এই চিত্রে যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁদের অধিকাংশই উচ্চ শিক্ষিত এবং পর্দায় এই প্রথম আবির্ভূত হয়েছেন, এইটিই সবচেয়ে প্রশংসার বিষয়। অধিকাংশই নবাগত শিল্পীদের নিয়ে ছবিটি গৃহীত বলে অভিনয়ের দিক দিয়ে আশানুরূপ সাফল্য লাভ করতে না পারলেও প্রথম প্রচেষ্টারূপে সত্যিই প্রশংসনীয়। এই ছবির কয়েকটি দৃশ্য যা বাঙালী দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করবে তা হচ্ছে আসামের বিহু উৎসব, বর্মী-রাজ সভায় নর্তকীদের নাচ কামাখ্যা মন্দিরের দৃশ্যাবলী প্রভৃতি। এই জন্যে ইস্টার্ন মুভীজের প্রথম প্রচেষ্টাকে আমরা সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি।

এই সঙ্গে আসাম সিল্ক ইণ্ডাস্ট্রির একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে। এর চিত্র গ্রহণ করেছেন ট্রপিক্যাল ফিল্ম অব ইণ্ডিয়া। আসাম সিল্ক ইণ্ডাস্ট্রি সম্বন্ধে আমরা ইতি-পূর্বে অনেক শুনেছি কিন্তু আসামের পল্লীর ঘরে ঘরে গুটি পোকার চাষ করা, সুতো কাটা তাঁত বোনা প্রভৃতি কিভাবে হয়ে থাকে তার পরিচয় ইতিপূর্বে আমাদের হয়নি। সেই দিক দিয়ে আমরা এই ছবির উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানাই।

খেলাধূলা

হকি

ভারতীয় হকি ফেডারেশনের মনোনীত খেলোয়াড়গণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও পর্যন্ত প্রদর্শনী খেলায় যোগদান করিতেছেন। পরবর্তী খেলাসমূহের ফলাফল পূর্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছে সন্দেহ নাই, তবে খুব প্রশংসনীয় হইয়াছে বলা চলে না। বাছাই করা দল হিসাবে যে কৃতিত্ব ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করা উচিত ছিল, তাহা করিতে পারে নাই। শীঘ্রই ইহাদের ভ্রমণ তালিকা শেষ হইবে ইহাই আমাদের ধারণা ছিল। কিন্তু বর্তমানে শোনা যাইতেছে যে, ফেডারেশনের কর্তৃপক্ষগণ দলটিকে সিংহলে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। এই ব্যবস্থা কেন যে করা হইতেছে, আমরা বুঝিনা। সিংহলের অধিবাসিগণ ভারতীয় হকি দল সম্পর্কে যে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেছে বর্তমানের মনোনীত দল সেই আশা পূরণ করিতে পারিবেন না। তাহা ছাড়া হকি ফেডারেশনের কর্তৃপক্ষগণ বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানে যে ভারতীয় দল প্রেরিত হইবে, তাহার গুরু ব্যয়ভার কিছুটা লাঘব করিবার মহৎ উদ্দেশ্য লইয়াই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রদর্শনী খেলার ব্যবস্থা করেন। সেই উদ্দেশ্যেই আশানুরূপ সাড়া যদি ভারতের বিভিন্ন স্থানের প্রদর্শনী খেলার দ্বারা সম্ভব না হইয়া থাকে, তবে তাহা সিংহল ভ্রমণ দ্বারা যে হইবে না এই বিষয় আমরা নিঃসন্দেহ।

ভারতীয় হকি ফেডারেশন বিভিন্ন স্থানের ২২ জন খেলোয়াড়কে এই সকল প্রদর্শনী খেলায় যোগদান করিবার জন্য মনোনীত করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে বাঙলার একজন মাত্র প্রতিনিধি ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই মনোনীত খেলোয়াড়টিকে, এমন কি অনেক খেলোয়াড়কেই এই সকল প্রদর্শনী খেলার কোনটিতেই যোগদান করিতে দেখা যায় নাই। আমরা যতদূর লক্ষ্য করিয়াছি, তাহাতে আমাদের দৃঢ় ধারণা—মাত্র ১৫ জন খেলোয়াড় এই পর্যন্ত খেলিবার সুযোগ পাইয়াছে। যদি সকলকে খেলিবার সুযোগই না দিতে পারিলেন, তবে কেন অযথা ঐ সকল খেলোয়াড়কে মনোনীত করিলেন বুঝিতে পারি না।

টেনিস

ভারতীয় ডেভিস কাপ দলের খেলোয়াড়গণ ব্রিটিশ হার্ডকোর্ট টেনিস প্রতিযোগিতায় অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিবেন এই ছিল সকলের দৃঢ় বিশ্বাস। এই ধারণা সকলে লাভ করেন ভারতীয় খেলোয়াড়গণের বেলজিয়ামের প্রদর্শনী খেলায় সাফল্য অবলোকন করিয়া। কিন্তু আমরা সেইরূপ কোন আশা মনে মনে পোষণ করি নাই। ভারতীয় টেনিস খেলার স্ট্যাণ্ডার্ড যে খুব উন্নত নহে, এমন কি এখনও পর্যন্ত আন্তর্জাতিক স্ট্যাণ্ডার্ডের সমপর্যায়ে পৌঁছিতে পারে নাই ইহা আমরা জানি। আর জানি বলিয়াই ব্রিটিশ হার্ডকোর্ট টেনিস প্রতিযোগিতায় ভারতীয় খেলোয়াড়গণকে সেমি-ফাইন্যাল পর্যন্ত উঠিয়া বিদায় গ্রহণ করিতে দেখিয়া আমরা কোনরূপ আশ্চর্য বা হতাশ হই নাই। প্রতিযোগিতায় ভারতীয় খেলোয়াড়গণ ব্রিটিশ খেলোয়াড়গণ অপেক্ষা উন্নততর নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন ইহা দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। কারণ আমরা ভুলিতে পারি না প্রতিযোগিতা আরম্ভের বহুদিন পূর্ব হইতে দিনের পর দিন ব্রিটিশ সংবাদপত্রসমূহের ভারতীয় খেলোয়াড়গণকে হীন প্রতিপন্ন করিবার প্রচেষ্টার কথা। ভুলিতে পারি না তাহাদের সেই উক্তি "প্রতিযোগিতার প্রথমেই ভারতীয় খেলোয়াড়গণকে শক্তিশালী ব্রিটিশ খেলোয়াড়গণের সম্মুখীন হইতে হইবে।" ইহার দ্বারা তাঁহারা প্রমাণিত করিতে চাহিতেছিলেন যে, ভারতীয় খেলোয়াড়গণ প্রতিযোগিতার প্রথমেই বিদায় গ্রহণ করিবেন। কিন্তু ফলত তাহা হয় নাই। ভারতীয় খেলোয়াড়গণ একের পর এক শক্তিশালী ব্রিটিশ খেলেয়াড়গণকে পরাজিত করিয়াই প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইন্যাল পর্যন্ত উঠিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সেই হীন প্রচারের সমুচিত প্রত্যুত্তর দিয়াছেন ইহা কি গৌরবের বা আনন্দের বিষয় নহে? ভারতীয় দলের ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার খেলা শীঘ্র আরম্ভ হইবে। প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসী দল খুবই শক্তিশালী। কিন্তু তাহা হইলেও আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, ভারতীয় খেলোয়াড়গণ তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন।

ভলিবল

বেঙ্গল ভলিবল এসোসিয়েশনের কর্তৃপক্ষগণ কিছু করিতেছেন না এই ধারণাই অনেকে করিতেছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি জেলা ভলিবল প্রতিযোগিতা বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে চন্দননগরে অনুষ্ঠিত হওয়ায় সেই ধারণা বোধ হয় পরিবর্তিত হইল। এই এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ গত দুই বৎসর শত বাধা-বিপত্তির মধ্যেও কোন না কোন অনুষ্ঠান করিয়াছেন। কিন্তু যে ফেডারেশন বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের আওতায় পরিপুষ্ট, তাঁহারা যে গত কয়েক বৎসর কিছুই করিতেছেন না, তাহা কি কাহারও মনে জাগিতেছে না? অথচ ইহারাই নিখিল ভারত অলিম্পিক অনুষ্ঠান হইলে বাঙলার ভলিবল দল গঠন করিয়া থাকেন, ইহাই আশ্চর্যের বিষয়।

ফুটবল

ফুটবল মরশুম আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতার গড়ের মাঠ শূন্য; কিন্তু কলিকাতার দক্ষিণাঞ্চলে দেশপ্রিয় পার্কে ফুটবল খেলার সোরগোল পড়িয়া গিয়াছে। এই অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছেন দক্ষিণ কলিকাতা স্পোর্টস্ ফেডারেশন। এই ফেডারেশনের পরিচালকগণ অযথা আলাপ-আলোচনা, জল্পনা-কল্পনায় সময় অতিবাহিত না করিয়া কর্মের মধ্যে নিজেদের ব্যস্ত রাখিয়াছেন দেখিয়া প্রকৃতই আমরা আনন্দ লাভ করিলাম। খেলাধূলা বা ব্যায়ামচর্চা রাজনীতি বা সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে, ইহা আমরা বহুবার বলিয়াছি; কিন্তু তাহার কোনই ফল হয় নাই। দক্ষিণ কলিকাতা স্পোর্টস্ ফেডারেশন যদি তাঁহাদের কর্মব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত অব্যাহত রাখিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদের উক্তির কিছুটা সার্থকতা হয়।

দেশী সংবাদ

২৮শে এপ্রিল—নয়াদিল্লীতে গণ-পরিষদের তৃতীয় অধিবেশন আরম্ভ হয়। বারোদা, কোচিন, উদয়পুর, জয়পুর; যোধপুর, বিকানীর, রেওয়া এবং পাতিয়ালা—এই আটটি দেশীয় রাজ্যের ১৬ জন প্রতিনিধি (তঁহাদের মধ্যে ১১ জন নির্বাচিত ও ৫ জন মনোনীত) গণ-পরিষদে যোগদান করেন। স্যার গোপাল স্বামী আয়েংগার পরিষদে যুক্তরাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কমিটির রিপোর্ট পেশ করেন এবং দেশীয় রাজ্য কমিটির রিপোর্ট সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরুর প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ গণ-পরিষদের অধিবেশনে বক্তৃতাদান কালে বলেন যে, সদস্যগণকে ভারত বিভাগের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। তিনি আরও বলেন যে, কেবল ভারত বিভাগ নহে, পরন্তু কয়েকটি প্রদেশ বিভাগের জন্যও প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

নোয়াখালি ও ত্রিপুরার দাঙ্গা-হাঙ্গামা সম্পর্কে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক শ্রীযুত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য লিখিত একটি প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য বাঙলা গভর্নমেণ্ট 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড'-এর ৭ হাজার টাকা জামানত বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন এবং ১৭ হাজার টাকা নূতন জামানত দাবী করিয়াছেন ও উপরোক্ত পত্রিকাদ্বয়ের মুদ্রাকর ও প্রকাশকের নিকট নূতন নাম জারী দাবী করা হইয়াছে।

কলিকাতার হাঙ্গামায় ৪ জন নিহত এবং ২২ জন আহত হয়। এই সংখ্যা সরকারীভাবে সমর্থিত হয় নাই।

স্যার যদুনাথ সরকারের জ্যেষ্ঠ পুত্র ডাঃ অবনীনাথ সরকার গতকল্য কলিকাতার রাজপথে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া হাসপাতালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

২৯শে এপ্রিল—গত রাত্রি হইতে ঢাকা শহরে ইতস্তত হাঙ্গামা শুরু হয় এবং ১ জন নিহত ও ১১ জন আহত হইয়াছে। শহরে সান্ধ্য আইন ও ১৪৪ ধারা জারী করা হইয়াছে।

ধুবড়ীর এক সংবাদে প্রকাশ, গত ২২শে এপ্রিল মানকাচরে মিলিটারীর গুলীতে তিন ব্যক্তি নিহত হইয়াছে এবং আসাম রেজিমেণ্টের এক ব্যক্তি ছুরিকাহত হইয়াছে।

কলিকাতার হাঙ্গামায় ৭ ব্যক্তি নিহত ও ৪০ জন আহত হয়। এই হিসাব সরকারীভাবে সমর্থিত হয় নাই।

খান আবদুল গফুর খান পেশোয়ারে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, বর্তমান দাঙ্গা-হাঙ্গামা জিন্না-চার্চিল ষড়যন্ত্রের ফল—যতদিন ইংরাজরা এদেশে থাকিবে, ততদিনই এ দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলিতে থাকিবে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের এক বিশেষ অধিবেশনে শ্রীযুত সুধীরচন্দ্র রায়চৌধুরী ১৯৪৭-৪৮ সালের জন্য কলিকাতার মেয়র এবং মিঃ গফুর্গোভিয়া ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হইয়াছেন।

৩০শে এপ্রিল—ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক খেতাবদানের প্রথা রহিতের জন্য অদ্য গণ-পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

কলিকাতার হাঙ্গামায় ৭ জন আহত হয়।

ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ এক বিবৃতিতে বলেন যে, ভারতবর্ষকে যদি বিভক্ত করিতেই হয়, তবে তাহা যথাসম্ভব পূর্ণ ও অবিমিশ্রভাবেই করিতে হইবে। ভবিষ্যতে যাহাতে কলহ ও সংঘর্ষের কিছু মাত্র সম্ভাবনা না থাকে, তজ্জন্য বাঙলা ও পাঞ্জাবকে বিভক্ত করিতে হইবে।

১লা মে—মহাত্মা গান্ধী পাটনা হইতে নয়াদিল্লীতে পেঁৗছেন।

নয়াদিল্লীতে গণ-পরিষদের অধিবেশনে ধর্ম ব্যাপারে স্বাধীনতা সংক্রান্ত ধারা বিনা বিতর্কে গৃহীত হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, ধর্ম প্রচার ও ধর্মাচরণের সমানাধিকার সকলেরই থাকিবে এবং সকলেই বিবেকের স্বাধীনতা পাইবে।

কলিকাতার হাঙ্গামায় ৬ জন নিহত এবং অনুমান ২০ জন আহত হয়। এই হিসাব সরকারীভাবে সমর্থিত হয় নাই।

বিগত অক্টোবর হাঙ্গামার সময় নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলায় ৪৪৩৬টি গৃহ লুণ্ঠিত ও ২৫৯১টি গৃহ ভস্মীভূত হয়। ইহা ছাড়া ত্রিপুরা জেলায় ৬৫২০টি কুটীর ভস্মীভূত হয়। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র সচিবের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী মিঃ কে নসরুল্লা উপরোক্ত হিসাব প্রদান করেন।

২রা মে—নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী যোগদান করেন। দেওয়ান চমনলাল, পণ্ডিত গোপীচাঁদ ভার্গব ও পণ্ডিত শ্রীরাম শর্মা—পাঞ্জাবের এই তিনজন কংগ্রেস নেতা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সমক্ষে পাঞ্জাবের বর্তমান পরিস্থিতির বিবরণ দান করেন। কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির অধিবেশনে সীমান্তের অবস্থা, বিশেষভাবে সীমান্তে নূতন নির্বাচন আহ্বানে কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা সম্পর্কে আলোচনা হয়। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সীমান্ত প্রদেশে বর্তমানে নূতন নির্বাচন আহ্বানের বিরোধিতা করিয়া বড়লাটের নিকট এক পত্র দিয়াছেন।

বাঙলার এক প্রতিনিধিমণ্ডলী আজ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নিকট এক স্মারকলিপি পেশ করেন। উহাতে কলিকাতা সহ পশ্চিম বঙ্গকে লইয়া এক স্বতন্ত্র বঙ্গ প্রদেশ গঠনের পক্ষে যুক্তি দেখান হইয়াছে।

মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত কমিটির রিপোর্টের কয়েকটি ধারা শেষ হওয়ায় আজ গণ-পরিষদের অধিবেশন মুলতুবী রাখা হয়।

আজ হাওড়ায় উপর্যুপরি দুইটি ঘটনায় একজন কনেস্টবল নিহত ও একজন আহত হয়। এই দিন কলিকাতায় বিভিন্ন ঘটনায় ১০ জন নিহত হয়।

লর্ড ইসমে বড়লাটের রাজনৈতিক উপদেষ্টা স্যার কনরাড করফিল্ড, বড়লাটের প্রাইভেট

সেক্রেটারী মিঃ জর্জ এবেলকে সংগে লইয়া নয়াদিল্লী হইতে লণ্ডন যাত্রা করিয়াছেন।

পোর্ট শ্রমিক ও কর্মীদের ৮৭ দিন ব্যাপী ধর্মঘট আজ প্রত্যাহৃত হইয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী কে নসরুল্লা বলেন যে, সরকারী হিসাব অনুসারে গত হাঙ্গামাকালে নোয়াখালিতে দুইটি এবং ত্রিপুরায় একটি বলপূর্বক বিবাহ হয়।

৩রা মে—কলিকাতায় হাঙ্গামাজনিত বিভিন্ন ঘটনায় ৫জন নিহত এবং ৩০ জন আহত হয়। এইদিন হাওড়ায় কয়েকটি হাঙ্গামার ঘটনায় ৩ জন নিহত ও ৮ জন আহত হয়।

বঙ্গের শেষ স্বাধীন বাঙ্গালী নরপতি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জয়ন্তী উৎসব পালন উপলক্ষে আজ কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে এক মহতী সভার অধিবেশনে তাঁহার পুণ্য স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন।

বাঙ্গলা কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের এক প্রতিনিধি দল নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সম্মুখে বাঙ্গলার দাবীসমূহ উপস্থাপিত করেন। উহাদের মধ্যে ভারতীয় ইউনিয়নের ইউনিট হিসাবে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল লইয়া বাঙ্গলা দেশে একটি নূতন প্রদেশ গঠন, অবিলম্বে সুরাবর্দী মন্ত্রিসভার বিলোপসাধন প্রভৃতি দাবীগুলি প্রধান।

৪ঠা মে—নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির তিন দিবসব্যাপী অধিবেশনের পরিসমাপ্তি হয়। ওয়ার্কিং কমিটি কোন প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই, তবে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বিশেষভাবে সীমান্ত প্রদেশের পরিস্থিতির পর্যালোচনা করিয়াছেন।

সীমান্তের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আচার্য যুগলকিশোর ও দেওয়ান চমনলাল এক বিবৃতি দিয়াছেন। উহাতে বলা হইয়াছে যে, গভর্নর ও সরকারী অফিসারগণ আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহাদের কর্তব্য সম্পাদনে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছেন। এই অফিসারদের প্রত্যেককে অপসারিত করিতে হইবে। ইঁহারা সীমান্ত প্রদেশে অশান্তির আগুনে জ্বালাইয়াছেন এবং হত্যাকাণ্ডকে ব্যাপক করিয়া তুলিয়াছেন।

বাঙ্গলার প্রতিনিধিগণ নয়াদিল্লীতে মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলেন, "আপনারা যদি সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সংযুক্ত থাকিতে চাহেন তাহা হইলে কেহই আপনাদিগকে বাধা দিতে পারে না।"

আসামের নবনিযুক্ত গভর্নর স্যার আকবর হায়দরী আজ কার্যভার গ্রহণ করেন।

বিদেশী সংবাদ

২৮শে এপ্রিল—ইউরোপ পরিভ্রমণের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেণ্ট মিঃ হেনরী ওয়ালেস ওয়াশিংটনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। উহাতে তিনি বলেন যে, প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান যে বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেছেন, তাহাতে ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ বাধিবার আশংকা রহিয়াছে।

২রা মে—গত কয়েক মাস ব্রহ্মে যে সকল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে, অদ্য কমন্স সভায় সহকারী ব্রহ্ম সচিব স্যার আর্থার হেণ্ডারসন তাহার পর্যালোচনা করেন। ব্রহ্মকে বৃটেন যে সকল শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়াছে, সেই সকল প্রতিশ্রুতি কার্যকরী না হওয়া পর্যন্ত, ব্রহ্মে বর্তমান মধ্যবর্তীকালীন শাসন ব্যবস্থা চালাইয়া যাওয়ার ঘোষণা অব্যাহত রাখার জন্য সভার সম্মতি চাহিয়া একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। প্রস্তাবটি কমন্স সভায় বিনা ডিভিসনে গৃহীত হয়।

৪ঠা মে—সম্প্রতি মস্কোতে মঃ স্ট্যালিনের সহিত আমেরিকার মিঃ স্ট্যাসোনের ৮০ মিনিটকাল আলোচনা হয়। এই সময় স্ট্যালিন বলেন যে, সোভিয়েট রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রথা পৃথক হইলেও সহযোগিতার মনোভাব থাকিলে, তাহারা পরস্পরের মধ্যে মৈত্রী বজায় রাখিয়া বসবাস করিতে পারে। স্ট্যালিন আরও বলেন যে রাশিয়া সহযোগিতা করিতে ইচ্ছুক এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার তাহার অভিপ্রায় নাই।
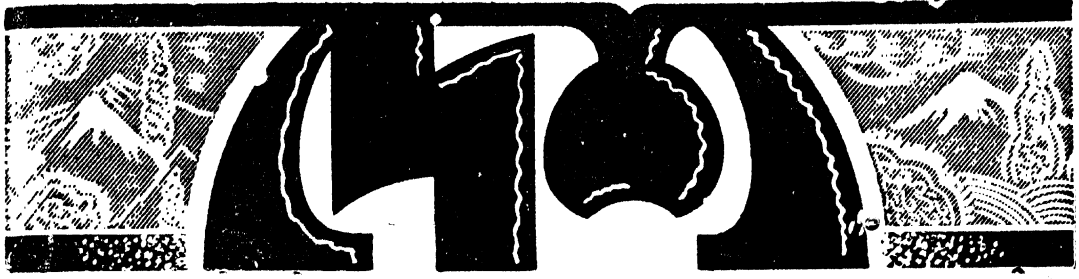
সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন   সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

চতুর্দশ বর্ষ]   শনিবার, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৪ সাল।   Saturday, 17th May, 1947.   [২৮শ সংখ্যা

জাতীয় বঙ্গের দাবী

কলিকাতায় জাতীয় বঙ্গ মহাসম্মেলনের অধিবেশন সমাপ্ত হইয়াছে। মুখ্যত ইহা কলিকাতা ও প্রেসিডেন্সী বিভাগের জাতীয়তাবাদিগণের প্রতিনিধিদের সভা হইলেও সমগ্র জাতীয় বঙ্গের বক্তব্যই এই সভার প্রস্তাবে প্রকাশ হইয়াছে। দশ বৎসর ব্যাপী লীগ শাসনের ফলে জাতীয় বাঙলা বুঝিতে পারিয়াছে যে, পাকিস্থান-প্রয়াসীদের অধীনে বাস করার অর্থ জীবন্মৃত হইয়া বাঁচিয়া থাকা। কিন্তু লীগ শাসনতন্ত্রের খেয়ালে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্থানী বাঙলায় বাস করিলে জীবনটুকুও থাকিবে কিনা সন্দেহ! তাই এই সম্মেলন প্রস্তাব করিয়াছে যে, জাতীয়তাবাদিগণ কর্তৃক অধ্যুষিত বাঙলার যতটা সম্ভব বৃহত্তম অঞ্চলকে ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। আর যতদিন না তাহা কার্যত সম্ভবপর হইতেছে ততদিন বাঙলা দেশের শাসনভার দ্বৈত মন্ত্রিসভার উপরে ন্যস্ত রাখিতে হইবে। দুইটি মন্ত্রিসভাই বাঙলার গভর্নরের অধীন থাকিবে। বর্তমান মন্ত্রিসভা অচিরে ভাঙিগয়া দিতে হইবে। কিন্তু ঘটনাস্রোত যদি সম্মেলনের ভাবনার অনুকূলে না হয় —তবে জাতীয়তাবাদকে সর্বশক্তি সমন্বয়ে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী মন্ত্রিসভা স্থাপন করিবার জন্য উদ্যোগী হইতে হইবে।

ইতিমধ্যে বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দি জাতীয়তার এক নূতন থিওরি ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার দাবী—স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও সার্বভৌম বাঙলা। মিঃ সুরাবর্দী বলিতে চান যে, বাঙলা দেশ হিন্দুস্থান ও পাকিস্থান কাহারো বশ্যতা মানিবে না—স্বাধীন, স্বতন্ত্রভাবে এবং সার্বভৌম শক্তিতে বিরাজ করিতে থাকিবে। মিঃ সুরাবর্দির মুখে একথা নূতন, তিনি স্বয়ং যে লীগের অন্তর্গত সেই লীগ ভারতীয় মুসলমানকে অভারতীয় স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া মনে করে। সেই তিনি যদি বাঙলা দেশের বিশেষ ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানকে এক জাতি বলিয়া ঘোষণা করেন, তবে তাহা জনসাধারণের কাছে একটু আকস্মিক বলিয়াই বোধ হইবে বলিয়া মনে করিলে নিতান্ত ভুল হইবে? মিঃ সুরাবর্দির মনে রাখা উচিত, আজ যে জাতীয় বঙ্গ গঠনের প্রস্তাব উঠিয়াছে ও সংকল্প দেখা দিয়াছে—তজ্জন্য একমাত্র লীগের নীতিই দায়ী। পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা চেষ্টার অনিবার্য পরিণাম জাতীয় বঙ্গ প্রতিষ্ঠার সংকল্প। জাতীয় বঙ্গ মহাসম্মেলনের প্রস্তাবে ইহাই ব্যক্ত হইয়াছে যে, মিঃ সুরাবর্দির 'স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও সার্বভৌম' বাঙলায় বাস করিতে জাতীয়তাবাদী বাঙালী মোটেই সম্মত নয়। তাহারা নিজেদের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ ও উন্নতির পীঠস্থান হিসাবে স্বতন্ত্র বঙ্গ চায়—এবং সেই বঙ্গকে বৃহত্তর ভারতীয় ইউনিয়নের গৌরবময় অংশীদাররূপে অন্তর্ভুক্ত দেখিতে চায়। জাতীয়তাবাদী বাঙালীর সম্মুখে সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক মুক্তির ইহাই একমাত্র পথ। সংসারে শুভ সহজলভ্য নয়—এইশুভলাভ করিবার জন্য বাঙলা দেশকে প্রস্তুত হইতে হইবে।

জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস

সম্প্রতি দিল্লী নগরীতে বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী শ্রমিক কর্মিগণের এক সম্মেলনে নিখিল ভারত জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস নামে একটি নূতন প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য—(১) শ্রমিকগণের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণ অবসানের চেষ্টা; (২) অর্থনৈতিক বৈষম্য ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করিবার প্রয়াস; (৩) শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার অথবা উহাদের সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিবার সংকল্প; (৪) শ্রমিকদের বেকার সমস্যার সমাধান; (৫) শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির উপরে যাহাতে শ্রমিকদের প্রভাব বিস্তারিত হয় তাহার সূচনা এবং (৬) শ্রমিকদের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার যাহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে—তাহার জন্য সর্বপ্রকার প্রযত্ন হইবে এই নবগঠিত প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস থাকিতে আবার নূতন শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন কি? সত্য বটে, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এক সময়ে জাতীয় শক্তির অনুকূলে কাজ করিত। কিন্তু গত কয়েক বৎসরের ইতিহাসে দেখা গিয়াছে যে, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস জাতীয় স্রোতের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধকালে সরকারী প্রশ্রয়-পুষ্ট কমিউনিস্টগণ ইহাকে সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া বসে। তখন অধিকাংশ জাতীয় নেতা ও কর্মিগণ ছিল কারান্তরালে। জাতীয় শক্তির সেই অক্ষমতার সুযোগে এবং কম্যুনিস্টগণের নেতৃত্বে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস তাহার নীতির পরিবর্তন করে। বর্তমানে ইহ

কম্যুনিস্টদের খেয়াল চরিতার্থ করিবার একটা যন্ত্র মাত্র। এখন এবম্বিধ ঘোড়া যন্ত্র দ্বারা দেশের কাজ যথার্থভাবে করা সম্ভব নহে, কারণ, ইহা শ্রমিকগণের উপকার সাধনেও অসমর্থ।

এহেন অবস্থায় পুরাতন ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস দ্বারা স্বাধীন ভারতের কাজ চলা আর সম্ভব নহে বিবেচনা করিয়াই নূতন শ্রমিক প্রতিষ্ঠান গঠনের আয়োজন হইয়াছে।

নিখিল ভারত জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস জাতীয় শক্তির ও জাতীয় প্রয়োজনের অনুকূলে কাজ করিতে থাকিবে। ইহা আদৌ অসম্ভব মনে করিবার কারন নাই। যেহেতু নূতন জাতীয় শক্তি যেপথে চলিয়াছে শ্রমিকগণ সেই পথের প্রধান পথিক। কংগ্রেস 'কৃষক-প্রজা-মজদুর-রাজ' প্রতিষ্ঠা করিতে কৃতসংকল্প। কাজেই কংগ্রেসের ও জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মধ্যে বিরোধ নাই। অর্থাৎ ইহারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নহে, পরস্পরের সহযোগী। এরকম ক্ষেত্রে আমাদের বিশ্বাস, এই দুইয়ের সহযোগিতায় পরস্পর বর্ধিতবল হইয়া মহৎ লক্ষ্যের অভিমুখে নিশ্চিত গতিতে দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকিবে।

বাঙলার সমস্যা সম্বন্ধে গান্ধীজীর উদ্যোগ

কলিকাতায় মহাত্মা গান্ধীর আগমন ও সপ্তাহব্যাপী অবস্থান সমগ্র দেশবাসীর মনে তীব্র ঔৎসুক্যের সঞ্চার করিয়াছে। দিল্লীতে কয়েকটি রাজনৈতিক আলোচনা সমাপ্ত করিয়াই মহাত্মা গান্ধী কলিকাতা আসিবার সংকল্প ঘোষণা করেন। সুতরাং মহাত্মা গান্ধীর কলিকাতা আগমনের ব্যাপার একটি বিশিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক তাৎপর্য লইয়া দেশবাসীর চিন্তায় ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করিয়াছে। কলিকাতায় আসিবার পর গান্ধীজীর সহিত বাঙলার বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের কয়েকটি আলোচনা হইয়াছে। শ্রীশরৎচন্দ্র বসু ও মিঃ সুরাবর্দীর সহিত গান্ধীজীর যে আলোচনা হইয়াছে, রাজনৈতিক তাৎপর্যের দিক দিয়া তাহাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সহিতও গান্ধীজীর আলোচনা হইয়াছে এক্ষণে এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই যে, মহাত্মা গান্ধী বাঙলার রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের পথ আবিষ্কার করিবার জন্য একটা উদ্যোগ করিয়াছেন। জাতীয়তাবাদী বাঙালী নূতন প্রদেশ গঠনের দাবী করিয়াছে, মিঃ সুরাবর্দী বাঙলাকে 'অখণ্ড স্বতন্ত্র সার্বভৌম' রাষ্ট্ররূপে পরিণত করিতে চাহেন এবং সাধারণ জিন্নাপন্থী মুসলিম লীগ বাঙলায় পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার দাবী করিয়াছে। ব্রিটিশ কর্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তর ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা যখন আসন্ন, সেই সময় বাঙলা দেশের জনমতে এই তিনটি পরস্পরবিরোধী দাবী জটিল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী এই সমস্যার সমাধানের উপায় হিসাবে কি প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা প্রামাণ্য সূত্রে এখনও ঘোষিত হয় নাই। প্রার্থনা সভায় বক্তৃতাকালে মহাত্মা গান্ধী যে সকল মন্তব্য করিয়াছেন, তাহার মধ্যে গান্ধীজীর অভিমতের কতগুলি মৌলিক সূত্র পাওয়া যায়। গান্ধীজী মনে করেন, বঙ্গ-বিভাগ অপরিহার্য নহে, বঙ্গ-বিভাগ না করিয়াও সমস্যা সমাধানের পথ আছে। দ্বিতীয়, ভারত বিভাগ অর্থাৎ পাকিস্থানের সম্ভাবনাকেও গান্ধীজী সুদূর-পরাহত সম্ভাবনা বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। তিনি ইহাও ঘোষণা করিয়াছেন যে, বাঙলার হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই সম্মিলিত সমর্থন না থাকিলে জোর করিয়া কোন ব্যবস্থা চাপাইয়া দেওয়া হইবে না। তিনি আরও বলিয়াছেন—'বাঙলা দেশ বোম্বাই অথবা পাঞ্জাব নহে।' এই মন্তব্যের যুক্তিসঙ্গত তাৎপর্য ইহাই দাঁড়ায় যে, বাঙলার সমস্যা বোম্বাই ও পাঞ্জাবের সমস্যা হইতে অনেক বিষয়ে পৃথক এবং বিশিষ্ট। সুতরাং বোম্বাই ও পাঞ্জাব সমস্যার সমাধান এবং বাঙলার সমস্যার সমাধান একই পদ্ধতিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। বাঙলার জন্য বস্তুত 'বিশেষ সমাধানের' নীতি গান্ধীজীর উক্তির দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। শ্রীশরৎচন্দ্র বসুও বঙ্গ-বিভাগের বিরোধী। তিনি বাঙলাকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে গঠন করিবার জন্য মুসলিম লীগের নিকট কতকগুলি প্রস্তাব করিয়াছেন। মিঃ সুরাবর্দীর প্রস্তাবের মর্মার্থ হইল—অখণ্ড বাঙলা হিন্দুস্থানের অংশ হইবে না, পাকিস্থানের অংশও হইবে না—স্বতন্ত্র এবং সার্বভৌম হইবে। মহাত্মা গান্ধী আলোচনা সমাপ্ত করিয়া বুধবার পাটনা রওনা হইয়া গিয়াছেন। সমগ্র আলোচনার ফলাফল কি হইয়াছে, তাহা এখনো প্রকাশিত হয় নাই।

বড়লাট কর্তৃক আহূত বৈঠক

বড়লাট প্রাসাদ হইতে এই মর্মে এক বিজ্ঞপ্তি ঘোষিত হয় যে, পণ্ডিত নেহরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, সর্দার বলদেব সিং, মিঃ জিন্না ও মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁকে বড়লাট ১৭ই মে তারিখে এক বৈঠকে আহ্বান করিয়াছেন। এই বিজ্ঞপ্তি ঘোষিত হইবার পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই অন্য একটি বিজ্ঞপ্তি ঘোষিত হয়—১৭ই মে তারিখে বৈঠক হইবে না, ২রা জুন তারিখে হইবে। ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট শেষ পর্যন্ত কোন্ কার্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, এই বৈঠকে নেতৃবৃন্দের নিকট বড়লাট তাহাই বিবৃত করিবেন। কিন্তু বৈঠকের তারিখ একবার ঘোষিত হইয়া হঠাৎ আবার পরিবর্তিত হইল কেন? ইহার ফলে স্বাভাবিকভাবেই জনসাধারণের মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে যে, কোথাও একটা গলদ ঘটিয়াছে। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট যে পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন, সম্ভবত তাহাতে এমন কোন ত্রুটি ছিল, যাহা বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন সমর্থন করিতে পারেন নাই। কিন্তু ইহা সন্দেহ মাত্র; এ বিষয়ে সুনিশ্চিত ধারণা করিবার মত কোন প্রামাণ্য তথ্য নাই। তবে একটি বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়, বৃটিশ গভর্নমেণ্ট এবং বড়লাট, উভয়েই ভারতীয় সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে যে আচরণ দেখাইতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের অস্থিরমতিত্বের কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। সমস্যার স্বরূপ বুঝিয়াও সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে তাঁহারা মাত্রহীন দ্বিধা ও বিলম্বের দ্বারা সমগ্র সমস্যাটাকেই বিড়ম্বিত করিতেছেন। বর্তমান মধ্যবর্তী ভারত গভর্নমেণ্টের ক্ষমতা ও কার্যকারিত্বকে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ যেভাবে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা বৃটিশের রাজনৈতিক সৎসাহস প্রমাণিত করে না। সর্দার প্যাটেল বলিয়াছেন, মধ্যবর্তী গভর্নমেণ্টের হাতে ডোমিনিয়ন ক্ষমতা অর্পিত হওয়া মাত্র সাত দিনের মধ্যে দেশের অশান্তি ও বর্তমান হিংসামূলক উপদ্রব উচ্ছেদ করা সম্ভব হইত এবং ভারতের রাজনৈতিক দলগুলি নিজের উদ্যোগে সমস্যা সমাধানের পথ গ্রহণ করিত। কিন্তু বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা ঘোষণা করিয়াও ভারতের অভ্যন্তরীণ মীমাংসার ক্ষেত্রে তৃতীয়পক্ষরূপে বর্তমান থাকিবার লোভটুকু ছাড়িতে পারিতেছেন না এবং সেই হেতু মধ্যবর্তী গভর্নমেণ্টের হাতে পূর্ণ শাসন-ক্ষমতা ও দায়িত্বও ন্যস্ত করিতেছেন না। সোজা পথের অবকাশ থাকিতেও বৃটিশ গভর্নমেণ্ট বাঁকা পথের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন। কংগ্রেস এতকাল ভারত বিভাগের দাবী সমর্থন করিতে পারেন নাই এবং বৃটিশ গভর্নমেণ্ট মিঃ জিন্নার পাকিস্থানী দাবীকে অজুহাত করিয়া কংগ্রেসকে বিব্রত করিয়াছেন। মিঃ জিন্নার ভারত-বিভাগ দাবীটাও যে একটা গণতান্ত্রিক দাবী এবং অধিকাংশ মুসলমানের দাবী, এ যুক্তিকে সহায় করিয়া বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ক্রমাগত কংগ্রেসকে 'নরম' করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে কংগ্রেস বস্তুত 'সঙ্গত পাকিস্থানের' দাবী মানিয়া লইয়াছে। লীগ-পন্থী মুসলমান সম্প্রদায় যে অঞ্চলে সংখ্যা-গরিষ্ঠ, সেখানে পাকিস্থান হইয়া যাউক, এমন কি, ভারতীয় বাহিনীও বিভক্ত হইয়া যাউক, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এ বিষয়ে স্পষ্ট অভিমত দিয়া দিয়াছেন। কিন্তু কতগুলি লক্ষণ দেখিয়া মনে হয়, এক্ষণে বৃটিশ গভর্ন-

...ষ্টের চিন্তাতেই ভারত বিভাগের দাবীটা ...ড়ের মত লাগিয়াছে। বিভক্ত ভারত যে বৃটিশ ...র্থের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে না, এই ...তব্য বৃটিশ রাষ্ট্রনায়কদিগের উক্তির মধ্যে ...িত হইতেছে। এমন কথাও শুনা যাইতেছে ... বৃটিশ গভর্নমেণ্ট আর একবার ১৬ই মে ...িখের পরিকল্পনা গ্রহণ করিবার জন্য ...রতীয় নেতাদিগকে অনুরোধ করিবেন। ...রতের অখণ্ডতা রক্ষা করিবার জন্য একটা ...ন গরজ যেন প্রচ্ছন্নভাবে বৃটিশ-নীতির ...ুলে কাজ করিতেছে। সুতরাং ক্ষমতা ...স্তান্তরের নূতন পরিকল্পনা প্রকাশ করিতে ...ম্ব এবং বৈঠকের তারিখ পিছাইয়া দেওয়া, ...র পিছনে কি বৃটিশ-নীতির কোন ...ৌলিক এবং মৌলিক পরিবর্তনের ব্যাপার ...য়াছে ?

...ঠান সাধারণতন্ত্র"

সীমান্ত প্রদেশে মুসলিম লীগের ...ভিযান সমূহভাবে ব্যর্থ হইয়াছে। লীগের ...ান্দোলনের ফলে সীমান্তের কংগ্রেস মন্ত্রি-...ডলী গদিচ্যুত হন নাই। কু-প্রচারের দ্বারা ... উৎকোচপুষ্ট একদল লোকের দ্বারা ...ল্প সম্প্রদায়ের কয়েকশত নিরীহ মানুষের ...ানি এবং সম্পত্তি লুণ্ঠন ছাড়া মুসলিম ...ের আন্দোলন আর কোন গৌরবজনক ...র্ম গ্রহণ করিতে পারে নাই। মুসলিম ... ধর্মোন্মাদের প্ররোচনা সৃষ্টি করিয়া ...ান সমাজকে পাকিস্থানী আন্দোলনে ...র ভরসা করিয়াছিল। কিন্তু বাস্তব-...ে দেখা যাইতেছে যে, জিন্নাকথিত 'মুসলিম ...' গঠনের প্রস্তাব পাঠান সমাজের মনে ... আবেদন সৃষ্টি করিতে পারে নাই। তাহার ...র্তে 'পাঠান সাধারণতন্ত্র' গঠনের আদর্শই ...ান সমাজকে উদ্বোধিত করিয়াছে। এই ...র্শ তীব্রগতিতে সমগ্র পাঠান অঞ্চলে ...ইয়া পড়িতেছে। লীগপ্রচারিত ধর্মীয় ...িমিকে আধুনিক পাঠান আদর্শ হিসাবে ...ই গ্রহণ করিবে না। পাঠান সংস্কৃতিকেই ...দের জাতীয়তার ভিত্তি বলিয়া তাহারা মনে ...েছে এবং বিশিষ্ট পাঠান জননায়কগণ ... 'পুশতুভাষী জাতির ঐক্য' এবং 'পাঠান ...রণতন্ত্রের' দাবী উত্থাপন করিয়াছেন। ...দিকে 'পাঠান জাতীয়তার' আবেদন এবং ...রদিকে পাকিস্থানী 'মুসলিম জাতীয়তার' ...দন—এই দুই আদর্শের দ্বন্দ্বে ধর্মীয় ...ীয়তার সংকীর্ণ মতবাদ পরাভূত হইবে, ... সুনিশ্চিত। সীমান্ত প্রদেশকে পাকিস্থান-... করিবার আহ্লাদ হইতে মিঃ জিন্না যে ...ত হইবেন, তাহার লক্ষণ সুস্পষ্ট।

সোদপুর আশ্রমে মহাত্মা গান্ধী ও শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু

শ্রীযোগেন্দ্র মণ্ডলের প্রচারকার্য

মধ্যবর্তী গভর্নমেণ্টের আইন সচিব শ্রীযুত যোগেন্দ্র মণ্ডলকে সহানুভূতি জানাইতেছি, তবে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তির তারিফ করিতে পারিতেছি না। "লীগের প্রতি প্রথম কর্তব্য" কবুল করিয়া মণ্ডল মহাশয় কি ফ্যাসাদেই না পড়িয়াছেন! দুই দিকের ঠেলায় বোধ হয় তাঁহার প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। লীগের হুকুম, কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের আইন বিভাগের ফাইলের যে ক্ষতি হয় হোক, সেদিকে দৃষ্টি না দিয়া বাঙলার পল্লীতে তপশীলীদের মধ্যে লীগের ধামা বহিয়া তাঁহাকে এখন ফিরিতে হইবে। হুকুম তামিল করিয়া মণ্ডল মহাশয় বাঙলায় আসিয়াছেন সত্য; কিন্তু তপশীলীরা কেহই তাঁহাকে পাত্তা দিতে চাহিতেছে না। তাঁহার বক্তৃতা শোনা দূরে থাকুক, হরতাল করিয়া মণ্ডল মহাশয়ের ছায়া মাড়ান পর্যন্ত বন্ধ করিয়াছে। ২৪ পরগণা জেলার জীবন মণ্ডলের হাটে সভা করিতে গিয়া তিনি যে কটু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহার বিবরণ জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। (কলিকাতা সংস্করণ, আনন্দবাজার, মঙ্গলবার, ৮ম পৃষ্ঠা) জলপাইগুড়ী প্রমুখ আরো কয়েকটি স্থানেও মণ্ডল মহাশয় বিরূপ অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছেন। তবু নির্বিকারচিত্তে তিনি লীগের ধামা ধরিয়াই আছেন, এমন না হইলে কি আর মজন্তালী সরকার "গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল" হইতে পারিতেন ?

নিজামাবাদী ছোরা

কলিকাতার পর ঢাকায় নিজামাবাদী ছোরা-ভর্তি পার্শেল ধরা পড়িয়াছে। ১১ই মে তারিখে মোট ২২ টি পার্শেল খুলিয়া ঢাকার পুলিশ ১৭৭০ খানি ছোরা, ছুরি হস্তগত করিয়াছে। ইহা ছাড়া, ৯ই তারিখে ধৃত আরো তিনটি ছোরার বাক্স আছে। এই সঙ্গে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জগৎ-বাজারের তল্লাসীতে ধৃত রিভলবার, ছোরা, তলোয়ার লৌহ বর্ম ও শিরস্ত্রাণ ইত্যাদির কথাও অবশ্য বিবেচ্য। বিশেষভাবে জানা প্রয়োজন যে, পাঞ্জাবের নিজামাবাদে কি কোন অস্ত্র নির্মাণশালা স্থাপিত হইয়াছে এবং ক্রমাগত সেই অস্ত্রাগার হইতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অস্ত্রশস্ত্র প্রেরিত হইতেছে? আরোও জিজ্ঞাস্য,—পাকিস্থানী উদ্দেশের সমর্থক কোনও ব্যাঙ্ক কি এই সকল বে-আইনী অস্ত্র আমদানীর এজেন্সী লইয়াছে? কেন্দ্রীয় পরিষদে অনুরূপ প্রশ্ন করিয়া যে জবাব মিলিয়াছে, তাহাতে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয় নাই। পাঞ্জাব গভর্নমেণ্ট তদন্ত করিয়া কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টকে জানাইয়াছেন যে, ব্যবসায়ের সাধারণ খাতেই নাকি এরূপ অস্ত্র নির্মাণ ও রপ্তানি চলিতেছে। প্রেরক প্রদেশের এই কৈফিয়তের পর প্রাপক প্রদেশের গভর্নমেণ্টের বক্তব্য শুনিবার প্রয়োজন। কিন্তু সেই বক্তব্য বিশেষ করিয়া বাঙলা গভর্নমেণ্টের বক্তব্য কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের নিকট পৌঁছায় নাই। বর্তমান লীগ মন্ত্রিসভা বলবৎ থাকিতে আদৌ পৌঁছাইবে কিনা, তাহাই জিজ্ঞাস্য।

শ্রীনন্দলাল বসু কর্তৃক অঙ্কিত স্কেচ

[শ্রীগোলকবিহারী দাসের সৌজন্যে]

সম্প্রতি মহাত্মা গান্ধী এবং কায়েদে আজম জিন্নার মধ্যে সাক্ষাৎ হইয়া গিয়াছে। সংবাদদাতা বলিয়াছেন,—আলাপ-আলোচনা প্রায় তিন ঘণ্টাকাল স্থায়ী হয়। আমাদের সংবাদ ভাষ্যকার অর্থাৎ বিশুখুড়ো বলেন,—"এই তিন ঘণ্টার মধ্যে এক ঘণ্টা ছাগদুগ্ধের উপকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা হয়, এক ঘণ্টা দিল্লীর লাড্ডুর অলীকতা নিয়া কথাবার্তা হয়, বাকী সময় মালীরের বাড়ী, মোজাফফরপুরের লিচু, কলিকাতার গরম ইত্যাদি আলোচনার পর হাতে থাকে মাত্র পাঁচ মিনিট, তার মধ্যে চার মিনিট সম্মিলিত শান্তি-আবেদনের প্রসঙ্গ নিয়া কাটিয়া যায় এবং সর্বশেষের এক মিনিটে যে আলোচনা হয় তাহাতে পাকিস্তান ছাড়া যে কোন সমস্যারই সমাধান হইতে পারে না সেই কথাই পরিষ্কার বলা হইয়াছে।"—বিভ্রান্ত ট্রামযাত্রীদের মুখের দিকে তাকাইয়া খুড়ো কথাটা শেষ করিলেন—"বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন।"

* * * *

সহযোগী "মহম্মদী" পাকিস্তানী পাঁজি প্রবর্তনের সুপারিশ করিয়াছেন। "যাঁহারা পাকিস্তানী নিরম্বু একাদশী পালন করিতে চান তাঁহারা নিশ্চয়ই এই পাঁজিতে উপকৃত হইবেন"—এক টিপ্ নস্যি নাকে লইয়া খুড়ো বলিলেন।

* * * *

মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন,—"আমি মুসলিম "পকেট" হিন্দু "পকেট"—

কোনরকম "পকেট"ই চাই না"—"পকেটমারগণ গান্ধীজীর এই উক্তিতে কাজে কাজেই ক্ষুণ্ণ হইবেন"—বলেন বিশুখুড়ো।

* * *

লর্ড ইস্মে বড়লাটের বার্তা বহন করিয়া বিলাত গিয়াছেন। বার্তাটি

কি তা না জানা পর্যন্ত আমরা বলিতে পারি—ইস্মে কেয়া হ্যায়।

* * * * *

দেশবাসীর প্রতি মিঃ গান্ধী ও মিঃ জিন্নার (ইউরোপীয়ান স্টাইলে মহাত্মা এবং কায়েদে আজম বর্জনীয়) যুক্ত আবেদন প্রধান মন্ত্রীর প্রচার বিভাগ হইতে "ইস্যুকৃত" (shape of things to come!) হইয়াছে। যাহা হউক, আবেদন "রেস্পণ্ডিত" হইলে (ইংরেজী Respond দেখুন) আমরা খুশী হইব।

* * * *

মহামান্য বড়লাট বাহাদুর সীমান্ত পরিভ্রমণে গিয়া আফ্রিদিদিগকে বলিয়াছেন যে, তাঁদের সঙ্গে তাঁর জীবনের যোগাযোগ আছে, কেননা, তিনি একদিন "S. S. Afridi" নামক জাহাজে কাজ করিয়াছেন। "আশা করি, আফ্রিদিদের তিনি জলে ভাসাইবেন একথা নিশ্চয়ই শ্রোতারা মনে করেন নাই"—বলিলেন বিশুখুড়ো।

* * * *

গণপরিষদ Fundamental right সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া "Involuntary Servitude except as a punishment for crime" সম্বন্ধেও বিবেচনা করিয়াছেন কিন্তু কোনরকম সিদ্ধান্তে পৌঁছাইতে পারেন নাই। আমরা "আলস্য অসুখ রোদ বৃষ্টি নাই, কাঁধেতে জোয়াল না আছে কামাই" বলিয়া যে গৃহিণীদের তাঁবেদারি করিতেছি তাহা Involuntary Servitude-এর পর্যায়ে পড়িবে কিনা সেই সম্বন্ধে পরিষদের নির্দেশ চাই",—প্রয়োজন খুড়োর।

* * * *

অনেক আমেরিকাবাসী ভারতে আসিয়া হাতীর বাজার দেখিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, আগের তুলনায় হাতীর দাম অসম্ভব বাড়িয়া গিয়াছে। এই ব্যাপারে আমরা কোন মতামত প্রকাশ করিতে পারিলাম না, কেননা, আমরা হাতী কোন দিন কিনি নাই, শুধু হাতী পুষিয়াছি!

* * * * * *

Holland to take a census of her ghosts—একটি খবর। আমাদের দেশের আদমসুমারীতে আমরা ভৌতিক কাণ্ড লক্ষ্য করিয়াছি বটে কিন্তু সত্যিকারের ভূত-সুমারী এখনো এখানে হয় নাই। খুড়ো বলিলেন,—"হইলে ভালই হয়, ভূত এবং মানুষের মধ্যে কাহার সংখ্যা বেশী সেই কথাটা খোলসা হওয়ার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।"

* * *

একটি গণনায় জানা গিয়াছে, শতকরা পঁচিশজন জাপানী-গৃহিণী স্বামীদের কর্তৃত্ব স্বেচ্ছায় মানিয়া লইতে প্রস্তুত।

"আমাদের দেশে অনুরূপ গণনা হইলে দেখা যাইবে, শতকরা একশতজন স্বামী গৃহিণীদের কর্তৃত্ব অনিচ্ছায় মানিয়া লইতে বাধ্য।"—বিশু-গৃহিণী ভাগ্যি "ট্রামে-বাসে" পড়েন না!
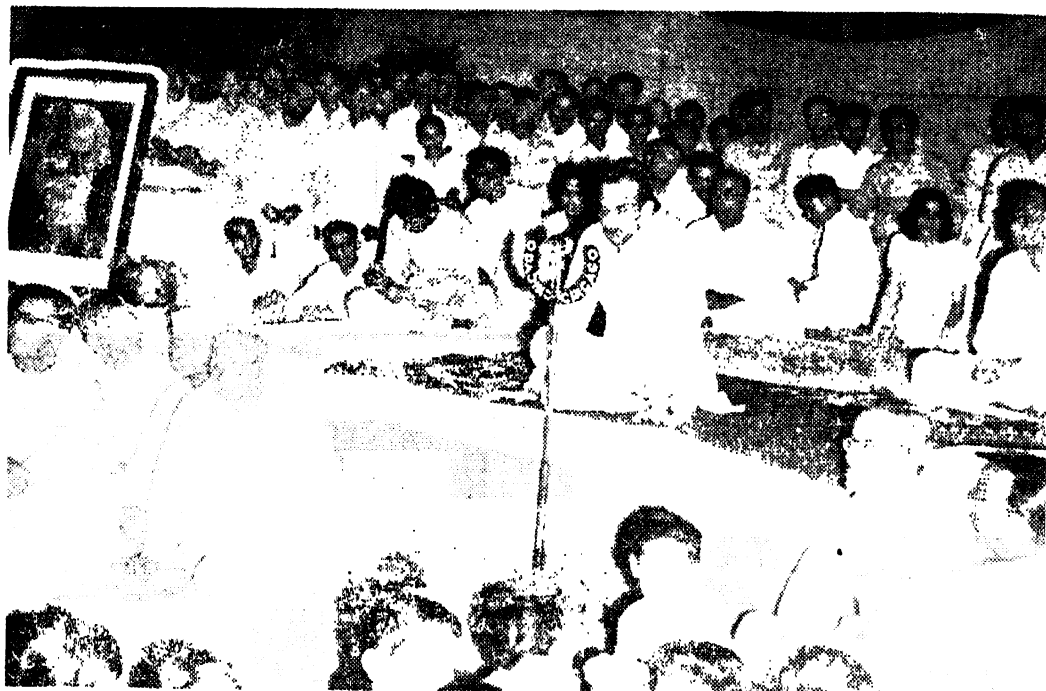
নয়াদিল্লীতে রবীন্দ্র জন্মোৎসবঃ রাষ্ট্রপতি আচার্য কৃপালনী কালীবাড়ীতে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে বক্তৃতা করিতেছেন

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ৮৭তম জন্মতিথি উদ্‌যাপন উপলক্ষে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট হলে বিরাট জনসভা। সভাপতি শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিতেছেন

প্রথম অধ্যায়

শো ঘরাত্রে মায়ের কোলের মধ্যে শুইয়া অসিত প্রশ্ন করিল—তারপর কি হ'ল মা? আত্রেয়ী ভাল করিয়া লেপখানি ছেলের গায়ে জড়াইয়া দিয়া তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন—কিসের রে অসি?

—সেই যে মা, কাল বলেছিলে সিপাই আর ইংরেজদের যুদ্ধের কথা? তোমার ছোট কাকুর কথা।

আত্রেয়ী হাসিয়া বলিলেন—তুই দেখছি ভুলিস নি অসি?

—ভুলবো কি মা, আমি যে কাল সারাটা দিন তোমার ছোটকাকুর কথাই ভেবেছি। আঃ, আমি যদি তখন এত বড়টি হতাম মা—আমি ঠিক বলছি তোমার ছোটকাকুর সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক ঘাড়ে করে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতাম।

আত্রেয়ীর বুক মুহূর্তের জন্য কাঁপিয়া উঠিল। তাহাকে আবার বুকের ভিতরে চাপিয়া ধরিয়া প্রশ্ন করিলেন—তুই কেন যেতে যাবি সব সবতো শুনিস্নি—সে যে কি কষ্ট!

অসিত বলিল—এত কষ্টই যদি, তবে তোমার ছোটকাকু কেন গিয়েছিল? থাক তোমার বাজে কথা—এখন গল্প বলো মা।

আত্রেয়ী আরম্ভ করিলেন—সিপাইরা তখন ক্রমে ক্রমে পালাতে লাগ্‌লো। কতক দলে দলে বনে জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিতে লাগ্‌লো। উদ্দেশ্য ছিল এমনি করে পালিয়ে নিজেরা আবার দলবদ্ধ হ'য়ে ইংরেজদের আক্রমণ করবে। তোমার ছোটকাকুও এই দলে ছিলেন। মীরাট থেকে মাইল পঞ্চাশেক দূরে এক জঙ্গলে গিয়ে নিলেন তাঁরা আশ্রয়। এদিকে কাকুর নাম ইংরেজদের কাছে প্রকাশ হ'য়ে পড়লো।—বাবা ছিলেন ইংরেজের ফৌজের একজন ক্লার্ক, মীরাট ছিল তাঁর বাসা—ইংরেজরা তাঁকে সন্দেহ করে মীরাটের এক বাড়ীতে আমাদের সকলকে বন্দী করে রাখ্‌লো। আমি তখন মায়ের কোলে—বয়স মোটে এক বছর। তারপর পাহারাওয়ালাদের ঘুষ দিয়ে আমরা পালিয়ে এলাম কলকাতায়।

ছোটকাকু বনে জঙ্গলে কতদিন বেড়োলেন ঘুরে—কত দুঃখ পেলেন, কত কষ্ট পেলেন, কিছু কিছু তার লোকের মুখে জানা গিয়েছিল। হয়তো আসল দুঃখের কথাই কেউ জানতে পারেনি—দিনের পর দিন—না খেয়ে, না ঘুমিয়ে অবশেষে ইংরেজ সৈন্যের বন্দুকের গুলিতে গেলেন তিনি মারা। কোথায় মারা গেলেন—তাও কেউ জানে না—তারপর কি হ'লো তারও কোন সাক্ষী নেই—হয়তো দেহ তাঁর বনে জঙ্গলে পড়েছিল—শিয়াল, শকুনে টেনে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলেছিল—কেউ তার খবর নেয়নি। বড়কাকু, মেজকাকু কিন্তু তাঁর নাম মুখেও আনতেন না। তাঁরা দুজনেই ছিলেন মোটা মাইনের সরকারী চাকুরে—বাবা তাই সকলের আড়ালে কাঁদতেন। আমরা বড় হয়েও তাঁকে অমনি করে কতবার কাঁদতে দেখেছি। বলিতে বলিতে আত্রেয়ীর দুই চোখ দিয়া ফোঁটাকয়েক অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। অসিত এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিল। হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিল—তোমার ছোটকাকু যে সত্যি সত্যি মারা গেছেন তাই বা তোমায় কে বল্লে মা? সেই যে সেদিন তুমি পক্ষীরাজ ঘোড়ার গল্প করেছিলে—যেখানে ইচ্ছে সে উড়ে যেতে পারতো, হয়তো তেম্‌নি করে তোমার ছোটকাকু তাঁর সেই আরবী ঘোড়ায় চড়ে সারা দেশের বনে জঙ্গলে, পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন—মাথায় তাঁর আজও তেমন বাব্‌রি চুল, পাঁচ হাত লম্বা শরীর, আর সোনার মতন গায়ের রং, পিঠে আছে বন্দুক ঝোলান, কোমরে বাঁকা তালোয়ার, বনে জঙ্গলে যে সব সেপাই আজও লুকিয়ে আছে তাদের ডেকে ডেকে এক সঙ্গে করছেন—বলছেন, "ভয় নেই।" আমি যদি সত্যিই তখন বড় হতাম মা—ছোট্ট একটা ঘোড়ায় চড়ে তোমার ছোটকাকুর পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াতাম—কত বন, কত পাহাড়, কত পাহাড়ী ঝরণা—সেই ঝরণার পাশে তিনি আর আমি গাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম করতাম—কত সোনার রংএর হরিণ আসতো জল খেতে—আমি বন্দুক উঁচু করে গুড়ুম করে গুলি করতাম আর হরিণগুলো তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে মাটির উপরে লুটিয়ে পড়তো।

আত্রেয়ী বলিলেন—ইস্, তুই কি নিষ্ঠুর, অসি? গুলি করে এমন সুন্দর হরিণগুলোকে মেরে ফেলতিস্?

অসিত অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—তাইতো মা! হ্যাঁ, তবে আমি আর তোমার ছোটকাকু গাছের ছায়ায় শুয়ে শুয়ে, হরিণগুলোর দিকে তাকিয়ে থাক্‌তাম—তারা দলে দলে নেচে নেচে ছুটে বেড়াত—আমাদের দেখে একটুও ভয় করতো না। কেমন তাই না, মা?

মা হাসিয়া বলিলেন—হাঁরে তাই, এখন চুপ করে শুয়ে থাক্—ফর্সা হ'য়ে গেছে—আমি এবার উঠি। বলিয়া আত্রেয়ী শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন—অসিত তেমনি করিয়া লেপের তলায় গুটি শুটি মারিয়া চোখ বুজিয়া কত কি ভাবিতে লাগিল।

বেলা তখন প্রহরখানেক উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আত্রেয়ী তাড়াতাড়ি রান্না চড়াইয়া দিয়াছেন—অসিত খাইয়া ইস্কুলে যাইবে। হঠাৎ বাহিরের দিকে কাহার চীৎকার শুনিতে পাওয়া গেল। আত্রেয়ী বাহিরে আসিয়া দেখেন, বড় বাড়ির বিরজাদিদি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র হরির হাত ধরিয়া তাহাদের বাহিরের উঠানে আসিয়া চেঁচাইতেছেন। কারণ বুঝিতে না পারিয়া আত্রেয়ী আগাইয়া যাইতেই বিরজাদিদি একবারে মারমুখী হইয়া উঠিলেন—বলি, তোদের ব্যাপারখানা কি বলতো শুনি বউ?

আত্রেয়ী প্রশ্ন করিলেন—কি হয়েছে দিদি?

বিরজাদিদি তেমনি চোখ্ পাকাইয়া হরিনাথকে সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন—দেখ্ না তোর গুণধর ছেলের কীর্তি—ছেলেটার সারা গা একেবারে নখ দিয়ে কেটে একাকার করে দিয়েছে না!

আত্রেয়ী তাকাইয়া দেখিলেন—সত্যই হরিনাথের বুকে ও মুখে কয়েক স্থানে কাটিয়া গিয়াছে। একটু দূরে আম বাগানের ধারে অসিত দাঁড়াইয়াছিল—সেদিকে তাকাইয়া বলিলেন—আয় আগে আজ বাড়ি—তারপরে দেখে নেব—তোর বড় বাড় হয়েছে না?

বিরজাদিদি পুনরায় এক ঝট্‌কা মারিয়া বলিয়া উঠিলেন—ছেলেপেলে আর কুকুর নাই দিলে মাথায় ওঠে—তোদের আস্কারা না পেলে কি অমনি হয় না? আমাদের অমনি ছেলে হলে করে কেটে কুচি কুচি করে গাঙের জলে ভাসিয়ে দিতাম—বলিয়া বিরজাদিদি পুনরায় হরিনাথের হাত ধরিয়া নিজেদের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হইলেন। শিবনাথ বোধ হয় রোগী দেখিয়া বাড়ি ফিরিতেছিলেন। হঠাৎ বাড়ির বাহিরে বিরজাদিকে, স্ত্রী আত্রেয়ীকে এবং পুত্র অসিতকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া—একটা কিছু যে ঘটিয়াছে, তাহা অনুমান করিয়া লইলেন। বিরজাদিদিকে প্রশ্ন করিতেই, তিনি আর এক দফা দাঁত, মুখ খিঁচাইয়া ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ দিয়া এবং নিজের পুত্র

হইলে অসিতকে কি কি শাস্তি দিতেন—তাহার তালিকা দিয়া দেহের কয়েকটি বিশেষ ভঙ্গি প্রকট করিয়া প্রস্থান করিলেন. শিবনাথ অসিতের নিকটে আগাইয়া গিয়া প্রশ্ন করিলেন—হরিকে মেরেছিস কেন রে? অসিত রাগে গজ্ গজ্ করিতেছিল। কোনক্রমে জবাব দিল—ও আমাকে আগে মারলে কেন?

শিবনাথ একহাত দিয়া তাহার কান ধরিয়া গালের উপর ঠাস করিয়া একটা চড় বসাইয়া দিলেন, তারপর তাহাকে হাত ধরিয়া বাড়ীর ভিতরে টানিয়া আনিয়া বলিলেন—আজ সারাদিন বাড়ী থেকে বেরুতে পারবি নে—সারাদিন ঘরে বন্ধ হয়ে থাকবি।

সেই হইতে এতক্ষণ অসিত ঘরের খুঁটীতে ঠেস দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, শিবনাথ তেল মাখিয়া নদীতে স্নান করিতে গিয়াছেন। আত্রেয়ী রান্না করিতেছিলেন, এখন বাহির হইয়া আসিয়া অসিতকে কোলের ভিতরে টানিয়া লইয়া বলিলেন—ছিঃ কাউকে কি মারতে আছে, বাবা! কেন শুধু শুধু হরিকে মারলি বলতো? অসিত স্নেহের স্পর্শ পাইয়া এবার একেবারে ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল—হাঁ, অমনি মেরেছি কিনা? এই দেখ না—আমার হাত ও আগে কেমন করে কামড়ে দিয়েছে? আত্রেয়ী অসিতের হাতখানা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিলেন—সত্যই তো তিন চারটি দাঁত যে একেবারে কাটিয়া বসিয়া গিয়াছে। অসিতকে ঘরের ভিতরে লইয়া গিয়া খানিকটা ভিজা ন্যাকড়া দিয়া ক্ষতস্থানে বাঁধিয়া দিয়া বলিলেন—কি হয়েছিল রে অসি?

অসিত চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া বলিল—আমরা সেপাই যুদ্ধ খেলছিলাম মা।

আত্রেয়ী সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন—সে কি রে—সে আবার কি খেলা?

কেন, সেপাই আর ইংরেজের যুদ্ধ। হরিরা ইংরেজ আর আমরা সেপাই। ওদের দলের সেনাপতি হলো হরি; আর আমি কি হয়েছিলাম জান মা? আমি হয়েছিলাম তোমার ছোট কাকু—শঙ্কর পারবে কেন আমার সঙ্গে—হরিকে চীৎ করে ফেলে বুকে হাঁটু দিয়ে বসেছিলাম। ও তখন ঠকে গিয়ে আমার হাতখানা এমনি করে কামড়ে দিলে—আমিও তাই আঁচড়ে দিয়েছি।

আত্রেয়ী অবাক হইয়া পুত্রের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া বলিলেন—ওসব নিয়ে খেলা করতে তোকে কে বলে দিলে, অসি? অসিত মায়ের মুখের প্রশ্ন কাড়িয়া লইয়া বলিল—খেলা করতে কেউ বলে দেয় নি, তবে একটা কথা শুনবে মা—তুমি তো ভোর বেলায় আমাকে বিছানায় রেখে চলে গেলে, আমি শুয়ে শুয়ে তোমার ছোট কাকুর কথাই কেবল ভাবছিলাম—ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে গেছি—ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলাম—তোমার সেই ছোট কাকু এসে আমায় ডাকছেন, অসিত! আমি উঠে দেখলাম মা, তিনি সত্যিই তোমার ছোট কাকু—মাথায় সেই লম্বা লম্বা চুল লম্বা চেহারা—সোনার মত রঙ—কোমরে তাঁর বাঁকা তলোয়ার, পিঠে বন্দুক। আমাকে বললেন—সেপাই হবি অসিত? আমি ঘাড় নেড়ে জানালাম—হবো। তারপর তাঁর কোমরের তলোয়ার কাঁধের বন্দুক খুলে আমার কোমরে আর কাঁধে ঝুলিয়ে দিলেন। আমি বললাম—আমার ঘোড়া কই দাদু?

তিনি হেসে বললেন—ঘোড়া তো আজ আনি নি ভাই, বড় হ'লে পাবি।

আমি বললাম—তুমি কোথায় থাক দাদু?

তিনি বল্লেন—অনেক দূরে হিমালয়ের চূড়ায়।

আমি বল্লাম—আমাকে তুমি নিয়ে চল দাদু, তোমার সাথে।

তিনি বল্লেন—আজ নয় ভাই, আগে বড় হ, তারপর আমার খোঁজ করিস, ডাকলেই এসে দেখা দেব। তারপর তোমার ডাকে ঘুম ভেঙ্গে গেল। অসিত এতক্ষণ লক্ষ্য করে নাই—এখন মায়ের দিকে তাকাইয়া দেখে, তাঁহার দুই চোখ দিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে।

সে অবাক হইয়া প্রশ্ন করিল—কি হলো মা, কাঁদছো কেন?

আত্রেয়ী চোখের জল মুছিয়া বলিলেন—কিছু হয়নি, বাবা, কিন্তু একটা কথা শুনবি অসি?

অসিত বলিল—"কেন শুনবো না, মা—কোন্ কথা তোমার না শুনি বলতো?

আর কোন দিন আমার ছোট কাকুর কথা ভাব্‌বি নে বল, আর কোন দিন সেপাই যুদ্ধ খেল্‌বি নে।"

—সে কি মা, তোমার ছোট কাকু যে মস্ত বড় বীর—দাদু বলতেন, তাঁর বংশের গৌরব, সৎ ছেলে—তাঁকে ভাবলে দোষটা কি শুনি?

—সে সব শুনে তোর কাজ নেই, অসি—তুই বল—আমাকে ছুঁয়ে বল—আর ভাব্‌বি নে তাঁদের কথা? অসিত মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল—তুমি যদি ব্যথা পাও মা, তা হ'লে আর ভাববো না। আত্রেয়ী পুত্রের মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন—অসি আমার লক্ষ্মী ছেলে! বেলা হলো—যা এখন স্নান করে আয়।

আহারান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া শিবনাথ প্রত্যহ পাশার আড্ডায় গিয়া বসিতেন আর ফিরিতেন সন্ধ্যার পূর্বে, আজিও অন্যদিনের ন্যায় যথারীতি চাদরখানা গায়ে ফেলিয়া বাহির হইতেছিলেন—এমন সময় পুত্রের হাত ধরিয়া আত্রেয়ী ঘরে ঢুকিলেন।

—বলি তখন তো ছেলেকে মারলে—কিন্তু ওর হাতখানা একবার দেখতো কামড়ে একেবারে রক্ত বের করে দিয়েছে যে!

কিন্তু ও হতভাগা ওদের সঙ্গে মিশতে যায় কেন শুনি?

—বেশ ও আর ওদের সঙ্গে মিশ্‌তে যাবে না—কিন্তু ওকে রাধানগরের হাইস্কুলে ভর্তি করে দাও—তোমাদের বড় বাড়ির ইস্কুলে আর ও যাবে না।

শিবনাথ চটিয়া উঠিয়া বলিলেন—কেন যাবে না শুনি?

—ও বড় বাড়ির জমিদারীর চাল আমার সহ্য হয় না বলে। যারা বাড়ি বয়ে এসে বিনা কারণে আমার ছেলেকে কেটে গাঙ দিয়ে ভাসিয়ে দিতে বলে—তাদের ইস্কুলে আমার ছেলেকে আমি যেতে দেব না, তাছাড়া ওখানে পড়াশুনোও কিছু হয় না।

—কে বল্লে, হয় না?

—আমিই বল্‌ছি—আর কে বল্‌বে?

শিবনাথ তেমনি রাগিয়া বলিলেন—ছেলে যেমনি তোমার, তেমনি আমারও—লেখাপড়া হয় কি না হয়,—সে খেয়াল আমার আছে। কথায় কথায় আত্রেয়ীরও জেদ বাড়িয়া গিয়াছিল—তিনি তেমনি শক্ত হইয়াই জবাব করিলেন—তাই যদি থাকতো, তাহলে আর আমাদের কথা বলতে হতো না। লেখাপড়া করে আর কি হবে—বামুনের ছেলে ভিক্ষে করলে তো আর জাত যাবে না। না হয় রাজা জমিদার দেখে মো-সাহেবী করবে। কিন্তু কথাটি বলিয়া ফেলিয়াই আত্রেয়ী বুঝিতে পারিলেন—এ ভাল হইল না। শিবনাথ একেবারে রাগে চোখ পাকাইয়া উঠিলেন—বলিলেন—দিন দিন কথা তোমার মাত্রা ছাড়িয়ে উঠছে দেখছি—আমি ভিক্ষে করি—মো-সাহেবী করি? নিজের বাপের গৌরবে তুমি আর কিছুই চোখে দেখতে পাও না। কিন্তু অসি এই ইস্কুলেই পড়বে—লেখাপড়া হয় কি না হয়—সেও আজ থেকে আমিই দেখ্‌বো। বলিতে বলিতে তিনি বাহির হইয়া গেলেন। একটা কথাও না বলিয়া আত্রেয়ী কিছুক্ষণ সেখানেই নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন।

শেষ বেলায় গৃহকর্ম সারিয়া আত্রেয়ী চুপ করিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া বসিয়াছিলেন। শিবনাথ সেই যে পাশার আড্ডায় গিয়াছিলেন—আর হয়তো সন্ধ্যার পূর্বে ফিরিবেন না। বড় ছেলে অমিয় ছ'সাত মাইল দূরে তাহার পিসিমার বাড়ি থাকিয়া লেখাপড়া করে। বাড়িতে একমাত্র বৃদ্ধা শাশুড়ী—তিনি বাতের বেদনায় অচল হইয়া আজ ৪।৫ বৎসর ঘরে পড়িয়া আছেন। এক অসিকে বুকে করিয়া আত্রেয়ীর দিন কোনক্রমে কাটিয়া যায়। অসিত যেন কোথায় খেলা করিতে গিয়াছিল। আজ নানা কারণে আত্রেয়ীর মন ভাল ছিল না।

স্বামীর সহিত ছোটখাট ব্যাপার লইয়া মনোমালিন্য—এতো তাহার নিত্যকার ব্যাপার। কিন্তু আজিকার কথা সম্পূর্ণ আলাদা—এতদিন নিজের মনের নিভৃত কোণে যে কাহিনী সঞ্চিত হইয়াছিল আজ হঠাৎ কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে অসির কাছে তাহাই কতকটা গেল প্রকাশিত হইয়া। তবু যেটুকু প্রকাশিত হইয়াছে তাহা যে তাহার কতটুকু মাত্র এবং যেটুকু বলা হয় নাই—তাহার ছত্রে ছত্রে যে কত বড় দুঃখের ইতিহাস লুকান আছে—তাহার পরিমাপ কে করিবে? আত্রেয়ীর মনে পড়ে তাঁহার পিতার মৃত্যুশয্যার কথা। ঘরে তখন আর কেউ ছিল না, পিতা তাহার একখানা হাত নিজের বুকের উপরে টানিয়া লইয়া সমস্ত দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করিয়া বলিলেন—আত্রেয়ী, যদি আমার পুত্র থাকতো মা, তা'হলে একথা তোকে বলতে হতো না—কিন্তু তোর যদি পুত্র হয় মা, তকেই বলিস—সে যদি পারে এর প্রতিশোধ নেয়। এ অনুরোধ আমার তোর উপরে রইলো মা, তোর অনাগত সন্তানের উপরে আমার প্রাণভরা আশীর্বাদ রইল—তোর ছোট কাকুর আশীর্বাদ রইলো। মা—সে যেন মানুষ হয়—সে যেন সত্যিকারের বীর হয়ে জন্মগ্রহণ করে। এর রইল তোর নির্যাতিতা জননীর আকুল প্রত্যাশা। আত্রেয়ী সেদিন চোখের জলে ভাসিয়া গিয়াছিল। হয়তো সেই উত্তেজনার মুহূর্তে পিতার নিকটে সম্মতি দিয়াছিল—হয়তো দিয়াছিল না! কিন্তু সেদিন তো সে সন্তান কোলে পায় নাই—জননীর যে কি ব্যথা—সন্তান যে জননীর কত বড় অংশ তাহা বুঝিতে পারে নাই। অমিয় ছোটবেলা হইতে যেমনি রুগ্ন, তেমনি ভীরু—তাহাকে আত্রেয়ী অসিতের মতো এমনি করিয়া কখনও ভালবাসিতে পারে নাই। অমিয়ও বড় একটা মায়ের ধার ধারিত না—ছোটবেলায় ঠাকুরমার কাছেই সে মানুষ হইয়াছে। কিন্তু যে কথা আজ সে তাহার এই পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত নিজের অন্তরের অন্তস্থলে গোপন করিয়া রাখিয়াছে—আজ পনর ষোল বৎসর ধরিয়া যাহা প্রতিদিন ভুলিয়া যাইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে—তাহারই খানিকটা আজ কেমন করিয়া তাহারই প্রাণাধিক পুত্রের কাছে উদ্ঘাটিত করিয়াছিল। বাড়ির সম্মুখ দিয়া শীতের ক্ষীণস্রোতা চন্দনার স্বচ্ছধারা তর্ তর্ করিয়া বহিয়া যাইতেছিল। তাহারই পরপারে দূরপ্রসারী মাঠের প্রান্তসীমায় অস্পষ্ট বনানীর শ্যামচ্ছায়া—কি এক গভীর মায়ার সৃষ্টি করিয়াছিল। সেইদিকে তাকাইয়া তাকাইয়া আত্রেয়ীর চোখ বারে বারে জলে ভরিয়া আসিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এমনি কাটিবার পর কোথা হইতে অসিত ছুটিয়া আসিয়া একেবারে তাহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ডাকিল—ওমা—মাগো!

আত্রেয়ী ব্যগ্র বাহু মেলিয়া তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিলেন,—কি বাবা?

অসিতের চপলতা এক মুহূর্তে একেবারে নিভিয়া গেল—ওকি তুমি কাঁদছো কেন মা"।

আত্রেয়ী জোর করিয়া হাসিয়া বলিলেন,—কে বল্লে কাঁদছি আমি?

—ওই যে তোমার চোখে জল! কি হয়েছে মা?

আত্রেয়ী তাহার মুখ চুম্বন করিয়া কহিলেন,—কিছুই তো হয়নি বাবা!

আত্রেয়ী রান্না ঘরে পাকের যোগাড় করিতেছিলেন—শিবনাথ পিছন হইতে গিয়া ডাকিলেন—পণ্ডিত বউ! আত্রেয়ী তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া জবাব দিল—কেন?

শিবনাথ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন,—তোমার কথাই ঠিক পণ্ডিত বউ।

অসিতকে রাধানগরের ইস্কুলেই ভর্তি করে দেব।

আত্রেয়ী হাসিয়া বলিলেন,—হঠাৎ যে মত বদ্‌লালো?

শিবনাথ বলিলেন,—আমিও আর ওদের বাড়ির পাশার আড্ডায় যাব না স্থির করেছি।

আত্রেয়ী উদ্বিগ্ন হইয়া প্রশ্ন করিলেন,—কেন কিছু হয়েছে নাকি আজ? স্বামীর একটা রূপকে আত্রেয়ী খুব ভাল করিয়াই জানিতেন—সে তাহার তীব্র আত্মমর্যাদাবোধ। ইহার জন্য শিবনাথ যে তাঁহার জীবনে কত হারাইয়াছেন—সমস্ত গ্রামময় কত দুর্নাম কিনিয়াছেন, তাহা আত্রেয়ীর অজানা নয়। আজ আবার এমনি কিছু ঘটিল কিনা—এই ছিল তাঁর আশঙ্কা। শিবনাথ আত্রেয়ীর প্রশ্ন এড়াইয়া গিয়া বলিলেন,—ওদের পুকুর উৎসর্গের সময় ওদের গোমস্তা নিধু মিত্তির বাবাকে কি একটা ঠাট্টা করেছিল, তারিণী সান্যালও সেখানে ছিল—কিন্তু নিধুকে একটা কথাও কয়নি। বরং অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে হেসেছিল। বাবা সেদিন প্রতিজ্ঞা করলেন—জীবনে ওদের পুকুরের জল খাবেন না। ওদের বাড়ি অন্ন গ্রহণ করবেন না। নিজেদের আত্মীয় ওরা, এসব সত্ত্বেও প্রতিজ্ঞা তিনি শেষ পর্যন্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গিয়েছিলেন।

আত্রেয়ী আগাইয়া আসিয়া শিবনাথের একখানা হাত নিজের মুঠার মধ্যে ধরিয়া বলিলেন—বল, কারো সঙ্গে ঝগড়া করনি?

না ঝগড়া করিনি বউ, মনে করেছিলাম বাবার ঝগড়ার জের আর আমি টেনে নিয়ে বেড়াব না—কিন্তু এখন দেখছি তা ভুল—অর্থের গৌরব ওদের—বংশের গৌরব ওদের—তা থেকে এক চুলও কমেনি। তারিণী সান্যালের ছেলেরা তারিণী সান্যালের জের এখনও টেনে চলছে—তা নিয়ে মানুষকে আঘাত দিতে ওরা আজও ছাড়ে না।

আত্রেয়ী বলিলেন,—বেশ, যেয়ো না। ও পাড়ায় গিয়ে পাশা খেলো—তারপর নিজের হাতের মুঠায় শিবনাথের হাতখানি আরও খানিকটা শক্ত করিয়া ধরিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—কিন্তু বল আমার ওপর রাগ করনি! শিবনাথ হাসিয়া বলিলেন,—রাগ আমি সত্যিই করি, কিন্তু আবার যেতেও বেশী সময় লাগে না, পণ্ডিত বউ।

কিন্তু ও নাম কি তোমার মুখ থেকে যাবে না?

শিবনাথ তেমনি হাসিয়াই বলিলেন,—অন্যায় তো কিছু নয়, মিথ্যেও তো নয়—তুমি পণ্ডিত বলেই তো সবাই তোমাকে পণ্ডিত বউ বলে ডাকে।

—যার যা খুশি বলুক, তুমি ডাকতে পারবে না?

কেন?

—ওতে আমি ব্যথা পাই!

—সত্যি?

—হাঁ।

—বেশ, আজ থেকে আর ডাকবো না।

আত্রেয়ী হাসিয়া বলিলেন,—মনে থাকে যেন।

শিবনাথ বলিলেন,—থাকবে।

—এখন যাও অসি পড়তে বসেছে—ওর কাছে বসোগে।

শিবনাথ হাসিমুখে বাহির হইয়া গেলেন—আত্রেয়ী হৃষ্টমনে রান্নায় মন দিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আত্রেয়ীর পিতা ধরানাথেরা চার ভাই—ধরানাথ, হরনাথ, তারানাথ ও শঙ্করনাথ। জ্যেষ্ঠ ধরানাথ মীরাটের কমিশারিয়েটের হেড ক্লার্ক ছিলেন, হরনাথ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, তারানাথ কলিকাতার সরকারী উকিল। শঙ্করনাথ কিন্তু লেখাপড়া বেশি না করিয়া খানিকটা বাংলা, ইংরাজী শিখিয়া বছর খানেক কোথাও উধাও হইয়া গিয়াছিল—অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়াও আর তাহার উদ্দেশ মিলিল না। অবশেষে বৎসর খানেক পরে একদিন মীরাটে ধরানাথের বাসায় গিয়া হাজির হইল। ধরানাথ শঙ্করকে বড় ভালবাসিতেন—কাজেই শঙ্করের এই আকস্মিক আগমনে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া উঠিলেন। এতদিন কোথায় ছিল—জিজ্ঞাসা করিলে হিমালয়ের নানা উপত্যকা, অধিত্যকা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ প্রভৃতি অনেক স্থানের নাম সে করিয়া যাইত। কেন গিয়াছিল জিজ্ঞাসা করিলে, জবাব দিত নিজেদের দেশটা একটু ভাল করে দেখে এলাম। বস্তুত এই বলিষ্ঠ ও উন্নতদেহ যুবকটির ভিতরে যে একটি অত্যন্ত খাপছাড়া ভবঘুরে মন লুকাইয়া আছে, যাহাকে আর দশজনের সহিত একই সঙ্গে বিচার করিতে

পারা যায় না—লাভ লোকসানের হিসাব করা যায় না—সে খবর ধরানাথের অজ্ঞাত ছিল না কিছুদিনের মধ্যেই শঙ্কর মীরাটে অত্যন্ত পরিচিত হইয়া উঠিল। সেপাই মহলে তাহার অত্যন্ত খাতির বাড়িয়া গেল—কখনও দেখা যাইত, শঙ্কর গাছতলায় বসিয়া সুর করিয়া তুলসীদাসী রামায়ণ পড়িয়া যাইতেছে। চার পাশে একান্ত মুগ্ধ শ্রোতার মত বেহারী সেপাইরা তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। কখনও দেখা যাইত—সে পাঞ্জাবী সেপাইদের দলে মিশিয়া তাহাদের হস্তরেখা বিচার করিয়া ভূত ভবিষ্যতের কথা বলিয়া দিতেছে। এমনি করিয়া সেপাইদের মধ্যে মিশিয়া নানা ব্যাপার লইয়া তাহাদের সহিত আলাপ আলোচনা করিত। ইহারই বৎসর খানেক পরে হঠাৎ একদিন একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে সেপাইদের ভিতরে চাঞ্চল্য দেখা গেল। সারা ভারতবর্ষময় সেপাই-বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। শঙ্কর হয়তো পূর্ব হইতে এই আগুনেরই ইন্ধন যোগাইতেছিল। এখন একেবারে তাহাতে ঝাঁপাইয়া পড়িল। ধরানাথেরও মনোভাবটা সেপাইদের অনুকূলেই ছিল এবং গোপনে অনেক সাহায্যও তিনি করিয়াছিলেন। কয়েক-মাস পরে সেপাইরা ক্রমে ক্রমে হঠিয়া বনে-জঙ্গলে আশ্রয় লইতে লাগিল। শঙ্করও মীরাট হইতে মাইল পঞ্চাশেক দূরে কোন জঙ্গলে অন্যান্য সিপাইদের সহিত আশ্রয় লইল। কিছুদিন পরে সেখানেই গোরা সৈন্যের গুলীতে তাহার মৃত্যু হয়। এদিকে ধরানাথকে সন্দেহ করিয়া মীরাটের এক বাড়িতে ধরানাথ, তাঁহার স্ত্রী ও একমাত্র কন্যা আত্রেয়ীকে বন্দী করিয়া রাখা হয়। ধরানাথের স্ত্রী ছিলেন অসামান্যা সুন্দরী। ইহারই ৫।৬ দিন পরে একদিন জোর করিয়া তাঁহাকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাওয়া হয় এবং পরের দিন রাস্তার পাশে তাঁহার মৃতদেহ দেখিতে পাওয়া যায়। ধরানাথ নিতান্ত নিরুপায়ের মতো চোখের সম্মুখে সমস্তই দেখিলেন—কিন্তু কোনই প্রতিকার করিতে না পারিয়া নিষ্ফল আক্রোশে ক্রুদ্ধ অজগরের মতো নিজের দেহে নিজেই ছোবল মারিয়া আক্রোশের বিষে জর্জরিত হইয়া মরিতেছিলেন। আত্রেয়ীর বয়স তখন এক বৎসর। ধরানাথ সমস্ত অপমান, সমস্ত আক্রোশ কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া সহ্য করিলেন। একদিন গভীর রাত্রিতে প্রহরীদের যথেষ্ট অর্থ ঘুষ দিয়া আত্রেয়ীকে বুকে করিয়া তিনি পলায়ন করিলেন। মাস দুই নানা বিপদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া অবশেষে তিনি আত্রেয়ীকে লইয়া কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে আসিয়া প্রকাশ করিলেন, তাঁহার স্ত্রীর পথে কলেরায় মৃত্যু হইয়াছে। অপমানের কাহিনী আপনার মনে গোপন করিয়া রাখিলেন। ভাইদের বাসায় কিন্তু তাঁহার মন টিঁকিল না। অবশেষে তিনি আত্রেয়ীকে লইয়া গ্রামের বাড়িতে চলিয়া আসিলেন। নদীয়া জেলায় পদ্মার সন্নিকটে তাঁহার পৈত্রিক বাস-ভবন। শুধু বাসভবনই নয়—এখানে খুব ভাল আয়ের সম্পত্তিও ছিল। এই বাড়িতে ধরানাথের এক বিধবা ভগ্নী তাঁহার জন দুই পুত্রকন্যা লইয়া বাস করিতেছিলেন। বাড়ির এবং সম্পত্তির আয়ে তাঁহাদের সচ্ছলভাবেই দিন কাটিতে লাগিল। ধরানাথের শরীর কিন্তু একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছিল। রাত্রি দিন তিনি ঘরে বন্ধ হইয়া থাকিতেন কাহারও সহিত মিশিতেন না কোথাও বাহির হইতেন না। প্রথম জীবনে ধরানাথ ব্রাহ্ম ধর্মের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। কবি হেমচন্দ্র ছিলেন তাঁহার সহপাঠী। নবীনচন্দ্রের সহিত তাঁহার সখ্যতা ছিল। নাট্যকার দীনবন্ধু তাঁহার খুল্লতাতের বন্ধু—এমনি করিয়া তৎকালীন সমস্ত সাহিত্যিক ও প্রগতিশীল সমাজের সহিত তাঁহার যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছিল। তাই এই নির্জন বাসের কালেও তাঁহার নিকটে এই সব সাহিত্যিক ও কবি বন্ধুদের পুস্তকাবলী তাঁহার নিকটে ডাকযোগে আসিয়া পৌঁছিত। শেষ বয়সে ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের একমাত্র খোরাক—রাত্রি দিন তিনি সাহিত্যালোচনা করিয়াই কাটাইয়া দিতেন। আত্রেয়ীর সমস্ত শিক্ষার ভারও তিনি নিজের হাতে লইয়া ক্রমে ক্রমে তাহাকে নানা বিষয়ে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। এমনি করিয়া এখানে পনরটি বৎসর গেল তাঁহার কাটিয়া। ইতিমধ্যে আত্রেয়ী বিবাহযোগ্যা হইয়া উঠিলেন। হরনাথ কলিকাতায় একটি উচ্চশিক্ষিত পাত্রের সহিত বিবাহের সমস্ত কথাবার্তা ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ধরানাথ গেলেন বরকে আশীর্বাদ করিতে কিন্তু হঠাৎ প্রকাশ পাইল ভাবী বর নাকি অত্যন্ত মদ্যপ। ধরানাথের শুচি মন এক মুহূর্তে একেবারে বেঁকিয়া দাঁড়াইল—সম্বন্ধ ভাঙিয়া দিয়া পরের ট্রেণেই বাড়ী রওনা হইলেন। পথে হঠাৎ শিবনাথের সহিত দেখা। শিবনাথের বয়স তখন ২৪।২৫ বৎসর। তিনি নিজের ভাগ্য পরীক্ষার জন্য তখন নানাস্থানে ঘুরিতেছিলেন। তাঁহার সহিত পরিচয়ে ধরানাথ অত্যন্ত আকৃষ্ট হইলেন—বংশ এবং কুলেও মিলিয়া গেল—তিনি মনে মনে ঠিক করিলেন—এই ছেলের সহিতই মেয়ের বিবাহ দিবেন। শিবনাথ কিন্তু ভাল লেখাপড়া জানিতেন না—এদিকে কন্যাকে তিনি নিজের তত্ত্বাবধানে বাংলায়, ইংরাজীতে মোটামুটি শিক্ষিত করিয়া তুলিয়া-ছিলেন। এখন সঙ্কল্প করিলেন—শিবনাথকে দুই এক বৎসর লেখাপড়া করাইয়া পরে কলি-কাতার বন্ধুবান্ধবদের ধরিয়া ভাল একটা চাকুরীতে ঢুকাইয়া দিবেন। অভিভাবকহীন শিবনাথ সানন্দে ধরানাথের সহিত তাঁহার বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। মাস দুই পরে বিবাহ হইয়া গেল—কিন্তু ধরানাথের কোন ইচ্ছা আর পূর্ণ হইল না। ইহারই মাস দুয়েক পর একদিন অকস্মাৎ তিনি এ সংসারের সকল মায় কাটাইয়া গেলেন। ধরানাথের মৃত্যুর দিন দু আগে যখন আর জীবনের কোন আশা না বুঝিতে পারিলেন, ধরানাথ আত্রেয়ীর একখান হাত নিজের বুকের উপরে টানিয়া লই ডাকিলেন—আত্রেয়ী, মা ! —আত্রেয়ী পিতা মুখের উপর ঝুঁকিয়া জবাব দিলেন—কে বাবা! ধরানাথ চাহিয়া দেখিলেন নিকটে আ কেহ নাই; বলিলেন—তোকে আজ একটা ক বলবো মা। একথা একমাত্র আমি ছাড়া আ কেউ জানে না মা। তারপর পিতার মু মীরাটে তাহার মাতার সমস্ত দুর্ভাগ্যের ক শুনিতে পাইলেন। কথা শেষ করিয়া ধরান দুই চোখের জলে ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন আত্রেয়ী নিজেও কাঁদিতেছিলেন। খানিক শান্ত হইয়া ধরানাথ বলিলেন—আজ বলতাম না মা, যদি না বুঝতাম আমার আ একেবারে শেষ হ'য়ে এসেছে। আজ তোর কা আমার একটা অনুরোধ রইল মা। আত্রে কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন—অনুরোধ বল্‌ছো বাবা? তুমি আদেশ কর!

—তা হ'লে আদেশই করি মা—আম ছেলে থাকলে একথা তোকে আজ বলতে হ না—মায়ের অপমানের প্রতিশোধ পুত্র অব নিতো। আমি নিজে পারিনি মা—যদি তোর প হয় এ অপমানের সে যেন প্রতিশোধ নেয়। য আদেশে এ অত্যাচার হয়েছিল, তাকে হয় আর খুঁজে পাওয়া যাবে না, মা—কিন্তু থাক তার জাতি—থাকবে তার বংশ। পুত্রের উপর রইলো তার ভা আত্রেয়ী সেদিন চোখের জলে স্বীকার করি ছিলেন—হাঁ বাবা, নিশ্চয় বল্‌বো—যারা আ মাকে এমনি করে অপমান করে হত্যা করে এর প্রতিশোধ নেব না? তুমি নিশ্চিন্ত হ একথা আমি জীবনে কোনদিন ভুলবো ইহারই দুইদিন পরে ধরানাথ দেহ করিলেন। ধরানাথের মৃত্যুর পরে হরনাথ তারানাথের সহিত শিবনাথের বনিবনাও না—তাই কিছুদিন পরে তিনি আত্রে শ্বশুরালয়ে রাখিয়া পুনরায় ভাগ্যা বাহির হইয়া পড়িলেন। অনেক খোঁজাখ পর উত্তরবঙ্গের এক জমিদারের কোন তহ তহশীলদারীর পদলাভ করেন এবং হইতে মাতাকে ও আত্রেয়ীকে নিজের কর্ম লইয়া যান। শিবনাথ অবসর সময়ে হো প্যাথিক চিকিৎসার পুস্তকাদি অধ্যয়ন করি

এইখানে আট-দশ বৎসর চাকুরী করিয় কিছু অর্থের সংস্থান করিয়া ঠিক করি আর পরের গোলামী করিবেন না—দেশে স্বাধীনভাবে চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ কর তাহার পর হইতেই শিবনাথ দেশে চিকিৎসা ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন।

আত্রেয়ী কিন্তু প্রথমাবধিই শিব প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাঁহাকে অত্যন্ত যত্ন লইয়া লেখাপড়া শি

ছেন, অথচ শিবনাথ ভাল লেখাপড়া জানেন না। ইহাই ছিল ক্ষোভের মূল কারণ। তা ছাড়া যখন এই দেশের বাড়ীতে তাঁহারা আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন তখন তাঁহার মন গ্রামের এই পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে একেবারে মুষড়াইয়া পড়িল। শৈশবকাল হইতে যে গ্রামে তিনি কাটাইয়াছেন—তাহা ছিল তৎকালে বাংলা দেশের ভিতরে একটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ গ্রাম। শুধু গ্রামেই তো নয়—কলিকাতায় খুড়োদের বাসায়ও তিনি মাঝে মাঝে যাইয়া কিছুদিন বাস করিয়া আসিতেন—কাজেই তাহার সহর ঘেঁষা তৎকালীন খানিকটা আলোকপ্রাপ্ত মন—এই গ্রামে আসিয়া কোথাও মিলিতে পারিত না—কাহারও নিকট যে নিজের মনের কথা কহিবেন—এমন মেয়ে একটিও নিজেদের পাড়ায় খুঁজিয়া পাইতেন না। স্বামী তাহাকে ভালবাসিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনেও একটা প্রচ্ছন্ন ক্ষোভ ছিল—তাহাই মাঝে মাঝে উলঙ্গ হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া বসিত। নিজের স্ত্রী সুশিক্ষিতা অথচ নিজে ভাল লেখাপড়া করেন নাই।—এই দুর্বলতা তাঁহাকে অহরহঃ পীড়া দিত, তাই পত্নীর উপরে সময়ে অসময়ে হঠাৎ অকারণে অপ্রসন্ন হইয়া উঠিতেন। যেখানে মেয়েরা নিজেদের নামটা পর্যন্ত লিখিতে জানিত না—স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা অনেকেই অন্যায় বলিয়াই মনে করিত—সেখানে আত্রেয়ীর মতো মেয়ের স্থান হইবে কেমন করিয়া। তাই গ্রামের মেয়ে পুরুষেরা আত্রেয়ীকে "পণ্ডিত বউ" বলিয়া, "চেয়ারে বসা বউ" বলিয়া ঠাট্টা করিত। শিবনাথ নিজেও কখনও তাঁহাকে পণ্ডিত বউ বলিয়া শ্লেষ করিতে ছাড়িতেন না। পিতৃগৃহ হইতে আসিবার সময় আত্রেয়ী পিতার সমস্ত পুস্তক নিজের সঙ্গে স্বামীর কর্মস্থানে লইয়া গিয়াছিলেন এবং সেখান হইতে পুনরায় গ্রামে আসিবার সময়ও পুস্তকগুলি তেমনি যত্ন করিয়া লইয়া আসিয়াছেন। এই পুস্তকগুলিই ছিল তাঁহার অবসরের সঙ্গী। রঙ্গলালের, হেমচন্দ্রের, নবীনচন্দ্রের মধুসূদনের কবিতা তিনি অনর্গল আবৃত্তি করিয়া যাইতে পারিতেন। দীনবন্ধুর নীল দর্পণ বন্ধ করিয়া তিনি দৃশ্যের পর দৃশ্য বলিয়া যাইতেন। এমনি তাঁহার স্মৃতিশক্তি ছিল। স্বামীর কর্মস্থানে একটু অধিক বয়সেই তাঁহার প্রথম সন্তান অমিয় জন্মগ্রহণ করে' কিন্তু এই সন্তানকেই তিনি খুব আপনার করিয়া পান নাই। শাশুড়ী অতি শৈশবেই অমির সমস্ত ভার নিজে গ্রহণ করেন—তা ছাড়া জন্মাবধি অমিয় এত রুগ্ন ও ভীরু যে আত্রেয়ী তাহার উপরে ভবিষ্যতের কোন ভরসাই রাখিতেন না। তারপর আসিল—অসিত। প্রথমাবধিই এই অসিত মায়ের কোল ও অন্তর একেবারে অধিকার করিয়া বসিল। অসিত জন্মিবার পর তাঁহার আর কোন সন্তানাদিও জন্মে নাই। অসিত হইল মায়ের একমাত্র সঙ্গী। মায়ের সমস্ত কর্ম ও চিন্তার সাথী। এমনি করিয়া সুখে-দুঃখে আত্রেয়ীর দিন কাটিতেছিল।

(ক্রমশঃ)

প্রতাপাদিত্য

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ শতকে এক বৈশাখী পূর্ণিমায় এই বঙ্গদেশে প্রতাপাদিত্য স্বাধীন নৃপতিরূপে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। আজ আমরা বাঙলায় তাঁহার পরবর্তী বাঙালীরা তাঁহার অভিষেকোৎসব জয়ন্তী করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বাঙলার সেদিনের অবস্থার সহিত বর্তমান সময়ের বাঙলার অবস্থা তুলনা করিব না। আজ কেবল আমরা স্মরণ করিব, সেই দীর্ঘকাল পূর্বে একজন বাঙালী দুর্গ স্থাপন, সেনাদল গঠন ও নৌবাহিনী রচনা করিয়া বাঙলার স্বাধীনতা রক্ষা করিতে—মোগল বাদশাহদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—বার বার মোগল বাহিনীকে পরাভূত করিয়া শেষে যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন। বার বার মোগল সম্রাটের মুসলমান সেনাপতিরা প্রতাপকে আক্রমণ করিয়া পরাভূত হইয়াছিলেন। শেষে যে যুদ্ধে প্রতাপের পরাভব ঘটে, তাহাতে সেনাপতি হিন্দু মানসিংহ। আর কয়জন বাঙালী হিন্দু তাঁহার সহায়। সেই কয়জনের মধ্যে একজন ভবানন্দ মজুমদার, মানসিংহকে আবশ্যক যানবাহন খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি যোগাইয়া বিপুল জমিদারী পুরস্কারস্বরূপে লাভ করেন। দ্বিতীয় বংশবাটীর জমিদারবংশের জয়ানন্দ রায়। তৃতীয়—সাবর্ণ চৌধুরী বংশের বংশপতি লক্ষ্মীকান্ত। কথিত আছে পাঁচু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র জীব গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহার পত্নী এক পুত্র প্রসব করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে জীব যখন সদ্যঃপ্রসূত পুত্রের ভবিষ্যৎ চিন্তায় চিন্তিত সেই সময়ে সহসা কক্ষের ছত্রতল হইতে একটি টিকটিকির ডিম্ব হর্ম্যতলে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যায় ও তাহা হইতে একটি মৃতকল্প শাবক বাহির হয়। ঘটনাক্রমে তখনই তথায় একটি পিপীলিকার আবির্ভাব হয় এবং শাবকটি তাহা গ্রাস করে। চিন্তিত জীব তাহাতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি রচনা করিয়া লিখিয়া পত্রখানি শিশুর বুকের উপর রাখিয়া গৃহত্যাগ করেন—

"কাকঃ কৃষ্ণঃ কৃতোযেন হংসশ্চ ধবলীকৃত।
ময়ূরশ্চিত্রিতোযেন তেন রক্ষা ভবিষ্যতি॥"

জীব উত্তরকালে উত্তর ভারতে কামদেব ব্রহ্মচারী নামে পরিচিত হয়েন এবং মানসিংহ তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। মানসিংহ যখন মোগল বাহিনী লইয়া বাঙলায় আগমন করেন, তখন কামদেব তাঁহাকে নানা বিষয়ে উপদেশ দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। ত্যক্ত পুত্র তখন প্রতাপাদিত্যের অন্যতম সেনাপতি। মানসিংহ গুরুপুত্রের সন্ধান করিলে জয়ানন্দ কেবল যে তাঁহার সন্ধান দেন তাহাই নহে—পিতার কথা বলিয়া লক্ষ্মীকান্তকে প্রতাপাদিত্যের কর্মত্যাগেও প্ররোচিত করেন। মানসিংহ জয়ী হইয়া এই তিনজন বাঙালীকে ভূসম্পত্তি প্রদান করেন। বাঙলার শেষ স্বাধীন বাঙালী রাজার সর্বনাশে কয়জন বাঙালীর ভাগ্যোদয়।

প্রতাপাদিত্যকে আমরা তিন ভাবে দেখিতে পারি—বাঙলা সাহিত্যে প্রতাপাদিত্য, ইতিহাসে প্রতাপাদিত্য ও স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রতাপাদিত্য।

বাঙলা সাহিত্যে প্রতাপাদিত্য কিম্বদন্তী মাত্র নহেন। যাঁহার কাব্য কথার তাজমহল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, সেই কবি ভারতচন্দ্র কাব্যারম্ভে লিখিয়াছেন—

"যশোর নগর ধাম প্রতাপাদিত্য নাম
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতসায় কেহ নাহি আঁটে তায়
ভয়ে যত ভূপতি তটস্থ॥
বরপুত্র ভবানীর প্রিয়তম পৃথিবীর
বাহান্ন হাজার যার ঢালী॥
ষোড়শ হলকা হাতী অযুত তুরঙ্গ সাতি
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী॥"

প্রতাপাদিত্যের সর্বনাশে যাঁহাদিগের ভাগ্যোদয় তাঁহাদিগের অন্যতম ভবানন্দের বংশধরের সভাকবি ভারতচন্দ্র প্রতাপাদিত্যের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতেই প্রতিপন্ন হয়—তখনও বাঙলায় প্রতাপাদিত্যের নাম শ্রদ্ধা সহকারে উচ্চারিত হইত এবং তাঁহার কীর্তি-কৌমুদীতে তখনও বাঙলার ইতিহাসের আকাশ পূর্ণ।

বাঙলার বর্তমান গদ্য সাহিত্যের আরম্ভ-কালে—১৮০১ খৃষ্টাব্দে রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' শ্রীরামপুরে ছাপা হয়। তাহাতে গ্রন্থকার বলেন——

"সম্প্রতি সর্বারম্ভে এদেশে প্রতাপাদিত্য নামে এক রাজা হইয়াছিলেন তাহার বিবরণ কিঞ্চিৎ পারস্য ভাষায় গ্রথিত আছে। সাঙ্গপাঙ্গরূপে সাম্প্রদায়িক নহি, আমি তাহারদিগের স্বশ্রেণী একই জাতি ইহাতে তাহার আপনার পিতৃপিতামহের স্থানে শূন্য আছে অতএব আমরা অধিক জ্ঞাত এবং আর আর অনেকে মহারাজার উপাখ্যান আনন্দপূর্বক জানিতে আকিঞ্চন করিলেন এজন্য যেমত আমার শ্রুত আছে তদনুযায়ী লেখা যাইতেছে।"

বাঙলায় প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে দ্বিতীয় গ্রন্থ—হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার প্রণীত 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র"। ইহা রাম রাম বসু মহাশয়ের পুস্তকেরই সংস্করণ বলা যায়। ভাষা সরল করিবার চেষ্টা লক্ষিত হয় এবং ছেদচিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

ইহার অল্পকাল পরে ১২৭৫ বঙ্গাব্দে "বঙ্গাধিপ পরাজয়" উপন্যাসের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়। "কলিকাতা রিভিউ" পত্রে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে এক প্রবন্ধে ইহার আলোচনা-প্রসঙ্গে বলা হয়, ইহার পূর্বে প্রকাশিত বাঙলা উপন্যাসের মধ্যে ২।৩ খানি মাত্র প্রশংসনীয়—"আলালের ঘরের দুলাল," "দুর্গেশ নন্দিনী" ও "কপালকুণ্ডলা"; কিন্তু সে সকল আকারে ক্ষুদ্র এবং ইংরেজী নভেলের মত বড় নহে। সে বিষয়ে "বঙ্গাধিপ পরাজয়" ইংরেজী নভেলের নিকটস্থ। সমালোচক ১৫ পৃষ্ঠাব্যাপী প্রবন্ধে 'বঙ্গাধিপ পরাজয়ের' সমালোচনা করেন এবং প্রকাশ করেন—লেখক প্রতাপচন্দ্র ঘোষ। প্রতাপবাবু তখন এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকাগার রক্ষক। তিনি যে সেই পুস্তকাগারে প্রতাপাদিত্যের সম্বন্ধীয় বিবরণ সন্ধান করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং রাজধানী রায়-গড়ের ভগ্নাবশেষ পরিদর্শন করিয়াছিলেন, তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়। পুস্তকে রায়-গড়ের ভগ্নাবশেষের চিত্রও প্রদত্ত হইয়াছিল। এই পুস্তকে সমসাময়িক পরিবেষ্টন-পরিচয় প্রদানের চেষ্টা ইহাকে ঐতিহাসিক উপন্যাসের পর্যায়ে উন্নীত করিতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের "বৌ-ঠাকুরাণীর হাট"—ইহার পরবর্তী। ইহার পরে বন্ধুবর সত্যচরণ শাস্ত্রী ও সুহৃদ্বর নিখিল নাথ রায় ঐতিহাসিক গবেষণার দ্বারা প্রতাপের ইতিহাস পুনর্গঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং কিম্বদন্তীর ফেনপুঞ্জতল হইতে সত্যের সঙ্কীর্ণ ধারা আবিষ্কারে বহুল পরিমাণে সফলকাম হইয়াছেন। বাঙলার রঙ্গালয়ের অভিনয়ের জন্য ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রতাপের বিবরণ উপকরণরূপে ব্যবহার করিয়া যে নাটক রচনা করেন, তাহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিখিল বাবুর পুস্তক তাঁহাকে রাজরোষভাজন করিয়াছিল; ক্ষীরোদ বাবুর নাটকের অভিনয় নিষিদ্ধ হয়।

আমি বাঙলা সাহিত্যে প্রতাপের পরিচয় সম্পর্কে আর একটি রচনার উল্লেখ করিব—তাহা কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের গাথা—"যশোর যুদ্ধ"। আমি সেই মনোজ্ঞ গাথার শেষাংশ প্রবন্ধ-শেষের জন্য রাখিলাম।

প্রতাপ যখন বাঙলায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন বাঙলায় ক্ষমতাশালী জমীদাররা বহুলাংশে স্বাধীনতা সম্ভোগ করিতেন—

মোগলদের বাঙলায় তাঁহারা আপনাদিগকে সম্ভব সুরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করিতেন। কিন্তু যে দ্বাদশ জন ভূম্যধিকারী সাধারণতঃ "বার ভূঞিয়া" বলিয়া পরিচিত তাঁহাদিগের মধ্যে আর কেহ যে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, এমন বলা যায় না। আজকাল কেহ কেহ সিরাজদ্দৌলাকে বাঙলার শেষ স্বাধীন নৃপতি বলিয়া থাকেন। কিন্তু সিরাজদ্দৌলা বাঙালী ছিলেন না এবং তিনি দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করেন নাই —তিনি কেবল বণিক ইংরেজের প্রাধান্য ও দম্ভ চূর্ণ করিবার জন্য তরুণের আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং ষড়যন্ত্রে প্রাণ হারাইয়াছেন। তিনি মাতামহের মৃত্যুতে বাঙলার নবাব হইবার পূর্বে আপনার উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার দ্বারা বহু শত্রু করিয়াছিলেন এবং সেই শত্রুদের সহিত তাঁহার কয়জন অকৃতজ্ঞ কর্মচারী যোগ দিয়া তাঁহার সর্বনাশ ঘটাইয়াছিলেন। আর তাঁহার মাতামহ নবাব আলীবর্দীও প্রভু-পুত্র সরফরাজের সম্বন্ধে বিশ্বাসঘাতকের কাজ যে করেন নাই, এমন নহে।

প্রতাপ বাঙালী এবং মোগল শাসনের শেষ দশায় নহে—প্রবল বলশালী মোগল সম্রাটের অধীনতা অস্বীকার করিয়া স্বাধীন বাঙলা রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সে জন্য তাঁহাকে যে সমর কৌশলের ও রণসজ্জার পরিকল্পনা করিতে হইয়াছিল, তাহাই বিস্ময়কর। বনভূমি পরিষ্কৃত করিয়া রাজধানী প্রতিষ্ঠা, জলপথে ও স্থলপথে শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য দুর্গ সংস্থাপন করিয়া নৌবাহিনী রক্ষা ও সজ্জিত করিয়া মগ ও ফিরিঙ্গীদিগের উপদ্রব হইতে বাঙলাকে —বাঙালীকে রক্ষা, নানা সম্প্রদায়ের লোককে সেনাপতি পদে বরণ করা,—বার বার যুদ্ধে মোগল বাহিনী পরাভূত করা—এ সকল যে অসাধারণ সামরিক প্রতিভার পরিচায়ক তাহা প্রতাপের পক্ষে স্বভাবজ হইলেও অনুশীলন ব্যতীত তীক্ষ্ণ হইতে পারে নাই।

একদিকে ইংরেজ লেখকরা যেমন প্রতাপকে সামান্য জমীদার মাত্র বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছেন, অপর দিকে তেমনই কোন কোন বাঙালী তাঁহাকে নিষ্ঠুর ও নানারূপ নৈতিক ত্রুটি সম্পন্ন বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রতাপ যে সামান্য জমীদার মাত্র ছিলেন না, পরন্তু বঙ্গাধিপ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, তাহা ঐতিহাসিক সত্য। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ডক্টর ওয়াইজ তাঁহার 'বাঙলার দ্বাদশ ভৌমিক' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রতাপকে প্রধান ভূঞিয়াদিগের মধ্যে অন্যতম বলিয়াছিলেন। রেনী বলিয়াছেন, প্রতাপাদিত্য এমনই প্রবল হইয়াছিলেন যে, বাঙলার, বিহারের ও উড়িষ্যার—এমন কি আসামেরও রাজারা তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভারতচন্দ্রের বর্ণনায়ও তাহাই বুঝা যায়—"ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ"।

রাসবিহারী বসু হইতে আরম্ভ করিয়া 'যশোহর-খুলনার' ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্র মিত্র পর্যন্ত অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়া যে সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, সে সকল হইতে প্রতাপাদিত্যের পরিকল্পনার বিস্তার ও সম্পূর্ণতা উপলব্ধ হয়। নিখিলনাথ লিখিয়াছেনঃ—

"আপনার বলসঞ্চয়ের জন্য প্রতাপ রাজ্য মধ্যে নানা স্থানে দুর্গ নির্মাণ করিয়া তাহাতে সৈন্য রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন। অদ্যাপি ঈশ্বরীপুর, মুকুন্দপুর, মৌতলা, গড় প্রতাপ নগর, গড় কমলপুর, বড়িশা বেহালার গড়, জগদ্দল, মাতলা প্রভৃতি স্থানে প্রতাপ-নির্মিত দুর্গের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। রাজধানীর নিকটে তিনি সৈন্যাবাস স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাকে অদ্যাপি বারাকপুর কহিয়া থাকে। এক বিস্তৃত প্রান্তরে তাঁহার সৈন্যগণের যুদ্ধ শিক্ষা হইত; তাহার বর্তমান নাম কুশলী ক্ষেত্র। পর্টুগীজ সেনাপতিগণের অধীনে তাঁহার সৈন্যগণ কামান বন্দুক চালনা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে। তাহাদের জন্য গোলাগুলী নির্মাণের ব্যবস্থাও হইয়াছিল, অদ্যাপি সেই সেই স্থান দমদমা ও লোহাগড়ার মাঠ নামে তাহার পূর্ব পরিচয় প্রদান করিতেছে। এইরূপে স্থলযুদ্ধ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া প্রতাপ জল-যুদ্ধ শিক্ষারও বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তিনি পোত নির্মাণ, সংস্কার ও রক্ষার জন্য রাজধানীর নিকট এক স্থান নির্দেশ করেন এবং তথায় রীতিমত জাহাজাদি নির্মিত, সংস্কৃত ও রক্ষিত হইত, এবং তথায় নৌসেনাগণ জলযুদ্ধ শিক্ষা করিত। দুধলী নামক স্থানে অদ্যাপি তাহার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন জাহাজঘাটা নামক স্থানে জাহাজাদি রক্ষিত হইত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন চকশ্রী নামক স্থান তিনি নৌবাহিনী রক্ষার জন্য নির্দেশ করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রুত হওয়া যায়। সর্বাপেক্ষা সাগর দ্বীপ তাঁহার নৌবলের প্রধান স্থান ছিল। এখানে অসংখ্য জাহাজ রক্ষিত হইয়া তাঁহার নৌবলের পরিচয় প্রদান করিত।"

সেনাপতি নির্বাচনেও প্রতাপ গুণগ্রাহিতার পরিচয় ও যোগ্যতার আদর দেখাইয়াছেন।

প্রতাপ যে তাঁহার রাজ্যে সকল ধর্মাবলম্বী প্রজার ধর্মাচরণের স্বাধীনতা দিয়াছিলেন—তাঁহার রাজধানীর উপকণ্ঠে মুসলমানদিগের মসজেদে ও খৃষ্টানদিগের গির্জায় তাহা প্রতিপন্ন হয়।

প্রতাপকে নিষ্ঠুর ও কার্যসাধন জন্য আবশ্যক উপায় অবলম্বনকারী বলা হয়। এই উভয়ই বর্তমান কালের বিচারে দোষ, সন্দেহ নাই। কিন্তু সময়ের ও অবস্থার বিষয় লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে ঘৃণাভাজন বলিলে তাঁহার সম্বন্ধে অবিচার করাই হইবে।

ইংলণ্ডের ইতিহাসে ধর্মযুদ্ধরত রিচার্ডের প্রশংসা দেখা যায়। তিনি সিংহ-হৃদয় বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন। তিনি যখনই কোন নগর অধিকার করিতেন তখন নরনারী নির্বিচারে অধিবাসীদিগকে হত্যা করিতেন। যুদ্ধকালে একবার তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন; রোগমুক্তির পরে তাঁহার শূকর মাংস আহারের ইচ্ছা হয়। কিন্তু ভাণ্ডারে শূকর মাংস ছিল না। ভৃত্যগণ এক তরুণ সারাসেনকে হত্যা করিয়া তাহার মাংস রন্ধন করিয়া লবণ দিয়া পরিবেশন করে। রাজা পরিতৃপ্তি সহ তাহা ভক্ষণ করিয়া নিহত শূকরের মুখ দেখিতে চাহেন। পাচক কম্পিতকলেবরে নিহত ব্যক্তির মুণ্ডটি রাজার সম্মুখে আনিলে তিনি হাসিয়া বলেন, এত খাদ্যদ্রব্য থাকিতে সেনাদলের কখন খাদ্যাভাব হইবে না। তিনি যে নগরের আক্রমণে রত ছিলেন, তাহা তাঁহার হস্তগত হইলে সালাডীনের দূতগণ বন্দীদিগের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতে রিচার্ডের নিকট উপনীত হন। রিচার্ডের আদেশে অভিজাতদিগের ৩০ জনের মুণ্ড কর্তিত করা হয়। তিনি পাচককে আদেশ করেন—সেই ৩০টি নরমুণ্ড সিদ্ধ করিয়া দূতদিগের আহারের জন্য পরিবেশন করিতে হইবে —প্রত্যেক মুণ্ডে নিহত ব্যক্তির নাম ও বংশ-পরিচয় লিখিত কাগজ থাকিবে। দূতদিগের উপস্থিতিতে তিনি তাঁহার পাত্রে প্রদত্ত মুণ্ডটি সানন্দে আহার করিয়া দূতদিগকে বলেন—খৃষ্টানরা কিরূপে যুদ্ধ করে, তাহা যেন তাঁহারা তাঁহাদিগের প্রভুকে জানাইয়া দেন!

ঔরংগজেব সাম্রাজ্য সম্ভোগে নিষ্কণ্টক হইবার জন্য পিতাকে বন্দী করিয়া সিংহাসন অধিকার করিবার পরে ভ্রাতৃত্রয়ের সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—দারাকে কিরূপে হত্যা করাইয়াছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

সময়ের ও সমাজের সঙ্গে ব্যবহার বিচার করিতে হয়। রাজ্য সম্ভোগে নিশ্চিত হইবার জন্য যেমন লোককে ভীতিবিহ্বল করিবার জন্য তেমনই ক্ষমতাশালীদিগকে নিষ্ঠুর হইতে দেখা গিয়াছে।

খুল্লতাত বসন্ত রায়ের হত্যা নিশ্চয়ই হিন্দুর বিবেচনায় প্রতাপের কলঙ্ক। কিন্তু কি অবস্থায় কি কারণে তাহা সংঘটিত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু জানিবার উপায় নাই। দেশব্যাপী অরাজকতা, অত্যাচার, অনাচার, লুণ্ঠন—ইহা নিবারণ করিয়া দেশে শান্তি স্থাপন, প্রজাকে নিঃশঙ্ক করিবার জন্য যে দৃঢ়তার প্রয়োজন, তাহার মাত্রা হয়ত সহজেই লঙ্ঘিত হয়। সে কার্যে বোধ হয় অহিংসার আদর নাই!

আজ বাঙলায়—নোয়াখালিতে, ত্রিপুরায় ও

কলিকাতায় আমরা যে অমানুষিক অত্যাচার লক্ষ্য করিতেছি, তাহা কি প্রতাপের সম্বন্ধে কিম্বদন্তীগত অত্যাচারকে ম্লান করিতেছে না? প্রতাপ ও ঔরঙ্গজেব আপনাদিগের শক্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যাচার করিয়াছিলেন। তবে আজ যাহারা অবাধে গৃহদাহ, লুণ্ঠন, নারী-নির্যাতন ও নরহত্যা করিতেছে, তাহারা কোন শ্রেণীর মানুষ; আর যাহারা তাহাদিগকে সেই কার্যে প্ররোচিত করিতেছে—তাহারা?

প্রতাপ বাঙলার স্বাধীনতার জন্য আপনার সকল শক্তি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহাই তাঁহার দিবসের চিন্তা ও রাত্রির স্বপ্ন ছিল। তিনি বাঙালীকে মগ ও ফিরিঙ্গীর অত্যাচার হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর ধর্মাচরণে বাধা না দিয়া সাহায্য করিয়া রাজধর্ম পালন করিয়াছিলেন। তিনি বাঙালী সেনাদলের দ্বারা মোগল সম্রাটের বাহিনীকে বার বার পলায়নপর করিয়াছিলেন। তিনি বাঙলায় স্বাধীনতার সূর্যোদয়ের জন্য সাধনা করিয়াছিলেন।

একদিন যে বাঙলার অধিবাসীরা মৎস্যন্যায় হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য গোপালকে রাজা মনোনীত করিয়াছিল; সেই বাঙালীরা যে বিদেশীর ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর নিষ্ঠুর নির্যাতন হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য প্রতাপের মত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বাঙালীকে রাজা করিয়াছিল, ইহা অনুমান করিলে তাহা কি অসঙ্গত হইবে?

হিন্দু যতদিন তাহার ধর্ম হইতে বিচ্যুত হয় নাই, ততদিন সে সবল ছিল। সে ধর্ম কি নির্দেশ দান করিতেছে? স্বামী বিবেকানন্দ সে বিষয়ে বলিয়াছেন:—

"অহিংসা ঠিক, নির্বৈর বড় কথা; কথা ত বেশ। তবে শাস্ত্র বলছেন, তুমি গেরস্ত; তোমার গালে এক চড় যদি কেউ মারে, তাকে দশ চড় যদি না ফিরিয়ে দাও, তুমি পাপ করবে। 'আততায়িনং উদান্তং'—ইত্যাদি; হত্যা করতে এসেছে, এমন ব্রহ্মবধেও পাপ নাই। মনু বলছেন। এ সত্য কথা, এটি ভোলবার কথা নয়। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা; বীর্য প্রকাশ কর, সাম দান ভেদ, দণ্ডনীতি প্রকাশ কর পৃথিবী ভোগ কর, তবে তুমি ধার্মিক।"

প্রতাপাদিত্য হিন্দু ছিলেন—রাজা ছিলেন। সর্বোপরি তিনি বাঙালীকে সবল ও স্বাধীন করিতে চাহিয়াছিলেন। সে জন্য তিনি জীবন দান করিয়াছিলেন।

হয়ত সেই জনাই সেই পুণ্যে—তিনি বন্দী অবস্থায় দিল্লীতে নীত হইবার পথে হিন্দুর ধর্মধানী বারাণসীতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। আমরা তাহা তাঁহার পুণ্যফল বলিয়াছি। কারণ, যে জাহাঙ্গীর আপনার উদ্দাম লালসা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য মেহের-উন্নিসার স্বামীর হত্যান্তে সেই বিধবাকে নূরজাহান করিয়াছিলেন—তাঁহার নিকট নীত হইলে বাঙলার শেষ স্বাধীন বাঙালী নৃপতির কি লাঞ্ছনা ঘটিত তাহা কে বলিতে পারে? তবে শিখগুরুর প্রতি তাঁহার ব্যবহারে, তাহা অনুমান করিতে পারা যায়। বন্দী বান্দাকে ব্যঙ্গ করিবার জন্য রাজবেশে সজ্জিত করিয়া পিঞ্জরাবদ্ধ অবস্থায় মুসলমান সম্রাটের রাজধানীর পথে পথে দেখান হইয়াছিল। তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে তাঁহার পুত্রের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া হৃদ্‌পিণ্ড লইয়া পিতার মুখে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। আর তাহার পরে অগ্নিতাপে রক্তবর্ণ লৌহ সাঁড়াশী দিয়া তাঁহার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটান হইয়াছিল। মোগলদিগের সেই নিষ্ঠুর ব্যবহারই হিন্দু-সম্প্রদায়ভুক্ত শিখদিগকে সামরিক দলে পরিণত করিয়াছিল। সেই সময় যে বৃটিশ দূত রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন, তিনি লিখিয়াছিলেন, যখন বান্দাকে বন্দী করিয়া আনয়ন করা হয়, তখন তাঁহার নিহত ২ হাজার সঙ্গীর মস্তক দণ্ডাগ্রে বদ্ধ করিয়া শোভাযাত্রা করিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার ৭ শত ৮০ জন জীবিত সহচরকে আনা হয়। তাহাদিগকে প্রতিদিন একশত হিসাবে মস্তকচ্ছেদে হত্যা করা হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের রচনায় বান্দার বিষয় আজ বঙ্গবিশ্রুত।

প্রতাপ বারাণসীধামে দেহ রক্ষা করেন।

আজ প্রতাপাদিত্য জয়ন্তী উপলক্ষে আমরা আর একজনের কথা স্মরণ করিতেছি তিনি প্রতাপের পট্টমহারাণী জিতামিত্র নাগের কন্যা। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—"ভারতবর্ষীয় মহিলারা রাজ্য শাসনে সুদক্ষ বলিয়া বিখ্যাত। পশ্চিমে কদাচিৎ একটা জেনোবিয়া, ইসাবেলা, এলিজাবেথ বা ক্যাথরাইন পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতবর্ষে অনেক রাজকুলাঙ্গনারাই রাজ্য শাসনে সুদক্ষ।" তখন তিনি রাজকুলাঙ্গনাদিগের কথাই বলিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার বহু উপন্যাসে তিনি দেখাইয়াছেন, এ দেশে বাঙালী মহিলারাও অনেকে অপরাজেয় মানসিক দৃঢ়তা, অবস্থানুযায়ী কর্মতৎপরতা প্রভৃতির পরিচয় দিয়া থাকেন। শান্তি, প্রভৃতি তাহার নিদর্শন। বাঙলার ইতিহাসে মহারাণী ভবানীর আদর্শ কত সমাদৃত তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। প্রতাপের মহারাণীর কথা বলিবার পূর্বে আমরা বাঙলার আর এক জন মহিলার কথা বলিব। তিনি বিষ্ণুপুরের পট্টমহারাণী। বিষ্ণুপুরের রাজাদিগের অন্যতম মল্লভূমির প্রথা বিস্মৃত হইয়া যবনী নর্তকীর মোহে মুগ্ধ হইয়া যখন সেই নর্তকীর গর্ভজাত সন্তানের অন্নাশন উপলক্ষে প্রজাদিগকে আহারার্থ নিমন্ত্রণ করেন এবং "ভোজনতলা" নামে পরিচিত স্থানে তাহার আয়োজন হয়, তখন অনন্যোপায় হইয়া হিন্দু প্রজারা মহারাণীর শরণাগত হইয়া কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রার্থনা করেন। মহারাণী পত্নীর কর্তব্য, রাণীর কর্তব্য, ধর্ম সম্বন্ধে কর্তব্য সব বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া বলেন, যে রাজা প্রজার ধর্ম হানির কারণ হয়েন, তাঁহার রাজা হইবার অধিকার থাকিতে পারে না—প্রয়োজন হইলে তাঁহাকে বধ করিতে হয়। তিনিই নিশীথে পুরদ্বার অনর্গল করিয়া দিলে প্রজাদিগের কেহ কেহ প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া রাজাকে হত্যা করেন। এইরূপে রাজের রাণীর কর্তব্য সম্পাদন করিয়া মহারাণী হিন্দু নারীর পত্নীর কর্তব্য পালন করেন—স্বামীর চিতায় তাঁহার সহিত সহমৃতা হয়েন।

প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে কিম্বদন্তী আছে, তিনি একবার "কল্পতরু" হইয়াছিলেন—যিনি যাহা চাহিবেন, তাঁহাকে তাহাই প্রদান করিবেন। এক ব্রাহ্মণ মহারাজার মনোভাব পরীক্ষার জন্য মহারাণীকে প্রার্থনা করিলে প্রতাপাদিত্য সত্যরক্ষার্থ রাণীকে ব্রাহ্মণের নিকটে যাইতে নির্দেশ দেন এবং মহারাজকুমার উদয়াদিত্যের জননী তখনই স্বামীর নির্দেশানুযায়ী কাজ করিতে উদ্যত হয়েন। তখন ব্রাহ্মণ মহারাণীকে কন্যা বলিয়া মহারাজাকে দিতে চাহিলে প্রতাপাদিত্য তাহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া শেষে ব্রাহ্মণগণের ব্যবস্থায় সালঙ্কারা পত্নীর সমভার স্বর্ণ ব্রাহ্মণকে দিয়া মহারাণীকে গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণও সেই স্বর্ণ তথায় দরিদ্রদিগকে বিতরণ করেন।

প্রতাপাদিত্য যুদ্ধে পরাভূত ও বন্দী হইলে কি হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে রামরাম বসু লিখিয়াছেন, যখন পুরী লুণ্ঠিত হইল তখন কেহ মহারাণীর আবাসে যাইতে পারিল না—রাঘব রায় অন্তঃপুরদ্বারে যাইয়া বলেন—তথায় পরিজনগণ আছেন, কেহ তথায় যাইতে পারিবে না। কিম্বদন্তী এই যে, প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায় তাঁহার দ্বারা নিহত হইলে বসন্ত রায়ের পত্নী সহমৃতা হইবার সময় অভিসম্পাৎ করিয়াছিলেন—তাঁহার পতিহন্তার পরিজনগণ বিধর্মীর হস্তগত হইবে। প্রতাপমহিষী আপনার সতীত্ববলে সেই অভিসম্পাৎ ব্যর্থ করিয়াছিলেন। পুত্র নিহত ও প্রতাপাদিত্য বন্দী হইলে তিনি সকল স্বজনকে লইয়া—প্রতাপের পরিবারের শিশু পর্যন্ত সকলকে সংগ্রহ করিয়া দৃঢ়তা সহকারে জাহাজে আরোহণ করেন এবং জাহাজ সাগরাভিমুখে চালনা করিতে আদেশ করেন। জাহাজ চলিল। যে স্থানে জল গভীর ও চঞ্চল জাহাজ তথায় উপনীত হইলে তিনি আদেশ করিলেন—কামান হইতে গোলা চালাইয়া জাহাজের তলদেশ নষ্ট করা হউক। কামানের গর্জনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জাহাজ জলমগ্ন হইল—জলে বুদ্বুদ উঠিয়া জলে মিশাইয়া গেল। প্রতাপের বংশে আর কেহ রহিলেন না—মহারাণী এই সান্ত্বনা লইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন যে, তাঁহার স্বামীর বংশে কেহ যবনের হস্তগত হইলেন না।

তাহার পরে দীর্ঘ ৩ শত বৎসর অতীত হইয়াছে প্রতাপের প্রতিষ্ঠিত দুর্গ নগর আজ ভগ্নাবশেষে পরিণত হইয়া অরণ্যাচ্ছন্ন হইয়াছে। সেই ভগ্নস্তূপে আজ বিষধর সর্প বাস করিতেছে—সেই অরণ্য এখন শার্দুলের গর্জনে মুখরিত হয়—যে জলপথ একদিন বহু রণতরীর গমনাগমনে চঞ্চল থাকিত, তথায় কুম্ভীর বিচরণ করিতেছে।

সে সব গিয়াছে। সে সব যেন স্বপ্ন!

কিন্তু সে সব ত স্বপ্ন নহে। তবে কেমন করিয়া বলিব, সব গিয়াছে?

একদিন উড়িষ্যায় প্রস্তর শিল্পের নিদর্শন দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—এ সকল যাহাদিগের কীর্তি তাহারা কি আমাদিগেরই মত হিন্দু? তিনি আপনিই সে প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেনঃ—

"মনে পড়িল, উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, পাণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, বৈশেষিক, এ সকলই হিন্দুর কীর্তি—এ পুতুল কোন্ ছার! তখন মনে করিলাম, হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি।"

তাই আজ যখন ইতিহাস কিম্বদন্তীতে অন্তর্গত হইয়াছে, তখন দীর্ঘ ত্রিশত বৎসরেরও অধিককাল পূর্বে যে বাঙালী একদিকে মগ ও ফিরিঙ্গীর সহিত এবং আর একদিকে পাঠান ও মোগলের সহিত অমিতবিক্রমে বাঙালী সেনা লইয়া স্থলে ও জলে যুদ্ধ করিয়াছিলেন—স্বাধীনতা লাভের প্ররোচনায় ও উত্তেজনায় অসম্ভব সম্ভব করিয়াছিলেন; তাঁহার ছিন্ন পতাকার উদ্দেশে বাঙালী কবি দীর্ঘ তিন শতাব্দীর ব্যবধানে সদর্পে বলিয়াছিলেন যেন ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেনঃ—

"বাঙালী বলিয়া গর্বে—সাহসে একতা-বলে
আবার দাঁড়া'ব মোরা এ ছিন্ন-পতাকা-তলে"

সেই প্রতাপের কথা স্মরণ করিয়া আমরা মনে করি, বাঙালী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম-সার্থক করিয়াছি।

ইংরেজ ঐতিহাসিক হাণ্টার বলিয়াছেন, বাঙালীরা উদ্যমশীল নাবিক ছিল; আজ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তনে তাহারা সে কাজে লিপ্ত হয় না। কিন্তু সুযোগ পাইলে সে তাহারা আবার পূর্ণ দক্ষতার পরিচয় দিতে পারিবে, তাহা মনে করা অসঙ্গত নহে। যে সামরিক প্রতিভা অনুশীলনের সুযোগ লাভ করিয়া মহারাজা প্রতাপাদিত্যের স্বাধীন বাঙলা রাজ্য স্থাপনে আপনাকে প্রযুক্ত করিয়া সার্থক করিবার আয়োজন করিয়াছিল, তাহা প্রতাপের রাজপথের, দুর্গের, প্রাসাদের ও নগরের ধ্বংসাবশেষতলে লুপ্ত হইতে পারে না। তাহা জাতির জাতীয় সম্পদ এবং আমরা যে এখনও তাহার পরিচয় পাইয়া থাকি, তাহা বলা বাহুল্য। অভাব কেবল সুযোগের। বহুকাল পূর্বে যেমন এক বাঙালী যুবক সিংহলে যাইয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তেমনই কয় বৎসর মাত্র পূর্বেও এই বাঙলার এক বরেণ্য সন্তান দেশাত্মবোধ সাধনার অপরাধে স্বদেশ ত্যাগে বাধ্য হইয়া পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক অবস্থায় দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার সম্পূর্ণ ইতিহাস যখন রচিত হইবে, তখন কেবল ভারতবাসীরা নহে—সমগ্র জগতের লোক বিস্মিত ও মুগ্ধ হইবেন, সন্দেহ নাই। তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন, প্রতাপের দেশাত্মবোধ প্রতাপের পরাভবে বিচলিত হয় নাই—তাহা জাতির জয়যাত্রায় অমূল্য উপকরণরূপেই জাতির হৃদয়ে বিরাজিত; জাতির কার্যে ও চিন্তায়, জাতির ধ্যানে ও ধারণায় তাহার প্রভাব অনুভূত হইতেছে।

বাঙালী কবি সেই জন্যই "যশোর যুদ্ধের" কথা—সেই মর্মবেদনার বিকাশ কবিতায় প্রকাশ করিবার সময় প্রতাপাদিত্য বন্দী হইবার পরে সেনাপতি সূর্যকান্তের—বাঙালী সূর্যকান্ত গুহের ভগ্ন ছত্র একত্রিত করিবার শেষ চেষ্টার ব্যর্থতায় আর্তনাদ করিয়াছেনঃ—

"বৃথা আশা! অবরোধ আঘাতে আঘাতে টলে,
ডুবিল উদয়াদিত্য! গেল সূর্য অস্তাচলে!
পড়িল মদন, রুড়া! ক্রমে সুবা, সেনা লীন!
বন্দী-মৃতকল্প প্রভু! বঙ্গ আজ পরাধীন!"

বাঙলার স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া তাহা রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত বাঙালীর জন্য বাঙালী কবির এই আর্তনাদ—পোলাণ্ডের কথায় ক্যাম্পবেলের মর্মবেদনাব্যঞ্জক আর্তনাদ অপেক্ষাও মর্মস্পর্শী—

**"Hope, for a season, bade the world farewell,
And Freedom shriek'd as Kosciusko fell."**

বাঙলার প্রতাপাদিত্য—বাঙালী প্রতাপাদিত্য আজ জীবিত নাই।

"জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে?
চিরস্থির কবে নীর হায়রে জীবন-নদে।"

মানুষের মৃত্যু হয়—আদর্শের মৃত্যু হয় না। প্রতাপের আদর্শ দীর্ঘ তিন শতাব্দীরও অধিককাল বাঙলাকে সুরভিত করিয়া রাখিয়াছে। বাঙলার আকাশ এখনও সেই স্মৃতিসমুজ্জ্বল; বাঙলার বাতাস তাঁহার তূর্যনাদে মুখরিত। তাই এই দীর্ঘকালের মধ্যে বিদেশীর বিজয়-বাত্যাবিধ্বস্ত, বিজাতীয়ের আক্রমণ-প্লাবনোৎপীড়িত এই দীর্ঘকালের মধ্যে বহুবার প্রতাপের সাধনা মূর্তি গ্রহণের চেষ্টা করিয়াছে।

প্রতিকূল অবস্থা হেতু হয়ত সে চেষ্টা অনেক সময় বিলয়ভূয়িষ্ঠ বিদ্যুতের মতই হইয়াছে অথবা জলে জলবিম্বপ্রায় হইয়াছে। কিন্তু তাহার পুনঃ পুনঃ আবির্ভাবে তাহার স্থায়িত্বের ও সজীবতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। বিলম্ব হয়ত বাঙালীর যোগ্যতার পরীক্ষা। আমাদিগের মনে করিবার কারণ আছে—নূতন নূতন বিপদও পদদলিত করিয়া বাঙালী তাহার জন্মগত অধিকার লাভের জন্য অগ্রসর হইবে এবং সাফল্যের সিংহদ্বার তাহারই বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্ট মন্ত্রোচ্চারণে—"বন্দে মাতরম্" রবে মুক্ত হইয়া তাহাকে তাহার সাধনার স্বর্গে প্রবেশাধিকার প্রদান করিবে। তথায় সে মন্দিরের রত্নবেদী ভক্তির গঙ্গোদকে ধৌত করিয়া তাহাতে দেশমাতৃকার প্রভাতারুণকিরণে হাস্যময়ী মাতৃমূর্তি তাহার শ্রদ্ধার পঞ্চপ্রদীপ মনীষার গব্য ঘৃতে পুষ্ট শিক্ষাসমুজ্জ্বল করিয়া জননী জন্মভূমির পূজা করিবে।

তাই আজ প্রতাপ জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে অক্ষয়কুমারের অক্ষয় প্রতিভার দান গাথার উপসংহার আবৃত্তি করিতেছিঃ—

"আছে মাত্র এই কেতু—অতিদূরগত-স্মৃতি,—
বাঙলার বীরগর্ব—বাঙালীর দেশপ্রীতি!
নিষ্কলঙ্ক গাঢ় তপ্ত হৃদি-রক্তে সুরঞ্জিত!
প্রতি ছিন্নে—ছিন্ন অংশে সহস্র মহিমা-গীত।
প্রতি ছিন্নে—ছিন্ন অংশে কত ধ্যান, কত জ্ঞান,
কত ত্যাগ, অনুরাগ—দেখ আছে দীপ্যমান!
বিজয়ে করিছে হেয়—পরাজয় পুণ্য রাগে।"

আজ প্রতাপের স্মৃতি বাঙালীকে বলিতেছে!
"লহ এই কীর্তিকেতু।"

আর সঙ্গে সঙ্গে দেশমাতৃকা যশোরেশ্বরীরূপে সেই কেতুর কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার সন্তানদিগকে আশীর্বাদ করিতেছেন—বরাভয় দিয়া প্রতাপের কথা স্মরণ করিতে উপদেশ নির্দেশ দিতেছেন। *

* প্রতাপাদিত্য জয়ন্তী উৎসবে সভাপতির ভাষণ।

সাহিত্য প্রসঙ্গ

নব্বই বছরের মানুষ বার্ণার্ড শ'

মণি বাগচী

জর্জ বার্নার্ড শ', সংক্ষেপে জি বি এস। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত অত্যন্ত সুপরিচিত একটি নাম। তারও চেয়েও পরিচিত এই নামের যে অধিকারী সেই অত্যাশ্চর্য প্রকৃতির মানুষটি। সেই জি বি এস আজ প্রায় শতায়ু লাভ করতে চলেছেন। ১৯৪৬ সালের ২৬শে জুলাই তারিখে শ' নব্বুয়ের কোঠায় পা দিয়েছেন। এই দিন তাঁর দীর্ঘকালের প্রতিবেশী ও জার্মান বন্ধু ফ্রেডারিক লোয়েনস্টিন যখন তাঁকে শুভ ইচ্ছা জানাতে আসেন তখন শ' তাঁকে বললেন : "আমি আজ বৃদ্ধ, বধির এবং একটা বিরাট শূন্যের সামিল। এক কথায়, আমি আজ অতীতকালের" ("I am old, deaf and dotty. In short, a Has-Been"), তখন লোয়েনস্টিন তার উত্তরে শ'কে বলেছিলেন, "বৃদ্ধ আপনি হয়েছেন তা স্বীকার করি। কিন্তু এ কথাতো অস্বীকার করতে পারিনে যে সর্ব-ধ্বংসী কাল আপনার মনের ওপর কিছুমাত্র প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি, আদৌ সক্ষম হবে কিনা সন্দেহ। দীর্ঘায়ু লাভ করাটা খুব বড় কথা নয়, তার চেয়েও বড় কথা হোলো জীবনের পরিমিত পরিধি অতিক্রম করে ইতিহাসের ব্যাপ্তি লাভ করা। বিংশশতকের মানুষ আপনাকে তাই আজ জেনেছে নাট্যকার বা সমালোচক হিসেবে নয়, জেনেছে এক বিরাট ইতিহাসের জীবন্ত প্রতীক হিসেবে এবং সেই ইতিহাসের মধ্যে তারা পেয়েছে নতুন কথা, নতুন চিন্তা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি।" এত সব কথা শোনবার পর শ' কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন, তারপর ধীরে ধীরে এই কটা লাইন আবৃত্তি করলেন :

> "Sopho'cles, Plato, Socrates,
> gentlemen,
> Pythagoras, Thucidides, Herodotus,
> and Homer—yea
> Clement, Augustin, Origen,
> Burnt brightlier towards their
> setting day, gentlemen."

ঠিক এই সময় লণ্ডন টাইমস্-এর একজন বিশেষ প্রতিনিধি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন এবং শ'য়ের নব্বুই বছর বয়স হওয়া উপলক্ষ্যে টাইমস সম্পাদক শুভেচ্ছাপূর্ণ যে চিঠিখানি তাঁকে লিখেছেন, সেই চিঠিখানি তাঁর হাতে দিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, অন্যান্য দু'চারটি কথার পর শ' দেখলেন যে কটা লাইন তিনি এইমাত্র তাঁর বন্ধুকে আবৃত্তি করে শোনালেন, সম্পাদকের চিঠিতে ঠিক সেই লাইন কটাই উদ্ধৃত হয়েছে। শুধু তাই নয়, সম্পাদক আবার শেষের লাইনটি Burnt brightlier towards their setting day, gentlemen—" বিশেষভাবে দাগ দিয়ে দিয়েছেন। পত্রিকার প্রতিনিধিকে

'দি সেল্‌টার' নামক নিরালা গৃহে সাহিত্য রচনায় ব্যাপৃত বার্ণার্ড শ'

শ' বললেন—"তোমার সম্পাদককে বলো, তাঁর শুভ ইচ্ছার সঙ্গে জি বি এসের প্রতি জি বি এসের শুভ ইচ্ছার সাদৃশ্যটা এত বেশীরকমের যে আমার সন্দেহ হচ্ছে আমি সত্যিই অস্তমিত কি না।"

শ' সত্যিই ইতিহাস। তিনি মানুষ এবং অতি মানুষ দুইই। এক জীবনে নির্মম কালের প্রভাবকে স্বচ্ছন্দে অতিক্রম করে কালজয়ী হয়ে ওঠা এবং ক্রমিক-পর্যায়ভুক্ত হওয়া বিংশ-শতকের আর কোনো সাহিত্যিকের ভাগ্যে ঘটেনি। জীবনের প্রান্তসীমায় পৌঁছেও এই মানুষটি আজও তেমনি সক্রিয় এবং সৃজনী-শক্তিসম্পন্ন। তেমনি উচ্ছল আজো তাঁর প্রাণের প্রাচুর্য। তাঁর লেখনী আজও তেমনি ক্লান্তিহীন এবং নির্ভীক যেমন ছিল ষাট বছর আগে। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে নানা ঘটনা ও দুর্ঘটনার সমাবেশ। বার্ধক্যশিথিল দেহ বয়সের ভারে ঈষৎ অবনমিত, গায়ের চামড়ার লোল-স্বচ্ছতা এবং তরল নীল দুটি চোখ—এর ভেতর দিয়েই মনে হবে, শ'য়ের বয়স নব্বুয়ের চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু এই বয়সেও তাঁর উজ্জ্বল স্বাস্থ্যের অম্লান দীপ্তি পৃথিবীর মানুষকে এই কথাই জানিয়ে দেয় তিনি সত্যিই একজন গ্রেট কমেডিয়ান। পৃথিবীকে, মানুষের সমাজ ও সভ্যতার অন্তরালের যত কিছু কাপট্য, ভণ্ডামী আর শঠতাকে পারিবারিক নীতির অন্তরালে সনাতন দুর্নীতিকে, প্রচলিত রীতি নীতি ও বিশ্বাসকে এমন কি বিজ্ঞানের

গোঁড়ামিকে পর্যন্ত তিনি যেমন ব্যঙ্গ করেছেন তেমনি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠও দেখিয়েছেন মহাকালের প্রভাবকে। সেক্সপীয়রকে তিনিই প্রথম আঘাত করেছিলেন; ডারুইন ও কার্ল মার্কস সম্বন্ধে তিনিই সর্বরকম স্পর্ধিত মন্তব্য করেন "They were neither of them illuminating or creative thinkers: they were neither of them original...." ব্যঙ্গ করেছেন, বিদ্রূপ করেছেন স্পষ্ট এবং রূঢ় কথার কষাঘাতে মানুষকে সচকিত করে বলেছেন—নতুন করে জীবন সম্বন্ধে ভাবতে ইঙ্গিত দিয়েছেন—নব্বুই বছর ধরে এই একটি মানুষ এইভাবে এক জীবনে পর্বে পর্বে ইতিহাস হয়ে উঠেছেন। ইতিহাসের যা ধর্ম শ'য়ের জীবনের গতি ও প্রকৃতি অনুশীলন করলে পরে দেখা যাবে তাঁর মধ্যেও সেই ধর্ম অতিমাত্রায় প্রকট। সেই জন্যেই তাঁর জীবনীকার হেসকেথ পিয়ার্সন লিখেছেন : "মানুষের চিন্তার এমন কোনো দিক নেই যেখানে আজ শ'য়ের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব অনুভব করা যায় না।" সমসাময়িক যুগের ওপর এবং পরবর্তী যুগের ওপরও এই যে একটি মানুষের প্রভাব এ কেমন করে সম্ভব? সম্ভব শুধু এই কারণেই প্লেটো, সক্রেটিস প্রভৃতি পূর্বাচার্যগণের মত তিনি নিছক প্রচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন নি। তাঁর যা বক্তব্য তা তিনি বলেছেন ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের ভেতর দিয়ে। শ'য়ের প্রতিভার চরম চরিতার্থতা এইখানেই। তিনি জি বি এস—এর বেশী তিনি কিছু হোতে

শ'য়ের শয়ন গৃহের একটি কোণ : দেওয়ালে টাঙানো ছবিটি তাঁর পরলোকগতা পত্নীর। অন্যান্য জিনিষগুলির মধ্যে পোর্সিলেনের তৈরী শেক্সপিয়ারের একটি মূর্তি দেখা যাচ্ছে।

চান না। তাই তিন বছর আগে তিনি যেমন Peerage এবং বৃটেনের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ রাজদণ্ড সম্মান "Order of Merit" প্রত্যাখ্যান করেন তখন রাজপ্রতিনিধি তাঁর মুখ থেকে এই কথা শুনে শুধু বিস্মিত হন নি, শ্রদ্ধায় ও সম্ভ্রমে তাঁর মাথা নত হয়ে গিয়েছিল; "I believe the name Bernard Shaw needs no adernment." এই কথা দাম্ভিকের নয়—এ কথা বাচালের নয়, এ কথা সেই মানুষের যাঁর জীবন জীবনকে অতিক্রম করে ইতিহাসের মহিমায় দেদীপ্যমান। এমনি দুর্জয় সাহস আর অপরিসীম কৌতুক আমরা দেখেছিলাম বহুকাল পূর্বে আর একটি মানুষের মধ্যে। তিনি ভলটেয়ার। সিংহপ্রতিম ভলটেয়ারের সঙ্গে শ'য়ের মিলও আছে অনেকটা—আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে।

নব্বুই বছরের মানুষ। আজ তিনি জগদ্বিখ্যাত। কিন্তু এমন একদিন গিয়েছে তাঁরই জীবনে যখন কেউ তাঁকে আমল দেয়নি। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে "immaturity" নামে তাঁর লেখা প্রথম গল্পটি অনেক চেষ্টা করেও তিনি লণ্ডনের কোনো কাগজে প্রকাশ করতে সমর্থ হননি। তাঁর প্রথম জীবনের লেখা পাঁচখানা উপন্যাসের একখানাও সেদিন কোনও প্রকাশক ছাপাতে রাজী হয়নি। কেন হয়নি—তার উত্তরে শ' বলেন : "সম্ভবত ভাষার দিক থেকে আমার এই নভেলগুলো ১৫০ বছর পিছিয়ে ছিল, এবং ভাবের দিক দিয়ে এগুলো এগিয়ে ছিল ১৫০ বছর। কিন্তু আসল কথা, আমিই ভুল করেছিলাম ঐসব মূর্খ ও অজ্ঞ প্রকাশকদের দরজায় নিজে গিয়ে।" এমনি ভাবে জীবনের প্রথম চল্লিশ বছর শ' কাটিয়েছেন দারিদ্র্য আর নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ভেতর দিয়ে। সেই দারিদ্র্য যে কী অসহনীয় ছিল তা বলবার নয়। ডাবলিন থেকে আইরিশ যুবক যেদিন লণ্ডনে এলেন সেদিন লণ্ডনের সাহিত্য-সমাজে তাঁর প্রবেশ-লাভ খুব সহজসাধ্য হয়নি। পার্কে পার্কে বক্তৃতা করে তাঁকে তখন সপ্তাহে পনেরো শিলিঙ রোজগার করতে হতো। কিন্তু যেদিন তিনি নিজেকে আবিষ্কার করলেন, যেদিন তাঁর অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় তিনি পেলেন, সেদিন তাঁর গতি প্রতিরোধ করা আর কারো সাধ্য ছিল না। তারপর যখন ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন হলেন, তখনও মানুষটির মধ্যে কোনোরকম পরিবর্তন দেখা গেল না। তিনি যে একজন বিত্তশালী লেখক এ অহঙ্কার একদিনের জন্যেও শ' করেন নি। এবং সেই কারণেই তাঁর চিন্তায় এতটুকু আবিলতার স্পর্শ লাগেনি। শ' যখন ১৯০৬ সালে লণ্ডনের কিছু দূরে বসবাস করবার জন্যে তিনতলা বাড়িখানা কেনেন সেই সময় তাঁর অন্যতম বন্ধু ও জীবনীকার ফ্রাঙ্ক হ্যারিস তাঁকে একদিন রহস্যচ্ছলে জিজ্ঞাসা করেন—"বন্ধু এখন তো পয়সার মুখ দেখেছ কী রকম মনে হচ্ছে?" উত্তরে শ' তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে হ্যারিসকে বললেন : "You want to know what it feels like to be a richman. But unfortunately, I am far too busy to enjoy money. I have more than I want, and I have had nothing; and the diference in happiness has been negligible."

নব্বুই বছরের মানুষ। মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে তিনি রাজত্ব করতে দেখেছেন; দুই মহাযুদ্ধের তিনি সাক্ষী এবং বিজ্ঞানের আধুনিকতম সৃষ্টি এ্যাটম্ বমের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হোলো। ইউরোপের মানচিত্রের কত পরিবর্তনই না তিনি এক জীবনে দেখলেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে ইংলণ্ডে যে সমাজতন্ত্রবাদ নিতান্ত অবজ্ঞার ও তামাসার জিনিস ছিল, শ'য়ের লেখনী ও প্রচেষ্টা সেই সমাজতন্ত্রবাদকে এমন দৃঢ় বুনিয়াদের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে যে পরবর্তী কালে ইংলণ্ডের শাসনকার্য পরিচালনায় সমাজতন্ত্রীরা অধিকার পেয়েছে। আর কিছুর জন্যে না হোক, অন্তত এই একটি মহৎকার্যের জন্যে ইংলণ্ড চিরকাল এই মানুষটার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। সিডনীওয়েব তাই বলেন—"সেক্সপীয়র বড়ো, কি শ' বড়ো; হ্যামলেট শ্রেষ্ঠ নাটক, কি ম্যান এণ্ড সুপারম্যান্ শ্রেষ্ঠ নাটক এ তর্কের বিষয়, কিন্তু ইংলণ্ডের রাজনীতি আজ যে এতখানি প্রগতিশীল হয়েছে এর সকল কৃতিত্ব একটি মানুষেরই প্রাপ্য। তিনি বার্নার্ড শ'।"

নব্বুই বছরের মানুষ! কিন্তু এই বয়সেও তাঁর মৌলিক চিন্তার বিদ্যুৎ চমক দেখে বিস্মিত হতে হয়। এই তো সেদিনও তাঁর মুখ থেকেই আমরা শুনলাম : "ইংলণ্ডের বর্তমান শাসনকার্যে চিন্তার যে লজ্জাকর দৈন্য দেখতে পাচ্ছি, তাতে আমার মনে হয় আমাদের এখন এমন একটি মানুষের প্রয়োজন যে চিন্তা করতে জানে অর্থাৎ একজন চিন্তাসচিবের (Thought Minister)। এ কথা কমেডিয়ান শ'য়ের নয়, ঐতিহাসিক দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন শ'য়ের। আজকের দিনের পৃথিবীতে এই কথাটির তাৎপর্য উপলব্ধি করবার মতন।

তাঁর গুণমুগ্ধ কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও রাষ্ট্রনীতিকরা মিলে তাঁর জীবনে নব্বুই বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে একখানি স্মারকগ্রন্থ রচনা করে শ'কে উপহার দিয়েছেন। বইটির নাম "G. B. S. 90"—এই বইখানিতে তাঁর বহুমুখী প্রতিভার এবং বৈচিত্র্যময় [illegible]জীবনের আলোচনা করেছেন একাধিক [illegible]। তাদের মধ্যে আল্ডুস হাক্সলি শ'য়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এক সুচিন্তিত প্রবন্ধে অন্যান্য কথার পর লিখেছেন :

"Are we justified in despising him when we survey his achievements? If he has done this much in so short a time how much more may we believe he may do in time to come? Consider the work of the venerable sage whom we are now discussing. Does he not give us cause for pride in our species? This one man, will no other advantages than he has himself made has energized the minds of multitudes. He stimulates the youths of today as vigorously as he stimulated the youth of half a century ago. His vitality has

no dependence on time. It belongs to his spirit. Age is unable to wither Shaw.'

শয়ের জীবনেতিহাস ও জীবনদর্শনের সঙ্গে যাঁদের নিগূঢ় পরিচয় আছে, তাঁরাই স্বীকার করবেন গুরুর প্রতি শিষ্যের এই উক্তি আদৌ অত্যুক্তি নয়। তাঁর বন্ধুরা সকলেই আশা করেন যে এই 'Vegetarian, teetotaler ও non-smoker মানুষটি আরও অন্তত পঁচিশ বছর বাঁচবেন। আমরাও আশা করি "ম্যান এন্ড সুপারম্যানের" বিস্ময়কর স্রষ্টা শতায়ু হোন। পৃথিবীর মানুষ তাঁর কাছ থেকে আরও অনেক কিছু প্রত্যাশা করে।

দীর্ঘ ১০ বর্ষকাল মুসলিম লীগ সচিব সংঘের শাসনের নামে কুশাসনে জর্জরিত বাঙলাকে হিন্দুর ধন, প্রাণ, মান, ধর্ম, সংস্কৃতি, উন্নতি রক্ষা করিবার জন্য বিভক্ত করা যত অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী হইতেছে সুরাবর্দী-হাসেম কোম্পানীর তাহার বিরোধিতা করিবার চেষ্টা ততই রূপান্তর গ্রহণ করিতেছে। এমন কি তাঁহারা এতদিন যে বলিয়া আসিয়াছেন—হিন্দু ও মুসলমান দুই ভিন্ন জাতি, এখন তাহাও অস্বীকার করিয়া কার্যসিদ্ধির চেষ্টা করিতে লজ্জানুভব করিতেছেন না।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে সার আবদর রহিম আলিগড়ে মুসলিম লীগের অধিবেশনে প্রথম দুইটি মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিভেদ নীতির সূচনায় সহকারী হইয়াছিলেনঃ—

(১) "কোন কোন হিন্দু নেতা প্রকাশ্যে বলিয়াছেন—মুসলমানগণ যদি শুদ্ধির দ্বারা হিন্দু না হয় অথবা হিন্দুদিগের রাজনীতিক কার্যপদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ না করে, তবে স্পেনের লোকরা যেভাবে মুরদিগকে স্পেন হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল, মুসলমানদিগকে সেইভাবে ভারতবর্ষ হইতে দূর করিয়া দিবেন। শুদ্ধি ও রাজনীতিক কার্য-পদ্ধতি গ্রহণ একের দ্বারা অপর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।"

বলা বাহুল্য, কোন হিন্দু নেতা এইরূপ উক্তি কখন করেন নাই। হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হইলেও কখন "মারকে লেঙ্গে হিন্দুস্থান" বলেন নাই।

(২) "কোন ভারতীয় মুসলমান যদি আফগানিস্থানে, পারস্যে, মধ্য এশিয়ায়, চীনা মুসলমানদিগের মধ্যে, আরবীয়দিগের বা তুর্কীদিগের বা মিশরীদিগের বা রীফিদিগের মধ্যে গমন করেন, তবে তাহাদিগের ও আপনাদিগের মধ্যে কোনরূপ অনভ্যস্ত আচার ব্যবহার অনুভব করিতে পারিবেন না। অথচ ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান এক শহরে বাস করিলেও মুসলমানগণ পথের পরপারে হিন্দু-প্রতিবেশীর আবাসাঞ্চলে যাইলে সম্পূর্ণ বিভিন্ন সামাজিক অবস্থার মধ্যে যাইয়া পড়েন।"

তবে তখনও বলা হয় নাই, হিন্দু ও মুসলমান এক জাতি নহে—মেদিনীপুরের রহিমের বা সুরাবর্দীর পূর্ব পুরুষেরা যাহাই কেন থাকিয়া থাকুন না—তাঁহাদিগের জ্ঞাতিত্ব আরব বা সোমালী বা সুদানীদিগের সহিত। তাহা ক্রমোন্নতির ফল।

এই নূতন দাবী যে রাজনীতিক কারণ হইতে উদ্ভূত তাহার প্রমাণাভাব নাই এবং বোধ হয়, বিলাতের রক্ষণশীল দলের পত্র 'অবজারভার' পত্রের সম্পাদক গার্ভিন প্রথম তাহার দিকে মুসলমানদিগের ও ইংরেজদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন। তিনি বলেন, মুসলমানগণ পৃথিবীর সর্বপ্রধান সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় তাহাদিগের সমর্থনকে ভারতে ইংরেজ লাভ করিতে পারেন নাই, তাহার জন্য ইংরেজই দায়ী।

ইংরেজের ভেদনীতি দিন দিন প্রবল হইয়াছে এবং ইংরেজ মুসলমানদিগকে নানারূপ অধিকার দিয়া তুষ্ট করিয়া আসিয়াছে—এখনও সে নীতি চলিতেছে এবং বাঙলায় য়ুরোপীয় সম্প্রদায় যেভাবে মুসলিম লীগ সচিবসঙ্ঘের দ্বারা আপনাদিগের স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ দানের বিনিময়ে সেই সচিবসঙ্ঘকে সমর্থন করিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে বঞ্চিত হইলে লীগের পক্ষে হিন্দুর ধন, প্রাণ, মান, ধর্ম সকল বিপন্ন করিয়া বাঙলায় প্রাধান্য পরিচালন কখনই সম্ভব হইত না। আজ যখন মুসলিম লীগের যুক্তিতেই বাঙলাকে বিভক্ত করা সমর্থিত হইতেছে, তখন নাকি বাঙলার য়ুরোপীয় দল—অন্তত কলিকাতা ও কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ শিল্পকেন্দ্র জাতীয়তাবাদী স্বতন্ত্র পশ্চিমবঙ্গে দিতে আপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন।

কিন্তু ক্লাইব যে ব্যবহার দ্বারা পলাশীর যুদ্ধের সময় স্বার্থসিদ্ধি করিয়াছিলেন—সেই ব্যবহার ব্যতীত বিলাতী সরকার কিরূপে বাঙলার হিন্দুদিগকে কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গ পাকিস্থানভুক্ত করিতে বলিতে পারেন? ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মে ভারত-সচিব যে পরিকল্পনা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি—পাকিস্থানের বিরুদ্ধে যুক্তি দিয়াছিলেন: হিন্দু প্রধান কলিকাতাকে ও পশ্চিমবঙ্গকে কোনমতেই পাকিস্থানভুক্ত করা যায় না।

সেই জন্যই আজ মিস্টার সুরাবর্দীও বলিতে পারিতেছেন না—বাঙলাকে স্বাধীন, স্বতন্ত্র সার্বভৌম রাষ্ট্র করিয়া পাকিস্থানভুক্ত করা হইবে কি না, তাহা পরে বিবেচ্য। অবশ্য তাঁহার "মুখের হাসি চাপলে কি হয়? মনের হাসি চোখে খেলে"; তিনি তখন বাঙলাকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত করিবার বিরোধী তখনই তাঁহার মনের কথা প্রকাশ পাইয়াছে।

তিনি একদিকে বলিতেছেন, হিন্দু ও মুসলমান ভারতবর্ষে উভয়ে ভিন্ন জাতি; আর একদিকে বলিতেছেন, বাঙলায় হিন্দু ও মুসলমান একই জাতি!

তিনি একদিকে বলিতেছেন, হিন্দুরা জ্ঞানে গুণে যোগ্যতায় এত শ্রেষ্ঠ যে কেহ তাঁহাদিগকে অধীন করিয়া রাখিতে পারে না; আর একদিকে বলিতেছেন, বাঙলা বিভক্ত হইলে রাষ্ট্রসঙ্ঘে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীরা "নস্যাৎ" হইয়া যাইবেন।

তিনি বলিতেছেন, বাঙলা বিভাগ করা বাঙলার হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই পক্ষে আত্মহত্যার নামান্তর মাত্র হইবে। ইহাতে কি বুঝিতে হইবে যে বাঙলার হিন্দুর পক্ষে পাকিস্থানে মুসলমানের অধীন থাকিয়া মুসলমান কর্তৃক ত্রিপুরায় ও নোয়াখালিতে যেমন হইয়াছে তেমনই বলে ধর্মান্তরিত হওয়া বা নির্মূল হওয়াই শ্রেয়ঃ—আর, তাহাই বাঙলার হিন্দুদিগের নিয়তি ও গতি?

কিভাবে বাঙলার মুসলিম লীগ সচিবসঙ্ঘ বিহার হইতে মুসলমান আনিয়া পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। পশ্চিমবঙ্গে সরকার "পতিত" জমী—নামমাত্র মূল্য দিয়া খাস করিবার জন্য আইন প্রণয়ন করিতেছেন—ব্যবস্থা পরিষদে তাঁহাদিগের ভোটের আধিক্য-হেতু তাঁহারা যে কোন আইন বিধিবদ্ধ করিয়া লইতে পারেন। জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল—ঐ সকল জমী খাস করিয়া সরকার কি সে সকলে বিহারী মুসলমান পত্তন করিবেন? তাহার পূর্বেই কোন পাকিস্থানী সংবাদপত্র বলিয়াছিলেন, ঐ সকল জমী খাস করিয়া বিহারী মুসলমান পত্তন করাই বাঙলার মুসলিম লীগ সচিবসঙ্ঘের কর্তব্য। জিজ্ঞাসায় সচিবদিগের পক্ষ হইতে প্রথমে বলা হইয়াছিল—বাঙলায় কেবল বাঙালীই নাই; সুতরাং যদি কখন বিহারী মুসলমানরা বাঙলা সরকারের পোষ্য হয় তবে জমি বিলি করিবার সময় বাঙালীদিগের সহিত তাহাদিগের কোন প্রভেদ করা হইবে না। তাহার পরে গত ৬ই মে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক

সভায় অন্যতম সচিব মিস্টার মুয়াজ্জেম উদ্দীন হোসেন বলিয়াছেন—"পতিত" জমী খাস করার আইন বিধিবদ্ধ হইলে হিন্দুদিগের পশ্চিমবঙ্গে প্রাধান্য লাভের স্বপ্ন বিফল হইবে। সেই জন্যই মুসলিম লীগ সচিবসঙ্ঘ যথাসম্ভব শীঘ্র ঐ আইন বিধিবদ্ধ করিয়া লইবেন।

এই উক্তির সহিত যুক্ত হইয়া নোয়াখালিতে ও ত্রিপুরায় গৃহদাহের, লুণ্ঠনের, হত্যার ও বলপূর্বক হিন্দুদিগকে ধর্মান্তরিত করার যে হিসাব সরকার দিয়াছেন, তাহা যে বাঙলার হিন্দু ও অন্য জাতীয়তাবাদীদিগকে বাঙলা বিভক্ত করিবার আন্দোলন প্রবল করিতে প্ররোচিত করিবে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ মাত্র থাকিতে পারে না।

মিস্টার সুরাবর্দী ও তাঁহার সমর্থকগণ বলিতেছেন, বর্তমানের সহিত ভবিষ্যতের কোন সম্বন্ধ নাই; বর্তমান বাঙলার রাজনীতির সহিত ভবিষ্যৎ অর্থাৎ তাঁহাদিগের পরিকল্পিত স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও সার্বভৌম বাঙলার রাজনীতির কোন সাদৃশ্য থাকিবে না। কিন্তু তাঁহাদিগের এই উক্তির সমর্থক কোন যুক্তি তাঁহারা দিতে পারিতেছেন না। যদি তাঁহাদিগের উক্তি যুক্তিসহ ও আন্তরিকতাপ্রসূত হইত, তবে গত ১০ বৎসরে তাঁহারা অবশ্যই তাহার পরিচয় দিতে পারিতেন।

আজ মিস্টার সুরাবর্দী বলিতেছেনঃ—

বাঙলার সমস্যা ও ভারতবর্ষের সমস্যা একরূপ নহে। বাঙালীরা (অর্থাৎ বাঙলার হিন্দু ও মুসলমান) একই জাতি; তাহাদিগের ভাষা এক; তাহাদিগের অনেক বিষয়ে পরস্পরের বিষয় বুঝিতে পারে এবং উভয়ের মঙ্গলের জন্য একযোগে কাজ করিতে পারে।

কিন্তু বাঙলা বিভাগের জন্য আন্দোলন আরম্ভ হইবার পূর্বদিন পর্যন্ত কি তিনি ইহাই অস্বীকার করেন নাই? তিনি স্বয়ং কি (তাঁহার পিতার মত) বাঙলাকে মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করেন? তিনি কি হিন্দু ও মুসলমান ভিন্ন জাতি বলেন নাই—এক বৎসর পূর্বেও বলেন নাই? তিনি কি "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস" সরকারী ছুটি ঘোষণা করিয়া হিন্দুর মনোভাব অবজ্ঞাত করেন নাই—দাবানল অপেক্ষাও ভয়ানক নরকাগ্নি প্রজ্বলিত করিবার কারণ হয়েন নাই? মুসলিম লীগ সচিবসঙ্ঘ কি মুসলিম লীগপন্থী মুসলমান ও সেই পন্থাবলম্বনকারী মণ্ডল প্রভৃতি ব্যতীত আর কাহারও কল্যাণের বিষয় বিবেচনা করিয়াছেন? লীগ সচিবসঙ্ঘের কার্য কি নোয়াখালিতে, ত্রিপুরায়, কলিকাতায় সপ্রকাশ নহে? সেই সচিবসঙ্ঘকে কি নানাভাবে হিন্দুর ধর্মাচরণে বাধার জন্য দায়ী বলা যায় না?

বাঙলায় মুসলিম লীগ সচিবসঙ্ঘ যেভাবে পাইকারী জরিমানা ধার্য করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহা কি একদেশদর্শিতার পরিচায়ক নহে?

এই সচিবসঙ্ঘ যেভাবে সংবাদপত্রকে দণ্ডদান করিয়াছেন, তাহাতে বলিতে হয়, তাঁহারা অপরাধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে চাহেন না—মতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই তাঁহাদিগের অভিপ্রেত ও কার্য।

সেকালের কলিকাতায় গল্প ছিল, যে একবার ব্যবসায়ী পামারকে স্পর্শ করে, সে-ই লাভবান হয়; তেমনই কি মুসলিম লীগের সহিত যাঁহাদিগের সম্পর্ক আছে, তাঁহারাই লাভবান হয়েন নাই।

সরকারী অনুসন্ধান কমিটিও বলিয়াছেন—আজ বাঙলায় সরকারী কর্মচারীদিগের মধ্যেও দুর্নীতি প্রবল। ইহার জন্য দায়ী কে?

এখনও মিস্টার সুরাবর্দী একদিকে বলিতেছেন, ভবিষ্যৎ বাঙলা স্বতন্ত্র, স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র হইলে তথায় "যে যার ভক্ষক সে তার রক্ষক" হইবে যে বাঙলায় কমলে কণ্টক, সেখানে কীট থাকিবে না, সে বাঙলায় সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা অধিক ক্ষমতা সম্ভোগ করিবেন। তাহার অনিবার্য ফল কি আমরা বাঙলায় গত ১০ বৎসরের শাসনে ভোগ করি নাই?

বাঙলার মুসলিম লীগ সচিবসঙ্ঘ—দুর্ভিক্ষের সময়েও খাদ্যদ্রব্যে লাভ করিতে ইতস্তত করেন নাই। অধিক খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যে অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে, তাহার ফলে বাঙলা খাদ্য বিষয়ে স্বাবলম্বী হইতে পারে নাই; সে অর্থ কি কোন চোরা বালুতে অদৃশ্য হয় নাই? বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের ব্যবস্থা দেশের ব্যবসা নষ্ট করিয়াছে এবং খাদ্যদ্রব্য দুর্মূল্য ও দুর্লভ করিয়া দুর্ভিক্ষের স্থানে অন্নকষ্ট স্থায়ী করিয়াছে বলা অসঙ্গত নহে। মিস্টার সুরাবর্দীও স্বীকার করিয়াছেন, যুদ্ধকালীন লাভের ভাগ মুসলমানদিগকেই প্রদান কর হইয়াছে! হয়ত ইহাই মিস্টার সুরাবর্দীর মতে গণতন্ত্রসম্মত।

যে সংবাদে নির্ভর করিয়া বাঙলার গভর্নর সার ফ্রেডারিক বারোজ বিলাতে নোয়াখালীর ঘটনা সম্বন্ধে ভিত্তিহীন রিপোর্ট দিয়াছেন, তাহা কি বাঙলার মুসলিম লীগ সচিবসঙ্ঘই সরবরাহ করেন নাই এবং তাহা কি সচিবসঙ্ঘের অজ্ঞাতে লিখিত ও প্রেরিত হইয়াছিল?

গান্ধীজী প্রকাশ করিয়াছেন, বিহারে হিন্দুর নিকট হইতে মুসলমানদিগের সাহায্যার্থ অর্থ পাওয়া গিয়াছে। বাঙলায় কয়জন মুসলমান নোয়াখালী ত্রিপুরায় দুর্গত হিন্দুদিগের সাহায্যার্থ কয় পয়সা প্রদান করিয়াছেন? বিহার হইতে আনীত মুসলমানদিগকে সুখে বাঙলায় রাখিবার জন্য সরকারী তহবিল হইতে যে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে, তাহাতে কি বাঙলার দুর্গতদিগের অধিকারই নহে? আর বিহারী মুসলমানদিগের সাহায্যার্থ যে টাকা ব্যয় করা হইয়াছে, তাহার তুলনায় নোয়াখালী ত্রিপুরার দুর্গতদিগের জন্য ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ কিরূপ?

ত্রিপুরায় ও নোয়াখালীতে সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের লাঞ্ছনার—তাহাদিগের উপর অত্যাচারের যে হিসাব বাঙলার মুসলিম লীগ সচিবসঙ্ঘ প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছেন অর্থাৎ যে হিসাব গোপন করা আর তাঁহাদিগের পক্ষে সম্ভব হয় নাই, সেই হিসাব প্রদানের পরেও কি সচিবরা মনে করেন, তাঁহাদিগের আর সচিব থাকিবার অধিকার আছে? না—তাঁহারা মনে করেন, এখনও পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার কার্য একটু অবশিষ্ট আছে এবং তাহা সম্পূর্ণ করাই তাঁহাদিগের ঈশ্বর নির্দিষ্ট কার্য ও কর্তব্য?

বাঙলায় হিন্দু - মুসলমাননির্বিশেষে জাতীয়তাবাদীরা আজ যে বাঙলাকে বিভক্ত করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তাহার কারণ—তাঁহারা পাকিস্থান বিরোধী; পাকিস্থানের যে পরিচয় তাঁহারা পাকিস্থানী সচিবদিগের ব্যবহারে দীর্ঘ দশ বৎসর পাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদিগের এ বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ নাই যে, পাকিস্থান জাতীয়তার স্থানে সাম্প্রদায়িকতার প্রতিষ্ঠা করিয়া জাতির সর্বনাশ সাধন করিতেই চাহে; পাকিস্থানের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করাই প্রয়োজন। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ তাহার স্বার্থরক্ষার জন্য যদি সাম্প্রদায়িকতার ভক্ত মুসলিম লীগপন্থীদিগের সহিত একযোগে এদেশের লোকের জন্মগত অধিকারলাভের বিরোধী হয়, তবে জাতীয়তাবাদের সমবেত শক্তিতে সেই সম্মিলিত চেষ্টার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে হইবে। সেজন্য যে ত্যাগ স্বীকার প্রয়োজন, তাহা ত্যাগ করিতে বাঙলার জাতীয়তাবাদীরা প্রস্তুত আছে। পাকিস্থানীরা বর্তমানে বাঙালীকে অনাচারের দ্বারা জর্জরিত করিয়া ভবিষ্যতের সুখস্বপ্নের কথা বলিলে তাহা ক্ষতে ক্ষারক্ষেপ ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না।

বাঙালী স্বাধীন অখণ্ড ভারতে অখণ্ড বাঙলাই চাহে; কিন্তু ভারতবর্ষ যদি হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানে বিভক্ত করা হয়, তবে জাতীয়তাবাদী বাঙলা স্বতন্ত্র হইয়া হিন্দুস্থান রাষ্ট্রসঙ্ঘে যোগ দিবে এবং তাহার দৃঢ় বিশ্বাস—তাহার চেষ্টায় একদিন খণ্ডিত ভারতকে আবার অখণ্ড রাষ্ট্রসঙ্ঘে পরিণত করিতে পারিবে এবং জাতীয়তাই জয়ী হইবে।

(৩)

ধর্মে ও সমাজে সংস্কার আন্দোলন

ব্রিটিশ সমালোচকেরা দুঃখ করেছেন যে, আদিবাসীরা 'হিন্দুত্ব' গ্রহণ করে হিন্দু সমাজে একটা নীচজাত রূপে স্থান লাভ করে। এ মন্তব্য কতখানি সত্য?

• এ মন্তব্য মোটামুটি ভাবে সত্য নয়। গোন্দ কোরকু ও বৈগা প্রভৃতি কয়েকটি আদিবাসী গোষ্ঠীর হিন্দুত্বপ্রাপ্ত শ্রেণীগুলির কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, এরা নিজেদের উন্নত বৈষয়িক অবস্থার জোরে এবং কতকটা গৌরব-ময় ঐতিহ্যের প্রেরণায় ক্ষত্রিয় ও রাজপুতের সমান শ্রেণী মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। ছোটনাগপুরে কুর্মি মাহাতোরা একটা সম্পন্ন সমাজ এবং তারাও ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করে। যেসব আদিবাসী সমাজের আর্থিক অবস্থা ভাল তারা হিন্দু সমাজের মধ্যে নিম্নতম স্থান কখনই স্বীকার করে না, তারা একটা ভাল জাত হিসাবেই মর্যাদা দাবী করে এবং সেটা আদায়ও করে নেয়। শুধু তাই নয়, যেসব আদিবাসী নীচ জাতরূপে স্থান লাভ করে থাকে, তারাও মর্যাদাসম্পন্ন জাত হবার জন্য দাবী করতে ত্রুটি করে না। শ্রেণী মর্যাদা লাভ করার জন্য তারা হিন্দুধর্মের অন্তর্গত কোন আশ্রয় আশ্রম বা আন্দোলনের সাহায্য গ্রহণ করে থাকে। পানকা নামে আদিবাসী সম্প্রদায়কে হিন্দু সমাজে অস্পৃশ্যের স্থান দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কবীরপন্থের আশ্রয় গ্রহণ করে পানকা সম্প্রদায় স্পৃশ্য জাত হয়ে ওঠে, ঠিক যেমন ছত্রিশগড়ের অস্পৃশ্য চামার সম্প্রদায় সৎনামী আন্দোলনের আশ্রয় গ্রহণ করে নিজেদের মর্যাদা উন্নীত করেছিল। ১৮৭০ সাল থেকেই উড়িষ্যার খোন্দ সমাজ নিজেদের উন্নত করার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং সুরাপান বর্জনের চেষ্টা করেছে। আদিবাসীদের একটা পরিবর্তনবিমুখ গোঁড়া সমাজ বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁরা ভুল করেন। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলবার চেষ্টা এঁরা করে থাকেন। নিজেদের গোষ্ঠী মর্যাদা সম্বন্ধে এঁরা খুবই সচেতন, নীচজাত হবার আগ্রহ এঁদের মোটেই নেই। গোন্দ মহাসভা একটি বড় সঙ্ঘ এবং রাজনৈতিক ব্যাপার সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন, নিজেদের সমাজের গলদ সম্বন্ধেও এই সঙ্ঘ অচেতন নয়। সঙ্ঘবদ্ধ কর্মপন্থা উদ্যোগ ও আন্দোলনের পদ্ধতিকে এঁরাও আয়ত্ত করেছেন। এঁরা হিন্দু সমাজের নীচ জাতের ঠাঁই গ্রহণ করতে প্রস্তুত নন এবং নিয়েও থাকেন না। ১৯০১ সালের আগে থেকেই পশ্চিম খান্দেশের ভীল সমাজের একটি নিজস্ব সঙ্ঘ আছে এবং জনৈক ভীল সর্দার এর সভাপতি। এই সঙ্ঘ ভীলদের বিবাদ নিষ্পত্তি করে এবং সুরাপানের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। ভীল মনস্বী গুলো মহারাজের সামাজিক প্রগতিমূলক আন্দোলনের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এই আন্দোলন ১৯৩৮ সালের ঘটনা। যদি ধরে নেওয়াও হয় যে, অতীতে কিছু কিছু আদিবাসী হিন্দু সমাজে এসে নীচজাতের স্থান লাভ করেছিল, কিন্তু বর্তমানে বা ভবিষ্যতে তার পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা নেই। তার দুটো কারণ আছে। প্রথমত, বর্তমানে আদিবাসী সমাজ তাদের আত্মমর্যাদা সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে সচেতন হয়েছে এবং দ্বিতীয়ত, হিন্দুসমাজও অস্পৃশ্যতা বর্জন করে সমাজ সাম্যের দিকে এগিয়ে চলবার প্রয়াস করছে।

বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর ধর্মবিশ্বাস এক নয়। সংস্কৃতির দিক দিয়েও সকলে এক স্তরের নয়। সম্পদের দিক দিয়েও সব গোষ্ঠী সমান নয়।

পাহাড়িয়া নামে আদিবাসী সমাজ 'এক ন্যায়বান ঈশ্বরে' বিশ্বাসী। জন্মান্তরবাদেও বিশ্বাসী—যারা ইহজীবনে সৎকর্ম করে তারা পরজন্মে উন্নত জীবন লাভ করবে এবং যারা অসৎ কর্ম করে তারা নীচ জীবন লাভ করবে। সাঁওতালী ধর্মমতে এক শ্রেষ্ঠ দেবতার কল্পনা করা হয়—তিনি হলেন 'ঠাকুর'। ঠাকুর কথাটি নিশ্চয় সাঁওতালদের নিজস্ব ভাষা নয়, হিন্দুদের থেকেই এই নাম এবং সম্ভবতঃ আইডিয়া তারা গ্রহণ করেছে। যেসব আদিবাসী হিন্দু ধর্মের মতবাদের সঙ্গে পরিচিত এবং প্রভাবিত হয়েছে, তাদের মধ্যে খৃষ্টধর্ম প্রসার কঠিন হয়েছে। "যেসব পাহাড়িয়া ও সাঁওতাল হিন্দুধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়নি তাদের মধ্যে খৃষ্টধর্ম প্রচার করা মিশনারিদের পক্ষে সহজ হয়েছে (১) হিন্দু ধর্মমতের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলে মুণ্ডা ও ওঁরাও সমাজে বহু ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছে। আদিবাসীদের প্রত্যেকটি সামাজিক আন্দোলনে হিন্দুধর্মনীতির ক্রিয়া দেখা যায়। হিন্দুধর্ম বা হিন্দুর নীতিতাৎপর্যকে সম্পূর্ণ বা সমগ্রভাবে উপলব্ধি করে আদিবাসী সমাজ একটা পরিবর্তন বা নূতনকে গ্রহণের জন্য উৎসাহিত হয়ে ওঠে, ঠিক এ ধরণের মন্তব্য করা যায় না। হিন্দুধর্ম পূজা পদ্ধতি লোকাচার ও উৎসবের বিরাট ক্ষেত্র থেকে যে বিষয়টি মনে ধরে সেইটি গ্রহণ করতে আদিবাসীরা দ্বিধা করে না। হিন্দুত্বপ্রাপ্ত গোন্দেরা হনুমান ও গণপতির পূজা করে। "বেরার থেকে বস্তার পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সমস্ত আদিবাসী সমাজে ভীমসেনের পূজা প্রচলিত।......নিজেদের দেবতা ছাড়া গোন্দের আর একটি অদৃশ্য সৃজনকর্তা ও পালনকর্তা দেবতার কল্পনা করে, যার নাম 'ভগবান' (হিসলপ)।" মান্দলা জিলায় গোন্দ এবং বৈগা গণেশ উৎসব, দশহারা, দীপালি এবং হোলি উৎসব পালন করে। হিন্দুত্ব-প্রাপ্ত বা হিন্দুধর্ম প্রভাবিত আদিবাসী সমাজ কর্তৃক যেসব হিন্দু ধর্মানুষ্ঠান পালিত হয়, তার মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে, এই সব ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে সাধারণতঃ আদিবাসীরা পানোৎসব বাদ দেয় না। নতুনকে গ্রহণ করেও তারা এই পানোৎসবের গোষ্ঠীগত ঐতিহ্য ছাড়তে পারেনি, অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য রকম ব্যতিক্রম দেখা যায়।

আদিবাসীদের মধ্যে সমাজ-সংস্কার আন্দোলন সাধারণতঃ কিভাবে হিন্দুনীতি গ্রহণ করে থাকে, তার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো:

টানা ভগত আন্দোলন

ছোটনাগপুর অধিত্যকায় ওঁরাও আদিবাসী সমাজ, চরিত্র, বুদ্ধি ও তেজস্বিতায় একটি অগ্রসরশীল সমাজ, এঁরা বহু সামাজিক আন্দোলনের অগ্রদূত এবং এঁদের মধ্যে বহু বিখ্যাত সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটেছে। সমাজকে বহু দূষিত রীতি ও আচার থেকে মুক্ত করবার জন্য এঁরা আত্মশক্তির সাহায্যেই প্রয়াস করে এসেছেন। দুঃখের বিষয় নব ভারতের আধুনিক ভারতীয়েরা আদর্শবাদী হয়েও আদিবাসী সমাজের বিদ্যাসাগর ও বিবেকানন্দের খবর জানেন না। মদ্যপান, ডাইন তন্ত্র ও ভুতপূজা ইত্যাদি সামাজিক দোষগুলিকে দূর করবার জন্য ওঁরাও সংস্কারকেরা একের পর এক চেষ্টা করে আসছেন। এই সব সংস্কারকের দল 'ভগত' নামে আখ্যাত। প্রথম

---

(1) Descriptive Ethnology of Bengal —Dalton.

(1) The story of an Indian upland—Bradley Brit.

বখ্যাত সংস্কারকের দল হলো ভুইপন্থ ভগত সমাজ। তারপর যারা আন্দোলন করেছে তারা হলো কেশ ভগত দল, বিষ্ণু ভগত দল, কবিরপন্থ ভগত দল। সব চেয়ে বিখ্যাত হলো টানা ভগত দল। ১৯১৪ সালে যাত্রা ভগত নামে এক ওঁরাও যুবকের মুখে এক নতুন বাণী শুনে ওঁরাও সমাজ চঞ্চল হয়ে ওঠে। যাত্রা ভগত ঘোষণা করে যে, স্বপ্নের মধ্যে 'ধর্ম' তারে কতগুলি আদেশ করে গেছে—ভুত বিশ্বাস ছেড়ে দাও, পশুবলি করো না, মাংসাহার ও মদ্যপান বর্জন কর। যাত্রা ভগতের আবেদনে হাজার হাজার ওঁরাও সাড়া দেয়। কিন্তু গভর্নমেণ্ট এই আন্দোলনকে সন্দেহের চক্ষে দেখতে থাকেন এবং যাত্রা ভগতকে গ্রেপ্তার করে আন্দোলন স্তব্ধ করে দেবার চেষ্টা করেন। আদিবাসী সমাজে কোন একটা সমাজ সংস্কারের আন্দোলন দেখলেই গভর্নমেণ্ট দমন করবার জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন. এটাই বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয়।

যাত্রা ভগতকে দমিয়ে দিলেও আন্দোলন প্রসারলাভ করে। আন্দোলনের পদ্ধতি এইঃ সন্ধ্যার পর গ্রামের সীমানায় যুবকেরা দলবদ্ধ হয়, তারপর ভুত তাড়াবার জন্য মন্ত্র আবৃত্তি করতে থাকে।

মন্ত্র ঃ—

"চন্দ্রবাবা সূর্যবাবা ধর্ত্রি বাবা
তারাগণ বাবা
নাচন কে জগহ কৌন হৈ,
কৌন হৈ, কৌন হৈ"

এইভাবে মন্ত্র আবৃত্তি করতে করতে তারা অগ্রসর হয়, কোথায় ভুত আশ্রয় নিয়ে রয়েছে সেই জায়গা খুঁজে বের করতে হবে। লক্ষণ দেখে যে জায়গায় ভুত আছে বলে সন্দেহ হয় সেইখানে এসে সকলে বৃত্তাকারে ঘিরে দাঁড়ায়, শুধু উত্তর দিকে একটু ফাঁক থাকে। তারপর হাতজোড় করে গানের সুরে আবৃত্তি করে ঃ

"টানা বাবা টান. ভুতনীকে টান
টানা বাবা টান. লুকল ছিপল
ভুতনীকে টান" ইত্যাদি।

ভুত তাড়াবার এই আন্দোলনে ব্রিটিশ-ভারত গভর্নমেণ্ট অস্থির হয়ে উঠলেন এবং বহু লোককে গ্রেপ্তার করলেন। কিন্তু তবু আন্দোলন চলতে থাকে।

টানা ভগত আন্দোলনের প্রথম অধ্যায়টির পরিচয় মাত্র দেওয়া হলো। টানা ভগতেরা আদিবাসী সমাজে আরও বৃহৎ একটি আন্দোলন করেছে এবং সেজন্য ত্যাগ দুঃখ নির্যাতন বরণ করেছে। এবিষয় অন্য অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

সনাতন গোন্দ

গোন্দ সমাজে ১৯৩৬ সালে বাদলশা ভাই নামে জনৈক সংস্কারকের আবির্ভাব হয়। 'সনাতন গোন্দ' নামে একটি পুস্তিকা প্রচার করে বাদলশা ভাই গোন্দ সমাজে সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। মিঃ এলুইন লিখেছেন, সনাতন গোন্দ আন্দোলনের নির্দেশ হলো—"বানর হত্যা করো না, কারণ তারা দেবতার সহচর, সত্যনারায়ণের ব্রত কর এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিত রাখ, বৈদিক প্রথায় বিবাহ অনুষ্ঠান কর। গো ব্রাহ্মণ ও সাধুকে সেবা করলে শ্রেষ্ঠ পুণ্য লাভ হয়। কলিযুগে মেয়েদের বিশ্বাস করো না, মেয়েদের মধ্যে যারা একবার গৃহত্যাগ করবে তাদের আর ঘরে ফিরিয়ে নিও না।" (১)

মিঃ এলুইন এই সংস্কার আন্দোলনের যেভাবে পরিচয় দিয়েছেন সেটা সত্য নয়। হিন্দুনীতি অনুসারে আন্দোলন হয়েছে ঠিকই, এবং মিঃ এলুইন বোধ হয় এই কারণেই ক্ষুব্ধ হয়ে সমস্ত আন্দোলনটাকে একটা কদর্য কুসংস্কারমূলক প্রগতিহীন আন্দোলন বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। সংস্কারক বাদলশা ভাই প্রধানতঃ শিক্ষা বিস্তারের জন্য, নারীর সম্মানের জন্য এবং মদ্যপান বর্জনের জন্যই এ আন্দোলন করেছিলেন, মিঃ এলুইন তাঁর গ্রন্থে সেসব কথা উহ্য রেখেছেন। মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি: তিনি আন্দোলনের দোষটুকু খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন। তিনি আন্দোলনের অন্তর্নিহিত ঐতিহাসিক তাৎপর্য ও প্রেরণাগুলি উপলব্ধি করতে পারেননি, আপাতদৃষ্টে যে ঘটনাগুলি তাঁর খারাপ লেগেছে সেইগুলিকে মূলধন করে তিনি সংস্কার আন্দোলনের বিরুদ্ধতা করেছেন।

আদিবাসীদের সামাজিক আন্দোলনের স্বরূপ থেকে আমরা একটি ঐতিহাসিক ইঙ্গিত পাই—সমস্ত আন্দোলনে হিন্দু রীতি নীতির প্রাধান্য, তার মধ্যে কোনটা ভাল এবং কোনটা মন্দ। এই ইঙ্গিতের অর্থই এই যে, হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যে একটা সহজ আবেদন আছে যা আদিবাসীদের নিবিড়ভাবে আকর্ষণ করে।

ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে আদিবাসী

বিদ্রোহিনী নাগা রাণী গুইদালোর কীর্তি কাহিনী সম্বন্ধে শিক্ষিত ভারতীয় সমাজ কিছু কিছু খবর রাখে। গৌহাটীতে কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় পণ্ডিত নেহরু এই নাগা মহিলার কথা জানিতে পারেন এবং এক প্রবন্ধে সে বিষয়ে উল্লেখ করেন। যেহেতু আধুনিক ভারতবাসী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত, সেই হেতু গুইদালোর ব্রিটিশ বিরোধী অভ্যুত্থানের সংবাদ স্বভাবত ভারতবাসীর মনে সাড়া জাগিয়েছে। কিন্তু শিক্ষিত ভারতবাসী আদিবাসী সমাজ সম্বন্ধে খোঁজ খবর করলে আরও বহু আদিবাসী বীর ও শহীদের কথা জানতে পারবেন। দুঃখের বিষয়, সে রকম উৎসাহের লক্ষণ বড় বেশী দেখা যায় না। আদিবাসীদের রাজনৈতিক তথা ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামের ইতিহাস শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ ও আলোচনা ভারতীয় সমাজে সাধারণত দেখতে পওয়া যায় না। স্বাধীনতার যুদ্ধে আদিবাসীর শোণিততর্পণ বহু পার্বত্য উপত্যকায় ও অরণ্যভূমিতে বহু পবিত্র হল্‌দিঘাট রচনা করেছে। সে কাহিনী বনমর্মরের মত নাগরিক ভারতীয়ের কাছ থেকে দূরেই রয়ে গেছে!

ব্রিটিশ রাজশক্তিকে ভারতে কয়েকটি দেশীয় রাজশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। মারাঠা, শিখ এবং হায়দার টিপুই ব্রিটিশ-বিরোধিতার সংগ্রামে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ইতিহাসে এই কাহিনী বড় করে লেখা আছে। কিন্তু ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ভারতে প্রথম গণসংগ্রামের দৃষ্টান্ত হলো আদিবাসীদের সংগ্রাম। কোন আদিবাসী রাজশক্তির সঙ্গে ব্রিটিশ রাজশক্তির লড়াই হয়নি, কারণ আদিবাসী রাজশক্তি বলে কিছু ছিল না। সিপাহী অভ্যুত্থানের মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে গণসংগ্রামের প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু সাঁওতালরের গণসংগ্রাম একমাত্র এবং প্রথম আদিবাসীরাই করেছে, সিপাহী যুদ্ধের পূর্বে এবং পরেও। আদিবাসীদের এই সব সংগ্রামকে অনেক ভারতীয় ঐতিহাসিকও নিতান্ত 'জংলী বিক্ষোভ' ধারণা ক'রে একটা আলোচনার যোগ্য বিষয় বলে মনে করতে পারেন নি। কিন্তু অনুসন্ধান করলে জানা যাবে, আদিবাসীদের সংগ্রামে সভ্য ভারতবর্ষের সংগ্রামের মতই দেশপ্রেমের এবং গোষ্ঠীপ্রেমের প্রেরণা ছিল।

একটি বিশেষ ঐতিহাসিক সত্য এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা প্রয়োজন মনে করি। ভারতে ব্রিটিশের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় সহযোগিতা করেছে। ব্রিটিশেরা ভারতীয়দের মধ্যে বহু তাঁবেদার রাজশক্তি পেয়েছেন, ভাড়াটিয়া ভারতীয় সৈনিকের সাহায্যেই ব্রিটিশ বহু ভারতীয় রাজ্য গ্রাস করতে পেরেছে। ভারতবাসী তার প্রাক্তন ইতিহাসের এই অখ্যাতি চাপা দিতে পারে না। কিন্তু ব্রিটিশ রাজশক্তি আদিবাসী সমাজ থেকে ভাড়াটিয়া সৈনিক সংগ্রহ করতে পারেনি কারণ আদিবাসীদের পক্ষে ভাড়াটিয়া মনোবৃত্তি গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া আদিবাসীদের এমন একটা সহজ বিদ্রোহীসুলভ দাসত্ববিরোধী চরিত্র ছিল যার জন্যে ইংরাজ সেনাপতির দল এদের মধ্যে রংরুট সংগ্রহে উৎসাহ বোধ করেননি। তার ওপর আদিবাসীরা তাদের গোষ্ঠী ও মেজাজের পরিচয় অল্পদিনের মধ্যেই ব্রিটিশ রাজশক্তিকে ভাল করেই জানিয়ে দিয়েছিল।

আদিবাসীদের সংগ্রাম—খণ্ড খণ্ড বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থানের মত। নিজেদের প্রেরণায়

(1) The Baiga—Verrier Elwin.

নিজেদের ঐক্যে ও উদ্যোগে পরিচালিত সংগ্রাম। সভ্য ভারতবর্ষের কাছ থেকে এ সংগ্রামে আদিবাসীরা কোন সহায়তা লাভ করেনি বরং তার উল্টোটাই সত্য। আদিবাসীদের সংগ্রাম দমনে ভারতীয় সিপাহী অস্ত্রচালনা করেছে এবং ভারতীয় দারোগা তসীলদার ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার স্তম্ভরূপে আদিবাসী অঞ্চলে আবির্ভূত হয়েছে। ইংরাজ আমলে আদিবাসীদের মনে যতটুকু ভারতীয় বিরোধী তথা হিন্দু-বিরোধী ক্ষোভ প্রবল হয়েছে, তার মূল কারণ এইখানে। হিন্দুরা ব্রিটিশের প্রজা হয়ে এবং ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার দ্বারাই পরিচালিত হয়ে ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠা কায়েম করার জন্য আদিবাসীদের আরণ্য ভূমিতে জমিদার, মহাজন ও বেনিয়ারূপে দেখা দেয়। ব্রিটিশ শোষণযন্ত্ররূপে হিন্দুরা আদিবাসীদের কাছে এগিয়ে যায়। এক্ষেত্রে আদিবাসীদের ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব স্বভাবত হিন্দু-বিরোধী মনোভাবের রূপে দেখা দিয়েছিল এবং তার জের আজও রয়ে গেছে।

কোল বিদ্রোহ

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙলার রাজা হয়ে বসবার পর বাঙলা ও বিহারের আদিবাসী অঞ্চলে ব্রিটিশ (কোম্পানী) আইন, ভূমিকর ও রাজস্ব প্রথার প্রবর্তন হতে থাকে। এই বৈদেশিক পদ্ধতি আদিবাসীদের চিরাচরিত আত্মনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার ওপর আঘাতের মত এসে পড়ে। ব্রিটিশ শাসকের আমলারূপে এবং ব্রিটিশ স্বার্থের ফড়িয়ারূপে হিন্দুরা আদিবাসীদের মধ্যে উপদ্রবের মত দেখা দেয়। ব্রিটিশ শক্তির পত্তনের পরেও সমতলবাসী হিন্দুরা পাহাড়ী আদিবাসীদের কাছে ঘেঁষতে পারতো না। কিন্তু না ঘেঁসতে পারলে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থা কায়েম থাকে না, সুতরাং ব্রিটিশ রাজশক্তি বার বার অস্ত্রের সাহায্যে আদিবাসীদের ঘায়েল ক'রে হিন্দুদের জন্য আদিবাসী অঞ্চলের পথ খুলে দিয়েছে এবং তারপর হিন্দুরা গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করেছে।

আদিবাসীদের সম্পর্কে অতীত ব্রিটিশ নীতি এবং বর্তমান ব্রিটিশ নীতির আকাশ-পাতাল পার্থক্য। একদিন সাম্রাজ্যিক স্বার্থের খাতিরে আদিবাসীদের নিভৃত আরণ্য এলাকায় সমতলবাসী হিন্দুকে গরজ ক'রে নিয়ে যেতে হয়েছিল। আজ এক একটা বহির্ভূত অঞ্চল (Excluded Area) সৃষ্টি ক'রে হিন্দুদের কাছ থেকে আদিবাসীকে পৃথক্ করে রাখবার চেষ্টা, কারণ আজ হিন্দু আর নিতান্ত ব্রিটিশের আমলা নয়, হিন্দু ব্রিটিশ-বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনের সংগঠক ও প্রচারক, সম্রাটদ্রোহী।

সিংভূমের কোলহান নামে অঞ্চলটি হো-অধ্যুষিত। হো সমাজের অপর নাম লড়কা কোল অর্থাৎ লড়ুয়ে কোল। কোলেরা আজ পর্যন্ত কোলহানে হিন্দুদের খুব সামান্য রকমই ঘেঁষতে দিয়েছে। শুধু হিন্দু নয়, হো ভিন্ন অন্য কোন আদিবাসী গোষ্ঠীকেও এই অঞ্চলে তারা প্রশ্রয় দেয় নি। জগন্নাথ দর্শনাভিলাষী হিন্দু তীর্থযাত্রীরা কোলহানের পথ দিয়ে পুরী যেত, হো'রা তাও বন্ধ করে দেয়।

১৮১৯ সালে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট কোলহানের হোদের দমন করবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করে। কিন্তু এই অভিযানের পরেও হো'রা সম্পূর্ণরূপে বশ্যতা স্বীকার করে নি। ১৮৩১ সালে সমস্ত ছোটনাগপুরে আদিবাসী সমাজে বিদ্রোহের ঝড় জেগে উঠে—এই অভ্যুত্থান কোল বিদ্রোহ নামে আখ্যাত। কোলহানের হো সমাজও এই বিদ্রোহে যোগদান করে। তীরধনু ও কুঠারে সজ্জিত আদিবাসী বিদ্রোহীর সংগ্রাম ব্রিটিশের উন্নত অস্ত্রের কাছে পরাজয় মানতে বাধ্য হয়। ছোটনাগপুরের অজস্র পাষাণবেদিকা সহস্র আদিবাসী শহীদের শোণিতে রঞ্জিত হয়ে ওঠে।

রাজমহলের বিদ্রোহী পাহাড়িয়া

ব্রিটিশ রাজত্বের সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে রাজমহলের পাহাড়িয়াদের সঙ্গে সমতলবাসী-জমিদারদের নানা রকম বিরোধ দেখা দিতে থাকে। পাহাড়িয়ারা মাঝে মাঝে পাহাড় অঞ্চল থেকে নেমে এসে আবাদী অঞ্চলের হিন্দুদের ধনসম্পত্তি লুটপাট করে নিয়ে যেত। হিন্দু জমিদারেরা নানা রকম ঘুষ বকশিস ও দক্ষিণা দিয়েও পাহাড়িয়াদের আক্রমণ বন্ধ করতে পারে নি। এর পর হিন্দু জমিদারেরা কৌশল করে একদল পাহাড়িয়াকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসে সকলকে হত্যা করে। পাহাড়িয়ারা প্রতিশোধ নেবার জন্য ভয়ানকভাবে তৈরী হয়। এটা ১৭৭২ সালের ঘটনা। জমিদারদের ওপর প্রতিশোধ চরিতার্থ করা আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ বাহিনী জমিদারদের সাহায্যে এসে পৌঁছে যায় এবং পাহাড়িয়াদের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে বৃটিশ সৈন্য ব্যর্থ হয় এবং পাহাড়িয়ারা ১৭৭৮ সাল পর্যন্ত তাদের যথেচ্ছা লুণ্ঠন ও আক্রমণের পালা চালাতে থাকে। এর পর বৃটিশ ফৌজের কর্তা পাহাড়িয়াদের শান্ত করার জন্য অন্য রকম পদ্ধতি অবলম্বন করে। পাহাড়িয়াদের জন্য বার্ষিক বৃত্তির ব্যবস্থা এবং গোষ্ঠীপতি সর্দারদের দ্বারা পঞ্চায়েৎ শাসনের ব্যবস্থা করা হয়।

সাঁওতাল বিদ্রোহ

১৮৩৬ সালে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট সাঁওতালদের স্থায়ীভাবে বসতি করবার জন্য বিশেষভাবে একটি এলাকা নির্দিষ্ট করে। এই এলাকা বর্তমান সাঁওতাল পরগণারই একটি প্রধান অংশ এবং তৎকালে এই অঞ্চল 'দামনি কো' নামে পরিচিত ছিল। এটা সাঁওতালী ভাষা, অর্থ পাহাড়ী অঞ্চল (Hill Assembly), এই অঞ্চলের জন্য সাঁওতাল গোষ্ঠী-পঞ্চায়েতের সাহায্যে একটা বিশেষ রকম শাসন-ব্যবস্থা কায়েম করা হয়েছিল। দামনি কো সাঁওতাল চাষীর পরিশ্রমের গুণে শস্যের ঐশ্বর্য পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বৃটিশ প্রবর্তিত নূতন অর্থনৈতিক পন্থা ও শাসন ব্যবস্থার অপরিহার্য পরিণাম অনুসারে এই অঞ্চলে হিন্দু মহাজন ও ব্যবসায়ীর আবির্ভাব ঘটে। মুদ্রা জিনিসটার রীতি নীতি ও চরিত্র সাঁওতালী মনের কাছে তখনও সম্পূর্ণ তাৎপর্য নিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। দাদন বন্ধক নিলাম ঠিকা মজুরী ও সুদ তেজারতীর জটিল অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে পড়ে সাঁওতাল চাষীর শস্য ও জমি ধীরে ধীরে পরহস্তগত হতে আরম্ভ করে। মহাজনী কারবারের লেনদেনের পরিণাম প্রথম তারা বুঝে উঠতে পারে নি, কিন্তু একদিন বুঝলো। একদিন দেখা গেল, তাদের সর্বস্ব পরের দখলে চলে গেছে। সাঁওতালদের মধ্যে বিক্ষোভ প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। এই সময় রেলপথ নির্মাণের কাজ আরম্ভ হয় এবং সাঁওতালেরা মহাজনদের কাছে দাদন-নেওয়া ঠিকা মজুর হিসাবে বাঁধা হয়ে থাকায়, রেলপথ তৈয়ারীর কাজে নগদ মজুরী অর্জন করবার সুযোগটুকুও ব্যর্থ হয়ে যায়। ১৮৫৫ সন, বিদ্রোহ জেগে ওঠে। সমস্ত সাঁওতাল একসঙ্গে বিদ্রোহ করে, ঘৃণ্য ডিকু অর্থাৎ বিদেশীর যে কোন চিহ্ন লোপাট করে দেবার জন্য দিকে দিকে আক্রমণ করে। শুধু হিন্দুকে হত্যা নয়, কুঠিওয়ালা ও পাদরী ইংরাজ নরনারীকেও হত্যা করতে থাকে। এর পর বৃটিশ ফৌজ আসে। অসংখ্য সাঁওতাল যোদ্ধার দল কামান ও রাইফেলের অগ্নিবর্ষণে ছিন্ন ভিন্ন হয়। এই সংঘর্ষে ১০ হাজার সাঁওতাল নিহত হয়।

বিরসা ভগবান

শিক্ষিত ভারতবাসী বিরসা ভগবানকে খুব বেশী চেনে না। মুণ্ডা সমাজে ইনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন এবং এঁর জীবন ও সাধনার প্রেরণা মুণ্ডা সমাজের মনে রাজনৈতিক স্বাধীনতার চির উৎসরূপে জাগ্রত রয়েছে। সুখের বিষয়, কয়েক বৎসর আগে পালামৌ ও রাঁচী কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে কয়েকবার 'বিরসা দিবস' উদ্যাপিত হয়েছিল। আধুনিক জাতীয়তাবাদী ভারতীয়ের মন যে বিরসা ভগবানের মত এক অদ্ভুত কর্মী মুণ্ডা মনস্বীর সাধনার মূল্য আজ উপলব্ধি করতে পেরেছে, কতিপয় কংগ্রেস কর্মীর উদ্যোগের মধ্যে তার কিছুটা প্রমাণ তবু পাওয়া গেল। ছোটনাগপুরের প্রতি থানায় পুলিশের খাতায় 'বিরসাইট' ('Birsaite) আখ্যায় চিহ্নিত শত শত আদিবাসীর নামের তালিকা আছে। এরা বিরসা-

পন্থী, সুতরাং ভয়ানক সন্দেহ ভাজন, সর্বদা পুলিশের নজর তাদের গতিবিধির ওপর সতর্ক হয়ে রয়েছে। আধুনিক ভারতীয়েরা জানেন, তাঁদের সমাজের রাজনৈতিক সাধনা-য় কত যুবক রাজরোষে পড়ে বিনা বিচারে বন্দীত্ব গ্রহণ করেছে, পুলিশের সদাসতর্ক খবরদারীর উপদ্রব বিড়ম্বিত জীবন যাপন করেছে। দেশের কাজের জন্য ভারতের যুবক এই নির্যাতন সহ্য করেছে এবং দেশবাসী যুবক তার তর এই ত্যাগের দৃষ্টান্তকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে। রাজরোষের মাত্রাহীন নিগ্রহ থেকে, অন্তরীণতা বা বন্দিদশা থেকে রাজনৈতিক কর্মীকে মুক্ত করার জন্য দেশব্যাপী জনমতের আন্দোলনও হয়ে থাকে। এইবার আদিবাসীদের প্রসঙ্গে আসা যাক। আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, হাজার হাজার বিরসাপন্থী মুণ্ডা কংগ্রেসী কিম্বা গুপ্ত বৈপ্লবিক আন্দোলনের সূত্রপাতের বহু পূর্ব থেকেই রাজরোষে নিগৃহীত হয়ে আসছে, কিন্তু তাদের সম্বন্ধে ভারতের জনমতে কোন প্রতিবাদের উচ্চবাচ্য হয়নি।

কে এই বিরসা ভগবান? ১৮৬০ সালে রাঁচীর এক মুণ্ডা আদিবাসী পরিবারে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। এর আগে ১৭৮৯ সালে, ১৭৯৯ সালে, ১৮০৭ সালে, ১৮১২ সালে, ১৮১৯ সালে এবং ১৮৩১ সালে মুণ্ডারা সশস্ত্র বিদ্রোহ করেছিল। ১৮৩১ সালের বিদ্রোহই বিখ্যাত 'কোল বিদ্রোহ'। এরপর মুণ্ডা সমাজে কতকটা শান্ত অবসাদের অধ্যায় আরম্ভ হয় এবং ১৮৪৬ সালে খৃষ্টান মিশনারীরা এসে ধর্ম প্রচার আরম্ভ করে মুণ্ডাদের ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবের ওপর রাজভক্তির প্রলেপ দিতে থাকেন। বিরসা মুণ্ডা চৈবাসায় মিশনারী স্কুলে শিক্ষালাভ করেন এবং সামান্য ইংরাজীও তিনি শিখেছিলেন। তিনি জার্মান লুথেরীয় মিশনের দ্বারা দীক্ষিত খৃষ্টান ছিলেন। কিন্তু স্কুলে শেখানো আইনসম্মত সুবাধ্য জীবনের আদর্শ বোধ হয় কিশোর বিরসার মনে কোন রেখাপাত করতে পারেনি। মুণ্ডা সমাজের দুঃখদীর্ণ অবস্থা, ইংরাজ শাসনের অবমাননাকর বন্ধন, বিরসার মনে বেদনার জ্বালা সৃষ্টি করে। খৃষ্টান মিশনারি ও গির্জার চূড়া, থানা আদালত ও কাছারী, জমিদার এবং মহাজনের গদি—এসব মুণ্ডাসমাজের পক্ষে কল্যাণের লক্ষণ, বিরসা মুণ্ডার মনে ঘোর সন্দেহ জাগে।

রাঁচী থেকে একদিন বিরসা মুণ্ডা তার নিভৃত উপত্যকার কুটীরে ফিরে যায়। তারপর একদিন পল্লী জনতাকে সম্বোধন করে বিরসা তার বাণী ঘোষণা করে—স্বপ্নে আমি প্রত্যাদেশ পেয়েছি। মুণ্ডাসমাজকে উন্নত হতে হবে। তার জন্যে প্রস্তুত হও। বিরসা তার গোষ্ঠী জনতার কাছে এক নতুন কর্মপন্থা উপস্থিত কর—মদ্যপান বর্জন, নিরামিষ গ্রহণ, উপবীত ধারণ ইত্যাদি। এই সামাজিক সংস্কার আন্দোলন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। গভর্নমেণ্টও সতর্ক হয়ে ওঠেন। গভর্নমেণ্টের দমননীতির সঙ্গে আন্দোলনও তীব্রতর হয়ে ক্রমেই পূর্ণ রাজনৈতিক বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থানের আকার ধারণ করে। বিরসার নির্দেশে মুণ্ডাসমাজ খাজনা বন্ধ আন্দোলন আরম্ভ করে। ভারতের ব্রিটিশ-বিরোধী রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম খাজনা বন্ধ আন্দোলনের দৃষ্টান্ত। মুণ্ডাদের সঙ্গে পুলিশের কতগুলি সংঘর্ষও হয়। তার পর বিরসাকে গ্রেপ্তার করে রাঁচী
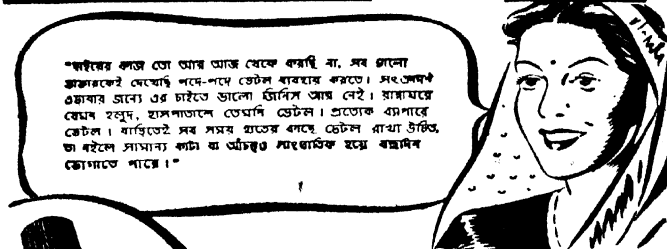
জেলে এনে রাখা হয়। সেই রাত্রে প্রবল ঝড় ও বৃষ্টি আরম্ভ হয় এবং অকস্মাৎ র'াচী জেলের প্রাচীর ধ্বসে পড়ে যায়। বিরসাকে তারপর হাজারিবাগ জেলে স্থানান্তরিত করা হয় এবং সেখানেই ১৯০২ সালে বন্দীদশায় বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই মুণ্ডা জননায়কের মৃত্যু হয়।

বিরসার আদর্শে অনুপ্রাণিত ও সংগঠিত মুণ্ডা সমাজের বিদ্রোহ প্রবল আকার ধারণ করে। বিদ্রোহীরা সড়ক পুল টেলিগ্রাফের তার থানা তশীলদারী অফিস প্রভৃতি সরকারী সংস্থাগুলির ওপর আক্রমণ চালায়। ব্রিটিশ সৈন্য দল বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয় এবং বিদ্রোহের অবসান ঘটে। কিন্তু মুণ্ডা-সমাজে বিরসা মুণ্ডা বিরসা ভগবান নামেই অমর হয়ে রইলেন। তাঁর আদর্শ আজও মুণ্ডার বনময় সংসারে সৌরভের মত ছড়িয়ে আছে। বিরসাপন্থীরা আজও ইংরাজ সরকারের কাছে সন্দেহভাজন। তারা চাকরী পায় না, তাদের নাম দাগীর খাতায় চিহ্নিত, তাদের সময়ে অসময়ে থানায় হাজিরা দিতে হয়।

একজন ইংরাজ মিশনারি লিখেছেন—বিরসা মুণ্ডার মুখের গড়নের সঙ্গে যীশু-খৃষ্টের মুখের গড়ণের সাদৃশ্য ছিল। বিদ্রোহী বিরসার ব্যক্তিত্বের প্রতি কোন কোন মিশনারী কিরূপে শ্রদ্ধা পোষণ করতেন এসব উক্তি তারই প্রমাণ।

বিরসা ভগবান প্রবর্তিত আন্দোলনের একটা ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। যদি বলা হয় যে, বিরসা ভগবান আধুনিক মহাত্মা গান্ধীর পূর্বরূপ (Proto-type) তাহলে যুক্তির দিক দিয়ে অত্যুক্তি হবে না। আমরা দেখেছি, গান্ধীজী রাজনৈতিক আন্দোলনকে একটা নীতিগত স্তরের মধ্যে রাখবার জন্য চেষ্টা করেছেন, এর মধ্যে সর্বপ্রধান নীতি হলো—অহিংসা। বিরসা ভগবান মুণ্ডাসমাজকে প্রথমে অহিংসা নীতির দ্বারাই একটা আদর্শসম্মত সঙ্ঘবদ্ধতার মধ্যে আনবার চেষ্টা করেছিলেন। ধনুক ও কুঠার বিলাসী শিকারপ্রিয় আমিষাশী মুণ্ডা সমাজের সম্মুখে তিনি কঠিন অহিংসার আদর্শ রেখেছিলেন। খাজনা বন্ধ আন্দোলনের তিনিই প্রথম প্রবর্তক, অহিংস সংগ্রামের এই একটি পদ্ধতিকে বিরসা ভগবান আবিষ্কার করেছিলেন।

তারপর, বিরসা আন্দোলনের চরম পরিণাম যেভাবে দেখা দিয়েছিল, সেটা যেন ভারতের আগস্ট সংগ্রামের পূর্বরূপ। আগস্ট সংগ্রামে ভারতীয় জনতা যেভাবে থানা কাছারী আদালত রেলপথ সড়ক ও টেলিগ্রাফের তার প্রভৃতি সংযোগ ব্যবস্থার (communications) উপর আক্রমণ চালিয়েছিল, পঞ্চাশ বছর পূর্বে মুণ্ডাসমাজ সেই গণসংগ্রামমূলক পদ্ধতির দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গেছে। আধুনিক কালে রাজ-নৈতিক সন্দেহভাজনদের (Political Suspect) ওপর যে রীতিতে সরকারী বিধিনিষেধের খবরদারী করা হয়ে থাকে, তার পরীক্ষা বিরসাপন্থী মুণ্ডাসমাজের ওপর প্রথম হয়েছে। অনেককাল আগেই হয়েছে এবং হয়ে আসছে। বিরসা আন্দোলনে সম্পূর্ণ অহিংসা আদর্শ শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকেনি, যেম ভারতের জাতীয় সংগ্রামেও মাঝে মাঝে অহিংস নীতির বিচ্যুতি ঘটেছে।

ক্রম

টমাস হাণ্ট মরগ্যান (১৮৬৬-১৯৪৫)

শ্রীশশাংকশেখর সরকার

বংশানুক্রম বিজ্ঞানের ইতিহাসের ১৮৬৬ খৃঃ একটি বিশেষ স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসরে পাদরী গ্রেগর মেণ্ডেলের (Gregor Mendel) মটরশুটীর উপর ৭ বৎসরের গবেষণা প্রকাশিত হয়, এবং এই বৎসরেই জীন (Gene) মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা মরগ্যানের জন্ম হয়। মরগ্যানের জন্ম হয় আমেরিকার কেণ্টুকী প্রদেশে এবং তাঁহার মাতাপিতা উভয়েই ইংরাজ

টমাস হাণ্ট মরগ্যান

বংশোদ্ভূত ছিলেন। কেণ্টুকীর প্রাদেশিক কলেজে মরগ্যানের শিক্ষা আরম্ভ হয়। পরে প্রাণিবিদ্যা পড়িবার জন্য Johns Hopkins বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। এখানে সামুদ্রিক মাকড়সার উপর কাজ করিয়া তিনি ১৮৯০ খৃঃ ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। ১৮৯৫ খৃঃ মরগ্যান প্রথম জার্মানীতে গমন করেন এবং পরে নেপলসের বিখ্যাত প্রাণিবিদ্যার গবেষণাগারে (Zoological Station) কাজ করেন।

১৮৬৬ খৃঃ প্রকাশিত মেণ্ডেলের গবেষণা এতদিন কাহারও নজরে পড়ে নাই কারণ সেটি চেকোশ্লোভাকিয়ার একটি ছোট পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৯০০ খৃঃ মেণ্ডেলের গবেষণা একযোগে তিনটি বিভিন্ন বিজ্ঞানীর গবেষণার দ্বারা পুনরাবিষ্কৃত হয়। সঙ্গে সঙ্গে পরের বৎসর ডি ভ্রিস (De Vries) তাঁহার বিখ্যাত Mutation মতবাদ প্রচার করেন। এই দুইটি ঘটনা মরগ্যানের চিন্তাধারার পরিবর্তন আনিয়া দিল। ডি ভ্রিসের মতে তিনি এক-প্রকার দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ফেলিলেন এবং এই প্রকার পরিবর্তন দ্বারাই যে জীব-জগতে নূতন নূতন জীবের উৎপত্তি হইতে পারে সে বিষয়ে কোন প্রকার পরীক্ষামূলক কাজ সম্ভব কিনা তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার বয়স ৪০। ইঁদুর, পায়রা, প্রভৃতি নানাপ্রকার জীবজন্তু লইয়া গবেষণা চলিল। অবশেষে একদিন তিনি ফল-মাছির (Drosophila) কথা শুনিতে পাইলেন। তখন এই মাছি লইয়া হারভারড (Harvard) বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর কাসল (Castle) কাজ করিতেছিলেন। মরগ্যান তথা হইতে এই মাছি কিছু সংগ্রহ করিয়া কাজ আরম্ভ করিলেন। ১৯০৯ খৃঃ এই মাছি-গুলিকে তিনি বিভিন্ন অবস্থায় রাখিয়া তাঁহাদের পরিবর্তন লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। ১৯১০ খৃঃ এপ্রিল মাসে তিনি প্রথম পরিবর্তন (mutation) লক্ষ্য করিলেন। একটি পুং মাছির লাল চক্ষুর বদলে সাদা চক্ষু হইয়াছে। এই গবেষণাটিতে যৌন-ঘটিত বংশানুক্রমের

ড্রসোফিলা মাছি

(Sex-linked heredity) মূল ভিত্তি স্থাপিত হইল। ১৯১০ খৃঃ মধ্যে মরগ্যানের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ১৫টি বিভিন্ন পরিবর্তন আবিষ্কৃত হয়। এই সময়ে মরগ্যানের সহিত এই কাজে কয়েকজন বিশিষ্ট ছাত্র সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তন্মধ্যে হারমান জে মালার অন্যতম— মালার ১৯১৪ খৃঃ ফলমাছির সর্বাপেক্ষা ছোট ক্রোমোসোমটির (chromosome) (ইহার দৈর্ঘ্য মাত্র ৭M*) পরস্পর সম্বন্ধ (linkage) স্থাপন করেন। বিশিষ্ট ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে মরগ্যানের স্ত্রী লিলিয়ানও ছিলেন। লিলিয়ান মরগ্যানের প্রাক্তন ছাত্রী; ১৯০৪ খৃঃ তাহাদের বিবাহ হয়। ১৯১৭ খৃঃ লিলিয়ান গৃহকর্ম ত্যাগ করিয়া পুনরায় স্বামীর গবেষণাগারে যোগ দেন। ইতি-মধ্যে তাহাদের একটি পুত্র ও দুইটি কন্যা হয়। ১৯২২ খৃঃ লিলিয়ান স্বাধীনভাবে কাজ করিবার

ফল মাছির ৪ জোড়া ক্রোমোসোম এবং এই ছবিটি পুং মাছির। স্ত্রীং মাছির Y ক্রোমোসোম নাই দুইটিই X-এর মত। IV জোড়ার দৈর্ঘ্য মাত্র ৭ M.

সময় একটি অদ্ভুত ফলমাছি পান—এই মাছিটি স্ত্রীং বটে কিন্তু তাহার দৈহিক অবয়ব পুং মাছির মত। কয়েক সহস্র মাছি লইয়া কাজ করিবার পর লিলিয়ান ইহার প্রকৃত কারণ নির্দেশ করেন। ইহা বলিতে গেলে যৌন পরি-বর্তনের ইতিহাসে গোড়ার কথা হইয়া আছে।

১৯২২ খৃঃ মরগ্যানের গবেষণাগারে বহু বিদেশীয় মনীষীদের আগমন হয়। তাঁহার কার্যের সুখ্যাতি চতুর্দিকে এত বিস্তৃত হয় যে, সুদূর চীন, জাপান প্রভৃতি দেশ হইতে ছাত্রেরা তাঁহার অধীনে কাজ করিতে আসে। ১৯২৮ খৃঃ মরগ্যান তাঁহার খ্যাতির স্থল কলম্বিয়া (Columbia) বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া পাসাডেনার (Pasadena) ক্যালিফরনিয়া ইনস্টিটিউটে যোগদান করেন।

১৯৩৩ খৃঃ মরগ্যানকে চিকিৎসা শাস্ত্র ও শারীরবিদ্যা বিভাগের নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়। নোবেল বক্তৃতায় তিনি বলেনঃ—

"The most important contribution to medicine that genetics has made is intellectual. The whole subject of human heredity in the past has been so vague and tainted by myths and superstitions that a scientific understanding of the subject is an achievement of the first order."

* ইহাকে 'মিউ' বলা হয়; Micron-এর সংজ্ঞা; ইহা এক মিটারের $\frac{১}{১,000,000}$ অংশ।

অর্থাৎ—

চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রজনন বিদ্যার সর্বাপেক্ষা বড় দান হইল নৈতিক। অতীতকালে মনুষ্য বংশানুক্রমের সমস্তটুকুই এত অস্পষ্ট ও নানা-প্রকার প্রবাদ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন রহিয়া গিয়াছে যে, উহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাই প্রথম শ্রেণীর কাজ হইবে।"

মানুষের বংশানুক্রমের কথা বলিতে গিয়া ফ্রাঙ্কলিন ইনস্টিটিউটে (Franklin) ১৯৩৮ খৃঃ মরগান বলিয়াছিলেনঃ—

"If the transmission of the traditions of the race, its myths, taboos, customs, even its humanitarian weaknesses come in conflict with the laws of man's physical inheritance the former may at times delay furthur evolutionary advances of the kind that have brought man to his present status. And, on the other hand, the physical deterioration of the race, that may take place under the abnormal conditions of a complex and protected social life, can be prevented or ameliorated only by an intelligent understanding as to how such physical impairment takes place."
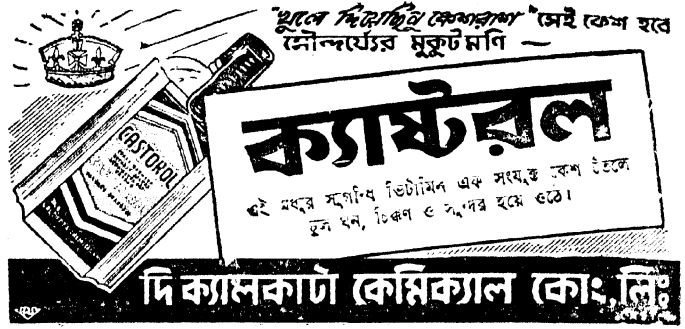
অর্থাৎ—"যদি জাতির রীতিনীতি ধারা, ইহার প্রবাদ, বাধা, বিধি, প্রভৃতি এমন কি ইহার মানবীয় দুর্বলতাগুলি মানুষের দৈহিক বংশানুক্রমের সূত্রগুলির সহিত সংঘর্ষে আসিয়া পড়ে তাহা হইলে প্রথমোক্তগুলি মানুষের ক্রমবিকাশের অগ্রগতির, অধুনা মানুষ যে স্তরে আসিয়াছে, তাহার বিলম্ব ঘটাইবে। আর, অপর পক্ষে, জাতির দৈহিক ক্ষয়, যাহা একটি জটিল ও রক্ষণশীল সামাজিক জীবনের অস্বাভাবিক অবস্থায় ঘটা সম্ভব, তাহার নিবারণ বা উপশম, একমাত্র কিরূপে এইরূপ দেহক্ষয় ঘটে তাহার সুদক্ষ বিবেচনার দ্বারা হইতে পারে।"

মরগ্যান ৭৫ বৎসর বয়সে ক্যালিফরনিয়া ইনস্টিটিউটের কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ইহার পর তিনি ফলমাছির কাজ পরিত্যাগ করিলেও তিনি অলস ছিলেন না। উক্ত ইনস্টিটিউটের সামুদ্রিক জীবতত্ত্বের গবেষণাগারে তিনি তাঁহার প্রথম বয়সের গবেষণা লইয়া ব্যস্ত ছিলেন এবং মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত তিনি কর্মরত ছিলেন। ১৯৪৫এর ৪ঠা ডিসেম্বর পাসাডেনায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

বংশানুক্রম বিজ্ঞানে মরগানের দান চির অমর হইয়া থাকিবে। নোবেল বক্তৃতায় তিনি প্রজনন বিজ্ঞানের দ্বারা মানবের কি কল্যাণ সাধিত হইতে পারে তাহার উল্লেখমাত্র করিয়াছিলেন এবং আজ তাঁহারই ছাত্র প্রফেসর মালার সেই নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর দুরারোগ্য ক্যান্সার ব্যাধির গবেষণায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। কে জানিত যে একটি সামান্য ফলমাছির আত্মজীবনী বিজ্ঞানের দৃষ্টি এতদূরে লইয়া যাইবে?

অশ্বত্থের অভিশাপ

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

(৪)

মুক্তামালা সকাল বেলা এক ঝুড়ি তরি-তরকারি লইয়া বসিত। এখানে আসিয়া এই তরকারি কোটা তাহার এক অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। প্রয়োজনের জন্য তরকারি কুটিবার আবশ্যক ছিল না, লোক ছিল, কিন্তু হাতের অতিরিক্ত সময় কাটাইবার পক্ষে কাজটা মন্দ নয়। পাশেই বাদলি একখানা ছোট বঁটি লইয়া বসিত। রাশিকৃত তরি-তরকারি বানান হইলে জগার মা আসিয়া উপস্থিত হইত, বলিত, বৌমা, এ কি কাণ্ড, তোমার বাড়িতে কি নিত্য সমারোহ, এত তরকারি খায় কে?

বাদলি বলিত, তোমাদের গাঁয়ে আবার খাবার লোকের অভাব? কই, কোনদিন তো পড়ে থাকতে দেখলাম না।

মুক্তামালা হাসিত। বাস্তবিক তাই, কোনদিন তরকারি নষ্ট হইত না। পাড়ার ঝি বউরা নিজ নিজ থালা বাসন লইয়া আসিত, তরকারি ও তাহার অনিবার্য উপকরণ হিসাবে আর সকলে লইয়া যাইত। সেই যে বাদলি তাহাকে শিক্ষা দিয়াছিল—বৌঠাকরুণ, ওরা তোমার বাড়িতে না খেলে কোথায় খাবে—এটা তাহার বেশ অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল।

সেদিন অভ্যস্ত ধরণের কথোপকথন শেষ হইয়া গেলে জগার মা বলিল—বৌমা, বুড়ো হয়েছি, কোনদিন বা মরে যাই। আর এতদিনে মরেই যেতাম, কেবল তোমার মুখখানা দেখবার জন্যেই বুঝি এতকাল বেঁচে ছিলাম।

তারপরে একটু থামিয়া আবার বলিল—চলো, একদিন তোমাকে বাড়ির সব মহলগুলো ঘুরে দেখিয়ে দিই। এত বড় বাড়ির কতটুকুই বা দেখেছ? তোমার শাশুড়ী বলতেন, নবু তো আর আমি বেঁচে থাকতে বিয়ে করল না, তা হ'লে বৌকে সব বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেখিয়ে শুনিয়ে দিয়ে যেতে পারতাম। এর পরে বৌ এসে একলা ছেলেমানুষ এত বড় বাড়ির ভার কি ক'রে নেবে এই ছিল তার ভয়।

তারপরে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিত, বৌ যদি বা এলো—সে থেকে গেল কলকাতায়। বাড়িতে এখন ঝি চাকর আর চামচিকে বাদুড়ের আড্ডা হয়েছে।

মুক্তামালা বাড়ির সব মহল দেখিবার আগ্রহ বলিল—আজই চলো না জগার মা—আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করে! কতটুকুই বা দেখলাম। দুচারটে ছাড়া সব ঘরগুলোই তো বন্ধ।

জগার মা বলিল—সেই ভালো মা, আজ দুপুরবেলা সব দেখিয়ে দিই। তখন যার জিনিস তার হাতে দিয়ে আমার ছুটি। তারপরে কতকটা যেন নিজেকেই সম্বোধন করিয়া বলিল—আর আমি হয়েছি যেন যক্ষ বুড়ি—সমস্ত পুরীটা আগলে বসে রয়েছি, কিন্তু আর কতকালই বা। এই বলিয়া সে নিজের কপালে একবার হাত ঠেকাইল।

* * * *

বাস্তবিক এত বড় বাড়ির অতি সামান্য অংশই মুক্তামালা দেখিয়াছিল। চৌধুরীদের সকল শরিকের বাড়ি পঁচিশ ত্রিশ বিঘা জমি অধিকার করিয়া গ্রামের মধ্যস্থলে বিরাজমান। কবে কতকাল আগে আদি পুরুষ পিপ্পড়িয়া ওঝার সেই বেলগাছতলার মৃৎকুটীর প্রথম ইটকালয়ে রূপান্তরিত হইয়াছিল তাহা কেহ বলিতে পারে না। তবে বাড়ির প্রাচীনতম অংশ হইতে আধুনিকতম অংশগুলি দেখিলে অন্তত তিন চারটা শতাব্দীর পদচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীনতম অংশ এখন সম্পূর্ণরূপে ব্যবহারের অযোগ্য, জীর্ণ ইষ্টক স্তূপ মাত্র। তাহার উপরে অশ্বত্থে, বেলে, বটে, পাইকড়ে অরণ্যের ভূমিকা। সেখানে দোলকলমির তার বনো ফুল ফোটে। গাছের শিকড় আর দেয়ালের ইঁট পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিয়া এমন শক্ত গাঁথুনির সৃষ্টি করিয়াছে যে প্রচণ্ড ভূমিকম্পেও আর তাহাকে টলাইতে পারে না। সেই ভাদ্রের বড় ভূমিকম্পে চৌধুরীদের বাড়ির গোটা একটা নূতন মহল ধ্বসিয়া পড়িল, গাঁয়ের কোঠা বাড়ি বড় একটা খাড়া ছিল না, কিন্তু এই প্রাচীন অংশের জীর্ণ স্তূপের একখানা ইঁট খসিল না। লোকে অবাক্ হইয়া বলাবলি করিল—সেকালের কাজই আলাদা। একালে কেবল ফাঁকি, কেবল ফাঁকি। আসল রহস্য যদি তাহারা জানিত বুঝিতে পারিত প্রকৃত কারিগরী সেকালের নয়—আদিম কালের। সকলের সেরা কারিগর উদ্ভিদরাজ নমনীয় শিকড়ের বন্ধনে এমন গাঁথুনির সৃষ্টি করিয়াছে বাসুকির শির নাড়িয়া তাহা ছিন্ন করিতে অক্ষম। যে বন্ধন নমনীয় তাহার মতো দৃঢ় আর কি? যে বন্ধন যত বেশী নমনীয় তাহা তত দৃঢ়। অদৃশ্য বন্ধন দৃঢ়তম। চৌধুরী বাড়ির প্রাচীনতম এই অংশে এখন আর কেহ থাকে না, অনেককাল হইল তাহা মনুষ্যবাসের অনুপযোগী। সেখানে গাছতলাতে পালে পালে শিয়াল, বন বিড়াল, খটাস নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া বেড়ায়। শীতকালে কখনো কখনো এক আধটা পলাতক বাঘ আসিয়া আশ্রয় নেয়। দিনের বেলায় গাছের ডালে ডালে নিম্নমুখী বাদুড়ের দল ঝুলিতে থাকে, রাত্রিবেলা হুতুম অন্ধকারের মন্ত্রীর মতো সকল কথাতেই হুম, হুম বলিয়া আপত্তি প্রকাশ করে। রাত্রির প্রহরে প্রহরে শিয়ালগুলি চৌধুরীদের ঘড়ির সঙ্গে অগণ্য দোহারের মতো প্রহর ঘোষণা করে। শজারু খড় খড় শব্দে নিস্তব্ধতাকে কণ্টকিত করিয়া আহারান্বেষণে বাহির হয়। আর একটা পুরাতন মহানিমের গুঁড়িকে জড়াইয়া গাছের আলোছায়ায় রং মিলাইয়া পড়িয়া থাকে—এটা বিরাট অজগর সর্প। ওটা চৌধুরীদের বাস্তু। পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে বাস্তুপূজা উপলক্ষে একটা ছাগলকে সবলে সেই মহা নিমের দিকে ছুঁড়িয়া দেওয়া হয়। আগাছায় অন্তরাল হইতে একবার কেবল হতভাগ্য পশুটার একটা অর্ধব্যক্ত কাতরধ্বনি ওঠে, আর বারেকের জন্য মাত্র আগাছাগুলি নড়ে, তাহার জীবনান্তের শেষ রহস্যটুকু জানিবার জন্যও লোকে অপেক্ষা করে না—পালাইয়া চলিয়া আসে। সে স্থানটা এমনি দুর্গম ও বিভীষিকাময় যে চোর ডাকাতও প্রাণভয়ে সেখানে পালাইয়া আত্মরক্ষা করিতে সম্মত হইবে না। সেখানে সারা বৎসর কেবল বাতাসের শন্‌শন্‌, আর পশুপক্ষীর রব। জায়গাটা কেবল মানুষের ব্যবহারের বাহিরে দিয়া পড়ে নাই, মানুষের স্মৃতির সীমানারও বহির্ভূত হইয়া গিয়াছে—ওটা যেন মানুষের পরিচিত পৃথিবীর ভূখণ্ড নয়, কোন পরিত্যক্ত পৃথিবীর একটা অপার্থিব অংশ। ওটা যেন নিস্তব্ধতার অদ্বৈতবাদের জগৎ।

* * * *

দুপুরবেলা আহারাদির পরে জগার মা এক গোছা চাবি হাতে করিয়া মুক্তামালার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল, মুক্তামালা প্রস্তুত

হইয়া বসিয়াছিল। জগার মার পিছনে পিছনে সে বাহির হইয়া পড়িল, সঙ্গে থাকিল বাদলি।

বাদলি বলিল—দাও না জগার মা চাবির গোছাটা আমার হাতে, তোমার কষ্ট হচ্ছে।

জগার মা বলিল—তুই থামতো ছুঁড়ি, ও চাবি যখন দেবো একেবারে মালিকের হাতেই দেবো। কষ্ট ক'রে এতদিনই যদি বইতে পারলাম, আর ক'টা দিনও পারবো।

জগার মা নূতন মহলের পিছনের প্রাচীরের একটা দরজার মরিচা-ধরা তালা খুলিয়া ফেলিল। বলিল, এসো বৌমা আমার সঙ্গে, কোন ভয় নেই।

মুক্তামালা এখানে ইতিপূর্বে প্রবেশ করে নাই, এমনকি এদিকটার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও তাহার কিছুমাত্র জ্ঞান ছিল না। সেখানে ঢুকিবামাত্র তাহার মনে হইল হঠাৎ যেন বাস্তবের তীর হইতে আরব্যোপন্যাসের একটা উপশাখার স্বচ্ছ হাটুজল স্রোতের মধ্যে নামিয়া পড়িয়াছে। জগার মা বলিল—বৌমা, এটা ছিল তোমার শাশুড়ীর বাগান। তার ফুলের সখ ছিল, কত রকম ফুলের গাছই না লাগিয়ে ছিল। তার মৃত্যুর পরে এদিকের দরজায় সেই যে চাবি পড়েছিল—আর আজই বোধ হয় প্রথমবার খুললো।

মুক্তামালা দেখিল, সত্যই একটা ফুলের বাগান। কিন্তু বহুকালের অযত্নে অধিকাংশ ফুলের গাছ মরিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আজও যাহা অবশিষ্ট—তাহার সৌন্দর্য তাহাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। প্রাচীরের ধার দিয়া সারিবন্দী ডালিমের গাছ, মানুষের নিত্য স্পর্শ হইতে বাঁচিয়া গিয়া তাহারা স্বচ্ছ সবুজ পল্লব প্রাচুর্যে আর শরতের সোনাঢালা রৌদ্রে ঝলমল করিতেছে। এক পাশে গোটা দুই নাতিবৃহৎ শিউলির গাছ—সকাল বেলার ঝরা ফুলগুলি শুষ্ক, শাখায় শাখায় অগুন্তি অস্ফুট কুঁড়ি। আর একদিকে এক সার পাতাবাহারের গাছ। কিন্তু সবচেয়ে বেশি করিয়া চোখে পড়ে—উত্তর দিকে প্রকাণ্ড একটা দারুচিনির বৃক্ষ। ঘন শ্যামল, চিক্কণ কোমল পাতার সৌষ্ঠবে পরিপূর্ণ তাহার বলিষ্ঠ শাখাগুলির কি বঙ্কিম ভঙ্গিমা—যেন বংশীধ্বনি বিমোহিত একটা শ্যামল অজগর মনের গোপন আনন্দকে প্রকাশ্য রূপ দিবার চেষ্টায় মনোহর ভঙ্গীতে অর্ধোত্থিত হইয়া বিরাজ করিতেছে। ডালিম গাছের উপরে গোটা দুই টুনটুনি পাখী; আর দারুচিনির পল্লবের মধ্যে অর্ধলুক্কায়িত একটা হলদে পাখীর পাখার পীতাভ ছটা। বাগানের মাঝখানে শ্বেতপাথরে বাঁধানো একটা গোলাকার চাতাল, পাশেই একটা লবঙ্গের গাছ।

মুক্তামালা সেই চাতালটার উপরে গিয়া বসিল। বলিল, জগার মা এত সুন্দর বাগান এত কাছে, আর আমাকে এতদিন দেখাওনি!

জগার মা বলিল—সবই তোমাকে দেখাবো ভেবে রেখেছি মা, কিন্তু যে ঝড় মাথায় করে তুমি এসেছ সময় পেলাম কই। তা ছাড়া বর্ষাকালে এদিকের আগাছা আর জঙ্গল এত বেশি হয় যে তখন ঢোকা সহজ নয়। বৌমা, তোমার শাশুড়ীর খুব ফুলের সখ ছিল। তিনি কত জাতের, কত রঙের গোলাপের গাছ লাগিয়েছিলেন, আর লাগিয়েছিলেন গাঁদার গাছ। আর ওই দিকটায় ছিল নানা রঙের সন্ধ্যা মালতী। সন্ধ্যাবেলা নিজের হাতে গাছে জল দিতেন। আমি বলতাম, বৌ, তুমি নিজে জল দাও কেন, তোমার কি ঝি চাকরের অভাব আছে নাকি? তা শুনে তোমার শাশুড়ী বলতেন, ওদের বললে ওরা ফাঁকি দেয়—ভাবে এ বুঝি কাজ নয়। সন্ধ্যাবেলা এখানে এসে মাদুর পেতে বসতেন। কাছারীর কাজ শেষ হলে তোমার শ্বশুর এসে বসতেন—প্রকাণ্ড আলবোলায় করে তামাক আসতো তাঁর জন্যে। তোমার শাশুড়ী বলতেন, তোমার তামাকের গন্ধে আমার ফুলের গন্ধ নষ্ট হয়ে গেল। তা শুনে তোমার শ্বশুর হেসে বলতেন বড়বউ, তোমার ফুলের গন্ধের চেয়ে আমার তামাকের গন্ধ অনেক ভালো—এ যে বাইশ টাকা সেরের তামাক। আজ সে সব দিন কোথায় গেল মা। বৃদ্ধার চোখ ছলছল করিয়া উঠিত। মুক্তামালার মন উদাস হইয়া যাইত, শরতের রোদ সহজেই মন উদাস করিয়া দেয়—তাহার সহিত পুরাতন স্মৃতি মিশ্রিত হইলে তো আর কথাই নাই।

জগার মা বলিল—চলো বৌমা, এখনো অনেক দেখবার আছে। তাহাকে অনুসরণ করিয়া দুইজনে উঠিয়া পড়ে। জগার মা বাগানের দক্ষিণ দিকের আগাছা ও লতাপাতা ঠেলিয়া প্রাচীরে একটা দরজা আবিষ্কার করে। মুক্তামালা অবাক হয়—এখানে দরজা ছিল, সে তো বুঝিতে পারে নাই। দরজা খুলিয়া জগার মা বলে—এসো বৌমা, ভয় নেই।

তাহারা একটা পুরাতন মহলে ঢুকিয়া পড়ে।

মুক্তামালা দেখে— জীর্ণপ্রায় চকমিলানো একটা মহল। মেঝেতে সিমেণ্ট নাই, খোয়া পিটাইয়া সমান করিয়া দেওয়া হইয়াছিল—এখন অব্যবহারে বন্ধুর। ছাদ নীচু, আস্তরখসা, দেয়ালে নোনা ধরিয়াছে, জানলার সংখ্যা নাই বলিলেও হয়, যাহা আছে অতি উচ্চে, অতিশয় ক্ষুদ্র। ইটগুলো এখনকার মতো নয়, পাতলা, চৌকা, দরজার কাঠ ও হুড়কা এখনো খুব মজবুৎ। সে বুঝিতে পারে এসব বাড়িঘর তখনকার দিনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়—চোর-ডাকাতের উপদ্রবের সময়ে চৌকিদার-পুলিশের চেয়ে দরজার হুড়কার উপরেই লোকে যখন বেশি নির্ভর করিত। তাহার নাকে আসে একটা বন্ধ-ঘরের ভাপসা গন্ধ।

জগার মা বলে—বৌমা, এই বাড়িতেই তোমার শ্বশুর বাল্যকালে কাটিয়েছেন। তোমার শাশুড়ীও এই বাড়িতে এসেই উঠেছিলেন। এই দেখো, এইটা ছিল তাঁদের শয়নঘর—এই দেখো এখানে জ্বলতো পিতলের পিলসুজে তেলের বাতি, এখনো দেয়ালে ধোঁয়ার দাগ লেগে আছে।

মুক্তামালার মনে চমক খেলিয়া যায়। সে ভাবে, আলোর চেয়ে ধোঁয়ার দাগেরই আয়ু বেশি। আলো নিভিয়া যায়—ধোঁয়ার দাগ মিলায় না।

—এদিকে এসো মা। এই শয়নঘরের দুপাশে দুটো কোঠা দেখছ? একটা দক্ষিণের কুঠুরি, একটা উত্তরের কুঠুরি। এই উত্তরের কুঠুরিতে তোমার শাশুড়ীর সব সৌখীন জিনিস থাকতো, কত খেলনা কাঁচের, চিনে মাটির। কড়ি-বসানো সুন্দর একটা বেড় ছিল—অমন সুন্দর জিনিস আর দেখলাম না। আর ওই দক্ষিণ দিকের ঘরটায় লোহার দরজা দেখেই বুঝতে পারছো, ওই ঘরটা থাকতো সোনা-দানা মোহর টাকা-কড়িতে ভরা। রুপোর ছাতি, রুপোর আশা-সোঁটা, রুপোর চৌদল বাসন হাওদা এমন যে কত ছিল, তার ঠিক নেই। ওই কোণে বড় বড় দুটো সিন্দুক-ভর্তি মোহর আর সোনার থান ছিল।

এমন সময়ে অন্ধকার হইতে গোটা দুই চামচিকা ফড় ফড় করিয়া উড়িয়া যায়—মুক্তামালা চমকিয়া ওঠে। জগার মা বলে—ভয় নেই মা, চামচিকা। বাদলি হাসিয়া ওঠে।

জগার মা বলে—আবার হাসির কি হল রে?

বাদলি বলে—চামচিকের শব্দে কি বৌঠাকরুণ মূর্ছো যাবে যে তুমি সাবধান করে দিচ্ছ? এতে আবার ভয়ের কি আছে?

জগার মা বলে—আছে রে আছে। সব কথা তো সবাই জানে না।

মুক্তামালা ও বাদলির কৌতূহল বৃদ্ধি পায়। তাহারা শুধায় কিসের ভয়—বলই না জগার মা।

জগার মা বলে—কর্তা হঠাৎ ওই নতুন মহল তৈরি করতে গেল কেন? যারা জানতো সে কথা—তাদের আজ তো কেউ বেঁচে নেই। সব পুরানো কথার থানাদার হয়ে কেবল আমি রয়ে গিয়েছি।

মুক্তামালা বলে—বলো না জগার মা কি হয়েছিল। তোমার গল্প আমার খুব ভালো লাগে।

জগার মার মুখ উজ্জ্বল হইয়া ওঠে। সে বলে, এই দালানে একটা দোষ ঘটেছিল। এই বংশেরই কোন এক বৌ গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল, সে অনেকদিন আগের কথা, সবাই ভুলেই গিয়েছিল। কিন্তু তোমার শাশুড়ীর

আসবার পর থেকে এই দালানে উপদ্রব আরম্ভ হল। এসব কথা তোমার শাশুড়ীর নিজ মুখে শুনেছি।

তোমার শাশুড়ী তো নূতন বউ। এত বড় চৌধুরী বংশ—সকলের সঙ্গে তখনো তাঁর পরিচয় ঘটেনি। একদিন সন্ধ্যাবেলা তোমার শাশুড়ী এই দালানের ছাদের উপরে বসে আছেন, তখনো তোমার শ্বশুর ভিতরে আসেন নি। তোমার শাশুড়ী বসে ভাবছেন তো ভাবছেনই—হঠাৎ পিছনে পায়ের শব্দ, পিছনে ফিরে তাকালেন, ভাবলেন হয়তো স্বামী আসছে! কিন্তু স্বামী কই? দেখলেন লাল-পেড়ে শাড়ি-পরা, ঘোমটা দেওয়া একটি বউ। তোমার শাশুড়ী ভাবলেন, চৌধুরী বাড়িরই কোন বউ হবে। তোমার শাশুড়ী ভবতারিণী তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে একখানা আসন এনে বসতে দিলেন। কিন্তু তাঁর খেয়াল হল না যে, এ বউ এলো কোন্ পথ দিয়ে। ছাদে উঠবার একমাত্র সিঁড়ি আগলে তো বসে ছিলেন নিজে। সে যাক গে—তিনি তো আসন পেতে দিলেন। কিন্তু বউ আর বসে না। তিনি যতই বসতে বলেন বউ মুচকে মুচকে হাসে, কিন্তু কিছুতেই আর বসতে চায় না। এমন সময়ে সিঁড়িতে তোমার শ্বশুরের পায়ের শব্দ শুনে ভবতারিণী তাড়াতাড়ি উঠেছেন, ইচ্ছা যে স্বামীকে আসতে নিষেধ করে। স্বামীকে নিষেধ করে ফিরে এসে দেখে— কই, কেউ কোথাও নেই। না, কোথাও নেই। ভাবলেন নেমে গিয়েছে। কিন্তু তখনো খেয়াল হল না যাবে কোন্ পথে। ভবতারিণী তখন ছেলে-মানুষ বউ, এসব কথার কিছুই সে স্বামীকে বলল না। আর বলবার আছেই বা কি? এমনি ভাবে দিন কতক যায়, হঠাৎ সেই বউটিকে তোমার শাশুড়ী দেখতে পেলো, সেই রকম লাল শাড়িপরা। বউ কাছে আসে, কিন্তু কথাও বলে না, বসতে দিলেও বসে না। তোমার শাশুড়ী ভাবলো ওই মেয়েটিও তার মতো নূতন বউ, তাই লজ্জায় কথা বলছেনা। ভবতারিণীর মনে হ'ল—আমিও তো একলা, ভালই হয় এই নূতন বউটির সঙ্গে ভাব জমে উঠলে, দুজনে বসে বসে বিবিধ গল্প করা যাবে!

সেই পুরানো দিনের পরিত্যক্ত জীর্ণ অট্টালিকার কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে ঘুরিতে ঘুরিতে বৃদ্ধা জগার মা, সে নিজেও প্রাচীন-কালের একটা জীর্ণ অট্টালিকা, বাস্তবের অপেক্ষা স্মৃতির রাজ্যেরই সে যেন প্রকৃত অধিবাসী, সে এই কাহিনী বলিয়া যায় আর মুক্তামালা ও বাদলি নিস্তব্ধ বিস্ময়ে শুনিতে থাকে। স্থান মাহাত্ম্য এমন গুরুতরভাবে মুক্তামালার বুকের উপরে চাপিয়া না বসিলে এ কাহিনী হয়তো সে বিশ্বাস করিত না। কিন্তু এখানে দাঁড়াইয়া এ কাহিনী বিশ্বাস না করিয়া উপায় কি? এই চামচিকা-ওড়া, চুণবালি খসিয়া পড়া, স্মৃতির দীপাঙ্ক আঁকা, সিক্ত, রিক্ত, নিস্তব্ধ অট্টালিকায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া এ কাহিনী বিশ্বাস করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। কাহিনীর ভাঁজে ভাঁজে তাহার গা ছম ছম করিয়া ওঠে, মনে হয় সেদিনের সেই লালপেড়ে শাড়িপরা বউটি কার্নিসের কাছে দাঁড়াইয়া থাকিবে এমন মোটেই অসম্ভব নয়। অনেককাল পরে মানুষ আজ তাহার কাছাকাছি আসিয়াছে। মুক্তামালার ছাদের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিতে ভয় হয়—অথচ কৌতূহল দৃষ্টির একটা অংশকে উপরের দিকে টানিয়া তোলে। একবার তাহার মনে হয় কাহিনীর বাকিটা শুনিয়া কাজ নাই, কিন্তু ভয়ের গল্প আর লঙ্কার ঝাল গলধঃকরণ করা কঠিন, না-করা আরও কঠিন। কাহিনীর স্রোত আবার বৃদ্ধার স্খলিত বচনে অবারিত হইয়া যায়।

একদিন বিকাল বেলা তোমার শ্বশুর শোবার ঘরে এসে দেখেন যে ভবতারিণী ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। শুধোলেন কোথায় চললে? ভবতারিণী বলল—আজ এত আগে এলে কেন? আমি যে চলেছি ওবাড়ির নতুন বউটির সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিতে।

তোমার শ্বশুর কেবল শুধোলেন—কোন্ বউ?

স্বামীর গম্ভীর স্বরে বিস্মিত হয়ে ভবতারিণী বলল—বোধ করি পাশের বাড়ির হবে। অনেকদিন থেকে আমাদের ছাদের উপরে যাতায়াত করছে—কিন্তু কিছুতেই কথা বলে না। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। স্বামী সবলে তার হাতটা ধরে ফেলে বলল—খবরদার যেয়োনা।

ভীত ভবতারিণীর মুখ থেকে শুধু বেরুলো—কেন?

—ও মানুষ নয়।

—মানুষ নয়! বলেই ভবতারিণী মূর্ছিত হয়ে পড়লো—স্বামী তাকে ধরে ফেলল।

মুক্তামালা স্তম্ভিত হইয়া শোনে।

জগার মা বলে—তারপরে তোমার শাশুড়ীর শরীর ভেঙে পড়বার মতো হল। সর্বদাই মনমরা হয়ে থাকে। তোমার শ্বশুর তখন এখন যে মহলে তোমরা বাস করছ সেই মহলটা তৈরি করে নিয়ে উঠে চলে এল। তখন থেকেই বাড়ির অংশটা জনশূন্য।

দীপ নিভিয়া গেলে সলতে-পোড়া গন্ধ রহিয়া যায় কাহিনীর শেষে তাহার স্মৃতি রহিয়া গেল। জগার মা বলিল—চলো বৌ মা, আর একটা মহল বাকি আছে, পুজোর দালান, দেখিয়ে নিয়ে ফিরে যাই, বেলা বোধহয় শেষ হয়ে এলো।

তাহারা তিনজনে বিরাট একটি চণ্ডী-মণ্ডপের খিলানের নীচে আসিয়া দাঁড়াইল। দেয়ালে দেবাসুরের যুদ্ধ, বস্ত্র হরণ, কালীয়-দমন প্রভৃতি আখ্যানের কাজকরা। দালানের মাঝখানে অতি পুরাতন একখানা চন্দন কাঠের তক্তপোষ, দেবী প্রতিমা স্থাপিত হইত। কুলুঙ্গির উপরে কতকালের একটা ভগ্ন ধূপদানি, ইতস্ততঃ মাটির প্রদীপ ছড়াছড়ি যাইতেছে।

জগার মা বলিল—এই তোমাদের পুরানো মণ্ডপ। এখন যে মণ্ডপে তোমাদের পুজো হয়ে থাকে সেটাও তোমার শ্বশুরের গড়া। এ মন্দিরে পুজো হয় না বলে এর মাহাত্ম্য কিছু কম মনে করো না যেন। যেখানেই যা হোক্, আগে এই বুড়ো মণ্ডপের নামে একটা পুজো দিতেই হবে। আর দেবেই বা না কেন? এযে জাগ্রত মণ্ডপ, কত দিনের পীঠস্থান। শোনো বউ মা একটা কথা বলি, কবে মরে যাই, কে আর এসব কথা বলবে? কখনো অস্নাত, বা একা বা সন্ধ্যার সময়ে এদিকে এসো না। কেন? রাত বিরেতে ওঁরা এখানে আসেন। কত লোকে দেখে দবকে উঠেছে, কত লোকের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে, মারাও গিয়েছে বলে শুনেছি। দেবতার দর্শন পাপী অশুচির সইবে কেন? ওঁরা যে আসেন তার প্রমাণ হচ্ছে সন্ধ্যাবেলা এখানে কাঁসর ঘণ্টা বাজে, ধূপ-ধুনোর গন্ধ ওঠে, কত লোকে দেখেছে। আর তাও বলি বউমা, ওঁদের লীলা খেলার মধ্যে মানুষের আসবার দরকারই বা কি?

এই পর্যন্ত বলিয়া সে বলিল—এবারে চলো বেলতলাটা দেখিয়ে নিয়ে ফিরে যাই। জগার মা বলিল—এই স্থানটুকুই চৌধুরীদের আদি পুরুষের বাসস্থান। চৌধুরীদের সব ভাগ হয়েছে, কিন্তু এটুকু ভাগ করবার কথা কেউ মনে করতেও সাহস পায়নি। এতটুকু জমি—দাম লক্ষ টাকা।

বৃদ্ধা লক্ষ শব্দটাকে বারম্বার আবৃত্তি করিতে লাগিল তাহাতে বুঝিতে পারা গেল না মূল্যটা মাত্র এক লক্ষ না লক্ষ লক্ষ।

—হাঁ—বলুক তো কেউ জমিটা ভাগ ক'রে নেবো—দেখি কার বুকের কত পাটা! কিম্বা কেউ কারু দরজা বন্ধ করুক তো দেখি কত সাহস? দুই শরিকে কতবার মামলা মোকদ্দমা মারামারি কাটাকাটি, এমন কি মুখ দেখাদেখি বন্ধ—কিন্তু বউমা বেলতলার উপরে হাত দিতে কেউ তো সাহস করলো না।। এইটুকু ভয় ভক্তি আছে বলেই চৌধুরীদের এখনো সব যায়নি। যেদিন এই ভয় ভক্তিটুকু যাবে—বলিতে বলিতে তাহারা বেলতলায় ছ'আনির দিকের দরজার কাছে আসিয়া পৌঁছায়। জগার মা একটা চাবি চাহিয়া লইয়া তালা খোলে। তারপরে তিনজনে সবলে টানাটানি করিয়া শাল কাঠের দরজা খুলিয়া ফেলে।

জগার মা চমকিয়া ওঠে বলে— দরজা গেল

কোথায়? এখানে দেয়াল গেঁথে দিল কে? বৃদ্ধা শিরে করাঘাত করিয়া বসিয়া পড়ে।

—হায় হায়, এ দুর্মতি কার হল? চৌধুরীদের আর কিছু থাকলো না! হায় হায়, এবারে চৌধুরীদের পাপের ভরা পূর্ণ হ'তে আর কিছু বাকি থাকলো না।

এইরূপ খেদোক্তি করিতে করিতে এই ভয়াবহ ঘটনা নবীন নারায়ণকে জানাইবার জন্য সে রওনা হইল। দরজা খোলাই পড়িয়া রহিল। মুক্তামালা ও বাদালি মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাহার পিছনে পিছনে চলিল।

(৫)

নবীননারায়ণ খবর পাইবামাত্র সেনা সর্দারকে সঙ্গে লইয়া বেলতলায় আসিয়া উপস্থিত হইল, দেখিল সত্য সত্যই ছ'আনির দরজা অপর দিক হইতে প্রাচীর তুলিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। জহিরুল্লা মিস্ত্রিকে ডাকিয়া আনিবার জন্য তখনই সে সোনা সর্দারকে পাঠাইয়া দিয়া বৈঠকখানায় ফিরিয়া আসিল।

অশথ গাছটা কাটিবার পর হইতে দশানি অনেক উৎপাত তাহার উপরে করিয়াছে। এই সব ব্যবহারে সে মনে মনে বিরক্তি বোধ করিত, কিন্তু আজ এই প্রথম তাহার বিষম ক্রোধের সঞ্চার হইল। যেন হঠাৎ এক পলকে দেহের সমস্ত রক্ত গিয়া তাহার মাথায় উঠিল। বৈঠকখানায় গিয়া সে সুস্থ হইয়া বসিবার চেষ্টা করিল, পারিল না, উঠিয়া ঘরময় পায়চারি করিয়া ফিরিতে লাগিল। তাহার যদি চিন্তা করবার মতো মনের প্রকৃতিস্থতা থাকিত তবে বুঝিতে পারিত এই এক বৎসরকাল সময়ের মধ্যে কি বিরাট পরিবর্তন তাহার হইয়াছে। সে যে কখনো জমিদার সাজিয়া বসিবে, প্রজা শাসন করিবে, শরিকের সহিত দাঙ্গা করিবে—এ সমস্ত তাহার চিন্তার অতীত ছিল। জমিদার পুত্র হইলেও জমিদারি মনোবৃত্তি হইতে সে রক্ষা পাইয়া গিয়াছে, জমিদারি চাল চলনের ঊর্ধ্বে সে উঠিতে সমর্থ হইয়াছে—ইহাই ছিল তাহার বিশ্বাস। সে জানিত সে আধুনিক যুগের মানুষ। জমিদার যতই শিক্ষিত হোক, যতই একালীন হোক, সে আধুনিক যুগের মানুষ হইতেই পারে না—কারণ জমিদারি ব্যাপারটাই প্রাচীন যুগের ছাপ মারা।

কিন্তু একটা বৎসরে তাহার কত পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। আর দৈবের কি শ্লেষ। সে গ্রামে আসিয়াছিল মাত্র কয়েকটা দিনের জন্য, যেমন আগে অনেক বার আসিয়াছে। হঠাৎ তাহার চোখে পুরাতন অশথ গাছটা নূতন করিয়া পড়িয়া গেল। গাছটা কি কাটিয়া খানিকটা জমি আবাদযোগ্য করিয়া তুলিবার কি খেয়াল তাহার মাথায় চাপিল। এই খেয়াল তাহাকে এবং সমস্ত গ্রামকে কোথায় আনিয়া ফেলিয়াছে—আর এই সব মামলা মোকদ্দমা উপলক্ষে গ্রামে থাকিতে বাধ্য হইয়া ধীরে ধীরে তাহার মনোবৃত্তির একটা ওলটপালট হইতে শুরু করিয়াছে।

সে নিজে জমিদার সাজিয়া বসিবে না স্থির করিয়াছিল। এমন প্রতিজ্ঞা রক্ষার স্থান কলিকাতা হইতে পারে—কিন্তু জোড়াদীঘি গ্রাম কখনেই নয়। এখানকার আবহাওয়া প্রাচীন যুগের বিদ্যুতে ঠাসিয়া ভরা। আর এই যে তাহার পৈতৃক ভবন, বহু যুগের এবং বহুতের পূর্ব পুরুষের স্মৃতি ও কর্মকীর্তির স্থিরাবর্ত রচনা করিয়া বিরাজমান, এখানে কলিকাতার আধুনিক মনোবৃত্তি রক্ষা করিয়া চলা কি সম্ভব? তৃণখণ্ডের আকৃতি ও প্রকৃতি যেমনই হোক নদীর আবর্তে পড়িয়া গেলে অসহায়ভাবে তাহাকে চক্রাকারে ঘুরিতেই হইবে। নবীন নারায়ণের আজ সেই অবস্থা। এক বৎসরের দীর্ঘ বিলম্বিত আঘাতে এবং বেলতলার দরজা বন্ধ হইবার অকস্মাৎ সংঘাতে তাহার ভিতরকার প্রাচীন দিনের স্মৃতির চাবুক খাওয়া রক্তধারা জাগিয়া উঠিল। সে অনুভব করিতে লাগিল যেন তাহার পূর্বগামী পিতামহগণ এই কাপুরুষতার জন্য তাহার হৃৎস্পন্দনের মধ্যে নিরন্তর ধিক ধিক ধ্বনি উচ্চারণ করিতেছে। পর্বতের বিপুল ভারে তাহার অধঃস্থাতন নিতান্ত অসহায় ও পীড়িত বোধ করিতে লাগিল। সে স্থির করিল—এই অপমানের, এ অপমান আর ব্যক্তিগত মাত্র নয়, তাহার পূর্বজ সমস্ত বংশধারকদের এই অপমানের—একটা যথার্থ বিহিত করিতে হইবে। আর অবহেলা করা উচিত হইবে না।

ইতিমধ্যে সোনা সর্দারের সঙ্গে জহিরুল্লা মিস্ত্রি আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। নবীন বলিল—এই যে এসেছ। দেখো এক কাজ করতে হবে। বেলতলার আমাদের দিকের দরজাটা কে যেন প্রাচীর তুলে গেঁথে দিয়েছে। ভেঙে ফেলতে হবে।

এই প্রাচীর যে দশানির হুকুমে গাঁথা হইয়াছে এবং গাঁথিয়াছে স্বয়ং জহিরুল্লা সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহের অবকাশ ছিল না। কিন্তু মিস্ত্রির ব্যবসায় জহিরুল্লার একচেটিয়া কাজেই তাহার উপরে রাগ করিলেও তাহা প্রকাশ করা চলে না। বিশেষ, তাহার নিরপেক্ষতার খ্যাতি সর্বজন বিদিত। নবীন জানিত সে যেমন নিস্পৃহভাবে প্রাচীর গাঁথিয়াছে তেমনি নিস্পৃহভাবে ভাঙিয়া ফেলিবে। এমন নির্বিকার লোকের উপর রাগ করা মনুষ্য-স্বভাব সুলভ নয়।

নবীন বলিল—এখনি কাজ আরম্ভ করতে হবে, একশো টাকা পাবে।

জহিরুল্লার মুখে চিরসংলগ্ন হাসির আভা একটু উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। সে ভাবে যেন না হইল আর গ্রামের একমাত্র রাজমিস্ত্রী হইয়া সুখ কোথায়। সে ভাবিল সে প্রাচীর গাঁথিয়ে সে পঁচিশ টাকা পাইয়াছিল ভাঙিলে পাইবে একশত। এমন হইলে ভাঙা ছাড়িয়া আর কে গড়ার কাজে হাত দিবে?

জহিরুল্লা কাছারী হইতে নগদ একশত টাকা চাহিয়া লইয়া প্রাচীর ভাঙিতে চলিল—সঙ্গে নবীন চলিল।

দমাদম হাতুড়ির আঘাতে স্বল্পক্ষণে গড় প্রাচীর খণ্ডখণ্ডরূপে ভাঙিয়া পড়িল। এবারে দশানির লোক প্রস্তুত ছিল, পাঁচ সাতজন লাঠিয়াল। সদ্য উন্মুক্ত দরজা দিয়া নবীন যেমনি প্রবেশ করিয়াছে অমনি লাঠিয়ালেরা তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। কেহ তাহার গায়ে হাত দিল না। কিন্তু ইহার চেয়ে বোধ করি তাহাও ভাল ছিল। তাহারা বলিল হুজুর আজ একবার দশানির বাড়িতে পায়ের ধুলো দিতে হইবে।

নবীন দেখিল সে নিতান্ত অসহায়। বল প্রকাশ করিলে এটুকু মর্যাদাও অক্ষুণ্ণ না থাকিতে পারে। অনিবার্য অপমান আগ বাড়াইয়া গ্রহণে তাহার গ্লানির লাঘব হয়। উপায়ান্তর হীন হইয়া সে দশানির বাড়িতে প্রবেশ করিল। দশানির দরজা সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল। জহিরুল্লার নিরপেক্ষতা এতই বহুপ্রমাণিত ও সর্বজনস্বীকৃত যে কেহ তাহাকে কোনদিকে সাহায্য করিতে অনুরোধ মাত্র করিল না।

ক্রমশ

অতীতের এক পাতা

শ্রীকনাদ গুপ্ত

মানুষের মগজ থেকে বর্তমানকে সিংহাসনচ্যুত করে অতীত যখন আপনার দখল স্থাপন করে, বুঝতে হবে তার বড় দুর্দিন। কারণ, যার নূতন উপার্জনের শক্তি যখন ফুরিয়ে যায়, তখনই মানুষ সঞ্চয়ে হাত দেয়, পুঁজি ভাঙে। জীবনীশক্তির প্রাবল্যে আপনার আশে-পাশে নিত্য নূতন ঘটনার আবর্ত সৃষ্টি করার সামর্থ্য যখন আর থাকে না, তখনই মানুষ অতীতের শরণাপন্ন হয়। থেলো হুঁকো নিয়ে দাওয়ায় বসে তামাক খায় আর ভাবে, আমি যেদিন ছিলাম, আমি তেমন ছিলাম।

মনের আনাচে কানাচে যখন ফেলে আসা অতীত ঘটনাগুলোর ধাক্কাধাক্কি লেগে যায় তখন শঙ্কিত হই, ভাবি, বৃদ্ধ হলাম নাকি। কিন্তু আমি অসুস্থ এবং অসুখও দেহের অনুযায়ী বার্ধক্য নাকি। তীর্থযাত্রার পথে স্থানে স্থানে যেমন কাষ্ঠদণ্ডের ওপর ফলকে ইঙ্গিতসূচক তীরচিহ্নের নির্দেশ থাকে, বার্ধক্যের পথে যৌবনের অস্থায়ী সম্পদও তেমনই একটি তীরচিহ্নের নির্দেশ। এর নিকটে এলেই সেই শক্তিহীন আনন্দলহীন গম্ভীর পরিণতির কথা মনে পড়ে।

সে যাক। জীবনের যে অতীত অধ্যায়টির কথা আজ মনে পড়ছে, তাকে পনের বছর পিছনে ফেলে এসেছি। বোধ করি এত দীর্ঘ কালের কথা বলেই যে সকল ঘটনায় সেদিন মনে মনে ভয়ানক উত্তেজনা এবং অতিশয় গৌরব অনুভব করেছি, আজ তাদের স্মৃতি কখনও বিষাদ, কখনও নৈরাশ্য, কখনও সংশয়, কখনও বা দুঃখিনপীড়িত সহিষ্ণু মানুষের অসময় হাসির মত ঠোঁটের কোণে শুধু একটা ক্ষীণ হাস্যাভ রেখা মাত্রের সঞ্চার করে। আর কিছু নয়।

একটা বন্দিনিবাসে কিছুকাল যাপন করিবার পর তখন আমি সবেমাত্র মুক্তিলাভ করেছি। আমার মত একজন অলস ও নিষ্কর্মা মানুষের ওপর ভারত সরকারের প্রবল-প্রতাপান্বিত গুপ্তচর-বিভাগের নজর কেন পড়েছিল, সে কথা তখন বুঝিনি। ধরা পড়বার পর শুনেছিলাম, প্রদেশ-ব্যাপী একটা বিরাট ষড়যন্ত্র মামলায় আমাকে আসামী করার জন্য গুপ্তচর-বিভাগের দক্ষ ইন্‌স্পেক্টরদের সলা-পরামর্শ চলছে।

আমার চার্জে যে ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন তাঁর নাম আজ মনে নেই, কিন্তু আকৃতিটি সুন্দর মনে আছে। বেশ মোটাসোটা একজন কৃষ্ণকায় ভদ্রলোক, থলো থলো দেহচর্ম, মিট মিটে চোখ, চোখের নীচে গণ্ডাস্থির তলা থেকে দুটি গাল অবিকল একটি ফোলানো বেলুনের মত চিবুকে নেমে এসেছে। একটি ক্ষুদ্র ঘরে দরজা ও জানলার কাচের শার্সিগুলি অর্গলবদ্ধ করে তিনি আমাকে নিয়ে বসতেন। পাশে দাঁড়িয়ে থাকত তালবৃক্ষের মত লম্বা দুজন পাঠান।

তাঁর মিটমিটে চোখ দুটি যথাসম্ভব বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে মোটা গলার ভারী স্বরে প্রায়ই বলতেন, তুমি নিশ্চয়ই ষড়যন্ত্রকারীদের দলে ছিলে।

এবং আমি বারবার অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতাম। বলতাম, ষড়দর্শন, ষড়রিপু প্রভৃতি নানাপ্রকার ষট্ সমবায়ের সঙ্গে আমার পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে বটে, কিন্তু ষড়যন্ত্র বস্তুটার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় তখনও হয়নি; তবে ধৃত ব্যক্তিদের অভিযুক্ত করবার জন্য ইন্‌স্পেক্টরদের মধ্যে যে পরিমাণ কানাঘুষো চলছে, তা থেকে বস্তুটার প্রকৃতি কতকটা মালুম পাচ্ছি বটে।

অবশেষে, স্বীকার করার কোন কিছু ছিল না বলেই যখন আমার নিকট থেকে কোনপ্রকার স্বীকারোক্তি এল না, তখন সেই বেলুন-বদন ইন্‌স্পেক্টর মহাশয় বোধকরি শুধু আক্রোশ বশেই আমাকে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে আটক করার ব্যবস্থা করালেন।

কিন্তু অপরাধ যে একেবারে ছিল না, তাও বলা চলে না। আমার অপরাধ ছিল, আমি হেমন্তদাকে ভালবাসতাম। হেমন্তদা ছিলেন সেদিনকার যুগের একজন যথার্থ দেশপ্রেমিক। আপন জননী বা ভগ্নীকে ভালবাসার মত দেশকে ভালবাসা তখনও একটা সহজ বৃত্তিতে পরিণত হয়নি। ভারতবর্ষের উদয় দিগন্তে অরুণাভ মুক্তির রক্তরশ্মির ক্ষীণ আভাটুকুও সেদিন দৃষ্টিগোচর হয়নি। সেই যুগে সর্বত্যাগের সুদৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে হেমন্তদা দেশসেবার ব্রত নিয়েছিলেন।

অবশ্য সর্ব বলতে হেমন্তদার বিরাট পরিবার কি বিপুল ধনসম্পত্তি কিছুই ছিল না। ধরা পড়ার পূর্বে হেমন্তদা দালালি করে সংসার চালাতেন। স্ত্রী, একটি পুত্র, একটি কন্যা, মাত্র এই হয়টি জীবকে নিয়ে ছিল তাঁর সংসার। তাঁর পরিবারে আমার যথেষ্ট গতায়াত ছিল এবং বৌদিকে আমি শ্রদ্ধা করতাম। সেই ক্ষীণজীবী শীর্ণাঙ্গী রমণীর উজ্জ্বল চোখ-দুটির মধ্যে আমি এমন একটি স্বাতন্ত্র্যের আভাস পেয়েছিলাম, যা আমাদের নারীসমাজে সুদুর্লভ।

হেমন্তদা সংসার সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন ছিলেন। বৌদির পক্ষ থেকে কড়া তাগাদার সঙ্গীন সর্বক্ষণ উঁচানো না থাকলে হেমন্তদা বোধকরি উপবাস করেই দেশের মুক্তি সাধনায় লিপ্ত থাকতেন। হেমন্তদার কাজে বৌদি প্রয়োজনমত সাহায্য করতেন, কিন্তু তাঁর এক চক্ষু নিজের ক্ষুদ্র সংসারটিকে শোভা ও প্রীতির আকর করে তোলার দিকে অনুক্ষণ জাগরূক থাকত। কিন্তু হেমন্তদার কাছে বৌদির এই গুণের সমাদর ছিল না। বৃহত্তর আদর্শের বিপুল ঔজ্জ্বল্য তাঁর চোখকে নিকটতর পরিবেশের প্রতি একেবারে অন্ধ করে রেখেছিল। বাইরে থেকে নানা কাজের পর ঘরে ফিরে হেমন্তদার যেদিন কথা বলার মেজাজ ও অবসর থাকত, সেদিনও বৌদির সঙ্গে তিনি ওই দেশের কথাই বলতেন—বিশাল ভারতবর্ষের বিপুল সম্ভাবনার কথা, দেশের অন্তহীন দুঃখের কথা এবং সেই দুঃখের প্রতি দেশবাসীর নির্বোধ ঔদাসীন্যের কথা। এ সব কথা বৌদি ধৈর্য ও সহানুভূতির সঙ্গে শুনতেন। প্রয়োজন হলে জবাবও দিতেন। কিন্তু আকারে ইঙ্গিতে কোনদিন এমন অনুযোগ প্রকাশ করতেন না যে, চল্লিশ কোটি নরনারীকে বিলিয়ে দেবার মত বিপুল দরদ যার হৃদয়ে সঞ্চিত আছে আপন গৃহিণীর প্রীতি উৎপাদনের জন্য একটি ইঙ্গিত, একটি বাহুল্য কথাও কি সে কোনদিন ভুলেও অপচয় করতে পারে না? আমি জানি, এমনি একটা অনুযোগের তির্যক ছায়া বৌদির মনকে অনেক সময় বিষণ্ণ রাখত। কিন্তু তিনি বলতেন না কারণ তিনি জানতেন যে হেমন্তদার মত অন্ধ দেশপাগলের কাছে এ অভিমান অত্যন্ত সিধে ভাষায় প্রকাশ করলেও তিনি তার মর্ম গ্রহণ করতে পারবেন না, বুমেরাঙের মত বৌদির বুকেই তা আবার ফিরে আসবে।

বৌদির ব্যবহারিক বুদ্ধি ছিল অতিশয় প্রখর। হৃদয়াবেগের যে দিকটা স্বামীর কাছ থেকে কিছুমাত্র প্রশ্রয় পেল না, বৌদি তার মোড় ঘুরিয়ে সন্তানদের দিকে চালিত করলেন। আস্তিক, বৈষ্ণব যেমন করে গোপাল মূর্তির সেবা করে, বৌদি যেন ঠিক তেমনি নিষ্ঠার

সঙ্গে ঐ একটিমাত্র পুত্র এবং একটিমাত্র কন্যার যত্ন করতেন। ডল পুতুলের মত ফুটফুটে চেহারা নিয়ে এবং সুপরিষ্কৃত কাপড়-জামা পরে ওরা যখন বাড়ির এপাশে ওপাশে ঘুরে বেড়াত, অনেকে দেখে মনে করত, ওরা বুঝি কোন ধনী অভিজাত বংশের সন্তান। কোন প্রতিবেশী ওদের প্রতি কিছুমাত্র তিরস্কার বা দুর্ব্যবহার করলে বৌদি জ্বলে উঠতেন, প্রাকৃত নারীর মত তীক্ষ্ণস্বরে কলহ বাধিয়ে বসতেন।

হেমন্তদা আমার কিছু পূর্বে ধরা পড়েন। যেদিন ধরা পড়েন, কিছু দূরে আমরা দাঁড়িয়ে-ছিলাম। দেখলাম, সিপাহীরা হেমন্তদাকে নিয়ে যাচ্ছে। বৌদি এসে জানালায় দাঁড়িয়েছেন। তাঁর সমস্ত মুখ পাথরের মত কঠিন হয়ে গেছে। যত অনিচ্ছাতেই হোক, হেমন্তদা যা উপার্জন করতেন, তাতে সংসার বেশ স্বচ্ছলভাবে চলে যেত। হেমন্তদার অনুপস্থিতিতে বৌদির চোখের সম্মুখে সমস্ত ভবিষ্যৎটা, যতদূরে দেখা যায়, একটা সীমাহীন আঁধারে একেবারে লেপা-জোপা হয়ে গেল।

যতদিন জেলে ছিলাম, বৌদির কোন সংবাদ পাইনি। একবার শুনেছিলাম, পাড়া প্রতি-বেশীদের সাহায্যে গবর্ণমেণ্টের কাছে বিস্তর আবেদন নিবেদন করায় গবর্ণমেণ্ট কিছু মাসোহারার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু সে অঙ্কটা কত, তাতে বৌদির বিনা আয়াসে চলে কিনা, এ সকল কোন সঠিক খবর জানতাম না।

এক একবার মনে হত, বৌদি কি বাপের বাড়ি গেলেন? কিন্তু বেশ জানতাম, একেবারে উপবাসের কিনারায় না এসে পড়লে বৌদি ওপথ মাড়াবেন না। বৌদির বাবা, মা তখন বেঁচে নেই। বাপের বাড়িতে থাকেন তাঁর বৈমাত্রেয় বড় ভাই। ভদ্রলোক নাকি অতিশয় স্ত্রৈণ এবং বৌদি যে তাঁর বৈমাত্রেয় ভগিনী, একথা দৈবক্রমে যখনই তিনি ভুলে বসতেন, তাঁর পতিসোহাগিনী স্ত্রী খর জিহ্বার কষাঘাতে তখনই তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতেন। তবু মেয়েদের মন থেকে পিতৃগৃহের মোহ কিছুতেই ঘুচতে চায় না বলেই বহুকাল পূর্বে বৌদি একবার সেখানে বেড়াতে গিয়েছিলেন। কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁকে আবার ফিরে আসতে হয়েছিল। ঠিক কি কারণে তা বৌদির মুখ থেকে কোনদিন শুনিনি। তবে আভাসে ইঙ্গিতে এবং ছেলেমেয়ের মুখের খাপছাড়া উক্তি থেকে এইটুকু বুঝেছিলাম যে, ঐ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে একটি বারও পেটভরা আহার ওদের ভাগ্যে জোটেনি।

কাজেই মুক্তি পাবার পর বৌদির সংবাদ নেবার জন্য আমার আগ্রহের অবধি ছিল না। দু' একদিন বিশ্রাম নেবার পর তাঁদের পুরানো বাড়িতে সংবাদ নিতে গিয়ে শুনলাম, তাঁরা গৃহান্তরে উঠে গেছেন। বাড়িওয়ালা একটা ঠিকানাও আমাকে বলে দিলেন। নূতন জায়গায় গিয়ে শুনলাম, সেখানে তাঁরা কিছুকাল ছিলেন বটে, কিন্তু সেখান থেকেও উঠে গেছেন। এবং এইভাবে পাঁচ ছয়টি ঠিকানা শেষ করে অবশেষে যেখানে এসে পড়লাম, সেটি একটি বস্তি।

তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বাড়িতে বাড়িতে বধূদের শঙ্খধ্বনির শেষ রেশটুকুও কিছু পূর্বে বাতাসে মিলিয়ে গেছে। বস্তির গলির মোড়ে কর্পোরেশনের একটা গ্যাস টিমু টিমু করে জ্বলছিল। তার স্তিমিত আলোয় দেখলাম, গলির শেষ প্রান্তে দুটি নারী প্রচণ্ড বেগে ও নানা ভঙ্গীতে হাত পা ও মাথা দোলাতে দোলাতে কলহ করছে। কলহের ঝোঁকে তাদের বস্ত্র সংযমের বোধ হারিয়ে গেছে।

সম্মুখে কাউকে না পেয়ে আমি সেই কলহরতা নারীদুটির নিকট উপস্থিত হয়ে বৌদির নাম করে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কোন্ ঘরে থাকেন।

ওদের মধ্যে একজন সম্মুখে একটা ভেজানো দরজার দিকে নির্দেশ করলে। বার দুই ঠেলা দিতে জীর্ণ দরজা ঈষৎ আর্তনাদ করে খুলে গেল। বৌদি বেরিয়ে এলেন। হাতের স্তিমিতশিখা প্রদীপটাকে আমার মুখের সামনে তুলে ধরলেন। ঈষৎ বিস্ময়ের স্বরে বললেন, ঠাকুরপো? এস।

সেই প্রদীপের ম্লান আলোয় বৌদির মুখের দিকে চেয়ে আমি একেবারে অবাক হয়ে গেলাম। বস্তুত, শরীরে কোন বড় ব্যাধি না থেকে মানুষের আকৃতির এত দ্রুত এতখানি পরিবর্তন হতে পারে আমার ধারণা ছিল না। চুলগুলো রুক্ষ, চোখ দুটো কোটরগত, হাত দুটো প্রায় আভরণহীন, সমস্ত মুখখানার যা কিছু শ্রী কে যেন ব্লটিং দিয়ে নিঃশেষে শুষে নিয়েছে। শুধু অন্তরের কোন্ চাপা আগুনে চোখের মণি দুটো ধক্ ধক্ করে জ্বলছে।

ঘরে প্রবেশ করতে বৌদি একটা আসন দিলেন। বসে বললাম, দিন দুই হল ছাড়া পেয়েছি, একটু জিরিয়ে মনে করলাম আপনার খবর নিই। কেমন আছেন বৌদি?

বৌদি স্থির স্বরে জবাব দিলেন, ঘরের চেহারা দেখে বুঝতে পারছ না, কেমন আছি।

দেখলাম, তাই বটে। বৌদির পূর্বেকার সেই সাজানো-গোছানো ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে সংসার আর নেই, সমস্ত ঘরখানা ছেঁড়ানেকড়া, কাঁইবিচি, মুড়ির গুঁড়ো প্রভৃতি ছাই-ভস্মে অতিশয় নোংরা হয়ে আছে, এবং এক কোণে একটা ভাঙা কুঁজো থেকে খানিকটা জল পড়ে মেঝের ওপর দিয়ে সরীসৃপের গতিতে চৌকাটের তলার নর্দমার দিকে এগুচ্ছে।

বললাম, এ কি বৌদি?

বৌদি বললেন, কি করব? এইটুকু একটা ঘরে গোটা সংসার নিয়ে কেউ ভদ্রভাবে থাকতে পারে? রান্নার জন্যও আলাদা জায়গা নেই।

বললাম, শুনেছিলাম যে, গভর্নমেণ্ট কিছু মাসোহারার বন্দোবস্ত করেছে।

বৌদি তীক্ষ্ণ শব্দ করে হেসে উঠলেন। মাথা নেড়ে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্যবস্থা একটা করেছে বৈকি। কিন্তু যেটা করেছে, সেটা বোধ হয় দিনহারা করতে গিয়ে কেরাণীরা ভুল ক'রে মাসোহারা করে ফেলেছে। তুমি একবার খবর নিও তো ঠাকুরপো।

বিস্মিত হয়ে বললাম, কেন?

—কেন কি? পনের টাকা করে দেয়, সে তো মাসের প্রথম দিনেই ভাড়া দিতে আর গয়লার দাম চুকোতে শেষ হয়ে যায়। তারপর সারা মাস তো চলে ভিক্ষেয়।

—ভিক্ষে!

—আর কিসে চলবে ঠাকুরপো? আমাদের সমাজ তো মেয়েদের উপার্জন করতে শেখায় না। ঠিক করে বল তো ঠাকুরপো, ওঁকে ওরা সত্যসত্যই ছাড়বে না আটক রাখার নাম করে তিলে তিলে একেবারে শেষ করে দেবে?

আমি হতবুদ্ধি হলাম। কি বলে এই নারীকে সান্ত্বনা দেব? ইংরেজের সঙ্গে সন্ধির মত একটা কিছু না হওয়া পর্যন্ত যে হেমন্তদের মত বড় শিকারকে ওরা ছাড়বে না, এ নিঃসংশয়। কিন্তু সে কথা এঁকে বলিই বা কেমন করে?

বললাম, ছাড়বে নিশ্চয়ই। তবে ঠিক কবে ছাড়বে, তা তো নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না বৌদি।

বৌদি বললেন, অর্থাৎ না খেয়ে আর আধ পেটা খেয়ে আমার ছেলেমেয়েরা যদি তিলে তিলে মরেও যায়, তবুও গভর্নমেণ্ট তাঁকে ছেড়ে দেবে না?

দারিদ্র্য যে বৌদির কাছে কি কারণে এত দুঃসহ হয়েছে আমি এতক্ষণে তা বুঝতে পারলাম। বললাম, সে কি কথা বৌদি! একটা বিপদ এসেছে বটে, কিন্তু বিপদ তো চিরদিন থাকে না। যেমন করে হোক, একটা ব্যবস্থা করে নিতেই হবে।

বৌদি বললেন, যেমন করে হোক মানে সেই ভিক্ষাবৃত্তি! না না, তুমি কিছু দিতে এস না, ঠাকুরপো, আমি নেব না। তা ছাড়া তোমার পুঁজি যে কতটুকু সে খবরও আমি জানি। ওই দেখ ওই কোণে আমার ভাঁড়ারের হাঁড়ি কুঁড়ি রয়েছে। একটু কষ্ট করে ওই তো তোমাকে পিদিম হাতে করে এখনই দেখিয়ে দি যে, ওর মধ্যে কোন পাত্রটায় তিল পরিমাণ জিনিষও নেই। পারবে তুমি দিনের পর দিন, যতদিন না উনি ফিরে আসেন, আমার ওই সব ক'টা পাত্রর পেট ভরিয়ে রাখতে? পরের টাকা আমাকে নিতেই হবে। কিন্তু রোজ রোজ তিল তিল করে মানুষের দয়ার অপমানে নিজেকে আর আমি ছোট করে পারি না। তার চেয়ে অপমানকে ভূষণের মত গায়ে পরে যদি ছেলে মেয়েদের মানুষ করতে পারি, সেও অনেক ভাল। আর তাই আমাকে করতে হবে।

বৌদির শেষের কথাগুলো যেন আমার দিকে ঘুলিয়ে দিল। বললাম, কি বলছেন দি? বুঝতে পারলাম না তো।

বৌদি অকস্মাৎ সোজা হয়ে বসে মুখ তুলে কবার আমার দিকে তাকালেন। সেই আবছা ধারেও মনে হল যেন গূঢ় বিদ্রোহ-বহ্নিতে দির মুখখানা অস্বাভাবিক রাঙা হয়ে ঠেছে। চকিত বিস্ময়ে আমার মন দুলে ল। বৌদির এ বিদ্রোহ কার বিরুদ্ধে? স্বামী বৃহত্তর আদর্শের যূপকাষ্ঠে নিজের ী ও সন্তানকে বলির মত উৎসর্গ করলে, তার রুদ্ধে? যে সমাজ অত বড় একজন মহাপ্রাণ নুষের দুর্দিনে তার স্ত্রী-পুত্রের ভরণ-ষণের ভারটুকুও গ্রহণ করতে পারলে না, র বিরুদ্ধে? না, যে অদৃষ্ট অসহায় নারীর আত্মরক্ষার সমস্ত চেষ্টা বিরাট অট্টহাস্যে পহাস করে বোবার বাক্য-চেষ্টার মত একেবারে ক করে দিচ্ছে, তার বিরুদ্ধে?

বৌদি কিন্তু তৎক্ষণাৎ মুখ নামিয়ে লেন। তারপর একটা অদ্ভুত বিকৃত স্বরে ললেন, রজনীবাবুর চিঠি পেয়েছি।

রজনীবাবু! সেই রজনীবাবু!

মুহূর্তমধ্যে আমার মাথায় চার পাঁচ বৎসর আগের একটা ঘটনার ছবি ভেসে উঠল। হেমন্তদা পূর্বে যে পল্লীতে ভাড়া থাকতেন, রজনীবাবু সেই অঞ্চলের একজন ধনী বণিক। দুর্নীতি এবং লাম্পট্যে লোকটার জুড়ি মেলা ভার। সেই সঙ্গে কুবুদ্ধিরও অভাব ছিল না। হেমন্তদা একবার কোন্ রাজনৈতিক প্রয়োজনে ভদ্রলোকের কাছে কিছু অর্থ সাহায্য চান। রজনীবাবু সে সাহায্য তো দিলেনই, উপরন্তু লোকটাকে ডান এবং বাম হস্তে হেমন্তদাকে দেশের কাজের জন্য এমন দমে দমে টাকা দিতে লাগলেন যে, হেমন্তদা কিছু না বুঝলেও আমার ধারণা হল, ভদ্রলোক দেশের কাজের ছলে নিজের কাজ গুছোবার মতলবে আছেন। কিন্তু সে কাজ যে কি তখন বুঝিনি। হেমন্তদার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সূত্র টেনে বাড়িয়ে ভদ্রলোক বৌদির সঙ্গেও আলাপ করলেন এবং ঘনিষ্ঠও হলেন। বৌদি বোধ করি সুরু থেকেই ভদ্রলোকের সাধু প্রকৃতির একটা ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। কিন্তু হেমন্তদার মত তালকানা মানুষকে তৃতীয় ব্যক্তির উপদ্রবের রহস্য বুঝিয়ে দিতে তাঁর সম্ভ্রম ও দর্পে সমান বেধেছিল। অবশেষে আমি এবং হেমন্তদা একদিন কি কাজে বহুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর ফিরে দেখি, বৌদির ঘরে রজনীবাবু অপ্রতিভের ভঙ্গীতে বসে আছেন এবং বৌদি তাঁকে তীক্ষ্ণস্বরে কি বলছেন। আমরা যেতেই বৌদি রজনীবাবুর দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, লোকটাকে দাঁড়িয়ে দাও তো ঠাকুরপো। ওর স্বভাব ভাল না। হেমন্তদা তখনও বোঝেননি। বৌদির অদ্ভুত আচরণে লজ্জিত হয়ে সম্ভবত রজনীবাবুর কাছে মার্জনা চাইবার উদ্যোগ করছিলেন। কিন্তু আমি কালবিলম্ব না করে ভদ্রলোককে অর্ধচন্দ্র প্রদান করে বিতাড়িত করেছিলাম।

সেই রজনীবাবু!

বললাম, রজনীবাবু! সে আজও আপনার পিছনে লেগে আছে।

বৌদি তেমনি স্বরেই বললেন, লোকটা অসম্ভব ধূর্ত। সে জানে, অভাব বাড়লে সতীত্বের বিলাস বজায় রাখা কত কঠিন।

চমকে উঠলাম।

—সতীত্বের বিলাস!

বৌদি আবার একবার মাথা সোজা করে আমার দিকে তাকালেন। অধৈর্য স্বরে বললেন, নয় তো কি ঠাকুরপো? তুমি কি বলছ যে, তোমার দাদা জেল থেকে ফিরে এসে মস্ত বড় সতী বলে আমাকে বাহবা দেবেন বলে আমি আমার ছেলেমেয়েকে চোখের সামনে শুকিয়ে মরতে দেখব?

আমি আর কোন উত্তর দিলাম না। মনে ভাবলাম, বৌদিকে বুঝতে সময় লাগবে। দীর্ঘকাল একাকী দারিদ্র্যের নির্যাতন সয়ে সয়ে বৌদির মনে দুঃখের যে ফল্গু জমে উঠেছে, আজ আমার মধ্যে একজন দরদীকে পেয়ে বোধ করি তা সমস্ত উদ্গারিত হতে চাইছে। নইলে আর কিই বা হবে!

কিছুক্ষণ পরে আমি উঠলাম। বললাম, আমি আসি বৌদি। আট দশদিন অপেক্ষা করুন, যতদূর মনে হয়, একটা ব্যবস্থা আমি নিশ্চয়ই করে উঠতে পারব। রজনীবাবু সম্বন্ধে যা বললেন, তার ওপর কোন গুরুত্বই আমি আরোপ করি না। তবে এটা ঠিক, যে, আপনি বদলে গেছেন।

আমাকে দ্বার অবধি এগিয়ে দিয়ে বৌদি মৃদু স্বাভাবিক স্বরে বললেন, আমি সত্যই বদলাইনি ঠাকুরপো। কিন্তু অনেক দিন ধরে ছেলেমেয়ের কষ্ট দেখলেও বদলে যাবে না, এমন কথা কি কোন মা'ই শপথ করে বলতে পারে?

বৌদিকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তার প্রতিক্রিয়ায় আমার অলস স্বভাবটা যথাসম্ভব গতিশীল হয়ে উঠল। বৌদির সংসারযাত্রা যাতে নিশ্চিন্তভাবে চলে, তার একটা পাকাপাকি ব্যবস্থার জন্য আমি নানাদিকে ঘোরাফেরা করলাম। আর্থিক সাহায্যে আমার নিজের ক্ষমতার কথা না তোলাই ভাল। আমার সংসারে আমি চিরকালই একটা অনাবশ্যক ভারস্বরূপ। এবং সহসা ভয়ানক পরিশ্রমী হয়ে সে ভার যে অল্পাধিক লঘু করে ফেলব, এমন দুরাশা আমার আজকের মত সেদিনও ছিল না। কিন্তু ছোট বড় যে সব ধনী আলাপী ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে বার বার মোলাকাৎ করেও বড় বিশেষ লাভ হল না। হেমন্তদার নামের অভাব ছিল না। তাঁর পরিবারের দুর্দশার কথা শুনে এঁরা জিহ্বার দ্বারা বিশেষ শব্দ করে আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করলেন বটে, কিন্তু দীর্ঘকালের জন্য একটা গোটা সংসারের যাবতীয় ভার গ্রহণ করতে কেউই রাজী হলেন না। অনেকে এমন কথাও বললেন যে, ব্যক্তিগত সাহায্যের পথে এসব গুরু সমস্যার সমাধানের কোন আশা নেই। এর জন্য সমস্ত জাতিকে রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি একটা বিপুল দরদে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে।—ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঠিক এতখানি নিরাশ হতে হবে আমি পূর্বে ভাবিনি। অবশেষে দশ বার দিন অতিবাহিত হবার পর একদিন অতি কষ্টে সংগৃহীত গোটা কুড়ি টাকা সঙ্গে নিয়ে বৌদির সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

সেদিন ছিল সকাল। বৌদির ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে দেখলাম, ঘরে কেউ নেই। বৌদির আট বছরের মেয়ে উমা ঘরের সম্মুখের সরু রোয়াকে বসে একটা দ্বিতীয় ভাগের পাতা খুলে অত্যন্ত বড় বড় চোখ করে গলিতে বস্তির ছেলেদের ডাংগুলি খেলা দেখছে।

তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, মা কোথায় উমা?

উমা বললে, মা উঠানে চান করছে।

বৌদি ভিতর থেকে আমার স্বর শুনতে পেয়েছিলেন। চেঁচিয়ে বললেন, একটু বস ঠাকুরপো, আমি এখনি আসছি।

আমি ঘরে প্রবেশ করে অলস চোখে এদিক সেদিক দৃষ্টিপাত করে বৌদির জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। পূর্বে বৌদির ঘরের দেওয়ালে পাঁচ ছয়খানি সুদৃশ্য ফ্রেমে বাঁধানো সুন্দর ছবি থাকত। কিন্তু এই খোলার চালের মাটির ঘরে বৌদি সেগুলির একখানিও টাঙান নি। বস্তুত ঘর সাজাবার জন্য বৌদি যে কোথাও কিছুমাত্র চেষ্টা করেছেন, এমন মনে হল না। সে বোধ করি দারিদ্র্যের প্রতি রাগে। কেবল একটি দিকের দেওয়ালে মেয়েরা যেমন করে আল্পনা আঁকে, যেন সেই পদ্ধতিতে একটা জগন্নাথের মূর্তি আঁকা রয়েছে। বৌদির পূর্বে নিশ্চয়ই কোন জগন্নাথভক্ত উড়িষ্যাবাসী এই সুন্দর ঘরখানিকে ভোগদখল করে গেছেন!

দেওয়ালের একটা কুলুঙ্গির দিকে সহসা আমার নজর পড়ল। মনে হল যেন একটা টিনের কৌটার তলায় কয়েকখানা দশটাকার নোট চাপা দেওয়া রয়েছে। তড়িতের মত মনে একটা সংশয় খেলে গেল। বৌদি এ টাকা কোথায় পেলেন? ক্ষিপ্রপদে কুলুঙ্গির নিকট গিয়ে দেখলাম, একখানা দুখানা নয়, টিনের কৌটা এবং আরও কি একটা ছোট বাক্সের পিছনে দশখানা দশটাকার নোট রয়েছে।

নির্বোধের মত আমি ক্ষণকাল সেই স্থানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। এ কি! এ টাকা কোথা

থেকে এল? পরক্ষণেই নজরে পড়ল, নোটগুলোর মাঝখানে একটা ক্ষুদ্র কাগজের টুকরোয় কয়েক ছত্র লেখা রয়েছে। তীব্র সংশয়ে উচিত-অনুচিতের বোধ কোথায় ভেসে গেল। আমি তৎক্ষণাৎ কাগজের টুকরোটুকু হাতে তুলে নিলাম। লিখিত বিষয় পাঠ করার পূর্বে আমার দৃষ্টি আপনা হ'তে চলে গেল স্বাক্ষরের দিকে এবং সঙ্গে সঙ্গে বৌদির প্রতি, নারীজাতির প্রতি নিরতিশয় ঘৃণা এবং বিতৃষ্ণায় সমস্ত চিত্ত বিমুখ হয়ে উঠল। দেখলাম, স্বাক্ষর রয়েছে 'র'।

বৌদি আমার নিজের কেউ নন, তাঁর পদস্খলনে আমার কোনদিক থেকে কিছুমাত্র ব্যক্তিগত ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু তবু অভাবের তাড়নায় তাঁর এই শোচনীয় চ্যুতিতে আমি নিজের ভারসাম্য হারিয়ে ফেললাম। অশুচি বস্তুর মত সেই টাকা এবং চিঠি কুলুঙ্গিতে ফেলে রেখে আমি তৎক্ষণাৎ দ্রুতপদে বেরিয়ে আসছিলাম, শুনলাম, বৌদি পিছন থেকে বলছেন, একটু রোয়াকে গিয়ে দাঁড়াও তো ভাই ঠাকুরপো, আমি কাপড়টি একবার বদলে নি।

বৌদি বোধ করি স্বাভাবিক স্বরেই কথাটা বলেছিলেন, কিন্তু আমার মনে হ'ল যেন ঘরে অনেকগুলো টাকা এসে পড়ায় বৌদি আজ একটু বিশেষ খোসমেজাজে আছেন।

আমি দাঁড়ালাম না। শুধু পিছন না ফিরে বৌদির উদ্দেশে বললাম, দাঁড়াবার উপায় নেই। আপনার সংসারে আর কখনও আসবার উপায়ও রইল না। কিন্তু আপনি শেষে এই কাজ করলেন। ছিঃ!

গলি পেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়ে, কিন্তু কিছুতেই থাকতে পারলাম না। একবার মাথা ঘুরিয়ে পিছন দিকে দৃষ্টিপাত করলাম। দেখলাম, ঘরের দরজায় বৌদি ভিজা কাপড়ে স্তম্ভিত মুখে দাঁড়িয়ে আছেন।

এই ঘটনার পর মাস দুই কেটে গেলো। বৌদির ওখানে আর আমি যাই নি, কোন খোঁজও নিই নি। বস্তুত তাঁর আচরণে আমার মনের মধ্যে যেন একটা মস্ত বিপ্লব ঘটে গেল। মহীয়সী বলে যে নারীকে এতদিন শ্রদ্ধা করে এসেছি শুধুমাত্র স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার লোভে সে আপনার সরম, সম্ভ্রম, সমাজ, সমস্ত একটা পশুর কাছে হেলায় বিকিয়ে দিলে! আমি পর, আমাকে গ্রাহ্য না করুন, নিজের বন্দী স্বামীর কথা চিন্তা করেও চিত্তে একবার দ্বিধা জাগলো না।

মাঝে একবার মনে হয়েছিল, হেমন্তদাকে মিথ্যা করে একটা চিঠি লিখে দি যে, তোমার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা কেউ বেঁচে নেই, অকস্মাৎ কলেরা হয়ে তাঁরা সকলেই মারা গেছেন। না হলে, দীর্ঘ কারাবাসের পর ফিরে এসে তিনি ... ঢুকিয়ে ... আমাকে পারবেন সেই আত্মভোলা আদর্শবাদীকে আমি কি বলে সান্ত্বনা দেব? কিন্তু এতবড় একটা মিথ্যাকে সত্যই কারও কাছে খবর বলে পাঠানো যায় না। অথচ, কিছু একটা করতে না পারায় আমার অস্থিরতারও শেষ রইল না।

অবশেষে, আকস্মিক ঘটনা-সংযোগে বৌদির সঙ্গে আমার একদিন দেখা হয়ে গেল। আজ ভাবি, ভাগ্যক্রমে সেদিন সেই সাক্ষাৎ না ঘটলে নারী সম্বন্ধে কি ভ্রান্ত ধারণাই না আমি সারাজীবন পোষণ করতাম।

সেদিন আমি মফস্বলে কোথায় যাবার জন্য শিয়ালদহ স্টেসনে গিয়েছিলাম ট্রেন ধরতে। টিকিট কাটা হয়ে গেছে। ট্রেন ছাড়তে অল্পকাল বাকী। গাড়িতে ভিড় ছিল না বলে আমি বাইরে প্ল্যাটফর্মে পায়চারী করছি। এক সময় দেখলাম, তৃতীয় শ্রেণীর একটি মহিলা-কামরা থেকে একটি মহিলা জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হাত নেড়ে কাকে ডাকছেন। পরক্ষণেই বুঝলাম, ডাকছেন আমাকেই এবং যিনি ডাকছেন, তিনি বৌদি।

একবার ইচ্ছে হ'ল, না দেখার ভাণ করে সরে গিয়ে দূরের একটা কামরায় উঠে পড়ি। কিন্তু বৌদি উচ্চৈঃস্বরে ঠাকুরপো, ঠাকুরপো বলে ডাকতে আরম্ভ করলেন। দৃশ্য সৃষ্টির আশঙ্কায় অগত্যা যেতেই হ'ল।

নিকটে যেতেই বৌদি কামরার দরজাটা খুলে দিলেন। বললেন, উঠে এস ঠাকুরপো। কামরায় আর কেউ নেই। এখনই গাড়ি ছেড়ে দেবে। কেউ উঠবেও না। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে, উঠে এস।

আমি ঈষৎ গম্ভীর স্বরে বললাম, যাবার উপায় নেই, বিশেষ কাজ আছে।

বৌদি বললেন, তা বললে তো শুনব না। তা ছাড়া, আমি বাপের বাড়ি যাচ্ছি। একটা বস্তির ছোঁড়াকে সঙ্গে নিয়েছি, পাশের গাড়িতে আছে। কিন্তু অনেকদিন যাইনি, রাস্তা যদি না চিনতে পারি, তখন সে তো কোন কাজে আসবে না। তোমার সঙ্গে যখন দেখা হয়ে গেছে, তখন তো আর ছাড়তে পারি না।

বিশেষ পীড়াপীড়িতে কতকটা বিরক্তচিত্তেই আমি কামরায় উঠে সম্মুখের একটা বেঞ্চে বসলাম। বাপের বাড়ি যাচ্ছেন, তা হ'লে বোধ করি রজনীবাবুর সখ ইতিমধ্যেই মিটে গেছে।

বাঁশী বাজল। ট্রেন ছেড়ে দিল।

বৌদি বললেন, সেদিন তুমি কুলুঙ্গীতে টাকা আর চিঠি দেখে রাগ করে চলে এলে, খানিকক্ষণ আমি যেন দুচোখে অন্ধকার দেখলাম। মনে হ'ল, এতদিন পরে যদি বা একজন সহায় হ'ল, সেও চলে গেল। কিন্তু তারপর ভাবলাম, এ তো হবেই। মানুষের সম্বন্ধে যতদিন ভাল ধারণা থাকে, ততদিন নানাভাবে বেয়ে-চেয়ে আমরা দেখে নিই, সে জ্ঞান ঠিক কি না; কিন্তু কোন সূত্রে কাউকে যদি একবার মন্দ বলে মনে হয় তৎক্ষণাৎ আমরা সে ধারণাকে পাকা সিদ্ধান্তের মত চরম বলে মেনে নিই, অনুসন্ধান করার এতটুকু ধৈর্য আর থাকে না।

তোমাকে আমি দোষ দিই না ঠাকুরপো, কারণ সেদিন যে অবস্থায় তুমি রাগ করে চলে এসেছিলে, সে অবস্থায় সমাজের পনের আনা পুরুষই রাগ না করে থাকতে পারত না। কারণ তোমরা মনে কর, মেয়েরা যা করে আর যা না করে, সে শুধু তোমাদের রাগের ভয়ে বা বাহবার লোভে। আমি জানি, তোমরা মনে কর, মেয়েরা যে সতী থাকে, সে শুধু তোমাদের অপবাদ আর সমাজের দণ্ডের ভয়ে। এ ভুল তো হবেই। আমাদের সমাজে না আমরা চিনি তোমাদের, না তোমরা চেন আমাদের। মেয়েদের কাছে পুরুষেরা আসে একটি অনিবার্য দাবীর দাবীতে, আর মেয়েরাও দক্ষ নটীর মত তাদের মনে এই বিশ্বাসই জন্মে দেয় যে, হাঁ, তারা সেই দাবী চমৎকার পূরণ করেছে। পরস্পরকে চেনাচিনির দৌড় যেখানে এইটুকু, সেখানে হবে না ভুল? কিন্তু যদি খোলা চোখে মেয়েদের দেখবার সুযোগ তোমাদের থাকতো, তাহলে বুঝতে যে, যত বড় লোভের বিনিময়েই হোক না কেন, মেয়েরা সতীত্ব হারাতে অত্যন্ত ভয় করে। তাই যদি না হ'ত, তাহলে শুধু পর্দার মধ্যে কেন ঠাকুরপো, বেশ মজবুত [illegible] সিন্দুকের মধ্যে মেয়েদের তালাচাবী দিয়ে বন্ধ করে রাখলেও দেখতে, সমাজে ভদ্রনারী বলতে আর একটিও নেই, যাদুমন্ত্রে সিন্দুক খুলে সবাই কুলটা হয়ে বেরিয়ে গেছে। এ বড় দুঃখের কথা যে, আমাদের শাস্ত্রে মানুষের ভিতরকার পশুটাকে দমন করবার জন্য মস্ত মস্ত গুরুভার শিকলের ব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু তার ভিতরকার দেবতাকে উৎসাহ দেবার জন্য এতটুকু স্বাতন্ত্র্য স্বাধীনতা কোথাও নেই।

সেদিন তুমি যা দেখেছিলে, তার ভিতর অনেক ভুল ছিল, একথা আমি বলছি না, কিন্তু আসল জায়গাটাতেই ভুল ছিল। রজনীবাবুর টাকা আমি নিয়েছিলাম, তার সঙ্গে একটা কথাবার্তাও চালাচ্ছিলাম। কিন্তু সে তার ইচ্ছের বশীভূত হবার জন্য নয়। মনে মনে আমি একটা শাঠ্যের মতলব করেছিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল, তাকে ছলনা করে মিথ্যা লোভ দেখিয়ে ফেরে ফেরে তার কাছ থেকে টাকা নেব। তারপর কিছুদিন যোঝবার মত অর্থ আমার হাতে জমে গেলে নোংরা পোকার মত তাকে টুসকি মেরে দূরে ফেলে দেব। কি? অন্যায়? একটা লম্পট তার দুর্নিবার পশুবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য যত খুসি অর্থ ব্যয় করে যাবে, অভাব হবে না, আর আমি আমার এই ছেলেকে আর মেয়েকে দুবেলা পেটভরা খাবার দেবার জন্য কোন উপায়েই অর্থ সংগ্রহ করতে পারব না? তুমি জবাব দাও ঠাকুরপো, এই কি স্বাভাবিক। এই কি বিধান? যদি বিধানই

হয়, সে তো মানুষের বিধান, অন্যায় বিধান। কেন আমি সে বিধান মানব?

কিন্তু ওই রজনীবাবু লোকটাকে আমি চিনতে পারিনি। সে একেবারে সাক্ষাৎ শয়তান। ফেরে ফেরে অনেকবার টাকা নেবার পরও যখন আমি তার প্রস্তাবে রাজী হবার লক্ষণ দেখালাম না, তখন একদিন গভীর রাত্রে সে আমার বস্তির ঘরে এল তারপর—

বলতে বলতে বৌদির সমস্ত শরীর ভয়ে ও ঘৃণায় একবার শিউরে উঠল। একটু স্থির হয়ে আবার বললেন, কিন্তু সে সব কথা আর তোমার শুনে কাজ নেই ঠাকুরপো। শুধু এইটুকু জেনে রাখ যে, নিতান্ত ভাগ্য না সহায় থাকলে সেদিন একটা খুনের দায় থেকে কেউ আমায় রক্ষা করতে পারত না।

সিগনাল না পাওয়ায় ট্রেন একটা ঝাঁকানি দিয়ে মাঝপথে দাঁড়িয়ে পড়ল। বৌদির ছেলেটা চমকে কেঁদে উঠল। কোলের কাছে টেনে নিয়ে বৌদি তাকে সামলাতে লাগলেন।

বৌদির কথার মাঝখানে আমি কোন কথাই বলিনি। কিন্তু ঝড়ো বাতাসের খন্ড খন্ড মেঘ যেমন ইতস্তত উড়ে যায়, বৌদি যে ঘটনা-গুলি বললেন, তার হাওয়ায় আমার সকল সংশয়ও তেমনি করে ভেসে গেল; মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, নারী-চরিত্রকে বুঝতে যাওয়ার দুঃসাহস আর যেন কখনও না করি। শুধু একটা ক্ষোভ আমার মনকে তখনও পীড়িত করতে লাগল যে, বৌদি বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্যে এত কান্ড করলেন, অথচ আমাকে একটা বার সুযোগ দিয়েও দেখলেন না, আমি কোন কাজে লাগি কি না।

কিন্তু এ ক্ষোভও অধিকক্ষণ রইল না। একটু পরে বৌদি নিজেই বললেন, তুমি হয়তো ভাবছ, এত কান্ড করলাম, অথচ তোমার ওপর একবার নির্ভর করে দেখলাম না কেন? কিন্তু ওই বস্তির জীবগুলোকে তো তুমি চেন না ঠাকুরপো। তুমি যেদিন এলে, তার পরদিনই ওখানকার দশ বারটা ঘরের মেয়েরা আমাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, তুমি কে, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি। মিথ্যে করে বললাম, তুমি আমার দূর-সম্পর্কের দেওর। নইলে রক্ষে ছিল? তখনই ওই নিয়ে একটা ঘোঁট পাকাতে শুরু ক'রত। কিন্তু তুমি যদি আমার কাছে মাঝে মাঝে আসতে, আর ওরা টের পেত যে, তোমার টাকাতেই আমার দিন চলে, তাহলে ওরা ভয়ানক খুসি হয়ে ভাবত, আমি ওদেরই মত একজন আর সেই সুখবর সারা শহরের লোকের কাছে রটিয়ে বেড়াত। দায়ে পড়ে আমি হয়তো সহ্য করতাম, কিন্তু তুমি তো পারতে না ঠাকুরপো। এখনই তো চটে উঠছ দেখছি। কিন্তু চটার কি আছে ভাই? ওরা গরীব। বেশী গরীব হলে মানুষ আপনা হতেই নীচ হয়ে যায়।

এইবার আমি আর নির্বাক থাকতে পারলাম না। বললাম, এত ভেবেছিলেন বৌদি, আর এটুকু ভাবেন নি যে, ওই বস্তি ছাড়াও ক'লকাতা শহরে আপনার থাকবার মত আরও ঢের জায়গা ছিল। দরকার হ'লে উঠেও তো যাওয়া যেত।

বৌদি বললেন, ভাবি নি তা নয়; কিন্তু শেষে মনে হল, অদৃষ্ট বলে একটা কিছু বোধ করি আছে, যার সঙ্গে লড়াই ক'রে শুধু নিজেরাই ক্ষতবিক্ষত হওয়া যায়, তাকে হারানো যায় না।
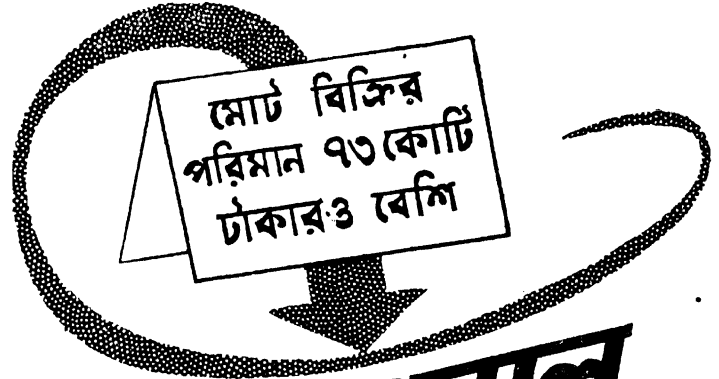
তাই ঠিক করলাম, বাপের বাড়িই যাই। বৈমাত্রেয় হলেও ভাই তো।

বলে বৌদি ঈষৎ হাসলেন। সে হাসি থেকে শুধু এইটুকু বোঝা গেল যে, তাঁর হৃদয়ে আশার এতটুকু রশ্মিও আর কোথাও অবশিষ্ট নেই।

কিছুক্ষণ পরে একটা স্টেসনে গাড়ি থামল। বৌদি বললেন, এসে গেছি ভাই। এখানে নামতে হবে। দশ মিনিটেরও পথ নয়। পেঁছে দিয়েই তোমার ছুটি।

পেঁছে দিয়েই ছুটি ছাড়া উপায় ছিল না। বাড়ির সদর দরজা ভিতর থেকে রুদ্ধ ছিল। বৌদি কড়া নাড়লেন। ক্ষণকাল পরে একটি বিপুল বপু কৃষ্ণাঙ্গী মহিলা দরজা খুললেন। তাঁর মাংসল চিবুকে তিন চারটে খাঁজ পড়েছে, চোখ দুটি জোনাকীর মত মিট্ মিট্ করছে। দরজার পাট দুটি ঈষৎ মুক্ত করে তিনি ক্ষণকাল মুখব্যাদান করে আমাদের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর সহসা ভিতরে ঢুকে ভয়ানক চেঁচামেচি করে বললেন, ওগো, এস এস, দেখসে, তোমার ভাই-সোহাগী বোন ভাইয়ের কাছে বেড়াতে এসেছেন। দুনিয়ায় আর কোন চুলায় ঠাঁই মিলল না। এখন ডাইনী এসেছেন ভাই-ভাজের ঘাড় মটকাতে। এস এস, দেখসে।

বৌদি পাংশু মুখে হাত নেড়ে আমাকে ইঙ্গিত করলেন চলে যেতে। তারপর পুত্র-কন্যার হাত ধরে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলেন। আমি বস্তির ছোকরাটিকে ডেকে নিয়ে স্টেসনের দিকে ফিরে গেলাম।

তারপর বার তের বছর আর বৌদির সঙ্গে দেখা হয়নি। যথেষ্ট আগ্রহ থাকলেও তাঁর পিতৃগৃহে যেতে পারিনি, কারণ তাঁর সেই বিপুলাঙ্গী কৃষ্ণকায়া ভাজের কথা মনে হওয়া-মাত্র মনটা সত্রাসে সে প্রস্তাব থেকে কুঁকড়ে এসেছে। ইতিমধ্যে কিছুকাল পরেই হেমন্তদা জেল-হাসপাতালে হৃদরোগে মারা যান। আরও বছর পাঁচ ছয় পরে তাঁদের গ্রামের এক পরিচিত বন্ধুর মুখে সংবাদ পেয়েছিলাম, বৌদির ছেলেটিও কি একটা রোগে দিনকয়েক ভুগে মারা যায়।

মাত্র কয়েক মাস পূর্বে আকস্মিক যোগাযোগে আবার একবার বৌদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কি একটা কাজে যাচ্ছিলাম বেনারসে। মোগলসরাইয়ে অনেকক্ষণ গাড়ি ধরবে বলে স্টেসনে নেমেছিলাম পায়চারী করতে।

সম্মুখে দেখলাম, অনেকগুলি ছেলেপুলে নিয়ে একটি বৃহৎ পরিবার প্ল্যাটফর্মে বসে আছে, বোধ করি কোন বদলি ট্রেন ধরবে বলে অপেক্ষা করছে। তাদের একপাশে বসে রয়েছেন একজন বিধবা। দেখেই চিনলাম, বৌদি। পরণে থান কাপড়, চুল অর্ধেক উঠে গেছে, কপালে বলি পড়েছে, চোখের পাশে চামড়াগুলো কোঁচকানো। সন্তর্পণে নিকটে গিয়ে বললাম, কে, বৌদি?

বৌদি মুখ তুলে আমার দিকে তাকালেন। দেখলাম, দৃষ্টির মধ্যে অগ্নিশিখার সেই ঔজ্জ্বল্য আর নেই। বললেন, ঠাকুরপো, কোথায় যাচ্ছ?

বললাম, যাচ্ছি বেনারসে। কেমন আছেন?

বৌদি বললেন, বেশ ভাল। এরা সব তীর্থে যাচ্ছে; আমিও যাচ্ছি এদের সঙ্গে।

ট্রেন এসে পড়ল। ওঠার জন্য এঁদের মধ্যে একটা তাড়াহুড়ো পড়ে গেল। বৌদিও উঠে দাঁড়ালেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, মেয়ে কেমন আছে? বিয়ে হয়েছে?

তখন সকলে গাড়িতে ওঠবার জন্য এগুতে শুরু করেছে। বৌদিও ওঁদের পিছু পিছু যেতে যেতে বললেন, কে? উমা? বিয়ের কথা চলছিল। হ'ল কৈ? মাস তিনেক আগে ভাজের এক মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে পালিয়েছে।

ও'রা গাড়িতে উঠে পড়লেন। আর কোন কথার অবসর হ'ল না।

আর কথার কিছু ছিলও না। বস্তুত, বহুদিন হ'ল নিত্যকার কাজের মধ্যে বৌদি আমার চিত্তে একটা মুছে যাওয়া স্মৃতিরেখা মাত্রেই পর্যবসিত হয়েছিল। কিন্তু ইদানীং এই অসুখে যত রাজ্যের পুরাণো কথার মধ্যে মোগলসরাইয়ে দেখা বৌদির সেই থান কাপড়পরা বিবর্ণ মূর্তিটাই বার বার মস্তিষ্কে ভেসে উঠছে। শুধু তাই নয়, বৌদির ক্লিষ্ট মুখচ্ছবির পশ্চাতে যেন আরও একটা কার কালো, নৃশংস, বীভৎস, অশরীরী ছায়ামূর্তিও মাঝে মাঝে নড়ে উঠছে। সে মূর্তি যেন বৌদির পিছন থেকে তাঁর জীবনের সীমাহীন, বেদনা ও নিষ্ফল ব্যর্থতাকে শব্দহীন হাস্যে উপহাস করছে।

বার বার চেষ্টা করেও আমি বুঝতে পারছি না, ও মূর্তি কার? অদৃষ্টের সমাজের, না হীনতা-দুষ্ট মনুষ্য-হৃদয়ের?

অধুনা

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

কী আছে আশ্বাস?
ট্রাম থেকে নেমে ভাবি বড় জোর ত্রাস।
বন্ধ ঘরে ধূর্ত চোখ, জোরালো আলোয়
কখনো বা মিটমিটে। কখনো শিরায়
জ্বালা ধরে। কখনো কি পাবে তাকে ফিরে?
যে-জীবন চলে গেছে, হঠাৎ শিশিরে?
শান্টিঙের শব্দ শোনা যায়
মিটমিটে আলো জ্বলে, পৃথিবী ঝিমায়।
ক্লান্তির গামছা পেতে কয়েকটি হাটুরে
মাঝরাতে প্যাসেঞ্জারে যাবে কিছু দূরে।
তারপর হয়তো বা ঝিঁঝিঁ-ডাকা গ্রাম
কী জানি কী নাম।
মাঝে মাঝে কখনো শেয়াল ডাকে
রাতচরা পাখী আর পাহারালা হাঁকে।
তারা থেকে হয়তো শিশির ঝরে
পাতা নড়ে।

বিড়ির লালচে মাথা এক কোণে মাঝে মাঝে জ্বলে
বুক-ভাঙা কাশি আর ঘুম-ভাঙা তারা টলটলে।
চা খাবে? (নিজেকে প্রশ্ন) ভাঙা আর ফাটা পেয়ালার
অথবা মাটির ভাঁড়ে গুড় গুলে? (চিনি নেই হায়)!
ঝিমন্ত অস্পষ্ট লোক কাঁপা-হাতে গরম চা ঢালে
(এরি মতো কেউ বুঝি ভেসেছিলো উত্তরের খালে!)
বিস্বাদ পেয়ালা ঠোঁটে আতঙ্কিত মনে পড়ে কালকের কথা
ক্লাইভের পথ ধরে ইতস্তত হাঁটা আর ভাবনা অযথা।
একরোখা সূর্য ধু-ধু শানবাঁধা পথে-পথে বেপরোয়া ঘোরে
গলির কাছের মোড়ে এলেই পিঠটা যেন শিরশির করে।
মানুষের মুখগুলো কিম্ভূত ছবির মতো আঁকা হয়ে গেছে
সামনে পিছনে লোকে নিজের মৃত্যুকে শুধু কেবলি খুঁজছে।
বিড়ির ধোঁয়ায় কাশি।—তারপর বিকেলের ভাবি নানা কথা
দক্ষিণে দরজা খোলা মত্ত হাওয়ার দিনে আজ কলকাতা।
সেখানে ফিরবো কিনা একেবারে জানা নেই, হায় জানা নেই
সম্ভবত মর্গে পচা মড়ার ভ্যাপসা ঘরে গিয়েছি আগেই।

Muslim Politics in India—শ্রীবিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরী প্রণীত ও ৯নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা, ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী হইতে প্রকাশিত। দাম—তিন টাকা।

ভারতে মুসলিম রাজনীতি মুসলিম জাতির অন্তর হইতে উত্থিত কোনো স্বতঃস্ফূর্ত জিনিস নয়। ইহা একান্তভাবেই সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের সৃষ্টি এবং তাহাদেরই স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে নানাভাবে ইহাকে বাঁচাইয়া রাখা হইয়াছে। ভারত শাসন ব্যাপারে যেদিন হইতে 'দুয়োরাণী-সুয়োরাণী' নীতি অনুসৃত হয়, সেইদিন হইতে ভারতের একটি বৃহৎ অংশকে জাতীয় আন্দোলন হইতে দূরে রাখিবার একটা প্রচ্ছন্ন ষড়যন্ত্র শুরু হয়। ১৯০৬ সালে লর্ড মিণ্টো যখন ভারতের বড়লাট সেই সময় আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মিঃ আর্চিবোল্ডের উদ্যোগেই এই ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত। তাহার পর হইতে জাতীয় কংগ্রেসের সহিত সাম্রাজ্যবাদের শক্তির পরীক্ষা একাধিকবার হইল। ভারতের হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে জনসাধারণের উপর কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ প্রভাব কর্তৃপক্ষকে শঙ্কিত করিয়া তুলিল। 'দুয়োরাণী'কে হাতে রাখিয়াও জাতীয় আন্দোলনের গতি কর্তৃপক্ষ ব্যাহত করিতে সমর্থ হইলেন না। এমনিভাবে আমরা যখন ১৯৪০ সালে আসিয়া পৌঁছিলাম তখন মুসলিম রাজনীতিতে নেতৃত্ব করিবার সুযোগ পাইলেন মিঃ জিন্না। বলিতে গেলে মিঃ জিন্নার [illegible] নেতৃত্বই ভারতের মুসলিম রাজনীতিকে একটা নূতন রূপ দিয়াছে। অবশ্য সেই রূপ [illegible] তুলি ও রঙ এবং পরিকল্পনা নেপথ্য হইতে যোগাইয়াছে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ। বস্তুত ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের নেপথ্য কাহিনীর সহিত যাঁহাদের স্বল্পবিস্তর পরিচয় আছে, তাঁহারাই স্বীকার করিবেন কিভাবে একটি তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি মানুষকে হাতের পুতুল করিয়া ভেদ-নীতির পথে, সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের পথে ইংরেজ ভারতে অকল্যাণের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে। [illegible] ত্রিশদুর অবলম্বন করিয়া ১৯৩৬ সাল হইতে মিঃ জিন্না সাম্রাজ্যবাদীর ছত্রছায়াতলে বসিয়া যে রাজনীতির চর্চা করিয়াছেন, তারপর ১৯৪০ সালের কুখ্যাত লাহোর প্রস্তাবে যাহাকে তিনি একটি বিশিষ্ট রূপ দিয়াছেন, তাহার মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার বাষ্পবিন্দুই নাই। সেই রাজনীতির যে আধুনিক রূপ আমরা দেখিলাম—তাহাকেই পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বলিয়াছেন—"Jungle Politics" অর্থাৎ নখদন্তী রাজনীতি। কসাইখানার ছুরি আজ এই মুসলিম রাজনীতির বাহন হইয়াছে।

আলোচ্য গ্রন্থে আমরা ভারতে মুসলিম রাজনীতির ক্রমবিকাশের ধারার একটা মোটামুটি পরিচয় পাই। গ্রন্থকার ১০০ পৃষ্ঠার মধ্যে যে বিষয়বস্তুর আলোচনা করিয়াছেন তাহা সর্বাংশে সুচিন্তিত ও সুখপাঠ্য। খুব উঁচুদরের গবেষণা ইহাতে নাই এবং তাঁহার যাকিছু বক্তব্য তাহার সমর্থনে তিনি প্রায় পঞ্চাশখানি পুস্তক হইতে প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। নিজের মতামত যেটুকু আছে তাহার সহিত আমাদের বিরোধ নাই। আমরা এখনকার সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার দিনে সুস্থচিত্ত ও সুস্থ মস্তিষ্ক প্রত্যেক মুসলিম তরুণকেই এই বইখানি পড়িতে অনুরোধ করি। ছাপা ও বাঁধাই খুবই ভালো তবে কলেবরের তুলনায় দামটা কিছু বেশীই মনে হইল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্জিকা—১৩৫৪ সাল। প্রকাশক—স্বামী শ্যামানন্দ, ১নং উমেশ দত্ত লেন, বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা।

এই পঞ্জিকায় বিশেষ বিশেষ পর্বদিনে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শরীর মনে বিশেষ বিশেষ ভাব প্রকাশিত হইত, সেগুলি উল্লেখ করা হইয়াছে এবং ঠাকুরের ভক্তগণের জন্মতিথি ও স্মরণীয় দিনের তালিকা আছে। হিন্দু গৃহস্থের পক্ষে পঞ্জিকার অন্যান্য সব জ্ঞাতব্য বিষয় দ্বারাও পঞ্জিকাখানি সমৃদ্ধ।

নোয়াখালির পটভূমিকায় গান্ধীজী—১ম পর্ব। শ্রীকানাই বসু সম্পাদিত। এস কে পালিত এণ্ড কোং, ৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য সাড়ে পাঁচ টাকা।

ভারতের জাতীয়তাবাদী জনসাধারণ ভদ্রবেশী বর্বরতার সহিত দীর্ঘকাল লড়াই করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু নোয়াখালিতে বর্বরতা যে রকম নগ্ন রূপ লইয়া দেখা দিয়াছিল, দানবীয়তার ইতিহাসে তাহা সম্পূর্ণ নূতন। বর্বরতার এই রূপের সহিত পৃথিবী বোধ হয় এই প্রথম পরিচয় লাভ করিল। এখনও ইহার ইতিহাস রচনার সময় আসে নাই, কারণ এই নিন্দনীয় অমানুষিকতার প্রভাব হইতে এখনও মুক্তিলাভ ঘটিয়া উঠে নাই। কিন্তু এই নিষ্ঠুর অভিযানের ঘটনাপঞ্জী সংকলন করিয়া রাখার প্রয়োজন ইতিহাসের দিক হইতে অনস্বীকার্য। বিরাট এই ধ্বংসকাণ্ডের মাঝখানে গান্ধীজী সাম্য, মৈত্রী, ত্যাগ ও শান্তির যে মহান ব্রত উদ্‌যাপনের দুশ্চর তপস্যায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহার স্মৃতি অতীতের যে কোন মহামানবের সাধনাকে ম্লান করিয়া দিয়াছে। 'নোয়াখালির পটভূমিকায় গান্ধীজী' গ্রন্থখানা একাধারে যুগোপযোগী এবং ভবিষ্যতের ইতিহাস রচনার উপাদানে পূর্ণ বলিয়া মূল্যবান। ছাপা, কাগজ, প্রচ্ছদপট ভাল। ৬১।৪৭

কলহংস—শ্রীসুকুমার রায় প্রণীত। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

'কলহংস' কবিতার বই। সহজ ভাবের প্রায় ত্রিশটি কবিতার সমষ্টি। কোন রচনাতেই বিশেষ কোন চমৎকারিত্ব না থাকিলেও কয়েকটি কবিতা প্রসাদগুণে সুখপাঠ্য হইয়াছে। ৬৭।৪৭

পুনর্ণবা—শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—রায় বাহাদুর এম সি সরকার এণ্ড সন্স, ১৪ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

'পুনর্ণবা' বৈষ্ণবভাবের দশটি কবিতার সমষ্টি। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সন্ন্যাস ও অপরাপর লীলা অবলম্বনে কবিতাগুলি রচিত। আবেগপূর্ণ ভাষা, সতেজ প্রকাশভঙ্গী ও ঝঙ্কারময় ছন্দের ঐশ্বর্যে সর্বোপরি ভক্তিরসের মাধুর্যে কবিতাগুলি অতিশয় সুখপাঠ্য হইয়াছে। প্রভুর লীলারসস্নিগ্ধ এই কয়টি রচনা পাঠে পাঠক মাত্রেরই প্রাণ দ্রবীভূত হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ৬৩।৪৭

মন্ত্রী মিশন ও পরবর্তী অধ্যায়—শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত। জে চৌধুরী ব্রাদার্স, ৬০।১।এ ওয়েলিংটন স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

মন্ত্রী মিশনের ভারতে আগমন, ভারতীয় নেতৃবর্গের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎকার, পত্রালোচনা, বিবৃতি এবং সংশ্লিষ্ট অপরাপর বিবরণ এই গ্রন্থমধ্যে সংকলিত হইয়াছে। অতঃপর অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্ট গঠন, লীগ কর্তৃক মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য এবং প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঘোষণা, দেশের নানাস্থানে উক্ত সংগ্রামের আত্মপ্রকাশ; অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টে লীগের প্রবেশ, মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব সম্পর্কে বৃটিশ সরকারের নূতন ব্যাখ্যা, গণ-পরিষদের অধিবেশন এবং ক্ষমতা হস্তান্তর সম্বন্ধে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণা—এই বিষয়গুলি পর পর গ্রন্থমধ্যে বিবৃত হইয়াছে। যাঁহারা রাজনীতি ও সাংবাদিকতার চর্চা করেন, তাঁহাদের নিকট বইটি বিশেষ প্রয়োজনীয়। ঘটনাপঞ্জীর একত্র সংকলন হিসাবে সাধারণ পাঠকগণেরও বইটি বিশেষ উপকারে আসিবে। ৬৪।৪৭

হাসি খুসি মজা—মৌমাছি প্রণীত। মিত্রালয়, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

মৌমাছি শিশুমহলে এতই সুপরিচিত যে, তাহার সম্বন্ধে নূতন করিয়া কিছু বলাই বাহুল্য। কি করিয়া শিশুদের মনের গভীরে আনন্দের সাড়া জাগাইতে হয়, তাহা তাঁহার বিশেষভাবেই জানা আছে; এক কথায়, তিনি শিশু সাহিত্যের পাকা লেখক। আলোচ্য বইটিতে তাঁহার রচিত শিশুদের সুখপাঠ্য অনেকগুলি গদ্যপদ্য রচনা তাঁহার অঙ্কিত চিত্রাবলীতে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। শিশুরা এই লোভনীয় বইটি হাতে পাইয়া যে নাওয়া খাওয়া ভুলিয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ৬৮।৪৭

কবিতাবলী—সংস্কৃত ও প্রকৃত নারী কবি রচিত—ডক্টর রমা চৌধুরী অনূদিত।

আজ আমরা চির আকাঙ্ক্ষিত ভারতীয় স্বাধীনতার দ্বারদেশে উপনীত হইয়াছি। ভারতের এই যুগসন্ধিক্ষণে ভারতীয় ঐতিহ্য ও কৃষ্টি সম্বন্ধে আলোচনা সমধিক বাঞ্ছনীয়। নারীজাগরণ ব্যতীত ভারতের প্রকৃত সমুন্নতি সম্ভবপর নহে; তাই অতীত ভারতের নারীদের বিদ্যাবত্তা, সামাজিক সম্মাননা প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের প্রগাঢ় জ্ঞান আজ অতীব আবশ্যক। অতীত ভারতবিষয়ক জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে সংস্কৃত জ্ঞানসাপেক্ষ। সংস্কৃত জ্ঞানের অত্যাবশ্যকতা সমাজে স্বীকৃত হইলেও, দুঃখের বিষয়, সংস্কৃত শিক্ষা আজ বড়ই দুঃস্থ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। তাই দেশে সংস্কৃতবিষয়ক জ্ঞান বিস্তারের নিমিত্ত অনুবাদ সাহিত্যের প্রয়োজন অত্যধিক। নারী কবিদের কবিতাবলীর বাঙলা অনুবাদ এ সময়ে একটি গুরুতর অভাব দূরীভূত করিয়াছে। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য নারীদের কি অনবদ্য দানে সুসমৃদ্ধ ছিল, বঙ্গভাষাভাষীদের পক্ষে এই গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে তা পূর্ণভাবে জানিবার বিশেষ কোনও উপায় ছিল না। তজ্জন্য অনুবাদিকা বিদুষী ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী এবং এই গ্রন্থপ্রকাশক বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ সুধীবর্গ ও জনসাধারণ সকলেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। এই গ্রন্থে ২৬ জন বৈদিক নারী ঋষি, ৩২ জন সংস্কৃত নারীকবি এবং ৯ জন প্রাকৃত নারী কবির যথাক্রমে ২৫৩টি ঋক, ১৪২টি সংস্কৃত কবিতা ও ১৬টি প্রাকৃত কবিতার বাঙলা অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। বৈদিক নারী ঋষিদের কবিতাগুলি সবই ঋগ্বেদের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ ঋক্। অবশ্য ইতঃপূর্বে

ঋগ্বেদের বাঙলা অনুবাদ হইয়াছে—যথা, রমেশচন্দ্র দত্তকৃত বঙ্গানুবাদ। কিন্তু কেবল নারী ঋষিকৃত ঋক্‌গুলির অনুবাদ একত্রে ইতঃপূর্বে করা হয় নাই। কেবল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ২।৪খানি কবিতা ব্যতীত, এতগুলি সংস্কৃত ও প্রাকৃত নারী কবির কবিতাও ইতঃপূর্বে বাঙলায় সুসংবদ্ধভাবে অনূদিত হয় নাই। এই দিক হইতে আলোচ্য গ্রন্থখানির পরিকল্পনা ও সম্পাদনা বাঙলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ অভিনব, সন্দেহ নাই। নারী কবিদের বিষয়ে সামান্য দু'একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু এতগুলি নারী কবির বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ কোনও গ্রন্থ ইতঃপূর্বে বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। বর্তমান গ্রন্থে লেখিকা ভূমিকার স্বল্প পরিসরে বৈদিক নারী ঋষি এবং সংস্কৃত ও প্রাকৃত নারী কবিদের বিদ্যাবত্তা ও জ্ঞানগরিমার বিষয়ে একটি উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। ইহা যে বর্তমান নারী প্রগতির বহুল পরিমাণে সহায়তা করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। লেখিকা পূর্বেই ঘোষা, গোধা প্রমুখ বৈদিক নারী ঋষিদের ঋক্; শীলা, বিজ্জা প্রভৃতি নারী কবিদের বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্কৃত কবিতা; গঙ্গাদেবী প্রমুখ নারীকবিদের "মধুরাবিজয়" প্রভৃতি সম্পূর্ণ সংস্কৃত কাব্য; রেবা, রোহা প্রমুখ প্রাকৃত নারী কবিদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাকৃত কবিতা সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় বিশদ আলোচনা এবং সংস্কৃত ও প্রাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতার ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া সুধীবর্গের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। বর্তমান গ্রন্থে তিনি কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন সংস্কৃত ও প্রাকৃত কবিতারই অনুবাদ প্রদান করিয়াছেন এবং নারীদের অন্যান্য রচনারও বাঙলা অনুবাদ প্রকাশের অত্যাবশ্যকতার বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাগুলিও নারী কবিদের কবিত্ব শক্তি ও ভাষা লালিত্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করে। ছন্দোবন্ধহীন পদ্যে মূলে সংস্কৃতের সুমিষ্টতা বহুলাংশে ব্যাহত হইতে যে বাধ্য, তাহা নিঃসন্দেহ। তথাপি লেখিকা তাহার মধ্যেই যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। এ গ্রন্থের অনুবাদ আক্ষরিক অথচ সাবলীল এবং লেখিকা পাদটীকায় দ্ব্যর্থবোধক সংস্কৃত শব্দাদির অর্থ প্রাঞ্জল ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

বাঙলা ভাষায় স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার সম্বন্ধে লেখিকা যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন যে, বাংলায় স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার সম্বন্ধে কোনও সার্বজনীন নিয়ম নাই। কোনো কোনো স্থলে স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার করা হয়, যথা—"ওজস্বিনী বাণী" "মহতী প্রতিভা"; কোনো কোনো স্থলে হয় না—যথা, "মধুর ভাষা", "তীব্র বিদ্যুৎ"। কিন্তু ভাষাকে বিজ্ঞানসম্মত, শিক্ষণীয় ভাষায় পরিগণিত করিতে হইলে যথাসম্ভব স্থির, সার্বজনীন নিয়মের প্রচলন বাঞ্ছনীয়। সেজন্য অধিকাংশ স্থলেই স্ত্রীলিঙ্গ প্রয়োগ করা হয় বলিয়া লেখিকা সর্বত্রই তাহা করিবার পক্ষপাতিনী। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মাবলী কতদূর বাংলা ভাষায় গ্রহণীয়, তাহা সুধীজন-বিবেচ্য। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, নিয়ম সার্বজনীন হওয়াই উচিত—আমরা যে বর্তমান বাঙলায় সংস্কৃত নিয়মাদি যথেষ্ট ভাবে প্রয়োগ করিতেছি, তাহাতে ভাষা শিক্ষার পথে যথেষ্ট বাধা জন্মাইতেছে, সন্দেহ নাই। সেই বিষয়ে সুধীবৃন্দের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া লেখিকা আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

ভারতের প্রাচীন ও মধ্য যুগে নারী কবি ও লেখিকাগণের অমূল্য দানে সংস্কৃত সাহিত্য বহুল ভাবে সুসমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই বিষয়ে আমরা এতদিন বিশেষ কিছুই জানিতাম না। সম্প্রতি নারীদের রচিত স্মৃতি, তন্ত্র, সম্পূর্ণ কাব্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা প্রভৃতি সংগৃহীত ও মুদ্রিত হওয়াতে আমাদের বহুল উপকার হইয়াছে। বিদুষী লেখিকা এই বিষয়ে অগ্রণী হইয়া নারীদের অন্যান্য রচনারও বাঙলা অনুবাদ প্রকাশে অবহিত হইবেন ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

—শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ)।

ব্লাড প্রেসার—ডাক্তার শ্রীখগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—হ্যানিম্যান পাবলিশিং কোং, ১৬৫, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

আলোচ্য পুস্তকে হোমিওপ্যাথি মতে ব্লাড প্রেসার রোগে চিকিৎসা প্রণালী বিবৃত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আগ্রহশীল ব্যক্তিগণ পুস্তক পাঠে উপকৃত হইবেন।

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজা ও কথা—তীর্থতীর্থ শ্রীউমেশ চক্রবর্তী, প্রণীত ও প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান—১২০।২, আপার সার্কুলার রো। মূল্য দশ পয়সা।

লক্ষ্মীপূজার পাঁচালী; লক্ষ্মীপূজার ধ্যান, মন্ত্র প্রভৃতি আছে।

সাহিত্য সংবাদ

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

বিষয়ঃ—

১। ছেলেদের জন্য—"জাতীয় ঐক্য ও সাম্প্রদায়িকতা।"

২। মেয়েদের জন্য—"সমাজ গঠনে নারীর স্থান।"

ছেলেদের প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার যথাক্রমে রৌপ্যাধার ও পদক।

মেয়েদের প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার ২টি পদক।

প্রবন্ধ পাঠাইবার শেষ তারিখ ১লা জুন, ১৯৪৭।

শ্রীকামাখ্যাচরণ ভট্টাচার্য, দর্শনা ছাত্র সংঘ, দর্শনা, নদীয়া।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

"দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে ছাত্রদের কর্তব্য"

নিয়মাবলীঃ—

(১) ফুলস্কেপ কাগজের ১৫০ লাইনের মধ্যে এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে।

(২) ২২।৩।৪৭এর মধ্যে "ছাত্র কংগ্রেস অফিস, শ্রীদীনেশ জোয়ারদার, ইংরেজ বাজার, মালদহ" ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

(৩) আমাদের মনোনীত বিচারকদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হইবে।

(৪) পুরস্কারঃ প্রথম ও দ্বিতীয়।

(৫) প্রধান শিক্ষক মহাশয় বা শিক্ষয়িত্রীর স্বাক্ষরিত হওয়া চাই।

শ্রীবিশ্বনাথ দাস, মালদহ।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

কুমারখালি সেবাব্রত সমিতির সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠান

রচনার বিষয়

(ক) বাংলার স্কুলের ছাত্র ও ছাত্রীগণের জন্য—"বর্তমান যুগের ছাত্র-ছাত্রীদের ব্রত।"

(খ) বাঙলার সর্বসাধারণ পুরুষ ও মহিলাদিগের জন্যঃ—

পুরুষঃ—"বাংলার ভবিষ্যৎ"।

মহিলাঃ—"বঙ্গ রমণীর বর্তমান কর্তব্য"।

পুরস্কার

(ক) বিভাগে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্য ছাত্রদিগের একটি ও ছাত্রীদের একটি এবং (খ) বিভাগে পুরুষের জন্য একটি ও মহিলাদের জন্য একটি যোগ্য পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—স্কুলের ছাত্র ও ছাত্রীগণের প্রধান শিক্ষকের ও সর্বসাধারণ পুরুষ ও মহিলাদের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির স্বাক্ষরযুক্ত প্রবন্ধ আগামী ১৯৪৭ সালের ৩০শে জুন বা ১৩৫৪ সালের ১৫ই আষাঢ় তারিখের মধ্যে সম্পাদক, সেবাব্রত সমিতি, কুমারখালি, নদীয়া ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

প্রতিযোগিতা পরিচালকঃ—

ভোলানাথ মজুমদার, বিদ্যাবিনোদ ও রামচরণ কর্মকার, কবিরত্ন।

রচনা প্রতিযোগিতা

বঙ্গীয় যুবশক্তি সঙ্ঘের উদ্যোগে রচনা প্রতিযোগিতা হইবে। রচনার বিষয় ঃ—(১) ভারতের বর্তমান পরিস্থিতি। (২) ভারতীয় শিক্ষা।

ইংরাজী ও বাঙলা উভয় ভাষাতেই লেখা চলিবে। প্রতি বিষয়ে ইংরাজী ও বাঙলায় দুটি করিয়া ৪টি অর্থাৎ সর্বসমেত ৮টি পুরস্কার দেওয়া হইবে। রচনা পাঠাইবার শেষ তারিখ ইং ১৯৪৭।৩১ মে। রচনার ফলাফল ইং ১৫ জুলাই পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। পূর্ণ বিবরণের জন্য আবেদন করুন।

সুদেব ব্যানার্জি, ১৬৪ই, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—মাইকেল মধুসূদন—

প্রবন্ধ ও কবিতা প্রতিযোগিতা

যশোহর সাহিত্য সংঘের পক্ষ হইতে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতি প্রবন্ধ ও কবিতা প্রতিযোগিতা আহ্বান করিতেছি।

প্রবন্ধের বিষয়—"মহাকবি মাইকেলের চতুর্দশপদী কবিতার বৈশিষ্ট্য"। ফুলস্কেপ কাগজে ৫ পৃষ্ঠা মধ্যে রচনা করিয়া ১লা জুন মধ্যে পাঠাইতে হইবে। কবিতার বিষয়—"মহাকবির প্রতিভা"। ফুলস্কেপ কাগজ ২ পৃষ্ঠার মধ্যে।

প্রবন্ধ ও কবিতা মনোনীত হইলে, যশোহর সাহিত্য-সঙ্ঘের পক্ষ হইতে সাহিত্যশ্রী, সাহিত্য ভারতী, কাব্যশ্রী প্রভৃতি উপাধি দান করা হইবে—২৯শে জুন, যশোহরে মাইকেল স্মৃতি সভায়।

শ্রীঅমলাকান্ত মজুমদার, সম্পাদক, যশোহর সাহিত্য সংঘ, যশোহর।

নয়া দিল্লীতে গণ-পরিষদের তৃতীয় অধিবেশন

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ও দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিগণ ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন

গণ-পরিষদের কংগ্রেসী সদস্যগণের নিকট পণ্ডিত নেহরু বক্তৃতা করিতেছেন। ছবিতে আচার্য কৃপালনী, সর্দার প্যাটেল, শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বরদলুই, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়াকে দেখা যাইতেছে

নার্স সিসি (নিউ থিয়েটার্স)—কাহিনী ঃ বিনয় চট্টোপাধ্যায়, পরিচালনাঃ সুবোধ মিত্র, আলোকচিত্রঃ সুধীন মজুমদার, শব্দ-নিয়ন্ত্রণঃ রণজিৎ দত্ত, সুরযোজনাঃ পঙ্কজ মল্লিক, শিল্পনির্দেশকঃ সৌরেন সেন; ভূমিকায়ঃ ছবি বিশ্বাস, অসিতবরণ, ভানু, আদিত্য ঘোষ, 'ভারতী, সুনন্দা, লতিকা প্রভৃতি। ছবিখানি অরোরা ফিল্মসের পরিবেশনায় ২৭শে এপ্রিল চিত্রা ও রূপালিতে মুক্তিলাভ করেছে।

গত যুদ্ধের সময় যুদ্ধ সংক্রান্ত প্রচার-কাজের জন্যে ভারত সরকার প্রধান প্রধান স্টুডিওগুলিকে নির্দিষ্টসংখ্যক ছবি তোলার যে বাধ্যতামূলক আইন ক'রেছিলো 'নার্স সিসি' সেই আইনেরই পরিপোষক চিত্র। ছবিখানি আরম্ভ হ'য়েছিল যুদ্ধ শেষ হওয়ার কিছুদিন মাত্র পূর্বে এবং প্রায় আড়াই বছরকাল চিত্রগ্রহণে ব্যয়িত হ'য়েছে; তবে যুদ্ধকালের প্রচার-চিত্র বলতে আমাদের যে তিক্ত অভিজ্ঞতা হ'য়েছে 'নার্স সিসি' তা শুধু খণ্ডনই করে নাই, উপরন্তু চলচ্চিত্রকে দেশ ও সমাজসেবার কাছে কিভাবে নিয়োজিত করা যায় তারই একটি সুন্দর নিদর্শনরূপে আত্মপ্রকাশ ক'রেছে।

আমাদের দেশের নার্সদের জীবনযাত্রা নিয়েই 'নার্স সিসি'র আখ্যানভাগ। নারী ও সেবিকারূপে নার্সদের দুঃখ ও আনন্দ, গৌরব ও অগৌরবের জীবন্ত প্রতিচ্ছবিরূপই নার্স সিসির চরিত্রে প্রতিফলিত হ'য়েছে। সিসি অর্থাৎ সুষমা দরিদ্র ঘরের সন্তান এবং দারিদ্র্যের জন্যেই নার্স হয়; সমাজ তার সেবা মেনে নিতে কুণ্ঠিত হ'লো না। দেশপূজ্য নেতা যতীন্দ্রমোহনের জামাতা অসুস্থ হ'য়ে হাসপাতালে আসে এবং সিসির পরিচর্যায় সুস্থ হয়ে ওঠে। সেই সূত্রে যতীন্দ্রমোহনের পুত্র ইন্দ্রনাথের সঙ্গে সিসির আলাপ এবং প্রণয়। যতীন্দ্রমোহন কিন্তু একটি নার্সকে পুত্রবধূ করে ঘরে তুলতে রাজী হ'লেন না। সিসি পিতার ডাকে গ্রামে যায় এবং সেখানে গিয়ে শোনে যে, এক অশীতিপর বৃদ্ধের সঙ্গে তার বিবাহ ঠিক করা হ'য়েছে এবং সে এ বিবাহ না করলে তার কনিষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ হওয়া সম্ভব হচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত কিন্তু তার পিতা নিজেই আবার বিবেকের তাড়নায় এ বিবাহ ভেঙে দেয়। সিসি কলকাতায় ফিরে আসে এবং কয়েকদিন পর যুদ্ধে আহত সেনাদের সেবার জন্যে ডাঃ ঘোষালের সঙ্গে মণিপুরে চলে যায়। এদিকে পিতার সঙ্গে আদর্শ ও নীতি নিয়ে ঝগড়া করে ইন্দ্রনাথও গৃহত্যাগী হয়। মণিপুরে অবিশ্রান্ত সেবাকাজের মধ্যে সিসি নিজেকে ডুবিয়ে রেখে দেয়। ইন্দ্রনাথও ঘুরতে ঘুরতে মণিপুরে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং সেখানে অসুস্থ হ'য়ে পড়ে। ডাঃ ঘোষাল মারফৎ সিসি এ খবরটি পায় এবং ইন্দ্রনাথকে শুশ্রূষায় সুস্থ ক'রে তোলে। ইন্দ্রনাথ ভেবেছিলো সিসি এবারে তাকে গ্রহণ ক'রবে, কিন্তু সিসির পক্ষে যতীন্দ্রমোহনের অপমান ভোলা সম্ভব হ'লো না ব'লে ইন্দ্রনাথকে

স্বপনপুরীর 'চোরাবালি' চিত্রে নীলিমা মুখার্জি

প্রত্যাখ্যান ক'রলে। ইন্দ্রনাথ আবার নিরুদ্দেশ হ'লো। এর কিছুদিন পর যতীন্দ্রমোহনের সাংঘাতিক অসুখের খবর পেয়ে ডাঃ ঘোষাল ক'লকাতা রওনা হ'য়ে গেলেন, সঙ্গে গেলো সিসি; এবং প্রধানত সিসির শুশ্রূষা গুণেই যতীন্দ্রমোহন আবার সুস্থ হ'য়ে উঠলেন; কিন্তু এমনি হ'লো যে সিসির সেবা না হ'লে তাঁর চলেই না। কিন্তু সিসি কাজ শেষে বিদায় নিলে। এমনি সময়ে পিতার অসুখের সংবাদ পেয়ে ইন্দ্রনাথও বাড়িতে এলো এবং সিসির কথা শুনলে। যতীন্দ্রমোহনের একান্তই তখন অসহায় অবস্থা; ইন্দ্রনাথ হাসপাতালে গিয়ে সিসিকে নিয়ে এলো সঙ্গে ক'রে; যতীন্দ্রমোহন এবারে সিসিকে বুকে তুলে নিলেন—নার্স সম্পর্কে তাঁর যে ধারণা ছিল, তা তার বদলে গিয়েছে।

সিসি চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে কাহিনীকার সমগ্র নার্সদের মোটামুটি জীবনধারার একটা পরিচয় দেবার চেষ্টা ক'রেছেন। কাহিনীটির মধ্যে অভিনবত্ব আছে স্বীকার ক'রতে হয়, কিন্তু এমন কোন অসাধারণ ঘটনা সংশ্লিষ্ট নেই এবং এমন কোন নাটকীয় পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটানো হয়নি, যা মনের ওপর গভীর রেখাপাত করতে পারে; সব কিছু থাকা সত্ত্বেও সর্বক্ষণই একটা ফাঁকা ভাব অনুভূত হয়। পরিচালন গুণে দর্শকমন ছবিখানির প্রতি আকৃষ্ট থাকে, নয়তো কাহিনীটির স্বকীয় ক্ষমতা অত্যন্ত দুর্বল। বাস্তবিকই পরিচালক সুবোধ মিত্র নিউথিয়েটার্সের ইজ্জত বাড়িয়ে দেবার মত ছবিই পরিবেশন ক'রেছেন। যুদ্ধ পরবর্তীকালে ভারতীয় ছবির একটা স্টাণ্ডার্ডের সূচনা করেছে 'নার্স সিসি' এবং তার জন্যে আমরা পরিচালক সুবোধ মিত্রকে অভিবাদন জানাচ্ছি। সর্ব-সাধারণের কাছ থেকে আর যাঁরা অভিবাদন পাবেন, তাঁরা হচ্ছেন নাম ভূমিকায় ভারতী, শিল্প নির্দেশনে সৌরেন সেন এবং আলোকচিত্র গ্রহণে সুধীন মজুমদার।

ভারতী ইতিপূর্বে যত ছবিতে অভিনয় ক'রেছেন, নার্স সিসির তুলনায় সেগুলি গণ্য হবারই যোগ্য নয়। চরিত্রটির মর্যাদা ফুটিয়ে তুলতে তিনি কি প্রাণঢালা নিষ্ঠা ক'রতে তিনি অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। সিসি চরিত্রটিকে তিনি এমন একটা উচ্চ স্তরে তুলে ধরেছেন যে, যার সামনে অন্য সব চরিত্রই ম্লান হয়ে গিয়েছে। যতীন্দ্রমোহনের ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস অভিনেতা নাম বজায় রাখার মত একটু আধটু যা ফুলকি দেখিয়েছেন, নতুবা কারুরই অভিনয় অতি সাধারণের উপরের স্তরে উঠে পাবার মত হয়নি। সুনন্দার মত শিল্পীকে নগণ্য একটি পার্শ্ব-চরিত্রে নামানোর অর্থ কি?

দৃশ্যসজ্জাদির দিক থেকে এমন নিখুঁত, সঙ্গতিপূর্ণ এবং চিত্তাকর্ষক সেট বা পারিপার্শ্বিক সজ্জা আর কোন ভারতীয় ছবিতে দেখেছি মনে হয় না। ছবিখানির সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে শিল্পনির্দেশক সৌরেন সেনের কৃতিত্ব আর কারুর চেয়ে কম নয়—প্রতিটি দৃশ্য যেন বিলিতী ছবির কথাই মনে করিয়ে দেয়। সুধীন মজুমদারের আলোকচিত্র সেই সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে যথাযথ সাহায্য করেছে। বস্তুত এমন ঝক্‌ঝকে এবং কাহিনী-অনুগ আলোকচিত্র অনেকদিন দেখা যায় নি। সুর-যোজনায়ও পঙ্কজ মল্লিক তাঁর অসাধারণ ক্ষমতারই পরিচয় দিয়েছেন। গান যদিও ধ'রতে গেলে মাত্র দেড়খানা, কিন্তু পশ্চাদপট সঙ্গীত ছবির একটি ঐশ্বর্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মাত্রা বিচার ছবিখানির একটি প্রধান গুণ।

যেখানে যে বস্তুটি যতখানি দরকার, তার চেয়ে বেশী বা অবান্তর ও অবাস্তব কিছু সংযুক্ত করে ছবিখানির ওজন কৃত্রিম উপায়ে বাড়াবার চেষ্টা নেই—বিন্যাসে, দৃশ্য সংগঠনে বা চরিত্র উপস্থাপনে পরিচালক বেশ সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। মার্জিত রুচি ও সুষ্ঠু চিন্তাধারারও ছবিখানির মাধুর্য বাড়াবার অন্যতম কারণ।

রায়চৌধুরী (নিউ সেঞ্চুরী)—কাহিনী ও পরিচালনা—শৈলজানন্দ; আলোকচিত্র সুধীর বসু; সুরযোজনা—শৈলেশ দত্তগুপ্ত; ভূমিকায়—প্রমীলা দেবী, কমল, নীতিশ, নরেশ মিত্র, জহর, পূর্ণিমা, প্রভা প্রভৃতি। ছবিখানি ... থেকে উত্তরা, উজ্জ্বলা ও পূরবীতে

চিত্রবাণীর 'রাত্রি' চিত্রে সাবিত্রী
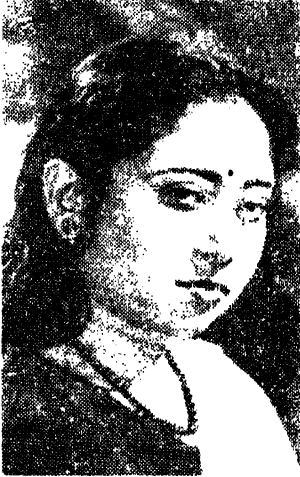
দেখানো হচ্ছে। একখানি ছবির জন্যে দু'বৎসরেরও অধিককাল সময় অতিবাহিত হওয়া এবং ছাপার অক্ষরে 'রায়চৌধুরী'র কাহিনী অনবদ্য চিত্রকাহিনী প্রতীত হওয়ার সাধারণে এ ছবিখানির ওপর যেমন উচ্চ আশা পোষণ করেছিলো, ছবিখানি মুক্তিলাভ করার পর ঠিক ততখানিই হতাশ হ'তে হয়েছে সবাইকে। প্রথম যারা শৈলজানন্দের ছবি দেখেছে, তারা কল্পনাই ক'রতে পারবে না যে, শৈলজানন্দের নাম এতটা কি ক'রে হ'তে পেরেছে। 'বন্দী', 'শহর থেকে দূরে', 'মানে না মানা' প্রভৃতি যুগান্তকারী চিত্রসমূহের পরিচালক ও বিশিষ্ট কাহিনীকাররূপে প্রখ্যাত শৈলজানন্দের কাহিনী বিন্যাসই হবে 'রায়-চৌধুরী'র অধঃপতনের মূল কারণ, সেকথা ভাবলে সত্যিই বিস্মিত হ'তে হয়। দীর্ঘ ছবিখানির মধ্যে এমন একটি দিক নেই, যেটির সম্পর্কে এতটুকুও প্রশংসার ভাষা উৎসারিত হ'তে পারে।

রায় ও চৌধুরী দুটি প্রতিবেশী পরিবারের মধ্যে বংশানুক্রমিক বিবাদ ও শেষে মিলন—এই নিয়েই কাহিনী। চীৎকার, ভাঁড়ামো, বন্দুকের দুড়ুম-দাড়াম আর ঘোড়দৌড় সংযোগে কোন রকমে কাহিনীটিকে রীল পাঁচেকের মধ্যেই শেষ ক'রে ফেলা হ'য়েছে, তারপর শুধু অবান্তর বুকনি, অসংলগ্ন দৃশ্য ও অনাবশ্যক চরিত্র সমাবেশে বাকী ক'রীল টেনে নিয়ে গিয়ে ছবি শেষ করা হ'য়েছে। শৈলজানন্দ যে এর মধ্যেই এতখানি ফুরিয়ে যাবেন, তা যেন বিশ্বাসই করা যায় না।

অভিনয়ে নাম করবার মত কৃতিত্ব কারুরই দেখা যায়নি, তবুও ওরই মধ্যে একেবারে খারাপ যাদের লাগে না, তাঁদের নাম হচ্ছে প্রমীলা দেবী, কমল মিত্র ও পূর্ণিমা। কলাকৌশলাদির দিক থেকেও উল্লেখযোগ্য কোন কৃতিত্ব নজরে পড়ে না। মোটামুটিভাবে 'রায়চৌধুরী' যে আমাদের এতটা হতাশ করলে, তার জন্যে আমরা মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না।

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

বিজ্ঞপ্তি

১০ই মে, ১৯৪৭ তারিখের 'দেশে' (২৭ সংখ্যা) প্রকাশিত "জাপানে রবীন্দ্রনাথ—১৯১৬" **শীর্ষক ছবিখানা আমরা ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের** সৌজন্যে পাইয়াছি।

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

বিলেত-যাত্রী তারকাদের নবতম তালিকায় রয়েছেন—স্নেহপ্রভা, মমতাজ শান্তি ও ওয়ালী, সরদার আখতার আর আমেরিকা যাত্রা ক'রছেন শোভনা সমর্থ ও কমলা কোটনিশ—অবশ্য সকলেই বেড়াতে যাচ্ছেন।

* * * *

বম্বের অন্যতম উঠতী তারকা দময়ন্তী সাহনী গত ২২শে এপ্রিল পরলোকগমন ক'রেছেন। লাহোরে কলেজে পড়বার সময়তেই অভিনয়-কলায় তাঁর দক্ষতা প্রকাশ হয়। দময়ন্তী তাঁর স্বামী বলরাজ সাহনীর সঙ্গে শান্তিনিকেতনে কিছুকাল শিক্ষাগ্রহণ করেন এবং গান্ধী সেবাশ্রমেও বৎসরাধিককাল অতিবাহিত করেন; পরে ইংলণ্ডে গিয়ে বি-বি-সিতে যোগ দেন। চার বছর বিলেতে থাকবার পর দেশে ফিরে পিপলস্ থিয়েটারের 'জুবেদা'তে প্রথম অবতরণ করেন এবং তাঁর প্রথম ছবি হচ্ছে 'ধরতী কে লাল।' পরে পৃথ্বী থিয়েটারের দীবার' তাঁকে অনন্যসাধারণ শিল্পী-রূপে খ্যাতি এনে দেয়। তার পরবর্তী ছবি হচ্ছে—'দূর চলে', 'গুড়িয়া' ও এক কদম।'

* * * *

প্রকাশ পিকচার্সের বিজয় ভট্ট আমেরিকাতে বুদ্ধের জীবনী অবলম্বনে একখানি ছবি তোলার আয়োজন করছেন এবং এ বিষয়ে তিনি আমেরিকার সুধীসমাজের সম্পূর্ণ সমর্থন লাভ করেছেন।

* * * *

আগামী সপ্তাহে নিউইয়র্কে ভারতীয় ছবির একটি বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছে আমেরিকাস্থ ভারতীয় সঙ্ঘের উদ্যোগে।

* * * *

বিখ্যাত তামিলী চিত্র 'লাভঙ্গী'র একটি হিন্দী সংস্করণ কলকাতায় তোলা হচ্ছে; মাদ্রাজী ছবির হিন্দী সংস্করণ এই প্রথম; ছবিখানির নাম 'জগন্নাথ পণ্ডিত' পরিচালনা করছেন ওয়াই ভি রাও এবং ভূমিকায় আছেন রুক্মিণী, পরেশ ব্যানার্জী, জ্যোৎস্না গুপ্ত প্রভৃতি।

* * * *

সামান্য টাকার মালিক হুজুগে ফাঁকিবাজ চিত্রনির্মাতাদের সংখ্যা বেশ বেড়ে যাচ্ছে। বর্তমানে ডজনখানেকেরও বেশী বাঙলা ছবি খানিকটা ক'রে হয়ে পড়ে রয়েছে টাকার অভাবে এবং দাঙ্গা প্রভৃতি বিপর্যয়ে ছবির বাজার যে অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তাতে এ ছবিগুলির কোনখানি সহজে সম্পূর্ণ হ'তে পারবে মনে হয় না।

বেঙ্গল প্রেস ফটোগ্রাফার এসোসিয়েশন
বার্ষিক সাধারণ সভা

গত রবিবার ৪৬।১ আমহার্স্ট স্ট্রীটস্থ এসোসিয়েশনের অফিসগৃহে বেঙ্গল প্রেস ফটোগ্রাফার্স এসোসিয়েশনের প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। শ্রীকাঞ্চন মুখার্জি সভায় সভাপতিত্ব করেন। শ্রীযুত মুখার্জি বাঙলার সাম্প্রতিক হাঙ্গামার কথা উল্লেখ করিয়া প্রেস ফটোগ্রাফারগণ কেমন করিয়া এই সমস্ত ঘটনার ফটো গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করেন।

এসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক শ্রীতারক দাস ও শ্রীবীরেন সিংহ তাহাদের রিপোর্টে বলেন যে, দেশে সাম্প্রতিক হাঙ্গামার জন্য তাঁহারা তাঁহাদের কর্মসূচী সম্পূর্ণভাবে কার্যে পরিণত করিতে না পারিলেও তাঁহারা তাঁহাদের সমব্যবসায়ীদের সহিত সৌহার্দ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

হাঙ্গামার জন্য প্রস্তাবিত প্রেস ফটোগ্রাফ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় নাই। সভায় জুলাই মাসের কোন সময়ে উক্ত প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইবে বলিয়া স্থির হয়। এই উদ্দেশ্যে শ্রীকান্তি গুহ, শ্রীসুধীশ ঘটক, শ্রীনীরদ রায়, মিঃ বি কে সিংহ ও শ্রীশম্ভু চ্যাটার্জিকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হয়। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া ১৯৪৭ সালের কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়ঃ—

সভাপতি—শ্রীকাঞ্চন মুখার্জি, সহঃ সভাপতি—মিঃ জে কে সান্যাল, যুগ্ম সম্পাদক—শ্রীতারক দাস ও শ্রীবীরেন সিংহ। কোষাধ্যক্ষ—শ্রীনীরদ রায়, সদস্যগণ—মিঃ বি কে সিংহ, শ্রীশম্ভু চ্যাটার্জি, শ্রীপান্না সেন ও শ্রীঅজিত সোম।

সভার শেষে এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীকাঞ্চন মুখার্জি সদস্যগণকে ভূরিভোজে আপ্যায়িত করেন।

হকি

ভারতীয় হকি দল বিশ্ব-অলিম্পিক অনুষ্ঠানে লণ্ডনে প্রেরিত হইবে। হকি ফেডারেশনের পরিচালকগণ এই দল প্রেরণের যাবতীয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছেন। মোট ১৬ জন খেলোয়াড় প্রেরিত হইবে বলিয়াও স্থির হইয়াছে। ঠিক কোন কোন খেলোয়াড় দলভুক্ত হইবেন অথবা দলের অধিনায়ক কে হইবেন তাহা ফেডারেশনের কর্তৃপক্ষগণ প্রকাশ করেন নাই। কবে করিবেন তাহারাই জানেন।

ফেডারেশন একটী মনোনীত দলকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শনী খেলায় যোগদান করিতে প্রেরণ করেন। এই দলের ভ্রমণ তালিকা শেষ হইলে সিংহলে গমন করে। সিংহলে তিনটী প্রদর্শনী খেলায় যোগদান করে ও কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করে। সিংহলে হকি খেলার কদর কোন দিনই ছিল না, সেইজন্য ভারতীয় ফেডারেশন দল প্রত্যেকটী খেলায় সিংহল দলকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করায়, আমরা কোনরূপে আশ্চর্য হই নাই। তবে এই ভ্রমণের সার্থকতা কি হইল সেইটাই আমাদের জিজ্ঞাসা? আর্থিক লাভ নিশ্চয় হয় নাই।

ভারতীয় হকি দল ১৯২৮ সালে, ১৯৩২ সালে ও ১৯৩৬ সালে পর পর তিনটী বিশ্ব-অলিম্পিক অনুষ্ঠানে হকি চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করে। সেই অর্জিত গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকুক ইহাই সকলের আন্তরিক কামনা। এইজন্যই আমরাও চাই উপযুক্ত অধিনায়কের অধীনে প্রকৃত শক্তিশালী দল এইবারের বিশ্ব-অলিম্পিক অনুষ্ঠানে প্রেরিত হউক। ফেডারেশন বর্তমানে যে সকল খেলোয়াড়কে লইয়া দল গঠন করিয়াছেন তাহার পরিবর্তন প্রয়োজন। ফেডারেশনের পরিচালকগণ গুরুদায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়া এই পরিবর্তন করিতে কুণ্ঠাবোধ করিবেন না।

সন্তরণ

আগামী অক্টোবর মাসের শেষে পাতিয়ালায় নিখিলভারত সন্তরণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে। এই অনুষ্ঠানের যে যে সাঁতারু বিভিন্ন বিভাগে সাফল্য অর্জন করিবেন তাঁহাদেরই বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানে প্রেরণ করা হইবে। নিখিল ভারত সন্তরণ ফেডারেশনের এই পরিকল্পনা খুবই আনন্দদায়ক সন্দেহ নাই তবে কার্যকরী হইলে আমরা সন্তুষ্ট হইব। ১৯৩৬ সালেও ভারতের সাঁতারু দল প্রেরণের কথা উঠিয়া শেষ পর্যন্ত ধামাচাপা পড়ে। কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া জানা যায়, নিখিল ভারত সন্তরণ ফেডারেশন প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। এইবারে সেইরূপ নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি না হইলেই সুখী হইব।

নিখিল ভারত সন্তরণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইলে বাঙ্গলা প্রদেশ যোগদান না করিয়া পারিবে না। কিন্তু আশঙ্কা হয় কখনো পূর্বে অর্জিত গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে না। বাঙ্গলার সন্তরণ মরশুম দুইমাস হইল আরম্ভ হইয়াছে। এই দুই মাসের মধ্যে কোন সন্তরণ প্রতিষ্ঠানেই কর্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হয় নাই। সম্প্রতি দুইটি প্রতিষ্ঠান অনুশীলনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, অপর সকল প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ নীরব। এইরূপ অবস্থায় বাঙ্গলার সাঁতারুদের সম্পর্কে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করা কি সম্ভব?

টেনিস

ভারতীয় টেনিস খেলোয়াড়গণকে শীঘ্রই ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার প্রথম খেলায় ফরাসী দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইবে। এই খেলার ফলাফল লইয়া ইতিমধ্যেই অনেক আলাপ আলোচনা হইয়াছে। এই সকল আলাপ আলোচনা বা উক্তির আমরা কোন মূল্য দিই না। কারণ খেলার ফলাফল সকল সময়েই অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকে। এই সম্পর্কে পূর্বাহ্নে কিছু বলা অর্থে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেওয়া হয়। অন্যান্য সকলের কথা ছাড়িয়া দিলে ভারতীয় দলের ম্যানেজারের উক্তির প্রতিবাদ না করিয়া আমরা পারি না। তিনি কেমন করিয়া দলের সকল খেলোয়াড়ের কথা ভুলিয়া একটি মাত্র খেলোয়াড়ের সাফল্য সম্পর্কে সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট বলিতে পারিলেন, ইহা আমাদের বোধগম্য হয় না। এইরূপ উক্তি দলের অপর খেলোয়াড়দের মনে আঘাত দিতে পারে ইহা তাঁহার বিবেচনা করা উচিত ছিল। দলের পরিচালক হইয়া দলের সকলকে সমানচক্ষে দেখিবেন এবং সকলকে সমানভাবে উৎসাহিত করিবেন ইহাই তাঁহার নিকট, যাঁহারা তাঁহাকে এই গুরুদায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা ঐরূপ আশা করিয়াই দিয়াছেন। কিন্তু তিনি তাহা পালন করিতে পারেন নাই। দল প্রত্যাবর্তন করিলে ইহার জন্য পরিচালকগণের নিকট নিশ্চয়ই জবাবদিহি করিতে হইবে।

ফরাসী দল যেরূপ শক্তিশালী করিয়া গঠন করা সম্ভব ছিল, তাহা হয় নাই। দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় গত বৎসরের উইম্বলডেন চ্যাম্পিয়ান দীর্ঘাকৃতি পেত্রা দলের পক্ষ সমর্থন করিতে পারিবেন না। তিনি এখনও অসুস্থ। তাঁহার স্থান পূরণ করা হইয়াছে ভেস্তেনাওর দ্বারা। তিনিও অনেকদিন খেলিবার সুযোগ পান নাই। অপর যে তিনজন খেলোয়াড়কে ফরাসী দলে লওয়া হইয়াছে, তাঁহারাও সম্প্রতি কোথাও অভাবনীয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন নাই। এইরূপ ক্ষেত্রে ভারতীয় খেলোয়াড়গণ এই খেলায় সাফল্যলাভ করিবেন ধারণা করিলে খুব অন্যায় হইবে না।

মুষ্টিযুদ্ধ

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস কণ্ট্রোল বোর্ডের সভায় মুষ্টিযুদ্ধ, কুস্তি ও বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। এমনকি এইবারের মুষ্টিযুদ্ধ অনুষ্ঠানের ভার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর অর্পিত হইয়াছে।

মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা তালিকাভুক্ত করিয়া ভালই হইয়াছে। তবে প্রথম বৎসরের অনুষ্ঠানের ভার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কিরূপে লইলেন, সেইটাই আমরা ভাবিয়া পাইতেছি না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে কোনদিন কোন মুষ্টিযুদ্ধ অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অথবা উৎসাহ প্রদর্শন করিতে দেখি নাই। আন্তঃ কলেজ মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন যতবার হইয়াছে, ততবারই অনুষ্ঠানের পরিচালকদের অতি অল্প সংখ্যক যোগদানকারীকে লইয়া কোনরূপে প্রতিযোগিতা শেষ করিতে হইয়াছে। কোন কলেজেই মুষ্টিযুদ্ধ শিক্ষার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয় না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকগণ এইরূপ অবস্থায় কিরূপে ভার গ্রহণ করিবেন তাঁহারাই জানেন।
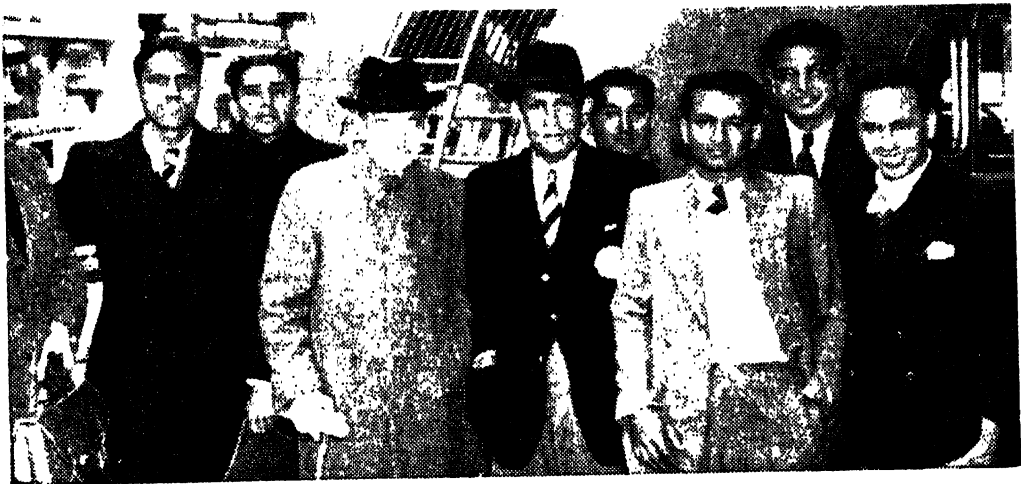
বেলজিয়ামে ভারতীয় ডেভিস কাপ দলের খেলোয়াড়গণ

দেশী সংবাদ

৫ই মে—নয়াদিল্লীতে মজদুর সেবক সঙ্ঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক শ্রমিক সম্মেলনে আনুষ্ঠানিক ভাবে ভারতীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস গঠন করা হয়। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জিকে চেয়ারম্যান ও ২১ জন সদস্য লইয়া একটি অস্থায়ী কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার শ্রীযুত প্রমথনাথ ব্যানার্জি এক বিবৃতিতে জানান যে, কলিকাতায় দাঙ্গা-হাঙ্গামাজনিত বিশৃঙ্খল অবস্থার দরুণ প্রায় সব পরীক্ষাই গড়পড়তা দুই মাস করে পিছাইয়া দিতে হইয়াছে। কিন্তু এসব পরীক্ষা যদি আরও পিছাইয়া দিতে হয়, তবে তাহাতে প্রদেশের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়ার সম্ভাবনা আছে।

সীমান্তের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী লীগপন্থী সর্দার আওরঙ্গজেব খাঁকে সীমান্ত অপরাধ নিরোধ বিধান অনুযায়ী গতকল্য মর্দানে গ্রেপ্তার করা হয়।

৬ই মে—নয়াদিল্লীতে মহাত্মা গান্ধী ও মিঃ জিন্নার মধ্যে সাক্ষাৎকার হয় এবং দুই ঘণ্টা ৪৫ মিনিটকাল আলোচনা হয়। বৈঠকের পর মিঃ জিন্না বলেন যে, মহাত্মা গান্ধী দেশ বিভাগ অনিবার্য বলিয়া মনে করেন না; কিন্তু তিনি (মিঃ জিন্না) মনে করেন যে, পাকিস্থান শুধু অনিবার্যই নহে—ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে উহাই একমাত্র কার্যকর পন্থা।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ও সীমান্তের লালকোর্তা দলের নেতা খান আবদুল গফুর খান এক বিবৃতিতে সীমান্ত প্রদেশকে রক্তপাত করা এবং মুসলিম লীগের সহিত প্রকাশ্য ষড়যন্ত্র করার জন্য সীমান্তের গভর্নর স্যার ওলাফ ক্যারোকে অভিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, "গভর্নর ক্যারো ইচ্ছা করিলে দুই দিনের মধ্যেই এই দাঙ্গা-হাঙ্গামা বন্ধ করিতে পারেন। কিন্তু নিজেই যখন লীগের হিংসাত্মক ও সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের পরিচালক, তখন তিনি কিরূপে তাহা পারিবেন?"

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের এক প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র বিভাগের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী বলেন যে, কলিকাতায় ২৭টি থানা আছে, তন্মধ্যে ১৫টির অফিসার ইনচার্জ মুসলমান, ১০টির হিন্দু এবং ২টির অন্য সম্প্রদায়।

৭ই মে—পাঞ্জাবের গভর্নর রাওয়ালপিণ্ডি জেলার মুসলমানদের উপর ৩০ লক্ষ টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য করিয়াছেন।

সীমান্ত সরকারের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ডেরাইসমাইল খান জেলার হাঙ্গামার প্রথম ১০ দিনে (১৫ই এপ্রিল হইতে ২৫শে এপ্রিল) ১১৮ জন নিহত এবং ৮১ জন আহত হইয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় অর্থ সচিব মিঃ মহম্মদ আলি ভোলা, কুড়িগ্রাম ও রংপুরের উলিপুরের অবস্থা সম্বন্ধে এক বিবৃতি দেন। ভোলা সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, সেখানে অরাজকতা সম্বন্ধে তিনি কোন সংবাদ পান নাই। উলিপুরে ও কুড়িগ্রামে ১২টি ঘটনা ঘটার সংবাদ পাওয়া

গিয়াছে। উপদ্রুত অঞ্চলে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হইয়াছে।

গত ৩০শে এপ্রিল ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর মহকুমায় এক প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যার ফলে ১১ জন নিহত, ২০০ লোক আহত এবং ২ হাজারের অধিক পরিবার গৃহহীন হইয়াছে।

৮ই মে—সমাজতন্ত্রী নেতা শ্রীযুত জয়প্রকাশনারায়ণ গতকল্য বোম্বাই হইতে বিমানযোগে হায়দরাবাদ পৌঁছিলে রাজ্যের পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া বিমানযোগে বোম্বাইয়ে প্রেরণ করে। শ্রীযুত জয়প্রকাশ নারায়ণের গ্রেপ্তার ও বহিষ্কারের প্রতিবাদে এক বিরাট জনতা সেকেন্দ্রাবাদের কিংসওয়ে রোডে পুলিশের উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে থাকে। উহার ফলে ৪ জন পুলিশ আহত হয়।

শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায় এক বিবৃতিতে বলেন যে, তিনি গত সপ্তাহের শেষে ছয়খানি বেনামী চিঠি পাইয়াছেন। এসব পত্রে তাঁহাকে এই বলিয়া ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে যে, তিনি যদি বঙ্গ বিভাগের আন্দোলন ত্যাগ না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে তজ্জন্য গুরুতর ফলভোগ করিতে হইবে। শ্রীযুত রায় বলেন যে, এই জাতীয় ভীতি প্রদর্শন তাঁহার মনে শুধু ঘৃণারই উদ্রেক করে। বঙ্গ বিভাগ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তিনি ঐ আন্দোলন ত্যাগ করিবেন না।

নিখিল ভারত দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলনের অস্থায়ী সভাপতি ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া এক বিবৃতিতে এই সতর্কবাণী করেন যে, হায়দরাবাদের নিজাম যখনই স্বাধীনতা ঘোষণা করিবেন, তখনই ৮৫ লক্ষ অন্ধ্র অধিবাসী অন্ধ্র দেশে চলিয়া যাইবে এবং প্রদেশের মধ্যে বাস করিবে।

কলিকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ অদ্য জোড়াসাঁকো থানার এলাকায় এক বাড়ীতে হানা দিয়া ১৬ বৎসর বয়স্কা এক বালিকাকে উদ্ধার করে। বাড়ির মালিককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

পুলিশের নিকট এই মর্মে এক এজাহার দেওয়া হইয়াছে যে, গত বুধবার গভীর রাত্রে বিশেষ শ্রেণীর দুইজন সশস্ত্র লোক মাণিকতলা থানা এলাকায় এক বাড়িতে প্রবেশ করে; বাড়ির লোকদের ভয় দেখায় এবং সশস্ত্র ব্যক্তির একজন এক বিধবার সতীত্ব নাশ করে। এই সম্পর্কে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

অদ্য হইতে চট্টগ্রাম পার্বত্য এলাকা ব্যতীত সমগ্র বাঙলা দেশে ১৯৪৭ সালের বঙ্গীয় খাদ্যশস্য (বণ্টন ও দখল) আদেশ বলবৎ হইবে। ব্যবসায়ী এবং উৎপাদকগণ কর্তৃক চাউল অথবা ধান মজুত রাখা বন্ধ করিবার জন্য এবং বে-আইনী ভাবে মজুত খাদ্যশস্য বাজারে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবার জন্য বাঙলা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনক্রমে এই আদেশ জারী করিয়াছেন।

৯ই মে—মহাত্মা গান্ধী আজ প্রাতে দিল্লী হইতে কলিকাতায় আগমন করেন। তিনি সোদপুরে খাদি প্রতিষ্ঠান আশ্রমে অবস্থান করিতেছেন। এই দিন শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু গান্ধীজীর সহিত দুইবার সাক্ষাৎ করেন এবং বাঙলার বর্তমান সমস্যাগুলি সম্পর্কে তাঁহার সহিত দীর্ঘকাল আলাপ আলোচনা করেন।

অদ্য কলিকাতা কর্পোরেশনের অধিবেশনে দর্শকের গ্যালারী হইতে একদল দর্শক ও সভাস্থ একদল মুসলিম লীগ দলভুক্ত সদস্য বিক্ষোভ প্রদর্শন করায় কর্পোরেশন সভায় বঙ্গ বিভাগ এবং মুসলিম লীগ মন্ত্রিমণ্ডলের অপসারণ দাবী করার প্রস্তাব আলোচনা করিতে পারা যায় নাই।

বর্তমানে কলিকাতার ১৩টি থানার এলাকায় যে সান্ধ্য আইনের মেয়াদ বলবৎ আছে, অদ্য কলিকাতার পুলিশ কমিশনার এক আদেশ জারী করিয়া তাহা শনিবার ১০ই মে হইতে আরও এক সপ্তাহকাল বাড়াইয়া দিয়াছেন।

আজ বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশনের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এই দিন পরিষদে চান্দিনা প্রজাস্বত্ব বিলটি গৃহীত হয়।

১০ই মে—সোদপুরে অনুষ্ঠিত প্রার্থনা সভায় মহাত্মা গান্ধী বলেন যে, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে তিক্ততা ও বৈরীভাব চিরকাল থাকিতে পারে না। তিনি আরও বলেন যে, বঙ্গ বিভাগ হইলে তাহার জন্য সংখ্যাগুরু মুসলমান সম্প্রদায় এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত মুসলিম গভর্নমেণ্টই দায়ী হইবে।

বালিগঞ্জ সিংঘী পার্কে জাতীয় বঙ্গ মহাসম্মেলনের অধিবেশন শুরু হয়। বাঙলার যেসব অঞ্চল ভারতীয় ইউনিয়নে থাকিতে ইচ্ছুক, উহাদিগকে লইয়া একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের দাবী জানাইয়া সম্মেলনে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সম্মেলনে প্রেসিডেন্সী বিভাগ ও কলিকাতার পাঁচ হাজার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের সভাপতি ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ বলেন যে, ভারত বিভাগ হইলে বাঙলা ও পাঞ্জাব বিভাগও অনিবার্য।

সিরাজগঞ্জের সংবাদে প্রকাশ, গত শুক্রবার শেষ রাত্রে বেঙ্গল আসাম রেলের ঈশ্বরদী-সিরাজগঞ্জ সেকসনের ঈশ্বরদী ও মুলাডুলি স্টেশনের মধ্যবর্তী স্থানে একটি পার্শেল ট্রেণ আটক করিয়া কয়েকখানি ওয়াগন লুঠ করা হইয়াছে।

১১ই মে—সিমলা বড়লাট ভবন হইতে এই মর্মে এক ইস্তাহার প্রচারিত হইয়াছে যে, আগামী ১৭ই মে নয়াদিল্লীতে বড়লাটের সহিত কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিগণের যে সম্মেলন হইবে বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল, তাহা আগামী ২রা জুন পর্যন্ত স্থগিত রাখা হইয়াছে।

বাঙলার প্রধানমন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী আজ সোদপুর আশ্রমে গিয়া মহাত্মা গান্ধীর সহিত দেড় ঘণ্টারও বেশী সময় আলোচনা করেন। প্রকাশ, অখণ্ড সার্বভৌম বাঙলা গঠন সম্ভবপর ও বাঞ্ছনীয় কিনা, সে সম্পর্কেই উভয়ের মধ্যে আলোচনা হইয়াছে। ভবিষ্যৎ অখণ্ড বাঙলার রূপ কি হইবে, মিঃ সুরাবর্দী তাহা মহাত্মাজীকে জানাইয়াছেন।

সোদপুরে প্রার্থনা সভায় বাঙলার সমস্যা সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী বলেন যে, হিন্দু ও মুসলমানদের সমবেত ইচ্ছা ব্যতিরেকে কিছুই সাধিত হইতে পারে না।

ভারতের খাদ্য সচিব ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ এক বিবৃতিতে বলেন যে, ভারতের গোধূমে ফসল ভাল না হওয়ায় এবং বিদেশ হইতে ভারতের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা অল্প পরিমাণ খাদ্য-শস্য ভারতে আমদানী হওয়ায় ভারত এক গুরুতর খাদ্য সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, জুলাই হইতে নবেম্বর মাস পর্যন্ত খুব সংকট যাইবে।

বাঙলা ও বিহারের কয়লা খনি শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি ও অন্যান্য সুবিধার ব্যবস্থা করিবার জন্য শ্রমিক বিরোধ সম্পর্কিত সালিশী বোর্ড একটি রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। তাঁহাদের সুপারিশসমূহ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ৮৭তম জন্মতিথি উদ্‌যাপন উপলক্ষে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে নিখিল ভারত রবীন্দ্র স্মৃতিরক্ষা সমিতির উদ্যোগে এক বিরাট জনসভা হয়। শ্রীযুত সজনীকান্ত দাস সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও ডাঃ কালিদাস নাগ সভার উদ্বোধন করেন। সভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বক্তৃতা প্রসঙ্গে কবিগুরুর বিভিন্নমুখী প্রতিভার আলোচনা করেন এবং তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন।

বালিগঞ্জে জাতীয় বঙ্গ মহাসম্মেলনের দুই দিবসব্যাপী অধিবেশন সমাপ্ত হয়। সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবে ১৩ই মে সভাসমিতি করিয়া পৃথক প্রদেশ গঠনের দাবী জ্ঞাপনের জন্য "জাতীয় বঙ্গ দিবস" উদ্‌যাপন করিতে বাঙলার জনসাধারণকে আহ্বান জানান হয়।

আজ অমৃতসরে দাঙ্গা-হাঙ্গামার অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করে এবং সহরে ইতস্তত আক্রমণ ও ব্যাপক অগ্নি সংযোগ চলিতে থাকে। শুক্রবার পুনরায় দাঙ্গা শুরু হওয়ার পর হইতে এ পর্যন্ত ১৭ নিহত ও ২২ জন আহত হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

৫ই মে—বাঙলার সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা নিবারণের জন্য কত সংখ্যক বৃটিশ সৈন্য নিয়োগ করা হইয়াছে এই সম্পর্কিত এক প্রশ্নের উত্তরে অদ্য কমন্স সভায় সহকারী ভারত সচিব বলেন যে, বিগত কয়েক মাসে এক কলিকাতা ব্যতীত বাঙলার অপর কোন স্থানে বৃটিশ সৈন্য নিয়োগ করিতে হয় নাই। এই মাসের প্রথম ভাগে কলিকাতায় ৭৫০ জন বৃটিশ সৈন্য নিয়োগ করা হয়।

৭ই মে—লণ্ডনে ১০নং ডাউনিং স্ট্রীটে জেনারেল লর্ড ইসমে ও তাঁহার সহযোগিগণ ভারতীয় শাসনতান্ত্রিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনার জন্য বৃটিশ মন্ত্রিসভার ভারতীয় বিশেষজ্ঞদের সহিত পুনরায় এক বৈঠকে মিলিত হন। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী উহাতে সভাপতিত্ব করেন। বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের প্রেরিত বিবরণ লর্ড ইসমে বৃটিশ মন্ত্রিসভার নিকট পেশ করিয়াছেন।

৮ই মে—বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী মন্ত্রি-সভার ভারত বিশেষজ্ঞ সদস্যদের এবং জেনারেল লর্ড ইসমে ও তাঁহার দলবলকে অদ্য রাত্রিতে এক সম্মেলনে আহ্বান করেন। গতকল্য রাত্রির আলোচনা বিশেষ গোপনে অনুষ্ঠিত হয়। লর্ড ইসমে ১৬ই মে নয়াদিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিবেন।

ইহুদী এজেন্সীর প্রতিনিধিমণ্ডলীর নেতা রাবি আব্বা সিলভার অদ্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ পরিষদের বৈঠকে এক বিবৃতি পাঠ করেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে অবিলম্বে প্যালেস্টাইন সংক্রান্ত তথ্যানুসন্ধান কমিটির নিকট প্যালেস্টাইনে শাসনকার্য পরিচালনা সম্পর্কে বিবরণ পেশ করিতে হইবে। তিনি অভিযোগ করেন যে, বৃটিশ সরকার প্যালেস্টাইনে অছিগিরি করার নামে রাজত্ব করিয়াছে।

দেশ

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন — সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

চতুর্দশ বর্ষ] শনিবার, ১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪ সাল। Saturday, 31st May, 1947. [৩০শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ক্ষমতা হস্তান্তর

ক্ষমতা হস্তান্তরের পদ্ধতি সম্পর্কে বড়লাটের সুপারিশই বৃটিশ মন্ত্রিসভা অনুমোদন করিয়াছেন অথবা বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের সুপারিশের রদবদল হইয়াছে—তাহা জানা যায় নাই। তবে লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ, বড়লাট এবং বৃটিশ মন্ত্রিসভার ভারত সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে যে আলোচনা হইয়াছে, তাহার ফলে বড়লাট এবং বৃটিশ মন্ত্রিসভা ক্ষমতা হস্তান্তরের পদ্ধতি সম্পর্কে একমতাবলম্বী হইয়াছেন। হয়তো বড়লাটের সুপারিশই তাঁহারা যথাযথ অনুমোদন করিয়াছেন, অথবা "বৃটিশ দায়িত্বের" ধারা যথাসম্ভব বজায় রাখিয়া কিছুটা রদবদল করিয়া সুপারিশ অনুমোদন করিয়াছেন।

বড়লাট ২রা জুনের পূর্বেই ভারতে ফিরিয়া আসিতেছেন। বৃটিশ সিদ্ধান্ত ভারতের নেতৃবর্গ বড়লাটের মুখেই সাক্ষাৎ ভাবে পরিজ্ঞাত হইবেন। কি হইবে সেই সিদ্ধান্ত, বড়লাট বিলাত হইতে কি বস্তু লইয়া আসিতেছেন, তাহা আজও সুস্পষ্ট নহে। তবে বিলাতী "ওয়াকিবহাল" ও বিশেষজ্ঞ মহলের জল্পনা-কল্পনা হইতে এই একটি কথা অনুমান করা যাইতেছে যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এবং তাঁহাদের মুখপাত্ররূপে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ক্ষমতা হস্তান্তর ব্যাপারে যতটা সম্ভব "সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার" অভিনয় করিবার বহু পুরাতন বৃটিশ শাসন নীতিরই অনুসরণ করিবেন। মুরুব্বী সাজিয়া ভারতীয় সকল দলের উপর সকল সম্প্রদায়ের উপর, সম-ব্যবহারের নিরপেক্ষ অভিনয়ে পৃথিবীর লোককে ভুল বুঝাইতে পারিবেন কিনা জানি না, তবে স্বাধীনতাকামী ভারতকে ভুলাইতে পারিবেন না।

বলা **হইতেছে:—১৯৪৮ সালের জুন মাসের** মধ্যে বৃটিশের প্রভুত্ব ত্যাগের সিদ্ধান্ত অপরিবর্তনীয়। তবে ক্ষমতা হস্তান্তর কিভাবে হইবে, এক অখণ্ড ভারতে অথবা বহুধা বিভক্ত ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে ক্ষমতা 'বণ্টন' করা হইবে, তাহা স্থির করিবেন ভারতীয় নেতৃবৃন্দ। কারণ "ভারতের ভাগ্য—ভারতবাসীদেরই করায়ত্ত, তাহাদের ইচ্ছামতোই ভারতের ভাগ্য নির্ধারিত হইবে।"—

কিন্তু আজ এত কাণ্ডের পরে, ভারত বিভক্ত হইবে কিনা, হইলে কতভাগে তাহা বিভক্ত হইবে, তাহা স্থির করার দায়িত্ব একমাত্র ভারতবাসীর, নিরপেক্ষ বৃটিশ এতকাল ভারতের শান্তিরক্ষার দায়িত্ব বহন করিয়াছে, আজ ভারতের শান্তি ও নিরাপত্তা অব্যাহত থাকিবে, কি থাকিবে না, তাহা ভারতবাসীরাই স্থির করুক, এতখানি সরলতায় কে বিশ্বাস করিবে?

পৃথিবীর লোক ভারত বিভাগ কখনও সঙ্গত ও সম্ভব মনে করিবে না। আজ বৃটিশ ভারত-খণ্ডনের দায় হইতে নিজে অব্যাহতি লাভ করিয়া বিশ্বের দরবারে সাধু সাজিবেন, বিশ্ববাসীর নিকট প্রমাণিত হইবে—ভারতবাসী একত্র ঘর করিতে পারে না, কোন সম্প্রদায় কোন সম্প্রদায়কে বিশ্বাস করিতে পারে না, বিপদের কারণ জানিয়াও অখণ্ড দেশকেই বহুধা-বিভক্ত করিতে চাহে। সুতরাং আমরা কি করিতে পারি? কিন্তু বৃটিশ এতদিন ধরিয়া ভারতে যে খেলা খেলিয়াছেন, এখনও খেলিতেছেন, তাহাতে তাহার এই 'নিরপেক্ষতা' ভাণ বলিয়াই প্রমাণিত হইবে। মিঃ জিন্নার সাম্প্রদায়িক দাবীর মাত্রা কি বৃটিশ প্রশ্রয়েই দিনে দিনে বাড়ে নাই, ভারত খণ্ডন তথা পাকিস্থান দাবী কি বৃটিশের অনুকম্পার বারিসিঞ্চনে পুষ্ট হয় নাই? দাবী যতই অসঙ্গত হউক, তাহা যতই গণতন্ত্রবিরোধী ও স্বাধীনতার পরিপন্থী হউক, তাহাই উত্থাপন করিবার জন্য বেপরোয়া হইতে তাঁহারাই কি উৎসাহ দেন নাই, কংগ্রেসের সঙ্গে কোন মীমাংসায় রাজী না হইয়া ভারতের স্বাধীনতার পথ বিঘ্নসঙ্কুল করিয়া রাখিতে এই যে অনমনীয় জেদ ইহা কি, বৃটিশের ভারতশাসন নীতির অবশ্যম্ভাবী ফল নহে? বৃটিশপক্ষ ভালই জানেন যে, কংগ্রেস চিরকাল অখণ্ড ভারতের সাধনা করিয়াছে, আজও অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতাই কংগ্রেস কামনা করে, একমাত্র ভারতীয় চেতনায় চিত্ত ভরিয়া লইয়াই কংগ্রেস ভারতের সর্ব সম্প্রদায়ের যাবতীয় সমস্যা মীমাংসার জন্যই আগ্রহশীল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কংগ্রেসের সুসঙ্গত, ভারতের ৪০ কোটি অধিবাসীর স্বাধীনতার আদর্শসম্মত কোন মীমাংসার কোন প্রস্তাবই যে মিঃ জিন্না মানিবেন না, এই সত্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভালই জানেন। ভারত খণ্ডন ভিন্ন মিঃ জিন্না স্বাধীনতাকেও চাহিবেন না। পরাধীন ভারতে তাঁহার প্রত্যক্ষসংগ্রামের হিংস্র কর্মসূচীই অনুসরণ করিবেন। ঐকামতের কোন পথই বৃটিশ রাখেন নাই। মিঃ জিন্না তাঁহাদের ভারতশাসন নীতিরই সৃষ্ট একটি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রতীক। সুতরাং ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তাবের পরে আজ এই যে ভারতবর্ষকে বহুধা বিভক্ত করার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে—তাহার দায়িত্ব বৃটিশের নহে—ইহা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সমগ্র প্রচার-শক্তি বিশ্বময় প্রচার করিয়া বেড়াইলেও কেহ বিশ্বাস করিবে না। বিশ্বাস করিবে ইহাই, বৃটিশ ঘটনাচক্রে পড়িয়া ক্ষমতা

হস্তান্তরে সম্মত হইয়াছে বটে, কিন্তু সর্ব অন্তর দিয়া নহে। ভারতবর্ষের মতো একটা দেশের স্বাধীনতার রূপ কেমন হওয়া উচিত, তাহা যেমন স্বাধীনতাকামী জানে, বিশ্ববাসী বোঝে, তেমনি বৃটিশ জাতি ভালোরূপেই জানে। তথাপি এই যে ভারত খণ্ডনের দায় আজ সহসা ভারতীয় নেতৃবৃন্দের উপর তাঁহারা চাপাইয়া সাধু সাজিতে চাহেন, তাহা একেবারেই অচল। তথাপি আমরা বলিব, তোমাদের শাসন-নীতির ফলেই মিঃ জিন্নার সৃষ্টি—পাকিস্থানী তাণ্ডবের আবির্ভাব। এই তাণ্ডব আমরা আর দেখিতে চাহি না। ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তোমরা (বৃটিশ) যখন কোন দায়িত্বই স্বীকার করিতেছ না, তোমাদের সৃষ্ট বিষ-বৃক্ষের ফলও তোমরা অস্বীকার করিতেছ, তখন ১৯৪৭ সালের জুন মাসেই ভারত ত্যাগ কর না কেন? ভাগ-বণ্টন মারামারির দায়িত্ব যখন ভারতেরই, তখন বৃথা আর এক বৎসর থাকিয়া কোন্ মঙ্গল সাধিত হইবে? ভারতের মঙ্গল যদি কাম্য হইত, তাহা হইলে ভারতবাসী এই অশান্তি প্রশমনের দায়িত্ব পালন করা হইল না কেন? মধ্যবর্তী গভর্নমেণ্ট থাকিলেও তাহার যে প্রকৃত কর্তৃত্ব নাই, ইহা কে অস্বীকার করিবে?

স্বাধীন বাঙলার মায়া-মৃগ

বাঙলার জনমত বঙ্গ-বিভাগ সমর্থন করিয়াছে। আজ যখন পাকিস্থান দাবী তথা অখণ্ড ভারত ও অখণ্ড ভারতীয় জাতিকে বিভক্ত করিয়া ভারতের স্বাধীনতাকেই বিকৃত, বিপন্ন ও দুর্বল করিবার ষড়যন্ত্র কার্যকরী হইতে চলিয়াছে, তখন জাতীয়তাবাদী বাঙলা পাকিস্থানের কুক্ষিগত হইবার দুর্গতি হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু প্রদেশ গঠন করিয়া ভারতীয় ইউনিয়নের সহিত যুক্ত থাকিতে চাহিবে, ইহাই স্বাভাবিক। ভারত অখণ্ড দেশ, ভারতবাসী একটি জাতি—ইহা আমরা বিশ্বাস করি। সেই কারণেই ভারতীয় ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হইয়া ভারতীয় ইউনিয়নকে শক্তিশালী করিতে চাহি। সেই সঙ্গে ইহাও বিশ্বাস করি আজ যদিও ভারত বিভাগ রোধ করা সম্ভব হইল না, এমন দিন আসিবে, সেইদিনও বেশী দূরে নহে, যেদিন পাকিস্থানী বুদ্বুদ ভারতমহাসাগরে মিশিয়া যাইবে।

শরৎচন্দ্র মিঃ সুরাবর্দীর সঙ্গে স্বাধীন অখণ্ড বাঙলার এক পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছেন! এই পরিকল্পনা সম্পর্কে ইতি-পূর্বেই আমরা আলোচনা করিয়াছি। ইহা যে আজ শুধু ব্যর্থ নহে—ক্ষতির কারণ, তাহাও আমরা বলিয়াছি। ভারত বিভাগ কংগ্রেসের কখনও কাম্য নহে; কিন্তু ভারতকে বিভক্ত করিয়া যদি পাকিস্থান-হিন্দুস্থানেই (রাজস্থানেও) পরিণত করা হয়, তাহা হইলে সেই অকল্যাণকে প্রতিহত করার পূর্বে বাঙলার স্বাধীনতা এবং অখণ্ড বাঙলার প্রস্তাব যে গোটা বাঙলাকে পাকিস্থানের কুক্ষিগত করিবার প্রস্তাব মাত্র, প্রস্তাব যে এই পথেই পরিণতি লাভ করিবে, ইহা নিতান্তই সুস্পষ্ট। মিঃ সুরাবর্দী তাঁহাদের পাকিস্থানী আকাঙ্ক্ষার অতি আগ্রহে 'স্বাধীন অখণ্ড বাঙলাই চাহিবেন, ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় না, কিন্তু বিভক্ত ভারতের পাকিস্থানী পাপ-অঙ্কে স্থানলাভ করিবার জন্য শরৎচন্দ্র, কিরণবাবু ও "অন্যান্য কংগ্রেস-নেতা"—উৎসাহ বোধ করিতেছেন কেন? এই পথে অখণ্ড ভারত দেখা দিবে, পাকিস্থান প্রতিরুদ্ধ হইবে—ইহা কেমন করিয়া শরৎচন্দ্রের মতো নেতাও আশা করিতে পারেন? মিঃ সুরাবর্দী কি পাকিস্থান দাবী ত্যাগ করিয়াছেন, অখণ্ড ভারতের আদর্শ মানিয়া লইয়াছেন, শরৎচন্দ্র এবং সুরাবর্দী যে এক ভারতীয় জাতি—ইহাই কি মিঃ সুরাবর্দী মানিয়া লইয়াছেন? বিভক্ত ভারতে স্বাধীন অখণ্ড বাঙলা অবাস্তব—অসম্ভব। এই অসম্ভব মায়া-মৃগের পশ্চাতে ধাবিত হইতে দেখিয়া প্রশ্ন উঠে—শরৎচন্দ্রেরও কি ধী-শক্তির অভাব ঘটিতেছে?

ভারতের সংকট

'ক্ষমতা হস্তান্তরে' আজও বিলম্ব আছে। কিন্তু ইতিমধ্যে মুসলিম লীগের ভারতব্যাপী অশান্তি উপদ্রব সৃষ্টির কার্যপদ্ধতি স্বীয় পথ অনুসরণ করিয়া চলিতেছে। বিরাম নাই। কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীশঙ্কর রাও দেও ভারতবাসীকে সাবধান করিয়া বলিতেছেন, মীমাংসার দ্বারা সমস্যার মীমাংসার আশা খুব কম। নিজেরাই যদি নিজেদের মীমাংসা না করিতে পারি—তাহা হইলে সমগ্র দেশকেই সংকটের সম্মুখীন হইতে হইবে। তিনি সর্দার বল্লভ-ভাইয়ের উক্তির উল্লেখ করিয়া বলেন, সর্দারজীর ন্যায় নেতাও প্রত্যেককেই নিজ নিজ রক্ষক হইবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। ইহার অর্থ এই যে, ভারত গবর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্যকেও বলিতে হইতেছে শান্তি-রক্ষার দায়িত্ব তাঁহাদের হইলেও, যেহেতু প্রয়োজনীয় কর্তৃত্ব নাই, এবং দেশের অশুভ শক্তি অশান্তি উপদ্রব সৃষ্টির জন্য বদ্ধপরিকর সেই হেতু তাহাদের সৃষ্ট অশান্তি উপদ্রব হইতে দেশবাসীকে রক্ষা করিতে পারিবেন, এই ভরসা তাঁহারা করেন না। তাই ভাবী সংকটকালে দেশবাসী নিজেরাই যেন নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া সংকটের সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত হন। ক্ষমতা হস্তান্তর যাহাতে শান্তিপূর্ণ পথে সুনির্বাহ হইতে পারে, সেইজন্য কংগ্রেস মুসলিম লীগকে এক বৈঠকে আমন্ত্রণ করেন। কিন্তু লীগনেতা উক্ত আমন্ত্রণ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াই চলিয়াছেন। মিঃ জিন্না জানেন যে, তাঁহার দাবী অসঙ্গত ও অযৌক্তিক, কোন মিলিত বৈঠকে উহার মীমাংসা হইবার নহে; তাই কংগ্রেসের সাদর আমন্ত্রণ উপেক্ষা করিয়া বৃটিশের হস্ত হইতেই তিনি তাঁহার দাবী পূরণ করাইয়া লইতে চাহেন। বৃটিশের প্রশ্রয় লাভ করিতে করিতে তাঁহার আশা এতই সীমা অতিক্রম করিতে অভ্যস্ত যে, আজ শুধু পাকিস্থান বা ভারত খণ্ডন নয়, এক সহস্র মাইল দীর্ঘ একটা "করিডরের" দাবীও মিঃ জিন্না উপস্থিত করিতে পারিতেছেন। ইহাই স্বাভাবিক। ভারত খণ্ডনের মতো অবাস্তব যুক্তিহীন দাবীই যদি বৃটিশের সস্নেহ প্রশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়া থাকে, তাহা হইলে করিডরের মতো অবাস্তব দাবী উপস্থিত করিতেই বা তাঁহার কুণ্ঠিত হইবার কারণ কি?

দেখা যাইতেছে, মীমাংসাও সম্ভব নয়, ক্ষমতা হস্তান্তরের মুখে সংকটও আসন্ন, কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের শান্তিরক্ষার শক্তিও প্রকৃত ক্ষমতার অভাবে পঙ্গু। এই অবস্থায় দেশবাসীর কর্তব্য আত্মরক্ষার জন্য সাহসের সহিত সংকটের সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত থাকা।

সৈন্যবাহিনীর বিভাগ

দিল্লীতে এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎকারকালে অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টের দেশরক্ষাসচিব সর্দার বলদেব সিং সম্প্রতি ভারতীয় বাহিনী সম্পর্কে বলেন:—ভারত বিভাগের অনিবার্য পরিণতিই হইবে সশস্ত্র বাহিনীর বিভাগ। ভারতকে খণ্ডিত করিয়া অখণ্ড ভারতীয় সেনাবাহিনী রক্ষার ব্যবস্থা হইবে মারাত্মক। এতদিন ধরিয়া ভারতীয় সৈন্যবাহিনী যে অসাম্প্রদায়িক প্রেরণা লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, ধর্মীয় ও সম্প্রদায় ভিত্তিতে ভারতকে বিভক্ত করার ফলে সৈন্যবাহিনীর সেই রূপই বদলাইয়া যাইবে। সেই অবস্থায় জোর করিয়া একটা তথাকথিত অখণ্ড সৈন্যবাহিনী রাখিবার চেষ্টা করিতে গেলে ফল অধিকতর বিষময় হইবে বলিয়া দেশরক্ষাসচিব মনে করেন। বৃটিশ রাজনীতিক মহলের কাহারও কাহারও অখণ্ড ভারতীয় বাহিনী রক্ষার বাসনা আছে। তাহা যে বৃটিশেরই স্বার্থে, তাহাতে সন্দেহ নাই। গোড়া কাটিয়া গাছের আগায় জল ঢালা যেমন অর্থহীন, তেমনি ভারত বিভাগ করিয়া অবিভক্ত সৈন্যবাহিনী রক্ষার চেষ্টাও তেমনি অর্থহীন। সর্দার বলদেব সিংহ বলেন—তাহার ফল হইবে মারাত্মক। সর্দারজী অখণ্ড ভারতের মতোই অখণ্ড সৈন্যবাহিনীরই পক্ষপাতী। তবে ঘটনাচক্রে, মিঃ জিন্নার অনমনীয় জেদের ফলে যদি ভারত বিভক্তই হয়,

তাহা হইলে সেই সংগে ভারতের সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীর বিভাগও অপরিহার্য হইবে। যেমন অপরিহার্য হইয়া উঠিবে—বাঙলা ও পাঞ্জাব বিভাগ। এতো সব বিভাগের ফলে মিঃ জিন্নার সাধের পাকিস্থানের যে পরিণাম সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে, তাহা হইতে ত্রাণ পাইবার জন্যই কি মিঃ জিন্না 'করিডরের' মতো অবাস্তব প্রস্তাব তুলিয়াছেন? বলদেব সিং মনে করেন, পাকিস্থান দাবী পরিত্যাগেরই ইহা চাল মাত্র।

শালবনী হাঙ্গামা

মেদিনীপুরের শালবনী থানার দাঙ্গা-হাঙ্গামার সংবাদ কিছুমাত্র অপ্রত্যাশিত নহে। কিছুকাল ধরিয়াই বহিরাগতদের উপদ্রবে পল্লীবাসীরা উত্যক্ত হইতেছিল। বিহার দুর্গতদের নাম করিয়া বাঙলায় যে সকল বহিরাগতদের বাঙলা গভর্নমেণ্ট পোষণ করিতেছেন, তাহারা যে অন্ন-বস্ত্রের কাঙাল নহে, আশ্রয় লাভ করিয়া তথা আশ্রয়কেন্দ্রকে নিজেদের কেল্লা মনে করিয়াই তাহারা যে স্থানীয় গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচার উপদ্রব চালাইতেছিল, তাহা গভর্নমেণ্টের না জানার কথা নহে। বর্তমান ঘটনা উহার পরিণতি। গ্রামবাসীদের বহুশত ঘর ভস্মীভূত করা হইয়াছে। পরিশেষে, কতক গ্রামবাসী উত্যক্ত হইয়া এবং মরিয়া হইয়াই বহিরাগতদের দুই একটি আশ্রয়-শিবিরে অগ্নি প্রদান করে। শালবনীর গৃহ, সম্পত্তি ও প্রাণহানির জন্য বাঙলা গভর্নমেণ্টকেই আমরা দায়ী করিতেছি। বিহার হইতে কতকগুলি লোক আনিয়া 'আশ্রয়প্রার্থীরূপে' বসানোর যে কোন প্রয়োজন নাই, শান্তিপূর্ণ অঞ্চলে অকারণ অশান্তি ডাকিয়া আনা যে সংগত নহে—ইহা পুনঃ পুনঃ বলা হইলেও, বাঙলার লীগ গভর্নমেণ্ট পাকিস্থানী প্রয়াসের অংগরূপেই আশ্রয়প্রার্থী আমদানী করিয়াছেন। এবারে শালবনী ও কেশপুর অঞ্চলে শান্তি স্থাপনের নামে স্থানীয় অধিবাসীদের উপর পুলিসী নিগ্রহ আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। লীগ গভর্নমেণ্টকে আমরা এখনও নিরস্ত হইতে বলি; তাঁহারা আর কালবিলম্ব না করিয়া বহিরাগতদের বিহারে পাঠাইয়া দিন—বাঙলার অর্থ, অন্ন বাঁচুক, পল্লীবাসী শান্তিতে থাকুক।

বাটপাড়ি?

গত ১২ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবারের আনন্দবাজার পত্রিকায় শ্রীশক্তিময়ী ঘোষের একখানা পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রখানা পাঠ করিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। পত্রলেখিকা জানাইতেছেন: গত আগস্ট হাঙ্গামার তাণ্ডবলীলার পরে তিনি তাঁহার ৩৯নং মীর্জাপুর স্ট্রীটের ত্রিতল ঘরে তালাচাবী দিয়া সাময়িক প্রয়োজনে কলিকাতার বাহিরে যান। পরে ঐ বাড়ি হইতে উক্ত মাল দুর্বৃত্তগণ কর্তৃক লুণ্ঠিত হওয়ার সংবাদ পাইয়া কলিকাতায় আসেন। এই অসহায় বিধবা, মুচিপাড়া থানায় বহুবার যাতায়াত করিয়া বহু কষ্টে যথাযত ডায়েরী করাইতে সক্ষম হন। কলিকাতার যাদুঘরে পুলিশ কর্তৃক উদ্ধারপ্রাপ্ত লুণ্ঠিত মাল রক্ষিত হইয়াছিল। গভর্নমেণ্ট লুণ্ঠিত দ্রব্যের একটি প্রদর্শনীও খুলিয়াছিলেন। সংবাদপত্রে তাহার ছবিও দেখিয়াছি। পুলিশ কর্তৃপক্ষ মাল সনাক্ত করিতে, প্রমাণাদি উপস্থিত করিতে দ্রব্যের প্রকৃত মালিকদের আহ্বান করেন। শ্রীমতী শক্তিময়ী ঘোষ যাদুঘরের প্রদর্শনীতে গিয়া তাঁহার অলঙ্কার ও অন্যান্য কয়েকটি দ্রব্য দেখেন এবং প্রমাণ ও চিহ্ন তথাকার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর দ্বারা লিপিবদ্ধ করাইয়া আসেন। মাস কয়েক মালগুলি পাইবার আশায় অপেক্ষা করিয়া পুনরায় থানায় খোঁজ করেন। থানার লোক পুলিশ কমিশনারকে জানাইতে বলেন। অতঃপর পত্র লেখিকা পুলিশ কমিশনারকে রেজিস্ট্রী করিয়া পত্র লেখেন। পত্রের উত্তর দূরের কথা—পত্র প্রাপ্তির রসিদও ভদ্রমহিলা পান না। পরে ফেব্রুয়ারী মাসে যাদুঘরে গিয়া দেখেন পূর্বের সনাক্ত জিনিসগুলি নাই। এই বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করা হইলে, বলা হয় ঐ সব জিনিস নিজ নিজ থানার এলাকায় পাঠানো হইয়াছে! থানায় গিয়া এ কথা জানাইলে থানার কর্মচারী জানাইলেন—যাদুঘরের মধ্যেই উক্ত জিনিসগুলি চুরি গিয়াছে! অসহায় বিধবা প্রশ্ন করিতেছেন: "ইংরেজ রাজত্বে বাঙালীর মন্ত্রিত্বে ও পুলিশের তদারকে কলিকাতা নগরীর প্রকাশ্য রাজপথের ত্রিতল বাটীর উপর হইতে দুর্বৃত্ত দ্বারা বিধবার মাল লুণ্ঠিত হইল। তাহার কিয়দংশ উদ্ধার ও সনাক্ত হইয়াও যদি তাহা বিলুপ্ত হয়, তবে মন্ত্রীরা ও পুলিশ বাহিনী কি করিতেছেন?" কি করিতেছেন; কে উত্তর দিবে? মন্ত্রিরা দলীয় স্বার্থ সাধনের কার্যে ব্যস্ত, স্বয়ং গভর্নর "নিয়মতান্ত্রিক" গবেষণায় কিংকর্তব্যবিমূঢ়—এই আবহাওয়ার মধ্যে পুলিশ যাহা করিবার তাহাই করিতেছে! যাদুঘরে সশস্ত্র প্রহরায় রক্ষিত মূল্যবান দ্রব্যাদি কোন্ যাদুমন্ত্রে উধাও হইয়া যায়—বাঙলার গভর্নর তাঁহার নিয়মতান্ত্রিক নিদ্রা ভংগ করিয়া একবার অনুসন্ধান করিবেন কি? এই বিধবা ভদ্রমহিলার মাল উদ্ধার করা হইল, মাল সনাক্তও হইল, কেবল পাইল না, যাহার মাল সেই মহিলা! ইহাকে চোরের উপর বাটপাড়ী ভিন্ন কি বলা যাইবে? প্রত্যক্ষ সংগ্রামের তাণ্ডবে শহরবাসীর কয়েক কোটি টাকার মাল লুণ্ঠিত হয়। লুণ্ঠনকারীরা বহু মাল কলিকাতার বাহিরে সরাইতে সক্ষম হইয়াছে, বহু মাল জলের দরে জাঁদরেল খলুদারদের কাছেও বিক্রয় করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ, কিছুটা মাল পুলিশ থানাতল্লাসী করিয়া উদ্ধার করে। মাল উদ্ধার করিয়া মালের প্রদর্শনী খোলা হয় ছবিও তোলা হয়—পুলিশের কৃতিত্ব জাহিরেরই জন্য। কিন্তু যাদুঘর হইতে মাল চুরি যায় কেমন করিয়া? বিধবার একটি ঘটনা জানা গেল। এমনি আরো কতজনের ভাগ্যে কি ঘটিয়াছে কে জানে? মালগুলি সব মালিকরা পাইয়াছে কি? কতজনে মাল পাইয়াছে, কত মাল সনাক্ত হয় নাই, কি পরিমাণ মাল "ঘাটতি" পড়িয়াছে অর্থাৎ উধাও হইয়াছে, তাহা গভর্নমেণ্ট জানাইবেন কি?

কি পরিমাণ অযোগ্যতা, অব্যবস্থা ও দুর্নীতি একটা গভর্নমেণ্টের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিলে এই অনাচার সম্ভব, তাহাই ভাবিয়া আমরা বিস্ময় বোধ করিতেছি।

শ্রীনন্দলাল বসু কর্তৃক অংকিত স্কেচ্

শ্রীগোলোকবিহারী দাসের সৌজন্যে
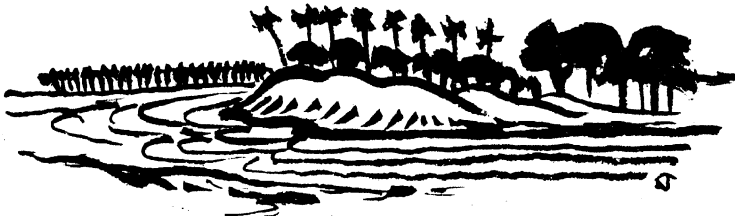
উইপিং উইলো

(Weeping Willow)

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

ঝঞ্ঝা যবে নেমে আসে প্রান্তরের সানুদেশে পশি'
হে বিষণ্ণা শোভনা রূপসী,
মেঘে নভ আঁধারিয়া ছড়াইয়া পড়ে কেশপাশ,
মুছে যায় ধরণীতে আলোকের মৃদুমন্দ হাস,
হাহাকারে বনভূমি বারম্বার জানায় মিনতি,
পর্বত শিখরে তরু অসহায়ে করে শুধু নতি'
তব শিরে, হে ক্রন্দসী নারী,
মেঘ ঢালে বারি।

অঝোর বর্ষণ সাথে ক্রন্দন উচ্ছ্বাস রণি' বাজে
বিলাপে মুখর ছন্দ মাঝে;
তোমার মর্মর ধ্বনি শূন্য মাঝে কোথায় হারায়,
সঘন কেশের রাশি কাঁদি কাঁদি লুটায় ধরায়,
পেলব পল্লব দেহ কাঁপি কাঁপি' পড়ে মুরছিয়া,
অশ্রান্ত মেঘের ডাকে থাকি' থাকি' চমকায় হিয়া;
ভাষা মৌন স্তব্ধতার ভারে
সান্দ্র অন্ধকারে।

ফেনিল যৌবন মত্তা উপলমুখরা চিত্ররেখা
লুকায়ে লয়েছে শেষ লেখা,
শস্য শীর্ষ শিহরিয়া তরঙ্গিয়া ওঠে সচঞ্চলে,
পর্বতের গম্ভীরতা মর্ম ব্যথা বলে বনতলে
আকাশ তারকা চক্ষু মুদি' ফেলে তোমার লাগিয়া,
অনন্ত বিরহ ফিরে তোমা মাঝে মুরতি মাগিয়া'
ধীরে ধীরে আসে সন্ধ্যাসতী
অতি ক্ষুণ্ণ মতি।

অম্বরের প্রান্ত ছিঁড়ি' মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ চমকে
অশ্রুভরা আঁখির পলকে,
মেঘের মাঝারে হারা আঁধার ঘনায় তোমা ঘেরি'
উতলা কলাপী থামে তোমার আকুল নতি হেরি'—
মেদুর দাদুরী ডাকে, ঝিল্লী রবে কাজল অমাতে
কদম্ব কেশর রাশি মোহ ভরে চলিছে ঘুমাতে;
অশান্ত পবনে সারারাতি
করে মাতামাতি।

থামিয়া গিয়াছে বৃষ্টি; বনান্তের বেণু কুঞ্জ মাঝে
নীরব প্রশান্ত স্বপ্ন রাজে।
নভে শুভ্র অভ্র মালা, দলে দলে চঞ্চল বলাকা
নীলিমা সায়র মথি' প্রসারিছে লঘু শ্বেত পাখা,
সুস্নিগ্ধ ধরণী তলে সুরভি উচ্ছ্বাস উঠে জাগি'
তরুণ অরুণ কর আসে দ্বারে আবাহন মাগি';
তুমি ঘন আনত কুন্তলা
কাঁদ অচঞ্চলা।

অমেয় বেদনা তব একনিষ্ঠা ব্যথিতা উইলো'
ক্ষণ তরে কেমনে বা ভুলো?
মর্মের মন্দির তলে লভিল যা অনন্ত জীবন,
নিভৃত অন্তর লোকে মানিলে যা প্রাণপ্রিয় ধন,
মুছাবে তাহার স্মৃতি ক্ষণিকের তুচ্ছ হাসি রাশি?
এমনি প্রয়াস কত অশ্রুধারে গিয়াছে যে ভাসি';
তব প্রাণ তাই চির মরু
হে ক্রন্দসী তরু!

সুর-সংগতি

সৌমিত্রশংকর দাশগুপ্ত

অতীতের বহু-বিচিত্র ধারা
নিয়ে এল মানুষকে বর্তমানের সাগর-সংগমে,
যেখানে উচ্ছ্বসিত জলকল্লোলে
মিশেছে প্রাণবিন্দুর কলতান।
অনেক তরংগ গান
বেজে উঠবে স্বচ্ছন্দ সম্পূর্ণতায়—গভীর সুষমায়—
অজস্র ধারার ঐকতানে;
অনেক দিনের মানুষের সুপ্রাচীন এই সাধনা।

আবেগ-মথিত বিক্ষুব্ধ সমুদ্র
কতবার পুঞ্জিত আক্ষেপের উদ্গীরণে
স্বপ্নসাধের অসংখ্য সৌধকে দিয়েছে বিদীর্ণ করে—
তার আবর্তিত আলোড়নে।
অধচারি দূষিত কামনা
ছড়িয়ে পড়েছে দিকে-দিগন্তে।
বেরিয়ে এসেছে সঞ্চিত ক্লেদ
অতলের গ্লানি-পংকিল আবর্জনায়
যা' ছিল আবরণের আড়ালে প্রচ্ছন্ন।

এমনি করে গুহা-গহ্বরের হিংস্র জীবেরা
নগ্ন আলোয় স্বরূপ প্রকাশ করেছে অতর্কিতে
বীভৎস কদর্যতায়।
তাদের মুখের কলঙ্ক দিবালোকের চেয়ে স্পষ্ট,
অম্লান হয়ে জয়-ঘোষণা করেছে
আপন অস্তিমে।
কত বিধান ভেঙ্গে চুরে গেছে
বিপুল প্রসার সমুদ্র-গর্ভে
উত্তাল আবর্ত সংঘাতে।

জানি কি বিচিত্র প্রস্তাব--
এই সমুদ্রকে শান্ত করা!
অনেক প্রাণের নদী মিলেছে যেখানে
আপন আপন গানে,
অযুত ষড়জ থেকে কোটি নিখাদে
সহস্র কোমল স্বর থেকে গভীর উচ্চ গ্রামে,
সেখানে সংগতি বিধান
যেন সপ্ত সুর-সমুদ্রকে শান্ত করা—
নিস্তরংগ বিস্ময়ের প্রশান্ত আবেগে!

বিচ্ছিন্ন সুরের প্রাধান্যে
সামঞ্জস্যের সার্থক রাগিণী
হতাশ হাওয়ায় চিরকাল গেছে হারিয়ে।
তবু যেন জল-তরংগে শুনি
বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের উদাত্ত গান—

নব-বিধানের বিচিত্র রাগ যেখানে ধ্বনিত
সুষমা আর সৌন্দর্যের দীপ্র উচ্ছ্বাসে।

আদি-অন্তহীন কালের উত্তপ্ত বিরহে
সুদূর আকাশে ঘনায় অশ্রুবাষ্পের মেঘ--
ঝরায় মেঘমল্লার আবেগ-সিক্ত আর্দ্র প্রাণে
অনেক সিন্ধু-বিহংগ সেই গানে
ভেসে আসছে উদয়-সমুদ্রের তীরে
মেলে সুর-সংগতির শুভ্র পাখা।
এই অনাদি বর্তমান
আর অনাগত ভবিষ্যের
উজ্জ্বল প্রণয়ের তারা অগ্রদূত।
সমুদ্র প্রবাহের অতল-স্পর্শী গভীরতায়
মিলনের গান তারা খুঁজে পেয়েছে,
নিয়ে চলেছে অসীম আকাশে
সুরের সপ্তলোকে।

দেশ-কালের বহু বিরোধী ধারায়
মানুষের প্রয়াস পাখা মেলেছে দিগন্তে।
জানি কঠিন দুঃখের অশেষ এ সাধনা।
তবু দুর্বার এ দায়
বিরোধী ধারায় সম্মিলিত দীপক সংগীত—
যেখানে নিকট ও দূর মিলেছে
গভীর ঐক্যের বন্ধনে,
গেঁথেছে পরিণয়ের নিবিড় গ্রন্থিতে
এক সূত্রে মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যতকে।

কৃষ্ণচূড়া

শ্রীবিভুরঞ্জন গুহ

ওলো পাগল কৃষ্ণচূড়া,
রংএ মাতাল আপন ভোলা মেয়ে
ফাল্গুনে যে তোর লাগি,
প্রতীক্ষায় ছিল পথ চেয়ে।
কলস্বনা তার বাঁশী,
ডেকেছিলো তোরে বারে বারে
মধু গন্ধে চাহিল ভুলাতে
সাড়া তবু দিলি নাতো তারে।
মোহনিয়া তার রূপে
পেলি তুই ছলের আভাস?
তাই নাহি দিলি ধরা
তারে নাহি করিলি বিশ্বাস?
গরবী লো, কৃষ্ণচূড়া
সর্বনাশা বৈশাখীর ডাকে,
জাগিলি কি শিহরিয়া
তাই ফুল ফোটে শাখে শাখে?

বৈশাখের মত্ত ঝোড়ো হাওয়া
ঝরাবে যে সব কটি দল
রিক্ত তোরে করিবে নিঃশেষে,
মানিবে না কোন আঁখি জল
তবু তুই হ'লি স্বয়ংবরা
মরণের গলে দিলি মালা
যে শুধু ভুলায় চোখে
সে সুলভে দিলি অবহেলা।
উজাড় করিয়া আপনারে,
দিলি সব রাখিলি না বাকি
রূপে রংএ সাজিলি গরবে,
সহিলি না এতটুকু ফাঁকি।
ন'স্ তুই বিলাসী চপলা
ন'স তুই কপটচারিণী,
বীর্যবতী তুই মহীয়সী,
তাই তোরে ধন্য বলে মানি।

পঞ্চম অধ্যায়

সপ্তাহখানেক আগে পাশের কয়েকটি গ্রাম ঘুরিয়া অসিত পরম উল্লসিত হইয়া উঠিল। উকিল মোক্তার, শিক্ষক, ছাত্র প্রত্যেক মহলে ইতিমধ্যেই অসম্ভব সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। দলে দলে লোক আসিয়া আন্দোলনে যোগ দিতে লাগিল। সেদিন তাহাদের গ্রামের ভোলানাথবাবু মহকুমা শহর হইতে আসিয়া বলিলেন—দিলাম ওকালতী ছেড়ে, অসিত। এখন থেকে দেশের কাজই করবো। অসিত তাঁহার পায়ের ধুলো মাথায় লইয়া বলিল—আপনারাই দেশের গৌরব দাদা—আমাকে পথ দেখিয়ে চালিয়ে নেবেন। এমনি করিয়া কিছু দিনের মধ্যে কয়েকখানি গ্রাম ও নিকটবর্তী মহকুমা শহর লইয়া গঠিত হইল "ব্রতী-সঙ্ঘ"। সঙ্ঘের উদ্দেশ্য হইল স্বদেশ সেবা—যতদিন বঙ্গভঙ্গ রহিত না হয় ততদিন বিলাতী দ্রব্য বর্জন করা, গ্রামে গ্রামে নৈশ বিদ্যালয় করিয়া অশিক্ষিত চাষী হিন্দু-মুসলমানকে শিক্ষিত করিয়া তোলা।

মাস দুই এমনি করিয়া কাটিয়া গেল। আজ ৩০শে আশ্বিন। আজ হইতেই বঙ্গভঙ্গ হইবে—তাই আজ দেশের পক্ষ হইতে রাখি-বন্ধন ও অরন্ধনের দিন স্থির হইয়াছে। কাল কতকগুলি সাদা সুতো অসিত গৈরিক রঙে রাঙাইয়া রাখিয়াছিল। ভোরের সময় মা ডাকিল, অসি, চাট্টি কিছু এখনই মুখে দে বাবা—সারাটা দিন খালি পেটে ঘুরলে অসুখ করবে যে।

অসিত হাসিয়া বলিল—আমি কি এখনও এতটুকু খোকা আছি মা যে একটা দিন না খেয়ে থাকতে পারবো না ?

আত্রেয়ী বলিলেন—এখনও তো অন্ধকার আছে বাবা। এখন খেলে তো দোষ হবে না।

অসিত পুনরায় হাসিয়া বলিল—হবে বই কি মা, এমনি সময় কি কোনদিন খেয়ে থাকি যে খাব ? আর কষ্ট করে উপবাস না করলে চিত্ত শুদ্ধিও তো হয় না মা—সে জন্যই না হয় একটা দিন কিছু নাই বা খেলাম।

মা আর কিছু বলিলেন না।

ফর্সা হইতেই অসিত সুতা পকেটে লইয়া বাহির হইয়া গেল। এই দুটো মাস ধরিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া সে বুঝিয়াছিল—দেশের মুষ্টিমেয় কয়জন শিক্ষিত ভদ্রলোক ছাড়া যে নগণ্য চাষা-ভূষা অশিক্ষিত জনসাধারণ—ইহাদের মধ্যে তো তারা মিশে নাই। তাহাদের সুখ দুঃখের খবর লইয়া এক হইয়া এক সাথে মিশিয়া তাহাদেরও তো নিজেদের মধ্যে টানিয়া আনিতে হইবে। তাহা না হইলে কোন আন্দোলনই যে সফল হইবে না। অথচ দেশের যাহারা বড় বড় নেতা—একথা এখন পর্যন্ত তাঁহাদের মুখ হইতে কেন বাহির হয় নাই ভাবিয়া অসিত আশ্চর্য হইয়া যাইত। তাই আজ অসিত ঠিক করিয়াছে—সে প্রথমে যাইবে জালালপুরের মিঞা সাহেবের বাড়ি। আবদুল গফুর মিঞা, শিক্ষিত লোক, ধনে, মানে এ অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে গণ্যমান্য। তাহার পর যাইবে মাধবপুরের নমঃশূদ্রপাড়ায়—রতন মণ্ডল, সাধু মণ্ডল এরা সব তার পরিচিত লোক। ইহাদের হাতে রাখি বাঁধিয়া তাহার পর সেখান হইতে তিন মাইল দূরে মহকুমা শহরটিতে বিকালবেলা যে সভার আয়োজন করা হইয়াছে—সেখানে গিয়া বক্তৃতা দিয়া রাত্রে বাড়ি ফিরিয়া আসিবে।

আবদুল গফুর মিঞা বাড়ি ছিলেন না। তাঁহার বড় ছেলে লতিফ মিঞা কয়েক বৎসর হইল ওকালতী পাশ করিয়া মহকুমা শহরে প্র্যাকটিস করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত অসিতের দেখা হইয়া গেল। তিনি চোখ পাকাইয়া মেজাজ দেখাইয়া বলিলেন—কিসের রাখি-বন্ধন ? ওসব আপনার জাতভাই হিন্দুদের কাছে নিয়ে যান—মুসলমানদের সঙ্গে আপনাদের হুজুগের কোন সম্বন্ধ নাই। অসিত অপ্রতিভ হইয়া প্রশ্ন করিল—কিন্তু দেশ কি একা হিন্দুদের—আপনাদের নয় ?

লতিফ মিঞা বলিলেন—কিসের দেশ আমাদের বলুন। যে দেশে নিজেদের মান নাই—সম্মান নাই—সে দেশ যাক আর থাক তাতে আমাদের কি? আপনারা টাকাওয়ালা শিক্ষিত, বড় বড় মাথাওয়ালা—এর পিছনে আপনাদের গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে কোন সুবিধা আদায়ের ফন্দি আছে কিনা তা কে জানে ? যদি এর থেকে কোন কিছু পাওয়া যায়—সে তো আপনারাই পাবেন। আমাদের কি—আমরা কেন আপনাদের সঙ্গে যোগ দিতে যাব ? অসিত কোন তর্ক না করিয়া পথে নামিয়া পড়িল। লেখাপড়া শিখিয়া লতিফ মিঞা এমন কথা কেমন করিয়া বলিলেন—অসিত ভাবিয়া পাইল না। ছোট একখানি মাঠের পরেই নমঃশূদ্রপাড়া। এই মাঠের ধারেই সাধু মণ্ডলের বাড়ি। অসিত সেখানে গিয়া যখন পৌঁছিল, তখন বেলা ১২টা বাজিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ সাধু মণ্ডল তাহার পায়ের ধুলো মাথায় লইয়া জিজ্ঞাসা করিল—দাদাঠাকুর কি মনে করে? অসিত ঘণ্টাখানেক ধরিয়া তাহাকে নিজেদের দেশের কথা, বিদেশী শাসকদের কথা— বঙ্গভঙ্গের কথা এবং সর্ব শেষে বিলাতী দ্রব্য বর্জনের কথা অনর্গল বলিয়া বলিয়া হঠাৎ এক সময় থামিয়া পড়িল, এতক্ষণে তাহার হুঁস হইল—শ্রোতা তাহার কথার এক বর্ণও বুঝিতে তো পারেই নাই—এমন কি তাহার কথা সে মন দিয়া শুনিতেছেও না। অসিতের বাক্যস্রোত বন্ধ হইতেই সাধু মণ্ডল হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল—আমার হালের গরু বাছুর সব যে কাল তোমাদের গাঁয়ের নিধু চক্কোত্তি দেনার দায়ে নিলাম করে নিয়ে গেছে দাদাঠাকুর। তার কি হবে? ছেলেটা কাল থেকে পথে পথে কেঁদে বেড়াচ্ছে—একটাবার বাড়ি আসেনি—এক মুঠো ভাত মুখে তোলেনি

অসিত আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কেন নিলেম করেছে—টাকা ধার করেছিলে—শোধ দেওনি বুঝি ?

—হাঁ বাবু, আট বছর আগে পঞ্চাশ টাকা কর্জ করেছিলাম, সুদে আসলে এই আট বছরে দুই শো টাকা দিলাম—তাতেও দেনা শোধ হলো না, এখনও পৌনে দুইশ টাকার দাবীতে নালিশ করে, নিলাম করে, আমার যথাসর্বস্ব নিয়ে গেল। এবার মাঠে ধান হয় নাই—কি করে যে সামনের বছরটা চলবে তা কে জানে, তারপর হালের গরু না হলে চাষ হবে কি দিয়ে ? এবার যে একেবারে ছেলেপেলে নিয়ে না খেয়ে মরবো, দাদাঠাকুর।

কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ সাধু মণ্ডল অসিতের দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—আজ তোমাদের সভা আছে বল্লে না, দাদাঠাকুর—আমার কথাটা একবার সেখানে তুলো—অনেক তো বড় বড় লোক আসবেন। হালের গরু দুটো না হ'লে যে আমি বাঁচবো না অসিত কোন প্রশ্নের কি জবাব দিবে কিছু ভাবিয়া পাইল না। ধীরে ধীরে পুনরায় মাঠে নামিয়া পড়িল। এই চাষা পাড়ার ভিতর দিয়া কিছু দূর গিয়া সহরে যাইবার পথে পড়িতে হয়। এদিকটায় অসিত বড় একটা আসে নাই—পথের দুই ধারে জীর্ণ খড়ের ঘরগুলি সব খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে। গত বর্ষায় ইহারই ভিতর দিয়া হয়তো অঝোরে বৃষ্টির ধারা ঘরের

মধ্যেই ঝরিয়া পড়িয়াছে। একখানিতেও এক-গাছি নূতন খড় দেওয়া হয় নাই। পথের ধারে দুই একটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে—যাহা অসিতের চোখে পড়িল—তাহার সবগুলিই রোগা—উলঙ্গ হইয়া, প্লীহা লিভারের স্ফীত উদর লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। রাস্তার ধারে মাঠের মধ্যে একটি বটগাছ ছিল। তাহার ছায়ায় আসিয়া অসিত বসিয়া পড়িল। তাহার সমস্ত উৎসাহ, সমস্ত উত্তেজনা যেন কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে। অসিত তাহার অলস দেহ লম্বা লম্বা ঘাসের উপর এলাইয়া দিয়া চোখ বুজিল। গৈরিক রঙে রঞ্জিত সূতাগুলি তাহার পকেটেই পড়িয়া আছে। এক গাছাও কাহারও হাতে বাঁধা হয় নাই। আজ বারে বারে তাহার মনের মধ্যে পাশাপাশি উঁকি মারিতে লাগিল—লতিফ মিঞা আর সাধু মণ্ডল। লতিফ মিঞা শিক্ষিত লোক—দেশের সহিত তাহার সংযোগ নাই—এই দেশটা যে নিজেদের একথাটা পর্যন্ত সে স্বীকার করিতে চাহে না। আর সাধু মণ্ডল—তাহার হালের গরু নাই, পেটে ভাত নাই, চালে খড় নাই এমনি পল্লীতে পল্লীতে যে শত সহস্র সাধু মণ্ডল অনাহারে, অর্ধাহারে শুকাইয়া মরিতেছে—তাহাদের কথা তো, তাহারা একবারও চিন্তা করে নাই। কলিকাতার কোন বড় নেতার মুখেও তো অসিত ইহাদের কথা একবারও উচ্চারণ করিতে শুনে নাই। অন্নহীনকে অন্ন না দিয়া, গৃহ-হীনকে গৃহ না দিয়া কেবল দেশ দেশ বলিয়া চীৎকার করিলে কি ফল হইবে? দেশের সত্যি-কারের কিছু করিতে হইলে ইহাদের সাথে করিয়া লওয়া চাই—ইহাদের সমস্ত দাবীকে বড় করিয়া দেখা চাই—তাহা না হইলে বঙ্গভঙ্গ হউক আর অখণ্ডই থাকুক, ফল তাহাতে কিছুই হইবে না। আজ অসিতের বক্তৃতা ভাল জমিল না। সভার শেষে যখন সে ঘরে ফিরিতেছিল তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। তাহার সংগী ছিল তাহাদেরই গ্রামের অন্য একটি কর্মী—নাম অক্ষয়। এখান হইতে সোজা মাইল তিনেক পথ অতিক্রম করিলে তবে তাহাদের বাড়ি। মিনিট দশেকের মধ্যে তাহারা লোকালয় ছাড়াইয়া একে-বারে মাঠের ভিতরে আসিয়া পড়িল। সম্মুখের সমস্তটাই একটি বিরাট প্রান্তর এবং এই প্রান্তরের দক্ষিণ দিকে যে সবুজ রেখা চক্রা-কারে বেড়িয়া আছে তাহারই একপাশে অসিত-দের গ্রাম এবং গ্রামের ঠিক পূর্ব দিক দিয়া চন্দনা নদী বহিয়া যাইতেছে। পূর্ণিমার কাছা-কাছি কি একটা তিথি—চন্দ্রালোকে ইতিমধ্যেই সমস্ত প্রান্তর দিবালোকের মতোই উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। বর্ষার জল এই দিন কয়েক হইল মাঠ হইতে নামিয়া গিয়াছে। ভিজা কাদা ও শেওলার সোঁদা সোঁদা গন্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। ক্ষেতভরা আমন ধানেরও ইতিমধ্যেই শিস্ বাহির হইতে আরম্ভ করিয়াছে। চন্দ্রালোক তাহার উপরে পড়িয়া চিকচিক করিতেছে। এই জ্যোৎস্না রাত্রে দূর আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিলে মন উদাসীন হইয়া কোথায় যেন উড়িয়া যাইতে চাহে। পৃথিবীর সমস্ত আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আকর্ষণ একেবারে তুচ্ছ করিয়া দেয়। কিন্তু অসিতের আজ মন ভাল ছিল না। তাহার উপরে সারাটা দিনের উপবাসে শরীর অবসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। তাই এ পর্যন্ত সে একটি কথাও কহে নাই—আপনার মনে চুপ করিয়া পথ চলিতেছিল। এমনি কিছুক্ষণ চলার পর অক্ষয় গুণ গুণ করিয়া গান ধরিল—বন্দে মাতরম্

সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং,
শস্য শ্যামলাং মাতরম্।

ক্রমে ক্রমে কখন যে অসিত অক্ষয়ের সহিত নিজের গলা মিলাইয়া দিয়াছে এবং দুইজনের স্বরের মূর্চ্ছনায় সমস্ত প্রান্তর একেবারে প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছে তাহা তাহারা কেহই বুঝিতেও পারে নাই। গান থামিলে অসিত ধরা গলায় বলিল—ভবানন্দ আর মহেন্দ্রও এমনি করে গান গেয়ে কেঁদেছিল, না অক্ষয়?

অক্ষয় বলিল—হাঁ, কিন্তু তুমিও তো কাঁদছিলে অসিত!

সলজ্জভাবে বলিল—সত্যিই চোখ দিয়ে আপনি জল বেরিয়ে আসে ভাই!

যিনি এই গান শুনিয়ে সন্তানদের একদিন কাঁদিয়েছিলেন—তিনি কি সত্যি সত্যিই অনুভব করেছিলেন যে, এই গানেই এমনি করে একদিন সারা বাঙলাদেশের আকাশ বাতাস ভরে যাবে?

অক্ষয় বলিল—কি জানি ভাই—হয় তো অনুভব করেছিলেন—হয় তো করেন নাই, কিন্তু মন্ত্র তাঁর সফল হয়েছে, তাঁরই মন্ত্রে সারা দেশ আজ জেগে উঠেছে।

অসিত আর কথা না কহিয়া একেবারে চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু তাহার সমস্ত অন্তরে তখনও গানের রেশ বাজিয়া বাজিয়া ফিরিতেছিল। এতক্ষণে আজিকার সারা দিনের গ্লানি তাঁহার মন হইতে একেবারে ধুইয়া মুছিয়া মিলাইয়া গেল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পরের দিন ভোর বেলায় বিছানায় শুইয়া অসিত গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতেছিলঃ—

"বাঙলার মাটী, বাঙলার জল
"বাঙলার বায়ু, বাঙলার ফল,
ধন হউক, ধন্য হউক—হে ভগবান্।"

আত্রেয়ী পাশের খাটে শুইয়া একমনে গান শুনিতেছিলেন। গান শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন—এ গান কার লেখারে অসি?

অসিত বলিল—রবীন্দ্রনাথের, মা! রবীন্দ্র-নাথ ঠাকুর—নাম শোনোনি, তুমি? মস্তবড় কবি তিনি খুব নাম হয়েছে যে তাঁর।

—সত্যি এমন সোজা সরল করে তো আর কেউ দেশের কথা বলেনি রে!

অসিত বলিল—এবার এমনি কত যে স্বদেশী গান বেরিয়েছে মা—তোমাকে আমি সব লিখে দেব।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া আত্রেয়ী বলিলেন—একটা কথা শুনবি, অসি?

মায়ের এই ভাবান্তর অসিতের চোখ এড়াইল না—সে উঠিয়া গিয়া দুই হাতে মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া প্রশ্ন করিল—কি হয়েছে মা? কেন অমন করছো বল তো?

আত্রেয়ী পুত্রকে বুকের ভিতরে টানিয়া লইয়া ধীরে ধীরে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিলেন—শ্রীচৈতন্য চরিত পড়েছিস অসি?

অসিত বলিল—ভাল করে তো পড়িনি মা—একটু আধটু কাগজপত্রে কোথাও হয়তো দেখে থাকবো।

মা বলিলেন—পড়িস্ বাবা, কলিযুগে এত বড় অবতার আর হয়নি! কিন্তু এত বড় যে অবতার তিনিও তো মায়ের দুঃখ বুঝেছিলেন, বাবা! আত্রেয়ীর দুই চোখ ভরিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল— কণ্ঠ গেল রুদ্ধ হইয়া। অসিত অবাক হইয়া গেল—মা হঠাৎ এমনি করিয়া কেন কাঁদিতেছেন—কোথায় তাঁহার বেদনা—অসিত তো কিছুই বুঝিতে পারিল না।

—কি হয়েছে মা, তুমি না খুলে বল্লে তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, তোমার অসি তোমার প্রাণে ব্যথা দিতে পারে, তাই কি তুমি বিশ্বাস কর মা?

আত্রেয়ী চোখের জল মুছিয়া বলিলেন—না, করিনে অসি—তোর গর্বে যে আমার বুক ভরে উঠে বাবা! কিন্তু আজ পাঁচটা বছর প্রতিটি দিন যে আমার কেমন করে কাটছে তাকি কোন দিন ভেবে দেখেছিস? সংসারে এমন একটি প্রাণী নেই যাকে নিয়ে আমার দিন কাটবে—একা একা এই শূন্য পুরীর মধ্যে আমার প্রাণ যে হাঁপিয়ে ওঠেরে।

অসিত বুঝিতেছিল না—ইহার প্রতিকার কি? কি জবাব দিবে তাহাও খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

মা পুনরায় বলিলেন—তুই এবার বিয়ে কর বাবা! না না হাসিসনে বাবা, মহাপ্রভু মার আজ্ঞায় দুই দুইবার বিয়ে করেছিলেন—জানিস্ তো? অসিত এবার একেবারে হাসিয়া উঠিয়া বলিল—বেশ মা, তোমার কথাই রাখবো—সেই যে ছোটবেলায় তুমি ছড়া বলতে—

"খোকন বাবুর বিয়ে—
ধুচনী মাথায় দিয়ে—
তেলা পোকা বেহারা হলো
পাল্কী কাঁধে নিয়ে—"

কিন্তু অসিত হাসি ঠাট্টায় ব্যাপারটি যত হাল্কা করিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিল—বস্তুত তাহার কিছুই হইল না—আত্রেয়ী তেমনি ভারাক্রান্ত মনে রুদ্ধস্বরে বলিলেন—তোর বউকে নিয়ে—ছেলেমেয়ে নিয়ে শেষের দিন কয়টা কোলাহল করে কাটিয়ে দেই বাবা—এই আমার একমাত্র বাসনা।

—কিন্তু তোমার কথায় তুমিই যে ঠকে গেলে মা; শ্রীচৈতন্যের একবারও তো বিয়ে করা উচিত হয় নি—বিয়ে করে স্ত্রীকে ত্যাগ করাও তো অপরাধ মা! আত্রেয়ী তাড়াতাড়ি অসিতের মুখে হাত চাপা দিয়া বলিলেন—ছি, ছি, বাবা, অমন কথা মুখে আনতে নাই—অন্যায় হয়—পাপ হয়। পরে যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাইয়া বলিলেন—ঠাকুর দেবতার কাজের বিচার কি বাইরে দেখে করা যায় অসি? বড় হলে যখন পড়বি সব—জানবি সব—তখন আর ওকথা মুখে আনতে পারবি নে—দেখিস্।

অসিত হাসিয়া বলিল—কিন্তু বড় তো হয়েছি মা!

আত্রেয়ী হাসিয়া উত্তর দিলেন—না, বড় এখনো হসনি বাবা, বড় হবার—জানবার এখনও যে অনেক বাকী আছে।

অসিত পুনরায় বলিল—কিন্তু তোমার ঠাকুর যে মা—

আত্রেয়ী পুনরায় তাঁহার মুখ বন্ধ করিয়া দিয়া বলিলেন—না, আর নয় অসি—আমার মাথা খাস্ বাবা। ঠাকুর দেবতার নামে ওসব বলতে যে অকল্যাণ হয়! তুই সর, আমি উঠি—বেলা হলো—বলিয়া তিনি শয্যাত্যাগ করিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেলেন।

মধ্যাহ্নে আহারান্তে অসিত বাহির হইয়া গিয়াছিল। আত্রেয়ী দেবী এতক্ষণ কল্যাণীর মা, কাত্যায়ণী দেবীর নিকটে বসিয়া কাঁথা সেলাই করিতেছিলেন; বেলা পড়িয়া আসিয়াছে—এমন সময় নিজের ঘরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই আত্রেয়ী পাশের জানালা দিয়া দেখিলেন, কল্যাণী যেন ঘরের ভিতরে দাঁড়াইয়া কি করিতেছে। কিছু না বলিয়া চুপি চুপি জানালার কাছে আসিয়া সতৃষ্ণনয়নে সেই দিকে তাকাইয়া রহিলেন। কল্যাণী অসিতের বইগুলি আঁচল দিয়া মুছিয়া সুন্দর করিয়া সাজাইয়া গোছাইয়া রাখিতেছে। আত্রেয়ীর দুই চোখ দিয়া স্নেহ ও মমতা যেন গলিয়া গলিয়া পড়িতেছিল—সমস্ত অন্তর ভরিয়া উঠিয়াছিল—এক অনির্বচনীয় পরিতৃপ্তিতে। হঠাৎ পিছন ফিরিতেই কল্যাণীর দৃষ্টির সহিত আত্রেয়ীর দৃষ্টি বিনিময় হইয়া গেল। কল্যাণী এক মুহূর্তে একেবারে লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল।

আত্রেয়ী ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া তাহার গায়ে-মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন—বাঃ দিব্যি সুন্দর করে তো সব গুছিয়ে রেখেছিস মা; এ তো তোদেরই কাজ। আমরা বুড়োমানুষ কি ওসব পারি মা! মা আমার সত্যিই কল্যাণী। কল্যাণী তেমনি ঠায় দাঁড়াইয়া রহিল, যেন কিসের লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল।

তারপর গন্ধতেল আনিয়া, আয়না চিরুণী আনিয়া আত্রেয়ী কল্যাণীর চুল বাঁধিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া অতি পরিপাটী করিয়া চুল বাঁধিয়া কাঁচ পোকার টিপ্ কপালে দিয়া বলিলেন—তোর সেই শান্তিপুরে কাল ডুরে শাড়ীখানা পরে আয় তো মা! কল্যাণী কাপড় ছাড়িয়া আসিলে—আত্রেয়ী মুগ্ধ নয়নে সেইদিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিলেন—তারপর কি জানি কেন তাহার হৃদয়ের অন্তস্তল কাঁপাইয়া একটি দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া সমস্ত অন্তর একেবারে হতাশ্বাসে ভরিয়া দিল।

সন্ধ্যার সময় অসিত বাড়ি আসিলে আত্রেয়ী দেবী তাহাকে বলিলেন—আমরা বড় বাড়ি কথকতা শুনতে যাচ্ছি অসি! রাতের রান্না বান্না যা কল্যাণীই করবে—তুই একটু তাকে দেখিস্ বাবা—ছেলে মানুষ একা একা ভয় না পায়। পরে কল্যাণীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—তোর রান্না হলে অসিকে খেতে দিস মা—আমাদের ফিরতে হয়তো রাত হবে। কাত্যায়নী দেবী নিকটেই দাঁড়াইয়াছিলেন—আত্রেয়ী তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—এসো দিদি! হঠাৎ কাত্যায়নী আর আত্রেয়ী দেবী এই উভয়ের দিকে যুগপৎ দৃষ্টি পড়িতেই অসিত দেখিতে পাইল- তাঁহাদের চোখে চোখে কি যেন এক দুষ্টামীর হাসি খেলিয়া গেল। অসিত একটা কথাও কহে নাই- এই প্রচ্ছন্ন হাসির ভিতরে সে এক মুহূর্তে কত কি যেন ভাবিয়া লইয়া লজ্জা ও সংকোচে ঘামিয়া উঠিল। অন্ধকার রাত্রি। দুইটি বাড়ির মধ্যে অন্য জনমানবের সাড়া নাই। অসিত নিজের ঘরে বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল—কল্যাণী একা একা রান্নাঘরে হয়তো ভয়ে সারা হইয়া যাইতেছে কিন্তু আজ তাহার নিকটে যাইতে পা যেন তাহার কিছুতেই সরিতেছিল না। সকাল বেলা কথার ছলনায় চোখের জলে মা তাহাকে যে কথা বলিতে চাহিয়াছেন—সন্ধ্যায় তিনিই হয়তো ষড়যন্ত্র করিয়া কল্যাণী ও তাহাকে এই অবস্থায় ফেলিয়া সরিয়া পড়িয়াছেন—কথকতা শুনিতে যাওয়াই হয়তো তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, ধীরে ধীরে অসিত রান্না ঘরের সম্মুখে আসিয়া যখন দাঁড়াইল— তখন কল্যাণী কড়াতে কি যেন একটা চাপাইয়া খুন্তি দিয়া খটাখট্ শব্দ করিতেছিল। অন্ধকারে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ঘরের ভিতরের শব্দ থামিলে অসিত কয়েকবার কাসিয়া শব্দ করিয়া কল্যাণীকে সেখান হইতেই প্রশ্ন করিল—কেমন, ভয়তো করছে না কল্যাণী? কল্যাণী ঘরের ভিতর হইতেই হাসিয়া জবাব দিল,—না ভয় করবে কেন—আমি কি এখনও ছেলে মানুষ আছি নাকি? কিছুক্ষণ চুপ্‌চাপ কাটিবার পর কি কাজে যেন কল্যাণী বাহিরে আসিয়া একেবারে অবাক হইয়া বলিল—ওমা, আপনি যে এখনও এই হিমের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন—অসুখ করবে যে? আমি মনে করেছি যে ঘরে গিয়ে বসেছেন বুঝি!

অসিত বলিল—তোমার ভয় করতে পারে তো?

কল্যাণী বলিল—বেশ বুদ্ধি, তাই বলে বুঝি অমনি করে হিমের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে? বারান্দায় উঠে বসুন—রান্না আমার হয়ে গেছে! বলিয়া বারান্দার উপরে একখানা আসন পাতিয়া দিয়া কল্যাণী থালায় করিয়া ভাত বাড়িতে বসিল।

—কিন্তু ভাত কি আমায় এখনই দিচ্ছ কল্যাণী?

—হাঁ, মিছে রাত করে লাভ কি?

—কিন্তু মা ফিরে আসলে হতো না?

—তাঁরা ফিরবেন সেই রাত দশটায়।

আহারে বসিয়া অসিত বারে বারে পথের দিকে তাকাইতেছিল—এখনই হয়তো মা আসিয়া পড়িবেন—সে আর লজ্জায় মাথা উঁচু করিয়া তাঁহাদের মুখের দিকে তাকাইতে পারিবে না। উনানের পাশে ছিল কল্যাণী বসিয়া—প্রজ্জ্বলিত আগুনের রশ্মি আসিয়া পড়িয়া তাহার মুখের উজ্জ্বল গৌরবর্ণ এক অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল—কপালের টিপটি উঠিয়াছিল জ্বল জ্বল করিয়া। অসিতের সেই দিকে দৃষ্টি পড়িতেই তাহার দুই চোখ যেন এতদিন পরে আজ কোন্ এক নূতন রূপ আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। কতক্ষণ এমনি অপলক দৃষ্টিতে সেদিকে তাকাইয়াছিল—তাহার খেয়াল নাই—কল্যাণী মাটীর দিকে চোখ্ করিয়া বসিয়াছিল হঠাৎ অসিতের দিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠিল—একি আপনি যে কিছুই খাচ্ছেন না? অসিতের এতক্ষণে খেয়াল হইল—তাড়াতাড়ি দুই চোখ নামাইয়া লইয়া হাতের সম্মুখে যাহা পাইল তাহাই নির্বিচারে মুখে তুলিয়া দিতে লাগিল। খানিক পরে হঠাৎ যেন কি ভাবিয়া সে প্রশ্ন করিয়া বসিল—আচ্ছা তোমার লজ্জা করে না কল্যাণী?

কল্যাণী কতকটা আশ্চর্য হইয়া বলিল—কেন?

অসিত কয়েকবার ইতস্তত করিয়া বলিল—এই যে আমরা দুটি প্রাণী এমন নির্জ্জনে বসে আছি। হঠাৎ কেউ দেখলে ভাববে আমাদের ভিতরে হয়তো কোন নিকট সম্বন্ধ আছে।

কল্যাণী লজ্জায় মুখ নীচু করিয়া বলিল—যান্, আপনি দিন দিন ভারী ইয়ে হচ্ছেন। কিন্তু অসিত থামিল না পুনরায় মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল—মা-দের এ ভারী অন্যায়, আমাদের কি এমনি একা একা ফেলে যাওয়া

উচিত? কল্যাণী কোন কথা না কহিয়া একবার ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়াই লজ্জায় মুখ নীচু করিয়া রহিল।

এমন সময়ে বাহিরে আত্রেয়ীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল—অসিত তাড়াতাড়ি আহার হইতে উঠিয়া মুখ ধুইতে বাহির হইয়া গেল।

সপ্তম অধ্যায়

তাহারা যেমন করিয়া আঁক কসিয়া আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিল—কিন্তু কার্যত 'দেখা গেল তাহা হইল না। তাই মাস তিন চার ধরিয়া বিলাতী নুন আর কাপড়ের দোকানে পিকেটিং চালাইবার পরও দেখা গেল—অসিতদের মহকুমা শহরটিতে ঐ দ্রব্য দুইটি তখন বেশ চলিতেছিল। বিরিঞ্চি সাহা আর অধর পোদ্দার এই দুইজনে খুব বড় মহাজন। তাহারা কাহারও কথা না শুনিয়া অনবরত বিলাতী মালের চালান আনিয়াই চলিয়াছিল। এই কয়টা মাস ধরিয়া ছোট বড় নির্বিশেষে দারিদ্দার মারেরই হাতে পায়ে ধরিয়া শূকর আর গরুর হাড়ের দোহাই দিয়া স্বদেশহিতের বুলি আওড়াইয়া এমন কি কিছুটা জোর জবরদস্তি করিয়াও তাহারা বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিল না। এমন কি কয়েকদিন আগে বিরিঞ্চি সাহা একদিন চরপাড়ার মুসলমান লাঠিয়াল আনিয়া তাহাদের গায়ে হাত পর্যন্ত তুলিয়াছিল। তাই এতদিনে এদিকেরও সহ্যের সীমা গেল শেষ হইয়া। হঠাৎ একদিন ভোর হইতেই দেখা গেল মফঃস্বল হইতে দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক আসিয়া শহরটিতে জমা হইতেছে। ক্রমে বেলাও বাড়িল—জনতাও বাড়িল। তারপর সমগ্র জনতা বিরিঞ্চি সাহা আর অধর পোদ্দারের দোকান একেবারে নিমেষে লুট করিয়া। বিলাতী লবণ রাস্তায় রাস্তায় ধুলার সঙ্গে মিশিয়া গেল। বিলাতী কাপড় স্থানে স্থানে স্তূপীকৃত হইয়া পুড়িতে লাগিল। মহকুমা হাকিম পূর্ব হইতেই ইহার আভাস পাইয়াছিলেন। কিন্তু জেলার শহর হইতে সশস্ত্র পুলিস বাহিনী আসিয়া পৌঁছিবার পূর্বেই জনতা সমস্ত কাজ সম্পন্ন করিয়া যে যেদিকে পারিল ভাগিয়া পড়িল। শান্তি রক্ষা হইল না—গভর্নমেণ্টের মর্যাদায় ঘা লাগিল; তখন কোপ গিয়া পড়িল—ইহারই মূলে থাকিয়া যাঁহারা মন্ত্রণা যোগাইতেছিলেন—তাঁহাদের উপর। সঙ্গে সঙ্গে দুইজন উকিল, একজন মোক্তার, একজন ডাক্তার ও অসিত এই পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হইল এবং সঙ্গে সঙ্গেই মহকুমা হাকিমের কোর্টে তাঁহাদের বিচার হইয়া প্রত্যেকের ছয় মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইল এবং আর কাল বিলম্ব করা যুক্তিসঙ্গত নয় বিবেচনা করিয়া তখনই তাঁহাদিগকে ডিস্ট্রিক্ট জেলে প্রেরণ করার আয়োজন হইল। এদিকে এই খবর মন্ত্রবলে যেন গেল চারিদিকে প্রচারিত হইয়া। ফলে যে জনতা ফিরিয়া যাইতেছিল—তাহারা আবার ঘুরিয়া দাঁড়াইল। অসিতদের যখন কোর্ট হইতে বাহির করা হইল, তখন সমগ্র মাঠ, পথ ঘাট একেবারে লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে। মুহুর্মুহু বন্দে মাতরম্ আর জয় ধ্বনিতে সারা আকাশ বাতাস একেবারে ভরিয়া গেল—ফুলের মালায় মালায় অসিতদের মুখ চোখ গেল ঢাকিয়া। অক্ষয় নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল। অসিত তাহার দিকে ফিরিতেই সে তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল।

অসিত বলিল—মাকে সকল কথা বলিস্ ভাই, বলিস্ অসিত তাঁর ভাল কাজেই দুঃখ বরণ করছে—ভাল কাজের পুরস্কার একদিন ভগবান নিশ্চয়ই আমাদের দেবেন—এই বিশ্বাস যেন তিনি মনে রাখেন। ছয় মাস পরে ফিরে এসে আমি আবার তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় নেব, তখন তাঁর কোন কথার আর অবাধ্য হবো না।

যখন তাহাদের ট্রেনে আনিয়া তোলা হইল—চারিদিকে তখন শুধু নরমুণ্ড ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। এই বিশাল জনসমুদ্রের দিকে তাকাইয়া এক মুহূর্তে অসিতের বুকখানা যেন একেবারে দশ হাত হইয়া ফুলিয়া উঠিল। এক মুহূর্তে নিজের কথা—আত্মীয় পরিজনের কথা—ইহার লাভ লোকসানের কথা সমস্ত ভুলিয়া গেল—এক অভূতপূর্ব আনন্দে ও উত্তেজনায় তাহার চিত্ত উঠিল ভরিয়া। সারা দেহ থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ভাবিল—কে বলে দেশ জাগে নাই—কে বলে জনসাধারণ তাহাদের কথা শুনে নাই? এই যে অগণিত তাহার স্বদেশবাসী, ইহারা কোন্ উন্মাদনায় এমন করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে? আজ এই উন্মাদনার মুখে ভয় বলিয়া অসিতের কিছু অবশিষ্ট রহিল না—দরকার হইলে আজ সে নিজের যথাসর্বস্ব এমন কি আপন জীবন পর্যন্ত একটা অতি তুচ্ছ বস্তুর মতো বিলাইয়া দিতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করিবে না। বাঁশী বাজাইয়া গাড়ি অতি ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিল। অসিত যুক্তকরে সমগ্র জনতার প্রতি তাহার শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করিল; অমনি হাজার কণ্ঠে পুনরায় জয়ধ্বনি আর বন্দে মাতরম্ ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

অষ্টম অধ্যায়

দ্বিপ্রহরে আত্রেয়ী দেবী পুত্রের জন্য রান্না করিয়া তাহারই অপেক্ষায় পথ চাহিয়া বসিয়াছিলেন। বেলা পড়িয়া আসিল কিন্তু ফিরিল না দেখিয়া তিনি বারে বারে ঘর বাহির করিতেছিলেন। আজ কেন যেন তাঁহার মন ভাল ছিল না—বারে বারে কেবলই শূন্য হৃদয় হু হু করিয়া উঠিতেছিল—অথচ ইহার কোন সঙ্গত কারণ তিনি খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। কল্যাণী আজ অনেকক্ষণ এ-বাড়িতে আসে নাই—হয়তো নিজেদের বাড়িতে রান্নাবান্না করিতেছিল, ভাবিলেন—তাহাকে ডাকিয়া কাছে বসাইয়া দুদণ্ড গল্প করিবেন। এমনি সময় হঠাৎ অক্ষয় ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল—জ্যাঠাইমা, অসিতকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে!

—ধরে নিয়ে গেছে?

—হাঁ জ্যাঠাইমা! আত্রেয়ী দেবীর মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির হইল না—ধীরে ধীরে সেখানেই চুপ করিয়া মাটির উপরে বসিয়া পড়িলেন। তারপর অক্ষয়, একে একে সকল কথা খুলিয়া বলিল—সেই বিপুল জনতার কথা—সেই জয়ধ্বনির কথা—অসিত মাকে যাহা বলিতে বলিয়াছিল—সে সমস্ত কথা। কিন্তু এত কথার একটি শব্দও বোধ করি তাঁহার কানে গেল না। নিতান্ত বিহ্বলের মতো সেখানেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। সমস্ত কথা শেষ করিয়া নানা প্রকার ভরসা দিয়া অবশেষে অক্ষয় চলিয়া গেল। আত্রেয়ীর সম্মুখে সমস্ত বিশ্ব সংসার যেন ঘুরিতেছিল কি হইয়াছে না হইয়াছে ইহার কিছুই যেন তিনি সুস্পষ্ট ধারণা করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। অক্ষয় যাইবার সময় পাশের বাড়িতেও খবরটি দিয়া গিয়াছিল। এমনি কতক্ষণ কাটিবার পর কল্যাণী আসিয়া ধীরে ধীরে তাঁহাকে সেখান হইতে তুলিয়া বিছানায় লইয়া গিয়া শোয়াইয়া দিল। শুইয়া শুইয়া অবিরলধারে দুই চোখের জলে আত্রেয়ী দেবী ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন কিন্তু মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইতেছিল না। কল্যাণী শিয়রে বসিয়া নীরবে ধীরে ধীরে তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিল। সম্মুখের খোলা জানালা দিয়া দিগন্তের কোণে শ্যাম বনচ্ছায়া দেখা যাইতেছিল। বেলা পড়িয়া আসিয়াছে—সেই দূর-বিস্তারী মাঠের শেষে শ্যামরেখার কোণে কোণে ক্রমে আঁধার নামিয়া আসিতে লাগিল। এমনি করিয়া সমস্ত মাঠঘাট কল্যাণীর দৃষ্টির সম্মুখে গভীর অন্ধকারে ডুবিয়া গেল। সে উঠিয়া গৃহে ও তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া তুলসী বেদীর উপরে গলায় আঁচল জড়াইয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। যখন মাথা তুলিল তখন তাহার চোখের দুই পাশ বহিয়া টপ্ টপ্ করিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে।

দ্বিপ্রহরের অন্নব্যঞ্জন সমস্ত কাকে ছড়াইয়া নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। কাত্যায়নী দেবী পুনরায় সমস্ত ধুইয়া মুছিয়া রান্নার যোগাড় করিতেছিলেন। রান্না শেষ করিয়া অনেক করিয়া বলিয়া কহিয়া তবে আত্রেয়ী দেবীকে লইয়া আসনে বসাইলেন। কিন্তু তিনি কয়েক গ্রাস মুখে তুলিয়াই একেবারে হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—আমি কেমন করে

মুখে ভাত দেব দিদি—আমার অসি হয়তো সারাটা দিনের মধ্যে একটা অন্নও মুখে তোলে নি। বলিয়াই গ্লাসের জল পাতের উপর ঢালিয়া দিয়া সরিয়া বসিলেন। অক্ষয় পুনরায় সন্ধ্যার পরে আসিয়া বাহিরের ঘরের দাওয়ার উপরে বসিয়াছিল। তাড়াতাড়ি হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিল—আপনি বলছেন কি জ্যেঠাইমা, আমরা যে তাকে ভাল করে লুচি-পুরি খাইয়ে দিয়েছি—বেলা দুটোর মধ্যে—জেলে গিয়ে ভাত খাবে। কিন্তু শান্ত হওয়া দূরে থাকুক, পুনরায় জেলের নামে তিনি হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—অসি আমার আজ জেলের ভাত খাবে অক্ষয়! আমি যে কোনদিন নিজের হাতে, কত যত্ন করে খাইয়েও তাকে তৃপ্তি পাইনি! জেলে কি মানুষ থাকে—সেখানে যে চোর ডাকাত যত সব বদ্ লোকের আড্ডা! আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি অক্ষয়, অসি আমার সেখানে গিয়ে—একেবারে অকূলে পড়েছে—মন ভরে কেঁদে মরছে।

অক্ষয় পুনরায় কহিল—কিন্তু মোটে তো ছয়টা মাস জ্যেঠাইমা—দেখতে দেখতে চলে যাবে।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—ছয়টি মাস—আমার কাছে যে কত যুগ, তা তোকে কেমন করে বোঝাব! এর প্রত্যেকটি মুহূর্ত যে আমাকে গুণে গুণে কাটাতে হবে বাবা!

পরের দিন সকাল বেলা আত্রেয়ী ঘুম হইতে উঠিয়া নিজের বিছানার উপরেই চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। বেলা তখন অনেক হইয়া গিয়াছে। বাহিরের কাজকর্ম সারিয়া কল্যাণী ঘরে আসিয়া ঢুকিল। ধীরে ধীরে আত্রেয়ীর পাশে বসিয়া পড়িয়া বলিল—এমনি করে তোমাকে ভেঙে পড়লে তো চলবে না কাকীমা!

সস্নেহে কল্যাণীর মস্তকটি নিজের বুকের ভিতরে টানিয়া লইয়া বলিতে লাগিলেন—আমি একা তার সাথে পেরে উঠবো না—সে ভয় আমার ছিল, তাই তোকে এমনি করে নিজের হাতে তারই যোগ্য করে গড়ে তুলেছিলাম মা, কিন্তু আজ দেখছি, তুইও হেরে গেলি। তোর এই যে রূপ, এই যে গুণ—ভালবাসা, এ একটিবারও সে ফিরে দেখলো না। না না লজ্জা কি মা—ভাল যদি সত্য সত্য বেসে থাকিস—তার চেয়ে বড় জিনিস আর কি আছে মা জগতে!

কল্যাণী হয়তো বা কথার স্রোত ঘুরাইয়া দিবার জন্যই বলিল—কিন্তু ছয়টা মাস তো, সত্যিই এমন কিছু বেশী সময় নয় কাকীমা! আত্রেয়ী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—তুই দেখছিস শুধু ছয়টি মাস, কিন্তু আমি যে তার চেয়েও অনেক দূর দেখতে পাচ্ছি মা! অসি আমার জেদী ছেলে, খেয়ালী ছেলে। আমি আজ স্পষ্ট দেখছি—ও ঝাঁপ দিয়েছে দুঃখের সাগরে মানিক তুলবে বলে। এযে অতল সাগর মা—মানিকের আশা আমি করিনে—কিন্তু অসি আমার ফিরে আসবে তো? পুনরায় তাঁহার দুই চোখ দিয়া টপ টপ করিয়া জল গড়াইতে আরম্ভ করিল। দেয়ালে একখানা বহু পুরাতন ফটো টাঙানো ছিল, হঠাৎ সেই দিকে দুই হাত যুক্ত করিয়া বলিয়া উঠিলেন—বাবা, তোমার বাসনা পূর্ণ হয়েছে—মা হয়ে আমি সন্তান-ঘাতিনী হয়েছি! কল্যাণী কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অবাক বিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। পরে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন—এ আমারই কর্মফল মা, দোষ আমি কাউকে দেব না মা, অসিতেরও নয়। সে হয়তো ঠিকই করেছে! সেদিন সে আমার মুখের দিকে চেয়ে বলেছিল—অন্যায়কে ন্যায় বলে মানবার, অত্যাচারকে নতমস্তকে স্বীকার করে নেবার শিক্ষা তো তোমার অসিকে কখনও দাও নি মা—আজ কথা ফেরালে চলবে কেন? আর দুঃখ! ভীরুর মতো দুঃখকে বারে বারে পাশ কাটিয়ে গেলেই দুঃখ এড়ান যায় না মা—তার সম্মুখীন হতে হয়, বীরের মতো বুক পেতে দাঁড়াতে হয়। পরে পুনরায় কল্যাণীকে বুকের মধ্যে জোর করিয়া চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—কিন্তু মা, যদি তাকে ফিরে পাই—তাহলে তোর পুণ্যেই পাব—তুই তো কোনদিন কোন পাপ করিস নি। যা অনেকে পারে না—আমি জানি, সেই ভালবাসাকে তুই নিজের অন্তরে অন্তরে জেনেছিস— ভাল বেসেছিস। এর যে পুরস্কার—তা স্বয়ং ভগবানও আটকে রাখতে পারে না মা।

খবর পাইয়া কয়েক দিনের মধ্যে কলিকাতা হইতে অমিয় বাড়ি আসিল। ইচ্ছা ছিল মাকে কলিকাতার বাসায় লইয়া যাইবে। কিন্তু অনেক সাধ্যসাধনা করিয়াও যখন তাঁহাকে রাজি করাইতে পারিল না—তখন অভিমান করিয়া কহিল—আমি তোমার অধম ছেলে—তা বলে অভিমান আমি করিনে, কিন্তু আজ যে এমনি অবস্থায় তোমাকে একটু সেবা করবো—সে অধিকারটুকুও কি আমায় দেবে না?

আত্রেয়ী চোখের জল ফেলিয়া বলিলেন—অভিমান করিস নে বাবা—এ সময় আমি বাড়ি ছেড়ে কোথাও গেলে বাঁচবো না, তার আশায় যে আমাকে এখানেই বসে থাকতে হবে!

—তাহলে খোকাদের এখানে রেখে যাই মা!

—না বাবা, তাতেও কাজ নেই—এ পাড়াগাঁয়ে সে কলকাতার মেয়ে এসে কি বিপদেই না পড়বে বলতো! তাছাড়া ঐ কচি ছেলের দায়িত্ব নেবার সাহস আর আমার নেই।

অগত্যা ক্ষুণ্ণমনে অমিয় কলিকাতায় ফিরিয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

মুক্তি

শান্তি দেবী

মুক্তির অমৃত স্বাদ পরিপূর্ণ প্রাণে
লীলায়িত ছন্দরসে রূপ গন্ধ গানে
নিদাঘের স্তব্ধ বুকে তৃষিতের ছলে
বরষার প্রভাতের বিরহের জলে—
শরতের অপরূপ জ্যোৎস্না গগনে
হেমন্তের হিম-ক্লিষ্ট মন্দ্র গুঞ্জরণে
শীতের নির্মল শান্ত বৈরাগীর বেশে
বসন্তের মায়া-গানে আমার উদ্দেশে
তুমিই গাহিলে প্রিয় মুগ্ধ নব সুরে
সেই সত্য, নিত্য করি মিথ্যা করি দূরে
আমার বুকের বাঁশি—চরণের তালে
বুকের মঞ্জরী দলে তব ইন্দ্রজালে
বাজাল, ফোটাল তারা নব মহিমায়
দোলাতে অনন্ত ছন্দ স্বপনের ভেলায়॥

(৫)

গোষ্ঠীগত খাঁটি আদিবাসী, ধর্মান্তরিত খৃষ্টান আদিবাসী, শিক্ষিত আধুনিক ভারতবাসী, খৃষ্টান মিশনারী এবং বৃটিশ গভর্নমেণ্ট—বিংশ শতাব্দীর ঘটনার পরিণামে এঁদের সকলকে একটা সম্পর্কের মধ্যে আসতে হয়েছে। এই সম্পর্ক কিন্তু সুস্থির হয়ে উঠতে পারেনি। প্রত্যেকের লক্ষ্য, রুচি এবং আদর্শের রূপ ক্রিয়া ও পন্থা ভিন্ন। পরস্পরের দ্বন্দ্বে ও প্রতিযোগিতায় এই সম্পর্ক একটা ঐতিহাসিক পরীক্ষার ভেতর ভেঙে-গড়ে নতুন করে তৈরি হয়ে উঠছে। এর মধ্যে কে কতখানি ভুল করছে এবং কে কতখানি নির্ভুল, তার মীমাংসা এখনো হয়নি। ভবিষ্যৎই বলতে পারবে। সমস্যাটার উদাহরণ হিসাবেই একটি কাহিনী এই প্রসঙ্গে বিবৃত হলো ঃ

"একটি বিরসাপন্থী যুবকের কাহিনীঃ

আমাদের ক্লাসটা ছিল একটি এথ্‌নোলজির ল্যাবরেটরীর মত। এমন বিচিত্র মানবতার নমুনা আর কোন স্কুলের কোন ক্লাসে আছে কিনা, জানি না। তিনটি রাজার ছেলে ছিল আমাদের ক্লাসে। একজন জংলী রাজার ছেলে, কুচকুচে কালো চেহারা। আর দুজন ছিল সত্যিকারের ক্ষত্রিয়াত্মজ—সুগৌর গায়ের রঙ, পাগড়িতে সাচ্চা মোতির ঝালর ঝুলতো। তাছাড়া ছিল—সিরিল টিগ্‌গা, ইম্যানুয়েল খালখো, জন বেসরা, রিচার্ড টুডু আর স্টীফান হোরো এবং আরো অনেক। এত সাঁওতাল ওরাও' আর মুণ্ডা সন্তানের সমাবেশের মাঝখানে তবু আমরা ক'জন ইণ্টার ক্লাস পরিবারের বাঙালী ও বেহারী ছেলে শুধু বুদ্ধির জোরে সর্ব-কর্মের মোড়লীর গৌরব অধিকার করে বসে-ছিলাম। রাজার ছেলেগুলোকে আমরা বলতাম সোনা ব্যাঙ, আর মুণ্ডা ওরাও'দের বলতাম কোলা ব্যাঙ্। ওদের কাউকে আমরা কোনদিন গ্রাহ্যের মধ্যে আনতাম না। রাজার ছেলেগুলি অবশ্য আমাদের সঙ্গে কথা বলতো না। অপর-পক্ষে টিগ্‌গা, খালখো, বেসরা, টুডু—ওরা আমাদের সঙ্গে দুটো কথা বলতে পারলে ধন্য হয়ে যেতো। টিফিনের সময় একটা আনি নিয়ে টুডুকে দিতাম। বলতাম—টুডু চট্ করে এক-দৌড়ে এই এক আনার ঝালবাদাম নিয়ে এসতো। গঙ্গা সাহুর দোকান থেকে আনবে।

স্কুল থেকে গঙ্গা সাহুর দোকান দেড় মাইল হবে। কৃতার্থভাবে আনিটা হাতে তুলে নিয়ে টুডু সেই প্রচণ্ড রোদে-ঝলসানো মাঠের ওপর দিয়ে পোড়া হরিণের মত উদ্দামবেগে দৌড়ে চলে যেতো গঙ্গা সাহুর দোকানে। ফিরে এসে ঝালবাদামের ঠোঙাটা আমাদের হাতে সঁপে দিয়ে নিজে দূরে সরে যেত। আমরা বলতাম—কী আশ্চর্য টুডু, এতটা পথ দৌড়ে এলে তবু তুমি একটুও হাঁপাচ্ছো না!

আর্যসুলভ এই ফাঁকা কথার কারসাজিটাকে আন্তরিক অভিনন্দন মনে করেই টুডু দূরে দাঁড়িয়ে গর্বভরে হাসতো! আমরা চোখ টিপে লক্ষ্য করতাম— টুডু কেমন জোর করে তার পরিশ্রান্ত শ্বাসবায়ুটাকে ঢোক গিলে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। তাকে ঝালবাদামের একটু শেয়ার দিতে আমরা বোধ হয় ইচ্ছে করেই ভুলে যেতাম। দিতে গেলেও টুডু নিত না।

আমরা দেখতাম, একটু দূরে দাঁড়িয়ে সুতীব্র একটা দৃষ্টি দিয়ে স্টীফান হোরো আমাদের হাবভাব লক্ষ্য করছে। আমরা ঘাবড়ে যেতাম। স্টীফান যেন তীর মেরে আমাদের বুকের ভেতরের ধূর্ত রসিকতার ফুসফুসটাকে চেখে দেখছে। সব বুঝে ফেলতে পারছে। কিন্তু সবার মধ্যে একমাত্র স্টীফানই পারে, আর কেউ নয়?

টুডু, খালখো, টিগ্‌গা, বেসরা সকলেই কতকটা এই রকমেরই বাধ্য বেকুব বিশ্বাসী আর নিরীহ ছিল। আমরা মনে মনে হাসতাম। —হায়রে, রাঁচীর জঙ্গলের যত কোল, যত সব কোলা ব্যাঙ!

ওদের মধ্যে ঐ একটিমাত্র কাস কেউটে ছিল স্টীফান হোরো। বড় উদ্ধত ছিল স্টীফানের স্বভাবটা। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, হোরোর কাছে আমাদের আভিজাত্য চুপে চুপে হার মেনে নিত। ওর সঙ্গে সদ্ভাব রাখার জন্য মাঝে মাঝে যেচে ওর সঙ্গে কথা বলতে হয়েছে। আরও লজ্জার বিষয়, স্টীফান এক-এক সময় আমাদের প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে অন্যমনস্কভাবে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিত। ঐ মাথাঠাসা মোটা মোটা চুলের ঘুঙুর, চেপ্টা নাক, আবলুস কালো চেহারা—তবু এত অহঙ্কারী!

স্টীফান হোরোর ওপর প্রথম একটু ভয় ও শ্রদ্ধা হলো একটা ঘটনায়। সেদিন খেলার মাঠে দেখলাম—হোরো হকি স্টীক আনেনি। হোরো তবু খেলতে চায়। কিন্তু নিজের হকি নিয়ে খেলতে হবে—এটাই আমাদের নিয়ম ছিল। হোরো বার বার আমাদের অনুরোধ করলো কিছুক্ষণের জন্য কেউ আমাকে একটা স্টীক ধার দাও, এক হাত খেলেই আবার দিয়ে দেব।

কেউ কারও স্টীক পরের হাতে দিতে রাজী ছিল না। হোরো বললো—আমি বিনা স্টীকেই খেলবো।

গোঁয়ার হোরো একটি ঘণ্টা আমাদের উদ্দাম হকি স্টীকের বাড়ি আর আছাড়ের সঙ্গে সমান স্বাচ্ছন্দ্যে পা দিয়ে খেলে গেল। হোরোর দুটি নিরেট শিশু কাঠের পায়ের ওপর বেপরোয়া হকি স্টীক চালাবার সময় এক একবার সন্দেহে আমাদেরই হাত কেঁপে উঠেছে—স্টীকটাই ভেঙে না যায়।

স্টীফান হোরো ক্রমেই আমাদের ভাবিয়ে তুলছিল। শুধু ভয় আর শ্রদ্ধা নয়—আর একটা কারণে আমরা হোরোকে এইবার ঈর্ষা করতে আরম্ভ করলাম। লেখাপড়ার ব্যাপারে হোরো আমাদের মনের শান্তি নষ্ট করতে চলেছে। ইংরেজি কবিতার আবৃত্তি ও ব্যাখ্যায় সে আমাদের ইন্দুকেও পরাজিত করে ছাব্বিশ নম্বর বেশী পেল। ঘটনাটা জাতীয় অপমানের মত আমাদের গায়ে বিঁধলো। বেহারী ছাত্রদের জাতীয়তা কতটা ক্ষুণ্ণ হয়েছিল জানি না, কিন্তু হোরোর সম্পর্কে একটা নিন্দার ষড়যন্ত্রে তারাও আমাদের সঙ্গে ইউনাইটেড ফ্রণ্ট করলো। আমরা বেশ জোর গলায় রটিয়ে দিলাম—এ স্কুলে অ-খৃষ্টানদের ওপর বড় অবিচার চলেছে। মাস্টারেরা সবাই খৃষ্টান। সুতরাং খৃষ্টান হোরো বেশী নম্বর পাবে, তাতে আর আশ্চর্য কি? কিন্তু কী ভয়ানক অন্যায় !

আমাদের অভিযোগকে মনে-প্রাণে সত্য বলে বুঝলেন শুধু একমাত্র অ-খৃষ্টান শিক্ষক —সংস্কৃতের মাস্টার বৈজনাথ শর্মা—পণ্ডিতজী।

পণ্ডিতজী আমাদের সান্ত্বনা দিলেন। —কি আর করবে বাবা! পাদরীদের স্কুলে এই রকমই অন্যায় কাণ্ড হয়ে থাকে। যাক,

ইউনিভার্সিটি তো আছে। সেইখানে ধরা পড়ে যাবে—কার কতখানি যোগ্যতা।

প্রমোশনের পর নতুন বছরে স্টীফান হোরো আরও ভয়ানক এক গোঁয়ার্তুমি করে বসলো—পা দিয়ে হকি খেলার চেয়েও ভয়ানক। স্টীফান হোরো তার এ্যাডিশনাল ইংরিজি ছেড়ে দিয়ে সংস্কৃত নিল। খৃষ্টান টীচারেরা সবাই হোরোকে ধমকালেন, হেডমাস্টার ফাদার লিণ্ডন ক্ষুণ্ণ হলেন, পণ্ডিতজী অদ্ভুতভাবে হাসতে লাগলেন। তবু অনার্য হোরোর সংস্কৃত পড়ার প্রতিজ্ঞা তিলমাত্র বিচলিত হলো না।

পণ্ডিতজী আমাদের আড়ালে ডেকে নিয়ে একটা অস্বস্তির হাসি হেসে বললেন—স্টীফান হোরো সংস্কৃত নিয়েছে। আর কি? এইবার দেবভাষার কপালে কি আছে কে জানে!

পণ্ডিতজী হাসতে লাগলেন। আমাদের কেমন সন্দেহ হলো—পণ্ডিতজীকে যেন খুশি খুশি দেখাচ্ছে! যাক্।

শীঘ্রই আমাদের যত ধারণা, সংশয়, আক্ষেপ ও আশঙ্কা পর পর কতগুলি ঘটনায় আরও জটিল হয়ে উঠতে লাগলো।

নিউ টেস্টামেণ্ট থেকে ডেভিডের গাথাগুলি আগাগোড়া নির্ভুল আবৃত্তি করে ফার্স্ট প্রাইজ পেল স্টীফান হোরো। সেকেণ্ড, থার্ড ও ফোর্থ প্রাইজের অগৌরবে মুখ শুকনো করে আমরা বসে রইলাম। ফাদার লিণ্ডন উচ্ছ্বসিত আনন্দে হোরোর প্রশংসা করে ঘোষণা করলেন—ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পর তোমায় নিশ্চয় মাস্টার করে দেব স্টীফান, আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম।

তা করতে পারেন ফাদার লিণ্ডন। এতটুকু সুপারিশ করার ক্ষমতা তাঁর আছে, কিন্তু এটুকুই যদি স্টীফান হোরোর জীবনের পরমার্থ হয় হোক, তার জন্য আমরা মোটেই হিংসা করি না। তার জন্য এত কষ্ট করে নিউ টেস্টামেণ্ট মুখস্থ করার দরকার নেই আমাদের।

তার পরের দিনই বাইবেল ক্লাসে হোরোকে একেবারে ভিন্ন রূপে দেখতে পেলাম আমরা। দুর্বোধ্য বিস্ময়ে আমরা শুধু খাবি খেতে লাগলাম।

বাইবেল ক্লাসের একেবারে পেছনের বেঞ্চিতে বসেছিল হোরো। পড়াতে পড়াতে ফাদার লিণ্ডন বার বার পুলকিত নেত্রে হোরোকে প্রশ্ন করছিলেন—স্টীফান, তুমিই উত্তর দাও। তুমিই সবচেয়ে ভাল উত্তর দিতে পারবে।

—জানি না স্যার। স্টীফানের রুক্ষ গলার স্বরে চমকে উঠে আমরা সবাই তার দিকে তাকালাম। দেখলাম, স্টীফান হোরোর আরও রুক্ষ ও বিরক্ত মুখটা ডেস্কের ওপর ঝুঁকে রয়েছে। ফাদার লিণ্ডনের দিকে যেন তাকাতে চায় না হোরো।

ফাদার লিণ্ডনের সোনালি দাড়ির ওপর বসানো শক্ত বরফ দিয়ে গড়া সাদা মুখে ক্ষণে ক্ষণে গাঢ় রক্তচ্ছটা ছড়িয়ে পড়ছিল। চোখের দৃষ্টিটা তীব্র হয়ে উঠছিল। স্টীফানের দিকে তাকিয়ে রুষ্ট স্বরে বললেন—স্টীফান, আজ কি তোমার ব্রেনটাকে দরজার বাইরে রেখে ক্লাসে এসেছ? উত্তর দিতে পারছো না কেন?

—জানি না স্যার। আবার স্টীফান হোরোর সেই স্পষ্ট অবিচল ও অকুতোভয় উত্তর শুনে আমাদের বুকে দুরু দুরু শুরু হয়ে গেল। আকস্মিকভাবে অসময়ে ক্লাস বন্ধ করে ফাদার লিণ্ডন চলে গেলেন।

কিন্তু স্টীফান হোরোর এত রাগ কেন? এত অভিমান কেন? নিউ টেস্টামেণ্ট মুখস্থ করে কার মাথা কিনেছে? কী হতে চায়? হাউস অব লর্ডস-এর সদস্য?

এর পর বিপদে পড়লেন পণ্ডিতজী। পণ্ডিতজীর মতিগতিও ক'দিন থেকে কেমন একটু বিসদৃশ দেখাচ্ছে। আমাদের এড়িয়ে যেতে পারলেই যেন পণ্ডিতজী একটু সুস্থ-বোধ করেন। দেখা হলেই ব্যস্ত হয়ে সরে পড়েন। অথচ পণ্ডিতজীকে কত কথাই না জিজ্ঞাসা করার আছে। ফার্স্ট টার্মিন্যাল পরীক্ষা হয়ে গেছে। এই তো যত নম্বর প্রমোশন আর পজিশন নিয়ে একটা দুশ্চিন্তা, গবেষণা ও কৌতূহলের সময়। পণ্ডিতজীর উদার হাতের নম্বর অনেক সময় আমাদের টোটালকে পরিস্ফীত করে কৃপণ খৃষ্টান শিক্ষকদের ষড়যন্ত্র থেকে আমাদের বাঁচিয়েছে। আজও আমরা তাই জানতে চাই—পণ্ডিতজী কার জন্য কতদূর করলেন। ইন্দুকে যদি একবার বুক ঠুকে পঁচাশি দিয়ে দেন, তবে টোটালে তার ফার্স্ট হওয়া সম্বন্ধে আর কোন সংশয় থাকে না। সব খৃষ্টানী ষড়যন্ত্র জব্দ হয়ে যায়।

পণ্ডিতজীর বাড়িতে গিয়েছি, লাইব্রেরী ঘরে একা একা পেয়েছি, পথে পথরোধ করেছি—কিন্তু পণ্ডিতজী কিরকম গোলমেলে কথা বলে সব কৌতূহল যেন চাপা দিতে চান। আমাদের সন্দেহ আরও প্রখর হয়ে ওঠে।

আমতা আমতা করে দুবার মাথা চুলকিয়ে পণ্ডিতজী শেষ পর্যন্ত সত্য সংবাদটা ব্যক্ত করে দিলেন। —সংস্কৃতে স্টীফান হোরো সবচেয়ে বেশী নম্বর পেয়েছে—একশোর মধ্যে পঁচাত্তর।

—আর ইন্দু? আমাদের প্রশ্নে একটু অপ্রস্তুত হয়ে পণ্ডিতজী অপরাধীর মত বললেন—বত্রিশ।

মাত্র বত্রিশ! পণ্ডিতজীর মত বিশ্বাসহন্তা পৃথিবীতে আর নেই। আমাদের ক্ষোভ অসংযত হয়ে উঠেছিল। পণ্ডিতজী মিনতি করে বললেন—স্টীফান হোরো এত ভাল সংস্কৃত লিখেছে, এ-তো তোমাদেরই গৌরব, আর্যভাষার গৌরব। এতে তো তোমাদের খুশি হবার কথা। এটা হোরোর জয় নয়, এটা হলো সংস্কৃত ভাষার জয়।

চুলোয় যাক সংস্কৃত ভাষার জয়। ইন্দু ফার্স্ট হতে পারবে না, এটা যে আর্যত্বের কত বড় পরাভব, বাঙালীর কত বড় অপমান—তা পণ্ডিতজী বুঝলেন না। কিন্তু আমরা ঠিক রহস্যটি বুঝে ফেললাম—পণ্ডিতজী হলেন বেহারী, তাই।

কিন্তু বাতাসের নিশ্চয় সেই পরম গুণ আছে—যার জন্য শত অন্যায়ের অবরোধের মধ্যেও ধর্মের কল নড়ে ওঠে। লাইব্রেরী ঘরে যেদিন বোর্ডনিবদ্ধ মার্কশীটের কাছে আমরা গিয়ে চোখ তুলে দাঁড়ালাম, সেদিন আমরা বিশ্বাস করলাম—সত্যের জয় আছে, মিথ্যার পরাজয় আছে।

ইন্দুই ফার্স্ট হয়েছে। স্টীফান হোরো অনেক নীচে। ইংলিশে, ইতিহাসে, ভূগোলে, অঙ্কে—সব বিষয়ে অতি নগণ্য নম্বর পেয়েছে স্টীফান হোরো, একমাত্র সংস্কৃত ছাড়া। ভেবে অবাক হলাম আমরা—খৃষ্টান টীচারেরাও হোরোর ওপর হঠাৎ এত নির্দয় হয়ে উঠলেন কেন?

আরও কিছুদিন পরে স্টীফান হোরো আমাদের কাছে একেবারে দুর্বোধ্য হয়ে গেল। শুধু আমাদের কাছে নয়, খালখো, বেসরা, টিগ্গা সবাই বলাবলি করে—কি জানি হয়েছে হোরোর!

বড়দিনের উৎসবে আমরাও পিকনিক করতে গিয়েছিলাম শিলোয়ারার জঙ্গলে। রান্নার কাঠের জন্য মহা উৎসাহে একটা মরা কেঁদ গাছ ভাঙছিলাম আমরা। হঠাৎ দেখলাম, স্রোতের ধার দিয়ে একা একা হোরো চলেছে। হাতে একটা গুলতি। আমরা চেঁচিয়ে ডাকলাম হোরোকে। এরকম অভাবিত ভাবে হোরো যখন এসেই পড়েছে, তখন সেও আমাদের সঙ্গে এই বনভোজনের আনন্দের একটু শেয়ার নিক না কেন। পোলাও হবে, মাংস হবে, দই আছে, বৈকুণ্ঠ ময়রার সন্দেশ আছে। খেয়ে খুশি হবে হোরো। একেবারে আনকোরা মুণ্ডা, জীবনে বোধ হয় এসব খায়নি কখনো।

হোরো এগিয়ে এল। আমাদের কাছে এসেই একটা শাল গাছের শাখার দিকে নিবিষ্টভাবে তাকিয়ে রইল। তারপরেই শিকার লক্ষ্য করে গুলতি তুলে ধরলো। সঙ্গে সঙ্গে একটা হৃষ্টপুষ্ট কাঠবিড়ালি আহত হয়ে ধপ করে মাটীর ওপর পড়ল। একটা লাফ দিয়ে আহত কাঠবিড়ালিটাকে লুফে নিয়ে পকেটের ভেতর রাখলো স্টীফান।

আমরা আতঙ্কিত হয়ে প্রশ্ন করলাম—ওটা কি হবে স্টীফান?

—খাব। নিঃসঙ্কোচে কথাটা বলে ফেললো হোরো। মনের ঘেন্না চেপে রেখে তবু আমরা

হোরোকে নিমন্ত্রণ করলাম। —ওসব ছুড়ে ফেলে দাও স্টীফান। পাগল কোথাকার। এস, আমাদের পিকনিকে তুমিও থাবে আমাদের সঙ্গে।

—না। হোরোর কাল মুখের ভেতর থেকে ঝকঝকে দুপাটি সাদা দাঁতের হাসি আপত্তি জানালো।

এ রকম জংলী হয়ে যাচ্ছে কেন স্টীফান? রিচার্ড টুডু একদিন কানে কানে আমাদের বললো,—সত্যিই কি জানি হয়েছে হোরোর, বোধ হয় শীগ্‌গির পাগল হয়ে যাবে। ফাদার লিণ্ডন আমাদের সাবধান করে দিয়েছে, হোরোর সঙ্গে যেন কেউ না মেশে।

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম। —কেন টুডু?

টুডু।—একজন বুড়ো সোখার * সঙ্গে আজকাল বড় ভাব হয়েছে। লুকিয়ে লুকিয়ে প্রতিদিন মঙ্গলবারের হাটে গিয়ে সোখার সঙ্গে দেখা করে হোরো।

—তাতে কি এমন অপরাধ করেছে হোরো?

টুডু ভুরু কুঁচকে বললো।—অপরাধ নয়? এতে বাইবেলের অপমান করেছে হোরো। চার্চে যায় না, কারও কথা শোনে না। তিনদিন বোর্ডিংয়ে ছিল না। ওকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।

—বোর্ডিংয়ে ছিল না? কোথায় ছিল?

টুডু গলার স্বর আরও নামিয়ে চুপে চুপে বললো।—দুরুতে গিয়েছিল। সেখানে নেচে গেয়ে এসেছে। পেট ভরে ইলি খেয়ে নেশা করেছে। তা ছাড়া......

টুডু হঠাৎ থেমে গিয়ে বললো—একটা কথা বলছি, কাউকে বলো না যেন। জানতে পারলে হোরো আমায় মেরে ফেলবে।

টুডুকে অভয় দিলাম।—না, কেউ জানতে পাবে না, তুমি বল।

টুডু।—একটি মেয়ের সঙ্গে ওর খুব ভাব হয়েছে। মেয়েটার নাম চিরকি—মোরাঙ্গি পাহাড়ের মুরমুদের মেয়ে।

টুডুর কথাগুলি মুগ্ধ হয়ে যেন গিলছিলাম আমরা। আমাদেরই সহপাঠী—দীন-দরিদ্র মুণ্ডা হোরো, কতই বা বয়স; তবু সেই হোরো আজ এক মুহূর্তে আমাদের বাইবেল ক্লাশ, সংস্কৃতের নম্বর আর হকি খেলার সব আনন্দ উত্তেজনাকে মূল্যহীন করে দিয়ে, এক রোমাঞ্চময় অনুরাগের স্কুলে গিয়ে সবার অগোচরে নাম লিখিয়ে এসেছে। সেই মেয়েটি, চিরকি মুরমু তার নাম, তাকে যেন আমরা চোখে দেখতে পাচ্ছি। শাল ফুলের মালা গলায় দিয়ে, খোঁপায় একটা বনজবা গুঁজে, স্রোতের ভাষার মত খল খল হাসির বন্ধনে হোরোর কালো হৃদয়ের সব দুরন্ত-পনাকে বন্দী করে কোন্ উপত্যকার একটি নিভৃতে নিয়ে চলে গেছে। সেখান থেকে ফিরে আসার সাধ্য নেই হোরোর। কোন্ সাধেই বা আসবে।

টুডু তখনো সেই রকম পাকা পাকা কথা বলে চলেছিল।—মুরমুরা বোঙা পুজো করে, ওদের সঙ্গে মেলামেশা কি উচিত হলো? বড় ভুল করেছে হোরো।

স্টীফান হোরোকে বোর্ডিং থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে—এটা শুধু একটা গুজব হয়েই রইল। কার্যতঃ দেখলাম, হোরোকে তাড়ানো হলো না। নিজের ইচ্ছে মত ক্লাশে আসে হোরো। নিজের ইচ্ছে মতই অনুপস্থিত হয়। অনুগত খৃস্টান ছাত্রেরা হোরোকে এড়িয়ে যায়। হোরো যেন একঘরের মধ্যেই একঘরে হয়ে আছে।

রিচার্ড টুডু যে আশঙ্কা প্রচার করেছিল—কাজের বেলায় দেখলাম তার উল্টোটাই হয়েছে। হোরোকে বোর্ডিং থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়নি। সে বোর্ডিংয়েই আছে—অথচ তার সম্পর্কে যেন সব শাসন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।

আমরা দেখে অবাক হয়ে যেতাম, এক একদিন বিকেলে ফাদার লিণ্ডন টেনিস খেলছেন হোরোর সঙ্গে। আশ্চর্য! টুডু বেসরা টিগ্‌গো—এরা হোরোর চেয়ে কম কালো আর বেশী বিশ্বাসী খৃস্টান। কিন্তু আজ পর্যন্ত ওরা শুধু ফাদার লিণ্ডনের টেনিস খেলার সময় বল কুড়িয়ে দেবার মর্যাদা পেয়েছে। তার বেশি নয়। আর স্টীফান একেবারে ...সত্যি আশ্চর্য।

বোর্ডিংয়ের বাগানে বিকাল বেলা জল দেবার ভার ছিল হোরোর ওপর। এই কর্তব্য-টুকুর বিনিময়ে হোরো বোর্ডিংয়ে ফ্রী খেতে পেত আর থাকতো। আমরা দেখলাম—হোরো আর বাগানে যায় না, জল তোলে না। উদ্যান-সেবার ভার টিগ্‌গোর ওপর চাপানো হয়েছে। বেচারী টিগ্‌গো! সকাল বেলার রান্নার জন্য কাঠ কাটে, তার ওপর আবার বিকেল বেলা জল তোলা!

টুডু এসেই আর একদিন একটা খবর দিল —আজকাল আর হাটে যাবার সুযোগ পায় না, স্টীফান বুড়ো সোখার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পায় না। প্রতি মঙ্গলবারে সারা দুপুর ফাদার লিণ্ডনের ঘরে বসে Pilgrim's Progress পড়ে। পড়া শেষ হলে নাকি চা-বিস্কুট খায় হোরো। ফাদার লিণ্ডন খাওয়ান।

আমাদের উৎসাহ ঔৎসুক্য আলোচনার আর গবেষণার সীমা ছিল না। অলক্ষ্যে কত বড় একটা ঘটনার দ্বন্দ্ব জমে উঠেছে, তার কিছু কিছু আভাস আমরা আমাদের অনুভব দিয়ে ধরতে পারছিলাম। একদিকে কেম্ব্রিজের এম-এ বিখ্যাত শিক্ষিত সুসভ্য ও শ্রদ্ধেয় ফাদার লিণ্ডন। অপর দিকে কোন এক জংলী মুণ্ডা ডিহির বুড়ো সোখা—দীনতম নগণ্য অর্ধোলঙ্গ বর্বরবেশী এক যাদুমন্ত্রা। যেন দুই যুগে লড়াই—বিংশ শতক বনাম প্রাক্‌ ইতিহাস। বুড়ো সোখা বোধ হয় সে লাঞ্ছনা ভুলতে পারে না—ছেলেধরা পাদরীরা তাদের ছেলেকে ধরে নিয়ে গিয়েছে, খৃস্টান করে দিয়েছে হোরোকে। তারই প্রতিশোধ নেবে বুড়ো সোখা। এই সুসভ্য ডাইনদের দুর্গ থেকে আবার জঙ্গলের ছেলেকে জঙ্গলে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

ফাদার লিণ্ডন তাই বোধ হয় সতর্ক হয়েছেন। স্টীফান হোরো যদি আবার জংলী হয়ে যায়, সে পরাজয় আর অপমান বড় বেশি করে বুকে বাজবে। সহ্য করা কঠিন হবে। লিণ্ডন জানেন প্রতি মঙ্গলবারের হাটে বুড়ো সোখা আসে। একটা আরণ্য আত্মা প্রতিশোধ নেবার জন্য যেন আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সুযোগ খুঁজছে। চা বিস্কুট টেনিস—সুসভ্যতার এক একটি প্রসাদ খাইয়ে হোরোকে যেন পোষ মানিয়ে রাখতে চাইছিলেন ফাদার লিণ্ডন।

আমরা বলতাম—চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধ। দেখা যাক, কে জেতে কে হারে।

গুড ফ্রাইডের ছুটিতে সবাই দেশে যাবার ছুটি পেল। টুডু টিগ্‌গো বেসরা খালখো—সবাই চলে গেল। ওদের পক্ষে যাবার কোন বাধা ছিল না। কাঁধের লাঠিতে এক একটা পোঁটলা ঝুলিয়ে জঙ্গলের পথে ত্রিশ-চল্লিশ মাইল একটানা হেঁটে ওরা চলে যাবে নিজের ডিহিতে। কোন গাড়ীর দরকার হয় না। ততখানি পয়সা খরচ করার সামর্থ্যও নেই ওদের। কিন্তু হোরোকে ছুটি দিতে রীতিমত বিচলিত হয়ে পড়লেন ফাদার লিণ্ডন। হোরো যেদিন গেল, সার্ভিস বাসটা এসে দাঁড়ালো বোর্ডিংয়ের কাছে। আমরা দেখলাম, ফাদার লিণ্ডন মনিব্যাগ থেকে টাকা বের করছেন—বাসের টিকিট কিনে দিচ্ছেন হোরোকে।

আমাদের মধ্যে বাজি ধরা হলো—হোরো আর ফিরে আসবে কি না। ইন্দু বললো—নিশ্চয় আসবে। ফাদার লিণ্ডন ওর জংলীপনা ঘুচিয়ে দিয়েছে। দুবেলা চা-বিস্কুট খাচ্ছে আজকাল। তার আস্বাদ কি ভুলতে পারবে হোরো।

আমি বললাম—আর ফিরে আসবে না হোরো। এখানে না হয় চা-বিস্কুট আছে, কিন্তু ওদিকে যে......

ইন্দু।—ওদিকে কি?

বললাম।—চিরকি মুরমুকে ভুলে গেলে?

ইন্দু একটু নিরাশ হয়ে পড়লো।—তাই তো!

* সোখা অর্থাৎ ওঝা

ছুটি ফুরিয়ে গেলে আবার বোর্ডিংয়ের জীবন চঞ্চল হয়ে উঠলো। সবাই এসেছে। স্টীফান হোরো ফিরে এসেছে। ইন্দুর জিত হলো। আমরা নিরাশ হয়ে পড়লাম। রাগ হলো হোরোর ওপর। হোরোটা সত্যিই একটা গবেট ও বেরসিক।

কিন্তু টুডুর কাছে কতগুলি গল্প শুনে আমাদের এই আক্ষেপ মুহূর্তে মুছে গেল। আমরা শুনলাম বুড়ো সোখার কথা, হোরোর কথা, চিরকি মুরমুর কথা। হোরোদের জঙ্গলের ছবিটা মুহূর্তের মধ্যে ফোটা পলাশের আগুনের মত হয়ে আমাদের কল্পনার সীমার পারে দুলতে শুরু করে দিল।

ইন্দু বললো।—চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধে বুড়ো সোখার জয় অবধারিত।

হোরোর পাশের ডিহির ছেলে টুডু। খৃস্টান টুডুরা অখৃস্টানদের সঙ্গে মেশে না। টুডু কিন্তু যেন গোয়েন্দার মত হোরোর সব কীর্তি দেখে এসেছে। তবে টুডু প্রাণ থাকতে ফাদার লিণ্ডনের কানে এসব কথা কখনো তুলবে না। হোরোর ওপর প্রচণ্ড একটা শ্রদ্ধা ও মমতা আছে টুডুর। হোরোর কাছে গিয়ে কিছু বলতে পারে না বলেই, আমাদের কাছে গল্প বলে বলে যেন স্তব্ধ শ্রদ্ধার বেদনা খানিকটা হালকা করে নেয়।

টুডু দেখেছে—একদিন তীর দিয়ে একটা হরিণ মেরেছিলো হোরো। স্রোতের ধারে হোরো দাঁড়িয়েছিল ধনুকে হাতে। চিরকি মুরমু তার পা ধুইয়ে দিচ্ছিল।

টুডু দেখেছে চিরকি তাদের গাঁয়ের ওরা* থেকে জ্যোৎস্না রাতে চুপে চুপে পালিয়ে এসেছে। হোরো আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে চিরকিকে হাতে ধরে নিয়ে গেছে।

টুডু দেখেছে—হোরো খৃস্টান হয়েও আখড়াতে গিয়ে মাদল বাজিয়েছে। চিরকিও নাচে কিনা সেখানে। বুড়ো সোখা ভালবাসে হোরোকে। কেউ তাই হোরোকে ঘৃণা করে না।

টুডু বললো।—জংলীদের সঙ্গে মিশে শিকার সেন্দেরা করেছে হোরো। টাঙি হাতে উৎসবে পাগলের মত নেচেছে। শিমুল গাছে আগুন ধরিয়েছে—দাউ দাউ করে আগুন জ্বলেছে। সবার আগে এক লাফ দিয়ে এক কোপে জ্বলন্ত গাছ কেটেছে হোরো।

টুডু গলার স্বর খুব অস্পষ্ট করে ভয়ে ভয়ে বললো আমি দেখেছি, তারপর গায়ের ফোস্কাতে ঠাণ্ডা বাতাস লাগাবার জন্য আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়েছে হোরো। চিরকি মুরমু আস্তে আস্তে এসে হোরোকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে।

বোর্ডিংয়ের পাশে ছোট মাঠের ঘাসের উপর সন্ধ্যার অন্ধকারে বসে আমরা টুডুর গল্প শুনছিলাম। হঠাৎ বোর্ডিংয়ের বারান্দা থেকে একটা বাঁশীর স্বর ভেসে এল। সঙ্গে সঙ্গে তারই সঙ্গে মিলিয়ে, তালে তালে মাথা দুলিয়ে, টুডু গুণ গুণ করে গাইতে লাগলো—

রাতা মাতা বিরকো তালা
রে নালো হোম নিরজা
রাগা ইংগা.................

উৎফুল্ল টুডুর হাবভাব আর উৎসাহ দেখে মনে হলো—এখুনি সে নাচতে শুরু করে দেবে।

—কে বাজাচ্ছে বাঁশী? কে?

আমাদের সমস্ত জিজ্ঞাসার উত্তরে টুডু গান থামিয়ে বললো—ঐ, সেই গান। হোরো সেই সুরটা বাজাচ্ছে।

—কোন্ গান?

—চিরকি মুরমুর গান।

—গানটার মানে কি টুডু?

টুডু উত্তর দিল।—গানটার অর্থ, শোন আমার জোয়ান বন্ধু, পালিয়ে যেও না, এই ঘন জঙ্গলে আমায় একা ফেলে চলে যেও না।

একটা পুলকের সঞ্চার আমাদের মনের ওপর অগোচরে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছিল। বললাম—এ যে আমাদেরই মত গান টুডু!

ইন্দু চাপা সুরে আবৃত্তি করলো—শুনে শুনে হে পরাণ পিয়া...

কিছুক্ষণ আবিষ্টের মত নিঝুম হয়ে বসেছিলাম আমরা। বোধ হয় আমরা মনে মনে চিরকি মুরমু নামে বনের লতার মত না-দেখা একটি মেয়েকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম—না, তোমার বন্ধু পালিয়ে যাবে না। আমরা প্রার্থনা করছি, হোরো তোমার কাছে ফিরে যাবে।

হঠাৎ ফাদার লিণ্ডনের গর্জন শুনতে পেয়ে চমকে উঠলাম। বোর্ডিংয়ের বারান্দার অন্ধকারে যেন একটা ধস্তাধস্তি চলেছে। টুডু দৌড়ে গিয়ে ঘটনাটা স্বচক্ষে দেখে ফিরে এল। সন্ত্রস্তের মত হাঁপাতে হাঁপাতে বললো—ফাদার লিণ্ডন হোরোর বাঁশী ভেঙে দিয়েছে।

আমাদের সবার মনে একসঙ্গে ধক্ করে কতগুলি প্রতিহিংসার শিখা জ্বলে উঠলো। ঘা কতক জমিয়ে দিতে পারলো না হোরো?

টুডু বিমর্ষ ভাবে বললে—আমারও কেমন ভয় হচ্ছে। হোরো বড় গোঁয়ার। ফাদার লিণ্ডনকে এর ফল টের পাইয়ে দেবে হোরো।

কিন্তু এর পর স্টীফান হোরোর গোয়ার্তুমির কোন প্রমাণ পেলাম না। বরং দেখলাম, গোঁ ধরেছেন ফাদার লিণ্ডন। ফাদার লিণ্ডনের অভিযান আরম্ভ হয়ে গেছে। প্রতি সপ্তাহে একবার সফরে বের হন। কখনো ভোজপুরী লেঠেল সঙ্গে যায়, কখনো বা আট দশটা কনেস্টবল। থানাতে একটা চিঠি দিলেই কনেস্টবল চলে আসে। যেন একটা যোদ্ধার দল নিয়ে দুদিনের জন্য জঙ্গল এলাকায় অদৃশ্য হয়ে যান ফাদার লিণ্ডন। সত্যিই তিনি একজন ধর্মযোদ্ধা। আমরা শুধু মনমরা হয়ে ভাবতাম—ফাদার লিণ্ডনের এই রহস্যময় আনাগোনা কবে বন্ধ হবে? কবে শান্ত হবে তাঁর সাদা মুখের লালচে উত্তেজনা?

টুডুর কাছে শুনে স্পষ্ট করে বুঝলাম—মোরাঙ্গি পাহাড়ের মুরমুদের ডিহিতেই ফাদার লিণ্ডনের অভিযান শুরু হয়েছে। পাহাড়ের গায়ে এরই মধ্যে একটি মাটির গীর্জা তৈরী করে ফেলেছেন। অরণ্যের বুকের ভেতর ঢুকে তিনি যেন লক্ষ বছরের বৃদ্ধ যত বোঙাদের শিলাময় বেদী কাঁপিয়ে দিয়ে এসেছেন।

খুব বেশী দিন পার হয়নি, শুনলাম, মোরাঙ্গি পাহাড়ে একটা হাঙ্গামা হয়ে গেছে। মাটির গীর্জাটা ভেঙে ধুলো করে দিয়েছে। কে করেছে?

যে করেছে, তাকে আমরা স্বচক্ষে একবার দেখলাম। বুড়ো সোখা। সেসন জজের আদালতের ভিড়ের মধ্যে মাথা গুঁজে আমরাও রায় শুনলাম—বুড়ো সোখার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

স্টীফান হোরোকে দেখতাম—বোর্ডিংয়ের বাগানে একটা বুড়ো বটের ঝুরিতে দোলনা বেঁধে সময় অসময় শুধু দোল খায়। দুলে দুলে যেন এক দুঃসহ গায়ের জ্বালা জুড়িয়ে নিচ্ছে স্টীফান হোরো।

নন্‌কো-অপারেশনের ঝড় বইল সারা দেশে। আমরা স্কুল ছাড়বো। জালিয়ানওয়ালা বাগের অপমান আমরা যতটা বুঝেছিলাম, তাতেই যথেষ্ট অশান্ত হয়ে উঠেছিলাম।

আমরা বাঙালী আর বেহারী ছেলেরা স্কুল ছাড়লাম। রাজার ছেলেরা কেউ ছাড়লো না। খৃস্টান ছেলেরাও নয়—টুডু টিগ্‌গা বেসরা খালখো কেউ নয়। আমরা পিকেটিং করে ওদের বাধা দিতে লাগলাম।

আমাদের খুব ভরসা ছিল, হোরো আমাদের দলে আসবে। ফাদার লিণ্ডন যেভাবে ওকে অপমান করেছে, জীবনে সে আর কোন দিন পাদরী বা সাদা চামড়াকে সহ্য করতে পারবে কি না সন্দেহ।

আমরা স্কুলের ফটকে পিকেটিং করছিলাম। দেখলাম হোরো আসছে—স্বতন্ত্র ভারত কি জয়! জয়ধ্বনি করে আমরা হোরোকে অভ্যর্থনা জানালাম।

হোরো এগিয়ে এসে ইন্দুকে একটা ধাক্কা দিল, পরেশের হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিল। বন শুয়োরের মত গোঁ গোঁ করে পথ করে নিয়ে ক্লাশে গিয়ে ঢুকলো।

সেইদিন হোরোকে আমরা ভাল করে চিনলাম। পাদরীদের ক্রীতদাস, মনুষ্যত্বহীন, মর্যাদাশূন্য, মূর্খ জংলী হোরো। স্বতন্ত্র ভারতবর্ষকে চিনলো না, একটু শ্রদ্ধা করলো না। চিনলো শুধু ওর জঙ্গলটাকে। কিন্তু

* ওরা অর্থাৎ কুমারীদের শয়নশালা

তোর জঙ্গলটা যে ভারতবর্ষের মধ্যেই রে বনবুয! ভারতবর্ষের বাইরে তো নয়।

আট বছর পরের কথা। আমি লেপো থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা। সকাল বেলায় ক'জন বিরসাইট মুণ্ডা এসেছে হাজিরা দিতে। জেল থেকে আজই ওরা খালাস পেয়েছে। এখানে হাজিরা দিয়ে তারপর নিজের নিজের ডিহিতে চলে যাবে। বিরসাইটরা অত্যন্ত সন্দেহভাজন জীব। প্রতি বছর হাঙ্গামা বাধায়। পুলিশকে ব্যতিব্যস্ত করে। জঙ্গল আইন মানে না, মহাজনদের পিটিয়ে তাড়িয়ে দেয়, চৌকিদারী ট্যাক্স দিতে চায় না। বাজারে বসলে তোলা দেবে না। জমি ক্রোক করতে গেলে আদালতের পেয়াদাকে টাঙি নিয়ে কাটতে আসে। দু'বছর আগে একবার স্বরাজ ঘোষণা করেছিল বিরসাইট মুণ্ডারা। পাদরীকে মেরেছে, পুলিশকে মেরেছে, অনেকগুলি পুল ভেঙেছে। ওরমাঁঝির জঙ্গলে একটা খণ্ডযুদ্ধ হয়েছিল ওদের সঙ্গে।

সব চেয়ে শেষে হাজিরা লেখাতে যে লোকটা উঠে এল তার নাম রুনুন্দ হোরো।

ডায়েরীর ওপর থেকে চোখ তুলে লোকটার মুখের দিকে তাকালাম। তার মাথার চুলের জংলী খোঁপাটাও জটার চূড়ার মত হয়ে গেছে। গলায় একটা ভেলাফলের মালা, আদুড় গা, কোমরে ছোট একটি কাপড় জড়ানো। হাতে একটা কাঁসার বালা। এই প্রাগৈতিহাসিক সজ্জার মধ্যে শুধু এক জোড়া সুশানিত আধুনিক চোখ......।

বিস্ময় চাপতে গিয়ে তার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে বললাম—স্টিফান হোরো।

লোকটা ম্লানভাবে হেসে বললো।—না না ঘোষ, আমি রুনুন্দ হোরো।

তুমি একজন বিরসাইট?

—আমি বিরসা ভগবানের শিষ্য।

—বিরসা ভগবান? সে কে?

—সে আমাদের গান্ধী ছিল ঘোষ। আমি তাঁকে চোখে দেখিনি, আমার বাবার মুখে তাঁর কথা শুনেছি। ইংরেজের জেলখানার অন্ধকারে একজন কয়েদীর মত মরে গেছে আমাদের বিরসা ভগবান। তাঁর চেহারা দেখতে কেমন ছিল জান ঘোষ?

—কেমন?

—যীশু খ্রীষ্টের মত।

একটু চুপ করে থেকে হোরো বললো—আমাদের জঙ্গলে বাইরে থেকে অনেক পাপ এসে ঢুকেছে, ঘোষ। তাই বিরসা ভগবান আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন। তাঁর অনুরোধ কি ভুলতে পারি?

আমি ডাকলাম। —স্টীফান হোরো......

হোরো প্রতিবাদ করলো। —বল, রুনুন্দ হোরো।

চুপ করে গেলাম। হোরো নিজে থেকেই খুশি হয়ে নানা খবর জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করলো। —ইন্দু কোথায়? পরেশ কি করছে?

চারদিকে একবার সাবধানে তাকিয়ে নিয়ে হোরোকে প্রশ্ন করলাম—এত রোগা হয়ে গেলে কেন হোরো?

হোরো—আমার টি বি হয়েছে। আচ্ছা, এবার যাই আমি।

একটা কথা জানবার জন্য মনটা ছট্‌ফট্‌ করছিল। তবু সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে পারছিলাম না। শেষে সাহস করে বলেই ফেললাম। একটা খবর জানতে বড় ইচ্ছে করছে স্টীফান।

স্টীফান।—বল।

জিজ্ঞাসা করলাম—চিরকি মুরমু কোথায়?

স্টীফান শান্তভাবে উত্তর দিল—ও: জান না বুঝি? ফাদার লিণ্ডনের মিশনে চলে গেছে চিরকি। খৃষ্টান হয়েছে। এখন হাজারীবাগের কনভেণ্টে থাকে।

স্টীফানের চোখের দৃষ্টিটা হঠাৎ একবার চক চক করে উঠলো, তীক্ষ্ন তীরের ফলার মতই, কিন্তু জলে ভেজা। আর কোন কথা জিজ্ঞেসা করা হলো না, স্টীফানও নিঃশব্দে চলে গেল।

কাউকে মুখ ফুটে বলতে লজ্জা করবে, একটা ভুলের স্মৃতি কিছুক্ষণের জন্য কাঁটার মত মনের মধ্যে বিঁধছিল। হয়তো আমারই নিরপেক্ষ থেকে চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধে স্টীফানকে হারিয়ে দিলাম, স্টীফানও অনায়াসে চলে গেল। (মন্দিরা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯ সাল হইতে উদ্ধৃত।
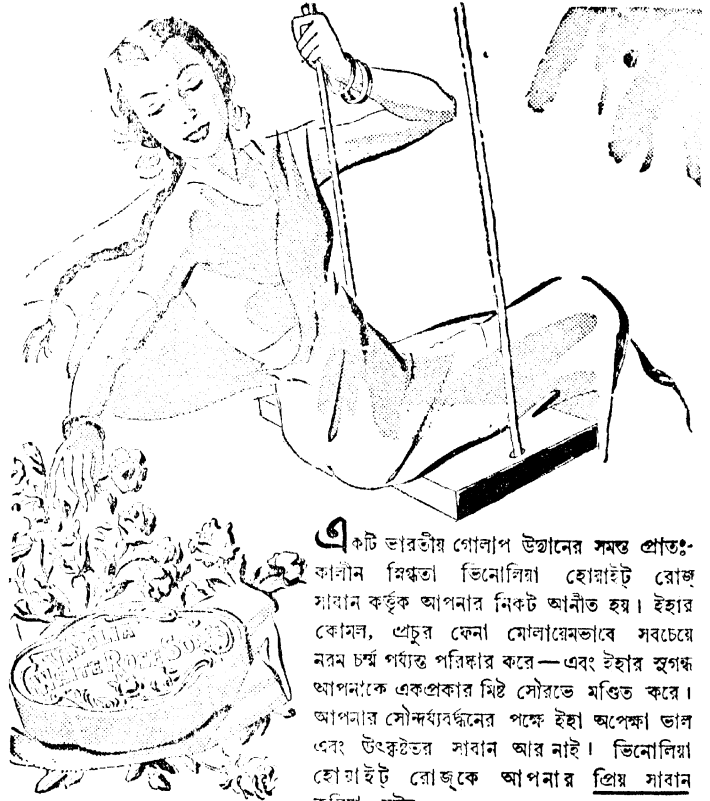
পায়ের ওপর পা তুলে একতার সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মনীষার চিঠি পড়ছিলো বিকাশ। মনীষার এই সুদীর্ঘ চিঠির অজস্র কথা সেমিকোলনের মাঝে মাঝে তার অনেক কথাই যে অব্যক্ত ছিলো, বিকাশ তা বুঝতে পারছিলো বটে, কিন্তু আর কোন উপায় নেই। সে মন স্থির করে ফেলেছে।

মনীষা ঝকঝকে পালিশ করা মেয়ে। তার চাল চলনে আর কথায় এই পালিশ সমান ঝকঝকে। বিকাশের 'মানভঞ্জন' চিত্রটি যেদিন শেষ হলো, সেইদিন হঠাৎ তার জীবনে মনীষার আবির্ভাব। সসম্ভ্রম দূরত্বে বসে ছবিটার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলো মনীষা। তারপর ধীরে ধীরে সে ব্যাখ্যা শুরু করলো মান-ভঞ্জনের। বললো, 'ওই শিখি চূড়াটা যেভাবে প্লেস করেছেন, শ্রীরাধার চরণের নীচে তাঁর পা-দুটি যেভাবে এঁকেছেন তাতে বিশ্বাস করবেন না বিকাশবাবু, এ আপনার তুলিতেই শুধু সম্ভব। আপনার তুলিতে রামধনুর বিচিত্র বর্ণের সুষমা ঝরে ঝরে পড়েছে।'

বিকাশের লাজুক শিল্পীচিত্ত এই স্তুতিতে বিচলিত হয়ে উঠলো। মনীষার সুউচ্চ চোয়ালের দিকে আড়চোখে তাকালো শুধু একবার। তারপর নীরবে কতদিন কেটে গেলো। মানভঞ্জনের পর বিরহ বেদনা, অকাল-বসন্ত, পলাতক ইত্যাদি কত ছবি আঁকা হয়ে গেলো। মনীষার স্তুতিবাদের শেষ নেই। সে ঠায় বসে বসে বিকাশের অঙ্কণ পারিপাট্য দেখে কেবল। তার শরীরের মধ্যে শিহরণ আসে। কঙ্কালকে দিয়ে কথা কওয়াতে যে পারে, সে শিল্পী নয়, সে স্রষ্টা। 'বিকাশ, তুমি স্রষ্টা।' একদিন মনীষা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে বসলো।

চমকে তাকালো বিকাশ। তার কানের মধ্যে মনীষার কথাটা আবার ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো— 'বিকাশ, তুমি স্রষ্টা।' এর জবাব কী হতে পারে। কিছুই বলতে পারলো না সে।

আসল কথা, কঙ্কাল চিত্রটি আঁকবার প্রেরণা বিকাশ পেয়েছে মনীষার কাছ থেকেই। মনীষার চেহারাটা চামড়ায় মোড়া কঙ্কাল ছাড়া আর তো কিছুই নয়। কিন্তু এই কঙ্কালের প্রাণ আছে, চোখ আছে, চাওয়া আছে, পেতে চায়—সবই মানব-ধর্মী। বিকাশকে সে যতই আপনার বলে গ্রহণ করার জন্যে ব্যগ্র ব্যাকুল হয়ে ওঠে, আতঙ্কে বিকাশ ততই দূরে সরে যায়। নরকঙ্কালের ক্ষুধা ততই বেড়ে ওঠে, পিপাসা ততই তীব্র হয়ে ওঠে। গ্রীষ্মের পিপাসা নিয়ে সে নিঃশেষে শুষে নিতে চায় বিকাশকে। সে চায় এই শিল্পীকে সে নিজের মধ্যে একাকার করে জড়িয়ে রাখবে।

নিস্তারের পথ খুঁজছিলো বিকাশ। সে স্বীকার করে, মনীষার শিল্পবোধ আছে। বিকাশের ছবি দেখে সে যে মন্তব্য করে তার সঙ্গে বিকাশের দ্বিমত নেই। কিন্তু মতের মিলকেই তো মনের মিল বলা চলে না। জীবনের পার্টনার যে হবে, তার সঙ্গে মনের মিলন দরকার। এদিক থেকে অবশ্যই যোগ্য মেয়ে। তার মনকে অবশ্যই নাড়া দিয়েছে।

বিকাশের স্টুডিওয়ার পাশেই একটা ছোট বস্তি। সম্প্রতি বস্তিটা সংস্কার করে অনেক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে। তারপর নতুন এক ঘর গেরস্ত এসেছে বস্তীতে। লবঙ্গ তাদেরই মেয়ে।

হাই-পাওয়ার আলো জ্বালিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত বিকাশের শিল্প সাধনা চলে। একাগ্রমনে বিকাশ ক্যানভাসে তুলি বুলিয়ে বুলিয়ে ছবির পর ছবি এঁকে চলে। আশপাশ থেকে কেউ তার দিকে চেয়ে আছে কিনা, সেদিকে তার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। কিন্তু লবঙ্গ জানলার ওপারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিকাশের চিত্রাঙ্কণ দেখে হা হয়ে থাকে।

তুলি রেখে বিকাশ একটা সিগারেট ধরালো। হঠাৎ জানালায় চোখ পড়তেই তার মনে হলো, কি যেন একটা জিনিস জানলার পাশ থেকে সরে গেলো।

বিকাশ বললো, 'কে?'

মেয়েটি থমকে থেমে বললো, 'আমি।'

বিকাশের মাথা যেন ঘুরে গেলো। তার এত কাছে এসে এমন একটা দেবীমূর্তি দাঁড়িয়ে ছিলো, এতক্ষণ সে তা লক্ষ্য করেনি বলে নিজেকে তার অপরাধী বলে বোধ হলো যেন। জানলার এ-পার থেকে বিকাশ তার আপাদ-মস্তক চোখ বুলোতে লাগলো। এতক্ষণ একটানা তুলি ঘষার দরুণ তার চোখের ওপর যে চাপ পড়েছিল, তার ওপর কে যেন ঠাণ্ডা একটি হাত বুলিয়ে দিচ্ছে বলে তার মনে হতে লাগলো।

'কি নাম তোমার?'

'আমার? আমার নাম লবঙ্গ।'

বিকাশ আর কিছু না বলে জানলা থেকে সরে এলো। তার চোখের সামনে পাশাপাশি এসে দাঁড়ালো দুটি মূর্তি। এই দুটি মূর্তির মধ্যে একটি যে মনীষার, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মনীষার শারীরিক কদর্যতা তার চোখে আরও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠলো। সে কঙ্কাল চিত্রটি টেনে বের করে আবার মিলিয়ে নিলো তার মনের চিত্রটির সঙ্গে। কিন্তু হঠাৎ আজ এ কি হলো। শুকনো, শীর্ণ আম্র শাখার কোল দিয়ে নতুন সতেজ ও সবুজ পাতার উদ্‌গম সে যেন দেখলো আজ। আজ লবঙ্গ তার অপর্যাপ্ত যৌবনশ্রীতে বিকাশের হৃদয় বিকশিত করে দিয়ে গেলো।

মনীষা তার অজস্র বাক্‌পটুতায় বিকাশের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ক্ষুৎপিপাসাকে যেভাবে চাপা দিয়ে দিয়েছিলো, তাতে তার আর মনে হয়নি যে, সে মানুষের মতো চাওয়ার প্রেরণা আর কখনো পাবে। বিকাশের জীবনকে সে বেড়াজাল দিয়ে ঘিরে রেখেছিলো প্রায়। আজ বিকাশ সেই বেড়া টপকে বাইরে বেরিয়ে আসতে পেরে ধন্য হয়ে গেছে যেন। এজন্য লবঙ্গকে সে ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

বস্তীবাসিনী এসে এক অভিজাতবংশীয়াকে এভাবে উহ্য করে দিতে পারে, বিকাশও কোনদিন তা ভাবতে পারে নি। বিকাশ তাই ভাবতে চেষ্টা করে এর কারণটা কি। সে তার জীবনকে বেশী ভাল বাসে, না, তার শিল্পকে —এইটেই হলো তার বিচার্য বিষয়। জীবনের চেয়ে অনেক বেশী সে তার শিল্পকে ভালবাসে বলেই তার ধারণা ছিল। কিন্তু এখন সে বিশ্বাসকে ভ্রান্ত বলেই তার বোধ হচ্ছে। যে প্রেরণায় সে রঙে রঙে রঙিন করে তুলছে চিত্রপট, তার মানসপট তো সেই প্রেরণায় ঠিক তেমনিভাবে রঙিন হয়ে উঠছে না। তাকে রাঙিয়ে তুলতে হলে তার জন্য আলাদা রং আর আলাদা তুলি দরকার। লবঙ্গর মধ্যে সে যেন চকিতে সেই রঙের ভাণ্ড আবিষ্কার করে ফেলেছে। লবঙ্গর দুটি ভ্রূ তার কাছে তুলি বলে মনে হতে লাগলো।

লবঙ্গ প্রত্যহই আসে। আজকাল সে বিকাশের স্টুডিয়োর ভেতরে এসেই বসে। তার অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্য, অটুট যৌবন, লীলাচঞ্চল তার চাল-চলনে বিকাশ মুগ্ধ হয়ে গেছে। শিল্পীর সম্পদ

তো বলে একেই। সম্মুখে এমনি একটি নারী-মূর্তি না থাকলে শিল্পের উৎসই যে হারিয়ে যায়। লবঙ্গর দিকে মাঝে মাঝে তাকায় বিকাশ। সরল ও স্বাভাবিক তার মুখের ভাব, এর মধ্যে কোথাও পালিশ নাই, অনাড়ম্বর কথা বলার ধরণ। যা বোঝে না, নিঃসঙ্কোচে তা প্রকাশ করে; যা বুঝতে পারে অসঙ্কোচে তা প্রকাশ করতে পারে। শহুরে সভ্যতার আঁচে গলে ঝলসে যায়নি, একেবারে কাঁচা সোনার গন্ধ এর সারা গায়ে।

বিকাশের মতে, এই হচ্ছে সত্যকার সঙ্গিনী। তাই সে আর কিছু বিচার বিবেচনার অপেক্ষা না রেখে যেভাবেই হোক লবঙ্গকে পাকাপাকিভাবে আপনার করে নেবার চেষ্টায় মত্ত হলো।

এমন সময় মনীষা কাকুতি মিনতি করে বিকাশের কাছে লম্বা একটা চিঠি লিখে পাঠালো। মুখে যা সে বলতে পারেনি, তাই সে লিখে জানাবার চেষ্টা করেছে। বিকাশ যেন একবার মনীষার মনের দিকটা নজর করে—মাত্র একবার। মনীষার আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও তার বলার আসল কথাটা চিঠির কথা সেমি-কোলনের ফাঁকে ফাঁকে হারিয়ে গেছে। কথাটা হারিয়ে গেলেও বিকাশের বুঝতে বাকি নেই। মনীষার বক্তব্য সে অনেক আগেই ধরে ফেলেছে। সে জানে, মনীষার বুদ্ধি আছে, বিদ্যা আছে, শিক্ষা আছে, কালচার আছে—কিন্তু শিক্ষা আর কালচার, বিদ্যা আর বুদ্ধি দিয়ে তার প্রয়োজনটা কী। জীবনে জলতরঙ্গই যদি না বাজলো, তবে জীবনের অর্থ কোথায়। সিগারেটের পর সিগারেট পুড়িয়েও সে ঠিক করতে পারলো না, মনীষাকে একটা জবাব দেবে কি না। সারা ঘর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেলো, বিকাশের মনেও ধোঁয়া ঘনিয়ে এলো যেন। না, ঠিক আছে। যা সে স্থির করে ফেলেছে, তার থেকে আর নড়চড় হবার জো নেই।

অতএব লবঙ্গকে আমরা বিকাশের স্ত্রীরূপে দেখতে পেলাম কয়েকদিন পরেই।

বিকাশ গদ্‌গদভাবে বললো, 'তোমার নামটা কিন্তু ঠিক রাখা হয়নি। তোমাকে আমি দারচিনি বলে ডাকবো, যেমন ঝাল তুমি তেমনি মিষ্টি।'

লবঙ্গ যেন তেতে উঠলো, 'ও মা, সে কি গো! দারচিনি আবার নাম হয় নাকি! ও-নামে কক্‌খনো ডেকোনা আমাকে—রাগারাগি হয়ে যাবে কিন্তু। সবই তোমার ব্যায়ড়া আবদার।'

বিকাশ বেকুবের মত তাকালো লবঙ্গর দিকে। লবঙ্গ বললো, 'তোমাকে আমি যদি গরমমশলা বলে ডাকি—কেমন শুনতে লাগে, একবার ভাবো তো।'

ভাববার আর কিছু নেই। বিকাশের সব ভাবনা চিন্তার বাইরে হয়ে গেছে। তবু বললো, 'তুমি ভেবেছ সত্যি বলছি।'

'সত্যিই যদি না হবে, তবে অত মিছে কথা কেন?'

বিকাশ উঠে গিয়ে স্টুডিয়োয় ঢুকলো। মহাশ্মশানের একটা ছবি আঁকবার তার সাধ হয়েছে। চারিদিকে ধু ধু মাঠ, তার মাঝে মাঝে শিশু হস্তীর মত উঁচু উঁচু পাথর, মাঝখান দিয়ে মরা ঝর্ণার শীর্ণ রেখা ঝির ঝির করে করে বয়ে চলেছে। এইখানে মহা-শ্মশান। নির্জন নির্জীব চারিদিক আকাশে একটা ক্ষুধার্ত শকুনি পাক খেয়ে ঘুরে
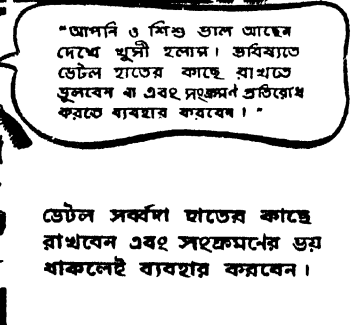
বেড়াবে। বিকাশের মহাশ্মশানের এই হবে রূপ। প্রথমে বিকাশ মনে মনে ছবিটা ভাল করে ছকে নিলো। তারপর পেন্সিল দিয়ে স্কেচ করতে বসলো। এমন সময় লবঙ্গ এসে জানিয়ে গেলো, 'বিকালে বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে কিন্তু।'

বিকাশ সেদিকে না তাকিয়ে শ্মশানের শিব হয়ে বসে রইলো। সে এখন ধ্যান করছে, তার আরাধনার পুরস্কারের প্রতীক্ষায় সে বসে রইলো। তুলিতে রং মাখিয়ে বিকাশ শ্মশানের রূপ দেবার চেষ্টা করছে। এমন সময় লবঙ্গ গুণ গুণ করে গান করতে করতে ঘরে ঢুকলো। বিকাশের কানে গানের সুর হয়ত ঢুকলোই না। সে এখন গভীর অতলে তলিয়ে আছে। লবঙ্গ সাড়া না পেয়ে বললো, 'এত ভড়ংও জানো! কানে শুনেছো? টকি দেখবো। নিয়ে যাবে কিনা বলো!'

বিকাশ মাথা তুলে বললো, 'কি বললে? বসো।'

লবঙ্গ তার যৌবনশ্রী বিস্ফারিত করে বসলো, বললো, 'টকি দেখবো।'

'টকি আবার কি?' বিকাশ কথাটা যেন বুঝলো না।

'ওমা, সে কি গো। টকি চেনো না? বায়স্কোপ গো বায়স্কোপ!'

'কাল যেয়ো। আজ একটু কাজ আছে।' বিকাশ অনুনয়ের সুরে বললো,—'আমার একটু কাজ আছে।'

লবঙ্গ তাচ্ছিল্যের সুরে বললো, 'কি কাজ? ওই চিত্তির করা? ও-সব ফেলে দাও। কেবল সময় খরচা, পয়সা নষ্ট। মাসে কত টাকার রং খরচা কর?'

নিশ্বাস ফেলে বিকাশ বললো, 'সে অনেক; হিসাব করিনি।'

'মস্ত কাজ করেছ! হিসাব না করে খরচা কেউ করে? আমার এক মাসী ছিলো, মেসো খরচে ছিলো বলে সেই মাসী মেসোর গালে একদিন ঠাস করে এক চড় কষে দিয়েছিলো।'

বিকাশের গালেই যেন চড়টা লাগলো। সামলে নিয়ে বললো, 'চলো তোমার টকিতে।'

টকি দেখে ফিরে এসে বিকাশ আবার কাজে বসেছিলো। লবঙ্গ বললো, 'আগে একটা কথা শুনে নাও। আমাকে অমনি একটা শাড়ী আর অমনি একটা দুল দেবে?'

'কি রকম দুল, কি রকম শাড়ী?' বিকাশ লবঙ্গর মুখের দিকে তাকালো।

'ওই যে গো, বায়স্কোপে দেখলে না? বলো দেবে?' লবঙ্গ বিকাশের তুলি-শুদ্ধ হাত চেপে ধরে বললো, 'কথা না দিলে ছাড়ছিনে। বলো, কথা দাও।'

বিকাশ হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, 'দেব। এবার ও-ঘরে যাও। এই ছবিটা শেষ করতে দাও।'

লবঙ্গ চলে গেলো। মহাশ্মশানের আইডিয়াটা কি রকম ঝাপসা হয়ে গেলো যেন। তার জীবনের মধ্যে নতুন একটি মহাশ্মশান এসে তার কল্পনার মহাশ্মশানের ওপর গভীর ছায়াপাত করে তাকে একেবারে ঢেকে দিলো। নিচের ধূ ধূ প্রান্তর ও শিশু হস্তীর মত ছোট ছোট পাথরের চাপের ওপর একটি শকুনি পাক খেয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। কী চায় সেই শকুনি এই মহাশ্মশানের কাছ থেকে, সেটা তো ভেবে দেখা হয়নি। আলবৎ। সেটা ভেবে ঠিক করতে হবে। নইলে ছবি জ্যান্ত হবে কী করে! মহাশ্মশানে শব নেই, শবের কঙ্কাল নেই—ক্ষুধার্ত লুব্ধ শকুনি কিসের মোহে তাহলে পাক খাবে!—সব ভেবে ঠিক করতে না পেরে বিকাশ তার এই চিত্রটি আঁকবার সমস্ত প্ল্যান বাতিল করে দিলো।

বাইরে জানলার দিকে তাকালো বিকাশ। আজও যেন লবঙ্গ তার উচ্ছল যৌবনশ্রী নিয়ে তাকে প্রলুব্ধ করার জন্যে এখনো ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। রোমাঞ্চকর লাগছে বিকাশের। বিকাশ অভ্যাসমত উঠে গিয়ে একবার জানলার কাছে দাঁড়ালো। মাংসল একটি মেয়ে তাকে যেন নীরব অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। তাকে যেন ইঙ্গিতে বলে দিচ্ছে—জীবন-বেদের কোনো পৃষ্ঠায় যৌবনকে উপেক্ষা করার উপদেশ দেওয়া হয়নি।

বিকাশ লবঙ্গকে ডাকলো। বললো, 'ধুনিমুন কাকে বলে জানো?'

'ওসব জানিনে বাপু!'

'মধুচন্দ্রিকা। তার মানে বোঝ?'

'উঁহু।'

বিকাশ বললো, 'তোমাকে নিয়ে বেড়াতে যাব বাইরে। সেখানে আর কেউ থাকবে না। তুমি আর আমি!'

মুখ-ঝামটা দিয়ে লবঙ্গ বললো, 'কত রংগই জানো। তামাশার আর অন্ত নাই। আমি বাপু কোথাও যেতে পারবো না। বেশ আছি এখানে।'

বিকাশ তবু তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলো, বললো, 'চারিদিকে শালবন, তার নিবিড় ছায়া, দূরে পাহাড়ী ঝর্ণা, তারি পাশ দিয়ে ঘুরে বেড়াব দুজন। আকাশে উড়ে বেড়াবে বুনো হাঁস, আমরা বরাবর নদীর বালুর ওপর বসে—'

ঠোঁট উল্টে দিয়ে লবঙ্গ বললো, 'কিচ্ছু বুঝলাম না ছাই। বেড়িয়ে লাভটা কী। তোমার যেমন বুনো সখ। বনে বনে ঘোরে তো জানোয়াররা।'

লবঙ্গর কথা শুনে হঠাৎ ক্ষেপে উঠলো বিকাশ। ইচ্ছে হলো লবঙ্গর মাসী যেমন মেশোর গালে চড় কষে দিয়েছিলো, তেমনি একটা চড় সে লবঙ্গর গালে—

ঝড়ের মত বিকাশ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। লবঙ্গ বললো, 'আদিখ্যেতায় বাঁচিনে! মরদের মত খাটতে জানে না, ঘরে বসে সময় নষ্ট করা আর আজগুবী সব কথা! বনে চলো, জঙ্গলে চলো। কেন, কিসের গরজ আমার!'

কিছুক্ষণ বাদেই বিকাশ ফিরে এলো। তার জীবন কেমন তেতো তেতো ঠেকছে। গভীর রাত্রি পর্যন্ত সে ঘরে বসে বসে অনবরত সিগারেট টানতে লাগলো। হাই পাওয়ারের আলো জ্বলছে ঘরে। জানলা দিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাক খেতে খেতে বেরিয়ে যাচ্ছে। কী করা যায়! কঙ্কাল ছবিটা টেনে বের করলো বিকাশ। কঙ্কালকে দিয়ে যে কথা কওয়াতে পারে, সে নাকি শিল্পী নয়, সে স্রষ্টা! বিকাশ কান পেতে কঙ্কালের কথা শোনবার চেষ্টা করলো। কিন্তু কোনো সাড়াই যেন পেলো না। বিকাশের জীবনের ট্রাজেডি দেখে কঙ্কালও তাহলে হয়ত স্তব্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু বিকাশের মনে আক্ষেপের আগুন জ্বলে উঠলো। তার মহাশ্মশানে আগুনের শিখা দেখা দিয়েছে এবার। এই আগুনে সে পুড়িয়ে খাক করে দিতে চায় সব। সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। এমন সময় লবঙ্গ তার সামনে এসে দাঁড়ালে সে তাকে ভস্ম করে দেবে। কিন্তু লবঙ্গ তো এলো না।

বিকাশই উঠে গেলো। রাত গভীর। অন্ধকার ঘরে লবঙ্গ অকাতরে ঘুমচ্ছে। আলো জেলে বিকাশ দেখলো, উচ্ছল যৌবনশ্রী নিয়ে ঘুমন্ত লবঙ্গ তাকে পথভ্রষ্ট করার জন্য যেন নীরবে প্রলোভন দেখাচ্ছে। একটা শাড়ি আর একটা দুলের জন্যে লবঙ্গ অনুনয় করছে যেন তার কাছে।

কিন্তু না, এ প্রলোভনে ভুলতে বিকাশ রাজি নয়। সে ফিরে এলো। কঙ্কালটি চোখের সামনে ধরে সে মনীষার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বসলো। লিখলো, 'আমাকে উদ্ধার করার ভার তোমার ওপর রইলো, মনীষা।'

সাহিত্য সংবাদ

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

পল্লীমঙ্গল সমিতি শিক্ষা বিভাগের তরফ থেকে প্রতিযোগিতার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়ের যে-কোন একটির উপর প্রবন্ধ আহ্বান করা যাইতেছে। কোনরূপ প্রবেশমূল্য নাই। রচনার বিষয়ঃ—(১) শরৎচন্দ্র (২) ভারতের বর্তমান সমস্যা সমাধানের উপায়, (৩) বর্তমান যুগে বাঙলা দেশের স্ত্রী-শিক্ষা ব্যবস্থা, (৪) পরিকল্পনা (Planning) ও ভারতের জাতীয় পরিস্থিতিতে উহার প্রয়োজনীয়তা। যোগদানের শেষ তারিখ ৭ই জুলাই, ৪৭। সুভাষ সরকার, ১১।৩, চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, ভবানীপুর, কলিকাতা—২৫।

অশ্বত্থের অভিশাপ

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

৮

আজ অম্বিকা দেবীর কাশীযাত্রার দিন। চণ্ডীমণ্ডপের আঙিনায় প্রকাণ্ড একখানা পাল্কী সজ্জিত—আটজন বেহারা পাশে অপেক্ষা করিতেছে। জিনিসপত্র, বাক্স, পেঁটরা আগেই মহিষের গাড়িতে স্টেশনে রওনা হইয়া গিয়াছে—স্টেশন বারো মাইল পথ। আঙিনায় বাড়ির আমলা, বরকন্দাজ, গ্রামের অনেকে, বালক, বৃদ্ধ ও রমণী সমবেত, সকলেই নীরব। কীর্তিনারায়ণের প্রতি তাহাদের মনোভাব যেমনি হোক, সকলেই অম্বিকা দেবীকে, তাহাদের কর্তামাকে ভক্তি করিত, ভালোবাসিত। কীর্তিনারায়ণের অত্যাচার হইতে অম্বিকা দেবী যে সব সময়ে তাহাদের রক্ষা করিতে পারিত এমন নয়, তবে একটা সান্ত্বনার ক্ষেত্র ছিল—আজ তাহাও অপসারিত হইতে চলিয়াছে, কাজেই সকলেরই মুখ বিষণ্ণ।

আজ কয়েকদিন হইল রুক্মিণী তাহার শাশুড়ীর সঙ্গে ছায়ার মতো ঘুরিয়াছে, কাল সারারাত্রি তাঁহার পায়ের উপরে পড়িয়াছিল। রুক্মিণী বলিয়াছিল—মা, ছেলে যদি অপরাধী হয় তাই বলে কি মেয়েকে দণ্ড দিতে আছে?

সে বলিয়াছিল—তুমি চলে গেলে এত বড় বাড়ি যে শূন্য হ'য়ে যাবে। আর তুমি তো জানো মা, তোমার ছেলে দুরন্ত। তোমার ভয়েই সে তবু সামলে চল্‌তো—এখন তাকে সামলাবে কে?

অম্বিকা দেবী বলিয়াছিলেন—মা তুমি আমার মেয়ের মতো মেয়ে। আমার মেয়ে হয়নি, তুমি সে অভাব পূর্ণ ক'রে ছিলে। নিজের মেয়ে হ'লে এর চেয়ে বেশি আর কি করতে পারতো!

তারপরে বলিলেন—তোমাকে তো আমি ছেলেবেলা থেকে জানি। তুমি আর দশজনের মতো হ'লে একটা বৃথা সান্ত্বনা দিয়ে যেতে চেষ্টা করতাম। কিন্তু সে রকম দিতে চাইনে, আর দিলেও তোমার বিশ্বাস হ'ত না। তোমাকে সত্যি কথাই বল্‌বো।

এই বলিয়া তিনি আরম্ভ করিলেন—এখন আমার যাওয়াই উচিত। কীর্তি যখন নিজের মুখে কাশী যাওয়ার কথা বল্‌তে পারলো—তখন কি আর আমার থাকা উচিত।

রুক্মিণী বলিল—তোমাকে তো একেবারে যেতে বলেনি, কাশীদর্শন করতে যেতে বলেছে।

অম্বিকা বলিলেন—মা তুমি বুদ্ধিমতী। কোন্ কথার কি অর্থ তা তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারো। ও দুই একই কথা হ'ল। বাড়িঘর, বিষয় সম্পত্তি ছেলের, তার যাতে অসুবিধা হয় তেমন কাজ করা কি উচিত। আমি থাক্‌লে ওর অসুবিধা। তাইতো আমাকে সরিয়ে দেবার জন্য কাশীযাত্রার ছল উঠিয়েছে এ কি আমি বুঝি না!

রুক্মিণী বলিল—মা তুমি গেলে যে ওঁর দৌরাত্ম্য আরও বাড়বে।

অম্বিকা বলিলেন—সে আমি জানি। কিন্তু আমি থেকেই বা কি বাধা দিতে পারছিলাম।

রুক্মিণী বলিল—কিন্তু মা তুমি চল্‌লে—ফিরে এসে আর এই বাড়িঘর, বিষয় সম্পত্তির কিছুই দেখ্‌তে পাবে না।

অম্বিকা বলিলেন—সে কথাও আমি জানি। এ সমস্তই যাবে। কেমন যেন বুঝ্‌তে পারছি এ সমস্তর কিছুই থাকবে না। আজ এ সমস্ত যেন শেষবারের জন্যে দেখ্‌তে পাচ্ছি। তাই তো কালকে সমস্ত ঘরগুলো একবার দেখে এলাম।

একথা সত্য। গতকল্য চাবির গোছা লইয়া রুক্মিণীকে সঙ্গে করিয়া অম্বিকা প্রকাণ্ড এই বাড়ির সমস্ত মহলগুলি একবার ঘুরিয়া আসিয়াছেন। এক একটা করিয়া দালান খোলেন আর কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকেন—তারপরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া সে কক্ষটা বন্ধ করিয়া নূতন কক্ষের দ্বারোন্মোচন করেন। এই রকম দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়াছিল। এই রকম করিতে করিতে যখন তাঁহার পুরাতন শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন, যেখানে তিনি ও তাঁহার স্বামী দীর্ঘকাল দাম্পত্যজীবন যাপন করিয়াছেন, তখন বধূকে একটা কাজের ছুতায় প্রেরণ করিয়া সেই পুরাতন পালঙ্কের উপরে উপুড় হইয়া লুটাইয়া পড়িয়া অশ্রুধারা অবারিত করিয়া দিলেন। বধূ কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া শাশুড়ীকে সেই অবস্থায় দেখিয়া গৃহের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল। শাশুড়ী জানিল না যে, তাহার অজ্ঞাত অশ্রুর একজন সাক্ষী রহিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে শাশুড়ী উঠিয়া চক্ষু মুছিয়া প্রস্তুত হইলে বধূও নিজের অশ্রু মুছিয়া প্রবেশ করিল। তিনি সেই গৃহত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে বধূ ধুলিমাখা সেই পালঙ্কের উপরে বসিয়া পড়িয়া বলিল—মা এইখানে একটু বসি। অগত্যা যেন শাশুড়ী তাহার পাশে বসিলেন।

রুক্মিণী অতিশয় সন্তর্পণে পুরাতন স্মৃতির একটু সূত্র ধরাইয়া দিল আর অমনি শাশুড়ী সেই সূত্র অনুসরণ করিয়া পুরাতন দিনের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন।

অম্বিকা বলিলেন—ওই যে ওখানে একটা জানলার দাগ দেখ্‌ছ ওখানে একটা জানলা ছিল, কি ক'রে সেই জানলা বন্ধ হ'লো তবে শোনো। ওই জানলার পাশে মস্ত একটা কাঁঠাল গাছ ছিল। রাতের বেলায় সেই গাছে হুতুম এসে বস্‌তো আর সারারাত হুম হুম ক'রে ডাকতো। আমি তখন কেবল বিয়ে হ'য়ে এসেছি। ওই ডাকে আমার বড় ভয় পেতো, ঘুম ভেঙে যেতো। ঘুম ভেঙে গিয়ে খাটের এক কোণে জড়োসড়ো হ'য়ে বসে থাকতাম। কর্তাকে জাগাতে ভয় হ'তো আবার লজ্জাও কম হতো না। একদিন ওইভাবে পুঁটুলিটার মতো বসে আছি এমন সময়ে কর্তা ঘুম ভেঙে সেই অবস্থায় আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—অমন ক'রে আছো কেন? আমি কোন কথা বল্‌তে পারলাম না, কেবল আঙুল দিয়ে কাঁঠাল গাছটার দিকে দেখালাম। কর্তা প্রথমে বুঝ্‌তেই পারেন না—শেষে বুঝতে পেরে হেসে উঠলেন। আমার সে কি লজ্জা! অবশেষে তিনি উঠে হুতুমটাকে তাড়িয়ে দিলেন। তারপর দিনে হুকুম দিয়ে কাঁঠাল গাছটা কাটিয়ে দিলেন। লোকে জিজ্ঞেস করলো অতদিনের গাছটা কাটালেন কেন? তিনি আর আসল কথা প্রকাশ করলেন না, পাছে আমি লজ্জা পাই, বল্‌লেন, শয়নঘরের পাশে বড় গাছ থাকলে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়!

রুক্মিণী জিজ্ঞাসা করিল—কিন্তু জানলা বন্ধ হ'ল কেমন ক'রে?

অম্বিকা বলিলেন—রসো মা, বল্‌ছি। ওই দিকেই তো একটু দূরে মস্ত আমের বাগান। সেই মুখপোড়া হুতুমটা কাঁঠাল গাছ থেকে উঠে গিয়ে সেই আমবাগানে বস্‌তো আর ডাকতো—হুম, হুম। আমি ভয় পেয়ে ঘুম ভেঙে উঠে বোকার মতো ব'সে থাক্‌তাম। কর্তা বললেন, তোমার জন্যে আমবাগানটা কেটে ফেল্‌তে হ'ল দেখছি।

আমি বললাম—করো কি, তুমি কি পাগল হ'য়েছ নাকি? লোকে কি বল্‌বে। তখন

তিনি ওদিকের জানলা মিস্ত্রি ডাকিয়ে বন্ধ ক'রে দিলেন।

তারপরে বধূর চিবুক ধরিয়া আদর করিয়া হাসিয়া বলিলেন—এখনো যে পূব বাগানের ফজলি আম খেতে পারছো সে আমারি দয়ায়। আমি সেদিন বাধা না দিলে ওখানে ফাঁকা মাঠ হয়ে যেতো।

বধূ বলিল—মা যা খাচ্ছি সবই তো তোমার দয়ায়।

এই কথায় অম্বিকার চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল। মানুষের মনে হাসি ও অশ্রু বড় ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী।

তারপরে শাশুড়ী উঠিয়া গিয়া দেয়ালের এক স্থানে কি যেন খুঁজিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিয়া উঠিলেন—এই যে পেয়েছি। বধূ নিকটে আসিয়া শুধাইল—কি মা?

অম্বিকা বলিলেন—এই যে একটা দাগ দেখতে পাচ্ছ?

রুক্মিণী একটু ঠাহর করিয়া দেখিল, দেয়ালের এক স্থানে একটু কাটা চিহ্ন। ধূলি পড়িয়া পড়িয়া প্রায় ঢাকিয়া গিয়াছে।

অম্বিকা দেবী বলিলেন—যেন নিজের মনেই—এতদিনের দাগ এখনো মেলায়নি! তারপরে বধূকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—একদিন পান পছন্দ না হওয়াতে কর্তা বিড়দানি শুদ্ধ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন, দেয়ালে লেগে ঝন্ ঝন্ শব্দে প্রকাণ্ড বিড়দানি প'ড়ে গেল—দেয়াল কেটে চিহ্ন হয়ে রইলো। আমি সেই শব্দে ছুটে এলাম।

রুক্মিণী শুধাইল—হঠাৎ তিনি রাগ করতে গেলেন কেন? শুনেছি, তিনি মাটির মানুষ ছিলেন।

অম্বিকা স্বামীর প্রশংসায় গৌরববোধ করিয়া বলিলেন—ছিলেনই তো। যারা তাঁকে দেখেছে, তারা বুঝতেই পারে না, অমন মানুষের এমন ছেলে হয় কেমন করে?

কথাটা বলিয়া ফেলিয়া তাঁহার মনে হইল কথাটা বলা উচিত হয় নাই—রুক্মিণীর মনে লাগিতে পারে। তাই বলিলেন—কীর্তি আমার সব দিকেই ভালো কেবল রাগটা একটু বেশি। একটু থামিয়া বলিলেন—তা পুরুষ মানুষের একটু রাগ থাকা দরকার।

রুক্মিণী বলিল—মা সেই বিড়দানির কথাটা বলো।

অম্বিকা বলিলেন—আমার সাজা পান ছাড়া কর্তার পছন্দ হত না। আমি দুবেলা প্রকাণ্ড বিড়দানি ভর্তি করে পান সেজে রাখতাম, তিনি দুপুর বেলা শোবার সময়ে আর রাত্রিবেলা ঘুমের আগে খেতেন। সেদিন আমার হাতে কি যেন কাজ ছিল, চিন্তা নামে আমার এক বাপের বাড়ির ঝি ছিল, তাকে বললাম—তুই পান সেজে রাখিস। সেই পান মুখে দিয়েই কর্তা বুঝলেন আমার সাজা নয়—আর বিড়দানি ছুঁড়ে মারলেন দেয়ালে।

অম্বিকার মনে হইল সেদিনের কিছুই আর নাই—শুধু ওই তুচ্ছ চিহ্নটা এখনো রহিয়া গিয়াছে। সেই সুখের দিনের, আনন্দের দিনের, দাম্পত্য গৌরবের মহিমময় দিনের একমাত্র ভগ্নদূতের মতো ওই নগণ্য ক্ষত-চিহ্নটা। সেই চিহ্নটার কাছে দুইজনে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল। তালায় আবার চাবি পড়িল। কেবল ধূলিমলিন সেই পালঙ্কের যেখানে তাহারা বসিয়াছিল, সেখানে তাহাদের উপবেশনের ছাপ অঙ্কিত হইয়া রহিল। ধূলা পড়িয়া সেই ছাপ দুটি ঢাকিয়া যাইতে বেশ কিছুদিন সময় লাগিবে। তখন শাশুড়ী-বধূর এদিনকার অভিনয়ের আর কোন চিহ্ন থাকিবে না।

রাত্রে শাশুড়ীর পাশে শুইয়া পড়িয়া রুক্মিণী বলিল—মা তুমি সেকালের পাথরে গড়া, এসব ছেড়ে যেতে তোমার কষ্ট হ'লেও সইতে পারবে—কিন্তু মা আমি যে মাটির মানুষ—আমার যে সহ্য হচ্ছে না।

অম্বিকা বলিলেন—মা, যেদিন বাপ মায়ের কোল ছেড়ে এই বাড়িতে এসেছিলাম সেদিন কি কম কষ্ট হয়েছিল? আবার আজ এই বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছি—কষ্ট হচ্ছে বই কি! কিন্তু সেদিনের অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারছি এও সহ্য হবে। তোমারও সহ্য হবে মা। সহ্য করাতেই নারীর নারীত্ব, আঘাত করাতেই যেমন পুরুষের পৌরুষ।

তারপরে রাত্রি অনেক হইলে বধূ ও শাশুড়ী নিদ্রার ভাণ করিয়া পড়িয়া রহিল। কেহই ঘুমাইল না। দুজনেই জানিল যে অপরে জাগ্রত তথাপি কেহ কাহাকেও সচেতন করিল না। রাত্রির প্রবহমান কালো প্রহরের অনুগামীভাবে দুইজনে দুইটি অশ্রুর নির্ঝর রচনা করিয়া চলিল। সেই দুঃখের ছদ্মবেশী সুখরাত্রির অবসানে এক সময়ে প্রভাতের পাখীর ঐকতান বাজিয়া উঠিলে ইষ্ট নাম স্মরণ করিয়া তাহারা শয্যাত্যাগ করিল। কেহ কাহারো মুখের দিকে তাকাইতে সাহস করিল না।

তাড়াতাড়ি আহারাদি শেষ করিয়া অম্বিকা দেবী যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। আত্মীয়-স্বজন ও গ্রামের লোকেরা আসিয়া প্রণাম করিয়া গেল। সকলেই বুঝিল, অনেকেই বলিল কর্তা মাতার গ্রামত্যাগ করাতে গ্রামের একটা পর্ব শেষ হইতে চলিয়াছে। মেয়েরা চোখ মুছিতে লাগিল, পুরুষেরা নীরব। এতক্ষণের গোলমালে লক্ষ্মীর কথা কাহারো মনে পড়ে নাই। অম্বিকা বলিলেন—আমার কাশী যাত্রার সেথো দাদুয়া কই?

তখন লক্ষ্মীর খোঁজ পড়িয়া গেল।

অম্বিকার কাশী যাইবার কথা শুনিয়া লক্ষ্মী বলিয়াছিল যে সেও দাদুয়ার সঙ্গে কাশী যাইবে। অম্বিকা বলিতেন কাশী যে অনেক দূরে। লক্ষ্মী বলিত—দূরে হইল তো কি হইল? তুমি যাইতে পারিলে আমি পারিব না কেন? অম্বিকা জিজ্ঞাসা করিতেন—মাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে? লক্ষ্মী উত্তর দিত—কতক্ষণই বা ছাড়িয়া থাকিতে হইবে—সন্ধ্যা বেলাতেই ফিরিয়া আসিবে। লক্ষ্মীর ধারণা ছিল যে দাদুয়া কখনোই দীর্ঘকাল বাড়ি ছাড়িয়া থাকিবে না, কাজেই অল্পক্ষণের মধ্যে একটা নূতন দেশ দেখিবার এই সুযোগ কেনই বা সে ছাড়িতে যাইবে!

এমন সময়ে একজন আসিয়া খবর দিল যে লক্ষ্মী পাল্কীতে চাপিয়া বসিয়া আছে। সকলে বুঝিল আজ তাহাকে লইয়া মুস্কিল বাধিবে। ইতিমধ্যে টোলের সারদা ঠাকুর আসিয়া বলিলেন যে কর্তা মা এবারে উঠতে হয়—লগ্ন সমুপস্থিত। অম্বিকা উঠিয়া গৃহ-বিগ্রহকে গললগ্নীকৃতবাসে প্রণাম করিয়া আদি বেলতলায় প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়া পাল্কীতে উঠিলেন। রুক্মিণী বাড়ির বধূ, সে এত লোকের সম্মুখে আসিতে পারে না। শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া নিজের ঘরে গিয়া সে আছাড় খাইয়া পড়িল।

অম্বিকা পাল্কীতে চড়িয়া লক্ষ্মীর মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন—দাদুয়া এবার আসি।

লক্ষ্মী বলিল—আবার আসতে যাবে কেন—আমিও তো সঙ্গে যাচ্ছি।

অম্বিকা বলিলেন—সে কি হয় মা, সে যে অনেক দূরের পথ।

লক্ষ্মী বলিল—দূরের পথ তো কি হ'ল? হেঁটে যেতে তো হবে না।

অম্বিকা বলিলেন—কাশীতে কি ছেলে মানুষে যায়?

লক্ষ্মী হটিবার নয়, সে বলিল—কেন? কাশীতে কি ছোট ছেলেমেয়ে নেই?

সকলে হাসিয়া উঠিল। লক্ষ্মী নামিবার কিছুমাত্র ত্বরা দেখাইল না, দিব্য নিশ্চিন্ত বসিয়া রহিল। এদিকে লগ্ন উত্তীর্ণ হয়, সকলে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু লক্ষ্মীর তাহাতে ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই। সে চুলের ফিতেটার প্রান্ত দাঁতে চাপিয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে জড়াইতে লাগিল। তাহাকে নামাইবার আর কোন উপায় নাই দেখিয়া কীর্তিনারায়ণ অগ্রসর হইয়া আসিল, চোখ বড় বড় করিয়া একবার মাত্র ডাকিল, লক্ষ্মী। পিতার ডাকে কন্যার মুখ শুকাইয়া গেল। সে পিতার চোখের ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া পাল্কী ছাড়িয়া নামিল, অম্বিকা তাহাকে ধরিবার জন্য হাত বাড়াইলেন, সে ধরা দিল না, ছুটিয়া বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেল। কীর্তিনারায়ণ একটা শুষ্ক প্রণাম করিয়া কর্তব্য সারিল, মাতা তাহার মাথায়

একবার হাত রাখিলেন। বেহারাগণ পাল্কী কাঁধে তুলিল। দরজা বন্ধ করিয়া দিবার পূর্বে অম্বিকা একবার, শেষবারের মতো আজন্মের বাড়িঘর দেখিয়া লইলেন। পাল্কী চলিতে লাগিল।

পাল্কীর দরজাটা একটু ফাঁক করিয়া গ্রাম দৃশ্য দেখিতে দেখিতে অম্বিকা দেবী চলিয়াছেন। এই গ্রামে পঞ্চাশ বৎসরকাল কাটিয়াছে তবু ইহার অধিকাংশই তাঁহার অদৃষ্ট। যতদিন বধূ ছিলেন বাড়ির বাহির হন নাই। প্রৌঢ় বয়সে সংসারের কর্ত্রী হইবার পরে তাঁহার গতিবিধির পরিধি অনেকটা বাড়িয়াছিল—তৎসত্ত্বেও গ্রামের কতটুকুই বা তিনি দেখিয়াছেন। কিন্তু চোখে না দেখিলেও সমস্তই তাঁহার কত পরিচিত। প্রত্যেকটি গাছ, প্রত্যেকটি বাড়িঘর, প্রত্যেকটি লোকের চেহারা ও ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে তাঁহার অধিগত।

দেউড়ি পার হইতেই অম্বিকা দেবীর চোখে পড়িল দর্শানির অতিথিশালা। কত পরদেশী লোক সেখানে আসিয়া বাসাহার পাইয়া থাকে। তখনি একজন পথিক ছাতির সহিত একটি পুঁটুলি বাঁধিয়া অতিথশালার রোয়াকে আসিয়া উঠিল। তারপরেই ওই যে গোয়ালঘর—গোরুর পাল মাঠে চরিতে গিয়াছে—কেবল দুটা গাই দাঁড়াইয়া শুষ্ক বিচালি চিবাইতেছে। গোয়ালঘরের পরেই পিলখানা। হাতীটা স্থির দাঁড়াইয়া আছে—অম্বিকার মনে হইল—তাহার চোখে যেন জলের ধারা।

অম্বিকা দেবী চমকিয়া উঠিলেন—এই সেই বট! আহা শীতের রোদ্দুরে জট মেলিয়া দিয়া সমস্ত গাছটা যেন চোখ বুঁজিয়া আরাম করিয়া রোদ পোহাইতেছে। সম্পূর্ণ গাছটা কখনো তিনি দেখেন নাই—ছাদের উপর হইতে কেবল তাহার মাথাটা দেখা যাইত। আর ওই যে আম বাগানের মধ্যে ছুতোর পাড়া। এত কাছে—তাঁহার ধারণা ছিল না জানি কতই দূরে। ছুতোরদের ঠক ঠক করিয়া কাঠ কাটিবার শব্দ শীতের নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে তিনি শুনিয়াছেন। ওই শব্দটা শুনিতে তাঁহার বড় ভালো লাগিত। সেই যে ছেলেবেলা রূপকথার তেপান্তরের রাজপুত্রের কাহিনী শুনিয়াছেন তাহার অশ্ব ক্ষুরের ধ্বনি বলিয়া মনে হইত ছুতোর পাড়ার ওই ঠক ঠক আওয়াজকে! আর ওই যে বাদামতলায় মুচির ঘর। তিলক বারান্দায় বসিয়া একটা ঢোলক মেরামত করিতেছে। তিলক তাহার খুব পরিচিত। যেদিন তাহার ঘরে অন্নাভাব হইত সে বিনা নোটিশে দর্শানির পাকশালার আঙিনায় গিয়া পাত পাতিয়া বসিয়া যাইত—বলিত, কর্তা মা প্রসাদ পেতে এলাম। অম্বিকা বলিতেন—এসেছিস বাবা, বোস, বোস। ও ঠাকুর, তিলক এসেছে, ওকে দেখে শুনে দিও।

হঠাৎ পাল্কীর ডান দিকে একটা হল্লা শুনিয়া সেদিককার দরজা ফাঁক করিলেন, দেখিলেন ইস্কুলের টিফিনের ছুটি হইয়াছে ছেলেরা হৈ হৈ করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার চোখে পড়িল—ঘোষেদের পেটমোটা বিশুকে! মা মরা ছেলে। তাহার মায়ের মৃত্যুর পরে অনেকদিন তিনি বিশুকে মানুষ করিয়াছিলেন। অম্বিকা ভাবিলেন, বিশু এরি মধ্যে ইস্কুলে আসিয়াছে। একবার তাঁহার ইচ্ছা হইল ছেলেটাকে একটু কাছে আনিয়া আদর করেন! কিন্তু তাহা হইবার নয়—তিনি যে বড়ঘরের গৃহিণী, নিজের ইচ্ছামত সব কাজ করিবার অধিকার তাঁহার নাই। তাঁহার বিস্ময় বোধ হইল—লোকে কেন বড়লোককে সুখী মনে করে!

পাল্কী বাজারের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া অন্য পথে চলিল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই মাঠের মধ্যে গিয়া পড়িল। ওই যে তিনু গোয়ালা বাঁকে করিয়া দুধ লইয়া চলিয়াছে—দর্শানির বাড়ির জন্যে। ও আজ কুড়ি বৎসরের অধিক দর্শানির বাড়ির দুধ জোগাইতেছে। এত বেলাতে। অম্বিকার মনে হইল বিলম্বের জন্য কতবার তিনি তিনুকে ভৎর্সনা করিয়াছেন। তিনু কখনই রাগ করিত না। অম্বিকাকে দেখিলেই বলিত দণ্ডবৎ হই কর্তা মা! অম্বিকা যদি বলিতেন—তোর এত দেরী হ'ল কেন রে? তিনু বলিত, কর্তা মা জন্তু জানোয়ার নিয়ে কারবার। ওই ছিল তার শেষ ও শ্রেষ্ঠ যুক্তি। অধিক কিছু বলিত না। অম্বিকার মনে হইল আহা। ও কত সুখী, ও গিয়া অনায়াসে দর্শানির দেউড়িতে প্রবেশ করিবে। কিন্তু তাঁহার আর—ওই যে রামহরি হরকরা থলি ভরা চিঠিপত্র লইয়া গ্রামে চলিয়াছে। এতক্ষণ হাঁটিতেছিল, পাল্কী দেখিয়া ছুটিবার ভাণ করিতেছে। ওর থলি না জানি শুভাশুভ কত সংবাদে পূর্ণ!

অল্পক্ষণের মধ্যেই গ্রামের মানব সম্পর্কের সূত্র ছিন্ন হইয়া গেল—তখন রহিল কেবল চারিদিকে অবারিত চাষের ক্ষেত—সরিষার ফুলে দিগন্ত অবধি পীতাভ। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল আর একদিন কবে যেন এমনি সরষে ফুলের পীতিমা দেখিয়াছিলেন! কবে? কোথায়? ওঃ তাই বটে! সে আজ পঞ্চাশ বৎসর আগেকার কথা! তখন তাঁহার বয়স ছিল নয়, সেদিন তিনি নূতন বধূরূপে চেলি পরিয়া, ঘোমটা টানিয়া এই পথেই, এমনি ফুল-ফোটা সর্ষেক্ষেতের আল ভাঙিয়া, পাল্কী চড়িয়া এই গ্রামে প্রবেশ করিতেছিলেন। সে আজ কত দিনের, কত বৎসরের কথা। আজও আবার সেইখানেই তেমনিভাবে পাল্কী চড়িয়া চলিয়াছেন। একই পথ, তবু কত প্রভেদ! সেদিনও চোখে তাঁহার অশ্রু যবনিকা ছিল, আজও সেই অশ্রু যবনিকা! দুই দিগন্তের দুই অশ্রু যবনিকার মধ্যবর্তী অর্ধ শতাব্দী ব্যাপী তাঁহার জীবনখণ্ড বিস্তৃত! সেই জীবনের অধিশ্বরী অশ্রুর ঘোমটা টানা দিগন্তের পরপারে আজ কোথায় চলিয়াছেন। তিনি আর ভাবিতে পারিলেন না। বিদায়ের পূর্বে কঠোর সংযমে যে বন্যাকে তিনি বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন—এখন তাহা বাঁধ ভাঙিয়া নামিল।

হঠাৎ পাল্কীর কোণে একটা শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখিলেন ন্যাকড়ায় জড়ানো কি যেন একটা নড়িতেছে। হাতে তুলিয়া দেখিলেন অস্ফুট চক্ষু একটা বিড়াল ছানা! লক্ষ্মীর বিড়াল ছানা! সে যে পাল্কীতে উঠিয়াছিল নামিয়া যাইবার সময়ে বিড়াল ছানাটিকে রাখিয়া গিয়াছে। তাহার দাদুয়ার উদ্দেশে তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ দান। বিড়াল ছানাটি লক্ষ্মীর বড় আদরের ছিল। কাহাকেও ছুঁইতে দিত না, কাহাকেও কাছে যাইতে দিত না, নিজের হাতে সল্‌তে করিয়া দুধ পান করাইত, নিজের বিছানার পাশে শোয়াইত। কেহ চাহিলে লক্ষ্মী মারিতে যাইত, কেহ লুকাইয়া রাখিলে কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থ বাধাইয়া দিত।

কেবল তাহার এক ক্ষোভ ছিল যে, তাহার দাদুয়া এমন সুন্দর বিড়ালছানাটিকে কখনো কোলে লইয়া আদর করেন না। লক্ষ্মী বলিত—দাদুয়া একবার কোলে নাও না। এই বলিয়া তাঁহার কোলে দিতে যাইত।

অম্বিকা বলিতেন—দূর, দূর, আমাকে আবার স্নান করাস না।

লক্ষ্মী বড় রাগ করিত। বলিত—আর কাউকে ছুঁতে দিই না, তোমার কোলে যে দিতে যাচ্ছি, তোমার ভাগ্য!

অম্বিকা বলিতেন—সরিয়ে নিয়ে যা বাপু! ছুঁলে এখন অবেলায় আমাকে স্নান করতে হবে।

সেই বহু আদরের বিড়ালছানাটি লক্ষ্মী তাহার বালিকা হৃদয়ের গোপন দানের মতো সকলের অজ্ঞাতসারে পাল্কীর মধ্যে রাখিয়া পলায়ন করিয়াছে! সে খুব সম্ভব ভাবিয়াছিল দাদুয়া এবারে নিশ্চয় বুঝিতে পারিবে লক্ষ্মী তাহাকে কতখানি ভালবাসে!

যে-বিড়ালছানাটিকে আগে কখনো স্পর্শ করেন নাই এখন তাহাকে সাগ্রহে কোলে টানিয়া লইয়া অম্বিকা দেবী জড়াইয়া ধরিলেন। চোখের জল দ্বিগুণ বেগে নামিল। বিড়ালছানাটি তাহার কোলের মধ্যে নীরবে পড়িয়া রহিল, শব্দ করিল না, নড়িল না, সে কি অম্বিকার দুঃখের ভূমিকা বুঝিতে পারিতেছিল! অম্বিকার অশ্রু পড়িয়া বিড়ালছানার মাথা ভিজিয়া যাইতে লাগিল! পাল্কী চলিতেছে—বেহারাদের সুর-সংযুক্ত ধ্বনিতে বিশ্বের সমস্ত বেদনা ঘনীভূত হইয়া ধ্বনিত হইতে লাগিল। পাল্কী চলিতেই লাগিল।

(চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত)

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

(২)

অগত্যা মাধব চিঠি দিলেন। চৈতন্য কাব্যতীর্থ দুই বন্ধুকে যাত্রাকালে পথ দেখাইয়া ও বাড়ি বুঝাইয়া দিলেন। বলিলেন, "এই রাস্তার মোড় ঘুরতেই পাঁচিল দিয়ে ঘেরা দোতলা বাড়ি, দেখলেই চিনতে পারবে। বাসুকী ভট্টাচার্য মস্ত পণ্ডিত, তিনি সব ব্যবস্থা করে দেবেন।" চৈতন্য বিদায় লইলেন।

মিনিট দুইয়ের মধ্যেই উভয়ে গন্তব্যস্থলে পোঁছিল। জীর্ণ দ্বিতল গৃহ। বাগানটি কিন্তু খুব সুন্দর, অজস্র ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। সূর্য ডুবিয়া গিয়াছে, কিন্তু তখনও সূর্যাস্তের সোনালি আলোকে চারিদিক ঝলমল করিতেছে। বাড়ি মেরামতের জন্য মিস্ত্রি লাগিয়াছিল। তাহারা বিদায় লইবার জন্য গেটের কাছে দাঁড়াইয়া কলরব করিতেছিল, আর এক-জন হ্যাট-কোটধারী কৃষ্ণবর্ণ বাঙালী সাহেব পাইপ-মুখে টাকা গণিয়া দিতে দিতে গৃহ সংস্কার বিষয়ে ভুল ত্রুটির জন্য তাহাদিগকে হিন্দীতে কি সব ধমক দিতেছিলেন। বাড়িটি গ্রামের শেষ প্রান্তে, তাহার পর আর বাড়ি নাই। পথ ভুল হইয়াছে ভাবিয়া ভোঁদা এবং অন্তু হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিল।

মাধব ভট্টাচার্য তখনও দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফির্‌ল্যা যে?"

অন্তু বলিল, "বাড়ি খুঁজে পেলুম না।"

মাধব বলিলেন, "বারি আবার যাইব কই? বারির কি পাখা হৈসে?"

"আজ্ঞে, যে বাড়ি ব'লে দিলেন সেখানে একজন বেঁটে মতন সায়েব মিস্ত্রি খাটাচ্ছে। ভট্টাচার্য বাড়ি বলে মনে হ'ল না।"

মাধব ভট্টাচার্য হাহা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। হাসি থামিলে বলিলেন, "খাইসে! আরে ওই তো বাসুকী, আমাগো বিপ্রদাস দাদার পোলা। হঃ! তোমরা কি বট্‌চার্যের শিখার খোঁজ করসিলা? হাঃ, হাঃ, হাঃ! আরে বেলাতফেরত সইব্য বট্‌চার্য, শিখা পাইবা কই? উয়ার নামই বাসুকী, বোঝ্‌লা?"

ভোঁদা এবং অন্তু অপ্রস্তুত হইয়া ফিরিয়া গেল। সাহেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে কি ভাষায় কথা বলা হইবে তাহা লইয়া পথের মধ্যে দুই বন্ধুতে তর্ক চলিল। ভোঁদা বলিল, "বাঙালীর ছেলে, সোজা বাংলায় ব'লব, পারবেন কি পারবেন না ব'লে দিন স্পষ্ট।" অন্তু বলিল, "নারে না, গোড়াতেই ও-রকম গোঁয়ারতুমি ক'রলে সব মাটি হ'য়ে যাবে। হেডমাস্টারের ঘরে ঢুকতে যেমন আগে জিজ্ঞেস ক'রতে হয়, 'মে আই কাম্‌ ইন?' তেমনি জিজ্ঞেস করব, 'ইয়েস' ব'ললে তবে ঢুকব। ঢুকেই ব'লব, 'গুড মর্ণিং সার, হাউ ডু ইউ ডু।" ভোঁদা বলিল, "তোর যেমন বিদ্যে, সন্ধ্যেবেলা গুড্‌মর্ণিং কি রে?" অন্তু বলিল, "ঐ হ'ল, গুড্‌ ইভনিং সার।" ভোঁদা বলিল, "বেশ বাপু, তুই যা খুশি বলিস, আমি বাংলাই ব'লব।"

মিস্ত্রিরা চলিয়া গিয়াছিল, সাহেব আকাশের দিকে তাকাইয়া পা ফাঁক করিয়া পাইপ টানিতেছিল। গেটে পোঁছিয়া অন্তু প্রশ্ন করিল, "মে আই কাম ইন সার?" বাঙালী সাহেব অর্থাৎ শাস্ত্রী মহাশয় আগাইয়া অসিয়া গেট খুলিয়া ধরিয়া বলিলেন, "ডু প্লিজ।" তারপর ইংরেজিতে অনেকগুলো প্রশ্ন করিয়া বসিলেন। অন্তুর সযত্নরচিত আলাপের খেই হারাইয়া গেল। ইয়েস্‌ তো আসিল না? এ রকম তো কথা ছিল না? তাহাকে নীরব দেখিয়া ভোঁদা খাঁটি বাংলায় মুখরক্ষা করিল। বলিল, "আমরা মাধব ভট্টাচার্য মশায়ের কাছ থেকে এই চিঠি-খানা নিয়ে এসেছিলুম।" চিঠি পড়িতে পড়িতে শাস্ত্রী বার-দুই শিস্‌ দিলেন, চিঠি শেষ করিয়া কিছুক্ষণ দুই বন্ধুর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন, "বাই জোভ্‌, দ্যাটস র‍্যাদার ইঞ্জিনিয়াস! আমারও দু'জোড়া জুতো গেছে। তা' আমি পুরোহিত হ'তে রাজি আছি। মন্ত্র দেখেশুনে নেব' এখন, না পাই তো বানিয়েও নিতে পারব। তবে কি

জানো, কুকুরগুলোকে হিপ্‌নোটাইজ করে টেনে আনা আমার দ্বারা হবে না। মন্ত্রগুলো গুরুর কাছ থেকে তো পাইনি, তেমন বিশ্বাসের জোর নেই।"

ভোঁদা এবং অন্তু সমস্বরে বলিল, "মন্ত্রের জোরে সত্যি কুকুরকে টেনে আনা যায়?"

শাস্ত্রী মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "কি করে ব'লব বলো? নিজেতো দেখিনি। শুনেছি সেকালে যেত, একালেও রোজারা নাকি ও সব একটু আধটু পারে। আমরা মন্ত্রই জানি, কিছু মন্ত্রের ওপর তেমন অধিকার নেই তো আমাদের। কলির ব্রাহ্মণের সে ব্রহ্মতেজও নেই আর। তা, তার জন্যে ভাবছ কেন? সেজন্যে কিছু আটকাবে না। তোমরা তো দলে ভারী আছ, সবাই দু'চারটে ক'রে এনে এক জায়গায় জড়ো করো না, তারপর যা ব্যবস্থা করবার আমি করব।"

ভোঁদা বড়ই নিরাশ হইল। তথাপি হাল ছাড়িল না। বলিল "আচ্ছা, যজ্ঞের জন্য উপকরণ কি কি লাগবে? কি রকম আন্দাজ খরচ হবে মনে হয়?"

শাস্ত্রী চিন্তা করিয়া বলিলেন, "সেটা তো আমি এখন চট্‌ ক'রে ব'লতে পারছি না, আমাদের সমস্তই পুঁথিগত বিদ্যে। কাল আমি ফর্দ ক'রে রাখব এখন, তোমরা পরশু এস। হ্যাঁ একটা কথা। তোমরা সবাই ছেলেছোকরা, না বড়োরা কেউ আছেন এর মধ্যে? কেউ নেই? আমার মনে হয় এ রকম একটা ব্যাপারে তাঁদের মতামত নিলে ভালো ক'রতে। শেষে পুলিস কেস হ'তে পারে জেল হাজত জরিমানা অনেক কিছু হ'তে পারে। চারদিকে আটঘাট বেঁধে কাজ ক'রতে হবে।"

ভোঁদা এবং অন্তু ক্রমেই হতাশ হইয়া পড়িতেছিল। বড়োরা কি সকলে মত দিবেন? তা ছাড়া কতকগুলো কুকুর মারার জন্য জেলই বা হইবে কেন? অন্তুর প্রশ্নের উত্তরে শাস্ত্রী বলিলেন, "কুকুর তো পরের কথা, আমার বাড়ির ঐ মুরগীটাকে আমার হুকুম না নিয়ে তুমি মারো না দেখি তোমায় জেল দিতে পারি কিনা দেখ। তোমরা যে কাজে হাত দিয়েছ এতে তো শুধু ডোমপাড়ার জেলেপাড়ার বেওয়ারিশ কুকুর মরবে না, বড়লোকের পোষাকুকুরও অনেক মরবে। তার জন্যে থানা পুলিস হবে না মনে করেছ? আমার মনে হয় সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করা ভালো। সকলে বলতে কি আমি গ্রামের প্রত্যেককে ডাকতে বলছি? কেবল মাথা গোছের দু'চার জন। এই ধরো জমিদার অপরেশবাবু, সিঁটকের কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট ভবেশ বাবু, ভেটকিপোতার আড়তদার গদাধরবাবু, নিমগাছির ডাক্তার নিবারণ বাবু, রিটায়ার্ড সিভিল সার্জন রাধাশ্যাম দস্তিদার এইরকম জনকয়েকের সঙ্গে কথা ক'য়ো দেখ। এ গ্রামের মাখন ভটাচার্য মশায় তো তোমাদের দলে ভিড়েছেন আগেই। আমি বলি কি এমনভাবে কাজ করো যাতে পরে আফসোস করতে না হয়। আমি অবশ্য তোমাদের পক্ষেই আছি, কিন্তু কর্তৃপক্ষ কেউ এর মধ্যে না থাকলে এত বড়ো একটা হত্যাকাণ্ডে হাত দিতে ভরসা পাচ্ছি না। যদি সকলের মত হয় তবে আমার এই বাগানেই যজ্ঞের আয়োজন করতে পারা যাবে। পাঁচিল-ঘেরা আছে চারদিকে, একবার ঢুকলে একটা কুকুরের সাধ্য নেই বেরিয়ে পালায়।"

ভোঁদা বলিল, "কিন্তু সবার মত নিতে গেলে শেষ পর্যন্ত কিছুই হবে না। দস্তিদারদের, গদাধরবাবুদের তো বাড়িতে কুকুর। বরং বেশি জানাজানি হ'লে তাঁরা সবাই বাধা দেবেন আগে থেকে। যা করবার গোপনে এবং তাড়াতাড়ি করা দরকার।"

শাস্ত্রী বলিলেন, "এটা তোমার মতো কথা হ'ল না। গুপ্ত যুগের পর এই প্রথম এতবড়ো একটা আয়োজন হচ্ছে, চোরের মতো চুপি চুপি করতে যাবে কেন? সাতখানা গাঁ নেমন্তন্ন ক'রে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে করো। তাছাড়া শাস্ত্র বলে "শুভস্য শীঘ্রং, অশুভস্য কালহরণং।" তা এই কুকুর পোড়ানো কাজটা তো ঠিক শুভকার্য হবে না, সুতরাং একটু কালহরণ ক'রে দেখতে আপত্তি কি? কে শত্রু কে মিত্র বুঝতে পারবে, তা ছাড়া কেউ কেউ হয়তো আর্থিক সাহায্যও করতে পারেন। সেটাও তো দরকার?

ভোঁদা বলিল, "আপনি বলছেন, আমরা চেষ্টা করব। গুরুজনরা মত দিলে কাজের সুবিধা নিশ্চয়ই হবে, কিন্তু মত না দিলেও যজ্ঞ বন্ধ হবে না, এ আপনি জেনে রাখবেন।" কথা রহিল আগামী পরশু বড়োদের দলে ভিড়াইবার চেষ্টার ফলাফল কতদূর কি হয় তাহারা জানাইয়া যাইবে এবং যজ্ঞের জন্য ফর্দ লইয়া যাইবে। শাস্ত্রী বলিলেন "আচ্ছা তাহ'লে এখন এস, পরশু দেখা হবে। পুনর্দর্শনায় চ।"

রান্নাঘর হইতে মাংস রান্নার সুগন্ধ আসিতেছিল, শাস্ত্রী সম্ভবত তাহারই আকর্ষণে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অন্তু ও ভোঁদা বিরস বদনে বিদায় লইল। কুকুর যদি তাহারাই ধরিয়া আনিবে তাহা হইলে আর মন্ত্রের শক্তি কিসের? পণ্ডিতদের বিদ্যা বোঝা গিয়াছে এবার শেষ চেষ্টা হিসাবে শাস্ত্রী মহাশয়ের কথামতো রোজার বিদ্যা পরীক্ষা করিবার জন্য তাহারা দুইজনে ডোমপাড়া চলিল, ভূতের রোজা চিতু ডোমের বাড়ি।

ততক্ষণে অন্ধকার বেশ ঘোর হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু চিতু তখনও ঘরের চালে বসিয়া খড়ের গুঁজি দিতেছিল, তাহার ছেলে নীচে দাঁড়াইয়া খড় তুলিয়া দিতেছিল। রোজার কাজটা উপরি, বেচারা পেটের দায়ে সারাদিন পরের বাড়ি জন খাটে, নিজের বাড়ির কাজে সময় দিতে পারে না। দুই বন্ধুকে আসিতে দেখিয়া চিতু হাত না থামাইয়াই বলিল, পেন্নাম হই দা ঠাকুর। ইদিকে কি মনে করে? আজ কার মুক দেখে উঠেছিনু গো?" ছেলেকে ধমক দিয়া বলিল, "মুয়ে আগুন, হাঁ করে দেঁড়িয়ে রইলি কেন, খড় দে? হাতে কাজ কর, মুকে হরি বল!" লোকটা বড়ো কাজে বকে, ভোঁদাদের বাড়ি দুই দিন মজুরী করিতে গিয়া যমপুরী হইতে তাহার পত্নীর হাতের মুঠার সন্দেশ লইয়া প্রত্যাবর্তনের কথা সে ছেলেদের শুনাইয়াছিল। তাহার গল্প শুনিতে কাজে ভালো, কিন্তু এখন তো গল্প শুনিলে চলিবে না। ভোঁদা একেবারে কাজের কথা পাড়িয়া বসিল। বলিল, "চিতু, তুমি কি কি বিদ্যে জানো?"

অন্ধকারে আর চোখে দেখা যায় না, এবার চিতু কাজ বন্ধ করিল। ঘরের চাল হইতে নামিয়া দুই হাত জোড় করিয়া উর্ধ্ব মুখে গুরুর উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া বলিল, "আজ্ঞে গুরুর আশীর্বাদে আর আপনাদের পাঁচজনের দয়ায় বিদ্যে কিছু কিছু জানি বই কি?" আঙুলে গণিতে গণিতে বলিয়া চলিল, 'এই ধরো ভূত ঝাড়ানো, পেঁচো ছাড়ানো, সাপ ধরা, সাপের নিলবন্ধন, বাড়িবন্ধন, হাঁড়িবন্ধন, দেহবন্ধন, এই ধরো গে গামছাপড়া, সরষেপড়া, জলপড়া, তেলপড়া, ফুলপড়া, মাটিপড়া, বাটিচালা, থালাচালা, নলচালা, হাতচালা, ক্ষুরচালা এই ধরোগে বশীকরণ, বাণবিদ্যে, নিশুতি, নখদর্পন—'

বোঝা গেল সংসারে এমন কোনো অলৌকিক বিদ্যা নাই যাহা চিতু জানে না। এত বড়ো একটা গুণীলোক গ্রামে থাকিতে ভোঁদারা কিনা পণ্ডিতদের কাছে মন্ত্র চাহিতে গিয়াছিল। আশার উৎসাহে তাহাদের হৃদয় আবার নাচিয়া উঠিল। এদিকে চিতুর বিদ্যার তালিকা আর শেষ হইতে চায় না। ভোঁদা শেষটা অসহিষ্ণুভাবে তাহার বক্তৃতাস্রোতে বাধা দিয়া বলিল, "চিতু, তুমি এমন কোন মন্তর জানো, যার জোরে সাতখানা গাঁয়ের সবক'টা কুকুরকে এক জায়গায় টেনে আনা যায়?

এই সোজাসুজি প্রশ্নে চিতু একটু দমিয়া গেল। আমতা আমতা করিয়া বলিল, "আজ্ঞে জানবুনি কেন দা'ঠাকুর, জানিনি এমন বিদ্যে নেই। ঐ কাঁকড়ির দুলেদের নেতাকে দেকেছ? ও-বছর তার মা এসে বললে, কি হবে বাবা, জামাই মেয়েকে ন্যায়নে; সাত বছর বে হয়েছে একবার এমুখো হলনি। তা পেতায় যাবেনে দা'ঠাকুর, তুক করে একটা পান দিয়েছিনু। বলেছিনু, গাঁয়ের লোক কাউকে দিয়ে খেইয়ে দিস, তারপর দেখব সে কত বড়ো মরদ। পরের

দিন সকালেই জামাই এসে হাজির। নেত্যর মা ছুটে এসেছে, 'কি হবে বাবা, একটা ট্যাকা না হলে তো মান থাকে নে। কাচে ছিলনি, আমার ভেয়ের বাড়ি থেকে চেয়ে আট আনা এনে দিনু তবে মাগী বিদেয় হয়। সে পয়সা আর দিলে নে।" চিতুর ছেলে তামাক সাজিয়া আনিয়াছিল, চিতু অতীতের সেই আট আনার শোকে বিষণ্ণ বদনে তামাক টানিতে লাগিল।

এদিকে ভোঁদা এবং অন্তু দুইজনেরই অবস্থা কাহিল: বুকের মধ্যে তোলপাড় চলিতেছে, আশা-নিরাশায় দুইজনারই মাথা খারাপ হইবার জোগাড়। সাতখানি গ্রামের প্রত্যেকটি কুকুরকে গিয়া পান খাওয়াইয়া আসিতে হইবে নাকি?

কুকুরেরা পান খাইবে তো? কাজটা অবশ্য এভাবে হইলে বেশ শান্তিপূর্ণভাবে যজ্ঞ সমাধা হইতে পারিত। আগের দিন চুপি চুপি পান খাওয়াইয়া দিয়া আসা হইল; পরের দিন সাতখানা গ্রামের কুকুর নিঃশব্দে সুড় সুড় করিয়া যজ্ঞস্থলে আসিয়া উপস্থিত।

ছবিটা কল্পনানেত্রে দেখিতে দেখিতে ভোঁদা সন্দেহভরে বলিল, "কুকুর কি পান খায়?"

চিতু বলিল, "কুকুর কি জামাই, যে পান খাওয়াতে যাবে? সে বিয়ের যে মন্তর। নিদুলির মন্তরে মন পাড়িয়ে রাখব সব বেটাকে, তোমরা একটা গরুরগাড়ি নে গাঁ ঘুরে এলেই হবে। উঠোনে সরষে পড়া আছে, কত কি আছে। তা সে কথার কি হবে দাঠাকুর?"

ভোঁদা সগর্বে বলিল, "কুকুরমেধ যজ্ঞ হবে। দেশে আর কুকুর রাখব না।"

চিতু তামাকে আর একটা টান দিয়া বলিল, "কুকুর মেরে যজ্ঞি হবে? আমি তবে ওতে নেই দাঠাকুর, আমার গুরুর নিষেধ আছে। কুষ্টের জীব, আমার কোন অনিষ্ট করেনি, তাদের হত্যে করে কি শেষে নরকে পচে মরব? এই বয়েস ষোল-গণ্ডা বছর পেরমাই হল—আর কদিন?"

ব্যস, আশার সপ্তম স্বর্গ হইতে হঠাৎ ধপাস করিয়া নিরাশার নরককুণ্ডে পতন। কুষ্মণে কুকুরের প্রয়োজনের কথাটা বলা হইয়া গিয়াছে। ভোঁদা এবং অন্তু অনেক কাকুতি-মিনতি করিল, দুই-দুইটা টাকা দিতে রাজি হইল, কিন্তু চিতুর ধর্মজ্ঞান কমিল না। সে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "একটা শ্যাল ডাকলে তো পঁচিশটা কুকুর জড়ো হয়, তার জন্য কি গুরুদত্ত মন্তরের অপমান করতে পারি? বাপরে? আমার তো আর এদেশের রাম-শ্যামার কাছে শেকা মন্তর নয়, আমার শিক্ষে সেই খাস কামরূপ কামিখ্যেয়। বললে পেত্যয় যাবেনে দাঠাকুর, ঐ যে পুকুরটা দেকছ, ঐখেনে ছিল দত্ত বাবুদের বাগান। সেই বাগানের মাজখেনে ছিল এক দো-ফলা আঁবের গাছ। তেমন আঁব তো আজকাল আর চোকে দেখিনে দাঠাকুর। যেমন গুড়পাড়া মিষ্টি তেমনি রাজসই চেহারা। একটা খেলে আর সে বেলা ভাত খেতে হোত্তুনি। তকোন আমার বয়েস কতোই হবে, এই জোর চার গণ্ডা কি পাঁচগণ্ডা। একদিন চাঁদনি আত্তিরে সেই গাছে উঠিচি চুরি করে আঁব খেতে। তাকোন ঐ দত্তদের একটা ঝি ছেল, তার নাম বুঝি কি যেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েচে জগদম্বা। সে কেমন করে সেই সময় আমায় দেকেচে। আর যায় কোতা! গাচ চলতে লেগেচে। আমার তো ভয়ে আত্মারাম খাঁচাছাড়া। দু হাত দিয়ে একটা মোটা ডাল জড়িয়ে না ধরে তেমনি কান্না জুড়ে দিইচি। নাবতেও পারিনি পালাতেও পারিনি। সে কি চলা দাঠাকুর, সাঁ-সাঁ করে সারা আত গাছ চলেছেন যেন এল গাড়ি ছুটেছেন।" চিতু তামাক টানিতে লাগিল।

কোথায় গিয়াছে শ্বমেধ, কোথায় গিয়াছে আশানিরাশার দ্বন্দ্ব। দুই বন্ধু নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া গল্প শুনিতেছিল। বলিল, "তারপর?"

মুখ হইতে হুঁকাটা নামাইয়া চিতু বলিল, "তারপর সকালবেলা কামিখ্যে দেবীর মন্দিরের দরজায় গিয়ে তবে গাচ থামল। তাকোন হঠাৎ, বললে পেত্যয় যাবেনে দাঠাকুর, আমার হয়ে গেল শাপে বর। মন্দিরের দোরে বসে কাঁদিচি, খুব খিদে লেগেচে। এমন সময় ইয়া গোঁফ, ইয়া দাড়ি এক সন্নিসী ঠাকুর এসে হাজির। বললে "আ মোলো বুড়ো মিন্সে কাঁদিচস? তুই নিত্তীমির আঁবুড়ে ডোম, তোর বাপঠাকুদ্দা লেঠেলের সর্দার ছেল; মাথা কেটে গেলে রা কাড়ত্তোনি, চোকে এক ফোঁটা জল দ্যাকা যেত্তুনি; —তুই ব্যাটা তাদের নাম ডোবালি? আয় আমার সঙ্গে, কি খাবি বল্?" তারপর কত কি যে সুখাদ্য খাওয়ালে তার নামও জানিনি। কত যত্ন করলে দাঠাকুর, তা আর পাপমুখে কি বলব? শেষে বললে, "বিদ্যে শিকবি তো আমার বিদ্যেধরী মায়ের কাচে মন্তর নে।" তা' বিদ্যেধরী, না বিদ্যেধরী। উপেও বিদ্যেধরী গুণেও বিদ্যেধরী! মা বলে বাড়িতে রইনু, কত কি শিকনু দাঠাকুর কি বলব। সারাদিন সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতুম, জলটাই যা কেবল খেত্তুনি হাতে তা ছাড়া আর কোনো বিচের ছিলুনি; বাড়ির ছেলের মতোই ছিনু দশটি বচ্ছোর। মাচ কি সস্তা গো দাঠাকুর সে দেশে, বাজারটা হাটটা করতুম, দুটি বেলা মাচ ভাত পেসাদ পেতুম। সুকেই ছিনুগো, শেষটায় আমারই দুর্মতি ধরল, অত সুক সইল নি। এখন হয়েচে কি একদিন আমাবস্যের রাত্তির, মা ঠাকরুণ বললে, "চিতু আজ চাতারে যা'ব, তুই বাজনা বাজাতে পারবি?" বল্লু "কেন পারবুনি? কি রকম কি ক'রতে হবে আপনি ব'লে দিয়ো।" মা ঠাকরুন বললে, "খুব সহজ বাজনা। তুই মাদল হাতে নিয়ে শ্মশানের এপাশে বসবি, আর শ্মশানের ওপাশে আর একজন বসবে মাদল নিয়ে। শ্মশান না শ্মশান, ফাঁকা মাঠ ধু ধু করছে, জনমনিষ্যি নেই ধারের কাছে। তা বললে, "আমি তোর পেছনে দাঁড়াব, আর আমার এক গুরুবোন সৌদামিনী দিদি এসেচে চন্দ্রনাথ পাহাড় থেকে, সে দাঁড়াবে ওধারে। আমি তোর মাতার ওপর দে ডাক ছেড়ে উড়েগে ওধারে পড়ব, সে ওমনি ডাক ছেড়ে উড়ে এসে আমার জায়গা নেবে। এইভাবে সারারাত খেলা চ'লবে। তুই চোক তুলবিনি, আমি হাঁক ছাড়লেই 'গুর গুর গুর গুর গুর গুর গুম্, গুর গুর গুর গুর গুর গুর গুম্' এইভাবে বাজিয়ে যাবি। আমি মাটিতে নেবেই ঝম্ ক'রে করতালে ঘা দোবো, আর তুই থামবি।" তা' বলব কি দাঠাকুর, তিন ঘণ্টার ওপর ঠায় মাটির দিকে তাকিয়ে তো বাজানু। তারপর কি কুবুদ্ধি হ'ল, ভাবনু, কতায় বলে ডাইনের মরণ চাওরে। তা' এমন খেলাটা জমেচে একবার দেখবুনি? একবারটি চোক তুললে আর কে দেকচে? ও বাবা! চোক তুলতেই দেখি, সৌদামিনী ঠাকরুন আমার মাতার ওপরে! অন্ধকার আত্তির আলো ক'রে উড়ে এসচে, সব্বাঙ্গে কিছুটি নেই। কবো কি দাঠাকুর, আমার মাথা ঘুরে গেল,—বাজনার তাল গেল কেটে। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকরুণ সোঁ ক'রে নেবে এসে ধাঁই করে আমার মাথায় এমন এক মেয়ে লাতি না দেলে, আমি তো অজ্ঞান! জ্ঞান হ'তে মাঠাকরুণ বললে, "চিতু, আর না তুই দেশে যা।" কত পায়ে ধরনু, কত কান্নাকাটি করনু, কিছুতে টলাতে পারনু নি। তাকোন চলে বেরিইচি। তাকোন পতে এসে এক কৌটা সিঁদুর আর দশটা ট্যাকা দে ব'ললে, "যা ক'রেচ, করেচ আর কখনো মন্দ পতে যেওনি, কারু ক্ষেতি কোরনি, তাহলে নিব্বংশ হ'বে।" সেই থেকে দাঠাকুর, আমারও প্রিতিজ্ঞে, কারু ভালো ছাড়া মন্দটি করবুনি, তাতে দুবেলা দুমুঠো জোটে ভালো, না হয় দুদিন উপোস যায় সেও ভালো।"

চিতুর উপাখ্যান শেষ হইল। ভোঁদা বলিল, "কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ না চিতু, এতে বহুলোকের উপকার হবে। কুকুরের অত্যাচারে দেশ রসাতলে গেল। তোমরা গুণী লোক, তোমরা যদি এর প্রতীকার না করো তবে কে করবে বলো?" তোষামোদে দেবতা প্রসন্ন হন, চিতু তো সামান্য ব্যক্তি। সে এক গাল হাসিল কিন্তু কোট ছাড়িল না। এবার অন্য ওজুহাত বাহির করিল। বলিল, "দাঠাকুর আপনি তো ব'ললে কুকুর; দেবতা ব্রাহ্মণ কার মধ্যে কে আছেন বলা তো যায় না?" তারপর অদূরে শায়িত একটি ঘিয়েভাজা জাতীয় লোম ওঠা কুকুরকে দেখাইয়া বলিল, "ঐ যে দেকচো

শুয়ে আছেন, উনি আমাদের কাঁকড়ির ভূধর চাটুজ্যে। বিশবচ্ছর হ'ল গত হয়েছেন, এখনও নাম করলে হাঁড়ি ফাটে। আমরা ছোটো বেলায় ওনার বাড়িতে যেতুম কিনা, দেখলেই খ্যাঁক খ্যাঁক ক'রে তেড়ে এসতো। আবার ইদিকে ওনার গিন্নী ছিলেন অন্নপুন্নো, নুকিয়ে চুরিয়ে নিজে না খেয়ে আমাদের কাঙ্গাল গরিবদের খেতে দিতো। তা' ভূধরঠাকুর হাড় কেপ্পন, সইতে পারবে কেন? দেখতে পেলেই তেড়ে এসতো; ব'লতো, "বেরো শালারা। আমি শালা আধপেটা খেয়ে পয়সা করেছি দুটো; আর তোরা শালারা ভরপেট খেয়ে যাবি মাগ্‌নায়।" তা' ঠাকুরের দুদ্দশাও তেমনি হয়েচে দা'ঠাকুর। আর জম্মে ক্ষীরি ময়রাণীর ভিটেটা মিথ্যে মামলা ক'রে নেছেল, তা' ক্ষীরি তার শোধ নেছে। সেবারে ক্ষীরি মেলাতলায় দে'ড়িয়ে বলেছেল, "তোমরা কেউ কিছু ক'রলেনে? বেশ, আমি একাই ওকে দেখব। ওর কান কাটব, নাক কাটব, হাত পা ভেঙ্গে আধমরা ক'রে ছাড়ব। বামুনে মানুষে, পেরাণে মারবুনি, কিন্তু এমন শিক্ষে দে'ব যে বাপের জম্মে ভুলবে নে। তা শিক্ষে দিয়েছে দা'ঠাকুর! সে জম্মে হঠাৎ ওলাওঠো হ'য়ে মরে গেল, কিছু করতে পারলেনে, এ জম্মে শিক্ষে দিয়েছে। ঠাকুর গেছে দস্তিদার বাড়ি চুরি ক'রে হাঁড়ি খেতে, ক্ষীরি ময়রাণী যে সেখানে ডালকুত্তো হ'য়ে আছে তাতো জানে না? তা' একটি কথা মিথ্যে হয়নি ক্ষীরির। কান ছিঁ'ড়ে দিয়েছে, নাক কামড়ে নিয়েছে, পা ভেঙ্গে আধমরা ক'রে ছেড়ে দিয়েছে, নেহাৎ বামুন ব'লে পেরাণটায় ঘা দেয়নি। তা দা' ঠাকুর, ওই বেন্ধ বাহ্মণকে সরষে চেলে তোমাদের গাঁয়ে টেনে নে যেতে গেলে উনি কি আর বাঁচবে? উনি তো পথেই মারা যাবে আজ্ঞে? শেষে কি বেহ্মহত্যের পাতক কিনব? না দা' ঠাকুর, ও আমার দ্বারা হবেনে। ও চণ্ডালের কাজ আমি পারবুনি। আপনারা অন্য লোক দ্যাকো।"

নিতান্ত নিরাশ হইয়া ভোঁদা এবং অন্তু সে রাত্রে দুইজনে বাড়ি ফিরিল। পরদিন টিফিনের ঘণ্টায় গুপ্ত পরামর্শ সভায় স্থির হইল, কুকুরগুলোকে জোর করিয়া ধরিয়া আনা সম্ভব হইবে না, অগত্যা লোভ দেখাইয়া আনিতে হইবে। কাবুলীওয়ালা, ভালুক এবং হাতী যখন একান্তই কাছাকাছি পাওয়া যাইবে না, তখন শিয়ালডাক ডাকিয়াই সন্ধ্যার পর কুকুর সংগ্রহ করিতে হইবে, জ্যান্ত শিয়াল বা শিয়ালের বাচ্চা সংগ্রহ করিতে পারিলে অবশ্য আরও ভালো হয়।

ইতিমধ্যে বড়োদের মতামত সংগ্রহের কাজ আছে। সেদিন ছুটির পর ভোঁদা ও অন্তু সিঁটকের কংগ্রেস সভাপতি ভবেশবাবুর বাড়ি গিয়া তাহাদের লিখিত আর্জি পেশ করিল। ভবেশবাবু কিছুক্ষণ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন, "ওহে গণপতি, এরা বলে কিহে?" গণপতি প্রতিদিন বৈকালে খবরের কাগজ পড়িতে এবং রাজাউজীর মারার পরামর্শ করিতে আসেন, বলিলেন, "কুকুর হ'ল প্রভুভক্তির প্রতীক। আমরা আমাদের প্রভু ইংরেজকেই যখন বিদায় করতে চাইছি তখন নিশ্চয়ই আমাদের প্রভুভক্তির অভাব ঘটেছে। সেক্ষেত্রে প্রভুভক্ত জীবদের সঙ্গে একত্রে বাস করা যদি আমরা পছন্দ না করি, তাতে বলবার কি আছে? তা' ছাড়া কুকুরকে লাই দিলে মাথায় ওঠে, ওদের প্রশ্রয় দিতে নেই।" ভবেশবাবু দম লইয়া বলিলেন, "তা নেই বটে, কিন্তু ওরা যাবে কোথা? ওদের তাই ব'লে হত্যা ক'রতে হবে? এ কিন্তু আমার মত নয়। ঈশ্বরের সৃষ্টিতে সবারই স্থান আছে, সবারই বেঁ'চে থাকবার অধিকার আছে। তোমরা কুকুর মারবার কে?"

অন্তু বলিল, "দেখুন ওরা জুতো চুরি করে, হাঁড়িতে মুখ দিয়ে গৃহস্থের রাঁধা ভাত নষ্ট করে, যাকে তাকে কামড়ে দেয়।"

ভবেশবাবু বলিলেন, "আরে বাপু, সে তো ওরা আদিকাল থেকেই ক'রে আসছে, তার জন্য তো কোনোদিন ওদের সবংশে সংহার করা হয়নি। এক সঙ্গে থাকা অসম্ভব হয়, ওদের জন্যে আলাদা থাকবার ব্যবস্থা করতে পারো। ইংরেজ রাজ্য চুরি করেছে, ব্রাদাররা ঘরের বৌ চুরি করছে, তাদের কিছু পারোনা? যত দোষ করলে কুকুর, দুটো জুতো চুরি করে?"

গণপতি বলিল, "সেই ভালো, তোমরা একটা কুকুরীস্থান করো। ধরো নদীর ওপারে তো অনেকখানি পতিত জমি প'ড়ে আছে, ঐখানে যদি কুকুরগুলোকে ছেড়ে দিয়ে আসো তা'হলে কি হয়?"

ভোঁদা বলিল, "তা'হলে তারা আবার সাঁতরে ফিরে আসবে।"

গণপতি বলিলেন, "সে তো তোমরা সাত-খানা গাঁয়ের কুকুর আজ শেষ করলে আবার সাতখানা গাঁয়ের কুকুর এসে জুটবে কালই জুতো খাবার লোভে। তখন?" "তখন আবার শবমেধ যজ্ঞ করব।" "আবার এলে?" "আবার করব।" কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া ভবেশবাবু বলিলেন, "এক কাজ করো, তোমরা জুতোপরা ছেড়ে দাও।"

ভোঁদা বলিল, "তা না হয় ছাড়লুম, কিন্তু ভাত খাওয়া কি ছেড়ে দে'ব? দেশে ভাত থাকলেই ওদের উপদ্রব থাকবে।"

ভবেশবাবু বলিলেন, "ওরা খায় তো তোমাদের পাতের ফেলা দুটি ভাত, কত উপকার দেয় বলো দিকিনি? নোংরা খেয়ে সাফ করে, চোর তাড়ায়। না বাপু, আমার মত নেই। তোমরা যা খুশী করোগে।"

গণপতি বলিলেন, "দেখুন, সাহায্য নাই করলেন এদের কাজের বিরুদ্ধতা ক'রেই বা লাভ কি? এ'রা নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য শুধু একাজে নেমেছেন। আপনার নামের পাশে লিখে দিন 'না গ্রহণ, না বর্জন'।" কথাটা ভবেশবাবুর মনে ধরিল, লিখিলেন 'না গ্রহণ, না বর্জন করিলাম।' স্বাক্ষরসহ সেই চিঠি লইয়া ভোঁদা ও অন্তু গেল ডাক্তার নিবারণবাবুর বাড়ি। নিবারণবাবু দেখিয়াই বলিলেন, "কদ্দিন কামাই হয়েছে?"

ভোঁদা অবাক হইয়া বলিল, "আজ্ঞে?"

"মানে, কতদিনের মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দিতে হবে? কি লিখব? জ্বর, না আমাশা? বাবা পাঠিয়েছেন, না নিজে এসেছ? কোথায় গেছলে? মাসতুতো বোনের বিয়েতে?"

ভোঁদা হাসিয়া বলিল, "আজ্ঞে না, আমাদের সার্টিফিকেট দরকার নেই। আমরা একটা শবমেধ যজ্ঞ করব, আপনার অনুমতি চাই।"

ডাক্তারবাবু অবাক হইয়া বলিলেন, "তোমরা যজ্ঞ করবে? তা আমার অনুমতির কি দরকার?"

ভোঁদা বলিল, "আমাদের আবেদনপত্রটা প'ড়ে দেখুন না?"

ডাক্তারবাবু সন্দেহভরে বলিলেন, "চাঁদা দিতে হবে না তো?"

"আজ্ঞে না।"

ডাক্তারবাবু আবেদনপত্রটি দুইবার পড়িলেন, পড়িয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তারপর বলিলেন,—"বেশি রোদ্দুরে ঘুরো না, আজকাল প্রায়ই 'সান্‌স্ট্রোক' হচ্ছে। তোমার ব্রেন কি খুব উইক? বংশে কেউ পাগল ছিলেন?" ভোঁদার অত্যন্ত অপমান বোধ হইল। এ পর্যন্ত মতে মিলুক না মিলুক তাহার উদ্ভাবনী শক্তির প্রশংসা সকলে করিয়াছে। সে ক্ষুব্ধভাবে বলিল, "আজ্ঞে না তা হ'লে আপনার মতটা"—

"এই যে লিখে দিচ্ছি।" বলিয়া নামের পাশে লিখিলেন, "ছোটোচাঁদরা, কাম্ফর স্যালিসিলেট অফ সোডিয়ম, ব্রোমাইড।"

ভোঁদা রাগিয়া বলিল, "একি?"

নিবারণবাবু বলিলেন, 'ঐ হ'লেই চ'লবে মাথা ঠাণ্ডা হবে আপাতত। বড়ো বড়ো ডাক্তার নাম দিয়ে লাভ নেই। নিজে সস্তায় জোগাড় করতে পারো তো কোরো। না পারোতো আমার কম্পাউণ্ডারের কাছে এসো টাকা নিয়ে। না ফী'টা আর ধরব না। মাঝে মাঝে 'এনিমা' নিও, ঘুমটা যাতে ভালো হয় সেদিকে নজর রেখে যাও।"

ভোঁদা রাগে গরগর করিতে করিতে বাহির হইয়া আসিল। অন্তু বলিল "সত্যি, লোকটার কি আক্কেল? পাগল পেয়েছে, নাকি? কাগজখানা নষ্ট ক'রে দিলে। কি করা যায় এখন

কি আর করা যাইবে? জমিদার বাড়িতে কাগজ লইয়া যাওয়া চলে না, তাছাড়া তাঁহার নিজেদের বাড়িতে সেণ্ট বার্নার্ড কুকুর, তাঁহ

যে মত দিবেন তাহা তো মনে হয় না। চারিদিকে কেবলই বাধা। ভোঁদা বলিল, "দুত্তোর কারো মত নিয়ে কাজ নেই। বাসুকী শাস্ত্রীর কাছে যাই, বলি, মন্তরগুলো আপনি লিখে দিন, তারপর যা করবার আমরা করব। জেলে যেতে হয় আমি একাই যাব, সকলকে জড়িয়ে দরকার কি?" অন্তু বলিল, "ভোঁদাদা', তোমার যা গতি, আমাদেরও সেই গতি। যদি তুমি জেলে যাও, তবে চাইনে আমি বাইরে থাকতে। সত্যিই তো, কার কতো মুরোদ সব বোঝা গেছে। কেউ সাহায্য করবে না, কেবল ভয় দেখাবে। নিজেরা যা পারি করি চলো। পণ্টুকে চমৎকার শেয়াল ডাকতে পারে। মুখুজ্যেদের পোড়ো বাড়িটাতে বেশ বড়ো বড়ো ক'খানা ঘর আছে, ভূতের ভয়ে কেউ রাত্তিরে যায় না ওদিকে। ঐ ঘরে কুকুরগুলোকে জড়ো করে বন্ধ করি, একদিনে সব না হয় দু'দিন তিন

"ছোট চাঁদরা ক্যাম্ফর"—

দিনে শেষ করা যাবে। আর আসল শেয়ালের বাচ্চাও জোগাড় করতে লোক লাগাচ্ছি, কাল পরশুর মধ্যে পেয়ে যাব।"

বিড়মি গ্রামের ঠিক কেন্দ্রস্থলে মুখুজ্যেদের পোড়ো ভিটায় সেদিন হঠাৎ সন্ধ্যার পর বিকট স্বরে শিয়াল ডাকিতে আরম্ভ করিল। পাড়ার যেখানে যত কুকুর ছিল সকলেই ঘেউ ঘেউ করিয়া ছুটিয়া আসিল, শিয়ালের ডাক অনুসরণ করিয়া অনেকগুলা কুকুর সেই ভাঙা বাড়িতে প্রবেশ করিয়া আর ফিরিল না। ভাঙা বাড়িতে সারারাত কুকুর ডাকিতে লাগিল, কিন্তু পাড়ার লোক কেহ সাহস করিয়া খোঁজ লইতে পারিল না। গ্রামের লোকের ভূতের ভয়, সহরের লোকের সাপখোপ চোর ডাকাতের ভয়। যাহাদের ভয় নাই, সেই ছেলেরা সকলে ভোঁদার দলে।

পরদিন রবিবার। রাত্রের মধ্যেই হৃদয় নারিকের পুরাতন ইঁটের পাঁজার পাশে শিয়ালের বাসা লুঠ হইল। পরেশের পূর্ব হইতেই সন্ধান জানা ছিল, ভোর হইতে না হইতে সে তিন তিনটি বাচ্চা আনিয়া হাজির করিল। ছানাগুলি সবে ছুটিতে শিখিয়াছে, গুড় গুড় করিয়া এমন ছোটে, দেখিলেই মজা লাগে। ভোঁদা সকাল আটটার মধ্যে সেগুলিকে বন্ধুদের ভিতর বিতরণ করিয়া দিল। তিন চারজন করিয়া বালক এক একদিকে রওনা হইল, শিয়াল ছানার গলায় দড়ি বাঁধিয়া ডুগডুগি বা ক্যানেস্তারা বাজাইতে বাজাইতে তাহারা একটির পর একটি গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। পালে পালে কুকুর তাহাদের অনুসরণ করিয়া মুখুজ্যে বাড়ির মধ্যে শেষ পর্যন্ত অন্তর্হিত হইল। তাহাদের চেঁচামেচিতে অস্থির হইয়া পাড়ার প্রধানেরাও বাড়ির বাহিরে রাস্তায় আসিয়া সমবেত হইলেন, কিন্তু বন-জঙ্গল ভাঙিয়া পোড়ো বাড়িতে কুকুরের পালের মধ্যে ঢুকিতে কাহারও সাহস হইল না, তাঁহারা বাহির হইতে দুই একঘণ্টা রাগারাগি করিয়া ফিরিয়া গেলেন।

এদিকে বিড়মি, নিমগাছি, ভেটকিপোতা, অরুচি, সিণ্টকে প্রভৃতি সাতখানা গ্রামে হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। বেওয়ারিশ নেড়ি এবং খেঁকি কুকুরের দল নিশ্চিহ্ন হইয়া গেলে কাহারও আপত্তি ছিল না, কিন্তু বাড়ির পোষা কুকুর দেশী কেলো, ভুলো, বুড়ো, বেঁড়ে এবং বিলাতী টম, জিম, রয়, রুবি, মেরী, ডেজি প্রভৃতিতে যখন টান ধরিল তখন সকলেই চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। হীরু নস্করের খাঁদা, মতি পালের হটুরা, যদু বাইনের 'টেঁপী', নিধি বাগ্দীর 'হরিমতী' প্রভৃতি যখন শৃগাল শাবকের পিছনে ছুটিতে ছুটিতে গ্রামত্যাগ করিল তখন তাহারা একটু চেঁচামেচি করা ছাড়া তাহাদের খোঁজ লইবার জন্য বিশেষ কোনো চেষ্টা করিল না, কারণ গ্রামান্তরে দুই চারিদিন ঘুরিয়া তাহাদের কুকুর প্রায়ই আবার ফিরিয়া আসে। কিন্তু গোলমাল বাধিল সর্বপ্রথম যখন ভেটকিপোতার আড়তদার গদাধর গুঁইয়ের গৃহিণী নয়নতারা দাসীর নয়নতারা সদৃশী 'সোনামণি', লেডি ডাক্তার এলোকেশী সামন্তের ক্রোড়কুক্কুরী টেরেসা এবং সিণ্টকের রিটায়ার্ড সিভিল সার্জন মিস্টার রাধাশ্যাম দস্তিদারের পত্নী মিসেস মালতী দস্তিদারের (যাঁহার পিসতুতো ভায়ের শ্যালকের সহিত স্যার দীনেন্দ্রের মাসতুতো বোনের জ্যাঠতুতো ভাইঝির বিবাহ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ) আদরের গ্রে হাউন্ড জাতীয়া কুক্কুরী ডেজি সহসা অদৃশ্য হইল। টেরেসা বাড়ির পিছন দিকে বাগানে পাখী ধরিবার চেষ্টায় ঘুরিতেছিল, সোনামণি কয়েকটি স্বজাতীয় ভক্তের সহিত রাস্তার ধারে লুকোচুরি খেলিতেছিল। ডুগডুগি বা ক্যানেস্ত্রার শব্দে আকৃষ্ট হইয়া তাহারা যখন গৃহত্যাগ করে তখন কেহই কাছাকাছি ছিল না! তাহাদের বাড়ির লোক কুকুর পলাইবার দুই ঘণ্টার মধ্যে বাড়ি হইতে তাহাদের প্রস্থানের সংবাদ জানিতেই পারিলেন না। প্রথম এ বিষয়ে সচেতন হইলেন নয়নতারা। স্নানের পর ছাদে চুল শুখাইতে উঠিয়া তিনি সহসা লক্ষ্য করিলেন অনেক দূরে মাঠের পথে কয়েকটি বালক এক পাল কুকুর লইয়া চলিয়াছে। দাসী বিনোদিনী একটা ছেঁড়া কাপড় পাতিয়া বড়ি দিতে বসিয়াছিল, নয়নতারা তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বিনি, দ্যাখ, দ্যাখ!" বিনি নয়নতারার পরিধানের ছাপা শাড়িটির দিকে চাহিয়া বলিল, "অহা! মেনিয়েচে বটে! উপ্ যেন উপছে প'ড়চেন? কত দাম গা বৌদিদি? দাদাবাবু এবারে ক'লকাতা থেকে নেসেচে বুঝি?" নয়নতারা

"উপ্ যেন উপ্‌ছে পড়ছেন!"

চটিয়া বলিলেন, "আ মর! মাগীর ভীমরথি ধরেছে। কি দে'কতে বোল্লুম, কি দেকছে? ঐ যে মাঠের মধ্যে একটি ছেলে ডুগডুগি বাজিয়ে একটা কি জন্তু নিয়ে যাচ্ছে, আর তা'র সঙ্গে পাল পাল কুকুর ঘেউ ঘেউ ক'রতে ক'রতে ছুটেচে—দে'খতে পাচ্চিসনে?" বিনোদিনী এইবার সেদিকে চাহিয়া বলিল, "কেন পারবুনি? ঐতো ঐ ছোঁড়াটা, ওর নাম বুঝি বাঁটলো, একটা শ্যালছ্যানা নে যাচ্চে—আর ওটা তো পালেদের ঘুঁটে, একটা ঠ্যাঙা নে কুকুরগুলোকে 'নাইন' করাচ্ছে।"

নয়নতারা বলিলেন, "ধন্যি তোর চোখ! এখান থেকে মানুষ চিনতে পারচিস?"

বিনোদিনী বলিল, "পারবুনি? আমাদের ঘরের পাশেই যে বাঁটলের ঘর। তবে ছোঁড়াটা হাড়পাজি, ভয়ডর কা'কে বলে জানে নে। ওমা! কোথা যা'ব? তোমার সোনামণিও যে ওদের দলে ভিড়েছেন গো!"

নয়নতারা মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। বলিলেন, "কি হবে বিনি? তুই যা? যা চায় তাই দোব, নটা ট্যাকা দোবো সোনামণিকে ফিরিয়ে নে আয়! আহা, বেচারী, সকালে সেই যা এক বাটি দুধভাত খেয়েছে তারপর এখন পর্যন্ত আর কিচ্ছু খায় নি। কোথায় মরতে চলল এই দুকুর রোদ্দুরে"—

বিনোদিনী বড়ি মাথা হাতে "আমি কি আর এই পথ ছুটে যেয়ে ওদের ধরতে পারব, গা বৌদিদি। দেখি," বলিয়া ছুটিল। নয়নতারা এক দৃষ্টে সেইদিকে চাঁহিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন, কুকুরের পাল সহ ছেলেরা বিড়মি গ্রামের আমবাগানের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

গদাধর গুঁই দোকান হইতে ফিরিয়া ঘরে ঘরে দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণীকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলেন। গ্রামের নবাগতদের কল্যাণে তাঁহার মুদিখানা এখন আড়ৎ হইয়াছে, কথাবার্তাও কিছু মার্জিত হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত ছাদে আসিয়া তিনি পত্নীর সাক্ষাৎ পাইলেন, তাঁহার শেষ কথাগুলোও কানে গেল। বিনোদিনী বলিয়া গেলে তিনি পিছন হইতে বলিলেন, "মরতেই চলেছে গিন্নি যাক আপদ যাবে, আমি সিন্নি দেব।" গৃহিণী তাঁহার চেয়ে সোণামণিকে অধিক স্নেহ করেন বলিয়া গদাধরের বিশ্বাস; তিনি কুকুরটার প্রতি সপত্নী-বিদ্বেষ গোছের একটা মনোভাব পোষণ করিতেন। নয়নতারা মাথার কাপড় টানিয়া রাখিয়া বলিলেন, "তা আমি জানি ও মলে তুমি বাঁচো। তা ঠিক দুকুরে ঐসব অকল্যেণের কথাগুলো বোলুনি বলচি। ও যদি সত্যি মরে যায়?"

গদাধর বলিলেন, "সত্যি নয়তো কি মিথ্যে? আমি খোঁজ নিয়েছি। ও আর ফিরবে না। বিনির কম্ম নয় ওকে ফিরিয়ে আনা। সাত গাঁয়ের ছেলে একজোট হয়েছে, কোনো গাঁয়ে কুকুর রাখবে না, সব নিয়ে গিয়ে কালীর কাছে বলিদান দেবে।"

এমন সময় কাঙ্গালের মা আসিয়া খবর দিল, মেম ডাক্তার আসিয়াছেন, গৃহিণীর সহিত দেখা করিবেন। নয়নতারা জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, "মেম ডাক্তার না আরো কিছু! কেরেস্তান। এই অবেলায় আবার জ্বালাতে এল কেন? আমি বলে মরচি নিজের জ্বালায় যা বলে দে এখন আমি দেখা করতে পারবু নি।"

গদাধর বলিলেন, আহা বাড়ীতে এসেছে, মানুষটাকে অপমান কোরো না। কি বলে শোনো না একবার।

গৃহিনী গজগজ করিতে করিতে এবং কর্তা হাসিমুখে নামিয়া আসিলেন। কাঙ্গালের মা মেম ডাক্তারকে খবর দিতে গেল। মিনিট দুই পরে অন্দরের বারান্দায় মিস এলোকেশী সামন্ত হন্তদন্ত হইয়া প্রবেশ করিলেন। নয়নতারাকে দেখিয়া আকুলভাবে বলিলেন, "কি হবে দিদি? আমার টেরেসাকে ওরা নিয়ে গেছে, শুনেছি বলিদান দেবে।"

নয়নতারা অবাক হইয়া বলিলেন, "ওমা কোতা যাব।"

"হ্যাঁ, দিদি, কি হবে? আপনারা গ্রামে থাকতে দিন দুপুরে এই রকম অত্যাচার"—

নয়নতারা বিরক্তভাবে বলিলেন, "দ্যাকো বাপু, তুমি আমাকে দিদি দিদি কোরুনি বলচি। কপালে বিয়ে জোটে নি তা কি করবে, তা বলে মেঘে মেঘে বেলা তো কম হয় নি। তুমি যে আমার মায়ের বয়সী! দিদি বলতে নজ্জা করে নে? আমি বাপু এখন তোমার কাঁদুনি শুনতে পারবুনি। আমার সোনামণি পড়েছে ছেলে ধরার পাল্লায়, তাকে কি করে বাঁচাব ভেবে পাচ্ছি নি, এখন তুমি এলে খুকী সেজে তোমার সেই পুঁটলি কুকুরের জন্যে কাঁদুনি গাইতে।"

এলোকেশী ভৎসনাটা গায়ে মাখিলেন না, সহানুভূতি দেখাইয়া বলিলেন, "কি সর্বনাশ! 'সোনামণি'ও চুরি হয়েছে! এ সব কি কান্ড বলুন তো? দেশ কি মগের মুল্লুক হয়ে উঠল?" গদাধরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনারা কি এর কোনো প্রতিবিধান করবেন না?"

নয়নতারা চোখে জল আনিয়া বলিলেন, "সত্যি, যা করবার করো; সোণামণিকে না ফিরে পেলে আমি কিন্তু আত্মঘাতী হ'ব তা বলে দিচ্ছি। থাক তুমি তোমার ট্যাকা নিয়ে।"

গদাধর বলিলেন, "সাতগাঁয়ের ছেলে এক-জোট হয়েছে কোথায় তাদের আড্ডা কিছুই জানিনে। আর আমি দোকানদার মানুষ, আমার কতটুকুই বা শক্তি।"

এলোকেশী বলিলেন, "আপনার শক্তি নেই তো আছে কার? যার অর্থবল আছে, তার সব আছে। আপনি যদি দারোগাকে একবার খবর দেন।"

গদাধর বলিলেন, "পুলিশের হাঙ্গামা জানেন না তো, লোকে বলে বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। তার চেয়ে একটা কুকুর কিনে দেওয়া সহজ।"

নয়নতারা মুখ বাঁকাইয়া চোখ ঘুরাইয়া বলিলেন, "মুয়ে আগুন, তবু যদি কিনে দিতে একটা। বাপের বাড়ি থেকে নেসেছিনু, এতটুকু বাচ্চা। দুটো ভাত দিতে হ'য় বলে কি রাগ। কাঁই বা খায় পাতের এঁটো কাঁটা, যা খায় তাও হজম হয়নি। নজরে নজরেই শুকিয়ে হাড় হয়ে যাচ্ছেল, এবার একেবারে পরাণে মোলো।" নয়নতারা আবার চক্ষে অঞ্চল দিলেন।

গদাধর গুঁই করুণ স্বরে বলিলেন, "ওকথা বলোনা ছোটো গিন্নী, তোমার কুকুর যা খায় আমি তা খেতে পাই নে। তা নিয়ে আমি কোন দিন কিছু বলেছি! ওর জাত ঐ রকম হাড় বার করা তা আমি কি করব। আচ্ছা বেশ আমি দারোগার কাছে যাচ্ছি, যা খরচ লাগে করব তোমার সোণামণিকে ফেরাতে পারি কিনা দেখি।"

"তা খেয়ে দেয়ে নিয়ে বেরোলে হতো না?" নয়নতারা বলিলেন, "ক্যাঙ্গালের মা বামুন দিদিকে বল বাবুকে ভাত দিতে, আমি আজ কিছু খাবু নি।"

গদাধর বলিলেন, "তবে আমারও আর খেয়ে কাজ নেই।" তারপর সামন্তর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, একটা আর্জি লিখি দিনতো গুছিয়ে। নয়নতারা বলিলেন, হ্যাঁগা, তুমি নিজে লিখলে হোতুনি? মেয়ে ছেলে যাতোই নিকিয়ে পড়িয়ে হোক পুরুষ ছেলের সমান হয়? এলোকেশী বলিলেন আমি বলি কি ঐ সঙ্গে ম্যাজিষ্ট্রেটকে একটা টেলিগ্রাম করে দিননা। গতবার ম্যাজিস্ট্রেট গ্রামে এসে তো আপনার বাড়ীতে খানা খেয়েছিলেন। তিনি একটু চাপ দিলে তাড়াতাড়ি কাজ হবে। বিশেষকরে যদি মিসেস গুঁইয়ের নাম দিয়ে টেলিগ্রামটা করা যায়। উনি যেন লিখছেন বিপন্ন হ'য়ে—

নয়নতারা স্বামীকে কার্যক্ষেত্রে নামিতে দেখিয়া একটু প্রসন্ন হইয়াছিলেন। বলিলেন "তুমি আর হাসিয়ুনি বাপু! আমি আবার মিসিস, আমি আবার নিকবো। আমার চৌদ্দ পুরুষে কেউ কখনো নিকেছে যে আমাকে বলছো নিকতে? আমি নিকতে যাব কোন দুঃখে? আমার ঠাকুরদাদা ছেল জমিদার। ও সব তোমাদের কেরেস্তান আর মুদিদের পোষায়। বাবা নেশা ক'রে সব্বস্ব উড়িয়ে দিলে, কপালের নেখন ছেল, তাই মুদির হাতে পড়িচি। না হ'লে আজ আমার এই দশা হ'বে কেন? ওরে সোনামণিরে, তুই আমায় ছেড়ে কোথায় গেলিরে?" আবার পুরাতন শোক নূতনের সহিত মিলিয়া উথলিয়া উঠিল। নয়নতারার কণ্ঠস্বর পর্দায় পর্দায় চড়িতেছে দেখিয়া গদাধর ভয় পাইয়া বলিলেন, "চেঁচিয়ো না গিন্নী, চেঁচিয়ো না, সবাই ভাববে তুমি বিধবা হয়েছ।" চলুন মিস সামন্ত, টেলিগ্রামটা ক'রে দিয়ে থানায় যাই।" উভয়ে বাহির হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে টেলিগ্রাম "সোনামনি অ্যান্ড টেরেসা কিডন্যাপ্‌ড্! লাইফ ইন ডেঞ্জার। হেল্‌প্।"

এদিকে সেই সময়েই সিঁটকে গ্রামেও কুকুর চোরের দল কাজ আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের সর্দার হাঁটু হোড়। গ্রামের পথে পথে

ঘুরিয়া অনেকগুলি কুকুর সংগ্রহ করিয়া তাহারা দস্তিদার বাড়ির দিকে চলিল।

মিস্টার দস্তিদার বাড়ি ছিলেন না, মিসেস দস্তিদার বাড়ির বাহিরের দিকের টানা বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন এবং মাঝে মাঝে চাকরবাকরদের কাজের খোঁজ খবর লইতেছিলেন। ডোজি ইজিচেয়ারের একটা পায়ার সঙ্গে চেন দিয়া বাঁধা অবস্থায় তাঁহার পায়ের কাছে শুইয়াছিল। কলিকাতায় নানারূপ রোগের প্রাদুর্ভাবের কথা পড়িতে পড়িতে হঠাৎ মিসেস দস্তিদারের সন্দেহ হইল ডোজির শরীর ভালো নাই। হাঁকিলেন, "কালীপদ!"

কালীপদ বীরভূমের লোক, হাওড়া জেলায় আসিয়া তাহার শরীর মন কিছুই ভালো থাকিতেছে না, সঙ্গীদের কাছে দেশের গল্পেই তাহার যেটুকু আনন্দ। বাটনা বাটিতে বাটিতে সে বামুনঠাকুরের সঙ্গে বীরভূমের গল্প জুড়িয়াছে গৃহিণীর কথা তাহার কানেই গেল না। "তারপর বুইলে ঠাকুরমশায়, সে যা গান গেলে। মোছলমানে গাইলে কি হবে, সব দেবদেবীর কথা, একটু কেবল ঘুরিয়ে লেয়! আমরা বলি 'দেবী, মনসা তোমার চরণে সেলাম', ওরা বলবে 'বিবি মনছা, তোমার কদমে ছ্যালাম' এই যা তফাৎ। তা বাবুরা সেটা শুনতে বেশি যায় না, অনেক খারাপ কতা থাকে কিনা। কিন্তু ভালো কতাও অনেক থাকে। সেবার মুলুকের মেলায় সেথা গাইলে! একদল ছোকরা সখী সেজে কোমর বেঁকিয়ে নেচে নাচতে—"

"কালীপদ! কানের মাথা খেয়েছ? ডাকছি, শুনতে পাচ্ছ না?"

"আঃ জ্বালিয়ে খেলে, দিন নেই, রাত নেই, খালি কালীপদো, আর কালীপদো! আমি যেন ওঁর খানাবাড়ির চাকর! তারপর বুইলে ঠাকুরমশায়, সেই গানটা যা গাইলে। (সুরে)

"আয় মা সরস্বতী সর্বমঙ্গলা!
তোমার ভোবনে বাজে জোড়া ডুগিতবলা,
ফুলুট বাজে তালে তালে,
আয় মাগো হেলেদুলে,
দয়া করো দয়াময়ী আমরা অবলা।

আমরা অবলা। ঐখানে 'অ—বোলা' বলে একটা প্যাঁচ যা দেলে, আসর জমিয়ে দিলে।"

"কালীপদ!"

"যাই মশায়!" বলিয়া এতক্ষণে কালীপদ বাটনা বাটা শেষ করিয়া ধীরে সুস্থে হাত ধুইয়া হেলিতে দুলিতে কর্ত্রীর নিকট পৌঁছিল।

মিসেস দস্তিদার বলিলেন, "কখন থেকে ডাকছি, কি, করছিলে কি?"

"কত্ত কাজ ক'রছি, ক'টার জবাব দিব আজ্ঞা? ঘর ঝাঁট দিছি, পকুরকে গে'ইছি, বাটনা"—

"ডোজিকে আজ সাবান মাখিয়ে স্নান করানো হ'য়েছিল?"

"আজ্ঞ হবেক ক্যানে? এখন কি টাইন হইচেন? কাল হইছিলেন আজ্ঞা। দ্যাখেন ক্যানে, এখনও ভুর ভুর ক'রে বাস ছুটেছেন।"

মিসেস দস্তিদার বলিলেন, "গায়ে বিশ্রী গন্ধ হয়েছে। গ্রীষ্মকালটা সমানে এবার থেকে রোজ দু'বার করে স্নান করাবি। আর স্নানের পর আমার ঘরে ঐ যে টেবিলের উপর 'লিলি অফ দি ভ্যালি' এসেন্স আছে ঐ একটু স্প্রে ক'রে ওর গায়ে দিয়ে দিবি।"

"ক্যানে বটে?"

"ক্যানে বটে কি আবার? আমি বলছি, তাই দিবি।"

"বাবুরা 'এসেন' মাখতে পেছেন না, কুকুর মাখবেন আজ্ঞা?"

"হ্যাঁ, যা বলছি শুনবি, মুখের ওপর কথা কইবি না। যা।"

গ্রামের একধার দিয়া ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের পাকা রাস্তা গিয়াছে, সেই রাস্তার ধারেই দস্তিদারদের বাড়ি। বাড়িটি নূতন, কম্পাউন্ড ঘিরিয়া কাঁটা তারের এবং মুক্তকেশীর বেড়া, সামনে একটি ছোটো সাদা রং করা কাঠের গেট। মিস্টার দস্তিদার শেষ জীবনটা এইখানেই গীতা, উপনিষদ লইয়া কাটাইবেন স্থির করিয়াছেন, মিসেস দস্তিদারও মহিলা সমিতি বাগান এবং কুকুর লইয়া পুত্রশোক ভুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। সেদিন সকালে দারোগও ডুগডুগির শব্দ মাঝে মাঝে তাঁহার শান্তিভঙ্গ করিলেও বিশেষ কোনো অশান্তির কারণ এখনই ঘটিতে পারে ইহা তাঁহার কল্পনারও অগোচর ছিল! রাস্তায় কচিৎ কখনও লোক চলিতেছিল। সহসা ডুগডুগি বাজাইতে বাজাইতে একটি বালক সেই পথে দেখা দিল। তাহার সঙ্গে দড়ি দিয়া বাঁধা একটি শৃগাল শাবক। সম্মুখে পিছনে এক পাল কুকুর ঘেউ ঘেউ করিতে করিতে এবং একদল শিশু ও বালকবালিকা হৈ হৈ করিতে করিতে চলিয়াছে। দুইটি বালক লাঠি হাতে তাহাদের সামলাইতেছে, কেহ শৃগাল শাবকের বেশি কাছাকাছি আসিয়া পড়িলেই লাঠি তুলিয়া ভয় দেখাইতেছে, কদাচিৎ দুই এক ঘা দিয়া ভিড় সরাইতেছে। পাড়ার অনেকগুলি শিশু মজা দেখিতে জুটিয়াছে, তাহারাও চীৎকার করিয়া পাড়া তোলপাড় করিতেছে, কদাচিৎ শৃগাল শাবকের প্রাণরক্ষায় বালকদ্বয়কে সাহায্য করিতেছে। পিছনে একজন কান্না জুড়িয়াছে, "ওঁ দাদা, টেংপীকে যে'তে দি'উনি গো. সব্ব'নে'শে'রা প'ড়িয়ে মাববে গো।"

ডোজির ঘুম ভাঙিল। এই বিচিত্র শোভাযাত্রাটি দেখিয়া সে হঠাৎ খাড়া হইয়া উঠিল, পরক্ষণেই প্রতিবাদ জানাইয়া ভুকভেও করিয়া একটা হুঙ্কার ছাড়িল। শোভাযাত্রা বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইল, হাঁটুর একজন সঙ্গী দড়িতে ফাঁস লাগাইয়া এবং আর একজন একটা চটের বস্তা লইয়া প্রস্তুত হইল, হাঁটু নূতন উদ্যমে ডুগডুগি বাজাইতে আরম্ভ করিল। ডোজির ধৈর্য অল্প, আর সহ্য হইল না। সে লাফ দিয়া বারান্দা হইতে নীচে পড়িল। মিসেস দস্তিদারও চেয়ারশুদ্ধ সঙ্গে সঙ্গে নীচে পড়িলেন। নূতন শিকল ছিঁড়িল না, চেয়ারের গায়ে খাঁজ কাটিয়া ডোজিকে বাঁধা হইয়াছে, সে বাঁধনও খুলিল না, সুতরাং ডোজির সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারও চলিল। মিসেস দস্তিদার প্রথমটা

সম্মুখে পিছনে একপাল কুকুর—

আচমকা চেয়ার হইতে উল্টাইয়া নীচে পড়িয়া অশোভনভাবে একটা আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিলেন, দুইদিক হইতে দুইজন কালীপদ এবং নিস্তারিণী আসিয়া তাঁহাকে টানিয়া তুলিতে তিনি খানিকটা সামলাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "উঃ, কোমরটা ভেঙে দিয়েছে। ওরে কালীপদ দ্যাখনা বাবা, ডোজি কোথায় গেল। উঃ এখানটা খটু খটু করছে। নিস্তার দ্যাখ তো মা, হাড়টা কি সত্যিই ভেঙে গেছে? আচ্ছা, ডোজি তো কখনো এমন অবাধ্য ছিল না?"

ইজিচেয়ার টানিতে টানিতে ডোজি যখন পথে গিয়া পৌঁছিল, তখন হাঁটু হোড়, ভোম্বল দত্ত এবং ঘেঁটু মণ্ডল ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি সেখানে অবশিষ্ট ছিল না। ডোজির যাত্রাপথে তাহার প্রকাণ্ড শরীরের এবং চেয়ারের ধাক্কায় কয়েকটি কুকুর উল্টাইয়া পড়িতেই বাকীগুলো ঊর্ধ্বশ্বাসে যে যেদিকে পারিয়াছে পলাইয়াছে।

ছেলেরাও কেহ বেড়া টপকাইয়া দস্তিদারদের বাগানের ভিতরে পড়িয়াছে, কেহ কাছাকাছি অন্য কোন বাড়িতে গিয়া ঢুকিয়াছে। ভোম্বল একটু ভড়কাইয়া গিয়াছিল, আক্রমণোদ্যত ডেজির মুখের সামনে বোরাটা ঠিক মত খুলিয়া ধরিতে পারিল না, কোনমতে সেইটা দিয়া আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করিল। ফলে ডেজি আসিয়া সটান বোরার মধ্যে না ঢুকিয়া বোরাটা কামড়াইয়া ধরিল। এই সময়ে তাহাকে রক্ষা করিল ঘেঁটু, বলিল "ও বোরাটা ছিঁড়ুক, তুই ততক্ষণ বাঁচবি তো ছোট না হয় গাছে ওঠ।" পথের ধারে বড়ো বড়ো অশ্বত্থ, আম, জাম প্রভৃতির গাছ। হাঁটু ততক্ষণে তীরবেগে ছুটিয়া অনেক দূরে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, গাছে উঠিবার কথা তাহার মাথায় আসে নাই। ভোম্বল এবং ঘেঁটু তরতর করিয়া দুইজনে দুইটা গাছে উঠিয়া বসিল। ততক্ষণে ডেজি বোরাটাকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া পরবর্তী শিকার খুঁজিতে গিয়া দেখিল, কাছাকাছি কেহ নাই, দূরে ধাবমান হাঁটু শৃগালশাবক লইয়া পথের বাঁকে অদৃশ্য হইতেছে। একটা হুঙ্কার দিয়া সে তাহাকে অনুসরণ করিল। ইজিচেয়ারটা প্রতিপদে তাহার যাত্রায় বাধা না জন্মাইলে সেদিন বালকগুলির কাহারও জীবনের আশা ছিল না। ভাগ্যক্রমে বিপদ আসন্ন দেখিয়া হাঁটুরও বুদ্ধি খুলিল, সেও শৃগাল শাবকের গলায় বাঁধা দড়িটির কথা ভুলিয়া তাড়াতাড়ি একটা গাছে উঠিয়া পড়িল। দু'তিন মিনিট পরেই ডেজি ইজিচেয়ার টানিতে টানিতে সেখানে গিয়া পেঁছিল। শৃগাল শাবকটির তখনই মৃত্যু নিশ্চিত, কিন্তু দৈব তাহাকে বাঁচাইয়া দিল। হাঁটু হোড় হাতের দড়ি ছাড়িল বটে, কিন্তু পাছে শৃগাল শাবক তাহার হাত ফসকাইয়া পলায়, সেই ভয়ে প্রথমেই সে দ্বিতীয় একটি দড়ি দিয়া নিজের কোমরের সহিত তাহার একটা পা বেশ করিয়া বাঁধিয়াছিল, সুতরাং এক্ষণে সে ছাড়িলেও শৃগালশাবক তাহাকে ছাড়িল না। সে যখন একটা উঁচু ডালে গিয়া বসিল, তখন শৃগাল শাবক তাহার কোমর হইতে পায়ে দড়ি বাঁধা অবস্থায় অধোমুখে ঝুলিতে লাগিল। ডেজি গাছতলায় পেঁছিয়াই তাহাকে ধরিবার জন্য একটা লাফ দিল। এতক্ষণে হাঁটু হোড় শৃগাল-শাবকের অস্তিত্ব এবং তাহার বিপদের সম্বন্ধে সচেতন হইয়া দড়িশুদ্ধ তাহাকে টানিয়া তুলিল, সঙ্গে সঙ্গে ডেজি প্রাণপণ শক্তিতে লাফ দিয়া সে যেখানটায় ঝুলিতেছিল, তাহার কাছাকাছি একটা নীচু ডালে আসিয়া উঠিল। কিন্তু চেয়ারের টান যাইবে কোথায়? স্থির হইয়া ডালে পা রাখিতে না রাখিতে পা ফসকাইল। এবার যেদিক দিয়া উঠিয়াছিল, সেদিকে সে পড়িল না, ভারসাম্য রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিতে গিয়া ডালের অপর দিক দিয়া পিছলাইয়া পড়িল। ফলে পথের মাটীতে তাহাকে পেঁছিতে হইল না, ডালের অপর পার্শ্বে বিলম্বিত ইজিচেয়ারটির কিছু ঊর্ধ্বে ভারসাম্য রক্ষা করিয়া সে শিকল বাঁধা অবস্থায় ঝুলিতে লাগিল। গলায় বগলস আঁটিয়া বসিয়াছে, মুখে শব্দ নাই। জীবন বুঝি যায়। এমন বিপদে ডেজি কখনও পড়ে নাই। ডেজিকে তদবস্থায় দেখিয়া হাঁটু হোড় গাছ হইতে নামিয়া নিঃশব্দে পলায়ন করিল, তাহার সঙ্গীরাও তাহাকে পথে দেখিয়া বিপদ কাটিয়া গিয়াছে বুঝিয়া নিঃশব্দে যে যাহার বাড়ি ফিরিয়া গেল। কুকুর ধরার উৎসাহ তখনকার মতো তাহাদের চলিয়া গিয়াছিল।

এদিকে মালতী দস্তিদার কালীপদকে পাঠাইয়াছেন ডেজির সন্ধান লইতে। কালীপদ লোক ভালো, উঁচু নজর নাই। ডেজির সন্ধানে পথের বাঁক ছাড়াইয়া অর্থাৎ কর্ত্রীর দৃষ্টির অন্তরালে গিয়া সে একটা গাছতলায় বসিয়া বিড়ি ধরাইল। বিড়মির দিক হইতে একজন দোকানী আসিতেছিল, তাহাকে দেখিয়া বলিল, "কোথায় আঁইচ গো?"

"বিড়মি গেছনু হাট করতে। তুমি বসে যে?"

কালীপদ বলিল, "একটা শুটকেপোরা কুকুর দেখেছ? একটা চেয়ার নিয়ে যেতে?"

"কুকুর তো কতই দেখছি। বিড়মিতে কুকুরের যজ্ঞি হবে শুনেছি, সাত গাঁয়ের কুকুর আমদানী হচ্ছে। তা চিয়ার নিয়ে যেতে তো কাউকে দেখনু নি।"

দোকানী চলিয়া যাইতেছিল, ঊর্ধ্বমুখে লম্বমান ডেজি পায়ের নীচে পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া অনেক কষ্টে একটা অস্ফুট আর্তনাদ করিল। দোকানী চমকিয়া উপর দিকে চাহিয়া বলিল, "ঐ তো গো তোমার কুকুর গাছ থেকে ঝুলেছে। বাঃ, বেশ কলে পড়েছে।"

ডেজির অবস্থা দেখিয়া কালীপদ মহা খুশী। বলিল, "থাকো শালা তুমি ঐখানে, বেশ হয়েছে। সাবান মাখাচ্ছি তোমারে। এসেন মাখবে না, এসেন?" দোকানী হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। কালীপদ বাড়ি ফিরিয়া খবর দিল কুকুরের যজ্ঞে আহুতি হইবার জন্য ডেজি বিড়মি চলিয়া গিয়াছে। সেখানে কড়া পাহারা, কিছু করিবার উপায় নাই।

সর্বনাশ! এখন উপায়। মিস্টার দস্তিদার কলিকাতায় গিয়াছেন। কাহার সহিত পরামর্শ করা যায় ভাবিয়া না পাইয়া শেষ পর্যন্ত মিসেস দস্তিদার ঝি নিস্তারিণীকে ডাকিলেন। "কি করি বল দিকি নিস্তার?"

নিস্তারিণী বলিল, "তুমি ভেবুনি মা, তোমার ডেজিকে কেউ কিছু করতে পারবে নে। ও দিন তিন টাকার খানা খায়। মুরগীর মাংস, ভ্যাড়ার মাংস খেয়ে খেয়ে ওর তেজ কত? ওকে যে পুড়িয়ে মারবে সে ছেলে এখনো জন্মায়নি। তবে সাবধানের মার নেই, তুমি বরং এক কাজ করো।"

"কি বল দিকি?" "তোমার যে কে বড়ো লোক কুটুম আছে না, তাকে তার করে দাও।" "দূর, কুকুর চুরিতে তাঁরা কি করবেন?"

"তবে তুমি ম্যাজেস্টর সায়েবের কাছে একটা খবর পেটিয়ে দাও। বাছাধনরা জব্দ হয়ে যাবে। ঘুঘু দেখেছে, ফাঁদ দ্যাকেনি তো। ওপর থেকে গুঁতো এসে বাপ বাপ বলে কুকুর বাড়িতে পেঁছে দে যাবে।"

"ঠিক বলছিস", বলিয়া মিসেস দস্তিদার তাড়াতাড়ি রাইটিং টেবলে গিয়া বসিলেন। একটা টেলিগ্রামের ফর্ম লইয়া লিখিলেন, "ডেজি ক্যাপ্টিভ উইথ ফ্রেন্ডস, অ্যায়েটিং ক্রুয়েল ডেথ। সেন্ড হেল্প ইমিডিয়েটলি।"

"বন্ধুগণসহ বন্দিনী অবস্থায় ডেজি নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। অবিলম্বে সাহায্য পাঠান।" ডাকঘর কাছেই, কালীপদর উপর পুরোপুরি বিশ্বাস না থাকায় গৃহিনী নিস্তারিণীকেই তার করিতে পাঠাইলেন।

মিনিট কুড়িক পরে বাড়ি ফিরিয়া নিস্তারিণী হৈচৈ লাগাইয়া দিল, টেলিগ্রাম করিয়া ফিরিবার পথে সে ডেজিকে একটা গাছের ডালে ঝুলিতে দেখিয়া আসিয়াছে, এখনও গেলে তাহার জীবন রক্ষা হয়। মিসেস দস্তিদার সঙ্গে সঙ্গে নিজে ছুটিলেন, নিস্তারিণী এবং বামুন ঠাকুর ছুটিল, কালীপদও ভালো মানুষের মতো মুখ করিয়া সঙ্গে ছুটিল। সকলে মিলিয়া মিনিট কুড়িক পরে ডেজিকে অর্ধমৃত অবস্থায় বাড়ি ফিরাইয়া আনিলেন ভাঙা চেয়ারটা তাহাকে বহিয়া আনিবার স্ট্রেচারের কাজ করিল।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

সেকালের য়ুরোপে যেমন সব পথই রোমের দিকে প্রসারিত হইত, তেমনই আজ বাঙলার সব আন্দোলনই বঙ্গবিভাগ সম্পর্কিত। বাঙলাকে বিভক্ত করিয়া জাতীয় স্বতন্ত্র বাঙলা গঠনের যে দাবী আজ দিকে দিকে উপস্থাপিত করা হইতেছে, তাহার উদ্ভব—মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক কুশাসনে বাঙলার জাতীয়তাবাদীদিগের অপরিসীম দুঃখ-দুর্গতি। সে দুঃখ-দুর্গতি যে মুসলিম লীগের ইচ্ছাকৃত তাহাতে আর সন্দেহ করা যায় না। নোয়াখালি, ত্রিপুরা, কলিকাতা—সর্বত্র তাহার প্রমাণ সুস্পষ্ট হইয়াছে—তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

তবে সম্প্রতি মেদিনীপুর শালবনীতে যে ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ অনিবার্য। যখন বিহারে হিন্দুরা মুসলমানদিগকে উৎপীড়ন করে, তখন কেহ কেহ বলিয়াছিলেন—কয় বৎসর হইতে তথায় মুসলমানরা সংখ্যালঘিষ্ঠ হইলেও মুসলিম লীগের প্ররোচনায় যেরূপ উদ্ধত ব্যবহার করিতেছিল, তাহাতেই হিন্দুদিগের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। কিন্তু পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও বিহারের প্রধান সচিব প্রমুখ ব্যক্তিরা যে কথা বলেন—তাহাতে সে কথার আর আবশ্যক আলোচনা হয় নাই। পণ্ডিতজী প্রভৃতি বলেন, কলিকাতায় বহু বিহারী হতাহত হয়, তাহাতে বিহারী হিন্দুরা এতই বিচলিত হইয়াছিল যে, নোয়াখালির অত্যাচারের সংবাদে তাহারা ধৈর্যচ্যুত হয়। কিন্তু বাঙলার মুসলিম লীগ সরকার বিহারী মুসলমানদিগকে যেভাবে ব্যবহার করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহাতে মনে হয়, বিহারে মুসলমান লাঞ্ছনাও চক্রান্ত ফল হইতে পারে। বিহারের ঘটনার পরেই বাঙলার মুসলিম লীগ সরকার আড়কাটিরূপে তাঁহাদিগের কর্মচারী পাঠাইয়া বাঙলায় বিহারী মুসলমান আমদানী আরম্ভ করেন। সেই ব্যাপারে বাঙলার প্রধান সচিব যে মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন, তাহাও বিহারের সরকার সুস্পষ্টরূপে বলিয়াছেন। বিহার হইতে মুসলমান আমদানী করিয়া পশ্চিমবঙ্গে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেছে—এই সন্দেহ ও সংবাদ প্রথম 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' প্রকাশ করেন। তাহার পরে জানা গিয়াছে, ঐ সকল মুসলমানের জন্য বাঙলার মুসলিম লীগ সরকার বাঙালীকে বঞ্চিত করিয়া অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া যাইতেছেন। বাঙলা সরকার যে আইন করিয়া "পতিত" জমি অধিকার করিয়া তাহাতে ঐ সকল মুসলমানকেই বসতি করাইবেন না, এমন কথাও তাঁহারা বলেন নাই, পরন্তু বলিয়াছেন,—তাহাতে দোষ নাই। 'আজাদ' বহুদিন পূর্বেই পশ্চিমবঙ্গে ঐ সকল মুসলমান পত্তন করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহাতেই বুঝিতে পারা যায়—বিহার হইতে মুসলমান আমদানী ও 'পতিত' জমি অধিকার একই পরিকল্পনার অংশ—একই ষড়যন্ত্রের ফল।
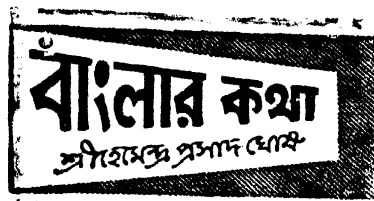
বিহার হইতে আমদানী এই সকল মুসলমান সচিবসঙ্ঘের সোহাগে স্থানীয় লোকদিগের প্রতি নানারূপ অত্যাচার করিয়া আসিতেছে। শালবনীর ব্যাপারও তাহাই। আমাদিগের বিশ্বাস, অল্পদিনের মধ্যেই যখন প্রকৃত ব্যাপার বিবৃত হইবে, তখন ইহাতে আর সন্দেহের অবকাশ থাকিবে না।

বাঙলা যদি দ্বিধাবিভক্ত হয়, তবে পাকিস্থান পরিকল্পনার সমাধি অনিবার্য বুঝিয়া বাঙলার মুসলিম লীগপন্থীরা বিভাগ চেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য দ্বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন—একদিকে মিস্টার সুরাবর্দী ও মিস্টার হাসিম বাঙলাকে অ-বিভক্ত রাখিয়া স্বাধীন স্বতন্ত্র সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত করিবার চেষ্টায় আলোচনা করিতেছেন; আর একদিকে মিস্টার আক্রাম খাঁ প্রভৃতি বলিতেছেন, "বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী—মুসলমান "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্থান।"

যাঁহারা আলোচনার পথ বন্ধ করিতে চাহেন না, তাঁহাদিগের মধ্যে কংগ্রেসী দলের কয়জন আছেন। কিন্তু আলোচনা প্রধানত শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর সহিত হইতেছে। শরৎবাবু যেমন পাকিস্থানের তেমনই বঙ্গ-বিভাগের বিরোধী। তিনি যে উচ্চস্তর হইতে বিষয়টি বিবেচনা করিতেছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার প্রস্তাবে যে লীগ সম্মত হইবেন না, তাহাও দেখা যাইতেছে। তাঁহার সহিত আলোচনাকালে যে প্রস্তাব হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে, তাহা এইরূপঃ—

(১) বাঙলা (অবিভক্ত) স্বাধীন রাষ্ট্র হইবে এবং সেই স্বাধীন রাষ্ট্র অবশিষ্ট ভারতবর্ষের সহিত তাহার সম্বন্ধ কিরূপ হইবে, তাহা স্থির করিবে।

(২) এই স্বাধীন বাঙলায় শাসনতন্ত্র ব্যবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা পরিষদ যৌথ-নির্বাচন ও প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত হইবে। সদস্য-সংখ্যা হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যানুপাতে স্থির হইবে। "বর্ণহিন্দু" ও "তপশীলী হিন্দু" সদস্যের সংখ্যা উভয়ের সংখ্যানুপাতে অথবা উভয়ের স্বীকৃত ব্যবস্থানুসারে নির্দিষ্ট হইবে। একই নির্বাচন-কেন্দ্রে একাধিক সদস্যের আসন ব্যবস্থা থাকিবে। কিন্তু ভোটদাতা ভোটদানকালে একজন প্রার্থীকে ভোট না দিয়া ভাগ ভাগ করিয়া দিবেন। নির্বাচনে যে প্রার্থী তাঁহার নিজ সম্প্রদায়ের সর্বাধিকসংখ্যক ও অপর সম্প্রদায়ের ভোটের শতকরা ২৫টি ভোট পাইবেন, তিনি নির্বাচিত বলিয়া বিবেচিত হইবেন। যদি কোন প্রার্থী ঐ সর্ত পূর্ণ করিতে না পারেন, তবে যিনি নিজ সম্প্রদায়ের সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক ভোট পাইবেন, তিনিই নির্বাচিত বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

(৩) বৃটিশ সরকার যখন বাঙলাকে অবিভক্ত ও স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকার করিবেন, তখন বাঙলার বর্তমান সচিবসঙ্ঘের অবসান ঘটাইয়া অন্তর্বর্তী কাজের জন্য সচিবসঙ্ঘ গঠন করা হইবে। মুসলমান প্রধানসচিব হইবেন এবং তাঁহাকে বাদ দিয়া সচিবসঙ্ঘে সমসংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান সচিব থাকিবেন। একজন হিন্দু স্বরাষ্ট্রসচিব হইবেন।

(৪) নূতন শাসনপদ্ধতি অনুসারে ব্যবস্থা পরিষদ সচিব সঙ্ঘ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সরকারী চাকরীতে হিন্দু (তপশীলভুক্ত হিন্দু লইয়া) ও মুসলমান নিয়োগ সমসংখ্যায় হইবে। সামরিক ও পুলিস বিভাগের ব্যবস্থাও অনুরূপ হইবে। সরকারী চাকরীতে কেবল বাঙালীদিগকেই নিযুক্ত করা হইবে।

(৫) ব্যবস্থা পরিষদে য়ুরোপীয় ব্যতীত অ-মুসলমান ও মুসলমান সদস্য কর্তৃক নির্ধারিত ১৪ জন অ-মুসলমান ও ১৬ জন মুসলমান লইয়া গণ-পরিষদ গঠিত হইবে।

আমাদিগের বিশ্বাস, ইহাতে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব যেমন অধিক, ইহা তেমনই সমাজতন্ত্রের ও গণতন্ত্রের নীতির বিরোধী। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাম্প্রদায়িক নির্বাচন ব্যবস্থার স্থান থাকিতে পারে না। বাঙলায় মুসলমানের সংখ্যা (বিগত লোকগণনার হিসাবে) অল্প অধিক হইলেও এই পরিকল্পনায় মুসলমানদিগের অধিক অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। আর সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান যে স্বাধীন (সমাজ-তান্ত্রিক নহে) বাঙলাকে পাকিস্থানভুক্ত করিতেই চাহিবেন, তাহা অনায়াসে অনুমান করিতে পারা যায়।

মুসলিম লীগ এই ব্যবস্থায়ও সম্মত হইবেন কিনা সন্দেহ। মিস্টার আক্রাম খাঁ প্রভৃতি যৌথ নির্বাচনেও বিরোধী। কিন্তু এমনও হইতে পারে যে, মিস্টার আক্রাম খাঁর সহিত মিস্টার সুরাবর্দীর মতভেদ—অভিনয় মাত্র এবং উভয়ের দলের উদ্দেশ্য এক—বাঙলাকে বিভক্ত ভারতে অবিভক্ত রাখিয়া পাকিস্থানভুক্ত করা।

ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ যদি বিভক্ত হয়, তবে শিখদিগের জন্য পাঞ্জাব এবং জাতীয়তাবাদী হিন্দুদিগের জন্য বাঙলা বিভক্ত করিতেই হইবে। আমরা আশা করি, ইহাই কংগ্রেসের মত।

যে পরিকল্পনার সহিত শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর নাম জড়িত, তাহাতে যে হিন্দুসমাজের একাংশকে "তপশীলভুক্ত" স্বীকার করিয়া সেই বিভাগে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভারতীয়দিগকে দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়া যখন চতুর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা দেখেন, সংখ্যাগরিষ্ঠতাহেতু হিন্দুর প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ করা সম্ভব নহে এবং হিন্দুরা জাতীয়তাবাদী ও স্বাধীনতাকামী, তখন তাঁহারা হিন্দুসমাজকে আবার দ্বিধাবিভক্ত করিয়া দুর্বল করিবার উপায় স্থির করেন এবং ম্যাকডোনাল্ডের সংহিতায় তপশীলভুক্ত হিন্দুর সৃষ্টি হয়। তাহারই ফলে আজ আমরা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল প্রভৃতিকে পাইয়াছি। নোয়াখালি ও ত্রিপুরার ব্যাপারের পরেও সেই সকল স্থানে দরিদ্র "তপশীলভুক্ত" সম্প্রদায়ের নারীর লাঞ্ছনা স্বীকার করিয়াও যাঁহারা মুসলিম লীগের প্রচারকার্য পরিচালন করিতে পারেন, তাঁহাদিগের কথা অধিক না বলাই সংগত।

যে সচিব সংঘের শাসনে নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলাদ্বয়ে পৈশাচিক অনুষ্ঠান সম্ভব হইয়াছে এবং যে সচিব সংঘ আজও কলিকাতায় শান্তিস্থাপনে অক্ষম এবং হয়ত সেই অক্ষমতার আবরণে পাঠান পুলিস আমদানীর ব্যবস্থা করিয়াছেন—যে সচিব সংঘ আসাম আক্রমণের ব্যবস্থায় সহায়তা করিয়াছেন, সেই সচিব সংঘের অবসান যদি অবিলম্বে করা না হয়, তবে কবে হইবে?

মিস্টার সুরবাদীই বলিয়াছেন, হিন্দু ও মুসলমান ভিন্ন জাতি। কাজেই তিনি যখন বলেন, বাঙালীরা এক, তখন তাঁহার কোন্ উক্তি সত্য ও আন্তরিক বলিয়া মনে করিতে হইবে, তাহা কে বলিবে?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে—বাঙলা বিভক্ত হইলে যেরূপ হইবে, তদপেক্ষাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু রাষ্ট্র আছে, তাহা আমরা জানি। যদি সেই সকল রাষ্ট্রের সমন্বয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গঠিত ও রক্ষিত হওয়া সম্ভব হইয়া থাকে, তবে পশ্চিমবঙ্গ স্বতন্ত্র রাষ্ট্র করিতে কি আপত্তি থাকিতে পারে?

পশ্চিমবঙ্গ যদি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়, তবে তাহার আবার কি রূপ হইবে, তাহা বিবেচনা করা প্রয়োজন। অবশ্য সেজন্য যথাকালে সীমা নির্ধারণ কমিশন নিযুক্ত করিতে হইবে। কিন্তু তাহার পূর্বে সে সম্বন্ধে একটি মূলনীতি স্বীকার করা প্রয়োজন। লোকসংখ্যার অনুপাতেই যখন পাকিস্থানের দাবী উপস্থাপিত করা হইয়াছে, তখন আমরা কেবল জেলা হিসাবেই নহে, পরন্তু বিভাগ হিসাবেও আমাদিগের দাবী উপস্থাপিত করিলে তাহা কখনই অসংগত হইতে পারে না।

সমগ্র বর্ধমান বিভাগ অর্থাৎ বর্ধমান, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম এবং হুগলী ও হাওড়া হিন্দুপ্রধান। ইহার সহিত কলিকাতা ও ২৪ পরগণা যুক্ত করা যায় এবং খুলনা জিলাও হিন্দুপ্রধান। প্রেসিডেন্সী বিভাগের যশোহর ও নদীয়া দুইটি জিলা—জিলা হিসাবে অ-হিন্দুপ্রধান। কিন্তু উভয় জিলার এবং মুর্শিদাবাদের কোন কোন অংশের অবস্থা ভিন্নরূপ। জনসংখ্যার হিসাবে ভূমি দাবী করিলে পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র প্রেসিডেন্সী বিভাগও দাবী করিতে পারে। তাহার পরে মালদহের সামান্য অংশ "করিডর" হিসাবে পাইলে দিনাজপুরের যে অংশ হিন্দুপ্রধান, তাহা লইলে জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং লইয়া একটি প্রদেশ গঠন করা যায়। তাহাও লোকসংখ্যার হিসাবে অধিক হয় না। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা স্বতন্ত্রভাবে সমাধান করা প্রয়োজন হইবে।

বিলাতের মন্ত্রী মিশনের উক্তির যদি কোন মূল্য থাকে, তবে আজ ইঙ্গ-মুসলিম ষড়যন্ত্রেও কোন যুক্তিতে কলিকাতা পাকিস্থানভুক্ত করা যায় না এবং তাহা স্বতন্ত্র বন্দর করিবারও কোন কারণ থাকিতে পারে না। কারণ মন্ত্রী মিশন স্বীকার করিয়াছেন, কোন যুক্তিতেই পশ্চিমবঙ্গকে ও কলিকাতাকে পাকিস্থানভুক্ত করা যায় না।

প্রকাশ—

(১) য়ুরোপীয় ব্যবসায়ীরা কলিকাতাকে পশ্চিমবঙ্গ অর্থাৎ জাতীয় বঙ্গভুক্ত করিবার বিরোধী;

(২) কলিকাতায় বহু "তপশীলভুক্ত" হিন্দুর বাস এবং তাঁহারা বঙ্গ বিভাগের বিরোধী—অন্তত কলিকাতা পশ্চিমবঙ্গভুক্ত করিবার বিরোধী, ইহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা মুসলিম লীগের পক্ষ হইতে হইতেছে এবং সেজন্য স্বাক্ষর সংগ্রহ করা চলিতেছে।

কিন্তু "তপশীলভুক্ত" হিন্দুরা যে সহজে নোয়াখালি, ত্রিপুরায় তাঁহারা যে ব্যবহার লাভ করিয়াছেন তাহা ভুলিতে পারিবেন, এমন মনে করা যায় না।

যে সম্প্রদায়ের লোক পূর্ববঙ্গে হিন্দুদিগের প্রতি অকথ্য অত্যাচার করিয়াছে, তাহাদিগের সম্প্রদায়ভুক্ত ও তাহাদিগের সমর্থকদিগের সহিত সহযোগে কোনরূপ ব্যবস্থা যে প্রীতিপ্রদ বা সম্ভব হইতে পারে, এমন বলা যায় না।

সেই সঙ্গে কলিকাতার অধিবাসিগণকে কলিকাতা কর্পোরেশনে কয়দিন মুসলমান কাউন্সিলার প্রভৃতির ব্যবহার স্মরণ করিতে হইবে।

বাঙলায় মুসলিম লীগের সভাপতি মিস্টার আক্রাম খাঁন মুসলমানরা কিভাবে বঙ্গ বিভাগের বিরোধিতা করিবেন, তাহার আভাস তাঁহার উক্তিতে দিয়াছেন। সেজন্য বাঙলার জাতীয়তাবাদী মাত্রকেই প্রস্তুত থাকিতে হইবে। আমাদিগের দৃঢ়বিশ্বাস, সে বিরোধিতায় সময় মিস্টার আক্রাম খাঁ ও মিস্টার সুরাবর্দী এক হইয়া যাইবেন।

আমরা আশা করি, বাঙলার গভর্ণর স্যার ফ্রেডারিক বারোজ মিঃ আক্রাম খাঁর উক্তি পাঠ করিয়াছেন এবং শালবনীতে বিহার হইতে আনীত মুসলমানদিগের আচরণের বিবরণ পাইয়াছেন। আমরা জানি, তিনি নোয়াখালির ঘটনা সম্বন্ধে যে বিবরণ বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে শালবনীর ঘটনার বিবরণ কিভাবে তিনি পাইবেন, তাহা বলা যায় না। কিন্তু যদি সত্যে তাঁহার অনুরাগ থাকে, তবে তিনি সে ঘটনার বিবরণ চেষ্টা করিয়া জানিতে পারেন এবং জানিয়া সেজন্য আবশ্যক উপায় অবলম্বন করিতেও যে পারেন না, এমন নহে।

যতদিন বাঙলা সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট সচিব সংঘের কুশাসন হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে না পারিবে, ততদিন বাঙালীর ধন, প্রাণ, মান, সংস্কৃতি কিছুই নিরাপদ হইবে না এবং লোকের ধর্মাচরণের স্বাধীনতাও থাকিবে না।

মুসলিম লীগের সহিত আলোচনাকালে সে অবস্থার প্রতীকার হইতে পারে কি? লীগানুগত সচিব সংঘের সময় দুর্ভিক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের বর্ণনা মনে পড়িয়াছিল—"কোন্ দেশের এমন দুর্দশা, কোন্ দেশে মানুষ খেতে না পেয়ে ঘাস খায়? কাঁটা খায়, উইমাটি খায়, বনের লতাপাতা খায়?" আর সেই সচিব সংঘের সময় নোয়াখালি-ত্রিপুরার অবস্থায় মনে পড়ে—কোন্ দেশের মানুষের সিন্দুকে টাকা রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, সিংহাসনে শালগ্রাম রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, ঘরে ঝি-বৌ রাখিয়া সোয়াস্তি নাই?"

আজ বাঙলায় সেই প্রশ্নই দিকে দিকে জিজ্ঞাসিত হইতেছে।

মুক্তি কোথায় ?

শ্রীদেবব্রত বড়ুয়া, এম-এ

ধন-ধান্য-পুষ্প-ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা'—এই বসুন্ধরার বয়স হয়েছে অনেক। বিস্মৃতির অতলতলে তলিয়ে গেছে এই অতি পুরাতন, পরিচিত পৃথিবীর সেই আদিম দিনটি, যেদিন ঘন তমসার পর্দা ভেদ করে পৃথিবীর বুকে এলো নবারুণ-রেখা; স্মরণের মালা হ'তে খসে পড়েছে ধরিত্রীর বুকে প্রথম মানব-শিশুর অসহায় আর্তনাদ। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়, স্মরণ-বিস্মরণ, সব কিছুর ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলে প্রিয়তম পৃথিবী।

মানুষ,—আদিম মানুষ,—অসহায়, একক। বনে বনান্তরে ঘুরে বেড়ায়। প্রকৃতি আর প্রয়োজনীয়তায় খুঁজে সাথী! এ দুয়ের প্রয়োজনায় গড়ে উঠে মানব-পরিবার; মানুষের সমাজ জন্ম নেয় পৃথিবীর বুকে। আদিম বর্বর নরনারীর সমাজের সরল মানুষ প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠে। ....মানব-সভ্যতার চাকা চলে ঘুরে। পৃথিবীর বুকে আসে নানা সভ্যতা; বিভিন্ন সভ্যতার সংমিশ্রণে জন্ম নিয়েছে আজকের নূতন মানুষ: এই নূতন মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে, 'মুক্তি কোথায় ?'

এই পৃথিবীর বুকে এসেছে,—মিশর, এশিরিয়া, ব্যাবিলন, গ্রীস প্রভৃতি দেশের 'হিদেন' সভ্যতা; আবেস্তার বৈশ্বানরের দিগ্বিজয়; ইহুদী, খৃষ্টান আর মুসলমানের একেশ্বরবাদ; বৈদিক যুগের প্রকৃতি-পূজার সরল মানব-মনের অভিব্যক্তি; উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্ব, মহাবীরের কৃচ্ছ্রসাধন, বুদ্ধের যুক্তিবাদ। এগুলির ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে মানব-সভ্যতার ক্রম-বিকাশ; এদের প্রত্যেকটি আজ এক একটি ধর্ম বলে পরিচিত। কিন্তু এই সামান্য 'ধর্ম' কথাটি আজ এক বিরাট সমস্যার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেক স্বাধীন চিন্তাকামীর চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, ধর্মের সার্থকতা।

সাধারণ ধারণা,—ধর্মের সার্থকতা মানব-মুক্তির পথ-নির্দেশে। হিন্দুধর্মে মুক্তি রয়েছে ব্রহ্মলোকে, জৈন ধর্মে মুক্তি কৈবল্যে, বৌদ্ধ ধর্মে মুক্তি নির্বাণে; খৃষ্ট ধর্ম আর ইসলামএ মুক্তি "হেভেন" আর "বেহেস্ত"এ। কিন্তু এই মুক্তি কি? মুক্তি কিসের? এই প্রশ্ন ক'টির উত্তর অবশ্য স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক ধর্মেই রয়েছে। তবু 'মুক্তি কোথায়?' প্রশ্নটা আজ একটা ভাববার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পার্থিব দুঃখের হাত থেকে রেহাই পাওয়াই মুক্তি। কিন্তু কোন হিন্দুকে মহাবীর এসে যদি বলেন, 'মুক্তি আমার কাছে,' বুদ্ধ এসে বলেন, "না, আমার কাছে," যীশু আর মহম্মদ বলেন, তাঁদের কাছে; তাহলে সে বেচারা যায় কোথায়? "সো অহং"-ই যদি মুক্তির সংজ্ঞা হয়, ব্রহ্মলোকের সন্ধান পাবার আগে যাঁরা সরলচিত্তে প্রতি প্রভাত-সন্ধ্যায় অরণ্যানীর শীতল ছায়ায়, গম্ভীর মন্দ্রে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে বেদ-গান করে গেছেন, তাঁরা কি মুক্তির সন্ধান পান নাই? অনন্তকাল ধরে তাঁরা কি শুধু ঘুরে মরছেন, জন্ম-জন্মান্তরের দুঃখের আবর্তে? সংবর-শীলের মধ্য দিয়ে তিলে তিলে আত্মহত্যা করে যা'রা কৈবল্যের সুখাস্বাদ পায় নাই, তাদের কি মুক্তি নেই? যারা 'মধ্যম পথ' অবলম্বন করে 'নির্বাণং পরমং সুখং' লাভ করে নাই, নির্বাণের পথ প্রদর্শিত হবার আগে যারা এই মর্ত্যলোকের যাত্রী হয়ে এসেছিল, তারা কি শুধু 'ভুবনের ঘাটে ঘাটে এক হাটে লয় বোঝা শূন্য করে দেয় অন্য হাটে?' যাদের কাছে বুদ্ধের মুক্তি-বাণী গিয়ে পৌঁছায় নাই, তারা কি চিরকাল ধরে জন্ম-জন্মান্তরের স্রোতে শুধু ভেসেই চলেছে? আব্রাহাম, আইসাক্, জেকব-এর বংশধররা যীশুর বাণী শুনতে পায় নাই বলে কি মুক্তির সন্ধান পায় নাই? যীশুর বাণী যেখানে প্রচার লাভ করে নাই, সেখানকার নরনারী কি 'হেভেন্'এর অনাবিল সুখের আস্বাদ থেকে বঞ্চিত? অ-মুসলমানরা কি আদম-ইভএর আমল থেকে "দোজক"এ গিয়ে জমা হয়েছে? মুক্তিই যদি প্রত্যেক ধর্মের মূলে উদ্দেশ্য হয়, আর সেই মুক্তির ভিতর থাকে পক্ষপাতিত্ব, তা হলে বলতে হবে ধর্ম একটা কিছু না। মুক্তির দোহাই দিয়ে যাঁরা ধর্ম প্রচার করেন, তাঁদের ধর্ম গ্রহণ না করলে কি মুক্তি-পথের সন্ধান মিলে না?

ধর্মের নামে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে বর্বরতা, নৃশংসতা, অরাজকতা। এ বলে, "আমার ধর্ম বড়" ও বলে "আমার।" তাই ধর্ম আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে evil necessity। ধর্মের প্রয়োজন শুধু এইজন্য, মানবের প্রকৃতি আর প্রবৃত্তিকে পশুত্বের স্তর থেকে উন্নত করবার, সংশোধিত করবার এবং তার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সমাজ-সভ্যতাকে এগিয়ে দেবার মূলে আছে ধর্ম। ধর্ম মহাপুরুষদের চিন্তার ধারা; এই চিন্তাধারা 'গোপনে গোপনে কাজ করে যায় ভুবনে ভুবনে;' মানব-প্রকৃতি আর মানব-সভ্যতার হয় ক্রমবিকাশ আর ক্রমোন্নতি (elevation of human nature and human civilisation).

এইজন্যই আমরা প্রত্যেক ধর্মের মূলে দেখি "নীতি" (ethics)। তবে এই নীতি সর্বকালে সর্বদেশে এক নয়। বিলাতী মেয়েদের পক্ষে হাঁটুর উপর 'গাউন'-পরা সহজ-সুন্দর হলেও খাঁটি বাঙালী কিংবা ভারতীয় নারীর নীতিবোধে এটা নেহাৎ বেয়াদবী বলেই পরিগণিত হয়। সে যাই হোক, বুদ্ধের দেওয়া সাধারণ চারিত্রিক নীতিও যদি মানতে না পারা যায়, তাহলে বৌদ্ধ বলে পরিচয় দেওয়া লজ্জার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এই কথাটা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের বেলায়ও প্রযোজ্য। প্রত্যেক ধর্মে যে মুক্তির বিবরণ পাওয়া যায়,—সে মুক্তি জৈব প্রবৃত্তি আর প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্তি। এই মুক্তির সংজ্ঞা সুন্দর হতে সুন্দরতর হয়েছে যেখানে মানব-প্রকৃতিকে, মানব-সভ্যতাকে উন্নত হ'তে উন্নততর করবার আভাস পাওয়া গেছে।

বর্তমান পৃথিবীতে আমরা যে কয়টি ধর্ম দেখতে পাই, তাদের মূলে রয়েছে দুটো উৎস, দুটো ভাবধারা,—'সেমিটিক' ও আর্য (Aryan)। সেমিটিক ভাবধারার ক্রম-বিকাশ রূপ পেয়েছে জেহোভা'র (Jehovah) নির্বাচিত সম্প্রদায় (chosen people), যীশু আর মহম্মদ-এর চিন্তাধারার ভিতর দিয়ে। আর্য-সভ্যতা, বিশেষ করে ভারতীয় আর্য-সভ্যতার (Indo-Aryan Civilisation) ক্রম-বিকাশ হয়েছে বেদ-ব্রাহ্মণ, আরণ্যক-উপনিষদ, জৈন আগম আর বৌদ্ধ-পিটক প্রভৃতির ভিতর দিয়ে। এদের প্রত্যেকটি স্ব স্ব ভাবধারার এক একটি বিশেষ স্তর। একটির সঙ্গে আর একটির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। পৃথিবী যখন এগিয়ে চলে তখন সেই এগিয়ে চলার সাথে প্রয়োজন হয়, সমাজকে এগিয়ে নেবার। যে সমাজে এটা ব্যর্থ হয়েছে সে সমাজ পড়েছে পিছিয়ে; হয়েছে তার মৃত্যু। পৃথিবীর অগ্রগতির সাথে পা ফেলে চলবার জন্য প্রয়োজন হয়, মানুষের সমাজে নূতন চিন্তাধারার। 'পুরাতন নিয়ম'-এর (Old Testament) ব্যর্থতার দিনে 'নূতন নিয়ম'এর (New Testament) জন্ম; জোহন-এর (Johan, the Baptist) ব্যর্থতাকে সফল করে তুললেন যীশু। যীশু তাঁর নূতন চিন্তাধারা দিয়ে সেমিটিক ভাবধারার মোড় ফিরিয়ে দিলেন। আবার তেমনি আরবের আতপতপ্ত মরুপ্রান্তরে ঘোষিত হলো মহম্মদএর ইসলাম; ইসলাম-এর প্রয়োজন ছিল পিছিয়ে-পড়া আরববাসীকে চলমান পৃথিবীর সাথে এগিয়ে নেবার জন্য। মহম্মদ পুরাতন আর নূতন নিয়মের উপর ভিত্তি করে 'কোর-আন'-এর ভিতর দিয়ে আরববাসীকে

দুশ্চরিত্রতার হাত থেকে মুক্তি দিলেন। তাই দেখতে পাওয়া যায় Judaism, Christianity আর Islam—এই তিনটি সেমিটিক ভাবধারার বিভিন্ন স্তর; একটির সাথে আর একটির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ এবং এই তিনটির ভিতর দিয়ে সেমিটিক ভাবধারার ক্রম-বিকাশ।

ভারতীয় আর্য-সভ্যতার ক্রম-বিবর্তনের ইতিহাসেও আমরা এই একই ধারা দেখতে পাই। বৈদিক যুগের সরল মানব-সন্তান প্রকৃতির ক্রোড়ে, প্রকৃতির লীলানিকেতনে চরম তৃপ্তির আস্বাদ পেয়েছিল প্রকৃতি-পূজায়; তাদের সরল ভাবধারা বেদ-ব্রাহ্মণ-আরণ্যকের ভিতর দিয়ে নূতনের সন্ধান পেলো উপনিষদে। দৃষ্টি হলো অন্তর্মুখী; ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের কণ্ঠে মূর্ত হয়ে ধ্বনিত হলো কর্মবাদ। এই ভাবধারা আবার নানা মুনির নানা মতের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চল্‌লে; মহাবীর এসে তাঁর চিন্তাধারা দিয়ে এই ভাবধারার মোড় ফিরিয়ে দিলেন; বুদ্ধ এলেন,—যুক্তিবাদের ভিতর দিয়ে তিনি দেখালেন মানবের অগ্রগতি। এমনি করে এগিয়ে চল্‌ল,—ভারতীয় আর্য-সভ্যতার ধারা।.........

অনেকে মনে করেন, বৌদ্ধ ধর্ম ও জৈন ধর্ম হিন্দু ধর্মের শাখাবিশেষ। কিন্তু এই মনে করার মধ্য দিয়ে সত্যের কিঞ্চিৎ অবমাননা হয় বললেও অত্যুক্তি হয় না। প্রকৃতপক্ষে জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম ভারতীয় আর্য-ভাবধারার দু'টো ক্রমোন্নত স্তর; এ দু'টোকে ভারতীয় আর্য ভাবধারার শাখা বলাও সংগত নয়; কারণ তাহ'লে এ দু'টোকে সেই ভাবধারা হ'তে কিছুটা পৃথক করে রাখা হয়।

একটি চিন্তাধারা যখন অপর্যাপ্ত মনে হয়, তখন তা'রই উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয় আর একটি চিন্তাধারা। বুদ্ধ নবম ধ্যান স্তর "সম্মা বেদয়িতনিরোধ সমাপত্তি" লাভ করে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন। তাঁর আগে আর্য-ঋষিরা অষ্টম ধ্যানস্তর অবধি পৌঁছেছিলেন; বুদ্ধ তাঁদেরই প্রদর্শিত পথের ভিতর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে নবম ধ্যান স্তরে উপনীত হলেন। পৃথিবী চলেছে এগিয়ে; সামনে যে আর একজন মহাপুরুষ এই ধূলি-ধূসর ধরার বুকে অবতীর্ণ হয়ে দশম ধ্যান স্তরের ভিতর দিয়ে ভারতীয় আর্য ভাবধারাকে আরও মহীয়ান করে তুলবেন না, তা' কে বলতে পারে? আজকের দিনে যে মুক্তি নবম-ধ্যান স্তরে সম্পন্ন হবে, আগামী দিনে তা' হয়তো হবে দশম ধ্যান স্তরে গিয়ে। ধ্যান স্তর মানবের চিন্তার অগ্রগতির প্রতীক; এই চিন্তাধারার অগ্রগতির সংগে সংগে মানবের প্রবৃত্তি আর প্রকৃতি, মানুষের সমাজ হবে উন্নত হতে উন্নততর; আজকের মানুষের স্বভাব-প্রকৃতিতে যা' কিছু জৈব প্রভাব রয়েছে, তার হাত থেকে রেহাই মিলবে সেদিন। সেদিনের মুক্তির সংজ্ঞা হবে আরও বড়, আরও উন্নত, উন্নততর।

রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্য

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

বড়কে ছোট করা ও ছোটকে বড় করা হচ্ছে দুর্বলের ধর্ম বা স্বভাব। আমার থেকে কেউ বড়—আমার মত বা বিশ্বাস থেকে অন্য কেউ আর কোনো রকমের সত্যকে দেখেছে তা স্বীকার করার মনঃশিক্ষাও নেই, বিনয়ও নেই। তাই মানুষের নিরন্তর চেষ্টা চলে তার থেকে যে পৃথক বা বড় তাকে ছোট প্রমাণের জন্য। কিন্তু কারো মধ্যে যদি অসাধারণত্ব বা দৈবশক্তি একবার আরোপ করতে পারে তখন তার মহত্ত্ব সম্বন্ধে বিচারের অবসান নিঃশেষেই হয়ে যায়। মোট কথা, ছোট আমির সংগে বড় আমির দ্বন্দ্ব চলেছে অহর্নিশি—হতভাগ্য ছোট আমিরই জয় হয়—লোকে তাকে বলে Success। জগতময় এই ছোট আমির জয় জয়কার ঘোষণা করে মানুষ যে আপনাকে পদে পদে কী পরিমাণে অপমানিত করছে—তা বুঝবার শক্তি পর্যন্ত আজ অসাড়—তার মন এমনি বিষবাষ্পে অন্ধকার। তাই আজ লোকধর্ম ও মানবধর্মের মধ্যে দ্বন্দ্ব এমন উৎকট আকার ধারণ করেছে। সাময়িকতা ও চিরন্তনতার এ বিরোধ।

মানুষ সাময়িকতার দোহাই দিয়ে সাময়িক দুঃখ-কষ্ট থেকে ত্রাণ পাবার জন্য চিরন্তনতার আদর্শকে খর্ব করতে তার লজ্জাবোধ হয় না, —সে চায় উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে—সে বলে Expediency—যেন তেন প্রকারেণ কার্য-সিদ্ধির মধ্যে মানুষের পৌরুষ। সে উপদেশ করে "কার্যসিদ্ধি যতক্ষণ নাহি হয়, বন্ধ রেখো মুখ।" অর্থাৎ সত্যকথাটা এখন চেপে যাও। লৌকিক ধর্মবোধ মানুষকে এই কার্যসিদ্ধির জন্য উপায়ের আশ্রয় নিতে পরামর্শ দেয়। মানুষের উপায়-বুদ্ধি "খুঁড়িছে সুড়ংগপথ চোরের মতন রসাতলগামী।" আর মানুষের চিরন্তন ধর্মবোধ নিষ্পেষিত হয়েও ক্ষীণ স্বরে বলতে থাকে 'ধর্মেই ধর্মের শেষ'। রবীন্দ্রনাথ জীবনশিল্পী বা আর্টিস্ট—তাই তিনি সমগ্রের দৃষ্টিতে সমস্যাকে দেখেছেন—উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য উপায়ের পথ নির্দেশ করেননি।

মানুষ যখন আপনার শাশ্বত মানব সত্তাকে অস্বীকার করে ক্ষুদ্র-আমির পূজা করে—তখনই চারিদিক থেকে বিপর্যয় ও বিপদ উদগ্র হয়ে ওঠে; এই বিপর্যয়ের মুখে—এই সাময়িকতার মুখে আমরা প্রশ্ন পর্যন্ত করিনে —এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী কে? আমরা বাইরের ঘটনার মধ্যে কারণ খুঁজি—নিজ অন্তরের দিকে ফিরেও তাকাই নে—ধর্ম লাঞ্ছিত হয়েছেন কিনা—সে প্রশ্ন মনে জাগে না।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যিক-কবি জগতের কাছে সেইটাই তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়; সুতরাং এই অন্তর-বাহিরের দ্বন্দ্ব, জগতের সাময়িকতার ও চিরন্তনতার বিরোধ—সমাজের ধর্ম ও অধর্মের অসামঞ্জস্য—কীভাবে দেখেছেন, তার একটা আংশিক আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। যে কাল পড়েছে—এখন 'অধর্ম' যে-অধর্ম, অন্যায় যে-নিন্দনীয়—এই সুকুমার বোধটুকু মানুষের হৃদয় থেকে লোপ পেতে বসেছে; সেইজন্য আজ আমাদের জোর করেই বড় কথাকে বড় বলেই ঘোষণা করতে হবে—অসম্মানের ভয়ে যেন শাশ্বত সত্যকে বক্রোক্তির দ্বারা তাচ্ছিল্য না করি। রবীন্দ্রনাথের বিরাট সাহিত্য থেকে কয়েকটি নাটককে কেন্দ্র করে তিনি লোকধর্ম ও শাশ্বত ধর্মের দ্বন্দ্ব কীভাবে দেখিয়েছেন তারই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো।

জীবনকে সমগ্রভাবে দেখবার দার্শনিকতার প্রথম সন্ধান পাই প্রকৃতির প্রতিশোধ নাটিকায় —এটা লেখেন বাইশ বৎসর বয়সে। কবির জীবনদর্শনের মূল কথাটি এর মধ্যে নিহিত আছে—তাঁরই ভাষায় বলি—"প্রকৃতির প্রতিশোধের মধ্যে একদিকে যতসব পথের লোক, যতসব গ্রামের নরনারী—তাহারা আপনাদের ঘরগড়া প্রাত্যহিক তুচ্ছতার মধ্যে অচেতনভাবে দিন কাটাইয়া দিতেছে; আর একদিকে সন্ন্যাসী সে আপনার ঘরগড়া এক অসীমের মধ্যে কোনো-মতে আপনাকে ও সমস্ত কিছুকে বিলুপ্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রেমের সেতুতে যখন দুই পক্ষের ভেদ ঘুচিল, গৃহীর সংগে সন্ন্যাসীর যখন মিলন ঘটিল, তখনই সীমায় অসীমে মিলিত হইয়া সীমার মিথ্যা তুচ্ছতা ও অসীমের মিথ্যা শূন্যতা দূর হইয়া গেল।" এই কয়েকটি পংক্তির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে কথাটি

বললেন, তার গভীরতা সহজে বোধগম্য হবে না, যদি আমরা প্রত্যেকটি বাক্য গভীরভাবে মনন দ্বারা উপলব্ধি করতে চেষ্টা না করি। 'বিসর্জন' নাটক আশা করি সকলেই পড়েছেন। বিসর্জনের মধ্যে পদে পদে লৌকিক ধর্মের সংগে মানব-ধর্মের বিরোধ; ধর্মের নামে পুরোহিত চাইছেন ভাই দিয়ে ভ্রাতৃহত্যা করতে, গুপ্তঘাতক দিয়ে রাজহত্যা করতে, অপহরণ করে শিশু হত্যা করতে—সমস্তই ধর্মবোধ থেকে! স্ত্রী স্বামীকে ত্যাগ করছেন ধর্মের নামে, ভাই ভ্রাতৃদ্রোহী ধর্মের নামে। দেবতার নামে, ধর্মের জয়গান করে মানুষ যে কত বড় নৃশংস হতে পারে—তার দৃষ্টান্ত পাই এই নাটকে। মানবের মধ্যে সুপ্ত পশু ধর্মের মুখোস পড়ে বলে—'কে বলিস হত্যাকাণ্ড পাপ। এ জগৎ মহা-হত্যাশালা।" অদৃশ্য দেবতার নামে নরবলি চিরকালই হচ্ছে—সেই দেবতার নাম কখনো চতুর্দশ দেবতা—কখনো রাষ্ট্র বা নেশন দেবতা, কখনো ধর্ম দেবতা! বিকট উল্লাসে মানুষ ভগবানের নাম করে মানুষেরই অপমান করেছে, হত্যা করে চেঁচিয়ে বলছে—রাজ্যের মংগল হবে—ধর্মের জয় হবে!

দাঁড়াইয়া মুখোমুখি দুই ভাই হানে
ভ্রাতৃবক্ষে লক্ষ্য করে মৃত্যুমুখী ছুরি—
রাজ্যের মংগল হবে তাহে? রাজ্যে শুধু
সিংহাসন আছে, গৃহস্থের ঘর নেই,
ভাই নেই, ভ্রাতৃত্ববন্ধন নেই কোথা?

এই কয়টি কথা বলেছিলেন গোবিন্দ-মাণিক্য নক্ষত্র-মাণিক্যের পত্র পেয়ে যখন তিনি লিখে পাঠিয়েছিলেন যে, তাঁকে রাজ্য ছেড়ে না দিলে

......"ভাসাবে রক্তস্রোতে
সোনার ত্রিপুরা—দগ্ধ করে দিবে দেশ,
বন্দী হবে মোগলের অন্তঃপুর তরে
ত্রিপুর রমণী......"

ইহার ভাষ্য নিষ্প্রয়োজন।

ক্ষুদ্র "মালিনী" নাটিকাটির কথা আপনাদের স্মরণে আনতে বলছি; এখানেও কবি লৌকিক ধর্মবোধ ও মানবধর্মবোধের বিরোধের চিত্রই এঁকেছেন। ব্রাহ্মণরা রাজকন্যা মালিনীর নির্বাসন চাহে। তার অপরাধ—সে বৌদ্ধশ্রমণদের ধর্মকে অন্তরে বরণ করেছে। এই নাটকের অন্যতম নায়ক সুপ্রিয় বলছে—

যে শাস্ত্রের অনুগামী
এ ব্রাহ্মণ, সে শাস্ত্রে কোথাও লেখে নাই
শক্তি যার ধর্ম তার!

জগতে বার বার সত্যকে শক্তির কাছে পরীক্ষা দিতে হয়েছে—'বেশি বল যাঁর সেই বিচারক' হয়ে মানব ধর্মকে আঘাত করেছে—কিন্তু ততঃ কিম্—হাঁ এই কিন্তুরই জয় হয়েছে ও চিরদিন হবে—সাময়িকতার উপর চিরন্তনতার জয় হবেই।

নাট্যকাব্যগুলির মধ্যে 'গান্ধারীর আবেদনে' এই সংগ্রাম আরও স্ফুটতর হয়েছে। লৌকিক ধর্ম, রাজধর্ম, সমাজ ধর্মের নিকট মহামানব ধর্ম লাঞ্ছিত, পদদলিত; দুর্যোধনের কাছে রাজধর্মই একমাত্র ধর্ম—মানবধর্ম বিদ্রুপিত—

"রাজধর্মে ভ্রাতৃধর্ম, বন্ধুধর্ম নাই, শুধু জয়ধর্ম আছে।"—অর্থাৎ Expediency বা কার্যসিদ্ধির জন্য কোনো কাজই অন্যায় নয়, ruthlessness-ই হচ্ছে রাজধর্ম। এই সর্বনেশে ধর্মবোধহীন রাজনীতি আজ জগতে ভদ্রবেশে ধর্মের নামে, নেশনের নামে, সংঘের নামে যে কাণ্ডটা করছে তার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। উদ্ধত রাজনীতি বলে "অব্যক্ত নিন্দায় কোনো ক্ষতি নাহি করে রাজ-মর্যাদায়—ভ্রূক্ষেপ না করি তাহে।" চিরদিনই দুর্যোধন প্রমুখ হিটলারের দল এই দম্ভোক্তি করেছে। কিন্তু ততঃ কিম্—তারপর হলো কি? ঐ কিন্তুরই জয় হয়েছে ও চিরকাল জয় হবে।

মরে না, মরে না কভু সত্য যাহা শত শতাব্দীর বিস্মৃতির তলে—নাহি মরে উপেক্ষায় অপমানে না হয় অস্থির, আঘাতে না টলে। মানুষ যখন 'অধর্মের মধুমাখা বিষফল তুলি আনন্দে' নাচতে থাকে, অসত্যের কাছে মনুষ্যত্বকে বলিদান দেয়, তখন সে ব্যক্তি নিন্দাতেও আর লজ্জা বোধ করে না—এমনি তার কৃপার দশা হয়। কারণ দুর্যোধন ভাবে 'বেশি বল যার, সেই বিচারক হবে। হোতে পারে সাময়িকতার জয় হোতে পারে সাময়িকভাবে—চিরন্তনার জয় চিরদিনের। গান্ধারীর আবেদন ব্যর্থ হয় ধৃতরাষ্ট্রের নিকট, কারণ সে বলে 'অন্ধ আমি ভিতরে বাহিরে।' শুধু অন্ধ নহে—বধিরও সে 'সেই ত বধিরতম যেজন শোনেও শোনে না।' হিতকথা তার কানে পোঁছায় না—সে ভুলে যায়—

'ধর্ম নহে সম্পদের হেতু মহারাজ, নহে সে সুখের ক্ষুদ্র সেতু, ধর্মেই ধর্মের শেষ।'

গান্ধারীর আবেদনের প্রত্যেকটি পংক্তি আজ পুনরায় সকলকে পাঠ করতে অনুরোধ করছি। ধর্মের দোহাই দিয়ে, কাপুরুষতার প্রশ্রয় দিয়ে ক্লীবতাকে বড় নাম দিয়ে সেদিন রাজসভায় দুর্যোধনের অন্নদাস মহারথিগণ নীরবে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা দেখেছিলেন। গান্ধারী বলছেন—

"মোরা থাকি দূরে
আপনার গৃহকর্মে শান্ত অন্তঃপুরে।"
"যে সেথা টানিয়া আনে বিদ্বেষ অনল
বাহিরের দ্বন্দ্ব হতে, পুরুষেরে ছাড়ি
অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া নিরুপায় নারী
গৃহধর্মচারিণীর পুণ্যদেহ 'পরে
কলুষ-পরুষ স্পর্শে অসম্মানে করে
হস্তক্ষেপ, পতি সাথে বাধায়ে বিরোধ
যে নর পত্নীরে হানি লয় তার শোধ—
সে শুধু পাষণ্ড নহে, সে যে কাপুরুষ।"

"...অনাথিনী পাঞ্চালীর...বস্ত্র আকর্ষিয়া
খলখল হাসিতেছে সভামাঝখানে
গান্ধারীর পুত্র পিশাচেরা। কুরুরাজগণ,
পৌরুষ কোথায় গেছে ছাড়িয়া ভারত।
তোমরা, হে মহারথী জড়মূর্তিবৎ
বসিয়া রহিলে সেথা চাহি মুখে মুখে
কেহ বা হাসিলে, কেহ করিলে কৌতুকে
কানাকানি,—কোষমাঝে নিশ্চল কৃপাণ
বজ্র-নিঃশেষিত লুপ্ত বিদ্যুৎ-সমান
নিদ্রাগত। দূরে করো জননীর লাজ,
বীর ধর্ম করহ উদ্ধার, পদাহত
সতীত্বের ঘুচাও ক্রন্দন, অবনত
ন্যায় ধর্মে করহ সম্মান, ত্যাগ করো
দুর্যোধনে।"

অত্যাচার উৎপীড়ন নীরবে দেখলেন বসে কাপুরুষ অন্নদাসের দল—রাজধর্মানুগত্যের নামে! অত্যাচার যে করে আর অত্যাচার যে সয়, কবি তাদের এক শ্রেণীর অন্তর্গত করে' ধিক্কৃত করেছেন। একদিন দুর্যোধনের সংগে সেই অন্নদাস বীরদেরও দারুণ দুঃখের মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল। কারণ—ধর্ম আছেন জাগ্রত।

লোকধর্ম ও মানবধর্মের সর্বাপেক্ষা গভীর ও জটিল প্রশ্ন কবি তুলেছেন 'সতী' নাটকে। ধর্ম মানুষের সৃষ্টি—মানুষ দেবতার সৃষ্টি—সুতরাং ধর্ম থেকে মানুষ বড়—'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'। বিনায়ক রাও-এর কন্যা অমাবাঈ কোনো মুসলমান যুবককে ভালোবেসে বিবাহ করে; অমাবাঈ-এর মা যবনের সংগে কন্যার এই বিবাহকে অস্বীকার করে কন্যা-জামাতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। যুদ্ধে অমাবাঈ-এর মুসলমান স্বামী পিতার হাতে নিহত হলো। অমাবাঈ-এর উপর হুকুম হোলো যবনের ঔরসজাত শিশুপুত্রকে ত্যাগ করে চলে আসবার জন্যে। যবন পতি ও তার পুত্র অমাবাঈ-এর পিতামাতার চোখে পাপ মাত্র—তাদের ত্যাগ করলেই কন্যার সদ্গতি হবে। এই যুদ্ধে অমাবাঈ-এর বাকদত্তা স্বামী জীবাজীরও মৃত্যু হয়। বিনায়ক বললেন, জীবাজী যথার্থ পতি, কারণ সে বাকদত্ত—যবন তার স্বামী নহে—তখন অমাবাঈ বললে—

তব ধর্ম কাছে
পতিত হয়েছি, তবু মম মর্ম আছে
সমুজ্জ্বল। পত্নী আমি নহি সেবাদাসী।
বরমাল্যে বরেছিনু তাঁরে ভালোবাসি।
......শ্রদ্ধাভরে হৃদয় অর্পণ
করেছিনু বীর পদে। যবন ব্রাহ্মণ
সে ভেদ কাহার ভেদ? ধর্মের সে নয়।
অন্তরের অন্তর্যামী যেথা জেগে রয়
সেথায় সমান দোঁহে। হয়েছি যবনী
পবিত্র অন্তরে; নহি পতিতা রমণী।"

প্রেম মানবের আদিম ধর্ম—লৌকিক ধর্ম সৃষ্টি হবার বহু পূর্বে প্রেমের জন্ম হয়েছিল—কোন অনাদিকালে কেউ জানে না। লৌকিক ধর্মে প্রেম জাতি-বর্ণ-গোত্র বিচারী। তাই মানুষের রচিত ধর্ম অনুসারে অমাবাঈ জীবাজীর বাকদত্তা—অতএব পত্নী যবনের বিবাহিত পত্নী হয়ে ত আজ সে সে-অধিকার থেকে বঞ্চিত হলো। তাকে মুসলমানের হাত থেকে উদ্ধার করে জীবাজীর সঙ্গে সহমৃতা করা হলো। তখন অমাবাঈর প্রার্থনা উঠল—"তব নিত্যধর্মে কর জয়ী ক্ষুদ্র ধর্ম হতে।" অমাবাঈ যথার্থ সতী; কিন্তু তার মা পরপুরুষের সঙ্গে তাকে জীবন্ত দগ্ধ করে আচার-ধর্মে জয় ঘোষণা করলেন—নিত্যধর্ম অপমানিত হলো—দেবতা বিমুখ হলেন। আর একটি মাত্র নাট্যকাব্যের কথা বলে, আমার বক্তব্য শেষ করবো। সেটি হচ্ছে কর্ণকুন্তী সংবাদ। কর্ণকে কুন্তী শিশুকালে নদীবক্ষে নিক্ষেপ করেন। সমাজের ভয়ে তিনি মাতৃধর্ম পালন করেন নি—মাতৃধর্ম জগতের নিত্যধর্ম। কুন্তী মাতৃত্বের গর্ব ও গৌরব বহন করে, বলতে পারেন নি জাবালির ন্যায়—'জন্মেছিস্ ভর্তৃহীনা' জননীর ক্রোড়ে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মুখে তাঁর স্মরণ হয়েছে কর্ণের কথা—তাকে তিনি ভ্রাতৃপক্ষে যোগদানের জন্য অনুরোধ জানালেন 'বিধির প্রথম দান এ বিশ্ব সংসারে। মাতৃস্নেহ, কেন সেই দেবতার ধন আপন সন্তান হোতে করিলে হরণ' তাহার উত্তর তিনি কর্ণকে দিতে পারেন না। কর্ণ বলে—

"মাতঃ সূতপুত্র আমি, রাধা মোর মাতা,
তার চেয়ে নাহি মোর, অধিক গৌরব।
পাণ্ডব পাণ্ডব থাক, কৌরব কৌরব।

কুন্তী তাহাকে সিংহাসনের লোভ দেখালে সে বললে—

"যে ফিরাল মাতৃস্নেহ পাশ,
তাহারে দিতেছ মাতঃ রাজ্যের আশ্বাস।
একদিন যে-সম্পদে করেছ বঞ্চিত
সে আর ফিরায়ে দেওয়া তব সাধ্যাতীত।
জন্মরাত্রে ফেলে গেছ মোরে ধরাতলে
নামহীন গৃহহীন—আজিও তেমনি
আমারে নির্মম চিত্তে তেয়াগো জননী
দীপ্তিহীন কীর্তিহীন পরাভব 'পরে।"

আমরা যদি ক্ষণমাত্র স্তব্ধ হয়ে কর্ণের উক্তি সম্বন্ধে চিন্তা করি, তবে বুঝতে পারবো সমাজে অসংখ্য কর্ণকে আমরা অস্পৃশ্য বলে দূরে ত্যাগ করেছি। বিস্মৃতির মধ্যে ডুবেছিল কর্ণ, আজ প্রয়োজনের তাগিদে তার কাছে কুন্তী এসেছেন পাণ্ডবগণকে ভাই বলে গ্রহণ করবার অনুরোধ নিয়ে। পুরাতন সম্বন্ধ, এক রক্ত বহে দুই দেহে বলে তাকে আহ্বান করলেন—কিন্তু সাড়া পেলেন না। কর্ণ বলে—'সূত পুত্র আমি'—সেই তার গৌরব। আজ কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গণে কর্ণ পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে কার অপরাধে? ন্যায়ধর্ম, মাতৃধর্ম—লৌকিকধর্ম হতেও বৃদ্ধ সেই শাশ্বতধর্ম কুণ্ঠিত হয়েছিল—এ তারই প্রায়শ্চিত্ত। মানুষের কাছে নিত্য নূতন সমস্যা আসে—তার গৌরব যে সে নিজেই তার সমস্যার সমাধান করে; যে প্রাণী নিজের সমস্যা নিজে পূরণ করতে পারেনি—তারা পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে—মানুষেরও কত জাত গেছে এই কারণেই। আজ জগতময় সমস্যা হচ্ছে লৌকিকধর্ম ও মানবধর্মের বিরোধকে কেন্দ্র করে। আজ সমস্যা এমন আকার ধারণ করছে—যে কথা কচকচানিতে সত্যধর্মকে চাপা দেবার চেষ্টা বৃথা। মানুষ যে ধর্মকে মানে তার প্রমাণ তত্ত্বকথার কেরামতি নয়, বাক্য বা বুলির জাল-বোনা নয়, মানুষের ধর্মের একমাত্র প্রমাণ ও মাপকাটি হচ্ছে তার লোক-ব্যবহার; এই লোক-ব্যবহারেই অন্তরের স্বরূপটি প্রকাশ হয়ে পড়ে 'ভিতরে রস না জমিলে বাইরে কিগো রঙ ধরে?' আজ একবার এই শুভদিনে অন্তরের মধ্যে তাকিয়ে দেখি—মনকে জিজ্ঞাসা করি—সকলকে আপনার করতে পেরেছি কি? ভিতরে কি এতটুকু প্রেমের রস জমেছে? না কার্যসিদ্ধির জন্য উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছি? কেবল নেতি নেতি করে মানুষ হয়ে মানুষকেই দূরে ঠেলে রাখলে কি? তাই কি আজ আমাদের আহ্বান তাদের কানে পেশছেছে মাত্র—হৃদয়কে স্পর্শ করছে না? কারণ হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে সে-ডাক উঠছে না। আর কি সময় আছে? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতের সমষ্টিতে কি 'জাতি' গড়বে? আজ আমাদের 'তপস্যাবলে একের অনলে বহুর আহুতি দিয়া' বিভেদ ভোলবার দিন কি আসে নি?

আজ মহাকবির বাণী এই ইঙ্গিতই বহন করছে।

ট্রেন-ফেল

আমার বন্ধুটি সেদিন যখন ট্রেন ফেল করে স্টেশন থেকে ফিরে এলেন তখন আমার ভারী আনন্দ হল। সেটা সাধারণ কৌতুক বোধের আনন্দ নয়। অপরের ক্ষতি কিংবা অসুবিধায় দুষ্ট ব্যক্তির মনে যে আনন্দ জন্মে সেটা সে আনন্দও নয়। সত্যি সত্যি আমার ভালো লাগল। অনেকদিন কাউকে গাড়ি ফেল করতে দেখিনি। ট্রেন ফেল করাটাকে লোকে অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার মনে করে; আমি তা করি না। সংসারে অনেক লজ্জাকর ব্যাপার আছে, কিন্তু আমার মতে এটি তার অন্তর্ভুক্ত নয়। আমি জীবনে অন্ততঃ পাঁচ ছ' বার ট্রেন ফেল করেছি। তাতে অপরে যতই কৌতুক বোধ করুক, আমি কখনো লজ্জাবোধ করিনি। আর গাড়ি ফেল করে কোন ক্ষতি কিম্বা অসুবিধাও আমার হয়নি। যাঁরা মামলা মোকদ্দমা সংক্রান্ত কাজে কিম্বা লাটের খাজনা জমা দেবার জন্য ট্রেন ধরতে যান তাঁদের আমি কখনো গাড়ি ফেল করতে বলব না। আমি ও রকম কোন জরুরী কাজে কখনো রেলে যাতায়াত করিনি, আমি যেতে হলে বিনা প্রয়োজনে খোশখুশি মত যাই।

ইস্টেশন থেকে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসচে এর মধ্যে একটি বিশেষ এক রকমের আনন্দ আছে। সুটকেশ হাতে ঘরে ঢুকতেই মা বলচেন, কিরে গাড়ি পেলিনে বুঝি? তা ভালই হয়েছে। বারবেলায় রওনা হলি, মনটা খুঁত খুঁত করছিল। ভাইবোনেরা হাততালি দিয়ে বলে উঠবে, কি মজা দাদা ফিরে এসেছে। স্ত্রী বোধকরি রান্না কিম্বা ভাঁড়ার ঘরে কাজ করছিলেন; সাড়া পেয়ে তিনি উৎকর্ণ হয়ে উঠবেন। মুখখানা কৌতুকের হাসিতে উজ্বল। আস্তে আস্তে ঘরে প্রবেশ করে বলবেন, কেমন হ'ল তো? আমার কথা ঠেলে—! বাঙ্গালী গৃহের অতি বিরল মুখচ্ছবির মধ্যে এটি একটি। আমার কথা শুনে আপনাদের অনেকেরই বোধ হয় ট্রেন ফেল করবার লোভ হচ্ছে। তা বেশ তো, অন্তত পরীক্ষা করবার জন্য হলেও একবার গাড়ি ফেল করে দেখুন না।

ইদানীং আমি অনেকদিন ট্রেন ফেল করিনি। তার কারণ আমি একলা বড় একটা কোথাও যাই না, বন্ধুবান্ধব সঙ্গে থাকেন। তাঁরা কিছুতেই ট্রেন ফেল করতে রাজি নন। তাতে বোধকরি তাঁদের প্রেস্টিজের হানি হয়। আর বন্ধুরা যদি সঙ্গে না থাকেন তো আমার স্ত্রী সঙ্গে থাকেন। তিনি এ বিষয়ে আরো বেশি কড়া। কোথাও যেতে হলে তিনি এমন আটসাঁট ভাবে সংসার গুছিয়ে যান যে দৈবাৎ ট্রেন ফেল হলে ফিরে এসে আবার সংসার চালু করা এক বিষম ব্যাপার। সেই ভয়ে তিনি কিছুতেই ট্রেন ফেল করতে রাজি নন। সুতরাং তিনি তাঁর বাক্স প্যাঁটরা এবং আমাকে নিয়ে —ট্রেন টাইমের অন্ততঃ দেড় ঘণ্টা আগে গিয়ে ইস্টেশনে বসে থাকেন। সেটা যে কি শাস্তি কি বলব। পাঁচ মিনিটের জন্য গাড়ি ফেল করার চাইতে গাড়ি ধরবার জন্য দেড় ঘণ্টা আগে গিয়ে বসে থাকা যে অনেক বেশি unpunctual ব্যাপার এটা ওঁকে আমি কিছুতেই বোঝাতে পারিনি।
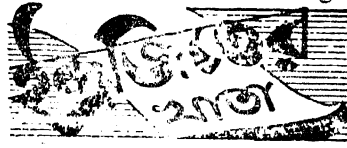
সেবারে আমি ট্রেন ফেল করেছিলুম বলে একজন মহিলা আমাকে মিডিয়াভেল বা মধ্যযুগীয় বলে গাল দিয়েছিলেন। এ গালাগালটা যে একটা এ্যানাক্রনিজম্ তা আপনারা সহজ দৃষ্টিতেই বুঝতে পারছেন। কারণ মধ্যযুগের লোকেরা কখনো ট্রেন ফেল করতেন না, কারণ মধ্যযুগে রেলগাড়ি ছিল না। ঐ ভদ্রমহিলাও আমাকে প্রেস্টিজের দোহাই দিয়েছিলেন। আমি বলেছি যে আমার প্রেস্টিজ এমন ঠুনকো নয় যে ট্রেন ফেল করলেই প্রেস্টিজ ফেল করবে। তা ছাড়া, যে গাড়ি আপন সময় মত চলে, আমার সময় কিম্বা সুবিধার জন্য বিন্দুমাত্র কেয়ার করে না সে গাড়িকে ধরাধরি করতেই আমার প্রেস্টিজে বাধে। সত্যি বলতে কি আমার বন্ধুদের সাহচর্যে এবিষয়ে আমার যথেষ্ট অবনতি হয়েছে। এই সেদিন এঁদের প্ররোচনায় আমাকে ভোর পাঁচটায় গাড়ি ধরতে হয়েছিল। ভাবুন একবার, বাড়ি থেকে দু মাইল দূরে ইস্টেশন, ভোর পাঁচটায় গিয়ে গাড়ি ধরা কি ব্যাপার! এমন undignified কাজ আমি জীবনে কখনো করিনি। গাড়ি ইস্টেশনে ইন্ করেছে, আমরা তখনো ইস্টেশনের হাতায় পৌঁছিনি। পড়ি কি মরি ছুটে গিয়ে গাড়ি ধরলুম। Running after one's hat এর চাইতেও এটা বেশি হাস্যকর দৃশ্য। সেদিন লজ্জায় আমি অধোবদন হয়েছিলাম। —

আমাদের মেয়েরা আধুনিকাই হোন্ আর পৌরাণিকাই হোন্ কখনো ট্রেণ ফেল করেন না। তাঁরা একলা বড় একটা চলেন না, কাজেই সঙ্গের পুরুষ escortটি দয়া করে ট্রেন ফেল করলে তবেই তাঁরা গাড়ি ফেল করবার সুযোগ পান। তা ছাড়া যে দেশের শাস্ত্রে উপদেশ রয়েছে পথি নারী বিবর্জিতা সে দেশে নারীকে নিতান্ত বিবর্জন করা না গেলে অগত্যা দেড় ঘণ্টা আগে গিয়ে ইস্টেশনে বসে থাকতে হয়। আধুনিকাদের কথা আলাদা। এমন যে আধুনিক রবীন্দ্রনাথ তিনিও আধুনিকদের ট্রেন ধরার কসরৎ দেখে আৎকে উঠেছিলেন—

> শুনেছিনু নাকি মোটরের তেল
> পথের মাঝেই করেছিল ফেল,
> তবু তুমি গাড়ি ধরেছ দৌড়ে'—
> হেন বীরনারী আছে কি গৌড়ে?

আছে বৈকি, আছে। তবে সেই গাড়ি ধরার দৃশ্যটা বড় একটা edifying spectacle নয়। আমাদের মরালগমনারা যদি হঠাৎ ক্ষিপ্রগমনা হয়ে ওঠেন, তাতে আধুনিকাদের সম্মান অক্ষুন্ন থাকলেও নারীর সম্মান কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হয়। দৌড়ে গিয়ে গাড়ি ধরবার এমন কি দরকার ছিল বলুন তো? উনি গাড়ি ফেল করলে সৃষ্টি একেবারে রসাতলে যেত না। বরং আমি বলি সৃষ্টির রস-মাধুর্য অনেকখানি বজায় থাকত।

দুঃখের বিষয় আজকাল ছেলে মেয়েরা বড় বেশি সময়তান্ত্রিক, বড় বেশি সেয়ানা। এ'দের স্বভাবে ঢিলেঢালা কিছু নেই একেবারে আঁট সাঁট। এ'রা ট্রেণ ফেল করেন না, হাতের ছাতিটি ভুলে কোথাও ফেলে যান না, দুদণ্ড হাত পা ছড়িয়ে কোথাও বসে গল্প করেন না। হাতের অতি সূক্ষ্ম কব্জিতে সূক্ষ্মতর কব্জিঘড়ি বাঁধা। কেবলই বলেন, সময় নেই, উঠতে হল। অনবরত তাড়া দিয়ে দিয়ে জীবনটাকে কোণঠাসা করে এনেছেন। তাঁরা ভাবেন কাব্জি-ঘড়িতে বাঁধা সময়কে তাঁরা হাতের পুতুল করেছেন। জানেন না যে নিজেই নিজের হাতে সময়ের নিগড় বেঁধে দিয়েছেন। আমি কখনো ঘড়ি ব্যবহার করি না। ভগবানের দেওয়া অসীম সময়কে আমি টুকরো টুকরো করে কাটতে রাজি নই। যারা এক ভগবানকে dissect করে তেত্রিশ কোটি দেবতায় পরিণত করেছে তারা অসীম সময়কে কেটে কুটে ঘণ্টা মিনিট সেকেণ্ডে পরিণত করবে, এ আর বিচিত্র কি?

একমাত্র ভরসা ছিল মহাত্মা গান্ধীর উপরে। তিনি আমাদের যুগকে গরুর গাড়ির যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন, এমন আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু সেবারে দেখি তিনিও ট্যাঁক থেকে ট্যাঁকঘড়ি বের করে বলছেন, জলদি কর জলদি কর—I am working against time, কারণ কিনা তাঁকেও গাড়ি ধরতে হবে। যদিচ সেটা স্পেশাল ট্রেন, এবং তাঁর জন্যই ইস্টেশনে নোঙর করে দাঁড়িয়ে আছে!

ইদানীং একটা শুভ লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আমরা যেমন গাড়ি ফেল করি গাড়িও তেমনি আমাদের ফেল করে। আজকাল প্রায়ই ইস্টেশনে গিয়ে দেখি গাড়ি পাঁচ ঘণ্টা ছ' ঘণ্টা লেট্ আসচে। কাজেই গাড়ির আশা ত্যাগ করে বাড়ি ফিরে আসতে হয়। এ যুগের বাস্তবাগীশদের জব্দ করবার এটাই সব চেয়ে ভালো উপায়।

গত ১৬ই মে রাত্রিতে কুমিল্লার নিকটে কমলাসাগর ও নয়নপুর ষ্টেশনের মধ্যবর্তী স্থানে ডাউন সুরমা এক্সপ্রেস যে দুর্ঘটনায় পতিত হয় তাহাতে নিহত কতিপয় যাত্রী

আরও কয়েকজন যাত্রীর মৃতদেহ
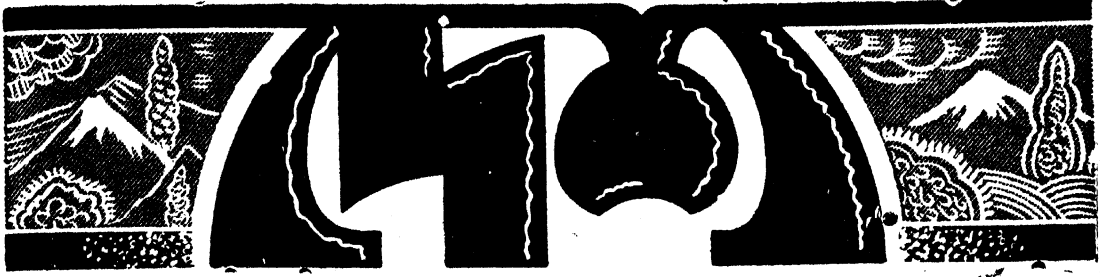
সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন   সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

চতুর্দশ বর্ষ] শনিবার, ২৩শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪ সাল। Saturday, 7th June, 1947. [৩১শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বৃটিশ গভর্নমেণ্টের পরিকল্পনা

লর্ড মাউণ্টব্যাটেন বিলাত হইতে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের যে পরিকল্পনা বহন করিয়া আনিয়াছেন, গত ৩রা জুন সন্ধ্যাকালে তাহার মর্ম সরকারীভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৪৬ সালের ১৬ই মে মন্ত্রিমিশনের যে পরিকল্পনা ঘোষিত হয় তাহাতে সর্বভারতীয় ঐক্য রক্ষার প্রচেষ্টাই ছিল প্রধান কথা। পক্ষান্তরে বর্তমান পরিকল্পনা ভারত বিভাগের নীতিকে কেন্দ্র করিয়া রচিত। সুতরাং কোন কোন বিষয়ে উভয় পরিকল্পনার মধ্যে কিছুটা সাদৃশ্য লক্ষিত হইলেও বর্তমান পরিকল্পনাটি মূলতঃ প্রথমটি হইতে পৃথক। ৩রা জুনের এই পরিকল্পনার নিম্নোক্ত বিষয় কয়টিই বিশেষভাবে দ্রষ্টব্যঃ—

(১) ভারত বিভক্ত হইলে বাঙলা, পাঞ্জাব এবং আসাম প্রদেশকেও বিভক্ত করিবার নীতি স্বীকৃত হইয়াছে। ১৯৪১ সালের আদম-সুমারীর ভিত্তিতে দেখান হইয়াছে যে, পূর্ববঙ্গের ১৬টি জেলায় এবং পশ্চিম পাঞ্জাবের ১৭টি জেলায় মুসলমানদের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা বর্তমান। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য জেলাগুলিতে অ-মুসলমানরাই সংখ্যায় অধিক। বর্তমান পরিকল্পনায় উক্ত প্রদেশ দুইটির ব্যবস্থা-পরিষদের মুসলমান প্রধান জেলাগুলির এবং অ-মুসলমান প্রধান জেলাগুলির প্রতিনিধিরা পৃথক পৃথকভাবে মিলিত হইয়া সংশ্লিষ্ট প্রদেশ বিভাগ সম্বন্ধে ভোট দিবেন। ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণের উপরোক্ত দুইটি অংশের যে কোন একটি অংশ প্রদেশ বিভাগের প্রস্তাব গ্রহণ করিলেই উহা যথারীতি কার্যকরী করার ব্যবস্থা হইবে। পরিকল্পনার এই সর্ত অনুসারে বাঙলার অমুসলমানপ্রধান ১২টি জেলার (মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া, কলিকাতা চব্বিশ-পরগণা, খুলনা, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম) নির্বাচিত প্রতিনিধিরা (ইহাদের অধিকাংশই হিন্দু) ইচ্ছা করিলেই ঐ জেলা-গুলিকে নিখিল ভারতীয় ইউনিয়নের সহিত যুক্ত করিতে সক্ষম হইবেন।

(২) আসামে মুসলমানেরা সংখ্যালঘু হইলেও শ্রীহট্ট জেলায় তাহাদের সংখ্যাধিক্য বর্তমান। পরিকল্পনায় ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বঙ্গ-বিভাগ সাব্যস্ত হইলে শ্রীহট্ট পূর্ব-বঙ্গের সহিত মিলিত হইতে ইচ্ছুক কি না, তাহা উক্ত জেলার ভোটারগণের অভিমত দ্বারা নির্ণীত হইবে।

(৩) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সম্বন্ধেও এই ব্যবস্থাই অবলম্বিত হইয়াছে, অর্থাৎ সীমান্ত প্রদেশ বর্তমান গণপরিষদেই যোগ দিবে, না ভাবী মুসলিম গণপরিষদে যোগ দিবে তাহা উক্ত প্রদেশের ভোটারগণের ভোট দ্বারাই সাব্যস্ত হইবে।

(৪) প্রদেশসমূহের সীমা চূড়ান্তভাবে নির্ধারণের জন্য বড়লাট "সীমা নির্ধারণ কমিশন" নিযুক্ত করিবেন।

(৫) বৃটিশ গভর্নমেণ্ট প্রস্তাব করিয়াছেন যে, কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহারা ভারতবর্ষকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনাধিকার দিবার উদ্দেশ্যে পার্লামেণ্টে আইন প্রণয়ন করিবেন। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট আশা করেন, এইভাবেই তাঁহারা দায়িত্বশীল ভারতীয়গণের হাতে যথা-সত্বর ক্ষমতা অর্পণ করিতে সক্ষম হইবেন। বিশেষভাবে বলা হইয়াছে যে, কোন অংশ যদি বৃটিশ কমনওয়েলথের বাহিরে যাইতে চায়, তবে প্রস্তাবিত আইন তাহার প্রতিবন্ধক হইবে না।

পরিকল্পনার দোষ-গুণ

পরিকল্পনা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পণ্ডিত জওহরলাল বেতারযোগে ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহারা এই পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। মিঃ জিন্নাও পরিকল্পনা গ্রহণের পক্ষেই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তবে তিনি ইহাও বলিয়া রাখিয়াছেন যে, লীগ কাউন্সিলই এই ব্যাপারে চূড়ান্ত রায় দিবেন। সর্দার বলদেব সিং যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতেও মনে হয় যে, শিখরাও এই পরিকল্পনা গ্রহণ করিবেন। তবে এই সঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, কোন পক্ষই পরিকল্পনাটিকে আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতে পারে নাই। পণ্ডিত জওহরলাল পরিষ্কারভাবেই বলিয়াছেন যে, অখণ্ড ভারতের কল্পনা আজ সাময়িকভাবে হইলেও বিসর্জন দিতে হইল, ইহা পরম বেদনার কথা। ভারতের শান্তি এবং বৃহত্তর কল্যাণের জন্যই কংগ্রেসকে ভারত বিভাগের প্রস্তাবে সম্মতি দিতে হইয়াছে। আমরা বিশ্বাস করি, ভারতের জাতীয়তাবাদী মাত্রেই কংগ্রেসের উক্ত সিদ্ধান্তকে এই মনোভাব লইয়াই বিচার করিবেন। মিঃ জিন্না সর্বাংশে খুশী হইতে পারেন নাই। তার কারণ তাঁহার দাবী ছিল সমগ্র বাঙলা, আসাম, পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। তন্মধ্যে তিনি পাইবেন মাত্র পূর্ববঙ্গ ও সিলেট এবং পশ্চিমে বেলুচিস্তান, পাঞ্জাবের পশ্চিমাংশ ও সিন্ধু। সীমান্ত প্রদেশ তাঁহার ভাগ্যে জুটিবে কি না, তাহা এখনও অনিশ্চিত।

এই সঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মন্ত্রী মিশন এই দেশে আসিয়া প্রথম দিকেই মিঃ জিন্নাকে উপরোক্ত প্রস্তাব দিয়াছিলেন। কিন্তু মিঃ জিন্না তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেন। মিঃ জিন্না যদি সেই সময় এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতেন, তবে তিনি আজ যাহা পাইলেন, তাহা তো পাইতেনই, উপরন্তু সীমান্ত প্রদেশ সম্বন্ধেও তিনি নিশ্চিত হইতে পারিতেন। সর্বোপরি ভারতময় এত রক্তপাত এত দাঙ্গাহাঙ্গামা এবং অশান্তির দায়িত্ব তাঁহাকে স্পর্শ করিত না। শিখেরা পাঞ্জাব বিভাগ চাহিয়াছিল। তাহাদের সেই দাবী পূরণ হইয়াছে; কিন্তু পাঞ্জাবকে যেভাবে বিভক্ত করার প্রস্তাব হইয়াছে, তাহাতে কয়েক লক্ষ শিখ মুসলিমপ্রধান অঞ্চলে পড়িয়া থাকিবে। শিখদের পক্ষ হইতে ইহাই হইতেছে অসন্তোষের প্রধান কারণ।

স্বাধীন ভারতবর্ষ?

বৃটিশ গভর্নমেণ্ট সত্যসত্যই প্রভুত্ব ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন—কিন্তু ভারতবর্ষকে 'আস্ত" রাখিয়া নহে। ভারত খণ্ডন ভিন্ন "ক্ষমতা হস্তান্তরের" আর কোন সুষ্ঠু পন্থা বৃটিশের সম্মুখে নাই। ভারতকে অখণ্ড রাখিয়া 'ক্ষমতা হস্তান্তর' করিতে পারিলেই তাহা উত্তম হইত, ভারত-খণ্ডন যে সঙ্গত ব্যবস্থা নহে, ইহা উপলব্ধি করিয়াও বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতবাসীর মতভেদের দরুণ ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করিতে বাধ্য হইলেন এবং বিভক্ত ভারতে স্বাধীনতা দান করিলেন। ভারত-খণ্ডন ভারতের অধিবাসীর বৃহত্তম অংশ চাহে নাই, চাহে না। মুসলিম লীগ ও তাহাদের সমর্থকগণ ভারত বিভাগ চাহে। এস্থলে গোটা ভারতবর্ষ কি চাহে, মুসলিম লীগ ব্যতীত ভারতের হিন্দু শিখ খৃষ্টান বৌদ্ধ জৈন জাতীয়তাবাদী মুসলমান ভারত-খণ্ডন চাহে না. কিন্তু একমাত্র মুসলিম লীগ নেতা মিঃ জিন্নার পাকিস্থানী দাবী মিটাইতেই—লীগ নেতাকে তোষণ করিতেই ভারত-ব্যবচ্ছেদের মত বিপজ্জনক কার্য করিতে হইয়াছে। এই স্থলে মাইনরিটিকেই মেজরিটির সম্মতির পথ রুদ্ধ করিবার ভিটো ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। যদিও তাহা দেওয়া হইবে না বলিয়াই মিঃ এটলী প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন।

পণ্ডিত জওহরলালের বুকফাটা দুঃখ তাঁহার বেতার-বক্তৃতাকে ভারাক্রান্ত করিয়া দিয়াছে। স্বাধীনতাকামী ভারতের মর্মান্তিক বেদনাই তাঁহার কণ্ঠে কথঞ্চিত ভাষা পাইয়াছে মাত্র। ভারতের স্বাধীনতার জন্যই প্রায় শতাব্দী-কাল ধরিয়া স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ সৈনিকগণ সংগ্রাম করিয়াছেন। ভারতবর্ষ যেমন অবিভাজ্য, তেমনি ভারতের স্বাধীনতা অবিভাজ্য। খণ্ডিত ভারতের খণ্ডিত স্বাধীনতাকে আমরা কখনো স্বাধীনতা বলিয়াই মনে করিতে পারিব না। তাই আমাদের সাধনা সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, অভীষ্ট ভারতের স্বাধীনতা আমরা পাইয়াছি, তাহা মনে করি না। ভারত খণ্ডনের দ্বারা ভারতের স্বাধীনতা বিকৃত ও বিপন্ন হইয়াই থাকিল। ঘটনাচক্রে বাধ্য হইয়া অতিশয় বেদনার সহিত স্বাধীনতার আদর্শবিরোধী ভারত-খণ্ডনকে আজ কংগ্রেস স্বীকার করিয়া লইলেও স্বীকার করিয়া লইতেছে কেবল অখণ্ড দেশ ও অখণ্ড জাতির অবিভক্ত স্বাধীনতারই জন্য। যতদিন ভারত পুনরায় অখণ্ড ভারতের স্বকীয় মহিমায় প্রতিভাত না হইতেছে, ততদিন আমাদের স্বাধীন ভারত গড়িয়া তুলিবার সংকল্পকে অম্লান রাখিতে হইবে। ভারতের ইতিহাস—ভারতের ভৌগোলিক সংস্থান ভারতের শিক্ষা-সংস্কৃতি, ভারতের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আবেদন এক অখণ্ড ভারতের প্রতিই অঙ্গুলী নির্দেশ করিতেছে। খণ্ড-বিচ্ছিন্ন ভারতকে, ভারতবাসীকে এক ও অবিভাজ্য দেখিবার মহান ব্রতই আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা ভারতের স্বাধীনতা চাই, সেই স্বাধীনতার নিরাপদ ভিত্তি চাই। ভাবী বংশধরগণ যেন বিচ্ছিন্ন ভারতের বিকৃত, অভিশপ্ত 'স্বাধীনতার' রূপ দেখিয়া আমাদের উদ্দেশে অভিশাপ বর্ষণ না করে। ভারত ইতিহাসের এই কলঙ্ক যেন আমরা মুছিয়া ফেলিতে পারি। যেন আমাদেরই স্বাধীনতার সংকল্প-নিষ্ঠায় ৪০ কোটি নরনারীর সম্মিলিত ভারত এবং ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতা সম্ভব হয়। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট সীমান্ত প্রদেশের 'জনমত' গ্রহণ করিবেন, সিলেটেরও জনমত জানা জরুরী; কিন্তু অবিভাজ্য ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করিবার মত গুরুতর ও অবাঞ্ছিত ব্যবস্থা করার পূর্বে ভারতের জনমত সংগ্রহের প্রয়োজনবোধ দেখা দিল না। বৈদেশিক আক্রমণ ও অশুভ প্রভাব প্রতিহত করিবার জন্য সম্মিলিত ভারত থাকিল না, বৈদেশিক সম্পর্কের আদর্শ ও নীতি একৈক লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট থাকিতে পারিল না—এই সমস্তই ভারতের স্বাধীনতারই কণ্টক স্বরূপ বিদ্যমান থাকিতেছে। সুতরাং স্বাধীনতার সৈনিকবৃন্দকে বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, স্বাধীনতার সাধনা সিদ্ধিলাভ করে নাই, নূতন পর্যায়ে বিঘ্ন দেখা দিল। এই বিঘ্ন-বিপত্তির স্বরূপ এবং মাত্রা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে এবং তাহা দূর করিয়া বাঞ্ছিত ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইবে। সেই অভীষ্ট বস্তু অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত বিরাম নাই।

ইংরেজের দায়িত্ব

ভারত খণ্ডনের দায়িত্ব কাহার? কংগ্রেসের না মুসলিম লীগের? অথবা বৃটিশের? বৃটিশ বলিতেছে, ভারত খণ্ডনের দায়িত্ব ভারতবাসীর। কারণ তাহারা যদি এক মতাবলম্বী হইয়া একই কেন্দ্রে 'ক্ষমতা' গ্রহণ করিতে চাহে, বৃটিশ ঐ এক কেন্দ্রেই ক্ষমতা হস্তান্তর করিয়া নিস্কৃতি পাইতে চাহে।

বৃটিশ যদি এইরূপ শুভ ইচ্ছা পূর্বে পোষণ করিতেন, তাহা হইলে ভারতে সাম্প্রদায়িক উগ্রতা বৃদ্ধি পাইত না, সাম্প্রদায়িক তাণ্ডবে ভারতের রাজনৈতিক গতিপথ কণ্টকিত ও অবরুদ্ধ হইতে পারিত না। বৃটিশ ভারতের উপর যতদিন সম্ভব প্রভুত্ব করিয়া যাইবেন, সাম্রাজ্য-ব্যবসায় সহজে গুটাইবেন না, এই কামনা হইতেই ভারতের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক ভেদ আমদানী করিয়াছেন। সেই বিষবৃক্ষের চিন্ময় ফল—সমগ্র ভারতদেহকে বিষাক্ত করিয়া দিয়াছে। বৃটিশের আশ্রয়ে ও প্রশ্রয়ে এতকাল অনৈক্যই বাড়িয়াছে, ঐক্য প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে। আজ ঐক্যের কথা সহসা বলিলে চলিবে কেন? কংগ্রেস কখনো ভারত খণ্ডন চাহে নাই, ভারতবাসীর মধ্যে ভারতের সকল সম্প্রদায় ও শ্রেণীর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতেই চাহিয়াছে। বৃটিশের ১৬ই মের পরিকল্পনা আশানুরূপ না হইলেও ভারতের ঐক্যের জন্যই কংগ্রেস তাহা মানিয়া লইতে প্রস্তুত ছিল, প্রস্তুত হয় নাই, অসম্মত হইয়াছে মুসলিম লীগ। সুতরাং ভারত খণ্ডনের দায় কংগ্রেসের নহে—তথা ভারতের বৃহত্তর অংশের নহে। কিন্তু ইহাও সত্য যে, মুসলিম লীগকে ভারত খণ্ডনের জন্য দায়ী করিলেও তাহা সত্য হইবে না। ভারতে বৃটিশের শাসন নীতির অপরিহার্য অঙ্গরূপে যে সাম্প্রদায়িক অনৈক্য দেখা দিয়াছে, লীগের অনমনীয় মতিগতি তাহারই ফল মাত্র। সুতরাং ভারত খণ্ডনে আজ যদি বৃটিশ 'বাধ্য' হইয়াই থাকে, তাহা হইলে স্বীয় কর্মফলেই তাহা হইয়াছে। একটি ভ্রান্তি অথবা একটি অপকার্য যেমন অপর ভ্রান্তি কিম্বা অপকার্য করিতে বাধ্য করে, তেমনি বৃটিশের গড়া কর্ম-পথে নামিয়া বৃটিশকেই ভারত খণ্ডন করিতে হইতেছে। অপর পথ থাকিলেও তাহা গ্রহণের শক্তি আর তাহার নাই। কেন সেই শক্তি নাই, তাহার কারণ বিশ্লেষণ করিলে বড় তিক্ত হইয়া পড়িবে। আজ আর সেই তিক্ততা নাই বাড়াইলাম। কিন্তু ইহা সত্য, আজ ঘটনা চক্রে বৃটিশকে যখন "ক্ষমতা হস্তান্তরে" সম্মত হইতে হইল, তখন বৃটিশের পূর্ব অনুসৃত পথেই অবশিষ্ট কর্তব্য পালন করিতে হইতেছে। বৃটিশকে তাহার এতোকালের ইতিহাস আপন হস্তে কলঙ্কিত করিতে হইল। এতদিন বৃটিশই কি বিশ্ব-বাসীকে শুনায় নাই, ভারতে অখণ্ড শান্তি তাহারা আনিয়াছেন, ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক অখণ্ডতা তাহাদের শাসনের আদর্শ? যাহার গৌরব তাহারা করিতেন, তাহাই যাইবার মুখে তাহারা মুছিয়া যাইতেছেন। বৃটিশ শাসনের

দুঃখ গ্লানির অবধি নাই। কিন্তু যাহা নাকি ছিল তাহাদের একমাত্র বলিবার দেখাইবার, তাহারও গোড়া কাটিতে হইল, তাহাদের নিজ হস্তে! পৌণে দুই শত বৎসর ভারত শাসন করার পর বৃটিশ যখন চলিয়া যাইতেছেন, তখন ভারতকে অখণ্ড রাখিয়া গেলেন না—যদিও অখণ্ড রাখাই ছিল তাহাদের সংগত ও স্বাভাবিক কর্তব্য। খণ্ড বিচ্ছিন্ন ভারত রাখিয়া যাইতেছেন, ভবিষ্যৎকে বিঘ্ন সংকুল করিয়া রাখিয়া যাইতেছেন। অথচ বলা হইতেছে, ভারত খণ্ডনের দায়িত্ব বৃটিশের নহে।

যদি চলিয়াই যাইতে হয়, পরবর্তী দায়িত্ব গ্রহণ না-ই করিতে হয়, তাহা হইলে ভারত যেমন ছিল তেমন রাখিয়া গেলে, কেহ নিন্দা করিত না। তথাপি কংগ্রেস এই অবাঞ্ছিত ব্যবস্থাকেই ভবিষ্যতের বৃহত্তর কল্যাণের আশায় গ্রহণ করিতে ভারতবাসীকে আহ্বান করিয়াছে। বর্তমানে তাহার পক্ষে আর গত্যন্তর নাই, আর সাম্প্রদায়িক অরাজকতার বেদনা দেশকে যেন আর সহিতে না হয়, তাহারই জন্য ভারত খণ্ডন মানিতে হইতেছে, কিন্তু ইহার দায়িত্ব বৃটিশের নহে, এ কথা আমরা বলিব না।

মিঃ সুরাবর্দির বক্তৃতা

মিঃ সুরাবর্দি মুসৌরি পাহাড়ের সুশীতল আবহাওয়ায় বসিয়া একটা বক্তৃতা করিয়াছেন। বক্তৃতাটির প্রকৃত উদ্দেশ্য সহজে বুঝিবার উপায় নাই, কারণ মুখ্যের সহিত তিনি সুকৌশলে একাধিক গৌণ উদ্দেশ্য যোগ করিয়া দিয়াছেন। ইহা কি জিন্না প্রশস্তি? না বাংলার হিন্দুদের প্রতি চোখ রাঙানি? না "স্বাধীন বঙ্গরাষ্ট্র" বানচাল হইয়া যাওয়ার ফলে আক্ষেপ? তিনটিই আছে, কিন্তু মুখ্যে গৌণে এমন সাড়ে বত্রিশ ভাজার মতো মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাই বক্তৃতাটির আগাগোড়াই আলোচনা করিতে হয়।

প্রথমতঃ ইহা একটি সুদীর্ঘ এবং নির্জলা জিন্না প্রশস্তি। কলিকাতার দুধে দুধের পরিমাণ যতটুকু জিন্না-প্রশস্তিতে সত্যের পরিমাণ তাহারও কম। মিঃ সুরাবর্দি বলিয়াছেন যে, কায়েদে আজম বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মানব এবং একমাত্র তিনিই ভারতবর্ষের প্রদেশসমূহের মধ্যে প্রীতি, সৌহার্দ ও ন্যায় বিচারের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে সক্ষম। এত বড় নির্লজ্জ প্রশংসা, এত বড় মিথ্যা লিখিবার সময়ে মিঃ সুরাবর্দির কলমের কালি লজ্জায় লাল হইয়া উঠিয়াছিল কি না প্রকাশ নাই। আজ কাহারো জানিতে বাকি নাই যে, ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক অশান্তির মূলে কারণ মিঃ জিন্নার পাকিস্থানী জিদ। তাঁহারই নাকি এই প্রশংসা! কিন্তু মিঃ সুরাবর্দির মুখ দিয়া এই কথাগুলি এই সময়ে বাহির হওয়ার বড় জরুরী প্রয়োজন ছিল—মিঃ সুরাবর্দির রাজনৈতিক ভবিষ্যতের কল্যাণের জন্যই।

কিছুদিন হইতে মিঃ সুরাবর্দি "স্বাধীন বঙ্গরাষ্ট্র" গঠন পরিকল্পনায় ব্যস্ত ছিলেন। উক্ত স্বাধীন রাষ্ট্রের হিন্দু-মুসলমান একজাতি, তাহাদের সভ্যতা সংস্কৃতি ও ভাষা অভিন্ন এমন অভিমত তিনি ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এখন, স্পষ্টত ইহা কায়েদে আজম জিন্নার পাকিস্থানী তত্ত্বের প্রতিকূলে। বাঙলার হিন্দু-মুসলমান এক বলিয়া স্বীকৃত হইলে পাকিস্থানের ভিত্তি ধসিয়া যায়। মিঃ সুরাবর্দি নিজের হঠকারিতা দ্বারা মিঃ জিন্নাকে বড় ফাঁপরেই ফেলিয়াছিলেন। মিঃ জিন্না নিশ্চয় খুশি হন নাই। এদিকে মিঃ সুরাবর্দির স্বাধীন বঙ্গরাষ্ট্র পরিকল্পনা কুঁড়িতেই বিনষ্ট হইল। হিন্দু ও মুসলমান কেহই তাহা গ্রহণ করিবার উদ্যম দেখাইল না। এমতাবস্থায় মিঃ সুরাবর্দির অবস্থা এদিক ভ্রষ্ট, ওদিক নষ্টের ন্যায় হইয়া দাঁড়াইল। কাজেই মিঃ জিন্নার প্রশস্তি গাহিয়া আবার তাঁহার প্রসন্নতা অর্জন ছাড়া আর কি গত্যন্তর আছে। তাঁহার বক্তৃতাটির ইহাই মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়।

দ্বিতীয়ত বাঙলার হিন্দুদের শাসাইয়া তিনি বলিয়াছেন যে, খণ্ডিত বাঙলার অধিবাসী হইলে 'হিন্দুস্থান রিপাবলিকের' আসরে তাহাদিগকে পিছনের বেঞ্চিতে বসিতে হইবে। মিঃ সুরাবর্দির মুখ হইতে এই উক্তি হিতৈষীর উক্তি নয়। ইহা ভগ্নহৃদয় ব্যক্তির প্রচ্ছন্ন তর্জন মাত্র। তাঁহার ভাবটা এই যে, বাঙলাদেশকে ভাগ করিতে যাইতেছ—মজা দেখিবে এখন! মিঃ সুরাবর্দির কথা সত্য হইলে বলিতে হয় যে, তাঁহার শাসনে বাঙলার হিন্দুগণ বড়ই সুখে আছে। বাস্তবিক হিন্দুদের সুখের অবধি নাই। লীগের শাসনের ফলে এদেশের লোকের অন্ন গিয়াছে, বস্ত্র গিয়াছে, বাকি ছিল প্রাণটুকু—তাহাও যাইতে আর বাকি থাকে কেন? পথেঘাটে নিজামাবাদী ছোরাছুরি তক্ষকের জিহ্বার মতো উঁকি মারিতেছে। অগণিত নরনারী প্রাণ হারাইয়াছে—অন্যবিধ দুঃখ-দুর্দশার তালিকা আর নাই দিলাম। এহেন সুখের শাসন হইতে বাঙলার হিন্দু-প্রধান অঞ্চল বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে তাহাদের অধিক আর কি দুর্দশা হইবে তাহা তো ভাবিয়া পাই না। তবে খণ্ডিত বাঙলার লোকেরা সুখী হইবে না দুঃখে তাহাদের দিন কাটিবে, 'হিন্দুস্থান রিপাবলিকে' তাহাদের মর্যাদা কোন্ স্তরের হইবে, এসব বিষয়ে আমরা আদৌ মিঃ সুরাবর্দীর সহিত আলোচনা করিতে চাহি না। তবে খণ্ডিত বাঙলায় মিঃ সুরাবর্দীর অবস্থা কি হইবে তাহা দেখিবার আশায় আমরা কৌতূহলী হইয়া রহিলাম।

শরৎচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অপরাজেয় কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া বাঙালী সমাজের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। শরৎচন্দ্র স্মৃতিপক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে ত্রিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় তাহা সানন্দে গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত অর্থের উপরে ভিত্তি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কৃতী ঔপন্যাসিককে পুরস্কার ও পদক দান করিবেন। তাহা ছাড়া শরৎচন্দ্রের রচনা সম্বন্ধে বক্তৃতা করাইবার ব্যবস্থাও হইবে। ইহাতে প্রত্যক্ষত শরৎ সাহিত্য সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ হইবে সন্দেহ নাই। পরোক্ষত কৃতী বাঙালী সাহিত্যিকগণ বাস্তব উৎসাহ লাভ করিবার সুযোগ পাইবেন। আমরা আশা করি, বাঙালীর বদান্যতায় মৌলিক ত্রিশ হাজার টাকা অতি শীঘ্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে।

রক্তসন্ধ্যা

শ্রীসুনন্দা সেনগুপ্তা

সাঁঝের আকাশে উঠলো ঝড়,
একটি দুটি তারা ফুটতে আরম্ভ করেছিলো অসীমের নীলিমায়,—
কোন অতলের আড়ালে তারা গেলো হারিয়ে।
ঝোড়ো হাওয়ার মাতামাতি—
দিগন্ত ছেয়ে এলো অন্ধকারের বান—
যেন সব কিছুকেই আড়াল করে দেবে।
দুটো শাদা পায়রা,
দিশেহারা হয়ে কোথায় গেলো!
ঐ দূরে তালগাছের পাতাগুলো
আর্তস্বরে ক্রন্দন করছে বুঝি—
ভীত তারা, ঝোড়ো হাওয়ার তাণ্ডবনৃত্যে।
পাগল হাওয়ায় জাগে লাল বালুর আভাস,
কানে আসে শোঁ শোঁ শব্দ।
ভীরু পৃথিবী!
এ যে প্রলয়েরই পূর্বাভাষ।
ঐ ঈশান কোণে জমেছে পুঞ্জমেঘ,
এতদিনের রুদ্ধবেদনাকে
এখনি যে সারা বিশ্বময় দেবে ছড়িয়ে!

*   *   *

ঝড় হঠাৎ গেলো থেমে।
শান্ত হলো আকাশ।
কিন্তু, এযে ক্ষণিকের স্তব্ধতা!
আকাশের সে প্রশান্ত নীলিমা তো নাই—
লাল রং ছেয়ে গেছে চারদিকে;
এ যে রক্তসন্ধ্যা!
যেন সারা আকাশের করাল ভ্রূকুটি!

*   *   *

আমার অনুমান ব্যর্থ নয়—
ক্ষণপরে ঘনিয়ে এলো প্রলয়বান,
পুঞ্জীভূত অন্ধকার ধেয়ে এলো প্রেতায়িত ছায়ার মতন!
মুহুর্মুহু বিদ্যুতের ঝলক্
আর গুরুগম্ভীর মেঘগর্জন!
এই কি প্রলয়?

*   *   *

মনে হলো মাতৃভূমির কথা!
হে সুন্দরী জননী!
ক্ষণবর্ষণ তো অনেক হয়েছে
এবার তবে আনো প্রলয়।
ভেঙ্গে ফেলে দিক শৃঙ্খলের বন্ধন—
দূরে যাক পরাধীনতার অপমান!
কেন তুমি আজও রয়েছ শৃঙ্খলিতা?
এতো শুধু ব্যর্থতা নয়!
তোমার এই নিশ্চুপ ক্রোধ—
বুঝি প্রলয়বর্ষণেরই পূর্বসূচনা?

সুদূর

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

হে সুদূর, জীবনের কোন্ ছায়াবনে
পাতিয়াছ আশ্রম তোমার? কার সনে
হবে খেলা, রবে প্রেম, লবে চিত্ত কার
আপনার বিনিময়ে পূর্ণ অধিকার?

ফুটাইবে অলখ পরশে কার মুখে
হাসি, কাঁদাইবে কারে বেদনায়, সুখে
বসিবে কাহার সাথে প্রসারিয়া কর
আসিবে যখন ঘিরে দুঃখ ভয়ংকর?

হে সুদূর প্রিয়তম, সন্ধ্যা অন্ধকারে
জ্বালায়েছি এ প্রদীপ, মত্ত হাহাকারে
আসে বায়ু, আপনার ক্লান্ত হস্ত দিয়ে
রেখেছি বাঁচায়ে তারে তোমার লাগিয়ে;
আঁধারে অন্তর তলে উজলি' দেখিয়ো
ভালবাস যারে সে যে আমি—আমি, প্রিয়।

বাধা

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

জানি তুমি আজো দূরে একান্ত বিজনে
স্মরিবে আমার নাম যেথা শান্ত ক্ষণে
পশিবে না কোলাহল, আলোকের ভীড়
ঘুচাবে না চিররাত্রি কালের তিমির
রূঢ় স্পর্শ দিয়া; তব ধৈর্যের মহিমা
সহিবে সহস্র ক্লেশ সংসারের সীমা
তুচ্ছ করি অবহেলে; চরণ পরশি'
মোহ বন্ধনের পাশ দূরে যাবে খসি'।

আমি তাই দূর দেশে একান্ত বিজনে
এখনো অতীত পানে দীর্ঘ নির্বাসনে
রহিনু চাহিয়া; এতটুকু জিজ্ঞাসায়
নাহি করি অভিযোগ, সুনম্র আশায়
বরি অনাগত কাল; সংসারের বাধা
মানিয়া রাখিনু তব প্রেমের মর্যাদা।

বাঙলার লাট তাঁর সাম্প্রতিক বেতার ভাষণে বলিয়াছেন—"I am not going to add my voice to the chorus"—খুড়ো বলিলেন—"বোধহয় স্যার বারোজের আওয়াজ একটু বাজখাঁই, তা ছাড়া

তিনি যে music face করিতে অনিচ্ছুক সেই পরিচয়ও দুর্ভাগ্যবশত মিলিয়াছে"!

* * * * *

আসামে বহিরাগতদের অভিযান সম্বন্ধে স্যার আকবর হায়দারী বলিয়াছেন যে, তিনি কাহাকেও সরকারী জমিতে Squat করিতে দিবেন না। স্যার আকবর নিশ্চয় জানেন—"বসতে পেলে শুতে চায়"।

* * * * *

IF you want to leave India why do you want twelve months time?—বৃটিশদের এই প্রশ্নটি করিয়াছেন—ফিরোজ খাঁ নুন। খুড়ো জবাবে বলিলেন—"বোধহয় ভারতের নুনের মায়া কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না"!

* * * * *

রয়টারের প্রতিনিধির প্রশ্নের উত্তরে মিঃ জিন্না জানাইয়াছেন যে, মুসলিম পার্লামেণ্টের Collective Conscienceই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের রক্ষণাবেক্ষণের একমাত্র গ্যারাণ্টি। কিন্তু Individual Conscience যদি গ্যারাণ্টি দিতে রাজী না হয় তাহা হইলে পরিস্থিতিটা কি দাঁড়াইবে সেই সম্বন্ধে কোনো আভাস দেওয়া হয় নাই।

* * * * *

একটি সংবাদে প্রকাশ, উত্তরবঙ্গের পল্লী অঞ্চলে বাঙলা সরকার নাকি বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিকল্পনা করিতেছেন। সাধু প্রস্তাব সন্দেহ নাই কিন্তু নৌকাডুবির পর এইবারে শক (Shock) ছাড়া আর কিছু জুটিবে বলিয়া যে ভাবিতে পারিতেছি না।

* * * *

ভারত ব্যবচ্ছেদ নিবারণের জন্য দিল্লীতে নাকি সাধুরা দলে দলে সত্যাগ্রহ করিতেছেন। ইহাকেই বুঝি বলে সাধুসংকল্প, আমরা তাঁহাদিগকে সাধুবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

* * * * *

পাটনা হইতে দিল্লী যাওয়ার পথে মহাত্মাজীর ঘড়িটি নাকি খোয়া গিয়াছে। সংবাদে বলা হইয়াছে—এই ঘড়িটি মহাত্মাজীর সঙ্গে পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত ছিল এবং তাঁর ব্যবহৃত ইহাই ছিল একমাত্র বিলাতী দ্রব্য। "যাক্, আমরা দুঃখ করিব না, মহাত্মাজী এতদিনে খাঁটি স্বদেশী হইলেন"—বলেন খুড়ো।

* * * * *

ATTEMPT to legalise mercy killing"—একটি সংবাদ। খুড়ো

বলিলেন—"তাতে আমাদের কোন মাথা ব্যথা নাই, Great Killingটা legalised না হইলেই হয়!"

* * * * *

কলিকাতা কর্পোরেশনের C. E. O কলিকাতা Population pressure কমাইবার ব্যবস্থার কথা শুনাইয়াছেন। খুড়ো বলিলেন—"এই কাজটার ভার C. G. D অর্থাৎ চীফ গুণ্ডা দলের লোকেরাই করিতেছে, কর্পোরেশন আপাতত জলের Pressureটা বাড়াইয়া দিলেই তবু একটু ধড়ে জল আসে"!

* * * * *

এলাহাবাদের এক সংবাদে প্রকাশ ' যে, সেখানে গাধারা বিক্ষোভ প্রকাশ করিয়া নাকি তাদের রেশনের বরাদ্দ বাড়াইয়া নিতে সক্ষম হইয়াছে। খুড়ো মন্তব্য করিলেন—"বুঝিলাম শুধু গাধার মত চেঁচাইয়া কোন ফলই হয় না, রেশন বৃদ্ধির জন্য সত্যিকারের গাধা বনিয়া যাওয়াই একমাত্র উপায়।"

* * * * *

লিভারপুল ইউনিভার্সিটির জনৈক প্রফেসর নাকি ভূমধ্যসাগরের উপকূলে একটি স্থান আবিষ্কার করিয়াছেন। আরবের অধিবাসীদের মতে এই স্থানটিই নাকি ছিল ইডেন গার্ডেন অর্থাৎ আদম ও ইভের আদি বাসস্থান। শ্যাম হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"মোটেই একথা বিশ্বাস করি না, আদম আর ইভের বাসস্থান নিশ্চয় এই কলিকাতায় ইডেন গার্ডেন-এ নয়, বস্ত্র রেশনের দোকানের সামনে। স্থানটা আবিষ্কার এখনও হয় নাই বটে, তবে অচিরেই হওয়ার সম্ভাবনা আছে।"

* * * * *

জনৈক বৃটিশ ডাক্তার জানাইতেছেন—আফ্রিকাতে নাকি ওঝারা মানুষকে শেয়ালে পরিণত করিয়া দিতে পারে এবং তিনি নাকি নিজের চোখে এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দর্শন করিয়াছেন। আমরা নিজের চোখে না দেখিলেও অনুমানে বুঝিতেছি—আকারে না হউক, অন্তত শৃগালের ধূর্ততার স্বভাব—অনেক মানুষই সেখানে অর্জন করিয়াছে। খুড়ো বলিলেন—"শৃগালীকরণের মন্ত্রও জানি, তবে সেটা নেহাৎ Smutty বলিয়া উচ্চারণ করিলাম না।"

* * * * *

বিলাত হইতে একটি মহিলা ক্রিকেট টিম নাকি অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট খেলিতে যাইবেন। পরশুরামের ভাষায় খুড়ো আশীর্বাদ

জানাইলেন—"তোমাদের হাতের ব্যাট্ অক্ষয় হোক্।"

ঘাড়ে ছাঁটা চুল

সেদিন আমার কন্যার চুল ছে'টে দেওয়ার প্রস্তাবে প্রথমটায় সে মাথা নেড়ে ঘোরতর আপত্তি জানালে। তারপরে নিষেধ সত্ত্বেও চুল কেটে দেওয়াতে সে কে'দেই ফেললে। চুল ছাঁটাই-এর এমন শোচনীয় পরিণাম হবে তা আমি ভাবতেই পারিনি। তার কেশ বৃদ্ধির জন্যই যে আমার ছাঁটাই প্রস্তাব সে কথা ওকে বোঝানো কঠিন হ'ল। আমি ভেবেছিলাম এতে ও খুশিই হবে, কারণ ঘাড়ে ছাঁটা চুল একেলে মেয়েদের ফ্যাশান বলেই জানি। আমার মেয়েটি কি তবে সেকেলে ভাবাপন্ন? তা বোধ হয় নয়। এখনও ওর মাথার চুল পিঠ ছাপিয়ে পড়েনি। মাথায় কেশের সম্বল যৎসামান্য। সেজন্যই অত মমতা। অল্প লইয়া থাকে, তাই ওর যাহা যায় তাহা যায়। সামান্য মূলধনের কণাটুকুও ও খোয়াতে চায় না। আসল কথা এগারো বছরের মেয়ে এখনও ফ্যাশান ধর্মে দীক্ষিত হয়নি। ফ্যাশানের জন্ম adolescence-এর পরে। আর বছর দুতিন বাদে বোধ করি ওর কেশপ্রেম অনেকটা শিথিল হয়ে আসবে। অন্তত একথা নিশ্চিত যে এগারো বছরের মতামত একুশ বছর অবধি টিকবে না। তখন তার বিলম্বিত বেণী আজানুলম্বিত হবে না, ঘাড়ের কাছে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে যাবে।

আমি অনেক ব্যাপারে অতি আধুনিক, কিন্তু এ বিষয়ে আমি সেকেলে। মেয়েদের ঘাড়ে ছাঁটা চুল ঠিক আমার বরদাস্ত হয় না, আমার সৌন্দর্যবোধকে পীড়া দেয়। মেয়েদের পিঠ ছাপিয়ে-পড়া চুল দেখতে আমার ভারি ভালো লাগে। মেঘবরণ চুল শুধু মেঘের মতো কালো দেখতে নয়, মেঘের মতো পুঞ্জ পুঞ্জ এবং বহু বিস্তৃত। আমাদের লেখকরা বলেন—ঘন চুলের অরণ্য—কথাটা আমার কাছে বেশ লাগে। ঘন অরণ্যের মধ্যে নারী-রহস্যের ইংগিত আছে। আর অরণ্যের analogy বজায় রেখে বলা যেতে পারে—deforestation-এ যেমন ভূমির সরসতা নষ্ট হয় কেশ কর্তনে তেমনি নারীর সরসতা নষ্ট হয়ে যায়। প্রাচুর্যের মধ্যেই সৌন্দর্য, বৃদ্ধির মধ্যেই সমৃদ্ধি। ইয়োরোপের মেয়েরা আধিক্য বর্জনের পক্ষপাতী। তাঁদের বক্ষ অনাবৃত, গাত্রাবাস সংক্ষিপ্ত, কুন্তল কর্তিত। অতি নিষ্ঠুর হস্তে দেহের উপরে কাঁচি চালিয়ে চেহারাটাকে এরা আটপৌরে করে
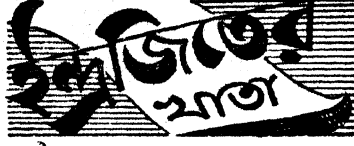
তুলেছে। মনে রাখা উচিত ছিল যে সৌন্দর্য-চর্চায় কোনো সর্ট-কাট্ পন্থা নেই।

কিন্তু আমাদের দেশে কেশ কর্তনের চলন এল কেমন করে? একি কেবল মাত্র ইয়োরোপের অনুকরণ? আমার মনে হয় এর পশ্চাতে আমাদের দেশের ছেলেদের অনুমোদন আছে। মেয়েদের বেশ-বিন্যাস বলুন, কেশ-বিন্যাস বলুন সবই ছেলেদের রুচি অনুযায়ী। ছেলেদের চোখে যেমন ভালো লাগে মেয়েরা ঠিক তেমনিভাবে নিজেদের সাজায়। অবশ্যি এর উল্টোটাও সত্য। ছেলেরা সাজে মেয়েদের রুচি অনুযায়ী। আমাদের মেয়েরা যদি জোর করে বলতে পারত যে হ্যাট-কোট-নেকটাইতে আমাদের ছেলেদের কুৎসিৎ দেখায় তবে বিদেশী পোষাক কোন্ দিন দেশছাড়া হয়ে যেত। পর রুচি পরনা কথাটা সত্য। অবশ্য এখানে পর অর্থে মেয়েদের পক্ষে ছেলে আর ছেলেদের পক্ষে মেয়ে। একালের মেয়েরা যদি পরার্থে কেশ উৎসর্জেৎ করে থাকেন তবে তাঁদের ঠিক প্রাজ্ঞ বলা চলে কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভংগ করা চলে কিন্তু নিজের কেশ কর্তন করে পরের মনোরঞ্জন করা উচিত কিনা সেটাই প্রশ্ন।

কেশ কর্তনে মেয়েদের মস্তিষ্ক বিকৃত না হলেও মস্তক যে কিয়ৎ পরিমাণে বিকৃত হয় এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। তাছাড়া ফ্যাশানের কাছে মস্তক বিক্রয় করা নিশ্চয় বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বেণীচ্ছেদনের প্রস্তাবে শিখবীর তরু সিং জবাব দিয়েছিলেন—

যা চেয়েছ তার কিছু বেশি দিব
বেণীর সংগে মাথা।

বীরের মতো কথা বটে। আমাদের বিলম্বিত-বেণী কন্যাদের মুখে সেই জবাবটা শুনলেই আমরা খুসি হতাম। কেশ বিনাশ না করে কেশ-বিন্যাস করলে পরম সুখের কথা হতো।

আমাদের পূর্ববর্তী সাহিত্যিকরা সুকেশিনীর শিরোশোভা নিয়ে কত শত মনোরম চিত্র রচনা করেছেন। ইদানীং সাহিত্যিকদের রচনায় রমণীর কেশ বর্ণনার প্রাচুর্য নেই। হালের লেখকদের মধ্যে একমাত্র বুদ্ধদেব বসু এই জিনিসটিকে যথাযোগ্য মূল্য দিয়েছেন। অন্যেরা এ বিষয়ে অল্পবিস্তর উদাসীন। না হয়ে উপায় কি? যার মাথা তারই যদি ব্যথা বোধ না থাকে তবে অপরে মাথা ঘামাবে কেন? আগে স্ত্রীলোকের কেশ স্পর্শ করলে রক্ষা থাকত না এখন সেই কেশের কি দুর্দশাই না হয়েছে!

এ যুগের হ্রস্বকুন্তলাদের জন্য কেবলমাত্র আমিই দুঃখ করছি এমন নয়। আমি জানি আপনাদের মধ্যেও অনেকের এ বিষয়ে মর্ম-বেদনা আছে। পাঠিকাদের মনের কথা অবশ্য আমি জানিনে। বক্তব্য হচ্ছে বিধাতাপুরুষ রমণীকে রমণীয় করেই সৃষ্টি করেছেন, বিধাতার উপরে বৃথা কারসাজি করতে যাওয়া কেন? এমন কি পাশ্চাত্য রমণীদের কেশ কর্তন তেমন তেমন পাশ্চাত্যরাও বরদাস্ত করতে পারেননি। তাঁরা নিতান্ত সেকেলে ব্যক্তি নন। ডি এইচ লরেন্সকে কেউ সেকেলে বলবে না। কোনো কোনো বিষয়ে তাঁর উগ্র মতামত এখনও পর্যন্ত ইংলন্ডের লোকদের ধাতস্থ হয়নি। এহেন ডি এইচ লরেন্সের মুখেও আমরা আক্ষেপোক্তি শুনেছি। তাঁর একটি কবিতায় তিনি বলছেন—

Why did they cut off their hair
That they could comb by the hour
In luxurious quiet?

এ প্রশ্নের জবাব কে দেবে? সম্মুখে রাখিয়া স্বর্ণমুকুর বাঁধিতেছিল সে দীর্ঘ চিকুর। কিশোর বয়সে যখন প্রথম এই কবিতা পড়েছিলাম তখন বধূ অমিতার এই ছবিটি আমার মনকে আশ্চর্য রকম নাড়া দিয়েছিল। এইজন্য বড় হয়ে যখন লেখায় হাত মক্স করতে শুরু করি তখন আমার এক উপন্যাসের নাম দিয়েছিলাম বধূ অমিতা। আমার আরেকখানি উপন্যাসেও আমি আধুনিক হ্রস্বকুন্তলাদের স্মরণ করে কিঞ্চিৎ আক্ষেপোক্তি করেছিলাম। যদিচ, সেটা বক্রোক্তি নয় তথাপি জানিনা আমার পাঠিকারা তাতে মর্মাহত হয়েছিলেন কিনা। অবশ্যি তাঁরা রাগ করলেও আমি দীর্ঘকুন্তলের গুণকীর্তন করতে ছাড়ব না। কালিদাস শকুন্তলা কাব্য রচনা করেছেন। আমার যদি ক্ষমতা থাকত তবে শকুন্তলাদের স্তুতিগান করে কাব্য রচনা করতুম।

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

(৩)

ম্যাজিস্ট্রেট ম্যাকডফ সাহেব বড়োই সাধু প্রকৃতির লোক। তাঁহার এলাকায় কোনরূপ গোলমাল হইলে সাধারণত তিনি গ্রাহ্যই করেন না। গোলমাল মিটিয়া গেলে অনাচারীদের আত্মগোপনের সুযোগ এবং অত্যাচারিতদের গোটাকতক সদুপদেশ দিয়া অক্লেশেই তিনি কর্তব্য শেষ করেন। সহজে তাঁহার ধৈর্যচ্যুতি হয় না। কিন্তু উপর উপর দুইখানা টেলিগ্রাম পাইয়া তিনি বিচলিত হইলেন। 'সোনামণি'র জন্য তিনি প্রথমটা বিচলিত হন নাই, কারণ নেটিভদের মধ্যে অমন নারীহরণ হইয়াই থাকে। টেরেসার নাম সোনামণির সঙ্গে থাকায় তিনি অবশ্য একটু চিন্তায় পড়িয়াছিলেন, ভাবিয়াছিলেন হয়তো দেশী খৃষ্টান হইবে। কিন্তু মিসেস দস্তিদার মহিলা সমিতির সম্পাদিকা এবং একজন মান্যগণ্য ব্যক্তির পত্নী, তিনি যখন 'ডেজি'কে রক্ষা করিবার জন্য টেলিগ্রাম করিলেন তখন সাহেবের সন্দেহ হইল হয়তো কোনো মিশনারী মেমের দল প্রচারের কাজে গ্রামে গিয়া বিপদে পড়িয়াছে। সাহেব তৎক্ষণাৎ পুলিশ সাহেবের কাছে খবর পাঠাইলেন। এক ঘণ্টার মধ্যে একদল সশস্ত্র পুলিস সিটকের টিকিট কাটিয়া ট্রেনে চড়িয়া বসিল। হুকুম রহিল, "প্রয়োজন হইলে গুলি চালাইবে। ডেজির জীবন সকলের চেয়ে মূল্যবান, টেরেসাকেও বাঁচানো চাই। যেরূপে পারো তাহাদের উদ্ধার করিবে।" শ্বেতাঙ্গ মহিলা বিপন্ন, আর কথা আছে?

ওদিকে ঠিক সেই সময়েই জমিদার বাড়ির সেণ্ট বার্নার্ড জাতীয় কুকুর বিশপকে লইয়া মহা বিপদ বাধিয়াছে। জমিদার অপরেশবাবুর বাড়ি গ্রামের শেষপ্রান্তে বসনা নদীর ধারে, কিন্তু বাড়ির সদর দরজা বাড়ির দক্ষিণ দিকে খেয়াঘাটে যাইবার রাস্তার উপর। অপরেশবাবু খেয়ালী মানুষ, খেয়ালের মাথায় যুদ্ধের পূর্বে এক জার্মান সাহেবের কাছে দেড়হাজার টাকা দিয়া এক বৎসর বয়স্ক বিশপকে কিনিয়াছিলেন, কলিকাতার সাহেব পাড়ায় তাঁহার বাড়ির শোভা বর্ধনের জন্য। এখন গ্রামে আসিয়া বিশপ প্রকৃতপক্ষে কাজ দিতেছে। সে কাহাকেও কিছু না বলিলেও সকাল বিকাল সে যখন চাকরের সহিত হাওয়া খাইতে বাহির হয় তখন তাহার বপুখানি দেখিয়াই গ্রামের চোর-ডাকাতের দল শিহরিয়া উঠে। রাত্রে বিশপ খোলা থাকে জানিয়া কেহ ভুল করিয়াও সে পথে হাঁটে না। বাড়ি পাহারার জন্য দুইজন দরোয়ান আছে বটে, কিন্তু না থাকিলেও কোনো ক্ষতি হইত না।

কাজ কঠিন হইবে জানিয়া ভোঁদা এখানে স্বয়ং ভার লইয়াছিল, সঙ্গে ছিল বিশ্বস্ত ভক্ত মাণিক এবং অন্তু। ভোঁদার সঙ্গে ছিল ক্যানেস্ত্রা এবং শৃগালশাবক, মাণিকের সঙ্গে ছিল খ্যাপলো জাল এবং দড়ি, অন্তুর সঙ্গে ছিল চটের থলি এবং লাঠি। প্রথমত কেহ কেহ পরামর্শ দিয়াছিল প্রথমে কুকুরটার সঙ্গে ভাব করিয়া তাহার কাছে বসিয়া একজন তাহার মুখে জালতি বাঁধিয়া দিবে। কুকুরটার পিঠে বাড়ির ছেলেমেয়েরা চড়িয়া বেড়ায়। সে কাহাকেও কিছু বলে না, সুতরাং কাজটা হয়তো শক্ত হইবে না। কিন্তু দারোয়ানরা কাছে থাকিলে তো জালতি বাঁধিতে দিবে না। অন্তুই চর হইয়া কর্মিদলের আগে গেল অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতে। দেখিলে দেউড়ির ধারে দারোয়ান রামকিষণ তাহার ছোট ঘরটিতে বসিয়া চাপাটি বানাইতেছে আর কুকুরটা একটা থামের সঙ্গে চেনবাঁধা অবস্থায় ঘরের বাহিরে শুইয়া শুইয়া দেখিতেছে। অন্তু শিস দিয়া সঙ্কেতে জানাইল, জালতি বাঁধা সম্ভব নয়, সাবধানে আসিতে হইবে। সে খ্যাপলাজাল লইয়া জমিদার বাড়ির সামনেই রাস্তার ওধারে একটা গাছে উঠিয়া বসিল। ভাবটা যেন উপর হইতে জাল ফেলিয়া সে তাহাকে বন্দী করিবে। ভোঁদা মনে মনে হাসিল, সবারই সাহস বোঝা গিয়াছে। কিন্তু সে নিজেও সদর দরজায় পৌঁছিবার পূর্বেই ক্যানেস্ত্রা বাজানো বন্ধ করিল এবং একটু দ্রুত পদেই সিংহদ্বারের সম্মুখের পথটা অতিক্রম করিয়া গেল। বিশপ ভোঁদা, মাণিক, শৃগালশাবক এবং তাহাদের অনুসরণকারী কুক্কুর ও বালকদলকে দেখিয়া একবার কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল মাত্র,

মাথাটা তুলিয়া যতক্ষণ তাহারা দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া না গেল ততক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া আবার নিজের প্রসারিত সম্মুখপদদ্বয়ের উপর মুখ রাখিয়া চোখ বুজিয়া শুইল।

ভোঁদার সাহস বাড়িল। নদীর কাছাকাছি পৌঁছিয়া সে ঘোররবে ক্যানেস্তা পিটিতে আরম্ভ করিল এবং শিয়াল ডাকের কাছাকাছি গোছের একরূপ বিকট শব্দ করিতে লাগিল। বিশপের নিদ্রার ব্যাঘাত হইল, সে গা ঝাড়া দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া একবার শিকলে ঝঙ্কার দিল, 'ঘং' করিয়া একবার একটা অকুক্কুর জনোচিত হুংকার ছাড়িল, তারপর আবার চোখ বুজিয়া শুইল। ভোঁদার উৎসাহ বাড়িয়া গেল, সে ক্যানেস্তা পিটিতে পিটিতে ক্রমে জমিদার বাড়ির সিংহদ্বারের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, শৃগাল শাবকটি অনিচ্ছা সত্ত্বেও কুঁই কুঁই করিতে করিতে তাহার দড়ির আকর্ষণে তাহার পিছন পিছন আসিতে লাগিল। চতুর্দিকে পাড়ার ছেলের দল কোলাহল করিতেছে, নেড়ি কুত্তার দল ঘেউ ঘেউ করিতেছে। পথের ওধারে অনেকগুলো বাড়ির দরজায়, জানালায় এবং ছাদে লোক জমিয়াছে। বাবুদের বাড়ির দারোয়ান মদন সিং খৈনি টিপিতে টিপিতে বাহির হইয়া প্রশ্ন করিল, "আরে ক্যা ভইল্? এৎনা হল্লা কাহে রে?"

বিশপ স্বভাবতই বড়ো শান্ত এবং সহিষ্ণু প্রকৃতির, সহজে কেহ তাহার গলার স্বর শুনিতে পায় না। যেমন বিশাল শরীর, তেমনি ধীর মন্থরগতি। কিন্তু সহ্যেরও তো একটা সীমা আছে? সে কিছুতেই নড়ে না দেখিয়া ভোঁদার অতি উৎসাহী ভক্ত মানিক তাহাকে লক্ষ্য করিয়া একটি ঢিল ছুঁড়িল। অব্যর্থ লক্ষ্যে ঢিল দরজা পার হইয়া সোজা আসিয়া লাগিল বিশপের কপালে। বিশপ বিদ্যুৎবেগে দাঁড়াইয়া উঠিল এবং এক ঝটকায় শিকল ছিঁড়িয়া নিমেষের মধ্যে লাফ দিয়া পথে গিয়া পড়িল। আততায়ীকে আক্রমণ করাই ছিল তাহার উদ্দেশ্য, মানিকের সৌভাগ্যক্রমে সে তাহাকে ঢিল ছুঁড়িতে দেখে নাই কারণ সে সময়ে তাহার নজরে পড়িলে থাম বাহিয়া সিংহ দরজার চূড়ায় নবতখানায় উঠিবার সুযোগ মানিক অবশ্যই পাইত না। চক্ষের পলকে দৃশ্যপট পরিবর্তিত হইল। কোথায় গেল ছেলের পাল, কোথায় গেল নেড়ি কুত্তার দল! নিমেষের মধ্যে যেন একটা ঝড় বহিয়া গেল। কতকগুলো কুকুর ছিটকাইয়া খানায় পড়িল, বাকীগুলো দৌড়িয়া কাছাকাছি যে যে বাড়িতে পারিল ঢুকিয়া পড়িল। ভোঁদা অসমসাহসী, ভোঁদা সপ্তগ্রামের মুকুটহীন সম্রাট দ্বিতীয় সমুদ্র গুপ্ত সহসা আত্মবিস্মৃত হইয়া শৃগাল-শাবকটিকে পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ ভয়ে তীর-বেগে ছুটিয়া গিয়া খেয়া নৌকায় উঠিল।

অসহায় বন্ধনমুক্ত শৃগালশাবকটি গুড়ি গুড়ি করিয়া তাহাকে অনুসরণ করিল বটে, কিন্তু তাহাকে বেশী দূর যাইতে হইল না, তিন চার হাত দূরেই বিশপ আসিয়া তাহাকে ধরিল। রাস্তার এ ধারে জমিদার বাড়ির উঁচু পাঁচিল, ওধারে সারি সারি অনেকগুলি একতলা এবং দোতলা বাড়ি। সকল বাড়িতেই দরজা বন্ধ হইয়া গিয়াছে, ছেলে বুড়ো অনেকেই নিরাপদে জানালায়, বারান্দায় অথবা ছাদে দাঁড়াইয়া মজা দেখিতেছে; কেহ কেহ শৃগালশাবকটিকে বিশপের কবলে পড়িতে দেখিয়া 'লেলেঃ' করিয়া পৈশাচিক উল্লাসে বিশপকে উৎসাহিত করিতেছে। কিন্তু বিশপ তো চপলচিত্ত মানুষ নয়, সে সম্ভ্রান্তবংশীয় সারমেয়। অসহায় প্রতিদ্বন্দ্বীকে আক্রমণ করিতে তাহার আত্মসম্মানে বাধিল। সে নিঃশব্দে তাহার মাথা, বুক পিঠ আঘ্রাণ করিল, তাহার পর তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত আততায়ীর সন্ধানে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিল। ঘটনাটা ঘটিতেছিল ঠিক অন্তু যে গাছটার উপরে ছিল তাহারই তলায়। সুযোগ বুঝিয়া অন্তু অব্যর্থ লক্ষ্যে তাহার উপর খ্যাপলা জাল ফেলিল, কিন্তু ফলে হিতে বিপরীত হইল। প্রথমটা জালে জড়িত হইয়া বিশপ ক্ষণিকের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু পরমুহূর্তেই সে দারুণ ক্রোধে উন্মত্তবৎ হইয়া সুতার জালখানাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া বাহির হইল এবং প্রচণ্ড বেগে বিশ পঁচিশ হাত দূরে অবস্থিত খেয়া নৌকা লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। খেয়াঘাটে মাঝি ছিল না, নৌকায় ভোঁদা একা। চতুর্দিকে বাড়ির ছাদে, বারান্দায়, জানালায় হায় হায় শব্দ উঠিল।

ভোঁদা এতক্ষণ অবাক হইয়া বিশপের কাণ্ড দেখিতেছিল, অন্তুর জাল ফেলারও তারিফ করিতেছিল। সহসা ক্রুদ্ধ বিশপের হুংকার শুনিয়া তাহার খেয়াল হইল সেণ্ট বার্নার্ডের বাঘের মতো প্রকাণ্ড শরীরটি তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া মেল ট্রেনের বেগে ছুটিয়া আসিতেছে, সেই বিভীষিকাময় মূর্তি একবার দেখিলে সন্দেহ থাকে না, তাহার কবলে পড়িলে মৃত্যু নিশ্চিত এবং সে মৃত্যুর চেয়ে অধিকতর বীভৎস ও যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু জগতে হয়তো নাই। নিজের আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে সহসা সচেতন হইয়া ভোঁদা তাড়াতাড়ি নৌকার নোঙর তুলিয়া নৌকা ভাসাইয়া দিল। বিশপ ঘাটে পৌঁছিয়া এক সেকেণ্ড ইতস্তত করিল তারপর এক লাফে হাত চারেক ব্যবধান পার হইয়া নৌকায় উঠিল ঃ ভোঁদাও সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল।

এদিকে একটু বিবেচনার ভুলে বিপদ ঘটিল। হাঁটু অতি সাবধানতার জন্য যেমন শৃগালশাবককে কোমরের সঙ্গে দড়ি দিয়া বাঁধিয়াছিল, ভোঁদা তাহা করে নাই বটে, কিন্তু বাজাইবার সুবিধার জন্য ক্যানেস্তাটিকে সে ডানদিকের কাঁধ হইতে দড়ি বাঁধিয়া নিজের বাঁদিকে কোমরের কাছাকাছি ঝুলাইয়াছিল। জলে পড়িবামাত্র ক্যানেস্তাটি জলে ভরিয়া ভারী হইল এবং তাহাকে নীচের দিকে টানিতে লাগিল। ভোঁদা ইদানীং পল্লীগ্রামে বাস করিলে কি হইবে, তাহার জীবনের অধিকাংশ সময় কলিকাতায় কাটিয়াছে, সাঁতারে তাহার দক্ষতা ছিল না। সাঁতার দিতে দিতে কাঁধ হইতে দড়ি কাটিয়া বা মাথা গলাইয়া জলভর্তি টিনটার ভার হইতে মুক্ত হওয়াও তাহার পক্ষে সম্ভব হইল না। সে একবার ডুবিয়া অনেকটা জল খাইয়া প্রাণপণ চেষ্টায় যখন মাথা তুলিল তখন বিশপের উদ্যত দুইটা লোলজিহ্বা মুখখানা তাহার পাশেই আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ভোঁদা শিহরিয়া উঠিল। বাঁচিবার সম্ভাবনা যখন কোনোদিকেই নাই তখন ঐ হিংস্র রাক্ষসটার ভক্ষ্য হইয়া টুকরা হইয়া মরার চেয়ে জলে ডুবিয়া শান্তিতে মরাই ভালো। এত কথা স্পষ্ট করিয়া ভাবিবার সময় হয়তো সে পায় নাই, কেবল তাহার ব্যাকুল দৃষ্টি চতুর্দিকে নিক্ষেপ করিয়া যখন সে কাছাকাছি একজন মানুষকেও দেখিতে পাইল না তখন হয়তো আত্মরক্ষার চেষ্টা বৃথা বলিয়াই তাহার মনে হইয়া থাকিবে ঃ সে হতাশভাবে চোখ বুজিয়া দ্বিতীয়বার জল মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। বিশপও তাহাকে অনুসরণ করিয়া সেই সঙ্গেই অন্তর্হিত হইল।

ততক্ষণে তীরে অনেক লোক জমায়েত হইয়াছে। বিশপের ভয়ে বাহিরের লোক কেহ কাছে যাইতে সাহস না করিলেও দারোয়ান রামকিষণ দেখিল আর অপেক্ষা করা উচিত নয়। সে দ্রুত সাঁতরাইয়া গিয়া নৌকা ধরিল এবং দাঁড় বাহিয়া যেখানে বিশপ ও ভোঁদা অদৃশ্য হইয়াছে, তাহার কাছাকাছি পৌঁছিল। প্রায় এক মিনিটকাল চতুর্দিক নিস্তব্ধ, উৎকণ্ঠায় অনেকে নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। অনেকেরই বিশ্বাস হইল ছেলেটা এবং কুকুরটা এক সঙ্গেই ডুবিয়া মরিয়াছে। ভোঁদার ভক্তেরা কেহ কেহ কেবল সে কথা বিশ্বাস করিল না, তাহারা চুপি চুপি বলাবলি করিতেছিল, ভোঁদা নিশ্চয় একক্ষণে ডুব সাঁতার দিয়া ওপারে পৌঁছিয়াছে ঃ শক্র সৈন্যের সর্বশ্রেষ্ঠ বলি বিশপের বধসাধনের জন্য এইভাবে নিজে জলে ডুব দিয়া সে ধাপ্পা চালই চালিয়াছে!

কিন্তু সহসা বিশপের মাথা দেখা গেল ঃ সে কালো মতো কি একটা পদার্থ কামড়াইয়া ধরিয়া নৌকা হইতে কয়েক হাত দূরে ভাসিয়া উঠিয়াছে। রামকিষণ নৌকাটাকে তাহার পাশে লইয়া গেল, দুই হাত বাড়াইয়া তাহার

মুখ দিয়ে বস্তুটির ভার নিজে লইতে চেষ্টা করিল। দারুণ ভার, চুলের গোছা ছাড়িয়া সে নৌকা হইতে অনেকখানি ঝুঁকিয়া ভোঁদার হাত ধরিল, সঙ্গে সঙ্গে বিশপ তাহাকে ছাড়িয়া নৌকায় আসিয়া উঠিল। ভোঁদাকে সেইভাবে বেশিক্ষণ ধরিয়া রাখা রামকিষণের পক্ষে সম্ভব নয় তাহা সে নিজে বুঝিতেছিল, কিন্তু উপায় কি? শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়া সে ভোঁদাকে টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিল. কিন্তু পারিল না' মাঝ.হইতে বিশপের, তাহার এবং ভোঁদার সমবেত ভার একদিকে পড়ায় ছোটো নৌকা কাৎ হইয়া ডুবিবার উপক্রম করিল। এক ঝলক জল উঠিয়া নৌকাটিকে আরও ভারী করিয়া দিল। রামকিষণের দুই হাত জোড়া, ভোঁদার কাঁধের দাড়ীটি প্রথমে সে লক্ষ করে নাই. এখন চোখে পড়িলেও এবং ক্যাম্বিস ভর্তি জলের গুরুভার ভোঁদাকে টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে গিয়া অনুভব করিলেও সে এমন বেকাদায় বসিয়াছিল এবং তাহার দুই হাত ভোঁদাকে আঁকড়াইয়া রাখিবার চেষ্টায় এমনভাবে ব্যাপৃত ছিল যে, তাহার কাঁধের দড়ি কাটিয়া বা খুলিয়া দেওয়ার চেষ্টা করাও তখন তাহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। তীর হইতে আর দুই তিনজন সাঁতার দিয়া আসিতেছে, কিন্তু তাহারা পৌঁছানো পর্যন্ত ভোঁদাকে এইভাবে ধরিয়া রাখা সম্ভব হইবে কি? এমন সময়ে বিশপের প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বের পরিচয় পাওয়া গেল। তাহার যে সকল পূর্বপুরুষেরা আল্পস পর্বতের প্রাণ সংহারী তুষার ঝটিকায় বিপন্ন পথভ্রান্ত পথিকদের জীবন রক্ষার্থে বৎসরের পর বৎসর, দিনের পর দিন মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া অদম্য শক্তি লইয়া অগ্রসর হইয়াছে তাহাদের অসীম সাহস এবং অপূর্ব প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সে বোধ হয় তাহার রক্তের সহিত উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছিল। সহসা নৌকা হইতে মুখ বাড়াইয়া সে দাঁত দিয়া অবলীলাক্রমে ভোঁদার কাঁধের দড়ি কাটিয়া ফেলিল। ভারের টানে দড়িটা কাঁধের উপর আঁটিয়া বসিয়াছিল; দড়ি কাটিতে গিয়া ভোঁদার কাঁধের খানিকটা মাংসও কাটিল; সেইখানকার জলটা মুহূর্তের জন্য লাল হইয়া উঠিল। জলভরা ক্যাম্বিস্টা দড়িটাকে টানিয়া লইয়া দেখিতে দেখিতে তলাইয়া গেল। অদ্বৈত, শ্রীনিবাস, মদন সিং এবং রামকিষণ যখন ভোঁদার অচৈতন্য দেহ নৌকায় টানিয়া তুলিল তখন তীরে মুহুর্মুহু হরিধ্বনি উঠিতেছে।

জমিদার অপরেশবাবুর মেজ ছেলে পরমেশবাবু মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র। তিনি ফার্স্ট এড দিলেন। কৃত্রিম উপায়ে অনেকখানি জল পেট হইতে বাহির করানো হইলে ভোঁদার শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিকভাবে পড়িতে লাগিল। জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে সে ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। তাহার বাড়ির লোককে তখনই খবর দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহারা সারাদিন জমিদার বাড়িতে তাহার পরিচর্যায় কাটাইয়া সন্ধ্যার পর গরুর গাড়ী করিয়া তাহাকে বাড়ি লইয়া গেলেন।

এদিকে আর্মড পুলিশের দল সিংটকে স্টেশনে নামিয়াই স্টেশন মাস্টারকে জেরা আরম্ভ করিল, "ইঁহা রিস্তাদার বাবুকো কোঠি কাঁহা।" স্টেশন মাস্টার বলিলেন, "রিস্তাদার তো কেউ নেই জমাদার সায়েব—একজন সেরেস্তাদার আছেন রিটায়ার্ড, ঐ বিড়মি গ্রামে।" "অচ্ছা রাস্তা দেখলানে কে লিয়ে এক আদমি হামারা সাথ দে দেও।" একজন কুলি চলিল সঙ্গে, পথে কিছুদূর যাইতে না যাইতেই গ্রামে খবর রটিয়া গেল, সেপাই আসিয়াছে। ছাদে, জানালায় এবং রাস্তায় সিপাহীদের দেখিতে লোক দাঁড়াইয়া গেল। হঠাৎ একজায়গায় অনেকগুলি লোক দেখিয়া জমাদার সাহেব দাঁড়াইয়া গেলেন। একজন বৃদ্ধকে ধরিয়া জেরা আরম্ভ করিলেন, "ইধর কয়ঠো মেমসাব আয়ি থী, তোম দেখা?" বৃদ্ধ খাঁটি বাঙালী, গ্রামের বাহিরে কখনো যায় নাই, হিন্দির 'হ'ও বুঝে না। কাঁদো কাঁদো হইয়া বলিল, "আমি কিছু জানি না বাবা! আমার 'আই' টাই কেউ নেই, অনেকদিন মরে গেছে।"

ফতেবাহাদুর বুঝিল, কাহারা মারা গিয়াছে। বলিল "কৌন মরে গিয়েছে?"

বৃদ্ধ আঙুলে গণিতে গণিতে ফর্দ দিতে লাগিল, "আমার মা মারা গেল আগে, বাবা গেল তার দুবছর পরে। পিসিমা গেল সেই বছরই ভাদর মাসে। তারপর দুটো ভাই গেল, এক-দিনে ওলাউঠা হয়ে"—

ফতেবাহাদুর বিরক্ত হইয়া বলিল, "বুরবক হায়।" তারপর কাছাকাছি জোয়ান মত একজন যুবককে পাকড়াও করিয়া বলিল "তোম জানতে হো? হামলোগ তো ইনাম মিলেগা, নেহি বাত দেগে তো পোলিসমে মার দেগা।" ছোকরা হিন্দী বুঝিত, বলিল "কিসকো মাংতে হ্যায় আপলোগ?"

ফতেবাহাদুর বলিল, "হামলোগ মাংতে হ্যায়- ডোজি আর টেরেসা বিবিকো।"

ডোজিকে চিনিত না সিংটকে গ্রামে এমন লোক বেশি ছিল না। দস্তিদার বাড়ির পথে চলিতে অনেকবার অনেকে তাহার দন্তের তীক্ষ্ণতা অনুভব করিয়াছে, কাহাকেও কাহাকেও মিস্টার দস্তিদার খরচ দিয়া চিকিৎসার জন্য কলিকাতা পাঠাইয়াছেন। সম্প্রতি ছেলেরা এক বিরাট যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছে এবং তাহাতে আহুতি হইবার জন্য বহু কুকুর ইতিমধ্যে গ্রাম ত্যাগ করিয়াছে এ সংবাদ গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইঁহারা সকলেই সংবাদটা শুনিয়াছিল এবং ডোজিও নিশ্চয় সেই বন্দী-দের অন্যতম এই চিন্তায় সকলেই নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। এখন তাহাদের জন্য যে সদর হইতে সিপাহীর দল আসিতে পারে একথা কেহ কল্পনা করিতে পারে নাই, ফতেবাহাদুরের কথায় উপস্থিত সকলেরই তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল। একজন বলিল "দেখেছিস, বিলিতী কুকুরের কি খাতির? আমরা গাঁকে গাঁ উজোড় হয়ে গেলেও কেউ খবর নিতুনি।" ছেলেদের শুভানুধ্যায়ী চর ছিল, ব্যাপার বুঝিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সাবধান করিতে লোক চলিয়া গেল। এদিকে তাহাদের শত্রুরও অভাব ছিল না। কানা বাগ্দীর কুকুর 'বেচা' চুরি গিয়াছিল, সে আগাইয়া আসিয়া বলিল "হুজুর, বিড়মি গেরামে মুখুজ্যেদের একটা পোড়োবাড়ি আছে। বুড়োরা মরে গেছে, ছেলেরা বিদেশে চাকরী করে, বহুকাল কেউ দেশে আসে না। সেই বাড়িটাতে আজ দুদিন ধরে দিনরাত কুকুর ডাকছে। আমার বোধ হয় সেইখানে গেলে আপনারা খবর পাবেন।" ফতেবাহাদুর তাহাকে পথ দেখাইতে বলিয়া সকলকে শুনাইয়া দিয়া গেল, "বিবিলোগকো নেহি মিলেগা তো বিলকুল গাঁও জ্বালা দেগা।"

মিনিট পনেরোর মধ্যে সশস্ত্র পুলিসের দল বিড়মি গ্রামে পৌঁছিয়া পোড়োবাড়ি ঘিরিল। চারিদিকে বন্দুকধারী লোক দাঁড় করাইয়া ফতেবাহাদুর তিনজন অসমসাহসী সঙ্গী লইয়া বাড়ির মধ্যে ঢুকিল। সদর দরজা ভাঙ্গা বারান্দা পার হইয়া দেখা গেল একটা বড় ঘরের সমস্ত দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। ফতেবাহাদুর হুঙ্কার ছাড়িল, "কেওয়াড়ি খোল দেও।" কেহ উত্তর দিল না, দরজাও খুলিল না, কেবল কতকগুলো কুকুরের ডাক শোনা গেল। ফতে-বাহাদুর এবং তাহার সঙ্গীরা লাথির পর লাথি মারিতে লাগিল, পুরাতন বাড়ি থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত দরজার খিল ভাঙিয়া পথ পরিষ্কার হইল। সঙ্গে সঙ্গে এক পাল ক্ষুধায় উন্মত্ত কুকুর হুড়মুড় করিয়া তাহাদের ঘাড়ে আসিয়া পড়িল। ফতেবাহাদুর গুলি চালাইতে হুকুম দিল; তবে গুলি চালাই-বার স্থানাভাব এবং সুবিধার অভাবে চার পাঁচটার বেশি গুলি চলিল না। তিনটা কুকুর মরিলে এবং গোটা দশ বারো বন্দুকের বাঁটের ঘায়ে আহত হইলে অন্য প্রায় পঞ্চাশটা কুকুর চারিদিকে দেয়ালের গা ঘেঁসিয়া ভীতভাবে তাকাইয়া, কেহ দাঁড়াইয়া—কেহ শুইয়া—হাঁফাইতে বা ক্ষীণ স্বরে আর্তনাদ করিতে লাগিল। টেরেসা প্রাণভয়ে ক্ষুদ্র শরীরটি ঘরের এককোণে নর্দমার ফাঁক দিয়া গলাইবার চেষ্টা করিতে গিয়া সেইখানেই আটকাইয়া গিয়াছিল, একজন পুলিস তাহাকে তাহার পিছনের পা দুটা ধরিয়া টানিয়া বাহির করিল। যাহা হউক যুদ্ধ থামিলে প্রশ্ন হইল, মেমসাহেবরা গেল কোথায়? দেখা গেল ঘরটার ছাদের কোণের

দিকে মানুষ গলিবার মতো একটা প্রকাণ্ড ফুটো এবং ঘরের ভিতর দিকের দেয়ালের গায়ে একটা মই লাগানো। ভোঁদার অনুচরেরা ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া সেই মই বাহিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, তারপর মইটাকে এমনভাবে ঠেলিয়া দিয়াছে যাহাতে কুকুরগুলা তাহার সাহায্যে ছাদের কাছাকাছি পেঁৗছিতে না পারে। ফতেবাহাদুর অন্য সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল, অধিকাংশ ঘরেরই দরজা জানালা ছিল না; যে দুইটি ঘরের ছিল, সেগুলির মধ্যে একটির দরজায় বাহির হইতে তালা দেওয়া ছিল এবং আর একটির দরজার কড়া দুটিতে দড়ি বাঁধিয়া দরজা বন্ধ করা ছিল, সেই দুইঘর হইতেও পাঁচসাতটি করিয়া কুকুর বাহির হইল। অগত্যা তাহারা নিরাশ হইয়া বাহির হইয়া আসিল, তাহাদের পিছন পিছন কুকুরের দলও আসিল। বাহিরে অপেক্ষমান জনতার মধ্যে তুমুল কোলাহল উঠিল, কেহ খেঁদীকে, কেহ বুঁচিকে, কেহ হরিমতীকে, ফিরিয়া পাইয়া আনন্দ করিতে লাগিল, মিস এলোকেশী সামন্ত পুলিস আসিয়াছে শুনিয়া আশা আশঙ্কায় দোদুল্যমান চিত্তে অপেক্ষা করিতেছিলেন, সহসা টেরেসাকে বিষণ্ন বদনে দেখিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাকে বুকে তুলিয়া লইয়া জড়াইয়া ধরিলেন। অশ্রুভারাক্রান্ত চক্ষে অনুযোগ করিতে লাগিলেন "টেরেসা, টেরেসা, কোথায় ছিলি মা আমাকে ছেড়ে?"

মেমসাহেব উদ্ধার করিতে আসিয়া কয়েকটা কুকুর মারিয়া এবং উদ্ধার করিয়া ফতেবাহাদুর বড়োই অপ্রস্তুত হইয়াছিল, এখন তাহার পাশেই টেরেসার নাম শুনিয়া অবাক হইয়া প্রশ্ন করিল "ইয়ে টেরেসা হ্যায়?"

মিস সামন্ত কথা কহিবার পূর্বেই দুই-তিনজন বলিয়া উঠিল "হাঁ, জমাদার সাহেব, আপনার দয়াতে ওর জান বেঁচে গেছে আজ।"

ফতেবাহাদুর প্রশ্ন করিল "ইসকো লিয়ে তার গিয়া থা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকো পাশ? সোনামনি কাঁহা?"

গদাধর গুঁই মিস সামন্তের সঙ্গেই আসিয়াছিলেন। বিনি ঝি সঙ্গে ছিল, সে সোনামণিকে গলার বগলেসে দড়ি বাঁধিয়া টানিয়া আনিল। গদাধর গুঁই আভূমি আনত হইয়া সেলাম করিয়া বলিলেন, "মিল গিয়া সাহেব, আপকা মেহেরবানি!"

ফতেবাহাদুর ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া গর্জিয়া উঠিল "ইয়ে কুত্তেকে লিয়ে মোফৎ হামকো এৎনা হয়রান কিয়া? চলো সব সাহেবকো পাশ, সব জেল দিয়া যায়গা।"

মিস্টার দস্তিদার বাড়ি ফিরিয়া গৃহিণীকে ধমক দিতেছিলেন। তিনি যে ট্রেনে ফিরিয়াছেন সেই ট্রেনেই সশস্ত্র পুলিশ স্টেশনে নামিয়াছে। বাড়ি ফিরিয়া যখন শুনিলেন, তাঁহার গৃহিণীই এজন্য দায়ী তখন তিনি ভয়ে, বিরক্তিতে, ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "বুড়ো বয়সে দুটো ঠাকুর দেবতার নাম শুনব তা না, দিন-রাত কেবল ঘেউ ঘেউ আর কেউ কেউ। তা'ও না হয় সহ্য করছিলুম; রাজ্যের লোকের নালিশ, একে কামড়াচ্ছে, ওকে আঁচড়াচ্ছে; এর পায়ে ধরে ওকে টাকা দিয়ে তাও সামলাচ্ছিলুম। তা'র ওপর এরকম করলে আমি পারি কোত্থেকে? নাও, এখন পুলিস কেস করোগে, কিছুদিন ঠাণ্ডি গারদে ঘুরে এস। আপদ বিদেয় হয়েছিল, আবার মরতে ফিরল কেন?"

মিসেস দস্তিদার বলিলেন, "অসভ্যের মতো চেঁচামেচি ক'রে তো কোনো লাভ হবে

"কোথায় ছিলি মা!"

না। সার দীনেন্দ্রকে একটা টেলিগ্রাম করো গভর্নরকে বলে তিনি যাতে একটা ব্যবস্থা করেন।"

"ছাই করবেন তোমার সার দীনেন্দ্র। আমাকেই এখন ছুটতে হবে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে। হাতে পায়ে ধরে কিছু হয় কি না দেখি। মিথ্যে ভয় দেখিয়ে পুলিশ আনিয়েছ, এখন আমাকে শুদ্ধ কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে বুড়ো বয়সে। দুর্ভোগ! দুর্ভোগ!

এমন সময় সশস্ত্র পুলিশের দল মার্চ করিয়া আসিতেছে দেখা গেল। উভয়েই প্রমাদ গণিলেন। সঙ্গে স্থানীয় পুলিশের দারোগা এবং চৌকিদার দফাদার প্রভৃতিকে দেখা গেল; সঙ্গে টেরেসাকে কোলে লইয়া এলোকেশী সামন্ত এবং সোনামণির দড়ি টানিতে টানিতে গদাধর গুঁইও দেখা দিলেন। তাঁহারা যে স্বেচ্ছায় আসেন নাই তাহা বেশ বোঝা গেল।

মিস্টার দস্তিদার কাঁপিতে কাঁপিতে এক মুখ হাসিয়া সকলকে অভ্যর্থনা করিলেন। বৈঠকখানা ঘরে ফতেবাহাদুর এবং দারোগাকে বসানো হইল। মিস সামন্ত কাঁদিয়া চোখ মুখ ফুলাইয়াছিলেন, তিনি মিসেস দস্তিদারের কাছে আসিয়া বলিলেন, "কি হ'বে দিদি? আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। আমি জেলে গেলে টেরেসা আমার বাঁচবে না!"

মিসেস দস্তিদার আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "কিচ্ছু ভাববেন না, আমি যাচ্ছি আপনাদের সঙ্গে। সার দীনেন্দ্রকে একটা খবর পাঠালেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে। মিস্টার গুঁই, আপনি বসুন না, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?" মিস্টার গুঁই ওরফে গদাধর কাতরভাবে হাসিয়া বলিলেন, "দারোগাবাবু রয়েছেন, হুজুররা রয়েছেন, ওঁদের সামনে কি আমি বসতে পারি?"

মিসেস দস্তিদার আর কিছু বলিলেন না, ব্যঙ্গের হাসি হাসিলেন। দারোগা মিস্টার দস্তিদারকে বলিতেছিলেন, "আপনারা আমাকে খবর না দিয়ে একেবারে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে তার ক'রতে গেলেন কেন? এর পরিণাম কি হতে পারে তা জানেন?"

মিস্টার দস্তিদার বলিলেন, "আর বলেন কেন? আমি বাড়ি ছিলুম না, এসেই দেখছি এই কাণ্ড! স্ত্রীবুদ্ধি, স্ত্রীবুদ্ধি! যাই হোক, যা হবার হয়েছে, এখন কি ক'রে উদ্ধার পাই তা'র ব্যবস্থা করুন। খরচপত্র যা হয়, তার জন্য তৈরী আছি। কি বলেন মিস্টার গুঁই?"

মিস্টার গুঁই হাসিয়া বলিলেন, "আজ্ঞে তাতো বটেই, তাতো বটেই! আমাদের দারোগাবাবুকে তাই বলছিলুম এখনি"--

ইঁহারা বড়োলোক, উদ্ধারের উপায় শেষ পর্যন্ত হইল। কিভাবে হইল সে প্রসঙ্গে আর প্রয়োজন নাই। পুলিশের দল ভূরি-ভোজনে তৃপ্ত হইয়া ফিরিয়া গেল। মিস্টার দস্তিদার সদরে গিয়া সাহেবের কাছে কাকুতি মিনতি করিলেন। তাঁহাকে বা মিসেস দস্তিদারকে কাঠগড়ায় উঠিতে বা জরিমানা দিতে হইয়াছিল কি না আমরা জানি না। সংবাদপত্রে এ সম্বন্ধে কোনো খবর বাহির হয় নাই।

সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে ভোঁদার দুই সপ্তাহ গেল। ইতিমধ্যে তাহার শ্বমেধ যজ্ঞের কথা শাখা পল্লবে বিস্তারিত হইয়া গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। পুলিশ কেস যে হয় নাই তাহার কারণ সাতখানা গ্রামের ধনী দরিদ্র অনেক ঘরের ছেলেই শ্বমেধ যজ্ঞের ব্যাপারে জড়িত ছিল; সকলকে শত্রু করিয়া এবং অনেকের কৃপা কটাক্ষ উপেক্ষা করিয়া কিছু করা স্থানীয় দারোগার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ভোঁদার জনপ্রিয়তা ইহার পর বাড়িল কি কমিল তাহা বলা যায় না, কারণ তাহার ভক্ত দলের মধ্যে একদিকে যেমন ভাঙন ধরিল তেমনি অপরদিকে অনেকগুলি বয়স্ক ব্যক্তি

...র ভক্ত হইয়া দাঁড়াইলেন। রোগশয্যায় ...রা তাঁহার সহিত নিয়মিত দেখা করিতে ...তেন তাঁহাদের মধ্যে চৈতন্য কাব্যতীর্থ ... বাসুকী শাস্ত্রীর নাম উল্লেখযোগ্য। ...কী শাস্ত্রী ইতিপূর্বে যজ্ঞের দরুণ দুই ... উপায়নের ফর্দ তাহাকে দিয়াছিলেন, ...র রোগশয্যায় তাহার খোঁজ লইতে ...য়া এবং তাহাকে অনেকটা সুস্থ দেখিয়া ... একদিন আর কয়েকখানি কাগজ তাহাকে ...ন। তাহাতে অনেকগুলি মন্ত্র লেখা ...। ভোঁদা কাগজগুলি হাতে লইয়া ...করিল, "কী এ সব?"

...বাসুকী শাস্ত্রী বলিলেন, "বৈদিক আর ...ক মিশিয়ে এক রকম দাঁড় করিয়েছি, এই ... তোমাদের যজ্ঞের কাজ মোটামুটি ...তে পারবে।" ভোঁদা একবার মাত্র একখানা ...র দিকে চাহিয়া দেখিল। চোখে ...ল "দহ, দহ, মার, মার খাদয় খাদয়"— ...সে কাগজখানি বাসুকী শাস্ত্রীকে ফেরত ... বলিল, "আপনাকে শুধু শুধু কষ্ট ...ম। আমি যজ্ঞ করব না।"

...শাস্ত্রী হাসিয়া বলিলেন, "না না, আমার ...কি? বসেছিলুম, তোমার কল্যাণে ...ই শাস্ত্র আলোচনা করা গেল। আমি ...ই দুঃখিত হইনি। যজ্ঞের ব্যাপারে ...র প্রতি আমার শ্রদ্ধা এসেছিল, যজ্ঞ ...র ব্যাপারে সেটা আরো বেড়ে গেল।"

...ডাক্তার নিবারণবাবু প্রথম তিন চারিদিন ... আসিয়াছিলেন, ভোঁদার প্রলাপ থামিলে ...জ্বর থামিলে কয়দিন আর আসেন নাই। ...ন সকালে অন্ন পথ্য দিবার অনুমতি দিয়া ...কে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "তোমাকে প্রেসক্রিপশনখানা দিয়েছিলুম, সেটা বোধ ...আর দরকার হবে না। কয়েক ঢোক জল ...ই তোমার মাথা বেশ পরিষ্কার হয়ে ... দেখছি। আমরাও অনেক সময় অন্য ...উপায় না থাকলে জলই দিই অনেককে। ...ভালো জিনিস।"

জমিদার অপরেশবাবু নিজে না আসিলেও ...র ছেলে পরমেশবাবু একদিন অন্তর ...কে দেখিতে আসিতেন। তিনি সেইদিন ...হাতে তাঁহার পিতার নিকট হইতে একখানি লইয়া আসিলেন। পত্রটি এইরূপঃ

মহামহিমার্ণব শ্রীল শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ...পাধ্যায়, মুকুটহীন দ্বিতীয় সমুদ্রগুপ্ত ...শয় প্রবলপ্রতাপেষু—যথাবিহিত সম্মান ...সর নিবেদনমিদং—

মহাশয়, শুনিলাম আপনি এক বিরাট ...মেধ যজ্ঞের আয়োজন করিতেছেন। অবিলম্বে ...মাদের সাতখানি গ্রামকে কুক্কুর শূন্য ...বেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, এ ...দও পাইলাম। আমাদের বাড়িতে একটি ...র আছে, আপনার যজ্ঞারম্ভের পূর্বে যদি তাহাকে কলিকাতায় বা অন্যত্র পাঠাইয়া দিই তাহা হইলে কি যজ্ঞের কোনোরূপ ক্ষতি হইবে? গ্রামে গুজব, বিলাত ফেরত পুরোহিতের সাহায্যে কুকুরগুলিকে মন্ত্রঃপূত করিয়া বৈদিক প্রথায় জীবন্ত পুড়াইয়া মারা হইবে। এ বিষয়ে আমার মত এই যে কুকুর মাংস খাইতে সুস্বাদু নয়, প্রাচীনকালে মহর্ষি বিশ্বামিত্র দুর্ভিক্ষের সময় একবার চাখিয়া দেখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পছন্দ না হওয়ায় গায়ত্রী মন্ত্রের মতো উহার বহুল প্রচার করেন নাই। এখনও কলিকাতার কোনো কোনো হোটেলে ছাগ মাংসের সহিত ভেজাল দিবার জন্য উহা ব্যবহৃত হয় শুনিয়াছি, কিন্তু উহা সর্বজন সমাদৃত নহে। সুতরাং কুক্কুরপোড়া না করিয়া আপনারা যদি বেওয়ারিশ কুক্কুরগুলিকে বলি দিয়া তাহাদের মৃতদেহ মাটিচাপা দেন তাহা হইলে ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি হয়, দেশেরও প্রকৃত কল্যাণ হয়। বিশেষ করিয়া পুলিশের লোক গ্রামের মধ্যে একটা পোড়ো বাড়িতে আপনার সংগৃহীত যে কুক্কুরগুলিকে হত্যা করিয়াছে, তাহাদের দুর্গন্ধে লোকে অস্থির হইয়াছে। ঐগুলিকে আপনার অনুচরগণ যদি অবিলম্বে মাটিতে পুঁতিয়া ফেলে তবে সুখী হইব। আপনার যজ্ঞ আরম্ভ হইবার পূর্বে দয়া করিয়া সংবাদ দিবেন; উপযুক্ত রাজকর লইয়া উপস্থিত হইব। তৎপূর্বে কুক্কুর কুলের অত্যাচার নিবারণ সম্পর্কে আপনার মতামত জানাইবেন। আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার জানিবেন। বিনীত সেবকাধম

শ্রীঅপরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

ভোঁদা ইহার উত্তরে কেবল একটি কথা পরমেশবাবুকে বলিল ঃ "বলে দেবেন, শ্বমেধ যজ্ঞ হবে না। আমি আজকালের মধ্যে মরা-কুকুরগুলো পুঁতিয়ে ফেলবার ব্যবস্থা করব, ছেলেরা কেউ দেখা করতে এলেই বলে দেব। আর আপনাদের কুকুর? সে আমার ভাই, তার ঋণ আমি কোনোদিন শোধ করতে পারব না।"

ইহার এক মাস পরের কথা। স্কুলের মাঠের এক প্রান্তে পূর্ব বর্ণিত গাছতলায় কিশোর সঙ্ঘের সভা বসিয়াছিল। ভোঁদা এবং তাহার অনুচরবৃন্দ চাঁদা করিয়া দুই টাকা দিয়া হরিচরণ কুমারের বাড়ি হইতে একটা জন্তুর মূর্তি তৈয়ারী করাইয়া আনিয়াছে। সেটাকে কুকুরও বলা চলে, বাঘও বলা চলে, গাধাও বলা চলে; চাকা লাগাইয়া সেটাকে সভায় টানিয়া আনা হইয়াছে। ভোঁদাদের একান্ত ইচ্ছা সেটাকে সেই গাছ তলায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার জন্য একটা চালাঘর তুলিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু তাহার বিপক্ষ দল ইহাতে তীব্র আপত্তি জানাইতেছে। ফটিক তারস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "কুকুরে তোমার জীবন বাঁচিয়েছে, তাতে আমাদের কি? আমরা সাধারণের জায়গায় কেন ঐ বিকট মূর্তিটা বসাতে দোব? আর ওটা কি কুকুর হয়েছে? ওটা তো গাধা। দে ওটাকে শেতলাতলায় পাঠিয়ে।"

মহাকিশোর ভোঁদা শ্বমেধ যজ্ঞ বন্ধ করায় তাহার কয়েকটি উৎসাহী ভক্ত তাহার প্রতি বিরূপ হইয়াছিল, মটরু প্রভৃতি তাহার কয়েকটি বিশিষ্ট ভক্ত ইতিমধ্যে শত্রু পক্ষে যোগ দিয়াছিল। মটরু বলিল, "ওর কথা ছেড়ে দাও, ওর কি কোনো মতির স্থিরতা আছে? ভোঁদাদিত্য না আরো কিছু, ওটা গাধাদিত্য!"

শত্রু পক্ষ সমবেত কণ্ঠে জয়ধ্বনি তুলিল, "জয় কুকুর ভক্ত গাধাদিত্যের জয়!"

নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ হইতে ফিরিয়া আসিয়া মহান্ত ভোঁদার স্বভাবের সত্যই পরিবর্তন হইয়াছিল, তাহার 'মোহান্ত' হইয়াছিল। সে বলিল, "আমার কোনো জোর নেই। পয়সা খরচ করে এটাকে করানোই সার হ'ল। বাবা বাড়িতে রাখতে দেবে না, তোমরা এখানে রাখতে দেবে না, এটাকে নিজে শেষ পর্যন্ত কোথায় রাখব জানি না। সে যা হয় হবে, এখন কেবল একটা কথা তোমাদের কাছে আমার বলবার আছে। একদিন তোমরা কেউ কেউ আমাকে শ্বমেধ যজ্ঞ করতে নিষেধ করেছিলে, আমি রাগের মাথায় সেদিন তোমাদের কথা শুনিনি। তার জন্যে আজ আমি অনুতপ্ত। একটা কুকুরের অপরাধে আমি সাতখানা গ্রামের সমস্ত কুকুরকে মারব বলে প্রতিজ্ঞা করে সেদিন ভুল করেছিলুম, অন্যায় করেছিলুম। আমার অবিবেচনার ফলে কতকগুলো নিরীহ নির্দোষ কুকুরের প্রাণ গেছে, কতকগুলো জন্মের মতো খোঁড়া হয়ে গেছে।
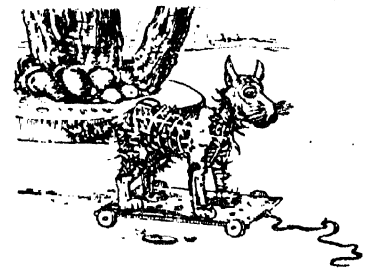
শীতলাতলায় দাঁড়াইয়া আছে

তার জন্য বাইরের কেউ আমাকে কোনো শাস্তি দেয়নি, কিন্তু ঈশ্বর জানেন, আমি নিজের অন্তরের মধ্যে কি শাস্তি দিনরাত ভোগ করছি। বিপদ আমাকে এই শিক্ষা দিয়েছে যে, শত্রুরও জীবনরক্ষা করা জীবমাত্রেরই ধর্ম। পশুরও যে কর্তব্যজ্ঞান আছে, আমার সে কর্তব্যজ্ঞান ছিল না। ক্ষিধের জ্বালায় কে কবে আমার কি ক্ষতি করেছে,

আমি সেজন্য তাদের জাতের ওপর প্রতিহিংসা নিতে গেছলুম, তাকেই পৌরুষ বলে মনে করেছিলুম। আমি মানুষ হয়ে কুকুরের অধম কাজ করেছি, বিশপ কুকুর হয়ে আমাকে মনুষ্যত্ব শিক্ষা দিয়েছে। আমরা যে মূর্তিটা গড়িয়েছি এটা কাঁচা হাতের কাজ, দেখতে ভালো হয়নি, ঠিক চেনা যাচ্ছে না। কিন্তু তাতে কি আসে যায়। যার উদ্দেশ্যে আমরা ভক্তি নিবেদন করতে চাই সে তো একটা উপলক্ষ্য মাত্র। আমাদের আসল উদ্দেশ্য আত্মশুদ্ধি এবং যে কুকুর জাতের মধ্যে বিশপের মতো মহাপ্রাণের জন্ম হয়, সে জাতের কাছে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন। শালগ্রামে যদি নারায়ণের পূজো হ'তে পারে তাহ'লে একেই বা বিশপের প্রতীক বলে ভাবতে পারব না কেন? আজ আমি তোমাদের সকলের কাছে করযোড়ে মিনতি করছি, তোমরা নিজেরা ভাবতে শেখো। আমি বলেছি বলেই, আমাকে ভালোবাসো বলেই, আমার কোনো কথা নির্বিচারে মেনে নিয়ো না। আমি বিপথে গেলে তোমরা আমাকে বাধা—"

তাহার কথা শেষ হইল না। তাহার বিপক্ষ দল তাহার বৈষ্ণবী বিনয়ে উৎসাহিত হইয়া জয়ধ্বনি তুলিল, "জয় কুকুর ভক্ত গাধাদিত্যের জয়, জয়, থোঁতা-মুখ-ভোঁতাদিত্যের জয়।" পরক্ষণেই তাহারা মহাকলরবে বিশপের প্রতিমূর্তিকে গড় গড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। কেহ চীৎকার করিয়া বলিল, "খবরদার।" কেহ বলিল, "আরে আরে, ও কি! দাঁড়া, একটা মীমাংসা হোক।" কেহ কেহ দৈহিক বলপ্রয়োগে বাধা দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহাদের উৎসাহ উদ্দীপনার মূল উৎস তখন শুখাইয়া গিয়াছে। ভোঁদা ইহার পিঠে হাত দিয়া উহার হাত ধরিয়া টানিয়া নিঃশব্দে নিজের ভক্ত দলকে শান্ত করিল, অনেকেই তাহার চোখের দিকে চাহিয়া আর কিছু করিতে সাহস করিল না। সেনাপতি যেখানে পরাজয় মানিয়া লইয়াছে, সেখানে অনুগামী সৈনিকেরা কি করিবে? বিপক্ষ দল গ্রাম ছাড়িয়া শীতলাতলার পথ ধরিল, ভোঁদা সদলে তাহাদের অনুসরণ করিল।

এ সমস্ত চার বৎসর পূর্বের কথা। বিড়মি গ্রামের শীতলাতলায় বিশপের সেই অপরূপ প্রতিমূর্তিটি আজও আছে। সেই দীর্ঘকাল শীতলামাতার গর্দভরূপে পরিচিত হইয়া এবং প্রচুর পরিমাণে সিন্দুর ঘৃতাদি লিপ্ত হইয়া গ্রাম্য নারীদের নিকট পূজা পাইয়াছে। প্রথম প্রথম ভোঁদার ভক্তেরা তাহার নির্দেশমতো প্রতিদিন নিজেদের বাড়ির উচ্ছিষ্ট ও পর্যুসিত কিছু কিছু আহার্য দ্রব্য তাহার সম্মুখে একটা মাটির সরায় রাখিয়া দিয়া যাইত, কেহ কেহ নিজেদের ছেঁড়া জুতাগুলিও তাহাকে মাঝে মাঝে প্রণামী দিত। বিশপের কল্যাণে কয়েকটি বেওয়ারিশ অসহায় কুক্কুর কুক্কুরী কিছুদিন সেইগুলি ভক্ষণ করিয়া আনন্দে জীবিকানির্বাহ করিত বলিয়া প্রকাশ। সম্প্রতি বিশপের প্রতিমূর্তির দেহে সিন্দুর মাখাইবার স্থানাভাব ঘটিয়াছে। গত কয়েকবারের বর্ষায় মূর্তিটির অধিকাংশ জায়গায় মাটি গলিয়া খড় বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, সম্প্রতি সেই খড়গুলি পর্যন্ত পচিয়া খসিয়া পড়িতেছে। যুদ্ধ থামিবার পর ভোঁদা কলিকাতায় কলেজে পড়িতে চলিয়া গিয়াছে, শহরের ছেলেরা অনেকেই শহরে ফিরিয়া গিয়াছে। ভোঁদার গ্রাম্য ভক্তদেরও উৎসাহে ভাঁটা পড়িয়াছে। কেহ উদরান্নের চিন্তায় ব্যস্ত, কেহ সংসার লইয়া মশগুল, অধিকাংশই আর এদিক মাড়ায় না। কেবল বিশপের মৃন্ময় মূর্তির ভাঙা কাঠামোখানা কয়েকটা নড়বড়ে পচা বাঁশ বাঁখাড়ির কংকালে এখানে ওখানে খানিকটা মাটির চাপড়া ও খড়ের পিণ্ড লইয়া একটা কিম্ভূতকিমাকার গোলোকধাঁধা স্বরূপ হইয়া সপ্তগ্রামের এককালীন মুকুটহীন সম্রাট দ্বিতীয় সমুদ্রগুপ্ত ভোঁদাদিত্যের অশ্বমেধ-যজ্ঞের স্মৃতিটুকু জাগাইয়া আজও বিড়মি গ্রামের শীতলাতলায় দাঁড়াইয়া আছে।

(সমাপ্ত)

৯ম অধ্যায়

লের জাঙিয়া ও কোর্তা গায়ে একে-
বারে ভিতরে ঢুকিয়া নিজের সঙ্গীদের
তাকাইয়া এত দুঃখেও অসিত হাসিয়া
লে। উকিল ভোলানাথকে সম্বোধন করিয়া
ল, ত্রেতাযুগে ভগবান রামচন্দ্রের সহচর আর
দের মূর্তির মধ্যে তফাৎ কতখানি আছে
ভাবছি দাদা। নিজের চেহারাখানা নিজের
ভাল করে নজর পড়ছে না—তাই রক্ষে!
নাথবাবু চেষ্টা করিয়াও মুখে হাসি
আনিতে পারিলেন না; কহিলেন—
আরও কত লেখা আছে অসিত,
কে জানে।

অসিত পুনরায় হাসিয়া বলিল—'মেক-আপ'
দেখেই ঠাহর হচ্ছে—দাদা—এ যাত্রা
ভাল। চাই কি ঘানিগাছ পর্যন্ত ঘুরিয়ে
তে পারে!

ভোলানাথ বিরক্ত হইয়া বলিলেন তোমার
সবেতেই হাসিঠাট্টা অসিত! তোমাদের কি
বস্তু তোলা মন! অগত্যা আর জবাব না দিয়া
থামিয়া গেল। অপর সঙ্গীদের দিকে
ইয়া দেখিল—সেদিকের অবস্থাও বিশেষ
রের নয়—অন্তত হাসি ঠাট্টা করিবার মতো
নাই। জেলটির বর্ণনা এক মুহূর্তে তাহারা
করিয়া লইতে পারিল না—সম্মুখেই
টি দোতলা দালান তাহারই পাশে
ঘাসের জমি সেইখানে ১৫।২০ জন
বসিয়াছিল বেশভূষার দিকে তাকাইয়া
ত দূর হইতেই বুঝিতে পারিল—ইহারা
ত্র অর্থাৎ কয়েদী। যে মেটটি সঙ্গে
সিয়াছিল—সে বলিল উঁরা স্বদেশী
দী। আপনাদের ওখানেই থাকতে হবে।
একটু অগ্রসর হইতেই—সেই দলের মধ্য
ত ৩।৪ জন উঠিয়া আসিয়া তাহাদের
র্থনা করিয়া লইল, তারপর আধ ঘণ্টা
না আলাপ পরিচয়ের পালা শেষ হইল।
দুই-তিন সঙ্গে করিয়া লইয়া রাত্রিবাসের
গা দেখাইয়া আনিল। দোতালায় স্বদেশী
দীদের থাকিবার স্থান। তাহাদের চারখানা
ল, দুইটি জাঙিয়া, একখানা গামছা, দুইটি
র্তা ও একটা কম্বলের জাঙিয়া, একখানা
র থালা ও একটা বাটী বুঝাইয়া দেওয়া
হইল। একখানা কম্বল ও কম্বলের জাঙিয়া
শীতকালের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা। বেলা ততক্ষণ
চারটা বাজিয়া গিয়াছে। জেলের সঙ্গীরা বলিল
—খেতে আসুন, খাবার এসে গেছে।

ভোলানাথবাবু প্রশ্ন করিলেন—এখন
খাবার?

—হাঁ, এখনই তো খেতে হয়—পাঁচটার মধ্যে
"লক্-আপ" হ'তে হ'বে যে!

—সে আবার কি?

—সবাইকে ঘরে ঢুকিয়ে তালা বন্ধ করে
রাখবে!

ভোলানাথবাবু কপালে চোখ তুলিয়া
বলিলেন কি সর্বনাশ—সারা রাত এতগুলো
লোককে গরু ভেড়ার মতো ঘরে তালা দিয়ে
রাখবে না কি?

সঙ্গীটি হাসিয়া বলিলেন—তাই নিয়ম যে!

—কিন্তু যদি বিশেষ কারণে বাইরে যেতে
হয়?

—বিশেষ কারণটাও ঘরের মধ্যেই সারতে
হবে—সে ব্যবস্থাও আছে।

ভোলানাথবাবু আর কথাটি কহিলেন না।

অসিত চাহিয়া দেখিল—মুখখানি তাঁহার
নানা ভঙ্গিতে সঙ্কুচিত, প্রসারিত হইয়া এক
অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে।

অসিত আর সেদিকে না তাকাইয়া দুই
চোখ ফিরাইয়া লইল।

থালা বাটী হাতে করিয়া নিচে নামিয়া
আসিয়া দেখে—একজন সেপাই চীৎকার
করিতেছে "এ বাবু লোক ফাইল হো যাইয়ে—
ফাইল হো যাইয়ে"। বাবুরা সুবোধ বালকের
মতো থালা বাটী সম্মুখে করিয়া সারি বাঁধিয়া
বসিয়া পড়িতেছিল।

ভোলানাথবাবু পুনরায় বলিলেন—এ
আবার কি?

অসিত ব্যাপারটি আগেই ধারণা করিয়া
লইয়াছিল—বলিল—পংক্তি ভোজন দাদা—সারি
বেঁধে বসে খেতে বলছে। যথারীতি বসিয়া
পড়িবার পর—অন্ন থালায় পরিবেষণ করা হইতে
লাগিল, অন্নের রূপ বর্ণনা করিতে নাই—মা
লক্ষ্মী মুখ ভার করিতে পারেন। কিন্তু যিনি
পরিবেষণ করিতেছিলেন—তাহার বেশভূষার
দিকে চোখ পড়িতেই পেটের নাড়ী মোচড় দিয়া
উঠিয়া একান্ত অনিচ্ছা ঘোষণা করিতে থাকিল।
কিন্তু এসব অসিত ভাবিল না—তাহারই পাশে
আহারে বসিয়া পরম সাত্ত্বিক ভোলানাথবাবু—
ব্রাহ্মণকুলের নৈকষ্য কুলিনের বংশধর; এদিকে
পরিবেশনকারীর আধ হাত লম্বা এক মুখ
দাড়ি। ভোলানাথের পাতে টক্ করিয়া চাট্টি
ভাত ঢালিয়া দিয়া চলিয়া যাইতেই—তিনি
অসিতের কানের কাছে মুখ লইয়া বলিলেন—
কি জাত অসিত?

অসিত অম্লানবদনে বলিয়া গেল—ব্রাহ্মণ,
দাদা!

চেহারাটা যে কেমন কেমন মনে হ'চ্ছে—
মুখে যে একমুখ দাড়ি!

—বলেন কি দাদা, বামুনের দাড়ি থাকতে
নেই?

—পৈতে আছে তো?

—হাঁ, ঐ যে ওর জামার নীচে এখনও
দেখতে পাচ্ছি, দাদা। কথা বলিতে বলিতে
খানিকটা হলদে গোলা জল পাতের উপরে
পড়িল, আর খানিকটা কুমড়া সিদ্ধ অর্থাৎ ডাল
আর তরকারি। এই রাজভোগ সম্মুখে করিয়া
নাড়িয়া নাড়িয়া ভোলানাথ কয়েকবার ইতস্তত
করিয়া দুই একবার মুখে তুলিয়াই চুপ করিয়া
বসিয়া রহিল, গন্ধেই হইয়া আসিয়াছিল।
অসিত পরম উৎসাহে পর পর কয়েক গ্রাস মুখে
পুরিয়া দিয়া দুই চোয়ালের উপরে রীতিমত
শক্তি প্রয়োগ করিয়া নীচের দিকে ঠেলিয়া দিয়া
—মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল, বেশ
করেছে দাদা! ভোলানাথের চোখ ফাটিয়া জল
আসিতেছিল, চটিয়া বলিলেন—চুপ কর আর
মস্করা করার সময় পেলে না। অসিতের এত
সাধনার ফল উল্টা হইল দেখিয়া সে অনেকখানি
দমিয়া গেল। অগত্যা জলের বাটীতে একটা
চুমুক দিয়া থালার উপর জল ঢালিয়া দিয়া
নিশ্চিন্ত হইল। পাশের ভদ্রলোকটি বলিলেন—
আহা করেন কি—অমনি করলে বাঁচবেন কেমন
করে, এই খেয়েই বাঁচতে হবে যে!

অসিত বলিল—একটু অভ্যাস করে নিতে
দিন্ মশাই—গলাটায় কেমন বাধ বাধ ঠেকচে।

ঘরে ঢুকিতেই জমাদার আসিয়া প্রত্যেককে
গণিতে লাগিল—এক্—দো—তিন—চার.........
বিশ। ঠিক্ হায়। জমাদার বাহির হইবামাত্র
বাহির হইতে লোহার দরজা ঠেলিয়া তালা বন্ধ
করিয়া দিয়া গেল।

বন্ধ হইয়া একখানা কম্বল মেঝের উপরে
পাতিয়া এবং আর একখানা ভাঁজ করিয়া
বালিশের মতো করিয়া লইয়া অসিত সটান
শুইয়া পড়িল। সারাদিনের উত্তেজনায় সে
অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সন্ধ্যা
লাগিতে না লাগিতেই ঘুমাইয়া পড়িল। রাত্রি

অনুমান গোটা বারর সময় তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। পাশ ফিরিয়া চাহিতেই দেখে ভোলানাথ-বাবু গায়ে কম্বল ঢাকা দিয়া গুটি সুটি মারিয়া বিছানার এক পাশে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। সেদিকে দৃষ্টি পড়িতে অসিত আঁৎকাইয়া উঠিয়াছিল আর কি—চন্দ্রালোকে হঠাৎ কোন জন্তুবিশেষের কথা তাহার মনে পড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু ভোলানাথবাবুর চোখের দিকে তাকাইয়া অসিত একেবারে ঘাবড়াইয়া গেল—দেখিল দুই চোখ বাহিয়া ধারার জল গড়াইয়া পড়িতেছে। ঘরে আর কেহ জাগিয়া নাই—ধীরে ধীরে উঠিয়া অসিত জিজ্ঞাসা করিল—কি হয়েছে দাদা—শুয়ে একটু ঘুমুতে চেষ্টা করুন।

—হাঁ এই বিছানার গোষ্ঠীর কেউ কোনদিন শুয়েছিল না কি, যে ঘুমোব? একে ঠাণ্ডা, তায় গায়ে যেন একেবারে বেতের কাঁটার মতো কুটকুট করে বিঁধতে থাকে। তোমাদের যেন কুম্ভকর্ণের নিদ্রা—আমার ভায়া এ পোষাবে না—এবার একেবারে কপালে নির্ঘাৎ মৃত্যু লেখা আছে দেখছি।

অসিত কি বলিয়া প্রবোধ দিবে ভাবিয়া পাইল না। সত্যই তো এই বিছানায় শুইয়া ঘুমাইবার কল্পনা সে ইহার পূর্বে কোনদিন করিতেও পারে নাই এবং এতক্ষণ নেহাৎ ক্লান্তিবশতই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, নইলে ঘুম তাহার চোখের ত্রিসীমানার কাছেও পৌঁছিতে পারিত কিনা সন্দেহ! আর জেলে ঢুকিবার পর এই যে হাসিখুশি ভাবটি এটিও তো তাহার স্বাভাবিক নয়, কিন্তু ইহা ছাড়াও যে উপায় ছিল না, সে ভাঙিয়া পড়িলে তাহারা যে কোথায় গিয়া দাঁড়াইত, সেটা ভাবিবার বিষয় বটে। সকালে আর এক দফা ক্ষুদ আর ভাঙা চাউলের সহিত মিশাইয়া এক অপূর্ব খিচুড়ি প্রস্তুত হইয়া আসিল। ইহার নাম "লপসী"। যেমন রূপ তেমনি গুণ। ইহারই এক এক তাল করিয়া গলাধঃকরণ করাইয়া তাহাদের ঢেঁকি-খানায় লইয়া যাওয়া হইল। দেশসেবকেরা তিনজন করিয়া প্রত্যেক ঢেঁকিতে লাগিয়া গেলেন। ভোলানাথবাবু চোখ কপালে তুলিয়া পুনরায় বলিলেন—এ আবার কি?

—এই তো কাজ।

—কাজ?

—হাঁ সশ্রম কারাদণ্ড যে! প্রত্যেক ঢেঁকিতে আধমণ করিয়া ধান দেওয়া হইল—সারাদিনে ইহারই চাউল প্রস্তুত করিয়া দিতে হইত। সাধারণ কয়েদীদের জন্য বরাদ্দ ছিল—ত্রিশ সের করিয়া—জেল-কর্তৃপক্ষ নেহাৎ সদাশয় বলিয়া এই শিক্ষিত ভদ্রসন্তানদের, মোটে আধ মণ করিয়া ধানের চাউল করিতে দেওয়া হইয়াছে। আহারান্তে দ্বিপ্রহরের পরে অসিতকে একান্তে পাইয়া ভোলানাথবাবু একেবারে কাঁদিয়া বলিলেন—কি হবে অসিত?

অসিত প্রশ্ন করিল—কিসের দাদা?

—এমনি করে তো আমি থাকতে পারবো না ভাই?

—কি করতে চাচ্ছেন তবে?

—তাই তো জিজ্ঞাসা করছি ভাই! অসিতের নিজের মনও বিশেষ ভাল ছিল না—তায় আজ দুইদিন ধরিয়া এই ভীরু ও দুর্বলচিত্ত লোকটিকে লইয়া সে একান্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। এখন তাহার একেবারে বিরক্তির শেষ সীমায় গিয়া পৌঁছিল।

রাগ করিয়া বলিল—স্বদেশ উদ্ধারের বাতিকটা দাদা আপনার না করাই তো উচিত ছিল।

কিন্তু ভোলানাথবাবু রাগ না করিয়া বলিল—আগে কে জানতো ভায়া—সেজন্যে মনে মনে শতবার নাক-কান মলা খাচ্ছি। কিন্তু এখন উপায় কি বল তো—বাঁচতে তো হবে?

অসিত রাগ করিয়া বলিল—মানুষ অত শীগগির মরে না—আর দশজন ভদ্রসন্তান যেমন করে বাঁচে, আপনিও তেমনি করেই বাঁচবেন।

ভোলানাথ যেন পুনরায় কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু অসিত কাঁথিয়া উঠিয়া বলিল—যান, আপনার অত কথার রাতদিন আমি জবাবদিহি করতে পারিনে কাঁদতে হয় একা একা ঘরের কোণে মেয়েমানুষের মতো বসে কাঁদুন। বলিয়া সে গট্ গট্ করিয়া নীচে নামিয়া গেল।

দিন দুয়ের মধ্যে জেলের সমস্ত ব্যবস্থাপত্র দেখিয়া শুনিয়া অসিত একেবারে অবাক হইয়া গেল। ইহা যেন সম্পূর্ণ একটি পৃথক দেশ। ইহার সহিত বাহিরের জগতের কোনপ্রকার সংস্পর্শ নাই। কয়েদীরা এখানের প্রজা—ওয়ার্ডার, জমাদার, জেলার, সুপার—ইহারা সব পর পর পদমর্যাদা হিসাবে কেহ সেপাই, শান্ত্রী, মন্ত্রী, রাজা। সমস্ত হিন্দুশাস্ত্র খুঁজিয়া খুঁজিয়া একটি উপমাই ইহার বাহির করা যাইতে পারে। এই পৃথিবীতে যে সমস্ত লোক ভাল ভাল নামকরা সৎকর্ম করিয়া যখন তাহারই জোরে একটি বিশেষ রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হন (সেখানকার আকাশ, বাতাস, রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া সেপাই-শান্ত্রীর চেহারার বর্ণনা এবং বিশেষ করিয়া বাছিয়া বাছিয়া নর-লোকের ভাল লোকগুলির জন্য কুম্ভীপাক ...... ইত্যাদি ভাল ভাল ব্যবস্থা আছে, যাহা কেনরকেই আমাদের মতো মর্ত্যবাসীদের কাম্য নয়) সেই রাজ্যের যিনি একচ্ছত্র সম্রাট, ধর্মরাজ, তাহারই সহিত সুপার, জেলার ইত্যাদির তুলনা করা যায়। জেলটি যেন সেই বিশেষ ভাল-লোকদের নরলোক হইতে বিদায়ের পরবর্তী আশ্রয়স্থল। বাহিরের মানুষ যেন মরিয়া পুনর্জন্ম লাভ করিয়া জেলে আসিয়া পড়িয়াছে। বাহিরে যাহাদের সম্মানের পান হইতে চুণটুকু খসিলে আর রক্ষা থাকে না—এমন লোক এখানে আসিয়া কয়েদী জন্ম ধারণ করিয়া রসুই বামুনের কাজ হইতে মেথরের কর্ম পর্যন্ত করিয়া যায়। ভারতবর্ষের এই জেলগুলির ন্যায় আহারে, বসনে, ভূষণে, মান-মর্যাদায়—এমন একাকার এমন সম-ব্যবস্থার কল্পনা বুঝি কোন দেশের কোন বড় নেতার মাথা দিয়া এখনও বাহির হইয়া পড়ে নাই—ভবিষ্যতে বাহির হইবার আশঙ্কা আছে বলিয়া মনে করিবারও কোন কারণ ঘটে নাই।

এখানে সর্ব ঘটে কয়েদী। কয়েদী রান্না করে, কয়েদী জল তোলে, কয়েদী [illegible]—এমনি এই রাজ্যের যাবতীয় কর্ম ইহাদের দিয়াই করান হয়। এমন কি মেথরের কর্মটিও বাদ যায় না। জেলখানা নাকি সংশোধনাগার, কোন কোন দেশের ব্যবস্থাও নাকি সত্যি সত্যি তাই। তর্ক করিয়া বলা যাইতে পারে—আরে সেটা হ'লো শীতপ্রধান দেশের ব্যবস্থা [illegible] এই গরম দেশের নাড়ীতে ও ব্যবস্থা যে একেবারে অচল। আমরা মস্তক নত করিয়া এখনও সুবোধ বালকের মতো 'তথাস্তু' বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য এবং আমরা যে [illegible] তাহা যে কোন ইউরোপীয় [illegible] এই জেলখানাগুলি একবার [illegible] যান, তিনিই এ সম্বন্ধে [illegible] পারিবেন না।

একদিন এক ভদ্রলোক জেল অফিস হইতে বলিয়া কহিয়া একখানা জেল [illegible] লইয়া আসিলেন। ইহারই [illegible] খানিকটা পড়িয়া অসিত [illegible] হইয়া গেল। প্রতি কয়েদীর জন্য [illegible] ছটাক চাউল, দুই ছটাক ডাউল, [illegible] তরকারী।

পাশের ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিল—এতো সব চাল, ডাল যায় কোথায় দাদা? [illegible] ভাত, ডাল, তরকারীর তো প্রচুর বরাদ্দ দেখতে পাচ্ছি; কিন্তু আমরা যা পাই, সে [illegible] মোটেই—

ভদ্রলোকটি বাধা দিয়া বলিলেন—আহা, সেটা আর বুঝছেন না—সুপার আছেন—জেলার আছেন—ডাক্তার আছেন—এঁরা কি সব অমনি অমনি খাটে? অসিত আশ্চর্য হইয়া গেল। ভদ্রলোক বলে কি? সুপার নাকি অতি সজ্জন ব্যক্তি—জেলার ভদ্রলোক জাতিতে ব্রাহ্মণ—চাকুরীর খাতিরে, বৈদেশিক ধড়াচূড়া পরিলে কি হইবে—তবুও টিকি আর তুলসী মালা ছাড়েন নাই—তিলকের ঘটাটাও তদনুরূপ—একেবারে পরম বৈষ্ণব। ইহাদেরই এমনি কর্ম! ভদ্রলোকটি পুনরায় বলিলেন—মাইনেটাতে আর কি হয় দাদা—এইটেই যে আসল।

ইতিমধ্যে একদিন জমাদার আসিয়া কি কারণে যেন ভোলানাথবাবুকে অফিসে ডাকিয়া লইয়া গেল। তিনি ফিরিয়া আসিয়া ডাকিয়া

ণ যাহা বর্ণনা করিলেন, সেটা ঠিক মত ইই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। এমনি য়া আরও দিন তিনেক পরে আবার তাঁহার সে ডাক পড়িল, কিন্তু সেদিন সেই সকাল তে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাটিয়া গেল---আর লানাথবাবুকে ফিরিয়া আসিতে দেখা গেল পরের দিন প্রকাশ পাইল, তিনি "বণ্ড" খয়া দিয়া অর্থাৎ জীবন থাকিতে আর এমন কর্ম করিবেন না---প্রতিজ্ঞা করিয়া খালাস য়া বাঁচিয়াছেন। অন্যান্য ভদ্রলোকেরা পর চোখে চোখে কি যেন ইসারা করিতে-লেন। রাগে, দুঃখে ও লজ্জায় অসিতের বারে মাটির সহিত মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা তেছিল। ভোলানাথবাবু যে তাহারই কর্মী, তাঁহার প্রতিই বা ইঁহারা ইহার পর ধারণা করিবেন---কে জানে?

১০ম অধ্যায়

নূতন আবেষ্টনীর মধ্যে, কয়েকদিন নকটা উত্তেজনায় অসিতের দিন একরকম য়া কাটিয়া গেল। আজ বিকালবেলা সে এক ন তাহাদের দোতালা "ওয়ার্ডের" জানালার র দাঁড়াইয়া দূরে আকাশের দিকে তাকাইয়া ল। নীল আকাশের গায়ে সাদা সাদা ছিন্ন ঘর টুকরা ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, সেইদিকে চোখ মেলিয়া এই অপূর্ব শোভার মধ্যে তার চিত্ত যে কতক্ষণ এমনি করিয়া একেবারে য়া গিয়াছিল, তাহা সে নিজেই ঠিক পায় । ক্রমে ক্রমে দৃষ্টি তাহার নীচের দিকে য়া আসিল। দূরে হয়তো একখানা গ্রাম শ সরু রেখার মত দেখা যাইতেছে---তাহারই মুখে খানিকটা পাতলা কুয়াশা গ্রামখানিকে রও অস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। সম্মুখের টির উপর দিয়া এক ঝাঁক সাদা সাদা বক ড়য়া গেল---দূরে একটা মহিষ ও গোটা য়েক গরু চরিয়া বেড়াইতেছিল। মাঠের ভিতর টি গাছের তলায় কয়েকজন রাখাল ছেলে সুয়া আছে বলিয়া মনে হইতেছে। আরও কটু কাছে হয়ত ওটা তেঁতুল গাছ, তারপরে টা তিন চার আমগাছ। তারই পাশে ছোট একটা গাছে অজস্র সাদা সাদা ফুল ফুটিয়া রিয়া আছে। মটরশাকে সারা মাঠ ঢাকিয়া লিয়াছে---মনে হইতেছে, কে যেন সমস্ত ন্তরখানির উপর সবুজ রং লেপিয়া একাকার রিয়া দিয়াছে। তাহারই মাঝে মাঝে রাই-রিষার-ফুলে অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। ইদিকে চাহিয়া অসিতের মনের ভিতর হু হু রিয়া উঠিল, হঠাৎ বাড়ির কথা মনে পড়িয়া ল। মা তাহার কি করিতেছেন এখন? এই কালবেলা হয়তো সমস্ত গৃহকর্ম সারিয়া ধি গাইয়ের ছোট বাছুরটার গলা চুলকাইয়া দের করিতেছেন। বুধি হয়তো চোখ বুজিয়া দাঁড়াইয়া জাবর কাটিতেছে। মায়ের পাশে হয়তো বসিয়া আছে কল্যাণী। কথাটি ভাবিতেই অসিতের মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা মধুর ব্যথা টন টন করিয়া বাজিতে লাগিল। তাহার নিজের অন্তরের দিকে তাকাইয়া সে যেন দেখিতে পাইল, সেখানে একটা তীব্র কামনা তীব্র আকাঙ্ক্ষা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। নব যৌবনের এই কামনায় তাহার সারা দেহ এক অপূর্ব উন্মাদনায় ভরিয়া উঠিল। কিন্তু হঠাৎ সকল চিন্তা ছাপাইয়া তাহার মনে জাগিয়া উঠিল---মা তাহার এই সংবাদে একেবারে মুষড়াইয়া পড়েন নাই তো---নিয়মমত স্নানাহার করিতেছেন তো? না না, মা তাহার কাঁদিয়া কাঁদিয়া দুই চোখ রাঙা করিয়া ফেলিয়াছেন---স্নানাহার ত্যাগ করিয়াছেন---এ যে সে দিব্য দৃষ্টিতে দেখিতে পাইতেছে। দুই চোখ ছাপাইয়া তাহার অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সিঁড়ির দিকে শব্দ হইতেই সে গামছা দিয়া দুই চোখ ভাল করিয়া মুছিয়া ফেলিল। কেহ দেখিলে কি মনে করিবে! ভোলানাথ কি শত্রুতাই না করিয়া গিয়াছে। একটু নির্জনে বসিয়া ভাবিতে বসিলে হয় তো আর সকলে আবার কত কি খারাপ ধারণা করিয়া বসিবে। "অসিত বাবু খেতে চলুন---খাবার এসে গেছে যে।" "চলুন, যাচ্ছি"---বলিয়া অসিত থালাবাটি হাতে করিয়া নীচে নামিয়া আসিল।

শেষ রাত্রির দিকে জাগিয়া উঠিয়াও তাহার মায়ের কথাই মনে হইল। কিন্তু আবার ভাবিল মা তো তাহার যে সে মা নয়---যে মা শৈশব হইতে তাহাকে স্বাধীনতার কথা শুনাইয়াছেন---অসিতের এই স্বাদেশিকতার সকল উৎসের মূলে যিনি---সেই মাকে সে আর দশজন বাঙালী ঘরের মায়ের মতো দুর্বল ভাবিয়া ছোট করিয়া দেখিবে কি করিয়া? কথাটা ভাবিয়া অসিত অনেকখানি উৎফুল্ল হইয়া উঠিল---মন গেল লঘু হইয়া---সে শুইয়া শুইয়া গুণ্ গুণ্ করিয়া গাহিতে লাগিল---

---"এসো কে কেঁদেছো নীরবে।
মায়ের মুখপানে চেয়ে---এস যে মরিতে পারিবে
নিজেরে ভাবিয়া অক্ষম দুর্বল
বাড়ায়েছ মায়ের যাতনা কেবল
যার মাতৃকণ্ঠে বাজিছে শৃঙ্খল
দুর্বল সবল, সে কি ভাবিবে।"

এই স্বদেশী দলে সর্বপ্রথমেই এক ব্যক্তি অসিতের নজরে পড়িয়াছিল, ইঁহার নাম মধুকর দত্ত। ইনি লম্বায় যাকে বলে পুরা পাঁচ হাত তাহাই হইবেন। হাতপাগুলি যেন শরীর অনুপাতে অতিরিক্ত দীর্ঘ---মাথায় লম্বা লম্বা চুল কাঁধের উপরে নামিয়া পড়িয়াছে---মুখে একমুখ দাড়ি---চোখ দুটি যেন সদাসর্বদা জ্বলিতে থাকে---সেদিকে অধিকক্ষণ তাকাইয়া থাকা যায় না। তিনি বড় একটা কাহারও সহিত মিশিতেন না---নিজের বিছানায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। তাঁহার এই আকৃতি ও প্রকৃতি যেন অন্য সকল হইতে তাঁহাকে অনেকখানি পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল। তাই অসিতও এই কয়দিন তাঁহার সহিত বড় একটা মিশিবার সুযোগ পায় নাই। সেদিন একটি ঘটনায় এই লোকটির উপরে অসিতের শ্রদ্ধায় সারা অন্তঃকরণ ভরিয়া উঠিল---শুধু তো দেহই নয়---তাঁহার মনের বলের পরিচয় পাইয়া সে অবাক্ হইয়া গেল। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জেল পরিদর্শন করিতে আসিবেন---তাই সকাল হইতে সারা জেলে সেদিন সাজ সাজ রব---কোথাও একটুকরা আবর্জনা পড়িয়া আছে কিনা, সেদিকে খরদৃষ্টি রাখিয়া জমাদার, সেপাই সর্দারী করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব যখন সুপার, জেলার প্রভৃতি পারিষদ সহ তাহাদের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন---তখন মধুকর গেলেন আগাইয়া। তাঁহার বক্তব্য ছিল "জেলের কাজ স্বদেশী কয়েদীরা করিবে না" কিন্তু তিনি কথা কহিতে আরম্ভ করিবার পূর্বেই হাবিলদার উপদেশ দিল---সাহেবকে সেলাম দেও। মধুকর তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া নিজের বক্তব্য বলিয়া যাইতেছিলেন---হাবিলদার পুনরায় তাঁহাকে বাধা দিল কিন্তু তিনি একবার মাত্র তাহার দিকে ভ্রূকুটি করিয়াই পুনরায় নিজের কথা আরম্ভ করিলেন। অসিত তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়াছিল---দেখিল তাঁহার দুইচোখ ইতিমধ্যেই একেবারে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু পুনরায় হাবিলদার তাঁহার কথায় বাধা দিতেই---তিনি একেবারে সিংহের মত গর্জিয়া উঠিয়া বলিলেন---চোপ্!---সেই গর্জন যেন সমস্ত জেলখানা কাঁপাইয়া ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিতে লাগিল।

কয়েক মুহূর্তে ম্যাজিস্ট্রেট, সুপার, জেলার কাহারও মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির হইল না। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সত্যিকারের সাহেব। এক মুহূর্তে তাঁহার চোখ মুখ একেবারে রাঙা হইয়া উঠিল। কিন্তু সামলাইয়া লইয়া মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া বলিলেন---"ও বেচারার দোষ কি? আমার সরকারী মর্যাদাটাতো তোমাকে দিতে হবে।"

মধুকরও অনর্গল শুদ্ধ উচ্চারণে ইংরাজীতে বলিয়া গেলেন---"কিন্তু একজন ভদ্রলোকের যাহা প্রাপ্য তাহা তোমাকে দিয়াছি---তার বেশী তোমার প্রাপ্য নয়।"

ম্যাজিস্ট্রেট পুনরায় হাসিয়া বলিলেন---"কিন্তু বৃটিশ গভর্নমেণ্ট যে আমাকে একজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট করেছেন, তা অস্বীকার করছ কেমন করে?"

মধুকর অম্লান বদনে জবাব দিলেন---"তোমার গভর্নমেণ্টকে আমি মানিনে"---

ম্যাজিস্ট্রেট হইতে স্বদেশী কয়েদীরা

পর্যন্ত এই কথায় একেবারে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেল।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব পুনরায় বলিলেন,—"তুমি বল্‌ছো কি পাগলের মত। তোমাদের বড় বড় নেতার মুখ দিয়েও তো আজ পর্যন্ত এমন কথা শোনা যায়নি।"

মধুকর জবাব দিলেন—"অন্যের কথা জানিনে, আমার কথা তোমাকে বলেছি—এইমাত্র।'"

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব অনেকখানি উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, বলিলেন,—"তোমার কিন্তু মতিগতি সত্যি ভাল নয়। আমি এ নিয়ে কিছু করতে চাইনে, কিন্তু অন্য কোন ম্যাজিস্ট্রেট হ'লে ব্যাপারটা এখানেই শেষ হোত না, ভবিষ্যতে সাবধান হ'য়ো।" বলিয়াই তিনি বড় বড় পা ফেলিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেলেন।

মধুকর সেখানেই মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন—তাঁহার ঠোঁটে মুখে ব্যঙ্গের হাসি খেলিয়া গেল, দুই চোখ তেমনি ধ্বক ধ্বক করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

দিন দুই পরের কথা। আজও অসিত তাহার বিছানার কাছের জানালাটির ধারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। আজিও সেদিনের মতই নিজেদের বাড়ির কথা—মায়ের কথা ভাবিয়া মন তাহার বারে বারে ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল। এমন সময় হঠাৎ কাহার স্পর্শ পাইয়া সে চম্‌কাইয়া উঠিল—ফিরিয়া দেখে মধুকর আসিয়া তাঁহারই পাশে দাঁড়াইয়া আছেন।

অসিত আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল—"দাদা আপনি!"

মধুকর হাসিয়া জবাব দিলেন—"হ্যাঁ ভাই! এমন একলাটি চুপ করে দাঁড়িয়ে কেন? বাড়ির জন্য মন কেমন কচ্ছে?"

অসিত তাড়াতাড়ি যেন কি বলিয়া প্রতিবাদ করিতে গেল কিন্তু তিনি পুনরায় তাহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—"না না ভাই মন তোমার ভাল নেই, আমি বুঝতে পেরেছি—ছেলেমানুষ তো! বাড়িতে কে কে আছেন অসিত? মা আছেন তো?" অসিতের দ্বিধা ও সঙ্কোচ অনেকটা কাটিয়া গেল—বলিল—"হ্যাঁ, মা আছেন দাদা!"

—"আর কে কে আছেন?"

"বাড়িতে তো আর কেউ নেই—দাদা আছেন কল্‌কাতায় চাকুরী করেন।"

মধুকর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—মা যার আছে তার সব আছে—মার জন্যে যদি চোখের জল না আসে তো কার জন্যে আস্‌বে ভাই! মা আমার কতকাল ছেড়ে গেছেন, কিন্তু এখনও প্রতি দিনরাত্রি তাঁরই জন্যে দুই চোখ জলে ভেসে যায় ভাই। মাকে কি এত সহজে ভোলা যায় রে?

সহানুভূতির স্পর্শ পাইয়া অসিতের দুই চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া কয়েক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। মধুকর তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিয়া বলিলেন—"দেশের কাজে দরকার হ'লে আবার জেলে আস্‌বো—হাসি-মুখে প্রাণ দেবো—কিন্তু তাই বলে মাকে কখনও ভুলবো না অসিত।

ঘরে এই সময়টাতে কেহ থাকিতনা—সকলেই বাহিরের আঙিনাটুকুতে ঘাসের উপর বসিয়া বসিয়া গল্প গুজব করিত, অসিত পরম উৎসাহে বলিয়া উঠিল—নিশ্চয় ভুলবো না। আর আমার মাকে তো আপনি জানেন না দাদা—মা আমার ছোটবেলায় মুখে মুখে রাণা প্রতাপের গল্প করতেন, সিপাহী বিদ্রোহের কথা বলতেন, হেমচন্দ্রের কবিতা, পলাশী যুদ্ধের কবিতা এ সব তাঁর মুখে শুনে শুনেই আমি মুখস্থ করে ফেলেছি। খুব লেখাপড়া জানেন তিনি। মা আমার যেন এ কালের মেয়ে নন। আমার দাদামশায় সিপাহী যুদ্ধের সময় ইংরেজদের হাতে মীরাটে বন্দী হন্—মার বয়স তখন মোটে এক বৎসর—তাঁকে কোলে নিয়ে দাদামশায় পালিয়ে আসেন। মার ছোটকাকু বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে বনে বনে বহুদিন ঘুরে—পরে গোরা সৈন্যের গুলিতে মারা যান। মা তার ছোট্ট অসিকে রোজ শেষ রাত্রে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে এই সব গল্প করতেন। সব সময় ভাবতাম কবে আমি তাঁর মত ঘোড়ায় চড়ে, কাঁধে বন্দুক ঝুলিয়ে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াব!

মধুকর মুগ্ধ দৃষ্টিতে অসিতের দিকে তাকাইয়া তন্ময় হইয়া শুনিতেছিলেন, দুই চোখ তাঁহার খুশীতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। অসিত চুপ করিলে পর বলিলেন, "মা তোমাকে অসি বলে ডাকেন বুঝি?" অসিত ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, "হ্যাঁ।" —"সত্যিই তুমি অসি—একেবারে মুক্ত অসি—খাপখোলা তলোয়ার—তোমাকে আমার সত্যিই ভাল লাগে ভাই।"

অসিত লজ্জিত হইয়া বলিল—আপনি বড় কিনা তাই সকলকে বড় করে দেখেন। ইঃ, আপনার সেদিনকার কি মূর্তি! সেদিনকার কথা আমি কোনদিন ভুল্‌তে পারবো না দাদা। আর কি কারু সাধ্যি ছিল—ম্যাজিস্ট্রেট্ সাহেবকে এত বড় কথা বলে!"

মধুকর তাহাকে পূর্ব কথার সূত্র ধরিয়া বলিলেন—"সত্যি তোমাকে আমার ভাল লাগে অসি—আমি মানুষ খুঁজি—মানুষ চিনিও বোধ হয়। তোমার চোখে যে আলো দেখ্‌ছি ভাই—এখানে আর একটা লোকের চোখেও সে আলো দেখ্‌তে পাই নি। ঐ যে নীচে যারা দল বেঁধে বসে গল্প করছে ওর ভিতরে তোমাদের ভোলানাথের মতো কত যে ভোলানাথ লুকিয়ে আছে, সে কথা তো জান না ভাই। এদের সখ করে হুজুগে মেতে জেলে আসা।" অসিত অত্যন্ত কুণ্ঠিতস্বরে বলিল—আপনি আমাকে উপদেশ দিবেন—আমাকে সত্যিকারের ৭ দেখিয়ে দেবেন দাদা!

মধুকর তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন নিশ্চয় ভাই! আমি নিজে যা যখন বুঝ্‌বো : তোমাকে বল্‌বো—দুইজনে একসঙ্গে ব ভাব্‌বো।

অত্যল্পকাল মধ্যে দুইজনের ভাব যত অন্তরঙ্গতায় গিয়া পেঁৗছিতে লাগিল—তত মধুকরের সমস্ত পরিচয় জানিয়া—অসিতে আর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। এই বয় তিনি ইংলণ্ডে গিয়াছেন, জার্মানীতে, ফ্রা গিয়াছেন। তাঁহার বিদ্যার পরিধিও অসি করিয়া উঠিতে পারিল না। জার্মান ভাষা ফরা ভাষা এবং ভারতীয় ৩।৪টা ভাষায় রীতিম তাঁহার দখল আছে। নিজের এত যে বিদ এত যে অভিজ্ঞতা তাহাও কোনদিন যে ই উপার্জনের জন্য নিয়োজিত হইবে তাহাও ম করিবার কোনই কারণ নাই। এই বয়স পর্য তিনি বিবাহ করেন নাই—কখনও যে করিবে সে কল্পনাও নাই। এমন অদ্ভুত লোকে সংস্পর্শে আসা তো দূরের কথা অসিত ম মনে কোনদিন কল্পনাও করিতে পারে নাই

সেদিন পড়ন্ত বেলায় জেলের একটি নির্জ কোণ বাছিয়া লইয়া অসিত আর মধুকর কথ কহিতেছিলেন।

অসিত এক সময়ে প্রশ্ন করিয়া বসিল—আচ্ছা দাদা—আমাদের এই আন্দোলনে কি সত্যি সত্যি বঙ্গ ভঙ্গ রহিত হবে?

মধুকর অম্লানবদনে জবাব দিলেন—যা খুসী হোক্ ভাই। ও নিয়ে মনে কোন আগ্রহ নেই।

অসিত আশ্চর্য হইয়া কহিল—তার মানে?

—মানে অতি সহজ—বঙ্গ ভঙ্গই হোক আর নাই হোক্, তাতে দেশের স্বাধীনতা এক ইঞ্চি এগোবেও না পিছোবেও না।

—কিন্তু এই বিভাগে বাঙলা দেশটা যে একেবারে শক্তিহীন হয়ে পড়বে দাদা—এর সংস্কৃতি এর সম্মিলিত শক্তি—

মধুকর তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিলেন—সে সব তো জানি ভাই কিন্তু বলতে পার তাতে দেশের এই যে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে শুকিয়ে মরছে—লক্ষ লক্ষ লোক অর্ধাহারে থাক্‌চে এর কোন প্রতিকার এতে হবে? অশিক্ষার অন্ধকারে যে সারা দেশটা একেবারে ডুবে গেল এর কোন প্রতিকার হবে? নিজেদের দেশে এই দাসের জীবন বহন করে চরম অপমানকে মাথায় করে নিয়ে—ত্রিশ কোটি মানুষ দিনে দিনে অমানুষ হ'য়ে উঠ্‌ছে—এর কোন প্রতিকার এ'তে হবে?

অসিত কোন জবাব দিল না।

মধুকর পুনরায় বলিতে লাগিলেন—না সত্যি হ'বে না ভাই—কোন আন্দোলনকে ছোট করে দেখবার ইচ্ছা আমার নেই, কিন্তু যাঁরা

কর্ণধার তাঁদের মুখ দিয়েও তো কোনদিন সব অনাহারে অর্ধাহারে মৃতকল্প কদের জন্যে একটি দিনের তরে একটি ও বেরোয় নি।

অসিত বলিল—কিন্তু এই যদি আপনার ণা—তবে নিজে কেন এরই জন্যে জেল তে এসেছেন?

মধুকর হাসিয়া বলিলেন—কেন এসেছি, বে?

আসলে আন্দোলন আমি ভালবাসি—এতে ষের মনে একটু একটু করে সাহস এনে , পরে সেই সাহস ঘুরিয়ে নিয়ে হয়তো ত্তের কোন কাজেও লাগান যেতে পারে। র একটি কাজ কি হয় জান? এতে ষ চেনা যায়, দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের ধান না মিলুক এমন দুই চারজন লোক ওয়া যায়—যারা সত্যি সত্যি দেশের জন্যে দে—সত্যিকারের সাহস যাঁদের মনে আছে। নি করে জেলে না এলে আজ কি মাদের মত দুই চারজন সাহসী প্রাণের ধান পেতাম ভাই!

অসিত পুনরায় তর্ক তুলিল—আচ্ছা যাঁরা আজ দেশের নেতা তাঁরা কি তো করেই দেশের এই অন্নহীন, বস্ত্রহীন তাদের খবর জানেন না? এ হয় তো পনার মিথ্যে সন্দেহ।

মধুকর ম্লান হাসিয়া বলিলেন—মিথ্যে নয় ই সত্যি করে যদি কেউ এ দেখতে পায়— ত্যি করে যদি অনুভব করতে পারে—সে গল হ'য়ে যাবে।

—আপনি কি এমনি করেই দেখতে পেয়েছেন দাদা?

—হাঁ দেখেছি ভাই—শুধু একটা নয়—দুটো নয়—কত ঘটনায় যে আমাকে কত দুঃখের সাক্ষী হ'তে হ'য়েছে অসি—তার সব কথা তোমাকে মুখ ফুটে বলতে পারবো না—বুঝাতেও পারবো না। একটা গল্প শোন—বয়স তখন আমার চৌদ্দ-পনের—আমি পিসিমার বাড়ি থেকে লেখাপড়া করি। পিসিমার বাড়ির কাছে এক ঘর মুসলমান চাষীর বাস—তার নাম ছিল করিম সেখ। বড় গরীব, এত গরীব যে দুবেলা ভাল করে খাবার চাল তাদের কোন-দিনই জুটতো না। নিজের হাল বলদ ছিল না, এদিকে সংসারে তার ছোট ছোট দুইটি ছেলে ও স্ত্রী। তবু পরের বাড়ি খেটে খুটে এমনি করে কোন রকমে দিন তাদের চলে যাচ্ছিল। আমাদের বাড়িতে করিমের স্ত্রী মাঝে মাঝে এসে পিসিমার কাছ থেকে চালটা ক্ষুদটা চেয়ে নিয়ে যেতো। কিন্তু রোজ রোজ কে কাকে দেয় বল? পিসিমা দুই একদিন হয়তো রাগ করতেন—বউটি উঠানের এক পাশে দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলতো। তারপর হয়তো পিসিমা আবার তাকে ডেকে আঁচলে তার চাট্টি চাল বা ক্ষুদ ঢেলে দিতেন বলতেন এমনি করে কি যখন তখন চাইলে দেওয়া যায়? আমি কতদিন আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখেছি তবু বউটির দুই চোখ যেন আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠতো—আমাদের উঠান হ'তে নেমেই একেবারে জোর পায়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে ছুটে যেত। কিন্তু সেবার দেশের বড় দুর্দিন—ধান ভাল হ'লো না—চালের দাম হু হু করে বেড়ে গেল। এদিকে করিমের মজুরী গেল কমে—তাও রোজ কাজ জুটতো না। দিনের পর দিন চলতে লাগলো উপবাস। কিন্তু এমনি করে কয়দিন চলতে পারে—মানুষ তো? কচি ছেলে দুটি কেঁদে কেটে অনর্থ বাধিয়ে তুলতো। মা তাদের সারাটা দিন বাড়ি বাড়ি ঘুরে নিরাশ হ'য়ে শুধু হাতে ফিরে আসতো—করিম চাষী পাড়ায়, ভদ্র পাড়ায় ঘুরে কাজ পেত না। কোনদিন সন্ধ্যা বেলায় দুমুঠো ক্ষুদের জাউ অনেকখানি জলে গুলে নুন দিয়ে ছেলে দুটোকে খেতে দিত—ছেলে দুটো তাই পরমানন্দে খেয়ে খানিকটা সময়ের জন্যে চুপ করে থাকতো। পিতামাতা তাদের পরস্পর পরস্পরের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে থাকতো। কিন্তু দিন আর কাটে না। সেদিন তিনদিন স্বামী স্ত্রীর আহার জোটে নাই। আমি বাইরের ঘরে বসেছিলাম—পিসিমাকে করিমের স্ত্রীকে বলতে শুনলাম—এই চাট্টি মুড়ি নে বউ—কাল আমি আর দিতে পারবো না—আর আসিস নে। আমার মনে কথাটা খচ খচ করে বিঁধতে লাগলো। সেদিন তিনদিন অনাহারের পরে করিম যেন কোথা হ'তে সের দুই চাল এনে স্ত্রীকে দিয়ে বল্লে—ভাত তুলে দে বউ—আমি ডোবা থেকে চাট্টি মাছ ধরে আনি। ঘণ্টাখানেক পরে করিম ফিরে এসে দেখে বউ তার দুই চোখের জলে বসে বসে ভাসছে, ছেলে দুটি ভাত ভাত করে চীৎকার শুরু করে দিয়েছে। করিম জিজ্ঞাসা করে জানলো যে সে বাড়ি থেকে বেরুবার পরই প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েতের চৌকিদার এসে ট্যাক্সের জন্যে তার চাল দুই সের ক্রোক করে নিয়ে চলে গেছে। সংবাদ শুনে করিম কয়েক মুহূর্তে নাকি স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল—তিন-দিন অনাহার—তারপরে এই ঘটনা—তাকে একেবারে পাগল করে দিল। সে কি ভেবে দাওয়ার উপর যে চকচকে দাওখানা ছিল তাই দিয়ে বউয়ের গলায় গোটা দুই কোপ বসিয়ে দিল—বউটা চীৎকার করে ঢলে মাটিতে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ছেলে দুটিও তার এক এক কোপে নিঃশব্দে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। তারপর করিম এক গাছা দড়ি নিয়ে ছুটে গেল আম বাগানে। সেখানে গিয়ে আম গাছের ডালে গলায় ফাঁসী দিয়ে—তবে বেচারা সকল জ্বালা জুড়াল। খবর শুনে আমরা তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম দেখতে। দেখি ছেলে দুইটি উঠানের উপরে সারা গায়ে রক্ত মেখে যেন চুপ করে ঘুমিয়ে আছে। মার দেহে তখনও প্রাণ ছিল চোখের তারা নড়ে নড়ে উঠছিলো। একটু পরেই সব শেষ হ'য়ে গেল। মধুকর চুপ করিলেন।

অসিত চাহিয়া দেখিল তাঁহার দুই চোখ দিয়া অবিরল ধারে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে—অসিতের কণ্ঠও রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল—দুইজন অনেকক্ষণ তেমনি চুপ করিয়া বসিয়া রহিল

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মধুকরই প্রথমে কথা কহিলেন—বলিলেন, জীবনে কোনোদিনই আর এ ঘটনাটি ভুলতে পারলাম না ভাই। সেদিন সারাদিন রাত্রি ধরে আমি কেঁদেছিলাম। তারপর বহুদিন শুধু মনে মনে এই প্রশ্নই করেছি। কেন এমন হয়? কেন মানুষ মোটে তার মুখের দুমুঠো অন্নের সংস্থানও করে উঠতে পারে না? তখন বয়স ছিল অল্প—বুদ্ধি দিয়ে এর মীমাংসায় আসতে পারতাম না। আজ যত বুঝি ততই মন বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে। আর শুধু এই ঘটনাই তো নয়—এমনি কত ঘটনা যে নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছি—মানুষকে পশুর মত বিনা চিকিৎসায় ক্রমাগত দিনের পর দিন রোগে ভুগে মরতে দেখেছি—পিতামাতা চোখের উপরে নিজেদের সন্তানকে ক্রমাগত দিনের পর দিন বিনা চিকিৎসায় একটু একটু করে মরতে দেখে ভগবানের কাছে তারই মৃত্যু কামনা করেছে—সে সব শুনলে তুমি ব্যথা পাবে ভাই! এই সব দেখে শুধু ভেবেছি—মানুষ যদি এমনি করে পশুর মত মরে তাহ'লে তার মানুষ হ'য়ে জন্মানোর সার্থকতা কি? বলদ হাল টানে কিন্তু পেট ভরে খেতে পায়—মানুষ কাজ পায় না—খেতে পায় না—বিধাতার একি পরিহাস ভাই! শুধু এই জন্যেই আমি ভারতবর্ষের বাইরে অনেক দেশ ঘুরেছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন পথ খুঁজে পাই নাই। আর আমি শুধু একাই নই অসি— কলকাতায় যদি কখনও যাও তোমার সঙ্গে আমি অনেকের পরিচয় করিয়ে দেবো। তারা শুধু এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করে দিয়েছেন।

অসিত বলিল, কিন্তু চিরটাকাল ধরে শুধু পথ খুঁজে বেড়ালেই তো চলবে না দাদা—পথে চলতে হ'বে যে!

হাঁ চলতে হবে বৈ কি ভাই—আজও ঠিক পথ আমরা পাই নি, তবে পেতে যে বেশী দেরী হবে তাও মনে হ'চ্ছে না। এইটুকুমাত্র বলতে পারি ভাই সে হ'বে পরম দুঃখের পথ—চরম নির্যাতনের পথ। নিজের জীবনকে সংসারের সকল সুখ থেকে সকল ভোগ থেকে বঞ্চিত করে, একেবারে দেশ মাতৃকার সেবায় নিঃশেষ করে দিতে হ'বে। পুরস্কার কিছু

ভাগ্যে মিলবে না—হয়তো কেউ ঘৃণা করবে—কেউ দস্যু বলবে—এমনি কত কি। কিন্তু যে সত্য করে দেশকে ভালবাসে অসিত, এই হবে তার দেশের কাজে 'আত্মসমর্পণ যোগ'—এই তার ধর্ম, এই তার মোক্ষ। যেদিন তোমাকে ডাক দেব, অসি—সেদিন কিন্তু পিছিয়ে যেতে পারবে না ভাই।" অসিতের সারা দেহ ও মন একেবারে আবেগে ভরপুর হইয়া উঠিয়াছিল।

সে বলিয়া উঠিল—না পিছিয়ে যাব ন পথ আপনি দেখাবেন। প্রয়োজন হ জীবন আমার পণ রইলো দাদা।

(ক্রমশ

মুসলিম লীগ সচিবসংঘের অনাচারে ও লীগপন্থীদিগের অত্যাচারে বাঙলায়—পশ্চিম-বঙ্গে ও পূর্ববঙ্গে হিন্দু ও অন্য ধর্মাবলম্বী জাতীয়তাবাদীদিগের দ্বারা বর্তমান অবস্থায় বাঙলা হিন্দু-প্রধান ও মুসলমান প্রধান দুই ভাগে বিভক্ত করিবার সংকল্প যত দৃঢ়তা সহকারে প্রচারিত হইতেছে—মুসলিম লীগের দ্বারা ছলে, বলে, কৌশলে সেই সংকল্প ব্যর্থ করিবার জন্য তত অধিক চেষ্টা আত্মপ্রকাশ করিতেছে। বাঙলার বাহিরে মুসলিম লীগ নেতারা বলিতেছেন—তাঁহারা কিছুতেই বাঙলা বিভাগ সহ্য করিবেন না। সর্বনাশের জন্য পাপাশ্রয়ী কৌরবগণ যেমন বলিয়াছিলেন—"বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্রমেদিনী" পাটনায় গত ২৭শে মে মিস্টার গজনফর আলী খাঁন তেমনই বলিয়াছেন—মুসলিম লীগ যুদ্ধক্ষেত্রের শেষ পরিখা পর্যন্ত বাঙলা ও পাঞ্জাব বিভাগের বিরোধিতায় যুদ্ধ করিবে। তাঁহার এই উক্তি মিস্টার জিন্নার উক্তির প্রতিধ্বনি। আর বাঙলায় মুসলিম লীগ দুই দিকে দুইভাবে সেই চেষ্টা করিতেছেন। "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে" যে আক্রাম খাঁ তাঁহার গৃহসম্মুখস্থ গৃহে হিন্দু প্রতিবেশীকে তাঁহার সমধর্মীদিগের দ্বারা নৃশংসভাবে নিহত হইতে দেখিয়া তাহা নিবারণের আগ্রহমাত্র না দেখাইয়া হিংস্র জন্তুরও অধিক নিষ্ঠুরতার ভাব দেখাইয়াছিলেন, তিনি ভয় দেখাইতেছেন—যাঁহারা বাঙলাকে দুইভাগে বিভক্ত করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে মুসলমানের শবের উপর দিয়া সে কাজ করিতে হইবে। আর বাঙলার দুর্ভিক্ষের জন্য যাঁহার দায়িত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক আর যিনি পূর্ববঙ্গে অত্যাচার সম্বন্ধে বহু ঘৃণ্য মিথ্যা উক্তি করিয়াছেন, সেই সুরাবর্দী-বর্ধমানের আবুল কাশিমের পুত্র হাসিমকে লইয়া কৌশলে কার্যসিদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন; বলিতেছেন—সমগ্র ভারতে হিন্দু ও মুসলমান দুই স্বতন্ত্র জাতি হইলেও বাঙলায় তাহারা এক জাতি—উভয়ে এক সঙ্গে থাকিবে—উভয়ে একযোগে স্বাধীন, সার্বভৌম বাঙলা গঠিত করিবে।

বুঝিতে বিলম্ব হয় না—উভয় দলের উদ্দেশ্য এক—বাঙলাকে অবিভক্ত রাখিয়া মুসলমান-প্রধান পাকিস্তানভুক্ত করিয়া মুসলমানের দ্বারা হিন্দুকে শাসন ও শোষণ। ইহার প্রমাণ—যে দীর্ঘকাল সুরাবর্দী বাঙলায় সচিবসংঘ পরিচালিত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কখন তিনি হিন্দুর সংগত স্বার্থ রক্ষার বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখান নাই। তিনিই বাঙলায় "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস" সরকারী ছুটী ঘোষণা করেন; তিনিই নোয়াখালী, ত্রিপুরায় হিন্দুর প্রতি পৈশাচিক অত্যাচার যথাসম্ভব গোপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।
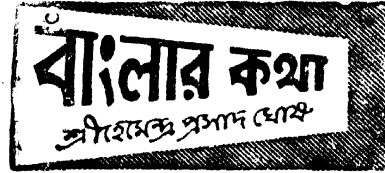
দুর্ভিক্ষে ৩০।৩৫ লক্ষ লোকের মৃত্যুর পাপ যাঁহার মস্তকে এবং কলিকাতায়, ত্রিপুরায় ও নোয়াখালীতে নিহত হিন্দুর রক্তে যাঁহার সচিবত্ব রঞ্জিত—তাঁহার দ্বারা যে মনোভাব পরিবর্তন সম্ভব তাহা মনে করিবার কারণ কোথায়? কাজেই তাঁহার সহিত কোন-রূপ মীমাংসার চেষ্টা একান্ত অযৌক্তিক। যাঁহারা সে আলোচনা করিতেছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা কংগ্রেসের দলভুক্ত বলিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করেন—তাঁহারা কংগ্রেসদ্রোহিতাই করিতেছেন; শিষ্ট সমাজে তাঁহারা রাজনীতিক প্রবঞ্চক, দলদ্রোহী ও ঘৃণ্য বলিয়াই বিবেচিত হইবেন। আয়র্লণ্ডে ডাবলিন বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক কনোলী বলিয়াছেন—যাঁহারা দীর্ঘকাল দেশসেবক বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, সেরূপ কোন কোন আইরিশ প্রকৃত-প্রস্তাবে দেশদ্রোহীর কাজই করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদিগের কথায় তাহাই মনে পড়ে। ইঁহারা কংগ্রেসের গৃহীত প্রস্তাবের বিরোধিতা করিতেছেন—ভণ্ডামিই ইঁহাদিগের সম্বল। ইঁহারা কি আজ ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য পদ ত্যাগ করিয়া পুনরায় নির্বাচনপ্রার্থী হইতে সাহস করিবেন? কংগ্রেস দলভুক্ত হইয়া যে কয়জন বাঙালী হিন্দু সুরাবর্দী প্রভৃতির সহিত মিলনালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা কংগ্রেসের বিরোধিতা করিতেছেন, কিন্তু সুরাবর্দীর দল মিস্টার জিন্নাকে সকল বিষয় জানাইয়াছেন। আর তাহাতেই বুঝিতে পারা যায় আক্রাম খাঁয়ের ভীতিপ্রদর্শন ও সুরাবর্দীর প্রেমাভিনয়—উভয়ই এক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত—দ্বিবিধ ষড়যন্ত্র ব্যতীত আর কিছুই নহে।

বাঙলাই ভারতবর্ষে জাতীয় জাগরণে অগ্রদূত। সেই বাঙলা যদি আজ রাষ্ট্রসঙ্গে যোগ দিয়া তাহার উপযুক্ত স্থান অধিকা করিতে চাহে, তবে তাহা অসংগত হইবে ন পরন্তু সংগতই হইবে। বিভিন্ন ও ভি ভিন্ন রূপে অগ্রসর সম্প্রদায়সমূহের সাহি প্রতিনিধিমূলক স্বায়ত্তশাসনের সামঞ্জস্য সাধ সহজসাধ্য না হইতে পারে; কিন্তু অসম্ভ নহে। আমেরিকা রাষ্ট্রসংঘ গঠনকারীরা তাঁহা-দিগের রচিত শাসনপদ্ধতিতে তাহাই দেখাইয়া-ছেন। বাঙলা কেন রাষ্ট্রসংঘভ্রষ্ট হইয়া স্বতন রাষ্ট্র হইবে? সে প্রস্তাব তাহাকে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করিবার ষড়যন্ত্র ব্যতীত আর কি বলা যায়?

বাঙলায় যে সুরাবর্দী আলোচনা করিতে-ছেন, তিনি ১৬ই আগস্ট (১৯৪৬) খৃঃ অনায়াসে বলিয়াছিলেন, কলিকাতায় হাঙ্গামা প্রশমন হইয়াছে; তখন শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু যে সচিবসংঘের অবসান দাবী করিয়াছিলেন, মিস্টার সুরাবর্দী সেই সচিবসংঘই রক্ষা করিয়াছেন এবং নোয়াখালী-ত্রিপুরার ব্যাপার ঘটিয়েছে—কলিকাতায় আবার অশান্তির উপদ্রব চলিতেছে যখন মুসলীম লীগের গুণ্ডাবাহিনী ত্রিপুরা জিলায় প্রবেশ করিয়াছে, তখন সুরাবর্দী কলিকাতায় (১৬ই অক্টোবর) বলিয়াছিলেন তাঁহার সুব্যবস্থায় অশান্তি নোয়াখালীর সীমা অতিক্রম করিয়া ত্রিপুরায় প্রবেশ করিতে পারিবে না। তাঁহারই পরামর্শে রাণীগঞ্জ মুসলীম লীগের সভাপতি নরহত্যার অভিযোগে দণ্ডিত গুমা খাঁয়ের দণ্ড হ্রাস করা হইয়াছে। এই সুরাবর্দীকে বিহার হইতে মুসলমান আমদানী সম্পর্কে বিহার সরকার মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন তাঁহার কথায় কিরূপে বিশ্বাস স্থাপন করা যায়?

অথচ তিনিই আলোচনা করিতেছেন।

তিনি কি যে কোন মুহূর্তে উক্তি ব যুক্তি অস্বীকার করিয়া বলিতে পারেন না—বঙ্গ-বিভাগ চেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য তিনি মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মুসলীম লীগের স্বার্থসাধনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন?

যে মুসলীম লীগের অনুবর্তীরা "মারকে লেঙ্গে পাকিস্তান" মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সহস্র সহস্র হিন্দুকে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করিয়াছে —নারীহরণ, নারীধর্ষণ প্রভৃতি কার্যের দ্বারা সভ্যতার সর্বনাশ সাধন করিয়াছে, সেই লীগের প্রতিনিধি সুরাবর্দী প্রভৃতির সহিত কিজন্য বাঙলার জাতীয়তাবাদীরা কোনরূপ মীমাংসার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, তাহা বুঝা যায় না।

গত ১৬ই আগস্টের বহ্নি যখন এখনও অনির্বাপিত, তখন শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু যে য়ুরোপীয় বণিক সম্প্রদায়কে বর্তমান সচিবসঙ্ঘের সাহায্যে প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টার অপরাধে অভিযুক্ত করিয়াছিলেন, সেই য়ুরোপীয় বণিক সম্প্রদায়ই কি আজ সুরাবর্দীর দলের প্রস্তাবের পশ্চাতে থাকিয়া কলিকাতাকে স্বতন্ত্র করিবার চেষ্টা করিতেছেন না?

শালবনীতে বিহারী মুসলমান উপনিবেশে যে ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার পরেও কি বাঙলার সুরাবর্দী সচিবসঙ্ঘের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে? সে ঘটনা কাহার প্রশ্রয়ে ঘটা সম্ভব হইতে পারে?

মিস্টার সুরাবর্দী যখন বাঙলাকে পরিকল্পিত ভারতীয় রাষ্ট্রসঙ্ঘ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য কয়জন কংগ্রেসপন্থী প্রভৃতির সহিত আলোচনা করিতেছেন এবং স্বতন্ত্র বাঙলার উন্নতির ও ঐশ্বর্যের অতিরঞ্জিত চিত্র অঙ্কিত করিতেছেন তখনই তিনি পাঞ্জাবী পুলিশ আমদানী করিয়া বাঙলার জাতীয়তাবাদ নষ্ট করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। এই একটি ব্যাপারই তাঁহার স্বরূপ প্রকাশের পক্ষে যথেষ্ট।

দীর্ঘকাল প্রায় অবলিগত ক্ষমতা পরিচালনের সুযোগ পাইয়া তিনি সেই ক্ষমতা সাম্প্রদায়িক অত্যাচারের জন্য ব্যবহার করিয়া আজ সকল দিকে বাঙলার যে দুর্দশার উদ্ভব করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সহিত কোনরূপ সহযোগে যে কেবল বাঙলার জাতীয়তাবাদের সর্বনাশ সাধনই করিবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। তাঁহার কার্যফলে তিনি বাঙলার আস্থার অনুপযুক্ত বলিয়াই লোকের বিশ্বাস জন্মিয়াছে। সে বিশ্বাস দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে বহরমপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের যে অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে দীপনারায়ণ সিংহ মহাশয় সভাপতিরূপে বাঙলার প্রতিনিধিদিগকে বলিয়াছিলেনঃ—

"আপনাদিগের প্রদেশ ভারতে জাতীয়তার জন্ম প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং আজ যে সেই ভাব সমগ্র দেশকে সঞ্জীবিত করিতেছে, তাহা প্রধানত বাঙ্গালীর চেষ্টায়।"

আজ দীর্ঘ ৪০ বৎসর পরে সেই জাতীয়তার জয়ধ্বনিতে ভারতবর্ষের আকাশ বাতাস পরিপূর্ণ। ত্যাগের মূল্যে স্বাধীনতা অর্জন করিতে হয় এ সত্য বাঙলা কখন ভুলে নাই। তাই স্বাধীনতা লাভের জন্য বাঙালীর ত্যাগ অসাধারণ। পথের বিচার আজ করিব না। কিন্তু অচল পথেই বাঙ্গালীর নেতৃত্ব-পরিচয় সপ্রকাশ। আজ যখন ভারতের জাতীয়তার সাধনা সিদ্ধির সম্ভাবনা অদূরবর্তী তখনও যদি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাহার পথ বিঘ্নকণ্টকর কণ্টকিত করিতে তাহার ছল ও কৌশল ব্যবহার করে, তবে—গত প্রায় দুই শত বৎসরের ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিষয় বিবেচনা করিলে তাহাতে বিস্ময়ের কোনই কারণ থাকিতে পারে না। এ দেশকে স্বায়ত্তশাসনভার দিয়া যাইবার মত উদারতার পরিচয় ইংরেজ দিতে পারে না। আজ মনে পড়িতেছে, আয়র্লণ্ডের প্রতি তাহার ব্যবহার। সেই ব্যবহারের ফলেই বুয়র যুদ্ধে যখন ইংরেজের পরাভব ঘটিতেছিল তখন বৃটিশ পার্লামেণ্টে ভিলেরীর নিকট ইংরেজের পরাজয়-বার্তা ঘোষিত হইলে সশইফট, ম্যাকনিল প্রভৃতি আইরিশ সদস্যগণ আনন্দধ্বনি করিয়াছিলেন। তখন ইংরেজ সাংবাদিক স্টেড লিখিয়াছিলেন—সেই আনন্দধ্বনিতে ইংরেজ বুঝিয়াছে, আয়ার্লণ্ডে তাহার কৃতপাপের ফল তাহাকে ভোগ করিতেই হইবে—ঐ আনন্দপ্রকাশ নির্যাতনপিষ্ট আইরিশদিগের পক্ষে একান্তই সঙ্গত ও স্বাভাবিক। এদেশে ইংরেজ দেশবাসীর স্বাধীনতা লাভ প্রয়াস ব্যর্থ করিবার জন্য কত অনাচার করিতে পারে তাহা অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হইলে ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল ক্রোজিয়ার তাঁহার গান্ধীজীর জন্য উদ্দিষ্ট পুস্তকে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তাহার পরিচয় আমরা বাঙলায় বিশেষভাবেই পাইয়াছি।

এদেশে—বিশেষ বাঙলায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্রত্যক্ষভাবে যে কাজ করিতে না পারিতেছে তাহাই তাহার অনুগ্রহপুষ্ট মুসলীম লীগের দ্বারা পরোক্ষভাবে করাইতেছে। বাঙলা বিভক্ত হইলে পশ্চিম বঙ্গ (কলিকাতা পশ্চিম বঙ্গের অবিচ্ছেদ্য অংশ) জাতীয়তাবাদীর প্রাধান্যে পরিচালিত হইলে তাহাতে বৃটিশ বণিকদিগের অসঙ্গত স্বার্থের হানি যে অনিবার্য তাহা তাহারা বুঝে এবং তাহাদিগের সেই মনোভাব অনেক সময় অপ্রকাশও থাকে নাই। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে যখন প্রথম সচিব সঙ্ঘের সম্বন্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব উপস্থাপিত হয় তখন য়ুরোপীয় দলের নেতা অকুণ্ঠভাবেই বলিয়াছিলেন—সচিব সঙ্ঘের নানা ত্রুটির বিষয় য়ুরোপীয় দল অবগত আছেন; কিন্তু তথাপি তাঁহারা সেই সচিব সঙ্ঘের সমর্থন করিতেছেন; কারণ, এই সচিব সঙ্ঘের পতনের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসী সচিবসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাহাই য়ুরোপীয়দিগের অনভিপ্রেত।

য়ুরোপীয়-মুসলিম লীগ ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিবার জন্য বাঙালী জাতীয়তাবাদীদিগকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। অতীতের অভিজ্ঞতা যেমন আমাদিগকে সে কার্যে প্ররোচনা প্রদান করিবে—বর্তমানের প্রয়োজন তেমনই তাহা প্রবল করিবে এবং ভবিষ্যতের আশা আমাদিগের সহায় হইবে।

পশ্চিম বঙ্গ পৃথক করিবার প্রধান কারণ—বাঙলা পাকিস্থানে থাকিয়া দাসত্বের লাঞ্ছনা ভোগ করিতে সম্মত নহে। গত দশ বৎসরের অভিজ্ঞতা সে ব্যর্থ হইতে দিতে পারে না।

সর্বাঙ্গীন সার্বভৌম বাঙলার কথা হইতেছে। তাহা যে লোককে বিভ্রান্ত করিবার কৌশলমাত্র তাহা বলা বাহুল্য—কারণ, মুসলমানাতিরিক্তদিগের স্বার্থ পদদলিত করিয়া "লড়কে" ও "মারকে" পাকিস্থান প্রতিষ্ঠাই যদি মুসলিম লীগের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রেত না হইত তবে সর্বপ্রকারে বাঙলার হিন্দুকে পীড়িত করিবার পক্ষে সুরাবর্দী প্রভৃতি লীগপন্থীদিগের আগ্রহ দেখা যাইত না।

বাঙলার একাংশ যদি স্বতন্ত্র প্রদেশ হইয়া ভারতীয় রাষ্ট্রসঙ্ঘে যুক্ত হইতে চাহে, তবে তাহা কেন অসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে? যদি সত্য সত্যই সুরাবর্দীর দল বাঙলাকে হিন্দু মুসলমানের তুল্যাধিকার ক্ষেত্র বলিয়া মনে করেন, তবে পূর্ববঙ্গে তাঁহারা তাহা প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন। তাহা তাঁহারা করিবেন কি?

দেখা যাইতেছে, মুসলীম লীগ পাকিস্থান চাহেন এবং বাঙলাকে অখণ্ড রাখিয়া মুসলমান প্রধান বলিয়া পাকিস্তানভুক্ত করিতেই আগ্রহশীল।

বাঙালী জাতীয়তাবাদীর—বাঙ্গালী হিন্দুর আত্মরক্ষার প্রয়োজন আজ অত্যন্ত অধিক হইয়া উঠিয়াছে।

বাঙলার জিলায় জিলায় ও মহকুমায় মহকুমায় আজ লোকমত যেরূপ সঙ্ঘবদ্ধভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, তাহাতে তাহা প্রহত করা আর সম্ভব নহে। মুসলমানের অত্যাচারে যেমন শিখ সম্প্রদায়ের সামরিক প্রকৃতি উদ্ভূত হইয়াছিল, মুসলমানদিগের অত্যাচারে তেমনই বাঙলায় বঙ্গ বিভাগের এই দাবীর উদ্ভব হইয়াছে। এই দাবী ছলে, কৌশলে—এমন কি বলে নষ্ট করা সম্ভব হইবে না। বাঙলার জিলায় জিলায় সেই দাবীর সমর্থনে যেসব সভা সমিতি হইতেছে, সে সকল সাম্প্রদায়িকতার পরিচায়ক নহে—সে সকল জাতীয়তার উৎস হইতে উৎসারিত।

কিভাবে বাঙলা বিভক্ত হইবে, এখন সেই বিষয়ে সুনিশ্চিত প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়া তদনুসারে কাজ করিবার সময় সমাগত। সেই জন্য সকল দলকে সমবেত চেষ্টায় চেষ্টিত হইতে হইবে।

(৬)

আদিবাসীদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

ভারতবর্ষের লোকের নৃতাত্ত্বিক (Anthropological) পরিচয় দিতে গিয়ে অনেক পণ্ডিত দ্রাবিড় আর্য ও কোলারীয় ইত্যাদি কতগুলি কথা বংশবাচক অর্থে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এটা পুরাতন প্রথা এবং বৈজ্ঞানিকভাবে ঠিকও নয়। দ্রাবিড় বা আর্য বলতে কোন বিশিষ্ট নরবংশ বোঝায় না। ঐ কথাগুলি ভাষাবাচক অর্থেই ঠিক। বলতে পারা যায়, দ্রাবিড়ভাষী বা আর্যভাষী গোষ্ঠী ইত্যাদি। শোণিত ও আবয়বিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে ভারতের মানুষকে *বিচার করলে কয়েকটি মৌলিক নরবংশের (Race) পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায়। নৃতাত্ত্বিক ফন আইকস্টেট *(Von Eickstedt)* ভারতের মানুষকে তিনটি নরবংশগত বর্গে ভাগ করেছেন ঃ (১) বেদ্দা বর্গ (Weddid Group)—যারা হলো প্রাচীন ভারতবাসী। (২) মেলানীয় বর্গ (Melanid Group)—যারা হলো কৃষ্ণকায় ভারতবাসী এবং (৩) হিন্দু বর্গ (Indid Group)—যারা হলো আধুনিক বা নতুন ভারতবাসী।

ফন আইকস্টেট ভারতের অধিবাসীর নৃতাত্ত্বিক বর্গ বিভাগের যেসব সংজ্ঞা তৈরী করেছেন, সেগুলি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পরিভাষা থেকে ভিন্ন। সংজ্ঞাগুলি নিতান্ত দেশীয় এবং এর কোন প্রয়োজন ছিল না। পৃথিবীর মনুষ্য জাতির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় দেবার মত যেসব পারিভাষিক বর্গবিভাগ আছে, তার দ্বারাই ভারতের আদিবাসীদের পরিচয় প্রকাশ করা যায়, কারণ আদিবাসীরা পৃথিবীর মনুষ্যজাতির একটা অংশ। আদিবাসীরা যদি নিতান্ত ভারতের মাটীতেই উদ্ভূত মানুষ হতো, তবে আইকস্টেটের দেওয়া সংজ্ঞাগুলির বিশিষ্ট একটা অর্থ হতো। কিন্তু সেটা তো ঐতিহাসিক সত্য নয়; প্রাচীন পৃথিবীতে কোন নরবংশ স্থাণু হয়ে ছিল না, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে মানুষের স্রোত বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়ে গেছে; মনুষ্য জাতির ইতিহাস বলতে গেলে মানুষের শোণিতের পৃথিবী-পরিক্রমার ইতিহাস। সেই জন্য সাধারণভাবে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির নৃতত্ত্বগত পরিচয় যে পরিভাষার সাহায্যে দেওয়া হয়ে থাকে, ভারতের আদিবাসীর পরিচয় সম্পর্কে সেই পরিভাষা প্রযোজ্য।

ডাঃ বিরজাশংকর গুহ বিজ্ঞানসম্মত পরিভাষার সাহায্যে ভারতের আদিবাসীদের যে নৃতাত্ত্বিক বর্গবিভাগ করেছেন এই প্রসংগে সংক্ষেপে তাই বিবৃত হলো।

(১) প্রোটো-অস্ট্রেলয়েড (Proto-Australoid)ঃ

আইকস্টেট যে বংশকে বেদ্দীয় *(Weddid) নাম দিয়েছেন ডাঃ গুহ তাকেই প্রোটো-অস্ট্রেলয়েড অর্থাৎ প্রায় অস্ট্রেলীয় বংশ* বলেছেন। সিংহলের বেদ্দা, মধ্য ভারত ও দক্ষিণ ভারতের আদিবাসী গোষ্ঠী এবং অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী—এই তিন নরবংশের মধ্যে আকৃতিগত যে সামঞ্জস্য পাওয়া যায়, তার থেকে এই তিন নরবংশকেই একই মূল গোষ্ঠীর মানুষ বলে ধারণা করা হয়েছে, এবং এই মূল গোষ্ঠীর বৈজ্ঞানিক আখ্যা হলো প্রায়-অস্ট্রেলীয় বা প্রোটো-অস্ট্রেলয়েড। এই তিন নরবংশের মধ্যে ভারতীয় নরবংশ (মধ্য ও দক্ষিণ ভারত) হলো দৈর্ঘ্যে সব চেয়ে ছোট, বেদ্দারা তার চেয়ে বড় এবং অস্ট্রেলীয় আদিবাসীরা সব চেয়ে বড়।

সমগ্র মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের আদিবাসী প্রধানতঃ প্রায়-অস্ট্রেলীয় গোষ্ঠীর মানুষ। শুধু তাই নয়, পশ্চিম ভারতের আদিবাসীরাও এবং গংগা উপত্যকাবাসী নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরাও প্রায়-অস্ট্রেলীয় গোষ্ঠীর মানুষ। মধ্য ভারতের মালভূমিবাসী ভীল, কোল, বড়াগা, কোরোয়া খারোয়ার, মুণ্ডা, ভূমিজ এবং মাল পাহাড়িয়া—এরা সকলেই প্রায়-অস্ট্রেলীয় গোষ্ঠী। দক্ষিণ ভারতের চেঞ্চু, কুরুম্বা, ইয়েরুবা ইত্যাদিও প্রায়-অস্ট্রেলীয়।

এর মধ্যে একটা কথা আছে, উল্লিখিত সকলেই শুদ্ধশোণিত প্রায়-অস্ট্রেলীয় নয়। অনেকের সংগে নিগ্রোবটু বা নেগ্রিটো গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ হয়েছে এবং সেই কারণে প্রায়-অস্ট্রেলীয় গোষ্ঠীর এই আদিবাসীদের অনেকের মধ্যে নেগ্রিটো মুখ ও দৈহিক বৈশিষ্ট্যের ছাপও কিছু পড়েছে।

(২) নিগ্রোবটু (Negrito)ঃ

এরা বৃহত্তর নিগ্রো (Negroid) বংশেরই একটা খর্বতাগ্রস্ত শাখা। খুলির গড়ন এবং আংটির মত কোঁকড়ান চুল এদের বৈশিষ্ট্য। আর বৈশিষ্ট্য হলো—দৈর্ঘ্যে বামনাকার, ছোট মাথা, ছোট চিবুক, ফোলা কপাল, অংগপ্রত্যংগের গঠন হালকা, শরীরের তুলনায় হাত লম্বা, গায়ের রং অত্যন্ত কালো (উদাহরণ, দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকার বুসম্যান ও হটেনটট)। আফ্রিকা ছাড়া নিউগিনি, ফিলিপিন, মালয় এবং আন্দামানে নিগ্রোবটু গোষ্ঠীর নিদর্শন পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষে নিগ্রোবটু (Negrito) আকৃতির মানুষের ঠিক 'টাইপ' (Type) বা সর্বলক্ষণযুক্ত চেহারা পাওয়া যায় না। সম্প্রতি কোচিন এবং ত্রিবাঙ্কুড়ের পার্বত্য অঞ্চলে সার্ভে করার পর কোন কোন শ্রেণীর মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে যাদের চুল নিগ্রোবটু ধরণের কোঁকড়া ও আংটি-পাকানো। কাডার, পুলাইয়া, ইরুলা ও ইয়ানাড়ি ইত্যাদি কয়েক শ্রেণীর মধ্যে *এই লক্ষণযুক্ত মানুষ দেখা যায়।* ডাঃ হাটন আংগামি নাগাদের মধ্যেও এই নিগ্রোবটু সুলভ লক্ষণ দেখতে পেয়েছেন, রাজমহল পাহাড়ের আদিবাসীদের অনেকের মধ্যে নিগ্রোবটু সুলভ আংটি-পাকানো চুলের নিদর্শন দেখা গেছে।

দেখা যাচ্ছে যে, ভারতে সম্পূর্ণ নিগ্রোবটু গঠনের কোন গোষ্ঠীর সাক্ষাৎ না পাওয়া গেলেও, নিগ্রোবটুর ছাপ পাওয়া যায়। সুতরাং অনুমান করা অসংগত নয় যে ভারতে প্রাচীনকালে নিগ্রোবটু গোষ্ঠীর মানুষ ছিল অথবা এসেছিল। কবে এসেছিল তাও বলা যায় না। আজ ভারতে তাদের আর কোন বিশিষ্ট গোষ্ঠীগত অস্তিত্ব নেই। তারা অন্যান্য গোষ্ঠীর সংগে একদেহে লীন হয়ে গেছে। শুধু এখানে ওখানে ব্যক্তিবিশেষের দৈহিক লক্ষণের মধ্যে এদের ঐতিহাসিক পরিচয়ের ছিটেফোঁটা দেখা যায়।

(৩) মংগোলীয় (Mongoloid)ঃ

অরোমশ, বিরলশ্মশ্রু, চওড়া চোয়াল চ্যাপ্টা নাক ও ভারি ভুরু—মংগোলীয় আকৃতি বিশিষ্ট লক্ষণ। মংগোলীয়ের চোখই হলো প্রধান বৈশিষ্ট্য যাকে অনেকে 'বাদাম-আকৃতি চোখ' (almond-shaped eyes) বলে থাকেন

ভারতের আদিবাসীদের কয়েকটি গোষ্ঠী ূল মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীয় মানুষ। আসাম এবং ূর্ব বাঙলাতেই এই গোষ্ঠীর আদিবাসীরা াকে। মূল মঙ্গোলীয় বংশের মধ্যে দৈহিক বশিষ্ট্য অনুসারে দুটি বিশিষ্ট উপবংশ ল্পনা করা যেতে পারেঃ—(১) পূর্ব-ঙ্গোলীয় (Palae-Mongoloid) এবং (২) ত্বিব্বতী-মঙ্গোলীয় (Tibeto-Mongoloid)

পূর্ব-মঙ্গোলীয়েরা বেশী পুরাতন রবংশ এবং এদের আকৃতিতে মঙ্গোলীয় ক্ষণগুলি খুব পরিস্ফুট নয়। এদের মাথার ড়ন পরিণত মঙ্গোলীয়ের মত গোলাকার নয় বং মাঝারী থেকে শুরু করে লম্বা গড়নের Dolichocephalic)। আসামের আদি-াসীদের মধ্যে পূর্ব-মঙ্গোলীয় শোনিতেরই াধিক্য। ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তবাসী অনেক গাষ্ঠী ও পূর্ব-মঙ্গোলীয় বংশের মানুষ। ট্টগ্রামের চাক্মা জাতিও পূর্ব-মাঙ্গোলীয় পবংশের মানুষ, যদিও খুলির আকৃতি ঠিক াসামের আদিবাসীদের মত নয়। চাক্মাদের াথা ছোট ও চওড়া (Brachycephalic)।

তিব্বতী-মঙ্গোলীয়দের মধ্যেই মঙ্গোলীয় ক্ষণ সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুট। সিকিম ও ূটানের অধিবাসীরাই এই গোষ্ঠীর খাঁটি নদর্শন। হিমালয়ের উত্তরে বহুদূর বিস্তৃত অঞ্চলে এবং এদিকে নেপালেও তিব্বতী-ঙ্গোলীয়ের ছাপ ছড়িয়ে পড়েছে।

ভারতের আদিবাসীদের নৃতাত্ত্বিক িচয়ের জন্য যে কয়টি মূল নরবংশের িরিচয় দরকার, তার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ ওয়া হলো। নিগ্রোবটু, প্রায়-অস্ট্রেলীয় এবং ঙ্গোলীয়—এই তিন মূল নরবংশের শোণিত ারতের বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর দেহ ঠন করেছে। যুগ যুগ ধরে, শতাব্দীর পর তাব্দী ধরে তিন মহাদেশবাসী এই তিনটি রবংশের মানুষ ভারতভূমিতে স্থান গ্রহণ ক'রে আবার নানা ভৌগোলিক ব্যবধানে ভিন্ন ভন্নভাবে বিভিন্ন হয়ে নানা গোষ্ঠী ও উপ-গাষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। প্রত্যেক গোষ্ঠী অন্য গাষ্ঠীর সঙ্গে সামাজিকতার কোন যোগাযোগ াখতে পারেনি। প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্নভাবে ামাজিক পরিণতি লাভ করেছে। প্রত্যেক গাষ্ঠীই হলো অন্তর্বিবাহচারী (Endogamous) অর্থাৎ নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ াচার সম্পন্ন ক'রে থাকে। এক একটি গাষ্ঠী আবার বিভিন্ন গোত্রে (clan) বভক্ত এবং সগোত্র বিবাহ আবার নিষিদ্ধ অর্থাৎ গোত্র হিসাবে আদিবাসীরা হ'লো বহির্বিবাহচারী (Exogamous)। একই গোত্রের দুই নরনারীর মধ্যে বিবাহ হ'তে পারে না। গোত্রের নাম সাধারণতঃ আদিপিতারূপী কোন টোটেমের (জীব বৃক্ষ ইত্যাদি) নাম অনুসারেই হয়ে থাকে।

নিগ্রোবটু বা নেগ্রিটো নরবংশই ভারতের প্রাচীনতম অধিবাসী, এ বিষয়ে অধিকাংশ পন্ডিত একমত। দক্ষিণ ভারতে এমন কতগুলি আদিবাসী গোষ্ঠী আছে, যাদের 'পৃথিবীর প্রাচীনতম মানুষের নিদর্শন' বলা যায়। নীলগিরি পাহাড় এবং নন্নামালাই পাহাড় এবং পূর্ব মহীশূরের অরণ্য অঞ্চলে কুরুম্বার, কালিকার, ইরুলার ও ইয়ানাডি প্রভৃতি গোষ্ঠী অতি প্রাচীন মানুষের শরীরের ধাঁচ আজও তাঁদের আকৃতির মধ্যে বজায় রেখে চলেছে।

ভারতের প্রায়-অস্ট্রেলীয় নরবংশের গোষ্ঠীগুলি এবং নিগ্রোবটু নরবংশের গোষ্ঠীগুলির উভয়ের মধ্যে কতগুলি বিষয়ে আকৃতিগত সামঞ্জস্য আছে এবং কতগুলি অসামঞ্জস্যও আছে। দৈহিক উচ্চতা, মাথার গড়ন, চওড়া চ্যাপটা নাক, পুরু ঠোঁট এবং কৃষ্ণ বর্ণ—এই কয়টি লক্ষণ উভয়ের মধ্যেই আছে।

কিন্তু প্রায়-অস্ট্রেলীয়দের কপাল এবং ভুরু নেগ্রিটো (নিগ্রোবটু) সুলভ ছেলে-মানুষী গড়নের মত নয়। প্রায়-অস্ট্রেলীয়দের অঙ্গ প্রত্যঙ্গও নিগ্রোবটুদের মত হাল্কা ধরণের নয়। উভয়ের মধ্যে সব চেয়ে বিশিষ্ট পার্থক্য হলো—প্রায়-অস্ট্রেলীয়দের মাথার চুল আংটি পাকানো কোঁকড়া (Frizzly) নয়। প্রায়-অস্ট্রেলীয়দের চুল ঢেউ খেলানো এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কুঞ্চিতও (curly) বটে, কিন্তু স্প্রিংয়ের মত আংটি পাকানো (spirally coiled) নয়। অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের থেকে ভারতের প্রায়-অস্ট্রেলীয়-দের দৈহিক লক্ষণের একটা ছোট পার্থক্য আছে—অস্ট্রেলীয় আদিমেরা রোমশ চেহারার, ভারতের প্রায়-অস্ট্রেলীয়েরা সাধারণতঃ রোমবিরল। কতগুলি ভারতীয় গোষ্ঠীর মধ্যে আবার রোমশতাও দেখা যায়।

শিক্ষা

ভারতের আড়াই কোটি আদিবাসী আধুনিক শিক্ষার (Education) ক্ষেত্রে ভারতের মধ্যে সবচেয়ে অনগ্রসর সমাজ। শুধু শিক্ষার কথাই বা বলি কেন, সাক্ষরতা (Literacy) বলতে যা বোঝায় তাও এদের মধ্যে অতি অকিঞ্চিৎ। আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের কোন ব্যাপক পরিকল্পনা বা উদ্যোগ সরকারী তরফে হয়নি। হেলাফেলা ক'রে দু'এক ক্ষেত্রে সামান্য কিছু চেষ্টা হয়েছে। বেসরকারীভাবে অর্থাৎ খৃষ্টান মিশনারী এবং কয়েকটি দেশীয় সেবাসমিতি উদ্যোগে অঞ্চল বিশেষে কতগুলি স্কুলের প্রতিষ্ঠা অবশ্য হয়েছে, কিন্তু এই সব জ্ঞানের প্রদীপ এত অল্প সংখ্যক যে তাতে আদি-বাসীর মনের অন্ধকার দূর করতে পারেনি, পারা সম্ভবও নয়। তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, অশিক্ষার সমস্যাটা সমস্ত ভারতবাসীরই সমস্যা। ভারতের দরিদ্র জনসাধারণ জ্ঞান ও শিক্ষার বারি আকণ্ঠ পান করবার সুযোগ এযাবৎ পেয়েছে—এটা সত্য নয়। এ বিষয়ে তারা আজও তৃষিত হয়েই আছে। আদি-বাসীদের সম্পর্কে বলা যায়, অন্যের তুলনায় এ বিষয়ে তারা সবচেয়ে বেশী বঞ্চিত—প্রায় নির্জলা উপবাসী।

১৯৩১ সালের ৭৬,১১,৮০৩ জন আদি-বাসীর লিখন পঠন ক্ষমতা সম্বন্ধে হিসাব গ্রহণ করা হয়েছিল। এদের মধ্যে মাত্র ৪৪,৩৫১ জন অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন লোকের পরিচয় পাওয়া যায়। অর্থাৎ সাক্ষরতার হার হলো শতকরা ০·৫৮ মাত্র। ১৯৩১ সনের একটা হিসাব ঃ

প্রদেশ	যত সংখ্যক আদিবাসী সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হয়	যত সংখ্যক লিখনপঠনক্ষম লোক পাওয়া যায়	শতকরা হার
(১) আসাম	৯,৯২,৩৯০	১৪,০৯৪	১·৪
(২) বাঙলা	৫,২৮,০৩৭	৩,৮৭৪	০·৭
(৩) বিহার-উড়িষ্যা	২০,৪৪,৮০৯	১১,৮৩৪	০·৫
(৪) মধ্য প্রদেশ	১৩,৫১,৬১৫	৬,৭৬৯	০·৫

১৯২১ সালের সেন্সাসে হিসাব পাওয়া গিয়েছিল—প্রতি হাজার কত্কারি গোষ্ঠীর লোকের মধ্যে ৩ জন এবং প্রতি হাজার ভীলের মধ্যে ৪ জন লিখন পঠনক্ষম পুরুষ আছে।

ঐ সালেরই সেন্সাসে কয়েকটি অতি অনগ্রসর হরিজন শ্রেণীর সাক্ষরতার হিসাব পাওয়া যায়—মহরদের মধ্যে হাজার করা ২৩ জন এবং ভাঙ্গিদের মধ্যে হাজার করা ৬৫ জন লিখন পঠনক্ষম।

ভীল সমাজ খুবই হিন্দুত্ব প্রাপ্ত এবং কৃষিপ্রবণ গোষ্ঠী। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, তারা অতি অবনত ভাঙ্গি হরিজনদের চেয়ে লিখনপাঠন ক্ষমতায় ৭ গুণ বেশী অবনত। ভাই অমৃতলাল ঠক্কর লিখেছেন—"১৯২৪ সালে মধ্য ভারতের দক্ষিণ অঞ্চলে কোন দেশীয় রাজ্যে, যে রাজ্য সম্পূর্ণরূপে ভীলদের দ্বারা অধ্যুষিত, সেখানেও আমি দেখেছি যে, ভীলেদের মধ্যে প্রতি ১৩ হাজারে ১ জন মাত্র

লিখনপঠনক্ষম অর্থাৎ সাক্ষরতার পরিমাণ হলো শতকরা শ‍ূন্য।"

আদিবাসী অঞ্চলের শিক্ষা প্রসারের জন্য গভর্নমেণ্ট যে ব্যয় মঞ্জ‍ুর করেন, তা অতি নগণ্য। জিলার স্কুলগ‍ুলিকে আর্থিক সাহায্য দেবার যে ব্যবস্থা আছে, তাহা স্কুলের সংখ্যা হিসাবে করা হয় না। জিলা হিসাবে একটা নির্দিষ্ট ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। কোন জিলায় যদি অনেকগ‍ুলি নতুন স্কুলের পত্তনও হয়, তবে সেই অন‍ুপাতে ব্যয়-বরাদ্দ বাড়িয়ে দেবার রীতি নেই। কাজেই কোন জিলায় স্কুলের সংখ্যা বাড়লে নির্দিষ্ট আর্থিক সাহায্যের পরিমাণও বেশী ক'রে ভাগ হয়ে যায় ও প্রত্যেকের ভাগ্যে যা পড়ে সেটা খ‍ুবই কম। সাইমন কমিশন মন্তব্য করেছিলেন—"বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশ ছাড়া সব প্রদেশে একটা রীতি দেখা যাচ্ছে—জিলা কর্তৃপক্ষ নিজস্ব আর্থিক সামর্থ্য অন‍ুসারে জিলার শিক্ষার জন্য যে পরিমাণ অর্থ নির্দিষ্ট করতে পারেন, প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট সেই পরিমাণের সঙ্গে অন‍ুপাত রেখে জিলা কর্তৃপক্ষকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকেন। যে জিলা নিজস্ব আর্থিক সামর্থ্য অন‍ুসারে শিক্ষার জন্য বেশী খরচ করতে পারে, তাকেই প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট আন‍ুপাতিক হিসাবে বেশী সাহায্য দিয়ে থাকেন। যে জিলার আর্থিক সামর্থ্য কম এবং সেই অন‍ুসারে শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট অর্থও কম, সেই জিলা প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে আন‍ুপাতিক হিসাবে কম সাহায্য পায়। এইভাবে, অনগ্রসর অঞ্চলগ‍ুলি বস্তুতঃ তাদের দারিদ্র্যের অপরাধে প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে কম সাহায্য পাচ্ছে।"

এ বিষয়ে অপেক্ষাকৃত ভাল ব্যবস্থা সম্পন্ন বিহার-উড়িষ্যা গভর্নমেণ্টও কমিশনের কাছে এক মেমোরেণ্ডামে বলেছিলেন—"প্রদেশের সাধারণ অধিবাসীদের তুলনায় আদিবাসীরা ১৯২১ সালে যতখানি লিখনপঠনক্ষম ছিল, বর্তমানে (১৯২৯ সালে) আদিবাসীরা তার চেয়েও খারাপ অবস্থায় রয়েছে। প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষার সাধারণভাবে যে প্রসার হয়েছে, তাতে আদিবাসীরা তাদের প্রাপ্য অংশের কিছ‍ু কমই লাভ করেছে। মধ্য ও উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে তারা উচিত প্রাপ্যের অনেক কম পেয়েছে।"

মধ্য স্কুল, হাইস্কুল ও কলেজ—এই তিনটি উচ্চশিক্ষায় প্রতিষ্ঠানগত পদ্ধতি আদিবাসীদের মধ্যে আজও প্রসার লাভ করেনি। আসামের খাসি ও ছোট নাগপ‍ুরের ম‍ুণ্ডা এবং ওঁরাওদের মধ্যে অবশ্য কিছ‍ু সংখ্যক লোক আছেন যাঁরা উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী-ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত।

(ক্রমশ)

অশ্বত্থের অভিশাপ

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

দ্বিতীয় ভাগ

১

·খন জোড়াদীঘি গ্রামে এই পারিবারিক বিবাদ সর্পিল গতিতে চলিতেছিল তখন রের জগতে তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা ছিল না মনে করিলে নিতান্ত ভুল হইবে। দীঘির জমিদারদের অনুচরেরা যখন রক্ত তেছিল, জোড়াদীঘির জমিদারদের বর্গ যখন অশ্রু ঢালিতেছিল, তাহাদের রভাগে একটি রজতধারা প্রবাহিত হইতে করিয়াছিল। সেই ক্ষীণ ধারা জোড়া- র উৎস হইতে বহির্গত হইয়া মহকুমা লত, সদর আদালত হইয়া বর্ধিত আয়তনে আদালত পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে—হাসমুদ্রে বাঙলাদেশের সমস্ত রজত- হনী, রক্তরঙ্গিনী, অশ্রু-স্রোতস্বিনী য়া পর্যবসিত। এই ত্রি-প্রবাহিনী স্রোতে র পড়িলে আর রক্ষা নাই—মানুষকে রের কূল পর্যন্ত না লইয়া গিয়া ইহারা না। জোড়াদীঘির দুই শরিক যুগপৎ প্রবল স্রোতে পড়িয়া গেল। প্রথমে তাহাদের বেশ একটা প্রতিযোগিতার ভাব লক্ষিত কে কাহাকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে। দের গতিবেগ বৃদ্ধির জন্য স্রোতের টানের রূপে বৈঠাফেলা, লগিমারা, পাল তোলা ণে টানিবার উৎসাহের অভাব হইত না। ক পক্ষই ভাবিত, আমি আগে গিয়া কূলে ! সর্বনাশের স্রোত কবে সার্থকতার ভালিয়া দেয়? কিন্তু অনেক সর্বনাশ চরম মুহূর্ত ছাড়া বুঝিতে পারা যায় আর বুঝিতে পারিলেও টান তখন বল হইয়া উঠিয়াছে। ফিরিবার পথ অদৃষ্টের স্রোতের মতো ভাসিয়া যাওয়া তখন আর গত্যন্তর থকে না। তটস্থ ভীত বিস্ময়ে এই সর্বনাশের প্রতিযোগিতা তে থাক—ভাসমান ব্যক্তি জড়বৎ নির্ভীক। আবার ভয় কি?

জোড়াদীঘির দশানি ও ছ' আনিতে প্রবল মামলা বাধিয়া উঠিল। উভয় পক্ষের সাক্ষীর দল সুবর্ণ সুযোগ দেখিয়া নাচিয়া খাড়া হইল। তাহাদের আদর আপ্যায়নের অন্ত নাই। আদালতের ভাষায় সাক্ষী নারায়ণ। কিন্তু আসল নারায়ণ নির্বিকার। তাঁহাকে ষোড়শো- পচার দিলেও খুশী, না দিলেও বিরাগ প্রকাশ করে না। কিন্তু সাক্ষীনারায়ণদের প্রকৃতি ভিন্ন। মুখর দেবতাদের সন্তুষ্ট করা সামান্য মানুষের কর্ম নয়। দুপক্ষের সাক্ষীর দল তারিখে তারিখে মহকুমা আদালতে হাজিরা দিতে লাগিল। যাহারা সারাজীবন হাঁটিয়া যাতায়াত করিতে অভ্যস্ত, তাহারা সামাজিক মান অনুসারে গাড়ি, পাল্কী দাবী করিল। গোরুর গাড়িতে চাপিলে নাকি তাহাদের কোমরে ব্যথা হয়, কাজেই পাল্কী ও একার ব্যবস্থা করিতে হইল। চিড়া দইয়ে যাহারা তৃপ্ত, তাহারা এক্ষণে কাঁচাগোল্লা ছাড়া অন্য কিছু খায় না, রসগোল্লা নাকি গলায় বাধিয়া যায়। এরকম অপ্রত্যাশিতভাবে তাহাদের মুখবন্ধ হইয়া গেলে সাক্ষ্যদান করিতে অসুবিধা হইবে ভাবিয়া বাবুরা নীরবে কাঁচাগোল্লা যোগাইয়া যাইতে লাগিল। ফল কথা, জোড়া- দীঘির অনেকেরই এই উপলক্ষে খোড়ো ঘর টিনের হইল, টিনের ঘর পাকা হইল, পাকা ঘরের আয়তন বর্ধিত হইল।

ওদিকে মহকুমার উকীল মোক্তারগণ তালি- মারা, তেলে-মলিন চাপকান পরিত্যাগ করিয়া নূতন চাপকান কিনিল, অনেকেরই দু'চার বিঘা ভূসম্পত্তি বাড়িল। সদর আদালতের উকীলবাবুরা অপেক্ষাকৃত অভিজাত, তাহাদের লাভের অঙ্ক চাপকানে প্রকাশিত না হইয়া ব্যাঙ্কে অঙ্কুরিত হইয়া চক্রবৃদ্ধির সুদে নিত্য নূতন পল্লব বিকাশ করিতে শুরু করিল। আজকাল বড় মামলা একটা জোটে না বলিয়া সদরের উকীলেরা বিষণ্ণ। তাঁহারা অভাবিত- ভাবে এই মামলাটিকে পাইয়া অনেক দিনের হারানো শিশুর মতো আদরে কোলে তুলিয়া লইয়া নাচাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের সমবেত চেষ্টায় শিশুটি পূর্ণিমামুখী চন্দ্রকলার মতো তিথিতে বাড়িতে লাগিল এবং অবশেষে সাবালকত্ব প্রাপ্ত হইয়া একদিন শুভ প্রাতে উচ্চ আদালতে গিয়া উপনীত হইল।

উচ্চ আদালত! সে যে দুস্তর পারাবার। যেমন প্রকাণ্ড বাড়ি, তেমনি উচ্চ, তেমনি নিরেট, কাণ্ডজ্ঞান ও সত্যের পক্ষে সমান দুর্ভেদ্য। সেখানে বড় বড় উকীল ব্যারিস্টারের দল নিয়মিত গতিতে চলাফেরা করেন, তাঁহাদের দেহ বিদ্যা ও মেদের স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার প্রশস্ত ক্ষেত্র। এক একজন বড় ব্যারিস্টার যেন এক একখানি মনোয়ারি জাহাজ, তাঁহার আগে পিছে জুনিয়ারের দল ডেস্ট্রয়ার জাহাজস্বরূপ, মুহুরির দল ইউ-বোটের মতো নিস্তব্ধ, সতর্ক; নবীন উকীলগণ সিন্ধু শকুনের মতো লক্ষ্য সঞ্চরণশীল; আর হতভাগ্য মক্কেল খালাসীর মতো প্রত্যেকের প্রচণ্ড জঠরানলে সাধ্যাতীত ক্ষিপ্রতায় কয়লা নিক্ষেপ করিতেছে—নিছক কয়লা হইলে তত আপত্তি হইত না। আর এই নক্র কুম্ভীর চোরা পাহাড়সংকুল পারাবারের বাতিঘর স্বরূপ বিরাজমান 'মি-লর্ড' জজের দল। তাহারা জাগিয়া ঘুমান, ঘুমাইয়া শোনেন, গভীর গবেষণার প্রয়োজন হইলে ঊর্ধ্বনেত্র হইয়া কড়িকাঠ পর্যবেক্ষণ করেন, হাইকোর্টের সরস্বতী টিকটিকির মতো কড়ি- কাঠে লেপটিয়া বিরাজমানা। আর অন্নহীন উকীলের দল চারিদিকের চক মিলানো বারান্দায় অবিরাম গতিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অধীত বিদ্যা ও ভুক্ত খাদ্য পরিপাক করিতে চেষ্টায় নিরত। প্রত্যেকের নির্দিষ্ট পাক-খাওয়া শেষ হইলে শূন্য উদরে গড়ের মাঠের ক্ষুধোদ্রেককারী হাওয়া খাইয়া বাড়ি ফিরিয়া আসেন। হায়রে! নবীন উকীলের দল প্রাত্যহিক এই পাকচক্রপথে ভ্রমণ না করিয়া সরল পথে চলিলে এতদিন তাঁহারা আমেরিকা গিয়া পৌঁছিতেন। ওয়ার্ল্ড ট্যুরিস্ট বলিয়া খ্যাতি রটিত, কাগজে ছবি উঠিত এবং প্রসঙ্গত উল্লেখ করিতে পারা যায়, তাঁহাদের অন্নহীনতারও একটা সমাধান হইয়া যাইত।

ফল কথা জোড়াদীঘির মামলা জারি, গরজারি, মোশন, আপীল, ছানি, রিভিউ প্রভৃতির কুটিল পন্থায় শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে লাগিল—মহকুমা হইতে সদরে, সদর হইতে কলিকাতায়। সর্বনাশ প্রহরে প্রহরে আপন মূর্তি ক্রমে প্রকাশ করিতে থাকিল।

২

গ্রামে বসিয়া মামলা মোকদ্দমার তদ্বির সুবিধাজনক হইতেছে না বুঝিতে পারিয়া নবীন নারায়ণ মুক্তামালাকে সঙ্গে করিয়া সদরে আসিয়া বাসা করিল। পদ্মার ঠিক উপরেই বাড়ীটি।

একদিন সকাল বেলা নবীন নারায়ণ তাহাদের এষ্টেটের পুরোতন উকীল তারিণী-বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। তারিণী-বাবু প্রবীণ উকীল। অনেক টাকা জমাইয়াছেন কিন্তু কথাবার্তায় ও আচার ব্যবহারে তাহার চিহ্ন প্রকাশ পায় না। সেইজন্য লোকটার কৃপণ বলিয়া অখ্যাতি আছে। শহরের ছোট একটি গলিতে তারিণীবাবুর বাড়ী। বাড়ীটি শহরের প্রাচীনতার একটি সাক্ষী। লোকে যখন রোদ হাওয়াকে মানুষের শত্রু বলিয়া মনে করিত বাড়ীটি তখনকার পরিকল্পনায় গঠিত। ছাদ নীচু, জানলা ছোট, কাঠের গরাদে, মেঝেতে সিমেণ্ট নাই, দরজায় ও চৌকাঠে অন্য রঙের অভাবে পুরু করিয়া আলকাৎরা মাখানো। বাড়ীর বাহিরের ঘরে কেরাসিন কাঠের টেবিল ও খান দুই তিন চেয়ার পাতিয়া তারিণীবাবু সেদিনকার আদালতের নথীপত্র দেখিতেছেন। তাঁহার পাশে জন দুই মুসলমান মক্কেল চেয়ারে উপবিষ্ট, আর জন দুই বসিবার স্থানের অভাবে পাশে দাঁড়াইয়া আছে। ঘরের এক পাশে জীর্ণ তক্তপোশের উপরে তারিণীবাবুর মুহুরী খানকতক নথী-পত্র লইয়া নাড়িতেছে, পাশেই একজন মক্কেল, তাহার সহিত অপরের অশ্রুতিগম্যভাবে কি যেন বলিতেছে। তক্তপোশের একধারে মলিন বিছানা। দেয়ালের কাছে একটি দড়ি টানানো, তাহার উপরে খান দুই কাপড় গামছা। ঘরের অপর দিকে গোটা কয়েক তারের ফাইল কাগজের স্তূপে পীড়িত হইয়া দোদুল্যমান। তারিণীবাবুর নিজের চেহারাও জীর্ণতায় এই বাড়ীর অনুরূপ। মাথার চুল রুক্ষ্ম, মুখে চোখে শিকারী বিড়ালের সতর্ক দৃষ্টি ও শাদা পাকা গোঁফ, নাকে নিকেলের চশমা, কোঁচার খুট গায়ে, পায়ে খড়ম।

তারিণীবাবুর কৃপণ অপবাদের কথা বলিয়াছি। তাঁহার স্ত্রী চির রুগ্ন, বাড়ীতে পোষ্য অনেকগুলি, কাজেই একজন পাচক ছাড়া চলে না। পাচকের বেতনে তাঁহার তত আপত্তি নাই কিন্তু সাধারণতঃ পাচকগণের দোষ এই যে রন্ধনের উপকরণ হিসাবে ঘৃত, তৈল, গরমমশলা প্রভৃতি দুর্মূল্য বস্তু দাবী করিয়া থাকে। সেইজন্য তারিণীবাবু শহরের উড়িয়া বামুনদের আড্ডায় গিয়া উৎকল দেশ হইতে সদ্যাগত ব্রাহ্মণ বটু আনিয়া কাজে লাগাইয়া থাকেন। ইহাতে অনেক সুবিধা। বালক বলিয়া বেতন অল্প আর রন্ধনে অনভিজ্ঞ বলিয়া ঘি তেল প্রভৃতির ব্যবহারও জানে না। ব্রাহ্মণ বটুরাও প্রথম কিছুদিন জল ও অগ্নির সাহায্যে পাককার্য সমাধা করে। কিন্তু সংসর্গ দোষ অচিরে দেখা দেয়। কিছুদিন পরে তাহারা ঘি ও তেল দাবী করিলে তারিণীবাবু তাহাদের ডিসমিস করেন। করিয়া আবার নূতন বটু সংগ্রহ করেন। কাল নিরবধি, তেমনি উড়িষ্যার ব্রাহ্মণ বটুর সংখ্যাও অল্প নহে, এক রকম করিয়া চলিয়া যায়, বিশেষ অসুবিধা হয় না।

নবীন নারায়ণ ঘরে প্রবেশ করিয়া তারিণীবাবুকে প্রণাম করিল। তারিণীবাবু অমনি লাফাইয়া উঠিয়া মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—এই যে বাবা নবীন। এসেছ! ভালো হয়েছে। আরে গ্রামে থেকে মামলা চালানো যায় ! রামঃ। আমি কতবার তোমার নায়েব যোগেশকে বলেছি—আরে ছোটবাবুকে পাঠিয়ে দাও। এখানে শহরের সঙ্গ সহবৎও ভালো, আবার তদ্বির করবারও সুবিধে। তা ওদের ইচ্ছা বাবুরা যাতে শহরে না আসেন। তোমরা গ্রামে বসে থাকলে ওদের পোয়া বারো, নয় ছয় করতে পারে, কেবল আমার ভাগ্যে ঢন ঢন! এই বলিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটা বারকতক নাড়িলেন।

নবীন নারায়ণের অভ্যর্থনার আতিশয্য দেখিয়া উপবিষ্ট মক্কেলদ্বয় চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়াছিল। সেই সুযোগে নবীনকে একখানি চেয়ারে বসাইয়া তারিণীবাবু বসিলেন। চেয়ারের সংখ্যা বাড়িল না, কাজেই দণ্ডায়-মানের সংখ্যা বাড়িল।

তারিণীবাবু শুধাইলেন—তা বাসা নিলে কোথায় ?

নবীন বলিল।

তারিণীবাবু বলিলেন—বেশ হয়েছে, পদ্মার খোলা হাওয়া পাবে। বৌমাও তো সঙ্গে এসেছেন।

নবীন বলিল।

তারিণীবাবু খুশী হইয়া বলিলেন—বেশ হয়েছে, স্থির হ'য়ে কিছুকাল বসো। ছটফট করলে মামলা হয় না—এ-ও এক প্রকার সাধনা।

তারিণীবাবু মিথ্যা বলেন নাই। পঞ্চ-মকারের মধ্যে মোকদ্দমা অন্যতম। আর ফৌজদারি মামলার প্রতিষ্ঠা তো পঞ্চমুণ্ডী আসনের উপরেই। তা ছাড়া ফৌজদারি, দেওয়ানি দুই প্রকার মামলাতেই মানুষে বাধ্য হইয়া কাঞ্চন পরিত্যাগ করিতে শেখে।

তারিণীবাবু পুনরায় বলিতে লাগিলেন—হাঁ, মামলা করতে জানতেন তোমার বাপ! তুমি তো তারই সন্তান। আমি যখন শুনলাম যে তুমি কলকাতায় গিয়ে পড়াশুনো নিয়ে সময় নষ্ট করতে আরম্ভ করলে ভাবলাম নাঃ ছেলেটা বয়ে গেল। এবারে জমিদারি সব নষ্ট হয়ে যাবে। কতদিন আমি ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেছি, ঠাকুর ছেলেটার সুমতি দাও, পৈত্রিক ধারা ফিরে পাক। তা ঠাকুর আমার প্রার্থনা শুনেছেন দেখ্‌ছি।

নিজের প্রার্থনার সার্থকতায় পুলকিত হইয়া বলিলেন—শুনবেন না? তোমাদের বাড়ীর আমি কত কালের উকীল।

তারপরে হাসিয়া বলিলেন—বাবা জমিদারী-যজ্ঞের আমরাই পুরোহিত।

নবীনের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—এবারে মানুষের মতো মানুষ হতে চলুলে।

এই বলিয়া গোটা দুই গোঁফ টানিয়া তুলিয়া দেখিলেন এবং পর ক্ষণেই হাওয়ায় ছাড়িয়া দিলেন।

—আজ কি আছে? একটা মোশন? না। কোন ভয় নেই। দাঁড়াও না দশানিকে মজা দেখিয়ে ছাড়ছি !

তারপরে মুহুরীকে ডাকিলেন—বিজয় ছ' আনির মোশানের নথী ঠিক আছে তো ? এই যে ছ' আনির বাবু নিজে এসেছেন।

বিজয় ইতিপূর্বে নবীন নারায়ণকে দেখে নাই—তবে তারিণীবাবুর কথাবার্তায় কতকটা অনুমান করিয়া লইয়াছিল। এখন পরিচয় পাইবামাত্র তক্তপোশ হইতে একলাফে নামিয়া আসিয়া নবীনকে প্রণাম করিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তাহার নিকটে দাঁড়াইল।

তারিণী বলিল—ছোকরার বয়স অল্প, কিন্তু চালাক চতুর, বেশ চটপটে, যেমন কথায়, তেমনি কাজে।

তারিণীবাবু এই বালক মুহুরীটিকেও ব্রাহ্মণ বটুর সংগ্রহরীতিতে সংগ্রহ করিয়াছেন। উকীল ও মুহুরির মধ্যে কে বেশি চালাক চতুর বলা সহজ নয়। একের হাতে অপরের টাকা পড়িলে তলাইয়া যায়। মূল কথা দুইজনেই রজতকাঞ্চনের পরমহংস, হাতে টাকা কড়ি পড়িলেই আঙুলগুলি আপনিই বাঁকিয়া যায়। তবে প্রভেদের মধ্যে এইটুকু যে বিজয়ের সম্মুখে আজিও ভবিষ্যৎ প্রসারিত, সে ভাবে এখনো কত হইবে। তারিণীবাবুর পশ্চাতে অতীত লম্বমান—তিনি ভাবেন, কিছুই হইল না।

তারিণীবাবু নবীনকে বলিলেন—যাও বাবা খাওয়া দাওয়া করে এসো গে—এখান থেকে আমার সঙ্গেই যাবে। আমি ততক্ষণ হাতের কাজটা সেরে নিই।

নবীন মুক্তি পাইয়া বাহিরে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে ভাবিল লোকে মামলা করিতে যায় কেন? তখন ঘরের মধ্যে তারিণীবাবু ভাবিতেছিলেন, লোকে মামলা না করিয়া রেস্ খেলিয়া, বই কিনিয়া, সদাব্রত করিয়া টাকা নষ্ট করে কেন?

নবীন আহারাদি শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিল তারিণীবাবু আদালতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। তাঁহার পরণে একটি জিনের জীর্ণ প্যাণ্ট, নিজস্ব আকৃতি হারাইয়া অনেক দিন হইল তাহা তারিণীবাবুর নিম্নার্ধের আকার পাইয়াছে, গায়ে গলাবন্ধ কালো কোট; দুই পকেট নথির ভারে স্ফীত,

...য়ে তালি-মারা ডার্বি সু। বাড়ীর সম্মুখে ...খানি ঘোড়ার গাড়ী অপেক্ষা করিতেছে।

তারিণীবাবু বলিয়া উঠিলেন—এই যে ...বা এসো, ওঠো, ওঠো, উঠে পড়ো।

নবীন গাড়ীতে উঠিল। তারিণীবাবু ...টিয়া বাড়ীর মধ্যে গেলেন, বাহিরে ...সিলেন, আবার গেলেন, আবার বাহিরে ...সিলেন, এই রকম বার কয় আনাগোনা ...রিয়া, ছটফট করিতে করিতে অবশেষে তিনি ...ড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী চলিতে শুরু ...রিলে মুখ বাহির করিয়া বলিলেন—বিজয় ...মি করিমপুরের মক্কেলদের নিয়ে অন্য ...ড়ীতে এসো।

এই বলিয়াই গাড়ীর সিটে হেলান দিয়া ...হূর্তে মধ্যে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। ...বীন বুঝিল তাহার এস্টেটের প্রবীণ উকীল ...বুর ইচ্ছানিদ্রা। নবীনের মানবচরিত্র বুঝিতে এখনো অনেক বাকি।

শহর হইতে আদালত দুই মাইলের পথ। তারিণীবাবু প্রত্যহ এই পথটুকু যাতায়াত করিবার সময়ে ঘুমাইয়া লন। এই সময়ে ঘুমাইবার অনেক সুবিধা। প্রথমতঃ আহারান্তে বিশ্রাম হয়, দ্বিতীয়তঃ শহরের মধ্য দিয়া যাইবার সময়ে দর্শকগণ তাঁহার সম্বন্ধে যে সব আলোচনা করে, তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে না; তৃতীয়তঃ প্রত্যেক মক্কেলের নিকট হইতেই স্বতন্ত্রভাবে তিনি যাতায়াতের যে ভাড়া আদায় করিয়া থাকেন ঘুমের মধ্যে তাহা ভুলিবার প্রশস্ত সময়, কারণ আদালতে নামিয়াই তিনি এক দৌড়ে এজলাশে চলিয়া যান, তাঁহার সহগামীদের একজনকেই নূতন করিয়া আবার ভাড়া চুকাইয়া দিতে হয়।

গাড়ী আদালতের বটতলাতে পৌঁছিবা-মাত্র তারিণীবাবু ঘুম ভাঙিয়া একলাফে নামিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন, নবীন গাড়ীর ভাড়া চুকাইয়া দিল।

নবীন তারিণীবাবুকে খুঁজিতে লাগিল, অবশেষে দেখিতে পাইল তিনি জজ কোর্টের বারান্দায় জন দুই মক্কেলকে সঙ্গে লইয়া ষ্ট্যাম্প ভেণ্ডারের নিকট হইতে ষ্ট্যাম্প কিনিতেছেন। সে পিছনে গিয়া দাঁড়াইল।

তারিণীবাবু মক্কেল দ্বয়কে হিসাব বুঝাইতেছেন, বলিতেছেন—সোয়া বারো আনার তিনখানা, দশ পয়সার পাঁচ খানা হলো গিয়ে, হলো গিয়ে চার টাকা ছ' আনা, আর পেস্কার বাবু দুই টাকা, নাজির সাহেব চার টাকা হ'লো দশ টাকা বারো আনা, আর গাউন ফিঃ পাঁচ টাকা, তাহলেই হলো চার আনা কম ষোল টাকা। আমার ফিঃ না হয় পরেই দিয়ো।

গোলমাল বাধিল ওই গাউন ফিঃ ব্যাপার-টাতে। মক্কেলদ্বয় গাউন ফিঃ ব্যাপারটা বুঝিতে পারিতেছে না। তাহারা বলিল—বাবু গাউন ফিঃ আবার কি? ওই ফিঃ তো কখনো দিই নি।

তারিণীবাবু বলিলেন, জজ সাহেবের কাছে কখনো মামলা করেছ? তাই দাওনি।

তাহারা তখনো না বুঝিতে পারিয়া বলিল—সেটা আবার কি?

তারিণীবাবু তাহাদের ডাকিয়া লইয়া জজের এজলাসের দরজায় দাঁড়াইলেন। জজ সাহেবের সম্মুখে কয়েকজন উকীল গাউন পরিয়া মামলার সওয়াল জবাব করিতেছিল। তারিণীবাবু তাহাদের গায়ের গাউন দেখাইয়া বলিলেন—ওইগুলোকে গাউন বলে।

একজন বলিল—ওই যে নীল আলখাল্লা।

তারিণীবাবু হাসিয়া বলিলেন—আল-খাল্লা নয়, গাউন। তোমাদের মামলার সময়ে ওই জিনিস আমাকে প'রে দাঁড়াতে হবে।

অপর একজন বলিল—তার আর দরকার কি? আপনি কোট গায়ে দিয়েই দাঁড়ান, আমরা গরীব মানুষ।

তারিণীবাবু বলিলেন—মিঞা সাহেব, তোমরা গরীব মানুষ নও, ছেলে মানুষ! গাউন গায়ে দিয়ে না দাঁড়ালে জজ সাহেব আমার কথা কানেই তুলবেন না।

তখন অপর জন বলিল—ওই বাবুদের কাছে থেকে চেয়ে চিন্তে নেন না—

তারিণীবাবু বলিলেন—তার উপায় নেই, সাহেব। ওই গাউন থাকে জজ সাহেবের নিজের হেফাজতে। ও জিনিষ বিলাত থেকে আসে—একেবারে মহারাণীর নিজের হাতের শিলমোহর করা। দরখাস্ত ক'রে নিতে হয়—দরখাস্তের সঙ্গে নগদ পাঁচ টাকা জমা দিতে হবে। দাও, দাও, আর দেরী হ'লে অন্য উকীলবাবুরা বের ক'রে নেবে, আমি পাবোনা, তোমাদের মামলা ডিসমিস হ'য়ে যাবে। দাও, শীগগীর।

অগত্যা তাহাদের একজন দুইখানি দশ টাকার নোট বাহির করিল। অমনি তারিণী-বাবু তাহার হাত হইতে নোট দু'খানি এক প্রকার ছোঁ মারিয়া লইয়াই মুহূর্তে মধ্যে একটা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অপর দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। যাইবার সময়ে মক্কেলদের সংকেতে বলিয়া গেলেন তাহারা যেন ইতস্তত না ঘুরিয়া একটা বটগাছ তলাতে গিয়া বিশ্রাম করে। একটা বট গাছও নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিলেন।

নবীন তারিণীবাবুর অপূর্ব হিসাব ও গাউন ফিঃ শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল, নড়িতেও ভুলিয়া গেল। এমন সময় পিঠের উপরে আঘাত পাইয়া ফিরিয়া দেখিল তারিণীবাবু। তারিণীবাবু বলিলেন—একটু পলিটিকস করতে হ'ল, নইলে ওরা পয়সা বের করতেই চায় না. উকীলকে বিনা পয়সায় খাটিয়ে নেয়। তারপরে হাসিয়া বলিলেন—এ তোমাদের সাহিত্য নয় বাবাজী, সাহিত্য নয়—এ একটা 'লার্ণেড প্রফেশন।' চলো, উকীল ঘরে চলো, সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।

নবীন তারিণীবাবুর সঙ্গে যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিল তিনি নবীনের পরিচয় বুঝিয়া ফেলিয়াছেন, নবীন এখনো তাহার পরিচয় পায় নাই।

৩

শেক্সপীয়র আদালতের দীর্ঘসূত্রিতার কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু আদালতের ক্লান্তির উল্লেখ করেন নাই। দুপুরে বেলায় কয়েকঘণ্টা আদালতে ঘুরিলে একটা স্বাস্থ্যবান লোক ভাঙিয়া পড়িবে, অথচ উকীলবাবুরা এই তপ্তকটাহে দিনের পর দিন ভর্জিত হইতেছেন, ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই, তাঁহাদের মেধা ও মেদ বাড়িতেছে। মফঃস্বল আদালতের উকীলগণ সাধারণ মনুষ্য হইতে স্বতন্ত্র ধাতুতে গঠিত। আর মোক্তারবাবুরা একেবারে 'সুপার ম্যান।' আদালত হইতে ফিরিয়াই তাঁহাদের কাজ শেষ হয় না। গভীর রাত্রে প্রতিবেশীদ্বয়ের বেগুন ক্ষেতে ঢিল ছুড়িয়া সকাল বেলা উভয়ের মধ্যে ঝগড়া বাধিবার কারণ ঘটাইয়া থাকেন। কিছুক্ষণ পরেই তাহারা দুই মোক্তারের মক্কেল শ্রেণীভুক্ত হয়। ফল কথা, আদালত একটি কামরূপ কামাখ্যার মন্দির, এখানে একবার প্রবেশ করিলে ভেড়া না বনিয়া উপায় নাই।

তারিণীচরিত্র চিন্তা করিতে করিতে নবীন বাসায় ফিরিল. তাহার শরীর এমনি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, সে আর চলিতে পারিতেছিল না, কোন রকমে টলিতে টলিতে একখানা চৌকী টানিয়া লইয়া ছাদের উপরে বসিল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার পরে ভিতর হইতে মুক্তামালার আহ্বান আসিল। নবীন ভিতরে গিয়া স্নান করিল, চা-পান করিল, আবার এই ছাদটিতে আসিয়া বসিল। এই বাড়ির মধ্যে, এই শহরের মধ্যে এই ছাদটুকুই বিশেষ করিয়া তাহার আশ্রয়। ছাদের ঠিক নীচেই পদ্মা।

নবীন সম্মুখে তাকাইয়া দেখিল, ভাদ্রের ভরা পদ্মা কূলে কূলে কানায় কানায় পূর্ণ—যেন আর এক ফোঁটা জল বাড়িলেই কানা ছাপাইয়া যাইবে। দক্ষিণে যতদূর তাকানো যায় একটানা জলরাশি, মাঝখানে এক জায়গায় কতকগুলি গাছের আভাস, বুঝিতে পারা যায় ওখানে একটা স্থায়ী চর আছে, তারপরেই আবার জলরাশি—দক্ষিণের দূরতম দিগন্তে একটি অনতিস্থূল দীর্ঘ রেখা—নবীন বুঝিল ওটাই নদীর প্রসারের সীমা। ভরা পদ্মার প্রচণ্ড স্রোত, কিন্তু জলতলের বিস্তারের জন্য তাহা বুঝিতে পারা যায় না,

কেবল নৌকাগুলির দিকে তাকাইলে বুঝিতে পারা যায়, তাহাদের গতি কি তীব্র!

আদালতের গ্লানিকর অভিজ্ঞতার পরে এখানে বসিবামাত্র নবীনের সমস্ত ক্লান্তি, সমস্ত বিরক্তি দূরে হইয়া গেল—তাহার সমস্ত সত্তা যেন আরামে 'আঃ' বলিয়া নিশ্বাস ফেলিল। নিকটেই মুক্তামালা আর একখানা চৌকি টানিয়া বসিল। বলিল, এত বড় নদী আমি দেখিনি।

নবীন উত্তর দিল না, তাহার মন মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই মুক্তামালাও পদ্মার ইন্দ্রজালে মুগ্ধ হইয়া নীরবে তাকাইয়া রহিল; দুইজনেই শিশুর মতো অবাক নেত্রে দেখিতে লাগিল। মহৎ প্রকৃতির নিকটে মানুষ মাত্রেই শিশু।

পূর্বদিক হইতে বাতাস আসিতেছে, পূবে আকাশ হইতে মেঘ ভাসিতেছে, কালো মেঘের ছায়া জলে পড়িতেছে, ঘোলা জল কালো হইতেছে, নৌকার শাদা পালের উপরে পড়িয়া শাদা ম্লান হইতেছে, মেঘে মেঘে মিশিয়া এক হইতেছে, ছায়ায় ছায়ায় একাকার হইতেছে। পশ্চিম দিগন্তের এক স্থানে মেঘ নাই, সেখানে সূর্যাস্তের আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছে—সূর্যের স্বর্ণ তোরণ ধীরে ধীরে জলের তলে চলিয়া যাইতেছে—জলের উপরে বিগলিত সূর্যকিরণ। হঠাৎ নদীর পশ্চিম প্রান্ত হইতে পূর্ব তীর পর্যন্ত জলের উপরে কে যেন একটা স্বর্ণ সেতু প্রসারিত করিয়া দিল। সেই ছায়াময় সেতু দেখিয়া নবীনের প্রাচীন কাহিনীর দুর্গ সেতুর কথা মনে পড়িয়া গেল—সন্ধ্যার প্রাক্কালে সেতু নামাইয়া দিয়া শেষ আশ্রয়প্রার্থীটিকে যখন দুর্গের মধ্যে সংগ্রহ করা হইত। নবীনের মনে হইল প্রকৃতি তাহার স্বর্ণ সেতু বিস্তারিত করিয়া দিয়াছে, মানুষের সংসারের দিকে, প্রকৃতির কোলের পরমাশ্রয় প্রার্থীর দিকে। এমন দিনের পর দিন, যুগের পর যুগ চলিতেছে মানুষ বড় একটা চাহিয়া দেখে না। তাহার অনেক বেশী ঝোঁক আদালতের দিকে, তারিণীবাবু তাহার তরণের জন্য যে পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন তাহার প্রতি মানুষের অত্যধিক বিশ্বাস।

নবীন আবার তাকাইয়া দেখিল সমস্ত জলতল সমাপ্ত-দিগ্বিজয় সম্রাটের অসির মতো রক্তাক্ত। ধীরে ধীরে রক্তচিহ্ন ফিকে হইয়া আসিল। জলতল পাটল, ধূমল, কৃষ্ণ—সমস্ত অন্ধকার। আকাশের মেঘের ফাঁকে ফাঁকে তখন তারা উঠিয়াছে।

ক্রমে অন্ধকার নিবিড় হইয়া আসিল, রাত্রি গভীর হইল, মুক্তামালা ও নবীননারায়ণ পাশাপাশি দুইখানি চৌকিতে নীরবে বসিয়া রহিল, কেহ কোন কথা বলিল না। দিবসের কর্মকোলাহলস্তব্ধ নৈশজগতে পদ্মার গর্জন কোনো অতিকায় দৈত্য গুণীর এক-তারার অপার্থিব সঙ্গীতের মতো অনন্যশব্দ সেই প্রহরগুলিকে প্লাবিত করিয়া ধ্বনিত হইতে থাকিল। কল, কল, ছল ছল, খল খল, গল গল, ঘল ঘল—অবিরাম, অবিশ্রান্ত অনাদ্যন্ত, অনন্ত! মেঘাচ্ছন্ন আকাশে তারা নাই। নদীতে নৌকা নাই, নৌকায় দীপ নাই, ভাদ্র মাসের মন্থর বায়ুমণ্ডলে বায়ু তরঙ্গ নাই, অন্ধকার জগতে স্পর্শযোগ্য বস্তু নাই—বিশ্ব যেন একমাত্র শ্রবণেন্দ্রিয়ে পরিণত, আর তাহার বিষয়-স্বরূপে সমস্ত বিশ্ব যেন শব্দরূপে পরিগ্রহ করিয়াছে—কল কল ছল ছল, খল খল, গল গল, ঘল ঘল! নবীনের মনে হইল—সৃষ্টির আদি গোমুখী নিঃসৃত অনাদি নাদব্রহ্ম অবিরাম নির্গলিত হইতেছে। তাহার মনে হইল স্রষ্টার মানসকুহর হইতে বিশ্বের আদি রূপ নিঃসারিত হইয়া চলিয়াছে পদ্মা নহে, পদ্মযোনির বেদধ্বনি উদ্গীরণ। নবীন চাহিয়া দেখিল আকাশের দূরতম প্রান্তের গূঢ় ভবিষ্যতের মতো ঘনকৃষ্ণ শিলাখণ্ডের উপরে বিদ্যুতের বহ্ন্যক্ষর ইন্দ্রের বৈদিক স্তবমন্ত্রকে মুহুর্মুহু ক্ষোদিত করিয়া দিতেছে। প্রাক্‌সৃষ্টিপূর্ব এক অপূর্ব অভিজ্ঞতায় নবীনের সমস্ত শরীর মন কণ্টকিত হইয়া উঠিল, চিন্তার শক্তি তাহার রহিত হইল।

অনেকক্ষণ পরে কতক্ষণ পরে না জানি, রাত্রি তখন কত গভীর না জানি, মুক্তামালা বলিল—শুতে চলো।

নবীন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া মূঢ়ের মতো শুইতে চলিল। বিছানায় গিয়া শয়ন করিল বটে, কিন্তু তাহার ঘুম আসিল না। নবলব্ধ অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাহার জীবনের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার কিছুতেই সে সামঞ্জস্য করিতে পারিতেছিল না। দিনের বেলায় আদালতে গিয়া মানুষের এক রূপ দেখিয়া আসিয়াছে, আবার রাত্রের আর এক রূপ তাহার চোখে এই মাত্র উদ্ভাসিত হইয়াছে। দুই-ই বিশ্বের অন্তর্গত। কিন্তু দুই-ই কি সত্য? দুই-ই কি সমান সত্য? সত্যের কি শ্রেণী ভেদ সম্ভব? তাহার মনে হইল, অগ্নিশিখা ক্ষুদ্র বৃহৎ হইতে পারে, কিন্তু দাহিকা শক্তির বিচারে সব অগ্নিই সমান, সব অগ্নিই এক। তবে সত্যের আবার শ্রেণী ভেদ কিরূপে সম্ভব? তবে কি এ দুইটি সমান সত্য নয়? অর্থাৎ একটা সত্য আর একটা মিথ্যা, অথবা একটা সত্য আর একটা তাহার বিকার, যেমন লোহ আর মরিচা! অথবা এ দুই-ই সত্য কেবল শক্তির অভাবে নবীন তাহাদের সমন্বয় করিতে পারিতেছে না।

এই রকম কত কি ভাবিতে ভাবিতে কখন সে ঘুমাইয়া পড়িল। অনেক বেলায় যখন তাহার ঘুম ভাঙিল প্রথমেই মনে পড়িল এখনই তারিণীবাবুর কাছে যাইতে হইবে। তাহার মনটা বিমর্ষ হইয়া গেল।

৪

জোড়াদীঘি ছাড়িয়া নবীননারায়ণকে সহসা কেন সদরে আসিয়া বাসা লইতে হইল? কিছুকাল আগে একটা চরের দখল লইয়া ছ'আনি দশানিতে বিবাদ বাধে। সেই বিবাদের ফলে দুই পক্ষের লাঠিয়ালে মারামারি হইয়া উভয়ের পক্ষের কয়েকজন লাঠিয়াল আহত হয়। নিরপেক্ষ দারোগা রামনাথবাবু তদন্ত করিয়া দুই পক্ষের কয়েকজন লাঠিয়ালকে চালান দেন। প্রাথমিক তদন্তের ফলে মহকুমা হাকিম তাহাদিগকে সেশনে প্রেরণ করিয়াছেন। সেশনের বিচার হইবে জজের কাছে—সদরে। এই মামলার যথোপযুক্ত তদ্বিরের জন্যই নবীন শহরে আসিতে বাধ্য হইয়াছে।

নবীনের নায়েব ও অন্যান্য কর্মচারিগণ তাহাকে বুঝাইয়াছিল যে, এই সামান্য কাজের জন্য হুজুরের শহরে যাওয়া উচিত নয়—মান-মর্যাদার হানি হইবে। কিন্তু এই যুক্তি নবীনের মনে ধরিল না, সে ভাবিল, বলিল যে, যাহারা তাহার জন্য আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছে তাহারা যাহাতে সুবিচার পায় সে দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে তাহার।

কর্মচারীরা বলিল—দশানির বাবু তো গ্রামেই রহিলেন তবে তাঁহারই বা শহরে যাইবার প্রয়োজন কি?

এ যুক্তিটাও নবীনের নিকটে অচল বলিয়া মনে হইল। সে বলিল, দশানির বাবুর কর্তব্য-বোধকে সে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না।

বস্তুত ছ'আনির বাবু শহরে মামলা তদ্বিরের উদ্দেশ্যে গেলে আর কাহারও না হোক, তাহার কর্মচারীদের বিশেষ অসুবিধার কারণ ছিল—একরূপ খরচ করিয়া আর একরূপে হিসাব লিখিবার জন্মগত স্বাধীনতা লোপ পাইবে বলিয়া তাহাদের বিশেষ আশঙ্কা ছিল।

নবীন অভিযুক্ত লাঠিয়ালদের পরিবারবর্গের মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া সপরিবারে শহরে চলিয়া আসিল।

ইহা দেখিয়া কীর্তিনারায়ণ খুব একচোট হাসিয়া লইল। বলিল, ভায়া এইভাবে মামলা তদ্বির ক'র্‌বেন তা হলেই হয়েছে। আদালত থেকে আদালতে ঘুরেই যে দম ফুরিয়ে যাবে। বাবা—এসব এম-এ, বি-এ পাশ করা নয়। দেখো না কেন, আমি তো কোথাও যাইনি, তবু আমার লাঠিয়ালদের জামীনে খালাস ক'রে আনলাম—আর, আমার ভায়ার।

কীর্তিনারায়ণ এই গর্বটুকু করিলে করিতে পারেন, যেহেতু নবীননারায়ণ অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহার পক্ষের লাঠিয়ালদের জামীনে

ক্ত করিতে পারে নাই। এমন যে হইল, তার রণ আইনের পুস্তকগত সদর রাজপথটাই বীন জানে। কিন্তু আইনের রাজ্যে রাজপথের য়ে গলিঘুজির মাহাত্ম্যই অধিক—সে-সব ন্ধিসন্ধির খবর আদর্শবাদী নবীনের সম্পূর্ণ জ্ঞাত। দশানির বাবু ফরাসের উপরে ড়াইতে গড়াইতে কোথায় কি কলকাঠি নাড়িয়া ল, তাহার পক্ষের লোকে জামীন পাইল, বীনের লোকে পাইল না।

* * * *

নবীনের বাসার নীচের তলাটা মামলার ক্ষী-সাবুদে সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া কাইয়া বসিয়াছে। সাক্ষীদের প্রধান টোলের ড়ো শশাঙ্ক ঠাকুর। স্বাভাবিক টানে তাহার নির দিকে যাইবারই কথা—কিন্তু একটা স্বাভাবিক টানে সে ছ'আনির পক্ষভুক্ত হইয়াছে। সি মুক্তামালার সঙ্গে শহরে আসিয়াছে।

ছ'আনির অপর একজন সাক্ষী নীলাম্বর ষের কনিষ্ঠ পুত্র পীতাম্বর। জ্যেষ্ঠপুত্র ম্বর দশানির প্রধান সাক্ষী। নীলাম্বর য গীতাধ্যয়নের ফলে এই দিব্যজ্ঞান লাভ রিয়াছে যে, স্বয়ং নারায়ণ ও নারায়ণী-সেনা চীনকালে পাণ্ডব ও কৌরব পক্ষভুক্ত হইয়া রক্ষালের জন্য নিরপেক্ষতার দৃষ্টান্ত স্থাপন রিয়া গিয়াছেন। সেই মহৎ দৃষ্টান্ত অনুসরণ রিয়া নীলাম্বর দুই পুত্রকে দুই পক্ষে ভর্তি রিয়া দিয়াছে,—যে পক্ষই জয়লাভ করুক, নি ফাঁকিতে পড়িবেন না। গীতাকে তেমন রিয়া অধ্যয়ন করিতে পারিলে সাংসারিক তির সোপান না হইয়া যায় না।

আজ রবিবার। আদালত নাই, কিন্তু দালতের নেপথ্য বিধান আছে। তারিণীবাবু বিজয় মুহুরি ছ'আনির পক্ষের সাক্ষীদের লিম দিবার উদ্দেশ্যে ছ'আনির বাসা বাড়িতে সিয়াছেন।

নীচের তলার বড় হলঘরে দ্বিপ্রহরের রান্তে সাক্ষী শিখানো চলিতেছে। আনির প্রধান সাক্ষী শশাঙ্ক পণ্ডিত ও তাম্বর ঘোষ।

তারিণীবাবু সূত্রধরের ভূমিকায় অবতীর্ণ য়া বলিতেছেন—আমাদের মামলা হচ্ছে যে, কুন্দপুরের চর আবহমানকাল থেকে ছ'আনির লে। ছ'আনির প্রজারা চিরকাল এই চরে ষ করে আসছে। যেদিন মারামারি হয়, দিনও সকালে তারা চাষ করছিল, এমন সময়ে আনির লাঠিয়ালেরা গিয়ে তাদের মারপিট রু করে দেয়।

তারপরে একটু থামিয়া বলিলেন—এবারে ানবাবু বলে দিন সেদিন সকালে আপনাদের ন্য কোন্ প্রজা চাষ করছিল?

ঘাড়-টান পঞ্চানন কাগজপত্র ঘাঁটিয়া বলিল , রহিম আর করিম দুই ভাই আউশ ধান নিবার জন্যে লাঙল দিচ্ছিল—

তারিণীবাবু বলিলেন—বেশ, বেশ, তাহলে রহিম আর করিমকেও সাক্ষী মান্‌তে হয়—

এমন সময়ে শশাঙ্ক তারিণীবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল—মহাশয়, যদি ধৃষ্টতা মাপ করেন, তবে আমি একটা কথা বলি। রহিম আর করিম না লিখে রহিম আর কেদার লিখুন।

তারিণীবাবু বলিলেন—কেন?

শশাঙ্ক বলিল রহিম ও করিম আর রহিম আর কেদার চারটা নামই সমান সত্য। এ রকম ক্ষেত্রে যে সত্যে অধিকতর ফললাভের আশা তাই করতেই শাস্ত্রকারগণ পরামর্শ দিয়াছেন।

তাহার যুক্তির ধারা সকলে অনুসরণ করিতে অসমর্থ দেখিয়া ব্যাখ্যার ছলে শশাঙ্ক বলিল—মহাশয়, দিনকাল খারাপ। বিচারক যদি হিন্দু হয়, তবে দুটি মুসলমান নামে তাহার সুবিচার ইচ্ছা জাগ্রত না করিতেও পারে, আবার বিচারক মুসলমান হলে দুটি হিন্দু নাম তেমন ফলপ্রদ না হতেও পারে, কিন্তু একজন হিন্দু আর একজন মুসলমান হলে বিচারক যিনিই হোন না কেন, সুফল অবশ্যম্ভাবী।

তাহার অকাট্য যুক্তিতে তারিণীবাবু চমৎকৃত হইলেন, বলিলেন—পণ্ডিত মশায়, এ প্রতিভা কোথায় পেলেন?

শশাঙ্ক সবিনয়ে বলিল—গীতা পাঠ করেছি কিনা, তবু তো এখনও সমাপ্ত করতে পারিনি।

তারিণীবাবু বলিলেন—গীতা তো আমিও পড়েছি, রোজ সকালে এক অধ্যায় করে পাঠ করি। কিন্তু কই এমন—বিস্ময়ে আর কথা বলিতে পারিলেন না।

শশাঙ্ক বলিল—হবে, হবে। সবই গুরুর ইচ্ছা। বলিয়া সে কপালে হাত ঠেকাইল।

তখন তারিণীবাবু বলিলেন—পঞ্চাননবাবু তবে তাই লিখে নিন। রহিম আর কেদার আর পাশে লিখে রাখুন, একজন মুসলমান, অপরজন হিন্দু।

পঞ্চানন সেইরূপে লিখিয়া লইল।

তারিণীবাবু বলিলেন—পণ্ডিত মশায়, আপনি তো দেখলেন যে, দশানির লেঠেলরা এসে ওদের উপরে চড়াও হ'য়েছে।

শশাঙ্ক বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

তারিণীবাবু পুনরায় শুধাইলেন—কিন্তু মুকুন্দপুরের চর জোড়াদীঘি থেকে দশ মাইল পথ, আপনি হঠাৎ সেখানে গেলেন কেন?

শশাঙ্ক বলিল—গোবিন্দপুর থেকে ফিরছিলাম, পথে মুকুন্দপুরের চর পড়ে—

তারিণীবাবু প্রশ্ন করিতে লাগিলেন—আর শশাঙ্ক উত্তর দিতে লাগিল।

—গোবিন্দপুরে কেন গিয়েছিলেন?

—আমার একজন খাতক ওখানে থাকে।

—আপনি কি তেজারতির ব্যবসা করেন?

—অল্প স্বল্প ক'রে থাকি।

—বেশ; কিন্তু পীতাম্বর ঘোষের সঙ্গে দেখা হলো কোথায়?

—মুকুন্দপুরের বড় বটগাছের তলায়।

তারিণীবাবু বলিলেন, পীতাম্বরবাবু আপনি হঠাৎ ওখানে গেলেন কেন?

পীতাম্বর ঘোষ বলিল—আজ্ঞে, শ্বশুরালয় থেকে ফিরছিলাম।

তারিণীবাবু বহুক্ষণ ধরিয়া দুইজনকে জেরা করিলেন; কিন্তু দুই সাক্ষীই ভগবদ্দত্ত সত্যদর্শনের ক্ষমতা লইয়া অবতীর্ণ। তাহাদের বর্ণিত ঘটনায় কোথাও রন্ধ্র আবিষ্কার করিতে পারিলেন না—আনন্দে বলিয়া উঠিলেন, এমন এক জোড়া সাক্ষী পেলে আমি মামলায় দিগ্বিজয় করে আসতে পারি।

এমন সময়ে রাস্তায় শব্দ উঠিল—চাই ক্ষীরমোহন।

সাক্ষী, উকিল সকলে একযোগে উৎকর্ণ হইয়া উঠিল।

তারিণীবাবু বলিলেন—বিজয় ও, বুঝি মোহন ময়রা? আহা, ও-রকম ক্ষীরমোহন তৈরী করতে আর কাউকে দেখলাম না।

পঞ্চানন ইঙ্গিত বুঝিয়া ক্ষীরমোহন-ওয়ালাকে ডাকিল।

ময়রা ভিতরে ঢুকিতেই তারিণীবাবু শুধাইলেন—কি মোহন, ভালো তো?

মোহন বলিল—আজ্ঞে নিজের মুখে আর কি বলবো—

শশাঙ্ক বলিল—তার চেয়ে আমাদের মুখেই পরীক্ষা হোক, এই বলিয়া একটা ক্ষীরমোহন তুলিয়া লইয়া আলগোছে মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিল। তারপরে আর একটা, তারপরে আর একটা।

—পণ্ডিতমশায়, বলুন না কেমন? বলিয়া তারিণীবাবু মুখে একটা একটা করিয়া ক্ষীর-মোহন ফেলিতে লাগিলেন। তখন উকিলে আর সাক্ষীতে ক্ষীরমোহন গ্রাসের একপ্রকার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইল। আর সকলে ক্ষীয়মান আধার লক্ষ্য করিয়া ক্রমেই অধিকতর বিমর্ষ হইতে লাগিল।

কিছুক্ষণের মধ্যে পাঁচ-ছয় সের ক্ষীরমোহন উদরসাৎ করিয়া তারিণীবাবু ও শশাঙ্ক দুজনেই স্বীকার করিল, মিষ্ট উৎকৃষ্ট; কিন্তু তাঁহাদের সেই পূর্বের আহার-শক্তি আর নাই।

তারিণীবাবু উদারভাবে বলিলেন—মোহন দাও, সকলের হাতে হাতে দিয়ে দাও। তখন বাকি সকলে মুহূর্ত মধ্যে ভাণ্ডটির উপরে গিয়া পড়িল।

দোতালার বারান্দা হইতে নবীন তাহার এস্টেটের প্রবীণ উকিলবাবুর ও প্রধান সাক্ষী শশাঙ্কের সর্বগ্রাসী শক্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইল এবং কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্নও হইল। তাহার মনে হইল, মামলা শেষ হওয়া পর্যন্ত ইঁহারা দুই-জনে বাঁচিয়া থাকিলে হয়। এত ঠেকিয়াও নবীনের কিছুমাত্র সাংসারিক জ্ঞান হয় নাই—সংসারে সর্বগ্রাসীরাই চিরজীবী।

(ক্রমশ)

পুতুল

হরিনারায়ন চট্টোপাধ্যায়

প্রথমে দূরাগত একটা অস্পষ্ট কলরব তারপর আরো এগিয়ে আসে চীৎকারের রেশ! ভোরের ঠাণ্ডার ভয়ে মাথার দিকের জানালাটা বন্ধ করে রাখেন রামলোচনবাবু। আজ বলে নয়, এ তাঁর চল্লিশ বছরের অভ্যাস। কে বলতে পারে ঠাণ্ডা একটা হাওয়ার ঝলক অনায়াসে ঢুকে পড়তে পারে ঘরের মধ্যে, তারপর ঘুমন্ত অবস্থায় হঠাৎ যদি ঠাণ্ডা লেগে যায়, সর্দি জমে যায় বুকে, তা থেকে কিনা হ'তে পারে মানুষের। যে কোন রকমের সাংঘাতিক একটা রোগ—ওই শুধু একটু ঠাণ্ডা হাওয়া লাগার অপেক্ষা।

আজকাল অবশ্য দাঙ্গাহাঙ্গামার জন্য কাছের দূরের সব কটা জানলাই বন্ধ ক'রে দেন রামলোচনবাবু। বলা যায় নাকি কখন কি অঘটন ঘটে! ভারি আশ্চর্য বোধ হয় তাঁর। হিন্দু-মুসলমানে আবার কিসের লড়াই। এতদিন তো লড়াই চলেছিলো ইংরাজদের সঙ্গে, যারা মুখের ভাত আর অঙ্গের বসন ছিনিয়ে নিয়েছিলো, শক্ত থামের সঙ্গে লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছিলো সবাইকে, মাঝে মাঝে বাঁধন একটু আলগা দিয়ে মজাই দেখছিলো বুঝি! বোঝা-পড়া ছিলো তাদের সঙ্গে। কিন্তু মাস কয়েক ধরে এ আবার কি শুরু হয়েছে!

ভেবেই কূল পান না রামলোচনবাবু। অনেকদিন আগেকার টুকরো টুকরো কথাগুলো ভীড় করে আসে মনের সামনে। ঠিক তাঁদের বাড়ীর পাশেই ছিলো হানিফ গাজীর ঘর: মধ্যে কেবল কয়েকটা রাংচিতার সার। ও'র বাপের জমি জমা নিয়ে চাষ করতো হানিফ। চাষও করতো আবার নতুন চর উঠলে ধলাই নদীর বুকে, মোটা লাঠি আর সড়কি হাতে ছুটতো সবার আগে। কতদিন চাকরদের নজর এড়িয়ে হানিফের ঘরের দাওয়ায় গিয়ে দাঁড়াতেন রামলোচনবাবু।

ঃ আরে, বড় রাজপুত্তুর যে কি খবর?

তখনকার দিনে ভারি ভালো লাগতো এই সম্বোধনটুকু। পিসীমার কোলে শুয়ে শোনা রূপকথার রাজপুত্র, বিরাট নীল পক্ষীরাজ ঘোড়ার পিঠে চড়ে পাহাড় পর্বত নদনদী ডিংগিয়ে কেশবতী কন্যার খোঁজে সে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াতো, তার সঙ্গে তিনি মিশে একাকার হ'য়ে যেতেন।

কিন্তু শুধু এইটুকুর জন্যই যেতেন না রামলোচনবাবু। আস্তে আস্তে দাওয়ায় উঠে দাঁড়াতেন হানিফের পিছনে তারপর খুব মৃদু গলায় বলতেন ঃ হানিফ চাচা, কত জামরুল হ'য়েছে তোমার গাছগুলোয় এবার।

হানিফ প্রথম প্রথম যেন আমলই দিতো না তেমন। মুখ নিচু করে হাসতো আর মাথাটা হেঁট করে তালপাতার পাখা বুনতে বুনতে বলতো ঃ হ'য়েছে নাকি। ভালোই হ'লো পাখ-পাখালীরা জামরুল খেয়ে বাঁচবে এবার।

কথাটা বিশেষ ভালো লাগতো না রামলোচন-বাবুর। পাখীদের জন্য কিসের এত ভাবনা। ওরা খেলো বা না খেলো। তার চেয়ে ওকে পিঠে নিয়ে অনায়াসেই তো জামরুল তলায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে হানিফ। কত আর উঁচু গাছগুলো দু একটা নিচু ডালের ঠিক নাগাল পেয়ে যাবে।

কিন্তু এত সব কথা হানিফকে বলতে কেমন যেন বাধো বাধো ঠেকতো। থাক্‌গে, কি আবার ভাববে হানিফ চাচা!

হানিফ কিন্তু ভাবতো না এ সব কিছু। কাজের ফাঁকে ফাঁকে মুখ তুলে দেখতো রামলোচনবাবুর দিকে আর এক সময়ে বলতো ঃ জামরুল কিন্তু ফল হিসেবে ভারি চমৎকার, বড় রাজপুত্তুর। ফলেদের মধ্যে আমীর।

আমীর কথাটার সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না রামলোচনবাবুর কিন্তু তবুও এ বিষয়ে হানিফের সঙ্গে তিনি একমত। জামরুলের মতন ফল আর আছে নাকি সংসারে!

রামলোচনবাবুকে একেবারে অবাক করে দিয়ে হানিফ চালের বাতা থেকে একটা আঁকশী টেনে বের করতো। প্রকাণ্ড আঁকশী, আগাতে দড়ির থলি বাঁধা। একটি জামরুলও মাটিতে পড়বার উপায় নেই। আনন্দে একেবারে হাততালি দিয়ে উঠতেন রামলোচনবাবু।

এ সব যেন অনেক যুগের কথা। তারপর কোথা থেকে কালো মেঘ এসে জমা হ'লো এদিকে ওদিকে—জমাট কালো মেঘ। ধুলোর ঝাপটায় অন্ধকার হ'য়ে আসলো চারপাশ। কুৎসিৎ সন্দেহ আর বিদ্বেষ, ধর্মের নামে অপপ্রচার। মিথ্যা বালির চর পড়ে পড়ে প্রকাণ্ড ব্যবধানের সৃষ্টি হ'লো দুজনের মাঝখানে।

বিছানার ওপরে উঠে বসেন রামলোচনবাবু। গুমোট গরম। ঘামে ভিজে গিয়েছে সমস্ত বিছানাটা। অনেকগুলো কণ্ঠের সম্মিলিত আওয়াজ ভেসে আসে। আজ ব'লে নয়, রোজ রাত্রে এই ধরণের চীৎকার। ক্ষেত-খামারের মধ্যে জন্তু-জানোয়ার ঢুকে যেন ফসল না নষ্ট করতে পারে, সেই জন্য উঁচু মাচা থেকে মাঝে মাঝে চীৎকার করতো চাষীরা—উৎকট এক চীৎকার। তেমনি চীৎকার করে কি তাড়াচ্ছে এরা সবাই!

সব যেন গোলমাল হ'য়ে গেছে। তাঁর মেজ ছেলে লিখেছে দেশ থেকে করিমের কথা। হানিফ চাচার ছেলে করিম, লড়াইয়ের বাজারে মোটা কণ্ট্রাক্টের দৌলতে ফুলে ফেঁপে একেবারে লাল হ'য়ে উঠেছে। আগে দেখা হ'লেই ছুটে এসে দাঁড়াতো সামনে, আদাব করতো নিচু হ'য়ে। আজ আর কিন্তু ধারে কাছে ঘেঁষে না। বরং উল্টো সব কথা বলে ঃ বাবুদের তালুকমুলুক ও সব তো আমাদেরই রক্ত নিঙড়ে করা। চাকা ঘুরেছে ভাইসব আর ভয় নেই!

কিসের ভয় ছিলো এতদিন সে কথা খুলে বলে না করিম, কিন্তু রাংচিতার বেড়ার বদলে, প্রকাণ্ড ইঁটের চার হাত পাঁচিল উঠেছে দুজনের জমির মাঝখানে—শক্ত পাকা পাঁচিল—লাল রংয়ের আর মধ্যে মধ্যে চাঁদ আর তারা খোদাই করা থামের মাথায়।

শুধু কি করিম? বিশ বছরের পুরোনো গাড়োয়ান জাহির মিয়ারও ওই এক কথা।

ঃ আমাকে ছুটি করে দিতে হবে বাবু।

ঃ সেকিরে ছুটি,—হাত থেকে গড়গড়ার নলটা খসে পড়ে যায় রামলোচনবাবুর ঃ কিসের ছুটি?

সত্যিই কিসের ছুটি! গাড়ী এখন তার ব্যবহার করেন না রামলোচনবাবু। ঘোড়ার গাড়ীর রেওয়াজ নেই আজকাল। তাঁর ছেলেরা নতুন ঝকঝকে মোটর কিনেছে একটা। কিন্তু তবু এতদিনের সম্পর্কটা চুকিয়ে দিতে পারেননি তিনি ঃ তুই থাক জাহির। কোথায় যাবি এই বুড়ো বয়সে। মোটরটা ঝাড়পোঁছ করবি আর সময় পেলে দুই বুড়ো বসে বসে গল্প করবো'খন।

সেই থেকে রয়ে গিয়েছিলো জাহির। ভোরবেলা সামনের পার্কে পায়চারি করতেন রামলোচনবাবু, সঙ্গে থাকতো জাহির। বেড়ানোর চেয়ে সুখ-দুঃখের গল্পই হতো বেশী। পুরোনো দিনের সব হাসিকান্না, আমোদ-আহ্লাদেরই গল্প।

অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারেন না রামলোচনবাবু ঃ তুই চলে যাবি জাহির? হঠাৎ?

ঃ হঠাৎ নয় বাবু, অনেক দিন ধরেই বলবো বলবো ভাবছি, কিন্তু কেমন যেন সরম

াগেছিলো। এখান থেকে না গেলে আমার েলের ভালো চাকরী হবে না বাবু—আমার ওই কটি মাত্র ছেলে।

অসহায়ের ভংগীতে মুখটা তোলেন মলোচনবাবু। সত্যিই কি জাহির বলছে এই ব কথা?

ঃ সরকারের অফিসে চাপরাশীর কাজের না কমাস ধরে চেষ্টা করছিলো রহমান, কিন্তু ফিসের লোকেরা বলে দিয়েছে যে চাকরী েতে হলে তার বাপকে অন্য জাতের গোলামী ড়তে হবে, নইলে কিছু হবে না। আমি তদিন কিন্তু জানতাম না বাবু যে আপনারা মরা অন্য জাত। আপনারাও ফাঁকি দিয়ে সেছেন, কিছু বলেন নি আমাকে। ছেলেটার দ একটা সুরাহা হয়, কিসের মায়ায় ভিন্ন াতের দরজায় পড়ে থাকবো বলুন?

রামলোচনবাবু আর জাহিরের মাঝখানে স্পষ্ট ধোঁয়ার কুণ্ডলী একটা। কোথায় তোলা ান ধরানো হয়েছে বুঝি, বিশ্রী একটা শ্বেট ধোঁয়ার তরল স্রোত। ভালো করে দেখা য় না জাহিরের মুখ। কিন্তু কেমন যেন েদেহ হয় রামলোচনবাবুর। জাহিরই বললো থাগুলো, না জাহিরের গলায় আর কেউ চ্চারণ করলো এসব।

জাহির যাবার পর থেকে আর ভোরে ায়চারি করেন না রামলোচনবাবু। বাড়ির য়েরা অনুযোগও করেছে অনেকবারঃ অনেক-দিনের অভ্যাস বাবা, চট করে ছাড়া কি ঠিক বে? গৌতম তো রয়েছে, সেই যাবেখন সংগে।

বাড়ির উড়ে চাকর গৌতম। বৌমাদের েলেপুলের ভার তার ওপরে। না থাকঃ ড়িয়ে গেছেন রামলোচনবাবুঃ ভোরের দিকে াড়াবো না আর। ওই বিকেলের দিকেই াঁটবো একটু আধটু।

কেমন যেন ভয় হয় তার। আবার কোনদিন েত চৌকাঠের কাছে এসে দাঁড়াবে গৌতম। লবেঃ চল্লুম বাবু তোমরা আমরা তো ভিন্ন াত। তোমাদের ঘরে থাকলে দেশের লোক কঘরে করবে আমাদের। জল ছোঁবে না কেউ। া থাক্, কিসের বেড়ানো। কটা দিনের জন্যই বা।

মশারীটা তুলে খাটে পা ঝুলিয়ে বসেন ামলোচনবাবু।

আওয়াজটা আরো যেন এগিয়ে আসে। খুব াছে বলে মনে হয়। অনেকগুলো লোকের কটানা চীৎকার। ওপরের ঘরের জানলা খোলার শব্দ হয়। ঠিক ওপরেই থাকে ওঁর বড় ছেলে। তার গলার আওয়াজও পাওয়া যায়। তারপরই চটির শব্দ,—সিঁড়ি দিয়ে কে নেমে াসে। ফটকের চাবি খোলার শব্দও কানে যায়।

আস্তে আস্তে উঠে দরজা খুলে বেরিয়ে াসেন রামলোচনবাবু।

পাতলা অন্ধকার। রাস্তার গ্যাসের বাতি-গুলোর ম্লান শিখা। দাওয়ার কাছ বরাবর গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। সর্বনাশ, কি হলো আবার। তাঁর গেটের সামনে কিসের এত ভীড়। বড় ছেলে হাত নেড়ে কি যেন বোঝায় উত্তেজিত জনতাকে। সব কিছু মিলে খুব একটা হৈ চৈ।

পায়ে পায়ে ফটকের দিকে এগিয়ে যান রামলোচনবাবু। ফটকের ওপারে অনেকগুলো লোকের ভীড়। কয়েকজনের হাতে বাঁশের লাঠি,—দু'একজনের কাছে পার্কের রেলিং ভাঙা লোহার ডাণ্ডা। পাড়ারই ছেলেছোকরা বলে মনে হয়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখ দুটো কুঁচকে দেখেন রামলোচনবাবু,—ভটচায মশাইয়ের সেজ ছেলে যদুই হাত-মুখ নাড়ে সবচেয়ে বেশী, তার পাশে বোসেদের অনাদিও রয়েছে। বাকিগুলোকে ভালো করে ঠাওর করে উঠতে পারেন না তিনি। এখনও অন্ধকার ছড়ানো রয়েছে এখানে ওখানে।

ঃ ব্যাপার কি অমরেশ, ভীড় কিসের এত।

ঃ না, কিছু নয়, আপনি আবার এই ভোরে উঠে এলেন কেন বিছানা ছেড়ে।

ব্যাপারটা যেন একটু ঢাকতে চেষ্টা করে অমরেশ।

ঃ এই হট্টগোলে মানুষের শুয়ে থাকাও তো সম্ভব নয়। ব্যাপারটা কি বলো তো?

অমরেশ কিছু বলবার আগেই চীৎকার করে ওঠে কে একজন। পাড়ারই ছেলে বোধ হয়, বলেঃ কাকাবাবু, বস্তি ওঠাতে হবে এখান থেকে। এ পাড়ায় ও আপদ থাকতে দেবো না।

ঃ বস্তি, কিসের বস্তি?

ঃ মুসলমানদের বস্তি আপনার বাড়ির পিছনে। ভালোয় ভালোয় যদি না সরে যায় তো বস্তি জ্বালিয়ে দেবো। ঃ ছেলেটি হাতের লাঠিটা উঁচিয়ে ধরে কথার সংগে। ক্ষীণ হাতে প্রকাণ্ড তাবিজটা ঝকঝক করে ওঠে গ্যাসের আলোয়।

কথাটা বুঝতে একটু সময় লাগে রাম-লোচনবাবুর। কোমরে হাত দিয়ে দম নেন তিনি। উঠিয়ে দিতে হবে বস্তি, নইলে বিশ্রী একটা কাণ্ড শুরু হবে বুঝি!

বাড়ির পিছনের দিকে খান পাঁচেক খোলাঘর নিয়ে ছোট্ট বস্তি একটা। এক সময়ে নিজের গ্রাম থেকে রামলোচনবাবুই উঠিয়ে নিয়ে এসেছিলেন এদের। সে অনেকদিনের কথা। তখন রাস্তাঘাট হয়নি এদিকে। এঁদো ডোবা আর বড় বড় পাকুড় আর বটের সার। জলাজমি ছিলো এ কটা। দিনের বেলাও মানুষের সমাগম ছিলো না এ তল্লাটে। সে কি আজকের কথা! তাদের মধ্যে এখন বেঁচেও নেই অনেকে। নুরুল, শোভান, হাবিবুল্লা মাথায় করে বয়েছে চূণ আর সুরকি। মাটি এনে ডোবা বুজিয়েছে, গাছ কেটে বাড়ির পত্তন করেছে। তাঁর নিজের বাড়ি তৈরীর খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি কাজে ছাপ রয়েছে এদের হাতের। বাড়ির লোকেদের সংগেও প্রায় একাত্মই হয়ে গিয়েছিলো এরা। কিন্তু এখানে থাকা চলবে না এদের। তর্ক করেন না রাম-লোচনবাবু কেবল আস্তে আস্তে বলেনঃ কিন্তু এরা তো কিছু করেনি বাপু ভারি নিরীহ লোক এরা, সাত চড়ে রা করে না।

আক্রোশে যেন ফেটে পড়ে ছেলেটিঃ নিরীহ! নিরীহই বটে। দুধ কলা দিয়ে কেউটে পুষেছেন আপনি। কিন্তু কোন কথা নয়, পাড়ার ভালোর জন্য ওদের সরাতে হবে এখান থেকে। আপনাদের মত লোকের ভালোমানুষীর সুযোগ নিয়েই তো মাথায় ওঠে ওরা। জানেন কি হয়েছে ও-পাড়ায়।

কথা শেষ হবার সংগে সংগে ফটকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কয়েকজন ঃ গেট খুলে দিন, আপনাদের মায়া হয়, আমরাই সব কিছুর ভার নিচ্ছি।

রামলোচনবাবুর কাছে এসে দাঁড়ায় অমরেশঃ আপনি ভেতরে যান বাবা। আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।

ফটকের কাছ থেকে সরে আসেন রাম-লোচনবাবু। সত্যি কথা—এসব ঝঞ্ঝাট পোয়াবার মত বয়স আর সামর্থ্য দুই-ই নেই তাঁর। যা হবার হোক। চৌকাঠ পার হয়ে ঘরে এসে ঢোকেন কিন্তু কোথায় যেন কাঁটা বিঁধে থাকে একটা। নড়াচড়া করতে গেলেই খচ করে ওঠে। কিছুই কিন্তু করেনি ওরা। কোন ঝামেলায় থাকেনা। এখান থেকে তাড়িয়ে দিলে যাবেই বা কোথায়!

দুপুরবেলা খাওয়ার সময় পরিষ্কার হয়ে আসে ব্যাপারটা।

অমরেশই শুরু করেঃ ওদের যেতেই বলে দিলাম বাবা।

ঃ কাদের? প্রশ্নটা করেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন রামলোচনবাবু। আবার কাদের? সকালেই কথা হয়েছিলো যাদের সম্বন্ধে।

ঃ ওই আব্দুল আর ইসমাইলদের। কাল ভোরের মধ্যে এখান থেকে চলে যেতে বলেছি।

ঃ এই দুর্যোগে যাবে কোথায় ওরা?

ঃ সে ওরা বুঝবে। তা ছাড়া ওদের আবার দুর্যোগ কি! ওদেরই তো সুযোগ। লুটপাট হৈ-হল্লা যত হয় ততই তো লাভ ওদের।

খেতে খেতে মুখটা একবার তোলেন রামলোচনবাবু। সামনে বসে বাতাস করছিলো সুরমা। তার চোখে চোখ পড়তেই তাড়াতাড়ি নামিয়ে নেন দৃষ্টি। চকচক করছে সুরমার চোখ, ঠোঁট দুটোও যেন কাঁপছে। ওরও কি এই ইচ্ছে? এতদিনের একটা সম্বন্ধ ঘুচে যাবে এমনিভাবে!

ঃ ও-পাড়ায় থাকতে যা সব ব্যাপার হয়েছে তারপরে কিছুতেই থাকতে দেওয়া চলে না এদের। শেষ-কালে আমরা মুস্কিলে পড়বো। বিশ্বাস করতে আছে এদের। সুযোগ পেলে আমাদেরই গলায় ছুরি বসাবে একদিন। এই তো কালকের কাগজেও বেরিয়েছে, পাশাপাশি বাস করছিলো দু ঘর। সময় বুঝে বাইরের গুণ্ডাদের সঙ্গে নিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকে অকথ্য অত্যাচার করেছে সবাইয়ের ওপর। অথচ তিন পুরুষের বাস তাঁদের ও-পাড়ায়। বহু কষ্টে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে তারা।

মুখের গ্রাস কিছুটা তুলতে গিয়েই চমকে ওঠেন রামলোচনবাবু। সুরমা বলছে এই সব কথা! ওর মুখের বিষণ্ণভাবে ভুলই বুঝে-ছিলেন তিনি। সমবেদনায় নয়, এদের জাত ভাইয়ের অত্যাচারের ব্যাপারেই বুঝি মুষড়ে পড়েছে সে। কোথায়, কতদূরে কে কি করেছে বলে এরা ভোগ করবে তার ফল, এ কেমন বিচার! কিন্তু চুলচেরা বিচারের দিন নয় আজ। সমস্ত আবহাওয়া বিষিয়ে উঠেছে। বিশ্রী একটা সন্দেহ নেমেছে মানুষের মনে।

মাথাটা নিচু করে পাতের ভাতগুলো নাড়াচাড়া করেন রামলোচনবাবু। হ'তে পারে নাকি এ সব। ইসমাইল আর কাদের সন্তর্পণে ঘরে ঢুকে ঘুমন্ত অবস্থায় পারে ছুরি বসাতে ও'র গলায়? পারে হয়ত, কি জানি। গত যুগের চোখ নিয়ে এ যুগকে দেখা চলে না। এ যুগে ওরা আর আমরা আলাদা জাত—আলাদা মানুষ।

হঠাৎ একটা আওয়াজে দিবানিদ্রা ছেড়ে উঠে পড়েন রামলোচনবাবু। কারা বুঝি এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়।

ঃ কে?

ঃ আজ্ঞে আমরা, লোচন চাচা।

ঃ ভেতরে এসো।

ঘরে ঢোকে কাদের, আব্দুল আর ইসমাইল; সঙ্গে ইসমাইলের ছোট মেয়েটাও রয়েছে। ওরা এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে রামলোচনবাবুকে তারপর তাঁর খাটের নিচে বসে গোল হ'য়ে।

ঃ কি করেছি লোচন চাচা, আমাদের তাড়িয়ে দেবার হুকুম দিয়েছো।

কি করেছে? করে নি কি তাই বলুক। উত্তর পাড়ায় বীভৎস কাণ্ড করে তুলেছে এরা। তিন পুরুষে পাশাপাশি বাস ক'রে গলায় ছুরি বসাতেও দ্বিধা করেনি। কিছু বিশ্বাস নেই এদের।

কিন্তু এত সব কথা বলতে কোথায় যেন বাধে রামলোচনবাবুর। ও পাড়ার খবর এরা জানেও না বোধ হয়।

ঃ চারদিকে খুব গোলমাল শুরু হয়েছে। এখানে থাকা তোমাদের ঠিক হবে না। কোথা দিয়ে কে উৎপাত আরম্ভ করবে তখন মুস্কিলে পড়ে যাবে।

ঃ কিন্তু আপনি থাকতে কে উৎপাত করবে আমাদের ওপর। তা ছাড়া কিই বা করেছি আমরা।

মাথাটা নাড়েন রামলোচনবাবু! কিছু বোঝে না ওরা। এ সব ব্যাপারে কোন হাত নেই ও'র। ধূমায়িত অসন্তোষের বহ্নি ও'কে ডিঙিয়ে উঠেছে আজ,—হিংসার কালো ছায়া নেমেছে চারপাশে। এ যুগে রামলোচনবাবু শুধু একটা ফসিল।

ঃ কিন্তু তোমরাই যদি গোলমাল শুরু করো, অত্যাচার আরম্ভ করো আমাদের ওপর, কে ঠেকাবে তবে। জিভটা বার বার শুকিয়ে আসে। নিস্তেজ হয়ে আসে গলার স্বর। শক্ত রকম কিছু একটা বলতে কেমন যেন ঠেকে রামলোচনবাবুর। কিন্তু কিছু একটা নিশ্চয় ঘটেছে ও পাড়ায়, নয়ত সুরমার চোখের জল মিথ্যা হ'তে পারে নাকি!

ইসমাইলেরা কোন উত্তর দেয় না এ কথার। মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। চোখ বোলায় সামনের দেয়ালে।

ঃ তুমি এই কথা বললে চাচা? আমরা করবো অত্যাচার? আমাদের জন্মাতে দেখেছো তুমি। তোমাদের পাতের ভাত খেয়ে আমরা মানুষ। বাপজান মারা যাবার সময় তোমার হাতে তুলে দিয়ে যায়নি আমাকে? ছেলেবেলা থেকে তুমিই তো দেখাশোনা করেছো চাচা ঃ খুব ভারি ঠেকে কাদেরের গলা।

কথাগুলো কিন্তু সত্যি। বেশ মনে আছে রামলোচনবাবুর। নাম করা রাজমিস্ত্রী ছিলো কাদেরের বাপ। কোথায় বাঁশের মই বেয়ে উঠতে গিয়ে পা ফসকে একেবারে নিচে পড়ে গিয়েছিলো। খবর পেয়ে কাদেরকে সঙ্গে নিয়ে যখন হাসপাতালে গেলেন রামলোচনবাবু তখন প্রায় সব শেষ হয়ে এসেছে। শীর্ণ একটা হাত কপালে ঠেকিয়ে সেলাম করেছিলো কাদেরের বাপ তারপর আস্তে আস্তে বলেছিলো, এত আস্তে যে ভালো করে শুনতেই পাননি রামলোচনবাবু। ঝুঁকে পড়ে একেবারে তার মুখের কাছে কান নিয়ে গিয়ে শুনেছিলেন ঃ কাদেরকে তোমার হাতে দিয়ে গেলাম ভাইসাব, ওকে তুমি দেখো।

সেই থেকেই কাদেরকে দেখে আসছেন রামলোচনবাবু। কিন্তু ও পাড়ার ব্যাপারটায় সব গুলিয়ে দিয়েছে যেন।

চাচা ঃ এগিয়ে আসে ইসমাইল।

মুস্কিলে পড়ে যান রামলোচনবাবু। এই সহজ কথাটা বোঝে না কেন এরা। বোঝে না ও'র যুগ ফুরিয়ে এসেছে, যে যুগে অনায়াসে পাশাপাশি থাকা চলতো ওদের সঙ্গে। নতুন সনদ এনেছে এ যুগ—ওরা আলাদা জাত, আলাদা মানুষ। তাই এদের বাড়ির ছায়ায় ওদের বাড়ির দেয়াল উঠতে পারে না, ওদের রাস্তায় চলতে পারে না এরা।

একটা উপায় যেন আবিষ্কার করেন রাম-লোচনবাবু। বাইরের দিকে চেয়ে বলেন ঃ তোমরা বাপু অমরেশের কাছে যাও। আমার কোন হাত নেই। বিষয়-সম্পত্তি সেই সব দেখাশোনা করে কি না। আমি আর কদিন। আজ আছি, কাল নেই।

ওরা কিন্তু ওঠে না।

ঃ কে কোথায় কি করেছে চাচা, সেই জন্য দু পুরুষের বাস উঠিয়ে ভিটে ছাড়া করবে আমাদের?

ঃ না, আমাকে বলো না কিছু। আমার কিছু করবার নেই। অমরেশকে বুঝিয়ে বলো সে নিশ্চয় উপায় করে দেবে একটা ঃ উঠে পড়েন রামলোচনবাবু। সকাল থেকে একই কথা শুনে শুনে মাথা যেন খারাপ হ'য়ে যাবার যোগাড়।

কিছুক্ষণ বারান্দায় পায়চারি করে অন্দরে ঢোকেন রামলোচনবাবু। কিছুটা এগিয়েই চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়েন। বড় বৌমার ঘরের চৌকাঠের এ পাশে তিন চারিটি মেয়ের ভীড়—কেউই অচেনা নয় তাঁর। পুরুষদের কাছে দরবার করে হতাশ হ'য়েছে ইসমাইলের দল তাই জেনানা মহলে আবেদন পাঠিয়েছে। বলা যায় না, সুরমা হয়ত বন্দোবস্ত করতে পারে একটা। হয়ত বলতে পারে ঃ আহা, থাক বেচারীরা, আমাদের তো অনিষ্ট করেনি কোন, বরং কাজে অকাজে উপকারেই লেগেছে। দাঙ্গাহাঙ্গামা তো চিরকালের নয়, ওরা কিন্তু বংশ পরম্পরায় বাস করবে এখানে।

কপাটের এ পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন রামলোচনবাবু।

ঃ না, তা হয় না। চারদিকে তোমার জাত ভাইয়েরা যা সব কাণ্ড করছে, তারপর তোমাদের এখানে থাকতে দেওয়া চলে না। বিশ্বাস কি তোমাদের?

কাঁদো কাঁদো গলায় কথা বলে কাশিমের বৌ ঃ আমরা কি করতে পারি দিদি। এই তো জনকয়েক মোটে আমরা, মুঠোর মধ্যে তোমাদের। সে রকম যদি কিছু হয় তো দেয়ালে মুখ ঘষে দিও আমাদের। পুরুষ মানুষদের ধ'রে সাত জুতো লাগিও। তোমাদের খেয়ে পরেই তো জন্মজন্ম মানুষ আমরা দিদিমণি।

ঃ উঁহু, তোমরা সব পারো। বাইরে থেকে গুণ্ডা আমদানী করে সব কিছু করতে পারো তোমরা। তোমাদের আবার দয়ামায়া! তোমাদের আবার নিষ্ঠা।

কান খাড়া করে শোনেন রামলোচনবাবু। সুরমা বলছে এই সব কথা! ঠিক খবরের কাগজের ভাষা,—তেমনি রূঢ় আর কর্কশ।

ঃ কোথায় যাবো দিদিমণি আমরা? কে নে আমাদের? বিশেষতঃ এই অবস্থায় ঃ থাটা নিচু করে কথা বলে আব্দুলের বোন। । মাস অন্তঃসত্ত্বা। এই অবস্থায় কোথায় ব সে। মনে আছে আগের বারে এই দিদি-ণই সব কিছু করেছিলো। আঁতুর ঘরের বস্থা থেকে শুরু করে প্রসব হওয়া পর্যন্ত টিনাটি সমস্ত কিছু।

ঃ তোমাদের কুটুমের আবার অভাব! হোক ব্যবস্থা একটা ঠিক হ'য়ে যাবে। নকের খবরের কাগজের ওই ব্যাপার পড়ার র আমার আর একটু মায়া নেই তোমাদের রে। সব পারো তোমরা।

কথা এখানেই শেষ হোক এই ভেবেই ধ হয় শব্দ ক'রে সেলাইয়ের কলটা চালাতে রু করে সুরমা। স্তূপাকার কাপড় নিয়ে লেমেয়েদের জামা সেলাই করতে আরম্ভ র।

অনেকক্ষণ বসে থেকে আস্তে আস্তে যায় মেয়ের দল।

খুব ভোরবেলা বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েন মলোচনবাবু। দরজা খুলে দাওয়ায় বেরিয়ে সেন। চলে গেছে নাকি ওরা। খড়ম খুলে খ উঠান পার হ'য়ে বেড়ার ধারে এসে ড়ান। শিরীষ আর বটের ঘন ছায়ার নিচে নও অন্ধকার রয়েছে এদিকটা। চোখ দুটো কে দেখেন রামলোচনবাবু। অনেকগুলো টলী ছড়ানো এখানে ওখানে। কারা যেন রাঘুরি করছে ঘরের দাওয়ায়। চলেই ছ ওরা। অনেকদিন কিন্তু ছিলো এরা। জের হাতে গড়েছে এই খোলাঘরের সার, মাটি কেটে কেটে দেয়াল তুলেছে, বেড়া বেঁধেছে নিজের হাতে।

অন্ধকার তরল হ'য়ে আসে।

আবছা দেখা যায় সব কিছু। পুরুষেরা পুটলীগুলো কাঁধে তুলে নেয় আর মেয়েরা ছেলেমেয়েদের কাঁধে পিঠে নেয়, হাত ধরে দু একজনের। কিছুটা এগিয়ে গিয়ে ফিরে ফিরে দেখে পিছনের দিকে। অনেকদিনের একটা সম্পর্ক। কাশিম বাগিচার সামনে এসে দাঁড়ায়। তার নিজের হাতে পোঁতা শিম আর বেগুন গাছের চারা। কচি কচি চকচকে সবুজ পাতা দেখা দিয়েছে কেবল। জল না পেয়ে শুকিয়েই যাবে হয়ত।

আরো এগিয়ে যায় ওরা। উঠান পার হ'য়ে মিত্তিরদের বাড়ির পিছন দিয়ে মাঠ বরাবর চলতে শুরু করে। বেড়ার আগল খুলে এগিয়ে আসেন রামলোচনবাবু। চেয়ে দেখেন ওপারের দিকে। না, সমস্ত জানলা বন্ধ। ঘুমোচ্ছে বাড়ির লোকেরা। এত ভোরে কে আবার উঠতে যাবে।

উঠান পার হয়ে খোলার ঘরগুলোর সামনে এসে দাঁড়ান। সত্যি, এরই মধ্যে কেমন যেন খাঁ খাঁ করে সমস্ত জায়গাটা—কেমন যেন নিঃঝুম। পা দুটো কেঁপে ওঠে রামলোচন-বাবুর। কেমন একটা ব্যথা বুকের মাঝখানে। সামনের একটা ঘরের দাওয়ার ওপরে বসে পড়েন। বসেই কিন্তু চমকে ওঠেন। কি যেন একটা পড়ে রয়েছে চৌকাঠের পাশে। হাতড়ে হাতড়ে জিনিসটা তুলে নেন। একি, এ যে রঙীন একটা পুতুল। এক সময়ে মেলা থেকে তিনিই কিনে এনেছিলেন ইসমাইলের মেয়ে আমিনার জন্য। আহা, ভোরবেলা অত খেয়াল করতে পারেনি বেচারী। হট্টগোলের মধ্যে ফেলে গিয়েছে বুঝি!

মুখ তুলে চেয়ে দেখেন,—না, বেশীদূর এখনো যায় নি ওরা। এপাশের রাস্তা দিয়ে গেলে অনায়াসেই ধরা যায় ওদের। উঠে পড়েন রামলোচনবাবু।

আমিনা, আমিনা।

শুনতে পায় ওরা। দাঁড়িয়ে পড়ে আর চেয়ে চেয়ে দেখে পিছন দিকে তারপর কয়েকজন এগিয়ে আসে। কাছে আসতেই চিনতে পারেন তাদের। আমিনা আর ইসমাইল, কাদেরও রয়েছে বুঝি পিছনে।

তোর পুতুলটা ফেলে যাচ্ছিলি আমিনা। এই নে।

আমিনা হাত বাড়াতেই তার হাতটা চেপে ধরে ইসমাইলঃ ও পুতুল তুমিই নাও চাচা, আমিনার দরকার হবে না। চল, চল, মিছামিছি দেরী হয়ে গেলো খানিকটা।

হাতটা গুটিয়ে নেন রামলোচনবাবু।

ওরা চলে যাচ্ছে,—সাঁকোর ওপর দিয়ে বড় রাস্তায় গিয়ে উঠেছে। বাঁক ফিরলে আর দেখা যাবে না ওদের।

চোখ ফিরিয়ে নিজের হাতের দিকে চেয়ে দেখেন রামলোচনবাবু। অন্ধকার নেই আর, ভোরের পাতলা আলোয় সব কিছু স্পষ্ট হয়ে আসে। কি অবস্থা হয়েছে পুতুলটার। রং উঠে গিয়েছে, সেদিনের উজ্জ্বল রংয়ের একটুও অবশিষ্ট নেই। হাতে হাতে বিশ্রী ময়লা হয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া কাঠ বেরিয়ে পড়েছে জায়গায় জায়গায়। আর কিছুদিন পরে পুতুল বলে হয়ত চেনাই যাবে না এটাকে।

কেন

কুমারী অমিতা বিশী

শৈশবের স্বপন যায় টুটে
সংসারের আবর্ত মাঝারে।
কুসুমের কুঁড়ি নাহি ফুটে—
জীবন-মরণ-পারাবারে।

বাধা হেথা প্রতি পদক্ষেপে;
সুখ নাই শুধু মরীচিকা—
জীবনের পটভূমি ব্যেপে
মরণের টানে যবনিকা।

হে দেবতা! একি পরীক্ষায়
ফেল তুমি ক্ষুদ্র মানবেরে।
সংসারের এ কুটিলতায়
পাবে কি সে মুক্তির উৎসেরে?

কেন তবে তার প্রাণ নিয়ে
খেলা কর পরম হেলায়।
কেন তবে স্বপ্ন আয়ু দিয়ে
ছেড়ে দাও সংসার খেলায়।

দুদিনের হাসি কান্না ভরা
এই ছোট খেলাঘর মাঝে।
কেন মিছে অবহেলা করা
অজ্ঞান এ মানব সমাজে?

বিজ্ঞানের কথা

সৌর কলঙ্ক

শ্রীসতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

সাত বৎসর পূর্বে পত্রান্তরে সৌর কলঙ্ক সম্পর্কে আমি এক প্রবন্ধ লিখি; তখন সৌর কলঙ্ক সম্পর্কে জনসাধারণের বিশেষ কোনও উৎসাহ ছিল না। প্রবন্ধ লিখেছিলাম তথ্য পরিবেশন হিসাবে। সম্প্রতি অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। সৌর কলঙ্ক (Sun's spot) সম্পর্কে আলোচনা এখন বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানী রাজ্যের সীমা অতিক্রম করে জন-সাধারণের আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। ফলে এ আলোচনা দৈনিক খবরের কাঁগজে প্রকাশের মর্যাদা প্রাপ্ত হয়েছে। এ সব বিষয় বিবেচনা করে সৌর কলঙ্ক সম্পর্কে
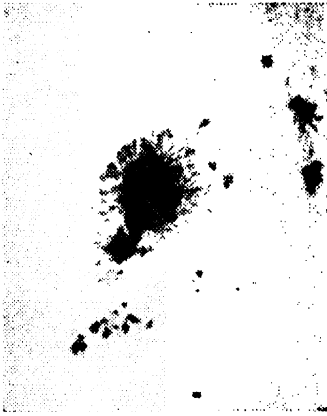
১৯২৮ সালের জুন মাসে ইয়র্কস মানমন্দিরে গৃহীত ছবিতে বৃহৎ সৌরকলঙ্ক

পুনরায় প্রবন্ধ লিখতে উৎসাহী হয়েছি। সূর্যের কলঙ্কের কথা কিছু বলবার পূর্বে, সূর্যের অন্যান্য গুণের পরিচয় দেবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি—যদিও সৌর কলঙ্কে আর সাধারণ কলঙ্কে আকাশ পাতাল প্রভেদ। অর্থাৎ সৌর কলঙ্ক সাধারণ কলঙ্ক নয় এবং কলঙ্ক শব্দ যে অর্থ বহন করে, সে অর্থে Sun's spotsকে সৌর কলঙ্ক বলা চলে না। হিন্দুরা সূর্যকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করে থাকেন। 'জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং, ধ্বান্তারিং সর্ব পাপঘ্নং প্রণতোঽস্মিং দিবাকরম্‌—একথা বলে তাঁরা সূর্যকে নমস্কার করেন। এখানে 'সর্ব পাপঘ্ন' শব্দটি প্রণিধানযোগ্য। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে সূর্য-কিরণ সর্ব রোগের নিরাময়ক। সূর্য 'সর্ব পাপঘ্ন' কিনা সে বিচার চিকিৎসাবিদ্‌রা করবেন। আমি এ কথা বলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করি না যে, সূর্যকিরণ বহু রোগ নিরাময়ক। এবং সূর্য যদি হঠাৎ তাপ দানে বিরত হন বা বিন্দুমাত্র তাপ হ্রাস-বৃদ্ধি করেন, পৃথিবীতে আমাদের জীবন ধারণ অসম্ভব হয়ে উঠবে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের মতে গ্যালিলিও প্রথম ১৬১১ সালে সূর্য সম্পর্কে প্রত্যক্ষ তত্ত্ব অবগত হন। সূর্য সম্পর্কে কিছু জানতে হলে আমাদের তিনটি যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। তারা হচ্ছে Telescope, Spectroscope এবং Poirheliometers অথবা Bolometers বা Rediometers. Telescope বা দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দূরের জিনিসকে স্পষ্ট করে দেখা যায়। Spectro-scope-এর সাহায্যে বর্ণালী পরীক্ষা করে তার গঠন প্রণালী জানা যায়। আর গ্রহ ও উপগ্রহের তাপ নির্ণীত হয় Radiometer দিয়ে। কানা হওয়ার ভয় ছিল—তা সত্ত্বেও গ্যালিলিও দূর-বীক্ষণের সাহায্যে সূর্যদেবের দেহ স্পষ্ট করে দেখে ধন্য হলেন। সুখী হলেন কিনা জানি না। কিন্তু যা দেখলেন তা প্রকাশ করতে সাহসী হলেন না। কিন্তু ফ্যাব্রিকাশ এবং ফাদার সিনারের স্বতন্ত্রভাবে ঘোষণার পর গ্যালিলিওর আর কোনও দ্বিধা রইল না, তিনি সূর্যদেহের ক্ষতসমূহের কথা উল্লেখ করলেন এবং বললেন—

Repeated observations have finally convinced me that these spots are substances on the surface of the solar body where they are continuously produced and where they are also dissolved, some in shorter and others in longer periods. And by the rotation of the sun, which completes its period in about a lunar month, they are carried round the sun: an occurance important in itself and still more so foi its significance'.

কয়েকটি কথায় প্রায় সব কথাই বলা হলো। পৃথিবীর মত সূর্যও তার অক্ষকে কেন্দ্র করে ঘোরে। সূর্যের গাত্রে নানা রকমের ক্ষত দেখা যায়; তাদের স্থান এবং কাল পরিবর্তনশীল; কিন্তু পরিবর্তনকাল সূর্যের ঘূর্ণনকালের সঙ্গে অতি সুন্দরভাবে সংশ্লিষ্ট; এমনভাবে সংশ্লিষ্ট যে, একটি জানা থাকলে অপরটির কাল জানা আপনা থেকে সম্ভব হয়।

ক্যাপলার ও নিউটনের গবেষণার পর এক রকম স্থির সিদ্ধান্ত বলে গণ্য হচ্ছিল যে, সূর্য হচ্ছে সৌর-জগতের রাজা এবং এর দূরত্ব এবং পরিমাণ নির্ণয় কঠিন নয়। কি সূর্যের দেহ-গঠন সম্পর্কে বিশেষ কি জানবার উপায় তখনও আমাদের আয়ত্তে ছি না। অবশেষে বর্ণালী বিশ্লেষণ থেকে সূ গঠনপদ্ধতি সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করা আ আমাদের সীমার বাইরে রইল না। অধিক শক্তিশালী দূরবীণ নূতন নূতন তথ্য পরিবে করতে শুরু করলো।

পরবর্তী কালের বিভিন্ন প্রথিতনামা অখ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক গবেষকের গবেষণ ফলে আমরা জানতে পেরেছি যে, সূর্যের ব্যা পৃথিবীর ব্যাসের ১০৯ গুণ। পৃথিবীর ব্যাসে

১৯২৪ সালে মাউণ্ট উইলসন মানমন্দিরে গৃহীত ছবি। সৌরকলঙ্ক গোষ্ঠীর মধ্যে ঘূর্ণির চিহ্ন সুস্পষ্ট

পরিমাণ ৭২৯০ মাইল। সুতরাং সূর্যে ব্যাসের পরিমাণ হবে ৭২৯০×১০৯ মাইল সূর্যের দেহ-পরিমাণ (mass) পৃথিবীর দেহ পরিমাণের ৩৩২০০০ গুণ। এবং সূর্যে ঘনত্ব (density) পৃথিবীর ঘনত্বের এ চতুর্থাংশ। পৃথিবীর ঘনত্ব জলের ঘনত্বে ৫ গুণ। অর্থাৎ সম-পরিমাণ মাটি এবং সম পরিমাণ জলের ওজন সমান নয়—মাটির ওজ জলের ওজনের ৫ গুণ ভারী। হিসেব মত সম পরিমাণ সূর্যের দেহ-দ্রব্যের ওজন ১·৪ গুণ অর্থাৎ পৃথিবীর অপেক্ষা অনেক হালকা, কিন্ত জল অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভারী।

এসব তথ্য থেকে একটা কথা আমরা পারি—বলতে পারি যে সূর্য যে সব বারা গঠিত তারা নিশ্চয়ই ঘন (solid) য় নেই; বর্ণালী বিশ্লেষণের ফল থেকে জানতে পেরেছি সূর্যদেহের চতুর্দিক ৷টি সোডিয়াম, ম্যাগ্নেসিয়াম্ কন্, পটাসিয়াম্, ক্যালসিয়াম এবং লোহ ঘেরা। এরাই মূলত সূর্যদেহের কের বায়ুমণ্ডল পরিপূর্ণ করে রেখেছে। ভিন্ন অন্য দ্রব্যের উপস্থিতির পরিচয়ও পেরেছি। তাদের পরিমাণ খুব কম। রটরীতে পৃথিবীর বিভিন্ন দ্রব্যের বর্ণালী সূর্যের দেহ কি কি দ্রব্য দিয়ে তৈরী তা ত হয়েছে। শুধু তাই নয় এই বর্ণালী সূর্যদেহ গঠনকারী দ্রব্যসমূহের তাপ, সম্পর্কেও আমরা একটা ধারণায় উপনীত পেরেছি। এসব থেকে আমরা বলতে পারি নম্নলিখিত মৌলিক পদার্থসমূহ অবশ্যই বিদ্যমান আছে, যথা—হাইড্রোজেন, য়াম লিথিয়াম বেরিয়াম কার্বন ট্রাজেন, অক্সিজেন, সোডিয়াম্, নেসিয়াম্, সিলিকন্, ফস্ফরাস্, সালফার দি।

টিন, টেরবিয়াম্, থেলিয়াম হয়ত সূর্যদেহে মান রয়েছে। তবে সোনা, পারা, রেডিয়াম, রন নিয়ন ক্লোরিন আর্গন আর্সেনিক ত যে নেই তা একরকম সুনিশ্চিত। দেহের সবচেয়ে সেরা মৌলিক পদার্থ হাইড্রোজেন। সমস্ত অবয়বের ৯৫ ই হাইড্রোজেন। এই তো গেল—সূর্য কি দ্রব্য দিয়ে গঠিত তার পরিচয় এবং পূর্বেই ছি এরা সবাই বিদ্যমান বায়বীয় অবস্থায়। বায়বীয় বললে সবটা বলা হলো না। অত দ্রব্য সাধারণ বায়বীয় অবস্থায় থাকতে না—তারা থাকে 'আয়নাইজ' অবস্থায়। াণু হতে ইলেকট্রন খসে পড়লে পরমাণুকে নাইজাইড পরমাণু বলে, তখন তা হয় ং সমন্বিত।

যত প্রকারের আলো আমরা জানি, তাদের সূর্যের আলো সর্বাপেক্ষা তীব্র—কট্রীক আর্কের চার গুণ এবং লাইম টের ১৫০ গুণ তীব্র। সূর্যের তাপও বড় ন্য নয়। সূর্যের উষ্ণতা ১২০০০ এফ: মিনিটে ১০ লক্ষ কেলোরী তাপ প্রতি ফুট থেকে বিকিরিত হচ্ছে। লর্ড কেলভিন সব করে দেখেছেন, সূর্যদেহ যদি কয়লা গঠিত হতো এবং যদি এই পরিমাণ তাপ করণ করতো, তাহলে ৬ হাজার বছরে, দেহ পুড়ে ছাই হয়ে যেত। বহু ছয় ার বছর চলে গেছে, সূর্য অবিরত প্রায় ই তাপে তাপ দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু আজও ছাই হয়ে যায়নি। এখানে একটা কথা ণ রাখা প্রয়োজন যে, সূর্যের সমগ্র তাপের অতি সামান্য অংশই পৃথিবীতে এসে পৌঁছয়। কত সামান্য অংশ এসে পৌঁছয়, তা বুঝতে হলে একটা ভগ্নাংশ বুঝতে হয়। ১৮ শত কোটি পাউণ্ডের ৯ পাউণ্ড যে সামান্য অংশ সেই প্রকার এক অতি সামান্য অংশ হচ্ছে পৃথিবীর প্রাপ্তি। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক এবং উঠেছেও—সূর্যের এই প্রচণ্ড তাপ-ভাণ্ডারের ইতিহাস কি? রাশিয়ান্ বৈজ্ঞানিক 'গ্যামো' এ বিষয়ে আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং মতবাদ বিশ্লেষণ করে এক বই লিখেছেন। ৭ই আষাঢ় ১৩৫৩ সালে 'দেশ' পত্রিকায় আমি
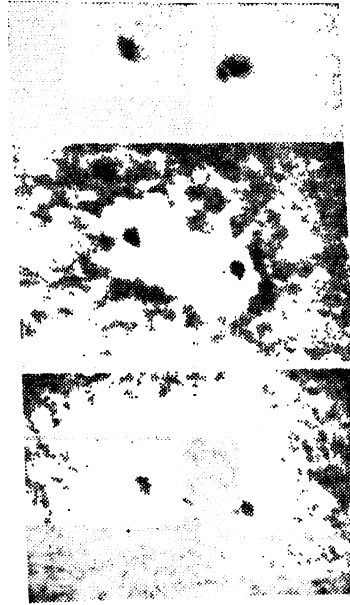
সৌরকলঙ্কে দুইটি 'পোল' বিদ্যমান

এই বইটির উপর ভিত্তি করে এক প্রবন্ধ লিখেছি। এখানে তার পুনরুল্লেখ সম্ভব নহে।

দূরবীনের সাহায্যে আমরা জানতে পেরেছি, সূর্যের মধ্যস্থল অতীব উজ্জ্বল; কিন্তু এই উজ্জ্বলতা কেন্দ্র থেকে ধীরে ধীরে কমতে থাকে এবং ধারে এসে একেবারে ম্লান হয়ে যায়। এই যে থালার মত উজ্জ্বল স্থান—একে বলি 'ফটোস্ফিয়ার'। ভিতরের উজ্জ্বলতাকে ম্লান করে মাঝে মাঝে কালো কালো দাগ দেখা যায় যাকে বলা হয় 'Sun'spots' বা সৌর-কলঙ্ক এবং ধারের ম্লান অংশকে উজ্জ্বল করে দেয় তীব্র উজ্জ্বল দাগ—যাকে বলি 'ফ্যাকুলে' (Faculae)। দিনের পর দিন শক্তিশালী দূরবীনের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের অবয়বের নানা বিচিত্র তথ্য আমাদের হস্তগত হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছি এই যে থালার মত চক্চকে সূর্য-দেহ—এও আবার মসৃণ নয়। ভিতরে দানা রয়েছে—অতি ছোট এই দানা। প্রায় বালির কণার মত। এই বালির কণা-ই সূর্যের মধ্যস্থলের উজ্জ্বলতার কারণ। চন্দ্রের গাত্রে যে পর্বত ও শৃঙ্কপর্বত রয়েছে তাকেই তার কলঙ্কের কারণ বলা হয়। সূর্য সম্পর্কেও অনুরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। পরে সে ধারণা বদলাতে হয়েছে। গ্যালিলিও তার প্রথম চিঠিতে এ সম্পর্কে লিখেছিলেন, Rather I judge the spots seen in the sun to be not only less dark than the dark patches seen in the moon, but to be no less bright than the brightest parts of the moon when fully illuminated by the sun.

চন্দ্রের কলঙ্ক থেকে সূর্যের কলঙ্ক কম ম্লান নয়, চন্দ্রের সর্বোজ্জ্বল অংশ থেকে ওরা অধিকতর উজ্জ্বল।

সূর্যের ভিতরে বালুকণার মত যে শ্রেণু-সমূহ দেখা যায় তার মধ্যে রয়েছে ছিদ্র, এই ছিদ্র যখন বড় হয়ে দেখা দেয় তাকেই বলা হয় spot বা দাগ। বহু প্রকার ছিদ্র সংযুক্ত হলেই সেটা হলো কলঙ্ক। কিন্তু সব ছিদ্রই কিন্তু দাগ হয়ে দেখা দেয় না। আর এসব দাগের ব্যাসও বড় কম নয়—কোন কোনটা পৃথিবীর ব্যাস থেকেও বড়। যেটা সম্পূর্ণ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তার অপর দুটো অংশ আছে,—একটা হচ্ছে umbra এবং অপরটি penumbra. umbra অতিকতর কালো। পূর্বেই বলেছি এই দাগ আবার এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না—তারা কেন্দ্র হতে ধারে সরে আসে। ১৭৭৪ সালে এ উইলসন্ ঘোষণা করলেন যে দাগ যখন কেন্দ্র থেকে ধারে সরে তখন ধীরে ধীরে umbra ছোট হতে থাকে এবং যখন একেবারে ধারে এসে পৌঁছে, umbra একেবারে লোপ পেয়ে যায়। সৌর কলঙ্কের আয়তনের কথা তো পূর্বেই বলেছি—উইলসনের পরীক্ষার পর দাগের গভীরতা সম্পর্কেও আমাদের একটা ধারণা করা সম্ভব হয়েছে এ ধারণা অনুযায়ী বলি যে এর গভীরতা পৃথিবীর ব্যাসের এক তৃতীয়াংশ। অবশ্যই সকল দাগই যে এ প্রকার গভীর তা নয় তবে বেশীর ভাগই এ প্রকার। দাগের আয়তন যেমন সবটারই কিছু সমান নয় গভীরতাও তেমনি। ১৯০৫ সালে এক কলঙ্ক সৃষ্ট হয়েছিল, তা ৪০টি পৃথিবীর আয়তনের সমান। এ রকম বৃহৎ দাগ অবশ্য খালি চোখেই দেখা যায়। দাগের ভিতরের তাপ অন্য যায়গা অপেক্ষা কম বটে, কিন্তু তাই বলে হিমশীতল নয়। তুলনামূলকভাবে কম—এ পর্যন্ত। সর্ব সময়েই সূর্যে দাগ থাকে বটে তবে দেখা গেছে কোন কোন সময়ে এদে সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়—আয়তন বৃহৎ হয় এব

এ পরিবর্তন একটা সুনির্দিষ্টকাল পরে সংঘটিত হয়। প্রতি এগার বৎসর পর পর এদের বর্ধিত অবস্থা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। ১৯১৭, ১৯২৮, ১৯৩৯ সালে সৌর কলঙ্ক বিরাট আকার নিয়ে প্রকট হয়েছে।

এর পরই জানা প্রয়োজন সৌর কলঙ্ক কি? এর সৃষ্টির ইতিহাস কি? উত্তরে এই সৌর কলঙ্ক বলে আমরা যাদের পরিচয় দেই, তারা প্রকৃত প্রস্তাবে সূর্যদেহের অভ্যন্তরস্থিত বায়ুমণ্ডলের এক এক প্রচণ্ড বাত্যা। সূর্য মণ্ডল প্রচণ্ড উত্তপ্ত বায়বীয় পদার্থের এক বিশাল আধার। এই বায়বীয় পদার্থ কিছু ধীর স্থির নহে। নদীবক্ষে স্রোতশীলা জলরাশি যে প্রকার ঘূর্ণন সৃষ্টি করে, এই প্রচণ্ড উত্তপ্ত বায়ুমণ্ডলও সেই প্রকার ঘূর্ণন সৃষ্টি করে। এই ঘূর্ণনই Sun spots-এর কারণ। বিজ্ঞানের ছাত্রের নিকট একথা সুবিদিত যে, গ্যাসকে হঠাৎ সম্প্রসারিত হ'তে দিলে, তার তাপ হ্রাস হয়। এখানে সূর্য কলঙ্কে এ সম্প্রসারণ সাধিত হয়। সাধিত হয় বলেই অপেক্ষাকৃত তাপ কম হয়। এ ছাড়া, চুম্বকের যেমন দুটি পোল (pole) থাকে, Sunspot-এরও তেমনি দুটি pole থাকে। তা ভিন্ন সূর্যের চতুষ্পার্শে চুম্বক ক্ষেত্রের (magnetic field) পরিচয় পাওয়া গেছে। এ ব্যতীতও সূর্য সম্পর্কে অনেক কিছু বলবার রইল। বর্তমান প্রবন্ধে সূর্য সম্পর্কে পূর্ণ আলোচনা সম্ভব নয়। বারান্তরে সে আলোচনা করা যাবে। এখন কথা হলো এই যে, মর্তবাসী আমরা, সৌর কলঙ্ক নিয়ে আলোচনায় আবশ্যক কি? এ কি শুধু নিছক জ্ঞানস্পৃহা বা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এর কোন প্রয়োজন আছে? বলা শক্ত। কেন না নিছক জ্ঞান বলে যা কিছু ছিল, তারা প্রায়ই মানুষের দৈনন্দিন জীবনে অপরিহার্য হিসাবে প্রযুক্ত হয়েছে। যা হ'ক একথা জোর করে বলা চলে, সৌর-কলঙ্কের জ্ঞান এখন নিছক জ্ঞানের রাজ্যের সীমা অতিক্রম করেছে।

সূর্যের পরিবর্তনের সঙ্গে পৃথিবীর যে সব পরিবর্তন অবশ্য সংশ্লিষ্ট, তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয় কয়টি উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর চুম্বক ক্ষেত্র (magnetic field) এবং পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের তড়িৎ (electric current in the terrestrial atmosphere (2) মেরুদেশের অরোরা (polar auororae) এবং হাওয়া বিষয়ক ঘটনা (metereorological phenomena) এ ব্যতীত বায়ুমণ্ডলের তড়িৎ, রেডিও প্রবাহ (Radio transmission), বায়ুমণ্ডলের ওজনের পরিমাণ, নৈশ আকাশের আলো, বিদীর্ণকারী আলো রশ্মি, বায়ুমণ্ডলের শোষণ প্রভৃতি রয়েছে। প্রতি এগার বৎসর পর সূর্যের বিভিন্ন বিভূতির ক্রম-পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর চুম্বক ধর্ম আবার প্রতি এগার বৎসর পর পালাক্রমে পরিবর্তন স্বীকার করে। এ দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক নেই, একথা বলা চলে না। ১৮৫০ সালে সুইজারল্যাণ্ডের উলফ, ফ্রান্সের গুইতার, জার্মেনীর ল্যামণ্ট এবং ইংলণ্ডের সেবিন প্রথম এ সম্পর্ক লক্ষ্য করেন। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনার সঙ্গে সূর্যের অবস্থার একটা সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস চলে। আশ্চর্য নয়—কেন না স্ব-গোষ্ঠীর মধ্যে মিল অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। আর বিজ্ঞানীর কাছে কার্য ও কারণ নির্ণয় অবশ্যকরণীয় ধর্ম। ১৯২৪ সালে এ উদ্দেশ্যে এক আন্তর্জাতিক কমিশন নিযুক্ত হয়।

সূর্যের এই কলঙ্কের সঙ্গে পৃথিবীর অধিবাসীদের চরিত্র এবং অবস্থার অত্যাশ্চর্য সম্পর্কের সন্ধান বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন। কোনও কারণ ব্যতীত আমরা যে হঠাৎ বিমর্ষ বোধ করি এটা ত সর্বজন স্বীকৃত। কারণ আবহাওয়ার অবস্থার সঙ্গে রয়েছে আমাদের মনের নিকটতম সম্পর্ক। কিন্তু উৎকৃষ্ট সূর্যালোক শোভিত মৃদু পবন আন্দোলিত কুঞ্জবনে বসেও যে আমরা বিমর্ষ হই তার কারণ কি?

কয়েক বৎসর পূর্বে পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বেকসফোর্ড হারসে কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের ১৭ জন কর্মচারীর মানসিক ও দৈহিক অবস্থার রেকর্ড রাখেন এবং দেখেন যে, তাদের অবস্থার পরিবর্তন একটা সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করে। রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক এ, চিজেভস্কি সূর্যের এই কালো দাগের পরিবর্তনের সঙ্গে পৃথিবীর ইতিহাসের পরিবর্তন লক্ষ্য ক'রে এক প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি বলেছেন যে, পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির উত্থান পতনের সঙ্গে বিশ্বের ইতিহাসের সঙ্গে সূর্যের দাগের সম্পর্ক অতীব নিবিড়। বিগত (প্রথম বিশ্ব সংগ্রাম) মহাযুদ্ধের সময় তিনি দেখেন যে, সূর্যের দাগের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের আক্রমণ শক্তি নির্ভরশীল ছিল। গণ-আন্দোলন ও বিপ্লব এরও পশ্চাতে রয়েছে এই সূর্য কলঙ্ক। মানুষের মানসিক ও স্নায়বিক পরিবর্তন উভয়েই নাকি সূর্য দাগের পরিবর্তন সাপেক্ষ। অধ্যাপক চিজেভস্কির এই মতবাদের স্বপক্ষে এখনও সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগৃহীত না হ'লেও এবং এর মধ্যে কিছু কল্পনার প্রাবল্য রয়েছে বলে মনে হ'লেও এ একেবারে ভূয়া আজ এ কথা বলা চলে না।

প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, সূর্যের এই দাগের সঙ্গে মানুষের দৈহিক ও মানসিক যে পরিবর্তনের উল্লেখ করা হলো, তা কেমন করে সম্ভব? উত্তর এই যে, সূর্যের দাগের পরিবর্তনের সঙ্গে সূর্যালোকের পরিবর্তন হয়। সূর্যালোকের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের অবস্থার পরিবর্তন হয় এবং সে পরিবর্তনই পৃথিবীর জীব-জগতের মানসিক ও দৈহিক পরিবর্তন সাধন জন্য দায়ী। শুধু তাই নয়, সূর্যের আলোর পরিবর্তনের সঙ্গে দ্রব্যেরও পরিবর্তন হয় এবং আমরা যা খেয়ে বেঁচে থাকি আমাদের মন ও শরীরের উপর যে তার প্রভাব কম নয় এ সংবাদ আজ সকলেরই জানা। সুতরাং খাদ্যবস্তুর অবস্থার পরিবর্তনের জন্য যদি সূর্য-কলঙ্ক দায়ী হয়, তবে তাকে আমাদের শরীর ও মনের পরিবর্তনের জন্য দায়ী সাব্যস্ত করার মধ্যে খুব কিছু গলদ নেই বলা চলে। কেমন করে সূর্যালোকের পরিবর্তনের সঙ্গে আমাদের দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তন নির্ভর করে, সে সম্পর্কে কিছু বলা নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ফ্রাঙ্কফোর্টের অধ্যাপক দেসর (Dessaur) তাঁর গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, ধনাত্মক ও বিয়োগাত্মক আয়ন (ions) মানুষের দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তন আনয়ন করে। তাঁর মতে আমরা যখন নিশ্বাসের সঙ্গে ধনাত্মক আয়ন (positive ions) গ্রহণ করি, ক্লান্ত হ'য়ে পড়ি, আমাদের মাথা ধরে। আর যখন বিয়োগাত্মক আয়ন (negative ion) গ্রহণ করি সব উপসর্গ সেরে যায়, রক্তের চাপে ভুগছেন যে রোগী, তাঁর রক্তের চাপ সেরে যায়। জার্মানীর এই বৈজ্ঞানিকের গবেষণায় বিশ্ববাসী চমৎকৃত হয়ে উঠেছে।

He startled the world with a report that he has observed a change of blood pressure and of mental attitude that accompanied the change in the atmosphere from a positive to negative change.

এখন কথা হচ্ছে এই যে, এই আয়নের সঙ্গে সূর্য-দাগ বা সৌর-কলঙ্কের সম্পর্ক কি? সম্পর্ক রয়েছে। পৃথিবীর একশত মাইল উর্ধ্বস্থিত বায়ুমণ্ডলের আয়নসমূহের অবস্থা যে সূর্যালোকের সহিত সংশ্লিষ্ট, সে প্রমাণ আমরা পেয়েছি। অতি-বেগুনী (ultra violet) রশ্মি যে বায়ুমণ্ডলের কণাসমূহকে আয়নে পরিণত করে, সে সংবাদও আপনারা জানেন। এখন কথা হচ্ছে এই যে, সূর্যের অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে যদি এই বায়ুমণ্ডলের অবস্থার পরিবর্তন হয়, তবে সূর্যের আলোর পরিবর্তনের সঙ্গে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের পরিবর্তন কিছু অসম্ভব নয়। সূর্য কলঙ্কের পরিবর্তনের সঙ্গে যদি পৃথিবীর বায়ুস্থিত আয়নের ধনাত্মকতা ও বিয়োগাত্মকতা নির্ভর করে, তবে এর সঙ্গে আমাদের দৈহিক ও মানসিক ঘটনা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। এ

ব্যতীত ইতিমধ্যেই দিনের বিভিন্ন সময়ের সংগে এই বায়ুমণ্ডলের পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। দেখা গেছে যে, মধ্যাহ্নে আয়নের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশী। প্লান্ডের রস-ক্ষরণের উপর সূর্যালোক ও বায়ুমণ্ডলের প্রভাব আজ সর্বজন স্বীকৃত ঘটনা, আবার প্লাণ্ডের সাথে মানুষের কর্মশক্তি ও জীবনীশক্তি নির্ভরশীল। সুতরাং সূর্যালোক প্রত্যক্ষভাবে আমাদের সর্ব কাজের নিয়ন্তা—কেননা মানুষকে একটা যন্ত্রের সংগে তুলনা করলে বলা চলে যে খাদ্য হচ্ছে মানুষের কয়লা, প্লাণ্ড হচ্ছে তার 'পাওয়ার হাউজ' এবং সূর্যরশ্মি কয়লা এবং পাওয়ার হাউজ এ উভয়েরই কর্তা।

মানুষের দেহযন্ত্র এক অদ্ভুত সৃষ্টি—প্রকৃতির সংগে এর সামঞ্জস্য আরও বিস্ময় সৃষ্টি করে। ঠিক যেমনটি আছে, তার সামান্য পরিবর্তন হলে আমাদের পক্ষে জীবনধারণ অসম্ভব হ'তো—অবশ্য যদি দেহযন্ত্র ঠিক এখন যেমনটি আছে, তেমন থাকতো। থাকতো কিনা তাতে গভীর সন্দেহ বিদ্যমান। কেননা দেখা গেছে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুযায়ীই দেহযন্ত্র গঠিত হয়।

ধরাপৃষ্ঠের ২৫ মাইল ঊর্ধ্বে যে অম্লজান (oxygen) কণা আছে সূর্যের অতি-বেগুনী রশ্মির প্রভাবে এসে তা ওজনে (ozone) পরিণত হয় এবং এই ওজন গ্যাস অতি-বেগুনী রশ্মি শোষণ ক'রে থাকে। যে পরিমাণ অতি-বেগুনী রশ্মি আমাদের জীবনধারণের জন্য আবশ্যক, ঠিক ততটাই এসে ধরাপৃষ্ঠে পেঁৗছে—এর বেশী হলে অতি-বেগুনীর তীব্র আলোতে আমরা বাঁচতে পারতাম না, তরুলতা ভস্মীভূত হয়ে যেত এবং এর কম এলে রিকেট (Ricket) হয়ে যেতুম—সংগে সংগে ভিটামিন পিল খেয়ে বাঁচতে হতো। অতি-বেগুনী রশ্মি যে ভিটামিনের উৎসস্থল, তাতো আপনারা জানেনই। সূর্যের এই অতি-বেগুনী আলোর সংগে নাকি সূর্য-কলঙ্ক-বিশালতার সম্পর্ক রয়েছে—দেখা গেছে যে, কলঙ্ক যখন বিশাল হয় অতি-বেগুনী রশ্মি হয় তখন সর্বাপেক্ষা তীব্র। কিন্তু তাই বলে একথা মনে করার কোনও কারণ নেই যে, এই কলঙ্কই অতি-বেগুনীর আধার।

সুতরাং সূর্যালোকের সংগে ভিটামিনের এবং আয়নের সম্পর্ক থাকলে একথা বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে যে সূর্য-কলঙ্কের সংগে-এদের সম্পর্ক বিদ্যমান।

সূর্য-কলঙ্ক কি এবং তার উৎপত্তির কারণ কি জানতে পারলে আমাদের অনেক সুবিধে হয়। আমরা বুঝতে পারি, ভবিষ্যতে সূর্য আমাদের কখন উপকার করবে এবং কখনই বা অপকার করবে এবং তা করবেই বা কিভাবে। সূর্যপৃষ্ঠের গ্যাসমণ্ডলের ঝটিকা থেকেই যে এই কলঙ্কের উৎপত্তি তা ত ইতিপূর্বেই বলেছি এবং এ নিয়ে বিতর্কের অবসরও সামান্যই। কিন্তু এই ঝটিকার কারণ কি? সূর্য-কলঙ্কের নিয়মিত বিবর্তন লক্ষ্য করে কেউ কেউ গ্রহ-উপগ্রহের বিবর্তনের সংগে এর সম্পর্কের ইঙ্গিত করেছেন, কিন্তু তার পূর্ণ সমর্থনের উপযুক্ত তত্ত্বের অভাব। কেউ কেউ বলেছেন সূর্যের মধ্যেই সূর্য-কলঙ্কের কারণ বিদ্যমান, বাইরের কোনও ঘটনার সাথে এর কোনও সম্পর্ক নেই।

অধ্যাপক জার্গনিশের (Bjerknes) মতে সূর্যের অভ্যন্তর এবং পৃষ্ঠস্থিত গ্যাসমণ্ডলের মধ্যে এক অতি তীব্র স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে, ফলে পৃষ্ঠস্থিত গ্যাসমণ্ডলী ইকুয়েটর থেকে মেরু অভিমুখে ছুটে চলেছে তীব্র বেগে। এসব স্রোত-প্রবাহ সূর্য-কলঙ্কের জন্মের কারণ। পৃথিবীর সংগে তুলনা করে দেখা গেছে যে, পৃথিবীর যে যে স্থানে ঝড়-ঝটিকা বেশী হয় সূর্যেরও ঠিক সে-সে দেশেই কলঙ্ক বেশী। কার কার মতে গ্রহমণ্ডলীর বিবর্তনই সূর্য-কলঙ্কের জন্য দায়ী।

অন্যান্য গ্রহমণ্ডলীর বিবর্তনই যদি সূর্যের এই কলঙ্কের জন্য দায়ী হয়ে থাকে, তবে গ্রহমণ্ডলীর বিবর্তন এবং কলঙ্ক বিবর্তনের সময় নিরূপণ করে দেখা উচিত এই মতবাদ সমর্থনযোগ্য কিনা। সূর্যের নিকট-বর্তী বৃহৎ গ্রহের মধ্যে বৃহস্পতির (Jupiter) নাম উল্লেখযোগ্য। ১১ বৎসর ৮ মাসে বৃহস্পতি সূর্যের চতুর্দিকে একবার প্রদক্ষিণ করে আসে। সূর্যের কলঙ্ক এগার বৎসর পর তার বিবর্তন পূর্ণ করে। বৃহস্পতির বিবর্তনই যদি সৌর-কলঙ্কের কারণ হতো, তাহলে এই আট মাস ব্যবধান সম্ভব হতো কি? তারপর আর একটা কথা, চন্দ্রের আকর্ষণের জন্য পৃথিবীর ধীর জলে যে জোয়ার-ভাঁটার সৃষ্টি হয়, জুপিটরের আকর্ষণেও ত সূর্যদেহের পৃষ্ঠদেশে অনুরূপ জোয়ার-ভাঁটা হওয়ার কথা। জোয়ার-ভাঁটা হয়, কিন্তু তা হিসেব মত হয় না। বৃহস্পতি গ্রহমণ্ডলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ না হলেও পৃথিবী থেকে ৩১৭ গুণ ভারী। সুতরাং এর প্রভাব সামান্য মনে করে অবজ্ঞা করার কোনও কারণ নেই। কথা উঠতে পারে যে সৌরমণ্ডলীতে বৃহস্পতি হয়তো একটিমাত্র গ্রহ নয়, আরও তো অনেক গ্রহ রয়েছে, তাদের সকলের প্রভাব বিচার করে দেখা আবশ্যক।

আপনারা শুনে সুখী হবেন যে, বিজ্ঞানীরা তা বাদ দেননি। অধ্যাপক ব্রাউন (Professor E. W. Brown of Yale) সকল গ্রহ-উপগ্রহের ফলাফল বিচার করে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাতেও সমস্যার সমাধান হয়নি। পূর্বেরই মতো অসামঞ্জস্য রয়ে গেছে। শুক্র পৃথিবী বৃহস্পতি বুধ শনি এই সকল গ্রহ-দেবতার সমন্বয় ফলও আমাদের সমস্যা সমাধান করতে পারেনি। ১৯০৬ সালে সুটোর এক প্রবন্ধ লিখে জানান যে, সূর্য কলঙ্ক বিবর্তন কালের সংগে কোনও গ্রহের বিবর্তন কালেরই কোনও সামঞ্জস্য নেই। সূর্য কলঙ্কের প্রভাব কেবল মানুষের চরিত্রের উপরই কার্যকরী, একথা মনে করলে ভুল করা হবে। দেখা গেছে যে, জীবদেহের মনের উপর এবং বৃক্ষের উপর এর প্রভাব কম নয়। এমন কি, 'জগতের ব্যবসা-বাণিজ্য শিল্প উন্নতির সংগে নাকি এর আশ্চর্য সম্পর্ক রয়েছে। বর্তমানে জগতে বিভিন্ন গবেষণাগারে সূর্য-আলোর সংগে প্রাণীদেহের সম্পর্ক নিয়ে চিত্তাকর্ষক গবেষণা চলেছে। সূর্য-বর্ণালীর লোহিত অংশ অপেক্ষা বেগুনী রশ্মির প্রতিই যে বৃক্ষকুড়ির মমত্ববোধ বেশী তা পরীক্ষিত সত্য। অবশ্য বর্ণালীর লোহিত অংশও অপ্রয়োজনীয় নয়। বীজ থেকে অঙ্কুর উদ্গমের জন্য এর প্রয়োজন আছে। সবুজ ও বেগুনী আলো অঙ্কুর উদ্গমে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। সূর্য-কলঙ্কের বিবর্তনের সংগে যদি সূর্যালোকের পরিবর্তন ঘটে, তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে, শস্যের ভালমন্দের জন্য বৃষ্টি ও জমির উর্বরতা শক্তিই দায়ী নয়, এর জন্য সূর্যকলঙ্কও সমভাবে দায়ী। আপনারা জানেন যে, যাদের শরীরে 'ক' ভিটামিনের অভাব হয়, তারা হয় রাতকানা, 'খ'র অভাব হলে হয় দুর্বল এবং খ, গ'র অভাব হলে হজম পীড়া ঘটে। এদের সংগে সূর্য-বর্ণালীর কি সম্পর্ক তা নির্দিষ্টভাবে প্রমাণিত না হলেও একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, সূর্য-আলোর মধ্যেই এর প্রতিকার রয়েছে। প্রাণী-দেহে ভিটামিন খ'র সৃষ্টি যেমন অতি বেগুনী রশ্মির দান, উদ্ভিদ্ দেহেও তাই কি? ভিটামিন খ'র অভাবগ্রস্ত যারা রুগ্ন, অতি বেগুনী রশ্মি তাদের যেমন ঔষধ, তেমনি সূর্য-রশ্মির অন্যান্য বর্ণালীর মধ্যে কি সেই "সর্ব পাপঘ্ন"র বীজ নিহিত নেই? কোন কোন উদ্ভিদের উপর অতি বেগুনী আলোর প্রভাব ভয়ঙ্কর। যেমন টমেটো গাছ অতিরিক্ত অতি বেগুনী রশ্মির প্রভাবে এলে পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। সূর্য কিরণের তথা কলঙ্কের সংগে আমাদের খাদ্যের, সুতরাং আমাদের শরীরের ও মনের নিবিড় যোগ রয়েছে। শুধু ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নয়, দেশের সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের সংগেও এর সম্পর্কের ইঙ্গিত বৈজ্ঞানিকরা পেয়েছেন।

বেতার প্রেরণে—বিশেষ করে তা যদি দূরবর্তী হয়, মাঝে মাঝে বিঘ্ন ঘটে। বেতার প্রেরিত সংবাদ হঠাৎ থেমে যায়। এর কারণ কি? পৃথিবীর ২০০ মাইল ঊর্ধ্বস্থিত বায়ু-মণ্ডলে যে গ্যাস থাকে, সূর্যালোকের প্রভাবে

তাদের ধনাত্মক ও বিয়োগাত্মক তড়িৎকণা বিচ্ছিন্ন হয়। ফলে তারা হয় তড়িৎবাহী। এরা পৃথিবীর চতুর্দিকে গঠন করে এক তড়িৎ-ছাদ। একেই বলি ionosphere. এই ছাদ কিন্তু এক অবস্থায় থাকে না। এর বিবিধ রকমের পরিবর্তন হয়। সেজন্যই বেতার প্রেরণে বিঘ্ন এই 'ionosphere'র দূরত্বের পরিবর্তনের উপর সূর্য-কলঙ্কের প্রভাব আছে। সূর্য-কলঙ্কের জন্যই এর পরিবর্তন হয়। আপনারা হয়ত ভাবতে পারেন যে, এই দূরত্ব মাপা কি করে সম্ভব? সমুদ্রের উপর থেকে শব্দ প্রেরণ করে তা যখন সমুদ্রের তলদেশ থেকে ফিরে আসে, তখন এই তরঙ্গের যাওয়া ও আসার ঠিক সময় নির্ণয় করা যায়। শব্দতরঙ্গের গতি জানা থাকলে এই সময় থেকে তার দূরত্ব নিরূপণ সহজ। ঠিক এভাবেই ionosphere এর দূরত্ব নিরূপণ করা হয়। দেখা গেছে যে, ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গেও বেতারবার্তা নির্ভরশীল। গ্রীষ্মকালে এই 'ছাদ' নীচে নেমে আসে এবং শীতকালে উর্ধ্বে চলে যায়; সূর্য-কলঙ্ক যখন বিশাল হয়ে ওঠে, তখন অতি বেগুনী রশ্মির পরিমাণ বাড়ে ionosphere-এ অতিরিক্তভাবে ion-এর সংখ্যা বর্ধিত হয়। ফলে ছাদের উত্থান পতন সূর্য-কলঙ্কের পরিমাণের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে চলে। সুতরাং শেষ পর্যন্ত বলতে পারি যে, বেতার প্রেরণও সৌর-কলঙ্কের প্রভাব থেকে মুক্ত নয়।

নারী ও নগরী

পরিমল দত্ত

আমার স্ত্রী হলেন প্রবাসী-বাঙালিনী। তাঁর বাঙলা তদ্ভিৎ, শব্দ চয়ন, অনুকার অনুপ্রাস আর ব্যাকরণঘটিত হাজার খুঁটিনাটি—আমায় অহরহ মনে করিয়ে দেয় তিনি পর-দেশিনী আর আমি যে দেশে থাকি সেটা যাদুর মুলুক বাঙলা দেশ নয়। আবার ঠিক এমনটি স্ত্রী না হলে আমার প্রবাসের দিনগুলো অপূর্ণ রয়ে যেত। এবিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। স্ত্রী আমার সুন্দরী রূপসী আর শিক্ষিতাও। চুমকি বসানো ফিকে হলহলে হলুদ আর কমলা মেশানো কোর্তা, সালোয়ার, ঘিয়ে রঙের দোপাট্টা, দিল্লীশাহী টকটকে লাল ভেলভেটের নাগরায় সুর্মায় ঠোঁটছাড় ও মেকআপে সে সত্যিই অপরূপ। বাঙলার জলে আর মাটিতে গড়া, বাঙালী মেয়ের যে-শ্রীই থাক, শমিতার মতো সে জীবন্ত হতে পারে না। আমার স্বীভাগ্য আছে, আপনি একথা নিশ্চয়ই মানবেন। অপিসের ছুটির শেষে শমিতার দৈনন্দিন নামচা শুনি। 'মালহোত্রার ছেলের বৌগো ভাল শামোশা ওগারা (সিঙাড়া ইত্যাদি) বানাতে পারে। পারসিঙ্ স্কোয়ারটা একেবারে গোল মার্কেটের নজদিক্। তাজাতাজা হাওয়ার অভাব এই যা। উটরাম স্কোয়ারের হরিহর জুড়ের মেয়েগো—মীনাক্শী, সেই যে য়ুনিভার্সিটিঃ পড়ে আর রয়-ইজমের আঁচলায় কোন্-এক পাঞ্জাবী মুসলমানের সংগে প্রেম করে; শকলত (চেহারাত) ঐ একেবারে কালী লকড়ী (কালো কাঠ)'। বাড়ির সামনেকার বাগানে নিড়ানি দিয়ে ফুল গাছের কেয়ারি খুঁড়তে খুঁড়তে স্ত্রীর কথায় সায় দি, অনেকটা হিন্দুস্থানী মাথা নাড়া জী জী ভঙ্গিতে। শুনেছি, পরোক্ষে লোকে বলে আমি নাকি স্ত্রৈণ! রূপসী তরুণী স্ত্রী ঘরে থাকলে, আপনাকেও ঠিক আমার মতো কিম্বা তার চেয়েও বেশি সায় দিতে হত। স্ত্রী আর দিল্লী এই হল আমার উপজীব্য, আর এই নিয়েই আমার আজীবন কাটাতে হবে। আমার হিন্দী আর দশ জন বাঙালী ভদ্র সন্তানের মতো করুণ আর অসহায় না হলেও শমিতার মনের মতোন নয়। রবীন্দ্রনাথের যোগীনদার মতো,—আমার হিন্দী শুনে কেহ, হিন্দী বলে করে না সন্দেহ। কথাটা হল এই, উর্দু হিন্দীয়ানী, হিন্দুস্তানী—এর সেক্স সমস্যা আমাকে রীতিমতো পীড়িত করে তোলে। শব্দের এই খামখেয়ালি স্ত্রীত্ব আর পুরুষত্ব আমার আজো ঠিক হল না, আর হিন্দী বলার সবচেয়ে বড়ো অন্তরায়—এই অসভ্য লিঙ্গ চিন্তা। ভাগ্যিস শমিতা ছিল—তাই তাঙ্গ-ওয়ালা, গোয়ালা, মেহেরান, কুঁজড়ার সংগে দরকষাকষি, কেনাকাটা সম্পৃক্ত রকমারি বার্তালাপ, আমার বকলমে ঐ চালায়। দিল্লী আমার ভাল লাগে না চাই কি অপচ্ছন্দও করি, কিন্তু তাই বলে শমিতা আমার মোটেই অপচ্ছন্দের নয়, বরং পছন্দসই। এমনকি সে যদি হনুমানজী মন্দিরের সাপ্তাহিক মেলায় গিয়ে দহিবড়া খায়, তাও আমার ভাল লাগে। শমিতা যদি বরাবর লাহোরে মানুষ না হয়ে, ঢাকা, বরিশাল, ময়মনসিংহ কিম্বা চাটগাঁয়ে মানুষ হলে তার মুখের বাঙলা অনিন্দনীয় হত—এমন মুগ্ধবোধ দুরাশা আমার নেই। ভাষার চেয়েও, ভাষাতীত মানুষ ঢের বড়ো সত্য।

আমার এক আত্মীয়কে জানি, তিনি আজীবন কলকাতায় আছেন, আর এই সেদিন জাপানী বোমার হিড়িকে, বোমাতঙ্কী হয়ে চার সপ্তাহের জন্য কাশীতে এসেছিলেন। যাঁরা আমাকে চেনেন, ইতিমধ্যে তাঁকেও হয়ত চিনি-চিনি করছেন। আমার মতোন তিনিও বই ভালবাসেন, কলকাতা ভালবাসেন। সে ভাল-বাসার কিছু তারতম্য আর রকমফের আছে বৈকি? আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন সত্তর বছর বয়সে, তাঁর মতোন এডগার ওয়ালেস বা দীনেন রায়ের গোয়েন্দা নভেল বা সৌরীন মুখুয্যের বিহ্বল-করা লেক রোমান্স পড়বো না। কলকাতাকে চিরদিন ভালবাসব—কেবল গলদা চিংড়ি, ঘিলুওলা কাঁকড়া, থকথকে পালঙ্ শাক আর সন্দেশ ও রাবড়ির জন্য নয়। কলকাতা সম্পর্কে আমার ভালবাসা অনেকটা 'খোকা বলেই ভালবাসি, ভাল বলেই নয়'। কতদিন কলকাতার বাইরে আছি, প্রতিটি দিন ঘুরে ফিরে, কলকাতার কথা মনে পড়েছে। গঙ্গার উপর বর্ষার কালো মেঘ, গড়ের মাঠের সবুজ ঘাস, আলোকোজ্জ্বল চৌরঙ্গি, কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে ফুলওয়ালার করুণ হাঁক—দামী সিগারেটের গন্ধে, পুরানো বইয়ের অপূর্ব খস্‌খসানিতে, সহস্রমুখ স্মৃতির টুকরোয় ধূসর-প্রসর কলকাতা মনের মধ্যে বারে বারে ঠিকরে উঠে। পরম দয়ালু যীশুর সেটা কত সাল মনে নেই,—একদা প্রথম যৌবনের যাদুলাগা চোখে একটি পীবর শামলা মেয়েকে মনে ধরে-ছিল, ভালও বেসেছিলুম। শপথ করে বলতে পারি, জীবনের ঐ সংক্ষিপ্ত অধ্যায়টুকু বাদ দিলে, আমার কলকাতাপ্রীতির একনিষ্ঠতার বিপক্ষে কোনো উল্লেখ নেই; আর সেই কয়মাস কলকাতার অস্তিত্ব ভুলে ছিলুম। যাঁরা পাকা দলিল আর আসল নজিরের ভক্ত, শুনে খুশি হবেন ল্যাম্বের জীবনেও ঠিক এমনটি ঘটেছিল। কোন মানুষীর প্রেমে পড়ে, আশৈশবের ভালবাসা লণ্ডনকে অল্পকালের জন্য বিস্মৃত হয়ে-ছিলেন। লালফিতেওলা নিরন্ধ্র দপ্তরের কাজের ফাঁকে, মাঝে মাঝে একখানি মুখ ও একটি শহর উঁকি মারে ও সে হল সেই শামলা পীবর মেয়ে, আর ধূসরপ্রসর কলকাতা।

অবশ্য এ তথ্য শমিতার অবিদিত। আর তা ছাড়া ইংরেজিতে যাকে বলে 'পুরানো আগুন' তার কথা কে আর কবে নিজের স্ত্রীকে বলে? স্বামীর পূর্বতন প্রেম ও আসক্তির কথা, খাঁটি বাঙালিনী বা প্রবাসী-বাঙালিনী—কোন স্ত্রীই পছন্দ করবেন না। সে-কথা যাক। কলকাতা আর দিল্লী সেই পীবর শামলা মেয়েটি আর আমার স্ত্রী—এই দুই নারী আর নগরীর টান-পোড়েন ও ঘনিষ্ঠ প্রভাব, আমার শরীর ও মনের স্বচ্ছকে আজো ঘিরে রয়েছে। ব্যক্তিজনীন পছন্দ আর ব্যক্তিগত ভালবাসা; বিচার করা বড়ো কঠিন। কারণ বোধহয় একান্ত করেই

ব্যক্তিগত বলে। বিশেষ একটি মেয়ের ভালবাসার হাবুডুবু সাধারণ নয়, সে বিশেষই। কলকাতা মনে পড়লেই কেন কি জানি সেই মেয়েটিকে আমার মনে পড়ে, কিম্বা মেয়েটিকে ভাবলেই কলকাতার ভাবনা মনের মধ্যে ওতঃপ্রোত হয়ে ওঠে। ভালবাসার বিমূর্ত প্রতীক কি আমার জানা নেই, কিন্তু আমার ভালবাসার প্রতীক কলকাতা। অবিস্মরণীয় সেই নতুন প্রথম ভালবাসার মেয়ে আর বিস্ময়হীন ধূসর কলকাতাকে আজো ভুলিনি।

দিল্লীর পূর্বতন দিনের ইতিহাসের রোমান্স আমাকে যে মুগ্ধ করে না এমন নয়। তার সুবৃহৎ বিপুল পটভূমিকা, রাজা-রাজড়া লুণ্ঠন-আক্রমণ, রক্তাক্ত অভিযান আর ক্ষুধিত পাষাণাবলী আমাকে বিচলিত, বিমূঢ় ও বিপর্যস্ত করে—তবুও দিল্লীকে ভালবাসতে পারলুম কৈ? কবরের দেশ এই দিল্লীর দু'হাজার বছরের পুরানো ইতিহাস, হাতের নাগালে আনা দূরে থাক, কল্পনার জাল ফেলেও ধরতে পারি না। হনোজ দেহলী দূর-অস্ত্—দিল্লী অনেক দূরে—এ উপলব্ধি কার জানি না! কিন্তু এ বাণী নিখিল ভারতবাসীর মনের কথা। দিল্লী কারও নিজ বাসভূমি নয়, দিল্লী সর্বভারতীয় সরাইখানা। রমেশ বঙ্কিমের উপন্যাসলালিত ইতিহাসের রঙলাগা মনের ঘোর এখানে থাকতে থাকতে ফিকে হয়ে যায়। দূরের থেকে দিল্লীর বাদশাহীআনা মনকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়, আচ্ছন্ন করে, কিন্তু দিল্লীতে এলে মনের চোখে আঙুল দিয়ে যেটা প্রতিভাত হয়ে ওঠে তা বাদশাহীআনা নয়, নোকরশাহীপনা। দশটা-পাঁচটার দপ্তরের অনুজীবী আপিসী জনস্রোত দেখে মনে হয়েছে—এরাই হল শাশ্বত, চিরন্তন—চিরদিন ছিল আর 'রবে চিরদিন ধরিয়া'। ইংরেজ মুঘল পাঠান, শকহূন দল তাদেরও বহুযুগ আগে মহাভারত আর ইন্দ্রপ্রস্থের অমোল থেকে শুরু করে দিল্লীতে যে অবিচ্ছিন্ন বিরামহীন ধারা বয়ে আসছে সেটা কোনো সংস্কৃতি, কৃষ্টচর্চা বা দার্শনিক চিন্তার ধারা নয়—নোকরশাহী কেরানীর শেষহীন ধারাবাহিক শোভাযাত্রা। অল্ডাস হক্সলি বলেছেন, দিল্লীর মনোরম কাহিনী আঁকতে হলে আর একজন প্রুস্তের দরকার। কিন্তু ফরাসীর কাছে যা প্যারী, ইংরেজের যা লণ্ডন, ভারতীয়ের কাছে দিল্লী ঠিক তা নয়। যদিও ভারতের ভাগ্যের দাবাবোড়ে দিল্লী একাধিকবার মাৎ করেছে। স্থানীয় অলিখিত অভিধানে দিল্লী-ওয়ালার অপর নাম হল ঠগ জোচ্চোর বা সুবিধাবাদী। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়েছে, রক্তের নদী বয়েছে। কঙ্কালের পাহাড় উঠেছে—আর দিল্লীর বিজয়ী সিংহাসনের ছায়ায়, প্রসাদপ্রার্থী ভিক্ষুকেরা অশোভন ব্যগ্রতায় কোলাহল তুলেছে। দিল্লীর পথ, স্বাধীনতার পথ নয়। জানি না, হয়ত ভালবাসি না বলেই দিল্লী আমার ভাল লাগে না। শমিতার কিন্তু দিল্লী ভাল লাগে, আর দিল্লী সে ভালও বাসে। সে হাজার বার দেখা কুতুব, কোট্‌লা কিম্বা মকবেরা-ই-হুমায়ুন সময় আর সুযোগ পেলে আবার দেখতে চায়। সেটা বোধ হয়, বেড়াতে ও ভালবাসে বলেই বেড়াতে চায়।

জবচার্নকের উপনিবেশ কলকাতার চেয়ে দিল্লীর ইতিহাস অনেক বড়ো, অনেক পুরানো। আর য়ুনিভারসিটির করিডরে কুড়িয়ে পাওয়া সেই শামলা পীবর মেয়েটি যে শমিতার চেয়ে সুশ্রী—তা নয়। তবু এই দুই নারী আর নগরীর মনে মনে তুলনা করতে গিয়ে, কলকাতা আর সেই মেয়েটিকে, শমিতা আর দিল্লীর উপর বারেবারেই উঁচু আসন দিয়েছি। নিজেই বুঝি, আমার পক্ষপাত কোথায়? কোন মেয়েকে ভাল-বাসার অসুবিধা হল এই, ঠিকমত সময়ে তাকে গৃহজাত না করতে পারলে খল সংসারে, অসজ্জনের হাটে সে হারিয়ে যাবেই। আর যাই করি, সেই কারণে কলকাতাকে ভালবেসে ঠকিনি—আমার ভালবাসার স্বপ্ন নগরী উর্বশীর মতো অনন্তযৌবনা, তার ক্ষয় নেই, আর পৃথিবীর জনারণ্যে কলকাতা কোনদিন খোয়া যাবে না। আমার মনে আশা আছে আর আমার স্ত্রীরও বাসনা একদা এখানকার পাট উঠে গেলে পর, কলকাতায় ফিরে যাব। স্ত্রীর ভয় তাঁর বাঙলা শুনে কলকাতার লোকে হাসবে না ত? আমার ভাবনা যদি দীর্ঘ তিরিশ বচ্ছর পরে, আবার যদি সেই মেয়েটির সঙ্গে দেখা হয়!

অনাগত

নির্মাল্য বসু

আমাদের সমুদ্র-মন্থনে কালকূট লাভ হোল শুধু!
লক্ষ্মীও হোল না পাওয়া—উঠিল না অমৃতের মধু।
নীলকণ্ঠ হয়ে গেছি তাই।
জীবনের প্রতি অহর্নিশ
অসঙ্কোচে পান করি
উপকণ্ঠ ভরি
সংসারের সবটুকু বিষ।
অমৃতের পুত্র মোরা—পাই নাই অধিকার তার ঃ
কে যেন সবল হাতে
দিনে রাতে
আঁধারের অতল গহীন গহ্বরে
প্রাণপণে ঠেলিছে মোদেরে
হাতে দিয়ে তীব্র বিষাধার।

দুঃসহ জ্বালার পুঞ্জে
কুঞ্জ রচি ধুনি জ্বালিয়াছি
মৃত্যুর অতি কাছাকাছি;
করিতেছি মৃত্যুঞ্জয়ী পূজা
দগ্ধ জীবন শেষে পূর্ণাহুতি ভরে
পলে পলে—জীবনের প্রহরে প্রহরে।

পূর্বাশার প্রান্তছায়ে অরুণাংশু রেখা
একদা নিশ্চিত দিবে দেখা,
সেদিনের অনাগত মৃত্যুঞ্জয়ী ভাবী
শিবত্ব করিবে দাবী
মোদের পূজার ফুল হাতে
মোদের তপস্যা-লব্ধ প্রাতে॥

রুশো—শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এম-এ প্রণীত। পূর্বাশা লিমিটেড, পি-১৩, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা দুই আনা।

ভারতের এই বিপ্লবের দিনে বৈপ্লবিক ফরাসী দার্শনিক রুশোর জীবনী ও চিন্তাধারার সহিত পরিচয়ের প্রয়োজন আছে। আলোচ্যগ্রন্থে বেশ সহজ ভাষায় সহজবোধ্য ভাবে রুশোর চিন্তাধারার আলোচনা করা হইয়াছে। বইটি ছোট হইলেও আগাগোড়া পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনায় পূর্ণ। অল্পের মধ্যে এই ফরাসী চিন্তাবীরকে বুঝিবার পক্ষে বইটি বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। রুশোর জীবনী এবং সমসাময়িক অন্যান্য দার্শনিক ও চিন্তাবৈপ্লবিকদের বিষয় সঙ্গে সঙ্গে আলোচনা করা হইয়াছে। ছাপা ও প্রচ্ছদপট সুন্দর।

৮৬/৪৭

ভাসান—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব, ৭, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা আট আনা।

ভাসান পল্লীচিত্র। সাধারণ পল্লীবাসীর সুখ দুঃখ উৎসব আনন্দের পটভূমিকায় ইহার আখ্যানভাগ রচিত। সার্কাসওয়ালা রতন, রাখাল এবং বারবণিতা কামিনী—ইহাদের মধ্যে নিতান্ত দুই দণ্ডের পরিচয়ের সূত্র ধরিয়া যে নৈকট্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, মমতা ও ত্যাগের মধ্য দিয়া তাহার পরিসমাপ্তি ঘটাইতে লেখক যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়াছেন। সুনিবিড় বেদনাবোধ যাহা শৈলজানন্দের অন্যান্য রচনারও বৈশিষ্ট্য, তাহা এই বইটিতেও সুপ্রচুর।

৯১/৪৭

বঙ্গ-ভঙ্গ?—শ্রীনিকুঞ্জ সেন প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—সুভাষ সাহিত্য প্রকাশনী, ময়মনসিংহ। মূল্য চারি আনা।

প্রস্তাবিত বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে নানা যুক্তি-তর্ক তোলা হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গ-ভঙ্গের সমর্থকদের বিরুদ্ধে উষ্মা না দেখাইয়া বিষয়টি স্থির মস্তিষ্কে আলোচনা করিলে লোকের পক্ষে স্বাধীন মত গঠনের উপযোগী হইত। দেশে জাতিগের শাসনে ইতিমধ্যে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠিয়াছে। এই সময়ে এই রকম মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিয়া লেখনি চালনা সংযত হওয়া প্রয়োজন।

ঈশোপনিষৎ—শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত কর্তৃক ব্যাখ্যাত। প্রাপ্তিস্থান—জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিসার্স, ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

আমরা ঈশোপনিষদের শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত কৃত অবধূত ভাষ্য পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিলাম। এই ভাষ্য উক্ত উপনিষৎ বুঝিবার পক্ষে যে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। তাঁহার এই ভাষ্যে পাণ্ডিত্যের অভাব নাই, অথচ কোন বিষয়বস্তুকে জটিল হইতে কোথাও দেওয়া হয় নাই। এইজন্য সাধারণ পাঠকগণও এই গ্রন্থ পাঠে উপনিষদের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

৮৪/৪৭

নারীপ্রগতির তত্ত্বকথা—শ্রীপ্রতিভা রায় প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—নাভানা পাবলিশিং হাউস, ২এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা চারি আনা।

শ্রুতি ও স্মৃতির কথোপকথনের মধ্য দিয়া লেখিকা এই গ্রন্থে নারীপ্রগতির জন্মকথা বিবৃত করিয়াছেন। নারীজীবনে প্রগতি ও পাশ্চাত্যানুসরণ এক নহে; তাহাদের সত্যিকারের প্রগতি গৃহধর্ম বিচ্ছেদ নহে বরং কল্যাণধর্মে। নানাবিধ অস্বাস্থ্যকর বন্ধন মুক্ত হইয়া শরীর, চিত্ত ও মন কিভাবে অধ্যাত্মপূত প্রগতির প্রসারতায় বিকাশ লাভ করিতে পারে, তাহার সম্বন্ধে অনেক চিন্তার কথা এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে।

৮৫/৪৭

গান্ধীজীর অগ্নিপরীক্ষা—অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্র দত্ত এম-এ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—মিত্রালয়, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা চারি আনা।

নোয়াখালির বর্বরতাপীড়িত পল্লীসমূহে গান্ধীজীর ঐতিহাসিক পরিক্রমার দিনলিপি, ঐ সকল স্থানে তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষণ এবং সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী সহজ ভাষায় এই গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। বর্ণনা বাহুল্যবর্জিত, সরস এবং আন্তরিকতাপূর্ণ। ঐ দুর্গতি দুর্গম দেশে গান্ধীজীর একক ভ্রমণের অভূতপূর্ব প্রচেষ্টাকে মানবতার অগ্নিপরীক্ষা ভিন্ন আর কি আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। অগ্নিপরীক্ষা শুধু পুরাণেই আবদ্ধ নহে, গান্ধীজীর জীবনে আমরা তাহাই দেখিয়াছি। গান্ধীজীর দৈনন্দিন ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত সংকলন হিসাবে বইটি বিশেষ মূল্যবান।

৭৩/৪৭

সোভিয়েট নাট্য-মঞ্চ—শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—রূপমঞ্চ প্রকাশিকা, ৩০, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা।

আলোচ্য গ্রন্থের লেখক শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায় দীর্ঘকাল রূপমঞ্চ নামক পর্দা ও মঞ্চ বিষয়ক মাসিকপত্র সম্পাদনা করিয়া এ বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। বাঙলার নাট্য-মঞ্চের উন্নতিসাধনের সংকল্প তাঁহাকে সোভিয়েট নাট্যমঞ্চ বিষয়ে আলোচনার উদ্বুদ্ধ করে। তাহার ফলে তিনি এই বইটি রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে সোভিয়েট দেশের বিভিন্ন থিয়েটারগৃহগুলির গড়িয়া তোলার ইতিহাস, পরিচালনাদির খুঁটিনাটি প্রভৃতি অনেক বিষয়ই বিবৃত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে শিল্পী গঠন এবং নাট্যমঞ্চ সংশ্লিষ্ট বহু জ্ঞাতব্য বিষয় বহুবিধ পুস্তকের সাহায্যে এই গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে। বইটির ছাপা, বাঁধাই এবং চিত্রসজ্জা প্রশংসনীয়।

৮৮/৪৭

বিজ্ঞানবীর এডিসন—শ্রীশুভেন্দু ঘোষ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—সাহিত্যিকা, ১২৩, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা চারি আনা।

বৈজ্ঞানিক এডিসনের জীবন-কাহিনী সংক্ষেপে ও সহজভাবে এই পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আবিষ্কারের বিষয়গুলিও সহজবোধ্যভাবে দেওয়া হইয়াছে। বইটি ছেলেদের জন্য লেখা হইলেও উহা পাঠ করিয়া সকলেই এই বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানবীরের জীবন ও আবিষ্কার সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন।

৭২/৪৭

মহাসূর্য ও অন্যান্য কবিতা—রচয়িতা 'কিংশুক'। প্রাপ্তিস্থান—সেঞ্চুরী পাবলিশার্স, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

মহাসূর্য ও অন্যান্য কবিতা পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি। ইদানীং কবিতার বড় দুর্দিন যাইতেছে। যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত কবিতাকে নূতনত্বের জন্য হেঁয়ালির পর্যায়ে ফেলিয়া রাখা ও দুর্বোধ্য করার চেষ্টা দেখা যাইত। যুদ্ধের সময় কবিতার একদিক ফ্যাসিবিরোধী শ্লোগানে কণ্টকিত ও অন্যদিক মানবতার অপমানে অধোবদন হইয়াছিল। এখন কবিতার সব সুরই স্তব্ধ। মাঝে মাঝে দুই একটি যে বিজলীচমক দেখা যায়, আলোচ্য বইটি তাহারই পরিচয়। এমন সতেজ ভাষা, সাবলীল ছন্দ, বলিষ্ঠ ভাব ও স্বচ্ছ ভঙ্গী এর প্রত্যেকটি কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে যে, খুশী না হইয়া উপায় নাই। 'কিংশুকে'র ছদ্মনামে নিজেকে আবৃত রাখিয়াছেন—তিনি যিনিই হোন না কেন, কাব্যরসিক সমাজে প্রতিষ্ঠালাভের ক্ষমতা তাঁহার প্রত্যেকটি কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে।

৮৩/৪৭

জীবন দোলায়—শ্রীনীলমণি সান্যাল প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—দি গ্রেট ইস্টার্ন পাবলিশার্স লিঃ, ২৬।১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা বার আনা।

'জীবন দোলায়' উপন্যাস। মানুষের দুঃখ বেদনা, প্রীতি ও মমতার নানা আলেখ্য সংযোগে এর গল্পাংশ গড়িয়া উঠিয়াছে। বইটি উপন্যাস পাঠকদের ভাল লাগিবে।

৭০/৪৭

আততায়ী—শ্রীরবীন্দ্রনাথ মহলানবীশ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

'আততায়ী' ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস। লেখক নূতন, কিন্তু গোয়েন্দা কাহিনী জমাইবার ক্ষমতা তাঁহার আছে। যাঁহারা গোয়েন্দা কাহিনী পড়িতে ভালবাসেন, তাঁহাদের নিকট এই বইটিও মন্দ লাগিবে না।

৭৭/৪৭

নৌবিদ্রোহ—শেখ শাহাদাত আলী প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান, ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতীয় নৌবাহিনীতে বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং কয়েক দিনের মধ্যেই তাহা ব্যাপক আকার ধারণ করে। ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে এই ঘটনাটিও বিশিষ্ট স্থান লাভ করিবে। এই বিদ্রোহ কিরূপ পটভূমিকায় উদ্ভূত হইয়া করাচী, বোম্বাই, মাদ্রাজ, আম্বালা প্রভৃতি স্থানে প্রসার লাভ করে এবং নানাদিকে উহার প্রতিক্রিয়া চলিতে থাকে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। লেখক স্বয়ং এই বিদ্রোহের একজন পরিচালক ছিলেন। কাজেই বিদ্রোহের প্রামাণ্য ইতিহাস হিসাবে সংক্ষিপ্ত হইলেও বইটি বিশেষ মূল্যবান। বিদ্রোহের কয়েকখানি ছবি আছে।

৮২।৪৭

মহারাজ নন্দকুমার—শ্রীদুর্গামোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—সাহিত্যিকা, ১২৩, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা চারি আনা।

ভারতে বৃটিশ শাসনের গোড়া পত্তন হয় শাঠ্য, জুলুম, জালিয়াতি, ষড়যন্ত্র, উৎকোচ, অত্যাচার প্রভৃতি বহুবিধ অনাচারের মধ্য দিয়া, আর আজ

র অবসান ঘোষিত হইয়াছে তাহার হাতে গড়া াশকর বর্বর হিংস্রতাকে পশ্চাতে রাখিয়া। মারকে ফাঁসী দেওয়া এই শাসনের একটি র কলঙ্ক হিসাবে বৃটিশ ভারতের ইতিহাসে দ্ধি লাভ করিয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থে লেখক গ্য গ্রন্থাদি অবলম্বন করিয়া নন্দকুমারের নেতিহাসের মালমসলা সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থ ন করিয়াছেন। বৃটিশ শাসনের বর্তমান নতির বুকে বসিয়া ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনের অনেক দৃশ্য নন্দকুমারের জীবনী লাচনায় স্মরণপথে উদিত হইবে। ৭১।৪৭

পড়ার পরেও ভাবতে হবে—শ্রীকৃষ্ণদয়ালু বসু ত। প্রাপ্তিস্থান—মিত্রালয়, ১০, শ্যামাচরণ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা চারি আনা।

বড় বড় মনীষীদের জীবনের এক একটি র ঘটনা সংক্ষেপে এবং গল্প বলার মত কৌশলে লেখক বিবৃত করিয়াছেন। ছেলেদের ক বইটি বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। শিশু হত্যার নানারকম গল্প ও হাসিতামাসার বই পক্ষা বড়লোকদের জীবনের কৌতূহলোদ্দীপক চ শিক্ষনীয় বাস্তব কাহিনী শিশুদের মন ও র গঠনের অধিক সহায়ক। এজন্য লেখক সার্হ। কিন্তু তিনি বিষয়বস্তু সবই নির্বাচন রয়াছেন বিদেশী বড়লোকদের জীবন হইতে। দেশের মহাপুরুষদের জীবন হইতেও অনুরূপ নক বিষয় গ্রহণ করা চলিত না কি?

৭৪।৪৭

রাশিয়ার রাজদূত—শ্রীমনোমোহন চক্রবর্তী নূদিত। সরস্বতী লাইব্রেরী, সি-১৮।১৯ কলেজ ট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

বিখ্যাত ফরাসী লেখক জুলে ভার্ণের মাইকেল গফ্ নামক পুস্তকের অনুবাদ। সাইবেরিয়ায় তার বিদ্রোহের সময়ে রুশিয়ার জারের বার্তাবাহক ইকেল স্ট্রগফ্ নানাবিধ রোমাঞ্চকর বাধাবিপত্তির ভতর দিয়া অবশেষে গন্তব্যস্থান সাইবেরিয়াতে য়া উপস্থিত হয়। এই দুঃসাহসিক যাত্রার কাহিনী গাগোড়া রোমাঞ্চকর ঘটনাবলীতে পূর্ণ। তারদের বর্বর অভিযান ও নিষ্ঠুর কার্যকলাপ বং সাইবেরিয়ানদের দুঃখ ও নির্যাতন বরণের শ্যগুলি পাশাপাশি চিত্রিত হইয়াছে। বইটির নুবাদ বাঙলা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে। অনুবাদ স্বচ্ছ, ছাপা, বাঁধাই এবং প্রচ্ছদপট প্রশংসনীয়। ৭৬।৪৭

সগরল—শ্রীসত্যভূষণ চৌধুরী প্রণীত। মডার্ণ বুক ডিপো, জিন্দাবাজার, শ্রীহট্ট। মূল্য আড়াই টাকা।

'সগরল' বিভিন্ন ভাবের, বিভিন্ন বিষয়বস্তু লইয়া লিখিত ১৫টি ছোট গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলি পড়িয়া আমরা খুশী হইয়াছি। প্রকৃত ছোট গল্পের সংজ্ঞা ও আঙ্গিক এই বইয়ের সবকয়টি রচনাতেই অক্ষুন্ন রহিয়াছে। গল্পগুলি হয়ত বিশেষ কোন অসাধারণত্বের দাবী করিতে পারিবে না, কিন্তু মানুষের সমবেদনার দ্বারে আঘাত দেওয়াই যদি ছোট গল্পের উদ্দেশ্য হয়, তবে এই বইয়ের গল্পগুলি যে সার্থকনামা হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। আশা করি, বইটি গল্পরসিকদের ভাল লাগিবে। বইটি পাঠকদের নিকট আরও এক কারণে ভাল লাগিবে। নানা কারণে আমাদের কথা-সাহিত্যের বিষয়বস্তুতে একঘেয়েমি ঢুকিয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থের গল্পগুলিতে পাঠকগণ অন্ততঃ বিষয়বস্তুর দিক হইতে কিছু কিছু নূতনত্ব পাইবেন।

৯০।৪৭

মুক্তির গান—শ্রীসতীশচন্দ্র সামন্ত কর্তৃক সঙ্কলিত। প্রাপ্তিস্থান—ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, ৯নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা আট আনা।

'মুক্তির গান' মোট ১১৫টি জাতীয় সংগীতের একত্র সংকলন। তন্মধ্যে ৭টি সংগীতের স্বরলিপিও গ্রন্থশেষে দেওয়া হইয়াছে। জাতীয় সংগীতের সংকলন গ্রন্থ ইতিপূর্বেও কয়েকখানা বাহির হইয়াছে। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থখানা অধিকতর প্রতিনিধিত্বমূলক হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। তবে গানগুলি সাজানোতে ভাবের বা সময়ের দিক হইতে কোন ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয় নাই। নামকরা জাতীয় সংগীতকারদের বাছাই করা কতকগুলি গান ইতস্তত ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। তবু অনেকগুলি উৎকৃষ্ট জাতীয় সংগীতের একত্র সংকলন হিসাবে বইটি সকলেরই সমাদর লাভ করিবে। এই সকল গান জাতির প্রাণে এক সময় যথেষ্ট প্রেরণা জাগাইয়াছে। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের সহিত এই সকল সংগীতের অধিকাংশেরই ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে।

৮১।৪৭

সীমান্ত গান্ধী ও খোদাই-খিদমদ্‌গার আন্দোলন—শ্রীসুকুমার রায় প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—ওরিয়েণ্টাল বুক কোম্পানী, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা চারি আনা।

দুর্ধর্ষ পাঠান জাতিকে অহিংসায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা সহজ কাজ নয়। সীমান্ত গান্ধীর আজন্ম সাধনা এতখানি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল যে, বিগত নির্বাচনের পূর্বেও সেখানে লীগ নেতারা প্রচারকার্যের জন্য গেলে পাঠান রমণীরা পর্যন্ত তাঁহাদিগকে লোষ্ট্রাঘাতে বিতাড়িত করিয়াছিল। আজ লীগের দুষ্টনীতির ফলে সেখানে পাঠান জাতির মধ্যে ভাঙ্গন ধরিয়াছে সত্য, কিন্তু সীমান্ত গান্ধীর খোদাই খিদমদগার দল কংগ্রেসের অহিংসা নীতি পুরোভাগে রাখিয়া আজিও সেখানে শান্তি রক্ষার কার্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। সীমান্তে খোদাই খিদমদগার আন্দোলন সীমান্ত গান্ধী খাঁ আব্দুল গফুর খাঁর জীবনের এক সুমহৎ সাধনা। সরলতায় যেমন তিনি শিশুর মত, দৃঢ়তায় তেমনই তিনি বজ্র কঠোর। ভারতের সীমান্তে তিনি দিকপালের মতই অবস্থিত আছেন। তাঁহার জীবনী ও তৎপরিচালিত খোদাই-খিদমদগার আন্দোলনের বিস্ময়কর বিবরণ সংক্ষেপে এবং সহজবোধ্য ভাষায় এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে।

৮০/৪৭

যে ডালে বসে থাকে সেই ডালই কাটে এমন বিচারবুদ্ধিহীন লোক অধুনা ছবির রাজ্যে অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছে, বিশেষ করে অভিনয় শিল্পীদের মধ্যে। বস্তুত বাঙলা দেশের অভিনয় শিল্পীদের মত দায়িত্ব-জ্ঞানহীন এবং নিয়ম পরাঙ্মুখ লোক বড় একটা নজরে পড়ে না। চিত্রনির্মাতাকে পরের স্টুডিও ভাড়া নিয়ে যে কি কষ্টে কাজ করতে হয় ভুক্ত-ভোগীরা তা জানেন এবং খরচেরও অন্ত থাকে না, কিন্তু অভিনয়শিল্পীরা সে সব কথা মোটেই ভেবে দেখেন না এবং প্রযোজকের ক্ষয়-ক্ষতি বিষয়ে একেবারেই উদাসীন থাকেন। বিশেষ করে নামকরা শিল্পীরা যে কি পরিমাণ অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করেন কাজে না নামলে ধারণা করা যায় না। সকাল দশটায় হয়তো শুটিং আরম্ভ হবার কথা, কিন্তু অভিনয় শিল্পী, অবশ্য নামকরারা কেউ বেলা বারোটা একটার আগে স্টুডিওতে পা দেবেন না—তাদের সাধারণ অজুহাত হ'চ্ছে যে খাওয়া এবং

বোসার্ট প্রডাকসন্সের 'প্রিয়তমা' চিত্রে পাহাড়ী সান্যাল ও আরতি মজুমদার

খাওয়ার পর বিশ্রাম না করে তারা কাজে বেরোতে পারেন না এবং বেলা বারোটা একটার আগে তাদের খাওয়ারও অভ্যেস নেই। এই দেরী করে আসার জন্যে প্রযোজকের যে ক্ষতি হয় সে তারা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন না। প্রযোজককে দিন আট ঘণ্টা পিছু প্রচুর স্টুডিও ভাড়া গুণতে হয় সুতরাং দুতিন ঘণ্টা এমনি নষ্ট হওয়ায় যে কতখানি ক্ষতি হয় তা সহজেই অনুমেয়। তাছাড়া বড়দের তো আরও শতেক রকম বাহানা থাকেই। আবার আরেক দল আছেন যারা শুটিংয়ের আগের দিন নানা রকম বেলেল্লাপনা করে পরের দিন শরীরটাকে কাজের অক্ষম করে রাখে এবং ইচ্ছে করে কেউ একেবারেই যায় না, কেউ বা হাজরী দিয়েই বাড়ি চলে যায়—প্রযোজককে যে একটি দিনের পুরো ভাড়া স্টুডিওকে দিতে হবে সে কথা এরা মনেই করে না—প্রযোজকের আর্থিক অবস্থাকে এরা ইচ্ছে করেই যেন খারাপ করে তোলবার জন্যে উঠেপড়ে লাগেন—অর্থাৎ যে গরু দুধ দেয় সেইটিকেই বধ না করতে পারলে যেন এরা শান্তি পান না। প্রযোজকের জন্যে এদের একটুকুও দুখদরদ থাকে না। এইভাবে দেখা গিয়েছে যে, অধিকাংশ ছবিই শেষ হতে চুক্তিকালের চেয়ে বেশী সময় নেয় এবং সেটা হয় সম্পূর্ণরূপে অভিনয় শিল্পীদের জন্যেই। লোকে বলে যে চুক্তিকাল ছাপিয়ে বেশী করে প্রযোজকের টাকা শোষণ করার জন্যেই অভিনয় শিল্পীরা ঐ রকম করে থাকেন। অনেকে আছেন যারা রাত্রে শুটিং হলে কাজ করেন না —অথচ অল্প স্টুডিও এবং বেশী ছবি হওয়ার ফলে রাত্রে শুটিং না হ'লেও চলে না; প্রযোজককে বাধ্য হয়েই রাত্রে কোন কোন দিন কাজ করতে হয় বলে যত দুঃখ কষ্ট বরাদ্দ হয়ে যায় ছোটখাট শিল্পীদের কপালে। বড়-শিল্পীরা বীভৎস উচ্ছৃঙ্খলতায় রাত কাটাবে তবু যে প্রযোজক না হলে তার ডালভাতের সংস্থান হয় না তার হয়ে একটু কাজ করতে রাজী হবে না। বড় অভিনয় শিল্পীরা তাদের এ মনোবৃত্তির পরিবর্তন না ঘটালে তারা নিজেদের ব্যক্তিগত যা ক্ষতি তা তো ভোগ করবেনই, আরও সমগ্র শিল্পকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে তুলবেন।

নূতন ছবির পরিচয়

আট দিন (ফিল্মিস্তান)—কাহিনী জ্ঞান মুখার্জি; পরিচালনা—দশ্ডারাম পাই, আলোক চিত্র এস হরদীপ, শব্দ-যোজনা : জগতপ, সুরযোজনা : শচীন দেববর্মণ, ভূমিকায় : অশোক-কুমার, ভি এচ দেশাই, রামা সুকুল, এস এল পুরী, বীরা, সুনলিনী দেবী প্রভৃতি।

কাপুরচাঁদের পরিবেশনায় ৯ই মে থেকে প্যারাডাইস, বীণা, চিত্রলেখা, পার্ক শো আলোয় দেখান হচ্ছে।

বছর চারেক আগে কানকাটা ঢাক পিটিয়ে পত্তন হবার পর ফিল্মিস্তান এতদিনে একখানা সর্বজন-উপভোগ্য ছবি সাধারণ্যে উপহার দিতে পারলে। উজবুকী আর আজগুবিতে ভরা কাহিনী হলেও আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত ছবিখানির প্রতিটি ইঞ্চি প্রমোদ উপাদানে ভরা এবং কোন এক মুহূর্তও নীরস নয়।

শ্যামু পাঁচ বছর যুদ্ধক্ষেত্রে কাটাবার পর গ্রামে ফিরলো মেজর শ্যামসের হ'য়ে। তার প্রত্যাবর্তনে গ্রামের লোকে তাকে আদর ক'রে অভ্যর্থনা ক'রলে আর ঠিক সেইদিনই তার মা তার বিবাহেরও আয়োজন ক'রলে। শ্যামসের নানা দেশ ঘুরে এসেছে অনেক বিষয়ে জ্ঞান ও দীক্ষা লাভ ক'রেছে, তাই সে প্রথমটায় এ বিবাহে রাজী হয়নি কিন্তু মার আগ্রহে সে রাজী হয়ে বরবেশ পরলে। বর যাত্রা করার সময়ে একজন খবর আনলে, যে মেয়ের সঙ্গে বিবাহ সে মেয়েটি দরকারী কাজে হঠাৎ শহরে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে, সুতরাং বিবাহ হবে না। শ্যামসের রেগে গেলো এবং জীবনটা গ্রামোন্নয়নে কাটাবে স্থির করে চাষবাসের আধুনিকতম যন্ত্রপাতি কেনার জন্যে শহর যাত্রা

এসোসিয়েটেড ওরিয়েণ্টাল ফিল্মসের 'দেশের দাবী' চিত্রে শ্রীমতী সাবিত্রী

ক'রলে। ট্রেনে কোথাও বসবার যায়গা না পাওয়ায় এক তরুণী তার পাশের আসন ছেড়ে দেয়। শহরে এসে শ্যামসের তার বন্ধু তিক্রমের বাড়িতে ওঠে এবং সেখানে ট্রেনের সেই তরুণীর সাক্ষাৎ পায়। তরুণী নীলা তখন এক কঠিন সমস্যায় পড়েছে। তার এক আত্মীয় স্যার নরেন্দ্র মরবার সময় উইল করে যায় যে, নীলা যদি তার মৃত্যুর এক মাসের মধ্যে বিবাহ করে তাহলে সে তিরিশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি পাবে, নয়তো পাবে মোটে পনের হাজার—এক মাস শেষ হবার তখন আটটি দিন মাত্র বাকী। সম্পত্তির অপর দুই উত্তরাধিকারী অর্জুন ও চিরঞ্জীব নীলাকে লাভের চেষ্টা করতে লাগলো এবং নীলা তাদের দুজনকে এড়িয়ে যাবার জন্যে তিক্রমের পরামর্শে অকস্মাৎ আবির্ভূত শ্যামসেরকে পতিরূপে

গ করবে বলে ঘোষণা করে। অর্জুন চিরঞ্জীব চলে গেলে নীলা স্তোকবাক্যে সেরকে ঘুম পাড়ায় এবং সেখান ক পালিয়ে যেতে চেষ্টা করে' তু ধরা পড়ে ফিরে আসতে বাধ্য । শ্যামসেরের তবু ধারণা নীলা তাকে বাসে। কিন্তু নীলা শ্যামসেরকে হটাবার য অর্জুন আর চিরঞ্জীবের সংগে একটা ন্ত্র পাকিয়ে তোলে। একদিন চিরঞ্জীব ও ুন নীলার বিবাহ-সম্বন্ধে ঘোষণা করার : একটি পার্টির আয়োজন করে এবং সেরকে সেখানে অনুপস্থিত রাখার জন্যে া তাকে এক জায়গায় আটকে রাখার চেষ্টা । কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত শ্যামসের সেখান ক চলে আসতে সক্ষম হয় এবং পার্টিতে ত্যাশিতভাবে এসে পড়ে। শ্যামসেরের সংগে ুন ও চিরঞ্জীবের হাতাহাতি হয়ে যায় এবং া পর্যন্ত শ্যামসের আহত হয়। কিছুতেই শ না হয়ে শ্যামসের একফাঁকে, জোর করে াকে নিয়ে পালিয়ে যায়। বহু দূর যাবার শ্যামসের ও নীলার মধ্যে মারপিট হয় যাতে া পালিয়ে গিয়ে এক কুটীরে আশ্রয় নেয়— কুটিরটি আবার শ্যামসেরেরই বাড়ী। শ্যামসের দিনই নীলাকে জোর করে বিবাহের য়োজন করে। বিবাহ সমাপ্তপ্রায় এমন সময়ে ুন, চিরঞ্জীব প্রভৃতি সেখানে উপস্থিত হয় ং নীলাকে নিয়ে শহরে চলে এসে শ্যামসেরের ম মামলা রুজু করে দেয়। শ্যামসেরকে গল সাব্যস্ত করাই ছিল মামলার উদ্দেশ্য; দালত হয়তো তা পারতো না, কিন্তু শ্যামসের ন জানলে যে নীলা তাকে সত্যিই ভালবাসে তখন সে আদালতে পাগলামী দেখিয়ে জেকে পাগল সাব্যস্ত করিয়ে নিলে। মামলার । শ্যামসের গ্রামে ফিরে এলো আর এদিকে লার মাতুল নীলাকে বিবাহের ন্য গ্রামে নিয়ে গেলো। ঘরে ফিরতে মসেরেরও বিবাহের আয়োজন হলো এবং জের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও শ্যামসেরকে বরবেশ ণ করে আসরে দাঁড়াতে হলো। দুটি নিময়ের সময়ে দেখা গেলো শ্যামসেরের সংগে বাহ হয়েছে নীলার এবং জানা গেলো যে ঃ নীলার সংগেই শ্যামসেরের প্রথম বিবাহের বন্ধ হয়েছিল।

ঘটনা চরিত্র সব কিছুই আজগুবি ও বনুকী হওয়া সত্ত্বেও হাল্কা রসের সংযোগে ং অসংখ্য হাস্যোদ্দীপক পরিস্থিতির ন্বয়ে 'আটদিন' একখানি শ্রেষ্ঠ প্রমোদদায়ক ত্র পরিণত হয়েছে। ঘটনাবিন্যাস ও চুট্‌কী লাপ ছবিখানিতে এমনি এক তর্‌তরে গতি ন পিয়েছে যে, দেখবার সময় লোকের ভাববার নিঃশ্বাস ফেলার একটু অবকাশ থাকে না। বর সংগীতাংশ একটি সম্পদ বিশেষ এবং শ নতুনত্বের পরিচয় দেয়। সর্বাংগীন সুন্দর অভিনয় ছবিখানির একটি বৈশিষ্ট্য; বিশেষ-ভাবে অশোককুমারের অভিনয়ের তুলনা পাওয়া যায় না। সবদিক বিবেচনায় 'আটদিন' বর্তমান সময়ের পক্ষে লোকের কাছে প্রভূত আনন্দদায়ক ছবি হিসেবে অভিনন্দন লাভ করবে।

যুক্ত প্রদেশের সরকারী বিভাগ গান্ধী-জিন্নার শান্তি-আবেদন চলচ্চিত্রাকারে প্রচার করবার ব্যবস্থা করেছে।

* * *

ফণী মজুমদার বম্বেতে 'হাম ভী ইনসান হৈ' (আমিও মানুষ) নামক একখানি ছবি তোলা আরম্ভ করেছেন, যাঁর প্রধান ভূমিকায় আছেন রমলা।

* * *

বম্বের অভিনেত্রী স্নেহপ্রভা সম্প্রতি বিলেতে টেলিভিসন পর্দায় অবতরণ করবার এক সুযোগ পেয়েছিলেন; ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই এবিষয়ে প্রথম।

* * *

মেহবুবের 'হুমায়ন' আমেরিকায় মুক্তি-দানের চেষ্টা করা হচ্ছে; সংলাপের বদলে এতে ইংরিজীতে আবহ বিবৃতি সংযুক্ত করা হয়েছে।

* * *

বম্বের একটি সংবাদে প্রকাশ, প্রতিমা দাশ-গুপ্তা ও বেগমপারা অভিনেতা হিমালয়-ওয়ালাকে প্রহার করার দায়ে আদালতে অভিযুক্ত হয়েছিলেন; পরে অবশ্য বন্ধুবান্ধবদের মধ্যস্থতায় মামলা প্রত্যাহৃত হয়।

সাহিত্য সংবাদ

ফরিদ স্মৃতি প্রতিযোগিতা

বিষয়ঃ

(ক) ছোট গল্প (শিশু সাহিত্য) গল্পটি ফুলস্কেপ কাগজের ৩ পৃষ্ঠার মধ্যে হওয়া দরকার। চিত্তাকর্ষক নাম, চলতি ভাষায় লেখার স্টাইল, নতুন প্লট—নির্বাচনের সময় এ তিনটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করা হবে।

(খ) ছোট কবিতা (শিশু সাহিত্য) কবিতাটি ২০ লাইনের অনধিক হওয়া আবশ্যক। চিত্তাকর্ষক নাম ও ছন্দ—নির্বাচনের সময় এই দুটি বিষয় বিশেষ করে বিবেচনা করা হবে।

যে কেউ যোগ দিতে পারেন। কোন প্রবেশমূল্য নেই। যোগদানের শেষ তারিখ ৩০শে জুন ১৯৪৭। প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারীদের পুরস্কৃত করা হবে। আমাদের বিচারই চূড়ান্ত।

পরিচালকঃ

সৈয়দ নুরুল আলম।
"আলম লাইব্রেরী"
সেণ্ট্রাল ঘোপ রোড
যশোহর।

শিখা রচনা প্রতিযোগিতা

যে কোন প্রতিযোগী ইহাতে যোগদান করিতে পারেন। কোন প্রবেশমূল্য নাই। রচনা যত ছোট হইবে, ততই ভাল। বিভাগীয় বিচারকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। ১৬ই শ্রাবণের মধ্যে রচনা পাঠাইতে হইবে।

রচনার বিষয় ঃ—

(ক) প্রবন্ধ, (খ) গল্প, (গ) কবিতা, (ঘ) মেয়ে মহল, (ঙ) কিশোর মহল।

বিঃ দ্রঃ—(ঘ) বিভাগে কেবলমাত্র মেয়েরা (ঙ) বিভাগে কেবলমাত্র ১৬ বছরের অনধিক ছেলেমেয়েরা যোগদান করিতে পারেন।

পত্র ও লেখা পাঠাবার ঠিকানা ঃ— অতুলচন্দ্র মাহাত, সাহিত্যবিনোদ। ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর।

রামানন্দ স্মৃতি গ্রন্থাগার

প্রতিভাবান সাংবাদিক ও নির্ভীক সমালোচক স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নামানুসারে গত দুই বৎসর যে স্মৃতি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার উন্নতিকল্পে আমরা নিম্নলিখিত কার্যসূচী অনুসরণ করিতে উদ্যোগী হইয়াছি।

আপনাদের যথাযোগ্য সহযোগিতা ও সহানুভূতি প্রার্থনা করি।

(ক) জনশিক্ষা প্রচারকল্পে একটি নৈশ বিদ্যালয় ও একটি গ্রন্থাগার পরিচালনা।

(খ) প্রতি পূর্ণিমায় বিবিধ আলোচনা সভার ব্যবস্থা।

(গ) কবিতা, প্রবন্ধ, ছোট গল্প, ইত্যাদি প্রতি-যোগিতার (পুরস্কারমূলক) মধ্য দিয়া তরুণদিগকে উৎসাহ দান।

(ঘ) সুস্থ, সবল, পরোপকারী নাগরিক গঠনের প্রচেষ্টা।

বিনীত—শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়।

অভিনেতা

জন ব্যানক্রফ্ট

সমস্ত সন্ধ্যাটা গ্রেগরি উদ্বিগ্ন চোখে তার অতিথিদের মধ্যে কাকে খুঁজে বেড়িয়েছে। নতুন ঘরটায় অতিথিরা সব ভীড় করে আছে। বারান্দায় গল্পনিরত দুটি লোকের দিকে চোখ পড়তেই উদ্বেগ তার ঘৃণায় ফেনিয়ে উঠল।

জেরোম তা'হলে এসেছে। গ্রেগ একবার ভয় পেয়েছিল। ভেবেছিল অভিনেতা বন্ধুটি বোধ হয় এল না। কিন্তু সে এসেছে এবং বরাবরকার মতই গল্প করছে গ্রেগরীর স্ত্রী ক্লেয়ারের সঙ্গে নিভৃত একটা কোণ খুঁজে নিয়ে। অনেক চেষ্টায় মুখে নিরুদ্বিগ্ন অমায়িকতার একটা হাসি টেনে এনে গ্রেগরী এগিয়ে গেল ওদের কাছে।

এই যে জেরী, অভিনেতাটির পিঠে চাপড় মারল সে। বাড়ীটা খুঁজে পেলে তাহ'লে; কেমন লাগছে ?

'এই ঘরটা অপূর্ব হয়েছে'—একটু কারুণ্যের হাসি হাসল জেরোম। 'অবিশ্যি, তোমাদের—যাদের টাকা আছে, তাদেরই মানায় এ সব।'

'টাকাতে অনেক কিছুই হয় জেরী'—গ্রেগরী হেসে বল্‌ল। ক্লেয়ারকে কেমন চিন্তিত দেখাচ্ছে। ওকি ভয় পেয়েছে ? ভাবছে গ্রেগরী একটা হৈচৈ বাধাবে ? জেরোমের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, এই এক মুহূর্তে ক্লেয়ারের চোখের মধ্যে যেন গ্রেগ্‌ তা দেখতে পেল। জ্বলে গেল ওর সমস্ত মনটা।

জেরী, তোমাকে আমার লাইব্রেরীটা দেখাতে চাই। আমার ভারী প্রিয় ঘরটা'। ক্লেয়ারের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকাল সে। 'জেরীর নিশ্চয় ভালো লাগবে ঘরটা কি বল ?'

'নিশ্চয়', ক্লেয়ার একটু বিস্মিত হয়ে একবার জেরী, একবার গ্রেগের দিকে তাকাল। 'ঘরটার পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবেই গ্রেগের খেয়ালমত হয়েছে—দেখে এসো।' 'ভারী কৌতূহলী করে তুলছ আমায় কিন্তু তোমরা—'চলো না হে, দেখেই আসবে।

মুখের ঈর্ষা ও বিরক্তিটা গোপন করতে করতে গ্রেগ বারান্দার দরজাটা খুলে ধরল। লম্বা, নির্জন বারান্দাটা পেরিয়ে বাড়ির অপর প্রান্তে পড়ার ঘরটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল তারা। বহু চেষ্টায় হাতের কাঁপুনিটা থামিয়ে ঘরের দরজাটা একটানে খুলে ফেললো গ্রেগরী।

"আশ্চর্য ! কি আশ্চর্য !"

ঘরটা দেখে জেরোম একেবারে অভিভূত হ'য়ে গেল।

"আমি ভেবেছিলাম তুমি অবাক হবে খানিকটা", হাসতে হাসতে গ্রেগ্‌ বলল, "ঐ যে তোমার চেয়ারটা, চিনতে পারছো ?"

"আরে, নাটকটার শেষ দৃশ্যে আমি তো ওখানেই বসি।" বসতে বসতে জেরোম ব'লল।

গ্রেগরী জেরোমের মুখোমুখি দাঁড়ালো।

"জেরি ! তুমি হয়তো ভাবছো উৎসবের কোলাহল থেকে টেনে তোমাকে আমি ক্লেয়ার সম্বন্ধে কথা বলতে ডেকেছি। তা কিন্তু ঠিক নয়। নাও, সিগারেট নাও,—আরাম করে বসো। সত্যি বলতে কি, ক্লেয়ার যা করতে চায়, তাতে আমি কখনও বাধা দেই না। আর তোমার অভিনয়ের আমিও একজন মস্ত ভক্ত। বিশেষ করে তোমার যে বইটা এখন চলছে—অদ্ভুত করেছ কিন্তু তুমি।"

ন্যায্য প্রশংসা শুনে জেরোম পরিতৃপ্তিতে হেলান দিয়ে বসলো। বললে, "বইটা সত্যিই ভাল হয়েছে।"

—"বইটার কথা ছেড়েই দাও না, আসলে তুমি যে একজন উঁচুদরের শিল্পী, এ বইটায় তোমার সেই পরিচয়টা কিন্তু ভারি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। বইটা চলছেও প্রায় এক বছর ধ'রে, না ?"

—"হ্যাঁ, এক বছর না হ'লেও আটচল্লিশ সপ্তাহ তো হ'লোই।

—"আমি বইটা পাঁচবার দেখেছি। বিশেষ ক'রে শেষ দৃশ্যটা ! আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল প্রথমবার। আর সেই জন্যেই আমি এই ঘরটা হুবহু সেই দৃশ্যের মত ক'রে সাজিয়েছি।"

"খুঁটিনাটিটা পর্যন্ত ভুল করোনি কিন্তু। আমার এখানে বেশ লাগছে। মনে হচ্ছে যেন স্টেজেই আছি।"

—"ওঃ সেই শেষ দৃশ্যটা জেরি, এমন অভিনয় আর আমি কখনও দেখিনি।

"তোমার ভাল লেগেছে জেনে আমি সত্যিই খুশী। ঐ দৃশ্যটা কিন্তু আমারও খুব ভাল লাগে।"—চেয়ারটাতে নড়েচড়ে ব'সে জেরি চোখ বুঁজলো।

অদ্ভুত একটা দৃষ্টিতে গ্রেগ জেরোমের মুখটা নিরীক্ষণ করতে লাগলো। নাঃ লোকটার চেহারা সত্যিই ভালো। এ রকম সুপুরুষ সচরাচর দেখা যায় না। স্বাস্থ্যটাও চমৎকার—স্বীকার ক'রতেই হয়। আচ্ছা কি ভাবছে জেরোম আস্কট। হয়তো ওর গৌরবোজ্জ্বল সন্ধ্যাগুলির কথা ভাবছে। কিংবা ক্লেয়ারের কথাই ভাবছে—যেদিন প্রথম আলাপ হয়েছিল ওদের। যাহোক ভঙ্গীটা মানিয়েছে জেরিকে।......

"......ঠিক এমনটি করেই বসে আছ তুমি—ঠিক এই চেয়ারটাতে—পর্দাটা উঠলো।"

জেরি মাথা নাড়লো।

গ্রেগরী ব'লে চললো, "তারপর তোমার ব্যবসার অংশীদার বন্ধুটি ঢুকলো স্টেজে আর বললো" এই কথাকটি বলে গ্রেগ অংশীদার বন্ধুটির চরিত্রটি আবশ্যক অঙ্গভঙ্গীর সঙ্গে আগাগোড়া অভিনয় ক'রে গেল।

'সাবাস ! চমৎকার হয়েছে' জেরী বলল।

গ্রেগের মুখটা লাল। যাক পেরেছে সে তাহ'লে, বারবার রিহার্স্যাল দেওয়া বৃথা হয়নি তার।

'তোমার ভূমিকাটা করে যাও জেরি, দেখা যাক, অভিনয় বিদ্যাটা আমার আসে কি না।'

দৃশ্যটা সত্যিই নাটকীয়, বইটাতে এই দৃশ্যে এস্‌কটকে তার অংশীদার জেরা করছে। জালিয়াতি, চুরি, সরকারী কাগজপত্র ভাঙিয়ে ধনী হবার চেষ্টা—একটার পর একটা অভিযোগ আনছে সে। জেরোম সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করল প্রথমে। ধীরে ধীরে স্বীকার করতে বাধ্য হোল' সে।

তারা দুজন দৃশ্যটা অভিনয় করে চলল। প্রথম দিকটাতে গ্রেগরী বেশ অস্বস্তি বোধ করছিল, কিন্তু মাঝামাঝি জায়গায় এসে অতি-কুশল নৈপুণ্যে সে করে চলল। সামান্য একটা অঙ্গুলের ভঙ্গীও চোখ এড়ায়নি তার বেশ বোঝা যায়, জেরোম স্টেজের মতই সহজ ভাবে অভিনয় করে চলল।

কথাকাটাকাটি আস্তে আস্তে ঝগড়াতে গিয়ে পেঁৗছল। ঘৃণা, বিরক্তি, ক্ষোভ হতাশা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়ছে প্রতিটি উক্তিতে। তারপর আসল নাটকটার মতই জেরোম অনুশোচনায় ভেঙ্গে পড়ল চেয়ারটাতে। গ্রেগ এবার বোধহয় শেষ কথা বলার জন্য তৈরী হোল। বিস্ময়কর কুশলতায় সে পুঞ্জিত ঘৃণা ঢেলে দিল তার উক্তিতে।

এবার। এবার নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত চরমে এসে পেঁৗছেছে। গ্রেগ রুদ্ধ নিঃশ্বাসে জেরোমের প্রতিটি অঙ্গ সঞ্চালন দেখছে। অবরুদ্ধ উত্তেজনায় প্রতিটি লোম তার খাড়া হয়ে উঠেছে। পাশের ছোট টেবিলটায় জেরোম ধীরে হাত রাখল। হাতটা খোলা দেরাজে ঢুকল। বেরিয়ে এল চকচকে একটা রিভলভার নিয়ে।

শেষ উক্তিটি দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে বলে অস্ত্রটার নল কপালে লাগিয়ে জেরোম ঘোড়া টিপে দিল।

এই একবারই তাতে আসল গুলি ভরা ছিল।

অনুবাদক—**মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য**

খেলাধূলা

ফুটবল

কলিকাতায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে নাই। সামরিক কর্তৃপক্ষ কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলের শান্তিরক্ষার জন্য কড়া পাহারায় নিযুক্ত হওয়ায় ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই অস্বাভাবিক অবস্থা ফুটবল খেলার উৎসাহে বাধ সাধিতে পারে নাই। কলিকাতায় ফুটবল খেলার উৎসাহ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। দক্ষিণ কলিকাতা এতদিন সকল খেলার উৎসাহের কেন্দ্রস্থল ছিল। বর্তমানে ইহা উত্তর ও মধ্য কলিকাতায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। উত্তর কলিকাতার কতিপয় বিশিষ্ট ক্রীড়ামোদীর প্রচেষ্টায় উত্তর কলিকাতায় ফুটবল লীগ খেলা আরম্ভ হইয়াছে। মাত্র এক সপ্তাহ হইল এই খেলা আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু ইতিমধ্যেই খেলায় যোগদান করিবার জন্য খেলোয়াড়ের অথবা দর্শকের অভাব হইতেছে না। দক্ষিণ কলিকাতার অনুষ্ঠানের ন্যায় উত্তর কলিকাতার খেলায় বহু খ্যাতনামা ফুটবল খেলোয়াড় যোগদান করিতেছেন। মধ্য কলিকাতার অনুষ্ঠান হিসাবে গড়ের মাঠের পাওয়ার মেমোরিয়াল লীগের খেলা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই প্রতিযোগিতার বিভিন্ন খেলায় উত্তর, দক্ষিণ, মধ্য প্রভৃতি সকল কলিকাতা অঞ্চলেরই খেলোয়াড়গণ যোগদান করিয়া থাকেন। প্রতিদিন বিভিন্ন খেলা নির্বিঘ্নে অনুষ্ঠিত হইতেছে। যানবাহনের অসুবিধার জন্য দর্শক সমাগম খুব বেশী হইতেছে না কিন্তু তাহা বলিয়া কোন দলকেই খেলোয়াড়ের অভাব অনুভব করিতে হইতেছে না। ইহা ছাড়া কলিকাতার বহু পার্কে ছোট ছোট অনেক ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইতেছে। ফুটবল খেলার এই যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি ইহার পর যদি আমরা বলি "খেলোয়াড়দের সহিত দাঙ্গাহাঙ্গামার কোনই সম্পর্ক নাই" খুব কি অন্যায় বলা হইবে? আই এফ-এর পরিচালকগণ প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল খেলা বন্ধ করিয়া খেলোয়াড়দের প্রতি অন্যায় অবিচার করিয়াছেন ইহা কি সত্য নহে?

সম্প্রতি আই এফ-এর এক সভায় কতকগুলি বিশিষ্ট খেলোয়াড়কে দক্ষিণ কলিকাতায় বিভিন্ন দলে খেলিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য অঞ্চল হইতে বিশিষ্ট খেলোয়াড়গণকে দলে খেলিবার অনুমতি দিতে যদি আবেদন করা হয়, তাহা যে গ্রাহ্য হইবে উক্ত সভার সিদ্ধান্ত হইতে উপলব্ধি করা যায়। পরিচালকগণ অনুমতি দিতে যে আপত্তি করেন নাই ইহা খুবই আনন্দের বিষয়। তবে আমাদের জিজ্ঞাস্য যে, পরিচালকগণ নিজেরা কবে মাঠে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিবেন? শোনা যায় শীল্ড প্রতিযোগিতা যাহাতে হয় তাহার জন্য তাঁহারা নাকি আলাপ আলোচনা করিতেছেন এই আলাপ ফলবতী হইবে কবে? সাধারণ ক্রীড়ামোদী বা খেলোয়াড়ের ধৈর্যের এক সীমা আছে—সেই সীমা অতিক্রম করিলে পরিচালকমণ্ডলীকে অনেক কিছু সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে। সেই সকল সমস্যা যে কি তাহার কিছু আভাষ আমরা পাইয়াছি। আমরা আশা করি সেই সকল দেখা দিবার পূর্বেই আই এফ-এর পরিচালকগণ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া ক্রীড়াক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন।

টেনিস

নিখিল ভারত টেনিস এসোসিয়েশন ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার জন্য যখন খেলোয়াড় নির্বাচন করেন তখন আমরা একটি তরুণ উৎসাহী খেলোয়াড়কে দলে স্থান দিবার জন্য বার বার অনুরোধ করি। কিন্তু আমাদের সেই আবেদন ও যুক্তি টেনিস এসোসিয়েশনের কর্তৃপক্ষগণকে বিচলিত করে নাই তাঁহারা তাঁহাদের খুশী মত কয়েকজনকে নির্বাচিত করেন। ইহার ফল যাহা হইল তাহা আর পুনর্বার না বলাই ভাল। তবে আমরা যে খেলোয়াড়টির কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম সে নিজ অর্থ ব্যয়ে লণ্ডনে গিয়াছে। উইম্বলডেন প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবে বলিয়া শোনা যায়। তবে ইতিমধ্যে সে ইংলণ্ডের টেনিস খেলায় সুনাম অর্জন করিয়াছে। বার্মিংহাম টেনিস প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া ডাবলসে চ্যাম্পিয়ান হইয়াছে। নিখিল ভারত টেনিস এসোসিয়েশন মনোনীত খেলোয়াড়গণের কেহই এই সুনাম অর্জন করেন নাই। এই তরুণ খেলোয়াড়টির নাম মানমোহন। ইহার কৃতিত্ব প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যখন এই খেলোয়াড় চেকের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় ড্রবলীকে কলিকাতায় নিখিল ভারত টেনিস প্রতিযোগিতায় পরাজিত করে। সেই দিনের মানমোহনের খেলা যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। ড্রবলী এই খেলায় পরাজিত হইয়া এতই বিচলিত হন যে, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে খেলিবার ব্যবস্থা বাতিল করিয়া দেশে চলিয়া যান। এইরূপ একটি খ্যাতিসম্পন্ন তরুণ উৎসাহী খেলোয়াড়কে বাদ দিয়া প্রবীণ, স্থূলকায় খেলোয়াড়কে দলভুক্ত করা কোনরূপেই যুক্তিসংগত হয় নাই। ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় ভারতীয় খেলোয়াড়গণ কোনরূপেই সাফল্যলাভ করিবেন না ইহা আমরা পূর্বেই জানিতাম এবং সেইজন্যই বার বার তরুণ খেলোয়াড়গণকে ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরণ করিতে বলি। কারণ তরুণ খেলোয়াড়দের যে অভিজ্ঞতা লাভ হইবে তাহার দ্বারা ভবিষ্যতে তাহারা উন্নতি করিতে পারে। কিন্তু যাহাদের উন্নতি হইবার আশা নাই তাঁহাদের বহু অর্থ ব্যয় করিয়া অভিজ্ঞতা লাভের জন্য প্রেরণ করার কোনই মানে হয় না। যাহা হউক মানমোহন বার্মিংহাম টেনিস প্রতিযোগিতায় সাফল্যলাভ করিয়া কর্তৃপক্ষগণের উপেক্ষার সমুচিত প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছেন। উইম্বলডেন প্রতিযোগিতায় আরও উন্নততর নৈপুণ্য প্রদর্শন করুন ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

মুষ্টিযুদ্ধ

পশ্চিম ভারত এমেচার বক্সিং এসোসিয়েশন বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানে ভারতীয় মুষ্টিযোধা প্রেরণের তোড়জোড় করিতেছেন। আগামী জুলাই মাসে এইজন্য নাগপুরে একটি নিখিল ভারত মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিয়া বিভিন্ন প্রাদেশিক এসোসিয়েশন বা ফেডারেশনকে প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। সকল প্রদেশ হইতেই প্রতিনিধি প্রেরিত হইবে ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কেবল আশঙ্কা হইতেছে বাঙলা হইতে কোন দল যাইবে না। ইহার প্রধান কারণ দুইটি পরিচালকমণ্ডলী বাঙলায় বর্তমান। বেঙ্গল এমেচার বক্সিং ফেডারেশনের অস্তিত্বই নাই কিন্তু আইনতঃ ইহারাই বাঙলার দল নির্বাচনের অধিকারী। অপর প্রতিষ্ঠানটিতে বহু বাঙালী ও অ-বাঙালী মুষ্টিযোধা আছেন, যাঁহারা উক্ত প্রতিযোগিতায় প্রেরিত হইলে সাফল্য লাভ করিতেন নিশ্চিত, কিন্তু বাঙলার প্রতিনিধিত্ব করিবার অধিকার ইহাদের নাই। কিছুদিন পূর্বে শোনা গিয়াছিল বাঙলার মুষ্টিযুদ্ধের প্রথম প্রবর্তক শ্রীযুত পি এল রায়, বেঙ্গল এমেচার বক্সিং ফেডারেশন ও বেঙ্গলী বক্সিং এসোসিয়েশন এই দুইটি প্রতিষ্ঠানকে লুপ্ত করিয়া বেঙ্গল বক্সিং এসোসিয়েশন নামে একটি নূতন প্রতিষ্ঠান গঠন করিবেন। এই প্রতিষ্ঠান উক্ত দুইটি প্রতিষ্ঠানেরই প্রতিনিধি থাকিবেন। সেই প্রচেষ্টা ফলবতী হইবে এইরূপ সময় দেশের অবস্থা শোচনীয় হওয়ায় শেষ পর্যন্ত উক্ত নূতন প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হয় নাই। আমরা আশা করি নাগপুরের অনুষ্ঠানের পূর্বে উক্ত নূতন প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া উঠিবে ও বাঙলার উৎসাহী মুষ্টিযোধাগণ বিনা বাধায় উহাতে যোগদান করিবেন।

যদি উক্ত প্রতিষ্ঠান গঠিত না হয় বেঙ্গলী বক্সিং এসোসিয়েশন সকল বাধা অতিক্রম করিয়া দল প্রেরণ করিবেই বলিয়া স্থির করিয়াছে। মুষ্টিযুদ্ধ বিষয়ে বাঙলা এখনও ভারতের যে কোন প্রদেশ অপেক্ষা অনেক উন্নত। বাঙলা এই বিষয় সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে বলিলে অন্যায় হইবে না। সেই বাঙলার মুষ্টিযোধাগণ ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে পারিবে না ইহা বেঙ্গলী বক্সিং এসোসিয়েশনের কর্তৃপক্ষগণ কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারেন না। সেইজন্যই তাঁহারা নাগপুর অনুষ্ঠানে বাঙলার প্রতিনিধি প্রেরণের আয়োজন করিতেছেন। ইঁহাদের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হউক ইহাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা।

দেশী সংবাদ

২৬শে মে—কবি নজরুল ইসলামের ৪৯তম জন্মতিথি উপলক্ষে অদ্য কলিকাতায় শ্যামবাজার এ ভি স্কুলে এক মহতী সভা হয়। সভায় কবির রোগ মুক্তি ও দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া বিভিন্ন বক্তা তাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

কলিকাতায় দাংগা-হাংগামাজনিত ঘটনাবলীতে ৮ ব্যক্তি নিহত এবং ১২জন আহত হয়। এই সংখ্যা সরকারীভাবে সমর্থিত হয় নাই।

ময়মনসিংহের সংবাদে প্রকাশ, ঢাকা-ময়মনসিংহ লাইনে সাতখামার ও শ্রীপুর ষ্টেশনের মধ্যে ট্রেণ ধ্বংসের চেষ্টা হইয়াছিল।

২৭শে মে—নাটোরের সংবাদে প্রকাশ, কিছুদিন যাবৎ নাটোর মহকুমায় সিংরা ও গুরুদাসপুর থানায় নারীহরণ ও নারীদের উপর অন্যান্য প্রকারের অত্যাচার বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া জানা যায়।

মার্ঘারিটার সংবাদে প্রকাশ, লামডিং-তিনসুকিয়া লাইনে বালিমারা ও নামরূপ ষ্টেশনের মধ্যে ৩৬নং ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেণখানি লাইনচ্যুত করিবার জন্য চেষ্টা হইয়াছিল বলিয়া সন্দেহ হইতেছে।

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে বাংগলার অনুন্নত জাতির এক সম্মেলনের উদ্বোধন প্রসংগে অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টের খাদ্য সচিব ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেন যে, ভারতবর্ষ যদি বিভক্ত হয়, তবে বাংগলা ও পাঞ্জাব প্রত্যেকটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে। অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টের শ্রম সচিব শ্রীযুত জগজীবন রাম সম্মেলনে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন।

কলিকাতায় দাংগা-হাংগামাজনিত বিভিন্ন ঘটনায় ৬জন নিহত ও ২৩জন আহত হয়।

বাংগলার গবর্ণর মিঃ ফ্রেডারিক বারোজ বাংগলার নরনারীদের উদ্দেশ্যে এক বেতার বক্তৃতা করেন। উহাতে তিনি বলেন যে, বাংগলায় সাম্প্রদায়িক অশান্তি দমনের জন্য তিনি পূর্ণ ক্ষমতা প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং এই উদ্দেশ্যে বাংগলা প্রদেশে আরও সৈন্য আনাইয়া বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে উহাদিগকে মোতায়েন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

বাংগলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ এইচ এস সুরাবর্দী, শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু প্রমুখে বাংগলার কয়েকজন বিশিষ্ট কংগ্রেস ও লীগ নেতা এক যুক্ত আবেদন প্রচার করিয়া শান্তি রক্ষার জন্য সকলকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

২৮শে মে—অদ্য কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় কাউন্সিলার শ্রীযুত ভবেশচন্দ্র দাস এইরূপ অভিযোগ করেন যে, রেশন দোকানে নিয়মিতভাবে আটা পাওয়া যায় না। তদুপরি মাঝে মাঝে যে আটা দেওয়া হইতেছে, তাহাতে তেঁতুল বিচির গুঁড়া মিশান থাকে।

কুমিল্লার সংবাদে প্রকাশ, গত ২৬শে মে চাঁদপুরের নিকট সাহাতলী ষ্টেশনে রেলওয়ে প্রহরীদের একখানা স্পেশ্যাল ট্রেণ সামান্য লাইনচ্যুত হইয়াছিল। ফলে কেহই হতাহত হয় নাই।

মালদহ টাউন হলে মালদহ জেলা বংগ-ভংগ সম্মেলনের অধিবেশন হয়। সম্মেলনে বংগ বিভাগের দাবী সমর্থন করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

রাষ্ট্রপতি আচার্য জে বি কৃপালনী সম্প্রতি লাহোর ও রাওয়ালপিণ্ডি পরিদর্শনান্তে নয়াদিল্লীতে প্রত্যাবর্তনের পর এসোসিয়েটেড

প্রেসের প্রতিনিধির নিকট সাক্ষাৎকারকালে বলেন যে, পাঞ্জাবের দাংগা-হাংগামার একটি প্রত্যক্ষ ফল এই যে, প্রদেশ বিভাগের দাবী অধিকতর সুসংবদ্ধ ও শক্তিশালী হইয়াছে।

পাঞ্জাবে আইন ও শৃংখলা রক্ষা কার্যে অসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার জন্য যে সব সৈন্য রহিয়াছে, তাহাদের শক্তি বৃদ্ধিকল্পে দক্ষিণ ভারত হইতে আরও কয়েক ইউনিট সৈন্য পাঞ্জাব যাত্রা করিয়াছে।

২৯শে মে—নয়াদিল্লীতে প্রার্থনান্তিক সভায় মহাত্মা গান্ধী বলেন যে, ১৬ই মের ঘোষণা অনুযায়ী গণ পরিষদের অধিবেশন চলিয়াছে এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কাজ হইল ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিয়া ভারত ত্যাগ করা।

বাংগলা সরকার কলিকাতা কর্পোরেশনকে উহার আর্থিক সংকট কাটাইয়া উঠিবার জন্য ৫০ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করিয়াছেন।

৩০শে মে—দক্ষিণ পাঞ্জাবের গুরগাঁওএ পুনরায় গুরুতর হাংগামা শুরু হইয়াছে। উহার ফলে ৩০টি গ্রাম ভস্মীভূত হইয়াছে। হতাহতের সঠিক সংবাদ পাওয়া না গেলেও সামরিক ও বে-সামরিক কর্তৃপক্ষের অনুমান যে, উক্ত হাংগামায় প্রায় দুইশত লোক প্রাণ হারাইয়াছে এবং বহুসংখ্যক লোক আহত হইয়াছে।

দেশরক্ষা সচিব সর্দার বলদেব সিং অদ্য গুরগাঁও জেলার উপদ্রুত অঞ্চলসমূহ পরিদর্শন করেন। স্বরাষ্ট্র সচিব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল অদ্য মোটরযোগে নয়াদিল্লী হইতে গুরগাঁওয়ের উপদ্রুত অঞ্চলে গিয়াছেন।

কলিকাতায় দাংগা-হাংগামাজনিত বিভিন্ন ঘটনায় তিনজন নিহত ও ১০জন আহত হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের সমস্যা সম্পর্কে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও ফিল্ড মার্শাল স্মাটসের মধ্যে যে পত্র বিনিময় হইয়াছিল, সেগুলি প্রকাশ করা হইয়াছে। জেনারেল স্মাটস ও ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন যে, ভারতীয় হাই কমিশনারকে পুনরায় দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রেরণ না করিলে আলোচনা আরম্ভ হইতে পারে না। এ সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্টের বক্তব্য এই যে, উভয় দেশের মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল, উহার অবনতি ঘটিয়াছে বলিয়াই হাই কমিশনারকে দেশে ফিরাইয়া আনা হইয়াছে। এই সম্পর্কের উন্নতি না ঘটিলে ভারতীয় হাই কমিশনারকে সে দেশে পুনরায় পাঠাইয়া কোনই লাভ নাই।

বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন আজ রাত্রিতে নয়াদিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

ভারত সরকার শ্রীযুত আণের স্থলে শ্রীযুত ভি ভি গিরিকে সিংহলস্থিত ভারতীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছেন।

৩১শে মে—কলিকাতায় দাংগা-হাংগামাজনিত অবস্থার অবনতি ঘটে এবং বিভিন্ন ঘটনায় ১৩জন নিহত ও প্রায় ৭০জন আহত হয়। এই সংখ্যা সরকারী সূত্রে সমর্থিত হয় নাই।

নয়াদিল্লীতে মহাত্মা গান্ধীর বাসস্থান ভাঙ্গী কলোনীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হয়।

কৃষ্ণনগরে নদীয়া জেলা জাতীয় বংগ সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবে এই দাবী জানান হয় যে, ভারত বিভাগ হইলে বংগ বিভাগ অবশ্যম্ভাবী।

বরোদার দেওয়ান স্যার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "বরোদা রাজ্য অখণ্ড ভারতের সমর্থক। ভারতকে যদি খণ্ডিত করা হয়, তাহা হইলে আমরা হিন্দুস্থানে যোগদান করিব।"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সভায় বাংগলার খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক স্বর্গীয় ডাঃ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নামানুসারে বার্ষিক এক বক্তৃতা মালার ব্যবস্থা এবং ত্রৈবার্ষিক একটি পুরস্কার ও পদক দানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১লা জুন—কলিকাতার বেলিয়াঘাটা, মুচিপাড়া, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, তালতলা, এণ্টালী, বেনিয়াপুকুর ও মাণিকতলা এই ৭টি থানা এলাকা মিলিটারীর অধীনে গিয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

২৬শে মে—বৃটিশ শ্রমিক দলের বাৎসরিক সম্মেলনে শ্রমিক দলের চেয়ারম্যান মিঃ ফিলিপ নোয়েল বেকার তাঁহার সভাপতির অভিভাষণকালে পৃথিবীর সমস্ত সমাজতন্ত্রীদল এবং সমাজতান্ত্রিক গভর্নমেণ্টের জন্য এক চারি দফামূলক বিশ্ব সনদের উল্লেখ করেন। দফা চারিটি হইল, (১) পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে এক নূতন সম্পর্ক স্থাপন, (২) ঐক্যবদ্ধ ইউরোপ গঠন, (৩) পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে পারস্পরিক সহযোগিতার এক নূতন সম্পর্ক গড়িয়া তোলা ও (৪) যুদ্ধ-ভীতির বিলোপ সাধন।

২৯শে মে—তুরস্কের প্রধান মন্ত্রী মঃ পেকার তুর্ক পার্লামেণ্টে বলেন যে, কোন এক বিদেশী রাষ্ট্র তুরস্কের নিকট ঘাঁটি প্রতিষ্ঠার দাবী জানাইয়া নোট প্রেরণ করিয়াছেন। সমান দায়িত্বের অছিলায় এইসব ঘাঁটি প্রতিষ্ঠার দাবী করা হইয়াছে। ইহা তুরস্কের ভূখণ্ড দাবী করার সমতুল এবং তুরস্ককে এই নূতন বিপদ সম্পর্কে সর্বদা সচেতন থাকিতে হইবে।

৩০শে মে—আমেরিকার কো-গার্ডিয়া বিমান-ঘাঁটির নিকট একটি বিমান ধ্বংস হওয়ায় ৪২ জন আরোহী আগুনে পুড়িয়া মারা গিয়াছে।

আফগান জাতীয় পরিষদে বক্তৃতা প্রসংগে রাজা জহির শাহ ভারতের আসন্ন শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন সম্পর্কে উল্লেখ করেন এবং বলেন, ভারতের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ নিজেরা মিটাইয়া ফেলিলেই তাহাদের নিজেদের পক্ষে এবং প্রতিবেশীর পক্ষে ভাল। ভারতের আসন্ন স্বাধীনতা লাভে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া তিনি বলেন যে, ভারত ও আফগানিস্থানের মধ্যে চিরদিনের বন্ধুত্ব সম্পর্ক আরও দৃঢ়ীভূত হইবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফ হইতে ডেনমার্ককে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, উত্তর মেরু রক্ষা ব্যবস্থায় গ্রীনল্যাণ্ড একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র বলিয়া যুক্তরাষ্ট্র বিবেচনা করে এবং উক্ত ভিত্তিতে ডেনমার্কের সহিত একটি নূতন আত্মরক্ষামূলক চুক্তি সম্পাদনে ইচ্ছুক।

৩১শে মে—ওয়াশিংটনের সংবাদে প্রকাশ, এশিয়া ও ইউরোপের রণবিধ্বস্ত দেশগুলির সাহায্যকল্পে ৩৫ কোটি ডলার সাহায্য দিবার জন্য কংগ্রেসে যে বিল গৃহীত হইয়াছে, প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান অদ্য উহাতে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন   সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

চতুর্দশ বর্ষ]   শনিবার, ৩০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪ সাল।   Saturday, 14th June, 1947.   [৩২শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

টিশ সিদ্ধান্ত ও বাঙলা

ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ৩রা জুনের সিদ্ধান্ত হাতে সত্বর কার্যকরী হয় লর্ড মাউণ্টব্যাটেন প্রীতি অর্জিত হইয়াছেন। ভারত বিভাগ মন সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত বাঙলা এবং পাঞ্জাব ভাগও তেমনি সুনিশ্চিত। ভারত বিভাগ ন হইল, আজ আর তাহা লইয়া বিতর্ক, ভিযোগের অবসর নাই এবং বাঙলা পাঞ্জাব ভাগ সম্পর্কেও তেমনি বিতর্ক, অভিযোগের বসর নাই। বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন একথা স্পষ্ট করিয়াই সাংবাদিক বৈঠকে প্রকাশ রিয়াছেন যে, বর্তমান সিদ্ধান্তে উপনীত বার প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি কংগ্রেস, সলিম লীগ ও শিখ নেতৃবর্গের সঙ্গে পরামর্শ রিয়াছেন এবং বিভাগ বিষয়ে তাঁহাদের সম্মতি রিয়াছেন। বড়লাট সাংবাদিক বৈঠকে জানান ভারত বিভাগের সিদ্ধান্তের কথায় যেমন গ্রেস নেতৃবর্গ দুঃখিত হইয়াছিলেন, তেমনি ঙলা ও পাঞ্জাব বিভাগের সংবাদে লীগ নেতৃ বিষণ্ণ হইয়াছিলেন। দুঃখিত এবং বিষণ্ণ লেও কংগ্রেস ও শিখ নেতৃবর্গ যেমন এই দ্ধান্তই মানিয়া লইয়াছেন মিঃ জিন্নাও তেমনি দ্ধান্ত মানিয়া লইয়াছেন। বলা বাহুল্য লীগ রক যখন ভারত খণ্ডন ভিন্ন অন্য মীমাংসায় মত হইতে রাজী হইলেন না তখন সেই সঙ্গে ঙলা ও পাঞ্জাব বিভাগেও তাঁহাকে রাজী হইতে ইয়াছে। মিঃ জিন্নার বেতার বক্তৃতায় যদিও লীগ কাউন্সিলের সমর্থনের কথা আছে, তথাপি ই সিদ্ধান্ত লীগ কাউন্সিলও মানিবে. মিঃ জিন্না লীগ কাউন্সিলকে মানাইতে সক্ষম ইবেন, এমন কথা বড়লাটকে তিনি দিয়াছেন— তাই সঙ্গত অনুমান। মিঃ জিন্না ইহাও আশা রেন যে, সীমান্ত প্রদেশ তাহার পাকিস্থানের অন্তর্গত হইবে। এই অনুমান অসঙ্গত নহে য, মিঃ জিন্না সীমান্তে নূতন করিয়া ভোট গ্রহণের দাবী বড়লাটকে স্বীকার করানোর বিনিময়েই বাঙলা ও পাঞ্জাব বিভাগে রাজী হইয়াছেন। এক বৎসর পূর্বেই সীমান্তে নির্বাচন হইয়াছে। পাকিস্থানের 'ইস্যুতে'ই নির্বাচন হইয়াছে। সুতরাং পুনরায় এই 'ইস্যুতে' 'রেফারেণ্ডাম' লওয়ার সিদ্ধান্ত নিতান্ত অযৌক্তিক। "ব্যক্তিস্বাধীনতার" মিথ্যা নাম করিয়া লীগপন্থিগণ সীমান্তে যে সাম্প্রদায়িক তাণ্ডব সৃষ্টি করিয়াছে—তাহা কোন ব্যক্তি-স্বাধীনতার জন্য নহে, বর্তমান জনপ্রিয় মন্ত্রি-মণ্ডল ভাঙিয়া দিবারই উদ্দেশ্যে। সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা সৃষ্টি করা হইয়াছে; তাহারই ফলে মিঃ জিন্না আশা করেন যে, এবারে পাকিস্থান ইস্যুতে ভোট গৃহীত হইলে তিনি বাঞ্ছিত ফল লাভ করিবেন। সীমান্তে এই অসঙ্গত রেফারেণ্ডাম দানস্বরূপ পাইয়াই মিঃ জিন্না খুশী।

সব কথা বিবেচনা করিলে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয় যে, লীগ কাউন্সিল বর্তমান ব্রিটিশ সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিবেন। মিঃ জিন্না অনুগামীদের বুঝাইতে সক্ষম হইবেন যে, পাকিস্থান পাওয়া গিয়াছে, রেফারেণ্ডামের সুযোগে সীমান্তও আসিবে। সীমান্ত পাকিস্থানে আসিলে লীগের কি সুবিধা তাহাও তিনি অনুগামীদের বুঝাইয়া দিবেন। বাঙলার লীগ সদস্যগণ বাঙলা বিভাগে আপত্তি তুলিতে পারেন বটে, তবে কাউন্সিলের সদস্যের অধিকাংশই যে কায়েদে আজমকেই সমর্থন করিবেন ইহা একপ্রকার নিশ্চিত।

কেহ কেহ অখণ্ড বাঙলার কথা তুলিতে-ছেন। কেহ কেহ বলেন, বাঙলার মুসলিম লীগের একদল ভারতীয় ইউনিয়নে থাকিতে রাজী হইয়া অখণ্ড বাঙলা চাহিবেন। বাঙলার বর্তমান সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করিলে ইহাই বলিতে হইবে যে, এত-দিনের সাম্প্রদায়িক তাণ্ডবের ফলে অখণ্ড ভারত ও অখণ্ড বাঙলার যেভাবে লীগ-পন্থীরা গোড়া কাটিয়া শেষ করিয়াছেন, আজ সহসা উহার অগ্রভাগে অখণ্ডতার জল সিঞ্চন নিতান্তই অকারণ।

ব্রিটিশ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভারত খণ্ডন এবং পাকিস্থানও হইবে, তেমনি বাঙলাও বিভক্ত হইবে। বাঙলার লীগ দল যদি ভারতীয় ইউনিয়নে আজ যোগদানের কথাও বলে, তাহা হইলেও বাঙলার বর্তমান পরিস্থিতিতে বঙ্গ-বিভাগ ভিন্ন বাঙলার হিন্দু রাজী হইতে পারে না। তবে মুসলিম লীগ যদি সত্যই মনে করেন যে, পাকিস্থানে যোগদান অপেক্ষা ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান শ্রেয়ঃ—তাহা অবশ্য তাহারা করিতে পারেন। কিন্তু অখণ্ড বাঙলার লোভে তাহা উক্ত হইলে তাহার মূল্য কি? যেখানে সত্যই ঐক্য নাই—যেখানে হৃদয়ের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন লক্ষিত হয় না, সেখানে আজ সহসা তাহাদের ভারতীয় ইউনিয়নের প্রীতি নিতান্তই উদ্দেশ্যমূলক। বঙ্গ-বিভাগ আমরা চাই। চাই, কারণ বাঙলার সুখ-শান্তি, শিক্ষা-সংস্কৃতি রক্ষার ইহাই একমাত্র পথ। বাঙালী হিন্দু তো একত্রই ঘর করিতে চাহিয়াছিল। মুসলিম লীগই 'দুই জাতির' নামে দেশে সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততাকে লেলাইয়া দিয়াছে। বিভক্ত হওয়া ভিন্ন আজ আর ঐক্যের জোড়াতালি দিবার উপায় নাই। খণ্ডিত পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলায় স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গড়িয় উঠুক। অতঃপর যাহারা ভারত বিভাগের জন দায়ী তাহাদের যদি সত্য সত্যই অনুতাপ

জন্মে, সত্যই হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটে—সাম্প্রদায়িকতার পরিবর্তে ভারতের জাতীয়তাকেই বাঁচিবার ও সমুন্নত হইবার পথ বলিয়া তাহারা নিঃসংশয়ে গ্রহণ করেন, তখন সমগ্র ভারতের সমস্যাই জাতীয়তার সত্য পথে মীমাংসিত হইতে পারিবে; সে ক্ষেত্রে বাঙলার সমস্যাও স্বতন্ত্র থাকিবে না।

কিন্তু আজ অখণ্ড বাঙলার কথা উঠে না। এছাড়া মিঃ জিন্না তাঁহার পাকিস্থান দাবীকে যে পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ না করিতেছেন, সে পর্যন্ত অখণ্ড বাঙলার প্রস্তাব বিবেচনারও অযোগ্য।

পরিষদ সদস্যগণের কর্তব্য

বাঙলার হিন্দুর এখন প্রধান কর্তব্য সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাঙলা বিভাগ সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া। বাঙলা বিভাগ সম্বন্ধে পরিষদের সদস্যগণকে আগামী অধিবেশনে অভিমত ব্যক্ত করিতে হইবে। বর্তমান পরিকল্পনা অনুযায়ী মুসলমান-প্রধান জেলাগুলির এবং অ-মুসলমান-প্রধান জেলাগুলির সদস্যগণ পৃথক পৃথক ভাবে মিলিত হইয়া প্রদেশ বিভাগ সম্বন্ধে ভোট দিবেন। ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণের উপরোক্ত দুইটি অংশের যে কোন একটি অংশ প্রদেশ বিভাগের প্রস্তাব গ্রহণ করিলেই উহা কার্যকরী হইবে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান হুগলী হাওড়া কলিকাতা চব্বিশপরগণা, খুলনা, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ির সদস্যগণ যদি বঙ্গ-বিভাগ দাবী করেন, তাহা হইলে বঙ্গ-বিভাগ অপরিহার্য। এই কয়টি জেলার মুসলমান সদস্য সংখ্যা সর্বসমেত ২১। হিন্দু ৫৪। ভারতীয় খৃষ্টান ১। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ৪ জন। সুতরাং অ-মুসলমান সদস্যদের ভোটেই বিভাগ সুনিশ্চিত। অমুসলমান সদস্যগণের কেহ দলত্যাগী না হইলে অথবা তাহাদের নির্বাচন-কেন্দ্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকা না করিলে মুসলমান সদস্যগণের বিরুদ্ধ ভোট সত্ত্বেও বাঙলা বিভাগ হইবে। অ-মুসলমান কোন সদস্য জাতীয়বাদী বাঙলার এই সংকটকালে স্বীয় কর্তব্যপালনে কুণ্ঠিত হইবেন না বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি।

মন্ত্রিমণ্ডল অপসারণ

আগামী ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই অধিবেশনেই সদস্যগণের ভোটে বাঙলার ভাগ্য নিরূপিত হইবে। এ ছাড়া আছে সীমা নির্ধারণ কমিশন। প্রদেশ বিভাগ স্থির হইলে বিভাগ সম্পর্কিত বহু কাজ সুসম্পন্ন করিতে হইবে। এই অবস্থায় বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলকে আর মুহূর্তকালও বাঙলার শাসনদণ্ড পরিচালনার সুযোগ দেওয়া উচিত নহে। কারণ দলীয় স্বার্থে শাসনকার্য পরিচালনার সুযোগের অপব্যবহার হইবে—এই আশঙ্কা বিদ্যমান। ইহাও জানা গিয়াছে যে, বাঙলা বিভাগ হইবে—ইহা ধরিয়া লইয়াই বাঙলার গভর্নর ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়ায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। এই অবস্থায় বাঙলার লীগ মন্ত্রিমণ্ডলকে বৃটিশ পরিকল্পনা এবং পরিকল্পনার অভিপ্রায় বিরোধী কোন কাজ করার সুযোগদান করা গভর্নরের পক্ষে অসঙ্গত কার্য হইবে। বলা বাহুল্য মাত্র যে, লীগ মন্ত্রিমণ্ডল নিরপেক্ষভাবে কোন কাজ করিতে সক্ষম হইবেন—ইহা বাঙলার হিন্দু বিশ্বাস করে না, এই মন্ত্রিদলের উপর তাঁহাদের আস্থাও নাই। হয় গভর্নর নিজে ৯৩ ধারার আশ্রয় গ্রহণ করুন অথবা অবিলম্বে দুইটি আঞ্চলিক গভর্নমেণ্ট বা মন্ত্রিসভা গঠন করিয়া বর্তমানের কার্যভার ন্যস্ত করুন। কেয়ারটেকার বা ঠিকাদার গভর্নমেণ্টরূপেও বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলকে রাখা চলিতে পারে না। কারণ সে-ক্ষেত্রেও অন্যায় প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়া তাহারা বাঙলার হিন্দু সাধারণের ক্ষতি সাধন করিতে পারেন। বাঙলার গভর্নর যদি এই কর্তব্য পালনে শৈথিল্য প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেনেরই কর্তব্য হইবে—যাহাতে অবিলম্বে বাঙলার লীগ মন্ত্রিমণ্ডল অপসারিত হন, তাহার নির্দেশ দান করা।

সীমা নির্ধারণ

বর্তমান পরিকল্পনায় ষোলটি জেলাকে 'মুসলমানপ্রধান' জেলা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বাঙলার অবশিষ্ট জেলাগুলি হিন্দুপ্রধান জেলারূপে গণ্য হইয়াছে। কিন্তু বড়লাটের ঘোষণায় ইহা সুস্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে যে, প্রদেশ বিভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যই নিতান্ত সাময়িকভাবেই জেলাগুলিকে এইভাবে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দুই প্রদেশের সীমা নির্ধারণকালেই জেলাগুলির কোন্ অংশ কোন্ প্রদেশের অন্তর্গত হইবে, তাহা স্থির হইবে। মুসলমান-প্রধান অংশের কোন কোন জেলার কোন অংশ হিন্দুপ্রধান এবং সেইগুলি হিন্দু-বাঙলার সংলগ্ন স্থান বলিয়া উহারই সঙ্গে সংযুক্ত হইবে। সীমা নির্ধারণকল্পে যে 'কমিশন' বসিবে, উহাকে এইরূপ নির্দেশই দেওয়া হইবে যে, পরস্পরসংলগ্ন মুসলমানপ্রধান অঞ্চলগুলি এবং অ-মুসলমানপ্রধান অঞ্চলগুলি যাহাতে সংযুক্ত হইতে পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই সীমা নির্ধারণ করিতে হইবে। জনসংখ্যা ও সংলগ্ন অঞ্চলই হইবে প্রধান বিবেচ্য; এছাড়া অপর বিচার্য বিষয়ও বিবেচনা করিতে হইবে।

সীমা নির্ধারণ ব্যাপারে বাঙলার হিন্দুকে এই দাবী করিতে হইবে—যাহাতে বাঙলার মোট আয়তন ফলের অর্ধাংশ লইয়া নূতন প্রদেশ গঠিত হয়। জমির স্বত্ব-স্বামীত্ব বিচার করিলে হিন্দু অর্ধাংশেরও অধিক দাবী করিতে পারে। বাঙলার প্রস্তাবিত নূতন প্রদেশের জন্য বর্ধমান বিভাগ ও প্রেসিডেন্সী বিভাগ এবং ইহার সহিত সংলগ্ন ঢাকা বিভাগের হিন্দুপ্রধান অংশ অবশ্যই সঙ্গতভাবে হিন্দু দাবী করিতে পারে। রাজসাহীর দিনাজপুর জেলায় হিন্দুর সংখ্যা এবং অবস্থান (সংলগ্ন) বিবেচনা করিলে নূতন বাঙলা প্রদেশের অন্তর্গত হওয়া অপরিহার্য। মালদহের হিন্দুপ্রধান অংশ সম্পর্কেও ঐ একই যুক্তি প্রযোজ্য। সীমা নির্ধারণ কমিশন সম্প্রদায় হিসাবে লোকসংখ্যা ও পরস্পরসংলগ্ন অঞ্চলের প্রতি যেমন দৃষ্টি দিবেন, তেমনি অপরাপর বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টি রাখিবেন। সংস্কৃতিগত বিশেষ কোন স্থান প্রাকৃতিক সীমার সুবিধা-অসুবিধা প্রভৃতিও অবশ্যই অপরাপর বিষয়ের অন্তর্গত। প্রকাশ, সীমা নির্ধারণ কমিশনের সভাপতি থাকিবেন লর্ড মাউণ্টব্যাটেন। ভাল। কিন্তু কমিশনের সদস্য কাহারা হইবেন—তাহা এখনো স্থির হয় নাই। তবে নিরপেক্ষ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ যাহাতে কমিশনের সদস্য মনোনীত হন, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কারণ সীমা নির্ধারণের উপর জাতীয়তাবাদী বাঙলার স্বার্থ বহুলাংশে জড়িত।

শরৎচন্দ্রের বিবৃতি

বৃটিশ গভর্নমেণ্টের ঘোষণার সমালোচনা করিয়া শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু যে বিবৃতি দান করিয়াছেন, তাহা অভিনিবেশসহকারেই আমরা পাঠ করিয়াছি। এই ঘোষণাকে কংগ্রেসও আদর্শসম্মত বা বাঞ্ছিত বলেন নাই। প্রসঙ্গত, শরৎচন্দ্র বাঙলা বিভাগের কুফল সম্পর্কে অনেক কথা বলিয়াছেন। ভারত-বিভাগ রোধ করা যেখানে সম্ভব হয় নাই, সেখানে বাঙলার যে হিন্দুপ্রধান অংশ ভারতীয় ইউনিয়নের সহিত যুক্ত থাকিতে চাহে, সেই অঞ্চলগুলি লইয়া নূতন বাঙলা প্রদেশ গঠন ভিন্ন হিন্দুর স্বার্থরক্ষার আর কোনও উপায় আছে কি? আমরা বহুবার বলিয়াছি—ভারত-বিভাগ হইলে বাঙলা-বিভাগ অনিবার্য। এই অনিবার্য ব্যবস্থাকে মানিয়া লইয়া হিন্দুকে অগ্রসর হইতে হইবে। শরৎচন্দ্র পূর্ব-বাঙলার হিন্দুদের অভিমতের যে কথা বলিয়াছেন তাহাও সত্য নহে। ইহাই মনে হয়, কোন বিশেষ ব্যক্তি ও দলের নিকট সংবাদ পাইয়াই তাহার পূর্ব-বাঙলার হিন্দু জনমত সম্পর্কে

ভ্রান্ত ধারণা হইয়াছে। পূর্ব-বাঙলার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণই শুধু নহে, বহু বার-লাইব্রেরীও বঙ্গ-বিভাগেরই সমর্থন করিয়াছেন। পূর্ব-বাঙলা পাকিস্থানের কুক্ষিগত হইবে—ঠেকানো যাইবে না; কিন্তু তাই বলিয়া সমগ্র বাঙলাই পাকিস্থানের কুক্ষিগত হউক—পূর্ব-বাঙলার হিন্দু অবশ্যই তাহা চাহে না চাহে নাই। পূর্ব-বাঙলার হিন্দুর অভিমত বলিয়া শরৎচন্দ্র যাহা বলিতেছেন, তাহা পূর্ব-বাঙলার অভিমত নহে—ইহাই আমাদের বক্তব্য।

লীগ কাউন্সিলের সমর্থন

আমরা এই অভিমতই ব্যক্ত করিয়াছিলাম যে, ৩রা জুনের বৃটিশ ঘোষণাকে বাঙলার লীগ দল কর্তৃক যতই নিন্দা করা হউক না কেন, মিঃ জিন্নার সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাঁহাদের সুরও ঘুরিয়া যাইবে। সংবাদে দেখিতেছি ঃ লীগ কাউন্সিলের অধিবেশনে নগণ্য আপত্তির পরেই তাহাদেরই দ্বারা বহুনিন্দিত কবন্ধ পাকিস্থানই তাহারা মানিয়া লইয়াছেন। অবশ্য প্রস্তাবে আপোষ বা Compromise হিসাবে পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে—বাঙলা ও পাঞ্জাব বিভাগকে অবিচার বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু বৃটিশের এই পরিকল্পনা গ্রহণ ভিন্ন অন্য কোন পথ যে খোলা নাই—মিঃ জিন্নার কথায় তাহা মর্মে মর্মে বুঝিয়াই পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ইহা গ্রহণ করিতে হইয়াছে, একথাও বলা হইয়াছে। 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামের' ভয়াবহ পরিণাম অবশ্যই তাঁহারা দেখিয়াছেন। সাম্প্রদায়িক তান্ডবে দেশ শ্মশান হইয়াছে। শ্মশানে দাঁড়াইয়া শান্তির সন্ধান ভাল লক্ষণই। শান্তির সঙ্গে সুখ-সমৃদ্ধি সমুন্নতি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। দেশের জনসমষ্টির শান্তি কামনা যত আন্তরিক হইবে, সমগ্র ভারতের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য-বুদ্ধি ততই জাগ্রত হইবে। এই শান্তির পথে চলিতে হইবে—জোর-জুলুম-জবরদস্তি ত্যাগ করিয়া অহিংস নীতিরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। এই পথেই একদা লীগ নেতাদের ভারতের ঐক্যের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইতে হইবে। ইহাও লক্ষ্য করিবার যে, ১৬ই মে'র পরিকল্পনাকে যদি এমনি দৃঢ়তার সহিত, কোন 'যদি ও কিন্তু' না রাখিয়া বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ও বড়লাট অগ্রসর হইতেন—তাহা হইলে "প্রত্যক্ষ সংগ্রামের" দ্বারা দাবী পূরণ করাইয়া লইবার উৎসাহ দেখা দিত না। আজ বড়লাটের দৃঢ়তার জন্যই —কবন্ধ পাকিস্থান পাইয়াও ইহাতেই মিঃ জিন্নাকে তুষ্ট হইতে হইয়াছে।

দেশীয় রাজ্য

দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে বৃটিশ পরিকল্পনায় বিশেষ কোন নূতন ব্যবস্থা নাই। তবে বৃটিশ প্রভুত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে বৃটিশ রাজশক্তির যে সম্পর্ক ছিল, তাহারও অবসান হইবে। ইচ্ছা করিলে তাহারা যেমন ভারতীয় গণপরিষদে যোগ দিতে পারেন, তেমনি পরিকল্পিত পাকিস্থান গণ-পরিষদেও যোগ দিতে পারেন, অথবা কোথাও যোগ না দিয়া তাহারা 'স্বাধীন' থাকিতে পারেন। বর্তমানে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট এবং বড়লাট তাহাদের লইয়া মাথা ঘামাইবেন না। কিন্তু বৃটিশ-প্রভুত্ব ত্যাগের পরে কোন দেশীয় রাজ্য যদি বৃটিশের সঙ্গে কোন সম্পর্ক স্থাপন করিবার প্রস্তাব করেন, তাহা হইলে তাহা যে বৃটিশ বিবেচনা করিবেন, তাহা অনুমান করা চলে। ইহাও অনুমান করা চলে যে, বৃটিশ গভর্নমেণ্ট প্রসন্নচিত্তেই 'নূতন সম্পর্ক' স্থাপন করিবেন। ইতিমধ্যে অনেক দেশীয় রাজ্যই গণপরিষদে যোগদান করিয়াছেন। কিন্তু কতকগুলি 'রাষ্ট্র' এখনো দ্বিধায় দুলিতেছেন। কেহ কেহ আবার 'স্বাধীন' হইবার জন্য নাচিতেছেন। হায়দরাবাদ স্বাধীন হইবেন। ভূপাল স্বাধীন হইবেন। ত্রিবাঙ্কুরও স্বতন্ত্র থাকিবার কথা বলিতেছেন। স্বাধীনতা অর্জন ও উহা রক্ষার প্রতি তাহাদের মরণপনের প্রমাণ বিশেষ কিছু নাই। বৃটিশ শক্তির নিকট নতি-স্বীকার করিয়া কার্যত বৃটিশকে "প্রভু ও মুরুব্বী" করিয়াই তাহারা এ পর্যন্ত রাজ্য বা রাজত্ব প্রাপ্তির অধিকারটুকু রক্ষা করিয়াছেন। সেই বৃটিশ শক্তি আজ চলিয়া যাইতেছেন, তাঁহাদের ভারত-শাসনের ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইতেছে। এই অবস্থায় ভারতীয় ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত না হইয়া তাঁহারা এই যে "স্বতন্ত্র" থাকিতে চাহিতেছেন—তাহা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, ইহা কেহ মনে করিবে না। তাঁহারা রকমফের করিয়া রূপান্তরিত বৃটিশ আশ্রয়ে থাকিবার জনাই তথাকথিত স্বধীনতার কথা বলিতেছেন। এই তথাকথিত স্বাধীন দেশীয় রাজাগুলি বৃটিশ শক্তির প্রভাবে থাকিয়া বৃটিশ ঘাঁটিরূপে ব্যবহৃত হইতে পারেন। তবে আশার কথা এই যে, ভারতের অধিকাংশ দেশীয় রাজাই গণপরিষদে যোগ দিয়াছেন ও দিতেছেন। প্রতিক্রিয়াশীল স্বৈরাচারী শাসনের অবসানদিন যে নিকটবর্তী তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াই তাঁহারা ভারতের অগ্রযায়ী শক্তির সঙ্গে সংযুক্ত হইতেছেন। তাঁহাদের রাজ্যরক্ষা এবং জনগণের কল্যাণ এক-সঙ্গেই সম্ভব, এই বিশ্বাসই তাঁহাদের জন্মিয়াছে। কিন্তু যে সকল দেশীয় রাজ্য আজও সেই মধ্যযুগীয় শাসন-ব্যবস্থা অব্যাহত রাখিতে চাহেন প্রজাসাধারণের বৃহত্তর কল্যাণ হইতেও স্বীয় অধিকারকেই বড় মনে করিতেছেন, তাঁহারাই গণপরিষদ হইতে দূরে থাকিয়া স্বাধীনতার নামে পুরাতন শাসন-ব্যবস্থা কায়েম রাখিতে চাহিতেছেন। কিন্তু এ-যুগে ইহা যে সম্ভব নহে, এই দুরাশা যে তাসের ঘরের মতোই ভাঙিয়া পড়িবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।
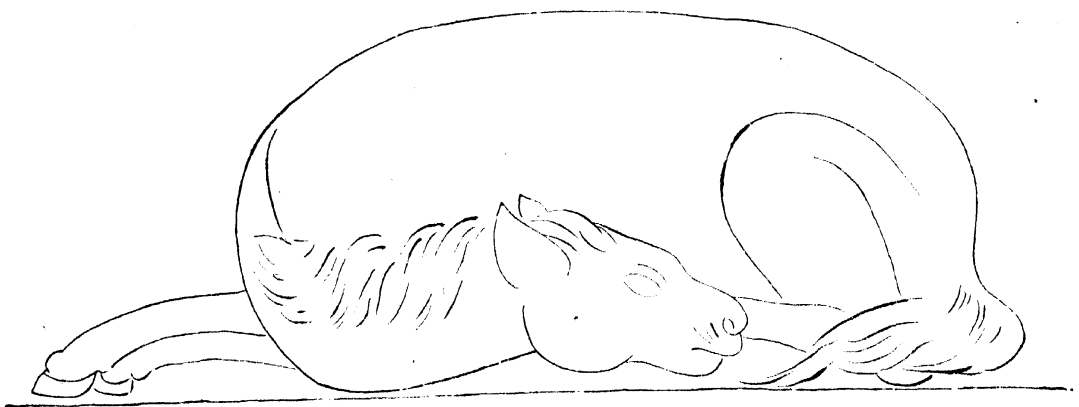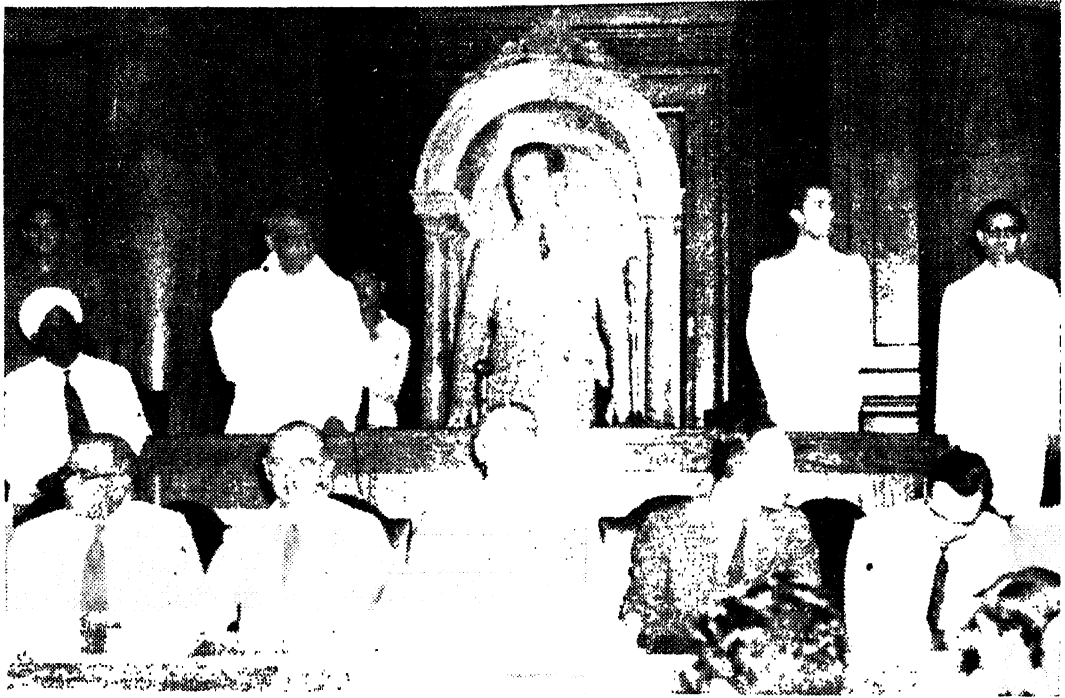
ভারতীয়দের হস্তে ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ে বৃটিশ সরকারের পরিকল্পনা সম্পর্কে সাংবাদিক সম্মেলন। বড়লাট দীর্ঘকাল ধরিয়া বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। সর্দার প্যাটেল সভার কার্য পরিচালনা করেন। বড়লাটের দক্ষিণে সর্দারজীকে দেখা যাইতেছে।
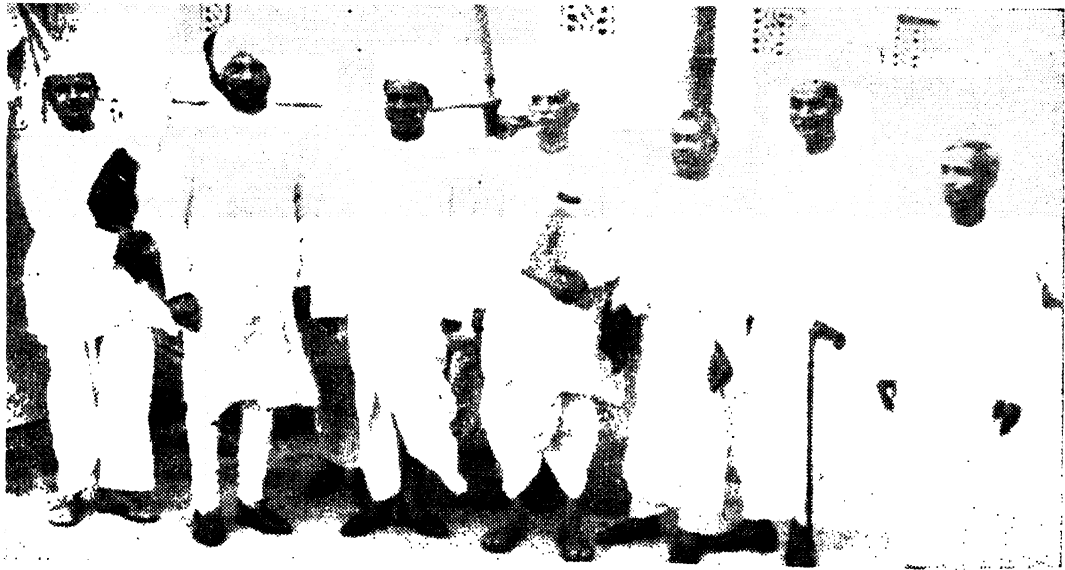
৩রা জুন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের পর গৃহীত চিত্রে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সাধারণ সম্পাদক আচার্য যুগলকিশোর, সর্দার বলদেব সিং, শ্রীযুত জগজীবন রাম, ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া, শ্রীযুত শংকররাও দেও, ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ প্রভৃতিকে দেখা যাইতেছে।

পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ, পণ্ডিত নেহরু, মিঃ রফি আমেদ কিদোয়াই ও ডাঃ রামমনোহর লোহিয়া। তাঁহারা ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে যোগদানের জন্য যাইবার সময় এই আলোকচিত্র গৃহীত হয়।

বড়লাট প্রাসাদে বড়লাটের সহিত ভারতীয় নেতৃবৃন্দের ঐতিহাসিক সম্মেলন। বড়লাটের দক্ষিণে কংগ্রেস প্রতিনিধি হিসাবে পণ্ডিত নেহরু, সর্দার প্যাটেল ও আচার্য কৃপালনী এবং বামে লীগ প্রতিনিধি হিসাবে মিঃ জিন্না, মিঃ লিয়াকৎ আলী খাঁ এবং সর্দার আব্দুর রব নিস্তার এবং শিখ প্রতিনিধি হিসাবে সর্দার বলদেব সিংকে আচার্য কৃপালনীর দক্ষিণে উপবিষ্ট দেখা যাইতেছে।

ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র-ব্যবস্থা নেতৃবৃন্দ গ্রহণ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে বন্ধুবান্ধবদের একটু মিষ্টিমুখের ব্যবস্থা হইল না, কেননা, অনেক প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মত এই দ্রব্যটিও সম্প্রতি কলিকাতায় অপ্রাপ্য হইয়াছে। খুড়ো বলিলেন—"মিষ্ট দ্রব্য পুনঃ প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন আভাস বড়লাটের ঘোষণায় নাই, আমরা ইতর-জন সেই দ্রব্যেই অধিক কৌতূহলী।"

* * * * *

পাকিস্তানের দাবীর অনেকাংশ না মিটিলেও বেতারে বক্তৃতার সুযোগ-প্রাপ্ত হইয়া কায়েদে আজম পরম আহ্লাদিত হইয়াছেন। খুড়ো বলিলেন—"জিন্নাজীর

আব্দার সম্বন্ধে যাঁরা সমালোচনা করেন, তাঁরা জানিয়া রাখুন, সামান্য একটি মোয়া হাতে পাইলেও তিনি খুশী হইতে পারেন—তবে মোয়াটি জয়নগরের হইলে চলিবে না, হওয়া চাই খাঁটি বিলাতি।"

* * * * *

পণ্ডিত নেহরু বেতারে বক্তৃতান্তে "জয় হিন্দ" উচ্চারণ করিয়াছেন। কিন্তু জয়পরাজয়ের **পক্ষাপক্ষ** নিয়া পাছে কাহারও মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়, সেইজন্য জিন্নাজীও ভাষণান্তে "পাকিস্থান জিন্দাবাদ" উচ্চারণ করেন। তাঁদের ভাষণের এই অংশটি স্টেটসম্যান পত্রিকা না ছাপিয়া প্রমাণ করিলেন যে, তিনি সত্যই "ভারত-বন্ধু"—সুতরাং উচিত কথা বলিয়া বন্ধু বেজার করেন নাই।

* * * * *

ত্রিবাঙ্কুরের স্বনামখ্যাত দেওয়ান বড়লাটের ঘোষণায় গান্ধীর পরাজয় এবং জিন্নারই জয় হইয়াছে বলিয়া কায়েদে আজমকে একটি প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন। কিন্তু প্রতিদানে রামস্বামীর জয় বলা জিন্নার পক্ষে সম্ভব নয়, কেননা, জিন্নাজী রামনাম উচ্চারণ করিতে পারেন না। খুড়ো বলিলেন—"অগত্যা জিন্না সাহেব রামস্বামীর Initialটিকে একটু ঘুরাইয়া ছি পি (ছিঃ প্রাইম মিনিস্টার নয়) মোবারক জানাইতে পারেন।

* * * * *

জিন্না সাহেবের নিকট হইতে মোবারকবাদ মোড়ল ছাহেবেরও প্রাপ্য। কেননা, মোড়ল ছাহেবকে গাঁ না মানিলেও পাকিস্তান নিশ্চয়ই মানিবে—এই কথা নাকি যোগেন্দ্র যোগ সাধনায় জানিতে পারিয়াছেন !

* * * * *

বাঙলার শিক্ষামন্ত্রী শুধু দুঃখ করিয়াছেন, বলিয়াছেন—"আমরা গোস্ত চাহিয়াছিলাম, পাইলাম শুধু পাথর।" খুড়ো

বলিলেন—"চাউল চাহিলে কাঁকর দেওয়ার শিক্ষা যে তাঁরাই দিয়াছেন।

* * * * *

একটি সংবাদে জানিলাম—মিঃ সুরাবর্দী নাকি বলিয়াছেন—তিনি একটি "Falling Star." পাছে আমরা Cinema Star বলিয়া ভুল করি, সেই জন্য খুড়ো বুঝাইয়া বলিলেন "Sin-e-master" ! !

* * * * *

এই বিবৃতির বাজারে বাঙলার ব্যাঘ্র গর্জন না শুনিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। লীগ সরকারে আরজি জানাইয়াও তিনি সিমেণ্ট সংগ্রহ করিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁর একটি অভিযোগ আমরা কতকদিন আগে শুনিয়াছিলাম। "তাঁর চারিদিকে এত ফাটল এবং সকলের থেকে এত ব্যবধান তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন যে, সিমেণ্টের প্রয়োজন তাঁরই সকলের অপেক্ষা বেশী; সরকার উদাসীন থাকিলে—Cruelty to Animal (শের হিসাবে) হইবে"—বলেন খুড়ো।

* * * * *

লীগ সেক্রেটারী হাবিবুল্লা বাহার বলিয়াছেন—"মুসলমানদের ঐশ্বর্যের সময় তাজমহল নির্মিত হইয়াছিল। পাকিস্থান

প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহা দ্বিতীয় তাজমহল স্থাপনেরই সমতুল্য হইবে।" আমরা এই সঙ্গে নকল তাজের নকল কবিতার নমুনা দিতেছি, লেখা অবশ্যই খুড়োর—

এ কথা জানিতে তুমি লীগের বাহার
লড়কে পারে না নিতে কেহই তো
কারো অধিকার।
শুধু তব অন্তরের গোসা
চিরন্তন হয়ে থাক—এই কথা মনে
ছিল পোষা !

* * * * *

একটি সংবাদে দেখিলাম, বঙ্গবিভাগ হইলে পূর্ববঙ্গে নাকি অন্য একটি হাইকোর্ট স্থাপিত হইবে। অতঃপর দূরে বা অদূরভবিষ্যতে বাঙালগণ পশ্চিমের সঙ্গে মিলিত হইলে তাঁহাদিগকে আর হাইকোর্ট দেখান চলিবে না। খুড়ো বলিলেন—"সে কথা সত্য; এই সঙ্গে পাকিস্থান একটি চিড়িয়াখানা খোলার ব্যবস্থাও করিয়া ফেলুন, রাতারাতি চালাক বনিবার সুযোগ মিলিয়া যাইবে।"

একাদশ অধ্যায়

দিন যতই যাইতে লাগিল আত্রেয়ী দেবীর শরীরও ততই ভাঙিগয়া পড়িতে লাগিল। ্যাণী বা তাহার মাতা আসিয়া পীড়াপীড়ি করিলে—কোনদিনই সময়মত স্নানাহার রতেন না। দিনরাত বিছানার উপরে চুপ রয়া পড়িয়া দূরের মাঠের দিকে উদাস ষ্টিতে তাকাইয়া থাকিতেন। গৃহকর্ম, তাঁহার ্য দুটি রান্না করা, সে সমস্তই কল্যাণী রত। আত্রেয়ী দেবীর এক কাকার বৎসর নেক হইল মৃত্যু হইয়াছিল—তিনি মৃত্যু র তাঁহাদের পৈত্রিক বিষয়ের আয় হইতে ভাই ধরানাথের দৌহিত্রদের জন্য একটি সাহারার বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছিলেন। ময় টাকা লইতেন না—মায়ের নিকটই প্রথম তে সমস্তটা ধরিয়া দিতেন। আত্রেয়ী নিজে া-পয়সার কোন হিসাব রাখিতেন না—সবই কল্যাণী করিত।

সেদিন রান্না শেষ করিয়া অনেকক্ষণ রয়া কল্যাণী আত্রেয়ী দেবীর জন্য বসিয়াছিল কিন্তু সেই যে কখন তিনি স্নান করিতে ায়াছেন, আর ফিরিতেছেন না। অবশেষে সে ান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া মাকে খুঁজিতে াঠাইল। কাত্যায়নী দেবী নদীর ঘাটে আসিয়া খেন, ঘাটের একপাশে মেয়ে-পুরুষ কতক-ুলি লোক ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, আর ভালানাথ যেন হাত নাড়িয়া কি সব বলিয়া াইতেছে। কাছে আসিয়া দেখিলেন—সেই ীড়ের একপাশে ভোলানাথের কাছে আত্রেয়ী দবী বসিয়া আছেন। ভোলানাথ তাঁহার দিকে াকাইয়া তাকাইয়া বলিতেছেন বুঝলে মাসী, স কি ভীষণ যায়গা—আমি কি আর সাধ করে াই নাকে খৎ দিয়ে এসেছি? ঢেঁকিতে ধান ভান, ানি ঘোরাও, ময়দা পেষো, যদি না পারলে মম্নি হাতে হাতকড়ি—পায়ে বেড়ি দিয়ে বেত াগাবে। হাজার হোক ভদ্রলোকের ছেলে তো; তারপর খাওয়ার কথা আর শুনোনা মাসী—াড়ীর গরু-বাছুরগুলিকেও আমরা তার চেয়ে ত্ন করে খেতে দিই। ভাতের চেহারা দেখলে য়ে আসে—ডাল তরকারির কথা শুনো না—ডাল তো শুধু হলুদ গোলা জল, আর তরকারির ভিতর ঘাস সিদ্ধ—বটের পাতা সিদ্ধ—এই সব। ইস্ এই কয়টা দিনে না খেয়ে যে একেবারে শুকিয়ে গেছি।

ভিড়ের ভিতর হইতে একটি দুষ্ট ছেলে হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিল—কয় হাত মেপে নাকে খৎ দিলে ছেড়ে দেয় দাদা! ভোলানাথ চটিয়া বলিল বড় যে দাঁত বের করে হাসছো—যাও না একবার দেখে এসো গে ব্যাপারটা একবার। বণ্ড লিখে দিয়েছি—আর কখনও এমন কাজ করবো না। তাতে হয়েছে কি শুনি! নিজে যদি এমনি করে মারা যাই তো বঙ্গ ভঙ্গই হোক আর নাই হোক আমার কি? আগে বুঝিনি ভাই, তাই এই নাক্ কান্ মলছি—ওতে আর আমি নেই।

আত্রেয়ীর বুকের ভিতরে বারে বারে দপ্ দপ্ করিয়া উঠিয়া সমস্ত শরীর অবশ করিয়া দিতেছিল অতি কষ্টে দুই হাত দিয়া বুক চাপিয়া ধরিয়া প্রশ্ন করিলেন—অসি কেমন আছে ভোলানাথ?

ভোলানাথ তেম্নি করিয়াই জবাব দিল—কেমন আর থাক্বে মাসী! সবারই এক অবস্থা, মানুষতো সবাই—গরু ভেড়া তো আর কেউ সেখানে যায় নাই যে, ঐ সব ছাইপাঁশ মুখ বুজে গিল্বে। তবে ওদের সোমত্ত বয়েস কিনা—দুইচার দিন রক্তের জোরে কোন রকমে টিকে থাকবে—তারপর যখন শুকিয়ে শুকিয়ে একেবারে রোগা-পটকা হয়ে যাবে—তখন একদিন কাউকে না জানিয়ে চুপ করে জেল অফিসে এসে আমারই মত এমনি নাকে খৎ দিয়ে বেরিয়ে আস্বে। তুমি ভেবো না মাসী—এমনি করে বেশী দিন সেখানে থাক্তে পারবে না।

আত্রেয়ী জোর করিয়া বলিয়া উঠিলেন—না-না-ভোলানাথ তোমরা তাকে জানো না—সে ফিরে আসবে না—মাথা হেঁট সে কিছুতেই করবে না—সে যে তেমন ছেলে নয়।

বলিতে বলিতে দুই চোখ দিয়া তাঁহার অশ্রুধারা একেবারে শ্রাবণের ধারার মতোই গড়াইতে লাগিল—কণ্ঠ গেল রুদ্ধ হইয়া।

ভোলানাথ বলিয়া উঠিল—ইস্—আসবে না আবার! যখন ঘানি গাছে জুড়ে দেবে তখন বাপ্ বাপ্ বলে... ... ...

হঠাৎ কাত্যায়নী দেবী চেঁচাইয়া উঠিয়া বলিলেন—তুই থাম্ তো ভোলানাথ—আর বাঁদ্রামি করতে হবে না।

তুমি ওঠো বোন—আর এখানে এমনি করে আমি কিছুতেই বসে থাকতে দেবো না—বলিয়া কাত্যায়নী দেবী জোর করিয়া আত্রেয়ীকে ধরিয়া তুলিয়া বাড়ীর দিকে টানিয়া লইয়া চলিলেন। কিন্তু আহারে তাঁহাকে আর বসানো গেল না। কাত্যায়নী দেবী বুঝিলেন এখন পীড়াপীড়ি করিয়াও কোন লাভ নাই—তাই তাঁহাকে কাপড় বদলাইয়া বিছানায় লইয়া শোয়াইয়া দিলেন।

কিছুদিন হইতে আত্রেয়ী দেবীর প্রথম রাত্রে অল্প অল্প জ্বর আসিত এবং শেষ রাত্রের দিকে ঘাম দিয়া ছাড়িয়া যাইত। সর্বদা খুক্ খুক্ করিয়া কাসিতেন। বুকের একটা পাশ একটু একটু বেদনা করিত—নিজে সমস্তই লুকাইয়া চলিতেন—কল্যাণী বা কাত্যায়নী দেবী কাহাকেও কিছু বলিতেন না; কিন্তু কয়েক-দিন পরে একদিন রাত্রে যে জ্বর আসিল তাহা আর সেই রাত্রেই ছাড়িয়া গেল না। কয়েকটা দিন ধরিয়া রীতিমত বিক্রম প্রকাশ করিয়া কমিয়া গেল বটে, কিন্তু তাহার পর হইতে অল্প অল্প জ্বর আর কাসি সর্বদা লাগিয়াই রহিল। শরীর উঠিল নিতান্ত দুর্বল হইয়া—বিছানা হইতে বড় একটা উঠিতেন না। রাতদিন চুপ করিয়া শুইয়া থাকিতেন। এদিকে কাত্যায়নী দেবী ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিতে-ছিলেন। এমনি করিয়া অত্যাচার করিলে শরীর তাঁহার কয়দিন টিকিবে? সঙ্গে সঙ্গে নিজের কন্যার ভবিষ্যতের চিন্তাও তাঁহাকে একান্তভাবে পাইয়া বসিল। যদি আত্রেয়ীর ভাল মন্দ একটা কিছু হইয়াই যায়, তাহা হইলে কল্যাণীর বিবাহের কি হইবে? অসি জেল হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিবাহ যে করিবেই তাহারই বা এমনি কি নিশ্চয়তা আছে? ভাবিতেই সারা দেহ তাঁহার ভয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিতে লাগিল। এ বিবাহ যে নিশ্চিত তাহা তাঁহারা মনে করিয়া আছেন। গ্রামের লোক জানিয়াছে এবং ইহা লইয়া একটা দুর্ণামের কানাঘুষা পর্যন্ত কখনও কখনও চলিয়াছে। এমন কি মেয়ে তাঁহার ইহা যে নিশ্চিত ধারণা করিয়া লইয়াছে এমনই নয়—সে তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। মেয়ের মনের গোপন কামনা—মায়ের চোখে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। এখন যদি কোন রকমে এ বিবাহ না হয়, তবে মেয়ের বিবাহ আর যে কোথাও সহজে হইতে চাহিবে না—সে সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। তারপর মেয়েও তো তাঁহার রাজী হইবে না। সেদিন বিকালে বেলা কাত্যায়নী দেবী আত্রেয়ীর বিছানার ধারে গিয়া বসিয়া বলিলেন—এখন

তাকাইয়া বলিলেন—শরীর তো আমার ভাল হয়ে গেছে দিদি!

কাত্যায়নী বলিলেন—তুমি আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না বোন! শরীর যে তোমার দিন দিন একেবারে খারাপ হয়ে পড়ছে এতো আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

ধীরে ধীরে আত্রেয়ীর একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিলেন—এমনি করলে যে শরীর আর বেশী দিন টিক্‌বে না বোন! দুটো মাসতো গেল আর কয়টা মাস পরে ফিরে এসে অসিত কার কাছে দাঁড়াবে বলতো?

অসিতের নাম করিতেই আত্রেয়ী একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন। বাঁধ ভাঙ্গা বন্যার জলের মত তাঁহার দুই চোখ অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কাত্যায়নী নিজের আঁচল দিয়া তাঁহার চোখের জল মুছাইয়া দিতে দিতে বলিলেন—অত অধৈর্য হইলে তো চলবে না বোন। বুদ্ধি দিয়ে বিদ্যা দিয়ে বিপদকে জয় করতে হয়। তুমি এত যে লেখাপড়া কর—এত যে বুদ্ধি রাখ—তা যদি আজ এই বিপদের দিনে তোমাকে এতটুকু ধৈর্য ধরতে না শেখায়, তবে তার লাভটা কোনখানে বলতো বোন?

খানিকটা শান্ত হইয়া আত্রেয়ী বলিলেন—কিন্তু আমি যে পারিনে—দিদি! অসিত আমার জেলের ঘানি ঘোরাচ্ছে—যাঁতায় ময়দা পিষছে—ধান ভানছে—যে খাদ্য মানুষে মুখে তুলতে পারে না, তাই খেয়ে দিন কাটাচ্ছে এ আমি কোন প্রাণে সইব দিদি?

অনেকক্ষণ আর কেহ কোন কথা কহিলেন না। অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া আত্রেয়ী চুপ করিলেন।

কাত্যায়নী পুনরায় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন—কিন্তু আমি তো শুধু তোমাদের কথাই ভাবছিনে বোন। তুমি কবিরাজ দেখাবে না—ওষুধ খাবে না—এমনি করলে যে শরীর তোমার বেশীদিন টিকবে না—সে তো জানা কথা; কিন্তু তাহ'লে আমার কল্যাণীর বিয়ের কি হবে?

বলিতে বলিতে কাত্যায়নীর দুই চোখ দিয়া টপ্‌ টপ্‌ করিয়া কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

আত্রেয়ী অনেকটা বিচলিত হইয়া বলিলেন—কিন্তু কল্যাণীকে তো আমি নিয়েছি, ওকে যে অসিতের জন্যেই নিজের হাতে তৈরী করেছি—এ সে জানে—দিদি!

—কিন্তু কথা যদি সে না রাখে বোন?

—আমি জানি দিদি, অসিত আমার কথা কোনদিন ফেলবে না। ইহার পর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া শুইয়া থাকিয়া পুনরায় বলিয়া উঠিলেন—কল্যাণীর মঙ্গলামঙ্গলের কথা আমিও তো কম ভাবিনি দিদি—তবু তোমার মায়ের প্রাণ—তুমি যেমনি করে দেখতে পেয়েছো আমি তেমনি করে পাইনি। তোমার কথাই ঠিক দিদি। তুমি কবিরাজ বাড়ি লোক পাঠাও—এখন থেকে ওষুধ আমি খাবো—শরীরের উপর আর অযত্ন করবো না—দেখি এ কয়টা মাস যদি তাতে কোন রকমে টিকে থাকতে পারি!

—আমি এখনই লোক পাঠাচ্ছি বোন!

বলিয়া কাত্যায়নী দেবী উঠিয়া বাহিরে গেলেন।

পরের দিন সকালে কবিরাজ মহাশয় রোগী দেখিয়া মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন—বড় দেরী হ'য়ে গেছে—ক্ষয়কাসে দাঁড়িয়েছে। কি হ'বে বলতে পারিনে। মাস খানেক ধরিয়া চিকিৎসার পরও যখন রোগ কিছুমাত্র আরোগ্য হইল না বরং দিন দিন শরীর তাঁহার একেবারে দুর্বল হইয়া পড়িল, তখন কল্যাণী ও তাহার মাতা বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কলিকাতা হইতে অমিয় আসিলেন। এই মাস তিনেকের মধ্যে মায়ের শরীর যে এমনি করিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহা তিনি কল্পনাও করিতে পারেন নাই। মা যে এযাত্রা আর ফিরিবেন না তাহা তিনি নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

মায়ের বিছানায় মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া বলিলেন—"আমাকে কি শেষে এমনি করেই শাস্তি দিলে মা! অসময়ে আমাকে দূরে দূরে রাখলে—নিজের অসুখের কথা ঘুণাক্ষরেও জানতে দিলে না—এ দুঃখ আমি কেমন করে সইবো? অসি ফিরে এলে তাকে কি জবাব দেব?"

আত্রেয়ী ধীরে ধীরে অমিয়র মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিলেন—তোর কোন দোষ নেই বাবা, এ আমার কর্মফল! অসিকে যদি আমি আর সত্যিই দেখতে না পাই বাপু—তাকে কোলে তুলে নিয়ে সান্ত্বনা দিস। ফিরে এসে যদি আমাকে না দেখতে পায়—সে বড় কষ্ট পাবে রে! উদ্গত দীর্ঘশ্বাসে তাঁহার কথা অসমাপ্ত রহিয়া গেল। দুই চোখ দিয়া জল গড়াইতে লাগিল। আহারাদির পর কাত্যায়নী দেবী শয্যাপার্শ্বে বসিয়া একেবারে কাঁদিয়া ফেলিলেন—বলিলেন—আমার কল্যাণীর কি হবে বোন? অনেকক্ষণ নীরবে থাকিয়া আত্রেয়ী ধীরে ধীরে বলিলেন, তোমার কথা আমি বুঝেছি দিদি—আমি আর সত্যিই বাঁচবো না—কল্যাণীর কথা আমি ভুলিনি—তার ব্যবস্থা আমি করে যাব। এ শুধু আমার ইচ্ছা নয়—এ তার মায়ের শেষ আদেশ। তোমরা ভয় করো না তার মায়ের আদেশ সে অবশ্য রাখবে দিদি। এ বিশ্বাস তার 'পর তোমরা চিরদিন রেখো। তুমি কল্যাণীকে গিয়ে পাঠিয়ে দাও আর আমি দেরী করবো না—আজই লিখে রাখি এর পর হয়তো আর সময় পাব না। অতি কষ্টে কয়েক ছত্র লিখিয়া কাগজখানা ভাঁজ করিয়া কল্যাণীর হাতে দিয়া বলিলেন—খুব ভাল করে রেখে দিবে এসো মা—দেখো যেন হারায় না। অসি ফিরে এলে তাকে দিও।

পত্রখানা রাখিয়া কল্যাণী আসিয়া তাঁহার পাশে বসিল।

আত্রেয়ী কল্যাণীর একখানা হাত নিজের দুইখানি শীর্ণ হাত দিয়া বুকের মধ্যে টানিয়া ধরিয়া—অনেকক্ষণ পর্যন্ত চোখ বুঁজিয়া চুপ করিয়া রহিলেন পরে ধীরে ধীরে ডাকিলেন—মা রে!

কল্যাণী জবাব দিল—কেন মা?

মাতৃ সম্বোধনে আত্রেয়ীর মুখ চোখ যেন আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বলিলেন—এখন থেকে আমাকে মা বলেই ডাকিস্ কল্যাণী।

কল্যাণী মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া বলিল—তাই ডাকবো মা।

কিছুক্ষণ পরে আত্রেয়ী পুনরায় বলিলেন—চিঠিখানা তাকে তুই নিজ হাতে দিস্ মা। লজ্জা তাতে নেই। ভগবান তোদের দুজনকে সেই ছোটবেলা থেকে এক করে দিয়েছে—আমরাও তাঁর ইচ্ছাই মাথা পেতে নিয়েছি—কিন্তু দেখিস মা, কখনও যেন ভুলেও অসির উপরে অবিশ্বাস রাখিস্ নে। ছোট কাজ কোনদিন সে করেনি—এ আমি আমার এই শেষ সময়ে তোকে জোর করে জানিয়ে যাচ্ছি মা। আমার অনেক সাধ ছিল—কিন্তু সে আর পূর্ণ হবে না জানি। ভগবানের কাছে আমার যাবার সময় এই প্রার্থনাই জানিয়ে যাই—তোরা যেন সুখে থাকিস্—সংসারে বড়ো হ'য়ে থাকিস্। আমি যতদূরেই থাকি না কেন মা—তোদের সুখ দুঃখ হয়তো সেখানে গিয়েও আমার বুকে বাজবে।

কল্যাণী কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল—তুমি চুপ কর মা—কি তোমার হয়েছে যে, এতো ভাবছো—কবিরাজ মশায় বলেছিলেন—ভাল হ'য়ে উঠবে।

আত্রেয়ী ম্লান হাসিয়া বলিলেন—পাগলী, কবিরাজ তা বলে নাই রে—তুই মিথ্যে কথা বলছিস। আর আমি ভিতর থেকেই যে যাবার তাগিদ পাচ্ছি মা!

পরে ইসারায় কল্যাণীর মাথা তাঁহার বুকের কাছে আনিতে বলিয়া নিজের শীর্ণবাহু তুলিয়া কম্পিত হস্তে তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিয়া বলিলেন—কাঁদিস নে পাগলী, মানুষ কি চিরকাল বাঁচে রে!

কিছুক্ষণ দম লইয়া বলিলেন—কিন্তু অসি যে বড় দুঃখ পাবে মা তুই তাকে সান্ত্বনা দিস। নিজের হাতে সন্তানকে এই অগ্নিপরীক্ষায় ঠেলে দিয়েছি। তবু এই সান্ত্বনা যে, তাকে আমি কোন ছোট কাজের মাঝে ঠেলে দিইনি। বড় কাজের বিপদও যে বড় মা!

আজ আর একটা কথা তোকে বলি—তোর
নেও হয়তো ভবিষ্যতে এমনি কত বিপদ
বে—তা ব'লে যেন আমার মত ভেঙেগ
স নে। আমি যে ভিতরে ভিতরে এত
ল তাতো জানতাম না। অসিকে ভালবাসায়
ক দুঃখ আছে এ আমি জানি—তাই আগে
তেই তোর নিজের মনকে ঠিক করে নিস্

কল্যাণী বাধা দিয়া বলিল—তুমি চুপ কর
দুর্বল শরীরে অত কথা বললে যে আরও
শ দুর্বল হয়ে পড়বে।

ইহারই কয়েকদিন পরে দিনদুই ধরিয়া
র বারে কাসির সঙেগ অনেকখানি করিয়া
ন রক্ত বাহির হইতে লাগিল এবং ক্রমে ক্রমে
নীশক্তিটুকু একেবারে ক্ষয় হইয়া হইয়া
দিন অপরাহ্ন বেলায় তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস
র হইয়া গেল। অমিয় যথাবিধি মায়ের
র করিয়া শ্রাদ্ধাদি চুকাইয়া অবশেষে
তের কথা মনে করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে
কাতায় ফিরিয়া গেলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

জেলের এই একঘেয়ে নিরানন্দ দিনগুলি
ক একে শেষ হইয়া অবশেষে অসিতের
র দিনটি আসিয়া পড়িল। বিদায়ের
দিনে মধুকর তাহাকে নিজের বুকের
র টানিয়া লইয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া
লেন। তারপর দুই বাহু দ্বারা তাহার
বেষ্টন করিয়া বলিলেন, আমাকে ভুলো
অসি! অসিত মধুকরের বাহু-ডোরে বদ্ধ
য়া বলিল—এত দুঃখের মাঝে যে
পনাকে পেয়েছি, এইটাই তো আমার মস্ত
সান্ত্বনা দাদা—আপনাকে ভুলবো কেমন
!

মাকে আমার প্রণাম জানিও, অসি। তোমার
সামান্য মা নন সে আমি বুঝেছি ভাই!
সত মায়ের কথায় উৎসাহিত হইয়া উঠিল—
য় দাদা, মা-ই আমার সব—ভাবছি কতক্ষণে
য়া মাকে দেখবো—কতক্ষণে তাঁর কোলে
রেখে তাঁর মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে
কয়ে থাকবো। মধুকর হাসিয়া বলিলেন—
মার উপরে আমার হিংসে হয় অসি, ইচ্ছে
র তোমার মাকে দু'ভায়ে ভাগ করে নিই।
ন্তু যেখানেই যখন থাক এ কথা যেন কখনও
লা না ভাই, যে সংসারে কেবল সুখ-ভোগের
নাই আমরা জন্মি নাই। আমাদের সামনে
ছে এই দেশ—এই অগণিত নিপীড়িত
ত! গণদেবতা যদি ডাকেন গৃহ দেবতাকেও
ড়ে এসো ভাই। অসিত বলিল—স্পর্ধা
মার নেই দাদা, মনে মনে আপনাকেই গুরুর
সনে বসিয়েছি। ডাক যদি আসে আমাকেও
পনিই ডেকে তুলবেন।

—কিন্তু গুরু তো কেউ কারু নয় ভাই—এ তোমার ভুল, আমরা সব ভাই—ভাই—দুর্গম পথের যাত্রিদল!

অসিত হাসিয়া বলিল—ভাই বটে, তবে অগ্রজ গুরুজন!

মধুকর পুনরায় তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিলেন—আর একটা কথা অসি—কখনও যেন ভগবানের উপর বিশ্বাস হারিয়ো না। যুক্তির জাল দিয়ে তাঁকে ধরতে পারবে না, সে চেষ্টাও যেন করো না। বিশ্বাস করতে চেষ্টা করো। আমাদের সমস্ত আশা ভরসা তাঁর হাতেই ছেড়ে দিয়ে নিষ্কাম হয়ে কাজ করে যাব।

অসিত তাঁহার পায়ের ধূলো মাথায় লইয়া গেটের ভিতর দিয়া অফিস ঘরের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। কতক্ষণ পরে যখন নিজের জিনিসপত্র বুঝিয়া লইয়া সে বাহির হইতেছিল, তখন জানালার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই দেখিতে পাইল মধুকর জানালার তারের জালের উপর দুই হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

আজ প্রায় ছয় মাস ধরিয়া যে জেলের প্রাচীর প্রতিবারে তাহার দৃষ্টিকে ধাক্কা মারিয়া ফিরাইয়া দিয়াছে, অসিত আজ তাহারই বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। মুক্তির একি আনন্দ! বাইরের সূর্যকিরণ যেন আজ অনেক গুণ উজ্জ্বল মনে হইতেছে। পথের ধূলিরাশি যেন আর ধূলি নয়—কত পবিত্র! বাতাস যেন কোথাকার কোন্ তপোবনের সুরভি বহন করিয়া আনিতেছে। অসিত কয়েকবার বুক ভরিয়া নিঃশ্বাস টানিয়া লইল। কিন্তু একি? সমস্ত শরীর তাহার এখন অবশ হইয়া আসিতেছে কেন? দুই পা, দুই হাতের আঙুলগুলো সব থর থর করিয়া কাঁপিতেছে কেন?

অসিত ভাবিল—মুক্তির আনন্দে তাহার সমস্ত শরীরের অণুপরমাণু একেবারে নাচিয়া উঠিয়াছে, হয় তো এ তাহারই প্রকাশ! সমস্ত শরীরটাকে কয়েকবার নাড়া দিয়া লইয়া সে স্টেশনের দিকে পা বাড়াইল। নিজেদের স্টেশনে আসিয়া নামিতেই দেখে অক্ষয় আসিয়া তাহারই অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে।

অসিত তাহাকে বুকের ভিতরে জড়াইয়া ধরিয়া প্রশ্ন করিল—ভাল আছিস্ ভাই! অক্ষয় মাথা নাড়িয়া জানাইল—ভাল আছে।

পরক্ষণেই অসিতের মুখ হইতে বাহির হইয়া আসিল—মা কেমন আছেন ভাই—আমার মা?

অক্ষয় অন্য দিকে ঘাড় ফিরাইয়া জবাব দিল—হ্যাঁ, ভাল আছেন। কিন্তু কণ্ঠস্বর যে তাহার কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল অসিত তাহা লক্ষ্যও করিল না।

অক্ষয় ঘোড়ার গাড়ী ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। এখন দুইজন গিয়া সেই গাড়ীতে চাপিয়া বসিল। সেই মাঠের মাঝখানের রাস্তাটি ধরিয়া গাড়ী হেলিয়া দুলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। সমস্ত মাঠ আজ ফসলে ফসলে ভরিয়া উঠিয়াছে। কোথাও বাতাসে পাট-খেতগুলি মাথা দুলাইতেছে। সম্মুখে শত শত বিঘা ধানের জমির উপর দিয়া সবুজের ঢেউ তুলিয়া বাতাস বহিয়া যাইতেছে। অসিত গাড়ীর ভিতরে বসিয়া কল্পনার জাল বুনিয়া যাইতেছিল—আর আধ ঘণ্টার মধ্যে সে বাড়ি গিয়া পেণছিবে। মা তাহার এতক্ষণে নিশ্চয়ই নদীর ঘাটে আসিয়া তাহারই প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন—পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন কাত্যায়নী দেবী—কল্যাণী হয়তো লজ্জায় আর ঘাটে আসিয়া দাঁড়ায় নাই—হয় তো বা তাহাদের ঘরের জানালা খুলিয়া দুই চোখের দৃষ্টি নদীর ধারে প্রসারিত করিয়া দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আজ ছয় মাস সে মাকে দেখে না। উঃ এই ছয়টা মাস যেন ছয়টি বৎসর বলিয়া মনে হইতেছে। সর্বপ্রথম সে মাকে গিয়া প্রণাম করিবে—মা তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া মস্তক চুম্বন করিবেন—হয়তো আনন্দে একেবারে কাঁদিয়াই ফেলিবেন। তারপর কাত্যায়নী দেবীকে প্রণাম করিবে এবং তারপর গ্রামের আর আর গুরুজনদের। কল্যাণীকে নির্জনে পাইলে একটুখানি আদর করিবে—সে লজ্জায় বুঝি আজকাল আর কাছেই আসিতেই চাহিবে না—সব সময় পলাইয়া পলাইয়া বেড়াইবে। বিকাল বেলায় সমস্ত গ্রামখানির প্রত্যেকটি বাড়িতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে। ছয়টি মাস তো সোজা নয়। না জানি এই দীর্ঘদিনগুলির মধ্যে গ্রামের কাহার কত কি মংগলামঙগল ঘটিয়া থাকিবে! কথাটি ভাবিতেই অকারণে কি জানি কেন অসিতের বুক কাঁপিয়া উঠিল। খেয়া ঘাটে আসিয়া গাড়ী থামিল। অক্ষয় গারোয়ানকে ভাড়া মিটাইয়া দিল। অসিত চাহিয়া দেখে নদীর পাড়ে আম গাছের তলায় কয়েকজন মেয়ে পুরুষে সত্যই তো বসিয়া আছে—হয়তো উহারই মধ্যে তাহার মা বসিয়া আছেন। অসিতের বুকের ভিতরে কয়েকবার দুলিয়া উঠিল, কিন্তু ভাল করিয়া তাকাইয়াও এতদূর হইতে সে ঠিক করিয়া চিনিতে পারিল না।

মিনিট দশেক পরে খেয়া নৌকা আসিয়া এ পাড়ে থামিল। ওপাশে কতকগুলি মেয়ে-ছেলে স্নান করিতেছিল। সান্যাল বাড়ির পিসি ছিলেন এক হাঁটু জলে দাঁড়াইয়া। অসিতের দিকে নজর পড়িতেই একেবারে সংসারের সকল মায়া কণ্ঠস্বরে টানিয়া আনিয়া কাঁদিয়া বলিলেন—ওরে, অসিরে, সেই আসাই এলি—আর দুটো মাস আগে যদি আসতিস্ বাছা, তবু তো অভাগীকে চোখের দেখা দেখতে

পারিতস। ওরে তোর জন্যেই যে মা তোর নিজের দেহটা শেষ করে দিল রে—এমন শত্রুও মানুষ পেটে ধরে রে! অসিত সহসা ইহার কোন অর্থ না বুঝিতে পারিয়া হাঁ করিয়া তাকাইয়াছিল। কয়েক মুহূর্ত পরে বিহ্বলতা কাটাইয়া উঠিয়া বলিয়া উঠিল—কি, কি, কি হয়েছে মার। —মা কি আর আছে রে—সে যে আজ দুই মাস হ'লো—অসিত অক্ষয়ের গায়ে একটা ঠেলা দিয়া বলিল—অক্ষয় তুই বল মার আমার কি হ'য়েছে! অক্ষয় কথা কহিতে পারিল না—দুই চোখ দিয়া তাহার জল গড়াইয়া পড়িল। অসিত আর একটা কথাও কহিল না—কতক্ষণ বিহ্বলের মত একেবারে উদাস দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। নদী গাছপালা বাড়ীঘর সমস্ত যেন তাহার চোখের সম্মুখে একেবারে তাণ্ডব নৃত্য শুরু করিয়া দিল—চোখের দৃষ্টি আসিল ঝাপসা হইয়া—সে ধীরে ধীরে চোখ বুজিয়া একেবারে নৌকার উপরে শুইয়া পড়িল।

অসিতের জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে চাহিয়া দেখে সে তাহাদের ঘরের বারান্দায় শুইয়া আছে। কাত্যায়নী দেবী ও অক্ষয় তাহার পাশে বসিয়া আছেন। কাত্যায়নী দেবী তাহাকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন—অসিত তাঁহার কোলের মধ্যে মুখ লুকাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া খানিকটা শান্ত হইল। ইতিমধ্যে গাঙ্গুলী খুড়ো আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়া বলিলেন—তাই তো কল্যাণীর মা—ছোঁড়াটা এতদিন পরে এলো—মায়ের সৎকাজটার সময় কাছে থাকতে পারেনি—শ্রাদ্ধ শান্তির কিছুই করতে পরেনি—একটা কিছু ব্যবস্থা তো এর করতে হ'বে—কথাটা শোনামাত্রই তো অশৌচ স্পর্শে। তা আজকের মতো ঘি, সৈন্ধব দিয়ে সংযম করিয়ে রাখ। কাল থেকে তেরাত্রি হবিষ্যান্ন করাতে হবে। আমি শাস্ত্রটাস্ত্র ঘেঁটে সব বিধি ব্যবস্থা করে দেব। কিন্তু এতদিন জেলে ছিল একটা প্রায়শ্চিত্তি টিত্তি হয়তো করতে হ'বে।

কাত্যায়নী দেবী বলিলেন—আজ সে ব্যবস্থাই তো করছি ঠাকুরপো—আহা, বাছা আমার এত বড় শোকে একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। গাঙ্গুলী খুড়ো আরও দুই চারিটি সদুপদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন। অক্ষয় আর বাড়ি যায় নাই—অসিতকে স্নান করাইয়া আহার করাইয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার জন্য বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া বাড়ি গেল।

অনেকক্ষণ অসিত চুপ করিয়া বিছানায় পড়িয়া রহিল। তাহার এই তেইশ বৎসরের পরিচিত গৃহ—এই শয্যা—গৃহের যাবতীয় আসবাবপত্র সবই তাহার মায়েরই স্মৃতিতে ভরা। অসিত ইহারই মাঝে একান্ত নিশ্চল-ভাবে বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া যেন মায়েরই স্মৃতি—মায়েরই স্নেহ সারা গায়ে মাখিয়া লইতেছিল। মায়ের নিজের হাতের তৈরী করা বিছানা—নিজের হাতে তৈরী করা বালিশ—এই খাটেই হয়তো মা তাঁহার শেষ রুগ্নশয্যায় শুইয়া ছিলেন। অসিতের মনে পড়িয়া গেল সেই অতি শৈশবের কথা—শীতকালে এইখানে শুইয়া লেপের ভিতরে ঢুকিয়া একেবারে মায়ের বুকের ভিতর মিশিয়া থাকিয়াছে—শেষ রাত্রে জাগিয়া মায়ের সহিত কত কথা বলিয়াছে। মা একে একে কত না গল্প—কত না ইতিহাসের কথা—কত না কবিতা বলিয়া গিয়াছেন। গৃহের সব যেখানে যা ছিল তেমনি আছে। ওপাশে সারি সারি শিকায় ৫।৭টি ঘিয়ে পাকান মেটে হাঁড়ি ঝুলিতেছে—কোনটাতে কুলের আচার—কোনটিতে আমের আচার—যে কালের যা মা সমস্তই তৈরী করিয়া অতি যত্নে তুলিয়া রাখিতেন। অসিতকে তাঁহার সতর্ক করার অন্ত ছিল না—চুরি করে কিন্তু আচার খাসনে—অসি বেশি খেলে পেট কামড়ায়—অসুখ করে—যখন চাইবি আমি নিজে পেড়ে দেব। অসিত কোন কথাই না বলিয়া মায়ের উপদেশ কান পাতিয়া শুনিয়া যাইত। মনে মনে বলিয়া যাইত—তোমার কথাই আমি শুনি আর কি? তারপর মা যখন স্নান করিতে কি অন্য কোথাও বেড়াইতে যাইতেন—সে চুপি চুপি পেড়া বাহিয়া উপরে উঠিয়া গিয়া হাত ভরিয়া যত খুশী আচার আনিয়া খাইত মা জানিতেও পারিতেন না। তারপর যেদিন আচারের হাঁড়িতে নিজে হাত দিতেন সেই দিন চেঁচাইয়া উঠিয়া বলিতেন—ওরে চোর—এমনি করে চুরি করে আচার খেয়ে পেট কামড়ে মরবি দেখছি—এত যে নিষেধ তবু কি কথা শোনে! সেই যে কথায় আছে "চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী"। অসিত চুপ করিয়া মনে মনে হাসিয়াছে।

মাচার উপরে তিনটি বড় বড় কালো রংএর মাটির কলসী অসিত ছোট বেলা হইতে দেখিয়া আসিয়াছে—তাহার একটিতে মুড়ি একটিতে খৈ ও অপেক্ষাকৃত ছোটটিতে চিড়া থাকিত। কতদিন মাচার উপর উঠিয়া সে মুড়ির কলসীর ভিতর হাত ঘুরাইয়া খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাতাসা বাহির করিয়া খাইয়াছে। আজও তেমনি করিয়া আচারের হাঁড়িগুলি শিকায় ঝুলিতেছে—মুড়ি খইয়ের কলসীগুলি রহিয়াছে। এই তুচ্ছ ছেঁড়া বালিশ, এমন কি সেই কোন্ কালের ছেঁড়া মাদুরখানা পর্যন্ত ঘরের এক কোনায় গুটান রহিয়াছে—কিন্তু যিনি এই সকলকে যত্ন করিয়া পরিপাটি করিয়া সাজাইয়া গোছাইয়া টিকাইয়া রাখিয়াছিলেন—তাঁহাকে আজ আর কোথাও খুঁজিয়া পাইবার উপায় নাই! এ কি পরমাশ্চর্য ঘটনা। এই মাটির হাঁড়ি আর ছেঁড়া মাদুর কি মানুষের জীবনের চেয়েও সত্য—মানুষ কি এমনই মিথ্যা এমনি অস্থির জীবনকে এমন সত্য মনে করিয়া বহিয়া বহিয়া বেড়ায়।

অসিত বিছানা ছাড়িয়া যখন বাহিরে আসিল—তখন বেলা আর বেশী নাই। ঘরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইতেই রান্নাঘরের দিকে কল্যাণীকে দেখিতে পাইল—সে এক মুহূর্ত তাহার দিকে তাকাইয়া নিজেদের বাড়ির দিকে সরিয়া গেল। ওপাশে বুধি গাইটা বাঁধা ছিল—অসিত খানিকক্ষণ তাহার গায়ে গলায় হাত বুলাইয়া তুলসীতলায় আসিয়া দাঁড়াইল। তুলসীমঞ্চের কয়েকহাত দূরেই দুইটি হরিতকী ও আমলকী গাছ পোঁতা হইয়াছিল—গাছগুলি বড় হইয়া সমস্ত স্থানটি ছায়াচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। মা তাহার প্রতিদিন তুলসী বেদীটি পরিষ্কার করিয়া লেপিয়া দিতেন—সন্ধ্যায় তাহারই তলায় প্রদীপ জ্বালিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া গলায় আঁচল জড়াইয়া প্রণাম করিতেন। অসিতের কখনও অসুখ বিসুখ করিলে, তুলসী তলার ধূলি আনিয়া তাহার কপালে মাথায় মাখিয়া দিতেন! অসিত আজ তুলসী তলায় মাথা ঠেকাইতে গিয়া একেবারে সেখানের সমস্ত ধূলি তাহার সারা গায়ে মাখাইয়া লইল। সেখান হইতে ধীরে ধীরে বাড়ির বাহিরে চলিয়া আসিল। সম্মুখে ছোট একটু ফুলের বাগান—সেখানে দুইটি গন্ধরাজ ফুলের গাছ। গাছে অজস্র ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। এ গাছ দুটিও মা নিজের হাতে পুঁতিয়াছিলেন। ফুলবাগানের পূবেই একেবারে চন্দনা এবং বাগানের লাগা দক্ষিণদিকটায় একটু উঁচু জমি—সেখানে আসিতেই অসিত দেখিতে পাইল একটি বৃষকাঠ এখানে পোঁতা রহিয়াছে। পাশেই একটি মেটে কলসী, একটি তুলসীগাছ—কতকগুলো পোড়া কাঠের টুকরো ইতস্তত ছড়ান রহিয়াছে। অসিত দেখিবা মাত্র বুঝিতে পারিল এখানেই তাহার মায়ের দেহখানি পোড়াইয়া একেবারে নিঃশেষ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অসিত সংজ্ঞাহীনের মত ধীরে ধীরে সেখানে বসিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে সেই-খানের খানিকটা ধূলামাটি তুলিয়া গায়ে মাথায় কপালে মাখিতে লাগিল। তারপর উঠিয়া গিয়া দুই হাত ভরিয়া গন্ধরাজ ফুল তুলিয়া আনিয়া মায়ের শ্মশানের উপর ছড়াইয়া দিয়া পুনরায় চুপ করিয়া সেইখানেই বসিয়া রহিল। পশ্চিম দিকের আমবাগানের অন্তরালে সূর্য অনেকক্ষণ ডুবিয়া গিয়াছে। একটু দূরে গোটা দুই শিয়াল হোয়া হোয়া করিয়া ডাকিয়া গেল—ধীরে ধীরে অন্ধকারে চোখের দৃষ্টি আসিল আবছা হইয়া। অসিত তেমনি ঠায় সেখানে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। (ক্রমশঃ)

লক্ষ্মীছাড়া

শ্রীসুরেশনাথ ঘোষ

চায়ের দোকানটার হাত বদলায়, কিন্তু নাম বদলায় না। অথচ আশ্চর্য এই ব, যে নামের মূলধন ব্যবসায়ীর পরম লভ্য, া পাওয়া দূরে থাক, দুর্নামের ঠেলায় কানে আঙুল দিতে হয়। তবু নীলকণ্ঠের মত সমস্ত বিষ গলায় নিয়ে আজ দোকানটা দাঁড়িয়ে আছে, গলিটার মোড়ে অচল, অটল।

পাড়ার ভদ্রলোকদের কাছে ওটা একটা আবর্জনার মত। গলি দিয়ে বেরুবার সময় যদি কারো চোখ ওদিকে পড়ে ত সহসা মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিয়ে চলে যায়। কেউ বা আড়চোখে একবার চেয়েই মনে মনে বলে ওঠে চায়ের দোকান নয় যেন একটা ডাস্টবিন।'

পাড়ার বুড়ীরা নাতনীদের সঙ্গে করে গঙ্গাস্নান থেকে ফিরতে ফিরতে গালাগাল পাড়েন, এত লোক ওলাউঠায় মরে, মায়ের অনুগ্রহে মরে, কিন্তু এরা কি যমের অরুচি? এদের দিকে কি তার চোখ পড়ে না? তারপর নাতনীদের পাশে আড়াল করতে গিয়ে গজ গজ করেন, মুখপোড়াদের কি বাড়িতে মা-বোন নেই? কেউ বা ঘৃণায় মুখটা বেঁকিয়ে নিতে নিতে বলেন, চিংড়ীমাছ পচলেও খাওয়া যায়, কিন্তু রুই মাছ পচলে একেবারে নর্দমায় ফেলে দিতে হয়! ছ্যাঃ এদের আবার বলে ভদ্রলোকের ছেলে?

চায়ের দোকানের মধ্যে একটা অস্ফুট কৌতুকধ্বনি শোনা যায়। কেউ মুখে অদ্ভুত রকমের 'সিটি' মেরে তাকে প্রকাশ করে কেউ বা হঠাৎ কোন একটা সিনেমার গানের একটা লাইন গেয়ে ওঠে—' যদি ভাল না লাগে তবে দিয়ো না মন।'

এ চায়ের দোকানটায় পাড়ার যত বয়াটে ছোঁড়াদের আড্ডা। যারা রাস্তার ধারে রকে বসে এ'টো বিড়ি ভাগ করে খায়, যারা পাঁচ পয়সার শেয়ারে রেস খেলে, মেয়ে স্কুলের গাড়ি দেখলে যাদের মুখ চুলকে ওঠে—সেইসব ঘাড়-কামানো, ঝাঁকড়াচুলো ছোঁড়ারাই সব সময় ভীড় করে থাকে এখানে। অদ্ভুত এদের জীবন। এদের না আছে বাড়িতে স্থান, না আছে বাইরে। সমাজের চোখে ওরা যেমন ঘৃণ্য, ঘরেতেও তেমনি অপবাদ, অবিশ্বাস, অসন্তোষ এদের প্রতিদিনের পুরস্কার। যত লক্ষ্মীছাড়া হতচ্ছাড়ার দল। ভদ্রসমাজে তাদের প্রবেশ নিষেধ। সংসার-সমুদ্রে দ্বীপের মত ওই চায়ের দোকানটুকু যেন তাদের একমাত্র আশ্রয়। কালো 'অয়েল ক্লথ' মোড়া টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে পুরু কাঁচের দাগকাটা গেলাসে 'ডবল-হাপ' কিংবা 'হাপ কাপ' চা গলাধঃকরণ করতে করতে তারা দিনের অধিকাংশ সময় কাটিয়ে দেয়। এদের হিসাব মাসকাবারী; যদিও কেউ দেয় এক মাসে, কেউ তিন মাসে, কেউ বা বছরের শেষে। আবার দেয় না এমন লোকেরও অভাব নেই। তাদের বলাই অশ্লীল ভাষায় গালাগাল দেয়, ঝগড়া করে, আবার হেসে কথা কয়, ধারে চা-ও বেচে। যেমন খরিদ্দার তেমনি মহাজন। কোথায় যেন উভয়ের মধ্যে একটা মিল আছে; তাই কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারে না। বলাই এক একদিন রেগে গিয়ে বলে, দিবি নি তাই স্পষ্ট করে বল না— আমি খাতা থেকে নামটা কেটে দিই।

একমুখ বিড়ির ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে তারক উত্তর দেয়, তোর দান গ্রহণ করবো আমি? জানিস, আমি রায়সাহেবের ছেলে? তোর এত বড় আস্পর্দ্দা যে, তুই সকলের সামনে আমায় অপমান করিস? ছোট মুখে বড় কথা! খবরদার বলছি, ফের যদি কোনদিন শুনি......

বলাই তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে, বেশ তবে কবে দিবি বলে দে—একটা তারিখ দে অন্তত যে বুঝি তোর শোধ দেবার ইচ্ছা আছে।

এইবার সে আরও রেগে ওঠে। বলে, যেদিন পাবো, সেইদিনই কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করে দেবো—এক আধলা কোন শালার ধার রাখবো না।.

বলাই রুক্ষস্বরে উত্তর দেয়, সেদিনটা কবে শুনি?

তারক বলে, সে খবরে তোর দরকার কি—চা খেয়েছি, পয়সা ফেলে দেবো।

এইভাবে তর্ক থেকে শেষে ঝগড়ায় গিয়ে ব্যাপারটা নিষ্পত্তি হয়। মানে বলাই নিজে থেকেই এক সময় থেমে যায়। ওদের নাম সে খরচের খাতায় আগেই লিখে রেখেছে। তবু তাদের সাহচর্য ছাড়া তার দিন চলে না। হাসি ঠাট্টা অশ্লীলতা, স্থানে অস্থানে যাওয়ার তারা বিশ্বস্ত সঙ্গী। তাদেরও ত একটা সমাজ চাই। বেঁচে থাকবে তাহলে মানুষ কি করে?

বলাই একথা ভাল করেই জানে যে, দোকানটা যাদের জন্যে চলে, সে অন্তত ওরা নয়। স্টীল ট্রাঙ্কের কারখানার কর্মচারী, কাঠের মিস্ত্রী, প্রেসের কম্পোজিটার, রিক্সাওয়ালা, কর্পোরেশনের ঝাড়ুদার—ওরাই ওর লক্ষ্মী। এছাড়া সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভীড় করে আসে যত ফুটপাথে শুয়ে-থাকা ভিখিরীমাগুনের দল—টিনের ভাঙা কৌটা, মাটির এ'টো ভাঁড় নিয়ে তারা ছুটে আসে।

পাড়ার ভদ্রলোকেরা সবাই এই দোকানটার ওপর চটা। ভেতরে ভেতরে সকলে চেষ্টা করে দোকানটাকে উঠিয়ে দেবার জন্য। পাড়ায় কোন চুরি হলে তারা গোপনে ওই চায়ের দোকানটার নাম লিখিয়ে দেয়, বলে যত বদমাইস গুণ্ডাদের আড্ডা ওখানে। কেউ বা পাবলিক নুইসেন্স' বলে বড় বড় ইংরেজি দরখাস্ত লিখে পুলিস কমিশনারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কিন্তু তাতে বিশেষ সুফল হয় না। বরং বলাইয়ের ক্রোধবহ্নি আরো বেশি প্রজ্বলিত হয়। বাবুদের আপিস যাবার সময় সে তার হাড়বারকরা বুকের ছাতির ওপর ডান হাতটা সশব্দে ঠুকতে ঠুকতে বলে, বেশ করবো আমার দোকানে যা ইচ্ছে তাই করবো—দেখি কোন্ শালা আমায় এখান থেকে ওঠায়। ঢের ঢের ভদ্দরলোক আজ পর্যন্ত দেখলুম—বলে মুখে একটা অশ্লীল গালাগালি দেয়।

বাস্তবিক বলাই যেন কি যাদু জানে। পুলিস আসে, ইন্সপেক্টর আসে, তার চায়ের দোকান সম্বন্ধে অনেক লম্বা লম্বা রিপোর্ট লিখে নিয়ে যায়, কিন্তু ওই পর্যন্ত। অবশ্য, ভদ্রলোকেদের কৃপায় বলাইয়ের কোমরে দড়িও পড়েছে বার দুই—পুলিস সকলের সামনে দিয়ে তাকে বেঁধে নিয়ে গিয়েছে; কিন্তু তাতেও বিশেষ সুবিধে হয়নি। পরদিন হাসিমুখে ফিরে এসে বলাই আবার দোকান খুলেছে। পাড়ার ভদ্রলোকেদের গাত্রদাহ এতে আরো বেড়ে যায়। কেমন করে সেই চায়ের দোকানটাকে ওঠাবে তখন তাই নিয়ে তাদের গবেষণার অন্ত থাকে না। এমন সময় এক কাণ্ড ঘটলো। শোভনা

একদিন কলেজ থেকে ফিরে এসে তার দাদাকে বললে যে, চায়ের দোকানের কাছ দিয়ে যাবার উপায় নেই। কয়েকটা ছোঁড়া রোজ তাকে দেখে 'হুইসিল' দেয়, গান গেয়ে ওঠে। আর যায় কোথায়? যেন বারুদে অগ্নিসংযোগ হলো। পাড়ার কলেজে-পড়া যুবকরা ক্ষেপে ওঠে। বলাইকে তারা মেরে পাড়া থেকে বার করে দেবে বলে শাসিয়ে যায়। বলাই বলে, আমি গরীব লোক দুটো করে খাচ্ছি, তা বুঝি আপনাদের সহ্য হচ্ছে না, তাহলে আমার খাওয়া-পরার একটা ব্যবস্থা করে দিন। আপনারা থাকতে আমি যেন উপবাস করে না মরি।

যুবকরা উত্তপ্ত স্বরে বলে, তোমার ব্যবসা আমরা বন্ধ করতে চাই না, তবে তোমার এখানে যে বদমাইসের আড্ডা সেটা বন্ধ করবো।

বিস্মিতকণ্ঠে বলাই বলে বদমাইস!

যুবকরা এবার রাগে ফেটে পড়ে। হ্যাঁ, বদমাইস—যারা দিনরাত তোমার এখানে পড়ে থাকে—পাড়ার যত আবর্জনা তাদের ঝেঁটিয়ে বিদেয় করবো।

কি বলছেন আপনারা আমি বুঝতে পারছি না।

ন্যাকা সাজতে হবে না; তুমি শয়তান সবই বোঝো।

এইবার বলাইয়ের চোখ দুটো দপ করে জ্বলে উঠলো। সে বললে, আমার দোকানে খদ্দের এলে কি করে তাকে তাড়িয়ে দেবো বলুন?

ধমক দিয়ে উঠে তারা বললে, খদ্দেরের কথা বলছি না। বলছি যারা দিনরাত তোমার এখানে আড্ডা দেয় তাদের কথা। কাল থেকে যদি তাদের কাউকে ফের এখানে আড্ডা দিতে দেখি, তাহলে তোমায় দেখে নেবো। বলতে বলতে তারা সকলে চলে গেল।

কিন্তু পরদিন হঠাৎ দাবানলের মত শহরের বুকে জ্বলে উঠলো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। কলকাতার ইতিহাসে এ রকম নারকীয় কাণ্ড আর কখনো ঘটেনি। অমানুষিক অত্যাচার। মানুষের ধন-প্রাণ রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে উঠলো। পিশাচরা মানুষকে পশুর মত চারিদিক থেকে ঘিরে বধ করতে শুরু করলে। ভদ্র-শিক্ষিত সভ্য সমাজ আতঙ্কে শিউরে উঠলো। এ রকম বীভৎস হত্যাকাণ্ড তারা কোনদিন কল্পনাও করতে পারে নি। ভয়ে তারা আহার-নিদ্রা ভুলে গেল। ঘর ছেড়ে, ধন সম্পত্তি ফেলে রেখে যে যেদিকে পারলে পালালো। আর যারা পালালো না, তারা দলবদ্ধ হয়ে নিজেরা নিজেদের পাড়া পাহারা দিতে শুরু করলে। লেখাপড়া জানা শিক্ষিত ভদ্র সম্প্রদায় তারা শুধু কলম ধরতে জানে, অস্ত্রশস্ত্র দূরে থাক লাঠি ধরতেই জানে না এক ফোঁটা যায়—প্রাণের দায়ে তারা সব বেরুল ঘর থেকে। দৈহিক বল তাদের নেই সত্য, কিন্তু মানসিক বলের অভাব ছিল না। 'বন্দে মাতরম্' বলে চীৎকার করে তারা দিবারাত্র নিজের পল্লীকে পাহারা দিতে লাগল। কোন পাষণ্ডকে তারা ঢুকতে দেবে না সেখানে, কঠোর প্রতিজ্ঞা করলে।

কিন্তু বিপদ হলো সেই সব পাড়ার, যাদের নিকটেই এই পশুগুলোর বাস। ভদ্রলোকেদের বুক কেঁপে ওঠে পাহারা দিতে গিয়ে। সকলেই পাড়ার মধ্যে থাকতে চায়; কেউই আর সেই পশুদের নিকটবর্তী হতে চায় না। অথচ সবচেয়ে দরকারী হলো 'মওড়া' আগলানো। সীমারেখাটাকে কঠিনহস্তে রক্ষা করতে না পারলে পল্লীর মধ্যে যে কোন সময়ে এই নরপিশাচরা ঢুকে পড়বে। ভদ্দরলোকদের হাতে লাঠি কেঁপে ওঠে। কি হবে? কে যাবে সেখানে?

বলাইদের পল্লীটায় এই ভয় ছিল সবচেয়ে বেশী। তাই পাড়ার লোকেরা হঠাৎ বলাইয়ের এমন ভক্ত হয়ে পড়লো যে, বলাই শুদ্ধ বিস্মিত হলো। সকলের মুখে এখন বলাইয়ের নাম, সকলের মুখে মিষ্টি কথা। একটু ভয়ের কারণ দেখা দিলেই সকলে বলাইকে ঠেলে দেয় সব-চেয়ে বিপজ্জনক এলাকায়। বলাই সগর্বে তার দল নিয়ে এগিয়ে যায়। তার চায়ের আড্ডার সেইসব বন্ধুদের ওপরই এখন পাড়ার স্ত্রীপুরুষ ও শিশুদের ধন-মান রক্ষা করার সবচেয়ে গুরুদায়িত্ব।

ভদ্রলোকেরা এখন তাদের ডেকে নিয়ে নিজেদের বৈঠকখানায় বসিয়ে চা খাওয়ায়, সিগ্রেট দেয় এবং মুখে বড় বড় বক্তৃতা দিয়ে উৎসাহ দেয়।

এই নির্ভীক, বয়াটে ছোঁড়ার দল সকলের আগে ছুটে যায়, আর তাদের পিছনে থাকে সভ্য ও শিক্ষিত যুবকের দল। গোলমাল শুনলেই বলাই মুখে একটা অদ্ভুত রকমের 'সিটি' বাজায়। সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্থরা সাবধান হয়ে যায়—ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে রুদ্ধশ্বাসে ঘরের মধ্যে বসে থাকে। আর বলাই তার দলবল নিয়ে ছুটে চলে যায় বিপদের মধ্যে। সামনাসামনি কতবার তারা লড়াই করেছে। রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়েছে নরপশুগুলো, আর এপারে বলাই ও তার দল। তারপর ওদিক থেকে যতবার তারা এগুতে চেষ্টা করে, এপার থেকে বলাই তত ছোঁড়ে ইঁট, সোডার বোতল, পাথর। এমনি করতে করতে বলাইয়ের দল যখন ক্রমশ এগিয়ে যায়, তখন তারা কুকুরের ভয়ে ভীত শেয়ালের মত পালিয়ে যায়। বলাইয়ের অসীম সাহস। দু'চারজনকে সে সহজেই কাবু করে দেয়।

যত দিন যায়, তত শহরের অবস্থা খারাপ দাঙ্গা আয়ত্তে আনবার জন্যে। তার মধ্যেও কিন্তু একটু ফাঁক পেলে লেগে যায় উভয়পক্ষে। বলাইয়ের দল 'ওৎ' পেতে থাকে। পাড়ার মান-ইজ্জৎ রক্ষা করার ভার যেন তাদের ওপর। শিক্ষিত যুবকরাও আছে দলে, কিন্তু তাদের ভয় বড্ড বেশী—কাজের সময় খুঁজে পাওয়া যায় না। যে যার ঘরে গিয়ে লুকোয় কিংবা বাপ-মা ঘর থেকে বেরুতে দেয় না।

বলাই তাতে গ্রাহ্য করে না। বরং বলে, ভীত হলে কাজ মাটি হয়ে যাবে—তার চেয়ে যাদের সাহস হচ্ছে না, তাদের আনবার দরকার নেই।

এমনিভাবে সে অনেক যুবককে কাপুরুষতার লজ্জা থেকে রেহাই দেয়। বিশেষ করে রাত্রে। দিনের বেলায় তবু তাদের মধ্যে কিছু সাহস দেখা যায়; কিন্তু রাত্রি আসার সঙ্গে সঙ্গে যেন তাদের মুখের চেহারা যায় বদলে।

হঠাৎ একদিন পুলিসের হাতে বলাইয়ের দলের কয়েকজন ধরা পড়লো দাঙ্গাকারী ব'লে। তাদের একটা বড় গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে গেল সশস্ত্র লাল-পাগড়ীর দল।

বলাই একটু দমে গেল। কি জানি তাদের কি শাস্তি দেবে? সে পাড়ার মাতব্বরদের গিয়ে বললে এর একটা ব্যবস্থা করতে। তদ্বির তদারক ক'রে আইনের সাহায্যে তাদের ছাড়িয়ে আনতে, তাদের হয়ে মোকদ্দমা করতে।

কিন্তু আশ্চর্য এই, এতে কারুর কোন উৎসাহ দেখা গেল না। দু'চারজন মুখে স্তোক দিলেন বটে যে দাঙ্গাটা একটু কমলে ব্যবস্থা করবেন, কিন্তু কার্যত কিছুই করলেন না। এতে বলাইয়ের মনে অত্যন্ত আঘাত লাগল। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে আর পাড়ার লোকেদের জন্যে রাত্তির জেগে পাহারা দেবে না। যাদের জন্যে তারা মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যেতেও ভয় পায়নি—তাদের এই ব্যবহার! তারা একবার খোঁজও করলে না কি হলো তার সঙ্গীদের। পাড়ার লোকেদের সঙ্গে তাদের কি তবে এই সম্পর্ক?

দাঙ্গাটা তখন প্রায় থেমে এসেছিল। বলাই পাড়ার উকিলবাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে তার সঙ্গীদের খোঁজ-খবর নেওয়ার কথা বললে!

উকিলবাবু প্রবীণ লোক। বেশ পসারও জমিয়েছেন। নামডাকও যেমন উপার্জনও সেই পরিমাণ। তিনি বলাইকে চুপি চুপি বললেন, দু'শো টাকা আগাম যদি দিতে পারো ত চেষ্টা করতে পারি!

বলাই বড় বড় চোখ বার করে বললে, এত টাকা আমি কোথায় পাবো? তাছাড়া তারা ত আপনাদেরই কাজ করতে গিয়েই ধরা পড়েছে এর জন্যে আপনাদেরই ত করা উচিত।

উকিলবাবু ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বললেন, আমার একার জন্যে কি গিয়েছে? বলাই বললে,

জন্যেই ত! উকিলবাবু বিজ্ঞের হাসি হেসে বললেন, তাহ'লে পাড়ার সকলে চাঁদা ক'রে এই টাকাটা তুলে দিক। তুমি পাড়ার সকলের কাছে গিয়ে বলো। বলাই তখন পাড়ার আরো কয়েকজনের কাছে গিয়ে চাঁদা তোলার কথাটা পাড়লে কিন্তু কেউই কথাটায় গা দিলে না। একজন আর একজনের কাছে যেতে বললে, আর একজন আবার চতুর্থ ব্যক্তিকে দেখিয়ে দিলে। তাকে যেন সকলে বিদায় করতে পারলে বাঁচে। কেউ বললে, এখন সময় নেই, এখুনি আমায় অফিস বেরুতে হবে কেউ বললে রাত্তিরে যেতে, কেউ বললে মাসকাবারে মাইনে পেলে দেখা করতে ইত্যাদি।

যেন অপরাধ সমস্ত বলাইয়ের! এইভাবে দোরে দোরে নানাজনের মুখে নানাকথা শুনে বলাই একেবারে বসে পড়লো। শিক্ষিত ভদ্রলোকেদের কাছ থেকে সে এরকম আচরণ প্রত্যাশা করেনি। কি করবে আকাশ-পাতাল ভেবেও সে কোন কূলকিনারা করতে পারলে না।

দাঙ্গা থেমে গিয়েছে। এখন আর পাড়ার ভদ্রলোকেরা তাকে চিনতেও পারে না। আবার সেই দূরত্ব, সেই ব্যবধান গড়ে ওঠে। সে যেন অস্পৃশ্য! চায়ের দোকান খুলে বলাই চুপচাপ বসে থাকে। তার সঙ্গীদের কথাই বুঝি ভাবে তার এ নিঃসঙ্গ জীবনকে যারা পূর্ণ ক'রে তুলতো তাদের হাসি ঠাট্টা বিদ্রূপ উপস্থিতি দিয়ে।

পাড়াটা খুবই খারাপ। তাই পাঁচ সাতদিন চুপচাপ থাকবার পর আবার হঠাৎ একদিন গোলমাল শুরু হ'লো।

এবার বলাই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে আর ওকাজে যাবে না। বরং কেউ যদি ডাকতে আসে ত বেশ দুকথা শুনিয়ে দেবে!

ছোটখাটো গোলমাল এখানে ওখানে হয়, আবার থেমে যায়। বলাইয়ের প্রয়োজন হয় না। বলাই দোকান খুলে বসে থাকে।

কিন্তু একদিন দুপুরবেলা এই গোলমাল এমন তীব্র হয়ে উঠলো যে বলাই কিছুতেই চুপ করে থাকতে পারলে না। নারীকণ্ঠের আর্তনাদ, রক্ষা করো, রক্ষা করো—কানে আসতেই সে লাঠিটা হাতে নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটলো। গিয়ে দেখলে শোভনাদের বাড়িটা আক্রমণ করবার জন্যে একটা দল এগিয়ে আসছে। এ কান্না শোভনাদেরই—এদিকেও অনেকে ছিল, কিন্তু ভয়ে কেউ অগ্রসর হতে পারছিল না। বলাই একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ে বোতল ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে উভয় দলে বেশ একটা তাণ্ডব শুরু হলো। অনেকক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি করার পর গুণ্ডাদের তাড়িয়ে দিয়ে যেমন বলাই পিছন ফিরেছে অমনি কোথা থেকে একজন ছুটে এসে একটা ছুরি তার বুকে বসিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেল।

বলাই একটা আর্তনাদ করে রাস্তায় পড়ে গেল। রক্তে তার সর্বাঙ্গ যেন ভেসে যাচ্ছে আর তারি মধ্যে ছটফট করছে সে কাটা ছাগলের মত। জল, জল—তার শুষ্ক আর্তকণ্ঠ দিয়ে বারবার কেবল সেই কথাটাই বার হচ্ছিল।

কিন্তু কে জল দেবে। বলাইকে ছুরি মারতে দেখে সবাই তখন পালিয়েছে যে যেদিকে পেরেছে।

একটুখানি পরেই একটা 'এ্যাম্বুলেন্স' এসে তাকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে চলে গেল! শোভনার সমস্ত দেহ থরথর করে কাঁপতে লাগল। সে জানলার ফাঁক দিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা দেখেছে নিজ চোখে! তাদেরই রক্ষা করতে এসে প্রাণ দিল বলাই! যদি বলাই মরে যায়, যদি না বাঁচে! তাহ'লে? শোভনা আর ভাবতে পারে না! এই বলাইকেই একদিন কত অপমান করেছে পাড়ার লোকেরা তারই জন্যে! তারই কথায়! অনুশোচনার গ্লানিতে তার সমস্ত অন্তর যেন সহসা ভরে যায়।

জানলার ধারে সে দাঁড়িয়ে থাকে পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে। তার চোখের সামনে বলাইয়ের রক্তাক্ত দেহটা ভেসে ওঠে। তারই কানের কাছে সে যেন বলতে থাকে জল, জল!

সহসা দু'হাতে সজোরে কান দু'টো চেপে ধরে শোভনা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। আপন মনেই সে বলে ওঠে, না না তার কাছে সে চায়নি! অসম্ভব! ক্ষণিকের উত্তেজনা ক্ষণিকেই যায় মিলিয়ে। তবু সেদিন আর কোন কাজে শোভনা মন দিতে পারে না। কেবলই যেন তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে বলাইয়ের মুখ! শোভনা বিরক্ত হয়—প্রাণপণে চেষ্টা করে তাকে ভুলতে। অন্যমনস্ক হবার জন্যে রেডিওটা খুলে সিনেমায় দেখা বহু পুরাতন সব ছবির গান শোনে। ভাল লাগে না তবুও শোনে। রোমাঞ্চকর ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়ে, শরৎ চাটুজ্জ্যের বহু পঠিত প্রেমের উপন্যাসের মধ্যে মনোনিবেশ করে। যেমন ক'রে হোক তার মন থেকে যেন তাকে তাড়াতেই হবে সেই মুখখানাকে—সেই চা-ওলা বয়াটে ছোঁড়ার মুখটাকে!

কালো বরণ গৌর হবে!

সম্প্রতি আমেরিকার এক খবরে জানা গেছে যে সেখানে প্রফেসর এফ স্কিরোকয়ার বলে এক আমেরিকান বৈজ্ঞানিক সম্প্রতি মানুষের গায়ের চামড়ার রং বদলানোর এক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করেছেন। এবং সম্প্রতি এই অভিনব পন্থায় তিনি কয়েকটি কালো কুচকুচে নিগ্রোর গায়ে পাকা কালো রংকে পরিবর্তিত করে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণে পরিণত করতে পেরেছেন বলেও জানা গেছে। তাঁর এই অভিনব পন্থা 'হর্মোন-তত্ত্ব'কে (Hormone Theory) অবলম্বন করে ইনজেকসনের সাহায্যে সাফল্যমণ্ডিত হতে চলেছে। অধ্যাপক স্কিরোকয়ার অচিরেই পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জন করুন এই কামনাই করি। কারণ তাহলে এদেশের অনেক কালো মেয়ের বাপ মায়েরা কসাই বেয়াইদের পণের দাবী থেকে রেহাই পাবেন।
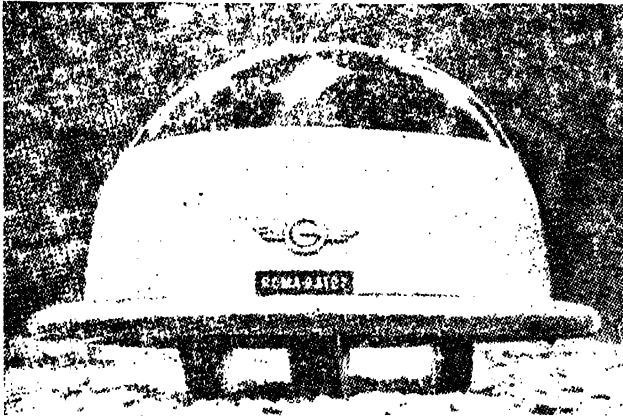
চূড়ান্ত ডানপিটেমী!

সম্প্রতি বিদেশের এক খবরে জানা গেছে —খুব শীগ্গিরই জিন্ লুসিয়ার নামে এক ডানপিটে ব্যায়ামবীর এক বিরাটাকার রবারের বলের মধ্যে ঢুকে ঐ অবস্থাতে নায়গ্রা জলপ্রপাতের ওপর থেকে জলধারা বেয়ে নীচে গড়িয়ে পড়বে। খবরটা শুনে শিউরে উঠছেন হয়তো! কিন্তু এই ব্যবস্থায় তিনি ১৯২৮ সালে আর একবার ঐ রকম একটা মস্ত রবারের বলের ভিতর ঢুকে নায়গ্রা জলপ্রপাতের ওপর থেকে অতল তলে গড়িয়ে পড়েছিলেন—তবে সেবার ঐ বলের ভিতর থেকে তাঁকে অচৈতন্য অবস্থায় বার করা হয়। তাই তাঁর এই দ্বিতীয় প্রচেষ্টা। সেবার পুলিশ কর্তৃপক্ষ তাকে এই দুঃসাহসিক চরম ডানপিটেমী করা থেকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছিল—কিন্তু তারা তা শেষ পর্যন্ত পারেনি। এবারও পুলিশ তাঁকে যথেষ্ট বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবে বলে জানা গেছে কিন্তু তাতে লুসিয়ার সাহেব এতটুকু নিরুৎসাহ হননি। শোনা যাচ্ছে, যে বিরাট রবারের বলের মধ্যে ঢুকে তিনি এই দুঃসাহসিক কার্যটি করবেন বলে মনস্থ করেছেন—সেটি তৈরী হয়ে গেছে। ফাঁপা বলটির চারধারে ৩ ফুট পুরু রবারের দেওয়াল ও ভেতরকার ফাঁকা যায়গার ব্যাস হচ্ছে ৬ ফুট। রবারের দেওয়ালে ৩২টা অক্সিজেন-বাহী খোপর আছে। এইগুলি অক্সিজেন যুগিয়ে লুসিয়ার সাহেবকে বলের মধ্যেই শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করবে। বুঝুন অন্যদেশে ডানপিটেমীর নেশাটা কতদূর পর্যন্ত চড়তে পারে—আমাদের দেশের লোকে বলে ডানপিটের মরণ তালগাছের আগায়। কারণ তার বেশী তারা ভাবতেই পারে না।

লুসিয়ারের রবারের বল

ভবিষ্যতের ট্যাক্সী

সম্প্রতি জানা গেছে যে ভবিষ্যতে স্ট্রীম লাইনড্ অভ্যন্তরে কাঁচের ট্যাক্সী চালানোর ব্যবস্থা যাতে হতে পারে তাই নিয়ে পরীক্ষা হচ্ছে। ঐ নতুন ধরণের একটি ট্যাক্সী তৈরীও হয়েছে—তাতে বনেট, উইণ্ডস্ক্রীন প্রভৃতির বালাই নেই দরকার হলে শুয়েও পড়া যাবে সীটটা সরিয়ে—ছবিতেই তার নমুনা।

সাহিত্য সংবাদ

নিখিল বঙ্গ তৃতীয় বার্ষিক অন্তর্বিদ্যালয়
প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

বিদ্যাসাগর-স্মৃতি পুরস্কার

সাধারণ প্রগতি পাঠাগার (ঘাটাল, মেদিনীপুর) কর্তৃক পরিচালিত।

রচনার বিষয়ঃ—"শিক্ষাব্রতী বিদ্যাসাগর"

রচনা পরীক্ষকঃ—শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস।

সর্তাবলীঃ—

(ক) প্রথম পুরস্কার একটি রূপোর প্লেট, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার যথাক্রমে একটি রূপোর পদক। প্লেট ও পদকে বিদ্যাসাগরের প্রতিমূর্তি মিনে করা থাকবে।

(খ) প্রবেশমূল্য প্রতি রচনার জন্য দু'আনা মাত্র। রচনার সঙ্গে দু' আনার উপযোগী ডাক টিকিট পাঠালেই হবে। কেবল মাত্র অনুমোদিত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সপ্তম হ'তে দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীগণ এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে পারবেন।

(গ) রচনার আয়তন লাইন দেওয়া সাধারণ একসারসাইজ বুকের (৮" × ৬") ছয় পৃষ্ঠার বেশী হবে না। পরিষ্কার অক্ষরে বাঙলা ভাষায় ও আপন যুক্তিতে রচনা লেখা চাই। প্রত্যেক রচনাই প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের মারফৎ এবং তাঁর দ্বারা সনাক্তীকৃত হয়ে প্রতিযোগিতার জন্য প্রেরিত হওয়া প্রয়োজনীয়।

(ঘ) রচনার গুণাগুণ ব্যাপারে পরীক্ষকের সিদ্ধান্তই চরম।

(ঙ) পুরস্কার প্রাপ্ত ছাত্রগণকে যথাসময়ে তাঁদের সাফল্যের কথা জানানো হ'বে। তাঁদের প্রাপ্য পুরস্কার ডাকযোগে তাঁদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

(চ) প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত রচনাটি এখানকার "বিদ্যাসাগর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়" ও বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান বীরসিংহে অনুষ্ঠিত ১৩ই শ্রাবণের "বিদ্যাসাগর জয়ন্তীতে" পঠিত হ'বে। বিখ্যাত মাসিকী 'শনিবারের চিঠি'তে রচনাটি সম্ভবত (অর্থাৎ রচনাটি যদি পত্রিকার যোগ্য হয়) প্রকাশিত হ'বে।

(ছ) পুরস্কার প্রাপ্ত ছাত্রগণের রচনা ফেরৎ দেওয়া হবে না। অন্যান্য রচনা ফেরৎ দেতে হ'লে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠাতে হ'বে। পত্রোত্তরের জন্যও ডাকটিকিট প্রেরিতব্য।

(জ) ১৩৫৪ সালের ২৫শে আষাঢ়ের মধ্যে সমস্ত রচনাই এখানে পৌঁছান চাই। রচনা বা চিঠিপত্র, "কুঠিবাজার, ঘাটাল, মেদিনীপুর" এই ঠিকানায় কর্মসচিবের কাছে পাঠাতে হ'বে।

নিবেদক—গুণময় মান্না। কর্মসচিব, 'বিদ্যাসাগর স্মৃতি সংসদ' সা প্র পা (ঘাটাল, মেদিনীপুর)।

বৌদ্ধ সাহিত্যে নর-নারীর প্রেম

শ্রীদেবব্রত বড়ুয়া

d the Lord God caused a deep
to fall upon Adam, and he slept:
.e took one of his ribs, and closed
ne flesh instead thereof; "And
ib, which the Lord God had taken
man, made he a woman, and
ht her unto the man.
id Adam said, This is now bone
y bones, and flesh of my flesh:
shall be called Woman, because
vas taken out of Man. "Therefore
a man leave his father and his
er, and shall cleave unto his
and they shall be one flesh."
Holy Bible, Genesis, CHAP. 2,
; 21—24.)

সৃষ্টিতত্ত্বের দিক্ থেকে বাইবল্-এর এই উক্তি সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ ও মানব-মানবীর যে সম্বন্ধ এর মধ্যে পেয়েছে তা' চিরন্তন। মানব-মানবীর রের প্রতি আকর্ষণ আদিম আদম-এর থেকে আজ অবধি চলে আসছে; কোথাও এতটুকু ব্যতিক্রম নেই। স্ত্রী-পুরুষের আকর্ষণ স্বভাবগত; শুধু মানবের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, মানবেতর প্রাণীর মধ্যেও ় এর বিকাশ। প্রাচীন সাহিত্য আলোচনায় যায়, এই পার্থিব জগতের বাইরের স্ত্রী-ষের মধ্যেও রয়েছে এই আকর্ষণ। প্রেম র্ষণের-ই রূপান্তর।

'বৌদ্ধ সাহিত্যে নর-নারীর প্রেম" কথাটা তঃদৃষ্টিতে খাপছাড়া মনে হয়; কারণ সাহিত্যে বুদ্ধের উপদেশ, র্ আর তাঁ'দের বিশ্লেষণ ইত্যাদি-ই হত হয়েছে। প্রেম-আখ্যান বর্ণনা সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু বৌদ্ধ সাহিত্যের নানাদিকে ছড়িয়ে প্রাচীন ভারতের নর-নারীর জীবন-যাত্রা, -সভ্যতার ইতিবৃত্তিকার উপকরণ। ত্যের উপর দেশ-কালের প্রভাব অস্বীকার যায় না; মূল উদ্দেশ্য যা-ই হোক না কেন প্রভাবকে উপেক্ষা করে চলবার উপায় সাহিত্যের নেই। সাহিত্য মানবের; যে' ত্যে নর-নারীর অশ্রু-হাসি উপেক্ষিত ছ সে' সাহিত্য মৃত। Universality সার্বজনীনতা সাহিত্যের প্রাণ। সেই versality রূপায়িত হয়ে ওঠে মানুষের ন-বর্ণনায়। বৌদ্ধ সাহিত্যে এই Univer-ty পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

জীবনকে বাদ দিয়ে ধর্ম হয় না। ধর্ম বর; মানবের জন্য-ই ধর্ম। মানব-জীবনকে য়ান করে তোলাই ধর্মের কাজ; ধর্মের ন্য মানুষের মাঝে সত্যের আর শিব-রের প্রতিষ্ঠাতেই। বুদ্ধ মানবের জয়-যাত্রার প্রতীক; বুদ্ধের মধ্যে রূপ পেয়েছে পূর্ণ মানব এবং মানবতার পূর্ণতা। তা'-ই মানব-জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের পর্যালোচনার ভিতর দিয়ে মানুষকে উন্নততম আদর্শের দিকে টেনে নেওয়া-ই বৌদ্ধ সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য। মানব-জীবনকে বিভিন্ন দিক্ থেকে পর্যালোচনা করতে গিয়ে পুরুষ ও নারীর চিরন্তন সম্বন্ধকে বাদ দেওয়া যায় না; কারণ এই আন্তরিক সম্বন্ধ মানবের জীবনেতিহাসের একটি বিরাট অধ্যায় দখল করে আছে। তা-ই মানব-মানবীর অরূপ প্রেম বৌদ্ধ সাহিত্যে রূপায়িত হয়ে একটি বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছে।

বৌদ্ধ সাহিত্যের থের-থেরী গাথায় ব্যক্ত হয়েছে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা। তবে এই অভিজ্ঞতার কাহিনী বিশেষ করে দৃষ্ট হয় থেরী-গাথাতেই। বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘ—এই ত্রিশরণে আশ্রয় পেয়েছে পুত্রহীনা শোকাতুরা নারী, অনাথা বিধবা, ব্যথা-বেদনা জর্জরিতা রমণী, রূপ-পসারিণী বার-বণিতা, প্রেম-বঞ্চিতা দয়িতা, রাজরাণী, কুলবধূ, কুলবালা। এদের জীবনের অভিজ্ঞতা ফুটে উঠেছে থেরীগাথার প্রত্যেকটি গীতি-কবিতায়। থেরী-গাথার গীতি-কবিতার প্রত্যেকটি স্তবক ভিক্ষুণীদের অভিজ্ঞতার-ই স্বীকারোক্তি (personal confession)। এই গীতি-কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে স্বামীর পায়ে প্রেম-কাতর চাপার আকুল মিনতি, জীবকের আম্রকুঞ্জবাসিনী শুভার কাছে ধূর্ত যুবকের প্রেম-নিবেদন, মন্তাবতীর রাজকুমারী সুন্দরী সুমেধার কাছে বারণাবতী-রাজ প্রিয়দর্শন অনিকরত্তের পাণি-প্রার্থনা। থেরী গাথায় ভিক্ষুণীদের অব্যক্ত বাণী ব্যক্ত হয়েছে বৌদ্ধ সাহিত্যের অন্য কয়েকটি জায়গায়, পরের যুগের অর্থকথায়।

ভিক্ষুণী ভদ্রা কুণ্ডলকেশা। রাজগৃহের শ্রেষ্ঠী-দুহিতা ভদ্রা,—সুন্দরী, পরিণত বয়স্কা। একদিন সে দেখতে পেল, পুরোহিত-পুত্র সথুককে ঘাতক নিয়ে চলেছে। ঘাতক পালন করবে রাজাজ্ঞা, সুন্দর সথুকের মস্তক দেহ থেকে ছিন্ন হয়ে লুটিয়ে পড়বে মাটির বুকে;—ভাবতেও ভদ্রার বুকে ব্যথা লাগে। সথুকের বিষণ্ণ বদন, উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টি ভদ্রার কোমল বুকের সূক্ষ্ম তন্ত্রীটিতে ঘা দিল। ভদ্রার মায়া হল; প্রেমে দাঁড়াল মায়া। সথুককে বাঁচাবার ঐকান্তিক বাসনায় ভদ্রা মরিয়া হয়ে উঠল। কিন্তু সামান্য নারীর শক্তি কতটুকু? বেদনায় আর ব্যর্থতায় ভদ্রা প্রতিজ্ঞা করে, সথুককে বাঁচাতেই হ'বে, নয়তো মরণের পথে সেও হ'বে তা'র অনুগামিনী। পিতা শ্রেষ্ঠীর কানে পৌঁছায় কন্যার সংকল্প। উৎকোচের সাহায্য নিয়ে ঘাতকের হাত থেকে শ্রেষ্ঠী ফিরিয়ে আনে কন্যার বাঞ্ছিতাকে। ভদ্রার মুখে চোখে তৃপ্তি আর হাসির রেখা ফুটে ওঠে। মনের মতন করে সাজে ভদ্রা; মণিমুক্তা-বিভূষিতা দয়িতা সাদরে বরণ করে দয়িতকে। কিন্তু হায়! অকৃতজ্ঞ সথুকের কাছে ভদ্রার চন্দ্রাননের কোনো দাম নেই। ভদ্রার দেহের অলংকারই শুধু তা'র লোভনীয় হয়ে ওঠে। কৃতঘ্ন সথুক ফাঁকি দিয়ে নিয়ে যায় ভদ্রাকে, দূরে—বনদেবীর পূজো দিতে। গহন বনানীর নির্জন শৈলশিখরে সথুক চাইল তা'র দেহাভরণ, ব্যক্ত করল তা'র মনের বাসনা। ক্ষোভে, দুঃখে ভদ্রার চোখে আসে জল; তা'র প্রেমভরা বুকের আকুল মিনতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। চতুরা ভদ্রা শেষ ভিক্ষা মাগে দয়িতের পদে; শেষবারের মত দু'বাহু বাড়িয়ে পাষণ্ড প্রেমাস্পদের কঠিন দেহ নিবিড় আলিংগনে চেপে ধরে তা'র কোমল বুকে। তারপর......নীচে, বহু নীচে পড়ে থাকে সথুকের রক্তাক্ত দেহ, প্রাণহীন। নেমে আসে ভদ্রা দ্রুত পদক্ষেপে। কিন্তু ফিরল না সে আর পিতৃগৃহে। লজ্জা, ঘৃণা, দুঃখ আর যৌবনের প্রভাত বেলায় প্রথম প্রেমের নিদারুণ ব্যর্থতাকে বুকে নিয়ে ভদ্রা গ্রহণ করে নির্গ্রন্থ জীবন। সন্ন্যাসিনী ভদ্রার জীবনে আসে শুভ লগ্ন। ভদ্রা আশ্রয় নেয় বুদ্ধের শ্রীচরণে। (Theri-Gatha Commy, P 207 ff; Buddhist Parables, P 151 ff.)

শ্রাবস্তীর শ্রেষ্ঠীর কন্যা পটাচারা। পটাচারার জীবন-কুঞ্জে বসন্ত আসে, বুকে জাগে তা'র অনন্ত প্রেম। কিন্তু প্রেম অন্ধ; প্রেম মানে না শাসন-বাঁধন, পাত্রাপাত্রের বিচার; পটাচারা ভালবাসে পিতার ভৃত্যকে। কলরব-মুখর বিবাহ-রজনীর অন্ধকারে বধূবেশে সজ্জিতা পটাচারা বেরিয়ে আসে প্রেমাস্পদের হাত ধরে। পিছনে পড়ে থাকে পিতৃগৃহে পিতামাতা, ভাই-বন্ধু, আত্মীয়স্বজন; সম্মুখে তা'দের সীমাহীন পথরেখা; বুকে আছে দুর্জয় প্রেম। দূরে, বহুদূরে, নগরীর কোলাহলের বাইরে শান্ত শ্যামল পল্লীর বুকে তা'রা বাঁধে শান্তির নীড়। পটাচারার অভাবের সংসার আনন্দমুখর হয়ে ওঠে নূতনের আগমনে; প্রেমোৎপল সন্তানের আধো হাসি আধো কথা ভুলিয়ে দেয় নিত্যকার অভাব-দুঃখ। দিন যায়। পটাচারার আবার সন্তান হ'বে। চারিদিকে ঝড়জল; পটাচারার ভাগ্যাকাশেও আসে দুঃখের কালবৈশাখী। স্বামী গেছে বনে; খড়কুটো যোগাড় করে নিয়ে আসবে। রাত হলো; কিন্তু তা'র দেখা নেই।

বেদনাতুর পটাচারার বুকে ভয়ে কেঁপে ওঠে। রাত্রিশেষে শিশু দু'টি সাথে নিয়ে পটাচারা বেরিয়ে পড়ে স্বামীর সন্ধানে। কিন্তু হায়! স্বামীর মৃতদেহ পড়ে আছে বনতলে,— সর্পাঘাতে দেহ তা'র নীল। পটাচারার চোখে ঘনিয়ে আসে অন্ধকার। বুকভরা ব্যথা নিয়ে, সমস্ত লজ্জা দূরে সরিয়ে দিয়ে অনাথা পটাচারা ফিরে চলে পিতৃগৃহে—স্নেহের বন্ধন হেতু সেখানে হয়তো হতে পারে তার আশ্রয়। কিন্তু দুঃখের জীবনে দুর্ভাগ্য এসে দেখা দেয় শত-রূপে বারবার। পটাচারার দু'দুটি সন্তান, বুকের দুখানি পাঁজরা—পথের মাঝেই নেয় চিরবিদায়। এবার ভেঙে পড়ে পটাচারা; সইতে পারে না সে আর দুঃখের কষাঘাত; তবু চলে পটাচারা, শ্রান্ত পায়ে ক্লান্ত পথের রেখা ধরে। চোখ তার ঝাপসা...আবার সেই শ্রাবস্তী, জন্মভূমি শ্রাবস্তী। কিন্তু একি এলো পটাচারার কানে? তার বাপ মা ভাই কেউ-ই নেই? সব শেষ হয়ে গেছে ধ্বংসীভূত গৃহ-তলে এই শেষধাক্কা পটাচারা আর সইতে পারল না। পটাচারার মাথা গেল ঘুরে, চোখের সামনে ত্রিভুবন কেঁপে উঠল।...পটাচারা পাগল। পাগলিনী পটাচারা ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে। তাঁর জীবনের ব্যর্থতার গাঢ় অন্ধকারে দেখা দিল আলোর রেখা। বুদ্ধের করুণ সস্নেহ বচন তার সংজ্ঞা দিল এনে। আশ্রয়হীনা আশ্রয় পেল বুদ্ধ, ধর্ম আর সঙ্ঘে। .... পটাচারা ভিক্ষুণী,—ধীর স্থির শান্ত কোমল। (Theri-Gatha Commy, P 108 c; Buddhist Parables, P 94 ff; Manorathapurani, Pp 356—'60.)

"মার" বৌদ্ধ সাহিত্যের satan বা শয়তান। প্রলোভনে মুগ্ধ করে নরনারীকে সৎপথ থেকে ছিনিয়ে এনে দুঃখের আবর্তে নিক্ষেপ করা-ই এই মারের কাজ। বনানীর শীতল ছায়ায় বিশ্রামরত ভিক্ষুণীদের কাছে মারের নগ্ন প্রেম নিবেদনের কাহিনী 'ভিক্ষুণী সংযুক্ত' আর 'থেরীগাথায়' বর্ণিত আছে।

সমগ্র বৌদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে জাতকের গল্পগুচ্ছেই বিশেষ করে পাওয়া যায় প্রাচীন ভারতের ইতিকথার মাল-মসলা। জাতকের নানা-স্থানে বর্ণিত হয়েছে নরনারীর বিরহ-বিধুর মিলন মধুর প্রেমের কাহিনী। "বেসসন্তর জাতক" ছোটোখাটো একটি কাব্য। নায়িকা মাদ্রীর ভিতরে ফুটে উঠেছে রামায়ণের সাধ্বী সীতার পতিপ্রেম। সীতার মত মাদ্রীও স্বামীর অনুগমন করে নিবিড় অরণ্যে। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যার হাস্যোদ্দীপক প্রেম-আব্দার "বেসসন্তর জাতক"এর একটি বিশেষ অঙ্গরূপে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ জুজুক আর তার যুবতী পত্নীর চিত্রে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। জাতক সাহিত্যে

পরকীয়া প্রেম রাজপুত্র কু-রূপ কুশের অন্তর্বেদনা।

শ্যামা। বারাণসীর রূপ-বিলাসিনী শ্যামা; দাম তার হাজার মুদ্রা। রাজা মহারাজার আনাগোনা শ্যামার ঘরে; পাঁচশত তার দাসীবাঁদী। শ্যামার আগুনের মত রূপে পতঙ্গের মত আকৃষ্ট হয় সুদর্শন এক যুবক বণিক। শ্যামার অপরূপ লাবণ্য, চঞ্চল গতি, চটুল কটাক্ষে বণিকের "বক্ষ মাঝে নাচে রক্তধারা"; সর্বস্ব সে সপে দেয় বনিতার পায়ে। কিন্তু বারবনিতা শ্যামার কাছে ওপ্রেমের দাম কি আছে? বারবনিতার পায়ে প্রেম নিবেদন প্রেমের অবমাননা। ফল হয় শ্যামার হাতে বণিকের অপমৃত্যু আর প্রেমের সমাধি,— উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের শোচনীয় পরিণাম। কিন্তু প্রেমপসারিণীরও হৃদয় আছে; অশুচির বুকে শুচিতা জন্ম নেয়; শ্যামারও বুকে জাগে প্রেম। ...... বাতায়ন-পাশে শ্যামা দাঁড়িয়ে আছে। নীচে রাজপথে চলে প্রহরী বেষ্টিত বন্দী, দস্যু। বন্দীর গৌরকান্তি বলিষ্ঠ দেহ, আয়ত নেত্র, গম্ভীর আনন। উপরে শ্যামা, নীচে বন্দী —"আকাশ নামে ধরার পানে।" শ্যামার দেহে কাঁপন জাগে; কম্পিতা পতিতার পাষাণ হৃদয়ের ফাটল থেকে সুপ্তি ভেঙ্গে জেগে ওঠে নারী, চিরন্তন নারী। হাজার মুদ্রার বিনিময়ে শ্যামা মুক্তি কিনে বন্দীর। বারাঙ্গনার পিশাচ জীবনের হয় অবসান। শ্যামার জীবন-পঞ্জীর আর একটি অধ্যায় সূচিত হল—রক্তে লেখা নারীপ্রেমের মর্মন্তুদ কাহিনী। বন্দী— পুরুষ, পৌরুষের আধার, তার পাষাণের মত কঠিন বুকে আঘাত খেয়ে ফিরে শ্যামার প্রেম। বন্দীর বুক থেকে দীর্ঘ দিনের দস্যু-জীবন শোষণ করে নিয়েছে মানব-মনের শাশ্বত সুকুমার-বৃত্তি। পতিতার প্রেমে বন্দীর বিশ্বাস নেই। জনহীন পুষ্প-কাননে দস্যুর কঠিন হস্তের নিষ্পেষণে সংজ্ঞাহীনা শ্যামা শ্যামল কচি তৃণের উপর লুটিয়ে পড়ে। দীর্ঘক্ষণ পরে দীর্ঘশ্বাস টেনে শ্যামা চেয়ে দেখে সে নেই; তার সর্বাঙ্গ নিরাভরণ। নিদ্রাহীন রজনীর গাঢ় অন্ধকারে অশ্রুমতীর প্লাবন নামে অনশন-কৃশা শ্যামার দুচোখ বেয়ে। শ্যামা স্বপন দেখে, দুঃস্বপন। অতীতের মাঝে ডুব দেয় শ্যামা। (Cowell, Jataka III, Pp. 40—42)

অবদান সাহিত্য, বলতে গেলে জাতক সাহিত্যের-ই অনুবৃত্তি। অবদানেও ফুটে উঠেছে নরনারীর প্রেম-জীবনের আলো-ছায়ার রূপ। সুদর্শন কুণাল—সম্রাট অশোকের পুত্র। বিমাতা তিষ্যরক্ষা কুণালের রূপমুগ্ধা। নারীর বুক ফাটে মুখ ফোটে না; তিষ্যরক্ষা কিন্তু নিবিড় করে পেতে চায় কুণালের সুখ-সঙ্গ। দিন যায়। লজ্জাবরণ ছিঁড়ে ফেলে রাণী কুণালের কাছে নিবেদন করে তার গোপন প্রেম।

নেয়; তিরস্কারে ফিরিয়ে দেয় বিমাতা[illegible] প্রেমার্ঘ্য। ব্যর্থতার রোষে ফণিনীর মত কেঁপে ওঠে তিষ্যরক্ষা; তিষ্যরক্ষা প্রতিশোধ চায় বিমাতার ষড়যন্ত্রে কুণালের পদ্মোপ[illegible] চক্ষুদ্বয় উৎপাটিত হ'ল; নন্দদে[illegible] সে বিতাড়িত হ'ল পিতৃরাজ্য থেকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে ফিরে রাজা কুমার; পত্নী কাঞ্চনমালা অন্ধ স্বামীর হা[illegible] দু'টি ধরে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তর। .... জন্মভূমি পাটলিপুত্রের একান্তে অন্ধ ভিখারী করুণ বাঁশী বেজে ওঠে, ব্যথার রাগিনী কেঁ[illegible] কেঁদে ফিরে প্রাচীরের চারিধারে। সম্রাটের কা[illegible] আসে বাঁশীর ক্রন্দন; চোখের সামনে ভেসে ও[illegible] কুণালের সুন্দর মুখ। রাজা বেরিয়ে আসেন ......বাঁশী থামল। মিলনের সুর গেয়ে ও[illegible] হৃদয়ের বীণা......অন্ধ কুণাল ক্ষমা ক[illegible] বিমাতার বিকৃত চিত্তের গুরুতর অপরাধ[illegible] (অবদান কল্পলতা, কুণাল অবদান)

চণ্ডালকন্যা প্রকৃতি কলসী কাঁখে জল নি[illegible] চলেছে কূপ থেকে। সামনে এসে দাঁড়ালে[illegible] শান্ত, সৌম্য, গৌরবর্ণ, কাষায়ধারী এক নব[illegible] সন্যাসী, সন্যাসী ভিক্ষু আনন্দ,—বুদ্ধে[illegible] সেবক। শ্রাবস্তীর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক[illegible] ভিক্ষু আনন্দ ফিরে চলেছেন আপন আবাসে[illegible] তৃষ্ণায় কাতর হয়ে প্রকৃতির কাছে ভিক্ষা চাইলে[illegible] জল। সসংকোচে প্রকৃতি সরে দাঁড়ায় নতনে[illegible] জ্ঞাপন করে জন্ম তা'র নীচকুলে। সামে[illegible] সাধক বৌদ্ধ ভিক্ষুর সুন্দর মুখে করুণ[illegible] হাসি ফুটে ওঠে। জাত-কুলে ভিক্ষু আনন্দে[illegible] প্রয়োজন নেই; আবার তিনি চাইলেন জ[illegible] শ্রদ্ধাভরে প্রকৃতি ভিক্ষুর তৃষ্ণা দূর ক[illegible] ভিক্ষু আনন্দের সস্নেহ বাণী সংযতভ[illegible] চণ্ডাল-কন্যার মর্মস্থল স্পর্শ করে। প্রকৃ[illegible] বুকে জাগে প্রেম। আনন্দকে পাবার আশ[illegible] সরলা কিশোরী মরিয়া হয়ে ওঠে; জননীর ক[illegible] সলজ্জ নয়নে ব্যক্ত করে তা'র কোমল বু[illegible] গোপন কথাটি। জননীর যাদুমন্ত্রে আনন্দে[illegible] মনে হয় "ত্রিভুবন যৌবন চঞ্চল"; ব্রহ্মচর্যে[illegible] শিকল ছিঁড়ে ছুটে আসেন আনন্দ। সান[illegible] প্রকৃতি বরণ করে আনন্দকে,—মুখে হাসি চো[illegible] প্রেমাবেশ। কিন্তু দীর্ঘ দিনের সযত্ন পালি[illegible] ব্রহ্মচর্যের চরম বিপদের মুহূর্তে দু'হা[illegible] মুখ ঢেকে কেঁদে উঠলেন আনন্দ; স্ম[illegible] করলেন ভগবান বুদ্ধকে। অবাক বিস্ময়ে ে[illegible] রইল প্রকৃতি। শিষ্যের করুণ প্রার্থনায় ছ[illegible] আসেন গুরুদেব—বুদ্ধ, ক্ষমাসুন্দর মহামান[illegible] মন্ত্রপাশ হ'তে আনন্দ মুক্ত হ'ল। কি[illegible] প্রকৃতি? প্রকৃতি প্রেমোন্মত্তা। শ্রাবস্তীর দ্ব[illegible] দ্বারে ভিক্ষা করেন ভিক্ষু আনন্দ; দূরে থে[illegible] বাঞ্ছিতের পশ্চাতে চলে উন্মত্তা উপেক্ষি[illegible] প্রকৃতির কাছে মিলনের সন্ধান আসে। মিল[illegible]

প্রকৃতি ঊর্ধ্বে ওঠেন মানব-মানবীর
মিলনের কামনা-বাসনার, অশ্রুহাসির।
ান, শার্দূল কর্ণাবদান;
rnitz, Indian literature, Vol. II,
)

পদ অর্থ কথায় বৎসরাজ উদয়ন এবং
। রাজকুমারী বাসুলদত্তার প্রেম অক্ষয়
হয়ে আছে। (উদেনবত্থু ধর্মপদের
৩ শ্লোকের ব্যাখ্যা)। এমনিতরো আরো
প্রেমের কথা বৌদ্ধ সাহিত্যের নানাদিকে
রয়েছে।

ী-পুরুষের যে আন্তরিক আকর্ষণ
ায় প্রেমে, সে আকর্ষণের মূলে আছে
যৌনানুভূতি। প্রেম কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত।
যেখানে জন্ম দিতে হয়, প্রেম সেখানে
য়; যৌন চেতনার তীব্র অভিব্যক্তি। সে
বকৃত, কৃত্রিম। বৌদ্ধ-সাহিত্যে এই
প্রেমের কাহিনীরও অভাব নেই।

শ্বঘোষের বুদ্ধ-চরিত বুদ্ধ-কাব্য।
াষ নিজেই বুদ্ধ-চরিতকে একটি
ব্য বলেছেন। কিন্তু প্রেম-চিত্রাঙ্কন
াব্যর যেখানে একটা অত্যাবশ্যকীয় অংশ,
রিতের বিবাগী বুদ্ধের জীবন-নদনায়
য়ে তা সম্ভব? অশ্বঘোষ তাই আশ্রয়
ন কৃত্রিম প্রেমের চিত্রাঙ্কনের। বুদ্ধ-
র চতুর্থ সর্গে বর্ণিত হয়েছে,—

কোন নারী মদোন্মত্ত হইয়া কঠিন,
ংলগ্ন, মনোজ্ঞ পীন স্তনের দ্বারা
ক (সংসার-বিরাগী রাজপুত্র সিদ্ধার্থকে)
করিল ॥ ২৯ ॥

কোন নারী ছলপূর্বক স্খলিত হইয়া
কোমল স্কন্ধালম্বিত ললিত বাহু-
দ্বারা তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া বলপূর্বক
গন করিল ॥ ৩০ ॥

শব্দায়মান কনককাঞ্চীপরিহিতা কোন
সূক্ষ্ম-বস্ত্রে দেহ আবৃত করিয়া
যুগল প্রদর্শন করিতে করিতে ইতস্তত
করিতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥

কেহ কেহ বা তাহাদের সুবর্ণ কলসসদৃশ
রসমূহ প্রদর্শনপূর্বক মুকুলিতচ্যুত-শাখা
করিয়া ঝুলিতে লাগিল ॥ ৩৫ ॥"
ীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনূদিত)।

-রাজকুমার সিদ্ধার্থের সংসারে আসক্তি
জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তির
চিন্তায় তিনি মগ্ন। একমাত্র পুত্রের
ক্লিষ্ট বিষণ্ণ বদন বৃদ্ধ পিতা শুদ্ধোদনের
বাথার তীর হানে। তা-ই তিনি ব্যবস্থা
হন, ভোগ-লালসার প্রলোভনে প্রাণাধিক
। বিরাগী মনকে ফিরিয়ে আনতে সংসার-
"অলকায় আনীত নবব্রতধারী মুনির
বিঘ্নকাতর রাজকুমার সুন্দরী অপ্সরা-
দ্বারা পরিবৃত;" কিন্তু তাঁর দৃষ্টি
অনেক দূরে,—কাম-জগতের কাম-
ার অনেক ঊর্ধ্বে।

সাধারণ দৃষ্টিতে মনে হয় নিরস বৌদ্ধ সাহিত্যের মাঝে সরস প্রেম-কাহিনী ধূসর মরুভূমির বুকে ঊষর মরুদ্যান। কিন্তু নিছক প্রেম-কাহিনীর জন্য বৌদ্ধ-সাহিত্যের প্রেম-কাহিনী নয়; প্রেম-চিত্রের ভিতর দিয়ে প্রেমের আদর্শ রচনাও বৌদ্ধ-সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়। তবে নরনারীর প্রেমের ধারায় ভারতীয় আদর্শের বৈশিষ্ট্য বৌদ্ধ-সাহিত্যের কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। বৌদ্ধ-সাহিত্যের প্রেম-কাহিনীর ভিতর ব্যক্ত হয়েছে মানব-মানবীর জাগতিক কর্তব্য, মানবতার উচ্চতম আদর্শ। প্রেমের পথ সোজা নয়, প্রেমের পথে আছে চড়াই-উৎরাই; দুপাশে তার ছড়িয়ে আছে দুঃখ-শোক-ব্যথা-ভয়। তাই বৌদ্ধ-সাহিত্যের সমস্ত প্রেম-কাহিনীর ভিতরে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত যে ভাবটি লীন হয়ে আছে, তা—

"পেমতো জায়তে সোকো পেমতো জায়তে ভয়ং
পেমতো বিপ্পমুত্তস্‌সে নত্থি সোকো কুতোভয়ং ॥"

(ধর্মপদ; প্রিয়বর্গ ৫)

—প্রেম থেকে শোকের উৎপত্তি, প্রেম থেকেই ভয়ের জন্ম; প্রেম থেকে যিনি মুক্ত, তার কোন শোক নেই, ভয়ের ত কথা-ই নেই।

প্রেম অন্ধ। অন্ধ প্রেমের আবেশ মাখানো চোখে ঘনিয়ে আসে তীব্র মোহের ঘন আঁধিয়ার। করুণা-মৈত্রীর রস-সিঞ্চিত কামনাবিহীন যে প্রেম, সে প্রেম চোখ দেয় খুলে; সে প্রেমের আলোয় বিরাট বিশ্বের বাস্তব রূপ চোখে এসে ধরা দেয়। সে প্রেম-ই বৌদ্ধ-সাহিত্যের আদর্শ, বুদ্ধের আদর্শ, বৌদ্ধের আদর্শ।

অশ্বত্থের অভিশাপ

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

৬

পদ্মার চরে বিকাল বেলা নবীন ও মুক্তামালা বেড়াইতে গিয়াছে। এই চরটাই ছিল তাহাদের সান্ধ্যভ্রমণের স্থান। শহরের পথ ঘাট পরিষ্কার নয় আর যে-অঞ্চলটা পরিচ্ছন্ন সেখানে সান্ধ্য বায়ুভুক দলের এমন জনতা যে রীতিমত বায়ুর দুর্ভিক্ষ হইবার আশঙ্কা। তাই তাহারা নদী পার হইয়া চরে যাইত। এখন শীতকালে নদী পার হওয়া কঠিন নয়। হাঁটিয়াই পার হওয়া যায়, কোন কোন স্থলে জুতো ভেজে মাত্র, জুতা খুলিয়া হাতে লইলেই হইল। চরের দক্ষিণ দিকে গভীর নদী—উত্তর দিকটা শীতকালে নৌকা চলাচলের অযোগ্য হইয়া যায়।

ভরা বর্ষার ছাদে বসিয়া এই চরের মগ্ন প্রায় গাছপালার মাথাগুলি নবীন দেখিয়াছে—কিন্তু এখন চরটার অধিকাংশই জলের গ্রাস হইতে মুক্ত। চরে এখন রবি-শস্যের পালা চলিতেছে। যতদূর দেখা যায়, কচি মশুর ছোলা মটর আর শর্ষের ভুঁই। মটর ক্ষেতে ছোট ছোট নীল বেগুনী আর লালের ছোপ দেওয়া ফুল। শর্ষের ফুলও দেখা দিতেছে, কাছে হইতে তেমন চোখে পড়ে না—দূরে দাঁড়াইয়া নিরিখ করিলে একটা পীতাভ প্রলেপ ভাসিয়া ওঠে। চরের মাঝখানটাতে গৃহস্থদের বাড়ি। বর্ষার সময়ে অনেকেই শহরে চলিয়া আসে, কেবল যাহাদের বাড়ি উচ্চতম ভূমিখণ্ডে তাহারা থাকিয়া যায়, তাহাদেরও অনেকে থাকে না, নিতান্ত না ঠেকিলে বা নিতান্ত দুঃসাহসী না হইলে কেহ বর্ষাকালে সেখানে বাস করে না। এখন গৃহস্থেরা সবাই ফিরিয়া আসিয়াছে, যাহাদের বাড়িঘর পড়িয়া গিয়াছিল তাহারা আবার বাড়িঘর তুলিয়াছে। সেই গৃহস্থপল্লীর কাছে বাঁশের ঝাড় কলাগাছ বেগুনের ক্ষেত লাউ কুমড়োর মাচা আম কাঁঠালের গাছও কিছু কিছু আছে। তখন সন্ধ্যার প্রাক্কালে প্রত্যেক গৃহ হইতে ধূম্ররেখা উঠিতেছে—আর সবগুলি ধূম্ররেখা মিলিত হইয়া সেই চাষী পল্লীর শিরঃস্থিত নিস্তব্ধ বায়ুস্তরে একটি কালিন্দী প্রবাহ রচনা করিয়া তুলিয়াছে। কালিন্দী প্রবাহ না বলিয়া কালীয় হ্রদ বলাই উচিত, ধূমস্তরে গতি নাই—হ্রদের মতো অচঞ্চল এবং নিস্তব্ধ।

চরের শুষ্ক জমিতে উঠিয়া নবীন ও মুক্তামালা জুতো পায়ে দিল এবং পুনর্বার যাত্রা করিবার আগে একবার পর পারবর্তী শহরের দিকে ফিরিয়া তাকাইল। দুজনে দেখিতে পাইল নদীর অর্ধ বৃত্তাকার তীরভূমিতে বঙ্কিম অট্টালিকাশ্রেণীর সৌধশুভ্রতার উপরে দূরত্বের নীলাভ অঞ্জন অর্পিত হইয়া সমস্ত যেন কেমন থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। শহরের মাথার উপরেও ধূমস্তর জমিয়াছে। যেন রাত্রের প্রহরী ইতিমধ্যেই মাথায় কালো পাগড়িটা বাঁধিয়া পাহারা দিবার জন্য প্রস্তুত।

নবীন বলিল—বলোতো মুক্তি, আমাদের বাড়িটা কোথায়?

তখন দুইজনে অগণ্য অট্টালিকার ভিড়ের মধ্যে তাহাদের বাড়িটা খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টায় নিযুক্ত হইল।

নবীন বলিল—ওইটা।

মুক্তা বলিল—দূরে ওটা কেন হবে, আমাদের বাড়ী যে তে-তলা।

নবীন ভুল বুঝিয়া বলিল—তাও তো বটে! তবে ওইটা

মুক্তা বলিল—ওইটা? কিন্তু অত গাছ-পালা এলো কোথা থেকে?

নবীনের আবার ভুল হইয়াছে।

এবারে মুক্তামালা বলিল—ওই দেখো বাঁ দিকে ওইটা। দুপাশে একতলা দুটো বাড়ি, পিছনে মস্ত চারতলা। আর ওই দেখো আমাদের রান্নাঘর থেকে ধোঁয়া উঠছে।

নবীন অনেক ঠাহর করিয়া বুঝিল ওটাই বটে! শুধাইল বুঝলে কি করে?

মুক্তামালা সপ্রতিভভাবে বলিল—আমার রান্নাঘরের ধোঁয়া দেখলেই বুঝতে পারি।

নবীন ঠাট্টা করিয়া বলিল—রান্নাঘরে কি কি রান্না হচ্ছে তাও বোধকরি বলতে পারো?

মুক্তামালা আবার সপ্রতিভ ভাবে বলিল—তাও পারি, কারণ রান্নার জোগাড় আমিই দিয়ে এসেছি।

দুইজনে হাসিয়া উঠিল। নবীন বলি[ল]
চলো ওই গায়ের দিকে যাই। দেখা যাবে ও[...]
বাড়িতে কি রান্না হচ্ছে কেমন বলতে পারো[...]

দুইজনে আবার হাসিল। হাসি [...]
যৌবন ঘনিষ্ঠ মিত্র।

তখন দুইজনে শর্ষে ক্ষেতের আল বা[...]
ঘন ঘন দিক পরিবর্তন করিয়া চলিতে লাগ[...]
শর্ষে ফুলের ঈষৎ মদির গন্ধ, তার স[...]
শিশির ভেজা চষা মাটির গন্ধ, সন্ধ্যা বায়ুস্ত[...]
খড়পোড়া ধোঁয়ার গন্ধ—সবশুদ্ধ মি[...]
এক রূপকথার আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়া[...]
ক্ষেতের মধ্যে অদৃশ্য শালিখ পাখির [...]
অদূরস্থিত আখের ক্ষেতের মধ্যে ব্যস্ত বা[...]
পাখীর অকারণ যাতায়াতের পাখার শ[...]
বিলম্বিত গাড়ীটির করুণ আর্তস্বর, এ[...]
বহুতর শব্দজাল ভেদ করিয়া তাহারা চলি[...]
একবার আল ঘুরিতেই তাহাদের মুখ পশ্[...]
ফিরিল। সেখানে বনরেখার বাধাহ[...]
অতিদূরে পশ্চিমে নাজানি কোন চোরাপা[...]
ঠেকিয়া এই মাত্র সূর্যাস্তের ভরা তরী ব[...]
চাল হইয়া গিয়াছে। রাশিরাশি লাল ন[...]
হলদে বস্তুপুঞ্জ নীল সমুদ্রে ভাসমান [...]
সবার পিছনে দিগন্তের ঠিক কোণের কা[...]
অগ্নিশিখা পরিমণ্ডিত সূর্য গোলকের ত[...]
একটু একটু করিয়া অতলে তলাইয়া চলিয়া[...]
একি নৈরাশ্যের সমারোহ, ধ্বংসের একি অক[...]
আড়ম্বর। কয়েকটা জলচর পাখী উড়িতে[...]
—ওরা কি এই উপমা-সিন্ধুর সিন্ধু-শকু[...]
দল।

এই চিত্রার্পিত সন্ধ্যার কোনখানে জ[...]
মানবের চিহ্ন মাত্র নাই। নবীনের মনে হ[...]
তাহারা যেন মানবজগতের সীমান্তে আ[...]
পড়িয়াছে—তাহার মনে হইল নিকটের ছন্দ[...]
বহুদূরস্থিত এই ভূখণ্ড মানব ও প্রকৃ[...]
'নোম্যান্সল্যাণ্ড'—এখানে কাহারো একাধি[...]
নয়, যে যখন পারে আসিয়া অতর্কিতে উপস্[...]
হয়, কার্যসিদ্ধি করিয়া আবার তখনি স[...]
পড়ে।

আরও একটু অগ্রসর হইতেই তাহা[...]
চোখে পড়িল দূরের ভূখণ্ড উচ্চতর। [...]
ভূমিখণ্ডের উপরে তরল অন্ধকারে অস্পষ্টী[...]
দুইটি মানব দেহের সীমানার ছাপ। এ[...]
আগে, একটি পিছে, একটির অপেক্ষা এ[...]
দীর্ঘতর আরও একটু ঠাহর করিয়া দেখ[...]
অনুভূত হয় আগেরটি পুরুষ, পিছনে[...]
নারী—দুটিরই মাথায় ছোট ছোট দুটি বো[...]
তদধিক কিছু বুঝিবার উপায় নাই, তদ[...]
কিছু বুঝিবার প্রয়োজনই বা কি। মানবমূ[...]
দুটির অঙ্গ হইতে মনুষ্য সংসারের মন[...]
সংস্কারের আর সমস্ত লক্ষণ, আর সমস্ত [...]
নিঃশেষে ঝরিয়া পড়িয়া গিয়াছে। কে[...]
অবর্জনীয়তম অপরিহার্যতম গুণটুকু [...]
অবশিষ্ট আছে। তাহারা নরনারী—শস্যভ[...]

বাহী। পৃথিবীর অশ্রুলস্থলিত স্নেহকণা বাহী জীবলীলার অনিবার্যতম প্রতীকবাহী নশ্বর অথচ অবিনশ্বর ভূতলসংলগ্ন অথচ আকাশস্পর্শী, চিরচঞ্চল ও চিরস্থায়ী নরনারী। তাই বলিয়াছিলাম এতদধিক বুঝিবার আর প্রয়োজনই বা কি? কিম্বা এতদধিক আর বুঝিবার আছেই বা কি? এতদধিক যাহা বোঝা যায়—সবই ভুল বোঝা সবই অকিঞ্চিৎকর।

মূর্তি দুটি উচ্চ ভূখণ্ডে অবস্থিত, নবীন ও মুক্তামালা নীচে, তাহাদের মনে হইল মূর্তি দুটির মাথা যেন আকাশে গিয়া ঠেকিয়াছে। মূর্তি দুটি দূরে ছিল, তাই মনে হইল তাহারা যেন চলিয়াও চলিতেছে না—স্থির দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের মনে হইল সেই অশরীরীবৎ মূর্তি দুইটি যেন শরীরী জগতের একমাত্র অধিবাসী যুগল। তাহাদের মনে হইল জগতের শেষ রহস্য যেন অকস্মাৎ তাহাদের চোখে উদ্ঘাটিত হইয়া গেল—পৃথিবী ও মানুষ। পৃথিবী ও মানুষের নিজস্বতম, মৌলিকতম, চিরন্তনতম মূর্তি, শস্যদাত্রী পৃথিবী ও শস্যগ্রহিতা মানুষ।

এই মহারহস্যের সমীপে নিজেদের শিশুবৎ মনে হইল, তাহারা আর অগ্রসর হইতে সাহস করিল না, এক প্রকার ভীতি মিশ্রিত বিস্ময়ে তাহারা নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কথা বলিতে ভুলিয়া গেল, তাহাদের মন আদিম অনুভূতিতে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। যতক্ষণ না সেই মানব মূর্তি দুইটি অন্ধকারের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া যায়, তাহারা নিষ্পলক নেত্রে তাকাইয়া রহিল। অবশেষে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া নিরেট হইয়া উঠিলে পুরাতন পথে তাহারা প্রত্যাবর্তন করিল।

* * * * *

সেদিন রাত্রে নবীন ও মুক্তামালা ঘরের মধ্যে বসিয়া ছিল। নবীন বলিতেছিল—দেখো মুক্তি, আজকাল প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায় পৃথিবী কাদের? এ প্রশ্নের উত্তর রাজনীতিকরা, অর্থনীতিকরা একভাবে দিয়ে থাকেন, তাঁদের উদ্দেশ্য বুঝতে পারা যায়। তাঁরা বলেন যারা প্রত্যক্ষভাবে ধনোৎপাদন করছে, যেমন কৃষক, যেমন শ্রমিক পৃথিবী আসলে তাদেরই। আমার মনেও এই প্রশ্ন ছিল, উত্তর খুঁজেছি, পাইনি। আজ সন্ধ্যায় চরে বেড়াতে গিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে এই প্রশ্নের উত্তর পেলাম—পৃথিবী কাদের?

নবীন বলিতে লাগিল পৃথিবী তাদেরই যারা একেবারে ঘনিষ্ঠভাবে পৃথিবীর বুকের কাছে রয়েছে, তারা কৃষক হ'তে পারে, শ্রমিক হ'তে পারে, আবার তা ছাড়াও আরও কিছু হতে পারে। মানুষের সভ্যতা মানুষকে পৃথিবীর নিবিড় সান্নিধ্য থেকে ক্রমে দূরে সরিয়ে আনছে। শহরের মানুষ পৃথিবী থেকে অনেক দূরে গিয়ে পড়েছে, গ্রামের মানুষ অনেক কাছে, বনের মানুষ আরও কাছে। যারা পৃথিবীকে কর্ষণ ক'রে মাঠে মাঠে শস্যরাশি হিল্লোলিত ক'রে দিচ্ছে তারাই পৃথিবীর আপনার, সেই শস্যকে যারা কলে ভাঙছে, চাল করছে, তেল করছে, আটা ময়দা করছে, তারা পৃথিবীর তেমন আপন নয়। আবার যারা পৃথিবীর গর্ভ থেকে কয়লা তুলছে, সোনা রূপো তুলছে প্রথমত তারা পৃথিবীর বুকের কাছে থাকলেও তারা পৃথিবীর আপন নয়—কেননা, তাদের কারবার প্রাণহীন বস্তুকে নিয়ে। পৃথিবী যে উচ্ছিষ্টকে সযত্নে নিহিত ক'রে রেখেছে তা মানুষের সংসারে তুলে নিয়ে এসে তাদের কারবার। তারা পৃথিবীর পর।

নবীন বলিয়া চলিল—আজ সন্ধ্যার অন্ধকারের পটে শস্যরাশিবাহী ওই যে অস্পষ্ট দুটি মূর্তি দেখতে পেলাম ওরাই পৃথিবীর সবচেয়ে আপন। ওদের মূর্তির মধ্যে মানুষের চিরন্তন রূপ ধরা পড়েছে, যে মানুষ আদিমকাল থেকে শস্য সংগ্রহ করছে, পৃথিবীর আপন হাতের সেই প্রসাদ ঘরে ব'য়ে নিয়ে এসে সকলে মিলে জীবন ধারণ করছে। ওরাই পৃথিবীর আপন, পৃথিবী ওদেরই, কেননা পৃথিবী স্বেচ্ছায় ওদের কাছে তার শ্যামল প্রসাদ মাঠে মাঠে অবারিত ক'রে দিয়েছে।

এই বলিয়া সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—মুক্তি আমরা অনেক দূরে এসে পড়েছি।

মুক্তামালা বলিল—তবে কি সভ্যতা সেই আদিম সম্বন্ধের শত্রু?

নবীন বলিল—তা নয়, প্রকৃত সভ্যতা সেই সম্বন্ধেরই পোষক। প্রকৃত সভ্যতা পৃথিবীকে সজ্ঞানে ভালোবাসতে শেখায়, আপন ভাবতে শেখায়—সেই ভালোবাসা থেকেই মহৎশিল্পের সৃষ্টি। কবিরা, শিল্পীরা—তারাও পৃথিবীর আপনার, কেননা পৃথিবীর সৌন্দর্যকে তারা ভালোবাসতে পারে। আকাশে যে সুধাসঞ্চারী মেঘ রৌদ্রের লীলা, ধরাতলে অমৃত প্রলেপবিস্তারী যে শস্য ক্ষেত্রের হিল্লোল, শ্যামল তৃণের প্রসার, সমুদ্রে যে নীলিমার হিল্লোল, পর্বতে যে ধবলিমার উচ্ছ্বাস এ সবকে যারা আপন মনে ক'রে তারাই তো, তারাও তো পৃথিবীর আপনার।

মুক্তামালা শুধাইল—তবে কি একজন কৃষক আর একজন কবি সমান?

নবীন বলিল—সমান বই কি—তবে প্রভেদ এইটুকু যে কৃষকরা আত্মঅগোচরে পৃথিবীকে ভালবাসে, আর শিল্পীরা ভালোবাসে সজ্ঞানে। একজন পৃথিবীর শিশু পুত্র, আর একজন বয়ঃপ্রাপ্ত সাবালক ছেলে। এ দুইয়ে যেটুকু প্রভেদ তার বেশী নয়।...তরুলতা গুল্ম কেমন শিকড় দিয়ে সাগ্রহে পৃথিবীকে আঁকড়ে পড়ে রয়েছে, মানুষের পক্ষে তেমন দৈহিক সান্নিধ্য আর সম্ভব নয়—কিন্তু সে অভাব পূরণ ক'রে নিয়েছে মানুষ ভালোবাসা দিয়ে। উদ্ভিদ, কৃষক ও কবি—এরাই পৃথিবীর সবচেয়ে আপন। আর সবাই কেবল পরস্বাপহারী, কেবল পরগাছা মাত্র, তার বেশী কিছু নয়। তারা পৃথিবীর কাছে থেকে যা গ্রহণ করছে, ভালোবাসা দিয়ে তার শোধ করছে না।

নবীন আপন মনে বলিয়া যাইতেছিল। মুক্তামালা কাঁচের জানলার ভিতর দিয়া বাহিরের শীতের আকাশের দিকে তাকাইয়া রহিল। স্বচ্ছ কুয়াশায় চতুর্দিকে শুভ্র অস্পষ্টতা আর আকাশে অর্ধ সমাপ্ত তাজমহলের মতো অষ্টমীর অপরিণত চন্দ্র। সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ, যেন সে মুমূর্ষু, আর দেয়ালঘড়ির কাঁটা দুটি সেই অসাড়ের সঙ্গে পলে পলে একটা করিয়া সুতীক্ষ্ম বাণ বিদ্ধ করিয়া দিতেছে।

মুক্তামালা বলিল—দেখো অনেকদিন থেকে তোমাকে একটা কথা বলবো ভেবেছি, বলা হয়নি, সময় পাইনি, সুযোগ আসেনি, কিন্তু আজকে তুমি আপনিই সেই কথার সীমান্তে এসে পড়েছ—তাই বলছি।

তারপরে একটু ইতস্তত করিয়া বলিল—বুড়ো অশথ গাছটাকে কেটে হয়তো ভালো করনি। তুমি এই মাত্র বললে যে তরুলতা মাত্রেই পৃথিবীর আপনার, ওরা প্রায় মানুষের সগোত্র। একথা যদি সত্যি হয় তবে বুড়ো অশথ সম্বন্ধে সে কথা আরো কত বেশী সত্য! মানুষ ওকে পূজনীয় ক'রে তুলেছিল। তোমার মাথায় তখন কি পাগলামি চাপলো, তুমি তাকে কাটলে? এমন বুদ্ধি কখনো তোমার তো হয় না! আর দেখো না কেন অশথ গাছটি কাটবার পর থেকেই তুমি কি রকম ঘটনাচক্রে জড়িয়ে পড়েছো—এখনো সে পাক খুলবার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

নবীন বলিল—মুক্তি, তোমার কথা হয়তো মিথ্যা নয়। হয়তো ওই গাছটার জীবনান্তের সঙ্গে পরবর্তী ঘটনাজালের কোন নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। আমি অনেক সময়ে ভেবেছি কোন একটা সুযোগ পাবামাত্র সমস্ত ঘটনাজাল চুকিয়ে দিয়ে আবার কলকাতায় ফিরে যাবো। এমনভাবে গ্রামে ব'সে শয়তানের সাকরেদি করা আমার কর্ম নয়—ও কীর্তিদাদাই ভালো পারে।

মুক্তা বলিল—কিন্তু অমন লোকের অমন মা, অমন বউ কেমন ক'রে হয়?

নবীন বলিল—ওই তো স্বভাবের নিয়ম, ইস্পাতের তলোয়ারের আশ্রয় কোমল মখমলের খাপ।

তারপরে সে মনের মধ্যে নাড়া খাইয়া বলিয়া উঠিল—নাঃ এবারে আমি জোড়াদীঘি এই পর্বটাকে চুকিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর হ'য়েছি। অশথ গাছটার সম্বন্ধে যে

কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে তার মূলে কিছু সত্য থাকলেও থাকতে পারে—কিন্তু সে সব বিচার ক'রে লাভ নেই। আমি দেখছি ওটাকে কাটবার পর থেকে আমার বিপদের আর অন্ত নেই—একটার পরে একটা আসছেই। এই মামলার আসামীদের জামিনে খালাস ক'রে আনতে পারলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হই।

মুক্তামালা তাহার কথায় মনে মনে খুশী হইয়া উঠিল।

নবীন বলিল—তারপরে একবার গাঁয়ে ফিরে গিয়ে হাতের কাজকর্মের একটা বিলি ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে—বাস্—জননী জন্মভূমিকে গড় ক'রে, কল্‌কাতায় পলায়ন। আমাদের জননী জন্মভূমির এমন যে দূরবস্থা তার কারণ কীর্তিনারায়ণের মতো লোকেরাই তার ধারক বাহক। ও কাজ ভদ্রলোকের স্বারা হ'বার নয়।

নবীনের মতিগতির পরিবর্তনে মুক্তামালার আনন্দের অন্ত রহিল না। রাত্রি সুগভীর দেখিয়া তাহারা শুইতে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই চতুর্দিকে শিবাধ্বনি উঠিল। তাহারা যেন উচ্চস্বরে নবীনের সংকল্পকে ব্যঙ্গ করিতে থাকিল।

ক্যা হুয়া, ক্যা হুয়া, তা হয় না, তা হয় না, হুক্কা হুয়া, হুক্কা হুয়া—এখনি কি হ'য়েছে! এখনি কি হ'য়েছে! হুয়া হুয়া হুয়া! আরো হবে! আরো হবে।

কিন্তু নবীন সে ব্যঙ্গ বুঝিতে পারিল না, বলিল, গভীর রাত্রের শিয়ালের ডাক আমার বেশ লাগে।

মুক্তামালা বলিল—কিন্তু আমার বড় ভয় করে। মনে হয় ওদের ডাক যেন শ্মশান যাত্রীর হরিধ্বনি! এই বলিয়া সে নবীনের নিকটে সরিয়া আসিল।

৬

নবীননারায়ণ তারিণীবাবুকে বলিল—আমি আর মামলা চালাবো না।

শুনিয়া তারিনীবাবু বিস্ময়ে হাঁ করিয়া রহিলেন, কিছুক্ষণ বাক্যস্ফূর্তি হইল না, এমন অসম্ভব কথা জীবনে তিনি শোনেন নাই। বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কা কিঞ্চিৎ কাটিলে তিনি আপন মনে বলিতে লাগিলেন—কালে কালে কতই কি যে দেখলাম। জমিদারের ছেলে মামলা করবে না, বামুনের ছেলে সন্ধ্যাহ্নিক করবে না, চাষার ছেলে ইস্কুলে ভর্তি হবে! দেশের হ'ল কি!

এই বলিয়া তিনি কপালে হাত ঠেকাইলেন। তারপরে নবীনকে শুধাইলেন—মামলা করবে না তো করবে কি?

নবীন বলিল—মামলা ছাড়া আর কিছু কি করণীয় নেই?

তারিণীবাবু বলিলেন—আর কি আছে তা তো জানিনে। কিছুক্ষণ থামিয়া আবার বলিলেন—একবার তোমার পিতার কথা স্মরণ ক'রে দেখো, মামলা করতে করতেই তিনি সাধনোচিত ধামে গিয়েছেন।

এই পর্যন্ত বলিয়া তিনি উদাস দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন। যেন দিব্যদৃষ্টির ফলে তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলেন নবীনের পিতা পরলোকে গিয়াও স্বর্গীয় আদালতে মামলার তদ্বির করিতেছে। তারিণীবাবুর মনে বোধ করি আশা ছিল যথাসময়ে সাধনোচিত ধামে গিয়া তিনি পুরাতন মক্কেলের উকীলরূপে নন্দন কাননের বটবৃক্ষের ছায়ায় অবস্থিত আদালতে সওয়াল জবাব আরম্ভ করিয়া দিবেন।

নবীন বলিল—এই মামলাই আমার শেষ মামলা।

তারিণীবাবু বলিলেন—তাহ'লে আসামীদের জামিনের কি হবে?

নবীন বলিল—যেমন ক'রে হোক তাদের জামিনের ব্যবস্থা করুন। সরকারী উকীলকে ধরুন, অপর পক্ষের উকীলকে ধরুন, যত টাকা লাগে তাদের জামিনে খালাস করতেই হবে।

তারিণীবাবু বলিলেন—সরকারী উকীলের তেমন আপত্তি নেই। অপর পক্ষের উকীল হরিচরণের আপত্তিতেই সরকার পক্ষের জোর।

নবীন বলিল—তবে হরিচরণকে রাজি করান। তারিণীবাবু বলিলেন, বাবা নবীন তাকে তো দেখোনি—বেটা চামার।

নবীন বলিল—শুনেছি সে টাকার বশ।

তারিণী বলিল—টাকার বশ নয় কে? আচ্ছা আমি দেখি, কতদূর কি করতে পারি? আজ দুপুরে আদালতে গিয়ে তাকে ধরবো, তুমি একবার তার সংগে দেখা করলে লোকটা খুশী হ'তে পারে।

নবীন বলিল—তাই করবো। আপনি তাকে দেবার জন্যে কিছু টাকা রাখুন। এই বলিয়া তাঁহার হাতে এক তাড়া নোট দিল।

হরিচরণ দাস অপর পক্ষের উকীল। সে যে বড় উকীল এমন নয়। কিন্তু আদালতের নেপথ্য বিধানের উপরে তাহার অসীম প্রভাব। আদালতের অন্তরালে যেখানে গোপন টাকার চলাচল, সাক্ষী ভাঙানো, দলিল জাল, উপঢৌকন প্রেরণ প্রভৃতি হইয়া থাকে সেই রসময় রসাতলের প্রধান ব্যবস্থাপক হরিচরণ দাস। যে কাজ অন্য উকীলেরা করিতে সংকোচ বোধ করে—হরিচরণ সেখানে নাচিয়া খাড়া হয়। লোকটা আবার স্থানীয় লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান। আদালতের নিকটবর্তী লোকাল বোর্ডের আফিসে তাহার আফিস। এখানে বসিয়া সুকৌশলে টাকা হস্তান্তর করিয়া সে সত্যের মুখে তুড়ি মারিয়া হাসিতে থাকে।

পুরাণে বলে যে, দেবতাগণ বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর সৌন্দর্য তিল তিল চয়ন করিয়া তিলোত্তমার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। হরিচরণ দাসের বিধাতা বিশ্বের যাবতীয় জন্তু-জানোয়ারের রূপ ও গুণ সংগ্রহ করিয়া তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছে। তাহাকে না দেখিলে বিশ্বাস হয় না, দেখিলেও বিশ্বাস করা কঠিন।

মহিষের বর্ণ, হস্তীর আয়তন, কোকিলের চক্ষু, সিন্ধু ঘোটকের গোঁফ, সর্পের কুটিলতা, ব্যাঘ্রের হিংস্রতা, কুকুরের স্বজন-বিদ্বেষ, শিয়ালের ধূর্ততা, বিড়ালের তস্করবৃত্তি, পেচকের মুখশ্রী, বায়সের সতর্কতা, হংসের লোলুপতা, বৃশ্চিকের হুল-বিদ্ধন ক্ষমতা, সিংহের ক্রোধ, ভল্লুকের জড়তা যদি একত্র করা যায় এবং তাহার সহিত মানুষের অপরিমিত লোভ জুড়িয়া দেওয়া যায়—তবে হরিচরণ দাসের কাছাকাছি পৌঁছিতে পারে। কিন্তু একেবারে দোসর হয় না, যেহেতু মিথ্যাবাদিতা স্তাবকতা প্রভৃতি গুণ পশুতে কোথায়?

এহেন হরিচরণ দাস লোকাল বোর্ডের অফিসে বসিয়া একজন মক্কেলের নিকট হইতে ফিঃ আদায় করিতেছিল। ফিঃ না বলিয়া তাহার সর্বস্ব অপহরণ করিতেছিল বলাই উচিত, কিন্তু আদালতের এলাকার মধ্যে এমন বে-আইনী কাণ্ড হইতেছে বলিলে কেহ বিশ্বাস করিবে না, মনে করিবে লোকটা স্বভাব নিন্দুক, তাই ফিঃ বলিয়াই পরিচয় দেওয়া উচিত।

বৃটিশ রাজের আদালত এক বিচিত্র বস্তু। বৃটিশের আদালত একাধারে বিদ্যালয় ও ব্যবসায়, শ্মশান ও সূতিকা গৃহ, পীঠস্থান ও সমাধি ক্ষেত্র, তাড়িখানা ও বারাঙ্গনা গৃহ, মরুভূমি ও মেরুভূমি, দানসত্র ও পান্থনিবাস, মক্কা এবং কাশী। শ্মশানে নাকি সকলেই সমান। এখানে সকলেই অসমান। তুমি দুই টাকা দিলে এক রকম বিচার পাইবে, চার টাকা দিলে তার কিছু বেশি, ষোল টাকা দিলে আরও একটু বেশি। কিছু দিতে না পারিলে কিছুই পাইবে না। তাই বলিতেছিলাম বিচিত্র এই বস্তু। বৃটিশ এদেশ ত্যাগ করিলেও তাহার এই 'অবদান' থাকিয়া যাইবে বলিয়াই কেমন যেন সন্দেহ হইতেছে। এহেন আদালতের ছত্র-ছায়ায় বসিয়া হরিচরণ নিঃসংকোচে ফিঃ আদায় করিতেছে।

লোকটা হরিচরণের টেবিলের উপরে দুইটা টাকা রাখিয়া করজোড়ে বলিতেছে বাবু আর কিছুই নাই।

হরিচরণ ওরকম কথা অনেক শুনিয়াছে; সে বলিল, রামপিয়ারী, তোরা দুইজনে ওকে ধর।

তখন রামপিয়ারী ও অপর একজন চাপরাশি আসিয়া লোকটার দুই হাত ধরিল। স্বয়ং হরিচরণ উঠিয়া তাহার পিরানের পকেটে

হাত ঢুকাইয়া সাড়ে তেরো আনা পয়সা বাহির করিয়া টেবিলের উপরে রাখিল।

লোকটা আবার বলিল—বাবু, খোদার কসম, আর কিছুই নাই।

হরিচরণ হাঁকিল, রামপিয়ারী, ধুতি।

রামপিয়ারী পাশের ঘর হইতে একখানা ময়লা খাটো ধুতি আনিয়া দিল।

হরিচরণ আবার বলিল—পরাও

রামপিয়ারী লোকটাকে বলিল—এইখানা পিন্ধিয়া তোমার ধুতি ছোড়কে দাও।

লোকটা প্রথমে কিছুক্ষণ ইতস্তত করিল, কিন্তু শত্রুপক্ষের চতুরঙ্গ বাহিনীর সংখ্যা দেখিয়া অগত্যা ধুতি পরিবর্তন করিল।

তখন রামপিয়ারী লোকটার পরিত্যক্ত ধুতির তিন প্রান্ত হইতে এককুনে দুই টাকা দশ আনা খুলিয়া লইয়া টেবিলের উপরে রাখিল।

হরিচরণ গুনিল দুই টাকা, আর দুই টাকা দশ আনা হলো দিয়ে চার টাকা দশ আনা, আর সাড়ে তেরো আনা হ'লো গিয়ে পাঁচ টাকা সাড়ে সাত আনা। মোট পাওনা ষোল টাকার! তা'হলে বাকি থাক্‌লো এখনো দশ টাকা সাড়ে আট আনা।

এইবারে সে অন্তরালের দিকে লক্ষ্য করিয়া ডাকিল—কই যতীনবাবু! এদিকে আসুন!

যতীনবাবু নিকটে আসিলে বলিল—লোকটার কাছে পঁচিশ টাকার খত লিখে নিয়ে সাড়ে দশ টাকা দিন! দেখবেন টাকা ওর হাতে দেবেন না।

রামপিয়ারীর পাহারায় যতীনবাবু লোকটাকে লইয়া গৃহান্তরে প্রস্থান করিল।

তখন উপস্থিত সকলের দিকে সগর্বে তাকাইয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জনী আস্ফালন করিয়া হরিচরণ বলিল—কলিকালে কি সোজা আঙ্গুলে ঘি ওঠে?

বাস্তবিক তাহার তর্জনীটি বাঁকাই বটে। ছোটবেলা কুল গাছ হইতে পড়িয়া গিয়া বাঁকিয়া গিয়াছিল আর সোজা হয় নাই। পরবর্তী জীবনে বাঁকা আঙ্গুলের ইঙ্গিত নিজ জীবনে সে সার্থক করিয়া তুলিয়াছে। অনিচ্ছুক মক্কেলের নিকট হইতে টাকা আদায় করিবার টেকনিক ও ল্যোওয়াজিমা সর্বদা তাহার প্রস্তুত। কেহ কখনো এ পর্যন্ত বলিতে পারে নাই যে হরিচরণ দাস টাকা আদায়ে ঠকিয়া গেল। তাহার অগাধ অর্থ। এবং তাহার পত্নীটি উন্মাদ আর দুইটি সন্তানের মধ্যে একটি অন্ধ, একটি বোবা।

এমন সময়ে নবীননারায়ণকে সঙ্গে করিয়া তারিণীবাবু প্রবেশ করিলেন। নবীনকে দেখিবামাত্র হরিচরণ লাফাইয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল আর মুখে বিনীত হাস্য বিকাশ করিয়া, হাত কচলাইয়া, অঙ্গভঙ্গী করিয়া এমনভাব করিতে লাগিল যে অত্যন্ত প্রভুভক্ত কুকুরও তেমন করিয়া বিদেশাগত প্রভুকে অভ্যর্থনা করিতে পারে না। হরিচরণ দাস কুকুরের উত্তম দৃষ্টান্তস্থল।

সে বলিল—ছোটবাবু শহরে এসেছেন শুনেছি, আজ আমার বড়ই সৌভাগ্য যে আমার এখানে তাঁর পায়ের ধুলো পড়লো।

তারিণীবাবু বলিলেন—উনি জামিনের তদ্বিরের জন্যই আপনার কাছে এসেছেন।

হরিচরণ বলিল—এ আর শক্ত কি! আমাকে তলব করলেই যেতাম।

নবীন বলিল—সে কি হয়? আমার কাজ আমারই আসা উচিত।

হরিচরণ বলিল—আপনার কাজ আমাদেরই কাজ, কি বলেন? এই বলিয়া সে তারিণীবাবুর দিকে তাকাইল।

তারিণীবাবু বলিলেন—যা'হোক একটা ব্যবস্থা ক'রে দিন।

হরিচরণ বলিল—ছোটবাবু যা হুকুম করবেন তাই হবে।

তখন তারিণীবাবু নবীনকে বলিল—শুনলে তো বাবা, তোমার আর থাকা নিষ্প্রয়োজন, তুমি আর কষ্ট ক'রে থেকে কি করবে, বাড়ি যাও।

নবীন নিষ্কৃতি পাইয়া পলাইয়া বাঁচিল। তারিণীবাবুও বাঁচিলেন—কারণ নবীনের উপস্থিতিতে নিজের মন ও পরের টাকার থলি খুলিয়া তদ্বির করা কঠিন।

তারিণী ও হরিচরণ দুইজনে পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে হরিচরণকে নগদ হাজার টাকা এবং সরকারী উকীলকে পাঁচ শত টাকা দিলে তাহারা আর জামিনের বিরুদ্ধে আপত্তি করিবে না। তারিণীবাবু জামিনের তদ্বির বলিয়া নবীনের নিকট হইতে দুই হাজার টাকা আদায় করিল। দেড় হাজার পূর্বোক্ত দুইজনকে দিয়া পাঁচশত নিজে রাখিল। সম্পূর্ণ রাখিতে পারিল না। একশত টাকার একখানা নোট বিজয়কে ভাঙ্গাইতে দিল, সে আর তাহা ফেরৎ দিল না। ইহাতে তারিণীর নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ হইল না, শিষ্যের কৃতিত্বে গুরু হিসাবে সে এক প্রকার সুক্ষ্ম গর্ব অনুভব করিল।

যথাসময়ে জজের নিকটে জামিনের দরখাস্ত 'move' করা হইল। জজ রোখ ধরিয়া বসিলেন, নগদ দশ হাজার টাকা জামিন দিতে হইবে। নবীনের উকীল বলিল, তাহার প্রয়োজন নাই; নবীন নিজে জামিন হইতেছে, সে মস্ত জমিদার। কিন্তু জজ সাহেব কিছুতেই শুনিলেন না। এমনকি সরকারী উকীল ও হরিচরণ অবধি উভয়েই বলিল যে, নগদ জামিনে প্রয়োজন নাই। তাহারা অকৃতজ্ঞ নহে! কিন্তু জজ সাহেব অটল। জজ সাহেব ছোঁয়াটে কমুনিস্ট, জমিদারীর প্রতি তাঁহার ঘোরতর অনাস্থা, নগদ টাকা ছাড়া তিনি আর কিছু বোঝেন না। অগত্যা নগদ জামিনের হুকুমই বজায় রহিল।

হুকুম শুনিয়া নবীন মাথায় হাত দিয়া বসিল। নগদ দশ হাজার টাকা অবিলম্বে তাহার পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব নহে। কয় বৎসরের মামলা-মোকদ্দমায় তাহার সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষ প্রায়। এত নগদ টাকা সে কোথায় পাইবে। সে শুষ্ক মুখে বাড়ি ফিরিয়া আসিল। মুক্তামালাকে কিছু বলিল না। কিন্তু কথাটা মুক্তামালার অজ্ঞাত থাকিল না। শশাঙ্কের নিকটে বাদলি শুনিল, বাদলির নিকটে মুক্তামালা শুনিল।

৭

মনের দুশ্চিন্তা মনের মধ্যে চাপিয়া নবীননারায়ণ ছাদের উপরে পায়চারি করিতে লাগিল। রাত্রি প্রহরে প্রহরে বাড়িতে বাড়িতে এক সময়ে আকাশ নক্ষত্রে ভরিয়া গেল—আর একটি মাত্র নক্ষত্র বসাইবার স্থানও যেন অত বড় আকাশটাতে নাই। অন্যদিন আদালত হইতে ফিরিয়া সে মুক্তামালার কাছে বসিত, আদালতের অভিজ্ঞতা বলিত, আজ মুক্তামালার কাছেই গেল না। মুক্তামালা ডাকিল, কাছে আসিল। কোন সাড়া পাইল না। আহারের সময়ে মুক্তামালা ডাকিল, নবীন যন্ত্রের মতো আহার সমাধা করিয়া আবার ছাদের উপরে আসিয়া পায়চারি শুরু করিল। সে ভাবিতে ছিল দশ হাজার টাকা অবিলম্বে সে কোথায় পাইবে? না পাইলে লোকগুলোকে জামিনে খালাস করা যাইবে না, তবে তাহারা কি হাজতেই পচিতে থাকিবে! উকিল বলিয়াছিল, আসামীদের জামিনে খালাস করিয়া আনিতে না পারিলে 'কেস' খারাপ হইয়া যাইবে, সকলেরই দণ্ড হইতে পারে। নবীন ভাবিতে লাগিল—সে সব তো পরের কথা আপাতত দশ হাজার টাকা সে কোথায় পায়! ভাবিয়া ভাবিয়া সে কোন কুল পাইল না।

রাত্রি অনেক হইলে মুক্তামালা তাহাকে শুইতে ডাকিল। যন্ত্রচালিতবৎ নবীন আসিয়া শয়ন করিল—কিন্তু ঘুম কোথায়? সে চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে মুক্তামালার কণ্ঠস্বরে সে চোখ মেলিল।

মুক্তামালা বলিল—তোমাকে একটা জিনিস দিচ্ছি—নাও

—কি? বলিয়া নবীন চোখ মেলিল।

—'এই নাও' বলিয়া ছোট একটি বাক্স স্বামীর হতে দিল।

নবীন হাতে লইয়া দেখিল মখমলে আবরণে ঢাকা ছোট একটি বাক্স।

মুক্তামালা বলিল—ঢাকনাটা খোল।

মখমলের আবরণ সরাইতেই একটি হাতির দাঁতের কারুকার্য করা বাক্স প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

নবীন শ্রধাইল এর মধ্যে কি আছে?

মুক্তামালা বলিল—খুললেই দেখো না।

কৌতূহলী নবীন বাক্সের মুখ খুলিল, অমনি অজস্র রশ্মিবিচ্ছুরণ তাহার চোখ ঝলসিয়া দিল, দ্বিতীয় দৃষ্টিতে সে বুঝিল অনেকগুলি অলংকার!

বিস্মিত নবীন শুধাইল—এ কার?

মুক্তামালা প্রসন্নমুখে বলিল—আমার কাজেই তোমার।

নবীন মূঢ়ের মতো শুধাইল—কি হবে?

মুক্তামালা বলিল—জামিনের টাকা!

—জামিনের টাকা! তুমি শুনলে কোথেকে?

—যেখান থেকেই হোক শুনেছি।

নবীন দৃঢ়স্বরে বলিল—না তা হবে না। এই বলিয়া সে বাক্সের ডালা বন্ধ করিল।

মুক্তামালা বলিল—আচ্ছা দাও তবে রেখে দিই। আজ থেকে আমার অলংকার পরা শেষ!

চমকিয়া উঠিয়া নবীন স্ত্রীর অঙ্গের দিকে চাহিল, দেখিল কোথাও অলংকার নাই, কেবল দুই মণিবন্ধে খান দুই করিয়া চুড়ি অবশিষ্ট আছে।

নবীন শয্যাত্যাগ করিয়া খাড়া হইয়া দাঁড়াইল। বলিল, একি? কেন এমন করতে গেলে?

তারপরে সে অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিল—তুমি কি ভাবো আমার এমনি অর্থাভাব যে, তোমাকে নিরলংকার করে মামলা খরচ চালাবো? তুমি কি ভাবো আমি এতই নির্মম, এতই পাষণ্ড!

আবেগের সহিত সে বলিতে লাগিল, না, না, কিছুতেই তা হবে না! আমার মামলা মোকদ্দমা বিষয় সম্পত্তি সমস্ত রসাতলে যাক, তবু এ হ'তে পারে না!

গহনাগুলি দিবার সংকল্পে অবশ্যই মুক্তামালার কষ্ট হইয়াছিল কিন্তু এই উপলক্ষ্যে স্বামীর যে প্রণয় প্রকাশিত হইতে দেখিল তাহাতে তাহার সব ক্ষতি পূরণ হইয়া গেল! অলংকার তো স্বামীর প্রীতির চিহ্ন, আজ সেই প্রীতিকেই যখন সে এমন প্রকট দেখিল—তখন চিহ্নগুলো গেলে কি এমন ক্ষতি? আর গুলো থাকিলে কি প্রীতির পরিমাণ বাড়িবে? বরঞ্চ এগুলোর ত্যাগের সংকল্পেই তো প্রীতি সংকোশিত হইয়া পড়িল? এ যে অপ্রত্যাশিত! অপ্রত্যাশিত সুখই তো সুখ! যে-সুখ প্রত্যাশিত সে তো ধার পড়িয়া-যাওয়া খড়্গ!

নবীন কাণ্ডজ্ঞানহীন বালকের মতো, বুদ্ধিবিরহিত প্রণয়ীর মত কেবলি বলিয়া যাইতে লাগিল না না এ কিছুতেই হতে পারে না! আমার সব রসাতলে যাক, তবু এ হ'তে পারে না!

ড্রেসিং টেবিলের পাশে দাঁড়াইয়া বাম করতল টেবিলের উপরে রাখিয়া ঈষৎ ঝুঁকিয়া পড়িয়া মুক্তামালা দাঁড়াইয়াছিল। তাহার ছায়া কাকচক্ষু দর্পণে প্রতিবিম্বিত। ঘোমটা স্থানচ্যুত, ললাট নির্মল, ওষ্ঠাধর দৃঢ়বন্ধ, কুঞ্চিত চূর্ণালক নূতন আষাঢ়ের মেঘের মতো কমনীয় কর্ণদ্বয় ঢাকিয়া অংসাবিলম্বী, কপোল পাণ্ডুরাভ, চোখ দুটিতে ঘনীভূত অপরিমেয় করুণা, প্রাচীন হস্তীদন্তের বর্ণাভ নিটোল সুডোল, সৌন্দর্যের দ্রবীভূত চন্দনে চন্দ্রিকা-চিক্কণ বাম বাহুর করতল টেবিলের উপরে ন্যস্ত। সরোবরে পূর্ণ বিকশিত পদ্ম যেমন না কাঁপিয়াও কম্পিত বলিয়া মনে হয়—তেমনি তাহার ছায়াটি বেপথুমতী! দর্পণ বিম্বিতা পদ্মিনী কি আরও সুন্দরী ছিল? লোকে ছায়াকে মিথ্যা বলে কেন? কই ওই ছায়াময়ীর অলংকারের অভাব তো চোখে পড়ে না। যে প্রকৃত সুন্দরী, অলংকারে তাহার সৌন্দর্য আচ্ছন্ন হয় মাত্র। মুক্তামালার চাঁপা রঙের শাড়ীর অঞ্চল চাঁপার গন্ধে বিমূঢ় বসন্তের বাতাসের মতো ঈষৎ সঞ্চারিত হইতেছিল। আর দক্ষিণ বাহুতে ব্লাউজের হাতাটি কেমন বাহুর মাপে মাপে খাপে খাপে মিলিয়া গিয়াছে—এক তিলও অবকাশ নাই, গৌর বাহুর বেড়-দেওয়া কাঁচ কলাপাতা ব্লাউজের প্রান্ত!

নবীন তখনো বলিতেছিল, না, না, সব রসাতেল যাক!

মুক্তামালা ধীরে ধীরে বলিল—তবে তাই যাক। এই বলিয়া সে অলংকারের বাক্সটি তুলিয়া লইয়া বলিল—এই অলংকারগুলোও রসাতলে যাক।

নবীন বলিল—ও কি করো? ও কি করো? এই বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল। মুক্তামালা জানালা দিয়া বাক্সটা নদীগর্ভে ফেলিতে উদ্যত হইয়াছিল।

বাক্সটা টেবিলের উপর নামাইতেই তাহার দৃষ্টি ছায়াময়ীর দিকে পড়িল। সে চমকিয়া উঠিল! ওই কি তাহার পত্নীর ছায়া? হঠাৎ তাহার মনে হইল ওই ছায়াটিই যেন সত্য। কায়া তাহার প্রতিবিম্ব মাত্র। পদ্মিনীকে দর্পণে দেখিয়া দিল্লীর সুলতান তবে প্রতারিত হন নাই। কিন্তু লোকটা নিতান্ত ভাগ্যহীন বলিয়াই সত্যের রহস্য বুঝিতে অক্ষম হইয়াছিল। নবীন চমকিয়া উঠিল! এক শ্রেণীর সৌন্দর্য আছে যাহাতে লোকে উন্মত্ত হইয়া ওঠে, সে সৌন্দর্যের দেবতা রতি ও মদন। আর এক শ্রেণীর সৌন্দর্যে লোকের মনে পূজার ভাব জাগ্রত করে, তাহার দেবতা-লক্ষ্মী! মুক্তামালার সৌন্দর্য দ্বিতীয় শ্রেণীর, অন্তত এই মুহূর্তে তো বটে! নবীন কি করিতেছে বুঝিবার আগেই তাহার পায়ের কাছে আসিয়া নত হইয়া বসিয়া পড়িল, কিছু বলিতে পারিল না, কেবল মাথা নাড়িয়া প্রকাশ করিতে থাকিল না, না!

তখন অসীম করুণাভরে মুক্তামালা হাত ধরিয়া স্বামীকে দাঁড় করাইল, তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল—আমার গহনা নেই বলে তুমি দুঃখ করছো? দেখো আছে কি না?

এই বলিয়া বুকের ব্লাউজ অপসারিত করিয়া স্বামীর মুখ চাপিয়া ধরিয়া বুকের উপরে চুম্বনের শাতনরি হার অঙ্কিত করিয়া লইল! তারপরে স্বামীর মুখ দুই হাতে ধরিয়া মুখের কাছে আনিয়া বলিল—দেখলে তো?

নবীনের চোখে তখন জল। মুক্তামালার মুখে তখন হাসি! স্বামীস্ত্রীর মধ্যে বড় কে? স্বামী? স্ত্রীর কাছে পুরুষ চিরকালই শিশু। একটি পাঁচ বৎসরের মেয়েও তাহার পিতার চেয়ে অনেক বিষয়েই বড়। ইভ বড় বলিয়াই আদমকে লুব্ধ করিতে পারিয়াছিল। পুরুষ বুদ্ধিজীবী, নারী সংস্কারজীবিনী, সংস্কারের তুলনায় বুদ্ধি নিভান্ত নাবালক। পুরুষ নারীর খেলার পুতুল। তবে যে কখনো কখনো পুরুষকে সে বড় বলিয়া স্বীকার করে—সেটাও খেলার রমকফের মাত্র।

তখন মুক্তামালা বলিল—হ'ল তো? এবারে এগুলো নাও।

নবীন বলিল—নিতেই হবে কি?

মুক্তামালা বলিল—কেন না নেবে?

নবীন বলিল—তবে দাঁড়াও। আপত্তি ক'রো না। আজ শেষ বারের জন্যে একবার পরো—কাল সকালে নেবো! সে বলিল—না, আমি নিজ হাতে পরাই।

মুক্তা সস্নেহে হাসিয়া বলিল—তাই পরাও।

তখন বাক্স হইতে একটি একটি করিয়া অলংকার তুলিয়া টেবিলের উপর স্তূপীকৃত করিল। তারপরে মুক্তামালার বসন খুলিয়া ফেলিয়া দিল। করুণাময়ী পাষাণী আজ কিছুমাত্র আপত্তি করিল না। নবীন স্বহস্তে তাহার সীঁথি হইতে পায়ের নূপুর অবধি যেখানে যে অলংকার সাজে, পরাইয়া দিল। অলংকার পরিয়া মুক্তামালার রূপ বাড়িল না। পূর্ণচন্দ্রের আর বৃদ্ধি সম্ভব কি? অলংকারের শোভা বাড়িল। বিস্মিত শিল্পীর দৃষ্টিতে নবীন তাহাকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিল—নিজের অজ্ঞাতসারে তাহার মুখ হইতে বাহির হইল—কি সুন্দর!

মুক্তামালার ওষ্ঠাধরে হাসি ফুটিল। সে

মাটির তলায়

লেখক : এডমণ্ড ওয়্যার

ওরা তিনজন বৃষ্টির তেরছা ছাঁট থেকে গা বাঁচাবার চেষ্টা করছিলো : আলামো ক্যা, নিক ক্রিস্টোফার আর সেই বাড়ি-ালো ছেলেটি। কোদালের লম্বা হাতলে দিয়ে তারা দেখছিলো বহু পরিশ্রমে ড়া গর্তটা আবার কোন অজানা স্থান-নৃত নীল কাদায় ভরে যাচ্ছে। সব শ্রম ের বুঝি পণ্ড হয়ে যায়।

তবু তখন লাম্কার মনে উষ্ণ সাগরপারের দৃশ্য ডানা মেলে দেওয়া বন্য-হংসীর ন। নিকের বিশাল বুকের মধ্যে দূর দেশে তার স্ত্রী আর পুত্রের মধুস্মৃতি। সেই ছেলেটি ভিজতে ভিজতে ভাবছিলো মায়ের কথা।

দিনটা রবিবার। তারা তিনজন বাদে অন্য ারা যে যার ডেরায় খানা পিনায় বিভোর। ঠাণ্ডা দিন! তাদের নিঃশ্বাস পর্যন্ত র। পিঠে তো বাষ্প উড়ছে।

লাম্কা বলে : দেখো, কী রকম ভরে চ্ছে!

নিক বলে : পাইপের মধ্যেও কাদা ঢুকছে। রো ঢুকতে দিলে ইন্সপেক্টর আর আমাদের ন্ত রাখবেন না।

ট্রেঞ্চের কিনার ঘেঁষে একটা বিরাটকায় নযন্ত্র। একটা পিস্টনের গণ্ডগোলে বিকল। াদিক তেরপলে ঢাকা। দেখে মনে হচ্ছিলো, ন কোন বন্য জন্তু ওৎ পেতে আছে। তার পরীত দিকে ট্রেঞ্চের মুখ থেকে একটা সর নালা বেরিয়ে এসেছে; তারি ত্রিশ ফিট চে নতুন বসানো ড্রেন পাইপ। যন্ত্রটার ঠিক চ থেকে পাইপটা সমান্তরালভাবে প্রায় কশো গজ চলে গেছে একটা ম্যানহোল র্যন্ত। যেখানে মুখটা খোলা। সেই খোলা-খে কাদা ঢুকে যাতে আটকে না যায়, তারি ন্য সেদিন অসময়ে কাজ পড়েছিলো। তারা তনজন প্রায় ঘণ্টা এগারো ধরে চেষ্টা করছে ড়ে খুঁড়ে পাইপের খোলা মুখটা বার করে তে বন্ধ করে দেয়া যায়। কিন্তু ঝড় বৃষ্টি ার পাতলা কাদা সব চেষ্টা তাদের ব্যর্থ করে চ্ছে। নালার পাড় ধ্বসে পাইপের মুখ একদম পা পড়তে চলেছে।

লাম্কা বলে : অন্ধকার হয়ে আসছে, দিকে কাজ তো কিছুই হোল না।

ছেলেটা বললে : আর কিছু করা যাবেও া।

নিক কোদালের উপর থেকে কাদা ঝাড়ে। তারপর মেঝের দিকে তাকিয়ে বলে : আমি এক বছরের মধ্যে দেশে চলে যাবো, ছেলেমেয়ে বউকে দেখে আসবো।

লাম্কা বললে : নিক, ঘরে গিয়ে কয়েকটা লণ্ঠন নিয়ে এসো, আর স্টেণ্ডারকে ফোন করে বলে দিও, ইন্সপেক্টরকে যদি আমাদের পেছনে না লাগাতে চায়, তাহলে এক্ষুণি যেন কিছু লোক নিয়ে চলে আসে।

নিক মাটিতে কোদালটা পুঁতে খোলা মাঠের উপর দিয়ে কুঁড়ের দিকে চলে যায়।

ছেলেটার ভারি ঠাণ্ডা লাগছিলো। যেন ভয় পেয়ে সে লাম্কার মুখ খোঁজে : আরো লোক এলে কি হবে, পাইপের মুখ পরিষ্কার হবে কেমন করে?

লাম্কা বলে : হোস পাইপের জল দিয়ে হয়তো মুখটা বার করা যাবে।

: কাছাকাছি মাইল খানেকের মধ্যেও তো জল-পাইপের প্লাগ নেই?

লাম্কা কিছু বলে না। ছেলেটা জবাবের প্রতীক্ষা করেও পায় না। ভেজা শার্টটা খুলে সে মাথায় রাখে। বাতাসে তার ঝুলানো অংশগুলো লটপট করে গায়ে আছড়ায়। মাথার হলদে চুলগুলো তার ভেজা। মুখখানা পাতলা একটু রোগারোগা। গালে চিবুকে ফোঁটা ফোঁটা জল। শীতে ঠোঁট দুটি নীল হয়ে গেছে।

তার বয়স মাত্র সতেরো বৎসর।

লাম্কা গর্তটার দিকে তাকায়। অন্ধকারে তলাটা দেখা না গেলেও সে চোখ ফিরায় না। অন্ধকার গর্তটা যেনো তাকে আকৃষ্ট করে রাখে।

: পাইপের মধ্যে একটা দড়ি ঢুকিয়ে ম্যানহোল পর্যন্ত বালির বস্তা টেনে নিয়ে গেলেও চমৎকার সাফ হয়ে যায়।

: কিন্তু ভেতরে দড়ি কেমন করে ঢোকাবে?

: কী জানি! হয়তো স্টেণ্ডার পারবে। বলে লাম্কা যন্ত্রটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়। বৃষ্টি থেমে তখন তুষার পড়ছে। বললে : বড্ড শীত লাগছে তো! ছেলেটাও গা গরম করার জন্য তার কাছে যেয়ে ঘেঁষে দাঁড়ায়।

অনেকক্ষণ অপেক্ষার পরে দূরের ঘরে হলদে আলো দেখা যায়। দরজা খুলতে অনেক-গুলো ছায়া আলোর সম্মুখ দিয়ে বাইরে আসছে চোখে পড়ে।

: হেই! লাম্কা ডাকে।

: হেই! ওরাও সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসতে থাকে।

দুজনে কাদার উপরে ওদের পায়ের শব্দ, কোদালের ঠনঠনানি, আর ফোরম্যান স্টেণ্ডারের কণ্ঠ শুনতে পায়। লণ্ঠনগুলো হলদে পেণ্ডুলামের মতো দুলে দুলে কাছে আসে। লম্বা লম্বা পায়ের ছায়াগুলো ওরা একেবারে কাছে এলে মিশিয়ে যায়।

কিনারায় দাঁড়িয়ে সকলে একবার নিচুটা পর্যবেক্ষণ করে। স্টেণ্ডারের মুখে তখন লণ্ঠনের আলো পড়েছে। ঠোঁট কুঞ্চিত, যেনো ঈশ্বরকে গালাগালের জন্য সর্বদা তৈরি। দীর্ঘাকৃতি, অনেক বিপদ, অনেক অসুবিধা জয় করা দেহমন।

তার গম্ভীর আদেশে লোকগুলো নীচে নেমে খুঁড়তে শুরু করে। খুঁড়ে খুঁড়ে জীবন বাঁচানোর জন্য লড়াইর ও পাঁকে ডোবা পশুর মতো তারা হাঁপায়।

ছেলেটা তাকিয়ে তাকিয়ে তাদের দেখে। কাদামাখা দৈত্যের মতো তাদের চেহারা। লণ্ঠনের আলোতে তাদের কালো বর্বর চক্ষুগুলো চক চক করে।

স্টেণ্ডার বৃষ্টির মধ্যে চলে আসে : ওরা নেমেছে, আঞ্জেলোর কোদাল এইমাত্র পাইপের কাছে পেণছেচে।

লাম্কা অস্পষ্ট আওয়াজ করে।

স্টেণ্ডার নাক ঝেড়ে আবার যেয়ে গর্তে নামে। পাড়ের আড়ালে যাবার পর আর তাকে দেখা গেলো না। নীচে তখন খোঁড়ার শব্দ থেমেছে। উপরে দু'তিনটি লোক কোদালের উপর বসে বিশ্রাম করছিলো। নীচের আলো তাদের চ্যাপ্টা মুখের উপর এসে পড়েছে। লাম্কা এবং ছেলেটা বুঝতে পারে স্টেণ্ডার পাইপ পরীক্ষা করছে। তার গলা শোনা যাচ্ছিলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে লণ্ঠন হাতে আবার উপরে আসতে দেখা যায়। গলায় জোর দিয়ে বলে : একজনকে পাইপের মধ্যে ঢুকতে হবে। পাইপের মধ্য দিয়ে পায়ে দড়ি বেঁধে যে ম্যানহোল পর্যন্ত যেতে পারবে, সে পঞ্চাশ ডলার পাবে। পঞ্চাশ ডলার।

এক মুহূর্ত কেউ কোনো কথা বলে না। সবাই পঞ্চাশ ডলারের পাশাপাশি কাজের গুরুত্বটা পরিমাপ করে। ছেলেটার মনে হয়,

সে ছাড়া আর কেউই ও কাজে ভীত নয়। সে পঞ্চাশ ডলার নয়, ভয়ের কথাটাই ভাবে। আঠারো ইঞ্চি ব্যাসের ঐ পাইপের মধ্য দিয়ে তিনশো ফুট যাওয়া ! নোংরা, কাদা, আর স্যাঁৎসেঁতে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ? পেছনে ফেরার উপায় নেই ! কিন্তু সে যদি না এগোয় তবে সবাই ভাববে সে ভয় পেয়েছে। লাম্কার পিছন থেকে সে সামনে এসে অস্ফুট কণ্ঠে বলে ঃ আমি নামবো স্টেণ্ডার। বলেই মনে হয়, কথাগুলো ফিরিয়ে নিতে পারলে ভালো হোতো, কেননা চারিদিকে তাকিয়ে দেখে আর কেউই সেই আঠারো ইঞ্চি পাইপের মধ্যে নামতে প্রস্তুত নয়। সে ছাড়া আর কেউ এগিয়ে আসেনি।

স্টেণ্ডার কাছে এসে লণ্ঠনটা উঁচু করে তার মাথার কাছে ধরে। একটুকাল দেখে বললে ঃ কাপড়-চোপড়গুলো খুলে নাও।

ঃ কাপড়-চোপড় খুলবো ?

ঃ তাই-তো বললাম।

ঃ তোমার পায়ে একটা বকলস বাঁধা থাকবে বুঝলে ? বললে লাম্কা।

ছেলেটা কেবল বুঝলে অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে সে আটকা পড়েছে। বাড়িতে সে তার ভীরুতা প্রকাশ করতে দ্বিধা করে না কারণ, সেখানে সবাইতো তাকে ভালো করে জানে। সেখানে অনায়াসে বলা যেতো ঃ আমি পারবো না। আমি ভয় পাচ্ছি, গেলে আমি মরে যাবো। কিন্তু এখানে সকলেই তার দিকে তাকালো। লাম্কা এক বাণ্ডিল তার নিয়ে এসে একমাথা তার পায়ে বেঁধে দিচ্ছে। বলছে ঃ সোয়েটার আর জুতোটা পায়ে থাক। আমরা তোমার জন্য ম্যানহোলের মুখে অপেক্ষা করছি।

ছেলেটার ইচ্ছে করে দুরন্তবেগে ছুটে সে অন্ধকারের মধ্যে পালিয়ে যায়। কিন্তু ধীরে ধীরে যন্ত্রচালিতের মতো কাপড়-চোপড় খুলে ফেলে। নিক ইতিমধ্যে কুড়িয়ে যেয়ে একজোড়া জুতো এনেছে ঃ এইটা পরে নাও।

সে জুতো দুটো পরে। লাম্কা পায়ে তার বাঁধতে বাঁধতে জিজ্ঞাসা করে ঃ খুব টাইট হয়েছে নাকি ?

ঃ না, ঠিক আছে মনে হয়।

ঃ বেশ, এসো।

অন্যান্যদের মধ্যে পায়চারিরত স্টেণ্ডারকে ছাড়িয়ে তারা এগোয়। খোঁড়া গর্তটার মধ্যে নামে। পাইপের অর্ধেক ঢাকা মুখের কাছে যখন দাঁড়ায় তখন তারা উপরের মাটির প্রায় ত্রিশ ফিট নীচে চলে এসেছে।

লাম্কা তারের গিঁটগুলো পরীক্ষা করে পাইপের মধ্যে উঁকি দেয়। তার সাবধানতা দেখে মনে হয় যেনো ভিতরে ভূত আছে। ছেলেটা দুধারের ভেজা দেয়াল পর্যবেক্ষণ করে। উপরে পাড়ের কিনারে একসারি হলদে মুখ তার দিকে তাকিয়ে আছে।

ঃ যাও, ঢোকো। লাম্কা বললো।

ছেলেটার মুখ বিবর্ণ হয়ে ওঠে।

লাম্কা বললে ঃ ম্যানহোলের কথাটা কেবল ভাববে, সেখান দিয়ে বেরোবে।

ছেলেটার গলা আটকে যায়। মনে হয় কোনো চাপে সে এবার ভেঙে পড়বে। পেটের উপর ভর করে সে শুয়ে পড়ে। তুষারের কুচি আর কাদা যেন চামড়া ভেদ করে সারা গায়ে ঠাণ্ডা ছড়ায়। আস্তে আস্তে মাথাটা একবার ভিতরে নিয়েই তৎক্ষণাৎ ভয় পেয়ে বাইরে আনে। মুখ থেকে অস্পষ্ট কতগুলো কথা বেরিয়ে যায়।

ঃ আ, বাহাদুর ছেলে। তুমি নিশ্চয় পারবে, এগোও।

বাঁ পাঁজরে শুয়ে সে বামবাহু ভিতরে বাড়িয়ে একটা জয়েণ্টে হাত লাগিয়ে নিজেকে মধ্যে টেনে নেয়। চারিদিকে কাদা ঘিরে আসে। মুখ নাক বাঁচাবার জন্য সে মুখের ডানদিকটা প্রায় পাইপের ছাদের সঙ্গে ঠেকায়। লাম্কার কণ্ঠ ক্রমান্বয়ে দূরে সরে যায়। লাম্কা তখন অন্য এক জগতের লোক—রাত্রি ঝড় লণ্ঠন ভরা এক স্বাভাবিক জগতের মানুষ।

ঃ সব ঠিক হচ্ছে তো, খোকা ?

ছেলেটা চিৎকার করে ওঠে। চতুর্দিক যেনো পক্ষাঘাতের মতো তাকে ছেয়ে ফেলতে চায়।

খনির লোকদের কাছে মাটির নীচে যে অন্ধকার পরিচিত, তার তুলনা নেই। এ অন্ধকারের কিছুটা যেনো রাত্রি, সমাধি স্তম্ভ বা বাদুড় থাকার যায়গা থেকে আনা। এই তরল অন্ধকার, আলোকেও ভীত করে তোলে। দম বন্ধ করে মানুষকে পাগল করে দিতে পারে। বন্দীশালায় চতুর্দিকে আঘাত করে বাঁচার জন্য লড়াই করার এক ভয়ংকর ইচ্ছা জাগে। ছেলেটারও ইচ্ছে করে, তার সবটুকু সাধ্য দিয়ে সে দেয়ালের চারিদিকে আঘাত করে; যেনো শুধু এই অন্ধকার নয়, আরো কিছু তার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেছে এই উন্মাদ বিশ্বাসে থাবায় থাবায় সে কঠিনভাবে চোখ দুটিকে রগড়ে নেয়।

কিছুটা এগোবার পরই আবার সারা মন আতঙ্কে ভরে ওঠে। সামনে নিরেট কাদার ঢেউ। বাঁ হাত বাড়িয়ে সে অনুভব করে সেই মাটির স্রোত আর পাইপের ছাদের মধ্যে মাত্র ইঞ্চি দুই ব্যবধান। ফিরে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। সামনে এগোলে নির্ঘাৎ দম বন্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটবে। কিন্তু পেছু হটতে গিয়ে বাধা পায়, পাইপের একটা জয়েণ্টের সঙ্গে পায়ের গোড়ালি আটকে গেছে। এবারে নিশ্চিত সমাধি। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে শুধুমাত্র একটা মৃতদেহে পরিণত হবে। ওরা মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে তার কাছে আসার অনেক আগেই এই ঠাণ্ডা আর স্যাঁৎসেঁতে পরিবেশ তাকে হ[...] করবে। নিক এবং লাম্কা তাকে মাটির [...] থেকে টেনে নেবে। লাম্কা বলবে ঃ [...] বেচারা খতম হয়ে গেছে !

হঠাৎ সে উন্মাদের মতো শক্তিপ্রয়োগ [...] চারদিকে ঘুষি ছোঁড়ে। পরক্ষণেই টের [...] কর্কশ দেয়ালে লেগে হাতের উপরের চা[...] কেটে গেছে। দেবতারা নিশ্চয় তখন হা[...] কারণ পাইপের উপরে ত্রিশ ফিট মাটির [...] যা বহু চেষ্টা করেও সরানো যায়নি, আর [...] তো আট হাজার মাইল কঠিন মাটি। ধীরে ধী[...] এক একবার আকুলতা হাহাকার আর হ[...] ছেলেটার মনে ছেয়ে আসে। মাটির দিক থে[...] কোনো সাড়া নেই। তার রক্ত ঝরেনা, [...] যন্ত্রণার বেদনা নেই, নেই কোনো কাতরো[...] তার এই নির্বিকার গাম্ভীর্যের গুরুভার [...] মনে নির্মমভাবে চেপে বসে।

চারদিক থেকে যখন তার দেহমনচেতনা এই আক্রমণ—দেয়ালে দেয়ালে আঘাতে আঘা[...] তার সারা দেহ রক্তপ্লাবিত, হঠাৎ তখন মানু[...] জগত থেকে একটি সহানুভূতির স্বর ভে[...] আসে। লাম্কা ডাকে ঃ সব ঠিক হচ্ছে [...] খোকা ?

সেই মুহূর্তে লাম্কাকে তার [...] সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম বলে বোধহয়। তার [...] যেনো সেই ভারকে সরিয়ে নেয়, দূরে [...] অন্ধকার, তার মনে নোতুন উদ্দীপ[...] বাঁচার আশা জাগিয়ে তোলে। ভগ্নকণ্ঠে চেঁচিয়ে বলে ঃ সুন্দর এগোচ্ছি।

অদ্ভুত মনে হয় নিজের স্বর। [...] চেঁচায়। তবু এই পরিবেশে সবই [...] বলে মনে হয়।

বাঁ হাতে হাতড়ে সে অনুভব করে [...] কাদার ঢেউটা নিজের ভারেই নিচু হয়ে [...] পড়েছে। সে শরীরটা টেনে পরে পাইপের গা[...] আটকে আবার নিজেকে সোজা করে—এম[...] করে ইঞ্চি ছয়েক এগোয়। তারপর উপ[...] জয়েণ্ট থেকে ঝোলা একটা কড়ার মতো [...] একটা আঙুলে অনুভব করে, সেটা [...] সাতারুর ভঙ্গিতে আরো অনেকটা এগি[...] যায়। ধীরে ধীরে তার ভয় কেটে যায়। [...] অন্ধকার নয়, চোখে এসে বাসা বাঁধে সার্থক[...] স্বপ্ন। প্রত্যেকটা জয়েণ্ট অতিক্রম করে সে [...] লক্ষ্যের কুড়ি ইঞ্চি করে কাছে এসে প[...] একটা জয়েণ্ট পার হয়ে আরেকটাতে পৌঁছে[...] উদ্দীপনা পায়। এ পৌঁছুনো যেনো [...] যাত্রাপথে ক্ষণিকের বিরাম।

এক ঘণ্টা কেটে যায়। এক তৃতীয়াংশ [...] অর্ধেক, কতোটা যে এসেছে তা সে নিজে[...] ধারণা করতে পারে না। যে জল ঠাণ্ডা, অন্ধক[...] ভয় এবং বর্তমান সব কিছুই যেনো বিস্ম[...] হয়ে [illegible] কেবল [illegible] এই বন্দিশাল[...]

মানুষের জগতের কথা। নরকের এই থেকে বাইরের জগতে মেলার কথা। যে জয়েণ্টগুলো গুণতে শুরু করেছে তা নিজেরো খেয়াল নেই একান্ন, বায়ান্ন, ...কাদার সঙ্গে তীব্র লড়াই করে কটি জয়েণ্ট পার হবার পরে পায়ে বাঁধা কে আরো ভারি বলে অনুভব হয়।

অকস্মাৎ সামনে তাকিয়ে নিকষ অন্ধকার র চোখ যেনো বেদনায় আঘাত পায়। ক্ষীণ র রেখা। চোখ বন্ধ, আবার সেদিকে তাকায়। স্বপ্নময় ! আঃ বুক ড় করা স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে যায়। এ র স্টেণ্ডারের লণ্ঠনের আলো। মনে মনে স্টেণ্ডার এবং অন্যান্যদের রূপে কল্পনা ঃ ম্যানহোলের মুখে দাঁড়িয়ে সবাই তার ক্ষা করছে। আঃ কখন যে পৌঁছুবে র কাছে !

ঃ ছিয়াত্তর, সাতাত্তর, আটাত্তর...

আলোর রেখাটি ক্রমশ বড়ো হয়ে ওঠে। রেখাটা ধীরে ধীরে বাদামের মতো, পরে ডিমের মতো এবং সবশেষে গোল হয়ে হয়ে আসে। কাদার চাপও কমে যায়। হোলের মাথাটাও যেনো দেখা যায়। তার চতুর্দিকে পাইপের দেয়ালে একটা ঠ বেজে ওঠে ঃ কেমন হচ্ছে।

ঃ বেশ এগোচ্ছি। নিজের কণ্ঠস্বরও যেন অসংখ্য হুল নিয়ে তার কানের পর্দাকে বিদ্ধ করে।

ঠাণ্ডায় সমস্ত শরীর জমে গেছে বলে ন হয়। মুখের সঙ্গে খসখসে দেয়ালের ঘষা য় আর বেদনা বোধ হয় না। সমস্ত র বেদনা দূর হয়ে কাদার মধ্যে এই সংগ্রাম লো এখন সহজ এবং স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। ক আর শুষ্ক থাকার স্বাদও সে আর স্মরণ রতে পারে না। সে যেনো অন্ধকারের আদিম অধিবাসী; আলোর দেশে আগন্তুক। সম্মুখের আলাকার হলদে আলোকবর্তিকাটিই তার ছে জীবনের অস্তিত্ব বহন করে আনছিলো। চোখ বুজে সে আরো পাঁচটা জয়েণ্ট পার হয়ে উল্লসিত হয়ে ওঠে। তারপর হঠাৎ অনুভব করে স ম্যানহোলের কাছে পৌঁছে গেছে। উপরে লোকজনের চলাফেরার আওয়াজ। ম্যানহোলের মুখে স্টেণ্ডারের ঝুঁকে পড়া মাথাটাও পরিষ্কার চোখে পড়ে। অন্যান্যেরা পরস্পর ঠেলাঠেলি করে তাকে হাতড়ে হাতড়ে বেরিয়ে আসতে দেখছে। উত্তেজিতভাবে তারা কথা বলতে শুরু করেছে। এমন কী তাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দও সে শুনতে পায়। সর্বকিছু। স্টেণ্ডার আর লাস্কা এগিয়ে এসে তাকে ধরে। তারপর তাকে সকলের মধ্যে টেনে নিয়ে যায়; অনুসন্ধিৎসু চোখে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ করে। ছেলেটা অনুভব করে সবাই কী অদ্ভুত অস্বাভাবিকরূপে তাকে দেখছে। আলোটা চোখে ধাঁধাঁ আনে। একটা আলো যেন শতটা হয়ে তার চারদিকে নাচানাচি শুরু করে। স্টেণ্ডারের গলা শোনা যায় ঃ কাজ খতম করেছে, কী বলো !

লাস্কা একটা বোতল তার মুখের কাছে ধরে বললে ঃ নাও, যতোটা পারো খেয়ে ফেলো দিকি !

সে আর তখন দাঁড়াতে পারছিলো না। দেহের রক্তেমাংসে আর কোনোকিছুই যেনো অনুভবের শক্তি নেই। সার্থকতার পরে যে সকলের উল্লাসধ্বনি শুনবে ভেবেছিলো আর তা শোনার সাধ্য হয় না। নির্বোধের মতো সে তার রক্ত রাঙা হাতের দিকে তাকায়—কোনো বেদনার অনুভব নেই। হাত পা আছে কি না আছে বোঝা যায় না। এই আলো আর জীবনের দেশে সে যেনো কোনো অপরিচিত আগন্তুক এসে হাজির হয়েছে।

সবাই চোখ বড়ো বড়ো করে তার দিকে চেয়ে থাকে। লাস্কা হঠাৎ দুহাতে তাকে বুকে টেনে নেয়। সে ক্ষীণস্বরে বলে ঃ কাদা লাগবে তোমার গায়ে।

ঃ দুত্তোর, কাজ শেষ না করতে পারলে মুশকিল হোতো। ভাগ্যিস পাইপটা ভাঙতে হয়নি। স্টেণ্ডার বলে ওঠে।

ঃ গোল্লায় যাক তোমার পাইপ ! লাস্কা বলে।

ছেলেটার ভেজা মাথা তার বুকে এলিয়ে পড়েছে তখন। টের পায় তার পেশীগুলি ওঠানামা করে। বুঝতে পারে ম্যানহোলের লোহার পাদানিগুলো বেয়ে লাস্কা তাকে নিয়ে উপরে উঠছে। ঠাণ্ডা রাত্রির হাওয়া যেনো গায়ে সূচ ফুটায়। লাস্কার বুকের মধ্যে মুখখানাকে সে আরো ঘনিষ্ঠ করে আনে। সেখানে অজস্র উত্তাপ আছে বলে মনে হয়। তারপর গভীর প্রশান্তিতে লড়াইজেতা আহত সৈনিকের মতো স্বস্তির সঙ্গে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে। আঃ ! খতম হয়েছে তার লড়াই।

অনুবাদ ঃ আবুল কালাম শামসুদ্দীন

রুশিয়ায় বড় বড় ক্ষেতের আইল্ ভেঙ্গে মোটরের লাঙ্গল দিয়ে বিঘার পর বিঘা জমি তার কল্পনায় চাষ করে যায়, গমের শিষ যখন দিগন্তের কোল পর্যন্ত শীতের হাওয়ায় ফুলে ফুলে ঢেউ খেয়ে যায়, পাথর বাঁধান বাঁধ, লোহার বড় বড় দরজা বসান গেট, ইলেকট্রিকের বড় বড় চাকা জলের স্রোতের উপর উন্মত্ত ফেনা তুলে মরা নদীতে নূতন জোয়ার আনে, দুদিকের শুষ্ক ভূখণ্ড বৈজ্ঞানিক প্রথায় জল সিঞ্চনে উর্বর হয়ে ওঠে, তখন সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, তার মামাবাড়ী পোড়াদহের জলহীন দিগন্ত বিস্তৃত বিবর্ণ শুষ্ক মাঠগুলোর কথা মনে করতো। দুই একটি নিঃসঙ্গ খেজুর গাছ কোমড় বেঁকিয়ে তার মানসপটে এসে দাঁড়ায়—বুকটা তার টন্ টন্ করে, ওঠে মনে পড়ে ঋজু দেহকে আরো সমতল করতে যত সব শক্ত গিটে বডিস্, ব্লাউজ পরেছিল সেই সকালে এখন সে সবগুলি যেন তার ফুস্ফুস্ চেপে ধরেছে আর ভাল লাগছে না। খুলতে হবে বার ঘণ্টা পর তবু বইখানার এমন জায়গায় এসে পড়েছে, যেখানে রুশ গভর্নমেণ্ট বড় অভিনব উপায়ে চাষীদের ফসল খিলি করছে, ধারের টাকার কিছু সুদ নিচ্ছে।

ডিটেকটিভ্ বই-এর "খুনী" আর উপন্যাসে "মেয়েটার তারপর কি হোল" ঘুম কেড়ে নেওয়ার বড় কড়া ঔষধ। পারিপার্শ্বিক জ্ঞান তখন থাকে না, ঠিক সেই রকম অবস্থায় মৌমাছি বই-এর পাতায় মুখ ডুবিয়েছিল এমন সময় রাস্তার পাশে ঠিক সিঁড়ির তলায় শুধু শুধু চীৎকার করে উঠলো পাড়ার একটি একনিষ্ঠ মিনুর উপাসক—

"কুলপি বরফ!"

ছেলেটির মাথায় হাঁড়ি ছিল না, বরফও ছিল না, ওটা শুধু মৌমাছির দৃষ্টি আকর্ষণের একটা নিকৃষ্ট প্রণালী নিছক পূর্ব পরিচয়ের অধিকারে, যখন সে মৌমাছিকে অনেক দেশী ও বিদেশী বই চেয়ে ধার করে, কলেজ লাইব্রেরী থেকে সরবরাহ করতো। তখন সে ছিল সৌখিন্ কম্যুনিস্ট।

মৌমাছি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করল না। ছেলেটি আবার ডাকল "কুলপি বরফ!"

কেউ জবাব দিল না।

"এই মৌমাছি! এই শুনেচো মিনু?"

"এই সময় এখানে দাঁড়িয়ে কোন ভদ্রমহিলাকে এভাবে ডাকা কতটা অভদ্রতা জানেন না? যান্ এখান থেকে এক্ষুনি!

"চাকরী পেয়ে যে বড্ড দেমাক হয়েছে দেখছি? কর তো কেরানীগিরি। টাইপ করা, নয়তো টেলিফোন ধরে থাকা ইন্সিওরমেন্স্ অফিসে—"

"তাতে আপনার কী?"

"আমার কিছু না—তবে যে এককালে খুব বড় বড় আদর্শ নিয়ে লম্বা লম্বা কথা বলতে সে সব কোথায় গেল তোমার মৌমাছি?"

"যেখানেই যাক্ না, আপনার কী? আপনি যান্ এখান থেকে বিরক্ত করবেন না বলছি।"

"এই শোন, একটা কথা শুধু বলতে এসেছি।"

"কি কথা?"

"দুখানা পাশ পেয়েছি, কাল চল অফিস ফেরৎ—"এই তো জীবন" দেখে আসি।"

"অত সখ নেই আমার।"

"চল চল, সাহেবী রেস্টুরেণ্টে চিংড়ীর কাট্লেট্ খাওয়াবো, চল।"

দিয়েছেন? চলে যান, কোথায়ও যাবো না আপনার সঙ্গে আর।"

"উঃ তোমার মনটা কি রকম যে বাইরের থেকে বুঝতেই পারলাম না চেহারা চোখ মুখ দেখে। সর্দার প্যাটেলের মতন কঠিন, অবোধ্য।"

"না, আপনাকে বুঝতে দেবার জন্য আমার মনটা কাচের বয়ামের মধ্যে নিয়ে বসে থাকবো লেবেনচুস্ টফির দোকানের মতন! চলে যান্ বলছি।"

শহরে একপ্রকার সুশিক্ষিত সম্প্রদায় আছে যাদের আকর্ষণ শক্তি অত্যন্ত স্থূল। সম্বল শুধু তাদের দুদশখানা নোট, হোটেলে রেস্তোরাতে খাওয়ানো, বায়োস্কোপ, থিয়েটার, ট্যাক্সী, চৌরঙ্গীর সৌখিন দোকানের এক আধখানা সঙ্-ঢঙ্-এর শাড়ী ব্লাউজ,
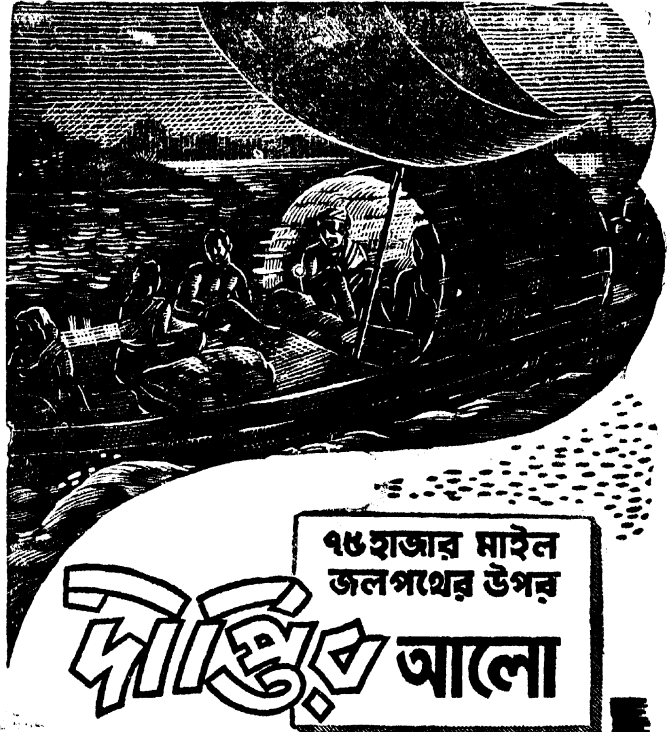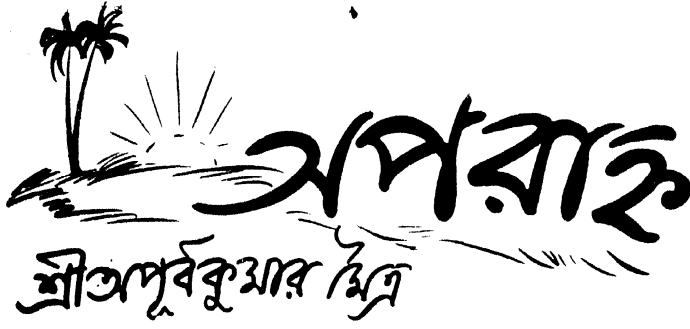
(বড় গল্প)

আমার এই গল্পের নায়িকা একটি মেয়ে। বন্ধু মহলে সে মৌমাছি নামে পরিচিত। একটু ইতিহাস আছে তার এই "মৌমাছি" নামের। মৌমাছি নামেই পুরুষের বেলায় ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়ানো কথাটা একটা গোপন তিরস্কার। কিন্তু এই মেয়েটির বেলায় মৌমাছি নাম সে অর্থে নয়। মিনতির নাম মৌমাছি তার বন্ধু মহলে, কারণ তাদের সকলের সকল সমস্যার সমাধান তাকেই করতে হোত।

ট্রাম চলেছে। কে একজন প্রশ্ন করল—"মৌমাছি! একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করবো?"

"কাজের প্রশ্ন কি? না আপনার সেইসব প্রেমের ধাঁধা?"

"ধর যদি দুই-ই হয়?"

"প্রথমটার জন্য আমাদের জীবনবীমা অফিসের অনুসন্ধান বিভাগে চিঠি দেবেন। আর দ্বিতীয়টির মরীচিকায় যদি পথ হারিয়ে থাকেন, তবে ঐদিকের ফুটপাত ধরে সোজা প্রেসিডেন্সী কলেজের রেলিং-এর ধারে চলে যান।"

"সেখানে কে আছে?"

"চার পয়সাতে ভূত ভবিষ্যত বর্তমান খড়ি-মাটির তিনটি দাগ কেটে সঠিক গণনা করে দেবে কোথায় আছে আপনার বিপুল দেহের অর্ধাঙ্গী সেই সাবিত্রী।"

"আঘাত করাটা তোমার চিরদিনের স্বভাব জানি কিন্তু গণৎকার কেন? তুমি কি বলতে পারো না জেলের পরে তোমার মামুলী খবর দু'একটা?"

"এত আগ্রহ কোন অধিকারে?"

"মনে কর দ্বিতীয় বিদ্রোহ যুগের আন্দোলনে মেদিনীপুর জেলের সমসাময়িক বন্দীর অধিকার।"

"প্রণম্যের সঙ্গে থাকলেই প্রণম্য হওয়া যায় না স্বদেশবাবু! এক জেলে থাকার অধিকার গ্রাহ্য হ'লে আপনিও হয়তো মন্ত্রী হতে পারতেন, নয়তো একজন গণপরিষদের সভ্য অন্তত। অধিকার সেই দিক দিয়ে দাবী করুন—এখন একটা কালো বাজারের দালাল হয়ে, জোয়ারের জলের মতন নতুন রক্ত হয়েছে তাই একটা অবলম্বনের আশায় যার তার পিছু পিছু ঘুরছেন।"

"ছিঃ ছিঃ মৌমাছি! তুমি এত রূঢ় হতে পারো, সামান্য একটা কথা জিজ্ঞেস করেছি বলে?"

"জবাব চান? জানতে চান আমার কি খবর? শুনুন তবে, ভূত আমার জেলখানায় ফেলে এসেছি, ভবিষ্যত খোলা মাঠ আর বর্তমান আমার এই ট্রামের ভিতর; যেখানে নিয়ত আপনার প্রকাশ্য এবং অনেকের গোপন ইতর চাউনি আমার গায়ে এসে ছিটকে পড়ছে।"

"মৌমাছি! তোমার মধুর থেকে হুলের পরিচয়টা বেশী, ঠিক নয়?"

"না স্বদেশবাবু, ভুল বুঝবেন না। হুল আমার নেই। ব্যথা যদি দিতেই হয় পায়ে রাখি একজোড়া প্লেন স্যাণ্ডল ভুলবেন না।"

"এর পরে আর তোমার পাশে বসা চলে না। তুমি এত অভদ্র, ভাবতে পারিনি।"

"হ্যাঁ যান উঠেই যান—আর শুনুন ভবিষ্যতে যদি কোন ভদ্রমহিলা ট্রামে বা বাসে অফিস ফেরত শুধু দয়া করে একটু পাশে বসতে দেয়, ডান হাতখানা পক্ষাঘাতের রোগীর মতন অসাড় করে ঝুলিয়ে রাখবেন তার পাশে। সব মেয়েই গণ্ডী নয়, হিলতোলা জুতোর আঘাত নরম শরীর অনেকটা রেখাপাত করে যাবে।"

"খবরদার! মুখ সামলে কথা বল মৌমাছি।"

"নেমে যান স্বদেশবাবু, কথা বাড়াবেন না। শ্যামবাজারের লোক টালিগঞ্জ পর্যন্ত চলে এসেছেন লজ্জা করে না?"

সন্ধ্যা পার হয়ে গিয়েছে তখন। ট্রামের ভিতর মিশ্রিত কলরব, চীৎকার, সহানুভূতির উচ্ছ্বাস—নানাভাবে চলন্ত গাড়ীখানাকে মুখরিত করে তুলেছিল। মৌমাছির চোখদুটি জলভারাক্রান্ত পূর্বেই হয়েছিল, ট্রামের ঝাকুনিতে দু'ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে গেল। ট্রামের জানালার উপর একভাবে ঘাড় কাত করে ভাবতে লাগলো জীবনে কতবার কত-জনকে এমনি করেই সে আঘাত করেছে, অপমান করেছে, প্রত্যাখ্যান করেছে। এমনি করে তেইশটা বছর নিজের অজ্ঞাতসারে চারিদিকে আত্মরক্ষার একটা বেষ্টনী গড়ে নিয়ে স্কুল করেছে, কলেজে গিয়েছে, মানুষের সঙ্গে মিশেছে, বিপ্লবী কাজে হাত দিয়েছে, জেলে দিন কাটিয়েছে, বাইরে বেড়িয়েছে, অফিসে কাজ করে গিয়েছে একটানা। আত্মীয়স্বজন যা কিছু ছিল তাদেরও এড়িয়ে চলেছে।

ট্রামখানা ফাঁকা রাস্তায় ঘাসের উপর দিয়ে আপন লাইনে হন্ হন্ করে চলে যেতে লাগলো, মুখ ফিরিয়ে গাড়ীর জনতার দিকে তাকাবার কৌতুহল তার ছিল না।

এক সময়ে গন্তব্যস্থানে ট্রাম থামতেই কোলের উপর থেকে দু'খানা বই জড়সড় করে বুকের বাঁদিকে চেপে মৌমাছি নেমে পড়লো। তারপর বড় রাস্তা পার হয়ে হন্ হন্ করে বাড়ীর দিকে দ্রুত পদে চল্ল। বারে বারেই বাতাসের সঙ্গে শাড়ীর আঁচলের ঝগড়া নিয়ত ডান হাতে মীমাংসা করতে করতে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল, এমনি সময় ছোট একটা একতলা বাড়ীর বারান্দা থেকে সমবেত আনন্দ কলরব জেগে উঠলো ...... "ঐ যে দিদি আসছে—মুকুটা কানা নাকি মা! চিনতে পারছে না. ......আমি আগেই বলেছি ও দিদি—নিশ্চয় দিদি!"

বারান্দায় উঠতে না উঠতেই স্যাণ্ডাল জোড়া দু'দিকে পা দিয়ে ঠেলে হাতের বই দু'খানা মেঝেতে ফেলে চৌকীর উপর মা যেখানে পা ছড়িয়ে বসে পুরোন কাপড়ের পাড় থেকে সুতো তুলছিলেন সেখানে একেবারে কাত হয়ে শুয়ে পড়লো। মার কোলের উপর ছোট্ট একটু ঝনাৎ করে আওয়াজ হোল—এক'শ ঊনত্রিশ টাকা বারো আনা, একটা চাবীর রিং ও একখানা ময়লা রুমাল। সেদিন ছিল মাসের পয়লা তারিখ।

এটা দরিদ্রের সংসার নয়। মৌমাছির চাকরীর টাকাটা মধ্যবিত্ত সংসারে আরো একটু স্বাচ্ছল্য বাড়িয়েছিল—এই যা।

তিন চারটি বোন ছিল ছোট, তাই বলে যদি বড় মেয়ের চাকুরীর টাকায় ছোট বোনদের বিয়ে দেওয়া যেতো তবে আমাদের দেশের আঁতুড়ে মেয়ে হোলে শাঁখের বদলে ব্যাণ্ড বাজানো হো'তে পারতো। তাকে অফিস যেতে দেওয়া হয়েছিল শুধু তার সাময়িক আইবুড়োত্ব চোখের সামনে ঢাকা দিতে; যেমন করে অনেক ছেলেরা এম এ আর আইন প'ড়ে বেকার জীবনটাকে চোখের আড়ালে রাখত।

এক ফাঁকে মার কোলের মধ্যে মুখ উঠিয়ে নিয়ে মৌমাছি উপুড় হয়ে পড়েছিল।

মা বল্লেন—"ওঠ হাতমুখ ধো।"

তারপরই চমকে গিয়ে তার কপালে, চোখে মুখে হাত বুলিয়ে বলে উঠলেন—"মিনু, একেবারে যে ঘেমে নেয়ে উঠেচিস্। আঁচল দিয়ে নিজের অজ্ঞাতে ঘামের পরিবর্তে মা তার উচ্ছ্বাসাকুল অশ্রুধারা মুছে ফেল্লেন। তবু ঘরের বিদ্যুৎ-বাতিতে রাঙ্গা চোখ দেখে পুনরায় কপালে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—

"আবার বুঝি বিকেলের দিকে জ্বর আসছে? দেখি দেখি?"

"তুমি খালি আমার জ্বরই দেখ! চল খেতে দেবে চল।"

"চ' ওঠ্!"

বেশ আস্বাদজ্ঞান মৌমাছির। প্রথমে দুধ রুটি চিনি দিয়ে তার পর ওলের ডালনা খেয়ে মুখ ধুয়ে অনেকগুলো হরিতকীর টুকরো মুখে দিয়ে ছোট খুকুকে সাথে নিয়ে ছাতের সিঁড়ির মাঝামাঝি একটা ধাপে বসলো যেখানে সামনের গ্যাস্ পোস্টের আলো একেবারে চোখের উপর পড়ে। গানের ধার সে ধারে না কোনদিনও, কখন কখন নিজের অজ্ঞাতসারে গুন্ গুন্ করে। পুরোন একটা সুর তিন বছর আগে জেলে থাকতে একজন সহবন্দিনীর কাছে নিয়ত শুনতো—তারই দুটি লাইন্—

"কত বসন্ত কত মধুরাতি......
মনের সে কথাটি বলাতো হো'ল না—"

দিদিকে অনামনস্ক দেখে ছোট খুকু সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে আসে কোলাহলের ভিতর। সেই অবসরে মৌমাছি বই খুলে বসে—"রুশিয়ার চাষ-আবাদ ও পঞ্চবৎসরের পরিকল্পনা।" খুব ভাল লাগে তার এসব পড়তে, কারণ এত সহজভাবে লেখা—বাঙ্গলা দেশের আউশ আমন ধানের মত জটিল নয়। মৌমাছি যখন তন্ময় হয়ে সুদূর

বুশিয়ায় বড় বড় ক্ষেতের আইল্ ভেঙ্গে মোটরের লাঙ্গলে দিয়ে বিঘার পর বিঘা জমি তার কল্পনায় চাষ করে যায়, গমের শিষ যখন দিগন্তের কোল পর্যন্ত শীতের হাওয়ায় ফুলে ফুলে ঢেউ খেয়ে যায়, পাথর বাঁধান বাঁধ, লোহার বড় বড় দরজা বসান গেট, ইলেকট্রিকের বড় বড় চাকা জলের স্রোতের উপর উম্মত্ত ফেনা তুলে মরা নদীতে নূতন জোয়ার আনে, দুদিকের শুষ্ক ভূখণ্ড বৈজ্ঞানিক প্রথায় জল সিঞ্চনে উর্বর হয়ে ওঠে, তখন সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, তার মামাবাড়ী পোড়াদহের জলহীন দিগন্ত বিস্তৃত বিবর্ণ শুষ্ক মাঠগুলোর কথা মনে করতো। দুই একটি নিঃসঙ্গ খেজুর গাছ কোমড় বেঁকিয়ে তার মানসপটে এসে দাঁড়ায়—বুকটা তার টন্ টন্ করে, ওঠে মনে পড়ে ঋজু দেহকে আরো সমতল করতে যত সব শক্ত গিটে বডিস্, ব্লাউজ পরেছিল সেই সকালে এখন সে সবগুলি যেন তার ফুস্ফুস্ চেপে ধরেছে আর ভাল লাগছে না। খুলতে হবে বার ঘণ্টা পর তবু বইখানার এমন জায়গায় এসে পড়েছে, যেখানে রুশ গভর্নমেণ্ট বড় অভিনব উপায়ে চাষীদের ফসল খিলি করছে, ধারের টাকার কিছু সুদ নিচ্ছে।

ডিটেকটিভ্ বই-এর "খুনী" আর উপন্যাসে "মেয়েটার তারপর কি হোল" ঘুম কেড়ে নেওয়ার বড় কড়া ঔষধ। পারিপার্শ্বিক জ্ঞান তখন থাকে না, ঠিক সেই রকম অবস্থায় মৌমাছি বই-এর পাতায় মুখ ডুবিয়েছিল এমন সময় রাস্তার পাশে ঠিক সিঁড়ির তলায় শুধু শুধু চীৎকার করে উঠলো পাড়ার একটি একনিষ্ঠ মিনুর উপাসক—

"কুলপি বরফ!"

ছেলেটির মাথায় হাঁড়িও ছিল না, বরফও ছিল না, ওটা শুধু মৌমাছির দৃষ্টি আকর্ষণের একটা নিকৃষ্ট প্রণালী নিছক পূর্ব পরিচয়ের অধিকারে, যখন সে মৌমাছিকে অনেক দেশী ও বিদেশী বই চেয়ে ধার করে, কলেজ লাইব্রেরী থেকে সরবরাহ করতো। তখন সে ছিল সৌখিন্ কম্যুনিস্ট।

মৌমাছি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করল না। ছেলেটি আবার ডাকল "কুলপি বরফ!"

কেউ জবাব দিল না।

"এই মৌমাছি! এই শুনেচো মিনু?"

"এই সময় এখানে দাঁড়িয়ে কোন ভদ্রমহিলাকে এভাবে ডাকা কতটা অভদ্রতা জানেন না? যান্ এখান থেকে এক্ষুনি!

"চাকরী পেয়ে যে বড্ড দেমাক হয়েছে দেখছি? কর তো কেরানীগিরি। টাইপ করা, নয়তো টেলিফোন ধরে থাকা ইন্সিওরমেন্স্ অফিসে—"

"তাতে আপনার কী?"

"আমার কিছু না—তবে যে এককালে খুব বড় বড় আদর্শ নিয়ে লম্বা লম্বা কথা বলতে সে সব কোথায় গেল তোমার মৌমাছি?"

"যেখানেই যাক্ না, আপনার কী? আপনি যান্ এখান থেকে বিরক্ত করবেন না বলছি।"

"এই শোন, একটা কথা শুধু বলতে এসেছি।"

"কি কথা?"

"দুখানা পাশ পেয়েছি, কাল চল অফিস ফেরৎ—"এই তো জীবন" দেখে আসি।"

"অত সখ নেই আমার।"

"চল চল, সাহেবী রেস্টুরেণ্টে চিংড়ীর কাট্লেট্ খাওয়াবো, চল।"

সাহিদকে খেতে

দিয়েছেন? চলে যান, কোথায়ও যাবো না আপনার সঙ্গে আর।"

"উঃ তোমার মনটা কি রকম যে বাইরের থেকে বুঝতেই পারলাম না চেহারা চোখ মুখ দেখে। সর্দার প্যাটেলের মতন কঠিন, অবোধ্য।"

"না, আপনাকে বুঝতে দেবার জন্য আমার মনটা কাচের বয়ামের মধ্যে নিয়ে বসে থাকবো লেবেনচুষ্ টফির দোকানের মতন! চলে যান্ বলছি।"

শহরে একপ্রকার সুশিক্ষিত সম্প্রদায় আছে যাদের আকর্ষণ শক্তি অত্যন্ত স্থূল। সম্বল শুধু তাদের দুদশখানা নোট, হোটেলে রেস্তোরাতে খাওয়ানো, বায়োস্কোপ, থিয়েটার, ট্যাক্সী, চৌরঙ্গীর সৌখিন দোকানের এক আধখানা সঙ্-ঢঙ্-এর শাড়ী ব্লাউজ,

একজোড়া দুল নয়তো একটা ব্রোচ্ খরিদ করে স্বার্থসিদ্ধির গোড়াপত্তন করা। মৌমাছির এই উপাসকটি কিছুদিন হো'ল তার সকল শক্তি এইভাবে প্রয়োগ করতে না পেরে বড়ই মর্মাহত হয়ে পড়েছিল;—নূতন কিছুই সম্বল আর ছিল না।

সেদিন সে হতাশ হয়ে ফিরে যাবার আগে, একখানা নিমন্ত্রণ-চিঠি সিঁড়ির উপর ছুঁড়ে ফেলে হন্ হন্ করে চলে গেল। মনের অবস্থা তখন ঠিক উপাসকের মতন ছিল না। মৌমাছির অনেক খুঁত চোখে পড়েছিল সেই রাতে—কপাল ছোট, গালে মাংস কম, গড়ন বড্ড পেটা, দেহভঙ্গী সমতল, চুল অনেক বটে কিন্তু একটুও গোছালো নয়—বরং দুরন্ত, ব্লাউজের সামনেটা ছোট, হাতাটা পিস্তলের মতন নয়, ঘটির মতন মোটা-সোটা, চুড়ি চারগাছির পালিস উঠে গিয়েছে, কারো দিকে তাকাতে গেলে, ইচ্ছা করে ভ্রূ দুটিকে এমন করে টেনে তোলে যেন কত যুগ পরে ঘুম থেকে জেগে উঠেছে—বড্ড অহংকারী, ঐ তো রূপ!

ছেলেটি সিঁড়ির তলা থেকে সরে গেল কেমন একটা নিঃশ্বাস ফেলে, যার মানে—আঙ্গুর ফল টক!

ছেলেটির নাম মদন, বড়জোর এক আধ বছরের বড় মিনুর থেকে।

—দুই—

হাতের বইখানার যে ক'পাতা পড়া হয়েছিল সেই ভাঁজে মদনের দেওয়া নিমন্ত্রণ চিঠিখানা রেখে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। পরদিন নিত্যকার অভ্যাস-মত মৌমাছি আবার ট্রামে উঠলো, দশটার মধ্যে অফিস পেঁছোতে হবে। প্রথম প্রথম তার ভিজে খোঁপা ও এক তরকারী ডাল ভাত, নয়টা না বাজতেই চৌবাচ্চার জল কেমন অসহ্য বোধ হোত। এখন সেসব একরকম সহ্য হয়ে গিয়েছে, শুধু অস্বস্তি বোধ হয় ট্রামে সোজা হয়ে বসতে। হেলান দেবার উপায় নাই বেঞ্চেতে তাহোলে, আরোহীদের আঙ্গুল কাঁটার মত বিঁধে। তাঁদের দেখতে ভিজে বিড়ালের মতন মনে হতে পারে, হাত দুখানা হয়তো এমনি-ই আছে ওখানে গাড়ির ঝাঁকুনি সামলাতে। ঐ মনে করে হেলান দিলেই হয়েছে। একটু পরে বোঝা যায় আঙ্গুলগুলোর বয়েস ও জাতিনির্বিশেষে ভাবা আছে কথা কইতে চায়। মৌমাছিকে মুখরা হয়ে বলতে হয়,—"হাতটা নাবিয়ে রাখুন।" যতটা মিষ্ট করে কিম্বা গ্রীবা বেঁকিয়ে অনুরোধ জানায়, কিন্তু কেউ তার নারীসুলভ মধুরতা কথায় বা ব্যবহারে পায় না।

ট্রামখানা বেশ চলেছে অফিস অভিমুখে, আবার কে একটি ছেলে চলতি ট্রামে বেপরোয়া লাফ দিয়ে উঠে পড়লো। বগলে তার বি এ ক্লাসের সব পাঠ্যপুস্তকগুলিই রয়েছে মনে হয়। এখনও সেই পশ্চিমাধরণের বাঁদিকে পাঞ্জাবীর গলাকাটা, সোনার বোতাম বৃথাই কালো সুতোয় বাঁধা, বুকটা খালি। দিশি হোসিয়ারীর গেঞ্জীর উপরের কিয়দংশ দেখা যায়-যায়-যায়-না এমনিভাব। ট্রামে উঠেই ছট্‌ফট্ করতে থাকে, গাড়ি থামার ঝোঁক সামলাতে চায় না, বইগুলো স্থানচ্যুত হয়ে যেতে চায় তারই মধ্যে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে সিগারেট একটা ধরিয়ে, একটা হাতকে ভিড়ের মধ্যে আরো অকর্মণ্য করে ফেলে। সহানুভূতির আশায় মৌমাছির পাশে এসে সামনে ঝুঁকে বইগুলো বুকের মধ্যে যেন অপত্যস্নেহে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করে খুব আস্তে আস্তে—

"আমি একটু বসতে পারি এই জায়গাটায়?"

এদের পূর্বাহ্নের নম্র, অমায়িক ব্যবহার মৌমাছির জানতে বাকি নাই। জবাব দেয় অস্বাভাবিক ভাবে

"না পারেন না!"

"তবে দয়া করে এই বইগুলোকে একটু আশ্রয় দিন—দেবেন না?" উত্তরের অপেক্ষা না করেই মৌমাছির পাশে বইগুলো সব ছড়িয়ে দিয়ে ধন্যবাদ জানায়। এইসব লোককে স্বয়ং সাবিত্রীও এড়াতে পারতেন না। অগত্যা মৌমাছি তার নিজের বই-খানার পাতায় মন দেয় পারিপার্শ্বিক অবস্থার থেকে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকতে। ভিড় ঠেলে ট্রামের কণ্ডাক্টার তার টিকিট বেচে চলেছে, একঘেঁয়ে পাঁচ মিশালি শব্দের মধ্যে বাকি পথটুকু এখন নিশ্চিন্তে চলেছে। এমনি সময় কানে এল—"দু'খানা আমাদের।"

মৌমাছি অভ্যাসমত রুমালের খুঁট থেকে আনি বার করলে হাত বাড়িয়ে কণ্ডাক্টারকে দিতে।

"থাক! করেছি আমি।"

"কেন, আপনি কেন দেবেন?"

"থাক না তাতে কি হয়েছে, একটা টিকিটে তো কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছি না, বড়জোর অফিস পর্যন্ত! একি। রাগ করলেন? না না বসুন বসুন।"

মৌমাছি টপ্ করে উঠে দাঁড়ালো রাগে লজ্জায়, অপমানে নিচের ঠোঁট তার কাঁপতে লাগলো, কান দুটি ঈষৎ লাল হয়ে উঠলো, সেই কলেজের ছেলের বই অনেকগুলো শাড়ীর টানে পড়ে গেল বেঞ্চির থেকে। সব উপেক্ষা করে মৌমাছি ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে নিজেই দড়ি ধরে টান দিল গড়ের-মাঠের মাঝখানে, অফিসে পেঁছানর অনেক আগেই। মাঠের ধারে নেমে পড়লো, অচেনা অজানা কার উপর রাগ করে। হাঁটতে শুরু করলো। বর্ষার আকাশ তখন জল ভারাক্রান্ত, ঠাণ্ডা বৃষ্টির ফোঁটায় আর বাতাসে মৌমাছির রাগ একটু পরেই নেমে এল।

অফিসে যখন পেঁছিল, লিফ্‌টের আয়নায় মৌমাছি দেখলে চুলের উপর জলের ছিটে যেন খই ছিটিয়ে আছে, কাপড় ব্লাউজ এত ভিজেছে যে গায়ের সঙ্গে লেপটে গেছে। পাতলা স্যাণ্ডেল জলে ও কাদায় ভিজে পায়ের তলায় একটা খয়েরি রঙ ধরে গিয়েছে। অফিস ঘরে ঢুকে মার্বেল পাথরের মেজের উপর হাঁটতে কেমন অসুবিধা বোধ হোল। এগারখানা পাখার আওয়াজ ও বাতাস ওকে কেমন ব্যাকুল করে তুলেছিল।

নিজের জায়গাটিতে বসতে না বসতেই চাপরাশি এসে এমনি কায়দায় সেলাম দিল যাকে অভিনন্দন বলা চলে একেবারে ভক্তিশ্রদ্ধাবর্জিত।

"চলিয়ে, ছোটাসাহেব সেলাম দিয়া।"

"যাচ্ছি!" বলেই তাড়াতাড়ি চাবি দিয়ে টেবিলের দেরাজ খুলে খাতা পেনসিল নিয়ে ছুটলো ছোট সাহেবের ঘরের দিকে।

ঘোষসাহেব তখন বাদলা আকাশকে কাঁচের সার্সি দিয়ে ঢেকে ইলেকট্রিকের আলোতে ঘরটাকে মনোরম করে তুলেছেন। আস্তে আস্তে পাখা ঘুরছে, কাঁচের টেবিল টপের উপরে নানা রকম পিতলের কাগজ চাপা। কলমদানি, খামকাটার ছুরি চক্‌চক্ করছে। দু'খানি চিঠির জবাব সুদীর্ঘ তিন ঘণ্টার মধ্যে দিতে পারলেই লাঞ্চটাইম পর্যন্ত অফিসে কাটিয়ে একেবারে শনিবারের ছুটি। তাই বোধ হয়, এত তাড়াতাড়ি মৌমাছির ডাক পড়েছিল।

"হ্যাল্লো! একি আপনি যে একেবারে ভিজে গিয়েছেন?" মৌমাছি খাতা খুলে পেনসিল ধরে, নির্দিষ্ট চেয়ারে বসে হাসলে শুধু।

"না না, সে হয় না—ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করতে পারে। চলুন কাপড় ছেড়ে আসবেন, আমি পেঁছে দিচ্ছি গাড়িতে চলুন?"

"না স্যার! কিছু দরকার নাই। শনিবার, তিন ঘণ্টা পরেই তো ছুটি......বলুন!" পেনসিল নিয়ে সাদা খাতার উপর গভীর মনোযোগ দিল।

"বড্ড অবাধ্য মেয়ে আপনি, যাই বলুন।"

"কেন স্যার?"

"ঐ ভিজে চুলে, ভিজে শাড়ীতেই থাকবেন—এইতো জেদ?"

"তাতে কি হয়েছে স্যার, গরীব মানুষ আমাদের সব সয়।"

"ওঃ, শালীনতা আছে খুব—আচ্ছা যান তবে ঐখানে, তোয়ালে দিয়ে অন্তত চুলগুলো মুছে আসুন, যে একরাশ চুল করেছেন মাথায়, ভিজে থাকলে সর্দি, ফ্লু, জ্বর, ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া, হাঁপ, টি বি সব হতে পারে," বলে নিজের কথায় নিজেই হেসে উঠলেন। টাইটা ও ভুঁড়িটা সেই হাসিতে দুলে উঠলো একটু, পুকুরের ধারে কলমি শাক ঢেউএ দোলার মতন।

সাহেবের অফিসের সংলগ্ন বাথরুমে ঢুকে, সাহেবের ব্যবহৃত তোয়ালে কেমন করে একজন নিম্নপদস্থা কর্মচারিনী ব্যবহার করবে এই ভেবেই মৌমাছি লাল হয়ে উঠলো। তবু বারে বারে মনিবের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা চলে না। বাথরুমে ঢুকে "ক্লিট্" করে দরজা বন্ধ করতে তার ভয় করলো। কোমর সমান উঁচু একখানা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শাড়ীর আঁচলটা দিয়ে যতটা পারা যায় তাড়াতাড়ি মুছতে সুরু করে দিল।

"একস্‌কিউস্!—ক্ষমা করবেন, ভুলে গিয়েছিলাম, এই নিন্ শুকনো তোয়ালে। ওটা একেবারে জলে চপ্‌চপে হয়ে গিয়েছে। ওটা ব্যবহার করতে পারবেন না।"

এই অবস্থায় মনিবের অনুগ্রহের আতিশয্য দেখে মৌমাছির মন বিষাক্ত হ'য়ে উঠলো।

ঘোষ সাহেব নিজের চেয়ারে ফিরে এসে মৌমাছিকে দরকারী চিঠিপত্রের জবাব বলে দিতে দিতে কেমন যেন উন্মনা হয়ে যেতে লাগলেন বারে বারে। মনে ভাবলেন, আজ কেন হঠাৎ এমন হচ্ছে তাঁর মৌমাছির জন্য, যদিও তাঁর চালচলনের সঙ্গে সামান্য এই মেয়ে কেরানীর রুচির, আদব কায়দার কোন সামঞ্জস্যই নাই। বিলিতি মেয়ে সেক্রেটারির মতন দরকার হ'লে চায়ে, মদে, ভোজনে, সিগারেটে এমনকি মনের কথার মধ্যেও ভাগ বসাতে এ মেয়েটি পারবে না তিনি জানেন। তবু একটু ভীরুতা কাটিয়ে, ভাবতে আরম্ভ করলেন, কেমন করে কোন পথে মৌমাছিকে একটি দিনের জন্যও আকৃষ্ট করা যায়।

"হয়েছে?"

"হ্যাঁ।"

"থাক্ আজ এই পর্যন্ত। সোমবার টাইপ্ করবেন কেমন?"

পেনসিল কামড়ে ঘাড় কাত করে সম্মতি জানালে মিনতি। পনের বছর আগে ঘোষ সাহেব যখন ল' কলেজে পড়তেন তখনকার দিনে বর্ষাকালে তাঁর ভাল লাগতো পেঁয়াজ, মুড়ি আর পেনাল-কোডের উপর তবলা বাজিয়ে গান—সেই যৌবনকে—পনের বছর পিছিয়ে, পুনর্বার চেষ্টা করলেন মনের রঙ দিয়ে আবার সঙ সাজতে।

"মিস্ মিটার, এদ্দিন আমরা এক সঙ্গে কাজ করলাম তবু আপনার নামটা পুরোপুরি জানতে পারলাম না, কেন বলুন তো?"

"কেন স্যার? আপনি তো প্রত্যেক মাসেই মাইনের বিলে সই দিচ্ছেন।"

"তাই নাকি? ঠিক ঠিক।"

"আচ্ছা স্যার যাই এখন?"

শুনুন্ শুনুন্। এই রকম বর্ষায় আগে আমার কি ভাল লাগতো জানেন? মচ্‌মচে মুড়ি

আর বর্ষাসঙ্গীত। রবীন্দ্রনাথের সেই যে, জানেন নিশ্চয়—"এমন দিনে কি তারে বলা যায়?" কেন জানিনে আজও.....ওকি! রবীন্দ্র সঙ্গীত বুঝি আপনার ভাল লাগে না?"

"লাগে।"

"তবে?"

"অফিসে না স্যার।"

"ওঃ না সে কথা বলছি না, মচ্‌মচে মুড়িই কি ছাই এখানে বসে দুজনে খবর কাগজ বিছিয়ে খেতে পারি? কানাঘুসো কথা উঠবে, সবাই অফিসের কি ভাববে বলুন তো আমাদের?"

মৌমাছিকে নির্বাক দেখেই হয়তো সাহস সীমানা ছাড়িয়ে গেল।

"চলুন না দুপুরে কি সত্যিই মুড়ি ভাল লাগবে? কোনো হোটেলে গিয়ে চিংড়ীর কাটলেট্‌ খেয়ে একটা "শো"তে ঢুকে পড়ি যাতে গান টান ভাল আছে—কেমন? চলুন—একটা দিন বইতো নয়?"

"কেন স্যার, আপনি কি এদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন?"

"না না তা কেন হবে। এই আর কি একদিনই—প্রত্যেক দিনই কি এমন সুন্দর বর্ষা হবে?"

নিবিষ্টমনে যখন মৌমাছি প্রত্যাখ্যানের পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিল, এমন সময় কানে এল......

"একটু আড়ষ্টভাব ছাড়ুন দেখি; একটু ডেমোক্রাটিক হোন। এতদিন আলোবাতাসে আছেন, জেল খেটে এলেন, কত স্বার্থত্যাগ, চাকুরী করছেন তবু যেন কি রকম ভাব করেন।"

মৌমাছির কানের ভিতর কে যেন লঙ্কাবাটা পুরে দিচ্ছে মনে হোল। ভাবতে লাগলো, আজ বিকেলে বাড়ি ফিরে অফিসের দেরাজের চাবি ছুঁড়ে ফেলে, বাবাকে বলে দেখবে—বাবা! চাকরী ইস্তফা দিয়ে এসেছি, কাল যেন তুমি তিনদিনের মাইনে আর চাবিটার ব্যবস্থা কোরো। ভাবতে লাগলো—কেমন হয় বাবা হয়তো মুখখানা বিষণ্ণ করে ফেলবে, কালো হয়ে যাবে, অনটনের চিন্তায় তিনি হতবাক হয়ে প্যাটিতে চুপ করে বসে থাকবেন, টাইম্‌পিস্‌ ঘড়িটা টিক্‌ টিক্‌ করবে ময়লা দেয়ালে, আট বছরের পুরোন একখানা ক্যালেণ্ডারের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকবেন। ছোট খুকুটি গলা জড়িয়ে ধরে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করবে—দিদি সত্যি নাকি রে?

না না তা হয় না। সংসারটার সব ভার কেমন করে বুড়ো বাবা মার উপর দিয়ে নিশ্চিন্তে সে দিন কাটাবে। হয় না।

"চুপ করে রইলেন কেন? উঠে পড়ুন?"

"বাড়ি যাবো স্যার।"

"সে তো যাবেনই—এখন তো উঠুন, চলুন, বল্লাম তো একটু ডেমোক্রাটিক হোন—" ঘোষ সাহেব উদাসীনভাবে অনুনয় করতে করতে এক সময় মৌমাছির ডান হাতটা দু' আঙ্গুলে এসরাজের তারের মতন ধরে দেহটাকে সুরের মতন তুলতে যেই চেষ্টা করলেন, মৌমাছি উঠে চেয়ার থেকে তিন পা পিছিয়ে অতি বিনীতভাবে বল্লে—

"স্যার মা আমাকে বড্ড বকেন মাঝে মাঝে আমি মুখরা বলে।"

"তাই নাকি! এতো খুব অন্যায়; আপনার মতন এমন সুন্দর ঠাণ্ডা মেয়েকে মুখরা বলেন? চলুন চলুন, গাড়িতে যেতে যেতে শুনবো সব।"

"হ্যাঁ স্যার চলুন গাড়িতে না হোক অন্তত রাস্তায় নেমে বলবো নইলে লজ্জা পাবো আমি, মনিবের ও অফিসের অসম্মান হতে পারে।

ঘোষ সাহেবের বিলম্ব সহ্য হচ্ছিল না। গাড়ীর দরজা খুলে ঈষৎ সামনে ঝুঁকে ১৮ শত খৃষ্টাব্দের বিলাতি কায়দায় বল্লেন—উঠুন?

"শুনুন, স্যার, বৃষ্টির দিনে ডেমোক্রাটিক হওয়া খুবই ভাল। কিন্তু অফিসে আমিই কি একা সমস্ত পুঁজি নিয়ে পর্বত শিখরে বসে আছি যে তখন থেকে আমাকেই সমতলে নামিয়ে আনতে চান? আমাদের সেকসনেই আরো সাতটি কেরানীবাবু আছেন—ডাকুন না তাঁদের। অর্ধভুক্ত পেটে তাঁদেরও দুটো চিংড়ীর কাটলেট পড়ুক, সিনেমায় নিয়ে চলুন না তাদের।

"আপনি কি বলতে চান মিস মিটার?"

"বলতে চাই, কাটলেট খেলাম না বলে হিংস্র হয়ে কাল যেন আমার চাকরীটা খাবেন না। আর বলতে চাই বড়লোকের সাম্যবাদ জাগে সমাজের ছোটবড়কে এক করবার জন্য নয়। ওটা আপনাদের ছলনা শুধু ঘোল খেয়ে দুধের তৃষ্ণা মিটাতে।...... আজ হয়তো আপনার দুধের সুযোগ হয় নি বলে ঘোলের পাত্র ঠোঁটের সামনে ধরে চোখকে মোহমুগ্ধ করছেন স্যার!"

"মিস মিটার! কার সঙ্গে কথা বলছেন জানেন?"

"জানি! ফুটপাতে ভদ্রবেশধারী একটা ক্ষুধিত জীব, সোমবারে সাড়ে দশটায় আবার আমার অন্নদাতা হয়ে চেয়ারে বসে অধীনের তলব করবেন চিঠি টাইপ করতে নয়তো টেলিফোনের জবাব নেওয়া দেওয়া করতে।"

শেষের কথাগুলো শেষ হতে না হতে পেট্রোল পুড়ে নীল আকাশের মতন ধোঁয়া ফুটপাতে ছড়িয়ে ঘোষ সাহেব বেরিয়ে গেলেন হন্‌ হন্‌ করে নিজের গাড়ী চালিয়ে। মৌমাছিও মুখ ফিরিয়ে দেখলে ঘোষ সাহেবের মোটরখানা রাস্তা দিয়ে ধূর্ত শৃগালের মতন পালিয়ে গেল। তার চোখের কালো তারা দুটি নোনা জলের ভিতর টলমল্‌ করতে লাগলো। বৃষ্টি তখন একঘেয়ে ঝর ঝর করে আবার পড়তে শুরু করেছে। অফিস এলাকায় সাহেব বাড়ীর দোকানের বারান্দার নীচে একটা ষাঁড় দুটো মিলিটারী একটা কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত ভিখারী আর আহত মৌমাছি দাঁড়িয়ে রইল। অবিরাম যানবাহনের স্রোত সামনে দিয়ে চলে যেতে লাগলো রাস্তার কর্দমাক্ত জল পথিকের গায়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। (ক্রমশঃ)

পুস্তক পরিচয়

শিল্পদ্রব্য উৎপাদন প্রণালী—শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—দি এসেন্স এণ্ড নটল সাপ্লাই এজেন্সী, ১৪, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১। বোর্ড বাঁধাই; পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪৪। মূল্য পাঁচ টাকা।

বহু প্রকারের শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের প্রণালী এই পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে। নানা প্রকারের পানীয় জল, গন্ধ দ্রব্যাদি, প্রসাধন সামগ্রী, মোরব্বা, জেলী, লজেন্স প্রভৃতি দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া যাঁহারা অল্পের মধ্যে ব্যবসা চালাইতে চান, এই পুস্তকটি তাঁহাদের বিশেষ কাজে লাগিবে। বইটি আগাগোড়া কাজের কথায় পূর্ণ। লেখকের নিজের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা হইতে বইটি রচিত। কাজেই ইহার প্রত্যেকটি 'ফরমুলা' বিশেষ নির্ভরযোগ্য হইয়াছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। ৯৫।৪৭

কথাশিল্প (গল্প সংগ্রহ)—শ্রীরাধারাণী দেবী ও শ্রীনরেন্দ্র দেব সম্পাদিত; প্রকাশক—এম সি সরকার এণ্ড সন্স্‌ লিঃ, ১৪নং কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা; মূল্য ৩৸৹ টাকা; পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬৮। "বনফুল", শ্রীযুত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শ্রীযুত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত সরোজকুমার রায় চৌধুরী, শ্রীযুত অন্নদাশঙ্কর রায়, শ্রীযুত প্রবোধকুমার সান্যাল শ্রীযুত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুত মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্তা আশাপূর্ণা দেবী, শ্রীযুত গজেন্দ্রকুমার মিত্র, শ্রীযুত সুবোধ বসু ও শ্রীযুক্তা বাণী রায়,—এই চৌদ্দজন লেখক-লেখিকার গল্প এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। প্রত্যেক গল্পের সঙ্গে শিল্পী কর্তৃক অঙ্কিত লেখক ও লেখিকার চিত্র, তৎসহ স্বাক্ষরের প্রতিলিপি এবং সংক্ষিপ্ত জীবনী দেওয়া হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত জীবনীর মধ্যে একটি বিষয় কৌতূহলোদ্দীপক এই যে, লেখক-লেখিকা বিবাহিত কিংবা অবিবাহিত এবং বিবাহিত হইলে কোন্‌ মতে বিবাহিত তাহাও কোন কোন ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে। কোন্‌ লেখক কলিকাতায় বাড়ী তৈয়ারী করিয়াছেন, সে কথাও জানাইয়া পাঠকগণের কৌতূহল চরিতার্থ করা হইয়াছে।

এই গল্প সংগ্রহের অধিকাংশ গল্পই সুলিখিত, সুখপাঠ্য এবং লেখক-লেখিকাগণের প্রায় সকলেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক। এই হিসাবে এই গল্প সংগ্রহখানির বৈশিষ্ট্য অসঙ্কোচে স্বীকার করিতে হয়। গ্রন্থখানির সম্পাদনায় সম্পাদিকা মহাশয়া ও সম্পাদক মহাশয় যথেষ্ট শ্রমস্বীকার করিয়াছেন এবং কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

এই গল্প সংগ্রহখানির অভিনবত্ব এই যে, কোন এক বিশিষ্ট প্রসাধন দ্রব্য-ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে। ভূমিকা হইতে জানা যায়, উদ্যোক্তৃগণ এই গ্রন্থের প্রত্যেক গল্প-লেখক ও লেখিকাকে ১০০৲ টাকা হিসাবে সম্মান দক্ষিণা প্রদান করিয়াছেন এবং শ্রেষ্ঠ গল্প-লেখক অথবা লেখিকাকে পাঠকগণের প্রদত্ত ভোট অনুসারে ১০০০৲ টাকা পুরস্কার দিবারও ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভোটের তারতম্য যদি বেশী না হয়, তবে প্রথম তিনজন লেখক-লেখিকার মধ্যে ১০০০৲ টাকা ভাগ করিয়া ৫০০৲, ৩০০৲ ও ২০০৲ টাকা হিসাবে দেওয়া হইবে। ভূমিকার এক স্থানে বলা হইয়াছেঃ—"শুনে সুখী হবেন, এই গল্পগুলি সংগ্রহ ও প্রকাশ করার মূলে উদ্যোক্তা-দের কোনও লাভজনক ব্যবসায় বুদ্ধি নেই।" কিন্তু গ্রন্থের শেষে প্রত্যেক গল্পের সূত্র অবলম্বন করিয়া উদ্যোক্তাদের প্রসাধন দ্রব্যগুলির বিজ্ঞাপন দেওয়ায়, গল্প-সংগ্রহখানির সাহিত্যিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে এবং গ্রন্থখানিকে কিছুকাল পূর্বে কোন এক গন্ধতৈল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত "—পুরস্কার" গল্প সিরিজের অনুকরণ বলিয়া মনে হইবে।

গল্প-সংগ্রহখানির অঙ্গসজ্জা, মুদ্রণ ও বাঁধাই মনোজ্ঞ ও সুরুচিসম্মত। ২১২।৪৬

(৭)

ামের আদিবাসী সমাজের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

আসামের আদিবাসী সমাজ ভারতের ান্য অংশের আদিবাসী থেকে ভাষায় ও ারায় পৃথক। মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভব এই িবাসী সমাজকে 'কালি প্রজা' (...ack ...) বলা যায় না। এদের দেহের বর্ণ কালো . সুগৌরও নয়; বরং পীতাভ বলা যেতে ের। এদের শরীরের গঠন মজবুত, এরা উসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী; মনের দিক দিয়ে ধারণত আনন্দপ্রবণ ও নির্ভীক।

আসামের ভৌগোলিক শরীরের দিকে কালে দেখতে পাওয়া যায় যে, তার মধ্যে নটি অস্থিরেখার মত তিনটি সুবিস্তৃত গিরি-িগ আছে। (১) ব্রহ্ম সীমান্ত সংলগ্ন গিরি-্রণী — সিংফো (কাচিন), নাগা, কুকি ও লুসাই োষ্ঠীর দ্বারা অধ্যুষিত। (২) ব্রহ্মপুত্র পত্যকা ও সুর্মা উপত্যকার মধ্যবর্তী িরিশ্রেণী—গারো, খাসি ও ডিমাসা (পাহাড়ী াছাড়ী) প্রভৃতি গোষ্ঠীর দ্বারা অধ্যুষিত। ৩) তিব্বত সীমান্ত সংলগ্ন হিমালয়ের দক্ষিণ ালু—মিশ্‌মি, আবোর, মিরি, দাফলা ও আকা ্ভৃতি গোষ্ঠী দ্বারা অধ্যুষিত। এছাড়া (৪) াসাম উপত্যকার নওগাঁ ও শিবসাগর জিলার ধ্যবর্তী অনুচ্চ গিরিশ্রেণী—মিকির গোষ্ঠীর বারা অধ্যুষিত।

আসামের আদিবাসী বা উপজাতির সঙ্গে ্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সম্পর্ক ঊনবিংশ শতাব্দীর শষভাগে আরম্ভ হয়। ভারতের অন্যান্য াদিবাসীদের সঙ্গে তার অনেক আগেই ্রিটিশ-সম্পর্কের সূচনা হয়েছিল। ভারতের অন্যান্য আদিবাসী অঞ্চলের সঙ্গে আসামের াদিবাসী অঞ্চলের আর একটা ঐতিহাসিক িরণামের তারতম্য আছে। ভারতের অন্যান্য াদিবাসী অঞ্চলে বৃটিশ শাসন-ব্যবস্থা প্রবেশ করার যে পথ পেয়েছে, আসামের পার্বত্য উপজাতির সংসারে প্রবেশ করতে সেরকম সুগম পথ পাওয়া সম্ভব হয়নি। এই অঞ্চল যেমন ভৌগোলিক অর্থে দুর্গম, এই অঞ্চলের উপজাতির মনস্তত্ত্বও তেমনি দুর্গম। এমনকি কোন কোন অঞ্চলে এখন পর্যন্ত কোন বৃটিশ বা ভারতীয় সার্ভেয়ারের অথবা মিলিটারী শাসন অফিসারের পদচিহ্ন পড়েনি।

অন্যান্য আদিবাসী অঞ্চলের মত আসামের আদিবাসী অঞ্চলও আংশিক বা সম্পূর্ণ বহির্ভূত অঞ্চলরূপে খাস গভর্নরী শাসনের অধীন। প্রধানত গোষ্ঠীগত লোকাচার ও রীতির অনুশাসনকেই বৃটিশ গভর্নমেণ্টের 'ম্যাজিস্ট্রেট' কানুন হিসাবে গ্রহণ করে এই উপজাতীয় সমাজের ওপর একটা শিথিল শাসন-ব্যবস্থা চালিয়ে যাচ্ছেন।

আসামের বিভিন্ন উপজাতীয় অঞ্চলের ভৌগোলিক, শাসনিক ও সামাজিক পরিচয় সংক্ষেপে বিবৃত করা গেল।

(১) **বলিপাড়া সীমান্ত অঞ্চল :** উত্তরে তিব্বত, পশ্চিমে ভুটান, দক্ষিণে সমতল আসাম, পশ্চিমে সুবনসিরি অঞ্চল। পূর্বে সুবনসিরি অঞ্চল বালিপাড়া অঞ্চলেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল, ১৯৪৩ সালে পৃথক করা হয়। বলিপাড়া পলিটিক্যাল অফিসারের পরিচালনাধীন। এই অঞ্চলের উপজাতীয় গোষ্ঠীর মধ্যে তিব্বতীয় সংস্কৃতি খুবই প্রসার লাভ করেছে। বর্তমান তিব্বতের প্রচলিত তন্ত্রপ্রধান বৌদ্ধধর্মই স্থানীয় উপজাতিদের ধর্ম। পরিচ্ছদেও তিব্বতীয় রীতি। প্রধান উপজাতির নাম মোন্‌বা। তিব্বতীদের প্রাধান্যও খুব বেশী। উত্তর বলিপাড়া সেদিন পর্যন্ত একরকম তিব্বতীদের দখলেই ছিল। মোন্‌বা, খোওয়া, শেরদুক্‌পেন, হ্রুসো প্রভৃতি উপজাতি তিব্বতী সংস্কৃতি গ্রহণ করেছে। সিলুং, লামাই এবং নিসু (দাফলা) ইত্যাদি কয়েকটি উপজাতি গোষ্ঠীগত বিশিষ্ট ধর্ম অনুসরণ করে।

(২) **সুবনসিরি (সুবর্ণশ্রী?) অঞ্চল :** অঞ্চলের অধিকাংশই বিদেশীর পক্ষে অগম্য হয়ে আছে এবং ভেতরের অবস্থা সম্বন্ধে কোন বিস্তৃত তথ্য জানা যায় না। আসামের সঙ্গে এইঅঞ্চলের মত নয়। লখিমপুরের পাহাড়ী অঞ্চলের মানুষের সম্পর্ক নেই বললেই চলে। সুবনসিরি উপজাতি ব্যবসার সম্পর্কে তিব্বতের সঙ্গেই যোগাযোগ রেখেছে। আপাতানি নামে এই অঞ্চলের একটি প্রধান উপজাতির সম্পর্কে কিছু বিবরণ সম্প্রতি জানা গেছে; কারণ তারা সমতলের সঙ্গে একটা সামান্য সম্পর্কের সূত্র গ্রহণ করেছে। লবণ ইত্যাদি কয়েকটি জিনিস সংগ্রহের জন্য আপাতানি সমাজের লোক শীতকালে সমতলে এসে থাকে। আপাতানিদের গ্রামগুলি বৃহৎ ও জনবহুল; একটি গ্রামে হাজারখানেক গৃহও দেখা যায়।

(৩) **সদিয়া সীমান্ত অঞ্চল :** সুবনসিরি নদী থেকে শুরু করে তিরাপ সীমান্ত অঞ্চলের উত্তর সীমা পর্যন্ত এই অঞ্চল বিস্তৃত। এই অঞ্চলের পশ্চিমার্ধে আবর উপজাতির বাস। কিছু কিছু তিব্বতী সংস্কৃতিসম্পন্ন (Tibetanised) মেম্বা উপজাতিও এই অঞ্চলে আছে। আবর অধ্যুষিত অঞ্চলকে বৃটিশ সরকারী ভাষায় সিয়াং উপত্যকা সাব-এজেন্সী আখ্যা দেওয়া হয়েছে (Siang Valley Sub-Agency)। শাসন ব্যাপার জনৈক অ্যাসিস্টেণ্ট পলিটিক্যাল অফিসারের অধীন। আবরদের গ্রামগুলি বৃহৎ; এদের স্বভাব যুদ্ধপ্রিয়। সিয়াং উপত্যকার মধ্যে যাতায়াতের সুবিধা পেয়ে তিব্বতী কর-সংগ্রাহকের (Tax-Collector) দল এ অঞ্চলে পূর্বে খুবই বেশী তৎপর ছিল, বর্তমানে আসাম গভর্নমেণ্ট এই অনধিকার প্রবেশ অনেকখানি রুদ্ধ করতে পেরেছেন।

এই অঞ্চলের পূর্বার্ধে প্রধানত মিশমি উপজাতির বাস। এছাড়া সামান্য সংখ্যক তিব্বতীয় সংস্কৃতিসম্পন্ন মাইয় উপজাতি পূর্বাংশে আছে, আর আছে সমতল এলাকার সামান্য সংখ্যক শান (Shan) উপজাতির লোক, যাদের স্থানীয় ভাষায় বলে হকামপ্‌তি (Hkampti)। মিশমি সমাজ চারদিকে ছড়ানো ছোট ছোট গ্রামে থাকে। দিবাং উপত্যকায় ইদু মিশমি নামক গোষ্ঠীর সামাজিক পরিচয় খুব কমই জানা যায়। এদের মধ্যে গোষ্ঠীবিরোধ খুবই প্রবল, এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অপর গোষ্ঠীর সংঘর্ষ প্রায়ই হয়ে থাকে এবং সেই কারণে সামাজিক ঐক্যও সম্ভব হয়নি। পূর্বাঞ্চলের মিশমিদের সঙ্গে আসামের কিছু যোগাযোগ আছে, কারণ এই অঞ্চলের লোহিত উপত্যকা তিব্বত ও আসামের মধ্যে প্রধান বাণিজ্য পথ। প্রতি বৎসর তিব্বতী সদাগরের শত শত বোঝাবাহী ভৃত্য আসামে আসে ও পণ্যদ্রব্য বহন করে তিব্বতে নিয়ে যায়।

(৪) **লখিমপুর সীমান্ত অঞ্চল :** এই ক্ষুদ্র 'বহির্ভূত' অঞ্চল আসামের অন্যান্য পার্বত্য

এলাকায় ও সমতল এলাকার সমাজ ও সমস্যা একই রকম। লখিমপুর জিলার ডিপুটি কমিশনারই এই সীমান্ত অঞ্চলের শাসনকার্য পরিচালনা করে থাকেন। অধিবাসী প্রধানত কাছাড়ী উপজাতি। এ ছাড়া আছে মিরি উপজাতি।

(৫) তিরাপ সীমান্ত অঞ্চল ঃ বর্মার সীমান্ত সংলগ্ন এই অঞ্চলের একটি বৈশিষ্ট্য হলো—এর ভৌগোলিক পূর্ব সীমানা এখন পর্যন্ত অনির্দিষ্ট হয়েই আছে। বর্তমান ভারত গভর্নমেণ্ট নাগা উপজাতির সমস্ত গোষ্ঠীকে আসামের অধিবাসীরূপে অন্তর্ভুক্ত করে সমস্ত এলাকার একটা সীমা সুস্থির করবার পরিকল্পনা করেছেন, যাতে বর্মার সংগে সীমান্তরেখা নিয়ে কোন অস্পষ্টতা না থাকে। তিরাপ সীমান্ত অঞ্চলের প্রধান তিনটি উপজাতি হলো

(ক) চিংপ কাচিন—এরা বর্মার পার্বত্য অঞ্চল থেকে এসে এখানে বসতি করেছে। ধর্মে বৌদ্ধ এবং পরিচ্ছদ ও সংস্কৃতিতে বর্মার কাচিনদেরই মত।

(খ) ইয়োগালি, লোংচাং ইত্যাদি উপজাতি—এরা নাগা গোষ্ঠীর দূরাপসৃত কয়েকটি শাখা। এরাও কাচিন সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত।

(গ) কোনিয়াক নাগা—নাগা উপজাতি সমাজের মধ্যে এই কোনিয়াক গোষ্ঠীই হলো সব চেয়ে প্রধান ও শক্তিশালী গোষ্ঠী; ৭০ বছর আগে কোনিয়াক নাগাদের অঞ্চল একবার সার্ভে করা হয়েছিল, এদের নিজস্ব একটা সুগঠিত গোষ্ঠীশাসন পদ্ধতি আছে। গোষ্ঠীপতিরা আংগ নামে পরিচিত। আংগের ওপরে আবার বড় আংগ আছেন, তেমনি সহকারী আংগও আছেন। অতীতে আহম রাজাদের সংগে কোনিয়াক নাগা সমাজ অনেক যুদ্ধ ও সন্ধি করেছে। এদের গ্রামগুলি বৃহৎ, গৃহরচনা ও গৃহসজ্জায় এদের শিল্পরুচি আছে।

তিরাপ সীমান্ত অঞ্চল একজন পলিটিক্যাল অফিসারের পরিচালনায় আছে।

(৬) নাগা পাহাড় ঃ নাগা পাহাড়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীর নাগা উপজাতি বাস করে। অঞ্চলের শেষ দক্ষিণে থাডো কুকি গোষ্ঠীর বাস। নাগা সমাজে যদিও গোষ্ঠীপতির নেতৃত্বই স্বীকৃত, কিন্তু তবুও গোষ্ঠীগত শাসন ব্যবস্থায় কিছুটা গণতান্ত্রিকতা আছে। অঞ্চল ডেপুটি কমিশনারের পরিচালনাধীন।

(৭) উত্তর কাছাড় পাহাড় ঃ যদিও এই অঞ্চল ভৌগোলিক ভাবে নাগা পাহাড়েরই অংশ, কিন্তু শাসনব্যবস্থার সুবিধার জন্য এই অঞ্চলকে পৃথকভাবে কাছাড় জিলার ডেপুটি কমিশনারের পরিচালনায় রাখা হয়েছে। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা হলো ঃ

(ক) জেমি নাগা, থাডো কুকি—এরা পাহাড়ের পূর্বাঞ্চলে থাকে।

(খ) ডিমাসা কাছাড়ী—এরা মধ্য অঞ্চলে থাকে। অতীতে আহমদের চাপে কাছাড়ী নামে আখ্যাত গোষ্ঠী আসাম উপত্যকা ছেড়ে কাছাড়ে চলে যায়। কাছাড় পাহাড়ের ডিমাসা কাছাড়ীরা স্থানচ্যুত হয়নি। ডিমাসা কাছাড়ীরা হিন্দুসংস্কৃতিসম্পন্ন এবং ধর্মেও এদের হিন্দুত্ব প্রাপ্তি ঘটেছে।

(গ) পশ্চিমে বিভিন্ন কুকি গোষ্ঠীর বাস, কিছু আরলেং (মিকির) গোষ্ঠীও আছে।

(৭) লুসাই পাহাড় ঃ এই অঞ্চলের অধিবাসীরা সাধারণত লুসাই নামে অভিহিত, যারা উপজাতি হিসাবে কুকি সমাজেরই বিভিন্ন গোষ্ঠী, নিকটবর্তী চিন পাহাড়ের (বর্মার অন্তর্গত) অধিবাসীদের সংগে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। অধিকাংশ খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে। লিখনপঠনক্ষম লোকের সংখ্যাও বেশী। এ অঞ্চলেও গোষ্ঠীপতিদের মারফৎ শাসন ব্যবস্থা চালিত হয়ে থাকে। আসামে যে কোন উপজাতি অঞ্চলের তুলনায় লুসাই পাহাড়ের উপজাতিদের মধ্যে সামাজিক সংহতি সবচেয়ে বেশী।

(৮) গারো পাহাড়—প্রধান অধিবাসী গারো।

(৯) খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড়—প্রধান অধিবাসী খাসি।

(১০) মণিপুর দেশীয় রাজ্য—মণিপুরের জনবহুল উপত্যকায় মণিপুরীদের বাস। চারদিকে উপজাতি অধ্যুষিত পাহাড়ের বৃত্ত। উপত্যকাবাসী মণিপুরীদের সংগে এই অঞ্চলের পাহাড়ীদের কোন সংস্কৃতিগত সাদৃশ্য নেই। সমগ্র মণিপুর রাজের আট ভাগের সাত ভাগ হলো পাহাড়ী অঞ্চল। উপত্যকাবাসী মণিপুরীদের তুলনায় পাহাড়ী উপজাতিরা সংখ্যায় অল্প, অর্থাৎ পাহাড়ীরা সমগ্র রাজ্যের জনসংখ্যায় পাঁচভাগের দুভাগ মাত্র। উপত্যকাবাসী খাস মণিপুরী সমাজ হলো হিন্দু, শিক্ষিত ও উন্নত সমাজ। পাহাড়ী অঞ্চলের লোকেরা নাগা গোষ্ঠী এবং কুকি গোষ্ঠী—যারা হয় খৃষ্টান, নয় গোষ্ঠীগত ধর্মাচারী।

১৯১৮ সালে কুকি বিদ্রোহ হয়। তারপর থেকে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট মণিপুরের পাহাড়ী এলাকায় শাসন দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে মণিপুর দরবারের হাতে ছেড়ে না দিয়ে, দরবারের সংগে সমভাবে পরিচালনার জন্য নিজ প্রতিনিধি (পলিটিক্যাল অফিসার) নিয়োগ করেন।

অতীতকাল থেকেই একটা প্রথা চলে আসছে —বালিপাড়া পাহাড় অঞ্চলের উপজাতিরা সমতলবাসী গ্রামগুলির উপর কতকগুলি ক্ষমতার ও দাবীদাওয়ার অধিকারী ছিল। আহম রাজারাও উপজাতিদের এই অধিকার মেনে নিয়ে ছিলেন। আসাম ব্রিটিশ শাসনভুক্ত হওয়ার পর ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টও উপজাতিদের এই প্রাচীন অধিকার স্বীকার করে নেন এবং এই সমস্ত অধিকারের বিনিময়ে মূল্য হিসাবে বাৎসরিক বৃত্তি দেবার চুক্তি অথবা সন্ধি করেন। এই বৃত্তির নাম 'পোষা'। উপজাতিরা ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে বাৎসরিক 'পোষা' পেয়ে থাকে। ওদিকে তিব্বত গভর্নমেণ্ট আবার বালিপাড়া পাহাড়ী অঞ্চলকে তাঁদের অধিকারভুক্ত এলাকা বলে দাবী করতে থাকেন। এ বিষয়ে ভারত গভর্নমেণ্ট ও তিব্বত গভর্নমেণ্টের মধ্যে মনকষাকষির অনেক ব্যাপার ঘটে গিয়েছে। ১৯১৪ সালে তিব্বত গভর্নমেণ্টের সংগে ব্রিটিশ (ভারত) গভর্নমেণ্টের চুক্তি হয়ে একটা মধ্যবর্তী সীমারেখা পর্যন্ত নির্দিষ্ট হয়, যার নাম ম্যাকম্যাহন লাইন (McMahon Line)। কিন্তু তিব্বতীরা এই লাইনের মর্যাদা প্রায়ই উপেক্ষা করে থাকে এবং ভারত গভর্নমেণ্টের এলাকায় এসে অনধিকার প্রবেশ ও অনধিকার চর্চাও করে। ব্রিটিশ ভারত গভর্নমেণ্ট এবিষয়ে সতর্কতার জন্য এই অঞ্চলের কোন কোন স্থানে রক্ষীবাহিনী বসিয়েছেন।

সুবনসিরি এলাকায় কতগুলি নিসু (দাফ্‌লা) উপজাতির গ্রামও 'পোষা' পেয়ে থাকে। সদিয়া সীমান্ত অঞ্চলে আবর উপজাতিরা পূর্বে প্রায়ই আক্রমণ করতো। আবরদের সায়েস্তা করার জন্য ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট বার বার শাস্তিমূলক অভিযান (Punitive Expedition) করেন। সিয়াং উপত্যকায় গত ত্রিশ বছর ধরে স্থায়ীভাবে আসাম রাইফেল্‌স্‌ বাহিনীকে রাখা হয়েছে। এর দ্বারা যেমন একদিকে আবরদের সংযত করা হয়েছে, অপরদিকে তিব্বতী কর-সংগ্রাহকদের আনাগোনাও বন্ধ করা হয়েছে। লোহিত উপত্যকাতেও তিব্বতীদের অনধিকার প্রবেশ বন্ধ করার জন্য রক্ষীবাহিনী রাখা হয়েছে।

তিব্বত সীমান্ত সংলগ্ন উপজাতীয় অঞ্চলের সমস্যা সম্বন্ধে বলা হলো। এ ছাড়া বর্মা সীমান্ত সংলগ্ন উপজাতীয় অঞ্চলের সমস্যার ইতিহাস কতকটা একই রকমের। বর্মার দিক থেকে অতীতে পর পর আহম, শান ও কাচিনেরা এসে আসামের পূর্বাঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করেছে। শানেরা সতের শতাব্দীতে প্রবেশ করে ও সদিয়া এবং তিরাপ অঞ্চলে আত্মপ্রতিষ্ঠা করে। কাচিনেরা মাত্র গত শতাব্দীর প্রথম ভাগে আসে এবং কতকগুলি ক্ষুদ্র নাগাগোষ্ঠীর ওপর প্রভুত্ব কায়েম করে।

আহম রাজত্বকালে কোনিয়াক নাগারাও কতগুলি বিশেষ দাবী আদায় করতো। নাগারা যেন সমতলের গ্রামগুলির ওপর লুঠ ও আক্রমণ না চালায় তার জন্য আহম রাজারা নাগাদের জন্যে বৃত্তির ব্যবস্থা করে একটা চুক্তি

করেছিলেন। এই বৃত্তির নাম 'খত'। খত প্রথা অনুসারে নাগারা আহম রাজাদের কাছ থেকে সমতল অঞ্চলের নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি লাভ করতো, ঐ জমির চাষী প্রজার কাছ থেকে নাগারা খাজনা আদায় করে নিত। এই প্রাচীন খত প্রথাটা মাত্র কয়েক বৎসর আগে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট বাৎসরিক আর্থিক বৃত্তিতে পরিণত করেছেন।

আসাম ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হবার পরেও আংগামি নাগারা সমতল অঞ্চলে তাদের ঐতিহ্যগত আক্রমণের অভ্যাস বজায় রেখে চলেছিল। ১৮৭৯ সালে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট কোহিমাতে একটি শাসনকেন্দ্র কায়েম করেন। আংগামি নাগারা এই শাসনকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি কমিশনার ও তাঁর কর্মসংগী সকলকেই হত্যা করে। এর পর আংগামি নাগাদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরিত হয় ও ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভাল ক'রেই প্রতিশোধ তুলে নেয়।

আও নাগারা ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের অনুরোধে মুণ্ডশিকার প্রথা বর্জন করেছিল। ব্রিটিশ অনুরক্ত এই আও গোষ্ঠীকে পূর্বদিক থেকে এসে চাং উপজাতি গোষ্ঠী আক্রমণ করে। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট আওদের সুরক্ষার জন্য উদ্যোগ করেন এবং সেই থেকেই মোকোকচুং সাব-ডিভিসনের উৎপত্তি। তারপর থেকে নাগা পাহাড়ের পূর্বাঞ্চলে ধীরে ধীরে ব্রিটিশ শাসন ক্রমবিস্তারিত হয়ে চলেছে।

প্রাচীন কাছাড়ী রাজশক্তি লুপ্ত হয়ে যাবার পর উত্তর কাছাড় পাহাড়ের উপজাতীয়দের ওপর নাগা উপজাতীয়দের আক্রমণ চলতে থাকে। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট উত্তর কাছাড় পাহাড়কে দখলে আনবার পর এই আক্রমণের ইতিহাসও শেষ হয়েছে।

লুসাই পাহাড়ের লুসাইদের পূর্বপুরুষেরা বর্মার চীন পাহাড় থেকে এসেছিল (১৭৫০—১৮৫০)। স্থানীয় উপজাতীয়েরা যদিও আগন্তুক লুসাইদেরই সমগোত্র ছিল, কিন্তু নবাগত লুসাইরা তাদের ওপর প্রভুত্ব করতে থাকে। লুসাইরা ক্ষান্তিহীনভাবে কাছাড়, ত্রিপুরা রাজ্য ও চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের ওপর হানা দিতে থাকে। ১৮৯০—৯৫ সালে লুসাইদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক অভিযান করা হয় এবং সমস্ত লুসাই পাহাড় অঞ্চলটিকে ব্রিটিশ দখলে আনা হয়।

আসামের আদিবাসীদের সম্বন্ধে যেটুকু ঐতিহাসিক ও সামাজিক তথ্যের উল্লেখ করা হলো, তার মধ্যে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। ঘটনা হিসাবে এবং সমস্যা হিসাবে, আসামের আদিবাসীর জীবন ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের আদিবাসীর জীবন থেকে কতকগুলি ব্যাপারে পৃথক্।

(১) আসামের মানচিত্রে অঙ্কিত এবং সরকারীভাবে ঘোষিত সম্পূর্ণ বহির্ভূত বা আংশিক বহির্ভূত এই অঞ্চলগুলিকে ভারতের অন্যান্য বহির্ভূত অঞ্চলের মত বস্তুত সমগ্রভাবে ব্রিটিশ-ভারত গভর্নমেণ্টের বিশেষ শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে আনা হয় নি। অঞ্চলগুলির কোন কোন অংশে বিশেষ শাসন-ব্যবস্থা (অর্থাৎ খাস গভর্নরী শাসন) প্রচলিত হয়েছে, কোন কোন অংশে উপজাতীয়েরা নিজেদের গোষ্ঠীগত স্বাধীনতা নিয়েই রয়েছে। ব্রিটিশ-শাসিত ও গোষ্ঠীগত শাসিত এলাকার মধ্যে কোন সীমারেখা স্থিরীকৃত নেই। এখানে ব্রিটিশ শাসন-নীতি এখনও 'অগ্রসর' (expansion) হওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে।

(২) কাছাড়ী সমাজ ছাড়া আসামের উপজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে হিন্দুত্ব প্রাপ্তির (Hinduisation) আর কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। বরং উত্তর অঞ্চলে তিব্বতীয়ত্ব ও একেবারে পূর্বাঞ্চলে বর্মীত্বের প্রভাব বিস্তারিত হয়েছে দেখা যায়।

(৩) ভারতের অন্যান্য আদিবাসী অঞ্চলে সমতলবাসীকে (অর্থাৎ সাধারণ ভারতীয়) যে কারণেই হোক আদিবাসীর ওপর মহাজনী ও জমিদারী করে বস্তুত শোষক শ্রেণী (Exploiter) হিসাবে পরিণত হতে দেখা গেছে। আসামের আদিবাসী সমাজের উপর সমতলবাসী সাধারণ ভারতীয় ও হিন্দু এতটা অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করতে পারে নি।

(৪) আসামের উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলির মধ্যে পারস্পরিক হানাহানির (Inter-tribal Feuds) ব্যাপার এখনও যেন সামাজিক ঐতিহ্য বা লোকাচারের মত রয়ে গেছে। ভারতের ছোটনাগপুর, মধ্যভারত বা মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি আদিবাসী অঞ্চলে এ রকম গোষ্ঠীগত অন্তর্দ্বন্দ্ব হয় না।

আদিবাসী সমাজে নতুন শ্রেণীর উদ্ভব

পুরাণের আর্য রাজারা মাঝে মাঝে এক একজন প্রতাপশালী কিরাত রাজার সংগে যুদ্ধ করেছেন, এ কাহিনী আমরা শুনেছি। সুতরাং ঐ কিরাত রাজার যে একটা রাজত্বগোছের কিছু ছিল, তা আমরা বিশ্বাস করতে পারি। মহাভারতে অনেক অনার্য রাজত্বের সংবাদ পাওয়া যায়।

ভারতের আদিবাসী সমাজে প্রাচীনকালে 'রাজা' ছিল এবং আজও যে নেই তা নয়। অপেক্ষাকৃত নিকট অতীতের ইতিহাসেও দেখতে পাই, বহু আদিবাসী রাজবংশ (Dynasty) এক একটা পার্বত্য অঞ্চলে সুদীর্ঘকাল ধরে প্রজাশাসন করেছে। ঐশ্বর্যে ও সম্পদে সমতল অঞ্চলের রাজাদের তুলনায় এই আদিবাসী রাজবংশগুলি যদিও সমান নয়, কিন্তু তার জন্য তাদের রাজনৈতিক মর্যাদা তুচ্ছ হয়ে যায় না।

আদিবাসী রাজা, রাজাত্মীয়, গোষ্ঠীপতি সর্দার ইত্যাদি নিয়ে প্রাচীনকালে একটা অভিজাত আদিবাসী সমাজ (Aristocracy) ছিল। আজও সেই অভিজাত সমাজ লুপ্ত হয়নি, বরং বলতে পারা যায় নতুন রূপে গ্রহণ করেছে, যেমন প্রাচীন ভারতীয় অভিজাত সমাজের পুরাতন রূপ বদলে গিয়ে আধুনিক কালে নতুন রূপ গ্রহণ করেছে।

কারা এই আদিবাসী অভিজাত সমাজ? ভীল সর্দার, নাগা সর্দার, গন্দ রাজা, বিনুঝোয়ার ও ভুইয়া জমিদার, কোরকু ভদ্রলোক, সাঁওতাল ও ওরাঁও নেতা, শিক্ষিত মুণ্ডা অফিসার—শিক্ষায় সম্পদে ও রুচিতে এই আদিবাসী অভিজাত সমাজই প্রাচীন অভিজাত সমাজেরই নব কলেবর। কয়েকটি দেশীয় রাজ্যের (Native States) অধিপতি আদিবাসী সমাজের মানুষ। শরণগড়ের গন্দ রাজাকে আপনি আজ দেখতে পাবেন, তিনি প্রাসাদবাসী, আধুনিক আসবাবে ও বিলাসোপকরণে তাঁর প্রাসাদ পরিপূর্ণ। তাঁর প্রকাণ্ড লাইব্রেরীতে বসে আজ আপনি আলডুস হাক্সলি, বার্নাড শ' ও ম্যালিনওস্কির গ্রন্থ পড়তে পারেন। তিনি একজন সুদক্ষ ক্রিকেট ও টেনিস খেলোয়াড়।* শরণগড়ের গন্দ রাজা নিজেকে খাঁটি গন্দ বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেন। তাঁর গৃহ গোষ্ঠীগত পবিত্র টোটেম জীব কচ্ছপের মূর্তি দ্বারা বিচিত্রিত। তাঁর আধুনিক প্রাসাদের মাঝখানে একটি ক্ষুদ্র পর্ণকুটিরে গোষ্ঠী দেবতার পূজা আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

আদিবাসী সমাজের মধ্যে এমন অনেক সম্পন্ন ও শিক্ষিত লোকও আছেন যারা পারিবারিক জীবনে আধুনিক বিলাতী আদব কায়দা গ্রহণ করেছেন। আধুনিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও বিশিষ্ট ও যোগ্য নেতা দেখা যাচ্ছে। আসামের প্রাক্তন মন্ত্রিসভায় কাছাড়ী আদিবাসী শ্রীরূপনাথ ব্রহ্ম মন্ত্রী ছিলেন। মিস্ মেভিস ডান (Miss Mavis Dunn)—শিক্ষিতা খাসিয়া মহিলা, ইনিও আসামের অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। বহু শিক্ষিত খৃষ্টান ওরাঁও ধর্মযাজকের ব্রত গ্রহণ করেছেন। রাঁচীর ওরাঁও আদিবাসী রায়সাহেব বন্দীরাম তাঁর স্বসমাজে একজন প্রতিষ্ঠাবান নেতা।

এ ছাড়া সরকারী চাকুরীতে এবং উচ্চ রাজকর্মচারীর পদেও অনেক আদিবাসী আছেন—ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, আবগারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, মুন্সেফ, সাব-ডেপুটি, পুলিস অফিসার ইত্যাদি। আধুনিক কলেজে শিক্ষিত আদিবাসী অধ্যাপনাও করছেন। রাজনৈতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব করছেন, শিক্ষিত আদিবাসী নেতা। অনেক আদিবাসী স্কুল-টিচারও আছেন।

(ক্রমশ)

*The Aboriginals—Verrier Elwin.

ফুটবল

বাঙলার ফুটবল পরিচালকগণ এই বৎসর কিছুই করিবেন না। মাঝে মাঝে প্রচার করিবেন "আলোচনা হইতেছে" এই পর্যন্ত, ইহাই হইয়াছে বর্তমানে আমাদের দৃঢ় ধারণা। এই ধারণা হয়তো ভ্রান্তিমূলক হইতে পারে, কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতেই সেইরূপ মনে হইতেছে। দীর্ঘ এক মাস পূর্বে এক সভায় মিলিত হইয়া কিছু আলাপ আলোচনা করিয়া আর ইহার মধ্যে কোন সভা আহ্বান করা হইল না কেন? শীঘ্র যে তাঁহারা মিলিত হইয়া কোন কার্যকরী ব্যবস্থা করিবেন তাহারও কোন নিদর্শন দেখা যাইতেছে না। অথচ আশ্চর্য হইতে হয় যখন শুনিতে পাই "লীগ খেলা ও শীল্ড খেলার ব্যবস্থা হইতেছে।" এই সকল কথার যে কোন ভিত্তি আছে তাহাও কেহ বলিতে পারেন না। যাঁহারা ঐ সকল কথা বলিয়া থাকেন তাঁহাদের জোর করিয়া ধরিলে বলেন "আমি শুনিয়াছি।" ফুটবল পরিচালকগণের যদি কিছু করিবার আন্তরিক ইচ্ছাই থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা এইভাবে নীরব থাকিতে পারিতেন না। উৎসাহী ফুটবল খেলোয়াড়দেরই হইয়াছে সর্বাপেক্ষা বিপদ। তাঁহারা কি করিবেন কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছেন না। যে যেখানে পারিতেছেন "ছোটখাট" প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতেছেন। ঐ সকল প্রতিযোগিতা ঠিক সুপরিচালিত নহে। ফলে অনেক খেলোয়াড়কেই খেলা হইতেও ধীরে ধীরে সরিয়া দাঁড়াইতে হইতেছে। একজন বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় অতি দুঃখের সহিত আমাদের জানাইয়াছেন "ফুটবল খেলা ছাড়িয়া দিব। বাঙলা দেশের বর্তমান ফুটবল পরিচালকগণ যতদিন আছেন ততদিন বাঙলার ফুটবল খেলার কোনরূপ উন্নতি অসম্ভব। ইহারা কর্তৃত্ব চান, প্রকৃত উন্নতি চান না। বাঙালীর মাঠে অ-বাঙালী খেলোয়াড়দের যে প্রাধান্য সৃষ্টি হইয়াছে ইহার জন্য পরিচালকগণই দায়ী। ইহারা অনেক সময় জানিয়া শুনিয়াই বাহিরের খেলোয়াড়দের আমদানীতে সাহায্য করিয়াছেন। এই সকল বাহিরের খেলোয়াড় নামেই এমেচার, কাজে পেশেদার। টাকা ছাড়া ইহারা কোন দলে যোগদান করেন না। ইহাদের জন্যই বাঙালী খেলোয়াড়দের মধ্যেও টাকা পয়সা লাভের জঘন্য লোভ জাগিয়াছে। ২০ বৎসর পূর্বেও বাঙলার মাঠে এই সকলের কোন চিহ্নই ছিল না। পরিচালকগণ দৃঢ়তার সহিত সততার পথে যদি চলিতেন তবে এই সকল কোন দিনই খেলার মাঠে স্থান পাইত না। খেলার উন্নতি করিবার যদি কোন খেলোয়াড়ের আন্তরিক ইচ্ছাও থাকে সে এই জঘন্য আবহাওয়ার মধ্যে পড়িয়া পারে না। অনেকে বিরক্ত হইয়াই খেলা ছাড়িয়া দেয়। বাঙলার ফুটবল খেলার স্ট্যাণ্ডার্ড এইজন্যই পড়িয়া গিয়াছে। বিলাতের ন্যায় ফুটবল খেলোয়াড়দের যদি ইউনিয়ন থাকিত তাহা হইলে খেলোয়াড়দের এইরূপ অসহায় অবস্থা অনুভব করিতে হইত না। প্রতিবাদ করিবার ক্ষমতাও থাকিত। এমনকি পরিচালকগণকেও ঠিক পথে চালিত করিতে পারিত। নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি যদি কোন দিন নিয়োগ করা হয়, তাহা হইলে অনেক সত্য কথা প্রকাশ পাইবে।

খেলোয়াড়টির উক্তির সব কিছুই যে সত্য তাহা আমরা বলি না। তবে সর্বকিছু মিথ্যা বলিয়া বলা যায় না। নিরপেক্ষ তদন্ত হইলে সত্যই অনেক কিছু জানিতে পারা যাইবে। তবে এইরূপ তদন্ত কমিটি নিয়োগ করিবে কে? সাধারণ ক্রীড়ামোদীদের এইজন্য আন্দোলন করিতে হইবে। তবে এই বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ যে, খেলোয়াড়দের ইউনিয়ন একটা শীঘ্রই গঠিত হইতেছে। বাঙলার ফুটবল খেলোয়াড় ও খেলার এই শোচনীয় পরিণতি সত্যই খুব পরিতাপের বিষয়। এই অবস্থার পরিবর্তন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সন্তরণ

নিখিল ভারত সন্তরণ প্রতিযোগিতা অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। বিভিন্ন প্রাদেশিক সন্তরণ পরিচালকগণ নিজ নিজ প্রদেশের সাঁতারুদের সুনাম বৃদ্ধির জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। কেবল বাঙলার পরিচালকগণকে কোনরূপ তোড়জোড় করিতে দেখা যাইতেছে না। ইহার প্রকৃত কারণ কি কিছুই জানিতে পারা যায় না। বাঙলা হইতে দল প্রেরিত হইবে কি না তাহাও ইহারা এখনও স্থির করেন নাই। কবে করিবেন তাঁহারাই জানেন। সাঁতারুগণই পড়িয়াছেন মহা সমস্যার মধ্যে। নিয়মিত অনুশীলন করিবেন কি না অথবা করিলে শেষ পর্যন্ত বাঙলার প্রতিনিধি হিসাবে নিখিল ভারত সন্তরণ প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবার সুযোগ পাইবেন কি না, এই সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে পারিতেছেন না। এইরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। বাঙলার পরিচালকগণের উচিত অনতিবিলম্বে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত প্রচার করা।

ব্যাডমিণ্টন

বাঙলা দেশে ব্যাডমিণ্টন খেলার পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী উৎসাহ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত দুই বৎসরের মধ্যে বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েক শত নূতন ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা খুবই সুখের বিষয়। তবে আশ্চর্য হইতে হয়, যখন দেখিতে পাই যে, এই সকল ক্লাবের অধিকাংশই এখনও পর্যন্ত বেঙ্গল ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশনের বাহিরে রহিয়াছেন। ইহারা কেন যে এসোসিয়েশনে যোগ দিতেছেন না অথবা যোগদানে বিরাট বাধাই বা কি আছে তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। এসোসিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত হইবার ফি খুবই সামান্য এবং যাঁহারা এই পরিচালকমণ্ডলীর সভ্য তাঁহারা সকলেই নিঃস্বার্থ কর্মী। ইহারা প্রত্যেকেই বাঙলার সুনাম যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। ইহা ছাড়া ইহারা আর একটি বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন যাহা সকল ক্লাবের পরিচালকগণকে অনেক আর্থিক ব্যয় হইতে অব্যাহতি দিবে। ব্যাডমিণ্টন বল বা "সাটলকক্" বাজার দর অপেক্ষা কম দামে পাইবেন। ইহার পরও কোন দলের এসোসিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া সমর্থন করা চলে না।
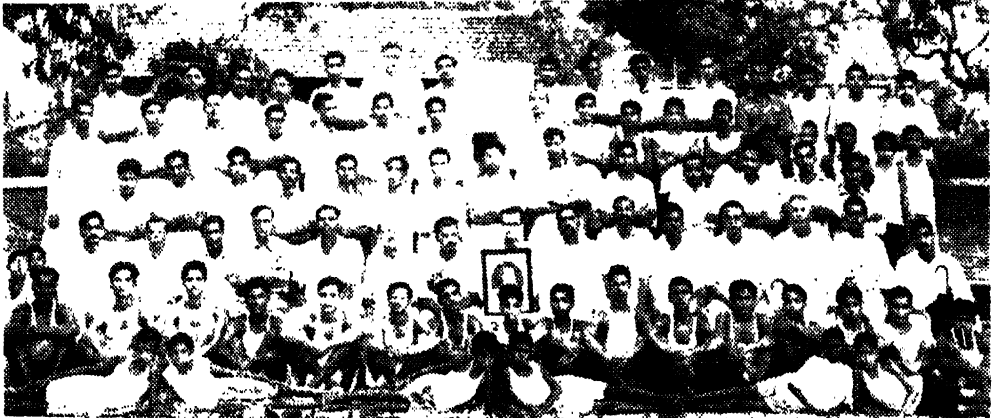
বর্ধমান তরুণ সঙ্ঘের সভ্য ও পরিচালকগণ

দেশী সংবাদ

২রা জুন—গত ১৪ই এপ্রিল রাত্রে ১০০নং হ্যারিসন রোডে অনুষ্ঠিত কতকগুলি ঘটনার অভিযোগ সম্পর্কে কলিকাতার স্পেশ্যাল প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ আর ডেভিসন আই. সি. এস অদ্য ভারতীয় দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারা অনুসারে কলিকাতার সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর মহম্মদ আলি ও গোলাম হোসেনকে বিচারার্থ হাইকোর্টে দায়রায় সোপর্দ করিয়াছেন।

নোয়াখালির সংবাদে প্রকাশ, বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া প্রায় ৫০ জন লোক সম্প্রতি সেনবাগ থানার অন্তর্গত কাজিরখিলের শ্রীযুত চন্দ্রকুমার নাথের গৃহে হানা দেয়। প্রকাশ, দুর্বৃত্তগণ বাড়ির লোকজনকে মারপিট করে এবং নগদ ও অলঙ্কার-পত্রে প্রায় ছয় হাজার টাকার জিনিসপত্র লইয়া সরিয়া পড়ে।

গত রবিবার নয়াদিল্লীর কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এক বিরাট হিন্দু জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকা ও হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রীযুত সুরেশ-চন্দ্র মজুমদার বলেন, মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনানুযায়ী ভারত-বিভাগ হউক বা না হউক, অথবা ভারত হিন্দুস্থান ও পাকিস্থান রাষ্ট্রে পরিণত হউক বা না হউক, আমাদের অবশ্যই স্বতন্ত্র বাঙলা প্রদেশ গঠন করিতে হইবে। বাঙলার হিন্দুদের জাতীয় সত্তা বজায় রাখার জন্য ইহা আজ অপরিহার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

৩রা জুন—ভারতীয়দের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের পরিকল্পনা অদ্য প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে পাঞ্জাব ও বাঙলা বিভাগের ব্যবস্থা রহিয়াছে, বিভাগের পদ্ধতিও উক্ত পরিকল্পনায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। পাঞ্জাব ও বাঙলার আইনসভার মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা-সমূহের প্রতিনিধিগণ ও অবশিষ্টাংশের প্রতিনিধি-গণ দুইভাগে বসিয়া প্রদেশ বিভক্ত করা হইবে কিনা এ বিষয়ে ভোট লইবেন। সাধারণ ভোটাধিক্য-বলে কোন অংশ যদি প্রদেশ বিভাগের পক্ষে মত দেন, তাহা হইলে প্রদেশ বিভাগ হইবে এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থাদি অবলম্বিত হইবে। গণপরিষদে ভারতের কতকাংশের প্রতিনিধি নূতন শাসনতন্ত্র প্রণয়নকার্যে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন, কিন্তু বাঙলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও বেলুচিস্থানের অধিকাংশ প্রতিনিধি গণপরিষদে যোগদান করেন নাই। এই ঘোষণার পর উহারা বর্তমান গণপরিষদে যোগদান করিবেন, না করিলে উহারা একটি নূতন গণপরিষদ গঠন করিবেন। সীমান্ত ও শ্রীহট্টে গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থা হইবে। ভারতের এক বা একাধিক কর্তৃপক্ষের হস্তে ঔপনিবেশিক গভর্ন-মেণ্টের মর্যাদার ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য পার্লামেণ্টের বর্তমান অধিবেশনেই বৃটিশ গভর্ন-মেণ্ট আইন প্রণয়নের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন নয়াদিল্লী হইতে এ বেতার বক্তৃতায় বৃটিশ পরিকল্পনা ঘোষণা করেন।

বৃটিশ সরকারের ঘোষণা সম্পর্কে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বেতার বক্তৃতায় বলেন, "আমরা বৃটিশ গভর্নমেণ্টের এই প্রস্তাবসমূহ গ্রহণ করিব বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছি।"

নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভাপতি মিঃ জিন্না বেতার বক্তৃতায় বলেন যে, একমাত্র লীগ কাউন্সিলই বৃটিশ পরিকল্পনা সম্পর্কে চূড়ান্ত

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে। ৯ই জুন লীগ কাউন্সিলের অধিবেশন আরম্ভ হইবে। লীগ সভাপতি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করিবার জন্য অনুরোধ করেন।

ভারতের সমস্যা সমাধানকল্পে বৃটিশ সরকারের পরিকল্পনা সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুমোদনের জন্য আগামী ১৪ই ও ১৫ই জুন দিল্লীতে নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন আহূত হইয়াছে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সাধারণভাবে বৃটিশ পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন।

৪ঠা জুন—বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন নয়া-দিল্লীতে এক সাংবাদিক বৈঠকে দৃঢ়তার সহিত বলেন, "বৃটিশ ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতেছে।" বর্তমানে স্থির হইয়াছে যে, এ বৎসরই ক্ষমতা হস্তান্তর করা হইবে।"

সীমান্ত প্রদেশের গভর্নমেণ্টের ইস্তাহারে প্রকাশ, গত সোমবার রাত্রে অগ্নিকাণ্ডের ফলে হাজারা জেলার নওয়ানশের শহরের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ভস্মীভূত হইয়াছে।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এক বিবৃতিতে বলেন যে, নূতন বৃটিশ পরিকল্পনায় ভারত ব্যবচ্ছেদের প্রস্তাব করা হইয়াছে। হিন্দুদের তরফ হইতে ইহা সমর্থন করা চলে না।

৫ই জুন—নয়াদিল্লীতে সাতজন ভারতীয় নেতার সহিত বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের এক বৈঠক হয়। প্রকাশ, বৈঠকে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি কমিটি গঠনের বিষয় আলোচিত হয়। বৃটিশ গভর্নমেণ্টের পরিকল্পনা অনুযায়ী দুইটি ডোমিনিয়ন গঠন করিতে যাইয়া যে সকল সমস্যা দেখা দিবে, এই কমিটি সেইগুলির সমাধান করিবেন। কমিটি কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইবে এবং বড়লাট ইহার সভাপতিত্ব করিবেন।

নয়াদিল্লীতে প্রার্থনান্তিক সভায় মহাত্মা গান্ধী এক অভিমত জ্ঞাপন করেন যে, অন্তরের নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত ভারত-বিভাগ রোধের জন্য তিনি আমরণ অনশন অবলম্বন করিতে পারেন না।

নবরঙ্গ এসোসিয়েশন নূতন বাঙলা প্রদেশের সীমা-নির্ধারণের জন্য মিঃ এস এন মোদক আই সি এস-এর (অবসরপ্রাপ্ত) সভাপতিত্বে একটি বেসরকারী সীমা-নির্ধারণ কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন।

৬ই জুন—নয়াদিল্লীতে মহাত্মা গান্ধী ও বড়লাটের মধ্যে আর এক দফা সাক্ষাৎকার হয়। এই সময়ে উভয়ের মধ্যে আড়াই ঘণ্টাকাল আলোচনা চলে। উহার পর মহাত্মা গান্ধী প্রার্থনা সভায় জানান যে, বড়লাট তাঁহাকে বলিয়াছেন,—১৫ই আগস্টের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য ইংরেজেরা প্রস্তুত হইতেছে। মহাত্মা বলেন, আমি বড়লাটকে জানাইয়া দিয়াছি যে, যাহা হইয়াছে তাহার জন্য তাঁহার কোন দোষ নাই। মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস যুক্তভাবে তাঁহাকে যাহা করিতে বলিয়াছে তিনি তাহাই করিয়াছেন।

বাঙলা সরকারের জুডিসিয়েল সেক্রেটারী এবং লিগ্যাল রিমেম্ব্র্যান্সার শ্রীযুত জ্ঞানাঙ্কুর দে, আই সি এস'কে আজ সকালে তাঁহার ২৮নং ক্যামাক স্ট্রীটস্থ বাসভবনের দোতালায় শয়নকক্ষে মৃত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যাপারটি খুন বলিয়া সন্দেহ করা হইতেছে।

বর্তমান সপ্তাহে মাথাপিছু প্রত্যেককে মোট যে পরিমাণ খাদ্য রেশন দেওয়া হয়, বাঙলা গভর্ন-মেণ্ট শীঘ্রই তাহা হইতে আরও এক ছটাক করিয়া রেশন হ্রাস করিতে চাহেন বলিয়া বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে।

কলিকাতার পুলিশ কমিশনার কলিকাতার কয়েকটি থানা এলাকায় ৭ই জুন হইতে ১৩ই জুন পর্যন্ত আর এক সপ্তাহকাল সান্ধ্য আইন বলবৎ রাখার আদেশ জারী করিয়াছেন। তবে সান্ধ্য আইনের মেয়াদ দুই ঘণ্টা হ্রাস করা হইয়াছে। এই সব থানা এলাকায় সন্ধ্যা ৭টার পরিবর্তে প্রত্যহ রাত্রি ৯টা হইতে ভোর ৬টা পর্যন্ত সান্ধ্য আইন বলবৎ থাকিবে।

যুক্তপ্রদেশের আওয়াগড়ের রাজা সাহেব নিখিল ভারত রবীন্দ্র স্মৃতি তহবিলে আরও ৫১ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। তাঁহার পূর্বের দান ২৫ হাজার টাকা লইয়া তিনি মোট ৭৬ হাজার টাকা দান করিলেন। স্মৃতি কমিটি তাঁহার নিকট হইতে সর্বাধিক দান পাইয়াছেন।

ডায়মণ্ডহারবারের ভূতপূর্ব মহকুমা হাকিম শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী উৎকোচ গ্রহণের ষড়যন্ত্র ও উৎকোচ গ্রহণের ৫টি সুনির্দিষ্ট অভিযোগে আলীপুরের প্রথম স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক মোট তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ২,৫৬০ টাকা অর্থদণ্ডে (অন্যথায় আরও ৯ মাস কারাদণ্ড) দণ্ডিত হইয়াছেন।

৭ই জুন—নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, আগামী ২৬শে জুন ভারত ও প্রদেশ বিভাগ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রাদেশিক আইনসভার অভিমত গৃহীত হইবে।

মজুতে চিনির পরিমাণ বিশেষ হ্রাস পাওয়ায় বাঙলা গভর্নমেণ্ট ৯ই জুন হইতে এক সপ্তাহের জন্য কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলের রেশন এলাকার সর্বশ্রেণীর রেশন গ্রহীতাদের চিনি সরবরাহ বন্ধ রাখিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

৮ই জুন—নয়াদিল্লীতে প্রার্থনান্তিক ভাষণে মহাত্মা গান্ধী অখণ্ড সার্বভৌম বাঙলা গঠন প্রচেষ্টার উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, যাহা প্রকাশ্যে ও ন্যায়সঙ্গতভাবে সমর্থন করা যায় না, এমন কোন বিষয় সমর্থন করিবার অপরাধে তিনি কখনও অভিযুক্ত হইতে পারেন না। গান্ধীজী বলেন যে, তিনি একতা পছন্দ করেন, কিন্তু সম্মান ও ন্যায় বিচার পরিত্যাগ করিয়া তিনি একতা চাহেন না।

নয়াদিল্লীতে হিন্দু মহাসভার নিঃ ভাঃ কমিটির বৈঠকে সাম্প্রতিক বৃটিশ ঘোষণা সম্পর্কে আলোচনা হয়। নিঃ ভাঃ কমিটি ভারত বিভাগের পরিকল্পনার বিরোধিতা করিয়া জানাইয়াছেন যে, বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে আনিয়া অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে যুক্ত না করিলে কখনই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, আগামী আগস্ট মাসে ভারতে ডোমিনিয়ন গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেল-এর পদে ইস্তফা দিবেন।

বিদেশী সংবাদ

৩রা জুন—কমন্স সভায় প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী ঘোষণা করেন যে, বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতবর্ষে দুইটি গভর্নমেণ্টকে ডোমিনিয়নের যে মর্যাদা দিতে চাহিয়াছেন তাহা তিনটি দলই (কংগ্রেস, লীগ ও শিখ) গ্রহণ করিয়াছেন। বৃটিশ গভর্নমেণ্টের ভারতবর্ষের জন্য কোন চূড়ান্ত গঠনতন্ত্র প্রণয়নের ইচ্ছা নাই। ভারতীয়েরাই উহা স্থির করিবে। যুক্ত ভারত গঠনকল্পে বিভিন্ন সম্প্রদায় যদি আলোচনা করেন, বৃটিশ গভর্নমেণ্ট তাহাতেও কোন বাধা সৃষ্টি করিবেন না।

৫ই জুন—ভারতবাসীদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে বৃটিশ পরিকল্পনা লইয়া বিদেশী পত্রিকাগুলিতে আলোচনা হইয়াছে। দক্ষিণপন্থী পত্রিকাগুলিতে ঐ পরিকল্পনার অকুণ্ঠ প্রশংসা করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে বামপন্থী পত্রিকাগুলিতে পরিকল্পনার বিরূপ সমালোচনা করা হইয়াছে। আয়ার্ল্যাণ্ডের সংবাদপত্রসমূহে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সততায় সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে।

সরকারের বর্তমান পরিকল্পনানুযায়ী কাজ চলিলে সাত সপ্তাহের মধ্যেই ভারতে দুইটি স্বায়ত্তশাসনশীল উপনিবেশ সরকারের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইবে। ঐ বিষয়ে বর্তমানে এইরূপ কার্যসূচী নির্দিষ্ট হইয়াছে। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই পার্লামেণ্টে প্রয়োজনীয় আইনের খসড়া পেশ করা হইবে এবং সাত দিনের মধ্যে লর্ড ও কমন্স সভায় উহার আলোচনা শেষ হইবে।

৭ই জুন—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত মিঃ আসফ আলি এক বেতার বক্তৃতায় ভারতের পক্ষ হইতে এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, বিশ্বের শান্তি স্থাপন, স্বাধীনতা অর্জন ও উহাকে সমৃদ্ধিশালী করিবার নিমিত্ত যুক্তরাষ্ট্রের সকল প্রচেষ্টা ভারত সমর্থন করিবে।

[illegible] সৌন্দর্য গর্বে না, স্বামীর পরিশ্রমের সার্থকতায়।

নবীন আবার বলিল—মুক্তি, তুমি কী সুন্দর?

মুক্তামালা সন্দেহে স্বামীর মস্তকে হাত দিয়া বলিল—পাগল?

এই দাম্পত্য অভিনয়ের দৃশ্যটি আর কেহ দেখিল না, জানিল না, কেবল আকাশের নক্ষত্ররাজি যাহারা সর্বকালের সর্ব [illegible] নীরব সাক্ষী, বাতায়নের আকাশপথে [illegible] তাহারাই লক্ষ্য [illegible]।

(পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত)

দৃষ্টির দোষ

ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য, ডি টি এম

আগেকার লোকেরা বলে থাকেন যে, এখনকার কালের লোকদের যেমন প্রায়ই চোখ খারাপ হতে আর অল্প বয়স থেকেই চোখের দৃষ্টি কমে যেতে দেখা যায়, আগেকার কালে এমন ছিল না। আমরা হয়তো এই মন্তব্যকে বাজে কথা বলে উড়িয়ে দিই, কিন্তু কথাটা যে যথার্থ তাতে সন্দেহ নেই। এখনকার [illegible]লে আমাদের মধ্যে অন্ধের সংখ্যা আগেকার চেয়ে অনেক বেশী, ক্ষীণদৃষ্টির সংখ্যা আরো বেশী। রাতকাণার সংখ্যাও কিছু কম নয়। ছোটোখাটো বাচ্চাদের প্রায়ই নানা প্রকার চোখের অসুখ হতে দেখা যায়, আর স্কুলে পড়া ছেলে-মেয়েদের মধ্যে অনেকেই চশমা ছাড়া চোখে দেখতেই পায় না। আগেকার কালে এত অল্পবয়স্কদের চশমা পরতে কদাচ দেখা যায়নি।

বর্তমান মানুষের স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তির এমন অভাবনীয় অবনতির কারণ কি, বৈজ্ঞানিকরা তা খুঁজে বের করেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা এ সম্পর্কে অনেক আশার বাণী শুনিয়েছেন। তাঁরা বলেন যে, কয়েকটা নির্দিষ্ট কারণেই চোখের স্বাভাবিক শক্তির এমন অবনতি হয়, আর সেই কারণগুলো দূর করতে পারলে ক্ষীণদৃষ্টি চোখ আবার তার সম্পূর্ণ শক্তি আপনা থেকেই ফিরে পেতে পারে। তাঁরা খুব জোরের সঙ্গেই বলেন যে, অধিকাংশ চোখের দোষের এই হলো একমাত্র প্রতিকার, সেই কারণগুলি দূর করবার ব্যবস্থা করতে পারলে তখন আর ঔষধ প্রয়োগেরও দরকার হয় না। কিংবা চশমা ব্যবহারেরও দরকার হয় না। যারা চোখ খারাপ হওয়াতে চশমা ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছে, তারাও যদি তার কারণ বুঝে ঠিক ঠিক নিয়ম মতো তার প্রতিকার করে চলতে পারে, তাহলে ক্রমে ক্রমে তাদের দৃষ্টিশক্তির এতই উন্নতি হয় যে, অতঃপর আর চশমার সাহায্য নেবার কোনো দরকারই হয় না।

বৈজ্ঞানিক মতে কি কি কারণে আমাদের চোখ খারাপ হয়, সেগুলি সকলেরই বিশেষ করে জেনে রাখা দরকার। তাহলে গোড়া থেকে আমরা এ বিষয়ে সাবধান হতে পারি, আর চোখের দোষ হয়ে পড়েছে দেখলেও হতাশ না হয়ে তার উপযুক্ত প্রতিকার নিজের থেকেই করতে পারি। প্রতিকারের সেই ব্যবস্থাগুলো খুব বেশী কঠিনও নয়, জানা থাকলে তা সকলেই আমরা অনায়াসে পালন করতে পারবো।

চোখ খারাপ হবার প্রথম কারণ হলো উপযুক্ত খাদ্যের অভাব। এমন কতকগুলো বিশেষ রকমের খাদ্য আছে যাতে চোখের দৃষ্টি ভালো থাকে। দৃষ্টিশক্তিকে সতেজ রাখবার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট জিনিস ভিটামিন—এ। এই ভিটামিন—এ যে সকল খাদ্যে প্রচুর পরিমাণে আছে, সেগুলি খেলে চোখের দৃষ্টি কখনো খারাপ হয় না। বার বার পরীক্ষার দ্বারা এ কথা প্রমাণ হয়ে গেছে। কোনো ব্যক্তির দৈনিক খাদ্যের মধ্যে ভিটামিন—এ-র অভাব ঘটলেই কিছুদিন পরে কতকগুলি চোখের দোষের লক্ষণ দেখা দিতে থাকে। তখন তার চোখের জোর কমে যায়, তার দ্বারা রাত্রে মোটেই কিছু দেখাই যায় না, জোর আলোর দিকে চাওয়া যায় না, চোখের পাতার কোলগুলো প্রায়ই লাল হয়ে ফুলে ওঠে, ঘা হতে থাকে, নেত্রগোলকের সজল সরস ভাবটা যেন ক্রমে ক্রমে শুকিয়ে যায়। এই ভিটামিন এ-র সমূহ অভাবে অনেক শিশুই জন্মের মতো অন্ধ হয়ে যায়। বেশী বয়সেও এই ভিটামিনটির অভাব ঘটলে পরিষ্কার দিনের আলোতেও চোখে কেমন ঝাপসা ঝাপসা ঠেকে, অল্প অন্ধকারেও ভালো দেখতে না পেয়ে রাস্তায় ঠোক্কর খেতে হয়, চোখের পাতাগুলো কুঁচকে যায় বার বার করে চোখ রগড়াতে ইচ্ছে হয়। এমন সব লক্ষণ দেখলেই তখন বুঝে নিতে হবে যে, আর কিছুই নয়, খাদ্যে ভিটামিন এ-র অভাব হচ্ছে। গতবারের যুদ্ধের সময় বেলজিয়ামের লোকদের এই সম্বন্ধে খুবই একটা অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে। সেখানকার লোকেরা প্রচুর দুধ খেতো, তাই সকলেরই চোখের দৃষ্টি সাধারণতঃ খুব ভালো ছিল। কিন্তু যখন আক্রমণকারীদের সৈন্যেরা এসে সমস্ত দুধের সরবরাহ বাজেয়াপ্ত করে নিলে তখন থেকে সেখানকার অধিকাংশ লোকই রাতকাণা হয়ে গেল। সে সময় তারা টাটকা শাকসব্জিও খেতে পেতো না। যাদের চোখের দোষ ঘটলো তারা অনেক রকমের চিকিৎসা করালে, কিন্তু কিছুতেই কোনো ফল হলো না। এক বছর পরে যখন তারা আবার দুধ আর টাটকা শাকসব্জি খেতে লাগলো, তখন আপনা থেকেই তাদের সেই চোখের দোষ সেরে গেল।

চোখ ভালো রাখার জন্যে আমাদের প্রত্যহ অন্ততঃ ৫০০০ ইউনিট ভিটামিন এ দরকার। একসের দুধে প্রায় ঐ পরিমাণই ভিটামিন এ থাকে। ৫০০০ ইউনিটের চেয়ে বেশী খেলেও কোনো দোষ নেই, বরং ভালোই। আমেরিকার কোনো কোনো শহরে যে সমস্ত পুলিশের লোক রাতে পাহারা দেয়, তাদের চোখের দৃষ্টিকে প্রখর রাখবার জন্যে প্রত্যহ তাদের বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত ঘন আকারে পঞ্চাশ হাজার ইউনিট করে ভিটামিন এ খেতে দেওয়া হয়। তাতে তাদের দৃষ্টিশক্তি খুবই ভালো থাকে।

ভিটামিন এ সবচেয়ে বেশী পরিমাণে আছে মাছের তেলে, বিশেষতঃ কড্ লিভারের তেলে, আর আজকাল দেখা যাচ্ছে হাঙগরের যকৃতের তেলে। কিন্তু ঐগুলি খাদ্য হিসাবে সাধারণতঃ কেউ খায় না। দুধে যথেষ্ট ভিটামিন—এ থাকে, সেইজন্যে ছেলেপুলেদের চোখের দৃষ্টি ভালো রাখবার জন্যে দুধই সবচেয়ে প্রশস্ত। ক্ষীর সর এবং ননী মাখনেও এই সব ভিটামিন আছে। এ ছাড়া অন্যান্য সকল জাতের জন্তুর দেহের মেটেগুলিতেও প্রচুর ভিটামিন এ আছে। ডিমের হলদেটুকুর মধ্যেও আছে। এ ছাড়া গাজরের রসেও এই ভিটামিন আছে। পালং শাক, শালগমের শাক, সরিষার শাক, বীট শাক আর অন্যান্য কয়েক রকমের শাকসব্জিতেও যথেষ্ট মাত্রায় ভিটামিন এ থাকে। আমেও এই ভিটামিন ভালো পরিমাণেই আছে। সুতরাং যারা দুধ ডিম কিংবা মেটুলি খেতে পারে না, আর যাদের কড্ লিভারের তেলও খাওয়ানো যায় না, [illegible] ভিটামিন এ [illegible] উপায় আছে [illegible] খাই[illegible] [illegible]

নেই। কাঁচা গাজরের ছে'চা রসের সংগে পালং শাক, শালগমের শাক প্রভৃতি ছে'চে তার রস মিশিয়ে কিছু চিনি বা [illegible] দিয়ে সরবতের মতো প্রত্যহ পান করে নিতে পারলে আশাপ্রদ ফল হয়। বেশী পরিমাণে প্রয়োজন নেই, ঐ রস প্রত্যহ আধ পেয়ালা খেতে পারলেই যথেষ্ট। এতেই এক মাসের মধ্যে দৃষ্টিশক্তির অনেক উন্নতি হতে পারে। আমের সময় আম খাওয়াও খুব উপকারী।

চোখ ভালো রাখবার জন্যে আরো এক-প্রকার ভিটামিনের বিশেষ দরকার। তার নাম ভিটামিন বি২ অথবা ভিটামিন জি, অনেকে বলেন রিবোফ্লেভিন। অল্পবয়স্কদের দৃষ্টিশক্তির জন্যে এর তত প্রয়োজন না থাকতে পারে, কিন্তু বয়স্কদের জন্যে খুবেই দরকার। এর অভাবে নরম নেত্রগোলক কঠিন হয়ে যায়, আর এরই অভাবে চোখে ছানি পড়ে। আমাদের দেশে অল্পবয়স্কদের মধ্যেও যে ছানি পড়তে দেখা যায়, তা শুধু এই ভিটামিনের অভাবে। চোখের স্বাভাবিক স্বচ্ছ লেন্স অনেক সময় এই ভিটামিনের অভাবেই অস্বচ্ছতাপ্রাপ্ত হয়, তখন তার দ্বারা আর কোনই কাজ হয় না। যার চোখে ছানি পড়তে আরম্ভ হয়েছে, তাকে সময় থাকতে এই ভিটামিন দিতে পারলে আর সেটা অগ্রসর হয় না, সেই অবস্থাতেই থেমে যায়। এই ভিটামিন খেতে পারলে বৃদ্ধদের দৃষ্টিশক্তিও বহুকাল পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকে। সুবিধার কথা এই যে, ভিটামিন এ যে সকল খাদ্যে আছে, এই ভিটামিনটিও প্রায় সেই সকল খাদ্যেই আছে। সুতরাং ঐ খাদ্যগুলির দ্বারা এক কাজে দুই কাজই হয়। কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত এই ভিটামিন ঔষধ হিসাবেও খাওয়া যায়।

চোখ খারাপ হবার দ্বিতীয় কারণ; উপযুক্ত খাদ্যগুলির অভাবের উপর চোখের অযথা অপব্যবহার। খুব ছেলেবেলা থেকেই ছোট ছোট অক্ষরের বই নিয়ে অনেকক্ষণ বসে একদৃষ্টে চোখ চেয়ে পড়া, মাথা হে'ট করে বইয়ের দিকে অত্যন্ত ঝু'কে বসে পড়া, ধোঁয়া-ওঠা লণ্ঠনের আলোতে চোখ ঠিকরে কষ্ট করে লেখাপড়া বা সেলাই করা বা অন্য কোন সূক্ষ্ম রকমের কাজ করা, এতেই অনেক সময় অল্প বয়স থেকে আমাদের চোখ খারাপ হয়। ভালো ভিটামিন-যুক্ত খাদ্য খেলে হয়তো এতেও এতটা অনিষ্ট হতো না, কিন্তু আজকালকার কোন খাদ্যই তেমন খাঁটি আর পুষ্টিকর নয়। কৃত্রিম খাদ্য খেয়ে, কৃত্রিম পদ্ধতিতে জীবনযাপন করে তার ওপর চোখকে অতিরিক্ত রকমে খাটিয়ে নেবার দরুণই হয়তো এতটা অনিষ্ট হয়ে থাকে। এরই [illegible] কারো বা হয়ে যায় শর্ট-সাইট অর্থাৎ [illegible] হয় লং-সাইট অর্থাৎ লম্বা নজর, আবার কারো বা হয় অ্যাসটিগম্যাটিজম্, অর্থাৎ আঁকাবাঁকা বিকৃত নজর।

কিন্তু যে কারণেই দৃষ্টিশক্তির এই সকল অস্বাভাবিক বিকার ঘটুক, এর অবশ্যই কিছু প্রতিকার আছে। আর সে প্রতিকার যে কেবল চশমা নেওয়ার মধ্যেই পর্যবসিত তাও নয়।

দৃষ্টিশক্তির বিকার কেন হয় ? এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। সাধারণত চোখ দিয়ে দেখবার সময় কাছের জিনিস দেখতে হলে চোখের ভিতরকার যন্ত্রগুলিকে যেভাবে সন্নিবেশিত করে নিতে হয় দূরের জিনিস দেখতে হলে সেই সন্নিবেশের সম্পূর্ণ বদল করতে হয়। নতুবা বিভিন্ন দূরত্বের দৃশ্যবস্তুর প্রতিবিম্বটি ঠিক-ভাবে অক্ষিপটে গিয়ে পড়ে না। কাছের জিনিস দেখার অবস্থা থেকে প্রয়োজন হলে মুহূর্তের মধ্যে দূরের জিনিস দেখার অবস্থায় চোখের যন্ত্রগুলিকে সন্নিবেশিত করে নেবার শক্তিকে বলে অ্যাকোমোডেশন (accommodation) অর্থাৎ দৃষ্টি-সংস্থান। চোখের বিকারে এই শক্তির অপচয় ঘটে। হেলমহোলজ প্রমুখ আগেকার বৈজ্ঞানিকদের মতে মাংসপেশীর সাহায্যে চোখের লেন্সের আকুঞ্চন-বিকুঞ্চনের দ্বারাই এই দৃষ্টি-সংস্থানের কাজ চলে। অর্থাৎ দূরের জিনিসের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করতে হলে লেন্সটিকে সঙ্কুচিত ও পুরু করে নিতে হয়, আর কাছের জিনিসের হলে তাকে প্রসারিত ও পাতলা করে নিতে হয়। কিন্তু আজকালকার বৈজ্ঞানিকরা বলছেন যে, তা ঠিক নয়। স্বয়ং লেন্সের কোন পরিবর্তন না ঘটিয়ে নেত্র-গোলকটির পরিবর্তন ঘটিয়ে ঐ কাজ হয়ে থাকে। অর্থাৎ বর্তুলাকার নেত্র-গোলকটিকে প্রয়োজনমতো কখনো বা লম্বাটে করে নেওয়া হয়, যাতে তার পিছনে অবস্থিত অক্ষিপট লেন্সের কাছ থেকে আরো পিছিয়ে যায়। আবার কখনো বা গোলকটিকে চ্যাপ্টা করে নেওয়া হয়, যাতে অক্ষিপট লেন্সের কাছে প্রয়োজনমতো এগিয়ে আসে। তাঁরা বলেন, এই সকল ক্রিয়া কেবল নেত্রগোলকের উপরকার মাংসপেশীর সাহায্যেই হয়।

নেত্র-গোলককে ঘোরাবার ফেরাবার এবং লম্বা অথবা চ্যাপ্টা করবার জন্যে প্রত্যেক গোলকের গায়ের সঙ্গে আঁটা লাল সরু সিল্কের ফিতের মতো মোট ছয়টি করে মাংসপেশী আছে—দুটি লম্বাভাবে ওপর-নীচে, দুটি দুই পাশে, আর দুটি আড়াআড়ি তির্যকভাবে লাগানো। এই মাংসপেশীর অপর প্রান্তগুলি চোখের কোটরের হাড়ের সঙ্গে সংলগ্ন। কাজে কাজেই এই সকল পেশী যেমনভাবে সঙ্কুচিত হয়, চোখও তেমনিভাবেই ঘোরেফেরে। এখনকার বৈজ্ঞানিকদের মত এই যে, ঐ মাংসপেশীগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলেই চোখের দৃষ্টিও স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবে। আর এই পেশী-গুলি বিগড়ে গেলেই চোখও বিগড়ে যাবে। অর্থাৎ এই পেশীগুলির ক্রিয়া ঠিকভাবে হতে না পারলেই চোখের দৃষ্টি-সংস্থানের ক্রিয়াও ঠিকভাবে হতে পারবে না।

একথা যদি সত্য হয়, তাহলে চোখের দোষ হলে যে চশমা নেওয়া হয়, তাতে দৃষ্টি-শক্তিটা ফিরে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাতে চোখের আসল দোষটার কোন প্রতিকার হয় না। বরং দোষটাকে বেড়ে যাবারই কিছু প্রশ্রয় দেওয়া হয়। কারণ দেখতে পাওয়ার যে অক্ষমতাটুকু ছিল তা চশমার কৃত্রিম লেন্সের দ্বারাই যখন পূরণ হয়ে যায়, তখন মাংসপেশী-গুলিকে দেখতে পাওয়ার জন্যে অতিরিক্ত কোন প্রয়াস করতে হয় না। এই আংশিক নিষ্ক্রিয়তার দরুণ মাংসপেশীগুলি অলস হয়ে পড়ায় চোখের দৃষ্টি আরো ক্ষীণ হয়ে আসে, আর চশমার কাচটিকে উত্তরোত্তর পুরু করতে থাকতে হয়।

চোখের দোষ হয় তার মাংসপেশীর দোষে, আর মাংসপেশীর দোষ হয় তার অব্যবহার ও অপব্যবহারে। কাঁচা বয়সে চোখের অপরিণত অবস্থায় যদি তার দ্বারা এমন কোন কাজ করানো হয়, যাতে কয়েকটা মাত্রই মাংসপেশীর অতিরিক্ত ক্রিয়া হতে থাকে আর বাকি কয়েকটার প্রায় কিছুই হয় না, তাহলে তার দ্বারা নেত্র-গোলকের ওপর একভাবেই অত্যধিক টান পড়তে থাকে ও তার বিপরীতভাবে মোটেই টান পড়ে না। এই একপেশে ভাবে টান পড়াতে গোলকটি আর সম্পূর্ণভাবে গোলাকৃতি থাকে না, কোথাও বা স্থায়ীভাবে লম্বাটে আর কোথাও বা স্থায়ীভাবে চ্যাপ্টা হয়ে যায়। এতেই দৃষ্টি-সংস্থানের ক্রিয়ার বৈগুণ্য ঘটে।

এর প্রতিকারের জন্যে চোখের মাংসপেশী-গুলিকেই সংশোধিত করতে হবে। অর্থাৎ সেগুলিকে মাঝে মাঝে বিশ্রাম দিতে হবে আর মাঝে মাঝে তাদের এমন ব্যায়াম অভ্যাস করাতে হবে, যাতে সমস্তগুলিরই ক্রিয়ার একটা সম্যক সামঞ্জস্য ঘটে। এই সামঞ্জস্যটুকু এনে ফেলতে পারলেই নেত্র-গোলক বিকৃত আকারে পরিবর্তন করে ক্রমে ক্রমে তার আগেকার স্বাভাবিক গোলাকৃতি পুনরায় ফিরে পাবে।

মোটের উপর কথা এই যে, চোখ যার খারাপ হচ্ছে কিম্বা হয়েছে, তাকে স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তিতে ফিরিয়ে আনবার জন্যে কতক-গুলি নির্দিষ্ট রকমের প্রক্রিয়া তাকে শিখিয়ে নিতে হবে আর সেইগুলি অভ্যাস করাতে হবে। সর্বক্ষণ চশমা ব্যবহার করতে থাকলে এটা সম্ভব নয়। মাঝে মাঝে চোখ থেকে চশমা খুলে রাখতে হবে ও খালি চোখে থাকার অসুবিধা-টুকু কিছুক্ষণের জন্য সহ্য করতে হবে। যারা চশমা ছাড়া মোটেই নড়তে পারে না, তাদেরও দৈনিক অন্তত এক ঘণ্টা করে চশমা [illegible]

মৌ-পিঁপড়ে

শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন

অস্ট্রেলিয়া আজব দেশ। সেখানে জন্তুর পেটের তলায় থাকে থলে। বাচ্চা জন্মে মায়ের পেটের তলার সেই থলেতে বসে মায়ের বুকের দুধ খায়। বড় হয়েও চরতে চরতে হঠাৎ কোন কারণে ভয় পেলে বাচ্চাগুলি ছুটে এসে ঢোকে সেই থলের ভিতরে। মা তখন তাদের নিয়ে দূরে ছুটে পালায়। ক্যাঙ্গারু সেই জাতীয় জন্তু। কলকাতার চিড়িয়াখানায় আমরা ক্যাঙ্গারু দেখে থাকবো। কিন্তু ওরা আমাদের দেশের জন্তু নয়। ওদের আদি বাসস্থান অস্ট্রেলিয়া। হংস-চঞ্চুসুন্দরী (Duck-Mote) সেই দেশের অন্য একটি আজব জন্তু। জন্তুটি দেখতে অনেকটা হাঁসের ন্যায়। মুখের ঠোঁট হাঁসেরই মতো, পায়ের নখ হাঁসেরই নখের ন্যায় চামড়াগুলো পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্ন। কিন্তু গায়ে তাদের হাঁসের ন্যায় পালক নেই, জন্তুর ন্যায় ওদের গা লোমে ঢাকা। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় ডিম পাড়ে ওরা হাঁসের মতো কিন্তু বাচ্চারা খায় জন্তুর মতো তাদের মায়ের বুকের দুধ।

অস্ট্রেলিয়ার আর একটি আজব প্রাণী—জন্তুও নয়, পাখীও নয়—এক শ্রেণীর পিঁপড়ে। বিজ্ঞানী দ্বারা প্রদত্ত এদের নাম অতি বিদ্ঘুটে মেলফেনিস ইনফ্লেটস্ (Melphonis Inflatus) সহজ কথায় এদের বলা যেতে পারে মৌ-পিঁপড়ে (Honey ant)। মিষ্টি-ভক্ত সব পিঁপড়েই, কিন্তু এরা শুধু মিষ্টিভক্তই নয়, মৌমাছির ন্যায় এরা ভবিষ্যতের জন্য মধু সঞ্চয় করতেও জানে। কিন্তু মধু সঞ্চয় করবার পদ্ধতি ওদের বড় অদ্ভুত। মৌমাছি মধু সঞ্চয় করে তাদের নিজেদেরই তৈরী চাকে। চাকের মধ্যে ওরা কতগুলি খোপ রাখে শুধু মধু সঞ্চয় করবার জনাই। কিন্তু মৌ-পিঁপড়ে মধু সঞ্চয়ের জন্য চাক তৈরী করতে জানে না। মৌমাছির ন্যায় ওদের মোম তৈরী করবার ক্ষমতা নেই। বাসার ভিতরে ওরা যে-পাত্রে মধু সঞ্চয় করে তা বড় অদ্ভুত। ওদের মধু জমাবার পাত্র ওদের নিজেদেরই পেটটি। একটুখানি তো পিঁপড়ে ওদের পেটটিই বা আর কত বড় তাতে কতটুকুই বা মধু ধরবে! সেইজন্য বাসার ভিতরে কতগুলি পিঁপড়েকে বিশেষভাবে নির্বাচিত করা হয় তাদের পেটে মধু সঞ্চয়েরই জন্য। অন্যসব পিঁপড়েদের সঙ্গে এদের বিশেষ কোন পার্থক্য না থাকলেও ক্রমাগত মধু খাইয়ে খাইয়ে ওদের পেটটিকে এতটা ফাঁপিয়ে তোলে যে হঠাৎ দেখলে মন হয় ওরা পিঁপড়েতো নয়, যেন প্রত্যেকে এক একটি জ্যান্ত জালা। বাসার মধ্যে কে নির্বাচিত হবে, কে ওদের নির্বাচন করে আমাদের মতো ওদের মধ্যেও কি ভোটের প্রথা প্রচলিত আছে, না স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয়েই বাসার কতক পিঁপড়ে এই আত্মদান গ্রহণ করে তা জানবার উপায় নেই। মৌমাছি, পিঁপড়ে ও উঁই প্রভৃতি সমাজবন্ধ পতঙ্গের জীবনযাত্রার প্রণালীর অনেক কিছুই এখনো পর্যন্ত গভীর রহস্যে আবৃত।

বাসার ভিতরে যারা মধু সঞ্চয়ের জন্য জন্তু জালারূপে নির্বাচিত হয় তাদের জীবন একটু আঘাতেই তা ফেটে যেতে পারে। পেটের ভিতরে এই মধুর ভার নিয়ে দিনের পর দিন একই কুঠরীতে একই স্থানে বন্দীর ন্যায় এরা জীবন কাটায়। এমন কি তখন তাদের চলৎশক্তি পর্যন্ত রহিত হয়ে যায়। বাইরের আলো হাওয়ার সঙ্গে ওদের কোন সম্বন্ধ থাকে না। নতুন নতুন খাবারের সন্ধানে তাদের ছুটোছুটি করতে হয় না। যে-মধুতে ওদের পেট দিন-রাত্রি বোঝাই হয়ে আছে তার স্বাদও কি ওরা বড় একটা জানে? ওরা শুধু উদরের মধ্যে এই মধু সঞ্চয়েরই অধিকারী তা পান করবার অধিকার ওদের নেই। ঝড় বৃষ্টি বাদলা বা অতিরিক্ত শীত বা গরমের সময় ফুলের অভাবে
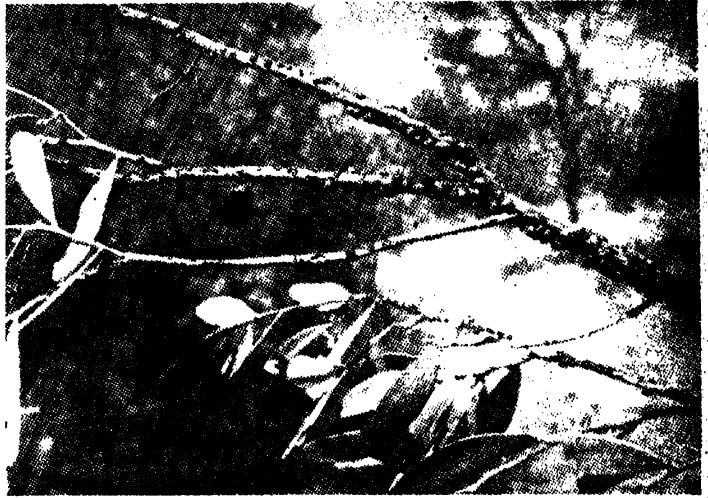
'ওয়ামা' বা মুলগা গাছের ডালে পোকায় জমানো রস বা মধু। অস্ট্রেলিয়ার জঙ্গলী অধিবাসীদের প্রিয় খাদ্য।

যে আত্মদান ভিন্ন আর কিছুই নয় তা বুঝতে পারা যায় বাসার ভিতরে তাদের দিকে একবার একটু তাকিয়ে দেখলেই। বাসার ভিতরে ছয়-সাত ফিট গভীর সুড়ঙ্গের ধারে ধারে আট নয় ইঞ্চি দূরে দূরে নীচের দিকে অন্ধকারময় ছোট ছোট এক একটি কুঠরী। তার মধ্যে দেয়ালের গায়ে মাটি বা শিকড় প্রভৃতি আঁকড়ে সারি সারি পরস্পরের গা-ঘেঁষে ঝুলে আছে এই জ্যান্ত জালাগুলি। পেটগুলি মধুতে টুসটুসে। মধুর ভারে পেটের পাতলা চামড়া এতটা টান হয়ে আছে যে সামান্য যখন মধুর অনটন ঘটে, অন্যান্য খাবারও বড় একটা জোটে না তখন জ্যান্ত জালায় পূর্ণ কুঠরীতে বাসার পিঁপড়েদের আনাগোনা চলে অবিরত। পিঁপড়েরা জ্যান্ত জালাগুলির কাছে এসে তাদের গায়ে দেয় একটু সুড়সুড়ি আর অমনি জালার ভিতর হ'তে উগরিয়ে আসে ফোঁটা ফোঁটা মধু। তাই মুখে নিয়ে তৃপ্তির সঙ্গে একটু একটু করে পান করে পিঁপড়েগুলি। অবশ্য এ মধু এরাই এক সময় একটু একটু করে খাইয়ে ওদের পেটটি বোঝাই করেছিলো। দুর্দিনে দুঃসময়ে ওদের খাইয়েই

হাতের উপরে কয়েকটি মৌ-পিঁপড়ে। মধুর ভারে পেট জালার মতো হয়ে গেছে। অস্ট্রেলিয়ার জঙ্গলী অধিবাসীদের এ মধু অতিশয় প্রিয় খাদ্য।

যেন জ্যান্ত জালাগুলির তৃপ্তি। ওদের তৃপ্তি-দান ভিন্ন জালাগুলির স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব যেন আর কিছুই নেই। নিজ বাসার ও নিজ সমাজের কল্যাণ কামনাই যেন ওদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

এই সব মৌ-পিঁপড়ে সাধারণত বাসা বাঁধে একজাতীয় বাবলা গাছের নীচে। সে দেশে সে বাবলার নাম মুলগা (Mulga) গাছ। মধ্য অস্ট্রেলিয়ার যেসব স্থান শুষ্ক, যেসব স্থানে বৃষ্টিপাত কম সাধারণত সেসব স্থানেই এ সব মুলগা গাছ জন্মে। মৌমাছির ন্যায় মৌ-পিঁপড়ে নানা ফুলে ঘুরে ঘুরে মধু সঞ্চয় করে না, যে মুলগা গাছের নীচে মাটির তলায় ওরা বাসা বাঁধে সেইসব গাছের ফুলের মধুই ওদের খাদ্য। সেই মধুই একটু একটু করে আহরণ করে ওদের নির্বাচিত জ্যান্ত জালাগুলিতে জমায়। সে সময় ওদের কর্মব্যস্ততা খুব বেশি বেড়ে যায় তখন শুধু নিজেদের উদর পূরণই নয়, ফুল শুকিয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবার পূর্বে বাসার জ্যান্ত জালাগুলির উদরও মধুতে ভর্তি করতে হবে। বাসার সব পিঁপড়েই এই কাজের ভার নেয়। জ্যান্ত জালাগুলির যতক্ষণ উদরে মধু ধারণ করবার ক্ষমতা থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ওদের মধু ভক্ষণে কিছুমাত্র অরুচি দেখা যায় না। অবশ্য তাদের পক্ষে এ ঠিক ভক্ষণ নয়। মধু সঞ্চয়ের জন্য ওদের পেটের ভিতরে থাকে একটি বিশেষ থলে। সে থলের সঙ্গে ওদের পাকস্থলীর কোন যোগ নেই। সুতরাং যে মধু ওরা থলের ভিতরে সঞ্চয় করে তার কণামাত্রও ওরা হজম কতে পারে না। এ মধুর সবই ব্যয় হয় দুর্দিনে ও দুঃসময়ে বাসার অন্যান্য পিঁপড়েদের অনাহার হ'তে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য।

কিন্তু সব সময়েই কি ওরা এই সঞ্চিত মধুর সদ্ব্যবহার করতে পারে? ওদের ন্যায় সেদেশের জঙলি অধিবাসীরাও অতিশয় মধু ভক্ত। চিনি বা গুড় প্রভৃতি অন্য কোন মিষ্টির সঙ্গে ওদের বড় একটা সম্বন্ধ নেই। তাই মৌমাছি বা মৌ-পিঁপড়ের বাঁসার খোঁজ পেলে ওদের আর আনন্দের সীমা থাকে না। আনন্দে ওদের দু'চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। নিজেদের অজ্ঞাতসারেই ওদের জিব জলে ভরে যায়। বিলম্বমাত্র না করে ছোটে ওরা বাড়ির দিকে। মধু ধরবার একটি পাত্র ও মাটি খোঁড়বার এক-মুখ ধারালো একটি লাঠি নিয়ে ফিরে আসে মৌ-পিঁপড়ের বাসার কাছে তখনি। মৌচাকের মধুর ন্যায় মৌ-পিঁপড়ের বাসার মধু আহরণ করা ততটা সহজ নয়। অতি সন্তর্পণে হাতের একমুখো ধারালো লাঠিটি দিয়ে মাটি খুঁড়তে হয়। জ্যান্ত জালাগুলির উপর একটু অসাবধানে হাত পড়লেই মধুতে টুসটুসে জালাগুলি মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি দিতে পারে, তাতে জালাগুলি ফেটেও যেতে পারে। তাই বাসার ভিতরে জ্যান্ত জালাগুলির খোঁজ পাওয়া মাত্র ওরা অতি সাবধানে একটি একটি করে পিঁপড়ে পাত্রেতে তুলে নেয়। কিন্তু এই মধুর দিকে ওদের যতই লোভ থাকুক না কেন পল্লীতে ফিরে না আসা পর্যন্ত সেই মধুর সামান্য কণাও ওদের স্বাদ করবার অধিকার নেই। এ ওদের পল্লীর সাধারণের সম্পত্তি। মধুর জালাগুলি সকলের মধ্যে ভাগ হয়ে গেলে যে যার ভাগ খেয়ে নিঃশেষ করে। পিঁপড়ের ক্ষুদ্র মাথাটি দু'আঙুলে ধরে রসে টুসটুসে গোটা পেটটিই দেয় মুখে পুরে। ক্ষুদ্র মাথাটি পাকা ফলের বোঁটার ন্যায় তখন পিঁপড়ের গা হতে খসে আসে। মধুপূর্ণ গোটা পেটটিই তখন ওরা তৃপ্তির সঙ্গে চুষে চুষে খায়। মৌচাকের মধুর ন্যায় মৌ-পিঁপড়ের মধুও তেমনি সুস্বাদু।

মুলগা গাছে অন্য এক জাতীয় মধুও পাওয়া যায়। এক জাতীয় গলপোকা মুলগা গাছের সরু সরু ডালের ছালের নীচে বাসা বাঁধে। ওদের গা হতে ডালের গায়ে আটার ন্যায় যে রস জমে তা খেতে মধুর মতই মিষ্টি। আটার ন্যায় সেই বিন্দু বিন্দু রস ঠিক সময় মত ওরা গাছ হতে তুলে এনে জলে গুলে নেয়। সেই মিষ্টি জল ওরা সরবতের ন্যায় খায় অতিশয় তৃপ্তির সঙ্গে। এ দু'জাতীয় মধুই সে দেশের জঙলী অধিবাসীদের অতিশয় প্রিয় খাদ্য।